মাসিক বসুমতী

পঞ্চম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা)

সম্পাদক ঃ—

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

সূচিপত্র

৫ম বর্ষ] বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

প্রবন্ধের নামানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অর্ঘ্য (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেব	৫৫৪
অর্চনা (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫০৩
অদ্ভুত প্রতিশোধ (গল্প)	শ্রীমনোমোহন রায়	৭৪৩
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য (প্রবন্ধ)	শ্রীহরিহর শেঠ	৩৩৬
অধ্যাত্ম জ্যোতিষ (প্রবন্ধ)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়	৫৯২
অনুশীলন (প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	২০৯
অবতার (কবিতা)	স্বামী অসীমানন্দ	৮২
অবতারের আশ্রয় (প্রবন্ধ)	শ্রীবিহারীলাল সরকার	৪৮
অভিভাষণ (প্রবন্ধ)	মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ	৪৯৮
অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতার স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	২৩৮
অসময়ে (কবিতা)	শ্রীবীরেশচন্দ্র মিশ্র	৬৫৪
আইনগঠনে হিন্দুনরনারী (প্রবন্ধ)	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	৫২
আকিঞ্চন (কবিতা)	শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী	৮১১
আধুনিক স্থাপত্য (প্রবন্ধ)	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮৯
আনমনে (কবিতা)	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১২
আনারস (প্রবন্ধ)	শ্রীআশুতোষ দত্ত	২৩১
আষাঢ়ের প্রথম দিন (কবিতা)	শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩
ইটাজাতির ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০৫
ইটালীতে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	সম্পাদক	৯০২
ইতিহাস (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮১
ইন্দি (প্রবন্ধ)	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে সরকার	২৩৭
ইংলণ্ডের ধনাগম ও তাহার ব্যবহার (প্রবন্ধ)	আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	৯০৬
ঈশ্বরগুপ্তের স্মৃতিস্তম্ভ (প্রবন্ধ)	সম্পাদক	৫৫৫
উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা (প্রবন্ধ)	শ্রীবিধুরঞ্জন দাস	৮২১
উলা (প্রবন্ধ)	শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী	২১১, ৭৯৮
উৎকলিঙ্গ (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৬০২
উড়িষ্যার বঙ্গবিজয় (কবিতা)	শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ	৫৮২
এই ত জীবন (কবিতা)	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৩১
কপালকুণ্ডলা (প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৬১৪
কবির মেয়ে (গল্প)	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	১০৪২
কলিকাতার দাঙ্গা (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৪২৫
কলিকাতায় শিখ মিছিল (ঐ)	সম্পাদক	১৯৮
কলিকাতা ও সহরতলী (প্রবন্ধ)	আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	২৭
কারেন্সী কমিশন (প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৭৫
কালপূর্ণিমা (গল্প)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫১
কালিদাসের পক্ষিতত্ত্বজ্ঞান (প্রবন্ধ)	শ্রীসত্যচরণ লাহা	৭০৫
কিসের পুরস্কার (গল্প)	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৪
কিন্তু (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৮
কুতব মিনার (কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৬৪৬
কৃতজ্ঞতা (গল্প)	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৬৩
কৃষিমূলক শিল্প—চাউলের কল (প্রবন্ধ)	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৯৪০
কৃষ্ণনগর সম্মেলন (মন্তব্য)	সম্পাদক	৩৬৭
কেল্লার মা (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১৭
কোনার্ক (প্রবন্ধ)	ডাক্তার শ্রীচুণিলাল বসু	৮৭২
গণির মা (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	১০২২
গরব (কবিতা)	শ্রীমতী মোহিনী দেবী	৩৪৩
গরু মহিষ (চয়ন)	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪৪
গীতি (কবিতা)	শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী	২০৮
গুরু (কবিতা)	শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৬৩২
গুরুঠাকুর (নক্সা)	শ্রী	৪২৪
গৌরীদান (কবিতা)	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯৩
গ্রীষ্মে (কবিতা)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ	৪৮০
গ্রীষ্মের প্রতাপ (চিত্র)	শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ	৩৭১, ৪৭৪
চপলার লীলা (গল্প)	শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী	১০০৬
চরম অভিশাপ (কবিতা)	শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৫১
চয়ন ...		১২৮, ৩০৬, ৫৩৯, ৭২১, ৮৩৮
চাল (প্রবন্ধ)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯৬
চুপ চুপ [ঐ]	বীরবল	৭২৫
চুপি চুপি সারো পূজা [কবিতা]	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১০৬৯
চুরি [ঐ]	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৬৬
ছলনা [ঐ]	শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ	৬৯৩
ছুটী [গল্প]	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৯৫৬
জমীর মোহ [ঐ]	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	৪৫৩
জয়শ্রী [নাটক]	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৩৮১
জাতিতত্ত্ব প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর (প্রবন্ধ)	শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি	৪৩১
জীর্ণ দীঘি [কবিতা]	শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৬৯২
জীবন-কথা [আত্মজীবনী]	সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	১৮৮, ৩৩১
জীবনযাপন [কবিতা]	শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর	৬০১

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জ্যোছনা রাতের ডাক	[কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৮৪৮
টঙ্কনাথ	[গল্প)	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক	৯৯৯
ডাক্তারের জন্য যোগাড়	[প্রবন্ধ]	ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়	৪৬২
তখন ও এখন	[কবিতা]	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১৫৯
তবু	ঐ	শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল	৮৪২
তরুণের সাধনা	[প্রবন্ধ]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯
তাজমহল	[কবিতা]	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৮৬৪
তুষার স্বপন	ঐ	বারিদবরণ	৭৮৩
তেত্রিশের ত্রাস	ঐ	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১৫৯
ত্রিবেণী	[উপন্যাস]	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৫০৭, ৬৯৪, ৮২৫
দাদাঠাকুরের নিষ্ঠা	[গল্প]	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭৩৭
দেশবন্ধুর স্মৃতিবাসর	[মন্তব্য]	সম্পাদক	৫৫৪
দেশীয় গন্ধশিল্পের ভবিষ্যৎ	[প্রবন্ধ]	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৭৪৬
নটীর পূজা	[নাটক]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
নববর্ষের গান	[কবিতা]	শ্রীগোপাললাল দে	৪৭
নারিকেলছোবড়ার ব্যবসায়	[প্রবন্ধ]	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৬৫০
নিবেদন	[কবিতা]	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস	৯৯৫
পদ্মা	(কবিতা)	শ্রীচন্দ্রবিনোদ দাস	৪৪৫
পল্লীজননী	(কবিতা)	শ্রীনিরঞ্জন সেন গুপ্ত	৬৬০
পাবনায় তাণ্ডবলীলা	(প্রবন্ধ)	সম্পাদক	৪৩৩
পাহাড়িয়া প্রেম	(কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৪৬৩
পুরস্কার	(গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৬০
পুরাণে আয়ুষ্কাল	(প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল	৮৩৭, ৮১৩
পূর্ণিমায়	(কবিতা)	শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী	৭৪২
পোড়ো বাড়ী	(গল্প)	শ্রীমনোমোহন রায়	৯৬৮
প্রজাপতি রাউজ	(প্রবন্ধ)	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	৮০২
প্রতিফলক	(উপন্যাস)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৯৯, ২৯৮, ৬৬৮, ৭৭২
প্রতীক্ষা	(কবিতা)	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৩১০
প্রতীক্ষায়	(ঐ)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৪০
প্রত্যাবর্ত্তন	(কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৬৩০
প্রলয়ের আলো	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	১৯, ২২১, ৪৫৫, ৬১২, ৮৫৭, ৯২১
প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের আদর্শ	(প্রবন্ধ)	শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ	৭৭৮
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পুরুষকার ও স্বাদেশিকতা	(প্রবন্ধ)	শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ	৪৮৫
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব	(প্রবন্ধ)	শ্রীমতী সুধীরা দেবী	৫৯৩
প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবন	(প্রবন্ধ)	শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী	২৭২
প্রেমিক	(কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ সরকার	৬৬৭
ফলের ব্যবসায়	(প্রবন্ধ)	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯২
ফুল	(কবিতা)	শ্রীকুমুদকান্ত স্মৃতিভূষণ	২৬
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ	৮৯
বঙ্গনারীর লাঞ্ছনায়	(কবিতা)	শ্রীঅমলাকুমার রায়চৌধুরী	৯৮
বন্দিজীবন	(কবিতা)	শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী	৭৪

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
বরষায়	(কবিতা)	শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৩২
বলরামের দোল	(প্রবন্ধ)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৮৪৫
বর্ষণান্তে	(কবিতা)	শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত	৫৯১
বর্ষায়	(ঐ)	রোজী	৬৯২
বর্ষায়	(ঐ)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৬৯৩
বর্ষায়	(ঐ)	শ্রী কালিদাস রায়	৫৪৭
বর্ষাগমে	(ঐ)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯২
বর্ষার মাঠে	(ঐ)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৬৯১
বর্ষামঙ্গল	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৬৪৩
বসন্তরাণী	(কবিতা)	কুমারী বীণাপাণি দেবী	৮৬
বাদল	(কবিতা)	শ্রীলীলা মিত্র	৬৯২
বাদল বেলায়	(ঐ)	শ্রীললিত	৬৯০
বায়ুবিলাসিনী	(ঐ)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮২৪
বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	(প্রবন্ধ)	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	৯০
বাঙ্গালার বিপ্লবকাহিনী	(পবন্ধ)	শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই	৪১
বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম	(পবন্ধ)	শ্রীহরিপদ ঘোষাল	৬৪
বাঙ্গালী বীর যুবকদ্বয়	(কবিতা)	শ্রীচন্দ্রনাথ দাস	৪২৮
বিজ্ঞাপনে বিপত্তি	(রঙ্গচিত্র)	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু	১০৩৩
বিবাগীর বিড়ম্বনা	(গল্প)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৬০৬
বিশ্বতীর্থ	(কবিতা)	শরদিন্দু রায়	৮৭৪
বুদ্ধগয়া	(প্রবন্ধ)	শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী	৪৮১
বেদান্তের অনুবন্ধচতুষ্টয়	(প্রবন্ধ)	শ্রীবিহারীলাল সরকার	৪৬৪
বৈদেশিক	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১৭৮, ৩৬৪, ৫৪৫, ৮৪৯
বৌদ্ধযুগে সমাজচিত্রের একাংশ	(প্রবন্ধ)	শ্রীকালীপদ মিত্র	৬৬০
ব্যবস্থা পরিষদে বাধা প্রদান	(প্রবন্ধ)	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৯২
ভাদরে	(কবিতা)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার	৮০৪
ভাবপ্রবাহ	[প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা	৭৮৯
ভারত ও প্রাচীন প্রতীচ্য গ্রন্থ	[প্রবন্ধ]	শ্রীমন্মথনাথ সিংহ	৮১৮
ভারতের কার্পাস-শিল্প	[প্রবন্ধ]	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	২২৮
ভালমন্দ	[কবিতা]	শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	২৯৪
ভুল বোঝা	[গল্প]	শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ	৫৮৩
মরমের বীণা	[কবিতা]	শ্রীমাধবচন্দ্র শিকদার	১০০৫
মরীচিকা	[গল্প]	শ্রীপরিমল গোস্বামী	২১৬
মহত্ব	[কবিতা]	শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য	৪৩০
মহা জোড়	[গল্প]	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৯৩০
মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস	[প্রবন্ধ]	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [কর্ণেল]	১৩, [illegible]২
মহিলার কবি	[কবিতা]	শ্রীমতী লীলা দেবী	২১৫
মাতৃপূজা	[কবিতা]	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৯৯৮
মানবের শ্রেষ্ঠ বন্ধু	[প্রবন্ধ]	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১০৫
মানভঞ্জন	[কবিতা]	কুমারী "বী"	৭৯৪
মাসী	[গল্প]	শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত	১০৫১
মিলন	[কবিতা]	শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী	৪৩[illegible]
মিলন সেতু	[গল্প]	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৮২
মিলনের রাতে	[কবিতা]	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৮৫
মুক্তা সংগ্রহ	[প্রবন্ধ]	শ্রী সরোজনাথ ঘোষ	৪৪৬
মৃত্যু রজনীতে	[কবিতা]	শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২২[illegible]

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
মেজর হীরালাল	[গল্প]	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	১০৪৪
মোহভঙ্গ	[গল্প]	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য	৯৭৭
মোহেন-জো-দড়	[প্রবন্ধ]	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
রসশাস্ত্র	[প্রবন্ধ]	মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	২০৫, ৫৫৭
রহিব দেশের হিন্দু	[কবিতা]	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৩৮
রাষ্ট্রনীতি	[প্রবন্ধ]	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৮৬৫
রুদ্র তাল	[গল্প]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৩৫
রূপকথা	[কাহিনী]	শ্রীঅমৃতলাল বসু	১৪১, ৩৪৪
রূপান্তরিত	[কবিতা]	মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	২৪০
রূপপূজারী	[গল্প]	শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮৭
রূপের মোহ	(উপন্যাস)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৫৬, ২৫৮, ৫৬১, ৭৮৪, ৯৪৬
রেডিও টেলিফোনি	(প্রবন্ধ]	শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৭৫১
লক্ষ্মীর স্বামী	[গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	২৪১
লক্ষ্য	[কবিতা]	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন	৭৫০
লাঞ্ছিতা	[কবিতা]	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২৩
শরতে	[ঐ]	শ্রীমতী বীণাপাণি রায়	৯২০
শারদীয়া	[ঐ]	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৯১৬
শাহুকার এবং সাধু	[ঐ]	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৫
শিল্পমঞ্জরী	[প্রবন্ধ]	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	২৯৬, ৬৩১
শিশাল শণশিল্প	[প্রবন্ধ]	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৪৯৩
শিক্ষার দান	[গল্প]	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১০১৬
শোকাতুরা	[কবিতা]	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৫৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	[কবিতা]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৯৬২
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	[প্রবন্ধ]	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	১
সঙ্গ	[কবিতা]	মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৪৪
সচিত্র য়ুরোপ	[প্রবন্ধ]	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	৬৪৭
সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব	[প্রবন্ধ]	শ্রীপ্রাণনাথ সরকার	৫৯৫
সতীর পতি	[উপন্যাস]	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—	১৪৫,৩৭৫,৫৫৯,৭২৭,৮৯৮
সমালোচনা		সম্পাদক	৮৯৭
সহধর্ম্মিণী	[গল্প]	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল	৯৪০
সংগঠনের সদুপায়	[প্রবন্ধ]	শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৮৭,২৭৭,৪৮৩,৬০০,৮২০
সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বিয়োগান্তের স্থান	[প্রবন্ধ]	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	২৭৯
সার্থকতা	[কবিতা]	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৯৫৯
সার্থক ভিক্ষা	[ঐ]	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৪
সাধকের ঝুলি	[ঐ]	শ্রীবিষয়রঞ্জন দেব	[illegible]
সাধনপথে	[গল্প]	শ্রীমতী সরসীবালা বসু	৯১২
সাময়িক প্রসঙ্গ	[মন্তব্য]	সম্পাদক	১৫২,৩৫২,৫১৫,৭০৫,৮৮৫
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ	(প্রবন্ধ]	সম্পাদক	১৯০
সাহিত্যে শ্রীরাধা	[ঐ]	মহামহোপাধ্যায়— শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	৭৩৩
সাহিত্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম	[প্রবন্ধ]	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৫০৪
সেলিনা	[গল্প]	শ্রীরাজেন্দু দত্ত	৯৯২
স্বরলিপি		শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩২
স্মৃতির দান	[কবিতা]	শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০১
স্মৃতির বোঝা	[গল্প)	শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৪৬৭
হানাবাড়ী	[উপন্যাস]	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (এটর্ণি)—	৮৭, ৩২৩,৬৭২,৮০৬
হামিদের হিম্মৎ	[গল্প]	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৬৫৫,৮৯৪
হিন্দু বিধবা	[কবিতা]	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ভৌমিক	৬০৪
হিমাদ্রি	[ঐ]	শ্রীকালিদাস রায়	[illegible]
হীরক	[প্রবন্ধ]	শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬৪০,৭৩৭
হীরাকাটা	[ঐ]	শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৯

চিত্রসূচী—বৈশাখ

চিত্র	পৃষ্ঠা
ত্রিবর্ণ চিত্র—	
গে হাউণ্ড	১০৬
ড্যালমেশিয়ান	১০৭
নরওয়ের এলকহাউণ্ড	১০৭
প্রভাত	১৬৪
বিগেল বাসেট	১১০
ব্লড হাউণ্ড	১১০
রাসিয়ান উল্‌ফ হাউণ্ড	১০৬
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শিল্পী—শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়	প্রথম
সিক্তবসনা শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	৬০
সেটার	১১১
স্কটিশ ডিয়ার হাউণ্ড	ঐ
একবর্ণ চিত্র -	
অগ্নিদগ্ধ গৃহ	১৯৬
অদ্ভুত	১৭৭
অপূর্ব্ব যন্ত্র	১২৯
অমাত্যপরিবেষ্টিত ভুটানের মহারাজা	৩৬
অবরুদ্ধ জলাশয়ে দাঁড়টানা	১৩২
অশ্বপৃষ্ঠে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর	২০২
আকালী দল	২০১
আদিরস	১৭৩
আলোকধারী পুলিস প্রহরী	১২৯
ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধিমন্দির	৭৯
ইয়াটুং	৩৮
উভচর তরণী	১৩৩
কর্দ্দমনিবারক যন্ত্র	১৩৩
কমল-কুটীর	৭
করুণ	১৭৪
কেশবচন্দ্র সেন	২
গুরুগোবিন্দ সিংহ	১৯৮
গুরুগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার দরবার	২০৪
চন্দ্রকান্ত দেব	১৯২
চাউল পৃথক্ করিবার যন্ত্র	৯৬
চাউল শাদা করিবার যন্ত্র	ঐ
চাউল মাজাই যন্ত্র	৯৭
চীনাদের পারিবারিক সমাধি	১৩৩
চুরুটিকা-বিশেষজ্ঞ	১৩০
ছিন্নবসনা তরুণীগণ	১৭৯

চিত্র	পৃষ্ঠা
জনতার দৃশ্য	২০১
জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের ভগ্ন শিবমন্দির	১৯০
টালোমঠ	৩৭
ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে পাহারা	১৯১
ঢোলক বাজাইয়া পড়া মুখস্থ	১৩৭
তালের সঙ্গে মিল	১৩৯
তুরাজঙ্গ	৪০
দমকল ও দগ্ধ বাড়ী	১৯৪
দগগিজঙ্গ দুর্গ	৩৫
দরোয়ানের শবযাত্রা	১৯৬
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির	৫
দারুনির্ম্মিত লৌহ কীলকহীন সৌধ	১২৮
ধানভানা কল	৯৬
ধান্য সিদ্ধ ও শুষ্ক করিবার যন্ত্র	৯৭
নবীনচন্দ্র সেন	৭৩
নাল—তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রাদি	৭৮
নালএ প্রাপ্ত নরকঙ্কাল	৮০
নালএ প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রসমূহ	৮০
নালের কঙ্কাল	৮২
পল্লীপ্রাণ—ভাস্কর শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক	১৪৮
পল্লীশ্রী— " শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক	৮৪
পাটের গাড়ী দগ্ধ	১৯৪
পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী	১৯৫
প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধার	৭৯
বঙ্কিমচন্দ্র	৭০
বড়বাজারের জুম্মা মসজেদ	১৯০
বড় শিখসঙ্গত-সম্মুখস্থ মিছিল	২০০
বাণবিদ্ধ হিন্দু	১৩১
বিরাট ঘণ্টা	১৩৪
বীভৎস	১৭৫
বীর	১৭৯
বৌবাজারের শিখ মিছিল	২০২
ব্যাঘ্রনিবাস	৩৩
ভয়ানক	১৭৪
ভাসমান শিকারীর পরিচ্ছদ	১২৯
ভুটানী বাসভবন	৩৪
ভুটান মহারাজার অস্ত্রধারী সৈনিক	৩৬
ভুটানের উত্তর-ভাগের অধিবাসী	৩৭
মৎস্যাকৃতি মৃৎপাত্র	৮১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬৫
মার্কিণের জিনিস	১২৮
মাথার খুলি ও কবর	৮১
মাধো ভবনের সম্মুখস্থ মিছিলের দৃশ্য	২০১
মিছিলের দৃশ্য	২০১
মিলন	১৯৭
মিলিটারী পাহারা	১৯১
মৃন্ময় ও তাম্রনির্ম্মিত বাটালী	৮১
মোটর-চালিত বৃহৎ জাহাজ	১৩২
মোটরে গ্রস্ত সাহেব	১৯৯
মোহেন-জো-দড়ো—ইষ্টকনির্ম্মিত নর্দ্দামা	৭৬
ঐ করাত ও অন্যান্য পাত্র	৭৮
ঐ কূপসমন্বিত স্নানাগার	৭৬
ঐ তাম্রনির্ম্মিত রত্নাধার	৭৭
ঐ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি	৭৬
ঐ প্রবাল-কাঠিনির্ম্মিত ছয় নর	৭
মোহেন-জো-দড়ো রাজপথের নর্দ্দমা	৭৫
ঐ সমাধিক্ষেত্রে আবিষ্কৃত অস্থিপূর্ণ মৃৎপাত্র	৭৮
ঐ সুমেরীয় যুগের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বদৃশ্য	৭৭
ঐ সোনার বলয় ও কর্ণাভরণ	৭৮
ঐ স্বর্ণনির্ম্মিত সূচ প্রভৃতি	৭৮
যতীন্দ্রনাথ সুর	১৯২
রুসিয়ার আশ্রয়হীন তরুণসঙ্ঘ	১৫৮
রৌদ্র	১৭৬
লীলার পিয়ানো বাজান	১৩৮
শলাকা-কণ্টকিত মানুষ	১৩১
শান্ত	১৭৭
শিখমিছিল	১৯৯
শিখসঙ্গতে উপাসনা	২০০
শিবাজী	৭২
শীলমোহর	৮২
শোভাযাত্রা	১৯৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ব্রাহ্ম ভক্তগণ	৫
সিংহিজঙ্গ	৩৯
সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	১৮৮
সুধীর লীলার মাথায় বাজনার বোল সাধিতেছে	১৩৬
সোনার খনিতে বিমানপোত	১৩৪
স্বামী বিবেকানন্দ	৩
সূচী-কণ্টকিত-দেহ মানুষ	১৩১
হ্যারিসন রোডে শিখ মিছিল	২০৩

জ্যৈষ্ঠ

ত্রিবর্ণ চিত্র—

চিত্র	পৃষ্ঠা
আসার আশায়—শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	৩৪৫
ওমর খৈয়ম—শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার	২৬৫
শীতাবগুণ্ঠনে—শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন	প্রথম

একবর্ণ চিত্র—

চিত্র	পৃষ্ঠা
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ১ম	৩৩৬
ঐ ২য়	ঐ
ঐ ৩য়	ঐ
ঐ ৪র্থ	৩৩৭
ঐ ৫ম	ঐ
ঐ ৬ষ্ঠ	ঐ
ঐ ৭ম	৩৩৮
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ৮ম	৩৩৮
ঐ ৯ম	ঐ
ঐ ১০ম	ঐ
ঐ ১১শ	৩৩৯
ঐ ১২শ	ঐ
ঐ ১৩শ	ঐ
ঐ ১৪শ	ঐ
ঐ ১৫শ	৩৪০
ঐ ১৬শ	ঐ
ঐ ১৭শ	ঐ
ঐ ১৮শ	ঐ
ঐ ১৯শ	ঐ
ঐ ২০শ	৩৪১
ঐ ২১শ	ঐ
ঐ ২২শ	ঐ
ঐ ২৩শ	৩৪২
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ২৪শ	৩৪২
ঐ ২৫শ	ঐ
ঐ ২৬শ	৩৪৩
ঐ ২৭শ	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দিগের বৈঠকখানা বাটী	২৫২
অপাত্রে দান—শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৭
আবদুল করিম	৩৬৫
আবৃত চক্ষু পীড়িত কুকুর	৩০৯
উলাই চণ্ডীতলার দৃশ্য	২৫৪
উড্ডীয়মান সরীসৃপ	৩১০
এন্‌কোর—অভিনেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯৫
কাচের মধ্য দিয়া দ্বিচক্র যান পরিচালন দৃশ্য	৩০৯

চিত্র পৃষ্ঠা
কি ভয়ানক ছারপোকার অত্যাচার ২৯৫
অভিনেতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ক্রীড়াক্ষেত্রে আরোহিণী ৩১১
গ্রীষ্মের প্রতাপ ১নং চিত্র
শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ৩৭১
ঐ ২নং ৩নং ঐ ৩৭২
ঐ ৪নং ৫নং ঐ ৩৭৩
ঐ ৬নং ৭নং ঐ ৩৭৪
চক্র সাহায্যে ব্যায়াম ৩১২
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের উদ্বোধন সভা ৩৫৫
ঐ ঐ অভ্যন্তর ৩৫৬
জমীদার—শিল্পী শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫১
জর্ম্মাণ তাস ৩১১
জীয়ন্ত ডানা ৩১০
টাউনহলের সভা—বাজপেয়ীর বক্তৃতা ৩৬১
টাউনহলের সভা—প্রতিবাদ সভার জনতা ঐ
টাউনহলের সভা ৩৬২

চিত্র পৃষ্ঠা
তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান ৩০৭
দক্ষিণপাড়ায় বারইয়ারী চাঁদনী ২৫৫
নমনীয় কাচ ৩১২
নারিকেল খোলনির্ম্মিত বীণযন্ত্র ৩০৬
পতিভক্তি ২৫০
পুষ্পসার পূর্ণ অঙ্গুরীয়ক ৩০৭
প্রাচীন ও আধুনিক মিশর ৩১০
বঙ্কের দিকে সুনজরে—
অভিনেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯৫
বাজারের বারইয়ারী চাঁদনী ২৫৫
বালুকার মানচিত্র ৩১১
বৃক্ষশীর্ষস্থ গৃহ ৩০৬
ব্যাঃ, ব্যাঃ ! তোফা—অভিনেতা
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮১
ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত ২৫৩
ভূপালের নবীন নবাব ৩০৭
ভূপালের বেগম সাহেবা ৩০৮

চিত্র পৃষ্ঠা
মিলন ৩১৮
মুস্তৌফী বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের অর্দ্ধাংশ ২৫২
মুস্তৌফী বাটীর সদরদরজার ভগ্নাবশেষ ২৫৪
রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা ৩৬০
রাজরাজেশ্বরী প্রতিমাপুঞ্জ ৩৬৩
রেশমের গোলাপফুলনির্ম্মিত মনুমেণ্ট ৩০৯
লরীর উপর রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা ৩৬১
শব্দ সাহায্যে চরিত্র পরীক্ষা ৩০৮
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮১
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ৩৬৯
" বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ঐ
" সুধীরকুমার ঘোষ ৩৬৬
সেমিজ কাটিবার ১নং চিত্র ২৯৬
ঐ ২ নং চিত্র ঐ
সংকীর্ত্তন—শিল্পী শ্রীসুধীর খাস্তগীর ২৯৭
স্বরাজের পথে
শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৬

আষাঢ়

চিত্র পৃষ্ঠা

ত্রিবর্ণ চিত্র—

আলোকের পথে শিল্পী—জি, সি, দে ৫১৩
পূজার্থিনী শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ প্রথম
শিবদুর্গা 'প্রাচীন চিত্র হইতে ৪৭৩

একবর্ণ চিত্র—

আওয়াজের ফটোগ্রাফ ৫৩৯
আধুনিক বাসভবন ৪৯০
আরব ডুবুরী ৪৫৩
আরব ডুবুরীর নিশ্বাস গ্রহণ ৪৪৮
ঈশ্বর গুপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ ৫৫৬
ঊর্দ্ধবাহু বৃন্দাবন ৫২৬
কর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ধারক যন্ত্রে হীরক ৪৩০
কারখানার আপিস ভবন ৪৯১
কুঁড়ের গরম ৪৩৬
কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দির ৫২৩
গিন্নীপনার গরম ৪৩৪
গুণ্ডারাম গাঁটকাটিয়া ৫৩০
ঘূর্ণ্যমান আধার ৫৩৯
ঘূর্ণ্যমান চক্রযন্ত্রে হীরক ছাঁটা ৪২৯
চারি জাতীয় ডুবুরী ৪৪৭
চিত্তরঞ্জন দাশ ৫২১
চীন সম্রাট ৫৪৪

চিত্র পৃষ্ঠা
চীন সম্রাটমহিষী ৫৪৩
ছাগল ভেড়ার লড়াই ৫৩৮
তন্তু নিষ্কাশনের কল ৪৯৬
তামিল ডুবুরী ৪৪৯
দুই মুখ ৫০৬
নিমাইচরণ বসু ৫২১
নূতন ধরণের আপিস বাটী ৪৯১
নেশার গরম ৪৩৫
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৪১৪
পালযোগে নৌযাত্রা ৪৪৭
প্রতিযোগিতায় নৌকাসমূহ ৪৫০
প্রস্তরমূর্ত্তি ৫৪০
ফাঁস গলায় বৃন্দাবন ৫২৮
বাষ্পীয় পোত সাহায্যে নৌকাশ্রেণী ৪৪৮
বিদ্যার গরম ৪৩৫
বিরাট গ্যারাজ ৪৯০
বৃন্দাবন ও হেমাঙ্গিনী ৫৩১
বৃন্দাবন ও ক্ষেন্তি ঘোষাণী ৫৩৬
বৃহত্তম অট্টালিকা ৫৪২
বোঝা মাথায় ডুবুরী ৪৪৯
বংশপরিচয়জ্ঞাপক স্তম্ভ ৫৪২
ভিলাবাড়ী ৪৮৯

চিত্র পৃষ্ঠা
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ৪৯৮
মুক্তার ক্রেতা ৪৫২
মুক্তা-বণিক ৪৫১
মুক্তার সন্ধান ৪৫০
মুক্তাছিদ্রকারী শিল্পী ৪৫৪
মোহরাঙ্কিত মুক্তার থলি ৪৫৩
ম্যানার উপসাগরে শুক্তিসংগ্রহ ৪৫১
যন্ত্রসাহায্যে হীরকের ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি ৪৩০
রাজা প্রমোদানাথ রায় ৫২১
রূপের গরম ৪৩৪
শতবর্ষবয়স্ক কুম্ভীর ৫৪০
শিরস্ত্রাণধারিণী নারী ৫৪১
শীতনিবারক পরিচ্ছদ ৫৪১
শুক্তি ধৌত করিবার ব্যবস্থা ৪৫২
শুক্তিসংগ্রহকারী নৌকা ৪৪৬
শ্রীমান্ সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৪৪
স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উৎসব ৫৫৫
হস্তপরিচালিত কল ৪৯৬
হাকিমী গরম ৪৩৬
হীরক কাটিয়া ছাঁটিয়া চিহ্নিত
করা হইতেছে ৪২৯
হীরকের দ্বারা হীরক কর্ত্তন ৪৩০

শ্রাবণ

চিত্র পৃষ্ঠা

ত্রিবর্ণ চিত্র—

তিমিরপথের যাত্রী—
শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার ৬৯৬

চিত্র পৃষ্ঠা
দময়ন্তী শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬২৪
প্রভাতের তাজ—
শিল্পী—এস্, জে, ঠাকুর সিং প্রথম

চিত্র পৃষ্ঠা

একবর্ণ চিত্র—

অভিনব মোটর বোট ৭২৪
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ৭১৫

চিত্র	পৃষ্ঠা
আমার চক্ষু স্থির	৬৮৯
আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের প্লাবন দৃশ্য	৭১৮
ইটাগণের বাসভূমি	৬১০
ইটা পুরুষের ফলাহরণ	৬০৬
'এক মিন্‌ষে বটেক্‌ গো !'	৬৮০
'ওঃ ক্যালকাটা !'	৭০৪
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নৌকাবিহার	৭১৭
কবিরাজ যামিনীভূষণ	৭১৫
কলিকাতার জিনিস	৭১৭
কলিকাতা—রাজপথে বাচখেলা	৭১৯
কলেজষ্ট্রীট প্লাবনদৃশ্য	৭১৮
কালীতলার বিচিত্র দৃশ্য	৭১৮
'ফিক্‌ ফিক্‌'	৭০১
'কেমন করে জান্‌ব গলায় ছুরী দেবে না'	৬৮৭
'গো—ল !'	৭০৪
'চল দাদা আমার বাড়ী'	৬৮৫
চক্ষুচিকিৎসার নূতন যন্ত্র	৭২[illegible]
চীনের প্রাচীন ঘণ্টা	৭২১
ছোবড়া-পেষণ যন্ত্র	৬৫১
জলপ্লাবিত রাজপথে মনুষ্যদেহ	৭১৮
জলপ্লাবনে অশ্বযান	৭১৯
জলাভাব	৭২০
জুরিচ মুখোস মিছিল	৬৪৮
ঝরণাপাথে হটা রমণী	৬০৬
টিরোলীদের মুখোস নাচ	৬৪৮

চিত্র	পৃষ্ঠা
ডাক্তার মুঞ্জে	৭১৩
তন্তুনিষ্কাষণ যন্ত্র	৬৫১
তন্ময়	৫৭১
তাম্রনির্ম্মিত সঙ্গীতাগার	৭২১
দড়ি প্রস্তুতের যন্ত্র	৬৫৩
'দিলে বুঝি গোল !'	৭০৩
ধনুর্ব্বাণ হস্তে ইটা	৬০৯
নূতন প্রণালীর বন্দুক	৭২৩
পথে শোভাযাত্রা	৭১৪
পণ্ডিত মদনমোহন	৭১১
প্রাচীন যুগের অষ্ট্রীচ ডিম্বের খোলা	৭২৪
ফরাসী মুখোস মিছিল	৬৪৭
ঐ ঐ	ঐ
বনপ্রদেশের এক পার্শ্ব	৬০৭
'বল্‌বে না কোথায় যাচ্ছ'	৬৭৭
বসন্ত-রথ	৬৪৯
বহিষ্কার	৬৭৫
'বাগ্‌ আপ্‌ মোহনবাগান !'	৭০৩
বাজেল মুখোস মিছিল	৬৪৮
ভাবের অভিব্যক্তি—২০ বৎসরে	৭০১
" ৩৫ "	ঐ
" ৪৫ "	৭০২
" ৫৫ "	ঐ
" ৭৫ "	ঐ
" ৯৫ "	ঐ

চিত্র	পৃষ্ঠা
ভার বহনের নূতন উপায়	৭২৩
মরুভূমির মাছ	৬৪৫
মানুষবাহী ঘুড়ি	৭২৪
মুখোস মিছিলের আর এক দৃশ্য	৬৪৯
মুক্তা ও প্লাটিনম্‌ নির্ম্মিত দুর্গ	৭২১
'মোহনবাগান গোল খেলে !'	৭০৩
যন্ত্রসাহায্যে চরিত্র বিচার	৭২২
রাজপথে তরঙ্গলীলা	৭১৭
লর্ড আরউইন	৭০৬
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	৫৯৯
সত্যেন্দ্রনাথ সেন	৭১৬
সঙ্কর গরু	৬৩৪
সঙ্কর মহিষ	৬৪৪
সভ্য ও বন্য ইটা	৬০৮
সান্ধ্যপ্রদীপ	৬১১
সুইজারল্যাণ্ডে মুখোস-মিছিল	৬৪৮
সূতাকাটার যন্ত্র	৬৫২
সেমিজ কাটা ১ নং চিত্র	৬৩১
ঐ ২ নং "	৬৩১
ঐ ৩ নং "	৬৩২
হাওড়া ষ্টেশনে সংবর্দ্ধনা	৭১৩
হীরক ১ নং চিত্র	৬৪০
ঐ ২ নং "	৬৪১
ঐ ৩ নং "	৬৪৩
ঐ ৪ নং "	ঐ
ঐ ৫ নং "	ঐ

ভাদ্র

ত্রিবর্ণ চিত্র—

চিত্র—	পৃষ্ঠা
কি সে যে মরম কথা	৮০৮
নগরের নটী চলে অভিসারে শিল্পী—শ্রীননীগোপাল দাসগুপ্ত	প্রথম
মাতৃমূর্ত্তি—শিল্পী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা	৮৬৪

একবর্ণ চিত্র—

চিত্র	পৃষ্ঠা
অগ্নিনির্ব্বাপক জাহাজ	৮৪০
অন্ধের পুস্তক পাঠ	ঐ
অরুণ স্তম্ভ	৮৭৩
অভিনব উপায়ে দস্যুদলন	৮৩৯
আপিস যাত্রা	৮৮৩
উভচর যান	৮৩৯
উলা ডাক্তারখানা	৮০০
উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমীন রিহাণী	৮৫৩
কলোসিয়মে রবীন্দ্রনাথ	৯০৩
কয়েকটি স্তম্ভ	৭৯৮
কুঁপোকাৎ	৮৮২
কোনার্ক মন্দির	৮৭২
গ্রাণ্ড হোটেলে রবীন্দ্রনাথ	৯০২
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া চালান	৮৩৯
চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব	৭৭৭
চীনের ঘুড়ী	৮৪২
ছাতার বিশ্বাসঘাতকতা	৮৮৩
ছিন্নবস্ত্ররচিত চিত্র	৮৩৮
জেনারেল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ	৮৫২
থিয়েটার কুইরিণো—রবীন্দ্রনাথ	৯০৪
নকল জাহাজ	৮৫৮
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	৮৯১
পর্ব্বতগাত্রে পুষ্পিত চোহরগুল্ম	৭৪৭
প্রকাশ্য রাজপথে বিচার	৮৫০
প্রজাপতি ব্রাউজ ১নং চিত্র	৮০২
ঐ ২নং ঐ	৮০৩
ঐ ৩নং ঐ	ঐ
ঐ ৪নং ঐ	ঐ
ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ	৯০৩
বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলন	৭৪৫
বনাকীর্ণ অট্টালিকা	৭৯৮
বন্দিনী চীনা যুবতী	৮৫১
বাবুর বাহার	৮৮৪
বিচিত্র বল্মীকস্তূপ	৮৪১
বিংশ শতাব্দীর যাওবৃষ্টি	৭৮০
বৃষ্টির বর্ম্ম	৮৮৪
মিঃ কেলকার	৮৯২
মিঃ জয়াকর	৮৯১
রেডিও টেলিফোনী ১নং চিত্র	৭৬১
" ২নং "	৭৬২
" ৩নং "	ঐ
" ৪নং "	ঐ
" ৫নং "	৭৬৩
" ৬নং "	৭৬৪
" ৭নং "	ঐ
" ৮নং "	ঐ
রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ	৯০৪
লজ্জা রক্ষে	৮৮৪
ল্যাবেণ্ডার ক্ষেত্র	৭৪৮
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তোফী	৭৯৯
সুলতান ইবন সাউদ	৮৫৪
সোজা দেখা ও উল্টা দেখা	৯০১
হীরক চিত্র ৬নং	৭৬৬
" ৭নং	ঐ
" ৮নং	৭৬৭
" ৯নং	৭৭০
হোকাকের বাজার	৮৫৫

আশ্বিন

চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
ত্রিবর্ণ চিত্র—		উদ্বন্ধন—শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৬৮	পারস্যের ক্রাউন প্রিন্স—শাপুর রেজাখাঁ	১০৬৩
ছায়া—শিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	প্রথম	গ্রেপ্তার !	১০৪০	প্রসাধন [মৃন্ময় মূর্ত্তি]	
তন্ময় " শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মন	১০০৪	দুগ্ধবান ছাগ	৯৯১	ভাস্কর শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক	১০১৩
নর্ত্তকী " শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১০৪৪	দৃষ্টি আকর্ষণ	১০৩৫	প্লাকার্ডের উপর প্লাকার্ড	১০৩৪
বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো !! ঐ	৯৪৮	দোকান ফাঁক	১০৩৮	প্লাকার্ড লাগাও	১০৩৩
একবর্ণ চিত্র—		দোকানে বিষম ভীড়	১০৩৭	বিনামূল্যে	১০৩৮
আসুন ! আসুন !	১০৩৬	নগদ লাভ	১০৩৯	মনুষ্য-গর্ত্তে ব্যাঘ্রশাবক	১০১৫

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর—জীবনযাপন	[কবিতা]	৬০১
শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন—লক্ষ্য	[কবিতা]	৭১০
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী—ত্রিবেণী	[উপন্যাস]	৫০৭,৬৯৪,৮২৫
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		
শোকাতুরা	[কবিতা]	৯৫৫
শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়		
আষাঢ়ের প্রথম দিন	[কবিতা]	৬৯৩
শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী		
আকিঞ্চন	[কবিতা]	৮১২
বঙ্গনারীর লাঞ্ছনায়	[ঐ]	৯৮
শ্রীঅমৃতলাল বসু—আনমনে	(কবিতা)	১২
চুপি চুপি সারো পূজা	(ঐ)	১০৬৯
তখন ও এখন	(ঐ)	১৫৯
তেত্রিশের ত্রাস	(ঐ)	১৫৯
প্রতীক্ষা	(ঐ)	৩৩০
মাতৃপূজা	(ঐ ,	৯৯৮
রূপকথা	(গল্প)	১৪১,৩৪৪
হামিদের তিস্মৎ	(ঐ)	৬৫৫,৮৯৪
শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ—ভুল বোঝা	(কবিতা)	৫৮৩
শ্রীঅসীমানন্দ স্বামী—অবতার	(ঐ)	৮২
শ্রীআশুতোষ দত্ত—আনারস	(প্রবন্ধ)	২৩২
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সার্থকতা	(কবিতা)	৯৩৯
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)		
মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	১৩,৫৭২
শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য—মহত্ত্ব	(কবিতা)	৪৩০
শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—চাল	(প্রবন্ধ)	৯৯৬
শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী—মিলন	(কবিতা)	৪৩৩
শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী		
চপলার লীলা	(গল্প)	১০০৬
শ্রীকালিদাস রায়—উৎকলিঙ্গ	(কবিতা)	৬০২
বর্ষায়	(ঐ)	৫৪৭
বর্ষামঙ্গল	(ঐ)	৮৪৩
হিমাদ্রি	(ঐ)	৩১৯
শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য		
সংগঠনের সদুপায়	(প্রবন্ধ)	৮৭,২৭৭,৪৮৩,৬০০,৮২০

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীকালাপদ মিত্র		
বৌদ্ধযুগে সমাজচিত্রের একাংশ	(প্রবন্ধ)	৬৬০
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়		
ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	২৮১
শ্রীকুমুদকান্ত স্মৃতিভূষণ—ফুল	(কবিতা)	২৬
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—অজানা	(কবিতা)	৫০৩
কিন্তু	(ঐ)	১৮
সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত		
জীবন-কথা	(আত্মজীবনী)	১৮৮,৩৩১
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক		
হিন্দু-বিধবা	(কবিতা)	৬০৪
শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ—গ্রীষ্মে	(ঐ)	৮০৪
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—এই ত জীবন	(কবিতা)	৩১
শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতির দান	(ঐ)	৮০১
শ্রীগোপাললাল দে—নববর্ষের গান	(ঐ)	৪৭
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বরলিপি		১০৩২
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস—বাঙ্গালী বীর যুবকদ্বয়	(ঐ)	৪২৮
শ্রীচন্দ্রবিনোদ দাস—পদ্মা	(ঐ)	৪৪৫
শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়		
আধুনিক স্থাপত্য	(প্রবন্ধ)	৪৮৯
কিসের পুরস্কার	(গল্প)	৩১৪
কৃতজ্ঞতা	(ঐ)	৯৬৩
গরু মহিষ	(চয়ন)	৬৪৪
ফলের ব্যবসায়	(প্রবন্ধ)	৪৯২
হীরাকাটা	(ঐ)	৪২৯
শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গৌরীদান	(কবিতা)	৯৩
চুরী	(ঐ)	৪৬৬
লাঞ্ছিতা	(ঐ)	৬২৩
ডাক্তার শ্রীচুণিলাল বসু—কোনার্ক	(প্রবন্ধ)	৮৭২
শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়		
রহিব দেশের হিন্দু	(কবিতা)	৬৩৯
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—বর্ষায়	(ঐ)	৬৯৩
শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—রূপ-পূজারী	(গল্প)	৯৮৭
শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী—বুদ্ধগয়া	(প্রবন্ধ)	৪৮১
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—গুরুঠাকুর	(নক্সা)	৫২৪

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়		
প্রলয়ের আলো	(উপন্যাস)	১৯,২২১,৪৫৫,৬১২,৮৫৭,৯২১
বলরামের দোল	(প্রবন্ধ)	৮৪৫
শ্রীদিলীপকুমার রায়—বিরাগীর বিড়ম্বনা	(গল্প)	৬৭৬
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	(কবিতা)	৯৬২
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	(প্রবন্ধ)	১
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শাহুকার ও ধনী	(কবিতা)	৫৫
শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেব—অর্ঘ্য	(ঐ)	৫৫৪
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার		
অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতার স্বাস্থ্য	(প্রবন্ধ)	২৩৮
শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়		
মৃত্যুরজনীতে	(কবিতা)	২২০
শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য—গুরু	(ঐ)	৬৩২
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—কেলোর মা	(গল্প)	১১৩
ছুটী	(ঐ)	৯৫৬
দাদাঠাকুরের নিষ্ঠা	(ঐ)	৭৩৭
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—কৃষিমূলক শিল্প	(পবন্ধ)	৯৪
দেশীয় গন্ধ-শিল্পের ভবিষ্যৎ	(ঐ)	৭৪৬
নারিকেল ছোবড়ার ব্যবসায়	(ঐ)	৬৫০
ভারতের কার্পাস-শিল্প	(ঐ)	২২৮
শিশাল শণ-শিল্প	(ঐ)	৪৯৩
শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত—পল্লী-জননী	(কবিতা)	৬৬০
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে সরকার—ইসি	(প্রবন্ধ)	২৩৭
শ্রীপরিমল গোস্বামী—মরীচিকা	(গল্প)	২১৬
আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়		
ইংলণ্ডের ধনাগম ও তাহার ব্যবহার	(প্রবন্ধ)	৯০৬
কলিকাতা ও সহরতলী	(ঐ)	২৭
শ্রীমতী পদ্মময়ী দেবী—ভালমন্দ	(কবিতা)	২৯৪
শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়—স্মৃতির বোঝা	(গল্প)	৪৬৭
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		
সতীর পতি	(উপন্যাস)	১৪৫,৩৭৫,৫৪৯,৭২৭,৮৯৮
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল—পুরাণে আয়ুষ্কাল	(প্রবন্ধ)	৪৩৭,৮১৩
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কলিকাতার দাঙ্গা	(প্রবন্ধ)	১২৫
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ		
রসশাস্ত্র	(প্রবন্ধ)	২০৫,৫৫৭
সাহিত্য ও শ্রীরাধা	(ঐ)	৭৩৩
শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		
ইটাজাতির ইতিবৃত্ত	(ঐ)	৬০৫
শ্রীপ্রাণনাথ সরকার—সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব	(ঐ)	৬৪৭
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী—কবির মেয়ে	(গল্প)	১০৪২
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্ষাগমে	(কবিতা)	৬৯২
সার্থক ভিক্ষা	(ঐ)	৪৫৪
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ		
অভিভাষণ	(প্রবন্ধ)	৪৯৮
শ্রীফণিভূষণ সরকার—প্রেমিক	(কবিতা)	৬৬৭
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল—সহধর্ম্মিণী	(গল্প)	৯৪০
ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়		
ডাক্তারের জন্য যোগাড়	(প্রবন্ধ)	৪৬২
বারিদবরণ—তুষার স্বপন	(কবিতা)	৭৮৩
শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল—তবু	(কবিতা)	৮৪২
শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী—বন্দিজীবন	(কবিতা)	৭৪
শ্রীবিধুরঞ্জন দাস		
উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা	(প্রবন্ধ)	৮২১
শ্রীবিনয়কুমার সরকার		
আইন গঠনে হিন্দু নরনারী	(ঐ)	৫২
সচিত্র য়ুরোপ	(ঐ)	৬৪৭
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু…বিজ্ঞাপনে বিপত্তি	(রঙ্গচিত্র)	১০৩৩
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—ব্যবস্থা-পরিষদে বাধা প্রদান	(প্রবন্ধ)	৯২
রাষ্ট্রনীতি	(ঐ)	৮৬৫
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত—মেজর হীরালাল	(গল্প)	১০৬৪
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়		
প্রতীক্ষায়	(কবিতা)	৯৪০
বারবিলাসিনী	(ঐ)	৮২৪
শ্রীবিষয়ারঞ্জন দেব		
সাধকের ঝুলি	(ঐ)	৩২
শ্রীবিহারীলাল সরকার		
অবতারের আশ্রয়	(প্রবন্ধ)	৪৮
বেদান্তের অনুবন্ধচতুষ্টয়	(ঐ)	৪৬৪
শ্রীমতী বীণাপাণি রায়—শরতে	(কবিতা)	৯২৯
কুমারী বীণাপাণি দেবী—বসন্ত-রাণী	(ঐ)	৮৬
কুমারী "বী"—মানভঞ্জন	(ঐ)	৭৯৪
বীরবল—চুপ চুপ	(প্রবন্ধ)	৭২৫
শ্রীবীরেশচন্দ্র মিশ্র		
অসময়ে	(কবিতা)	৬৫৪
শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী		
প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবন	(প্রবন্ধ)	২৭২
শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়		
চরম অভিশাপ	(কবিতা)	১৫১
শ্রীমনোমোহন রায়		
অদ্ভুত প্রতিশোধ	(গল্প)	৭৪৩
পোড়ো বাড়ী	(ঐ)	৯৬৮
শ্রীমন্মথনাথ সিংহ		
ভারত ও প্রাচীন প্রতীচ্য গ্রন্থ	(প্রবন্ধ)	৮১৮
শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ		
উড়িষ্যার বঙ্গবিজয়	(কবিতা)	৫৮২
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য—মোহভঙ্গ	(গল্প)	৯৭৭
শ্রীমাধবচন্দ্র শিকদার—মরমের বীণা	(কবিতা)	১০৬৫
৺মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ—রূপান্তরিকা	(ঐ)	২৪০
সঙ্গ	(ঐ)	১৪৪
শ্রীমতী মোহিনী দেবী—গরব	(ঐ)	৩৪৩
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—পাহাড়িয়া প্রেম	(ঐ)	৪৬৩
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ—গণির মা	(গল্প)	১০২৫
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়—অধ্যাত্ম জ্যোতিষ	(প্রবন্ধ)	৫৯২
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার—ভাদরে	(কবিতা)	৮০৪
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—প্রজাপতি ব্লাউজ	(প্রবন্ধ)	৮০৬
শিল্প-মঞ্জরী	(ঐ)	২৯৬,৬৩১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
তরুণের সাধনা	(ঐ)	৬৯
নটীর পূজা	(নাটক)	১
মিলনের রাতে	(কবিতা)	৯০৫

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ		
অনুশীলন	(প্রবন্ধ)	২০৯
কপালকুণ্ডলা	(ঐ)	৬২৪
শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী		
নীতি	(কবিতা)	২০৮
শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ		
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	৮৯
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		
মোহেন-জো-দড়	(ঐ)	৭৫
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী		
জোছনা রাতের ডাক	(কবিতা)	৮৪৮
বর্ষার মাঠে	(ঐ)	৬৯১
শারদীয়া	(ঐ)	৯৭৬
শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত		
বর্ষণান্তে	(কবিতা)	৫৯১
মাসী	(গল্প)	১০৫১
শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী		
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তের স্থান	(প্রবন্ধ)	২৭৯
শ্রীরামেন্দু দত্ত—কুতব মিনার	(কবিতা)	৬৪৬
তাজমহল	(ঐ)	৮৬৪
প্রত্যাবর্তন	(ঐ)	৬৩০
সেলিনা	(গল্প)	৯৯২
রোজী—বর্ষায়	(কবিতা)	৬৯২
ললিত—বাদল বেলায়	(ঐ)	৬৯৩
শ্রীমতী লীলা মিত্র—বাদল	(কবিতা)	৬৯২
শ্রীমতী লীলা দেবী—মহিলার কবি	(ঐ)	২১৫
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালপূর্ণিমা	(গল্প)	৭৫১
৺শরদেন্দু রায়		
বিশ্বতীর্থ	(কবিতা)	৮৭৪
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়		
কারেন্সী কমিশন	(প্রবন্ধ)	৮৭৫
শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—হারক	(ঐ)	৬৪০,৭৬৫
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র—জমীর মোহ	(গল্প)	৪৪১
শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি		
জাতিতত্ত্ব প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর	(প্রবন্ধ)	৪৩১
শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী জীর্ণগীতি	(কবিতা)	৬৯২
পূর্ণিমায়	(ঐ)	৭৪২
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক—টঙ্কনাথ	(গল্প)	৯৯৯
শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ		
গ্রীষ্মের প্রতাপ	(চিত্র)	১৭১,৪১৪
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ		
বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	(প্রবন্ধ)	৯০
শ্রীসত্যচরণ লাহা		
কালিদাসের পক্ষিতত্ত্বজ্ঞান	(প্রবন্ধ)	৭৯৪
শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ		
ছলনা	(কবিতা)	৬৯৩
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—প্রতারক	(উপন্যাস)	৯৯,২৯৮,৬৬৮,৭৭২
মহাজোড়	(গল্প)	৯৩০

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষ্মীর স্বামী	(গল্প)	২৪১
সাহিত্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম	(প্রবন্ধ)	৫০৫
সম্পাদক		
ইটালীতে রবীন্দ্রনাথ	(মন্তব্য)	৯০২
ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিস্তম্ভ	(ঐ)	৫৫৫
কলিকাতায় শিখ মিছিল	(ঐ)	১৯৮
কৃষ্ণনগর সম্মেলন	(ঐ)	৩৬৭
দেশবন্ধুর স্মৃতি-বাসর	(ঐ)	৫৫৪
পাবনার তাণ্ডবলীলা	(ঐ)	৪৩৩
বৈদেশিক	(ঐ)	১৭৮,৩৬৪,৫৪৫, ৮৪৯
সমালোচনা	(ঐ)	৮৯৭
সাময়িক প্রসঙ্গ	(ঐ)	১৫২,৩৫২,৫১৫,৭০৫,৮৮৫
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ	(ঐ)	১৯০
শ্রীমতী সরসীবালা বসু		
সাধন-পথে	(গল্প)	৯১২
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ		
মানবের শ্রেষ্ঠ বন্ধু	(প্রবন্ধ)	১০৫
মিলন সেতু	(গল্প)	১৮২
মুক্তা সংগ্রহ	(প্রবন্ধ)	৪৪৬
রূপের মোহ	(উপন্যাস)	৫৬,২৫৮,৫৬১,৭৮৪,৯৪৬
শিক্ষার দান	(গল্প)	১০১৬
শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		
বরষায়	(কবিতা)	৪১২
শ্রীমতী সুধীরা দেবী		
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব	(প্রবন্ধ)	৫৯৭
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার		
রুদ্রতাল	(গল্প)	১১৫
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস		
নিবেদন	(কবিতা)	৯১৫
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)		
হানাবাড়ী	(উপন্যাস)	৮১,৩২১,৬৩২,৮০৯
শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী		
রেডিও টেলিফোনি	(প্রবন্ধ)	৭৫১
শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী		
উলা	(প্রবন্ধ)	২৫১,৭৯৮
শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ		
প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের আদর্শ	(প্রবন্ধ)	৭৭৮
প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে পুরুষকার ও স্বাদেশিকতা	(প্রবন্ধ)	৪৮৫
বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম	(ঐ)	৬৪
শ্রীহরিহর শেঠ		
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য	(প্রবন্ধ)	৩৩৬
শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই		
বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী	(প্রবন্ধ)	৪১
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পুরস্কার	(গল্প)	১৬০
শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা (অধ্যাপক)		
ভাবপ্রবাহ	(প্রবন্ধ)	৭৮২
পণ্ডিত শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ		
জয়শ্রী	(নাটক)	৩৮১

[illegible] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

[illegible]]

[শিল্পী— শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক বসুমতী

৫ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৩ [১ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার চিহ্নিত সেবকরূপে তিনি নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন এবং ভারতের মোক্ষধর্ম্ম কলুষিত হইলে তাঁহারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সনাতন জাতিকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন, তিনি তাঁহাদেরই অংশভুক্ত। আর্য্যভূমে ধর্ম্মের নির্ম্মল আকাশ আপাততঃ যে কুয়াশার ঘনধূমে আবৃত হইয়াছে, তাহা বিদূরিত করিয়া মোহঘুমে আচ্ছন্ন লোক সকলকে সচেতন করিয়া আধ্যাত্মিক আলোক প্রদান করিতে হইবে, বিশ্বজননীর এই মহাকার্য্যে তিনি যন্ত্রস্বরূপ। এ মহাযজ্ঞে তিনি হোতা, তিনিই আহুতি। দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট পুষ্পের ন্যায় তাঁহার জীবন পূর্ব্ব হইতেই এ মহাব্রতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মানসনেত্রে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক দিন যে পবিত্রভূমি জ্ঞানে এবং গরিমায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ তাহা হৃতগৌরব; স্বর্গের পারিজাতকে পরাজিত করিয়া এক দিন যাহার পুণ্যসৌরভ বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিত, আজ তাহা পূতিগন্ধময়! আজন্ম ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য যে দেশের রাজরাণী রাজমাতা শিশু-সন্তানকে দোলায় শোয়াইয়া দোল দিতে দিতে গাহিতেন :—

> 'শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি
> সংসারমায়াপরিবর্জ্জিতোঽসি—'

জড়বাদী ঐহিক ভোগ-সুখ পরায়ণ ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে আসিয়া আজ সে দেশ বিলাসের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে! এক দিন যেখানে বাতাসে মন্ত্রিত বেদগাথা, আকাশে উত্থিত যজ্ঞধূম স্বর্গের দেবতাকে মর্ত্ত্যে আকৃষ্ট করিত, আজ সে স্থল শুধু কাম-কাঞ্চন-কোলাহলপূর্ণ, সেথায় হোমানলের পরিবর্ত্তে ধূ ধূ করিয়া কেবল চিতানল জ্বলিতেছে! দেখিলেন, ভারতের সনাতনধর্ম্ম ইন্ধনবিহীন বহ্নির ন্যায় নির্জ্জীব; মহিমান্বিত তীর্থ সকল রাহুগ্রাসগত রবিচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ! দেখিলেন, ঘোর তমে সত্ত্ব সমাচ্ছন্ন; আলস্যের জড়তা, বৈরাগ্যের ভাণে আত্মপ্রতারণা করিতেছে! সংশয়-জননী জড়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু আত্মবিস্মৃত; ধর্ম্ম কোথাও গুপ্ত, কোথাও লুপ্ত, কোথাও ক্ষীণধার! আচার-ব্যবহার, এমন কি, ঈশ্বরোপাসনায় পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য; মন্দির-মঠের পরিবর্ত্তে ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গাছ-পাথরে

দেবতার অধিষ্ঠান কু-সংস্কারজ্ঞানে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন। বটের ঝুরি যেমন মাটীতে শিকড় গাড়িয়া স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়, বিশাল বৈদিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত সগুণ ব্রহ্মোপাসনা তেমনই মূল হইতে পৃথক্ হইয়া শাখা-প্রশাখা-পল্লবে নব-কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম্মপিপাসু বিদ্বান্ সম্প্রদায় তাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্' জীবন-সমস্যার সার মীমাংসারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার-নিষ্ঠা, আহার্য্য-বিচার, জাতিভেদ কু-সংস্কার বলিয়া নিঃশেষে বর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির উন্মাদনা কেবলমাত্র ধ্যানে জ্ঞানে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতে পারে না, এ জন্য খোল-করতালসহ সহরের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন-রোল উঠিতেছে—'তোরা বল রে পুরবাসিগণ মধুর ব্রহ্মনাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, জাতিভেদ উঠাইতে গিয়া ব্রাহ্ম এবং হিন্দুদিগের মধ্যে বিশাল ব্যবধান ও তীব্র বিচ্ছেদ দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। শাখা ও মূল যে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট, সে কথা উভয় সম্প্রদায়ই ভুলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং অমৃতের অধিকারিগণ পরস্পর বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছেন। উদার আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া উভয় সম্প্রদায় যে অন্ধের ন্যায় আচরণ ও বিচরণ করিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মপিপাসু নবীন ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুর অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই বেদ-বাইবেল-সমন্বয়ে এক অদ্ভুত পন্থার আবিষ্কার করিয়াছেন। অবশ্য এ মতও যে সময়োপযোগী বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা সহজেই উপলব্ধি হইল। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে এ পথও যে এক দিন কোন্ দুর্গম গহনে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

কেশবচন্দ্র সেন

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তার পর অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! ইংরাজী আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সভ্যতা রাজপথের উপর দিয়া সদর্পে জুড়ী হাঁকিতে লাগিল। সাদর সম্ভাষণ, কুশল-প্রশ্ন, প্রণাম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে "হ্যালো" "হা-ডু-ডু-ডু" ও হাতে হাতে ঝাঁকা-ঝাঁকি চলিল কলাপাত ও কুশাসনের স্থান টেবিল চেয়ার ডিস অধিকার করিল সান্ধ্য আসরে সুরা সহকারে স্বাস্থ্যপান নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় শিখা বাঁচাইতে বিব্রত হইয়া উঠিলেন; মাতৃভাষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া সুসভ্য রসনায় রাজভাষা আসন পাতিল। সভায় বক্তৃতার ঢেউ উঠিতেছে, মুখে খৈ ফুটিতেছে, জিহ্বায় আগুন ছুটিতেছে! ছত্রিশ জাতিতে ছত্রাকার, উচ্চ-নীচে একত্র বিহার, অন্তঃপুর মুক্তদ্বার, সভ্যতার মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া ব্যভিচার প্রকাশ্যভাবে লীলা করিতে লাগিল। বহু আত্মপরায়ণ সুযোগপ্রয়াসী ইঙ্গ-বঙ্গ প্রবৃত্তির তাড়নায় ব্রাহ্মসমাজে

প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথায় তাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে গৃহীত হইতে পারিলেন না। যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর বিশ্বাস হারাইয়াও ধর্ম্মের পিপাসা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের মেরুদণ্ড এবং বাগ্মিবর কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁহাদের নেতা। বহুপূর্ব্বে মথুরের সঙ্গে এক দিন গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়া ফিরিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, চিৎপুর রোডের উপর একখানি বাড়ীতে বহু লোক সমাগম হইয়াছে; প্রশ্ন করায় মথুর বলিলেন, 'এটা আদি ব্রাহ্মসমাজ। আজ বোধ করি উপাসনা হচ্ছে, তাই এত ভিড়।' গাড়ী হইতে নামিয়া মথুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। কোন বিখ্যাত আচার্য্য সে দিন উপাসনা করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর-প্রয়াসী ভক্তদিগকে বলিতেন, 'বড় মাছ ধরবে ত আগে চার কর; তার পর টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে একমনে ব'সে থাক; চারের গন্ধে জলের তলে তলে মাছ আসবে; হয় ত একটা ঘাই দিলে। তোমার বিশ্বাস হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদ আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো। তার পর মাছটা হয় ত একবার খাব্‌লালে, অমনি ফাৎনা কেঁপে উঠলো। তখন কি আনন্দ! বড় মাছ ধরবে ত আগে প্রেমভক্তির চার কর। তবে ত গন্ধে গন্ধে মাছ আসবে।'

সমাজে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে লাগিলেন, কে কেমন প্রেম-ভক্তির চার ফেলেছে,—কার চারে মাছ এসেছে। একে একে দেখিতে দেখিতে একটি প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি যুবার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলিলেন, 'এরই ফাৎনা কাঁপছে।' ইনিই কেশবচন্দ্র।

দণ্ডিবেশে স্বামী বিবেকানন্দ

কিছুকাল পরে ঈশ্বরানুরাগী এই ভক্তের নাম শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন, ভক্ত শুনিলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রবর্ত্তক এই উদার পুরুষ-প্রবরের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বলিতেন, 'ভক্তের স্বভাব যেন গাঁজাখোরের স্বভাব। গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরের আনন্দ হয়।' কেশবের কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দেখিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসুক হইয়াছিলেন। এক দিন সংবাদ আসিল যে, কয়েকটি শিষ্য ও সঙ্গী সহ বেলঘোরের জয়গোপাল সেনের বাগানে কেশব সাধন-ভজন করিতেছেন। ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার উদ্দেশ্যে উদ্যানাভিমুখে গমন করিলেন।

গাড়ী যখন বাগানে পৌঁছিল, কেশব তখন কয়েক জন অন্তরঙ্গ সঙ্গে উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, 'আমার মামা

পরমহংস, ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসেন। শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর সমাধি হয়। আপনার নাম শুনে আপনার মুখে হরিকথা শুন্‌তে এসেছেন। অনুমতি করেন ত তাঁকে নিয়ে আসি।’

হৃদয়ের কথায় কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মগণ কল্পনায় এই ঈশ্বরপ্রেমিক পরমহংস সাধুর যে চিত্র অঙ্কিত করিলেন, প্রত্যক্ষ তাহাকে উপহাস করিল মাত্র। সকলে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এ কি! ইহার শিরে জটা নাই, গৈরিকের ঘটা নাই, তিলক-ত্রিপুণ্ড্রের ছটা নাই, এ কি পরমহংস? পরিধানে একখানি সরু লালপেড়ে কাপড়, তার কোঁচাটি আবার উত্তরীয়রূপে বাঁ কাঁধের উপর দিয়া পিঠে ঝুলিতেছে। এই ত সজ্জা! তার উপর না আছে লজ্জা, সভ্যতা বা ভব্যতা! লোকটা কোন দিকে না তাকাইয়া সরাসরি সটান আসিয়া বলিল, “বাবু, আপনারা নাকি ঈশ্বরের দর্শন পাও? সে কিরূপ দর্শন, বল!”

এমনি দুই একটি কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিলেন,—‘কে জানে কালী কেমন।’ সঙ্গীত শেষ হইতে না হইতে তাঁহার বাহ্যচেতনা সমাধিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। এরূপ অবস্থার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। কখনও যে তাহা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ হইবে, কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মগণ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এ কি অভিনয়, না স্নায়বিক বিকার? গম্ভীর কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রণবমন্ত্র কর্ণগোচর করাইয়া হৃদয় মাতুলকে পুনরায় চেতনরাজ্যে ফিরাইয়া আনিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রাকৃত মানুষের মত কথা সুরু করিলেন। তাঁহার মুখে সরল ভাষায় সহজ দৃষ্টান্তসহ উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনিয়া মনীষী কেশব বুঝিলেন, এই দীন-হীন ব্রাহ্মণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! কিন্তু তথাপি যাচাইয়া লইতে হইবে, পিতল কি পাকা সোনা! শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরন্তর লক্ষ্য করিবার জন্য দুই তিন জন ব্রাহ্ম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নিকষের কঠিন ঘর্ষণে কেশবের মনে পাকা সোনার কস্ ধরিল এবং দিনে দিনে সে রং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিতে লাগিল।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব-বংশে কেশবের জন্ম। পিতামহ রামকমল তুলসী-কাননের ভিতর বসিয়া হরিনাম করিতেন। পিতা প্যারীমোহন ছিলেন পরম ভাগবত, মাতা পরমা ভক্তিমতী। বাল্যবয়সে কেশব যখন হরিনামাঙ্কিত অঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি-গুণ গান করিতেন, সকলেই অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু ভক্তিতে কেশবের জন্মগত অধিকার হইলেও সংস্কারকের রক্ত তাঁহার শিরায় প্রশিরায় প্রবাহিত ছিল। মহাত্মা রামমোহনের আদর্শে সতীদাহ, বাণ ফোড়া, অন্তিমকালে অন্তর্জ্জলির প্রথা, ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাস-প্রসূত নিষ্ঠুর আচরণ জ্ঞানে রামকমল বদ্ধপরিকর হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সময় ও শিক্ষার প্রভাবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবী এবং পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস হারাইয়া উনিশ বৎসর বয়সে কেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কেশবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন তাঁহার গৃহে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, “মা, এখানে আসিস্‌নি, এরা তোর রূপটুপ মানে না।” এই উদার লোকশিক্ষক ভক্তের ভাব নষ্ট করিতেন না। নিরাকারবাদী কেশবকে বলিতেন, “রাধাকৃষ্ণ মান আর না মান, ঐ টানটুকু নিও।”

পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতিবাদস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজে সে সময়ে ‘অন্ধ বিশ্বাস’ কথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীনরেন্দ্রনাথ যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বপ্রভাবে ঐ কথাটি তাঁহার মুখে মাঝে মাঝে শুনা যাইত। এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা, অন্ধ বিশ্বাস কাকে বলিস্, বুঝাতে পারিস?” নরেন্দ্রনাথ বড় ফাঁপরে পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “বিশ্বাসের ত সবটাই অন্ধ, তার আবার চোখ কি? হয় বল্ বিশ্বাস, নয় বল্ জ্ঞান। তা নয়, বিশ্বাসের ভিতর কতকগুলো অন্ধ আর কতকগুলো চোখওলা, এ আবার কি রকম!”

নরেন্দ্রনাথ ঐ শব্দ আর কখনও ব্যবহার করেন নাই।

কেশবের মন হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত হইল, কিন্তু ভক্তির প্রমত্ত উচ্ছ্বাস গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, তোমরা ভক্ত, বৈদান্তিকদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বল না, তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল, তোমরা ভক্ত। ভক্তের প্রাণ ভগবানের নাম-গুণগান করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাই হরিসংকীর্ত্তনের স্থল ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন অধিকার করিল। দূর চুম্বকের আকর্ষণে

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ব্রাহ্ম ভক্তগণ

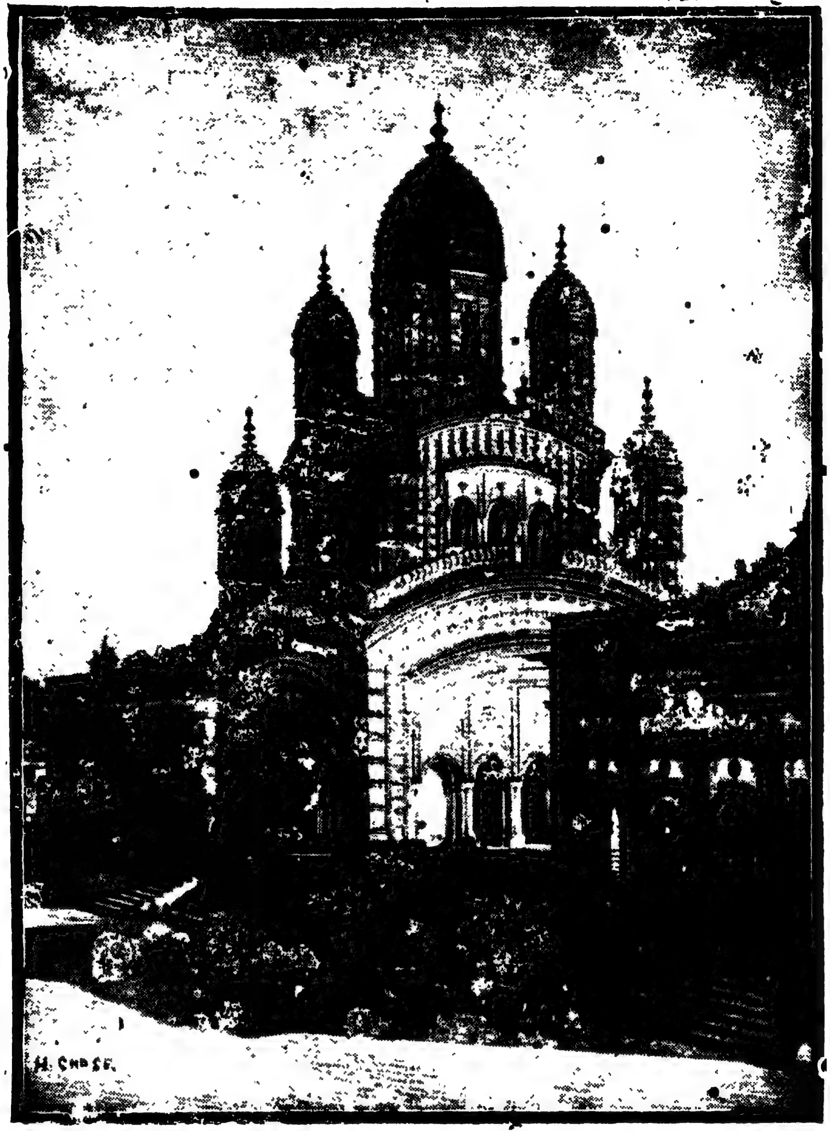

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

কম্পাসের কাঁটা যেমন চঞ্চল হয়, উপাসনায় বা ধ্যানে কেশবের হৃদয়ও তেমনই আন্দোলিত হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "এঁরই ফাৎনা নড়ছে।"

কেশব ক্রমে এই সমাজের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যেই উক্ত সমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও আদি সমাজ বিধবা-বিবাহ, আন্তর্জ্জাতিক পরিণয় এবং যজ্ঞসূত্র ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। এইখানে কেশবের সঙ্গে মতভেদ হইল। কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিলেন। সমমতাবলম্বীদিগকে দলবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র মন্দির-প্রতিষ্ঠা এখন হইতে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। শ্রীভগবান্ তাঁহার একান্ত কামনা পূর্ণ করিলেন। ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ অভ্রভেদ করিয়া অচিরে উন্নত শির তুলিল। সহরে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন, বঙ্গের নগরে নগরে স্বয়ং বক্তৃতাদান ও প্রচারক প্রেরণ করিয়া কেশবচন্দ্র এক দিকে যেমন তাঁহার অভিনব মত প্রচার করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে তেমনই ধর্ম্মের নামে যে কিছু অনাচার হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রতি তীব্র কশাঘাত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বৈষ্ণব বাবাজীরা অনেকেই সে সময় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় শ্লেষ করিয়া সংকীর্ত্তন বাহির করিলেন,—

"বাবাজী কি মজা লিচ্ছে,
চারি দিকে চার সেবাদাসী, দাঁতেতে লাগায়ে মিশি,
বাবাজী তায় হয়ে খুসী, খিল্ খিল্ খিল্ খিল্ হাসছে।
মাথাতে তরমুজের বোঁটা, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ উড়ছে।"

যাঁহারা শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অনন্যলক্ষ্যে সাধনা করেন, কেশব সে শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "কেশবের যোগ ভোগ দুই-ই ছিল।" সাধু ও সংসারী তাঁহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। প্রথম সাক্ষাতের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ খসেছে।" যত দিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে, তত দিন ডাঙ্গায় উঠিতে পারে না, ল্যাজ খসে গেলে সে জলে স্থলে সমভাবে বিচরণ করে। অবিদ্যার ল্যাজ খসায় কেশবের এখন সংসার ও ভগবৎ-রাজ্যে সমভাবে গতায়াত করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। এই দুই দিক বজায় রাখিবার জন্য কেশব অনেক সময় সচেষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে এক দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মহাশয়! বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত ক'রে যদি কেউ ঈশ্বরকে ডাকে, তাতে কি ক্ষতি হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, একটি স্ত্রীলোকের ভারি শোক হয়েছিল, তার নাকে একটা ফাঁদি নথ ছিল, পাছে ভেঙ্গে যায়, তাই আগে সেটিকে আঁচলে বেঁধে তার পর আছড়ে পড়ল, "ওগো! আমার কি হ'লো গো!" তীব্র বৈরাগ্য হ'লে কোন হিসাব আসে না।

কিন্তু কেশবের সে সৌভাগ্যের দিন এখনও সমুদিত হয় নাই, এখনও তাঁহার মন জগতের উপকারসাধন ও মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছে— ত্যাগ ও ভোগের মাঝে ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলিতেছে, স্বর্গে নিসর্গে বাচ্ খেলাইতেছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা জগতের উপকার উপকার কর, জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে যে জগতের হিত করবে! আগে সাধন-ভজন ক'রে ঈশ্বরকে লাভ কর, তিনি শক্তি দিলে তবে লোকহিত কর্ত্তে পারবে। এ যেন সেই ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দার।

এক দিন কেশবের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হইতেছিল, শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া কেশব বলিলেন, আরও বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আর বল্‌লে দলটল থাকে না।

কেশব ভয়ে পিছাইয়া গেলেন। বলিলেন, তবে থাক্ মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তবু কহিলেন, "আমি" "আমার" এটি অজ্ঞান, "আমি" ত্যাগ কর্ত্তে হবে।

কেশব বলিলেন, মহাশয়, অহং গেলে যে আর কিছুই থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, কেশব, আমি তোমাকে সব "আমি" ত্যাগ কর্ত্তে বল্‌ছি নে, তুমি কাঁচা আমি, বজ্জাৎ আমি ত্যাগ কর। যে আমি বলে, আমি কর্ত্তা, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার বিষয়, আমি দল করেছি, আমি দলপতি, আমি গুরু, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, সে আমি কাঁচা আমি। আর ভক্ত আমি, ভগবানের দাস আমি, এই পাকা আমি—এ আমিতে দোষ নেই।

কিন্তু মানুষ আপনার জালে আপনি জড়াইয়া পড়ে। উচ্চাভিলাষের প্রেরণা, সম্প্রদায়ের মোহ কেশবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিকেও অভিভূত করিয়া ফেলে। বিশেষ কেশবের তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি। সাগরপার হইতে তাহার দুন্দুভিনাদ আসিতেছে। স্বয়ং ভারত-সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে সমাদর করিয়াছেন, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রতীচীর মনীষিগণ প্রাচীর বাগ্মী সন্তানকে সম্ভ্রমের আসন দিয়াছেন, কেবল সমাজ নয়, সঙ্ঘ নয়, কেশবের বাসভবন কমলকুটীর বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্ম-পল্লীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যে মত প্রচারের জন্য তিনি জীবনপাত করিতেছেন, দুর্জ্জয় তরঙ্গভঙ্গে প্রতিকূল পবনের সঙ্গে প্রাণপাত যুদ্ধ করিয়া এখন পাড়ি জমিবার সময় আসিয়াছে। অদূরে বন্দর, কাম্যকাল প্রায় করায়ত্ত। সেই নিমিত্তই কেশব বলিয়াছিলেন, "আমি" ত্যাগ কল্লে যে আমার কিছুই থাকে না।

হায়! একমাত্র নিত্য বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষ যাহা কিছু প্রাণপণ যত্নে দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ করে, সে সকলই যে এক দিন তাহার বদ্ধকর হইতে কাঁচা পারার মত স্খলিত হইয়া পড়িবে, এ জ্ঞান তাহার সহজে জন্মে না, এ শিক্ষা সে সহজে শিখে না। বুঝিয়াও বুঝে না যে, আশা বার-বিলাসিনী হইতেও ছলভাষিণী। 'লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ-চপলা।' যে সংসার লইয়া তাহার জীবনের কারবার, তাহা রুচির রাগরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় নশ্বর। আর যাহা কিছু সেই জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, মান, সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, প্রসার সে সমস্তই বায়ুপুষ্ট বুদ্‌বুদের ন্যায় অসার। কেশব যে এ কথা বুঝিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু মন বুঝিলেও প্রাণ কি সহজে বুঝিতে

চায় ? কেশব এ কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন সেই দিন, যে দিন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া চকিত নেত্রের সম্মুখে সংসার আপনার উলঙ্গমূর্ত্তি প্রকাশ করিল, যে দিন স্তুতির সুধা-গীতির পরিবর্ত্তে কুৎসার বিষ-বর্ষণে তাঁহার কর্ণ জ্বালাময় হইয়া উঠিল। যে সমাজের কল্যাণকামনায় কেশব আপন কন্যাকে কোচ-রাজকরে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, আজি তাহারই গণ্য মান্যগণ তাঁহারই কৃত বিধিকে অস্ত্র করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়চেতা কেশব তাহাতে দমিলেন না, টলিলেন না ; কিন্তু তাঁহার পরম যত্নে গঠিত দল হিমপাতে সহস্রদল পদ্মের পাপড়ির মত একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ভারতীয় সমাজের গরিষ্ঠ, বিশিষ্টগণ দলবদ্ধ হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন বলিয়াছিলেন, 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ ঈশ্বরাধীন, কেশব, তুমি আবার তার আইন কত্তে গেলে কেন ?' যে সমাজ ও সঙ্ঘ গঠনের নিমিত্ত কেশব অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, চক্ষুর সমক্ষে তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহারই স্নেহপুষ্ট কীট সহসা ফণা তুলিয়া দংশন করিল। সংসারের মুখ হইতে মুখোস্ খসিয়া পড়িলে, কেশব তাহার কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন ; হৃদয়ে গুরু আঘাত বাজিল। হায় ! তথাপি মোহ কাটে না।

কমল-কুটীর

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, তুমি দল দল কচ্ছ, আর তোমার দল ভেঙ্গে যাচ্ছে।

কেশব কাতরোক্তি করিলেন, মহাশয়, তিন বৎসর আমার দলে থেকে শেষ আমাকে গাল দিয়ে ও দলে চ'লে গেল !

কিন্তু যিনি অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্ভব করেন, তিনি জীবনের কোন ঘটনাকে ব্যর্থ হইতে দেন না। প্রকৃতি-বিশেষে আঘাত ও ব্যাঘাত উগ্র বিষবৎ ঔষধের কার্য্য করে। কেশবের বহির্ম্মুখী মন অন্তর্ম্মুখী হইল। তাঁহার সঙ্ঘমধ্যে যে কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি এখন ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত এবং সময়ে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে কমলকুটীরে লইয়া গিয়া সংকীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন।

কেশব সাকার দেবদেবীর উপাসনা পৌত্তলিকতা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, নিরাকার। নিরাকার কি আবার সাকার হয় ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার এবং আরও কত কি, তা কারও জানা নেই। শীতে জল জমে যেমন বরফ হয়, সাধকের ভক্তি-হিমে তেমনই নিরাকার সাকার হন। তার ইতি করা যায় না। কেশব শক্তি মানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। সমাধিগত না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। যতক্ষণ ধ্যান-চিন্তা—ততক্ষণ শক্তির এলাকার মধ্যে। ব্রহ্ম আর শক্তি এক। এটিকে মানলে ওটিকে মান্‌তে হবে। যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি। আগুন বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না, আর দাহিকা শক্তি ছেড়ে আগুন ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। লীলাময়ী শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কচ্ছেন, তাঁরই নাম কালী। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম, যখন লীলাময়ী, তখন কালী। সমুদ্র যখন স্থির, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা। যখন হিল্লোল-কল্লোল হচ্ছে, তখন কালী।"

কেশবের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাতৃনাম মহামন্ত্র পাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ অভিনব আনন্দে মাতিয়া উঠিল। ব্রাহ্ম পত্রিকা সকলে কেশব এই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন প্রেমিক সাধু সম্বন্ধে নানা ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভক্তসমাগমে দক্ষিণেশ্বর

ক্রমে তীর্থধামের ন্যায় আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এক দিন কমলকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিকালে কোন ব্রাহ্ম ভক্ত কেশবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি কলির চৈতন্য। কেশব হাসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ইনি তা' হ'লে কি হ'লেন?' ভক্তটি কোন উত্তর দিতে না দিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আমি রেণুর রেণু—তোমাদের দাসানুদাস।

কোন সময়ে কেশবের কঠিন পীড়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মায়ের কাছে ডাব-চিনি মানত করিয়াছিলেন, 'মা, কেশবকে ভাল ক'রে দেও। কেশবের যদি কিছু হয়, কার সঙ্গে কথা ক'ব?'

কিন্তু ধর্ম্ম-পিপাসা যতই প্রবল হউক, ভোগ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য প্রভাবজনিত সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি যে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অধ্যাত্মের উচ্চ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। এইরূপ সম্প্রদায়কে তিনি বলিতেন, "আমি যা বল্‌বার বল্লুম, তোমরা এখন ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সাধনা ব্যতীত যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তি যে ধর্ম্মের মূলভিত্তি, ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ যে তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়, সংসারাসক্ত মন তাহা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে অক্ষম। যে রত্ন দানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উদার হৃদয় ব্যগ্র, উদ্যত কর নিয়ত প্রসারিত হইয়া থাকিত, তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য অধিকারীই নাই। বলিতেন, একটা ভূত একলা থাক্‌তে না পেরে সঙ্গী খুঁজে বেড়াত। যেখানে অপঘাত হয়, অমনি ছুটে যায়; কিন্তু গিয়ে দেখে—সে একটা না একটা রকমে উদ্ধার হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর নিকট কাতরে প্রার্থনা করিতেন, "মা! সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে ক'য়ে আমার ঠোঁট জ্বলে গেল—তোর ত্যাগী ভক্তদের এনে দে।" নিঃস্বার্থ পবিত্র হৃদয়ের একাগ্র প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না।

কেশব ক্রমে সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর সে আধ্যাত্মিক উত্তেজনা [illegible] দিন সহ্য করিতে পারিল না। খরস্রোতে যেমন নদীর কূল ক্ষয় হয়, ভাবের প্লাবনে কেশবের শরীর তেমনই ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন তাঁহাকে ভবরোগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, সংসারী জীব বিকারের রোগী। নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ আরাম হবে কি ক'রে? বিকারের রোগীর ঘরে আচার, তেঁতুল, জলের জালা থাক্‌লে কি রোগ সারে? মেয়েমানুষ এই আচার তেঁতুল, ভোগ-বাসনা জলের জালা, রোগ সারাতে গেলে এ সব থেকে দূরে থাক্‌তে হয়।

কেশবের সহিত শেষ দেখা করিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "হাঁসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, যতক্ষণ একটু কসুর থাকে, ডাক্তার সাহেব ছুটী দেয় না, রোগ না আরাম হ'লে কি ছাড়ে?"

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব কেশব যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া—"নব বিধান" নামে লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকসমূলার বলেন—

"But what is most interesting is the fact, that it was the Mahatma, who exercised the greatest influence on Keshav Chandra Sen, during the last phase of his career. It was a surprise to many of Keshav Chandra's friends and admirers to observe the sudden change of the sober reformer into the mistaken and extatic saint that took place towards the end of his life. But although this latter development of the New Dispensation and more particularly the doctrine of the motherhood of God may have alienated many of Keshav Chandra Sen's European friends. It seems to have considerably increased his popularity with Hindu society.

From the Ninteenth Century, August, 1896.

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

তরুণের সাধনা

আমি অনেক দিন অনেক দেশে অনেক বক্তৃতা করেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার সভাভীতি ভাঙেনি। আমার চেয়ে বয়সে যারা অনেক কম, তাদের মধ্যেও উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে গেলে মনটা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, মনের মধ্যে কিছুতে বিশ্বাস হয় না যে, আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। তার মধ্যে গূঢ় মনস্তত্ত্বঘটিত একটা কারণ আছে। সেটা ব'লে নিই। আমি যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম, সে বয়সে লেখাটা ধৃষ্টতা। যে বয়সে "অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর", সে বয়সে অন্যকে বাক্য শোনাবার স্পর্দ্ধা ক্ষমা করবার যোগ্য নয়। অনেকে ক্ষমা করেনও নি। অর্ব্বাচীনতার খোঁটা দিয়ে আমাকে ভৎ'সনা করেছেন, ছাপার অক্ষরে চোখ রাঙিয়ে আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি, আজ তার প্রমাণ পাচ্চেন। কিন্তু প্রতিদিন চারদিক থেকে শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ধারণা ধ্রুব হয়ে গেল যে, আমি ছেলেমানুষ। সে সময়ে যাঁরা সাহিত্যচর্চ্চা করেছেন, আমি তাঁদের সকলের চেয়ে অনেক পরিমাণে অল্পবয়স্ক। তার পরে তাঁদের চোখের সামনে কখন্ বড় হয়ে উঠেছি, সে তাঁদের খেয়ালেই আসে নি। জ্যাঠা-মশায়ের কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রের যে দশা, একদা সাহিত্যে আমার সেই দশা ছিল, অর্থাৎ বয়স যতই হোক্, অল্পবয়সের অখ্যাতি আর ঘুচতে চায় না। এমনি ক'রে সাহিত্যিকদের আসরে বালকের আসনে অনেক দিন ব'সে ব'সে নিজের কাঁচা অবস্থা সম্বন্ধে সঙ্কোচ একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও ভয় হয়, পাছে তোমাদের কাছে হঠাৎ ধরা পড়ে যে, আমার বয়স যথেষ্ট বেশী নয়। তার ফল হয়েছে এই যে, আমার সমান বয়সের লোকের যে আসন, সেখানে আমাকে যেন মানায় না। আমার চেয়ে অনেক কম বয়সের যে যায়গা, সেখান থেকে আমার আর প্রমোশন পাওয়া ঘটে উঠল না। আমার বন্ধুদের যখন তালিকা নিই, তখন দেখি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বয়সে আমার নাগাল পান না, কিন্তু আমার সঙ্গে হাসিতে, আলাপে, আলোচনায়, বাদে-প্রতিবাদে, কিছুতে তাঁদের স্বল্পতা দেখিনে। আমার সম্বন্ধে ব্যবহারে আমার প্রতি তাঁদের বয়স্যতার আড়ম্বর করা ঠিক সদাচারসঙ্গত না হ'তে পারে, কিন্তু দোষ আমারই। প্রবীণতার খোলাটা আজও শক্ত হয়ে আমাকে আবৃত করে নি। এমন অবস্থায় যতখানি দূরে দাঁড়িয়ে নিজের মর্য্যাদা রাখা বা উপদেশ দেওয়া শোভা পায়, ততখানি দূরত্ব আমি নিজগুণে অর্জ্জন করতে পারি নি। কেবলমাত্র পাকাচুলের জোরে এর উপরে দাবী বেশীক্ষণ টেকে না। তাই যখন আমার বয়স চল্লিশের কোটায় ঢুকে পঞ্চাশের দিকে চলেছিল, তখনও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার মত দুর্য্যোগ আমার কদাচিৎ ঘটে থাকবে। দায়ে প'ড়ে বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেহে স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক দশার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই সে কালে কখনও বা প্রান্তরের ধারে, কখনও বা নদীর পারে, কখনও কল্‌কাতার বাড়ীর কোন নিভৃত কক্ষে একলা ব'সে কথার জাল নীরবে বুনেছি।

কিছুকাল থেকে আমার সেই নিভৃত-লোকের বেড়া ভেঙে গেছে। এখন জনসঙ্ঘের দাবী আর ঠেকাতে পারি নে। এই জনসঙ্ঘের সঙ্গে ব্যবহারের সর্ব্বপ্রধান বাহন বক্তৃতার উচ্চৈঃশ্রবা। সেটা ত ফরমাস দিয়ে জোটে না। অথচ আমি বক্তা নই, এ কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে যত সময় ও পরিশ্রম লাগে, কোনো মতে বক্তৃতা ক'রে ফেলতে তার চেয়ে কম লাগে। সেই জন্যে অক্ষমতার ওজর ছেড়ে দিয়েছি। এ দিকে সাহিত্যিক ব'লে আমার একটা খ্যাতি হয়ে গেছে। সেই খ্যাতিটা বাঁচিয়ে বক্তৃতা করতে গেলে লোকের প্রত্যাশার অনুরূপ একটা মানানসই জিনিষ দাঁড় করাতে হয়। অথচ মনের মধ্যে আমি জানি যে, বক্তৃতা করাটা আমার স্বধর্ম্ম নয়। এক দিন যখন নির্জ্জনে কবির ধর্ম্ম পালন ক'রে এসেছি, তখন এই দ্বিধার মধ্যে ছিলাম না।

তাই বলছি, তোমরা যদি আমাকে এই বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে তোমাদের মাঝখানে ডাক দিয়ে নিতে, তা হ'লে আমাকে সহজভাবে পেতে পারতে। কথাটা শুন্‌লে হয় ত হাসবে, কিন্তু এক হিসাবে তোমাদের সঙ্গে আমি সমানবয়সী। তোমাদের অন্তরের মধ্যে কাঁচা মনের যে আন্দোলন চল্‌ছে, তাকে আমি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারি, তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আমার কণ্ঠে

বেজে উঠতে কোন বাধা পায় না। অথচ আমাকে অত্যন্ত প্রাচীন ব'লে অন্যায় ক'রে তোমরা আজ এই দূরে ঠেলে দিয়েছ। ঐতিহাসিক যাঁরা, তাঁরা কুষ্ঠীর প্রমাণের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে নড়তে পারেন না। আমরা কবি, নব্য দর্শনের মতেই আমরা চিরকাল চ'লে আসছি। Relativity of time আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রমাণ করি। আমাদের কাল্ পঞ্জিকার বাঁধা কাল নয়, আপেক্ষিক কাল। সেই জন্যে অবস্থাবিশেষে কখনও তরুণের সঙ্গে আমাদের বয়স মেলে, আবার কখনও বা প্রবীণের সঙ্গে আমাদের বয়সের ভেদ থাকে না।

আজ তোমাদের দিকে চেয়ে আমার মনে একটু ঈর্ষ্যার উদয় হয়েছে। তার কারণ এ নয় যে, তোমাদের সামনে ভোগের কাল ও কর্ম্মের সংসার বিস্তীর্ণ, আর আমার পক্ষে সেটা প্রান্তে এসে ঠেকল। তার কারণটা কি, একটু খোলসা ক'রে বলা যাক। আমরা যখন ছোট, তখন দেশে যে অবস্থাটা ছিল, এখনকার থেকে তার অনেক প্রভেদ। আজ চারদিকে যে প্রাণের স্পন্দন, তখন তার কোনও আভাস ছিল না। ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজের পরিবারটির মধ্যে একটা খুব ভাবের আন্দোলন ছিল। আমার দাদারা সকলেই ছিলেন সাহিত্যরসপিপাসু। কলাবিদ্যায়, সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁদের ঔৎসুক্যও ছিল, নৈপুণ্যও ছিল। স্বদেশকে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু মোটের উপর সমস্ত দেশের মধ্যে তখনও উদ্বোধনের দিন আসে নি। ইস্কুলে যখন আস্‌তাম, তখন এমন একটা চিত্তের জড়ত্ব ও বিকৃতির মধ্যে এসে পৌঁছতাম যে, মনটা সমস্তক্ষণ পালাই পালাই করত। এখনকার কালের নিতান্ত ছোট ছেলের মধ্যেও সেদিনকার মত প্রাণের দৈন্য নেই। যদি সত্য কথা বলতে হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, বাল্যকালে যে জগতে ছিলাম, সেখানে এমন গুমট যে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'ত। সেই পীড়নে অতি অল্পবয়সেই বিদ্যালয় থেকে পলাতক হয়ে বেরোলাম। শুনে খুসি হবে, সেই তেরো বছরের মধ্যে কেবল একটিবারমাত্র আমার ভাগ্যে প্রাইজ জুটেছিল। মধুসূদন বাচস্পতি মশায় যখন আমার প্রতি দয়া ক'রে সেই প্রাইজ দেবার প্রস্তাব করেন, তখন হেডমাষ্টার ভেবেই পেলেন না, কোন্ ছুতোয় সেটা বিদ্যালয়ের মান বাঁচিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি স্কুল-সরস্বতীর তক্‌মা-পরা ফৌজের দল সবাই ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াল, কেউ একটু ফাঁক দিল না। অবশেষে গুড কন্‌ডাক্টের নাম নিয়ে ছন্দোমালা নামক একখানি অত্যন্ত সঙ্কুচিত চটিবই এঁটো বাঁচিয়ে পরিবেশন করার মত বড় আলগোচে আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার উপলক্ষে নিদানশাস্ত্রের অন্যান্য রোগের চেয়ে মাথা ধরাটাই সব চেয়ে ভালো সহায় ছিল, কোনও ডাক্তার নাড়ী টিপে বা ষ্টেথেস্‌কোপ দিয়ে তার কিনারা পেতেন না। তেমনি গুড কন্‌ডাক্টটা যে কোন্‌খানে, তা পরীক্ষার মার্কা গণনায় নিশ্চিত ঠাহর করবার উপায় ছিল না। তাই ঐ ফাঁকে আমার জীবনে প্রথম পাব্লিক সম্মান লাভ করেছিলাম।

যাই হোক্, সে দিন আমরা ছিলাম গ্রীষ্মকালের শুষ্ক জলাশয়ের মাছ। আজ চারিদিকে দেখি প্রায় ভরা গাঙ। প্রাণের জোয়ার এসেছে, ছোট বড় কেউ কোথাও আজ নিরুৎসুক হয়ে নেই। একটা কিসের প্রত্যাশায় হাওয়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাই বল্‌ছি, এই যে পরম সুযোগ পেয়েছ, এর জন্যে তোমাদের পরে আমার ঈর্ষ্যা হয়। যে সময়ে প্রাণের হাওয়া দিয়েছে, এই সময়ে তোমাদের তরুণ চিত্ত যদি জাগ্রত থাকে, যদি নোট দিয়ে চাপা প'ড়ে না থাকে, তা হ'লে নিত্য নূতন জ্ঞানের আলোকে, নিত্য নূতন ভাবের রসে তোমাদের জীবনে যে ফুল ফুটতে পারে, যে ফল ফলতে পারে, তা কল্পনা ক'রে আমার মন ব্যাকুল হয়ে বলে, "আজ কেন তুমি উল্টো রথে চল্‌তে পার না, তোমার কুষ্ঠীর ষোল বছরের মুখে, আজ কেন তোমার এই মঞ্চে স্থান, ছেলেদের ঐ বেঞ্চিতে কেন তোমার যায়গা হ'ল না?" আজ ত দেখতে পাচ্ছি, দেশের জন্যে যখন বড় রকম ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তখন তোমাদের উপরই ডাক আসে, মার খাবার জন্যে ডাক, বিপদে পড়বার জন্যে ডাক। তার কারণ, আজ তোমরা ত' ঘরের আঙ্গিনায় নেই, আজ তোমরা সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছ। এম্‌নি ক'রে তোমরা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছ বলেই দুঃখের ভার বহন করবার গৌরব তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

দেশের উচ্চ আকাশ থেকে এই যে একটি দৈববাণী

এসে দেশের প্রত্যেক ছেলেকে বল্‌ছে, চেয়ে দেখ, তোমার সাম্‌নে একটি পরম ভবিষ্যৎ আছে, সে দিন এই বাণী বাহির থেকে আমাদের কাছে আসেনি। সে দিন আমাদের কাছে দারোগাগিরি কেরাণীগিরির প্রতীক্ষা ছিল। ক্ষ্যাপামি কোথাও কিছু ছিল না, তা নয়, কিন্তু সে ছিল কোণে-কানাচে ক্বচিৎ কোথাও; উনপঞ্চাশ বায়ু তখন ঈশানকোণ থেকে তার ধ্বজা তুলে আসেনি। আজ দেখি, হৃদয়ে তুফান উঠেছে সর্ব্বত্র, প্রাণের স্পন্দন আজ দেশব্যাপী, সেই প্রাণ-সমুদ্রের তরঙ্গে আজ তোমাদের চিত্ত আন্দোলিত। দেশের মহোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তোমরা স্বাগতসম্ভাষণে অভ্যর্থনা ক'রে নেবে, তোমাদের প্রাণ-ধনমানের অর্ঘ্য তার আগমনদ্বারে প্রস্তুত রেখে দেবে, তোমাদের কাছে এই আমন্ত্রণ এসেছে। জীবনে সকলের চেয়ে বড় যে অধিকার, সেই ত্যাগের অধিকার তোমরা পেয়েছ। এই অধিকার ত সহজে সবাই পায় না, কখনও অক্ষমতা বশতঃ, কখনও ডাক আসেনি ব'লে, কখনও পায় না, তার কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই। আজ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। আজ দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য অপমান নীরব হয়ে নেই, আজ তার ক্রন্দন জেগে উঠেছে। বল্‌ছে, আনো তোমাদের যা কিছু আছে, অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, নব-জীবনের সাধনায় অর্পণ কর সমস্তই। যে কালের মধ্যে এই বাণী নেই, সেই কালে মানুষের সম্মান নেই। যে কালে মানুষকে বলে অসাধ্যসাধন করতে, দুঃখ সহ্য করতে, মৃত্যু বরণ করতে, সেই কাল ধন্য, সেই কালেই মনুষ্যত্বের সম্মান। আজকের দিনে বাঙ্গালা দেশে যে কেহ জন্মেছে, সকলেরই কানে এই কথা এসেছে যে, আত্মার শক্তি অজেয়, এখন সেই মহাবাক্য প্রমাণ করবার ভার তোমাদের প্রত্যেকের। আজ দেশের প্রত্যেক সন্তানের পক্ষে শুভদিন। জানি, তোমাদের যখন বয়স হবে, তখন তোমাদের মধ্যে অনেকে আজ যে সঙ্কল্প করেছ, সে দিন হয় ত তা সফল করতে পারবে না; আজ যে পথে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছ, সে পথ থেকে হয় ত ভ্রষ্ট হ'তেও পার; কিন্তু একবার তরুণ বয়সে যে কল্পনায় মনকে সমাবিষ্ট করে, ভিতর থেকে তা কখনই একেবারে মরে না; আজ যদি তার পাতা ঝরেও যায়, পরবর্ত্তী কালের বসন্তে তা পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। পরবর্ত্তী যুগকে তোমাদের লোহার সিন্দুকে সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ দেবে না, বিষয়-সম্পত্তি দেবে না, তোমাদের আজকের দিনের অসম্পূর্ণ কর্ম্ম-কল্পনার যে অবশেষ তোমাদের গূঢ় চৈতন্যের ভাণ্ডারে গোপনে জমা হয়ে রইল—সেই জিনিষটি দিয়ে যাবে। তোমরা ভাবী দেশের যে বিরাট মূর্ত্তি ধ্যান করেছ, সেই ধ্যানটি ভাবী কালের মূর্ত্তি-রচয়িতার মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে; তোমাদের অকৃতার্থ জীবনের মধ্যেও যা চিরন্তন, তা কখনই নষ্ট হবে না।

তাই তোমাদের বলছি, আজ তোমরা বড় ক'রে ভাবতে শেখ, বড় ক'রে কামনা কর, ছোট কথা নিয়ে কলহ করো না, পরস্পর ঈর্ষ্যা করো না, উদার হৃদয়ে ক্ষমা করতে জানো। স্তব্ধ হয়ে কায কর, কাযের ভিতর শান্তি থাকা চাই। সেই শান্তিই কাযের ভিতরকার শক্তির আধার। শান্তিতে কর্ম্মের দীনতা ঘুচে যায়, তার অপব্যয় নিবারণ হয়। জাপানে থাকতে সেখানকার এক জন লোক আমাকে বলেছিলেন, তোমরা শক্তিকে রক্ষা করতে শেখনি, কোলাহল করাটাকেই তোমরা কাযের সব প্রধান অঙ্গ ব'লে জানো; আফিসের সাইনবোর্ড রঙিয়ে তুলতেই তোমাদের মূলধন খরচ হয়ে যায়, তার পরে ব্যবসা আর চলে না। বহুকাল থেকে দেশে এই দশাই দেখছি বটে, আমাদের মোটা অক্ষরে হেডলাইন আস্ফালনের তৃষ্ণা আর মেটে না। আগুন খুব মস্ত ক'রে জ্বেলে কাঠগুলো ভস্মসাৎ করা হ'ল, তার পরে রান্না চড়িয়ে দেখি, আগুনের বদলে ছাই দিয়ে রান্না এগোয় না। তাই বলছি, অতি বড় দায়িত্ব রয়েছে সকলের উপর; উত্তেজনাকে মজ্জার ভিতরে—রক্তের ভিতরে রেখে দাও। প্রাণের প্রবলতম ঔৎসুক্যকে স্তব্ধতার ভিতর নিঃশব্দে পালন কর। তা যদি পার, তা হ'লে তোমাদের কর্ম্ম কখনও ফতুর হবে না, দুর্ব্বল হবে না। কথায় কথায় বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ানোকেই বীরত্ব মনে করে তারাই—যাদের পৌরুষ কৃত্রিম এবং অগভীর, কলহ করাকে তারাই যুদ্ধ করা ভাবে, অসৌজন্যকেই তারা আত্মসম্মানের জয়ঘোষণা ব'লে ঠিক করেছে। আমাদের কর্ম্ম অনুষ্ঠান বার বার কেন দুর্ব্বল হয়ে গেছে, তার কারণ কি নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে না? তার একমাত্র কারণ এই যে, উত্তেজনাকে সম্ভোগ করবার জন্যে আমাদের এত বেশী উৎসাহ যে, কাযটাকে সিদ্ধ করবার জন্যে সে উৎসাহ বেশী

বাকী থাকে না। বস্তুতঃই এটা সাধনার ছদ্মবেশে ভোগ-সুখে মত্ত হওয়া। তপস্যায় যে কর্ম্ম যোগবলেই সিদ্ধ হ'তে পারে, সে কর্ম্ম ভোগাসক্তদের দ্বারা হ'তে পারে না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ত্যাগের ভেক ধারণ করা, জেলখানার অভিমুখে হল্লা ক'রে ছুটে যাওয়া, ধুমধাম ক'রে দুঃখ পাওয়া, অবশেষে সেই দুঃখের পরিমাণ ও অন্যায্যতা নিয়ে খবরের কাগজে কোন্দল করা অবস্থাবিশেষে এ সমস্তও ভোগাসক্তি, এতেও শক্তিনাশ হয়, কর্ম্মনাশ হয়।

আশা করি, আমার এই কথাগুলিকে বাক্যবিশারদের সদুপদেশ ব'লে দূর থেকে গ্রহণ করবে না। আমাকে তোমাদের কাছাকাছি ক'রে জেনো, তোমাদের সহকর্ম্মী সহযাত্রিরূপে। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাই—যখন নিজের কাযের ব্যাখ্যা করতে হয়। এত দিন করিনি, আজ আমার কাযের কথা বল্‌তে বেরিয়েচি, তার কারণ, আমার কর্ম্মকে তোমাদের হাতে তুলে দেবার সময় এসেছে। আমার এই দিনান্তকালে তোমাদের শুনতে হবে, কেবল যে কি চিন্তা করছি, তা নয়, কি সঙ্কল্প করছি, কি কায করছি। আমার কাযের ভিতর দিয়েই আমি নিজেকে তোমাদের সুহৃদ্‌রূপে পরিচয় দিতে চাই। সে সব কথা যথাসময়ে বলব, তোমরা শুন্‌তে পাবে। তার আগে, তোমাদের কর্ম্মের সঙ্গিরূপেই আজ আমি বল্‌তে চাই, অন্তরে বাহিরে গভীরভাবে শান্তিকে রক্ষা ক'রে দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হও। রেলগাড়ীকে মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে বাঁশী ফুঁক্‌তে হয়, কিন্তু যদি আপন চলা ঘোষণা করবার জন্যে নিরন্তর বাঁশী ফুঁকেই রেলগাড়ী আপন সমস্ত ষ্টীম ফুরিয়ে ফেলে, তা হ'লে তার চাকা চল্‌বে না, কিছুকালের জন্যে কেবল বাঁশীই চল্‌বে। শক্তির দায়িত্ব আছে, যে কর্ম্মী খাঁটি, শক্তি সম্বন্ধে সেই মিতব্যয়ী হয়; সে তার সমস্ত মূলধন কর্ম্মকে সাধন করবার জন্যেই রাখে, নিজেকে প্রচার করবার জন্যে একটুও বাজে খরচ করে না। বাহিরে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ধ্যানকে বিশুদ্ধ রাখতে হয়; গীতা এই কথাই বলেছেন, যখন বলেছেন, যোগযুক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। শান্তির দ্বারা, শক্তি সম্বন্ধে মিতাচারের দ্বারা এই ধ্যান, এই যোগ বিশুদ্ধ থাকে, এবং ধ্যানের দ্বারা—যোগের দ্বারাই আমাদের কর্ম্ম সকল প্রকার ভ্রষ্টতা থেকে অবসাদ থেকে রক্ষা পায়। এই শান্ত সমাহিত যোগযুক্ত কর্ম্মই অসাধ্য-সাধন করে, এই কর্ম্মই সৃষ্টি-সাধনের কর্ম্ম, এই ধৈর্য্যসুদৃঢ় অহমিকামুক্ত কর্ম্মেই আত্মার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঢাকা কার্জ্জন-হল—ষ্টুডেণ্টস্ য়ুনিয়ন।

আনমনে

(মাসিক বসুমতীর চৈত্র-সংখ্যার চিত্র-দর্শনে)

এ মেয়েটি বেশ;
আল্‌গা বেঁধে কেশ,
দেয়ালে দিয়ে ঠেস
ব'সে ব'সে হাসছে দিদি মুখটি টিপে টিপে।
তুলোর সল্‌তে জ্বল্‌ছে যেন পূজোর প্রদীপে॥

আপনি আছে, আপনার কাছে,
ভাবনা নাইকো আগে পাছে,
একার কাছে একাই আছে অমনি আন্‌মনে।
উঠছে কিশোর কাঠে ধূসর ধোঁয়া হয়নি আগুন-গন্‌গনে॥

বেলা কাটাবার কোন ফন্দি
পায় না খুঁজে অন্ধি-সন্ধি,
পুতুলগুলি বাক্সবন্দী,
ইন্দুমুখী নন্দিনী তাই রয়েছে আন্‌মনে।
ঝিয়ের বেলা ফুরিয়ে গেল সাজ্‌তে বিয়ের ক'নে॥

অবনী বাবুর ছবির দাবী কবির মুখের আহা।
বাঙ্গালী মেয়ে আঁকেন ভাল ভবানীচরণ লাহা॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

দ্যূতসভায় দ্রৌপদী হইলেন প্রধান মূর্ত্তি। কেবল দ্যূতসভায় নহে, দ্রৌপদী হইলেন সমগ্র মহাভারতের নায়িকা। দ্রৌপদী কল্পনা বুঝিতে হইলে তাঁহার পিতা দ্রুপদ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

উপরে লিখিয়াছি, "দ্রু দ্রুম" যাহাকে দ্রু বলে, তাহাকে দ্রুম বলে। দ্রু-পুং (দ্রু+ড্ অধি) (পক্ষিগণ) গমন করে ইহাতে। এ স্থলে কথার খেলাতে পক্ষিগণ দ্বিজ কথা স্থানে বসিয়াছে। তাহা হইলে দ্রুপদ হইল ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়; যজ্ঞের সহিত দ্বিজগণের সম্বন্ধ—বলা বাহুল্য, একান্ত ঘনিষ্ঠ। সেই যজ্ঞকারী ত্রিবর্ণের আশ্রয়স্থান এরূপ পিতার কন্যা হইলেন যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী। দ্রুপদ কথার তলে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা গভীর অর্থ আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—

"লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুদ্রুমসংস্থিতঃ।"

২৮-৮, বিষ্ণুপুরাণ।

তাহা হইলে দ্রু হইল শ্রীবিষ্ণু বা পরমাত্মা। পদ কথার নানা অর্থ হইতে পারে। পদং পদনীয়ং প্রাপ্যং।

৫০-৩৬, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

আশ্রয় লয় স্থান ইত্যাদি। যেমন -

"সর্ব্বজিহ্মং মৃত্যুপদং আর্জ্জবং ব্রহ্মণঃ পদম্।"

২১-৭৯, শান্তিপর্ব্ব।

দ্রুপদ হইলেন, পৃষত্যাতনয় পার্ষত। পৃষত্যা কথার অর্থ চিত্র হরিণ। ১০-১০, স্ত্রীপর্ব্ব।

হরিণ কথায় শ্বেত শুদ্ধ বুঝায়। ১২১-১৭, অনুশাসনপর্ব্ব।

এই কথাগুলি একত্র করিলে অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে কেন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়।

দ্রৌপদী কে? পুরাণে লিখিত আছে, সীতার যখন অগ্নিপরীক্ষা হয়, তখন প্রকৃত সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার ছায়ামাত্র প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সীতা পুনরায় দ্রুপদ রাজার যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত হয়েন।

মহাভারতে দ্রৌপদী সম্বন্ধে আর এক প্রকার উপকথা বা আখ্যায়িকা আছে। এক দিন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গঙ্গাতীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কতকগুলি সুবর্ণপদ্ম গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে; পদ্মগুলির অনুসরণ করিতে করিতে গিয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কলসে গঙ্গার জল ভরিতেছিলেন। তাঁহারই চক্ষু হইতে পতিত অশ্রুবিন্দু সুবর্ণপদ্ম হইয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিল। ইন্দ্র সেই কামিনীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কি জন্য কাঁদিতেছ?' কামিনীটি বলিলেন, 'আমি স্বর্গলক্ষ্মী, আমি কি জন্য কাঁদিতেছি, যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার সহিত এস।' ইন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করিলেন। উভয়ে যাইতে যাইতে এক স্থানে গিয়া দেখিলেন, হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছেন। ইন্দ্র একটু রুষ্ট হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং কিছু চোটপাটও করিলেন। মহাদেব তখন পার্ব্বতীর সহিত পাশা খেলিতে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্রকে কিছু উত্তর করিলেন না; কেবল একবারমাত্র তাঁহার দিকে তাকাইলেন; ফল এই হইল যে, ইন্দ্র এক গুহামধ্যে আবদ্ধ হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, তাঁহার মত আরও চারি জন ইন্দ্র সেই গুহামধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই আখ্যায়িকার তলে যে রহস্য আছে, তাহা এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব।

যখন স্থির হইল, পৃথিবীর ভার অপনয়নের নিমিত্ত বিষ্ণু স্বয়ং ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত আরও অনেকে নানা রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে আসিলেন। শচীর অংশে দ্রৌপদী অবতীর্ণা হইলেন; এই কারণে স্বর্গলক্ষ্মী শচী ইন্দ্রগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইন্দ্র

হইলেন যজ্ঞাভিমানী দেবতা, স্বর্গের সহিত যজ্ঞের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; সেই স্বর্গের রাজা হইলেন ইন্দ্র ; আর শচী বা দ্রৌপদী হইলেন স্বর্গলক্ষ্মী অর্থাৎ যজ্ঞাভিমানী দেবতা, ইন্দ্রের স্ত্রী। তাহা হইলে যজ্ঞের সহিত দ্রৌপদীর সম্বন্ধ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

দ্রুপদরাজ দ্রোণের হস্তে অতিশয় লাঞ্ছিত হন, তিনি বুঝিলেন, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের তুল্য হইতে পারে না। সেই কারণে এই উদ্দেশে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যে দ্রোণকে বধ করিতে পারিবে, এইরূপ তাঁহার যেন একটি পুত্র জন্মে। দ্রুপদ অন্বেষণ করিতে করিতে গঙ্গাকূলে কল্মাষপাদ নামক রাজার পুরীসমীপে যাজ ও উপযাজ নামে দুই জন ব্রাহ্মণকে পাইলেন, ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাজ লোভদোষে ঈষৎ দূষিত ছিলেন ; কনিষ্ঠ উপযাজের কোন দোষ ছিল না ; পরন্তু তিনি (অকামং উপযাজং) নিষ্কাম ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া দ্রুপদের পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলেন। যখন আহুতি প্রদানের সময় উপস্থিত হইল, তখন যাজ দ্রুপদরাজ-মহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি হবির্গ্রহণের নিমিত্ত শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর, তোমার পুত্র-কন্যা উপস্থিত হইয়াছে।' রাজ্ঞী তাঁহাকে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যাজ বলিলেন, "তুমি এস বা থাক, অবশ্যই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

> যাজেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজাভিমন্ত্রিতম্।
> কথং কামাং ন সন্দধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রো হি তিষ্ঠ বা ॥
> ৩৮—১৬৭ আদিপর্ব্ব।

শ্রপিতং পক্কম্ ক্ষেত্রম্ রেতঃসেকঞ্চ বিনা আবয়োঃ ামর্থ্যান্মিথুনমুৎপৎস্যত ইত্যর্থঃ।

যাজ কহিলেন যে, হব্য বস্তু উপযাজ কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত ইয়া আমা কর্ত্তৃক পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তুমি এস বা থাক, অবশ্যই তদ্দ্বারা কামনাসিদ্ধি হইবে। তখন হুত হুতাশনে ংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিবামাত্র সেই পাবক ইতে এক কুমার ও বেদীমধ্য হইতে এক কুমারী উত্থিতা ইল। সেই কন্যা দ্রৌপদী।

এই আখ্যায়িকার প্রতি কথার তলে নিগূঢ় অর্থ আছে। াজ ও উপযাজ সকাম ও নিষ্কাম যজ্ঞকারীর প্রতিরূপ। খন যাজের আহ্বানে দ্রুপদরাজ্ঞী কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে বলিলেন, তখন যাজ বলিলেন, আমাদেরই সামর্থ্য (বীর্য্য) হেতু দুই জনেই উৎপন্ন হইবে। 'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি' তাহা হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী উভয়ে হইলেন, যাজ ও উপযাজের স্বরূপ। দ্রৌপদী বেদী হইতে উত্থিতা হইলেন। তাঁহারও নাম বেদবতী, তিনিও ক্রোশব্যাপী গন্ধবিশিষ্টা ছিলেন।

আখ্যায়িকার মতে দ্রৌপদী পূর্ণাবয়বরূপে বেদী হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন, এই বেদী কি? যদি নদ ও নদী এক কথা হয়, তাহা হইলে বেদী ও বেদ এ উভয়ে প্রভেদ থাকিল না।

এ সকল কথার সহিত আমাদের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছে। ধীবর-কন্যা ব্যাসদেবের মাতার নাম সত্যবতী, বেদবতী, যোজনগন্ধা ইত্যাদি। তবে ব্যাসদেবের মাতা ছিলেন যোজনগন্ধা, দ্রৌপদী হইলেন ক্রোশগন্ধা। এরূপ প্রভেদ করিবার কারণ আমরা পরে বুঝিব।

কোন কোন স্থানে বেদ অর্থে কেবল কর্ম্মকাণ্ড বুঝায়। যোগকে উপাসনাকাণ্ড বলে, আর সবিজ্ঞান বলিলে জ্ঞানকাণ্ড বুঝায়।

> "ভূতস্থানানি সর্ব্বাণি রহস্যং ত্রিবিধঞ্চ যৎ।
> বেদো যোগঃ সবিজ্ঞানো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ ॥"

দ্রৌপদী হইলেন যজ্ঞ অথবা যজ্ঞকাণ্ডের অভিমানিনী দেবতা, ইঁহার অপর নাম যাজ্ঞসেনী। সেন শব্দ উপলক্ষিত অর্থে ব্যবহার হয় ; যেমন—সমুদ্রসেন, বসুসেন।

কথা হইতে পারে, যাজ ও উপযাজ সকাম ও নিষ্কাম যজ্ঞ ; দ্রৌপদী কাহার প্রতিরূপ? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু উত্তর শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

যখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইতেছিল, তখন পঞ্চ পাণ্ডব ব্রাহ্মণ সাজিয়া মাতার সহিত পাঞ্চাল নগরে এক কুমারের গৃহে বাস করিতেছিলেন। স্বয়ংবরস্থলে লক্ষ্য ভেদ করিয়া অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে সেই কুমারের গৃহে লইয়া আইসেন। এ স্থলে বোধ হয় একটু রহস্য আছে।

> গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং
> পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।
> তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতৌ
> ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ ॥
> ১—১৯১ আদিপর্ব্ব।

কুরুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন যখন ভার্গবগৃহে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

ভার্গবকর্ম্মশালা কথার তলে বোধ হয়, একটু নিগূঢ় অর্থ আছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নাম ভার্গব। পরশুরামকেও ভার্গব বলে, ভৃগুমুনির পুত্রের নাম চ্যবন, তাহাকে যদি ভার্গব বলা যায়, তাহা হইলে এ রহস্যের কিছু মর্ম্ম বুঝা যাইতে পারে। চ্যবনধর্ম্ম বলিয়া একটি কথা আছে। যজ্ঞ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্বর্গভোগ করিয়া সুকৃতিক্ষয় হইলে পুনরায় স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়; ইহাকে চ্যবনধর্ম্ম বলে। পঞ্চপাণ্ডব পূর্ব্বজন্মে পঞ্চ ইন্দ্র ছিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞাভিমানী দেবতা ছিলেন। দ্রৌপদী হইলেন যাজ্ঞসেনী, পূর্ব্ব জন্মে স্বর্গলক্ষ্মী ছিলেন। চ্যবনধর্ম্মের সহিত এই কথাগুলির সম্বন্ধ আছে, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই বুঝা যায়। বোধ হয়, সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর মিলন কবি ভার্গবগৃহে করাইলেন।

শেষকালে একটু কৌতুকের কথা আছে। বৈদেহী লব-কুশের মা ছিলেন। কুশীলব অর্থে নট গায়ক, বিদেহ অর্থে মাগধ, বিদেহাঃ স্তুতিপাঠকাঃ; যাহারা গান করিয়া বেড়াইত। কিন্তু বিদেহ কথার অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে; সীতা বিদেহ-রাজার কন্যা অর্থাৎ অশরীরী এক কাল্পনিক রাজার কন্যা। সেই অর্থে বৈদেহী হইলেন এক কাল্পনিক অপ্রকৃত সৃষ্টি। দ্রৌপদীর নাম পাঞ্চালী। পাঞ্চালী কথার এক অর্থ পাঞ্চালরাজদুহিতা। ইহার অন্য অর্থও আছে।

পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্রদন্তাদিভিঃ কৃতা

—অমরকোষ।

পাঞ্চালিকা পুত্রিকা শব্দে বস্ত্র, দন্ত প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত পুত্তলিকা (পুতুল) বুঝায়। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, কবি ইঙ্গিত দিয়াছেন, পাঞ্চালী বলিয়া যে স্ত্রীলোক আমরা মনে করি, তাহা একটি কাল্পনিক পুত্তলিকা মাত্র এবং শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কল্পনা-প্রসূত পুত্তলিকাতে কতকগুলি স্ত্রীলোকের গুণ আরোপিত করিয়াছেন। আর এক কথা, সীতা জনের কন্যা। জন ও জনক একই কথা; জনককে জনরাজ বলিত। দ্রৌপদী অর্জ্জুনরূপী নরের স্ত্রী।

দ্রৌপদী কল্পনার মূল কি, তাহা এখন কিছু বুঝা যাইতে পারে। যজ্ঞের অধিকারী, দ্বিজ, ত্রিবর্ণদিগের আশ্রয়স্থল দ্রুপদ হইলেন তাঁহার পিতা। তিনি হইলেন পৃষত-তনয়, অর্থাৎ শুক্ল, নিষ্পাপ। তাঁহার নাম যজ্ঞসেন, অর্থাৎ যজ্ঞ যাঁহার কেতু। যাজ ও উপযাজ নামে সুকাম ও নিষ্কাম দুই জন ভ্রাতার যজ্ঞপ্রভাবে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হইতে এবং পূর্ণাবয়বা দ্রৌপদী জ্ঞান অথবা বেদ হইতে উত্থিতা হয়েন। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞপ্রভাবে শুদ্ধ চৈতন্য রামের জন্ম হয়, আর সকাম ও নিষ্কাম যাজ ও উপযাজের যজ্ঞপ্রভাবে দ্রৌপদীর জন্ম হয়।

এই দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে স্বর্গলক্ষ্মী ইন্দ্রের শচী ছিলেন। অর্থাৎ যজ্ঞাভিমানী ইন্দ্রের লক্ষ্মী ছিলেন। তাহা হইলে দ্রৌপদী হইলেন যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা; কর্ম্মকাণ্ড অথবা যজ্ঞকাণ্ড বেদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ বেদের অংশ। দ্রৌপদী যজ্ঞের অভিমানিনী দেবতা, কি কারণে মহাভারতে নায়িকা হইল, তাহা পরে বুঝা যাইবে।

সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আরও জন কয়েকের পরিচয় প্রয়োজন। স্বয়ং ধর্ম্ম বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথা তাঁহার নামেও প্রকাশ পায়। বিদ্ ধাতু হইতে বেদ কথা সাধিত হইয়াছে; সেই বিদ্ ধাতু হইতে বিদুর কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদুর কথার অর্থ জ্ঞানী, বেদজ্ঞ। এ কথার কবি অনেক স্থলে ইঙ্গিত দিয়াছেন। বিদুরের বিশেষণ কবি প্রায় দিয়াছেন মহা-প্রাজ্ঞ; এক স্থলে (১৫—১৮ সভাপর্ব্ব) যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন, হে কবে! কবি কথার অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—সর্ব্বজ্ঞ বেদজ্ঞ। বিদুর হইলেন শূদ্রাণীগর্ভে জাত; অতএব বেদে অধিকার নাই, কবি এ ভাবটি এক স্থানে সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছেন। যখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন, তখন যে স্থলে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিতে হইবে, সে স্থলে কবি বিদুরকে দিয়া না বলাইয়া সনৎসুজাতকে দিয়া বলাইলেন। তথাপি বিদুর যে বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা এককালে বলা যায় না

বিদুর এই দ্যূতক্রীড়ায় বলিতেছেন, শৃণু মে কাব্যাং গিরঃ। কবি অর্থে যদি বেদজ্ঞ হয়, তাহা হইলে কাব্যাং গিরঃ—অর্থে বেদ সদৃশী অথবা বৈদিকী কথা যে না হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। বিদুর সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। মহাভারতে সকলেই কিছু না কিছু ভুল অথবা প্রমাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদুরের ও গান্ধারীর সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তিনি সকল সময়েই ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি। শূদ্রাণীর গর্ভজাত বিদুরের এই কল্পনা তৎকালে সমাজে শূদ্রদিগের স্থান বুঝিবার জন্য বিশেষ চিন্তা করিবার সামগ্রী।

দ্রোণাচার্য্য কে? দ্রোণ-চরিত্রে দুই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুণ তাঁহাতে মিলিত রহিয়াছে। যিনি বেদ শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলে। দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেন; সেই কারণে তাঁহার নাম দ্রোণাচার্য্য। আমার বোধ হয়, ধনু কথাটি ধেনু কথার রূপান্তর, আকার ও একারের পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে না, তাহা বলা যায় না।

আহারনিয়মং কৃত্বা মুনির্দ্বাদশবার্ষিকম্।
মরুং সংসাধ্য যত্নেন রাজা ভবতি পার্থিবঃ॥
৪৪—১৪২ অনুশাসনপর্ব্ব।

টীকাকার মরুসাধনং স্থানে লিখিতেছেন; মরুসাধনং মেরুসাধনং ইতি পর্য্যায়ঃ।

মরু ও মেরু যদি এক কথা হয়, তাহা হইলে ধনু ও ধেনু যে এক কথা নয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। ধেনু কথার অর্থ গো, গো শব্দে বেদ বুঝায়। তাহা হইলে দ্রোণাচার্য্য কি শিক্ষা দিতেন? মহাভারতে নানা স্থানে অস্ত্র ও শস্ত্র কথা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শস্ত্র ও শাস্ত্র কথা সচরাচর ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে উভয়েই এক কথা হয়। যেমন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শব ইব শাব, রব ইব রাব ইত্যাদি। মহাভারতে এক স্থানে দেখিতে পাই, ধনুর্ব্বেদ অর্থে বিষ্ণু।

দ্রু+উণ এইরূপে দ্রোণ কথা সাধিত হইতে পারে। দ্রবিণ কথায় যে দ্র আছে, আর দ্রোণ কথার দ্র যদি এক হয়, তাহা হইলে দ্রোণ কথায় রত্ন অর্থাৎ জ্ঞানের কিছু হীনতা বা ত্রুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দ্রোণাচার্য্যের বংশ দেখিতে গেলে জ্ঞানের হীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। দ্রোণ হইলেন ভরদ্বাজের পুত্র, ভরদ্বাজের মাতার নাম মমতা; বুদ্ধদেবের মাতার নাম মায়া। ম অর্থে মৃত্যু অথবা অবিদ্যা, এ কথা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সেই মমতা অথবা অবিদ্যা হইলেন উতথ্যের স্ত্রী, উতথ্য কথার উৎপত্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উ বিতর্কে তথ্যং সত্যং। উতথ্যের জ্যেষ্ঠ ভাই হইলেন বৃহস্পতি। চার্ব্বাক কথা, চারু+বাক্ এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। চার্ব্বাক মত তিনটি মত লইয়া গঠিত, প্রথম বৃহস্পতি, দ্বিতীয় আর্হত, তৃতীয় নাস্তিক। পুরাণের উপকথাটি এই—বৃহস্পতি নিজ কনিষ্ঠ উতথ্যের স্ত্রী মমতার নিকট উপগত হন, তৎকালে মমতার গর্ভে ভ্রূণ ছিল; বৃহস্পতি সেই গর্ভস্থিত-ভ্রূণকে অভিশাপ দেন যে, তুমি দীর্ঘতমা অর্থাৎ অন্ধ হইবে। এই ভাব পূর্ব্বে আমরা অম্বিকা ও ধৃতরাষ্ট্র কাহিনীতে দেখিয়াছি। দীর্ঘতমার সহিত বাঙ্গালা দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে কথা আমরা পরে দেখিব। যাহা হউক, নাস্তিক বৃহস্পতির ঔরসে অবিদ্যা মমতার গর্ভে ভরদ্বাজ ও দীর্ঘতমার জন্ম হয়; যাইবার সময় বৃহস্পতি মমতাকে বলিয়া গেলেন. তুমি এই দুইটি অজ অথবা ভ্রূণ ভর অর্থাৎ প্রতিপালন কর। বলা বাহুল্য, ভরদ্বাজ কথার তলে অনেক প্রকার রহস্য আছে; সে কথা আলোচনা পরে করিব। যাহাই হউক, নাস্তিক বৃহস্পতির পৌত্র দ্রোণে অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানতার ছায়া পড়িবে, তাহা সহজে বুঝা যায়।

ভীষ্ম কল্পনার মূল কি? তাহা বুঝা কঠিন নহে, ভীষ্ম হইলেন পিতামহ। মহাভারতে দুই ব্যক্তির উপাধি পিতামহ, এক জন হইলেন ব্যাস ও অপর ভীষ্ম। আখ্যায়িকা-পক্ষে উভয়েই পিতামহস্থানীয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতা হইলেন ব্যাস, জ্যেঠা হইলেন ভীষ্ম। কিন্তু পিতামহ কথার তলে একটু রহস্য আছে। দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতির সর্ব্ববাদিসম্মত পিতামহ হইলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপ হইতেই দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মাকে পিতামহ সম্বোধন সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অভিমানী দেবতার নাম ব্রহ্মা; যে বেদ, সেই ব্রহ্মা। ভীষ্ম পিতামহ অর্থাৎ তাঁহার কথা বেদ সদৃশ। পিতামহ জ্ঞান ও বেদ সদৃশ, এই ভাব আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই।

"তস্মৈ প্রোবাচ তৎসর্ব্বমেবং পৃষ্টঃ পিতামহঃ ।
সর্ব্বনিশ্চয়বিৎ প্রাজ্ঞঃ সংশয়ং পরিপৃচ্ছতে ॥"

৫—২৮ বনপর্ব্ব।

সকল বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞ প্রজ্ঞাবান্ পিতামহ প্রহ্লাদ সন্দিগ্ধচিত্ত পৌত্র বলি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে তৎসমুদয় কহিতে লাগিলেন। সর্ব্বনিশ্চয়বিৎ, প্রাজ্ঞ ও পিতামহ এই কথাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার কথা বেদ সদৃশ, যিনি মহাপ্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী, তিনি যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে কি করিয়া যুদ্ধ করিলেন? এ কথা কেবল ভীষ্মের পক্ষে খাটে, তাহা নহে; আচার্য্য দ্রোণ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর কবি দিয়াছেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ভূভার অবতরণের নিমিত্ত দেব-দেবীগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল দেবতারা এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে, অসুররাও এইরূপ কার্য্য করিয়াছিল। দানবগণ দুর্য্যোধনকে বলিতেছে :—

"ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেঽসুরাঃ ।
যৈরাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব বৈরিভিঃ ॥"

১১—২৫১ বনপর্ব্ব।

অপর অসুররাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরে অনুপ্রবেশ করিবে; সেই সমস্ত অসুর কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা দয়া পরিহার পূর্ব্বক তোমার অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

অসুর কথার অর্থ কি, তাহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কর্ণ কে, তাহাও বুঝিবার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে; রামায়ণের কুম্ভকর্ণের ন্যায় মহাভারতের কর্ণও শ্রুতির নামান্তর। কুম্ভকর্ণ বিশ্রবণের পুত্র; কিন্তু এই কর্ণ সূর্য্যপুত্র; সূর্য্যপুত্র কথা অর্কবন্ধু কথার রূপান্তর। অর্কবন্ধু বুদ্ধদেবের নাম।

"শাক্যমুনিস্তু যঃ ।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥"

—অমরকোষ।

তাহা হইলে অর্কপুত্র কর্ণ হইল বেদবিরোধী শ্রুতি।

কুন্তী কর্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"পাণ্ডবেষু কথং হার্দ্দং কুর্য্যান্ন চ পিতামহঃ ।
অয়ং ত্বেকো বৃথাদৃষ্টির্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেঃ ॥"

১৬—১৪৪ উদ্‌যোগপর্ব্ব।

এ স্থলে বৃথাদৃষ্টি কথার অর্থ মিথ্যাদর্শী।

দর্শন কথার এই ভাবে প্রয়োগ আমরা পরে অনেক স্থলে দেখিব। কর্ণ দুর্য্যোধনের মোহ উৎপাদন করেন।

"যো মুহ্যতাং মোহয়িতাদ্বিতীয়ো
বৈকর্ত্তনঃ কুশলং তস্য পৃচ্ছেঃ ।"

৩০—৩০ উদ্‌যোগপর্ব্ব।

যুদ্ধে দেবগণ ছিলেন অর্জ্জুনের পক্ষে, আর অসুরগণ ছিল কর্ণের পক্ষে। মোহ, দেব ও অসুর এ সকল কথার তাৎপর্য্য পরে দেখা যাইবে।

দুঃশাসন কল্পনার মূলে কি আছে, তাহা বুঝা কঠিন হইবে না। শাসন ও শাস্ত্র কথা শাস ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুঃশাসন অর্থে কু-শাস্ত্র, তাহা বুঝা যাইতেছে। তথাপি একটু রহস্য আছে; বুদ্ধদেবের নাম শাস্তা।

"মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥"

—অমরকোষ।

দুঃশাসনের হস্তেই প্রধানতঃ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হয়; শকুনি হইল গান্ধাররাজের পুত্র, শকুনির পুত্রের নাম উলূক। শকুনির পিতার নাম সুবল; সুবল হইল গরুড়ের পুত্র। গরুড়, সুবল, শকুনি, উলূক এই চারি পুরুষ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ পক্ষী কথার তলে বিলক্ষণ রহস্য আছে। খাণ্ডববন-দাহনকালে সকল প্রাণীই বিনষ্ট হয়, কেবল পাঁচটিমাত্র পক্ষী রক্ষা পায়। কবি এ পক্ষীদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়াছেন। পক্ষিমাতা নিজ সন্তানদিগকে বলিতেছে—তোমরা পাঁচ জন বেদের ঋষি। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দ্বিজ এবং পক্ষী লইয়া এই রহস্যটি রক্ষিত হইয়াছে। দ্বিজ অর্থে পক্ষী আরও অনেক স্থলে দেখিতে পাইব।

"স্বাধ্যায়েন কর্শিতং ব্রহ্মচারিণং মাং বিদ্ধি ।
তপসা মদেন যুক্তমাচার্য্যস্যাপ্রতিকূলভাষিণম্ ॥
এবং যুক্তমপাপং মাং বিদ্ধি ॥"

১৪—১৯৬ বনপর্ব্ব।

"গদামি বেদান্ বিচিনোমি চ্ছন্দঃ
সর্ব্ববেদা অক্ষরশো মে অধীতাঃ।"

১৫—১৯৬ বনপর্ব্ব।

শিবি রাজার উপাখ্যানে কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনপক্ষিরূপী ইন্দ্র হইতে ভীত হইয়া শিবি রাজার অঙ্কে পতিত হয়। কপোত বলিল, আমি মুনি ·· ·· ·· ··আপনি আমাকে স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রহ্মচারী, দম ও তপোযুক্ত, আচার্য্যের প্রতিকূলবাদী ও পাপরহিত জানিবেন। আমি বেদ প্রবচন করিয়া থাকি, আমার ছন্দোজ্ঞান আছে, আমি এক একটি অক্ষর করিয়া সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি।

গরুড়ের নানা রূপ আছে, গরুড় হইল অরুণের কনিষ্ঠ ভাই অর্থাৎ তাহার পরে জন্মিয়াছে। তাহা হইলে গরুড় হইল সূর্য্য, এ অর্থে শকুনি হইল সূর্য্যপুত্র অর্থাৎ অর্কবন্ধু। তাহা হইলে এ স্থলেও বৌদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু শকুনি কথার রহস্য বুঝিবার জন্য আর এক সহজ উপায় আছে। শকুনির পুত্রের নাম উলূক, উলূকের নামান্তর কৌশিক। এ স্থলে পুনরায় আমরা বেদ অপহারী বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ পাইলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল) ;

কিন্তু

নরের দেহ ধারণ ক'রে দৈত্য-দানব আছে
নানারূপে কষ্ট দেবেই তারা,
মিথ্যা গড়ার যন্ত্র ওরা হিংসা পিয়েই বাঁচে
মন যে তাদের সর্ব্ববিবেক-হারা।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি
থম্‌কে দাঁড়াও ন্যায়ের পথে থাকি,
দেবতা-দানা যা খুসী তাই পারবে তুমি হ'তে—
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

২

ভদ্রবেশী ভণ্ড সুহৃদ আগ্‌লে অনেক ঘাঁটী
মিথ্যা প্রচার করবে গলার জোরে,
কাগজ কালীর 'কালিয় পাকে'র লম্ফ পরিপাটী
হয় ত নিতুই চল্‌বে তোমার দোরে,
কিন্তু তুমি তাদের হাতে রক্ষা কেবল পেতে,
পালাও যদি অন্য সবায় রাখি
দেবতা-দানা যা খুসী তাই পারবে তুমি হ'তে---
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

৩

দৈত্য তাহার দীর্ঘ দশন হাসবে বাহির ক'রে—
ইচ্ছা তোমায় কড়মড়িয়ে খাবে,
পিশাচ আছে বন্ধুবেশে তীক্ষ্ণ ছুরি ধ'রে
ভাবছে তোমায় কখন্ বাগে পাবে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি—
পাপের সহিত সন্ধি কর ডাকি,
দেবতা-দানা যা খুসী তাই পারবে তুমি হ'তে—
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

আসবে বিপদ বাঘের মতন, হরির করুণাতে
মেষের মতন হতেই হবে তাকে,
দুঃখ আসে কষ্ট আসে দুঃখ কিবা তাতে,
বাইতে গেলেই পড়বে তরী পাকে।
কিন্তু তুমি তাহার ভয়ে হাল ছেড়ে দাও যদি
আপনাকে আপ্‌নি দেবে ফাঁকি,
দেবতা-দানা যা খুসী তাই পারবে তুমি হ'তে -
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

৫

সত্য এবং ধর্ম্মেরি জয় সহজ মুখে বলা
জীবনে তা প্রমাণ করা চাই,
সত্য চাহে বক্ষ দরাজ, চায় না ছলা-কলা
মিথ্যা সাথে মিত্রতা তার নাই।
দর্পহারী মধুসূদন পাপের বিনাশকারী
ভক্তে তাঁহার বক্ষে রাখেন ঢাকি,
এ সত্যে যে অবিশ্বাসী পতন হবে তারি—
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

৬

ক্ষমতার যে অপ-প্রয়োগ করছে দিবানিশি
অত্যাচারে আনন্দ যার পূরা,
মিথ্যা যাহার অস্ত্র প্রবল তাহার সাথে মিশি
অন্যে নভে গড়ুক গৃহের চূড়া।
কিন্তু তুমি তাদের সাথে মিল্‌তে চাহ যদি
শঙ্কিত হও দেখলে লোহিত আঁখি,
দেবতা-দানা যা খুসী তাই পারবে তুমি হ'তে—
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রলয়ের আলো

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অপ্রত্যাশিত পূর্ব্ব-ঘটনা।

কালনকি সলোমন কোহেনের উপবেশন-কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে রেবেকা তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, কোন কারণে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও গম্ভীর। অন্য সময় হইলে সলোমন কোহেন সর্ব্বপ্রথমেই তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিত, কালনকি কি উদ্দেশ্যে তাহার উপবেশন-কক্ষে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল? কিন্তু কালনকির প্রস্থানের পর সলোমন রেবেকাকে সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "রেবেকা, বড়ই দুঃসংবাদ আছে।"

রেবেকা বলিল, "সে সংবাদ আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি বাবা! জোসেফ পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে।"

সলোমন বলিল, "এ সংবাদ কোথায় শুনিলে?"

"কালনকি বলিয়া গিয়াছে।"

সলোমন সবিস্ময়ে বলিল, "কালনকি! কালনকি ইহা কিরূপে জানিতে পারিল?"

রেবেকা।—হাঁ, এই কথাই বলিবার জন্য সে এখানে আসিয়াছিল। সে আমাকে বলিয়া গেল—সে নিজেই পুলিসে খবর দিয়া জোসেফকে গ্রেপ্তার করাইয়াছে।

রেবেকার কথা শুনিয়া সলোমন হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কালনকি! কালনকির এমন কায?"

রেবেকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "হাঁ বাবা! সে ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে সয়তান। আমাদের খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। এই নরপিশাচ আমাদিগকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে! সে ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে।"

সলোমন কোহেন হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুমাল দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিল। সে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিল, বুঝিতে পারিল, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

কালনকি রেবেকাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, রেবেকা তাহার আদ্যোপান্ত ধীরে ধীরে তাহার পিতার গোচর করিল। সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ইহুদী মহাভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার বক্ষের স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল। সে হতাশভাবে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ সঙ্কটে পরিত্রাণের উপায় কি মা! ধন, মান, প্রাণ কিছুই যে রক্ষা করিতে পারিব না!"

রেবেকা সংযত স্বরে বলিল, "স্থির হও, বাবা! এ সময় অধীর হইয়া কোন লাভ নাই। এখন সতর্কতা ও কূটনীতির সাহায্যেই আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। বাবা! আমি নারী, আর আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ নহি; আমি কালনকিকে হাতে রাখিতে পারিব। কিন্তু জোসেফ ধরা পড়িয়াছে, ইহাই আশঙ্কার বিষয়। তাহার বিরুদ্ধে পুলিস ও গোয়েন্দারা কি প্রমাণ পাইবে, বুঝিতে পারিতেছি না। প্রমাণের উপরেই তাহার ভাগ্যফল নির্ভর করিতেছে। তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের যাহাতে অনিষ্ট হয়, এরূপ কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। কিন্তু জোসেফ আমাদের বাড়ীতে বাস করিত, সে তোমার আশ্রিত, ইহা পুলিসের অজ্ঞাত নহে; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ীতে পুলিসের

শুভাগমন হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য আমাদের ঘরে যে সকল গোপনীয় কাগজপত্র আছে, তাহা দগ্ধ করা বা পুলিসের হাতে না পড়ে, এরূপ স্থানে লুকাইয়া রাখা আবশ্যক। এ কাযে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না, বাবা! কালনকিকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার; সে যাহাতে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিব।"

সলোমন কোহেন আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইল। সে বুঝিতে পারিল, পুলিস যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার গৃহে খানাতল্লাসী আরম্ভ করিতে পারে; এই জন্য আর এক মিনিটও নিশ্চেষ্ট থাকিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

সলোমন রেবেকাকে বলিল, "তুমি অবিলম্বে জোসেফের শয়নকক্ষে গিয়া তাহার চিঠি-পত্র যাহা কিছু পাইবে, সমস্তই লইয়া আসিবে; যেন এক টুকরা কাগজ সেখানে পড়িয়া না থাকে। সেই কক্ষে তাহার একটি বাক্স আছে, যদি তাহা চাবি-বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বাক্সটি ভাঙ্গিয়া বাক্স হইতে কাগজপত্রগুলি সরাইতে হইবে। তাহার অপরাধের কোন প্রমাণ পুলিসের হস্তগত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই চাই। তুমি যাও, এখানে যাহা করিতে হয়, আমি করিতেছি।"

রেবেকা তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার উপবেশন-কক্ষ ত্যাগ করিল। সে প্রস্থান করিলে সলোমন ভিতর হইতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার ডেস্ক খুলিল। ডেস্কের একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠে ফিতা-বাঁধা চিঠির বাণ্ডিল ও কতকগুলি দলীল ছিল; সে সেগুলি হাতে লইয়া, একখানি চেয়ার সেই কক্ষের একটি দেওয়ালের কাছে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর একটি ছোট টেবল এক কোণ হইতে সেই স্থানে লইয়া আসিয়া, সে সেই চেয়ারখানি টেবলের উপর তুলিল। সলোমন টেবলের উপর দিয়া চেয়ারে উঠিল এবং কার্ণিসের কাছে হাত বাড়াইয়া সেই কক্ষের কাষ্ঠাবরণের এক অংশে ধাক্কা দিল; সেই ধাক্কায় কাঠের একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল; সেই দ্বারটি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, কাষ্ঠাবরণের বহির্ভাগ দেখিয়া, সেখানে যে কোন গুপ্তদ্বার আছে, ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই দ্বারের ভিতর দেওয়ালে একটি গুপ্ত গহ্বর ছিল। সলোমন সেই কাগজপত্রগুলি গুপ্ত গহ্বরগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারটি পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দিল। সেই গুপ্ত গহ্বরের অস্তিত্বের কথা না জানিলে সেখানে পুলিসের খানাতল্লাসের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সলোমন ভিন্ন অন্য কেহই ইহা জানিত না। পুলিসের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে বুঝিয়া সলোমন মনে মনে হাসিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর দুই হাতের ধুলা মুছিয়া ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "পুলিস আসিয়া আমার বাড়ী খানাতল্লাস করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। আমি প্রথম হইতেই সতর্ক আছি; কেবল এই কালনকিটাকেই পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই।"

রেবেকা জোসেফের শয়ন-কক্ষে যাইতেছিল, পথিমধ্যে কালনকির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কালনকি সেই দিকেরই একটা কুঠরীতে থাকিত। কালনকিকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া রেবেকা একটু খুসী হইল; কারণ, কালনকির সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাতের জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ডাকাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। রেবেকা কালনকির মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মানসিক অস্বচ্ছন্দতা বুঝিতে পারিল; সে তাহাকে অসঙ্কোচে বলিল, "তোমার মন বড় ভাল নাই। তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? আমাদের অপকার করিয়া তোমার মনে কষ্ট হইয়াছে না কি?"

কালনকি বলিল, "তুমি বলিলে 'আমাদের অপকার করিয়া', তুমি কি বলিতে চাও, আমি তোমার অপকার করিয়াছি?"

রেবেকা বলিল, "হাঁ, এ কথা কি মিথ্যা?"

কালনকি।—কুরেট ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে তোমার অপকার কি?

রেবেকা বলিল, "কুরেট আমাদের চাকরী করিত। সে অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ ছিল, আমার পিতা তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। তাহার মত কার্য্যদক্ষ, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে পুলিসের হাতে দিয়া তুমি আমাদের অপকার কর নাই?"

কালনকি বলিল, "অন্যায় কায করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। সে তাহার কৃত কর্ম্মের ফলভোগ

করিবে, আমি উপলক্ষ মাত্র; কিন্তু কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া বাজে কথায় আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ! প্রকৃত কথা এই যে, তুমি জোসেফ কুরেটকে ভালবাস; এই জন্য তাহার অপকারকে তোমার নিজের অপকার মনে করিতেছ।”

রেবেকা তাহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “আমি বলিয়াছি, উহা মিথ্যা কথা, তথাপি তুমি সেই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছ।”

কালনকি বলিল, “ভালবাসার কথাটা মিথ্যা হইতেও পারে; কিন্তু তুমি তাহাকে পছন্দ কর, এ কথাটা ত আর মিথ্যা নহে।”

রেবেকা বলিল, “হাঁ, পছন্দ করি। কেহ কাহাকেও পছন্দ করিলে কি খুব অপরাধ করা হয়?”

কালনকি বলিল, “না, অপরাধ হয় না বটে, কিন্তু এ যে অন্য রকম ব্যাপার। জোসেফ তোমাকে ভালবাসা দেখাইয়াছিল।”

রেবেকা বলিল, “হাঁ, সে আমার প্রতি ভালবাসা দেখাইয়াছিল।”

কালনকি বলিল, “সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম।”

রেবেকা বাধা দিয়া বলিল, “তুমিও ত আমার প্রতি ভালবাসা দেখাইয়াছিলে।”

কালনকি।—কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হয় নাই।

রেবেকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “অর্থাৎ?”

কালনকি।—অর্থাৎ তুমি আমার ভালবাসা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ; কিন্তু তাহাকে ত সে ভাবে প্রত্যাখ্যান কর নাই। আমি সব জানি।

রেবেকা রাগ করিয়া বলিল, “তুমি কচু জান! বারে বারে মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুমি কি জান, তোমাকে যে উত্তর দিয়াছি, তাহাকেও ঠিক সেই উত্তর দিয়াছিলাম? আমি তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলাম, তাহার প্রেমের প্রতিদান আমার নিকট লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

কালনকি স্থির দৃষ্টিতে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “রেবেকা, কি জন্য অসম্ভব, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।”

রেবেকা।—সে কথা তোমাকে বলিতেছি; তুমি সকল কথা শুনিলে, আশা করি, আমার প্রতি তোমার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইবে, এবং আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা তোমার বা অন্যের পক্ষে অসঙ্গত, ইহাও বুঝিতে পারিবে। কথা এই যে, আমি এক জনের বিবাহিতা পত্নী।”

কালনকি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিল, “অন্যের বিবাহিতা পত্নী? কে সে? তাহার পরিচয় কি?”

রেবেকা।—তাহার নাম শুনিয়া তোমার কোন লাভ নাই; এবং তাহার পরিচয়ও তোমার নিকট প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। তোমাকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, সে এখানে নাই, বহু দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। সে এখন জীবিত আছে কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত। এত দিন তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে; কারণ, আমি বহু দিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। সে জীবিত থাকিলে এত দিনের মধ্যে আমাকে চিঠিপত্র লিখিত না, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; তবে সে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক হইলে—সে স্বতন্ত্র কথা। তোমাকে সকল কথাই বলিলাম, শুনিয়া খুসী হইলে ত?

কালনকি মুখ ভার করিয়া বলিল, “হাঁ, খুসী হইবার মতই কথা বটে; কিন্তু তোমার সেই স্বামীও যদি সত্যই মরিয়া থাকে, তাহা হইলে?”

রেবেকা।—তাহা হইলে কি?

কালনকি ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “তাহা হইলে তোমার পত্যন্তর গ্রহণে আপত্তির কোন কারণ আছে কি?”

রেবেকা কালনকির প্রশ্ন শুনিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “হাঁ, ইচ্ছা হইলে আমি আর কাহাকেও পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও পারি, কিন্তু আমার এই ইচ্ছা কোন কোন অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে।”

কালনকি।—কিরূপ অবস্থা, জানিতে পারি কি?

রেবেকা।—কোন পুরুষ কোন নারীকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলে, সে যে সেই নারীর প্রেমের অযোগ্য নহে, ইহা তাহাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে। জোর করিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা আদায় করিতে পারে না; নারীর হৃদয় ভয় দেখাইয়া জয় করিবার বস্তু নহে।

কালনকি মাথা নাড়িয়া বলিল, “তাহা জানি ও মানি। আমি তোমাকে ভালবাসি, এই জন্যই তোমাকে পাইতে

চাই। আমি যে তোমার প্রেমের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেও প্রস্তুত আছি।"

রেবেকা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তাহার যে নমুনা দেখাইয়াছ, তাহাতেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রেমের যোগ্যতার চমৎকার পরিচয় দিয়াছ!"

কালনকি ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "রেবেকা, ঈর্ষাভরে মানুষ অনেক সময়ে হঠাৎ বিবেচনা-বহির্ভূত কায করিয়া বসে, কিন্তু সে জন্য অবশেষে তাহাকে পস্তাইতে হয়।"

রেবেকা।—তুমি যে কায করিয়াছ, সে জন্য কি অনুতপ্ত হইয়াছ?

কালনকি।—হাঁ, কতক পরিমাণে দুঃখিত হইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। দুঃখের প্রধান কারণ এই যে, আমার কার্য্যে তুমি মনে বেদনা পাইয়াছ; তোমাকে সুখী না করিয়া তোমার মনে বেদনা দিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই; তবে তাহার ফল পরে শোচনীয় না হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

রেবেকা আগ্রহভরে বলিল, "কিরূপে?"

কালনকি।—তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন আমার অসাধ্য; এখন শুধু ঘটনার গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। বল, আমাকে তুমি ঘৃণা কর না।

রেবেকা।—না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না।

কালনকি হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, রেবেকার হাতখানি তুলিয়া লইয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

রেবেকা মনে মনে বলিল, "আমাকে লাভ করিবার জন্য লোকটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! আমি উহাকে যদি রীতিমত শিক্ষা দিতে না-ও পারি, ও যাহাতে আমাদের আর কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

রেবেকা কালনকিকে পূর্ব্বে ঘৃণা না করিলেও তাহার ইতরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাইবার পর তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারে নাই; কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে ও কার্য্যসিদ্ধির জন্য সে সত্য কথা গোপন করিয়াছিল। রেবেকা বুঝিয়াছিল, এ সময় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদের বিপদের সীমা থাকিবে না। এই জন্য যে কোন কৌশলে কালনকিকে প্রতারিত করাই কর্ত্তব্য বলিয়া রেবেকার ধারণা হইয়াছিল। সলোমন নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল; রাজকর্ম্মচারিগণ কোন কারণে তাহাকে সন্দেহ করিলে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, তাহার প্রাণদণ্ডও হইতে পারে, ইহা রেবেকার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাদের যে কপট ও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর সাহায্যে পুলিস তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে, তাহাকে কৌশলে বশীভূত করিয়া অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। রেবেকা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। রেবেকা জানিত, সে ভিন্ন অন্য কেহ এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কালনকিকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া অবশেষে তাহার শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই রেবেকা তাহার সহিত কপট ব্যবহার আরম্ভ করিল।

রেবেকা কোহেনের অতীত জীবনের গুপ্ত-রহস্য তাহার পিতা ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। রেবেকা জোসেফ কুরেটের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেও তাহাকে বিবাহ করা অসম্ভব বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; একমাত্র কারণ, সে অন্যের বিবাহিতা পত্নী; কিন্তু রেবেকা জোসেফের নিকট কোন দিন এ কথা প্রকাশ না করিলেও কালনকির সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহার নিকট এই গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জোসেফ পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া ক্ষোভে, দুঃখে ও আশঙ্কায় রেবেকা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জোসেফের প্রতি তাহার ভালবাসা কত গভীর, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিল।

যাহা হউক, রেবেকা জোসেফের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, জোসেফের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ কোন কাগজপত্র দেখিতে পাইল না। জোসেফের টেবলের উপর একটি ছোট হাতবাক্স ছিল; বাক্সটি চাবিবন্ধ না থাকায় রেবেকা সহজেই তাহা খুলিতে পারিল। সে বাক্সের ভিতর একতাড়া চিঠি পাইল; চিঠিগুলি খুলিয়া পাঠ না করিয়া, সে সেই বাণ্ডিলটি বাহির করিয়া লইল। বাক্সে সে একখানি ফটোগ্রাফ দেখিতে

পাইল। ফটোখানি হাতে লইয়া রেবেকা দেখিল, তাহা জোসেফের ফটো, কিন্তু জোসেফের পাশে একটি পরমা সুন্দরী তরুণীর ছবি! বলা বাহুল্য, এই তরুণী বার্থা স্মিট। বার্থা যখন বার্ণির বালিকা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, সেই সময় জোসেফ বার্ণিতে উপস্থিত হইয়া এই 'ফটো' তুলিয়াছিল।

রমণীর হৃদয়ের রহস্য অতি বিচিত্র! বার্থাকে জোসেফের পাশে দেখিয়া রেবেকার হৃদয়ে হঠাৎ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। সে ফটোখানিব দিকে দুই এক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অবজ্ঞাভরে বাক্সের ভিতর নিক্ষেপ করিল; তাহার পর চিঠির বাণ্ডিল ও বাক্সটি হাতে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

মৌনাবলম্বনের মূল্য

রেবেকা তাহার পিতার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে, তাহাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিয়া সলোমন তাহার মানসিক অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রেবেকা তাহার পিতার নিকট সত্য কথা গোপন করিল; জোসেফের 'ফটোর' কথাও তাহাকে বলিল না। জোসেফের ছবির পাশে বার্থার ছবি দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল, ইহা তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে।

রেবেকা মনে মনে বলিল, "জোসেফ আমাকে কতই প্রেমের কথা বলিয়াছে, আমার প্রতি গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়াছে। আমিও তাহার প্রণয় উপেক্ষা করি নাই। কিন্তু তাহার হৃদয় অন্যের নিকট বিক্রীত! পুরুষদের চিত্তের কি স্থিরতা বা দৃঢ়তা নাই? 'ফটোতে' যে যুবতীর ছবি দেখিলাম, সে নিশ্চয়ই জোসেফের প্রণয়িনী, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।"

কিন্তু সে যথাসাধ্য চেষ্টায় এই অপ্রীতিকর চিন্তা ত্যাগ করিল। সে জোসেফের বিপদের আশঙ্কায় পুনর্ব্বার ব্যাকুল হইল; জীবনে আর কখন জোসেফকে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়া তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। জোসেফের বিরহ কিরূপ কষ্টদায়ক, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। জোসেফকে হারাইয়া জীবনের সুখশান্তি অব্যাহত রাখা সে অসম্ভব মনে করিল।

সলোমন একখানি খাতা খুলিয়া কতকগুলি হিসাব পরীক্ষা করিতেছিল, সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া, কন্যার বিশুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে মা! জোসেফের ঘরে তুমি কি এমন কোন জিনিষ পাইয়াছ, যাহা দেখিয়া তোমার মনে অত্যন্ত অধিক আঘাত লাগিয়াছে?"

পিতার এই প্রশ্নে রেবেকা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; সে রুমালে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। সলোমন জানিত, সামান্য কারণে এরূপ বিচলিত হওয়া রেবেকার স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই জন্য তাহাকে বিহ্বলভাবে রোদন করিতে দেখিয়া সলোমনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে সভয়ে বলিল, "কি হইয়াছে মা, বল। তোমার বুড়া বাবার কাছে মনের কথা গোপন করিও না।"

কিন্তু রেবেকা কোন কথা বলিল না; সে কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে তাহার ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। সে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রেবেকা কোনও কথা বলিল না দেখিয়া সলোমন তাহার কষ্টের কারণ জানিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না; কিন্তু কি এক অজ্ঞাত ভয়ে ও উদ্বেগে তাহার হৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সলোমন কয়েক মিনিট চিন্তাকুল চিত্তে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে একখানি খাতা টানিয়া লইল; সে খাতাখানি খুলিয়া তাহাতে কি লিখিবার জন্য দোয়াতে কলম ডুবাইয়াছে, এমন সময় একটি ভৃত্য ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কর্ত্তা, পুলিস আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। এক দল কনষ্টেবল বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।"

সলোমন ভৃত্যকে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় পুলিসের অধ্যক্ষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি সলোমনের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, জোসেফ কুরেট নামক আপনার

একটি অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারী নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আপনার গৃহে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, এই আশায় আমি আপনার বাড়ী খানাতল্লাস করিবার জন্য তল্লাসী পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছি। সেই পরোয়ানাখানি আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সলোমন কোহেন পুলিসের অধ্যক্ষকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রেবেকা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া গেল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার পরিচ্ছদের একাংশ খসিয়া পড়িল; কিন্তু সে তাহা সংযত করিয়া, এবং বিপুল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া, পুলিসের অধ্যক্ষকে কম্পিতস্বরে বলিল, "মহাশয়, এই আঘাত অত্যন্ত দুঃসহ এবং ইহা এরূপ আকস্মিক যে, আমরা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমরা কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই অপ্রীতিকর সংবাদ শুনিতে পাইয়াছি। এই সংবাদে আমরা কিরূপ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা সম্রাটের কিরূপ বিশ্বাসী, ভক্ত প্রজা এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের কি ভাবে সমর্থন করিয়া থাকি, তাহা আপনাদের সকলেরই সুবিদিত। এই অবস্থায় এক জন নিহিলিষ্ট আত্মপরিচয় গোপন করিয়া আমাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় আমাদের গৃহে বাস করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র চালাইতেছিল, এ সংবাদে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি এবং ইহা আমাদের পরম দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিতেছি! আমরা যে ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও সামান্য ক্ষোভ বা আক্ষেপের বিষয় নহে।"

পুলিসের অধ্যক্ষ সহানুভূতিভরে বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, মাদ্‌মোয়াসেল! এই নিহিলিষ্টগুলা এতই ধূর্ত্ত ও ফন্দীবাজ যে, রাজভক্ত নিরীহ সাধু ব্যক্তিদের অনায়াসে প্রতারিত করিয়া গোপনে অতি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রজাল প্রচারিত করে! তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কোন মনিবই তাঁহার ভৃত্যের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না, এ অবস্থায় মনিবরা ভৃত্যের দুরভিসন্ধি কিরূপে বুঝিবেন? আপনাদিগকে অনর্থক কষ্ট দিতে আসিয়াছি, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু সরকারের আদেশ আমাকে পালন করিতেই হইবে। আমার কর্ত্তব্যভার সময়ে সময়ে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে বটে, কিন্তু আমি নিরুপায়!"

রেবেকা বলিল, "আপনি রাজবিধানের প্রতিনিধি মাত্র, যে কর্ত্তব্যভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আপনাকে বহন করিতেই হইবে, সে জন্য আক্ষেপ বৃথা। জোসেফ কুরেট প্রথমে এখানে শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া সে কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইয়াছিল। সে তরুণ যুবক, বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাকে আদর-যত্ন করিতাম। সে যে এ ভাবে আমাদের বিশ্বাসের অপব্যবহার করিবে, ইহা কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। তাহার কপটতার পরিচয় পাইয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। কিন্তু সে যে প্রকৃতই অপরাধী, সে যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে এখনও আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। তবে দুঃশীল ও দুর্দ্দান্ত নিহিলিষ্টদিগের ফাঁদে পড়িয়া তাহার মতিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নহে। সে রুসিয়ান নহে, সুতরাং রুস-সম্রাট বা রুসিয়ান শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাহার ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকিবার কোন কারণ নাই।"

পুলিসের অধ্যক্ষ রেবেকার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন মাদ্‌মোয়াসেল! আপনার বয়স অল্প, লোকচরিত্র সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই; কাহার মনে কি আছে, তাহাও আপনার বুঝিবার সামর্থ্য হয় নাই। সেই যুবকটি অসৎ লোক নহে বলিয়াই আপনার ধারণা হইয়াছে, এ ধারণা সত্য হইলে আমি বড়ই সুখী হইতাম, কিন্তু তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সে সুযোগ পাইলে অল্পদিনের মধ্যেই অতি ভীষণপ্রকৃতি ও অসমসাহসী নিহিলিষ্ট হইয়া উঠিত।"

পুলিসের অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া রেবেকার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এই কথাতেই সে জোসেফ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের ধারণার পরিচয় পাইল এবং জোসেফের নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই বুঝিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। জোসেফের পক্ষসমর্থন করিয়া পুলিসের অধ্যক্ষের সহিত তর্ক করা নিষ্ফল বুঝিয়া রেবেকা নীরব রহিল। সে বুঝিল, তাহার

কথায় পুলিসের অধ্যক্ষের ধারণা হইয়াছে, তাহার পিতা ও সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, সুতরাং সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট মনে করিল।

অতঃপর পুলিসের অধ্যক্ষ দ্বারপ্রান্ত হইতে তাঁহার অনুচরগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সাহায্যে খানাতল্লাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সলোমন কোহেন তাহার বিভিন্ন ডেস্ক, বাক্স, আলমারী প্রভৃতির চাবি বিনা প্রতিবাদে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিল, কেবল তাহার লোহার সিন্দুকের চাবিটি নিজের কাছে রাখিল। সে পুলিসের সঙ্গে থাকিয়া খানাতল্লাসীতে সাহায্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোন কার্য্যেই অতিরিক্ত উৎসাহ বা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না, বরং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পুলিসের ধারণা হইল, তাহার ন্যায় রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহ এইভাবে খানাতল্লাস করায় তাহার মর্যাদাহানি হইয়াছে ভাবিয়া সলোমন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। আলমারী, ডেস্ক পরীক্ষা করিয়া পুলিসের অধ্যক্ষ সলোমনের লোহার সিন্দুকের চাবি চাহিলেন, সলোমন মৌখিক আপত্তি করিয়া বলিল, সিন্দুকে তাহার কতকগুলি মূল্যবান্ দলীল-পত্র, নোট ও টাকা ভিন্ন অপরাধের প্রমাণসূচক কোন কাগজ-পত্র নাই। পুলিস তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া সিন্দুক পরীক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় সলোমন মনে মনে হাসিয়া সিন্দুকের চাবিও বাহির করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ডেস্ক, বাক্স প্রভৃতির ন্যায় সিন্দুকেও তাহার অপরাধের কোন প্রমাণ না পাইয়া পুলিস নিরুৎসাহ চিত্তে প্রস্থান করিল।

পুলিস সলোমনের গৃহত্যাগ করিলে রেবেকা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "বাবা, আজ আমরা একটা কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আশা করি, ইহার ফলে ভবিষ্যতে আমরা লাভবান্ হইতে পারিব।"

সলোমন মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা, যখন হইতে আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছি, সেই সময় হইতেই যত দূর সম্ভব সতর্ক আছি, কিন্তু তোমার কথা মিথ্যা নহে, আজ যে শিক্ষালাভ করিলাম, তাহা ভবিষ্যতে আমাদের কাযে লাগিবে।"

রেবেকা বুঝিতে পারিল, কালনকি পুলিসের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। সে সুখী হইয়া মনে মনে বলিল, "কালনকিকে আমি বশীভূত করিয়াছি, সে এখন আমার গোলাম। যদি আমি তাহাকে আমাদের অনিষ্টচেষ্টায় বিরত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নারীজন্মই বৃথা।"

সেই দিন অপরাহ্ণে রেবেকা কালনকির সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিল, তাহাকে বলিল, "পুলিসের খানাতল্লাসী নিষ্ফল হইয়াছে, এ জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতে আসিয়াছি। তুমি পুলিসের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে আমরা অত্যন্ত বিপন্ন হইতাম; কিন্তু তুমি আমাদের বিপন্ন কর নাই। এই ব্যাপারে আমাদের প্রতি বিশ্বস্ততারই পরিচয় দিয়াছ। তুমি ভবিষ্যতে জানিতে পারিবে, আমি অকৃতজ্ঞ নহি এবং উপকার বিস্মৃত হইব না।"

রেবেকা এত অল্পসময়ের মধ্যে এ ভাবে সুর বদলাইবে বা এতদূর নরম হইবে, কালনকি ইহা প্রত্যাশা করে নাই। রেবেকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সে বিস্মিত হইলেও, বিস্ময় গোপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তোমাদের এইটুকু উপকার করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি। আমি কেবল মৌন ছিলাম, আর কিছুই করি নাই। যদি তোমার নিকট একটু আশা পাই, তাহা হইলে আমার এই মৌনব্রত কখন ভঙ্গ হইবে না। এ অঙ্গীকারে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার।"

কালনকির ধৃষ্টতায় রেবেকার মন ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ হইলেও সে মনের ভাব গোপন করিয়া কালনকির সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল, কোমল স্বরে বলিল, "আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার এই কৃতজ্ঞতা ভবিষ্যতে অন্য আকারে পরিণত হইতে পারে। আশা করি, আমার এইটুকু ইঙ্গিতেই আপাততঃ তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

কালনকি রেবেকার প্রসারিত হস্ত মুখের কাছে তুলিয়া চুম্বন করিল, তাহার পর হর্ষবিহ্বল স্বরে বলিল, "হাঁ, হাঁ, তা বটে, তা বটে! তুমি এখন আমাকে ইহার অধিক আশা দিতে পার না, তাহা কি আর আমি জানি না? কিন্তু পূর্ব্বে তুমি আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমার মনে বড়ই খট্‌কা বাধিয়া রহিয়াছে! তুমি বলিয়াছিলে, তোমাকে লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; এখন আবার এক আধটু আশার কথাও শুনাইতেছ। তোমার এই মতপরিবর্ত্তনের অর্থ কি?"

কালনকি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু রেবেকা তাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল, “হাঁ, তোমাকে আমি এ কথাও বলিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু এ কথাও বোধ হয় তোমাকে বলিয়াছি, কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যে বাধা আছে, সে বাধা ভবিষ্যতে না থাকিতেও পারে।”

কালনকি ব্যগ্রভাবে বলিল, “তোমার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না ; তোমার মনের কথা খুলিয়া বল।”

রেবেকা বলিল, “সকল কথা এখন খুলিয়া না-ই বা বলিলাম। যতটুকু বলিয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। আর আমাকে জ্বালাতন না করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া কিছু দিন অপেক্ষা কর। যাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে, প্রায় তাহারাই জয়লাভ করে।”

রেবেকা কালনকিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তাহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

রেবেকা অদৃশ্য হইলে কালনকি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মনে মনে বলিল, “কেমন কায়দায় ফেলিয়াছি! কিন্তু আমি এত সহজে উহাকে ভিড়াইতে পারিব, ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করিতে পারি নাই।”

বস্তুতঃ, কালনকি ও রেবেকা উভয়েই পরস্পরকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রেবেকা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কালনকিকে বড়শীতে বিঁধিয়া খেলাইবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু কালনকি স্বার্থানুরোধে অপকর্ম্মে যতই অকুণ্ঠিত হউক, রেবেকার প্রতি তাহার অনুরাগে কপটতা ছিল না ; সে রেবেকাকে প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিয়াছিল। তাহার আশা নিষ্ফল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সে জোসেফকে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া, অতি ঘৃণিত উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিল ; ইতরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল। রেবেকার কথায় সে আশ্বস্ত হইল, আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

রেবেকা সন্ধ্যার পর তাহার পিতার সহিত গল্প করিতে করিতে বলিল, “বাবা, কালনকি আমাকে ভারী ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! সে আমার খুব তোয়াজ করিতেছিল ; আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমি তাহাকে একটু আশা দিয়াছি।”

সলোমন তাহার চসমার ভিতর দিয়া রেবেকার মুখের দিকে মিনিট দুই হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল ; যেন কথাটা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিল, “তুমি কি সত্যই ক্ষেপিয়াছ, না তাহাকে বোকা বনাইয়া নাচাইতেছ ?”

রেবেকা হাসিয়া বলিল, “আপনার শেষের কথাই ঠিক।”

সলোমন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “এরূপ করিবার কারণ ?”

রেবেকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, “কারণ, সে আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, ইহা প্রার্থনীয় নহে। কালনকির শত্রুতায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এ কথা ভুলিও না, বাবা!”

সলোমন উত্তেজিত স্বরে বলিল, “সে আমার চাকর, তাহার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কায। সে ভবিষ্যতে আমাদের অনিষ্ট করিতে না পারে, এ জন্য আমি তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিব।”

রেবেকা ব্যগ্রভাবে বলিল, “না বাবা, তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমিই তাহাকে সায়েস্তা করিব। রমণীর প্রতিহিংসা কিরূপ সাংঘাতিক, ইহা সে ঠিক সময়ে জানিতে পারিবে।” [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ফুল

ওগো কোন্ দেবতার আশিস্ লভিতে প্রচারিতে কোন্ বাণী
কোন প্রিয়তমে দানিতে আদর ফুটেছ গো ফুলরাণি ?
কোথায় সে দেশ হাসিটি যেথায় শিখিয়া এসেছ তুমি,
পেয়েছ এমন রূপের গরিমা বল গো সে কোন ভূমি ?
সে স্বরগে বুঝি প্রভাতী লাস্য এমনি ছন্দে ভরা
এ হেন সুষমা এত মৃদুলতা নয়ন-পাগল করা।

পুণ্য পরশি গন্ধের-সাথে যত্ননিচিত মধু
স্নেহময়ী, শুধু পরে বিলাইয়া দিতেছ কুসুম বধু।
মন্দিরে তব অতিথির সাড়া হয় না বিফল কভু,
গুণ-মহিমায় সদাই তোমায় ভাল যে বাসেন প্রভু।
কেমনে হব গো তোমারি মন্ত্রে দীক্ষিত বল তাই।
যে প্রেমে পেয়েছ বাঞ্ছিত তুমি, আমি তা কেমনে পাই।

শ্রীকুমুদকান্ত স্মৃতিভূষণ।

কলিকাতা ও সহরতলী—৫০ বৎসর পূর্ব্বে

প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দেখুন, আমরা অর্থ-নৈতিক আত্মহত্যা করিতেছি। পূর্ব্বে যে সমস্ত ধনীর জুড়ি-গাড়ী ছিল, তাঁহাদের বর্ত্তমানে মোটর হইয়াছে।

কোনরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে বাঙ্গালীর মন যাইতেছে না। বাঙ্গালীর ছেলে আই, এস্, সি পাশ করিলেই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়। ছয় সাত বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়িতে হয়। উহাতে ৪।৫ হাজার টাকা খরচ হইয়া যায়। তাহার পর প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিলে চাই মোটর; নতুবা 'পসার' জমিবে না। অতএব আরও হাজার দুই তিন টাকা খরচ করিয়া মোটর কিনিতে হইবে। পূর্ব্বের ৪।৫ হাজার টাকা সুদে আসলে কত দাঁড়ায়, আর এই দুই হাজার টাকা তাহার সহিত যোগ দিলে কত হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। অথচ মোটর ক্রয় করিবার পরও কয় জনের ভাল 'পসার' হয়, তাহা জানা আছে। আর এক দিকে দেখুন, বাঙ্গালী ছাত্র বি, এ, অথবা বি, এস্, সি পাশ করিয়াই গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ল কলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহার ফলাফলের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি বলি, যদি দশ বৎসর নূতন উকীল না হয়, তাহা হইলে জুনিয়র উকীলরা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কিছু উপকার হয়। এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি, যত দিন ল কলেজ ভূমিসাৎ করা না হইবে, তত দিন দেশের মঙ্গল নাই।

গত ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় বিস্তর মোটর সার্ভিসের লাইন খোলা হইয়াছে। এই সকল মোটর কোম্পানীর মালিকের মধ্যে মাত্র দুই এক জন বাঙ্গালী; অবশিষ্ট প্রায় সমস্তই পাঞ্জাবী। সোফার দুই চারি জন বাঙ্গালী আছে ঘটে, তবে দুই চারি দিন পরে তাহাও থাকিবে কি না সন্দেহ। সোফাররা মাসে ৭০।৮০ টাকা উপার্জ্জন করে। একখানা পুরাতন মোটর ৭।৮ শত টাকায় পাওয়া যায়। চৌরঙ্গীতে যে সমস্ত ট্যাক্সি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সোফাররা ট্যাক্সির মালিকও বটে! ইহারা মাসে অন্যূন দেড় শত টাকা উপার্জ্জন করে। ভবানীপুর হরিশ পার্কের চারিদিকে যে একটা পাঞ্জাবী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, পাঞ্জাবীরা কি ভাবে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়াছে। অনেক সময় আমরা উহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করি, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদেরই অকর্ম্মণ্যতা হেতু উহারা এত সহজে আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। একখানা মোটর চালাইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের নাই। বাঙ্গালী পিতা হয় ত পুত্রকে একখানি মোটর ক্রয় করিয়া দিলেন, শ্রীমান্ বাড়ী বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার নীচে শুইয়া ঘুমাইবে, আর ওদিকে সোফার সুযোগ পাইয়া চুরি করিয়া নিজের পকেট পূরাইবে; তথাপি বাঙ্গালীর ছেলে গাড়ী হাঁকান অপমানকর বলিয়া মনে করিবে। ইহাই আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির নমুনা!

যদি অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিতে চাহেন, তবে দেখিবেন, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী সমস্ত কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া একেবারে 'কোণ্‌ঠেসা' হইয়াছে। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে।"

কেবল বিদেশী রাজার অপরাধ ধরিলে চলিবে কেন?

সে দিন হাইকোর্টের এক জন বাঙ্গালী অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইলেন। তাঁহার সম্মানার্থ বিরাট ভোজ দেওয়া হইল। এক ষ্টীমার কোম্পানীও অনেকগুলি টাকা পাইল। আমাদের অঞ্চলেও দুইবার দুর্ভিক্ষ হইল। আমি সেই সময়ে দেশে যাই। অনেক ছেলে আমাকে বলিল, 'আপনি দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ ক'রে মরেন। অথচ দেখবেন, একটা যোগে-যাগে লাঙ্গলবাঁধে ব্রহ্মপুত্র-স্নানে কত বিধবা তাহাদের আজন্ম-সঞ্চিত অর্থ ষ্টীমার কোম্পানীতে ঢেলে দেয়। যদি তারা আমাদের দেশী নৌকায় যেত, তা হ'লে আমাদের দেশের টাকাটা দেশেই থাক্‌ত। কিন্তু তা না ক'রে তারা ষ্টীমারে উঠ্‌ল, নেমে রেলে চাপ্‌ল। এই যে বিধবারা গঙ্গাস্নানে যায়, পুরীতে জগন্নাথের রথ দেখ্‌তে যায়, তারা কি রকম ছাগল-গরুর

মত ঠেসাঠেসি ক'রে যাস—আর গিয়ে আজন্মের রোজগার সেখানে নিঃশেষ ক'রে আসে, তা দেখেছেন কি ?'

বস্তুতঃ এইরূপ নানা কারণে আমরা শক্তি-সামর্থ্যহীন ও ধনহীন হইয়া পড়িতেছি। তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতাও আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। উপার্জ্জন আমাদের একেবারে নাই বলিলেই চলে, অথচ বিলাসিতা আমাদের ষোল আনার উপরে দুই আনা।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বাঙ্গালী ছাত্রগণ কালীঘাট, ভবানীপুর হইতে পদব্রজে জেনারল এসেম্ব্লীতে পাঠ করিতে যাইত, ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। মামলা-মোকর্দ্দমা উপলক্ষে পূর্ব্বে বাঙ্গালী মাত্র চিড়া-মুড়কী ভরসা করিয়া ১০।১২ ক্রোশ অতিক্রম করিত। আমার মনে আছে, আমি নিজে চাঁপাতলা হইতে চেৎলায় হাঁটিয়া গিয়াছি এবং চেৎলা হইতে চাঁপাতলায় পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। আজকাল এক দিন ট্রাম বন্ধ হইলে বাঙ্গালী ছাত্রগণ পদব্রজে পথ অতিক্রম করিতে হইলে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করেন। ইহাতে শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা কত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অল্প বেতনের কেরাণীও দৈনিক আফিস যাতায়াতের জন্য অন্ততঃ ৪।৫ আনা খরচ করেন, অথচ তাঁহার গৃহে হয় ত শিশুরা দুগ্ধ পায় না, দুই পয়সার জলখাবারও খাইতে পায় না। স্বাস্থ্যবিভাগের এক জন পাঞ্জাবী ডেপুটী কমিশনার আমায় বলিয়াছিলেন, তিনি মেদিনীপুরে কয়েকটি ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এক এক মেসে ১৫ জন আন্দাজ ছাত্র থাকে। তিনি জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারেন যে, ছাত্ররা মেসে দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের চেহারাও কখনও দেখিতে পায় না। কলিকাতার অনেক মেসেও এইরূপ ব্যবস্থা। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন, দেশের ভবিষ্য বংশধররা কিরূপে জীবন ধারণ করে! আজ বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য দুগ্ধ আর মৎস্য খাইতে পায় না—যদিও বা খাইতে পায়, তাহা অতি সামান্য। দিনে এক জনের জন্য অন্ততঃ অর্দ্ধ সের দুগ্ধ ও অর্দ্ধ পোয়া মৎস্য না হইলে শরীর সবল থাকে না, কিন্তু এখন মৎস্যের সের পাঁচ সিকা, দুগ্ধ টাকায় আড়াই সের—তাহাও জলমিশ্রিত। বাঙ্গালীর ছেলেরা দুধ ও মাছ খাইবে কোথা হইতে ? কিন্তু চপ-কাটলেটের দোকানে কলিকাতা ভরিয়া গিয়াছে। ছাত্রজীবনে আমরা বেলা ৪টার পর কিছু জলযোগ করিয়া রাত্রি ৯টার সময় অন্নাহার করিতাম, এখন শ্রীমান্‌রা কেবলই দেলখোসে গিয়া চপ্-কাটলেট চালাইয়া থাকেন। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। হোটেলওয়ালারা পূর্ব্বদিনের বাসি কারি-কোপ্তা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয় না। পরদিন সকালে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কুকুরের মাংস ব্যবহার না করুক,—বাসি পচা মাংস যে ব্যবহার করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ অনেক কম পয়সায় সেই সময়ে একটু দুধ বা মুড়ী-মুড়কীতে অনেক কায হয়। এ দেশের ছেলেদের কিরূপ রুচি-বিকার ঘটিয়াছে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বাল্যকালে এক পয়সায় যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাইত, এখন শ্রীমান্‌দের চারি আনাতেও তাহা কুলায় না। এক পয়সার ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে তাহা লবণ সহযোগে অতি পুষ্টিকর খাদ্য হয়। অপকৃষ্ট চা খাওয়া অপেক্ষা উহাতে অনেক বেশী কায হয়, পরন্তু নেশারও প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

৫৪ বৎসরে আমরা কত নূতন সভ্যতা শিখিয়াছি! আমাদের নারিকেলপ্রধান দেশ। বাল্যকালে এই জন্য আমরা নারিকেলের কতরূপ খাবার খাইয়াছি। নারিকেলের মত পুষ্টিকর খাদ্য খুব কমই আছে। কলিকাতার সভ্য বাবুরা ডাব-নারিকেল ৫।৬ পয়সায় কিনিয়া মাত্র জলটুকু খাইয়া শাঁস ফেলিয়া দেন। অথচ সেইটাই নারিকেলের সারাংশ। আমি রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। পাছে কেহ শাঁস খাইতে দেখিলে অসভ্য মনে করে, তাই কলিকাতায় জল খাইয়া ডাবটিকে ফেলিয়া দেওয়াই সভ্যতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! হাণ্টলি পামার্স বিস্কুটের দাম ৩ টাকা সওয়া ৩ টাকা। তাহার তুলনায় আমাদের দেশের মুড়ী খুবই সস্তা অথচ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। এখন যদি কেহ কাহারও বাড়ী যান, তাহা হইলে মুড়ী খাইতে দিলে অসভ্যতা অথবা দারিদ্র্যের পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু যদি মুড়ী না দিয়া হাণ্টলী পামার্সের দু'খানি বিস্কুট চায়ের সহিত দেওয়া যায়, তাহা হইলে সভ্যতার চরম পরিচয় দেওয়া হয়। দুই পাউণ্ড মুড়ীর দাম ৮ পয়সা কিম্বড় জোর ১০ পয়সা। অথচ

তাহার পরিবর্ত্তে বিস্কুটের বাবদে আমরা খরচ করিতেছি ৩ টাকা সওয়া ৩ টাকা। আমেরিকাতেও 'পাফ্‌ড রাইস্' (Puffed rice) খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, উহা আমাদিগেরই দেশের মুড়ীর মত।

বাঙ্গালী ছাত্র বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া কেরাণীগিরি করিবে, ব্যবসায় করিবে না, কিন্তু যেখানে বাঙ্গালী কেরাণীর ৭৫ টাকা না হইলে চলে না, সেখানে মাদ্রাজী কেরাণী ২৫ টাকায় ভর্ত্তি হইতেছে। ছোট ছোট কোঠা, ছোট দরজা-জানালা, সামান্য একটু বারান্দা, তাহাতেই পুত্র-পরিবার সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজীরা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বাঙ্গালী যেখানে ৫০ টাকায় সংসার চালাইতে পারে না, খোট্টা বা মাদ্রাজী সেখানে ২৫ টাকায় চালাইতে পারে।

বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস সকল জাতিই কাড়িয়া লইতেছে। কিন্তু মজা এই, বাঙ্গালার বাহিরে যেখানেই যান, সে সকল প্রদেশের লোক আপনাপন জাতির জন্য কাযের চারিদিকে বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। বেহারে যান, শুনিবেন—Behar for the Beharees' উড়িষ্যায় যান, শুনিবেন—Orissa for the Oryas. কিন্তু আমাদের দরজা সকলের জন্য খোলা। রবি বাবু বলিয়াছেন, "বিশ্বপ্রেম"—বাঙ্গালীর বিশ্বপ্রেম আছে। কিন্তু আমি বলি, বাঙ্গালীর যাহা কিছু আছে, তাহা একেবারে অন্তঃসারশূন্য। বাঙ্গালীর অহঙ্কারের কিছুই নাই। এই যে দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারে মহাত্মা গন্ধী দশ লক্ষ টাকা চাঁদার জন্য ধরণা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আট লক্ষ টাকাও উঠিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যে অধিকাংশ টাকা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা কে? অধিকাংশ টাকাই দিয়াছে মাড়োয়ারী ভাটিয়ারা। এ জন্য মহাত্মাকে দক্ষিণ হইতে মণিলাল কোঠারীকে আনিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীর টাকা দিবার ক্ষমতাই বা কোথায়? কয়েক মাস পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে যে Maternity hospital প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে এক ওয়াডিয়াই ১৬ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। উহারা রোজগার করিতে জানে, টাকার সদ্ব্যবহারও করিতে জানে। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে যখন মহাত্মা গন্ধী জেলে ছিলেন, তখন সবরমতী বিদ্যাপীঠের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য আমার ডাক পড়িয়াছিল। আমি গিয়া দেখিয়াছিলাম, তখনই ৭॥০ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, আরও কয়েক লক্ষ টাকা সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে তুলিতে পারা যাইবে। কিন্তু সে সময়ে মহাত্মার নিকট হইতে আদেশ পাওয়া গিয়াছিল যে, ঐরূপ ভাবে চাঁদা আদায় করা হইবে না, উহাতে আত্মসম্মানের লাঘব হইবে। তাঁহারই কথামত পরে সমস্ত টাকাই গুজরাট হইতে আদায় করা হইতেছে। গুজরাট, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি স্থানে বড় বড় ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজীই জানেন না। কলিকাতায় যথেষ্ট বোরা মুসলমান আছেন, সার ফজলভাই করিমভাই প্রভৃতি অনেক মুসলমান এই সম্প্রদায়ের। আবার কচ্ছের মেমন মুসলমানও আছেন। তাঁহারা চাউল রপ্তানী করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার মগরাহাট, বোলপুর প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ চাউল তাঁহাদের মুঠার ভিতর;

ইঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র আফ্রিকার সমুদ্রোপকূল ও জাপান প্রভৃতি দেশ। সার ফজলভাই করিমভাই এবং তাঁহার পরলোকগত পিতা ইব্রাহিম করিমভাই কত টাকার কারবারের মালিক, তাহার ধারণাই করিতে পারা যায় না। বোম্বাইয়ে ইঁহাদের কত বড় বড় কারখানা, আফিস ও এজেন্সী আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সার ইব্রাহিম করিমভাই মৃত্যুর পূর্ব্বে এক কোটি টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়, আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি। দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল আমাদের তরুণগণ দলে দলে "ল" কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবিয়া দেখেন কি? তাঁহাদের পিতা-মাতা ৪০।৫০ টাকা মাসহারা পাঠান, তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রগণের ভবিষ্যৎ ভাবেন কি? আমি পল্লী-মফঃস্বলে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, সেখানেও সহরের ন্যায় বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এখন প্রায় মফঃস্বলের সহরমাত্রেই মোটরবাস চলিতেছে। পূর্ব্বে আমাদের পল্লী-কৃষকরা বড় বড় মোট মাথায় করিয়া ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়া হাট-বাজার করিত, এখন তাহারা 'ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া হয়।' আত্রাই, রঘুরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিয়াছি, অধুনা কৃষকরা এক ঘণ্টা দেড়ঘণ্টার পথও পয়সা খরচ করিয়া রেলের টিকিট কিনিয়া যাতায়াত করে। এমনই ভাবে এ দেশের লোক প্রতিদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে!

১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতায় স্ত্রী-পুরুষের সেন্সাস্ গণনায় দেখা গিয়াছে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে যক্ষ্মারোগ অধিক,—এমন কি, পাঁচগুণ অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ কি? ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে আমাদের ছেলেরা স্কুল-কলেজে যায়, ময়দানে খেলে বা খেলা দেখে, চলাফিরা করে, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু আমাদের মেয়েরা অধিকাংশ সময় রুদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকে, ছুটাছুটি বা খেলা করিতে পারে না। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে রান্নাঘরে কায করে। সুতরাং বিধাতার প্রধান দান হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। এ পৃথিবীতে মানুষ যে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তাহার জন্য তাহাকে খরচ করিতে হয়। কিন্তু বিধাতা তাহাকে এমন দুইটি জিনিষ অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন—যাহার জন্য তাহাকে কোন দিন টেক্স-খাজনা দিতে হয় না;—সে দুইটি জিনিষ বায়ু ও রৌদ্র। মানুষের শরীররক্ষার পক্ষে এই দুইটি জিনিষ কত মূল্যবান্, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। আমাদের সহরবাসী পুরুষদের ভাগ্যে এই দুইটি জিনিষ কষ্টে মিলে, কিন্তু আমাদের নারীদের পক্ষে ত একেবারেই সুদুর্লভ। কলিকাতার গলীঘুঁচির মধ্যে বায়ু-চলাচল প্রায়ই হয় না। গৃহস্থ-গৃহের রন্ধনশালায় চিমনী নাই, চুল্লীর ধূম ঘুরিতে ঘুরিতে সমস্ত গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এক দিকে পায়খানা ও জলের কল, অপর দিকে পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র শয়নকক্ষ। ইহারই গণ্ডীর মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে হয়। এমন সব বাড়ীতে যক্ষ্মারোগ দেখা দিবে না ত দেখা দিবে কোথায়? আমাদের পুরুষরা তবু মাঝে মাঝে ঐ গলীর বাহিরে আলোক ও বাতাসে যাইতে পারে বটে, কিন্তু নারীদের পক্ষে সে সুযোগ একেবারে নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে কলিকাতায় যক্ষ্মারোগ ছিল না। কিন্তু গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরন্তু এই রোগ চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইয়াছে।

এই হেতু আমার মনে হয়, নানা কারণে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময় হইতেছে। সে অন্ধকারের মধ্যে আমি অতি ক্ষীণ আশার আলোকরশ্মিও দেখিতে পাইতেছি না। যেখানেই যাই সকলকেই বাঙ্গালীর রোগ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিই, ক্ষতের উপর কেবল মলম দিয়া ঢাকিয়া রাখি না। মিষ্ট কথা বলিবার সময় আর নাই। যেখানেই যাই, আমাদের সামাজিক দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই। আমরা যদি আমাদের এই সমস্ত মারাত্মক রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াস না করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। কেন না, সকলেই জানেন, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমি আমার দেশের তরুণদিগকে অনুনয় করিয়া বলি, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কায কর। অভিভাবক বলিতেছেন আইন পড়িতে—কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ কি? উহাতে বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় হইতেছে মাত্র। দেশের মধ্যে দুই চারি জন মুন্সেফ অথবা ডেপুটী হইল, ৫০ হাজার ছেলের মধ্যে দুই এক জন হাইকোর্টের জজ হইল,—কিন্তু তাহাতে ফল কি? উহাতে একটা জাতি গড়িয়া উঠে না। বুদ্ধিমান্ বলিয়া বাঙ্গালীর অহঙ্কার আছে, কিন্তু তাহার পরিচয় কৈ? রাণাঘাট চিংড়িপোতা হইতে বাঁধা মাহিনার বাঙ্গালী কেরাণীকুল কলিকাতায় যাতায়াত করে, প্রাতঃকালে ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, কিন্তু তাহাতে কি সংসারের দুঃখ ঘুচে? তথাপি বাঙ্গালী কোনও নূতন কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া লইবে না। বালীগঞ্জের দক্ষিণ হইতে মজিলপুর পর্য্যন্ত যত কয়লার আড়ৎ আছে, সে সব প্রায়ই মাড়োয়ারীর। বাঙ্গালার মফঃস্বলে গিয়া দেখ—চাউল বল, সর্ষপ বল, পাট বল—বেচিতে হইলে মাড়োয়ারীর কাছে যাইতে হয়। আবার কেরোসিন বল, বিলাতী কাপড় বল, অথবা অন্য যে কিছু বিলাতী মাল বল, কিনিতে হইবে মাড়োয়ারীর নিকট। এক কথায় বাঙ্গালার ব্যবসাবাণিজ্য সমস্তই মাড়োয়ারীর হস্তে। নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। সে সব অঞ্চলে যত কুলগাছ আছে, সে সমস্তই মাড়োয়ারীরা ইজারা লইয়া গালার পোকা ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যেক গাছের জন্য বৎসরে দুই চারি টাকা ভাড়া দেয়। গৃহস্থ যত পারে কুল খায়, তাহাতে মাড়োয়ারীর কোন আপত্তি নাই। আমার নিজের বাড়ীর কুলগাছও মাড়োয়ারীর হাতে।

যত দিন আমাদের বিদেশীর সহিত কোন প্রতিযোগিতা

ছিল না, তত দিন আমরা নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু এখন বিদেশীর প্রতিযোগিতা প্রবল। এই প্রতিযোগিতা—এই ঘাতসঙ্ঘাত ও প্রতিঘাতের সহিত যদি সম্মুখ-সমর করিতে না পারি, তাহা হইলে যোগ্যতররা অযোগ্য আমাদের জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত করিবেই। কালাজ্বর বল, ম্যালেরিয়া বল, থাইসিস্ বল,—এ সকল রোগের প্রধান কারণ উদরান্নের অভাব, সুতরাং উদরান্ন সংস্থানের জন্য আমরা যদি নিত্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত না হই, তাহা হইলে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গালীর নাম চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। ভগবানের দয়ায় এবং আমাদের নিজের চেষ্টায় আমরা কি এই আসন্নধ্বংসের মুখ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না ?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এই ত জীবন ?

এই ত জীবন ! সকাল বিকাল থলিয়া ভরতি করো,
সৎ বা অসৎ যে কোন প্রকারে যেমন করেই পারো।
মাগন দানা চিঁড়া চানা পুরী অন্নম্ লাগি,
"আসল কামে" বহুৎ সাজে ঘরমে লাগাও আগি।
খোদাবক্সের কোট-প্যান্টে বপুখানি সেঁটে,
হরদম্ ধড়ফড় ফড় ফড় তড় বড় মুখে পাইপ এঁটে।
উঁচিয়ে চাপ্পড় থাপ্পড় লাপ্পড় বুট সমেত লাথ
হুজুর জুজুর সামনে কসুর এয়সা ভোলানাথ ?
জীবন এই ত ! না আর কিছু ? শামলা মাথায় ধরা,
গামলা গামলা কুড়িয়ে মামলা হয় কে নয়টি করা।
ছুটিয়ে ঘোড়া উড়িয়ে জোড়া ফিটনে বাহার,
পইস্ পইস্ রোক্‌কে সইস্ তক্‌মা স্বনামদার।
ভোঁপতে শিঙা ড্রাইভার মিঞা ছুটছে মোটর কার,
এক নিমিষে ক্রোশেক্ ছোটে অসুর অবতার !
হাওয়া গাড়ী হাওয়া সাড়ী হাওয়ার ভস্ত্রা জান,
হাওয়া খাতে আনা যানা জীবন ইস্‌কা নাম !
নাকে মুখে ভাতটি গুঁজে হেঁটে পাড়া মারা,
ফিরিঙ্গী গুষ্টী নামের হিষ্ট্রী মাথার ঘাম পায় ঝরা।
মুখে ফেকা দিন-রাত জাগা হরদম্ বকবক্ বক্,
এম এ, বি-এল্ নকরী তিলক শিরপর ঝক্‌মক্ ঝক্ !
বিজ্ঞানবতী সেরা গুটী দুনিয়া হাতসে মুঠো,
নাশে অজ্ঞান বিজ্ঞান সুজ্ঞান আউর সকল ঝুঁটো।
গণিতের ফাঁদ ধরতেই চাদ বিচার বড়া জবর,
আউর কি চাও বিজলী জ্বালাও স্বর্গের দেবতা নকর।
ফরাস্ বিছান্ তাকিয়া ঠেসান্ গুড়্ গুড়্ ডাক্‌তা নল্,
খাবা, পাশা, বৈঠক খাসা ঘুমে ধোঁয়ার কল !
রায় বাহাদুর সি-আই-ই-ই রাজটীকা শিরপর,
গরীব অতিথ প্রবেশ নিষেধ সিপাই সঙ্গীন্ ধর।
ছেলে মেয়ের হোবে সাদি বর ক'নে দুই চাই —
বরের বাপের পেট্‌টি জ্বালা ক'নের বাপ্ জবাই।
খাসা খাসা এই যে পেশা সকল পেশার সার,
সেরা জুলুম আক্কেল গুড়ুম কসাই মানে হার।
সত্যের যুগে সত্য বাংলাও পরোয়া কিসের ভাই,
রোস্‌নাই জ্বালা বেহেস্ত খোলা ঝুঁট-মুট বল্‌তে নাই।
ইয়ে দুনিয়া সব আঁধিয়া বেগন্ চাঁদি-চাকী,
সব্‌সে পরম সুখের চরম পিয়ালা ভরতে সাকী !
সকল দোস্তি সটান চোস্তি খালি দেখলে থলি,
পাখা ঝট্‌পট্ সরে চট্‌পট্ ! ভুলে "রাম রাম" বুলি।
এই ত জীবন ! মেরে বাপ্‌ধন না আউর আছে কিছু,
লাগাও গাড়ি বাড়ী বাড়া পর পর্ চলো নীচু।
ঘাটে কাদা হাঁদা ভোঁদা মাথায় কচুর পাত,
কাঁপন জ্বরে লাঙ্গল ধরে জোগায় ধনীর ভাত।
দেশের উদ্ধার ওরাও করছে আদিম কালটি ধ'রে,
মোদের ঠোঁটে লেক্‌চার ফোটে হাতে বল্লম ধ'রে।
ওরাই ভগবান্ ওরাই জান্-মান্ দিচ্ছে হাতে তুলে,
ওদের বেলায় চোখ্‌টি বুজে নাকটি শিকায় তুলে।
স্বদেশভক্তি আন্‌বে মুক্তি বহুৎ উচ্চে লাফ !
দেশ-বিদেশে মিটিং বসে ঘরে উপোস্ বাপ্ !
এই ত জীবন না আর কিছু ? নাই কি কিছু বাকী,
জড়্‌জড়িয়ে বেড়াও ঘুরে আসল ঘরেই ফাঁকি।
হরদম্ সারগম্ হাম্মোনিয়ম ভাঁজ্‌তা বিবিজান্,
সাড়ী সেঁটে ব্লাউস্ এঁটে খাপি মিহি তান !
পাতাকাটা জরদা সাঁটা চলা শঙ্কর চালে,
রবি বর্ম্মার ছবির ফর্ম্মা সিন্দুর ফোঁটা ভালে !
ভাবের খস্ খস্ কলম ঘস্ ঘস্ দিস্তা দিস্তা কাগজ।
হায়রাণ প্রেসম্যান্ ছন্দের ফরমান্ হরদম্ ফুটছে মগজ !
জপের মালা ভবের থালা সকল করবে দূর,
মনের মধ্যে জাগবে বউয়ের নতুন রতনচূর !
এ বাত্ সাঁচ্চা পরকো কেচ্ছা বহুৎ আচ্ছা দেলখোস !
আপনা খাঁটী ঔর সব মাটী মু পর্ পরা মুখোস্।
লেনা-দেনা বিকি-কেনা এই দুনিয়াদারী,
আনা যানা ইস্‌কো লাগি সমঝতে পেয়ারী !
এরির তরে দেহ ধ'রে ভবের মাঝে আসা,
এইটি পরম জ্ঞানের চরম সাবাস্ সাবাস্ খাসা !
খানিক খানিক এমন মালিক ! আস্তরমে দেও ডুব।
জীবন কেয়া ওই খেয়ালী ভাব্‌তেই চাপ্ চুপ !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সাধকের ঝুলি

ছিন্ন করিয়া মায়ার বাঁধন
ত্যাগের শাণিত খড়্গে,
সাধক তুলসী হইল বাহির
ত্যজিয়া স্বজন-বর্গে ;
আশা বাসনার হ'ল অবসান,
প্রেম-ভক্তিতে 'গদ্‌গদ প্রাণ,
ইষ্ট-দেবেরে করিতে তুষ্ট
আপন জীবন-অর্ঘ্যে।

নির্ম্মল সে যে ভিতরে বাহিরে
অকপট তার চিত্ত,
জপ আরাধনা, পূজা অনুষ্ঠান
সকলই সে করে নিত্য ;
আগ্রা প্রয়াগ গয়া মথুরায়,
মন্দিরে মঠে ঘুরিয়া বেড়ায়,
সত্যের লাগি সে ভিখারী আজি—
এ কথাটা অতি সত্য।

গলে মোটা মালা, গেরুয়া বসন,
ললাটে তিলক রম্য,
স্কন্ধেতে ঝুলী, সবই আছে তাতে
যাহা কিছু তার কাম্য ;
কি অভাব বল জগতে তাহার,
স্বপাক ভোজন স্বেচ্ছা বিহার,
ভারতের যত পুণ্য ভূমিতে
সন্ন্যাসী সাজি' সৌম্য।

বহুকাল যায় এই ভাবে কেটে
সাধিয়া আপন ইষ্ট,
সাধনের ধন না পড়ে বাঁধনে
বৃথাই যতেক কষ্ট ;
অবশেষে সাধু শূন্য পরাণে,
ফিরিতে লাগিল স্বদেশের পানে,
ব্যর্থ শ্রমেতে ভগ্ন হৃদয়
বিষম বিষাদ-ক্লিষ্ট।

নিশার নিবিড় আঁধার নামিল
দিনের আলোক অন্তে,
পথে তরুমূলে হ'ল সে অতিথি
শ্বশুর-ভবন প্রান্তে ;
না চিনিল কেহ সেখানে তাহারে,
একটি অভাগী শুধু বারে বারে,
নিরখি' নীরবে ঢালিল অশ্রু
চিনিয়া জীবন-কান্তে।

অবলা কাতরে সুধাল সাধুরে—
সাধু যে গো মহামান্য,
"কহ মম ঠাঁই, কি চাহি গোঁসাই
তোমারি সেবার জন্য ;
এনে দেই তাহা ত্বরা করি হেথা,
নহে সমীচীন বিলম্ব বৃথা,
চলি' দূরপথ শ্রমেতে কাতর
তনু তব অবসন্ন।"

সন্ন্যাসী ভণে ধীরে আন্‌মনে
প্রসারি' আয়ত নেত্র,
"সবই আছে মোর ঝুল্‌নাতে দেখ
এ যে মোর বড় মিত্র ;
রন্ধন তরে রয়েছে কটাহ
ভিখ্-তণ্ডুল, আর যাহা চাহ,
ভোজনের তরে বর্ত্তন আছে
পান তরে পান-পাত্র।"

করযোড়ে নারী কহিল সাধুরে,
"হে মোর জীবনারাধ্য,
সকলি রেখেছ ঝুলিতে তোমার
যাহা কিছু তব সাধ্য ;
সংসার তব আছে ত গো সাথে ?
শুধু আমি নাহি তব ঝুল্‌নাতে,
আমাকেও নিয়ে চল তবে প্রভো
ঝুল্‌নায় পূরে অন্য।"

এইবারে সাধু শিহরি' উঠিল—
বিস্ময়ে হৃদি পূর্ণ,
আসন ত্যজিয়া আঁধারে উদাসী
আপনি ছুটিল তূর্ণ,
পত্নীর হেন উপহাস-কথা
হৃদয়ে হানিল বৃশ্চিক-ব্যথা,
ভাবিয়া সাধক ঝুল্‌না সে তার
নিক্ষেপে করে চূর্ণ।

শ্রীবিষয়ারঞ্জন দেব

ভুটানের কয়েকটি দৃশ্য

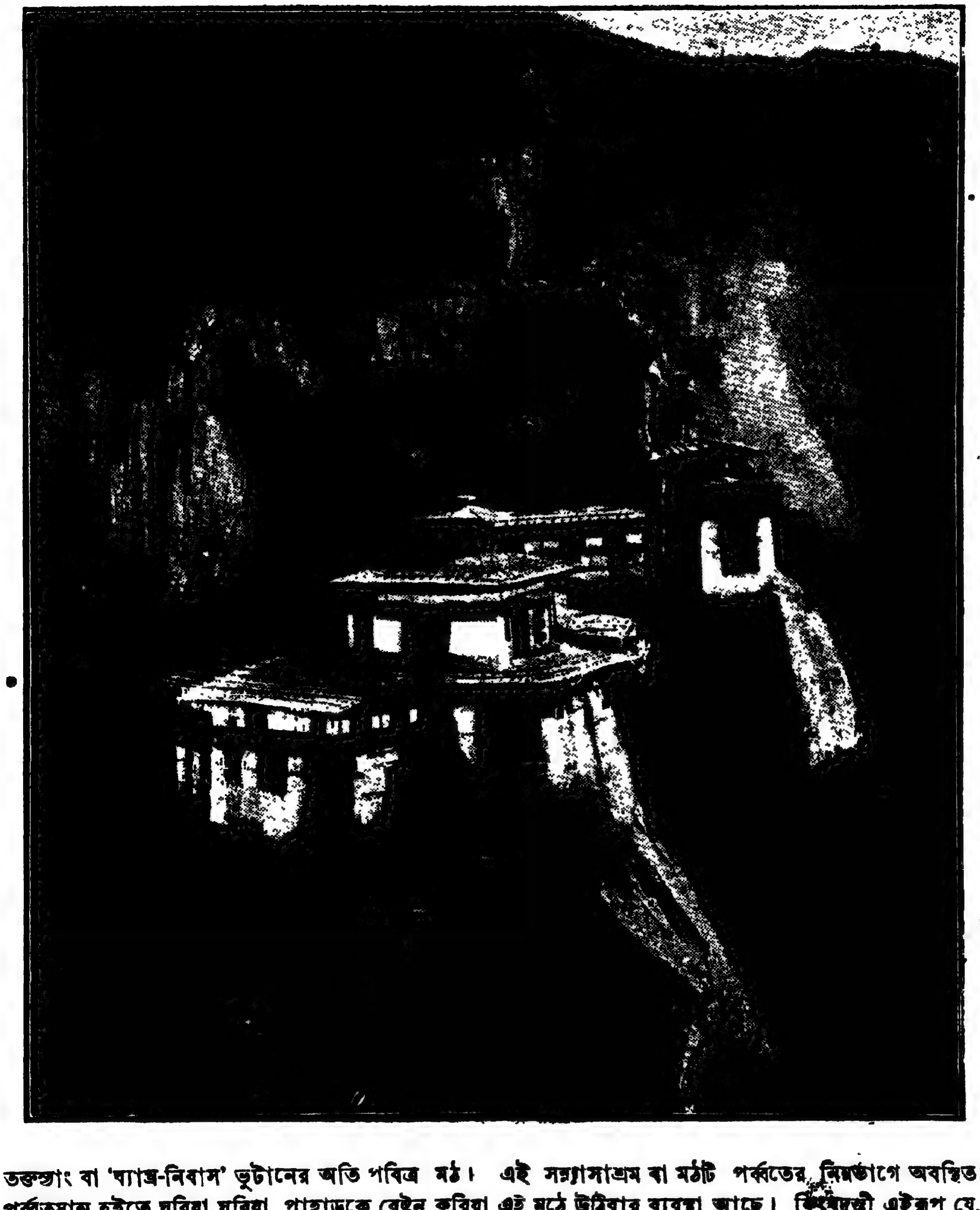

তক্তস্ত্যাং বা 'ব্যাঘ্র-নিবাস' ভুটানের অতি পবিত্র মঠ। এই সন্ন্যাসাশ্রম বা মঠটি পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। পর্ব্বতসানু হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া এই মঠে উঠিবার ব্যবস্থা আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, লামাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পদ্মসম্ভব এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাকি কোনও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মালোচনার পক্ষে স্থানটি মনোনীত করিয়া এইখানে মঠের স্থাপনা করেন।

তুষারকিরীটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্যে ভুটানীদিগের বাসভবন। তাহাদিগের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ভুটানীরা স্বভাবতঃ অতি ভদ্র। সাধারণতঃ ইহারা নগ্নপদে, নগ্নমস্তকে অবস্থান করে। ইহাদের মুখ সর্ব্বদাই হাস্যোজ্জ্বল। বিলাসিতা ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। সহজ সরল ভুটানীরা প্রফুল্লমনে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া থাকে। উর্ব্বরা—শস্যশালিনী উপত্যকা-ভূমিতে প্রচুর শস্য ও ফল উৎপাদিত হয় এবং লামাদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ভূখণ্ডের উৎপন্ন ফল-মূলাদির একাংশ ভুটানী শ্রমজীবি ও কৃষক-সম্প্রদায় লামাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে।

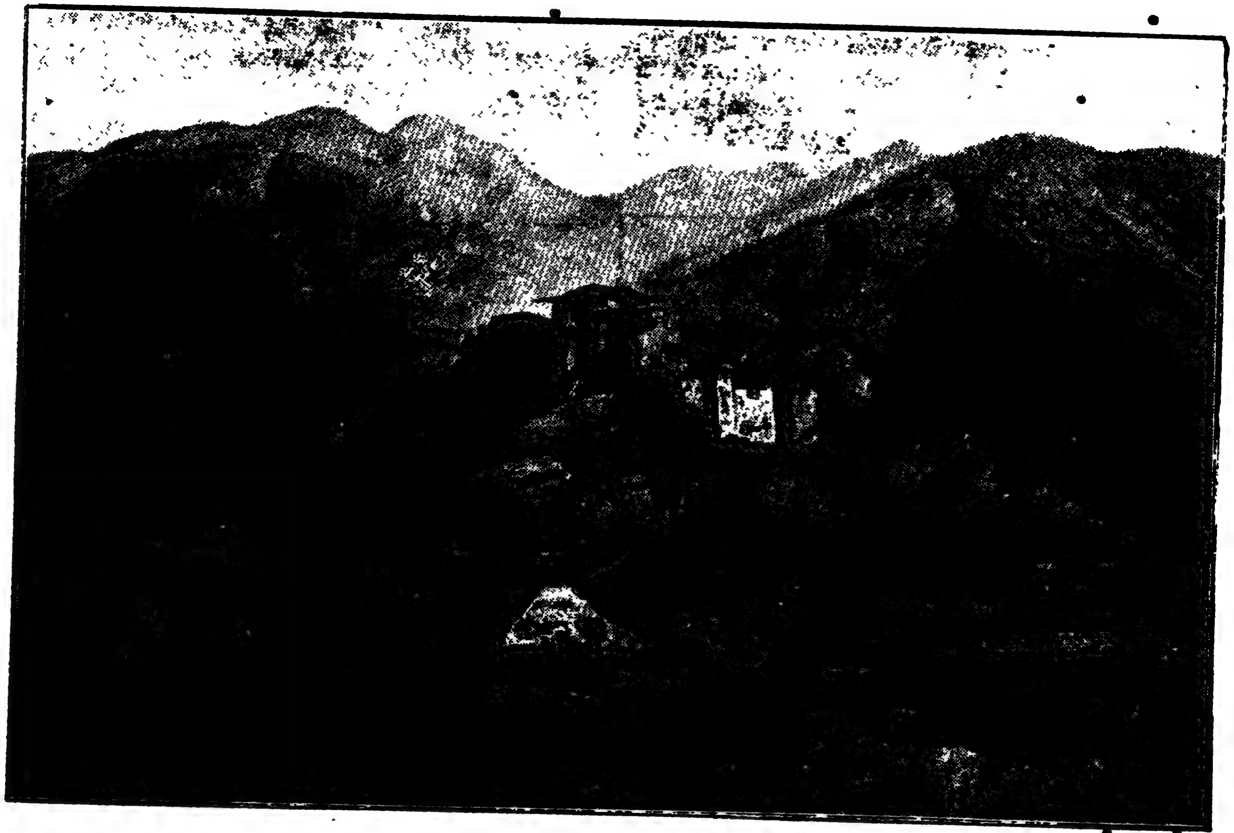

দগ্‌গিজঙ্গ দুর্গ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হয়। এইরূপ প্রাচীন দুর্গ এই অঞ্চলে আর নাই। ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উপরেই এই দুর্গ অবস্থিত। দুর্গের ছাদগুলি ঢালু, ইহাতে চৈনিক প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যথা দুর্গটি মধ্যযুগের ইংরাজ-ভবনের অনুরূপ। তিব্বতীয়গণ একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল, তদবধি ইহার নাম "বিজয়ী ভুটানের দুর্গ।"

অমাত্যগণ-পরিবেষ্টিত ভুটানের মহারাজা। প্রত্যেকেরই অঙ্গে লোহিতবর্ণের শাল। এই গাত্রাবরণ তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদার নিদর্শন। মধ্যস্থলে ভুটানের মহারাজা সার উগগেন ওয়াং-চুক্ (Sir Uggyen Wang-Chuk) ; ইনি বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভুটানের প্রথম মহারাজের সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। বৃটিশ রাজের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া ইনি ইংরাজের আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন। সে জন্য বৃটিশ সরকার ইঁহাকে কে, সি, আই, ই, উপাধি-ভূষণে সম্মানিত করিয়াছেন।

ভুটানের মহারাজার কয়েক জন অস্ত্রধারী সৈনিক। ভুটানে কোনও নির্দ্দিষ্ট সেনাদল নাই। মহারাজার পরিচারকগণই সৈনিকের কায করিয়া থাকে। রক্ত, পীত প্রভৃতি রেখাঙ্কিত পরিচ্ছদে ইহারা ভূষিত থাকে। সৈনিকদিগের মধ্যে দ্বিবিধ অস্ত্রসজ্জা আছে। এক দল ঢাল ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করে, অপর দলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ।

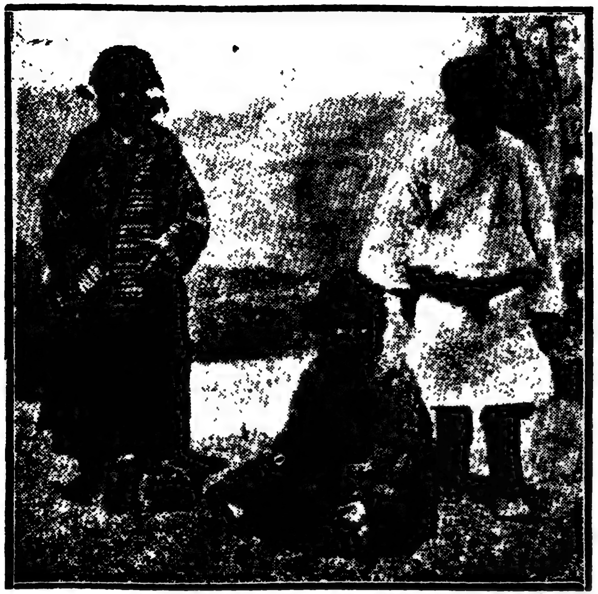

ভুটানের উত্তর ভাগের অধিবাসীদিগের পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের অঙ্গরাখার উপর কোমরবন্ধনী আছে। ঢিলা-হাতা কোর্ত্তা, বুট ইহারা পরিয়া থাকে। এখানকার নারীরা চুল ছাঁটিয়া ফেলে। ইহাদের চরণ ও মস্তক নগ্ন। কর্ণে প্রাচীন যুগের সুবৃহৎ অলঙ্কার এবং গলদেশে হার শোভিত থাকে।

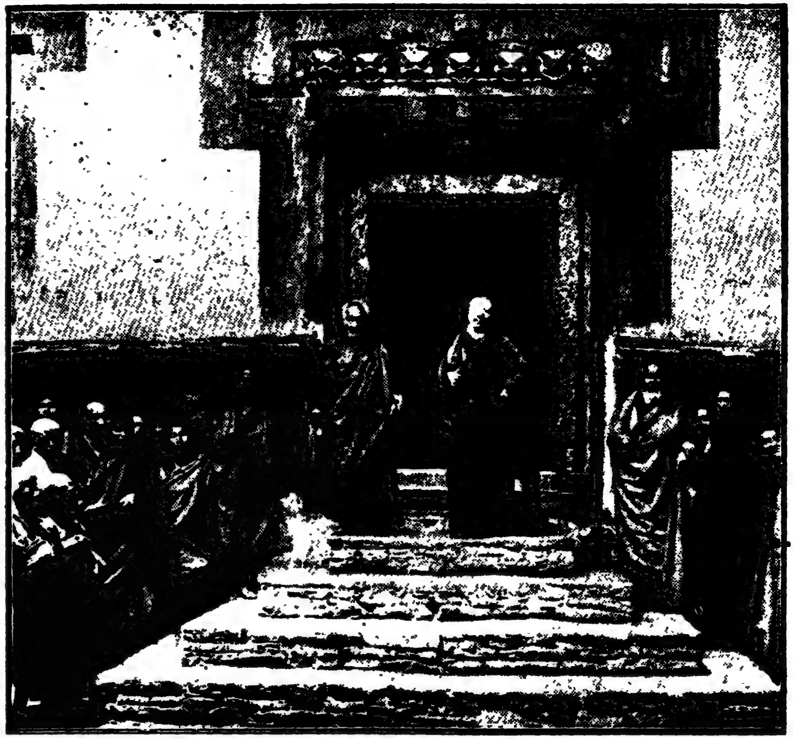

টালো মঠ। দ্বারপ্রান্তভাগে মঠের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারিগণ দণ্ডায়মান। সকলেরই লোহিত পরিচ্ছদ। সাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত এই মঠে সন্ন্যাসীরা তপস্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন। কোন কোন সময়ে ললিতকলাচর্চ্চা অথবা কারুশিল্পের আলোচনাও করিয়া থাকেন।

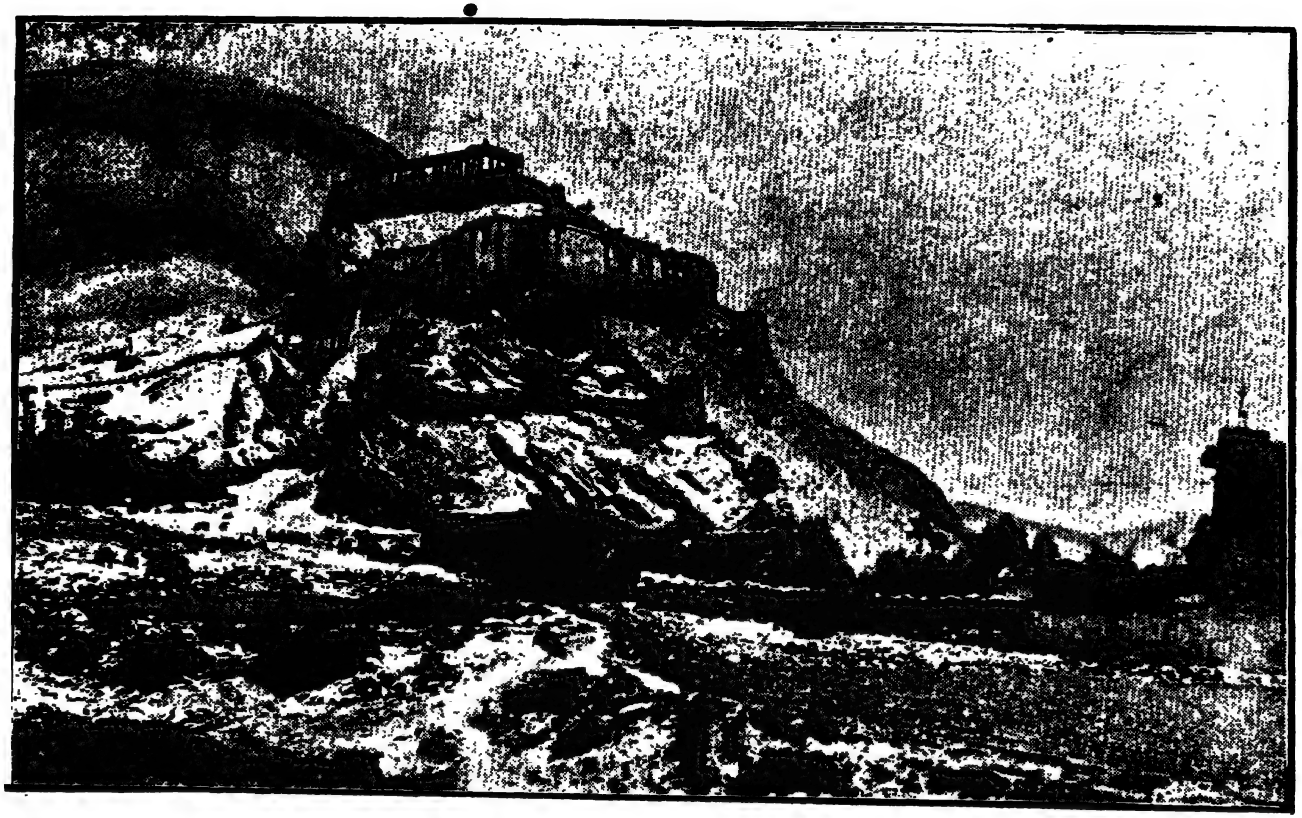

তুয়াজঙ্গ দুর্গ। পাহাড়ের উপর এই তিব্বতীয় দুর্গ অবস্থিত। ইহার নিম্নে পর্ব্বতপদপ্রান্তে একটি মঠ আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর এই মঠ নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে, কোনও সুপ্রসিদ্ধা সুন্দরী বিধবা এই দুর্গে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। দালাই লামার উপর ইহার স্বামী ও ভ্রাতা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়াছিল! এই নারীও নাকি তাহাদের এই দুষ্ট কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। সেই অপরাধে এই নারী এইখানে নির্ব্বাসিতা হইয়া কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী

একাদশ পরিচ্ছেদ

(অবশিষ্টাংশ)

ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসিনী এক মহিলা এনার্কিষ্ট, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হ'তে পারেন, এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন য়ুরোপের কোন বিশেষ দেশের পলাতক বন্দী। সে দিনকার আলাপের পর অনেক দিন যাবৎ তাঁকে খুঁজে পাই নি। কারণ, আমাদের সন্দেহ ক'রে তাঁর ঠিকানা ভাঁড়িয়েছিলেন।

মাসখানেক পরে হঠাৎ এক দিন তাঁকে একটা মিউজিয়ামে ধ'রে ফেল্‌লাম। সেবার তাঁর হোটেল পর্য্যন্ত গিয়ে অনেক ক'রে তাঁর সন্দেহভঞ্জন করতে পেরেছিলাম। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় প্যারিসের তখনকার কোন এক বিশিষ্ট সোসিয়ালিষ্ট দলের এক জন নেতার সাক্ষাৎ লাভ করলাম।

প্যারিসের লুকসেম্‌বার্গ গার্ডেনে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই নেতার সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সৌম্য সুন্দর মুখখানি দেখেই শ্রদ্ধা আপনি জেগে উঠেছিল। আজও তাঁর সেই মুখখানি হুবহু মনে পড়ছে। যাই হোক, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, বিশেষ ক'রে আমাদের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলাম, যেন তা শুনে তিনি বড়ই হতাশ হয়েছিলেন। মনে হ'ল, আমার বদ্‌খত চেহারা আর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বোধ হয় সেই হতাশার কারণ। কিছুকাল পরে যখন বেশ আত্মীয়তা জন্মেছিল, তখন এই হতাশার কারণ খুলে বলেছিলেন; এবং তা সত্ত্বেও যে কেন এত সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, তার কারণ না কি আমাদের আন্তরিকতার ত্রুটি দেখেন নি।

তিনি যা বলেছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, তার সার মর্ম্ম ছিল এই যে, তাঁদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত না হ'লে তাঁদের সাহায্য মিলবে না। আর সভ্য হ'তে হ'লে য়ুরোপে খ্যাত তিন জন সোসিয়ালিষ্টের জামিননামা চাই। আমি পরে বুঝে বলব ব'লে সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিলাম।

এমন তিন জন জামিন খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে যে কি রকম অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সোসিয়ালিজম্‌ বলতে জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যে কি, তার খোঁজ আমাদের দেশের খুব কম লোকই রাখত। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই এক কথাতেই যেমন সমস্ত চার্ব্বাক দর্শনের বিশদ তাৎপর্য্য আমাদিগকে বুঝিয়ে রাখা হয়েছে, সেই রকম "সমস্ত লোকের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, সকলকে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়ার" নাম যে সোসিয়ালিজম, সেই ধারণাই আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তখন প্রায় বদ্ধমূল হয়েছিল। হয় ত কারও এ ধারণাটা অন্য রকম ছিল। কিন্তু এই ধারণার বালাই নিয়ে য়ুরোপে প্রসিদ্ধিলাভের যোগ্য হওয়ার জন্য কোন কিছু করাটা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানর মত অকারণ কষ্ট ব'লেই বোধ হয় তখন গণ্য হ'ত। কাযেই ভারতে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য য়ুরোপে খ্যাত সোসিয়ালিষ্ট পাওয়া যেতে পারে ব'লে বিশ্বাস করতে পারি নি। তার পর যে সকল ভারতবাসী য়ুরোপে ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও তেমন কাউকে তখন খুঁজে পেলাম না। তথাকথিত ভারত-বন্ধু ইংরাজ সোসিয়ালিষ্ট নেতাদিগকে, আমাদের সমস্ত গুপ্ত সমিতির ব্যাপারটা জানান কারুরই সমীচীন ব'লে বোধ হ'ল না। নিরুপায় হয়ে অগত্যা মাঝে মাঝে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে আসতাম, আমরা চেষ্টা করছি।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্রমে বেশ আলাপ জমে উঠল। এঁর নাম আমরা জান্‌তে পারিনি। কারণ, এই ব্যাপারের

লোকদের মধ্যে নাম-ধাম আদি জিজ্ঞেস করা বা বলা একটা মস্ত বড় অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল। তাই আমরা Ph D. বা দার্শনিক ব'লে এঁর নামকরণ করেছিলাম। ইনি য়ুরোপের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের স্কলার ছিলেন। তার পর বেনারসে তিন বছর থেকে সত্যব্রত স্যামাধ্যায়ী প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে এ দেশের নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে য়ুরোপে এক জন orientalist ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই কারণে আমাদের সঙ্গে আলাপের জন্য উক্ত সোসিয়ালিষ্ট সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন।

এই সময় জার্ম্মাণীতে বিশ্ব সোসিয়ালিষ্ট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে প্যারিস থেকে ভারতীয় ডেলিগেট-রূপে দু'জন প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের এক জন ছিলেন পূর্ব্বোক্ত রাণা সাহেব। আর এক জন স্বনামধন্যা মেডাম কামা। ইনি জাতিতে পার্শি হয়েও নিজেকে হিন্দু মহিলা ব'লে সেখানে পরিচয় দিতেন। এঁর অর্থ ছিল প্রচুর। দেশের কাযে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলেন। আর উনি উক্ত "প্যারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটির" এক জন সংস্থাপয়িতা। অনেক দিন যাবৎ এঁর সঙ্গে এক টেবলে ব'সে খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি আমায় চিত্রকলাশিক্ষার্থী ব'লেই জান্‌তেন। বিপ্লববাদী ব'লে তখন বুঝতে পারেন নি। ভারতপ্রসঙ্গে, বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলাপ করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। দুনিয়ার নানা দেশে ভারতীয় রাজনীতির অবৈধতা দেখিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি অন্য দেশবাসীর সহানুভূতি উদ্রেক করানই ছিল এঁর প্রধান কায।

মেডাম কামা উক্ত বিশ্ব মহাসভাতে ভারতবাসীর পক্ষ হ'তে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা না কি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বক্তৃতাকালে তাঁর হাতে ছিল ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জন্য নির্ম্মিত এক ত্রিবর্ণ পতাকা। তাতে ছিল লাল, গেরুয়া ও নীল, পর পর এই তিনটি রং। ওপরে লাল রং, তাতে আটটি আধ-ফোটা সাদা পদ্ম; মাঝখানে গেরুয়ার ওপর দেবনাগরে লেখা ছিল,—"বন্দে মাতরম্"; তলায় নীল রংএর ওপর এক ধারে সূর্য্য, অন্য ধারে অর্দ্ধচন্দ্র ও তারা।

এ হেন পতাকা, তার ওপর পর্দ্দানসীন হিন্দু মহিলার বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা, য়ুরোপের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই সেখানকার বিস্তর কাগজে, মায় পতাকা তাঁর হরেক রকম ফটো এবং বক্তৃতার অনুবাদ বেরোবার পর বেশ হৈ-চৈ প'ড়ে গেছল।

এই ঘটনাটি আমাদের পক্ষে কাকতালীয়বৎ হয়েছিল। ঐ দুজনের কাছ থেকে, ঠিক কি জন্য দরকার, তা না জানিয়ে সহজে জামিননামা আদায় ক'রে নিয়েছিলাম। তার পর উক্ত Ph D. মশায়ও তখন অসঙ্কোচে আমাদের জন্য জামিন হয়েছিলেন। এইরূপে আমরা উক্ত সোসিয়ালিষ্ট দলে প্রবেশলাভ করেছিলাম। আমাদের স্বদেশপ্রীতি যে আন্তরিক, আমরা যে প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক নই, আর ভবিষ্যতে আমরা যে কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা করব না, জামিননামাতে সেই কথাই লিখিত ছিল।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হয়েছিল, তাঁদের দলের এক জন বিশিষ্ট ডাক্তারের সঙ্গে আর ঐ দলের লোক দ্বারা চালিত এক হোটেলে পরিচিত হয়ে থাকা। তার পর ছিল, হরেক রকম গোয়েন্দার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা ও তাতে অভ্যস্ত হওয়া। কত রকম গোয়েন্দা ছিল, তার একটা আন্দাজ দিই।

১। তাঁদের দলের বিরুদ্ধে নিযুক্ত তাঁদের দেশের গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা,

২। ফরাসী সরকারের গোয়েন্দা পুলিস,

৩। আমাদের বিরুদ্ধে বৃটিশরাজের গোয়েন্দা,

৪। দলভুক্ত প্রত্যেক লোকের চালচলন লক্ষ্য করবার জন্য নিজ দলের গোয়েন্দা,

৫। বিরুদ্ধ দলের গোয়েন্দা,

৬। দলের বিরুদ্ধে উক্ত শত্রুপক্ষীয় গোয়েন্দারা কি করছে না করছে, তার সন্ধান নেবার জন্য নিজ দলের তরফ থেকে নিযুক্ত গোয়েন্দা। এ ছাড়া অন্য অনেক বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নানা রকমের গোয়েন্দা সর্ব্বত্র বিরাজিত। সেখানকার গোয়েন্দাদের একটা নমুনা দিই।

এক দিন প্যারিসের সীমার বাইরে পরিখার পাড়ে নির্জ্জনে ঘাসের ওপর ব'সে আমার এক জুড়ীদারের সঙ্গে গল্প কচ্ছিলাম। হঠাৎ এক দল লোক এসে অতি বাড়াবাড়ি

রকমের ভদ্রতার সহিত জানালে, তারা ফরাসী গোয়েন্দা-পুলিস। প্রমাণস্বরূপ সরকারী তকমাও দেখালে। এই কারণে আমাদের ওপর সন্দেহ হয়েছিল যে, আমরা প্যারিসের সামরিক বন্দোবস্তের নাকি প্ল্যান যোগাড় কচ্ছিলাম। তাই আমাদিগকে তালাসী করতে চাইলে। সম্মতি নিয়ে তালাসীর পর কিছু না পেয়ে, নেহাৎ বিনয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা এবং করমর্দ্দন ক'রে চ'লে গেল।

পরক্ষণেই আরও দু'জন এসে জানতে চাইলে, কি হয়েছিল? তার পর পুলিসকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে এবং আমাদিগকে অশেষ প্রকার সহানুভূতি জানিয়ে আর মাঝে মাঝে অনেক কিছু জিজ্ঞেস ক'রে চ'লে গেল। তারা দু এক পা যেতে না যেতেই আরও এক জন এসে, আগের দু দলের কথা শুনে, দ্বিতীয় দলও পুলিস, ছলনা করতে এসেছিল, এই ব'লে খুব এক চোট গালাগালি দিলে। আর পূর্ব্বের মত সহানুভূতি দেখিয়ে ও সাবধান ক'রে দেওয়ার ছল ক'রে আমাদের ভেতরকার কথা বের করবার চেষ্টা করেছিল। আমরা কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। পরে আমাদের গুরু মশায়দের কাছে শুনেছিলাম, উক্ত তিন দলই না কি একই পুলিসের লোক।

সে যাই হোক, এইবারে আমাদের অর্থাভাবটা বড়ই তীব্র আকার ধারণ করল। রোজগারের জন্য যে সকল কায করতাম, সবই তখন ছেড়ে দিতে হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, এক জন জুড়ীদার জুটিয়েছিলাম। তা ছাড়া সকল প্রদেশের লোককে শিক্ষিত করতে হবে, এই দাবীতে এখন আবার লণ্ডন সমিতি থেকে আর এক জনকে নেওয়া হ'ল। তাদের খরচ যোগান ত আবশ্যক হলই, অধিকন্তু সেখানকার বন্ধুবান্ধবদের সংস্রব একেবারে ত্যাগ ক'রে, কোন রকম পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, এমন এক নির্জ্জন পল্লীতে গিয়ে বাস করার আবশ্যকও হয়ে পড়ল। অথচ লণ্ডন গুপ্ত সমিতির সংগৃহীত চাঁদার টাকা সেখানকার কোন কোন সভ্যের ব্যক্তিগত বাজে খরচের ঋণ শোধ করতে নাকি শেষ হয়ে গেছল। তাই স্থির হ'ল, পণ্ডিতজীকে আমাদের মতে আনতেই হবে। Ph. D মশায়, এই মতে আনবার ভার সাগ্রহে নিলেন। তখন পণ্ডিতজী পার্লামেণ্টে তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাতে, লণ্ডন ছেড়ে প্যারিসে এসেছিলেন।

তার পর এক দিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে Ph. D. মশায়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেকালে এ দেশের শ্রাদ্ধবাড়ীতে তথাকথিত পণ্ডিতদের ব্যাকরণের তর্ক-যুদ্ধের প্রহসন যেমন হ'ত, সে দিন সেখানেও তাই হ'ল। একমাত্র দম্পতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে তিন চার ঘণ্টা কেটে গেল। উপভোগ্য হলেও আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু Ph. D. মশায় আমাদের ধৈর্য্য ধরতে ইঙ্গিত করলেন। ঐ ব্যাকরণ-যুদ্ধে হার স্বীকার ক'রে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে তিনি বলেছিলেন, সহজে কার্য্য সিদ্ধ হবে।

দিন কয়েক পরের মিটিংএ কাযের কথা সুরু হয়েছিল এবং পণ্ডিতজী Ph. D. মশায়ের প্রদর্শিত ভারত উদ্ধারের পন্থা যে শ্রেষ্ঠ, তা অম্লান বদনে স্বীকার ক'রে নিজের পূর্ব্বমত একবারে ত্যাগ করেছিলেন, এবং তার প্রমাণস্বরূপ খুসী হয়ে শ পাঁচেক টাকার একখানা নোট ভারতীয় প্রথায় Ph. D. মশায়কে দান করেছিলেন। তিনি দান গ্রহণে নারাজ হ'লে পর তাঁদের সমিতিকে সেই টাকা দেওয়া হ'ল। সেই দিন থেকে তাঁর সোসিওলজীর সুর বদলে গেল।

এই পরিবর্ত্তনের আরও কতকগুলো গৌণ কারণ ঘটেছিল। এই সময়ের কিছু আগে হ'তে এ দেশে বৃটিশ-রাজের সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন স্বাধীনতার দাবী প্রকাশ্যভাবে জাহির করা হচ্ছিল এবং "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে লিখিত এই দাবীর পোষক যুক্তি-তর্কও সেখানকার ভারতীয়দের মনের ওপর যথেষ্ট কায করেছিল। কারণ, মাস কতক আগে বিপিন বাবুর "নিউ ইণ্ডিয়া" তাঁদের রাষ্ট্রীয় মতামতের খোরাক যোগাত। তার পর "বন্দে মাতরম্" পেয়ে অবধি নিউ ইণ্ডিয়াকে আর বড় একটা আমল দিতেন না। হেনকালে "বন্দে মাতরমে"র এডিটার ব'লে অরবিন্দ বাবু সিডিসনের দায়ে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ হলেন। দেশেও যেমন অরবিন্দ বাবুর নাম চরমপন্থী ব'লে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'ল, প্যারিসের ভারতীয়দের মনেও তেমনই বিপিন বাবুর স্থানে অরবিন্দ বাবু প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। তার বোধ হয় আগে যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক ভূপেন বাবুর গ্রেপ্তার এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর নির্ভীক উক্তি ভারতের রাষ্ট্রীয় গগনে সম্পূর্ণ পৃথক রকম আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। ফল

কথা, এ দেশের হঠাৎ রাষ্ট্রনৈতিক মতপরিবর্ত্তনের প্রভাব পণ্ডিতজীর মতকে পরিবর্ত্তনোন্মুখ ক'রে ফেলেছিল। এমন সময়ে Ph. D মশায়ের অকাট্য যুক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তনের কাযটা সুসম্পন্ন ক'রে ফেলল।

ভারতীয় নেতারা হাতকড়ার ভয়ে বা কোন রকমের বেগতিকে না পড়লে মত কখনও প্রায় বদলান না। যদিও বা কখনও বদলেছেন, তাও প্রায় গরম থেকে নরমের দিকে। সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বড় নেতা কখনও অন্যের যুক্তি-তর্কের প্রভাবে অন্তরের সহিত হঠাৎ নরম থেকে গরমে উঠেছেন ব'লে প্রায় শোনা যায় নি। তাই মনে হয়, পণ্ডিতজীর হঠাৎ এ রকম নরম থেকে গরমে পরিণতি ভারতীয় নেতার পক্ষে অভিনব ব্যাপার; বিশেষ ক'রে সদ্য পণ্ডিতজীর ওপর খোদ বৃটিশ-মজলিস থেকে রাজ-সরকারের চোখরাঙ্গানীর পর। এইখানে পণ্ডিতজীর বৈশিষ্ট্য।

যাক্, আমরা প্যারিসের কোন নির্জ্জন পল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠে গেলাম। ছয় মাসের জন্য সেখানে আমাদের অজ্ঞাতবাস হ'ল।

Ph. D. মশায় এবং তাঁর দলের আর এক জন ভূতপূর্ব্ব সামরিক কর্ম্মচারী আমাদের শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। শেষোক্ত ভদ্রলোক তাঁদের দেশের রাজ-সরকারের তরফ থেকে "মিলিটারী এভাসে" বা "এটাচি" হয়ে ভারতে বহুকাল ছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তিনিও এক জন বিশেষজ্ঞ ব'লে তাঁদের সমিতি থেকে এই কাযে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এঁরা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতে কথা বলতে পারতেন।

আমাদের শিক্ষা সুরু হ'ল। ক্রমে জগতের তুলনামূলক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্ম ইত্যাদি তত্ত্ব থেকে সুরু ক'রে সোসিয়ালিজম, কমিউনিজম আদি হরেক রকম চিজ একসঙ্গে খিচুড়ী পাকিয়ে গিলে ফেলতে লাগলুম, পরে পেট ফেঁপে মারা যাবার আশঙ্কা তখন করিনি। অবশেষে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিগঠন-প্রণালী ও তার বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সাধন-কৌশল সম্বন্ধে আমাদের লব্ধ জ্ঞান নোট-বুকে লিখিত হ'তে লাগল। এই ভাবে চার পাঁচ মাস অতীত হয়ে গেল। তখনও উক্ত ফ্রেঞ্চ কেমিষ্টের নিকট এক্সপ্লোসিভ কেমিষ্ট্রী শেখা পূর্ব্বের মতই চলেছিল; কিন্তু বোমা তয়েরী অথবা বৈপ্লবিক বা সামরিক নানা প্রকার কাযে তার যথাযোগ্য ব্যবহার শিখতে তখনও বাকী ছিল। সে কায শুধু কেমিষ্টের দ্বারা কিছুতেই নাকি সম্ভব নয়। এক্সপ্লোসিভ কেমিষ্ট্রী-জানা এক জন খুব হুঁসিয়ার মিস্ত্রীর সে কায। আমাদের বিশেষ অনুরোধে ও জেদে উক্ত সোসিয়ালিষ্ট সমিতি হ'তে এক জন বৃদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ঐ সকল শেখাবার কাযে নিযুক্ত হলেন। ইনি এক জন পলাতক রাজনৈতিক অপরাধী। তখন আমরা পূর্ব্বোক্ত ফ্রেঞ্চ কেমিষ্টকে বিদায় দিয়ে শোবার ঘরকেই মিস্ত্রীখানা ও ল্যাবরেটারীতে পরিণত ক'রে নতুন গুরুর কাছে বিদ্যারম্ভ ক'রে দিলাম। ইনি গোয়েন্দার ভয়ে দিনমানে ঘরের বাহির ত হতেন না, রাত্রেও ছদ্মবেশ ভিন্ন বেরুতেন না। কাযেই দিন-রাত আমাদের কায চলত।

গোয়েন্দা পুলিস হঠাৎ এসে পড়লে বা জিজ্ঞাসাবাদ করলে কি করা বা বলা উচিত, তাও শেখাবার জন্য নিজেদের লোকই আগে না জানিয়ে গোয়েন্দা সেজে হঠাৎ এসে পড়তেন এবং প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করতেন।

সে যাই হোক, এই ভাবে আমাদের এ লব্ধ বিদ্যাও বিশদরূপে নোট-বুকে লিখে গুরুজীর দ্বারা সুধরে নেওয়া হ'ত। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে তাঁর একখানি বিস্তৃতভাবে লিখিত সচিত্র সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি ছিল। তার হুবহু অনুবাদ ও লিথো করাতে অনেক ফিকির-ফন্দী ও অর্থ-ব্যয়ের আবশ্যক হয়েছিল। সে কথা এখন থাক। যদি কখনও সুবিধা হয়, তবে এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলোর উপন্যাসের মত রহস্যজনক অংশটা পরে পৃথক্ প্রবন্ধে লেখবার চেষ্টা করব।

কিন্তু আমাদের এই বোমা শেখার ব্যাপারে উক্ত গুরু মহাশয়রা প্রথমে রাজী ছিলেন না। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, ভারতবাসী তখন বৈপ্লবিক তাণ্ডব-কাণ্ডের (Terroristic work) জন্য প্রস্তুত হ'তে পেরেছে। সমস্ত ভারত জুড়ে বিশালভাবে সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুলবার আগে, বিশেষ ক'রে এই সমিতির গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ হওয়ার আগে, বৈপ্লবিক তাণ্ডব-ব্যাপার আরম্ভ করলে তার ফল যে মারাত্মক হবেই, তা অকাট্য যুক্তি ও নানা দেশের নজীর দ্বারা বুঝিয়ে আমাদিগকে ঐ কায থেকে আপাততঃ নিবৃত্ত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। আর বুঝিয়ে দিলেন, বোমা, গুলীগোলা আদি

তয়ের করতে শেখার ব্যাপারটা গুপ্ত সমিতির অন্য শিক্ষণীয় কাযের তুলনায় না কি নগণ্য।

এই সময়ের দশ বারো বছর আগে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তখন ভারতের যে অবস্থা দেখেছিলেন, তা থেকে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, হঠাৎ কি ক'রে ভারতের মত দেশে জনসাধারণের মনোভাব এমন ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের পোষক হয়ে গ'ড়ে উঠল। চীনে বহুকাল থেকে গুপ্ত সমিতি এমন দক্ষতার সহিত পরিচালিত হচ্ছিল যে, তার তুলনা না কি তখন দুনিয়াতে ছিল না। গুপ্ত সমিতি-গঠনে যে চীনারা কত দূর সিদ্ধ হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের প্রতিবেশী চীনারা, আমাদের দেশে এসে গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছে কি না? করছে ব'লে শুনলে হয় ত নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারতেন, আমাদের দেশ বোমা-কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

এ সকল ধর্ম্মের কাহিনী শোনবার মত মনের অবস্থা আমাদের মোটেই ছিল না। কোন রকমে তাঁদের রাজী করা আবশ্যক হয়েছিল। আমার জুড়ীদার দুটির এক জন দু বছর আর এক জন প্রায় দু তিন বছর আগে ভারত ত্যাগ করেছিলেন। তার পূর্ব্বে তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে বোধ হয় বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। কাযেই ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার সে সময়কার স্বদেশী আন্দোলন আর বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির অবস্থা সম্বন্ধে যা আওড়ে যেতাম, তা মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করবার, এমন কি, মিথ্যা ব'লে বোঝবার ক্ষমতাও সেখানে কারও ছিল না। আমাদের গুপ্ত সমিতির কায সম্বন্ধে বহ্বারম্ভে বে-পরোয়াভাবে কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যার গোজা-মিল দিয়ে যা মুখে আসে, তাই শুনিয়ে খুসী ক'রে দেওয়ার বিদ্যাতে আমার ওস্তাদ যতীন বাঁড়ুজ্যে আর বারীনকে হার মানিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার মধ্যে এ রকম মিথ্যা বচন দেওয়ার প্রবৃত্তি প্রধানতঃ এই সব কারণে গজিয়ে উঠেছিল যে, (১) আমি সত্যই এ কথা মনে করতাম যে, অন্ততঃ আট কি দশ বছরের মধ্যে, আমরা উঠে প'ড়ে লাগলেই বিপ্লব সার্থক হ'তে পারে। সুতরাং যত শীঘ্র হয়, বোমা আদি তয়ের করতে দেশকে শেখান উচিত।

(২) সকালে গ্রেপ্তারের দায় হ'তে সমিতির রক্ষার জন্য মন্ত্রগুপ্তি বিদ্যায় সিদ্ধ হ'তে অথবা নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ গ'ড়ে তুলতে যে রকম দীর্ঘকালসাপেক্ষ শিক্ষা ও অভ্যাস য়ুরোপে আবশ্যক হয়েছিল বা হচ্ছে ব'লে এঁদের কাছে শুনেছিলাম, আমাদের দেশে আদৌ সে রকম দরকার নাই বলেই মনে করতাম; কারণ, আমাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, এ দেশের টিকটিকির কান বেজায় লম্বা আর আমাদের সনাতন ধর্ম্মের দেশের লোক য়ুরোপের লোকের মত অত বিশ্বাসঘাতক হ'তেই পারে না।

(৩) বোমা-কাণ্ড সুরু ক'রে দেওয়ার জন্য যে বাঙ্গালার বিশেষ কতকগুলি লোক অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, আর সে জন্য আমাদের সমিতির সাহায্যে টাকা দিতেও চেয়েছিলেন, তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। তাঁদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারলে সমিতির আয়ের পথ সুগম হবে বলেই মনে করতাম।

(৪) আগে এও লিখেছি, আমার য়ুরোপে যাবার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধবিদ্যা ও সেই সঙ্গে কামান, রাইফেল, পিস্তল আদি তয়ের করতে শিখে এসে "আনন্দমঠের" মহেন্দ্রের পালা অভিনয় করা। অধিকন্তু তখন নিজের সম্বন্ধে এ ধারণাটাও কেমন ক'রে হয়ে পড়েছিল যে, আমার মত নিপুণভাবে এ সকল কায আর কেউ করতে পারবে না। ও সব শেখা যখন হলই না, তখন বোমার আর পিস্তল, রাইফেল, এমন কি, কামান আদি গোপনে সরবরাহ করবার হিকমতটা শিখে গেলে যে উক্ত মহেন্দ্রের মত একটা অতি বড় কাযের লোক ব'লে পরিগণিত হব, এ রকম আশাটাও তখন গজিয়ে উঠেছিল।

কাযেই সেই সময়ে ভারতে সংঘটিত কয়েকটা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ক'রে আমাদের গুরু মশায়দের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, ভারত তাঁদের অভিপ্রায়মত উক্ত Terroristic work-এর জন্য প্রস্তুত আছে। অগত্যা তাঁরা মনে ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, চীনের প্রায় সমান সনাতন সভ্যতাবিশিষ্ট ভারত হয় ত বা প্রাচ্য-সুলভ বৈপ্লবিক জিনিয়াসের দেশ।

যাই হোক, দেশ যে প্রস্তুত হয়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ যে সকল ঘটনা তাঁদের কাছে বিবৃত করেছিলাম, তার কয়েকটা নমুনা এখানে দিই।

১। সেই সময়ের ভারতীয় অনেক সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ খুব চোখো চোখো এমন অনেক ধৃষ্টতা-সূচক বচনবাণ প্রয়োগ সুরু করেছিলেন—যাতে ক'রে বাইরের লোকের পক্ষে ধ'রে নেওয়া খুব সহজ হ'ত যে, এ রকম বচনের পেছনে নিশ্চয় একটা বিপুল শক্তি গোপনভাবে গঠিত হয়েছে। এই ভাবটা সেখানকার সাধারণ পলিটিসিয়ানরা, এমন কি, আমাদের গুরু মহাশয়রাও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁদের বোঝান সহজ হয়েছিল যে, আমাদের শত শত গুপ্ত সমিতির হাজার হাজার সভ্য বৈপ্লবিক Terroristic workএর জন্য কি রকম হা-পিত্তেশ ক'রে অকারণ ব'সে আছে।

২। যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক ব'লে বিদিত ভূপেন বাবুর পূর্ব্বোক্ত সিডিসনের দায়ে গ্রেপ্তার আর প্রকাশ্য আদালতে তাঁর নির্ভীক উক্তি যে গুপ্ত সমিতির প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিচায়ক আর আমি যে ভূপেন বাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ সহযোগী কর্ম্মী, তাঁর গ্রেপ্তারের পর লিখিত চিঠি আর অন্য কাগজপত্রের দ্বারা তা প্রমাণ ক'রে দিলাম।

৩। "বন্দে মাতরম্" রাজদ্রোহ-সূচক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবুর গ্রেপ্তারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। সুবিধামত মাল-মসলার সহিত এটাকেও প্রমাণ ব'লে চালাতে তখন ছাড়িনি।

৪। তার পর পঞ্জাবে শ্রীযুক্ত লালা লজপৎ রায়, সর্দ্দার অজিৎ সিং ও সুফী অম্বালাপ্রসাদের হঠাৎ ডেপুটেসন সেই সময়ের কিছু আগে হয়েছিল, এ বিষয় প্যারিসের "তাঁ" (Temps) নামক সুবিখ্যাত দৈনিকে এক কলমব্যাপী একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল, তাতে লালাজীর নামটি ভুলে লজপৎ রায় করেছিল; আর একটা বিশ্রী রকমের ভুল করেছিল, লালাজীর ছবি ব'লে চাপকান-পরা, বুকে চাপরাস আঁটা কোন এক পঞ্জাবী চাপরাসীর ছবিও ছেপেছিল। আমরা অবশ্য তার প্রতিবাদ ক'রে সত্যিকার ছবি বার করেছিলাম। সে যাই হোক, "তাঁ" অনেক কথাই লিখেছিল; ভারতে আবার ১৮৫৭র সূচনা হয়েছে ব'লে আতঙ্কও প্রকাশ করেছিল; এমন আরও অনেক কাগজে অনেক কথা ছিল, যা না কি ভারতে বিপ্লব যে উন্মুখ হয়ে এসেছে, তার প্রমাণ ব'লে আমরা তখন দেখাতে পেরেছিলাম।

৫। বাঙ্গালা দেশে তখন তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন-ব্যাপারে এত ধর-পাকড় চলছিল, বয়কট ও পিকেটিং নিয়ে এমন হুলুস্থূল প'ড়ে গেছল, অনেক স্থানে পিটুনী পুলিসের কীর্ত্তিকথা এমন ক'রে বর্ণিত হ'ত, কয়েকটা সাহেব ব্যবসায়ীর বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা এমন ষ্ট্রাইক চালিয়েছিল যে, তা প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে আমাদের দেশ যে প্রচ্ছন্নভাবে বিপুল শক্তি সঞ্চয় ক'রে terroristic workএর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, আমাদের গুরু মশায়দিগকে অবশেষে তা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

প্রথমে সন্দিহান হলেও তাঁদের মনটাও যেন এই প্রস্তুত হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করবার জন্য কতকটা উন্মুখ হয়েছিল। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, তখন থেকে দশ বছরের মধ্যে না কি জার্ম্মাণদের সঙ্গে ইংরাজ আদির ভীষণ যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকা, মিশর ও আয়রল্যাণ্ড নিশ্চয় বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু ভারত বিদ্রোহী হয়ে না লড়লে ইংরাজ কিছুতেই কাবু হবে না। তা না হ'লে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হয়ে শিল্প-বাণিজ্যে অন্য দেশের মত আত্মনির্ভরশীল না হ'লে, না কি সোসিয়ালিষ্টদের কামনা সিদ্ধ হবে না। তাই তাঁদেরও মন বোধ হয় চেয়েছিল, ঐ দশ বছরের মধ্যে কোন রকমে ভারত যেন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়।

এই মনোভাবের বশীভূত ছিলেন বলেই বোধ হয়, তাঁদের কাছে আমাদের এত আদর, যত্ন ও সহানুভূতি; আমাদের সাহায্য করবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এমন কি, আমাদের দেশে আসবার জন্যও বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সে যাই হোক, সেই সময় না কি পর্ত্তুগালে বিপ্লবের বিপুল অনুষ্ঠান চলছিল। আর না কি ছ মাসের মধ্যে বিপ্লব-সংঘটন, অর্থাৎ রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উচ্ছেদ ক'রে তার যায়গায় গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ হব হব কচ্ছিল। হাতে-কাযে ক'রে শেখবার জন্য আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যেতে আমাদের Ph. D. মশায় বিশেষ ক'রে বলেছিলেন। আমাদের কারুরই কিন্তু তাতে মত হয় নি। যাই হোক, পর্ত্তুগালে কিন্তু ছ মাসের মধ্যে সত্যই বিপ্লব সিদ্ধ হয়েছিল।

সদ্য অর্জ্জিত বিদ্যাটা স্বদেশে জাহির করবার বাসনাটা নেহাৎ উৎকট হয়ে উঠেছিল; বিশেষ ক'রে পর্ত্তুগালে এমন ভীষণতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাদের একটুও শঙ্কা যে হয় নি, এ কথা বলতে পারি না।

অবশেষে অগত্যা এই স্থির হ'ল, আপাততঃ আমরা দেশে এসে সদ্যোলব্ধ বিদ্যার মোতাবেক সমস্ত ভারত যুড়ে গুপ্ত সমিতির পত্তন দিয়ে এক বছরের মধ্যে আবার ফিরে যাব। তখন প্যারিসে নিখিল ভারতীয় গুপ্ত-সমিতির প্রেরিত যোগ্য শিক্ষার্থীদিগকে বিপ্লব-বিদ্যার যাবতীয় বিষয়, মায় শেষকালের প্রযোজ্য সমরবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা গুপ্ত বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তার অবৈতনিক অধ্যাপনার কায করবেন উক্ত সোসিয়ালিষ্ট দলের বিশেষজ্ঞরা। আর শিক্ষার্থীদের নিজ ভরণ-পোষণের জন্য কায-কর্ম্ম করবার আবশ্যক হবে ব'লে একটা কোন ব্যবসায়ের কারখানাও প্রকাশ্যভাবে খোলা থাকবে।

এই সব করতে কম্মাতে টাকার কোন অভাবই যে হবে না, সে ধারণা আমাদের নিশ্চিত ছিল। কারণ, সেইখানেই অনেক টাকার যখন অযাচিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, তখন ভারতের ধনকুবের দেশ-প্রেমিকরা এমন কাযের মত কাযের জন্য যে একবাক্যে মুক্তহস্ত হবেন না, তা বিশ্বাস করতে তখন প্রবৃত্তি হয় নি।

তার পর আমাদের লণ্ডন সমিতির প্রেরিত জুড়ীদার আরও দু এক মাসের জন্য লণ্ডনে গিয়ে থাকলেন, বাকী আমরা দু জন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ইতালীর নেপলস বন্দরে জাহাজে চ'ড়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

নববর্ষের গান

পুরাতন গেছে নববর্ষের যাত্রা হয়েছে সুরু,
এখনও পিছনে প্রতিধ্বনিছে শঙ্খের গুরু গুরু।
এ হেন সময়ে কুণ্ঠিত-দেহ মাথাটিরে রাখি পায়,
পথের প্রান্তে কে তুমি বন্ধু খর্জ্জুর-বীথি-ছায়?
বামবাহু তব জড়ায়ে ধরেছে দক্ষিণ কফোণিরে,
দক্ষিণ বাহু ধূলি পরে বৃথা রেখা অঙ্কিয়া ফিরে;
নয়ন দুটির আনত দৃষ্টি মানসাম্বুধি-নীরে,
ডুবিয়া ডুবিয়া কি খুঁজে, বন্ধু! নামহারা মণিটিরে?

সমুখে চলিছে বিজয়যাত্রা উঠিয়াছে কোলাহল,
কোটি কণ্ঠের ধ্বনিত হর্ষে ক্বণিত আকাশতল।
নববর্ষের সফল উষায় এসেছে আলোর বান,
সকল শঙ্কা হরণ করিয়া এল যাত্রার গান।
ঘরে যারা ছিল বাহিরিল পথে মাতিল নান্দীগানে,
পিছনে যা ছিল ধূলিসম ত্যজি' চলিল সমুখপানে।
'কোথা যাব?' 'কেন?' এ সব প্রশ্ন করিতে সময় নাই,
এমন দিনেও অলসের মত তুমি প'ড়ে রবে ভাই!

বার বার তোরে ডেকে গেল তারা সঙ্গে যাবার তরে,
তুমি ব্যথাহত মুখ অবনত কি গো সে লজ্জাভরে।
বেদনা তোমারে দিয়েছে কি কেহ করেছে কি অপমান,
তরুণ-বুকের করুণারে কেহ করেছে কি হতমান,
পাইলি কি বিষ স্নেহ দিয়ে তুই মৃত্যু কি দিয়ে ক্ষেম,
শ্মশান-দগ্ধ অঙ্গার কি রে পেলি দিয়ে মণি হেম?
তাই একা আজ নীলাকাশ-তলে খুলে' বক্ষের দ্বার,
হৃদয়-দেবের চরণে সাজাস্ বেদনার উপহার!

কিন্তু বন্ধু, হে তরুণ প্রিয়, এই কথা মনে রাখো,
ওই যে তোমার সমুখে চলেছে যাত্রীর দল লাখো;
ওই যে কাহারো শিরে উষ্ণীষ, অনাবৃত কারো শির,
অনাবৃত কারো দেহ পদ, কেহ দ্রুতগতি কেহ ধীর;
কেহ চেয়ে আছে দিগন্তপারে কেহ গায় জয়গান,
তুমি নাহি গেলে স্বপ্নের মত বৃথা ওই অভিযান।
প্রভাতের গান আকাশের আলো বৃথা উহাদের কাছে,
লক্ষ লোকের বক্ষে যা নাই তোর বুকে তাই আছে।

মরুভূর মাঝে তার গানে বল্ উপবন হবে তবে?
হত্যাকারীর হাতিয়ারে তোরে বেহালা বাজাতে হবে।
জ্বলে-যাওয়া মাটী সবুজ করিয়া তুই ত ফোটাবি যুঁই,
পাহাড়েরে ভালবাসিয়া রে কবি, ঝরণা ছোটাবি তুই।
শ্মশানের হাওয়া মঙ্গলময় মলয় করিয়া আনা,
মৃত্যুরে দিতে অমৃত-মন্ত্র তোরি শুধু আছে জানা।
মানস-কুসুম তোর মুখ চেয়ে আরও কত কাল র'বে,
কেবলি মুকুল ঝরাইলি যদি ফুল ফুটাইবি কবে?

তবে আয় কবি, আয় উঠে আয়, ঝেড়ে ফেল অবসাদ,
প্রাণ ভরে' শুধু নে রে শিরে তোর দেবের আশীর্ব্বাদ।
যে দিয়েছে দুখ এক মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে তার কথা,
কোথা তোরে কেবা আঘাত করেছে ভুলে গিয়ে সেই ব্যথা,
এই অভিযান সফল করিবি কর আজি এই পণ,
ভাল দিয়ে চির-মন্দই পাবি এ যে তোরই প্রাক্তন;
তাই ব'লে কি রে নব-বর্ষের নব প্রভাতের বায়,
বসে' থাকা চলে পথের প্রান্তে খর্জ্জুর-বীথি ছায়?

শ্রীগোপাললাল দে।

অবতারের আশ্রয়

১। অবতার।

সাধনা করিয়া কেহ কেহ সাধ্যবস্তু লাভ করেন, তাঁহাকে সিদ্ধ বলা যায়। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
> আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥"

যিনি সর্ব্বমনোগত কাম নিঃশেষে নাশ করিয়াছেন, কেবল আত্মাতে আত্ম দ্বারা তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলা যায়।

আবার কেহ কেহ সাধনা না করিয়াই গোড়া হইতেই উর্জ্জিত শক্তিসম্পন্ন। তাঁহাকে জন্মসিদ্ধ বলা যায়। তাহা হইলে সাধন-সিদ্ধ ও জন্ম-সিদ্ধ দুই প্রকার সিদ্ধপুরুষ আছেন। সনক, সনন্দন প্রভৃতিকে সিদ্ধের সিদ্ধ বলা যায়। এ ছাড়া মাঝে মাঝে অবতার পুরুষ এই মর্ত্তভূমিতে আসেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীদত্তাত্রেয়, শ্রীবুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, কালী, তারা প্রভৃতি।

সিদ্ধপুরুষ জীব। অবতার-পুরুষ জীব নহেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলিতেন,—"একটি জীবশক্তি আর একটি দৈবশক্তি।" জীব অবিদ্যা-শক্তি, অবতার মায়াশক্তি। অবতারের দেহ-মন শুদ্ধ সত্ত্ব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"অবতারেরা ভগবানের সদর নায়েব। কোন জমীদারীর প্রজারা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, জমীদার এক জন সদর নায়েব পাঠাইয়া দেন। সদর নায়েব যাইয়া প্রজাদের শাসন করিয়া আসেন।" পুরাণে আছে,—

> "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থং আবির্ভবতি সা যদা।
> উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥"

দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি আবির্ভূতা হয়েন, যদিচ তিনি নিত্যা, তাহা হইলেও তাঁহার জন্ম হইল লোক বলিয়া থাকে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"

যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন অবতার পুরুষ আসেন। অবতারের পাপ হরণ করিবার ক্ষমতা থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"সিদ্ধপুরুষ যেমন হাবাতে কাঠ, কোন গতিকে ভেসে যায়, একটি পাখী বসিলেই ডুবে যায়। কিন্তু অবতারেরা বাহাদুরী কাঠ, নিজে ভেসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত বয়ে লয়ে যায়।" পাপ হরণ করিবার তাঁহাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে। মহাপ্রভু মাধাইকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার গৌরকান্তি দেহ নীল হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ জীবের পাপহরণ করিবার ক্ষমতা অবতার ছাড়া সিদ্ধপুরুষে নাই। অবতারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি সাঙ্গোপাঙ্গও আসেন। অবতার পুরুষ তাঁহাদের সহিত মানুষানুযায়ী লীলা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গরা নিত্যসিদ্ধ।" সাধনা সাধারণ উপায়। অবতারের আশ্রয় লইলে বিশেষ সাধনার আবশ্যকতা নাই। কারণ, তাঁহার কৃপাতে সব হইয়া যায়। তন্ত্রে আছে,—

> "তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"দক্ষিণে বাতাস বইলে, আর পাখার দরকার নাই।"

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥"

সেই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহার্থ অজ্ঞানজ তম আমি নাশ করিয়া দিই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া অন্ধকার নাশ করিয়া দিই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি দেশলাই জ্বালিলে, সেই আলোতে যেমন হাজার বছরের অন্ধকার তখনই নাশ হয়, সেইরূপ অবতারের কৃপা হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ হইয়া যায়।"

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

হাঁ, সাধনা দ্বারা সাধক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু যারা আমাকে আশ্রয় করে,

> "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"

আমি তাদের উদ্ধার করি। সে জন্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন, কোন সাধনার দরকার নাই, আমার আশ্রয় লইয়াছ।

> "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"

আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। একটু আধটু সাধনা করিলেই বা ঈশ্বরদর্শন হইলেই অবতার হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানীং সে রামকৃষ্ণ; তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

> "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম ভবতি।"

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান; ইহা আত্মা সম্বন্ধের কথা, শক্তি সম্বন্ধের কথা নহে। অর্থাৎ তিনি আত্মচৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্যের ঐক্য উপলব্ধি করেন, অতএব কূটস্থই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হয়। জীব ঈশ্বর হয়েন, এ অর্থ নহে। জীব ও ঈশ্বর আলাদা থাক। জীবের হাতে কেবল নিজের ভোগ-মোক্ষ আছে। ঈশ্বরের হাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। অবতারেরা ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। ধর্ম্মসংস্থাপন জগতের স্থিতিকার্য্যের অঙ্গ।

কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামী ছিলেন। তিনি দণ্ডী স্বামী। যেমন পণ্ডিত, তেমনই জ্ঞানী। খুব মান। একরূপ কাশীর রাজা। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে যান ও প্রকাশানন্দের সহিত দেখা হয়। প্রকাশানন্দ তাঁহাকে বলেন,—"নাচ, গান ও সব তোমার মাথার ভুল; বেদে আছে, সমুদ্রের মত গম্ভীর হবে।" শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর মণিকর্ণিকায় প্রকাশানন্দকে দেখাইয়া দিলেন, "তুমি যে জ্যোতির্ধ্যান কর, সেই জ্যোতিই আমি।" প্রকাশানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। সাধক জীব! জীবের শক্তি কতটুকু? তাঁহারা নিজ নিজ "ভাবের" মতের 'গণ্ডীর' মধ্যে বিচরণ করেন। অবতারেরা দৈবশক্তিতে শক্তিমান। সে জন্য তাঁহারা 'মত', 'গণ্ডী' ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবান্ জড়রাজ্য যেমন ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন, সেইরূপ ভাবরাজ্যও চুরমার করিয়া ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। এই খেলা চলিতেছে। সে জন্য সাধক মা'কে বলেন,—

> "মা! তুমি নূতনে বৈ পুরাণে!"

২। শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি, দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব যেমন অভেদ, তেমনই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন না, তখন ব্রহ্ম; আর যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তখন শক্তি। একই ব্রহ্ম, অনাদিসিদ্ধ মায়া হেতু ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম হইয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের প্রাথমিক ঈক্ষণ কথিত আছে।

"তদা ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়,"

তিনি আলোচনা করিলেন, বহু হইব, উৎপন্ন হইব।

"সোঽকাময়ত" তিনি ইচ্ছা করিলেন,

"তৎ তপ অকুরুত" তিনি তপঃ সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি।

জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার সমষ্টিকে ব্রহ্মধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন। কারণ, এই ধর্ম্ম তাঁর স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে,—

"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ,"

যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি বা দুগ্ধ ও ধবলত্ব। ব্রহ্মের 'ধর্ম্ম' এ জন্য 'শক্তি' সংজ্ঞা হইয়াছে। সেই শক্তি জড় বা জীব নহেন। কিন্তু অতি কোমল চিৎশক্তি, সে জন্য ব্রহ্ম কোটি। ব্যষ্টি জ্ঞান, ব্যষ্টি ইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়া, মহাসরস্বতী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সমষ্টি জ্ঞান ইচ্ছা-ক্রিয়া চণ্ডী নামে ব্যবহৃত হয়েন। এই ব্যষ্টিজ্ঞান, ব্যষ্টিইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়ার অপর নাম বামা, জ্যেষ্ঠা, অতি রৌদ্রী; অথবা পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী; অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। আর সমষ্টিজ্ঞান ইচ্ছাক্রিয়ার নাম অম্বিকা, শান্তা, পরা; ত্রিতয়ের সমষ্টি, এ জন্য তুরীয়া। পরব্রহ্মের পট্টমহিষী এই মায়াশক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

জননি পদপঙ্কজ" দেহি শরণাগত জনে
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়-ভয়-চয়বারিণী॥
প্রণব-রূপিণী সারা   কৃপানাথ-দারা তারা
ভব পারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা মূলহীনা,
মূলাধার—অমলকমলবাসিনী।
আগম-নিগমাতীতা খিল মাতা খিল পিতা
পুরুষপ্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি-ত্রিধাকারিণী।

৩। ভাব আশ্রয়

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে ডাকিলেই হইল, দেবদেবীর দরকার কি? তাঁহারা ঠাট্টা করেন,—"ইহাগচ্ছ" বল কারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন মর্ত্ত্যলোকে মানুষ প্রভৃতি নানা জীব বাস করে, সেইরূপ বিভিন্ন লোকে দেবদেবীও আছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা মানুষের নানা কর্ম্মে সাহায্য করেন। সে জন্য দেবদেবীকে ডাকা কি পূজা নিষ্ফল নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে ব্যক্তিবিশেষের আরাধনা করিলে সাংসারিক লাভ হইয়া থাকে, আর দেবদেবীর পূজা সাংসারিক হিসাবে নিষ্ফল হইবে কেন?

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"লভতে চ ততঃ কামান্।"

সেই সব দেবতা হইতে সংকল্পিত কাম পাইয়া থাকে। আরও দেবদেবীরা অতীন্দ্রিয়। ওরূপ পূজাতে অতীন্দ্রিয় জিনিষে বিশ্বাস হয়। তার পর ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় ত বটেই, আবার অনন্তশক্তি। তাঁহাকে ধারণা করা সোজা নয়। অনন্তশক্তির ধারণা একরূপ অসম্ভব। সে জন্য খণ্ড খণ্ড শক্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ডাকা সোজা হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"গঙ্গাস্পর্শ মানে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ছুঁতে হবে, তা নয়। যেখানে হ'ক, স্পর্শ করলেই গঙ্গাস্পর্শ করা হয়। সে জন্য সাধকরা অনন্তের অনন্ত ভাব ধরতে না গিয়ে এক একটা ভাব আশ্রয় করেন। পিতৃভাব, সখাভাব, মাতৃভাব, মধুর ভাব ইত্যাদি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—সকল ভাবের চেয়ে মাতৃভাব শুদ্ধ। পড়বার আশঙ্কা নাই।

"বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ॥
কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেৎ আশু সুনির্ম্মলা।
তদা আদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥"

তপস্যা, দান, ব্রত ও বহুজন্মের পুণ্য দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, সেই সব সাধকের কুলাচারে মতি হয়। কুলাচারে অভ্যাস করিলে বুদ্ধি শীঘ্র নির্ম্মল হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে আদ্যার চরণাম্বুজে মতি বাড়িয়া যায়।

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহো ধ্রুবম্॥
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥"

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, জনার্দ্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তি, এই জগৎই শক্তি অর্থাৎ সবই শক্তির খেলা, তিনিই এই সব হইয়াছেন, এরূপ যে দর্শন না করে, সে নারকী।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

সব নারী তোমার অংশ।

"বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ॥"

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা বা সুন্দরী বা কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা স্ত্রীলোককেও নমস্কার করিয়া জগন্মাতা চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ কুমারীতে জগন্মাতা দর্শন করিবে।

"কুমারী-পূজন-প্রীতা কুমারী-পূজকালয়া।
কুমারী-ভোজনানন্দা কুমারী-রূপধারিণী॥"

কুমারীকে পূজা করিলে তুমি প্রীত হও, কুমারী-পূজকের আলয়ে তুমি থাক, কুমারীকে ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়। তুমি কুমারীরূপধারিণী। একটি ৩।৪ বৎসরের শিশু কুমারীর হৃদয়ের ভাব চিন্তা করিতে হইবে। শিশু কুমারীর যৌবনোদ্ভবে যে সব ভাব পরিস্ফুট হইবে, শৈশব অবস্থায় সে সব সংস্কার নিশ্চয় আছে। কারণ, যদি উহা না থাকে, পরে উহা প্রকাশ হইত না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

যেটা আছে, সেইটি হয়, যেটা নাই, সেটা হয় না, কিন্তু সেই সব সংস্কার নিদ্রিত আছে বুঝিতে হইবে। এইটির সহিত প্রলয় অবস্থার সাদৃশ্য আছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যৌবনোদ্গমে যে সব ভাব—রমণবাসনা, রমণ, জনন প্রভৃতি কার্য্য তখনও প্রকাশ হয় নাই, অথচ সেই সব সংস্কার রহিয়াছে। এইটি অন্তর্যামী অবস্থা। এই সব নিদ্রিত সংস্কারগুলি বালিকা জানিতে পারে না, কিন্তু মহামায়া চিৎশক্তি সেই জন্য এই সব নিদ্রিত সংস্কারগুলি জানেন, সে জন্য শিশু কুমারী প্রাজ্ঞ আর মহামায়া সর্ব্বজ্ঞ। পরে যৌবনচিহ্ন প্রকাশ হইবার

উপক্রম হইলে বালিকার আপনা আপনি অস্ফুট রমণবাসনা মাত্র উদ্রিক্ত হয়, এইটির সহিত হিরণ্যগর্ভ অবস্থার সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। পরে তাহার রমণ ও জনন কার্য্যের সংস্কার প্রকট হয় এবং তদনুযায়ী দেহাবয়ব পরিস্ফুট হয়। এইটির মহামায়ার বিরাট অবস্থার সহিত সাদৃশ্য আছে। কুমারীতে মাতৃত্বভাব প্রথমে নিদ্রিত—পরে স্ফুট হয়, সে জন্য কুমারী মহামায়ার অনুকল্পরূপে পূজিত হয়েন।

"স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।"

স্ত্রীলোকের প্রতি রোষ ও প্রহার, বুদ্ধিমান্ নিয়ত ত্যাগ করিবেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥"

স্ত্রীলোককে এইরূপ মাতৃভাবে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ও জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়।

মহামায়ার উপাসনার বিশেষত্ব—(১) তিনি অত্যন্ত কোমলান্তঃকরণা, (২) ভক্তি-মুক্তিদাত্রী।

"আদ্যাসি অশেষজগতাং নবযৌবনাসি,
শৈলাধিরাজতনয়াসি অতিকোমলাসি।"

তুমি নিখিল জগতের আদ্যা হইলেও—নবযৌবনা আর শৈলাধিরাজতনয়া হইলেও অতি কোমলচিত্তা।

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো,
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥"

অন্য দেবতার উপাসনায় যদি ভোগলাভ হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হয় না, যদি মোক্ষলাভ হয়, ভোগলাভ হয় না, কিন্তু মা'র চরণপদ্ম-অর্চ্চকদের ভোগ-মোক্ষ দুই করতলগত হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মা'র ইচ্ছা যোগ-ভোগ ভক্ত জনে আছে।"

এই প্রসঙ্গে শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়া উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুর নিন্দা করিলে দুর্গা খুব খুসী হইবেন বা দুর্গার নিন্দা করিলে বিষ্ণু খুব খুসী হইবেন।

"দেবীবিষ্ণুশিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃৎ নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥"

দেবী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার অভিন্নত্ব চিন্তা করিবে। যিনি ভিন্ন দেখেন, তিনি প্রলয়কাল অবধি নরক প্রাপ্ত হয়েন।

"একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বান্ এব বিনিন্দতি।"

একের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন কর না দ্বেষাদ্বেষী।
ওরে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী॥"

বচন আছে,—

"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য, ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ, কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা॥"

পরমেশ্বরের একই শক্তি বিভিন্ন হইয়াছেন, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী, সমরে দুর্গা হইয়াছেন।

৪। কাল—আকাশ—কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ

সকলেরই স্বীকার্য্য, আকাশ ও কালকে বাদ দিয়া কিছু উপলব্ধি করা যায় না। আকাশ অর্থাৎ অবকাশ। নৈয়ায়িক মতে আকাশ ও কাল এক।

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

কালের নানারূপ বিভাগ, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি। আমরা দেখিতেছি, অদ্য গতকল্যকে গ্রাস করিকরিতেছে, পক্ষ দিবসকে গ্রাস করিতেছে, মাস পক্ষকে গ্রাস করিতেছে, ঋতু মাসকে গ্রাস করিতেছে, সংবৎসর ঋতুকে গ্রাস করিতেছে, যুগ সংবৎসরকে গ্রাস করিতেছে, কল্প যুগকে গ্রাস করিতেছে। কল্পের পর আর কালের ব্যবহারিক কল্পনা হয় না। সে জন্য কল্পকে মহাকাল গ্রাস করিতেছে অনুমান করা হয়। (অতএব বলিতে হইবে, কাল অপেক্ষা সংহারক আর কিছু নাই। কালের সংহার-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ।) মহাকালকে কালিকা গ্রাস করিতেছেন, অনুমান করা হয়। অর্থাৎ তিনি কালের অতীত বস্তু। তিনি অখণ্ড কালরূপিণী বিশ্ব-অম্বুগ।

প্রতি দিন তিন ভাগে বিভক্ত;—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন। প্রাতঃকালের অভিমানিনী দেবতা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নের অভিমানিনী দেবতা সাবিত্রী, সায়াহ্নের অভিমানিনী দেবতা সরস্বতী। সেইরূপ দিবসাভিমানিনী দেবতা আছেন, রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা আছেন, পক্ষাভিমানিনী দেবতা আছেন, মাসাভিমানিনী দেবতা আছেন, অয়ন-অভিমানিনী দেবতা আছেন, সংবৎসরাভিমানিনী দেবতা আছেন, যুগাভিমানিনী দেবতা আছেন, কল্পাভিমানিনী দেবতা আছেন, মহাকালাভিমানিনী দেবতা আছেন।

কালের আর একটি বিভাগ, চাতুর্ম্মাস্য। তিন চাতুর্ম্মাস্যে এক সংবৎসর। প্রতি চাতুর্ম্মাস্যে বিভিন্ন জীব-জন্তুকীটপতঙ্গ, গাছপালা, লতা-শস্য জন্মে। তাহাতে কালের উৎপাদয়িত্রী শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

আবার কালের নৃত্য সকলের প্রত্যক্ষ। রাত্রির পর দিবা, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, সংবৎসরের পর সংবৎসর এইরূপ অবিরাম নৃত্য চলিয়াছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেকের নিয়মিত আয়ুষ্কাল অবধি বাল্য যৌবন জরা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কালে লয় হইতেছে।

কালের যেরূপ বিভাগ অনুমান করা যায়, আকাশের সেইরূপ বিভাগ আছে।

"সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥"

আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ দ্বিবিধ;—ধ্বনি ও বর্ণ। বর্ণ একপঞ্চাশৎ। এক একটি বর্ণ দেবদেবীরূপে পূজিত হয়। বর্ণগুলিকে মন্ত্রমাতৃকা বলে। মাত্রা স্বরবর্ণ; অর্দ্ধমাত্রা ব্যঞ্জনবর্ণ।

বর্ণ দেবতা		শক্তি	বর্ণ দেবতা		শক্তি
অ···শ্রীকণ্ঠ	—	পূর্ণোদরী	এ···ঝিণ্টীশ	—	ঊর্দ্ধকেশী
আ···অনন্ত	—	বিজয়া	ঐ···ভৌতিক	—	বিকৃতমুখী
ই···সূক্ষ্ম	—	শাল্মলী	ও···সদ্যোজাত	—	জ্বালামুখী
ঈ···ত্রিমূর্ত্তি	—	লোলাক্ষী	ঔ···অনুগ্রহেশ্বর	—	উল্কামুখী
উ···অমরেশ্বর	—	বর্দ্ধলাক্ষী	ং···অক্রূর	—	চুল্লীমুখী
ঊ···অর্ঘীশ	—	দীর্ঘঘোণা	ঃ···মহাসেন	—	বিদ্যামুখী
ঋ···ভারভূতীশ	—	সুদীর্ঘমুখী	ক···ক্রোধীশ	—	মহাকালী
ৠ···অতিথীশ	—	গোমুখী	খ···চণ্ডেশ	—	সরস্বতী
ঌ···স্থাণুক	—	দীর্ঘজঙ্ঘা	গ···পঞ্চান্তক	—	গৌরী
···হর	—	কুম্ভোদরী	ঘ···শিবোত্তম	—	ত্রৈলোক্যবিদ্যা

বর্ণ দেবতা		শক্তি	বর্ণ দেবতা		শক্তি
ঙ…একরুদ্র	—	মন্ত্রশক্তি	প…লোহিত	—	কালরাত্রি
চ…কূর্ম্ম	—	আত্মশক্তি	ফ…শিখী	—	কুব্জিনী
ছ…একনেত্রেশ	—	ভূতমাতা	ব…ছগলণ্ড	—	কপর্দ্দিনী
জ…চতুরানন	—	লম্বোদরী	ভ…দ্বিরণ্ডেশ	—	বজ্রিণী
ঝ…অজেশ	—	দ্রাবিণী	ম…মহাকাল	—	জয়া
ঞ…সর্ব্ব	—	নাগরী	য…বলী	—	সুমুখেশ্বরী
ট…সোমেশ	—	খেচরী	র…ভুজঙ্গেশ্বর	—	রেবতী
ঠ…লাঙ্গলী…	—	মঞ্জরী	ল…পিনাকী	—	মাধবী
ড…দারুক	—	রূপিণী	ব…খড়্গীশ	—	বারুণী
ঢ…অর্দ্ধনারীশ্বর	—	বীরিণী	শ…বকেশ্বর	—	বায়বী
ণ…উমাকান্ত	—	কাকোদরী	ষ…শ্বেত	—	রক্ষোবিদারিণী
ত…আষাঢ়ি	—	পূতনা	স…ভৃগ্বীশ	—	সহজা
থ…দণ্ডী	—	ভদ্রকালী	হ…নকুলি	—	লক্ষ্মী
দ…অদ্রি	—	যোগিনী	ল…শিব	—	ব্যাপিনী
ধ…মীন	—	শঙ্খিনী	ক্ষ…সংবর্ত্তক	—	মায়া
ন…মেষ	—	গর্জ্জিনী			

একপঞ্চাশৎ রুদ্রমূর্ত্তি লোহিতবর্ণ, শূল ও কপালধারী। রুদ্রগণের অঙ্কে স্ত্রীবিগ্রহগণ রহিয়াছেন। ইঁহাদের দেহ সিন্দুরারুণ ও ইঁহারা রক্তোৎপল ও কপালধারিণী।

একটি একটি বর্ণ একটি একটি দেবদেবী বুঝাইবার জন্য কালীর গলে মুণ্ডমালা।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী
বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে।"

আকাশ আবার অবকাশাত্মক। এই হিসাবে দিক্‌গুলিকে আকাশের বিভাগ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋ‌ত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ। খণ্ডকালগুলি যেমন কালের অন্তর্গত, সকল দিক্‌গুলি সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত। পূর্ব্বদিগভিমানী দেবতা আছেন, তাঁর নাম ইন্দ্র। অগ্নিদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম অগ্নি। দক্ষিণদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম যম। নৈঋ‌তদিক-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম নিঋ‌তি, পশ্চিমদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম বরুণ। বায়ুদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম বায়ু। উত্তরদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম কুবের। ঈশানদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম ঈশান। ঊর্দ্ধদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। অধোদিক্ অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁর নাম অনন্ত।

যেমন এক একটি দিকের অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সমষ্টি আকাশাভিমানিনী দেবতাই কালিকা। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
তুমি নগর ফির মনে কর
প্রদক্ষিণ দিই শ্যামা মা'রে।"

আমরা দেখি, কালের মাপকাঠি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি। অর্থাৎ এইগুলি দ্বারা কালের পরিমাপ করা যায়। সেইরূপ দিক্‌গুলির মাপকাঠিও সূর্য্য। প্রথমে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয়েন, সে জন্য ঐ দিকের নাম প্রাচী। তার বিপরীত প্রতীচী। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যের পরিভ্রমণ হয়, সে জন্য অবাচী বা দক্ষিণ। তার বিপরীত উদীচী বা উত্তর। সে জন্য কালিকার সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি তিনটি নয়ন কল্পিত হয়।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কালের সহিত জড়িত। কার্য্য বুঝিতে হইলে কারণ বুঝিতে হয়। এ জন্য সৃষ্টি বুঝিতে হইলে মহাকারণ প্রথমে বুঝিতে হয়। ব্রহ্ম, আকাশ কাল বা কার্য্যকারণের অতীত। কারণ বলিলেই কার্য্য বলা হয়। কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। ব্রহ্ম অপারণামী, নির্ব্বিকার, সে জন্য তিনি কার্য্য-কারণের অতীত বস্তু। তিনি বিশ্ব-অতিগ। মহামায়া জীবজগতের উৎপাদয়িত্রী, সে জন্য মহামায়া কারণ, জীবজগৎ কার্য্য। তিনি বিশ্ব-অনুগ।

৫। শক্তিপূজা কি সকাম উপাসনা ?

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥"

আমার চতুর্ব্বিধ ভক্ত ;—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তিনি বলিয়াছেন,—

"উদারা সর্ব্ব এবৈতে।"

ইহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবে। তবে—

"জ্ঞানী তু আত্মৈব।"

জ্ঞানী আমার আত্মা। অর্থার্থী হইলেই যে খুব খারাপ, তাহা নহে।

অনেকের ধারণা, শক্তিপূজাতে কেবল কামভিক্ষা।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এই বাক্যগুলির ঠিক অর্থ বুঝিলে এ ধারণা থাকিবে না। প্রদীপ টীকাতে আছে "রূপং দেহি" অর্থাৎ হে দেবি! আমার উপর প্রসন্না হইয়া "রূপং দেহি" পরমার্থ বস্তু দাও, অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ দাও। "যশঃ দেহি" তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন জন্য যশ দাও। "দ্বিষঃ জহি" আমার কামক্রোধাদি শত্রুনাশ কর।

"পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্ ॥"

হে দেবি! সৎকুলোদ্ভবা মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা পত্নী দাও, যিনি এই ভীষণ সংসারসাগর হইতে আমাকে নিস্তার করিবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার কথা আছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণে চূড়ালার কথা আছে। মদালসা কর্ত্তৃক তাঁর পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। চূড়ালা কর্ত্তৃক তাঁর পতি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার

আইন-গঠনে হিন্দু নরনারী

মধ্যযুগের য়ুরোপ

হিন্দু নরনারী আইন তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত ছিল কি? হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার জন্য এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে।

আইন-বিজ্ঞান বা জুরীস্প্রুডেন্সের কতকগুলা পরিভাষা এইখানে আসিয়া জুটিতেছে। দুই এক কথায় তাহার আলোচনা করিব।

ইংরাজ পণ্ডিত জেঙ্কস্ প্রণীত "ল অ্যাণ্ড পলিটিক্স্ ইন্ দি মিডল্ এজেস" অর্থাৎ "য়ুরোপীয় মধ্যযুগের আইন ও রাষ্ট্রনীতি" নামক গ্রন্থ (লন্ডন ১৮৯৮) আছে। ইনি দেখাইয়াছেন যে, "সেকালে" য়ুরোপের খৃষ্টিয়ানরা "ল" অর্থাৎ আইন তৈয়ারী করিতে জানিত না। সমাজে "প্রচলিত রীতিনীতি" অনুসারে রাষ্ট্রগুলা কায-কর্ম্ম চালাইত। রীতিনীতিকে ফরাসীরা বলে "কুতুম"। ইংরাজী নাম "কাষ্টম"। ভারতীয় পরিভাষায় সেই বস্তু হইতেছে "চরিত্র"। কৌটিল্য বলেন,—"চরিত্রং সংগ্রহে পুংসাং।"

য়ুরোপ সম্বন্ধে এই মত দেখিতে পাই, কার্টার প্রণীত "ল, ইট্স্ অরিজিন, গ্রোথ, অ্যাণ্ড ফাঙ্কশুন" অর্থাৎ আইনের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং কর্ম্ম নামক গ্রন্থেও (নিউইয়র্ক, ১৯০৭)। হ্বিলোবি প্রণীত "গবর্ণমেণ্ট অব দি মডার্ণ ষ্টেটস্" অর্থাৎ "বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রশাসন" নামক গ্রন্থ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছে (নিউইয়র্ক)। আইন "তৈয়ারী" করা বর্ত্তমান যুগের এক বিশেষত্ব। নেপোলিয়নের "কোড" বা আইন-সংহিতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে য়ুরোপীয়ানরা নিত্য নূতন "ল", "ধর্ম্ম", "স্মৃতি" বা আইন কায়েম করিতে ঝুঁকিয়াছে। কিন্তু "কদ্ নাপোলেয়ঁর" পূর্ব্বেকার যুগে লোকরা "কুতুম," "কাষ্টম্" বা "চরিত্র" মানিয়া চলিত। এই সকল কথা হ্বিলোবিও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন।

"চরিত্র" (কাষ্টম) বনাম আইন ("ল")

"কুতুম" বনাম "ল" অর্থাৎ চরিত্র বনাম আইন সমস্যাটা অনুশাসন-বিজ্ঞানে আজ প্রায় বৎসর পঞ্চাশেক ধরিয়া চলিতেছে, ইংরাজ পণ্ডিত মেইনের "নৃতত্ত্ব" আলোচনায় এই কথা প্রথম ফুটিয়া উঠে। তাঁহার "আর্লি হিষ্টরি অব ইন্ষ্টিটিউশন্স্" অর্থাৎ "প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন ইতিহাস" প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তাহার পূর্ব্বেই "এন্শেণ্ট ল" বা "প্রাচীন আইন" নামক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল (১৮৭০)। এই সঙ্গে তাঁহার হ্বিলেজ কমিউনিটিজ" অর্থাৎ "পল্লীকেন্দ্রের যৌথ সমবায়" গ্রন্থও প্রকাশিত হয় (লণ্ডন ১৮৭৬)।

মেইনের তুলনামূলক আলোচনার ফলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় যে, "সেকাল বনাম একাল" সমস্যার আসল কথা "কাষ্টম বনাম ল" অর্থাৎ "চরিত্র বা রীতিনীতি বনাম আইন।" মেইনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ,—"সেকাল বনাম একাল" হইতেছে "ষ্ট্যাটাস বনাম কন্ট্র্যাক্ট" অর্থাৎ "স্থিতি বনাম চুক্তি" এক কথায় "গতানুগতিকতা অর্থাৎ গতির অভাব বনাম স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা।"

প্রাচীন জগৎ বলিলে মেইন গ্রীস, রোম এবং ভারত বুঝিতেন। পল্লী জীবনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আলোচনা করা তাঁহার এক বড় ধান্ধা ছিল। তুলনামূলক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার প্রথম ধাপ মেইনের হাতেই অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুশাসন বিজ্ঞানবিৎ মেইনের অসম্পূর্ণতা

মেইন যে ধুয়া ধরাইয়া গিয়াছেন, সেই ধুয়া অনুসারেই এখনও জগতের বহু লোক চলিতেছে। মেইন বলিয়াছেন,—হিন্দুজাতি আইন-তৈয়ারী করিতে জানিত না। এই কথাই দেশী বিদেশী আইন পণ্ডিতরা প্রাচীন-ভারত সম্বন্ধে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইন এনশ্যেণ্ট ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশাসন নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯১৭) সেই মতেরই অন্যতম সায় দেওয়া দেখিতেছি।

কিন্তু মেইনের মত গ্রহণীয় নয়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতে যে সকল রাষ্ট্র মাথা তুলিয়াছিল, সেই সকল রাষ্ট্র মেইনের পরিভাষা মাফিক "প্রাচীন" নয়। "প্রাচীন" শব্দে মানবজাতির অসংখ্য স্তর বা ধাপ বুঝিতে হইবে। সেই সকল ধাপের কথা মেইনের আমলে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মাথায় প্রবেশ করা সহজ ছিল না। মেইনের সিদ্ধান্তগুলা যাঁহারা হুবহু নকল করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা আজও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিজ্ঞানমণ্ডলেই জীবনধারণ করিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞান মেইন এবং তাহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণকে বাতিল বিবেচনা করিবে।

ভারতের তরফ হইতে মেইন যে বাতিল, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রচারিত রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রশাসনবিষয়ক তথ্যসমূহ। গড়ন-বিজ্ঞানের আলোকে যাঁহারা হিন্দু রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের হাড়-মাস শিরা-নাড়ী এবং রক্তের স্রোত দেখিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, মৌর্য্যরা মেইনের "প্রাচীন" আদমী নয়, চোলরাও মেইনের প্রাচীন দুনিয়া হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই মৌর্য্য-চোল ভারতের হিন্দু নরনারী "আধুনিক"।

অষ্টিনের "ল" (কৌটিল্যের "রাজ্ঞামাজ্ঞা")

আইনের মাপকাঠিতে লাগাইয়া বিষয়টা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। হিন্দু রাষ্ট্রের পরিচালনায় আইনের স্থান কতখানি ছিল? আর রীতিনীতি, দেশাচার, লোকাচার, চরিত্র ইত্যাদির স্থান বা কিরূপ? বলা বাহুল্য, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এই ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক প্রমাণ জাহির করা কঠিন, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই আলোচনায় প্রবেশ করা এক দম অসম্ভব নয়।

"ল" বা আইন কাহাকে বলে? ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে "ল" বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত জারি ছিল। "জুরিস্প্রুডেন্স" বিষয়ক যে কোনও আইন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিদেশী গ্রন্থে তাহার বিশ্লেষণ আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের "পলিটিক্যাল ইন্ষ্টিটিউশন্স্ অ্যাণ্ড থিয়োরি অব দি হিন্দুজ" নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে হিন্দুদর্শনের আইন-বিষয়ক মতামত আলোচিত হইয়াছে। সে সকল কথা এ ক্ষেত্রে তোলা হইবে না।

মেইন যাহাকে "আইন" বলেন, তাহার আসল দার্শনিক জন্মদাতা অষ্টিন। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আইন সম্বন্ধে সেই পারিভাষিক ব্যাখ্যাই লওয়া হইয়াছে: দেশের লোকের পছন্দ হউক বা না হউক, রাজশক্তি, সরকার, বাদশা বা রাষ্ট্র যে সকল নিয়ম সমাজে প্রচারিত করে, সেই সবই আইন, "ল" বা "ধর্ম্ম"। অধিকন্তু, সমাজের যে সকল নরনারী এই সব বাদশাহী, সরকারী বা রাজশক্তি-প্রচারিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা সকলেই দণ্ডনীয়। এই দুই তথ্য হইতেছে অষ্টিনের মতে আইনের প্রাণ।

অষ্টিনের আইনতত্ত্ব অতি পরিষ্কাররূপে হিন্দু দার্শনিক মহলেও প্রচারিত ছিল। কৌটিল্যের কথায় তাহার নাম "রাজশাসন"। "রাজ্ঞামাজ্ঞা তু শাসনম্"। আদালতে যত প্রকার আইন চলিত, তাহার ভিতর "রাজ্ঞামাজ্ঞা," বাদশার হুকুম অন্যতম। অষ্টিন "রাজ্ঞামাজ্ঞা" বস্তুটাকেই "কমাণ্ড অব দি ষ্টেট" বলিয়াছেন।

হিন্দু আইনের সংগ্রহালয়

এইবার হিন্দু রাষ্ট্রের গলিঘোঁচে "রাজ্ঞামাজ্ঞা" ঢুঁড়িয়া বেড়াইব। মেগাস্থেনিস বলিয়া গিয়াছেন যে, পাটলিপুত্রের নগর-শাসকরা লোক-জনের নাম-ধাম, আয়ব্যয় ইত্যাদি সবই টুকিয়া রাখিত। প্রত্যেক দপ্তরেই কাগজপত্র সংগৃহীত হইত, "অর্থশাস্ত্রে" এইরূপ আন্দাজ করা চলে। য়ুয়ান-চুআঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যে নীলপিঠ নামক দলিল দেখিয়াছিলেন। এই সকল দলিলে দেশের আপদ-বিপদ সু-কু ইত্যাদি বিষয়ক ঘটনা বিবৃত হইত। চোলমণ্ডলেও বাদশাদের আদেশ-বহি নামক কেতাব ছিল। এই সব কেতাবের জন্য স্বতন্ত্র দপ্তরখানাও ছিল। "লিপি" সাহিত্যে এইরূপ জানিতে পারি।

কিন্তু না পাওয়া গিয়াছে মৌর্য্য ভারতের তথ্য-তালিকা, না পাওয়া গিয়াছে হর্ষবর্দ্ধনের নীলপিঠ, আর না পাওয়া গিয়াছে চোল সাম্রাজ্যের "আর্শিস্", কাযেই হিন্দুরাষ্ট্রে "রাজ্ঞামাজ্ঞা" শ্রেণীর আইন ঢুঁড়িব কোথায় ?

দুনিয়ার আইন-সাহিত্যে "স্মৃতিশাস্ত্রের" স্থান

প্রশ্নটা শুনিবামাত্রই পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই ধাঁ করিয়া বলিয়া দিবেন,—"কেন ? সে ত অতি সোজা কথা। ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রগুলা সবই ত আইন।" আজকাল আবার কেহ কেহ হয় ত এই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে রাজি হইবেন—অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্যও।

আজ পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী পণ্ডিতরা এই মত অনুসারেই আলোচনা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে বরাবর এই রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালানো হইতেছে। প্রতিপদেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, গৌতমের ধর্ম্মসূত্রকে ভারতের কোন্ কোন্ বাদশা 'ল্যাণ্ড টেনিওর' বা ভূমি-বিধান, "পিনাল কোড" বা দণ্ডবিধি, 'ল, অব কন্‌ট্রাক্ট' বা চুক্তির আইন বুঝিতেন ? গুপ্ত-সম্রাটরা মনু-সংহিতাকে আর্য্যাবর্ত্তের "রাজ্ঞামাজ্ঞা" বিবেচনা করিতেন কি ? চোলমণ্ডলের কোনও আমলে কামন্দক, বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য্যের শাস্ত্রগুলাকে মান্দ্রাজীদের জন্য "দণ্ড"-নিয়ন্ত্রিত "রাজশাসন"রূপে জারি করা হইয়াছিল কি ?"

তাহার প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোমান বাদশা য়ুস্তিনিয়ান (খৃঃ অঃ ৫২৬-৫৬৫) যে সকল পুরাতন "রাজ্ঞামাজ্ঞা" সঙ্কলন করাইয়াছিলেন এবং যে সকল আইন নিজে জারি করিয়াছিলেন, সেই সমুদয়ের সঙ্গে ভারতীয় "শাস্ত্র" গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। য়ুস্তিনিয়ানের সঙ্কলনকে বলে "দিজেস্ত" আর "সৃষ্টি"কে বলে "ইন্‌স্তিতিউৎ"।

রোমান বাদশারা "রাজ্ঞামাজ্ঞা" জারি করিতেন। তাঁহারা মেইনের "প্রাচীন" ঘরের লোক নন। কিন্তু মধ্যযুগের য়ুরোপে "রাজ্ঞামাজ্ঞা" কাণ্ড বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রভেদ ম্যাকেঞ্জি প্রণীত "ষ্টাডিজ ইন রোমান ল" অর্থাৎ "রোমান আইন বিষয়ক গবেষণা" (এডিনবরা, ১৮৬২), টেলর-প্রণীত "মিডিয়্যাল মাইণ্ড" অর্থাৎ "মধ্যযুগের মানবচিত্ত" (লণ্ডন, ১৯১১) ইত্যাদি গ্রন্থে সহজেই ধরিতে পারি। অন্যান্য গ্রন্থ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তবে মধ্যযুগের য়ুরোপীয়রা নানা নামে কতকগুলা "সংহিতা" প্রচার করিয়াছিল। জার্ম্মাণীর স্যাক্সন এবং স্বাবিয়ান জাতীয় নরনারীর রাষ্ট্রে (স্পীগেল) অর্থাৎ "দর্পণ" বা আয়না নামক কতকগুলা সংগ্রহ জারি হয়। এই সব জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা। ইতালির লম্বাদ জাতি এবং ফ্রান্সের নরম্যান জাতি যে সকল সংগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাদের নাম এবং তথ্য ল্যাটিনে প্রচারিত। ভারতীয় সংস্কৃতের মত সে যুগের য়ুরোপে ল্যাটিনেরই সকল ক্ষেত্রে জয়জয়কার চলিত।

ইংরাজসমাজে কতকগুলি আইন সঙ্কলিত হয়। এইগুলা ল্যাটিন ভাষাতেই প্রণীত। সঙ্কলনকর্ত্তার নাম ব্রাকটন। ফ্রান্সের কোন কোন জনপদে বোমানো আর কতকগুলা "কুতুম" ফরাসী ভাষায় সংগ্রহ করেন।

এই সকল সংগ্রহের পশ্চাতে য়ুস্তিনিয়ানের "দিজেস্ত" সংহিতার আদর্শ বিরাজ করিতেছিল। খাঁটি "রাজ্ঞামাজ্ঞা" হউক বা না হউক, দেশের লোক যে সকল রীতিনীতি মানিয়া চলিত, তাহার একত্র সমাবেশ দেখিবার জন্য জমীদার বা রাজাদের ঝোঁক ছিল। কার্লাইল প্রণীত "মিডিয়্যাল পোলিটিক্যাল থিয়োরি ইন্ দি ওয়েষ্ট" অর্থাৎ "পাশ্চাত্য মধ্যযুগের রাষ্ট্রদর্শন" (লণ্ডন, ১৯০৩-১৯১৫) এবং হ্বাল্‌স্ প্রণীত "ত্রয়োদশ শতাব্দী" (নিউইয়র্ক ১৯০৭) ইত্যাদি গ্রন্থে এই সকল সংহিতার উৎপত্তি-কথা জানিতে পারি।

ব্রাকটন-নীতি, বোমানো আর স্মৃতি অথবা স্পীগেলশাস্ত্র ইত্যাদি সাহিত্যের আইনগুলাকে অষ্টিনের আইন বলা হইবে না। য়ুস্তিনিয়ানের "ইন্‌স্তিতিউৎ" এবং "দিজেস্ত" সংহিতার ইজ্জৎও এই সকল সংগ্রহের নাই। তবে য়ুরোপের খৃষ্টানরা "ফিউডাল" যুগে কোন্ কোন্ নিয়মকে "শিষ্টদের" মত বা সদাচারসঙ্গত বিবেচনা করিত, তাহার সন-তারিখ-সমন্বিত সাক্ষী হিসাবে এইগুলার দাম আছে।

কিন্তু সন-তারিখ-সমন্বিত রাজ-সংগ্রহের ইজ্জৎ না আছে গৌতম আপস্তম্বের, না আছে কৌটিল্য মনুর। গৌতম হইতে শুক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভারতীয় ব্রাক্‌টন বা বোমানো আরই আইন-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক একটি বিপুল সমস্যা। "শাস্ত্র"-বিবৃত ও তথাকথিত "ষষ্ঠাংশ" যে মৌর্য্য ও চোল রাজস্ব সম্বন্ধে খাটে না, এই তথ্যের মত অন্যান্য তথ্যও সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

চোল "রাজ্ঞামাজ্ঞার" দিজেস্ত

তাহা হইলে ভারতীয় "রাজ্ঞামাজ্ঞার" সংগ্রহ পাওয়া যাইবে কোথা হইতে ? "লিপি"-সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে সুরু করিলে হিন্দু রাষ্ট্রের বাস্তব আইন কিছু কিছু নজরে আসিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করি।

পল্লীশাসন উপলক্ষে চোল-বিধান উল্লেখ করা গিয়াছে। উহাকে বর্ত্তমান জগতের সুপরিচিত "লোক্যাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট" অর্থাৎ জনপদগত বা স্থানীয় স্বরাজবিষয়ক আইন বিবেচনা করিতে পারি।

শাসনাধ্যক্ষ বিষয়ক পরিচ্ছেদে জমী জরীপ সম্বন্ধে চোল-বিধান দেখিয়াছি। এই বিধানও "রাজ্ঞামাজ্ঞা" ছাড়া আর কিছু নয়। ৯৮৬ খৃষ্টাব্দের আইনে যে হারে সদর খাজনা ধার্য্য করা হইয়াছিল, সেই হার তুলিয়া দিবার জন্য ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে আবার আইন জারী হয়। সেই আইনেও গোটা সাম্রাজ্যের "ল্যাণ্ড টেনিওর" স্থিরীকৃত হয়। এই সব কাণ্ডকে "চরিত্র", "কুতুম," "কাষ্টম" বা সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির ইজ্জৎ রক্ষা করা বিবেচনা করিলে ভুল বুঝা হইবে। বর্ত্তমান জগতের অষ্টিন-পন্থী রাষ্ট্রে যে ধরণে এবং যে আদর্শে জমীজমা, করাদায় ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে, রাজরাজ এবং কুলোত্তুঙ্গ সেই পথের পথিক ছিলেন।

সরকারী আয়ব্যয় আলোচনা করিবার সময় করাদায় হইতে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও দেখিয়াছি। চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই "স্বাধীনতার দলিল" ও হিন্দু জাতির আইন "তৈয়ারী" করার নিদর্শন।

ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কোন হিন্দু বা মুসলমান বাদশা রোমান য়ুস্তিনিয়ানের আদর্শে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত চোল আইনগুলার সংহিতা তৈয়ারি করাইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে তামিল ভাষায় অভিজ্ঞ কয়েক জন উকীল বাহাল করিতে হইত। এই সকল উকীলের চেষ্টায় যে "দিজেস্ত" বা "রাজ্ঞামাজ্ঞার" সংগ্রহ গড়িয়া উঠিবার কথা, তাহার ভিতর পূর্ব্বোক্ত তিন চারটা আইনের ঠাঁই অবশ্যম্ভাবী।

সবগুলাই বাদশার হুকুমে জারি। আর প্রত্যেকটার সঙ্গেই দণ্ডের অর্থাৎ অষ্টিন-প্রচারিত "সাঙ্কশ্যনের" বিধান আছে। এই ধরণের হিন্দু আইন "এপিগ্রাফিয়া জেলালিকা" অর্থাৎ "সিংহলের লিপি-সাহিত্য" নামক পত্রিকার এখানে ওখানেও কতকগুলা আবিষ্কার করা সম্ভব। এই আইনগঠনে বাদশার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের অথবা জনগণের "প্রতিনিধি"র হাত কতটা ছিল. তাহার আলোচনা স্বতন্ত্র।

অশোক-সংহিতায় নবীন-প্রবীণ

মৌর্য্য সম্রাট অশোক ছিলেন "প্রপাগাণ্ডিষ্ট" অর্থাৎ "স্বদেশী বক্তা বা প্রচারক।" দুনিয়ার সর্ব্বত্র নানা প্রকার "হিতোপদেশ" ছড়ানো তিনি নিজের অন্যতম ব্যবসা বিবেচনা করিতেন। এই সকল বক্তৃতা পাহাড়ের পিঠে এবং স্তম্ভের গায়ে অমর হইয়া রহিয়াছে।

অশোকের লিপি-সাহিত্যে একটু আধটু আইনের অর্থাৎ "রাজ্ঞা-মাজ্ঞা"র ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়। অন্ততঃপক্ষে অনুশাসনগুলার ভিতর বাদশাহী "হুকুমের" দাগ ঢুঁড়িয়া পাওয়া অসম্ভব নয়।

চতুর্থ স্তম্ভ-লিপিতে দেখিতে পাই, [খৃঃ পূঃ ২৪৩] মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা "ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিবার" পূর্ব্বে তিন দিনের জন্য জীবনের মাত্রা বাড়াইবার সুযোগ পাইত। চোল আইনগুলার তুলনায় বাদশার এই দয়া-প্রকাশকে পারিভাষিক আইন হিসাবে একটা বড় কিছু বুঝা চলিবে না। তবে দয়া-প্রকাশের ইস্তাহারটা যে মামুলি দেশাচার "কাষ্টম্" বা লোক-"চরিত্র" মাত্র নয়, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে।

অশোকের পঞ্চম-স্তম্ভ-লিপিও খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৩ সালের রচনা। এইখানেও একটা আইনের খসড়া অথবা আইন-পরিচালনার বার্ষিক বিবরণী যেন প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বাদশা বলিতেছেন,—"আমার রাজত্বকালে ইতোমধ্যে পঁচিশবার কয়েদী খালাসের সুযোগ জুটিয়াছে।" প্রত্যেক বৎসর গদিতে বসার উৎসব উপলক্ষে অশোকের মুল্লুকে কয়েদী-খালাস করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল বুঝিতে হইবে। ইহাও একটা সমাজের "সনাতন-ধর্ম্ম" নয়, কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের অভিলাষ।

(২)

অশোক নিরামিষাশী ছিলেন। যখন তখন যেখানে সেখানে পশুহত্যা তাঁহার পছন্দসই ছিল না। পঞ্চম স্তম্ভ-লিপিতে তিনি ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথম পর্ব্বত-লিপি ক্ষোদিত হয় ২৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। তাহাতে এমন কি ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষেও বাদশা বাহাদুর পশুহত্যায় নারাজ, এইরূপই বুঝা যায়। চতুর্থ পর্ব্বত-লিপিতে দেখি, বাদশা বলিতেছেন :—"শত শত বৎসর ধরিয়া দেশের লোক পশুহত্যায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আমার আমলে নর-নারী অহিংসার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।" ইত্যাদি।

অশোকের কথায় প্রমাণিত হয় যে, দেশাচার বদলাইয়া দেওয়া হিন্দু-রাষ্ট্রের অজানা জিনিষ নয়। একটা "কাষ্টম" বা "চরিত্রে"র স্থানে আর একটা শিষ্টাচার দাঁড় করাইবার প্রয়াস হিন্দু-সমাজের রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। "কাষ্টমগুলা" ভারতে অমর নয়। প্রবীণকে সরাইয়া নবীন আসিয়া হাজির হইতে পারিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, পরিবর্ত্তনটা কি একমাত্র বক্তৃতার জোরে সাধিত হইয়াছিল? না, "দণ্ড" নামক যন্ত্রের "সদ্ব্যবহার" করিয়া অশোক হিন্দু নরনারীকে অহিংসার পথে ঠেলিয়া তুলিতেছিলেন? অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে যদি পশু-হত্যা সত্য সত্যই নিবারিত হইয়া থাকে, তবে তাহার পশ্চাতে আইনের ভয়, জেলখানার ভয়, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি কতখানি ছিল?

অশোক এক জন জবরদস্ত শক্তিযোগী বাদশা। তিনি "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" যতই বলুন না কেন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, রাষ্ট্রশাসনের ইজ্জৎ, সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতেন। কাযেই তাঁহার "হিতোপদেশ"গুলার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড, জেল এবং জল্লাদের হাতে মৃত্যু-ভয় গাঁথা থাকিত, এইরূপ সন্দেহ করা চলে। লিপি-সাহিত্য হইতে অবশ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেবল ঠারে-ঠোরে অশোকের আমলের "রাজ্ঞামাজ্ঞা" আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা গেল মাত্র। অশোক-সংহিতা আবিষ্কার করিবার পক্ষে লিপিগুলা সাহায্য করিবে।

চীনা-বৃত্তান্তে হিন্দু আইন

চীনা পর্য্যটকদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, তাঁহারা ভারতের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কিরূপ আইন দেখিয়া গিয়াছেন।

ফা-হিয়ান বলেন যে, গুপ্তভারতে জরিমানাই ছিল প্রধান সাজা। মৃত্যুদণ্ড এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল। বারবার রাজদ্রোহী হইলে অথবা গুণ্ডাগিরি করিলে অপরাধীদের ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হইত।

সপ্তম শতাব্দীর ভারত সম্বন্ধে য়ুয়ান-চুয়াঙের সাক্ষ্য আছে। তিনিও মৃত্যুদণ্ড দেখেন নাই। রাজদ্রোহীদের জেল হইত। জেলে তাহাদিগের জন্য অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের মরা-বাঁচার খবরাখবর লওয়া হইত না। পারিবারিক অপরাধের জন্য সাজা ছিল নির্ব্বাসন অথবা ডান হাত কাটা। জরিমানা ছিল অন্যান্য অপরাধের সাজা।

হিন্দু আইনের গতিশীলতা

এই সকল তথ্য চীনারা পাইলেন কোথায়? যদি চোখে দেখা ঘটনার বৃত্তান্ত হয়, তাহা হইলে বলিব যে, এই সকল ক্ষেত্রে বাস্তব "রাজ্ঞা-মাজ্ঞা"ই পাইতেছি। অন্ততঃ পক্ষে গুপ্ত এবং বর্দ্ধন আমলে কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে বিচার চলিত, তাহার পরিচয় পাইতেছি, কিন্তু তথ্যগুলা যদি চীনারা তাঁহাদের হিন্দু অধ্যাপকগণের "শাস্ত্র"গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্যা "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্।" কেন না, প্রশ্নটা আবার ফিরিয়া আসিবে, এই সকল আমলে কোন্ কোন্ শাস্ত্রের বিধান সরকারী আদালতে আইনরূপে স্বীকৃত ছিল?

চীনা বিবরণ যদি চাক্ষুষ বৃত্তান্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দু "রাজ্ঞামাজ্ঞা" সম্বন্ধে একটা নূতন কথা শিখিতে পারি। "ধর্ম্ম"প্রচারক, হিতোপদেশ-বক্তা নিরামিষাশী মৌর্য্য বাদশা অশোক মৃত্যুদণ্ড রদ করেন নাই। অশোক-সংহিতায় জল্লাদের হাতে কয়েদীদের প্রাণ যাইত। কিন্তু "যাগযজ্ঞ"প্রিয় পশুহত্যাকারী হিংসাধর্ম্মী গুপ্ত বাদশাদের "পেনাল কোড" মৃত্যুদণ্ড জানে না। হর্ষবর্দ্ধনের ভারতেও অশোক-সংহিতার নিষ্ঠুরতা নাই।

এখানে যাগযজ্ঞের ধর্ম্ম বনাম প্রিয়দর্শীর "ধর্ম্ম" সমস্যা তুলিতেছি না। আইন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে তথ্য বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। দেখিতেছি যে, এক হিন্দু রাষ্ট্র যে রীতি বা নিয়মকে আইন বা রাজ্ঞা-মাজ্ঞা বিবেচনা করে, অন্য হিন্দু রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় তাহা আইন বা রাজ্ঞামাজ্ঞা নয়। এক পাটলিপুত্রেই মৃত্যুদণ্ড মৌর্য্য আমলে প্রচলিত। আবার চন্দ্রগুপ্ত আমলে অপ্রচলিত। অর্থাৎ "কাষ্টমের" অমরতা, রীতিনীতির স্থিতিশীলতা বা গতিহীনতা, "ষ্ট্যাটাসের" দৌরাত্ম্য এবং "সনাতন ধর্ম্মের" "অচলায়তন" হিন্দু রাষ্ট্র-শাসনবিষয়ক ইতিহাসের বাস্তব কথা নয়। মেইন-পন্থীরা চোখ রগড়াইয়া হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন আলোচনা করিবার জন্য "কেঁচে গণ্ডূষ" করিয়া প্রবৃত্ত হউন।"

অর্থশাস্ত্রে মৌর্য্য ইন্‌স্তিতিউৎ

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রকে" স্থানে স্থানে "প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের" ইজ্জৎ দিয়াছি। "সরকারী গৃহস্থালী" সম্পর্কের "অর্থশাস্ত্রের" তথ্য এবং অঙ্কগুলাকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের বাস্তব বিবরণরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলে এই উপলক্ষে যাহা কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সবই "রাজ্ঞামাজ্ঞা।"

জমীর নিয়ম, বাণিজ্য-শুল্ক, এক্‌সাইজ, পাসপোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রত্যেক খুঁটিনাটিই "রাজশাসন।" প্রত্যেক বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই একটা করিয়া "দণ্ড" লাগানো আছে। জরিমানার হার আজি-কালিকার ২ পয়সা, দেড় আনা হইতে ২ হাজার ২ শত ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। মৌর্য্য আইনের "দিজেস্ত" তৈয়ারী করিতে হইলে রাজস্ববিষয়ক কৌটিল্যের প্রত্যেক কথাই তাহার ভিতর ঠাঁই পাইবে। বস্তুতঃ "অর্থশাস্ত্রের" এই অংশকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের "গেজেটিয়ার" ধরিয়া লইলে ইহা আইনের পরিভাষায় যুস্তিনিয়ানের "ইন্‌স্তিতিউৎ" সংহিতারই সমকক্ষ বিবেচিত হইবে।

মেগাস্থেনিস-সমস্যা

কিন্তু আবার এক আপদ জুটিয়াছে। মেগাস্থেনিস মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্রে বসবাস করিতেন। তিনি কিরূপ হিন্দু আইন দেখিয়াছিলেন?

(১)

মেগাস্থেনিসের বৃত্তান্ত সুবিদিত। তিনি বলেন,—"হিন্দু-রাষ্ট্রে আইনের ঝঞ্ঝাট নাই। লোকরা মামলাবাজ নয়। বন্ধক, সুদ, শীলমোহর ইত্যাদি কিছুই এ দেশে লাগে না। মুখের কথায়ই সব কার্য্য চলিয়া যায়। চুরি-ডাকাইতী অজ্ঞাত।"

এত বড় মৌর্য্য সাম্রাজ্যে না কি লোকরা মামলা-মোকর্দ্দমা করিত না! "মরদ কী বাত, হাত্তী কী দাঁত!" যেন গোটা ভারতের স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? "অর্থশাস্ত্র" যদি মৌর্য্য-ভারতের আইন হয়, তাহা হইলে মেগাস্থেনিস মৌর্য্য-ভারতের কতটুকু জানিতেন?

এই সমস্যায় পড়িয়াই ষ্টাইন বলিতেছেন যে,—মেগাস্থেনিস আর "অর্থশাস্ত্র" সমসাময়িক হইতে পারে না। মেগাস্থেনিসের মতে আরও দেখিতে পাই যে, মৌর্য্য-ভারতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, সাক্ষীর আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া হইত। কেহ কাহারও শারীরিক অনিষ্ট করিলে তাহার সেই অঙ্গ কাটা হইত, হাতও কাটা পড়িত। কোনও শিল্পীর হাত বা চোখ জখম করিলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইত।

ষ্টাইন বলেন,—অঙ্গুলী বা হাত কাটাকাটি নামক সাজা কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" জানা নাই। শিল্পীর অনিষ্ট সাধিত হইলে অপরাধীর বিচার কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধেও কৌটিল্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেন নাই। জরিমানা বা অর্থদণ্ডই "অর্থশাস্ত্রের" সাধারণ বিধান।

(২)

মেগাস্থেনিস-কৌটিল্য-সমস্যায় পুনরায় প্রবেশ করিবার দরকার নাই। মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্যকে আংশিকভাবেও ভারতের বাস্তব বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার উক্তির ভিতর কয়েকটা খাঁটি আইন বা "রাজ্ঞামাজ্ঞা" পাইতেছি সন্দেহ নাই। এইগুলা সরকারের হুকুম বলিয়াই আইন। দেশাচারের সঙ্গে এই সবের মিল থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না।

বস্তুতঃ মেগাস্থেনিসের সঙ্গে কোন কোন "শাস্ত্র"গ্রন্থের গরমিল আছে। তাহার দ্বারাই জোরের সহিত প্রমাণিত হইতেছে যে, বাদশার "কাষ্টম" বা "চরিত্র" উপেক্ষা করিয়াই "আজ্ঞা", "কমাণ্ড" বা ফার্ম্মান জারি করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ হিন্দু-রাষ্ট্রের গড়ন বুঝিবার সময় বর্ত্তমান জগতের আইন-সৃষ্টি নামক কর্ম্মরাশি তাহার ভিতর দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আইনের রাজত্ব ও আধুনিকতা

আইন-গঠন বিষয়ে হিন্দু ও রোমান সার্ব্বভৌমদিগকে "আধুনিক" বলিতেছি। কিন্তু আধুনিকতা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে মেইনের ভুলই উল্টা পিঠ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আইন গড়িয়া তুলিবার কাযে "রাস্তার লোক"ও অল্প-বিস্তর আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করে। ইহা আধুনিকতার এক বড় লক্ষণ। এই স্বরাজ সেকালে এক প্রকার ছিল না বলা চলে।

আর এক লক্ষণ এই যে, স্বরাজশীল নরনারী চৌপর দিনরাত একটার পর আর একটা "বিল", "ষ্ট্যাচিউট", "অ্যাক্ট" বা ঐ ধরণের নামে নূতন নূতন আইন তৈয়ারী করিবার ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে। আইন গঠন আর "রাষ্ট্রনীতি" বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আজকালকার দিনে একার্থক বস্তুতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই কারণেই বর্ত্তমান কালকে এক হিসাবে "রেইন অব্ ল" বা "আইনের রাজত্বে"র যুগ বলে। "সেকালে" এত বেশী এবং এত বিভিন্ন আইন তৈয়ারী করিবার দিকে লোকের মাথা খেলিত না।

তবে মৌর্য্য-চোল ভারত "কাল" হিসাবে প্রাচীন হইলেও "মাল" হিসাবে নবীন, এই কথাটা জানিয়া রাখা দরকার। প্রাচীন সভ্যতার এক অতি "আদিম" স্তরে যে সকল দেশী-বিদেশী পণ্ডিত সজ্ঞানে-অজ্ঞানে হিন্দু রাষ্ট্রগুলাকে ঠাঁই দিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা রোমান আইনের কিম্মৎ সম্বন্ধে অত্যুক্তি চালাইয়া থাকেন।

বাস্তবিক পক্ষে হাড্রিয়ান, দিয়োক্লেসিয়ান, যুস্তিনিয়ান ইত্যাদি রোমান বাদশারা যতটা প্রাচীন বা যতটা নবীন, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, রাজরাজ, কুলোত্তুঙ্গ ইত্যাদি হিন্দু সার্ব্বভৌমরা ঠিক ততটা প্রাচীন এবং ততটা নবীন। এইরূপ চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হইলেই মেইন-পন্থীদের নৃ-তত্ত্বে ও সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্যায় "সংস্কার" সাধিত হইতে পারে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

শাহুকার (ধনী) এবং সাধু

(মীরা বাঈ)

তুলসী হইল মগ্ন রাম-গুণ গাহিয়া
(হরির মায়া ধ্যান করিয়া)। (ধুয়া)
কেহ বসে ত্রিতল মহলে গবাক্ষ লাগাইয়া।
সাধু বসে ভাঙ্গা কুঁড়ে হরিগুণ গাহিয়া॥
কেহ চলে হাতী ঘোড়ায় পাল্‌কি আনাইয়া।
সাধু চলে নগ্নপদে পতঙ্গ-কীট বাঁচাইয়া॥
কেউ পরে চাঁদি-সোনা আশরফি ভাঙ্গাইয়া।
সাধু পরে তুলসীর মালা হরিগুণ গাহিয়া॥
কারও অঙ্গে শাল দোশালা মখমল বিছাইয়া।
কালো কম্বল সাধুর অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া॥
কেহ খায় লাড্ডু জেলাপি বরফি আনাইয়া।
সাধু খায় রুক্ষ অন্ন দেবভোগ লাগাইয়া॥
মীরাবাঈ কহে ঘরে ঘরে প্রভু রসিক হইয়া।
তুলসী পিয়ে রাম-রস মগন হইয়া॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রূপের মোহ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

না—সত্যই সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। উঃ! কি ভীষণ এই দাহ! সমস্ত অন্তর যেন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। কেন, কেন এই প্রদাহ? এ অনুভূতি এত দিন কোথায় ছিল? তাহারই অন্তরতম প্রদেশে নহে কি? হাঁ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। মনকে আঁখি ঠারিয়া কি রাখা যায়? ভাবের ঘরে চুরী করিলে বাহিরের কেহ হয় ত জানিতে না পারে বটে; কিন্তু মন?—তাহার কাছে ত লুকাচুরী খাটিবে না!

রমেন্দ্র তাহার কে? কেহ নয়। তবে আজ অন্তরতম প্রদেশে তাহার মূর্ত্তি সময়ে অসময়ে সহসা জাগিয়া উঠে কেন? তাহার স্বর্গের স্মৃতি এত জ্বালাময়, যন্ত্রণাপূর্ণ কেন? সে ত প্রাণপণে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তবুও জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাহার স্পর্শের স্মৃতি তাহার শরীরে, মনে এ কি যন্ত্রণা-ভরা গভীরতম ক্ষত করিয়া চলিয়াছে!

সে ত তাহাকে কামনা করে নাই, অপবিত্র মনে কখনও তাহার প্রতি চাহে নাই, ভ্রমেও নহে। তাহা কি সত্য নহে? অবশ্য তাহা যথার্থ, কিন্তু অমিয়া ভাবিতে লাগিল।

কোনও দিন কি সে রমেন্দ্রের সুন্দর মূর্ত্তিকে মনোমন্দিরে স্থাপনা করে নাই?—সুদূর অতীতে?—না, না, তা কেন? বিবাহিত জীবনের পূর্ব্বে যখন রমেন্দ্রের কিশোর মূর্ত্তি নিয়তই তাহার নয়নে প্রতিভাত হইত, যৌবন যখন সবে তাহার দেহ-লতিকায় সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনের মধ্যে পুষ্পিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় ত রমেন্দ্রকে জীবন-সখারূপে পাইবার আশা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না; তখন কিশোরহৃদয়ে ছায়াপাত হইয়াছিল বৈ কি! এ সত্যকে ত অস্বীকার করা চলেই না। কিন্তু আকাশ-কুসুমের মত সে স্বপ্ন যখন টুটিয়া গেল, ইন্দ্রধনুর মত গগনপটে দেখা দিয়াই আবার মিলাইয়া গেল—তখন হইতে সে সযত্নে কৈশোরের ছবি মন হইতে নিজেই মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে যুগের স্মৃতি অভিশাপের মত ভবিষ্যতে কখনও তাহাকে যন্ত্রণা দিবে না। তার পর মহাদেবের মত স্থির ধীর, কন্দর্পের মত রূপবান্ যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। রমেন্দ্রের স্মৃতির অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত তাহার মানসপট হইতে মুছিয়া গিয়াছিল।

যদি গিয়াছিল, তবে আজ কেন সেই বিপ্লবময়ী রজনীর ঘটনার কথা, সেই স্পর্শের জ্বালা সে বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না? স্বামীর অপরিমেয় প্রেমের স্রোতে যদি সে আপনার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়া থাকে, তবে আজ—

নিশীথ রজনীতে শয্যাত্যাগ করিয়া অমিয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। শয্যার অপর প্রান্তে সরযূ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সে স্খলিত চরণে বাতায়নের ধারে গিয়া বসিল। জানালা খুলিয়া দিবামাত্র চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল—ফেনপুষ্পিতশীর্ষ তরঙ্গ সৈকতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। সীমাহীন সমুদ্রের নিশীথ গাম্ভীর্য্যে মন মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া পড়ে; কিন্তু অমিয়ার মনে যে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা বুঝা গেল না। সে চাহিয়া ছিল সত্য; কিন্তু দৃষ্টি লক্ষ্যহীন।

সে তখন আপনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। তাহার অন্তর—মন কি চাহে? নয়ন মুদ্রিত করিয়া দৃষ্টিশক্তিকে সে যেন হৃদয়ের গোপনতম তলদেশে প্রেরণ করিল। সে কি দেখিল? সবই কি মহাশূন্যে পূর্ণ নহে? তাহার স্বামীর স্নিগ্ধগম্ভীর আননের রেখাচিত্র পর্য্যন্ত সেখানে নাই কেন? তাহার হৃদয়ের আসনে তাঁহারই ত স্থান! সেখানে তিনি ছাড়া আর কাহারও স্মৃতি ত থাকা উচিত নহে। যাহাকে ভালবাসা যায়—প্রাণ শুধু যাহার স্মৃতি ধ্যান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চায়, তাহারই চিত্র মানসপটে অঙ্কিত, চিরমুদ্রিত হইয়া যায়, ইহা কি সত্য নহে? তবে সেই সত্যের আভাস সে আজ হৃদয়ে অনুভব করিল না কেন? সে কি তবে এত দিন স্বামীকে ভালবাসে নাই? ভক্তি করে নাই, শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য দেয় নাই? না, না, তাহাও ত ঠিক নহে! এত ভক্তি সে কাহাকেও করে নাই, এমন শ্রদ্ধা সে দ্বিতীয় কোনও মানবকে নিবেদন করে নাই; কিন্তু ভালবাসা।—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক; সে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে বোধ হয় ভালবাসিতে পারে নাই। নহিলে, ও কি?—ঘনান্ধকারের মধ্য হইতে ও কাহার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতেছে?

শিহরিয়া, আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া অমিয়া নয়ন উন্মীলিত করিল। না—ও মূর্ত্তি সে দেখিতে চাহে না; কখনই নহে!

তাহার নারীত্ব, শিক্ষাভিমান, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও সংযম ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, “খবরদার!”

কিন্তু প্রকৃতি সংস্কারের প্রভাবকে যেন বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। অমিয়া দুই হাতে ললাট সবলে চাপিয়া ধরিল! এ কি প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষা! এ কি নিদারুণ দুর্দ্দৈব! কেমন করিয়া সে ইহার প্রভাব অতিক্রম করিবে?

আকুলভাবে অমিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, ও গো, তুমি এস, তুমি আমার সমস্ত অন্তরকে তোমার স্মৃতিতে ভরিয়া দাও! আমি শুধু তোমাকেই চাই—তোমার আসনে আসিয়া তুমি উপবেশন কর!

সত্যই কি অমিয়া এত দিন আত্মবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে? দুর্দ্দমনীয় মনকে সে শুধু শিক্ষা ও নারীত্বের আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আসিয়াছে? যে সাধনা ও সংযমের বলে মানুষ অসাধ্যসাধন করিয়া থাকে, কোনও দিন ত সে তাহা অবলম্বন করে নাই। যাহার স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে বলিয়া সে এত দিন ভাবিয়া আসিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা কি এত দিন তাহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশেই প্রচ্ছন্নভাবে ছিল? সে দিনের স্পর্শের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাব এখন কি আবরণমুক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে?

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, পাশ্চাত্য ভাবের অনুপ্রেরণা অমিয়াতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান সত্য; কিন্তু ভারতীয় নারীর রক্তেই তাহার জন্ম। যে দেশে সীতা, সতী সাবিত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই মহিমময়ী নারীর দেশে, তাঁহাদের পদরজঃপূত পীঠস্থানে সে-ও জন্মগ্রহণ করিয়াছে! তবে তাঁহাদের মত চিত্তবৃত্তি, তাঁহাদের মত সৌভাগ্যলাভে সে বঞ্চিতা কেন?

সহসা অমিয়ার মনে পড়িল, এক দিন সরযূ বলিয়াছিল, গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া না যাওয়া কি মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? সেই সঙ্গে সে অদৃষ্টেরও উল্লেখ করিয়াছিল। উত্তরে সে বলিয়াছিল যে, সে অদৃষ্ট মানে না। আজ যে তাহার অন্তরে এই বিপ্লবের ঝড় বহিতেছে, ইহা কি সেই অদৃষ্টের খেলা? অথবা তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা?

অমিয়া ভাবিতে লাগিল; কিন্তু কোন মীমাংসায় আসিতে পারিল না। সে ভাবিল, যদি অদৃষ্টই তাহাকে এই পথে টানিয়া লইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহাকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই?

এমনভাবে দিবানিশি মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলা অসম্ভব। বাস্তবিক সে আর পারিয়া উঠিতেছে না।

কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে? এই আত্মগ্লানি হইতে, মনের অশুচি অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভের উপায় কি? স্পর্শের জালাময়ী স্মৃতির সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত সে কোন মতেই স্থির হইতে পারিতেছে না।

অমিয়া পুনঃ পুনঃ স্বামীকে ভাবিতে লাগিল, মনোমন্দিরে তাঁহার স্মৃতিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভিতর হইতে সে যেন কোন শক্তি বা উৎসাহের সঞ্চার অনুভব করিল না।

রমেন্দ্র ও তাহার স্পর্শের স্মৃতি অভিশাপের মত চিরদিন কি তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মালগাড়ী সাক্ষিগোপাল ষ্টেশনে রমেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। ব্যাগ হাতে লইয়া রমেন্দ্র ষ্টেশনের বাহিরে গেল। যাইবার পূর্ব্বে সে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল যে, যাত্রিগাড়ী কোন্ সময়ে খুরদা অভিমুখে যাইবে।

রমেন্দ্র মন্দিরের দিকে চলিল—প্রয়োজন কিছুই ছিল না; কিন্তু যে ভূমিকার অভিনয় সে আরম্ভ করিয়াছে, বাহ্যতঃ তাহা বজায় রাখিতে হইবে ত!

মন্দিরের দেবতা দেখিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না, তবু রমেন্দ্র চলিল। যাত্রিগাড়ী আসিবার এখনও বিলম্ব আছে। খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া কিছু সময় থাকিতে সে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল। খুরদা পর্য্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া সে গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে ট্রেণ আসিতেই রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি এক কামরায় উঠিয়া বসিল। তথায় দ্বিতীয় আরোহী কেহ ছিল না। রমেন্দ্র যেন কিছু নিশ্চিন্ত হইল। তাহার অন্তরে তখনও প্রলয়ের ঝটিকা প্রবলবেগেই বহিতেছিল। এতক্ষণ ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখ হইতে যেন একেবারে সরিয়া গিয়াছিল। দূরে—বহু দূরে গিয়া সে আত্মগোপন করিতে চাহে।

সহসা রমেন্দ্রের মনে হইল, সে কোথায় যাইতেছে, কলিকাতায়? অমনই তাহার সমগ্র অন্তর যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কলিকাতার পরিচিতদিগের সম্মুখে সে এখন কোনমতেই যাইতে রাজী নহে। তবে কি সে দেশে—মা'র কাছে যাইবে?

মা!—জননীর স্মৃতি মনে হইবামাত্র রমেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল। সরলা, পুত্রগতপ্রাণা, অগাধ স্নেহশালিনী জননী! সে কেমন করিয়া তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তির কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? কত যত্ন, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, শৈশবে পিতৃহীন সন্তানকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন! সাধুতা, সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দিবার কি গভীর আগ্রহই না তাঁহার ছিল! সেই প্রাণপাত চেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কারই সে দিয়াছে বটে। শারীরিক অধঃপতন প্রকৃতপ্রস্তাবে না হইলেও তাহার মানসিক অধঃপতন যে কিরূপ শোচনীয়, নিন্দনীয়, তাহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই! বিবাহিতা পরস্ত্রীর প্রতি সে যেরূপ তৃষিত ও ঘৃণিত মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে কখনই মাতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সে অধিকার তাহার এখন আর নাই। তবে মাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে হইবে যে, আপাততঃ কিছু দিন সে পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইবে, তিনি যেন তাহার জন্য চিন্তিত না হন। রেলে ডাকঘরেই ঠিকানা না দিয়া পত্রখানি ফেলিয়া দিতে হইবে।

গত রজনীর কথা অনুক্ষণ রমেন্দ্রের চিত্তকে পিষ্ট করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে যে মনের মধ্যে অমিয়ার সম্বন্ধে এই গোপন লম্পটতাকে পোষণ ও পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমুদ্র-স্নানের সময় স্পর্শই তাহার কাল হইয়াছিল। স্পর্শের দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে সে কোনমতেই প্রতিহত করিতে পারে নাই।

রমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল। কেন পারে নাই? সে জন্য কি সে পর্য্যাপ্ত চেষ্টা করিয়াছিল? লোভ ত মানুষকে পদে পদেই মুগ্ধ, অভিভূত করিতে চাহে; কিন্তু উন্নত আত্মা সাধনার প্রভাবে লোভকে পরাজিত, পদানত ও পিষ্ট করিয়া বিজয়-মাল্য লাভ করিবে, ইহাই ত জীবনের শিক্ষা—ধর্ম্মতত্ত্বের মূল কথা। কিন্তু সে কি কায়মনোবাক্যে একবারও সে চেষ্টা করিয়াছিল?

না, তাহা রমেন্দ্র করে নাই। বরং সে মনে মনে কামনাকে পর্য্যাপ্ত প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছিল। মার্জ্জিত ব্যবহারের মুখোস পরিয়া সে ভদ্র পরিবারে মিশিয়াছিল। হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে পরস্ত্রীর প্রতি পূতিগন্ধবিশিষ্ট লালসা সন্ধুক্ষিত বহ্নির মত জলিয়া উঠিয়া তাহার লেলিহান শিখা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছিল। সে স্তোকবাক্যে মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, সে অমিয়াকে শুধু ভালবাসে।

রমেন্দ্রের সর্ব্বদেহ আবার শিহরিয়া উঠিল। ইহার নাম কি ভালবাসা? কবি বলিয়াছেন, 'ভালবাসার নাম আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।' কিন্তু সে ত আত্মসম্ভোগই করিতে চাহিয়াছিল! যদি সত্যই সে অমিয়াকে ভালবাসিত, তবে আত্মগ্লানির প্রবল দহনে আজ সে জলিয়া

মরিতেছে কেন? সে ত দূর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া, তাহার সুখ ও আনন্দ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত।

কিন্তু একটা কথা, অমিয়ার প্রতি তাহার এই যে উদ্দাম আকর্ষণ, ইহা সত্য না মিথ্যা? যদি সত্যই হয়, তবে তাহার অপরাধ কি এতই গুরু? সত্যকে কে কবে রোধ করিতে পারিয়াছে, অস্বীকার করিতে পারিয়াছে?

রমেন্দ্রের অন্তরমধ্যে যে দেবতা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এই যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি যেন বলিয়া উঠিলেন, 'মূর্খ! পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে, সবই সত্য; মিথ্যা কোথায়? কিন্তু যাহা অন্যের বা কোনও জীবের পক্ষে কষ্টদায়ক, তাহা স্বতঃ পরতঃ পরিহার করিতে হইবে। ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য। অন্যের ভাণ্ডারে মণিমুক্তা আছে, দেখিবামাত্র লোভ জন্মিল। ইহা মিথ্যা নহে; কিন্তু সেই লোভের বশবর্ত্তী হওয়াই ত মিথ্যাকে স্বীকার করা। আর লোভকে দমন করিতে পারার নামই সত্যানুবর্ত্তী হওয়া। অমিয়া তোমার নহে। লৌকিক হিসাবেও সে অন্যের বিবাহিতা পত্নী। তাহার প্রতি লোভ - পাপ। সে ঘৃণিত স্পৃহাকে দমন করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই, সুতরাং মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছ। ইহাতে তোমার নিজের মনে অশান্তি, অমিয়ার মনে অশান্তি; ঘটনা প্রকাশ পাইলে, অমিয়ার ও তোমার আত্মীয়-পরিজনের মনে ঘোরতর অশান্তি জন্মিবে। সুতরাং তুমি মহাপাপ করিয়াছ।'

এ প্রচণ্ড যুক্তির কাছে রমেন্দ্রের মাথা নত হইয়া পড়িল।

জংশন ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছিল। ব্যাগ হাতে রমেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। অন্তর্জ্জগৎ হইতে বহির্জ্জগতে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। সে এখন কি করিবে? কোথায় যাওয়া যায়?

প্লাটফরমের উপর কিয়ৎকাল বেড়াইবার পর রমেন্দ্র টিকিট-ঘরের দিকে চলিল। তখন টিকিট-বিক্রয় বন্ধ ছিল। ষ্টেশনের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট প্রশ্ন করিয়া সে জানিতে পারিল, সন্ধ্যাবেলা গাড়ী আছে; সে ইচ্ছা করিলে, আগ্রা ও গোমো হইয়া গ্রাণ্ডকর্ডের যে কোনও গাড়ী ধরিতে পারিবে।

তখন ধীরে ধীরে রমেন্দ্র ওয়েটিং রুমের দিকে চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সংসারের সহজ সরল পথে চলিতে চলিতে যে সকল নর-নারী কতকটা অজ্ঞাতসারে প্রথম অপরাধ করে, আত্ম-বঞ্চনা-জনিত আঘাত, অনুতাপ, অনুশোচনার জ্বালা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ যাহারা ভাবপ্রবণ, আঘাতটা তাহারা কঠিনরূপেই অনুভব করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ প্রখরতা হ্রাস পায়। ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম।

রমেন্দ্রের হৃদয় অনুতাপের অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। জীবনে ইহার পূর্ব্বে, সে কখনও এমন গর্হিত কায করে নাই। মাতার সুশিক্ষার প্রভাবে সে চিরদিন সত্য, ন্যায় ও মহত্ত্বেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ভ্রমেও সে অন্যায্য কার্য্য করিয়া তাহার শুভ্র জীবনের পৃষ্ঠায় কলঙ্করেখা-পাতের অবকাশ দেয় নাই।

রেল-গাড়ীর কোনও কক্ষে বসিয়া রমেন্দ্র অতীত জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। কাহারও সহিত আলাপে তাহার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ছিল না।

আজ দুই দিন ও তিন রাত্রি রমেন্দ্র রেল-গাড়ীতেই চলিয়াছে। এঞ্জিনের গতি অপেক্ষাও তাহার মনের গতির বেগ কি প্রচণ্ড! মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

যাহাকে এক দিন ধর্ম্মপত্নীর আসন দিতে গিয়াছিল, সেই অপাপবিদ্ধা নারীকে—পরস্ত্রীকে সে যে কথা বলিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেও রমেন্দ্রের অন্তর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। যাহার কাছে এত দিন সে শ্রদ্ধার সম্মান পাইয়া আসিয়াছিল, এখন সে তাহাকে কপট; জঘন্যচরিত্রের নারকী বলিয়া ধিক্কার দিতেছে না কি? শৈশববন্ধু সুরেশচন্দ্র তাহার এই নীচ, অমার্জ্জনীয় অপরাধের পরিচয় পাইয়া তাহাকে কি ভাবিয়াছে? বন্ধু বলিয়া ভদ্র পরিবারে প্রবেশাধিকার লাভের পর যদি সকলেই এমনই ভাবে বন্ধুত্বের প্রতিদান করে, তবে পৃথিবীতে আর মানুষ থাকে কি?

শিক্ষার অভিমানই বা রমেন্দ্রের কোথায় রহিল? শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয়; সে পূরা মাত্রায় সুশিক্ষা পাইয়াছে। তবে, 'স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন'

তাহার ঘটিল কেন? এ জন্য কে দায়ী?—মাতা? নিশ্চয়ই নহে।

মা'র কথা মনে পড়িতে রমেন্দ্র আবার শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার প্রশান্ত স্নেহগম্ভীর পবিত্র মূর্ত্তি তাহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জননীর স্নেহব্যাকুল নেত্র হইতে যেন অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

অসহ্য যন্ত্রণাভরে রমেন্দ্র দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া চোখ চাহিল।

বৃহৎ ষ্টেশনে বম্বে-মেল তখন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল। যাত্রীরা নামিতেছে, উঠিতেছে। তখন প্রভাত-রৌদ্রের কনক-কিরণে চারিদিক সমুজ্জ্বল।

গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রমেন্দ্র চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল। হাঁ, এই ত মোগলসরাই ষ্টেশন বটে। এখান হইতে তাহাকে আবার গাড়ী বদল করিতে হইবে। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলগাড়ী এইখান হইতেই ছাড়ে।

ব্যাগ হাতে লইয়া রমেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিল। জিজ্ঞাসায় সে জানিতে পারিল, আর দুই ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেণ ছাড়িবে। সে লক্ষ্ণৌয়ের টিকিট কিনিয়াছিল। কেন যে সে এত স্থান থাকিতে লক্ষ্ণৌ যাইতেছে, তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই। পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও যাইতে হইবে, এই কথাটাই মনে ছিল। টিকিট কিনিবার সময় লক্ষ্ণৌয়ের কথাটা মনে হইবামাত্র সে সেইখানের টিকিটই কিনিয়াছিল। দর্শনীয় বিষয় দেখিবার স্পৃহাবশতঃ যে সে তথায় চলিয়াছিল, তাহা নহে। দেখিবার শুনিবার বাসনা তাহার মনে তখন আদৌ ছিল না। তাহার কোনও পরিচিত আত্মীয়-স্বজন লক্ষ্ণৌয়ে নাই বলিয়াই বোধ হয় সে তথায় চলিয়াছিল। সে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহে।

কয় দিন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। আজও যে বিশেষ স্পৃহা ছিল, তাহা নহে। তবে জীবনরক্ষার জন্য কিছু মুখে দেওয়া দরকার; তাই সে ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কিছু ফল ও মিষ্ট কিনিয়া লইয়া লক্ষ্ণৌগামী ট্রেণে চড়িয়া বসিল।

তাহার কামরায় মাত্র এক জন য়ুরোপীয় আরোহী ছিল। সে আপন মনে কাগজ পড়িতেছিল। রমেন্দ্র একখানি আসন অধিকার করিল। জানালার ধারে সে ফল ছাড়াইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

প্রকৃতির প্রভাব হইতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অনিবার্য্যকে রোধ করিতে পারে কে? এই কয় দিনের দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনায় রমেন্দ্রের শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্নায়ুপেশী আর কায করিতে চাহিতেছিল না। কিছু আহার করিবার পর তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের শীতল বাতাস তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিয়া দিল। শ্রান্তদেহ কখন্ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল, রমেন্দ্র তাহা বুঝিতেও পারিল না। সে অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এমনভাবে ঘুমাইল, তাহার স্থিরতা নাই। সহসা কামরার দরজা খোলা ও বন্ধের গুরু শব্দে এবং গাড়ী ছাড়িবার ধাক্কায় তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, পার্শ্বের য়ুরোপীয় যাত্রী নামিয়া গিয়াছে; কিন্তু আর এক জন হৃষ্ট-পুষ্ট কোট-প্যান্টধারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গের জিনিষপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিলেন। জিনিষ যে খুব বেশী, তাহা নহে। কয়েকটা ফলের টুকরী, একটা গ্লাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ, একটা ছোট বিছানা—এইরূপ কয়েকটা দ্রব্য।

ভদ্রলোক সহসা রমেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ম'শায় কোথায় যাবেন?"

রমেন্দ্র বলিল, "লক্ষ্ণৌ। এটা কোন্ ষ্টেশন?"

"প্রতাপগড়। আপনি খুব ঘুমুচ্ছিলেন ত!"

একটু লজ্জিতভাবে রমেন্দ্র বলিল, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।"

আগন্তুক ভদ্রলোকের বয়স অধিক নহে। সম্ভবতঃ ত্রিশ বত্রিশ হইতে পারে। মুখখানি হাসি হাসি; ফ্রেঞ্চ-কট্ দাড়ী, সুন্দর মুখখানিতে বেশ মানাইয়াছিল। ললাট প্রতিভাদীপ্ত। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান্, তাহা তাঁহার উজ্জ্বল চোখ দুইটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুক রমেন্দ্রের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমেন্দ্র বলিল, "পুরী।"

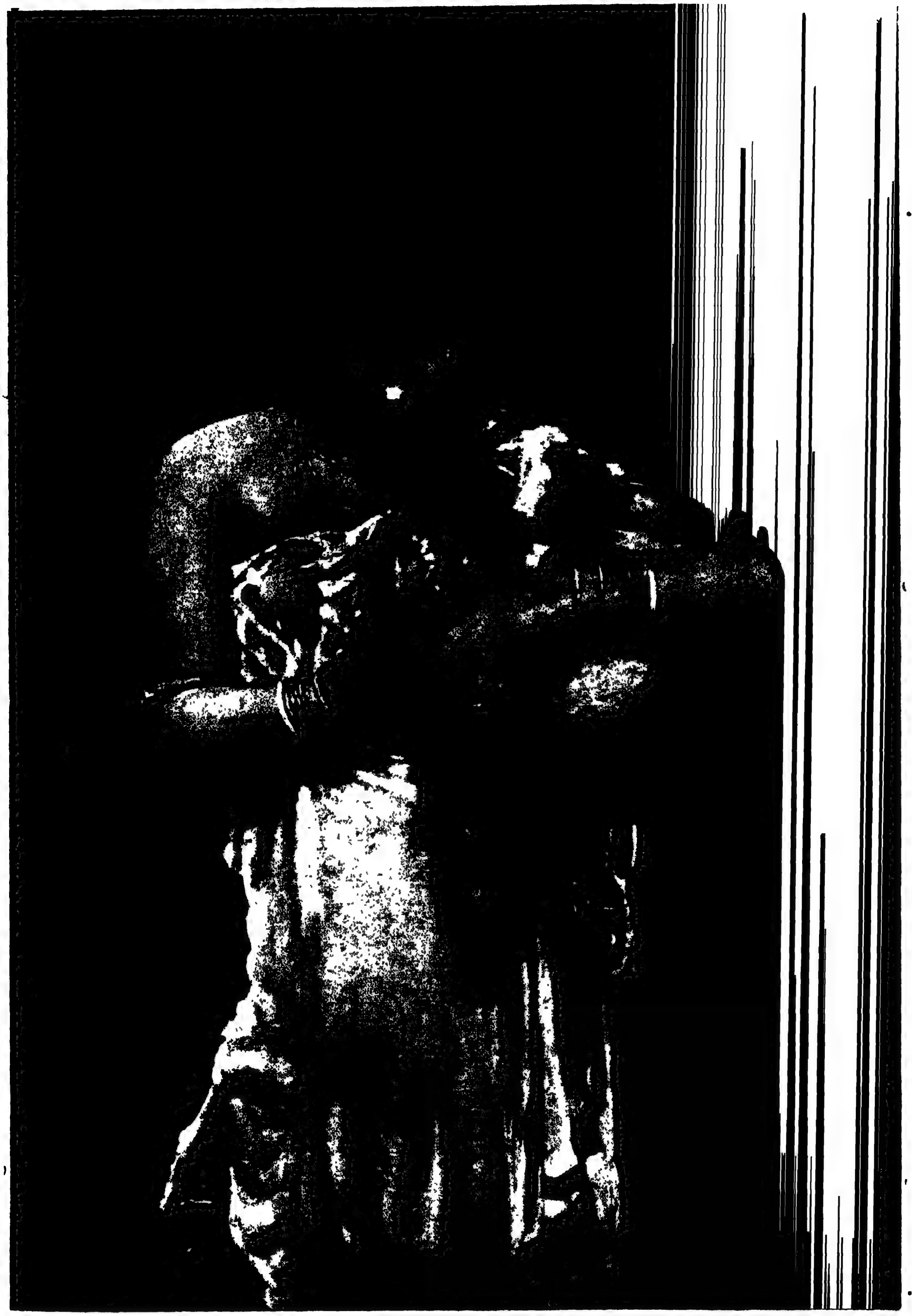

সিক্ত বসনা ।

রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুজ [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

"লক্ষ্ণৌয়ে কোথায় নাম্‌বেন ?"

লক্ষ্যহীনভাবে রমেন্দ্র বলিল, "তার কিছু ঠিক নেই। ওখানে থাক্‌বার হোটেল আছে বোধ হয়। একটা দেখে শুনে নেওয়া যাবে।"

ঈষৎ কৌতুক হাস্যে আগন্তুক বলিলেন, "ও! আপনি বুঝি দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন ?"

রমেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। কিন্তু ভ্রমণোপযোগী শয্যাটি পর্য্যন্ত যে তাহার সঙ্গে নাই—শুধু একটি ব্যাগমাত্র সম্বল—ইহাতে তাহাকে পর্য্যটকের মত যে দেখাইতেছিল না, ইহা মনে করিয়া সে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইতস্ততঃ চাহিয়া আগন্তুক কহিলেন, "আপনার সঙ্গে বিছানাও ত নেই দেখছি।"

প্রশ্নটা নিতান্ত অপরিচিতের পক্ষে আদৌ শোভন নহে। আগন্তুক বোধ হয়, সে কথাটা মনে ভাবিয়া প্রাণখোলাভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না, মশায়। আমরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী; আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় আপনি নেই। তাই অশোভন হলেও প্রশ্নটা করেছিলাম। বিদেশে বাঙ্গালী পেলে শিষ্টাচারের মায়া বজায় রেখে চলার অভ্যাস আমার নেই—মাপ করবেন।"

রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, মনে করবার কথা এতে কিছু নেই। হঠাৎ লক্ষ্ণৌ দেখার সখ হওয়ায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি। লক্ষ্ণৌ খুব বড় সহর শুনেছি। দরকার হ'লে সবই কিন্‌তে পাওয়া যাবে।"

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার সে অনুমান মিথ্যা নয়। লক্ষ্ণৌ খুব বড় সহর, আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন।"

রেলগাড়ী দ্রুত চলিতেছিল; সকল ষ্টেশনে থামিতেছিল না।

ডাক্তার বাবু একটা চুরুট ধরাইয়া জানালার ধারে বসিয়া বলিলেন, "আপনি বড় শ্রান্ত দেখছি। আমার বিছানাটা পেতে দেব ?"

রমেন্দ্র হাই তুলিতেছিল, সে বলিল, "না—থাক্।"

ডাক্তার বাঁধা বিছানাটা রমেন্দ্রের বেঞ্চের উপর রাখিয়া বলিলেন, "বেশ, বিছানা খুলে শুতে না চান, এটাকে বালিসের মত মাথায় দিয়ে আর একটু গড়িয়ে নিন্। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।"

বেশী কথা বলার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রমেন্দ্র প্রস্তাবমত কার্য্য করিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

"উঠুন! ষ্টেশনে এসেছি।"

রমেন্দ্র অঘোরে ঘুমাইতেছিল। ডাক্তার বাবুর ডাকে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

প্রকাণ্ড ষ্টেশন। যাত্রীরা মালপত্র সহ নামিতে ব্যস্ত। সে লজ্জা-কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "বড় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

উচ্চহাস্যে ডাক্তার বলিলেন, "তাতে লজ্জার কথা কিছু নেই, চলুন, নামা যাক্।"

উর্দ্দীপরা এক জন চাকর ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া সেলাম করিল।

"সামান্ সব্ উতার লাও, লছমন।"

"জী হুজুর", বলিয়া ভৃত্য ডাক্তার বাবুর দ্রব্যাদি ক্ষিপ্রতা সহকারে নামাইয়া লইল।

সঙ্গে সঙ্গে রমেন্দ্রও গাড়ী হইতে নামিল।

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, "হোটেলে গিয়ে অনর্থক কষ্ট পাবেন কেন ?—গরীবের আস্তানায় চলুন, কোন অসুবিধা হবে না। আমি আপনাকে ছাড়ছি না, বুঝেছেন ?"

রমেন্দ্র বলিল, "না—না, আমায় মাপ করবেন, আমি হোটেলেই যাব। আপনাকে—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এটা বিদেশ। স্বজাতি বাঙ্গালীকে পেলে কোন বাঙ্গালী তাঁকে ছেড়ে দেয় না। আপনার কোন ওজর আমি শুন্‌ছি না, মশায়। আমার বাসায় যথেষ্ট স্থান আছে, আপনার জন্য আমার কোন অসুবিধা হবে না। চলুন।"

ডাক্তার বাবু রমেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

রমেন্দ্র এই অপরিচিত ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল, সে আপত্তি করিবার কোন হেতু আর খুঁজিয়া পাইল না।

ষ্টেশনের বাহিরে—একখানা পাল্কী-গাড়ীর উপর সহিস জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। ডাক্তার বাবুকে আসিতে দেখিয়া উর্দ্দী-পরা সহিস গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। রমেন্দ্রকে তুলিয়া দিয়া ডাক্তারও গাড়ীতে বসিলেন। ষ্টেশন রোড অতিক্রম করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে আমিনাবাদের দিকে ছুটিল।

ডাক্তারটি অত্যন্ত সদালাপী; মুহূর্ত্ত নীরব থাকাও তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পথিমধ্যস্থ দর্শনীয় পদার্থগুলির পরিচয় দিতে দিতে তিনি চলিলেন। নবাব আসফউদ্দৌলার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়জ্ঞাপক সুগভীর খাত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, গঙ্গার জলস্রোত গোমতীতে আনিবার জন্য তিনি এই খাল কাটাইয়াছিলেন। তাহাতে গঙ্গার জল গোমতীতে না আসিয়া গোমতীর জল গঙ্গায় পড়িবার সম্ভাবনাই ঘটিয়াছিল।

আমিনাবাদের জনাকীর্ণ পথের উপর দিয়া গাড়ী কৈসরবাগের দিকে চলিল। রমেন্দ্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নবাবী আমলের হর্ম্ম্যমালা-শোভিত লক্ষ্ণৌ নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিল। অপরিচিত নূতন দেশে আসিয়া তখনকার মত সে সত্যই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল।

অবশেষে গাড়ী ফটক পার হইয়া উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী কঙ্করময় পথের উপর দিয়া একখানি সুদৃশ্য একতল গৃহের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া থামিল। ডাক্তার বাবু অগ্রে গাড়ী হইতে নামিয়া সাদরে রমেন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। চাকররা জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল। উভয়ে সম্মুখের হলঘরে প্রবেশ করিলেন।

ডাক্তার বাবুর অনুরোধে রমেন্দ্র একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল। চাকর আসিয়া ডাক্তারের ধড়া-চূড়া খুলিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইল। রমেন্দ্রের অকস্মাৎ মনে হইল, তাহার জীবনটা ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের একটি অধ্যায়। যাহা সে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে কল্পনাও করে নাই, এমনই সব ঘটনা তাহার জীবনে দেখা দিতেছে।

ডাক্তার বাবুর কণ্ঠস্বর তাহাকে পুনরায় বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনিল—"ধূমপান আসে?"

স্মিতহাস্যে সে জানাইল যে, ও রসে সে বঞ্চিত।

"তবে আপনি প্রেমিক পুরুষ নন।"

উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া ডাক্তার বাবু গড়গড়ার নল তুলিয়া লইলেন।

তাম্রকূট-ধূমের সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইতেছিল।

"আপনার স্নান হয়নি দেখছি। এ বেলা গা হাত-পা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলুন।"

রমেন্দ্রের তাহাতে আপত্তি ছিল না। সত্যই আজ কয়দিন হইতে সে অস্নাত। ধূমপানের পর ডাক্তার বাবু রমেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্বের কামরার সংলগ্ন 'বাথরুম' বা স্নানাগারে লইয়া গেলেন।

"বেশ ক'রে স্নান করুন, অসুখ করবে না। সাবান, তেল, তোয়ালে সব আছে। হ্যাঁ, ও কাপড় আপনার জন্য। কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। আমি বাইরের ঘরেই রইলাম। দরজা বন্ধ ক'রে দিন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রমেন্দ্র এই অদ্ভুত-চরিত্র মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিক, এত অল্পসময়ের আলাপে অপরিচিত, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তির প্রতি এতটা মমতা প্রকাশ করিতে সে পূর্ব্বে কাহাকেও দেখে নাই; কর্ত্তব্যপালন-স্পৃহারও এমন সুন্দর পরিচয় সে অন্যত্র পায় নাই। বাঙ্গালার বাহিরের বাঙ্গালীরা কি সবাই এইরূপ?

ভাবিতে ভাবিতে রমেন্দ্র সম্মুখের তাক হইতে সাবান লইয়া স্নানে বসিল। কয় দিনের সঞ্চিত কয়লার গুঁড়া ও ধূলা ধুইয়া ফেলা দরকার। কলে জল ছিল। কলিকাতার ন্যায় লক্ষ্ণৌয়ে কলের জল দেখিয়া রমেন্দ্র বিস্মিত হইল না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু বৃহৎ নগরেই কলের জলের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সংবাদপত্রের কল্যাণে সে সংবাদ তাহার অগোচর ছিল না।

উত্তমরূপে স্নানের পর রমেন্দ্রের শরীর যেন বহুপরিমাণে সুস্থ বোধ হইল। আলনার উপর পরিপাটীরূপে কোঁচান কাপড় ছিল। সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। তার পর জামা গায় দিয়া বাহিরে আসিল।

হল-ঘরে ডাক্তার তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। টেবলের উপর দুই জনের উপযোগী নানাবিধ খাদ্য স্বতন্ত্র পাত্রে রক্ষিত। লুচি, তরকারী, নানাবিধ ফল-মূল—প্রচুর আয়োজন।

ক্ষুধার জালাকে মানুষ দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিতে পারে

না। স্নানান্তে রমেন্দ্রের শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে রমেন্দ্র তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিল।

ডাক্তারটি যেমন সদানন্দ, তেমনই অতিথি-বৎসল। জলযোগ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, এখানে কাগজ, বই সব আছে, ইচ্ছা হ'লে পড়তে পারেন। আমি ভিতর থেকে এখনই আসছি। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল; যদি ইচ্ছে করেন, গোমতীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাবে। আর দেখুন, পাশের ঐ কামরায় আপনার শয়নের ব্যবস্থা হয়েছে, ওখানেই আপনার ব্যাগ পাবেন।"

ডাক্তার অন্তঃপুরে গেলে রমেন্দ্র চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। হলঘরে অনেকগুলি কাচের আলমারী। প্রত্যেকটিতে বাঁধান বই সাজান রহিয়াছে। একটা পান মুখে দিয়া সে কৌতূহলভরে বইগুলি দেখিবার জন্য উঠিল। একটা আলমারী ডাক্তারী কেতাবে ভরা। পার্শ্বেরটিতে নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ। ডিকেন্স, টলষ্টয়, সেক্সপীয়র, মিলটন সবই তাহাতে আছে। শুধু উপন্যাস, নাটক বা কবিতা নহে; ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ নানা প্রকারের প্রসিদ্ধ অনেকগুলি গ্রন্থ দেখিয়া রমেন্দ্র চমৎকৃত হইল। শেষের তিনটি আলমারী বাঙ্গালা গ্রন্থে পূর্ণ। লোকটি শুধু চিকিৎসক নহেন, দস্তুরমত সাহিত্যরসিক। রমেন্দ্রের মন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। বইগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল। তাহার রচিত 'যূথিকা'ও এই সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে!

সে যে রমেন্দ্রনাথ—যূথিকার রচয়িতা, এ পরিচয় ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। হ্যাঁ, তাহাকে আত্মগোপন করিতে হইবে; কারণ, সে অজ্ঞাতবাসে রহিয়াছে; পরিচয় দেওয়া এখন তাহার পক্ষে ঠিক হইবে না। রমেন্দ্র সংকল্প স্থির করিল—ছদ্ম নামেই সে পরিচিত হইবে। এ অভিনয়ে যদি দোষ ঘটে, রমেন্দ্রনাথ তাহাতে এখন পশ্চাৎপদ হইতে পারে না।

রমেন্দ্র অন্যান্য বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

এমন সময় দরজা খুলিয়া ডাক্তার বাবু গৃহপ্রবেশ করিলেন।

"বই দেখছেন? আমার গিন্নীর বই পড়ার ভারী সখ, মশায়। কেতাব না হ'লে এক দণ্ড চলে না। ও দোষটা আমারও কিছু আছে। তা আপনার যদি পড়াশুনা ভাল লাগে, যা ইচ্ছে বের ক'রে নেবেন। ঐ ছোট কাচের আলমারীর ভেতর নম্বর দেওয়া চাবী সাজান আছে।"

রমেন্দ্র স্মিতহাস্যে বলিল, "আপনার সংগ্রহ ত কম নয়। একটা বড় লাইব্রেরী বল্‌লেই চলে। বাস্তবিক আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।"

ডাক্তার বাবু গড়গড়ার নল তুলিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল। দুই এক টান দিয়া তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশে যত ভাল ভাল মাসিকপত্র আছে, গৃহিণী প্রত্যেকখানির গ্রাহিকা। কি করা যায় বলুন। সংসারে আমরা দুটিমাত্র প্রাণী। কাযেই কাগজ, বই বেশী দরকার। আর একটা কথা কি জানেন? দূরপ্রবাসে থাকি—ছাতুর দেশ, মাতৃভাষাটা এখানে লাগে বড় ভাল। কেতাবের ভেতর দিয়ে যতটা পারা যায়, বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে যোগ রাখা যায়।"

ডাক্তার বাবু হাসিতে লাগিলেন।

রমেন্দ্র এই নবপরিচিত লোকটির সহিত আলাপ করিয়া সত্যই যেন হৃদয়ে অনেকটা শান্তি পাইল।

সহসা ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আপনাকে কি নাম ধ'রে ডাকব বলুন? ও গো মশায়, হ্যাঁগো মশায় ব'লে ডেকে সুখ হয় কি? এতক্ষণ ও কথাটাই মনে আসে নি।"

রমেন্দ্র বলিল, "আমাকে শিশির বলেই ডাক্‌বেন—শিশিরনাথ বসু।"

"বেশ নামটি ত! চলুন, শিশির বাবু, একটু বেড়িয়ে আসা যাক; আপনার আপত্তি নেই ত?"

"কিছু না" বলিয়া রমেন্দ্র উত্তরীয়খানি তুলিয়া লইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

ইংরাজী সাহিত্য গঠন ও পাঠনের ফলে এক নূতন ভাব আসিয়া বাঙ্গালীর "ভীরু" হৃদয়কে উদ্বেল করিতে লাগিল। স্বাধীনতার যে রুদ্রবাণী শ্বেতদ্বীপের অতীত যুগযুগান্ত হইতে সুদূর আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের ভীমকল্লোলে শ্রুত হইতেছিল, তাহা ইংরাজ কবিগণের বীণা-তন্ত্রী সাহায্যে বাঙ্গালীর সুপ্তিমগ্ন হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব রসের অবতারণা করিয়াছিল। দিব্যোন্মাদে পরিমূর্ত্ত প্রেমের আনন্দধারার মধ্যে এই এক দেবদুর্ল্লভ অপরূপ ভাব বাঙ্গালী কবির হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রঙ্গলালের (১৮২৬ ১৮৮৭) সহিত বঙ্গ-সাহিত্যে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে স্বদেশ-প্রীতিরূপ অমৃতের নব-গঙ্গা আনয়নের ভগীরথ। "আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন" বলিয়া পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া রঙ্গলাল তাঁহার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূতিগন্ধময় কলুষিত দুর্ব্বলতা-প্রতিপাদক মানুষী প্রেমের বিকৃত কবিতা হইতে বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন রঙ্গলাল। ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে—শুধু ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে কেন, সমস্ত য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে যে প্রচণ্ডতা বর্ত্তমান আছে, যে অগ্নিশিখা য়ুরোপের সমস্ত জাতীয় সাহিত্যে প্রকট, তাহা বাঙ্গালা দেশে নবজীবনের অবতারণা করিয়াছিল—বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যে উত্তেজনা, রুদ্রতা ও প্রচণ্ডতার ভাব আনয়ন করিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল পদ্মিনীকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাহার বর্ত্তমান হীন ও পতিত অবস্থার কথা শুনাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে মত্ততা আনয়ন করিয়াছিলেন।

"অসংখ্য বীরের যিনি জন্মবিধায়িনী।
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী॥"

বলিয়া কবি স্বদেশবাসিগণের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার কথা শুনাইয়া দিতেছেন এবং বলিতেছেন—"তেজোহীন জনগণ যেন সব শব।" স্বাধীনতা হীনতায় জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ—দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ—অনন্তকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়া দাসত্বশৃঙ্খল পরিধান করা অপেক্ষা এক দিনের স্বাধীনতায়ও স্বর্গসুখ। রঙ্গলাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই আগুনের গতি সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী নূতন মন্ত্র শ্রবণ করিয়া চমকিত হইল। বাঙ্গালীকে নূতন ভাবে উজ্জীবিত করিতে হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসে সেরূপ মনোজ্ঞ কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করা অসুবিধা ভাবিয়া, বোধ হয় রঙ্গলাল বীরভূমি রাজপুতানার ইতিহাসের সেই চিরপ্রসিদ্ধ পদ্মিনী উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া নবযুগের বাণী প্রচার করিয়াছেন। মৃত জাতির অসাড় হৃদয়ে সঞ্জীবনীশক্তি আনয়ন করিতে হইলে তাহার অতীত পৌরুষবল ও স্বাধীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানের হীন অবস্থার সহিত তাহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর তুলনা করিতে হইবে। পদ্মিনী উপাখ্যানে কবি রঙ্গলাল সেই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য জাতি-বৈরজনিত দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ। কবি বলিতেছেন—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়॥

এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে
ক্ষত্রিয়-তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়?”

বিদ্রোহের এই সুর, জাতিবৈররূপ এই মাদকতা না থাকিলে “শরীরে রুধিরের ধার” ছুটে না—“অবসাদ-হিমে” জর্জ্জরিত কঠিন শীতল বক্ষে স্বাধীনতার উষ্ণ উৎস প্রবাহিত হয় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

এই সময় বাঙ্গালীর আর এক প্রতিভা-শিশু “ইংরাজী সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে তাহার ফুস্‌ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ড ভবিষ্যতের উপযোগী ক্রিয়াশক্তি” লাভ করিতেছিল। মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের অমৃত-ভাণ্ড হইতে মধুচক্র রচনা করিবার উপযুক্ত মালমসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং জাতীয় সাহিত্যের মহাপূজার আসনে উপবিষ্ট হইতেছিলেন। বোধ হয়, সময়োপযোগী হইবে ভাবিয়া, নব্যতন্ত্রিগণের মুখরোচক হইবে বুঝিয়া মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায় লিখিলেন—

“শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ’ ঘুম-ঘোর— হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়!
কোথায় বাল্মীকি ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়!
সুধারসে অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়!
মধু কহে, জাগো মা গো, বিভুস্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হোক্ তনয়-নিচয়।”

কিন্তু কলা, শিল্পাদর্শ ও সার্ব্বজনীন সাহিত্য ভাবপরিপুষ্টির পরিপন্থী মনে করিয়া, বোধ হয়, মধুসূদন এই নবোদ্বোধিত বিপ্লব ও স্বাধীনতা মন্ত্রের উন্মার্গগামিতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর যে সুর সুদূর ফরাসী রাজ্যে বাজিয়া উঠিয়া সমস্ত য়ুরোপকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালায় সাহিত্যসেবী ও ভাবুকগণের হৃদয়ে নূতন উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিলেও মধুসূদনের কলাশিল্পদৃষ্টি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনাবিল ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নদ-নদী-শোভিত শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত বনভূমি-বিরাজিত বঙ্গভূমি তাঁহার জন্মস্থান ছিল। কপোতাক্ষের দোয়েল-শ্যামা-পিকবর-মুখরিত শ্যামল তটে তাঁহার শৈশবের স্বপ্নময় দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার কোমল কবি-হৃদয়ে মাতৃভূমির স্মৃতি অন্তঃশিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত ছিল। বিদেশে বাস করিয়া, বিদেশের ভাবে অনুপ্রাণিত

হইয়া, বিদেশের ভাষায় কবিতা লিখিয়াও তিনি স্বদেশের পূর্ব্ব-স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

And where art thou, fair freedom ! thou,
Once Goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo round her brow
Shone radiant and she rose sublime,
Like her own towering Himalaye
To kiss the blue clouds thron'd on high !
(*King Porus—Legend of old*)

"Visions of the Past" নামক খণ্ডকাব্যে,—

As when Bengala ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan, slumberous haunt and cool,
Echo in mimic accents 'mong the flocks
Couch'd there in noon-tide rest and safe repose,
Repeats the deafening and deep thunder'd roar
Of him, the royal wanderer of thy woods !

আবার—

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।

ইংলণ্ডগমনকালে "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতায় মধুসূদনের যে স্বদেশপ্রেম পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা তাঁহার মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসভূমি রঙ্গ-কৌতুকের আগার ফুল্লকুমুদিনী সদৃশ শ্বেতাঙ্গদিগের লীলানিকেতন ফ্রান্সে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চির-আদরের কপোতাক্ষকে ভুলিতে পারেন নাই।

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,

* * * *

বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে !"

মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক যোগীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—"মাদ্রাজ-প্রবাসের পর একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।' আর এক দিন কপোতাক্ষের কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, 'কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পারে, সেও পরম সুখী'।" নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে তিনি কেমন সুন্দরভাবে স্বদেশের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—

"যে দেশে উদয়ি রবি—উদয় অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
শোভেন শৈলেন্দ্ররাজ মানসরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ) হেরি ভীষণ মূরতি ;
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত-কাননে—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে—
সে দেশে জনম মম।"

হ্যাট্‌কোট পরিধান করিলেও মধুসূদনের বাঙ্গালী-হৃদয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত। বঙ্গললনাগণের পরমারাধ্যা লক্ষ্মীদেবীকে বঙ্গদেশে চিরকাল বিরাজমানা থাকিতে বলিতেছেন—

"থাক বঙ্গগৃহে যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ।"

মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। মাদ্রাজে বাস করিয়া তিনি তাঁহার সাধের কৃত্তিবাস ও দরিদ্র কালিদাসকে স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তাহা নিম্নের কয়েক পংক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা' সবে অবোধ আমি, অবহেলা করি,—
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ—
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

স্বর্গীয় মনস্বী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের দেশপ্রাণতার কথা সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া নিজ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন—

“মধুসূদন য়ুরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুলকুলু করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল, সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া,—বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিত-প্রায়, সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন ও জানি না, কতই আনন্দ পাইতেন! বাঙ্গালায় মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেলসে বসিয়া কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেন! জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে, বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল! ‘বাঙ্গালার ফুলে, বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার ফলে’ তাঁহার অন্তর বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল।” য়ুরোপের প্রচণ্ডভাবে উদ্বোধিত মধুসূদন—দুঃখদারিদ্র্যহতাশার ক্রোড়ে পালিত মধুসূদন—নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত “চণ্ডমুণ্ড” দলের অগ্রণী মধুসূদন—নূতন ছন্দের স্বাধীনভাবের মধুচ্ছন্দা ঋষি মধুসূদন—তাঁহার বৃহৎ প্রাণকে জাতি-বৈর-প্রবণ স্বাদেশিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ করিয়া পরদ্রোহ, পরবিদ্বেষ ও জিঘাংসার উৎপাদন করেন নাই—অপ্রেম ও জীববিদ্বেষের ছুরি চালাইয়া স্থায়ী ক্ষত রাখিয়া যান নাই। তাঁহার বিনয়-নম্র পূত আদর্শ ও সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে মধুর উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতের বঙ্গসন্তান সমস্ত ভারতের আদর্শস্থানীয় হউক, বাঙ্গালীজাতি মহীয়ান্ হইয়া গৌরবমণ্ডিত হউক, ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ কল্পনা, আশা ও বিশ্বাস।

“এই বর হে বরদে, মাগি তব কাছে।
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ-ভারত রতনে॥”

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়া গেলে হেমচন্দ্রের বীণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের “ভারত-সঙ্গীত” প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রসিদ্ধ সমালোচক পরলোকগত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন, “হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বধর্ম্ম-পালন বা স্বজাতি-বাৎসল্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু হেমচন্দ্র জাতিবৈর-জনিত দেশভক্তিতে ভরপূর। হেমচন্দ্রের দেশভক্তি কখন রৌদ্ররসে ফুলিয়া উঠে নাই। সেই দেশভক্তি শান্ত, করুণ, বীররসে মাখান।” বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে হেমচন্দ্রের প্রভাব বড় কম হয় নাই। হেমচন্দ্রের স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশানুরাগ জাতিবৈরে প্রতিষ্ঠিত। এই “কৃষ্ণবর্ণ জাতি” বেদগান শুনাইয়া “স্তব্ধ বসুন্ধরাকে” এক সময় চমৎকৃত করিয়াছিল, পৃথিবীর লোক বিস্মিত হইয়াছিল, উৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা—

“শিখরে শিখরে, জলধির জলে
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে;

জগৎব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে,
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র অর্ণব আকাশমণ্ডল
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।"

পৃথিবীর সকল জাতির মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, সকল জাতিই মানের গৌরবে জাগরিত, কিন্তু পতিত ভারতবাসী বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় অভিমান ভুলিয়া গিয়াছে, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" ভারতবাসী এখন কাপুরুষ ও নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে, পরের পদলেহন করিতে ইহারা স্বতঃপরতঃ চেষ্টিত। আর্য্যাবর্ত্তজয়ী বীরগণের বংশোদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে মনে হয় না।

* * * *

"আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাঁহারা
সেই বংশোদ্ভূত জাতি কি ইহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।"

রণোন্মাদে মত্ত হইয়া, বীরপদভরে অরাতিকুল মথিত করিয়া যখন আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। সেই অতীত আর্য্যগৌরব-কাহিনী কবির হৃদয়কে এমনই ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে, তাঁহার রচনায় সেই ভাবই পদে পদে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিতে এরূপ রচনা বঙ্গভাষায় বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এখন ভারতে সে জ্ঞান নাই, সে সাহস নাই, ভারত এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; ভারতবাসী গোলামীতে নিপুণ হইয়াছে। রোষরুষ্ট অহঙ্কারদৃপ্ত কবি দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়া দুঃখে বলিতেছেন—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কা'রে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী,
আর কি ভারত সজীব আছে?"

কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে দেশবাসীকে শক্তিসঞ্চয় করিতে বলিতেছেন। কারণ, দেব-আরাধনা, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি প্রাকৃতজনসেবিত পন্থা সকল সময়ে কার্য্যকরী হইবে না। তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন আলস্য ও জাড্য পরিহার করিবার সময়।

যে জাতি-বৈর রঙ্গলালের পদ্যে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত, তাহা হেমচন্দ্রে শোণিত-মাংস-পরিপুষ্ট দেহরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় অবমাননা, জাতীয় লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া কবি তাঁহার তপ্ত-নিশ্বাসপ্রসূত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত ভারতবাসীর প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে যে সরল সত্যের কঠোর বাণী তাহার কর্ণে ধ্বনিত করিতে হইবে, তাহারও উপায় নাই।

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজি—উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

প্রথম বয়সে যৌবনের উষ্ণ রুধিরপ্রবাহে চঞ্চল কবি—স্বদেশের দুর্দ্দশায় ব্যথিত কবি, দেশবাসীর দুর্ব্বলতা দেখিয়া খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তরবারি ও দৈহিক বলের সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বিধবা রমণীর "সোনার প্রতিমা" গড়িয়া ভারতভূমির স্থানে স্থানে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, যেহেতু, তাঁহার মতে পতিব্রতা নারী পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি সেই হিন্দু-সমাজের প্রতি—সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।"

কবি ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় স্বদেশধর্ম্মানুরাগজনিত স্বদেশপ্রেম হেমচন্দ্রের ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশবাৎসল্য নিম্নের কয়েক ছত্র পদ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি—
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

আমি যে দেশকে ভালবাসি, সে দেশ অসুন্দর হইলেও আমি তাহাকে ভালবাসিব—আমি যে সমাজে জন্মিয়াছি,

সে সমাজের দোষ-ত্রুটি থাকিলেও তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিব না—যে দেশের জলে ফলে মূলে দেহ পরিপুষ্ট, যে দেশমাতৃকার স্তন্যপানে আমি বর্দ্ধিত, তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিব, ইহাই ত হইল যথার্থ স্বদেশপ্রেম। দেশবাসীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া, এমন কি, "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া," "দেশের কুকুরকে" গ্রহণ করিব। হইতে পারে, ইহা অন্ধ স্বদেশপ্রেম, কিন্তু ইহা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত, স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-মহিমা-মণ্ডিত। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"The naked Negro panting at the line,
Boasts of his golden sands and palmy wine ;
Basks in the glare or stems the tepid wave,
And thanks his gods for all the good they gave."

উত্তরকালে পরিপক্ক বয়সে হেমচন্দ্রের বীণায় আর এক নূতন সুর বাজিয়াছিল। "বৃত্র-সংহার" কাব্য রচনার সময় বোধ হয় তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অমরগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দেবসেনাপতি স্কন্দ ও অগ্নিমূর্ত্তি বৈশ্বানর পুনরায় যুদ্ধ করিতে আস্ফালন করিতেছেন, অস্ত্রের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরিতেছে না। কিন্তু প্রশান্ত ধীর স্থির প্রচেতা তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচাইবার জন্য বলিতেছেন—

"দেবতেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল? অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যান-নিরত?"

দেশ-উদ্ধাররূপ মহান্ ব্রতে ব্রতী হইতে হইলে তপস্যা চাই, আরাধনা চাই—স্বদেশের কল্যাণে স্বার্থত্যাগ চাই, কঠোর তপস্বী দধীচির মত পরহিতব্রতে আত্মবলিদান চাই। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি বলিতেছেন—

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণসাধন অনুদিন।
পরহিত-ব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে, উদযাপিলে আজ।"

বুদ্ধদেবের ন্যায় এক জন প্রকৃত প্রেমিকের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসত্যাগে—যীশুখৃষ্টের ন্যায় এক জন উদার প্রেমিকের আত্মদেহবলিদানে এবং বর্ত্তমান যুগে স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা গন্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের নিজ স্বার্থত্যাগে, স্বজাতির—মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ইহাই "বৃত্রসংহার" কাব্যের গভীর উপদেশ—ইহাই হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের চরম পরিণতি ও উৎকর্ষ।

এই স্থানে আমরা আর এক মহাপুরুষের কথা বলিতে ইচ্ছা করি। মাইকেলের মৃত্যুতে বঙ্গের কবি-সিংহাসন যখন শূন্য হইয়াছিল, তখন প্রধান পুরোহিতের ন্যায় তিনিই রাজটীকা দিয়া হেমচন্দ্রকে সেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র। ক্রান্তদর্শী ঋষির ন্যায় যিনি অনুভূতি ও কল্পনাবলে দেশে ভাবী জাগরণের বার্ত্তা তাঁহার "আনন্দ-মঠে" ও "বন্দে মাতরম্" গানে আস্থা ও আশাহীন দেশবাসীর কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছিলেন—যাঁহার কপালকুণ্ডলা আর্ট ও কাব্যাদর্শের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তিনি ছন্দোবন্ধে ভাবপ্রকাশ না করিলেও কবি-পর্য্যায়ভুক্ত।

আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের সুপাঠ্য উপন্যাস একটু যেন অবজ্ঞাত হইতেছে। বর্ত্তমানে বহুবিধ সংস্করণের উপন্যাস প্রত্যহ বাহির হইতেছে। গল্পের বই বা নভেল লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করা যেন কোন কোন গ্রন্থকারের একমাত্র উদ্দেশ্য? সামান্য একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া, কোথাও বা বিলাতী রং ফলাইয়া, কোথাও বা বিজাতীয় রুচি ও ভাব আমদানী করিয়া ঔপন্যাসিকের দল ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক ছাপাইতেছেন। সকলের উদ্দেশ্য অর্থ। এই ব্যবসাদার লেখকগণের মধ্যে অনেকের প্রতিভা ও মৌলিকতার একান্ত অভাব। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে জাতি বড়, তাহার সৎসাহিত্য তত বেশী, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সাহিত্য সাধনার ধন, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী "বেণিয়াবুদ্ধি" দ্বারা পরিচালিত হন না—তাঁহার হৃদয়ে উদারতা, সার্ব্বজনীন সহানুভূতি, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও

চিন্তাশক্তি চাই। তাই বলিতেছি, বঙ্কিমের উপন্যাসমালা, তাঁহার গদ্যকাব্য সমূহ, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, তাঁহার প্রবন্ধাবলী যতই পঠিত হইবে, ততই বাঙ্গালী সবল ও শক্তিশালী হইবে—ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের পূত মন্দাকিনী-ধারায় চরিত্রের আবিলতা ও কলুষতা ধৌত করিতে সমর্থ হইবে। আত্মবিসর্জ্জনের গৌরব-মণ্ডিত হইয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে শিখিবে।

১২৮০ সালে ১১ই কার্ত্তিকের "সাধারণী"তে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"যত দিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও, পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতি-বৈর-সমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদের মধ্যে এই জাতি-বৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতি-বৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমান-গ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেন না, সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনরায়—

"অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শাসিতবল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী ও ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। * * * * আজ্ঞাকারী আমরা বটে; কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না, আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল।"

বঙ্কিমচন্দ্র . হেমচন্দ্রের এই জাতি-বৈরতার সমর্থন করিয়াছেন ১২৮০ সালে। তিনি "আনন্দমঠ" লিখিয়াছিলেন ১২৮৮ সালে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। য়ুরোপের আদর্শে সন্তানসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের উদ্দেশ্যে "আনন্দমঠ" রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভক্তির প্রধান উপাদান আত্মবিসর্জ্জন। "আনন্দমঠে" তিনি ইহার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। দেশসেবীকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে—স্বার্থ ও সর্ব্বস্ব দেশমাতৃকার চরণতলে বলি দিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা সত্যানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে

সর্ব্বস্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত আবদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটী ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহেন্দ্র। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

~~সত্য।~~ স্ত্রী-পুত্রকলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই? সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহেন্দ্র। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

সন্তান-সেনা জয়ী হইলে, মা'র কার্য্যোদ্ধার হইল। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু শান্তি জীবানন্দকে রাজ্যভোগ করিতে নিষেধ করিতেছেন; কারণ, যে দেহ সন্তানধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তিতে সন্তানের আর অধিকার নাই। জীবানন্দ গৃহে গিয়া সুখভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শান্তি বলিলেন—

"আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুজনে সন্ন্যাসী থাকিব, চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জীবানন্দ। তার পর?

শান্তি। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মা'র মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।"

দেশহিতব্রত গ্রহণ করিতে হইলে জীবানন্দের ন্যায় পুত্র ও শান্তির ন্যায় কন্যার প্রয়োজন, যাঁহারা চিরজীবন মাতৃসেবায় ব্যাপৃত থাকিবেন, সুজলা-সুফলা দেশমাতা তাঁহাদের একমাত্র ধ্যান ও আরাধ্য বস্তু হইবে। পূর্ব্বে জাতি-বৈরিতার সমর্থন করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র পরে সে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। "আনন্দ মঠে" তিনি এই জাতি-বৈরিতার একটা সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। "যে রাজারা প্রজারক্ষা করে না—যাহাদের রাজত্বে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম-শিলা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে, যারা রক্ষা করে না, যাদের আমলে ধর্ম্ম গেল, হিন্দুর হিন্দুয়ানী গেল, সেই নেশাখোরদের না তাড়াইলে আর দেশের মঙ্গল নাই।" কেবল এইরূপ রাজাকেই রাজ্যচ্যুত করিতে পারা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে সনাতনধর্ম্ম আবশ্যক। কিন্তু অত্যাচারী দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজার হস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলজনক। অনর্থক প্রাণিহত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। আনন্দমঠের প্রধান পুরোহিত, সন্তানগণের প্রধান নেতা সত্যানন্দ "মাতৃরূপা জন্মভূমির প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না?" চিকিৎসক বলিলেন—"সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। * * * সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্নদেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। অতএব ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।" ইহা শুনিয়া সত্যানন্দ যখন ক্রোধে বলিলেন—"শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব—" তখন মহাপুরুষ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।"

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের স্বদেশ-প্রেমিকতা—এই স্বদেশ-প্রেমিকতা জাতি-বৈররূপ বিষ হইতে মুক্ত—

এই স্বদেশভক্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত।

সহস্র সহস্র সন্তান-কণ্ঠে উচ্চারিত, আনন্দমঠের সেই চিরপ্রসিদ্ধ "বন্দে মাতরম্" গান—যাহা বাঙ্গালীর, শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমস্ত ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ হৃদয়-নিহিত স্বদেশ-প্রেমরূপ উৎস প্রবাহিত হইয়াছে। এই গানটি সর্ব্বসাধারণের এত পরিচিত যে, ইহা পুরাতন হইবার নহে কিংবা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এমন সুন্দর ভক্তিরসাশ্রিত জাতীয়ভাব--উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত বাঙ্গালা ভাষায় কেন, ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতে শ্রোতার প্রাণে বলসঞ্চার করে সত্য, কিন্তু তাহা জিঘাংসাবৃত্তি উদ্রেক করে, শান্ত সরল কোমল ভাবের সৃষ্টি করে না।

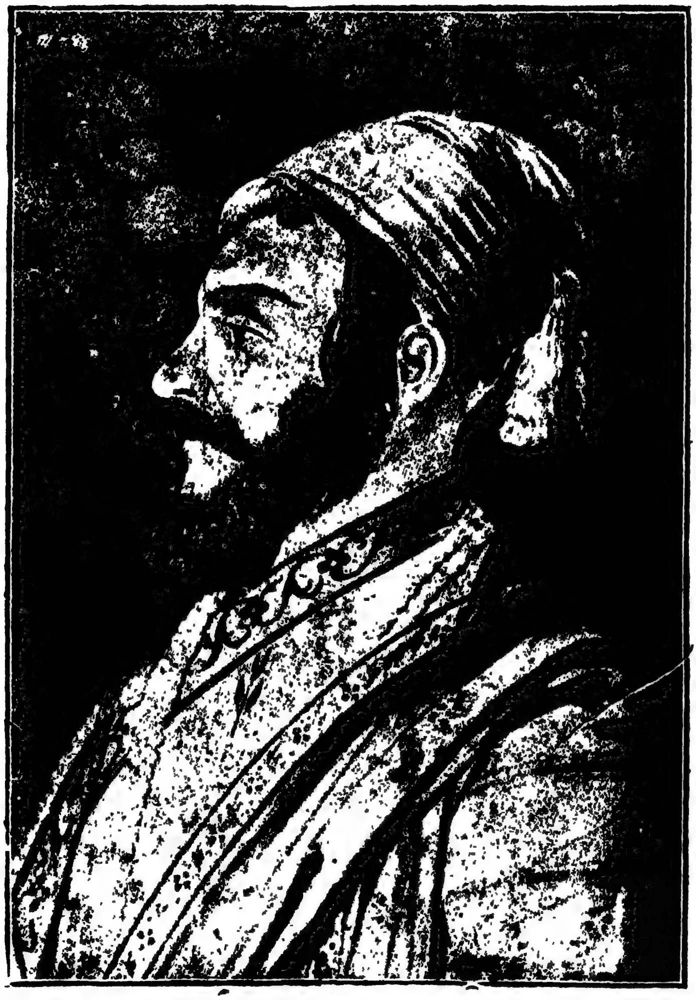

শিবাজী

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে হিন্দু কিংবা বাঙ্গালী জাতির পতনের কারণ এবং কি উপায়ে স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিষয় তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গালীর শারীরিক বল নাই, এই কথা অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শুধু শারীরিক বল থাকিলেই হয় না, বাহুবল চাই, শারীরিক বল বাহুবল নহে। "উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করায় যে, ফল, তাহাই বাহুবল। * * এই চারিটি বাঙ্গালীর কোন-কালে নাই, এ জন্য বাঙ্গালীর বাহুবল নাই।" বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয় সুখলাভের বলবৎ অভিলাষ তীব্রতর হইলে, প্রাণবিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে, তখন সাহস হইবে। বাঙ্গালীর এইরূপ মানসিক অবস্থা কখনও হইবে না, ইহা বলা যায় না। জাতীয় অন্তর্নিহিত শক্তির উপর বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গুণ।

হিন্দুর পরাধীনতার আর এক কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হিন্দু কখনও স্বাধীনতাপ্রয়াসী নহে। হিন্দু-সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব ও জাতি-হিতৈষিতার অভাবের জন্য হিন্দু বহুদিন পর-পদানত। ঐতিহাসিক যুগে কেবল দুইবার হিন্দু-সমাজ-মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। শিবাজীর সিংহনাদে মহারাষ্ট্র

জাগরিত হইয়াছিল, তাঁহার মহামন্ত্রপ্রভাবে মহারাষ্ট্রে ভ্রাতৃভাব জাগরিত হইয়া অজিতপূর্ব্ব মোগলসাম্রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেল, সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদানত হইল। আর একবার ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিং খালসার সাহায্যে, এমন কি, ইংরাজশক্তিকে বিচলিত করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

১২৮২ সালে নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। "পলাশীর যুদ্ধ" তখনকার যুবকদিগের অতি প্রিয় আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। জগৎ শেঠের সেই বিখ্যাত উক্তি সময়োপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কবি বাঙ্গালী-চরিত্র সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়!
কার্য্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।"

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর মুখ দিয়া ধূর্ত্ত ও কাপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তিগণকে তিরস্কার করিতেছেন এবং স্বদেশ উদ্ধারের বিস্তৃত পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, বঙ্গললনার এই তেজোদৃপ্ত বাক্যে কোন্ বাঙ্গালীর রক্ত উষ্ণতর হয় না?

যুদ্ধক্ষেত্রে বীর মোহনলালের গর্জ্জন—বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও যবনসেনার প্রতি তিরস্কার যেন আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?
এক দিন – এক দিন—জন্মজন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিণীর করে।"

অপার্থিব স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়া, অধীনতা অপমান সহ্য করিয়া পদদলিত হিন্দুজাতির দুর্দ্দশার যেমন সীমা নাই, সেইরূপ মুসলমানগণও হিন্দুর সহিত একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইবে সন্দেহ নাই। সমরক্ষেত্রে মোহনলালের মুখ দিয়া কবি নিজ প্রাণের কথা বলিয়াছেন। পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার শেষ আশা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। চির-অধীনা ভারতমাতা নূতন পিঞ্জরে আবদ্ধা হইলেন। বনবিহগী পিঞ্জরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুখদুঃখ তাহার পক্ষে সমান। পানিপথে যে স্বাধীনতা-রবি অস্ত গিয়াছিল, তাহা পরে দূর-নীলাচলে একবারমাত্র ঈষৎ কটাক্ষ হাসি হাসিয়াছিল। তাই কবি আশান্বিত হইয়া বলিতেছেন—পলাশীতে যে নিবিড় মেঘ ভারতগগন আবৃত করিয়াছিল, তাহা পুনরায় অপসারিত হইতে পারে, কারণ, মেঘের ছায়া অল্পক্ষণস্থায়ী এবং উদয় অস্ত জগতের নিয়ম।

স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতমাতার রূপে মুগ্ধ হইয়া কত বিজেতা কতবার তাঁহার সোনার অঙ্গে পীড়া দিয়াছে, ইহ ভাবিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে কবি বলিতেছেন—

"হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?"

যদি ভারত-সন্তান নারীসুকুমার ক্ষীণকলেবর না হইত-- যদি তাহাদের ধমনীতে উগ্রতর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে ভারত অদৃষ্টক্রীড়ার রঙ্গভূমি হইত না—ভারত গৌরব-সূর্য্য দিগ্‌দিগন্তর উদ্ভাসিত করিত এবং বাঙ্গালার ভাগ্য অন্যরূপ হইত। কিন্তু তাহা দুরাশা ভাবিয়া কবি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। ইংরাজ কবি Byronও Italyর দুর্দ্দশা দেখিয়া খেদে বলিয়াছিলেন—

"Italia! oh Italia, thou who hast
the fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past."

কিছু দিন পূর্ব্বে যিনি মিল্‌টনের Satanএর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস,"

তিনিই আবার রৈবতকে আমাদিগকে নূতন কথা শুনাইতেছেন,—

"বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব,
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি কিংবা, হে কংসারি! নিয়ম ইহার।
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব দয়ার।
বিশ্বরাজ্য ন্যায়-রাজ্য রাজত্ব নীতির।"

এখানে কবি পুণ্য-ভারতভূমিতে এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন স্থাপন করিবার উচ্চ আদর্শের মহতী বাণী ঘোষণা করিতেছেন। খণ্ড ভারতে রাজ্যভেদ—গৃহভেদ—জাতিভেদ-প্রধান স্বার্থ-পূতিগন্ধময় ভারতে প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময় "মহাভারত" স্থাপনরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিতে কবি উপদেশ দিতেছেন।

"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি;
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম লক্ষ সে পরম-ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ম্! করিব নিশ্চিত,
এই ধর্ম্মরাজ্য 'মহাভারত' স্থাপিত।"

সমস্ত ভারতবাসী এক মহাজাতিসঙ্ঘে পরিণত হইলে, সর্ব্বভূতহিতরূপ এক ভিত্তিতে সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা অপসারিত হইলে, ব্যাসের জ্ঞানবল ও অর্জ্জুনের বাহুবল সম্মিলিত হইলে, ভারত আবার জগৎ-সভায় শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবে, কারণ—

"ধর্ম্মভিত্তি নাহি যার বালিতে নির্ম্মাণ তার
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ নিজপাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল-পারাবারে।"

ইহাই নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির শেষ পরিণতি—এই আদর্শ তাঁহার চরম লক্ষ্য—ইহার সাধনা তাঁহার উন্নত উদার কবি হৃদয়ের চরম উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

বন্দি-জীবন

সুদূর আকাশ-পটে শোভিছে নীলিমা
তারি নীচে চারিদিকে নীল অম্বু বহে—
বক্ষে ধরি আমি তার নীল ছায়াখানি
সদাই কে যেন মোর কানে কানে কহে।
শন্ শন্ রবে বটে বহিতেছে বায়ু
আর্ত্ত স্বরে পাখীকুল উঠিতেছে ডাকি,
পশ্চিমে দিনান্ত-রবি যায় অস্ত বটে
উথলিছে কেন প্রাণ আজি থাকি থাকি।
হেথা একা ব'সে আছি ধরণীর কোলে
ভাসে হৃদে একে একে সংসারের ছায়া,
চিরতরে আমি যে গো বন্দী হয়ে আছি
মমতা যায়নি তবু ঘোচেনি ত মায়া!
আলোকেতে ফুটেছিল ম্লান-বসুন্ধরা
শয়ন-স্বপন সম ছুটে আসে মনে,
ফুটেছিল মৃদু হাসি আর ওষ্ঠপাশে
চিরতরে নিভে গেছে ঝঞ্ঝার পবনে।
তেমন হয় না হেথা ভকতি-আরতি
ভাসে না কানের পাশে কোকিলের স্বর,
সৌরভ ছোটে না কভু ফোটে না মালতী,
আঁধার সকলি আজি আঁধার অন্তর।
কাল ছিল সৌধে সৌধে আলোকের মালা
হইয়াছে আজি হায়! চির-অন্ধকার,
বাঁধ রে পাষাণ-শৈলে হে অবোধ প্রাণ!
প্রীতি-গীতি গাও তুমি হেথা বারে বার।

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

মোহেন্-জো-দড়ো

গত দুই বৎসর ধরিয়া মোহেন্-জো-দড়ো নামক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খনন করিয়া ভারতের অতি প্রাচীন কীর্ত্তির যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণকে জানাইবার জন্য সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সার জন মার্শেল ৭ই মার্চ্চ তারিখের সাপ্তাহিক "টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া" এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ও ৬ই মার্চ্চ তারিখের "ইলাষ্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ" নামক পত্রে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের জন্য তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ হারগ্রীব্স বেলুচিস্থানের পূর্ব্বাংশে ঝালাবান জিলায় নাল নামক স্থানে, রায় বাহাদুর লালা দয়ারাম সাহনী পঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মোহেন্-জো-দড়োতে খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই তিন জন পণ্ডিত যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিন্ধুনদের উভয় তীরে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রাচীন জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এই সভ্যতা এককালে পশ্চিমে বেলুচিস্থান ও পূর্ব্বে রাজপুতানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্জাবে হরপ্পা, সিন্ধুদেশে মোহেন্-জো-দড়ো ও বেলুচিস্থানের নালে যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় একই রকমের। সার জন মার্শেল মনে করেন যে, বেলুচিস্থানে এই প্রাচীন সভ্যতার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কারণ, এই দেশটি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে বাবিলন যাইবার পথ ছিল।

মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত ইষ্টক-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট রাজপথের নর্দ্দমা

মোহেন্-জো-দড়ো নগরে যে সমস্ত ঘর-বাড়ী পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই ইটের তৈয়ারী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মন্দির; কিন্তু অবশিষ্টগুলি মানুষের বাসের বাড়ী বা দোকান। প্রত্যেক বাড়ীতে বড় বড় ঘর, স্নান করিবার যায়গা ও কূয়া আছে। প্রত্যেক বাড়ী হইতে জল বাহির হইবার জন্য ছোট ছোট নর্দ্দমা বাহির হইয়া রাস্তায় বড় নর্দ্দমায় পড়িয়াছে। একটি ছবিতে দেওয়ালের গায়ে কাটা উপর হইতে রাস্তার নর্দ্দমায় জল পড়িবার একটি নালী দেখা যাইতেছে। এই নালীর নীচে যে খোলা নর্দ্দমাটি রহিয়াছে, তাহা রাস্তার নর্দ্দমা। আর একটি ছবিতে ইট দিয়া তৈয়ারী এবং ইট দিয়া ঢাকা একটি বড় রাস্তার নর্দ্দমা দেখা যাইতেছে। এই নর্দ্দমার বামদিকে রাস্তার ধারের বাড়ীর দেয়াল দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক রাস্তা ও প্রত্যেক গলিতে এইরূপ নর্দ্দমা পাওয়া

মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত প্রাচীন যুগের ইষ্টকনির্ম্মিত নর্দ্দমা

গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বড় বাড়ীতেই এক একটি ছোট বা বড় কূয়া আছে এবং এই কূয়ার ধারে স্নান করিবার ও কাপড় কাচিবার জন্য ইট দিয়া বাঁধান একটি ঘর বা রোয়াক আছে। অন্য এক ছবিতে এইরূপ একটি বড় বাড়ীর কূয়া ও স্নানের ঘর দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে সার জন মার্শেল স্বয়ং মোহেন্-জো-দড়োতে খনন করিয়াছিলেন এবং এই বৎসর অনেক নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোক দেখিতে কেমন ছিল, তাহা একটি শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই মূর্ত্তিটির কেবল উপরের অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে। লোকটির লম্বা দাড়ি ছিল, তাহার চুলের উপরে একটি ফিতা বাঁধা এবং সেই ফিতায় কপালের উপরে একটি গোল চাকা আছে। লোকটির বাম হাতে এইরূপ একটি ফিতা বা ধাতুর তাগার উপরে একটি গোল চাকা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটির গায়ে কাষকরা গায়ের কাপড় আছে। কাপড়ের উপরে কেবল তিনটি গোল পাতা জোড়া আমাদের শাক্তদের ত্রিপত্রের মত নক্সা আছে। মূর্ত্তিটি বেলে পাথরের তৈয়ারী; কিন্তু ইহার উপরে ক্ষোদাই করা চুণের লেপের মত একটা বজ্রলেপ আছে। সার জন মার্শেল অনুমান করেন যে, এই মূর্ত্তিটি আন্দাজ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তৈয়ারী হইয়াছিল। মূর্ত্তিটির চোখ ঝিনুক দিয়া তৈয়ারী। মানুষটিকে দেখিলে এখনকার সময়ের খিবা ও

মোহেন্-জো-দড়োতে কূপসমন্বিত স্নানাগার

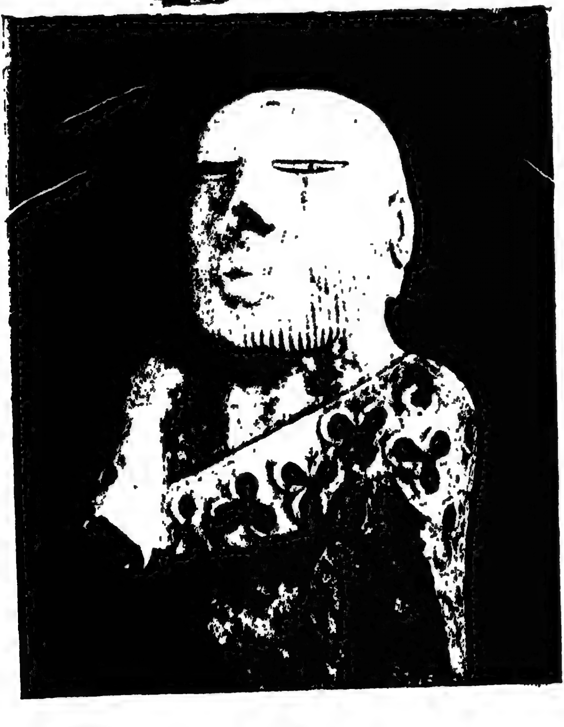

সিন্ধুপ্রদেশে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি

বোখারার লোকের মত বলিয়া বোধ হয়। আর এক ছবিতে মূর্ত্তির সম্মুখের দৃশ্য এবং অন্যত্র পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোক কেমন অলঙ্কার পরিত, তাহার অনেক নমুনা পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি অলঙ্কার একটি বাড়ীর মেঝের তলায় একটি তামার হাঁড়িতে পূরিয়া রাখা হইয়াছিল।

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত ভারতীয় সুমেরীয় যুগের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্ব-দৃশ্য

এই হাঁড়িটা যেরূপ অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা একটি ছবিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বড় বড় প্রবালের কাঁঠি চামড়ার সূতায় গাঁথিয়া গোড়ায় ও শেষে এবং মাঝখানে ছয়খানি সোনার থামি দিয়া যে ছয়নর তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা একখানি ছবিতে দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের মহিলারা এইরূপ মুক্তার বা সোনার পাঁচনর বা সাতনর পরিতেন।

মোহেন্-জো-দড়ো—কক্ষতলে প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত রত্নাধার

অপর ছবিতে সোনার মাদুলী ও সোনার বড় মোটা সূচ দেখা যাইতেছে। সার জন মার্শেল অনুমান করেন যে, এই সকল সোনার সূচ দিয়া জাল তৈয়ারী হইত। সে কালের রূপার বালা ও কানের অলঙ্কারযুক্ত একখানি ছবি প্রদত্ত হইল।

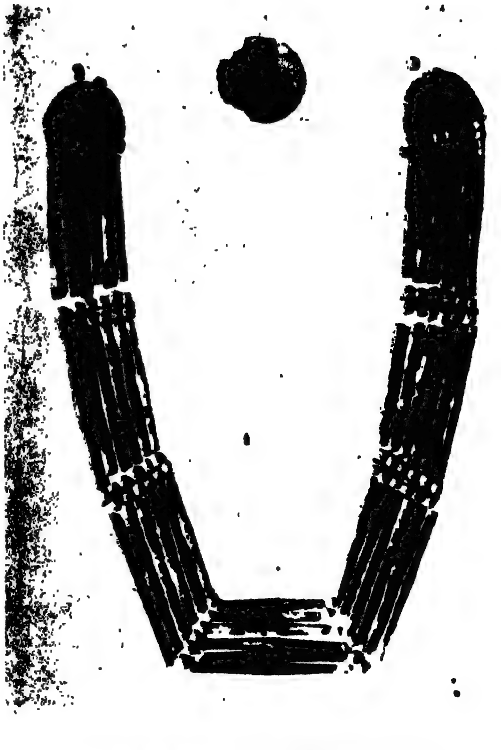

মোহেন্-জো-দড়ো—প্রবাল-কাঠি-নির্ম্মিত ছয়নর

মোহেন্-জো-দড়োতে এ পর্য্যন্ত লোহার তৈয়ারী কোন জিনিষ আবিষ্কৃত হয় নাই। অস্ত্র-শস্ত্র বা ধাতুর পাত্র সমস্তই তামার তৈয়ারী। মিঃ হারগ্রীবস্ নালে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র পাইয়াছেন, তাহাও তামার তৈয়ারী। আর একখানি ছবিতে মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত তামার গামলা, ঘটী ও বাটি এবং করাত ও নল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভিন্ন ছবিতে মিঃ হারগ্রীবস্ কর্ত্তৃক নালে আবিষ্কৃত

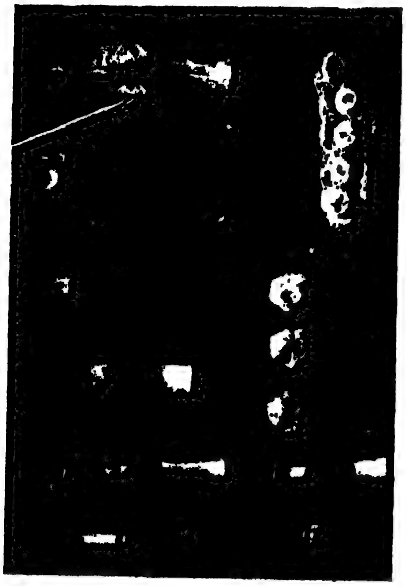

মোহেন্-জো-দড়ো—স্বর্ণনির্ম্মিত স্থচ প্রভৃতি

মোহেন্-জো-দড়ো—স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় ও কর্ণাভরণ

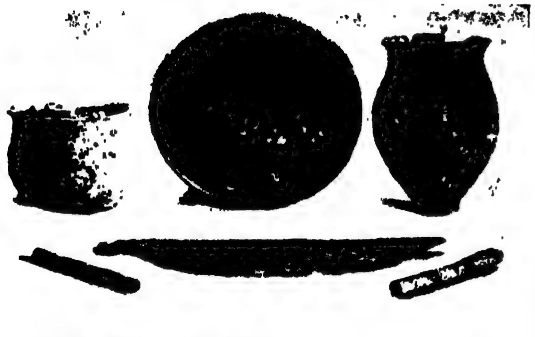

মোহেন্-জো-দড়ো—তাম্রনির্ম্মিত করাত ও অন্যান্য পাত্র

নাল—তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রসমূহ

মোহেন্-জো-দড়ো সমাধি-ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত অস্থিপূর্ণ মৃৎপাত্রসমূহ

তামার বর্শার ফলক, ছুরি, বাটালী, কুড়াল ও ছেনী দেখিতে পাওয়া যাইবে। নালের সমস্ত ধাতুর অস্ত্র কবরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধার

সে কালের সিন্ধুদেশের লোকরা দুই রকমে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত। ইটের কবর তৈয়ারী করিয়া হয় সমস্ত দেহটিকে পুতিয়া ফেলা হইত, না হয় মৃতদেহ ভস্ম করিয়া পরে একখানি বা দুইখানি হাড় একটি মাটীর পাত্রে রাখা হইত। পরে এই-রূপ ছোট অনেকগুলি মাটীর পাত্র একসঙ্গে একটি জালার মধ্যে রাখিয়া মাটীতে পুতিয়া ফেলা হইত। একখানি ছবিতে এইরূপ একটি বড় জালা ও তাহার ভিতরের টুকরা টুকরা হাড় পুতিবার ছোট ছোট মাটীর ভাঁড় দেখা যাইতেছে। এই জালাটি ১৯২৪—২৫ খৃষ্টাব্দে মোহেন্-জো-দড়োতে শ্রীযুত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মিঃ হারগ্রীবস্ নালে ছোট বড় অনেক মাটীর ভাঁড়ে এই জাতীয় সমাধি পাইয়াছেন। অপর এক ছবিতে নালের আবিষ্কৃত মৃৎভাণ্ডের সমাধি দেখা যাইতেছে। রায় বাহাদুর লালা দয়ারাম সাহ্নী হরপ্পা গ্রামে একটি ইটের কবর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কবরটি দেখিতে এখনকার বৈষ্ণব মোহান্ত অথবা দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের সমাধির মত। আর একখানি ছবিতে এই ইটের কবরটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ১৯২২—২৩ খৃষ্টাব্দে মোহেন্-জো-দড়ো প্রথম খননকালে আমি এইরূপ একটি ইটের কবরে একটি বালিকার মৃতদেহ পাইয়াছিলাম। মিঃ হারগ্রীবস্ নালে এই জাতীয় একটি বড় কবর পাইয়াছেন। এই কবরে মৃতদেহটিকে বামদিকে কাৎ করিয়া শোয়ান হইয়াছিল। অন্য ছবিতে এই কবর ও মৃতদেহের সমাধি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হরাপ্পায় আবিষ্কৃত ইষ্টক-নির্ম্মিত সমাধি-মন্দির

মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা ও নালে যে সমস্ত পুরাকালের সভ্যতার নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রকারের চিত্রিত মৃৎভাণ্ড বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় মৃৎভাণ্ড রায় বাহাদুর লালা দয়ারাম সাহনী সর্ব্বপ্রথমে হরপ্পা নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মফলার নামক এক জন ইংরাজ বেলুচিস্থানের নানা স্থানে এই জাতীয় অনেক চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কার করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছিলেন। ১৯২২—২৩ খৃষ্টাব্দে আমি ও ১৯২৩—২৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মাধো স্বরূপ ভট্ট মোহেন্-জো-দড়োতে অনেক চিত্রিত মৃৎভাণ্ডের টুকরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে শ্রীযুত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত ও সার জন মার্শেল মোহেন্-জো-দড়োতে এবং মিঃ হারগ্রীবস্ নালে বহু অখণ্ড চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই নালগ্রামে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে অনেক চিত্রিত মৃৎভাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সার জন মার্শেল প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিঃ হারগ্রীবস্ নালে অনেক চিত্রিত মৃৎভাণ্ড পাইয়াছেন।

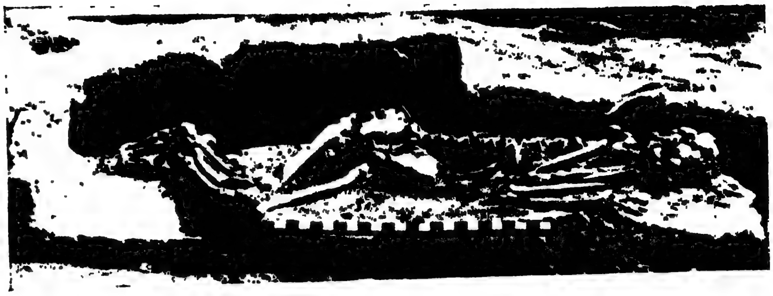
নালএ প্রাপ্ত নরকঙ্কাল

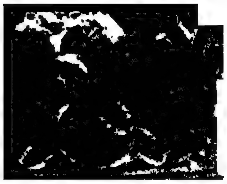

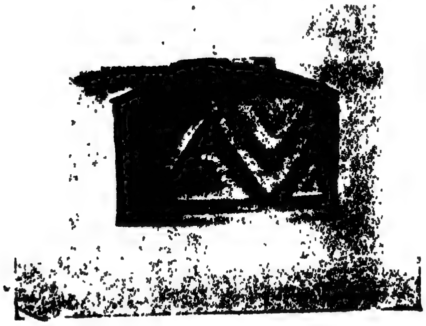
নালএর সমাধি-ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত কারুকার্য্য-খচিত মৃন্ময় আধার

নালএর সমাধিক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত আধার

নালএ প্রাপ্ত আধুনিক আকারের মৃন্ময় পাত্র

একখানি ছবিতে যে চারিটি মৃৎভাণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সাবেককালের ভুষাকালির দোয়াতের মত। অপর এক ছবিতে যে ছুইটি বড় বাটি দেখা যাইতেছে, সেইরূপ ধাতুর বা পাথরের বাটি বা যোড়া এখনও সিন্ধুদেশে ব্যবহৃত হয়। এই সকল চিত্রিত মৃৎভাণ্ডে অনেক জীবজন্তুর ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। অপর এক ছবিতে একসারি মাছের ও অপর ছবিতে একটি বৃষের মুখের ছবি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

নালএ প্রাপ্ত মৎস্যাঙ্কিত মৃৎপাত্র

সেকালের ভারতবর্ষের লোক শীলমোহর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিত। ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষার প্রচার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিঠিপত্র বা হিসাবে সাবেক কালের লোক সহি না করিয়া শীলমোহর করিয়া দিত। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজের রাজত্বের প্রথম ভাগে লবণ বিভাগের এক অশিক্ষিত মুসলমান কর্ম্মচারী সরকারী রিপোর্টে সহি করিতে না পারিয়া নিজের শীলমোহর লাগাইয়া দিতেন। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে শত শত শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত শীলমোহর পাথরের, কাচের গুঁড়া মিশ্রিত একপ্রকার লেপের অথবা হস্তিদন্তের। অধিকাংশ শীল-মোহরে একটি জীবের মূর্ত্তি এবং সেকালের অক্ষরে লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ছবিতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শীল-মোহরে একটি গাছ ও চারিপ্রকার জীবের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শীল-মোহরটিতে একটি হস্তী, তৃতীয়টিতে একটি বৃষ, চতুর্থটিতে ব্যাঘ্র এবং পঞ্চমটিতে খড়্গী বা গণ্ডারের চিত্র আছে। দ্বিতীয় শীল-মোহরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ছুই দিকে ছুইটি শৃঙ্গযুক্ত সাপের মাথা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৪—২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মোহেন্-জো-দড়োতে যে ১ শত ৪৬টি শীল-মোহর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই পাঁচটি বাছিয়া লইয়া সার জন মার্শেল বর্ত্তমান বৎসরের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "ইলাষ্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

নালএ প্রাপ্ত ষণ্ডমুখাঙ্কিত মৃৎপাত্র, মৃন্ময় ও তাম্র-নির্ম্মিত বাটালী

নালে প্রাপ্ত—মাথার খুলি ও বড় বড় হাড়ের অংশপূর্ণ কবর

উক্ত পত্রিকার ৭ই মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পাদটীকায় সার জন মার্শেল জানাইতেছেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে মোহেন্-জো-দড়োতে অনেক নূতন নূতন

বেলুচিস্তানের নাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত কঙ্কাল

জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাচের গুঁড়া-মিশ্রিত বজ্রলেপে তৈয়ারী একটি দেবমূর্ত্তি ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবতা ধ্যানাসনে সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রত্যেক দিকে একটি নতজানু সেবক ও নাগমূর্ত্তি। মূর্ত্তির চালের উপরে সেকালের অক্ষরে লিপি আছে। নীলরঙ্গের কাচের গুঁড়া মাটীর সহিত মিশাইয়া এই মূর্ত্তিটি তৈয়ারী হইয়াছিল। একটি রূপার পাত্রে অনেকগুলি অলঙ্কার এবং গোল ও চতুষ্কোণ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই টাকাগুলি রূপার এবং ইহার একটিতে প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে ব্যবহৃত কীলকাক্ষরে (Cuneiform Script) লেখা আছে। দুইখানি ছবির শ্বেতপাথরের মূর্ত্তির মত আর একটি মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল নবাবিষ্কারের ছবি এখনও ছাপা হয় নাই।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট শীলমোহর

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবতার

আস তুমি আস।
বিশ্বমানবে, তারিতে দেবতা
কারণ-সলিলে আপনি ভাস॥

ওগো মায়াধীশ, আপন মায়ায়,
জীব-হিততরে বাঁধ আপনায়,
সুখ-দুঃখ এই ব্যাধি-জরা-জরা,
ভুবনে আসিতে ভাল যে বাস॥

ওগো শাশ্বত, হে চিরন্তন,
হয়ে আস তুমি শান্ত নূতন
হে বিশাল তব, স্বল্পতা হেরি,
আপন করমে আপনি হাস॥

হে চির-মুক্ত, বাঁধি আপনারে,
খুলিবার পথ দেখাও সবারে
তাহাদের মত রোগে-শোকে ভোগি—
আপন মরমে আপনি নাশ॥

স্বামী অসীমানন্দ।

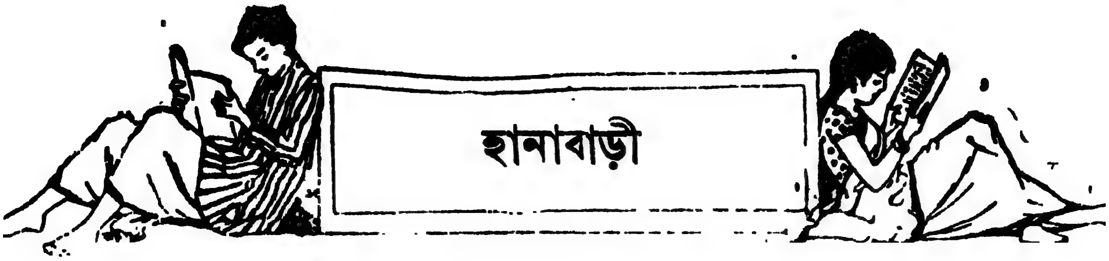

হানাবাড়ী

২৪

পরদিন এক মুসলমান-পর্ব্বোপলক্ষে কোর্টের ছুটী ছিল। সকালে কয়েকটি মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তা সারিয়া, যখন চেম্বার ছাড়িয়া উঠিলাম, তখনও নয়টা বাজে নাই। হাতে যথেষ্ট সময় আছে দেখিয়া, সেই পাড়ের ফিতাটা কিরূপে হানাবাড়ীতে গিয়া স্থান পাইল, তাহা নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্বরাত্রি হইতে ঐ বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিয়াও প্রাচীর-সংলগ্ন ছোট ঘরের মধ্যে সেই গাছ-সিন্দুকের পশ্চাতে ফিতাটার অবস্থিতির কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ অনুমান করিতে পারি নাই। আজ সেই জন্য প্রথমেই সেই ঘরে উপস্থিত হইলাম।

ঘরের প্রবেশদ্বার ব্যতীত তাহার আর অপর কোন দ্বার বা জানালা ছিল না বলিয়া তন্মধ্যে আলো প্রবেশের সুবিধার জন্য ছাদের উপর একটা কাচ-মণ্ডিত আলোক-পথ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উহা পরিসরে নিতান্ত ছোট নহে। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া ও প্রায় সেই পরিমাণ উচ্চ। কিন্তু উহা দ্বারা ঘরে আলো যথেষ্ট প্রবেশ করিলেও বায়ুপ্রবেশের কোন উপায় দেখিলাম না। কারণ, নীচে হইতে যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে দেখিলাম যে, ঐ আলোক-পথের শার্শীগুলা শুধু যে চৌকাঠের গায়ে আঁটা আছে, তাহা নহে, উহার বহির্ভাগে চারিদিকেই লোহার গরাদেও দেওয়া আছে। কাযেই শার্শীগুলার কোনটাই খুলিবার কোন উপায় নাই বলিয়া বোধ হইল।

ঘরের ভিতরের সেই বৃহৎ গাছ-সিন্দুকটা এই আলোক-পথের দক্ষিণ প্রান্তের ঠিক নীচেই অবস্থিত এবং সিন্দুকের পশ্চাদ্দিক্ হইতে সে দিকের দেওয়ালের মধ্যে ব্যবধান খুব সামান্যই। সিন্দুকটা উচ্চে প্রায় ৮ ফুট। তাহার সম্মুখভাগের নিম্নাংশে একটা সমচতুকোণ কপাট আছে এবং উহা ব্যতীত মাথার উপর একটা ডালাও আছে; কিন্তু তাহা ছাড়া সিন্দুকটার অন্য কোন দিকে আর কপাট নাই। দেখিলে বোধ হয় যে, উহা শস্যাদি রাখিবার আধাররূপে ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত। উপরের ডালা উঠাইয়া, তথা হইতে শস্য ঢালিয়া সিন্দুক পূর্ণ হইলে ডালা বন্ধ করিয়া নীচের ছোট কপাটের সাহায্যে ইচ্ছামত শস্য বাহির করা বেশ সহজ-সাধ্য। শস্য ঢালিবার জন্য উপরে উঠিবার অভিপ্রায়ে, সিন্দুকের এক দিকে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত তাহার গাত্র-লগ্ন ও স্বচ্ছন্দে পদস্থাপনের উপযোগী কয়েকটা খুব মোটা লোহার 'হাতল' আছে।

জিনিষটা সকল দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, পুরাতন হইলেও উহার অবস্থা বেশ ভালই রহিয়াছে। নীচের ছোট কপাটটা খুলিয়া দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলা খালি বস্তা ছাড়া অন্য কিছু নাই। শস্যাধাররূপে উহার ব্যবহার অনেক কাল হয় নাই বোধ হইল। উপরের ডালা খুলিয়া আরও একটু ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে পার্শ্বলগ্ন হাতলগুলার সাহায্যে বেশ অনায়াসে উপরে উঠিলাম। সেখানে দেখিলাম, ডালার প্রথম অর্দ্ধাংশ সিন্দুকের সহিত একবারে আঁটা এবং বাকী অর্দ্ধাংশ সিন্দুকের গায়ে কব্জা দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং শুধু সেই অংশটাই খোলা যায়। আমি আঁটা অংশের উপর দাঁড়াইয়া অপর অংশটাকে টানিয়া তুলিলাম এবং ভিতরে বাস্তবিকই অন্য কোন সামগ্রী নাই দেখিয়া ডালাটা আবার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখানে আমার সম্পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে কোনই ব্যাঘাত হইল না। কেন না, সিন্দুকের মাথা হইতে ঘরের ছাদের মধ্যে দুই হাতমাত্র ব্যবধান থাকিলেও তথা হইতে আলোক-পথের ছাদটা প্রায় আরও দুই হাত উর্দ্ধে থাকায়, উহা আমার মাথা হইতেও কিঞ্চিৎ উপরে রহিল; এবং ইহাতে শার্শীগুলাকে নিকট হইতে পরীক্ষা করিবার পক্ষে আমার বেশ সুবিধাই হইল। দেখিলাম, নীচে হইতে শার্শীগুলা চৌকাঠের সহিত যেরূপ সম্পূর্ণ

সংলগ্ন বোধ হইয়াছিল; তিন দিকে বাস্তবিক তাহাই বটে ; কিন্তু যে দিকটা ঠিক আমার সম্মুখেই ছিল, সে দিকের শার্শীটা দেখিতে ঠিক অপর দিকেরই মত বোধ হইলেও উহার চারি পাশের চৌকাঠের গায়ে সমরেখায় একটা জোড়ের ন্যায় দাগ রহিয়াছে। দেখিয়া অনুমান হইল যে, ভিতর হইতে ঠেলিলে শার্শীখানা সমস্তই বাহিরে অর্থাৎ ছাদের দিকে খুলিয়া যাইতে পারে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহা ঠেলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম দুই একবার অকৃতকার্য্য হইয়া পরে কয়েকবার সবলে ধাক্কা দিতেই শার্শীটার বাহিরের গরাদেগুলা সমেত খুলিয়া ছাদের দিকে ঘুরিয়া গেল। তখন সেই পথ দিয়া সহজেই ঘরের ছাদের উপরে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সে দিক্ হইতে দেখিলাম যে, দুইখানা মোটা কব্জা দ্বারা উহা এক পাশের চৌকাঠের বাকী অংশের সহিত সংলগ্ন। ছাদের দিক্ হইতে উহা টানিয়া খুলিবার জন্য উহার গায়ে একটা ছোট লোহার কড়াও লাগানো আছে।

২৫

উপরে উঠিয়া ছাদের দক্ষিণদিকের প্রান্তসীমা হইতে দেখিলাম যে, তাহার প্রায় এক হাত নীচে এবং এই ঘর ও তাহার পার্শ্বস্থ প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন আর একটা ছাদ রহিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে অন্যূন দশ হাত ও প্রস্থে প্রায় চারি হাত হইবে। তাহার উপর নামিয়া দেখিলাম যে, উহা পশ্চাতের বাড়ীর পাইখানার ছাদ। সে বাড়ীর উঠানের পশ্চিম সীমায় একটা প্রাচীর আছে। সেটা ঐ পাইখানার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছে। প্রাচীরের বাহিরের বা পশ্চিমের অংশটা আয়তনে ছোট এবং তাহার প্রবেশদ্বার হইতে কয়েক ধাপ পাকা সিঁড়ি প্রাচীরের বহির্ভাগের গাত্র-লগ্ন হইয়া ভূমিতল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। সেখান হইতে বাড়ীর পশ্চিম ধার দিয়া তাহার সীমান্ত পর্য্যন্ত একটা মেথর খাটিবার সঙ্কীর্ণ পথ আছে এবং সেই পথের শেষ মুখে একটা কপাট ও এ দিকে সিঁড়ির পাশে প্রাচীরের গায়ে আর একটা কপাট আছে। আপাততঃ দুইটা কপাটই অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে দেখিলাম।

পাইখানার যে অংশটা প্রাচীরের ভিতরদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, তাহা অপর অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণেরও বেশী। বোধ হইল, সে অংশে দুইটা ঘর আছে। তাহাতে প্রবেশদ্বারও দুইটা এবং তাহার সম্মুখে একটা অনতিপ্রশস্ত দালান বা রোয়াক। রোয়াকের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পাকা সিঁড়ি নামিয়া উঠানের সহিত মিশিয়াছে ও তাহার পশ্চিমদিকে প্রাচীরের গাত্রলগ্ন একটা কাঠের সিঁড়ি পাইখানার ছাদ পর্য্যন্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। এই কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠান হইতে ছাদে উঠা ত [illegible]-সাধ্য বটেই, তাহা ছাড়া পাইখানার যে অংশ পাঁচীলের বাহিরে অবস্থিত, তাহার সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইতে পাঁচীলের মাথায় উঠিয়া তথা হইতে আবার কাঠের সিঁড়ি দিয়া ছাদে আসাও যে বিশেষ দুরূহ ব্যাপার, তাহা মনে হইল না।

এই সব দেখিয়া বেশ বুঝা গেল যে, ইচ্ছা করিলে ও-বাড়ীর কোন লোক ঐ উপায়ে পাইখানার ছাদে উঠিয়া পরে হানাবাড়ীর ছাদের আলোক-পথের ভিতর দিয়া গাছ-সিন্দুকের সাহায্যে অনায়াসে বাড়ীর ভিতরে যাইতে পারে। হানাবাড়ীর লোকও ঐরূপে ও-বাড়ীতে যাইতে অথবা সেই সঙ্কীর্ণ পথে নামিয়া একেবারে সদর রাস্তায় উপস্থিত হইতেও পারে। তাহা ছাড়া, বাহিরের কোন লোকও যদি কোনক্রমে ঐ পথটার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে হানাবাড়ীর ভিতরে যাওয়া কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নহে।

কিন্তু আর অধিকক্ষণ এরূপে পাইখানার ছাদে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করা সমীচীন বোধ হইল না। অপরাপর বাড়ীর কেহ কেহ আমার এইরূপ আচরণে কৌতূহলী হইয়া ক্রমে আমার প্রতি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেও আরম্ভ করিতেছিল। কাযেই আমি তখন সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় গাছ-সিন্দুকের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তথা হইতে নীচে নামিবার পূর্ব্বে আর একবার চতুর্দ্দিক্ ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিলাম যে, সিন্দুকের মাথার পশ্চাদ্দিকের দুই কোণে ও মধ্যস্থলে একটা করিয়া লোহার গোলাকার আংটা বা কড়া লাগানো আছে এবং দেওয়ালে প্রোথিত তিনটা সূক্ষ্মাগ্র গজাল বা হুকের সহিত ঐ কড়াগুলা সংলগ্ন আছে। আরও দেখিলাম যে, মাঝের গজালের সূক্ষ্মাগ্রভাগে সংবদ্ধ হইয়া একখানি মলিন বস্ত্রখণ্ড সিন্দুকের পশ্চাদ্দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। কাপড়ের খণ্ডটুকু গজালের

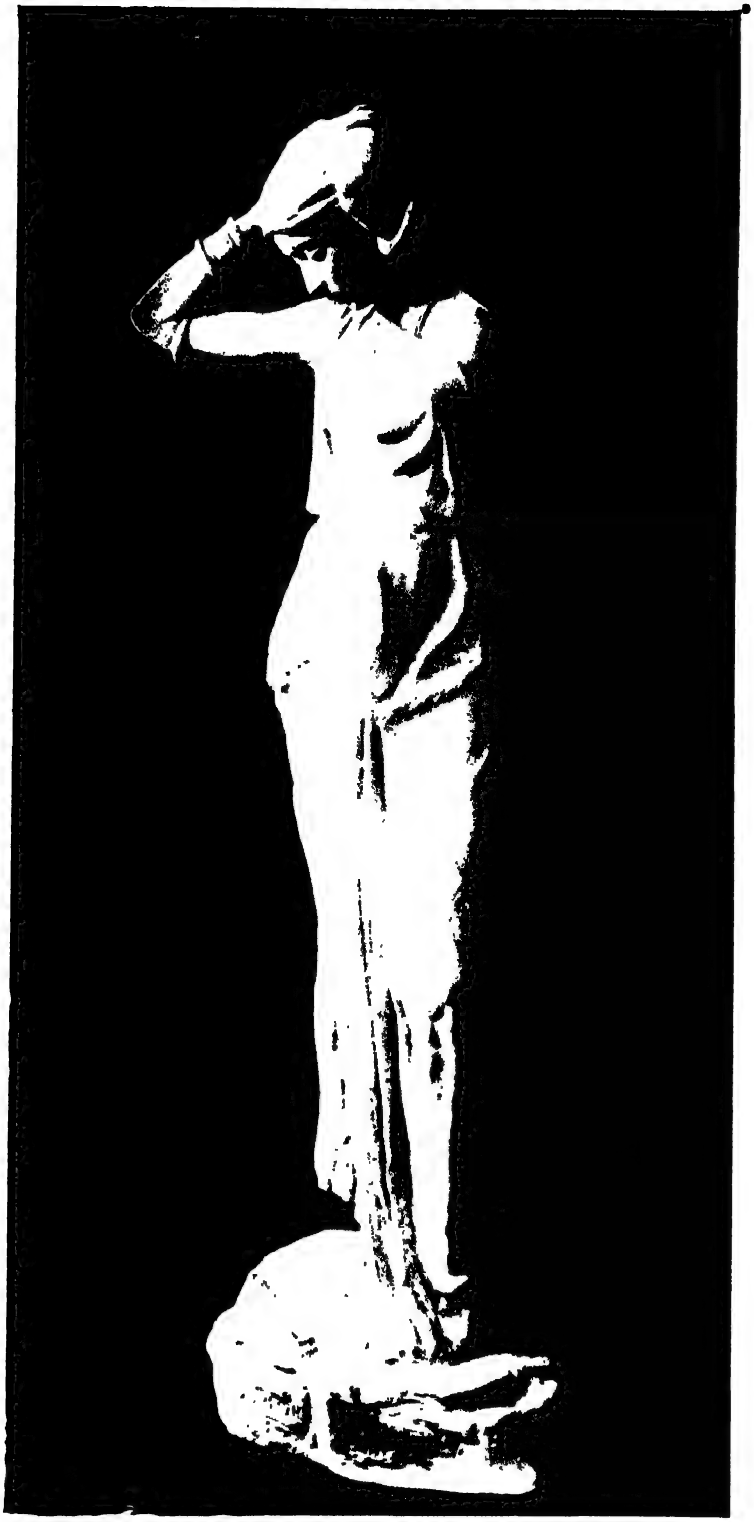

পল্লী-শ্রী

['ভাস্কর— শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

মুখ হইতে মুক্ত করিয়া দেখিলাম যে, উহা একটা ঢাকাই সাড়ীর পাড় সমেত খানিকটা বস্ত্রাংশ এবং তাহার সহিত একটা 'বুটিদার' লেসেরও একটু ছিন্নাংশ জড়িত আছে। লেসের খণ্ডটুকু কোন রমণীর 'পেটিকোটের' নিম্নভাগের পাড়ের টুকরা বলিয়া অনুমান হইল এবং দুইটা টুকরা একত্র করিয়া পরীক্ষা করাতে বুঝিলাম যে, ঐ পেটিকোট ও সাড়ী-পরিহিতা রমণী আলোকপথের ভিতর দিয়া ছাদে উঠিয়াছিল ও সেই সময় অনবধানতা বশতঃ তাহার বস্ত্রের নিম্নভাগ কোনরূপে ঐ গজালের মুখে জড়াইয়া গিয়াছিল এবং পরে উপরের টানে ছিঁড়িয়া গিয়া ছিন্নাংশগুলা এইখানেই আট্‌কাইয়া রহিয়াছে।

বলা বোধ হয় বাহুল্য যে, আমি ঐ দুইখানি বস্ত্রখণ্ড সযত্নে ধূলিমুক্ত করিয়া পকেটস্থ করিলাম। তৎপরে সেখানে আর দ্রষ্টব্য কিছু না থাকায় সিন্দুকের মাথা হইতে নীচে নামিয়া হানাবাড়ী হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরিদর্শনের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক পিসীমাকে বলিয়া যখন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দুইটুকু তাঁহাকে দেখাইলাম, তখন তিনিও ঐগুলার সম্বন্ধে আমার অনুমানই সমর্থন করিলেন।

পরদিন কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া যোগীন বাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভোজালীটা সেখানকার বাড়ীতে অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই। হানাবাড়ীতে প্রাপ্ত পাড়ের টুকরাটা বুড়ীর বর্দ্ধমানে সঞ্চিত অপর টুকরার সহিত মিলান করায় সাব্যস্ত হইয়াছে যে, দুইটাই ঠিক একই পাড়ের টুকরা। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, সেখানকার বাড়ী পরিষ্কার করা প্রায় শেষ হইয়াছে; অতএব তাঁহাদের সকলেরই অনুরোধ যে, আগামী কাল (শনিবার) পিসীমা ও ছেলেদের সকলকে লইয়া আমি যেন সেখানে যাইতে কোনমতে অন্যথা না করি।

পরে পিসীমার কাছে শুনিলাম যে, তিনিও যোগীন বাবুর স্ত্রীর এবং কাকলীর নিকট হইতে ঐ মর্ম্মের চিঠি পাইয়াছেন এবং আগামী কল্য কোর্টে আমার কোন কায নাই শুনিয়া তিনি তখনই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, কাল সকালের গাড়ীতেই আমরা সকলে বর্দ্ধমানে যাইয়া রবিবার বৈকালের কোন গাড়ীতে ফিরিয়া আসিব। তৎপরে তিনি যাইবার আয়োজন করিতে লাগিয়া গেলেন।

২৬

হানাবাড়ীর চাবিটা বাড়ীওয়ালাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। চাবি পাইয়া তিনি ঐ বাড়ীর একটি ভাড়াটে যোগাড় করিয়া দিবার জন্য আমাকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। কথায় কথায় তাঁহার নিকট ও-বাড়ীর পশ্চাতের বাড়ীটার কথা পাড়িয়া জানিলাম যে, সেটাও তাঁহারই সম্পত্তি। বাড়ীর নম্বর ৩৩ এবং যে রাস্তার উপর উহা অবস্থিত, তাহার নাম কানাই মল্লিক লেন। বাড়ীটা বেশ বড়। শরৎ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি উহা কয়েক বৎসরের ইজারা লইয়া নিজের প্রয়োজনীয় ঘর বাদে বাড়ীর বাকী অংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাকে ভাড়া দিয়াছে। গোঁসাইজী বেশ নিয়মিত ভাড়া দেয়, তজ্জন্য বাড়ীওয়ালা মহাশয় তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেও বলিলেন, "তা দেবে না কেন? ওকে ত এক পয়সাও নিজের ঘর থেকে দিতে হয় না, ওর ভাড়াটেদের কাছ থেকে যা পায়, তাতে ওর নিজের দুটো ঘরের ভাড়া শুদ্ধ পুষিয়ে বরং দুপয়সা লাভ থাকে! বামুনে বরাৎ কি না!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কিন্তু মাঝে মাঝে ঘর ত খালিও পড়ে? তবুও কি লাভ থাকে?"

"আরে না না! খালি ত প্রায় পড়েই না; আর যদিই বা কখনও পড়ে, ত সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন ভাড়াটে জুটে যায়। এই দেখুন না কেন, সেবার সরস্বতী-পূজার সময় ও-বাড়ীর নীচের দুটো ঘরের ভাড়াটে হঠাৎ চ'লে গেল; কিন্তু মাস না পোহাতে পোহাতেই আবার আগের চেয়ে বেশী ভাড়ায় ঘর দুটো বিলি হয়ে গেল। বরাৎ! বরাৎ!"

সরস্বতীপূজার উল্লেখ শুনিয়াই কথাটার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কারণ, পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, হানাবাড়ীর হত্যাকাণ্ডটা ঐ পূজার পূর্ব্বরাত্রিতে ঘটিয়াছিল। সেই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ চ'লে গেল কেন?"

"তা জানি না, মশায়। শুনেছি, লোকটা নাকি টুলো পণ্ডিত; শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়তো। মাস ছয়েক বুঝি ঐ ঘর দুটো ভাড়া নিয়েছিল। হাঁ,—তাই বটে;—আমার ঐ পোড়াকপালে ১০নং বাড়ীটা যখন নন্দন-বুড়ো ভাড়া নিলে,

তার কিছু দিন বাদেই ঐ পণ্ডিত ও-বাড়ীর ঘর ছুটো নিয়েছিল।”

“পণ্ডিতের নাম কি?”

“কে জানে, মশায়! গোঁসাইজীর ভাড়াটেদের অত খোঁজ রাখবার আমার কি দরকার বলুন? আমায় ত তারা আলাদা কিছু ভাড়া দেয় না!—কেন বলুন দেখি? আপনার কিছু দরকার আছে না কি?”

“নাঃ! এমন কিছু নয়। তবে অনেক দিন থেকে আমার একটু সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আছে, তাই লোকটা পণ্ডিত শুনে জিজ্ঞাসা করছিলাম।”

আর কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর আমি সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া কানাই মল্লিক লেনের ৩৯ নং বাড়ীটা একবার বাহির হইতে দেখিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটা দ্বিতল; বাহির হইতে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। পশ্চিমদিকের সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথের মুখের দরজাটা ঠেলিয়া দেখিলাম যে, তাহা ভিতর হইতে বন্ধই আছে। তাহার ঠিক পাশের যে ঘরটা রাস্তার উপর, তাহার জানালা খোলা ছিল ও ভিতরে একটা আলো জ্বলিতেছিল। পথের উপর ধীরে ধীরে পাদচারণা করিবার ছলে ঘরের ভিতরে লক্ষ্য করিয়া যত দূর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে অনুমান হইল যে, ঘরটার পশ্চিম দেওয়ালে একটা কপাট আছে; বোধ হয়, উহা দ্বারা ঐ গলিতে যাতায়াত চলিতে পারে।

বাহির হইতে আর কিছু দেখিতে না পাইয়া সদর দরজায় গিয়া গোঁসাইজীর অনুসন্ধান করায় জানিলাম, তিনি নবদ্বীপ গিয়াছেন; দিন দুই পরে আসিবেন। তখন আর অধিক কিছু করিবার না থাকায় আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন পিসীমা ও তাঁহার দুই পুত্র ও কন্যাকে লইয়া আমি সকালের প্রথম ট্রেণেই বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১০টায় “নন্দন-কুঞ্জে” উপনীত হইলাম। বাড়ীর সকলেই আমাদিগকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন।

“নন্দন-কুঞ্জ” অতি বিস্তৃত ও মনোরম এক বাগানের মধ্যে সুন্দর ও সুসজ্জিত একটি দ্বিতল বাটী। দুইটি বেশ বড় পুষ্করিণী ও নানাবিধ ফল-ফুলের গাছে বাগানটি সুশোভিত। যাঁহার পরিকল্পনা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সুরুচির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাড়ী ও বাগানের সর্ব্বত্র বেড়াইয়া দেখা শেষ হইলে সকলে স্নানাহার ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে যোগীন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং কাকলী, পিসীমা ও আমি একত্র বসিয়া আমার ও কাকলীর স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ফলাফল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমি হানাবাড়ী ও তাহার পশ্চাতের বাড়ী পরিদর্শন করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, সমস্ত বিশদরূপে বিবৃত করিয়া অবশেষে সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ও লেসের টুকরা অপর সকলকে দেখাইলাম। কাকলী তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, ওগুলা তাহার বিমাতার বস্ত্রেরই ছিন্নাংশ হওয়া সম্ভব। কেন না, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে, অধিকাংশ সময় তিনি ঢাকাই সাড়ীই ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার সব ‘পেটিকোট’গুলাতেই লেসের পাড় বসানো। তাহা ছাড়া, ঠিক এই রকম ‘বুটিদার’ লেসের পাড়, তাঁহার কয়েকটা পেটিকোটে কাকলী দেখিয়াছে। তৎপরে হানাবাড়ীতে প্রাপ্ত সেই নীল মখমলের উপর জরির কায করা পাড়ের ফিতার টুকরাটা কাকলীর নিজের কাছে রক্ষিত সেইরূপ অপর টুকরার সহিত মিলান করিয়া বেশ নিঃসন্দেহে দেখা গেল যে দুইটা টুকরাই একই পাড়ের অংশ। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।

বসন্ত-রাণী

হঠাৎ উঠিনু জাগি, কাহার পরশে
কুটীর ভরিয়া গেছে তাহার হরষে!
জানালার ধারে এসে দেখিলাম চেয়ে,
কে গেল চলিয়া পথ ফুলে ফুলে ছেয়ে!
আঁচল হইতে তার ঝরিয়া ঝরিয়া,
ধরণীতে কত ফুল রয়েছে পড়িয়া।
অমনি আসিল ভাসি কোকিলের তান,
মুকুলে শোভিত হেরি আমের বাগান!
মাধুরী কতই তার নাহি দেখি অন্ত,
সবিস্ময়ে দেখি এ যে রূপসী বসন্ত!

কুমারী বীণাপাণি দেবী।

সংগঠনের সদুপায়

(২)

প্রতীকারের পন্থা-নির্দ্দেশের কথা

উপরে কথিতরূপ কারণপরম্পরায় ভারতবাসী যে আজ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মরণোন্মুখ, ইহাতে বোধ হয়, মতদ্বৈধ হইতেই পারে না। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলনে, অথবা আধ্যাত্মিকতার উন্মেষণে যে উক্ত দুরবস্থার প্রতীকার হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনাতে এমন ত মনে হয় না। দৈহিক ক্ষুধায় কাতর দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর মানসিক ক্ষুধারও এমন সাফল্য লক্ষিত হইতেছে না যে, তাহার খোরাকী যোগাইবার জন্যই মাত্র চেষ্টার প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সহজ ও সরলভাবে এদেশবাসী সাধারণ মানুষগুলির জন্য কিছু করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইলে, সম্পূর্ণরূপে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে তাহাদের দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে, প্রথমে তাহারই বিধি-ব্যবস্থা করা সবিশেষ প্রয়োজন। স্বভাব হইতে উৎপন্ন মানুষ প্রথমেই স্বভাবের তাগিদের যোগান দিতে বাধ্য ; তাহার পর মানুষের কল্পিত সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির তাগিদের যোগান দিবার কথা। স্বভাবের তাগিদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আহার্য্য ও পানীয়, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী আচ্ছাদন, রোগে-ভোগে ঔষধ পথ্য—এ সব যোগান প্রথমে মানুষকে যোগাইতেই হইবে ; কারণ, ইহা স্বভাবের অনুশাসন—এড়াইবার বা সময়ের অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। এই অপরিহার্য্য স্বাভাবিক তাগিদের যোগানপথ বিঘ্নবহুল হওয়াতেই যখন ভারতবাসী মানুষের আজ এইরূপ মারাত্মিকা দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, স্বভাবের নিয়ম ও অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া এদেশবাসীদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কিছু করিতে হইলে, প্রথমে তাহাদের ঐ স্বাভাবিক তাগিদের যোগান দিবার ব্যবস্থাই বিশেষভাবে করিতে হইবে !

তাহা করিতে হইলে প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত রোগের উপসর্গগুলি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর মূলব্যাধি-ধ্বংসের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

উপসর্গসমূহ দূরীভূত করিতে হইলে দেশবাসীকে বর্ত্তমানে প্রচলিত ফড়ে বা দালালদের দোকানদারীর জুয়াখেলার গ্রাস হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী বহু দালাল পরিচালিত পাইকারী প্রণালীর বিকিকিনিটা চিরতরে লোপ পাইয়া তৎস্থলে যাহাতে একটিমাত্র সরবরাহ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সরবরাহ-সমিতি মূল উৎপাদকের বিক্রেয় পণ্য সরাসরিভাবে শেষ ক্রেতার নিকট যথানির্দ্দিষ্ট লাভে বিক্রয় করিবে ; এক কথায় মানুষের জীবন-যাপন জন্য যত সব ক্রেয় পণ্যের প্রয়োজন, তাহার সমস্তেরই যোগান বা সরবরাহের ভার বা দায়িত্ব যথাসম্ভবরূপে এই একমাত্র সরবরাহ সমিতিই গ্রহণ করিবে।

এই যে সরবরাহ-সমিতির কথা বলা হইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় গুরুত্ব ইহার অত্যন্ত অধিক। ইহাকেই মূল ভিত্তিপ্রস্তররূপে পল্লীর বুকে সংস্থাপিত করিয়া সাফল্যের সুবিরাট সৌধকে গড়িয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া একটিমাত্র সরবরাহ-সমিতি-নির্দ্দিষ্ট লাভে যত সব পণ্যের যোগানভার গ্রহণ করিলে, বহু দালালের প্রাপ্য বাট্টা বা কমিশনের উৎপাত কমিয়া গেলে পর আপনা হইতেই দেশবাসীদের প্রয়োজনীয় ক্রেয় পণ্যের মূল্য তাহারা যথাযথরূপে প্রাপ্ত হইবে।

এখন, মানুষের স্বভাব-ধর্ম্মই এই যে, ক্রেয় বস্তুটা যেখানে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইবে, আর নিজের বিক্রেয় বস্তুর মূল্যটাও যেখানে যথাযথরূপে পাইবে, সেখানেই সে আকৃষ্ট হইবে। এ তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না।

বক্তৃতাদি অন্য শত-সহস্ররূপ চেষ্টাতেও যে সর্ব্বসাধারণের সুপ্তপ্রায় স্তব্ধীভূত মনকে জাগ্রত ও আন্দোলনে আকৃষ্ট করিতে পারা যায় না, উক্তরূপ একটিমাত্র বিধানে সাধারণের সেই শিথিল মনই অতি উৎসাহ, আশা ও আগ্রহভরে সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠে। তখন সেই উদ্যমে উদ্বুদ্ধ জাগ্রত মনকে লইয়া কর্ম্মব্রত-সাধনায় লিপ্ত হইলে, সাফল্য স্বর্গের পথ আপনা হইতেই সরল ও সুগম হইয়া আইসে।

মানুষের ক্রেয় পণ্য অল্পমূল্যে যোগাইয়া দিয়া আর বিক্রেয় পণ্য যথাযথমূল্যে যথাকালে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, উপরে কথিত সরবরাহ সমিতি দেশের সর্ব্বসাধারণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়া, পরে তাহাদের নিয়া, দেশ-কাল পাত্রানুরূপ সব কর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করিবে।

সুযোগ, সুবিধা ও সুপরিচালনের অভাবে ভারতের যে অতি বিপুল কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হইয়া উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, অতিশ্রদ্ধা, সম্মান ও সমাদর সহকারে অভিনন্দন করিয়া লইয়া বিশ্বের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যের সুধা সংগ্রহের জন্য আশু তাহাকে মুক্তিদান করিতে হইবে।

বিশ্বের বাজারে অ-কর্ম্মী খরিদ্দাররূপে উপস্থিত হইয়া পরের পণ্য শুধু ক্রয় করিয়াই একটা জাতি চিরকাল ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকিতে পারে না, ক্রয়ের পূর্ব্বেই কিছু বিক্রয় করিয়া ক্রেয় বস্তুর মূল্য প্রথমে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহার পর ক্রয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতেই এদেশবাসীর এই দুর্দ্দশা ; তাই তাহার প্রতীকারের জন্য, ভারতের কর্ম্মক্ষম আবাল-বৃদ্ধবনিতা একজনও যাহাতে সুযোগ ও সুবিধার অভাবে অর্থকরী কর্ম্মব্রত-সাধনে বিরত থাকিতে বাধ্য না হয়, উক্ত সমিতির সহায়তায় বিধিমত তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে কি কি গুরু

অন্তরায়। উহা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া পরে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(১) কার্য্যসাধিনী-শিক্ষা, (২) অটুট স্বাস্থ্য, (৩) যাহা খাইয়া-পরিয়া কর্ম্মীরা কাযকর্ম্ম করিবে, প্রয়োজনীয় সেই প্রাথমিক খোরাক-পোষাক, (৪) উপযুক্ত ক্ষেত্র বা কর্ম্মশালা (৫) বিশেষ বিশেষ শিল্পাদির জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি, (৬) শিল্পের সব যোগ্য উপকরণ ও উপাদান, (৭) যথাযোগ্য পারিশ্রমিক, (৮) উৎপাদিত পণ্যের যথাকালে যথাস্থানে বিনিময়ের সুব্যবস্থা ;—এ দেশবাসীর অর্থ উৎপাদনের পথে, প্রধানতঃ উক্ত অষ্টবিধ বিষয়ের অব্যবস্থা ও অভাবই দারুণ অন্তরায়রূপে বর্ত্তমান। এই অষ্ট অরিষ্ট দূরীভূত করিবার ভার দেশের জননায়ক কর্ম্মকর্ত্তাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

সরবরাহ-সমিতির সংগঠন ও তাহার কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের কথা

উপরে যে সরবরাহ-সমিতির কথা লিখিত হইয়াছে, কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালেই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তাহার সংগঠন ও তাহার করণীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

প্রতি এক হাজার পল্লীবাসী লইয়া এক একটি পল্লী মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে। প্রতি মণ্ডলীতে ভিন্স্থানীয় এক জন করিয়া প্রধান পরিচালক, প্রধান শিক্ষক ও প্রধান চিকিৎসক সদস্য থাকিবেন। এই ৩ জন ছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট ও সাধারণ ৪ জন করিয়া উপযুক্ত সদস্যও নির্ব্বাচিত হইবেন। এই দশ জন সদস্যের সমবায়ে সংগঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিই অন্যূন হাজার জন সাধারণ সভ্য লক্ষ পল্লী মণ্ডলীর যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

স্থানীয় সদস্য-সপ্তকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি স্থানীয় সাধারণ সভ্যদের প্রদত্ত ভোটের আধিক্যবলে, মণ্ডলীর নায়কপদে বৃত হইবেন। তিনি স্থানীয় প্রধান পরিচালকের সহকারিতায় এবং অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতায় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

প্রধানতঃ উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সরবরাহ-সমিতিকে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে :—

(১) উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে ক্রমে কার্য্যালয়, আড়ৎগৃহ, শিক্ষাগার কর্ম্মশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা।

(২) মণ্ডলীর সভ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয় চাউল, ডাইল, লবণ, মরিচ, তৈল, তামাক, কাপড়, জামা প্রভৃতি পণ্য, মূল উৎপাদকের নিকট হইতে কিনিয়া আনিয়া যথানির্দ্দিষ্ট লাভে সরবরাহ করা।

(৩) সভ্যমাত্রেই উৎপাদিত বিক্রেয় পণ্য উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া যথাস্থানে রপ্তানী করা।

(৪) নিজ নিজ প্রতিভা, বুদ্ধি, কার্য্যকারিণী শক্তি ও শ্রম করিবার সামর্থ্যানুসারে কর্ম্মক্ষম স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকল প্রকারের কর্ম্মী সভ্য যাহাতে কোনও না কোনও অর্থকরী কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) কর্ম্মীদের কর্ম্মসাধন উপযোগী যন্ত্রপাতি, উপাদান উপকরণ ও মাল-মসলার প্রয়োজনানুসারে যোগান দেওয়া।

(৬) যোগ্যরূপ পারিশ্রমিক প্রদান পূর্ব্বক, কর্ম্মীদের উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যথাস্থানে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা।

(৭) মণ্ডলীর সভ্যদের যাবতীয় সাংসারিক অভাব, সভ্যদের নিজ নিজ শারীরিক শ্রমমূলক কার্য্যে যাহাতে স্থানীয়ভাবে মণ্ডলীতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা।

(৮) সভ্যদের অধিকৃত দেশ বা ভূমি, অনাবাদী অবস্থায় বনজঙ্গলে বা খানায় ডোবায় পূর্ণ হইয়া যাহাতে বৃথা পতিত না থাকে, ভূমির প্রতি অংশেই কিছু না কিছু ফসল যাহাতে সমুৎপন্ন হয় ;—আর কর্ম্মী সভ্যদের জীবিতকালের কোনও অংশই কর্ম্মের অভাবে যাহাতে বৃথা ব্যয়িত না হয়,—প্রতি মুহূর্ত্তই যাহাতে কোনও না কোনও শিল্পজ পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত হয়, যথাসম্ভবরূপে তাহার বিধান করা।

(৯) মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত পল্লীর গৃহে গৃহে যাহাতে কার্পাস চাষের বন্দোবস্ত হয়, সভ্যমাত্রই যাহাতে দৈনিক অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল চরকাতে সূতা কাটে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(১০) সভ্যদের নিকট হইতে চরকার সূতা সংগ্রহ করিয়া লইয়া হয় স্থানীয় তাঁতিদের তাঁতে, না হয় সমিতির নিজস্ব তাঁতশালায়, সেই সূতাতে বিশুদ্ধ খদ্দর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া।

(১১) সভ্য মাত্রেরই স্বাস্থ্য যাহাতে অটুট থাকে, কর্ম্মশক্তি যাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইতে না পারে, কোনও ব্যাধিই যাহাতে মণ্ডলী মধ্যে প্রকটিত হইতে না পারে, প্রধান চিকিৎসকের সহায়তায়, তাহার বিধি-ব্যবস্থা করা।

(১২) সভ্যমাত্রই সাধারণ ভাবে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে ক্রমে সুনিপুণ হইয়া উঠিতে পারে, প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় তাহার সুবন্দোবস্ত করা।

(১৩) সভ্যমাত্রই যাহাতে নিজ নিজ গৃহে গো-পালন করিয়া নিজেদের জন্য দুগ্ধ দধি মাখন ঘৃতাদি গব্যের এবং ফসলের জন্য গোময়জ সারের বন্দোবস্ত করে, তাহার প্রতি লক্ষ রাখা।

(১৪) গো-মহিষ ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মরিলে পর তাহা ভাগাড়ে বা যথাতথা না ফেলিয়া, সকল সভ্যই যাহাতে যথাকালে সমিতির কার্য্যালয়ে সংবাদ প্রদান করে, তদনুরূপ বিধান করা।

(১৫) অব্যবহার্য্য পুরাতন তৈজস পত্র, কাঁচ, কাগজ, বস্ত্রখণ্ড, লৌহাদি ধাতুবস্তু, কোন কিছুই নষ্ট না করিয়া, সভ্যমাত্রেই যাহাতে উক্ত সকল প্রকার বস্তু মূল্য-বিনিময়ে সমিতির হস্তে প্রদান করে, তাহার বিধান করা।

(১৬) কৃষক সভ্যরা যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ, উপযুক্ত সার, যথাযোগ্য চাষাবাদাদি সহযোগে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতঃ লাভবান হইতে পারে, তাহার সুবিধান করা।

(১৭) সভ্যদের বাস্তু বা বাস-গৃহাদি যাহাতে স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়, পানীয় জলের যাহাতে অভাব না হয়, চলিবার ফিরিবার রাস্তা ঘাট যাহাতে সুগম হয়,—সে সব বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(১৮) মণ্ডলীতে কোন্ শ্রেণীর-শিল্পী বা কর্ম্মী কত জন, কোন্ বা কোন্ কোন্ বিশেষ শিল্পকার্য্যের সাফল্য সম্ভব, মণ্ডলীর স্থানীয় অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা।

(১৯) মণ্ডলীতে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা মণ্ডলীর অভাব পূরণের পর, অন্যত্র রপ্তানী করিবার জন্য যাহা উদ্বৃত্ত রহিবে, নাম, পরিমাণ ও মূল্য অনুসারে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা।

(২০) গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি যেই এক সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট সমবায় সমিতির অঙ্গীভূত থাকিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত হইবে, মণ্ডলীর সভ্য-মাত্রকেই সেই বিরাট সমিতির অংশগ্রহীতা অংশীদাররূপে পরিণত করতঃ যথানির্দ্দিষ্ট হারে যথানির্দ্দিষ্ট কালে অংশের মূল্য আদায় এবং যথাকালে তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বণ্টন করা।

(২১) এতদ্ব্যতীত দেশকালপাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিরাট সমবায় সমিতির পরিচালক—সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তৃগণ যখন যেরূপ বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে গ্রাম্যমণ্ডলীর কার্য্য পরিচালনা করা।

মোটামুটি উক্ত ২১ দফাতে উল্লিখিত কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

বঙ্গবাণীর বরেণ্য বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-কুঞ্জের কোকিল-কল-ধ্বনি চিরতরে নীরব! সে কুহু-তান আর কি বাঙ্গালী কখনও শুনিবে? সে আশা কৈ? যেমনটি যাইতেছে, তেমনটি আর হইতেছে কৈ? বঙ্গীয় সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসন সত্যই শূন্য! বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান আর পূরণ হইবে না। সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উদ্ভব নিতান্তই অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কত বড় ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার রচিত বহু ভাবের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন; আর ভালরকম জানেন তাঁহারা, যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক বৈঠকে বসিয়া তাঁহার মুখের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন। তাঁহার সহিত বসিয়া একসঙ্গে গল্পগুজব করিয়াছেন, এমন বৃদ্ধ সাহিত্যিক আজি অল্পই আছেন। সেই অল্প সংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধ আমি এক জন, তবে আমি সাহিত্যিক হই বা নাই হই। তাঁহার সাহিত্যিক বৈঠকের কাহিনী কিছু কিছু কহিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। কোন বিশেষ কারণে এত দিন সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি নাই। এখন করিব মনে করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন পেন্‌সন লইয়াছেন। পটলডাঙ্গায় প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে থাকেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় একটা ধর্ম্মের প্রবল 'হুজুগ' উঠিয়াছিল। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা। অলকট, আনিবেশান্ত, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'থিওসফি' বা 'তত্ত্ব-বিদ্যা-সমাজ' সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্বকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ আর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ উভয় সমাজের সংঘর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত মন্দিরে বসিয়া পরমহংসদেব, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিষ্যবর্গকে লইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ হিন্দুধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজাইতে লাগিলেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের তথা কৃষ্ণধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার এই প্রচার-সংগ্রামে আরও নিযুক্ত হইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই প্রধান সেনাপতি চন্দ্রনাথ বসু আর অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তৎপক্ষে দুই প্রধান অস্ত্র হইল 'নবজীবন' আর 'প্রচার'। নবজীবনের ভার লইলেন অক্ষয়চন্দ্র আর 'প্রচারের' ভার লইলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ও তাঁহার পরমপ্রিয় পণ্ডিত জামাতা রাখালচন্দ্র। এই প্রচারকার্য্য সাধনের জন্য তিনি আরও অনেক ধর্ম্মপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, গীতা-ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় পুস্তকই প্রধান। এই সময়ে পুস্তকে বা প্রবন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিতেছিলেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—অনুশীলন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। গীতার ধর্ম্মকে তিনি অনুশীলনধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিতেছিলেন। অন্ততঃ আমি সেইরূপই বুঝিয়াছিলাম। আমি তখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহ' ও শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'অনুসন্ধান' নামক সাময়িক পত্রে উপর্য্যুপরি কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রতিবাদে আমি বলিয়াছিলাম—'গীতার চরম তত্ত্ব অনুশীলন নয়। অনুশীলন কর্ম্ম। গীতার মুখ্য ধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্ম্মাতীত অবস্থা। অবশ্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া সে অবস্থায় পৌঁছিতে হয়। অনুশীলন বা কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা যে নৈষ্কর্ম্ম্য, তাহার স্বরূপ বা নামান্তর "আত্মদর্শন।" এ কথা কিছু দিন পূর্ব্বে আমি সুবিখ্যাত হিন্দুপত্রেও লিখিয়াছিলাম যে, 'আত্মদর্শন' গীতায় তথা হিন্দু-ধর্ম্মের চরম সিদ্ধান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র দামোদর বাবুর সহিত আমার প্রতিবাদের কথা বলেন, দামোদর বাবু আমার পরম সুহৃদ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা অনুসারে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যান। দামোদর যাইবার প্রস্তাব তুলিলে আমি প্রথমতঃ যাইতে অস্বীকার করি। আমার ধারণা ছিল, বঙ্কিম সেকেলে হাকিম ডেপুটী—বড় দাম্ভিক। পরে বুঝিলাম, আমার ধারণা ঠিক উল্টা। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সরল শিশু। ক্রমে জানিলাম, দাম্ভিকের নিকট তিনি সিংহ, আর পরিচিতের পক্ষে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

পরিচয়ের পর আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম। ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে তাঁহার সঙ্গ-লিপ্সা একটা প্রবল পিপাসা হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বাহির হইতে তাঁহাকে এক জন অতি বড় শিক্ষিত মহাপণ্ডিত বলিয়া জানিতাম, এখন জানিলাম, কেবল শুষ্কজ্ঞান বা বিদ্যার আধার বঙ্কিমচন্দ্র নহেন; পরন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞান ও প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বসিত মহাসাগরস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সম্রাট।

আজিকালি এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সদর্পে বলিয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক সম্রাটও নহেন—তাঁহার সিংহাসনও শূন্য নহে। জিজ্ঞাসা করি, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, এমন সৃষ্টি-শক্তি (Creative power) আর উভয়ের এমন একত্র সমাবেশ কেবল বাঙ্গালায় কেন—সাহিত্য-জগতেই বা আর কোথা কত আছে? কি ভাবের মাধুর্য্যে, কি ভাষার সৌন্দর্য্যে, কি গবেষণায় গাম্ভীর্য্যে এমন আধার—এমন আদর্শ আর দেখা যায় কি? উপন্যাসরাজ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপাল-কুণ্ডলা'; গবেষণা ও ইতিহাসের রাজ্যে 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'গীতাব্যাখ্যা', 'কৃষ্ণ-চরিত্র'; ভাব-রসের রাজ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'—আর কত নাম করিব—সাহিত্য-সাম্রাজ্যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-দৃষ্টান্ত আর কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্কিমচন্দ্রের সিংসাহন শূন্য, এ কথা নিতান্ত মূঢ় মূর্খ ভিন্ন কে অস্বীকার করিবে?*

আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করি, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আর পূর্ব্বকার বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না। কোমৎ মিলপন্থী নাস্তিক ভাবাপন্ন বঙ্কিমচন্দ্র, তখন ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রে পরিণত হইয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ আর গীতা ভগবানের প্রত্যাদেশ ধর্ম্মপুস্তক (Revelation) বলিয়া তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিনই সরল বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, প্রথম অবস্থায় তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রতিভাশালী দার্শনিক লেখক নোভালিজকে তখন বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। নোভালিজের একটি মহৎবাণী "আত্মার ধ্বংস-সাধনই দর্শনের শ্রেষ্ঠ সাধনা" (the first act of philosophy is the annihilation of self) এ কথায় তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। এই সকল জীবজগৎই বা কেন আর 'আমি' 'তুমিই' বা কেন? কতকগুলা ভ্রম 'আমি' 'তুমি' সাজিয়া মিছা কষ্ট পাইতেছে, সেই 'আমি' 'তুমি'গুলাকে ধ্বংস করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহাতে 'আমি' 'তুমি'র সঙ্গে জগতের জীবের লয় হয়—সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা চিরতরে জুড়াইয়া যায়। সাংখ্য-দর্শনের সারসিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক আদি ত্রিবিধ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি জন্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয়সাধন বা পুরুষকারসাধন আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্ব এই সূত্রের উপর সংস্থিত। বিষাদবাদ হইতে এই সূত্রের উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বিষাদ-ভাবের ভাবুক ছিলেন, আনন্দপথের পথিক হন নাই। জগতে জীবে কেবল

---

* বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের এক প্রধান সম্রাট, তেমনই দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজক উপাসক। সাহিত্যভাণ্ডারে তাহার প্রমাণ প্রচুর। তবে তিনি কাজিল দেশহিতৈষী সাজিয়া লম্ফে-ঝম্পে দেশ কাঁপাইতেন না। নীরবে দেশের প্রকৃত হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন।

দুঃখ-যন্ত্রণার আধিক্য দেখিতে পাইতেন। তাই ভগবানের পথ—ভক্তি-প্রেমের পথ ছাড়িয়া যুক্তিবাদী হইয়া দাঁড়ান। তাহা হইতে অজ্ঞেয়-বাদী হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস হয় যে, মূল তত্ত্ব বা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব মানববুদ্ধির অতীত। মানব-জ্ঞান কেবল বিষয়-ব্যাপার বুঝিতে পারে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব তাহার পক্ষে চিরদিনই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কোমতের প্রত্যক্ষবাদেও তাঁহার আস্থা ছিল। প্রত্যক্ষবাদের প্রধান সিদ্ধান্ত বিশ্বমানবে প্রেমভাবকে তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের মধ্যে মিল, কোমৎ, কাণ্ট, হিগেল প্রভৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তখন বারগস, নিট্জে, উকেনের নামগন্ধ এ দেশে ছিল না—'অতিমানব' তৈয়ারির হজুগও প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে supermen উদ্ভূত হয় নাই। অতিমানব যে কি—আর 'অতি-মানবত্ব' যে কিরূপে লাভ করিতে হয়, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করি, তখন তিনি যথার্থই গীতায় বিভোর। তখন তিনি তন্ময় হইয়া গীতা অধ্যয়ন করেন, তন্ময়-ভাবে গীতা-কর্ত্তাকে পূজা করেন। প্রথম পরিচয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্র, দামোদর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া গীতা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। একটু পরেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয় উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে মজলিস ভরপূর হইল। আরও কয় জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া বৈঠকে যোগদান করিলেন। নক্ষত্র-বেষ্টিত পূর্ণশশীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সমুজ্জ্বল প্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ধীরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার গূঢ় গম্ভীর তত্ত্ব লইয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। গীতার চরম উদ্দেশ্যের কথা উত্থাপন করিয়া আমি কহিলাম—"কর্ম্ম গীতার চরম উদ্দেশ্য নয়। নৈষ্কর্ম্ম্য বা আত্মার স্থিতিলাভ—গীতা-সাধনার পরম সিদ্ধি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ সেই পরম সিদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

এই ত গীতার শেষ কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"শেষ কথা শেষে হইবে। আগে আগের কথা বুঝা দরকার। কর্ম্মই আগের কথা।"

দামোদর বাবু কহিলেন,—"কর্ম্ম কি? অনন্তকাল ধরিয়া হাঁসপাতাল, চেরিটেবল ডিস্‌পেনসারি স্থাপন কি বৃক্ষ-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাই কি কর্ম্ম?"

আমি কহিলাম, কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সংযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥" ৪র্থ অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"উহাও কর্ম্মের শেষ কথা। কর্ম্মের আদি কথা 'অনুশীলন'।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার কহিলেন,—"বর্ত্তমান জার্ম্মাণি এ কথাটা বুঝিয়াছে। ওই অনুশীলন cult বলিয়া সে খুব আন্দোলন আলোচনা করিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"কেবল জার্ম্মাণি কেন? প্রতীচ্য জগৎ পূর্ব্ব হ'তেই অনুশীলনের দিকে যাচ্ছে।"

আমি কহিলাম, গীতা সে পথ সুন্দররূপে দেখিয়েছেন। ওদের মনোবিজ্ঞান (Psychology) মানব-মনকে চৈতন্য (consciousness) ব'লে ধরে নে' তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে যথা,—বেদনা, বাসনা ও ও জ্ঞান (feeling, willing, knowing) গীতা সেই তিন ভাগের চরম অনুশীলন পন্থা বহু পূর্ব্বে দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কহিলেন,—"আমিও তাই বলেছি যে, বেদনা (feeling) থেকে ভক্তিযোগ, বাসনা (willing) থেকে কর্ম্মযোগ আর জ্ঞান, (knowing) থেকে জ্ঞানযোগ অনুশীলন, ভক্তের ইহাই পূর্ণ অভি-ব্যক্তি—মনুষ্যত্বেরও পূর্ণ পরিস্ফুরণ।

শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহোদয় তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগের "ছ" পরিশিষ্টের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে, চন্দ্রদ্বীপের পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরুর নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে (১)। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই কুলশাস্ত্রমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে।"

তিনি শ্রীচন্দ্রের যে তিন তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া কুলশাস্ত্রের প্রমাণ ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন করিতে যাইতেছেন, শ্রীচন্দ্রদেব তাহার একখানিতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মকর গুপ্তের প্রপৌত্র বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র কোটিহোমিক শান্তিবারিক পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে ভগবান্ বুদ্ধের উদ্দেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির নান্যমণ্ডলস্থ নেহকাষ্ঠি গ্রামের এক পাঠক এবং অন্য খানিতে (২) সতট পদ্মাবাটী বিষয়ের কমার তালকমণ্ডলস্থ লেলিয় গ্রামের কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিয়াছিলেন ; তৃতীয়খানি ব্যবহৃত হয় নাই, ভূমিদানার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দাতার বংশপরিচয় প্রভৃতি জাবেদা কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ; পরন্ত কোনখানিতেই সময়জ্ঞাপক কোন সঙ্কেতও নাই। প্রথমখানি বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে উক্ত দানকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন (৩)। দাতার বংশপরিচয়ে আছে, চন্দ্রবংশে পূর্ণ চন্দ্রতুল্য পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীখ্যাত ছিলেন ; প্রতিমার পাদপীঠিকা, জয়স্তম্ভ তথা তাম্রপট্টে তদীয় নাম পঠিত হইত। বৌদ্ধজাতকে যে বুদ্ধদেবের শশকরূপে জন্মগ্রহণের কথা আছে, শশাঙ্ক সেই শশকরূপী বুদ্ধকে অঙ্কে ধারণ করেন বলিয়া পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল (৪) ও চন্দ্রদ্বীপে (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে) রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার কাঞ্চনা নাম্নী প্রিয়ার গর্ভে

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পৃঃ ২৩৬, টীকা ৯।

(২) ইহা স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ফরিদপুর জিলায় ইদিলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট J. T. Rankin Esqr, I. C. S. "ঢাকা রিভিউ" পত্রে (অক্টোবর ১৯১২) আবিষ্কারকের লিখিত প্রবন্ধসহ প্রকাশ করেন।

(৩) Epigraphia Indica, Vol, xxii, p, 136-42.

(৪) হরিকেলের অবস্থান বিষয়ে আমরা বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব, সম্প্রতি স্থূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়াই মানিয়া যাইতেছি।

রাজযোগ মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচন্দ্র সর্ব্বদা বুধমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া অরিগণকে কারাবদ্ধ করিয়া যশঃ-সৌরভে চারিদিক আমোদিত রাখিয়াছিলেন। ইহা লিপির পাঠোদ্ধারকারী অধ্যাপক শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পত্নীকে মহিষী না বলিয়া প্রিয়া সংজ্ঞা দেওয়ায় এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রকেও কেবল নৃপতি বলায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,(১) ত্রৈলোক্যচন্দ্র কোনও প্রবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজের সামন্তরূপে চন্দ্রদ্বীপাদি শাসন করিতেন; শ্রীচন্দ্র বঙ্গের আধিপত্য হস্তগত করিয়া বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি অক্ষরতত্ত্বের আলোচনায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই চন্দ্রবংশের শাসনকাল অনুমান করেন। পক্ষান্তরে, তিব্বতীয় লামা তারানাথ তদীয় মগধের রাজবংশের ইতিহাসে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই শ্রীচন্দ্রদেবের শাসন বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু তারানাথ তথা অপর সকল ঐতিহাসিকের মতেই চন্দ্রবংশের পূর্ব্বে খড়্গবংশীয় রাজগণ কিছুকাল ধরিয়া বঙ্গ-সিংহাসন উপভোগ করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু খড়্গবংশের শেষ রাজা দেবখড়্গকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলায় (২) শ্রীযুত রাখাল বাবু তাহা ভ্রম সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি দেবখড়্গের দুই তাম্রলিপির অক্ষর দেখিয়া তাঁহাকে নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে চাহেন না (৩)। এমন কি, তদীয় অনুমান মতে (৪) দেবপাল দেব ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যথার্থই জীবিত থাকিলে দেবখড়্গকে নবম শতাব্দীর শেষ ভাগেরই লোক বলিতে হয়, সুতরাং শ্রীচন্দ্রদেব তদনুসারে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসিয়া পড়েন। পালবংশীয় পরবর্ত্তী নৃপতি প্রথম মহীপালের সময় ধরিয়া বিচার করিলেও রাখাল বাবুর অনুমান অনেকটা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

এই ত গেল বাঙ্গালার ইতিহাসের সিদ্ধান্ত। অন্য পক্ষে রাক্কাং বা রোসাং নামান্তরে আরাকানের ইতিহাস হইতে আমরা উক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের এক অতি বিস্তৃত ও মূল্যবান্ বিবরণী প্রাপ্ত হইতেছি, তৎপ্রতি সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাতেও দেখা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এক ভীষণ ধর্ম্ম তথা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ৭৮৮ অব্দে মহাতৈঙ্গচন্দ্র স্ববিক্রমে সিংহাসন লাভ করিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণের পরামর্শানুসারে রাজধানী নূতন যায়গায় স্থানান্তরিত করত তাহা (বিহারের বৈশালী নগরের অনুকরণে) বৈশালী নামে প্রথিত করেন। এই চন্দ্রবংশীয় ৯ জন নৃপতি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রায় ১৬৯ বৎসর ব্যাপিয়া আরাকান রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পার্শ্বে অপর ৮ জন নরপতির নাম ও রাজ্যপ্রাপ্তির খৃষ্টীয় অব্দ প্রদত্ত হইল। ইহাতে (তৈঙ্গ) শব্দটি সকল নামেই দেখা যায়। ব্রহ্মীয় ভাষায় তাহার অর্থ শ্রেষ্ঠ। আমাদের মতে বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের 'দেব' খ্যাতির ন্যায় "তৈঙ্গ" এই বংশীয় রাজাদিগের সাধারণ পদবী অর্থাৎ আরাকানের তৈঙ্গচন্দ্র বাঙ্গালার চন্দ্রদেব আখ্যায় পরিচিত। (৫) সুতরাং শ্রীতৈঙ্গচন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্রদেব অভিন্ন হওয়াই সম্ভবপর। রাখাল বাবুর নির্ণীত সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

শ্বা তৈঙ্গচন্দ্র	৮১০
মলা তৈঙ্গচন্দ্র	৮৩০
পলা তৈঙ্গচন্দ্র	৮৪৯
কালা তৈঙ্গচন্দ্র	৮৭৫
ঢুলা তৈঙ্গচন্দ্র	৮৮৪
শ্রীতৈঙ্গচন্দ্র	৯০৩
সিংহেণ তৈঙ্গচন্দ্র	৯৩৫
যোল তৈঙ্গচন্দ্র	৯৫১

শ্রীচন্দ্র শ্রীতৈঙ্গচন্দ্রেরই নামান্তর হইলে তৎপিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র, পিতামহ সুবর্ণচন্দ্র এবং প্রপিতামহ পূর্ণচন্দ্র আরাকানের ইতিহাসে যথাক্রমে ঢুলা (তৈঙ্গ) চন্দ্র, কালা (তৈঙ্গ) চন্দ্র এবং পলা (তৈঙ্গ) চন্দ্র নামে পরিচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আরও নানা কারণে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে। প্রথমতঃ বঙ্গীয় ইতিবৃত্তনিচয়েও অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মাৎস্যন্যায় (১) অর্থাৎ অরাজকতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তখন গৌড়-মগধে পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে আরাকান চন্দ্রবংশীয় রাজার অধীন হয়। দ্বিতীয়তঃ দেবখড়্গের পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজ্যসংস্থাপনবিবরণী শ্রীতৈঙ্গচন্দ্রের পিতা ঢুলা তৈঙ্গচন্দ্রের সিংহাসনারোহণ কালের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তৃতীয়তঃ নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম আরাকানের বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন হইয়াছিল বলিয়া চট্টগ্রামের ইতিহাস-লেখকমাত্রই স্বীকার করিয়াছেন; সেই বৌদ্ধ রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র কি তৎপিতামহ পূর্ণচন্দ্র ওরফে পলা তৈঙ্গচন্দ্রও হইতে পারেন? পালরাজবংশের প্রথম শাখার অধঃপতনে বঙ্গে যখন খড়্গোদ্যম স্বাধীনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে পলা তৈঙ্গচন্দ্র চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। শেষ কারণ অধিকতর রহস্যপূর্ণ। বাঙ্গালার ইতিহাসে এই চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তাহার একমাত্র কারণ বোধ হয়, শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলিপিতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে ভূমিদানের কথা লিখিত আছে। হঠাৎ বিদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত রাজার অভ্যুদয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে স্বতঃই বৌদ্ধদেশ (আরাকান) হইতেই আগত বলিয়া মনে আসিতেছে। পক্ষান্তরে, আরাকানের ইতিহাসেও এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা বিদেশীয় (২) তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনোক্ত কোটি হোমকারী শর্ম্মাবিশেষকে ভূমিদান ভগবান্ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে করিলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধ প্রজাগণের সন্তোষসাধনার্থই বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ইত্যাদি কারণে আমরা আরাকানের তৈঙ্গচন্দ্র এবং বঙ্গের চন্দ্র (দেব) বংশ অভিন্ন মনে করিয়া বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

(১) সাহিত্য, ১৩২০।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পৃঃ ১৪৭, টীকা ৭।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৩।

(৪) ঐ ঐ পৃঃ ২১৫।

(৫) ইতিহাসলেখকগণ যারাও স্ব স্ব দেশীয় বসন-ভূষণে সজ্জিত করা বিচিত্র নহে। কেন না, "ত্রিপুরার রাজমালা"র প্রধান ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ শেষ রাজা যোল তৈঙ্গচন্দ্রকে যোলচন্দ্র সিংহ নামেই প্রথিত করিয়াছেন (৩০৮ পৃঃ।)

(১) মাৎস্য ন্যায় অরাজকতারই নামান্তর বটে, তৎসম্বন্ধে কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্যের "অর্থশাস্ত্রে" আছে,—"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে।" উদাসীন রঘুনাথ বর্ম্মা বিরচিত "লৌকিক ন্যায় সংগ্রহে"র মতেও "প্রবলনির্ব্বলবিরোধে সবলেন নির্ব্বল-বাধবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ।" "রামচরিতে"র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় মাৎস্যন্যায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"To escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish." "মনু-সংহিতাতে"ও ইহার আভাস পাওয়া যায়,—

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥
২০, ৭ম অধ্যায়।

(২) শ্রীযুত রাখাল বাবুর মতে এই বংশের আদিপুরুষ রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্ব (রোহতাস্ গড়) পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার ইতিহাসের মতে শ্রীচন্দ্রের পর বঙ্গভূমি পুনরায় পালবংশের দ্বিতীয় শাখার অধিকারে যায়, তাই তাহাতে শ্রীচন্দ্রের পুত্র বা পৌত্রের নাম পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, আরাকানের ইতিহাসে শ্রীচন্দ্রের পুত্র সিংহেশ (তৈঙ্গ) চন্দ্র তৎপর পৌত্র যোল্ (তৈঙ্গ) চন্দ্রের রাজত্বের বিবৃতি রহিয়াছে। এই শেষ নরপতি যোলচন্দ্র চট্টগ্রাম পুনরায় জয় করিয়া সীতাকুণ্ডের অনতিদূরবর্ত্তী কুমিরার সমুদ্রোপকূলে এক বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। (১) ব্রহ্মদেশীয় জনপ্রবাদমতে উক্ত বিজয়ী যোলচন্দ্রের "চিৎ-ত-সং" অর্থাৎ 'যুদ্ধ করা অন্যায়' মন্তব্য হইতে চট্টগ্রাম 'চিটেগং' (Chittagong) আখ্যা লাভ করে। যোলচন্দ্রের উক্তবিধ মন্তব্য হইতে বোধ হইতেছে, তিনি যথার্থই বৌদ্ধ ছিলেন। তাই উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যরাজ অশোকের ন্যায়, যুদ্ধাদিতে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার সেই নিরীহতার সুযোগে তিনি ৬ বৎসর কালও রাজ্যশাসন না করিতেই জনৈক ম্রু সর্দ্দার কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। সেই ম্রু সর্দ্দার ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায় ৩৬ বৎসর ধরিয়া আরাকানের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বোধ হয় তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। অনন্তর যোলচন্দ্রেরই পুত্র স্থা-মিং-স্থা-তিন উচ্চারণান্তরে ঙামেং-ঙাতুঁ তত্রত্য-চাকমা (ব্রহ্মবাসীদের কথায় ছাক্) প্রজাবর্গের সাহায্যে পুনরায় পিতৃসিংহাসন হস্তগত করিয়া (২) প্রায় ২৪ বৎসর কাল আরাকান রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

পরন্তু আরাকানের ইতিহাসের উক্ত যোল তৈঙ্গচন্দ্রই বাঙ্গালার ইতিহাসের চন্দ্রবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দচন্দ্র কি না, বিবেচনার বিষয়। শ্রীচন্দ্রের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পালবংশের অধীনতা স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্যের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, জেজাক্ ভুক্তির চাঙ্গেলরাজ যশোবর্ম্মার গৌড়-বিজয়কাহিনী তদীয় ১০১১ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯৫৪ অব্দের শিলালিপি (৩) অদ্যাপি সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। সেই সুযোগে বাঙ্গালার ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ এই যোলচন্দ্রই ম্রু সর্দ্দার কর্ত্তৃক আরাকানের সিংহাসন হারাইলেও কেবল চট্টগ্রাম জয় নহে, পূর্ব্বপুরুষাধিকৃত বঙ্গসিংহাসনও হস্তগত করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের দৃঢ়প্রতীতি জন্মিতেছে। বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল উত্তরকালে "অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন" (৪) করিলেও মাত্র উত্তর-রাঢ়েশ্বর নামে পরিচিত হইয়াছেন (৫) এবং সেই সঙ্গেই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রথিত। পরন্তু চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে অতি বার্দ্ধক্য হেতুই হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিয়া থাকিবেন। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রবংশের সম্পর্কহীনতা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত যোলচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নত্ব পক্ষেও উল্লিখিত প্রমাণ যথেষ্ট মনে হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

---

(১) তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে অদ্যাপি চট্টগ্রামের ভূমিমাপ উক্ত কুমিরার উত্তরভাগে (বাদ) সাহী ও দক্ষিণাংশে মঘীমতে প্রচলিত।

(২) মদীয় "চাক্‌মাজাতি" নামক পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে, ৮ পৃঃ।

(৩) Epigraphia Indica, Vol I, p. 126.

(৪) বাণগড় তাম্রশাসন—গৌড় লেখমালা, ৯৫ পৃঃ।

(৫) তিরুমলৈ শিলালিপি ঐ ৩৯ পৃঃ।

ব্যবস্থা-পরিষদে বাধাপ্রদান

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট যে কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজার স্বত্ব-স্বাধীনতা বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ কল্পনা দেশের কোনও লোক করেন না। একেবারে কোণঠেসা না হইলে গভর্ণমেণ্ট যে লোকমতের অনুবর্ত্তন করিবেন না, ইহা শিক্ষিত অশিক্ষিত দেশের প্রায় সকল লোকেরই দৃঢ় ধারণা। এই গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লোক কোনও কিছু প্রত্যাশা করে না বলিয়াই মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের এতটা জোর হইয়াছিল। অন্যদিকে লোক ইহাও বুঝে যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ করা যায়, যতটা সম্ভব এই গভর্ণমেণ্টকে একরূপ একঘরে করিয়া রাখা যায়, কিন্তু ইহাকে রাতারাতি সংহার করা সম্ভব নহে। এই জন্য দেশের বহুতর লোক অসহযোগ নীতির অনুসরণ করিতে রাজী ছিল এবং আছে, কিন্তু কাউন্সিলে যাইয়া গভর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের প্রতিরোধ করিয়া যে কোনও ফলোদয় হইবে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই স্বরাজী দল কোকনদে যে বাহ্বাস্ফোট করিয়াছিলেন, লক্ষ্ণৌএর বৈঠকে তাহার পুনরভিনয় করেন। এখানে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীকে কতকটা মোলায়েম করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, আইন-বৈঠকে যাইয়া একেবারেই "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। সকল লড়াই বাধাইতে গেলেই প্রথমে একটা অছিলা খুঁজিতে হয়। একটা বিবাদের হেতু দাঁড় করান আবশ্যক হইয়া উঠে। জার্ম্মাণী বহু দিন হইতেই ইংরাজ, ফরাসী ও রুসের সঙ্গে একটা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু বিনা কারণে একেবারে ফরাসী, রুসিয়া বা ইংরাজের উপর চড়াও করিতে পারে নাই। অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর হত্যা-ব্যাপারে জার্ম্মাণী এই সংগ্রামের একটা অছিলা পাইল। ইহা হইতেই যুরোপের এত বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া উঠিল। প্রাচীন মহাভারতেও এইরূপ সূত্র অবলম্বনেই কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। পাণ্ডবরা নানা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বিবিধ রাজন্যবর্গের সঙ্গে নানাপ্রকারের সম্বন্ধ পাতিয়া নিজেদের হৃত-স্বত্ব উদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু সমরায়োজন শেষ হইলেও অমনি কুরুকুলের উপরে যাইয়া পড়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে আপোষে বিবাদ মিটাইবার জন্য কুরুদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। এইরূপে আগে বিবাদের হেতু সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বরাজী দলও লক্ষ্ণৌয়ের বৈঠকে এই সনাতন নীতিই অবলম্বন করেন। লক্ষ্ণৌয়ের বৈঠকের মূল সিদ্ধান্ত একটা বিবাদের হেতু সৃষ্টি করা।

মহাত্মা পঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচারের প্রতিবাদ করিবার জন্যই তাঁহার অসহযোগ প্রচার করেন। স্বরাজীদিগকে একটা নূতন অভিযোগ প্রস্তুত করিতে হইল। খিলাফতের কথা তোলা আর সম্ভব ছিল না। তুর্কীর সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ যদিও জাজারতুল-আরব অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া দখল করিয়া আছে এবং যত দিন মেসোপটেমিয়াতে মুসলমান অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইয়াছে, তত দিন খিলাফতের জের মিটিবে না, খিলাফৎ আন্দোলনের নায়করা এ কথা কহিতেছেন, কিন্তু এ সত্ত্বেও মূল খিলাফতের বিবাদ মিটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। সুতরাং খিলাফতকে ধরিয়া নূতন একটা বিবাদ বাধান যায় না। পঞ্জাবের অত্যাচারের কথাও এত কাল পরে আবার খোঁচাইয়া তোলা যায় না। যেমন তেমন করিয়াই হউক, সে বিবাদও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বরাজী দলের পক্ষে তাঁহাদের প্রতিরোধ-নীতি সমর্থন করিবার জন্য একটা নূতন বিবাদের হেতু প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এত কাল তাঁহারা কহিয়াছেন,—নিজেদের

শক্তিসামর্থ্যের দ্বারা দেশ-মাতৃকার বন্ধন মোচন করিবেন। নিজেদের সঙ্ঘশক্তিপ্রভাবে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সে সকল কথা এখন বদলাইতে হইল। বিনা উপদ্রবে বিগ্রহ-বিদ্রোহ ব্যতীত ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইংরাজের সঙ্গে একটা রফা করিতে হইবে, এত দিন ইঁহারা এ কথা কানে পর্য্যন্ত তোলেন নাই। যাহারা এ কথা কহিয়াছে, তাহাদিগের উপরে দণ্ডধারণ করিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অসহযোগের পথে স্বরাজ পাইতে হইলে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের শলা-পরামর্শ করিতেই হইবে। অসহযোগ নীতির পরিণাম সংগ্রাম নহে, সন্ধি; আততায়িতা নহে, আপোষ। মহাত্মা দিব্য দৃষ্টিতে এই সত্যটা প্রথমাবধিই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া গায়ে পাতিয়া তিনি বিবাদও বাধাইতে যান নাই, আপোষও করিতে যান নাই। ভিক্ষা করিয়া আপোষ হয় না। আপনার শক্তি-প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশের দ্বারাই বিপক্ষকে রফা করাইতে রাজী করাইতে হয়। আর আপোষের প্রস্তাব দুর্ব্বলের মুখে শোভা পায় না। সবল পক্ষকেই প্রথমে এই প্রস্তাব তুলিতে হয়। অথবা আপোষ করিবার ইচ্ছাটা পাকে-প্রকারে প্রকাশ করিতে হয়। মহাত্মা এই কথা অতি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন। আপোষের পথেই এই বিবাদ মিটিবে, ইহা সত্য। এই পথটা খোলসা করিবার জন্য আমাদিগকে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের শক্তি যখন জাগিবে, বৃটিশ প্রভুশক্তি তখন আপনা হইতে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ইহাই মহাত্মার কথা। এই জন্য তিনি ইংরাজের দিকে না চাহিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দিকে পশ্চাৎমুখ হইয়া নিজেদের শক্তি-সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মার সকল কথায় সায় দিতে পারি বা না পারি, তাঁহার অসহযোগনীতির মধ্যে যে কোনও স্ব-বিরোধিতা নাই, ইহা বুঝি, তাঁহার সকল কায যে এক সূত্রে গাঁথা, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার নীতিতে উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় আছে, কিন্তু স্বরাজী নীতিতে তাহা নাই।

স্বরাজী দল মহাত্মার নীতিও খোলাখুলিভাবে বর্জ্জন করিতে সাহস পাইলেন না; অথচ নিজেদের একটা খিচুড়ী-নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া নিজেদের বাক্য এবং কর্ম্মের পূর্ব্বাপরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। এক দিকে ভিক্ষা-নীতিকে তারস্বরে বর্জ্জন করিলেন, অন্যদিকে কাউন্সিলে যাইয়াই সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ কলিকাতা এবং দিল্লীতে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকটে দাঁড়াইলেন। ভিক্ষাকে দাবী বলিলেই তাহা দাবী হয় না। দাবীর পিছনে জোর থাকে। সে জোর প্রজার বাহুরই হউক, অথবা রাজার আইন-কানুন বা সিপাই-শাস্ত্রীরই হউক। স্বরাজী দল কলিকাতায় এবং দিল্লীতে যে "দাবী" পেশ করিলেন, তাহার পিছনে কোনও বলই ছিল না এবং নাই। তাঁহারা ইহা জানিতেন। এ দাবী যে গভর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিবেন না, ইহা জানা ছিল। তাই বলিয়া এই দাবী পেশ করা যে অন্যায় হইয়াছিল, এমন বলি না, কিন্তু তাঁহারা দাবী গ্রাহ্য হউক, এই জন্য ইহা পেশ করিয়াছিলেন, একটা বিবাদের হেতু গড়িয়া তুলিবার জন্য। এই সত্যটা ভাল করিয়া না বুঝিলে স্বরাজী নীতির খাঁটি ওজন ও বিচার সম্ভব হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গৌরীদান

১

আদরের মেয়ে ননী রূপের মাধুরী,
ফুটন্ত গোলাপ চেয়ে দেখিতে সুন্দরী।
খেলনা পুতুল লয়ে খেলে খেলাঘরে,
তুলিয়া আনন্দ-ধ্বনি গৃহের মাঝারে।
হাসিমুখে মা'র কাছে আসিয়া ছুটিয়ে,
বলে "মা গো! আজ মোর পুতুলের বিয়ে!"
রঙ্গিল বসনখণ্ড চেলীর বরণ,
সাজাল পুতুলে তার মনের মতন।
বাজাল কাঁসর, শঙ্খ, খেলানার বাঁশী,
"বরবধু"-গলে দিল মালা রাশি রাশি।
কৌতুকে বাড়ীর সবে খায় নিমন্ত্রণ,
ধুলা-কাদা দিয়ে গড়া খাদ্য অগণন।

২

"টুকটুকে মেয়ে মোর শীঘ্র দেবো বিয়ে,
বাজাবে নূপুরধ্বনি স্বামী-গৃহে গিয়ে।"
বড় সাধ এই হ'ল জননীর মনে,
দিলেন বিবাহ পিতা বালকের সনে।
রূপে গুণে বর-ক'নে লক্ষ্মী-নারায়ণ,
জনকজননী সবে আনন্দে মগন।
স্বামী সাথে খেলে ননী, পুতুলের মত,
সাজাবে স্বামীরে তার ফুল দিয়ে কত।

৩

বছর যেতে না যেতে এ কি গো প্রমাদ,
বিধবা হয়েছে ননী, আইল সংবাদ।
ভূমেতে লুটায়ে কাঁদে, পিতামাতা তার,
"কেন কাঁদ" ব'লে ননী ডাকে বার বার।
মাতা-পিতা-মুখে আর বাক্য নাহি সরে,
বলিতে পরাণ ফাটে, কি বুঝাবে তারে?

৪

এখনো রয়েছে তার সীমন্তে সিঁদুর,
পায়ের আল্‌তা তার হয়নি কো দূর!
অঙ্গের গহনাগুলি বাজিতেছে সুরে,
পরণে রয়েছে তার রঙ-করা ডুরে।
কে আছে পাষাণ এত এ সব ঘুচায়ে,
জ্বালিবে চিতার বহ্নি কোমল হৃদয়ে?
অবলার সংসারের ক্ষুদ্র খেলাঘর,
ভেঙ্গে দিল নিমেষেতে কোন্ যাদুকর?

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কৃষি
শিল্প
বাণিজ্য
সতীশ

কৃষিমূলক শিল্প—চাউলের কল

ভারতের শতকরা যেমন ৭২ জন লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে, ধান্য তেমনই আবার ভারতীয় কৃষির প্রধান ফসল। এতদ্দেশের মোট কর্ষিত জমীর প্রায় একের তিন ভাগ ধান্য উৎপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর যে ধান্য উৎপাদিত হয়, তাহার পরিমাণ সাড়ে ৯৪ কোটি মণেরও অধিক। এই বিপুল-পরিমাণ ধান্যকে চাউলে পরিণত করিতে যে কত শ্রম আবশ্যক হয়, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশীয় প্রথায় অর্থাৎ ঢেঁকি অথবা পার্ব্বত্য অঞ্চলে বড় বড় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখল দ্বারা চাউল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। এখন কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশেই দুই একটি করিয়া চাউলের কল দেখা দিয়াছে; ব্রহ্মদেশই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী।

কৃষিকার্য্যে কল-কব্জার ব্যবহার

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে কিংবা কৃষিজাত দ্রব্যাদিকে ব্যবহারোপযোগী করিতে আধুনিক কল-কব্জা প্রায়ই ব্যবহার হয় না দেখিয়া প্রতীচ্যের ব্যবসাদারগণ বড়ই দুঃখিত। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় প্রভূত পরিমাণ কৃষি-যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; ভারতের মত এত বড় বাজারে সেগুলি যদি কাটাইতে পারা না যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি। ভারতবাসীর আধুনিক কল-কব্জা কিনিবার মত সঙ্গতি আছে কি না এবং এতদ্দেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সেগুলি উপযোগী কি না, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই—প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যবসায়ের প্রসারবৃদ্ধি। আমাদের এই উক্তি হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা কল-কব্জা-মাত্রেরই প্রবর্ত্তনের বিরোধী। বস্তুতঃ তাহা নহে—কোন কোন স্থলে, যেমন তৈল-নিষ্কাশনে, শর্করা প্রস্তুত ইত্যাদিতে, কল না ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান অপচয় বন্ধ হওয়া কঠিন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের সকল বিভাগেই যে কল দ্বারা সুবিধা হইবে, কিংবা কল-কব্জার প্রবর্ত্তনই যে আমাদের কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারের একমাত্র উপায়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। চাউলের কলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষেও বলিবার অনেক কথা আছে।

এক দিকে দেশে শ্রমিকের অভাব যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে ও তৎসঙ্গে মজুরীর হার বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে কলের অধিকতর প্রচলন হওয়া অবশ্যম্ভাবী; ধানের ন্যায় বৃহৎ ফসলকে খাদ্যোপযোগী করিতে হস্ত-পরিচালিত শিল্প ব্যতীত কারখানা-শিল্পেরও যে অবসর আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না; খরিদ্দারের পক্ষ হইতে ইহাও বলা চলে যে, দেশীয় প্রথায় ঢেঁকি দ্বারা চাউল প্রস্তুত অপেক্ষা কলে চাউল প্রস্তুতের খরচ অনেক কম এবং চাউলের মূল্যও তজ্জন্য সুলভ। অবশ্য কল-ওয়ালা ও ব্যাপারীগণ সাধারণ খরিদ্দারকে সেরূপ 'পড়তা কমতির' সুবিধা উপভোগ করিতে দেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। অন্য দিকে ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, চাউল প্রস্তুত শিল্পে ধান্য কাটাই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তুতীকৃত চাউল বাজারে প্রেরণ পর্য্যন্ত, নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া গ্রামাঞ্চলের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। বস্তুতঃ এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া খুব বড় না দেখাইলেও দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া চাউল প্রস্তুতই যে ভারতের বৃহত্তম শিল্প, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কলের সমধিক প্রচলন হইলে এই সমুদয় গ্রাম্য লোকের জীবিকা অথবা উপজীবিকার যে ক্ষতি হইবে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কলে প্রস্তুত চাউলের ব্যবহার সম্বন্ধে আর একটি গুরু আপত্তি এই যে, উহা দেখিতে বেশ মুক্তাশুভ্র, চকচকে ও সুন্দর হইলেও দেশী প্রথায় প্রস্তুত চাউলের মত পুষ্টিকর নয়। ইহাতে কেবলমাত্র শ্বেতসার আছে; ধান্যের উপরের খোসা ও সাদা চাউলের মধ্যবর্ত্তী যে একটি লোহিতাভ পাতলা পর্দ্দা

দেখা যায়, উহাতেই সমধিক মাত্রায় আহার্য্যের প্রতিদ-উপাদান (Proteids) সঞ্চিত থাকে। ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটিলে এই পর্দ্দা একেবারে অপসৃত হয় না, কিন্তু যে প্রথায় কলে চাউল পালিস্ করা হয়, তাহাতে চাউলের প্রতিদ-অংশ (বাঙ্গালীর খাদ্যে যাহার একান্ত অভাব) লোপ পাইয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, উক্তরূপ মাজা চাউল ভক্ষণে শুধুই যে পুষ্টির লাঘবতা হয়, তাহা নহে; খাদ্যে বিশেষ বিশেষ পদার্থের অভাবের জন্য যে সমস্ত ব্যাধি (Defeciency-diseases) হয়, সেরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বস্তুতঃ বেরি-বেরি (Beri-Beri) নামক ব্যাধির সহিত মাজা চাউল ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য উপযুক্ত প্রথা অবলম্বনে কলের চাউল চাউলের কঙ্কালাবশেষ না হইয়া সমস্ত পুষ্টিকর উপাদান-সংবলিত 'পূরা' চাউলও হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ চেষ্টা এখনও করা হয় নাই।

চাউলের কলের প্রসার

১

ভারতের নানা প্রদেশে চাউলের কল থাকিলেও ব্রহ্মদেশেই চাউলের কারখানা-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। নিম্ন-ব্রহ্মের শতকরা ৯০ ভাগ কর্ষিত জমীতে ধান্য উৎপাদিত হয় এবং সমস্ত ধান্য ফসলের চু'য়ের তিন ভাগ এই অঞ্চলেই জন্মে। বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ব্রহ্মদেশের চাউলই ভারতকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাউল রপ্তানীর দেশ করিয়া রাখিয়াছে। ভারত হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ২০ লক্ষ টনেরও অধিক চাউল রপ্তানী হয়; তাহার মধ্যে এক ব্রহ্মদেশ হইতেই ১৬ লক্ষ টনের অধিক চাউল যায়। বস্তুতঃ রেঙ্গুন চাউলই য়ুরোপীয় চাউল ব্যবসায়ের ভিত্তি-স্বরূপ। সমস্ত ব্রহ্মদেশে যে কতগুলি চাউলের কারখানা আছে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারী অভিজ্ঞরা মনে করেন যে, ২০ জন অথবা ততোধিক সংখ্যক মজুর নিযুক্ত করে, এরূপ অন্যূন ৩ শত কল উক্ত দেশে আছে এবং ঐগুলি হইতে বৎসরে ৬০ লক্ষ টন আধছাঁটা চাউল প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশের চাউল-ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, ধান ঝাড়াইর পর রেলপথ দিয়া বস্তাবন্দী হইয়া অথবা নৌকার খোলে ঢালিয়া (শেষোক্ত প্রথাই অধিক প্রচলিত) কারখানায় আসিয়া পৌঁছে। কলে ধান্য সরবরাহের কাযে কারখানার নিজের দালাল, স্থানীয় মহাজন অথবা সাধারণ ধান-ব্যাপারী সকলেই নিযুক্ত থাকে। অনেক কলের নিজের নৌকা আছে; দালালগণের নিকট উপযুক্ত জামীন লইয়া সেই নৌকাগুলি দেওয়া হয়। সময়ে সময়ে দালাল নিজের নৌকাই জামিনস্বরূপ কলওয়ালার নিকট বন্ধক রাখে। ধানের গঞ্জের দূরত্ব হিসাবে একখানি নৌকা মাসে ৩।৪ বার ধান আনিতে পারে। নৌকা কারখানায় আসিলে উহাকে খালাস করিয়া দিতে এক দিনের অধিক দেরী হয় না। মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই কলওয়ালাগণ ধান্য সংগ্রহ-কার্য্য শেষ করে না। পূর্ব্বে গ্রামাঞ্চলে ধান্য খরিদ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না এবং বড় বড় আড়তও ছিল না। এক্ষণে কিন্তু চাষীগণ সমস্ত ধান্য একবারে বিক্রয় করিয়া ফেলে না; সুবিধামত বাজার দরের অপেক্ষা করে। এতদ্ভিন্ন সমবায় প্রথায় অথবা ব্যক্তিগত ভাবেও আজকাল এতগুলি গুদাম প্রস্তুত হইয়াছে যে, রপ্তানীর ধান্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে মজুত করিয়া রাখিতে পারা যায়।

চাউল-কলের কার্য্য

উপযুক্ত পরিমাণে ধান্য সঞ্চিত হইলে কল চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। কল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কল এমন স্থানে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক যে, এক দিকে সেখান হইতে চাউল বিক্রয়ের বাজার খুব অধিক দূরে নয় ও রাস্তা-ঘাটের সুবিধা আছে; অন্য দিকে সে স্থলে মজুর সুলভ। ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে পারা যায় এবং চাউল প্রস্তুত শিল্পের গৌণ দ্রব্যাদি (Bye-products) যথা তুঁষ, কুঁড়া, খুদ ইত্যাদি সহজে বিক্রয় করা চলে। সহরাঞ্চলে কল বসাইলে এই শেষোক্ত দ্রব্যাদি আবার 'বউনি' খরচ দিয়া গ্রামে আনিয়া বিক্রয় করিতে হইবে; সুতরাং যত দূর সম্ভব, কল গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চাউলের কল আজকাল অনেক প্রকারের হইয়াছে এবং ছোট বড় সকল রকম কলই আছে। কিন্তু সকল

প্রকার আদর্শের কলের কার্য্যপদ্ধতি মোটামুটি এক রকম। এ স্থলে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল। চাউল শিল্পের মূলতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান স্তর আছে বলিয়া ধরিতে পারা যায়:— (১) ধান্য ঝাড়াই; (২) ধান্য বাছাই; (৩) ভানাই; (৪) কাঁড়া ও আকাঁড়া চাউল পৃথক্করণ; (৫) ছাঁটাই ও মাজা; (৬) চাউলের শ্রেণীবিভাগ (grading); (৭) চক্‌চকে করা (glazing)।

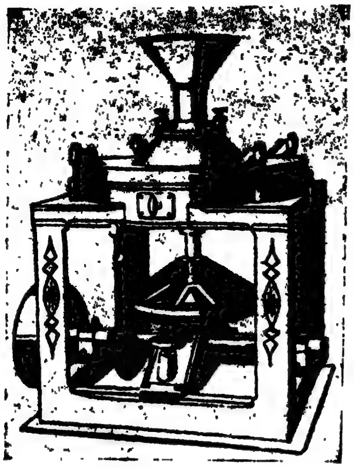

ধানভানা কল

প্রথম দুইটি স্তরের কার্য্য সমাধান করিবার জন্য এতদ্দেশে এখনও কলের প্রয়োগ হয় নাই। আপাততঃ ধান বাছাই হস্তপরিচালিত চালুনী, কুলা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। ধান-ভানার কলের সাধারণ নাম huller. ইহার কার্য্য ধান্যকে খোসা-বিচ্যুত করা, চিত্রের উপরিভাগে দৃষ্ট চোঙ্গে (funnel) পরিষ্কৃত ধান্য ঢালিয়া দিলে একবারের কার্য্যেই শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ধান্য ভানাই হইয়া বাহির হইয়া আইসে। কৃত্রিম পাথর দ্বারা জোড়াই দুইটি চক্রের সাহায্যে খোসা ভাঙ্গিবার কায হইয়া থাকে। অধিক দিন ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এই পাথর আবার নূতন করিয়া বসাইয়া লওয়া চলে। ৪র্থ স্তরের কার্য্য paddy separator নামক যন্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে। প্রথম কল হইতে তুঁষ, কুঁড়া এবং কাঁড়া ও আকাঁড়া চাউল বহির্গত হয়। উক্ত কলের সহিত যে চালুনী আছে, তদ্দ্বারাই চারিটি দ্রব্য অর্থাৎ তুঁষ, কুঁড়া, খুদ ও কাঁড়া-আকাঁড়া চাউল একত্র (cargo rice) পাওয়া যায়। ব্যবসায়ে 'fiv৪ parts cargo rice' বলিতে বুঝায় যে, উহাতে ৮০ ভাগ চাউল ও ২০ ভাগ ধান আছে। পূর্ব্বে এইরূপ cargo riceই যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পরিষ্কৃত চাউলই উহার স্থান অধিকার করিতেছে। Paddy separator নামক যন্ত্রের দ্বারা পৃথক্কৃত কাঁড়া চাউলকে আবার hullerএর মধ্যে দেওয়া হয়; তাহাতে যে আধ-ছাঁটা চাউল বাহির হইয়া আইসে, উহার ব্যবসায়িক নাম লুন্‌জেন্ (loonzain)। এই লুন্‌জেনই পূর্ব্বোক্ত cargo riceএর প্রধান উপাদান। এক শ্রেণীর চাউলের কল আছে—যাহা এই আধ-ছাঁটা চাউল প্রস্তুত করিয়াই কার্য্য সমাধা করে।

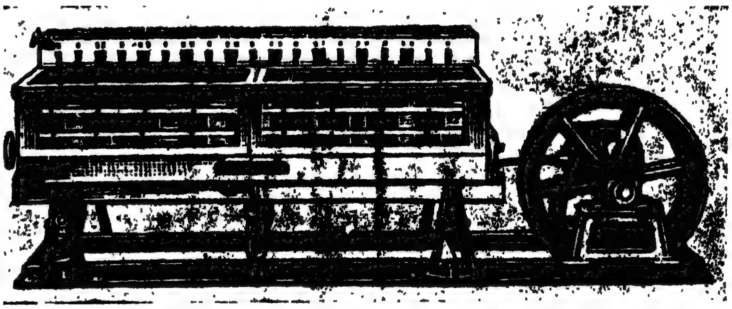

চাউল পৃথক্করণের যন্ত্র

পরিষ্কৃত ও শুভ্রবর্ণ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে White Rice Cone নামক যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক হয়। লুনজেন অথবা আধ-ছাঁটা চাউলের গাত্রে যে রক্ত অথবা ধূসরবর্ণের পর্দার অবশিষ্টাংশ থাকিয়া যায়, তাহা এই কল দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া চাউল একবারে শ্বেতবর্ণের হইয়া যায়। এই প্রধান অংশ emery composition মণ্ডিত cone ও তৎপার্শ্বে সজ্জিত বিভিন্ন আয়তনের ছিদ্রযুক্ত চালুনী কয়েকটি। এই চালুনীগুলির সাহায্যে চাউলের গুঁড়া ও খুদ পৃথক্ হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ ছাঁটা ও পরিষ্কৃত চাউল এই যন্ত্র হইতে পাওয়া যায়।

চাউল শ্বেতবর্ণ করিবার যন্ত্র

চাউলকে আরও নয়নমুগ্ধকর করিতে হইলে polishing cone নামক আর একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। এই মাজাই কল পূর্ব্বোক্ত White Rice coneএর আদর্শেই প্রস্তুত; বিশেষ পার্থক্য এই যে, White Rice coneএর cone emery composition মণ্ডিত এবং polishing coneএর cone চর্ম্ম অথবা বিশেষ প্রকারের মোটা ও শক্ত বস্ত্রমণ্ডিত। মাজা চাউলকে কলে চালিয়া ছোট বড় ও ভাঙ্গা দানা হিসাবে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিয়া গুদামজাত করা হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মাজা চাউলও কোন কোন শ্রেণীর লোকের পছন্দ হয় না। তাঁহারা অধিকতর চাকচিক্যশালী চাউল চাহেন। তাহাদের জন্য বিশেষ প্রকারে নির্ম্মিত ড্রুমে, তৈল অথবা গ্লেজের গুঁড়া অথবা তরলসার সংযোগে চাউল প্রস্তুত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ glazed rice দেখিতে খুবই চমৎকার এবং সাহেবদিগের কতিপয় শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুতের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী; কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এগুলি সখের খাদ্য—প্রধান কিংবা পুষ্টিকর খাদ্য নহে।

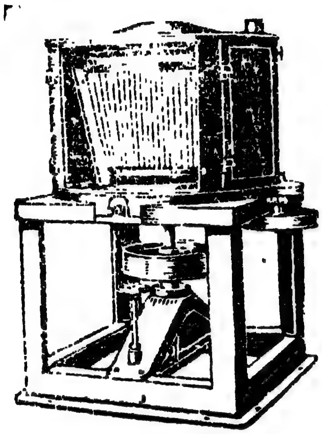
চাউল মাজাইয়ের যন্ত্র

সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের দেশে সিদ্ধ চাউলের চলনই অধিক। পক্ষান্তরে বিদেশে, যেখানে ভারতের লোক আছে, সেরূপ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও সিদ্ধ চাউলের কাটতি নাই বলিলেই চলে। সেই জন্য রপ্তানীর চাউল অধিকাংশই আতপ। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে সরু মোটা ধান হিসাবে এক দিন বা ততোধিক সময় ভিজাইয়া রাখিতে হয়; তৎপরে উহাকে আধ ঘ। হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয় এবং ধান্য শুষ্ক হইলে উহাকে কলে দেওয়া হইয়া থাকে। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিলে শতকরা ৬৮ ভাগ ও আতপ চাউল করিলে শতকরা ৫০ ভাগ চাউল পাওয়া যায়। সিদ্ধ চাউল খাইতে সুস্বাদু এবং অধিক দিন স্থায়ী হইলেও ইহা প্রস্তুতের একটি অসুবিধা আছে। ধান সিদ্ধ করার ব্যয় ত আছেই, তদ্ভিন্ন শুষ্ক করিবার সময় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গেলে অথবা শীঘ্র শীঘ্র উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে ইহাতে এমন এক প্রকার গন্ধ হয় যে, আর খাওয়া চলে না। আতপ চাউল প্রস্তুতে এই অসুবিধা নাই বলিয়া বৎসরের সকল সময়েই ইহা প্রস্তুত করা চলে; বর্ষাকালে কিন্তু সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত অনেক স্থলে বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু কৃত্রিম তাপ দ্বারা ধান্য শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করিলে সেই অসুবিধায় আর ভুগিতে হয় না। ধান্য সিদ্ধ করার ও উষ্ণ বায়ু সাহায্যে শুষ্ক করিবার ২।১ দেশীয় কল বেশ কার্য্যকর হইয়াছে।

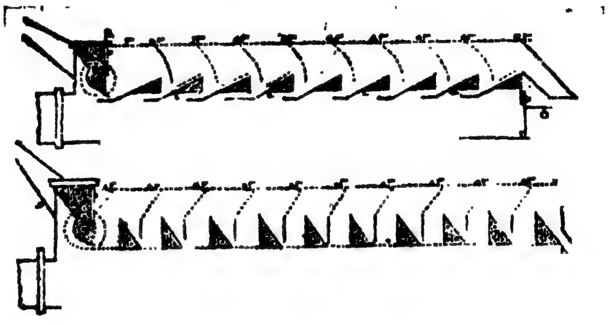
ধান্য সিদ্ধ ও শুষ্ক করিবার যন্ত্র

আমরা বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের ধান্যকলসমূহের গুণাগুণ আলোচনা করিতে এ স্থলে বিরত থাকিলাম। এত প্রকারের কল আজকাল প্রস্তুত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি আপনার আবশ্যকমত হস্ত-চালিত, পশু-চালিত অথবা তৈল কিংবা বাষ্প এঞ্জিন-পরিচালিত কল সহজেই পাইতে পারেন। ছোট ছোট সহর অথবা বড় বড় গঞ্জের জন্য পশুবলের কলই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বে যে কয়েকটি কলের উল্লেখ করিয়াছি, একটি সম্পূর্ণ কারখানা গঠন করিতে হইলে সেগুলিকে এক স্থলে বসান আবশ্যক। তাহাতে অবশ্য মূলধন অধিক দরকার। কিন্তু glazing ও polishing কল ইত্যাদি বাদ দিলে খরচ

অনেক কম হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ঝাড়া, বাছা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ এক সেট্ huller ১২ শত টাকায় পাওয়া যাইতে পারে। যদি ১২ অশ্ববলের একটি এঞ্জিন দিয়া উক্তরূপ ৭ সেট্ হালার একসঙ্গে চালান যায়, তাহা হইলে এঞ্জিন সমেত সমস্ত কল-কব্জার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব। কারখানায় যদি বাড়ী প্রস্তুত করিতে হয়, তবে তাহার খরচ স্বতন্ত্র। এরূপ কারখানায় প্রতিদিন ১ শত ২০ মণ চাউল প্রস্তুত হইতে পারে। সমস্ত প্রকার খরচ হিসাব করিয়া প্রত্যহ ১০৲ টাকা ধরিলে টাকায় ১২ মণ চাউল তৈয়ারী হয়। তাহা দেশীয় প্রথায় চাউল তৈয়ারী অপেক্ষা যে অনেক সুলভ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহা অপেক্ষাও যাঁহারা ছোট কল বসাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২ অশ্ব-বলের ছোট হালার ১ জোড়া বলদ দিয়া চালাইতে পারেন। তাহাতে প্রত্যহ ৭ মণ চাউল হইতে পারে এবং সর্ব্বসমেত কলকব্জার জন্য দেড় হাজার টাকার অধিক ব্যয় হওয়া সম্ভব নহে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বঙ্গনারীর লাঞ্ছনায়

তোমার লাগিয়া সতী
কেঁদেছিল পশুপতি,
ভেসেছিল প্রজাপতি—
দক্ষেরি যাগ।

ধরা হ'লে কম্পিত,
সুর নর শঙ্কিত,
জ্বেলেছিল দাবানল—
মহেশের রাগ।

ছলে বলে দশানন
হরিয়া সে সতী-ধন
লুকাইল লঙ্কায়—
জলধির মাঝে;

লঙ্কা পুড়ে হলো ছাই,
চিহ্নও কোথা নাই,
কলঙ্ক শুধু আছে—
বিশ্বেতে রাজে।

* *

হায়, আজি ঘরে ঘরে
দুষ্ট অধম করে—
সেই সতী লাঞ্ছিতা;
পশুর সমান।

বাংলার হিঁদু মোরা
এমনি কপাল পোড়া,
পারিনে পরাণ দিয়ে—
বাঁচাতে সে মান?

নাহি বটে সেই কাল,
তেজোময় সুবিশাল
ক্ষত্রিয়—দ্বিজ সেই—
বীরের সমাজ;

তুমি আজো সেই নারী,
ভারতের কাণ্ডারী,
স্নেহময়ী কল্যাণী—
রত গৃহ-কাষ।

মন্দিরে পূজারিণী,
চির-বাধা-নিবারিণী,
করমে সচিব, প্রাণ—
তুমি উৎসবে;

তোমা লাগি আমাদের
সংসার ও সমাজের
যাহা কিছু গৌরব,—
বিদিত এ ভবে!

সবি আছে, কোথা তবে—
দানবের মত্তাহবে
সতী তব মান তরে—
ভৈরবী খেলা?

করালী সে কাল-বেশে
উল্লাসে হেসে হেসে
উত্থিত অসিতলে—
মরণের মেলা?

কার পানে চেয়ে আছ?
আজ নারী,—নিজে বাঁচ;
এ দেশ ত ম'রে গেছে,—
সবি প্রাণহীন;

এত বড় দেশ ভ'রে
শব সম আছে প'ড়ে
ধিক্কৃত ক্লীব মত—
চেতনা-বিহীন!

মিছে কেন কাঁদ মাতঃ?
কর কর সঞ্জাত
ষড়ানন সম বীর—
সতেজ সন্তান;

জাগুক এ লাঞ্ছিত,
স্বাধীনতা-বঞ্চিত,
করুক মরণ-পারে—
অমৃত সন্ধান!

আন ফিরে বাংলায়
প্রতাপ কেদার রায়,
ঈশা, শঙ্কর বীর—
সে মোহনলালে;

তুই ছুটে আগে চল্,
পশ্চাতে বীরদল,
রণসাজে সজ্জিত—
জয়-টীকা ভালে।

আবার কাঁপায়ে জল,
আকাশ ধরণী-তল,
ডুবাও দানব-শির—
পাতকীর রক্তে!

জয় সতী জয় রবে
ত্রিলোক ত্রাসিত হবে,
সতীর অতীত তেজ—
গা'বে পুনঃ ভক্তে!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

প্রতারক

৮

স্নেহের ভগিনী ইভ,

তোমার পত্র পাইয়া যেমন আনন্দ পাইলাম, তেমনই দুঃখও হইল। তুমি যে সুস্থ-শরীরে স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়াছ, ইহাতে যে আমি কত আনন্দ পাইয়াছি, তাহা তোমায় পত্রে কি জানাইব? ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া স্বামীর প্রেমে সুখী হও—ইহার অধিক শুভকামনা আর কি করিব? দুঃখ এই, তুমি অবুঝের মত নিজের সুখকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া অতৃপ্তি ও অশান্তিকে অনর্থক আঁকড়িয়া ধরিয়া আছ।

তুমি লিখিয়াছ, স্বামীর প্রতি ভালবাসা তোমার অফুরন্ত, অগাধ, অপরিমেয়। আমিও তাহা বুঝিয়াছি। যে কয় দিন এখানে তোমার সহিত মেলামেশা করিবার অবসর পাইয়াছি, সেই কয় দিনেই বুঝিয়াছি, তোমার স্বামিপ্রেম কিরূপ। এত প্রেম সত্ত্বেও তোমার বিবেক তোমাকে বলিয়া দিতেছে, প্রতারক স্বামীকে দূরে রাখিতে। তোমার মন সংশয়-দোলায় দুলিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে,—কোন্ পথে যাইবে তুমি! বোন্, তুমি যদি হিন্দুর মেয়ে হইতে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য তোমায় খুঁজিয়া লইতে হইত না। আমাদের হিন্দুর মেয়ের সকলের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, কোনও দ্বিধা না করিয়া সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া। হয় ত তোমাদের সমাজে অবিচারিতচিত্তে অপরাধী স্বামীকেও ভালবাসিতে নিষেধ আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামি-প্রেমের স্বামি-সেবার বিচার-অবিচার নাই। স্বামীর অনুগামিনী হওয়ায় নারীত্ব-মর্য্যাদা আমাদের সমাজে ক্ষুণ্ণ হয় না।

হয় ত তুমি বলিবে, আমি কেন অবিচারিতচিত্তে স্বামীর অনুগামিনী হই নাই। কিন্তু তোমায় আমায় প্রভেদ অনেক। পরিত্যক্তা নারীর স্বামীর অনুগমনে অধিকার নাই। আমাদের আদর্শ পত্নী সীতা পতির দ্বারা বনবাসে পরিত্যক্তা হইয়া স্বামীর অনুগমন করেন নাই, কেন না, তাঁহার সে অধিকার ছিল না। কিন্তু তুমি স্বামি-পরিত্যক্তা নহ, বরং তুমিই নিজে স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছ। যদি তুমি আমাদের সমাজের হইতে, তাহা হইলে তোমার ভ্রম বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, হয় ত সে অধিকার আমার থাকিত। কিন্তু তোমাদের ও আমাদের সমাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার আমাদের সহিত মিলে না, এ অবস্থায় আমি তোমায় কি বুঝাইব?

তবে এক অধিকারে তোমায় আমায় ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। তুমিও আমার মত নারী। জগতে সকল দেশের সকল নারীরই একটা সাধারণ আদর্শ আছে, একটা সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, একটা সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। বিশেষতঃ তোমার মন যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে তোমাকে বুঝাইয়া বলিবার,—তোমার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার অধিকার আমার খুবই আছে। এই অধিকারের জোরে আমি তোমায় বলিতে চাই যে, তুমি স্বেচ্ছায় নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ বলি দিও না। আমি জানি, তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। হয় ত ক্ষণিকের মোহ তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিক,—সে মেঘ সরিয়া যাইতে কালবিলম্ব হয় নাই। আমি জানি, তোমার পীড়ার সময়ে তিনি কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে তোমার সেবা করিয়াছিলেন, তোমায় হারাইবার ভয়ে তিনি প্রায় উন্মত্তের মত হইয়াছিলেন। তুমি সৌভাগ্যবতী, সামান্য অভিমানভরে অথবা নারীত্ব-মর্য্যাদা-নাশের বৃথা আশঙ্কায় প্রিয়কে দূরে রাখিও না, নারীর

ঈপ্সিতকে হেলায় হারাইও না। আমি কায়মনে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া তোমায় এমন পরামর্শ দিতে সাহসী হইলাম। এই প্রগল্‌ভতায়—এ ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্ট হইও না, ইহাই তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীর একান্ত অনুরোধ।

তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে মাতাজীকে দেখিয়াছিলে, মনে পড়ে? তিনি তোমার কথা প্রায়ই বলেন। তিনি বলেন, সংসারী গৃহীর সংসারধর্ম্মই বড়, স্বামি-অনুরাগই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। আমি জানি, তুমি স্বামীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাস। তবে কেন মিথ্যা অভিমানে নিজেই প্রাণে রাবণের চিতা জ্বালাইতেছ? তুমি বোধ হয় জান না, আমাদের দেশে কথায় বলে, রাবণের চিতা। এ চিতা একবার জ্বলিলে ইহার আর নির্ব্বাণ নাই। তবে?

যেখানেই থাক, জানিও, আমি কায়মনে তোমার সুখ ও শান্তি কামনা করি। যখন মনে হইবে, আমায় পত্র দিও। আমি যেখানেই থাকি, তোমায় জানাইব। কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিও না। আমার কথা কেবল তুমিই জানিয়া রাখিও। জগবন্ধুর কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাক, শান্তি পাও। ইতি

তোমার স্নেহের ভগিনী,
প্রতিমা দেবী।

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে ইভের মুখে চোখে একটা অপার্থিব আনন্দ ও উৎসাহের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। এরাই 'হিদেন?' খৃষ্টান পাদরীরা এদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন? কি ভুল ধারণা! প্রতিমার মত মেয়ে কোন্ দেশে কয়টা জন্মগ্রহণ করে? এত স্বার্থত্যাগ এদের ভিতরে? হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর পতিপ্রেম—সে প্রেম অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, অথচ ত্যাগের আবরণে তা ঢেকে রাখে, কাউকে জানতে দেয় না। কি লুকাবে আমায় প্রতিমা? তুমি আমায় পরামর্শের আবরণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের যে নিভৃত স্থান উন্মুক্ত ক'রে দেখিয়েছ, তাতে কি বুঝতে পারছি না, তুমি কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছ? আমি নারী—তোমায় বুঝতে ত আমার কষ্ট হয় নি। তুমি যা স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে দেবতার দান ব'লে আমার হাতে তুলে দিয়েছ, তোমার ত্যাগের সম্মান রক্ষা করতে এবার আমি তা মাথায় পেতে নেবো। ইন্দু! ইন্দু! তুমি অন্ধ। কি রত্ন হাতে পেয়েও দূরে ফেলে দিয়েছ, তা ত এখনও জানতে পার নি।

এ আমি কচ্ছিলুম কি? সত্যই ত নিজের হাতে নিজের জীবন-নাশা বিষের বড়ী তৈরী কচ্ছিলুম! ইন্দু—ইন্দু—প্রাণাধিক,—তোমায় যে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারি নি কেন, তোমায় ছাড়বার কথা মনে হ'লে মৃত্যুদণ্ডের মত মনে হয় কেন, তা এই পত্রই ত আমায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনাধিক,—তোমায় কাছে রেখেও দূরে রেখেছি, সত্যিই ত মিথ্যে অভিমান ক'রে—সয়তানের বুদ্ধি ঘাড়ে চেপেছিল ব'লে। কে বড়? তোমার ভালবাসা বড়, না মিথ্যে অভিমান বড়? ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি কচ্ছিলুম! সামনে শান্তির শীতল প্রস্রবণ থাকতেও সাহারার ধূ ধূ বালির রাশিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলুম! প্রতিমা, বোন্, আমার শিক্ষাদাত্রী,—কি দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করব? ভালবাসার পাত্রকে তার সুখের জন্যে অপরের হাতে সঁপে দিতে এক বিন্দু কাতর হও নি—একটুও তোমার বুক কাঁপে নি—এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল নি তুমি, এত বড় ভালবাসা তোমার! এ দেখেও আমার প্রাণাধিককে মনে কষ্ট দিয়ে মিথ্যে অভিমানকে বুকে ক'রে ব'সে আছি? ছিঃ ছিঃ, ধিক্ এমন অভিমানে!

ইভের নীলোৎপল নয়ন দুইটি অশ্রুধারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় ভাবাবেশে উদ্বেল হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীরের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। এ কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতি—এ কি অচিন্তনীয় শান্তির অনুভূতি! তখনই ইভের মনে মধুর মিলনের পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই যে বিবাহের প্রথম প্রভাতে আনন্দশিহরণের অরুণরাগে দশদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ যেন তাহারই অনুভূতি আবার তাহার অন্তরে ফিরিয়া আসিল। সেই প্রেমের বন্ধন—সেই অন্তরে অন্তরে মিলন—সেই প্রেমাস্পদের সহিত আদরের খেলা—সেই মধুবাসরের সুখস্বপ্নময় জীবনলীলা—একে একে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। হেলায় সে ভগবানের এই দান দূরে নিক্ষেপ করিতেছে! কি মোহ তাহার!

ত্বরিতপদে ইভ উঠিয়া দাঁড়াইল। গভীর আবেগ ও প্রেমভরা হৃদয় লইয়া সে স্বামীর শয়নকক্ষে ডালি দিতে

অগ্রসর হইল। আজ তিন মাসেরও অধিক কাল স্বামী স্ত্রী স্বতন্ত্র বাস করে—মিলনের বন্ধন সে ত স্বহস্তেই ছেদন করিয়াছে। বড় আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে বুকভরা প্রেমের সঙ্গে অনুতাপ মিশাইয়া স্বামীর সান্নিধ্যে আপনাকে আবার তেমনই করিয়া বিলাইয়া দিতে চলিল।

কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, স্বামী শয্যার উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ইভ কক্ষদ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—পা আর যেন চলে না। এই পরিচিত অথচ অপরিচিত কক্ষ,—এই বড় আপনার অথচ বড়ই পর স্বামী, এই আনন্দ-শিহরণ অথচ লজ্জা ও সঙ্কোচ,—সে কোন্ দিকে যায়? এই ত সম্মুখে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর স্বামী একবার অস্ফুটস্বরে যেন তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'ইন্দু ডার্লিং! কিন্তু না, তাহার মনের মধ্যে কথাটা উচ্চারিত হইয়া বিলীন হইয়া গেল। ইভ নির্নিমেষ-নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কি, পা কাঁপে কেন? এই স্বামীর সহিত সে ত কিছু ব্যবধান রাখে নাই—তবে, তবে এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ—এ দ্বিধা কেন? এও কি তবে তাহার অভিমানের মত মিথ্যা? তবে স্বামীকে তাহার আপনার বলিয়া মনে হইতেছে না কেন—যেন, যেন পরপুরুষ, যেন অপরিচিত, যেন দূরের—বহু দূরের, তাহার অন্তর হইতে দূর-দূরান্তরের। ছিঃ ছিঃ, এখনও সংশয়, এখনও অভিমান!

হঠাৎ বিমলেন্দু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল; সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায় কি একটা কথা বলিল। ইভের বুক গুরু-গুরু কাঁপিয়া উঠিল, শরীরের রক্ত শন্ শন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল, সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, স্বামী অস্পষ্ট স্বরে যাহা বলিতেছেন, তাহার মধ্যে একটা কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—'প্রতিমা! প্রতিমা!'

ইভ স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চল পুত্তলের মত দণ্ডায়মান হইল। কক্ষের মধ্যে একটি পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, ঠিক তেমনই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার শুনিল, স্বামী নিদ্রিতাবস্থায় বলিতেছেন, 'দেখা দিতেও দোষ, প্রতিমা!'

দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, ইভের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ইভ কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষদ্বার আঁকড়িয়া ধরিল দুর্ব্বল শরীর তাহাতে আঘাতের পর আঘাত—কুসুমপেলব কোমল প্রাণ সহ্য করিতে পারিল না। টলিতে টলিতে ইভ নিজকক্ষেই ফিরিয়া গেল।

১৯

আকাশ নির্ম্মল—উজ্জ্বল রবিকরে পুরী হাসিতেছে। রামপ্রাণ বাবু আজ কয় দিন হইতে বড়ই অন্যমনস্ক—পুরীর এই সুন্দর মূর্ত্তিও তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিতেছে না। যেন কি নাই—যেন কিসের একটা অভাব তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, পুরী আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। আজকাল প্রতিমা প্রায় বাড়ী থাকে না, শৈলর প্রতি তেমন টানও আর যেন তাহার দেখা যায় না, সে প্রায় স্বর্গদ্বারের মঠেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। সেখানে তাহার নূতন মঠ-বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। প্রকাণ্ড ইমারতের ভিত্তি-পত্তন হইয়া গিয়াছে। গোপুর, দেবার্চ্চনা, নাটমন্দির, ভোগশালা, অতিথিশালা, যোগাশ্রম,—একে একে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতিমা যেন তাহাতেই মস্গুল হইয়া আছে।

এত দিন পিতা-পুত্রী পরস্পরের অবসরের অবলম্বন ছিল। এখন যেন তাহাতে অন্তরায় দেখা দিতেছে, দুই জনে কাছে থাকিয়াও যেন পরস্পর দূরে সরিয়া যাইতেছে। রামপ্রাণ বাবুর হৃদয়ের শূন্যতার ইহাই কি কারণ? প্রতিমাও কি এইরূপ শূন্যতা অনুভব করিতেছে? সেই জন্যই কি সে এখন এমনই করিয়া মঠের কাযে ডুবিয়া থাকে? তবে কি সে এখনও মন সংযত ও দৃঢ় করিতে পারে নাই?

রামপ্রাণ বাবুর মনটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তবে তিনি প্রতিমার সুখের পথে যে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন, তাহা কি এখনও উৎপাটিত হয় নাই? সে কি তাহা হইলে তাঁহার কন্যার উপযোগী নারীত্বের আত্মসম্মানজ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই? এ বিষয়ে তিনি প্রতিমার সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব হইলেন।

রামপ্রাণ বাবু শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে ডাকিলেন, "প্রতিমা!" প্রতিমা সেই মুহূর্ত্তে স্নানান্তে জগবন্ধু দর্শন করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল। বাপের ডাকে ভিতরে না গিয়া বাহিরের ঘরেই প্রবেশ করিল, সঙ্গে শৈল ও বৃদ্ধ দ্বারপাল।

'ডাকছো আমাকে বাবা ?'—বলিয়া প্রতিমা শৈলকে আর্দ্রবস্ত্রাদি ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। দ্বারপাল মহাপ্রসাদ রাখিয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। প্রতিমা বলিল. "আজ আর আমাদের কোণারক যাওয়া হবে না বাবা, মাতাজী বলেছেন. আজ মঠে কাঙ্গালী খাওয়াতে হবে।"

রামপ্রাণ বাবু স্নেহপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার যে দিন সুবিধা হবে, সেই দিন যাব, তার জন্য কি ? তুমি যা করতে ইচ্ছে কর মা, তাই কর। তোমার এই বুড়ো ছেলেটার দিকে মাঝে মাঝে একটু চেও, এইটুকুই তোমার কাছে ভিক্ষে চাই।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কেন বাবা, ছেলের কি কোন অযত্ন হচ্ছে ?"

"না মা, তা না। তবে কি জান, বুড়ো বয়সে কথায় কথায় অভিমান হয়। তুমি একটু চোখের আড়ালে থাকলেই মনে হয়, মা আমায় ভুলে গেছে। হাঁ মা, মঠটাই কি তোমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছে ? সত্যি বলছি, মঠের উপর আমার হিংসে হয়। এমন যে শৈল, তাকেও যেন তুই মঠের জন্যে দূরে রেখেছিস, মা।"

প্রতিমা পুনরপি হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন বাবা, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। তোমায় যে দিন ভুলে যাব, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" প্রতিমার চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া আসিল।

"ছি মা, ও কথা বলে না। বলছিলুম কি, পুরীতে আর ক-দিন থাকবে, এইবার কলকেতায় ফিরে যাই চল না। তুমি বুদ্ধিমতী, যা আছে, সব বুঝে নিতে হবে ত। আমি আর ক'দিন ?"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "ছি বাবা, তুমি ও কথা বলছ কেন ? আমায় বারণ করলে, আর নিজেই ত বলছ।"

রামপ্রাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আর তুমি ? আমার সময় হয়েছে, শীগ্‌গিরই ডাক পড়বে। তোমার সামনে এখন তোমার সমস্ত জীবনটা প'ড়ে রয়েছে।"

প্রতিমা উত্তর দিতে যাইতেছিল, রামপ্রাণ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "ব'স মা, অনেক কথা আছে। প্রসাদ কিছু পেয়েছ ত? বেশ। দেখ মা, কেউ চিরদিন বাঁচে না, আমারও ভাল-মন্দ আছে। বয়েস হয়েছে, কোন্ দিন ছুটী নিয়ে যেতে হবে, কেউ বলতে পারে না। তাই বলছিলুম কি, এই যে আমার বিষয়-আশয়, ধন-দৌলত,—এ সব ত তোমারই, মা। তাই এখন থেকে সব বুঝে সুঝে না নিলে আমার অবর্ত্তমানে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে, পাঁচ জনে লুটে পুটে খাবে। বিষয় তোমার—তোমার যা ইচ্ছে হবে, বিষয় থেকে তাই করবে। তবে তার জন্যে হাতে-কলমে কায শেখা চাই ত। পুরীতে বা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ালে তা হবে কি ক'রে ? তাই বলি, চল কলকেতায় ফিরে যাই। এত দিন হাতে ধ'রে যেমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তেমনই ক'রে বিষয়ের কায-কর্ম্মও শেখাব। কি বল ?"

প্রতিমা কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তাহার পর নখাগ্রে সম্মুখস্থ টেবলটা খুঁটিতে খুঁটিতে অধোবদনে গম্ভীরস্বরে বলিল, "এত বড় বিষয় নিয়ে আমি কি করব ? আমি মেয়েমানুষ, আমার বিষয়-বুদ্ধিরই বা প্রয়োজন কি ? বিষয় তুমি ঠাকুরের নামে ক'রে দিয়ে যাও। যাতে গরীব-দুঃখী প্রতিপালন হয়, যাতে অভাবগ্রস্ত ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধে হয়, তেমন বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমার জন্যে ভেবো না বাবা. মাতাজীর মঠের একটা কোণে আমার মত একটা প্রাণীর যথেষ্ট ঠাঁই হবে। তবে শৈলর লেখা-পড়া আর স্থিত-ভিতের জন্য যা হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিও, তা হলেই আমার জীবনে আর কোনও সাধ অপূর্ণ থাকবে না।"

স্থানটায় গভীর নীরবতা দেখা দিল। রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, গভীর অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, মনে হইল, যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদস্বরে তিনি বলিলেন, "তবে কি মা, তুই সত্যিই যৌবনে যোগিনী সাজতে মন করেছিস্ ?"

রামপ্রাণ বাবুর গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

প্রতিমার নয়নযুগলও শুষ্ক ছিল না। কিন্তু সে অসাধারণ শক্তির জোরে চোখে জল অথচ মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "বাবা যেন কি ! কেন, যোগিনী সাজতে যাব কেন ? আমার কি হয়েছে ? আমি কি গেরুয়া রুদ্রাক্ষি নিয়েছি না কি ?"

রামপ্রাণ বাবু ত্রস্তে উঠিয়া কম্পিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার মাথায় হাত রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,

"তবে, তবে বল মা, তুই আর আমায় এমন ক'রে যাতনা দিবি নি ? বল, তুই আমার প্রতিমাই থাকবি ? আমি ত তোকে আবার সংসারী করতে চেয়েছিলুম—তোর জন্যে ত ধর্ম্মত্যাগ পর্য্যন্ত করতে চেয়েছিলুম –"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "ছি বাবা, আবার ও কথা কেন ? যা হবার নয়, তা ব'লে আবার কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ, আপনিও কষ্ট পাচ্ছ ? আমরা বাপে ঝিয়ে ত বেশ আছি।"

রামপ্রাণ বাবু তখনও কাঁপিতেছিলেন, বলিলেন, "কৈ তা থাকছিস মা ? বল, মঠে গিয়ে বাস করবিনি—বল, সংসারে থেকে বিষয়-আশয় দেখবি ? কেন, সংসারে থেকে কি মানুষের উপকার করা যায় না, আপনার কায করা যায় না ? এই ত আমাদের দেশে কত বড় বড় লোক জন্মে গেছেন। তাঁরা সংসারে থেকেও সংসারের বিলাসে আরামে গা না ঢেলে দিয়ে মানুষের কত উপকার ক'রে গেছেন। দেশে কত দরিদ্র আছে, কত অভাবগ্রস্ত আছে, কত প্রার্থী আছে,—তাদের দুঃখ অভাব দূর করবার চেষ্টা কর না, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-দেবতার পূজো-আচ্চা কর না।"

প্রতিমা এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, বলিল, "তাই ত করবার চেষ্টা করছি, বাবা। মাতাজীর মঠে যে কায আরম্ভ হয়েছে, তা যদি শেষ করতে পারা যায়, তা হ'লে তুমি যা বলছ বাবা, তাই হবে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা করতে ত আমি তোমায় বারণ করিনি। কিন্তু তোমার নিজের সবটা ত পরের জন্যে বিলিয়ে দিচ্ছ, নিজের জন্যে কি এমনই ক'রে এই বয়েস থেকেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে ?"

প্রতিমা বলিল, "কেন বাবা, আমি ত সব সুখ, সব আরামই ভোগ করছি, আমি ত সব ছেড়ে দিয়ে মাতাজীর মত তপস্বিনী হইনি।"

রামপ্রাণ বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "গেরুয়া চিমটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই যে তপস্বিনী হয়, তা আমি মানতে চাইনি। তোমার বয়সে সংসারে সকল ভোগ হ'তে আপনাকে তফাতে রাখলেই তাকে তপস্বিনী হওয়া বলে। তুমি ত মা অবুঝ নও, লেখাপড়াও যে শেখনি, তা নয়। জনক রাজা গেরুয়া চিমটে নিয়ে বেরুননি। কিন্তু তা হলেও তিনি সকল সাংসারিক ভোগ-বিলাসে অনাসক্ত ছিলেন। তোমার বয়সে তাই হওয়া কি ভাল দেখায় ?"

প্রতিমা বলিল, "আপনার উন্নতি করার কি সময় অসময় আছে ? মাতাজী বলেছেন, মানুষ সকল অবস্থাতেই আত্মার উন্নতি করতে পারে, এর সময় অসময় নেই। ভগবানের উপর ভালবাসা আনতে হ'লে, মানুষের সেবা করতে হ'লে, সকল বয়সেই করা উচিত। এর কি সময় অসময় আছে ?"

রামপ্রাণ বাবু নীরব হইলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রতিমার মনের গতি কোন্ দিকে প্রসারিত হইয়াছে। দুঃখে, ক্ষোভে তাঁহার অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা রাগ হইল তাঁহার নিজের উপর। তিনিই ত স্নেহময়ী কন্যার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ। তিনি যদি নিজের জিদের জন্য জামাতা সম্বন্ধে দুর্জ্জয় পণ করিয়া না বসিতেন, তাহা হইলে ত এমন হইত না। কি করিলে আবার যেমন ছিল, তেমন হয়! তাহা ত আর হইবার নহে। তাঁহার জামাতাও জিদের বশে যাহা করিয়া বসিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবার নহে। অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি মাথাটা গুঁজিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল।

প্রতিমা কাছে আসিয়া পিতার শাদা মাথাটার উপর হাত রাখিয়া ব্যথিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কাতরস্বরে বলিল, "কেন বাবা, এত বিমর্ষ হচ্ছ ? নারীর বিবাহিত জীবন ছাড়া কি আর কোনও জীবন যাপন করতে নেই ? এমন ত কত নারী বিবাহই করেন না।"

রামপ্রাণ বাবুর গণ্ড বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "যাঁরা করেন না, তাঁরা করেন না। যাঁদের সংসারে অবলম্বন নেই, তাঁরা এমন ভাবে কাটিয়ে গেলে সমাজের ক্ষতি হয় না। কিন্তু তোমার আর কিছু অবলম্বন না থাক, অন্ততঃ আমি আছি। তুমি ত জান না, মা-হারা মেয়েকে আমি কি ক'রে এত দিন বুকে ক'রে মানুষ করেছি! আমার আর কি অবলম্বন আছে ?"

বলিতে বলিতে ধীর, স্থির, গম্ভীর রামপ্রাণ বাবুর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল,

অস্থির, অশান্ত বালকের মত তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতিমার নয়নযুগলও অনার্দ্র ছিল না, তাহারও ভাবাবেশে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে কোনও কথা হইল না। তাহার পর অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "আর আমি কিছু বল্‌তে চাই নে। তুমি সবই বোঝ মা। কেবল এই বুড়ো বাপের একটা অনুরোধ, নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমায় কষ্ট দিও না। বুঝছি, পরের কাযে ডুবে থেকে তুমি সব ভুল্‌তে চাইছ। কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সাধনা সফল হোক। কিন্তু তবুও ভিক্ষে চাচ্ছি, যে কটা দিন বেঁচে থাকি, স্বামীর উপর অভিমান ক'রে সব ছাড়লেও আমায় ছেড়ো না।"

প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সে কি কথা, বাবা? তোমায় ছাড়বার চেষ্টা করলেও কি ছাড়তে পারবো? হাজার কাযে ডুবে থাকলেও তোমার কাছ-ছাড়া হবার আমার সাধ্য নেই। আমি কি জানিনি, তুমি আমার কে, বাবা?"

হঠাৎ ঘরের বাহির হইতে এক জন ভৃত্য বলিল, "বাবু, তার এয়েছে।"

উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। রামপ্রাণ বাবু মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তার? কোত্থেকে? কই, নিয়ে এস।"

ভৃত্য একখানা লাল খাম রাখিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল। শিরোনামা পড়িয়া রামপ্রাণ বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ কি, এ যে তোমাকেই লিখছে। কে লিখলে? নাও, পড়।"

প্রতিমা পিতাকেই পড়িতে বলিল। রামপ্রাণ বাবু তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পড়িলেন:—

"ইভ সাংঘাতিক পীড়িত। কেবল তোমায় দেখিতে চাহিতেছে। শীঘ্র এস। ইতি, মিস্ বেল। দার্জ্জিলিঙ্গ।"

প্রতিমা তার শুনিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জানুদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। রামপ্রাণ বাবু সস্নেহে তাহার মেঘের মত কাল কুঞ্চিত কেশরাশির উপর হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ভয় কি মা, রোগ কি কারও হয় না? ও সেরে যাবে। আহা, বড় ভাল মেয়ে তোমার এই বন্ধু ইভটি!"

প্রতিমা শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ভাল হবে? ঠিক বলছ বাবা, ভাল হবে? বাবা, এমন সাদা মন কি কারও হয়, যেন পাঁচ বছরের মেয়ে! কার শাপে ওদের ঘরে এসে জন্মেছে।"

রামপ্রাণ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তা ঠিক। যাক, তুমি গুছিয়ে নাও, আজই কলকাতার একস্‌প্রেস ধরতে হবে। হাঁ, মিস বেল কে?"

প্রতিমা বলিল, "ইভের বন্ধু। তা হ'লে যাওয়া ঠিক?"

রামপ্রাণ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই!"

প্রতিমা ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি পিতার মুখের প্রতি উন্নীত করিতেই রামপ্রাণ বাবু তাহার মাথার উপর আবার হাত রাখিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কেন মা, আমি তোমায় দার্জ্জিলিঙ্গে যেতে দেবো না ব'লে কি সন্দেহ হয়েছিল?"

প্রতিমা লজ্জানম্রদৃষ্টিতে অধোবদনে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। রামপ্রাণ বাবু পুনরপি বলিলেন, "প্রলোভন যে তুমি জয় করতে শিখেছ—তা যে প্রতিদিন অভ্যাস করছ, তা কি বুঝিনি? তোমার কোন্ কাযটা এই বুড়োর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? তুমি যে আমার সব, মা!"

প্রতিমা এবারও কোন জবাব দিল না, তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। সে অন্য কথা পাড়িল, মৃদুস্বরে বলিল, "তা হ'লে এখন একবার মঠ হয়ে মাতাজীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। দার্জ্জিলিঙ্গ যাবার জন্যে গোছাবার কিছুই নেই। তা হ'লে যাই?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "এস মা! না, চল, আমিও একবার মাতাজীকে দর্শন ক'রে আসি। দার্জ্জিলিঙ্গে স্যানিটেরিয়ামে গিয়ে ওঠা যাবে, কি বল?"

প্রতিমা বলিল, "যা ভাল হয়, কোরো বাবা, আমি আর কি বল্‌ব?" কথাটা বলিয়া প্রতিমা শৈলকে খুঁজিতে গেল, রামপ্রাণ বাবুও স্বর্গদ্বারে যাইবার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

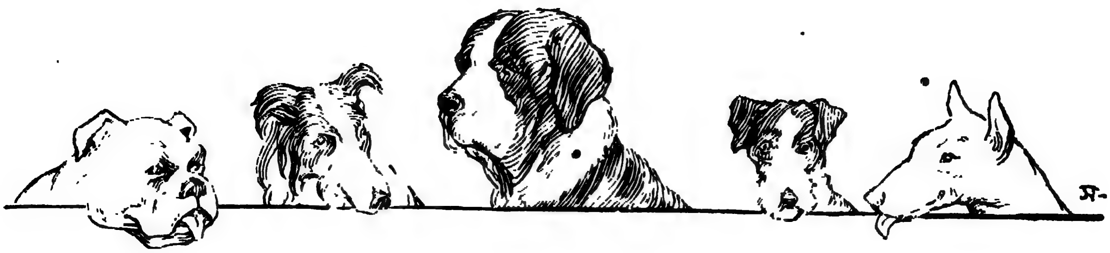

মানবের শ্রেষ্ঠ বন্ধু

নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন, পশুজাতির মধ্যে কুকুরই মানবের পুরাতন বন্ধু। মানবের সহিত কুকুরের বান্ধবতা কবে—কোন্ যুগে সর্ব্বপ্রথম ঘটিয়াছিল, তাহার কোনও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানবের যে নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে কুকুরের কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতেই মানব ও কুকুরের বান্ধবতা ঘটিয়াছিল।

কল্পনা করা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ হয় ত মানব ও কুকুরের মধ্যে মিত্রতা ঘটে নাই। যাবতীয় শ্বাপদের সঙ্গে মানুষকে সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; আরণ্য কুকুরের সঙ্গেও প্রথমতঃ মানুষের এই সংগ্রাম বাধিয়াছিল। কুকুরের স্বাভাবিক প্রকৃতি দলবদ্ধ হইয়া বাস করা। স্মরণাতীত যুগেও কুকুর এমনই দলবদ্ধভাবে অরণ্যে বাস করিত এবং মানুষকে দেখিতে পাইলে তাহারা একযোগে তাহাকে আক্রমণও করিত। কুকুরের দ্রুতধাবন-ক্ষমতা, শরীরের শক্তি, হিংস্র প্রকৃতি এবং দলবদ্ধভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি মানবকে নিশ্চয়ই বিব্রত করিয়া তুলিত। হয় ত অনেক ক্ষেত্রে এরূপ আক্রমণের ফলে মানব কুকুরের দ্বারা পরাজিতও হইত।

কিন্তু মানব পশু অপেক্ষা উচ্চতর জীব। তাহার হস্ত, পদ, অঙ্গুলী এবং মস্তিষ্ক অন্য জীবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষ বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিত, কুকুর তাহা পারিত না; সুতরাং কল্পনা করা যাইতে পারে যে, দলবদ্ধ কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ অবলীলাক্রমে উচ্চতর বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিত। ক্রমে হয় ত মানব বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় মস্তিষ্কের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিল যে, বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে বৃক্ষতলস্থ কুকুরদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর। এই বৃক্ষশাখা হইতেই পুরাকালের গদা-মুদগরের আবিষ্কার হইয়া থাকিবে। যষ্টিও উহার ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপই মনে হয়।

গদা হস্তে মানুষ কুকুরের দলকে বিতাড়িত করিবার কৌশল শিখিবার পর হয় ত কুকুরও মানুষের হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকল জীবকেই নানারূপ কৌশল শিখাইয়া দেয়। ইহার পর আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, কোনও মানুষ দূর হইতে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া শত্রুকে বিপর্য্যস্ত ও বিতাড়িত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকিবে। মনে হয়, লোষ্ট্রনিক্ষেপের কৌশল হইতেই ক্রমে বর্ত্তমান যুগের বন্দুক, কামান প্রভৃতির উদ্ভব।

কুকুর যখন বুঝিতে পারিল, মানুষকে সহজে আয়ত্ত করা যায় না, তখন হইতেই কুকুর তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। তাহারা বুঝিল যে, এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন জীব দন্ত ও নখরের সাহায্য না লইয়াই দূর হইতে তাহাদিগকে ধ্বংস করে, তাড়াইয়া দেয়। শক্তিমান্‌কে সকলেই ভয় করে, শ্রদ্ধা করে। কুকুরও ক্রমে মানুষকে এইরূপ ভাবে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। মানুষও কুকুরের গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব ও কুকুর মাংসভোজী ছিল। জঠরানল তৃপ্ত করিতে উভয়কেই পশু সংহার করিতে হইত।

এমনও কল্পনা করা অশোভন নহে যে, মানুষ যখন পশু সংহার করিত, কুকুর তখন দূরে থাকিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বল্লমের আঘাতে, গদা বা লোষ্ট্রের সাহায্যে প্রাচীন যুগের শক্তিশালী মানব মৃগজাতীয় পশু সংহার করিত। নিজের প্রয়োজনমত মাংস সংগ্রহ করিয়া মানব চলিয়া যাইত, কুকুর অবশিষ্ট অংশ স্বল্পায়াসে ভোগ করিতে পাইত।

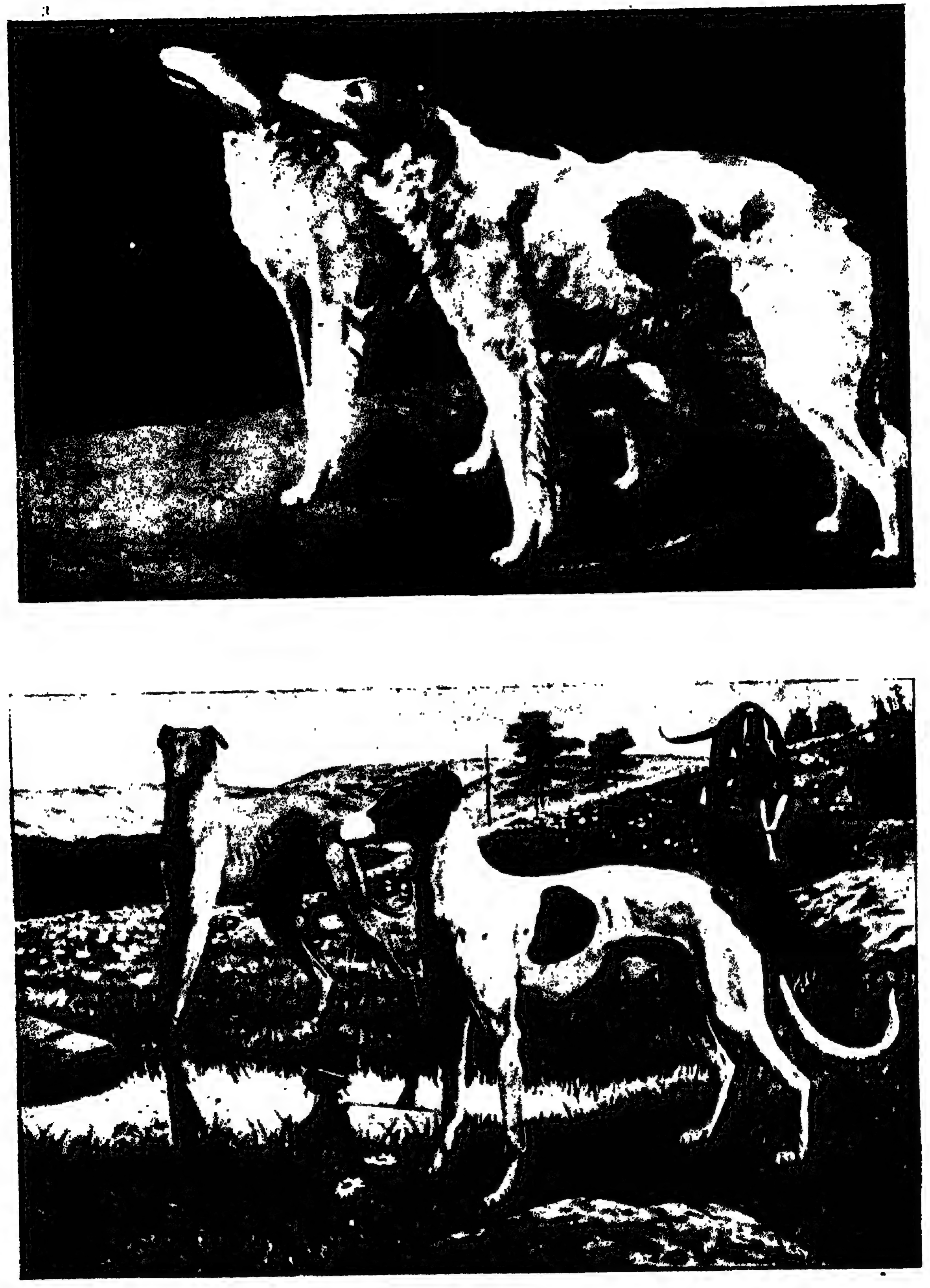

গ্রেহাউণ্ডস

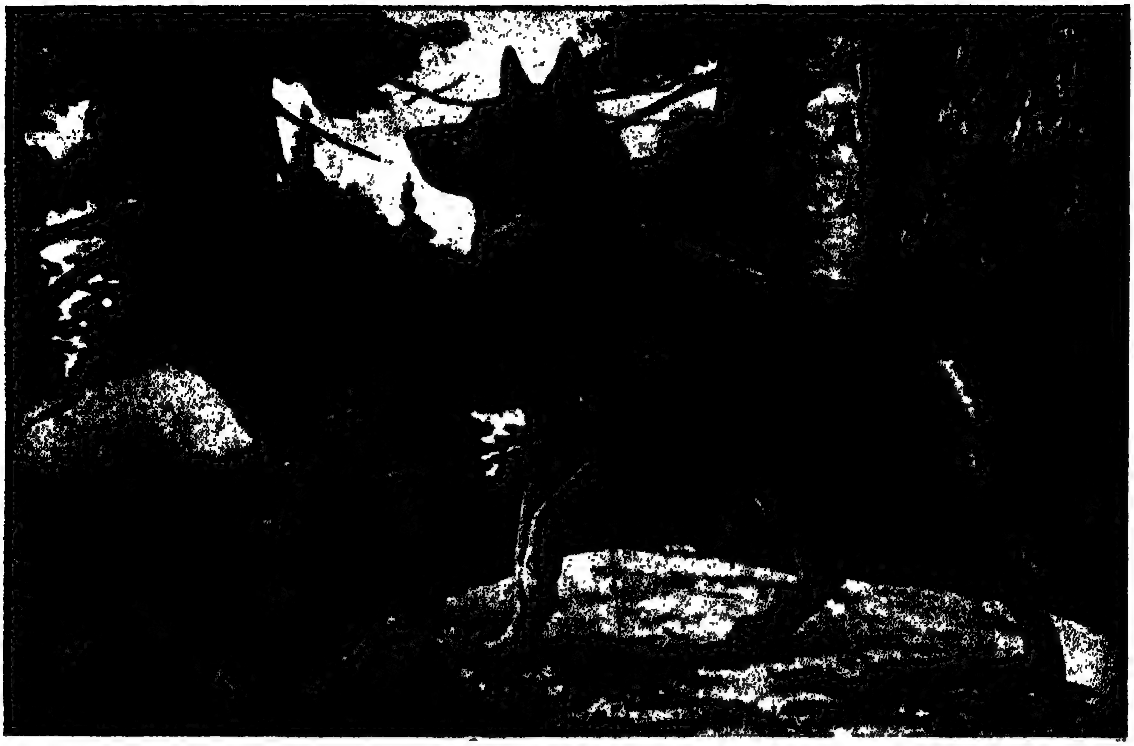

নরওয়েদেশীয় এলকহাউণ্ড

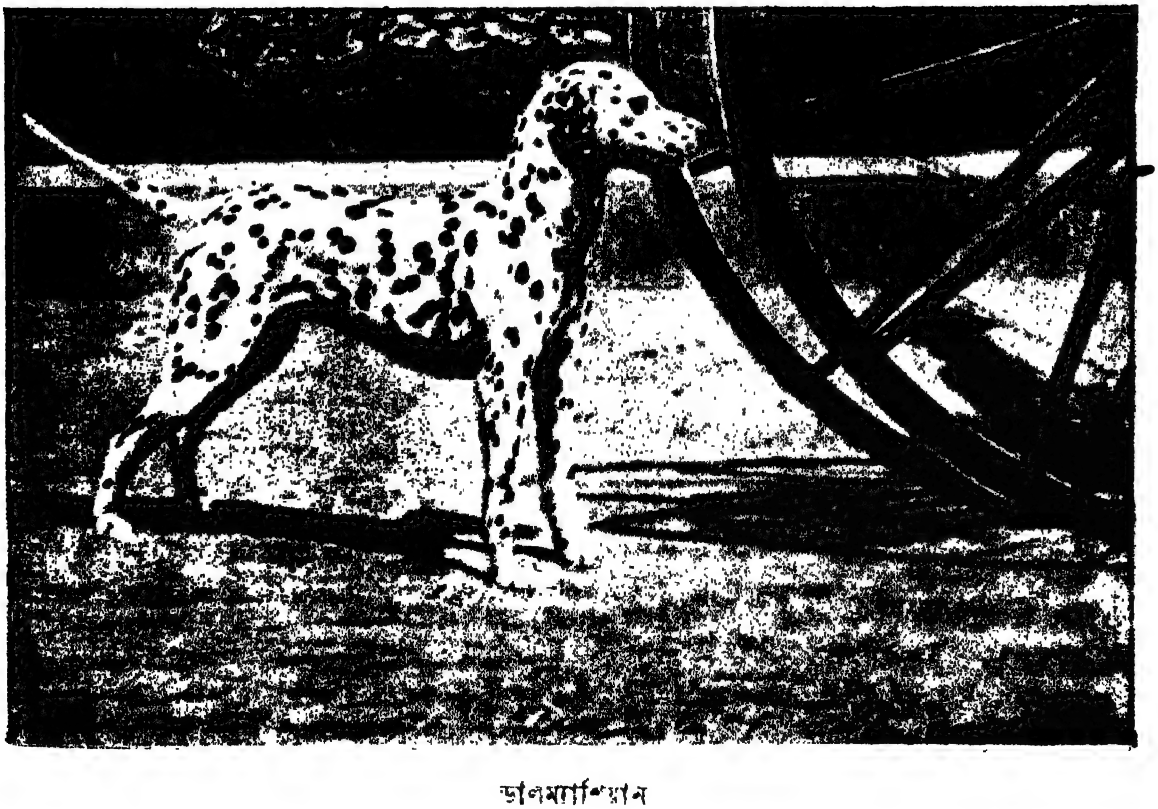

ডালম্যাশিয়ান

আবার হয় ত এমনও ঘটিত যে, কুকুরের দল তাড়া দিয়া কোনও দ্রুতগামী পশুকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিত—মানুষ হয় ত তাড়া করিয়া সে জীবকে ধরিতে পারিত না। এমন অবস্থায় মানব তাহার অস্ত্রসহ হয় ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত এবং তাহার সাহায্যে অবরুদ্ধ জীবকে সংহার করিত। প্রয়োজনমত মাংস লইয়া সে চলিয়া গেলে কুকুরের দল হত পশুর মাংসে ক্ষুধার জ্বালা মিটাইয়া লইত। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করার ফলে, কল্পনা করিয়া লইতে পারা যায়, উত্তরকালে কুকুর ও মানুষ শিকারের সময় পরস্পরকে বন্ধুবৎ সাহায্য করিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব যখন গুহাবাসী জীব ছিল, তখন সে আধুনিক যুগের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিশ্চয়ই ছিল না। সে সময় হয় ত সে ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি প্রভৃতি গুহার বাহিরে ফেলিয়া দিত। সেগুলি বাহিরে আবর্জ্জনার মত সঞ্চিত হইয়া থাকিত। কুকুরগণ যখন কোনও পশু সংহার করিতে পারিত না, ক্ষুধাকাতর হইয়া তাহারা সেই সময় গুহার পার্শ্বে আসিত। স্তূপীকৃত অস্থিমজ্জার গন্ধ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিত। প্রথমতঃ হয় ত ভয়ে ভয়ে আসিত এবং তাড়াতাড়ি যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়াই পলায়ন করিত। পরে যখন বুঝিতে পারিল যে, মানুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করে না, শুধু শুধু আঘাত করে না, তখন অপেক্ষাকৃত নির্ভয়ে তাহারা গুহাপার্শ্বে সমবেত হইত। অস্থিমজ্জা পচিয়া দুর্গন্ধ হইত এবং আদিম যুগের মানুষের পক্ষেও সে দুর্গন্ধ কখনই প্রীতিজনক ছিল না। মানুষ যখন দেখিল, কুকুরগণ সেই সকল বিকৃত অস্থিমজ্জা প্রভৃতি ভক্ষণ করার ফলে স্থানটি আবর্জ্জনা-দুষ্ট থাকে না, তখন হইতে সে-ও তাহাদিগকে বন্ধুবৎ গ্রহণ করিল।

সম্ভবতঃ এইরূপেই মানব ও সারমেয়কুলের মধ্যে সখ্যতা জন্মিয়া থাকিবে। পরস্পর পরস্পরের উপযোগিতা অনুভব করিয়া থাকিবে, আরও অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনায়াসলভ্য খাদ্যপ্রাপ্তির ফলে কালক্রমে সারমেয়গণ মনুষ্যাবাসের সন্নিহিত স্থানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে। শিকার অন্বেষণকালে কোন কোন মানব হয় ত কোন কোন কুকুরের আবাসস্থলও আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। হয় ত কোনও ক্ষেত্রে কুকুরশাবক দেখিয়া মানব তাহার শিশু সন্তানদিগের জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিত। এইরূপ কুকুরশাবক সযত্নে পালিত হইয়া আর মানুষকে তেমন ভয় করিত না। তাহার ক্রীড়াভঙ্গী এবং মিত্রবৎ ব্যবহারে মানুষও হয় ত কুকুরশাবককে প্রথমতঃ ভালবাসিতে না পারিলেও তাহার উপদ্রব অনেকটা সহ্য করিত এবং তাহাকে সংসারের অবশ্য প্রতিপাল্য জীবের মধ্যে গণনা করিত।

এইরূপ কুকুরশাবকগণ বড় হইলে তাহাদের সন্তানসন্ততি পূর্ব্বপুরুষগণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পোষ মানিত। আবার তাহাদের শাবকগণ আরও মনুষ্যভক্ত হইত। কালক্রমে এমনই ঘটিত যে, গৃহপালিত সারমেয়গণ আর বিপৎসঙ্কুল আরণ্য জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিত না।

ক্রমবিবর্ত্তনের পর মানব যখন অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছিল, সম্ভবতঃ কুকুরও তাহার আরাম হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পশু হইলেও স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে তাহারা মানবের ভাগ্যসূত্রের সহিত আপনাদিগকে অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত করিয়া তুলিয়া থাকিবে। যাহারা এমন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পারে, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার স্পৃহা পশুরও থাকে না।

ক্রমে মানবও হয় ত আবিষ্কার করিয়াছিল যে, সকল শ্রেণীর কুকুর শিকারের উপযোগী নহে। যাহারা দ্রুতধাবনে অভ্যস্ত এবং বলশালী, মানব তাহাদিগকে শিকারের সঙ্গী করিয়া লইত, অপরগুলি গৃহে থাকিত। যে সকল কুকুর কোনও কাযে লাগিত না, মানব হয় ত তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত, অথবা দূরে তাড়াইয়া দিত। সম্ভবতঃ এই ভাবেই মানব ক্রমশঃ শিকারী কুকুরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং ক্রমশঃ তাহাদের বংশবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকিবে।

গৃহরক্ষার কার্য্যে কুকুরের উপযোগিতা বুঝিয়া মানব ক্রমশঃ সেই শ্রেণীর কুকুরের উন্নতির জন্যও যে নানা প্রচেষ্টা করিয়াছিল, ইহা কল্পনা করাও অসঙ্গত নহে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। মানুষ যখন ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে লাগিল—ভিন্নদেশীয় লোকের সহিত তাহার সংস্রব ঘটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দেশের কুকুরের

আদান-প্রদানও ঘটিয়াছিল, ইহা অনুমান করা আদৌ অসম্ভব নহে।

কুকুরের জন্ম ও ইতিহাসের কোনও ধারাবাহিক প্রমাণ না থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে কুকুর যে মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং নানাবিধ ব্যাপারে অবশ্য প্রয়োজনীয় পশু, সে বিষয়ে প্রমাণ-প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন নাই।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই কুকুরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া থাকে; কুকুরের সম্বন্ধে প্রতীচ্য দেশে শত শত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। কুকুর যে মানুষের কত কাযে লাগে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। নির্জ্জনতায় কুকুর মানবের সহচর, যুদ্ধে বন্ধু, শিকারে সহকর্ম্মী। মানব-বন্ধুর নিকট হইতে মানবের আশঙ্কার শত শত কারণ বিদ্যমান, কিন্তু কুকুর-বন্ধু মানবের সহিত কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রাণ দিয়া সে প্রতিপালকের সর্ব্বস্ব রক্ষা করে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কুকুরের চিত্র ও বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) রুসীয় উলফহাউণ্ড বা বর্জ্জোয়াই—রুসীয় উলফহাউণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র জাতীয় কুকুর। ইহার আকার দীর্ঘ, গায়ের লোমাবলী রেশমের মত কোমল ও মসৃণ, গ্রে হাউণ্ডের মত গতি দ্রুত এবং শরীরের শক্তি আইরিশ উলফহাউণ্ডের মত প্রচণ্ড। এই সুন্দর কুকুরকে সুন্দরী রমণীরা অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ নহে।

রুসিয়ায় এই কুকুরের দ্বারা নেকড়ে বাঘ শিকার করা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ছোট কুকুর অথবা দলবদ্ধ লোকের সাহায্যে অরণ্যমধ্য হইতে অগ্রে নেকড়ে বাঘকে বাহিরের প্রান্তরে তাড়াইয়া বাহির করা হয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যাঘ্রটি আসিবামাত্র শিকারী দুই বা তিনটি বর্জ্জোয়াই কুকুরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দেয়। তাহারা বাঘটিকে দুই পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করে। ঠিক কর্ণমূলের কাছে উভয় কুকুর একই সময়ে ঝাঁপাইয়া আক্রমণ করে। ইহাতে নেকড়ে বাঘ তাহার ভীষণ দংষ্ট্রার দ্বারা কুকুরদিগকে দংশন করিতে পারে না। নেকড়ে বাঘকে এই ভাবে ধরিয়া রাখিবার পর অশ্বারোহী শিকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং হয় তাহাকে হত্যা করে অথবা কৌশলে আবদ্ধ করিয়া গৃহে লইয়া আইসে। সুদৃঢ় অঙ্গনের মধ্যে অশিক্ষিত কুকুরদিগকে নেকড়ে শিকারে দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য পরে ধৃত নেকড়ে বাঘটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(২) গ্রে হাউণ্ড—এই জাতীয় কুকুর অতি প্রাচীন কালের। মৃগ, কৃষ্ণসার প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ শিকারের জন্য গ্রে হাউণ্ড মানুষের পরম বন্ধু। ইহাদের দ্রুত গতি অতুলনীয়। ক্ষীণকায় হইলেও ইহাদের শারীরিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। গ্রে হাউণ্ডের অনায়াস গতিভঙ্গী পরম রমণীয়। ইহাদের শরীরের ওজন ৩০ হইতে ৩৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রে হাউণ্ডের শরীরের রোম অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এজন্য ইহাদের মাংসপেশীগুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চরণগুলি স্থূল হইলেও শক্তির আধার, শরীর ধনুকাকৃতি বলিয়া শক্তিতে কম নহে। গ্রে হাউণ্ডের বুদ্ধি কম হইলেও তাহারা নির্ব্বোধ নহে। ইংলণ্ডের গ্রে হাউণ্ডই গতিশক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে সারমেয়কুলের শ্রেষ্ঠ, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

(৩) নরওয়েজীয় এক্‌হাউণ্ড—এই কুকুর দেখিতে অনেকটা নেকড়ে বাঘের মত। মধ্য-য়ুরোপের সেফার্ড (Shepherd) জাতীয় কুকুর এক্‌হাউণ্ড হইতে উদ্ভূত। বড় বড় শিকারে এই কুকুর বিশেষ উপযোগী। দাঁড়াইয়া থাকিলে এই কুকুরের উচ্চতা ২৫ ইঞ্চির অধিক নহে। ইহার গাত্রবর্ণ নেকড়ে বাঘের মত, তাহারই মত শক্তিশালী। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে এই জাতীয় কুকুর দুর্ল্লভ বলিলেই হয়। কিন্তু উত্তর-য়ুরোপে ইহার প্রাচুর্য্য আছে। পার্ব্বত্য ও অরণ্যসমাকুল প্রদেশে এই কুকুর মানবের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়। ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ এবং আরণ্য হরিণ শিকারে ইহারা অত্যন্ত মজবুত।

(৪) ডালমাসিয়ান—এই জাতীয় কুকুর পয়েণ্টার হইতে উদ্ভূত। ইংলণ্ডে পয়েণ্টার যেরূপ শিকারের উপযোগী, ইহারা তেমন নহে। ঘোড়া ও আস্তাবলের প্রতি ইহাদের অনুরাগ দেখিয়া ইহাদিগকে গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ ইহাদের শ্বেত অঙ্গে কৃষ্ণ বা পাঁশুটে বর্ণের বিন্দু সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহুক্ষণ দৌড়াইয়াও ক্লান্ত হয় না।

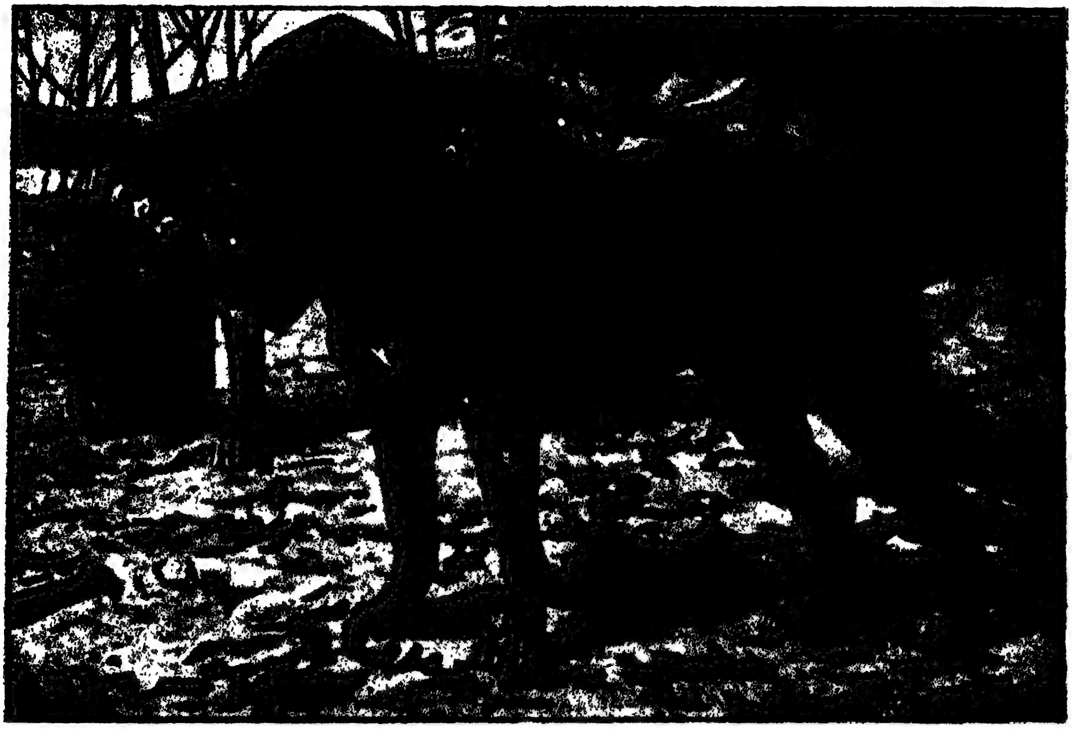

ব্লাডহাউণ্ড

বিগেল বাসেট

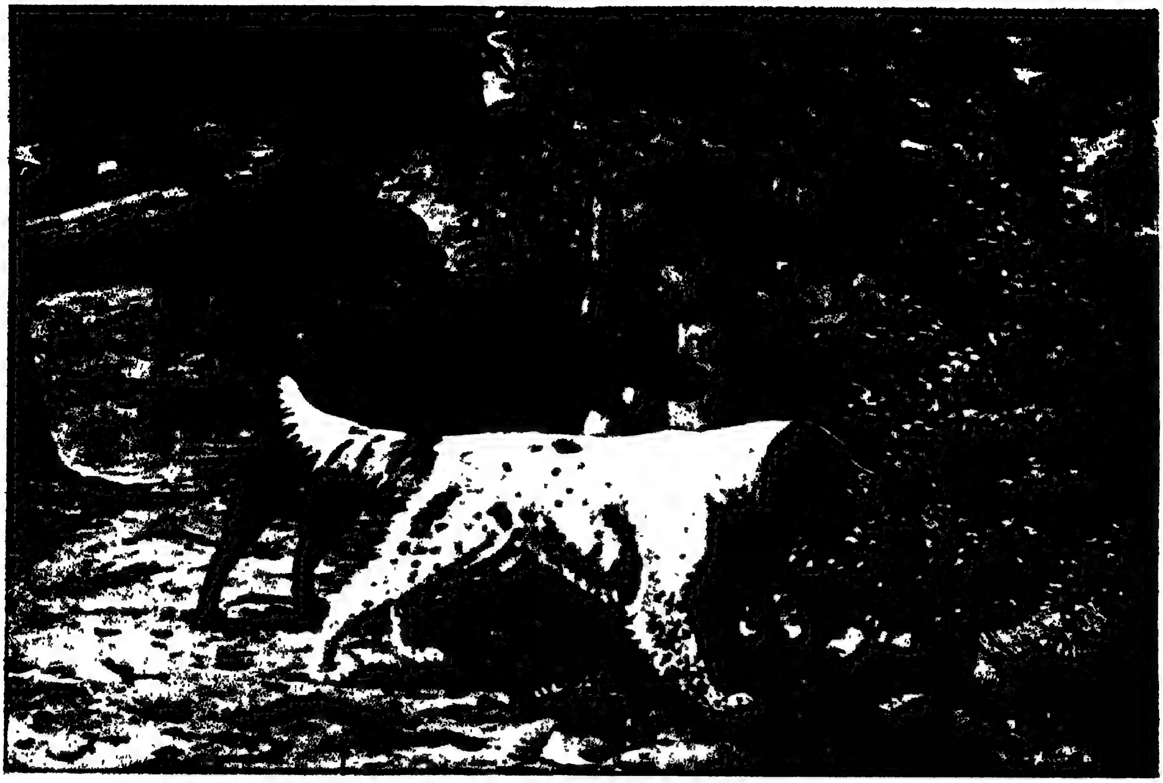

স্কটিস ডিয়ারহাউণ্ড

(৫) ব্লড হাউণ্ড—এই কুকুর মধ্যমাকৃতি এবং নাম শুনিলে মনে যেরূপ আতঙ্ক হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বভাব সেরূপ ভীষণ নহে। বিজয়ী উইলিয়ম না কি এই কুকুর ইংলণ্ডে প্রথম আমদানী করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে জেরুসালেম হইতে কোনও বীর এই কুকুর ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

ব্লড হাউণ্ড শুধু কৃষ্ণবর্ণের নহে, শ্বেত ও রক্তবর্ণের ব্লড হাউণ্ডও দেখা যায়। এই জাতীয় আধুনিক কুকুর উল্লিখিত তিন বর্ণের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিশারদদিগের মতে শত শত বৎসর হইতে ব্লড হাউণ্ড অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের ওজন ১ মণ হইতে প্রায় ১ মণ ১০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ব্লড হাউণ্ডের প্রকৃতি অত্যন্ত স্থির। য়ুরোপ ও আমেরিকার পুলিস বিভাগে এই কুকুর প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহার ঘ্রাণশক্তি এমনই প্রখর যে, কোনও ঘটনাস্থলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি এই কুকুরকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, অপরাধী পলাতক হইলেও কুকুর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া থাকে। ঘটনার ৩০ ঘণ্টা পরেও ব্লড হাউণ্ডের সাহায্যে পুলিস কোন কোন স্থলে অপরাধীকে ধরিতে পারিয়াছে।

(৬) বিয়াগল্—এই কুকুর ১৫ ইঞ্চির অধিক উচ্চতায় বড় হয় না। গতি দ্রুত না হইলেও ইহারা বুদ্ধিমান্ এবং জেদী। ইচ্ছা করিলে এই কুকুরকে তাহার মনিবের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া যায়। এই জাতীয় কুকুর অত্যন্ত মিত্রবৎসল। বিয়াগল্‌কে ক্ষুদ্র হাউণ্ড-জাতীয় কুকুর বলা যায়। শৃগাল শিকারে এই কুকুর ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৭) বাসেট্—এই কুকুর ইংলণ্ডে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে উহা নীত হয়। জার্ম্মাণীতে এই কুকুর প্রায় অনেকের গৃহেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি তীব্র; কিন্তু চরণের খর্ব্বতা হেতু দ্রুতধাবনে ইহারা অভ্যস্ত নহে। খরগস শিকারে এই কুকুর বিশেষ উপযোগী।

(৮) সেটার—পক্ষি-শিকারে এই কুকুর ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহার নাম সেটার হইয়াছে। তিন জাতীয় সেটার কুকুর আছে;—**গর্ডন সেটার, আইরিস্ সেটার ও ইংলিস সেটার।** শেষোক্ত শ্রেণীর সেটার কুকুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার ও বলবান্। প্রধানতঃ ইহারা দেখিতে শ্বেতবর্ণ।

আইরিশ সেটারগুলি মেহগ্নি বর্ণের এবং সহজে বিচলিত হইয়া পড়ে। ভালরূপ শিক্ষা পাইলে ইহারা শিকারের সময় কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারে।

গর্ডন সেটারগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের স্নেহ-মমতা অধিক এবং দেখিতে সুন্দর। শিকারে ইহাদের দৃঢ়তা বেশী নহে। মার্কিণ মুলুকে এই জাতীয় কুকুর লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।

(৯) ডিয়ার হাউণ্ড (স্কটল্যাণ্ডের):—এই জাতীয় কুকুর দেখিতে অনেকটা গ্রে হাউণ্ডের মত। আইরিশ উল্‌ফ্ হাউণ্ডের অপেক্ষা আকারে ইহারা কিছু ছোট। বলবান্ গ্রে হাউণ্ডের ন্যায় ইহাদের শক্তি অতুলনীয়। কিন্তু ইংরাজী গ্রে হাউণ্ডের মত ইহারা দ্রুতগতিবিশিষ্ট নহে। তথাপি শিকারের পক্ষে যেরূপ দ্রুতগতির প্রয়োজন, তাহা ইহাদের আছে। ইহারা গুরু পরিশ্রমেও সহসা ক্লান্ত হয় না, এ জন্য শিকারীরা ইহাদের পরম ভক্ত।

প্রাচীন যুগে ডিয়ার হাউণ্ড জাতীয় কুকুর যে দলে যত অধিক পরিমাণে থাকিত, সেই দলের সামরিক শক্তি সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। পিক্‌টস ও স্কটস্‌দিগের মধ্যে যুদ্ধে ১ শত ৬০ জন যোদ্ধা এই কুকুরের আক্রমণে নিহত হইয়াছিল। ডিয়ার হাউণ্ড মানুষের পরম বিশ্বস্ত ও সঙ্গী। ইহারা ভয়লেশশূন্য এবং ইহাদের দৃষ্টি প্রশান্ত। একবার চোখের দিকে চাহিলে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কেলোর মা

১

"শিবে, ওরে শিবে, ওরে হতভাগা ছেলে !"

শিবে ওরফে শিবনাথ তখন ঘোষেদের আমবাগানে দাঁড়াইয়া পাঁচ সাতটা ঢিল ছোড়ার পর একটি পাকা আম পাড়িয়া সবে মাত্র তাহাতে কামড় দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সহসা পশ্চাতে কেলোর মা'র রোষপরুষ আহ্বান শ্রবণে হাতের আমটাকে তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই কেলোর মা সত্বরপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া তিরস্কার-তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এখানে আম পেড়ে খাওয়া হচ্ছে, আজ যে বড় পাঠশালে যাস্ নি ?"

একটুও না ভাবিয়া শিবনাথ নির্ভীকভাবে উত্তর করিল, "আজ যে পাঠশালের ছুটী।"

মাথা নাড়িয়া কেলোর মা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ছুটী রে ? ছুটী ত অত ছেলে পাঠশালে যাচ্ছে কেন ?"

মিথ্যাটা ধরা পড়িয়া যায় দেখিয়া তাহা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে শিবনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "যাদের ছুটী নাই, তারা যাচ্ছে। গুরুমশাই ত সক্কলকে ছুটী দেয় নি।"

কেলোর মা তাহার মিথ্যা কথা বুঝিতে পারিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "সকলকে ছুটী দেয় নি, শুধু তোকে ছুটী দিয়েছে। আচ্ছা, চল দেখি তোর গুরুমশায়ের কাছে।"

শিবনাথ এবার ভয় পাইল, ভীতি-বিশুষ্ক মুখে বলিল, "আমি বুঝি মিছে কথা কইছি ? সত্যি মিথ্যে তুই গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে জেনে আয় না, কেলোর মা।"

"শুধু আমি গেলে ত হবে না, তোকে শুদ্ধ যেতে হবে।"

কেলোর মা শিবনাথের হাত ধরিয়া পাঠশালার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। শিবনাথ প্রথমতঃ আপত্তি, শেষে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। কেলোর মা কিন্তু তাহার অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না; জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। পথে শিবনাথ একবার তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কেলোর মা রাগে তাহার গালে এক চড় মারিয়া হাতটা বেশ শক্ত করিয়া ধরিল। শিবনাথ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

করালী চক্রবর্ত্তী সম্মুখের পথ ধরিয়া আসিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে কেলোর মা, ছেলেটাকে মারিস্ কেন ?"

সরোষ কণ্ঠে কেলোর মা উত্তর করিল, "সাধে কি মারি, বাবাঠাকুর, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, পাঠশালে যাবার নামটি করবে না। বামুনের ছেলে, এর পরে খাবে কি ক'রে ?"

অপ্রসন্ন মুখে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "যা করেই থাক্, বামুনের ছেলের গায়ে হাত তোলা তোর কিন্তু ভাল হয় নি, কেলোর মা।"

গর্জ্জন করিয়া কেলোর মা বলিল, "আরে মোর বামুনের ছেলে রে ! বামুনের ছেলে ব'লে গায়ে হাত তুলবো না, আর ছেলেটা মুখ্যু হয়ে থাকবে ?"

ধীরগম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ছেলেটা পণ্ডিত হবে, এ ত সুখের কথা কেলোর মা, কিন্তু এতে যে তোর পাপ হয়।"

তীব্র কণ্ঠে কেলোর মা বলিল, "রেখে দাও তোমার পাপ-পুণ্যি। পাপ হয়, আমি না হয় নরকে প'চে মরবো, কিন্তু শিবে ত মানুষ হবে। তা হলেই আমার ঢের হ'লো।"

চক্রবর্ত্তীর দিকে একটা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কেলোর মা শিবনাথকে টানিয়া লইয়া পাঠশালার দিকে চলিল। কৈবর্ত্তের মেয়ের হাতে ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদার এই লাঞ্ছনা দর্শনে চক্রবর্ত্তী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন

এবং ব্যথিত চিত্তে কেলোর মা'র এই মহাপাপের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

২

কেলোর মা কিন্তু এই বামুনের ছেলেটিকে একবারের জন্যও বামুনের ছেলে বলিয়া ভাবিত না, নিজের পেটের ছেলে বলিয়াই মনে করিত। স্বামীকে হারাইবার বছরখানেক পরেই সে যখন নিজের পেটের ছেলে কেলোর মুখাগ্নি করিয়া রূপনারায়ণের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আসিল, তাহার কয়েক দিন পরেই তদীয় প্রভুপত্নী হরনাথ ঘোষালের স্ত্রী শিবনাথকে প্রসব করিল। কেলোর মা সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া পুত্রশোকের দুর্ব্বিবহ জ্বালা কতকটা প্রশমিত করিল।

ছেলে তিন মাসের না হইতেই কেলোর মা তাহার সম্বন্ধে এত উচ্চ আশা পোষণ করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিয়া প্রভু হরনাথ হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। শিবু বড় হইয়া খুব লেখাপড়া শিখিবে, উকীল, মোক্তার—না হয় থানার দারোগা হইয়া বসিবে, রাজবাড়ীতে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হইবে, ঝাঁ গুড়-গুড় বাজনা বাজাইয়া পরীর মত সুন্দরী বৌ লইয়া ঘরে আসিবে, কেলোর মা পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিবে, আর সেই রাজার মেয়ে নিজের হাতে পান সাজিয়া দোক্তা মিশাইয়া তাহার হাতে আনিয়া দিবে। কেলোর মা পান-দোক্তা চিবাইতে চিবাইতে বৌয়ের উপর হুকুম জারি করিবে।

হরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "আশার অর্দ্ধেক ফল। রাজার মেয়ে ঘরে না আসুক, শিবুকে অন্ততঃ উকীল-মোক্তার করবার চেষ্টা করবো কেলোর মা।"

ঘাড় নাড়িয়া কেলোর মা বলিত, "তা হ'লেই রাজার মেয়েও ঘরে আসবে।"

কেলোর মা'র আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না। হরনাথ কারবারী লোক ছিলেন। হঠাৎ কারবারে লোকসান দিয়া তিনি দেনদার হইয়া পড়িলেন। মহাজনে জমীযায়গা বেচিয়া পাওনা আদায় করিয়া লইল। হরনাথও ইহলোকের দেনা-পাওনা শেষ করিয়া পরলোকের দেনা-পাওনার হিসাব দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তিনি বলিয়া গেলেন, "তোর আশা পূর্ণ করতে পারলাম না কেলোর মা, এখন তুই রইলি, আর শিবু রইলো।"

জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল রজনী সহসা মেঘাবৃত হইয়া দুর্য্যোগময়ী হইয়া আসিলে প্রকৃতির যে অবস্থা হয়, হরনাথের মৃত্যুতে সংসারের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। জমীযায়গা গেল, সংসারের অবলম্বন স্বামী গেল, পাচ বছরের ছেলে শিবুকে লইয়া কাত্যায়নী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি নিতান্ত কাতরভাবে কেলোর মাকে বলিলেন, "কি হবে, কেলোর মা?"

কেলোর মা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হবে আবার কি? যে যাবার, সে গিয়েছে। যারা আছে, তাদের সংসারে থাকতেও হবে, খেতে পরতেও হবে।"

"খাব কি?"

"যা ভগবান্ জোটাবেন।"

"কিন্তু তুই এখন কি করবি?"

"শিবুকে মানুষ করবো।"

"তোর মাইনে দেবে কে?"

"শিবু।"

এ কথায় কাত্যায়নী না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "ওই পাঁচ বছরের ছেলে তোর মাইনে দেবে?"

গম্ভীরভাবে কেলোর মা বলিল, "চেরকালই কি পাঁচ বছরের থাকবে গা? বড় হয়ে যখন উকীল-মোক্তার হবে, তখন আগা-গোড়া সব মাইনে চুকিয়ে নেব।"

কেলোর মা'র দুরাশায় কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কাত্যায়নী হতাশ হইলেও কেলোর মা কিন্তু আশা ত্যাগ করিল না। সে মহাজনের ঘর হইতে ধান আনিয়া তাহা ভানিয়া কুটিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাতে যে লাভ হইত, তদ্দ্বারা তিনটা পেট স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তা ছাড়া বাড়ীতে শাকসব্জী দিয়া তরকারীর অভাব পূর্ণ করিত। বেশী হইলে তাহা পাড়ায় বেচিয়া যে দুই চারি পয়সা পাইত, তাহাতে শিবুর জন্য একটু ভাল মাছ বা মুড়কী-বাতাসা কিনিয়া আনিত।

শিবুকে মুড়কী, বাতাসা বা মাছ খাওয়াইয়াই কেলোর মা নিশ্চিন্ত হইল না, তাহার লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করিয়া

দিল। পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়া তাহার হাতে খড়ি দেওয়াইল এবং গুরুমহাশয় লোচন সরকারের হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা বেতনে তাহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। বেতন দিতে না হইলেও কেলোর মাকে সময়ে সময়ে লোচন সরকারের বাড়ীতে ব্যাগাব দিয়া আসিতে হইত।

শিবনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে কেলোর মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। তাহার সামনে শিবুর একটি বেলাও পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। সে তাহাকে ভুলাইয়া, ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া, পরিশেষে মারিয়া ধরিয়া পাঠশালায় দিয়া আসিত। শিবু আছাড়ি-পিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে থাকিত, কিন্তু কেলোর মা তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিত না। অন্য সময়ে শিবুর এক ফোঁটা চোখের জল তাহার বুকে যেন শেলের মত বাজিত, কিন্তু এ সময়ে শিবুর চোখ দিয়া বন্যার প্রবাহ বহিয়া গেলেও কেলোর মা তাহাতে দৃক্‌পাত করিত না; সে যেন বুকের স্নেহপ্রবৃত্তির উপর একখানা পাথর চাপা দিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া শিবুকে পাঠশালায় টানিয়া লইয়া যাইত। পুত্রের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া কাত্যায়নী যদি বলিতেন, “এ বেলা না হয় থাক্ না, কেলোর মা! এক বেলা পাঠশালে না গেলে ছেলে কি এমন মুখ্যু হবে?” তাহা হইলে কেলোর মা চোখ পাকাইয়া ধমক্ দিয়া বলিত, “তুমি থাম ত ঠাকরোণ; এত যদি কদর হয়, তা হ’লে থাক তুমি তোমার আদুরে ছেলে নিয়ে, আমি আপনার পথ দেখি।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে কেলোর মা’র চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িত, তাহা অভিমান অথবা কণ্টরুদ্ধ স্নেহের উচ্ছ্বাস, তাহা সহজে কেহ নির্ণয় করিতে পারিত না। কাত্যায়নী কিন্তু আর বেশী কথা কহিতে সাহসী হইতেন না।

কেলোর মা মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের কাছে গিয়া সংবাদ লইত, শিবুর শিক্ষা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে। গুরুমহাশয় যে দিন শিবুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করিত, সে দিন কেলোর মা’র আনন্দের সীমা থাকিত না; সে বাড়ীর শাকপাত, শসা, বেগুন উপহার দিয়া গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়া আসিত। কিন্তু গুরুমহাশয় যে দিন শিবুর অমনোযোগিতার উল্লেখ করিয়া, তাহার কিছুই হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন, সে দিন কেলোর মা’র বুকটা যেন দমিয়া যাইত। সে মুখখানাকে হাঁড়ীর মত করিয়া ঘরে ফিরিত এবং পরের জন্য বৃথা খাটিয়া মরিতেছে বলিয়া আক্ষেপে বাড়ীখানাকে যেন ফাটাইয়া দিত।

মনিবের ছেলের শিক্ষার জন্য কেলোর মা’র এই অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখিয়া পাড়ার কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলিত, “শিবু পণ্ডিত হয়ে তোকে রত্নসিংহাসন গড়িয়ে দেবে কেলোর মা, তাতে চেপে তুই স্বর্গে যাবি।”

এই উপহাসের উত্তরে কেলোর মাও তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিত, “আঁস্তাকুড়ের পাত যদি স্বগ্‌গে যায় ভালই, তবে তাই দেখে অনেক লোকের বুক ফেটে যায় পাছে, এই আমার ভাবনা।”

এই কঠোর শ্লেষোক্তিতে অনেকেই যে সন্তুষ্ট হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। তাহারা এই মুখরা কৈবর্ত্তের মেয়েটাকে জব্দ করিবার জন্য অন্তরে অন্তরে প্রবল আগ্রহ পোষণ করিত, কিন্তু সুযোগ না পাইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হইত।

৩

পাঠশালার শিক্ষা এক প্রকার শেষ হইলে কেলোর মা যখন শিবুকে স্কুলে দিতে ইচ্ছুক হইল, তখন কাত্যায়নী বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিলেন, “তুই বলিস্ কি কেলোর মা, পেটে খেতে পাই না, ছেলেকে স্কুলে দেব?”

তর্জ্জন করিয়া কেলোর মা বলিল, “তুমি পেটে খেতে পাবে না, তাতে কার কি বল ত ঠাকরোণ! খেতে পাও না ব’লে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবে না?”

কাত্যায়নী বলিলেন, “লেখাপড়া শেখানো ত অম্নি হবে না। স্কুলের মাইনে চাই, বই চাই। এক একখানা বইএর দামই কত।”

ভ্রূকুটি করিয়া কেলোর মা বলিল, “বইএর দাম দু’শো দশশো টাকা। আচ্ছা ঠাকরোণ, এ দিকে ত ছেলের কথা উঠলেই বল, ছেলের কথা আমি জানি না, কেলোর মা জানে: তবে আবার এত কথা কইতে এস কেন?”

কাত্যায়নী বলিলেন, “সাধে কি কইতে আসি? এ পাঠশালা নয় কেলোর মা,—স্কুল। স্কুলের খরচ তোর চাল বিক্রীর পয়সায় কুলোবে না।”

ক্রুদ্ধভাবে কেলোর মা বলিল, "চাল বেচার পয়সায় না কুলোয়, ধান বেচ্‌বো। তাতেও না হয়, ভিক্ষে করবো। রোজ খাচ্ছি, না হয় এক দিন ছাড়া খাব।"

কেলোর মা'র সঙ্কল্প শুনিয়া কাত্যায়নী হাসি চাপিতে পারিলেন না। বলিলেন, "পেটে না খেয়েও ওকে স্কুলে পড়াতে হবে?"

জোর গলায় কেলোর মা উত্তর করিল, "হবেই ত। বাবা ঠাকুর বেঁচে নাই ব'লে ছেলেটাকে মুখ্যু ক'রে রাখ্‌তে হবে না কি? তা হ'লে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না, তা জান? বাবা ঠাকুর মত্তে যায়, তখন বলেছে, তুই রইলি কেলোর মা, আর শিবু রইলো।"

কেলোর মা'র চোখ দুইটা ছলছল করিতে লাগিল। কাত্যায়নী সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "তবে তুই যা জানিস্ কর্।"

গ্রামে একটি ইংরাজী স্কুল ছিল; কেলোর মা স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিয়া অর্দ্ধ-বেতনে শিবুকে ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং নিজের রূপার তাবিজ এক ছড়া বিক্রী করিয়া তাহার জামা, জুতা ও স্কুলের বই কিনিয়া দিল।

প্রতিবেশী করালী চক্রবর্ত্তী আসিয়া কাত্যায়নীকে উপদেশ দিলেন, "হাঁ বৌমা, ছেলেটাকে দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়ে করবে কি? পড়ার মত পড়াতে পারতে, তা হ'লেও কথা ছিল, কিন্তু ততটা ত পেরে উঠবে না। তার চাইতে বাঙ্গালা হাতের লেখাটা পাকিয়ে একটা দোকানে খাতা লিখ্‌তে দিলেও দশ টাকা মাইনে হ'তে পারে।"

তাঁহার এই সদুপদেশের উত্তরে কেলোর মা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "ক্যানে গা ঠাকুর, শিবু উকীল-মোক্তার হ'লে তোমাদের কিছু ক্ষেতি আছে কি?"

এই রূঢ় উত্তরে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও চক্রবর্ত্তী একটু মৌখিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "শিবু উকীল-মোক্তার হ'লে ক্ষতি কিছুই নাই কেলোর মা, তাতে আমাদের পাঁচ জনের মুখ বরং উজ্জ্বল হবে। তবে উকীল-মোক্তার হওয়া ত মুখের কথা নয়, তাতে অনেক পয়সার দরকার।"

মুখ বাঁকাইয়া কেলোর মা বলিল, "পয়সার দরকার হয়, আমরা যোগাব, তোমার সে জন্তে এত ভাবনা ক্যানে বল ত?"

চক্রবর্ত্তী এবার একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "ভাবনা আমাদের একটু আছে বৈ কি। হরনাথের ছেলে একুল ওকুল দুই কুল হারিয়ে ষাঁড়ের গোবর হয়ে দাঁড়াবে, সেটা আমাদের বিবেচনায় ভাল ব'লে বোধ হয় না। আত্মীয়-বন্ধু থাকলে ভাল উপদেশই দিতে হয়।"

দৃঢ়স্বরে কেলোর মা বলিল, "ভাল মন্দ জানি না, তবে শিবুকে আমি উকীল-মোক্তার করবোই করবো।"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাই হোক্ কেলোর মা, তাই হোক্, হরনাথের ছেলে উকীল-মোক্তার হোক্। তবে শেষে বামনের চাঁদ ধরা না হয়, এই হচ্ছে ভয়।"

উপদেশদান নিষ্ফল জ্ঞানে চক্রবর্ত্তী অপ্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কেলোর মা কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি ভাবছো কি ঠাকরোণ, ওনাদের হ'য়েছে, 'একগাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথাব্যথা।' তা আমার কাছে বাছা পষ্ট কথা। 'পাড়া-পড়সী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে'।"

কাত্যায়নী ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তাই ব'লে ওঁকে এতটা পষ্ট কথা বলা তোর ভাল হয় নি।"

ঝঙ্কার দিয়া কেলোর মা বলিল, "রেখে দাও তোমার ভাল। খোসামোদ কত্তে হয়, তুমি করবে, কেলোর মা রেখে ঢেকে কথা কইবে না। এক বেলা না খেতে পেলে যারা ফিরেও চেয়ে দেখে না, তারা আজ দরদ দেখাতে এসেছে।"

কেলোর মা'র রাগ দেখিয়া কাত্যায়নী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

পরদিন শিবু স্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি আর স্কুলে যাব না, কেলোর মা। আমাকে সব্বাই উকীল বাবু ব'লে তামাসা করে।"

কেলোর মা মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "করুক না এখন তামাসা, এর পর তুই যখন সত্যি সত্যি উকীল বাবু হবি, তখন সব্বার মুখে চুণকালি প'ড়ে যাবে।"

শিবু বলিল, "তা কি আমি হ'তে পারবো?"

কেলোর মা বলিল, "হ'তে পারবো কি, হ'তেই হবে তোকে। নয় ত আমার মুখে চুণকালি পড়বে। কেমন, উকীল বাবু হ'তে পারবি ত?"

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে শিবু বলিল, "নিশ্চয়ই হব, কেলোর মা।"

কেলোর মা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিল।

৪

কেলোর মা'র আশালতা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল,—শিবু এন্‌ট্রান্স পাশ করিল। কেলোর মা নিজের রূপার তাবিজ এক ছড়া বিক্রয় করিয়া জোড়া পাঁঠা দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিয়া আসিল। লোক বলিতে লাগিল, "হাঁ, হর ঘোষালের ছেলে মানুষের মত মানুষ হবে বটে।"

কিন্তু মানুষ হইবার পক্ষে বিষম বাধা উপস্থিত হইল পড়ার গোলযোগ লইয়া। শিবু কলিকাতায় গিয়া পড়িতে ইচ্ছুক হইল। কাত্যায়নী কিন্তু একমাত্র পুত্রকে বিদেশে রাখিতে রাজী হইলেন না। কেলোর মা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রাজী করিল বটে, কিন্তু পড়ার খরচ যোগান দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইল।

দুঃসাধ্য বলিয়া কেলোর মা কিন্তু হাল ছাড়িল না, শিবুর দশ টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সে তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল এবং তাহার মেসের খরচ যোগাইবার জন্য তরকারীর ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সে চাষীদের নিকট হইতে সস্তাদরে আলু, পটোল, বেগুন প্রভৃতি কিনিয়া লইত, এবং এ গাঁ সে গাঁ ঘুরিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া বেশ দুই পয়সা লাভ পাইত। কিন্তু পরিশ্রম ইহাতে বড়ই বেশী হইত। সকালে উঠিয়া তরকারীর বাজরা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া যাইত, ফিরিতে কোন দিন অপরাহ্ণ, কোন দিন সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইত। ঘরে ফিরিয়া সে যখন লাভের পয়সা কাত্যায়নীকে বুঝাইয়া দিত, কাত্যায়নী তখন সদুঃখে বলিতেন, "লাভ ত আট গণ্ডা পয়সা দেখাচ্ছিস্ কেলোর মা, কিন্তু তুই যে গেলি।"

কেলোর মা ইহাতেও যেন সাতিশয় বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিত, "আমি আবার কোথায় গেলুম গো ঠাক্‌রোণ, এই ত ঘরেই আছি।"

দুঃখগম্ভীর স্বরে কাত্যায়নী বলিতেন, "ঘরে ত আছিস, কিন্তু তোর শরীরটা কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস্ কি? এক বেলা এক সন্ধ্যে খেয়ে দিন দিন যে হাড়-সার হয়ে পড়ছিস্।"

কেলোর মা হাসিয়া উত্তর করিত, "এই কথা! তা হোক্ না ক্যানে এখন হাড়-সার, এর পর শিবু যখন মুটো মুটো টাকা আন্‌বে, তখন দুধ, ঘি, ক্ষীর, ছানা খেয়ে দু'দিনে গাছের গুঁড়ি হয়ে যাব।"

কাত্যায়নী বলিতেন, "তত দিন তুই বাঁচলে ত। যে রকম খাটুনী আরম্ভ করেছিস্, আমার ভয় হয়, কোন্ দিন না কোন্ দিন একটা শক্ত রোগে প'ড়ে যাবি।"

কেলোর মা মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "তা পড়বো না গো ঠাক্‌রোণ, তা পড়বো না। এ তোমাদের বামুন-কায়েতের মেয়ে নয় যে, এক দিন একটু পিত্তি পড়লেই অসুখ হবে। আমরা গরীব চাষাভুষোর মেয়ে,—আমাদের শরীরে সব সয়, দু'দিন না খেলেও কেটে যায়।"

গরীব চাষাভুষোর মেয়ে হইলেও দেহের উপর অত্যাচার সকল সময়ে সহ্য হইত না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে, স্নানাহারের অনিয়মে মধ্যে মধ্যে কেলোর মাকে অসুখে পড়িতে হইত। কিন্তু সামান্য অসুখকে কেলোর মা গ্রাহ্য করিত না। অসুখ যখন বেশী হইত, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু সে কয়দিন কেলোর মা যেন ছটফট করিতে থাকিত, এবং পোড়া অসুখ তাহাকে ছাড়া ধরিবার আর লোক পাইল না বলিয়া অসুখের উদ্দেশে যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিত, তাহা শুনিয়া কাত্যায়নী হাস্যসংবরণ করিতে পারিতেন না। তার পর একটু সুস্থ হইলেই আবার বাজরা মাথায় বাহির হইয়া পড়িত। কাত্যায়নী যদি নিষেধ করিয়া বলিতেন, "কাল সবে ভাত এক মুটো খেয়েছিস্ কেলোর মা, আজ বেরিয়ে কায নাই", তাহা হইলে কেলোর মা সরোষে উত্তর করিত, "হাঁ গো, বোধ হয় ত কায নাই, কিন্তু মাসটি গেলেই যখন কর্‌করে তিন গণ্ডা টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, তখন সে টাকা কি তোমার বাবার ঘর থেকে এনে দেবে?"

কাত্যায়নী বলিতেন, "কিন্তু টাকা টাকা ক'রে তুই কি শেষে ম'রে যাবি?"

কেলোর মা রাগে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "সক্কাল-বেলা গাল দিও না ঠাকরোণ, আমি যখন কেলোকে

খেয়ে, কেলোর বাপকে খেয়ে বেঁচে রয়েছি, এখন আমার মরণ শীগ্‌গির হবে না, তা জেনে রেখো।"

রাগতভাবে কথার জবাব দিলেও জবাবের সঙ্গে সঙ্গে কেলোর মা'র চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিত। সে আপন মনে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে বাজরা মাথায় বাহির হইয়া যাইত।

গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার প্রচণ্ড বারিধারা কেলোর মা'র মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত, কেলোর মা সে সকলকে তিলমাত্র গ্রাহ্য করিত না। শিবু যে তাহার টাকার আশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে, যথাসময়ে টাকা না পাইলে তাহার খাওয়ার কষ্ট হইবে, পড়া বন্ধ হইবে, এই আশঙ্কাটাই প্রবল হইয়া তাহার দৈহিক সকল কষ্টকে বাধা দিয়া ফেলিত। জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া—যেরূপেই হউক, মাসে বারোটি টাকা পাঠাইতেই হইবে, তাহাতে মরি আর বাঁচি।

সারাদিন রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এক এক দিন কেলোর মা নিতান্ত ক্লান্ত দেহটাকে কোনরূপে টানিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন ঘরে ফিরিত, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া কাত্যায়নী কাঁদিয়া ফেলিতেন, নিতান্ত কাতরভাবে বলিতেন, "দোহাই তোর কেলোর মা, শিবুকে আর পড়াতে হবে না। সে যা শিখেছে, তাতে বিশ তিরিশ টাকা স্বচ্ছন্দে আন্‌তে পারবে।"

দৈহিক ক্লান্তিটাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া কেলোর মা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিত, "তবে আর ভাবনা কি গো ঠাকরোণ, তোমার শিবু যখন বিশ তিরিশ টাকা আন্‌তে পারবে, তখন আমি মরি বাঁচি, তাতে কি আসে যায়?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কি আসে যায়, তুই তার কি বুঝবি কেলোর মা, সে কথা আমিই জানি, আমিই বুঝি।"

ভারী মুখে কেলোর মা বলিল, "রেখে দাও ঠাকরোণ তোমার জানাজানি! তুমি যদি ভাল বুঝতে, তা হ'লে কখ্‌খনো এমন সব কথা কইতে পারতে না। তোমার ছেলে মুখ্যু হয়ে থাক্‌, কিন্তু আমি বেঁচে থাকি, এই ত তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি। ছেলে হ'লো তোমার কাছে পর, আর আমি হলাম আপন।"

বাষ্পসজল কণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, "তোর পা ছুঁয়ে বল্‌তে পারি কেলোর মা, ছেলে আমি চাই না, আমি চাই তোকে।"

ঈষৎ শ্লেষের স্বরে কেলোর মা বলিল, "ক্যানে গো, ছেলের চেয়ে আমি তোমার আগে হলাম কিসে? আমি তোমার কে?"

গদগদ কণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, "তুই আমার মা, তুই ছেলে-মেয়ে—আত্মীয়-বন্ধু,—তুই আমার বিধাতা পুরুষ।"

কেলোর মা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বামুনের মেয়ে, ভ্যালা যা হোক খোসামুদে কথা শিখেছ। তা আমি যখন তোমার বিধাতা পুরুষ, তখন আমি সহজে মরবো না, অন্ততঃ শিবুর রোজগার না খেয়ে মরবো না, এটা ঠিক জেনো।"

এ কথার উত্তরে কাত্যায়নী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কেলোর মা তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ বাছা, বাবা ঠাকুর মরবার সময় যখন আমার ওপর শিবুর ভার দিয়ে গিয়েছে, এখন তুমি যতই বারণ কর, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না; শিবুকে আমি মানুষ করবোই করবো। এদ্দিন যখন সয়েছ, এখন আর দুটো বছর চুপ ক'রে থাক। তার পর যদি আমি উঠে বসি, তা হ'লে আমাকে নফর মাইতির মেয়েই বলো না।"

"তখন না হয় কুড়ো বাগ্দীর মেয়েই বলবো।"

"ক্যানে গা, তার চেয়ে বল না ঘোষালের মেয়ে বলেই ডাকবে।"

কেলোর মা'র সঙ্গে কাত্যায়নীও হাসিয়া উঠিলেন।

৫

করালী চক্রবর্ত্তী ক্যাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার কথা শোন বৌমা, শিবুর বিয়ে দাও তুমি, সকল দিকেই সুবিধা হবে। নগদ ত হাজার টাকা দিচ্ছেই, তা ছাড়া শিবু যত দিন পড়তে ইচ্ছা করে, তার সমস্ত খরচ যোগাবে। এমন সুবিধা কোথাও পাবে কি তুমি।"

কপাটের আড়ালে থাকিয়া মৃদুস্বরে কাত্যায়নী উত্তর করিলেন, "তা ত পাব না, কিন্তু কেলোর মা যে মত করে না। সে বলে, বড় লোকের মেয়ে ঘরে আনা ভাল নয়।"

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী সহকারে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "না,

হাভাতের ঘরের মেয়ে ঘরে আনা খুব ভাল। চাষার মেয়ের বুদ্ধি আর কত ভাল হবে !"

কাত্যায়নী চুপ করিয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তী তখন গম্ভীর উপদেশের স্বরে বলিলেন, "কেলোর মা'র কথা ছেড়ে দাও। তোমার ছেলে, তোমার নিজের মত কি. তাই বল। দেখ বৌমা, তোমাকে বলি আমি, ছেলে যে জুটে না, তা নয়, শিবুর চাইতে ভাল ছেলেও পাওয়া যায়। শিবু ত সবে দুটো পাশ করেছে, কিন্তু পাঁচ সাতটা পাশ—এমন ছেলেও ঢের পাওয়া যায়। তবে কি জান, তোমরা হচ্ছো আমার নেহাৎ আপন, হরনাথ ত আমাকে পর ভাবতো না, খুড়ো বল্‌তে অজ্ঞান হতো। তা তোমাদের যাতে ভাল হয়, আমার তাই ইচ্ছা। আমি কি তোমাকে মন্দ পরামর্শ দিচ্ছি ?"

লজ্জিতভাবে কাত্যায়নী বলিলেন, "আপনি ভাল কথাই বলছেন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কিন্তু ভাল কথা তোমরা শুন্‌ছো কৈ ? বড় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করায় কত যে উপকার, তা তোমরা কি বুঝবে ? আপদে বিপদে কত সাহায্য পাওয়া যায়। একটা তত্ত্বতাবাস ঘরে এলে তাতেই কত পাওনা।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু কেলোর মা বলে, বড় লোকের মেয়ে বড় ঠ্যাকারে হয়।"

চক্রবর্ত্তী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "আর গরীবের মেয়েই কি ঠ্যাকারে হয় না ? এই ত আমার ভাইপো যতীন গরীবের মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু বৌটি এমন ঠ্যাকারে যে, মুখ তুলে তোমার খুড়ীর সঙ্গেও কথা কয় না। আসল কথা কি জান বৌমা, বড় লোক গরীব লোক নয়, বনেদী ঘর দেখে মেয়ে আনতে হয়। বনেদীর ঘরের মেয়ের গুণ কত !"

চক্রবর্ত্তী বনেদীর ঘরের মেয়ের গুণবর্ণনা দ্বারা কাত্যায়নীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আনীত সম্বন্ধে মত দিলে সকল দিকেই উপকারের সম্ভাবনা। মেয়ের বাপ শিবুর পড়ার খরচ ত যোগাইবেনই, তা ছাড়া তিনি এক জন বড় উকীল। শিবু পড়া ছাড়িয়া চাকরী করিতে ইচ্ছা করিলে এক কথায় দুই এক শত টাকা মাহিনার চাকরী হইয়া যাইতে পারে। এমন সুযোগ ত্যাগ করিলে পরে ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে।

সকল দিকে লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া কাত্যায়নী এ প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কেলোর মাকেও ইহার উপকারিতা বুঝাইতে গেলে কেলোর মা তাঁহার মতেই সায় দিয়া বলিল, "তা বাছা, শিবুর যদি এতে ভাল হয়, তবে আমার অমত কিছু নাই।"

কেলোর মা যখন সম্মতি দিল, তখন আপত্তির আর কোন কারণই রহিল না। করালী চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় শিবনাথের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

অনেকেই বলিল, "উকীল শশী মুখুয্যের এই পাড়াকুঁদুলী মেয়েটাকে পার করিয়া দিয়া করালী চক্রবর্ত্তী দুই শত টাকা ঘটক-বিদায় পাইয়াছেন।" চক্রবর্ত্তী কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেন না ; বলিতেন, হরনাথের ছেলের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবেই তিনি এই ঘটকালি করিয়াছেন।

বৌ দেখিয়া কিন্তু সকলেই সন্তুষ্ট হইল। ছেলের মা'রও আনন্দের সীমা রহিল না। বাঃ, বেশ চাঁদের মত বৌ ! কেলোর মা যেমন আশা করিয়াছিল, প্রায় তেমনটি হইয়াছে। রাজকন্যা ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি সুন্দরী হইতে পারিত !

কাত্যায়নী কিন্তু বধূর সুন্দর মুখে কোমলতার আভাস না দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলেন।

বিবাহ ত হইয়া গেল, কিন্তু বিবাহের পর বৌ-ভাত লইয়া বড়ই গোল বাধিল। কেলোর মা'র স্পষ্টবাদিতায় যাহারা সন্তুষ্ট ছিল না, তাহারা এইবার কেলোর মাকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়া ধরিয়া বসিল, "কেলোর মা যখন হাটেবাজারে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরিয়া পয়সা রোজগার করিতে পারে, তখন উহার স্বভাবচরিত্র নিশ্চয়ই ভাল নয়। ও মাগী বাড়ীতে থাক্‌তে আমরা কেউ ওখানে পাত পাতবো না।"

কাত্যায়নী শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। করালী চক্রবর্ত্তী এই দলভুক্ত হইলেও তিনিই যখন এই বিবাহের ঘটক, তখন অগত্যা তাঁহাকে সাপ হইয়া খাইয়া ওঝা হইয়া ঝাড়িতে হইল। তিনি সকলকে বুঝাইয়া অবশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন, অন্ততঃ এই দিনের জন্যও কেলোর মাকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এই মুখরা রমণীর সম্বন্ধে এই দণ্ডই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল।

নিরুপায় হইয়া কাত্যায়নীকে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল। কেলোর মা'ও সহাস্য মুখেই এই দণ্ড মাথা পাতিয়া লইয়া বলিল, "তা দশ জনে যদি এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেয়, আমি না হয় এক দিনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে গেলুম।"

শিবনাথও বাঁকিয়া বসিল; দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বলিল, "আমার বাড়ীতে কেউ না খায়, তাতে আমার ক্ষতি নাই, আমি কিন্তু কেলোর মাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।"

চক্রবর্ত্তী অনেক বুঝাইয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কেলোর মা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "না শিবু, এমন 'তিক্' করিস না। আমি এক দিনের জন্যে বাড়ী ছেড়ে গেলে যদি পাঁচ জনে এসে খায়, তবে আমি না হয় বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি।"

শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কোথায় যাবি, কেলোর মা?"

কেলোর মা হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার যাবার ভাবনা কি রে, রাইপুরে আমার পিস্‌তুতো বোনের মেয়ের বাড়ী আছে। আমি গেলে তারা কি এক দিন আমাকে ভাত দেবে না?"

শিবু বলিল, "ভাত দেবে, কিন্তু তারা মনে করবে কি? না কেলোর মা, তোকে আমি যেতে দেব না।"

কেলোর মা এবার একটু রাগ দেখাইয়া বলিল, "যেতে না দিলে তোর ঘরে খেতে আস্‌বে কে বল্ ত? আমার জন্যে তুই একঘরে হয়ে থাক্‌বি না কি?"

দৃঢ়তার সহিত শিবু বলিল, "হাঁ, তাই থাক্‌বো।"

তর্জ্জন সহকারে কেলোর মা বলিল, "হাঁ, তাই থাক্‌বি বৈ কি। আমাকে নিয়ে থাকলে তোর আর দুটো হাত বেরোবে, না? তা তোর হাত বেরুলেও আমি থাকবো না। এই চললুম আমি, কৈ ধ'রে রাখ দেখি আমাকে।"

শিবু হাত দুটো বাড়াইয়া তাহাকে আগলাইয়া বলিল, "ধ'রে রাখবোই ত, কৈ যা দেখি।"

কেলোর মা তখন চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখ শিবে, ভাল চাস্ ত ছেড়ে দে আমাকে। কতক্ষণ তুই আগলে রাখবি? ভালয় ভালয় যদি যেতে দিস্, কা'ল সকালেই এসে হাজির হব, নইলে ছ'মাস আমি এমুখো হব না, তা ব'লে রাখছি।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে কেলোর মাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। শিবু বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার মঙ্গলের জন্য কেলোর মা আজ যে নির্ব্বাসন-দণ্ড মাথা পাতিয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এ সঙ্কল্প হইতে কেহই তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। কাযেই শিবু তাহাকে আর ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু এই আনন্দোৎসব হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া কেলোর মা যে কতটা মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া শিবুও কেলোর মা অপেক্ষা অল্প মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিল না। এই বেদনায় তাহার ফুলশয্যার আনন্দটা যেন সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া আসিল।

স্বজাতি-কুটুম্ব সকলে পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়া গেল। শিবু কিন্তু সে দিন কিছুই খাইল না; উপবাসে দিন-রাত্রি কাটাইয়া দিল। কাত্যায়নী খাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ নিষ্ফল হইল। অগত্যা কাত্যায়নীও কিছুই খাইলেন না।

বধূ অমলা নিতান্ত বালিকা নহে। পনরো বছরের মেয়ে, জ্ঞান-বুদ্ধি তাহার বেশ হইয়াছিল। একটা ঝি-মাগীর জন্য মাতাপুত্রের এতটা বাড়াবাড়ি তাহার কাছে যেন নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। মুখে কিছু না বলিলেও এ জন্য সে মনে মনে যথেষ্ট বিরক্তি অনুভব করিল।

৬

"হাঁ বৌ-মা, তোমার কি রকম আক্কেল গা? তুমি খেয়ে দেয়ে দিব্যি শুয়ে রইলে, আর শিবু ঘুম থেকে উঠে একটা পান পেলে না, অম্নি বেরিয়ে গেল?"

ভারি মুখে বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে অমলা উত্তর করিল, "অম্নি বেরিয়ে গেল কেন? তোমাদের যখন আক্কেল ছিল, তখন তোমরাও ত দিলে পারতে।"

অমলার এই রুক্ষ উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া কেলোর মা বলিল, "আমরাই যদি চিরকাল পান-জল দেব, তা হ'লে তুমি এসেছ কি জন্যে, বাছা?"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া ঘৃণা-বিমিশ্র কণ্ঠে অমলা বলিল, "আমি কি জন্যে এসেছি, সে কৈফিয়ৎ একটা ঝি-মাগীর কাছে দিতে পারবো না।"

ঝি-মাগী! বৌমা বলে কি? বিস্ময়ের আতিশয্যে কেলোর মা'র চোখ দুইটা যেন কপালে উঠিল। সে নির্ব্বাক্‌ভাবে অমলার ঘৃণাকুঞ্চিত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

কাত্যায়নী নিকটেই ছিলেন। তিনি বধূর উত্তরটা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিয়া তিরস্কারের স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ও কি কথা বৌ-মা, ঝি-মাগী বলছো কাকে? কেলোর মা ত ঝি-মাগী নয়, ও শিবুর মা, বাপ, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব যা কিছু বল সবই।"

ঘৃণায় ঠোঁট ফুলাইয়া অমলা পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "উনি যে এ বাড়ীর গুরুঠাকরুণ, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমাদের গুরুঠাকরুণ হ'লেও আমার কে?"

ক্রুদ্ধভাবে কাত্যায়নী বলিলেন, "তোমার কে? তুমি কি এ বাড়ীর কেউ নও?"

মুখখানাকে বেগে ঘুরাইয়া লইয়া দুঃখগাঢ় কণ্ঠে অমলা বলিল, "আমি এ বাড়ীর কেউ হ'লে আমাকে কি কথায় কথায় এই ঝি-মাগীর কাছে দশ কথা শুনতে হয়?"

আবার সেই ঝি-মাগী! ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি বৌমা, নেহাৎ ছোট লোকের মেয়ে।"

শ্লেষতীব্র কণ্ঠে অমলা বলিল, "আমার বাবা ছোট লোক না হ'লে এমন ছোট লোকের ঘরে মেয়ে দিতেন কি?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অমলা সেখান হইতে সরিয়া গেল। কাত্যায়নী ক্রোধে যেন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিলেন। কেলোর মা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শান্ত-কোমল স্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কি কর বাছা, কার সঙ্গে এত কথা কাটাকাটি কচ্ছো? ও যে শিবুর বৌ।"

কাত্যায়নী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তোর কথা না শুনে বড় লোকের মেয়ে ঘরে এনে আমি খুব অন্যায় কায করেছি, কেলোর মা!"

কাত্যায়নীর নেত্রপ্রান্ত দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কেলোর মা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না, তোমার বাছা, সেই চেরকেলে পাগ্‌লামী এখনও গেল না। বড় লোকের মেয়ে ঘরে এনে অন্যায়ই এমন করেছ কি বল। বড় লোকের মেয়ে না আন্‌লে এতগুলো নগদ টাকা, এত জিনিষপত্তর কোথায় পাওয়া যেতো, শিবুর এক শো টাকা মাইনের চাকরীই বা কি ক'রে হ'তো?"

অনুতাপদীর্ণ কণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, "এমন চাকরী হ'তো না, এত টাকা পাওয়া যেতো না বটে, কিন্তু তোকে এমন সব কথা শুন্‌তে হ'তো না, কেলোর মা।"

কেলোর মা ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা হোক শুন্‌তে আমাকে, শিবুর ভাল হয়েছে ত। আমাকে অপর কেউ ত এ সব কথা বলছে না, বলছে শিবুর বৌ। তা বলুক, তাতে আমার গায়ে ফোস্কা হবে না। তুমি কিন্তু বাছা, এত রেগে উঠে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটী ক'রো না। লোক শুন্‌লে বল্‌বে, বৌ নিয়ে ৮।১০ দিন ঘর কত্তে না কত্তে মাগী বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে। ছিঃ! শিবুই বা কি বল্‌বে?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু বোয়ের এমন সব উত্তর শুন্‌লে শিবু কি বল্‌বে?"

শঙ্কিত স্বরে কেলোর মা বলিয়া উঠিল, "খবদ্দার বাছা, শিবুকেও এ সব কথা শোনায়? আমার মাথার দিব্যি, তাকে যেন কোন কথা শুনিও না।"

কেলোর মা'র সহিষ্ণুতায় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কাত্যায়নী একটা দুঃখের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

৭

কাত্যায়নীকে শুনাইতে হইল না; অমলা নিজেই শিবনাথকে বলিল, "দেখ, আমি সব সইতে পারবো, কিন্তু এই ঝি-মাগীর কথা আমার সহ্য হবে না।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি-মাগী কে অমলা?"

ঝঙ্কার দিয়া অমলা উত্তর করিল, "তোমাদের বাড়ীতে কটা ঝি-মাগী আছে?"

শিবুর চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া আসিল। সে গম্ভীর সতেজ কণ্ঠে বলিল, "কেলোর মা'র কথা বলছো? ও এ বাড়ীর ঝি নয় অমলা, ও কেলোর মা।"

মুখ বাঁকাইয়া নিতান্ত অবজ্ঞার স্বরে অমলা বলিল, "কেলোর মা-ই হোক, আর ভুলোর মা-ই হোক, ওর গিন্নীপণা আমি সইতে পারবো না।"

নববধূর ঘৃণাকুঞ্চিত মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে শিবু বলিল, "এ বাড়ীতে থাকতে হ'লে ওর গিন্নীপণা সইতেই হবে।"

অমলা বলিল, "তা হ'লে এ বাড়ীতে নাই বা রইলাম?"

"কোথায় থাক্‌বে?"

"থাক্‌বার যায়গা আমার আছে। আমার বাবার ঢের ভাত আছে।"

রাগে মুখখানাকে কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে শিবু বলিল, "তোমাকে চিরকাল খাওয়াবার মত ভাত যদি তোমার বাবার থাক্‌তো, তা হ'লে এত টাকা দিয়ে এত খোসামোদ ক'রে তোমার বাবা তোমাকে অপরের হাতে দিতেন না।"

অমলা গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "আমার বাবা যদি জানতেন যে, যার হাতে তিনি মেয়ে দিচ্ছেন, সে এক ছোট লোক মাগীর খেয়ে মানুষ, তা হ'লে এমন ঝক্‌মারীর কায তিনি কখনও কত্তেন না।"

রাগে শিবুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অমলার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোধপরুষ কণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথার ব্যবসা ক'রে বড় লোক হওয়ার চাইতে ছোট লোকের খেয়ে মানুষ হওয়া লক্ষগুণে ভাল।"

শ্লেষকঠোর স্বরে অমলা বলিল, "মিথ্যুক বড় লোক শ্বশুর না থাক্‌লে কিন্তু এক শ টাকার মাইনের চাকরী পাওয়া যায় না।"

অমলার ওষ্ঠপ্রান্তে শ্লেষের তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। শিবনাথ আরক্ত মুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি ভয়ানক প্রকৃতির মেয়েমানুষ এই অমলা! এমন দাম্ভিকা স্ত্রী লইয়া সংসারী হওয়া অপেক্ষা অরণ্যবাসী হওয়াও শ্রেয়স্কর। খানিক ভাবিয়া শিবু বলিল, "তা হ'লে গরীবের এই তেতো ভাত আর না খেয়ে তোমার বড় লোক বাবার মিষ্টি ভাত খাওয়াটাই তোমার পক্ষে ভাল ব'লে আমি মনে করি।"

অমলা বলিল, "আমার ত তাতে আপত্তি নাই।"

শিবু বলিল, "ভাল, কালই তার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আর চাকরী—চেষ্টা করলে এক'শ টাকা মাহিনা না হোক, পঞ্চাশ ষাট টাকা মাহিনার চাকরী আমি যোগাড় ক'রে নিতে পারবো।"

শিবু পরদিন সকালে উঠিয়াই মাতার নিকট অমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। কাত্যায়নী শুনিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি রে, বৌমাকে আনা হয়েছে, এখনও তিন মাস পেরোয় নি, এরি মধ্যে পাঠিয়ে দিতে যাব কেন? তা ছাড়া তারা কেউ নিয়ে যেতেও আসে নি। সেধে পাঠিয়ে দিলে লোক বলবে কি?"

শিবু বলিল, "লোক বলবে, বৌকে খেতে পরতে দিতে পারলে না, তাই সেধে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে। তা বলুক।"

কাত্যা। তবু পাঠাতে হবে?

শিবু। হাঁ।

কেলোর মা কিন্তু তর্জ্জন করিয়া বলিল, "কেন বল্‌ ত, সোমত্ত বৌকে বাপের বাড়ীতে পাঠাতে যাব? তোর হুকুমে পাঠাতে হবে না কি? কৈ, দে ত পাঠিয়ে, দেখি তোর কত বড় সাদ্ধ্যি।"

গম্ভীরভাবে শিবু বলিল, "রাগ কর, আর যাই কর, কেলোর মা, না পাঠালে শেষটা কিন্তু ভাল হবে না, তা ব'লে রাখছি।"

কেলোর মা রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল হোক, মন্দ হোক, সে আমরা বুঝবো, তোর সে জন্যে এত মাথাব্যথা কেন বল্‌ ত। তুই চাকরী করবি, পয়সা আনবি, খাবি, ঘুমুবি—এই পর্য্যন্ত। সংসারের কোন কথা তুই কইতে যাস্ কেন বল্‌ ত?"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে শিবু বলিল, "ভাল, আর কোন কথা কইবো না।"

শিবু নিরস্ত হইল। কেলোর মা'র কিন্তু বুঝিতে বাকী রইল না। সে যে ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে। তাহারা বৌমার যে সকল কথা শিবুর কাছে গোপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল, বৌমা নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়াছে। নতুবা শিবু হঠাৎ বৌকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য এতটা ব্যস্ত হইয়া উঠিবে কেন? ছি ছি, বৌমার কি একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই?

কেলোর মা গোপনে অমলাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "দেখ বৌমা, তুমি এখনও নেহাৎ ছেলে মানুষ। উকীলের মেয়ে হ'লে কি হবে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও নাই। পাঁচ কথা শোনাতে হয়, আমাকে তুমি শোনাবে, শিবুর কানে তুলতে যাও কেন?"

অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া অমলা বলিল, "তুলেছি, তাতে হয়েছে কি? আমার কাছে এত ঢাক্‌-ঢাক্ গুড়-গুড় নাই, যা বল্‌বো, সকলের কাছেই স্পষ্ট বল্‌বো। তাতে কেউ পারে, আমার মাথাটা কেটে নেবে।"

অমলার স্পর্দ্ধিত বাক্যে কেলোর মা শুধু দুঃখিত নয়, অনেকটা চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে দিন-রাত্রি কেবল

ঠাকুর-দেবতার নিকট অমলার বুদ্ধি-শুদ্ধি পরিবর্ত্তনের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৮

কেলোর মা'র প্রার্থনা পূর্ণ হইল না, অমলার বুদ্ধি-শুদ্ধি পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বরং কেলোর মা'র উপর বিষদৃষ্টি দিন দিন যেন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কেলোর মা'র প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কায অমলার নিকট যেন বিষবৎ হইয়া উঠিল। কেন যে হইল, তাহা কেলোর মা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

ইহাতে সংসারে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কেলোর মাকে লইয়া শাশুড়ী-বধূতে প্রায়ই বিবাদ বাধিতে থাকিল। পাড়ার পাঁচ জন মেয়ে আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে গিয়া কেহ বধূকে, কেহ বা শাশুড়ীকে দোষ দিতে লাগিল। বৌয়ের উপর রাগে কাত্যায়নীকে কত দিন অনাহারে থাকিতে হইল। শিবু এই সকল ব্যাপার দেখিত, শুনিত, কিন্তু কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই বলিত না। মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে সে গুম্‌রাইতে থাকিত। ইহার ফলে সে দিন-রাত যেন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে থাকিল, তাহার কাঞ্চনকান্তি শরীর দিন দিন যেন কালি-মূর্ত্তি হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সকল দেখিয়া কেলোর মা বেশ বুঝিতে পারিল, সংসারে সে-ই বিষম অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যদি এই সংসার ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, আর কোনই গোল থাকে না। তাহারই উপর ত অমলার যত বিষদৃষ্টি; সে চলিয়া গেলে অমলা নিশ্চয়ই শান্তভাব ধারণ করিবে। তখন কাত্যায়নী বা শিবু শান্তিতে কাটাইতে পারিবে। কিন্তু সে যাইবে কোথায়? যাইবার স্থান যে একেবারেই নাই। কৈবর্ত্তের মেয়ে, এখনও তাহার খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে। যেখানে গিয়া গতর খাটাইবে, সেইখানেই এক মুঠা খাইতে পাইবে। কিন্তু সে ত শুধু খাওয়া-পরার ভাবনা ভাবে না, শিবুকে ছাড়িয়া সে কিরূপে যাইবে? গেলে সে বাঁচিবে কি? বাঁচা মরা পরের কথা, মরিলেই সে এখন বাঁচে। কিন্তু দেহে প্রাণ থাকিতে শিবুকে ছাড়িয়া সে যাইতে পারিবে কি? ওহো, শিবুই যে তাহার সংসারের সর্ব্বস্ব। বুকের এক এক বিন্দু রক্ত দিয়া সে শিবুকে মানুষ করিয়াছে, তাহার দেহের প্রত্যেক রক্ত-কণিকার সহিত যে শিবু মিশিয়া গিয়াছে। এখানে থাকিয়া সে সর্ব্ববিধ নির্য্যাতন সহ্য করিবে, কিন্তু শিবুকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না।

কিন্তু ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, না গেলে আর চলে না। শিবুর জন্য সে সকল নির্য্যাতনই মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার এই নির্য্যাতনের ফল ভোগ করিতেছে যে শিবু। শিবু যে দিন দিন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছে। শিবুকে ছাড়িয়া না গেলে শিবু যে বাঁচিবে না!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সঙ্কল্প স্থির করিয়া কেলোর মা শিবুকে বলিল, "হাঁ রে শিবু, এত ক'রে তোকে মানুষ করলুম, দু পয়সা রোজগারও তুই কচ্ছিস্। তা আমাকে শেষ বয়সে পুণ্যিধর্ম্ম করাবি না?"

শিবু বলিল, "তুমি কি পুণ্যিধর্ম্ম কত্তে চাও কেলোর মা, বল।"

কেলোর মা বলিল, "আমি আর কি পুণ্যিধর্ম্ম করবো? তবে বিপিন বোসের মা বিন্দাবনে যাচ্ছে, সেখানেই থাকবে বোধ হয়। তা বুড়ী আমাকে বলছিল, চল্ না কেলোর মা, আমার কাছে থাক্‌বি, আর গোবিন্‌জীর পেসাদ পাবি। শিবু এত টাকা রোজগার কচ্ছে, মাসে দু'টো টাকা কি আর তোকে পাঠাতে পারবে না?"

একটু ভাবিয়া শিবু বলিল, "টাকা পাঠাতে পারি, কিন্তু তুমি কি সেখানে থাক্‌তে পারবে?"

জোরে মাথা নাড়িয়া কেলোর মা বলিল, "খুব পারবো। আমার এখন আর কি, এখানেও যা, সেখানেও তাই।"

শিবু বলিল, "আচ্ছা, তাই না হয় হবে।"

শিবুর এই সম্মতিতে কেলোর মা'র সঙ্কল্পটা আরও যেন দৃঢ় হইয়া আসিল। হায়, বৌভাতের দিনে যে শিবু তাহাকে এক দিনের জন্যও ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল না, সেই শিবু আজ তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে প্রস্তুত। তবে আর কিসের জন্য সে এখানে থাকিবে? না, বৃন্দাবনে যাইতেই হইবে তাহাকে। শিবু টাকা না পাঠায়, ভিক্ষা করিয়াও ত সে পেট চালাইতে পারিবে। বড় দুঃখে কেলোর মা'র অন্তর ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল।

কাত্যায়নী শুনিয়া পুত্রকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,

"তা যাক্ বাছা মাগী সেখানে। তাতে তোর দশ টাকা খরচ হয় হোক, মাগীর হাড়টা জুড়ুক।"

তাহাই হইল। বিপিন বোসের মায়ের সঙ্গে কেলোর মা বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিবে স্থির হইয়া গেল। লোক শুনিয়া বলিতে লাগিল, "আহা, মাগী যে কষ্ট ক'রে শিবুকে মানুষ করলে, তা সার্থক হ'লো।. মাগীর কপাল ভাল।"

যাত্রার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতে কেলোর মা ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে এবং সংসার ও শিবুর সুখ অসুখ সম্বন্ধে কাত্যায়নীকে কি ভাবে চলিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিল। সেই সঙ্গে শিবুর মন বুঝিয়া চলিবার জন্য অমলাকেও উপদেশ দিতে ত্রুটি করিল না।

কেলোর মা সকলকে বুঝাইল, কিন্তু নিজের অবুঝ মনটাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিল না; মনটা থাকিয়া থাকিয়া যেন গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। হায় রে অবুঝ মন, শিবু তোর কে? তার মায়ায় জড়িয়ে কত দিন এখানে প'ড়ে থাক্‌বি? এখানে থেকে আর তোর হবে কি? চল্, সেখানে গিয়ে গোবিন্দজীকে ডাকলে পরকালের জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না।

মন কখন বুঝিত, কখন বুঝিত না। ক্রমে যাত্রার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, কেলোর মা'র মনটা ততই যেন আঁকুপাঁকু করিতে লাগিল।

৯

কাত্যায়নী ডাকিলেন, "ও কেলোর মা, শুয়ে রয়েছিস্ এখনও? আজ এক্ষুনি যে তোকে বেরুতে হবে।"

কোন উত্তর না দিয়া কেলোর মা নিজের বিছানা গুটাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল। কাত্যায়নী বলিলেন, "বস্‌লি যে আবার? নেয়ে এক মুঠো খেয়ে যাবি ত? আমি ভাত চাপিয়ে দিয়েছি।"

মুখ বাঁকাইয়া কেলোর মা বলিল, "হাঁ, সক্কালবেলা আমি ভাত খেতে যাব।"

বিপিন বোসের চাকর আসিয়া তাড়া দিয়া গেল, গিন্নী-মা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কেলোর মা শীঘ্র গিয়া যেন তাঁহার সহিত মিলিত হয়। কেলোর মা তাহাকে যাইতে বলিয়া যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

কাত্যায়নী তাড়া দিয়া বলিলেন, "এখনও তুই ব'সে রইলি কেলোর মা, যাবি কখন্ তবে?"

কেলোর মা নিরুত্তরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কাত্যায়নী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ কেলোর মা, তুই কি তা হ'লে যাবি না?"

ভারী গলায় কেলোর মা উত্তর দিল, "না।"

বিস্ময় সহকারে কাত্যায়নী বলিলেন, "ও মা, যাবার জন্যে সব ঠিক, পোঁটলা-পুঁটলী পর্য্যন্ত বাঁধা। এখন তুই বল্‌ছিস্ যাব না?"

কেলোর মা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিয়া উঠিল, "আমি যাব না গো যাব না। তোমরা আমাকে যতই তাড়িয়ে দাও, আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবো না।"

কাত্যায়নী বুঝিতে পারিলেন, কেলোর মা মুখে যাহাই বলুক, শিবুকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। মায়ার শৃঙ্খলে তাহার পা দুইটা যে বাঁধা পড়িয়াছে। কেলোর মা চলিয়া গেলে কাত্যায়নী যে তাহাতে সুখী হইতেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেবল কেলোর মা'র সুখশান্তির জন্যই তিনি এ প্রস্তাবে সায় দিয়াছিলেন। এক্ষণে সে যাইবে না শুনিয়া কাত্যায়নী হর্ষপ্রফুল্ল মুখে হাস্যকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "ও কি কথা কেলোর মা, আমরা তোকে তাড়িয়ে দেব! তুই নিজেই ত পুণ্যিকর্ম্ম কত্তে বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলি।"

কেলোর মা সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে বলিল, "ওগো, পুণ্যিধর্ম্ম আমার কিছু নেই। এই বাড়ীই আমার বিন্দাবন, শিবুই আমার স্বগ্‌গ। শিবুকে ছেড়ে আমি কাশী বিন্দাবন কোথাও গিয়ে থাক্‌তে পারবো না।"

পাড়ার লোক যখন শুনিল যে, কেলোর মা স্বেচ্ছায় তীর্থবাসের এমন সুযোগ ত্যাগ করিল, তখন সকলেই তাহার দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অমলা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "হাঁ, ও মাগী আবার বৃন্দাবনবাসী হবে। পচা ডোবার ব্যাং কখন স্বর্গে যায় কি?"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার দাঙ্গা

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্ম্মযুদ্ধ চলেছে, তা দেখে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতাদের মধ্যে অনেকে যে চমকে উঠেছেন, এতেই আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। কারণ, ব্যাপার যা ঘটেছে, তা বিনামেঘে বজ্রাঘাত নয়।

আজ কয় বৎসর ধ'রে ভারতবর্ষের পলিটিকাল গগনে যে মেঘ জমছে, সে বিষয়ে আর কারও না হোক, এ দেশের পলিটিকাল বিমান-বিহারীরা যে অন্ধ ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে শুনতে পাই যে, যাঁরা একটা বড় আইডিয়ালের ঘুড়ির পিছনে ছোটেন, তাঁরা না কি কোনরূপ পারিপার্শ্বিক সত্যের সন্ধান পান না।

সে যাই হোক, যাঁরা পলিটিকাল নেশার ঘোরে এ বিষয়ে আকাশকুসুম রচনা করছিলেন. তাঁরা যে আজ চোখে সরষের ফুল দেখছেন, এতে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

আজ কয় বৎসর ধ'রে মালাবারে, কোহাটে, দিল্লীতে, প্রয়াগে, লক্ষ্ণৌয়ে, গুলবার্গে, সেকন্দ্রাবাদে, মুলতানে যা ঘটেছে, সে ঘটনা কিসের লক্ষণ, সমাজদেহের রোগের, না স্বাস্থ্যের? যদি কেউ বলেন যে, ও সব তুচ্ছ ব্যাপার আমরা চক্ষুর অন্তরালেই রেখেছি, তা হ'লে বলতে হয় যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের চিকিৎসক আর যিনিই হোন, পলিটিসিয়ানরা নন। "কি হওয়া উচিত"—সে বিষয়ে জ্ঞান অতিমাত্রায় টন্‌টনে হ'লে—"কি হচ্ছে" তার জ্ঞান মানুষে হারিয়ে ব'সে থাকে। তখন সত্যকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তিও বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। এমন কথাও আমরা শুনতে বাধ্য হয়েছি যে, কলকাতায় যা ঘটেছে, তা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের নয়—সখ্যের নিদর্শন। "হয়"কে "নয়" করবার এমন নির্লজ্জ চেষ্টা পূর্ব্বে অন্ততঃ এ দেশে কখনও দেখা যায় নি।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানে সে দিন peace conferenceএর যে বৈঠক বসেছিল, তাতে একটা নতুন কথা শোনা গেল। এ হাঙ্গামার পিছনে না কি মস্তিষ্ক আছে আর আমাদের হিন্দু নেতারা সেই মস্তিষ্ক আবিষ্কারের কার্য্যে ব্রতী হবেন।

মস্তক বাদ দিয়ে মস্তিষ্কের খোঁজ পাওয়া যাবে না। আর যদি সে সব মস্তক তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন, তা হ'লে সেই সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করবেন যে, তাতে মস্তিষ্ক নেই। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ হিন্দু-মুসলমানদের কুকুর-বিড়ালের মত কামড়াকামড়ি করবার প্রেরণা যেখান থেকে আসে, তাকে হৃদয় বলতে পারো, কিন্তু মস্তিষ্ক কোন হিসেবেই বলা যায় না। কারণ, এ কামড়াকামড়িতে হিন্দুরও লাভ নেই, মুসলমানেরও লাভ নেই। যদি কোনও হিন্দু বা মুসলমান মনে করেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মেড়ার লড়াই করালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ফয়দা হবে, তা হ'লে বলি, উক্তরূপ ধারণা শুধু অমানুষিকতার নয়, নির্ব্বুদ্ধিতারও সমান পরিচায়ক। ওরূপ ধারণার মূল এই। পলিটিকসের ক্ষেত্রে নিজের ফয়দা একা হাতে করা যায় না। পিছনে বহু লোক চাই। এই বহুর নাম mass। অতএব এই massকে জাগাতে হবে। অর্থাৎ আমাদের ডুগডুগির তালে তাদের নাচাতে হবে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নবধর্ম্ম পলিটিক্‌সের "প"ও mass জানে না। তারা সেই সেকেলে হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম প্রাণপণে আঁকড়ে ব'সে আছে। সুতরাং ধর্ম্মের নামে যদি ডুগডুগি বাজাই, তা হ'লে mass জেগে উঠবে। ফলে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পলিটিকাল মামলা ফতে হয়ে যাবে। এ রকম অতিবুদ্ধি আসলে অতি নির্ব্বুদ্ধিতা। ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু-মুসলমান নেই, আর একটি তৃতীয় পক্ষ আছে—যার নাম বৃটিশরাজ। আর পলিটিসিয়ানরা যে সব ফয়দার জন্য লালায়িত, সে সবেরই দাতা হচ্ছে এই তৃতীয় পক্ষ—আর গ্রহীতা অপর দুই পক্ষ।

এই ধর্ম্মের আগুন হিন্দু-মুসলমান নেতারা জ্বালাতে পারেন, কিন্তু নেবাতে পারেন না; তার জন্য চাই ইংরাজের দমকল। আর সে দমকল আবশ্যক হলে তাঁরা পুরো চালাবেন। এ দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষজাত বিরাট অগ্নিকাণ্ড তাঁরা কিছুতেই হ'তে দেবেন না। কারণ, প্রথমতঃ তাঁরা রাজা—দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ইংরাজ। পলিটিক্‌সে কোথাকার আগুন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা তাঁরা সম্পূর্ণ জানেন। ভারতচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছেন—

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।"

ইংরাজ জানে যে, এ প্রশ্নের উত্তর—"এড়ায় না।"

সুতরাং জনসাধারণের মনে ধর্ম্ম-বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বালিত করা ততক্ষণই বড় চালাকির কায—যতক্ষণ না আমাদের ঘর পুড়তে আরম্ভ করে।

আমাদের নেতারা যে কত দূর অন্ধ অথবা কপট অন্ধ, একটি ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের জনৈক পলিটিকাল গুরু মৌলানা মহম্মদ আলি, কলিকাতার এ হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা শুনে হিন্দু নেতার দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। এঁদেরও হতভম্ব ভাব দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি। মৌলানা সাহেবের বাৎচিৎ তাঁরা পূর্ব্বে কখনও কি শোনেন নি, না তা বোঝেন নি? তাঁর লিখিত Comradeএর কথা আর তুলব না। কারণ, Comrade যখন হপ্তার পর হপ্তা কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হ'ত, তখন সম্ভবতঃ আজকালকার অনেক নেতা পলিটিক্সের রাজ্যে হামাগুড়ি দিতেন। সুতরাং পুরোণো কেচ্ছা কাটবার কোনও প্রয়োজন নেই। বিশেষতঃ ইতোমধ্যে যখন মহম্মদ আলির মস্ত একটা বদল হয়ে গিয়েছে। আজ বছর পাঁচ ছয় আগে তিনি "গন্ধীং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, কংগ্রেসং শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পলিটিকাল বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবনের বৌদ্ধযুগেরই প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

যিনি রাতারাতি মিষ্টার থেকে মৌলানা হয়ে ওঠেন, তাঁর কথাবার্ত্তা একটু মন দিয়ে শোনা দরকার। আমিও তাঁর ভূতপূর্ব্ব Comrade হিসাবে তাঁর কথা কান খাড়া ক'রে শুনেছি।

তাঁর যখন ফৌজদারী আদালতে বিচার হয়, তখন সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তৃতা প'ড়ে দেখবেন যে, সে দিন তিনি যা বলেছেন, তাঁর সে জবাব তারই পূর্ব্বসংস্করণ কি না। ধর্ম্মবিশ্বাস ও fanaticism যে পর্য্যায় শব্দ, সে বক্তৃতায় আগা-গোড়া তাই প্রমাণ করা হয়েছে। এক ধর্ম্মের fanaticism অর্থ যে অপর ধর্ম্মের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ, এ মনস্তত্ত্বের জ্ঞান মৌলানা মহম্মদ আলির নেই, কিন্তু আর পাঁচ জনের আছে। অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও fanatic সংস্কৃত ভাষাতেও পর্য্যায়শব্দ নয়, ইংরাজী ভাষাতেও নয়।

তার পর তাঁর কংগ্রেসের presidential speech প'ড়ে দেখবেন, সেটিও তাঁর বর্ত্তমান মতামতের পূর্ব্বসংস্করণ মাত্র। তাতে যাত্রাদলী বীররস ঢের আছে—কিন্তু সুবুদ্ধির লেশমাত্রও নেই। যখন দেখলুম যে, আমাদের পলিটিকাল নেতারা উক্ত মহাপ্রসাদ অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করলেন, তখন আমার সন্দেহ হয় যে, সে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, হয় তাঁরা ইংরাজী ভাষা জানেন না, নয় তাঁরা জেনেশুনেও বোকা সাজাটা পলিটিকাল বিজ্ঞতার কার্য্য মনে করেন। আজকে যে সেই দলই মৌলানা সাহেবের কথা শুনে চম্কে উঠেছেন, তাতে তাঁরা শুধু এই প্রমাণ করছেন যে, এত দিন তাঁরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন। আজকে গুঁতোর চোটে জেগে উঠে বিলাপ করছেন। এ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আর যাই কুফল হোক, একটি এই সুফল ফলেছে যে, পলিটিকাল স্বপ্ন-বিলাসীদের লীলাখেলার দিন ফুরিয়েছে।

কলকাতার দাঙ্গার নিমিত্ত-কারণ খোঁজবার আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ, তা খুঁজে বার করা পুলিসের কর্ত্তব্য, আমাদের কর্ম্ম নয়। যে প্রমাণ-প্রয়োগ পুলিসের কাছে যথেষ্ট মনে হয়, সাধারণ লোকের কাছে যে তা যথেষ্ট মনে হয় না, তার পরিচয় আগে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং পরে হয় ত পরিচয় পাওয়া যাবে যে, যে প্রমাণ-প্রয়োগ সাধারণ লোকের কাছে যথেষ্ট মনে হয়, পুলিসের কাছে তা যথেষ্ট নয়—

ভারতচন্দ্র বলেছেন—

'যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্ত লোকে লাঠি বাজে।'

এই কথাটি মনে রাখলে লেখক ও বক্তার দল অর্থাৎ কথা বেচে যাঁরা খান, তাঁরা অনর্থক বাক্যব্যয় ক'রে অনর্থের সৃষ্টি করেন না।

কিন্তু যিনি চোখ-কান খোলা রাখেন, তাঁর পক্ষে এ জাতীয় ঘটনা যতই অপ্রিয় হোক্, অদ্ভুত নয়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম যে বিভিন্ন এবং ও দুই ধর্ম্ম যে মিলেমিশে এক হয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা বলাই বাহুল্য। এ বিচ্ছেদের ভিতর বিরোধের সম্ভাবনা চিরকালই রয়েছে। সুতরাং যাঁরা হিন্দুস্থানের সমাজদেহের ধাতুসাম্য করতে চান, তাঁদের জানা উচিত যে, যে কথায়—যে কাযে এই বিচ্ছেদ বাড়ায়, তার ভিতরই ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ নিহিত থাকে।

গত পাঁচ ছয় বৎসর থেকে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের

যোগের প্রধান উপায় আমরা ঠাউরেছি বিয়োগ। যে দিন থেকে আমরা পলিটিকসে Communal representation অঙ্গীকার করেছি, সেই দিন থেকেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পাকাপাকি বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছি। ফলে এ কয় বৎসর ধ'রে এই দুই সম্প্রদায়ের সব বিষয়ে যথা—কেশে, বেশে, ভাষায়, ভাবে আলাদা হয়ে থাকার জোর প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। পলিটিকালি আমরা সকলে যে এক Community অর্থাৎ একই বিলাতি ক্ষুরে আমাদের মাথা যে মোড়ানো হয়েছে, এ সত্যটা এতই প্রত্যক্ষ যে, যার চোখ আছে, এ সত্য তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ পলিটিকস্ হিসেবে যা এক,তাকে দুটি স্বতন্ত্র-ভগ্নাংশ হিসেবে ধ'রে নিয়ে সেই দুই ভগ্নাংশকে আঠা দিয়ে জোড়বার চেষ্টাই আমাদের পলিটিসিয়ানরা এত দিন ধ'রে করেছেন। এই Mechanical চেষ্টার নাম Hindu Mahomedan entente। ফল যা হয়েছে, তা উক্ত প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল।

মানুষ পথিমধ্যে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হ'লে তার দুঃখ দেখে আমাদের কান্না পাওয়া উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কেউ আকাশের দিকে চোখ তুলে চলতে চলতে পথিমধ্যে কোনও বস্তুর ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়েন ত দর্শকরা না হেসে থাকতে পারে না। আর এই হাসি সমাজের বিশেষ উপকারী। কেন না, হাসির মানে হচ্ছে যে, যদি দেখে না শেখ ত ঠেকে শিখবে—অবশ্য যদি কোনও কিছু শেখবার ক্ষমতা তোমার থাকে। এই হচ্ছে জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সুতরাং আজ যখন দেখতে পাচ্ছি যে, যাঁরা দুই ভাগ হিন্দুর সঙ্গে এক ভাগ মুসলমানকে দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেনের মত মিশিয়ে জল ক'রে দিয়েছি ব'লে আস্ফালন করছিলেন, তাঁরাই জলের বদলে আগুনের সৃষ্টি হ'ল দেখে আঁতকে উঠেছেন, তখন হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ও রকম রাসায়নিক মিশ্রণ সাধন করতে হ'লে তার ভিতর একটি electric-spark অর্থাৎ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া দরকার। মনোজগতে এই বৈদ্যুতিক শক্তির নাম আধ্যাত্মিক শক্তি। এ শক্তি কেবলমাত্র বাক্‌শক্তি নয়। আত্মা আর যাই হোক্, পড়াপাখী নয়। বড় বড় কথার নাম আধ্যাত্মিক শক্তি নয়; টৈয়ার মুখে "রাধাকৃষ্ণ" শুনে অদ্যাবধি কেউ বৈষ্ণব হয় নি। সুতরাং স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ মহাবাক্যপ্রয়োগ—অধ্যাত্মিক শক্তির অপপ্রয়োগ। আর শক্তিমাত্রেরই অপপ্রয়োগ প্রলয়ঙ্করী। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অন্তরে electric-sparkএর অপটু প্রয়োগ ফলে শুনতে পাই, অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেন explode করে, তখন জল বানাতে গিয়ে আমরা আগুন বানাই। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। সে দিন যা ঘটেছে, তার রেশ অনেক দিন চলবে। বাইরে মানুষের মনকে এ ধাক্কা নানারূপ নাড়াচাড়া দিয়েছে। ফলে আমাদের মনে সাজানো বিলিতি তাস ভেস্তে গিয়েছে।

এ ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে পলিটিকাল, অতএব এর ফলও ফলবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। আমাদের কালকের পলিটিক্স্ যে ঠিক কি মূর্ত্তি ধারণ করবে, তা আমি বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আগামী কল্যের পলিটিক্সের চেহারা যে গত কল্যের পলিটিক্সের চেহারা থাকবে না, সে কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

যে সব আইডিয়া ও আইডিয়ালের উপর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের পলিটিকাল কল্পপুরীর প্রতীক্ষা করেছিলেন, সে সব আইডিয়া ও আইডিয়াল অতঃপর বাতিল হয়ে যাবে, আর তার স্থান অধিকার করবে নতুন আইডিয়া, নতুন আইডিয়াল। অবশ্য চলতি বোলচাল পলিটিসিয়ানরা সহজে ছাড়বেন না, কারণ, মনোরাজ্যেও পুরোনো পথ লোক সহজে ছাড়তে পারে না, বিশেষতঃ সে পথে যারা দৌড়ে চলে। চলবার ঝোঁক নামক অন্ধশক্তির ঠেলায় তারা অভ্যস্ত পথে আরও কিছু দিন অগ্রসর হ'তে বাধ্য। কিন্তু এই ঘটনায় অধিকাংশ লোকের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের পলিটিক্সের মূল ভারতবর্ষের জমীতে নেই। হিন্দুর মনের সঙ্গে মুসলমানের যে মিল নেই—ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের সঙ্গে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন যে এক নয়—আজকের দিনে কারও পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব। আমাদের হিন্দু-মুসলমানের মনের জমি যে পৃথক্, তা তারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় "cultivate your own garden অর্থাৎ নিজের জমী চাষ করো"—Voltaireএর এ পুরোনো উপদেশ গ্রাহ্য করতে অনেকে স্বীকৃত হবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বিচিত্র সৌধ

আমেরিকার মিচিগান প্রদেশে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিলাডেল্‌ফিয়ার শত বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দারুময় সৌধে একটিও লৌহকীলক নাই—শুধু কাঠের 'গোঁজ' বা কীলকের দ্বারা উহা বিনির্ম্মিত। ৫০ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি সৌধের অবস্থা পূর্ব্ববৎ দৃঢ় আছে। এই বিরাট সৌধ আটলান্টিক নগরের বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে উৎসব উপলক্ষে এইখানে 'মেলা' বসিয়াছিল।

দারু-নির্ম্মিত লৌহকীলকবিহীন সৌধ

মার্কিণের ভিনিস

আমেরিকায় ভেনিস নগরীর ন্যায় চারিদিকে সলিল-শোভিত কালিফ পল্লী নামক একটি স্থান আছে। এই পল্লী সম্প্রতি লস্ এঞ্জেলেসের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, এই পল্লীর সলিল-পূর্ণ পথগুলি মাটী ফেলিয়া 'ভরাট' করা হইবে। আমেরিকার এই পরম রমণীয় স্থানটিতে জনগণ নৌকা চড়িয়া অথবা সন্তরণ করিয়া বিবিধ আমোদ ও ক্রীড়া উপ-ভোগ করিত। জলপথ-গুলি স্থলপথে পরিণত হইলে তাহাদিগের সে-আনন্দ উপভোগ করিবার পথ বন্ধ হইবে।

মার্কিণের সলিলপথ-শোভিত ইতালীয় ভিনিস্

ভাসমান শিকারী

কালিফোর্ণিয়ার জনৈক শিকারী জলাভূমিতে হংস শিকারের জন্য বিচিত্র পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জলের মধ্যে ঋজুভাবে ভাসিয়া শিকারী সহজে হংস শিকার করিতে পারিবে। পদদেশে এক প্রকার রবার-নির্ম্মিত জুতা ও কটিদেশে বায়ুপূর্ণ শরীরের বেষ্টনী থাকিবে। এক খণ্ড রবারের চাদর বুট হইতে নল পর্য্যন্ত এমন ভাবে সংলগ্ন থাকিবে যে, কোনও দিক দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে হস্তপদ সঞ্চালনেরও কোনও ব্যাঘাত হইবে না।

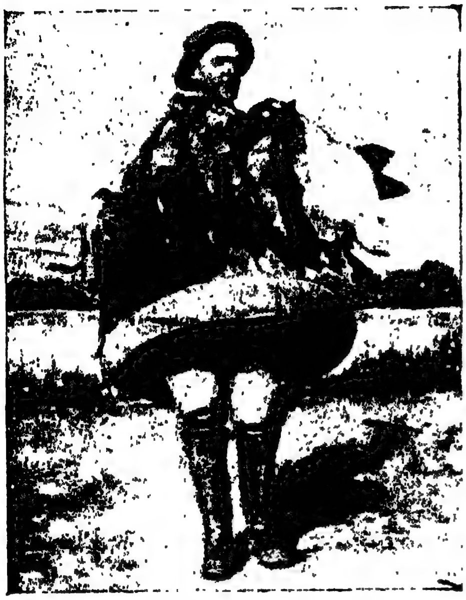

ভাসমান শিকারীর পরিচ্ছদ

অপূর্ব্ব যন্ত্র

আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক, নগরের কোন্ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা শব্দবহুল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এক বিচিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্র অট্টালিকার উপরিভাগে বা অন্যত্র স্থাপন করিয়া উদ্ভাবনকারী তাঁহার গবেষণার কার্য্য চালাইয়াছিলেন। নগরের প্রত্যেক অংশের শব্দের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইউইয়র্ক সহরে 'সিক্সথ এভিনিউ' এবং 'থার্টি ফোর্থ ষ্ট্রীট' সর্ব্বাপেক্ষা কোলাহলপূর্ণ এবং 'গ্রোভ ষ্ট্রীটের গ্রীণউইচ' নামক পল্লী কোলাহল-বিরহিত স্থান। নগরের কোলাহলে জীব-সম্প্রদায় অপেক্ষা মোটর-চালিত যানগুলিই বিশেষভাবে অপরাধী।

উদ্ভাবনকারী অট্টালিকার ছাদে যন্ত্র-সাহায্যে শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন

আলোকধারী পুলিস প্রহরী

রাজপথে আলোকধারী পুলিস

নিউ ইয়র্কের ডেপুটী পুলিস-কমিশনার মিঃ জন হ্যারিস্ রাজপথে বিবিধ বর্ণের আলোকাধারের পরিবর্ত্তে পুলিস প্রহরীর বক্ষোদেশে নানাবর্ণের আলোক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজপথের প্রহরী এই আলোকগুলি ইচ্ছামত

নির্ব্বাপিত বা প্রজ্বালিত করিয়া রাজপথের যান ও লোক-চলাচলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সবুজ, লোহিত ও পীত বর্ণের আলোক দৃষ্টে কখন্ চলিতে হইবে, কখন্ থামিতে হইবে বা কখন্ প্রস্তুত থাকিতে হইবে, জনতা তাহা বুঝিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় রাজপথের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয়—পুলিস প্রহরীরা বহু পথের সংযোগস্থানে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, আলোক দেখিয়া কায করিবার কাহারও অসুবিধা হয় না।

চুরুটিকা-বিশেষজ্ঞ

মিঃ বেঞ্জামিন হিল আমেরিকার তাম্রকূটবিশেষজ্ঞ। জগতের বিভিন্ন স্থানের চুরুটিকা সংগ্রহ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মার্কিণের শ্রমশিল্প বিভাগে তিনি তাম্রকূট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বিভিন্ন স্থানের চুরুটিকা পরীক্ষা করিয়া মিঃ হিল মার্কিণের চুরুটিকা প্রস্তুত বিষয়ে ব্যবসাদারদিগকে পরামর্শ প্রদান করেন। যুক্তরাজ্য হইতে প্রতি বৎসর ১ কোটিরও অধিক চুরুটিকা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় অন্য দেশকে চুরুটিকা ব্যবসায়ে হটাইয়া দিবার জন্য মার্কিণের ব্যবসায়িগণ মিঃ হিলকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়া থাকেন।

মিঃ হিল চুরুটিকা পরীক্ষা করিতেছেন

সূচ-কণ্টকিত মানুষ

সিঙ্গাপুরে অতি প্রাচীনকালে মানুষ দেহে সূচ বিদ্ধ করিয়া শাস্তি গ্রহণ করিত। সে প্রথা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। সেখানে হিন্দুগণ বাঙ্গালা দেশের চড়ক-সংক্রান্তির অনুকরণে নববর্ষের দিন নানা প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় সঙের মিছিলও বাহির হয়। কেহ কেহ নিজের দেহে অসংখ্য সূচ বিদ্ধ করিয়া প্রাচীন যুগের শাস্তিদানের প্রথাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলে। এক এক জনের দেহে দেড় সহস্রাধিক সূচ বিদ্ধ করিতেও দেখা যায়। সভ্যতালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হইতেছে।

দেড় হাজার সূচ-কণ্টকিতদেহ মানুষ

নববর্ষের বীভৎস উৎসব

সিঙ্গাপুরে নববর্ষের দিন কেহ কেহ মুখমণ্ডলে এবং জিহ্বায় বাণ বিদ্ধ করিয়া, বক্ষোদেশে সূচ ফুটাইয়া প্রখর রৌদ্রতাপে দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করে। বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে অনুরূপ নানা প্রকার উৎকট আনন্দপ্রদায়ক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত; উহা এখন এ দেশে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের হিন্দুগণ সানন্দে এখনও এই প্রকারে নববর্ষকে অভিনন্দিত করিয়া থাকে।

বাণবিদ্ধমুখ সিঙ্গাপুরী হিন্দু

শলাকা-কণ্টকিত বিনামাধারী হিন্দু

নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন যুগের শাস্তির অনুকরণে অধুনা কোন কোন হিন্দু তীক্ষ্মমুখ লৌহকণ্টকাকীর্ণ জুতা পরিয়া প্রখর সূর্য্যালোকে ৩।৪ মাইল পথ হাঁটিয়া বেড়ায়। উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া এইরূপ কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারকে তাহারা গ্রাহ্যই করে না।

শলাকা-কণ্টকিত বিনামাধারী মানুষ

অবরুদ্ধ স্থানে দাঁড় টানিবার ব্যবস্থা

তুষারপাতে বাহিরের জলবিস্তার জমিয়া গেলে নৌকায় দাঁড়টানা শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, এ জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের জন্য একটি স্থানে জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার চারিদিক পরিবেষ্টিত, উপরে ছাদও আছে। তুষারপাত হেতু এই স্থানের জল জমিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। শীত ঋতুতে এই জলাশয়ে শিক্ষার্থীরা দাঁড় টানা অভ্যাস করিয়া থাকে। একখানি নৌকা

অবরুদ্ধ জলাশয়ে শিক্ষার্থীরা দাঁড় টানিতেছে

জলের উপর স্থাপিত। তাহার উভয় প্রান্ত সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, অর্থাৎ এই নৌকা কোনও মতে বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হইবে না। শিক্ষার্থীরা যখন দাঁড় টানিতে থাকে, সেই সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক তাহাদিগের ক্রীড়াপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া ত্রুটি সংশোধন করিয়া থাকেন।

মোটর-চালিত বৃহৎ জাহাজ

১ শত ৪০ দিনে একখানি বিরাটদেহ, মোটর-চালিত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজের নাম 'সাটুর্ণিয়া'। ২ হাজার ২ শত ৮০ জন যাত্রী এই জাহাজে লইবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত জাহাজের খালাসী ও কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থানও ইহাতে রাখা হইয়াছে। এই জাহাজ উল্লিখিত যাত্রী ব্যতীত ১৫ হাজার ৫ শত মণ ভার বহন করিয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতে সমর্থ। 'সাটুর্ণিয়া'র দৈর্ঘ্য ৬ শত ৫০ ফুট। ইহা ঘণ্টায় ২১ 'নট' চলিয়া থাকে।

—

মোটর-চালিত সুবৃহৎ জাহাজ

কর্দ্দম-নিবারক যন্ত্র

পাশ্চাত্যদেশে নিত্য নূতন আবিষ্কার চলিয়াছে। রাজপথে যখন মোটর বা 'বাস' প্রভৃতি ধাবিত হয়, সে সময় পথ যদি কর্দ্দমাক্ত থাকে, তাহা হইলে অনেক সময়েই চক্রমর্দ্দিত কর্দ্দম উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথচারীদিগের বস্ত্রাদি কলঙ্কিত করিয়া দেয়। লিথ্-নিবাসী জনৈক জাহাজের মালিক পথচারীদিগের এই দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার জন্য সম্প্রতি এক প্রকার 'মড্ গার্ড' (কর্দ্দমনিবারক) যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা যে কোনও মোটর যানের চক্রে সংলগ্ন করিয়া দিলে, কর্দ্দম উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোনও পথিকের বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া দিতে পারিবে না। ইহার ফলে পথিকগণ পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারে। এই যন্ত্র উদ্ভাবনকারীর নাম মিঃ ডব্লু পিটারসন্। আমাদের দেশের মোটর, লরী, বা বাসের মালিকগণ অনুসন্ধান করিয়া এই 'মড্ গার্ড' আনাইয়া তাঁহাদের গাড়ীর চাকায় সংলগ্ন করিয়া

দিলে বেচারা পথচারীরা কর্দ্দমের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

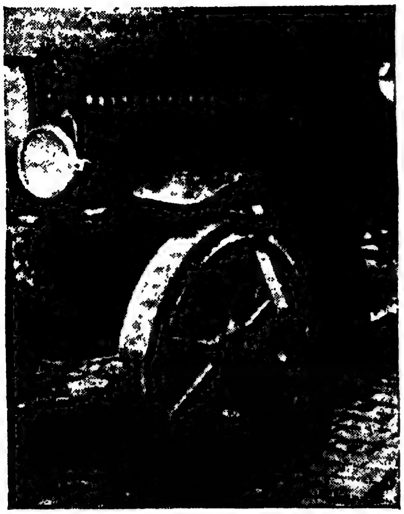

কর্দ্দম নিবারক যন্ত্র

চীনার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র

চীনারা পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত অবহিত। প্রত্যেক পরিবারের জন্য সমাধিক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে মৃতদেহ সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদের ধারণা, পিতৃপুরুষগণ সমাধিক্ষেত্রে আরামে সমাহিত হইলে, যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহাদের কল্যাণ হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। দক্ষিণ-চীনদেশে সমাধিভবনের আকার গ্রীক বর্ণ 'ওমেগার' মত।

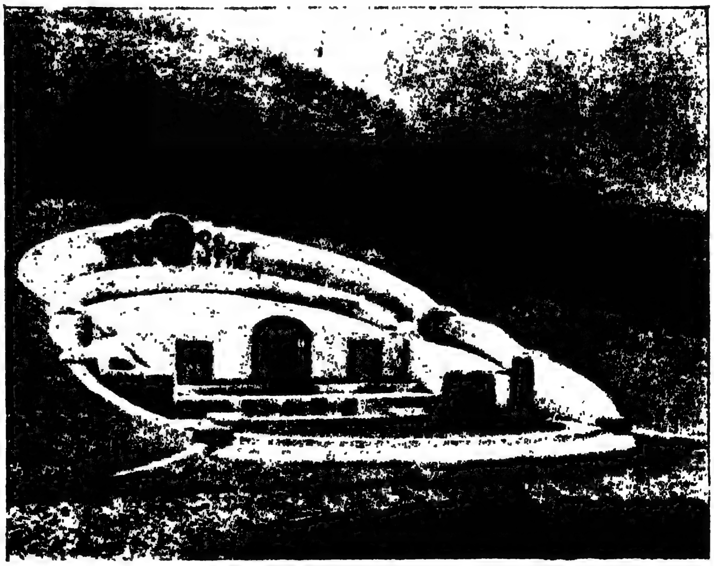

চীনাদের পারিবারিক সমাধি-ভবন

উভচর তরণী

জনৈক ওলন্দাজ শিল্পী একখানি তরণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা একটি ত্রিচক্রযানের উপর অবস্থিত। এই তরণীকে জল ও স্থলে সমানভাবে ব্যবহার করা যায়। তরণীর মালিক সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে প্যারী সহরীতে উহার সাহায্যে আসিয়াছেন। তরণী যখন জলের উপর ভাসিতে থাকে, সেই সময় পাইল ছাড়াও চরণ সাহায্যে উহাকে চালিত করা হয়। পথে চলিবার সময় নৌকার তলদেশ উপরেই থাকে, সুতরাং কোন বাধা ঘটে না।

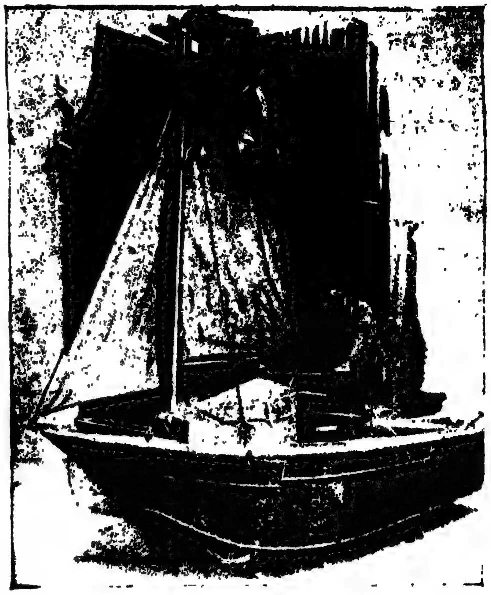

উভচর তরণী

বিরাট ঘণ্টা

মস্কো নগরে একটি বিরাট ঘণ্টা আছে। ইহার এক স্থল ভগ্ন। ঘণ্টাটির ওজন প্রায় ৪ হাজার ৯ শত ৫০ মণ। মহারাণী—সম্রাট-মহিষী অ্যানএর আদেশক্রমে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘণ্টা বিনির্ম্মিত হয়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, অগ্নির উত্তাপে নির্ম্মাণের অবস্থায় ঘণ্টার এক স্থল ফাটিয়া যায়। তদবস্থায় উহা প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ভূমিতলে পড়িয়া থাকে। রুস-সম্রাট—জার নিকোলাস উহার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া উহাকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া একটি বৃহৎ বেদীর উপর স্থাপন করেন। পরে এই সু-উচ্চ ঘণ্টাটি ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হয়। এই ঘণ্টা-মন্দিরের নাম 'কোলোকল'। এত বড় বিরাট ঘণ্টা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। নানা দেশের সহস্র সহস্র পর্য্যটক এই ঘণ্টা দেখিতে মস্কো সহরে প্রতি বৎসর যাত্রা করিয়া থাকেন।

মন্দির-ঘণ্টা।

নবাবিষ্কৃত স্বর্ণখনি

কানাডায় যে নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথায় স্বর্ণ সংগ্রহ-প্রয়াসীরা দলে দলে ধাবিত হইতেছে। বিমানপোত সমূহ খনিতে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল পোত হডসন্ হইতে লোহিত হ্রদ স্বর্ণখনি পর্য্যন্ত গতায়াত করিতেছে। চিত্র দৃষ্টে বুঝা যায়, স্বর্ণখনিতে কিরূপ বিপুল আয়োজনসহ স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে।

স্বর্ণখনিতে বিমানপোত বহর

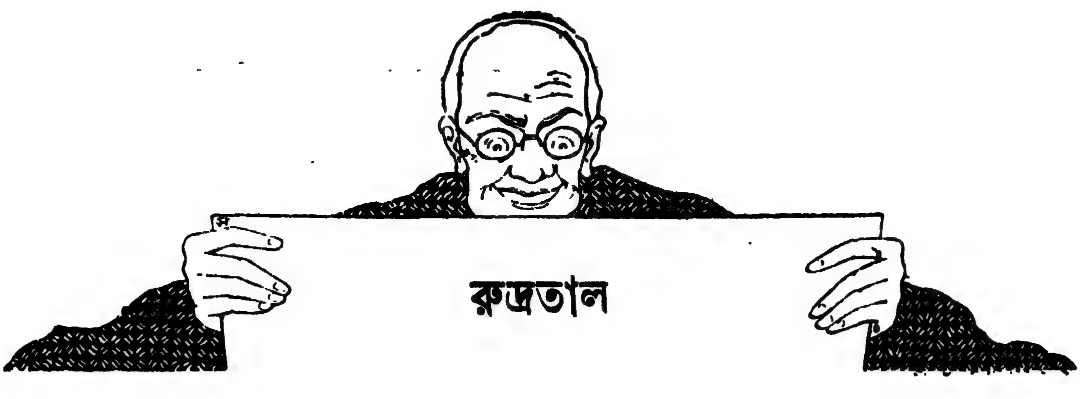

রুদ্রতাল

১

সুধীর বাবু আজন্ম খুব তাল-সিদ্ধ লোক। যখন তিনি দুগ্ধপোষ্য, তখন হইতেই এ কথা প্রকাশ। অর্থাৎ যখন তিনি ছয় মাসের শিশু এবং দন্ত বাহির হয় নাই, তখনই এমন ভাবে হাত-পা ছুড়িতেন যে, মহাকালও সে রকম কায়দায় কালকে বিভক্ত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এক জন ওস্তাদ বলিয়াছিল যে, "ইনি কেশব মিত্র ও নিতাই চক্রবর্ত্তীর চেয়েও বড় পাখোয়াজী হবেন এবং এঁর সম্মুখে কোন গায়ক যে গাইতে পারিবেন, তা বোধ হয় না।" উপরে উক্ত মত তাঁহার কোষ্ঠীফল গণনাতেও সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

বস্তুতঃ, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তালে তালে হস্ত ও পদ একত্র বিক্ষেপ করা খুব বাহাদুরীর কথা, এবং আরও বাহাদুরী, যদি সেটা তীব্র ক্রন্দনের সঙ্গে লয়ে এবং সমে জড়িত হইয়া পড়ে। এই ওস্তাদিটুকু বিশেষতঃ জাহির হইত স্তন্যদুগ্ধপানকালে। সুধীর জননীর একমাত্র সন্তান। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই নশ্বর সংসারে স্ত্রীলোকের অকৃত্রিম দুঃখ প্রসবযন্ত্রণা। কিন্তু প্রসবের পরেও যে এত যন্ত্রণা হইতে পারে, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস পাইলেও হয় ত তিনি ইহলোকে জন্মগ্রহণই করিতেন না। সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে কাতরভাবে স্বামীকে বলিতেন, 'ওগো, এ যন্ত্রণা কখন্ শেষ হবে গো!' পুত্রবৎসল স্বামী বলিতেন, 'কোন ভয় নাই, হাঁটতে শিখলেই ও সব বন্ধ হয়ে যাবে। আপাততঃ এক ডোজ ক্যামোমিলা মাঝে মাঝে খাইয়ে দেও, নচেৎ যদি এর উপর কামড়াতে সুরু করে, তবে আরও কষ্টকর ব্যাপার হবে।'

সৌভাগ্যক্রমে কিংবা ঔষধের গুণেই হউক, কামড়ানোর মাত্রাটা বেশী বিস্তৃত হইতে পারে নাই। দন্তোদ্গমের সময় মধ্যে মধ্যে সমের সঙ্গে কখনও কখনও দংশন-প্রবৃত্তি হইলেও সুধীর-জননী সন্তানের গাল এমন ভাবে কসিয়া টিপিয়া ধরিতেন যে, অসীম ওস্তাদিটুকু সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িত।

হাঁটিতে শিখিয়া পা ছুড়িবার প্রবৃত্তি খানিকটা বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পাইল বামহস্তে। অর্থাৎ দৌড়াদৌড়ির সময় ঠিক দ্রুত কাওয়ালী কিংবা ধামার কিংবা চৌতাল প্রভৃতির কসরৎ অসম্ভব দেখিয়া বালক সুধীর সেগুলি শূন্যেই হউক কিংবা খেলার সাথীগণের পৃষ্ঠে, মস্তকে কিংবা গালেই হউক, চড়টা-চাপড়টার ছলে এবং বলে সাধিয়া লইত। এই সব অত্যাচার সহ্য করিত বেশীর ভাগ তাহার শৈশবের সঙ্গিনী 'লীলা।' লীলা বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

২

সপ্তদ্বীপের মধ্যে বিধাতা একটা দ্বীপ সৃজন করিয়াছিলেন - যাহার অধিবাসিগণ বাকি ছয়টা দ্বীপের দুঃখভার বহন করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবে। সেই সপ্তম দ্বীপের নাম ভারতবর্ষ।

সেই ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী একটা গণ্ডগ্রামের বাঁশবনের মধ্যে সুধীর বাবুর জন্ম। গ্রামটার মধ্যে হাতী নাই। তহশীলদার মহাশয়ের একটা ঘোটক ছিল, তাহারও বৃদ্ধাবস্থা। উদ্ভিদের মধ্যে পুষ্করিণীর ও ডোবার পানাই বেশী। দ্বিপদের মধ্যে শালিক, কাক ও ঘুঘু। চতুষ্পদের মধ্যে গাভী ও ছাগল। ছাগলগুলি এত রুগ্ন যে, পগারে

অবতীর্ণ হইয়া ঘাস খাইবার শক্তি নাই। সমস্ত দ্বিপদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক-সন্তান। তাহাদের শরীরে বল নাই ও চক্ষুতে জল আসিলেও মস্তিষ্কেই শুকাইয়া যায়। কীট-পতঙ্গের মধ্যে মশা ও ফড়িংই বেশী। সত্য বটে, আকাশ মুক্ত, চন্দ্রসূর্য্যও নিয়মিত সময় উদয় ও অস্তাচলে যায়, তারকামালাও আঁধারে আকাশে দেখা দেয়, কিন্তু তাহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রামে পৌছায় না। সত্য বটে, গ্রামের জীর্ণ মন্দিরে কিংবা গৃহস্থের আঁধার ঘরে কখনও কখনও মঙ্গলশঙ্খ ক্ষীণস্বরে বাজে, কিন্তু তাহা বিধাতার স্বর্ণসিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে না। সকলেই দারুণ ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিত।

এ হেন স্থানে সুধীরের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের চিরকাল কালযাপন করা বিধাতার কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুতরাং তাহার যখন বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন সুধীরকে কলিকাতায় তাহার মাতুলালয়ে পাঠান স্থির হইয়া গেল। পাঠাইবার আরও একটা বিশেষ কারণ যে, লীলার পিতাও কলিকাতায় একটা চটের ব্যবসা খুলিয়া অনেক টাকা রোজগার করিতেছিলেন, অতএব তিনি পরিবারবর্গকে গ্রাম হইতে স্থানান্তর করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া দেশে আসাতে সকলের একসঙ্গে যাত্রা করিবার সুবিধা হইয়া পড়িল এবং পৃথক্ ফল হইবার সম্ভাবনা থাকিল না।

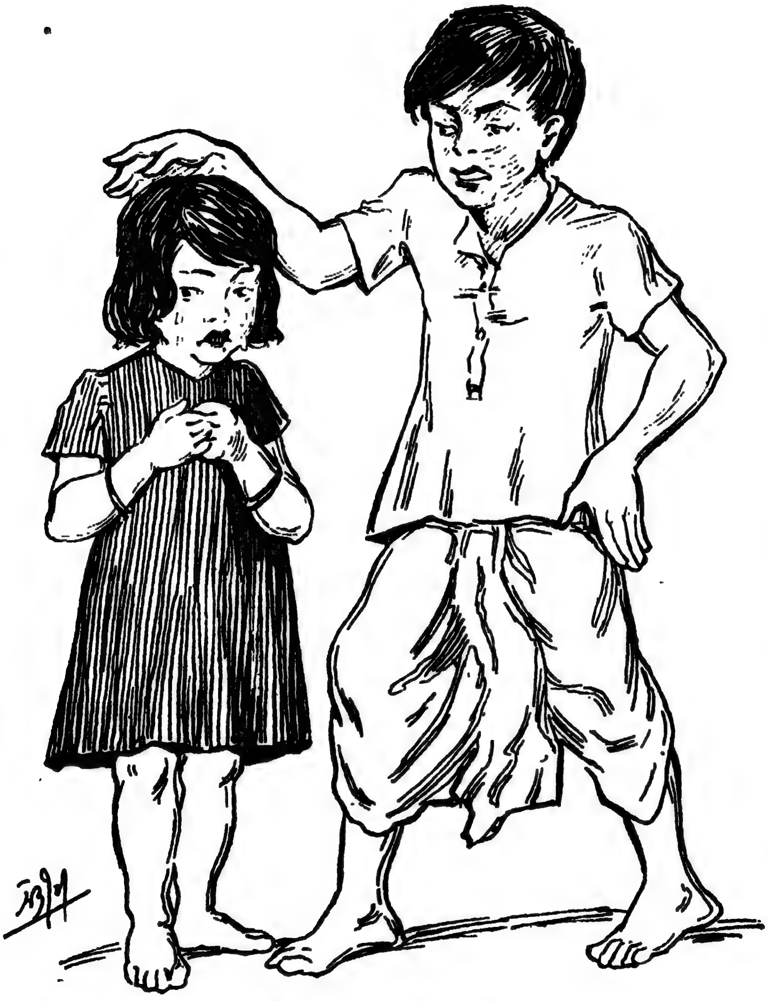

সুধীর তাহার শৈশব-সঙ্গিনী 'লীলার' মাথায় বাজনার বোল সাধিতেছে

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া লীলা বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী হইয়া লেখাপড়া, সেলাই ও গান শিখিতে সুরু করিয়া দিল। সুধীর স্কুলের ছাত্র হইয়া লেখাপড়ায় মন দিয়াছিল, কিন্তু গীতবাদ্য, বিশেষতঃ বাদ্যের কোন বন্দোবস্ত না থাকাতে তাহার একটা মহা অভাব ঘটিয়া গেল। সেই অভাব পূরণার্থ মাতুল মহাশয় তাহাকে একটা ঢোলক কিনিয়া দিয়াছিলেন। সুধীর সেই ঢোলক তালে তালে বাজাইয়া পড়া মুখস্থ করিত এবং তাহাতে তাহার ধারণাশক্তি এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, বার্ষিক পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল।

সুধীরের মাষ্টার মহাশয় নিজে এক জন বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। তিনি সুধীরের উচ্চস্থানলাভের দুরূহ রহস্য এক দিন সমবেত অধ্যাপকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, তালে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়। উৎসাহ নহিলে লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত হওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ অধুনা যে রকম 'সিলেবস্', তাহাতে দমবন্ধ হইয়া বসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কাযেই, ডুগি কিংবা তবলা, কিংবা

ঢোলকের চাটির সহযোগে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যত শীঘ্র প্রফুল্লচিত্তে আয়ত্ত করা যায়, তাহা কেবল মুখস্থ করিয়া হয় না। উদাহরণে তিনি দেখাইলেন যে, সৌরজগৎ ধামারের তালে চলে, হস্তী ঢিমা তেতালায়, অশ্ব দ্রুত কাওয়ালীতে, গাভী একতালায়, গর্দ্দভ যৎতালে; কারণ, তাহার পৃষ্ঠে ধোপা ও বস্ত্রের বোঝা (রাজকর্ম্মচারী ও ট্যাক্সের মত) উভয়েই চাপিয়া বসে। মানুষের পক্ষেও তাই। কেবল পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি উড়িবার সময় তালের দিকে লক্ষ্য করে না। তাহার কারণ যে, তাহারা বেতালা, তাহা নহে। নিজের গতিস্বরূপ রাগরাগিণীতে আত্মহারা হইয়া তালের দিকে মন দেয় না। যখন পুনরায় চৈতন্যলাভ করিয়া ভূতলে বিচরণ করে, তখন আবার তালের দিকে নজর পড়িয়া থাকে। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, সুরে মত্ত হইলে তালজ্ঞান যে লোপ পায়, তাহা সত্য নহে, তবে তালটা কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া লইতে হয়;—যেমন দুঃস্বপ্নের পর গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে চাহে। এই যে প্রতীতিলাভ,ইহার আখ্যা 'সম', অর্থাৎ 'এই যে আমি আছি, ভয় নাই, তুমি গেয়ে যাও।' এই জন্য পুরাকালে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর-কুলে গানের অধিকার স্ত্রীলোকেরই ছিল এবং বাজনার অধিকার—পুরুষের। কোন যুগবিশেষে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের মধ্যে ভয়ানক রকমের কলহ হইয়া যাওয়াতে পুরুষগণই নিজের মধ্যে গান-বাজনার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। সেই হইতে ধ্রুপদ অ=ধ্রুব-পদ (ধ্রু-কর্ত্তৃ-অন। উত্তানপাদ নরপতির পুত্র ধ্রুব, তাহার পদ) অর্থাৎ যাঁহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধে, তাঁহার তনয়ের নিম্নগামী পদসঞ্চালন, কিংবা 'তাল' দ্বারা ঊর্দ্ধপদ প্রাপ্ত হওয়ার কৌশল। অবশেষে, এই যে বালক সুধীর, ইহার পরীক্ষায় উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ যে, উহার মধ্যে চৌতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতির প্রভাব শৈশবকাল হইতেই আছে। তাহা পূর্ব্বসংস্কার, এবং ডারউইন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

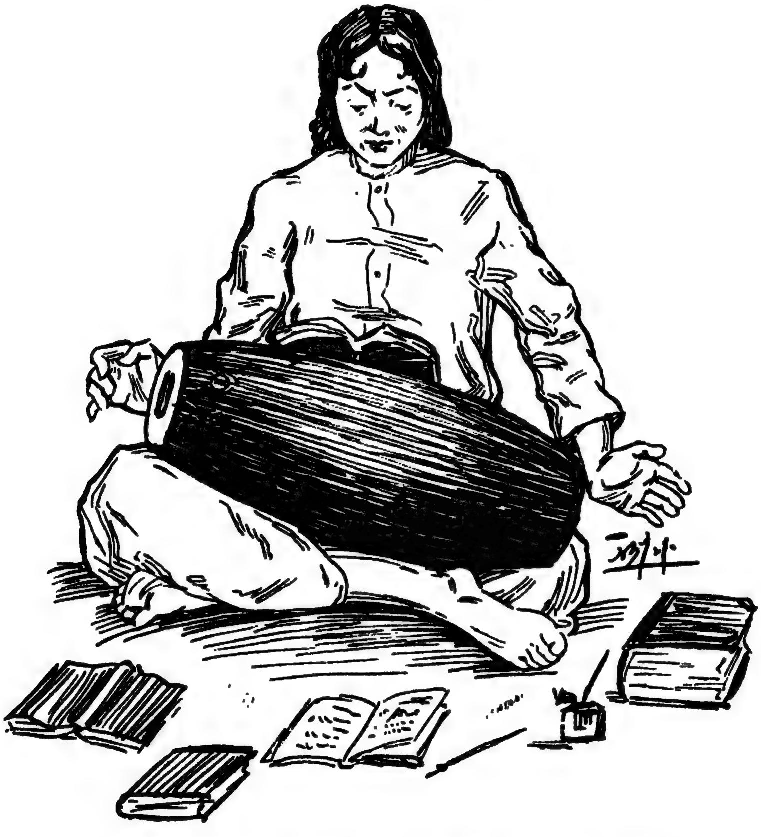
সুধীর সেই ঢোলক তালে তালে বাজাইয়া পড়া মুখস্থ করিত

মাষ্টার মহাশয়ের সারগর্ভ উপদেশ হাতে হাতে ফলিতে দেখিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা তবলা-ডুগি-ঢোলক-মৃদঙ্গ-ব্রাঞ্চ খুলিয়া দিলেন। সেই বিভাগের কৃতকর্ম্মা ছাত্রবৃন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকালে 'কলেজেরও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সুধীর তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি এম-এ পরীক্ষায় 'জুয়লজি' (পশুতত্ত্ব) পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া একটা 'থেসিস' লিখিয়া বাহির করেন। তাহার মর্ম্ম ইহাই যে, বিশ্বের মধ্যে একটা গান অহরহঃ গীত হইতেছে, সেটা অনাহত শব্দ নহে। বরঞ্চ 'আহত' অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে সমে আসিয়া

স্থির হয়। সেটার কোন নির্দ্দিষ্ট তাল নাই, অথচ সব তালেই মিলিয়া যায়। এই কৌশলটুকু দেখাইবার জন্য স্থাবর-জঙ্গম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও গতিবিধির দ্বারা তাল প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার নানাবিধ 'বোল্' আছে; তাহার আবৃত্তি জটিল এবং তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য পাখোয়াজ দ্বারা (অর্থাৎ পক্ষীর ডানার মত উভয় হস্ত সঞ্চালন করিয়া) আওয়াজ বাহির করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে এক দিন বিজ্ঞান-আসোসিয়েশন—মন্দিরে সুধীর বাবু বক্তৃতাও করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হস্ত ও মস্তক এত সুন্দর-ভাবে তালে তালে সঞ্চালিত হইয়াছিল যে, অনেক স্ত্রী-জাতীয় শ্রোতা মধ্যে মধ্যে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

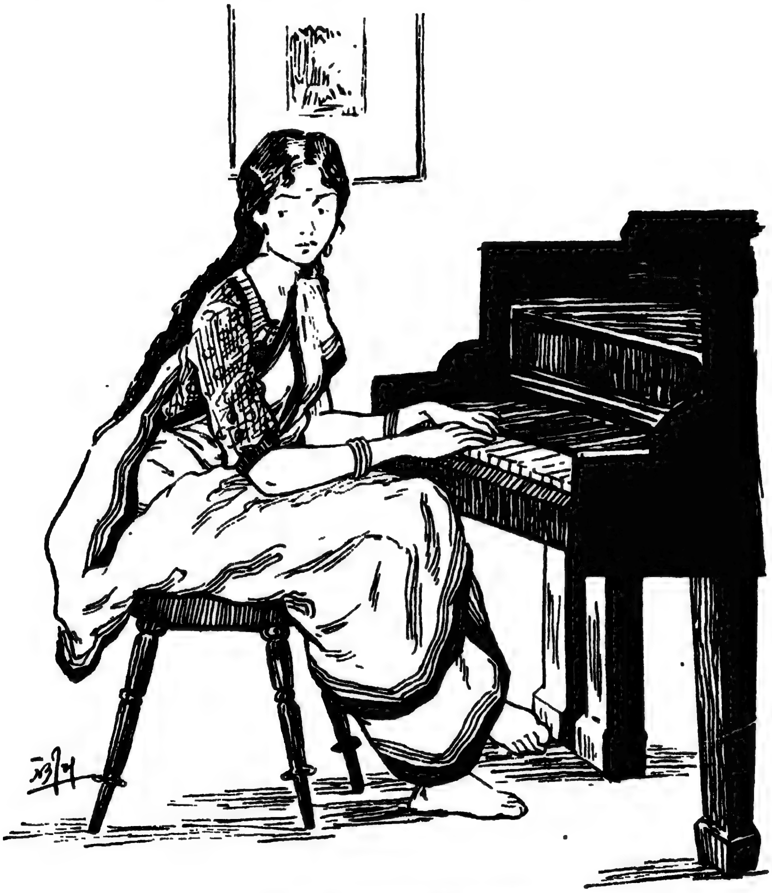

লীলা পিয়ানো বাজাইতেছে

এই যে দ্বাদশ বৎসর বাহিয়া 'তাল'-বিস্তার আলোচনা, তাহার মধ্যে সুধীরের বাল্যসঙ্গিনী লীলার সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। লীলারও ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের পর দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে এখন বিখ্যাতা গায়িকা। কণ্ঠ-সঙ্গীত, পিয়ানো, এস্রাজ ও বীণায় তাহার মত দক্ষতা কোন বালিকাই লাভ করে নাই। পাছে বিবাহ হইলে অভ্যাসগুলি বন্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে লীলার পিতা তাহার বিবাহের বিষয়ে সমাজের সাধারণ প্রথা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা সমিতি হইয়াছিল, লীলা সেখানেও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইত এবং গান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিত।

দোষের মধ্যে কি জানেন? লীলা বেতালা। সে তাল পছন্দই করে না। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ সুর ও তাল হইতেও কড়া। ঘটনাক্রমে সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ হইয়া গেল।

৩

ঘটনাটা একটু অভাবনীয়। পয়িণয়-সূত্রের গোড়ায় যে প্রণয়-সূত্র চরকায় কাটা হইয়াছিল, তাহার মূলে বোধ হয় শৈশবের চড়টা ও চাপড়টা। তাহার কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। সুধীরের বন্ধুবর্গের 'প্রাইভেট' মত যে, সুধীরের লীলাকে তাল শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প। লীলার বন্ধুগণের বিশ্বাস যে, লীলার সেই চড় ও চাপড় পরিশোধ করিবার ইচ্ছা। সাধারণ কর্ম্মফলের উদাহরণ।

তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, লীলাকে আলুলায়িত-কেশে গ্রে ষ্ট্রীটের একটা বাটীতে দ্বিতলে বসিয়া পিয়ানোর কালো চাবির উপর তাহার শুভ্র কোমল গোটা-পাঁচ-ছয় অঙ্গুলী প্রজাপতির ন্যায় উড্ডীয়মান, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবীর তরঙ্গায়িত তান; এবং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,

সুধীর বাবু একতলায় বসিয়া পাখোয়াজের বোল লইয়া আত্মহারা। গায়িকার সঙ্গে গায়কের দেখা নাই। অথচ বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা বাদক—সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রস, এবং গায়িকা সেই অপূর্ব্ব বাদ্যের নির্ঘোষ গ্রহণ করিতেছিলেন। বাদক নিতান্ত দুঃখিত যে, গায়িকার তালের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা নাই, এবং গায়িকা নিতান্ত দুঃখিতা যে, বাদকের বোলরাশি পঞ্জাব মেলের মত ভাবের গাছপালা ও পাহাড় ভেদ করিয়া কেবল ষ্টেশনের সমের দিকে ধাবমান!

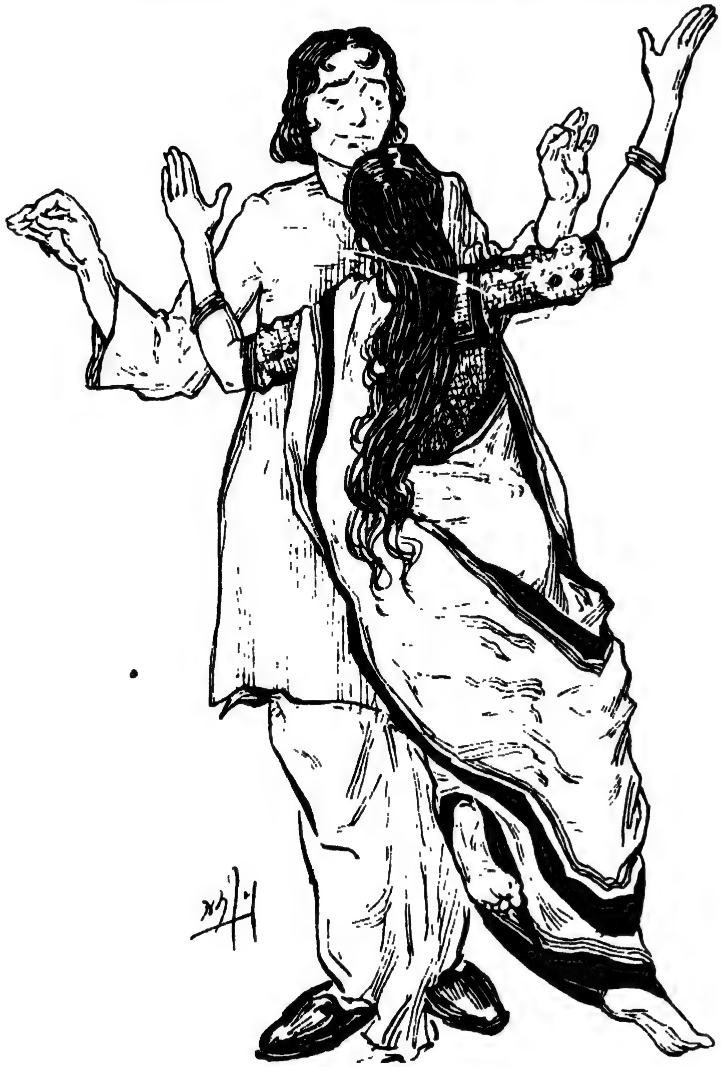

বস, এবার ঠিক তালের সঙ্গে মিলে গিয়েছে

গায়িকার প্রতিজ্ঞা, সে সুরকে তালে তালে সংএর মত নাচাইবে না। বাদকের প্রতিজ্ঞা যে, গানকে তাহার বোলের পিঞ্জরে বন্ধ করিবে।

যাহা হউক, সুধীর বাবুর একটা দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল যে, সহধর্ম্মিণীকে তালের দিকে নজর রাখিতে উপদেশ দেন। স্ত্রীকে উপদেশ দিতে স্বামীর স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপক্ষেও তাহার বিপরীত উপদেশ বাহির হওয়াও স্বভাবসিদ্ধ। সে কথা বিবেচনা করিয়াই সুধীর বাবু দ্বিতলে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। স্বামীর পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া লীলা চার ইঞ্চি পরিমাণের একটা অবগুণ্ঠন দিয়া পিয়ানো বন্ধ করিয়া দিল।

সুধীর। চলুক না।

লীলা। কেন?

সুধীর। মন্দ লাগছিল না, তবে কি জান? ওটা ধামার তালের প্রায় কাছাকাছি গিয়াছিল দেখিয়া—

লীলা। সেই জন্য আহ্লাদে সাতখানা হয়েছ?

সুধীর। ধামার তাল অর্দ্ধেক ভাগ করিলে সাতখানাই হয়।

লীলা। ভাগ ক'রে ফেল না।

সুধীর। যেমন--

ক ধে টে ধে টে ধা আ |
গ দেন দেন তা আ
পা খী স ব ক রে র্ |
ব রা তি পোহাইল

লীলা। অর্থাৎ, তোমার তালের জন্য 'রবের' 'র'টা কেটে এক দিকে ও 'ব'টা অন্য দিকে দিতে হবে। এতে কি রাগিণীর কোন স্বাধীনতা থাকে?

সুধীর। স্বাধীনতা সব বিষয়ে ভাল না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের পক্ষে। সুতরাং তাদের 'রবটা' কাটা গেলে ভাল বই মন্দের সম্ভাবনা নাই।

লীলা। তুমি একটু তালটা কেটে দেখ না, কি রকম বোধ হয়। আমাদের সুরটা কাটা গেলে গলাটা কাটা যায়।

সুধীর। বেতালা লোকের সঙ্গে দিন কাটান বড় অশান্তিকর।

লীলা। তা আমি বেশ দেখতে পেয়েছি, এবং তোমার তালে বাধা না দিয়ে আমি এখনই দূর হচ্ছি।

লীলার কখন হঠাৎ রাগ হইত না, কিন্তু না জানি কেন, স্বামীর কথা তাহার মর্ম্মে আঘাত করাতে সে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, 'গাড়ী তৈরি করিতে বল।'

সুধীর বাবু মনে করেন নাই যে, এতটা গড়াইবে; সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গন্তব্য পথে বাধা দিলেন। সুধীর বাবুর প্রথম উদ্যম লীলার হাতদুখানি ধরা। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল, বরং লীলার উভয় হস্ত অবলীলাক্রমে তাঁহার মস্তক ও স্কন্ধ জুড়িয়া ঘন ঘন চড়ের আলোচনা সুরু করিয়া দিল। লীলার রুদ্রমূর্ত্তি তিনি এই প্রথম দেখিলেন। তালসিদ্ধ সুধীর গবেষণা পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তালের গতিটা ঠিক রুদ্রতালের মত, এবং তাঁহার জ্ঞাত 'বোলের' সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যাওয়াতে তিনি নিতান্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, 'বস্, এবার ঠিক তালের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।'

লীলা। হাত ছেড়ে দেও বল্‌ছি, নইলে খুন ক'রে ফেলব।

সুধীর। তালে তালে খুন কল্লেও কোন কষ্ট হয় না। এখন একবার ঘরে চল, একবার পিয়ানোটা বাজাবে।

লীলা। টানাটানি ক'রো না বল্‌ছি, ভাল হবে না।

কিন্তু সুধীর বাবু দেখিলেন যে, লীলাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইতে গেলে নিশ্চয়ই ঢিমা তেতালার একটা সুন্দর কসরৎ হইবে, সুতরাং তিনি বলিলেন, 'তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি না, খুনই কর, আর যাই কর।'

স্বামীর স্কন্ধে দেহভার বাহুযুগে বদ্ধ হওয়াতে, এবং ঢিমা তেতালায় শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চালিত হওয়াতে, লীলা নিঃসহায় অবস্থায় কান্না জুড়িয়া দিল।

সুধীর বাবু কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'লীলা, কেঁদ না। ছিঃ, বরং রুদ্রতালে আমাকে খুন ক'রে ফেল।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রতীক্ষায়

কথা ছিল তুমি আসিবে হেথায়
আমার ঘরের এই পথে,
কাল সারাদিন দুয়ার খুলিয়া
ব'সে ছিনু তাই ভোর হতে।

আলোক আমায় বলে গেল ডেকে
"যাইবি না কি বাইরে আজ ?"
আমি শুধু তারে কহিনু হাসিয়া
"আসিবে সে মোর ঘরের মাঝ !"

পাখীরা ডাকিয়া গেল বারে বারে
"শুনিবি না কি মোদের গান ?"
আমি কহিলাম, "সে আসি গাইবে
তারি তরে আছি পাতিয়া কান।"

বাতাস আসিল দুয়ারে আমার
কহিল, "ঘরেতে করিস্ কি ?"
বলিনু তাহারে, "আসবে সে আজ
তুই বুঝি ভাই, শুনিস্‌নি ?"

আকাশ কহিল, "আজ কেন তুই
আসিস্ না মোর আঙিনায় ?"
"এ ঘরে যে তার আসিবার কথা
বাহিরে কেমনে যাইব হায় !"

সকলের সাথে না হ'য়ে বাহির
বসেছিনু ওগো তোর তরে,
কিছুতেই তুমি এলে না হেথায়
বারেক আমার পথ ধ'রে !

আজ আমি তাই, তব আশা ছাড়ি
বাহির হইনু সব সাথে !
পথের বাঁকেতে ব'সে আছ দেখি
মোর তরে মালা এক হাতে !

শ্রী ববেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

রূপকথা

ছেলে। অ মা, এস না, কখন্ আস্‌বে ?

মা। এই যাই বাবা, যাই।

ছেলে। হ্যাঁ, খালি "যাই বাবা যাই, যাই বাবা যাই," রান্নাঘরের পাট আর তোমার সারা হয় না !

মা। দোওয়া-থোওয়া সব হয়ে গেছে, এই হাঁড়ী-টাড়ীগুলো তুলে যাচ্ছি বাছা, একটু সবুর কর্।

ছেলে। "সবুর কর্, সবুর কর্"। আমি যে আজ বিকেলবেলা গুলী-ডাণ্ডা পর্য্যন্ত খেল্‌তে গেলুম না—সকাল সকাল তোমার কাছে শুয়ে কব্‌রেজের গপ্পর শেষটা শুন্‌বো ব'লে বিকেল থেকে তিনখানা কলাপাত সায় ক'রে আর বুড়্‌কে পর্য্যন্ত মুখস্থ ক'রে শুতে এলুম।

মা হাত-মুখ ধুয়ে হেঁসেলের কাপড় 'বদ্‌লে' 'নে কি বল্‌ছিস্ বল্' ব'লে ছেলের মাথার কাছে বস্‌লেন।

ছেলে। গপ্প ?

মা। আজ থাক, একটু ঘুমিয়ে নে—আমিও ঘুমুই, কাল সকাল সকাল উঠ্‌তে হবে।

ছেলে। তুমি কেবল-ই ফাঁকি দেবে ; আধখানা গপ্প শুনে আছি, আর আধখানা না শুন্‌লে আমার আধকপালে হবে না ?—তখন কিন্তু মজাটা টের পাবে।

মা। কাল আমার অনেক কাজ বাছা ! কাল লক্ষ্মী-পুজো—শেষ রাত্তিরে উঠে জলপীঁড়ি দিতে হবে।

ছেলে। আমায় ডেকো মা, আমায় ডেকো, আমি শাঁক বাজাবো।

মা। তা বাজাস্—এখন ঘুমো ; আয়, আমিও শুই।

মা ছেলের পিঠটিতে হাত দিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুলেন।

ছেলে। গপ্প ?

মা। এই যে শাঁক বাজাতে দোব বল্লুম—আবার গপ্প কেন ?

ছেলে। সকালবেলা শাঁক বাজালে বুঝি সন্ধ্যেবেলায় গপ্প শুন্‌তে নেই ?

মা। রোজ রোজ কি গপ্প শুন্‌তে আছে ?

ছেলে। না, রোজ রোজ ভাত খেতে আছে, রোজ রোজ পাঠশাল যেতে আছে, খালি রোজ রোজ গপ্প শুন্‌তে নেই !

মা'র ন্যায়শাস্ত্র পড়া ছিল না, সুতরাং পুত্রের এই তর্কের সদুত্তর দিতে পাল্লেন না ; ব'ল্লেন, "ভাল নাছোড়বান্দা ছেলে ; কাল কোন্ অব্‌ধি শুনেছিস্ বল দিকি।"

ছেলে। সেই যে—কব্‌রেজ মশাই ম'রে গেলেন, তুমি ব'ল্লে তার পর চিঁড়ে কোটা হবে, দই পাতা হবে—

মা। তা, অত বড় মানুষ স্বগ্‌গে গেলেন, মান্তিমান নোক, খরচ-পত্তরের দিকে দিষ্টি ক'ল্লে চল্‌বে কেন, ঘটা ক'রে ছেরাদ্দ ক'র্ত্তেই ত হবে।

ছেলে। ঢাক-ঢোল বাজ্‌বে, নেমতন্ন হবে—

মা। ছেরাদ্দয় কি ঢাক-ঢোল বাজে রে পাগল !

ছেলে। বাজ্‌না হবে না ? তবে কিসের ঘটা !

মা। ছেরাদ্দর দিন সভা হয়, কেত্তন হয়, খোল বাজে—

ছেলে। ওঃ সেই হরিবোল্—হরিবোল্ ! ম'লে খালি হরিবোল্—হরিবোল্ ! মরা ভাল না—ছ্যা !

মা। সে কি রে পাগল, হরিনাম কেমন মিষ্টি !

ছেলে। সে যখন খত্তাল বাজিয়ে গান কর্ত্তে কর্ত্তে বলে ; রাস্তা দিয়ে নে যাবার সময় হোঁত্‌কা লোকগুণো অমন "বল হরি হরিবোল" ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে কেন ? বাবা, বুকের ভেতরটা যেন আমার ধুপুস্ ধুপুস্ ক'রে ওঠে !

মা। ছেরাদ্দে তা নয় রে তা নয়—এ কেত্তন বড় মিষ্টি ; যখন গোষ্ঠ গায়—আহা—

ছেলে। ও মা, আমি গোষ্ঠ শুন্‌বো—

মা। শুনিস্। যখন আমার ছেরাদ্দ কর্‌বি, তখন কেত্তনওলাকে বলিস্, গোষ্ঠ গাইবে।

ছেলে ধড়মড় ক'রে বিছানা থেকে উঠে প'ড়লো—ব'ল্লে, "তোমায় আর গপ্প ব'ল্‌তে হবে না, যাই আমি ছোট পিসীমার ঘরে শুই গে।"

গোঁজ মুখে হন্ হন্ ক'রে চ'লে যায় দেখে মা উঠে ছেলেকে হাত ধ'রে টেনে কাছে শোয়ালেন, ব'ল্লেন, "দেখ্‌বো রে দেখ্‌বো তখন, বউ এলে আর ও কথা বল্‌বি নে।"

ছেলে। তোমার বউ আসুক! এখন গপ্প ব'ল্‌বে তো বল।

মা। বাড়ীর সাম্‌নে যে অনেকটা জমী প'ড়ে ছিল, তার ওপর গোলপাতা দিয়ে একটা মস্ত আটচালা বাঁধ্‌লে; রাজার বাড়ী থেকে সব সামিয়ানা এল, সতরঞ্চি, গাল্‌চে, জাজিম্, তাকিয়া, সব সোনা-রূপোর হুঁকো, বৈঠক, সট্‌কা, গুড়গুড়ি, আল্‌বোলা। বড় বড় আড়ানে পাখা নিয়ে চারিদিকে লোকজন সব বাতাস ক'র্‌তে লাগলো। এক দিকে সব দান সাজানো— ভাল ভাল খাট-বিছানা, শাল, বনাত, পেতলের ঘড়া, ঘটি, থালা, বোক্‌নো, বেলি—

ছেলে। এত সব জিনিষ কি হবে?

মা। সব উচ্ছুগ্‌গু ক'রে বামুনদের দেবে, রূপোর ঘড়া-টড়া সব অধ্যেপক বামুনরো বিদেয় পাবে।

ছেলে। এই সব? মা, আমি বড় হয়ে অদ্দেপক হব।

মা। বামুন না হ'লে কি অধ্যেপক হয় রে, আমরা যে কায়েত।

ছেলে। কায়েত কেন অদ্দেপক হয় না? একগাছা পৈতে গলায় দিলেই ত'হ'ল।

মা। আরে বোকা, কায়েত অধ্যেপক হ'লে খাতা রাখ্‌বে কে? হিসেব লিখবে কে? এই সব দলিল, কওলা, পাটা এ সব কি বামুনরো লিখতে জানে?

ছেলে। তবে আমি দলিল লিখবো, খাতা রাখবো, টাকা আমার কাছে থাক্‌বে ত? যাত্তোর ঘড়া আমি চাই না। তার পর?

মা। কত লোকজন এল, কিত্তুনে ঠাকুর থালা বোঝাই ক'রে প্যালা পেলে। তার পর সন্ধ্যের পর ক্যাঙালী বিদেয় —

ছেলে। ক্যাঙালী কি মা?

মা। সে তুই দেখিস্ নি। এই যারা বড় দুঃখী, খেতে পায় না, পর্‌বার কাপড় নেই, থাকবার ঘর নেই—

ছেলে। ও মা, সে কি, খেতে পায় না? ভারী ত সে কবরেজদের রাজা—গাঁয়ে বুঝি খেতে পায় না তাদের—

মা। তা কি ব'ল্‌ছি, সে রাজার রাজ্যিতে সব্বাই খেতে পেতো, সেই জন্যে ত কবরেজ মশাইয়ের ছেরাদ্দর সময় ঢোলসোরৎ ক'রে সেই কত দূর—দু তিনটে নদীপার—ইংরেজের সহর থেকে ভাল ভাল অনেক ক্যাঙ্গালী আনাতে হ'য়েছিল।

ছেলে। ইংরেজ কে মা?

মা। একরকম সাদা মানুষ—মদ খায়, আর হোঁক্ হোঁক্ করে কথা কয়।

ছেলে। সাদা? আমাদের ওই বাগ্‌দী কাকার মত?

মা। না, বাগ্‌দী ঠাকুরপোর যে একটা ব্যামো হয়ে অমন হয়েছে, আগে কি অমন ছিল, ওকে ধবল রোগ বলে। সাহেবদের ছেলে হ'লেই একটা মদের গাম্‌লায় ডুবিয়ে দেয়—তাই সাদা হয়। সাহেবরা বড় ভাল নোক রে, তাদের সহরে এমন সব বড়নোক আছে, তার সব কহিতব্যি নেই। আবার ক্যাঙালী এম্‌নি আছে যে, রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খায়।

ছেলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, রাস্তার ভাত—কি ঘেন্না!

মা। ঘেন্না না? সেই জন্যেই ত ভাত কুড়োতে দেখ্‌লে তাদের চৌকীদারে ধ'রে নিয়ে যায়। এখন শোন্, ক্যাঙালীরা সব ছেলে বুড়ো আদি ক'রে এক একখানা নতুন কাপড়, বড় বড় এক এক সরা ভর্ত্তি ভর্ত্তি চিঁড়ে-মুড়কি, নারকোল-নাড়ু, আর এক এক পোণ ক'রে ক'রে কড়ি পেয়ে জয়-জয়কার দিতে দিতে যে যার দেশে চ'লে গেল। তার পরদিন জলপান; পনেরো দিন ধ'রে ছুতোরপাড়ায় এক পোর রাত থাক্‌তে আরম্ভ ক'রে বেলা প্রায় পোর-খানেক পর্য্যন্ত ধুপ্ ধাপ্ ঢেঁকি পড়েছে;—আহা, সে যে কি চিঁড়ে, তোকে আর কি ব'ল্‌বো বাছা! সরু, সরু—আর কি সুগন্ধি!

ছেলে। মা, আমি গন্ধি চিঁড়ে খাব।

মা। আচ্ছা, এবার আসছে পোষমাসে বট্‌ঠাকুরঝির বাড়ী থেকে কামিনী-ধান এলে—চিঁড়ে কুটে খাইয়ে দোব।

ছেলে। কি দিয়ে?

মা। ক্ষীর দিয়েও খাবি—পায়েসও রেঁধে দেব—তার পর ভোজের কথা শুনিস্ ত শোন্; সেই চিঁড়ে, ছাঁচি গুড়ের মুড়্কি—ভাল ভাল মর্ত্তমান কলা, শুকো দই দিয়ে কতক আর শেষ ক্ষীর দিয়ে কতক—

ছেলে। দাঁড়াও মা দাঁড়াও—একটু মনে মনে খেয়ে নিই—

মা। ভারী হ্যাংলা ত তুই।

ছেলে। বাঃ, এক দিনও খেতে দিতে পারেন নি, এখন লোভ দেখাচ্ছেন আর বল্ছেন ভারী হ্যাংলা।

মা। তবে খাওয়ার কথা আর ব'ল্বো না, খুব ঘটা ক'রে ছেরাদ্দ হ'ল, চুকে গেল সব।

তার পর এক দিন যায়, দু দিন যায়, দু মাস, ছ মাস, বছর কেটে গেল; কিন্তু বদ্দির ছেলে ভাল ক'রে বিদ্দে শেখেনি ব'লে রাজার হুকুমে বক্সী মশাই ভিন্ দেশ থেকে নোক আনিয়ে রাজবদ্দি ক'রেছেন।

সবাই বলে বাপ কোকোনবাবুকে বাবু-ই ক'রে গেছেন, বিদ্যে-সিধ্যে কিছুই দিয়ে যান নি, কাযে-ই বাপের খাতিরে বদ্দিদের নিশিকে সবাই ভক্তি-ছেদ্দা ক'ল্লে-ও রোগ দেখাতে তাকে কেউ ডাকে না। নিশি খায় দায় বেড়ায়, তার মনে মনে কিন্তু বিশ্বাস যে, মিত্যুকালে বাবা তাকে দৈবী বিদ্যে দিয়ে গেছেন। নিশির একটি গুণ এই যে, বাপের ওপর তার যা বিশ্বেস ছিল, তা বোধ হয় দেব্তা-বামুনের ওপর-ও তত ছিল না; পিরথিমীতে তার বাপের মতন নোক জন্মেছে, এ কথা সে বিশ্বেস ক'র্তো না। মরণকালে বাবা আর কিছু না পড়িয়ে ঐ যে "কদাচিৎ কুপিতা মাতা" পড়িয়ে গেলেন, উরির ভেতর সমস্ত চিকিচ্ছে শাস্তর জ্যান্ত হয়ে র'য়েছে। নিশির কাছে তার বাপ ছেলেন মহাদেব, আর মা ছেলেন মা দুগ্গা।

এক দিন নিশিকান্ত মধ্যন্ন ভোজন ক'রে, দণ্ডখানেক বাঁ-কাৎ ফিরে শুয়ে (কব্রেজ মশার হুকুম ছেল, যে খেয়ে উঠে খানিক বাঁ-কাৎ ফিরে শোবে, তার কখন-ও কোন ব্যামো হবে না) শুয়ে উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে নাচ্-দোয়ায়ের কাছে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে দেখেন যে, উদ্ধব গয়লা রুখু রুখু মাথা, রোদে পোড়া মুখ, ঘেমে তিরখুত্তি হয়ে কোত্থেকে আসছে। ছোট বদ্দি ব'ল্লে, "কি উদ্ধব, বেলা যে তিন পোর হ'তে যায়, এখন-ও নাওয়া-খাওয়া কর নি—কোথা গেছেলে?" উদ্ধব হাত দুখানা মাথায় ঠেকিয়ে উত্তুর ক'ল্লে, "আর বদ্দি দা-ঠাকুর, আমার দুক্কের কথা আর জিজ্ঞুসো না; আজ তিন দিন হ'ল আমার সেই জর্দা গাইটে যে কোথায় গেছে, তা আর তলাস্ ক'রে পাচ্ছি নে, আহা, মা আমার আমি না মেখে দিলে কারুর হাতে জাব খেতো না" ব'লে মিন্ষে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্তে আরম্ভ ক'ল্লে। ছোট কবরেজ ব'ল্লে, "এ্যাঁ, এই একটা গরু হারিয়েছে—এ তুই আমাকে বলিস্ নি!"

গয়লা বল্লে, "তা আপনাকে জানালে কি ক'র্তে?"

কবরেজ বল্লে, "ওষুদ্ দিতুম্, আর কি কর্তুম্।"

উদ্ধব বল্লে, "তবে যে সকলে বলে, তুমি কবরেজী নেখাপড়া কর নি?"

নিশি বল্লে, "তারা ত জানে না যে, মিত্যুকালে বাবা আমাকে দৈবী বিদ্যে দিয়ে গেছেন।"

"তবে দা'ঠাকুর, আমায় রক্ষে কর" ব'লে উদ্ধব পায়ে জড়িয়ে ধ'র্লো, "যা খরচ হয়, আমি দিতে রাজী আছি। আহা, একটানে আড়াই সের দুধ দিতো গো, আড়াই সের দুধ—এব্লা ওব্লা।"

নিশি কবরেজ ব'ল্লে, "খরচপত্তর আবার কিসের! যা, ঐ দক্ষিণে রাজার জঙ্গল থেকে চারটি হরতকী কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী যা, পোটাক্ আন্দাজ হরতকী বেটে গরম ক'রে খেয়ে ফেল্ গে দিকিন্।"

উদ্ধব ব'ল্লে, "আমি খাব?"

কবরেজ বল্লে, "তোর গরু হারিয়েছে, তুই খাবি নি ত কি মোধো ময়রার মাসী খাবে? এ ওষুধের গুণ কি জানিস্, 'কদাচিৎ কুপিতা মাতা ন কুপিতা হরীতকী'—"

* * * * *

বেলা তিন পোরের সময় উদ্ধব ওষুদ সেবন ক'রেছে, সন্ধ্যের একটু পরেই পেট ছেড়ে দিলে, এই যায়, এই আসে, এই যায়, এই আসে, ক্রমে রাত ঘনিয়ে এল, কাহিলও হয়ে পড়েছে, মাঠের দিকে আর যেতে পারে না, ঘরের পেছনে বাগানটাতে গিয়েই বসে।

অষ্টুমীর রাত্তির, তেঁতুলগাছের পাতার ভেতর দিয়ে একটু একটু জোচ্ছনা দেখা যাচ্ছে, পেয়ারাতলায় হাত ঘষ্তে ঘষ্তে উদ্ধব যেন একটা খস্খসনি শব্দ শুনতে

গেলে; ইদিক উদিক চেয়ে ঠাউরে দেখে যে, কলা-ঝাড়ের কাছে কি একটা যেন নড়ছে; তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে কাছে গিয়েই ভূমিষ্টি হয়ে পেন্নাম ক'রে উদ্ধব ব'লে উঠলো, "চিত্তিরে মা আমার—আপনার ঘরে আপনি ফিরে এসো মা!" ব'লে গায়ে হাতটি বুলুতে বুলুতে উদ্ধব গেলো, গাইটিও পেছু পেছু চল্লো।

উদ্ধব। ভূতির মা, ওঠ রে ওঠ—ওঠ, শীগ্‌গীর শাঁকটা বাজা; বেইরে এসে দেখ, চিত্তিরে মা আমার ফিরে এসেছে।

"সত্যি না কি—সত্যি না কি" বল্‌তে বল্‌তে শাঁখ হাতে ক'রে উদ্ধবের বউ দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, সোয়ামীর দিকে চেয়ে বল্লে, "তবে ত বাপু কবরেজের ওষুধের গুণ আছে, হাতে হাতে ফল!"

উদ্ধব। তুই-ই ত গয়লার ঘরের বোকা—আমায় কত নিসিন্দে করেছিলি, অত হত্তুকী খেও না শেলোম্মো বাড়্‌বে।

বউ। তা কি জানি মা, নোকে বলে শুন্‌তে পাই যে, তেল দিয়ে হত্তুকী গুলে খেলে না কি নোকে গলায় দড়ি দিয়ে মরে; তা বাপু তোমার কি—

উদ্ধব। অঃ পাগ্‌লী সে হত্তেল হত্তেল, হত্তুকী নয়। পাঁচ জন ভদ্দরের কাছে বস্‌তিস ত এ সব শিখতিস। আহা, কোকন দা'-ঠাকুর যে শোলোকটি বলেছিল—"কাদাকিল কপাটি মোটা"—আমার সব মনে আসছে না এখন, শিখে এসে তোকে শোনাব তখন। চারটি জাব মেখে দি—কি ব'লিস্—ক'দিন হয় ত মার পেটে দুটি অন্ন যায় নি। বিচে কলাটার একটা আস্ত তেউড়কে তেউড়-ই খেয়ে ফেল্লেন।

বউ। তুমি গিয়ে ঘরে শোও—যাও, কাহিল আছ—আমি জাবটা মেখে দিচ্ছি।

আসল কথাটা হ'চ্ছে, চরা কর্‌তে গিয়ে, অন্য কারো গাইয়ের সঙ্গে মিশে চিত্তিরে গাঁ ছাড়িয়ে চ'লে গেছলো; কুকুর চেনে মানুষ, আর গাই চেনে ঘর; কদিন ঘুরে ঘুরে আজ খিড়কি দিয়ে বাগানটায় ঢুকেছেলো।

একখানি বড় সর, উপুড় কল্লে ভুঁয়ে পড়ে না, এমন দু'তিজেল দই আর চাঁপা-ফুলের রং এক তিজেল ক্ষীর মাসী আর ছোট ভেয়ের হাতে দিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি সের আড়াই আন্দাজ রুইমাছ হাতে ঝুলিয়ে দু'দিন পর উদ্ধব ঘোষ কোকন বদ্দির পায়ের কাছে রেখে বল্লে, "দা-ঠাকুর, তুমি দেবতা, রাজাদের চোগ নেই, তাই তোমায় চিন্‌তে পারলে না।"

* * * * *

নিশি কবরেজের ওষুধের গুণে উদ্ধব ঘোষের হারাগরু ফেরার কথা শুনে গ্রামের অনেক লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেল; ক্রমে দু' চার জন রুগীও কবরেজ-বাড়ী যাওয়া আসা করে আর 'কদাচিৎ কুপিতা মাতা'র ব্যবস্থা নিয়ে চ'লে যায়; কেউ বা সত্যি সেরে যায়, কেউ বা মনে করে, সেরে গেছি।

এ দিকে রাজবাড়ীতে একটা মস্ত চুরী হয়ে গেছে। সুয়োরাণী রাত্তিরে শোবার আগে তাঁর জরি-মখমল্‌-জড়ানো বেতের পেটিটির ভেতর কতকগুলি হীরে মতি জড়োয়ার অলঙ্কার—

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সঙ্গ

মধুর তোমার সঙ্গ—আনন্দ নির্ঝর—
হে বাঞ্ছিত—সুধাশুচি আরাধ্য আমার,
নিরন্ত ত্রিতাপদাহ ঘোর দুর্নিবার
অপ্রকাশ, প্রাণে এ কি প্রকাশ সুন্দর!
কত যুগ কত জন্ম খুঁজিয়া খুঁজিয়া—
তোমারে পেয়েছি আমি হে শোক-বিজয়,
অন্তরে বাহিরে তুমি, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
কি আনন্দ পাদপদ্ম পূজিয়া পূজিয়া—

তোমার মধুর বাণী বিশ্বের সঙ্গীত,
রূপাতীত হাসিতেছ তুমি সর্ব্বরূপে,
আর রহিব না বদ্ধ কামনার কূপে,
এবার সমুদ্রযাত্রা! সমস্ত অহিত,
জীর্ণ পুষ্পদলসম পড়িছে ঝরিয়া!
পরশে পবিত্র প্রাণ পরিতৃপ্ত হিয়া।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

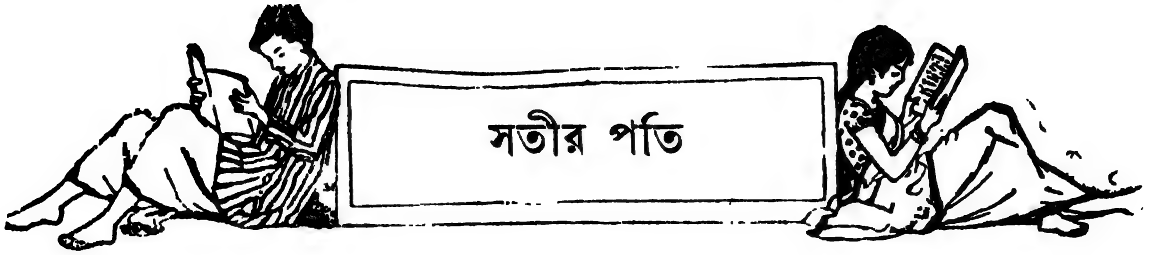

সতীর পতি

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবুঝ রমণী

বর্দ্ধমান জেলার মাধবপুর গ্রামের বারোয়ারি তলার মাঠে চালা বাঁধিয়া, "ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক এসোসিয়েসন" (সংক্ষেপে F. D A) কর্ত্তৃক অদ্য রাত্রিতে "আবু হোসেন" গীতিনাট্য অভিনীত হইবে, তজ্জন্য গ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় অভিনয় আরম্ভ। সূর্য্যাস্ত না হইতেই ঘরে ঘরে উনান জ্বলিয়াছে—ছেলেরা আটটার পূর্ব্বে আহার সারিয়া লইতে চায়। ছেলেদের মায়েরা বাপেরাও যে এ বিষয়ে নিতান্ত নির্লিপ্ত, তাহাও বলা যায় না; তবে তাঁহাদের মনের ঔৎসুক্য, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত।

ভর-সন্ধ্যার সময় দুই জন যুবক আসিয়া এক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "মিঞা সাহেব,—মিঞা সাহেব,—বাড়ী আছ ?"

মিঞা সাহেবের মা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইতেছিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, বদ্ধ দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে ?"

এক জন উত্তর করিল, "খুড়ী-মা, আমি অবিনাশ। হীরু দাদা বাড়ীতে আছে ?"

এই গৃহের যুবক-কর্ত্তা হীরালাল বসুই আগন্তুকদ্বয়ের উদ্দিষ্ট মিঞা সাহেব। আজ ছয় মাস ধরিয়া আবু হোসেনের রিহার্শাল চলিতেছে—নায়কের ভূমিকা হীরালালই পাইয়াছে; তাহার বন্ধুবান্ধবরা রহস্য করিয়া তাহাকে 'মিঞা সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

"হীরু দাদাকে একবার ডেকে দাও না, খুড়ী-মা !"

এই সময় খিড়কীর দ্বার দিয়া, হাতে গাড়ু, কাঁধে গামছা হীরালাল অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ২২।২৩ বৎসর, রঙটি বেশ ফর্সা, উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু—এবং একটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ দাড়ীটি তার, ঠিক থিয়েটরের আবু হোসেনের মতই। ইহা, 'আশ্চর্য্য ঘটনা-সমতা' নহে—এই ছাগল-দাড়ী ইচ্ছাকৃত এবং চেষ্টাকৃত। হীরালাল যে আবু হোসেন সাজিবে, ইহা ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল; অভিনয়কালে যাহাতে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে হীরালাল দাড়ীটি এই ভাবেই তৈরি করিয়া লইয়াছে।

পুত্রকে দেখিয়া জননী কহিলেন, "ও হীরু, অবু এসেছে, তোকে ডাকছে।"

হীরালাল গাড়ুটি রাখিয়া, গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে, "কে, অবিনাশ ?"—বলিয়া, গিয়া সদর দরজা খুলিল। দ্বিতীয় যুবককে দেখিয়া বলিল, "জাঁহাপনা যে! গোলামের গরীবখানায় কি মনে ক'রে ?"

বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় যুবকই আজ রাত্রিতে বাদশাহ সাজিবে। বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন, "চল, বিপিন বাবু তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"

বিপিন বাবু—বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী এই গ্রামের জমীদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনিই এফ-ডি-এ'র জন্মদাতা এবং পালনকর্ত্তা।

হীরালাল বলিল, "এই ত সবে সাতটা। এখনই কেন ?"

অবিনাশ বলিল, "বিপিন বাবু বল্লেন, হীরু না এলে কোনও কাযই এগুচ্ছে না। তাকে ডেকে আন। খাওয়ার জন্যে যেন দেরী না করে—এখানে এসেই খাবে।"

"কোথায় তিনি ?"

"বারোয়ারিতলায়। তিনি ত প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল এসে ব'সে আছেন। চল চল, আর দেরী ক'রো না।"

হীরালাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। অবিনাশ বলিল, "ভাবছ কি ?"

"ভাবছি, আমি এখনই চ'লে গেলে মা-টাকে কে

নিয়ে যাবে? কাযকর্ম্ম সারা না হলে ত ওঁরা যেতে পারবেন না?"

অবিনাশ বলিল, "মা-ও যাবেন, আবার টা-ও যাবেন?"

হীরু হাসিয়া বলিল, "টা যাবে না? তার স্বামী কি রকম অ্যাক্টো করে, কি রকম ক্লাপ পায়, সে দেখে তার নারীজন্ম সার্থক করবে না?"

"আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। আমি এসে ওঁদের নিয়ে যাব। বরং খুড়ীমার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাটা পাকা ক'রে রাখি।"-- বলিয়া অবিনাশ অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"খুড়ী-মা, হীরু দাদাকে আমরা এখন নিয়ে চল্লাম। সেখানেই সে খাবে। জমীদারবাড়ী থেকে বড় বড় দু ঝুড়ী লুচী, বেগুন ভাজা, আলুর দম, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, রসগোল্লা এই সব এসেছে। দুটো টিনের ক্যানাস্তারায় চায়ের জল ফুটছে। রাত ৯টায় প্লে আরম্ভ। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি সাড়ে আটটার সময় এসে আপনাদের নিয়ে যাব।" বলিয়া খুড়ীমার উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া, অবিনাশ আবার বাহির হইয়া গেল।

হীরু বলিল, "আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরালাল বলিল, "তা হ'লে মা, আমি এখন বেরুই। ঘণ্টাখানেক পরে এসে অবিনাশ তোমাদের নিয়ে যাবে।"

মা বলিলেন, "না বাবা, আমি থিয়েটার দেখতে যাব না। ঠাকুর-দেবতার কথা নয় কিছু নয়, মিছামিছি কেন?"

হীরু বলিল, "নাই বা হ'ল ঠাকুর-দেবতার কথা মা! যা হোক একটা গল্প ত বটে! তা ছাড়া তোমার ছেলে অ্যাক্ট করবে, তুমি দেখবে না?"

মা বলিলেন, "না বাবা, সে গল্প আমি জানি। বৌমা আরব্যোপন্যাস থেকে প'ড়ে আমায় শুনিয়েছেন। সে আমার দেখবার দরকার নেই।"

হীরু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে মা প্রকৃত কারণ তাহাকে খুলিয়া বলিলেন,—"তোর বউ তোকে চাদর চাপা দিয়ে, ওগো আমার কি হ'ল গো! ব'লে বুক চাপড়াবে, মা হয়ে আমি কি তা চোখে দেখতে পারি? আমি যাব না। বউমাকে বরঞ্চ মেঝ বউ, ছোট বউয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।"

হীরু হতাশ হইয়া জামা-কাপড় লইতে শয়নঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে তার স্ত্রী সুরবালা আড়াই বৎসর বয়স্কা খুকীকে কোলে লইয়া উপস্থিত ছিল। হীরু জামা গায়ে দিতে দিতে বলিল, "মা ত কিছুতেই যেতে রাজী হলেন না। তুমি তা হ'লে খুড়ীমাদের সঙ্গেই যেও। ঘণ্টাখানেক পরে অবিনাশ তোমাদের নিতে আসবে।"

সুরবালা বলিল, "আমি যাব না।"

"কেন? তোমার আবার কি হ'ল?"

"এমনি।"

হীরু স্ত্রীর নিকট সরিয়া গিয়া, প্রথমে মেয়েকে আদর করিয়া, তার পর স্ত্রীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "কেন যাবে না? আমি কেমন অ্যাক্ট করি, তুমি দেখবে না? হয় ত লোকে আমায় কত প্রশংসা করবে, সে সব শুনতে তোমার সাধ হয় না?"

সুরবালা বলিল, "তা হয় বটে। কিন্তু ও সব তোমরা যা করবে, আমি দেখতে পারবো না। সে আমার সইবে না।"

"কি সব আমরা করবো? মা'র যে জন্যে আপত্তি, তোমারও কি তাই না কি? মা হলেন সেকেলে মানুষ, নেহাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওঁর কথা ছেড়ে দাও। সত্যি ত আমি মরবো না গো! অভিনয় বৈ ত নয়, তাতে আর দোষটা কি?"

সুরবালা বলিল, "হোক অভিনয়, সে দৃশ্য চোখে দেখা আমার সাধ্যি নয়—তা ছাড়া—" বলিয়া সুরবালা চুপ করিল।

"তা ছাড়া আবার কি?"

সুরবালা এবার হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া, একটা ছুঁড়ীকে নিয়ে তুমি প্রেম করবে, তাকে বিয়ে করবে, তাকে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকবে, সে আমি চোখে দেখতে পারবো না, আমার ভয়ানক রাগ হবে!"

হীরু বলিল, "ছুঁড়ী কোথা? সে ত ছোঁড়া। ঐ চক্রবর্ত্তী পাড়ার বিনোদ মুখুয্যে।"

সুরবালা বলিল, "হোক ছোঁড়া, ছুঁড়ী সেজে তোমায় স্বামী ব'লে ডাকবে—তুমি তার গায়ে হাত দেবে ত? সে আমি দেখবো না—দেখবো না—দেখবো না।"

স্ত্রীকেও কোনও মতে রাজী করিতে না পারিয়া, দুঃখিত মনে হীরালাল বাহির হইয়া গেল।

এই অবসরে এই পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান আবশ্যক। হীরুর পিতা সর্ব্বেশ্বর বসু দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই ভাই, দুই বোন্ ছিল। মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক-পথে তাঁহার অগ্রগামী হইয়াছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যান নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ বসুর একটি পুত্র আছে, তাহার নাম চুণিলাল, বয়স ১২।১৩ বৎসর, সে এই গ্রামের মাইনর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করে। হীরালালের পিসীমা দুই জন আপন আপন শ্বশুরালয়ে বাস করেন। সুতরাং পরিবারে এই সাতটি প্রাণী—তিনটি বিধবা মা, সস্ত্রীক সকন্যা হীরালাল ও তাহার খুড়তুতো ভাইটি। বাড়ীতে চারিখানি পাকা কুঠরী আছে; রান্নাঘর ও গোশালা মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং খড়ে ছাওয়া। বিঘা ত্রিশ জমী আছে, তার অর্দ্ধেকের উপর খাজনা বিলি করা; বাকী কয়েক বিঘা ভাগে চাষ করানো হয়। সে জমীগুলিতে ধান, কলাই ও আখ হয়; উৎপন্নের অর্দ্ধাংশ যে চাষ করে, সে খায়; অর্দ্ধাংশ ইঁহাদের প্রাপ্য। জমীগুলি থাকাতে ডাল-ভাতের ভাবনা ভাবিতে হয় না বটে; কিন্তু তা ছাড়াও অন্য রকমের কত খরচ ত আছে। পূর্ব্বে সস্তাগণ্ডার দিনে কষ্টেসৃষ্টে এক প্রকার চলিয়া যাইত, কিন্তু দিন দিন সকল জিনিষের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন আর দিন চলা দুষ্কর। হীরু নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কুল হইতে দুইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এ দিকে বছর দুই তিন আড্ডা দিয়া, তাস পিটিয়া, থিয়েটর করিয়া কাটাইয়াছে; কিন্তু আর কাটে না। এখন একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় তাহাকে বাহির হইতেই হইবে। এত দিন সে কলিকাতায় যাইত, কেবল এই থিয়েটারের অভিনয় জন্য আটক পড়িয়াছে। পাঁজি দেখিয়া দিন স্থির করাই আছে, পরশ্ব হীরালাল কলিকাতা যাত্রা করিবে। জমীদারপুত্র বিপিন বাবু কলিকাতার দুই জন বিশিষ্ট বন্ধুর নামে অনুরোধপত্র লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে কলিকাতায় একটা কিছু কায-কর্ম্ম জুটিয়া যাইবেই, এ ভরসা আছে।

অবিনাশ যথাসময়েই আসিয়াছিল। হীরালালের জননী ও পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য সেও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশেষে হীরুর দুই খুড়ীমাকে লইয়াই সে গিয়াছিল।

অভিনয় শেষ হইতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। অভিনেতারা গ্রীণরুমে প্রবেশ করিতেই অনেকে হীরালালকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার প্রতি অজস্র প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। স্বয়ং বিপিন বাবু তাহার করমর্দ্দন করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "হীরু, ভাই, তুমি যে আজ প্লে করেছ, অতি চমৎকার - একেবারে নিখুঁৎ বল্লেই হয়। তোমা হতেই আজ এক-ডি-এর মুখরক্ষা হ'ল। পশু ড্রেস রিহার্শালের সময়ও আমি মনে করিনি যে, তোমার প্লে এত ভাল ওৎরাবে।"

বিপিন বাবুর জনৈক মোসাহেব ললিত বক্সী বলিল, "হীরু একটা জিনিয়স, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্লে যা করেছে, একেবারে লা গ্র্যাণ্ডি! যতবার ড্রপ পড়েছে, আমি অডিয়েন্সের ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শোনবার চেষ্টা করেছি। পাঁচখানা গ্রামের লোক, এক মুখে সুখ্যাতি করেছে। ওরই মধ্যে যারা লেখাপড়া জানে, কলকাতায় যাওয়া আসা করে, তাদের কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি 'এমন প্রতিভাশালী অভিনেতা, ক্যালকাটা ষ্টেজেও আমরা খুব কমই দেখেছি।' মিত্র সাহেব, তুমি ত ভাই চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় পশুই কলকাতায় চল্লে শুনছি, এ গরীবের একটি কথা মনে রেখ। কেরাণীগিরির ফাঁদে পা না দিয়ে, তুমি যদি চেষ্টা-বেষ্টা ক'রে কোনও পাবলিক থিয়েটরে ঢুকে পড়তে পার ত অল্পদিনের মধ্যেই তুমি নাম ক'রে নিতে পারবে—কেরাণীগিরির চেয়ে মাইনেও ঢের বেশী পাবে। এমন এক দিন আসবে, যখন থিয়েটরওয়ালাদের মধ্যে তোমায় নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে, এক থিয়েটরের এগ্রিমেণ্টের কাল উত্তীর্ণ না হতেই, মোটা টাকা পকেটস্থ ক'রে অন্য এক থিয়েটরে তুমি ঢুকবে, তোমার নামে মোকদ্দমা হবে, এ আমি ব'লে রাখলাম।"—বক্সীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

নিজের স্বর্ণনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে হীরালালকে একটা সিগারেট দিয়া বিপিন বাবু বলিলেন, "বক্সী কিন্তু বলেছে মন্দ কথা নয় হে! কথাটা একটু ভেবে দেখতে হবে হীরু। ওহে, তোমরা সব গোছ-গাছ ক'রে নাও,

অনেক রাত হয়েছে। চল্লাম ভাই হীরু! কাল তা হ'লে কখন্ তুমি আমার কাছে আসছ?"

হীরু বলিল, "কালকে ঘুম ভাঙ্গতে বোধ হয় একটু বেলাই হবে। বিকেলে ৩টে ৪টের সময় আসবো এখন। কি বল?"

"বেশ, তাই এস।"—বলিয়া বিপিন বাবু হীরালালের করমর্দ্দন করিয়া, অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক জন পাইক 'হ্যারিকেন' ধরিয়া সম্মুখে এবং এক জন দ্বারবান্ লাঠি হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা যাত্রা

পরদিন যথাসময়ে হীরালাল গিয়া বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

বিপিন বাবুর বয়স ২৫ বৎসর। কলেজে উচ্চশিক্ষা না পাইলেও তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের মোটা-মুটি পরিচয় অবগত আছেন। কয়েকখানি বাঙ্গালা মাসিক ও ইংরাজী সংবাদপত্র তিনি রীতিমত পাঠ করিয়া থাকেন। তবে নাট্যকলার দিকেই তাঁহার ঝোঁকটা একটু বেশী—নহিলে স্থানীয় এফ-ডি-এর জন্য এত টাকা তিনি খরচ করিতেন না।

বিপিন বাবু নিজ বৈঠকখানায়, টানা-পাখার তলায়, ফরাস বিছানার উপর অর্দ্ধশয়ানভাবে তাকিয়া হেলান দিয়া, খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একটি গুড়গুড়ির সরপোষ ঢাকা কলিকা হইতে সুগন্ধি ধূম উদ্গত হইতেছিল; মাঝে মাঝে নলটা হাতে করিয়া, দু' চার টান টানিয়া, আবার রাখিয়া দিতেছিলেন। হীরালাল প্রবেশ করিতে, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এস ভায়া! ব'স।"

হীরালাল তাঁহার অনতিদূরে উপবেশন করিল। বিপিন বাবু গুড়গুড়ির নলটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "কাল তা হ'লে রওয়ানা হচ্ছ?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত ঠিক করেছি।"

বিপিন বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক ত করেছ ভাই, কিন্তু চাকরীর বাজারের যে অবস্থা হয়েছে শুনতে পাই,—প্রথম ত একটা কিছু জোটাই ভার। তার পর জুটলেও, বড় জোর ত্রিশ কি চল্লিশ টাকা মাইনে হ'তে পারে। কলকাতার বাসা-খরচ, নিজের কাপড়-চোপড় খরচ বাদে কি-ই বা তুমি বাড়ীতে পাঠাবে! তার পর চিরটা জীবন, স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে বিদেশেই প'ড়ে থাকা। সে দিন হরিধন এসেছিল; তুমি ত জান, সে কলকাতায় কোন্ মার্চ্চেণ্ট আপিসে চাকরী করে। তার এক মাস ছুটী পাওনা হয়েছিল, সে ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পায়, কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে পরিবার নিয়ে যে বাস করবে, তার উপায় নেই। কথায় কথায় সে বল্লে, "বৌ দুঃখ ক'রে বলছিল, পাঁজি দেখতে দেখতেই জীবনটা কাটলো!"

হীরালাল কথাটার ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাঁজি দেখতে দেখতে কেন?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "কলকাতার অতি নিকটে যাদের বাড়ী, তারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি ক'রে চাকরী বাজায়। যাদের বাড়ী তার চেয়েও দূরে, তারা শনিবার শনিবার বাড়ী যায়। আমাদের এ গ্রাম কলকাতা থেকে এতটাই দূরে যে, এ গ্রামবাসী কলকাতার কেরাণীরা শনিবার শনিবারও বাড়ী আসতে পারে না। ১২ দিন পূজোর ছুটী, ৯ দিন বড়দিনের, ৪ দিন গুডফ্রাইডের। বছরে এই তিন বার মাত্র তারা বাড়ী আসতে পায়। সুতরাং ছুটী অন্তে স্বামী চ'লে যাবার কিছু দিন পর থেকেই, বৌ পাঁজি দেখতে আরম্ভ করে পরের ছুটীর আর কত দিন বাকী। তাই হরিধনের বৌ বলেছে, পাঁজি দেখতে দেখতেই জীবনটা কাটলো!"—বলিয়া বিপিন বাবু একটু মৃদুহাস্য করিলেন।

একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হীরালাল বলিল, "হুঁ, তা বটে!"—বলিয়া গড়গড়ার নলটি বিপিন বাবুর হাতে দিল।

বিপিন বাবু কিয়ংক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন। তার পর বলিলেন, "দেখ, কাল হঠাৎ ললিত বক্সীর মুখ থেকে যে কথাটা বেরুল, তা আমি বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি। কলকাতায় আজকাল শুনেছি, ভাল অভিনেতার ভারি কদর, আর বেশ মোটা মোটা মাইনেও তারা পাচ্ছে। তেমন

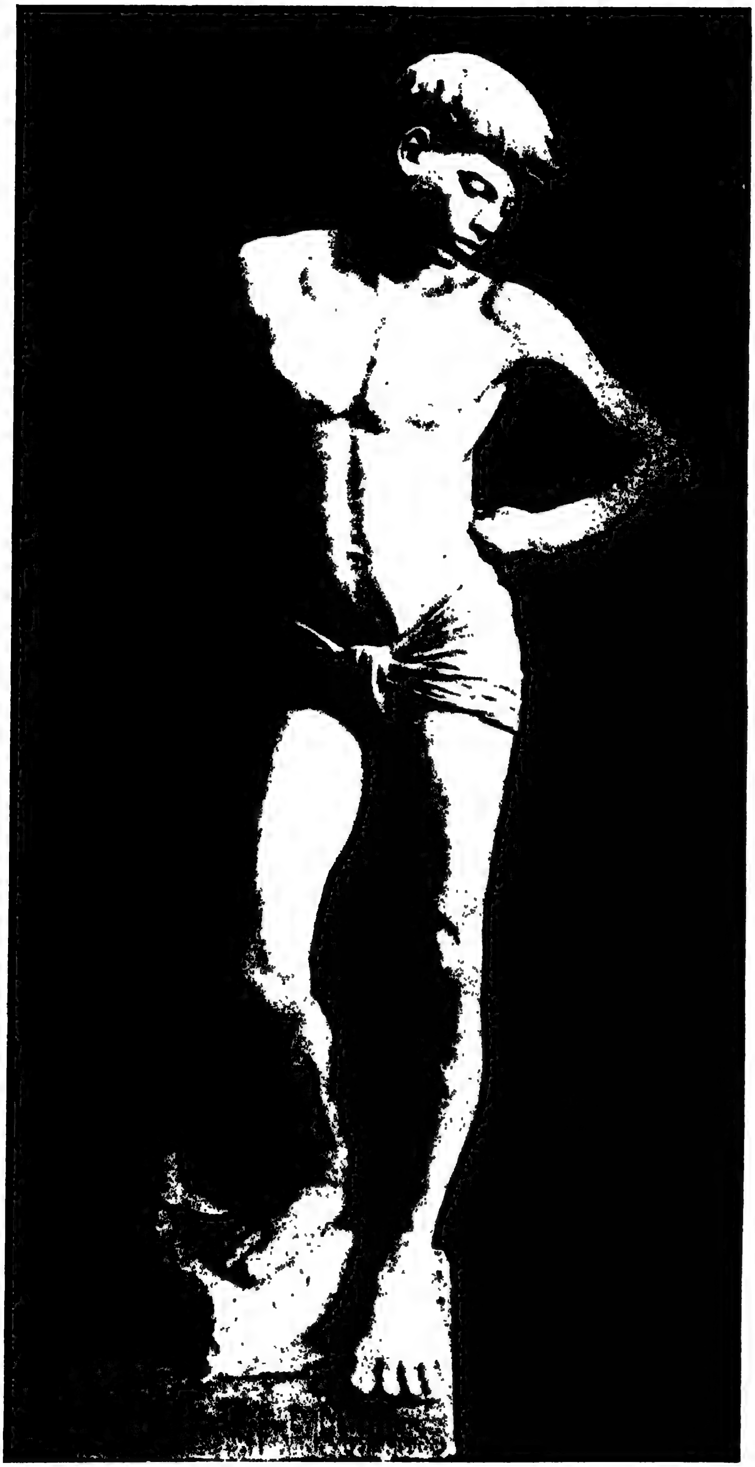

পল্লীপ্রাণ

[ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

প্রতিভাশালী লোক হ'লে দু'শো, তিন শো, এমন কি, পাঁচশো টাকা মাইনেও না কি তারা পায়। তা ছাড়া, যারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে, পূর্ব্বে লোকে যেমন তাদের একটা বওয়াটে, মাতালের দল ব'লে নীচু নজরে দেখতো, শুনেছি, এখন না কি সে ভাবটা নেই। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বি-এ, এম্-এ ডিগ্রীধারী যুবকরাও না কি অসঙ্কোচে থিয়েটরে ঢুকছে—তাতে বেশ মোটা মোটা মাইনে পাচ্ছে, সমাজেও তাদের হীন হয়ে থাকতে হচ্ছে না। আমার মনে হয়, কলকাতার থিয়েটর-ওয়ালারা যদি তোমার গুণের পরিচয় একবার পায়, ললিত বক্সীর কথাই ঠিক, তা হ'লে তোমায় তারা লুফে নেবে।"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু আমার ত আর বি-এ, এম্-এ ডিগ্রী নেই!"

"তা নেই বা থাকলো। তারা যেমন ভাল প্লে করে, তুমিও যদি সেই রকম অথবা তার চেয়েও ভাল প্লে করতে পার, তা হ'লেই ত হ'ল। আমি তোমাকে যে দু' জন বন্ধুর নামে চিঠি দেবো, তুমি যদি বল, তাঁদের এ কথাও লিখে দিতে চাই যে, তুমি এক জন খুব ভাল অ্যাক্টর, কোনও থিয়েটরের কর্ত্তাদের সঙ্গে যদি তাঁদের আলাপ থাকে, তা হ'লে সে দিকেও একটু চেষ্টা যেন তাঁরা করেন।"

এ কথা শুনিয়া হীরালাল ভাবিতে লাগিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

হীরালাল বলিল, "তাই ত ভাবছি!"

"কেন, এতে ভাবনার কি আছে?"

হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, "আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার মত হ'লে হয়।"

"কেন, তিনি অমত করবেন কেন? পাছে কোনও নটীর প্রেমে প'ড়ে যাও?"—বলিয়া বিপিন বাবু হাসিলেন।

হীরালাল বলিল, "সে ত বহু দূরের কথা।"—বলিয়া, কি কারণে তাহার স্ত্রী গত রাত্রিতে অভিনয় দেখিতে আসিতে সম্মত হয় নাই, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তার পর বলিল, "সাজা স্ত্রীলোককে আমি প্রণয়-সম্ভাষণ করবো, তাই তার সহ্য হয় না,—এ ত জলজ্যান্ত আসল স্ত্রীলোক!"

শুনিয়া বিপিন বাবু হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "তা, থিয়েটরে ঢুকে যদি তোমার মোটা মাইনে হয়, তা হ'লে তোমার গিন্নী ঐটুকুতে আপত্তি করবেন না বোধ হয়। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়।"—বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বিপিন বাবু চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম আনিতে আদেশ করিলেন। সেগুলি আনীত হইলে, বিপিন বাবু চিঠি লিখিতে লাগিলেন; ভৃত্য তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে নিবন্ত কলিকাটি গুড়গুড়ি হইতে তুলিয়া লইয়া নূতন করিয়া সাজিতে গেল। হীরালাল বিপিন বাবুর পরিত্যক্ত সংবাদপত্রখানি পাঠে মন দিল।

বিপিন বাবুর চিঠি লেখা শেষ হইতে প্রায় ২০ মিনিট লাগিল। চিঠি শেষ করিয়া তিনি গুড়গুড়ির নল হাতে লইতেই হীরালাল বলিল, "ওহে, পড়েছ, কলকাতায় কি কাণ্ডটা হয়ে গেছে?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "শিখে মুসলমানে লড়াই?"

"হ্যাঁ। আর্য্যসমাজীরা তাদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ক'রে বাজনা বাজিয়ে মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে মুসলমানরা ক্ষেপে উঠে খুব দাঙ্গা করেছে—কি ভয়ানক!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, পড়েছি। পর্শু এ ঘটনা ঘটেছে। জানিস ত বাপু, মসজিদের কাছে বাজনা বাজালে মুসলমানরা ক্ষেপে ওঠে, সেখানে বাজনা বাজাবার কি দরকার? দেখ না, কত মাথা ফেটেছে—লোক মরেছে পর্য্যন্ত—শেষে সশস্ত্র পুলিস এসে দাঙ্গা থামায়।"

হীরালাল বলিল, "ভাগ্যিস পর্শু আমি কলকাতায় পৌঁছিনি—আমার মাথাতেও লাঠি পড়তো কি না কে জানে!—আচ্ছা, এত দিনে সব মিটে গেছে বোধ হয়।"

বিপিন বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়। ও সেই দিনই মিটেছে। পুলিসের বন্দুক আর সঙ্গীন দেখেই যে যার আপনার কোটরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।—সে যাক্, চিঠি দুখানা তুমি প'ড়ে দেখ।"

হীরালাল মনঃসংযোগ সহকারে চিঠি দুখানা পড়িল। বলিল, "বেশ হয়েছে, এখন আমার অদৃষ্ট। এখন তা হ'লে উঠি ভাই—সব গোছগাছ ক'রে নিতে হবে, ভোর-বেলাই বেরুতে হবে কি না!"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এখন উঠবে? তা ওঠ। সন্ধ্যার পর এস, আজ এখানেই থাবে।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "আর কাউকে বলেছ না কি?"

"না, আর কাউকে বলিনি। তুমি কাল চ'লে যাচ্ছ, আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই, তাই দুজনে ব'সে একটু গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। বেশী কিছু আয়োজন নেই, মুর্গী-মাছের ঝোল দিয়ে খানকতক লুচি খাওয়া মাত্র।"

হীরালাল বলিল, "মুর্গী-মাছের ঝোল কি রকম?"

বিপিন বাবু বলিলেন, "এ গল্প আমি কত লোকের কাছে ত করেছি। তুমি শোননি বুঝি? পায়রাগাছির জমীদার—তিনি সম্বন্ধে আমার মামা-শ্বশুর হন—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কলকাতাতেই বাস করেন। আজকাল অনেক বড়লোকেরই যেমন দেখা যায়, মেজাজটা একটু সাহেবী ধরণের। বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে বাবুর্চ্চি আছে—রাতের খানাটা প্রায় ইংরাজী ধরণেরই হয়। সে বার ছেলে-পিলে নিয়ে তিনি দেশে গেছেন। বাড়ীতে বুড়ো মা আছেন—অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও সব আছে। মা জানেন যে, তাঁর ছেলে কলকাতায় বাস ক'রে বিগড়ে গেছে--খুব আচারনিষ্ঠ নয়। তাঁর মহল আলাদা। পৌঁছেই জমীদার মশায় রাত্রিভোজনের জন্যে গোপনে রামপাখীর আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তখন তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, বয়স ৫ বৎসর। শোবার আগে মেয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করতে যাবে। বাপ শিখিয়ে দিলেন, 'দেখ্ খুকী, ঠাকুমা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি দিয়ে ভাত খেলি, ত বলিস্ মাছের ঝোল দিয়ে খেয়েছি।' মেয়ে বল্লে, আচ্ছা। যথাসময়ে মেয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করতে গেল। ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুকী, কি দিয়ে ভাত খেলি?'—খুকী শিক্ষানুসারে বল্লে, 'মাছের ঝোল দিয়ে।' কিন্তু গোল বাধলো বুড়ীর দ্বিতীয় প্রশ্নে—'কি মাছের ঝোল?'—এ কথার উত্তর খুকীকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি;—সুতরাং সে অম্লানবদনে উত্তর করলে, 'মুর্গী-মাছের ঝোল।'-মুর্গী খেয়ে এসে খুকী তাঁর পায়ে হাত দিয়াছিল, খুকী চ'লে গেলে তিনি স্নান ক'রে ফেল্লেন!—সেই অবধি আমার শ্বশুরবাড়ীতে, ফাউল কারিকে সবাই মুর্গী-মাছের ঝোল ব'লে থাকে।"

শুনিয়া হীরালাল হাসিতে লাগিল। বিপিন বাবুই হীরালালকে এবং আরও কয়েকজন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিষিদ্ধ-পক্ষীর মাংসাহারে দীক্ষিত করিয়াছেন। কলিকাতার অনেকেই মনে করেন, তাঁহারাই আলোকপ্রাপ্ত হইয়া 'প্রেজুডিস্' বর্জ্জন করিয়াছেন, পল্লীগ্রামের সকলেই এখনও খাঁটি হিন্দুই আছে—ইহা মনে করা ভুল।

আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর, সন্ধ্যার পরই হাজির হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া হীরালাল উঠিল।

রাত্রিতে আহার করিতে করিতে হীরালাল বলিল, "ওহে, একটা কথা মনে পড়ল। থিয়েটরের কর্ত্তাদের কাছে আমি কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়ালে, তারা হয় ত আমার এ্যাক্‌টিংএর নমুনা দেখতে চাইবে। আমি বলি কি, আবু হোসেনের পোষাকটা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।"

বিপিন বাবু সম্মত হইলেন। এক ডি-এর সাজ-পোষাকের সিন্দুক তাঁহার জিম্মাতেই থাকিত। আদেশ অনুসারে এক জন কর্ম্মচারী সেই পোষাকটি বাহির করিয়া আনিল—লংক্লথের ইজার, আদ্দির পাঞ্জাবী, মখমলের ফতুয়া, মাথায় টুপী ও দিল্লীওয়ালা জুতা জোড়াটি পর্য্যন্ত। আহারান্তে সেগুলি পুঁটুলীতে বাঁধিয়া, হীরালাল বিদায় গ্রহণ করিল।

হীরালালের স্ত্রী সুরবালা, সে রাত্রি ত প্রায় কাঁদিয়াই কাটাইল। হীরালালের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। পাঁচ বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এই প্রথম দীর্ঘ দিনের জন্য দম্পতি-বিচ্ছেদ।

প্রভাতে উঠিয়া অশ্রুমুখী স্ত্রী ও নিদ্রিতা কন্যার মুখ-চুম্বন করিয়া হীরালাল বাহিরে আসিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, মা ও খুড়ীমা দু'জনকে ও মঙ্গল-ঘটকে প্রণাম করিয়া, মাতার আশীর্ব্বাদী দধির তিলক ললাটে ধারণ করিয়া, দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিল।

রেল-ষ্টেশন গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গরুর গাড়ীতে বেলা এগারটায় ষ্টেশনে পৌঁছিয়া হীরালাল শুনিল, কলিকাতায় মহা গণ্ডগোল। দাঙ্গা হইতেছে। শুনিয়া হীরালাল মনে করিল, গতকল্য সংবাদপত্রে সে যাহা পড়িয়া আসিয়াছে, সেই খবরটা শুনিয়াই ইহারা এরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পৌনে বারটায় ট্রেণ ছাড়িল। বেলা দুইটার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিলে হীরালাল দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মে বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিক্রয় হইতেছে—ফিরিওয়ালা

হাঁকিতেছে—"কল্‌কাতায় বিষম কাণ্ড, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা।" --হীরালাল দুইটি পয়সা দিয়া একখানি সংবাদপত্র ক্রয় করিল।

কাগজখানি খুলিয়া ডবল গ্রেট অক্ষরের হেডিংএ—"দাঙ্গার চতুর্থ দিবস—মুসলমানের ছোরায় বহু হিন্দু খুন"—পড়িয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সেই কামরার অন্যান্য আরোহিগণ সকলেই কাগজখানার দিকে ঝুঁকিয়া, মহা ভীতভাবে সংবাদ পাঠ করিতে লাগিল।

হিন্দু সম্পাদিত এই কাগজখানিতে, মুসলমানের ছোরায় কত হিন্দু খুন-জখম হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ছিল; হিন্দুর লাঠিতে কত মুসলমানের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত।

সেই খবরের কাগজ পড়িয়াই, কলিকাতার টিকিটধারী কয়েক জন আরোহী ব্যাণ্ডেলেই নামিয়া পড়িল; বলিল, তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। কেহ বলিল, "আমিও কলকাতা যাচ্ছিলাম, তা আর যাব না, শ্রীরামপুরেই নেমে পড়বো, সেখানে আমার পিস্‌শ্বশুর মোক্তারী করেন।" কেহ বলিল, "কলকাতায় যাব বলেই বেরিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেক দিন থেকে একবার বাবা তারকনাথকে দশন করবার বড় ইচ্ছে ছিল, সেইটিই এ যাত্রায় সেরে নেওয়া যাক। বাবা টেনেছেন বেশ বুঝতে পারছি। সেওড়াফুলিতেই নেমে পড়বো।" ফলে, গাড়ী শ্রীরামপুর অতিক্রম করিতেই হীরালালের কামরা একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল।

হীরালাল মহা ভাবনায় পড়িল। ভাবিল, কি করি? বাড়ীই ফিরে যাব কি?—তার পর সহসা তাহার মনে হইল, হিন্দুরই ত ভয়, মুসলমানের ত বেশী ভয় নাই। আমি ত আবু হোসেন মিঞা—আমার আর ভয় কিসের?—যাই না, কলকাতায় মজাটাই দেখি না!

তখন সে তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া আবু হোসেনের পরিচ্ছদ বাহির করিয়া পরিধান করিল। নিজ শ্মশ্রুতে হাত দিয়া বলিল, "বেঁচে থাক বাপ ছাগলদাড়ী!"

সাড়ে চারিটার সময় ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। হীরালাল ট্রেণ হইতে নামিতেই এক জন মুসলমান যুবক তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "সেলাম আলেকুম্ ভাই সাহেব! আপনার ইস্মশরিফ কি? কোথায় যাবেন আপনি?"

সৌভাগ্যবশতঃ হীরালাল ইস্মশরিফ শব্দের অর্থ অবগত ছিল। বলিল, "আমার নাম আবু মহম্মদ হোসেন। বর্দ্ধমান জিলায় আমার বাড়ী। একটা নকুরী চাকরীর চেষ্টায় কলকাতায় এসেছি। এখন আমার দোস্ত কি রিস্তাদার কেউ নেই। কলুটোলা ষ্ট্রীটে হাজি বক্স সাহেবের মোসাফিরখানা আছে শুনেছি. মুসলমানরা সেখানে বেগর কেরায়ায় এক হপ্তা থাকতে পায়, আমি সেখানেই যাব।"

মুসলমান যুবকটি বলিল, "সেখানে যাবেন না, আমার সঙ্গে আসুন। কলকাতায় এখন ভারি গোলমাল চল্‌ছে, হিন্দুরা মুসলমান দেখলেই মারপিট কর্‌ছে, খুন কর্‌ছে। কোনও মুসলমান ট্রেণ থেকে নামলে, আমরা তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্যে খিলাফতের হুকুমে ষ্টেশনে উপস্থিত আছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"—বলিয়া যুবক, হীরালালের হাত ধরিয়া, মুসলমান-চালিত একখানি ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চরম অভিশাপ

মৃত্যু? সেটা ত জগতের রীতি
মরিবে জনম নিলে,
বিচ্ছেদ শোক হয় সহনীয়
কালের প্রলেপ দিলে।
অর্থ-হীনতা? হলেও ভীষণ
আশা যে ছলনাময়,
পথের ভিক্ষু সুদিনের পানে
দিন গণি' চেয়ে রয়।
রুগ্ন কাতর নিমেষ তরেও
ভুলে যায় রোগ-জ্বালা,
প্রিয় আত্মীয় যদি কভু তার
সেবা করে প্রাণ-ঢালা।
কিন্তু যদি গো জীবনের সাথী
রমণী মুখরা হয়,
নিখিল বিশ্বে তার বাড়া আর
কোন অভিশাপ নয়।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়

অতীত ও বর্ত্তমান

১৩৩২ সাল অতীত হইল, ১৩৩৩ সাল তাহার অনিশ্চিত সুখদুঃখের পশরা লইয়া উপস্থিত হইল। অতীত ও তৎপূর্ব্ব-বৎসর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যে ক্ষতি করিয়া গেল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সার আশুতোষ সরস্বতী, সার আশুতোষ চৌধুরী, দেশবন্ধু দাশ, সার সুরেন্দ্রনাথ, সার কৃষ্ণগোবিন্দ, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—কত নাম করিব? বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া শ্লাঘা করিবার যাহা কিছু, সবই যেন কোন এক অজ্ঞাত কর্ম্মসূত্রের আকুঞ্চন-প্রসারণে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল; বাঙ্গালীর এ অভাব যুগযুগান্তরে পূর্ণ হইবে কি? বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই তাহা বলিতে পারেন। বাত্যা, বন্যা, অন্নকষ্ট, রোগ-শোক, এ সব ত বাঙ্গালীর নিত্য সহচরই হইয়া দাড়াইয়াছে। এ সকলের প্রভাব হইতে বাঙ্গালী কোন বৎসরই অব্যাহতি পায় না; সুতরাং এ সকলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ইহার উপরেও যে ভীষণ শেল বাঙ্গালীর বুকে বাজিয়াছে, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষের প্রভাব বাঙ্গালায় বহুকাল অনুভূত হয় নাই, গত বৎসরে তাহারও সূত্রপাত হইয়াছে। এ সংঘর্ষের ফলে দেশের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত হইল। জাতি মোহে অন্ধ না হইলে এমন করিয়া আত্মঘাতী হয় না। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান এত দিন পরস্পর সদ্ভাবে বসবাস করিয়া আসিয়াছে, আজ জানি না, কোন্ বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে ইহাতেও অন্তরায় উপস্থিত হইল। ১৩৩৩ সালের বর্ষারম্ভে ভ্রাতায় ভ্রাতায় রক্তপাত হইল, উভয়েরই জন্মভূমি সেই রক্তপাতে কলঙ্ক-রেখাঙ্কিত হইল। ইহার অপেক্ষা দুর্ব্বৎসরের আর কি সূত্রপাত হইতে পারে? যে বৎসরের সূত্রপাতে এমন অমঙ্গল, সে বৎসর কি ভাবে অতিবাহিত হইবে, তাহা ভাবিলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই ১৩৩৩ সালে বাঙ্গালার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কে জানে? তবে অমঙ্গল হইতেও মঙ্গল উদ্ভূত হয়। এই স্বেচ্ছাকৃত অমঙ্গলের ফলে প্রকৃত দেশহিতকামী হিন্দু-মুসলমানের চক্ষু ফুটিবে, এমন আশা কি করা যায় না? যাহাতে দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি, সাহিত্যের ক্ষতি, ব্যবসায়ের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি,—তাহাই কি আমাদের বরণীয় হইয়া রহিবে? ধর্ম্মে উদারতা প্রদর্শনে আমরা কবে অভ্যস্ত হইব? প্রকৃত ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই এক, তবে একে দুই কেন? এ শিক্ষা আমরা কবে লাভ করিব? নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে যাহারা জাতিগত বিদ্বেষ-বিষ উদ্গিরণ করে, তাহাদিগকে হিন্দু-মুসলমান কবে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে শিখিবে?

বিকৃত উপদেশ

ধর্ম্ম প্রথমে, তাহার পর দেশ, এ কথা মুসলমান নেতৃবর্গের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের অন্যতম পুরোহিত মওলানা মহম্মদ আলিও কলিকাতার দাঙ্গা-সম্পর্কে এ কথা উত্থাপন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, পরন্তু ধর্ম্মের ব্যাপারে হিন্দুকে ভয়প্রদর্শনও করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা মওলানা সৌকত আলি—যাঁহার বিরাট দেহ ও বিরাট হৃদয়ের কথা এ দেশের সকলেই অবগত আছে—সেই সৌকৎ আলিও হিন্দুকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "কাফের মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু মুসলমান তাহা করে না।" এরূপ অনর্থক ভয়প্রদর্শনে কি লাভ আছে? ধর্ম্মের প্রতি প্রীতি অথবা মরণভীতির প্রতি অপ্রীতি যে কেবল মুসলমানের একচেটিয়া সম্পত্তি, এমন কিছু কথা নাই। ইংরাজ, ফরাসী, জাপ প্রভৃতি 'কাফেরদিগের'ও যে মরণে ভীতি নাই, তাহা কি আলি-ভ্রাতা জানেন না? এই হিন্দুরাই যে বহুক্ষেত্রে 'শির দিয়াছে, তথাপি শের' দেয় নাই, তাহাও কি তাঁহার অবিদিত? হিন্দুর তরবারিহস্তে' রণাঙ্গনে আত্মাহুতি

প্রদান অথবা হিন্দুললনার জহরব্রত পালনের কথা কি আলি ভ্রাতারা কখনও শুনেন নাই ? তবে এই বৃথা শ্লাঘা কেন ?

ধর্ম্ম প্রথমে বটে, কিন্তু হদিসে হজরৎ মহম্মদ এ কথাও বলিয়াছেন,—হুববল ওতন মেনাল ইমান ; অর্থাৎ যাহার স্বদেশ-প্রেম নাই, সে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান নহে। যিনি মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, তিনিই স্বদেশকে এই উচ্চাসন দিয়াছেন, অথচ আজ তাঁহারই ধর্ম্মাবলম্বী দেশনায়কগণের মুখে শুনা যাইতেছে, ধর্ম্ম স্বদেশ অপেক্ষাও বড় ! হজরৎ মহম্মদ ত ধর্ম্ম বা স্বদেশ কাহাকেও ছোটবড় করেন নাই।

প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে যেমন ভালবাসে, স্বদেশকেও তেমনই ভালবাসে। যদিই বা ধরা যায়, ধর্ম্ম স্বদেশ অপেক্ষা বড়, তাহা হইলেও ধর্ম্ম ও দেশকে পৃথক্‌ভাবে উচ্চাসন দিলেই বা ক্ষতি কি ? দেশের কথার—রাষ্ট্রের কথার সহিত ধর্ম্মকে না জড়াইলেই ত হয়। গাজী মুস্তাফা কামালপাশা তুরস্কে তাহাই করিয়াছেন। তিনি খিলাফৎ, সেখ-উল-ইসলাম প্রভৃতিকে রাষ্ট্রশাসনের সহিত সম্পর্কহীন করিয়াছেন। তাহাতে নবীনতেজে বলীয়ান্ তুর্কীর কি ক্ষতি হইয়াছে ? তুর্কী মুসলমান দেশ ; সে দেশেই যখন এমন ব্যাপার সম্ভবপর হয়, তখন এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তাহা কেন সম্ভবপর হইবে না ? হিন্দুরা স্বরাজ বা দেশের মুক্তির সহিত ধর্ম্মকে সংশ্লিষ্ট করিতে চাহে না, মুসলমানও যদি ধর্ম্মকে প্রথম স্থান দিবার পর দেশের উন্নতির কথায় ধর্ম্মকে আনয়ন না করেন, তাহা হইলেই ত বিরোধের মূল দূর হয়।

হিন্দু সকলের ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তাই হিন্দু খিলাফৎ আন্দোলনে কায়মনে মুসলমানের সহায় হইয়াছিল। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এত অল্পকালের মধ্যেই কি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ? হিন্দু এই ভারতকে তাহার একলার দেশ বলিয়া মনে করে না, করিলে মুসলমানেরও আপদে বিপদে বুক দিয়া পড়িত না। উত্তর-বঙ্গের প্লাবনে কাহারা অধিক বিপন্ন হইয়াছিল ? শতকরা ৮০ জনের উপর মুসলমান কি উহাতে বিপন্ন হয় নাই ? মাদারীপুরের বাত্যায় কাহার অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে ? মুসলমানের নহে কি ? এ সকল বিপদে কাহারা অধিক সাহায্য দান করিয়াছে ? এই যে এত বড় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়রূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান, ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টিকল্পে কাহারা অর্থসাহায্য করিয়াছে, ইহার উন্নতির জন্য দান, পদক, পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান কাহারা করিয়াছে ? ইহার সংশ্লিষ্ট স্কুল-কালেজ কাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? হিন্দুদের দ্বারা নহে কি ? অথচ সে সকলের ফলভোগ কি হিন্দু একাই করিতেছে ? তবে ?

তাই বলিতেছি, এই দুঃসময়ে আলিভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের সমাজের পক্ষ হইতে দেশকে সুপরামর্শ দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সহিত হিন্দুরা কোন কালে বিরোধ করিতে চাহে না, বরং পরস্পর সহযোগ দ্বারা দেশের মুক্তিসাধন করিতে চাহে। সে ক্ষেত্রে তাঁহারা যদি হিন্দুকে বৃথা ভয় প্রদর্শন না করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাবস্থাপনে সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতেন। তাঁহারা কথায় কথায় মহাত্মা গন্ধীকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, অথচ সেই গুরুকেই মওলানা মহম্মদ আলি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহেন ! তাঁহারা সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহাদের পূর্ব্ব-ঘোষণার সামঞ্জস্য কোথায় ? হিন্দুকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের 'গুরুকেও' কি ভয় প্রদর্শন করেন নাই ? কেহ কাহাকেও ভয় প্রদর্শনের দ্বারা যে ভারতের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন না, তাহা সুনিশ্চিত।

রাজবন্দীর মুক্তি

শ্রীযুত অনিলবরণ রায় রাজবন্দী ছিলেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সহিত তাঁহাকেও বে-আইনী আইনে আটক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে কিছুদিন পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে মাঝে মাঝে দুই এক জন রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে। সরকার বিনা কারণে ইঁহাদিগকে ধৃত ও আটক করিয়াছিলেন এবং পরে বিনা কারণে মুক্তি দান করিতেছেন। অন্ততঃ কারণ থাকিলেও তাহা সাধারণে প্রকাশ নাই।

সম্প্রতি বাঙ্গালার গভর্ণরের দক্ষিণ হস্ত সার হিউ ষ্টিফেনসন এ বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কৈফিয়তের ইতিহাস সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিলাতের পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় মিঃ পার্টল ও মিঃ জনষ্টনের

প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব আরল উইণ্টার্টন বলেন, "মিঃ রায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, অতঃপর আর তিনি বিভীষিকামূলক বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করিবেন না, বরং ঐ আন্দোলন নষ্ট করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবেন। তাঁহার এই প্রতিশ্রুতিদানের জন্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দফা অভিযোগ আছে, এ কথা তাঁহাকে জানান হয়। তিনি তাহার যে জবাব দেন, দুই জন জজ তাহা বিচার-আলোচনা করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যও পরীক্ষা করেন। ফলে তাঁহারা তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। মিঃ জনষ্টন বলিয়াছেন যে, সরকারের কোনও কর্ম্মচারী স্বীকার করিয়াছেন, মিঃ রায়ের ব্যাপারে ভুল করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে সকল কাগজপত্র পাঠ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, মিঃ রায় আইনভঙ্গ করিয়াছেন।"

এইরূপে একতরফা 'ডিক্রী' দিয়া সহকারী ভারত-সচিব পরমানন্দ ও পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের জনসাধারণ এখনও তাঁহার মুখের কথায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুত অনিলবরণ স্বয়ং 'আসামী', সুতরাং তিনি যে পারেন নাই, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাই সংবাদপত্রে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তিলাভ করেন নাই। ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী য়ুরোপীয় সমাজ ইহাতে বিচলিত হইয়া বাঙ্গালা সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে সরকারের পক্ষে সার হিউ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, "শ্রীযুত অনিলবরণ প্রকৃতই অপরাধী, তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে রীতিমত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। তবে তাঁহার দ্বারা অনিষ্ট হইবার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাহা আর নাই, এ জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যখনই সরকার বুঝিতেছেন, রাজবন্দীদের কাহারও দ্বারা আর অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছেন। এই ভাবেই কার্য্য করা হইতেছে।" এ কথার জবাবে অধ্যাপক অনিলবরণের কেন, কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। আমি যদি প্রকাশ্যে কোন প্রমাণ-প্রয়োগ না করিয়া বলি, সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইতেছে, তাহা হইলে কেহ আমাকে বলাইতে পারে না যে, সূর্য্য বিপরীত দিকে উদয় হইতেছে। সার হিউ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, তাঁহার মুখের কথার মূল্য অনেক, কাযেই অবনতমস্তকে সকলকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। অনিলবরণ নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন না, কোনও প্রতিশ্রুতি দিলেন না, অথচ সার হিউ যখন বলিতেছেন, তিনি অপরাধী, তখন স্বীকার করিতেই হইবে, তিনি অপরাধী!

স্বৈরাচার শাসনের ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই ভাবে আটক ও মুক্তি যে আমলাতন্ত্র সরকারের মরজিমত করা হইয়া থাকে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ আমলাতন্ত্র সরকার বলিয়া থাকেন যে, এ দেশকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকারের স্বরূপ কি—আমলাতন্ত্র সরকারের অভিধানে উহার ব্যাখ্যা কিরূপ, তাহা সরকারের এই সমস্ত স্বেচ্ছামত কার্য্যের ফলেই প্রকাশ পায়। এ সকল ব্যাপারে দেশের ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ এবং মন্ত্রিগণও অন্ধকারে থাকেন। তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কখনও এ সব ব্যবস্থা করা হয় না। প্রকাশ্য বিচারের কথা পাড়িলে ব্যুরোক্রেশী তাহার অদ্ভুত উত্তর যোগাইয়া থাকেন। সে দিন পার্লামেণ্টে মিঃ থার্টলের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিবের সহকারী আরল উইণ্টার্টন বলিয়াছেন, "পাছে সাক্ষীদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রকাশ্য বিচার করা হয় না।" কিন্তু দেশের লোক জানে, এ দেশের বহু রাজদ্রোহের বা বিপ্লবঘটিত মামলায় অনেক সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে, অথচ তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় নাই। শাঁখারিটোলা পোষ্ট আফিসের হত্যাকাণ্ডে অথবা গোপীনাথ সাহার মামলায় সাক্ষীর অভাব হয় নাই। কিন্তু এ যাবৎ সে সকল সাক্ষীর জীবন কি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে? তবে এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে 'লোক ভুলিবে কেন? যদি যথার্থই সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রাজবন্দীরা অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়া মামলা চালান হয় না কেন? তাহা না করিয়া বিনা বিচারে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়

বলিয়াই লোক অসন্তুষ্ট হয়, সরকারের উদ্দেশ্যে সন্দেহ করে। উপেন্দ্রনাথ বা অনিলবরণকে ছাড়িয়া দিবার পর গঙ্গার জল যেমন বহিতেছিল, তেমনই বহিতেছে, কাহারও কোনও ক্ষতি হয় নাই। সরকার বোধ হয়, এত দিনে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উহা সংশোধন করিতেছেন। তবে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজবন্দীকে এখনও আটক করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? এখানেও ত সরকার তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন। ইঁহাদের মত দেশকর্ম্মী মুক্তি পাইলে দেশের ও দশের কত কায করিতে পারেন, দেশকে উহা হইতে বঞ্চিত করিয়া সরকার কি দেশের ক্ষতি করিতেছেন না? যে সকল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া সরকার এই প্রকৃতির ভ্রম-প্রমাদ করিয়া বসেন, উহা যে আদালতে জেরার মুখে টিঁকিতে পারে না, তাহা কি সরকার বুঝেন না? অনেক সময় অপদার্থ পুলিস গোয়েন্দার কথাই বেদবাক্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাতেই যত গোল বাধিয়া থাকে। সরকার কবে এ কথা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন? অনিলবরণের মত শিক্ষিত অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত দেশকর্ম্মীদের যে বিপ্লব ও বোমার সহিত কোনও সংস্রব থাকিতে পারে না, তাহা না বুঝিলে কি সরকার তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতেন? তবে 'প্রেষ্টিজ' যে বড় বালাই!

মিলন

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজ্য দলের মধ্যে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা আপোষ বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী আশ্রমে এক মিলন-বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতের গৃহবিবাদ নূতন নহে। হিন্দু-মুসলমানে, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে, লিবারল এক্‌ষ্ট্রিমিষ্টে বিবাদ ও মতবিরোধ বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী নামধেয় রাজনীতিক দলের মধ্যেও গৃহবিবাদ নূতন নহে। মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের পর 'সনাতন অসহযোগী' ও 'স্বরাজী' নামে চরমপন্থীদিগের মধ্যে দুই দল হইয়া যায়। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও ত্যাগের প্রভাবে মহাত্মার অসহযোগ নীতিও এক শ্রেণীর অসহযোগীর নিকট ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই দল কাউন্সিল প্রবেশের সঙ্কল্পকে অসহযোগনীতির অন্তরায় বলিয়া মনে করেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন, কাউন্সিলের মধ্য দিয়া আমলা-তন্ত্র সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যে অবিচ্ছিন্ন বাধাপ্রদান করাই অসহযোগের চরম দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা গন্ধী কারামুক্তির পর বলিয়াছিলেন, কাউন্সিলের মোহ একবার জাতিকে আচ্ছন্ন করিলে ফল উহার বিষময় হইবে, ক্রমে উহার ফলে অসহযোগ সহযোগে পরিণত হইবে। কিন্তু তাঁহার এই সাবধান-বাণী সে সময়ে গৃহীত হয় নাই। মহাত্মাও কংগ্রেসে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কায় এই নূতন অসহযোগী দলকে সর্ব্ববিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা যত দূর সম্ভব ঐ দলকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। পরে মহাত্মার ভবিষ্যবাণী কত দূর সত্য হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ হইতে জানা যায়। কাউন্সিলের নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে দেশের সকল শক্তি নিয়োজিত হওয়াতে জাতি ও গ্রামগঠনকার্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, দেশকে প্রস্তুত করিবার সংকল্প আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছে; হিন্দু-মুসলমান ও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব নূতন করিয়া দ্বিগুণ শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও স্বার্থলাভের জন্য পরস্পর বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে। ফলে যে আমলাতন্ত্র সরকারকে বিরোধের দ্বারা 'কাবু' করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, সেই সরকার প্রবলতর হইয়াছে এবং আমাদের পরস্পর বিবাদের ফলে আপনার নষ্ট প্রতিপত্তির উদ্ধারসাধন করিয়াছে।

মহাত্মার ভবিষ্যবাণীর সার্থকতা অন্য হিসাবেও প্রতিপন্ন হয়। দেশবন্ধু দাশ দেহত্যাগের পূর্ব্বে সম্মানমূলক সহযোগ করিতে আমলাতন্ত্র সরকারের প্রতি প্রীতির হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে হস্ত নব-বলে বলীয়ান্ সাম্রাজ্য-গর্ব্বে গর্ব্বী আমলাতন্ত্র সরকার গ্রহণ করে নাই। তাঁহার লোকান্তরের পর স্বরাজ্য দলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্কীন কমিটীতে আসন গ্রহণ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ধাপের পর ধাপ উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। কেলকার, আনে, মুঞ্জে প্রমুখ স্বরাজী নেতৃবর্গ তাহার পর Responsive co-operation অথবা 'প্রতিদানমূলক সহযোগ' কথা আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ

তাঁহারা বলেন, সরকার যদি সম্মানমূলক সহযোগ করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাও সরকারের মিনিষ্টারী আদি চাকুরী গ্রহণ করিয়া দেশের কায করিতে সম্মত আছেন। পণ্ডিত মতিলাল ইহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, চাকুরী গ্রহণ করিলে অসহযোগ-নীতি ভঙ্গ করা হইবে। উত্তরে স্বরাজীদের নূতন দল বলেন, তিনি যখন স্কীন কমিটীতে স্থান গ্রহণ করিয়া অসহযোগের মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন, তখন তাঁহারাই বা চাকুরী গ্রহণ করিবেন না কেন? এইরূপে স্বরাজীদের মধ্যেও দলাদলি উপস্থিত হয়, নূতন দল স্বরাজ্য দল পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করেন। মহাত্মার ভবিষ্যবাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়, সহযোগের পর সহযোগ ক্রমশঃ গৃহীত হইতে থাকে।

এই গৃহবিরোধের অবসান করিবার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রমে মিলন-বৈঠক বসে। মহাত্মা গন্ধী নিরপেক্ষ দর্শকরূপে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ বৎসরের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টরূপে তথায় আপোষের বিচার-আলোচনা শুনিবার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বহু প্রতিনিধিও তথায় সমবেত হইয়াছিলেন।

বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর উভয় পক্ষে প্রথমে একটা রফা হয়। এই রফা দুই অংশে বিভক্ত :—

(১) সরকারের নিকট কি প্রকৃতির ও কতটা সহযোগ পাইলে স্বরাজীরা তাহার প্রতিদানে সরকারের প্রতি সহযোগের হস্ত প্রসারণ করিবেন।

(২) এই 'সরকারী' সহযোগ পরিমাণমত হইল কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন কাহারা?

যদি মন্ত্রীরা তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালনের উপযুক্ত ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সরকারী সহযোগের প্রতিদান করা হইবে, ইহা রফায় ঠিক হইয়াছিল। এই ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পরিমাণমত হইয়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের কংগ্রেস সদস্যগণ। পরন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মিঃ জয়াকরকে লইয়া যে কমিটী গঠিত হইবে, সেই কমিটী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করিলে পর ঐ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইবে। রফায় ইহাও ঠিক হয়।

এই রফায় উভয় দলই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, উভয় দলই বলিয়াছিলেন, স্ব স্ব পক্ষের 'মান বজায়' হইয়াছে। মিঃ কেলকার বলিয়াছিলেন,—"আমরা যে যাত্রায় বাহির হইয়াছি, এই রফায় ফলে তাহার অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়াছি। কংগ্রেস যে শীঘ্রই প্রতিদানমূলক সহযোগনীতি গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ডাক্তার মুঞ্জে বলিয়াছিলেন, "এই রফা উভয় পক্ষেরই সম্মানজনক ও সন্তোষজনক হইয়াছে।" পণ্ডিত মতিলাল বলিয়াছিলেন, "এই রফায় আমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছিলেন, "এই সিদ্ধান্তে আমি পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।" বৈঠকে সমবেত প্রতিনিধিগণ ইহাতে পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার ফলে কংগ্রেসে নবজীবনীশক্তি সঞ্চারের এবং শীঘ্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারলাভের আশা করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু রফা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পণ্ডিত মতিলাল চাকুরী গ্রহণের রফায় সম্মত হয়েন নাই।

কিন্তু যদিই বা রফা পাকা হইত, তাহা হইলেও উভয় দলের মিলনে কি যথার্থই এমন নবজীবনীশক্তির সঞ্চার হইত, যাহার ফলে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অচিরে আমাদের করতলগত হইত? দেশবন্ধু দাশের নেতৃত্বাধীনে যখন স্বরাজ্য দল যথার্থই সজীব ছিল, কংগ্রেসের যখন কতকটা জীবনীশক্তি ছিল, তখনই কি প্রবল আমলাতন্ত্র সরকারের হৃদয়ের ভাবপরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল? বরং স্বরাজ্য দলের দ্বারা দ্বৈতশাসনের অবসান হইলে সরকার অম্লানবদনে পূর্ণোৎসাহে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নাগপুরেও বাঙ্গালার অবস্থা হইয়াছে। পরন্তু বাঙ্গালায় আরও এক উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে,—হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ, উহার ফল আমরা বর্ত্তমানে সকলেই ভোগ করিতেছি।

এখন রফার সর্ত্ত দুইটি আলোচনা করা যাউক। রফার প্রথম সর্ত্তের প্রকৃত মর্ম্ম কি? উহা কি কুহেলিকাচ্ছন্ন নহে? এই সর্ত্ত যদি স্বরাজ্য দল মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, তাঁহারা সংস্কার আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন? না হইলে তাঁহারা সরকারের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন কিরূপে? এ কথাটা তাঁহাদের খোলসা করিয়া বলা কর্ত্তব্য ছিল। সত্য বটে,

তাঁহারা বিনা সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু তাহা হইলেও যখন তাঁহারা এই সংস্কার আইনের সৃষ্ট মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত, তখন বুঝা যায়, তাঁহারা বর্ত্তমান সংস্কার আইন মানিয়া লইয়াছেন। তবে এত দিন সংস্কার আইনের বিপক্ষে অসহযোগ করিয়া বৃথা সময় অপব্যয় করিবার কি প্রয়োজন ছিল? গোড়ায় উহা করিলে ত এত ধরপাকড়, জেল, আটক হইত না। এরূপে শক্তিক্ষয় করায় কি ফললাভ হইয়াছে? কংগ্রেস প্রথমাবধি বহুবারই এই সংস্কার আইন বিফল করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের ছাপ লইয়া কিরূপে পূর্ব্বসংকল্প প্রত্যাহার করিবেন? ইহাতে তাঁহাদের মূল নীতি কিরূপে অক্ষুণ্ণ রহিতে পারে? দ্বিতীয় সর্ত্তে কংগ্রেসের দায়িত্ব মাত্র দুই ব্যক্তির স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যদি প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের কংগ্রেস সদস্যরা সরকারের সহযোগের প্রস্তাব যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহা সমীচীন কি না, সিদ্ধান্ত করিবেন পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীযুক্ত জয়াকর। ইহা কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল? এই ভাবেই কি জনমতের সম্মান রক্ষিত হইবে? অতঃপর কংগ্রেসের কার্য্য কি এই ভাবেই চলিবে?

যাহাই হউক, স্বরাজ্য দল যে ক্রমে সহযোগের পক্ষে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আজ না হউক, দুই দিন পরে যে কংগ্রেসে সহযোগ মন্ত্র গৃহীত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস এই সকল ব্যাপারে অনুসূচিত হইতেছে। কাউন্সিল কামনা যে ক্রমে সহযোগের পথে কংগ্রেসকে লইয়া যাইবে, তাহা মহাত্মা গন্ধী বহু পূর্ব্বেই ভবিষ্যবাণী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আশার সুবাতাস

প্রবাসী ভারতবাসীদিগের প্রতি দক্ষিণ-আফরিকার য়ুরোপীয়রা কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিছু দিন হইতে তাঁহাদের প্ররোচনায় য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যে কোণ-ঠেসা আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। আইন পাশ হইবার খুবই সম্ভাবনা হইয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট এই আইন আপাততঃ বিধিবদ্ধ করিবার সংকল্প হইতে নিরস্ত হইয়াছেন। সিমলা শৈল ও দক্ষিণ-আফরিকা হইতে একই সময়ে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধানার্থ য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী এক আপোষ-বৈঠকে বসিতে সম্মত হইয়াছেন। বৈঠক' এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বসিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিতই আশার কথা। এত দিন এসিয়াবাসীর বিরুদ্ধে কোণ-ঠেসা আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ-আফরিকার য়ুরোপীয় সমাজ ও গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপোষের কথায় আদৌ কর্ণপাত করিতে চাহেন নাই। এমন কি, বিশিষ্ট হৃদয়বান্ য়ুরোপীয় পাদরীরাও বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার অধিকার দক্ষিণ-আফরিকার য়ুরোপীয় সমাজেরই আছে, অন্য কাহারও নাই, স্বয়ং বিলাতের সরকারেরও নাই; দক্ষিণ-আফরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যবস্থা করিবার দক্ষিণ-আফরিকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অন্য কেহ সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, করিতে আসিলে দক্ষিণ-আফরিকা সে কথায় কর্ণপাত করিবে না। কেহ কেহ কথা তুলিয়াছিলেন যে, যখন দক্ষিণ-আফরিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত এবং যখন বৃটেনের নৌশক্তি দক্ষিণ-আফরিকাকে আশ্রয় প্রদান ও রক্ষা করিতেছে, তখন বৃটিশ ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণ-আফরিকার আইন ব্যবস্থা করা য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু দক্ষিণ-আফরিকা এ যুক্তিও মানিতে চাহেন নাই, অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ-আফরিকা স্বায়ত্তশাসিত দেশ, সে নিজের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে কাহারও কথা শুনিতে বাধ্য নহে। বৈদেশিক যুদ্ধ বা শান্তির ব্যাপারে দক্ষিণ-আফরিকা বৃটেনের কথা শুনিতে বাধ্য বটে, কিন্তু নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে নহে।

এ অবস্থায় আপোষ-বৈঠকে সম্মত হওয়া এবং আইন স্থগিত রাখা কতকটা আশার কথা বটে। অবশ্য য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এমন একটা সর্ত্ত রাখিয়াছেন, যাহাতে এই আশার মূলে কিছু 'নিরাশার' কথা আছে বলিয়া মনে

হয়। তাঁহারা ঘোষণায় এটুকুও বলিয়া দিয়াছেন যে, "যে আপোষ ব্যবস্থার ন্যায় ও আইনসঙ্গত উপায়ে পাশ্চাত্য আচারব্যবহারানুযায়ী জীবনযাত্রা ক্ষুণ্ণ বা ব্যথিত হয়, সে আপোষ ব্যবস্থা দক্ষিণ-আফরিকার জনমত (য়ুরোপীয়) সন্তোষ সহকারে অনুমোদন করিবেন না।" অর্থাৎ ব্যবস্থা এমন ভাবে করা চাই, যাহাতে য়ুরোপীয় প্রবাসীরা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাদের 'উচ্চাদর্শের' জীবনযাত্রা যেন 'নিম্নাদর্শের' ভারতীয় জীবনযাত্রার সংস্রবে আসিয়া অপবিত্র না হয়।

এই কথাটায় নিরাশার আভাস আছে, এমন কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। ভারতীয় প্রবাসীরা স্বল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে বলিয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় তাহারা য়ুরোপীয়দিগের উপরে জয় লাভ করিয়াছে। তাহারা পানাসক্ত নহে, অথচ য়ুরোপীয়দিগের পানদোষ ও দ্যূতক্রীড়াসক্তির দোষ আছে বলিয়া তাহারা ভারতীয়দিগকে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এইখানেই যত গোল। এই জন্যই কোণঠেসা আইনের প্রয়োজন। সেই প্রতিযোগিতার 'জড়' মারিবার চেষ্টায় যে এই সর্ত্তের প্রস্তাব পূর্ব্বাহ্ণে গাহিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং আপোষের প্রস্তাবরূপ বিশুদ্ধ দুগ্ধে যে এক ফোঁটাও গোমূত্র পতিত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

কিন্তু তাহা হইলেও ঘোষণা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী দক্ষিণ-আফরিকার ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি এক সময়ে সেখানে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার অতুলনীয় প্রভাব আজিও তথায় অনুভূত হয়। তিনিই বলিতেছেন, 'আপোষ-বৈঠকের প্রস্তাব আশাজনক'। এই যে অবস্থা উপনীত হইল, ইহার মূলে ভারতীয়গণের প্রবল আন্দোলন নিহিত আছে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলন ভারতীয় সংবাদপত্রে, কাউন্সিল অফ ষ্টেটে, এসেম্ব্লিতে অনুক্ষণ জাগাইয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দক্ষিণ-আফরিকায় (পূর্ব্ব-আফরিকার কংগ্রেসে নেতৃত্ব করিবার পর) যে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন,—যে ভাবে সেখানকার বড় বড় রাজপুরুষকে যুক্তিতর্কের দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, মহামতি এণ্ড্রুজ যে ভাবে নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখানে শ্বেতাঙ্গ সমাজকে বুঝাইয়া আসিতেছেন এবং বলিতেছেন,—strike but hear me, তাহাতেও যে শুভ ফল ফলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড রেডিংয়ের সরকার ভারতে আর কিছু করিতে না পারুক, ভারতীয়গণের অবিশ্রান্ত আন্দোলনের ফলে যে, দক্ষিণ-আফরিকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানে সজাগ হইয়াছিল এবং ফলে তথায় ডেপুটেশান প্রেরণ করিয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তাহাতেও অনেকটা কায হইয়াছে। যাহা হউক, এই সমস্ত যোগাযোগের ফলে এখন ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ কতকটা প্রশস্ত হইয়াছে।

আশার সুবাতাস যে বহিতেছে, তাহা এই ঘোষণার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছিল। "নাটাল এক্সপ্রেস" নামক নাটালের য়ুরোপীয় সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় প্রবাসীদিগের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। এসিয়াটিক বিলে যে ভেদনীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ভারতবাসীরা যদি ভারতীয় না হইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা হইত না। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষকে নাটালের উন্নতির জন্য আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে। তাহাদের বংশধররা এখন নাটালকে তাহাদের দেশ বলিয়া জানে। তাহারা যদি ভারতীয়ের সন্তান না হইত, তাহা হইলে তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বাধ্য করিয়া স্কুলে দেওয়া হইত, তাহাদের বাসগৃহের উন্নতিবিধান করা হইত এবং দৃষ্টান্ত ও উৎসাহ দ্বারা তাহাদিগকে বর্ত্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উত্তোলন করিবার চেষ্টা হইত। প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এ দেশে আনা হইয়াছে। এখন কি শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থসাধনের জন্য ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক অবনতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে হইবে? সুতরাং য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টের ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ে আপোষে আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতের সহিত বন্ধুতা করা নাটালের পক্ষে লাভজনক, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নাটালকে প্রাচ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবেই।

কেপ কলোনির 'কেপ টাইমস' পত্রও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্যা নাটালের; নাটাল

যদি বিল না চাহে, তাহা হইলে কেপ কলোনিও চাহে না। নাটালের ও কেপ কলোনির সকল লোক এই বিলের সমর্থন করে, এ ধারণা ভ্রান্ত। সুতরাং জনমতের মুখ চাহিয়া সিলেক্ট কমিটী এ সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করিতে পারেন। এখনও সময় আছে। ইহার পর একবার বিল বিধিবদ্ধ হইলে আর উপায় থাকিবে না।

যাহা হউক, নানা কারণে,—বিশেষতঃ মহামতি এণ্ড্রুজের অক্লান্ত প্রচারকার্য্যের দ্বারা যে দক্ষিণ-আফরিকার শ্বেতাঙ্গদিগের মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে,—'ধনুকভাঙ্গা' পণ নড়িয়াছে, ইহাও কতকটা সুরাহার কথা। এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি? সুবাতাস বহিতেছে, এ বাতাসের সুযোগ ভারতবাসীর হেলায় হারান কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এ সময়ে সকল দলের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর ভারতীয়েরই একযোগে এই অনুকূল বাতাসে পাইল তুলিয়া কার্য্যসাগরে পাড়ি দেওয়া কর্ত্তব্য। এ সময়ে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া সকলের একযোগে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইবে? এ অভাগাদেশে যাহা কখনও সম্ভব হয় নাই, তাহা এ সময়েও হইবার আশা নাই। আমরা এখন যে পরস্পর রক্তপাতের দ্বারা পরের গোলামীর আবহাওয়ায় কে বড় কে ছোট মীমাংসা করিয়া লইতেই ব্যস্ত!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

তেত্রিশের ত্রাস

হাতে ধ'রে খাঁড়া ঢাল, আসিল তেত্রিশ সাল,
কি করাল জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!
নগরে লাগিল দ্বন্দ্ব, বত্রিশে বিদায় বন্ধ,
রঙ্গের আনন্দগন্ধ পেলে না শঙ্কর॥

রাজপথে বাজে ঢোল, তাতেই বাধিল গোল,
কোলাকুলি ফেলে হ'লো গালাগালি সুরু।
হিন্দু কি মুসলমান, ভুলিয়া আসল মান,
বিবাদ বাধায়ে করে অপরাধ গুরু॥

পরস্পরে লাঠালাঠি, পরস্পরে কাটাকাটি,
গলিতে গলিতে ছোরা, নররক্ত-পাত।
ভাস্করে উপেক্ষা ক'রে তস্কর অপেক্ষা করে,
জুটিয়া লুঠিতে কুঠি বাধাতে উৎপাত॥

দোকানী দোকান ফেলে, পালায় চড়িয়া রেলে,
বাজারে বেসাতী নাই, পুরী অন্ধকার।
রাস্তায় না চলে গাড়ী, গৃহস্থ ছেড়েছে বাড়ী,—
কেহ বা কামায়ে দাড়ী টিকি করে সার॥

বেশ ছেড়ে দিয়ে হাল, ব'সে আছে মুন্সীপাল,
রাস্তায় জঞ্জাল জড় নাহি হয় সাফ।
ভুলে ভদ্র অভিমান, ব্যাধির বিষের বাণ
শিক্ষিত যুবকদল সরায় সে পাপ॥

শান্ত পান্থ নাহি পথে, লোক নাই আদালতে
চলে শূন্য ট্রাম্ বাস্ কেরাণীবিহীন।
বিদ্যালয়ে বন্ধ শিক্ষা, দোরে দোরে নাহি ভিক্ষা
বৈদ্যের প্রতীক্ষা মিথ্যা করে রোগী ক্ষীণ॥

বরাদ্দ চৌদ্দটি মুদ্রা, ত্যজেছে আহার নিদ্রা,
আর্দ্রচক্ষু ক্ষুদ্রজীবী পাহারালা দল।
লম্বা লম্বা লাঠী কাঁধে, ছুটে যেতে পায়ে বাধে,
গোরা চৌকীদার টেপে পিস্তলের কল॥

গুর্খা গোরা কেল্লা ছাড়া, মোড়ে মোড়ে হ'লো খাড়া,
নাড়োয়ারী পাড়া দেয় ভাঁড়ার খুলিয়া।
যমের যমজ যান, ভরা তায় অগ্নিবাণ,
উপরে রঙ্গীন মুখ সঙ্গীন তুলিয়া॥

হেথা হোথা দমকল, পলে ঢালে নলে জল,
অনলে জ্বালায় ঘর যেথা গুণ্ডাগণ।
নির্জ্জন গলির বাঁকে, গেলে কেউ টাকা ট্যাঁকে,
ছোরাছুরি-ধারে তা'র নিশ্চয় মরণ॥

প'ড়ে আছে নাহি সেন্স, তুলে ল'য়ে এম্বুলেন্স,
বাঁচাবার চ্যান্সে চলে রক্ত লালে লাল।
শ্মশান শোণিতে কাদা, মর্গেতে মড়ার গাদা,
হাত মাথা বুক বাঁধা ভরে হাঁস্পাতাল॥

মরি কি ঈশ্বর-ভক্তি, ভায়ে ভায়ে রক্তারক্তি,
বেহেস্তে কি বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হ'লে।
খুসী খোদা গদাধর, দেখে সৃষ্টি করা নর,
অমর হয়েছে প'রে ভ্রাতৃ-মুণ্ড গলে;—
অশান্তি এনেছে ভবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ব'লে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পুরস্কার

১

চলিত কথায় যাহাকে বলে "ডাকাবুকো"—অরুণা ছিল সেই দলের মেয়ে। সে কাহাকেও ভয় করিয়া কোন কথা বলিত না বা বলিতে ইতস্ততঃ করিত না; ভুতের গল্প শুনিলে সে হাসিত; এটা ছুঁইতে নাই—ওটা ছুঁইতে নাই, শুনিলে তাহার সেগুলা ছুঁইবার জন্য আগ্রহ বাড়িয়া যাইত। তাই যখন শিশিরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল, তখন তাহার দাদামণি বলিয়াছিলেন,—"যেমন হাঁড়ি তেমনই সরা।" কিন্তু তিনি শিশিরের সম্বন্ধে যে ধারণা লইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, সেইটাই ভুল। শিশিরের দেহে যেমন অসাধারণ বল ছিল—মনে তদপেক্ষাও অধিক সংযম ছিল। যখন তাহার বিবাহ হয়, তখন তাহার শারীরিক বলের খ্যাতি তাহার বিদ্যার খ্যাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল—ভাল করিয়াই করিয়াছিল; কিন্তু ফুটবল খেলায়, হাঁটার প্রতিযোগিতায়, সন্তরণে—কেহ তাহাকে পরাভূত করিতে পারিত না। ফুটবল খেলার মাঠেই তাহার শারীরিক বলের খ্যাতি প্রথম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে দিন সে খেলিতে যায় নাই—গিয়াছিল, খেলা দেখিতে। খেলা হইতেছিল এক দল ভারতবাসীতে আর এক দল গোরায়। দুই পক্ষেই দর্শক অনেক—কলিকাতার গড়ের মাঠের একটা অংশ কালা ও ধলা দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল। খেলায় সে দিন ভারতীয় দলেরই জয় হয়। কালার কাছে পরাভূত ধলা খেলোয়াড়রা যত না লজ্জিত হইয়াছিল—ধলা দর্শকরা তত লজ্জা অনুভব করিয়াছিল। পরাজয়টা তাহারা সহ্য করিয়াছিল—কিন্তু ভারতীয় দলের বিজয়ে বাঙ্গালী দর্শকদিগের উৎকট আনন্দচীৎকারে তাহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী দর্শকরা কেহ বা ছাতা তুলিয়া, কেহ বা রুমাল উড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে। গোরাদের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ হয়। গোরারা মারিতে আরম্ভ করিলে যখন বাঙ্গালী দর্শকরা কেহ ছাতা ফেলিয়া, কেহ বর্ষাতি হারাইয়া, কেহ জুতা অবধি ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন গোরারা প্রহারের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল। ঠিক সেই সময় শিশির তাহাদিগকে আক্রমণ করিল—তাহার ঘুসিতে দুই তিনটা গোরার নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, কয় জনের ঠোঁট কাটিয়া গেল—তাহারা বুঝিল—এ "যেমন বুনো ওল, তেমনই বাঘা তেঁতুল।" সাহসটা সংক্রামক। শিশির গোরাদিগকে আক্রমণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আরও কয় জন বাঙ্গালী যুবক তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইল। গোরারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তখন অবশিষ্ট বাঙ্গালী যুবকরা "হিপ! হিপ!"—বলিতে না বলিতে শিশির ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "লজ্জা করে না—চীৎকার কর্ত্তে! এতক্ষণ সব কোথায় ছিলে?"

সেই ঘটনাটা অনেকেই জানিয়াছিল—কাযেই অরুণার ভ্রাতা—শিশিরের সতীর্থ শৈলেন্দ্রও জানিয়াছিল। শিশির ও শৈলেন যেমন সতীর্থ ছিল, শিশিরের ভগিনী ইলা ও অরুণা তেমনই এক মেয়ে স্কুলে পড়িত। দুই পরিবারে জানাশুনাও হইয়া গিয়াছিল—বাসও দুই পরিবারের একই পল্লীতে—তবে খুব কাছাকাছি নহে। বিবাহের সম্বন্ধটার জন্যও ঘটক-ঘটকীর অপেক্ষা রাখিতে হয় নাই। এক পক্ষে যেমন শৈলেন, আর এক পক্ষে ইলা তেমনই শিশিরের ও অরুণার বিবাহের সম্বন্ধ আনিয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল—সম্বন্ধ ভাল; কেন না—শিশির যেমন বিদ্যা ও বলে বিখ্যাত ছিল, অরুণা তেমনই রূপের ও সপ্রতিভতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ঘর জানা—উভয় পক্ষেই।

কথা ছিল, শিশির উকীল হইয়া বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে—তখন অরুণার সপ্রতিভ ভাবটা তাহাকে ভালরূপ মানাইবে; কারণ, লজ্জায় জড়সড় বেনারসীর পুটুলী মেয়েরা "বিলাত ফেরৎদিগের" মনের মত হয় না। আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়াই অরুণাকে বিবাহের পরই পর্দ্দানশিন করা হয় নাই—সে জুতা পায়ে দিয়া, ঘোমটা না টানিয়া স্কুলে যাইত। শিশিরের মা সেটা যে খুব পসন্দ করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু শিশিরের দাদা বলিতেন,—"বৌমাকে ত আর একেবারে কোণের বউ হয়ে থাকলে চলবে না!" "একেবারে কোণের বউ" লইয়া যে ভোগ ভুগিতে হয়, তাহা তাঁহার খুবই জানা ছিল। তাঁহার স্ত্রীর ভূতের ভয়ে রাত্রিতে তাঁহার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে মা'কে বৌ'র কাছে জাগিয়া—তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। রাত্রিকালে ঘরের কোণে টিকটিকি ডাকিলে তিনি চোরের ভয়ে ভীত হইতেন।

২

কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, সব সময়ে যে তাহাই হয়, তাহাও নহে। শিশির ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই অসহযোগ আন্দোলন দেশের উপর দামোদরের বন্যার মত আসিয়া পড়িল—আর তাহাতে শিশিরের সব সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। সে ওকালতী ত্যাগ করিল এবং স্ত্রীকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করাইল।

ফলে অনেকগুলা অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিল। দাদা শিশিরের উপর বিরক্ত হইলেন। ভাইটিকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন; তাঁহার আশা ও ইচ্ছা ছিল, সে ব্যারিষ্টার হয়। নিজের বিলাতে যাওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার মনে বরাবরই আক্ষেপ ছিল এবং বিলাতে না যাইয়া যতটা "সাহেব" হওয়া সম্ভব, তিনি এটর্ণী হইয়া ততটা "সাহেব" হইয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। তাহার পর শিশির যখন খদ্দর-পরা যুবকদিগকে লইয়া কুস্তী ও লাঠিখেলার আড্ডা করিল, তখন তিনি ভয়ও পাইলেন এবং সে ভয় যে সকারণ, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া এক দিন পুলিসের লোক আসিয়া আকড়ার যুবকদিগের নামধাম লিখিয়া লইয়া গেল। পুলিসের এই দৃষ্টি খর রবিকরে ডোবার জলের মত যুবকদিগের উৎসাহ যেন শোষণ করিয়া লইল। তখন লোকের অভাবে শিশিরকে আকড়া তুলিয়া দিতে হইল।

মাও বিরক্ত হইলেন। অরুণা লজ্জাশীলা বধূটি ছিল না। তাহার সেই স্বাধীন ভাবটি মা যে সহ্য করিয়াছিলেন, সে কেবল—সে পরে "মেম সাহেব" হইবে বলিয়া। এখন যখন সে সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন তিনি অরুণাকে "আর পাঁচ বাড়ীর" বৌ'র মত করিতে যাইয়া দেখিলেন—পাকা কঞ্চী বাঁকান যায় না। সময় সময় শাশুড়ী-বধূতে একটু একটু কথাকাটাকাটিও হইত।

শাশুড়ীর উপর অরুণার বিরক্তি প্রবল হইয়া স্বামীর উপর পড়িয়াছিল। শিশির নিবিষ্টচিত্তে—ধর্ম্মাচরণের মত ভাবে চরকায় সূতা কাটিত বলিয়াই সে মিহি বিলাতী সাড়ী ও বিলাতী ছিটের জামা ছাড়িয়া খদ্দর পরিতে অসম্মত হইল। শিশির বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইল। কিন্তু সে মহাত্মা গন্ধীর 'Young India' বেদ করিয়াছিল; তাহার উপদেশের সহিত তাহার মনের মিল হইত—কারণ, সে স্বভাবতঃ সংযত—মহাত্মাজীরও উপদেশ, সংযত হও। সে কাহাকেও জিদ করিয়া স্বমতে আনিতে চাহিত না। তাহার এই যে অতিমাত্র সংযম, ইহাই যেন অরুণাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। মা যদি অরুণাকে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করিতেন, তবুও সে কাহাকেও কিছু বলিত না। মা মনে করিতেন—সে স্ত্রীর পক্ষ লইয়াই তাঁহার অপমান করিল, কেন না, সে স্ত্রীকে তিরস্কার করিল না; অরুণা মনে করিত, সে মা'র অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকেই অপমানিত করিল। তরুণীর মনে যখন এইরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়, তখন তাহা বাড়িয়া চলিতে বিলম্ব হয় না। অরুণার তাহাই হইয়াছিল। সে মনে করিত, পুরুষমানুষ যদি সবল, তেজস্বী না হয়—তবে সেই "মেয়েমুখো" লোককে শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু বুঝিত না বলের ও তেজের আতিশয্যই সংযম পুষ্ট করিতে পারে। স্বামিস্ত্রীতে এইরূপ মনোভাববৈষম্যে উভয়েরই জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছিল। সময় সময় এমনও হইত যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত মাসের পর মাস উভয়ে বাক্যালাপও হইত না—যে যাহার মনে বৈশাখের অপরাহ্ণের

গুমোটের মত অসন্তোষ লইয়া কাটাইয়া দিত। অরুণা তবুও সময় সময় তাহার মনের ব্যথা প্রকাশ করিতে পারিত এবং প্রকাশ করিয়া ভগিনীদিগের নিকট হইতে আন্তরিক ও ভ্রাতৃবধূদিগের নিকট হইতে মৌখিক সহানুভূতি লাভ করিত—শিশির কোন্ দিন কোনরূপে তাহার মনের ব্যথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিত না,—পরন্তু তাহার ভালবাসা তাহাকে অরুণার দোষ যত ছোট করিয়া দেখাইত, গুণ তত বড় করিয়া তুলিত। সে মনে করিত - হয় ত উভয়ের প্রকৃতিতে এমন একটা বৈষম্য আছে যে, কিছুতেই উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে পারে না; আর স্ত্রীলোক স্বামীর কাছে যাহা পাইবে আশা করে—অরুণা তাহা পায় নাই বলিয়াই তাহার হৃদয় অরুণার জন্য প্রেম-সঞ্জাত সহানুভূতিতে সিক্ত হইয়া উঠিত এবং সে অরুণার কোন কাযের প্রতিবাদ করিতে চাহিত না। সেই জন্যই স্ত্রীর কাছে অরুণার অভিযোগ শুনিয়া শিশিরের সঙ্গে অরুণার প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে তাহার মুখে অরুণার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দাবাদ কখনও শুনিতে না পাইয়া শৈলেন বিস্মিত হইত।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর আবহাওয়া যে তাহার পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাহা শিশির বুঝিতে পারিয়াছিল এবং অরুণার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সে তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতেও পারিয়াছিল। তাই শ্বশুরবাড়ীতে তাহার গতায়াতও কমিয়া গিয়াছিল—বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে বা জামাই ষষ্ঠীতে নিমন্ত্রণে যাওয়াটাই নিশ্চিত ছিল, আর সব অনিশ্চিত।

৩

এইভাবে কাল কাটিতে লাগিল। অসুখের ও অশান্তির কাল—বড় দীর্ঘ। আর যত দিন যাইতে লাগিল, শিশিরের উদ্যম, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি যেন ততই ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। দারুণ অবসাদই তাহার কারণ। এই অবসাদ দুই কারণে উৎপন্ন হইয়াছিল ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। প্রথম দাম্পত্য-জীবনে হতাশা; দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি। অরুণা তাহার নিকট যাহা পাইবে আশা করিয়াছিল, তাহা পায় নাই বলিয়া অরুণার প্রতি তাহার যে অনুকম্পা, তাহার মূলে তাহার প্রগাঢ় প্রেমই ছিল। সেই প্রেমই অরুণার প্রতি তাহাকে বিরূপ বা বিরক্ত হইতে দেয় নাই এবং সেই প্রেমই নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত, বোধ হয়, অরুণার দোষ নাই। কিন্তু অরুণার ব্যবহারে তাহার মনে যে দারুণ ব্যথা বাজিত—তাহার বুকে যে চিতানল জ্বলিত, তাহা সে যুক্তিতর্ক দ্বারা নিবারিত বা নির্ব্বাপিত করিতে পারিত না। সুস্থ ও সবল পুরুষের স্বাভাবিক প্রেম স্ফূর্ত্ত হইতে না পারিলে পুষ্পমধ্যগত কীটের মত তাহার সার নষ্ট করিয়া ফেলে। শিশিরের তাহাই হইতেছিল।

তাহার অবসাদের দ্বিতীয় কারণ— অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি। যে উৎসাহ লইয়া সে অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, সে উৎসাহ সে আর অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছিল না। অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর ঘটনায় কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, দেশ এখনও অহিংস অসহযোগের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। তাহার দার্শনিকোচিত মনোবৃত্তি যতই বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হইত, ততই সে মনে করিত, অহিংস অসহযোগের স্বর্ণে শ্যামিকা মিশিতেছে। বিদেশী পণ্যবর্জ্জনে তাহার সঙ্কল্প অবিচলিতই ছিল; বিদেশী বস্ত্র সে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সভা করিয়া সোৎসাহে বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করার মধ্যে সে হিংসার পরিচয় পাইত। অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতঃ যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন যে দলে দলে যুবক ও বালক খদ্দর বিক্রয়ের ছলে আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে যাইতেছিল, তাহাও সে সমর্থন করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, যে সব যুবক ও বালক এইরূপে কারাবরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে হয় ত অর্দ্ধাংশ অহিংস অসহযোগনীতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—কেবল হুজুগে পড়িয়া, কেবল সংক্রামক উৎসাহচালিত হইয়া কারাবরণ করিতেছিল।

তাহার পর গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে নেতৃগণের মধ্যে কয় জনের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইল। গঠনকার্য্যে আর কংগ্রেসের অখণ্ড মনোযোগ রহিল না। পৃথিবীতে কখন যেরূপ বিশুদ্ধ ও সাফল্যসম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলন হয় নাই, তাহা ভারতেই সফল হইবে মনে করিয়া যাহাদের অনাবিল হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার এইরূপ পরিণতিতে তাহাদের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

এই দ্বিবিধ কারণোদ্ভূত অবসাদে শিশির যত জড়ভাবাপন্ন হইতেছিল, তাহার প্রতি সকলের -বিশেষ অরুণার বিরক্তি তত প্রবল হইতেছিল। বাস্তবিক অরুণার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্বামিস্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে যেন অতি দূর সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছিল। স্বামী ও স্ত্রী—অত ঘনিষ্ঠতা আর কোন সম্বন্ধে হয় না—বুকে ধরিয়াও মনে হয়, উভয়ের মধ্যে বুঝি একটু ব্যবধান রহিয়া গেল; কিন্তু উভয়ে যেন উভয়ের কেহই নহে। এই ভাবটা অরুণাই সযত্নে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল এবং সে যে তাহা করিতে পারিয়াছে, তাহাই মনে করিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিত। সে যে বল্মীক-স্তূপ রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল, তাহা যে অপ্রত্যাশিত ঘটনার তরঙ্গাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে পারে, তাহা সে বুঝিতে চাহিত না—বুঝিতে পারিতও না।

এইরূপে যখন আত্মীয়-স্বজন সকলেই শিশিরের উপর বিরক্ত ও বিরূপ—তখন কেবল এক জন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই, বরং বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সে তাহার ভগিনী—ইলা। ইলার স্বামী নীরেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে যেমন অধ্যাপক ছিলেন—ব্যবহারেও তেমনই অধ্যাপক ছিলেন। মাছ যেমন জলে ডুবিয়া থাকে, তিনি তেমনই বিদ্যায় ডুবিয়া থাকিতেন। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার অজ্ঞতা যেমন অসাধারণ ছিল, তাঁহার প্রকৃতিতে সরলতা তেমনই সপ্রকাশ ছিল। তিনি শিশুরই মত সরল ও শিশুরই মত পরের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার জামায় বোতাম আছে কি না, দেখা হইতে ছেলের অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকান পর্য্যন্ত সবই ইলাকে করিতে হইত। এ জন্য ইলা যদি রাগের ভান করিত, তবে তিনি এমনই হাসিতেন যে, ইলাও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি বলিতেন, "যা'র যেটা ত্রুটি, তা'র সেটা স্বীকার করতে লজ্জা অনুভব করবার কোন কারণ নেই। ও সব আমি পারিনে। মনু মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন, তাহাদিগকে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করেন। আমার সম্বন্ধে তেমনই বলা যেতে পারে—আমাকে বাল্যে রেখেছেন মা আর মাসীমা, তা'র পর থেকে রক্ষা করছ তুমি।" যে লোক এমন কথা বলে, তাহার উপর কারণেও রাগ করা যায় না—অকারণে ত পরের কথা। তিনি শিশিরকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। লোকের নিন্দা করা তাঁহার ধাতুতে ছিল না—প্রশংসা করিতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। তিনি বলিতেন, "ত্যাগ যদি মানুষকে বড় করে, তবে শিশির বড়। তা'র ত্যাগ কি, অনেকে জানে না—হয় ত স্বীকারও করে না। কিন্তু সে যে তা'র মতের জন্য ওকালতী ত্যাগ করলে আর অনেকে ওকালতীতে ফিরে গেলেও ফিরে গেল না, সে তার পক্ষে প্রশংসার কথা। আরও দেখ, সে যে এই তা'র মতের জন্য বাড়ীতে সকলের—এমন কি, স্ত্রীরও বিরক্তি বরণ ক'রে নিয়েছে. সে যে কত বড় ত্যাগ, তা' বুঝবার শক্তিও সকলের নেই।" তিনি বলিতেন,—"ওর মধ্যে একটা বিরাট মনুষ্যত্ব সুপ্ত হয়ে আছে—তা'র জাগবার দিবালোক দেখা দিচ্ছে না। যে দিন সহসা সে আলো ফুটবে, সে দিন দেখতে পা'বে—সে কি, তা'কে লোক কত ভুল বুঝেছে।"

স্বামীর কথা ইলা বেদবাক্য মনে করিত। তাই শিশিরের সম্বন্ধে স্বামীর কথা সে বিশ্বাস করিত এবং তাহা বাল্যবন্ধু অরুণার কাছে বলিত। শুনিয়া অরুণা বিদ্রূপভরে মৃদু হাসি হাসিত। যে পুরুষমানুষ কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে পারে না—যে ব্যারিষ্টার না হইয়া চরকা কাটাই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার মধ্যে যে বিরাট মনুষ্যত্ব অনন্ত-শয়নে নারায়ণের মত থাকিতে পারে, এ কল্পনাও যে হাস্যোদ্দীপক! অরুণা ব্যঙ্গ করিয়া বলিত, "কিন্তু দেখো ভাই ইলা, তোমার কর্ত্তাটি যেন মনুষ্যত্বের আকর্ষণে অধ্যাপনা ছেড়ে চরকা না ধরেন।"

যত দিন যাইতেছিল, ততই অরুণার মনে স্বামীর প্রতি বিরক্তি যেন বিদ্বেষের ভাব ধারণ করিতেছিল। তাহার এই ভাবের বহ্নিতে ইন্ধন যোগের কারণও বাড়ীতেই ছিল। সে যখন স্কুলে পড়িত—সংসারের কায না করিয়া টেবলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া লিখিত—তখন তাহার তুলনায় আপনার দৈন্য অনুভব করিয়া শিশিরের দাদার স্ত্রী ঈর্ষ্যানুভব করিতেন। এখন তিনি সুযোগ পাইয়া সেই ঈর্ষ্যা ভাষায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সহ্য করাটা অরুণার ধাতুতে ছিল না; কাযেই সে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সব দোষ সে স্বামীর স্কন্ধেই ন্যস্ত করিত। ফলে স্বামীর প্রতি তাহার মনোভাবের তিক্ততা আরও

বাড়িয়া যাইত। ইলার কথা বা নীরেন্দ্রনাথের যুক্তি সে তিক্ততা দূর করিতে পারিত না।

স্ত্রীর এই ব্যবহার যে শিশিরকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। সে যতই কেন যুক্তি-তর্ক দ্বারা আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করুক না, তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা তাহাতে মিটিত না—মিটিতে পারেও না। প্রেমের সুধা ব্যতীত যে ক্ষুধা আর কিছুতেই মিটিতে পারে না, সে ক্ষুধা রাজনীতিক আন্দোলনে—বাহিরের কাযে—কিছুতেই মিটাইবার উপায় নাই। সে কেবলই মনে করিত, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে এবং সে পৃথিবীর অনাবশ্যক ভার ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার সব আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার জীবনে আর কোন লাভ নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখন উৎসাহের ও উদ্যমের উৎস-মুখ রুদ্ধ হইয়া যায়।

৪

কলিকাতার লোক কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগ্নেয়গিরির উপর বাস করিতেছিল। কর্ম্মকেন্দ্র ও জনকেন্দ্র সহরের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া কেহই তাই মনে করে নাই। কিন্তু ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসের শেষভাগে সহসা এক দিন গিরিগর্ভে গর্জ্জন শুনিয়া লোক স্তম্ভিত হইল এবং ব্যাপারটা কি, তাহা তাহারা বুঝিতে না বুঝিতেই সেই গিরিগর্ভ হইতে অনাচারের গৈরিকধারা উদ্গত হইয়া নাগরিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টাকাল পূর্ব্বেও কেহ বিপদের কোনরূপ আশঙ্কা করে নাই। অপরাহ্নে মুষ্টিমেয় আর্য্যসমাজী মিছিল করিয়া রাজপথে যাইতেছিলেন। মিছিল বড়বাজারে একটি মসজেদের সম্মুখে আসিলে বাজনা লইয়া বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ দেখিতে দেখিতে ছড়াইয়া পড়িল। বিবাদটা বাধিয়াছিল—মুসলমান ও আর্য্যসমাজী দুই সম্প্রদায়ে; কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদিগকেও আক্রমণ করিল। দুই দলে ইট-ছোড়াছুড়ি ও লাঠিচালাচালি চলিল। সন্ধ্যার পর যখন শান্তি স্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল—বহু লোক আহত হইয়াছে এবং জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে হিন্দুদিগের মন্দিরে শিবলিঙ্গ মুসলমানরা চূর্ণ করিয়া গিয়াছে।

সহরের পথে স্থানে স্থানে পুলিস পাহারা বসিল; লোক ভাবিল, "কালবৈশাখী" কাটিয়া গেল। কারণ, ইহার পূর্ব্বে কখন কখন কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে—যেটি অধিকদিনস্থায়ী হইয়াছে, সেটিও অল্পদিনেই মিটিয়াছে। কিন্তু লোক ভুল করিয়াছিল। কারণ, বাঙ্গালায় ইতঃপূর্ব্বে যাহা কখন হয় নাই, এ বার তাহাই হইল—মন্দির অপবিত্র করায় হিন্দুরা প্রতিশোধ লইল—তাহারা কয়টি মসজেদ ও দরগা নষ্ট বা অপবিত্র করিয়া দিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি তীব্র ও তিক্ত ভাবের সমুদ্ভব হইল। তাহার পর রাজপথে মারামারি ছোরাছুরী চলিতে লাগিল। সহর অশান্তির আগার হইয়া উঠিল। যাহা ঘটিল—তদপেক্ষা অধিক রটিল—অতিরঞ্জিত গুজবে লোক আরও ভয় পাইতে লাগিল।

চারি পাঁচ দিনে হাঙ্গামার প্রাবল্যের অবসান হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি তখনও স্থাপিত হইল না। তবে সকলে তাহা বুঝিল না। কয় দিন কলিকাতায় দোকান পাট বন্ধ ছিল,—আবার সে সব খুলিল। দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় বাঙ্গালার লাট বা তাঁহার শাসন পরিষদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য কলিকাতায় ছিলেন না। সদস্য কলিকাতায় আসিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন যেন আর হাঙ্গামার সম্ভাবনা নাই।

এই ব্যাপারে শিশির মনে বড় ব্যথা পাইল। কারণ, সে দেখিল, সে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই অপমানিত হইল—জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে যে জাতীয়তার সৌধভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কলিকাতায় সেই হিন্দু-মুসলমানেরই রক্তস্রোতে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। আর অহিংসায় অবিচলিত থাকা ত পরের কথা—মানুষ হিংসার পূজা করিয়া গর্ব্বানুভব করিতে লাগিল, যেন সে হিংস্র পশুতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজেদ সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের আয়োজন হইলে দেখা গেল, শিক্ষিত মুসলমানরাও বলিতে লাগিলেন, হিন্দুর অর্থে মসজেদ সংস্কার করা হইবে না; তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, বাঙ্গালায় অধিকাংশ মসজেদই হিন্দু জমীদারের উপহৃত জমীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মান্ধের বিদ্বেষ তাহাকে অন্ধই করে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদে বঙ্গদেশে হিন্দুরা কখন মার খাইয়া হাত তুলে নাই।

এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। দাঙ্গাহাঙ্গামা থামিল বটে. কিন্তু মুসলমান আহত সর্পের মত মার খাইয়া গজরাইতে লাগিল, হিন্দু আপনার শক্তির পরিচয়ে উৎফুল্ল হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অর্থাৎ যে অবস্থায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না হইতে পারে না—সেই অবস্থারই উদ্ভব হইল। প্রকৃত কথা এই যে, প্রথম বার হাঙ্গামাটা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ছিল কোন পক্ষই সে জন্য প্রস্তুত ছিল না; এবার উভয় পক্ষ বলপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

দাঙ্গার কয় দিন শিশির প্রাণভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া হাঙ্গামার স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল—আহতকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে, আক্রান্তের উদ্ধারসাধন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সে পথে ও হাঁসপাতালে বীভৎস ও করুণ দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, শান্তি স্থাপিত হয় নাই।

বাস্তবিকই শান্তি স্থাপিত হয় নাই। কয় দিন যাইতে না যাইতে এমন একটা সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া আবার হাঙ্গামা বাধিল যে, বেশ বুঝা গেল—লোক কেবল ছল খুঁজিতেছে। নহিলে তুলাপটীতে জন দুই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের বদজবানে সমগ্র সহরে আবার আগুন জ্বলিত না।

এ বার হাঙ্গামা আরও প্রবল- বিবাদ আরও তীব্র। কলিকাতার স্বাভাবিক অবস্থা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার এই হাঙ্গামার সময়ের অস্বাভাবিক অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। যে সব রাজপথে দিবারাত্রি কখনও যান-যাত্রীর অভাব হয় না সে সব রাজপথ যেন জনশূন্য শ্মশান; যে সব পল্লী রাত্রিকালেও মানবকণ্ঠের গুঞ্জনে মুখরিত থাকে, সে সব পল্লী দিবাভাগেও স্তব্ধ। যে সহরে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার কাযকারবার হয়, সে সহরে বাজারহাট বন্ধ! কুলী, মজুর, গাড়োয়ান, কোচম্যান পথে বাহির হয় না। লোক ভয়ে সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। জাহাজে মাল উঠে না, নামে না; রেলের ষ্টেশনে মাল খালাস করিবার কুলী নাই; বাজারে দোকান বন্ধ। পথে পদে পদে বিপদ- যে কোন মুহূর্ত্তে লোকের প্রাণ যাইতে পারে। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন কেবল জলের জন্য ব্যগ্র হয়, লোক তেমনই কেবল সংবাদের জন্য ব্যস্ত—সংবাদপত্রগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হইতে লাগিল তবুও লোকের সংবাদতৃষ্ণার তৃপ্তি নাই। হিন্দুরা মন্দির ও মুসলমানরা মসজেদ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শিখরা হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিল; কারণ, মুসলমানরা কয়টি শিখধর্ম্মস্থান অপবিত্র করিয়াছিল। সহরের পুলিস কমিশনার শিখদিগের মিছিল বাহির করিতে অনুমতি দেন নাই—চড়কে রাস্তায় ঢাকের বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। লোক এইরূপ ব্যবহারে এক দিকে যেমন সরকারের দৌর্ব্বল্য-পরিচয় পাইল মনে করিল, অপর দিকে তেমনই লোকের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল।

৫

যে পল্লীতে শিশিরের বাস, সে পল্লীতে একটু শঙ্কার সম্ভাবনা ছিল। তাহাদের গলির মোড়েই একটি শিবমন্দির—আর তাহারই পর বড় রাস্তায় একটু দূরে একটি মসজেদ এবং তাহার পশ্চাতে মুসলমানদিগের একটা বস্তী। বস্তীর মুসলমানরা প্রায়ই অশিক্ষিত ও দরিদ্র। এই দলের লোককে সহজেই উত্তেজিত করা যায়। তাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কয় জন মুসলমান আসিয়া ইহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল, বলিয়া দিয়াছিল—মসজেদ আক্রান্ত হইবে, তাহারা যেন মসজেদ রক্ষা করে—সে চেষ্টায় বাঁচিলে গাজি ও মরিলে সাহিদ হইবে। হিন্দুরাও মন্দিররক্ষার জন্য পুলিসের শরণ লইয়াছিল এবং ৪ জন হিন্দু কনষ্টেবল বড় বড় লাঠি লইয়া তথায় পাহারা দিতেছিল।

মধ্যাহ্নের পরই কে মসজেদে একখানা ইট ফেলে—ফলে মুসলমানরা মসজেদ আক্রান্ত হইল মনে করিয়া ভয় ত্যাগ করিয়া মন্দির আক্রমণের আয়োজন করিল। শিশির তখন বাড়ীতেই ছিল। যে বৃহস্পতিবারে দ্বিতীয় বার দাঙ্গা বাধে, সেই দিন সকালে ইলা পিত্রালয়ে আসিয়াছিল; কথা ছিল—সন্ধ্যায় ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু দাঙ্গার জন্য সে আর কয় দিন যাইতে পারে নাই। ইলার সঙ্গে শিশির দাঙ্গার কথাই বলিতেছিল- যে সব ভীষণ দৃশ্য সে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছিল, সে সব দৃশ্যের বর্ণনা করিতে করিতে সে যেন যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। অরুণা পাশের ঘরে ছিল—সব শুনিতেছিল।

সহসা একটা হল্লা শুনা গেল --"ঐ—ঐ— এল—এল—গেল—গেল" রব পল্লীকে চমকাইয়া দিল। মুসলমানরা মন্দির আক্রমণ করিতে আসিতেছে, মন্দির আক্রমণ করিয়া তাহারা পাড়া আক্রমণ করিবে। সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে যাহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিতে লাগিল। গলির মোড়ের পরই বাড়ীর অধিকারী ধনী; তাঁহার বাড়ী হইতে বন্দুকের কয়টা ফাঁকা আওয়াজ শুনা গেল।

পার্শ্বের দিকের ঘর হইতে শিশিরের দাদা বাহির হইতেই তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন—"যেও না গো, যেও না।"

ততক্ষণে শিশির উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাইতেছে দেখিয়া ইলা বলিল, "ছোড়দা, কোথায় যাচ্ছ?"

শিশির বলিল, "মন্দির আর পাড়া রক্ষা করবার উপায় কি করা যায়, তাই দেখতে যাচ্ছি।" বলিতে বলিতে সে সিঁড়ি দিয়া নিম্নে চলিয়া গেল।

ইলা যখন নিম্নতলে উপস্থিত হইল, শিশির তখন রাস্তায় যাইতেছে। ইলা বলিল, "ছোড়দা, তুমি একা অস্ত্র নেই, কোথায় যাচ্ছ? বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?"

শিশির ভগিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "যদি ঘটে, তা'তে ক্ষতি কি? আমার মত অপদার্থের জীবন থাকলেও কা'রও লাভ নেই, গেলেও কা'রও ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি দেবস্থান আর তোদের মান রাখবার জন্য সে প্রাণ যায়, তবে যে সে অমূল্য হয়ে যা'বে।"

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ইলা দ্বিতলে আসিল, অরুণাকে বলিল, "একবারও যেতে বারণ করলে না?"

অরুণার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। শিশির যে রিক্ত হস্তে সত্য সত্যই আক্রমণকারীদিগের গতিরোধ করিতে গেল, ইহা সে বিশ্বাস করিতেই পারিল না।

ইলা কিন্তু ভয় পাইল সে দাদার চক্ষুতে আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছিল; সে অগ্নি সব দগ্ধ করিতে পারে।

মা ডাকিলেন, "ইলা!"

ইলা বলিল, "কেন, মা?"

"শিশির কোথায় গেল?"

"রাস্তায়।"

"বলিস কি? ডাক।" মা'র স্বরে উৎকণ্ঠা।

"ছোড়দা চ'লে গেছেন।"

গোলমাল বাড়িয়া উঠিল--মধ্যে মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দশ মিনিট কাল কাটিল। তাহার পর ফট ফট করিয়া কতকগুলা গুলী ছোড়ার শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে "মার দিয়া! মার দিয়া!"—আর্ত্তনাদ। তাহার পরই নিস্তব্ধ।

রুদ্ধদ্বার গৃহে অধিবাসীরা ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলেন না; কেবল আশঙ্কায় ইলার, মা'র ও শিশিরের দাদার চিত্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

৬

শিশির বাড়ী হইতে বাহির হইলে নিকটস্থ গৃহ হইতে দুই জন যুবক বাহির হইল। শিশির যখন আকড়া করিয়াছিল, তখন ইহারা উভয়ে দিনকতক তথায় লাঠি খেলিত,—কুস্তী করিত। তাহাদের হাতে লাঠি ছিল। তিন জন যখন অগ্রসর হইল, তখন আরও দুই এক জন আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলেন। সকলে একটু অগ্রসর হইয়া যখন মন্দিরের কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন নিকটবর্ত্তী গৃহের বারান্দা হইতে বহু কণ্ঠে রব উঠিল—"পালা'ন! পালা'ন! দু'হাজার মুসলমান—মেরে ফেলবে।" তখন কনষ্টেবল কয় জন অগ্রসর হইয়াছে। সহসা তাহাদের মধ্যে এক জনের মাথায় লাঠির আঘাত পড়িল—মাথাটা ফাটিয়া গেল, কনষ্টেবলের গতপ্রাণ দেহ রাজপথে লুটাইয়া পড়িল এবং তাহার করধৃত লাঠিখানা ছিটকাইয়া আসিল।

শিশিরের আর বিচার-বিবেচনা রহিল না, সে সেই লাঠিখানা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট কনষ্টেবল কয় জন পলায়নোদ্যত হইয়াছিল, সাহস পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কয় জন বাঙ্গালী যুবকও সাহস করিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে প্রায় দুই হাজার মুসলমান হাতে লাঠি, ছোরা, টাঙ্গী। শিশির অনেক দিন লাঠি খেলে নাই। কিন্তু তাহার হাত যেন লাঠিচালনকৌশল ফিরিয়া পাইল। মত্ত মাতঙ্গের মত বিক্রমে সে অগ্রসর হইল। চালনপটু লোকের হাতে লাঠি অনভ্যস্তের হস্তে ছোরা তরবারি প্রভৃতি অপেক্ষা ভয়ানক। মুসলমানরা অগ্রসর হইতে

পারা ত পরের কথা, অনেকে লাঠির আঘাতে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল দুই চারি জন আহত হইয়া পড়িয়া গেল। শিশিরের লাঠি সেকালের লাঠিয়ালের হাতে লাঠির মত সশব্দে ঘূরিতে লাগিল- হিন্দুরা অগ্রসর হইতে লাগিল, মুসলমানরা পিছাইতে লাগিল। বারান্দায় জনতা সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া পুলিস ঘটনাস্থলে আসিতেছিল। শিশির ও তাহার দল প্রায় দশ মিনিট কাল সেই জনতার মোহাড়া রাখিবার পর তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে একখানি সাঁজোয়াগাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। গাড়ীর উপর বসিয়া এক জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক কেবল — "হঠো! হঠো!" বলিতে লাগিল। লোক ছুটিয়া ফুটপাথে উঠিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় এক জন মুসলমান সুযোগ পাইয়া শিশিরের মস্তকে প্রহার করিল। শিশির রক্তাক্তকলেবরে পড়িয়া গেল। দেখিয়া সাঁজোয়াগাড়ী হইতে অটো গানে এক দফা গুলী ছাড়া হইল; আট দশ জন লোক আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল—আর সকলে ছুটিয়া পলাইল। গুলী বন্ধ হইলেই কনষ্টেবলরা আসিয়া ব্যাপারটা গাড়ীর সৈনিকদিগকে বুঝাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া দেখিল, কনষ্টেবল গতপ্রাণ - দুই জন মুসলমানও মরিয়া গিয়াছে। ততক্ষণে ধনীর গৃহের দ্বার মুক্ত হইল এবং তাঁহারা এম্বুলেন্সের জন্য টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইলেন।

সেই সময় সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে একখানি মোটরে এক বাঙ্গালী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশিরের সঙ্গীরা তাঁহাকে বলিল, "মশাই, চলুন, এঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।" যুবক সম্মত হইলে তাহারা দুই জন শিশিরের সংজ্ঞাশূন্য দেহ মোটরে তুলিল—তাহার মাথা ও নাক হইতে রক্ত পড়িতেছিল। রক্তে যুবকদিগের কাপড় রঞ্জিত হইয়া গেল।

সাঁজোয়াগাড়ীর সৈনিকরা এম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে যুবকদিগকে লইয়া সংবাদপত্রসেবকের মোটর হাঁসপাতালের দিকে ছুটিয়া চলিল। সংবাদপত্রসেবক সেই অবসরে যুবকদিগের নিকট হইতে ঘটনার বিবরণ জানিয়া লইয়া "প্রত্যক্ষদর্শীর" বিবরণ রচনার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

গাড়ী হাঁসপাতালে পৌছিবামাত্র দুই জন ছাত্র আসিয়া শিশিরের দেহ ডুলিতে তুলিয়া অস্ত্রোপচারের কক্ষে লইয়া গেল। তথায় তাহাকে টেবলের উপর রাখিয়া চিকিৎসক ও কয় জন ছাত্র পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যুবকদ্বয় সংবাদপত্রসেবককে, বলিয়া তাঁহার গাড়ী লইয়া শিশিরের বাড়ীতে সংবাদ দিতে গেল। তাহারা শিশিরের যে অবস্থা দেখিয়া গেল, তাহাতে তাহারা তাহার বাঁচিবার আশা মনে স্থান দিতে পারিল না; বলাবলি করিতে লাগিল "একখানা গোটা মানুষ বটে! পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছে করে।" গাড়ী আসিয়া শিশিরের গৃহদ্বারে যুবকদ্বয়কে নামাইয়া দিল।

৭

রক্তরঞ্জিতবস্ত্র যুবকদ্বয়ই শিশিরের বাড়ীতে আসিয়া সব সংবাদ দিল।

সংবাদ শুনিয়া মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সে কেমন আছে?"

এক জন যুবক উত্তর দিল -- "মাথাটা কেটে গেছে -- ফেটেছে কি না, বুঝতে পারি নি; নাক দিয়েও রক্ত বেরুচ্ছে। অজ্ঞান। আমরা হাঁসপাতালে নামিয়ে দিয়েই আপনাদের খবর দিতে এসেছি।"

শিশিরের দাদা বলিলেন, "বাড়ীতে আনলে না কেন?"

দ্বিতীয় যুবক বলিল, "তাঁ'র বারণ ছিল। যা'বার সময় তিনি আমাদের বলেছিলেন, 'যদি ম'রে যাই, তবে ত চুকেই গেল; আর যদি না মরি, আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিও -বাড়ীতে যেন নিও না'।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

যুবকরা তাহার উত্তর দিতে পারিল না।

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দুই জনের মনে দেখা গেল। ইলা অরুণার দিকে চাহিল তাহার দৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার। সে দৃষ্টির সম্মুখে অরুণা নয়ন নত করিল—তাহার দৃষ্টিতে অপরাধীর কুণ্ঠাভাব। তাহারা দুই জনই বুঝিতে পারিল - কত বড় অভিমানে সে মরিতেও বাড়ী আসিতে চাহে নাই।

দাদা বলিলেন, "আমরা গেলে দেখতে পা'ব ত?"

যুবকদ্বয়ের এক জন বলিল, "বলতে পারি নে বোধ হয় পাবেন।"

"রাস্তায় ট্যাক্সী পাওয়া যাবে ?"

"যা'বে।"

দাদা ভৃত্যকে ট্যাক্সী আনিতে বলিলেন—সে ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া এক জন যুবকই যাইয়া একখানা ট্যাক্সী ডাকিয়া আনিল।

মা বলিলেন, "আমি যা'ব।"

দাদা বলিলেন, "এই হাঙ্গামার মধ্যে যা'বে ?"

"আমি যা'বই।"

ইলা বলিল, "আমিও যা'ব।"

দাদা বলিলেন, "হাঙ্গামার জন্যে ক'দিন বাড়ী যেতে পারলি নে, আর এই সময় যা'বি ?"

যে যুবক ট্যাক্সী ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে বলিল, "যেতে পারবেন—রাস্তায় মিলিটারী পাহারা বসেছে।"

তখন দাদার সঙ্গে মা ও ইলা যাইবার জন্য উঠিলেন। উঠিয়া ইলা অরুণার হাত ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "চল।" সে যেন আদেশ করিল। অরুণা তাহার সঙ্গে চলিল।

কয় মিনিট পরে যখন ট্যাক্সী হাঁসপাতালের দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন হাঁসপাতালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফল প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে—একের পর এক এম্বুলেন্স গাড়ী বা ট্যাক্সী আসিয়া দাঁড়াইতেছে, আর তাহা হইতে আহত ব্যক্তিদিগকে নামান হইতেছে; অধিকাংশ আহত ব্যক্তিই ছোরার আঘাতে আহত।

শিশিরদিগের পাড়ার দুই তিন জন যুবক তখন তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা শিশিরের দাদাকে ও মহিলাদিগকে পথ দেখাইয়া প্রবেশকক্ষে লইয়া যাইয়া পরের কক্ষে চিকিৎসক ও ছাত্রদিগকে সংবাদ দিল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন যেতে বল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখলে আমাকেই বকবে। এ সময় কি আনতে আছে ?"

যুবকরা বলিল, "কিন্তু এসে যখন পড়েছেন—"

"কি দেখবেন ? দেখবার যদি কিছু থাকে, পরে দেখবেন।"

এক জন ছাত্র বলিল, "ঐ ত টেবলে আছে—একবার এখান থেকে দেখিয়ে নিয়ে যাও। দেরী না হয় যেন।"

মা, ইলা ও অরুণা আসিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে দেখিলেন—সংজ্ঞাশূন্য শিশিরের দেহ অপারেশন টেবলের উপর স্থাপিত; মাথায় যে স্থানটা কাটিয়া গিয়াছে সে স্থানটায় চুল কামাইয়া দেওয়া হইয়াছে - এক জন প্রায় তিন ইঞ্চ লম্বা ক্ষত ধৌত করিতেছে, নাক দিয়া যে রক্ত পড়িয়াছে, তাহা মুখের উপর জমিয়া আছে। কি দৃশ্য !

ছাত্রটি বলিল, "এইবার আপনারা বাড়ী যান। আর এখানে থাকতে পাবেন না।"

তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন— ভাবিতে ভাবিতে গেলেন—এই কি শেষ দেখা ?

তাঁহারা গৃহে ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই নীরেন্দ্রনাথ হাঁসপাতাল হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা কাঁদিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ হ'ল, বাবা !"

নীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি কাঁদবেন না। শিশির যা' করেছে, তা' আর কেউ করতে পারে নি। সব বিপদ সে আপনি বুক পেতে নিয়েছে; কিন্তু তা'র কাযের গৌরব আমরা—বাঙ্গালী সকলে ভাগ ক'রে নিলেও ফুরা'বে না। আমি জানতাম, এমন কায করা তা'র পক্ষে সম্ভব—আমাদের আর কা'রও পক্ষে নয়। আপনারা তা'র উপর বিরক্ত হয়েছিলেন—আমি দেখতে পেতাম, তা'র মধ্যে কি মানুষ আছে !"

নীরেন্দ্রনাথের কথা সকলেই শুনিলেন। কিন্তু সেই কথা শুনিয়া অরুণার মনে হইতে লাগিল, কথাগুলি যেন তাহার বুকের মধ্যে কুরিয়া কুরিয়া প্রবেশ করিতেছে। অনুতাপের কি দারুণ যাতনা !

সন্ধ্যা হইতে না হইতে পল্লীর মহিলারা শিশিরের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মা'কে বলিলেন, "ছেলে সকলেই পেটে ধরে—কিন্তু ধন্য আপনি যে, অমন ছেলের মা হয়েছেন। বাছা না থাকলে আজ আমাদের কি হ'ত, ভাবলে গায় এখনও কাঁটা দিয়ে উঠে ! মন্দির যেত, মানসম্ভ্রম ধনপ্রাণ সব যেত—সব যেত।"

মোড়ের কাছেই যে ধনীর গৃহ, সেই রায় বাহাদুরের পত্নী ব্যাপারটা স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সব দেখেছি—মনে হ'ল, মন্দির থেকে বেরিয়ে স্বয়ং মহাদেব যেন শত্রু নাশ করতে আরম্ভ করলেন। মানুষ কি অমন কায করতে পারে ?" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আপনি ভয় পা'বেন না। আপনার শিশির সেরে উঠবে। আমি মানত—করেছি বাছা সারলে মা কালীর

পূজা করব—বুকের রক্ত আর সোনার বিল্বপত্র দিয়ে মা'কে পূজা দেব।"

মা বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—বাছা আমার সেরে উঠুক। যা' দেখে এলেম—" মা'র মুখে আর কথা সরিল না।

বৃদ্ধারা বলিলেন, "আমরা কেবল সেই আশীর্ব্বাদই করছি। মা বিপদবারিণী তা'র সব বিপদ হরণ করবেন।"

যুবতীরা অরুণাকে ঘিরিয়া বসিলেন—সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। তাঁহারা অজস্র ধারায় শিশিরের প্রশংসা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনুতাপের বেদনার সহিত আশঙ্কার যাতনা—মরুভূমিতে দীপ্তরবিকরের মত এতক্ষণ অরুণার নয়ন আর্দ্র হইতেও দেয় নাই। এই সান্ত্বনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। গাণ্ডীবীর শরবিদ্ধা ধরণীর বক্ষ হইতে উদ্গত জলধারা যেমন ভীষ্মের মৃত্যুতৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠ স্নিগ্ধ করিয়াছিল—অনুতাপের বাণদীর্ণ হৃদয়ের বেদনা তেমনই অশ্রুরূপে বাহির হইয়া তাহার যাতনা যেন কিছু প্রশমিত করিল।

মহিলারা চলিয়া গেলেন—গৃহ যেন অত্যন্ত শূন্য মনে হইতে লাগিল। গৃহে বিপদের ঘনীভূত ছায়া—সকলের মনে দারুণ আশঙ্কা। এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হয়!

ইলা তাহার পুত্রকে লইয়া অরুণার কাছেই শুইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনের কেহই ঘুমাইতে পারে নাই। কিন্তু কেহ কোন কথাও বলে নাই। উভয়েরই হৃদয় ভাবনায় ভরা।

ইলা শিশিরের সম্বন্ধে তাহাকে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কোন দিন সে তাহা বুঝিতে চাহে নাই—কেবলই স্বামীকে ভুল বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাঁহার মনে এত ব্যথা দিয়াছে যে, মৃত্যুমুখে যাইবার সময় তিনি কেবল বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে যেন বাড়ীতে লইয়া যাওয়া না হয়—সেই সব মনে করিয়া অরুণা কেবলই কাঁদিতে লাগিল। তাহার একবার মনে হইল, সে ইলার কাছে ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল—তাহার অপরাধে ক্ষমা করিবার অধিকার কেবল এক জনের আছে। কিন্তু—তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর সে আর পাইবে কি? হাঁসপাতালে অস্ত্রোপচারের টেবলের উপর মুদিতনেত্র সংজ্ঞাহীন শিশিরের দেহের স্মৃতি তাহার মনে সমুদিত হইল। অরুণা আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইলা উঠিয়া বসিল—উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগ সংযত করিয়া ধরা গলায় বলিল, "অরুণা, কেঁদে অমঙ্গল ডেকে এনো না। যা'র জন্য শত শত লোক ব্যস্ত—শত শত লোক যা'কে আশীর্ব্বাদ করছে, তা'র অকল্যাণ হ'তে পারে না। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় কর। সাবিত্রীর মত মনে কর—স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না—হ'তে দেবে না। মনে রেখো—তুমি কা'র স্ত্রী।"

কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণা বলিল, "কিন্তু আমি তাঁ'র অযোগ্য।"

"যোগ্যতা অযোগ্যতা সব সময় মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমি কি তাঁর ভগিনী হ'বার উপযুক্ত? কিন্তু তবুও—আমি তাঁ'র ভগিনী, তা'ই মনে ক'রে গর্ব্বে আমার বুক পূর্ণ হয়ে উঠছে। তুমি ছোড়দাদার যোগ্য স্ত্রী নও—কিন্তু যোগ্য হ'বার চেষ্টা করতে পার।"

অরুণা চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল। আর স্বামীর ও তাহার মধ্যে ব্যবধান কত অধিক, তাহা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিল—সে ব্যবধান সে আজ কেমন করিয়া দূর করিবে?

সকালে শৈলেন্দ্র সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিল। তাহাতে পূর্ব্বদিনের ব্যাপারের বিবরণের সঙ্গে শিশিরের ও অরুণার প্রতিকৃতি ছিল। যে সংবাদপত্র-সেবকের গাড়ীতে পাড়ার দুই জন যুবক শিশিরকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছিল, তিনিই তাহাদের সাহায্যে শৈলেন্দ্রনাথের নিকট হইতে ছবি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পল্লীর মহিলারা হইতে সংবাদপত্র পর্য্যন্ত শিশিরের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছেন, সে যে তাহাই অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা মনে করিয়া অরুণা আজ মনে কেবলই ব্যথা পাইতে লাগিল। প্রত্যেক ব্যাপারে তাহার আপনার দোষ তাহার কাছে প্রতিপন্ন হইতে লাগিল—সে আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে লাগিল—আপনার জন্য আপনি লজ্জানুভব করিতে লাগিল—লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল। এই লজ্জা হইতে সে কোন দিন অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে কি?

৮

পরদিনও অরুণা মা'র সঙ্গে হাঁসপাতালে গেল। সে দিনও শিশিরের জ্ঞান হয় নাই। তাহাকে একটা স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা হইয়াছিল। এক জন ফিরিঙ্গী শুশ্রূষাকারিণী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছিল।

পূর্ব্বদিন যাহা ভাল করিয়া লক্ষিত হয় নাই, আজ তাহা লক্ষ্য করিতে আর বিলম্ব হইল না—রক্তপাতে শিশির পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মহিলারা আসিলে শুশ্রূষাকারিণী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল এবং বলিল, ঘরের মধ্যে কোনরূপ শব্দ করা নিষিদ্ধ। সে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং অরুণার পরিচয় পাইয়া বলিল, "আপনার স্বামী বীর—সকলেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে।" বাস্তবিক পাড়ার ছেলেদের পক্ষে হাঁসপাতাল তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছিল এবং শিশিরের যশ এত দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যাঁহারা অন্য কোন কারণে হাঁসপাতালে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এক বার তাহার সন্ধান না লইয়া যাইতেন না।

সে দিনও ডাক্তাররা কোন আশা দিতে পারিলেন না যে, শিশির সারিয়া উঠিবে।

অরুণার মনে তখন কেবল আশঙ্কা। স্বামীর ও আপনার মধ্যে ব্যবধানের যে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া সে মনে করিয়াছিল, সে স্বামীকে তাহার জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে এবং তাহাই মনে করিয়া অকারণ উদ্ধত গর্ব্ব অনুভব করিত—সে প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিল আর তাহার হৃদয়ে অনুতাপ গর্ব্বের স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজ সে শুশ্রূষাকারিণী ফিরিঙ্গী নারীকেও সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছিল; সেই নারী শিশিরকে শুশ্রূষা করিতে পাইয়াছে আর সে—তাহার স্ত্রী—সে অধিকারে বঞ্চিত। তাহার মনে পড়িল, শিশির শিবমন্দিরের দিকে যাত্রাকালে তাহার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়াছিল। নহিলে সে বলিত না, সে যদি আহত হয়, তবে যেন তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়—বাড়ীতে সে আসিবে না। সেই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয়—তবে ত অরুণা তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অবকাশও পাইবে না! তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে মনে করিল—সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে! কিন্তু সেই প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর জন্য সে কখন আশঙ্কা অনুভব করে নাই—আর এ আশঙ্কার তীব্রতার তুলনা নাই।

অরুণার মাতা ও ভগিনীরা আসিতেন। সে তাঁহাদের উপর রাগ করিত। তাঁহারা তাহার স্বামীর সহিত সদ্ভাবের অভাবে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু কোন দিন বলেন নাই—সে ভুল করিতেছে।

উৎকণ্ঠায় ও অনুতাপে তাহার মনের আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

চতুর্থ দিন পাড়ার এক জন যুবক আসিয়া সংবাদ দিল—শিশিরের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। ডাক্তার আশা দিয়াছেন—সে সারিয়া উঠিবে। সকলের মনে নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোক বিকশিত হইল। কিন্তু সে দিনও তাহার মুখে একটি কথা শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইল না। কারণ, তাঁহারা যখন হাঁসপাতালে যাইলেন, তখন সে ঘুমাইতেছে; শুশ্রূষাকারিণী তাহার নিদ্রাভঙ্গভয়ে তাঁহাদিগকে সে কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল।

তাহার পর শিশির ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের পথে প্রত্যাবর্ত্তনে তাহার গতি অতি মন্থর হইল। ডাক্তাররা তাহার কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। সে কারণ দেহের নহে—মনের। মা'র সহিত প্রথম যে দিন সে কথা কহিতে পারিল, সেই দিনই বলিল, "মা আর কষ্ট ক'রে এখানে এস না। দাদার কাছে রোজই খবর পা'বে—আমি কেমন থাকি।" অরুণাকে মা'র সঙ্গে দেখিয়াই সে সেই কথা বলিল। মনে দারুণ অভিমান—অরুণা লোককে দেখাইবার জন্য তাহাকে দেখিতে আসিবার কষ্ট স্বীকার করিবে কেন? সে ত ব্যবহারে ও বাক্যে বুঝাইয়াই দিয়াছে—শিশির তাহার কেহ নহে! যুবকের হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা কেবলই তাহাকে পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু সুস্থ ও সবল অবস্থায় সে যাহা সহ্য করিতে পারিয়াছে, এখন যেন তাহা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অরুণার কথা ও আপনার ব্যর্থ প্রেমের কথা মনে করিয়া সে যেন বুকে বিষধরদংশন

যাতনা অনুভব করিতেছিল। মনের সেই ভাবই তাহার স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ডাক্তাররা দেহের চিকিৎসা করেন—মনের চিকিৎসা করিতে জানেন না। তাই তাঁহারা শিশিরের জন্য শৈলবাসের ব্যবস্থা করিলেন—তাহাকে দার্জ্জিলিং বা শিলং যাইতে উপদেশ দিলেন।

দাদা দার্জ্জিলিং বা শিলং কোথাও একটা বাড়ী ঠিক করিবেন বলিলে শিশির বলিল, "মিছামিছি হাঙ্গামা ক'র না। দার্জ্জিলিং সেনিটেরিয়ামে গিয়ে আমি উঠব।"

দাদা বলিলেন, "তোর এই দুর্ব্বল শরীর। তুই একা যা'বি কেমন ক'রে?"

"তুমি কিছু ভেব না। এঁরা রয়েছেন, ঘা একেবারে শুকিয়ে না গেলে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না—তত দিন আমি আরও সবল হব। না হয়, তুমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

বাস্তবিক ডাক্তাররা বলিয়াছিলেন, ক্ষত একেবারে আরোগ্য না হইলে তাঁহারা শিশিরকে যাইতে দিবেন না—তাহার সঙ্গ যেন তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

শেষে দার্জ্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল এবং টেলিগ্রাফ করিয়া সেনিটেরিয়মে একটি ঘর ভাড়া করা হইল।

শিশির স্থির করিয়াছিল, যে দিন সকালে সে হাঁসপাতাল হইতে ছাড়া পাইবে, সেই দিনই দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবে। দাদা বলিলেন, "দু' দিন বাড়ীতে থেকে যাবি না?"

শিশির বলিল, "একেবারে সেরে আসি।"

৯

কিন্তু হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সেই দিনই শিশিরের যাওয়া হইল না। প্রধান অন্তরায় হইলেন—রায় বাহাদুরের গৃহিণী ও পাড়ার সব মহিলারা। তাঁহারা কালীপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন—শিশির যে দিন বাড়ী আসিবে, সেই রাত্রিতেই পূজা। তাঁহারা জিদ করিলেন, শিশিরকে সেই একটা দিন থাকিয়া যাইতেই হইবে। পাড়ার বৃদ্ধরাও যখন মহিলাদিগের সেই অনুরোধ লইয়া শিশিরের কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন শিশির আর তাহাতে আপত্তি করিতে পারিল না। কারণ; যে কারণে সে বাড়ীতে যাওয়া এড়াইতে চাহিতেছিল, সে কারণ কাহাকেও জানান যায় না।

সকালে ডাক্তাররা সমবেত হইয়া শিশিরকে বিদায় দিলেন—সেও যেন একটা ছোট-খাট সংবর্দ্ধনা। কারণ, সব ডাক্তার ও ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া শিশির ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে ও লজ্জায় অভিভূত হইল। পল্লীর বহু লোক তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন—একটা মিছিলের আয়োজন! সে বলিল, "এ কি! এ আমার ধাতে সইবে না।" তাঁহারা কিছুতেই শুনিলেন না। অগত্যা শিশিরকে শোভাযাত্রা করিয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল। যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া একা পল্লীর মান ও মহিলাদের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে বিপদের সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল—জীবন পাইয়া সে যখন পল্লীতে ফিরিল, তখন সমস্ত পল্লীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা সে যে লাভ করিল—তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তাহার বাড়ীতে বহু লোকই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নীরেন্দ্রনাথ একখানা ছবি লইয়া আসিলেন। সেখানা আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় শিশিরের ছবি। হাঁসপাতালে ফটো লওয়া হইয়াছিল—তাহাই বড় করিয়া তৈলচিত্র অঙ্কিত। শিশির যখন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ আবার একটা গন্ধমাদন কি নিয়ে এলে?"—তখন নীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার জন্য নয়, ও ছোট বৌকে তোমার ভগিনীর উপহার। গন্ধমাদনই বটে—তিনি এ থেকে বিশল্যকরণী খুঁজে নেবেন।, মনের জীবন ফিরবে।"

শুনিয়া শিশির কাতর দৃষ্টিতে নীরেন্দ্রের দিকে চাহিল। নীরেন্দ্র কেবল একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি বরাবরই ব'লে এসেছি, তোমার দোষ—তুমি 'তালকাণা'—আপনাকে আপনি খুঁজে পাও না। তাই তোমাকে মাথায় লাঠি মেরে দেখিয়ে দিতে হ'ল, তুমি কি।"

শিশির বলিল, "আর বক্তৃতা করতে হ'বে না।"

"না, এখন আর বক্তৃতা করব না—কারণ, বৈকালে ত অনেক বক্তৃতা শুনতে হ'বে।"

"কেন?"

"জান না?" বলিয়া বলিলেন, "অপরাহ্নে শিশিরের

সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সভার আয়োজন হইয়াছে।" তাহার পর নীরেন্দ্রনাথ কানে কানে শিশিরকে বলিলেন, "তা'র পর ত আবার ছোটগিন্নীর বক্তৃতা—curtain lecture আছে।"

শিশির একটু ম্লান হাসি হাসিল।

নীরেন্দ্রনাথ একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমতী ইলা, বোধ হয়, বক্তৃতার খসড়া খাড়া করেছেন।"

অপরাহ্ণে সভা। কলিকাতার নেতৃস্থানীয় বহু লোক সভাস্থ হইলেন। বক্তার পর বক্তা উঠিয়া শিশিরকে অভিনন্দিত করিয়া হিন্দু ও মুসলমান যুবকদিগকে শিশিরের আদর্শের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। সভায় পাড়ার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি মূল্যবান্ হাতঘড়ি শিশিরকে উপহার দেওয়া হইল। দৌর্ব্বল্যহেতু ও লজ্জায় শিশির কেবল সকলকে ধন্য দিয়াই নিরস্ত হইল এবং বলিল, সে যাহা করিয়াছে, তাহা না করিলে তাহার অপরাধ হইত—করিয়াছে বলিয়া সে প্রশংসা বা পুরস্কার পাইতে পারে না।

রাত্রিতে পূজা হইল। রায় বাহাদুর-গৃহিণী বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবীর পূজার উপকরণ যোগাইলেন। দেখিয়া অরুণার মনে হইল, যাহার জন্য পর এমন করে—তাহার জন্য সে—তাহার স্ত্রী কি করিয়াছে? প্রাণ তুচ্ছ—তাহা দিলেও ত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। নিশীথ পূজার বাদ্যরবে সমগ্র পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দিন আর কেহ তাহাতে বাধা দিতে সাহস করিল না। যদিও সকলেই যথাসম্ভব শীঘ্র শিশিরকে বিশ্রামের অবসর দিতে ব্যস্ত ছিলেন, তবুও শিশির যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি ১টা বাজিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল দেহে সমস্ত দিনের শ্রমে সে শ্রান্ত ও অবসন্ন। কিন্তু সে শয্যায় শয়ন করিলে তাহার নয়ন হইতে নিদ্রাবেশ দূর হইয়া গেল। হতাশার স্মৃতি যেন নূতন হইয়া উঠিয়া তাহাকে যাতনা দিতে লাগিল। শরীর যখন সুস্থ ও সবল থাকে, মন তখন যত দ্বন্দ্ব করিতে পারে, যত সহ্য করিতে পারে—দুর্ব্বল দেহে তত পারে না। তাই আজ শিশির মন হইতে হতাশার যন্ত্রণা অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া দিতে পারিতেছিল না। ব্যর্থ জীবনের পুরাতন কথা যেন নূতন হইয়া দেখা দিতেছিল।

শিশির আলোটি নিবাইয়া দিয়া পাখা খুলিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতেছিল। এই যে কয় দিনের ঘটনা—এই সবই যেন স্বপ্ন; আর ব্যর্থ জীবনের দুর্ব্বহ ভার, তাহাই সত্য। ঘরে ঢুকিয়া সে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিল—নীরেন্দ্রনাথ তাহার যে ছবিখানি আনিয়াছিলেন, সেখানি তাহারই ঘরের কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত হইয়াছে—আর তাহার টেবল ও টেবলের উপর সব জিনিষ ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখা হইয়াছে। কে ইহা করিয়াছে? শিশিরের মনে হইল ইলা। তাহার ভগিনীই কেবল তাহার উপর কখন বিরক্ত হয় নাই।

তাহার পর সে সমস্ত দিনের ঘটনাগুলির আলোচনা করিতে লাগিল। সকালের সেই শোভাযাত্রা, মধ্যাহ্নের সেই বহুজনসমাগম, অপরাহ্নের সেই সম্বর্দ্ধনা সভা, রাত্রির পূজা—এ সকলে আন্তরিকতার অভাব না থাকিলেও এ সবই তাহার কাছে উপহাস মাত্র মনে হইতেছিল। যে তৃষ্ণায় ব্যাকুল, তাহাকে জলের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপিণ্ড প্রদান করিলে, তাহার কি তাহাতে তৃপ্তিবোধ হইতে পারে? না। তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, না! না!

সহসা শিশির তাহার চরণে কাহার কোমল ওষ্ঠাধরের মৃদুস্পর্শ অনুভব করিল—সঙ্গে সঙ্গে দুই বিন্দু জল তাহার চরণে পতিত হইল। সে উঠিয়া বসিবার পূর্ব্বেই অরুণা তাহার চরণে মুখ লুকাইয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমায় ক্ষমা কর।"

"অরুণা!" বলিয়া শিশির উঠিল। এত দিনের অভিমানের ব্যবধান ভালবাসার প্লাবনে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শিশির অরুণাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখ-চুম্বন করিল। সে বুঝিতে পারিল- সব পুরস্কারই ব্যর্থ হয় না; যাহাতে বুকের জ্বালা জুড়ায় ও হৃদয়ের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়, সেরূপ পুরস্কারলাভও মানুষের ভাগ্যে ঘটিতে পারে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নবরস

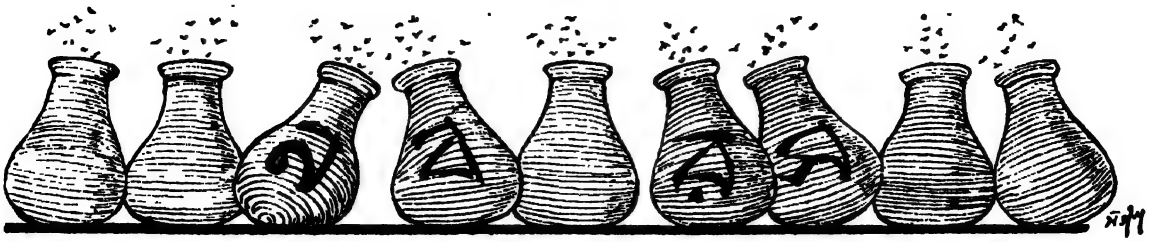

সারি সারি কল্‌সী ভরে সাজিয়ে নবরস।
দোর দে' ঘরে ঘুমিয়ে বালা স্বপ্নে খুঁজে যশ

আদি

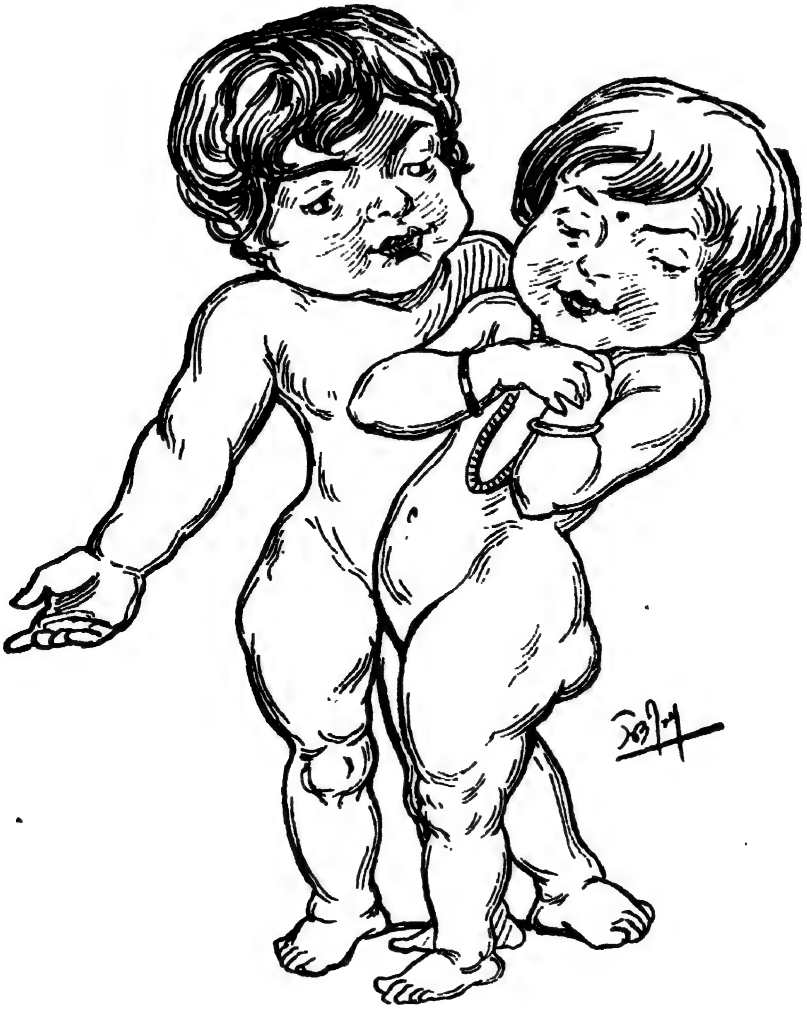

উলঙ্গ সন্ন্যাসী দু'টি হাসি ভরা মুখ।
দুঃখের সংসারে এরা স্বরগের সুখ ॥

নক

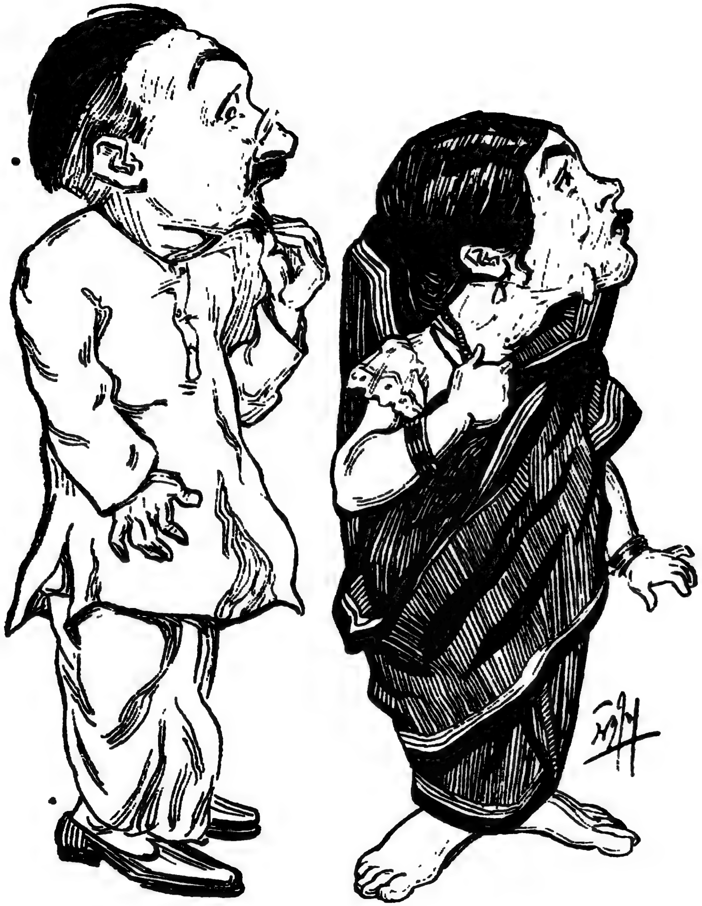

এরোপ্লেন দেখেন গিন্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাতে
পেছনেতে কর্ত্তা আছেন ছাগল দাড়ী হাতে ॥

করুণ

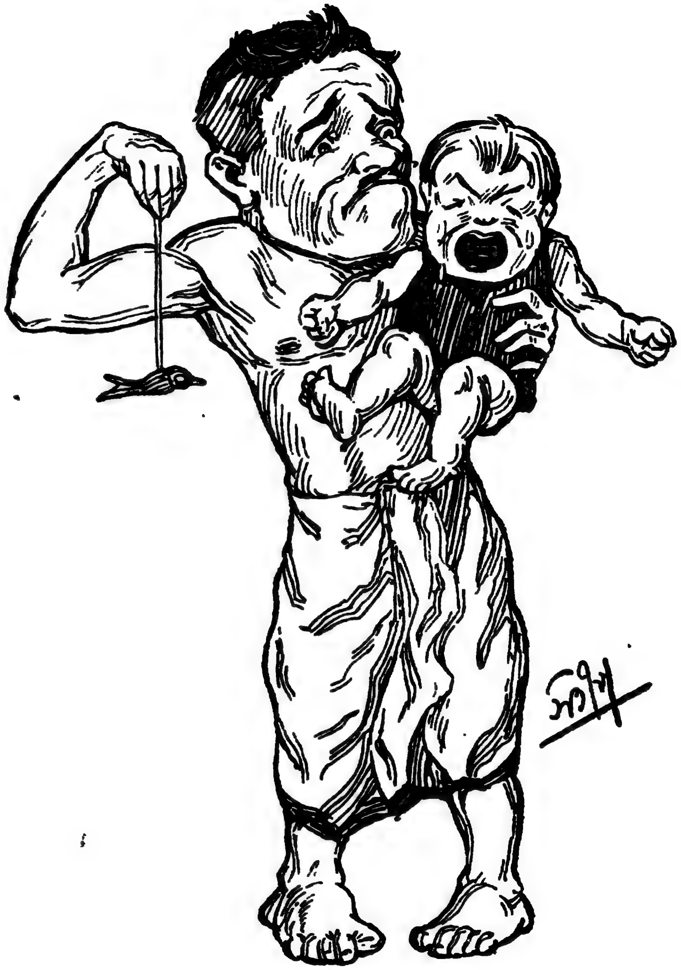

আব্দার ধরেছে ছেলে ঘোড়া খাব বোলে।
কাঠের পাখা দেখায় বাবা তুলে তারে কোলে ॥

৫স

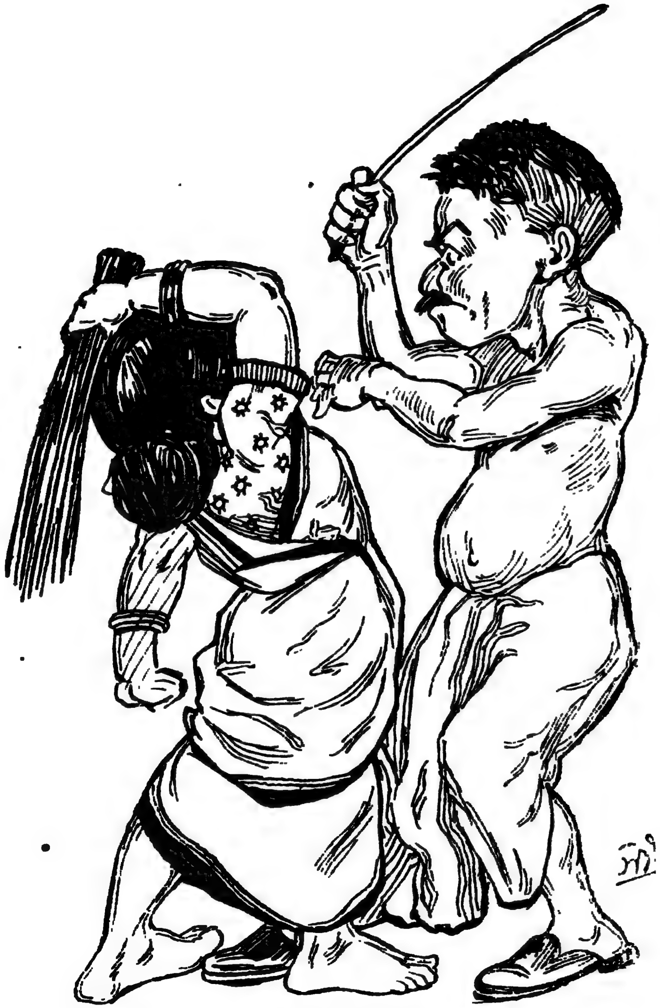

যেম্নি মাগী তেম্নি মিন্সে সংসারের কাঁটা ।
মদ্দা যদি ওঠায় লাঠি মাদী ঝাড়ে ঝাঁটা ॥

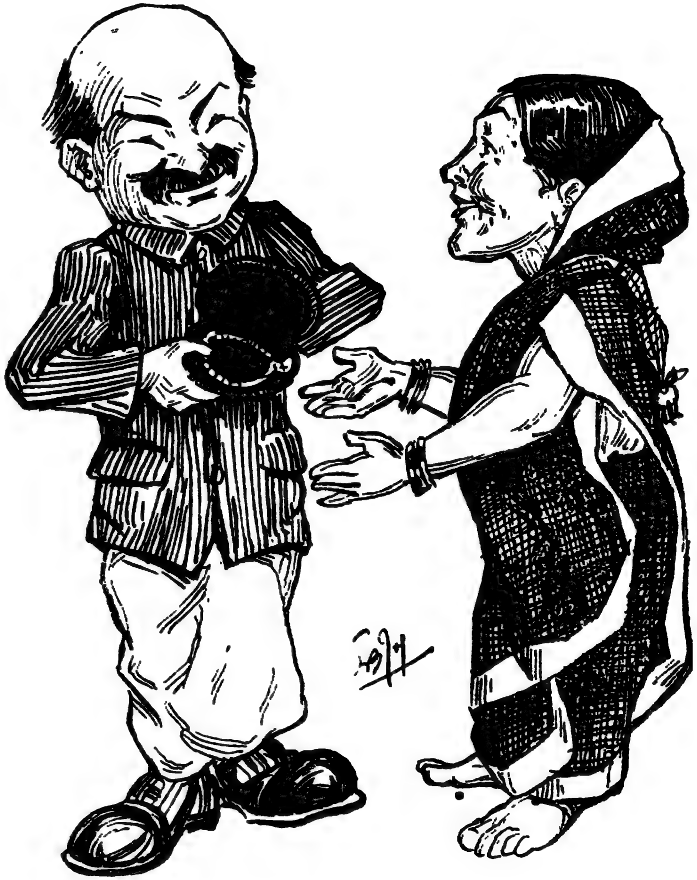

কেস্‌টি খুলে নেক্‌লেস ছড়া কত্তা দেখান হেসে
পেটে পাড়া বেঁটে গিন্নি আহ্লাদে যান ভেসে

রৌদ্র

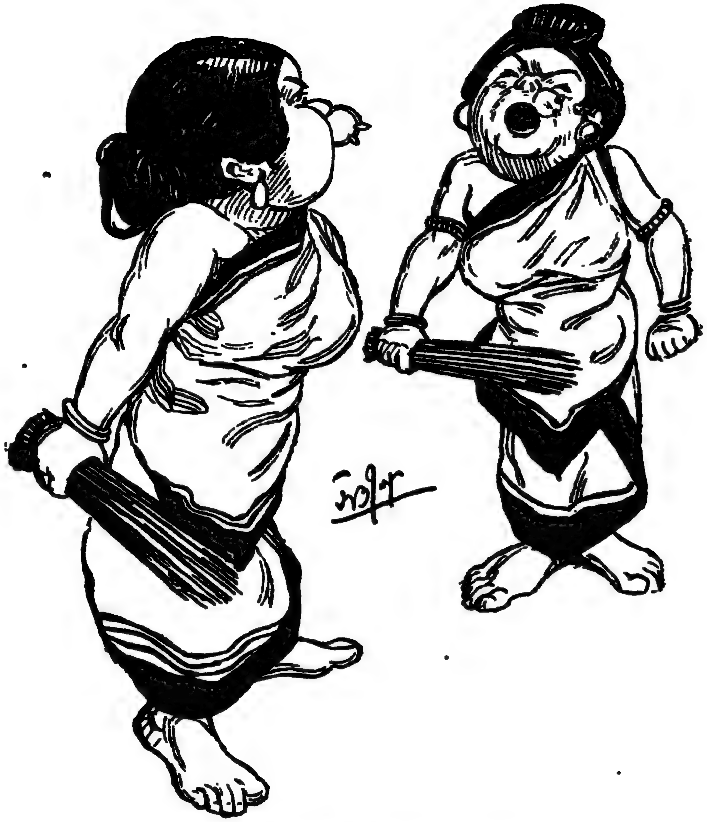

“যদি কলহে দু’ নারী মিলাইতে পারি,
পিশাচ পালায় ডরে।”
ধরেছে হাতেতে ঝাঁটা, তুলে সতীনের কাঁটা,
করে প্রেতকীর্ত্তি ঘরে॥

বীর

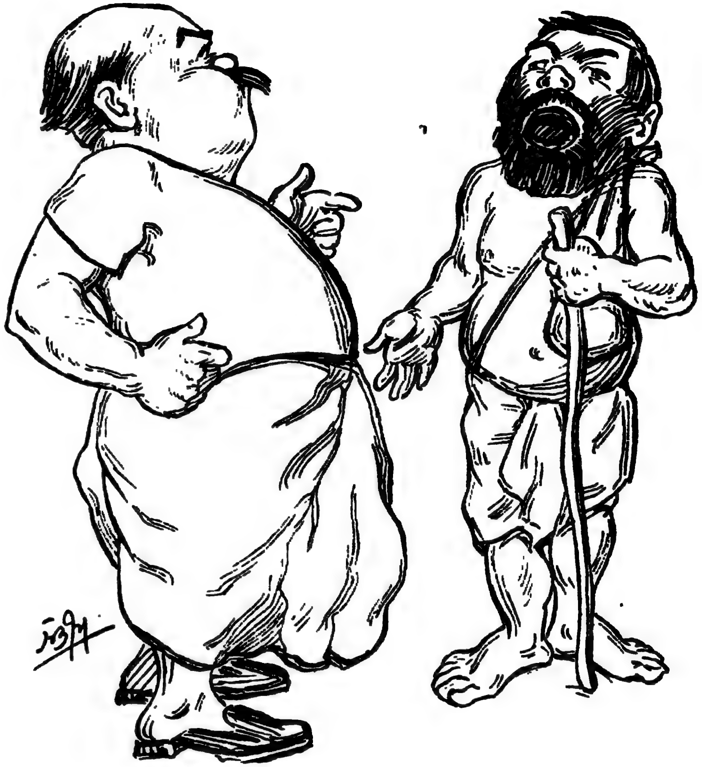

মুখখানি ঝুঁড়ি ফুলাইয়ে ভুঁড়ি
ভিখিরি তাড়ায়।
রাসভারি ব’লে মুরুব্বিমহলে
নাম এঁর পাড়ায়॥

অদ্ভুত

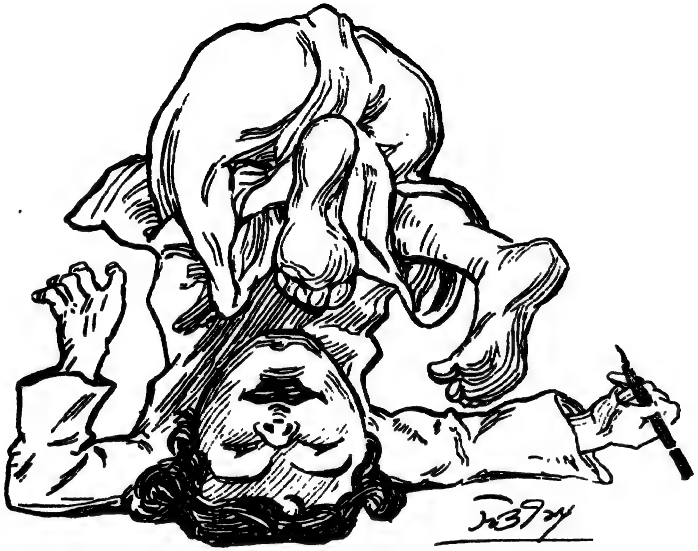

লিখ্‌তে লিখ্‌তে ভাব এসেছে আহ্লাদে আড়ষ্ট।
পত্যের জন্যে চোদ্দ গুন্তে চেহারাখানা নষ্ট॥

শান্ত

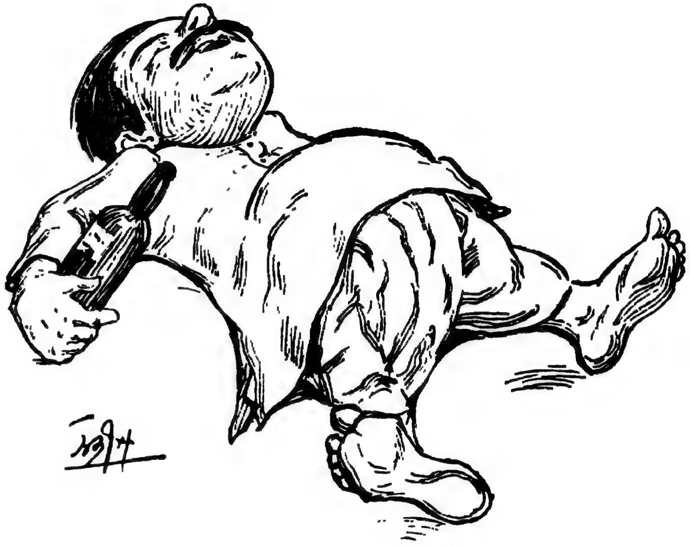

শান্তশিষ্ট ভদ্র বাবু নিদ্রা আর ভোজন।
ক্লান্তি হরণ কত্তে কেবল বোতল্ প্রয়োজন॥

রুসিয়ার গৃহহীন

মহাযুদ্ধের সময়ে রুসিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে এক শ্রেণীর গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন বালক-বালিকা দেখা দিয়াছে, ইহাদের নাম 'বেজপ্রিজোরনি' বা আশ্রয়হীন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন রুসিয়ার রুমানফ রাজবংশের পতন হয়, তখনও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল না, বর্ত্তমানে য়ুরোপের অন্য কোনও দেশে এই শ্রেণীর সংখ্যাতীত বালক-বালিকা নাই।

এই আশ্রয়হীনরা সংখ্যায় বহু লক্ষ। ইহারা কাহারও নহে, ইহাদের অভিভাবক নাই, ইহারা সহরের পথে পথে, গ্রামের বাজারে, হাটে, রেলে, ষ্টীমারে জনতা বৃদ্ধি করিয়া যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে। মহাযুদ্ধের সময়ে ও দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে ইহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিহত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত হইয়াছে, অথবা রোগে শোকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার রাজ্যে ইহাদের মত দুর্ভাগ্য জীব আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। কোমল-কিশোর বয়সে যাহাদের আপনার জন বলিতে কেহ থাকে না, তাহাদের মত দুর্ভাগ্য জীব জগতে কেহ থাকিতে পারে না।

এই আশ্রয়হীনরা গ্রাম হইতে নগরে, নগর হইতে গ্রামে শত শত মাইল হাঁটিয়া বা বিনা টিকিটে ফাঁকি দিয়া রেলে চড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে,—যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও মুখের অন্ন, দেহের আচ্ছাদন জুটে! কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহে না, কেন না, কাহারও সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। আহার না পাইলে তাহারা আহার্য্য চুরি করে। চুরি হইতে রাহাজানি, বাটপাড়ি, নরহত্যা অধিক দূর নহে। তাহাদের মধ্যে ১০ বৎসরের বালকও জানে না, তাহার ঘর-বাড়ী কোথায় ছিল, কে তাহার পিতা-মাতা, কে বা তাহার আত্মীয়-স্বজন। গৃহস্থ সংসারের ভোজন ও শয়ন কাহাকে বলে, তাহাও সে জানে না। এই কোমল বয়স হইতেই এই শ্রেণীর বালক-বালিকা সকল রকম পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে,—চুরি, বাটপাড়ি, জুয়াখেলা, মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যভিচার, লুকাইয়া থাকিয়া ডুক্কাযোর প্রতীক্ষা করা,—এ সকল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর তরুণদের শৈশব ও কৈশোর দেখা দেয় না, ইহারা একেবারেই পাপে অভ্যস্ত বর্ষীয়ান্ পুরুষে পরিণত হইতেছে।

ইহারা পাপে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, পাপকে পাপ বলিয়াই মনে করে না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক সহরের একটা ভূগভস্থ কক্ষে কয়েকটা আশ্রয়হীন বালক আশ্রয় লইয়াছিল; ইহাদের বয়স দশ হইতে কুড়ির মধ্যে। দিনে চুরি-রাহাজানি করিয়া ইহারা ঐ কক্ষে রাত্রিযাপন করিতে সমবেত হইত। এক দিন আর একটি নূতন ছোকরা তাহাদের দলে ভর্ত্তি হইল। এই ছোকরার পোষাক-পরিচ্ছদ একবারে টেনা নহে। কাযেই উহার পরিচ্ছদের উপর অন্যান্য বালকের লোভ হইল; এক দিন রাত্রিকালে তিনটা বালক তাহাকে আক্রমণ করিল; এক জন তাহার মাথা ধরিয়া রহিল, দ্বিতীয় তাহার পদদ্বয় ধরিয়া রহিল, তৃতীয় তাহার মুখগহ্বরে বলপূর্ব্বক ঝুল পূরিয়া দিতে লাগিল। শেষে ঐ হতভাগ্য বালক শ্বাসরুদ্ধ

রুসিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর আশ্রয়হীন তরুণসঙ্ঘ

অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিল। তখন তাহার হত্যাকারীরা তাহার জুতা, জামা ইত্যাদি ভাগ করিয়া লইল। এই নরহত্যাকে তাহারা একটা গুরু পাপ বলিয়া একবারও মনে করে নাই। পরে উহারা ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর বালকের দেহ ও দেহের আচ্ছাদন শতগ্রন্থিযুক্ত বসন অপরিষ্কৃত, ধূলিমলিন, দুর্গন্ধযুক্ত, উহারা প্রকাশ্যে পথে বসিয়া জুয়া খেলে, কদর্য্য ভাষায় পরস্পর গালিগালাজ করে, মারামারি হাতাহাতি করে। লজ্জা বা মান অপমান বলিয়া কোন কিছুরই সহিত ইহাদের পরিচয় নাই। এমনও দেখা যায়, ইহারা পথের কুকুর-বিড়ালকে গলা টিপিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে, ইহাতে কোনও দয়া-মায়া প্রদর্শন করে না। মনটা তাহাদের এতই ছোট হইয়া গিয়াছে যে, নিষ্ঠুরতা বা বর্ব্বরতাকে তাহারা মন্দ বলিয়া ধারণাই করিতে পারে না। ইহাদের সংখ্যা যে কত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এক মস্কো সহর ও সহরতলীতে ইহাদের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও অধিক। য়ুক্রেণ, ককেশাস ও বৃহৎ রুসিয়া ছাড়িয়া দিলে এক খাস রুসিয়ায় ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সহরে বাস করে। ইহাদিগকে বাজারে, পার্কে, রেল ষ্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে, মেলায় প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদিগকে দেখিলেই লোক নিজ নিজ পকেট সামলাইতে থাকে। পাখীদের মত ইহারা শীতকালে উত্তর-রুসিয়া হইতে দক্ষিণ-রুসিয়ায় চলিয়া যায়,—কারণ, সে অঞ্চলে গরম কাপড়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আবার গ্রীষ্মকালে উত্তরের বড় বড় সহরে স্থান পরিবর্ত্তন করে, সে সব সহরে চুরি-বাটপাড়ির দ্বারা জীবিকার্জ্জন সহজে সুগম হয়। আরও দুঃখের কথা, এই শ্রেণীর বালিকারা অতি অল্পবয়স হইতেই দেহ বিক্রয় করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতে শিখে!

এই বালকদের মধ্যে যাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, তাহাকে মাত্র নয় বৎসরের দেখায়। তাহার নয়ন দুইটি এই বয়সেই কোটরগত, সর্ব্বদা ভয়-চকিত, মুখমণ্ডল একবারে পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু অযত্নে, অনাদরে, অর্দ্ধাশনে, অনশনে দেহ শীর্ণ ও শুষ্ক। সে জন্মাবধি কখনও স্কুলে যায় নাই, লেখাপড়া করে নাই, বাল্যাবধি অসৎসঙ্গে মিশিয়া পাপের সকল প্রবৃত্তিই আয়ত্ত করিয়াছে, সর্ব্ববিধ শপথ করিতে শিখিয়াছে, সকল পাপেই রত হইয়াছে। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে বালক-বালিকা কত সুন্দর, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ও রুসিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে যে শ্রেণীর বালক-বালিকার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই কষ্টকর। ইহা যে কেবল রুসিয়ার পক্ষে লজ্জা ও দুঃখের বিষয়, তাহা নহে, ইহা জগতের সভ্য দেশের তাবৎ প্রাণীরই পক্ষে ভাবিবার কথা। যদি জগতের ৩ লক্ষ বালক-বালিকা জীবনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গমকালে এইভাবে পাপের পঙ্কিল-পথে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? মনুষ্যসমাজের পক্ষেও কি ইহা বিষম ক্ষতির কথা নহে?

আমাদের দেশেও এক নিম্ন শ্রেণীর বালক-সম্প্রদায় আছে। তাহারা শৈশব হইতেই পথের ধূলায় মানুষ হয়, ভয়ঙ্কর শপথ ও গালিগালাজ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করিতে শিখে। এই শ্রেণীর বালকরা চুরি, গাঁট কাটা প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রথমাবধি শিক্ষিত হয়। তবে রুসিয়ার বালকদের সহিত তাহাদের প্রভেদ এই যে, তাহাদের তথাকথিত এক শ্রেণীর অভিভাবক থাকে, তাহারা তাহাদিগকে পাপকার্য্য শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করে, বিনিময়ে তাহাদিগকে আশ্রয় ও আহার্য্য পরিধেয় প্রদান করে। রুসিয়ার বালক-বালিকাদের কিন্তু কোনওরূপ 'অভিভাবক' নাই, তাহারা স্বয়ং নিজেদের

আশ্রয়হীনা, ছিন্নবসনা তরুণীগণ.

অভিভাবক। তাহাদের পেশাকে তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে,—(১) Dry trade, (২) Wet trade. Dry trade বলিতে শুষ্ক পেশা অর্থাৎ ভিক্ষা, চুরি, বাটপাড়ি, রাহাজানি ইত্যাদি বুঝায় এবং Wet trade বলিতে খুন-জখম ও রক্তপাত দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বুঝায়। ইহাদের ভিক্ষা করিবার প্রথাও অভিনব। আমাদের দেশে হাওড়া বা পূর্ব্ববঙ্গ রেলে যেমন ভিখারী বৈষ্ণবরা গান করিয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ ভিক্ষা করে, ইহারাও তেমনই সরকারী পার্কে, বাজারে বা রেলে, বাসে গান করিয়া ভিক্ষা করে। দুইটা কাঠের চামচ বা দিয়াশালাইয়ের বাক্স বাজাইয়া ইহারা গান করে। গানের মর্ম্ম এইরূপ :—আমরা আশ্রয়হীন, আমাদিগকে কেহ দেখে না, আমাদের জীবন দুর্ব্বহ, আমরা মরিয়া গেলেও আমাদিগকে গোর দিবার কেহ নাই, ইত্যাদি। এক এক বালক সঙ্গীত দ্বারা এইরূপে লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া দিনে গড় পড়তায় ৮০ কোপেক (রুসিয়ান মুদ্রা) অর্জ্জন করে।

ইহাদের চুরি করিবার প্রথাও অভিনব। প্রত্যূষে যখন কৃষকরা ফল-মূল ও তরিতরকারি বোঝাই গাড়ী হাঁকাইয়া সহরের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন বালকরা গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া ছুরি দিয়া তরকারি বা ফল-মূলের থলিয়া চিরিয়া দেয় : সারা পথ গাড়ী হইতে ফল-মূল তরিতরকারি বৃষ্টি হইতে থাকে। তাহার পর তাহারা ঐ সকল সংগ্রহ করে। ধরা পড়িলে বিষম মার খায়, রাজদ্বারে দণ্ডিতও হয়। কিন্তু উহা তাহাদের ব্যবসায়ের অঙ্গ! এক মস্কো সহরেই গত বৎসর পাঁচ হাজার বালকবালিকা চৌর্য্যাদি অপরাধে আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, আর সারা সোভিয়েট য়ুনিয়নে এইরূপ ৩০ হাজার বালকবালিকা আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে দলপতিও আছে। এক এক দলের এক এক জন দলপতি। দলপতিরাও ১৬।১৭ বৎসরের বালক। দলপতিরা অভিনব উপায়ে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ঘুসি, লাথি, চড় শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রধান উপায় ; ছুরি স্তায়বিচার করিবার প্রধান অস্ত্র। দল ত্যাগ করা ইহাদের মধ্যে প্রধান পাপ ; দলের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা মহাপাপ।

তবে গত বৎসর হইতে রুসিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই বালকবালিকা-সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ব্যয় বরাদ্দ করিতেছেন। এতদর্থে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ রুবল (২ কোটি ৩ লক্ষ ডলার ; ১ ডলার=৩৵০) ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। রুসিয়ার সোভিয়েট সরকার এই আশ্রয়হীনদের জন্ত Nochleshkas অথবা নিশাবাসসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আশ্রয়হীনরা সন্ধ্যার পর এই সকল সরকারী আশ্রমে হাজিরা দেয়, সমস্ত রাত্রি তথায় যাপন করে, আবার রাত্রি প্রভাত হইলে যদৃচ্ছ আহার অন্বেষণে নির্গত হয়। সোভিয়েট সরকার ইহাদের শিক্ষার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। যাহাতে তাহারা সামান্ত শিক্ষা করিয়া জীবিকার উপযোগী কোনও ব্যবসায় বা শিল্পকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তাহার জন্ত কারখানা ও গোলাবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপাততঃ রুসিয়ার আশ্রয়হীনের সরকারী আশ্রয়সমূহে ২ লক্ষ ৯০ হাজার আশ্রয়হীন বালকবালিকা আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ৩ হাজার জনকে কারখানা ও গোলাবাড়ীতে শিক্ষার্থ প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। অবশিষ্ট আশ্রয়হীনের জন্ত কেবল রাত্রিবাসের সুবিধা আছে। গভর্ণমেণ্টের তহবিলে এমন অর্থ নাই যে, এই সমস্ত আশ্রয়হীনকে শিক্ষা দান করিবার সুযোগ হয়। লেনিনগ্রাডে মাত্র ৪ শত ৭৪ জন এবং মস্কো সহরে মাত্র ২ শত ৫০ জন বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই যে আশ্রয়হীন পাপে অভ্যস্ত বিরাট তরুণসঙ্ঘ,—ইহাদের ভবিষ্যৎ কি? সে ভবিষ্যৎ কেবল যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা নহে, ভয়াবহও বটে। আজ রুসিয়ান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেশের আশ্রয়হীন অসংখ্য বালকবালিকার আশ্রয়,শিক্ষা বা গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি? কারণ কিছুই নহে,—অর্থাভাব। বিপ্লবের সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ রুসিয়াকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। রুসিয়াও সে জন্ত 'পারিয়া' অস্পৃশ্যের মত হইয়া রহিয়াছে। তাহার বাণিজ্য-ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থাগম হইবে কোথা হইতে? ভাঙ্গনের পর গড়ন হইতে সময় লাগে। সে সময় রুসিয়াকে দেওয়া সকল সভ্য জাতিরই কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হয় নাই। কাযেই রুসিয়ার আশ্রয়হীন তরুণসঙ্ঘ পাপের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা যখন বড় হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তখন প্রাণধারণের জন্ত তাহারা সকল পন্থাই অবলম্বন করিবে। ইহার জন্ত তাহারা যে কেবল রুসিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। সুতরাং যখন তাহারা য়ুরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের পাপানুষ্ঠানের প্রভাব হইতে কে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? য়ুরোপের শক্তিশালী সভ্য জাতিসমূহ এ সমস্তার কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

পারস্যের জাগরণ

শাহ রেজা খাঁ পহ্লবী পারস্তের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতে পারস্তকে আধুনিক য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা হইতেছে। সৈন্তশ্রেণীর ত কথাই নাই, শাসন, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি সকল বিভাগেই নব-জাগরণের নিদর্শন দেখা যাইতেছে। পারস্তকে প্রাচ্যে শক্তিশালী করিবার জন্য যত দূর সম্ভব ঐহিক উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে।

একটা দৃষ্টান্ত এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পারস্যে যে কোনও কালে শৃঙ্খলাসঙ্গত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা কাজার বংশের শাসনকালে মনে হয় নাই। এখন পারস্যে অরাজকতা ও দস্যুভয় প্রায় দূর হইয়াছে বলিলে হয়। শাহ রেজা খাঁ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধা হইয়া থাকে। এখন তাহা সম্ভব হইয়াছে। পারস্যে উড়োকলের সাহায্যে যাত্রী ও মাল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় ২ বৎসর তর্ক-বিতর্ক ও লেখাপড়ার পর পারস্ত মজলিস জার্ম্মাণ জাঙ্কার্স কোম্পানীকে ৫ বৎসরের জন্ত বে-সামরিক উড়োকল চালাইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। প্রথমে টিহারাণ হইতে এঞ্জেলী, বুসায়ার ও বারাটু পর্য্যন্ত উড়োকলে যাত্রী, সরকারী ডাক এবং মাল বহনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। শীঘ্রই কোম্পানী সর্ব্বপ্রত যাত্রী ও মাল বহন করিতে আরম্ভ করিবেন। য়ুরোপের সহিত পারস্তের সম্বন্ধও রাখা হইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ জন্য পারস্তসরকার প্রত্যেক কিলোমিটার ভ্রমণের জন্য কোম্পানীকে ৩ ক্রাণ করিয়া সাহায্য দান করিবেন এবং সরকারী ডাক বহনের জন্য মাসিক ২০ হাজার ক্রাণ (৫ শত পাউণ্ড) ভাড়া দিবেন। জাঙ্কার্স কোম্পানীর কল-কব্জা প্রভৃতি কাষ্টম শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবে। জাতির প্রয়োজনের সময়ে কোম্পানীকে সরকারের ব্যবহারের জন্য উড়োকল দিতে হইবে। কোম্পানীকে পারস্তে একটি উড়োকলের কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং দুইটি পারসীক ছাত্রকে খরচা দিয়া প্রতি বৎসর জার্ম্মাণীতে উড়োকল-বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পারস্তে কয়েক জন পারসীককে উড়োকল উড়াইবার এবং উড়োকলের মিস্ত্রীগিরি করিবার নিমিত্ত কোম্পানীকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, টিহারাণে একটি বড় রকমের উড়োকলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ঐ স্থানে যাহাতে উড়োকল মেরামতের ব্যবস্থা হয়, তাহা করিতে হইবে। পরে পারস্তের আইনানুযায়ী একটি পারসীক

উড়োকল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে হইবে এবং পারস্যের অন্যত্র উড়োকল গতায়াতের সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। পরন্তু মেসেদ, টিহারাণ ও তাব্রিজ হইয়া মহাচীন পর্য্যন্ত উড়োকল যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে পারস্যে জার্ম্মাণ জাঙ্কার কোম্পানীর ৪ খানা উড়োকল আছে। আরও কয়খানা উড়োকল জার্ম্মাণী হইতে পারস্যের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে। টিহারাণ হইতে এঞ্জেলি পর্য্যন্ত যে উড়োকলের লাইন খোলা হইতেছে, উহার সহিত বাকু হইতে মস্কো লাইনের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া হইবে; তাহা হইলেই ক্রমে পারস্য হইতে জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত উড়োকলের পথ প্রস্তুত হইবে। তাহার পর যখন কায়রো হইতে করাচী লাইন খোলা হইবে, তখন ঐ লাইনেরও সহিত পারস্যের উড়োকল-লাইনের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এইরূপে পারস্যকে আধুনিক প্রতীচ্যের 'সভ্যতার' প্রভাবের মধ্যে আনয়ন করিবার ভিত্তিপত্তন হইতেছে। ইহার ফলে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

মহাচীনের গৃহ-যুদ্ধ

ডাক্তার এ, জেলওয়েগার চীনের সাংহাই সহর হইতে স্থলপথে ভারতযাত্রাকালে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চীনের পরিণামের বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায় না। চীনের খৃষ্টান সেনাপতি মার্শাল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ কি ভাবে স্বদেশের মুক্তিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দেশপ্রেমিক যে সময়ে দেশের উত্তরাংশে অর্থাৎ রাজধানী পিকিনের সান্নিধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে চীনের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে টুচুন বা স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা (সেনাপতিরা) পরস্পর আত্মকলহে দেশকে ছারেখারে দিতেছেন। এমন কি, তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, এক জন সেনাপতি মার্শাল ফেঙ্গের মস্তকের উপর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মার্শাল ফেঙ্গ তাঁহার পরিবারবর্গকে চীনে রাখিতে সাহস করেন নাই, তাহাদিগকে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা সহরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেশের অবস্থা শোচনীয় না হইলে যে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী সেনাপতি এরূপ করিতেন না, ইহা নিশ্চিত। কুয়োমিণ্ট্যাং দলভুক্ত চীন টুচুনরা 'স্বাধীনতার' নামে দেশে অরাজকতা আনয়ন করিতেছে বলিয়া রটান হইতেছে; এই দল ফেঙ্গের দল। পরন্তু জাপানের আশ্রিত জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে এবং পিকিনের সান্নিধ্যে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে পড়িয়া মার্শাল ফেঙ্গের চীনকে বড় করিবার, চীনকে স্বাধীন করিবার সঙ্কল্প ক্রমেই আকাশকুসুমে পরিণত হইতেছে।

ডাক্তার জেলওয়েগার যে এই প্রথম স্থলপথে সাংহাই হইতে চীনের বক্ষ ভেদ করিয়া ভারতযাত্রা করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বে সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড একবার পিকিন হইতে লাসা হইয়া দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বনভালুট, ওয়েলবি, ওয়াড এবং অর্লিয়ান্সের প্রিন্স হেন্‌রীও তাঁহার পূর্ব্বে চীনের মধ্য দিয়া স্থলপথে ভারতের দিকে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে সময়ে পরিব্রাজক ও আবিষ্কারকরূপে চীন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে চীনে বর্ত্তমান কালের মত অরাজকতা ও অশান্তি ছিল না, তখন মাঞ্চু-সম্রাটদিগের শাসনাধীনে চীনে বৈদেশিক পাশ্চাত্য জাতীয় লোকের জীবন বিপদশূন্য ছিল। এখন গৃহ-বিবাদের ফলে চীনের সে অবস্থা আর নাই। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির যে যাতনা হয়, নব-জাগ্রত চীনের প্রকৃত 'স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে সেই যাতনা হইতেছে। চীন এখন যে যাতনার মধ্য দিয়া আপনার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার ফলে চীনে এখন কাহারও জীবন বিপদশূন্য নহে।

ডাক্তার জেলওয়েগার সাংহাই হইতে যে পথে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে পথ ঘোর বিপৎসঙ্কুল, তথায় অরাজকতা ও অশান্তির তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। চীনে বৈদেশিকের যত বিপদই হউক না কেন, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই আভাস পাইয়া চীনের অশান্তিকামী লুণ্ঠনপ্রয়াসী দস্যুদল চীনের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেছে। মার্কিণ অগ্রণী হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনও বৈদেশিক শক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কেন না, চীন স্বাধীন; তাহার আভ্যন্তরীণ অশান্তি চীন নিজে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে চীনের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে অসংখ্য কর্ত্তা দেখা দিয়াছে, তাহারা এক এক অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা বা সেনাপতিরূপে আপনাদিগকে জাহির করিতেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা দস্যুদলপতি ব্যতীত কিছুই নহে। দলপতির লোকজন নিয়মিত বেতন পায় না, অন্নবস্ত্র পায় না, কাযেই লুণ্ঠন ভিন্ন তাহাদের জীবিকার অন্য উপায় নাই। এক দলপতির লোক নিজ হদ্দার মধ্যে শাসন-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও অন্য দলপতির হদ্দার মধ্যে লুণ্ঠন না করিলে খাইতে পায় না। কাযেই দলপতিরা পরস্পর পরস্পরের হদ্দার লোকের সম্পত্তি বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, লোককে ধরিয়া আটক করিয়া তাহার মুক্তির জন্য অর্থ দাবী করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে পিকিন-সরকার এই অর্থ দিয়া লোকের মুক্তিসাধন করিতেছেন। যদিও এই সমস্ত দূরবর্ত্তী প্রদেশের উপর পিকিন সরকারের কোনও কর্তৃত্ব বা প্রভাব নাই, তথাপি পিকিন-সরকার এই সমস্ত দূরবর্ত্তী স্থানের সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতে সমর্থ, এইটুকুই আশ্চর্য্য! মার্শাল ফেঙ্গ নিজ হদ্দার মধ্যে শক্তিশালী শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী গঠন করিয়াছেন এবং সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, এ কথা সত্য, কিন্তু দূরবর্ত্তী অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার মত অর্থ ও লোকবল এখনও তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পিকিনের দক্ষিণ হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত সুশাসনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। সান্‌সি, সেন্‌সি ও সান্‌টাঙ্গ প্রদেশ তিনটির ৩ জন শাসনকর্ত্তা আছেন। তাঁহাদের শিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যও আছে বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু তাহার পরেই ইয়াংসি নদীর উভয়তটস্থ প্রদেশের, কোয়াঙ্গ অঞ্চলের, য়ুয়ান্ অঞ্চলের এবং জেচুয়ান্ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তারা দস্যুদলপতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সমস্ত অঞ্চলে চীনের সরকারী বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সাহসী ও অত্যাচারী দস্যুদলপতির অধীনে পরিচালিত হইতেছে। দরিদ্র গৃহস্থ ও কৃষকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এই সকল দস্যুদলের হস্তে আধুনিক ম্যাগাজিন রাইফল এবং মেসিন-গান আছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহকালে বক্সারদের তরবারি ব্যতীত অন্য অস্ত্র ছিল না, তাহারা দেশের মুক্তির জন্য দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদেশীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে চীনের এই সকল দস্যুদলের সে উচ্চ আদর্শ নাই,—তাহাদের লক্ষ্য লুণ্ঠন, হত্যা ও স্বার্থসাধন। হস্তে তাহাদের আধুনিক অস্ত্রেরও অভাব নাই। সুতরাং লুণ্ঠনে তাহাদিগকে বাধা দিবে কে?

জাতি যখন আদর্শ হইতে চ্যুত হয়, জাতি যখন নেতৃবিহীন হয়, তখন এমন অবস্থাই হইয়া থাকে। স্বার্থ যখন দেশপ্রেম হইতে বড় বলিয়া বোধ হয়, তখন পরস্পর গৃহ-বিবাদের উদ্ভব হইয়া থাকে, আর তাহাতেই দেশ উৎসন্নের পথে অগ্রসর হয়। মার্শাল ফেঙ্গ একাকী এই অরাজকতা ও স্বার্থ-সমুদ্রের তুফান রোধ করিবেন কিরূপে?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

মিলন-সেতু

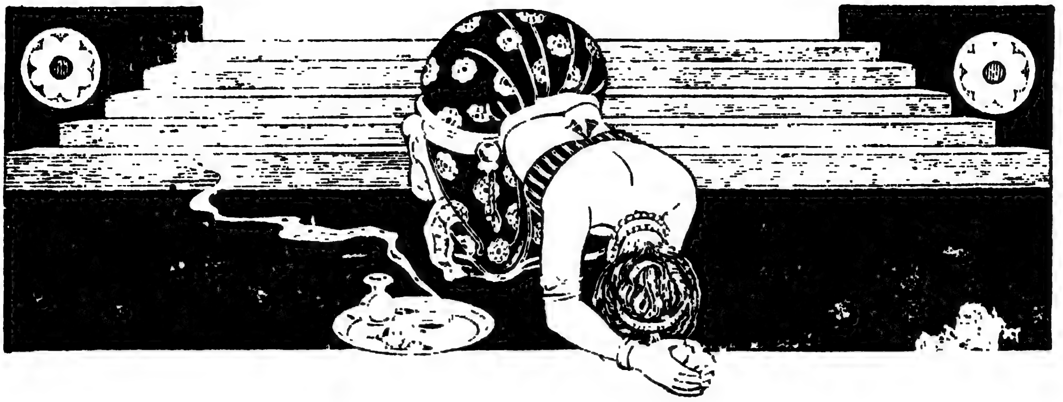

১

"প্রভাস !"—

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও গাঢ় হইয়া আইসে নাই। কর্ম্মশ্রান্ত শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবক হেদোর ধারে—উদ্যান-মধ্যে পরিক্রমণ করিতেছিল। কেহ কেহ সমবয়স্ক পরিচিতদিগের সহিত কাষ্ঠ বা তৃণাসনে বসিয়া গল্পের আসর জমাইয়া তুলিতেছিল।

অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে, একটি কাঁঠালি চাঁপার ঝোপের পার্শ্বে এক জন কিশোর নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সুগৌর আননে ক্ষোভ ও বিরক্তির ম্লান ছায়া। সহসা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল।

আগন্তুক কিশোরের স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তুই এখানে এসে ব'সে আছিস্!—আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি।"

প্রভাসকে নিরুত্তর দেখিয়া সে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "অমন ক'রে আছিস্ কেন, ভাই? বিকেলবেলা তোদের মেসে গিয়ে শুন্‌লুম, সেখানে তুই নেই। অজিতদের বাড়ী গেলুম, সে তোর খোঁজ দিতে পারলে না। শেষে এখানে এলুম।"

প্রভাসের ম্লান মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকার সাদাতের দৃষ্টি হইতে তাহা গোপন করিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে তাহার বলিষ্ঠ করপ্রকোষ্ঠমধ্যে বন্ধুর কোমল করপুট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মনে কষ্ট ক'রে কি কর্‌বি বল? আমি বরাবর ব'লে আস্‌ছি, আমার কথামত চল্, তা হ'লে দেখবি, লেখাপড়ায় যেমন তুই জয়মাল্য নিয়েছিস্, ভবিষ্যতে সকল বিষয়েই তেমনই তুই প্রধান হ'তে পার্‌বি।"

শৈশব-সহচর, অকৃত্রিম সুহৃদ, সতীর্থ সাদাৎ হোসেনের আন্তরিকতাপূর্ণ উৎসাহ-বাক্যে প্রভাসের সুন্দর নয়নযুগল একবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাই হবে।"

তরুণ সাদাৎ তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধুর অন্তরের সকল সংবাদ রাখিত। একই পল্লীর অঙ্গনে তাহাদের জন্ম। একই পল্লীমাতার স্নেহশীতল অঞ্চলচ্ছায়ায় তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, একই বিদ্যালয়ে একই সময়ে তাহাদের প্রথম অক্ষরপরিচয় হয়। উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও গ্রামের শান্তশ্রীমণ্ডিত অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস রূপ কোনও দিন প্রকট হইয়া উঠিতে, শুধু তাহারা কেন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণও কখনও দেখেন নাই। পূজাবাটীর প্রাঙ্গণে অথবা মহরম কিংবা পীরতলার উৎসবে গ্রামের সকল সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে যোগদান করিত; সমগ্র পল্লীর কার্য্য হিসাবে প্রত্যেকেই যথাসাধ্য শক্তি অনুসারে উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। এইরূপ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সাদাৎ ও প্রভাস জীবনপথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া গ্রামের পাঠ সমাপ্ত হইবার পর কলিকাতায় বিদ্যার্জ্জনের জন্য আসিয়াছিল। সাদাৎ জানিত, তাহার শৈশব-সঙ্গী প্রভাসের নবনীত-কোমল দেহের অন্তরালে, কুসুমপেলব অন্তরে দয়া, মমতা ও করুণার যে প্রস্রবণ সর্ব্বদা উৎসারিত হইত, তাহা সহসা অন্যত্র দুর্লভ এবং সে ইহাও

জানিত, কুসুমের মত কোমলচিত্ত হইলেও প্রভাসের মনে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রভাস কলিকাতার মেসে থাকিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সাদাৎ প্রভাসের মত লেখাপড়ায় কৃতিত্ব লাভ না করিতে পারিলেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং উভয়ে একই কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল। তবে তাহাকে মেসে থাকিতে হয় নাই। তাহার খুল্লতাত কলিকাতার কোনও সরকারী আফিসে বড় কায করিতেন, তাঁহারই বাসায় সে আশ্রয় লইয়াছিল।

বিবিধ প্রকার ব্যায়ামে সাদাৎ গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল এবং তাহার কিশোর দেহে শক্তিচর্চ্চার পরিচয় মূর্ত্ত হইয়াছিল। উভয় বন্ধুর মধ্যে পর্য্যাপ্ত প্রতিভা ছিল। প্রভাস বীণাপাণির প্রিয় পুত্র, সাদাৎ চণ্ডিকার প্রিয় সন্তান। কলেজের ছাত্রগণ এই যুগল বন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দকে শ্রদ্ধা করিত। ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া সে সময় যে ভাবপ্রবাহ বন্যার ধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছিল, তরুণের দল তাহাতে অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করিয়াছিল।

সে দিন রবিবার। প্রভাতে কোনও সহপাঠীর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে প্রভাস দেখিল যে, এক জন বৃদ্ধা ভিখারিণীকে কয়েক জন বালক বিরক্ত করিতেছে। তাহারা যে সকলেই ভদ্র বংশের, তাহাদের ব্যবহারে প্রভাস তাহার পরিচয় পাইল না। কোনও দুষ্ট বালক ভিখারিণীর রুক্ষ কেশপ্রান্ত ধরিয়া এমন বলে আকর্ষণ করিল যে, ভিখারিণী মাটীতে পড়িয়া গেল। এই অনাচার অনুষ্ঠান প্রভাসের চিত্তকে উত্তেজিত করিল। সে বালকদিগকে তাড়া দিতেই একটা গোলমাল হইল। অমনই কয়েক জন যুবক প্রভাসের ধৃষ্টতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে ঘিরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সে কোনও দিন শক্তিচর্চ্চা করে নাই, কাযেই তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইল। বন্ধুর সন্ধানে সাদাৎও বাহির হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। মুষ্টিযুদ্ধের কৌশলে, বলিষ্ঠ বাহুযুগলের সাহায্যে সে আততায়িগণকে হটাইয়া দেয়। তার পর কতিপয় ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় বিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

নিজের শক্তিহীনতায় প্রভাস এমনই অনুতপ্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মনের জ্বালা জুড়াইবার অভিপ্রায়ে, সে হেদোর ধারে আসিয়া বসিয়াছিল।

গম্ভীর স্বরে সাদাৎ বলিল, “প্রভাস, তোকে শুধু ভাইয়ের মত ভাবি, তা নয়। তুই আমার গুরু—তোর আদর্শে আমি নিজের জীবনকে পবিত্র ও মহৎ ক’রে গ’ড়ে তুলবার চেষ্টা কর্‌ছি। তোর জন্য আমার প্রাণ দেওয়া—সেটা বড় কথা নয়; কিন্তু সকল রকমে আমি তোকে বড় দেখতে চাই। মনের শক্তির সঙ্গে তোর দেহের শক্তি এক হ’তে দেখলে, আমার চেয়ে আর কেউ বেশী সুখী হবে কি না জানিনে।”

চৈত্র-বাতাস একটু জোরেই বহিতেছিল। পশ্চিমাকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারে প্রভাসের আয়ত নয়নযুগল আবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে পরিপূর্ণ আগ্রহভরে বলিল, “তোর মত শক্তিশালী ক’রে আমাকে গ’ড়ে তোল্, ভাই।”

নির্ম্মল, সরল, তরল হাস্যে সাদাৎ বলিয়া উঠিল, “পাগল! আমার মত কি রে? তোকে ভীমের মত শক্তিমান হ’তে হবে।”

‘কাল-বৈশাখীর’ আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় বন্ধুযুগল দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিল।

২

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একই সময়ে প্রভাস ও সাদাৎ এম্, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। প্রভাস ইংরাজী সাহিত্যে ডিগ্রী পাইল। বিস্ময়ের বিষয়, সাদাৎ সাংখ্য ও বেদান্ত পড়িয়া দর্শনশাস্ত্রে এম্, এ, উপাধি অধিকার করিল। তাহার এই বিচিত্র মনোবৃত্তির গতি তাহার আত্মীয়স্বজনের সকলের কাছে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট না হইলেও প্রভাসের নিকট আদৌ জটিল বলিয়া অনুভূত হয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই য়ুরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। এই সময়ে সরকারের আহ্বানে মহাত্মা গন্ধীর প্রচেষ্টায় মেসোপটেমিয়ায় দেশীয় পল্টনের কার্য্যে ভারতীয় যুবকদল যোগদান করিয়াছিল। বাঙ্গালী তরুণগণ ‘বাঙ্গালী পল্টনে’ নাম লিখাইতেছিল। উৎসাহের প্রবল বন্যা প্রভাসের চিত্তকেও ভাসাইয়া লইল। পিতা ও

জননীকে কোনও মতে সম্মত করাইয়া প্রভাস রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সাদাতের উপদেশে এবং নিজের অন্তরের প্রেরণাবলে সে কয়েক বৎসর ধরিয়া শক্তিরূপিণী জননীর অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছিল। কিশোর প্রভাস ও তরুণ প্রভাসের শরীরগত পার্থক্য এই কয় বৎসরে বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

রণ-দামামার আহ্বান সাদাতের ধমনীতেও রক্তস্রোতকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতা তখন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া মাতৃভক্ত সন্তান রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিল না।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে প্রভাসকে বলিল, "ভাই, আমার অদৃষ্টে নেই, তুমি যাও। জানি, তুমি যেখানে যাবে, জয়শ্রী তোমাকে বরণ ক'রে নেবে। দূর হ'তে তোমার প্রশংসা শুন্‌লেই আমি সুখী হব। এর চেয়ে বড় আশা—" বলিষ্ঠদেহ সাদাতের নয়নযুগল অশ্রুবাষ্পে আর্দ্র হইয়া গেল।

বিদায়ের দিন প্রভাতে বন্ধুযুগল অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। নবোদিত সূর্য্যের পানে চাহিয়া প্রভাস ধীরে ধীরে বলিল, "ভাই, এ পর্য্যন্ত জীবনের যাত্রাপথে দু'জনে একই ভাবে চল্‌ছিলাম। নূতন অভিজ্ঞতালাভের সময় তোকে ছেড়ে থাকৃতে হবে!"

সম্মুখের দেবদারুগাছের পাতার উপর রৌদ্রকিরণ আন্দোলিত হইতেছিল।

সাদাৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "দুঃখ কি ভাই! সংসারে অনেক কায বাকী। তুই ফিরে এলে, দুই ভাইয়ে মিলে আবার কাম সুরু ক'রে দেব। ভগবান্ তোকে নিরাপদে যেন আমার কাছে ফিরিয়ে দেন।"

বন্ধুযুগলের মস্তক একই সঙ্গে কাহার উদ্দেশ্যে যেন আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল।

গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ তরুণযুগল বহুক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু পবন তাহাদের স্পর্শে মিলনানন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিল।

৩

একনিষ্ঠ সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রভাস নিষ্ঠাভরে শক্তিসাধনা করিতেছিল। যিনি ফলদাতা, তিনি তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন না। বাঙ্গালী পল্টনের শৌর্য্য, বীর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ সামরিক কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসায় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণও পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রভাস যেমন অনায়াসে সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, সামরিক কার্য্যেও সে সেই প্রতিপত্তিকে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। সাদাৎ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল না।

অজস্র প্রশংসা ও যশঃ অর্জ্জন করিয়া প্রভাস দেশে ফিরিয়া আসিল। য়ুরোপের সমরানল নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী পল্টনের দল ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং তাহারও সৈনিকবৃত্তির অবসান ঘটিল।

সংসারপ্রতিপালনের জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন ছিল না। পিতা জমীদার, সুতরাং চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন না করিলে ভবিষ্যতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তথাপি সে কোনও মফঃস্বলের কলেজে অধ্যাপকতা গ্রহণ করিল। ইচ্ছা করিলে সে কোনও সরকারী চাকরী পাইতে পারিত। কিন্তু ভবিষ্যযুগের বাঙ্গালীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার হৃদয়ে একটা প্রবল স্পৃহা জন্মিয়াছিল। উপস্থিত অন্য কোনও পথ না দেখিয়া সে অধ্যাপনার দ্বারা সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করিল।

বাল্য ও যৌবনের বন্ধু সাদাতের সহিত তাহার সর্ব্বদা পত্রব্যবহার হইলেও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। সাদাতের সাংসারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। সে কোনও পিতৃবন্ধুর আগ্রহ ও উপদেশে ব্রহ্মদেশে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রভাসের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়া সাদাৎ লিখিয়াছিল, "বন্ধু, তুমি যে পথ অবলম্বন করিতেছ, তাহা সাধু। ভগবান্ তোমাকে জয়যুক্ত করুন। সংসারের পেষণে আমাকে বিদেশে অর্থার্জ্জন করিতে আসিতে হইয়াছে। আমি জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত। সে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। ব্যবহারিক প্রয়োজনে অ-বাঙ্গালী পরিচ্ছদে থাকিতে হয়, ইহা মর্ম্মান্তিক অভিশাপ। কিন্তু জন্মভূমির স্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি না। আমি যে বাঙ্গালী, বাঙ্গালা যে আমার মা, সে কথা যে দিন বিস্মৃত হইব, সেই মুহূর্ত্তে যেন আমার মৃত্যু হয়। বেশী দিন এই ছদ্ম অভিনয়

আমার দ্বারা হইবে না। শীঘ্রই আমি মায়ের বুকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। তখন দুই ভায়ে আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার চেষ্টা করিব। তখনও তোমার বলিষ্ঠ হৃদয়ের পার্শ্বে আমার স্থান থাকিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।”

৪

সৌধকিরীটিনী, আলোকমালাময়ী কলিকাতা নগরী সন্ধ্যা হইতেই স্তব্ধপ্রায় কেন? যেখানে সর্ব্বক্ষণই পথে অসংখ্য যান-বাহনের অবিরাম শব্দ, ট্রামের ঘণ্টা-নিনাদ, মোটর-বাসের ভেঁপু, দ্বিচক্রযানের ঘণ্টা বা শৃঙ্গধ্বনি, শটকের চক্র-ঘর্ঘর, অশ্বক্ষুরের কর্কশধ্বনি বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, সন্ধ্যার প্রারম্ভেই কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে তাহা নিশীথ রজনীর নিস্তব্ধতায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে? কদাচিৎ কোন মোটর বা বাসের অসম্ভব দ্রুতগতি সেই নিস্তব্ধতাকে যেন আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যাহাকে গ্যাসালোকিত, জনবিরল পথে চলিতে হইতেছে, তাহার শঙ্কিত দৃষ্টি, স্খলিত গমন দেখিলে কি মনে হইবে?

পুলিস-প্রহরি-কণ্টকিত, বন্দুক-বেয়েনটে পরিবৃত বিরাট নগরী—দ্বাদশলক্ষ নরনারী যাহার বক্ষোদেশে নির্ভয়ে বাস করে—নিশীথ রাত্রিতেও চলাফিরা করিতে যেখানে কাহারও মনে কখনও সঙ্কোচের অবকাশমাত্র ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সেই মহানগরীতে সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকার চরণ-স্পর্শ করিতে না করিতেই এ কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!

চুপ! শীঘ্র গৃহের আশ্রয়ে আত্মগোপন কর! পথি-মধ্যে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে গুপ্ত ঘাতুকের শাণিত ছুরিকা তোমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবে—আততায়ীর যষ্টি তোমার মস্তককে সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। পলাও অসাবধান পথিক! দুঃসাহসের পরিচয় দিও না।

তুমি কোন অপরাধ কর নাই? মূর্খ! তাহাতে কি? সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-বিদ্বেষের শাণিত ছুরিকা ব্যক্তিগত অপরাধ বিচার করিয়া জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে না। সে শুধু ধরণীকে উষ্ণরক্তে অভিষিক্ত করিয়া বিশৃঙ্খলার পতাকা উড্ডীন করিতে চাহে। পবিত্র মিলনমন্দিরকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া সে নির্লজ্জ অত্যাচারের মহিমা ঘোষণা করিয়া দেশবাসীকে মৃত্যুর পথে পাঠাইয়া তৃপ্তি-লাভ করিতে চাহে। ভ্রাতা যেখানে ভ্রাতাকে পরম আশ্রয় মনে করিয়া বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া রাখে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সেখানে দানবের তাণ্ডব-নৃত্য ঘটাইয়া একক অপরের বিরুদ্ধে শোণিতপিপাসু শার্দ্দূলের ন্যায় উন্মত্ত করিয়া তুলে।

অসাবধান পথিক! চুপ করিয়া দাঁড়াইলে কেন? তোমার আশ্রয়স্থল কি নিকটে নহে?

আর্ত্তনাদ? উহা ত কয়দিন ধরিয়া সহরবাসীর নিকট নূতন নহে। তবে তুমি কেন অকারণ আপনাকে বিপন্ন করিতেছ? তুমি কি এই সহরে নবাগত? এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা এখনও জানিতে পার নাই?

যুবক উৎকর্ণ হইয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইল। পথের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের সদর দ্বার, তোরণ রুদ্ধ। প্রসুপ্ত রাজপথের কোথাও জনপ্রাণী নাই। প্রাণভয়ে পলায়-মান কোনও ব্যক্তি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। হতভাগ্য কোথায় আশ্রয় লইবে? প্রত্যেক গৃহের দ্বার রুদ্ধ।

পলাতকের পশ্চাতে ভীমদর্শন আট দশ জন ব্যক্তি। কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও মুষ্টিমধ্যে দীর্ঘ, দীপ্ত ছোরা।

বাতাস তাহার আর্ত্তনাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পল্লীবাসীদিগের প্রাণে তাহা কি সাড়া দিল না? দ্বিতলের কোন কোন বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত—আলোকরেখা শঙ্কিত অধিবাসীর মুখে নৃত্য করিতেছে।

পথিক—যুবক মুহূর্ত্তমধ্যে বস্ত্র সংযত করিয়া দাঁড়াইল। তাহার নয়নে আলোক জ্বলিয়া উঠিল—আননের শিরা ও পেশীগুলি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত করিল।

পরমুহূর্ত্তেই পলাতক, যুবকের পার্শ্বে আসিয়াই রুদ্ধশ্বাসে বলিল, “বাঁচাও! বাঁচাও!”

শাণিত ছোরা উদ্যত করিয়া যে বিরাটদেহ পুরুষটি সর্ব্বাগ্রে তাহাকে আক্রমণ করিল, অপূর্ব্ব কৌশলে নিমেষ-মধ্যে যুবক তাহার হস্ত হইতে শাণিত অস্ত্র কাড়িয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীর দেহ সশব্দে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল। সে উঠিতে না উঠিতেই, দ্বিতীয় আক্রমণকারীর অবস্থাও অনুরূপ হইল। তৃতীয় আক্রমণকারীর হস্ত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইয়া যুবক ভীমবিক্রমে অবশিষ্ট কয়জনকে আক্রমণ করিল। দুর্বৃত্তের দল পশ্চাতে হটিতে লাগিল।

"সাবাস্ ! ভাই, সাবাস্ !"

ফুটপাথের উপরের দ্বিতল অট্টালিকার ফটকের দরজা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। যে ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার কম্পিত দেহ আকর্ষণ করিয়া জনৈক যুবক তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

পথচারী যুবকের যষ্টির আঘাতে ছত্রভঙ্গ হইয়া আক্রমণকারীরা পলাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা শাসাইয়া গেল, অবিলম্বে তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবে।

গৃহস্বামী যুবক পুনরায় বাহিরে আসিয়া পথিকের স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া গদ্গদস্বরে বলিল, "প্রভাস !"

পথিক সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। এ কি বিস্ময়! এ যে তাহারই আশৈশবের বন্ধু সাদাৎ !

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে উভয়ে উভয়কে বাঁধিয়া ফেলিল।

সাদাৎ বলিল যে, আজ দুই দিন হইল রেঙ্গুন হইতে ব্যবসা বন্ধ করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। রেঙ্গুনপ্রবাসী কোনও ধনবান্ ব্যক্তির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। ব্যবহারাজীবের কায ছাড়িয়া দিয়া এখন হইতে সে স্বাধীনভাবে দেশের কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিবে। এই বাড়ীটা ভাড়া লইয়া সে এখানেই আপাততঃ থাকিবে স্থির করিয়াছিল। ইতোমধ্যে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধায় সে বড়ই মনস্তাপ ভোগ করিতেছে।

প্রভাস বলিল যে, সে আজ সকালে কলিকাতায় আসিয়াছে। দেশে বিশেষ প্রয়োজনে পিতা তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই পল্লীতেই সে কোন আত্মীয়ভবনে উঠিয়াছে। তিন চারি দিনের মধ্যেই সে দেশে যাইবে।

যে ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছিল, রাত্রির মত তাহাকে সাদাৎ নিজের আশ্রয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বলিল, "চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

প্রভাস বলিল, "কোন ভয় নেই ভাই, এই লাঠি হাতে থাকলে আমি যমকেও ডরাইনে।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে বন্ধুকে অভিষিক্ত করিয়া সাদাৎ বলিল, "তা জানি, তুই যে সত্যি বীরপুরুষ হবি, তা আমি জান্তাম। তুই বেঁচে থাক্।"

প্রভাস ক্ষোভের সহিত বলিল, "কিন্তু এদের অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হয়। আমরা কি মানুষ হব না?"

আকাশের দিকে চাহিয়া সাদাৎ বলিল, "সেই দুঃখেই ত আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। এদের ব্যভার দেখে মনে হয়, পশুরাও ঢের ভাল; তারা অকারণ এমন আচরণ করে না।"

৮

অপরাহ্নে প্রভাস শুনিতে পাইল যে, আজ গোপনে গোপনে চারিদিকেই একটা বিরাট আয়োজন চলিতেছে। কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কোথায় কখন্ কি ঘটিবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

সাদাৎ এই পল্লীর মধ্যে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীভাবে বাস করিতেছিল। তাহার প্রতিবেশীরা এখনও জানে না যে, সে ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। তাহার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা—কিছুতেই তাহার পার্থক্য বুঝিবার উপায় ছিল না। নবাগত বলিয়া পল্লীর কেহই তাহার যথার্থ পরিচয়ও পায় নাই।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রভাস সাদাতের বাসায় গেল। উভয় বন্ধুতে অনেক পরামর্শ হইল। সম্ভবতঃ এই পল্লীও আক্রান্ত হইতে পারে। প্রভাসের আদর্শে শিক্ষিত তাহার কয়েকজন ছাত্র কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছিল। সাদাতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে একবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। নিকটেই তাহাদের মেস। তাহারা প্রভাসকে বুঝাইয়া দিল যে, পল্লী আক্রান্ত হইলে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিবে। সকল সংবাদই তাহারা রাখিতেছে।

রাজধানীর উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। প্রভাস পল্লীর পথে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আশেপাশে গলির মধ্যে আত্মরক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ পল্লীরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সহসা দূরে মশালের আলোক দৃষ্ট হইল এবং উন্মত্ত জনতার কোলাহল শুনা গেল। ফটক খুলিয়া সাদাৎ বাহিরে আসিল। তাহার অঙ্গে খদ্দর, হস্তে একখানি লাঠি। প্রভাস বলিল, "ভাই, তুই বিয়ে করেছিস, এখনও ফুলশয্যার গন্ধ যায় নি। আজ তুই আমাদের উপর ভার দিয়ে ভিতরে থাক। দোহাই তোর সাদাৎ।"

সাদাৎ দৃঢ়স্বরে বলিল, "কেন?—তুই যা ভাবছিস, তা কি আমি বুঝি নি? না, না, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী

যেন ত্যাগ কর্‌তে পারি, ভগবান্ সেই আশীর্ব্বাদ করুন। আমি সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, প্রেমের পথে, মিলনের পথে যেন প্রাণ দিতে পারি।"

প্রভাস বলিল, "সবাই যদি তোর মত হ'ত!"

স্বপ্নাবিষ্টের মত সাদাৎ বলিল, "হবে এক দিন, তা হ'তেই হবে।"

তাহাদের আলোচনায় বাধা পড়িল। বন্ধনমুক্ত জলস্রোতের মত জনস্রোত বিস্তৃত পথের উপর আসিয়া পড়িল। সর্ব্বাগ্রে এক ভীমদর্শন ব্যক্তি, তাহার উভয় হস্তে ছোরা। সে ইন্দ্রজালবিদ্যানিপুণ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ছোরার নৃত্য দেখাইতে দেখাইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—"আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো।"

তাহার উভয় পার্শ্বে মশালধারী, পশ্চাতে অনুরূপ উত্তেজনাপূর্ণ জনমণ্ডলী। সংখ্যা গণনা করা যায় না—যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু নরমুণ্ড এবং উদ্যত লাঠি, লৌহদণ্ড, ছোরা অথবা অন্য কোনও আয়ুধ।

পল্লী-রক্ষা সমিতি স্থিরভাবে আত্মগোপন করিয়া উন্মত্ত জনগণের কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিতেছিল।

সাদাতের বাসাবাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া সম্মুখের লোকটি চীৎকার করিয়া বলিল, "এখানে, এখানে—"

কোলাহলে বাকী কথাগুলা শুনা গেল না। প্রভাস ফটকের অনতিদূরে গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। গত রজনীর ঘটনার কথা অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল। বুঝিল, প্রতিশোধকামনায় আজ সাদাতের বাড়ী উহারা আক্রমণ করিতে যাইতেছে।

ইঙ্গিতমাত্র দ্বাদশ জন যুবক লাঠি লইয়া অপূর্ব্ব কৌশলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সম্মুখে অগ্রসর হইল।

সাদাতের মুখমণ্ডলের পেশীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার নয়ন হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। প্রভাস সাদাৎকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইল। অমনই দুই জন বয়ঃকনিষ্ঠ যুবক তাহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে স্থান গ্রহণ করিল।

উন্মত্ত জনস্রোত ফটকের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অপূর্ব্ব কৌশলে যুবকগণ তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠির বর্ণনায় অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিচিত্র লাঠির মহিমা যুবকগণের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে জনস্রোত পশ্চাতে হটিতে লাগিল। বাহ্বাস্ফোট, মশালের নৃত্য এবং বাগাড়ম্বর পলায়নের কোলাহলে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পথ যখন আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইল, তখন সাদাৎ প্রভাসের বক্ষোদেশে মাথা রাখিয়া বলিল, "সার্থক তোর শক্তিসাধনা!"

প্রভাস তখন মস্তকের বস্ত্রখণ্ড খুলিয়া লইয়া স্বেদবারি মুছিয়া ফেলিতেছিল।

যুবকের দল মুহূর্ত্তমধ্যে স্থান ত্যাগ করিল। সাদাৎ প্রভাসের হাত ধরিয়া ফটকের ভিতর চলিয়া গেল।

আনন্দবিহ্বলচিত্তে সাদাৎ বলিল, "আজ যা দেখলুম, কখনও দেখি নি। এইবার আমার খুব আশা হচ্ছে, এত দিন পরে প্রকৃত মিলনের সন্ধান পেয়েছি। এক পক্ষ অপর পক্ষকে শুধু কৃপার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে। তারা ভাব্‌ত, সংহতি-শক্তি নেই, ওরা দুর্ব্বল। কিন্তু এখন থেকে বুঝতে পারবে, শক্তি-সাধনায় অপর পক্ষ দুর্ব্বল নয়। সংহতি-শক্তি গজিয়ে উঠেছে। আর ভয় নেই ভাই—এই শক্তিই মিলনের সেতু, প্রেম একে আরও দৃঢ় ক'রে তুলবে।"

সাদাৎ অধীর আনন্দে স্থান-কাল ভুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

"প্রভাস, তোর জয় হোক্। আজ ভাই, তোরা প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিয়েছিস্!"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জীবন কথা

[পরলোক গত সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার জীবন-কথা স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে কেবল তাঁহার জীবন-কথা বলা যায় না, ইহা গত পঞ্চাশৎ বৎসরের ইংরাজ শাসিত বাঙ্গালার ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে বাঙ্গালার—কেবল বাঙ্গালার কেন, ভারতের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সম্বন্ধের অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে এ দেশের লোক ৫০।৬০ বৎসরের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এই আশায় আমরা এই জীবন-কথা বাঙ্গালা ভাষায় সহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। অতঃপর এই জীবন-কথা ধারাবাহিকরূপে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইবে। মাঃ বসুঃ সঃ]

জন্ম ও বাল্যকাল

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার জন্ম হইয়াছিল। সে দিন শিবরাত্রি, সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত শুভ ছিল বলিতে হইবে। দুষ্ট গ্রহ ও ভূতাদির প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার পিতামহী আমাকে সামান্য দুই চারি কড়ির বিনিময়ে এক হাড়ীর নিকট সেই শৈশব অবস্থায় বিক্রয় করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অস্পৃশ্য হাড়ী-ডোমের ঘরের শিশুকে দেবতারা অকালে টানিয়া লয়েন না। সে কালে এ দেশের বহু বৃদ্ধার এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু বিক্রীত হইলেও আমি কখনই আমার পৈতৃক আবাসভবন ব্যতীত অন্যত্র হাড়ীর ঘরে লালিত-পালিত হই নাই। সুতরাং এ ব্যাপারকে মনকে চোখ ঠারা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বহুকাল আমায় আত্মীয়স্বজন এ জন্য আমাকে হাড়ী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহার বহু দিন পরে আমার বিবাহকালে আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে কড়ি মূল্য দিয়া আমায় হাড়ী ক্রেতার নিকট হইতে পুনরায় ক্রয় করেন। আমার পিতামহী আমাকে পাগলা সাহেব নামক ফকীরের আশ্রয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটে এই পাগলা সাহেবের কবর ও দরগা বিদ্যমান আছে। এই কবরে আমার 'মাথার মানত চুল দেওয়াও' হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম কত উদার, মুসলমান পীর বা ফকীরকেও হিন্দুরা সে সময়ে মুসলমানদের মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। আমার বৃদ্ধা পিতামহী নিষ্ঠাবতী হিন্দু-মহিলা ছিলেন, কিন্তু সে জন্য তিনি অপর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনা ছিলেন না।

ঢাকার ৩০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ভাটপাড়া গ্রামে আমার জন্ম হয়। বহু কাল হইতে এই স্থানে আমার পূর্ব্বপুরুষরা বসবাস করিয়াছিলেন। আমার বাল্যকাল হইতেই আমার পিতামহী আমাকে মহাভারত ও রামায়ণ হইতে কত গল্প শুনাইতেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার নিকট আমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের বহু কীর্ত্তির কথা শুনিতাম। আমার প্রপিতামহ রাজারাম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং পুরীর লোকনাথ মন্দিরে পদ্মাসনে বসিয়া তনুত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ময়মনসিংহ জিলায় সরকারী চাকুরী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং উহা হইতে অনেক জমীদারী ক্রয় করিয়া দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণের সহিত তুল্যাংশে ভোগ করিতে থাকেন। তখনকার কালে একান্নবর্ত্তী পরিবারের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। তিনি মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। আমার পিতামহী ভাগীরথী দেবী তখন বিংশতিবর্ষীয়া, তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। তিনি অন্য এক গ্রামের কোন দরিদ্র বৈদ্যবংশ হইতে আমার পিতা কালীনারায়ণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই আমার পিতা পাঁচদোমা গ্রামের সেন-বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহার নাম অন্নদা। আমি তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলাম।

গ্রামের অবস্থা

জন্মগ্রহণের পর আট বৎসর আমি গ্রামেই লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। তখন পল্লী-জীবন বড়ই সুখকর ছিল। তখনকার কালে সকলেরই কিছু জমাজমী ছিল। এই সকল জমী ভাগে চাষ করা হইত। এক এক শ্রেণীর লোক এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত, কারণ, তখনকার কালে চোর-ডাকাতের বড় ভয় ছিল। আমাদের গ্রামে ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য আদি সকল জাতির লোকেরই বসতি ছিল। গ্রামের সকল অভাব গ্রামেই পূর্ণ হইত, গ্রামের বাহিরে কোন কিছুর জন্য হাত পাতিতে হইত না। গ্রামে কোন দোকান-পাট ছিল না, কিন্তু ফিরিওয়ালারা নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ফিরি করিয়া বেড়াইত। ইহা ছাড়া সপ্তাহে নানা হাটে

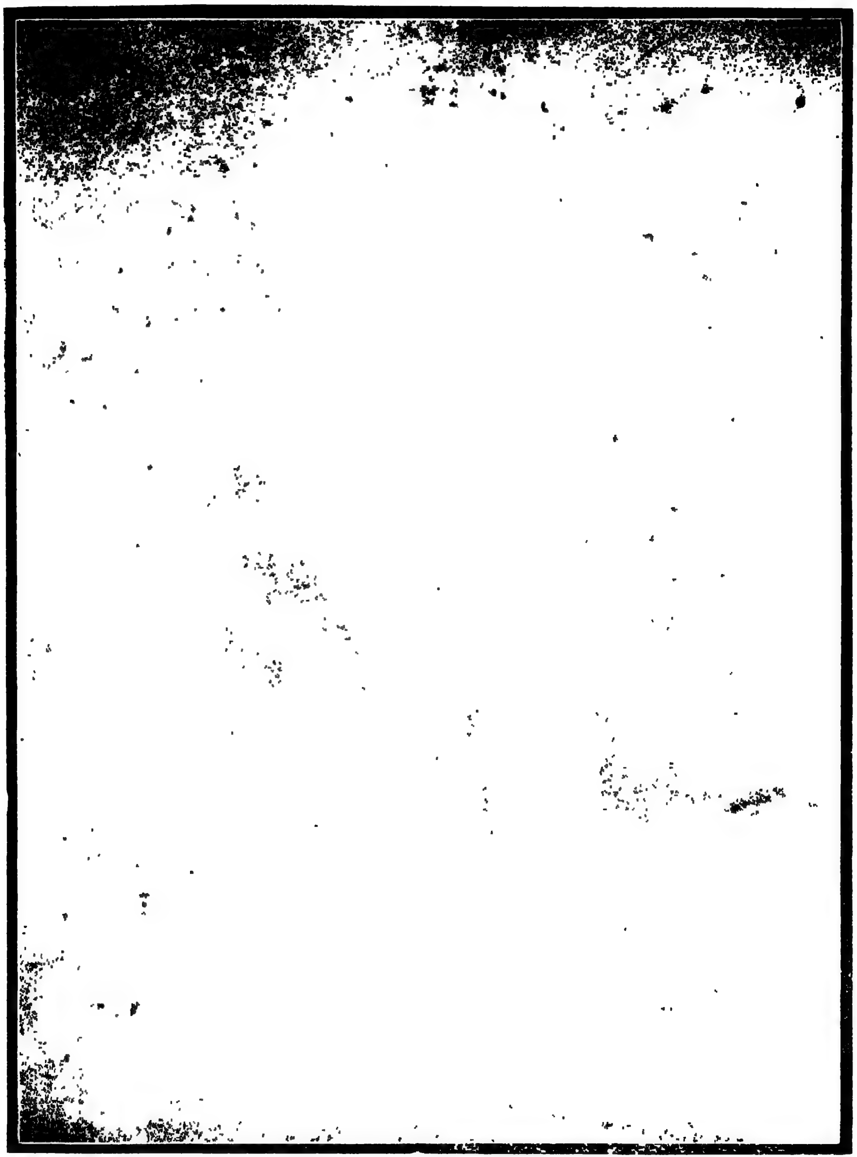

সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

সকল রকমের নিত্য ব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর জিনিষপত্র পাওয়া যাইত। বিশেষ কোনও বিলাসের দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইলে গ্রামান্তরের বাজারে অথবা ঢাকায় যাইতে হইত।

মুসলমান রাজত্বকালে গ্রামের লোক জীবিকার্জ্জনের জন্য গ্রামের বাহিরে যাইত না। সরকারী চাকুরী অতি অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পল্লীর ভদ্রলোকগণের সহরবাসের প্রবৃত্তি তখন জাগে নাই। যাঁহারা চাকুরীর খাতিরে সহরে যাইতেন, তাঁহারা পুত্র-পরিবারকে গ্রামে রাখিয়া যাইতেন এবং বৎসরে দুই তিন বার গ্রামে যাইতেন। তখন হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা পূরা মাত্রায় প্রকট ছিল। যাঁহারা সহরে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ গ্রামে সংসার পালনের জন্য প্রেরণ করিতেন।

আমাদের গ্রামে ঘন বনজঙ্গল ছিল। শীতকালে ঐ সকল জঙ্গলে বাঘ আসিত। আমার মনে আছে, এক বার ফাঁদ পাতিয়া এক বাঘ মারা হয়, আর এক বার বিষাক্ত বাণ মারিয়া বাঘ মারা হয়। এ সকল জঙ্গলে বন্যজন্তুর ভয়ে কেহ দিবাকালেও যাইতে সাহস করিত না। এই সকল জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত, ইহার দাম লাগিত না। জঙ্গলের ফাঁকা তৃণক্ষেত্রে গৃহপালিত গবাদি চারণ করিত। তখনকার কালে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ-ঘৃতাদি পাওয়া যাইত।

গ্রামে রাজপথ ছিল না। মানুষ হাঁটিয়া যে সঙ্কীর্ণ পথ করিয়া লইত, তাহারও উন্নতিবিধান করিবার কোনও চেষ্টা হইত না। বর্ষাকালে জলকাদা ভাঙ্গিয়া এই সকল পথ অতিক্রম করিতে হইত। বর্ষাকালে সেই হেতু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য ছোট ডিঙ্গি করিয়া যাতায়াত করা হইত। গ্রীষ্ম বা শীতকালে হাঁটা পথে মানুষ প্রায় পদব্রজে ভ্রমণ করিত, কচিৎ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে যাইত, গোযান তখন একেবারেই ছিল না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মহিলারা ডুলী পাল্কীতে যাতায়াত করিতেন। কোনও কোনও ভদ্রলোক ও জমীদার শ্রেণীর লোক পাল্কী ব্যবহার করিতেন। মালপত্র মানুষের মাথায় বাহিত হইত, অথবা নৌকাযোগে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইত।

ব্রাহ্মণদের জমিজমা ছিল, তাঁহারা পৌরহিত্যও করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আদালতে চাকুরী লইতেন। বৈদ্যরা খাজনা আদায় করিয়া অথবা চাষবাস করিয়া কিংবা সহরে চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের গৃহে চাকুরী করিত অথবা চাষবাস করিত কিংবা পেয়াদাগিরি করিত। নমঃশূদ্ররা মোট বহিত, কাঠ আনিত এবং জন খাটিত। বৈদ্য ও শূদ্রদের মাঝামাঝি সরকার পদবীধারী এক জাতি ছিল; উহারা খাজনা আদায় করিত অথবা হিসাবনবিশী বা মুহুরিগিরি করিত। মুসলমানরা স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিত। তাহারা চাসবাস করিয়া খাইত। এক শ্রেণীর মুসলমান বাজনদার ছিল, তাহারা সকল উৎসবে গীতবাদ্য নির্ব্বাহ করিত।

শিক্ষা

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সরকারদের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাঙ্গালা শিখিতেন, কেহ কেহ সংস্কৃত চর্চ্চাও করিতেন। এক জনের একটি টোল ছিল। বৈদ্যরা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষা করিতেন। সরকাররা বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন, হিসাবনিকাশে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তখনকার কালে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও পড়া এবং গণিত জানা শিক্ষার নিদর্শন ছিল, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা প্রচলিত ছিল না। পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। তবে রামায়ণ ও মহাভারতের অথবা দুই একখানি পুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ সর্ব্বত্র পঠিত হইত। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে কোনও লক্ষ্য রাখা হইত না, হস্তলিপি ভাল হইলেই তখনকার কালে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইত! আদালতের ভাষা তখনও ফার্সী ছিল। সুতরাং ফার্সী না শিখিলে তখনকার কালে 'সুশিক্ষিত' বলিয়া সম্মান পাওয়া যাইত না। ইংরাজী তখন প্রায় কেহ জানিত না। আমাদের বিপুল বংশের মধ্যে তখন কেবল এক জন কিছু ইংরাজী জানিতেন। তিনি সে জন্য আসামের গৌহাটীতে বড় সরকারী চাকুরী পাইয়াছিলেন। এখনকার মত তখনও পাঁচ বৎসরে শিশুর হাতে খড়ি হইত।

ইহার পর ইংরাজ মফঃস্বলের নানা সহরে এক একটি জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্ববঙ্গে তখন মাত্র একটি কলেজ ছিল, উহা ঢাকায় অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে বি, এ পর্য্যন্ত পড়ান হইত।

[ক্রমশঃ।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

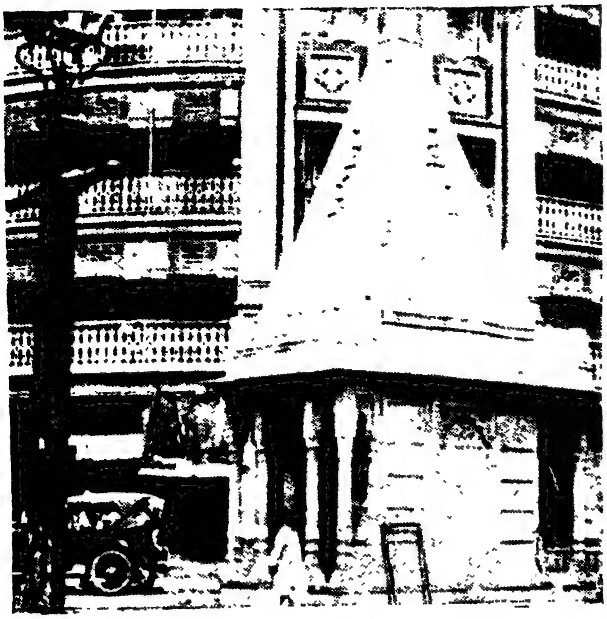

জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের ভগ্ন শিব মন্দির

এক মাস কাল পূর্ব্বে যখন আমরা কলিকাতায় দাঙ্গার সংবাদ দিয়াছিলাম, তখন কখনও মনে হয় নাই যে, এই দাঙ্গার কথা পুনরায় মাসাধিক কাল পরেও আলোচনা করিতে হইবে। এত দীর্ঘকালব্যাপী দাঙ্গা এই ভারতে আর কখনও সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান আমলের ত কথাই নাই, ইংরাজ শাসনাধীনেও কোহাট, সাহারাণপুর প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা এত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গার এত তীব্র হয় নাই। কলিকাতার ন্যায় ইংরাজের হাতে গড়া বিরাট সহরে মেসিন গান ও বন্দুক-বেয়নেটের আওতার যে এত দিন ধরিয়া এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটিতে পারে, তাহা কল্পনাতীত ছিল। ইংরাজ-শাসনের পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা, এ কথা নিরপেক্ষ মাত্রেই বলিবে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ হিন্দুমুসলমানের এই সর্ব্বনাশের দিনে আগুনের আঁচ হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া বিজ্ঞের মত বলিতেছেন যে, ভারতে এরূপ ব্যাপার নূতন নহে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরদিনই এরূপ বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতীয়রা এখনও দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা এ কথাটা সুবিধামত ভুলিয়া যায়েন যে, মুসলমান শাসনকালেও হিন্দু-মুসলমান বহুকাল সদ্ভাবে বসবাস করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও সামন্ত রাজ্যসমূহে হিন্দু-মুসলমান প্রজা সদ্ভাবে বাস করিতেছে। হিন্দু নরপতির অধীনে বিস্তর মুসলমান প্রজা বসবাস করে, মুসলমান নরপতির অধীনে অসংখ্য হিন্দু প্রজা বসবাস করে, কিন্তু ভারতীয় নরপতিদিগের শাসনের গুণে কোথাও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। হিন্দু নরপতির অধীনে বিস্তর উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী আছেন, মুসলমান নরপতির অধীনে অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু-রাজকর্ম্মচারী আছেন। ভারতীয় নরপতিরা সকল প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধেই উদারতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইংরাজরাজ্যেও ধর্ম্মে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হয়। তবে কেন এমন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা হয়? এ জন্য মূলতঃ দায়ী কে?

সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি রাজ্যশাসন-নীতির প্রধান অঙ্গ। কোন রাজা ইহার প্রভাব হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ভাবে রাজার অনুগ্রহনিগ্রহ দানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে যে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ সঞ্জাত হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, সুতরাং তাহার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনিবার্য্য।

কেহ কেহ বলেন, এমন কি, আলি ভাই মওলানা মহম্মদ আলিরও মত এই যে, শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও দাঙ্গার কারণ। কিন্তু শুদ্ধির সহিত হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্পর্ক নাই—যদিও অন্যায়রূপে এই আন্দোলনের সহিত হিন্দুসমাজকে জড়াইতে গিয়া মুসলমানরা ক্রমে হিন্দুদিগকে উহার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। আর্য্যসমাজীরা শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও পোষক। শুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা যাহাদিগকে মুসলমানধর্ম্ম হইতে আর্য্যসমাজে তুলিয়া লইতেছেন, হিন্দুসমাজে তাহারা 'চল' হয় না; সুতরাং শুদ্ধি আন্দোলনের ছুতা ধরিয়া যে সকল মুসলমান হিন্দুর সহিত বিরোধ করেন, তাঁহাদের বিরোধের ভিত্তি নাই।

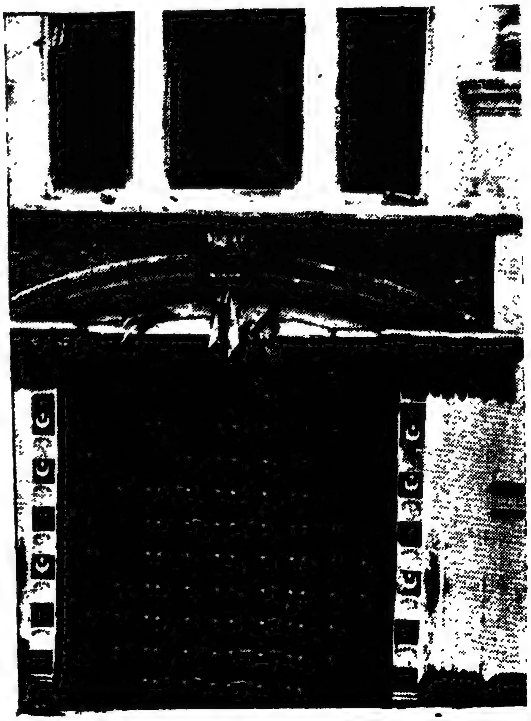

বড়বাজারের জুম্মা মসজেদ

তবে অকারণে যে ভাবে বিরোধ পাকাইয়া তুলা হইতেছে, তাহাতে হয় ত ভবিষ্যতে হিন্দুদিগের আর্য্যসমাজীদিগের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে পাহারা

সংগঠনে সকল হিন্দুরই সহানুভূতি আছে এবং থাকিবে। যাহাতে হিন্দু শক্তিশালী হয়, তাহাতে কোনও হিন্দুরই আপত্তির কথা থাকিতে পারে না। আমরা বহু বারই বলিয়াছি, সমানে সমানে না হইলে প্রকৃত মিলন বা সহযোগ হইতে পারে না; এক জন প্রবল ও অপর জন দুর্ব্বল হইলে উভয়ের মধ্যে মুখে মিলন হইলেও অন্তরে মিলন সম্ভবপর হয় না, কেন না, প্রবল দুর্ব্বলের নিকট আপনার মনোমত অধিকারের দাবীর উপর দাবী করিতে থাকিবেই, দুর্ব্বলকেও সে দাবী মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, অন্যথা পরস্পর বিরোধ ও রক্তারক্তি হইবেই। এই হেতু আমরা হিন্দু-সংগঠনের পক্ষপাতী। মুসলমানরা বাঙ্গালায় সংখ্যায় অধিক ও প্রবল, তাহাদের আঞ্জুমান ও তাঞ্জিম আছে, হিন্দুর কিছুই ছিল না, সুতরাং এখন যদি হিন্দুরা হিন্দু-সভা বা হিন্দু সংগঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধী করা যায় না।

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা খোলসা হইয়া যাইবে। কলিকাতার আর্য্যসমাজীদিগের সহিত মুসলমানের বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলেই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজেদ ভগ্ন, দগ্ধ বা অপবিত্রীকৃত হইয়াছে এবং কোথাও হিন্দু-মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে, কোথাও বা গুপ্ত-ঘাতকের ছোরা ও লাঠিতে খুনজখম হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার দাঙ্গা উপশমিত হইয়াছে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। এই দাঙ্গার প্রভাব কিন্তু বাঙ্গালার মফঃস্বলে বিসর্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু স্থানে প্রবল মুসলমানের অনাচার পরিলক্ষিত হইতেছে। বরিশাল হইতে চট্টগ্রাম এবং রঙ্গপুর হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেব-মূর্ত্তি ভগ্ন, দেবমন্দির অপবিত্র এবং হিন্দুর শোভাযাত্রাদি বন্ধ হইতেছে। অথচ সরকারের যে পুলিস কলিকাতায় খানাতল্লাস করিয়া

মেছুয়াবাজার ও আমহাষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে মিলিটারী পাহারা

হিন্দু-প্রেসে মুদ্রিত মুসলমান ট্যাক্সির সংখ্যা নিরূপণসূচক ব্লক আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, সেই পুলিস এ যাবৎ মফঃস্বলে এই সকল হিন্দু মন্দির ও দেবতা ধ্বংসের কোনও কিনারা করিতে পারে নাই, অথবা দুর্ব্বৃত্তদিগকে ধরিতে পারে নাই। ঢাকায় সরকারের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষাতে হিন্দুগণকে ১৩ হাজার মুসলমানের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে ও দণ্ড দিতে হইয়াছে; অথচ প্রকাশ, যে মসজেদের সম্মুখ দিয়া হিন্দু বিবাহের উদ্যোক্তৃবর্গ বাজনা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই মসজেদে সেই গভীর রাত্রিতে নমাজ পড়া হইতেছিল না! হিন্দুরা যদি এমন অবস্থায় পড়ে—যদি প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ-সরকার তাহাদিগকে রাজপথ ব্যবহারে আশ্রয় ও ভরসা দিতে না পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদিগের আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের ঘর, ধর্ম্ম ও ইজ্জৎরক্ষার জন্য সংগঠন করা ভিন্ন উপায়ান্তর কি? পক্ষান্তরে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গের জিলায় হিন্দু সংখ্যা অধিক ও হিন্দু প্রবল বলিয়া তথায় কোথাও অদ্যাপি দেব মন্দিরাদি ভগ্ন হয় নাই, শোভাযাত্রাদি বন্ধও হয় নাই। বরং বর্দ্ধমান সহরের বড়বাজারের মসজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুরা হরিসঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া মুসলমানরা তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, উভয় সম্প্রদায়ই শক্তি সঞ্চয় করিলে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইবে, অন্যথা নহে। তবে সংগঠনে মওলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গের এত আপত্তি কেন? তাঁহাদের তাঞ্জিমে যদি হিন্দুদের আপত্তি না থাকে, তবে হিন্দু সংগঠনে তাঁহাদের আপত্তি হয় কেন? আমরা

যতীন্দ্রনাথ সুর

বীর যুবক।

দমকল ও দগ্ধ পাটের গাড়ী

তাই বলিতেছি যে, .হিন্দুরা মুসলমানের মত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিখুন। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া মুসলমান যেমন একতাবদ্ধ হইয়া থাকেন, হিন্দুরাও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া একতাবদ্ধ হইতে শিখুন। কলিকাতার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, ডোম দোসাদরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গুণ্ডার হস্ত হইতে মন্দির রক্ষা করিয়াছে। তাহারা কি হিন্দুসমাজের কেহ নহে? তবে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ফেলিয়া রাখা হয় কেন? সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালায় অস্পৃশ্যতার প্রভাব অধিক নহে। সুতরাং মহাত্মা গন্ধীর কথামত "রোটি ও বেটী" বাদ দিয়া সকল হিন্দুকেই হিন্দুসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে নমঃশূদ্র, হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা, বাগ্দী প্রভৃতিকে লইয়া উচ্চবর্ণীয়রা ·হরিসংকীর্ত্তনের দল করুন, সেই একতাবদ্ধ হিন্দুগণের মধ্যে হরিলুঠ, প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি কার্য্য জাতিনির্ব্বিশেষে সম্পাদিত হউক। কাহারও সহিত বিরোধ বাধাইবার উদ্দেশ্যে ·এই সংগঠন যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ইহা দ্বারা কেবল আপনাদের মধ্যে একতা আনয়নের এবং জাতির উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা হউক। যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ-গান, মনসার ভাসান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুমাত্রেরই মধ্যে প্রীতির বন্ধন চিরস্থাপিত হউক। হিন্দু যখন এইরূপে একতাবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে শিখিবে, তখন মুসলমানরা আপনাদের শক্তিসঞ্চয় করিয়া বলশালী হইয়া হিন্দুকে ভালবাসিতে অভ্যস্ত হইবে। কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর মধ্যে যথাসম্ভব শিক্ষার বিস্তার করা হউক। উহার ফলে অজ্ঞতা দূর হইলে সহজে কেহ দেশের অমঙ্গলকামী দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবে না। তখন উভয় সম্প্রদায়ই বুঝিবে যে, পরস্পরের সৌভ্রাত্র ও প্রীতির উপরেই ভারতের—সকলের জন্মভূমির উন্নতি নির্ভর করে।

কলিকাতার দাঙ্গায় কয়েকটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমেই ত দেখা যায়,—(১) অজ্ঞ গুণ্ডাগণের পশ্চাতে—সাম্প্রদায়িক বিরোধের অন্তরালে স্বার্থসন্ধ চতুর লোকের বুদ্ধিবল আছে। পশুবল এই বুদ্ধিবলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় সভাপতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এবং অন্যান্য নেতা একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা বরিশাল হইতে লিখিয়াছেন যে, "তথায় কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রচারক ও স্বার্থপর ধর্ম্মোন্মত্ত লোক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।" বরিশালের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেওয়ার্ডের নিকট এক জন ভদ্রলোক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "কলিকাতা হইতে যাহারা মসজেদের সংস্কারের এবং আহতদের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।" এ সকল কথার অর্থ কি? ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় করা পুলিসের কর্ত্তব্য। তবে এই দাঙ্গা ও দেবস্থান অপবিত্র ও ভগ্ন করিবার মূলে যে দুষ্ট শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিবল নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের সভায় অনেকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। এ বিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা কলিকাতার রাজপথে ছড়ি লইয়াও ভদ্রলোককে যাইতে দিতেছেন না, অনেক সার্জ্জেণ্ট

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পাটের গাড়ী দগ্ধ

ভদ্রলোকের হস্ত হইতে ছড়ি কাড়িয়া লইতেছে। ইহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, যখন সরকার শান্তিরক্ষক, তখন প্রজাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে না, সরকারই প্রজাকে রক্ষা করিবেন। প্রাণ ও ধন অপেক্ষা প্রজার ধর্ম্মস্থান সমূহ যাহারা "কাপুরুষের মত গোপনে রাত্রির অন্ধকারে ভাঙ্গিয়াছে বা অপবিত্র করিয়াছে, সরকার তাহাদিগকে ধরিয়া সমুচিত দণ্ড দিবার অবশ্যই ব্যবস্থা করিতেছেন, এ আশা প্রজা অবশ্যই করিতে পারে।

(২) দাঙ্গায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, এবার শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও আপনাদিগের ধর্ম্ম, ধনপ্রাণ ও অন্তঃপুরের ইজ্জৎ রক্ষার নিমিত্ত গুণ্ডার দলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সহস্রাধিক মূর্খ উন্মত্ত জিঘাংসাপরায়ণ গুণ্ডার বিপক্ষে দুই চারি জন ভদ্র যুবকের এইভাবে দণ্ডায়মান হওয়া ইতিহাসে অভিনব (স্বদেশীর যুগে জামালপুরের দয়াময়ী প্রতিমা রক্ষার দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলে) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঝামাপুকুর—মেছুয়াবাজার পল্লীতে চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রমোহন শূর নামক যে দুইটি ২৩।২৪ বৎসরবয়স্ক বাঙ্গালী যুবক পল্লীর ইজ্জৎ রক্ষা করিতে নির্ভয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের নাম বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। বাঙ্গালী জাতি তাহাদের সম্মান করিয়া দেশ ও জাতিকে সম্মানিত করিয়াছে।

(৩) এই দাঙ্গার সম্পর্কে বিস্তর গুপ্ত ইস্তাহার বিলি হইয়াছে। এই সকল ইস্তাহারে সম্প্রদায়বিশেষকে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভীষণরূপে উত্তেজিত করা হইয়াছে। এ সকল ইস্তাহারের উৎস কোথায়? নিরক্ষর গুণ্ডাশ্রেণী লেখাপড়ার ধার ধারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহাদের মস্তিষ্ক হইতে এই সকল ইস্তাহার উদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা শিক্ষিত, পদস্থ ও ভদ্র। ইহারা সমাজের যত অনিষ্টকারী, এত আর কেহ নহে। ইহাদিগের প্রতি কোনও দেশহিতকামী ভদ্র ব্যক্তির সহানুভূতি থাকা উচিত নহে। ইহারাই বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করে। গুণ্ডা-দলনের পূর্ব্বে ইহাদের কঠোর দণ্ড হওয়া আবশ্যক।

ডেপুটী পুলিস কমিশনার শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী

(৪) এই হাঙ্গামায় দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিও গুণ্ডার পক্ষ লইয়াছেন। সুতরাং এ দাঙ্গায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক যত না দোষী, শিক্ষিত শ্রেণী ততোধিক দোষী। অশিক্ষিত চিরদিনই শিক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। শিক্ষিত গৃহস্থের দৃষ্টান্তে অশিক্ষিতও শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ হয়। এই যে পূর্ব্ববঙ্গে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত বহুদিন যাবৎ গৃহস্থের কুল-ললনার উপর অত্যাচার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, যদি তাহাদের সমধর্ম্মী শিক্ষিত সমাজ একবাক্যে সেই সকল অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, এই সকল অনাচার-অত্যাচার তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তে অতীতের কথায় পর্য্যবসিত হইত। দাঙ্গার সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সমাজ যদি প্রথম হইতেই দৃঢ়স্বরে অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ করিতেন এবং সকলে মিলিত হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ব্যাপার কখনই এত দূর সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিত না। শিক্ষা বা সভ্যতার গৌরব কি? মানবের পশুবৃত্তি জাগাইয়া তুলায় সে গৌরব নাই, যুক্তি ও ন্যায়ের সাহায্যে মানবকে হিংসা-দ্বেষ হইতে নিবৃত্ত করাতেই তাহার গৌরব।

(৫) এই দাঙ্গায় আর একটি বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে প্রকাশ্য রাজপথে অবস্থিত মন্দির বা মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য বা শোভাযাত্রা কোনও সময়ে কোনও সম্প্রদায়ের বিরাগ সৃষ্টি করে নাই। এখনও হিন্দুর মন্দিরের সম্মুখে এ সমস্ত উৎসব বিরক্তির সৃষ্টি করে নাই। মহরম বা অন্যান্য মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে শোভাযাত্রা হিন্দুর মন্দিরের সম্মুখ দিয়া অবাধে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে হিন্দুরা কখনও আপত্তি করে নাই। মসজেদের সম্মুখে এ সব উৎসব কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। হঠাৎ সম্প্রতি কি কারণে জানি না, মসজেদের সম্মুখে হিন্দুর শোভাযাত্রা মুসলমানের চক্ষুঃশূল হইয়াছে; হোষ্টেলে, স্কুলে সরস্বতীপূজা কোনও কালে মুসলমান ছাত্রের বিরক্তি উৎপাদন করে নাই, এখন করিতেছে। এ সকল কারণে দাঙ্গার সূত্রপাত হইতেছে। কলিকাতার রাজপথে ট্রাম, বাস প্রভৃতির

প্রসিডেন্সী কলেজের দরোয়ানের শবযাত্রা

অনবরত ঘড়ঘড় শব্দ, অবিরাম জনকোলাহল, ফিরিওয়ালার হাঁকডাক,—কত কি নমাজের ব্যাঘাত করে; কিন্তু তাহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয় না, কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রা যত অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। ঢাকায় গভীর রাত্রিতে যখন মসজেদে নমাজ পড়া হয় না, তখনও হিন্দুর শোভাযাত্রা বিরক্তিকর হইয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্মে মুসলমানের এই শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ কি, সে সম্বন্ধে ধর্ম্মের আইন-কানুন কি ও কি ভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা কোনও মুসলমান আজিও বুঝাইয়া দেন নাই। সুতরাং যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন হিন্দু ইহা অন্যায় জিদ ছাড়া আর কিছু বলিতে পারে না। এ দাঙ্গায় যাহা হইবার হইয়া গেল, আশা করা যায়, মুসলমান ধর্ম্মজ্ঞরা স্থিরমস্তিষ্ক হইয়া এ বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ দেখাইয়া হিন্দুদের সহিত একটা আপোষ বন্দোবস্ত করিবেন।

(৬) এই দাঙ্গায় ভদ্র যুবক সম্প্রদায় যে একতাবদ্ধ হইয়া কেবল আপনার ধর্ম্ম ও মান-ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা লোকসেবারও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ধাঙ্গড়-মেথররা সহরের আবর্জ্জনা সাফ করিতে বহির্গত হয় নাই, তখন কোন কোন পল্লীর যুবকরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে আবর্জ্জনা সাফ করিয়া পল্লীকে সম্ভাবিত মহামারীর প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জনসেবা ও আত্মনির্ভরশীলতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ইহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীন বৃত্তির বীজ নিহিত আছে; ইহা হইতেই তাঁহারা কালে নাগরিকের কর্ত্তব্যপালনে অভ্যস্ত হইবেন।

(৭ দাঙ্গায় হিন্দু বিপন্ন মুসলমানকে সাহায্য করিয়াছে, আবার মুসলমান বিপন্ন হিন্দুকে সাহায্য করিয়াছে। ইহা বিশেষ সুখের ও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

(৮) দাঙ্গায় দমকল বিভাগ ও এম্বুলেন্স বিভাগ সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছে। এই দুই বিভাগের কর্ম্মচারীরা অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে। এজন্য সহরবাসী তাহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। মেডিকেল ছাত্রবৃন্দের নিকটেও সহরবাসী অশেষরূপে কৃতজ্ঞ। ইহারাও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া রাত্রির ডিউটি সারিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন, তথাপি কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা এই সমস্ত হৃদয়বান্ বাঙ্গালী যুবক যে চরিত্রবল ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে হৃদয় আনন্দগর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হয়। প্রথমটা পুলিস ঔদাসীন্য দেখাইলেও শেষে অক্লান্ত পরিশ্রমে শান্তিরক্ষায় চেষ্টা করিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপ অনেক কথা দাঙ্গার সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার আছে। কিন্তু সকলগুলি উল্লেখ করা অসম্ভব, কেন না, স্থানাভাব। একটা কথা বিশেষভাবে বলিবার আছে। কলিকাতা যখন নররক্তস্রোতে ভাসিতেছে, তখন কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাসী আপনাকে মুহূর্ত্তকালও

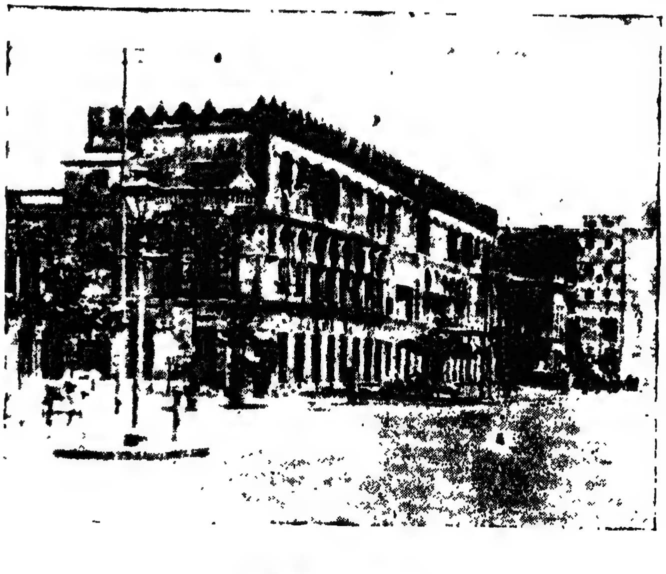

ঘেসোপটী অগ্নিদগ্ধ গৃহ

নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই,—সেই সময়ে বঙ্গের গভর্ণর ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সার হিউ ষ্টিফেনসন দার্জ্জিলিঙ্গের সুখ-গ্রীষ্মাবাসে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন! দেশের লোক কত চীৎকার করিয়াছে, কিন্তু শৈলের আসন টলে নাই। এক মাস কাল ধরিয়া এত বড় বিরাট সহরের এমন শান্তিভঙ্গ,—অথচ তাহার প্রতীকারব্যবস্থা করিবার যাঁহারা মূল, তাঁহারা রহিলেন অন্যত্র, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? একবার এইরূপ অবহেলার নিমিত্ত এই বাঙ্গালার এক শাসককে চাকুরী ছাড়িতে হইয়াছিল, তখন যিনি ভারতের কর্ণধার (বড়লাট) ছিলেন, তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ শাসক এ দেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন।

যাহাই হউক, শেষে যখন য়ুরোপীয় বণিকের স্বার্থে আঘাত লাগিল, যখন নিত্য-ব্যবসায়ের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতে লাগিল, তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহ ও ইংরাজ বণিক সভা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—এস, নামিয়া এস। তখন শৈল নাস টলিল। তাহার পর ক্রমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু দাঙ্গার প্রভাব এখনও কলিকাতায় অনুভূত হইতেছে। এ ক্ষত শুকাইতে আরও কিছু সময় লাগিবে। আরও বিশেষ ভাবনার কথা,—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের ফলে এই দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জড় এখনও মরে নাই। মওলানা আলি ভ্রাতৃদ্বয় যে ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর দুশ্চিন্তা উপশমিত না হইয়া বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, উপরে প্রলেপ দিলে ভিতরের ক্ষত শুকাইবে না, অস্ত্রোপচার কষ্টকর হইলেও করিতে হইবে। উভয় পক্ষেরই শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিকরা বুঝেন, উভয়ের মিলন ব্যতীত ভারতের মুক্তি সম্ভবপর নহে, অথচ উভয় পক্ষই প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া স্ব স্ব অভাব ও অভিযোগের কথা বলিতে চাহিতেছেন না। আমাদের মনে হয়, সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে খোলাখুলি কথা হউক, তাহার পর দেখা যাউক, উভয় পক্ষই কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়' প্রকৃত মিলন ঘটাইতে ইচ্ছা করেন।

মিলন

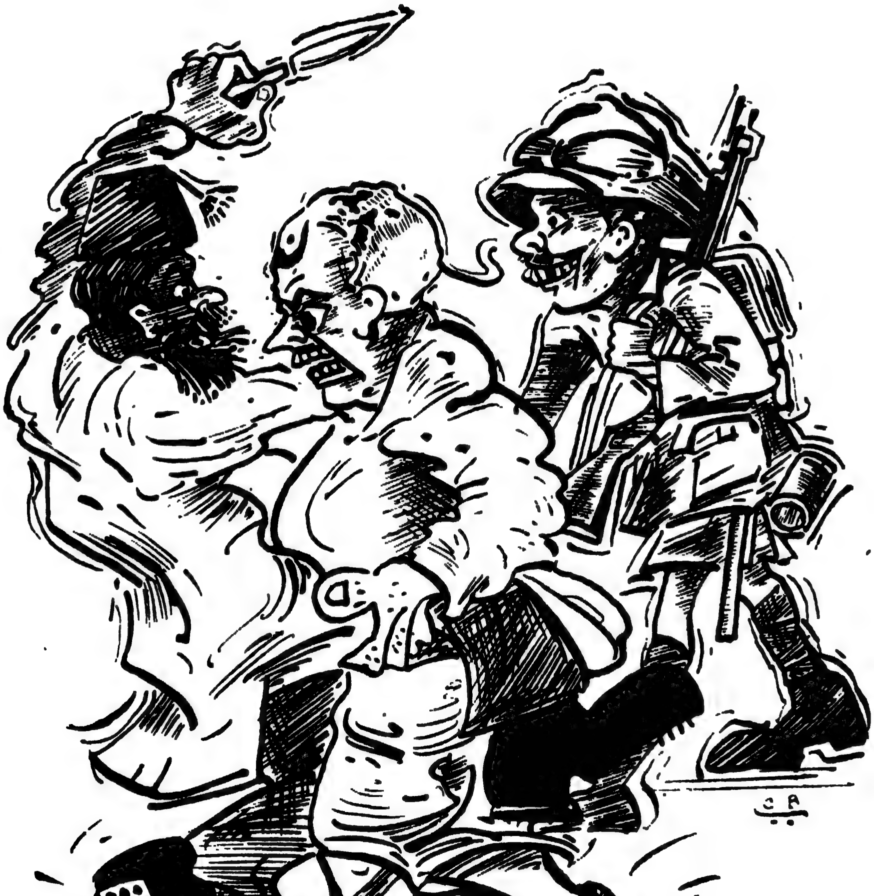

কলিকাতায় শিখ মিছিল

কলিকাতা সহরে অনেক শিখ কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই স্থানের পাকা বাসিন্দাই হইয়া গিয়াছেন। শিখ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা গুরু নানকের জন্মতিথি উপলক্ষে জগতে যেখানে শিখ আছে, সেইখানেই উৎসব ও মিছিল হয়। যিনি ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ শিখদিগকে শক্তিসম্পন্ন খালসায় পরিণত করেন, সেই দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে ঐ উৎসবকে জাঁকাইয়া তুলেন। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসরই চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এই জন্মতিথির বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। গুরু গোবিন্দ সিংহ মোগল অত্যাচারীর হস্তে স্বীয় পিতা গুরু তেজ বাহাদুরের পৈশাচিক হত্যার কথা শুনিয়া পিতৃবৈরী মুসলমান মোগল অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন এবং তদবধি শিখগণকে পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করাইলেন যে, তাহারা বীরের ন্যায় মোগলের বিরুদ্ধে গুরুহত্যার প্রতিশোধ লইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি নৈনাদেবীর শৈল-শিখরে দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা করেন। তাঁহারই আদেশে শিখরা খালসা নামে খ্যাত হইল এবং কাঙ্গী, কাছ, ফর্দ্দ (ছুরি), কেশ ও কৃপাণ ধারণ করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিল। ধর্ম্মের সহিত এই শক্তি-আরাধনা পরবর্ত্তী বার্ষিক চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসব ও মিছিলে পরিণত হইল। উহাতে শিখদিগের পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব'কে মহা সমাদরে সিংহাসনস্থ করিয়া গীতবাদ্যাদি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া পথে লইয়া যাওয়া হয়।

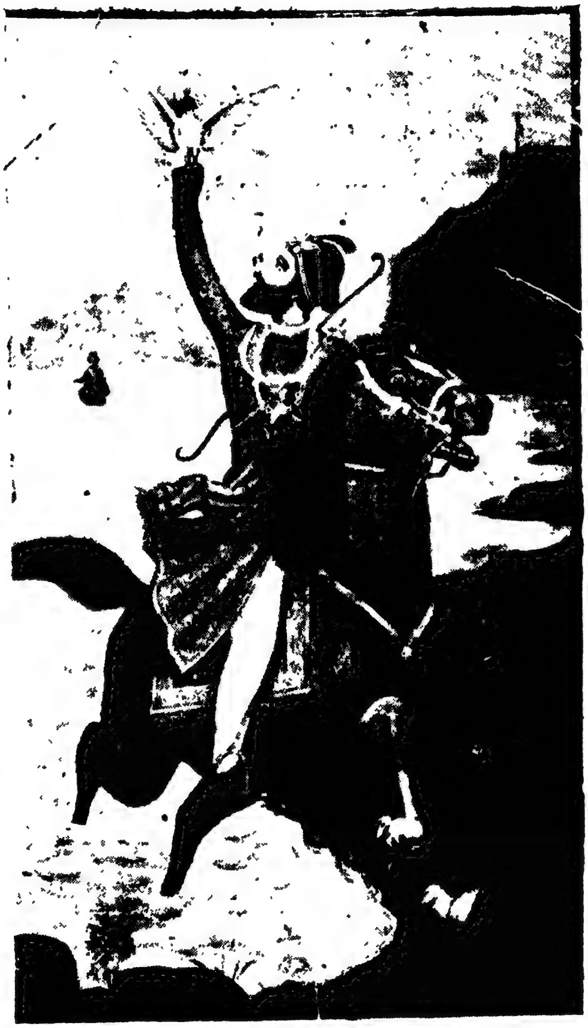

গুরু গোবিন্দ সিংহ

কলিকাতা সহরেও ১৭০নং হ্যারিসন রোডে শিখদিগের প্রধান কেন্দ্র 'বড় শিখ-সঙ্গত' নামে পরিচিত। ঐ স্থানে প্রত্যহ গ্রন্থসাহেবের পূজা ও আরাধনা হয়। বহু শিখ ঐ স্থানে সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শিখ-সঙ্গতের কর্ত্তৃপক্ষ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন তাঁহাদের বার্ষিক মিছিল বাহির করিবার জন্য পুলিস কমিশনারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ২রা এপ্রেল তারিখে আর্য্যসমাজীদের মিছিল-সম্পর্কে কলিকাতায় মুসলমানদিগের-সহিত দাঙ্গা হয়। ঐ দাঙ্গার সময়ে মুসলমান গুণ্ডারা ১৭নং সৈয়দ আলি লেনস্থ শিখ গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগ করিয়া শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল।

এই দাঙ্গার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে শিখরা ১৩ই এপ্রেল তাঁহাদের মিছিল বাহির করিয়া সৈয়দ আলি লেনস্থ গুরুদ্বারে গ্রন্থসাহেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করেন। কারণ, চৈত্রসংক্রান্তির দিন দাঙ্গা হওয়ায় ঐ দিন সরকার কোনও শোভাযাত্রা বাহির করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। সরকারের আদেশে ঐ দিন হিন্দুদিগের চড়ক উৎসব ও শোভাযাত্রাও বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মুসলমানদিগের ইদ পর্ব্বের দিন পেশোয়ারীদিগকে বাদ্যাদি করিয়া গড়ের মাঠে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এক সম্প্রদায়কে যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, অন্য সম্প্রদায়কে সে অধিকার প্রদান করা কেন হইল, তাহার কোন কৈফিয়ৎ আজিও পাওয়া যায় নাই।

সে যাহা হউক, শিখরা যখন ১৩ই এপ্রেল মিছিল বাহির করিবার জন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন পুনরায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে সরকার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। শেষে স্থির হয় যে, ৯ই মে মিছিল বাহির করা হইবে। দাঙ্গারম্ভের প্রায় ১ মাস কাল পরে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন লাট-প্রাসাদে এক মীমাংসা-বৈঠক আহ্বান করেন। উহাতে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বৈঠকে মুসলমান নেতৃবর্গের জিদের ফলে আশানুরূপ মীমাংসা হয় নাই। লর্ড লিটন তাঁহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নিজের দায়িত্বে ৯ই মে মিছিল বাহির করিবার অনুমতি দেন। তিনি আদেশ করেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিছিল বাহির হইবে এবং কোন কোনও মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি করিতে পাইবে।

সরকার এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ৯ই মে তারিখে মিছিলের সময়ে শান্তিরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করেন। পুলিস ও ফৌজে সে দিন শোভাযাত্রার পথ সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। পুলিস মিছিলে

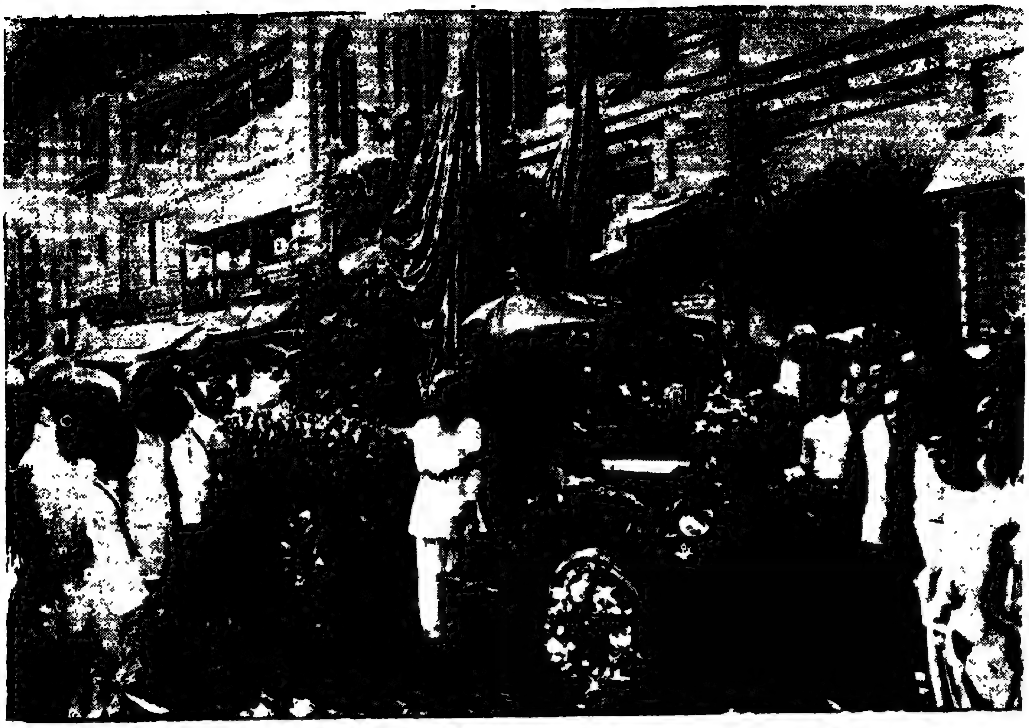

সুসজ্জিত মোটরে গ্রন্থসাহেব

সেন্ট্রাল এভেনিউতে শিখমিছিল [ফটোগ্রাফার এ. এন. দাস।

বড় শিখ-সঙ্গতের সম্মুখে মিছিল

৩ হাজার লোকের যোগদান করিবার অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু অসংখ্য হিন্দু মিছিলে যোগদান করায় মিছিল এক মাইলব্যাপী অভূতপূর্ব্ব বিরাট মিছিলে পরিণত হইয়াছিল। শিখ-সঙ্গত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই মিছিলে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মুসলমানরা এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। মিছিল বেলা ৮টার সময় বাহির হইয়া বেলা ১২টার সময় বড় শিখ-সঙ্গতে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপ কথা ছিল।

প্রাতে ৮টার সময় শোভাযাত্রা বাহির হয়। মিছিলটি প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল। মিছিলের মধ্যে একখানি সুসজ্জিত লরীতে গুরুগ্রন্থসাহেব রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে শিখগণ মুক্ত তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই লরীতে সর্দ্দার বলবন্ত সিং ও সর্দ্দার গণেশ সিং নামক শিখদের ২ জন প্রধান পুরোহিত ও ৫ জন সেবাইত ছিলেন। লরীতে একখানি পুষ্প ও মখমল-সজ্জিত সিংহাসন ছিল। এই সিংহাসনের উপর গ্রন্থসাহেব রাখা হইয়াছিল। এই সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া এক দল শিখ ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। ১৭ নং সৈয়দ আলি লেনস্থ গুরুদ্বারে এইগ্রন্থসাহেব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

শোভাযাত্রার প্রথমেই কতকগুলি বর্শাধারী সওয়ার ছিল। তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন আকালী দল। ইঁহারা বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের পতাকা লইয়া বাদ্যের সহিত গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন। গানের মর্ম্ম এইরূপ ;—শিখগণ জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা কখনও ধর্ম্মত্যাগ করিবেন না। তাহার পর আকালী জাঠারা ঢোল ও করতাল বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিলেন। পরে ছিলেন হিন্দু রিলিফ কমিটার সদস্যবৃন্দ; ইঁহারা "হিন্দুধর্ম্ম কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তাহার পর ছিলেন মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াগণ, কংগ্রেস কমিটার সদস্যগণ এবং কলিকাতার বাঙ্গালী অধিবাসিবৃন্দ। ইঁহারা "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। মিছিলের উভয় পার্শ্বে শিখ ও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকগণ জনতাকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিলেন। মিছিলের সঙ্গে ২খানি জলবাহী লরী ছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ তৃষ্ণার্ত্ত জনতাকে জলদান করিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন।

"সৎশ্রী আকাল" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মিছিল শিখ-সঙ্গত হইতে বাহির হইয়া মল্লিক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে। কটন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলে লোক মিছিলের উপর গোলাপজল ছিটাইতে থাকে। মিছিল ৯টার মধ্যে ১৫৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মসজেদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে কিছুক্ষণের জন্য গীতবাদ্যাদি বন্ধ হয়। তার পর পুনরায় বাদ্যভাণ্ড সহিত মিছিল অগ্রসর হইয়া দরগার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। মিছিল সৈয়দসালি লেন ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া থামে। পুরোহিতদ্বয় লরী হইতে গ্রন্থসাহেব নামাইয়া উহা মাথায় করিয়া সালিলেনস্থ গুরুদ্বারে লইয়া যায়েন এবং তথায় উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। উন্মুক্ত তরবারি লইয়া শিখ স্বেচ্ছাসেবকগণ পুরোহিতদ্বয়কে রক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা আসিয়া মিছিলের সহিত যোগদান করেন। মিছিল তখন সেন্‌ট্রাল এভিনিউএর মোড়ে অপেক্ষা করিতেছিল। সালি লেনস্থ গুরুদ্বারের সম্মুখে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, গ্রন্থসাহেব প্রতিষ্ঠা করিবার পর তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল।

গান, বাদ্য, ঘণ্টাধ্বনি এবং কম্বু-নিনাদের মধ্যে শোভাযাত্রা সেন্‌ট্রাল এভিনিউ দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সমগ্র সেন্‌ট্রাল

শিখ-সঙ্গতে উপাসনা—মধ্যস্থলে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর

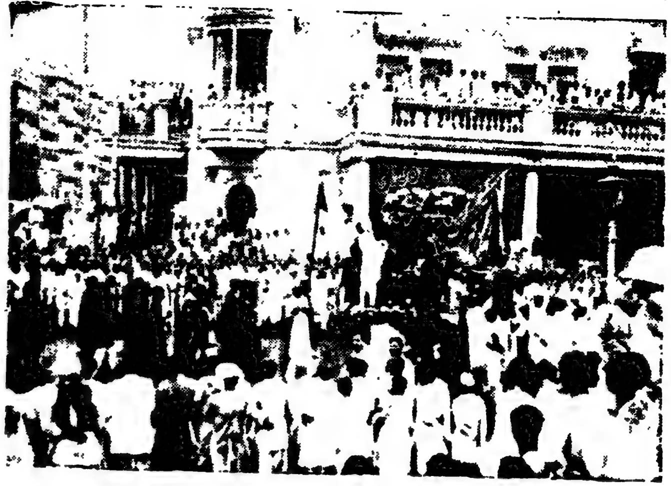

মাধো ভবনের সম্মুখে মিছিল ডি, রতন কো

মিছিলে মুক্ত তরবারি হস্তে আকালী দল [ডি. রতন কোং।

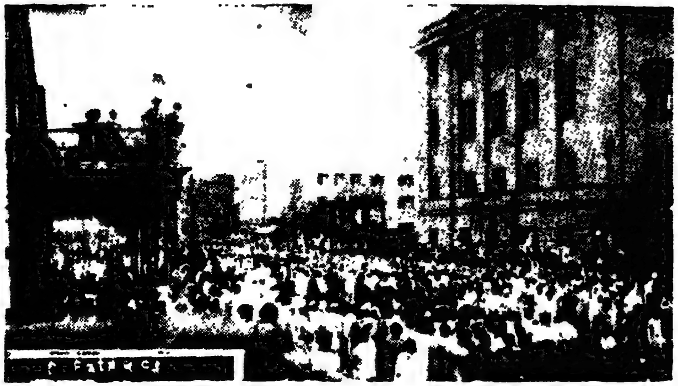

সেন্ট্রাল এভেনিউর জনতার দৃশ্য [ডি, রতন কোং!

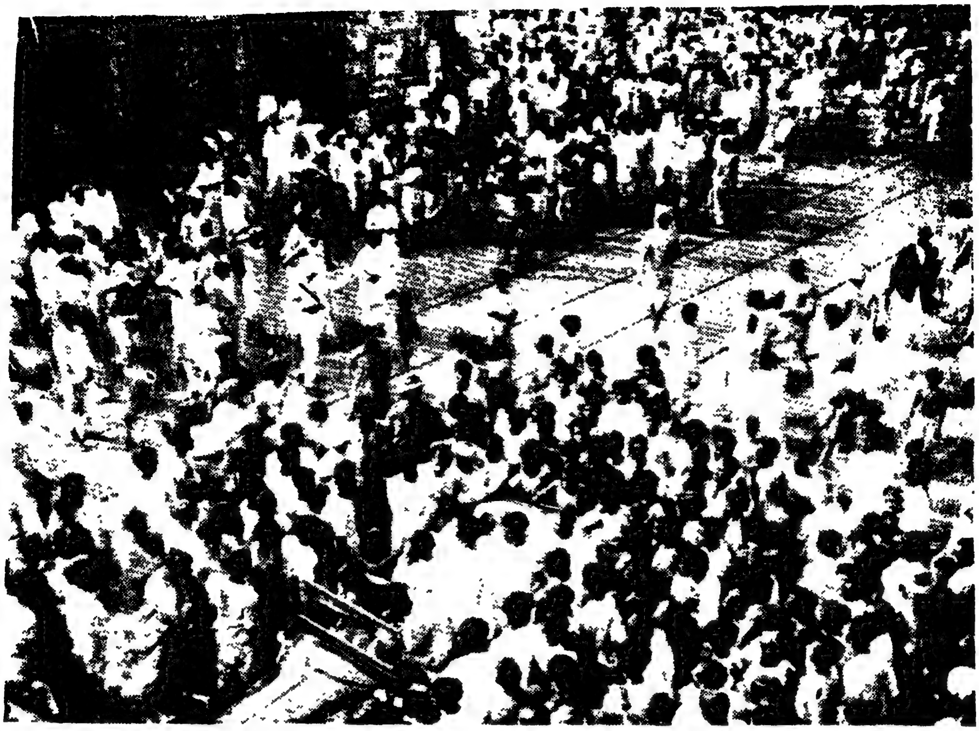

বৌবাজারে শিখ মিছিল

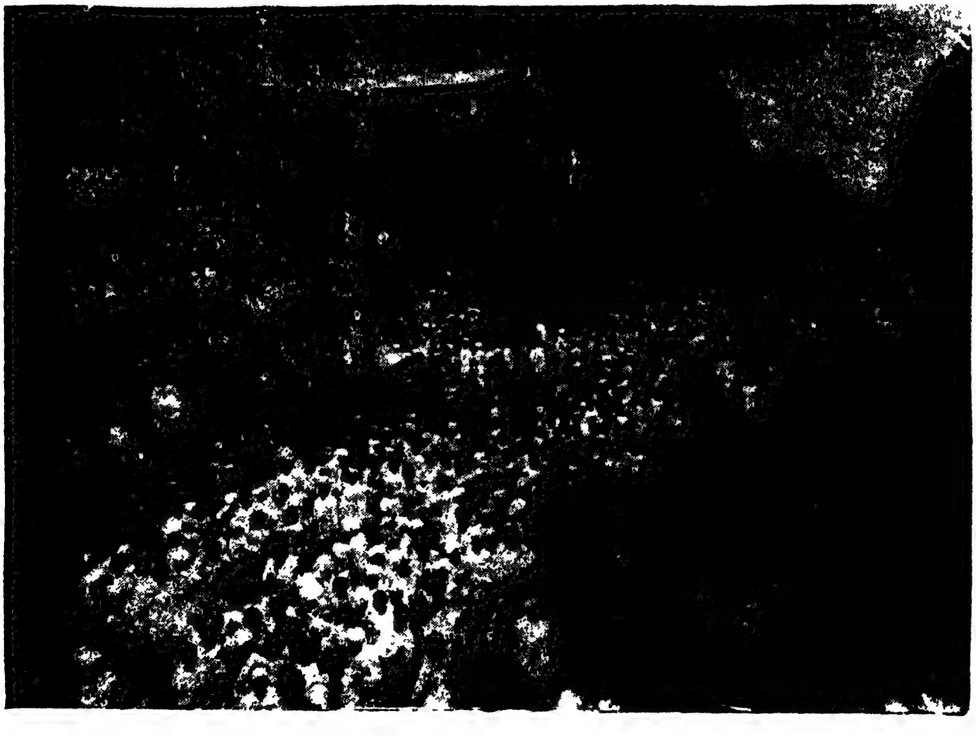

শোভাযাত্রায় অশ্বপৃষ্ঠে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর

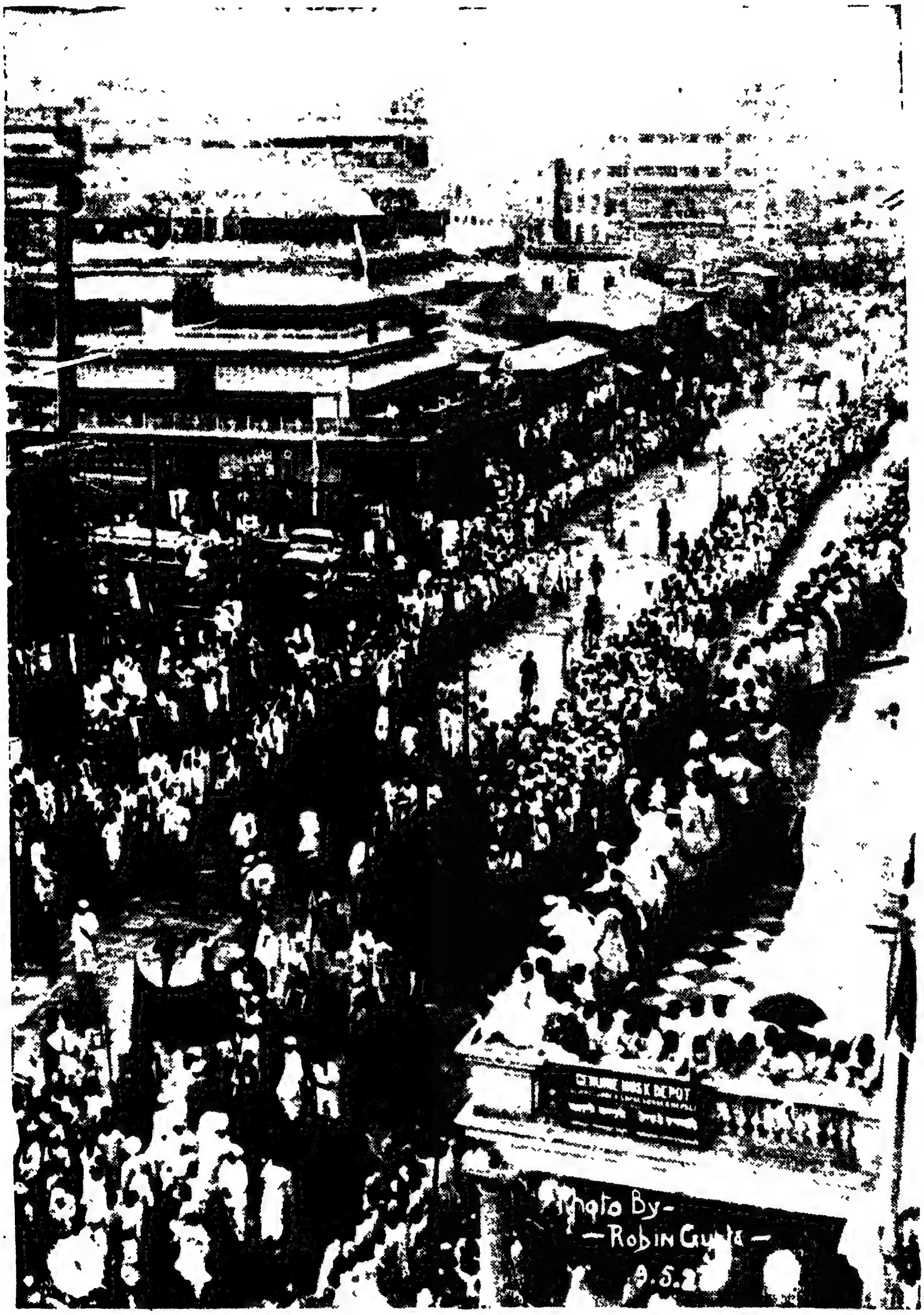
Photo By-
—Robin Gupta—

হ্যারিসন রোডে মসজেদের সম্মুখে শিখ-মিছিল

রবীন গুপ্ত

এভেনিউ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকার ছাদ হইতে পুরুষ-নারী অসংখ্য লোকে শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছিল। শোভাযাত্রা পতাকা সঞ্চালন করিয়া "সৎশ্রী আকাল" ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কলুটোলা ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভেনিউয়ের সংযোগস্থলে মেয়র শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শোভাযাত্রা যখন হ্যারিসন রোড ও সেন্ট্রাল এভেনিউয়ের মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম সকলের আননে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃই অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর অফিসের পার্শ্বে একটি মসজেদ অবস্থিত। এই মসজেদের সম্মুখ দিয়া তাহারা গীতবাদ্য করিতে করিতে যায়। শোভাযাত্রা এই মোড়ে ১০।১২ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছিল। মাড়োয়ারী গৃহস্থরা শোভাযাত্রার উপরে গোলাপজল বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং জনতার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতঃপর শোভাযাত্রা বহুবাজার অভিমুখে রওনা হয়। যখন শোভাযাত্রা বহুবাজার ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভেনিউয়ের মোড়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, জনতার মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা কোনরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। শোভাযাত্রা চিৎপুর রোডে না ভাঙ্গিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হয়, বেলা ১২টার সময় শোভাযাত্রা ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়া 'বড় শিখ-সঙ্গতে' উপস্থিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা কিছুকাল গান ও বাজনা করিয়াছিল। শিখ নেতৃগণ তখন হিন্দুসম্প্রদায়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শোভাযাত্রায় যাহারা যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল।

অশ্বপৃষ্ঠে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নটীর পুজা

(নাটক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটীর পূজা

প্রথম অঙ্ক

মগধ প্রাসাদ ; কুঞ্জবনে

মহারাণী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী, উৎপলপর্ণা।

লোকেশ্বরী

মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেচেন?

ভিক্ষুণী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

আজ তাঁর অশোক-চৈত্যে পূজা-আয়োজনের দিন—সেই জন্যেই বুঝি?

ভিক্ষুণী

আজ বসন্ত পূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী

পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী

আজ ভগবান্ বুদ্ধের জন্মোৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী

আর্য্যপুত্রকে বোলো গিয়ে, আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েচি। কেউ বা ফুল দেয়, দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য ক'রে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী

কী বলচ মহারাণী?

লোকেশ্বরী

আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু ক'রে। তবু বলে পূজা দাও! লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী!

ভিক্ষুণী

যাকে দিয়েছ, তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে, আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী

নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী

না।

লোকেশ্বরী

কোনোদিন ছিল ?

না। আমি প্রথম বয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী

তা হলে চুপ করো। যে-কথা জানো না, সে-কথা বোলো না।

ভিক্ষুণী

মহারাণী, সত্যধর্ম্মকে তুমিই ত রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান ক'রে এনেছিলে ? তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী

আশ্চর্য্য—মনে আছে তো দেখি ! ভেবেছিলাম সে কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্ম্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণ পঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙ্‌ত আমার উপবাস, প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সঙ্ঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্ম্মবৈরি দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলোমলো, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোক-তলায় বসিয়ে সকলকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই ! যে মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েচে যারা, তাদের তো কিছুই হ'লো না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

সংসারের মূল্যে ধর্ম্মের মূল্য নয় মহারাণী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক ?

লোকেশ্বরী

যে-দিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্ব্বোধ সে-দিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়।

দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন, এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্ব্বে বল্‌লেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি, তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার ! ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্য্যপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করালেম তবু জয় হ'লো কার ?

ভিক্ষুণী

তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না।

লোকেশ্বরী

আমারই ?

ভিক্ষুণী

নয় ত কী। পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন, সেদিন তিনি যে-রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী

সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ। আর আমার দিকে তাকাও দেখি ! আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্ব্বাসিতা। এটাতো মুখের কথা নয় ! যারা তোমাদের ধর্ম্ম কোনোদিন মানে নি, তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞার হেসে চ'লে যাচ্চে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী

মহারাণী এর মধ্যে সত্য আছে কোথায় ! এতো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক্ না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী

স্বপ্ন বটে ! তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা, যা'কে বলে বিত্ত, যা'কে বলে পুত্র, যা'কে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ঐ দিকে যাঁরা মাথা উঁচু ক'রে বেড়াচ্ছেন, বলো না তাঁদের গিয়ে। পুজো দিন না তাঁরা !

ভিক্ষুণী

যাই তবে।

লোকেশ্বরী

যাও, কিন্তু আমার মত নির্ব্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরা তো বুদ্ধকে মানে নি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়ে নি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ধৈর্য্যের ভাণ করতে শিখেচ ?

ভিক্ষুণী

কেমন ক'রে বল্‌ব ? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী

ধৈর্য্য ভঙ্গ হয়, তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করচ। তোমাদের এই নীরব স্পর্দ্ধা অসহ্য ! যাও !

(ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম)

লোকেশ্বরী

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী-একটা নতুন নাম নিয়েছে। জানো তুমি ?

ভিক্ষুণী

জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী

যে-নামে তার মা তাকে ডেকেচে, সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চ'লে গেল।

ভিক্ষুণী

মহারাণী যদি ইচ্ছা করো তাঁকে এক দিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী

আমি ইচ্ছা কর্‌তে যাব কোন্ লজ্জায়! আর আজ তুমি আন্‌বে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেচে তাকে এই পৃথিবীতে!

তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী

একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

হয়।

লোকেশ্বরী

আচ্ছা, একবার না হয় তাকে—যদি সে— না, থাক্।

ভিক্ষুণী

আমি তাঁকে বল্‌ব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

লোকেশ্বরী

হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে "হয়তো" ছিল না। এত দিনের সেই মাতৃঋণের দাবী আজ এই একটুখানি হয়তো-য় এসে ঠেকল! এ'কেই বলে ধর্ম্ম! মল্লিকা!

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা

দেবী।

লোকেশ্বরী

কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা

পেয়েছি। দেবদত্তকে আন্‌তে গেছেন। এরাজ্যে ত্রিরত্ন পূজার কিছুই বাকি থাক্‌বে না।

লোকেশ্বরী

দেবদত্তকে সহায় চাই! ভীরু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে! বুদ্ধ ধর্ম্মের কত যে শক্তি, তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ঐ অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হ'ল না!

মল্লিকা

মহারাণী, যাদের অনেক আছে, তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায়, অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী

আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্ব্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা

দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারাণীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী

দেখো, ঐ সব বানানো কথা শুন্‌লে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতি নির্ম্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ঐ মাটিতে-মাখা খুঁটি ক'টা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা হলে আবার না হয় অশোক চৈত্যে দীপ জ্বালব, একশো শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে, সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় ত আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হোন আর ঝুঁটোই হোন! যাই, একবার প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখিগে এঁরা কতদূরে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ)

লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া—দূরে চাহিয়া—

শ্রীমতী

সময় হোলো, এসো তোমরা।

(আপন মনে গান)

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী

তুমি শ্রীমতী ?

শ্রীমতী

হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী

প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী

প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্ব্বে কখনো দেখি নি।

মালতী

নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী

কেন এলে বাছা ? সেখানে কি দিন কাট্‌ছিল না ? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুসি ; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেচ ? এইটুকু তোমার আশা ?

মালতী

সত্যি বলব ? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বল্‌তে সঙ্কোচ হয়।

শ্রীমতী

ও, বুঝেছি। রাজরাণী হবার দুরাশা। পূর্ব্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি ক'রে থাকো তো হতেও পারে। বনের পাখী সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী

কী তুমি ব'লচ, দিদি, ভালো বুঝতে পারচিনে।

শ্রীমতী

আমি বলচি— (গান)

বাঁধন কেন ভূষণ বেশে তোরে ভোলায়
হায় অভাগী !
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী !

মালতী

তুমি আমাকে কিছুই বোঝোনি। তবে স্পষ্ট ক'রে বলি। শুনেচি, একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরামবনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানে না কি বেদী গড়ে দিয়েচেন।

শ্রীমতী

হাঁ, সত্য।

মালতী

রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন।—আমার যদি সে অধিকার না থাকে, আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব, এই আশা ক'রে এখানে গায়িকার দলে ভর্ত্তি হয়েছি।

শ্রীমতী

এসো এসো বোন, ভালো হ'ল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্ম্মল হাত দুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী

কেমন ক'রে বলব, দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চ'লে। তার বয়স আঠারো। হাতে ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কোথায় যাচ্ছিস ভাই," সে বল্‌লে "খুঁজতে।"

শ্রীমতী

নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একডাকে ডেকেচে। পূর্ণ চাঁদ উঠল।—একি! তোমার হাতে যে আঙ্‌টি দেখি। কেমন লাগচে যে! স্বর্গের মন্দার কুঁড়িতো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেলো না?

মালতী

তবে খুলে বলি – তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী

অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েচে।

মালতী

তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ ক'রে তাঁকে দেখেচি। একদিন নিজে এসে বল্‌লেন, মালতীকে আমার ভালো লাগে। বাবা বল্‌লেন, মালতীর সৌভাগ্য। সব আয়োজন সারা হ'ল যেদিন, এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয়, ভিক্ষুর বেশে। কাষায় বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বল্‌লেন, যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।—দিদি, কিছু মনে কোরো না—এখনো চোখে জল আসচে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী

চোখের জল ঝরে যাক্ না। মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে।

মালতী

প্রণাম ক'রে বল্লেম, "আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। যে আঙটি পরাবে কথা দিয়েছিলে, সেটি দিয়ে যাও।" এই সেই আঙ্টি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খ'সে পড়বে, সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী

কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিলো, আজ তারা ঘর ভাঙলো। কত মেয়ে চীবর প'রে পথে বেরিয়েচে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে? কতবার হাত জোড় ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি "মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।" রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসচেন।

(বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ)

বাসবী

এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি! চুল চূড়া ক'রে বেঁধেচে, অলকে দিয়েচে জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কি রকম উঁচু ক'রে জড়িয়েচে। গলায় বুঝি কুঁচ ফুলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এলো?

শ্রীমতী

গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী

পেয়েছ একটি শীকার! ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধ'রে মুক্তির ব্যবসা চালাবে!

শ্রীমতী

গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী! ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি—না ধূলায়, না মণিমাণিক্যে—স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী

স্বর্গে যদি না যাই, সেও ভালো, কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মান্‌তে রাজি আছি।

নন্দা

রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,—লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ! ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী

ওর চুপ ক'রে থাকাইতো রাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো না, চুপি চুপি হাসচে। ওটা কি উপদেশ হ'ল না?

রত্নাবলী

মহৎ উপদেশ ! অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্তের দ্বারা তাম্রকে।

বাসবী

একটু ঝগড়া করো না কেন, শ্রীমতী। এত মধুর কি সহ্য হয় ? মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী

ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম, বাইরে মন্দর ভাণ করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভাণ করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্তা ! সে যদি মেঘের মুখোষ পরে ?

অজিতা

ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক্ হয়ে ভাবচে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী

মালতী।

অজিতা

কী ভাবছিলে বলো না।

মালতী

দিদিকে ভালো বেসেছি, তাই ব্যথা লাগ্‌ছিল।

অজিতা

আমরা যাকে ভালোবাসি, তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলঙ্কারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা

মালতী, কী-একটা কথা যেন বল্‌তে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলো না। আমাদের তুমি কী ভাবো, জান্‌তে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী

আমি বল্‌তে চাচ্ছিলেম, "হাঁগা, তোমরা নিজের কথা শুন্‌তেই এত ভালোবাসো, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।"

(সকলের উচ্চহাস্য)

বাসবী

হাঁ গা, হাঁ গা ! রাজবাড়ির ব্যাকরণচুঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধকারকের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।

রত্নাবলী

হাঁগা বাসবী, হাঁগা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী

হাঁগা রত্নাবলী, হাঁগা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী—ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ! সম্বন্ধ কারকে হাঁগা!

মালতী

দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেচেন?

নন্দা

ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলি বনে যখন শিল বৃষ্টি করে, তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ঐ।

অজিতা

ঐ দেখো শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্চে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁছচ্চে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও না, আমরাও যোগ দেব।

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি!
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

বাসবী

মালতী, তোমার চোখে যে জল ভ'রে এলো। এ গানের মধ্যে কী বুঝলে বলোতো।

মালতী

শ্রীমতী ডাক শুনেচে।

বাসবী

কার ডাক ?

মালতী

যার ডাকে আমার ভাই গেলো চ'লে। যার ডাকে আমার—

বাসবী

কে, কে তোমার ?

শ্রীমতী

মালতী, বোন আমার, চুপ্, আর বলিস্‌নে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী

শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন ? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি ?

ভদ্রা

আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না ?

মালতী

রাজকুমারী আজ ত বাতাসে বাতাসে কথা চল্‌চে, তোমরা শোনো নি ?

নন্দা

সকালের আলোতে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল ত খোলে না।

(লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম)

লোকেশ্বরী

আমি সহ্য করতে পারচিনে। ঐ শুনচনা রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায়। শুন্‌লে এখনো আমার বুকের ভিতর জ্বলে ওঠে। (কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনি এখনি।

মল্লিকা

দেবী শান্ত হোন্ !

লোকেশ্বরী

শান্ত হব কিসে ? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে ? সেই, নমঃ পরম-শান্তায়, মহাকারুণিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র "নমো বজ্রক্রোধ-ডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়।" অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আস্‌বে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চ'লে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করচ ?

রত্নাবলী

(হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্ম্মল ক'রে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু ক'রে এগোচ্চি।

বাসবী

অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী

এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্ম্মই এসেচে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বুঝি হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেচে! যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন, রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখ্‌তে এলো, এ'কেও দয়া ক'রে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলোই না। তবু আজ না কি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্ম্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধূলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম্ম! যেখানে রাজার প্রভাব ছিল, সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—এ'কে ধর্ম্ম বলিস্ তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্ দেখি নটী! দেখি কত বড়ো সাহস! পাপ রসনায় পক্ষাঘাত হবে না?

শ্রীমতী

(করযোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমো ধর্ম্মায় তারণে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ!

লোকেশ্বরী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক্ থাক্ থাম্ থাম্।

শ্রীমতী

মৎহিতায় অনাথায় অনুকম্পায় বে বিভো—

লোকেশ্বরী

(বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা!—শ্রীমতী একবার বলোতো, "মহাকারুণিকো, নাথো"—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।

লোকেশ্বরী

হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়! "নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ!"

(অনুচরীর প্রবেশ)

অনুচরী

মহারাণী, এই দিকে আসুন নিভৃতে। (জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী

কে বলে ধর্ম্ম মিথ্যা! পুণ্যমন্ত্রের যেম্‌নি উচ্চারণ, অম্‌নি গেল অমঙ্গল! ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি! "মহাকারুণিকো নাথো" তাঁর করুণার কত বড়ো শক্তি! পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের সবাইকে ব'লে যাচ্চি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন্। যারা ভগবানকে অপমান করেছে, দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে! বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি—

[বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান।

রত্নাবলী

মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্ দিক থেকে বইল?

মল্লিকা

আজকাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে? হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায়, কেউ বল্‌তে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি না কি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেচে। আবার নন্দিবর্দ্ধন, যজ্ঞে যে সর্ব্বস্ব দিতে পণ করলে, আজ ব্রাহ্মণ দেখ্‌লে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী

তাহলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন!

মল্লিকা

দেখোনা শেষ পর্য্যন্ত কী হয়।

মালতী

ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন, সেদিন শ্রীমতী দিদি তাঁকে দেখতে যাওনি, একি সত্য?

শ্রীমতী

সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী

হায়, হায়, তবে কী হলো দিদি!

অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখ্‌লেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুন্‌লেই কি শোনা যায়?

রত্নাবলী

ইস্, এটা আমাদের পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বল্‌ব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেচে, তোমরা তাঁকে দেখোনি।

রত্নাবলী

বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্দ্ধা সহ্য করচ কেমন ক'রে?

বাসবী

বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি, তা হ'লে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার ক্ষয়ে যাক্।

শ্রীমতী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমো ধর্ম্মায় তারণে, নমঃ সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা

ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী

বিনয় ভুলেচ নটী! এ কথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী

কেন করব রাজকুমারী? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন, তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই?

বাসবী

থাক্ থাক্, মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হ'তে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

নেপথ্যে

ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, বোধিসত্ত্বায়, মহাসত্ত্বায়, মহাকারুণিকায়।

(উৎপলপর্ণার প্রবেশ)

সকলে

ভগবতি, নমস্কার।

ভিক্ষুণী

ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে॥

শ্রীমতী!

শ্রীমতী

কী আদেশ?

ভিক্ষুণী

আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী

বোধ হয় ভুল শুন্‌লেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বল্‌চেন?

ভিক্ষুণী

এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী

রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক্ষুণী

হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী

স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েচেন?

ভিক্ষুণী

তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী

কে তাঁরা? নাম শুনি।

ভিক্ষুণী

একজন তো উপালি।

রত্নাবলী

উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী

সুনন্দও বলেছেন।

রত্নাবলী

তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী

সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী

তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জানোনা।

রত্নাবলী

নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী

সে কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার "রাজগৃহ" নগরীর নির্জ্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে আনিগে।

[প্রস্থান।

অজিতা

কোথায় চলেচ শ্রীমতী?

শ্রীমতী

অশোকবনের আসনবেদী ধৌত করতে যাব।

মালতী

দিদি, আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা

আমিও যাব।

অজিতা

ভাব্‌চি গেলে হয়।

বাসবী

আমিও দেখিগে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী

কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী

আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবেনা, শ্রীমতীর শান্তিও থাক্‌বে অক্ষুণ্ন।

[রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।

রত্নাবলী

সইবেনা! সইবেনা! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ! মল্লিকা, পুরুষ হয়ে অন্যমনা কেন! এই কঙ্কণপরা হাতের পরে ধিক্কার হয়! যদি থাকৃত

তলোয়ার ! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলে, একটি কথাও কও নি ! তুমিও কি ঐ নটীর পরিচারিকার পদ কামনা করো ?

মল্লিকা

করলেও পাবোনা। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী

চুপ ক'রে সহ্য করো কী ক'রে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা

আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিনে।

রত্নাবলী

নিশ্চিত জানো ?

মল্লিকা

নিশ্চিত।

রত্নাবলী

গোপন কথা যদি হয়, বোলোনা। কেবল এইটুকু জান্‌তে চাই, ঐ নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মল্লিকা

না, কিছুতেই না ! আমি কথা দিচ্চি।

রত্নাবলী

রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন !

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা।

মল্লিকা

পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হ'লো মহারাণী! তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী

পুত্রের সঙ্গে? পুত্র কোথায়? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি! আগে বুঝতে পারি নি!

মল্লিকা

এমন কথা কেন বল্‌চেন?

লোকেশ্বরী

পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মা'র কাছে আসে, তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম ক'রে সে চাইলে আমার দিকে? তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেচে—কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই! নিজের এত বড়ো নিঃশেষে সর্ব্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা

রক্ত-মাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্ম্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী

হায়রে রক্ত-মাংস! হায়রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা! রক্তমাংসের তপস্যা এ'দের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম!

মল্লিকা

কিন্তু যাই বলো দেবী, তাঁকে দেখ্‌লেম, সে কী রূপ! আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্ত্তিখানি।

লোকেশ্বরী

ঐ রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ঐ রূপ ধিক্কার দিলে! যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ! দেখ মল্লিকা, আজ খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলেম, এ ধর্ম্ম পুরুষের তৈরি। এ ধর্ম্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না-পুত্র না-স্বামী না-ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে প'ড়ে থাক্‌ব! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম্ম আমাদের মেরেচে, আমরাও এ'কে মারব!

মল্লিকা

কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্তে!

লোকেশ্বরী

মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে, তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি ক'রে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।

মল্লিকা

মুখে বল্‌চ, মহারাণী। নিশ্চয় জানি, তোমার ঐ পুত্র আজ তোমার সেবা-কক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেচে। তোমার মানবপুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতাপুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী

চুপ্ চুপ্! বলিস্‌নে! আমি হাত জোড় ক'রে তাকে অনুরোধ করলেম, বল্‌লেম, "একরাত্রির জন্তে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।" সে বল্‌লে, "আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।" মল্লিকা, যদি মা হতিস্ তো বুঝতিস্ কতবড় কঠিন কথা! বজ্র দেবতার হাতের, কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঐ যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জ্জন আমার পাঁজরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্চে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি!

মল্লিকা

একি মহারাণী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী

ঐ তো বিপদ! মল্লিকা, দুর্ব্বলের ধর্ম্ম মানুষকে দুর্ব্বল করে। দুর্ব্বল করাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট ক'রে দেবে। ব্রাহ্মণকে বল্‌বে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বল্‌বে ভিক্ষা করো। এই ধর্ম্মের বিষ অনেক দিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেচি। সেইজন্তে আজ আমিই এ'কে সব চেয়ে ভয় করি! ঐ কে আসচে?

মল্লিকা

রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে এসেচেন।

(বাসবীর প্রবেশ)

লোকেশ্বরী

পূজায় চলেচ?

বাসবী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

তোমাদের তো বয়স হয়েচে।

বাসবী

আমাদের ব্যবহারে তার কি কোন বৈলক্ষণ্য দেখচেন ?

লোকেশ্বরী

শিশু ! তোমরা না কি ব'লে বেড়াচ্চ, অহিংসা পরমোধর্ম্ম !

বাসবী

আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি, তাঁরাই ব'লে বেড়াচ্চেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী

নির্ব্বোধকে কেমন ক'রে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম্ম। হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী

শক্তির কি কোমল রূপ নেই ?

লোকেশ্বরী

আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় ক'রে বাঁধে, তখন না। পর্ব্বতকে সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দয় পাথর দিয়ে গড়েচেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত সবই কি হবে পাঁক ? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মান্‌তে ঘৃণা হয় না ? চুপ ক'রে রইলে যে ?

বাসবী

ভেবে দেখচি, মহারাণী।

লোকেশ্বরী

ভাববার কী আছে ! চোখের সামনে দেখলে তো, রাজপুত্র এক মুহূর্ত্তে রাজা হতে ভুলে গেল। ব'লে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোনোনি, বাসবী ?

বাসবী

শুনেছি।

লোকেশ্বরী

তাহলে নির্দ্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে ? কেউ যদি না করে, তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি ? যত সব মাথা-হেঁট-করা উপবাস-জীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জ্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে ? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেক্‌চে কেন বাসবী ?

বাসবী

এই পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা প'ড়ে গেছে—বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন ক'রে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী

কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম্ম ভুলে যায়, কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুল্‌তে দেয়, তাহলে মরণ যে সেই নারীর! মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই? সব গাছই কি গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল্‌না। মুখে যে উত্তর নেই!

বাসবী

মহাবৃক্ষ চাই বৈ কি।

লোকেশ্বরী

কিন্তু বনস্পতি নির্ম্মূল করবার জন্তেই এসেচেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন, এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মরো, আমার এই আশীর্ব্বাদ। কী ভাব্‌চ? কথাটা মনে লাগচেনা?

বাসবী

ভাল ক'রে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী

ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্য্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিষ নয়, তাতেই তাঁর ধর্ম্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মকর ধর্ম্ম কানে মন্ত্র দিল, অম্‌নি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খ'সে পড়লেন—অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে, এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী

কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী

তাহলে জিজ্ঞাসা করি, দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টল্‌মল্ করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান, তাকে শ্রদ্ধা ক'রে বরণ করতে পারবে?

বাসবী

না।

লোকেশ্বরী

আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবচ ওঁর জন্তে সাজব! যে-মানুষ রাজাও নয়, ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই, ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বারবার বল্‌চি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্ম্মকে কিছুতে স্বীকার কোরোনা।

মল্লিকা।

রাজকুমারী কোথায় চলেচ ?

বাসবী

ঘরে।

মল্লিকা

এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এলো।

বাসবী

থাক্, থাক্।

[প্রস্থান।

মল্লিকা

মহারাণী, শুন্‌তে পাচ্চ ?

লোকেশ্বরী

শুন্‌চি বইকি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা

নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েচেন।

লোকেশ্বরী

কিন্তু ঐযে এখনো শুন্‌চি, নমো—

মল্লিকা

স্বর বদলেচে। "নমো বুদ্ধায়" গর্জ্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেচে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শোনো—"নমঃ পিনাকহস্তায়! আর ভয় নেই।"

লোকেশ্বরী

ভাঙ্‌লরে ভাঙল! যখন সব ধুলো হয়ে যাবে, তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায়রে, কত ভক্তি! মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি – ওর ভীৎটা যে আমার বুকের মধ্যে!

(রত্নাবলীর প্রবেশ)

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায় ?

রত্নাবলী

ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি, কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী

তবে কোথায় যাচ্চ ?

রত্নাবলী

মহারাণীর কাছেই এখানে এসেচি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী

কী, বলো।

রত্নাবলী

ঐ নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায়, তাহলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী

আশ্বাস দিচ্চি, আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী

আজ না হোক্, কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী

যে অপমান সহ্য করেছি, তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী

তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্ব্বাসন, এমন কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী

তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী

তবে তোমার কী ইচ্ছা?

রত্নাবলী

ও যেখানে পূজারিণী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল, সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ ক'রে রইলে যে। তুমি কী বলো?

মল্লিকা

প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী

ছি ছি, না। আমার মন সায় দিচ্চে না রত্না।

রত্নাবলী

ঐ নটীর পরে মহারাণীর এখনো দয়া আছে দেখচি।

লোকেশ্বরী

দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া!

রত্নাবলী

তবে?

লোকেশ্বরী

অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েচি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে, সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরাণীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী

প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। ঐটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন, তবে ঐ ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারেবারে গড়ে উঠ্‌বে।

লোকেশ্বরী

সে ভয় মনে একেবারে নেই, তা নয়।

রত্নাবলী

মোহে প'ড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন, তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন, তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, ঐ শোনো। উদ্যানের উত্তরদিক্‌ থেকে শব্দ আস্‌চে। ভেঙে ফেল্‌লে, সব ভেঙে ফেল্‌লে। ওঁ নমো—যাক্‌ যাক্‌ ভেঙ্গে যাক্‌!

রত্নাবলী

চলোনা মহারাণী, দেখে আসিগে!

লোকেশ্বরী

যাব, যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী

আমি দেখে আসিগে। [প্রস্থান।

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড় বাজে।

মল্লিকা

তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়চে।

লোকেশ্বরী

ঐ শোনো না, "জয় কালী করালী"—অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এলো, এ আমি সইতে পারচিনে।

মল্লিকা

বুদ্ধের ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্য ধর্ম্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে, তখনি সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী

ছি, ছি, বোলোনা, বোলোনা, মুখে এনো না! দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট! যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম, তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে-আসনে আমার সেই পরম নির্ম্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি, তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। "যাবত্রয়েণ

কৃতং সর্ব্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো !" (উঠিয়া) ভয় নেই মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক্, বাইরে আছে নিটুয়া, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জ্জন ঘরে গিয়ে বসিগে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে, তখন আমাকে ডেকো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধুপ দীপ গন্ধমাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পুজোপকরণ লইয়া
রাজবাটির একদল নারীর প্রবেশ)

পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ গন্ধ গুণোপেতং মেতং কুসুম সন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরি পাদ সরোরুহে ॥

(প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি)

ধুপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ সম্ভার যুত্তেন ধূপেনাহ সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং ॥

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

শ্রীমতী

(প্রদীপের থালা ঘিরিয়া)

ঘন সারপ্প দিত্তেন দীপেন তম ধ্বংসিনা।
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং ॥

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

(আহার্য্য নৈবেদ্য ঘিরিয়া)

অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগৃহ্ণাতু মুত্তমং।

(শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম)

(জানু পাতিয়া)

যো সন্নিসিন্নো বর বোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগচ্ছি অনন্ত ঞ্ঞানো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধ।

শ্রীমতী

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপমূলে।

মালতী

কিন্তু শ্রীমতী দিদি, ঐ দেখ, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।

বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।

নন্দা

বোধ হচ্চে রাজার নিষেধ।

শ্রীমতী

কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।

নন্দা

কী ভয়ঙ্কর গর্জ্জন! এ কি রাষ্ট্রবিপ্লব?

শ্রীমতী

গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃরবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি-জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে॥

কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এলো তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

(একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ)

রক্ষিণী

ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী

আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী

আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী

এও কি সম্ভব?

রত্নাবলী

পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য। (পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া)

শ্রীমতী

এ কী পরীক্ষা আমার! অপরাধ কি ঘটেছে কিছু?

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রত্নাবলী

বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী

দ্বারের কাছেই অবরোধ। প্রবেশ আমার ঘট্‌ল না ঘট্‌ল না।

মালতী

কাঁদো কেন শ্রীমতী দিদি! বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না? ভগবানতো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেচেন।

শ্রীমতী

শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা

শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্ত্তে আজ এমন দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল কেন?

শ্রীমতী

দুর্দ্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে, তা জোড়া লাগ্‌বে, যা পড়েচে, তা উঠ্‌বে আবার।

অজিতা

দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্চে, তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী

আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেচেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা

রাজার বাধাও সরাতে পারবে?

শ্রীমতী

সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

(রত্নাবলীর প্রবেশ)

রত্নাবলী

কী বল্‌ছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মানোনা, এত বড় তোমার সাহস।

পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী

নেই রাজার বাধা? সত্যি না কি? যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী

যিনি অন্তর্যামী, তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

তোমার দিন এবার হয়ে এসেচে, অহঙ্কার ঘুচবে।

শ্রীমতী

তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাক্‌বে না, কিছুই না।

রত্নাবলী

এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসচি।

[প্রস্থান।

ভদ্রা

কিছুই ভাল লাগচে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় স'রে পড়েচে।

অজিতা

আমার কেমন ভয় করচে।

(উৎপলপর্ণার প্রবেশ)

নন্দা

ভগবতি, কোথায় চলেছেন?

উৎপলপর্ণা

উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেচি।

শ্রীমতী

ভগবতি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

উৎপলপর্ণা

কেমন ক'রে নিয়ে যাই? তোমার উপরে যে-পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী

পূজার আদেশ এখনো আছে দেবি?

উৎপলপর্ণা

সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই?

মালতী

মাতঃ, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে।

উৎপলপর্ণা

ভয় নেই, ধৈর্য্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।

ভদ্রা

শুনচ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জ্জন।

নন্দা

আমার তো মনে হচ্চে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ ক'রে ভাঙচুর রচে। শ্রীমতী শীঘ্র চলো, রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে।

[প্রস্থান।

ভদ্রা

এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন ব'লে বোধ হচ্চে।

[রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান।

মালতী

দিদি, বাইরে ঐ যেন মরণের কান্না শুন্‌তে পাচ্চি। আকাশে দেখচ ঐ ধা। নগরে আগুন লাগল বুঝি। জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন?

শ্রীমতী

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী

মনে ভয় আস্‌চে ব'লে বড় লজ্জা পাচ্চি দিদি। পূজা করতে যাব, ভয় নিয়ে যাব, এ আমার সহ্য হচ্চে না।

শ্রীমতী

তোর ভয় কিসের বোন?

মালতী

বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারচিনে, অন্ধকার ঠেকচে, তাই ভয়।

শ্রীমতী

আপনাকে এই বাইরে দেখিস্‌নে। আজ যাঁর অমর জন্ম, তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী

তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতী

গান

আর রেখোনা আঁধারে আমায়
দেখ্‌তে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনাকে
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয়না যে আর,
যাক্ না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে ;
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥
জানিনা তো কোন্ কালো এই ছায়া।
আপন বলে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও ॥

(একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ)

রক্ষিণী

শোনো, শোনো, শ্রীমতী !

মালতী

কেন নিষ্ঠুর হচ্চো তোমরা ? আর আমাদের যেতে বোলোনা ! আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির পরে ব'সে থাকি না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে ?

রক্ষিণী

তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন ?

মালতী

ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন, তার শেষ প্রান্তেও তাঁর পদধূলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও, তাহলে আমরা এইখানে সেই ধূলার ব'সে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রত্নিণী

কেন বলবে না মন্ত্র? বলো, বলো। শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেচি! অন্য রত্নিণীরা দূরে আছে, এই বেলা আজ পুণ্য দিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন, অশোক-ছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপ চোখে দেখেছি, তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দিমায়,
নমো নমো নন্ত গুণণ্ণবায়,
নমো নমো সাকিয় নন্দনায়॥

রত্নিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রত্নিণী

আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে?

শ্রীমতী

ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বল্‌বে তাই পুণ্য হবে। বল নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়—

(ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল)

রত্নিণী

আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হ'ল।—যে কথা বলতে এসেছিলেম, এবার ব'লে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ ক'রে দিচ্চি।

শ্রীমতী

কেন?

রত্নিণী

মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোক-তলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েচেন।

মালতী

হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হ'লো না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেলো সব।

শ্রীমতী

কী বলিস মালতী! তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেম, তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে? ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী

রাজা প্রচার করেচেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তব মন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে ?

শ্রীমতী

অপেক্ষা ক'রে থাকব।

রক্ষিণী

কতদিন ?

শ্রীমতী

যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি, ততদিনই।

রক্ষিণী

পূর্ব্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্চি শ্রীমতী।

শ্রীমতী

কিসের ক্ষমা ?

রক্ষিণী

হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী

কোরো আঘাত।

রক্ষিণী

সে আঘাত হয়ত রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সে দিনো আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী

আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন! বুদ্ধো খমতু, বুদ্ধো খমতু।

(অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ)

২ রক্ষিণী

রোদিনী !

১ রক্ষিণী

কি পাটলী।

পাটলী

ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী

কী সর্ব্বনাশ !

শ্রীমতী

কে মারলে ?

পাটলী

দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী

রক্তপাত তবে সুরু হ'ল ; তাই যদি হলই, তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এযে প্রভুর সজ্যকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চল্‌বে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী

লোভ দেখিয়োনা রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী

তাহলে এই নাও। (তরবারী দান)

শ্রীমতী

(শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলচে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক্, প্রভুর জয় হোক্।

পাটলী

চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রত্নাবলীর কয়েকজন রক্ষিণী সহ প্রবেশ)

রত্নাবলী

এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী

মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী

নাচ! আজ!

মালতী

তোমরা এ কী কথা বলচ গো! মহারাজের ভয় হোলো না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী

ভয় হবারই ত কথা! সেই দিনই ত এসেচে! দাসী তাঁর নটীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্ব্বর!

শ্রীমতী

কখন্ নাচ হবে?

রত্নাবলী

আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী

প্রভুর আসন বেদীর সাম্‌নে?

রত্নাবলী

হাঁ।

শ্রীমতী

তবে তাই হোক্।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

শ্রীমতী, মালতী।

মালতী

দিদি, শান্তি পাচ্ছিনে।

শ্রীমতী

কী হয়েচে?

মালতী

তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল, আমি চুপি চুপি ঐ প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখি, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে—আর,

শ্রীমতী

থাম্‌লে কেন? বলো।

মালতী

রাগ করবে না দিদি? আমি বড় দুর্ব্বল!

শ্রীমতী

কিছুতে না।

মালতী

দেখলেম, অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী

কে যাচ্ছিলেন?

মালতী

দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী

অসম্ভব নেই।

মালতী

পণ করেছিলেম, মুক্তি যত দিন না পাই, তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী

সে পণ রাখা ভালো।

মালতী

কিন্তু আজ মন মানচে না।

শ্রীমতী

সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাক্‌লেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিস্‌নে।

মালতী

তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করচি মনে কোরো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তা'রা মারবে। তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারচিনে ব'লে আমাকে অবজ্ঞা কোরোনা দিদি।

শ্রীমতী

আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে?

মালতী

তাঁকে বাঁচাতে পারব না, কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি—এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী

যাঁর কাছে যাচ্ছিস, তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারবেন। কেন না, তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী

কী বুঝলে, দিদি!

শ্রীমতী

এখনো আমার মনের মধ্যে পুরাণো ক্ষত চাপা আছে—সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেচি, ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েচে। মরণকালে জীবনের সঙ্গে সেই ব্যথা প্রভুর পায়ে দেব, আমার শেষ অর্ঘ্য।

মালতী

রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই, তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্চি। কিন্তু যেতে হ'ল। যখন সময় পাবে, আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী

"বুদ্ধো যো খলিতো দোসো,
বুদ্ধো খমতু তং মম।"

মালতী

(প্রণাম করিতে করিতে) "বুদ্ধো খমতু তং মম।"—যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। কিন্তু তোমার ঐ মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাবো কী করে!
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও, আঁধারের ঘোরে॥

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছো কাছে
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে॥

মালতী

শোনো দিদি, আবার গর্জ্জন! দয়া নেই, কারো দয়া নেই! অনন্ত কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েচেন, তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না! আর দেরি করতে পারিনে! প্রণাম, দিদি! মুক্তি যখন পাবে, আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখো।

শ্রীমতী

চল্, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ)

রত্নাবলী

দেবদত্তের শিষ্যরা ভিক্ষুণীকে মেরেচে! তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা

কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী

মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়?

মল্লিকা

আজকাল তো দেখ্‌চি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী

রেখে দে ও সব কথা! প্রজারা উত্তেজিত হয়েচে ব'লে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারিনে। তোমার ঐ ভিক্ষুধর্ম্ম রাজধর্ম্মকে নষ্ট করবে।

মল্লিকা

উত্তেজনার আরো একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা ক'রে বেরিয়েচেন, কিন্তু এখনো পৌঁছননি; প্রজারা সন্দেহ করচে।

রত্নাবলী

কানাকানি চল্‌চে আমিও শুনেচি। ব্যাপারটা ভাল নয় তা মানি। কিন্তু কর্ম্মফলের মূর্ত্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা

কী কর্ম্মফল দেখলে?

রত্নাবলী

মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্ম্মকে তো বিনাশ করেচেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলেচে, যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুন এক দিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা

চুপ্ চুপ্, আস্তে। জানো তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েচেন!

রত্নাবলী

কার অভিশাপ?

মল্লিকা।

বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ তাঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী

বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা

তাই তার এত মান। বড়ো দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় খুসি করে, ছোট দেবতাকে দেয় দামী অর্ঘ্য।

রত্নাবলী

যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা

যাই হোক্, এই ব'লে যাচ্ছি, আজ সন্ধেবেলায় ঐ অশোকচৈত্যে পূজো হবেই।

রত্নাবলী

তা হয় হোক্, কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও ব'লে দিচ্চি।

[মল্লিকার প্রস্থান।

(বাসবীর প্রবেশ)

বাসবী

প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী

কিসের জন্যে?

বাসবী

শোধ তুল্‌ব ব'লে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ঐ নটী।

রত্নাবলী

উপদেশ দিয়ে?

বাসবী

না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী

তাই ছুরি হাতে এসেচ ?

বাসবী

সে জন্যে না। রাষ্ট্র-বিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেচে—বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী

নটীর উপর শোধ তুল্‌বে কী দিয়ে ?

বাসবী

(হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী

তোমার হীরের হার।

বাসবী

বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে, ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী

ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে ? যদি না নেয়।

বাসন্তী

(ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে।

রত্নাবলী

শীঘ্র ডেকে আনো মহারাণী লোকেশ্বরীকে। তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী

আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুন্‌লেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন, এ কি রাষ্ট্র-বিপ্লবের ভয়ে, না, স্বামীর পরে অভিমানে ? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী

কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারাণীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী

নটীর নতিনাট্য ? নামটি বেশ বানিয়েছ।

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা

যা মনে করেছিলেম, তাই ঘটেচে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে, মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েচেন। গ্রহপূজা চল্‌চেই, কখনো বা শনিগ্রহ, কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী

ভালোই হয়েচে। বুদ্ধের সব ক'টি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ ক'রে দিন,—তাতে সময়সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা

সে জন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসচে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েচেন।

বাসবী

কেন এই দুর্ব্বলতা ?

মল্লিকা

লোকে কি বল্‌চে শোনোনি বুঝি ? দেবদত্তের শিষ্যদের মহারাজ এখন আর নিজেই সাম্‌লাতে পার্‌চেন না।

বাসবী

তাতে কী হয়েচে ?

মল্লিকা

কী আশ্চর্য্য ! এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয়নি ? সবাই অনুমান করচে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেচে।

বাসবী

সর্ব্বনাশ ! এ কখনো সত্য হতেই পারে না !

মল্লিকা

কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েচে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্চেন।

বাসবী

হায়, হায় ! এ কী সংবাদ !

রত্নাবলী

লোকেশ্বরী মহারাণী কি শুনেচেন ?

মল্লিকা

এত বড়ো অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে, তাকে তিনি দু'খানা ক'রে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্চে না।

বাসবী

সর্ব্বনাশ হ'ল। এত বড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ীর কেউ বাঁচবে না। ধর্ম্মকে নিয়ে যা খুসি করতে গেলে কি সহ্য হয় ?

রত্নাবলী

ঐ রে ! বাসবী আবার দেখচি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকচে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্ম্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী

কখনো না। আমি কিচ্ছু ভয় করিনে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসিগে।

রত্নাবলী

মিথ্যা ছুতো ক'রে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েচ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচ সংসর্গের ফল।

বাসবী

অন্যায় বলচ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী

আচ্ছা, তা হ'লে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী

কেন যাব না! তুমি ভাবচ আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্চ ?

রত্নাবলী

আর দেরি নয়, মল্লিকা শ্রীমতীকে এখনি ডাকো—সাজ হোক্ বা না হোক্। রাজকন্যারা যদি না আস্‌তে চায়, রাজকিঙ্করীদের সবাই চাই—নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী

ঐ যে শ্রীমতী আসচে। দেখ, দেখ, যেন চল্‌চে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

(ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান)

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও, জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ॥

রত্নাবলী

এই দিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌচচ্চে না? এই যে এই দিকে।

গান

পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

রত্নাবলী

বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী

না, আমি যাবো না।

রত্নাবলী

কেন যাবে না ?

বাসবী

তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না !

রত্নাবলী

ভয় করচে ?

বাসবী

হাঁ ভয় করচে।

রত্নাবলী

ভয় করতে লজ্জা করচে না ?

বাসবী

একটুমাত্রও না। শ্রীমতী সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী

বুদ্ধো ক্ষমতু তং মম, বুদ্ধো খমতু তং মম,
বুদ্ধো খমতু তং মম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল—ভাঙা স্তূপ

ভগ্নপ্রায় আসনবেদী

রত্নাবলী, রাজকিঙ্করীগণ, শ্রীমতী, একদল রক্ষিণী।

১ম রাজকিঙ্করী

রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হয়ে যাচ্চে।

রত্নাবলী

আর একটু অপেক্ষা করো, মহারাণী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

২য় রাজকিঙ্করী

আপনার আদেশে এসেচি, কিন্তু অধর্ম্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

৩য় রাজকিঙ্করী

এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা! ছি ছি! কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

৪র্থ রাজকিঙ্করী

এতবড় বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না, থাকতে পারব না আমরা—কিছুতে না!

রত্নাবলী

মন্দভাগিনী তোরা, শুনিস্‌নি, বুদ্ধের পূজা এ রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

৪র্থ

রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই—ভগবানের পূজা নাই করলেম, কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

১ম

রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা রাজবধূদেরই জন্যে—এ সভায় আমাদের কেন? চলো, তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান, সেখানে যাই।

রত্নাবলী

(রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিও না ওদের।

(প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া)

১ম কিঙ্করী

পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী! ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচ্‌বি! তোর দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো না এখনো?

শ্রীমতী

উপায় নেই, আদেশ আছে।

২য় কিঙ্করী

নরকে গিয়ে শত লক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে, এ আমি ব'লে দিলেম।

৩য় কিঙ্করী

দেখো একবার, পাতকিনী আপাদমস্তক অলঙ্কার পরেচে, প্রত্যেক অলঙ্কারটি আগুনের বেড়ি হ'য়ে তোর হাড়ে-মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে, তা জানিস ?

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা

(জনান্তিকে রত্নাবলীকে) রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে নিষেধ প্রচার হয়েছিল, সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলচে। হয় ত এখনি এখানেও আস্‌বে, তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন, তার জন্যে প্রস্তুত হচ্চেন।

রত্নাবলী

একবার দৌড়ে যাও তা হ'লে মল্লিকা—শীঘ্র মহারাণী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা

ঐ যে তিনি আস্‌ছেন !

(লোকেশ্বরীর প্রবেশ)

রত্নাবলী

মহারাণী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী

থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী !

শ্রীমতী

কি মহারাণী !

লোকেশ্বরী

এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী

কি এনেছেন ?

লোকেশ্বরী

অমৃত।

শ্রীমতী

বুঝতে পারচিনে।

লোকেশ্বরী

বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী

লোকেশ্বরী

না, রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচের আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না।

রত্নাবলী

মহারাণী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হোক।

লোকেশ্বরী

এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল্। এখানে ম'লে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচ্‌লে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী

সর্ব্বাগ্রে আদেশ পালন ক'রে নিই।

লোকেশ্বরী

নাচবি ?

শ্রীমতী

হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই তোর ?

শ্রীমতী

না, কিছু না।

লোকেশ্বরী

তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী

যিনি উদ্ধারকর্ত্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী

মহারাণী, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী চলবে না, বাইরে গোলমাল শুনচ না ? হয় ত বিদ্রোহীরা এখনি রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে !

নটী, নাচ সুরু হোক্।

গান ও নাচ

আমায় ক্ষমহে ক্ষম, নমোহে নমঃ,
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমায় সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।

রত্নাবলী

এ কী রকম নাচ ? এতো নাচের ভাণ, আর এই গানের অর্থ কি ?

লোকেশ্বরী

না না, বাধা দিয়োনা।

গান ও নাচ

এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে,
শান্তি-সাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে,
আমার আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কি আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরেনা যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।

রত্নাবলী

একি হচ্চে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ঐ স্তূপের মধ্যে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্চে। ঐ গেল কঙ্কণ, ঐ গেল কেয়ূর, ঐ গেল হার। মহারাণী দেখচেন, এ সমস্ত রাজবাড়ির অলঙ্কার – একি অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলঙ্কার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও,যাও এখনি।

লোকেশ্বরী

শান্ত হও, শান্ত হও, ওর দোষ নেই, দোষ নেই, এমনি করেই আভরণ ফেলে দেওয়া, এ তো নাচেরই অঙ্গ, আনন্দে আমারো শরীর দুলে উঠচে (গলা হইতে হার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থেমোনা, থেমোনা।

গান ও নাচ

আমি কানন হ'তে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্য সম
ভরিনি তীর্থ-জল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক্ তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।

রত্নাবলী

একি রকম নাচের বিড়ম্বনা, নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখ্‌চ ত মহারাণী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। এ'কেই কি পূজা" বলে না? রক্ষিণী তোমরা দেখ চ। মহারাজ কি দণ্ডবিধান করেচেন মনে নেই।

রক্ষিণী

শ্রীমতীত পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী

(জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী

(শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া বন্ধ করিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিঙ্করীগণ

সর্ব্বনাশ করিস্‌নে শ্রীমতী, থাম্ থাম্!

রক্ষিণী

যাস্‌নে মরণের মুখে, উন্মত্তা!

২য় রক্ষিণী

আমি করযোড়ে মিনতি করচি, আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিঙ্করীগণ

চক্ষে দেখ্‌তে পারবনা, দেখ্‌তে পারবনা, পালাই আমরা। (পলায়ন)

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

(জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

(রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল)

(ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।)

লোকেশ্বরী

(শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের এক প্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

(রত্নাবলী ধুলিতে বসিয়া পড়িল)

মল্লিকা

(বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া), এইবার আমার ভয় হচ্চে।

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতিহারিণী

মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করচেন, দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা

চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে।

[মল্লিকার প্রস্থান।

লোকেশ্বরী

বসো তোমরা সবাই, বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

সকলে

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

সকলে

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি!

সকলে

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা

মহারাজ, এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী

কেন?

মল্লিকা

সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী

কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা

ঐ হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী

চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি, এর দেহকে সকলে বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

[রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান।

রত্নাবলী

(শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম ও জানু পাতিয়া বসিয়া)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বগুণ্ঠনে

সুমতী প্রেস]

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

৫ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ [২য় সংখ্যা

রসশাস্ত্র

কাব্য বা নাটকে রসসৃষ্টির ও রসপরিপুষ্টির প্রধান উপকরণ—অনুকূল বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সমাবেশ এবং প্রতিকূল বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের পরিবর্জ্জন। এই বিষয়টি প্রত্যেক কবির ভাল করিয়া বুঝা উচিত। এই অনুকূল ও প্রতিকূল বিভাবাদির জ্ঞান যাঁহার নাই, তাঁহার পক্ষে কাব্য বা নাটক-রচনা-প্রয়াস বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন্ স্থায়ী ভাবের সহিত কোন্ বিভাবের, অনুভাবের বা সঞ্চারী ভাবের সম্বন্ধ অনুকূল বা প্রতিকূল, তাহা জানিতে হইলে, অগ্রে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব কাহাকে বলে, তাহাই জানিতে হইবে; সেই জন্য প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রত্যেক রসের উদাহরণ দিলে বিষয়টি নিতান্ত বিস্তীর্ণ ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে, এই কারণে সকল রসের প্রধান আদিরসের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবেরই বিচার করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানব-হৃদয়ে অনুরাগ বা রতিরূপ যে স্থায়ী ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই আদিরসের উপাদান, এই অনুরাগই কাব্য বা নাটকের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া, সহৃদয় সামাজিকগণের নিকট যখন আস্বাদ্যমান হয়, তখনই ইহা আদি বা শৃঙ্গাররস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই অনুরাগ বা রতি মানব-হৃদয়ে যাহাকে বিষয় বা আলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ রতির আলম্বন বিভাব বলিয়া থাকেন। যেমন নায়কের হৃদয়ে যে রতি বা অনুরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার আলম্বন বিভাব তাহার প্রণয়পাত্রী নায়িকা; এইরূপ নায়িকার হৃদয়ে যে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার আলম্বন বিভাব হইয়া থাকে, তাহার জীবনসর্ব্বস্ব নায়ক। এই প্রকারে কোন পুরুষের প্রতি কোন স্ত্রীর বা কোন স্ত্রীর প্রতি কোন পুরুষের যে অনুরাগ আবির্ভূত হয়, তাহাকে যে সকল বাহ্য কারণ উদ্দীপ্ত বা প্রবল করিয়া থাকে, তাহাই অলঙ্কারশাস্ত্রে উদ্দীপন বিভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন নব-বসন্তসমাগমে পুষ্পিত মাধবীলতা, কোকিলের প্রাণস্পর্শী পঞ্চমস্বর, ভ্রমরকুলের মোহমদিরাবেশময় গুঞ্জন, শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত নীলাকাশে অমল-ধবল সুধাকরের শান্তিময় জ্যোৎস্না-প্রবাহ প্রভৃতি। যাহার হৃদয়ে অনুরাগ আবির্ভূত হইয়াছে, এই সকল বস্তুর

অনুভূতিতে তাহার হৃদয়ে সেই নবজাত অনুরাগ হঠাৎ উদ্দীপনা বা প্রবলতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় উদ্দীপনবিভাব বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই আলম্বন ও উদ্দীপন দ্বিবিধ বিভাবের লক্ষণনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই, লোকসমাজে যাহা রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক (অর্থাৎ উৎপাদক ও পরিপোষক) তাহা যদি কাব্য ও নাটক প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়, তাহা হইলেই তাহা বিভাব এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এখন অনুভাব কাহাকে বলে, তাহাই দেখা যাউক্। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন,—

"উদ্‌বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥"

নিজ নিজ কারণসমূহের দ্বারা হৃদয়ে অনুরাগ প্রভৃতি ভাব জাগরিত হইলে, সেই ভাব যদি দেহাদিতে কৃত স্বাভাবিক বা কৃত্রিম চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা বাহিরেও প্রকাশযোগ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই শারীরিক চেষ্টা প্রভৃতি রতির কার্য্য-নিবহই অনুভাব বলিয়া কাব্য ও নাটকাদিতে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই অনুভাব দুই প্রকারে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—কৃত্রিম বা প্রযত্নসাধ্য, এবং সাত্ত্বিক বা স্বাভাবিক।

হৃদয়ে প্রেম বা ভালবাসা যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সেই প্রেমের পাত্র বা আলম্বনকে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া মনের মত করিয়া সেবা বা উপভোগ করিবার জন্য সকল নর-নারীরই হৃদয়ে তীব্র অভিলাষ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেরই স্বানুভবসিদ্ধ, সেই অভিলাষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রী বা পুরুষ—জানিয়া শুনিয়া প্রযত্ন সহকারে নানাপ্রকার দৈহিক চেষ্টা করিয়া থাকে, সেই জাতীয় চেষ্টানিবহকেই আলঙ্কারিকগণ অনুভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, (অর্থাৎ ভাবের উদয়ের পর যাহা উদিত হয় অথবা মানবহৃদয়ের অন্তর্গত ভাবগুলিকে অনুভূতির বা অনুমিতির বিষয় যাহা করিয়া তুলে, তাহাই অনুভাব-শব্দবাচ্য হইয়া থাকে)।

প্রেমিকার প্রিয়তমের প্রতি ভাববিস্ফারিত নয়নে দৃষ্টিপাত বা দীনভাবে বা অভিমানের ভাবে কাতর কটাক্ষ বা কঠোর ভ্রূ-বিন্যাসপ্রভৃতি মনোভাবব্যঞ্জক অথচ ইচ্ছাকৃত দৈহিক বা বাচনিক চেষ্টাগুলিই এইরূপে কৃত্রিম বা প্রযত্নসাধ্য অনুভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সাত্ত্বিক বা স্বভাবকৃত অনুভাবগুলি এই শ্রেণীর অনুভাবের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, সেই সাত্ত্বিক অনুভাবগুলি আমাদের ইচ্ছা বা প্রযত্নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং হইতেও পারে না। প্রিয়জনের আকস্মিক বিরহে বা অকস্মাৎ অতর্কিত শুভসমাগমে আকস্মিক তীব্র ঝটিকার প্রভাবে বিক্ষুব্ধ জলধির ন্যায় মানব-হৃদয়ের ভাবসমুদ্র যখন উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন নয়নদ্বয় হইতে আপনা হইতেই দরদরিতভাবে অশ্রুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে, বাগিন্দ্রিয় জড়িত হইয়া আইসে, সমুদয় শরীর এক অপূর্ব্ব জাড্যের অনুভূতিতে বিবশ হইয়া পড়ে, নবজলদসমাগমে প্রফুল্ল কদম্বরাজির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন রোমাঞ্চের আবির্ভাব হয়, মুখের স্বাভাবিক বর্ণ বা ছবি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়, নব-বসন্তসমাগমে মৃদু-শীতল সুরভি মলয়-মারুত স্পর্শে বিকশিত মাধবী-লতিকার ন্যায় দেহ-যষ্টিও ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে থাকে, অকস্মাৎ উপচীয়মান স্বেদ-বারিধারায় সর্ব্বশরীর অভিষিক্ত হইয়া উঠে, আবার কখনও কখনও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অথচ অনির্ব্বচনীয় আবেশময় মোহের আবিলতায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ কার্য্য করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থানিচয়কেই সাত্ত্বিক অনুভাব বলা যায়। এই সাত্ত্বিক অনুভাবের পরিচয়-প্রসঙ্গে আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

"বিকারাঃ সত্ত্বসম্ভূতাঃ সাত্ত্বিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃসত্ত্বমিহোচ্যতে॥"

অন্তঃকরণে সত্ত্বাংশ প্রবল হইয়া যখন রাজস কর্ত্তৃত্বশক্তি এবং তামস দেহাত্মাধ্যাসকে অভিভূত করে, সেই সময় দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে বিকার বা অবস্থাবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। রজোগুণের অসাধারণ পরিণতি মানবের ইচ্ছাশক্তি এই অবস্থায় কুণ্ঠিত হয় বলিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানব এই সকল বিকারকে

নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না, তমোগুণের কার্য্য দেহাত্মাধ্যাসও এই সময়ে বিলুপ্তপ্রায় হয় বলিয়া, এই অবস্থায় মানব নিজের প্রযত্ন দ্বারা এই সকল বিকারকে অন্তর্নিরুদ্ধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না, এই কারণে এই সকল ভাবকে সাত্ত্বিকভাব বা অপ্রযত্নসাধ্য অনুভাব বলা যায়। এই সাত্ত্বিকভাব আট ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—

> "স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
> বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"
>
> (সাহিত্য-দর্পণ)

আকস্মিক সর্ব্বশরীরব্যাপী জাড্য, স্বেদবারি, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদস্বর, কম্প, বিবর্ণভাব, অশ্রুজল এবং মন ও ইন্দ্রিয়নিবহের কার্য্যাসামর্থ্যরূপ মোহ অথবা একেবারে সংজ্ঞালোপ, এই আটটি অবস্থাকে সাত্ত্বিকভাব বলা যায়।

সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান ভাব-কবি শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির ভাবপ্রবণ-ললিতকবিতার জীবিতচিত্রময়ী তুলিকায় এই সাত্ত্বিক অনুভাবের নিসর্গোজ্জ্বল ছবি কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখুন—

> "সস্বেদ-রোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী,
> জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
> মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা,
> কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥"

দীর্ঘ দারুণ বিপ্রবাসের ঘনশোকতিমিরাবৃত দুর্ব্বিষহ বিরহ-দুর্দ্দিনে, অকস্মাৎ দণ্ডকারণ্যে প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রের অসম্ভাবিত দর্শনে জনক-নন্দিনীর অভূতপূর্ব্ব ভাববিবর্ত্ত দেখিয়া, তমসা বিস্মিত ও নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

"এ কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! বর্ষার নববারিধারাবর্ষণে ও সুশীতল মারুতসঞ্চারে সিক্ত এবং কম্পিতা বিকশিত কদম্বযষ্টির ন্যায়, বাছা জানকী স্বেদবারিবিধৌতা, রোমাঞ্চিতাঙ্গী ও কম্পিতসর্ব্বাবয়বা হইয়া কি অপরূপ শ্রীই ধারণ করিয়াছে!"

আর এই চিরবাঞ্ছিত অথচ চিরনির্ব্বাসিত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রেমকল্প-লতিকা মৈথিলীর কান্তকোমল করকিশলয় স্পর্শে অযোধ্যার আদর্শ-ভূপতি রঘুনাথের হৃদয়-সমুদ্রে যে ভাবতরঙ্গ তৎকালে দোলায়মান হইয়া উঠিতেছিল, সাত্ত্বিক অনুভাবের দ্বারা তাহা কেমন মধুরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও দেখুন।

রঘুনাথ বলিতেছেন—

> "আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ-
> রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
> সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মাদ্,
> আনন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্॥"

"এ কাহার স্পর্শ? এ স্পর্শ যেন অমৃতময় প্রলেপের দ্বারা বাহিরের ও অন্তরের ত্বক্, রুধির ও অস্থি প্রভৃতি শরীরের ধাতুনিচয়কে সমালিপ্ত করিয়া, নূতন করিয়া আনন্দময় জীবনীশক্তির সঞ্চারণ করিতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূতির অননুভূত বৈবশ্যে নূতন প্রকারের মোহবিস্তার করিতেছে।"

এই ত গেল সাত্ত্বিক অনুভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এখন সঞ্চারী ভাব কাহাকে বলে এবং তাহা কত প্রকার, তাহা দেখা যাউক। অলঙ্কার-শাস্ত্রে সঞ্চারী ভাবের আর একটি নাম ব্যভিচারী ভাব। ইহার স্বরূপনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন,—

> "বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
> স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ॥"

অনুবাদ—'স্থায়ী ভাব আবির্ভূত হইলে, তাহাতে কখনও উন্মগ্নভাবে অথবা কখনও নিমগ্নভাবে অভিব্যক্ত হইয়া যে সকল মনোবৃত্তিগুলি বিশিষ্টভাবে পরিপূর্ণ প্রকটতার সহিত আস্বাদের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলা যায়।'

স্থায়ী ভাব বা রসাস্বাদের মূলস্বরূপ প্রধান মানসিক বৃত্তির উদয় হইলে, সাত্ত্বিক অনুভাবরূপ বিকারগুলি যেমন বাহিরে দেহে প্রকাশ পায়, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও কতকগুলি বিভিন্ন বৃত্তিও উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়া থাকি—যেমন, কেহ যদি কাহাকে ভালবাসে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহার তাহাকে পাইবার জন্য বা তাহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিবার জন্য উৎকট অভিলাষ স্বতই উদিত হয়, অভিলষিত প্রিয়জনকে না পাইলে কি উপায়ে তাহাকে

পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা চিন্তাও তখন মনে আপনা হইতেই উদিত হইয়া থাকে, চির-আকাঙ্ক্ষিতের দুর্লভতা বোধ হইলে অন্তঃকরণে কেমন একটা বিষাদের ভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ উৎকণ্ঠা, ভয়, লজ্জা, দৈন্য প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক বৃত্তি ভালবাসার সঙ্গে মনের মধ্যে কখনও উদিত হয় এবং বিলীন হয়, উহাদের মধ্যে অবস্থাবিশেষে কোন কোন বৃত্তি, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মনোমধ্যে বিরাজমান থাকে। এই সকল মনোবৃত্তির মধ্যে ভালবাসাই প্রধান বা অবলম্বনস্বরূপে গণ্য হয়, কারণ, চিন্তা, উদ্বেগ বা বিষাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যতকাল ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, সেই কালের মধ্যেই উদিত হইতে পারে, আবার যদি কোন কারণে ভালবাসা অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে ইহারা সকলেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। নাটকে বা কাব্যে আলম্বনাদি দ্বারা অভিব্যক্ত অনুরাগের আস্বাদন যেমন রুচিকর হয়, সেইরূপ অনুরাগ-সহচর এই সকল মনোবৃত্তিরও আলম্বনাদি দ্বারা আস্বাদনও রুচিকর ও প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে এমনও হইয়া থাকে যে, সাক্ষাৎভাবে অনুরাগের আস্বাদন অপেক্ষা এই সকল মনোবৃত্তির অভিনয়াদি দ্বারা অভিব্যক্তিতে আস্বাদন-প্রকর্ষ অধিকতরভাবে রুচি ও প্রীতির কারণ হইয়া থাকে, আবার কখনও কখনও ঐ সকল মনোবৃত্তি স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া অনুরাগের গাঢ়তাকেই বিস্পষ্টরূপে আস্বাদন করাইয়া দিয়া অনুরাগেই আত্মসত্তাকে মিলাইয়া দিয়া থাকে—'স্থায়িনি উন্মগ্ননির্মগ্নাঃ' এই বিশেষণের দ্বারা ঐ সকল মনোবৃত্তির এইরূপে স্থায়িভাবাপেক্ষা আস্বাদপ্রকর্ষ বা আস্বাদসাম্য, কখনও কখনও বা আস্বাদের একীভাব হইয়া থাকে, ইহাই সূচিত হইতেছে। এই সকল অভিলাষ, চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয় কাব্যে বা নাটকে অভিব্যক্ত হইয়া যখন রসাস্বাদনের বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকে, সেই সময়েই ইহারা ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব এইরূপ আখ্যা লাভ করিয়া থাকে।

এই সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব মোটের উপর তেত্রিশ প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—

নির্ব্বেদ-গ্লানি-শঙ্কাখ্যাস্তথাঽসূয়া-মদ-শ্রমাঃ ।
আলস্যঞ্চৈব দৈন্যঞ্চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা ।
গর্ব্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাঽপস্মার এব চ ॥
সুপ্তং প্রবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা ।
মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ ॥

(কাব্যপ্রকাশ)

নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, (বা আকারগুপ্তি) উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মৃতি, ত্রাস ও বিতর্ক, সর্ব্বসমেত ব্যভিচারী ভাব নামতঃ তেত্রিশটি হইয়া থাকে। প্রাচীন ভরতমুনি প্রভৃতি আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ এই ভাবেই ইহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মোটের উপর এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটি বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে পরিগণিত, ইহারা প্রত্যেক রসেই যে সকলে মিলিয়া অভিব্যক্ত হইবার যোগ্য, তাহা নহে, কোন্ রসের সহিত কোন্ কোন্ ব্যভিচারী ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে এবং কোন্ রসের সহিত কোন্ কোন্ ব্যভিচারী ভাবের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে, তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

নীতি

সমান থাকে না কিছু, বিশ্বে এই রীতি ;
বন্ধু ! তাই ভেবে চিন্তে ক'রো পদক্ষেপ।
সুখ দুখ কিংবা তব স্নেহ দ্বেষ প্রীতি,
চির তরে নহে কিছু—ক'রো না আক্ষেপ।

মিত্রে তাই বলিবে না গুপ্ত হৃদি-কথা,
শত্রু জনে দিবে নাক অধিক যন্ত্রণা ;
মিত্র তব শত্রু হয়ে দিতে পারে ব্যথা,
শত্রু হ'তে পারে মিত্র, দিয়ে সুমন্ত্রণা।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

অনুশীলন *

ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ এক দিন মিল্‌টন্‌কে স্মরণ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"Milton ! thou should'st be living at this hour :
England hath need of thee : she is a pen
of stagnant waters : ……… ………… ..

* * * * *

…………… ………We are selfish men :
Oh ! raise us up, return to us again :
And give us manners, virtue, freedom, power."

আজ বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়, "বঙ্কিমচন্দ্র, আজ তুমি জীবিত থাকিলে বড় ভাল হইত। বাঙ্গালায় তোমার পুনরাগমনের প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালার উন্নতির স্রোত বন্ধ হইয়াছে। ·· আমরা আত্মপরায়ণ লোক। আমাদিগকে টানিয়া তোল। আমাদিগকে সদাচার, সদ্‌গুণ, স্বাধীনতা, শক্তি দাও।"

পৃথক্ জনের (Individualএর) সমষ্টি জাতি। পৃথক্ পৃথক্ জনের উন্নতি না হইলে জাতি উন্নত হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা যেন আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের এখন স্মরণ নাই। দেশের লোক এখন সমগ্র দেশের এবং সমগ্র জাতির উন্নতির চেষ্টায় এত ব্যস্ত যে, পৃথক্ জনের উন্নতি হইল কি না, সে দিকে লক্ষ্য করিবার বড় কাহারও অবকাশ নাই। এখন আমরা can not see the trees for the wood, "বন দেখিতেছি, বনের গাছ দেখিতে পাইতেছি না।" এক দিকে প্রতিযোগিতা, জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠিনতর হইতেছে ; সংসারক্ষেত্রে যোগ্যতর কর্ম্মীর, যোগ্যতর নায়কের প্রয়োজন দিন দিন বাড়িতেছে। আর এক দিকে, বাঙ্গালায় যে কয় জন মানুষের মত মানুষ ছিলেন, একে একে তাঁহাদের যেমন অন্তর্ধান হইতেছে, শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য নূতন তেমন কেহ অগ্রসর হইতেছেন না। এ দেশে মানুষের মত মানুষের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ—এ দেশের প্রচলিত শিক্ষাবিধি মানুষ গড়িবার উপযোগী নহে। যেরূপ শিক্ষারীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন নাম দিয়াছেন, যোগ্য মানুষ বা মানুষের মত মানুষ গড়িতে হইলে সেই প্রকার শিক্ষাবিধি অবলম্বন করা আবশ্যক। সুতরাং এ সময় অনুশীলনের একনিষ্ঠ সাধক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে যে আমাদের বিশেষ কল্যাণ হইত, এ কথা কে না স্বীকার করিবে ?

অনুশীলন কি ?

"ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্ব সংক্ষেপে এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই তত্ত্বের বীজ দেখা যায়—১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের লিবার্টি নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত 'স্ব-স্বভাবানুবর্ত্তিতা' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত উইলিয়ম হোম্বোল্টের একটি বচনে। ইহার প্রায় ৫ বৎসর পরে ১২৮৪ সালে পঞ্চম খণ্ড বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা" নামক প্রবন্ধে এই বীজ সুন্দর অঙ্কুররূপে বিরাজমান রহিয়াছে। অনুশীলনতত্ত্বের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ঋণী ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে কখনও তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মিলের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা প্রবন্ধের যে অংশে অনুশীলন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা তিনি দ্বিতীয় ভাগ বিবিধ প্রবন্ধে "মনুষ্যত্ব কি" নাম দিয়া পুনঃ প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

আরও ৫ বৎসর পরে ১২৮৯ সালের বঙ্গদর্শনে আরব্ধ দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে অনুশীলনতত্ত্ব নব-মঞ্জরী-মণ্ডিত চারা গাছের আকার ধারণ করিয়াছে। নায়িকা প্রফুল্লকে

---

* ১৩৩১ সালের ৮ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বে শিক্ষিতা করাইয়াছেন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে একটি পাঠ্য-তালিকা দিয়াছেন, তাহা এখন বিশেষভাবে বিবেচ্য। নিশি ঠাকুরাণীর কাছে প্রফুল্ল বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক শিখিল। "তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ হইল।...... ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অধীত করাইলেন।"

আমাদের মনে হয়, এই পাঠ্য-তালিকাই এই বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু যুবক-যুবতীর পড়া-শুনার ভিত্তি হওয়া উচিত। তাহার এক কারণ—অবশ্যই আপন আপন বিভাগে এই সকল গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত, সুতরাং সাহিত্যের এই সকল বিভাগের অনুশীলনের জন্য এই সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যখন "চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি কাব্যাদেব," তখন সে উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট কাব্যের দ্বারা উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত উৎকৃষ্ট কাব্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি অনুশীলনের দ্বারা আর একটি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্য জাতীয় আত্মজ্ঞানলাভ। আমরা কে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব কি, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে কি গুণ-দোষের—কি বলাবলের অধিকারী হইয়াছি; অথবা এক কথায়, নিয়তি আমাদিগের জাতীয় জীবনকে কোন্ দিকে টানিতেছে, তাহা জানার নাম জাতীয় আত্মজ্ঞান। জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ গতিবিধি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে জাতীয় আত্মজ্ঞান আবশ্যক। পূর্ণমাত্রায় জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন দর্শনাদি আয়ত্ত করা দরকার। কিন্তু এরূপ পূর্ণজ্ঞান বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভবে; সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য অনুকল্প বিহিত। সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এইরূপ অনুকল্প হইতে পারে;—যে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, যে যুগে হিন্দুর আত্মশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, নাগার্জ্জুন, ঈশ্বরকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাত্মগণের সেই অভ্যুদয়কালের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, কোন একটি দর্শন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি ও পুরাণের আবশ্যক অংশ বিশেষজ্ঞের কাছে অধ্যয়ন করিলে মনোবৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের ইতিহাস এবং জাতীয় চরিত্রের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানলাভের জন্য সাহিত্য-দর্শনাদি যথেষ্ট নহে; সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পে সমসময়ের মূর্ত্তি ও মন্দিরে জাতীয় জীবনের স্পষ্টতর অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক জ্ঞান ছাড়াও প্রাচীন ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের অনুশীলন পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে শাণিত এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে মার্জ্জিত করে। সুতরাং কালিদাসাদির কাব্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ ও শঙ্করাচার্য্যের দর্শন, প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ এবং সমসময়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রত্যেক হিন্দু যুবক-যুবতীর শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত। এই সকল বিষয়ের সামান্যরূপ অনুশীলন করিতে হইলে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ এখনকার বি, এর সমান অনুশীলন দরকার। এই জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্যের যুগে এইরূপ প্রস্তাব বোধ হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই গৃহীত হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিভাগের হিসাবে দুই তিনটি বিভাগ আমাদের প্রস্তাবের সামিল দেখা যাইবে,—প্রাচীন সাহিত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয় দর্শন। ইংরাজীর বোঝা কিছু কমাইলে এইরূপ পাঠ্যের স্থান হইতে পারে। আর্টবিভাগের জন্য এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। গোল হইবে বিজ্ঞান বিভাগে। সেখানকার পাঠ্য-তালিকায় প্রাচীন সাহিত্যের ও প্রাচীন ইতিহাসের স্থান হওয়া অসম্ভব। য়ুরোপে বিজ্ঞানের সহিত সংগ্রামে প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য এবং ইতিহাস প্রাধান্য হারাইয়া কোণঠাসা হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষার কর্ত্তারা হুজুগপ্রিয়; তাঁহারা দেখাদেখি মেট্রিকুলেসন বিদ্যালয়ের শেষ তিন বৎসরে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, ইতিহাস, ভূগোল পড়া শিক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন করিয়াছেন। ইহাতে বিজ্ঞানের প্রচার হউক না হউক,

অজ্ঞানের প্রসার বাড়িতেছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে গ্রীক্ এবং রোমান সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস অনুশীলন যত দরকার, বর্ত্তমান কালের হিন্দুর পক্ষে প্রাচীন হিন্দুর উন্নতির যুগের সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস অনুশীলন তাহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী দরকার। ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণদিগের শিক্ষাগুরু গ্রীক্ রোমানগণ হইলেও তাহারা স্বতন্ত্রবংশীয়। যে সকল বর্ব্বরজাতীয় আক্রমণকারী গ্রীক্ এবং রোমান সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল, ইহারা তাহাদের জ্ঞাতি। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুর সহিত বর্ত্তমান হিন্দুর সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, প্রাচীন গ্রীক্ বা রোমানগণের সহিত বর্ত্তমান ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণগণের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নহে। সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয় বলিয়াই প্রাচীন গ্রীকের বা রোমানের তুলনায় বর্ত্তমান কালের ইংরাজের বা জার্ম্মাণের যতটা স্বাতন্ত্র্য আছে, প্রাচীন হিন্দুর তুলনায় বর্ত্তমানের হিন্দুর ততটা স্বাতন্ত্র্য নাই। বর্ত্তমানে হিন্দুকে যদি ভাল করিয়া আপনাকে জানিতে, চিনিতে, বুঝিতে হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুরা যে সাহিত্যে এবং যে কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণমাত্রায় আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্ অনুশীলন করিতেই হইবে, নতুবা সে নিজেকে চিনিতে পারিবে না—নিজের ভবিষ্যতের পথও চিনিয়া লইতে পারিবে না। এই প্রকার শিক্ষার পথের পথিকের ভবানী ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী স্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনসংহিতা ধর্ম্মতত্ত্ব ১২৯১ সালের নবজীবন পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ৪ বৎসর পর উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বে বিবৃত অনুশীলনের প্রাণবস্তু সামঞ্জস্য। সেই সামঞ্জস্য কিরূপ, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়; কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ-শক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি আর অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্য-চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া ইহাদিগের সম্প্রসারণ-শক্তি অন্য অন্য বৃত্তির অপেক্ষা অধি এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সক বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে, আরও কতকগুলি বৃ আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি, সেগুলি অধিক সম্প্রসারশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধি সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয় সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তত দূর স্ফূ হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। .... নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারি প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল। তাহা বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি সামঞ্জস্য বলিয়াছি।"

"ধর্ম্মতত্ত্বের" উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন সেই অবস্থাই ভক্তি।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত। এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বে স্থূল মর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"

উপসংহারের এই অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেন সর্ব্বত্র সামঞ্জস্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, ঈশ্বরভক্তির এবং স্বদেশপ্রীতির অপরিমিত অনুশীলনের ব্যবস্থা

করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বের এক স্থানে শিষ্যও এইরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরে গুরু বলিয়াছেন, "ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না।" এই কথায় অবশ্যই শিষ্যের আপত্তি খণ্ডিত হয় নাই এবং শেষে গুরু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যুক্তির দ্বারা এই প্রকার আপত্তি খণ্ডন করা অসম্ভব; আজীবন কার্য্যতঃ অনুশীলন-ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে তবে এই কথার সত্যতা অনুভব করা যাইতে পারে। "সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা স্বতঃ ঈশ্বরমুখী হয়" ইহাই অনুশীলনতত্ত্বের শেষ কথা এবং এরূপ হওয়া সম্ভব বা সঙ্গত কি না, এ বিষয়ের বিচার-বিতর্ক ত্যাগ করিয়া মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করাই অনুশীলনপন্থীর কর্ত্তব্য।

সামঞ্জস্যমূলক অনুশীলনের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশপ্রীতি। "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং অন্যান্য রচনা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যায়—"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি এবং "আনন্দ-মঠের" স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্র সামঞ্জস্যের ব্যাঘাতকারী স্বদেশপ্রীতির অপরিমিত অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্বদেশপ্রীতির সহিত রাজভক্তির সামঞ্জস্যের বিধান করিয়াছেন। ১২৯১ সালের প্রচারে প্রকাশিত (২১৮-২২০ পৃঃ) "লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ" শীর্ষক প্রবন্ধে উৎসবের লাভ-লোকসান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"প্রথমতঃ আমরা এই উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি। অনেকে বলিবেন, আমাদের রাজভক্তি ছিল বলিয়াই উৎসব করিয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে; অন্য কারণে এই উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়িয়াছে। রাজভক্তি বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ। রাজভক্তির জন্য ইহা প্রয়োজন নহে যে, রাজা স্বয়ং একটা ভক্তির যোগ্য মনুষ্য হইবেন। ....এলিজাবেথের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি ইংলণ্ডের উন্নতির একটি কারণ। ফ্রেড্রিকের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি প্রসিয়ার উন্নতির একটি কারণ।

"আমাদের দ্বিতীয় লাভ জাতীয় ঐক্য। এই বোধ হয়, ঐতিহাসিককালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কায করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা এক জাতি।

"তৃতীয় লাভ রাজকীয় শক্তি।——সকল সমাজেই সমাজই রাজা।——প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ লর্ড রিপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।" তার পর লোকসানের হিসাব বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন———

"আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাত্ম্যটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছড়ি বড় বেশী হইয়া গিয়াছে। সেটা কুশিক্ষা। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্যবাহাদুর। তার উপরে বক্তৃতা নামে বিলাতী মালের আমদানী হইয়াছে। সোনা বলিয়া সোহাগা বিক্রয় হইতেছে। আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাক্যজালে আপনারাই জড়াইয়া পড়ি, কথার কুয়াশায় আর পথ দেখিতে না পাই; তুবড়ী-বাজীর মত মুখে সোঁ সোঁ করিয়া ফাটিয়া যাই।"

বক্তৃতা এখন এ দেশী বস্তুর সামিল হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতার ব্যবস্থা না থাকিলে সভা-সমিতি জমে না। সুতরাং উহার বর্জ্জন অসম্ভব। কিন্তু বক্তৃতা অনেক সময়েই বিচারবুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়া রাগ-দ্বেষ উত্তেজিত করে, এই জন্য বক্তৃতা মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে; বিশেষতঃ যে দেশের লোক স্বভাবতঃ ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ, সে দেশের লোকের পক্ষে ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা অনেক সময় অহিতকারী। উহা বৃত্তিবিশেষের অপরিমিত অনুশীলন-জনিত অনিষ্টের সূত্রপাত করে। ধর্ম্মতত্ত্বের "মনুষ্যে ভক্তি" নামক দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র রাজভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ———

"লর্ড রিপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে রাজভক্তির পুনঃ পুনঃ প্রশংসা আছে।

* * *

"যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে এক জন রাজা নাই—সে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে

করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্য-বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে।

* * *

"রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র।"

'স্বদেশ-প্রীতি' নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এ জন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

"যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ধর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে।

* * *

"কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব?

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল উক্তিতে অধৈর্য্য সমালোচকরা হয় ত সে কালের ডেপুটী কালেক্টরের মনোবৃত্তির প্রভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্র আজন্ম অনুশীলনের সাধক ও প্রচারক ছিলেন। অনুশীলনপন্থীর হিসাবের সঙ্গে রাজনৈতিকের হিসাবের একটু তফাৎ আছে। অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য জনে জনের উন্নতিসাধন—পৃথক্ জনের মনুষ্যত্ববিধান; রাজনৈতিকের মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের উন্নতিবিধান। জনে জনের উন্নতি না হইলে গণের উন্নতি হইতে পারে না; আবার গণের সহায়তা ভিন্ন জনে জনের উন্নতি সহজ নহে। সুতরাং অনুশীলনপন্থীর এবং রাষ্ট্রনৈতিকের চরম লক্ষ্য কার্য্যতঃ এক হইলেও কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য বশতঃ উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে। এই যুগের রাজনৈতিকগণ স্বরাজপন্থী। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অনুশীলনপন্থী চাহেন পৃথক্জনের মনুষ্যত্ব-বিকাশের সমান-সুযোগ-বিধায়ক সুরাজ (Good Government)। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রীতির সহিত রাজভক্তির সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অনুশীলনের আর এক জন একনিষ্ঠ সাধক, জর্ম্মাণ কবি গেটে, জীবনের সায়াহ্নে লিখিত উইলহেল্ম্ মিষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"Two duties we have most rigorously undertaken : first, to honour every species of religious worship, for all of them are comprehended more or less directly in the creed : secondly, in like manner to respect all forms of government ; and since every one of them induces and promotes a calculated activity, to labour according to the wish and will of constituted authorities, in whatever place it may be our lot to sojourn, and for whatever time."

"আমরা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত দুইটি কর্ত্তব্য অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কর্ত্তব্য, সকল প্রকার উপাসনা-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা; কারণ, সকল প্রকার (উপাসনাই) সাক্ষাৎসম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের ধর্ম্মের সামিল। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সকল প্রকার গভর্ণমেণ্ট বা শাসনযন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন; কেন না, সকল প্রকার শাসনযন্ত্রই নিয়মমত কার্য্যকলাপ, দেশকালভেদে যথাবিধি নিয়োজিত কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ এবং নিয়োগমত কর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও পোষণ করে।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাজভক্তিকে এ দেশীয় হিসাবে গুরুজনের প্রতি ভক্তির পর্য্যায়ের সামিল করিয়া দেখিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বে "মনুষ্যে ভক্তি" নামক অধ্যায়ের উপসংহারে হিন্দু-সমাজে দিন দিন এই প্রকার ভক্তির তিরোভাব দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"এখন ভক্তির অভাবে আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "my dear father" অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলালোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধুমাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীরূপে মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মী আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গোবেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।"

অনুশীলনে পাশ্চাত্যগুরু গেটেও উইলহেল্ম্ মিষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে একটি আদর্শ শিশু-বিদ্যালয়ের বিবরণে মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ব্বতোমুখী ভক্তিকে এই প্রকার উচ্চ স্থানই প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের নায়ক উইলহেল্ম নিজের শিশু পুত্রকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গী বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে দেখিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুগণ হাত দুইখানি বুকের উপর রাখিয়া সানন্দে আকাশের দিকে তাকাইতে লাগিল; মধ্যম আকারের শিশুগণ হাত দুইখানি পিছনদিকে রাখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মাটীর দিকে তাকাইল; বয়োজ্যেষ্ঠ বালকগণ বাহুদ্বয় নীচের দিকে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উইলহেল্ম্ বিদ্যালয়ের আচার্য্যত্রয়কে এই বিচিত্র অভিবাদনের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, সুগঠিত এবং সুস্থদেহ শিশুরা কতকগুলি বৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সেইগুলিকে বিকশিত করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কতকগুলি বৃত্তি আপনা আপনি ভাল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু একটি বস্তু আছে, যাহা কোন শিশু সঙ্গে করিয়া আনে না; অথচ এই বস্তুটি না ফুটিলে মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারে না। এই বস্তুটি ভক্তি (Reverence)। আচার্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, তিন প্রকার ভক্তির অনুশীলনের জন্য তিন প্রকার অঙ্গভঙ্গী বিহিত হইয়াছে। যাহা আমাদের অপেক্ষা উচ্চ, তাহার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আকাশপানে দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। যাহা আমাদের নীচের স্তরে আছে, তাহার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অধোদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। উচ্চ-নীচের প্রতি ভক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে তবে মানুষের প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা বিকশিত হইবার অবকাশ পায় এবং তখন সে সমকক্ষগণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।

* * * * *

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক মহাত্মা রস্কিন সমাজে সমানভাবে ধনসম্পদ বিভাগের (socialismএর) পক্ষপাতী

ছিলেন এবং নিজের অভিমত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে বিকৃত সাম্যবাদের প্রসার সম্বন্ধে তিনি Fors Clavigera নামক গ্রন্থের (Letter 66) এক স্থানে লিখিয়াছেন, "These infernal notion of Equality and Independence are so rooted, now, even in the best men's minds, that they don't so much as know even what obedience or Fellowship means." এই নারকীয় সাম্যভাব এবং স্বাধীনতার ভাব অনেক সজ্জনের মনেও এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আনুগত্য এবং সাহচর্য্যের যে অর্থ কি, তাহা তাঁহারা জানেন না। আমাদের সমাজে যে বিকৃত সাম্য এবং স্বাধীনতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হিন্দুজাতির দুইটি প্রধান আশ্রয় পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, গেটে, রস্কিন বা বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ মনুষ্যভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সেকালের বকেয়া বস্তু, তাহা আধুনিক যুগের উপযোগী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত অনুশীলনের মূলে যে ভক্তিপরায়ণতা, সংযম ও বিবেচনাশীলতা নিহিত আছে, তাহাকে সেকেলে বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিবেচনা এবং অসংযত প্রবৃত্তিনিষ্ঠা পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর এবং অনেক মনুষ্যের সাধারণ লক্ষণ। বিজ্ঞানের মতে এমন এক দিন ছিল, যখন পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল না, ইতর প্রাণী ছিল। ইতর প্রাণীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি যেমন এখনও আছে, তেমন তখনও ছিল। কিন্তু সংযমাদি তখন ছিল না; মনুষ্যের আবির্ভাবের অনেক দিন পরে অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে মানুষ তাহা লাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রাণিজগতের ইতিহাস পূর্ব্বাপর আলোচনা করিতে গেলে সংযমকে সেকেলে এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে হাল ফ্যাসানের বস্তু বলা চলে না। অবশ্যই কালের হিসাবে বাঙ্গালা দেশের আজকালকার কয়েক জন শক্তিশালী সাহিত্যিক যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আত্মম্ভরিতা প্রচার করিতেছেন, তাহার তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সেকেলে। এই সকল প্রবল প্রতিযোগীর সমক্ষে বাঙ্গালার সাহিত্যশক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত অনুশীলনের পথে পুনঃসংস্থাপনের সামর্থ্য আমাদের নাই। কিন্তু আমরা বঙ্কিম-স্মৃতির আরাধনা এবং বঙ্কিম সাহিত্য যথাবিধি অনুশীলন করিয়া বঙ্কিম-সাহিত্য-নিহিত শক্তিকে আবার জনসেবায় নিয়োগ করিতে পারি না কি? পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কাঁঠালপাড়ার অধিবাসিগণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রগণ এই সম্মিলনের উদ্যোগ করিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে বঙ্কিম-সাহিত্যশক্তির সম্যক্ উদ্বোধনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

'মহিলা'র কবি

মগ্ন হয়ে হে তাপস রমণীর ধ্যানে
জীবন কাটায়ে গেলে গভীর আনন্দে
মধুর নারী মঙ্গল ধরি গাঢ় ছন্দে
গেয়ে গেলে একমনে ভাবে ভোলা প্রাণে।
সংসারের কলরব পশেনিক কানে
টলে পড়েনিক তার কোন ভাল মন্দে
আলোকে প্রভাত যথা পৃথিবীরে বন্দে
তেমনি বন্দিলে তুমি রমণীরে গানে।

তুমি কবি বুঝেছিলে নারীর গৌরব,
তুমি জেনেছিলে তার হৃদয়-বেদনা,
তুমি লভেছিলে তার প্রেমের সৌরভ
তুমি দেখেছিলে তার স্নেহের সাধনা।
তাই সবে তারে যবে দিল অবহেলা
পূজা তারে ক'রে গেছ তুমিই একেলা।

শ্রীলীলা দেবী।

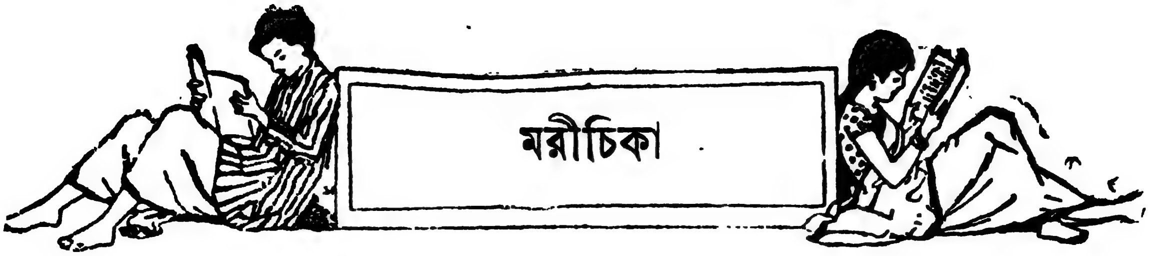

মরীচিকা

ছেলেবেলা হইতেই ছবি আঁকিতে ভালবাসিতাম এবং ভবিষ্যতে যে এক জন বিখ্যাত চিত্রকর হইব, সে আশা প্রবলভাবেই মনকে অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু অর্থের অভাবে সখ ছাড়িয়া হইলাম দোকানদার। বাজারে চলে, এই রকম সব ছবি—কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, সুন্দরী-মূর্ত্তি, জার্ম্মাণ দৃশ্য হইতে জয় মা তারা—ধারে বিক্রয় নাই, বন্দে মাতরম্, একদর, থুথু ফেলা নিষেধ পর্য্যন্ত সব রকম বস্তুই আমার কাছে থাকিত। এই সব পট বিক্রয় করিয়া এক রকমে দিন কাটিতেছিল, কিন্তু আমার জন্য একটি অভিনব অভিজ্ঞতা এত কাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল।

এক দিন এক জন ভদ্রলোক একখানা অয়েল পেণ্টিং বাঁধাইবার জন্য দিয়া গেলেন। একটি সুন্দরীমূর্ত্তি, তাহার আননে মৃদু হাস্যরেখা। সে যে কোন্ দেশীয় সুন্দরীর প্রতিকৃতি, তাহা বলা শক্ত,—যেন বিশ্বের সকল মাধুরী আর লাবণ্য ইহার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া আছে। ছবিটি পাইয়া অবধি আমার মনের মধ্যে একটা নূতন রকমের উল্লাস বহিয়া যাইতে লাগিল। শুধু দেখার আনন্দ যে এত গভীর হইতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। যাহা হউক, মনে করিলাম, ছবিটা একটু দেরী করিয়া বাঁধাইয়া দিব। কত লোক আসিয়া কত ছবির দিকে চায়, কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, এই ছবিখানার দিকে চাহিলে তাহাদের চোখের আর পলক পড়িত না। ইহার সুষমা-মণ্ডিত স্নিগ্ধতার কাছে জয় মা তারা, হরিনাম সত্য, ধারে বিক্রয় নাই প্রভৃতি যেন ম্লান হইয়া যাইত।

এক দিন দুপুরবেলা এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, ছবিখানা তিনি কিনিতে প্রস্তুত। আমি বলিলাম—ওটা অপরের ছবি, বিক্রয়ের জন্য নহে।

ভদ্রলোক একটু নিরাশভাবে বলিলেন—"মশায়, বলতে পারেন, কে এই ছবি আপনার কাছে দিয়ে গেছেন? আমি তাঁকে একবার চাই—তাঁর কাছ থেকেই না হয় কিনে নেব।" আমি বলিলাম—"তিনি বেচবেন কি না, তা জানি না, তবে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতে পারি। রোজ সন্ধ্যার পর আপনি দুই এক দিন এলেই তাঁর দেখা পাবেন।"

সন্ধ্যা না হইতেই দেখি, ভদ্রলোকটি আসিয়া হাজির। তাঁহার এতটা আগ্রহ দেখিয়া আমার কেমন একটা কৌতূহল হইল। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিয়া উঠিলেন—"মশায়, আমার আগ্রহ দেখে আপনি কি মনে করছেন, জানি না, কিন্তু যদি শোনেন, ছবি সম্বন্ধে কেন আমার এত আগ্রহ, তা হ'লে আপনি আমাকে সহানুভূতি না দেখিয়ে পারবেন না। শুনলে হয় ত আপনার সময় নষ্ট হবে এবং আমার সে জন্যে বিবেচনা করা উচিত; কিন্তু তা আর পারছি না, আপনাকে শুনতেই হবে।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমার কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন—"যখন কলেজে পড়ি, তখন থেকেই বড় বড় আইডিয়া আমার মাথায় আস্‌ত। কি ক'রে এই বিশাল ভারতবর্ষকে বিদেশী সভ্যতার হাত থেকে বাঁচান যায়, কি ক'রে বিলিতী বিজ্ঞানের স্রোত থেকে নিমজ্জমান হিন্দুকে রক্ষা করা যায়, এই চিন্তা ঘুরে ঘুরে নানা আকারে আমার সকল চিন্তা অধিকার ক'রে থাকত। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমার প্রাণে এমন একটা সাড়া দিয়েছিল যে, আমার শিরায় শিরায় তাঁর ওজস্বিনী ভাষার ঝঙ্কার বিদ্যুতের মত খেলা করত। তার পরই পড়া ছেড়ে দেশের কাযে লাগলাম।

"প্রথমে একটা সঙ্ঘ স্থাপনা ক'রে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানই ছিল আমাদের কায। চাঁদা তুলে একটি ছেলেকে ভারতীয় বিজ্ঞান শেখবার জন্যে দিলাম পাঠিয়ে জার্ম্মাণীতে,—কেন না, ভারতের যা কিছু দর্শন বিজ্ঞান এখন জার্ম্মাণীর হস্তগত। তার সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল এই যে, সে ধুতি-চাদর নিয়েই সেখানে থাকবে, কোন কারণেই 'সাহেব' সাজতে পারবে না। ভারতবর্ষকে য়ুরোপ বানাবার

জন্যে ইংরেজ যে সব যন্ত্র-পাতি এ দেশে এনেছে, তার ভারতীয় চেহারাগুলো তাকে আয়ত্ত করতে হবে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, মোটর কার, ফোটগ্রাফ, বাইসিকেল, গ্রামোফোন, ষ্টীমার, টেলিফোন, এরোপ্লেন, কাপড়ের কল, পাটের কল, ছাপাখানা এর প্রত্যেকেরই একটা বিশিষ্ট ভারতীয় রূপ আছে—সেটা আমরা বিস্মৃত হয়েছি,—এক জার্মাণী ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান দিতে পারে না।

"দুই মাস পরে তার কাছ থেকে চিঠি পাওয়া গেল—'আমি কতকগুলি যন্ত্র তৈরী করতে সুরু করেছি—তার মধ্যে দেবদেবীর চেহারাবিশিষ্ট রেলওয়ে এঞ্জিন, ঋগ্বেদ, পরাশর, শঙ্কর, বেদব্যাস প্রভৃতির কোটেশান এন্‌গ্রেভ করা, ছাপাখানার প্লেট, হিন্দু-চন্দ্রিকা-রিমবিশিষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' ছাপাখানার প্লেটে এই সুবিধে হবে যে, যিনি যা ছাপবেন, তার চার ধারে বাসাংসি জীর্ণানি—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ, ত্বয়া হৃষীকেশ—মায়াময়মিদমখিলং, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি, শরীরমাদ্যং ইত্যাদি অটোম্যাটিক্যালি ছাপা হয়ে যাবে। গভর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে যখন আফিসের ফরম্ ছাপা হবে, তার চার ধারেও এই সব মুদ্রিত হয়ে যাবে। যে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট বিদেশী সভ্যতা নিয়ে আমাদের মারতে এসেছেন, তাঁদের শেল্‌ফে শেল্‌ফে শ্রুতি, স্মৃতি, মনুসংহিতা, চরক ও সুশ্রুতের বাণী বিরাজ করবে। এইখানেই আমাদের হবে জয়। তার পর গ্রামোফোন রেকর্ডের রিমের দিকে হিন্দুভাবের উন্মেষকারী তিন চার লাইন আবৃত্তি থাকবে, মাঝখানে থাকবে সাদা। থিয়েটার-সঙ্গীত, বক্তৃতা যা কিছু রেকর্ডে উঠবে, তাই বাজাতে গেলে গৌরচন্দ্রিকার মত খানিকটা হিন্দু চন্দ্রিকা বেজে উঠবে। ব্যারোমিটারে Fair, Rain, Storm, Dry এই সকলের স্থানে যথাক্রমে শ্রীরাধা, বরুণ, রুদ্রদেব, সূর্য্যদেব থাকবেন। কাঁটা শ্রীরাধার মূর্ত্তির ওপর গেলেই জানা যাবে, পরিষ্কার দিন, বরুণে বৃষ্টি, রুদ্রে ঝড়, সূর্য্যে রৌদ্র। ঘড়ীর ডায়ালে—এক দুইএর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে—ব্রহ্মা, যুগল মূর্ত্তি, ত্র্যম্বক, চতুর্ব্বেদ, মকরধ্বজ, ষড়রিপু, সপ্ত সিন্ধু, অষ্টবজ্র, নবগ্রহ, দশভুজা, বিশ্বরূপদর্শন, দ্বাদশ ব্রাহ্মণ থাকবে। বিজ্ঞানের ইহাই ভারতীয় রূপ। আত্মা এক, কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম প্রকাশ। চীনাম্যান, রেড ইণ্ডিয়ান, আফ্রিকান্, আর্য্য, অনার্য্য, অ্যাংলিস, স্যাক্সন, কসাক, কেল্‌টিক, তুর্কী, সেমেটিক, ইরাণী, সিঙাপুরী এ সব বিভিন্নতা ভগবান্ করেছেন, মানুষের কি ক্ষমতা যে, সে সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করতে পারে? বিলিতী বিজ্ঞান যদি ভারতে এসে ভারতীয় চেহারা না পায়, তা হ'লে সেও মরবে, হিন্দুকেও মারবে। কি বলেন আপনি?"

আমি বলিলাম, "আপনিই ব'লে যান, আমার কিছু বলা ভাল দেখায় না।" ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"বেছে বেছে লোক নিলাম আমাদের দলে। যারা বাঙ্গালী হয়েও সাহেবী নাম নিয়ে 'সাহেব' সাজতে চেয়েছিল, তারা হঠাৎ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আমার গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়ল। সাইলেন চাট্টো, শাউরীন গিউহারে, বেদালগসে, মাণি ডাট, একস্ রে—যথাক্রমে শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন গুহরায়, বাদল ঘোষ, মণি দত্ত, অক্ষয় রায় হয়ে দেশের কাযে লাগল। শৈলেন এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করল—কোন্ মানসিক অবস্থায় পশ্চিমের প্রতি পূর্ব্বের এত টান হয়। তার ফলে এই আবিষ্কার হ'ল যে, ইথার তরঙ্গের পরিসরের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুপাতে সাতটি রং আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে যে তরঙ্গের পরিসর সব চেয়ে কম, সেই ভায়োলেট রং, আর যে তরঙ্গের পরিসর সব চেয়ে বেশী, সেই রেড-কলার উৎপাদন করে। খুব কম হ'লে হয় আল্‌ট্রা ভায়োলেট, আর খুব বেশী হ'লে হয় ইন্‌ফ্রা-রেড। এ দুটোকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। এই আল্‌ট্রা ভায়োলেট কায করে স্বাস্থ্যের ওপর—আর ইন্‌ফ্রা-রেড কায করে মনের ওপর। চীনারা আল্‌ট্রা ভায়োলেটের ভক্ত, তারা কেবল দেহেই পরিপুষ্ট হচ্ছে, মনের কোন সাড়া নেই। আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক রেড আর ইন্‌ফ্রা-রেডের ওপরে। আর্য্যগণ চিরদিনই বৃহৎ-এর সেবা করেছেন, সুতরাং ইথারের সর্ব্ববৃহৎ তরঙ্গ যা লাল ব'লে আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়, সেটাকেও তাঁরা সেবা না ক'রে পারেন না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাকাশের চেয়ে সূর্য্যাস্তের পশ্চিমাকাশ লাল হয় বেশী, অতএব আমাদের পশ্চিমের দিকে যে বেশী ঝোঁক হবে, এর আর বিচিত্র কি? এই ইন্‌ফ্রা-রেড রবীন্দ্রনাথের মনে কায করছে। তাই তিনি পশ্চিমাকাশ আর সূর্য্যাস্ত সম্বন্ধে যত ভাল কবিতা লিখেছেন, পূর্ব্ব সম্বন্ধে ততটা

পারেন নি। যেমন—পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন—ঐ যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা, শতাব্দীর সূর্য্য আজ রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। পশ্চিম দেশের সব চেয়ে শক্তিশালী যে জাত অর্থাৎ ইংরেজ, তারাও এই লাল রঙ্গের প্রধান ভক্ত। তাঁরা নিজ অধিকারের দেশগুলোকে মানচিত্রে লাল রঙ ক'রে আনন্দ পান। কলম্বস্ যে এক দিন ভারত আবিষ্কার করতে রওনা হয়ে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সে-ও এই পশ্চিম প্রীতির ফলে। আমেরিকায় যখন রেড-ইণ্ডিয়ান আবিষ্কার হ'ল, তখন দলে দলে ভূতপূর্ব্ব বিলিতী আর্য্যগণ সেখানে গিয়ে আড্ডা গাড়লেন। আর আর্য্যদের প্রধান দেবতা সূর্য্য—তিনিও শেষকালে পশ্চিমদিকেই বেঁকে দাঁড়ান।

"সুতরাং স্থির হ'ল এই যে, পশ্চিমকে আমরা কোনমতেই অবহেলা করব না। শৈলেনের এই আবিষ্কারে আমাদের পূর্ব্ব-প্রোগ্রাম আরও দৃঢ় হ'ল। সে লাল, নীল, হলদে, সবজে সব রকম আলো নিয়ে রাত্রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে যে, ফড়িংগুলো পর্য্যন্ত লাল আলোর দিকেই উড়ে আসে। ছোট ছোট ছেলেদের সামনে নানা রঙ্গের খেলনা ধরলে—লালটাকেই আগে নিতে চায়। আমাদের বিয়ের সময় যে লাল চেলী পরে আর লাল রঙ্গে হোলি খেলা হয়, এ বিজ্ঞান-সম্মত।

"আমরা প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, কেউ বিয়ে করব না, আজীবন যারা দেশসেবা করবে, তাদের সাংসারিক হওয়া পোষায় না। কিন্তু মানুষ গড়ে আর ভাগ্য ভাঙ্গে। আমাদের আড্ডা ছিল বাঙ্গালার বাইরে দুমকা পাহাড়ের কাছে একটা জঙ্গলে। জঙ্গলে থাকবার উদ্দেশ্য শুধু নির্জ্জনতা নয়, কষ্ট সইবার ক্ষমতা লাভ করা, আর পাহাড়ে ওঠা-নামা ক'রে মাংস-পেশীকে কার্য্যক্ষম করা। কিন্তু পাহাড়ের বুকেও যে পদ্মফুল ফুটতে পারে, তা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের অরণ্যনিবাসে সে দিন আমি আর শৈলেন ছাড়া আর কেহ ছিল না, দুজনে মিলে ভবিষ্যতের একটা ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় দেখা গেল, একটা সাঁওতাল মেয়ে আমাদের কাছে আসছে। স্ত্রীলোক দেখেই রুখে গেলাম তার দিকে, এখানে তার কি কায, কি উদ্দেশ্যে সে এসেছে, ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। সে অতি অসহায়ভাবে আমার দিকে চেয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সে পথ হারিয়েছে, এখানে যদি কেউ জানে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেবে। আমি কোন রকম দুর্ব্বলতা প্রকাশ না ক'রে তাকে সোজা তাড়িয়ে দিলাম। আর সে-ও ভীতভাবে কোন কথা না ব'লে চ'লে গেল।

"শৈলেন ব'লে উঠল,—'কালো সাঁওতালের মধ্যে এ বেশ সুন্দরী। তার পর মাথার চুলে লাল ফুল গোঁজা রয়েছে। এতে আমাদের মন তার দিকে আকৃষ্ট হ'তে পারে। তার গায়ের রঙ্গে ইনফ্রা-রেডের আভাস পেলাম, কিন্তু সেটা ভেতরে আছে—বাইরে যে ফরসা ভাব দেখলেন, ও তারই প্রতিফলন। আমাদের এই সব গেরুয়া রঙ্গের কাপড়ের মধ্যে যে রেড ইন্‌ফ্রা-রেড রয়েছে, তাই ওর চোখকে এই অন্ধকার সবুজ জঙ্গলেও টেনে এনেছে। ওর বিশেষ দোষ নেই, ও না এসে পারত না। ওকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করেছেন, নইলে হয় ত ওর ইন্‌ফ্রা-রেড রঙটি আমাদের সকল রেড স্বপ্নের স্থান অধিকার ক'রে বসত। এখনও যে আমরা নিরাপদ, তা মনে করবেন না। ও যে চ'লে গেছে, তবু আমাদের চোখ জ্বালা করছে, ওরও করছে। ভবিষ্যতে এ জঙ্গলে ওর মত আরও অনেকে হয় ত আসবে, তখন অনেককে তাড়ান মুস্কিল হবে।'

"কিন্তু সে আলট্রা-ভায়োলেটই হোক আর ইন্‌ফ্রা-রেডই হোক, আমার মনটা আচম্বিতে দমে গেল। পথ-ভোলা একটি সামান্য মেয়ের প্রতি কেন এ রূঢ়তা প্রকাশ করলাম! যতই ভাবতে লাগলাম, ততই সেই মুখখানা, তার সেই ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এই সামান্য একটি ঘটনাতেই আমাদের সঙ্ঘের যবনিকাপতন এবং আমার জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হ'ল। আপনি মনে করছেন, এত বড় কর্ম্মী যে, তার এত দুর্ব্বল হওয়া সাজে না। কিন্তু আমরা কি সব সময়েই বুঝতে পারি, অলক্ষ্যে কোন্ বিধাতা আমাদের জন্যে কোন্ পথ নির্দ্দেশ করছেন? আপনি ত ছবির দোকান করেছেন? কিন্তু আমি একটি ছেলেকে জানি, সে আজীবন চিত্রকর হবার জন্যে সাধনা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ময়দার কল খুলে বসল। এক সংস্কৃতের এম, এ, হ'ল ইলেকট্রিক ফিটার।

"এ সব কার দ্বারা ঘটছে, তা মানুষ জানে না। মনকে মিথ্যা আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে, আমি টের না পেলেও

মন তা টের পায়। আমিও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই টের পাই নি। আপনি ভাবছেন, একটা সামান্য সাঁওতাল মেয়েকে দেখে আত্মবিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে মোটেই শোভন হয় নি, আমিও তা ভেবেছি। আমরা কাব্যে আর অলঙ্কারে রূপের যত রকম ব্যাখ্যাই পড়ি, চোখের অভিজ্ঞতার কাছে তা হার মানে। ভাষার বর্ণনায় কেবল তার সুষমা, সুসঙ্গতিপূর্ণ একটি জ্যামিতিক আকৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু তার প্রাণ ত পাওয়া যায় না। মন যখন ক্ষুধিত হয়ে ওঠে, তখন সে সামান্য একটা ইঙ্গিত পেলেই তাকে নিয়ে তার ক্ষুধা মেটায়। আমি যে এত দিন ধ'রে আমার মনের সকল রস দিয়ে তাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছি—সে ত এখন আর সামান্য সাঁওতাল মেয়ে নয়। যাই হোক, আমার নিজের জীবনের ওপর একটা বিতৃষ্ণা এল, আমি যেন সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে ব্যথা দিয়ে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যকে পদাঘাত করেছি, এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত কি? ভেবে চিন্তে কোন কিনারা করতে পারি না, কোন শান্তি পাই না। এমনই যখন অবস্থা, তখন সৌরীন এসে বলল, 'আমায় বিদায় দিন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, তোমার আর্য্য-দেশ বিদেশ-ষ্টীমার-সার্ভিসের কি হ'ল, দেশের সহানুভূতি পেলে না?' সে বল্লে, 'আমি ভাগলপুর থেকে সুরু ক'রে মণিহারী ঘাট, লালগোলা, বেলগাছি, দুর্গাপুর, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত সকল যায়গায় গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য নিবেদন করেছি, অনেকেই শেয়ার কিন্‌তে প্রস্তুত। তবে আগে খুব সামান্য কিনবে. লাভ দেখে পরে আরও বিবেচনা করবে।' বল্লাম—'আমরা জার্ম্মাণীতে একটি ছাত্রকে পাঠিয়েছি. সে নানা রকম আর্য্যাকৃতি যানবাহন এ দেশে আমদানী কচ্ছে, যার ফলে দেখবেন, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আরাম উপভোগ করব অথচ আমাদের আর্য্যভাব সম্পূর্ণ বজায় থাকবে। আমাদের সঙ্ঘের প্রধান কায হচ্ছে পশ্চিমকে স্বীকার করা এবং তাকে আমাদের মত গ'ড়ে তোলা। মুর্গী খেলেও যে পৈতে রাখা যায়, এ সত্য কেবল আমরাই আবিষ্কার করেছি। কেন না, এর আগে এই ধারণাই সবার মনে ছিল যে, হিন্দু-চেহারা নিয়ে বিজ্ঞানসাধনা করা যায় না। রাজনারায়ণ বসুর আমলে সকলে মুর্গী খেয়ে পৈতে ছেড়েছিলেন, এখন আর তার দরকার নেই। এ সব কথা যথাসাধ্য বুঝিয়েছি, কিন্তু কেউ বেশী টাকা ছাড়তে রাজি হয় না।'

"আমি বল্লাম—'দেশের কাযে আর দরকার নেই, ভাই—তোমরা ঘরে ফিরে যাও।' শৈলেন, সৌরীন দুজনকেই দেশে পাঠিয়ে দিলাম। শৈলেন হ'ল স্কুল-মাষ্টার, আর সৌরীন বিষয়-আশয় দেখতে লাগল। যখন চিঠি পেলাম, দুজনেই বিয়ে করেছে, তখন অনেকটা হাল্কা হয়ে আমার নিজের চিন্তায় মন দিলাম। এইবার বুঝতে পারলাম, আমার গতি কোন্ পথে। জঙ্গলের পাশ দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথের ধারে আশ্রয় নিলাম। আশা রইল, সেই পাহাড়ের মেয়ে হয় ত কোন দিন এই পথে আসবে, কিন্তু হায়, কত দিন—কত মাস অপেক্ষা করেছি, সে আর এল না। তার পর আর অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে গেলাম তাকে খুঁজতে। আমার মত নীরস লোকের প্রাণে এক স্বদেশপ্রেম ছাড়া যে মানবী-প্রেম কি ক'রে এমন ক'রে অধিকার বিস্তার করতে পারে, তাই ঘুরে ফিরে মনে আসে। কেবলই ভাবছি, হয় ত আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, তারই ফলে আজ আমার এই দুর্দ্দশা। কিন্তু থাক্।

"বস্তীতে বস্তীতে পাহাড়ে পাহাড়ে অনুসন্ধান করলাম; মাসের পর মাস, ক্রমে বছর ধ'রে তাকে খুঁজলাম, কিন্তু সে যে পথে গিয়েছিল, সে পথের কোথাও শেষ হয় নি—আরও বড়, আরও বেশী পথের সঙ্গে কত যায়গায় সে গিয়ে মিলেছে। তাই মনে হয়, সে-ও হয় ত কোথাও থামে নি—এখনও চলছে। কত সুন্দরীর মুখের দিকে চেয়েছি তাকে দেখব ব'লে—কিন্তু কোনও মুখে তার সাড়া পাইনি। ক্রমে তার মুখও আমার স্মৃতির বাইরে চ'লে যেতে লাগল। তার কথা ভাবতে গেলেই হাজার সুন্দরীর মুখ একসঙ্গে মনে পড়ে—সেই হাজার মুখের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মিলিয়ে আছে, অথচ কোন বিশেষ মুখের সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাইনে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, ভদ্রলোক আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"দয়া ক'রে মশায় আমার হাতে একবার ছবিখানা দিন।" ছবি দিলে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "এত বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, এত বড় বিড়ম্বনা নিয়ে আরও কত কাল ঘুরব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি, আপনার

ঘরের এই ছবি যেন সেই মুখের ছাপ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। এর আঁখিতে অতীতের বুক ভেসে আসা একটি হারানো বসন্তের বর্ণগন্ধভরা স্মৃতির রশ্মির সন্ধান যেন আমি পাচ্ছি। যতই দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, এই সেই মুখ, এ তাহারই মুখ—আর কারও নয়, চলতি পথে কোন্ শিল্পী তাকে পেয়ে তার ছবি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছে। আমার সকল বিস্মৃতিকে সার্থক ক'রে এই ছবিখানা আমার প্রাণে এসে গান গেয়ে উঠছে। ওগো আমার ব্যর্থ জীবন আকাশের ধ্রুবতারা, মনে হচ্ছে, আমার সকল গতি তোমার মধ্যে আজ শেষ হ'ল। তুমি যার ছবি, সে এক দিন অনাহূত আমার দ্বারে এসেছিল, আর আমি তাকে নির্ম্মমভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম!”

এই পর্য্যন্ত বলিতেই দেখি, যাঁহার ছবি. তিনি আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছেন। ছবিকে ও রকম অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার চোখে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। ভদ্রলোকটি হঠাৎ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “অ্যাঁ, এ যে শ্যামাশঙ্কর! জার্ম্মাণী থেকে কবে এলে?”

বুঝিলাম, ইনিই সেই ছাত্র, যিনি ভারত-বিজ্ঞান শিখিতে জার্ম্মাণী গিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভদ্রলোক উঁহার ছবি হাতে করিয়া এ সব কি বলিতেছেন?

শ্যামাশঙ্কর বাবু বলিলেন –“দেখুন, আপনার এতটা অধঃপতন হয়েছে, তা জানতাম না। আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে জার্ম্মাণীতে পাঠালেন, কিন্তু শেষে দিলেন ফাঁকি! সেখানে গিয়ে দুদিনেই আমার ভ্রান্তি বুঝতে পারলাম। দেখলাম, বিজ্ঞানের প্রাণটাই আসল। তার চেহারা কি হবে, এরোপ্লেনের গলায় পৈতে থাকবে কি না, আর ফোনগ্র্যাফ মোহমুদ্গর আওড়াবে কি না, এ সব নিয়ে যারা ভাবে, তারা অতি নিম্ন স্তরের জীব। যা হোক, কথায় আপনাদের কাছে গোপন রাখতে হ'ল, নইলে খরচ দেওয়া বন্ধ করতেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে দুই-ই সমান হয়ে উঠল। আপনারা বিনা কারণেই খরচ দিলেন বন্ধ ক'রে; সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে মজুরের কায ক'রে পড়া চালাতে হ'ল। আপনাদের মত লোকের ওপর যারা নির্ভর করে, তারা মূর্খ। যা হোক, এত কষ্ট সহ্য করেও প্রথম পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। সেই সময় থেকে স্নেহপরবশ হয়ে আমাদের অধ্যাপক আমাকে নিজে থেকে সাহায্য করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার ভাব হয় এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাকে আমি বিয়ে করি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনার অধঃপতনের কথা! আপনি পরস্ত্রীর একটি ছবিকে এমন ক'রে অপমান করতে পারেন?”

ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,—“তবে এ কোন সাঁওতাল মেয়ের ছবি নয়?”

শ্যামাশঙ্কর বাবু ক্রুদ্ধভাবে তাঁহার হাত হইতে ছবিখানা টানিয়া লইয়া বলিলেন,—“আজ্ঞে না, এটা আমার জার্ম্মাণ সহধর্ম্মিণীর ছবি।”

ভদ্রলোকটি একটি কথা না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্যামাশঙ্কর বাবু আমাকে বলিলেন,—“আপনার আর ছবি বাঁধিয়ে দরকার নাই।”

শ্রীপরিমল গোস্বামী।

মৃত্যু-রজনীতে

সে রাতে নিদ্রার বেশে জাগিল মরণ
নয়নে, সমস্ত বিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে
হৃদয়ের মাঝে এসে করিল শয়ন।
কি এক বিরাট শব্দ শুনিনু বিস্ময়ে!
যেন আদি অনন্তের ভীষণ আহবে
ব্যথিত দুর্ব্বল বিশ্ব উঠিল কাঁদিয়া,
জীবনের অসারতা জানাতে মানবে
ধ্বনিল কালের কণ্ঠ স্তব্ধতা ভেদিয়া।
কিসের কণ্ঠধ্বনি নারিনু বুঝিতে,
মনে হ'ল মরণের বিজয় উল্লাস
সমগ্র পৃথিবী বুঝি আসিছে গ্রাসিতে,
পরক্ষণে মনে হ'ল জীবনের ত্রাস
সব মিছে, চারিধারে অনন্ত জীবন
পদতলে দলিতেছে অসত্য মরণ।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রলয়ের আলো

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত পরামর্শ

রুস-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন, রুসিয়ায় যখন মহাপরাক্রান্ত জারের একাধিপত্য ছিল, তখন তাঁহার যথেচ্ছাচার তৎকালপ্রচলিত আইনের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই ধর্ম্মাধিকরণে বিচারের অভিনয় হইত। এই জন্য কোন প্রসিদ্ধ লেখক এই শ্রেণীর বিচারকে 'প্রতিহিংসার বিচার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে সকল রাজনীতিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইত, তাহাদের অপরাধের বিচারকালে বিচারের অভিনয় অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। রুস-সম্রাটের বেতনভোগী বিচারকগণ 'প্রতিহিংসার বিচারের' খ্যাতি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রুজি ও পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেন। রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ বর্ব্বরতাপূর্ণ নিষ্ঠুরাচরণসমূহ অনুষ্ঠিত হইত, পৃথিবীর অধিক দেশে তাহার তুলনা মিলিত না। রুসিয়ার সেণ্টপিটার ও সেণ্টপল নামক দুর্গ-কারাগারে যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইত, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিলে সকলেরই দেহ আতঙ্কে লোমাঞ্চিত হইত, হৃদয় স্তম্ভিত হইত! য়ুরোপের কোন সুসভ্য গভর্ণমেণ্ট এরূপ পৈশাচিক বর্ব্বরতার পরিচয় দিতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে সহসা কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু সেণ্টপিটার ও সেণ্টপলের কারাগারে রাজনীতিক কয়েদীদের প্রতি রাজানুচরগণের ব্যবহার যতই পীড়াদায়ক হউক, লাডোগা হ্রদের মধ্যবর্ত্তী একটি পাষাণময় দ্বীপে 'শ্লুসেল্‌বার্গ' নামক যে রাজকীয় কারাগার সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই কারাগারের তুলনায় সেণ্টপিটার ও সেণ্টপলের কারাগার স্বর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

লাডোগা হ্রদ সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই হ্রদের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে 'শ্লুসেল্‌বার্গ' কারাগার নির্ম্মিত বলিয়া তাহা সুরক্ষিত; এই কারাগার হইতে কোন কয়েদীর পলায়নের সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য রুস-গভর্ণমেণ্ট যে সকল রাজনীতিক অপরাধীকে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত মনে করিতেন, অথচ প্রকাশ্য আদালতে যাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়ার উপায় নাই বুঝিয়া যাহাদিগকে বিচারালয়ে পাঠাইতে সাহস করিতেন না, তাহারা ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টকে বিপন্ন বা বিব্রত করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শ্লুসেল্‌বার্গ কারাগারে আবদ্ধ করা হইত। কোন নরনারী এই কারাগারে প্রেরিত হইলে, বহির্জগতের কোন লোক তাহাদের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারে না। সেই সকল হতভাগ্য রাজবন্দীর প্রতি এরূপ পৈশাচিক নির্য্যাতন চলিত যে, সেই অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইত। তাহাদের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর, তাহাদের মৃতদেহগুলি ক্যাম্বিসের থলির ভিতর পুরিয়া, সেই সকল থলির ভিতর কতকগুলি পাতর দিয়া তাহা যথেষ্ট ভারী হইলে থলির মুখ শেলাই করিয়া প্রস্তরসহ সেই মৃতদেহপূর্ণ থলিগুলি হ্রদের জলে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা কেহই জানিতে পারিত না। এই জন্য শ্লুসেল্‌বার্গের কারাগার রুসিয়ায় 'সজীব সমাধি-সৌধ' নামে অভিহিত হইত।

যে সকল রাজনীতিক অপরাধী অধিকতর দুর্ভাগ্য, তাহারা শ্লুসেল্‌বার্গের পরিবর্ত্তে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত

হইত। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইতে হইবে শুনিলে অধিকাংশ কয়েদীর মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সেই সুবিশাল বিজন প্রদেশে, তুষারীভূত মৃত্যু ও রহস্যময় স্তব্ধতার রাজ্যে প্রেরিত সহস্র সহস্র হতভাগ্য রাজবন্দী নিয়ত যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সেই যন্ত্রণার তুলনায় উপকথা-বর্ণিত নরকযন্ত্রণাও তাহাদের বাঞ্ছনীয় মনে হইত। যে সকল রাজবন্দীকে ফাঁসীতে লটকাইবার কোন সঙ্গত কারণ না থাকিত, তাহাদিগকেই সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইত। যে সকল নির্ব্বাসিত বন্দী কোন কৌশলে সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিত, তাহারা পথহীন, তুষারাচ্ছন্ন জলাভূমিতে আসিয়া পড়িয়া অনাহারে দারুণ শীতে প্রাণত্যাগ করিত; কেহ কেহ পথ হারাইয়া অসীম অরণ্যে প্রবেশ করিত, তাহাদের রক্ত-মাংসে অরণ্যচর ক্ষুধিত নেকড়ের দলের ক্ষুধানিবৃত্তি হইত!

রুস-সাম্রাজ্যের রাজবন্দিগণের পরিণাম সেকালে কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এখন আমরা আমাদের আলোচ্য আখ্যায়িকার অনুসরণ করিব।

* * * *

নিকোলাস ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ কুরেটের বিচারের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রেবেকার আশঙ্কা ও উদ্বেগ ততই বাড়িয়া উঠিল। তাহাদিগকে তিন সপ্তাহ কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইল; কারণ, মাসের শেষে তাহাদের বিচারের দিন পড়িয়াছিল। রেবেকা জানিত, তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল বিচারাভিনয়ের প্রতীক্ষায় দণ্ডাদেশ প্রচারের বিলম্ব হইতেছে। এ যাত্রা জোসেফের পরিত্রাণ নাই বুঝিয়া রেবেকা ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া উঠিল; তথাপি, কালনকি তাহাদের গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহাকে হাতে রাখিবার জন্য সে তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টায় বিরত হইল না। কিন্তু এই প্রকার কপটাচরণে তাহার মন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইল এবং কালনকির প্রতি তাহার ঘৃণাও উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল; সে অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিত।

যে দিন জোসেফের বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে এক দিন সায়ংকালে রেবেকা তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, জোসেফের বিচারের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে; তাহার প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ হইবে, অনুমান করিতে পার?"

সলোমন কোহেন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল, "হয় সাইবেরিয়া, না হয় শ্লুসেল্‌বার্গ।"

রেবেকা নতমস্তকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তাহাকে বাঁচাইবার কোন উপায় করা যায় না কি?"

সলোমন ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "না মা! আমি ত কোনও উপায়ই দেখিতেছি না। জোসেফ বড় ভাল ছেলে, অদ্ভুত তাহার সাহস! আমাদের সে বড়ই অনুগত। তাহার বিপদে আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সে অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়াই আমাদের প্রতিকূলে একটি কথাও বলে নাই; যদি তাহার মুখ হইতে সেরূপ কোন কথা বাহির হইত, তাহা হইলে আজ আমরা এখানে বসিয়া এ ভাবে আলাপ করিতে পারিতাম না; আমাদিগকেও এত দিন তাহার সঙ্গী হইতে হইত। যদি অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতাম না; কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেও তাহার উদ্ধারের আশা নাই।"

রেবেকা আর কোন কথা বলিল না; কিন্তু তাহার পিতার একটি কথা তাহার মনে গাঁথিয়া রহিল। 'যদি অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতাম না,'—তাহার পিতার এই কথা সে ভুলিতে পারিল না। সে ভাবিল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

সারারাত্রি রেবেকা বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিল এবং অর্থব্যয় করিয়া জোসেফকে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না, কাহাকে উৎকোচদানে বশীভূত করিতে পারিলে তাহার আশা পূর্ণ হইবে—এই চিন্তায় রেবেকা বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করিল; কিন্তু সে সারারাত্রি চিন্তা করিয়াও এই দুর্ব্বোধ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে হঠাৎ তাহার মনে হইল—কালনকির সাহায্যে তাহার চেষ্টা সফল হইতেও পারে; কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কালনকির তাহা অজ্ঞাত নহে। তাহার অনুরোধে কালনকি কি এই

ভার গ্রহণ করিবে না? কালনকি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; এই জন্য রেবেকার আশা হইল, তাহাকে দুই চারিটি মন-ভুলানো ও প্রাণ-মাতানো কথা বলিলেই সে তাহার অনুরোধরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে রেবেকা কালনকিকে ডাকিয়া পাঠাইল। কালনকি উৎফুল্লচিত্তে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "রেবেকা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

রেবেকা বলিল, "হাঁ, একটা কথা আছে। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, আর কয়েক দিন পরে জোসেফ কুরেটের বিচার হইবে। যদি দৈবানুগ্রহে তাহার প্রাণরক্ষা না হয়, তাহা হইলে বিচারে তাহার প্রতি কিরূপ দণ্ডের আদেশ হইবে, তাহা জানিবার জন্য দৈবজ্ঞের সাহায্যগ্রহণের প্রয়োজন নাই। তাহাকে কিরূপ দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাহা আমরা সকলেই জানি। তাহার এই দুর্দ্দশার জন্য তুমিই দায়ী, কারণ, তুমিই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছ। আশা করি, তাহাতেই তোমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। এখনও সে বেচারার উপর তোমার রাগ থাকা অন্যায়; আর যদি তাহাকে শাস্তিই দিতে চাও, তাহা হইলে, মনে রাখিও, সে শাস্তিটা আমাকেই দেওয়া হইবে। আমার কথাটা তুমি খারাপভাবে লইও না, কালনকি!"

কালনকি মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "ও কথা আবার ভালভাবে লওয়া যায় না কি? তোমার কথার মর্ম্ম এই যে, তুমি তাহার পীরিতে বেসামাল! আমাকে কি তুমি এখন বাঁদর নাচাইতে চাও?"

রেবেকা বলিল, "তুমি বাঁদর হইলে কি তোমাকে না নাচাইয়া ছাড়িতাম? কিন্তু সুখের বিষয়, তুমি বাঁদর নও; তুমি অত্যন্ত চালাক মানুষ এবং বাঁদর অপেক্ষাও বুদ্ধিমান্! তবে বুদ্ধিমান্ হইলেও তুমি সোজা কথার অর্থ বুঝিতে পার না। আমার কথার মর্ম্ম এই যে, জোসেফ কুরেট আমাদের বড়ই অনুগত চাকর; বিশেষতঃ, বাবা তাহাকে দিয়া অনেক কায পাইতেন। তুমি ত আমার ভালবাসা পাইবার জন্য ভয়ঙ্কর ব্যাকুল হইয়াছ; কিন্তু ও জিনিষটা চাহিয়া পাওয়া যায় না, উপার্জ্জন করিতে হয়; তুমি উহা উপার্জ্জন করিতে রাজী আছ?"

কালনকি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "জোসেফ কুরেট আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী; তাহার বড় তেজ! সে আমাকে রাস্তায় ধরিয়া ঠেঙ্গাইয়াছিল, আমি তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছি। তাহাকে রীতিমত জব্দ করিয়াছি।"

রেবেকা বলিল, "হাঁ, প্রেমিক বীরের মত কায করিয়াছ! অপমানের শাস্তি দিয়াছ; তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য—তাহার চূড়ান্ত করিয়াছ। এখন সে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া অধঃপতিত শত্রুর প্রতি মহত্ত্ব প্রদর্শন কর। আমি জানি, প্রেমিকমাত্রেই উদারপ্রকৃতির লোক।"

কালনকি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "অতখানি মহত্ত্ব যদি আমার হৃদয়ভাণ্ডে সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলেও তাহা খয়রাত করিয়া কোন ফল হইত না। কারণ, আর তাহাকে রক্ষা করা অসম্ভব; অন্ততঃ সেরূপ কোন উপায়ের কথা আমার জানা নাই। আর যদি সেরূপ কোন উপায় খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব না হইত, অসম্ভব নহে, এ কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, যদি তাহাকে মুক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইত, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইত?"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "ফল এই হইত যে, আমি তোমাকে যেটুকু শ্রদ্ধা করি, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক শ্রদ্ধা করিতাম; তোমাকে সত্যই ভালবাসিতাম।"

কালনকি বিদ্রূপের সুরে বলিল, "বটে, বটে!—দেখ রেবেকা, তুমি স্বীকার কর আর না কর, যদি আমি তোমার এই ধাপ্পাবাজিতে ভুলিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে বাঁদর মনে করিতে! কিন্তু সত্যই আমি তত দূর সরল প্রকৃতির লোক অর্থাৎ নির্ব্বোধ নহি। আজ যদি কোন উপায়ে জোসেফ মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে কাল আমি কোথায় থাকিব?—তোমার হৃদয় হইতে হাজার গজ দূরে! না রেবেকা, তুমি কথায় ভুলাইয়া আমাকে বাঁদরের মত নাচাইতে পারিবে না। আমি সব বুঝি।"

রেবেকা ভুবনমোহন হাস্যে কালনকির মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কচু বোঝ! আমার কথাগুলি মন দিয়া শোন। যদি তুমি কোন উপায়ে জোসেফ কুরেটকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পার, তাহা

হইলে আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যে মুহূর্ত্তে দেখিব, সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার হাতে হাত রাখিয়া বলিব, 'কালনকি, আমি তোমার।' তুমি আরও স্মরণ রাখিও, যদি তাহাকে কারামুক্ত করিবার জন্য সোনার চাবি দিয়া কারাগারের দ্বার খুলিতে হয়, তাহা হইলে সেই চাবিও আমি তোমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব।"

রেবেকার কথা শুনিয়া প্রেমান্ধ কালনকি মানসিক উল্লাস গোপন করিতে পারিল না। এই দুর্জ্জয় লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। রেবেকা যে মূল্যে তাহার নিকট আপনাকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে মূল্য অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু বিনা চেষ্টায় আশা ত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কালনকি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ, কারাদ্বার খুলিবার জন্য সোনার চাবির প্রয়োজন আছে বটে; কেবল প্রয়োজনীয় বলিলেই যথেষ্ট হইল না—তাহা অপরিহার্য্য। কারণ, কারাগারের দ্বার যদি খুলিতে পারা যায়, তবে কেবল সোনার চাবিতেই খুলিবে। মনে কর, তোমার সোনার চাবি দিয়া গোপনে কারাদ্বার খুলিয়া জোসেফ কুরেটকে বাহির করিয়া আনিলাম, সে মুক্তি লাভ করিল; তখন তুমি যে তোমার এই অঙ্গীকার পালন করিবে, ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? তুমি কি জামিন দিবে বল?"

রেবেকা বলিল, "আমার কথাই জামিন, আবার কি জামিন দিব? তুমি আমার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পারিবে না?"

কালনকি বলিল, "না, আমি তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করি না। তুমি বড়ই চতুরা; দম দিয়া কায আদায় করিয়া লইয়া, শেষে যদি আমাকে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া সরিয়া যাও, তখন তোমার অঙ্গীকার লইয়া কি ধুইয়া খাইব? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রতারিত করিবে—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না; কিন্তু আমাকে প্রতারিত করিতে না পার, এজন্য আমি যথাযোগ্য জামিন চাহি। মানুষের মনের গতি সকল সময় এক রকম থাকে না—তাহা ত জান।"

রেবেকা বলিল, "পুরুষের মনের গতি সকল সময় এক রকম থাকে না, তাহা জানি এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, ইহাও দেখিয়াছি।"

কালনকি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তোমার এই তিরস্কার আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম। আমি নিজেকে সাধু পুরুষ বলিয়া জাহির করিতেছি না; আমি অনেকের অপেক্ষা মন্দ লোক হইতে পারি, আবার অনেকের তুলনায় আমি তাহাদের অপেক্ষা ভাল লোক। তবে তুমি আমাকে যেরূপ অসৎ লোক বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছ, আমি তত দূর অসৎ নহি। আমি তোমার পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য এবং বিশ্বাসী বলিয়াই আমি তোমাদের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা জানিলেও তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। জোসেফ কুরেট ত সে দিন আসিয়া তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; তাহার এখানে আসিবার বহু পূর্ব্বেই আমি তোমাকে জানাইয়াছিলাম—তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। কিন্তু তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আমার প্রেমের প্রতিদান করা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার পর জোসেফ আসিল; তাহার প্রতি তোমার ব্যবহার আমি গোপনে লক্ষ্য করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, তুমি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ। ইহাতে আমি মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলাম। জোসেফকে জব্দ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, অবশেষে তাহাকে মুঠায় পুরিবার সুযোগ পাইলাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার অনিষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; শেষে সে আমার অপমান করিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে চূর্ণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ শুনিয়া আমার দুঃখ হইতেছে; তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি তাহার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি; এমন কি, যদি তাহাকে মুক্তিদান করা অসম্ভব না হয়, সে জন্যও আমি চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি তোমাকে চাই। তুমি তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির পর আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না; এই জন্যই আমি তোমার নিকট জামিন চাহিয়াছি। যদি আমি জোসেফ কুরেটকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে লাভ করিতে পারিব,

ইহার নিশ্চয়তাসূচক কিরূপ জামিন দিতে প্রস্তুত আছ, বল।"

রেবেকা নতমস্তকে চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি কিরূপ জামিন চাহিতেছ ?"

কালনকি বলিল, "সে কথা কাল বলিব। আজ আমি ভাবিয়া দেখিব—কিরূপ জামিনের উপর নির্ভর করিতে পারি।"

রেবেকা বলিল, "বেশ, কালই বলিও; কিন্তু জোসেফকে কারামুক্ত করিতে হইলে আর অধিক বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিলম্বে তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইতে পারে।"

কালনকি হাসিয়া বলিল, "তোমার যে আর বিলম্ব সহিতেছে না! যত শীঘ্র সম্ভব তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিব, আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার।—এখন বিদায়!"

কালনকি রেবেকার হাতখানা খপ করিয়া টানিয়া লইয়া তাহা ওষ্ঠে স্পর্শ করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

রেবেকা কয়েক মিনিট একাকী স্তব্ধভাবে সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল; দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ ক্রোধে ও ক্ষোভে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত নেত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আলেকজান্দার কালনকি, তুমি আমার পিতার নগণ্য ভৃত্য, এ কথা ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমার প্রণয়লাভের জন্য নূতন চা'ল চালিতে আরম্ভ করিয়াছ; তোমার সকল আশা চূর্ণ করিবার জন্য আমাকেও চা'ল চালিতে হইতেছে। কিন্তু আমাকে চাল-বাজিতে মাত করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে সতর্ক হইয়া খেলা করিতে হইবে। আমাদের এই খেলার ফলাফলের উপর আমার সকল আশা, সকল সুখ, আমার প্রণয়ের সফলতা, এমন কি, আমার ও আমার পিতার জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে। তুমি শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ না করিয়া আমার নিকট হইতে এগুলি কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

উভয়সঙ্কট

পরদিন কালনকি রেবেকার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "জামিন-নামা প্রস্তুত; তুমি ইহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া দলিলখানি আমাকে ফেরত দাও, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।"—সে একখানি কাগজ রেবেকার হস্তে প্রদান করিল। এই কাগজখানিতে লিখিত ছিল :—

"আমি, রেবেকা কোহেন, এই একরারনামায় স্বীকার করিতেছি যে, আমি এবং আমার পিতা সলোমন কোহেন, আমরা পিতা পুত্রী উভয়েই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছি। রুস রাজধানীতে আমরাই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। আমরা তাহাদের অনুষ্ঠিত রাজদ্রোহমূলক সকল কার্য্যেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছি এবং এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের উভয়েরই আন্তরিক সহানুভূতি আছে।"

রেবেকা গভীর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হৃদয়ে এই একরারনামাখানি পাঠ করিল। পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখ ম্লান হইল, চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল, তাহার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। সে নিঃশব্দে পাঠ শেষ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি মনে কর, আমি পাগল, নির্ব্বোধ ও অন্ধ যে, এই রকম একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিব ?"

কালনকি অচঞ্চল স্বরে বলিল, "তোমাকে পাগল, নির্ব্বোধ বা অন্ধ মনে করিব, আমিও এরূপ বাতুল নহি। একরারনামাখানির উপর চোখ বুলাইয়াই ক্রোধে তুমি দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান হারাইয়াছ! কিন্তু স্থিরচিত্তে সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, আমার প্রস্তাব বিন্দুমাত্র অসঙ্গত বা তোমাদের পক্ষে অপমানজনক নহে।"

রেবেকা অসহিষ্ণু স্বরে বলিল, "না, তোমার প্রস্তাব অত্যন্ত সঙ্গত এবং আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর সম্মানজনক! তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তুমি আমাকে কাণ্ডজ্ঞানহীনা ও নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে না করিলে কখন এ আশা করিতে না যে, আমি তোমার এই কাগজে

সহি করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিব। নিশ্চয়ই আমি ইহাতে সহি করিব না।"

কালনকি পূর্ব্ববৎ ধীর স্বরে বলিল, "ইহাতে তুমি নাম স্বাক্ষর করিলেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি? তোমার সঙ্গে আমার কি চুক্তি হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া দেখ না। কথা হইয়াছে—আমি জোসেফ কুরেটকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব, এ কথা বলি নাই; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যদি আমার চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে তুমি আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে, আমাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু আমি কৃতকার্য্য হইলে যদি তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ কর, চুক্তি অনুসারে কায করিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে তোমাকে লাভ করিবার কোন উপায় আছে কি?"

রেবেকা অবজ্ঞাভরে বলিল, "আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহারই উপর তোমার নির্ভর করা উচিত। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না, ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

কালনকি বলিল, "বেশ, ভাল কথা, আমিও অঙ্গীকার করিতেছি, এই একরারনামায় সহি করিলে তোমার ও তোমার পিতার কোন অপকারের আশঙ্কা নাই, আমি ইহা লুকাইয়া রাখিব। কেহই ইহা দেখিতে পাইবে না বা ইহার কথা জানিতে পারিবে না। যে দিন আমাকে তুমি বিবাহ করিবে, সেই দিনই এই একরারনামা তোমাকে ফেরত দিব, তুমি ইহা লইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিও। তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে আমি কোন দিন ইহা সিন্দুক হইতে বাহির করিব না, বা ইহা কাযে লাগাইবার চেষ্টা করিব না।"

রেবেকা ঘৃণার সহিত বলিল, "যে দিন আমি তোমাকে বিবাহ করিব?"

কালনকি বলিল, "হাঁ, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও নাই?"

রেবেকা মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হাঁ, সে সত্য।".

কালনকি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, তোমার অঙ্গীকার এই অল্পসময়ের মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছিলে! অঙ্গীকারটা যাহাতে দীর্ঘকাল তোমার স্মরণ থাকে এবং তোমার কার্য্যোদ্ধার হইলে তাহা একেবারেই বিস্মৃত না হও, এ জন্য এই কাগজে তোমার একটা সহি থাকা উচিত।"

রেবেকা উভয়সঙ্কটে পড়িয়া ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "এই একরারনামায় যদি আমি নাম স্বাক্ষর না করি?"

রেবেকার এই প্রশ্নে কালনকি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "সে তোমার ইচ্ছা; তবে একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে—জোসেফ কুরেটের মুক্তিলাভের আশা ঐখানেই শেষ! আমার সঙ্গে তুমি যে চুক্তি করিয়াছিলে, সেই চুক্তি অনুসারে কায করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই একরারনামায় সহি করিতে তোমার আপত্তি হইত না। কিন্তু আমাকে কথায় ভুলাইয়া, আমার সাহায্যে কায উদ্ধার করিয়া লইয়া, অবশেষে আমাকে প্রতারিত করিবার দুরভিসন্ধি থাকিলে এই একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিতে তোমার আপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।"

রেবেকা কালনকির ধৈর্য্যের ও কুটিলতাপূর্ণ কৌশলের পরিচয় পাইয়া যতই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হউক, তাহার যুক্তির সারবত্তা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশেষতঃ, সে জানিত, উপস্থিত ক্ষেত্রে কালনকির সহিত বিবাদ করিলে তাহাদের বিপদের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। কালনকি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। একরারনামায় রেবেকা নাম স্বাক্ষর না করিলেও, কালনকির কবল হইতে তাহাদের মুক্তিলাভের উপায় নাই বটে, কিন্তু একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিলে কালনকির হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন পরিত্রাণলাভের অন্য কোন উপায় থাকিবে না বুঝিয়া রেবেকা কঠোর সমস্যায় পড়িল। প্রায় দুই মিনিটকাল সে কোন কথা বলিতে পারিল না; শেষে ক্রোধ গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এরূপ একরারনামায় হঠাৎ নাম স্বাক্ষর করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

কালনকি বলিল, "বেশ, ভাল কথা। যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি ভাবনা-চিন্তা কর; তোমার চিন্তার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য রেবেকা কালনকির নিকট সময় লইল বটে, কিন্তু কয়েক দিন দিবারাত্রি চিন্তা করিয়াও সেই সাংঘাতিক একরারনামায় সে নাম স্বাক্ষর করিবে কি না, তাহা স্থির করিতে পারিল না। এই দুর্ব্বিষহ চিন্তা হইতে সে মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না; এই অসহ্য চিন্তা পাষাণভারের ন্যায় তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। সে এই সকল কথা তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে ভাবিয়া দেখিল, এ সকল কথা পিতার কর্ণগোচর না করাই সঙ্গত। এই ভয়ঙ্কর একরারনামার কথা শুনিলে তাহার পিতার আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সীমা থাকিবে না, অথচ কুরেটকে সে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। সে সকল দায়িত্ব-ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু নিদারুণ চিন্তায় সে প্রতিদিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল; তাহার চোখ বসিয়া গেল, মুখে কালি পড়িল এবং তাহার দেহের লাবণ্য হ্রাস হইয়া আসিল। সলোমন কোহেন কন্যার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, জোসেফের বিপদের জন্য সে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; বিশেষতঃ তাহার অপরাধের বিচারের সময় যদি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিংবা কালনকি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়াই তাহার মানসিক সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই—ইত্যাদি।

সলোমন কোহেনও সর্ব্বদা এই সকল কথাই চিন্তা করিত; সুতরাং সে রেবেকার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। এমন কি, রেবেকাকে সান্ত্বনাদানের জন্য কোন কথা বলিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সলোমনের মানসিক অবস্থা তখন এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রেবেকার কথা শুনিয়া সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ইহার পর কালনকির সহিত কোন কোন দিন রেবেকার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু একরারনামা সম্বন্ধে কেহই কোন কথার আলোচনা করিল না। জোসেফকে কারাগার হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে, এ কথা যেন কালনকি বিস্মৃত হইয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। একরারনামায় স্বাক্ষর না করিয়া সে জন্য কালনকিকে অনুরোধ করিয়া কোন ফল নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া রেবেকাও তাহার সহিত এই প্রসঙ্গের আলোচনায় বিরত হইল।

অবশেষে জোসেফ কুরেটের বিচারের দিন আসিল। সেই দিন জোসেফ ও ট্রোভিল ব্যতীত আরও দ্বাদশ জন নিহিলিষ্টকে আসামীর কাঠরায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা গেল। বিচার শেষ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হইল না। পুলিসের দক্ষতায় যোগাড়-যন্ত্রে অতি সহজেই তাহাদের অপরাধ সত্য প্রতিপন্ন হইল এবং আসামীরাও আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিল না। সুতরাং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বিচারক জলদ-গম্ভীর স্বরে তাঁহার লিখিত রায় পাঠ করিলেন। তিনি কি রায় প্রকাশ করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল; কারণ, এই শ্রেণীর মামলার রায় কখন আসামীর অনুকূল হইত না। ট্রোভিল ও কুরেট উভয়ের প্রতি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ট্রোভিল যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ পাইয়া বিচারপতিকে 'কুর্ণিশ' করিল; তাহার মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কুরেটের ২০ বৎসর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল; আদেশ হইল, এই ২০ বৎসরের মধ্যে তাহাকে ৫ বৎসর নার্সিনেস্কের খনিতে খননের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

নার্সিনেস্কের খনির ন্যায় ভীষণ স্থান পৃথিবীর অন্য কোন অংশে আছে কি না সন্দেহ। মস্কো নগর হইতে ইহার দূরত্ব ৪ হাজার ৫ শত মাইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ভারতের কার্পাস-শিল্প

দীর্ঘকালের পর ভারতের কারখানাজাত কার্পাস-বস্ত্রাদির উপর যে অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায় করা হইত, তাহা ভারত সরকার এবার তুলিয়া দিলেন। এই Cotton Excise Duty তুলিয়া দেওয়ার মূলে যে কতকটা দেশীয় জনসাধারণের মতের প্রভাব আছে, ল্যাঙ্কাসায়ারের ভবিষ্যৎ প্রতিপত্তির উপর লক্ষ্য আছে এবং সরকারী স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায় আছে, তাহা রাজনীতিকগণই বলিতে পারেন। সাধারণ লোকের বিবেচনায় এই শুল্ক-বিবর্জ্জন তুলা-শিল্পের ইতিহাসে একটি নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিল। প্রাচীনকালে ভারতের তুলাজাত দ্রব্যাদি যে তদানীন্তন অজ্ঞ জগতের সর্ব্বত্রই বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীই নানা প্রকারে এই বিশাল কার্পাস-শিল্পের উচ্ছেদ-সাধন করেন। অনেক পুরাতন কেন্দ্র হইতেই তুলা-চাষ ও বস্ত্র প্রস্তুত উঠিয়া যায় এবং তন্তুবায়গণ অন্য জীবিকা অবলম্বন করিতে থাকে। এখন হস্তপরিচালিত চরকা ও তাঁতের কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও গ্রাম্য-শিল্প হিসাবে কার্পাস পূর্ব্বতন সমৃদ্ধ অবস্থা লাভ করিতে পারিবে কি না, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আধুনিক কার্পাস-শিল্প

তুলার কুটীর-শিল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত আর এক দিকে উন্নতি লাভ করিয়াছে—তাহা তুলার কারখানা-শিল্পে। বোম্বাই তুলা-শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঘুসুড়ী নামক স্থানে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম তুলার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার অনেক দিন পরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে সর্ব্বপ্রথম কল স্থাপিত হইয়াছিল। একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হইতেই ভারতে কার্পাসের কারখানা-শিল্প সংগঠনের বিশেষ সহায়তা হয়—তাহা মার্কিণের গৃহ-যুদ্ধ (American Civil War)। সেই সময় তুলা রপ্তানীর সমস্ত বন্দরই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ল্যাঙ্কাসায়ারকে বাধ্য হইয়া ভারতের বাজারে তুলা কিনিতে হয় এবং সুচতুর ভারতীয় বণিকও উক্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়ে নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, বোম্বাইর সওদাগরগণ এই অবসরে প্রায় ১৪ কোটি টাকা লাভ করেন। সে যাহা হউক, এই সময় হইতে তুলা-চাষের পরিসর শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং উৎপন্ন তুলা দেশমধ্যেই কারখানা স্থাপন করিয়া তুলাজাত দ্রব্য প্রস্তুতে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হইতে থাকে। ১৮৫৩ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলের সংখ্যা তত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত কলগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে থাকে; সাধারণতঃ বলিতে গেলে এই সময়ে আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল এবং সূক্ষ্ম সূতাজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া কলসমূহ অনেক পরিমাণে ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতময় প্লেগমহামারীর আবির্ভাব হইয়া তুলা-কল-সমূহের মজুর অভাবে যথেষ্ট ক্ষতি হয়; তথাপি এই সময়ের মধ্যেও ৫৬টি নূতন কল স্থাপিত হয়। ১৯০৫ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিগত দুই বৎসর ব্যতীত তুলার কলগুলির অবস্থা প্রায় ভালই চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময় ভারতে সর্ব্বসমেত প্রায় ২৮২টি তুলা-কল আছে এবং তাহাদিগের অবস্থিতি ও শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

প্রদেশ		কলের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
(১) বোম্বাই		১৮২	২০০৮৩০
(২) মাদ্রাজ		২১	২৫২৭০
(৭) যুক্ত-প্রদেশ		১৭	১৫৯৫৪
(৪) মধ্য-প্রদেশ	বরার	১৩	১৪৬২১
(৫) বঙ্গ		১২	১২০৭৩
(৬) দেশীয় রাজ্যাদি		৩৭	

তুলা-কল-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সমস্যা

তুলা-কল-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের অবিমিশ্র মঙ্গল সাধিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। বড় বড় কারখানা-শিল্পের বৃদ্ধির সহিত দেশে যে এক শ্রেণীর গৃহ ও ভূমিহীন, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী মজুরের দলের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। নামে তাহারা যথেষ্ট মজুরী পাইলেও কাযে অতি সামান্যই পাইয়া থাকে এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ আদৌ সঞ্চয়ের অনুকূল নহে। কর্ম্মে অক্ষম হইলেই ইহারা কোন না কোন প্রকারে সমাজের স্কন্ধে চাপে। কলওয়ালাগণ মজুরদিগকে খাটাইয়া লয়েন বটে, কিন্তু তাহাদের দৈহিক, নৈতিক অথবা মানসিক উন্নতিবিধানকল্পে সামান্য চেষ্টাই করিয়া থাকেন। আজকালকার এক একটি কার্পাস-কল বিরাট ব্যাপার; সহস্রাধিক লোক একটিমাত্র কলেই খাটিয়া থাকে। এতগুলি স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা যদি একসঙ্গে থাকে এবং তাহাদিগের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার নরনারী যে কেবলমাত্র খাটিবার কলেই পরিণত হইয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কলওয়ালাগণ অবশ্য বলেন যে, দেশীয় মজুর আদৌ স্থায়ী নয়; কৃষিকার্য্যাদির অবসরে তাহারা কলে খাটিতে আইসে এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেই চলিয়া যায়; ইহারা কখনই সুদক্ষ শ্রমিক হয় না এবং ইহাদিগকে শিক্ষাদি দেওয়া নিষ্ফল; কারণ, চর্চ্চার অভাবে শিক্ষা তাহাদের কোন উপকারে আইসে না। এই সমুদয় উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু এইরূপ অবস্থার দোহাই দিয়া যে সমুদয় কলওয়ালা নিজ নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বলা আদৌ অসঙ্গত নহে। সুখের বিষয় যে, সকল কলওয়ালাই স্বার্থপর নহেন। মাদ্রাজে কর্ণাটক ও বকিংহাম মিলসে শ্রমিকগণের জন্য নব-রচিত গ্রাম, মিলনাগার ও বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহা হইতে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত কলসমূহের মালিকগণ কলে নিয়োজিত শ্রমিকবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে কতদূর সচেষ্ট।

Cotton Excise Duty তুলিয়া দেওয়া বিষয়ক বাদানুবাদ উপলক্ষে ইহা অনেকেই বলিয়াছেন যে, ভারতে তুলা-কল পরিচালনায় যথেষ্ট অপচয় আছে। কাঁচা মাল ক্রয়ে Managing Agentগণের কমিশন ও অন্যবিধ পরিচালনা-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সকল সময় অর্থের সদ্ব্যবহার হয় না। ইহা কিন্তু সাধারণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। মাকিণ ও জাপানের সহিত তুলনা করিয়া কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয় কলসমূহের অধ্যক্ষগণ স্বল্পদর্শী ও অপেক্ষাকৃত কম কার্য্যদক্ষ। কিন্তু ভারতের শ্রমিক, মূলধন ও সামাজিক বিশেষ অবস্থাসমূহ এরূপ স্থলে বিবেচিত হয় নাই। অপচয় যে হয় না, তাহা বলা যায় না, কিন্তু ভারতে কার্পাসের কারখানা-শিল্পের বয়স হিসাব করিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কলের অধ্যক্ষগণ যথেষ্ট কর্ম্মপটু এবং সুযোগ পাইলে যে কোন দেশের তুলা-শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে সমর্থ।

তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্য

ভারতের অধিকাংশ শ্রেণীর তুলা হ্রস্বতন্তু হইলেও ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের মধ্যে কার্পাস উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মাকিণের নীচেই ইহার স্থান। ২ কোটি একরের অধিক জমীতেও তুলা-চাষ হয় এবং নানাবিধ কারণে প্রতি বৎসর ফসলের তারতম্য হইলেও গড়ে ৫ মণ গাঁটের প্রায় ৪৫ লক্ষ গাঁট তুলা উৎপাদিত হয়। অন্য দিকে ভারতে যে সমুদয় বড় বড় কল-কারখানা আছে, তাহার মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৯ শত ৪০টি তুলা অথবা তুলাজাত দ্রব্য প্রস্তুতে নিযুক্ত। আমরা পূর্ব্বে যে তালিকা দিয়াছি, তাহাতে কেবল সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কলের উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রদেশেই তুলা ঝাড়াই ও গাঁট বাধার (Ginning and Baling) অল্পবিস্তর কল আছে। কিন্তু ভারতোৎপাদিত তুলার মধ্যে অতি অল্পমাত্রাই দেশে ব্যবহৃত হয়। প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ বিদেশে রপ্তানী হয়; প্রায় সিকি ভাগ দেশমধ্যে তুলাজাত দ্রব্যাদিতে পরিণত হয় এবং অবশিষ্ট সিকি ভাগের সূত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে চালান যায়। তুলা, তুলাজাত দ্রব্যাদি এবং তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদির আমদানী

রপ্তানীর বিবরণ (১৯২৪-২৫) নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	আমদানী	রপ্তানী
দ্রব্যের নাম	মূল্য	মূল্য
কাঁচা তূলা	৪২৪৫৩২১৪	৯১৩১৮৮৭৬২
তূলার ছাঁট	২০১৩৩	৪৯২৭৩৯১
তূলাজাত দ্রব্যাদি—সূত্র	৯৬৬৩১০৭৭	৩৭০১১৪৩৮
রুমাল ও চাদর	৩০৭৭১৭২	৪৫৬৪২৪৬
মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি	১১১৯২২১৯	—
কোরা কাপড়	২৮৪৮৮৯৮৩০	১৩৩৫৬৩৫৫
ধোয়া কাপড়	২০২৩১৮৫৬২	৪৮৮৩০০
রঙ্গিন কাপড়	২০০১৫৯৬০৪	৫৪৭১৫৯৩৫
অন্যান্য প্রকার	১৭৬৩৫৫৭২	২২০৫৬২২
সেলাইর সূতা	৭৩৪৭৪৭৩	৪০৫৯৯৯
মোট	৮৬৫৭২৪৮৫৬	১০৩৩২৭৮২৫৭

কলকব্জা

সূতা কাটার জন্য	১৫১৪৬২৯৭
বয়নের „	৬৮৯৬১৯৮
বিবর্ণ ও রঞ্জনের „	৭৬৫৭১০
ছাপানর „	২৩৭২৪
অন্যান্য প্রকারের	৩৯২৯০৩২
মোট—	২৬৭৬০৯৬১

কার্পাস-বীজ	১৯১২৮৯৯১

কার্পাসের কারখানা-শিল্প ভারতে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আপাততঃ ভারতীয় কল-সমূহে মোট ১ শত ৯৮ কোটি গজ কাপড় উৎপাদিত হয়; তাঁতের কাপড়ের মাত্রাও ১ শত ৪০ কোটি গজের কম হইবে না। অর্থাৎ ভারতে মোট ৩ শত ৩৮ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ড ও জাপান হইতে ১ শত ৮৬ কোটি গজ কাপড় আমদানী হয়। কিন্তু মোট এই ৫ শত ২৪ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি গজ আবার রপ্তানী হইয়া যায়। সুতরাং ভারতে ৪ শত ৯৮ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ ভারতের কলসমূহ প্রায় দেশে কাপড়ের অভাবের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পূরণ করিতেছে। কিন্তু ইহাও এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, ভারতবাসী যে পরিমাণ বস্ত্র ক্রয় করিত অর্থের অসচ্ছলতায় তাহা আজকাল আর করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে লোকপ্রতি প্রায় ১৩ গজ কাপড় খরচ হইত; এখন সে স্থলে কেবলমাত্র ৯ গজ খরচ হইতেছে।

তূলা-শিল্পে জগৎ-প্রতিযোগিতা

ভারতের তূলা-শিল্পের বিনাশসাধন করিয়া ইংলণ্ডে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে তূলা-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা এখনও জগতে কার্পাস-শিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর তূলাজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের যেগুলি প্রধান কেন্দ্র, তৎসমুদয়ের চরকা ও তাঁতের হিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

দেশের নাম	তাঁতের সংখ্যা	চরকার সংখ্যা
গ্রেটব্রিটেন	৮০০০০০	৫,৬৭,৫০,০০০
মার্কিণ	৭৫০০০০	৩,৭৭,৮৬,০০০
ভারত	১৫০০০০	৭৯,২৮,০০০
জাপান	৬১০০০	৪৩,২৫,০০০
চীন	১৫০০০	৩৩,০০,০০০

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, গ্রেটব্রিটেন ও জাপান উভয়েই তূলার জন্য অন্যদেশের মুখাপেক্ষী; তথাপি প্রথমোক্ত দেশ তূলা-শিল্পে অগ্রণী। জাপানে কার্পাস-শিল্পের প্রতিষ্ঠা মাত্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু যে চীন, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের বাজারে জাপানী সূত্র ও বস্ত্রাদি সমশ্রেণীর ভারতীয় দ্রব্যাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, তাহা নহে, ভারতের বাজারেও জাপানী মালের কাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, জাপানী মাল ঠিক ভারতীয় মালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বরং ল্যাঙ্কাসায়ারের মালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাহা সত্য হইলেও ভারতবাসিগণের লাভ কি? লভ্যাংশের কেবল হস্তপরিবর্ত্তন মাত্র। অন্যদিকে ইংলণ্ডে মোটা সূতার কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে এবং চীনে কার্পাস উৎপাদন ও অধিকসংখ্যক কলপ্রতিষ্ঠায় প্রগাঢ় চেষ্টা

চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারত আদৌ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না; যে পরিমাণ বস্ত্র আজকাল কলে প্রস্তুত হইতেছে, দেশের অভাবমোচনের জন্য তাহার অন্ততঃ দেড়গুণ বস্ত্রাদি আবশ্যক এবং বস্ত্রও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হওয়া প্রয়োজনীয়। আপাততঃ Excise Duty উঠিয়া যাওয়ায় কলওয়ালাগণ বিশেষ সুবিধা পাইলেন। আশা করা যায় যে, বস্ত্রাদির মূল্য সুলভ করিয়া, শ্রমিকগণের মঙ্গলসাধন করিয়া ও অধিকসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন, নতুবা জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইবে না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

আনারস

আনারস যে একটি উপাদেয় রসনা-তৃপ্তিকর ফল, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং এই অম্ল-মধুর সুরুচিকর ফলের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয়, সাধারণের উহাতে অরুচি জন্মিবার আশঙ্কা নাই।

আনারস ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি কি না, এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় 'বহুনেত্র'। অনেকের মতে এ নামটি প্রাচীন নামকরণ নহে। ফলের গাত্রে অসংখ্য চোখের আকারের চক্র থাকায় এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচ্য জাতির মতে মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা আমেরিকা হইতে আমাদের দেশে আনীত হইয়াছে। পশ্চিম মহাদেশদ্বয় আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশে আনারস পাওয়া যাইত না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রমওয়েলের শাসনকালে ইহা সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে উপঢৌকন হিসাবে প্রবেশলাভ করে। পরে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডজাত আনারস দ্বিতীয় চার্লস উপঢৌকন প্রাপ্ত হয়েন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে আনারস সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা সর্ব্বপ্রথমে আনারস ভারতে আনয়ন করেন। অন্য দিকে প্রাচ্য লেখকগণের মতে ইহা আমেরিকা হইতে পারস্যদেশ ও পারস্য হইতে ভারতে আনীত হয়। পারসীক ও ভারতীয় নামের সামঞ্জস্যহেতু বোধ হয় তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী।

আনারসের আমেরিকাদেশীয় নাম আনাসী, নানস বা আনানস। ল্যাটিন নাম আনানস স্যাটিভা (Annanas Sativa), পারসীক নাম আনাসী ও ভারতীয় নাম আনানস, আনানসী বা আনারস। নামের এরূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বলোকপ্রিয়। তাহা না হইলে এত অল্পসময়ের মধ্যে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এরূপ সমাদৃত হইত না। দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচুর পরিমাণে আনারস পাওয়া যাইত। সুতরাং ব্রেজিলকেই সকলে আনারসের প্রকৃত জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আনারস ভারতে উদ্যানজাত ফলের মধ্যে গণ্য হয়। অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ প্রদেশেই ইহার যথারীতি চাষের কোনও ব্যবস্থা নাই। এই দেশের মৃত্তিকা ও আব-হাওয়া (climate) ইহার পক্ষে এত অনুকূল যে, মানুষের যত্নের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রচুর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি এ দেশের কৃষিজীবীরা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহার নিয়মিত চাষ করে, তবে অদূরভবিষ্যতে ইহা যে একটি লাভজনক কৃষি-কর্ম্মে পরিণত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আনারস ভারতে যে স্থান হইতে আনীত হউক না কেন, সর্ব্বপ্রথমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে দৃষ্ট হয় ও সেই স্থান হইতে এই দেশের সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ব্রহ্মদেশ, আসামের খাসিয়া পর্ব্বত ও পশ্চিম উপকূলস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে অরণ্যজ আগাছার মত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া সুস্বাদু ফল প্রদান করে। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে টেনিসেরিয়মে এত আনারস জন্মিত যে, তখন ঐ স্থানে এক টাকা মূল্যে এক নৌকা বোঝাই আনারস বিক্রয় হইত। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগ, বন্যা-প্লাবিত প্রদেশ, জলাভূমি, নিম্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশের শুষ্ক বালুকাময় পলির জমী ও বর্ষা-প্লাবিত দেশসমূহ আনারসের পক্ষে অনুকূল। ভারতে এরূপ ক্ষেত্রের অভাব নাই। সুতরাং এখানকার প্রায় সকল প্রদেশেই আনারস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উষ্ণ, আর্দ্র বায়ু ও কঙ্করাবৃত বালুকাময় ভূভাগ আনারসের পক্ষে আরও অনুকূল। কিন্তু

এঁটেল-মাটীবহুল জমী ও রুদ্ধ জলাশয় ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

চূর্ণক (Calcium) আনারসের জমীর বেশ ভাল সার। এতদ্ভিন্ন জৈব সার (organic manures), পচা পাতা, গোময় প্রভৃতি ইহার ফসল বর্দ্ধিত করে। চারা রোপণ করিবার সময় তুলা-বীজের খইল ও তামাকের গুঁড়া মাটীর সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিলে খুব ভাল ফসল হয়। Bone Meal বা হাড়ের গুঁড়াও আনারসের ফসলের পক্ষে ভাল সার। ফল উৎপন্ন হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই সার ব্যবহার করা উচিত।

আনারস গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি তিন বৎসরকাল পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। পরে ইহার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হয়। এই সময় পুরাতন গাছগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া সার দিয়া জমী প্রস্তুত করিয়া নূতন চারা রোপণ করিতে হয়। ফলের পত্র-কিরীট, ফলের অভ্যন্তরস্থ কাল বীজ অথবা পুরাতন গাছের শিকড় হইতে উৎপন্ন চারা গাছ রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি দুই হাত অন্তর বসান হয়। এই প্রকারে প্রতি বিঘা জমীতে প্রায় ১ হাজার ৬ শত চারা বসান যায়। এই চারা হইতে দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি হাজার গাছ উৎপন্ন হয়। চারার শ্রেণী যদি একটু তফাৎ থাকে, তবে নূতন চাষের বড় সুবিধা হয়। কারণ, পুরাতন গাছ উপড়াইয়া দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ জমীতে নূতন চারা বসান যাইতে পারে। এইরূপে একই জমীতে বহুকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে চাষ করা যায়।

আমেরিকার ফ্লোরিদা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের লোক মাচার নীচে ২ ফুট অন্তর প্রতি একর জমীতে প্রায় ২০ হাজার চারা রোপণ করিয়া থাকে। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চারা বসাইবার সময় হইতে ৮।৯ মাসের মধ্যে চারাগুলি ফলোৎপাদন করে। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসই চারা বসাইবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে চারাগুলি পুষ্পিত হইয়া ফল পরে ও আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকিয়া থাকে। কখনও কখনও আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পুষ্পিত হইয়া আব-হাওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় শীতকালে ফল পাকিতে দেখা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন ফলের ন্যায় শীতকালের ফল সুস্বাদু হয় না। ইহার কারণ, তাপের স্বল্পতা বশতঃ ফলের শ্বেতসারময় পদার্থের সম্পূর্ণ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে না পারায় মিষ্টত্বের স্বল্পতা ও অম্লের আধিক্য থাকে।

আনারসের গাছ অত্যধিক তাপ বা শৈত্য সহ্য করিতে পারে না। এ জন্য স্নিগ্ধ, সুশীতল, আতপতাপ-বর্জ্জিত স্থানে অনাদরেও ইহা বেশ ভাল জন্মিয়া থাকে। এ রকম "অকেজো আওতার জমী" আমাদের দেশের প্রতি পল্লীতেই যথেষ্ট দেখা যায়। বিশেষতঃ ফলের বাগানে অনেক জমী অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়া থাকে। এই সকল জমীতে আনারসের চাষ করিলে বেশ লাভ হয়।

ব্রহ্মদেশে ও মলয় উপদ্বীপে জাত আনারস খুব বড় হয়, কিন্তু আসাম, শিলং ও মরিসসজাত আনারস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মালাবার উপকূলে, মাহী ও ব্রহ্মদেশের মেনাং এ প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপন্ন হয়। মাহীর অধিবাসীরা বিষাক্ত জ্ঞানে ইহা ভক্ষণ করে না। তাহারা ঐ সকল ফল নষ্ট করিয়া ফেলে। এই প্রকারে নষ্ট হইতে দেখিয়া এক জন ফরাসী রাসায়নিক উহা হইতে ঐ স্থানে স্যাম্পেন (Shampagne) নামক মদ্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

[ডাক্তার রসিকলাল দত্ত —ডি, এস, সি Industrial Chemist, Government of Bengal মহাশয় অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আনারস চাষের বন্দোবস্ত করিতেছেন শুনিতে পাইতেছি। এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আরও অধিক বিষয় জানিতে পারিব বলিয়া আশা করি]

আনারস বা আনারসের মধুর রস আচার, সরবৎ, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সংরক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সকল সংরক্ষিত ফল অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশে এ ব্যবসায় এখনও শৈশবাবস্থায়।

সুপক্ক আনারসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত জিনিষগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

শর্করা	৬·৯৭	শতকরা
শ্বেতসার	০·২৩	”
ধাতবিক পদার্থ বা ভস্ম	০·৬৯	”
দ্রাবক বা অম্লাংশ	২·১৪	”
জলীয় অংশ	৮৯·৬৭	”

উপরি-উক্ত ধাতবিক পদার্থ বা ভস্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল নিম্নে লিখিত হইল :—

পটাশ বা সুরিয়া ক্ষার	৪৯·৪২	শতব
সুবঙ্গম ভস্ম (MgO)	৮·৮০	”
চূর্ণক (CaO)	১২·১৫	”
প্রস্ফুরক দ্রাবক (Phosphoric acid)	৫·০৮	”
গন্ধকাম্ল (SO_3) বা Salphuric Anhydride	০·০১	”
বালুকীন (Silica)	৪·০০	”
লৌহাম্ল (Fe_2O_3)	১·৯৩	”
লবণক বা সোডিয়মাম্ল (Na_2O)	১০·০১	”
হরিতীন বা ক্লোরিন	৯·৪১	”
	১০০·৮৩	”

সুরাসারে Ethyl Butyrate নামক Ester সংযোগ করিলে যে সুগন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা ঠিক পরিপক্ক আনারসের গন্ধের অনুরূপ। সুতরাং আনারসে এই Ester বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়।

জ্বরের সময় পরিপক্ক আনারসের রস ছাঁকিয়া দুই এক চামচ পান করিলে পাকস্থলীর উত্তেজনার উপশম হয়। আনারসপত্রের (কোঁড়) রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়। শিশুদিগের ক্রিমিনাশের জন্য ঐ রস চূণের জলের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা মৃদু বিরেচক। পক্ক আনারসের রস তাপনাশক, স্নিগ্ধকারক, মূত্রবৃদ্ধিকারক, ঘর্ম্মসঞ্চারক এবং পাণ্ডু ও শ্বাসনালীর প্রদাহ-নিবারক। হেকিমগণ বল ও পুষ্টিসাধনের জন্য আনারসের মোরব্বা খাইতে দেন। অপরিপক্ক আনারস জরায়ুর সঙ্কোচক; সুতরাং গর্ভিণীদিগের পক্ষে ইহা একান্ত অহিতকর।

শুনা যায়, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অধিবাসিগণ ঘরে ব্যবহার করিবার জন্য পচা আনারস হইতে সিরকা প্রস্তুত করিত। এই সিরকার কোনও ব্যবসা প্রচলিত ছিল কি না, জানা যায় নাই। তবে যে প্রক্রিয়ায় তাহারা সিরকা প্রস্তুত করিত, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। বড় বড় মৃন্ময় জালা মাটীর মধ্যে পুতিয়া তাহার মধ্যে ঈষৎ পচা বা অতি পক্ক আনারস রাখিয়া ও উহার সহিত এক মুঠা ছোলা ও একটু রুটী দিয়া জালার মুখ বেশ ভালরূপে বন্ধ করিয়া এক মাস হইতে দেড় মাস কাল পচিতে দেওয়া হয় (পচনক্রিয়া Fermentation বর্দ্ধিত করিবার জন্য ছোলা ও রুটী দেওয়া হয়)। অতঃপর গলিত আনারসের রস বা সিরকা কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে ভরিয়া রাখা হয়।

আনারসের সিরকা আনারসের বিকৃত অবস্থা। কিন্তু অবিকৃত অবস্থাতেও ইহার রস অনেক দিন রাখা যাইতে পারে। এ জন্য প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়াইয়া বীজগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর চাপ দিয়া উহার রস বাহির করিয়া ফারেনহীটের ১৭৫°–১৯০° তাপে প্রায় আধঘণ্টা কাল গরম করিয়া পরিষ্কৃত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে উহার Albumen বা অণ্ডনালের অংশ পৃথক্ হইবে। এক্ষণে ঐ রস পরিষ্কার বোতলের আকণ্ঠ ভরিয়া পুনরায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ফারেনহীটের ২০০° ডিগ্রী তাপে উত্তপ্ত করিয়া ছিপি বন্ধ করিতে হইবে। ছিপিটি দ্রবীভূত মোমে ডুবাইলে আর বোতলের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভবপর। গ্রীষ্মের দিনে আমাদের দেশে স্নিগ্ধকর পানীয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়, সুতরাং আনারসের মরসুমে (জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ হইতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত) উহার রস উক্ত প্রকারে বোতলে ভরিয়া রাখিলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমেরিকায় প্রতি বৎসর প্রায় ২ হাজার ৫ শত টন (প্রায় ৬৭ হাজার ৯ শত মণ) আনারসের রস প্রস্তুত হয়। ঐ রস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রীত হয়।

আনারসের সরবৎ।—পাকা আনারসের খোসা ও চোখগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে উহা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একখানি পরিষ্কৃত কাপড় দিয়া নিঙড়াইয়া উহার রস বাহির করিতে হয়। ঐ রসের সহিত সামান্য চিনি, একটু লবণ ও একটু লেবুর রস মিশাইয়া পাত্র সমেত বরফের মধ্যে রাখিলে বেশ স্নিগ্ধকর সরবৎ হয়।

আনারসের মোরব্বা করিতে হইলে উহার খোসা

ছাড়াইয়া উভয় প্রান্ত হইতে এক টুকরা করিয়া কাটিয়া বাদ দিতে হয় এবং প্যাচের মত কাটিয়া উহার চোখ বাদ দিতে হয়। যদি গোটা আনারসের মোরব্বা করিতে হয়, তবে আনারসগুলি এই প্রকারে তৈয়ারী করিতে হইবে, নতুবা সকলগুলিই টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হইবে। এক্ষণে গোটা আনারস বা আনারসের টুকরাগুলি পরিষ্কার টিনের কৌটায় পুরিয়া কৌটার মধ্যে চিনির রস ঢালিয়া দিতে হয়। চিনির রস প্রস্তুত করিবার জন্য এক ভাগ চিনি ও এক ভাগ জল পরিষ্কৃত কটাহে ফুটাইয়া লইতে হয়। কৌটার মধ্যে রস ঢালিয়া দিবার পর কৌটার মুখ বন্ধ করিয়া একটিমাত্র ছোট ছিদ্র রাখিতে হয়। এই প্রকারে যত ইচ্ছা টিন পূর্ণ করিয়া বাষ্পাগারে (Steam Chamber) অথবা ইহার অভাবে ফুটন্ত জলের তাপে এক ঘণ্টাকাল গরম করিতে হইবে। গরম অবস্থায় ছোট ছিদ্রগুলি রাং দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে টিনগুলি বায়ুসংস্রবহীন (airtight) হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ২৭ লক্ষ ৭৭ হাজার বাক্স মোরব্বা প্রস্তুত হয়। প্রতি বাক্সে চারি ডজন টিন থাকে, এরূপ প্রতি ডজন টিনের মূল্য ৩ টাকা ৪ আনা হইতে ৬ টাকা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকা আনারসের মোরব্বার ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৫ কোটি টাকা দ্বারা স্বীয় ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর কোনও মোরব্বার কারখানার রসায়নজ্ঞ আনারসের রস হইতে চিনি তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং ঐ চিনি বেশ সুন্দর হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। উক্ত কারখানায় মোরব্বা প্রস্তুত করিবার জন্য যত চিনি খরচ হইত, তাহার অধিকাংশই আনারসের রস হইতে প্রস্তুত হইত। আনারসের চিনি প্রতিযোগিতায় আকের চিনির সমকক্ষ নহে। কারণ, আকের রসে শতকরা ১৪ হইতে ১৮ ভাগ ও আনারসের রসে শতকরা ৭ ভাগ চিনি থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণ আছে, যাহার জন্য আনারসের চিনি লাভজনক ব্যবসায় নহে।

আনারসের সূতা।—আনারসের পাতাও ফেলা যায় না। ইহার পাতা হইতে বেশ সূক্ষ্ম, মসৃণ ও দৃঢ় সূতা প্রস্তুত হইয়া তদ্দ্বারা পরিধেয় বসনাদি প্রস্তুত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে "পাইনা" নামে মস্‌লিনের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহাই আমাদের দেশে "পাইনাপুলি" কাপড় বলিয়া বিখ্যাত। আনারসের সূতা কতকটা রেশমের মত মসৃণ ও নরম। রংপুর জিলার চর্ম্মকাররা আনারসের পাতার আঁশ হইতে সূতা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পাদুকা সীবন করিয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া অঞ্চলে ইহার সূতা গলার হাররূপে ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ্জ ওয়াট যখন "ভারতের আয়কর উৎপন্ন দ্রব্যের" (Economic Products of India) অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে তিনি এই সূতার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য বিলাতের Imperial Institutionএ কিছু নমুনা প্রেরণ করেন। তথায় ইহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইহাতে—

কৌষিক (Cellulose)	৮০·৮৭	শতকরা
জল বা জলীয় অংশ	১১·৩৩	"
ধাতবিক পদার্থ	০·৯০	"

আছে। ঐ সময় বিলাতের বাজারে এই সূতার মূল্য যাচাই হইয়া প্রতি মণ ১১ টাকা হইতে ১৪ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছিল।

আনারসের সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে পাতাগুলি প্রায় ১৮ দিন জলে পচাইতে হয়। অতঃপর যেরূপে পাটের আঁইশ বাহির করে, সেইরূপে ঐ পাতা কাচিয়া আঁইশ বা সূতা বাহির করিতে হয়। সিঙ্গাপুরে কাঁচা পাতা হইতে আঁইশ বাহির করে। কাঁচা পাতাগুলি তক্তার উপর রাখিয়া উপত্বক্‌গুলি ছুরির সাহায্যে চাঁচিয়া ফেলা হয় ও আঁইশগুলি পৃথক্ হইয়া যায়। ইহার সব আঁইশ সমান নহে। ইহাতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ রেশমের মত সূক্ষ্ম ও মসৃণ আঁইশ আছে। এরূপ আঁইশ প্রতি মণ প্রায় ৬০ টাকা দরে বিক্রয় হইতে পারে। ইহার সূতা খুব মজবুত ও সহজে পচিয়া যায় না। এই সূতার কাপড় শোণের সূতার কাপড় অপেক্ষা শতগুণ মজবুত, সূক্ষ্ম ও মসৃণ। ইহা রেশমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সিঙ্গাপুর হইতে চীনদেশে এই সূতা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া তথায় ইহা হইতে সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে

চট্টগ্রাম ও সিঙ্গাপুর হইতে ইহার প্রচুর রপ্তানী হইয়া ওলন্দাজ অধিকৃত উপনিবেশ-সমূহে কাপড়, চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে কার্পাস-সূত্র ইহার ব্যবসায় বিলুপ্ত করিয়াছে। যদি উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অল্প ব্যয়ে এই সূতা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, তবে পুনরায় ইহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। এই সূতা এত শক্ত বা ভারসহ যে, ৩/৪ ইঞ্চি মোটা রজ্জু প্রায় ৬০ মণ ভার সহিতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইহার চাষে কিরূপ লাভ হওয়া সম্ভব। এক বিঘা ফলের বাগানে অর্থাৎ যেখানে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি অন্যান্য গাছ আছে, এরূপ স্থানে যদি আনারসের চাষ করা হয়, তবে প্রায় ১ হাজার ৫ শত চারা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই চারার শতকরা ৫০টায় ফল হইলে প্রায় ৭ শত ৫০টি আনারস হইবে। (প্রথম বৎসর এত ফল না হইতে পারে, পর পর বৎসর ফলের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে)। প্রতি আনারস গড়ে ৴০ হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিলে এক বিঘা জমীতে উৎপন্ন ফলের মূল্য ৪৬৸৴০।

ফল পাকিলে উহার পাতা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এক বিঘা জমীর চারা হইতে প্রায় ত্রিশ সের সূতা পাওয়া যাইবে। ঐ সূতা প্রতি মণ ৫০৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইবে, সুতরাং ত্রিশ সেরের মূল্য ৩৭৷৹। মোট আয়——৮৪।৴০।

প্রতি সপ্তাহে এক জন মজুর লাগাইয়া সার দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার প্রভৃতি জমীর পাট করা যায়। সুতরাং এক বৎসর বা ৫২ সপ্তাহে প্রতি রোজ ৸০ হিসাবে মোট ৩৯৲ টাকা খরচ হয়। সূতা তৈয়ারী করিবার জন্য ৭টি রোজ—প্রতি রোজ ১৲ টাকা হিসাবে মোট—৭৲

মোট ব্যয়—৪৬৲

প্রতি বিঘায় লাভ ৩৮।৴০

সুতরাং ফলের বাগানের আওতার জমী হইতে ন্যূনকল্পে বিঘাপ্রতি ৩৫৲ টাকা লাভ হইবে। মজুর-ব্যয় কিছু অধিক ধরা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহার অর্দ্ধেক খরচই যথেষ্ট।

আমেরিকার কৃষিসঙ্ঘ (Agricultural Society) হইতে প্রকাশিত Farmer's Bulletin নামক পুস্তিকায় আনারসের চাষের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। তদনুসারে আমরা ১ শত বিঘা জমীতে আনারসের চাষ করিতে যে আয় ও ব্যয় হইবে, তাহার একটু আভাস দিলাম।

প্রাথমিক ব্যয়

এক শত বিঘা জমীর সেলামী— প্রতি বিঘা ৭০৲ হিঃ — —	৭০০০৲
৬ জোড়া বলদ— প্রতি জোড়া ১২৫৲ হিঃ —	৭৫০৲
বীজ, লাঙ্গল ও চাষের অন্যান্য আসবাবপত্র—	৪৫০৲
মোট—	৮২০০৲

ব্যয় (বাৎসরিক)

উপরি-উক্ত ৮২০০৲ টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ৯৲ হারে — —	৭৩৮৲
১ শত বিঘা জমীর খাজনা প্রতি বিঘা ২।০ হিসাবে — —	২২৫৲
৪ জন চাষীর বেতন মাসিক ২০৲ হিঃ = ৮০৲ × ১২ —	৯৬০৲
অতিরিক্ত মজুর ৪ জন তিন মাসের জন্য মাসিক ৮০৲ হিঃ—	২৪০৲
৬ জোড়া বলদের খোরাক গড়ে মাসিক ৭৫৲ হিঃ — —	৯০০৲
জমীর সার প্রতি বিঘার ৩৲ হিঃ — —	৩০০৲
অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় — —	২২৫৲
মোট ব্যয়	৩৫৮৮৲

প্রতি বিঘা জমীতে প্রথম বৎসর ২ হাজার, দ্বিতীয় বৎসর ৪ হাজার ও তৃতীয় বৎসর ৬ হাজার—তিন বৎসরে ১২ হাজার অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ৪ হাজার চারা হইবে। ঐ চারার শতকরা ৪০ টায় ফল হইলে প্রতি বিঘায় প্রায় ১ হাজার ৬ শত আনারস জন্মিবে। সুতরাং এক শত বিঘা জমীতে ১৬০০ × ১০০ = ১৬০০০০ আনারস হইবে। ঐ আনারস শতকরা ৪৲ হিঃ বিক্রয় করিলে উহার মূল্য ৬৪০০৲।

প্রতি বিঘা জমী হইতে প্রায় ৩০ সের সূতা পাওয়া যায়, সুতরাং ১০০ বিঘা হইতে ১০০ × ৩০ = ৩০০০ সের = ৭৫ মণ

মণ প্রতি মণ ৫০৲ হিঃ	৩৭৫০৲
মোট আয়	১০১৫০৲
” ব্যয়	৩৬৮৮৲
	৬৪৬২৲
মোট বাৎসরিক আয়	৬৪০০৲
সুতরাং মাসিক আয় প্রায়	৫৩০৲

ঐ লাভের টাকা হইতে বাৎসরিক ২ হাজার টাকা করিয়া ৪।৫ বৎসরের মধ্যে মূলধনের ঋণের টাকা পরিশোধ করা যাইবে।

যে সকল কৃতবিদ্য পল্লীবাসী চাকরীর মোহে অন্ধ হইয়া পল্লীভবন ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি পরিহার করিয়া সহরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্ব স্ব পল্লীতে গিয়া আপনার জিনিষ আপনি দেখিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদরান্নের জন্য আর পরের দাসত্ব ও উমেদারী করিতে হয় না—তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সারাজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন।

শ্রীআশুতোষ দত্ত।

স্বরাজের পথে

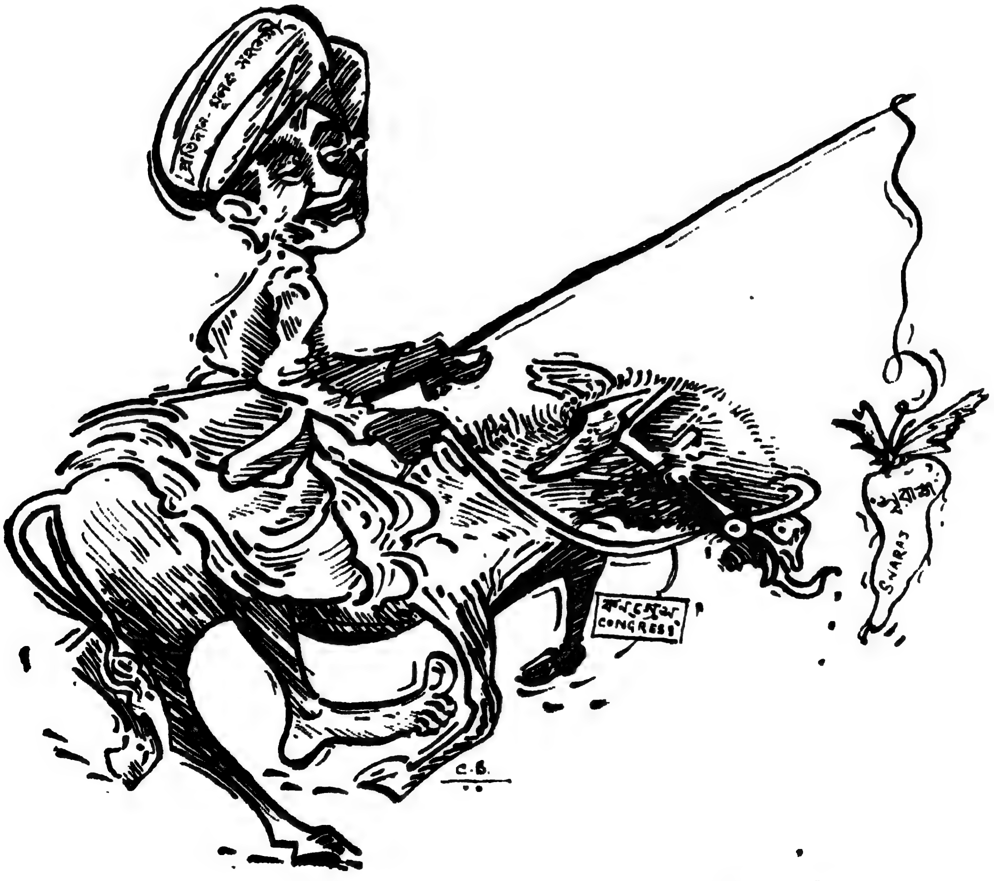

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক
প্রসঙ্গ

ইসি (ইলেক্‌ট্রোলাইটিক ক্লোরিণ)

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন গ্রামে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি, হাত বা পা কাটিয়া গেলে অনেক সময় তাহাতে পূঁয় জন্মিত। আমাদের বাড়ীর ভৃত্যরা তাহাদের ঐ প্রকার ক্ষত হইলে 'মুণজল' দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া রাখিত। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইত। ইসি প্রস্তুতের প্রধান উপাদানই 'মুণজল' এবং ইসি বর্ত্তমান অস্ত্রচিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পাস্তর জীবাণুর (germs) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই তিনি প্রমাণ করেন যে, সংক্রামক রোগ ও ক্ষত প্রভৃতির সংক্রামণ জীবাণু দ্বারাই হইয়া থাকে। তিনি পরীক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীবাণু ব্যতীত কোনও প্রকার রোগের সংক্রামণ হইতে পারে না। তাঁহার এই আবিষ্কারের পর হইতেই জীবাণুর আক্রমণ হইতে রোগীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসকগণ প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও তাঁহারা প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। কারণ, তাঁহারা যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করিতেন, তাহাদের জীবাণু নাশ করিবার ক্ষমতা অধিক হইলেও হয় তাহারা বিষাক্ত, না হয় অত্যধিক ক্ষার-সংযুক্ত (highly poisonous or contain high percentage of alkali), সেই জন্য তাহা সহজভাবে ক্রমাগত ক্ষতের উপর ব্যবহার করা যাইত না। বিষাক্ত প্রতিষেধক ঔষধ অধিক মাত্রায় ক্ষতের উপর ব্যবহার করিলে ক্ষত অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া শেষে পচন পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং রোগীকে তখন রক্ষা করা যায় না। অধিক ক্ষার-যুক্ত প্রতিষেধক ব্যবহার করিলে ক্ষত যন্ত্রণাদায়ক হয়, নূতন মাংস জন্মিলেই তাহা নষ্ট হয় এবং ক্ষত হইতে স্রাব আরম্ভ হয়। ফলে ক্ষত বর্দ্ধিতায়তন হয়। এই ভাবেই অস্ত্রচিকিৎসার কার্য্য চলিতে থাকে।

তাহার পরেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী মহা সমরানল জ্বলিয়া উঠে। দলে দলে আহত সৈন্যে সমস্ত হাঁসপাতাল পূর্ণ হইয়া যায়। মাঠের মধ্যে মাইলব্যাপী তাঁবু ফেলিয়া হাঁসপাতাল রচনা করা হয়। সেই সময় বাইক্লোরাইড অফ মারকারী বা রসকর্পূর, কার্ব্বলিক এসিড, এবং টীনচার আইওডিন প্রভৃতি প্রতিষেধক ঔষধ এই সকল আহতের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু তাহাতে ক্ষত শুষ্ক হইতে এত বিলম্ব হইত ও ক্ষতের অবস্থা এত মন্দ হইত যে, রক্ত বিষাক্ত হইয়া অধিকাংশ রোগীই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। শেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, অস্ত্রোপচার করিলে শতকরা ৭৫ জনই পচন রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। হাজার হাজার সৈন্যের রক্ত-পূঁয়-মাখা পরিচ্ছদ হইতে দুর্গন্ধ উত্থিত হইত এবং পানীয় জল বিষাক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কলেরাও দেখা দিত। হাজার হাজার আহতের আর্ত্তনাদে চিকিৎসকগণ বিশেষ বিচলিত হইতেন। সেই সময় ডাক্তার ড্যাকিন ও ডাক্তার ক্যারেল এই সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে ড্রামে ড্রামে ব্লিচিং পাউডার পানীয় জলে দেওয়া হইতে লাগিল। ইহাতে জলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইল এবং জল বিস্বাদ হইয়া গেল। আহত তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিক প্রাণ ভরিয়া জলপান করিবার মানসে জলপাত্র হস্তে লইয়া সামান্য পান করিয়াই পাত্র ফেলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া

মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে সৈনিকগণ জলপান করিতে অস্বীকার করিল। যাঁহারা সে সময়ে মেসোপটেমিয়াতে ছিলেন, তাঁহাদের হয় ত এ বিষয়টি আজও মনে আছে।

ডাক্তার ড্যাকিন ও ক্যারেল বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে, প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করা হইলেও তাহা দ্বারা কোনই ফল হইতেছে না। কারণ, যে সমস্ত প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তাহা অতিরিক্ত ক্ষার-সংযুক্ত এবং বিষাক্ত হওয়ায় দুই একবারের বেশী ক্ষতস্থানে লাগান যাইতে পারে না। ফলে অধিকাংশ সময়ই ক্ষত-প্রতিষেধক ঔষধ বর্জ্জিত হইতে লাগিল এবং সহজেই জীবাণু বংশবৃদ্ধি করিয়া সমস্ত শরীরের রক্ত বিষাক্ত করিয়া দিল। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যদি ক্ষতস্থান সকল সময় প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে রোগীদিগকে সংক্রামণের হস্ত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে (continuous irrigation with antiseptic)। কিন্তু ঐ সকল বিষাক্ত এবং অধিক ক্ষারযুক্ত প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইল না। তখন তাঁহারা ব্লিচিং পাউডার ও সোডা জলে মিশাইয়া 'ফিলটার' করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত সামান্য লবণ ও বোরিক এসিড মিশাইয়া তাহা দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এই চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল এবং কিছু দিনের মধ্যেই সংক্রামণের সংখ্যা একেবারেই শূন্য হইয়া গেল এবং মৃত্যুর হার কমিতে লাগিল। ডাক্তার ড্যাকিন ও ক্যারেলের নামানুসারে এই ঔষধের নাম হইল ক্যারেল ড্যাকিন সলিউসন। এই আবিষ্কারে অস্ত্রচিকিৎসা-জগতে সাড়া পড়িয়া গেল এবং প্রায় সকল হাঁসপাতালেই ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইল।

ব্লিচিং পাউডার জলে মিশাইলে ক্যালসিয়ম হাইপোক্লোরাইট সলিউসন পাওয়া যায়, ইহার সহিত সোডা মিশাইলে সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত হয় এবং ক্যালসিয়ম বা চুণ তলানী পড়িয়া থাকে। এই সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইটের নামই ড্যাকিন সলিউসন। আরও দুই প্রকারে এই হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত করা যাইতে পারে। (১) সোডিয়ম হাইড্রেট সলিউসনের মধ্যে ক্লোরিণ প্রেরণ করিলে সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইট পাওয়া যায়। প্রথম উপায়ে প্রস্তুত সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইট এবং উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হাইপোক্লোরাইটের অনেক অসুবিধা আছে। ইহার কোন প্রণালীতেই অনুপাত এবং পরিমাণ ঠিক থাকে না, তাহা ছাড়া হাইপোক্লোরাইট অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। সেই জন্য ইহাকে স্থায়ী করিতে মাঝে মাঝে চিকিৎসকগণ বেশী পরিমাণ সোডা হাইড্রেট মিশাইয়া থাকেন। ডাক্তার ড্যাকিন ইহার ক্ষারের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য (To minimise the irritating property of alkali) বোরিক এসিড ব্যবহার করেন। তাহা ছাড়া বোরিক এসিডের প্রতিষেধক গুণ আছে। উল্লিখিত উপায়ে বোম্বাইয়ের ক্লোরোজনে, ক্লোরোডাষ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই সকলের প্রধান দোষ যে, ইহারা অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ক্ষারের মাত্রা ইহাদের মধ্যে এত বেশী যে, অস্ত্রচিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বার ইউসন বা ড্যাকিন সলিউসন প্রস্তুত করিতে চিকিৎসকগণকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় এবং সময় সময় এই সকল ঔষধ একেবারেই শক্তিশূন্য অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়, ফলে প্রত্যেক বার শক্তি পরীক্ষা করিবার দরকার হয়।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইটকে ইসি বা ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্লোরিণ বলা হইয়া থাকে। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে (an electrolyser without partitions) 'নুণ-জলের' মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ করিলে প্রথমে নুণের বিশ্লেষণ হইয়া সোডিয়ম এবং জল একত্র মিশিয়া সোডা হাইড্রেট হয়, তাহার পর তাহার সহিত নুণের ক্লোরিন গ্যাস মিশিয়া সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত সোডিয়ম হাইপোক্লোরাইট সলিউসনে সামান্যমাত্র ক্ষার থাকে—শতকরা এক ভাগ ফিনলথেলিন সলিউসনের কয়েক ফোঁটা ইহার সহিত মিশাইলে সামান্য লাল রং হইয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যায়। ইসিতে শতকরা ২½ ভাগ ক্লোরিণ শক্তি থাকে এবং ক্ষত শোধনের উপযুক্ত ক্ষার ও নুণ থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রস্তুত

বলিয়া সকল .জিনিষের অনুপাত আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়।

বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রস্তুত হাইপোক্লোরাইট Blood serumএর সহিত মিশিলে Staphylococi, Streptococi, প্রভৃতি জীবাণু নাশ করিতে কার্ব্বলিক এসিডের ৩০ গুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়। প্রতিবেধক ঔষধ সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, ক্ষতের উপর direct apply করিলে বেশীর ভাগ প্রতিবেধক ঔষধই কুফল প্রদান করে, কিন্তু কেবলমাত্র হাইপোক্লোরাইটই সুফল দিয়া থাকে। ইহা নির্ভয়ে যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার ক্ষতের উপর প্রয়োগ (direct apply) করা চলে। ইহাতে ক্ষতে যন্ত্রণা হয় না। প্রকৃতভাবে ক্ষতকে জীবাণুশূন্য করিতে হইলে কিয়ৎপরিমাণ ক্ষারের প্রয়োজন, কিন্তু বেশী ক্ষার ভয়ানক ক্ষতিকারক—ইহা ক্ষতের নূতন tissue নষ্ট করে, উহা দ্বারা স্রাব হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে ক্ষতস্থান শীঘ্র নিরাময় হয় না। জরায়ু-সংক্রান্ত ক্ষতে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, কারণ, ইহা membranes ও tissueগুলিকে একেবারে পুড়াইয়া শক্ত এবং শুষ্ক করিয়া ফেলে। তাহাতে অনেক সময় স্বাভাবিক স্রাব (secretions) বন্ধ হইয়া যায় এবং জরায়ুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। কিন্তু ইলেক্ট্রোলাইটিক হাইপোক্লোরাইটে ক্ষার পরিমাণমত থাকায় ইহা দ্বারা সুফল পাওয়া যায় এবং ইহা জরায়ু-সংক্রান্ত রোগে ডুসে ব্যবহার করিয়া বাইক্লোরাইড অফ মারকারী, কেওসল এবং কার্ব্বলিক এসিড প্রভৃতি হইতে সহস্রগুণ ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

হাইপোক্লোরাইট ক্ষতের proteinsএর সহিত মিশে এবং সেই জন্যই ক্রমাগত হাইপোক্লোরাইট দ্বারা ক্ষতস্থান ভিজাইয়া রাখা দরকার হয়। ইহাতে ক্ষত শুধু জীবাণুশূন্য হয় না, জীবাণুকে একেবারে শক্তিহীন করিয়া ফেলে। অধিকাংশ চিকিৎসকই এখন হাইপোক্লোরাইটএর ব্যবহার জানেন এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারা যে কায পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ প্রতিষেধকেও পাওয়া যায় না। হাইপোক্লোরাইট চিকিৎসায় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ইহা ক্ষতের সকল স্থানে সমানভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এক ভাগ 'ইসি' পাঁচ ভাগ জলে মিশাইয়া তাহাতে ক্ষতের মাপে এক টুকরা বস্ত্র ১৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, পরে সেই বস্ত্রখণ্ড ক্ষতস্থানে লাগাইয়া মাঝে মাঝে তাহা উক্ত ইসি সলিউসন দ্বারা ভিজাইয়া দিতে হয়। সাধারণ ক্ষতে এক ভাগ ইসি ও ২০ ভাগ জল ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট।

অনেকের এখনও পর্য্যন্ত ধারণা আছে যে, ঠাণ্ডা লাগিলে বা হঠাৎ ঋতু-পরিবর্ত্তন হইলেই সর্দ্দি লাগে। এই সকল কারণ সর্দ্দির পরিপোষক বটে, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, জীবাণু ব্যতীত সর্দ্দি হয় না। নাসিকা হইতে নির্গত কফ পরীক্ষা করিয়া তাহাতে Staphilococi, Streptococi, Influenza, Cacilli, Deptheroid cacilli প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল জীবাণুকে বাধা প্রদান করিবার শক্তি আমাদের শরীরে আছে বলিয়াই আমরা সহজে ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হই না। সর্দ্দিতে ইসি বেশ উপকারী। সামান্য গরম জলে কয়েক ফোঁটা ইসি মিশাইয়া নাকের ভিতর, গলা প্রভৃতি ধুইয়া ফেলিলে বেশ আরাম পাওয়া যায় এবং সর্দ্দি ভাল হইয়া যায়। বেশী সর্দ্দি লাগিয়া গলা ভাঙ্গিলে ইসি ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। গরম জলে কয়েক চামচ ইসি ফেলিয়া তাহার vapour মুখের মধ্যে লইলে এক ঘণ্টার মধ্যে গলা পরিষ্কার হইয়া যায় ও রোগীও অনেক সুস্থ বোধ করে।

দাঁতের অসুখ আজকাল প্রায় সকল লোকেরই হইতেছে—ইহা যে জীবাণু দ্বারাই হইয়া থাকে, তাহা প্রায় সকলেই জানেন। আধ গেলাস জলে ১ চামচ ইসি ঢালিয়া তাহা দ্বারা মুখ ধুইলে উপকার পাওয়া যায় এবং এক দিন ব্যবহার করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আমি প্রত্যহ ১৫।১৬টি রোগীকে ইসি ব্যবহার করাইয়া যথেষ্ট ফল পাইয়াছি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইসি ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়। সেই সময় উত্তর-বিহার ও মজঃফরপুর প্রভৃতি জিলায় অত্যন্ত কলেরার প্রকোপ হয়। গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যায়। তখন কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পানীয় জল দুষিত হওয়াই এই মহামারীর প্রধান কারণ। যুদ্ধের সময় জল শোধন করিবার উপযুক্ত ঔষধ

আসিতে পারিত না। ব্লিচিং পাউডার পাওয়া যাইত এবং তাহাই ব্যবহার করা হইত। তাহা সত্বেও রোগের আক্রমণ হইতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে, ব্লিচিং পাউডারও সম্যক্‌রূপে জল শোধন করিয়া জীবাণুশূন্য করিতে পারিতেছে না। ব্লিচিং পাউডার আমাদের দেশে আসিতে অনেক সময় লাগে এবং তাহা গুদামে সঞ্চিত থাকিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই decomposed হইয়া পড়ে। ইহাতে ক্লোরিণের শক্তি অনেক কমিয়া যায়। জলের মধ্যে যে সকল organic impurities থাকে, তাহা বেশীর ভাগ ক্লোরিণের সহিত মিলিত হইয়া জল শোধন করিবার শক্তিকে হ্রাস করে। এই জন্য জল ভালরূপে শোধন হয় না। তাহার পর ব্লিচিং পাউডারের decomposed productsগুলিও ঐ সঙ্গে মিলিত হইয়া জলের স্বাভাবিক স্বাদ নষ্ট করিয়া দেয়। এই সকল নানা অসুবিধার জন্য পুষা কৃষিবিজ্ঞানাগারে মিঃ সি, এম, হাচিনসন * প্রথম বৈদ্যুতিক শক্তিতে ইসি প্রস্তুত করেন এবং তাহা ব্যবহার করিয়াই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের কলেরা নিবারিত হয়। সেই হইতে ইসি বিহারে “বিজলী দাওয়াই” নামে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে। পুষা, মুক্তীশ্বর প্রভৃতি স্থানের জলকূপগুলি প্রতি সপ্তাহে এক বার করিয়া ইসি দ্বারা শোধন করা হয়, ফলে আজ ৬.৭ বৎসরের মধ্যে সেই সকল স্থানে কলেরার প্রকোপ হয় নাই। সেই সময় হইতেই ইসি সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগে ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ Indian Medical Gezetteএ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসি বা হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত করিবার অনেক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সকলগুলিরই মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং তাহাতে প্রয়োজনানুরূপ কায হয় না। তাহা ছাড়া অতি অল্পসময়ের মধ্যে যন্ত্রগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ডাক্তার নেভ বলিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনের খুব বড় একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফারম হইতে এক সেট যন্ত্র আনিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা দ্বারা শতকরা ২॥০ ভাগ ক্লোরিণ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতে যন্ত্র ক্রয় করা সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াছেন। অনেক গবেষণার পর এবং ২ বৎসর সকল প্রকার Electrolyser দ্বারা কায করিয়া আমি তাহাদের দোষ ঠিক করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং এ দেশের ব্যবহারের উপযুক্ত, স্থায়ী, শতকরা ২॥০ ভাগ ক্লোরিণযুক্ত হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক প্রকার যন্ত্র (Electrolyser) প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার এক সেট যন্ত্রে ৫।৬ ঘণ্টায় ২॥০ ভাগ ক্লোরিণযুক্ত ১০ গ্যালন হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত হয়। ইহার মূল্য বিলাতী যন্ত্র হইতে তিন গুণ কম এবং অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ।

ইসি বা হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত করিবার সকল জিনিষই আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং যন্ত্রও আমাদের দেশের মিস্ত্রীরা প্রস্তুত করিতে পারে; ইহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা। ইসি বা হাইপোক্লোরাইট কেবল যে একটি উচ্চ শ্রেণীর পরিষেধক ঔষধ, তাহা নহে, ইহা আরও অনেক প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমরা যে সাদা কাগজ ব্যবহার করি, তাহা প্রস্তুত করিবার pulp এই হাইপোক্লোরাইট দ্বারা bleach করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে সরকার (বি, এস-সি)।

---

* Imperial Agricultural Bacterilogist.

রূপান্তরিতা

এ তুমি সে তুমি নহ, প্রেম নহে কাম,
মলয়জ নহে পঙ্ক, সুধা হলাহল,
মুক্তি নহে মোহবন্ধ শুক্তি মুক্তাদাম,
ভোগ নহে যোগানন্দ—কৈবল্য বিমল।

মহানির্ব্বাণের মূর্ত্তি চিদানন্দনিধি—
সর্ব্বরত্নোত্তমা তুমি - তুমি স্পর্শমণি,
বহু তপস্যার ফলে মিলাইল বিধি,
পেয়েছি পরম ধন আমি আজি ধনী।

জীবত্বের দেবত্বের শিবত্বের শিরে,
অক্ষয় অমৃতাধার চন্দ্রমণি-রেখা,
জ্ঞানপ্রেম যোগানন্দ জাহ্নবীর নীরে
কত প্রতিবিম্বরূপে দিতেছ গো দেখা,

রূপাতীতা রূপময়ী—হে চিরবাঞ্ছিতা,—
স্ফুরিছে অনন্তকাল তব দেবীগীতা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

লক্ষ্মীর স্বামী

১

"কি ক'রে এলে? কিছু ঠিক হ'ল কি"—গৃহিণী সারদাসুন্দরী কচি আমের ঝোলটুকু স্বামীর পাতের কাছে রাখিয়া যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কর্ত্তা শিবরতন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, "কিছু ঠিক করতে পারি নি। বরাত!"

গৃহিণী ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "বরাত ব'লে চুপ ক'রে থাকলে ত হবে না। সোমত্ত মেয়ে, মুখে যে আর ভাত রোচে না!"

কর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার ত বেশ রুচ্ছে।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তির সুরে বলিলেন, "কি যে বল, হাড় জ্ব'লে যায়!"

কর্ত্তা তখনও হাসিতেছেন; বলিলেন, "কি করবো বল, চেষ্টার ত ত্রুটি নেই। মেয়ে আমার ত ফেলনা নয়,—হাজারে অমন একটা মেলে না। তবুও সোনাদানা দিয়ে মুড়ে না দিলে ত কেউ নেবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ব'লে ওর বিয়ে হবে না? হিঁদুর ঘরের আইবুড়ো মেয়ে, সতেরোয় পা দিয়েছে, আরও দেরী করতে বল? আর ঐ দস্যি মেয়ে, ওর দিদিদের ধার দিয়ে যায় না। পাড়ায় রব উঠেছে, ধেড়ে মেয়ে, ধিঙ্গী মেয়ে! পোড়ারমুখীর লজ্জা-সরম তিলমাত্তর নেই, রাত-দিন পাড়ায় পাড়ায় টো-টো ক'রে বেড়াচ্ছে। এতখানি বেলা হ'ল, ঘরে ফেরবার হুঁস নেই।"

কর্ত্তা আহার শেষ করিয়া খড়িকা খাইতে খাইতে বলিলেন, "আহা, ও কি পিঁজরের পাখী যে, রাত-দিন খাঁচায় পুরে রাখতে চাও?—বয়েসকালে যদি খেলে না বেড়াবে, তবে কি ছেলেপুলের মা হয়ে তাই করবে? আমাদের ঘরে ছেলেমেয়েদের ছেলেমেয়ের মত থাকতে দিই নি বলেই আমাদের ছেলেমেয়েরা কাঁচা বয়েস থেকেই পেকে যায়, এক রাশ ভাবনা-চিন্তের বোঝার ভারে নুইয়ে পড়ে।"

গৃহিণী সারদাসুন্দরী মুখ ঘুরাইয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "তা নয় ত কি ধিঙ্গী দস্যি হয়ে বেড়াবে?"

শিবরতন বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর নীলরতন পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "জান না ত বৌদি, বিলেতে সাহেবদের ঘরে 'টম-বয়' ব'লে এক রকম জীব আছে। যে আইবুড় ধেড়ে ধিঙ্গী লাফমারা মেয়েদের কথা বলছিলে, এরা তারাই। আজকাল আমাদের দেশের নভেলে গল্পে এদের দিশী সাড়ী পরিয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়ে আনা হচ্ছে, তাই কত দস্যি মেয়ে নভেলে-নাটকে দেখা দিচ্ছে। দাদা আমাদের এই রাজীবপুরের মাষ্টার মশাই আর লাইব্রেরিয়ান কি না,—তাই লাইব্রেরীর বই প'ড়ে প'ড়ে ধেড়ে মেয়ের ধিঙ্গী লাফ দেখতে ভালবাসেন।"

কথাটা বলিয়া নীলরতন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে সারদাসুন্দরীও যোগদান করিলেন। শিবরতন বাবু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "না, নীলু, ঠিক তা নয়। আমি সত্যি বলছি, আমি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েকে ছেলে-বয়েসের বিমল আনন্দ-উল্লাস ভোগ করতে দেখতে চাই। থাক্ গে সে কথা, একটা সম্বন্ধ পেয়েছি, তোমাদের কি পছন্দ হবে?"

সারদাসুন্দরী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সম্বন্ধ? ছেলে কি করে? তারা কারা? বিষয়-আশয় কেমন? ঘরটা ভাল ত?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন,—"ওরে বাপ রে! একেবারে অতগুলো কথার জবাব দিই কি ক'রে? ছেলে ডুয়াসে কাঠের চালানী ব্যবসা করে, পাশটাশ কিছু নয়, বাপ-মা নেই, নিজেই কর্ত্তা, তবে পয়সা আছে।"

সারদাসুন্দরী বলিলেন, "ও মা, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই? তবে এই দস্যি মেয়েকে আঁটবে কে? জা-ননদরা আছে বুঝি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "না, কেউ নেই, সে বাপ-মার এক ছেলে। তবে এক দূরসম্পর্কীয় পিসী না মাসী তার ঘর-সংসার দেখে বটে।"

নীলরতন বলিলেন, "থাকে কোথায়? সেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে না কি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ, এক রকম তাই। বছরের আট মাস সেখানে থাকে, বাকী ক'মাস কলকাতায় কাঠ বিক্রী করে।"

নিকটে প্রথমা কন্যা অমলা বসিয়া ছিল, সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ও মা! কুঁদুড়ী!"

শিবরতন বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ঐ ত, ঐ জন্যেই মেয়ের সম্বন্ধ দেখতে চাইনি। দেখ, কেবল পাশ ক'রে গেলেই ভদ্রলোক, আর যা কিছু করলেই ছোটলোক, এ ধারণা তোমাদের কবে যাবে বল ত? এ দালাল, ও মুদী, এ দরজী, ও উড়ে, সে মেড়ো,—তোমাদের এ ধারণা না গেলে এ দেশের কোনও মঙ্গল নেই। যাক্, এ বিয়েতে সুবিধেও আছে, অসুবিধেও আছে। তোমাদের সব খুলে বলছি। সুবিধে এই, মেয়ে সুখে থাকবে, নিজের ঘরের গিন্নী হবে। অসুবিধে এই, বছরের ক'মাস জঙ্গলে প'ড়ে থাকতে হবে, আর অমলা যা বল্লে, ঐ কুঁদুড়ীর ঘর তাকে করতে হবে। কি বল, এতে তোমরা রাজী আছ?"

সকলেরই মুখ ভার, কেহ স্পষ্ট অনুমোদন করিলেন না। কেবল নীলরতন বলিলেন, "ছেলে রাজী হবে? মেয়ের গুণ সব শুনেছে ত?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ভাবনা নেই। কেবল গুণ কেন, রূপের কথাও জানে।"

সকলে বিস্মিত হইলেন, গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

কর্ত্তা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "সব বলছি। এবার যখন কলকাতায় বই কিনতে যাই, তখন বিমল বাবুর বাসায় ঐ ছেলেকে দেখেছিলুম, ছেলে বিমল বাবুর মামাত ভাই কি না!"

নীলরতন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঠের ব্যবসাদার, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুড়ো—চল্লিশ পার?"

শিবরতন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মোটেই না। বয়েস তার ২৪।২৫এর বেশী হবে না। অমলা রয়েছে, তবুও বলব, এ ছেলের মত দেখতে আমার একটি জামাইও হয় নি। তবে বন-জঙ্গলে থাকে, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে লড়াই করে, কাযেই আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছেলের মত একবারেই ননীর পুতুল নয়। মানুষের মত চেহারা তার, বড় গম্ভীরপ্রকৃতির, আর অল্পভাষী। ছেলেটির নাম—নীরদবরণ, ওরা রায়। সে চ'লে গেলে বিমল বাবুই আমায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, আমার মেয়ের বিয়ের কথা। শুনেছিলেন, মেয়েটি বড়, দেখতে সুন্দর। বল্লেন, নীরদবরণ বিবাহ করতে কলকাতায় এসেছে, আমাদের ঘরের সঙ্গে মেলে। যদি আমরা রাজী হই, তা হ'লে তিনি চেষ্টা দেখেন। আমি তখন সব কথা খুলে বল্লুম। মেয়ে সুন্দর, কিন্তু দস্যি, বিশেষ আমার দেবার থোবার সামর্থ্য নেই। শুনে তিনি হেসে বল্লেন, তাতে এসে যাবে না, সে যা চায়, তা পাবে, মেয়ে সুন্দর, ঘর ভাল; কেবল ঐ দস্যির কথাটা যা। তা বলেই দেখবেন বললেন। এর পরদিন তিনি আমায় বল্লেন, নীরদবরণ সম্মত, তবে সে একবার নিজে গোপনে মেয়ে দেখতে চায়। আমি রাজী হয়ে দেশে আসবার দিন তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলুম। সে লক্ষ্মীকে আড়াল থেকে দেখে গেছে; রাজী হয়েছে, এখন তোমরা রাজী হলেই হয়। সে এক পয়সা নেবে না, বরং উল্টে মেয়েকে ৫।৬ হাজার টাকার গয়না-গাটি দেবে, বিয়ের খরচটা পর্য্যন্তও দিতে চায়।"

সকলে চমকিত হইলেন। গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও মা, এত কাণ্ড হয়েছে, কিছু বল নি? আচ্ছা মানুষ ত। তা, ছেলেকে ত আমাদের বাড়ীতে আন নি, ছেলে লক্ষ্মীকে দেখলে কি ক'রে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ঢের কথা, সে আমাদের বাড়ীতে উঠবে না, আর কাউকে এই ব্যাপারের কথা জানতে দেবে না, এই সর্ত্ত ক'রে নিয়েছিল, তাই তাকে লালুদের বাড়ী রেখেছিলুম।"

নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ছেলেটি? আমি গেল রবিবার লাইব্রেরীতে যাকে ব'সে থাকতে দেখেছি?"

শিবরতন বলিলেন, "হাঁ হে, ঐ তুমি যাকে এ গাঁয়ে নতুন লোক দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলে?"

নীলরতন কেবল বলিলেন, "ছেলেটি ত বেশ, তবে বড় গুমুরে, কারও সঙ্গে কথা কয় না।"

শিবরতন বাবু বাহিরের আটচালায় যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিলেন, "বলেছি ত, সে অল্প কথা কয়।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোড়ারমুখীকে পছন্দ হয়েছে তার? দেখলে কেমন ক'রে? মা গো! যে ধিঙ্গী হয়ে বেড়ায়, সে অবস্থায় যদি দেখে থাকে!"

শিবরতন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভটচায্যিদের বাগান থেকে এক আঁচল পেয়ারা পেড়ে সে যখন চিবুতে চিবুতে বাড়ী ঢুকছিল, তখন দেখেছে একবার, আর একবার দেখেছে যখন সে চুল এলো ক'রে দিয়ে মেয়ে ইস্কুলের উঠোনে আর কজনের সঙ্গে লোটন পায়রা খেলছিল।"

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও মা, কি সর্ব্বনাশ! পোড়ারমুখী মুখে চুণকালী দিলে!"

শিবরতন বাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাই করুক সে, ছেলের কিন্তু পছন্দ হয়েছে। আমার সে দুষ্টু মা'টা গেল কোথা? তাকে ডাকতে পাঠাও না, খাবে-দাবে না? আমার যা বলবার বললুম, এখন তোমরা কি করবে, ঠিক কর।"

শিবরতন বাবু বাহিরে ঘুমাইতে গেলেন, গৃহিণী দেবর ও কন্যার সহিত মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধের সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

২

বিবাহের পূর্ব্বে শিবরতন বাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কেন না, তাঁহার 'আদুরে' মেয়ে লক্ষ্মী বিবাহ করিবে না বলিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। লক্ষ্মীর যত আবদার ও বাহানা তাহার বাপের কাছে, মাকে সে যমের মত ভয় করিত। তাই যখন সে পাড়া বেড়াইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ঘরে ফিরিল, তখন চুপি চুপি অন্দরে না গিয়া আটচালায় বাপের কাছে গিয়া বসিল। শিবরতন বাবু তখনও নিদ্রা যায়েন নাই। শিবরতন সস্নেহে কন্যার একরাশ এলোচুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "পাগলী কোথাকারের! এত বেলা অবধি কোথা ছিলি মা! নাবার খাবার কথাও মনে থাকে না? যা,খে গে যা, বাড়ীর ভেতর ওঁরা কত রাগ করছেন। যা, যা।"

লক্ষ্মী বাপের হাতের আঙুলগুলি মটকাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই, খাব না বাবা। মা কেন আমায় যখন তখন চুলোয় পাঠায়?"

শিবরতন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কবে আবার তোকে চুলোয় পাঠালে?"

লক্ষ্মী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "কেন, আজ সকালে। আমি ভটচায্যিদের রাখালীর সঙ্গে ওদের খিড়কীর পুকুরে সাঁতার কাটছিলুম ব'লে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি ত খাব না।"

এই সময়ে গৃহিণী ঝড়ের বেগে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া রোষদীপ্ত নয়নে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে আমার সোহাগী রে! নালিশ করতে এয়েছেন সদর কাছারীতে! ধিঙ্গী মেয়ে, সকাল থেকে নেচে-কুঁদে বেড়াবেন, সংসারের কুটোগাছটা নাড়বেন না। ওর দাসী-বাঁদীরা ওর পিণ্ডির যোগাড় ক'রে দেবে! সেই যে বেরিয়েছিলি সকালে, এতটা বেলা অবধি কার পিণ্ডি চটকাচ্ছিলি পোড়ারমুখী? বে হ'লে এদ্দিন—"

শিবরতন বাবু কন্যার অশ্রুভারাক্রান্ত আরক্ত মুখখানি দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিয়া বলিলেন, "আহা হা, যেতে দাও না। দুধের মেয়ে, ও আবার সংসারের কি করবে? যাও, ভাত দাও গে যাও।"

গৃহিণী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাত দেবে, না, চুলোর পাঁশ দেবে! আদর দিয়েই ওর মাথাটা খেলে! জিজ্ঞাসা কর দিকি তোমার ধিঙ্গি মেয়েকে, পরশু বিকেলে পোড়ারমুখী গাছ-কোমর বেঁধে মিত্তিরদের ধীরেনের সঙ্গে নৌকোয় বাচ খেলতে গিয়েছিল কি না! আমার মাথা-মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে! এত বড় ধেড়ে মেয়ে, ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে!"

লক্ষ্মী এইবার সমান ওজনে জবাব দিল, "বা রে, আমি বুঝি একলা গিছলুম? রাখালী ছিল, গিরি ছিল, পুঁটি ছিল, বিজয়-দা ছিল,—সবাই ত ছিল।"

গৃহিণী ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন,"তোমার মাথা ছিল, পোড়াকপালী রাক্কুসী! যারা ছিল, তারা ত তোমার মত সোমত্ত মাগী হয় নি, বের যুগ্যিও হয় নি। এই যে সম্বন্ধ হচ্ছে, যদি তারা এ সব কথা শোনে, তা হ'লে যে মুড়ো খ্যাংরা মেরে দূর ক'রে দেবে। মুখ নেড়ে আবার জবাব দিচ্ছে! এস, এখন পিণ্ডি গিলবে এস।"

গৃহিণী রাগে গনগন করিতে করিতে অন্দরে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর নীলোৎপলনয়ন বহিয়া গণ্ডে তখন

মুক্তাবিন্দু সম অশ্রু ঝরিতেছিল। সে মায়ের তিরস্কারে এমন করিয়া প্রায় কাঁদে না, সে তিরস্কার হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আজ কি জানি কেন, তাহার ভাবান্তর হইল। শিবরতন বাবু ব্যথিত হৃদয়ে তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি মা, কাঁদিস নি। এখন বড় হয়েছ, বুঝতে শিখেছ, দেখ ত তোমার গর্ভধারিণীর মনে কত কষ্ট হয়েছে, না হ'লে তার পেটের সন্তানকে কি এমনই ক'রে বকে? যাও মা, খাও গে যাও।"

লক্ষ্মী আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া বলিল, "না, খাব না।"

শিবরতন বাবু আবার বুঝাইতে লাগিলেন, "শুনলে ত মা, এই তোমার গর্ভধারিণী ব'লে গেল, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আর বাইরে বাইরে খেলে বেড়ান কি ভাল দেখায় মা?"

লক্ষ্মী চোখের জল মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল। হঠাৎ কে যেন তাহার অন্তরের মধ্য দিয়া একখানা তপ্ত ক্ষুরধার অস্ত্র টানিয়া লইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমায় বিয়ে দিও না বাবা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না।"

কথাটা বলিয়া সে পিতার পদদ্বয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শিবরতন বাবু প্রমাদ গণিলেন। নির্ব্বন্ধপরায়ণা কন্যার বিবাহে আপত্তির কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। তিনি জানিতেন, তাঁহার আদরিণী কন্যা যতই লজ্জাহীনা বলিয়া সাধারণে পরিচিত হউক, নিজের বিবাহের কথায় সম্মতি বা আপত্তির কোন কথাই কহিবে না। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত হইল। তিনি বুঝিলেন, জিদ করিলে কোন ফল হইবে না, তাই মিষ্ট কথায় তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে ফল এই হইল যে, লক্ষ্মী পুনরায় আর আপত্তির কথা না তুলিয়া কেবল জিদ ধরিল যে, বিবাহের পরেও তাহাকে যেন পিতার নিকটই থাকিতে দেওয়া হয়, অন্যথা সে পলাইয়া যাইবে, না হয় 'ভটচায্যিদের' পুকুরে ডুবিয়া মরিবে,—যাহা হয় একটা কিছু করিবে। শিবরতন বাবু তখনকার মত তাহার কথাতেই সম্মত হইলেন; বলিলেন, "যা, এখন খে গে যা, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

লক্ষ্মী অন্দরে চলিয়া গেলে পর শিবরতন বাবু বহুক্ষণ তাহার কথাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, তাঁহার আর সে দিন দিবানিদ্রা হইল না।

৩

লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে শিবরতন বাবু কলিকাতায় গিয়া নীরদবরণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা খোলাখুলি বলিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা যে নির্ব্বন্ধপরায়ণা, সে কথা তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে জানাইয়াছিলেন। তাই ভাবী জামাতার হাত দুখানি ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, "বাবা, কিছু মনে কোরো না, ও জেদ বড় হ'লেই সেরে যাবে। আপনার ঘর-সংসার চিনে নিতে পারলে তখন আর ও জেদ থাকবে না। এখন যখন ধরেছে, বাড়ী ছেড়ে যাবে না, তখন বলি কি, বিয়ের পর এখন মাসকতক আমার ওখানেই থাক। তার পর যখন তুমি কর্ম্মস্থানে যাবে, তখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও। তত দিনে তোমায় চিনতেও পারবে। কি বল?"

নীরদবরণ তদুত্তরে বিনীতস্বরে বলিয়াছিল, "আপনি আমায় এমন ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? দেখুন, আমিও ছেলেবেলা থেকে বড় জিদ্দী, যখন জিদ ধরেছি, আপনার ওখানেই বিয়ে করব, তখন শত বাধা থাকলেও তাই করব। আর আমারও ত ডুয়ার্সে যাবার চার মাস সময় আছে। না হয় এবার আরও চার পাঁচ মাস এখানেই থেকে যাব। সে ক'মাস তারা এখানে থাকলেই বা। তবে আমারও একটা কথা আছে। আপনার কাছে তাদের রাখতে রাজী আছি, কিন্তু তা ব'লে আপনার বাড়ীতে নয়। যাতে আপনার কাছেও থাকতে পায়, অথচ আপনার বাড়ীতে নয়, এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?"

শিবরতন বাবু এই আশ্চর্য্য প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি ব্যবস্থা হ'তে পারে?"

তাহাতে নীরদবরণ বলিয়াছিল, "এই ধরুন না, আপনাদের ওখানে ছোট-খাট পোড়ো বাড়ী কিনতে পাওয়া যায় না? শুনেছি, আপনাদের গাঁয়ের অনেকে ভিটে ছেড়ে কলকাতায় বা পশ্চিমে কর্ম্মস্থানে গিয়ে বাস করেছে।"

শিবরতন বাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ওঃ, এই কথা! তা কেন পাওয়া যাবে না? এই ধর না, আমাদেরই পাড়ার স্মরণ মিত্তিররা দেশের বাস

উঠিয়ে বিদেশে বাস করছে। তারা তাদের ভিটে আর জমীজমা বিক্রী করবে ব'লে খদ্দের খুঁজচে—ভিটের অবস্থাও বেশ ভাল আছে, অল্পদিন দেশ ছেড়েছে কি না। আমিই কিন্‌তুম সম্পত্তিটা, তা হাতে কাণা কড়িও নেই, দুটো মেয়ের পর পর বিয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হয়েছি।"

নীরদবরণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, "ওঃ, তবে ত বেশ হয়েছে, ঐ বাড়ীটাই কিনে ফেলুন, যা লাগে দেবো।"

তাহাই হইয়াছিল। শিবরতন বাবু ভাবী জামাতার হইয়া দুই চারি দিনের মধ্যেই মিত্তিরদের ভিটা-বাড়ী মায় বাগান ও পুষ্করিণী ক্রয় করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পরামর্শমত আসবাবপত্র দিয়া বাড়ী সাজাইয়া ফেলিলেন। নীরদবরণ কোনও বিষয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করিল না, তাহার নূতন বাড়ীতে দাস-দাসীও নিযুক্ত হইল।

বিবাহের পর যখন বর-বধূ নূতন বাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং নীরদবরণের পিসীমা যখন সেখানে নূতন সংসার পাতাইয়া বসিলেন, তখন পাড়ার বড় ঠানদি, কনে ঝি-মা প্রভৃতিদের চক্ষু আকাশপাতাল বিস্তৃত হইল। কি হইল, এ কি রূপকথার রাজপুত্তুর রাজকন্যা না কি? পাড়াকুঁদুলী দস্যি মেয়ের এ কি বরাত গা! প্রথম বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া কেহ বিশ্বাসই করেন নাই—হাঃ, ঐ মেয়ের না কি বর জুটবে ভূভারতে? বাজে কথা গো, বাজে কথা! তাহার পর যখন সত্য সত্যই বিবাহের আয়োজন হইল, নূতন বাড়ীর সাজ-সজ্জা হইল, বর আসিল, বিবাহ হইল, ধুমধামে খাওয়ান-দাওয়ান হইল, বর-কন্যা বাজনা-বাদ্যের সহিত ঘটা করিয়া নূতন বাড়ীতে গিয়া উঠিল, তখন শুভাকাঙ্ক্ষিণী ঠানদি-ঝিমাদের বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল, আহারে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, প্রাণ সদাই ধড়ফড় করে। এঁ্যা, সত্য সত্যই এ হইল কি? বর তেজ পক্ষের পাকা-চুলো ঘাটের মড়া-টড়া না, সাতটা েড়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে কাসতে কাসতে বিয়ে করতে এল না,—এ কি আপশোস্ গো! তার পর মেয়ের এক া গয়না, পাল্‌কী চ'ড়ে বাদ্যি-বাজনা ক'রে যাত্রা, তৈরী সারে গিয়ে গিন্নী হওয়া, এও কি সয় গা! না, কিছু আছে নিশ্চয়ই, ছেলের জাতের গোল নেই ত?

নূতন বাড়ীতে আসিবার পর লক্ষ্মী প্রথম মাস দুই, দিনে পাঁচ সাত বার বাপের বাড়ী যাইত, পূর্ব্বের মত পাড়া বেড়াইত, কেহ নিষেধ করিলে খিল খিল হাসিত, ছুটিয়া পলাইত। তাহার পিস-শাশুড়ী এক দিন প্রাতঃকালে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৌমা, আজ কি রান্নাবান্না হবে,' তখন সে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিল, 'কেন, ভাত!' বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়ে! ভাত ত হবেই, তা সব যোগাড়-যন্তর ক'রে দাও। এই নাও ভাঁড়ারের চাবী, তোমার ঘরকন্না তুমি বুঝে নাও।"

লক্ষ্মী সে কথায় কান দেয় নাই। সংসারের ভার লওয়া দূরে থাকুক, সে সংসার হইতে দূরেই থাকিত। স্বামীর সহিত সে পারতপক্ষে দেখাসাক্ষাৎ করিত না, দেখা হইলে হাঁ না করিয়া কথার জবাব দিত। শাশুড়ীর নিষেধ সত্ত্বেও সে কখনও মাথায় কাপড় দিত না, বিবাহের পূর্ব্বে যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তেমনই করিত। বেশী দিন বাপের বাড়ীতেই রাত্রিবাস করিত। পিসীমা এ বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুযোগ করিলে নব-বিবাহিত নীরদবরণ গম্ভীর হইয়া থাকিত, কথার জবাব দিত না।

মাস দুই এই ভাবেই কাটিল; লক্ষ্মী পোষ মানিল না। নীরদবরণ প্রথম প্রথম তাহার সকল আবদার-অভিমান সহ্য করিত, তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিত, তাহার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সে মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীকে সর্ব্বদা তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। কখনও কখনও সে তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গিয়া লক্ষ্মীর নিকটে আপনার নিঃসঙ্গ জীবনের কষ্টের কথা—হাহাকারের কথা বুঝাইত, আদর করিয়া তাহার কোমল কর-পল্লব দুইখানি নিজের হাতে লইতে যাইত। লক্ষ্মী নীরবে তাহার কথা শুনিত বটে, কিন্তু সে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেই ক্রোধারক্ত মুখে সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইত—এমন কি, অনেক সময়ে এজন্য নীরদবরণকে অল্পবিস্তর আঘাতও পাইতে হইত। ক্রমে নীরদবরণের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিতে লাগিল; তাহার ললাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর এইরূপে ক্রমশঃ প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মাথা কাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্মী এ ব্যবধানের কথা অনুভব করিত কি না, বুঝা যাইত না, সে পূর্ব্ববৎ যথারীতি হাসিয়া খেলিয়া

বেড়াইত। কিন্তু নীরদবরণ ক্রমেই বিষম অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

আর কর্ম্মস্থানে যাইবার মাত্র মাস দুই আছে। এবার নীরদবরণ ছয় মাসকাল এই গ্রামেই কাটাইয়াছে। এত দীর্ঘ সময় সে আজ ৪ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে কখনও অতিবাহিত করে নাই।

এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে নীরদবরণ হঠাৎ অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লক্ষ্মী শয়নকক্ষে অনাবৃত মস্তকে ভূতলে জানু পাতিয়া বসিয়া একখানি ক্ষুরধার ভোজালি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিতেছে; সেখানা নীরদবরণ ডুয়ার্স হইতে আনিয়াছিল। লক্ষ্মী দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার অন্য কোন দিকে নজর ছিল না। নীরদবরণ কিছুক্ষণ পরম তৃপ্তির সহিত একান্তে তাহার নব-কিশলয়লাবণ্য উপভোগ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "লক্ষ্মি!"

লক্ষ্মী ভোজালিখানা ফেলিয়া দিয়া তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কক্ষ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিল। তাহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদবরণ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "পালাচ্ছ কোথায়, পালাতে ত দেবো না। আজ তোমায় আমায় একটা বোঝা-পড়া হবে। দেখ, আমাদের চার হাত যখন এক হয়েছে, তখন এ বন্ধন হ'তে তোমার আমার কারও মুক্তি নেই। তুমি আজ দুদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু চিরদিন ত পালাতে পারবে না। শোন একটা কথা।"

নীরদবরণ লক্ষ্মীর দুইটি হাত ধরিল। লক্ষ্মী অমনই সজোরে হাত দুখানি ছাড়াইয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "যাও!"

নীরদবরণ অতর্কিতভাবে ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কে নাম রেখেছিল তোমার লক্ষ্মী! বুঝে শুঝেই বোধ হয় এই নামটি দিয়েছিল। দেখ, এখানে ছ'মাস কেটে গেল। এর মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কেবল পালিয়েই বেড়াচ্ছ। আর মাসেক দু'মাস পরে যখন আমার সঙ্গে জঙ্গলে যেতে হবে, তখন কি করবে? জঙ্গলে গিয়ে কার কাছে পালাবে?"

লক্ষ্মী তখনও রাগে ফুলিতেছিল, বলিল, "কে যাচ্ছে জঙ্গলে, আমায় ত ভূতে ধরে নি। সর, যাই।"

নীরদবরণের তখন হাসি অন্তর্হিত হইয়াছে, মুখে দারুণ দৃঢ়তা ও গম্ভীরতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "যাবে না বললেই ত হয় না। জেনে রেখো, আমি তোমার স্বামী।"

লক্ষ্মী আরও পরুষ কণ্ঠে জবাব দিল, "ওঃ, ভারী স্বামী! আমি ত আর সেধে বিয়ে করতে যাই নি। সর।"

লক্ষ্মী নীরদবরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে গেল; কিন্তু সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহকে বিন্দুমাত্র নড়াইতে পারিল না। বরং নীরদবরণ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শোন বলি। জেদ যে তোমার কেবল একচেটে, তা ভেবো না। আমিও জেদ করেছি, এক মাস পরে তোমায় নিয়ে জঙ্গলে যাবই, পৃথিবীতে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তাই বলছি, ভালয় ভালয় কথা শোনো, কোন হাঙ্গাম হবে না।"

লক্ষ্মী কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনও তাহার অন্তরের বিজাতীয় ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে কান্নাটা অভিমানের নয়, ক্রোধের, ব্যর্থ চেষ্টার। কান্নাজড়িত ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলিল, "গোঁয়ার! চাষা! মেয়েমানুষের গায় হাত তুলতে লজ্জা করে না?"

নীরদবরণ আহত হইয়াও প্রশান্ত স্বরে বলিল, "না, করে না। যে মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ হয়েও নিজের কর্ত্তব্য পালন করে না, পুরুষের মত মর্দ্দানি ক'রে বেড়ায়, তাকে তার বাপ-মা আদর দিতে পারে, কিন্তু আমি পারি না। সে অবাধ্য মেয়েমানুষের রোগ সারাবার ওষুধ আমার কাছে আছে। ভাব কি, আমি কিছু খবর রাখি না, কিছু শুনতে পাই না? আমার স্ত্রীকে আমি পাড়ায় পাড়ায় হতভাগা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলিয়ে বেড়াতে দেবো না। যদি এমনই তোমার সে রোগ সারে, ভালই, না হ'লে তোমায় সায়েস্তা করবার ওষুধ আমার জানা আছে।"

লক্ষ্মী ভূতলে বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখনও তাহার যৌবন-মদগর্ব্বিত দেহ ক্রোধে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নীরদবরণ কিছুক্ষণ তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে তখন ভাব-সমুদ্রের কি তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে-ই জানে, তবে তাহার মুখে-চোখে একটা অনির্ব্বচনীয় কোমলতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে ক্ষণপরে

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ও পরুষ করিয়া বলিল, "আমার শেষ কথা, এখন থেকে গেরস্তর ঘরের বৌ-ঝির মত ঠাণ্ডা হয়ে ঘরকন্না করতে শেখ। তুমি খুকী নও। যেতে তোমায় হবেই, সে জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক।"

নীরদবরণ কথাটা বলিয়া আর অপেক্ষা করিল না, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আর লক্ষ্মী—দুরন্ত অবাধ্য ধিঙ্গী মেয়ে লক্ষ্মী মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া খুব এক পালা কাঁদিয়া নিজের অপমানের ক্ষত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

৪

কথাটা আর কেহ জানিল না। লক্ষ্মী যেমন নির্ব্বন্ধ-পরায়ণ, তেমনই তেজস্বিনী, সুতরাং এ অপমানের কথা সে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তাহার আপনার জন - সকল মান-অভিমান আবদার-বাহানার স্থান পিতার সমীপেও নিবেদন করিল না। সে কেবল অপরাহ্ণে পিত্রালয়ে গিয়া গোপনে পিতার হাত দুখানা ধরিয়া কম্পিত ব্যগ্র কণ্ঠে বার বার অনুরোধ করিল, তাহাকে যেন জঙ্গলে পাঠান না হয়, হইলে সে নিশ্চিতই জলে ডুবিয়া মরিবে। শিবরতন বাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন, হঠাৎ কন্যার এই ভাবের কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে জামাতার সহিত কথা কহিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন।

সেই দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি কেহ ভট্টচায্যিদের খিড়কির বাগানে এক ঝোপের আড়ালে অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই দেখিতে পাইত, দুইটি প্রাণীতে চুপি চুপি পরামর্শ হইতেছে, সে দুই জনের এক জন লক্ষ্মী অপরা ভটাচায্যিদের রাখালী। লক্ষ্মী রাখালীকে তাহার গোপন কথা সবই জানাইয়াছিল। বালবিধবা রাখালীও সংসারে সুখে ছিল না, দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের জন্য সে ভ্রাতৃজায়াদের নিকট উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিত। বিশেষতঃ রাখালীও লক্ষ্মীর মত খেলা-ধুলা লইয়া থাকিত বলিয়া তাহার উপর ভ্রাতারাও সন্তুষ্ট ছিল না। পিতার নিকট কোনও আশার কথা না পাইয়া লক্ষ্মী তাহাকে তাহার অপমান-নির্য্যাতনের কথা নিবেদন করিল। রাখালী পরামর্শ দিল, "চল্ না কেন, দু'জনে বাজীৎপুরে মাসীর বাড়ী চুপি চুপি পালিয়ে যাই।" লক্ষ্মী পরম আনন্দ ও উৎসাহভরে তাহাতে সম্মতি দিল—তাহার বিদ্রোহী অন্তর তখন স্বামীর গৃহ হইতে দূরে—অতি দূরে পলায়ন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই গোঁয়ার চাষাটার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য যদি তাহাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইতে হয়—এমন কি, নরকেও যাইতে হয়, তাহার জন্য তখন সে প্রস্তুত।

কিন্তু এক প্রবল অন্তরায়, কে তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাইবে, তাহারা ত পথ চিনে না। রাখালী বলিল, "ভাবনা নাই, ধীরেন-দা আছে, সে বাজীৎপুর জানে।" মিত্তিরদের ধীরেন প্রায় তাহাদের সমবয়স্ক, শৈশব হইতে তাহাদের সহিত খেলা-ধুলা করিয়াছে, এখনও যে সুযোগ ও সুবিধা পাইলে করে না, এমন নহে।

যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কায। লক্ষ্মী 'ধীরেন দার' সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া সব কথা জানাইল। স্থির হইল, সকলে ঘুমাইলে, গ্রাম নিশুতি হইলে, লক্ষ্মী ও রাখালী চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইয়া বাজারখোলার তেমাথায় ধীরেনের জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহার পর ধীরেন আসিয়া তাহাদের দুই জনকে বাজীৎপুর লইয়া যাইবে। বাজীৎপুর রাজীবপুর হইতে বেশী দূর নহে। সন্ধ্যার পর হইতে লক্ষ্মী রাখালীদের ঢেঁকিশালে লুকাইয়া রহিল।

* * * *

নীরদবরণ রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে থাকিয়া তাহার পত্নীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে শিবরতন বাবুর সহিত অনেক পরামর্শ করিল। তাহার পর বাসায় ফিরিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে সে বলিল, "আপনি এ সময়ে একটু কড়া হবেন, না হ'লে কার্য্যোদ্ধার করা সহজ হবে না।" শিবরতন বাবু বলিলেন, "তুমি যা করবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। লক্ষ্মী এখন আর আমার ঘরের নয়, তোমার। তবে একটা কথা, একবারে কঠিন ব্যবহার কোরো না, কি জানি যদি বিগড়ে যায়, বড় জিদী কি না!"

বাসায় ফিরিয়া আহারে বসিয়া নীরদবরণ পিসীমার কাছে শুনিল, তখনও লক্ষ্মী বাসায় ফিরে নাই; সে অপরাহ্ণে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে তাহার আর কোনও খবর নাই।

মুখের গ্রাস হাতেই রহিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেল, কিন্তু সেখানেও যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। আজ দ্বিপ্রহরে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে অভিমানিনী লক্ষ্মী হয় ত একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, হয় ত সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিয়াছে, এই ভাবনাটাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রকাশ্যে কাহাকেও মনের ভাব জানিতে না দিয়া শ্বশুরালয়ের সকলকে এ বিষয়ে কোন গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। শিবরতন বাবু ভাবিলেন, তাঁহার কন্যা নিশ্চিতই রাখালীদের বাড়ী লুকাইয়া আছে। তাই তিনি গোপনে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, রাখালীও তাহার ঘরে নাই। তখন একটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার রেখা সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিল। সকলে ভাবিলেন, উহারা দুই জনে নিশ্চিতই পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছে। উহারা যে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, এ কথা কাহারও মনে হইল না। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নীরদবরণ বাসায় ফিরিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর সে অস্থির হইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পথে কোনও নির্দ্দিষ্ট দিকে অগ্রসর না হইয়া সে আনমনে সদর পথ ধরিয়া চলিল। হঠাৎ এক জন লোক নমস্কার করিয়া বলিল, "জামাই বাবু, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?"

নীরদবরণ চমকিত হইয়া বলিল, "কোথাও না।" লোকটা হারু গোয়ালা, সে ভিন্ন গ্রামে কুটুমবাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। সে বলিল, "পথে দু'জনা ভদ্দর মেয়েলোককে এই রাতে বাজারখোলার দিকে যেতে দেখলাম। তারা মুখ ঢেকে যাচ্ছিল, এক জনারে দেখে মনে হোলো আমাদের মাষ্টার বাবুর মেয়ে। এত রাতে মেয়েলোক কমনে যাচ্ছে?"

কথাটা শুনিয়াই নীরদবরণ চমকিত হইল। সে আর অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে বাজারখোলার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে তখন কত কি আশঙ্কার কথার উদয় হইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে। যখন সে বাজারখোলার কালীবাড়ীর নিকটে পৌছিল, তখন দূর হইতে দেখিল, তেমাথার উপরে দুইটি নারী শ্বেতবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরও দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নীরদবরণ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই নারীমূর্ত্তি দুইটি অন্য দিকে ছুটিয়া পলাইতেছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিল, "লক্ষ্মি, ঘরে চল, অনেক ঢলিয়েছ, আর না।"

রাখালী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু লক্ষ্মী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে এক ফোঁটাও জল নাই।

বেতের লাঠিটা ঘুরাইয়া নীরদবরণ পূর্ব্ববৎ কঠিনস্বরে বলিল, "চল, ঘরে ফিরে চল।"

যন্ত্রচালিতবৎ লক্ষ্মী ও রাখালী বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল, নীরদবরণ তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। পথে তখন জন-প্রাণী নাই, গ্রাম সুষুপ্ত নিস্তব্ধ। পথের গম্ভীরতা ভঙ্গ করিয়া নীরদবরণ রাখালীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছিলে তোমরা, কার সঙ্গে যাচ্ছিলে?"

রাখালী কান্না-জড়িত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিল। লক্ষ্মী একটি কথাও কহিল না।

নীরদবরণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "হুঁ। সে ছোঁড়াটা কোথায়? থাকলে তাকে আজ বিস্তিয়ে লাল ক'রে দিতুম। তোমাদেরও বেতের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। যার ভরসায় বাড়ীর বার হয়েছ এই আঁধার রাতে, সে ত খুব এল। খুব মুরুব্বী ধরেছ বটে!"

লক্ষ্মীর অন্তরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। ধীরেনটা কি পাজী! এত অপমান কেবল তাহার জন্যই ত? সে সময়ে আসিলে এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। স্বামীর প্রতি ক্রোধে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, নিজ-কৃত গর্হিত কার্য্যের জন্য তাহার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হয় নাই।

পথে যাইতে যাইতে এ সম্বন্ধে আর বড় একটা কথা হইল না। নীরদবরণ একবার বলিল, "জঙ্গলে আমার একটা তেজী কুকুর আছে। কুকুরটা খুব শিকারী; কিন্তু বড় জিদী। সে যখন জেদ ধরে, তখন তাকে সায়েস্তা

করতে কেউ পারে না, পারি কেবল আমি। কিসে সায়েস্তা করি জান? এই বেতের ছড়ি দিয়ে!"

লক্ষ্মী মুহূর্ত্তকাল অপাঙ্গে তাহার দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল। সে স্বামীর মুখে এক বিন্দু দয়া-মমতার চিহ্ন দেখিতে পাইল না। রাখালী কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

বাতাসে বেতের ছড়িটা সজোরে দুই চারিবার আঘাত করিয়া, একটা বিকট বোঁ বোঁ আওয়াজ করিয়া নীরদবরণ বলিল, "এই ছড়িটা আমায় বড় কায দেয়। যখন এতেও শানায় না, তখন অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করি।"

হঠাৎ লক্ষ্মীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কি ব্যবস্থা কর?"

নীরদবরণ গম্ভীরভাবে বলিল,"খাওয়া বন্ধ ক'রে দিই। দুদিন না খেলেই বদমাস কুকুর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাছাধনের জেদ তখন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।"

কথাটা বলিবার সময়ে নীরদবরণের মুখমণ্ডলের একটি শিরা বা পেশী কুঞ্চিত হইল না, তাহার চোখ দিয়া কঠোরতা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল।

লক্ষ্মী আর কোনও কথা কহিল না, সে অসম্ভব গম্ভীর হইয়া রহিল। গ্রামে পৌঁছিয়া নীরদবরণ রাখালীকে তাহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সস্ত্রীক বাসায় ফিরিল। পিসীমা তখনও আলো জ্বালিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নীরদবরণ ব্যস্তভাবে বলিল, "এই যে, তুমি এখনও জেগে আছ? ওরা রাখালীর ঘরে খিল দিয়ে লুকিয়ে ছিল, বেরুতে চায় না, কত ক'রে দোর খুললে। যাও, যাও, শোও গিয়ে।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নীরদবরণ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, লক্ষ্মী এক কোণে গিয়া তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন কি একটা ব্যাপারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নীরদবরণ স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "লক্ষ্মি!"

লক্ষ্মী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,- এমন কোমল করুণকণ্ঠে সে ত আজ স্বামীকে একবারও সম্বোধন করিতে শুনে নাই, তাহার স্বামীর চোখেমুখে বিরক্তি, ক্রোধ বা ঘৃণার ত একটি রেখাও নাই। সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে ক্ষণমাত্র তাকাইয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

নীরদবরণ বলিতে লাগিল, "আমি আজ তোমার সঙ্গে সত্যিই পশুর মত ব্যবহার করেছি, আমায় ক্ষমা করতে পার কি?"

লক্ষ্মী নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। নীরদবরণ আবার বলিল, "ক্ষমা করবে না? করা আশ্চর্য্য বটে। যাক্, কালই আমি জঙ্গলে চ'লে যাচ্ছি, আমার জঙ্গলই ভাল। তোমায় আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে নিয়ে যেতে চাই নি। গোঁয়ারের মত জোর ক'রে তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, তার ঠিকই শিক্ষা পেয়েছি। তুমি যেখানে থাকতে ভালবাস, সেইখানেই থেকো, তোমার সুখে আমি বাধা দেবো না। তোমার বাবা তোমায় ভালবাসেন, তাঁর কাছেই থেকো। এই বাড়ী-ঘর জিনিষপত্র সব তোমারই রইল। এই নাও চাবীর থোলো। ঐ আলমারির মাঝের ড্রয়ারে গয়নার বাক্স আছে, তার চাবী হাত-বাক্সের মধ্যে আছে। মাসে মাসে ৫০৲ টাকা ক'রে পাঠাব, তাতে তোমার যা দরকার হবে কিনে নিও, কারুর কাছে হাত পেতো না। আমায় ঘৃণা কর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু এইটে সকল সময়ে মনে রেখো, তুমি যার ঘরের লক্ষ্মী, তার টাকার অভাব নেই।"

কথাটা শেষ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় নীরদবরণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের সকরুণ দৃষ্টি অবনতমুখী লক্ষ্মী দেখিতে পাইল না, সে পূর্ব্ববৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নীরদবরণ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চাবীর তাড়াটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। কক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া সে বাহিরে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সে চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে চাহিতেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, লক্ষ্মী ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

একলম্ফে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নীরদবরণ সেই সুবর্ণ-প্রতিমাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। প্রেম-পূরিত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! কাঁদছ? কেন, কেন, আমি ত এবার তোমায় কঠিন কথা বলিনি।"

লক্ষ্মী হাসি-কান্নাজড়িত ভাব-গদগদস্বরে বলিল, "ওগো! তুমি তাই বল, তাই বল। যেমন ক'রে বেতের ছড়ি দিয়ে তোমার কুকুরকে সায়েস্তা করেছিলে, তেমনই

ক'রে আমায় সায়েস্তা কর; আমি যে পাপ করেছি, তার শাস্তি দাও; না হ'লে ত আমি মনে সুখ পাব না।"

দৃঢ় আলিঙ্গনে লক্ষ্মীকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া নীরদবরণ হাসিয়া বলিল, "ছি, লক্ষ্মি! আর সে কথা কেন?—আমি বুনো জঙ্গলী। এ গোঁয়ার চাষার কাছে তুমি কি প্রত্যাশা কর? কিন্তু আমি যাই হই লক্ষ্মি, আমি তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। বল, আমার অন্তরের দান পায়ে ঠেলবে না?"

নীরদবরণের চক্ষুও তখন অনার্দ্র ছিল না। তাহার কণ্ঠলগ্না লক্ষ্মী হাসি-কান্নার মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "আমরা দুজনেই বুনো, না হ'লে তোমায় আমায় মিলন হবে কেন? কিন্তু—কিন্তু তুমি ত আমায় বকলে না, শাস্তি দিলে না? আমি ঘরের বার হয়েছিলুম জেনেও ত তুমি বেত মারলে না?"

নীরদবরণ লক্ষ্মীর কপোলের চূর্ণকুন্তলগুলি সরাইতে সরাইতে হাসিয়া বলিল, "বেত ত কাছেই রয়েছে, দরকার হ'লে আন্‌তে কতক্ষণ?"

লক্ষ্মী বলিল, "তামাসা না, সত্যি বলছি। তোমার ঐ বেতই আমার ভাল লাগে। তুমি যখন গম্ভীর হয়ে বকো, তখন মনে হয়, তোমার বিশাল বুকের উপরেই আমার সব চেয়ে বড় আশ্রয় রয়েছে। পুরুষমানুষ যদি পুরুষের মত না হয়, তা হ'লে তাকে কি ভাল দেখায়?"

নীরদবরণ ভীত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "বাপ রে! তাও কি হয়? তোমরা যে শক্তি—আমাদের বুকের হার।"

লক্ষ্মী স্বামীর দিকে প্রেম-পূরিত নয়নে তাকাইয়া ভাব-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার চরণসেবার দাসী!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পতিভক্তি

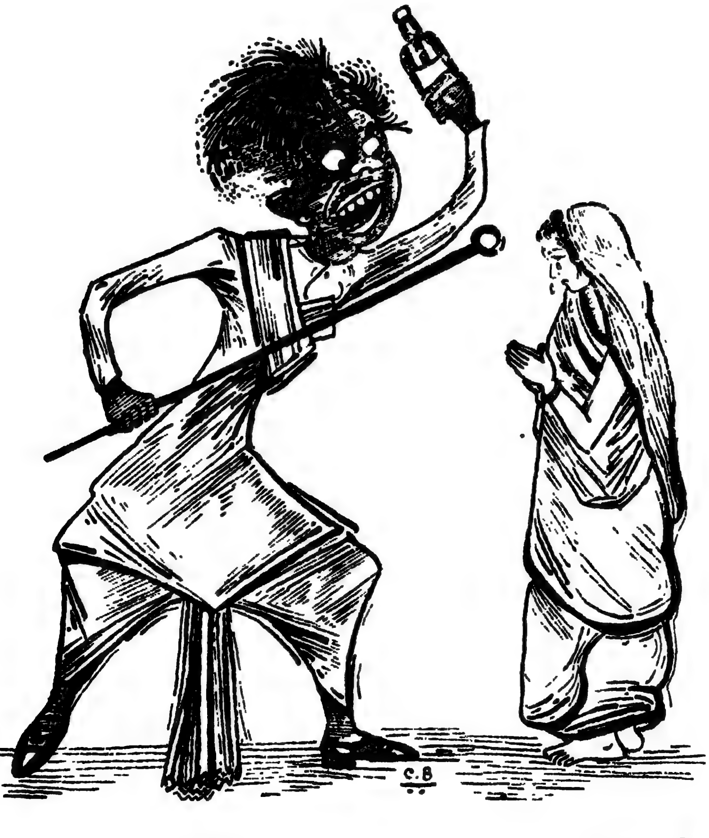

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

অতি প্রাচীনকাল হইতে উলায় বহু পণ্ডিত ও অনেকগুলি টোল ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এই টোলগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সে কালের হিন্দুসমাজের ক্রিয়া-কর্ম্ম ও বার-ব্রত সম্বন্ধে উলার একটি পৃথক্ মত ছিল। উলার টোলগুলিতে ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। গ্রামে নামজাদা বৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বর মুস্তৌফীর ঠাকুরবাটীতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটি অন্যতম টোল ছিল। উলার কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি সুস্থ ব্যক্তির বদনমণ্ডল ও কণ্ঠের শিরা দেখিয়া, তাঁহার কবে মৃত্যু হইবে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন।

উলার পণ্ডিতদিগের মধ্যে গোবিন্দরাম চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সদাশিব তর্কালঙ্কার, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সারণ সিদ্ধান্ত, শিবশিব তর্কবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন। সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি বিদুষী কন্যা ছিলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহাদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত প্রণীত "বিজন গ্রামে" উলার ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"নস্তের শামুখ করে চলিতেন সবে
পথিমধ্যে কত শত তর্ক-কলরবে।
ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত লইয়া,
ঘোরতর দ্বন্দ্বানল উঠিত জ্বলিয়া।
তব বিপ্রকুল বঙ্গে অসীম সম্মানে
মাতঃ! ধনে মানে কুলে কেবা নাহি জানে।
অন্য গ্রামী দ্বিজ আসি তব বিপ্রগণে
সভয়ে বন্দিত সদা মান্য ত্রিভুবনে।
কত শত অধ্যাপক চতুষ্পাঠী করি
বিস্তারিত জ্ঞান-রত্ন গৌড় বঙ্গ ভরি!
সে সব ব্রাহ্মণ কভু না দেখিব আর
বেদময় ব্রহ্মমূর্ত্তি পূর্ণ সদাচার।"

মহামারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে উলায় ১৪ শত ঘর ব্রাহ্মণের বাস এবং প্রায় ২০টি টোল ছিল। মহামারীর পরে উলায় ১০।১২টি টোল ছিল। প্রত্যেক টোলে গ্রামের ও বাহিরের ৮।১০ জন হইতে ১৭।১৮ জন পর্য্যন্ত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। মহামারীর পরে নন্দ চূড়ামণি, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কালী বিদ্যারত্ন, রবিলোচন ভট্টাচার্য্য, যাদু বিদ্যালঙ্কার, অপর এক জন নন্দকুমার চূড়ামণি এবং গদাধর শিরোমণি প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিতের টোল ছিল। এখন আর উলায় টোল নাই। উলার শেষ টোল গদাধর শিরোমণির ছিল, তাহাও আজ কয় বৎসর উঠিয়া গিয়াছে। অন্ধ গদাধর এক্ষণে কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন।

কলুপাড়ার মসজিদে মুসলমান ছাত্রদিগের আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে তাহারা শিক্ষার দায় হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদের শিক্ষার কেন্দ্র প্রাচীন মসজিদটি নিবিড় অরণ্যের মধ্যে শ্বাপদগণের আবাসস্থল হইয়াছে।

মহামারীর পূর্ব্বে গ্রামের প্রত্যেক পাড়ায় কয়েকটি করিয়া পাঠশালা ছিল। উহাতে বর্দ্ধমান জিলার কায়স্থজাতীয় গুরুমহাশয়গণ বালকদিগকে বঙ্গভাষায় শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী, শ্যামলপ্রাণ মুস্তৌফী, বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও গ্রামের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের বাটীতে পাঠশালা ছিল। ১২৬১ সালে শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও গ্রামের ভদ্রলোকদিগের চেষ্টায় কয়েকটি পাঠশালার ছাত্র লইয়া গ্রামের তিন পাড়ায় তিনটি ইংরাজী আমলের বাঙ্গালা স্কুল গঠিত হইয়াছিল।

মহামারীর পূর্ব্বে ১২৩৯ সালের নিকটবর্ত্তী সময়ে ঈশ্বর মুস্তৌফীর বহির্ব্বাটীতে উলার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাতে চন্দননগরের ডিজার বারেট নামক জনৈক ফরাসী অধ্যাপনা করিতেন। তিনি এক জন অসাধারণ জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি-চাদর পরিধান করিতেন ও খিচুড়ী-পরমান্ন খাইতে

ভালবাসিতেন। তিনি এক জন ভাল জ্যোতিষী ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় উলার জ্যোতিষিগণ বিখ্যাত অন্ধ পণ্ডিত সদাশিব তর্কালঙ্কারের নেতৃত্বাধীনে প্রচার করিলেন যে, গ্রহণ উলা হইতে দেখা যাইবে। ডিজার বারেট গণনা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, গ্রহণ উলা হইতে দেখা যাইবে না। গ্রহণের সময় দেখা গেল যে, ফরাসী শিক্ষকের গণনাই সত্য হইয়াছে। সেই হইতে গ্রহণাদি উপলক্ষে স্ত্রীলোকগণ যেরূপ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সিধা পাঠাইতেন, সেইরূপ মোসিঁয়ে বারেটকেও সিধা পাঠাইতেন।

দক্ষিণপাড়ায় মুস্তৌফীবাটীর চণ্ডীমণ্ডপের অর্দ্ধাংশ
প্রতিষ্ঠাতা—রামেশ্বর মুস্তৌফী (প্রতিষ্ঠা অনুমান শকাব্দা ১৬০০)

এই স্কুলের পরে সন ১২৫৪।৫৫ সালে দক্ষিণপাড়ার জনসাধারণের চেষ্টায় মঠবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী তুতবাটীতে একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার তৎকালে উলার মুন্সেফ ছিলেন, তিনি এই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করেন। ইহার পরে ১২৬১ সালে মুন্সেফ গঙ্গাচরণ সরকার ও শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় শম্ভুনাথের পূজার দালানে একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল ১২৬৩ সালে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রলোকদিগের চেষ্টায় শম্ভুনাথের পূজার দালানে পুনরায় একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। পরে ইহা কালীকুমার মিত্রের বাটীতে ও মতি ঝিলের পশ্চিমদিকে নিজস্ব বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। তখন ইহা এনট্রান্স স্কুল। ক্রমে স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে একটি শ্রেষ্ঠ মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে বারাণসী বসুর চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে উহা এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হয় এবং সাধারণের চাঁদায় স্কুলের বর্ত্তমান নিজস্ব কোঠা-বাড়ীটি নির্ম্মিত হয়। বারাণসী বসুর মৃত্যুর পরে নানা দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া উহা পুনরায় মাইনর স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রাভাবে ও অর্থাভাবে স্কুলের অবস্থা ভাল নহে। স্কুলের অর্থের অনাটন কয়েক বৎসর হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করিয়া আসিতেছেন। গ্রামে ইতঃপূর্ব্বে ২।৩ বার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় ৬।৭ মাস পূর্ব্বে একটি নূতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে প্রায় ৩০ জন ছাত্রী আছে।

উলার অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দিগের বৈঠকখানাবাটী

সন ১৩০২।৩ সালে উলার "রিডিং এণ্ড স্পোর্টিং" ক্লাবের উদ্যোগে "পল্লী সুহৃদ্" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত, উহা ১৩০৪ সালে বন্ধ হইয়া যায়।

উলায় অনেকগুলি গ্রন্থকার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থরাজি বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক একটি রত্ন। সুললিত পদ্যগ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "তিথিদানাদি-ব্যবস্থা"-প্রণেতা ভূতনাথ সার্ব্বভৌম, "প্রকৃতিতত্ত্ব বা নাস্তিকবাদ"-প্রণেতা পরশুরাম মুস্তৌফী, "গোভিলোক্ত সামবেদীয় সন্ধ্যা"-প্রণেতা বামনদাস মুখোপাধ্যায়, "পরলোকতত্ত্ব, প্রণয়তত্ত্ব, সৃষ্টি ও বেদান্ত দর্শন" প্রভৃতি প্রণেতা চন্দ্রশেখর বসু, "হরিকথা, পোঁরিয়েড (ইংরাজী), বিজন গ্রাম, উড়িষ্যার মঠ, (ইংরাজী), শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জীবধর্ম্ম, প্রেমপ্রদীপ, বালিদে রেজেষ্ট্রী (উর্দ্দু), শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" (সংস্কৃত) প্রভৃতি বাঙ্গালা, ইংরাজী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত, "বীরাঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য, নরসিংহ, কালিনা" প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থ এবং Indian limitation Act, Select English cases প্রভৃতি আইনগ্রন্থ-প্রণেতা হেমচন্দ্র মিত্র, Rhetoric & Prosody, Pearlessays, The speaker, Unseen passages, প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য-প্রণেতা ও জ্যোতিষগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুস্তৌফী, সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র-দর্পণ ও রঘুবংশের টীকা প্রভৃতি প্রণেতা কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, "সাধারণের জ্ঞাতব্য আইন Guardians and Wards Act, Transfer of Property Act," প্রভৃতি আইনগ্রন্থ-প্রণেতা ও উলার বর্ত্তমান দাতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র এবং Measurement and Freight Calculation Tables নামক ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র উলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত (বহু গ্রন্থপ্রণেতা)

৭

উলাতে পাগলের অখ্যাতি বা সুখ্যাতি বহুকাল হইতে আছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ছড়া আছে :—

> "পোল পাগল পুলো।
> তিন নিয়ে উলো॥"

আবার—

> "উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর
> ও হালিসহরের তেঁদড়।"

কথিত আছে যে, পূর্ব্বে প্রতিবৎসর উলাইচণ্ডী পূজার দিন অন্ততঃ এক জন করিয়া উলাবাসী পাগল হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত উলায় প্রকৃত পাগল অনেকগুলি ছিল, তন্মধ্যে হরা ও বিশে পাগলা বিশেষ খ্যাত। লোকের ধারণা ছিল যে, বিশে বা বিশ্বনাথ এক জন সিদ্ধ-পুরুষ। একবার শান্তিপুরের বিখ্যাত ভূস্বামী মতি রায়ের ইচ্ছাক্রমে বহু পাগল একত্র হইয়াছিল। তিনি উক্ত পাগলদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেককে এক একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিলেন। সকল পাগল রজতখণ্ড লইয়া চলিয়া গেল, একমাত্র বিশ্বনাথ তাহার রৌপ্যমুদ্রাটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিল, "থু-থু, এ কাগের গু, এ আবার মানুষে লয়!" তখন সকলেই বুঝিল যে, বিশ্বনাথই প্রকৃত পাগল। বিশ্বনাথ উলার লোক হইলেও সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। উক্ত ঘটনার পরে এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল যে, বিশ্বনাথ কোন দোকান হইতে কিছু লইলে দোকানদার তাহাকে বিনা বাধায় উহা দিবে এবং মূল্য লইবে না।

অন্য স্থানের লোক সহজ অবস্থায় যাহা না করিতে পারিত, উলার লোক,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে তাহা করিয়া বসিতেন, কোনরূপ লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করিতেন না। সে কালে ঐগুলি অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইত না; পরন্তু অতিশয় রসিকতা বলিয়া উপভোগ্য হইত। গ্রামের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক পাগল আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, যথা—প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে পেশা পাগলা, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় হইতে শম্ভা পাগলা ইত্যাদি। ঐ

মুস্তৌফী-বাটীর সদরদরজার ভগ্নাবশেষ

সকল ব্যক্তি এইরূপ অপূর্ব্ব উপাধি লাভ করিয়া কিছুমাত্র রুষ্ট হইতেন না, পরন্তু আমোদ অনুভব করিতেন। গ্রামের পাগলের অপবাদ গ্রামের লোক স্বীকার করিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একবার উলার ঈশ্বর কবিরাজ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের নাড়ী টিপিয়া কহিলেন যে, "রোগ এমন কিছু নহে, কিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ আছে মাত্র।" ইহা শুনিয়া বামনদাস কহিলেন, "ওটা ত গ্রামের, এখন আমার কি বলুন।"

উলার লোক প্রাণখোলা, সর্ব্বদা আমোদ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ লইয়া থাকিত এবং স্পষ্ট বক্তা ছিল—ছিল কেন, আজিও আছে। একবার কোন বিশিষ্ট রসজ্ঞ লোক বলিয়াছিলেন যে, উলার চতুর্দ্দিকে একটি উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া দিলে উহা একটি বড় রকমের পাগলা-গারোদ হইতে পারিত।

উলার বারইয়ারীগুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। উলায় কোন গঞ্জ ও তাহার আনুষঙ্গিক ঈশ্বরবৃত্তি আদায়ের উপায় না থাকিলেও কেবলমাত্র গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে ও বঙ্গদেশের নানা স্থানের অবস্থাপন্ন লোকদিগের নিকট হইতে নানা প্রকারে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উলার ছয়টি বারইয়ারীর মধ্যে বিশেষতঃ বড় বারইয়ারী দুইটিতে বিবিধ প্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও সমারোহ করা হইত। বারইয়ারীর ঠাকুরের ভোগ হইতে বারইয়ারীর তিন দিবস অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে খাওয়ান হইত। গ্রামবাসী কেহই অতিথি বিমুখ করিত না। আজিও উলার লোক অতিথিকে বিমুখ করিতে শিখে নাই। বিদেশী কোন লোক গাছতলায় বা পথিপার্শ্বে রাঁধিয়া খাইতে পাইত না। এরূপ করিতে দেখিলে গ্রামবাসিগণ তাহাকে সাদরে আপন গৃহে লইয়া গিয়া খাওয়াইত। সে কালে উলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যদি কোন উলাবাসী বারইয়ারীর তিন দিনের মধ্যে অতিথি বিমুখ করেন, তবে তিনি সমাজে হেয় বিবেচিত হইবেন। অতিথিসৎকারের জন্য উলা চিরদিন বিখ্যাত।

বারইয়ারীর অর্থ সংগ্রহের জন্য উলার লোক, বিশেষতঃ বারইয়ারীর পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ দূরদেশে গমন করিয়া ভিক্ষা চাহিয়া ও উপস্থিতবুদ্ধির দ্বারা ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তাঁহারা সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও পাথেয়াদির জন্য রাখিয়া বক্রী টাকা বারইয়ারীর জন্য দিতেন। অনেক স্থানে বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। আজিও কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি আপনাদিগকে উলার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া উলার চণ্ডীপূজা ও বারইয়ারী পূজার নাম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিতেছে; ইহারা উলার লোক নহে। ইহারা ভদ্রলোকদিগকে ঠকাইয়া এইরূপে আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করে।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন উলাইচণ্ডীতলায় দৃশ্য

উলার লোক দেশ-বিদেশে যাইয়া যেরূপে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি,—

একবার উলার কয়েক জন ব্রাহ্মণ কলিকাতায় কোন ধনী কৃপণের বাটীতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে যাইতে উদ্যত হইলেন। সে কৃপণ কিছুই দিবে না ভাবিয়া লোক

বারইয়ারীর পাণ্ডাদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করিল। পাণ্ডাগণ নিষেধ না শুনিয়া সেই কৃপণের সুসজ্জিত বৈঠকখানার দ্বিতলগৃহে উপস্থিত হইলেন। কৃপণ বাবুটির একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি কিছু ক্ষীণ ও অপর চক্ষু কাণা হওয়ায় তিনি চোখে চশমা দিতেন। ব্রাহ্মণগণ উক্ত ধনীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রমাগত ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। উক্ত ধনী কোন কথা কহেন না দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার আর এক পার্শ্বে আসিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। ধনী তখন ব্রাহ্মণদিগকে এরূপ স্থানপরিবর্ত্তন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "আগে মহাশয়ের যে দিকে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছিলাম, সে দিকের চক্ষুটি কাণা। কাণা চক্ষু অশুভ, সেই জন্য ও দিকে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মিলিল না। এক্ষণে মহাশয়ের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেছি।" অপরিচিত ব্রাহ্মণদিগের মুখে এই অপ্রিয় সত্য শুনিয়া উক্ত ধনী কহিলেন, "আপনারা যান। আমি বাজে খরচ করি না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "মহাশয় না দিতে ইচ্ছা করেন, না দিবেন; কিন্তু আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মিছা কথা কহা শোভা পায় না। আপনার যদি বাজে খরচ নাই, তবে আপনার যে চক্ষুটির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কেবল সেই চক্ষুতে চশমা না দিয়া দুই চক্ষুতে চশমা দিয়াছেন কেন?" ইহা শুনিয়া উক্ত ধনী কহিলেন, "আপনারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন বটে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদিগকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতেছি।" ব্রাহ্মণগণ তখন অর্থ লইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

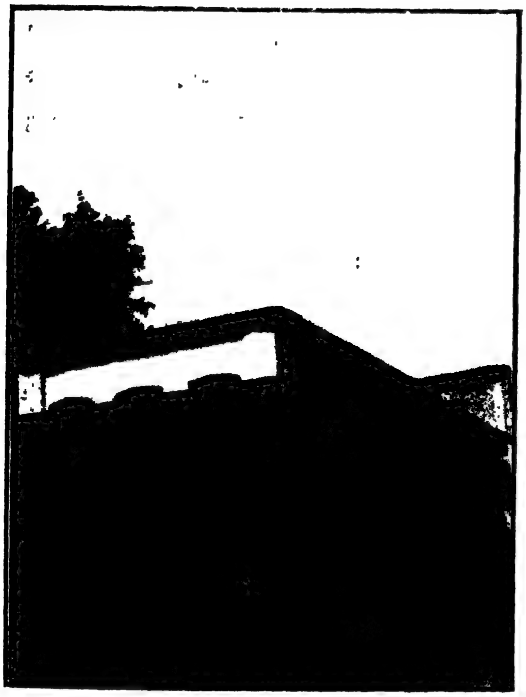
উলা বাজারের পাড়ার বারইয়ারী চাঁদনী

আর একবার উলার ব্রাহ্মণগণ কোন এক বিখ্যাত গ্রামের জনৈক ধনীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই সময় উক্ত ধনীর গুরুদেবও তথায় আসিয়াছেন। ধনীর ঠাকুরবাটীর এক স্থানে গুরু ঠাকুরের জন্য এবং অন্য এক স্থানে উলার ব্রাহ্মণদিগের জন্য মধ্যাহ্ন-পাকের আয়োজন হইয়াছে। গুরুর জন্য ভাল আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের জন্য তাহা হয় নাই। উলার ব্রাহ্মণগণ ভিজা কাঠের জন্য রন্ধন করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু ও দিকে গুরু ঠাকুর রন্ধন সমাপ্ত করিয়া আহারের আয়োজন করিলেন। উলার ব্রাহ্মণগণ তখন গোপনে পরামর্শ করিলেন যে, গুরুঠাকুরের অন্ন দ্বারা তাঁহারা জঠরজ্বালা নিবারণ করিবেন। ইতোমধ্যে গুরুঠাকুর কোন দ্রব্য আনিবার জন্য যেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন দৌড়াইয়া গিয়া গুরুঠাকুরের অন্নব্যঞ্জনের অতি নিকটে বসিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ক্ষিপ্ত শৃগাল-দষ্ট রোগীর ন্যায় "খ্যাক্ খ্যাক্" করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সোরগোল পড়িয়া গেল। উলার ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "কি করিব মহাশয়, ঐ লোকটিকে শৃগালে কামড়াইয়াছিল,

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী চাঁদনী

এক্ষণে দেখিতেছি যে, ক্ষেপিয়া গিয়াছে।" ইহা দেখিয়া শুনিয়া গুরুঠাকুর ক্রোধান্ধ হইলেন ও সেই প্রস্তুত অন্নের মায়া ত্যাগ করিলেন। অবসরক্রমে উলার ব্রাহ্মণগণ সেই অন্ন ভোজন করিলেন।

পরদিন উলার ব্রাহ্মণগণ যখন গৃহস্বামীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি রুষ্ট গুরুর পরামর্শানুযায়ী অতি সামান্য অর্থ তাঁহাদিগকে দান করিলেন। ইহাতে উলার ব্রাহ্মণগণ উক্ত গুরুকে শিক্ষা দিয়া আশানুরূপ অর্থ আদায় করিবার জন্য পরামর্শ করিয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিলেন। গুরুঠাকুরটির একটি পদ কিঞ্চিৎ খঞ্জ ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত ধনীর নিকটে এবং সেই গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী ও পণ্ডিতদিগের নিকটে গমন করিয়া কোন জটিল প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসার জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। উক্ত ধনীর বাটীতে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাসময়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও পূর্ব্বোক্ত খঞ্জ গুরুঠাকুর সভাস্থ হইলে উলার ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করিলেন যে, 'ঠাকুরের যদি অঙ্গহানি হয়, তবে শাস্ত্রমতে কি করা কর্ত্তব্য?' সকলে একবাক্যে কহিলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দেওয়াই বিধি। তখন উলার ব্রাহ্মণগণ হরিধ্বনি করিয়া লম্ফ দিয়া গুরুঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা নিমেষমধ্যে গুরুকে বাঁধিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "মহাশয়, এই ঠাকুরটি খোঁড়া ও অঙ্গহীন। আমরা এই সভার নির্দ্দেশমত ইঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে লইয়া যাইতেছি।" তৎপরে পথে গুরুঠাকুর উলার ব্রাহ্মণদিগকে বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া ও অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অর্থ পাইয়া ব্রাহ্মণগণ হাসিতে হাসিতে সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

শুনা যায় যে, আর একবার উলার ব্রাহ্মণগণ নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্রের নিকটে অর্থের জন্য উপস্থিত হয়েন। তখন পৌষমাস, অত্যন্ত শীত। শ্রীশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা কহিলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই শীতে সমস্ত রাত আমার দীঘির জলে গলা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অর্থ-সাহায্য করিব।" ব্রাহ্মণগণ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে ঐ কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি রাজার দীঘির জলে গলদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া কাটাইলেন। পরদিবস ব্রাহ্মণগণ রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, "ও ঠিক হয় নাই। আমার প্রাসাদের আলোকরশ্মির দ্বারা আমার দীঘির জল গরম হইয়াছিল বলিয়া আপনাদিগের নিযুক্ত লোক ঐরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব আপনারা আমার নিকট কিছুই পাইবেন না।" রাজার এই অপূর্ব্ব যুক্তি শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ চলিয়া আসিলেন। পরে কোন গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষে রাজা যে পথে গঙ্গাস্নানে যাইবেন, সেই পথের পার্শ্বে এক স্থানে ব্রাহ্মণগণ একটি অত্যুচ্চ বংশদণ্ড পুতিয়া তাহার অগ্রভাগে সজল তণ্ডুল এক হাঁড়ী বাঁধিয়া দিয়া বংশদণ্ডের পাদমূলের সন্নিকটে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। যথাসময়ে রাজা ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় কয়েক ব্যক্তিকে এই অদ্ভুত কার্য্যে নিবিষ্ট দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন উক্ত ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "মহারাজ! এই উচ্চ বংশদণ্ডের অগ্রভাগে যে হাঁড়ী বাঁধা আছে, উহাতে চাউল ও জল আছে। আমরা এই বংশদণ্ডের পাদমূলে অগ্নি জ্বালিয়া রাঁধিতেছি।" ইহা শুনিয়া রাজা তাহাদিগকে বাতুল মনে করিয়া উপহাস করিলেন। তখন উলার ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "মহারাজ! যদি আপনার প্রাসাদের আলোকরশ্মির দ্বারা শীতকালের রাত্রিতে আপনার দীঘির জল গরম হইতে পারে, তাহা হইলে এই বংশদণ্ডের পাদদেশে প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা ১৫।১৬ হাত উর্দ্ধে স্থাপিত হাঁড়ীর চাউল সুসিদ্ধ না হইবে কেন?" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে আশাতীত অর্থ দান করিয়াছিলেন।

আর একবার বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নৌকা করিয়া যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া উলার পাণ্ডাগণ নদীতীরে যেখানে গঙ্গাগোবিন্দের বজরা বাঁধা ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মালকোচা মারিয়া রজ্জু হস্তে লইয়া আস্ফালন সহকারে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সিংহ! তুমি বড়ই ধূর্ত্ত হইয়াছ। মা মহামায়া তোমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া উলায় আসিবেন, আর তুমি কি না এখানে পলাইয়া আসিয়াছ। আমরা তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" কোলাহল শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বজরার

বাহিরে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেবার বারইয়ারীর সকল ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়াছিলেন।

বারইয়ারীর সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সকল সময়েই উলার লোক উপস্থিতবুদ্ধির ও দুষ্টামির পরিচয় দিয়া বিখ্যাত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উলা যে পাগলের দেশ, ইহা দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছে। উলা, শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়া এই তিন স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে সকল বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বেষাদ্বেষি চলিত। একবার উলার কোন লোক এক চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পূর্ব্ব হইতে শান্তিপুরনিবাসী এক ব্যক্তি তামাকু সেবন করিতেছিল। শান্তিপুরের লোকটি এমন ভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিল, যেন তাহার তামাকু-সেবন শেষ হইয়াছে এবং তৎপরে সে হস্ত দ্বারা হুঁকার মুখ মুছিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শান্তিপুরের লোকটির ধুমপান শেষ হইয়াছে মনে করিয়া উলার লোকটি হুঁকা লইবার জন্য যেই হস্ত প্রসারণ করিল, শান্তিপুরের লোকটি অমনই পুনরায় নূতন করিয়া হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ ২।৩ বার হইবার পরে শান্তিপুরের লোকটি রাগিয়া উলার লোককে কহিল, "তুমি ওরূপ ভাবে মুলো বাড়াইতেছিলে কেন?" তখন উলার লোক উত্তর করিল, "ভাবিয়াছিলাম নেংটি ইঁদুর, তাই মুলো বাড়াইয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, সে ইন্দুর নহে, ছুঁচো।"

গুপ্তিপাড়া এককালে বানরের জন্য বিখ্যাত ছিল। উলা বলিলে যেমন পাগল বুঝাইত, গুপ্তিপাড়া বলিলে তেমনই বানর বুঝাইত। একবার উলার এক ব্যক্তি গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া পূজা করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ গড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু উহার গঠন ঠিক হইতেছিল না। তাহাকে কয়েক বার ঐরূপ করিতে দেখিয়া তথায় সমাগত গুপ্তিপাড়ার এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "লোকটা শিব গড়িতে বানর গড়িতেছে।" ইহা শুনিয়া উলার লোকটি উত্তর করিল, "গুপ্তিপাড়ার মাটীর এমন গুণ যে, এখানে শিব গড়িতে গেলে বাঁদর হয়।"

উলার স্ত্রীলোকগণ কম বুদ্ধিমতী ছিলেন না। ইঁহারা কুলের গরব করিতে ভালবাসিতেন। কথায় বলে—

"উলোর মেয়ের কুলকুলুটি, নদের মেয়ের খোঁপা।
শান্তিপুরে হাত নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥"

উলার নারীদিগের উপস্থিতবুদ্ধি ও রসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একবার উলার কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা নূতন শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে গিয়াছে। উলার মেয়ের কত বুদ্ধি, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন নব বধূকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া কি রান্না হইবে, তাহা বলিয়া কহিয়া তাহাকে রান্নার আয়োজন করিয়া রাখিতে বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া বধূকে ইচ্ছাপূর্ব্বক রান্নাঘরের মধ্যে রাখিয়া শিকল টানিয়া দিয়া ঘাটে চলিয়া গেলেন। উলার মেয়ে দেখিল যে, তাহাকে রান্নার আয়োজন করিতে বলা হইল, কিন্তু আয়োজন করিবার মত কিছুই নাই। সে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে রান্নাঘরের কোণে একটি কলার থোড় আছে ও আস্ত মসলা আছে, কিন্তু জল বা অগ্নি কিছুই নাই। সে তখন থোড় কুটিয়া, হস্ত দ্বারা টিপিয়া উহার জল বাহির করিল এবং তদ্দ্বারা বাটনা বাটিতে লাগিল। ইতোমধ্যে তাহার শাশুড়ী প্রভৃতি ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ঐরূপ ভাবে থোড়ের জল দিয়া বাটনা বাটিতে দেখিয়া তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া আদর করিতে লাগিলেন। এইরূপ গল্প অনেক আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

রূপের মোহ

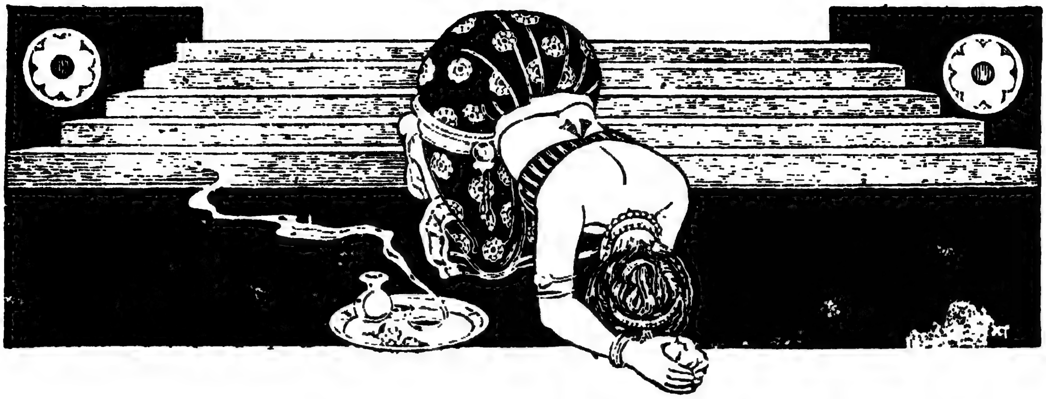

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কিছুতেই কি মনের উচ্ছৃঙ্খলতা কমিবে না? এ তাহার কি শাস্তি? একটু কর্ম্মহীন হইলেই, মুহূর্ত্ত নিরালা থাকিলেই নাগিনীর শত পাকে পিষ্ট জীবের মত তাহার প্রাণটা যেন পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকে। কোনও মতেই কি এই যন্ত্রণাভরা স্মৃতি হইতে আত্মরক্ষা করা যায় না—মুক্তি পাওয়া যায় না? সে ত মনকে আঁখিঠার দিয়া, জুয়াচুরী করিয়া জীবনের পথে চলিতে রাজি নহে। কিন্তু মন তাহাকে শুভ, সুন্দর, সরল পথে চালাইতে পারিতেছে না কেন?

সে ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তথাপি রমেন্দ্রের স্মৃতি—তাহার কলুষিত স্পর্শের জ্বালাময়ী স্মৃতির যন্ত্রণা ভোলা যাইতেছে না ত! অসতর্ক হইলেই অবাঞ্ছিত স্মৃতির চিত্র আপনা হইতে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে! না—এমন অবস্থায় থাকা অসহ্য সে বিস্মৃতির অন্ধকারে এ দৃশ্যকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে চাহে। কিন্তু উপায় কোথায়?

এই যে চিন্তা—মনের অবস্থা, ইহা সত্য না মিথ্যা? যদি ইহাকে সত্য বলা যায়, তবে তাহাতে যন্ত্রণা কেন? সত্য বস্তুতে কি যন্ত্রণার লেশমাত্রও থাকিতে পারে?

উপাসনা-মন্দিরে গিয়া সে জোর করিয়া আচার্য্যের উপদেশাবলী গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সে সব উপদেশ যেন তাহার কাছে প্রাণহীন—শুধু কথার সমষ্টিমাত্র। নেত্র নিমীলিত করিয়া কেতাবে উক্ত অনন্ত-সুন্দরের রূপ-জ্যোতি কল্পনা করিতে গিয়া ভিতর হইতে সে কোন উৎসাহ পায় না। তেমন সাধনা সে ত কোনও দিন করে নাই। বিশ্বাস ও ভক্তির একাগ্রতা তাহার কোনও দিন কি ছিল? জীবন-পথে সে যে প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটা শব্দ এবং প্রচলিত উপাসনা-ব্যবস্থাই তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইয়া গিয়াছিল মাত্র। প্রাণের দ্বার খুলিয়া আসল স্থানে তাহাদের পৌছিবার সুযোগ ও সুবিধা ত ঘটে নাই। চক্ষু নিমীলিত করিলে মহাশূন্যই ভাসিয়া উঠে। কিন্তু শূন্যকে অবলম্বন করিয়া মন স্থির থাকিতে পারে কি? একটা কিছু নির্দ্দিষ্টকে অবলম্বন না করিয়া সে যে থাকিতেই পারে না। তাই হতাশ হইয়া অমিয়া উপাসনা-মন্দিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

জগন্নাথের মন্দিরে অথবা অন্যান্য দেবালয়ে শত শত যাত্রী ভক্তিভরে দেবতার অর্চ্চনা করিতেছে, সে দেখিয়াছে। আশাপূর্ণ হৃদয়ে দাদার সহিত সে কতবার মন্দিরে মন্দিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রার্থিত শান্তি তাহাকে এক দিনের জন্যও কৃতার্থ করিল না ত! পট্টাম্বরধারিণী মহিলারা ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে দেবতার পানে চাহিয়া সত্যই কি অভীষ্ট ফল পাইতেছে? তাহাদের উৎফুল্ল আনন, শান্ত-স্নিগ্ধ ভাব দেখিলে তাহাই ত মনে হয়; কিন্তু সে যাহা খুঁজে, তাহা সে পাইতেছে না কেন?

সে আপনার অন্তরতম প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছে —না, তাহার নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছুই নাই! জ্ঞান তাহাকে এই পথের সন্ধান এত দিনেও দিতে পারে নাই। সে বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন করিতে শিখে নাই! তবে তাহার উপায় কি? কেমন করিয়া সে অশুচি স্মৃতির জ্বালা ভুলিতে পারিবে—আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে? এ যে কি জ্বালা, তাহা ত বলিয়া বুঝাইবার নহে!

বাহিরে সে অচল, অটল, কিন্তু অন্তরে কি দীনা মূর্ত্তি? উঃ! কি জ্বালা, কি অশান্তি, কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

অমিয়া সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া উপাসনা-গৃহে যাওয়া বা দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করা সবই ছাড়িয়া দিল। আচার্য্যের বক্তৃতা, ভক্তের বন্দনাগান সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছে, আপনাকে স্থলাভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এক দিনের জন্যও সে উৎসাহকে বজায় রাখিতে পারে নাই।

এমন করিয়া আর ত চলে না। যদি স্বামী আজ কাছে থাকিতেন! - অমিয়া ভাবিতে লাগিল। তবে কি হইত? পাপস্পর্শের স্মৃতি হইতে তাঁহার সান্নিধ্য তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত কি? হয় ত বা সম্ভব হইতে পারিত; কিন্তু তিনি ত শত শত ক্রোশ দূরে রহিয়াছেন। স্থূল-দেহ কি অশরীরী যন্ত্রণার ভেষজ?—অমিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। না বুঝার যন্ত্রণা ত ইহা নহে। সে ত সবই বুঝিয়াছে, জানিয়াছে; তথাপি মনের উপর প্রভাব নাই কেন?—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিরূপ অশ্বকে সে সুসংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না ত!

অমিয়া আপনার অন্তরকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মনকে কেন সে ইচ্ছামত চালাইতে পারিতেছে না?—দুর্ব্বলতা? কিসের দুর্ব্বলতা? মনের?—মন কয়টা? আপনার অবস্থাকে যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতেছে, সেই বা কে? আর স্মৃতিকে যে সময়ে অসময়ে, অতর্কিত অবস্থাতেও ফুটাইয়া তুলে, সেই বা কে? এক না দুই?

কে ইহার মীমাংসা করিবে? অমিয়া ত পারিল না! সে কি তবে হাল ছাড়িয়া দিবে? যাহা অন্যায়, যাহা লোকাচার—সমাজবিধির বিরুদ্ধ, যাহা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ক্লেশদায়ক, শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্রের সম্বন্ধে বেদনাজনক, যাহা তাহার মানস-রাজ্যেও যন্ত্রণা, অতৃপ্তি, অশান্তি এবং মর্ম্মান্তিক ব্যথার দ্যোতক, তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিবে?

অসহ্য! অসহ্য!—কিন্তু এই যন্ত্রণার বোঝা বুকে লইয়া তাহাকে হাসিতে হইতেছে, সংসারের খুঁটিনাটি কাযে লিপ্ত হইতে হইতেছে, সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইতেছে। মনোরাজ্যে সর্ব্বদা প্রলয়-ঝটিকা বহিতেছে, বাহিরে সে স্থিরা, ধীরা!

কি কঠোর পরীক্ষা চলিয়াছে! এ দুর্ভাগ্যের বোঝা কি নামিবে না? কে আছ তুমি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! কে আছ তুমি দয়াময়!—সত্যই কি তুমি আছ?

না, অমিয়ার মন সে পথে স্থির হইতে চাহে না। ইহাও কি তাহার বিধিলিপি? এই কি সরযূর কথিত সেই অদৃষ্ট? যদি অদৃষ্টই হয়, তবে তাহার রচয়িতা কে? ভগবান্? যদি তাই হয়, তবে তিনি তাহারই ললাটে এই বিচিত্র বিধান করিলেন কেন? সংসারে কি আর কোন পাত্র ছিল না? বাছিয়া বাছিয়া তাহারই উপর এই কঠোর পরীক্ষা চলিল! ভগবান্ কি এমনই পক্ষপাতী?

ভগবান্! ভগবান্! সবাই ত বলে ভগবান্; কিন্তু তিনি কিরূপ? শুধু জ্যোতির্ম্ময়? না, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোনও রূপ আছে? পৃথিবীর বিভিন্ন মতবাদের কোন্‌টি সত্য?

হতাশ হইয়া অমিয়া সে বিতর্কও ছাড়িয়া দিল। মীমাংসার শক্তি তাহার নাই। সে তাহা চাহে না। সে শুধু এই কামনা করিতেছে, মনের সুস্থ, সবল, শুভ্র অবস্থা যেন সে ফিরাইয়া পায়। তথাকথিত উপদেশ, অনুষ্ঠান তাহার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

"অমি, চল বোন্, আজ তোমাদের এক যায়গায় বেড়িয়ে আনি।"

দাদার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই স্নিগ্ধ; কিন্তু আজ যেন অমিয়ার মনে হইল, সে কোমল, স্নিগ্ধস্বরে সহানুভূতি ও করুণার উচ্ছ্বাস উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। সে দাদার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের আননে কোনও বৈলক্ষণ্য সে দেখিতে পাইল না। দাদার এমন কণ্ঠস্বর বহুদিন সে ত শুনে নাই!

"কোথায়, দাদা?"

"বেশী দূর নয়, এই পুরীর মধ্যেই। মিস্ মিত্র, আপনিও চলুন।"

সরযূ কি একটা কায করিতেছিল। সে সেই অবস্থাতেই বলিল, "আমি ত আজ আপনাদের সঙ্গে যেতে

পারছি না। আমার সইদের ওখানে আজ যাবার কথা আছে। কাল তাঁরা এখানে এসেছিলেন। আজ সেখানে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে গেছেন। বৌদি দু'দিন গিয়েছিলেন, আজ যাবেন না ব'লে দিয়েছেন। আমাকে মাপ করতে হবে, মিঃ ঘোষ।"

সুরেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে মিঃ ঘোষ বল্‌লে আমি এর পর আর উত্তর দেব না, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি। আমি বাঙ্গালী, সে কথাটা আমি নিজে এক মিনিটের জন্যও ভুলে যেতে রাজি নই। অপরকেও ভুলবার অবসর দিতে চাই না।"

সরযূ উচ্চহাস্যে বলিল, "তা মান্‌লুম; কিন্তু আমাকে মিস্ মিত্র ব'লে কি আপনি আমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন? আপনিই ত আগে আমাকে মিস্ মিত্র ব'লে ডেকেছেন। আমার কি একটা নামও নেই?"

পরাজয় স্বীকার করিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "দোষ আমারই। ভবিষ্যতে ও রকম ত্রুটি আর হবে না।"

সরযূ বলিল, "তা' হ'লে আপনিও দেখে নেবেন, দ্বিতীয় বার আমিও আপনাকে বিদেশী প্রথায় সম্বোধন কর্‌ব না।"

অন্য সময় হইলে হয় ত অমিয়া এ সকল তর্কে যোগ দিত; কিন্তু ইদানীং তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কথাগুলি তাহার কানের মধ্যে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু 'মরমে পশিল' কি না সন্দেহ।

বেশ-পরিবর্ত্তনের পর ভ্রাতা ও ভগিনী বাসা হইতে বাহির হইলেন। সরযূও সৈরভীর সঙ্গে সখীর বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

সমুদ্রতীর ছাড়াইয়া কাছারীর দিকে যাইবার পথে গাড়ীর আড্ডা হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সুরেশচন্দ্র গাড়োয়ানকে কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিলেন।

অমিয়া এক বার জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কোথায় যাচ্ছ?—অনেক দূর?"

"না, বেশী দূর নয়। তবে তোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব না বলেই গাড়ী ভাড়া করলাম।"

অমিয়া আর কিছু বলিল না। সুরেশচন্দ্র এক বার ভগিনীর দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া রাজপথের দিকে মুখ ফিরাইলেন। রাজপথে পড়িয়া মন্দিরের বিপরীত দিকে গাড়ী ধাবিত হইল।

অমিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—বাহিরের দৃশ্য পদার্থগুলি তাহার চিত্তে কোনও কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতেছিল বলিয়া মনে হয় না।

গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহ্যচেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। এ কোথায় সে আসিয়াছে!

ফুলের বাগানের মধ্যে একটি একতল বাড়ী। গাড়ী থামিবার পর সুরেশ ভগিনীকে নামাইলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে অমিয়া দেখিল, একটি বড় ঘরের মধ্যে যেন বহু লোক মিলিত হইয়াছে। উহারা কাহারা?—দাদা তাহাকে কোথায় আনিলেন?

ভিন্ন পথে সুরেশচন্দ্র অমিয়াকে বাড়ীর ভিতরের অংশে লইয়া চলিলেন। একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘরে জাজিম বিস্তৃত—দরজা, জানালা খোলা। ঘরের মধ্যে বাতাস ও আলো যথেষ্ট। সুরেশচন্দ্র অমিয়াকে বলিলেন, "এখানে ব'স।"

দাদার নির্দ্দেশমত অমিয়া বসিতে গেলে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "ওখানে নয়, এ দিকে এস।"

যন্ত্রচালিতবৎ অমিয়া একটা খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইল। সেই দরজার উপর একখানি পাতলা সবুজ বর্ণের জালের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। অমিয়া দেখিল, সম্মুখে একটা বড় হল-ঘর—বাঙ্গালী ও উৎকলদেশীয় ভদ্রলোকে পূর্ণ। সে বুঝিল, আজ এখানে কোন সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা এ সকলের প্রতি অমিয়ার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

সুরেশচন্দ্র প্রসন্নহাস্যে বলিলেন, "একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না, তাই এখানে নিয়ে এলাম। এর জন্য অনুতাপ করবার দরকার হবে না। তুমি এখানে ব'স; কেউ এখানে আসবে না। এখান থেকে সব দেখ্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। আমি এখন ঐ ঘরে যাচ্ছি।"

অমিয়ার একবার মনে হইল, দেখিতে পাইলেই বা কি এমন ক্ষতি? সে ত আর ঘোরতর পর্দ্দানশীন নহে যে, অন্তঃপুরের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে আসে না? দাদা ত সবই জানেন, তবে?—

অমিয়া ভাবিয়া লইল, দাদার অন্যান্য অর্থহীন খেয়ালের মত ইহাও আর একটা খেয়াল !

সুরেশচন্দ্র ততক্ষণ অন্য দ্বার খুলিয়া আবার তাহা বন্ধ করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। অমিয়া দেখিল, আর এক দিক হইতে গৈরিক বেশধারী এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। অমনই সমবেত দর্শকের দল সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুক হাত তুলিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, পরে স্বয়ং অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটি বেদীর উপর বিস্তৃত কম্বলাসনে উপবেশন করিলেন।

অমিয়ার নিকট এমন উপাসনাসভা নূতন নহে। বহু বার সে বহু প্রবীণ ও বিচক্ষণ আচার্য্যের বক্তৃতা শুনিয়াছে ; সে জন্য তাহার বিন্দুমাত্র কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল না। কিন্তু দীর্ঘকায় সুদর্শন সন্ন্যাসীর দিক হইতে সে চক্ষু সরাইয়া লইতে পারিল না।

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসায় সভাগৃহের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অমিয়া যেখানে বসিয়া ছিল, সে ঘরে দীপ জ্বালা হয় নাই। সূক্ষ্ম পর্দ্দার ভিতর দিয়া অমিয়া সবই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

বক্তা একটা সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তির পর কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অমিয়া সে সময়টা আপনার কথাই ভাবিতেছিল, তাই সে গোড়ার কথা শুনিতে পায় নাই।

কিন্তু সহসা তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দূর বনপ্রান্ত হইতে মধুর স্বরে বাঁশী বাজিয়া উঠিলে কুরঙ্গী যেমন উৎকর্ণ হইয়া শুনে, অমিয়াও ঠিক তেমনই ভাবে কান পাতিয়া বক্তার কথা শুনিতে লাগিল।

সঙ্গীতের ছন্দের ন্যায় মধুর বাক্যধারা বক্তার মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল। অমিয়ার হৃদয়ে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। এমন মধুভরা ওজস্বী কণ্ঠে এমন বক্তৃতাভঙ্গী সত্যই সে কখনও শুনে নাই। কোনও ধর্ম্মসভায় কোনও প্রসিদ্ধ আচার্য্যের কণ্ঠ হইতে এমন বক্তৃতাপ্রণালী সে পূর্ব্বে শুনে নাই, সে কথা সে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবে।

বক্তার কণ্ঠস্বর কখনও সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায় গম্ভীর, কখনও উপলঘাতিনী তটিনীর ন্যায় কলোচ্ছ্বাসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। অমিয়া গোড়া হইতে মনোযোগ না দিলেও বুঝিল যে, তিনি সেবাধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝাইতেছিলেন, বাঙ্গালী কেমন করিয়া পবিত্রতম ‘মা’ ডাক ভুলিতে বসিয়াছে। যে মাতৃভাবের অনুশীলন বাঙ্গালী জাতির অস্থিমজ্জাগত ছিল, বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালার সাধকগণ যুগ যুগ ধরিয়া যে শ্রেষ্ঠতম সাধনতত্ত্বের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, জাতির দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বনাশের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে।

অমিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বক্তার কথামৃত পান করিতে লাগিল। যেখানে কোনও আগ্রহ বা উৎসাহের রেখামাত্র ছিল না, তথায় যেন গভীর আবেগ ও উত্তেজনার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল !

বক্তার সৌম্য আননে উজ্জ্বল দীপরশ্মি নৃত্য করিতেছিল ; কথার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, শ্রোতৃমাত্রেরই মন তাহাতে আকৃষ্ট হইবেই। যেন ধ্যানস্থ হইয়া সাধনলব্ধ তত্ত্বের কথা তিনি শিষ্যবর্গকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছিলেন। মুখস্থ করা পাণ্ডিত্য এমনভাবে এ তত্ত্বের আভাস দিতে কোনও কালে সমর্থ নহে। তাঁহার এক একটা কথা অমিয়ার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত প্রাণকে আলোড়িত করিতে লাগিল—‘মা’কে ভুলিয়া বাঙ্গালী বিশ্বমাতার অর্চ্চনা ভুলিয়াছে ;—তাই আজ কামনার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে ! বাঙ্গালী পুরুষ এখন আর মায়ের জাতিকে মাতৃভাবে দেখিতে পারিতেছে না—ডাকা ত দূরের কথা ! বাঙ্গালার কাব্যে, বাঙ্গালার সাহিত্যেও এই মহাপাপ প্রবেশ করিয়াছে ! ঘোরতর জড়ের পূজা, জড়ের সেবা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। পুরুষ অধঃপাতের চরমসীমায় দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের জাতিকেও টানিয়া লইয়া চলিয়াছে !

ভাষার এমন অপূর্ব্ব বিন্যাসভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের এমন আকর্ষণী শক্তি, যুক্তির এমন অমোঘ প্রয়োগ অমিয়ার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। স্বদেশের নরনারীর দুর্গতির চিত্র আঁকিবার সময় বক্তার কণ্ঠস্বর ব্যথায় যেন ভারী হইয়া উঠিতেছিল। যেন যুগ-যুগ-সঞ্চিত ক্রন্দনধ্বনি প্রতি শব্দের সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। অমিয়ার বুকের মধ্যেও

ব্যথা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল, বুকের জমাট অশ্রু আজ যেন নয়নপথে ধারায় ধারায় নামিয়া আসিল। বহু—বহু দিন সে এমনভাবে কাঁদে নাই!

বক্তৃতা কখন্ থামিয়া গিয়াছিল, শ্রোতৃবর্গ কখন্ চলিয়া গিয়াছিল, অমিয়ার সে দিকে কোনও খেয়াল ছিল না। সে শুধু অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপরিচিত বক্তার কথাগুলি ভাবিতেছিল, "বাঙ্গালী পুরুষ নারীজাতিকে মা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে; বাঙ্গালী মেয়েরা মাতৃভাবের চর্চ্চা—পুরুষকে সন্তানের মত ভাবিতে ভুলিতেছেন। তাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, আনন্দ, হ্রী ও শ্রী পথের ধুলায় লুটাইতেছে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সহসা আলোকসম্পাতে ঘরের অন্ধকার সরিয়া যাওয়ায় অমিয়া আত্মস্থা হইল। সে দেখিল, তাহার দাদার পশ্চাতে সেই দীর্ঘাকার, প্রিয়দর্শন পুরুষটি আসিতেছেন।

"গুরুদেব! এই আমার বোন্ অমিয়া।"

অমিয়া চমকিয়া উঠিল। দাদা কাহাকে 'গুরুদেব' বলিলেন? বিহ্বল দৃষ্টিতে সে সুরেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

সুরেশ বোধ হয় তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভগিনীর কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "সব কথা পরে তোমায় বল্‌ব।"

আগন্তুক বলিলেন, "এইটি তোমার বোন, সুরেশ? তবে ত উনি আমার আর এক মা।"

অমিয়ার মাথা সহসা কাহারও কাছে নত হইত না; কিন্তু কখন্ যে তাহার মস্তক গৈরিক বসনধারী প্রৌঢ়ের চরণতলে নত হইল, তাহার হিসাব অমিয়ার ছিল না।

"হয়েছে মা, উঠ—ব'স। আশীর্ব্বাদ করি, আনন্দলাভ কর।"

সে আশীর্ব্বচন তথাকথিত নহে; যেন অন্তস্তল হইতে সে আশিস্‌বাণী উদ্গত হইতেছিল।

সন্ন্যাসী অদূরে বসিলেন।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আপনার মধুর কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আমার বোন্ আপনার বিশ্ব-বিশ্রুত নাম সম্ভবতঃ শুনে থাক্‌বে, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুন্‌বার সৌভাগ্য হয় ত জীবনে সে আর পাবে না, তাই তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

"বেশ করেছ, সুরেশ। মা লক্ষ্মি! এখানে তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। তুমি ভাল হয়ে ব'স, আমি ত তোমার সন্তান।"

অমিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার দাদা যে সমাজের লোক, সেখানে এরূপ ভাবের সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রব কোথায়? দাদা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-সন্ন্যাসীর ভক্ত শিষ্য, এও এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যখন ভাল করিয়া স্বামীজীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তখন দেখিল, শিশুর মত সারল্য এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর নয়নে, আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুন-গুনস্বরে রামপ্রসাদের গানের একটা চরণ আবৃত্তি করিয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "আমার মায়ের হাতের রান্না এক দিন খেতে হবে। একঘেয়ে ঠাকুরের রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। কি, মা, আপত্তি আছে?"

এমন শিশুর মত আব্দার, এমন সরল প্রাণের খোলা কথা অমিয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাহার হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃভাব যেন আজ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ অনুভূতি যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই আনন্দভরা। হর্ষানন্দে সে বলিয়া উঠিল, "কাল সকালে দয়া ক'রে আমাদের ওখানে যাবেন কি?"

প্রাণ-খোলাভাবে হাসিয়া স্বামীজী বলিলেন, "মা, তোমার এ ছেলেটি বড় পেটুক। নিমন্ত্রণ পেলে, বিশেষতঃ মায়ের হাতের রন্ধনের সন্ধান পেলে, কখনও সে সুযোগ ত্যাগ করে না।"

বাস্তবিক কি মধুর, কি সরল, কি প্রাণ-গলান মিষ্ট কথা! অমিয়া যেন অনুভব করিল, স্বামীজীর স্নেহদৃষ্টিতে—একাধারে পরলোকগত পিতা ও মাতার স্নেহমাধুর্য্যভরা বাৎসল্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"সুরেশ, ভাই, তোমার চা তৈরী।"

অপর কক্ষ হইতে পরিচিত কণ্ঠের সাদর আহ্বানে সুরেশচন্দ্র সাড়া দিলেন। অমিয়ার কি চায়ের স্পৃহা আছে—এক পেয়ালা? মাথা নাড়িয়া অমিয়া জানাইল যে, সে চা পান করিবে না।

স্বামীজীর অনুমতি লইয়া সুরেশ চা পান করিতে গেলেন। স্বামীজী অমিয়ার সহিত নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অমিয়া বুঝিল, আজ সত্যই সে এমন এক জন মানুষ পাইয়াছে—যাঁহার কাছে শঙ্কা বা সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন হয় না। বিংশ শতাব্দীতে এমন লোক থাকা সম্ভবপর, ইহা যেন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অমিয়া অবশ্য তাহাদের নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কয়েক জন মহৎ-হৃদয় ধার্ম্মিকের কাহিনী জানিত; কিন্তু প্রকৃত শিশুর মত সরল, অসাধারণ পণ্ডিত, অপূর্ব্ব তত্ত্বদর্শী এমন মানুষ সে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সে বুঝিল, তাহার দাদার মত লোক কেন ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীজী বলিতেছিলেন, "মা, সংসারে মা হওয়ার মত আশীর্ব্বাদ আর নাই। মাতৃত্বের বিকাশ থেকেই নারী চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। প্রাচ্যদেশ এ তথ্যটা ভাল করেই বুঝেছিল; প্রতীচ্য এ মহৎ সত্যটাকে এ দিক দিয়ে ধরতেই পারে নি। তাই পশ্চিম—জড় বিজ্ঞানে বড় হলেও আমি বল্‌ব দুঃখী। এক দিন ভারতবর্ষের এই পরম তত্ত্বটি তারা বুঝতে পারবে! আজ সভায় সেই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তোমরা মা লেখাপড়া শিখেছ। এখন তোমাদের উচিত সারা বাঙ্গালায় আবার তোমরা পূর্ব্বের ভাব ফিরিয়ে আনো। বাঙ্গালীকে আবার মা ব'লে ডাক্‌তে, নারীকে মা ব'লে ভাবতে শেখাও। তবেই পুরুষগুলো মানুষ হয়ে উঠবে, আর মা, তোমরাও ধন্য হবে।"

সন্ন্যাসীর নয়নে যেন এক অপূর্ব্ব আলোক জ্বলিয়া উঠিল। অমিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে শুনিতেছিল। সহসা সে মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "আমি বড় মনের অশান্তিতে আছি। এ অশান্তির জ্বালা অসহ্য! ভুলবার কোন উপায় আছে কি?"

স্বামীজী স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমাত্র অমিয়ার দিকে চাহিলেন। তাঁহার প্রসন্ন আনন আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, অশান্তি মানুষের নিজের তৈরী। তার ঔষধ তোমার নিজের কাছেই আছে।"

অমিয়ার মুখ যেন আজ মুক্ত হইয়াছিল—তাহার বুকের মধ্যে এত দিন ধরিয়া যাহা জমিয়া উঠিয়াছিল, সবই যেন আপনা হইতে বাহির হইতে চাহিতেছিল। নৈরাশ্যজড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "কই! কোথায় সে ঔষধ, আমি ত জানি না! মনের জ্বালায় আমি জ্বলে-পুড়ে মলুম!"

নিমীলিত নেত্রে কি চিন্তা করিয়া স্বামীজী হাসিলেন। সে হাসি যেমন স্নিগ্ধ মাধুর্য্যভরা, তেমনই পবিত্র। তিনি বলিলেন, "মা লক্ষ্মি! তুমি সুরেশের বোন্‌, লেখাপড়া ভালই শিখেছ; কিন্তু বিদ্যা তোমাকে জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারেনি। বিদ্যা সব সময় তা পারে না। আজকালকার শিক্ষাপ্রণালীর সেটা মস্ত অভাব। ভক্তির রসমাধুর্য্য ভোগ করার পথ খুঁজে পাওনি, কারণ, সে শিক্ষার অবকাশ তোমার হয়নি। তাই এই মনস্তাপ। একটা পথের সন্ধান ব'লে দেই—তাতেই সব পাবে, মা। জীবসেবা—কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে জ্ঞান ও ভক্তি আপনি এসে দেখা দেবে। তখন বিশ্বদেবতার আনন্দ-ঘন জ্যোতির সমুদ্রে অবগাহন ক'রে সব তাপ, সব জ্বালা ভুলে যাবে।"

তীব্র-আগ্রহে অমিয়া বলিয়া উঠিল, "তা কি হবে? তা কি পাব? আমার পাপ মনের কথা সব আপনি—"

বাধা দিয়া স্বামীজী বলিলেন, "মা, মুখে সব কথা কি ছেলের কাছে খুলে বল্‌বার দরকার হয়? মা'র ব্যথা, মা'র যন্ত্রণা ছেলে মায়ের চোখ-মুখ দেখেই বুঝে নেয়—তা না হ'লে সে ত ছেলে নয়!"

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া অতি মৃদুভাবে স্বামীজী অমিয়ার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, তোমার মনের সব গ্লানি মুছে যাক্‌, মা!"

অমিয়ার শরীরমধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা আনন্দের শিহরণ তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গেল। ইহা কি তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্কের কল্পনা? না সত্যই কোন কোন মানুষের স্পর্শশক্তির এমনই প্রভাব?

নিমীলিত নেত্রে সন্ন্যাসী বলিলেন, "অশান্তির কথা, যন্ত্রণার কথা কি বল্‌ছ, মা! প্রায় ২৫ বৎসর আগে এক দিন অশান্ত, অভিশপ্ত মন নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সংসারে সবই ছিল, অথচ কিছুই ছিল না। এক দিন এক মহাপুরুষের সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখা হয়ে গেল। তিনি কানে মন্ত্র দিলেন, পথ দেখিয়ে দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লুম। কি মুক্তি, কি আনন্দ! তার পর

সেই আদর্শ-মহাপুরুষের আদেশে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে তাঁর বার্ত্তা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছি। এখন খালি আনন্দ! খালি তৃপ্তি!"

অমিয়া অবাক্ বিস্ময়ে ভাবিল, এই মানুষটি শেখা-বুলীর মত শুধু কথার তাজমহল গাঁথিয়া তুলিতেছেন না। তত্ত্বদর্শন না করিলে এ সব কথা এমন ভাবে কেহ বলিতে পারে না। সত্যই এমন লোকের চরণতলে পড়িয়া জীবন ধন্য হয়।

"তোমার চা শেষ হয়েছে, সুরেশ?"

"আজ্ঞে, যাই" বলিয়া সুরেশ ঘরের মধ্যে আসিলেন। একবার ভগিনীর দিকে চাহিয়া তিনি বসিলেন।

"তোমরা আর ক'দিন এখানে আছ?"

"বেশী নয়। ২।৪ দিনের মধ্যেই যাব। আপনার কোন আদেশ আছে?"

"এবার কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

"স্থির কিছু করিনি, তবে কলকাতায় ফিরে ঠিক করব।"

"ভাল। কিন্তু একবার বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ালে ভাল হয় না? তোমাদের মত লোক শুধু দেশ দেখে বেড়াবে, কোন কায করবে না, সেটা ঠিক নয়। কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়, বাবা। দেশ যে তোমাদের কাছে অনেক কিছু চায়। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ও-দিকে দিন কতক ঘুরে-ফিরে দেখ না? তোমাদের মত লোকের সেখানে এখন বড় দরকার! আজকার কাগজ পড়েছ?"

"আপনি পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষের কথা বল্‌ছেন?"

"হ্যাঁ। তোমাদের মত যাদের প্রাণ আছে, উৎসাহ আছে, তারা যদি এ ডাকে সাড়া না দেবে, তবে কে দেবে?" বলিতে বলিতে স্বামীজী অমিয়ার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মা, জীবসেবায় মানুষ সব জ্বালা ভুলে যাবে, এই হ'ল ভগবানের আর একটা বিধান। তাইতে অনন্তসুন্দরের দেখা সত্যই পাওয়া যায়। তোমার দাদার সঙ্গে একবার কর্ম্মতীর্থ দেখে আসতে পার।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আজ তবে আমরা আসি, রাত হ'ল।"

ভ্রাতা ও ভগিনী স্বামীজীকে নত হইয়া প্রণাম করিল।

অমিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাল সকালে তা হ'লে দয়া ক'রে আমাদের ওখানে যেতে হবে।"

সন্ন্যাসী সহাস্যে বলিলেন, "নিশ্চয় যাব, মা। সুরেশ, তোমার প্রেমানন্দজীও সঙ্গে যাবে। সেও আমার মত ঔদরিক।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে ভ্রাতা ও ভগিনীতে বিশেষ কোন কথা হইল না। অমিয়ার অন্তরতম প্রদেশে আশার একটা ক্ষীণ আলোকরেখা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এ ব্যাধি হইতে সত্যই কি সে মুক্তি পাইবে? আশ্রমে আসিবার সময় যে ভারাক্রান্ত মন লইয়া আসিয়াছিল, এখন ফিরিবার সময় বোঝা যেন একটু লঘু বোধ হইতেছিল।

এই স্বামীজী যে কে, তাহা সে এখনও জানে না; কিন্তু এমন চমৎকার লোক সে ত আর দেখে নাই! উনি কি মন্ত্র-তন্ত্র জানেন? না, অমিয়া ও সব বিশ্বাস করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সরলপ্রকৃতি, সদানন্দ মানুষটিকে দেখিলে যেন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়।

সে কোন কথাই ত বলে নাই, অথচ দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছবির মত সন্ন্যাসী যেন তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে পড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাহার এমনই যেন বোধ হইতেছিল। অথচ মুখে কোন কথাই ত বলিলেন না! সত্যই কি তিনি তাহার মনের ভীষণ ব্যাধির ইতিহাস জানেন? তাই বা সম্ভবপর কিসে? সে ত কিছুই বলে নাই! তাঁহার স্পর্শও কি স্নিগ্ধ! সব জ্বালা যেন সেই মুহূর্ত্তেই নিবিয়া গিয়াছিল। সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তির স্পর্শ সত্যই কি স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়? না, ইহাও তাহার কল্পনা-প্রসূত? দুই প্রকার স্পর্শের কি প্রচুর পার্থক্য!—রমেন্দ্রের স্পর্শে, বাক্যে তাহার অন্তর্নিহিত বাসনার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নহিলে অমিয়া এত অশান্তির জ্বালা অনুভব করিবে কেন? আবার স্বামীজীর মৃদুতম স্পর্শেই বা তাহার দেহ ও মনে শান্তির প্রবাহধারা বহিয়া যাইবে কেন?—কে জানে!

পথের দিকে সে মুখ ফিরাইয়াই বসিয়াছিল। ক্লিষ্ট নয়ন তুলিয়া সে একবার সম্মুখে উপবিষ্ট দাদার দিকে চাহিল। রাজপথের মৃদু আলোকে সে দেখিল, সুরেশচন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

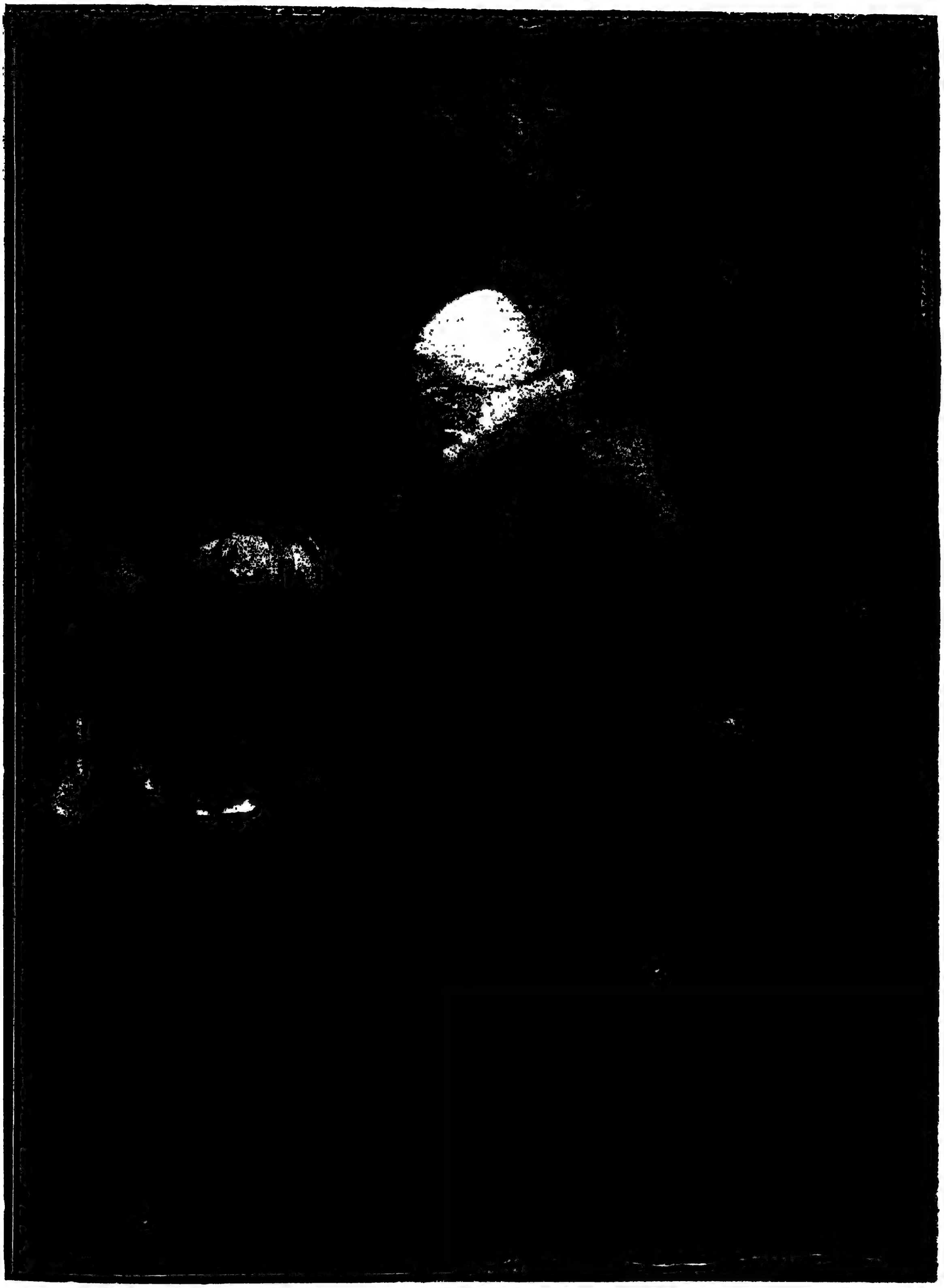

"রাত পোহালো—শুনছো সখি, দীপ্ত-উষার মাঙ্গলিক !"—ওমর খৈয়াম।

[শিল্পী—শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার।

"আমার উপর রাগ করেছ, অমি ?"

দাদার প্রশ্ন শুনিয়া অমিয়া বিস্মিতা হইল ; বলিল, "তোমার উপর রাগ—কেন ?"

"এই স্বামীজীর বক্তৃতা শুন্‌তে এনেছিলুম ব'লে। সরযূর সঙ্গে তাঁর সইয়ের বাড়ী গেলে হয় ত বেশী আনন্দ পেতে।"

অমিয়া বলিল, "না, এখানে এসে ভালই করেছি, দাদা। তোমার সঙ্গে স্বামীজীর কত দিনের জানা-শুনা, দাদা ?"

"অনেক দিনের। কেমন লাগ্‌ল বল ত ?"

"বড় চমৎকার লোক। আমি এমন আর দেখিনি।"

মৃদুহাস্যে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাই ত তোমায় এনেছিলুম।"

অমিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। তাহার দাদা তাহার মনের কথা কি টের পাইয়াছেন ? তাহার ভাব-বিপর্য্যয় কি লক্ষ্য করিয়াছেন ? এই স্বল্পভাষী অথচ সদানন্দ মানুষটিকে ত বুঝিবার উপায় নাই ! সত্যই কি তিনি কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছেন ? তাই বা কেমন করিয়া হইবে ? সে বিপ্লবময়ী রজনীর ইতিহাস আর কেহই ত জানে না। অবশ্য সে রাত্রির কথা লজ্জা-জনক সত্য ; কিন্তু লুকাইয়া রাখিবার স্পৃহা তাহার নাই। অপরাধী সে কাহাকেও করিতে চাহে না। দোষ যাহা কিছু তাহারই। তাহার ব্যবহারে প্রকাশ না পাউক, তাহার অন্তরতলে এমন কিছু ছিল, যাহা স্পষ্টতর না হইলেও রমেন্দ্রকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বাক্যে, ব্যবহারে অথবা কার্য্যে প্রকাশ না পাইলেও হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে ফল্গুধারার মত মনের যে ভাবধারা বহিতে থাকে—অপ্রকাশ্য হইলেও তাহার একটা আকর্ষণ-বেগ আছেই। যে ভাবধারা সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী কোনও নর বা নারীর হৃদয়ে বহিতে থাকে, সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ সমভাব-বিশিষ্ট ভিন্ন প্রান্তবাসী নর বা নারীর হৃদয়ে সেই একই চিন্তাধারার উৎপত্তি যখন সম্ভবপর—বৈজ্ঞানিক যখন এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তখন ইহাই বা সম্ভবপর নহে কেন ? 'টেলিপ্যাথির' অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা স্বামীর নিকট সে শুনিয়াছে, গ্রন্থে পড়িয়াছে। সুতরাং সে আপনাকে অপরাধমুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না।

ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিয়া ফেলিল, তাহার দৈন্য, দুর্ব্বলতা সে স্বামীর নিকট গোপন রাখিবে না। ইহা প্রকাশ না করিলে তাহার ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা অব্যাহত থাকিবে না। তিনি কি তাহাতে হৃদয়ে বেদনা পাইবেন ? সম্ভব ; কিন্তু তাই বলিয়া সে স্বামীর নিকট কিছুই লুকাইতে পারে না। স্বামীর কাছে স্ত্রীর বা স্ত্রীর কাছে স্বামীর গোপনীয় কিছুই থাকিতে পারে না।

স্বামীজীর শেষ কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল, "মা'র মত হয়ে, পুরুষকে মা ব'লে ডাক্‌তে শেখাও। মাতৃমন্ত্র-প্রচারে সহায় হও। কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সরলভাবে জীবসেবায় লেগে যাও। তখন অনন্তসুন্দরের আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে জেগে উঠ্‌বে। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি তখন নিভে যাবে।"

কি দৃঢ় আশ্বাসবাণী ! এমন একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে, এত সোজা ভাবে এমন কথা কে বলিতে পারে ? রমেন্দ্র ! রমেন্দ্র !—স্মৃতি মুছিয়া যাক্।

গাড়ী একটা শব্দ করিয়া থামিয়া পড়িল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দম্‌কা বসন্ত হাওয়ার মত সরযূ দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিল, "এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন আপনারা বলুন ত ?"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি ফিরে এসেছেন ?"

"ফিরে আস্‌ব না, তার মানে ?—আপনাদের মত রাত ৯টা পর্য্যন্ত হাওয়া খেয়ে বেড়াতে হবে না কি ? সত্যি বউদি, কোথায় গিয়েছিলে বল ত ?"

অমিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি অনুমান করুন না।"

"বেশ ! আমি ত আর জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িনি যে, অঙ্ক কষে ব'লে দেব ! গেলেন আপনারা, আর অনুমান করব আমি ? এ ব্যবস্থা মন্দ নয় !"

অমিয়া বলিল, "সন্ন্যাসীর আশ্রমে।"

দীর্ঘায়ত নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করিয়া সরযূ বলিল, "সন্ন্যাসী ? সে আবার কি ? কে তিনি ?"

"দাদার গুরু—স্বামীজী।"

সরযূর ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল। মৃদু হাস্যরেখা তাহার দন্তরুচি-কৌমুদীর শোভা যেন বাড়াইয়া দিল। সে হাস্য কি বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের দ্যোতক ?

"সুরেশ বাবু, শেষকালে সন্ন্যাসী, আশ্রম, স্বামীজী

এই সব নিয়ে মেতে গেলেন না কি? ও সব বিশ্বাস করেন? আমাদের সমাজের লোক আপনাকে একঘরে ক'রে রাখবে যে! আপনি শেষে ঘোর পৌত্তলিক হয়ে উঠ্ছেন দেখ্ছি!"

জানালা খোলা ছিল। সমুদ্রের জলে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো—ঊর্দ্ধবাহু তরঙ্গগুলি যেন কিরণধারা পানে বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুরেশচন্দ্রের হৃদয়-বীণায় কবির সেই মধুর গানের প্রথম ছত্রটি বাজিয়া উঠিতেছিল—"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে দেছে চাঁদের আলো!"

সরযূর মন্তব্য শুনিবামাত্র তিনি মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার মুখকান্তি সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন, মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অভিজ্ঞতা চরম সীমায় পৌঁছেছে? আমি যা জানি, তার চেয়ে বেশী কিছু জান্বার কি নেই? আমাদের সম্প্রদায়ের কথাই আপনি তুলেছেন। কিন্তু সত্যি ক'রে বলুন ত, তাঁরাই বা কোন্ চরম তত্ত্ব, পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা কর্তে পেরেছেন? খালি খানিকটা আভাস মাত্র; তাতেও কত মতবিরোধ! সসীম মানুষ অসীম বিশ্বের কতটুকু জান্তে পারে? বিশ্বনিয়ন্তাকে জানা ত দূরের কথা। আপনার কাছে আজ যা গাঁজাখুরী অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হচ্ছে, সেটা সত্য কি না, তা কোন দিন যাচাই ক'রে দেখেছেন কি? বিদেশী সভ্যতার চশমা প'রে সব বিষয়ের বিচার কর্তে গেলে অনেক সময় প্রতারিত হতেই হবে। এই জ্ঞানটুকু মাত্র আমি অর্জ্জন করেছি।"

বলিতে বলিতে সহসা সুরেশচন্দ্রের প্রশান্ত আননে একটা আলোকরেখা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "পৌত্তলিকতার কথা বল্ছিলেন। ও বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই। আমি ত দেখতে পাচ্ছি, সকল মানুষই কোন না কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আকারকেই উপাসনা করে। কেউ বা জ্যোতিষ্কগুলের, কেউ বা হাত-পা বা মূর্ত্তিবিশিষ্ট কোন কিছুকে ধ্যানের বিষয় ঠিক ক'রে নেয়। যাক, তাতে তর্ক উঠ্বে, অথচ মীমাংসা হবে না। কিন্তু একটা কথা আপনি জেনে রাখুন, আমাদের সম্প্রদায় ব'লে আপনি আমাকে যা বোঝাতে চাচ্ছেন, তেমন কোন সম্প্রদায়কে আমি স্বীকার করি না। আমি সত্যের উপাসক, তত্ত্বের ভক্ত, তথ্যের অনুরাগী। যেখানে তা পাব, তাকেই আমি মান্ব। তবে সে জন্য নিজের সমাজ বা ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য স্থানে নাম লেখাতে যাব না। সেটা আমার কাছে ভণ্ডামী ব'লেই মনে হয়।"

সরযূ সুরেশচন্দ্রের উত্তেজনাশূন্য, অথচ দৃঢ়তাভরা কথাগুলি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অমিয়াও দাদার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া সরযূ বলিল, "আপনি হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাস করেন?"

"সহস্রবার। আর সে কথা কেন? আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম মান্ব না?"

"আমরা হিন্দু!—সে কি রকম?"

"আপনি বিস্মিত হচ্ছেন যে? আমরা হিন্দু, বাঙ্গালী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করতেন, আমরা কোন্ অধিকারে তা অবিশ্বাস করব?"

"কিন্তু আপনার বাবা—"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি। আপনি আমার কথার মানে মোটেই বুঝতে পারেন নি। আমাদের বর্ত্তমান সম্প্রদায়ের যে ধর্ম্মমত, সেটা কি হিন্দুধর্ম্মের অংশ নয়? রাজা রামমোহন সংস্কারের উদ্দেশে একটা পথের নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। সে পথ আগেও ছিল, এখনও আছে। সে কথাটা ভুলে গেলে চল্বে না। দলে দলে ভারতবর্ষের লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করছিল, তাই তিনি কালোপযোগী ক'রে বিরাট হিন্দুধর্ম্মের একটা দিক্ গ্রহণীয় ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল, তা সিদ্ধ হয়েছে।"

অমিয়া বলিল, "দাদা, আর তর্কে কায নেই, রাত হয়েছে, খাবে চল।"

সুরেশচন্দ্র বলিয়া চলিলেন, "একটা কথা জেনে রাখুন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি। আমাদের সম্প্রদায়—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতির মত একটা সম্প্রদায় হয়েই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থেকে যাবে। এর স্বতন্ত্র—বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত অনুষ্ঠানগুলি কালে লুপ্ত হয়ে যাবে। আর তা হওয়াও দরকার। আমরা যেন না ভুলে যাই যে, আগে আমরা হিন্দু, পরে আর কিছু।"

সরযূ বলিল, "দাদা আপনার এ সব মনের ভাব জানেন?"

"জানেন বৈ কি। শুধু তাই নয়, তাঁরও বিশ্বাস আমার মত। যাঁরা শুধু খোসা নিয়ে তৃপ্ত নন, তাঁদের সকলেরই মনের অবস্থা এই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়াতে হবে।"

সরযূ ও অমিয়া সুরেশচন্দ্রকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ। তবে তাহাদের অন্তরে যে একটা আলোড়ন হইতেছিল, তাহা তাহাদের বিস্ময়বিমূঢ় ভাবেই প্রকাশ পাইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

অপাত্রে দান

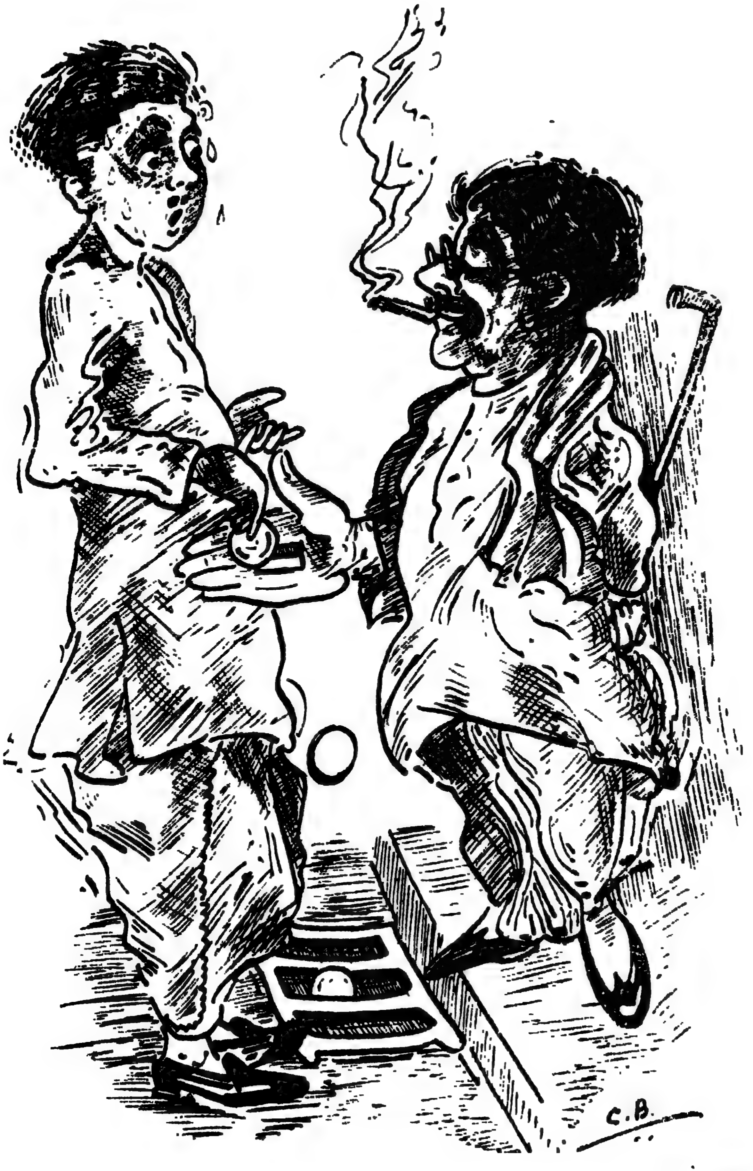

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতার স্বাস্থ্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোবিন্দপুর গ্রাম (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা-স্থল) প্রথম স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ শেঠ ও বসাকদিগের ব্যবসায় দ্বারা উহার উন্নতি হইতে থাকে। কিছু পরে সূতানুটী হাট (বর্ত্তমান হাটখোলা) স্থাপিত হয়। ক্রমে বহু ব্যবসায়ীর তথায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গর্ত্ত, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি যথেচ্ছ খনিত হওয়ায় পুরাতন কলিকাতার অংশবিশেষের স্বাস্থ্য অতিশয় হীন হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমশঃ এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব অনুভূত হয়। সে সময় কলিকাতার ব্যবহার্য্য জলাশয়—কূপ, পুষ্করিণী, খাড়ি, খাল, নদী প্রভৃতির জল নির্ম্মল ও দোষশূন্য রাখিবার জন্য কোনও আইন না থাকায় উহাদিগের জল বিশেষরূপে দূষিত হইয়া বিসূচিকা ও অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদিত হইত।

তখন ইংরাজ পল্লীর আয়তন ২ শত ৪৮ বিঘা, সূতানুটী বাজার ৪ শত বিঘা এবং ইহার সংলগ্ন জমী ৩ শত ৬৬ বিঘা। "ডিহি কলিকাতার" এইগুলির চতুর্দ্দিকে ১ হাজার ৪ শত ৭০ বিঘা চাষী ও পতিত জমী ছিল। সূতানুটীতে বসতি ১ শত ৩৪ বিঘা এবং ১ হাজার ৫ শত ৫৮ বিঘা চাষী এবং জঙ্গল জমী ছিল। গোবিন্দপুরে কেবল ৫৭ বিঘা বসতি এবং অবশিষ্ট অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। গঙ্গার ধারে অবস্থিত সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের পরিমাণ প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও দেড় হইতে দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। সহরের যে অংশ ইংরাজগণ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার লোকসংখ্যা ২২ হাজার ও চতুর্দ্দিকের গ্রামের লোকসংখ্যাও অনুমান ঐরূপ ছিল। ইহা ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের কথা।

ইংরাজ এ স্থলে আসিয়া বাস করিবার কিছুকাল গত হইতেই তাঁহারা কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান এজেন্টগণ, তাঁহাদের জমীদারীর (কলিকাতা, সূতানুটী, গোবিন্দপুর) ভিতর নিয়মবহির্ভূত পাকা বাড়ী বা পুষ্করিণী করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পুরাতন কেল্লার চতুর্দ্দিকে অধিকসংখ্যক বৃক্ষ ও পর্ণকুটীর ছিল। উহার চারিদিকে গর্ত্ত ও ডোবা পঙ্কিল সলিলে পূর্ণ থাকায় স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাতন কেল্লার সম্মুখের পথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য এবং নিম্নস্থানগুলি মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া সঞ্চিত জলরাশি বাহির করিয়া দিবার জন্য কোম্পানীর কাউন্সিল, পথের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত কারণে কলিকাতার স্বাস্থ্য এই সময় (১৭০৫-১৭০৭) অতিশয় হীন হইয়াছিল। সহর ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির আকর হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ১ হাজার ২ শত য়ুরোপীয়ের মধ্যে ৬ মাসের মধ্যে ৪ শত ৬০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজটোলার লোকসংখ্যা ৩১ হাজার এবং সন্নিহিত স্থানে লোকসংখ্যা প্রায় অনুরূপ ছিল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪১ হাজারে পরিণত হয়। উপকণ্ঠস্থ গ্রামসমূহের লোকসংখ্যা ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ হ্যামিল্টনের মতে লোকসংখ্যা তখন ১২ হাজারএর অধিক ছিল না।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনটি নূতন গ্রাম—কলিকাতা, সূতানুটী, গোবিন্দপুর ক্রীত হইবার পর এবং ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে পুরাতন কেল্লা প্রস্তুত হইবার পর, বেশ শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বহু লোক আসিয়া সহরে ও ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করিতে আরম্ভ করে। গোবিন্দপুর, কলিকাতা, সূতানুটী তখন যথাক্রমে দক্ষিণে বর্ত্তমান "প্রিন্‌সেপস্" ঘাট হইতে উত্তরে চিৎপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরাজটোলা তখন ইডেন উদ্যান হইতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কিছু উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য জমীদারের অধিকৃত স্থানে দেশীয় লোকের বাস ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণে সূতানুটী ও গোবিন্দপুর নদীর ধারে অবস্থিত ও জঙ্গলপূর্ণ ছিল।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কোম্পানীর কাউন্সিলের—নিম্নলিখিত হুকুম (১৩ই জানুয়ারী) হইতে জানা যায় ;—"গভর্ণর কয়েক মাস যাবৎ অতিশয় অসুস্থ থাকায় ডাক্তারগণ নদীয়ায় জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইতে বলায় গভর্ণর ডাক্তারের সহিত তথায় যাউন এবং দেশ বিপৎসঙ্কুল হওয়ায়, কাপ্তেন উডভিল ৫০ জন সৈনিক লইয়া গভর্ণরের সহিত যাউন এবং গভর্ণরের অনুপস্থিতিসময়ে রবার্ট হেজেস্ অন্যান্য সভ্যগণের সহিত কাউন্সিলের কার্য্য নির্ব্বাহ করুন ও তহবিলের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

পুনরায় ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, গভর্ণর পূর্ব্বোক্ত স্থানে যাইয়া জলবায়ু দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় এবং পুনরায় অসুস্থ হওয়ায় কাউন্সিল গভর্ণরকে পুনরায় জলবায়ু পরিবর্ত্তন হেতু, নদীয়া যাইতে আদেশ করেন এবং কোম্পানীর অসুস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীও তাঁহার সঙ্গে নদীয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। মিঃ হেজেস্ পুনরায় কাউন্সিলের প্রধান নিযুক্ত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই সময়ে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। ইহা দ্বারা কলিকাতার অতি হীন স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুমিত হইতে পারে।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গঙ্গার উভয় ধারে ৩৭খানি গ্রাম ক্রয় করেন। ইহাতে ইংরাজের আধিপত্য ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং সহরও পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হয়। এ জন্য পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মেনিয়ান, মোগল, হিন্দু এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর আগমন এবং তাহাতে ব্যবসা ও ধনের বৃদ্ধির সহিত তখনকার সহরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভবানীপুর, কালীঘাট, চিৎপুর ক্রমশঃ ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইংরাজের অধিকার সহরের চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু সহরের আয়তন তখনও বৃদ্ধি পায় নাই।

ব্যবসায় উপলক্ষে অন্যান্য লোকের আগমনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল সত্য, কিন্তু সহরের স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ অবনতই হইতেছিল। পুঞ্জীকৃত ময়লা, আবর্জ্জনা, দূষিত জল কলিকাতার স্বাস্থ্যকে ক্রমশঃ আরও হীন করিতেছিল। স্থানীয় লোকরা স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তখন অবহিত হয় নাই, তাহাদের সামর্থ্যও ছিল না। দুর্গন্ধযুক্ত জলাশয় ইতস্ততঃ

খনিত হইয়াছিল। জঙ্গল খাল, অসংখ্য কূপ, গর্ত্ত, পগার, আর্দ্র মৃত্তিকা, অস্বাস্থ্যকর বায়ু, ধাপার দূষিত বায়ু (তখন ধাপা বৌবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল) এবং নিকটস্থ সুন্দরবনের অস্বাস্থ্যকর বায়ু—এই সমস্তই সহরকে বিশেষরূপে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭২৬-৩৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপুর, চৌরঙ্গি ও "ডিহি" কলিকাতার ভিতরের খালগুলি তখন অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এক জন মেয়র ও ৯ জন অলডারম্যান লইয়া কলিকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হয়। উহারা জমীর খাজানা, ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিত এবং রাস্তা ও ড্রেণ মেরামত করিত। কিন্তু ভাল জল সরবরাহ, ড্রেণ নির্ম্মাণ বা আবর্জ্জনা দূর করার ব্যবস্থা ছিল না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জমীর ও ব্যবসার কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ এত সামান্য ছিল যে, তাহাতে সহরের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নাই।

তখনকার জমীদার মিঃ হলওয়েল মেয়র ছিলেন, তিনি জমীর ও ব্যবসায়ের কর আদায় করিতেন, সহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইত এবং উহার শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল—অর্থাৎ তিনি ইহার পুলিসের প্রধান ছিলেন। এইরূপে গঠিত মিউনিসিপ্যালিটী,—অর্থাভাবেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক—তখনকার সহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই।

প্রায় এই সময় হইতে শস্য ও অন্যান্য পদার্থের উপর শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্যবসা, বিবাহ, ক্রীতদাস ব্যবসা, দোকান প্রভৃতির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইত ও তজ্জন্য অর্থও সংগৃহীত হইত এবং এই অর্থ দ্বারা রাস্তা, ড্রেণ প্রভৃতি সামান্যরূপ মেরামত হইত। সহরের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য জমীদার মেয়র দায়ী ছিলেন।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সমৃদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু ভূমিকম্প ও বন্যায় সহর বিধ্বস্ত হওয়ায় উহার স্বাস্থ্য অতিশয় হীন হইয়া গিয়াছিল।

১৭৪২-৪৭-৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "বর্গীর অত্যাচার" হেতু চতুর্দ্দিক হইতে বহু লোক আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে অনেক স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইংরাজ আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করিবার অভিপ্রায়ে বহু লোকসমাগম হওয়ায়,—সিমলা, ঠনঠনিয়া, আড়কুলি, মলঙ্গা, ডিঙ্গাভাঙ্গা, কলিঙ্গা, তালতলা, বিরজি, উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি মৌজার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইংরাজরা চৌরঙ্গীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন ঐ স্থানে বাড়ীগুলি অতি দূরে দূরে অবস্থিত ছিল এবং উহাদের সংখ্যাও অল্প ও উহারা সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ডিহি কলিকাতায় জমীর পরিমাণ ১ হাজার ৭ শত ৫ বিঘা ছিল ও ইহাতেই ইংরাজ বসতি ছিল। ইহার দক্ষিণে চাঁদপাল হইতে "ধাপা" বিল পর্য্যন্ত খাল; পূর্ব্বে লালবাজার ও চিৎপুর; উত্তরে বড়বাজার এবং পশ্চিমে গঙ্গা। সুতানুটীর জমীর পরিমাণ ১ হাজার ৮ শত ৬১ বিঘা। ইহার উত্তরে বাগবাজার খাল, পূর্ব্বে অপার সার্কুলার রোড, (চিৎপুর রোড) রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে গঙ্গা। গোবিন্দপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার স্থানে স্থানে খড়ের ঘর ছিল এবং মধ্যে মধ্যে জঙ্গল। ইহার জমীর পরিমাণ ১ হাজার ৪৪ বিঘা। ইংরাজাধিকৃত সহরের লোকসংখ্যা অনুমান ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত ৬০ এবং চতুর্দ্দিকের অন্য জমীদারাধিকৃত স্থানের লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রায় তদ্রূপ। জঙ্গলের আধিক্যহেতু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় জঙ্গল কাটিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য কাউন্সিল হুকুম দিয়াছিলেন।

কাউন্সিল কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানাইয়াছিলেন যে, জমীদার বা মেয়রকে সহরের ড্রেণগুলিকে সংস্কার করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারণ, ড্রেণ ভাল রাখিলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে।

ডালহৌসী বা লালদীঘির জলই পানীয় ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উহাতে অবগাহন, স্নান, পরিধেয়াদি পরিষ্কার এবং অশ্বসমূহকে সর্ব্বদা স্নান করাইবার ফলে অতিশয় দূষিত হইত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ যখন কলিকাতা পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন, তখন হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কারণ, ইংরাজাধীন সুরক্ষিত কলিকাতায় তখন বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত অধিক লোকসমাগম হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার পরিসরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাদের স্থান সংকুলান জন্য অনেক অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ২১ খানা বাড়ী ছিল, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে উহা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] শত ৬৮খানা হইয়াছিল। প্রায় ৩ হাজার হিন্দু-পরিবার এই সময় কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ যখন গোবিন্দপুরে প্রস্তুত হইতে লাগিল, তখন ঐ গ্রামের লোক আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, বাঁকা ও অপরিষ্কার ছিল, এবং নিকটস্থ ব্যাধিজনক জঙ্গল-জলার বায়ু সহরের বায়ুকে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর করিল এবং অরক্ষিত দূষিত ময়লা কূপ, পুষ্করিণী, খাল, নদী প্রভৃতির জল অতিশয় অস্বাস্থ্যপ্রদও ছিল। কলিকাতা ইংরাজ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার অধিকারের পর সহরের কিছু কিছু উন্নতির জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্গ ও এসপ্লানেড যেখানে অবস্থিত, তথায় যে জঙ্গল ছিল, তাহা পরিষ্কার করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানের রাজপ্রাসাদ ভুলা চৌরঙ্গীতে তখন কয়েকখানামাত্র পর্ণকুটীর ছিল। বর্ত্তমান দুর্গ ও রেড রোড যেখানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় তখন সুন্দরবনের ন্যায় জঙ্গলযুক্ত জলা ছিল। তথায় কুম্ভীর ও জলচর পক্ষীরা ইচ্ছামত চরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক কলিকাতা সুন্দরবনের এক অংশমাত্র এবং তথায় বৃহৎ কুম্ভীর, জলচর পক্ষী ও বন্যজন্তু দ্বারা পূর্ণ ছিল। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সাহায্যে ইংরাজের চেষ্টায় এখন তথায় স্বাস্থ্য ও ধনের আগার হইয়াছে।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট প্রদেশ তখন জঙ্গলময় ছিল এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃষ্টির কয়েক মাস যাতায়াতের অযোগ্য ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সহরে সংক্রামক, মারাত্মক ব্যাধি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং মেজর ব্যারণ্যাক ক্লাইবের নিকট কলিকাতা সৈন্যদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল, এরূপ অনুযোগ করায় সৈন্যগণকে আর কলিকাতায় রাখা হইবে না, এরূপ আদেশ হইয়াছিল। ২।৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্ব্যয়ে সহর পরিষ্কার ও সুন্দর করার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা ফলবতী হয় নাই। ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা (সিক্কা) সংগৃহীত সহরের কর হইতে উহার প্রায় তৃতীয়াংশ পুলিসের ব্যয়িত হইত। এই পুলিস অশিক্ষিত থানাদার ও পিয়ন ব্যতীত কিছুই নহে; ইহাদের দ্বারা সহর রাত্রিতে চৌকী দেওয়া হইত। পুলিসের জন্য ব্যয় নির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা দ্বারা ভাল ড্রেণ নির্ম্মাণ, কূপের জল সরবরাহ বা আবর্জ্জনা দূরীভূত কবার ব্যবস্থা ভালরূপ হইত না। এই হেতু কলিকাতার স্বাস্থ্য তখন অতিশয় মন্দ ছিল এবং "পালা" জ্বর (একরূপ সাংঘাতিক জ্বর) প্রভৃতি উহার ফলস্বরূপ দৃষ্ট হইত। সহরের অতিশয় মন্দ স্বাস্থ্য হেতু জঙ্গল কাটিবার হুকুম হয়। কূপজল লবণাক্ত ছিল, উহা যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "কভেনানটেড" কর্ম্মচারীগুলির সংখ্যা সহরের অস্বাস্থ্য হেতু অতিশয় হ্রাস পাইয়াছিল। এই কর্ম্মচারীরা বিলাত হইতেই নিযুক্ত হইয়া আসিতেন; কিন্তু উঁহাদের সংখ্যা উপরি-উক্ত কারণে অতিশয় হ্রাস পাওয়ায়, কলিকাতা হইতেই মিঃ হলওয়েল নামক এক ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইংরাজ ধর্ম্মযাজকদিগেরও অসুস্থতা হেতু এরূপ অভাব হইয়াছিল যে, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সহরে "চ্যাপলেন" (ধর্ম্মযাজকবিশেষ) ছিল না।

কলিকাতায় কোম্পানীর একটি সুন্দর হাঁসপাতাল ছিল। কিন্তু

ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা অধিক ছিল। ডাক্তার আইভিস হাঁসপাতালে চিকিৎসিতদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন :—৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই আগষ্ট ১ হাজার ১ শত ৪০ জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল ; ইহার মধ্যে স্কার্ভি রোগ হইতে ৫৪ জন, যকৃতের দোষযুক্ত জ্বর হইতে ৩ শত ২ জন এবং শূলবেদনা হইতে ৫২ জন মারা যায়। ৯ই আগষ্ট হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ৭ শত ১৭ জন নূতন রোগী ভর্ত্তি হয় ; ইহাদের মধ্যে ১ শত ৪৭ জন “পচা” জ্বর ; ১ শত ৫২ জন “পচা” ভেদ এবং ১ শত জন অন্য রোগে মারা যায়। উপরে যে “পচা” ভেদ লেখা হইল, উহা সম্ভবতঃ বিসূচিকা। সে কালে সমস্ত জ্বররোগীর রক্ত মোক্ষণ করা হইত, ডাক্তার বোগ বলেন, এই জন্য মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইত। বৃষ্টির কয়েক মাস তখন অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল, বিশেষতঃ নবাগতদিগের পক্ষে। রাত্রিকার কুজ্ঝটিকায় উন্মুক্ত স্থানে থাকা হেতু জাহাজের মাল্লাদের প্রায় চতুর্থাংশ বা ৩ শত মারা যাইত।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কলিকাতায় ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপিত করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতেই অস্বাস্থ্যকর স্থান সত্ত্বেও কলিকাতা বেশ একটি সহরে পরিণত হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ও ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের চন্দননগর বাণিজ্যস্থান ইংরাজ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইবার পর কলিকাতার আয়তন ও লোকসংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; কিন্তু উহার সহিত সহরের স্বাস্থ্যও অতিশয় হীন হইতে হীনতর হইতেছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুনরধিকারের পর অনেক দিন যাবৎ লবণাক্ত “ধাপা” বিল বহুবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জঙ্গলযুক্ত জলা ও জঙ্গল—যথায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু লুক্কায়িত থাকিত —এই সমস্ত সহরের অতি নিকট থাকায়,—কলিকাতা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল। বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, য়ুরোপীয়গণ প্রত্যেক বৎসর ১৫ই অক্টোবর পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেন এবং অতি অশাস্থ্যকর, মারাত্মক বৃষ্টি-ঋতু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরস্পরকে পরস্পরের সহানুভূতি জানাইতেন। (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ)

ইংরাজ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সুতানুটীতে কুঠী স্থাপন করিবার পূর্ব্ব হইতে পলাশী যুদ্ধে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ও বক্‌সর যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহারা শেষে দেওয়ানী সনন্দ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্য ক্রমশঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং এই অবস্থা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পরেও চলিতেছিল। (১৭৫৪-৬৫ খৃষ্টাব্দ)।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভাল রাস্তা মাত্র কয়েকটি ছিল। বারাসত যাইবার পাকা রাস্তাই সাধারণের যাতায়াতের প্রিয় পথ।

মিঃ হ্যাণ্ডেল নামক এক ব্যক্তি সহরের ঝাড়ুদার সরবরাহ করিতেন, তাঁহার তখনকার বেতন ছিল ৬০ টাকা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল উহা বৃদ্ধি করিয়া ৮০ টাকা করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সহরের ঝাড়ু কার্য্য একেবারেই ভাল হইত না।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৩৬০ দেখা যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বার্ষিক য়ুরোপীয় মৃত্যুসংখ্যা ১৬৪ ছিল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সহরে জঙ্গল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; ব্যাঘ্র এবং বন্য বরাহ সেণ্টপল গির্জ্জা স্থলে চরিয়া বেড়াইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র খাদের এ ধারে জঙ্গল কাটারও হুকুম প্রচারিত হইয়াছিল এবং কয়েকটি নূতন রাস্তাও প্রস্তুত ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হইয়া ৫০ হাজার জন দেশীয় ও ৮ শত য়ুরোপীয় প্রাণত্যাগ করে। এই ব্যাধি কি, কেহ তাহা বলেন নাই ; বিসূচিকা হইতে পারে। এই সময় সহরের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত ৬০ জনেরও অধিক ছিল। ডাক্তারের সংখ্যা অতি অল্প ও তাঁহাদের প্রাপ্যও অতি অল্প ছিল।

১৭৬০-৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এবং উহার চতুর্দ্দিকের রাস্তা ভাল ছিল না। নদীর ধারে কোন রাস্তা ছিল না। “রেডরোড” স্থানে রাস্তা ছিল ; কিন্তু উহা অধিক ধূলিপূর্ণ হওয়ায় নির্ম্মল বায়ু সেবনে বড় সুবিধা বা আনন্দ লাভ করা যাইত না। অনেকে তখন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইত ; কিন্তু এ স্থানও অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল। পুরাতন কেল্লার পূর্ব্বদিকস্থ গর্ত্ত পূর্ণ করাইয়া উহা স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

য়ুরোপীয়রা গঙ্গার দক্ষিণে “বীরকুল বাঙ্গালায়” বা উত্তরে চন্দননগর, সুখসাগর ও কাশিমবাজারে নৌকায় বা জাহাজে “হাওয়া” বদলাইতে যাইতেন।

কলিকাতার অতিশয় অস্বাস্থ্যকর বায় ত্যাগ করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীরা গঙ্গার উত্তরে ও দক্ষিণে বাগানবাড়ীতে বাস করিতেন। ক্লাইভ দম্‌দমায় থাকিতেন, সার উইলিয়ম জোন্স্ গার্ডেনরিচে, সার রবার্ট চেম্বার্স ভবানীপুরে, জেনারল ডিকিন্‌সন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন।

মুখ্যতঃ সৈন্যদের জন্য প্রস্তুত হাঁসপাতাল পুরাতন কেল্লায় অবস্থিত ছিল। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়ায়, কাউন্সিল সভ্যরা পর্য্যায়ক্রমে হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবেন, এরূপ আদেশ হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বক্‌সার যুদ্ধের পর ইংরাজ সম্পূর্ণরূপ “দেওয়ানী” ভার প্রাপ্ত হইবার পরে কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অধিক চেষ্টা হইয়াছিল। পুরাতন কেল্লায় অবস্থিত হাঁসপাতালের নিকট একটি কবরস্থান ছিল। উহাতে ১৪ হাজার মৃতদেহ গলিত অবস্থায় থাকার জন্য হাঁসপাতাল ও নিকটস্থ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়াছিল। এ জন্য নূতন কবরস্থান ও নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের স্থির মীমাংসা হইয়াছিল। “শারমান” বাগানের বিপরীত দিক “সুমাত্রা দ্বীপে” প্রথম হাঁসপাতাল প্রস্তুত করা স্থির হইয়াছিল ; কিন্তু পরে আলিপুরেই হাঁসপাতাল প্রস্তুত হয়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিলের কার্য্যে হাঁসপাতাল, রাস্তা, সেতু প্রভৃতির আনুমানিক ব্যয় লেখা হয়—৯ হাজার ৭ শত টাকা ঐ বৎসরে ব্যয় হইবে স্থির হয়। “দালান্দা” রাস্তায় দুইটি পুলের জন্য ১ হাজার টাকা ব্যয় স্থির হয়, কিন্তু চৌরঙ্গী রাস্তার ড্রেণের জন্য মাত্র ২৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়। এই ড্রেণ কালীঘাট যাতায়াতের কাঁচা রাস্তার পার্শ্বস্থ একটি অপ্রশস্ত, অগভীর নালা মাত্র। সে কালে দমদমা ও বারাসত যাইবার রাস্তার জন্য যত্ন দেখা যাইত ; কারণ, দমদমায় ক্লাইভ থাকিতেন এবং অন্য কোন কোন উচ্চ কর্ম্মচারী বারাসতে থাকিতেন। সহরের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের জন্য কাহারও বিশেষ চেষ্টা বা যত্ন দেখা যাইত না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পর যদিও সহরের স্বাস্থ্যের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাকে পৃথিবীর ভিতর একটি বিশেষ অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার পরেও রাস্তার কদর্য্য অবস্থা এবং স্বাস্থ্য ও নিয়মবিগর্হিত সহরের শোচনীয় অবস্থার জন্য মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রিকায় বিশেষ আলোচনা হইত।

১৭৫৭-৬০, ১৭৬০-৬৫, ১৭৬৫ ৬৭, ১৭৬৭-৬৯, ১৭৬৯-৭২ এই পঞ্চদশ বর্ষে কলিকাতার গভর্ণরগণ—ক্লাইভ, ভেরেলেষ্ট, ভান্‌সিটার্ট, কার্টিয়ার কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং বহু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক খাদ্যাভাবে কলিকাতায় আসায় প্রায় ৭৬ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং এই মৃতদেহগুলি নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করায় ও কতকগুলি রাস্তায় গলিত হইতে থাকায় সহরের স্বাস্থ্য অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল।

১৭৭২-৮৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস সহরকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যপ্রদ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পুলিসের হস্তে অধিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের সহরাংশকে ৩৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং এ

সম্বন্ধে অধিক দূর অগ্রসর হইবার জন্য দেশীয়দিগের সম্মতি গ্রহণার্থ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অর্থব্যয় হইয়াছিল। "গভর্ণমেণ্ট বাড়ীর" পূর্ব্বদিকে "স্কচগির্জ্জা" পর্য্যন্ত ৬০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, কয়েকটি প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান, উহাদের একটিতে পুষ্করিণী, ট্র্যাণ্ড রাস্তা ২৷৩ মাইল, বৈঠকখানা রাস্তা, চৌরঙ্গী, রসা পাগলা ও চিৎপুর রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কর্দ্দমময় "খাড়ি", খাল ও নদীর ধারের উন্নতি করা হইয়াছিল। এই সমস্ত সত্ত্বেও কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আরও অনেক কার্য্য হইতেছিল এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা একটি বিশেষ অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং এ জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধিকাংশ জজ জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইতেন না।

১৭৭৭-৮০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকিণ্টস নামক :কোন ইংরাজ এই সময় কলিকাতার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন—পশ্চিমে কালিফোর্ণিয়া হইতে পূর্ব্বে জাপান পর্য্যন্ত কোন সহর দেখা যায় না—যথায় স্বাস্থ্য, রাস্তা, যাতায়াতের সুবিধা, সুরুচি প্রভৃতির নিয়ম এত জঘন্যরূপে লঙ্ঘন করা হয়। রাস্তা সংকীর্ণ ও বাঁকা ও ময়লাযুক্ত ও যাতায়াতের অসুবিধাজনক, ইহার পার্শে উন্মুক্ত অপরিষ্কৃত, অতিশয় ময়লা, পূতিগন্ধময় ড্রেণ, অস্বাস্থ্যকর ময়লা, দূষিত জলযুক্ত গর্ত, কূপ ও পুষ্করিণীর অভাব নাই এবং মশক জন্মিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। নানারূপ ময়লা ও আবর্জ্জনা হইতে মক্ষিকাকুল জন্মিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। রাস্তায় নিক্ষিপ্ত ময়লা কুকুর, শৃগাল, কাক, চিল ও শকুন দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়। বাড়ী বাড়ী হইতে যে ধূম নির্গত হয়, উহা দ্বারা মশক ও মক্ষিকার উৎপাত কিঞ্চিৎ নিবারিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

তাঁহার এই মন্তব্য তখনকার কলিকাতার মশক-মাছি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিলেও ১৭৭০-৮০ খৃষ্টাব্দে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ের স্বাস্থ্যের বিশেষ অবস্থার কিছুই প্রকটিত করে না।

১৭৮ খৃষ্টাব্দেও সহরের পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল কিরূপে দূষিত হইত তা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়;—"এই ঐশ্বর্য্যশালী নগরের মধ্যস্থলে, চক্ষুর সম্মুখে ৬ শত বর্গ-ফুট জমীতে পর্টুগীজরা বৎসরে প্রায় ৪ শত মৃতদেহ অতিস্বল্পগভীর গর্ত্তে প্রোথিত করেন ও সামান্য দেড় ফুট মাত্র মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করায়, বৃষ্টিতে ঐ গলিত দেহ ধৌত হইয়া নিকটস্থ ব্যবহার্য্য পানীয় জলাশয়গুলিকে অতিশয় দূষিত করে। কবরের উপরস্থ মৃত্তিকা বৃষ্টি দ্বারা ধৌত হইয়া দেহগুলি উপরে দৃষ্ট হইতে থাকে এবং উহা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া বায়ুকে অস্বাস্থ্যকর করে।" এই কবরস্থান আর্ম্মেনিয়ান গির্জ্জার নিকট অবস্থিত ছিল। কিরূপে জল দূষিত হইত এবং উহা ব্যবহারে কিরূপে বিসূচিকা প্রভৃতি আন্ত্রিক ব্যাধি জন্মিয়া লোকক্ষয় করিত, তাহা অনুমেয়।

অনেক সময় দেখা যাইত, লোকবহুল রাস্তা দিয়া গরীবদের মৃতদেহ ডোমরা রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিতেছে। কোথাও বা বহু লোকপূর্ণ বাজারের নিকট গলিত মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত। স্থানীয় অধিবাসীরা অর্থ দ্বারা বাধ্য করিয়া ডোম দ্বারা উহা দূরে অপসারিত করাইত।

এই সময় কলিকাতা জঙ্গলময় জলা ভিন্ন কিছুই ছিল না। নিকটে বড় জঙ্গল, ইহার চারি পার্শ্বে নানারূপ ময়লাবাহী খাদ—৩০ বৎসর যাবৎ ছিল এবং নদীর ধার মনুষ্য ও জন্তুর মৃতদেহ দ্বারা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরিণত হইত। সহরের চারি পার্শ্বের প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর এবং সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হইয়া সহরকে বিধ্বস্ত করিত।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ক্যাম্বেল সহর পরিষ্কার ও ড্রেণ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন দেখাইয়া এক প্রস্তাব করেন, কিন্তু বোর্ড ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জমীর উপর শত করা ৭-১৪ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন এবং উহা দ্বারা সহরের ড্রেণ ও পরিষ্কার কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

ডালহৌসী পুষ্করিণী বা লালদীঘি ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় য়ুরোপীয়গণ উহা ত্যাগ করিয়া চৌরঙ্গীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং পুলিস কমিশনার ২৬শে আগষ্ট, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ট্যাক্স রেহাই জন্য হুকুম প্রচার করেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হেঙ্কেল সহরের নিকটস্থ অনেকটা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার জন্য অভিযোগ হইতেছিল। কারণ, লোক রাস্তায় যথায় তথায় মলমূত্রাদি ত্যাগ করিত; চুরি প্রভৃতির দমন হইত না। ইহা পুলিস কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ৯ই জুন, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সহরের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন এবং ঝাড়ুদারদিগের কার্য্যের পুনর্ব্যবস্থা করেন। ঝাড়ুকার্য্যের সুবিধার জন্য গভর্ণর জেনারলের মতানুসারে নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হয়:—(১) সহর ৩১ ভাগে বিভক্ত করিয়া ৩১ জন থানাদারের অধীনে রাখা হয়, (২) য়ুরোপীয় সহরের প্রত্যেক থানার জন্য ৪ খানা গরুর গাড়ী ও সহরের দেশীয় অংশের প্রত্যেক থানার জন্য ২ খানা গাড়ী—ময়লা, আবর্জ্জনা দূর করার জন্য থাকিবে। (৩) ময়লা দূর করা বা চুরি প্রভৃতি নিবারণ জন্য প্রত্যেক থানায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে; তথায় প্রার্থনা নিষ্ফল হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাঁহার আপিসে যাইয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। (৪) রাস্তায় ময়লা, আবর্জ্জনা, রাবিস প্রভৃতি নিক্ষেপ সম্বন্ধে নিয়মগুলি বিশেষরূপে প্রতিপালিত করাইতে হইবে।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উপরি-লিখিত নূতন নিয়মানুসারে আবর্জ্জনা দূর করার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা হইলেও রাস্তায় আবর্জ্জনা-ময়লার হ্রাস পায় নাই। রাবিস, আবর্জ্জনা প্রভৃতি লোকের বাড়ীর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হইত এবং উহা অতি অস্বাস্থ্যকর ছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় কলিকাতা গেজেটে এই বিষয়ে বিশেষভাবে অভিযোগ হইয়াছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য, মন্দ স্বাস্থ্য ও চুরি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা কিছু কিছু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কতকগুলি পুরাতন ড্রেণ পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং পুরাতন বাজারের মৃত্তিকা-দেওয়াল ও খড়ের চালাযুক্ত ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে দেখা যায়;—অনিয়মে বিচ্ছিন্নভাবে প্রস্তুত খড়ের চালাযুক্ত পুরাতন বাজার কেবল নানারূপ ময়লা আবদ্ধকারী ও সংক্রামক ব্যাধি ও সমাজের শত্রু চোর এবং ডাকাতের আশ্রয়স্থল। ডাকাতি, চুরি প্রত্যহ হইত, তাহার কোন প্রতিকার হইত না। প্রধান কর্ম্মচারী গভর্ণমেণ্টের নিকট ড্রেণগুলি, বিশেষতঃ "মালখানা" হইতে যেগুলি আরম্ভ হইয়াছিল—পূর্ণ করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে ড্রেণের অবস্থা ও আবর্জ্জনা সংগ্রহ ও দূর করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে আলোচিত হইয়াছিল;—রাস্তার দুই পার্শ্বের উন্মুক্ত নালায় লোকবহুল সহরের ময়লা সূর্য্যোত্তাপে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত করিতে থাকে। এই ময়লা নালা হইতে বাহির হইয়া দূরে যাইবার কোন ব্যবস্থা নাই এবং উহা সময় সময় রাস্তার উপর উঠাইয়া ফেলা হয়; তথায় উহা শুষ্ক হইতে থাকে ও রাস্তা ও বায়ুকে অস্বাস্থ্যকর করে এবং শেষে ঝাড়ুদার দ্বারা সংগৃহীত হইয়া দূরীভূত হয়।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ভাল পানীয় জলের অভাবে তিনটি পুষ্করিণী খনন জন্য হুকুম প্রচারিত হয় এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনটি পুষ্করিণী খনিত হয়। একটি চৌরঙ্গী ও এস্‌প্লানেডের সংযোগস্থলে ; এইটি এখন মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া ট্রামগাড়ী যাতায়াতের স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। অন্য দুইটি ময়দানে—একটি আস্তাবলের নিকট ও অন্য একটি বড় জেলের নিকট। এই পুষ্করিণী হইতে যে মৃত্তিকা উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ময়দান ও উহার নিকটবর্ত্তী নীচু জলাভূমি পূর্ণ করিয়া উঁচু করা হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর ধনী মনোহর দাস স্বীয় ব্যয়ে চৌরঙ্গীতে আর একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও—সহর বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে—স্বাস্থ্যও অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ১৭২৭-১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহরের জমীদার, ইহার রাস্তা, জল, ড্রেণ ও পুলিসের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সহরের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকায় উহার উন্নতির জন্য ঐ ক্ষমতা তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের আমলের আইনানুসারে নিযুক্ত "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্" নামক কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পণ করা হয়।

এই সময় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাক কর্ত্তৃক প্রথম "অ্যাসেস্‌মেণ্ট" হয়। "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্"গণ বিশেষরূপে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া সহরের স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আইন দ্বারা মাদকদ্রব্য বিক্রয় জন্য ফিস লইয়া "লাইসেন্স" দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অর্থ আবর্জ্জনা দূর ও পুলিস রক্ষার্থ ব্যয় করা হইত। কিন্তু তথাপি অনেক দোষ রহিয়া গেল। সহর বিশেষ পরিষ্কৃত হইল না। জষ্টিস্‌গণ দ্বারা তবুও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহরের ঐ সমস্ত কার্য্য চালান হইল। এরূপ হুকুম হইয়াছিল যে, জষ্টিস্‌গণ সহর চৌকী, ড্রেণ মেরামত ও সহর পরিষ্করণ কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবেন। অ্যাসেস্‌মেণ্ট অনুসারে কলিকাতার কলেক্টর মিঃ গ্রাডউইন ট্যাক্স আদায় জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত পাকা বা কাঁচা বাড়ীর বা জমীর বাস্তবিক মূল্যের $\frac{১}{২০}$ অংশ ট্যাক্সরূপে ধার্য্য হইয়াছিল। এই শতকরা ৫ টাকা ট্যাক্স, যে সহর দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছিল, উহার স্বাস্থ্য ও পুলিসরক্ষার্থ একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সহরের লোকসংখ্যা অনুমান ২।০ লক্ষ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গণনায় লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯ শত ১৭; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পরে ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গণনায় লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৭ শত ১৪ ; ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ২ লক্ষ ১০ হাজার ছিল। ইহা সমস্তই অনুমান মাত্র। ইহার পরে, বিশেষতঃ সিপাই বিদ্রোহের পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬ শত ৬২ জন হইয়াছিল। বন্দর ও কেল্লার লোকসংখ্যা ও প্রত্যহ যে সংখ্যক লোক কার্য্য জন্য আসিত ও প্রত্যহ চলিয়া যাইত, তাহাদিগকে গণনা করা হয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ও পরে সহরে "লটারী" হইত ; তখন লটারী কমিশন ছিল। কতকগুলি ভাল রাস্তা ও গির্জ্জা "লটারীর" অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বহুলোক "লটারীতে" যোগ দিত এবং উহা দ্বারা অনেক অর্থও সংগৃহীত হইয়া সদ্ব্যয় হইয়াছিল।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সহরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি লর্ড ওয়েলেস্‌লীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটীর দ্বারা ও লটারী কমিটির অর্থ দ্বারা সহরের স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন বড় বা বিশেষ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করা হয় না। সহরের সাধারণ "চেহারা" ও ইতস্ততঃ কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল মাত্র। সার্কুলার রোড ইঁহাদিগের দ্বারা পাকা করা হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর কলিকাতা গেজেটে বৈঠকখানা রাস্তা, চৌরঙ্গী, বেন্‌টিন্‌ক্ ও চিৎপুর রাস্তা কন্‌ট্রাক্ট দ্বারা "পাকা" করিবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। "জষ্টিস্ অব দি পিস"গণ দ্বারা রাস্তা বা গলির কোন অংশের উপর বাড়ী প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর মতে কলিকাতায় বৃষ্টির শেষে যে জল সহরের ড্রেণে, নালায় ও সহরের নিকট জমিয়া থাকিত, উহাই কলিকাতার মন্দ স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ কারণ।

সহরের মন্দ ড্রেণ, অত্যধিক লোকসংখ্যা, বাড়ীগুলিতে বায়ু যাতায়াতের অভাব, ময়লা ও দূষিত পুষ্করিণী—ডাক্তার মার্টিন ও নিকলসনের পুনঃ পুনঃ লেখা ও রিপোর্ট দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত বিষয়ের উন্নতিসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবন

বর্ত্তমান যুগের লোক আমরা ভাবি যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সুতরাং আধুনিক সভ্যসমাজের সহিত কোন দেশের প্রাচীন যুগের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে পারিলে, তাহা সেই দেশের গৌরবের বিষয় হয়, কিন্তু প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবন এ কালের ছাত্রজীবন হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে কালে এ দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রাচীন ভারতের বর্ণনায় আমি সেই কালকেই লক্ষ্য করিব। মৃত্যু দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীবনভাগ, তাহাতে সুখে থাকিবার উপযোগিতালাভই বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা সুখান্বেষী ছিলেন না। তাঁহারা শান্তিকামী ছিলেন। সুখ ও শান্তিতে প্রভেদ আছে। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পৌষমাসের শীতে ভোরবেলায় যখন বিছানার সুখ উপভোগ করেন, তখন শান্তিকামী হিন্দু প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্ট-চিন্তায় নিরত হয়েন। সুখ বাহ্য উপাদানের উপর নির্ভর করে এবং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ব্যস্ততা ও অস্থিরতার সহিত তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। পক্ষান্তরে, শান্তি বাহ্য অবস্থানিরপেক্ষ মনের অবিক্ষিপ্ত অবস্থামাত্র। সুখ রজোগুণলভ্য, শান্তি সত্ত্বগুণের বিকাশ। সুতরাং যে ছাত্রজীবনের লক্ষ্য সুখ, শান্তিকামী ছাত্রজীবনের সহিত তাহার ঐক্য থাকিতে পারে না।

দৃশ্যমান জড় জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের সম্প্রসারণই আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রাচীনকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞানই শিক্ষার বিষয়ীভূত ছিল। ইহকালের স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের সাধনার বিষয়, কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষরা ঐহিক ও পারত্রিক জীবন যাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পথে পরিচালিত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তেমন ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রণীত ও প্রচলিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবনের সাধ্য, সাধনা ও সিদ্ধি বর্ত্তমান যুগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু কোন দেশেই তাহা এ যাবৎ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা বাধ্যতামূলকই ছিল। সমাজ তখন কর্ম্মবিভাগানুসারে চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নির্দ্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার না করিলে চলিত না। উপনয়নের সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিতে হইত।

কোন ব্রহ্মচারী চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ বা দুইটি বেদ অধ্যয়ন

করিতেন। অন্ততঃ একটি বেদ অধ্যয়ন না করিলে কাহারও সমাবর্ত্তন হইত না। সুতরাং দ্বিজ-সংজ্ঞক ত্রিবর্ণের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলকই ছিল। শূদ্রবর্ণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কল্প, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও শিল্পবিদ্যাদি অধ্যয়ন করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রকৃতিতে তমোগুণের প্রাধান্যবশতঃ অল্পসংখ্যক শূদ্র শুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চায় আকৃষ্ট হইতেন। পক্ষান্তরে, শিল্পবিদ্যা তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল। বিষ্ণু-সংহিতা প্রভৃতিতে ব্যবস্থা আছে, "শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি।" কিন্তু শূদ্রের জন্য কোন বিদ্যাই বাধ্যতামূলক ছিল না। তথাপি সমাজের তিন-চতুর্থাংশ লোক শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য ছিলেন, এবং সেই শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষামাত্র ছিল না। এখনও আমরা ব্রাহ্মণ-সমাজে দেখিতে পাই যে, বিদ্যারম্ভ এবং উপনয়ন, দুইটি ক্রিয়া প্রচলিত আছে। পুরাকালে বিদ্যারম্ভের পরে তৎকালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দ্বিজ-বালক উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত উপনীত হইত অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইত। এই বিদ্যারম্ভের আনুষঙ্গিক প্রাথমিক শিক্ষায় শূদ্রদিগেরও অধিকার ছিল। বর্ত্তমান অবাধ অধিকারের যুগেও আধুনিক শূদ্ররা প্রকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন না। স্বকীয় বুদ্ধি খাটাইয়া সঙ্কল্পসিদ্ধির শক্তি প্রকৃতি যাহাদিগকে দেন নাই, যাহারা কেবল আদেশপালন দ্বারা অন্যের সঙ্কল্পসাধনার সহায় হইতে সমর্থ, তাহারাই প্রকৃত শূদ্র এবং ইহারা সকল দেশে ও সকল কালে বিদ্যমান ছিল ও আছে এবং অসম্ভাবিত উপায়ে প্রকৃতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে এবং সেবা অর্থাৎ অন্যের আদেশপালন দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতে থাকিবে।

এখন চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষা যত দূর প্রসার লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে কত কাল পরে তাহা সংঘটিত হইবে, কল্পনা করা যায় না। পূর্ব্বকালে শূদ্রের সংখ্যা অত্যধিক ছিল না। এখনও নাই। সঙ্করজাতিগুলি সকলই প্রকৃত শূদ্র সংজ্ঞার অন্তর্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই কালে জন্ম দ্বারা কাহারই শিক্ষার অধিকার সীমাবদ্ধ নহে, তথাপি আধুনিক নামমাত্র উচ্চশিক্ষা আশুতোষের অপার কৃপাসত্ত্বেও আশানুরূপ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, শিক্ষার ফল সমাজের পক্ষে শুভ না হইয়া অশেষ অমঙ্গলের কারণ হইতেছে। অন্নসমস্যা, বেকার-সমস্যা, অসন্তোষ, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি শিক্ষার অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বিস্তার এই সকল অশুভ ফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। তখন বর্ণ-বিভাগের সহিত বৃত্তি-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক বর্ণ অন্য বর্ণের বৃত্তি হরণ করিতে পারিত না। এখন যে যুবক কলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে, সে বা তাহার অভিভাবক বলিতে পারিবেন না যে, সংসারে সে কোন্ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবে; ঘটনাস্রোত তাহার কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক ছাত্র জানিত যে, সমাবর্ত্তনের পরে তাহাকে কি কর্ম্ম করিতে হইবে, অথবা কোন্ বৃত্তি তাহার জীবিকা অর্জ্জনের অবলম্বন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশের বলে অর্থদেবতার পৌরোহিত্যলাভ তাহার অধ্যয়নের লক্ষ্য ছিল না। পরন্তু বেদাধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃতির মূল সত্যগুলি অবগত হইয়া তৎসাহায্যে প্রকৃতির অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামক্রোধাদি রিপু ও শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মানাপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমূহের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজলাভ বা স্বরাট্ হওয়াই দ্বিজ মানবকের প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভই প্রকৃত স্বরাজ, কারণ, এই স্বরাজ-লাভ ঘটিলে ইহকাল পরকাল অনন্ত কালের জন্য মানুষ স্বাধীন হইয়া যায়। সেই যুগে সকলেই যে স্বরাজ বা মুক্তি লাভ করিত, এমন নহে, কিন্তু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং শিক্ষা দ্বিজসংজ্ঞক ত্রিবর্ণের প্রথমাশ্রমোচিত প্রধান সাধনার বিষয় ছিল। এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৈধ ভোগের সহিত মুক্তির বিরুদ্ধতা স্বীকার করিতেন না। অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় বৈধ ভোগবহুল গার্হস্থাশ্রম মুক্তির সাধনরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ গৃহস্থ ছিলেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করিতেন, তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক ছিলেন এবং শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যারই উপদেশ দিতেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি কি ছিল, তাহার অনুধাবন আবশ্যক। বিদ্যারম্ভ ক্রিয়ার সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা নহে। বর্ণ, সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষাই ইহার অন্তর্গত ছিল। উপনয়নের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা আরব্ধ হইত।

শিক্ষার বিষয়

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রধানতঃ মানসিক চর্চ্চায় সীমাবদ্ধ হইলেও তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষ্য ত্রিবিধ;—শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বিষয় ছিল চতুর্ব্বর্গ। এই চতুর্ব্বর্গের নাম— ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তন্মধ্যে ধর্ম্ম স্বাস্থ্যরক্ষার নামান্তর মাত্র। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। দেহ সম্পর্কে ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইলে আমরা সুস্থ থাকি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে আমরা অসুস্থ হই। স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম পালন করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, অর্থাৎ যে শক্তি আমাদের সত্তাটি ধারণ করিয়া আছে, তাহা প্রকৃতিস্থ থাকে, সুতরাং এই শাস্ত্রের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তাহার প্রণেতা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক নামে আখ্যাত। দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল দেহের স্বাস্থ্য রক্ষাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট। তাহাতে এমন বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে, যাহার অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াধার স্থূলদেহ, ভাবময় কামদেহ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানাশ্রয় কারণ-দেহের ধর্ম্ম বা স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শৌচবিধির দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি, এই উভয়বিধ শুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আসন, মুদ্রা, আহার, বিহার প্রভৃতির নিয়ম পালন দ্বারা স্থূলদেহের; আহ্নিককৃত্য, তিথিকৃত্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান সাহায্যে ভাব-সংযম দ্বারা কামদেহের এবং স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা কারণদেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রমোন্নতিসাধন ঘটিত। সুতরাং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই তিন প্রকারের শিক্ষাই চতুর্ব্বর্গমধ্যে কেবল প্রথম বর্গ ধর্ম্মের সাধনার অন্তর্গত ছিল।

দ্বিতীয় বর্গ অর্থ।—ইহার সাধনা জীবিকার্জ্জন। এ স্থানে প্রয়োজনার্থ অর্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবনধারণের নিমিত্ত এবং অন্য ত্রিবর্গের সাধনার্থ যাহার একান্ত প্রয়োজন, তাহাই অর্থ। প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি বা জীবিকার উপায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই পৈতৃক বৃত্তির সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে প্রস্তুত হইতে হইত। ইহাই অর্থ বর্গের শিক্ষা। বেদাধ্যয়নের সঙ্গে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছাত্রকে অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক্ প্রভৃতির কর্ম্ম শিখিতে হইত। তদ্রূপ ক্ষত্রিয় ছাত্র ধনুর্ব্বেদ ও রাজনীতি ইত্যাদি এবং বৈশ্য ছাত্র কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্যবিষয়ক শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। শূদ্রের পুথিগত বিদ্যা ইচ্ছাকৃত হইলেও শিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখন আমরা যাহাকে ইংরাজীতে Technical Education বলি, তাহা এবং তাহার অতিরিক্ত কিন্তু তজ্জাতীয় বিষয়, অর্থ বর্গের অন্তর্গত ছিল।

তৃতীয় বর্গ কাম।—স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যাহার প্রয়োজন নাই, এমন বিষয় কামনায় বিষয়ীভূত হইলে তল্লাভের যে উপায়, তাহাই কামবর্গের শিক্ষণীয়। অভিচারাদি কামবর্গের অন্তর্গত। ইহা অথর্ব্ববেদে শিক্ষা করিতে হইত। তন্ত্রশাস্ত্রে কামবর্গ উড্ডীশের অন্তর্গত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের সাহায্যে পাদুকা সিদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শন (Clairvoyance), সূক্ষ্ম শ্রবণ (Clairaudience) প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করা হইত। পক্ষান্তরে মারণ,

উচ্চাটন, বশীকরণাদি এবং মন্ত্রচিকিৎসা, ভাবচিকিৎসা (যাহা এখন Christian treatment নামে আমেরিকায় প্রচলিত হইতেছে) স্পর্শ-বিভূতি (Psychometry) প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিদ্যা ছিল। বর্ত্তমান যুগে অনেকেই এই সকল বিষয়ে বিশ্বাসহীন এবং পুরাকালেও এই বিদ্যা অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল না। বরং যাঁহারা রিপু জয় করিয়া হিংসা-দ্বেষের অতীত হইতে না পারিতেন, তাঁহাদিগকে এই বিদ্যার অনধিকারী বলিয়া গণ্য করা হইত। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ বর্গ মোক্ষ।—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট জীবকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। যজ্ঞ অর্থ দেবোদ্দেশে ত্যাগ। নিষ্কাম হইয়া ভগবানের নামে কর্ম্ম করিলে তাহাতে অদৃষ্ট জাত হয় না এবং তজ্জনিত বন্ধন ঘটে না। অতএব বাসনাত্যাগই মুক্তির হেতু। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই বাসনা ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

পরিদৃশ্যমান জগৎ কোথা হইতে আইসে ও কিসে লীন হয়, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং মায়াজনিত অজ্ঞান বা মিথ্যা ধারণা দূরীভূত হয়। এই আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার প্রভাবে বাসনা থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির সাধন। প্রাচীন ভারতে মুক্তিই একমাত্র কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য সকলেই যত্ন করিতেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, কেবল ব্রাহ্মণরা বা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, চতুর্ব্বর্ণই মুক্তির অধিকারী, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যালাভেরও অধিকারী। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য পরং বিন্দতি মানবঃ" অতএব শূদ্রও তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ ত্রিবর্ণের সেবাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। এ কথা শুনিয়া কেহ চমকাইবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতিই ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহাতে শূদ্রের অধিকার ছিল না বলিয়া মুক্তির সাধন পরা বিদ্যায়ও শূদ্রের অনধিকার ছিল, তাঁহাদের ধারণা সত্য নহে। মুণ্ডকোপনিষদে স্পষ্ট বাক্য আছে যে, বেদ উপনিষৎ হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল প্রকার পুঁথিগত বিদ্যাই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা এবং পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহা—যদ্দ্বারা তৎশব্দের বাচ্য সেই অক্ষরকে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই পরাবিদ্যা কোন গ্রন্থ হইতে শিক্ষা করিবার বস্তু নহে, তাহা কেবল গুরুকৃপায় লাভ করা যায়। গুরুকৃপা ও সাধন ব্যতীত, কেবল গুরূপদেশেও এই পরা বিদ্যা অধিগত হয় না। এই নিমিত্ত ভগবান্ই গীতায় বলিয়াছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" শূদ্রগণও পুরাকালে গুরু লাভ করিতেন, এখনও করিয়া থাকেন। সাধনাদির অভাবে পুরাকালেও সকলের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিত না, এখনও জন্মে না। আমি এমন বর্ণজ্ঞানহীন শূদ্র দেখিয়াছি, যিনি আমার ন্যায় উপনিষৎপাঠক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকতর অগ্রসর। বর্ণজ্ঞানহীন হইয়াও যে পরা বিদ্যায় অগ্রসর হওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন ভারতে মুক্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের উন্নতির নিমিত্ত যত প্রকার প্রতিষ্ঠান ছিল, তৎসমস্তের শেষ লক্ষ্য ছিল মোক্ষ। মুক্তির প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া জীবনযাত্রার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির মূলেও মুক্তির সাধনা বিদ্যমান ছিল। শিক্ষার্থীদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সংযমের অনুশীলন করিতে হইত। সংযমের ফলে অনাসক্তি সুলভ হইয়া পড়িত এবং অনাসক্তি বা নিষ্কামতাই মোক্ষসাধনার প্রথম স্তর। কিন্তু অনাসক্তি বশতঃ জড়তা আসিতে পারিত না। কারণ, সম্যক্ অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে উৎসাহের অভাব ঘটিতে পারিত না।

শিক্ষার প্রণালী

ব্রাহ্মণ-বালকের পঞ্চম বর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ ও অষ্টম বর্ষে তাহার সমাপ্তি ঘটিত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বালককে আরও কিছু কাল এই বৈষয়িক শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বালকের সাধারণতঃ অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হইত। উপনয়নের সঙ্গে যে শিক্ষার প্রারম্ভ, তাহার বর্ণনা করিতেছি।

বিদ্যার্থী বালককে আচার্য্য প্রথম উপদেশ দিতেন,—"মমব্রতে তে হৃদয়মস্তু।" অর্থাৎ "আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিযুক্ত হউক।" অনন্ত জগৎ, অনন্ত জ্ঞান এবং বৈচিত্র্যই প্রকট অনন্তের প্রধান লক্ষণ। হে মানবক, তুমি বয়স এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে এই বৈচিত্র্যময় জগতে কত নব নব ভাব উপলব্ধি করিবে এবং মানবজীবনের কত নব নব আদর্শ দেখিতে পাইবে। কিন্তু বিভিন্ন আদর্শের মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যদি তুমি জীবনের ব্রত পরিবর্ত্তন কর, তবে জীবন বিফল হইয়া যাইবে। তুমি যখন স্ব-ইচ্ছায় আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছ, তখন আমার ব্রত, আমার আদর্শই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহা কিছু জ্ঞান সম্পত্তি, তপঃ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিবে, তাহা এই ব্রতের উদ্যাপনার্থ নিয়োগ করিবে। দেখ, যেন কখনও আদর্শান্তর গ্রহণ করিয়া ব্রতচ্যুত হইও না।" ইহাই প্রথম উপদেশ। ছাত্রের চরিত্রগঠন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে এই উপদেশের সম্যক্ প্রতিপালন একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই উপদেশের স্থান নাই। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ছাত্রের জীবনের ব্রত নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ার ভার তাঁহাদের উপরে ন্যস্ত নহে, তথাপি যদি কেহ চরিত্রের দৃঢ়তা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহার কোন ছাত্রকে একটি ব্রত ধরাইবার চেষ্টা করেন, তবে তিনি পদে পদে অনুভব করেন যে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। আদর্শ সম্পর্কে অনুপদিষ্ট বালক স্বভাবতঃ পিতার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বাহিরের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া পরে সে পিতার আদর্শকে যে হেয় জ্ঞান করিতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শিক্ষক হইতে আদর্শ গ্রহণের স্থল অত্যল্প, কারণ, শিক্ষক এক জন নহেন এবং আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা শিক্ষকগণের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ শিক্ষকেরই জীবনের কোন ব্রত নাই। পক্ষান্তরে, সামাজিকগণের মধ্যে যাঁহারা কোন ব্রত বা আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বকালের ন্যায় কেবল জিজ্ঞাসুকে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন না। পরন্তু দলবৃদ্ধির নিমিত্ত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন। ইঁহারা ছাত্রদিগকে শ্রোতৃরূপে পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়েন, কারণ, ছাত্র অপেক্ষা কেহই তাঁহাদের আদর্শে অধিকতর আকৃষ্ট হয় না। এমন দেখা গিয়াছে যে, একটি ছাত্র কোন সমাজ-সংস্কারকের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ব্রত গ্রহণ করিল এবং সমাজ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। কিছু দিন পরে এক ধর্ম্মবক্তা আসিয়া তাহাকে এমন মুগ্ধ করিলেন যে, সে এখন প্রাতঃস্নান, চাতুর্ম্মাস্য ও জপ-তপ করিয়া আর সমাজ-সংস্কারের অবসর খুঁজিয়া পায় না। আরও কিছু কাল পরে কোন রাজনৈতিক বক্তা তাহাকে দেশভক্তিতে ডুবাইয়া দিলেন এবং সে পূর্ব্ব-গৃহীত ব্রত ভুলিয়া গিয়া স্বেচ্ছা-সেবকের কায আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল যে, সেই ছাত্রটি এখন যুবক গৃহস্থ হইয়াছে এবং তাহার জীবনের কোন ব্রতই নাই, অথবা যদি থাকে, তবে তাহা অর্থার্জ্জন ও পরিবার-প্রতিপালন মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে জাতীয় জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, এ দেশে ব্যক্তিগত জীবনের ব্রত ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে

এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ গঠিত হয় নাই। ফল এই হইয়াছে যে, আমরা প্রায় সকলেই ব্রতহীন জীবনযাপন করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে বালকের পিতা স্বীয় আদর্শের অনুরূপভাবে আচার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার হাতেই পুত্রকে সমর্পণ করিয়া দিতেন। আচার্য্য বালকের উপনয়ন সংস্কার করিয়া তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইত। এ কালের শিক্ষক ভয়ের শাসন দ্বারা ছাত্রকে পাঠ শিক্ষা করিতে বাধ্য করেন, এবং বাহিরের শাসন দ্বারা তাহার নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছাত্ররা শাসন এড়াইয়া অধ্যয়ন বিষয়ে শিক্ষককে ফাঁকি দিতে পারিলে সাধারণতঃ তাহাতে ত্রুটি করে না এবং দুষ্কার্য্য হইতে বিরত না হইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে। এমন ভাব দেখা যায় যে, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হওয়া যেন ছাত্রের স্বার্থ নহে, তাহা যেন শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রতি অনুগ্রহমাত্র। প্রাচীন ভারতে ইহার বিপরীত অবস্থা ছিল। শিষ্য জানিত যে, জিজ্ঞাসু না হইলে গুরুর নিকট কোন উপদেশ লাভ করা যাইবে না। গুরুদেব সর্ব্বজীবে করুণাময় এবং শিষ্যের প্রতি স্নেহশীল, কিন্তু বদ্ধমুখ পাত্রে জল ঢালার ন্যায় তিনি অজিজ্ঞাসুকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না। কোন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পালন না করিলে অন্য উপদেশলাভ যে দুর্ঘট হইবে, তাহাও শিষ্যের অবিদিত ছিল না। সুতরাং শিষ্য জানিত যে, গুরুশুশ্রূষা ও সম্যক্‌ভাবে গুরুর আদেশপালন ব্যতীত তাহার বিদ্যালাভ অসম্ভব। অতএব শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ গুরুর না হইয়া শিষ্যেরই হইত এবং ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

উপনয়ন কর্ম্মের চারিটি অংশ আছে:—(১) বস্ত্র পরিধান, (২) মেখলা গ্রহণ, (৩) দণ্ড গ্রহণ এবং (৪) গায়ত্রী গ্রহণ। আমি এই সকল কর্ম্মের বিবৃতির প্রয়াস করিব না। কারণ, কালপ্রভাবে এইগুলি এখন অবোধ্য হইয়াছে। এই স্থানে কেবল বলিতে চাই যে, এই চারিটি ক্রিয়াই আভ্যন্তরিক ব্যাপার। তন্মধ্যে প্রথমটি গুরু সম্পাদন করিয়া দিয়া শিষ্যের তপঃসঞ্চয়ের বিঘ্ন দূর করিতেন এবং অবশিষ্ট তিনটি শিষ্য এক দিনে আয়ত্ত করিতে পারিত না; তাহা দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা-সাধ্য ছিল।

সাধারণতঃ ষোল বৎসরকাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। জীবনের এই অংশ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে আখ্যাত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য পর পর করণীয় চারি অংশে বিভক্ত ছিল। এই চারি অংশের নাম—(১) সাবিত্রী, (২) প্রাজাপত্য, (৩) ব্রাহ্ম ও (৪) বৃহৎ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এই বিভাগগুলির লাক্ষণিক বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে সত্যনির্দ্ধারণের নিমিত্ত কিরূপ পন্থা অবলম্বিত হইত, তাহা বলা আবশ্যক।

প্রাচীন ও আধুনিক কালনির্ব্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রকৃতিই ভগবানের একমাত্র গ্রন্থ। ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ হয় ত অস্বীকার করিবেন না, এই প্রকৃতি গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়াই বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি অপৌরুষেয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এ কালের বৈজ্ঞানিকগণও প্রকৃতি-গ্রন্থের পাঠোদ্ধারেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু প্রাচীন প্রণালীর সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ঐক্য নাই। আমি কেবল বেদকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন প্রণালীর বিষয় বলিব। বিদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং ইংরাজী Science শব্দের অর্থও জ্ঞান, তথাপি বেদ ও Science একার্থবাচক নহে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না এবং বৈজ্ঞানিককে ঋষি বলা যায় না। ইহার কারণ এই যে, আবিষ্কৃত সত্যের ছন্দ ও দেবতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কোন জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং সমগ্র সত্যটি বৈজ্ঞানিকের নিকট ধরা পড়ে না। ছন্দ ও দেবতা কি? আর্য্য-শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বুঝিয়াছেন যে, এ জগৎ স্পন্দনসমষ্টি মাত্র। স্পন্দন-তত্ত্ব যোগবাশিষ্ঠে বিবৃত আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দরূপে প্রকৃতি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। রূপ, রস প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের ছন্দ বা তাল আছে এবং প্রত্যেক ছন্দের নিয়ামক একটি শক্তি আছে। আর্য্যশাস্ত্রমতে এই শক্তি জড় বা বুদ্ধিহীন নহে, পরন্তু সচেতন বুদ্ধিযুক্ত (intelligent) বটে। এই শক্তিকেই দেবতা বলা হয়। বৈদিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় এক একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগৎবিষয়ক হইতে পারে এবং তাহাকে মানবের মঙ্গলার্থ বিভিন্ন কর্ম্মে বিনিয়োগ করিবার বিধি বেদে ব্রাহ্মণাংশে ব্যবস্থিত হইয়াছে। কোন সত্যের বা প্রাকৃতিক নিয়মের ছন্দ ও দেবতা জানিতে না পারিলে সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়ম যে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার কারণ—ছন্দের অপরিবর্ত্তনীয়তা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই অপরিবর্ত্তনীয়তা অব্যাহত রাখেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা সত্যের আবিষ্কার করেন, ঋষিগণ কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন না। ঈশ্বরনির্ম্মিত দেহ-যন্ত্রই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রহস্যময় ব্রত ও যজ্ঞাদি দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহগুলির এমন ব্যায়াম তাঁহারা করিতেন যে, এই সকল দেহের নিদ্রিত (latent) শক্তিসমূহ জাগিয়া উঠিত। এই ব্যায়াম শিক্ষাতেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্রজীবনের সূচনা হইত। আত্ম-শক্তির উদ্বোধক প্রথম ব্যায়ামের নাম মেখলা ক্রিয়া। উপনয়নের তারিখ হইতেই এই ক্রিয়া যথানিয়মে করিতে হইত।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগারে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যেরূপ পরীক্ষা দ্বারা যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিজ্ঞানাগারে তাহার পুনরনুষ্ঠান করিয়া সেই সত্যের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ করা হয়। হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। আপনার মধ্যে যে শক্তির বিকাশের ফলে কোন ঋষি যে সত্যের দর্শন পাইয়াছিলেন, শিষ্যের মধ্যে সেই শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সেই সত্যের উপলব্ধি করাইতেন। গুরু ছুঁইয়া দিলেন, আর অমনি শিষ্যের শক্তি ফুটিয়া উঠিল, এরূপ ধারণা কেহ পোষণ করিবেন না। শিষ্যের সাধনা দ্বারা তাহার নিদ্রিত শক্তি স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ পাইত। উপনয়ন ও বেদারম্ভ দুইটি পৃথক্ ক্রিয়া। পূর্ব্বকালে এই দুই ক্রিয়া বর্ত্তমানের ন্যায় এক বৈঠকে সম্পাদিত না হইয়া বিভিন্ন কালে পৃথক্ আভ্যুদয়িকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। ইহার কারণ এই যে, ছন্দ ও দেবতা উপলব্ধি করিবার শক্তি শিষ্যের মধ্যে বিকসিত হইবার পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন আরব্ধ হইত না। এই শক্তি কিয়ৎপরিমাণে ফুটিলেই আচার্য্য শিষ্যকে হাতে-কলমে বেদ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতেন। আচার্য্য-বিহীন বেদ-শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। আচার্য্যবিহীন বেদালোচনার ফলে এই যুগে বেদ "চাষার গান," "মানবজাতির শৈশবকালের অদ্ধস্ফুট ভাষা" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতেছে। বেদের সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝিবার বা তন্নিহিত সত্যের উপলব্ধি করিবার শক্তি গুরুকৃপা ভিন্ন অন্য উপায়ে জন্মিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যপালন, মেখলা ক্রিয়া ও দণ্ড-ক্রিয়া গুরুকৃপার সহযোগী উপায়।

এখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের চারিটি স্তরের বর্ণনা করিতেছি। (১) গায়ত্রী-মন্ত্রোক্ত ভর্গের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার ধ্যান-কৌশল আয়ত্ত করিতে যে সময় লাগিত, তাহা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাবিত্র ভাগ, (২) মেখলা ও দণ্ড-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সহ নির্দ্দিষ্ট ব্রতাদির আবরণ দ্বারা ভুবর্লোকাদিতে অনুভূতি ফুটাইতে যে সময় ব্যয়িত হইত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সেই ভাগই প্রাজাপত্য নামে অভিহিত। (৩) এই ভাবে ক্রমশঃ জাগ্রত সূক্ষ্মানুভব শক্তির সাহায্যে বেদাধ্যয়ন করিয়া যে সময় কাটিত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সেই অংশকে ব্রহ্ম বলা যায়। কারণ, ব্রাহ্ম শব্দ বেদেরই নামান্তর। (৪) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যে শেষ অংশে মন্ত্রার্থের সমালোচনা ও

সামঞ্জস্তবিধান দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠালাভের চেষ্টা চলিত, তাহার নাম বৃহৎ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাবিত্র অংশে ব্রহ্মচারী মানবক অরুণোদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক যজ্ঞার্থ সমিধ্‌সংগ্রহে বাহির হইত। কাষ্ঠভার সহ ফিরিয়া সে দেখিত আচার্য্যদেব প্রাতঃসবন সমাপ্ত করিয়াছেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা প্রাতঃকালীয় আহুতিদানের নাম প্রাতঃসবন। ইহার পরে চমস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা গৃহস্থ (আচার্য্য) প্রাতঃসবনের অবশিষ্ট ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ পরিবারবর্গসহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিতেন। নূতন ব্রহ্মচারী ইহার এক অংশ পাইতেন। ইহার পরে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল আনিয়া গুরুকে দিতে হইত। তৎপরে তাহাকে গুরুর গরু চরাইতে যাইতে হইত। আশ্রমে কখনও পয়স্বিনী ধেনুর অপ্রচুরতা ঘটিত না। রাজন্তবর্গ ও ধনিগণ অধ্যাপনানিরত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা সবৎসা গাভী দান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন। গো-দুগ্ধ, তজ্জাত ঘৃত, শিষ্য-ব্রহ্মচারীর ভিক্ষালব্ধ আতপতণ্ডুল, দানপ্রাপ্ত ভূমিজাত ফলসম্ভার, এই কয়টি বস্তু অধ্যাপকের আশ্রমে সর্ব্বদাই সুলভ ছিল। এইগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক আহার, যাহাতে আয়ু, সত্ত্ব, বল ও নীরোগতা বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ উপশান্ত হইয়া নিদ্রিত শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করে। প্রবীণ ডাক্তাররা অধুনা ফল, দুগ্ধ ও হবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বিনা ঔষধে ক্ষয়রোগাদি পর্য্যন্ত সারাইয়া দিতেছেন, উহা অনেকেই অবগত আছেন।

ব্রহ্মচারী শিষ্য গরু চরাইতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি তখন বৃক্ষে, লতায়, গরুর শরীরে এবং অন্য বিবিধ বস্তুতে ভর্গানুসন্ধান করিতেন। সর্ব্বক্ষেত্রাবস্থিত যে শক্তির ক্রিয়া দ্বারা বিশ্বজগৎ পাক পাইতেছে, অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর পরিণাম ঘটিতেছে, তাহাই ভর্গ। গুরু দয়া করিয়া গায়ত্রীদানকালে ইহার সহিত মানবকের সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দেন। গায়ত্রী-বেত্তা ব্রহ্মচারীর নিকট ভর্গ কল্পনার বস্তু নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব পদার্থ বটে। গোধন-রক্ষাকালে চতুষ্পার্শ্বস্থ সর্ব্বপদার্থে ভর্গলীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে মানবকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। কোন স্থলে ভর্গলীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধ না হইলে, সে অমনই দৌড়িয়া আচার্য্যসমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া দাঁড়ায় এবং গুরুবাক্যে প্রবোধ পাইয়া আনন্দের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে আবার গোচারণক্ষেত্রে ফিরিয়া আইসে। ভর্গানুসন্ধানে ও ভর্গানুধ্যানে তাহার জীবন সরস ও মধুময় হইয়া উঠে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কঠোরতার সহিত প্রাচীন স্পার্টার ছাত্রজীবনের তুলনা করিয়া যাঁহারা ইহাকে বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচারীর জীবন আনন্দের মাপকাঠীতে অতুলনীয় ছিল। ভূমিশয্যায় শয়ন হবিষ্যান্ন ভোজন এবং চিত্তচাঞ্চল্যকর আমোদ হইতে বিরতি—ইত্যাদি দ্বারা বীর্য্যধারণের সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় দূরীভূত হইত। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ" এই প্রসিদ্ধ মহাবাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ জন্মিবার কারণ নাই। বিন্দুধারণ দ্বারা শরীরের বল, ইন্দ্রিয়ের ওজঃ ও মনের সহঃশক্তি বৃদ্ধি পায়, পরন্তু ব্রহ্মচারীর শরীরে, প্রাণে ও মনে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার সমস্যা সমাহিত হইলে শিক্ষার অন্তরায় অল্পই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এ কালের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এই সমস্যা-সমাধানের অনুকূল নহে। প্রথম হইতেই আমরা শিশুকে সর্ব্বপ্রকার কোমলতার মধ্যে লালন করিতে থাকি। কোমল শয্যা, কোমল উপাধান, বিলাসিতার পরিচ্ছদ ইত্যাদির সহিত বালককালেই পরিশ্রমবিমুখতা ও অসহিষ্ণুতা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেক বালক পরিচ্ছন্নতার নাম করিয়া বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দেয়। ১৭ বৎসর হইতে কৈশোরের প্রারম্ভে চরিত্র বিষয়ে যে সঙ্কট সময় উপস্থিত হয়, তখন কোমলতায় অভ্যস্ত বালকের স্বাভাবিক চিত্তোদ্বেগ প্রবল হইবার সম্ভাবনা। তাহার উপর আধুনিক এক শ্রেণীর নাটক ও উপন্যাস তাহার চিত্তবৃত্তিকে নরকের পথেই প্রবাহিত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবকের সতর্কতা তাহাকে অসৎ সঙ্গ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক পন্থা সম্যক্ রুদ্ধ করিতে পারে না। যাহাতে ব্রহ্মচর্য্যনাশের কোন পন্থাই খোলা না থাকে, এমনভাবে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ব্যবস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও প্রাথমিক শিক্ষামাত্র পিতৃ-গৃহে থাকিয়া লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বিলাসিতা-পঙ্কিল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাচীন আশ্রমোপম গুরুকুল উচ্চশিক্ষা লাভের বিধান করা কেন অসম্ভব হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। শরীর ও মনের তেজোবল বৃদ্ধি যদি আহারের উদ্দেশ্য হয় এবং পরিচ্ছদ ও শয্যা যদি শীতাতপের অনুকূল হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না।

গুরু-গৃহে বাসকালে রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যশালী বণিক পুত্র এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্রের একভাবেই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিতে হইত। এই নিয়মের একটি মঙ্গলকর ফলের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকলেরই কঠোরভাবে জীবনযাপনের অভ্যাস পরিপক্ব হইত। যৌবনে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পর জীবনযাত্রার উৎকৃষ্ট—উপাদানের অভাব ঘটিলেও, সেই অভ্যাসের ফলে কাহারও ক্লেশানুভব হইত না। বর্ত্তমান কালে দরিদ্রের পুত্রও ছাত্রাবস্থায় বিলাসিতা অভ্যাস করে এবং পরে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অভ্যস্ত বস্তুর অভাববশতঃ ক্লেশ পায়, পরন্তু ধনীর পুত্রও ভোগের বয়স উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয় বলিয়া ভোগের বয়স যৌবন উপস্থিত হইলে ভোগে তাহার আনন্দ থাকে না, কিন্তু তাহার অভাব ক্লেশের কারণ হয়। পুরাকালে ধনীর সন্তান যৌবনে সমাবর্ত্তন করিয়া ভোগের প্রকৃত আস্বাদন পাইতেন। অধিকন্তু, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হইত যে, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির উপর তাহার শাসনাধিকার থাকিত। প্রবৃত্তির দাস না হইয়া প্রবৃত্তির প্রভুরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধনই গৃহস্থাশ্রমের জন্য ব্যবস্থিত ছিল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাত্ত্বিক আহারে ক্রমশঃ দেহ ও মস্তিষ্ক পবিত্র হইতে থাকে। ভর্গানুসন্ধান ও ভর্গানুধ্যান দ্বারা দিব্যদৃষ্টি বা তৃতীয়-চক্ষু বিকাশের সাহায্য হয়। এই যুগের Physiology শাস্ত্রে যাহাকে Pituitory body বলা হইয়াছে, মস্তিষ্কস্থিত সেই ইন্দ্রিয় কেন্দ্রের কর্ম্মক্ষমতা লাভই দিব্যদৃষ্টি। মেখলা-ক্রিয়াও এই শক্তি বিকাশে সাহায্য করে। যখন ব্রহ্মচারী চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্ধকার দর্শন করেন না, তৎপরিবর্ত্তে নানা বর্ণের খেলা দেখিতে পান, তখনই তাঁহার বেদারম্ভের সময় উপস্থিত হয়। ইহাই সাবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি ও প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ, এতদুভয়ের সন্ধিকাল।

তখন আচার্য্যদেব দয়া করিয়া বেদারম্ভক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন ও বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বেদমন্ত্রের শব্দার্থ জ্ঞানই মাত্র এই অধ্যাপনার লক্ষ্য নহে। তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা ও ছন্দের জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিতে হইত, কিন্তু সাবিত্র ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে দিব্যদৃষ্টি ফুটিত, তাহা ভুবর্লোকের নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ থাকিত। স্বর্লোকে দৃষ্টি না ফুটিলে প্রায় সমুদয় বেদমন্ত্রেরই দেবতা ও ছন্দের দর্শনলাভ ঘটিতে পারে না সুতরাং প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন বিশেষ অগ্রসর হইত না। এই সময়ে গুরু দণ্ডক্রিয়ার প্রক্রিয়াগুলি শিষ্যকে বিস্তৃতভাবে শিখাইয়া দিতেন এবং এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী দিব্যদৃষ্টির সম্প্রসারণ সাধনের যত্ন করিতেন।

স্বর্লোকের দৃষ্টি স্বাভাবিক ইচ্ছাধীন হইলেই প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি হইত। ব্রহ্মচারী প্রজাপতিরূপে দিব্যদৃষ্টির সৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার নাম প্রাজাপত্য।

ইহার পরেই ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ, ব্রহ্ম বা বেদের অধ্যয়নই এই অংশের প্রধান কর্ত্তব্য। এই অধ্যয়ন শুধু মানসিক ব্যাপার ছিল না। কেবল মন দ্বারা কোন সত্যের অর্দ্ধেক ভাগও লাভ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "কাহারও মনে ক্লেশ দিও না" এই উপদেশ শিশুকালেই পাইয়াছিলাম এবং তন্নিহিত সত্যের যতটুকু মন দ্বারা লাভ করা যায়, তাহাও করিয়াছিলাম। তথাপি অন্যের মনে ক্লেশ দেওয়ারূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হই নাই। এক দিন আমা অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তিকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা তাঁহার প্রাণে আঘাত দিতে থাকি, কিন্তু তিনি সরল বিশ্বাসী সাধুলোক ছিলেন। অন্তরে আঘাত পাইয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল এবং তিনি একমাত্র বলিলেন,—"বাবু! আপনি সংস্কার ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যদি একবার বাইবেলখানা পাঠ করেন, তবে নিশ্চিতই আপনার এ ভাব থাকিবে না।" তাঁহার কথায় নহে, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন ক্লেশমিশ্র সরলতামাখা মুখভাব লক্ষ্য করিয়া আমি হৃদয় দ্বারা বাল্যে শ্রুত সেই উপদেশের আরও এক অংশ লাভ করিলাম। সেই সত্যাংশ যেন প্রাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। এখন বুঝিতে পারি যে, মন ও হৃদয় দ্বারা সত্যের একাংশমাত্র লাভ করিয়াছি। পূর্ণ সত্যের দর্শনলাভ এখনও ঘটে নাই। তাহা যে দিন ঘটিবে, সে দিন হইতে কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়ার শক্তিই আমার লোপ পাইবে। আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন দ্বারা পূর্ণ সত্য লাভের যত্ন লিত। মন্ত্রের ঋষি যে ভাবে দেবতা ও ছন্দের সহিত পূর্ণ সত্যের র্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভাব বা অবস্থা শিষ্যের মধ্যে বিকাশ া পাইলে, অধ্যয়ন সফল হইল বলিয়া গণ্য হইত না। অধ্যয়ন শব্দের অর্থই পূর্ণাধিকারলাভ। ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্বীয় শক্তি নুসারে কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ, কেহ এক বেদ এবং কহ বা বেদাংশমাত্র অধ্যয়ন করিতেন।

বেদাধ্যয়নের ফলে অনেকের বিপ্রবুদ্ধি জাত হইত। আধুনিক বজ্ঞানিকরা যেমন প্রকৃতিতত্ত্বের গবেষণা করিতে করিতে মনে রেন যে, জগৎকার্য্য প্রকৃতিরই লীলা, প্রকৃতির অতীত ও তাহার ধিষ্ঠাতা সত্যজ্ঞান-আনন্দময় কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার য়োজন নাই; তেমনই অধীত-বেদ ব্রহ্মচারীর ইহার অনুরূপ কোন মনোভাব উপস্থিত হইত। ইহারই নাম বিপ্রবুদ্ধি। ব্রহ্ম-াশ্রমের বৃহৎ নামক চতুর্থ স্তরে প্রকৃতিগত সত্য এবং প্রকৃতির তীত সত্যের সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা বিপ্রবুদ্ধি-নাশের চেষ্টা চলিত। হৎ বা পূর্ণতার জ্ঞানই এই স্তরে সাধনার বিষয় ছিল। এই বিষয়ের স্তৃতি বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত যে শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা করা হইল, াহা এই যুগে অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। কামদেহ, ারণদেহ, তৃতীয় চক্ষুঃ প্রভৃতি আফ্রিকার স্ফিঙ্কসের ন্যায় কল্পনা-ত্র বলিয়া অনেকে ধারণা করিবেন। যদি কল্পনাই হয়, তবে তাহা আমার কল্পনা নহে, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমি সপ্রমাণ করিতে ারিব, কিন্তু বিচারসাপেক্ষ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উল্লিখিত বিবরণ তে প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিলাম, াহার সারমর্ম্ম এ স্থলে সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

(১) আচার্য্যের ব্রতে শিষ্যকে ব্রতী করা প্রাচীন শিক্ষার এক ধান লক্ষ্য ছিল এবং এই লক্ষ্য প্রায় সর্ব্বত্রই সফল হইত। বর্ত্তমান ক্ষাপদ্ধতিতে এই লক্ষ্যের অভাববশতঃ ছাত্রদের চরিত্রগঠনে ন্তরায় ঘটে এবং প্রায়শঃ তাহাদের জীবনের কোন আদর্শ থাকে না। প্রত্যেক ছাত্রকে একটি ব্রত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা এই যুগে অন্তরায়বহুল হইলেও সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এ ব্রতে সকলকে দীক্ষিত করা কেবল যে বিফল হইবে এমন নহে, পরন্তু তাহা অশুভফলপ্রসূ হইবে। কারণ, বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি এক উপাদানে সকলকে গঠন করেন নাই। প্রত্যেক ছাত্রের প্রকৃতি, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের সম্ভাবিত বৃত্তি ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক, তাহার নিজের ও তাহার অভিভাবকের সম্মতি সহকারে ব্রত নির্ব্বাচন আবশ্যক এবং কি ভাবে অধীত জ্ঞান, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিনিয়োগ তাহার ব্যক্তিগত ব্রত উদ্‌যাপনে হইতে পারে, তাহা তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে। অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষমধ্যে জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট না হইলে, তাহার কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। ব্রতসমস্যার সমাধান হইলে বর্ত্তমান শিক্ষার বিফলতা অনেকাংশে দূরীভূত হইবে।

(২) প্রাচীন ভারতে অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় যে অধীতশাস্ত্র ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অমোঘ উপায় যদি উদ্ভাবিত হয় ও কর্ম্মক্ষেত্রে সেই উপায় সম্যক্ অবলম্বিত হইতে পারে, তবে শিক্ষা-সমস্যার জটিলতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে। তখন সমাজে রোগপ্রবণতা থাকিবে না, অকালমৃত্যু হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব থাকিবে না, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের বল বৃদ্ধি পাইবে এবং সর্ব্ববিধ তমোগুণাশ্রিত ভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, সামাজিকগণের মনোভাব ব্রহ্মচর্য্যপালনের বিরোধী। যাহা ইচ্ছা খাইব, আহারাদি বিষয়ে স্পর্শবিচার বর্জ্জন করিব, শয্যা ও পরিচ্ছদাদি বিলাসিতাগ্রস্ত থাকিবে, উপন্যাস-নাটকাদি পাঠ ও সর্ব্ববিধ আমোদ উপভোগ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে; অথচ আমি ব্রহ্মচর্য্যও অক্ষুণ্ণ রাখিব, এবম্প্রকার সঙ্কল্প অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। যদি বর্ত্তমানযুগের ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তবে ছাত্রগণের আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ, আমোদ উপভোগ প্রভৃতি বিষয়ে তদনুকূল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার সম্যক্ প্রতিপালনে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষার্থীর গুরুগৃহে বাস প্রাচীন ভারতে বাধ্যতামূলক ছিল। তাহাতে নিয়মানুবর্ত্তিতার সুবিধা ঘটিত। বর্ত্তমান যুগেও পাশ্চাত্য দেশে Boarding school আছে। স্বগৃহে বা আত্মীয়গৃহে অথবা নামমাত্র অভিভাবকের অধীনে বাস করিলে, ব্রতপালন বা ব্রহ্মচর্য্যপালন, এতদুভয়ের কোনটিই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। এই দেশে Boarding school করিলে দরিদ্রতাবশতঃ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুণের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে সংখ্যা হ্রাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে চলে না, কিন্তু বৃত্তি ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিভাশালী দরিদ্র ছাত্রের সংস্থান করিতে হইবে।

শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী·(বি. এ, বিদ্যাবারিধি)।

সংগঠনের সদুপায়

৩

বিরাট সমবায়-সমিতি বা জাতীয় মহাসংসদ সংগঠনের কথা

প্রতি দশ দশটি পল্লী বা গ্রাম্যমণ্ডলীর সমবায়ে এক একটি দশমণ্ডলী গঠিত হইবে।

প্রতি পল্লীমণ্ডলী হইতে ভিন্নস্থানীয় পূর্ব্বোক্ত ৩ জন আর স্থানীয় শ্রেষ্ঠ দুই জন—এই ৫ জন করিয়া সদস্য লইয়া মোট ৫০ জন সদস্যে দশমণ্ডলীর সংসদ সংগঠিত হইবে।

পর্য্যায়ক্রমে প্রতি পল্লীমণ্ডলীর প্রধান কার্য্যালয়ে এক মাস অন্তর এক বার করিয়া দশমণ্ডলীর সংসদের অধিবেশন হইবে। সদস্তদের মধ্যেই প্রতি অধিবেশনে এক জন করিয়া সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

প্রতি অধিবেশনেই প্রতি পল্লীমণ্ডলীর নির্ব্বাচিত নায়ক তাঁহার মাসিক কার্য্য-বিবরণী উপস্থাপিত করিবেন।

পণ্যের আমদানী-রপ্তানী-মূলক অর্থনৈতিক ব্যাপারে এক মণ্ডলী হইতে অপর মণ্ডলী কিরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার আলোচনা ক্রমে উক্ত অধিবেশনে সমিতিগুলিকে সমবায়সূত্রে গ্রথিত করিবার বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতি দশমণ্ডলীর এক জন সাধারণ পরিচালক থাকিবেন। মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে ঘুরিয়া তিনি মণ্ডলীগুলিকে যথাপথে পরিচালিত করিবেন। দশমণ্ডলীর মাসিক কার্য্য-বিবরণী এই পরিচালকের কার্য্যালয়ে পেশ হইবে।

প্রতি তিন মাসের কার্য্য-বিবরণী লইয়া এই পরিচালক তাঁহার মন্তব্য-সংবলিত ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

প্রতি দশটি দশমণ্ডলী লইয়া এক একটি শতমণ্ডলী গঠিত হইবে।

প্রতি পল্লীমণ্ডলীর নির্ব্বাচিত সদস্য এক জন করিয়া, প্রতি দশমণ্ডলীর সদস্য ১০ জন, আর পরিচালক সদস্য এক জন—এই ১১ জন হিসাবে শতমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা মোট ১ শত ১০ জন হইবে।

প্রতি তিন মাস অন্তর এক বার করিয়া শতমণ্ডলীর সংসদের অধিবেশন হইবে। এই সংসদেরও এক জন বিশিষ্ট পরিচালক থাকিবেন। তাঁহার কার্য্যালয় কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই কার্য্যালয়েই শতমণ্ডলীর সংসদের ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। পরিচালক প্রয়োজনানুরূপ সহকর্ম্মীদের সহযোগিতায় এই কার্য্যালয়ের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

প্রত্যেক জিলার শতমণ্ডলী সমূহের সমবায়ে জিলা-সংসদ সংগঠিত হইবে। প্রতি শতমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত ২ জন, আর পরিচালক ১ জন—এই ৩ জন করিয়া সদস্য লইয়া জিলা-সংসদের সদস্য সমিতি গঠিত হইবে।

প্রতি ৪ মাস অন্তর এক বার করিয়া বৎসরে ৩ বার জিলা-সংসদের অধিবেশন হইবে। শতমণ্ডলীর পরিচালক সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের স্ব স্ব মণ্ডলীর চাতুর্ম্মাসিক কার্য্য-বিবরণী উক্ত সব অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন।

জিলা-সংসদের স্থায়ী কার্য্যালয় জিলারই কোনও সুনির্ব্বাচিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ২ জন সহকারী, ১ জন সম্পাদক ও প্রয়োজনানুরূপ সহকর্ম্মীসহ এক জন বিশিষ্ট নায়ককে জিলাসংসদের পরিচালনকার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।

জিলা-সংসদসমূহের সমবায়ে বিভাগীয় সংসদের সংগঠন করিতে হইবে। প্রতি জিলা হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য ৫ জন আর জিলা-সংসদের নায়ক ১ জন—মোট ৬ জন করিয়া সদস্য লইয়া বিভাগীয় সংসদের সদস্য সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর এক বার করিয়া এই বিভাগীয় সংসদের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে জিলা-সংসদের নায়করা তাঁহাদের ষাণ্মাসিক কার্য্য-বিবরণী উপস্থাপিত করিবেন।

বিভাগীয় সংসদের কার্য্যালয় বিভাগেরই কোনও সুনির্ব্বাচিত স্থানে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রয়োজনানুরূপ সম্পাদক, সহকারী, সহকর্ম্মী প্রভৃতিসহ এক জন অধিনায়ক বিভাগীয় সংসদের পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন।

বিভাগীয় সংসদগুলির সমবায়ে প্রাদেশিক সংসদ সংগঠিত হইবে। প্রাদেশিক সংসদের কার্য্যালয়, প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান নগরে স্থায়িভাবে সংস্থাপিত থাকিবে। আবশ্যকানুরূপ কর্ম্মিমণ্ডলীর সহযোগিতা ও সহকারিতায় বিশিষ্ট এক অধিনেতা প্রাদেশিক সংসদের কার্য্য পরিচালিত করিবেন। বৎসরে এক বার করিয়া প্রাদেশিক সংসদের কার্য্যালয়ে এই সংসদের এক সাধারণ অধিবেন হইবে। এই অধিবেশনে বিভাগীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী উপস্থাপিত হইবে।

দশমণ্ডলী, শতমণ্ডলী, জিলা ও বিভাগীয় প্রতি সংসদের পরিচালক সদস্যই প্রাদেশিক সংসদের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

প্রাদেশিক সংসদের সমবায়ে বিরাট জাতীয় মহা-সংসদের প্রতিষ্ঠা হইবে। জনমণ্ডলীর অধিকাংশের মান্য এক মহানেতা—জাতীয় মহা-সংসদের পরিচালক পদে বৃত হইবেন।

প্রাদেশিক সংসদসমূহের অধিবেশনের পরে ৩ মাসের মধ্যে নির্ব্বাচিত সময়ে, নির্ব্বাচিত স্থানে জাতীয় মহা-সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে প্রাদেশিক কার্য্য-বিবরণীসমূহ উপস্থাপিত করা হইবে।

প্রতি প্রাদেশিক সংসদের নির্ব্বাচিত সদস্যমণ্ডলীতে জাতীয় মহা-সংসদের সদস্য সমিতির সংগঠন হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরে জাতীয় মহা-সংসদের স্থায়ী কর্ম্ম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রয়োজনানুরূপ কর্ম্মিমণ্ডলীসহ সেই কর্ম্ম-মন্দিরে থাকিয়া মহানেতা প্রস্তাবিত বিরাট সমবায় সমিতির সর্ব্বকার্য্য পরিচালিত করিবেন।

জনপ্রতিনিধিদের সমবায়ে বিশিষ্ট এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সংগঠন করিয়া মহানেতা প্রয়োজনীয় সমুদয় বিধি-বিধানের প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিবেন।

সংসদসমূহের বিশেষ বিশেষ করণীয় কর্ত্তব্যের কথা

প্রতি দশমণ্ডলীর পরিচালক তাঁহার অধীন প্রতি পল্লীমণ্ডলীর হিসাব পরীক্ষা করিয়া সেই সেই মণ্ডলীর ক্রেয় ও বিক্রেয় পণ্যের অভাব ও আধিক্যের পরিমাণ ঠিক করিবেন। এক পল্লীর ক্রেয় পণ্যের অভাব, অপর পল্লীর সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য দ্বারা সম্পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ বন্দোবস্তে অভাব ও আধিক্যের সমঞ্জস্য না হইলে যথাকালে এই অভাব ও আধিক্যের বিবরণ-সম্বলিত মন্তব্য-পত্র মণ্ডলীর কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

শতমণ্ডলীর প্রধান পরিচালক প্রতি দশমণ্ডলীর প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষান্তে উক্ত অভাব ও আধিক্যের সামঞ্জস্যসাধনে যত্নবান্ হইবেন। এক দশমণ্ডলীর ক্রেয় পণ্যের অভাব তিনি অপর দশমণ্ডলীর সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য হইতে সম্পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতেও উক্ত অভাব আধিক্যের সামঞ্জস্য না হইলে, শতমণ্ডলীপতি যথাকালে তদধীন শতমণ্ডলীর মোট অভাব ও আধিক্যের বিবরণ-সম্বলিত বিবরণী জিলা-সংসদের কার্য্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করিবেন।

জিলা-সংসদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সমগ্র জিলার হিসাব পরীক্ষান্তে উক্ত অভাব ও আধিক্যের সামঞ্জস্যসাধনে তৎপর হইবেন। এক শতমণ্ডলীর ক্রেয় পণ্যের অভাব তিনি অপর শতমণ্ডলীর সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য হইতে সম্পূরণের বন্দোবস্ত করিবেন। তাহাতেও সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে জিলা-সংসদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা যথাকালে তদীয় জিলার প্রয়োজনীয় সব ক্রেয় ও বিক্রেয় পণ্যের অভাব ও আধিক্যের পরিমাণ সম্বলিত বিবরণী বিভাগীয় সংসদের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। বিভাগীয় সংসদের অধিনায়ক পূর্ব্বোক্ত বিধানমতেই এক জিলার ক্রেয় পণ্যের অভাব অপর জিলার সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য হইতে সম্পূরণের সুব্যবস্থা করিবেন।

তাহাতেও সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে বিভাগীয় সংসদের অধিনায়ক যথাকালে তদধীন বিভাগের অভাব ও আধিক্যের বিবরণী প্রাদেশিক সংসদের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। প্রাদেশিক সংসদের অধিনেতা পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে এক প্রদেশের ক্রেয় পণ্যের অভাব অপর প্রদেশের সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য হইতে সম্পূরণের সুব্যবস্থা করিবেন।

তাহাতেও সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে প্রাদেশিক সংসদের অধিনেতা তদীয় প্রদেশের মোট অভাব ও আধিক্যের বিবরণী যথাকালে জাতীয়

কর্ম্মমন্দিরে প্রেরণ করিবেন। জাতীয় মহা-সংসদের মহানায়ক তদধীন সমগ্র দেশের প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রথমে এক প্রদেশের ক্রেয় পণ্যের অভাব অপর প্রদেশের সমজাতীয় বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য হইতে সম্পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। তাহাতেও সামঞ্জস্য না হইলে দেশ ছাড়িয়া বিদেশীয় পণ্যের প্রয়োজনানুরূপ আমদানী দ্বারা দেশের অভাব পূরণ এবং উদ্বৃত্ত পণ্যের বিদেশে রপ্তানী দ্বারা বিক্রেয় পণ্যের আধিক্য স্থলে দেশে বিদেশাহরিত অর্থের আধিক্যসংসাধনের সুব্যবস্থা করিবেন।

বিদেশের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানীমূলক বাণিজ্যব্যাপার সংসাধনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র জাতীয় মহাসংসদের উপরই বিন্যস্ত থাকিবে। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য যে সব বিধিবিধানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইবে, বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় মহানায়ক যথাকালে সেই সব বিধিবিধান করিয়া লইতে পারিবেন।

উপরি-উক্ত ক্রেয় পণ্যের অভাব সম্পূরণ ও বিক্রেয় পণ্যের আধিক্যের অপসারণমূলক কার্য্যের সুব্যবস্থা করাটা প্রতিষ্ঠিত সংসদগুলির নিত্য করণীয় অন্যতম বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

তাহার পর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিতে পাইবেন যে, এ দেশে চিরচলিত বংশানুক্রমিক শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। স্ব স্ব স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিল্পীরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে বা করিতে বাধ্য হইতেছে। পণ্য উৎপাদনের পথে ইহা এক বিষম অন্তরায়।

পল্লীমণ্ডলীগুলির সহায়তায় সর্ব্বশিল্পী সম্প্রদায়ের আদম-সুমারী তৈয়ার করিয়া সংসদসমূহ দেশের শিল্পী সমুদয়কে পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ করত স্ব স্ব বৃত্তিতে সংস্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। এইরূপে তাহাদিগকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপাদানাদি যোগাইয়া তাহাদের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ শিল্পকে পুনঃ দেশে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ইহাও সংসদসমূহের অন্যতম সাধনীয় কর্ত্তব্য। সংসদসমূহ আরও দেখিতে পাইবেন যে, মানুষের সেই পূর্ব্বোক্ত উপক্ষুধা বা বিলাসিতার পরিতৃপ্তির জন্য এমন কতকগুলি অবান্তর শিল্পজ পণ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশে উৎপন্ন হয় না বলিয়া যাহার আমদানী বিদেশ হইতেই হইতেছে। বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সে সকলের উৎপাদনবিধান এ দেশেই করিতে হইবে। সংসদসমূহের কর্ম্মকর্ত্তারা বিশেষ বিশেষ সমিতির সংগঠন দ্বারা উক্ত পণ্যের তত্ত্বানুসন্ধান করাইয়া যথাযোগ্য বিধি-ব্যবস্থায় দেশেই সমস্ত পণ্যের উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তারা আরও দেখিতে পাইবেন যে, এ দেশের বহু কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়া তথায় দ্বিবিধভাবে কার্য্যে লাগিতেছে।

(১) বিদেশবাসীর অভাব পূরণ করা।

(২) তাহার পর অতিরিক্ত কাঁচা মাল পাকা মালে পরিণত হইয়া এ দেশে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া এ দেশবাসী কৃষকদের অর্থ অপহরণ করা।

৬ষ্ঠ প্রকরণ উক্ত ৩য় দফানুসারে দেশবাসিমাত্রেরই শ্রমোৎপন্ন বা সহযোগে সংগৃহীত বিক্রেয় পণ্য সংসদের হস্তগত হইতে বাধ্য। দশের সমুদয় কাঁচা মাল সংসদের হাতে পড়িলে সংসদ তাহার ইরূপ ব্যবহার ব্যবস্থা করিতে পারেন ;—

(১) এ দেশবাসীর প্রয়োজনীয় পাকা পণ্য এ দেশীয় কর্ম্মীদের রা আধুনিক প্রণালীমতে এ দেশেই সম্পূর্ণরূপে সমুৎপন্ন করা।

(২) প্রথমে কিছুকাল অবশিষ্ট কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী করা।

(৩) কালক্রমে সুবিধা করিয়া লইয়া কাঁচা মাল মাত্রই বিদেশে নী না করিয়া বিদেশীদের পছন্দমত এ দেশেই পাকা পণ্যে পরিণত করিয়া—সে পণ্য বিদেশীদের ব্যবহারের জন্য বিদেশে রপ্তানী করা। শিল্পের উপাদান যাবতীয় কাঁচা মালের কথাই উপরে বলা হইল।

এতদ্ব্যতীত অপর্য্যাপ্ত খাদ্য-শস্যও এ দেশ হইতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বক্ষ্যমাণ সংসদের শাখাপ্রশাখার প্রতিষ্ঠা হইলে—আর দেশবাসীমাত্রই ইহার সভ্য বা সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ৬ষ্ঠ প্রকরণের ৩য় দফা মতে যাবতীয় বিক্রেয় খাদ্য-শস্যও সংসদেরই হস্তগত হইতে বাধ্য। ভারতের সেই চাউল, গমাদি জাতীয় খাদ্য-শস্যের বিপুল ভাণ্ডার সংসদের হস্তগত থাকিলে ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব, অসাধ্য বা কালসাপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এ দেশবাসীর উপক্ষুধা—বিলাসিতার পরিতৃপ্তির উপকরণ বাজে পণ্যের অবাধ আমদানী, আর দৈহিক ক্ষুধার অপরিহার্য্য নিত্য-প্রয়োজনীয় অন্ন—খাদ্য-শস্যের অতি উচ্ছৃঙ্খল অবাধ রপ্তানীর পথ—সংসদের কর্ত্তাদের বিশেষভাবে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এই কার্য্যটিকেই বর্ত্তমানে তাঁহারা তাঁহাদের সাধনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব্রত বলিয়া মনে রাখিয়া কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তের স্থান

সংযমপূত ভারতের ভাষা সংস্কৃত ভাষা, অপর নাম দেবভাষা। ভারতের ইতিহাস, কাব্য, নাটক—ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সাধন ; ভগবানের স্তুতি বক্ষে ধরিয়া তাঁহার মহিমা ও লীলা দেখাইয়া মুক্তিরও প্রযোজক। আলঙ্কারিকরা "ত্রিবর্গসাধনং নাট্যং" বলিয়া নাটককে ত্রিবর্গসাধন বলিয়াছেন।

সংস্কৃত নাটক মিলনান্ত হওয়াই রীতি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অনুশাসন এই যে, নাটক বিয়োগান্ত হইবে না। অবসানে মিলন দেখান চাই-ই। ভালবাসার আবেগে পূর্ণ, মধ্যে বিরহে বা শোকে করুণ, শেষে কিন্তু পুণ্যের প্রতিষ্ঠায় পবিত্র হওয়া চাই-ই। লোকশিক্ষা ও আদর্শ সৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য ; চিত্তরঞ্জন মাত্র অপ্রধান উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, আমরা মিলনান্ত নাটকের পক্ষপাতী। তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইবে।

সংসারে শুভ ঘটনা ঘটিলে সকলেরই চিত্তে প্রীতি জন্মে ; আশ্বাস জাগিয়া উঠে। সংসারারণ্য ফল-ফুলে ভরিয়া উঠিলে কাহার না তৃপ্তি হয় ? বেদনা-কাতর মানবজীবনে অমর সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতে দেখিলে কাহার না সুখ জন্মে ? "সু" সকলেই চাহে, কিন্তু তাহা ঘটে কৈ ? বরং "সু" স্থলে "কু" আসিয়া দেখা দেয়। সাহিত্য (নাট্য ও সাহিত্য) আরাধনার বস্তু ; ভয় এবং বেদনার জন্মদাতা নহে। ইহা উপাদেয়, হেয় নহে। পূজার মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টাই বাজে, চন্দন-কুঙ্কুমের গন্ধই ছুটে। ইহাকে জড় পৃথিবী না বলিয়া সুখময়ী অমরাবতী বলিলেই ঠিক হয়।

সংসারে যেমন ঘটনা ঘটিলে মানব সুখী হয়, যেরূপ ঘটনা ঘটিলে সৃষ্টি সার্থক হয়, মিলনান্ত নাটকের তাহাই উদ্দেশ্য। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখান সৎ-সাহিত্যমাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যাহা আদর্শ, যাহা স্পৃহণীয়, যাহাতে লোকহিত ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা, তাহার উপর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব ফুটাইয়া তোলাই সৎসাহিত্যের কার্য্য। পুণ্যের উপর আশ্বাস, পাপের উপর সন্ত্রাস জাগাইয়া আদর্শের পথে ধীরে ধীরে মানবগণকে লইয়া যাওয়াই সৎ-সাহিত্যের ফল। সৎসাহিত্য যাহা ভাবের উপর—কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে, সৎসাহিত্যের অন্যতম অংশ উৎকৃষ্ট নাটক তাহাই প্রত্যক্ষের উপর সজীব করিয়া ধরিবে।

এই জন্য কাব্য উপন্যাস অপেক্ষা নাটকের সুফল ও কুফল দুই-ই অধিক। সাধারণের উপর নাটক আধিপত্য স্থাপন করিয়া ঝটিতি কার্য্য করে, তাই নাটকের দায়িত্ব গুরু।

নাটকের সর্ব্বত্রই বিরহের বেদনা জাগাও, বিয়োগের সঙ্গীত গাও, কিন্তু পরিণামে প্রণয়ের সুখশান্তি ফুটাইতে হইবে, মিলনের গান গাহিতে হইবে। স্থায়ী ভাব শোক হইলে চলিবে না। বিয়োগান্ত নাটক রসবিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। রসজ্ঞ আলঙ্কারিকরা বুঝিয়াছিলেন—"রস ঔষধ নহে যে, বলপূর্ব্বক তাহা গলাধঃকরণ করাইতে হইবে।" "রসস্ততে ইতি রসঃ" যাহা আস্বাদনীয়, তাহাই রস। পিপাসুর মুখে অবিশ্রান্ত জলধারা ঢালিয়া দিলে তাহার প্রাণান্তই ঘটিয়া থাকে, জলপানের তৃপ্তি জন্মে না। আকস্মিক শোক-দুঃখের অতল গহ্বরে হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিয়া দিলে, হত্যা আত্মহত্যার বজ্রশিখায় সহসা দগ্ধ করিলে কোন বীরত্ব বা মহত্ব নাই। প্রকৃত কবি প্রতিভা হইতে যাহা জন্মে না, তাহাতে লোকহিত সাধিত হয় না, নাটকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায়ই ঘটে।

সাত্ত্বিকতায় যাহার প্রতিষ্ঠা নহে, ত্যাগে ও সংযমে যাহার স্থিতি নহে, সুখে-শান্তিতে যাহার পরিণতি নহে—এমন নাটক শান্ত সংযত ভারতের উপযোগী হইতে পারে না। এ তপোবন—এখানে মদমত্ত হস্তীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ গোলোকভূমি—এখানে অভক্ত দৈত্যের আস্ফালন অশোভন। এ বিষ্ণুমন্দির—এখানে হত্যা আত্মহত্যার রক্তস্রোত অচল।

বস্তুতঃ হত্যা আত্মহত্যা করিয়া কোন কৃতিত্ব নাই। পক্ষান্তরে, অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাসানরও কোন গৌরব নাই। হত্যা আত্মহত্যার উপর সকলেরই একটি অস্বাভাবিকত্ব বোধ আছে, নিরন্তর হত্যা আত্মহত্যা-দর্শনে আর সে অস্বাভাবিকত্ব বোধ থাকে না। ইহা সমাজের পক্ষে বড় অহিতকর। যুদ্ধ, মৃত্যু এবং কোনরূপ অশ্লীল ব্যাপার রঙ্গমঞ্চে দেখান সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। বেণীসংহার নাটকে ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান দৃশ্যটি বর্ণনার মধ্যেই ফুটান হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যক্ষ দর্শনের বীভৎসতা ও অপ্রাকৃতিকতা থাকে না, অথচ উদ্দেশ্যটি সফল হয়। অন্তরালে যুদ্ধবর্ণনার সৌন্দর্য্য যে অধিক, তাহা বর্ত্তমানে সিরাজৌদ্দলা ও মীরকাসেম নাটক দেখিলেই বুঝা যায়।

বিষাদ বা শোকের অভিনয়ে অশ্রুবিন্দু মর্ম্ম-শোণিতের মত ধীরে ধীরে দেখা দিক, সমবেদনার মুক্তামালা চন্দ্রকরস্পর্শে চন্দ্রকান্ত-মণির বারিক্ষরণের মত শনৈঃ শনৈঃ ফুটিয়া উঠুক, তবেই সেই বিষাদ বা শোক অপূর্ব্ব ত্রবীভাবময় রসরূপে পরিণত হইবে। ক্ষণিক ভাবের উত্তেজনায় চালিত হইয়া উন্মত্তের মত হা হা হৈ হৈ করিলে রসের বিকাশ হয় না। সাময়িক ক্রোধ, হিংসা ও বীভৎসতার বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যাইলে রসের পরিণতি জন্মে না। শোকের দৃশ্যের পর রস-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই প্রহসনের তাণ্ডব-নৃত্যের আরম্ভ দেখা যায়। ভাব-মুক্তাগুলি থরে থরে রাখা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সূত্র দ্বারা গ্রথিত না করায় রসরূপ মালাটি গ্রথিত হইতে পারে না।

তন্ময়তার শব্দতরঙ্গের মতই সৃষ্টি, নিদ্রাবেশের মতই স্থিতি, কৌস্তুরিকা-সৌরভের মতই ভঙ্গ। তন্ময়তাই কবির সর্ব্বস্ব, কাব্য নাটকের প্রাণ; তন্ময়তাতেই শ্রোতৃবর্গের সুখ। তন্ময়তা না থাকিলে প্রকৃত আনন্দময় "ব্রহ্মস্বাদ সহোদর" রসের উপলব্ধি ঘটে না। হত্যা, আত্মহত্যা, লাফালাফি, দাপাদাপি, হুড়ুম-দুড়ুমের মধ্যে প্রকৃত রসের আবির্ভাব হয় না।

অন্তঃকরণের তারে রস-সঙ্গীতের মৃদু মৃদু ঝঙ্কারই সহৃদয়ের মনোরম, লজ্জার সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত সৌন্দর্য্যই প্রেমিকের উপভোগ্য। বিয়োগান্ত নাটক সাধারণের চিত্তে সহসা আধিপত্য বিস্তার করে বটে, কিন্তু তাহা জীবনের কল্যাণ না আনিয়া বরং অকল্যাণই আনিয়া ফেলে। স্থায়ী ভাব জন্মিলেও তাহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে না বলিয়া নাটকের উদ্দেশ্যটি নষ্ট হইয়া যায়।

উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ে সহৃদয়ের হৃদয়ে যে রসের উপলব্ধি হইবে, তাহা ভূমিকম্পের মত ধরা ভেদ করিয়া উঠিবে না, উৎসের মত নীরবেই ফুটিয়া উঠিবে। বন্যার মত উন্মত্ত গতিতে আসিবে না, শিশুর মত নাচিতে নাচিতেই আসিবে। বিরাট দৈত্যের মত সপদদাপে আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে না, হাস্যময়ী প্রিয়ার মত মৃদু-মন্দ গতিতে আসিয়া কোমল বাহুপাশেই চাপিয়া ধরিবে।

প্রকৃত কবি বা নাট্যকারের যে অলোকসামান্য প্রতিভা উৎকৃষ্ট কাব্য, উপন্যাস বা নাটকের সৃষ্টি করে, সে প্রতিভা আপনা হইতেই বিকসিত হয়। ইন্দ্রজাল-যষ্টির মত সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় না।

যাহা প্রকৃত কবিপ্রতিভাজাত নহে, তাহা ছায়াবাজীর মত বস্তুতন্ত্রতাশূন্য। এই সকল নাটকের দৃশ্যগুলি চলচ্চিত্রের মত নয়নে প্রীতি জন্মায় বটে, চিত্তের উপরে কিন্তু কোন স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করে না। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্কগুলি বাষ্পীয় যানের মত পর পর হু হু বেগে ছুটিয়াই চলে। সে যানে বিশ্রামব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহাতে সে অবসরও নাই। হৃদয় ত আর জীর্ণ অট্টালিকা নহে যে, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। চিত্ত একটি বাদ্যযন্ত্র; বেশ সুনিপুণ হস্তেই তাহাতে সুরের সৃষ্টি করিতে হইবে।

নায়ক-নায়িকার মৃত্যু বা চিরবিরহরূপ যে বিয়োগান্ত (ট্রাজিডি) নাটক, তাহাই সংস্কৃত নিয়মে নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহা বলিয়া মিলনান্ত নাটকে যে বিয়োগের করুণ ছবি অঙ্কিত করিতে হইবে না, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত উত্তরচরিতে সীতা, অভিজ্ঞানশকুন্তলে শকুন্তলা ইত্যাদি। বিয়োগান্ত নাটক পাশ্চাত্য সাহিত্যের আমদানী। সে দেশের উপযোগী হয় হউক, সংযমপূত শান্তপ্রকৃতি ভারতীয় নরনারীর উপযোগী নহে। আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা হেয়, তবে সত্যঘটনামূলক ঐতিহাসিক হইলে অবশ্য কিয়ৎপরিমাণে উপকারক।

মিলনান্ত অক্ষম হস্তের রচিত হইলে অবশ্য উপকারী না হইতে পারে, কিন্তু সমূহ ক্ষতিকর হয় না। বিয়োগান্ত কিন্তু সমূহ সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

আজিকালি যে সমস্ত নাটক প্রণীত ও অভিনীত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা ক্ষণিক তৃপ্তি ব্যতীত স্থায়ী কোন উপকার হয় না। সাধারণ শ্রোতৃবর্গের মনোবৃত্তির উপর নাটক সহজেই আধিপত্য বিস্তার করে বলিয়াই নাটক সম্বন্ধে নিয়মের বন্ধন এমত কঠিন করিয়া আর্য্য মনীষীরা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নাটকের শেষে মিলন রাখিয়া মিলনান্তের উপকার করা হইল, অথচ তাহাতেই বিরহের ছবি ও শোকের মূর্ত্তি করুণ স্মৃতির মত এমন ভাবে সহৃদয়ের চিত্তে ফোটান হইল, যাহাতে বিয়োগান্তের উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া গেল। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়ের মধ্যে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু বা চিরবিরহ না ঘটাইয়া বিয়োগের ভাব অঙ্কিত করাই কবিপ্রতিভা ও নাট্যকলার নিদর্শন। হত্যা, আত্মহত্যা বা রমণী-ধর্ষণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বনের তাহাতে কোন প্রয়োজন ঘটে না।

আজিকালিকার উপন্যাসরাশি দেখিয়া বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় বলা যায় না। বর্ত্তমানে হত্যা, আত্মহত্যা, "রোমাণ্টিক" বা "প্যাথেটিক্" দৃশ্যের অবতারণা করিয়া যে নাটকাবলী রচিত, তাহা দেখিয়া চিত্তে কোন আশ্বাস জাগে না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কঠিন বন্ধন ও সংযত অনুশাসন মানিয়া চলিলে বোধ হয়, বঙ্গসাহিত্য এত অসার উপন্যাস ও নাটকের ভারে প্রপীড়িত হইতে পারিত না।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

ইতিহাস

আমার মত অল্প শক্তিশালী ব্যক্তিকে আপনারা এবার ইতিহাস বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। স্বয়ং অসমর্থ জানিয়াও আপনাদের অনুরোধ-পত্রের প্রার্থনা আমি আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। অন্য দুই ক্ষেত্রে এইরূপে আহূত হইলেও স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বহু দিন হইতে এই সামান্য শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশের ইতিহাসের একাংশ আলোচনা করিয়া আসিতেছি; ইতিহাস কি ভাবে গঠিত হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অনেক যুক্তি-তর্কও দেখিয়াছি। আমাদের দেশের ইতিহাসের ধারা কোন্ প্রকৃষ্ট প্রণালীতে চালিত হওয়া আবশ্যক, শিক্ষক হইলেও এই ব্যাপক বিষয়ের নূতন কোন সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ বা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে যখন 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত' মত করিয়া (প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ভায়ার আন্তরিকতার সহিত প্রস্তাবে) আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিলেন, তখন "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ"—মহাজনের এই সর্ব্বজনপরিচিত উক্তি অনুসরণ করিয়া আমাকে ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিতেই হইবে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, আমি অভিনব বাঙ্গালীর দ্রাবিড়ো-মুঙ্গলীয় পংক্তিতে বসিতে রাজি নহি; প্রাচীন ভারতকে আমার বলিবার কিছু দাবি রাখি। বৈদিক সাহিত্যে 'ইতি-হ-আস' ইহা নিশ্চয় ঘটিয়াছিল, এই অর্থে ইতিহাসের উল্লেখ আছে, এ কথা এই শাখাসীন মতিমান্ দুই এক জন পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন। অথর্ব্ব-সংহিতা বা আরণ্যক উপনিষদের নাম লইবার প্রয়োজন নাই; ঐ সমস্ত গ্রন্থ আমার পঠিতও নহে, পরন্তু ঐগুলিকে অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্যোগী পুরুষেরও এ কালে বড় অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে অর্থের তথা অর্থশাস্ত্রের যুগ। কৌটিল্য বা কোটল্যের (কুটলগোত্রজ) অর্থশাস্ত্রের পুথি আবিষ্কার এবং প্রকাশ আমাদের ইতিহাস ও অর্থনীতিক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়াছে। কৌটল্য অর্থাৎ চাণক্য—

সূত্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী, এ কথা দেশীয় বিদেশীয় প্রমাণ-প্রয়োগে ইতঃপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইলেও সম্প্রতি ডাক্তার জলী মহোদয় বৃদ্ধবয়সের সমগ্র শক্তিতে ঐ গ্রন্থের কালকে ৬ শত বৎসর হঠাইয়া দিয়া গুপ্তযুগে আনিয়া আরও (jolly) আনন্দিত হইয়াছেন ; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের আর নাম করিলাম না। মিগাস্থিনিসের উক্তির সঙ্গে মিলে না,—সুরঙ্গ কথা গ্রীক্ ভাষা হইতে আসিয়াছে—ইত্যাদি তাঁহাদের বক্তৃতা অকিঞ্চিৎকর, ইহা দুই এক জন সমালোচক দেখাইয়া দিয়াছেন। যাক্, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দের এই কৌটল্য-অর্থশাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে,—"সাম, ঋক্, যজুঃ এই তিন বেদ ; অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাস-বেদও বেদ।" তিনি আরও বলেন, 'ইতিহাস অর্থে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র।' তাঁহার সময়ে ইতিহাসকে বেদের মত মান্য করা হইত, বুঝা গেল। রাজাদিগকে পুরাণ, ইতিহাস শুনাইবার ব্যবস্থার কথাও এই অর্থশাস্ত্রে আছে। মহাভারতে "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্, পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে" এই ভাবে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের লোক মহাভারতে অনেক নূতন কথা সংযোজিত করিয়াছে, এই অজুহাতে এ কালের বৈজ্ঞানিক বিচারকবর্গ এ ভারতের অনেক উক্তিই, বিশেষতঃ যেখানে ধর্ম্মের গন্ধ আছে, তাহা অর্ব্বাচীন বলিয়া ফতোয়া দেওয়ায় কৌটিল্যের পরে ইহার নজীর দেখাইতেছি। গৃহ্যসূত্র এবং মন্বাদি সংহিতায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইতিহাস, পুরাণ শুনাইবার ব্যবস্থা আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদেরও এক ভাবের ইতিহাস ছিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'ইতিহাস-পুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতে' ইত্যাদি ভাষায় ইতিহাস, পুরাণের প্রামাণিকতা মানিয়া লইয়াছেন ; 'চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং' প্রাচীন মহাত্মগণের প্রত্যক্ষ বলিয়া উহার প্রমাণ শিরোধার্য্য করিয়াছেন। সমসাময়িক মনীষীদিগের রচিত মৌলিক উপাখ্যান যে প্রকৃত ইতিহাসের অঙ্গ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবে অনেক নূতন উপকরণ সংযুক্ত হইয়াছে ; কালের মত করিয়া সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। উহা হইতে 'বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা' বিচার করিয়া কোন্‌টা খাঁটি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার হইলেও এ কালে পার্জিটার প্রমুখ পণ্ডিতরা দেখাইয়াছেন যে, পুরাণে সত্যমূলক জনশ্রুতি যথেষ্ট আছে, বিচার করিয়া লইলে ইতিহাসের উপকরণ উহাতে অনেক মিলিবে।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর লৌকিক ইতিহাস একেবারেই নাই, পারলৌকিক ব্যাপার লইয়াই তাহারা ব্যস্ত ছিল, ইত্যাদি মত সবিশেষ যুক্তি-তর্কের সহিত ধ্বনিত হইত। পার্থিব বিষয়ে উদাসীনতা বা বৈরাগ্য হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের শিক্ষা বলিয়া প্রাচীন হিন্দুরা সকলেই যে ইহজগতের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল পারলৌকিক কল্যাণচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এই ধারণা ভ্রমাত্মক, তাহা এখন স্বীকৃত হইতেছে। ধর্ম্মশিক্ষার সময়ে ঐহিক সম্পদের অসারত্ব বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য-মনীষিগণ নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ অধিক দিয়াছেন, সেই জন্যই এখন সমগ্র জগতে তাঁহারা বরেণ্য। তাই বলিয়া ব্যবহারিক সমস্ত লক্ষ্যই অসার, অধ্যাত্ম উন্নতি সকল লোকের সকল অবস্থাতেই একমাত্র কাম্য, সকলেই সমান অধিকারী হইবে, এ কথা হিন্দুশাস্ত্র কখনও বলে নাই। ইহা সত্য হইলে প্রাচীন ভারতে গণিত, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং নানা কলাবিদ্যার তত উন্নতি সাধিত হইত না। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গসাধন মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও অর্থ এবং কাম ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ; প্রাচীন ভারতের কামার্থসাধনের উন্নতির বর্ণন এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

ইতিহাস-পুরাণ অর্থে সেকালে যাহা বুঝাইত, তাহার আলোচনা যথেষ্ট ছিল। পুরাকালের সূত-মাগধগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত বংশানুক্রমাদি প্রথম যুগের পুরাণে নিবিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলে যে যে রাজবংশ বা তাহার মধ্যে যে সকল প্রধান নরপতি প্রজাবৃন্দের ধর্ম্মরক্ষণের অনুকূল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া গৃহীত হওয়া বিচিত্র নহে। ৫ হাজার বৎসরের বংশাবলী এবং প্রত্যেকের সামান্য কার্য্যগুলিও ইতিহাস-পুরাণে স্থান দিতে হইলে কিরূপ মহাভারতের আয়োজন হইত, অনুধাবন করুন। পরবর্ত্তী যুগের পুরাণকার প্রাচীন আখ্যায়িকা সমগ্র গ্রহণ না

করিলেও উদাহরণ দ্বারা যেখানে লোকশিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সত্য ঘটনার উপরেই নির্ভর করিতেছে, ঐতিহাসিকরা এখন ইহা বিশ্বাস করেন। এ কালে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পুরাণ-চর্চ্চার বিচারক পাইয়াছি। এ স্থলে এই শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের শ্রমশীলতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। জজ পার্জিটার পরিণতবয়সে বহু শ্রমসাধ্য বিচারকের কার্য্যের সামান্য অবসরের মধ্যে কলিযুগের রাজবংশ রচনা করিয়াছেন। জজ বেভারিজ নন্দকুমার প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়া যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর; তখনও তিনি পার্শী পুস্তক পড়িতে পারিতেন না, এ কথা বহরমপুরে আমাকে বলিয়াছিলেন; অতঃপর ৩ বৎসরমধ্যেই শুনিয়াছিলাম যে, তিনি হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া আকবরনামার মত উচ্চ অঙ্গের পার্শী গ্রন্থের অনুবাদ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ পাজিটার অবসর লইবার পরে সমগ্র পুরাণ, ইতিহাস মন্থন করিয়া Ancient Indian history & tradition নামক গ্রন্থে উহার আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়াছেন। অবশ্য, ইহার উপরে আপীল চলে। সকলের নাম লইব না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে ভারতে প্রত্নতত্ত্বের দুর্গম পথ কত সহজ হইয়াছে, অনেকেই জানেন। প্রিন্সেপ (Prinsep) প্রমুখ মহাপণ্ডিতের এ দেশে আবির্ভাব না হইলে অশোকের অনুশাসন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিদুরাদির সাঙ্কেতিক লিখন বলিয়াই পূজা পাইয়া আসিত। ইঁহাদের কল্যাণে আজকাল অনেকেই এই 'মরার মাথার লেখা' পড়িতে পারেন বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি। কিন্তু বড়ই দুঃখ হয়, ভাণ্ডারকার তিলকের পরে শঙ্কর সায়নের দেশে আর বড় পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখিতেছি না; অবশ্য সমবেত চেষ্টায় মহাভারত হইতেছে। হিন্দুস্থানের প্রতিভা ত হিন্দুরাজের সঙ্গে মলিন হইয়াছে। বঙ্গে রাজা রাজেন্দ্রলালের পর শাস্ত্রী আছেন, কিন্তু স্থায়ী গ্রন্থ রচিত হইল কই? বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে নবীন ঐতিহাসিকের দল পাইয়া আমরা আনন্দিত; ইঁহারা নানা ভাবে আমাদের প্রাচীন অর্ব্বাচীন ইতিহাসের আলোচনায় যশস্বী হইতেছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য মনীষীদিগের ন্যায় শ্রমশীল ও সহিষ্ণু হউন, এই কামনা। 'অবসরমত বাসিব' ভাবের ইতিহাস-প্রেম না করিয়া আমাদের নবীন তন্ত্রের ঐতিহাসিক লেখকগণকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া এই কার্য্যে নিরত থাকিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। এ যুগের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "ইতিহাস সকলকেই লিখিতে হইবে" এই আদেশ দেশে অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইতেছে; পুরাবৃত্তচর্চ্চায় নব্য বাঙ্গালী এখন যেমন সোৎসাহে মনোযোগ করিতেছেন, ২০ বৎসর পূর্ব্বেও এমনটি ছিল না। কিন্তু কেবল পশ্চিমাস্য হইয়া ইংরাজীতে না লিখিয়া ইঁহারা দীনাক্ষীণা বঙ্গভাষাকে বাহন করুন। কাব্য-সাহিত্যে আমাদের একমাত্র রবি গ্রহগণ সমেত এখনও প্রাচীন মতের অনুসরণে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছেন (আজ অসুস্থতায় আমাদের নায়কত্ব গ্রহণে অক্ষম জানিয়া আমরা দুঃখিত); উত্তম নাটক-নভেল-লেখকও বাঙ্গালায় পাইতেছি। ইতিহাসে চন্দ্রোদয় দেখিতে বড়ই বাসনা হয়।

য়ুরোপে ইতিহাসের আলোচনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। গ্রীক্ হিষ্টোরিয়া শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল জ্ঞানানুশীলন এবং অনুসন্ধান, তাহা যে ভাবেই হউক না কেন। তথাকথিত ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস্ প্রথমে কথাটা ঐ অর্থেই গ্রহণ করিয়া নিজ সুবিখ্যাত গ্রন্থের লিখনপ্রণালীতে অনুসন্ধানের সহিত বর্ণনা ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বস্তু করিয়া তুলেন। পরবর্ত্তী যুগে লিপি-কুশলতা ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তথ্য অনুসন্ধান ততটা নহে। থিউকীডাইডিস্ প্রভৃতি প্রধান ঐতিহাসিকের নাম সকলেই জানেন; তাঁহাদের গুরুগম্ভীর চিত্র বা সরল সতেজ লিখন-ভঙ্গী একালেও লোকের অনুকরণযোগ্য। বহুকাল ধরিয়া এই ভাবেই নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত চিত্রের মত বর্ণনা যিনি দিতে পারিতেন, তিনিই উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিকের আসন পাইতেন। ইংলণ্ডে পরবর্ত্তী কালের মেকলে বা ফ্রুড্, ফ্রান্সে মিচিলেট্ প্রমুখ প্রতিভাশালী লেখক কলার দিক্ হইতেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক লেখক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন—কেহ বা ইহাকে উচ্চশ্রেণীর কাব্যের সাজে সাজাইয়াছেন, কেহ বা ঘটনাবাহুল্যে ভারাক্রান্ত করিলেও চিত্রপটের রঙ্গের কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। ফরাসী-বিপ্লবের নানা শ্রেণীর এই ভাবের ইতিহাস লক্ষ্য করিবার বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য বাস্তব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বানুসন্ধানেই ইতিহাসের প্রাণ, জার্ম্মাণ লেখকদিগের এই নির্দ্দেশ সবিশেষ উপলব্ধ

হইয়াছে। ক্রমে এক এক বিভাগের কার্য্যে এক এক দল তত্ত্বান্বেষী সুদক্ষ ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া সরকারী এবং অন্যত্র রক্ষিত কাগজপত্র ঘাঁটিয়া ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স এই কার্য্যে সমধিক অগ্রসর হইয়াছিল। আরও কিছু পরে বর্ত্তমান পুরাবিদ্‌গণ মৌলিক গবেষণা দ্বারা প্রাচীন পুথি, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড, ভূগর্ভ হইতে খনিত পদার্থ, অনুশাসন-লিপি প্রভৃতির যথাযথ আলোচনার পথ দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে সত্যনিষ্কাশন করিতে পারিলে আমাদের ইতিহাস-চর্চ্চা সার্থক হইবে। সম্প্রতি ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা পশ্চিম হইতে ধ্বনিত হইয়াছে। এই বিষয়ে সমস্ত বক্তব্য এখানে বলা অসম্ভব। যখন প্রত্যক্ষদর্শী সকল স্থলে মিলে না, মিলিলেও তাঁহাদের অনেকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন অনেক সময়ে ‘অনুমিত হয়’, ‘সম্ভবতঃ’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন ইতিহাস লেখা হয় না। কোন্ সালে কে কোন্ স্তম্ভ বা চৈত্য, ন্দির বা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছে, কোন্ সময়ে কি দ্ধে কি সামরিক ফল হইয়াছে, ইহাই লিখিলে ইতিহাস য় না, এ কথা এখন বালকেও বুঝে। আবার ধীমান্ কল‌এর দৃষ্টান্তে সকল শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে দেখাইয়া, বহু উপ-রণ সাজাইয়া, বুদ্ধির দৌড়ে মন-গড়া সভ্যতার ইতিহাস র্কে একবার দাঁড় করাইলেও উহা চিরপ্রতিষ্ঠ হয় না; া যতই জ্ঞান-গরিমা ও কল্পনার খেলা দেখান হউক।

এ কালে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রতিনিয়ত যে সমস্ত পকরণ আবিষ্কৃত হইতেছে, যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে র্ম্মিদল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সকল দেশের বর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের সাফল্যসাধনোদ্দেশে যেমন অকা-রে সাহায্যদান করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, অচিরে ভূত উপাদান সংগৃহীত হইয়া প্রাচীন ইতিহাস-সঙ্কলনে গান্তর আসিয়া পড়িবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে তথ্যের নুসন্ধানে সার সত্য নির্দ্ধারণ করা গেল বলিয়া অনেকে ল্লসিত হইয়াছেন, আজ তাহাই ভবিষ্য পুরাণের শ্রেণীতে াসিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসে বিজ্ঞান কথার অর্থ যদি ই হয়, যে কিছু উপকরণ সম্মুখে উপস্থিত আছে, তাহাই তর্ক-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিচারিত হইয়া গ্রন্থ লিখিত হউক, তাহা হইলে কাহারও কোন আপত্তি থাকে না। উচ্চ শ্রেণীর সমালোচনা এখন জ্ঞানোন্নতির সকল ক্ষেত্রেই প্রসার লাভ করিতেছে। ইতিহাসচর্চ্চায় বহু উপাদান চাই; কেবল খনন-কার্য্যের সাহায্যে বা বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর ইতিবৃত্ত সুপ্রতিষ্ঠ হইবে না। ইতিহাস-রচনা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; সেই নিমিত্তই মহাপণ্ডিতরা অনেকে কেবল এক এক দিকের বা কালের উপকরণ সংগ্রহেই ব্যাপৃত থাকেন। লেখক ভবিষ্যতে হইতে পারে, ‘বিপুলা চ পৃথ্বী’---আমরা যেন সবাই ঐতিহাসিক হইয়াছি মনে করিয়া বৃথা ফুলিয়া ভেকের দশা প্রাপ্ত না হই। রচনার ঝঙ্কারে বা তারিখের বহরে আর লোক ভুলে না। মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, সবগুলির তত্ত্ব বিচার করিবার ক্ষমতা যিনি রাখেন, তিনিই প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারেন। ভূতত্ত্ব, মানব-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির এখন অনেক আলোচনা চলিতেছে; পুরাবৃত্তবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ, মুদ্রা, শিলা বা ধাতুলিপি, শিল্পকলা প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের সঙ্গে সমাজ-তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বস্তু পর্য্যালোচিত হইলে তবে প্রকৃত ইতিহাস গঠিত হইবে। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা মানব-সমাজের জীবন-প্রবাহে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে কতদূর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার অনুধাবন করিতে হইবে; আবার সমাজবিশেষের সর্ব্বতোমুখী বিভিন্ন ধারার পুষ্টি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে হইবে। নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিতে না পারিলে তত ক্ষতি নাই। নিজের পূর্ব্ব-সংস্কারকে ভিত্তি না করিয়া, সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। এ কালে আবার Nationalistic বা স্বজাতিপ্রেম দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ ঐতিহাসিক বর্ণনা চলিতেছে; ইহা দোষের বলিয়া জ্ঞান থাকিলেও মোহান্ধ মানব আমার ও তোমার—বন্ধুর ভেদাভেদ একদেশদর্শীর মতই দেখিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ইতিহাস-রচনা বড়ই কঠিন কার্য্য। বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলার কথা, কবিতা, ছড়া, প্রবাদ, শ্রেণীবিশেষের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ কিছু পূর্ব্বে যাহা দেখা দিয়াছিল, তাহা আবার মন্দীভূত হইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়।* অন্যান্য দেশে

এক এক দল লোক এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। আমাদেরও এই ভাবের স্থায়ী উদ্যম চাই। এক জন বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তির উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি অল্পকাল বিদ্যুৎপ্রভা বিকাশ করিয়া খনিত্র-লেখনী সহযোগে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের উপক্রমণিকা মাত্র প্রকাশ করিয়া একভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াই আমাদের ভাগ্যদোষে স্তিমিতমত হইয়া গেল। পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে পাহাড়পুর খনন কার্য্যে মন্দিরের মস্তক বাহির হইয়াছে; বরেন্দ্রের বহুতর ধ্বংসাবশেষ সন্ধান করিলে গৌড়ের প্রাচীন ইতিবৃত্তের এক দিকে আলোকপাতের আশা আছে। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি এক যুগ পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে কল্পিত হইয়া মুদ্রাদোষে বর্দ্ধমান না হইয়া 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' মত হইয়া গেল। আপনারা বীরভূমে যে অনুসন্ধান ও ফলাফল জানাইয়াছিলেন, তাহারও আর কোন সাড়া পাই না। ঢাকায় ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও স্থায়ী কোন কার্য্য এখনও দেখা দেয় নাই। মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট, যশোহরের অনেক কথা লইয়া পুস্তক রচিত হইয়াছে; কিন্তু লৌকিক আচার বা প্রবাদ ও ছড়া লইয়া বিচার দেখা যায় না। অন্যান্য জিলায় বিশেষ চেষ্টা কিছুই নাই। পাশ্চাত্য দেশের পল্লী ইতিহাস রচনা আদর্শ করিয়া কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে হইবে; দেশের অর্থশালী লোককে এ কার্য্যে উৎসাহদানে উদ্‌বুদ্ধ করা সাময়িক পত্রের কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান পদ্ধতির ইতিহাস আলোচনায় আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ ঋণী। সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া অবধি তাঁহারা সকল দিক্ হইতে এ দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের তথ্যনির্দ্ধারণ কার্য্যে যে প্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছেন, আমাদের পণ্ডিতরা সেই পথই ধরিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের মত সমালোচনা এখন অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তি অশ্রদ্ধার সহিত দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিভাশালী গুণীর মধ্যেও অনেকে পূর্ব্ব-সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত অবশ্য সমস্তই স্থির থাকিবার নহে। বড়জোর খৃষ্টজন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সভ্যতার অস্তিত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্যমে প্রকটিত হইয়াছিল; অনেকে এখনও এই সিদ্ধান্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন। অধ্যাত্ম জগতে প্রাচীন হিন্দুর কৃতিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও বাস্তব জগতে হিন্দুর কার্য্য এই শ্রেণীর লোক খর্ব্ব করিতে পারিলে খুসী হয়েন। রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, কেহ কেহ দশমিক অঙ্ক-লিখনপ্রণালী যে এ দেশে উদ্ভূত, তাহা পর্য্যন্ত তর্কে উড়াইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মধ্যে যেন ইহার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের যাহা ছিল, তাহা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' এই ভাব না দাঁড়ায়। বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসন্ধান এ দেশে অভিনব; ইহা তুলনামূলক এবং সত্যসন্ধ হওয়া আবশ্যক। অসঙ্কোচে সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে; বাগাড়ম্বরে সত্যের বহিরাবরণে কল্পিত চিত্র সজ্জিত করিতে গেলে সত্যেরই নগ্ন প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িবে।

এখানে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। আমাদের পঠদ্দশায় বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্দিহান ছিলেন। 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং' ইত্যাদি ভাষায় এই বীরভূমের কান্ত কবি জয়দেব যে অবতারের স্তুতিগান করিয়াছেন, পণ্ডিতরা তর্কের বলে তাঁহাকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেই দেন নাই। কপিলবাস্তুর শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেবের জন্ম, আর যায় কোথায়? সব কথাই যে 'বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা' করা চলে! কপিলবাস্তুর মায়াদেবীর অর্থাৎ কপিলকলিত দার্শনিক মত ও মায়াবাদ একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়াই ত বৌদ্ধধর্ম্ম; শুদ্ধোদনই হিন্দুর 'সিদ্ধার্থ' বা বুদ্ধ হইবার উপকরণ; অতএব প্রমাণীকৃত হইল যে, বুদ্ধ বলিয়া একটা মানুষ কেহ ছিল না, বৌদ্ধভাব একটি দার্শনিক মত মাত্র। ইহার পরে এ দেশে দুই একখানি করিয়া বৌদ্ধ পুঁথি বাহির হইল; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কানিংহাম প্রমুখ কর্ম্মিবর্গের খনিত্র ও লেখনী চালিত হইল। এক দিকে হজসন, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পণ্ডিতের পুঁথি অনুসন্ধানে প্রিন্সেপের পাঠোদ্ধারে এবং অন্যত্র সিংহল, চীন ইত্যাদি বৌদ্ধ-প্রভাবের নিদর্শনভূমিতে প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কারে প্রতীচ্য তার্কিকও স্বীকার করিলেন যে, বুদ্ধদেব মানুষই ছিলেন বটে এবং

গয়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজগৃহ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করার কথা সত্য হইতে পারে। তৎপরে স্রোত উজান বহিয়া এমনই ধারায় চলিতে লাগিল যে, বৌদ্ধ গ্রন্থে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহা অকাট্য সত্য; তাহা বহু পরবর্ত্তী ললিতবিস্তারেই থাকুক বা আবিষ্কৃত অবদান নিকায়াতেই লিপিবদ্ধ হউক। জাতকের গল্পগুলির মধ্যেও অনেকে খাঁটি ইতিহাসের গন্ধ পাইলেন। পালিতে লিখিত গল্পগুজব বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের উপজীব্য; বামুণে পুরাণের সব কথাই অগ্রাহ্য। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক তথা পৌরাণিক অনেক আখ্যান Solar myth বলিয়াই গণ্য হইত। অবশ্য, এইরূপ ব্যাখ্যার পথ দেখাইয়াছেন—মনীষী কুমারিলভট্ট। প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধরা যখন অহল্যা উপাখ্যান ইত্যাদি লইয়া হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের দৌড় দেখাইতেছিলেন, তখন তিনি 'অহনি অহনি গীয়তে' ইতি অহল্যা—নিশাশেষ, জীর্য্যতি ইতি জার'—অহল্যা-জার অর্থে সূর্য্য। উষাহরণ বা বৃহস্পতির উপাখ্যান ঐ ভাবের, এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মতে এই ভাবের ব্যাখ্যায় রামচন্দ্র মনুষ্যত্ব হারাইলেন, সীতা লাঙ্গলের ফাল হইলেন,—দক্ষিণাপথে কৃষিবিস্তার রামায়ণের নির্গলিতার্থ হইয়া দাঁড়াইল। বৈদিক কৃষ্ণের সহিত ভারতের কৃষ্ণের একত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের তর্কের কথা বলিয়া প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহি না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই সমস্ত তত্ত্বকথা প্রমাণ করিবার জন্য যে ভীষণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা দেখিবার বিষয়। মহাভারত ও পুরাণের আখ্যান-বস্তুর প্রধান ভিত্তিগুলিও খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল।

অতঃপর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার এক নূতন যুগ ক্রমশঃ আসিয়াছে। প্রথমে বৈদিক সমালোচনার কথা কিছু বলিব। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কলির প্রারম্ভে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, এই উক্তি অবলম্বন করিয়া বেদ তথা বৈদিক দেবতার বয়স নিরূপণ এবং আর্য্যজাতির নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের উদ্যোগ চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। প্রতীচ্য মনীষীরা বেদ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিলেন যে, বৈদিক আর্য্যরা পশ্চিমোত্তর ভাগ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। Internal evidence ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় এক প্রকার স্থির হইল যে, এই আর্য্যরা য়ুরোপের নানা স্থানে যে শ্বেতকায় তথাকথিত সুসভ্য জাতি আছেন, তাঁহাদেরই জ্ঞাতি; পৃথক্ হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া শেষে পঞ্চনদ (সপ্তসিন্ধু) প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। কেহ বা মধ্য-এসিয়া, কেহ কৃষ্ণসাগর বা ভল্‌গা নদীর উপকূল, আবার কেহ বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ইঁহাদের আদি জন্মভূমি স্থাপন করিলেন। বহু দিন ধরিয়া আর্য্য দলের ঘোরা-ফেরায় গল্পের মত এই মতেরও ঘোর-ফের চলিল। অল্পকাল পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন মিতান্নি জাতির প্রাচীন নিদর্শন খুঁড়িবার সময়ে এক সন্ধিপটে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি নাম দেখিয়া ঐ স্থানেই আদিভূমি স্থাপনের উদ্যোগ হইল; অন্ততঃ ইরাণীদের সঙ্গে একযোগে থাকিয়া আর্য্যরা যে ঐ অঞ্চল হইতেই পরে ভারতে প্রবেশ করেন, এ বিষয়ে বড় একটা সন্দেহ রহিল না। মহামতি তিলক এবং অন্যের হিমমণ্ডলের আদি নিবাস (Artic Home) অনেকের মনোমত হইল না। এ কালে আবার অন্য ভাবে প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে। গ্রীয়ারসন্ এত কালের পর আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাতত্ত্বচর্চ্চায় বেশ বুঝিলেন যে, উত্তর-ভারতের সকল জাতি এক শ্রেণীর Aryan নহেন। রিজলী লোকগণনায় মাথা, নাক, করোটি মাপিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে আর্য্য-রক্ত সবেগে প্রবাহিত, মধ্যদেশে আসিয়া সে বেগ মন্দীভূত এবং নিম্নবঙ্গের পলি মাটীতে কচিৎ একটু রক্তবিন্দু দেখা দিতেছে। আমাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ভায়ার মত দুই এক জন সামান্য আপত্তি করিলেন। এক সময়ে ঐতরেয় আরণ্যকের 'বঙ্গা বগধা চের পাদা' আবিষ্কৃত হইয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, সেকালে বাঙ্গালী ও মগধবাসী সমস্ত লোক ছোট-নাগপুরের বর্ত্তমান চের জাতির লোকের মত পক্ষিধর্ম্মবিশিষ্ট ছিল অর্থাৎ এখানে সেখানে উড়িয়া বেড়াইত। বঙ্গা কি না বাঙ্গালী, বগধা যে মগধা, ইহা যে না বুঝে, তাহার কণ্ঠী ছিঁড়ি, এই ভাবের ভাগবতব্যাখ্যা চলিল। মতান্তরে বগধা বাগদী—আবার বাগদী হইতেই বাগড়ী—তা ঐ অঞ্চল বাগদী জাতির বাসভূমি নাই বা হইল? এ দিকে তিন বেদে বঙ্গের নামগন্ধ নাই। কীকট নামে বৈদিক দেশ মগধের দক্ষিণ ভাগ বলিয়া স্থির হইল। অথর্ব্ববেদে

জ্বর পীড়াকে মগধ ও অঙ্গের লোককে অঙ্গ দিতে বলা আছে; অথর্ব্ব-পরিশিষ্টে বঙ্গের নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু অথর্ব্ব স্বয়ং অর্ব্বাচীন, পরিশিষ্টে কা কথা। সম্প্রতি শ্যাম, আনাম দেশের পুরাবৃত্তে বংএর দর্শন পাওয়া গেলেও সে কত কালের প্রাচীন, তাহা স্থির হয় নাই।

মহামনস্বী সায়নাচার্য্য 'বঙ্গা' বনং গতা অর্থ করেন। তাঁহার সময়েও দক্ষিণাপথে পণ্ডিতে বৈদিক প্রক্রিয়া বুঝিতেন; বাঙ্গালা দেশেও ঐ কালে বেদপাঠক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈদিক ভাষা ও ভাবের ধারা বুঝিয়া উঠা যে বড় কঠিন, ঋষিদের সে যুগের উক্তি যে তত্ত্বাবভাবিত না হইলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে না, এ কথা ভাষাবিৎ পণ্ডিত আমলে আনিবেন না। অধ্যাত্মবিদ্যার সংস্পর্শে না আসিয়া, পুরাকালের যাগ-যজ্ঞের কিছুই না জানিয়া, ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র আলোচনা করিয়া অনেকেই বৈদিক সাহিত্যে পারদর্শী হইতেছেন। ম্যাকসমুলার হইতে ম্যাক্‌ডনেল পর্য্যন্ত অনেক প্রতীচ্য বৈদিক দেখা গেল; এখন ম্যাক-ই বেশী চলিতেছে বলিয়া আমাদের দেশেও নানা সাজের বৈদিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইতেছে। পরম সুহৃদ্ সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদের সময় অনেক সময়ে বলিতেন, এই শ্রেণীর গ্রন্থের যথাযথ মর্ম্মগ্রহ হওয়া বড়ই কঠিন। প্রাজ্ঞ লোক কঠিন মনে করিলেও এ যুগে কার্য্য বড় সহজ দাঁড়াইয়াছে। মনে পড়ে, ঋগ্বেদের 'শিশ্নদেবা' ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যখন অনার্য্যের লিঙ্গপূজা নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন, সেই সময়ে বৈদিক সমালোচনায় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী দেখাইয়াছিলেন, উহার মানে 'শিশ্নই দেবতা যাহার'—শিশ্নোদরপরায়ণ কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পশুভাবের লোক বুঝাইতে চিরকাল ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত সামশ্রমী মহাশয় বামুণ-পণ্ডিতের রাগ প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও 'তত্তৎ-পাদাব্জলেহী' দেশীয় লেখকের উপর গালিগালাজ করিয়া সমালোচনা কলঙ্কিত করিলেও অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন। তিনি প্রমাণ দিয়াছেন—'সমগ্র ঋগ্বেদ প্রাচীন, সাম পরবর্ত্তী' এ কথা ঠিক নহে, বরং সামগানের অনেক যাহা ঋগ্বেদে ধৃত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। 'বেদের মধ্যে আমি সাম,' এ কথার ভাল বিচার এখনও হয় নাই। যজ্ঞাদি কার্য্যে বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে ত্রয়ী বিভক্ত হইয়াছে; বাকী মন্ত্র যাহা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত নহে, অথর্ব্বণ আঙ্গিরস (প্রথম ব্যাস) পৃথক্ বিভাগ করায় শেষটি তাঁহার নামে অথর্ব্ববেদ বলিয়া কথিত হয়। আমি কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ, পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বিবাহের সময় কেবল গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবিধির কিয়দংশমাত্র মুখস্থ থাকিলেও 'কৌথুমী শাখৈকদেশাধ্যায়িনে' বলিয়া বিষ্ণুসাক্ষাৎ অনেকের মত আমাকেও অপ্রতিভ করা হইয়াছিল, তাই পরে সামশ্রমীর কৌথুমীর একদেশ যথাজ্ঞান পড়িয়াছিলাম (ভঙ্গ কুলীন—যদি আবার বিবাহে বসায়)। বেদের কিছুই জানি না, প্রায়শঃ অনুবাদ ও ইংরাজী সমালোচনা পড়িয়া এ কালের মতে সমালোচক হইতেছি, আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। আমার প্রার্থনা, কবির ভাষায় 'আবার তোরা মানুষ হ'—আবার অধিকারী হইয়া বাঙ্গালী বৈদিক গ্রন্থ বুঝিতে চেষ্টা করুক। অনুবাদে নির্ভর করিতে হইবে না, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও আবশ্যক হইবে না। বন্ধু অবিনাশ বাবুর বৈদিক ইতিহাসের কথা পরে একটু বলিব। ইলার বংশই ঐল, ঐড় কি না আর্য্য; অর্থাৎ কুরুপঞ্চালবাসীই খাঁটি বৈদিক আর্য্য, মনুর বা সূর্য্যবংশ অনার্য্য বা অন্য দল, এই সংবাদ পার্জিটার প্রকাশ করিতেছেন। আবার 'পিতৃকন্যা' বিবাহ মানে সহজ ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইত, এই অদ্ভুত মতও তাঁহার পুস্তকে আছে!

প্রাচীন ইতিহাস বা কাহিনীর কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, সামান্য আরও কিছু বলিবার নিমিত্ত আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি। 'খৃষ্টের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদল উত্তর-পশ্চিমের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া অসভ্য অনার্য্যদলকে বিতাড়িত করিতেছিল, তাহারা তখনও ভাল কৃষিকার্য্য, রন্ধন-কৌশল বা বস্ত্রবয়ন জানিত না' ইত্যাদি সত্য সংবাদ যাহা আমরা পড়িয়াছি ও পড়াইয়া আসিয়াছি, তাহা এখন কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইলেও এ কালে লোক আর বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। বেদ কৃষকের গান ছিল, এখন একটু উচ্চে আসন পাইতেছে। পণ্ডিতপ্রবর তিলক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রবিচারে তাঁহার Orion গ্রন্থে জ্যোতিষিক গণনায় বেদমন্ত্র রচনার কাল ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহার প্রমাণ দিলেও পশ্চিমের পণ্ডিতবর্গ সে মত গ্রহণ করেন নাই। শেষ তাঁহার Arctic Home গ্রন্থে বৈদিক

যুগ অন্ততঃ আড়াই হাজার বর্ষ খৃঃ-পূর্ব্ব বলায় কেহ কেহ সায় দিবার মত করিয়াছেন। অয়নচলন ও কৃত্তিকা লইয়া না কি জ্যোতিষ ৫ হাজার খৃঃ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে। প্রতীচ্যগণ মিত্র-বরুণাদি দেবতাকে আর্য্য-আত্মীয় দলকে একযোগে দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ভারতে আর্য্য সভ্যতার কাল আর পিছাইতে সম্মত নহেন। আমাদের পক্ষে প্রবীণ বন্ধু অবিনাশ দাস সজোরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে পাশ্চাত্য মতেই মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া খৃষ্টের অন্ততঃ ২০।২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে গিয়া পৌছিয়াছেন; কিন্তু ভায়া যখন ঐ যুগে আর্য্য-বসতির ত্রিসীমায় সাগর আনিয়া আমাদের বাঙ্গালাকে অতল জলে ডুবাইয়াছেন, তখন আর আমাদের আর্য্যের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে গৌরব অনুভব করিয়া লাভ কি ?

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহকার্য্যে পুরাতত্ত্ব বিভাগ সারনাথ, বোধগয়া, মথুরা, সাঁচি ও ভারতস্তূপ, শেষ পাটলিপুত্র এবং তক্ষশিলার খনন ও অনুসন্ধান করিয়া খৃঃ-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর আগে পৌছিতে পারেন নাই। পরন্তু ইহাতেও গ্রীক পারসীক ঋণ অধিক করিয়া চাপাইবার উদ্যম হইয়াছে। গত দুই বৎসর হইতে সিন্ধুপ্রদেশের হারাপ্পা ও মোহেঞ্জো-দড়োর খননকার্য্যে যে সমস্ত প্রাচীন চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে সুদূর অতীতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-বিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। পুনশ্চ সুমেরীয় সভ্যতা ভারতের প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার কাহিনী যাহা ওয়াডেল্ প্রমুখ লেখকবর্গের ধারণা, তাহাও উড়িয়া যায় মনে হইতেছে। এই সমস্ত বিষয়ের সবিস্তার বিবরণী দিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার ইচ্ছা নাই।

এ দিকে যাহাই হউক, বর্ত্তমানের ইতিহাসের ধারা এবং বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকরা ঐ স্রোতে কিরূপ উৎসাহে অগ্রসর হইতেছেন, তাহার কথাই আমাদের এই সম্মিলনের ইতিহাস বিভাগের প্রধান আলোচনার বিষয়। বড়ই আনন্দের কথা, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধানের এক প্রবল স্পৃহা জাগিয়াছে। পুরাবৃত্ত, লিপিতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণের প্রধান বিষয়গুলি এখন নানা দিক্ দিয়া সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অন্যান্য প্রদেশের সুকৃতী কয়েক জন পণ্ডিতের মত বাঙ্গালীও যশস্বী হইতেছেন; অন্য অনেকে হিন্দু এবং বৌদ্ধগ্রন্থ, শিলালিপি, মূর্ত্তি প্রভৃতির পরিচয় দিয়া পুরাতত্ত্ব সংগ্রহকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত আমাদের ঐতিহাসিক চিত্র তিন বার দর্শন দিয়াই মুছিয়া গিয়াছিল; এখন মাসিক পত্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পাতাও কাটা হয় দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর স্নেহভাজন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহার ইংরাজী ভারত ইতিহাসের ত্রৈমাসিক পত্র চারিখানিই প্রকাশিত হইয়াছে;—পরে বাঙ্গালা ভাষায়ও সাধারণ পাঠ্য সাময়িক পত্র ইতিহাসের উপকরণ অধিক বহন করিবে বলিয়া আশা হইতেছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালার অধিকাংশের পুরাবৃত্ত ইতোমধ্যেই কয়েক জন বাঙ্গালী যুবক প্রচারিত করিয়াছেন; এখনও অনুসন্ধান অনেক বাকী, সুতরাং তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অধিকাংশ আলোচনা বাঙ্গালা ভাষায় হইলে আরও সুখের হইত। পাশ্চাত্যদেশেও যাহাতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল প্রচারিত হয়, এই আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালা ভাষা এখনও এত উচ্চ স্থান অধিকার করে নাই যে, অন্য ভাষায় উহার অনুবাদ হইবে, এই বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ ভাষান্তরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু আমাদের সুকৃতী ঐতিহাসিক লেখকগণ নিজ মৌলিক গবেষণার ফল যদি বাঙ্গালায় প্রচারিত না করেন, তাহা হইলে ইহার সম্পদ কিরূপে বাড়িবে, ইহাও তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হয়। যতই ভাল ইংরাজী লিখুন, ইংরাজী সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় ?

কেহ কেহ মনে করেন, এমন কি, ছাপার অক্ষরে প্রকাশও করিয়াছেন যে, "বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস গৌরবের অপূর্ব্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল।" আমার মনে হয়, এতটা বাড়াবাড়ি না করিয়া গৌরবের বা অগৌরবের কথা কি আছে, তাহার যথাযথ সমালোচনা হওয়াই ভাল। আমাদের পুরাতন আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্মভাব, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হয়, নানা দিক্ দিয়া তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে। কিরূপ ঘটনা

পরম্পরার সমাবেশে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। নতুবা তথাকথিত স্বদেশপ্রীতির মোহে চালিত হইয়া, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সব ভাল মনে করা অভ্যাস হইয়া গেলে প্রকৃত ইতিহাসচর্চ্চা ত হইবেই না; অযথা গর্ব্বে যেটুকু মনুষ্যত্ব এ যুগের আঘাতে জন্মিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস, তাহাও হারাইব। দেশাত্মবোধ মাথায় আসিয়াছে, ইহা মনে হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে নামিতে অনেকটা সময় লাগে। আমাদের মধ্যে যিনি বড়, তিনি বর্দ্ধমানে প্রথম গৌরবের কথায় হাতী ধরিয়াছিলেন, এখনও মনে আছে; কিন্তু তাহাও অঙ্গের সহিত অঙ্গ মিশাইয়া। অঙ্গদেশকে বেদও অঙ্গ দিয়াছেন।

বাঙ্গালার রেশম, তসর, তূলার বস্ত্রবয়নকৌশল, বিজয় সিংহ প্রভৃতির সিংহল শ্যাম আনাম আদি দূরদেশে উপনিবেশস্থাপনের কথা, ধর্ম্মপ্রচারকবর্গের সুদূর চীন জাপান পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দার্শনিক ভাব প্রচার; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য প্রভৃতির গুণপনা, শীলভদ্র, শ্রীজ্ঞান, অতীশ প্রমুখ মহামনস্বী লোকশিক্ষকদিগের বিদ্যাবত্তা; শাক্ত বৈষ্ণব মতের সহিত সে যুগের বৌদ্ধভাবের মিশ্রণে আধ্যাত্মিক উন্নতি, সর্ব্বশেষ বৈষ্ণব গীতিকার এবং চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে সাধারণ বাঙ্গালীর প্রাণের সাড়া ইত্যাদি গৌরবের কথা যত ইচ্ছা প্রচার করুন, কিন্তু সেই সঙ্গে বঙ্গের বস্ত্র-শিল্পের বাণিজ্যের অবনতি এবং ধর্ম্মমতের অপব্যবহারে সমাজের অধোগতি ইত্যাদি অগৌরবের বিষয়টাও যেন স্মরণ থাকে। বাঙ্গালীর বল সেকালে যাহা ছিল বলিয়া বিশ্বাস, তাহা কিরূপে গেল, ইহাও অনুসন্ধানের বিষয়। জাতীয় অধঃপতনের কারণ ও নিদান স্থির হইলে রোগমুক্তির উপায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতঃপর বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের কঙ্কাল যেটুকু যোজনা করা হয়, তাহার উল্লেখ করিব। অথর্ব্ববেদসংহিতায় অঙ্গের এবং অথর্ব্বপরিশিষ্টে বঙ্গের নাম পাওয়া যায়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র অর্থাৎ 'বরেন্দ্র দস্যুর' নিবাস বলিয়া কথিত। শতপথ ব্রাহ্মণের মাথবা যজ্ঞীয় অগ্নির সঙ্গে পূর্ব্বাভিমুখে সদানীরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই নির্দ্দেশে এক সময়ে 'করতোয়া সদানীরা' অভিধান পাইয়া বরেন্দ্রের আনন্দ-উল্লাস বাড়িয়াছিল; এখন আবার গণ্ডকের গণ্ডীতে সদানীরাকে বাঁধা হইতেছে। এ দলের কর্ম্মীরা বৈদিক সভ্যতা গণ্ডকের ধার পর্য্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে আনিতে দিবেন। ঐতরেয় আরণ্যকের 'বঙ্গা বগধা' যদি বাঙ্গালা হয়, তবে তাহারাও ভবঘুরে বলিয়া সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত। আর্য্য বৈদিক গ্রন্থে বঙ্গের গৌরব এই পর্য্যন্ত। বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রে পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলা আছে। এই উক্তি হইতে অনুমিত হইয়াছে যে, বৈদিক বা সূত্রযুগে যদি কোন আর্য্যদল এ দেশে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-রচয়িতৃগণের বিবেচনায় অসভ্য। পুরাণে পাওয়া যায় যে, বলি পূর্ব্বদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অপুত্রক হইলে ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে তাঁহার পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র। পৌরাণিক পার্জ্জিটার স্থির করিয়াছেন যে, এই বলি নিশ্চয়ই অসুর বলি নহেন; পরবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ লেখক ইতিহাসজ্ঞানের অভাব বশতঃ ইঁহাকেও বৈরোচন আখ্যা দিয়াছে। এই দ্বিতীয় বলি অসুর-বংশে জন্মিয়া প্রাচ্যদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বঙ্গাদি পাঁচ পুত্রকে সকলে গল্পের রাজপুত্রের মতই ভাবিত। এক্ষণে পৌরাণিক বিচারে জনশ্রুতিমূলক ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাশিত হইতে পারে, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতেছেন। লোকের নামে নগর পরে দেশের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আপাততঃ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন হাজার পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ওদিকে যাইতে পারে না, তখন বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তে (অঙ্গে) ঐ কালের পূর্ব্বেই আর্য্যের বসতিবিস্তার হইয়াছিল এবং পৌরাণিক জনশ্রুতি দৈত্য বলিকে আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অঙ্গ-বঙ্গাদির প্রাচীন ঋষিপুত্র রাজবংশীয়েরা মিশ্রজাতি ছিল বলা যায়। পুরাণে অনেক দৈত্য অসুর রাক্ষসকে ব্রাহ্মণ জনক দেওয়া হইয়াছে, এ কথারও ব্যাখ্যা চাই। কেহ কেহ বৈদিক আর্য্যের বাস-ভূমির চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য আর্য্যদলকে স্থান দেন। পার্জ্জিটার অনুমান করেন, বঙ্গ-পুণ্ড্রাদির প্রাচীন লোকরা জলপথে আসিয়া ক্রমে উত্তরদিক পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়েন। তিনি কি এই ভাবে বলির বংশকে পাতাল হইতে আনিতেছেন?

প্রবীণ বন্ধু নন্দলাল বাবু কি বলিবেন? মহাভারতে কর্ণ পূর্ব্বদেশীয়কে শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বলিলেও পৌণ্ড্রা শাশ্বত ধর্ম্মে জ্ঞাত আছে বলিয়া আমাদিগকে হিন্দুর দলে লইয়াছেন।

বঙ্গে আর্য্যনিবাসের পূর্ব্বে কাহারা বাস করিত, এই কথা লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে। অবশ্য, এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। সাক্ষী-সাবুদ দিয়া সানির প্রার্থনা চলে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পূর্ব্বাগত আর্য্যগণ দেশ জয় করিতে করিতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিলে আর এক সভ্যতর আর্য্যদল উত্তরপশ্চিম পথে পঞ্চনদে প্রবেশ করেন, ইঁহারাই বৈদিক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। কেহ বা বলেন, মধ্য-এসিয়া হইতে আর এক দল আর্য্য হিমালয়ের পথে আসিয়া মধ্যদেশনিবাসী ঐ আর্য্যদের তিন দিকে ছড়াইয়া পড়েন। এই শেষোক্ত পণ্ডিত কয় জনের মতে অঙ্গ-বঙ্গবাসী প্রধানতঃ আর্য্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। রিজলীর বৈজ্ঞানিক এবং পার্জিটারের পৌরাণিক প্রক্রিয়ায় প্রাচীন বাঙ্গালী দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় মিশ্রজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিঞ্চিৎ আর্য্যরক্ত ইহাতেও আছে বলিয়া অভয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা কতটা আর্য্য, কতটা অনার্য্য, স্থির করা কঠিন সমস্যা হইলেও য়ুরোপীয় সুসভ্য জাতিরাও মিশ্র, এ কথা একালে স্বীকৃত হওয়ায় আমাদের লজ্জার আর কোন কারণ নাই। বৈদিক গ্রন্থ রচনায় বাঙ্গালীর অংশ না থাকে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বাঙ্গালী যে সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে কষ্টের কিছু লাঘব হইতে পারে।

পুরাণের উক্তি ঐতিহাসিক তুলাদণ্ডে মাপিয়া স্থির হইয়াছে যে, মহাভারতের নির্দ্দেশমত ভীমের অঙ্গরাজ কর্ণ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গের সমুদ্রসেন, এবং সুহ্মের রাজাকে দিগ্বিজয়ব্যাপারে নির্জ্জিত করার কথা বিশ্বাসযোগ্য। সুহ্ম প্রসুহ্মের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত না হইলেও বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত স্থান লইয়া সুহ্ম বসান যায়। প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে ‘সুহ্মা রাঢ়াঃ’ – দশকুমারচরিতে ‘সুহ্মেষু দাম লিপ্তি নগরী’— আছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বীরভূমকে এই সুহ্মের মধ্যে আনিতে ইচ্ছা করিলে কাহারও আপত্তি নাই। মহাভারতে এ দেশে সমুদ্রকূলে কিরাত ও ম্লেচ্ছদিগের বসতির নির্দ্দেশ আছে। এই যুগে মহাবল জরাসন্ধ এ দিকের আসমুদ্র ক্ষিতীশ ছিলেন। তাঁহার নিধনের পরে কর্ণ বঙ্গীয় সৈন্য-সামন্ত সহ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যোগ দেন; কিছু কাল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ যে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহা স্থির। শিশুনাগবংশের অধিকারকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; নানা স্থানে ক্ষুদ্র তথা-কথিত রাজবংশ অধীনতা স্বীকার করিয়া দেশ শাসন করিতেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। গ্রীক-লিখিত বিবরণী হইতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বাঙ্গালায় গঙ্গারিডি নামে এক সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। প্রাচী অর্থাৎ মগধের পূর্ব্বদিকে গঙ্গাস্রোতান্তরে ইহার অবস্থান, পরবর্ত্তী কালে প্লিনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গারিডির পশ্চিম সীমায় গঙ্গা, এই কথা পাইয়া উহার সন্ধানে বহু ক্লেশ স্বীকার করা হইতেছে। কেহ কেহ পদ্মাকে প্রাচীন কাল হইতেই গঙ্গার খাত মনে করিয়া লইয়া বর্ত্তমান বাগড়ীর ত কথাই নাই, ফরিদপুর বরিশাল পর্য্যন্ত এই গঙ্গাহৃদয়ে আনিতেছেন (গঙ্গাহৃদয়-ই নাম কি না, ইহাতেও ঝগড়া আছে)। পৌরাণিক জনশ্রুতির সুবিচার করিলে এবং গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুর চিরদিনের বিশ্বাস মনে রাখিলে পদ্মাপ্রবাহ যে প্রাচীন গঙ্গা নহে, এটা বেশ বুঝা যায়। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া জিলায় ভাগীরথীর উভয় তীর একটু দূর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিলে এখনও প্রমাণ হইবে যে, “ভগীরথখাদাবচ্ছিন্ন যে জলপ্রবাহ”—বাঙ্গালায় ভাগীরথী, তাহাই পুরান গঙ্গার খাদ; এই অঞ্চলে বিভিন্ন কালের নানা খাত, বিল প্রভৃতি এবং পার্শ্ববর্ত্তী কাটোয়া (মিগাস্থিনিসের কাটদ্বীপ), অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়, চাকদহ প্রভৃতি স্থান এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। যদি বাগড়ী বঙ্গাড়ীর অপভ্রংশ হইয়া ক্রমে গঙ্গাড়ীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তাহাতে এ পক্ষের আপত্তি নাই। চারি শত বর্ষ পরবর্ত্তী টলেমীর ভূগোলে গঙ্গারিডির রাজধানীর নামও গঙ্গা। মুর্শিদাবাদে পশ্চিম রাঢ়ে ‘গঙ্গারডি’ নামে এক গ্রাম আছে; তথাকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ এক উকীল বন্ধু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সেইখানে রাজধানী স্থাপনের আর্জ্জি পেস্ করিয়াছিলেন; আপনারা এখন বিচার করুন —আইনের দেরীর প্রবাদ ত সবাই জানেন।

পরবর্ত্তী যুগের কর্ণ স্নবর্ণের প্রধান গড় (রাজধানী) যে ভাগীরথীতীরে রাঙ্গামাটি, তাহা ঐ অঞ্চলের একটু দূরে ; কাটোয়ার অনতিদূরে গঙ্গাটিকরীকে নিজ রাজধানী হইলেও পরিহাসরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রাচীন রাজধানী বানাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। যাহাই হউক, গ্রীক্ লেখকগণ গঙ্গারিডির বিপুলায়তন হস্তী সেনাদলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহারই জন্য বিদেশী কোন রাজা কখনও গঙ্গারিডি জয় করিতে পারেন নাই ; আলেকৃজণ্ডার ‘গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া’ ঐ দেশের রাজার ৪ হাজার হাতী আছে শুনিয়া আর আক্রমণে অগ্রসর হয়েন নাই,—এই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার গল্প অলীক। গঙ্গারিড়ির রাজা Xandrames লইয়াও অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে—অনেকে ইহাকে নন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া মগধের সঙ্গে অঙ্গ, বঙ্গ মিশাইয়া ঐতিহাসিকত্ব বজায় রাখিতে ইচ্ছা করেন।

নন্দবংশীয় নৃপতিরা কোন কোন মতে আদিতে বাঙ্গালার লোক ছিলেন। তাঁহারা প্রবল হইয়া ক্রমে অঙ্গ ও পাটলিপুত্র অধিকার করিয়া বসিলে, তথায় শূদ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই দুই এক জন লেখকের মত ; –‘নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।’ নন্দদিগের পরে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় বাঙ্গালার অধিকাংশ মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ; মৌর্য্যের অধঃপতনের সময় মুরুণ্ডা নামক জাতির বাঙ্গালায় প্রবল হওয়ার কথা এ কালে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণ হইতে পার্জিটার দেখাইয়াছেন যে, দেবরক্ষিত নামে আর এক দল চম্পায় রাজধানী করিয়া তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। পৌণ্ড্র অন্ধ্র পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকারে থাকার উল্লেখে অনেকে বুঝিয়াছেন যে, গঙ্গাতীরে অন্ততঃ ভাগলপুর হইতে গোদাবরী উপকূলে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত এই দেবরক্ষিতরা রক্ষা করিতেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ অশোকস্তম্ভ লিপিতে দেবরাষ্ট্র বলিয়া যে রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহা এই দেবরক্ষিত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। খৃষ্ট চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্র নামক দিগ্বিজয়ী নরপতি পশ্চিমে বাহ্লীক হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিকাংশ জয় করেন,মেহেরুণী শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে যে চন্দ্রবর্ম্মার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনি এই চন্দ্র হইতে পারেন অনেকে মনে করেন ; কেহ কেহ বা গুপ্তবংশের স্থাপয়িতা চন্দ্র ও ইঁহাকে অভিন্ন বলেন। ইনি যে চন্দ্রই হউন, বাঙ্গালার তারাগণ ইঁহার নিকটে নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অতঃপর সমগ্র বাঙ্গালা গুপ্ত সম্রাটগণের অধিকারে আইসে। নদীয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগড় এই অঞ্চলের প্রবাদমতে মহাভারতের সমুদ্রসেনের নামের সঙ্গে সংযুক্ত, না বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের স্থাপিত, ইহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। যাহাই হউক, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপ ক্ষুদ্র রাজ্য বা অধীনতা এই উভয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিতে হইতেছে। এ কালের মতে মহাকবি কালিদাসকে যদি গুপ্তযুগে আনিয়া রাখাই ভাল মনে করেন, তবে তাঁহার “আপাতপদ্মপ্রণতা কলমা ইব তে রঘুম্’ বা ‘বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্’—সার্টিফিকেট মাত্র বাঙ্গালীর সম্বল থাকে। কিন্তু শিবশক্তিসাধক মহাকবির এ কালে দুই শিব-নামা জাতকলেখক উঠিয়াছেন, এক আমার শিক্ষাগুরু ৺সারদারঞ্জন, দ্বিতীয় কে শঙ্কর : ইঁহারা যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন যে, কালিদাস খৃঃ-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক। মহাকবি যে কালেরই হউন, বাঙ্গালীর উপর তাঁহার ধারণা উচ্চ ছিল না ;—যাঁহারা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

অশ্বমেধযজ্ঞকারী কুমারগুপ্তের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে চিরাত দত্ত এবং কোটিবর্ষ বিষয়ে (বর্ত্তমান দিনাজপুর, রঙ্গপুরে) বেত্রবর্ম্মা নামক সামন্ত-রাজার নাম তাম্রফলকে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই দামোদরপুরের শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অন্যান্য ফলকে উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সামন্ত ‘মহারাজ’ উপাধিতে ভূষিত। তখন নাম মাত্র সম্রাট বুধগুপ্ত পাটলিপুত্রের অধিপতি। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে ক্ষোদিত ফলকে পুণ্ড্ররাজের নাম ও উপাধি ‘মহারাজ রাজপুত্র দেব ভট্টারক।’ এই কালেই বাঙ্গালার অন্যভাগে গোপচন্দ্র, সমাচারচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য প্রভৃতি অন্য মহারাজাধিরাজের নামও এ কালে জানা গিয়াছে। সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে প্রাদেশিক ক্ষুদ্র রাজগণের উপাধি বেশ একটু দীর্ঘ হয় ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহা মোগলের অধঃপতনের পরে ক্রমে যে সুদীর্ঘ উপাধি সকল সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ-নবাবের তিন ছত্রে লিখিত উপাধিতে দৃষ্ট হয়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে এক বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। শশাঙ্ককে 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দুঃ কিরণেষু' ইতি ভাবে দেখিলে আমাদের 'একচন্দ্রস্তমো হন্তি' বলা যাইতে পারে। হর্ষবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধনকে শশাঙ্কের হত্যা করার কাহিনী এবং বোধিদ্রুম ছেদন করার উপাখ্যান অনেক ইতিহাসপাঠকই জানেন। মহাকবি বাণভট্ট এবং পণ্ডিতবর হুয়েন্‌সাং (এখন ইয়ুন্ চোয়াং) যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বদেশ-প্রেমের আতিশয্যে তাহাকে পক্ষপাতযুক্ত মনে করিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার করা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাস-চর্চ্চা হয় ত হউক। বাণভট্টকে মিথ্যাবাদী এবং ইয়ুন্ চোয়াংকে হর্ষবর্দ্ধনের অনুগ্রহপ্রার্থী হঠাৎ বলিয়া ফেলা বড়ই সাহসিকতা। ইয়ুন্-চাংএর বর্ণনায় বাঙ্গালার অবস্থা সর্ব্বজনপরিচিত, তাহা লইয়া প্রবন্ধ বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ সম্বন্ধে গল্প ইয়ুন্-চাং নানা স্থানে শুনিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ভুল থাকিতে পারে, এইরূপে সমগ্র বঙ্গের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সাবধানে গ্রহণীয়। তাই বলিয়া মূল কথা রাজ্যবর্দ্ধন-নিধন উড়াইয়া দেওয়া চলে না। শশাঙ্কের পরবর্ত্তী কালে পুনরায় বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে গোলযোগ ঘটে; উত্তরে শৈলবংশ এবং সমতটে খড়্গরাজগণের নাম পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় আদিত্যসেন নামক রাজার নাম করেন; এই আদিত্যসেন মগধের আদিত্যসেন হইতে পারেন। এ কালে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ গৌড়রাজ্য বলিয়া পরিচিত। শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর; অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে কামরূপ-অধিপতি হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশলের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

অতঃপর কানোজের যশোবর্ম্মা গৌড়-বিজয়ে উল্লসিত হইয়াছেন, এমন সময়ে কাশ্মীরের ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে আসিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়া বিশ্বাস-হন্তা হইয়া তাঁহাকে নিহত করাইলে গৌড়ীয় দল সেখানে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন, কহ্লনের প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীতে এই উপাখ্যান আছে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক দুই এক জন এটি গল্পমাত্র বলেন; বাঙ্গালীর বীরত্বের কথা কি বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাসযোগ্য? যাহা হউক, বহিরাক্রমণ এবং অন্তর্বিপ্লবে সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং অষ্টম শতাব্দীর সমগ্র ভাগে বাঙ্গালা বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। এক সময়ে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়লক্ষ্মীর অধীশ্বর হইয়া তাঁহার শ্বেতছত্র লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে লামা তারানাথ লিখিয়াছেন, "ওডি বিসা, বাঙ্গালা এবং পূর্ব্বদেশের অন্য পাঁচটি বিভাগে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন, দেশে কোন রাজা ছিল না"—ইহার অর্থ, যিনি একটু বলসঞ্চয় করিতেন, তিনিই রাজা নাম পাইতেন; দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার হইত। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের সুপ্রসিদ্ধ তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, দেশে "মাৎস্যন্যায়" অর্থাৎ অরাজক অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় প্রজাবর্গ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বপ্যটের পুত্র গোপালকে রাজা মনোনীত করেন। পালবংশের অভ্যুদয় বাঙ্গালার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা; রাজা মনোনয়নে স্বরাষ্ট্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'সমুদ্রপুত্র' বিশেষণে পালবংশের আদিনিবাস বঙ্গসাগরের উত্তর-কূলে কোন স্থানে মনে হয়। মহাবল পালরাজ ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের সময়ে বাঙ্গালার বিজয়বাহিনী মধ্যদেশ পর্য্যন্ত পদানত করিয়াছিল; মহীপালের কীর্ত্তিগাথা প্রবাদ-বাক্যে এখনও বর্ত্তমান। বাঙ্গালার সমৃদ্ধি, শান্তি-সুখ, ধর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতি এই যুগের; তক্ষণ-শিল্পে ও দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণে বাঙ্গালী ভাস্কর এ কালে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছে। পাল এবং সেনবংশ সম্বন্ধে ইতিহাসের বহুল আলোচনা হইয়াছে; সুতরাং সে কথা অধিক বলা বাহুল্য। সেনবংশের অভ্যুদয় কোথায়, এই কথা লইয়া আমাদের বিদ্যা এখন "বিবাদায়" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার কোন ঐতিহাসিক অধ্যাপক বন্ধু গল্প করিতেন, 'মুন্সীগঞ্জ বড়, না মাণিকগঞ্জ বড়', এই তর্ক লইয়া দুই সহোদর পৃথগন্ন হইয়াছিল; সেনের প্রথম রাজধানী রাঢ়ে না বরেন্দ্রে, এই লইয়া আমরা সবাই আজ ভিন্ন হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি। সেনকুলতিলক বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের কথা বলিবার লোভ বাধ্য হইয়া সংবরণ করিতেছি। সেনবংশের সহিত ক্রমে গৌড়-বঙ্গের অধঃপতন এবং মুসলমান বিজয়ীর অভ্যুদয় 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' পুস্তকে অল্পদিন পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; পুনরুল্লেখের ক্ষেত্র ইহা নহে।

এই অধঃপতনের কারণগুলি বিশেষরূপে অনুধাবন করিবার বিষয়।

বঙ্গে ৬ শত বর্ষব্যাপী মুসলমান অধিকারের ইতিহাসের কথা কিরূপে বলিব? ৪০ বৎসর ধরিয়া এই যুগের ইতিহাস চর্চ্চাই করিয়া আসিলাম। শুনিয়াছি, কোনও পণ্ডিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর আবার ইতিহাস!' মহাপণ্ডিতরা হাজার হাজার বৎসরের পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন, তাহাতে কাহার আপত্তি আছে? কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত কাদা মাখাই সার দেখিতেছি। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, ডাঙ্গার ঘুটিং কুড়াইয়া মরি! দুঃখের কাহিনী শুনিবার লোকের আজও অভাব হয় নাই। হিন্দুর চরিত্রহীনতা এবং দুর্ব্বলতা কেন আসিল? কোন্ পথে চালিত হইলে আবার তাহারা মানুষ হইতে পারে, এইগুলি সর্ব্বদাই ভাবি; কবি কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ বলিয়া উৎসাহ দিলেও প্রাণ বুঝে না। হিন্দুরাজের অধঃপতন কিরূপে ঘটিল, তাহার যথাযথ আলোচনার অবসর এখানে নাই। শুদ্ধ বাহুবলের অভাব ইহার কারণ নহে। নানা ভাবে জাতীয় চরিত্রের অবনতি, দেশাত্মবোধের সম্পূর্ণ অভাব বাঙ্গালী-সমাজের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল; আবার মুসলমানরাজের পতনও ঐরূপ কারণেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদের দৌর্ব্বল্য এবং অগৌরবের কারণসমূহের যথাযথ আলোচনা হওয়া উচিত। আর বেশী বিরক্ত করিব না।

আজ আমরা বীরভূমির প্রধান নগর সিউড়ীতে সম্মিলিত হইয়াছি। ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে ভূগোলসূত্রে মুখস্থ করিয়াছি, বীরভূম—সিউড়ী, নগর, সুরুল। সিউড়ী একালে প্রধান নগর হইয়া উঠিলেও নগর বা রাজনগরই বীরভূমির প্রধান স্থান। নগরের রাজবংশ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই,—পুরাতত্ত্বের খনিত্র এখানে চালিত হওয়া উচিত। সুরুল এক কালে এ অঞ্চলের বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্র ছিল। রাজকুমার মহিমানিরঞ্জনের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতি হরেকৃষ্ণ বসু প্রমুখ কর্ম্মিদলের অনুসন্ধানের ফল দুই খণ্ড বীরভূম-বিবরণ প্রকাশিত করিয়া অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব কথা জানাইয়াছেন। পাইকোড়ে চেদিরাজ কর্ণের নামাঙ্কিত শিলালিপি এবং 'শ্রীবিজয়সেন'-অঙ্কিত এক পাদপীঠের আবিষ্কারে নানা ঐতিহাসিক সন্দেহ মুখরিত হইয়াছে। উত্তরকালে আরও সন্ধান হইলে প্রকৃত তথ্য প্রচারিত হইবে। প্রকাশক বলিয়াছেন, ইহা ইতিহাস নহে, তবে দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিহাসকে লইয়া টানাটানি করা হইয়াছে। এরূপ টানাটানি এই শ্রেণীর দেশ-সেবকরা যত পারেন করুন; ছিঁড়িবে না, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম প্রশংসা পাইবে। তবে মহীপালের রাজধানী তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদ সাগরদীঘির কিছু দূরে মহীপাল হইতে গয়সাবাদের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বহুতর ধ্বংসাবশেষ-সমন্বিত স্থান নিকটেই আছে জানিয়াও নিজের জিলায় রাজধানী বসান কেন? উত্তররাঢ়ের গৌরবের ভাগ পূর্ব্বোত্তর বীরভূম পশ্চিম মুর্শিদাবাদ হইতে কিছু কম পাইবে মনে হয়।

বীরভূম বাঙ্গালীর মধ্যে "বীরের ভূমি" বলিয়াই পরিচিত। এখন শব্দতত্ত্ববিৎ আবার এ বীরের অর্থ 'জঙ্গল' করিয়া আরণ্যদেশ বলিতে চান। ভবিষ্য-পুরাণে এখানকার তীরন্দাজের কৌশল বর্ণিত আছে;—তাহা কি সাঁওতালের অংশে পড়িবে? পালরাজের সময়েও এই বীরভূমের ইছাই ঘোষ বাহুবলে স্বাধীন হইয়া, দেউল দিয়া, যুদ্ধকার্য্যে পুরান পত্রিকায় তথা ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন বীরের সহিত যুদ্ধ দিয়াছিলেন। নাগপুর করভোসন্তাচাং সম্বন্ধাচে কাগজ-পত্র নামক মারাঠী পুস্তকেও বীরভূবন নাম আছে এবং বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে লোকের সাহসের কথা কিছু আছে। বীরকিটি দমদমাতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ হইয়াছে; পরে কাসেম আলি খাঁর সময়েও বীরভূমের হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। যদি বীরধর্ম্মই প্রকৃত গৌরব হয়, তবে বীরভূমের উহাতে বেশ ভাগ আছে। কিন্তু বঙ্গবাসীর নিকটে বীরভূমের প্রধান গৌরব কবির কান্ত পদাবলী। যথায় অজয়তটে অজেয় কবি জয়দেব মধুর গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা ঝঙ্কৃত করিয়াছেন, যেখানে প্রেমের কবি চণ্ডিদাস 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' প্রভৃতি মধুময় মরমের গীতে চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীমাত্রকে মোহিত করিয়াছেন, যেখানে অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ আবির্ভূত হইয়া ভবিষ্যতে "মেরেছিস্ কলসীর কাণা তা ব'লে কি প্রেম দিব না"—ভাবের কথায় পাষাণহৃদয় জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কি

আবার অন্য গৌরবের আবশ্যক আছে? সাহিত্য-শাখায় অবশ্য এ সব বিশেষ আলোচিত হইবে। তবে "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ" না হইয়া বাঙ্গালীর কেবল 'বিলাস-কলাসু কুতূহলং' হইয়া থাকে, 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর'—যদি প্রাণে ভাবান্তর আনিয়া চণ্ডিদাসের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তিকে সহজে আনিয়া পরবর্ত্তী যুগে ব্যভিচার ঘটাইয়া এক শ্রেণীর লোককে কুরুচিগ্রস্ত করিয়া থাকে, তবে দোষ ঐ মহাকবিদের নহে। দোষ বাঙ্গালার জল-বায়ুর। অন্য গুণ থাকিলেও বাঙ্গালীর এই দোষ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বাঙ্গালাতেই পরিহাসচ্ছলে হইলেও 'নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ' প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যের উদ্ভট শ্লোক হইতে কামিনীকুমারের মত কাব্য পর্য্যন্ত আদিরস বলিয়া আদৃত হইয়াছে।

এ কালের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগের কথা আলোচনা করার ক্ষেত্র এই সম্মিলন নহে। একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিয়া আজিকার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। কিরূপ অবস্থায়, কি ঘটনাচক্রে মুসলমান নবাবের দুর্ব্বল হস্তের রাজদণ্ড ইংরাজ কোম্পানীর তুলাদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, সেই কাহিনী এখন প্রায় সকলেরই পরিচিত। এক কালে নবাবের হাতে রাজ্যভার অর্থাৎ 'সর্ব্বস্ব' এবং কোম্পানীর লোকের হাতে 'চাবি' থাকায় বাঙ্গালার প্রজাবর্গ দোটানায় বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিল। সেই সময়ে এক বৎসরের অজন্মা এবং রাজপুরুষদিগের উদাসীনতায় ১১৭৬ সালে ভয়াবহ ছেয়াত্তুরে মন্বন্তরে মধ্যবঙ্গের প্রায় চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, এ কথাও অনেকে শুনিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ উত্তরে রঙ্গপুর, দিনাজপুরে এবং বর্দ্ধমান বিভাগে, প্রধানতঃ এই বীরভূমে 'সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ' বলিয়া কথিত বিপ্লব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গীতি যে আনন্দ-মঠে আছে, তাহার গল্পভাগ এই বীরভূমির কথা। তিনি যে নিজামৎ রেকর্ড হইতে ইহার নমুদ পান, সেই রেকর্ডের সমস্ত বিবরণ আমার সংগৃহীত আছে; তাহার কথা ও মন্বন্তরের ব্যাপার অন্যত্র বিবৃত হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডের একটা রিপোর্ট হইতে ঐ সময়ের একটা চাউলের দর শুনাইতেছি:—

দিনাজপুরে চাউলের দর

	ভাল আমন			আউস	মোটা আমন
বাংসাল	১নং	২নং	৩নং		
১১৬৮	৶৬	৶৯	১৷১	১৷৷৩	১৷৮
১১৬৯	৷৷৫	৷৷৯	১৴৭	২৷৬	২৷৩
১১৭০	৷৷৫	৶১	১৷৷৩	২৴০	১৷৷০
১১৭১	৷৷৫	৶০	১৷৷০	২৷৪	২৷০
১১৭২	৶১	১৴০	১৷০	১৷৷৭	১৷৷১
১১৭৩	৷৷৩	৶১	১৴৫	১৷৷৯	১৷৷২
১১৭৪	৷৷৩	৶১	১৴০	১৷৷৪	১৷৷২
১১৭৫	৷৷৩	৷৷৫	৶০	১৷৪	১৴৭

বর্দ্ধমান বিভাগের এই সময়ের চাউলের দর রেকর্ডে পাই নাই। টাকায় দশ সের চাউল হওয়ায় ঐ মন্বন্তর; এখন দশ টাকা মণ অম্লানবদনে কিনিয়া খাইতেছি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাল-মন্দ

যার যাহা লাগিয়াছে ভাল,
সেই করে তাহারে বাখান।
বিষ-মক্ষি হলাহলে মানে
অনুপম অমিয়া সমান!
সংসারী বলিবে শত মুখে
তা'র ক্ষুদ্র সংসারের কথা।

সাধু ভাসে প্রেমাশ্রু-ধারায়—
স্মরি তাঁর প্রিয়ের বারতা!
ওগো, আমি কবে আর পা'ব,
তোমার ও সুধার সন্ধান।
কবে—আর কবে ছুটে যা'বে
তাহারি উদ্দেশে মোর প্রাণ।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

ভাবের অভিব্যক্তি—থিয়েটার-দর্শক

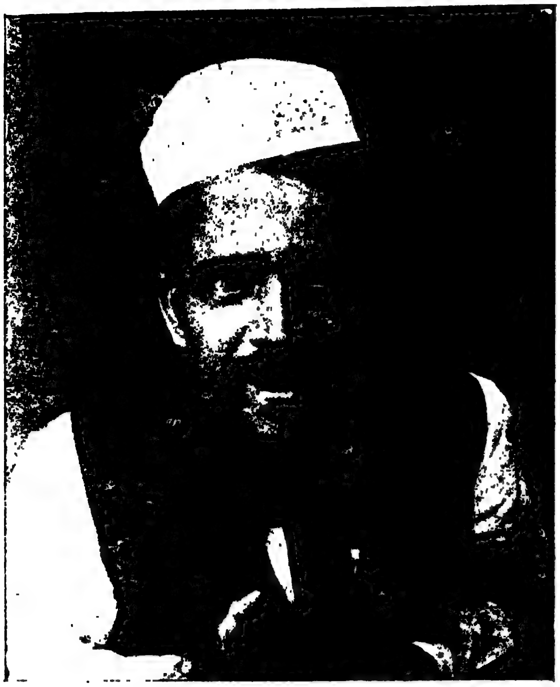

ব্যাঃ—ব্যাঃ—তোফা !!

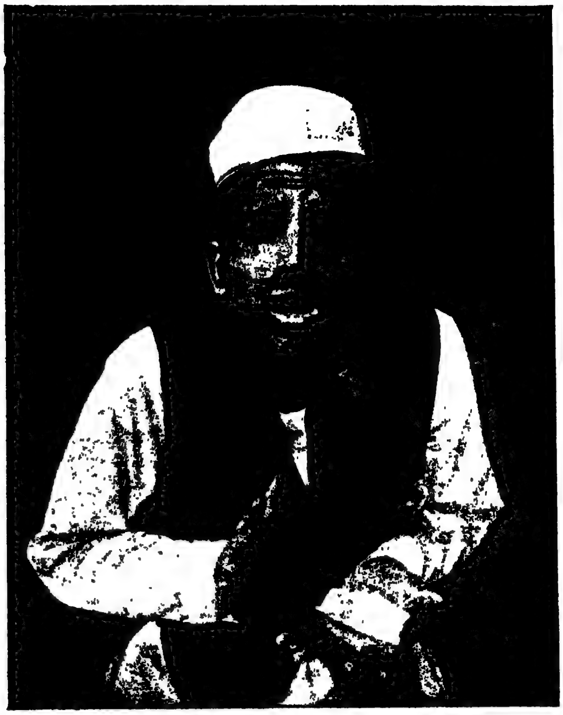

এন্‌কোর—এন্‌কোর !!

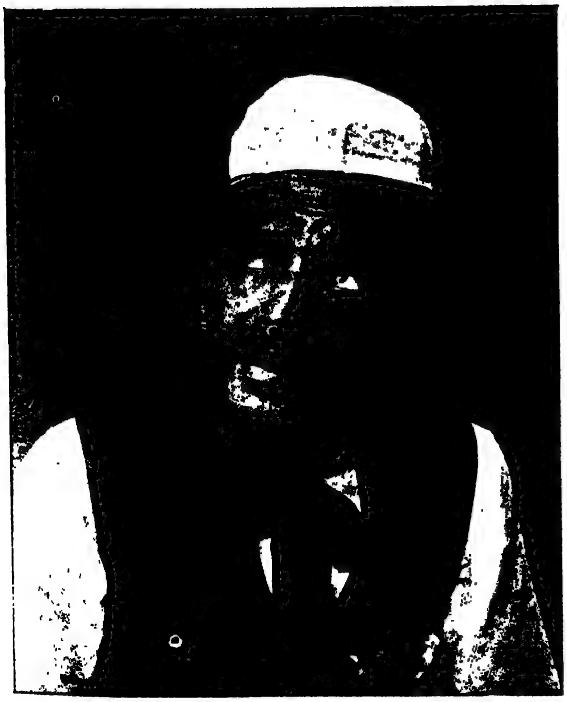

বক্সের (Box) দিকে সুনজরে।

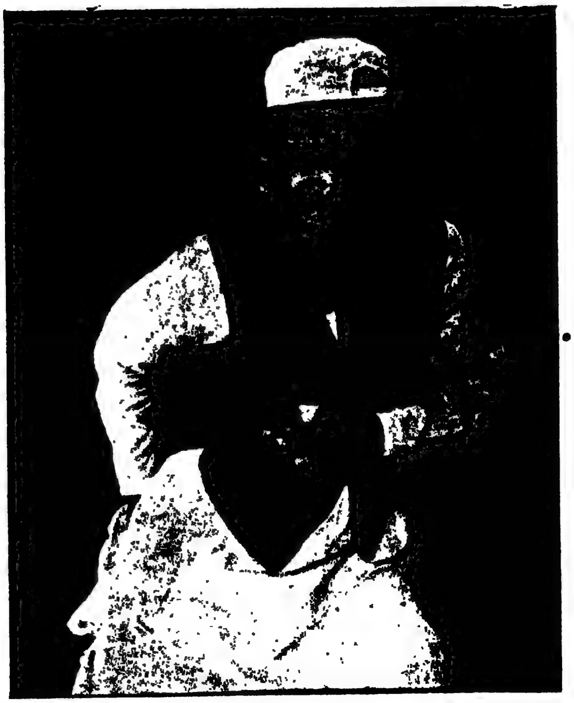

বাপ্‌ রে—কি ভয়ানক ছারপোকার অত্যাচার !

অভিনেতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প-মঞ্জরী

ভি-কলার সেমিজ—এই সেমিজ মেয়েদের পোষাকের মধ্যে অন্যতম।

সরঞ্জাম ঃ—(Materials) কাপড়—২ গজ ২২" অথবা ২¾ গজ।

সেমিজের মাপ ঃ—লম্বা—৪৫", ছাতি—৩২", কোমর—২৮", পুট—৬", পুট হাতা—১২", মোহরী—১০"

সেমিজ কাটিবার প্রণালী ঃ—প্রথমতঃ লম্বা মাপের ২" ইঞ্চি বেশী লইয়া এড়ো দিকে ছাতির মাপের ডবল ভাঁজ করিয়া লম্বায় ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। লম্বা—৪৫"+২"=৪৭" ক, খ লম্বা মাপ কম লাইন হইতে ছাতি ¼ অংশ ৮"—২"=৬" ইঞ্চি স্থানে গ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ বিন্দু হইতে চ বিন্দু ১½" ইঞ্চি নীচে চিহ্ন করিয়া চ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"+২½"=১০½" ইঞ্চি স্থানে ছ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের

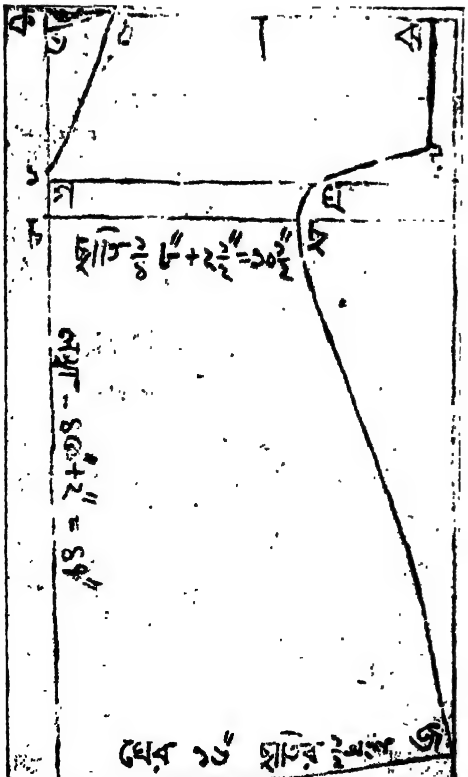
ক
ঙ
খ
১
গ
ঘ
চ
ছ
ছাতি ¼ ৮"+২½"=১০½"
লম্বা - ৪৫"+২" = ৪৭"
ঘের ১৬" ছাতির ½ অংশ
জ

১ নং চিত্র

২ নং চিত্র

১০½ স্থানে ঘ বিন্দু চিহ্ন করিতে হইবে। ক বিন্দু হইতে × চিহ্ন পুট মাপ ৬", ক বিন্দু হইতে পুট হাতার মাপ ১২" স্থানে ঝ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ক ঠ ছাতির ১/১২ অংশ ক বিন্দু হইতে ড বিন্দু ১" ইঞ্চি নীচে ড ঠ সংযোগ করিয়া ঝ বিন্দু হইতে ট বিন্দু মোহরীর অর্দ্ধেক ৫"+২"=৭" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া ট, ঘ, ছ চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া খ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের অর্দ্ধেক ১৬" ইঞ্চি স্থানে জ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ছ বিন্দু হইতে জ বিন্দু পর্য্যন্ত চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। খ লাইন হইতে জ বিন্দু ১" ইঞ্চি উপরে বাঁকাভাবে থাকে। সেমিজের ঘের আরও ৪" ইঞ্চি বেশী রাখিলে মন্দ হয় না। ঐটি মেয়েদের পছন্দানুযায়ী। এ সেমিজে কাঁধের অংশ জোড়া থাকিবে। ড, ঠ দাগে কাটিয়া ঝ, ট, ঘ, ছ, জ ও ঘ দাগে কাটিয়া লইলে সেমিজের পশ্চাতের অংশ শেষ হইল বটে, সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় উপরকার দাগ দেওয়া ছ'পাত অংশে গ .বিন্দু হইতে ½" ইঞ্চি উপরে ১ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঠ, ১ সংযোগ করিয়া লইলে "ভি-কলার সেমিজ" কাটা হইল।

সেমিজ সেলাই ঃ—সেমিজের গলার অংশের জন্য ১" ইঞ্চি চওড়া এড়োভাবে কাপড় কাটিয়া গলার ভিতর দিকে একখানি টেপ বসাইতে হইবে। গলার অংশে ইনসেসনও বসান যায়—টেপ বসাইবার সময় কলারের মুখের অংশে কলের সেলাই বা হাতের বকেয়া সেলাই দিয়া পাশে যে সেলাই হইবে, হাতের তুরপাই দিতে হইবে। হাতের মোহরীর অংশে ইনসেনস দিলে দেখিতে খুব ভাল দেখায়, অথবা ১" ইঞ্চি পরিমাণ টেপ ভিতর দিক বসাইয়া সেলাই দিয়া দু' পাশ জুড়িতে হইবে। নীচের অংশে যে ২" ইঞ্চি কাপড় রাখা হইয়াছে, তাহাকে ভিতর দিক মুড়িয়া সেলাই দিলে "ভি-কলার সেমিজ" সম্পূর্ণ হইল।

সংকীর্ত্তন

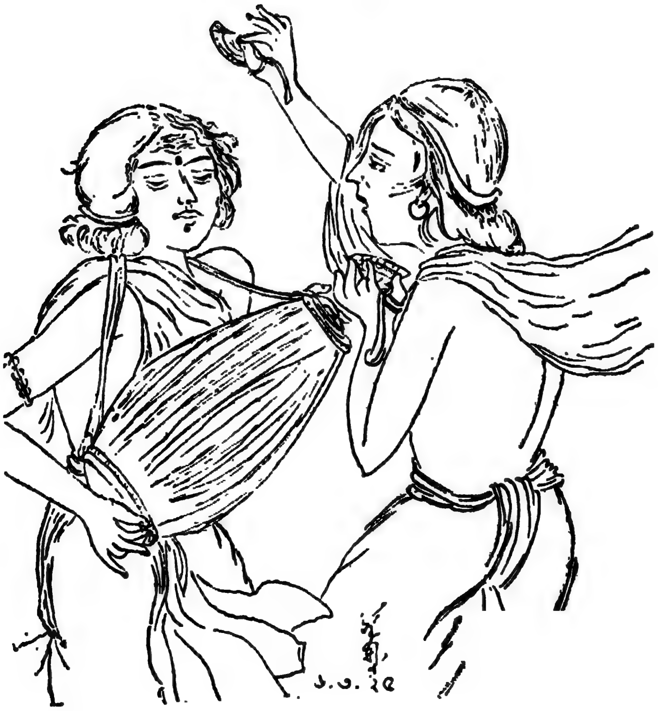

শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর।

প্রতারক

২০

সারা বাড়ীটি যেন একটা ঘন-ঘোর বিষাদের মেঘে আবৃত হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা গভীর চিন্তা ও বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে, আনন্দের হাসি যেন এই স্থান হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আজ সাত দিন ইভের জীবন লইয়া যমে-মানুষে সংগ্রাম চলিতেছে, এই নবীন মুকুলিত জীবনে ইভ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

এই গৃহের অধিবাসিমাত্রেরই নয়নানন্দ ইভ—এই গৃহ ইভের হাস্যকোলাহলে সদা মুখরিত হইয়া থাকিত, আজ তাহারই জীবন-প্রদীপ কালের ফুৎকারে বুঝি বা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়,—এ অবস্থায় গৃহবাসী কেহ কি আনন্দিত থাকিতে পারে! সদা হাস্যস্ফুরিতাধরা—সদা আনন্দময়ী, সদা কোমলা, করুণাময়ী ইভ এই গৃহখানিকে হাস্যময় করিয়া রাখিত, আজ নিষ্ঠুর কালের অমোঘ দণ্ডস্পর্শে সে হাসি কি চিরতরে অন্তর্হিত হইবে? কে জানে!

ইংরাজ চিকিৎসক কঠিন আদেশ দিয়াছেন যে, রোগিণীর কক্ষে হাঁসপাতালের সুদক্ষ সেবারতা শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অন্য কেহ অবস্থান করিতে পারিবে না। আত্মীয়-স্বজন দেখিবার জন্য মাত্র দুই এক মুহূর্ত্ত কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে, অন্যথা নহে। বিমলেন্দু এ নিষেধ শুনে নাই। সে প্রথম তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় রোগিণীর কক্ষে রোগশয্যার পার্শ্বে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া একাগ্রচিত্তে যাপন করিয়াছিল। শেষে তাহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসক আর থাকিতে পারেন নাই, তাহাকে জোর করিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন এবং মিষ্ট ভৎ'সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এমন করিলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। তুমি না পুরুষ? তুমি কি আমায় একই সময়ে একই স্থানে দুইটি রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য করবে? যাও, স্নান ক'রে কিছু আহার কর।

বিমলেন্দুর কর্ণকুহরে সেই কথাগুলি প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। এই কয় দিনে তাহার মূর্ত্তি শুষ্ক, রুক্ষ, অপ্রকৃতিস্থের মত হইয়াছিল। সে কেবল উন্মত্তের মত ভীতি-ব্যাকুলনেত্রে চিকিৎসকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানা সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'ডাক্তার, আর কিছু চাই না, তুমি আমার ইভকে ফিরিয়ে দাও, তুমি যা চাও, তাই দেবো।'

চিকিৎসক হৃদয়হীন ছিলেন না। তিনি সমবেদনার সুরে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনলে আমি কিছুই করবো না। যাও।'

বিমলেন্দু ইহার পর স্নান ও যৎসামান্য আহার করিয়াছিল। তাহার পর আবার ইভের শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া সযত্নে দুই হস্তে ইভের ক্ষুদ্র করপল্লব ধারণ করিয়া পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দুই দিন জ্ঞান হইবার পর আবার প্রবল জ্বরে ইভ অচেতন হইয়াছিল, মাঝে মাঝে প্রলাপের ঝোঁকে তাহার তপ্তশ্বাসের সহিত 'প্রতিমার' নাম উচ্চারিত হইতেছিল। কখনও বা ইভ করুণ কোমল স্বরে উদ্দেশে স্বামীকে অনুযোগ করিতেছিল,—নিষ্ঠুর, কেন সে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল! ইভ ত তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই!

সপ্তম দিবসে ইভের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইল। সারারাত্রি প্রবল জ্বরের মুখে সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। তাহার কোনও কথার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। কেবল দুই জনের উদ্দেশেই তাহার প্রলাপোক্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল,—তাহার স্বামী ও প্রতিমা। শেষরাত্রিতে চিকিৎসকের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি

বলিলেন, 'বোধ হয়, রোগিণী এ যাত্রা রক্ষা পাইল।' তখন বিমলেন্দু পাগলের মত কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। কথাটা শুনিয়া সে চিকিৎসকের হাত দুইখানা ধরিয়া অশ্রুসজল নেত্রে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে পত্নীর শয্যাপার্শ্বে কাষ্ঠাসনে বসিয়া শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। চিকিৎসক ক্ষণেককাল তাহাকে এই অবস্থায় থাকিতে দিলেন, তাহার পর সস্নেহে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং পার্শ্বস্থ কক্ষে একখানা চেয়ারের উপর তাহাকে বসাইয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, 'যদি মিসেস রায়কে বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এখন আর তার ঘরে যেও না। বোধ হয়, ভোরবেলাই জ্বরবিচ্ছেদ হবে, সেইটাই সঙ্কটকাল, সে সময়ে পাঁচ জন ঘরে ভিড় করলে চিকিৎসা ও সেবায় বাধা পড়বে।—বুঝেছো?' ডাক্তার অতঃপর রোগিণীর কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

বিমলেন্দুর অনুভূতির শক্তি ছিল কি না, ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন না, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। সে ঘরে আর এক জন পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিলেন, তিনি লেফটানেণ্ট সিবরাইট। বিমলেন্দু তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, তাঁহার অস্তিত্বই অনুভব করিয়াছিল কি না সন্দেহ। হঠাৎ লেফটানেণ্ট সিবরাইটের গম্ভীর প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে শুনিল, সিবরাইট বলিতেছেন, 'বলতে পারেন, মিস্ রবিনসনের এই অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে?'

মরিস এ যাবৎ ইভকে মিসেস্ রায় বলিতে কিছুতেই অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। বিমলেন্দুর মনের অবস্থায় এ ত্রুটি ধরা পড়িল না, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মরিসের দিকে ফেলফেল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

লেফটানেণ্ট সিবরাইট অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও উচ্চস্বরে আবার বলিলেন, "কথাটায় না বোঝবার মত কিছুই নেই। তবে যদি বুঝেও জবাব না দেন, তা হ'লে জবাব দিতে বাধ্য করবার ক্ষমতা যে আমার নেই, তা ভাববেন না।"

বিমলেন্দু কেবল বলিল, "কি বলছেন?"

মরিস উদ্ধত গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, "বলছি এই যে, মিস্ ইভ রবিনসনের হত্যাকারী কে, তা আপনি বলতে পারেন?"

বিমলেন্দু বিমূঢ়ের মত বলিল, "হত্যাকারী?—ইভের হত্যাকারী? কে সে?"

মরিস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে, তা কি আপনি জানেন না বলতে চান? মানুষ মানুষকে গুলী ক'রে বা ছুরি মেরে হত্যা করে, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু গুলী ক'রে বা ছুরি মেরে খুন করা ছাড়া মানুষকে কি অন্য কোনও রকমে খুন করা যায় না? পলে পলে তিলে তিলে মানুষের আত্মাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা যে খুনীডাকাইতের নরহত্যার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টদায়ক, অনেক বেশী পাপ, তা স্বীকার করেন কি? না, তা স্বীকার করবার মনুষ্যত্বও আপনার নেই?"

মরিসের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল; কিন্তু বিমলেন্দু বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব প্রকাশ করিল না। অন্য সময় হইলে বিমলেন্দু এমনভাবে বিনা প্রতিবাদে যে কথাটা লইত না, তাহা তাহার পূর্ব্বের নানা আচরণে বুঝা গিয়াছে। এ সময়ে কিন্তু সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "ঠিক বলেছেন, এমন হত্যাকারী খুনে-ডাকাতের চেয়ে অনেক বেশী পাপী। তার কি শাস্তি হওয়া উচিত?"

মরিস ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "কি শাস্তি হওয়া উচিত, তা আপনিই সকলের চেয়ে ঠিক বলতে পারেন। আপনি কি ভাবেন, মিস রবিনসন কেন এই নবীন বয়সে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তা আর কেউ জানে না? ব্রুট! কাওয়ার্ড! জান কি, সে শাস্তি আমি ইচ্ছা করলে দিতে পারি?"

বিমলেন্দু ক্ষণেক নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ঠিক বলেছেন, আমিই ইভের হত্যাকারী —আমার পাপে আমার সোনার সংসার ছারেখারে যেতে বসেছে। আপনি যে শাস্তি দিতে চান, আমি মাথা পেতে নেবো। বলুন, কি শাস্তি দিতে চান।"

মরিস বিস্মিত হইলেন, তিনি বিমলেন্দুর এমন ভাব কখনও দেখেন নাই। তিনি এতক্ষণে বিমলেন্দুর আহত ক্ষত-বিক্ষত মনের সন্ধান পাইলেন। বিমলেন্দুর অনাহার ও অনিদ্রা-ক্লিষ্ট শুষ্ক রুক্ষ বদনমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার মনে অপার করুণার উদয় হইল। তথাপি সাধ্যমত মনের ভাব গোপন রাখিয়া মরিস বলিলেন, "দেখুন, আমি সব শুনেছি।

ভাববেন না যে, মিস রবিনসন জগতের কাউকে নিজের গোপন ব্যথার কথা না জানালেও অপরের অন্য সূত্র থেকে তা জানবার সুযোগ হয় নি। আমি জেনেছি, তার কারণ, আমি ইভকে প্রথম থেকেই ভালবেসেছি। আমি যাকে জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান ব'লে মনে করি, আপনি তাকে অনাদরে তিলে তিলে হত্যা করছেন। এ কথাটা আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারি নি। তাই এক এক সময় মন যখন বড় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন ইচ্ছে হয়, আপনার মত নারী-হত্যাকারী নরাধমকে হত্যা ক'রে পৃথিবীর ভার খানিকটা লাঘব করি; কিন্তু যখনই মনে হয়, আপনি ইভের স্বামী, ইভ আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখনই সে সঙ্কল্প বালির বাঁধের মত চিন্তার তরঙ্গে ধুয়ে মুছে যায়।"

বিমলেন্দু মরিসকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, ব্যথিত স্বরে বলিল, "না, না, সে সঙ্কল্প ভুলবেন না, আমায় হত্যা করুন, এই আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। ইভই যদি ছেড়ে যায়, তা হ'লে আমার এ জীবনের প্রয়োজন কি?"

মরিস তাহার হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ইভকে ভালবাস? সত্য বল, তুমি কি ইভকে ভালবাস? তুমি প্রতারক হলেও আমি তোমার কথা বিশ্বাস করবো।"

বিমলেন্দু টেবলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া মরিসের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "দেখুন, যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমার ইভ যখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, তখন সব কথাই খুলে বলবো। অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমার কাছে কোন জবাবই পেতো না। কিন্তু আপনি ইভকে ভালবাসেন, আপনার কাছে কোন কথা লুকুবো না। সরলা আমা-অন্ত-প্রাণা ইভের নিকট আমি অবিশ্বাসী—আমার মন কলুষিত! আপনি আমায় কি তিরস্কার করবেন,—কি শাস্তি দেবেন? আমি এর জন্যে আমাকে কত তিরস্কার করেছি, কত দণ্ড দিয়েছি, আপনি তা কি জানবেন? কিন্তু চেষ্টা করেছি, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই মত ফিরুতে পারি নি। তাই এক একবার আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার হাত এড়াতে প্রস্তুত হয়েছিলুম। আবার ইভের কথা মনে ক'রে তা করতে পারি নি। মরণে কি দুঃখ আছে, জানি না, কিন্তু জীবনে এমনই ক'রে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তার চেয়ে সে দুঃখ, সে কষ্ট যে বেশী, তা মনে করতে পারি নি। আপনি সত্যই বলেছেন, আমার মত নরাধমের মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে।"

বিমলেন্দু বালকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মরিসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি পুরুষকে এমন ভাবে ধৈর্য্যহারা হইয়া কখনও কাঁদিতে দেখেন নাই। কত বড় আঘাত পাইলে পুরুষ এমন বিচলিত হয়, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তাঁহার অন্তর সমবেদনায় ভরিয়া গেল। ক্ষণপরে বলিলেন, "দেখুন মিঃ রায়! মরণে যে আপনার ভয় নেই, তার প্রমাণ আমি এক দিন পেয়েছিলুম। আপনি যে দিন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমার গুলীভরা পিস্তলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, সেই দিন বুঝেছিলুম, কি ধাতু দিয়ে আপনার মনটা গড়া। মাপ করবেন, আপনাদের নেটিভের এতটা নার্ভ আছে, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। যাক্, মরেও ত আপনি ইভকে সুখী করতে পারবেন না। ইভ কিসে সুখী হয়, তাই আমার লক্ষ্য—অন্য কিছু আমি চাইনে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় ত ইভ আজ থেকেই ভালর দিকে যাবে, হয় ত তাঁর দয়ায় সেরে উঠবে। এ কথা ডাক্তারও বলেছেন। কিন্তু তার পর?"

বিমলেন্দু বলিল, "তার পর? কিসের পর?"

মরিস বলিলেন, "ইভ সেরে উঠলে তার পর? তার পর কি করবেন ভেবেছেন? এমন ক'রে আপনাদের উভয়ের বিবাহিত জীবন কাটান অসম্ভব।"

বিমলেন্দু বলিল, "তবে কি করতে বলেন,—বিবাহ-বিচ্ছেদ—"

মরিস দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন, "ইডিয়ট! আপনি আজও ইভকে চিনতে পারেন নি—সে একবার আপনাকে ভালবেসে আপনার সঙ্গে এ জীবনের সম্বন্ধ ছিন্ন করবে, এ কথা মনেও ভাববেন না। তার চেয়ে এক কায করুন—ইভকে নিয়ে দূরদেশে চ'লে যান। দূরে—দূরে—পৃথিবীর অপর প্রান্তে। সেখানে গেলে হয় ত সময়ে অবিশ্বাসের কারণকে ভুলতে পারবেন, আবার নতুন ক'রে সংসার গ'ড়ে তুলতে পারবেন।"

বিমলেন্দু বাধা দিয়া আকুল প্রাণে বলিল, "ভুল বুঝেছেন লেফটানেণ্ট সিবরাইট! বিদ্রোহী মনকে বশে আনবার জন্যে প্রলোভনের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে ছুটে পালিয়ে এসেছি, ইভের সঙ্গকে জীবনের মূল লক্ষ্য ক'রে চলেছি, তবু ভুলতে পারিনি। সে পাপ চিন্তা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে তাকে ঘৃণা করেছি, দূর-ছাই করেছি, তবু সে সঙ্গ ছাড়েনি। প্রতারণা ক'রে ইভকে লাভ করেছি, তার কি এই শাস্তি! উঃ!"

বিমলেন্দু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার টেবলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার শরীরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মরিস এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষণকাল থাকিতে দিলেন, তাহার পর উঠিয়া গিয়া তাহার কাঁধের উপর দুইখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, "মিঃ রায়! বালকের মত কাঁদা-কাটা পুরুষের সাজে না। আপনার মনের অবস্থাটা এখন বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু যত অসাধ্য হ'ক, তবুও মানুষের মত আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে, কেন না, এতে কেবল আপনার ভাল-মন্দ থাকলে আমি কোন কথায় থাকতুম না; কিন্তু এতে আর এক প্রাণীর ভাল-মন্দ রয়েছে—যাকে আমি জগতে ভগবানের অমূল্য দান ব'লে মনে করি তার সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর কথা রয়েছে; সুতরাং আপনি যে পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—নিজের উপরে সকল দুঃখ-কষ্টের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে ইভকে সকল ঝড়-ঝাপটা হ'তে দূরে রাখতে হবে। এর জন্যে আপনার মন যদি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তাও সহ্য করতে হবে—কিন্তু তাও হাসিমুখে, ইভকে কিছু জান্‌তে না দিয়ে। কেমন, পারবেন? তা হ'লে বুঝবো, আপনি মানুষ, যথার্থই আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ইচ্ছা হয়েছে। না হ'লে কেবল বালকের মত কেঁদে মনের কষ্ট জানালে কিছুই হবে না।"

বিমলেন্দু বলিল, "সব বুঝি, কিন্তু মনের উপর জোর ত চলে না। আমি ইভের জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তাতে ইভ কি সুখী হবে?"

মরিস বলিলেন, "প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কথা নয়, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা মনকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে; এইটেই শক্ত কথা। আপনি পুরুষ, পুরুষমানুষের মত মনের উপর সে জোর করতে হবে। তবে বুঝবো, আপনার যথার্থ অনুতাপ হয়েছে। যদি ঈশ্বর-ইচ্ছায় ইভ এ যাত্রা রক্ষা পায়, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করুন, ইভের চিন্তা ধ্যান জ্ঞান করতে অভ্যাস করবেন, বলুন, অন্য পাপ চিন্তাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করবেন?"

বিমলেন্দু উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে নার্স আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং বিমলেন্দুকে দেখিয়া বলিল, "এই যে আপনি এখানে। ডাক্তার বললেন, মিসেস রায়ের জ্ঞান হয়েছে, বারো ঘণ্টার মধ্যে জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই, মিসেস রায় মিস বেলকে খুঁজছেন, বলছেন, দু দিন আগে পুরীতে যে তার করেছেন, তার জবাব এসেছে কি না।"

বিমলেন্দু মাথা নত করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরকে তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল, তাহার পর বলিল, "হাঁ, তারের জবাব সেই দিনই এসেছে। তাঁরা বোধ হয় আজ দুপুরে এখানে পৌঁছবেন। আপনি মিস বেলকে ডেকে দিন। আমার কি এখনও দেখা করতে মানা?"

নার্স বলিল, "হাঁ, ডাক্তার এখন কাকেও যেতে নিষেধ করেছেন।"

নার্স এই কথা বলিয়া মিস বেলের সন্ধানে গেল।

মরিস ঈষৎ প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বোধ হয়, বিপদ কেটে গেল। আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন। আবার বলছি, মানুষের মত পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।"

মরিস চলিয়া গেলেন, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, নবোদিত সূর্য্যকিরণে জগৎ হাসিতেছে। বিমলেন্দু তদবস্থায় বসিয়া মরিসের কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

২১

প্রতিমারা দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছে এবং সেই দিনই প্রতিমা ইভকে দেখিতে গিয়াছে। ইভ ডাক্তারের নিষেধ শুনে নাই, সকলকে ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া বহুক্ষণ প্রতিমার সহিত রুদ্ধ কক্ষে কথোপকথন করিয়াছে। কি কথা হইয়াছিল, তাহা ইভ বা প্রতিমা ভিন্ন কেহ জানে না। প্রতিমার নিষেধ সত্ত্বেও ইভ এই দুর্ব্বল শরীরেও বহুক্ষণ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করিয়াছিল। ইভ এমন কখনও করে

নাই,—সে স্বভাবতঃই কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করে না। প্রতিমা যখন ইভের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আইসে, তখন তাহাকে যাহারা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল, প্রতিমার নয়ন দুইটি জবা-ফুলের মত রক্তবর্ণ, মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন। সে যে বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিল, তাহা তাহাকে দেখিয়া বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। প্রতিমা কাহারও কোনও কথার জবাব না দিয়া, কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া কক্ষান্তরে পিতার নিকট চলিয়া গেল।

রামপ্রাণ বাবু যখন আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইভ কেমন আছে", তখন প্রতিমা সে কথার জবাব না দিয়া বিষাদজড়িত স্বরে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, যে মানুষ প্রতিক্ষণেই মৃত্যু-কামনা করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, সে কি বাঁচে ?"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ? ইভ কি তোমায় মৃত্যুর কথা বলেছে ? তোমার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল ?"

প্রতিমার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা কোরো না বাবা, আমি কোন কথা বলতে পারব না।"

রামপ্রাণ বাবুর বিস্ময়বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তিনি জানিতেন, প্রতিমা যাহা সঙ্কল্প করে, তাহা হইতে সহজে তাহাকে বিচ্যুত করা সম্ভবপর নহে। তাই কথাটা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইলেও তিনি নীরব রহিলেন। প্রতিমা তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়া দুঃখিত হইল, সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "যা আমায় বলেছে ইভ, তা আমাকেই বলেছে। তা শুনে জগতের আর কারুর কোন লাভ-লোকসান নেই।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "না, আমি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে চাইনি। তবে জান্‌তে চাই, তুমি কেন বল্‌লে, যে মৃত্যু চায়, সে বাঁচে কি না ? ইভ কি মৃত্যু চাইছে ?"

প্রতিমা কেবল ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ।"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ? ইভের কিসের অভাব ? তার ত কোনও সাধ অপূর্ণ হয়নি—তবে এই বালিকাবয়সে এমন কামনা করছে কেন ?"

প্রতিমা এবারও সহসা উত্তর করিল না, কেবল মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামপ্রাণ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি ত এ সব কিছুই বুঝতে পারিনি। আর ইভের এই বয়সে এত ঘন ঘন এমন কঠিন রোগই বা হয় কেন, তাও মাথায় আসে না। কিছু দিন আগে পুরীতে কি রোগ থেকেই না সেরে উঠল !"

প্রতিমা অনুচ্চস্বরে কেবল বলিল, "রোগ কি কারু হাতধরা যে, জানিয়ে আসবে যাবে ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা ঠিক। তবে প্রথমে পুরীতে ইভের ত চমৎকার স্বাস্থ্য দেখেছিলুম।"

প্রতিমা মাথাটা আরও অবনত করিয়া জড়সড় হইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "হুঁ।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "যাক্, ডাক্তার কি ব'লে গেলেন ? কোন আশা দিয়েছেন কি ?"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, তিনি বলেছেন, এখন আর তিন দিনের মধ্যে প্রাণের ভয় নেই, তবে—তবে—"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তবে কি ?"

প্রতিমা বলিল, "তবে ডাক্তার এ কথাও ব'লে গেছেন যে, যদি এর উপর আর কোন উপসর্গ না জোটে, যদি মনটা ওর প্রফুল্ল থাকে, তা হ'লে ভালর দিকেই যাবে। কিন্তু ওর মনের গতি ত ভাল ঠেকলো না। বাবা ! বাবা ! যদি ইভের কিছু ভাল-মন্দ হয় !"

বলিতে বলিতে প্রতিমা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামপ্রাণ বাবু তাহার মাথার উপর হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিলেন, "ভয় কি মা ! সেরে উঠবে সে। রোগ কি কারও হয় না ?"

প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ইভের মত মেয়ে কটা হয় বাবা ! এমন মায়াবী কাউকে দেখিনি। হাঁ বাবা, পুরীতে মাতাজীকে লিখে ইভের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যেন করলে হয় না ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা কি হয় মা ? ওরা যখন ও সব মানে না, তখন—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া প্রতিমা বলিল, "নাই মানলে, তাতে কি ? আমি যদি ওর কল্যাণে শান্তি-স্বস্ত্যেন করি, তাকে দোষ কি ?"

রামপ্রাণ বলিলেন, "তবে তাই কর। যাতে মনে শান্তি পাও, তাই কর।"

এই সময়ে মিস্ বেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এখানে? চলুন, ইভ আবার আপনাকে ডাকছে। আজ তাকে যেন একটু ভালই দেখাচ্ছে—আপনি আসার পর থেকে তার মুখে হাসি দেখছি।"

প্রতিমা সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই খানিক আগে তার ঘর থেকে আসছি। ডাক্তার সাহেব আর তার ঘরে ভিড় করতে মানা করে দিয়েছেন। তা হ'লে কি আমাদের এখন আর যাওয়া উচিত?"

মিস্ বেল বলিলেন, "সে কারও কথা শুনতে চাইছে না, কেবল আপনাকে ডাকছে। বোধ হয়, তার কি বলবার আছে।"

প্রতিমা যখন ইভের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল, তখন তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভীত হইল—সে চক্ষু এত উজ্জ্বলতা ত কখনও ধারণ করে নাই!

প্রতিমা নতজানু হইয়া বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া ইভকে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইভ, ডেকেছিলে কেন? তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?"

ইভ সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "ব'স।" তাহার মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল।

প্রতিমা একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল, দুই হাতে ইভের রোগশীর্ণ একখানি হস্ত ধারণ করিয়া রহিল।

ইভ অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "আচ্ছা, মানুষ ম'রে কোথায় যায়, বলতে পার?—সেখানে কি এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ সঙ্গে যায়?"

প্রতিমা ব্যাকুলভাবে বলিল, "কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, ইভ?"

ইভ কেবল বলিল, "বল।"

প্রতিমা নীরবে ব্যথিত-হৃদয়ে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন ইভ বলিল, "বলবে না? তা যাক্. না বল, ক্ষতি নেই, আজ তোমায় আমায় শেষ বোঝাপড়া হবে।"

প্রতিমার হৃদয় ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে আলোড়িত হইয়া উঠিল, একটা অজানা আতঙ্কে তাহার বুক দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিমা যে ইভকে বস্তুতঃই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, সেই ইভের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে তাহার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাকে এই অস্বস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই যেন সেই সময়ে নার্স আসিয়া বলিল, "ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ওষুধ দিই।"

ইভ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, "আমি ত এখন কাউকে এ ঘরে আসতে মানা করেছি। আমি ওষুধ খাব না, যাও, পরে এস।"

নার্স ইভকে চিনিত, সুতরাং কোনও আপত্তি না করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। প্রতিমা বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইভ তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "বাধা দিও না প্রতিমা। হয় ত এই শেষ দেখা। আমায় শেষ মুহূর্ত্তে শান্তিতে যেতে দাও। স'রে এস, আরও কাছে স'রে এস, আমার বলা শেষ করতে দাও।"

তখন ইভ একান্তে প্রতিমাকে পাইয়া তাহার মনের কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে, অতি ধীরে, কখনও মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, কখনও কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিয়া ইভ তাহার অন্তরের অন্তস্তলের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। সে করুণ-কাহিনী ইভ ও প্রতিমা ব্যতীত আর কেহ শুনিল না। যিনি অন্তর্যামী, তিনি ভিন্ন আর কেহ এই দুইটি মর্ম্মপীড়িতা নারীর বিশ্রম্ভালাপের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

২২

মাতাজী সন্ন্যাসিনী, কিন্তু সন্ন্যাসিনী হইলেও সংসারের সহিত সকল সম্পর্কে বর্জ্জিত ছিলেন না। তাই যখন তিনি প্রতিমার নূতন মঠ-নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রতিমার অনুরোধ আসিলে তিনি সংসারীরই মত হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন; ভাবিলেন, এখনও ত তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হইতে পারেন নাই? প্রতিমা তাঁহাকে ইভের অবস্থার কথা জানাইয়া তাহার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে লিখিয়াছিল। ইভ তাঁহার কে, অথচ ইভের অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয়

কেন? দেহী হইলেই কি চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি থাকে না?

যখন তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, তখন এক দিন কোনও এক ভক্ত শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি বিধাতা তাঁহার বিধান পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখেন, তাহা হইলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন কি? উহাতে কি বিধাতার বিধান টলান যায়?"

মাতাজী বলিলেন, "বিধাতা কি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মানুষের অজ্ঞেয়, ধারণার অতীত, সুতরাং স্বস্ত্যয়ন করিতে ক্ষতি কি? বিধাতা যদি এমনই বিধান করিয়া থাকেন যে, স্বস্ত্যয়ন করিলে রোগশোকের উপশম হইতে পারে, তাহা হইলে স্বস্ত্যয়ন করিতে আপত্তি কি? মনের সংশয় রাখিয়াই বা ফল কি? রোগ হইলে রোগী বাঁচিতেও পারে, মরিতেও পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা হইবে তাহা হইবেই নিশ্চয় করিয়া রোগের চিকিৎসা না করিয়া কেহ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে কি? সেইরূপ স্বস্ত্যয়ন দ্বারা প্রতীকারের চেষ্টা করিলেই বা ক্ষতি কি?"

এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা হইবার পর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মাতাজী, কেউ স্বস্ত্যেনের জন্যে নারায়ণের তুলসী দেয়, কেউ বা তারকনাথের মানসিক করে, কেউ বা মা কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা মানে। কিন্তু আপনিই ত বলেছেন, ভগবান্ এক, আর তাঁকে ঘুষ দিয়ে মানুষ নিজের কর্ম্মফল হ'তে নিস্তার পায় না, তাঁর বিধানও উল্টে দিতে পারে না, তবে এ সব মিথ্যে আড়ম্বর করার প্রয়োজন কি?"

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "কি মিথ্যে, কি সত্যি, তা আমরা নিশ্চয় ক'রে যখন বলতে পারিনে, তখন হয় ত ভগবান্‌ই আমাদের স্বস্ত্যেন করতে মনকে ব'লে দিচ্ছেন ভেবে স্বস্ত্যেন করতে ক্ষতি কি?"

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ যখন এক, তখন কোথাও তিনি শালগ্রামপাথর হয়ে তুলসী দিতে মনকে ব'লে দেন কেন, আবার কোথাও বা কালী হয়ে জোড়া পাঁঠা মানসিক করতে ব'লে দেন কেন?—তারকনাথ হয়ে হত্যে দিতেই বা ব'লে দেন কেন? তিনি ত সকল মানুষকেই এক রকম ক'রে স্বস্ত্যেন করতে ব'লে দিতে পারেন। তাঁর এমন নানা মূর্ত্তি ধ'রে মানুষের মনকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার দরকার কি?"

মাতাজী বলিলেন, "তুমি বাপু বড় বড় কথা এনে ফেলছ, এ সব সমস্যার অল্পসময়ে জবাব দেওয়া যায় না। আমরা সবাই মানুষ—মানুষের এ সব বোঝবার ক্ষমতা নেই। যাঁরা সিদ্ধসাধক হয়েছেন, তাঁরাই এ সকল কথার মীমাংসা ক'রে দিতে পারেন।"

শিষ্য বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের মত সাধারণ মানুষরা কি করবে—যা দেখে আসছে, বিচার না ক'রে অন্ধের মত তাই ক'রে যাবে?"

মাতাজী বলিলেন, "হাঁ, তাই ক'রে যাবে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মত যারা মহাপুরুষ, তাঁরা আমাদের যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তাই বিনা বিচারে মেনে নিয়ে চলা ভিন্ন আমাদের উপায় কি?"

শিষ্য বলিলেন, "শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রচার ক'রে গেছেন, এক বই দুই নেই, তবে আমরা কেন অনেকের পূজো করি, মানসিক করি?"

মাতাজী বলিলেন, "শঙ্কর একের পূজো প্রচার ক'রে গেছেন, এ কথা যেমন সত্য, তেমনই শঙ্কর গঙ্গা-স্তোত্র লিখে গেছেন, গোপালের স্তোত্রও প্রচার ক'রে গেছেন। চৈতন্য কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও জান্‌তেন, ভগবান্ এক। তবুও তিনি জগন্নাথে গিয়েছেন, বৃন্দাবনে গিয়েছেন, কত তীর্থে গিয়েছেন,—কত মূর্ত্তি পূজো করেছেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি জগবন্ধুর পূজো-আরতি দেখে চোখের জলে ভেসে যেতেন, কত সময়ে তাঁর প্রেমোন্মাদ হ'ত। কেন হ'ত? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের চেয়ে আমরা পণ্ডিত নই, তাঁদের মত আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নেই, তাঁরাও 'অনেকের' পূজো ক'রে গেছেন, একের ভেতরে অনেক দেখে গেছেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মা কালীর পূজোয় ব'সে তন্ময় হয়ে যেতেন। আমরা কে যে, তাঁদের এই ভাবের পূজোর ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে বসব? তার চেয়ে তাঁদের মত মহাপুরুষরা যে পথে চ'লে গিয়েছেন, সেই পথে চলাই কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়? যাক, আমি ভাবছি, মেয়েটার কি হবে। আজ দার্জ্জিলিঙ্গের চিঠি পাবার কথা, দেখ দেখি ডাকহরকরা এল কি না।"

শিষ্য উঠিয়া গেলেন, মাতাজী গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া

বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "কেন এমন হয়? যার জীবনের কোনও সাধ পূর্ণ হয় নাই, তাকে ভগবান্ অল্পবয়সে কোলে তুলে নেন কেন? কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! কিন্তু তিনিই ত কর্ম্ম দেন, তবে মানুষ তার ফলভোগ করে কেন? মানুষকে তিনি কর্ম্মও দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিবেকও দিয়েছেন। বাসনার বশে বিবেকের ইঙ্গিত মানুষ শোনে না ব'লে তাকে কর্ম্মফল ভুগতে হয়। তা, বাসনাও ত তিনি দিয়েছেন। বাসনা আর বিবেক দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করছেন,—এই তাঁর লীলা। কিন্তু এ লীলার রহস্য বুঝবো কি ক'রে?"

অকস্মাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, যাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই, তাহাই ঘটিয়া গেল, প্রতিমার পত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিমা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল,—তাহার পদ্মনেত্র দুইটি জলে ভাসিতেছে। মাতাজী সন্ন্যাসিনী, সংসারবিরাগিণী, কিন্তু তথাপি আতঙ্কে তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। কি শুনি, কি শুনি! কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

প্রতিমা তাঁহার চরণে নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল, ধরা গলায় বলিল, "সব শেষ ক'রে এসেছি মা, আজ নেমেই এখানে চ'লে এসেছি।"

মাতাজী তাহাকে বসাইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কবে হ'ল?"

প্রতিমা বলিল, "আজ চার দিন। মা গো, কেন এমন হয়? অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এমন ক'রে পৃথিবীর ভোগ অসম্পূর্ণ রেখে কেন অল্পবয়সে মানুষ চ'লে যায়? নিষ্ঠুর দেবতা!"

মাতাজী সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "না মা, দেবতা নিষ্ঠুর নয়, নিষ্ঠুর আমরা নিজেই। যে যেমন কায ক'রে এসেছে, সে তেমনই ফল ভোগ করছে। এই এতক্ষণ এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিলুম। অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নি, কেন এমন হয়। কিন্তু তুমি আসবার পরেই কে যেন আমায় অন্ধকারে আলো দেখিয়ে দিলে। যাক্, শেষটা কি হ'ল? তোমায় কিছু ব'লে গেল? আহা, অভাগী ইভ!"

প্রতিমা বলিল, "না মা, তাকে অভাগী বলবেন না, তার মত সৌভাগ্যবতী কে? শেষের দিনে আমায় যা ব'লে গেল, তাতে বুঝেছিলুম, কি তৃপ্তি—কি শান্তি নিয়ে সে চিরবিদায় নিচ্ছে!"

মাতাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "শান্তি—তৃপ্তি? সে কি? তার বাসনা ত অপূর্ণ রয়েই গেল, সব ত আমায় বলেছো।"

প্রতিমা বলিল, "জানি। কিন্তু জেনেও বলছি, সে পরম শান্তিতে জগতের কাছে বিদায় নিয়েছে। তার কি আশ্চর্য্য ত্যাগের ক্ষমতা ছিল, তা ত দেখলেন না। আমায় যা ব'লে গেল, তাতেই বুঝেছিলুম, তার মনটা কত উঁচু ছিল, কত বড় ত্যাগ ক'রে সে শান্তি পেয়েছিল। এমন ক'রে পরের জন্যে আপনাকে ত্যাগ করতে কাউকে দেখি নি।"

মাতাজী হর্ষভরে বলিলেন, "বটে? তা হ'লে আমার আর কোন দুঃখ নেই। তা তোমায় কি ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেল?"

প্রতিমা নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিল। মাতাজীর বিস্ময়বৃদ্ধি হইল। তিনি ত এ যাবৎ প্রতিমাকে কোন কথা গোপন করিতে দেখেন নাই। বলিলেন, "বল্‌তে কি বাধা আছে?"

প্রতিমা কেবল বলিল, "সে নিজে নিষেধ করেছে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিইছি।"

মাতাজী এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল বলিলেন, "বিমলেন্দু বাবু কোথায়?"

প্রতিমা অবনত মস্তকে বলিল, "জানি না। বোধ হয় দার্জ্জিলিঙ্গে।"

মাতাজী বলিলেন, "তোমাদের স্নানাহার হয় নি দেখছি। এখানেই কি প্রসাদ পাবে, না তোমার বাবাও এসেছেন?"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, তিনিও এসেছেন, শৈলও এসেছে। আজ বাসাতেই যাই, এর পর আসব।"

প্রতিমা প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিল, মাতাজী ইভের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বৃক্ষশীর্ষস্থ গৃহ

পেনসিলভেনিয়া সহরের উপকণ্ঠে কয়েক জন যুবক বৃহৎ বৃক্ষের উপরিভাগে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবকাশসময় আনন্দে যাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৃক্ষটি কোনও তটিনীতীরে অবস্থিত। বৃক্ষশীর্ষস্থ গৃহে তিনটি কক্ষ আছে। বৃক্ষটি ঋজু নহে, সুতরাং গৃহে পৌছিবার জন্য সোপানও নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিচিত্র গৃহে যুবকগণ মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। রন্ধনাদির জন্য প্রয়োজনীয় জল কলনাদিনী তটিনীসলিল হইতে সমাহৃত হয়। কীটপতঙ্গাদির উপদ্রব কোনও প্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

বৃক্ষশীর্ষস্থ গৃহ

নারিকেল-খোলের বাদ্যযন্ত্র

অধুনা হাওয়াই দ্বীপে নারিকেলের খোল পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ করিয়া বীণজাতীয় তারের যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। নারিকেলের খোল অত্যন্ত দৃঢ় এবং শব্দের ঝঙ্কার ইহাতে ভালরূপই হইয়া থাকে। খোলের এক পার্শ্বে বড় ছিদ্র রাখার ফলে 'শব্দকক্ষ' হইতে আশানুরূপ স্পন্দন-প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। পূর্ব্বে দারুনির্ম্মিত খোলের সাহায্যে এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইত। নারিকেলখোলবিশিষ্ট এই বীণজাতীয় যন্ত্রের দেশীয় নাম 'কোকোলেলী।'

নারিকেল-খোল-নির্ম্মিত বীণযন্ত্র

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান ৬ষ্ঠ মহম্মদ

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান ৬ষ্ঠ মহম্মদ পরলোকগমন করিয়াছেন। নবজাগ্রত তুর্কশক্তি যখন তুরস্কের সুলতানকে রাজশক্তি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া নূতন ভাবে স্বদেশকে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় তুর্কীর গণতন্ত্র-পূজক দেশবাসিগণ ইঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে নির্ব্বাসিত সুলতান অন্যত্র জীবনযাপন করিতেছিলেন।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান ৬ষ্ঠ মহম্মদ

অঙ্গুরীয়ে পুষ্পাসার

আমেরিকার বাজারে অধুনা এক প্রকার অঙ্গুরীয় বিক্রয় হইতেছে। এই অঙ্গুরীয়গুলি এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, যাহাদের অভ্যন্তরে পুষ্পাসার সঞ্চিত থাকে। অঙ্গুলীয় চাপে অঙ্গুরীয়ের একটা স্প্রিংযুক্ত স্থান মুক্ত হইয়া পড়ে এবং উহার অভ্যন্তরস্থ পুষ্পাসার যে কোনও ব্যক্তির অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রাচীন যুগে গরলাধার অঙ্গুরীয়ের আদর্শে উহা নির্ম্মিত। প্রাচীন কালে শত্রুকে অকস্মাৎ বিনষ্ট করিবার জন্য অথবা আত্মহত্যার জন্য ঐ শ্রেণীর অঙ্গুরীয় নির্ম্মিত হইত। বর্ত্তমান যুগে ঐরূপ অঙ্গুরীয় বিলাসিনীর চম্পকাঙ্গুলীতে শোভিত হইয়া প্রিয়জনকে পুষ্পাসারে চর্চ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইতেছে।

পুষ্পাসার-পূর্ণ অঙ্গুরীয়ক

ভূপালের নবীন নবাব

ভূপালের নবীন নবাব বাহাদুরের নাম হামিদুল্লা খাঁ। বেগম সাহেবা পুত্রহস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর লওয়ায় ইনিই এখন ভূপালের কর্ণধার হইলেন।

ভূপালের নবীন নবাব

শব্দ-সাহায্যে চরিত্র-পরীক্ষা

য়ুক্রেনিয়ার জনৈক চিকিৎসক একরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে তিনি যে কোনও ব্যক্তির চরিত্র --গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। পরীক্ষার্থী একটি 'ইলেক্‌ট্রোড' ধরিয়া থাকে এবং চিকিৎসক আর একটি দণ্ডাকৃতি ইলেক্‌ট্রোড হস্তে গ্রহণ করেন। চিকিৎসকের উভয় কর্ণে এক জোড়া মাইক্রোফোন যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া, চিকিৎসক উক্ত দণ্ডাকৃতি ইলেক্‌ট্রোড যন্ত্রটি পরীক্ষার্থীর ললাটের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপন করেন। ললাটের ৫৫টি বিভিন্ন অংশে মানবের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির আবাসস্থল আছে বলিয়া চিকিৎসক বিশ্বাস করেন। ইলেক্‌ট্রোড দণ্ডটি যখনই ললাটের কোনও অংশে স্পৃষ্ট হয়, অমনই যন্ত্র হইতে শব্দ নির্গত হইতে থাকে। শূন্য (০) হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত একটি মাত্রা-নির্দ্দেশক পরিমাপক (Scale) যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট থাকে। শব্দ কোন্ মাত্রা পর্য্যন্ত উঠিল, তাহা ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শব্দমাত্রা বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষার্থীর কোন্ কোন্ বৃত্তি উন্নত বা অবনত, তাহা বুঝিতে পারা-যায়।

শব্দ সাহায্যে চরিত্র-পরীক্ষা

ভূপালের বেগম সাহেবা

ভূপালের বেগম সাহেবা পুত্রের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দের মধ্যে ইনিই একমাত্র নারী দেশ-শাসনকর্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার পর ৬৭ বৎসর বয়সে এখন তিনি দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার আমলে ভূপালে বেগম সাহেবা নানাবিধ সংস্কার ও মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এক জন দক্ষ চিত্রশিল্পী।

ভূপালের বেগম সাহেবা

কুকুরের পীড়া

যে সকল ক্ষুদ্রতম জীবাণু কুকুরের দেহে বিদ্যমান থাকিয়া তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায়, উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগেও এত দিন তাহা আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু নবোদ্ভাবিত বার্ণার্ড (Barnard) অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে অধুনা সে সকল জীবাণুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অলট্রাভায়োলেট (Ultra Violet) আলোক-সম্পাতে কুকুরের এই পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

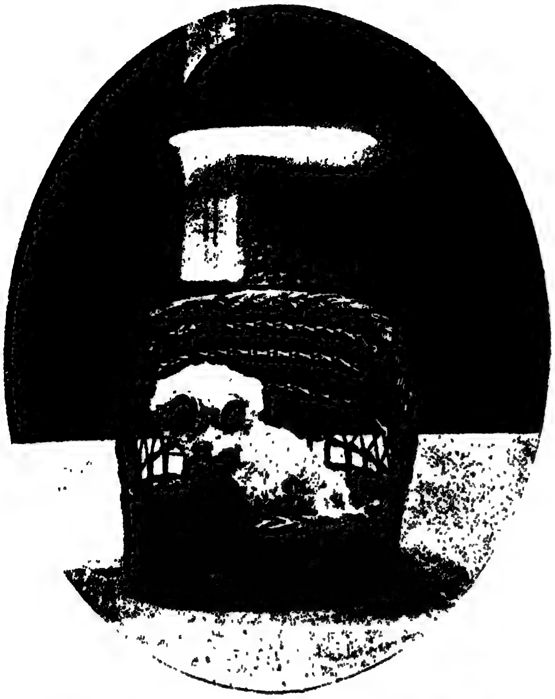

চিকিৎসাকালে পীড়িত কুকুরের চক্ষু আবৃত রাখা হইয়াছে

চিকিৎসার সময় পীড়িত কুকুরের চক্ষুতে যাহাতে আলোক-দীপ্তি না লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

কাচের মধ্য দিয়া দ্বিচক্রযান চালান

জনৈক ইংরাজ মোটর-চালিত দ্বিচক্রযানে চড়িয়া সম্প্রতি এক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন। চারিদিকে দারুবেষ্টিত এক বিরাট কাচ পথিমধ্যে স্থাপিত করিয়া, চালক ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে গাড়ী চালাইয়া কাচের মধ্য দিয়া প্রায় অক্ষতদেহে অপর দিকে চলিয়া যান। ভগ্ন কাচ লাগিয়া তাঁহার মুখের দুই স্থানে সামান্য ক্ষত হইয়াছিল। এই পরীক্ষার সময় আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ভগ্ন কাচখণ্ডগুলির চিত্র পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

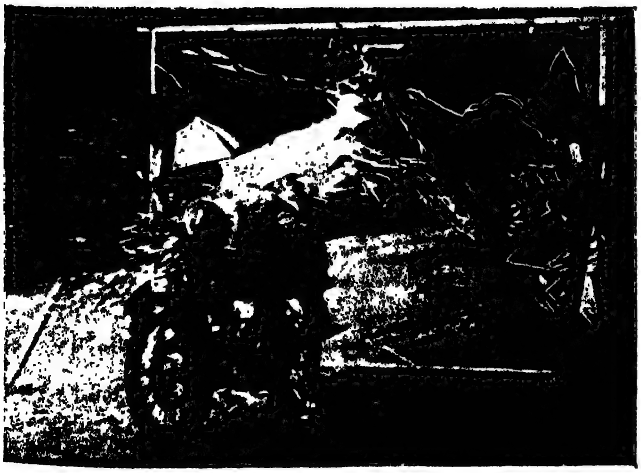

কাচের মধ্য দিয়া দ্বিচক্রযান পরিচালনের দৃশ্য

শ্বেত-গোলাপনির্ম্মিত মনুমেণ্ট

শ্বেত-রেশম-নির্ম্মিত ২৫ হাজার গোলাপফুলের সাহায্যে নিউইয়র্কে ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের আদর্শে একটি মনুমেণ্ট রচিত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে ৭টি বৈদ্যুতিক আলোকদানের ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রপতি কুলিজের একটি প্রতিমূর্ত্তি মনুমেণ্টের অঙ্গে সন্নিবিষ্ট আছে। বৈদ্যুতিক আলোক রাত্রিকালে মনুমেণ্টের অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত করা হয়। শিল্পী ৩ সপ্তাহে এই ফুলের মনুমেণ্ট রচনা করিয়াছে। উহা রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

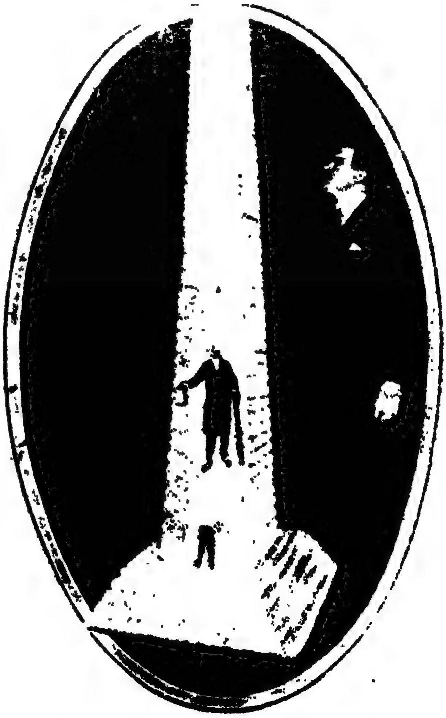

রেশমের গোলাপফুলনির্ম্মিত মনুমেণ্ট

প্রাচীন যুগের উড্ডীয়মান সরীসৃপ

প্রাচীন যুগে অনেক সরীসৃপ ছিল, যাহারা আকাশে উড়িতে পারিত। ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে এই প্রাচীন যুগের উড্ডীয়মান সরীসৃপ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

উড্ডীয়মান সরীসৃপ

জীয়ন্ত ডানা

পাখীর ডানা নহে—আলোকচিত্র গ্রহণ উপলক্ষে ১৩ শত ব্যক্তিকে পক্ষীর ডানার ন্যায় আকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ফটো তোলা হইয়াছিল। চারি পার্শ্বে শ্বেত সার্ট-ধারী ব্যক্তিগণকে স্থাপন করিয়া ডানার শোভা-বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে—ফেলিফিন্ড নামক স্থানে এই ব্যাপারটি ঘটে। ১৩ শত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ গৃহীত হইলে চিত্রটি ঠিক জীয়ন্ত পক্ষীর মত দেখিতে হইয়াছিল।

জীয়ন্ত ডানা

প্রাচীন ও আধুনিক মিশর

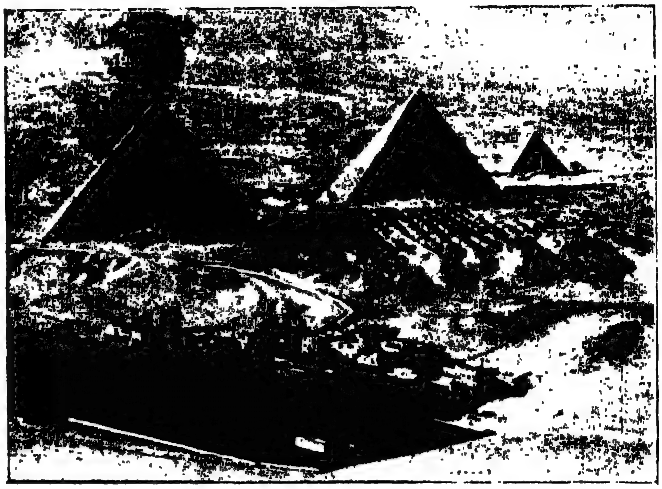

প্রাচীন ও আধুনিক মিশর

প্রাচীন যুগের মিশরীয়গণ মৃতব্যক্তিদিগের দেহরক্ষার জন্য অনেক চিন্তাশীলতা ও যত্নের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সমগ্র জাতি জীবিতদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনবহিত নহে। গিজার বিরাট পিরামিডের সন্নিকটে ইদানীং পর্য্যটকদিগের বিশ্রাম ও তৃপ্তির জন্য মনোরম হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। সভ্যতালোকদীপ্ত যে কোনও প্রসিদ্ধ নগরে যেরূপভাবে যাত্রীদিগের জন্য হোটেল ও নানাবিধ আরামের ব্যবস্থা থাকে, এই প্রাচীন পিরামিডের পাদদেশে এখন তাহার কোনও অভাব দৃষ্ট হইবে না। তৃণচ্ছায়াচ্ছন্ন ক্ষেত্র, মনোরম উদ্যান পর্য্যটকদিগের জন্য সেখানে রচিত হইয়াছে। বিমানপোতে আরোহণ করিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে।

বালুকার মানচিত্র

কালিফ স্থান্‌জোসের কোনও বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার জন্য ছাত্রগণ বালুকার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে।

বালুকার মানচিত্র

নিজ নিজ দেশের মানচিত্রে ছাত্রগণ প্রসিদ্ধ পাহাড়, নদ-নদী প্রভৃতিও বালুকার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখায়। এইরূপ মানচিত্রে ভূগোল পাঠের বিশেষরূপ সহায়তা হয় বলিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করেন। বালুকার মানচিত্র স্বহস্তে রচিত হওয়ায় তাহারা ভূগোল সম্বন্ধে সকল কথা স্মৃতিপথে রাখিয়া থাকে। খেলাচ্ছলে এইরূপে শিক্ষাদান-প্রথা এ দেশে কি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না?

ক্রীড়াক্ষেত্রের সহচর

বালক-বালিকাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গাছে আরোহণ করার দিকে অধিক। পাশ্চাত্যদেশে ক্রীড়াক্ষেত্রে শিশুদিগের জন্য আরোহণী সরবরাহ করা হইয়া থাকে। অধুনা এক প্রকার আরোহণী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে শিশুদিগের বস্ত্রাদি ছিন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নল-নির্ম্মিত এই আরোহণীগুলি দীর্ঘকালস্থায়ী।

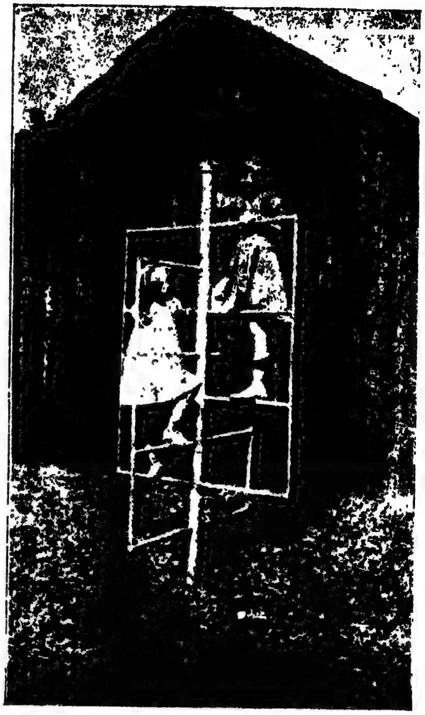

ক্রীড়াক্ষেত্রে আরোহণী

জার্ম্মাণ ভীম

জার্ম্মাণীর জনৈক অসীম শক্তিশালী ব্যক্তি সার্কাসে তাঁহার

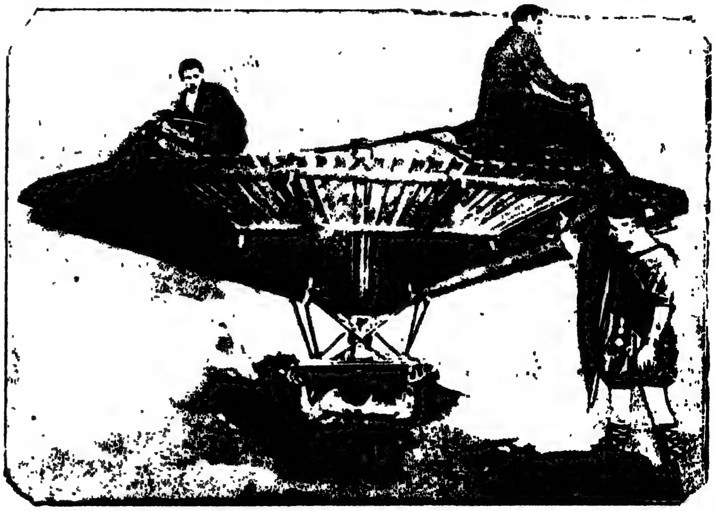

জার্ম্মাণ ভীম

অপূর্ব্ব সামর্থ্যের পরিচয় দিতেছেন। ভূমিতলে শয়ন করিয়া, এই প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বক্ষোদেশে এক বিরাট আধার ধারণ করিয়া থাকেন। মোটর-চালিত দুইখানি দ্বিচক্র যানে দুই জন লোক দ্রুতবেগে সেই আধারের উপর ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। যতক্ষণ খেলা শেষ না হয়, এই বিংশ শতাব্দীর ভীম ততক্ষণ আধার সহ দুই জন লোককে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন। দ্বিচক্র যান দুইটি আধারের মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি দণ্ডে আবদ্ধ থাকে। ইহার ফলে আধারটি কোনও দিকে না হেলিয়া সমানভাবে থাকে।

নমনীয় কাচজাতীয় পদার্থ

ইংলণ্ডের মিঃ ভেরেডেন্‌বার্গ ও ভায়েনার ডাক্তার ফ্রিজ পোলাক অধুনা এক প্রকার কাচ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কাচ যেমন ভাবে ইচ্ছা বক্র করিতে পারা যায়। প্রকৃত কাচ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু এই নূতন কাচ বিবিধ পদার্থ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে—কাচেরই মত ইহা স্বচ্ছ। যে কোনও আকারে ইহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লইতে পারা যায়। ভাঙ্গিয়া গেলেও কাচের মত ইহা তীক্ষাগ্র হয় না। এই নবোদ্ভাবিত কাচ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। ভূমিতলে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে কাচনির্ম্মিত 'বল' লাফাইয়া উঠে! এই কাচে বর্ণানুলেপ করা সহজসাধ্য।

আবিষ্কারক কাচকে ধনুকের ন্যায় বক্র করিয়া দেখাইতেছেন

চক্র-সাহায্যে ব্যায়াম

জার্ম্মাণীর কোনও ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে নূতন উপায়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইস্পাতনির্ম্মিত দৃঢ়চক্রমধ্যে ব্যায়ামেচ্ছু দাঁড়াইয়া থাকে। পদযুগল 'সাণ্ডাল'-জাতীয় চক্রসংলগ্ন পাদুকামধ্যে রাখিয়া, শিক্ষার্থী চাকার উভয় পার্শ্ব হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখে। তার পর শরীরের শক্তি প্রয়োগ করিয়া চক্রকে পরিচালিত করিতে হয়। চক্র যখন আবর্ত্তিত হয়, তখন হস্ত বা পদে কোনওরূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ, চক্র ভূমিস্পৃষ্ট হইলেও হস্ত ও পদ ভূমির অনেক উর্দ্ধে থাকে। এইরূপ ব্যায়ামে শরীরের সর্ব্বাংশের পেশীগুলি দৃঢ় হয়। ঘরের মধ্যে বা বাহিরে চক্রব্যায়াম অনায়াসে সম্পন্ন হয়। জার্ম্মাণীর ব্যায়ামশিক্ষার্থীরা অধুনা এই উপায়ে শক্তিলাভের বিশেষ পক্ষপাতী।

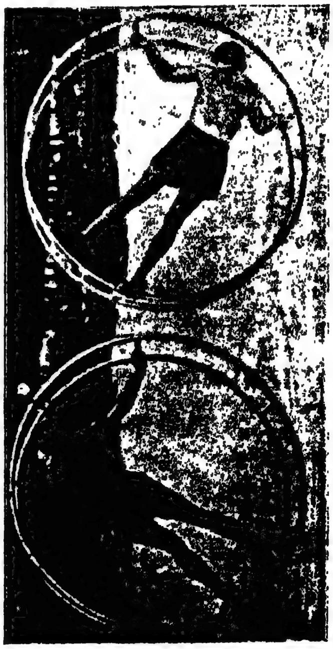

চক্রসাহায্যে ব্যায়াম

কিসের পুরস্কার ?

তার বাপ-মা যদিও তার নাম রেখেছিলেন সুশীল, কিন্তু সে-ই হচ্ছে তাদের স্কুলের মধ্যে সবার সেরা দুরন্ত ও প্রাণবন্ত। তার দুষ্টামীতে তার পিতা-মাতা যে মিথ্যাবাদী হয়ে উঠছেন, অন্ততঃ তাঁদের আশা-ভঙ্গ ঘট্‌ছে, সে দিকে সুশীলের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না; সে প্রাণ খুলে দুষ্টামী করে।

সুশীল পড়ে থার্ড ক্লাসে; বিদ্যাবুদ্ধিতে সে থার্ড ক্লাসেরই: কিন্তু দুষ্টামী-বুদ্ধিতে সে ফার্ষ্ট হবার যোগ্য।

পাড়া-গাঁয়ের ছোট স্কুলে সে পড়ে। স্কুল-বাড়ীটি একটি বড় আটচালা; সেই আটচালার মাঝখানে একটা চৌকা ঘর, আর সেই ঘর ঘিরে চারিদিকে চওড়া দালানের মত আছে, যেন একটা ছোট চতুষ্ককে একটা বড় চতুষ্কের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে; সুশীল এই জন্য স্কুল-বাড়ীটার নাম রেখেছে ইক্‌মিক্-কুকার।

স্কুল-বাড়ীর মাঝখানের ঘরটিকে একটা ব্ল্যাক্-বোর্ড দিয়ে দু-ভাগ করা হয়েছে; তার এক ভাগে বসে ফার্ষ্ট ক্লাস আর অপর ভাগে আছে দু-আল্‌মারী বইএর লাইব্রেরী, হেডমাষ্টারের এক ঘণ্টা অবসরে ঘুমোবার জন্য একখানা চেয়ার, আর ফিফ্‌থ-মাষ্টারের এক ঘণ্টা অবসরে আপিসের কায কর্‌বার জন্য একটা টেবল-চেয়ার। ব্ল্যাক্-বোর্ডখানা ঘরটিকে দুই ভাগ করার ইঙ্গিতস্বরূপ খাড়া হয়ে আছে, কিন্তু তাতে দুই ভাগের এক ভাগেরও আব্রু রক্ষা হয় নি; তাই সুশীল একে বলে হুঁকোর নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া!

এই মাঝের ঘরের চারিদিক ঘেরা চওড়া দালানে খানিক খানিক অন্তর এক একটি ক্লাস সাজানো আছে; প্রত্যেক ক্লাসের পুঁজি মাষ্টার-মশায়ের জন্য একখানি চেয়ার ও টেবল আর সেই টেবলের দুই পাশে দুইখানা বেঞ্চি ছাত্রদের আসন এবং এক ক্লাস থেকে অপর ক্লাসকে আড়াল কর্‌বার জন্য এক-একখানা দাঁড়া ব্ল্যাক্-বোর্ড। এই ক্লাসগুলি এত কাছাকাছি যে, ব্ল্যাক্-বোর্ডের বেড়া দেওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে পৃথক্ ব'লে চেনা একটু লক্ষ্য-সাপেক্ষ।

সুশীলের কায হচ্ছে—রোজ স্কুলে এসেই একবার স্কুলের এক মুড়ো থেকে টেবল-বেঞ্চির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে সমস্ত ক্লাসের ছেলেদের জানিয়ে দিয়ে আসা যে, সে স্কুলে এসেছে। সুশীল এর নাম রেখেছে হার্ডল্ রেস্। সে এক ক্লাস থেকে অপর ক্লাসের ব্যবধানটি লঙ্ঘন ক'রে এক বেঞ্চি থেকে অপর বেঞ্চিতে লাফিয়ে পড়ে, বেঞ্চি থেকে এক লাফে টেবলে উঠে, এবং তৎপরতার সহিত ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ফ্রেমের মাথায় দুই হাতের ভর রেখে ডিগবাজি খেয়ে ওপারের ক্লাসের টেবলের উপর গিয়ে পড়ে।

সুশীলের শুভাগমনে সারা স্কুলময় একটা সাড়া প'ড়ে যায়—এসেছে রে এসেছে! কে এসেছে বলা কেউ আবশ্যক মনে করে না, এবং কর্ত্তা উহ্য থাকাতে বাক্যের অর্থ বোধ কর্‌তেও কারও কিছুমাত্র কষ্ট বা বিলম্ব হয় না। কর্ত্তার ক্রিয়াই এমন প্রবল যে. তা কর্ত্তাকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে! সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র অপূর্ব্ব একটু কাব্যপ্রিয়; সে সুশীলের শুভাগমনকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পংক্তি আবৃত্তি ক'রে অভিনন্দিত করে—"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে!"

সুশীলের শুভাগমন স্কুলের ছাত্রদের কাছে একাধারে কৌতুক ও ভয়ের বিষয়; সুশীল স্কুল-পরিক্রমার সময় কারও মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে যায়, পাছে সুশীল তার ঘাড়ে হুড়হুড় ক'রে পড়ে, এই ভয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়; কারও মাথায় চাঁটি লাগিয়ে চম্পট দেয়; ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের শিশুদের মধ্যে মেষপালের মধ্যে নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে

কাউকে টপ ক'রে তুলে নিয়ে ব্ল্যাক্-বোর্ডের ফ্রেমের উপর বসিয়ে দেয় এবং সে প'ড়ে যাবার ভয়ে নামিয়ে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি কর্‌লে সুশীল চুম্‌কুড়ি দিয়ে বলে—'পড় বেটা আত্মারাম! দাঁড়ে ব'সে ছুটি ছোলা খাবে?' তার পর সে তাকে উঁচু থেকে নামিয়ে না দিয়েই প্রস্থান করে এবং অপর কোন বড় ছেলে গিয়ে সেই রোরুদ্যমান শিশুকে নামিয়ে দেয়।

টিফিনের ছুটীর সময় ঘণ্টা বাজবামাত্র সুশীল কামানের গোলার মত ছিট্‌কে স্কুলের কারাগার থেকে বাইরের মাঠে বেরিয়ে পড়ে এবং হুটোপাটি ক'রে একাই খেলার মাঠ মাতিয়ে সরগরম ক'রে তোলে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে যদি দেখে, কোনও ছেলে মাঠে ঘাসের উপর চুপ ক'রে ব'সে আছে, তা হ'লে সে হঠাৎ আচম্‌কা টপ ক'রে এক হাতে কারও বা পা ও কারও বা হাত চেপে ধ'রে দৌড়াতে থাকে এবং আক্রান্ত বালকরা হাসিতে আর ভয়ে মিশিয়ে চীৎকার ক'রে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। সে মুক্তিলাভে চেষ্টিত বালকের ছট্‌ফটানি ও টানাটানিতে ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের মুক্তি দেয় না; এবং মুক্তি যখন দেয়, তখন ভর্ৎসনার স্বরে বলে—'হতভাগারা, ছুটোছুটি কর্ না, জড়-পিণ্ডের মত চুপ ক'রে ব'সে থাকিস্ কেন?'

সুশীল স্কুলের ছাত্রদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে বলে—মানুষ তিন প্রকার,—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ।

কখনও বা সে বলে—"মানুষ দুই প্রকার;—পদার্থ ও অপদার্থ।"

সে কোন ছাত্রকে ভব্যযুক্ত হয়ে চাদর নিয়ে স্কুলে আস্‌তে দেখলে টপ ক'রে কেড়ে নিয়ে হয় ছাদের উপর ছুড়ে ফেলে দেয়, অথবা কখনও সেই চাদর প'রে স্কুলের পুকুরে সাঁতার কাটে। স্কুলের পুকুর-পাড়ে একটা প্রকাণ্ড লিচু গাছের একটা ডাল জলের উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে, সুশীল সেই গাছে চ'ড়ে সেই নোওয়ানো ডাল ধ'রে ঝুলে জলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে। তার সাঁতারের কসরৎও বিচিত্র! সে আসন-পীড়ি হয়ে জলে সাঁতার দিতে পারে, বুকের উপর হাঁটু গুটিয়ে সাঁতার দিতে পারে, সে মাথার দিকে জল ঠেলে পায়ের দিকে সন্‌সনিয়ে শাল্‌তি নৌকার মত চল্‌তে পারে; সে চিৎ হয়ে আড় অচলভাবে জলে ভাস্‌তে পারে। তাই যার চাদর ভিজে যায়, সে বিরক্তও হয়, আবার সুশীলের সাঁতারের কসরৎ দেখে আনন্দও সম্ভোগ করে।

এই সব কারণে হেড-মাষ্টারের কাছে সুশীলের নামে প্রত্যহ পাঁচ-সাত নম্বর নালিশ দায়ের হয়; এবং সুশীল সমস্ত অপরাধ মৌনভাবে স্বীকার ক'রে নেয় এবং প্রত্যেক অপরাধের গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে শাস্তি বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে বেত খাওয়া পর্য্যন্তও সে মৌনভাবেই সহ্য করে। সুশীলের স্কুলে থাকার ৫ ঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধেক সময় হয় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে, নয় ক্লাসের কোণে নাড়ুগোপাল হয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে কাটাতে হয়।

এই শাস্তিভোগের সময়েও সুশীল শান্ত হয়ে থাক্‌তে পারে না; সে গাধার টুপী মাথায় দিয়ে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কোন ছেলের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই অদ্ভুত মুখবিকৃতি ক'রে ভেঙচায়; কখনও বা গাধার টুপীটাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে দেখিয়ে পরক্ষণে কোন মাষ্টার মশায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দেখায়। যে সব ছাত্র তার এইরূপ অঙ্গভঙ্গী দেখে, তারা নিজেদের মনগড়া অর্থ সে ভঙ্গীতে আরোপ ক'রে হাসি চাপ্‌বার চেষ্টাতেই আরও হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে না। গাধার টুপীর সঙ্গে মাষ্টার মশায়দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত কল্পনা ক'রে ছেলেরা হেসে গড়িয়ে পড়ে; এবং মাষ্টার মশায় ক্লাসের ছেলেদের যখন অকারণে হাস্যাকুল দেখে তর্জ্জন ক'রে ওঠেন—"এই তোরা সব শুধু শুধু হাস্‌ছিস কেন?" তখন ছেলেরা হাসির বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে যখন কেবলমাত্র উচ্চারণ কর্‌তে পারে—"সুশীল ..." তখনই মাষ্টার মশায়ের আর বেশী কিছু জান্‌বার দরকার থাকে না—সুশীল নামটিই তাঁর মনের সাম্‌নে হাজার রকম দুষ্টামীর একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে এসে হাজির হয়! কিন্তু মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি সুশীলের দিকে পড়বামাত্রই তিনি দেখ্‌তে পান, সুশীল তার নামের অর্থ অনুযায়ীই দিব্যি শান্ত সুশীল ভালমানুষটির মত দাঁড়িয়ে আছে! কিন্তু সুশীলের বাহ্য সুশীলতা দেখে প্রতারিত হবার মত সুশীলের আচরণের ইতিহাসের সুখ্যাতি ছিল না!

এক দিন সকালবেলা স্কুলে এসেই সুশীল নিত্যক্রিয়া পরিক্রমার সময় বেঞ্চি টেবল টপ্‌কে টপ্‌কে ছুট্‌তে

ছুটতে গিয়ে একটি শিশুকে তুলে যেই ব্ল্যাকবোর্ডের ফ্রেমের উপর তুলে বসিয়ে দিতে গেছে, সেই ছেলেটি তার আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার ব্যস্ততায় ফ্রেমের উপর থেকে নীচে প'ড়ে গেল এবং একখানা বেঞ্চির একটা কোণের আঘাত লেগে মাথা কেটে খুব খানিক রক্তপাত হলো। সুশীল অনুতপ্ত হয়ে সেই শিশুটিকে কোলে ক'রে মাথায় জল ঢেলে তাকে সান্ত্বনা ও তার রক্ত বন্ধ কর্‌বার কিছুই ত্রুটি করেনি; কিন্তু তাতে তার অপরাধের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হয়েছে ব'লে হেড মাষ্টারের বিচারে গ্রাহ্য হলো না; সুশীলকে তিনি নিজ হাতে দশ ঘা বেত মার্‌লেন এবং আহত শিশুটিকে দিয়ে দশ ঘা বেত মারালেন। সুশীল আজ প্রহারে জর্জ্জরিতদেহ হয়ে ক্লাসে গিয়ে বস্‌ল। কিন্তু তার দিকে কোন ছাত্র কৌতূহলী বা কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে তাকাইলে সে তৎক্ষণাৎ তাকে মুখ ভেঙিয়ে দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি কর্‌ছিল না।

টিফিনের ছুটীর সময় সবাই মনে করেছিল যে, সুশীল অন্ততঃ আজকার দিনটা তার নামের অর্থ অনুযায়ী সুশীল হয়ে থাকবে। কিন্তু স্কুল-বাড়ী থেকে সব কটি মাষ্টার বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল আবার উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল এবং এক লাফে বেঞ্চি থেকে টেবলে এবং টেবল থেকে ব্ল্যাকবোর্ড ডিঙিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসের টেবলের উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু আজ তার বেত্রাহত বেদনা-কাতর দেহ তার মনের বশে ছিল না, সে টেবলের মাঝখানে গিয়ে না প'ড়ে পড়েছিল এক পাশে। সেখানে দেহভারের সামঞ্জস্য কর্‌তে না পেরে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার্‌লে না, ট'লে চিৎ হয়ে প'ড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। তার পিছনদিকে টেবল ও বোর্ডের মাঝখানে মাষ্টারের চেয়ারের হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিল অপূর্ব্ব। সুশীল পতন রোধ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে অপূর্ব্বকে ধর্‌তে গেল; কিন্তু অপূর্ব্ব ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স'রে যাওয়াতে সে টেবল থেকে নীচে প'ড়ে গেল এবং টাল সাম্‌লাবার চেষ্টায় বোর্ডের উপর গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে একখানা ম্যাপ টাঙানো ছিল; দপ্তরী তখন সেটা নিয়ে যায়নি, নিয়ে যাবে ব'লে আস্‌ছিল; সুশীলের সমস্ত গায়ের ভরের টান পেয়ে সেই ম্যাপখানা এমন বিশ্রী রকমে ফেঁসে ছিঁড়ে গেল যে, তাকে মেরামত ক'রে কায চালাবার আর কোন উপায়ই রইল না।

সুশীল আহত শরীরে আবার প'ড়ে গিয়ে যে বেদনা পেলে, তার দিকে মনোযোগ দিবার অবসর সে পেলে না, ম্যাপের দুর্দ্দশা দেখে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল, মুখ শুকিয়ে উঠল।

দপ্তরীও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল—"সুশীল বাবু! ম্যাপখানার দফা একেবারে সেরে দিলে! রসো! হেড মাষ্টার মশায় আসুন—"

সুশীল মুখে দম্ভ প্রকাশ ক'রে বল্‌লে "যা যা, তোর যা বল্‌তে হয় বলিস্‌। হেড মাষ্টার মশায় আমার যা করবেন, তা আমার জানাই আছে!"

দপ্তরী গজগজ কর্‌তে কর্‌তে ম্যাপ গুটিয়ে নিয়ে চ'লে গেল।

দপ্তরী চ'লে যেতেই অপূর্ব্ব সুশীলের মুখে ভয়ের ভাব লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে—"তোমার ভয় নেই, আমি সাক্ষী দেব, হঠাৎ এক্‌সিডেণ্টালি ম্যাপখানা ছিঁড়ে গেছে, তুমি মোটেই ইচ্ছা ক'রে ছেঁড়নি—"

সুশীল ব্যথাভরা হতাশের হাসি হেসে বল্‌লে—"তোমার সাক্ষীতেও আমার শাস্তি কিছুমাত্র লঘু হবে না; আর কেউ হ'লে হতো, কিন্তু আমি যে সুশীল!"

পরক্ষণেই সুশীল চেষ্টাকৃত কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লে—"আরে ভাই, শাস্তি-ফাস্তি আমার ত গা-সহা হয়ে গেছে! তবে আজকে এক দফা এক রকম বেশ উত্তম-মধ্যম হয়ে গেছে কি না, তাই এই অধমটাকে আমল দিতে তেমন উৎসাহ বোধ হচ্ছে না।"

অপূর্ব্ব আর কিছু না ব'লে স্কুল থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। সুশীল হেড মাষ্টারের আগমনপ্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে গিয়ে নিজের ক্লাসে বস্‌লো; আজ আর দুষ্টামী করবার উৎসাহ তার মনে ছিল না।

স্কুলের ক্লাস বস্‌বার ঘণ্টা বাজলো—ছুটো। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের মনের উপরও ছুটো মুগুরের ঘা পড়্‌ল! এইবার হেড মাষ্টার আস্‌বেন; দপ্তরী নালিশ কর্‌বে; আর শাস্তি নেবার জন্যে তারও ডাক পড়বে!

অপূর্ব্ব হেড মাষ্টারের আগমনের পথের ধারে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিল। হেড মাষ্টার তার কাছে আস্‌তেই সে তাঁকে নমস্কার ক'রে নম্রস্বরে বল্‌লে—"স্যার, আমি একটা অন্যায় কর্ম্ম ক'রে ফেলেছি!"

হেড মাষ্টার আশ্চর্য্য হয়ে অপূর্ব্বর মুখের দিকে গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ?"

অপূর্ব্ব মাথা নত ক'রে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বল্‌লে—"আমি সুশীলদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি কর্‌তে গিয়ে একখানা ম্যাপ একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছি !"

অপূর্ব্ব গ্রামের জমীদারের ছেলে; সে সকল রকমেই মাঝারী—লেখাপড়াতেও, আচরণে--স্বভাবেও। হেড মাষ্টার গম্ভীরতর হয়ে উপদেশ দেবার ভাবে বল্‌লেন—"তুমি যে নিজের মুখে এসে আত্মদোষ স্বীকার কর্‌লে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তুমি যদি নিজে স্বীকার না কর্‌তে, তা হ'লে আমি তোমাকে বেত মারতাম; অন্য লোকের কাছে আমি জান্‌তে পারার পর তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তুমি যদি স্বীকার করতে, তা হ'লে ম্যাপের দ্বিগুণ দাম তোমার জরিমানা করতাম; তুমি নিজে থেকে এসে যে অন্যায় অপরাধ স্বীকার করছ, এর জন্য তোমাকে ক্ষমা কর্‌লাম। যাও—কিন্তু তুমি ঐ হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া সুশীলটার সঙ্গে কখনও মিশবে না; তার সঙ্গে কোন সুবোধ ছাত্রের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়—তাকে তোমাদের সকলের একঘরে ক'রে বয়কট্ করা উচিত—আচ্ছা যাও—"

অপূর্ব্ব খুসী হয়ে হাসিমুখ নত ক'রে দ্রুতপদে অন্য দ্বার দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করলে।

সুশীলদের ক্লাস ও ফোর্থ ক্লাসের মাঝখান দিয়ে মাষ্টারদের বিশ্রামকক্ষ থেকে স্কুলে আসবার পথ। একে একে মাষ্টারদের সমাগমের ফলে স্কুলের কোলাহল ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছিল। স্কুলের কোলাহল যত ক'মে আস্‌ছিল, সুশীলের হৃৎস্পন্দনের শব্দ তত বেশী হয়ে উঠ্‌ছিল। হঠাৎ সমস্ত স্কুল একেবারে স্তব্ধ হয়ে ঘোষণা কর্‌লে যে, হেড-মাষ্টার মশায় স্কুলের মধ্যে পদার্পণ করেছেন। সুশীল মুখ না ফিরিয়েই তার পিঠ দিয়েই তাঁর স্থূল গম্ভীর মূর্ত্তির আবির্ভাব অনুভব ক'রে শিউরে উঠল!

দপ্তরী ছেঁড়া ম্যাপখানা হাতে ক'রে দরজার কাছে নালিশ কর্‌বার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হেড-মাষ্টার স্কুলের মধ্যে আসতেই সে ম্যাপখানা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌বার উপক্রম কর্‌লে—"হুজুর, ..."

হেড-মাষ্টার গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—"হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি, তুমি ঐ ছেঁড়া ম্যাপখানা আলাদা ক'রে রেখে দাও গে।"

সমস্ত স্কুল স্তব্ধ! কোথাও টুঁ শব্দটি নেই! সকল ছাত্রই ভাবছিল, এইবার সুশীলকে ডাক পড়বে এবং খুব সম্ভব তার পিঠে বেতও পড়বে! সুশীল নিজেও তাই ভাবছিল এবং হেড-মাষ্টারের চোখের কোল থেকে দাড়িভরা মুখ তার মনের মধ্যে উদয় হয়ে তাকে বিভীষিকা দেখাতে লাগল।

মাষ্টার মশায়রা হঠাৎ ছাত্রদের এমন শিষ্ট হবার কোনও কারণ অনুমান কর্‌তে না পেরে তাকে হেড-মাষ্টারের আবির্ভাব ব'লেই ধ'রে নিয়ে, হেড-মাষ্টার শুন্‌তে পান, এমন উচ্চ রবে পড়াতে প্রবৃত্ত হলেন।

সেকেণ্ড জুড়ে জুড়ে মিনিট, আর মিনিট জুড়ে জুড়ে ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল, তবু সুশীলের শমন এলো না! সুশীল ভাবলে, কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

অবশেষে স্কুলের ছুটী হয়ে গেল, তবু হেড-মাষ্টারের কাছে সুশীলের তলব এলো না। সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ছুটে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার মনে হলো, নিশ্চয় অপূর্ব্ব হেড-মাষ্টারকে কিছু ব'লে থাক্‌বে। সে ছুটে গিয়ে অপূর্ব্বকে ধর্‌লে। অপূর্ব্ব তার ব্যগ্রতা দেখে কেবল একটু হাস্‌লে।

সুশীল চুপি-চুপি অপূর্ব্বকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তুমি হেড-মাষ্টারকে কিছু বলেছিলে না কি ?"

অপূর্ব্ব বল্‌লে—"হ্যাঁ, বলেছি যে, ওটা হঠাৎ একসিডেণ্ট্যালি ..."

সুশীল কতকটা আশ্বস্ত হ'লেও আশ্চর্য্যের ভাবে বল্‌লে—"কিন্তু এক বার কৈফিয়ৎ তলব পর্য্যন্ত কর্‌লে না যে!"

অপূর্ব্ব ঈষৎ হাস্য ক'রে বল্‌লে—"তা কি জানি!"

সুশীল বল্‌লে—"এক বার সকালে মেরেছে ব'লে বোধ হয় দয়া হয়ে থাক্‌বে......"

অপূর্ব্ব হেসে বল্‌লে—"তা হবে।"

সুশীল বল্‌লে—"হাজার হোক্, হেড-মাষ্টার হলেও মানুষ ত, কসাই ত নয়!"

অপূর্ব্ব আবার হাসতে হাসতে বল্‌লে—"কসাইরাও মানুষ!"

অপূর্ব্বের এই কথায় সুশীলও হাসতে হাসতে বাড়ীমুখো হলো—সে অপূর্ব্বের উল্টা দিকে যাবে।

তাহার পর সকলে এই ব্যাপারের অপূর্ব্বতা ভুলে গেল।

* * * *

এই ঘটনার তিন মাস পরে স্কুলের প্রাইজ বিতরণ হবে। পুরস্কার বিতরণের এক হপ্তা আগে হেড-মাষ্টার প্রত্যেক ক্লাসে গিয়ে গিয়ে নাম ডেকে ডেকে ঘোষণা ক'রে দিলেন, কে কে প্রাইজ পাবে; সেই সেই ছাত্রকে পুরস্কার বিতরণের দিন পরিষ্কার বেশ-বিন্যাস ক'রে আস্‌তে ব'লে দিলেন।

অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে শুন্‌লে যে, সেও একটা পুরস্কার পাবে। শিক্ষকরাও কম বিস্মিত হলেন না। অপূর্ব্বের কোনও কিছুতে এমন বিশেষত্ব নেই, যাতে সে পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হ'তে পারে। লেখাপড়ায় সে মাঝারি; স্বভাব-চরিত্রেও সে মাঝারি; স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত হওয়াতেও সে মাঝারি। শিক্ষকরা কৌতূহলী হয়ে হেড-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, অপূর্ব্ব কিসে পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হলো? তাতে হেড-মাষ্টার দাড়ির বোঝার ভিতর থেকে একটু হেসে বল্‌লেন—"সে কথা যথা-সময়ে জান্‌তে পার্‌বেন।"

সমস্ত স্কুল কৌতূহলে ও বিস্ময়ে অধীর হয়ে পুরস্কারের দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পুরস্কার-বিতরণ-সভায় জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি হয়েছেন; ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী পুরস্কার বিতরণ কর্‌ছেন। সমস্ত ছেলের গুণ-তারতম্যে পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল। সর্ব্বশেষে ডাক পড়্‌ল অপূর্ব্বকে। সভা ঔৎসুক্যে আগ্রহে নিস্তব্ধ!

হেড-মাষ্টার অপূর্ব্বকে লক্ষ্য ক'রে সকলের নিকট ঘোষণা কর্‌লেন—"অপূর্ব্ব কেমন অকুতোভয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল; এই সত্যবাদিতা ও সৎসাহসের দৃষ্টান্ত স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের মনের সম্মুখে আদর্শ হয়ে যেন থাকে!"

অপূর্ব্ব নিজের অপ্রাপ্য সাধুবাদ শুনতে শুন্‌তে লজ্জায়, সঙ্কোচে অধোবদন হয়ে গেল। সে যে মিথ্যা কথা ব'লে হেড-মাষ্টারকে প্রতারিত করেছিল, তার চেয়েও বড় প্রতারণা মনে হ'তে লাগ্‌ল এই পুরস্কার লওয়া! তার মনে হ'তে লাগল, সুশীল প্রভৃতি দুই চার জন ছাত্র যারা প্রকৃত ব্যাপার জানে, তারা হয় ত এতক্ষণ উঠ্‌ল। ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি ও মাষ্টাররা মনে কর্‌লেন, অপূর্ব্ব নিজের সাধুবাদ শ্রবণে আনন্দিত, লজ্জায় অভিভূত হয়েছে!

হেড-মাষ্টারের পরিচয়প্রদান সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের করতালির প্রতিধ্বনি-স্বরূপ সভাস্থ সকলের করতালি-ধ্বনিতে সভা পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল; অপূর্ব্ব দ্বিগুণ লজ্জায় মাথা হেঁট কর্‌লে।

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী একটি লাল-রেশমী-ফিতায় ঝুলান একটি রূপার মেডেল হাতে তুলে হাসিমুখে অপূর্ব্বের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেন; সেই দৃষ্টির অর্থ আহ্বান অনুভব ক'রেও অপূর্ব্ব স্থির হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

হেড-মাষ্টার বল্‌লেন—"অপূর্ব্ব, এগিয়ে যাও ..."

অপূর্ব্ব এবার যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর সম্মুখে টেবলের এ-পারে দাঁড়াল; তিনি সাম্‌নে ঝুঁকে অপূর্ব্বের গলায় পদক দুলিয়ে দিলেন।

হেড-মাষ্টারের অত গুণব্যাখ্যাপূর্ণ বক্তৃতার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে অপূর্ব্বের বল্‌তে সাহস হলো না যে, সে মিথ্যা কথা বলেছিল, হেড-মাষ্টার মশায় প্রতারিত হয়ে আজ মিথ্যা কথা বল্‌লেন, সে অনধিকারে পুরস্কার গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না। সে যেন পদকটিকে চুরি ক'রে নিচ্ছে, এমনই অপরাধিভাবে নিজের আসনে ফিরে এসে বস্‌ল। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, তার বুকের উপর আগুনের টিক্‌লির মত ঐ মেডেল দুল্‌তে দেখে সুশীলরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে, পরস্পর কত কি বলাবলি কর্‌ছে! সে তাড়াতাড়ি সেই পদকটা গলা থেকে খুলে পকেটে লুকিয়ে রেখে দিলে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতাতেও অপূর্ব্বের অপূর্ব্ব সৎসাহস ও সত্যবাদিতার প্রশংসাই প্রধান হয়ে উঠ্‌ল। অপূর্ব্ব লজ্জায় এতটুকু হয়ে পড়্‌ল।

সভাভঙ্গ হলো।

সভাভঙ্গ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্ব স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল, কারও সঙ্গে দেখা হবার পূর্ব্বেই সে পলায়ন ক'রে আপনার মিথ্যা কথার প্রতারণার লজ্জা লুকাতে চায়।

বাইরে বেরিয়ে অল্পদূর অগ্রসর হয়েই দেখলে, উৎফুল্ল-মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুশীল! সুশীলের মুখের প্রফুল্লতা দেখেই অপূর্ব্ব বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, তার মধ্যে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ নেই, অনাবিল আনন্দ দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। তথাপি সে অপ্রতিভভাবে হেসে বল্‌লে—"মিথ্যা কথা ব'লে খুব বাহবাও পেয়ে গেলাম, আর একটা মেডেল পেয়ে গেলাম!"

সুশীল অপূর্ব্বের কাছে গিয়ে দুই হাতে তার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে—"মিথ্যা কথার জন্যে পুরস্কার নয়, পরোপকারের জন্যে! এ কথা তুমি ত আমাকে বল নি!"

অপূর্ব্বের মনের গ্লানি অনেকখানি লাঘব হয়ে গেল, সে এবার অনেকটা সহজ প্রফুল্ল-মুখে বল্‌লে—"মিথ্যা কথা ব'লে হেড-মাষ্টার মশায়কে প্রতারণা করেছিলাম, সে কথা কি বড়াই ক'রে বল্‌বার! এ আমার চিরকালের লজ্জার কারণ হয়ে রইল!"

সুশীলের মনে হলো—সত্যই ত! এই লজ্জা ত একা অপূর্ব্বের নয়, তারও! তারই সাহস ক'রে নিজের অপরাধ স্বীকার করা উচিত ছিল! তা হ'লে সেই হয় ত এই পুরস্কার পেত! অপূর্ব্ব যে এই পুরস্কার পেলে, সে তবে কিসের পুরস্কার?

অপূর্ব্ব সুশীলকে চিন্তাকুল দেখে ও বহু ছাত্রের সমাগম দেখে মৃদু হেসে সেখান থেকে প্রস্থান করলে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলন

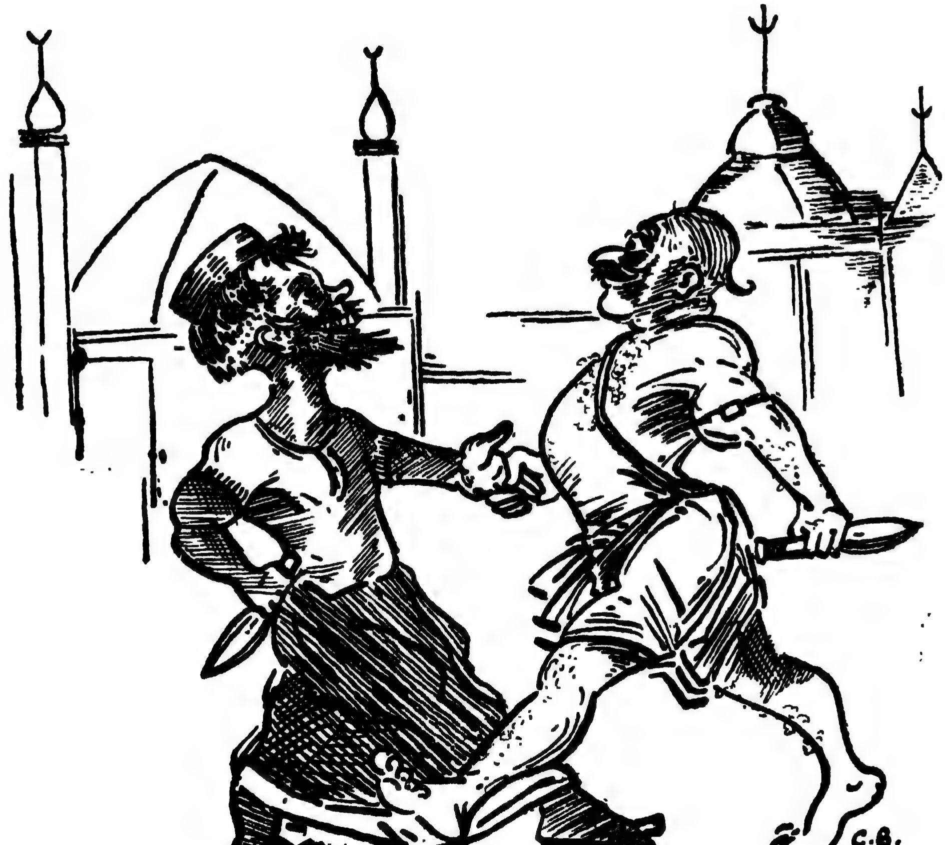

হিমাদ্রি

প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসঘন শিলাব্রহ্মরূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন নগনাগে, যোগাসীন জয় নগভূপ।
শশি-সূর্য্য-করস্নাত ভালে তব হরহাস্যসংহত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে কৃতাঞ্জলি কুবেরের ঐশ্বর্য্য সম্পুট।
অভ্রময় তনুত্রাণ অংস হ'তে লম্বমান ধরার ধূলায়,
কাঞ্চনজঙ্ঘায় ঘেরি ঝঞ্ঝা শিশুসম তারে খেলায় দুলায়।
জ্ঞানদীপ্ত আত্মতৃপ্ত তব চিত্ত-নয়নের ধ্যানকেন্দ্র হ'তে
কর্ম্মজ্ঞানভক্তিধারা নেমে আসে ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু গঙ্গাস্রোতে।
তোমার 'মানস-পদ্মে' মহাসরস্বতী রাজে 'কোটি-স্বরা' করে,
তোমার বাঙ্ময় সত্তা সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত তায় বিশ্বচরাচরে।

পঞ্চপ্রাণধারা তব পঞ্চনদে বিগলিয়া নামি, তপোবলে
ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্কুর মর্ত্তে জাগাইল ব্রহ্মাবর্ত্ত-মৃত্তিকার তলে।
দেশান্তর হ'তে সেথা ভূ-যজ্ঞে ঋত্বিকগণে করেছ আহ্বান,
অন্ন সোম হবি দুগ্ধ মধুময় মধুপর্ক করিয়া প্রদান।
তোমার দেবতাগণে তাহারা তুষেছে নিত্য উকৃথ,সূক্ত, সামে,
হোমধূম সঞ্চারিয়া মণ্ডিয়াছে তোমা তারা তড়িদভ্রদামে।

মহাসিন্ধু সনে রচি নব নব মেঘমালা মৈত্রীর বন্ধন,
বাৎসল্যের উৎসধারা মধুস্রবা দিগ্বিদিকে করিয়া প্রেরণ,
রচিয়াছ ক্ষেত্রোদ্যান, বনকুঞ্জ, পণ্যবীথি, পুরজনপদ
দীক্ষাশ্রম, শিক্ষাকেন্দ্র, তপোবন, তীর্থ, পীঠ, জ্ঞানপরিষদ,
গড়িয়াছ রাষ্ট্র রাজ্য রাজধানী দুর্গ মঠ জনোপনিবেশ,
করিয়াছ আর্য্যাবর্ত্তে দ্বিতীয় দ্যুলোক মর্ত্ত্যে পুণ্যঘন দেশ।
শাসনে ইঙ্গিতে তব উৎসঙ্গের ছায় শুভ সভ্যতাবিস্তার,
মিলায়েছ সর্ব্বজীব রচেছ আদর্শ শিবসমাজ-সংসার।
বরুণের আশীর্ব্বাদ দেবেন্দ্রের পরসাদ রয়েছ আগলি,
ব্যোমযাত্রা বোধ করি, তাই মুঠি-মুঠি ধরি ছড়াও কেবলি।
ভূষিয়া আদিত্যদেবে দাহদৈত্যে করি জয় কর' শৈত্যদান,
শরণ্য, চরণে তব দেবরোষবহ্নি হ'তে লভে দেশ ত্রাণ।

হে বিশ্ব-পুষ্পের বৃন্ত, মধুমান সর্ব্বসৃষ্টিরজোময় কায়
সর্ব্বলোক সর্ব্বভূত কেশরদলের মত গুম্ফিত তোমায়।
অপ্সর কিন্নর যক্ষ গুহ্যক অমর রক্ষঃ সিদ্ধ বিদ্যাধর,
ঋভুনাগ পিতৃগণ সকলেরি লীলাঙ্গন ও শিলা চত্বর।
আতিথ্য উৎসবে তব বিশ্ব মিলে নানা ছলে তুঙ্গ শৃঙ্গকূটে,
বিষাণে বিষাণে তব সেই মহাসঙ্গমের ঐক্যতান উঠে।
সহস্রকরের স্পর্শে রজতবীণায় তব, মিলনের তান
সহস্রধারার ছন্দে প্রপাতে কল্লোলানন্দে চিরস্পন্দমান।
গন্ধর্ব্বী নেমেছে হেথা সঙ্গীতধারায় পথে কন্দর্প-নিদেশে,
নাগাঙ্গনা সঙ্গ পেতে বিদ্যাধর মাল্য গেঁথে নামে বরবেশে।
যক্ষদের পানোৎসবে কিন্নর-মিথুন নাচে মায়ারূপ ধরি;
অপ্সরী ঋষির সাথে মিলেছে পূর্ণিমা রাতে তপোভঙ্গ করি'।

মানবের উগ্রতপে ইষ্টদেব ব্যগ্র হয়ে নামে তপোবনে,
ধরিতে কঙ্কালময় তনুশেষ বরাভয়-বাহুর বন্ধনে।
যজ্ঞে আমন্ত্রিত সোম শুনে সোমসিক্তকণ্ঠে পুণ্যসামগান.
সুধায় ভরিয়া পাত্র ফিরে দেয় ইন্দ্রমিত্র করি আজ্যপান।
কলধৌত শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভাস্বর সোপানশ্রেণী উঠে ব্রহ্মধামে,
স্বর্গ ত্যজি খরস্রোতে মন্দাকিনী সেই পথে গঙ্গা হয়ে নামে।
তোমার হিমাঙ্গতটে প্রথম ভূসঙ্গ লভে দেবেন্দ্রের রথ,
তব প্রস্থ-সানু দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে মহাপ্রস্থানের পথ।
গৌরী হরে, শ্রেয়ে প্রেয়ে, পুরহর্ম্ম্যে, তপোবন-
সংসার-শ্মশানে,
যোগে ভোগে, শুভে ধ্রুবে, অপূর্ব্ব সংহতি ভবে
তোমারি বিধানে।
হে বিরাট তপোধন, যুগে যুগে যোগিগণ তব অঙ্ক'পরে
সঞ্চি তপঃ কঠোরতা দিয়াছে লাবণ্য রূঢ় তব কলেবরে।
হিঙ্গুল বেদীর পরে কুশাসনে কুশেশয় ফুটায়েছ তারা
তপস্তেজে শিলা তব হয়েছে তরল দ্রব লীলাময়ী ধারা।
যোগস্থের জটাজালে পাখীরা বেঁধেছে বাসা, তবু যোগাসীন,
হয়নিক ধ্যানভঙ্গ প্লক্ষমূলে অর্দ্ধ-অঙ্গ যদিও বিলীন।
বল্মীকের আক্রমণে সমাহিত দেহে মনে—নৈবেদ্যের মত,
নাহি দেহে মাংসলেশ শুধুই কঙ্কালশেষ তবু ধ্যানরত।
ত্রিযুগের হোমক্ষেত্র কোটি কোটি অগ্নিহোত্র জ্বলে
তোমা ঘেরি।
হোমভস্ম স্তূপে স্তূপে রুদ্রাক্ষ মালিকারূপে শোভে কণ্ঠ বেড়ি'
শ্রেণীবদ্ধ হোমধেনু মণ্ডিয়া তোমার তনু রচে উপবীত,
ঋষিজটারশ্মিজাল ঘন হোম-ধূমস্তোমে যোগায় তড়িৎ।

তব অন্ধ দরী গুহা চিরদিন ব্রহ্মচিন্তামাণিকের খনি,
কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মরুৎ বন্দনা ছন্দে উঠে রণরণি।
ঋষিজায়াবিরচিতা ইঙ্গুদীর দীপান্বিতা আজো জ্বলে কিবা,
ওষধির দেহে দেহে বিতরিছে বিনা স্নেহে তাপশূন্য বিভা।
ললাট-নয়নে তব জ্বলিতেছে চিরদিন অতীন্দ্রিয় দ্যুতি,
নখরমুকুরে তব বিম্বিত নিখিল ছন্দ, মন্ত্র, তন্ত্র, শ্রুতি।

ধরার উদ্ধার তরে বরাহদশনক্ষত নিলে বক্ষ'পরি
ভার্গব-পরশুঘাত রেণুকা-হ্রদের ছলে আছ অঙ্কে ধরি'।
নিবেদিত কুশপিণ্ড, কুশাবর্ত্ত ঘাট হ'তে গঙ্গোত্তরী-কূটে,
হে পিতা তুমিই বহ পিতৃলোকে অহরহ অই পাণিপুটে।
শৃঙ্গচূড়া-হলধর, অনন্তদেবের তুমি বলভদ্ররূপ,
শুভ্রতনু, নীলাম্বর, বারুণী-অরুণান্বিত গিরিগোপভূপ।

তুমি মহাসিদ্ধিক্ষেত্র মুমুক্ষুরা তব অঙ্কে তপোমগ্ন থাকি,
আত্মসাধনার ফল অমৃতের পুত্রগণে বিলালেন ডাকি।
আরণ্য-মণ্ডলে তব প্রথম জাগিল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাণী,
অধ্যাত্ম-জীবনে ধন্য ভারত আশ্রমে তব পরাতত্ত্ব জানি'।
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আজো সে তত্ত্ব মোদের যাত্রা করে নিয়ন্ত্রিত,
ব্রহ্মবিদ্যা আরণ্যকে মূলভাষ্যে সূত্রে সূত্রে রয়েছে গ্রথিত।

অগস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, বৈখানস,
উদ্ধব নারদ সৌতি সবারি সাধনা-ভিত্তি তোমার উরস,
যেথায় বসিয়া ব্যাস রচিলেন ভাগবত নিখিল পুরাণ,
পালিলেন ঋষিসংঘ কুলপতিগণ যেথা করি অবস্থান।
নর নারায়ণ শুক উগ্র তপস্যায় তব বদরিকাশ্রমে,
রোপিলেন কল্পতরু, যুগে যুগে চতুর্ব্বর্গফলভরে নমে।
তোমারি প্রাঙ্গণে জ্বলে হরগৌরী-বিবাহের যজ্ঞের দহন,
তিন যুগ হ'তে হোতা সমিদ্ধ রেখেছে তারে—সাক্ষী নারায়ণ।

প্রতি পুণ্যচিন্তা তব সান্দ্রতায় শালগ্রামশিলারূপ ধরে,
কোটি রোমাঙ্কুরে অঙ্গে কোটি কোটি শিবলিঙ্গে
পুলক শিহরে।
তব রোমকূপে কূপে শীত তপ্ত কুণ্ডরূপে স্বেদবারি ঝরে,
প্রেতলোক তর্পকের সে বারি অঞ্জলি হ'তে পিয়ে তৃষ্ণা হরে।
গুপ্ত রাখিয়াছ তুমি কত মুক্ত যুক্তবেণী কত মায়া-কাশী,
তব পঞ্চ প্রয়াগের পঞ্চমুণ্ডী আসনের তলে, হে সন্ন্যাসি!

তব ইন্দ্রকিলোপরি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে করি তপস্যা দুশ্চর,
ব্যাসদত্ত মহামন্ত্র-প্রভাবে লভিল পার্থ পাশুপত বর।
মরুত্ত যজ্ঞের ছলে নিখিল ভূদেবগণে করি সম্মেলন
পুণ্যতীর্থ ক'রে নিলে কিরাত-সেবিত তব দেবদারু-বন।
ভগীরথ তপ চরি বিষ্ণুপদ স্বিন্ন করি ত্রিধারা-বন্ধনে,
বাঁধিলেন হরিহরে, স্বর্গ-মর্ত্তে সুর-নরে তোমারি প্রাঙ্গণে।
তব পাদমূলে দক্ষ ব্রাহ্মণ্যশাসনতন্ত্র করিল বন্ধন,
তব পাদমূলে 'মোক্ষ' বুদ্ধরূপ ধরি তারে করিল মোচন।

বেদান্তের দিগ্বিজয় ভারতের চতুর্ধামে আজিও প্রকট,
বৌদ্ধে জিনি ব্রহ্মবাদ-প্রতিষ্ঠার জয়স্তম্ভ তব যোশীমঠ।
শ্মশানবাসীর করে কন্যা সঁপি রাজবেশ শোভা নাহি পায়,
তাই ঈশানের সাজ পরেছ কি গিরিরাজ স্নেহের ব্যথায়?
তোমার শোভন অঙ্গ বিভূতি-ধূসর পিঙ্গ করেছে কুজ্ঝটি,
চপলাকপিশ রুক্ষ জলদের জটাকূর্চ্চ করেছে ধূর্জ্জটী।

শিরে তব সুরতটী, কণ্ঠে বক্ষে কোটি কোটি ভুজঙ্গের ভার,
করিয়াছে চন্দ্রচূড় চন্দ্রকরোজ্জ্বল চিরপুঞ্জিত তুষার।
আমেখল বনশোভা পরায়েছে আধ অঙ্গে শ্যাম গজাজিন,
প্রপাতে ডম্বরু বাজে, ধবল গিরিটি রাজে বৃষভ প্রাচীন।
উপলসঙ্কুল শীর্ণ নির্ঝর কঙ্কালে শোভে মহাশঙ্খমালা,
স্থাণু তুমি ব্যোমকেশ শৃঙ্গধর নেত্রে তব দাবানল-জ্বালা।
পাষাণ-বিগ্রহে লিঙ্গে 'কেদার' 'অমরনাথ' 'পশুপতিনাথে',
গিরীশ, গিরিশে তাই তোমাতেই পূজি মোরা
ভক্তি-প্রণিপাতে।

ত্যজিয়াছ রাজসজ্জা তাই ব'লে রাজলক্ষ্মী রাজেন্দ্র-বৈভব,
তোমারে ত্যজেনি, আরো বিসর্পিত দিগ্‌দিগন্তে
মহিমা-গৌরব।
কৃত্তিপট ঘেরি আজো নেপাল খোটান চীন ভুটান কাম্বোজ,
বক্ষোমধু-রজোদলে তোমার তাণ্ডবতলে ফুটায় অম্ভোজ।
ব্রহ্ম সঁপে গজভেট, ফলপুষ্পে অর্ঘ্য রচে বিদেহ গান্ধার,
কাশ্মীর, কুঙ্কুম, কুশ, বঙ্গ বহে তব যাগে শস্য দুগ্ধভার।
তোমার বন্দনা গায় মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, নীলাদ্রি, মন্দর,
নিখিল ভূধর নমে কৃতাঞ্জলি তব নামে বিনতকন্ধর।
উত্তর-বায়ুর দৌত্য চলে নিত্য, লভে ধ্বান্ত তেমনি শরণ,
সর্ব্বশৈলকরশুল্ক হবি', মেঘে মেঘে সিন্ধু করিছে প্রেরণ।

চমরী ব্যজন করে, কন্দরে কন্দরে জ্বলে মৃগমদধূপ,
তেমনি নিদেশবাণী ভূর্জ্জত্বক্‌পত্রী বহে ওগো গোত্রভূপ।
কিন্নরী তেমনি গাহে, কেশরী প্রহরী আজো স্ফীত
করি শটা,
অধিত্যকা হ'তে গিরি-সঙ্কটে তেমনি চলে দানযজ্ঞঘটা।
চিন্তামণিরত্নাকর, তরঙ্গিত নিরন্তর রহস্য-অর্ণব,
ধাতার ইঙ্গিতে কবে সহসা স্তম্ভিত হলো
তোমার তাণ্ডব ?
তরঙ্গ, নীলিমা আর বিশালতা আজো তার পায়নি বিলয়,
তিমিঙ্গিল নক্রকুল, মাতঙ্গ মৃগেন্দ্ররূপে ভ্রমে দেহময়।
স্তম্ভিত তরঙ্গ তব রুদ্ধবেগ, পঞ্জরের কুহরে কুহরে
শত শত নদী-নদে গতি লভে হ্রদে হ্রদে সহস্র নির্ঝরে।
ভৈরব সঙ্গীত তব গুঞ্জনে কোটিধা হলো উপল-ব্যথায়,
মহাকাব্য মন্ত্র তব ভাঙিয়া ঝঙ্কৃত লক্ষ গীতি-কবিতায়।

নিসর্গের সব তথ্য সৃষ্টির গোপন সত্য জেনেছে নিঃশেষে,
বলি গর্ব্ব করে নর, খর্ব্ব তার আড়ম্বর তব পাদদেশে।
কত যে রহস্যলীলা অচিন্ত্য বিস্ময়, শিলাগর্ভে স্পন্দমান,
বিজ্ঞানের শত সৃষ্টি প্রজ্ঞানের ধ্যানদৃষ্টি পায়নি সন্ধান।
কত ধাতু ক্ষারদ্রব জীব-জন্তু কত নব উদ্ভিজ্জ জীবন
নৃ-চক্ষুর অন্তরালে লভিতেছে তব কক্ষে ক্রমবিবর্ত্তন,
তোমার পরীক্ষাকুণ্ডে গুম্ফাগারে কত সৃষ্টি হতেছে কল্পিত,
গুপ্ত কত রসায়ন কত মৃতসঞ্জীবন নর-স্বপ্নাতীত।
লুপ্ত কত অতিকায় দানব-জীবের শিলা-কঙ্কাল-কহরে,
অনাগত ভবিষ্যের ভ্রূণ-ডিম্ব প্রাণবীজ অসংখ্য সঞ্চরে।
গহ্বরেই গুহাহিত করিয়া রেখেছ শত রহস্যকুঞ্চিকা,
চিরতুহিনের তলে 'এধাপেক্ষ' শিলাসুপ্ত কোটি প্রাণশিখা।

তমিস্রাবিদ্যুৎ মেঘে ছায়ালোকসন্নিপাতে নবরঙ্গভূমি
শিলাজতু-বেদিকায় হরিতাল-মঞ্চে রচি' রাখিয়াছ তুমি।
নাহিয়া অলকানন্দা অলকার নটনটী নামে সে নিলয়ে
ভোগবতী হ'তে উঠে নাগকুল তথা জুটে নাট্য-অভিনয়ে।
মানবে গৌরব দিলে রসজ্ঞের রূপে তারে করি আমন্ত্রণ
ভূলোকের বহু উর্দ্ধে মেঘের উপরে তারে দিয়াছ আসন।
যবনিকা সরাইয়া দৃষ্টি হানে তবু নর নেপথ্যের পানে,
কমলে সে তুষ্ট নয়, মৃণাল-মূলের সূত্র চিত্ত তার টানে।
কিন্নরের কণ্ঠসনে কণ্ঠ মিলাইতে নরে করেছ আহ্বান
ব্রহ্মবিদ্যা-তপোবনে দর্ভাসন দিয়ে তারে করেছ সম্মান।
দিলে তারে স্বর্গাভাস মর্ত্ত্যলোকে, মোক্ষপথে ধরেছ তুলিয়া,
স্বপ্নপুরী কল্পলোক পানে তার দিব্য চোখ দিয়াছ খুলিয়া।
তবু সে ত তুষ্ট নহে, খুলিয়া দেখিতে চাহে পাণিপুটখানি,
বজ্রমুষ্টিতলে গূঢ় তাও লভিবারে মূঢ় করে টানাটানি।
তব গুপ্ত মন্ত্রশালা যেথা নিত্য নিয়ন্ত্রিত জীবের নিয়তি,
তব যাদুযন্ত্রশালা লভে নব সৃষ্টি যেথা জীবনের গতি,
তব শিলাগর্ভগৃহ মহানদীদের যেথা সূতিকা-আগার
সেখানে দাওনি তুমি মূঢ় নর-কৌতূহলে প্রবেশাধিকার।
যেই স্তনে সুধাধারা পান করি বাঁচে তারা তাই চিরে চিরে,
দেখিবারে যায় ছুটে কেমনে তা' ভ'রে উঠে সুধাসম ক্ষীরে।
ভবিষ্যের ইন্দ্র, মনু শুভ্র শিলালীনতনু যে তুঙ্গ শিখরে
আছে চারি যুগ ধরি মগ্ন, উগ্র তপ চরি কাম্য পদতরে।
নন্দী যেই মহাক্ষেত্রে শাসে নিত্য হেমবেত্রে সতর্ক প্রহরী,
অধরে তর্জ্জনী রাখি স্তব্ধ করি চরাচর পন্থারোধ করি,
ভারতের বর্ষকোষ্ঠী যুগান্তজাতকপত্র কালের মসীতে,
নিভৃতে রচিত যেথা, তথায় উদ্ধত নেত্রে দাওনি পশিতে।

এসেছে যুনানী শক মোগল পাঠান হুন কুশান তাতার,
পশ্চিম সুড়ঙ্গ-পথে নানাছদ্মে যুগে যুগে, করে তরবার,
পূর্ব্ব ইরাবতী হ'তে পশ্চিমের ইরাবতী গণ্ডী বিরচিয়া
নৃ-মুণ্ডে কন্দুক-কেলি করিল সকলে মেলি তাণ্ডব নাচিয়া।
শতখণ্ডে ভেঙে তারা নিল ভারতের হৈম সিংহাসনখানি,
লুণ্ঠন-বণ্টনে শেষে করিল আপন কণ্ঠে খড়্গ হানাহানি।

উত্তাল শোণিতসিন্ধু তব পাদমূল হ'তে সতত ব্যাহত,
অরুণ অম্বুজসম জম্বুদ্বীপ তব পদে চির-মূর্চ্ছাগত।
ঘন-ঘোর রণঝঞ্ঝা তোমার বিরাট জঙ্ঘা পারেনি লঙ্ঘিতে,
তব শিলাপট্টপটে কোন অসি জয়লিপি পারেনি অঙ্কিতে।
তব শুভ্র উত্তরীয় লাঞ্ছিত করেনি কভু শোণিতের দাগ,
তব মনঃশিলাপুরে কোন দিন অশ্বক্ষুরে উড়েনিক ফাগ।
বিবিক্ত প্রাঙ্গণ তব হয়নিক আজো ভ্রাতৃ-হত্যার মশান,
গৃধ্র ফেরু সারমেয় বায়সকুলের হেয় উৎসব-শ্মশান।
পাহাড়ী দেউল তব বিরচিত কোটি কালাপাহাড়ের হাড়ে,
খড়্গপাণি দৈত্য হেথা অর্ঘ্যপাণি মহাকাল মন্দিরের দ্বারে।

তব পাদমূলে এসে জৃম্ভকে স্তম্ভিত যত চমূ, অশ্ব, রথ,
অজ্ঞাতদ:সত্বপঙ্ক চিরদিনই তব অঙ্ক ‘স্বাধীন ভারত।’
বৈদূর্য্যশলাকাময়ী তোমার বিদূর-ভূমি আজিও নিষ্কর,
তোমার মানসহ্রদে অবাধ আনন্দে আজো প্রবুদ্ধ পুষ্কর।

মন্থনকীলক তুমি, চারি পাশে বিশ্বভূমি আবর্ত্তে চঞ্চল,
আদিযুগ হ’তে শুধু তোমার স্থাণুতা ধ্রুব অনঘ নির্ম্মল।
বিশ্বভরা দস্যুদলে, দস্যু ঘূরে জলে স্থলে লুণ্ঠনের আশে,
সর্ব্বথা শক্তিতে হরে কাতর ভিখারী দীন শুধু তব পাশে।
কেহ ধরা-কুক্ষি চিরে ভূপঞ্জর টেনে ছিঁড়ে, গলায় পাথর,
কেউ রত্নাকরে ড়োবে কেউ স্বর্ণরেণুলোভে খুঁড়ে বালুস্তর,
তোমার গুহার মাঝে কোন্ রত্নখনি রাজে, পায়নি সন্ধান,
কিংবা তথা পশিবারে নরের কৌশল হারে, অশক্ত বিজ্ঞান।

ধরার জনমদিনে যে লাজবর্ষণ হলো, বজ্রমণিরূপে
সেই লাজ রাশি রাশি গুহার তমিস্রা নাশি জ্বলে কূপে কূপে।
শুভ্রদন্তে বিম্বাধরে হেসেছিল শিশু-ধরা তরঙ্গ-দোলায়,
প্রবাল মুক্তার রূপে সে হাসি পুঞ্জিত আজো তব মেখলায়।
যে পরশমণিহার সঁপি রবি দুহিতার হেরিল বদন,
তা’ আজি তোমার ঘরে পাষাণের স্তরে স্তরে বাড়ায় হিরণ।
ফণায় বহিয়া মণি, গুহাগৃহে কোটি ফণী দীপালী জ্বালায়,
তায়, ঘন আঁধিয়ারে নাগবালা অভিসারে পথ খুঁজে পায়।
করিকুম্ভ বিদারিয়া কেশরী ছড়ায়ে যায় গজমুক্তা-ফলে,
তব ভৃগুভূমি ভরি হেলায় রয়েছে পড়ি তুষারমণ্ডলে।

লোভ-লালসার ঠাঁই তোমার সংসারে নাই, তুষ্টি শুভঙ্করী,
শাসিকা ও মুক্তিদেশে, ভুক্তি কভু নাহি পশে তৃষ্ণাসহচরী।
তুমি যে জড়ের প্রভু, তাই জড়বাদ কভু তোমার সভায়
সাদরে পায়নি পদ, দীপ্ত তব পরিষদ অধ্যাত্ম-প্রভায়।
হোথা সদা স্নিগ্ধ পুণ্য অনুকূল রজঃশূন্য সমীরণ বয়,
নাহি পূতি বাষ্প স্বেদ নাহি পাপমল-ক্লেদ, সবি সত্ত্বময়।
স্বস্তি স্বাস্থ্য সনাতন, নাহি হোথা দেহমনোরোগের বীজাণু,
মর্ত্ত উঠে স্বর্গ নেমে রচিয়াছে মাঝে থেমে তব পুণ্য সানু।

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরল চিত, কোন্ ভাবাবেগে?
সেই আদিকাল হ’তে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেঘে মেঘে।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর স্রোতে সদুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর আচার্য্যের মত।
যুগ যুগ হ’তে চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা, প্রশ্ন না ফুরায়,
সিন্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে ধ্রুব সত্য তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ, সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল।

ভারতই তোমার উমা শ্মশানবাসিনী দীনা চির ক্লেশব্রতা,
তবু সে ত হরবধূ, চাহিয়া শূলীর পানে ভুলেছ সে ব্যথা।
কিন্তু ‘আর্য্য যোগীদের অধ্যাত্মসাধন ধন’, মৈনাক তোমার,
বিজ্ঞানের বজ্র-ভয়ে রচিয়াছে সিন্ধুতলে শয্যা আপনার।
পাসরিতে এই ব্যথা পেরেছ বৎসল পিতা? ভুলিবার নহে!
এ ব্যথা তোমার মর্ম্মে মুর্ম্মুর-দহনসম ধিকি ধিকি দহে।
বর্ষণের পূর্ব্বে যেন বজ্রগর্ভ চৈত্রঘন তব মৌনরূপ,
শিশু প্রলয়েরে যেন ধরিয়া রাখিতে নারে তব চিত্তকূপ।
অজ্ঞাতরহস্যময় বিপ্লবের পূর্ব্বসূচি ও মূক স্তব্ধতা,
বাহ্যসংযমের আর অন্তরের ঝটিকার কহে গূঢ় কথা।

মদন-ভস্মের পূর্ব্বে শঙ্করের চিত্তে যেন রুদ্র মৌন জাগে,
গরুড়ের শেষতন্দ্রা যেন অণ্ডচ্ছদ দীর্ণ করিবার আগে।
তোমা অতিক্রমি ঐ অভ্রভেদী জড়বাদ উঠে তুঙ্গ হয়ে,
যোগযুক্তি পদে দলি ভোগভুক্তি বিশ্বজয়ী, আছ তুমি স’য়ে?
মৈনাক-লাঞ্ছনা-ব্যথা মহাপ্রলয়ের রূপ করিয়া ধারণ,
একদা উঠিবে জেগে, করি ভীম রুদ্রবেগে বক্ষোবিদারণ।
তব ধৈর্য্যবন্ধ টুটি পাষাণ-পঞ্জর কোটি চূর্ণ দীর্ণ করি,
সুপ্ত মহাকাল ছুটে বাহিরে আসিবে, করে গৌরীশৃঙ্গ ধরি’,
অনিত্যের ঘটাছটা, সমারোহ, অধ্রুবের ব্যর্থ আয়োজন,
সবি হবে ধ্বংসশেষ তুমি বুঝি জপিতেছ সেই শুভক্ষণ?
ঐহিক ভোগের এই প্রেতনৃত্য, দেহপূজা, ইন্দ্রিয়বিনোদ,
সর্ব্ব ধ্বংস করি নিবে মৈনাকের লাঞ্ছনার পূর্ণ প্রতিশোধ।

শ্রীকালিদাস রায়।

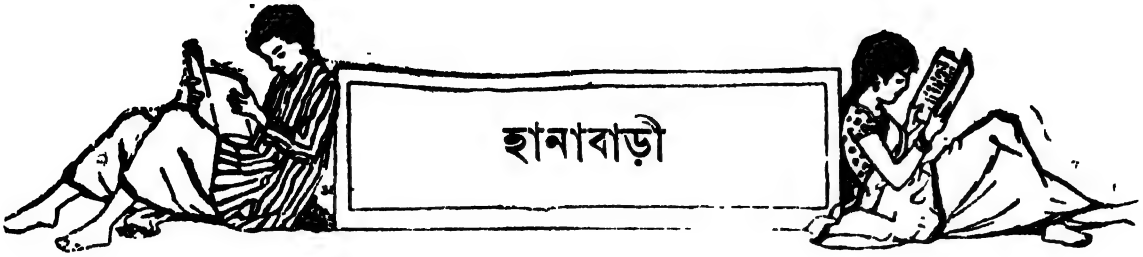

হানাবাড়ী

২৭

এই সকল আলোচনার ফলে কাকলীর মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না যে, তাহার পিতাকে তাহার বিমাতা নিজেই হত্যা করিয়াছে। অপর কয় জনেরও প্রায় ঐরূপই বিশ্বাস হইল।

তখন পিসীমা বলিলেন, "উঃ! কি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ যা হোক! এখান থেকে ভোজালীখানা হাতিয়ে নিয়ে কলকাতায় গেল; সেখানে মল্লিক লেনের বাড়ীর মেথর-খাটা পথে ঢুকে মই-সিঁড়ি দিয়ে পাইখানার ছাদে উঠলো; আবার সেখান থেকে হানাবাড়ীর উঠানের কোণের ঘরের ছাদে উঠে, তার আলো-পথের শার্শীর ভিতর দিয়ে গাছ-সিন্দুকের মাথা থেকে গা-বেয়ে নীচে নাম্‌লো; তার পর শোবার ঘরে ঢুকে, নিজের স্বামীকে খুন ক'রে, আবার সটান ঐ রকম পথ দিয়ে ফিরে এলো! একটু ভয়ও হ'লো না?—ধন্যি পাহাড়ে মাগী যা হোক! আবার এখন কি না সেই খুনের রক্ত-মাখা হাতে সেই স্বামীরই এক-কাঁড়ি টাকা নিয়ে দিব্যি ব'সে ব'সে খাচ্ছে আর আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে!—ও কি মানুষ, না রাক্ষুসী? অরুণ, তুমি বাবা, আর ইতস্ততঃ না ক'রে ওকে এইবারে পুলিসে ধরিয়ে দাও।"

আমি বলিলাম, "ধরিয়ে না হয় দিলুম; কিন্তু দোষী ব'লে প্রমাণ করতে ত হবে?"

"হ্যাঁঃ! তোমার ঐ এক কথা, সকলতাতেই প্রমাণ আর প্রমাণ! এ ত আর আমার ভূতের গল্প নয়, বাপু! এ সব ত সত্য ঘটনার কথা। এর আর প্রমাণের মুস্কিল কি?"

কাকলীও বেশ একটু বিরক্তিভরে বলিল, "আমরা এই যে প্রমাণগুলা পেয়েছি,—ওগুলা তা হ'লে আপনার মতে কোন কাযেরই নয়?"

"আমি তাও বলছি না। কিন্তু, আমার কথায় রাগ করলে চলবে না। তোমার বিমাতাকে আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে তাঁর বিরুদ্ধের প্রমাণগুলার কোথাও কোন দোষ আছে কি না, আগে তাই দেখা উচিত। সেই জন্য এখন আমি তাঁর স্বপক্ষের উকীলের মত ঐ প্রমাণগুলা তাঁর বিরুদ্ধে খাটে কি না, কিংবা সেগুলা কাটাবার কি উপায় আছে, তাই দেখতে চাই।"

তখন কাকলী একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, বেশ কথা। আপনি যেন ওঁর পক্ষের উকীল, আর আমরা সব যেন ওঁর বিপক্ষের সাক্ষী। এখন,—আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তা হ'লে গোড়া থেকেই ধরা যাক। আমি প্রথমেই জান্‌তে চাই যে, ভোজালীখানা এখান থেকে কোন্ ব্যক্তি কবে সরিয়েছে?"

কাকলী বলিল, "কেন? ও-ই সরিয়েছে, নিশ্চয়!"

"কেউ দেখেছে সরাতে?"

"তা জানি না। দেখে থাক্‌লেও সে রকম সাক্ষী পাওয়া ত এখন সম্ভব নয়। কেন না, বিমাতা এখানে প্রথম আসবার পর থেকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের পুরানো ঝি-চাকরগুলাকে তাড়িয়ে তাদের যায়গায় নূতন লোক বাহাল করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি এখান থেকে যাবার পরে বাকী যা ছিল, প্রায় সবই তাড়িয়েছিলেন। কেবল আমাদের পুরানো বুড়া মালীকে কেন অনুগ্রহ ক'রে তাড়ান-নি, জানি না। সাবেক সমস্ত লোকের মধ্যে কেবল একা ঐ মালীটিই এখনও আছে। নূতন যে সব লোক রেখেছিলেন, উইল প্রোবেট নেবার পর তাদেরও সব ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।"

"বুড়া মালী ভোজালী সম্বন্ধে কিছু জানে কি?"

"আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলে যে, রোজ সকালে বাবার পড়বার ঘরের টেবলের উপর ফুলের একটি বড় তোড়া, আর ঐ টেবলের সুমুখের দেয়ালের গায়ে আমার মায়ের যে একখানা বড় ছবি আছে,—

(যার নীচেই ঐ ভোজালীখানা ঝুলানো থাক্‌তো)—সেখানেও একটি ছোট তোড়া সাজিয়ে রাখা মালীর দৈনিক কাযের মধ্যে প্রধান কায ছিল। বাবা এখান থেকে চ'লে যাওয়ার পরে সেন সাহেব ঐ ঘরটা না কি ব্যবহার করতেন। আবার কান্‌ সাহেব এখানে থাক্‌লে সেও ব্যবহার করতো। তখনও মালী ঐ রকম তোড়া দিত; কিন্তু 'সাহেব'রা হুকুম না করলে দিত না। সে বলে যে, গত শীতকালে, সরস্বতী-পূজার ৫।৬ দিন আগে পর্য্যন্ত সে ঐ ভোজালীখানা যথাস্থানে দেখেছিল। তার পরে আর তোড়া দেবার হুকুম হয় নি ব'লে সে আর ও-ঘরে কখনও যায় নি।"

"এ থেকে তা হ'লে কি প্রমাণ হচ্ছে?"

"আপনি ত বলেছিলেন যে, সরস্বতী-পূজার আগের রাত্রে খুনটা হয়েছিল? তা হ'লে, তার ৫।৬ দিন আগেও যখন ভোজালীখানা এখানে ছিল, তখন প্রথম এই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাবা সেখানা নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান নি।"

বিহারী ঘোষ গৃহত্যাগের সময় ভোজালীখানা নিজেই সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকিতে পারেন,—এরূপ সিদ্ধান্তও যে হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই। অথচ এই সামান্য ষোল বৎসরের বালিকার মনে তাহা উদয় হইয়াছে, তাহার বিচারবুদ্ধির এইরূপ প্রখরতার পরিচয় পাইয়া আমার বড় তৃপ্তি বোধ হইল। আমি অকপট প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বাঃ! সকল সম্ভাবনার দিকেই লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ের বিচার করেছ দেখছি! বাঃ! বেশ, বেশ! এই রকমই ত চাই!"

কিন্তু আমার কথায় সে উৎসাহিত হওয়া দূরে থাক, বরং লজ্জায় নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে অবনতমুখে বসিয়া রহিল। তখন হঠাৎ যেন আমার চোখ ফুটিল। কাকলী সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা এত দিনে যেন সুস্পষ্টভাবে আমার নিজের নিকটে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তখন আমারও কেমন একটা লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; এবং কি যেন অপরাধ করিয়াছি, এইরূপ একটা সঙ্কোচের ভাব আমাকে অধিকার করিয়া বসিল, এবং তাহার ফলে আমি বড়ই কুণ্ঠিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

২৮

কিন্তু আমার এইরূপ ভাবান্তরের প্রতি অপর কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কেন না, যোগীন বাবু আমাদের আলোচ্য বিষয় উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "ঘোষজা মশায় যে ভোজালীখানা নিয়ে যান নি, তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু তা হ'লেও, কে কোন্‌ সময় সেখানা নিয়েছিল, তা ত সাব্যস্ত হলো না?"

আমার সাবেক প্রশ্নটা এইরূপে পুনরুত্থাপিত হওয়ায় আমার মনের চাঞ্চল্য অপসৃত হইল, আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলাম।

কাকলী বলিল, "কে যে নিয়েছিল, তা ঠিক করা দুর্ঘট। মালীকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি যা জেনেছি, তা ত শুনলেন। এখন আপনারা নিজেও তাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না, যদি আর কিছু জান্‌তে পারেন। তাকে ডাক্‌বো এখানে?"

সকলে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, মালীকে ডাকাইয়া আনা হইল। সে উৎকলবাসী হইলেও বহুদিন বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া বাঙ্গালায় বেশ কথা কহিতে পারে, এবং সাধারণ উড়িয়া অপেক্ষা অনেকটা উন্নত বোধ হইল। ভোজালী সম্বন্ধে কাকলী উহার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, মালী নিজ মুখেও তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু নানারূপ প্রশ্নের উত্তরে তাহার নিকট জানা গেল যে, 'দিদিমণি' (কাকলী) এখান থেকে যাইবার পর হইতে এখানকার সংসারের বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সেন সাহেব এখানে স্থায়িভাবে বাস করিতেন না; অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিতেন। মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া যাইতেন। কান সাহেব প্রায়ই এখানে একক্রমে অনেক দিন করিয়া থাকিত। কর্ত্তাবাবু (ঘোষজা মহাশয়) গৃহত্যাগ করিবার পরে মেম সাহেব (ঘোষ-পত্নী) সময়ে সময়ে কলিকাতায় যাইতেন, কিন্তু বেশী দিন তথায় থাকিতেন না। তিনি বাড়ীর পুরাতন দাস-দাসী সব ছাড়াইয়া নূতন লোক রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দিদিমণির 'গান-মা'কে (সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী সেই ব্রাহ্ম-মহিলা) ছাড়ান নাই। মেমসাহেব তাহার সঙ্গে গান-বাজনা করিতেন। সরস্বতীপূজার

৫।৬ দিন পূর্ব্বে, যখন মালী শেষবার ভোজালীখানা দেওয়ালের গায়ে দেখিয়াছিল, তখন বাড়ীতে মেম-সাহেব এবং সেন ও কান সাহেব সকলেই ছিল। তাহার ২।১ দিন পরেই কান সাহেব এবং তাহার পরে সেন সাহেব কলিকাতায় গিয়াছিল। কান সাহেব সরস্বতী-পূজার পূর্ব্বদিন আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মালী সেই দিন মেম-সাহেবের কাছে ছুটী লইয়া সরস্বতী পূজার দিন দেশে চলিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি মাসখানেক হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশে যাইবার আগে সেন সাহেবকে সে আর এখানে ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই।

এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরস্বতী-পূজার আগের দিন কান সাহেব এখানে কোন্ সময়ে এসেছিল?"

"এই, বেলা আন্দাজ ১২টায়।"

"মেম-সাহেব তখন কোথায় ছিল?"

"বাড়ীতেই ছিল।"

"কান আর মেম-সাহেব দু'জনেই সে দিন এখানেই ছিল? কলকাতায় কি অন্য কোথাও যায় নি? বেশ ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখ দেখি?"

"আজ্ঞে হাঁ, বাবু, আমার বেশ ভালই মনে আছে, তারা দু'জনেই এখানে ছিল। সে দিন আমার দেশ থেকে চিঠি এসেছিল যে, আমার ছেলের ভারী অসুখ, যেমন আছ, তেমনই চ'লে এসো। আমি মেম-সাহেবের কাছে ছুটী চাইতে আস্লাম। তখন বেলা আন্দাজ ৪টা। মেম-সাহেব তখন কান সাহেব আর 'গান-মা'র সাথে বারান্দায় ব'সে চা খাচ্ছিল। ছুটী পেয়ে আমি পেস্কার বাবুর কুঠীতে গিয়েছিলাম; সেথা আমার ভাই কায করে। রাতে তার কাছে থেকে, পরদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে, দেশের আর দু'জনা লোকের সাথে, বেলা ১টা নাগাত এখানে ফিরে এসেছিলাম। তার পরে আমার কাপড়-চোপড় মোটমাট ঠিক-ঠাক করার পর মেম-সাহেব, কান সাহেব আর গান-মা'কে পের্ণাম ক'রে দেশের সেই দু'জনা লোকের সাথে বেলা ২টার গাড়ীতে কলকাতায় চ'লে গিয়েছিলাম। সেথা থেকে রাতের গাড়ীতে দেশে গিয়েছিলাম।"

মালীর নিকট আর বেশী কিছু জানিবার না থাকায়, তাহাকে বিদায় দিয়া, যোগীন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে ত আমাদের সিদ্ধান্ত সব গোলমাল হয়ে গেল দেখছি! সরস্বতী-পূজার আগের দিনে,—রাত্রি ১২টায় খুন হয়েছিল; অথচ সে দিন এবং তার পরদিনেও, যমুনা ও কান উভয়েই এখানে ছিল। এটা ত আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল হচ্ছে না!"

আমি বলিলাম, "তা ছাড়া আরও দুই একটা কথা আছে, যা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

যোগীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি কথা?"

"প্রথমতঃ ঘোষ-পত্নী হানাবাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতেন কেন?"

"সে কি? ও যে মাঝে মাঝে সেখানে যেতো, তা কি ক'রে জান্লে?"

"কেন? সেই পর্দ্দার উপর ছায়ার কথাটা মনে ক'রে দেখুন। ঐ রকম ছায়া আমি ছাড়া অন্য লোকেও সময়ে সময়ে দেখেছিল। ঢাকাই শাড়ীর পাড় ও পেটিকোটের লেসের ছিন্নাংশ এবং মখমলের ফিতে পাড়ের টুকরা থেকে যদি সাব্যস্ত করা যায় যে, ঘোষ-পত্নী ওখানে গিয়েছিলেন, তা হ'লে এটাও মেনে নিতে হয় যে, মাঝে মাঝে পর্দ্দার উপর যে রমণীর ছায়া দেখা গিয়েছে, সেগুলা তারই ছায়া। অথচ, ঘোষজা মশায় ঐ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার সময়, ও-বাড়ীতে অপর কোনও লোক যে কখনও আইসে নাই,তা প্রমাণ করবার জন্য অত উৎসুক হয়েছিলেন কেন? তা হ'লে তাঁর জ্ঞাতসারেই তাঁর স্ত্রী ওখানে যেতেন এবং তিনি সেটা অপরের কাছে লুকাতে চেষ্টা করতেন। স্ত্রীর অত্যাচারেই যদি তিনি গৃহত্যাগী হয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে, একটা নিভৃত স্থানে বাস করছিলেন, তা হ'লে তাঁর স্ত্রী সেই অজ্ঞাতবাসের সন্ধান কি ক'রে পেল? আবার সেখানে লুকিয়ে যাতায়াতই বা করত কি জন্য? আর ঘোষজা মশায়ও সেটা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাই বা করতেন কেন?"

যোগীন বাবু বলিলেন, "তাই ত! বিষয়টা ক্রমেই যেন আরও বেশী জটিল হয়ে পড়ছে দেখছি!"

২৯

যোগীন বাবুর কথায় সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অবশেষে কাকলী বলিল, "আমি ত এতে

জটিলতা তেমন কিছু দেখছি না। বাবা এখান থেকে চ'লে যাবার পরে সৎ-মা ও তার দলের লোকরা বাবার সন্ধান পাবার নিশ্চয়ই খুব চেষ্টা করেছিল। সন্ধান বা'র কর্‌তেও যে পেয়েছিল, তা নিশ্চয়। কারণ, বাবা যেমন সাদা-সিধা লোক ছিলেন, ওরা তেমনই চতুর ও ফন্দীবাজ। আমার বোধ হয়, ওরা যে শুধু বাবার থাক্‌বার স্থানের সন্ধান পেয়েছিল, তা নয়; সেই সঙ্গে ঐ পিছনের বাড়ী দিয়ে লুকিয়ে হানাবাড়ীতে আসবার উপায়টাও জেনেছিল। ওরা বোধ হয় ঐ পথ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হানাবাড়ীতে গিয়ে, বাবার কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখত। সৎ-মা বোধ হয় সেখানেও বা়বার উপর দুর্ব্ব্যবহার করত; হয় ত ভয় দেখিয়ে, জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে উইল বদল করাবার চেষ্টা করত;—আরও যে কত কি করত, ভগবান্‌ই জানেন! এই সব অত্যাচারেই ত পাগলের মত হয়ে তিনি বাড়ী ছেড়েছিলেন;—আবার সেখানেও সেই উৎপাতের জ্বালায়, বোধ হয়, নিজের কষ্ট ভোলবার জন্য তিনি বেশী ক'রে নেশার জিনিষ খেতে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ, আগে ত তিনি ও-সব প্রায় খেতেন-ই না।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে ওদের আসা-যাওয়ার বিষয় তিনি ও রকম লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন কেন?"

"হয় ত পাড়ার লোক তাঁর ঘরের কথা সব জান্‌তে পারলে চারিদিকে নিন্দাবাদ হবে, এই ভয়ে স্ত্রীর লুকিয়ে আসা-যাওয়াটা বোধ হয় গোপন করতে চাইতেন। তাঁর মনের ত ইদানীং তেমন তেজ বা জোর ছিল না। তা ছাড়া ওরা বাস্তবিক কি উদ্দেশ্যে ও রকম লুকিয়ে আস্‌ত, তা ত ঠিক জানি না?—হয় ত তাদেরই কোন অভিসন্ধি অনুসারে বাবাকে কোন রকম ভয় দেখিয়ে, যাতায়াতের কথাটা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করেছিল।"

কথাগুলা আমার বেশ সমীচীন বোধ হইল। আমি বলিলাম, "এই অনুমানই খুব সঙ্গত মনে হয়। কারণ, তা হ'লে তিনি যে নিজেকে সর্ব্বদা শত্রুবেষ্টিত মনে করতেন কেন, তাও বেশ বুঝতে পারা যায়। প্রথম আলাপের রাত্রে রামপালের পোড়োর মধ্যে আমি যে তাঁকে কাতরভাবে কাঁদতে দেখেছিলাম, তারও কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ হয় না।"

"হাঁ; আমার এই অনুমানই যে ঠিক, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আহা! বাবা ওদের হাতে কি কষ্টই না পেয়েছেন!" বলিতে বলিতে কাকলীর চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার মাসী তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "উঃ! কষ্ট ব'লে কষ্ট!—শেষে কি না বেচারাকে প্রাণে পর্য্যন্ত মেরে তবে তারা নিশ্চিন্ত হলো!"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, ও মাগী শেষে তাঁকে খুন-ই বা করলে কেন?"

আমি বলিলাম, "কাকলীর অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হ'লে খুনের উদ্দেশ্যটাও অনুমান করা শক্ত নয়। তাদের হয় ত চেষ্টা ছিল, উইলটা এমন ক'রে বদল করবে, যাতে সমস্ত সম্পত্তি, কিংবা তার বেশীর ভাগ তাঁর স্ত্রীই পেতে পারে। কিন্তু ঘোষজা মহাশয়কে বোধ হয় তাতে কিছুতেই রাজী করতে পারেনি, কিংবা হয় ত তাদের অত্যাচারের ফল এমন উল্টা হয়ে পড়লো যে, ঘোষজা মশায় শেষে উইলখানা এমন ক'রে বদ্‌লাবেন বলেছিলেন, যাতে তাঁর স্ত্রী বিষয়ের কিছুই না পায়। পাছে তিনি ঐ কথা সত্যই কোন সময় কাযে পরিণত ক'রে ফেলেন, এই ভয়ে হয় ত তারা তাঁর জীবনের শেষ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। অবশ্য এ সবই আমার অনুমান মাত্র।"

কাকলী বলিল, "তা হ'লেও এই অনুমানই ঠিক ব'লে আমার বোধ হয়।" অপর কয় জনেও এই কথাই সমর্থন করিলেন।

পরে যোগীন বাবু বলিলেন, "ও কথাগুলা ত এখন একরকম বেশ বুঝা গেল। কিন্তু সরস্বতী-পূজার পূর্ব্ব রাত্রে ১২টা নাগাত ও মাগী কি ক'রে হানাবাড়ীতে গিয়ে স্বামীকে খুন করলে, সে কথাটার ত কোন সিদ্ধান্ত হলো না। মালীর কথা অনুসারে মাগী ত সে দিন এবং তার পরদিনেও এখানেই ছিল।"

কাকলী বলিল, "আচ্ছা, মালীর কথাগুলা একটু বিবেচনা ক'রে দেখুন। সে যা বলেছে, তা থেকে এইটুকু জানা যায় যে, সরস্বতী-পূজার আগের দিন বেলা প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত মেমসাহেব এখানে ছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে তার পরদিন বেলা ১টা পর্য্যন্ত মালী এ বাড়ীতেই ছিল না। এই সময়ের মধ্যে মেমসাহেব যে অন্য কোথাও

যায় নি,—এখানেই ছিল,—সেটা মালীর অনুমানমাত্র। কিন্তু বেলা ৪টার পরে কোন একটা ট্রেণে কলকাতায় গিয়ে সে রাত্রি সেখানে থেকে পরদিন সকালের ট্রেণে এখানে ফিরে আসা যে খুবই সহজ, তা ত জানেন;—ওরা দুজনে হয় ত তাই করেছিল।"

"হাঁ, তা সম্ভব বটে; কিন্তু, ওরা যে তাই করেছিল কি না, সেটা নিশ্চয় জানা যায় কি ক'রে? এত বড় একটা ভীষণ অভিযোগ করতে গেলে সবই অনুমানের উপর নির্ভর করলে ত চল্‌বে না।"

"সে সময় বাড়ীতে যে সব দাসদাসী ছিল, তাদের কারও সন্ধান পেলে হয় ত ও বিষয় ঠিক জান্‌তে পারা যেতো। কিন্তু তাদের এখন খোঁজ ক'রে বা'র করা বোধ হয় সম্ভব হবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সেই 'গান-মা'কে বা'র করা বোধ হয় বেশী দুঃসাধ্য নয়। তাকে পেলে এ খবরটা নিশ্চয়ই ঠিক জানা যেতে পারে।"

কাকলী বলিল, "ঠিক বলেছেন। আর তাঁর ঠিকানাও আমি জানি। তিনি কলকাতায় এক ব্রাহ্ম পরিবারের আশ্রয়ে থেকে লেখা-পড়া ও গান শিখেছিলেন। এখানে যখন ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এখন হয় ত সেইখানেই আছেন। আমি চিঠি লিখে তাঁকে আসতে বল্লে নিশ্চয়ই আসবেন।"

তখন সকলের পরামর্শে তাহাই করা স্থির হইল, এবং তদনুসারে কাকলী সেই দিনেই 'গান-মা'কে একখানা চিঠিও লিখিল।

সে দিন বৈকালে ও তাহার পরদিনেও আমরা নগর-পরিদর্শনাদি দ্বারা বেশ আমোদে সময় কাটাইলাম। এই সূত্রে যোগীন বাবুর পরিবারবর্গের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবকাশ পাইয়া তাঁহাদের অকপট সজ্জনতায় অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম। আর,—সেই সঙ্গে কাকলীর স্বাভাবিক সরলতা ও হৃদয়ের কোমলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়ায় এই দুই দিনের বর্দ্ধমান-প্রবাসটা আমার পক্ষে যে একটু বিশেষরূপে সুখকর হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

সে যাহা হউক, পিসীমার ছেলেদের স্কুল তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকায়, তিনি কাকলী ও যোগীন বাবুর স্ত্রীর অনুরোধে আপাততঃ কয়েক দিন এখানে থাকিবেন স্থির হইল। আমি রবিবারে সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় আমার উপর অপর সকলের অনুজ্ঞা হইল যে, আগামী শনিবার বৈকালে আমি পুনরায় সেখানে যাইব এবং ইতোমধ্যে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীর সেই ভাড়াটের সম্বন্ধে যতটা সম্ভব সংবাদ লইবার চেষ্টা করিব।

৩০

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতেই দেখিলাম, আমার এই ২৩ বৎসরের মনটার উপর বর্দ্ধমানবাসিনী সেই ১৫।১৬ বৎসরের বালিকাটি এতই প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে যে, আমার সমস্ত চিন্তার পর তাহার চিন্তাটাই সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। চিন্তারাজ্যে এই অপ্রত্যাশিত বিপ্লবটা দমন করিবার ইচ্ছাও ক্রমে জাগিয়া উঠিল দেখিলাম; তবে, উহার চেষ্টাও যে তদনুরূপ কার্য্য করিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। অথবা ইচ্ছা ও চেষ্টা উভয়েই যে গোপনে আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়া বিপ্লবকারিণীর সহায়তা করিতেছিল না, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু, কিন্তু ইহার ফলে আমার মনের স্থিরতা ও শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে যে বিষম ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি।

দুই এক দিন এইরূপে কাটিতে না কাটিতে আবার যখন দেখিলাম যে, পিসীমার অনুপস্থিতি বশতঃ, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গুপের হাতে দৈনিক বাজারের ফর্দ্দের কলেবরটি প্রত্যহই বেশ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং সেই সঙ্গে উৎকলদেশীয় পাচক মহাশয়ও তাঁহার রন্ধন-বিদ্যার পারদর্শিতা এরূপ ভীষণভাবে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, আমাকে অধিকাংশ দিন অর্দ্ধাশনে কোর্টে যাইতে হইত ও রাত্রিতে জঠরানলনিবৃত্তি করিতে মাঝে মাঝে হোটেলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত,—তখন আমার মনের শান্তিটুকু ফিরিয়া পাইবার আশা বড়ই ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ সে সপ্তাহে আমার আদালত-সংক্রান্ত কাযকর্ম্ম সংখ্যায় কিছু বেশী হওয়ায় এই সকল অশান্তির কারণগুলা মনটাকে বিব্রত করিবার বড় অবসর পাইত না, এবং সপ্তাহের দিনগুলা

কাটিয়া, পুনরায় শনিবার আসিয়া উপস্থিত হইতে খুব যে বেশী বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না।

এ সপ্তাহে আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ইতঃপূর্ব্বে, যথেষ্ট অবকাশ সত্ত্বেও আমার ভগ্নীদ্বয়কে যথাসময়ে চিঠি না লিখিবার কারণের কখনও অভাব হইত না। অথচ, এ সপ্তাহে নানা কার্য্যের মধ্যেও দুই ভগিনীকেই হানাবাড়ীর হত্যাসংক্রান্ত অনুসন্ধানের সমস্ত সংবাদ দিবার ইচ্ছা আমার হঠাৎ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, দুই জনকেই দুইখানা সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু চিঠি দুইখানাতে ঘোষজা মহাশয়ের হত্যা-প্রসঙ্গ অপেক্ষা তাঁহার কন্যার প্রসঙ্গই যে বেশী স্থান অধিকার করে নাই, তাহা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের দুই জনেরই নিকট হইতে ফেরত ডাকে যেরূপ উত্তর পাইলাম, তাহাতে তাঁহাদের মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে যে আমার কিছু সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা বেশ বলিতে পারি।

তাঁহাদের এই চিঠি হইতে এত দিনে তাঁহাদের পূর্ব্বের সেই প্রহেলিকাময় চিঠির তাৎপর্য্য এবং পিসীমার সেই লুকানো 'ফন্দী' যে কি, তাহাও জানিতে পারিলাম। আরও জানিলাম যে, যোগীন বাবুরা কলিকাতায় আসিবার প্রস্তাব করার পর হইতে পিসীমা না কি আমার ভগিনীদ্বয়কে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছেন; দুই জনকেই কাকলীর দুইখানি ছায়া-চিত্রও পাঠাইয়াছেন; তাঁহারাও পিসীমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছেন; আবার যোগীন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও না কি তাঁহাদের পত্র-ব্যবহার হইয়াছে; এবং—(এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ফলে, দুই ভগিনীরই বোধ হয় মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায়)—উভয়ে প্রায় একই বাক্যে আমাকে লিখিয়াছেন যে, শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব তাঁহাদের সহ্য হইতেছে না; অতএব আগামী আষাঢ়মাসেই,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাক সে কথা। দিদিরা পাগল হইয়াছেন বলিয়া, আমাকেও যে তাহাই হইতে হইবে, এমন কোন কথা ছিল না। আমি সেই জন্য তাঁহাদের চিঠির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া অপর কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলাম।

শুক্রবারের পূর্ব্বে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে গিয়া তদন্ত করিবার অবসর ঘটিল না। সে দিন বেলাবেলি কোর্ট হইতে ফিরিয়া ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে গোঁসাইজীর সহিত সাক্ষাৎলাভও হইল।

তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, গত সরস্বতী-পূজার সময় তাঁহার যে ভাড়াটে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার নাম কালিদাস স্মৃতিরত্ন। হানাবাড়ীতে নন্দন সাহেব বাস করিতে আরম্ভ করার ৮।১০ দিন বাদেই স্মৃতিরত্ন এ বাড়ীর এক তলায় দক্ষিণ-পশ্চিমের দুইটা ঘর ভাড়া লইয়াছিল এবং সরস্বতী-পূজার দিন দুই পরে হঠাৎ বিনা 'নোটিশে' উঠিয়া যায়। কিন্তু যাইবার সময় পূরা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাহার বয়স পঞ্চাশের উপর; দেখিতে সুশ্রী, গৌরবর্ণ, মাথায় কাঁচা-পাকা লম্বিত কেশ এবং মুখে পাকা গোঁফ ও দাড়ি ছিল। বেশ শান্তপ্রকৃতি ও সজ্জন লোক বলিয়া বাড়ীর সকলের ধারণা ছিল। বাড়ীর কাহারও সঙ্গে সে প্রায় মিশিত না; নিজের পড়া-শুনা লইয়াই থাকিত। সময়ে সময়ে এখান হইতে দেশে যাইত এবং কখনও ২।৪ দিন, কখনও বা ১০।১৫ দিন পরে ফিরিয়া আসিত। মাঝে মাঝে এক জন ফিরিঙ্গী গোছের যুবা ও একটি নব্য-ধরণে সজ্জিতা, মোজা-জুতা-পরা, বাঙ্গালী রমণী ছাড়া আর কেহ তাহার সহিত এখানে দেখা করিতে আসিত না। পুরুষটির বয়স ২৭।২৮, রং ফর্সা, কিন্তু মুখাবয়ব কতকটা জাপানী ধাঁচের। কিন্তু দাড়ি না থাকিলেও গোঁফ যথেষ্ট আছে। পোষাক ও চালচলন সাহেবী। উহারা দুই জনে একত্রই আসিত; কিন্তু সন্ধ্যার পরে ভিন্ন অন্য সময়ে আসিত না বলিয়া গোঁসাইজী সে স্ত্রীলোকটির মুখ কখনও ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। তবে তাহার আকৃতি ঈষৎ খর্ব্ব অথচ সুপুষ্ট, তাহা দেখিয়াছেন।

এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া গোঁসাইজী শেষে বলিলেন, "স্মৃতি-রত্ন সম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু জানি না, মশায়। তবে আমার নিতাই নামে একটি ছোকরা চাকর আছে;—লোক তাকে দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্ত বল্লেও আমার কাছে সে ছেলেবেলা থেকে আছে ব'লে এক রকম ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে। স্মৃতিরত্নও তাকে বেশ স্নেহ করতেন; সে জন্য সে-ও তাঁর কিছু অনুগত হয়েছিল, তাঁর ঘরের কায-কর্ম্মও ক'রে দিত। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় ত স্মৃতি-রত্ন সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জান্‌তে পারবেন। –কিন্তু এত

সব সংবাদ আপনি জান্‌তে চান কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"সে কথা বল্‌তে আমার কোন আপত্তি নাই।—আপনার পিছনের ঐ হানাবাড়ীতে গত সরস্বতী-পূজার সময় একটা খুন হয়েছিল, মনে আছে ত ?"

"হাঁ, আছে বৈ কি ! কি ভয়ানক ব্যাপারই হয়েছিল !"

"সেই খুনী আসামীকে এখনও ধরা যায়নি। কিন্তু এখনও তার অনুসন্ধান চলছে। আমি সেই অনুসন্ধানের জন্যই এখানে এসেছি।"

"বলেন কি, মশায় ? সে খুনের অনুসন্ধান এখানে কেন ? কি সর্ব্বনাশ ! দোহাই আপনার, আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ !"

"কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তা অনুসন্ধান শেষ না হ'লে ত জানা যাবে না ? কিন্তু আপনি 'আমরা' বল্লেন কেন ? আপনি নিজে ছাড়া আর কে ?"

"আমি আর আমার ঐ চাকর নিতাই, - আর কে ? কিন্তু সে দুষ্টই হোক আর বজ্জাতই হোক,—খুনে নয়, মশায় !"

আমি একটু 'উপর-চাপ' দিবার অভিপ্রায়ে গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলাম, "তা কি বলা যায় ? চোর-ছেঁচড়দের অসাধ্য কিছু নাই।—আমি শুনেছি, আপনার ঐ চাকরটা চোর।"

"না, না ! সে কথা ঠিক নয়। একটু আধটু হাত-টান আছে বটে, কিন্তু সে চোর-ডাকাত নয়, মশায় ! আপনি বোধ হয়, সেই ছাতাটার কথা কারও কাছে শুনেছেন, তাই ও কথা বল্‌ছেন। কিন্তু ছাতাটা নিতাই চুরি করেনি। ওটা তাকে স্মৃতিরত্নই দিয়েছিল।—আমি না হয় নিতাইকে এখানে ডাকছি; আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জান্‌তে পারবেন।"

এই বলিয়া গোঁসাইজী একটু উচ্চ স্বরে নিতাইকে ডাকিলেন। এক বার মাত্র ডাকিতেই তৎক্ষণাৎ ঘরের কপাটের অপর দিক হইতে একটা ১৬।১৭ বৎসরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কৃশকায় অথচ দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট বালক ঘরে প্রবেশ করিল। বেশ বুঝা গেল যে, সে এতক্ষণ সেই কপাটের আড়ালেই উপস্থিত ছিল এবং বোধ হয়, আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনিতেছিল। তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাহাকে খুব ধূর্ত্ত বলিয়া আমার বোধ হইল।

৩৭

নিতাই ঘরে প্রবেশ করিবার পর গোঁসাইজী তাহাকে বলিলেন, "ওরে, তোর সেই ছাতাটার কথা এই বাবুকে সব খুলে বল্ ত !"

নিতাই যেন বড় বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার আবার ছাতা কম্‌নে ? আজ এক বছর হলো একডা ছেঁড়া, বাঁট-ভাঙ্গা ছাতা দিছিলেন, তার এখন ত খালি শিকগুলা প'ড়ে আছে !"

"আরে, না না ! বেটা যেন ন্যাকা ! আমি সে ছাতার কথা বলছি না।—সেই যে, লম্বা বাঁটওলা, বাহারি কাপড়ের মেম-সাহেবী ছাতা,—যেটা স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তোকে দিয়েছিল, সেইটার কথা বল্‌ছি।"

"ওঃ, তাই বলেন ! তা সে আবার আমার ছাতা হলো কেম্‌নে ? সে ত সেই ন্যাস-মেমের ছাতা; সে হেথাকে ফেলে গেছিল। বুড়ো ঠাকুর দেশে যাবার কালে, ওডা আমারে রাখবের লেগে দেছিল। কয়েছিল যে, তানার ফিরবের আগে যদি ন্যাস-মেম এসে ত তেনাকে সেডা দিতে হবে। তাই না আমি সেডা রাখছিলেম ? তার পর থেকে আমার কাছেই রয়েছে ;—আর লোকে কয় কি না আমি সেডারে চুরি করিছি ! যারা কয়, তারা বড় সাধু কি না ? আর আমি হনু চোর ! আমি মনে করি ত তোদের কত চুরি ধ'রে দিতে পারি—"

"আচ্ছা, থাম্, থাম্ ! মিছে বাজে বকিসনি।"

আমি বলিলাম, "কৈ, সে ছাতাটা দেখি একবার !"

নিতাই তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়া, অবিলম্বে বিলাতী মহিলাগণের ব্যবহার্য্য একটা ছাতা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং তাহা আমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই ন্যান; আমি ওডারে আর রাখতে চাইনে, বাবু ! ওডা আপনার কাছেই রেখে দেন। যার ছাতা, তারে ফিরে দেবেন।"

"আমি তাকে কোথায় পাবো ?"

"কেন ? আপনি পুলিস,—ফেরারী লোক খুঁজে বা'র করেন,- আর তেনাকে বা'র করতে পারবেন না ?"

"আমি পুলিস, তা তোকে কে বল্লে ?"

"তা কি আমি জানিনে, বাবু ? আপনিই ত সে দিন আমাদের ঐ পায়খানার ছাতে দেঁড়িয়ে, এ-বাড়ীর সব

সন্ধান-সুলুক দেখতেছিলেন ;—আবার আজ ছাতার তল্লাসে এসেছেন। আমি কি বুঝতে পারিনে ?”

আমি তাহার কথার প্রতিবাদ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলাম না। গম্ভীরভাবে বলিলাম, “হুঁ! তা বেশ, আমি ছাতাটি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শুধু তাতেই হবে না। ছাতার মালিক, আর সেই বুড়া বামুন কোথায় আছে, তার সন্ধানও তোকে দিতে হবে ; নইলে তোকেও পুলিসে যেতে হবে।”

নিতাই বোধ হয় একটু ভীত হইল। বলিল, “আমি সত্যি কইছি, বাবু! আমি ওনাদের কোনই সন্ধান জানিনে। জান্‌লে পরে আমি নিজেই এখনি সে বুড়ো ঠাকুরকে পুলিসে হাজির ক’রে দিতেম। ও যে আমারে ফাঁসাবার লেগে ঐ ছাতাটি গছিয়ে গেছিল, তা কি তখন জানি ?”

গোঁসাইজী বলিলেন, “থাম্, থাম্! নেমকহারাম কোথাকার! সে বেচারা ভাল মানুষ, ভদ্রলোক,—তোকে কত স্নেহ করত,—আর তুই কি না তার এই রকম বদনাম করছিস্!”

“ওঃ! ছেঁহ কত করত, তা আর জানিনে ?—মিট-মিটে ডান্!”

আমি বলিলাম, “বটে ? লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেপুলে ধ’রে খেতো বুঝি ?”

“তেনার যে রকম ফন্দী, তা সে বুড়ো ধ’রেও খেতে পারে।”

“তা হ’লে সেই বোধ হয় ও-বাড়ীর বুড়ো সাহেবকে খুন করেছে ?”

নিতাই সামান্য একটু থামিয়া, ঈষৎ বিচলিতভাবে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, “খুন-টুনের কথা জানিনে, বাবু!—তবে, বজ্জাতিতে সে খুব দড়।”

“ও-বাড়ীর খুন সে করেছে কি না, তুই বল্‌তে পারিস্‌নি ?”

“না, বাবু! তা আমি কেম্‌নে বলবো ?”

“কে করেছে, তুই জানিস্‌নি ?”

“এজ্ঞে, আমি কেম্‌নে জান্‌বো ?”

“তবে, সেই বুড়ো বামুন নিশ্চয়ই জান্‌তো ;—কি বলিস্ ?”

“তা আমি বল্‌তে পারিনে।”

“আচ্ছা, এ বাড়ীর পশ্চিমের ঐ গলিপথ দিয়ে, পাইখানার ছাত পার হয়ে, ও-বাড়ীতে কে যেতো, তুই জানিস্ ত ?”

গোঁসাইজী তখন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভীতভাবে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ! ও কি বল্‌ছেন মশায় ? ও রকম ক’রে চোর-ডাকাত ছাড়া কি অন্য কেউ যেতে পারে ?”

আমি একটু হাসিয়া নিতাইকে বলিলাম, “নিতাই কি বলিস্ ?”

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।

প্রতীক্ষা

[মাসিক বসুমতীর চৈত্র-সংখ্যার চিত্র-দর্শনে]

নবীন পিয়াস, নবীন উপাস, নবীন উষায়
নবীন কুয়াশা মনে।

সুনীল সুরঙ্গ, শাড়ীবেড়া অঙ্গ, বনের কুরঙ্গ
তরুতলে উপবনে॥

লাজের কাজলে উজল নয়ন,
আশার কুসুম করিছে চয়ন,
প্রথম এ শিক্ষা, প্রথম পরীক্ষা, প্রথম প্রতীক্ষা
সে জন তরে বিজনে।

সিক্ত স্নান-জলে, মুক্ত কেশদলে
ব্যক্ত নহে ছলে আসক্তির ফলে.
কলার বিলাস কাম অভিলাষ রয়েছে বিকাশ
কালো কেশের রচনে।

পূতপ্রাণে সৃষ্ট, অতি শিষ্ট দৃষ্ট,
কি চিত্র উৎকৃষ্ট আঁকি হরেকৃষ্ট,
সরস্বতী-বরে চিরদিন তরে বঙ্গবালা করে
দিলে পুণ্য ধন্য পণে ;—
বিনা নগ্ন রঙ্গ, অনাবৃত অঙ্গ, রূপের তরঙ্গ
ফোটে না কি যুবা-নয়নে ?

শ্রীঅমৃতলাল বসু

জীবন-কথা

পূজা-পার্ব্বণ

তখনকার দিনে হিন্দু পূজা-পার্ব্বণ প্রায় সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত। 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' বালক-বালিকাকে সর্ব্বদাই আনন্দিত ও প্রফুল্ল রাখিত, বয়োবৃদ্ধরাও উহা হইতে পারলৌকিক মঙ্গল পাইতেন বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এই সকল উৎসব দুই অংশে বিভক্ত ছিল,– (১) পূজা, (২) ব্রত। পূজার উৎসবই বড় ছিল, পুরুষরা উহাতে নেতৃত্ব করিতেন। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব ছিল। এখনও দুর্গাপূজায় ধুমধাম হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালের প্রথায় নহে। বৎসরের সকল মাসেই প্রায় একটা না একটা পূজা থাকিত। ব্রতের উৎসবে সংসারের নারীদিগেরই বিশেষ অধিকার থাকিত। প্রতি মাসেই একটা না একটা ব্রত পালন করা হইত এবং এতদুপলক্ষে নারীরা উপবাসাদি করিতেন। সে সকল উৎসবে নানারূপ পিষ্টক-পায়সাদিরও ব্যবস্থা হইত—বালক-বালিকারা উপবাসের কষ্ট হইতে অব্যাহতি ত পাইতই, পরন্তু ভোজ্যপানীয়ের বিশেষ অংশ গ্রহণ করিত।

দুর্গাপূজায় ৪ দিন মহা উৎসব হইত। আমাদের গ্রামে প্রায় ১২খানি প্রতিমার পূজা হইত। সেই সময়ে বিদেশ হইতে চাকুরীয়ারা ঘরে ফিরিয়া আসিতেন এবং কয়েক সপ্তাহ ছুটীতে বাড়ীর সুখ উপভোগ করিতেন। আসিবার কালে তাঁহারা সহর হইতে নববস্ত্রাদি আনয়ন করিতেন এবং উহা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কেবল পূজার ৪ দিন নহে, উহার অতিরিক্ত আরও কয়েক দিন ধরিয়া পূজা-গৃহে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব উঠিত। ইহা ছাড়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদ হইত। এই সকল ভূরিভোজনে ও আমোদ-প্রমোদে সমস্ত গ্রামের লোক যোগদান করিত। নিম্নশ্রেণীর লোকরাও এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইত না। ঐ সময়ে সকলেরই মনে একটা শান্তভাব বিরাজ করিত এবং সকলেই পরস্পরের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা ভুলিয়া যাইত। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিন সকলে পরস্পর আলিঙ্গন করিত।

হিন্দুরা খৃষ্টান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর মত অনেকে এক স্থানে সমবেত হইয়া (যেমন গির্জ্জায় বা মসজেদে) পূজারাধনা করে না। হিন্দুদের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহদেবতা আছেন এবং প্রত্যেক গৃহদেবতার নির্দ্দিষ্ট পূজারী আছেন। নানা গৃহস্থগৃহে প্রায় একই সময়ে পূজা হইত এবং সকলেই নিজ নিজ পূজা জাঁকাইয়া করিবার জন্য বন্ধুভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন।

মেলা

প্রতি বৎসরই গ্রামে কয়েকটি মেলা বসিত। কোন না কোন একটা ধর্ম্মকার্য্যের সহিত এই সকল মেলা সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সকল মেলায় খেলানা, মিষ্টান্ন, বস্ত্র ও গৃহস্থালীর উপযোগী নানা পণ্য বিক্রয়ার্থ আনীত হইত। মেলায় নানারূপ আমোদ-প্রমোদও হইত। ইহাতে ব্যবসায়, আমোদ ও ধর্ম্ম তিনটি উদ্দেশ্যই একসঙ্গে সাধিত হইত।

ধর্ম্মোৎসব ব্যতীত হিন্দুদিগের অন্যান্য উৎসব ও মেলাও ছিল। হৈমন্তিক ধান্য ঘরে তুলিবার পর শীতকালে যখন গৃহস্থের অবসর ও অর্থের সুযোগ হইত, তখন হিন্দুর গৃহে কথকতা, রামায়ণ, কবি, যাত্রা ইত্যাদির উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। [এই স্থানে লেখক সম্ভবতঃ বিদেশী য়ুরোপীয় পাঠকগণের সুবিধার জন্য কথকতা ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা এ দেশীয়গণের পক্ষে নূতন নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। – বসুঃ সঃ]

তীর্থযাত্রা

তীর্থযাত্রা হিন্দুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তখনকার কালেও এখনকার মত বাঙ্গালী হিন্দুর পাঁচটি প্রধান তীর্থ ছিল,—পুরী, কাশী, গয়া, চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা। ইহার

মধ্যে প্রথম তিনটি তীর্থই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ছিল। তখন রেল বা ষ্টীমার ছিল না। কাযেই দূরদেশে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ও বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এ সকল বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য করিত না। যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নারী। তাঁহারা যে কেবল ধর্ম্মার্থ তীর্থযাত্রা করিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের একঘেয়ে পর্দ্দানশীন জীবনে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইবার পক্ষে তীর্থযাত্রা পরম চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার পিতামহী প্রায় সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দলবল লইয়া নৌকাযোগে কাশী ও গয়া যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ছয় মাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার 'সাথী'দিগের মধ্যে কয়েক জন কলেরা ও অন্যান্য রোগে পথেই প্রাণত্যাগ করেন। পুরী-যাত্রাকালে তিনি নৌকাযোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়া তথা হইতে পদব্রজে পুরী-যাত্রা করেন। ১৮ দিনে তিনি পুরী পৌঁছিয়াছিলেন। পাল্কীযোগে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেন না, উহা বহুব্যয়সাধ্য। গোযানে যাত্রাও তিনি পছন্দ করেন নাই, কেন না, তীর্থস্থানে যাত্রাকালে গোজাতিকে বাহন করিয়া যাওয়া তিনি পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

ডাক

তখনকার কালে সরকারী ডাক কেবলমাত্র জিলার সদরে অবস্থিত ছিল। তবে মহকুমা সমূহের পুলিস-থানাদির সহিত 'জমীদারী ডাক' দ্বারা সম্পর্ক রাখা হইত। এই ডাকের ব্যয় জমীদারদিগের নিকট খাজনা দ্বারা আদায় করিয়া নির্ব্বাহ করা হইত। গ্রামে ডাকের ব্যবস্থা ছিল না। তবে অনেকে সরকারী ডাকপিয়নের মারফতে পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। কিন্তু এই সকল পত্র যথাস্থানে পৌঁছান সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমার পিতা সেই সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। কলিকাতা হইতে ডাকযোগে ঐ পত্র রাজগঞ্জে পৌঁছিত। উহা আমাদের অঞ্চলের পুলিস-থানা ছিল। গ্রামের চৌকীদার মাসে যখন একবার থানায় হাজিরা দিতে যাইত, তখন ঐ পত্র লইয়া আসিত। এই ভাবেই গ্রামের চিঠি-পত্রাদিও চৌকীদারের মারফতে বাহিত হইত। তখনকার কালে ডাকটিকিট ব্যবহার করা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত না, তখন 'বেয়ারিং' প্রথাতেই চিঠি-পত্র বিলি হইত।

গ্রাম্য-শাসন

আমাদের গ্রামে কোন নির্দ্দিষ্ট পঞ্চায়েৎ ছিল না। গ্রামে কয়েক জন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈদ্য মাতব্বর ব্যক্তিকে সকলে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। তাঁহাদিগকেই সকলে বিরোধ বা বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিতে বলিত। এমন কি, পারিবারিক গুরুতর সমস্যাসমূহও ইঁহাদের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লওয়া হইত। ইঁহাদের ন্যায়-বিচারের উপর সকলের আস্থা ছিল। তখনকার কালে মিথ্যা বা জাল-জুয়াচুরি অতি অল্পই ছিল এবং গ্রামবাসীরা পরস্পর সদ্ভাব ও শান্তিতে বাস করিত। আমাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পুলিস-থানা ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। আমাদের ফৌজদারী মামলা করিতে হইলে ঢাকায় যাইতে হইত। আমাদের গ্রাম হইতে ৪ মাইল দূরে পলাশ নামক গ্রামে একটি মুনসেফী আদালত ছিল। এই স্থানে ভূমিঘটিত বিবাদ-বিসংবাদের মামলার বিচার হইত।

বর্ণশৃঙ্খলা

জাতিবিভাগের শাস্ত্রসম্মত আইন-কানুন সর্ব্বত্র রীতিমত পালিত হইত। উহা যে ঈশ্বর-কৃত, ইহা বিশ্বাস করিয়া সকলে অবিচারিতচিত্তে মান্য করিত। ইহার ফলে জনসাধারণকে যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত, তাহাতে কেহ কখনও স্বপ্নেও আপত্তি উত্থাপন করিতে সাহসী হইত না। এই হেতু সমাজ ঠিক যেন সুনিয়ন্ত্রিত কোনও যন্ত্র দ্বারা চালিত হইত। সকলেই স্ব স্ব জাতির মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিত। উচ্চ ও নীচ জাতির মধ্যে হিংসা বা দ্বেষের ভাব কখনও দেখা দিত না। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে যেমন একটা ছাড়াছাড়ির ভাব দেখা যায়, আমাদের গ্রামে বা দেশে সেরূপ দেখা যাইত না। ইহার কারণ এই যে, উচ্চ জাতিদিগের মধ্যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মত আত্মম্ভরিতা বা গর্ব্বের ভাব দেখা যাইত না। সকল জাতিই পরস্পর একটা আত্মীয়তা ও সদ্ভাব রক্ষা করিতেন। পূজা-পার্ব্বণে অথবা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক উৎসবে

উচ্চ জাতির গৃহেও অন্যান্য জাতির সহিত নীচ জাতিদিগের নিমন্ত্রণ ও আদর-আপ্যায়ন হইত। এই সকল উৎসবে গৃহস্থের গৃহদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। ধনী জমীদার-গৃহে দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রবেশ-নিষেধ ছিল না। এই সকল কারণে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা মিলামিশার সুযোগ ছিল। এ দেশে লোকের জাতি হিসাবে সমাজে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, অর্থসম্পদ হিসাবে নহে। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র হইলেও সমাজে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন।

আতিথেয়তা

গ্রামের গৃহস্থরা আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরিচিত পান্থকে আতিথেয়তা প্রদর্শনে কেহ কার্পণ্য করিতেন না; যাঁহার যেরূপ সাধ্য, সেই ভাবে অতিথিসৎকার করিতেন। গ্রামে হোটেল অথবা মূল্যবিনিময়ে খাদ্যসরবরাহের স্থান ছিল না। পথিককে গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় ও আহার সংগ্রহ করিতে হইত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে সদাব্রতের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল গৃহে অতিথিশালা থাকিত। যাহারা স্বহস্তে পাক করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে চাউল, দাইল, তরিতরকারী ইত্যাদি 'সিধা' দেওয়া হইত; যাহারা গৃহস্থের গৃহে প্রস্তুত আহার্য্য প্রার্থনা করিত, তাহাদের জন্য রসুইয়া ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত ছিল। কখনও কখনও পূর্ব্বাহ্ণে কোনও সংবাদ না দিয়া বৃহৎ পরিব্রাজক দল অসময়ে গৃহস্থ-গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করিত; কিন্তু 'অতিথি নারায়ণ' হিসাবে কাহাকেও বিমুখ করা হইত না। অনেক সময়ে এ জন্য গৃহস্থ ও গৃহস্বামিনীকে আহার্য্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত। অতিথির আগমনে দিবা বা রাত্রির বিচার ছিল না। আমার মনে পড়ে, আমার পিতামহীকে এক বার অধিক রাত্রিতে উঠিয়া অতিথি-সেবা করিতে হইয়াছিল। অনেক অতিথিকে শয্যাও দিতে হইত।

দলাদলি

কিন্তু তাহা বলিয়া গ্রাম্য-জীবন নির্দ্দোষ ছিল না। অনেক সময়ে স্বজাতির মধ্যে ভীষণ দলাদলি ও জাতির 'ঘোঁট' উপস্থিত হইত। আমাদের প্রতিবেশী সেন-পরিবারের সহিত আমাদের প্রায় বিবাদ-বিসংবাদ চলিত। এমন কি, আমাদের উভয় বংশের মধ্যে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু যখন আমাদের কাহারও গৃহে কোনও উৎসব উপস্থিত হইত, তখন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বিরোধ মিটাইয়া লওয়া হইত। কোন গৃহে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে সকলে বিরোধ ভুলিয়া একযোগে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে বহিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিত। এ কর্ত্তব্য কেহ অবহেলা করিত না।

অনুষ্ঠানাদি

গৃহস্থের গৃহে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। তন্মধ্যে বিবাহের উৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহুদিবসব্যাপী হইত। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই গৃহে বাদ্যাদির আয়োজন হইত। বহু দূর হইতেও জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত এবং কয় দিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে গৃহস্থ-গৃহে অথবা প্রতিবেশীদিগের গৃহে আশ্রয় ও আহার্য্য-পানীয়াদি প্রদান করা হইত। কয়েক দিন ধরিয়া 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। ধনী, দরিদ্র, —কেহই এই ভূরিভোজন হইতে বঞ্চিত হইত না। উৎসবকালে আতসবাজী ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইত।

স্বাস্থ্য

তখন দেশের এক ভাগ ম্যালেরিয়াবর্জ্জিত ছিল। তবে বর্ষা ও শরৎকালে জ্বররোগে বহু লোক প্রাণ ত্যাগ করিত। তখন কলেরা রোগ একেবারেই ছিল না। বসন্ত রোগেও অতি অল্প লোক প্রাণ হারাইত। গ্রামে একটি পরিবার বাস করিত, তাহারা বসন্ত চিকিৎসক। তাহারা মনুষ্য-বীজের টীকা দিত এবং বসন্ত রোগের সুন্দর চিকিৎসা করিত। গ্রামে সুপেয় পানীয়ের অভাব ছিল না। তবে জল বিশুদ্ধ ছিল না। গ্রামে কতকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী ছিল। মাঝে মাঝে নূতন পুষ্করিণীও খনিত হইত। কিন্তু কোনও পুষ্করিণীর জলই কেবল পানার্থ রক্ষা করা হইত না, সকল পুষ্করিণীতেই গ্রামের লোক স্নান করিত ও কাপড় কাচিত। কয়েকটি কূপের জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। আমাদের প্রতিবেশীর কূপোদক অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। আমি পরিণত বয়সেও স্বগ্রামে গিয়া এই কূপোদক পান করিয়া থাকি। ইহায়

অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য

ইহা একটি বিচিত্র চিত্রময় প্রবন্ধ। প্রবৃত্তির খেয়ালে বা স্বাভাবিক উৎপন্ন এক জিনিষের ছবিতে সময় সময় অন্য দ্রব্যের যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা দেখানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে শিল্পীরও যে নৈপুণ্য না থাকে, তাহা নহে। তিনি যে দ্রব্যের ছবি অঙ্কিত করিতে চান, সেই দ্রব্যের ছবি অঙ্কিত বা ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিলেও এমন করিয়া তাহা করেন বা এরূপ ভাবে তাহার ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন, যাহাতে উহা অন্য কোন জীব বা পদার্থের অনুরূপ দেখায়। তবে এক জিনিষ ঠিক অপর আর এক জিনিষের মত হইয়া স্বাভাবিক উৎপন্ন যে না হয়, তাহা নহে। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সময় সময় এমন আশ্চর্য্য তুল্যতা পরিলক্ষিত হয়, যাহা বিশেষ বিস্ময়কর।

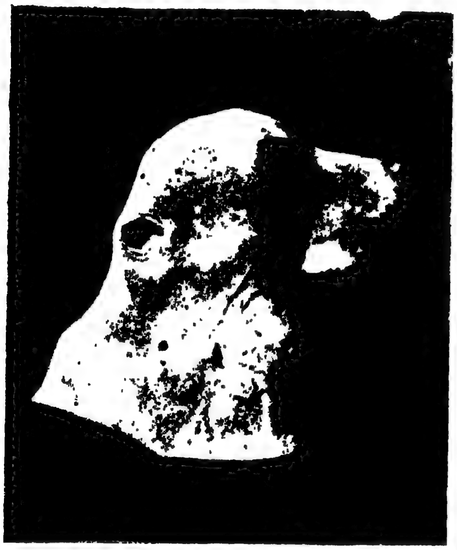

১ম চিত্র

প্রথম ছবিখানি দেখিলে একটি কুকুরের মাথা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কুকুর বা অন্য কোন জন্তুরই মাথা নহে। উহা ফেলিক্সটো (Felixstowe) নামক স্থানের সমুদ্রের উপকূলে প্রাপ্ত একখানি সাধারণ প্রস্তর, উহার স্বাভাবিক আকারই এইরূপ। সংগ্রাহকের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, মনুষ্য-হস্ত সাহায্যে ইহার কোন অংশই প্রস্তুত হয় নাই। অথচ নাক, মুখ চোখ ইহার সবই আছে।

দ্বিতীয় চিত্রের বিষয় একটি বৃক্ষগ্রন্থি, দেখিতে নর-মুখাকৃতি। ইহারও কোন অংশ মনুষ্য-হস্তে নির্ম্মিত হয় নাই, স্বাভাবিকভাবেই ইহা গঠিত হইয়াছে। আমেরিকার কোন স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মুখের মধ্যে দাঁতগুলিও যেন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

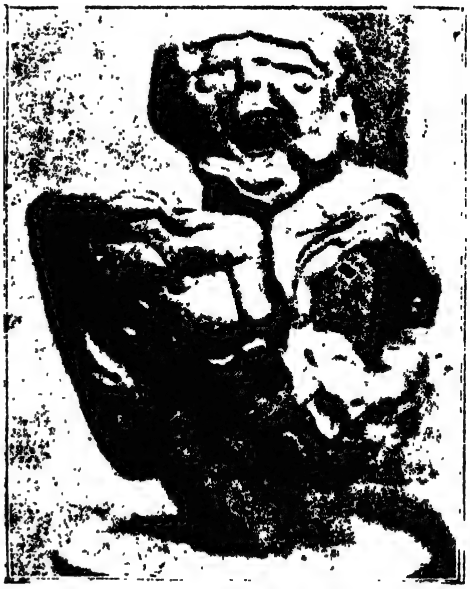

২য় চিত্র

তৃতীয় চিত্রখানি একখানি মারবেল পাতরের উপর

৩য় চিত্র

দিকের ছবি, সাধারণ কাগজ-চাপারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাও দেখিবামাত্র একটি মানুষের মুখের ছবি বলিয়া মনে হয়।

৪র্থ চিত্রখানি প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালের নমুনা। মুসলমানের মুখের ন্যায় নরমুখাকৃতিটির সম্বন্ধে কিছু না বলিলে উহা একটি সাধারণভাবে অঙ্কিত ছবি ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। উহা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ভারজিনিয়ার পর্ব্বত হইতে প্রাপ্ত একখানি তক্তার স্বাভাবিক আঁশের ছবি; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিনসিনিটির ষ্ট্রীট ও স্মিথ কোম্পানীর কারখানায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

৪র্থ চিত্র

৫ম চিত্রে যে পক্ষীর আকৃতি দেখা যায়, উহা একটি ডুমুরগাছের তক্তার গাঁইট। ম্যাঞ্চেষ্টারের এলথেড হাল্মের কাঠের গোলায় উহা পাওয়া গিয়াছিল।

৬ষ্ঠ চিত্র। তিনটি বিচিত্র গঠনের আলুর ছবি। উহা দেখিলে প্রথমটি পক্ষি-শাবক, মধ্যেরটি কাকাতুয়া এবং শেষেরটি একটি শাঁক-আলুর ফটোগ্রাফ।

৫ম চিত্র

৬ষ্ঠ চিত্র

পরবর্ত্তী অর্থাৎ ৭ম চিত্রখানি দেখিতে পাঁচ অঙ্গুলি-বিশিষ্ট মানুষের পায়ের ছবি মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে; উহা একটি সকরকন্দ আলুর ফটোগ্রাফ।

৮ ও ৯এর ছবি দুইখানি দেখিলে কোন ফুলের ছবি মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। প্রথমখানি এক প্রকার ফল বা বীজের ছবি এবং শেষের খানি অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে বর্দ্ধিত এক প্রকার বৃক্ষপত্রের উপরের ছবিমাত্র। কোন একটি জিনিষকে তাহার সাধারণ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ দেখা যায়।

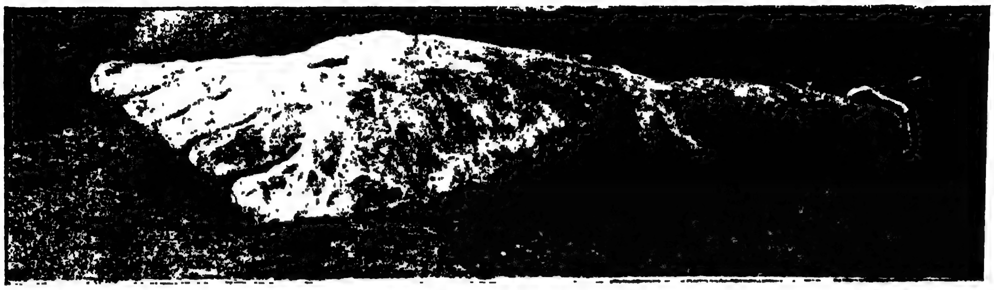
৭ম চিত্র

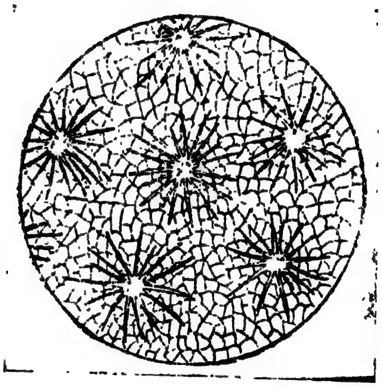
৯ম চিত্র

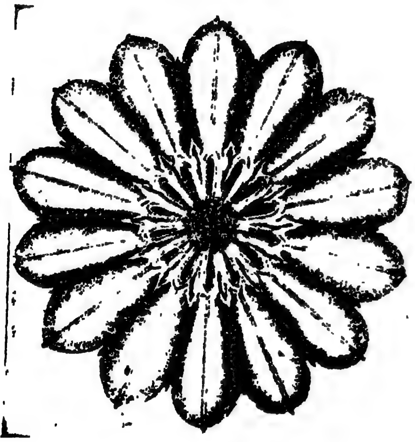
৮ম চিত্র

১০ম চিত্রখানি একটি মোজাইকের ফুলের মত দেখায়, কিন্তু উহা একটি সাধারণ তালকপির কর্ত্তিত অর্দ্ধাংশের উপরের ফটো মাত্র। ফটোশিল্পীর চেষ্টায় বহুবিধ সাধারণ জিনিষের এইরূপ বিচিত্র চিত্র সৃষ্ট হইতে দেখা যায়।

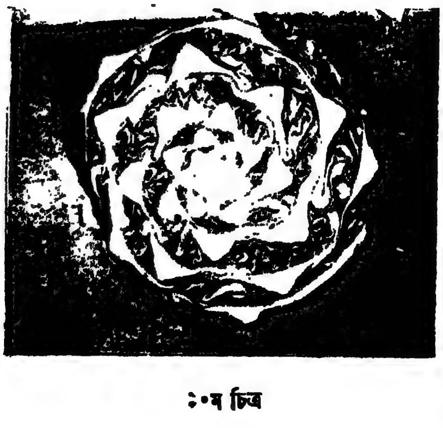
১০ম চিত্র

১১শ ও ১২শ চিত্র দুইখানি দেখিলেই মনে হয়, উহা কোন গাছের ছবি। প্রথমখানি কোন বহু কাঁটা-বিশিষ্ট এবং শেষোক্তখানি পুষ্পময় একটি তরুর চিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। উহা বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমখানি তুষারের এবং শেষের খানি প্রবালের ছবি। গাছের স্বাভাবিক ছবিও সময় সময় অন্যবিধ দেখা যায়।

১৩শ চিত্রখানি· একটি গাছের ছবি, কিন্তু উহা হঠাৎ দেখিলে একটি দাড়িবিশিষ্ট মানুষের মুখ বলিয়া মনে হয়।

:১শ চিত্র

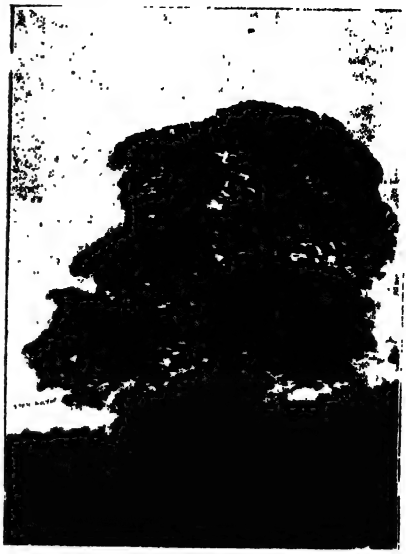

১৩শ চিত্র

গাছকে ইচ্ছামত ছাঁটিয়া বহু প্রকার জীব-জন্তুর আকার এবং বিচিত্র বেড়ার সৃষ্টি হইতেও দেখা যায়। ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ চিত্র তাহারই ছবি। ১৭শ সংখ্যক ছবিখানি দেখিয়া মনে হয়, এক পাটি মখমলের ভাল জুতা। কিন্তু উহা এক পাটি ছেঁড়া জুতা বহু দিন পড়িয়া থাকিবার পর শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ছোট ছোট ফুলের গাছ সাজাইয়া ও ইচ্ছামত ছাঁটিয়া বহুবিধ দ্রব্যের অনুরূপ ও সুন্দর মূর্ত্তি করা হয়, ১৮শ সংখ্যক ছবিখানি .ঐ প্রকারে সৃষ্ট নৌকা ও মাঝির ছবি।

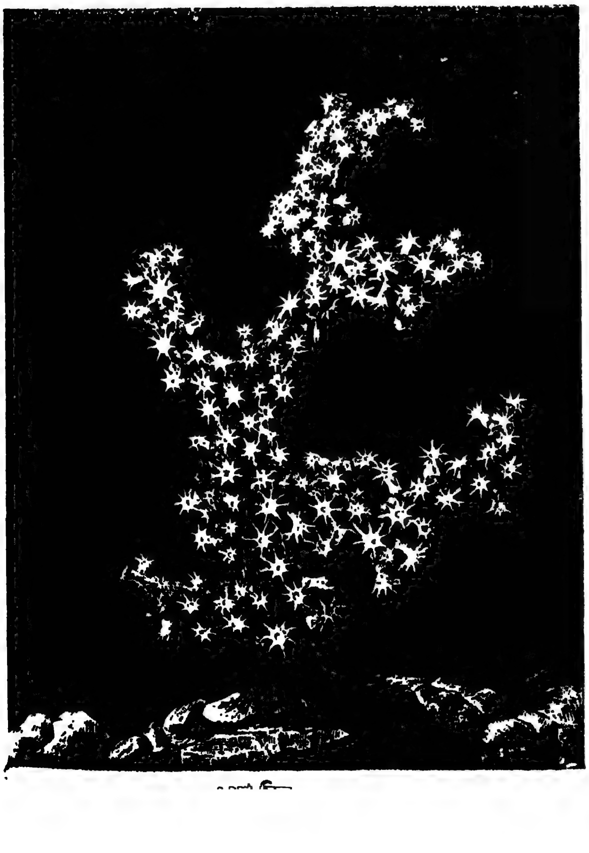

১৫শ চিত্র

১৬শ চিত্র

১৯শ সংখ্যক চিত্রখানি দৈবক্রমে হইয়াছে। উহা একখানি ব্লটিংয়ে ছাপা কালীর ছাপ মাত্র, দৈবক্রমে একটি ছেলে বা মেয়ের ছবির মত হইয়া গিয়াছে।

১৭শ চিত্র

১৮শ চিত্র

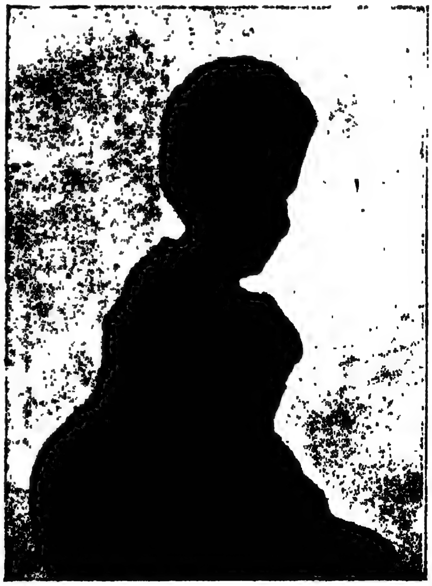

১৯শ চিত্র

পরবর্ত্তী (২০শ) চিত্রখানিও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। উহাতে দুইখানি তক্তায় হাঁসের মত ছবি দেখা যায়। বিলাতের বেরওয়েল নামক স্থানের পশ্চিমে শেল্‌ড়ন্ নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীর একটি গাছ চিরিয়া এই তক্তা দুইখানি পাওয়া যায়। তথায় একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে;—তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৬০১ খৃষ্টাব্দে) একটি হংস উড়িয়া এই গাছের নিকট আসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। তদবধি লোকের বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত হংস ঐ গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং এই হেতু উহাকে হংসবৃক্ষ বলা হইত

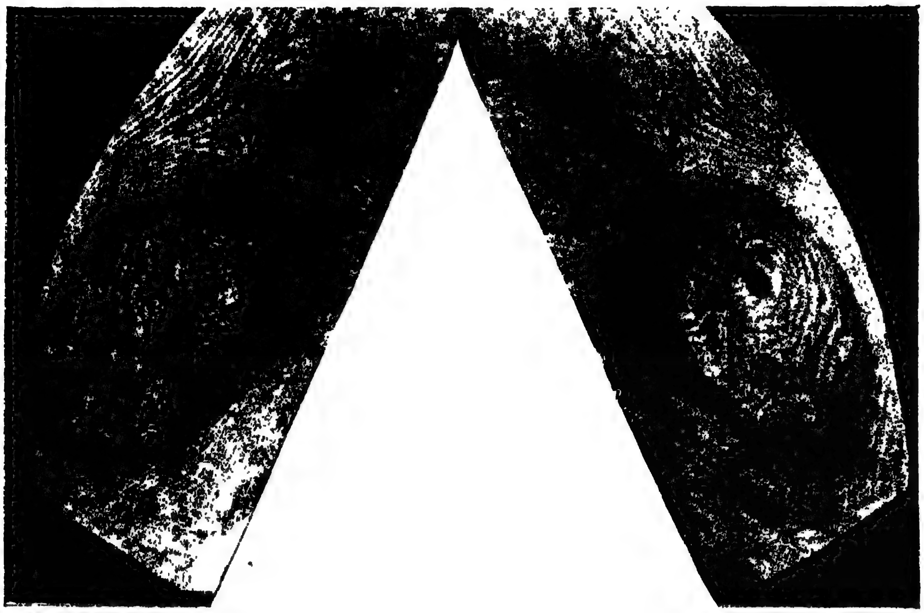

২০শ চিত্র

২১শ চিত্রখানি দেখিলে একটি উপবিষ্টা রমণীর ছবি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহাও একটি পাহাড়ের অংশবিশেষের ফটোচিত্র মাত্র। রমণী-মূর্ত্তির পশ্চাতে উহার দক্ষিণ-দিকে ছায়ার মধ্যে আর একটি অতি সুচিত্রিত নারীর মুখ দেখিতে পাইবেন। ২২শ সংখ্যক ছবিখানিও একটি পাহাড়ের উপরের উপলখণ্ডের ছবি, উহার মধ্যেও কোন জীবের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

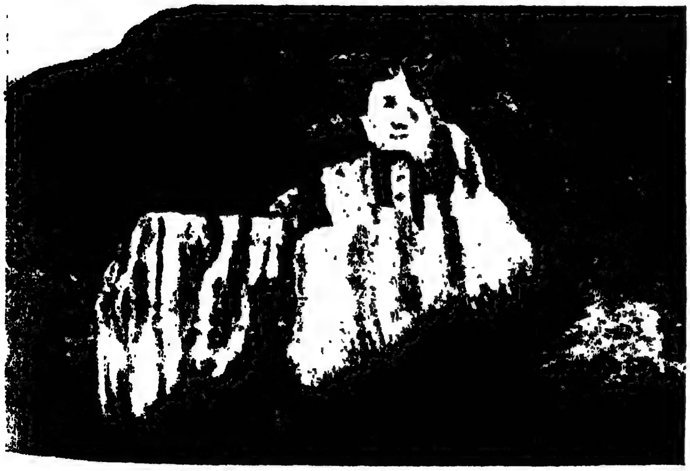

২১শ চিত্র

২২শ

পাহাড়-পর্ব্বত এবং মেঘের মধ্যে সময় সময় বহুপ্রকার জন্তু-জানোয়ারের আকৃতির মত দেখা যায়। তাহার মধ্যে এক একটির সাদৃশ্য এত অধিক যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ২৩শ সংখ্যক চিত্রে পাঁচটি পাহাড়ের অংশবিশেষের ছবি আছে। সকলগুলিই প্রায় মানুষের মাথা ও মানবমুখাকৃতি। আসামের হাতীশুঁড়ো পাহাড় দেখিতে ঠিক হাতীর শুঁড়ের মত এবং আবু পর্ব্বতের উপর ভেকাকৃতি পর্ব্বতটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শ চিত্র

২৪শ সংখ্যক ছবিখানি শিল্পীর খেয়ালে অঙ্কিত। ছবিখানি নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি; উহাও ঐ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে বত্রিশ জানোয়ারের ঘোড়া নামে, বত্রিশ প্রকার জীবের দ্বারা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গঠিত একটি সুন্দর ঘোড়ার মূর্ত্তি আছে। মানুষকে বিভিন্নভাবে অঙ্কিত

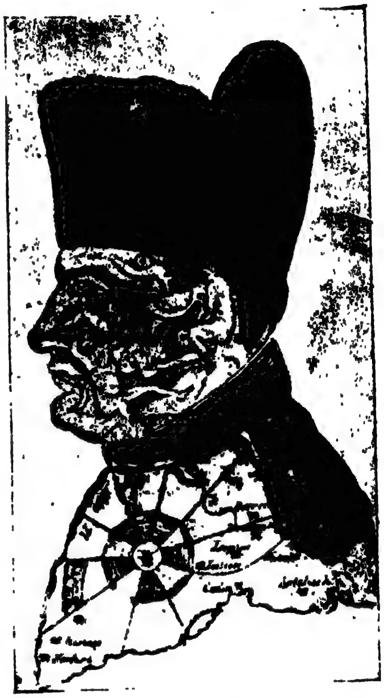

২৪শ চিত্র

২৫শ চিত্র

২৬শ চিত্র

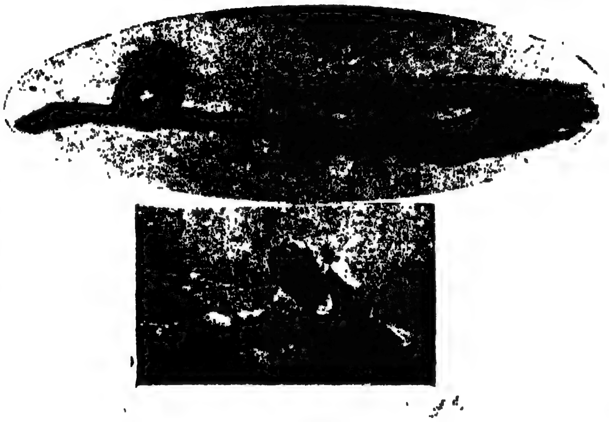

২৭শ চিত্র

করিয়া বর্ণমালার অক্ষর অঙ্কনও হইয়া থাকে। ২৫শ সংখ্যক ছবিতে উহা দেখান হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষর অঙ্কিত হইতেও দেখা যায়। মানুষের ভাল চেহারাও আবার বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করিবার খেয়ালও দেখা যায়। ২৬শ ছবিখানিতে তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। উহার দুইখানি ছবি তুলনা করিয়া দেখিলে ঠিক প্রতিকৃতি ও বিকৃত প্রতিকৃতি বুঝিতে পারা যায়। বিচিত্র দর্পণ হইতে এই ছবি লওয়া হইয়াছে।

২৭শ চিত্রের উপরের অংশটি একটি নারিকেল-মুচির শীষ এবং নিম্নের অংশটি একটি গাছের শুষ্ক ডাল মাত্র। প্রথমটি দেখিতে কতকটা গো-সাপের মত এবং নীচেরটি কতকটা সাপের মুখের মত মনে হয়।

শ্রীহরিহর শেঠ।

গরব

আঁধার হৃদয় উজল করিয়া
এস মোর প্রিয়তম,
প্রতীক্ষায় তব ব্যর্থ হয়েছে
কতই যামিনী মম।
সারাদিন ধরি করি মিছে খেলা
করি নাই কিছু কায,
নিশীথে তখন মনে হয় মোর
আসিবে হৃদয়-রাজ।
কামনা আমার পাইতে তোমারে
সাধনার নাই লেশ,
তোমারি গরবে তবু ডাকি স্বামী
হৃদে এস হৃদয়েশ॥

শ্রীমোহিনী দেবী।

রূপকথা

৩

ছেলে। তুমি যে মোটা চট্‌পানা সয়ের কথা আর শুকোদইয়ের কথা বল্লে, তাই ভাবতে ভাবতে বোধ হয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম্। আজ আর ঘুমোব না, তুমি বল।

মা। না, ঘুম এলে ঘুম তাড়াতে নেই, তা হ'লে অসুখ করে।

ছেলে। না, ঘুম আজ আস্‌বে না। কাল বড্ড পেট ভ'রে খেয়েছিলুম, তাতেই অত শীগ্‌গীর ঘুম এয়েছিল। তুমি তার পর যে সেই রাজবাড়ীর একটা চুরী না কি বল্লে, সেটা মনে আস্‌ছে আস্‌ছে, আস্‌ছে না—সেইখান থেকে আবার বল।

মা। তবে শোন্—উদ্ধব ঘোষের গরু ত ফিরে এল, তার পর রাজবাড়ীতে আবার একটা মস্ত চুরী হয়ে গেছে। সুয়োরাণী রাত্তিরে শোবার আগে তাঁর জরি-মখমল-জড়ানো বেতের পেটিটির ভেতর কতকগুলি হীরে, মতি, জড়োয়ার অলঙ্কার—

ছেলে। অলঙ্কার কি মা?

মা। এই গয়না। আমরা যেমন গয়না পরি, রাণীরে তেম্‌নি অলঙ্কার পরেন।

ছেলে। আর আমরা যেমন খাই?

মা। রাণীরে ভোজন করেন।

ছেলে। শুই?

মা। রাজা-রাণীরে শয়ন করেন।

ছেলে। শয়ন, ভোজন, অলঙ্কার। এইবার বল মা, বল—

মা। হ্যাঁ, তা রাণী অলঙ্কার খুলে পেটিতে চাবী বন্ধ ক'রে শয়ন করেছিলেন, সকালে উঠে তত নজর করেন নি, একটু বেলা হ'তে দেখলেন, পেটির চাবী ভাঙা—গয়না নেই। রাণী ত রেগে আগুন থেকে জলে পড়েন ত জল থেকে আগুনে পড়েন। দাসী, বাঁদী, সখী, সহচরী, লোকজন সবাই ত ভয়ে আড়ষ্ট—এ ওর মুখের দিকে চায়, ও ওর মুখের দিকে চায়। রাজার কাছে খবর গেল; কোটালকে ডেকে হুকুম দিলেন যে, সাত দিনের ভেতর যদি গয়না না পাওয়া যায় ত তার সপুরী একগাড়ে ক'রে মশানে বলিদান হবে। কোটাল দাড়ী-গোঁফ মুচড়ে দেউড়ীতে ব'সে চাকর-দাসীদের ধ'রে তাদের ওপর কত তম্বী কল্লে, কাকেও বা বেঁধে নে গিয়ে ঠাণ্ডা গারদে পুর্‌লে, তার পর গ্রামে এর বাড়ী ওর বাড়ী ঢুকে তাদের বিছানা-পত্তর, বাসন-কোসন ছড়িয়ে খানাতল্লাসী ক'রে শেষ আপনার বাড়ী গিয়ে শোবার ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে পড়লো। নায়-ও না, খায়-ও না—ওঠে-ও না। কপাটের শেকল নেড়ে নেড়ে ডেকে ডেকে কোটালনীর ত হাতে ব্যথা ধ'রে গেল, গলা শুকিয়ে গেল। শেষে মাগী যখন চৌকাঠের কাছে আছাড় খেয়ে চীৎকার ক'রে কান্না সুরু কল্লে, তখন কোটাল রাঘব জোয়ারদার উঠে দরজা খুলে দিয়ে বল্লে, "আর কাঁদা-কাটা কেন? সীঁথির সিঁদুর মোছ, হাতের শাঁখা খোল,—আমার হয়ে গেছে।"

কোটালনী। ও মা, সে কি গো—অমন কথা মুখে এনো না। আমি সবে এই নতুন বাঁউড়ী গড়াতে দিয়েছি।

ছেলে। এই মা ভুলে গ্যাছে, বাঁউড়ী না বাঁউনী—আমি জানি না বুঝি—পোষমাসে সেই পিঠের দিনে!

মা। তোর কেবলই খাই খাই। বাঁউড়ী—ঐ বাউটির মত একখানা হাতের গয়না।

ছেলে। বাউড়ী পরে শাউড়ী—

মা। নে, চুপ কর্, গল্প শুনিস্ ত শোন্। কোটাল বল্লে, 'সপুরী একগাড়ে যাবে—সাত দিন পরে সপুরী একগাড়ে যাবে—ছোটরাণীর গয়না চুরী গেছে, সাত দিনের মধ্যে মাল শুদ্ধ চোর না হাজির ক'রে দিতে পাল্লে সবার মুণ্ডু মশানে যাবে, গয়না পরবে কে?'

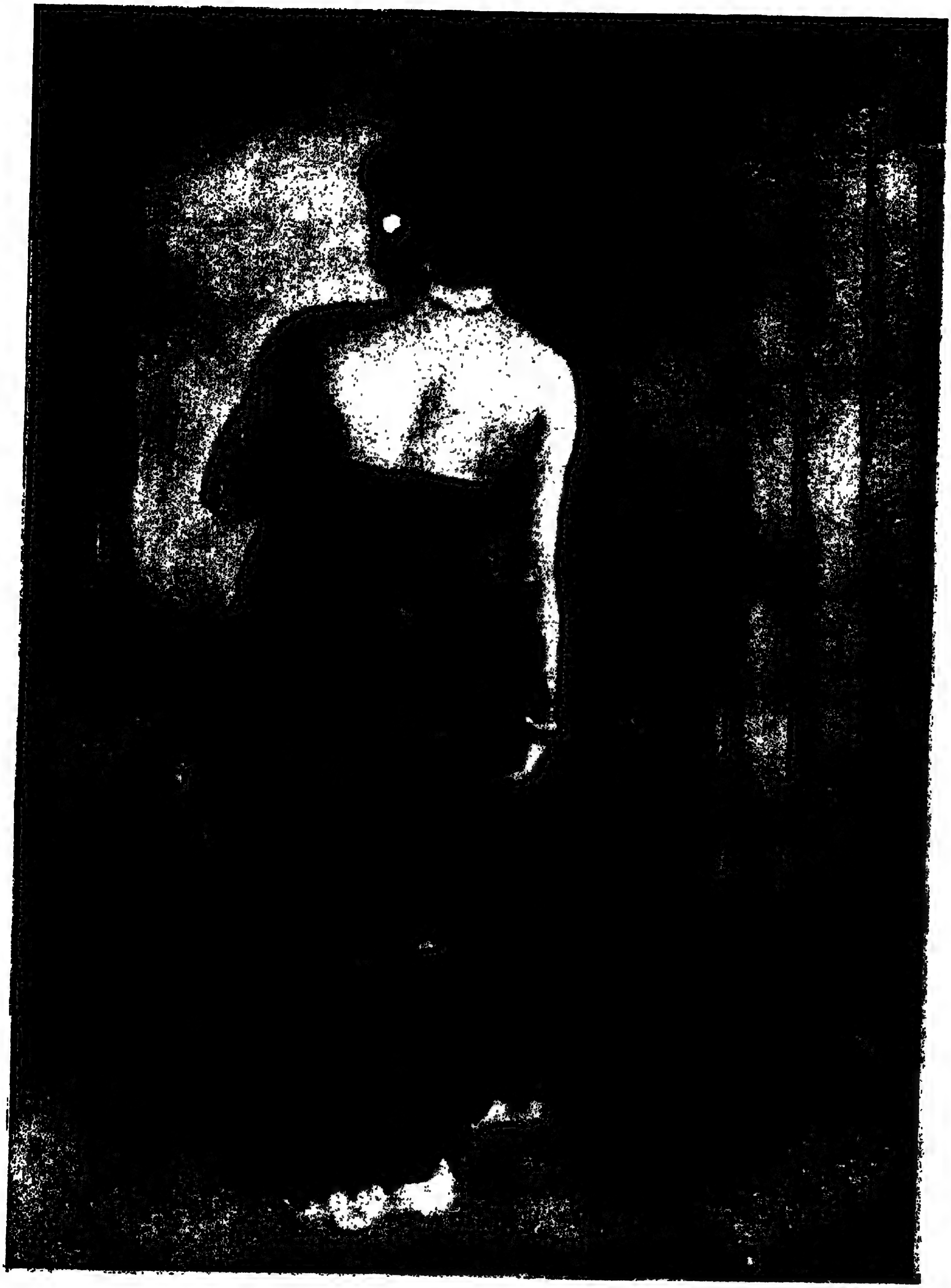

আসার আশায়

সুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কোটালনী। কোথাকার চোর কল্লে চুরী আর মুণ্ডু যাবে তোমার !

কোটাল। যাবে না ? আমায় মাসে মাসে অতগুলো টাকা তঙ্কা দেয় কেন ? রেয়োতদের ঘরে চুরী গেলে মাল যদি না বের ক'রে দিতে পারি, তাদের বাসন হোক্ কোসন হোক্, সোনা-রূপো হোক্, আমায় ঘর থেকে দিতে হবে না ?

কোটালনী। ও মা, তবে ও চাক্‌রী নেওয়া কেন ? আমি বলি, কোটালের চাক্‌রী বেশ চাক্‌রী—একে ধর্‌ছে, ওকে মার্‌ছে, হাজতে জেলে পূর্‌ছে—রাজার চেয়ে-ও মান ! ও মা ! এ ঘর থেকে ট্যাকা লোক্‌সান্ দিয়ে –

কোটাল। আছে আছে সে, তেমন রাজ্যি আছে, সেখানকার কোটাল যদি হতুম—এই চুরী ধরতে না পাল্লেও খালি তদারকের জোরে আমার মাইনে বেড়ে যেতো।

এই ব'লে কোটাল আবার শুয়ে পড়লো। ছ্-দিন গেল, তিন দিন গেল, সাত দিন বই ম্যাদ নয়, ক্রমে পাঁচ দিনের দিন কোটালনী দাওয়ায় ব'সে কাঁদ্‌ছে, এমন সময় উদ্ধবের মাসী দুধ দিতে এসে কোটালনীর চোখে জল দেখে অবাক্ হয়ে গেল। পাঁচ সাত বার জিজ্ঞেস করার পর কোটালনী বল্লে যে, শুনিস্ নি, রাজ্যিময় রাষ্ট হয়েছে সুয়োরাণীর হীরে জহরৎ চুরী গ্যাছে, সাত দিনের ভেতর জিনিষ বের ক'রে দিতে না পাল্লে তোমাদের কোটালের মাথা যাবে ? এই আজ পাঁচ দিন হ'ল, এখনও কোন আস্কারা হয় নি।

উদ্ধবের মাসী বল্লে, "ও মা, এই, তা' এদ্দিন বল নি কেন ?"

কোটালনী। তা কি মা জানি, তুমি চোর ধত্তে শিখেছ ?

উদ্ধবের মাসী। না মা, আমি কেন চোর ধরতে শিখবো ? আমার ওপর রাগ কর কেন ? রায় মশার ছেলে নিশি বদ্দিকে ডেকে পাঠালেই হ'ত।

কোটালনী। সেটা ত শুনেছি একটা মুখ্‌খু।

উদ্ধবের মাসী। আমরাও তাই মনে করতুম গো—মনে করতুম ; কিন্তু উদ্ধবকে ওষুধ খাইয়ে তার হারা গরুকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সবাইকে অবাক্ ক'রে দিয়েছে মা। আমার কথা শোন—কোটাল মশাইকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও, এখুনি সব সুরাহা হবে।

হুতোশের সময় লোকের আর জ্ঞানগোচর থাকে না। কোটালগিন্নী বুঝিয়ে সুঝিয়ে সোয়ামীকে নিশি বদ্দির কাছে পাঠিয়ে দিলে। নিশিকান্ত চুরীর সব কথা শুনে কোটালকে জিজ্ঞেস কল্লে, যে মহলে চুরী হয়েছে, সেখানে রাত্তিরে কজন সেপাই পাহারায় থাকে ? কোটাল উত্তর কল্লে, জন দশ বারো হবে। 'কদাচিৎ কুপিতা মাতা' মন্তরটা একবার আউড়ে নিয়ে বদ্দি ব'লে দিলেন যে, তাদের পেত্তেককে আজ বিকেলে আধ সের ক'রে হত্তুকী বেটে গরম ক'রে খাইয়ে দাও গে।

কোটাল ত অবাক্ ! নিশি বল্লে, "হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কি ? আমার কথায় পিত্যয় না হয়, উদ্ধব ঘোষকে জিজ্ঞেস ক'রে যাও।" কোটাল মনে মনে ভাবলে যে, মরে মরবে সেপাইগুণোই মরবে—আমায় ত আর খেতে হবে না, তাই ফিরে গিয়ে সেই ব্যবস্থামতই কায কল্লে।

রাত্তির ছ-ঘড়ির পরই ওষুধের ফল ফল্‌তে আরম্ভ হ'ল ; বার পাঁচ ছয়ের পর থেকেই সেপাইরা কোর্ত্তা গায়ে দেওয়া পাগড়ী বাঁধা ছেড়ে দিলে, ঐ এক একটা জাঙিয়া পরেই রইলো। অন্দরের একটা ছোট মহলে কেউ বড় থাকতো না, রান্নাবাড়ীর যত ছাইপাঁশ জঞ্জাল, ছুতো হাঁড়ী সেইখানেই গাদা হ'ত। ছ'মাস ছ'মাধ্র জমা হওয়ার পর রাজবাড়ীর হাড়ী-জমাদার এক এক দিন সেইগুলো পরিষ্কার করিয়ে দিত। এবার অনেক দিন পরিষ্কার হয়নি, স্তূপাকারে ছাই জমেছে। সে মহলের সেপাইটা বন্দুক ঘাড়ে পাহারা দিচ্ছিল, সে বেচারা একে পেটরোগা, তার ওপর ঐ একতাল হরতুকী খেয়েছে, তার আর হাতের জল শুকুচ্ছে না, হাতে মাটী কচ্ছিল সে গাদা ভেঙে ভেঙে ছাই সরিয়ে সরিয়ে, রাত যখন প্রায় আড়াই পোর, তখন তার হাতে কি একটা ঠেকলো; টেনে বের ক'রে দেখে যে, একটা ন্যাকড়া-বাঁধা পুঁটলী। তখন সে কষ্টে-স্রেষ্টে উঠে একটা মশালের আলোর কাছে নিয়ে খুলে দেখে যে, পঁইচে, কাঁকণ, গোঁফহার, সাতনর,মুক্তোর মালা, মাকৃড়ী, চৌদানী, মাছ আরও কত কি গয়না একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে, তখন সেপাই সাহেব একেবারে চীৎ হয়ে প'ড়ে ভাঙ্গা গলায় 'জমাদার জমাদার' ব'লে চেঁচাতে লাগলো। জমাদারটা

ছিল ভোজপুরে—নাম তার ঝণ্ডা সিং—সে একেবারে 'কা হুয়া, কা হুয়া—'

ছেলে। ও মা, শেয়াল না কি ?

মা। না, খোট্টারা যখন 'কি হয়েছে' জিজ্ঞেস করে, তখন অম্‌নি ক'রে শিয়াল-ডাক ডাকে। সে ঐ রকম হুয়া হুয়া করতে করতে এসে দেখে যে, সব গয়না বেরিয়েছে। তখন আহ্লাদে সব একেবারে হৈ-চৈ আরম্ভ কল্লে, বাড়ীর লোকজন চাকর-বাকর সব জেগে উঠলো, খবর পেয়ে কোটাল ত এক নিশ্বেসেই এসে হাজির। এই সব করতে করতেই রাত্রিপ্রভাত হয়ে গেল। রাজা-রাণী উঠে গয়না পাওয়া গেছে শুনে একবারে আহ্লাদে আটখানা !

ঝিয়েরা এ বলে, 'কেমন, আমি বলেছিলুম', ও বলে, 'কেমন, আমি বলেছিলুম', এ বলে, 'ধম্মের কল, বাতাসে নড়ে', আর এক জন বলে, 'গণক ঠাকুর ত ঠিক গুণে বলেছিল যে. চালের বাতায় গোঁজা আছে, তা চালের বাতা আর ছায়ের গাদায় তফাৎ কি বল,—হ্যাঁ গা !'

কোটাল হাতে হাতে পাঁচ শো টাকা বখশিস্ পেলে আর তার মাইনে বেড়ে গেল। কোটালনী নতুন বাঁউড়ী পরলে। যে সেপাইটের হাত দে গয়না বেরিয়েছেল, সে দারোগা হয়ে দিনরাত ঘুমোবার ছুটী পেলে; কেবল মুঙ্গলী ব'লে একটা নতুন ঝি মাসকতক হ'ল অন্দরে ঢুকেছিল, তাকে আর সে দিন থেকে কেউ দেখতে পেলে না।

* * * *

এখন থেকে নিশি কোবরেজের নাম-ডাক বেশ জেঁকে উঠল; রাজসভায় যাওয়া-আসা চল্‌ল, রাজা কখনও কখনও মুখের দিকে চেয়ে দু' একটা কথাও কন। নতুন রাজ-বদ্যি দু'একবার কবরিজি শাস্তরের বচন আউড়ে নিশিকান্তর বিদ্যে পরীক্ষে করবার চেষ্টা পেয়েছিলেন; নিশিবদ্যি কিন্তু বিদ্যের বড়াই ত আর করতো না যে, তাঁকে পেশ্ন ক'রে ক'রে ঠকাবেন, যিনিই যা বলুন, আর যিনিই যা জিজ্ঞেস করুন, কোকনের মুখে এক উত্তুর ;—

"কদাচিৎ কুপিতা মাতা ন কুপিতা হরীতকী।"

ছোট রাণীর চোরাই গয়না ফিরে পাওয়ার পর থেকে অন্দরেও কোবরেজ কোকনের খুব নাম জাহির হয়েছে, সিধে-পত্তর, দই-মাছ, ছানা-মাখন, তসর-গরদ প্রায়ই সওগাদ যায়।

এ দিকে ইচ্ছে চিরকালটাই ঘুরে মরে সাধু-সন্ন্যাসী গুণী লোক খুঁজে খুঁজে; যাকে দেখে, তারই কাছে কাঁদাকাটা ক'রে বড় রাণীর জন্যে ওষুধ চায় - যাতে রাজা বশ হয়; কত শেকড়-মাকড় জড়িবুটী যে মাগী লুকিয়ে লুকিয়ে সুয়ো রাণীর শোবার ঘরের ঈশেন কোণে নৈঋ'ত কোণে পুঁতেছে, তার আর ঠিকেনা নেই,—

ছেলে। ঈশেন কোণ নৈঋ'ত কোণ কোন্ দিকে মা ?

মা। অ কপাল, এও জানিসনি, পোড়া গুরু মিন্‌ষে করে কি ?

ছেলে। খালি শক্ত শক্ত বানান জিজ্ঞেস করে, 'বক্ষু, শঙ্খবণিক', 'মদ্‌গুর মৎস্য' আর না বল্‌তে পারলেই নাড়ুগোপাল ক'রে দেয়।

মা। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম চিনিস্ ত ?

ছেলে। সেই যে তুমি ব'লে দিয়েছিলে, বড় পিসীমার বাড়ী পশ্চিমে আর মামার বাড়ী উত্তুরে; রত্‌নি দিদির শ্বশুরবাড়ী পুবে, না মা ?

মা। হ্যাঁ, এই সূয্যি ওঠে পুব্বদিকে, এইটে মনে রাখিস। ঈশেন-কোণ হচ্ছে কোন্‌টা জানিস, এই উত্তর-পুবমুখো, আমাদের খেজুরগাছটা যেখানে. আর খেজুর-গাছটার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নে যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটা হবে, সেইটে নৈঋ'ত।

তার পর শোন; ইচ্ছে ভাবলে যে, কোবরেজ ওষুধের গুণে হারা-গরু গোয়ালে ফিরিয়ে এনে দিতে পারে, ছেয়ের গাদা থেকে হীরে-মতির সাতনর বের ক'রে দিতে পারে, সে কেন না উটকো সোয়ামী বশ ক'রে দিতে পারবে ? এক দিন দুপুরবেলা ইচ্ছে আপনার আঁচলে খানকতক মট্‌কা তেঁতুল বেঁধে নিয়ে আর তার গামছাখানা ভ'রে নিজের ভানা সেরকথানেক মুড়ীর চাল সঙ্গে নিয়ে নিশি কোবরেজের বাড়ী গেল।

ছেলেটা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। মা বলে, "ও কি রে অলপ্পেয়ে, হাসলি কেন ?" ছেলে বল্লে, "দেখ না মাগীর বুদ্ধি, হাসব না ? অত বড় কোবরেজ, যাদের ছেরাদ্দয় ক্ষীর-দয়ের ফলার হয়, তাদের দিতে গেল কি না কাঁচা তেঁতুল আর মুড়ীর চাল !"

মা। আঃ নিব্বুদ্ধি, এ-ও জান না, ও দিতে হয়—দিতে হয়, মানুষ-মানুষেত্তা রাখতে গেলে লোকের বাড়ী

শুধু হাতে যেতে নেই। তুই যখন বড় হবি, আমাদের এই জমীদারের বাড়ী যদি দুটো চালতা হাতে করেও যাস, দেখবি, মেজমশাই কত আদর করবেন। কোকন ওই তেঁতুল ক'খানি আর মুড়ীর চাল এক জন চাকরের হাতে ক'রে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, "কি ইচ্ছে, কি মনে ক'রে? কোন অসুখ-বিসুখ না কি? ও আর হাত দেখতে হবে না; কদাচিৎ কুপিতা মাতা—"

ইচ্ছে। আর আমার মাতা আর আমার মুণ্ডু! এ পোড়া শরীলে কি আর রোগ-ভোগ আছে, সকল বালাই কেড়ে নিয়ে যম আমার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করেছে। মরি কোবরেজ বাবাঠাকুর ওই রাণী মাগীর জন্যে, বড় দুসখু গো বড় দুসখু, মায়ায় প'ড়ে আছি, ছেড়েও যেতে পারিনি, তাই ভাবনু, বিশু বদ্যির ব্যাটা—অ বাবা, তোমার বাপ আমায় বড় ভালবাসতেন, নীলুর জন্যে কত রস-সিন্দুক যে তাঁর কাছে চেয়ে চেয়ে নিয়ে গেছি, তাই আপনার লোক বলেই তোমার কাছে এসেছি, লুকিয়ে বল্‌ছি,—তোমার ধনে-পুত্তুরে লক্ষ্মীলাভ হোক বাবা, তুমি যে হমুহর কোবরেজ হয়েছ—তুমি সব করতে পার; কোন একটা ওষুধ-পত্তর দিয়ে যদি বড় রাণীকে রাজা মশাইএর সুনজরে তুলে দাও।

কোবরেজ বল্লেন, "এর আবার ভাবনা কি, এখনই যাও, তিন পো হর্ত্তুকী বেটে গরম ক'রে ফুটিয়ে রাণীমাকে খাইয়ে দাও।" ইচ্ছে হর্ত্তুকী কুড়ুতে গেল।

কোকন জান্‌ত, তার বাপের হাত খুব দরাজ ছিল; তিনি ধামাভরা চাল, কোঁচড়ভরা কড়ি বামুন-বোষ্টমকে দিতেন, কাযেই ওষুধ যে তিনি চিম্‌টি কেটে তুলে কারুর হাতে দিতেন, তাঁর ছেলে এ কথা মনে করতে পারতো না।

* * * *

হর্ত্তুকী কায করতে আরম্ভ করেছে রাণীর ওপর সেই মধ্যাহ্ন রাত থেকে, ভোরবেলা ইচ্ছে দেখে যে, রাণীর চোখ দুটি পাতকোয় ঢুকে গেছে, গা একেবারে হিমাঙ্গ, আর বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্ছে। তখন সে একেবারে উদম্‌চুলে, হাত দু'খানা তুলে চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে উঠনের মাঝখানে আছাড় খেয়ে পড়ল, "ওগো আমার কি হ'ল গো, ওগো আমার বড় মা কোথা গেল গো, ই কি চামারের বাড়ী গো, মানুষ ম'লে কেউ ফিরে দেখে না গো, ওগো, ছোট রাণীর কি দাঁতের বিষ গো! ওগো মা গো, তোমার ইচ্ছেকে সাথে নিয়ে যাও গো!" চারদিক থেকে লোকজন এসে জড় হ'ল—চাকর, ঝি, রাঁধুনী—এ বলে ইচ্ছের কি হয়েছে, ও বলে ইচ্ছেকে ভূতে পেয়েছে। সোনার খাটে ছোট রাণী দাঁতে দাঁতে লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন; রাজা সে দিকে নজর না ক'রে তাড়াতাড়ি রূপোর খড়ম পায়ে দিয়ে ছুটে এসে শোনেন যে, বড় রাণীর ভেদবমি হয়েছে;—আসন্ন কাল। তখন তিনি সেই চন্দনের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করা অঙ্গখানি নিয়ে গোবিন্দমণির গোলপাতার কুঁড়েটির ভেতর ঢুকে রাণীর শিয়রের কাছে তক্তপোষের এক কোণে বসলেন। রাণীর তখন গলা ব'সে গেছে, আস্তে আস্তে 'পায়ের ধুলো' এই কথাটি ব'লে হাতের চেটোখানি বাড়িয়ে দিলেন। রাজার দু'চক্ষু জলে ভেসে যাচ্ছে, পাদ-পদ্মখানি খড়ম থেকে তুলে বুড়ো আঙুলটি সতীলক্ষ্মীর হাতের চেটোয় ঠেকালেন।

তখন রাজার সব আগেকার কথা মনে আস্‌তে লাগল। সেই তের বছর বয়সে, সাত বছরের মেয়ে গোবিন্দমণিকে গাঁটছড়ায় বেঁধে ঘরে এনে দুধে আল্‌তায় দাঁড় করানো, সেই একসঙ্গে বাগানে ছুটোছুটি ক'রে খেলা, গাছে উঠে পাকা পেয়ারা পেড়ে বউকে দেওয়া, সেই কত হাসি, কত ঝগড়া; তার পর বয়স একটু বেড়ে উঠলে একসঙ্গে কত আমোদ, কত আহ্লাদ; আর তার পর ছোট রাণী ঘর করতে আসার পর থেকে বড় রাণী আছে কি নেই, এ খবরটি পর্য্যন্ত না নেওয়া। রাজার মনে বড় ব্যথা লাগল,—তিনি মেয়েমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন।

ছেলে। চুপ কর্ মা, চুপ কর্—আমার কান্না পাচ্ছে।

মা। তোর আবার কি হ'ল?

ছেলে। বাঁচিয়ে দাও মা, বাঁচিয়ে দাও—বড় রাণীকে বাঁচিয়ে দাও, আমি রাজার কান্না শুন্‌তে পারব না।

মা। সব চোখের জলই গপ্প শুনে ফেলে দিবি ত আমি ম'লে কি করবি?

ছেলে। তুমি ম'লে তোমায় মারব, আর তিন দিন ভাত না খেয়ে বামুন মাসীমার বাড়ী লুকিয়ে থাকব, তখন তুমি টের্‌টি পাবে মজা! কবরেজ হর্ত্তুকী খাইয়েছে, তুমি একটা টিক্‌টিকি মিক্‌টিকি যা হয় খাইয়ে বড় রাণীকে বাঁচিয়ে দাও।

মা। টিক্‌টিকি খেলে কি ব্যামো ভাল হয় না কি ?

ছেলে। হয় না বৈ কি, তুমি বড় জানো ! মোড়ল মেসোর ময়না পাখীটা যখুনি চোখ বুজে ঝিম্ মেরে থাকে, ছাতু খায় না, অমনই মেসো একটা টিক্‌টিকির ন্যাজে বাড়ি মারে আর ন্যাজটা নড়তে থাক্‌তে থাক্‌তেই ময়নাটাকে খাইয়ে দেয়, খানিক পরেই পাখীটা তড়ব’ড়ে হয়ে ওঠে।

মা। তা রাণীকে আর টিক্‌টিকি খেতে হবে না, নারায়ণের ইচ্ছেয় যা হবার হবে। রাণী বল্লেন, “মহা-রাজ, তুমি কেঁদ না, আমি ম’লেই সবার মঙ্গল।” রাজা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাণীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আর বল্‌লেন,—“রাণি, আমায় মাপ কর, আমি বড় অন্যায় করেছি, কুললক্ষ্মীকে যন্ত্রণা দিয়েছি ; আমি লক্ষ্মীনারায়ণের দোরে হাজার সোনার তুলসী দেওয়াচ্ছি, মাখম-মিছরীর শেতল দিচ্ছি, তুমি সেরে উঠবে।” রাণী আস্তে আস্তে ব’ল্লেন, “আমার আর বেঁচে লাভ কি ?” রাজা বল্‌লেন, “সে কি, তুমি সেরে ওঠ, আমি লক্ষ্মীনারায়ণজীর নাম ক’রে শপথ কচ্ছি, এবার তিনি তোমায় আমায় ফিরিয়ে দিন, আবার তোমায় পাটরাণী ক’রে সোনার খাটে শোয়াবো, মহলের ওপর তোমার যে আধিপত্য ছিল, সেই আধিপত্য আবার বজায় হবে। গা যেন একটু গরম হচ্ছে হচ্ছে বোধ হয়, আমি শীগ্‌গির হাতে মুখে একটু জল দিয়ে আবার আস্‌ছি।”

কোকন বদ্যির বাপের পুণ্যিতে তিন দিনের দিন রাণী বেশ ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসলেন। হর্ত্তুকীর নেশা কেটে গেছে দেখে ইচ্ছে তখন খোল-ব্যাসন মাখিয়ে রাণীকে নাইয়ে ধুইয়ে দিলে, গজদন্তর চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে বেশ-বিন্যেস কল্লে, পাটের শাড়ী পরালে, পায়ে আল্‌তা, কপালে চন্নন, গায়ে গয়না পরিয়ে বড় রাণীকে তাঁর আগে-কার মহলে নিয়ে গেল। একে রাজার মুখের রাজ-বাক্যি, তার ওপর লক্ষ্মীনারায়ণের নামে শপথ, কাযেই রাজাকে প্রিতিজ্ঞে পালন ক’রে গোবিন্দমণির মন্দিরে যাতায়াত করতে হ’ল ; সকল কাণ্ড দেখে শুনে বুঝে ছোটরাণী আর দুটি ঠোঁট এক কল্লেন না।

ছেলে। আর কোকন কোবরেজ রাজবদ্যি হ’ল ?

মা। না, এখনও হয় নি, আরও চিকিচ্ছে বাকী আছে, দাঁড়া।

ছেলে। ইচ্ছের কি হ’ল ?

মা। ইচ্ছের আবার কি হবে ?

ছেলে। তা বুঝিচি, ঝি কি না ! – দুঃখের দিনে যত্ন কল্লে ইচ্ছে, ওষুধ এনে খাওয়ালে ইচ্ছে—

মা। হাঁ, হাঁ, হয়েছে হয়েছে, এখন ঘুমো।

ছেলে। হাঁ, তা বৈ কি, শেষটুকু শুন্‌ব না ?

মা। আজই ?

ছেলে। হাঁ।

মা। নে, তবে ভাল ক’রে শোন্। সে কালের রাজারা নড়াই-ঝগড়া ভালবাস্‌তো না। সভায় ব’সে রামায়ণ-মহাভারতের কথা শুন্‌তেন, কেউ বা কবিতে, কেউ বা হেঁয়ালী এই সব বল্‌তো ; হ’ল বা খানিক পাশাই খেল্‌লেন, এই রকম ক’রেই রাজকার্য্য চল্‌তো। রাজা মাণিকরায়ের রাজ্যির পাশে ছেল এক বৃহৎ নদী, এ পার থেকে ও পারের মানুষ চেনা যেতো না। নদীর ও পারে যাঁর রাজ্যি, সে রাজার কিন্তু বরাবর একটা লোভ ছিল মাণিকরায়ের রাজ্যির ওপর। সে রাজা এর মতন ধর্ম্মভীরু ছিল না, আর তাঁর সেনাপতিটাও কাঠ-গোঁয়ার ; হামেশা তক্কে তক্কে থাক্‌তো আর খবর নিতো, মাণিকরায়ের কত সেপাই, ভাঁড়ারে কত ধন—এই সব।

এখন কত কাল যুদ্ধ নেই, নড়াই নেই, অস্তর-শস্তর সব ভেঙেও গেছে, মরচেও ধ’রে গেছে ; সেপাই পাইক বুড়ো হ’লে, ম’রে গেলে তাদের যায়গায় নতুন লোক ভর্ত্তিও করা হয় নি। কাযেই শ পাঁচ ছয় বই আর নড়ুয়ে সেপাই ছিল না। তারা ডালরুটী খেতো, খঞ্জুনী বাজিয়ে ভজন গাইতো, কখন কখন বা পাহারা দিত আর দু্‌ দশ জন দল বেঁধে সকাল-বিকেল আখড়ায় ডন্-মুগুর করতো। আর বছরে পুজোর সময় এক বার রামনীলে ক’রে খুব ধুমধাম হ’ত।

ছেলে। রামনীলে কি মা ?

মা। সে মস্ত কথা। এক দিন মনে ক’রে দিস্, রামা-য়ণের গল্প বল্‌বো, তা হ’লে বুঝতে পারবি, এখন শোন্। ওপারের রাজা নর্সিং সেনের কিন্তু সেপাই ছিল প্রায় হাজার দেড়েক আর টাঙ্গী, বর্শা, খাঁড়া, তরোয়াল, আর ঢাল, ঢোলক, জগঝম্পে একেবারে মেদিনী কম্পিত। রাজা নর্সিং-এর সেনাপতি কানু নাগ আপনার রাজাকে ভজিয়ে

সজিয়ে ঠিক কল্লে যে, আমরা যদি গিয়ে মাণিক রায়ের রাজ্যে চড়োয়া হয়ে পড়ি, তা হ'লে একবারে মেরে ধুলধাপাটি বাধিয়ে দিতে পারি, আর সমস্ত রাজ্যিটা আমাদের দখলে আস্‌তে পারে। মাটীর লোভ বড় লোভ, রাজা রাজী হলেন। এই একেবারে কাড়া, নাগরা, ঢাক, শাঁক, কাঁসর, ঝাঁজর, শিঙে বাজিয়ে, রং-বেরঙের পাগড়ী বেঁধে, মুখে বুকে এলামাটী মেখে, গলায় রুদ্রাক্ষীর মালা ছুলিয়ে, মালকোচা মেরে পাঁড়ে, তেওয়ারী, মিশির মহারাজরা আর ছুলেপাড়া ঝেঁটিয়ে লাঠি-সড়কি ঘাড়ে বাগ্দী, কেওরা, চাঁড়ালের দল 'কালী মাইকি জয়' ব'লে যুদ্ধযাত্রা কল্লে।

দেড় দিনের পথ, তারা তাঁবু গাড়লে এসে নদীর পশ্চিম পারে।

সেনাপতি কমলনারাণ পিসেমশাইয়ের কাছে খবর এল যে, পাঁচ সাত হাজার ফৌজ নিয়ে কালু নাগ নদীপারে হানা দিয়েছে।

ছেলে। মা, তুমি যে বলেছিলে দেড় হাজার, আবার পাঁচ সাত হাজার হ'ল কেমন ক'রে ?

মা। ওরে বাছা, কথা কানে হাঁটে, তার ওপর অত বড় নদীটে পার হ'তে হ'তে দেড় হাজার আড়াই হাজার হতেই বা কতক্ষণ, সাত হাজার হতেই বা কতক্ষণ। সেনাপতি পিসেমশাই ত শুনেই খুঁটির গা থেকে হরিনামের ঝুলি পেড়ে জপ করতে ব'সে গেল। ভট্‌চার্য্যি মশাইরা শাস্তর ঘেঁটে রাজাকে ব্যবস্থা দিলেন যে, 'মল্লবিগ্ভাধমাধম', আপনি কখনই যুদ্ধ করবেন না—একটা বৃহৎ ব্রাহ্মণরস যজ্ঞ করুন, আর লক্ষ ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোভরা যে মাছুলীটি আছে, সেইটি গলায় দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন।

ছেলে। বানপ্রস্থ কি মা ?

মা। কে জানে বাছা! বোধ হয়, গেরোণের সময় সূর্য্যি যেমন রাহুগেরস্ত হয়, তেমনি গেরোয় পড়লে রাজাদেরও বানপ্রস্থ হয়।

গণক ঠাকুর গুণে বল্লেন, আর তের দিন বাদে রাহুটা স'রে যাবে, তার পর মহারাজের কেউ কিছু কত্তে পারবে না; তখন যুদ্ধ কল্লেও জয়, না কল্লেও জয়; এই তেরটা দিন নারায়ণের ইচ্ছায় কোনমতে কাটিয়ে দিতে পাল্লে হয়।

রাজার প্রেধান পাত্তর উমোচরণ বক্‌সি মশায় বল্লেন, কবরেজ মশায় পুত্তুর নিশি বদ্দি অনেক আশ্চয্যি দেখালে, তাকেই একবার ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা হোক না, যদি এর কিছু বিধেন দিতে পারে। ভটচায্যি মশায়রা হেসে উঠলে-ও রাজা বিপৎকালে তাকে ডেকে পাঠালেন। কোকন এসে সব বৃত্তান্ত শুনে ব'ল্লে, "এর আর ভাবনা কি, বাবার যে দৈবি বিগ্তে ছিল, তার জোরে কি না হ'তে পারে ? 'কদাচিৎ কুপিতা মাতা ন কুপিতা হরীতকী' ", সেনাপতি মশায়ের দিকে চেয়ে বল্লে, "নদীর ধারের গড়ে আপনার এখন কত সৈন্ত মজুত আছে ?" কমলনারাণ বাবু বল্লেন, "মজুতের কথা আর বোলো না বাবাজী, রোগা-ফোগাগুণোকে ধ'রেও বড় জোর শ' সাতেক হবে।" কবরেজের ছেলে বল্লেন, "এক কায করুন, পাঁচমণ হর্ত্তুকী উদুখলে ফেলে কুটিয়ে ফেলুন, তার পর তাকে জল দিয়ে বেশ মাখাজোখা ক'রে বড় বড় মাটীর খুলিতে দিন চাপিয়ে উমুনের ওপর; কুসুম কুসুম গরম থাকৃতে থাকৃতে এক এক জন পাঁড়েকে এক এক লোটা খাইয়ে দিন; প্রাতঃকালেই ওষুধের কায জান্‌তে পারবেন।"

রাত্তিরটা ছেল কেষ্টপক্ষের দশমী কি একাদশী—

ছেলে। একাদশী আমি জানি, যে দিন পিসীমা কিছু খায় না, খালি 'কেষ্ট' 'কেষ্ট' করে।

মা। হ্যাঁ, উ-দিন শেষ রাত্তিরে জোচ্ছোনা কি না, ভোরের আগেই ভোজপুরী মিন্‌ষেরা ঘটী হাতে ক'রে ক'রে চড়ায় যেতে সুরু কল্লে। ও পারে ছেল কালু নাগের চর, সে মনে কল্লে, প্রাতঃ-কীর্ত্তি করতে ত আর কেউ বাকী থাকবে না। যত সেপাই আছে, সবাই ত এক এক বার আসবে। এই সুযোগে এদের কত সন্ত আছে, একবার গুণে নি। সে এক ধামা কড়ি নিয়ে ও পারের ঘাটে একটা গাছের আড়ালে বস্‌লো, এক একটা সেপাই যেই আসে, সে অমনই এক একটা কড়ি তুলে পাশের খালি ধামায় ফেলে; ক্রেমে একসঙ্গে পাঁচ জন, দশ জন, কুড়ি জন ক'রে সেপাই আস্‌তে আরম্ভ কল্লে, আর চরও লোক গুণে গুণে পাঁচ কড়া, দশ কড়া ক'রে কড়ি ও-ধামায় ফেল্‌তে লাগলো। এখন সেপাইরা এক সের পাঁচ পো ক'রে হর্ত্তুকী পেটে পুরেছে, কাযেই তাদের ত আর প্রাতঃকীর্ত্তি নয়, পিত্তি একেবারে ছুমকুটে গেছে। এক

এক জন দশ বার, বারো বার, আরও বেশী বার আস্‌ছে; ওপার থেকে ত আর মুখ চেনা যাচ্ছে না, খালি মানুষ গুণে কড়ি ফেল্‌ছে; বাঁ দিকের ধামায় হাজারখানেক কড়ি ছেল, দেখতে দেখতে তা খালি হয়ে গেল, তখন চর মশাই ধামা পাল্টে আবার নতুন ক'রে কড়ি ফেলতে আরম্ভ কল্লে। দেড় দণ্ড না যেতে-ই সে কড়িও সাবাড়।

ছেলেটা হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো।

মা বল্লে, "হাসিস্ কেন রে ছোঁড়া?"

ছেলে। হাসবো না? বড় মজা—বড় মজা, বেশ গল্প, তুই বল্, তুই বল্। বেরজোবাসীরা দশ বার কুড়ি বার আসে আর চরটাও ধামার ওপর ধামা পাল্টায়,—না?

মা। হ্যাঁ, এই রকম ক'রে সুয্যি ঠাকুর আকাশের ওপর হাত দুই উঠতে না উঠতে-ই এ রাজার সেপাই কড়ির গুণতিতে দশ হাজারের ওপর হয়ে গেল, তখন চরের পো মুখখানা একেবারে পাঙাশে ক'রে কাঁপতে কাঁপতে নাগমশায়কে গিয়ে বল্লে—"ও ঠাকুর, আপনকারে কে কয়েছিল যে, মাণিক রাজার সকল সেপাই গুণলে এক হাজার-ও দাঁড়াবে না? সেই শেষ রাত্তির থেকে গড়ের সেপাইরে এক এক জন ঘটী হাতে ক'রে চড়ায় বস্‌তে সুরু করেছে, আর এই আড়াই দণ্ডের উপুর বেলা হ'ল, তখনও এক দল আস্‌ছে আর এক দল যাচ্ছে, আর এক দল যাচ্ছে, আর এক দল আসছে, প্রাতঃকীর্ত্তি আর ফুরোয় না। নড়ুইটে কি রকম হবে, আপনি বুঝে লও; মুই দশ হাজার অব্দি কড়ি ফেলে গুণলুম, আর পাল্লু না।" নাগ মশায় শুনে ত অবাক্! তবু সন্দ ঘুচুতে আর দু'জন বিশ্বিসি নোক পাঠালেন। তারা ফিরে এসে বল্লে, "ধম্মবতার, চর যথার্থ আজ্ঞে করেছে। এখন-ও আসা যাওয়া চলছে। বাবা! এত ঘটী-ই বা পেলে কোথায়? এই চোদ্দ পনরো হাজার লোককে সড়কি-তলোয়ার ধত্তে হবে না, ওই হাতের ঘটী এক একটা ছুড়ে মাল্লেই আমাদের এই ক'টা লোক নিকেশ। ভাল চান ত—"

নাগ। তাই ত! তাই ত!—

লোক। আর তাই ত, তাই ত নয় কত্তা, রাজ্যিতে ফিরে গিয়ে নিচিন্দি হয়ে তখন হাত-মুখ ধোওয়া যাবে; এখন চুপিসাড়ে ডেরাডাণ্ডা তুলে ফেলুন, বাজুন্দেরেদের মানা ক'রে দিন যে, ঢোলের ঢাকনা না খোলে।

নাগমশায় একটু ঠাউরে বল্লেন,—"তা যুদ্ধে এমন পদ্ধতি আছে, একে পলায়ন বলে না—"

লোক। পলায়ন কেন? পলায় ত শত্তুররা। একে কি বলে সেনাপতি মশায়?

নাগ। একে বলে পিঠপ্রদর্শনের জয়জয়কার। চল, চল, মনে মনে জয় জয় বল্‌তে বল্‌তে চল।

* * * *

কমলনারায়ণবাবু গড়ের নদীমুখো একটা জানালায় ব'সে আল্‌বোলা টানছিলেন, আর আপনার সৈন্যদের পেট খোলসার কাওয়াজ দেখছিলেন; যখন বুঝতে পাল্লেন যে, ও তাঁবু উঠেছে, নিশেনের রাঙা কাপড় সব ছিপের আগায় গুটিয়ে জড়ানো, তখন একেবারে গোঁপে চাড়া দিয়ে এক হাতে ঢাল, এক হাতে তরোয়াল না নিয়ে গড় থেকে বেরিয়ে হেঁকে ডেকে বল্লেন, "লড়াই ফতে।"

ছেলে। এই ভোলাদাদার মত—না?

মা। কে, ভোলা চৌকীদার?

ছেলে। হাঁ, সে অম্‌নি যতক্ষণ চুরি হয়, ততক্ষণ আপনার ঘরে লুকিয়ে থাকে, আবার সিঁদ্ কেটে ঘটী-বাটি সরিয়ে চোরেরা চ'লে যাবার পর, ভোলাদাদা বেরিয়ে কুঁদ্ জেড়ে "দেখে নেব শালাদের, দেখে নেব শালাদের"—বলে না?

মা। ও বীরের ধম্ম, তুই ছেলেমানুষ, কি বুঝবি? শুনিস্ ত শোন্, আমার ঘুম আসছে। কমল বাবু বেরুতেই মুন্ত্রি বেরুলেন, পাত্তর বেরুলেন, সওদাগর, কোটাল, বামুন-ঠাকুরেরা, নিজে রাজা পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়লেন। ঢোল, ঢাক, কাঁসি, কাঁসর সব ঝমাঝম্ বেজে উঠল, বামুন-পণ্ডিতরা সব এক এক জোড়া শাল মর্য্যেদা পেলেন—

ছেলে। বাঃ, বামুনরা কেন পাবে? ওরা ত পালাতে বলেছিল, সেই বান্‌পুস্ত না কি?

মা। ওরে আশীর্ব্বাদ রে হতভাগা আশীর্ব্বাদ।

ছেলে। আশীর্ব্বাদ না নব্বইবাদ, আমি কক্ষণো বামুনদের দিতে দেবো না।

মা। তা দিবি কেন? যেথায় যা পাবি, দিস্ তোর শাশুড়ীকে।

ছেলে। তোমার শাশুড়ীকে।

মা। আমার শাশুড়ী তোর কে হয়, বল দিকিন।

ছেলে। তা কি জানি ?

মা। তোর ঠাকুরমা যে রে, মনে পড়ে না ?

ছেলে। সেই ঠাকুরমা ? ঝালের নাড়ু লুকিয়ে রাখত ? যাক্, তার পর কি হলো ?

মা। আর কি হবে, গল্প ফুরিয়ে গেল।

ছেলে। বাঃ, কব্‌রেজের ছেলে কিছু পেলে না ?

মা। কোকন একেবারে রাজবন্দি হয়ে গেল ; বাপের চেয়েও বেশী মান। রাজবাড়ী থেকে এত সিধে এসেছিল যে, নিজে ঘর বোঝাই ক'রেও গাঁ শুদ্ধু লোককে বিলিয়েছে।

ছেলে। মা !

মা। আবার কি ? ঘুমো।

ছেলে। এই যে ঘুমুচ্ছি। মা !

মা। কি রে ? বল্ না।

ছেলে। মা, আমায় একটা জিনিষ দিবি ?

মা। এত রাত্তিরে আবার কি জিনিষের সখ পড়ল ?

ছেলে। এক দিন মা আমায় একটু হর্ত্তুকী গুলে খাইয়ে দিস্ না।

মা। কেন, হর্ত্তুকী খেতে গেলি কেন ?

ছেলে। এই যদি বুড়কেটা ঝাঁ ক'রে মুখস্থ হয়ে যায়, আর ফলা বানানগুলো আপনা আপনি হাত দে বেরোয়।

মা। ওরে আবেগে ! কোকনের দৈবি বিদ্যে খেটেছিল কি হর্ত্তুকীর গুণে ! তার বাপের ওপর বিশ্বেস, বাপ যা বলেছে, তা মিথ্যে হবে না, এই বিশ্বেস।

ছেলে। তাই না কি ? তবে আমিও বাবাকে খুব বিশ্বেস করবো,—কেমন ? যদি বাবার কথা কখনও না শুনি, তুই আমার কান ম'লে দিস্ ত মা ; অত আদর করিস্‌নে।

মা দুই হাতে ছেলেটিকে আঁকড়ে বুকের ওপর চেপে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

তখন সেই খড়ের চালা সোনায় মুড়ে গেল, গরাণের খুঁটি থেকে চন্দনের গন্ধ বেরুল, কাঠির মাদুর হাতীর দাঁতের শীতলপাটি হয়ে গেল, মায়ে-পোয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, ঘণ্টা বাজছে, কাঁসর বাজছে, শাঁখ বাজছে। আলোর আলোর মালা গেঁথে গেছে। সারা বাঙলা জুড়ে মা দুর্গার আরতি হচ্ছে।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

জমীদার

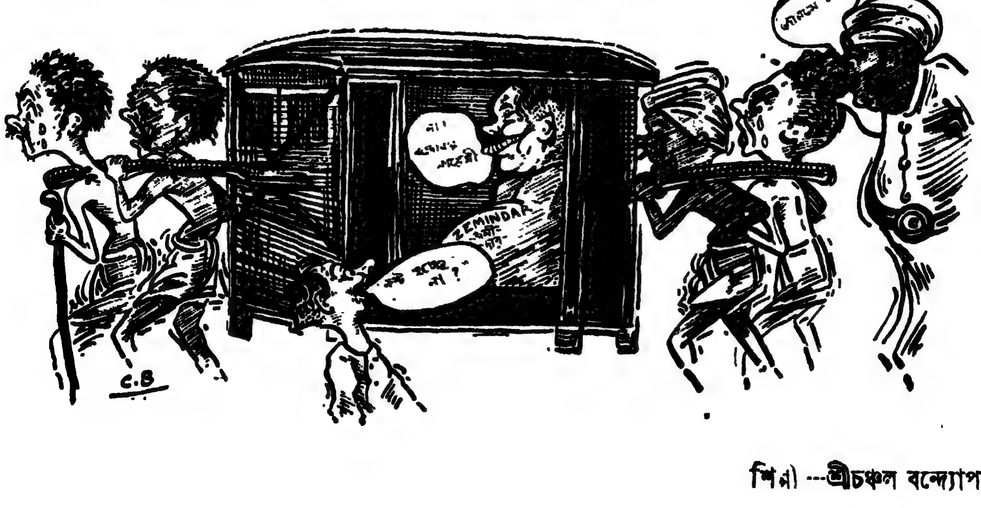

শিল্পী —শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট

বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল কৃষ্ণনগরে শাসমল মহাশয়ের সভাপতিত্ব ও হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহাদের দলপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত এই হেতু ক্ষোভে-রোষে সদলবলে সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার দল যাহাই করুন, বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিনিধিকে যে সভাপতি শাসমল মহাশয়ের অভিভাষণ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, ইহা সত্য। পরন্তু কন্‌ফারেন্সের অধিকাংশ সদস্য হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টও নাকচ করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় স্বরাজ্য দলের প্রভাব-সূর্য্য অস্তমিত হইবার সম্ভাবনা অনুসূচিত হইয়াছে, এ কথা অনেকেই অনুমান করিতেছেন।

প্যাক্টের খাতিরে যতীন্দ্রমোহন অনেক কিছু করিয়াছেন। তিনি ইহার জন্য মেয়র হিসাবে লাট-বাড়ীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তিনি ইহার জন্য হিন্দুর রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনে বাধা সম্পর্কে হিন্দু-সভা সদলবলে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্যাক্টের জন্য তিনি 'জাতি হারাইলেন,' সে প্যাক্টে যে তাঁহার 'পেট ভরিবারও' সম্ভাবনা নাই, তাহা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়রের ব্যাপারে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

ডেপুটী মেয়রের ব্যবহার সম্পর্কে কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহাতে কলিকাতার মুসলমান করদাতারা এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের মুসলমান কাউন্সিলার ও এলডারম্যানগণ প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করিবেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে স্বরাজ্য কর্পোরেশনের অস্তিত্ব সংশয়াকুল হইবে। কর্পোরেশনে প্যাক্ট ভাঙ্গিয়া গেলে অন্যত্র প্যাক্ট অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি?

পূর্ব্বাপর দেশের রাজনীতিক অবস্থার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্যাক্ট অর্থে এ যাবৎ হিন্দুর পক্ষে ত্যাগ-স্বীকারের পর ত্যাগস্বীকার এবং মুসলমানের পক্ষে দাবীর পর দাবী চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমান করদাতারা সভায় বলিয়াছেন, তাঁহারা অনেক ব্যাপারে কর্পোরেশনে হিন্দু কাউন্সিলারগণকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, অপরাধের উল্লেখ না করিয়া তাঁহারা মুসলমান ডেপুটী মেয়রের বিচারে কমিটী নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পীরের সমাধির ব্যাপারে হিন্দু কাউন্সিলাররা তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য ডেপুটী মেয়রকে সমর্থন করিয়াছিলেন। যে হিন্দু কাউন্সিলাররা এমন কায পূর্ব্বে করিতে পারেন, আজ তাঁহারা হঠাৎ বিনা কারণে সেই ডেপুটী মেয়রের প্রতি অন্যায় আচরণ করিবেন কেন? তাঁহারা কি মীনা পেশোয়ারীর কথাটা বিস্মৃত হইয়াছেন? যে ব্যক্তি কমিশনারের আফিসে জবরদস্তি করিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে পারে, তাহার দোস্তরূপে যিনি দেখা দেন, তাঁহার কি কোনও অপরাধ হয় না? কেবল সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতার জন্য ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছে?

কৃতজ্ঞতার সম্পর্কে অনেক কথা উঠিতে পারে। খেলাফৎ উদ্ধারের সময়ে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে কি সাহায্যদান না করিয়াছে? তাহারা খেলাফতের কথা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জনসাধারণকে বুঝাইয়াছে। অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমান খেলাফৎ কাহাকে বলে, জানিত কি না সন্দেহ। তাহাদিগকে এ বিষয়ে অবস্থাভিজ্ঞ করিয়াছে কাহারা? হিন্দুরা নহে কি? খেলাফতের জন্য চাঁদা তুলিয়াছে,—এমন কি, দুঃখ-কষ্ট ও কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে কে? হিন্দুরাও নহে কি? সেই খেলাফৎ উদ্ধার হইয়া গেলে পর মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছেন? দিল্লীর খেলাফৎ কন্‌ফারেন্স সে বিষয়ে মুসলমান নেতৃবর্গের মনোভাব স্বপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান একতার প্রচারক আলিভ্রাতৃদ্বয় হিন্দুদের প্রতি

ঐ সভায় কি বিষ উদ্গিরণ করিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? সুতরাং অকৃতজ্ঞ কে, তাহা জানিতে বাকী থাকে না। খেলাফতের সময়ে এ দেশে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অনেক মওলানা ও মৌলভী গজাইয়া উঠিয়াছিল। খেলাফৎ সমস্যা অবসানের পর ইহাদের কার্য্য কি হইয়াছে, তাহার সন্ধান দেশহিতৈষী মুসলমানরা রাখেন কি? পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে এই যে বহু হিন্দু দেবস্থান ভগ্ন বা কলুষিত হইয়াছে, ইহার মূলে কত মোলভী মওলানার উত্তেজনা আছে, তাহার সন্ধানও তাঁহারা রাখেন কি? ইহার পরেও কি তাঁহারা হিন্দুদিগকে প্যাক্ট ভঙ্গের জন্য অপরাধী করিবেন?

হিন্দু চিরদিনই শান্তিপ্রিয়, সে পরের দেবস্থানকে সম্মান করে—শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত উত্যক্ত না হইয়া তাহারা কলিকাতায় অত্যাচারের উত্তরে উত্তর দেয় নাই। এখনও তাহারা মুসলমানের সহিত সদ্ভাবে থাকিয়া দেশের মুক্তি-সমরে যুদ্ধ করিতে সম্মত আছে। কিন্তু এক পক্ষ অপরের ধর্ম্মের প্রতি ক্রমাগত অবমাননা প্রদর্শন করিলে, অপর পক্ষ কি কেবল প্যাক্টের খাতিরে নীরবে অত্যাচার সহ্য করিবে? মুসলমানদের নিকট যদি ধর্ম্ম আগে ও দেশ পরে হয়, তবে ক্রমে হিন্দুরও পক্ষে তাহা হইবে না কেন? হইলে কেহ তাহাদিগকে অপরাধী করিতে পারেন না। জানি, ইহাতে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে, দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত হইতেছে, পরন্তু এ দেশের মুক্তির পরিপন্থী ইহাতে মহা আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেছে। কিন্তু উপায় কি? প্যাক্ট এক পক্ষে হয় না, উভয় পক্ষকেই ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, অন্যথা প্যাক্টের সার্থকতা কি? বাঙ্গালার হিন্দুর মন্দির ও দেবতা কলুষিত হওয়ায় হিন্দু জনসাধারণের মন এতই উত্তেজিত হইয়াছে যে, এখনই শুনা যাইতেছে, হিন্দুরা বলিতেছে, "স্বরাজ চাহি না, প্যাক্ট চাহি না। আগে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষিত হউক, তাহার পর প্যাক্টের কথা শুনিব।"

এ মনোভাব দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে; কিন্তু না হইলেও উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুসলমান নেতারা যদি এখনও ধীরভাবে এ কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করেন, তবেই মঙ্গল, অন্যথা ইহা হইতে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গির যে হলাহল উত্থিত হইবে, তাহা সমগ্র সমাজ-শরীরকে জর্জ্জরিত করিবে সন্দেহ নাই।

মস্‌জেদের সম্মুখে গীতবাদ্য

কিছু দিন হইতে এ দেশের মুসলমানরা দাবী করিতেছেন যে, মসজেদের সম্মুখে কোনও রূপ গীতবাদ্য হইতে পারিবে না। এই নিষেধাজ্ঞা সকলের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, মসজেদের সম্মুখে গোরা-পল্টন ব্যাণ্ড বাজাইয়া জলস্থল কাঁপাইয়া যায়, মহরমের ভীম কাড়া-নাকাড়া বাজে, বুক চাপড়ানি ও গান হয়, ট্রাম-বাস প্রভৃতির ঘড়ঘড়ানি চলে, অথচ এ সব ব্যাপারে আপত্তির কথা উঠিতে দেখি না। তবেই বুঝা যাইতেছে, মুসলমানের আপত্তি কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রা ও উৎসবে।

বাঙ্গালার লাট-বাড়ীতে এ সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও সন্তোষজনক মীমাংসাই হয় নাই। শুনা যায়, গভর্ণর লর্ড লিটন না কি মুসলমানদের জিদে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, যখন হিন্দু-মুসলমানরা নিজে এ বিষয়ের আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইতে পারিল না, তখন সরকার নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিবেন। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জার কথা হইলেও শেষে লর্ড লিটনকে তাহাই করিতে হয়। তিনি এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় নাখোদা মসজেদের সম্মুখে সকল সময়ে গীতবাদ্য নিষিদ্ধ, অন্যান্য মসজেদে দিনে পাঁচ বার জনগত প্রার্থনাকালে সকলের গীতবাদ্য করিয়া শোভাযাত্রা করিবার অধিকার থাকিবে না, অন্য সময় থাকিবে। প্রার্থনার সময় সরকারপক্ষ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

ইহাতে লর্ড লিটন উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক পক্ষে হাজী গজনবি সাহেব প্রমুখ মুসলমানরা জিদ ধরিয়াছিলেন যে, সকল সময়েই সকল মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। অপর পক্ষে এক শ্রেণীর হিন্দু দাবী করিয়াছিলেন যে, যেহেতু দেশের চিরাচরিত আচার-পদ্ধতি অনুসারে সকল সময়ই মসজেদের

সম্মুখে গীত-বাদ্য করিয়া শোভাযাত্রা চলিয়া আসিতেছে, সেই হেতু ঐ প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। লর্ড লিটন কোনও পক্ষের দাবী স্বীকার করেন নাই, তিনি একটা মাঝামাঝি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ কলিকাতায় বলবৎ থাকিবে, মফঃস্বলে আপাততঃ স্থানীয় প্রথা অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন, পরে তথ্য সংগ্রহ করিয়া চরম সিদ্ধান্ত করিবেন। কলিকাতায় যে সকল মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি সহ শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, সে সকল মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি সহ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইবে কি না হইবে, তাহাও পুলিস কমিশনার বা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিম্নতন পুলিস কর্ম্মচারীর বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে।

এ ব্যবস্থা যে হিন্দুর পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সরকারী রাজপথে সকল প্রজারই সমান অধিকার আছে। মুসলমানের সরিয়তে বা হিন্দুর শাস্ত্রে যদি বিশেষ বিধি থাকে, সে জন্য জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। সন্ধ্যার সময়ে বহু হিন্দুর গৃহে গৃহদেবতার পূজা-আরাত্রিক হয়, সে সময়ে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া থাকে। ঐ সময়ে মুসলমানের মসজেদে আজান অথবা প্রার্থনা হইয়া থাকে। যদি পাশাপাশি মসজেদ ও হিন্দুগৃহ থাকে, তাহা হইলে কি হিন্দুর নিত্যপূজা বন্ধ করিতে হইবে? হিন্দুর উৎসব বা ব্যসনে গীতবাদ্য ধর্ম্মের অঙ্গ,—শবযাত্রায়ও হরিনাম ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উহাও কি উপাসনার সময়ে মসজেদের সম্মুখে বন্ধ করিতে হইবে? এরূপ হইলে রাজপথ অথবা হিন্দুপল্লী হইতে দূরে মসজেদ নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা ইহাতে বিরোধ বাধিবারই সম্ভাবনা।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান, রাজা হৃষীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ প্রমুখ হিন্দুরা এ বিষয়ে হিন্দুর ধর্ম্মাধিকারের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। বহু হিন্দু সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এমন কি, প্রিভি কাউন্সিলের নির্দ্ধারণও উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। সর্ব্বোপরি রেওয়ারীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, বি, পুল এ সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহাও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। রায়ে এই কয়টি কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে :-

(১) হিন্দুরা মসজেদের সম্মুখে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা লইয়া যায়, এ জন্য মুসলমানরা হিন্দুর উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; উহাই দাঙ্গার কারণ।

(২) হিন্দুদিগের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া জানা যায়, তাহাদের উপর কিরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইয়াছিল।

(৩) দাঙ্গাকারী মুসলমানরা বিনা উত্তেজনায় পূর্ব্বে মতলব ও বন্দোবস্ত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করেন যে,—

(১) মসজেদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রাকারীদিগের সকল সময়ে বাদ্যাদি করিয়া রাজপথ দিয়া যাইবার অধিকার আছে;

(২) তবে যাহাতে লোক ও গাড়ী চলাচলের অসুবিধা না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে;

(৩) হিন্দুর মিছিলে বা বাদ্যাদিতে বাধা দিবার কোন অধিকার মুসলমানের নাই।

ইংরাজ ম্যাজিষ্টেট ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং তাঁহার রায়ের এমন নজীর থাকিতেও লর্ড লিটন কিরূপে এক সম্প্রদায়ের অন্যায় দাবীর খাতিরে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। তিনি শান্তির উদ্দেশ্যে যে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া শান্তির উদ্দেশ্যে একবার এক অন্যায় দাবী সমর্থন করিলে তাহার ফল কত দূর-বিসারী হইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তও কি নজীর বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না?

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে যখন কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার খোলা হয়, তখন আশা করা গিয়াছিল যে, উহাতে ১০ লক্ষ টাকা উঠিবে। কিন্তু পরে হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, চাঁদা ৮ লক্ষের কিছু উপরে হইয়াছে। ঐ টাকা এখন প্রায় সমস্তই মজুত আছে। তবে ঐ টাকা হইতে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পত্তি উত্তমর্ণের কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং

বর্ত্তমানে সেবাসদনের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ২০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। গত ১লা বৈশাখ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই সেবাসদনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভারতের মুক্তিমন্ত্রের সাধক, বিরাট ত্যাগী, কর্ম্মী চিত্তরঞ্জন তাঁহার বড় সাধের এই আবাস-ভবন দেশবাসীকে শেষ দান করিয়া গিয়াছিলেন। যিনি আমীর হইয়াও দেশের জন্য ফকির সাজিয়াছিলেন, তাঁহার এই দান তাঁহারই মহাপ্রাণের পরিচায়ক। কর্পোরেশনের মেয়র হইয়া তিনি দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় অবহিত হইয়াছিলেন। তাই বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ও অবৈতনিক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার কল্পনা প্রথমাবধি তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। পুরুষপ্রবর অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাই তাঁহার দেশবাসী এই দানের সদ্ব্যবহার করিতে ও তৎসঙ্গে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের স্মৃতি-সম্মান রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন তাহারই ফল।

দেশীয় মহিলাদিগকে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়া এই সেবা-সদনের উদ্দেশ্য। ইহা যে দেশের পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। পণ্ডিত মতিলাল এই সেবাসদনের উদ্বোধনকালে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে হইলে এই ভাবের অবৈতনিক হাঁসপাতাল ও শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক। এই সেবা-সদন প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশবাসী চিত্তরঞ্জনের মনোবাঞ্ছা কতকটা পরি-পূরিত করিয়াছেন।" সুতরাং দেশবাসী যে এই সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা করিয়া মহত্তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

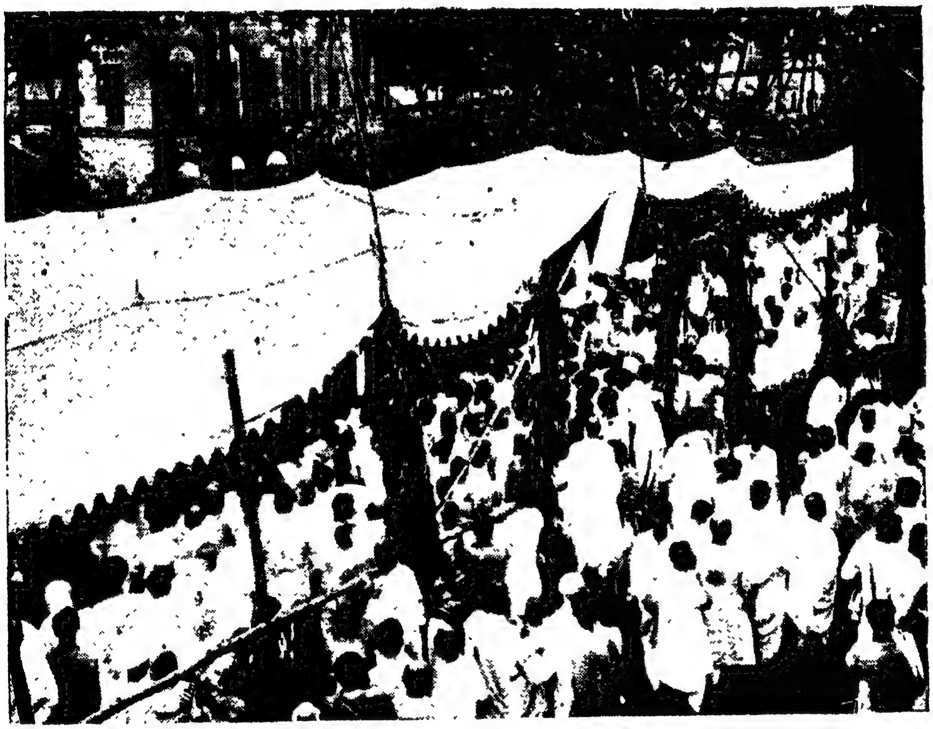

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের উদ্বোধন সভা

দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কর্পোরেশন কার্য্যালয়ে (১) এঞ্জিনিয়ার জে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র রক্ষা, (২) উক্ত কার্য্যালয়ে নানা স্থানে উপযুক্ত বেদীর উপর দেশবন্ধুর মর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, (৩) ইটালির গোরাচাঁদ রোডে গৃহীত ভূমির উপর নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের দ্বারা সজ্জিত একটি

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের অভ্যন্তর

শস্ত্র চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা, (৪) চিত্তরঞ্জন এভেনিউর (বর্ত্তমান সেণ্ট্রাল এভেনিউ) কোনও স্থানে উপযুক্ত বেদীর উপর দেশবন্ধুর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, (৫) ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি য়ুনানী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, (৬) কোন রাজপথের উপর ১২ কাঠা জমী সংগ্রহ করিয়া একটি লাইব্রেরী ও সাধারণ হল-ঘর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। দেশবাসী এই ভাবে দেশের মধ্যে মহতের স্মৃতি-সম্মান রক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইলে নিজেও ক্রমে মহৎ হইতে অভ্যস্ত হইবে। সকল দেশেই Representative men বা Heroeদিগের স্মৃতিসম্মান রক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহা দ্বারা জাতি মহৎ হইতে অভ্যস্ত হয়।

যতীশচন্দ্রের পরলোক

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র যতীশচন্দ্র গত ২৪শে চৈত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত বৎসর তাঁহার ভ্রাতা ললিতচন্দ্র মিত্র বিস্ফোটক রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা করপোরেশানের লাইসেন্স অফিসার ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা এটর্ণী ও হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার বঙ্কিমচন্দ্র আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর গৌরব নাট্যকার দীনবন্ধুর বর্ষীয়সী বিধবা পত্নী এখনও জীবিতা আছেন, তাঁহার বয়স ৯০ বৎসরের উপর। যতীশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন। তিনি পিতার 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' নাট্যাকারে 'যম জব্দ' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

যতীশচন্দ্র মিত্র

দাঙ্গার বিবরণ

কলিকাতার পুলিস কমিশনার মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং গত ১০ই জুনের কলিকাতা গেজেটে কলিকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, আর্য্যসমাজীদের শোভাযাত্রা উপলক্ষে দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং প্রথমে দাঙ্গা মুসলমান ও আর্য্যসমাজীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ কথা ঠিক। তাহার পর তাঁহার বিবরণে প্রকাশ, দাঙ্গা পরে উত্তর-পশ্চিমা মুসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে বিসর্পিত হইয়া পড়ে। কিন্তু কেন ইহা হইয়াছিল, তাহা তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করেন নাই। আর্য্যসমাজীদের সহিত বিবাদ হইলেও মুসলমানরা সহসা কেন জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের শিবমন্দির আক্রমণ ও অপবিত্র করে, তাহা তাঁহার বিবরণে নাই। জনসাধারণের অভিমত এই যে, মুসলমানরা ঐ মন্দির এবং পথে উত্তর-পশ্চিমা হিন্দুগণকে আক্রমণ ও হিন্দুর দোকানপাট লুণ্ঠন করিবার পর উত্তর-পশ্চিমা হিন্দুরাও প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত হয়। এ কথা সত্য কি না, মিঃ আর্ম্মষ্ট্রংয়ের বিবরণে তাহা বলা হয় নাই। শিখদিগেরও সহিত মুসলমানদের কোন বিবাদ হয় নাই। তথাপি মুসলমানরা কেন শিখগুরুদ্বার ও ধর্ম্মগ্রন্থ অপবিত্র করিল, তাহার কারণও বিবরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মিঃ আম্মষ্ট্রং বাঙ্গালী হিন্দুদের সম্বন্ধে বিবরণে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতার অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন, যতক্ষণ মুসলমানরা ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী আক্রমণ করে নাই, ততক্ষণ বাঙ্গালী হিন্দুরা এ দাঙ্গায় একেবারেই যোগদান করে নাই। তাহার পর কালীবাড়ী আক্রান্ত হইলে বাঙ্গালী হিন্দু যুবকরা তাহাদের দেবস্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহির হইয়াছিল এবং বার বার আক্রমণ বিফল করিয়াছিল। পরন্তু বাঙ্গালী হিন্দুরা কোথাও অপরকে আক্রমণ করে নাই, সর্ব্বত্রই আত্মরক্ষা করিয়াছিল। মিঃ আর্ম্মষ্ট্রংয়ের এই নিরপেক্ষ অভিমতের জন্য বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ কাহারও ধর্ম্মস্থান আক্রমণ করা অথবা বিনা কারণে কাহাকেও আক্রমণ করা হিন্দু বাঙ্গালীর ধাতুসহ নহে। তাহারা সকল ধর্ম্মের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তবে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনার ধর্ম্মস্থান অথবা গৃহ রক্ষা করা স্বতন্ত্র কথা। এ কথাটা যদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা অনুক্ষণ স্মরণ রাখেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত তাঁহাদের বিরোধের কোনও কারণ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং যথার্থই বলিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দুরা কোথাও aggressive part গ্রহণ করে নাই, অর্থাৎ কাহাকেও উপযাচক হইয়া আক্রমণ করে নাই। ইহাই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রকৃতি। এই হেতু বাঙ্গালী হিন্দু শান্তিরক্ষকের উপর সকল ভার দিয়া আত্মরক্ষার্থ কোনও ব্যবস্থা করে না। কিন্তু এ বারের দাঙ্গায় তাহাদের এই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় যদি তাহারা তাহাদের ধর্ম্মস্থান ও পল্লী রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে কি হইত, বলা যায় না। অবশ্য শেষ অবস্থায় সরকারী পুলিস ও মিলিটারী তাহাদের দেবস্থান ও পল্লী রক্ষা করিয়াছিল, এ কথা সত্য। তাই মনে হয়, সকল সময়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত না থাকাও নিরাপদ নহে। এ কথা বোধ হয় মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং স্বীকার করিবেন। এই হেতু বাঙ্গালীরা যদি এখন হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে—কাহাকেও আক্রমণ করিবার জন্য নহে, অথবা কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যও নহে, তাহা হইলেও কি পুলিস সে চেষ্টায় বাধা দিবে ? ন্যায়ের দিক দিয়া দেখিলে তাহা উচিত নহে। এই হেতু আমরা সরকারকে এ বিষয়ে একটা খোলসা ভরসার কথা দিতে বলি। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতে পারে এবং আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে পারে, তাহা সরকারের করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রাজনীতির অথবা জাতি-বিদ্বেষের নামগন্ধও নাই। দেশের সকল পিতামাতা ও অভিভাবকই তাঁহাদের বালক ও যুবকগণকে বিদ্যা-চর্চ্চার সঙ্গে ব্যায়ামচর্চ্চায় অভ্যস্ত করুন, ইহাই কামনা।

বিবরণে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের উপর বিলক্ষণ কটাক্ষপাত আছে। উহাতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ঐ সকল সংবাদপত্র দাঙ্গা উপশমের জন্য সরকারের সাহায্য না করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। এ কথার কোনও ভিত্তি নাই।

মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং এরূপ বেড়াজালে সকলকে টানিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। কোনও কোনও পত্র হয় ত এ বিষয়ে অপরাধ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল পত্র এ যাবৎ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার বাণী প্রচার করিয়া স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং কি তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে অকারণে অপরাধী করিতে চাহেন? তিনি জানেন, তাঁহার এই বিবরণের উপর এ দেশের ও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কতটা নির্ভর করিবেন। সুতরাং তাঁহার বিশেষ বিবেচনার সহিত অভিমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি এ বিষয়ে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট অমঙ্গল করিয়াছেন এবং স্পষ্টবাদিতার খ্যাতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

ডেপুটী মেয়র মিঃ সুরাবর্দ্দীর সম্বন্ধে বিবরণে আর একটি কীর্ত্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং বিবরণে লিখিয়াছেন যে, মিঃ সুরাবর্দ্দী এক মসজেদ ভাঙ্গিবার মিথ্যা সংবাদ দিয়া পুলিস ও মিলিটারীকে ঘটনাস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ভাবের মিথ্যা সংবাদপ্রচারের অপরাধে অবশ্য সংবাদপত্রকে আদালতে টানাটানি করা হইত; কিন্তু ডেপুটী মেয়র সাহেবের সাত খুন মাপ! যে সকল মুসলমান, সভা করিয়া তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন এবং স্বধর্ম্মী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও অলডারম্যানগণকে পদত্যাগ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা পুলিস কমিশনারের এই বিবরণ পাঠ করিয়া কি বলিতে চাহেন?

সরকার ও সংবাদপত্র

বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও দাঙ্গা উপলক্ষে এ দেশের সরকার দেশীয় চালিত সংবাদপত্র সমূহের সম্পর্কে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দেশে দাঙ্গা, গুণ্ডামী বা অরাজকতার কালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত শান্তিরক্ষক সরকারের পক্ষে আইনের কঠোরতা অবলম্বন করা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, নতুবা শান্তিপ্রিয় আইনভীরু প্রজার ধন-প্রাণ-রক্ষা, অথবা শান্তিতে বসবাস করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু সেই কঠোরতা কতটুকু প্রযোজ্য, তাহাই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষে সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কয়েকখানি দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্র রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবিষ বিসর্পিত করাই প্রধান অভিযোগ; এতদ্ভিন্ন অন্য অভিযোগও ছিল। যাহারা এ বিষয়ে যথার্থ অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদিগের বিচার ও দণ্ড হওয়ায় কেহ আপত্তি করে না, কেন না, যাহারা এই ভাবে সমাজের অনিষ্ট করে, তাহাদিগের দণ্ড হওয়ার দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু এই ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের অথবা বিপ্লববাদের চরম দিনে যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এ দেশের জনসাধারণকে 'দাঁত দেখাইতে' বলিয়াছিল অথবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ তাহাদের সমাজকে নিত্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তখন তাহারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই। তাহারা সমাজের কি অনিষ্ট করিয়াছিল, এ দেশে য়ুরোপীয়ের বিপক্ষে অসন্তোষের বীজরোপণে কতটা সহায়তা করিয়াছিল, তাহা সরকারের অবিদিত হইতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে অবিদিত ছিল না। সুতরাং এ সম্বন্ধে বলিবার এইটুকু আছে যে, সমাজের অনিষ্টকারীদিগের বিচার ও দণ্ডের সম্পর্কেও জাতিবৈষম্যের নমুনা পাওয়া যায়, ইহাই দুঃখের কথা।

যাহা হউক, বিচারে প্রায় সকল অভিযুক্ত দেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকের অল্প-বিস্তর দণ্ড হইয়াছে, এক জনকে সতর্ক করাও হইয়াছে, আবার অপর এক দফা অভিযোগে বেকসুর খালাসও দেওয়া হইয়াছে, আর এক জন অপরাধ স্বীকার করায় মুক্তি পাইয়াছেন, আর দণ্ডিত জনের হাইকোর্টে আপীলের অবসর দেওয়া হইয়াছে। বিচারক আইন অনুসারে যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই। যে সকল প্রবন্ধে সত্যই জাতিবিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে নানারূপে উত্তেজিত করা হইয়াছে, সে সকল প্রবন্ধ সত্যই দণ্ডার্হ। যে সকল সংবাদপত্র কেবল এই উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের দমন আশু প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া যে সকল সংবাদপত্র এ যাবৎ বহুকাল ব্যাপিয়া

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, যাহাদের মূলমন্ত্র হিন্দু-মুসলমান একতা এবং স্বরাজপ্রতিষ্ঠা, সে সকল সংবাদপত্র সামান্য একটুকু সংবাদ প্রকাশের জন্য অন্যান্য অপরাধীর ন্যায় অভিযুক্ত হয়, ইহাই দুঃখের বিষয়। উত্তেজনার সময়ে জনরবের অন্ত থাকে না। সকল সময়ে সে সকলের সত্যাসত্য নির্ণয় করাও ঘটিয়া উঠে না। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে এমন কত জনরব রটিয়াছিল। জার্ম্মাণরা মরা মানুষের চর্ব্বির কারখানা করিয়াছিল, এমন সংবাদও ইংরাজী পত্রে রটিয়াছিল। পরে উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য কোনও সংবাদপত্র অভিযুক্ত হয় নাই। এখানকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহ অসহযোগ বা বিপ্লবের সময় কত জনরব রটাইয়াছিল। তাহার জন্য তাহারা অভিযুক্ত হয় নাই। সংবাদপত্রের বয়স, মান-মর্য্যাদা ও অতীত খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিবেচনা করিয়া সরকারের পক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে কি ?

সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহারে এ দেশীয় সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে কঠোর পথিনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সংবাদপত্রসমূহকে প্রত্যেক জিলার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া সংবাদ প্রকাশ করিতে হইবে, অন্যথা সংবাদ বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা সংবাদপত্র-সম্পাদনের পক্ষে কতদূর কঠোর হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দেশে "এসোসিয়েটেড প্রেস" ও "ফ্রি-প্রেস" প্রায়শঃ সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংবাদও কি সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট যাচাই করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে ? সকল সংবাদ যদি এইরূপে যাচাই করিয়া ছাপাইতে হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্রপরিচালনা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহও কি সকল সংবাদ যাচাই করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ?

জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ যাচাই করার অর্থ সরকারী সেনসরের আদেশমত সংবাদপত্র পরিচালনা করা। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিসের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করেন, পুলিস গ্রাম্য চৌকীদারের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করে। তবেই হইল, সংবাদপত্রসম্পাদককে গ্রাম্য চৌকীদারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া পত্র সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে বলা যায় না ? লর্ড লিটনের পূর্ব্বপুরুষ সংবাদপত্রদলনে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বংশধর কি তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণে ব্যগ্র হইয়াছেন ?

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই কঠোর ব্যবস্থা হইতেছে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে মন্দির ও বিগ্রহ ভঙ্গ বা কলুষিত হওয়ার জন্য যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, এ সকল সংবাদ প্রায়শঃ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সরকার ইস্তাহারে কিরূপে লিখেন যে, "পাবনা ও নোয়াখালি জিলায় ঐ প্রকারের ঘটনার সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে; সরকারী কর্ম্মচারীরা আশা করেন যে, সত্বর অবস্থার উন্নতি হইবে ?" অপর এক স্থলে সরকারী ইস্তাহারে আছে—"ময়মনসিংহের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন যে, দেবমূর্ত্তির ধ্বংস বন্ধ হইয়াছে।" ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় ? যে ঘটনা "কমিয়া" যাইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বে "বাড়িয়াছিল", না বাড়িলে তাহা "কমে" কিরূপে ? সরকারী কর্ম্মচারীরাই বা আশা করেন কেন "সত্বর অবস্থার উন্নতি হইবে ?" অবস্থার "অবনতি" যদি না ঘটে, তবে উন্নতির আশা কিরূপে জন্মিতে পারে ? ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইতেছেন, "দেবমূর্ত্তির ধ্বংস বন্ধ হইয়াছে।" ইহা সংবাদপত্রের 'সংবাদ' নহে, ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বীকারোক্তি, তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ময়মনসিংহ জিলায় হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছিল।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেশীয় সংবাদপত্রসম্পাদকগণ হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংসের সংবাদ প্রকাশ করিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন, তাহা লর্ড লিটনের সরকার বুঝাইয়া দিবেন কি ? যাহা সরকারী কর্ম্মচারীরা স্বীকার করিতেছেন এবং যাহা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইলেই কি যত দোষ ?

রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রা

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বড়বাজার হ্যারিসন রোডের বাবুলাল ধর্ম্মশালা হইতে রাজরাজেশ্বরী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথা স্থির ছিল। বড়বাজারের সুতা-ব্যবসায়ীরা গত ৬৯ বৎসরকাল এই বারওয়ারী পূজা এবং বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছেন। এই শোভাযাত্রায় বাদ্যাদিসহ প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। এ বৎসরও ইহার জন্য পুলিসের নিকট পাশ লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর মুসলমানগণের অন্যায় জিদের ফলে এবং সহরের শান্তিরক্ষার অজুহাতে এই শোভাযাত্রা বন্ধ করা হইয়াছে।

রাজরাজেশ্বরী-প্রতিমা

মঙ্গলবার দিন অপরাহ্নে ৫টার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথা ছিল। প্রতি বৎসর যেমন হ্যারিসন রোড, সেন্ট্রাল এভেনিউ, বিডন ষ্ট্রীট এবং ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া বাদ্য সহকারে প্রতিমা-নিরঞ্জনের মিছিল লইয়া যাইবার পাশ দেওয়া হয়, এবারও তাহা হইয়াছিল। হিন্দুগণ এ জন্য মোটর-লরীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া বাদ্যাদিসহ মিছিলের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ বিনাবেঘে বজ্রাঘাতের মত শেষ মুহূর্ত্তে পুলিসের হুকুম আসিল যে, মিছিল নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া যাইতে পারিবে না, অন্য পথ দিয়া প্রতিমা লইয়া যাইতে হইবে। কারণ দেখাইয়া পুলিস বলে যে, যেহেতু পাশে নির্দ্দিষ্ট লোকসংখ্যা হইতে অধিকসংখ্যক লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিবে, সে জন্য পাছে উত্তেজনার কারণে শান্তিভঙ্গ হয়, এই হেতু শোভাযাত্রা নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে পাইবে না।

হিন্দুরা এই আদেশে মর্ম্মাহত হয়েন। তাঁহারা বলেন, যদি বহুকালের অধিকার এইরূপে কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শোভাযাত্রা লইয়া যাইবেন না এবং যত দিন না নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে দেওয়া হয়, তত দিন তাঁহারা প্রতিমা পথেই রাখিয়া দিবেন।

পরদিন অর্থাৎ বুধবার পুলিস কমিশনার ১৪৪ ধারার নোটিশ দিয়া প্রতিমা পথ হইতে সরাইয়া লইতে আদেশ করেন। ফলে প্রতিমা বাবুলাল ধর্ম্মশালায় তুলিয়া রাখা হয়। ধর্ম্মের মর্য্যাদা এইরূপে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় বড়বাজারের

লরীর উপর রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা

টাউনহলের সভায় বাজপায়ীর বক্তৃতা

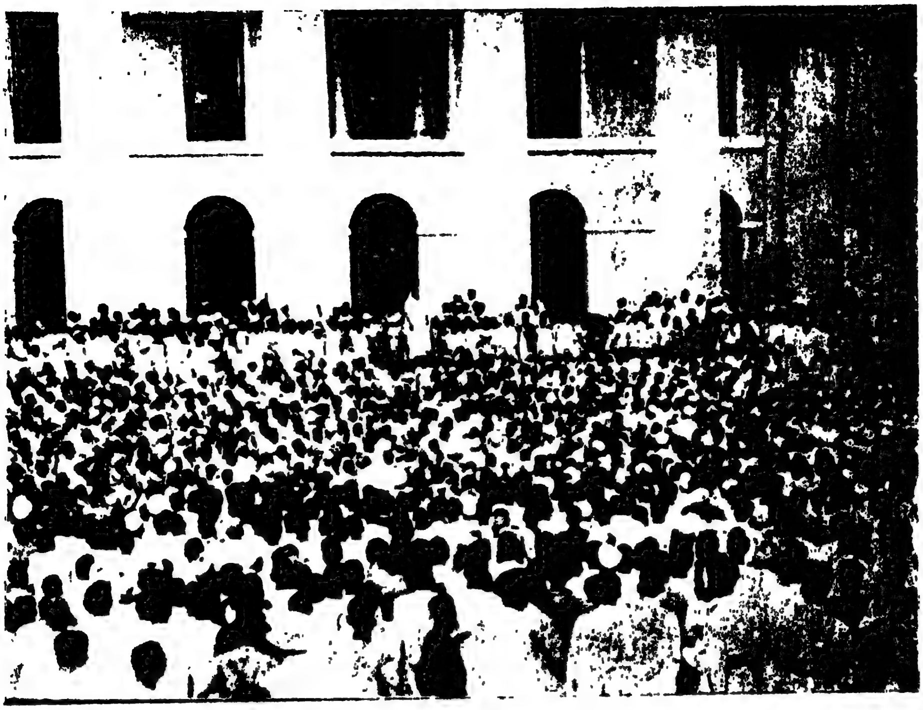

টাউনহলের প্রতিবাদ সভায় জনতা

টাউনহলের সভা

হিন্দুগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতেই দোকানপাট বন্ধ রাখিয়াছিলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার পুলিস আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ সমগ্র সহরে হিন্দুগণ হরতাল অনুষ্ঠান করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে টাউনহলে ব্যারিষ্টার মিঃ এন, এন, সরকারের নেতৃত্বে হিন্দুগণের এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। মিঃ সরকারের মত রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দলাদলিবর্জ্জিত ব্যক্তিও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, “যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী মনে করেন, হিন্দুদের মনোভাব নির্ব্বিঘ্নে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের অবৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ দ্বারা মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক, সেই সকল কর্ম্মচারীর কার্য্যের আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।” তাঁহার এমন কথা বলিবার কারণও ছিল। তাঁহার বক্তৃতার অন্যত্র আছে,—“প্রায় ৪ শত মুসলমান শোভাযাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে উপাসনার ভাণ করিয়া বসিয়াছিল। এইরূপ পথ অবরোধ কি বে-আইনী নহে? পুলিস এই সকল পথাবরোধকারীকে কিছুই বলে নাই। অপিচ, সেই স্থান হইতে বহুদূরে সেন্‌ট্রাল এভেনিউয়ে মোটরের বাঁশী বাজান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। এক সম্প্রদায়কে পদাঘাত ও অপর সম্প্রদায়কে চুম্বন করা হইয়াছে।”

রাজরাজেশ্বরী প্রতিমাপুঞ্জ

মিঃ সরকার আরও বলিয়াছিলেন যে, যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে অধিক লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সে বিজ্ঞাপন প্রচার বিষয়ে শোভাযাত্রার তত্ত্বাবধায়কগণের কোন হাত ছিল না।

এই সভাধিবেশনে জানা যায়, হিন্দুরা পুলিসের হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কিরূপ মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিল। ইহার পরে তত্ত্বাবধায়কগণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পাশে নির্দ্দিষ্ট লোকসংখ্যার অতিরিক্ত লোক শোভাযাত্রার সহিত যাইবে না এবং কোনও উত্তেজনাকর কার্য্য করিবে না। ইহাতেও কোনও ফল হয় নাই। হিন্দুর পক্ষ হইতে দার্জ্জিলিংএ গভর্ণরকেও তার করা হইয়াছিল এবং এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তাহাতে গভর্ণর জবাব দেন,—যাহা জানাইবার, পুলিস কমিশনারকে জানাইবেন। যাহার বিপক্ষে অভিযোগ, তাঁহার কাছেই মীমাংসার ভার অর্পণ,—ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে?

ফল কথা, হিন্দুর প্রতিমা বিসজ্জিত হয় নাই, উহা তুলিয়া পুনরায় ঘরে রাখা হইয়াছে। কবে হইবে, তাহাও কেহ জানে না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

মিশরে জজলুল

মিশরের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জজলুল পাশা ও তাঁহার দলের জয় হইয়াছে। ইহার ফলে মিশরে আবার গোলযোগের সম্ভাবনা হইতে পারে, এইরূপ অনেক ইংরাজ রাজনীতিকের অভিমত। তাঁহারা বলিতেছেন, যদি জজলুল সার লি ষ্ট্যাকের হত্যাকাণ্ডের পর মিশর সম্বন্ধে ইংরাজের নূতন সর্ত্ত মানিয়া মন্ত্রিত্ব চালাইতে সম্মত হয়েন, তবেই মঙ্গল, অন্যথা মিশরে আবার অশান্তি দেখা দিবে, ও তাহার ফলে ইংরাজের কর্ত্তৃত্বের পাষাণ-চাপ আরও অধিক গুরুভাবে বসিবে। ফরাসীর বিখ্যাত সমালোচক 'পার্টিনাক্স' কোন ফরাসী সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, "হয় ইংরাজকে মিশর ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইবে, না হয় তাঁহাকে কঠিন বন্ধনে মিশরকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।" অর্থাৎ তাঁহার অভিমত এই যে, জজলুলের ন্যাশনালিষ্ট দল যখন জয়ী হইয়াছে এবং মিশরের প্রকৃত শাসন-ভার তাহারাই গ্রহণ করিবে, তখন ন্যাশনালিষ্ট দল মিশর ও সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের জন্য সম্ভবমত ষড়্‌যন্ত্র করিতে ছাড়িবে না। সে ক্ষেত্রে হয় ইংরাজকে মিশর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, না হয় মিশরকে পুনরায় ইংরাজের protectorate বা রক্ষিত রাজ্যে পরিণত করিতে হইবে।

ফরাসী সমালোচকের এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ যে একবারে নাই, তাহা নহে। গত ২৯শে মে মিশরের বর্ত্তমান ইংরাজ হাই কমিশনার লর্ড লয়েড (যিনি সার জর্জ্জ লয়েডরূপে পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের গভর্ণরের কার্য্য করিয়াছিলেন) জজলুল পাশাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের কার্য্যপদ্ধতির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জজলুল তাহার উত্তরে স্পষ্টই বলেন যে,—(১) তিনি সুদানে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবেন না, (২) সুয়েজ খালরক্ষায় ইংরাজের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিবেন না, (৩) মিশরে ইংরাজ, বৈদেশিকগণের স্বার্থরক্ষার যে অধিকার ভোগ করিতেছেন, তাহাও দিতে সম্মত হইবেন না, (৪) ইংরাজ মিশরকে বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার যে অধিকার দাবী করিয়াছেন ও ভোগ করিতেছেন, তাহাও স্বীকার করিবেন না। এতদ্ব্যতীত জজলুল দাবী করিয়াছেন যে, মিশর হইতে ইংরাজকে তাঁহার নিজস্ব সেনা সরাইয়া লইতে হইবে।

লর্ড লয়েড জজলুলের এই মনের ভাব অবগত হইয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা জানাইতে লিখিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, তিনি জবাবও পাইয়াছেন, সে জবাব আর কিছুই নহে,—ইংরাজ কোনমতেই মিশর ছাড়িবেন না।

ইংরাজের মনোভাব তাঁহাদের নানা সংবাদপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। 'ডেলী মেল' পত্র "আমরা মিশরে থাকিব" শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"ইংরাজকে মিশর হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই জজলুলের প্রথম লক্ষ্য। এই হেতু জজলুলকে খোলাখুলি বলিয়া দেওয়াই ভাল যে, আমরা কোন অবস্থাতেই মিশর ত্যাগ করিব না। কেন ত্যাগ করিব না, তাহার দুইটি কারণ আছে,—

(১) আধুনিক মিশরের সমগ্র ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, মিশরবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নহে। জজলুলকে অত্যন্ত অধিক ভোটের জোরে মিশরের জনসভা নির্ব্বাচিত করিয়াছে বলিয়াই যেন মিশরবাসীরা মনে না করে যে, তাহারা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইয়াছে। (২) যদি আমরা আজ মিশর ত্যাগ করি, তাহা হইলে কাল অপর এক য়ুরোপীয় শক্তি মিশরে উপস্থিত হইবে এবং হয় ত পরশ্ব আর এক য়ুরোপীয় শক্তি মিশর আক্রমণ করিবে। তখন মিশরে নিশ্চিতই অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইবে এবং সে সময়ে ঐ সকল য়ুরোপীয় শক্তি মিশরবাসীর স্বাধীনতার প্রতি কোনওরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে না।

"সার লি ষ্ট্যাকের হত্যাকাণ্ডের পরেও আমরা দয়াপরবশ হইয়া মিশরকে যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছি, মিশরীয় চরমপন্থীরা উহার সদ্ব্যবহার করে নাই, সে তাহাদের দোষ। কিন্তু উহারা যাহাই করুক, আমরা মিশরে বিদেশীর স্বার্থ এবং সুয়েজ খালের সম্পর্কে সাম্রাজ্যের স্বার্থ আমাদের হস্তে রক্ষা করিতেছি। আমরা মুহূর্ত্তকালের জন্য সে স্বার্থ ত্যাগ করিব না। জজলুল বা অন্য কোন মিশরীয় ষড়্‌যন্ত্রকারী আমাদের বিপক্ষে যদি ষড়্‌যন্ত্র করে বা গোলযোগ ঘটায়, তাহা হইলে আমরা মুহূর্ত্তমাত্র তাহা সহ্য করিব না। আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া আছে। লণ্ডনে এক শক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং মিশরে তাহার শক্তিশালী প্রতিনিধি রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ঠকান বা বোকা বানান সহজ হইবে না।"

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের অবসানকাল হইতে ইংরাজ কত শক্তিশালী হইয়াছেন, তাহা এই সদম্ভ উক্তিতেই সপ্রকাশ। ইংরাজের প্রধান আশঙ্কা এই যে, জজলুল যদি প্রধান মন্ত্রী হয়েন, তাহা হইলে সুয়েজ খালের স্বাধীনতার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন এবং তৎফলে অশান্তির সৃষ্টি হইবে। এই হেতু ইংরাজ এখনও চেষ্টা করিতেছেন—যাহাতে জজলুল লিবারল দলপতি আদলি পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। যদিও আদলি পাশা জজলুলের মনোনীত ব্যক্তি, তথাপি ইংরাজ আশা করেন যে, জজলুল নিজে প্রধান মন্ত্রী না হইলে অশান্তির আশঙ্কা বহুলাংশে হ্রাস হইবে।

ফলে ঘটিয়াছেও তাহাই। জজলুল মন্ত্রিত্ব লইতে সম্মত হয়েন নাই, তিনি আদলি পাশাকেই সে ভার দিয়াছেন। পরন্তু তিনি লর্ড লয়েডের সহিত পরে বেশ প্রাণ খুলিয়া মিলামিশা করিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি ব্যাপার বুঝিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং ইংরাজের আশঙ্কার কারণ আর আদৌ নাই!

আসল কথা, জজলুলকে ইংরাজ stormy petrel বা মিশরের ঝড়ের পাখী বলিয়া মনে করেন। এই পাখী আকাশে দেখা দিলেই লোক আশঙ্কা করে, ঝড় উঠিবে। এই হেতু এত আশঙ্কা, এত ভয়-প্রদর্শন। অবশ্য ইংরাজ প্রবল শক্তিশালী জাতি—আজ জগতে বাহুবলে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও চলে। সুতরাং জজলুল প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাঁহার আশঙ্কা নাই, কেন না, বাহুবলই এখন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। মিশর বা আরব,—যেখানেই ইংরাজের

দীর্ঘবাহু বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই সে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তির আশা কাহারও নাই. কিন্তু তাহা বলিয়া সে সব দেশের মনের বাসনা কি. তাহা জানিতে কষ্ট হয় না। মিশরবাসীরা কাহাকে চাহে, তাহা জগলুলের নির্ব্বাচনেই স্বপ্রকাশ। তবে জাতি যখন নাবালক নালায়েক থাকে, তখন তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার বাসনার বিরুদ্ধে প্রবল অভিভাবককে কঠোর ব্যবস্থা করিতে হয়। মিশরবাসীরা এই কথাটা বুঝিয়া যথাসম্ভব মনে সান্ত্বনা লাভ করুক।

তুর্কী ও মসুল

মসুল অঞ্চল লইয়া ইংরাজ ও তুর্কীতে যে মনোমালিন্য চলিতেছিল, এত দিনে বোধ হয় তাহা অপগত হইল। পূর্ব্বে তুর্কীদের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের মারফতেই শুনা গিয়াছিল যে, তুর্কী মসুল কিছুতেই ছাড়িবে না,—বিনাযুদ্ধে মসুলের সূচাগ্র ভূমিও ইংরাজকে লইতে দিবে না, কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, এই বাগাস্ফোট কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুর্কী এখন মসুল সম্বন্ধে ইংরাজের সহিত আপোষ বন্দোবস্তে সম্মত হইয়াছে। সদা অশান্ত জগতে এই শান্তির কথা সত্যই আশাপ্রদ।

য়ুরোপীয় সংবাদপত্র মহলে প্রকাশ, তুর্কী সহজে এই রফায় সম্মত হয় নাই। ইটালীর 'লড়াইয়ে' ডিক্টেটর মাসোলিনি তুর্কদেশ আক্রমণ করিতেছেন বলিয়া জনরব রটে। তুর্ক দেশেও এ জন্য সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। তুর্কী না কি সেই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ইংরাজের সহিত সন্ধিশান্তি করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ বলেন, যদি ইটালী তুর্কীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংরাজ ইটালীর বিপক্ষে তুর্কীকে সাহায্য করিবেন, এমন ভাবের একটা গোপন কথাও না কি হইয়া গিয়াছিল।

কথাটা কেমন হেঁয়ালির মতই ঠেকে। ইটালী তুর্কীকে আক্রমণ করিবে কোথায়? যে ত্রিপোলি রাজ্য লইয়া তুর্কীর সহিত ইটালীর যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তাহা ত বহু দিন তুর্কীর হস্তচ্যুত হইয়াছে, ইটালী ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। তুর্কীর আরবের হজ, ইহুদা, ইরাক প্রভৃতি অংশও একে একে হস্তচ্যুত হইয়াছে। এখন তুর্কীর সাম্রাজ্য খাস তুর্কী ও আনাটোলিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে কোন্ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে তুর্কীর কোন্ অংশ ইটালী আক্রমণ করিবে? এ প্রশ্নের ত অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আর একটা কথা। ইংরাজ ইটালীর মিতা। মাসোলিনিও ইংরাজের বন্ধু। তিনিও জার্ম্মাণ কাইজারের মত ইটালীর জন্য a place under the sun খুঁজিতেছেন বটে, কিন্তু সেই place কি তুর্কীরাজ্য ছাড়া আর কোথাও নাই? আর সেই placeএর জন্য তিনি কি বন্ধু ইংরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন? ইংরাজও কি মাত্র মসুলের লোভে মিত্র ইটালীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন?

তাই মনে হয়, এ ব্যাপারটার আগাগোড়াই হেঁয়ালিতে ঢাকা। হয় ত সে রহস্যভেদ অচিরেই হইতে পারে।

আবদুল করিমের আত্মসমর্পণ

রিফ যুদ্ধের নায়ক আবদুল করিম

রিফের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নায়ক গাজী আবদুল করিম ফরাসীর হস্তে সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। রিফের মূররা স্বাধীনতাপ্রিয় শূরবীর, এ কথা সকলেই বুঝিয়াছিল। বিশেষতঃ আবদুল করিমের ন্যায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ শূরবীর নেতার অধীনে তাহারা যে বহু দিন য়ুরোপীয় শক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে, এ কথাও কাহারও অবিদিত ছিল না। পরন্তু ফরাসী ও স্পেনীয়দিগের ন্যায় দুইটি প্রবল য়ুরোপীয় শক্তির সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে যে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে না, তাহাও সকলে জানিত, কিন্তু যে আবদুল করিম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত মূররা রক্তদান করিবে, তথাপি পরাধীনতা স্বীকার করিবে না, সেই আবদুল করিম যে স্বয়ং উপযাচক হইয়া রিফ মূরগণকে ত্যাগ করিয়া সপরিবারে শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন, এ কথা কেহ স্বপ্নেও অনুমান করে নাই।

কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। যে আবদুল করিম আপনার দলের লোককে যুদ্ধে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাহাদের কঠোর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল, সেই আবদুল করিম হঠাৎ যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া সহযোদ্ধৃবর্গকে বিপদের মুখে ফেলিয়া স্বয়ং শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সমর-সংবাদদাতারা আবদুল করিমের শেষ দুর্দ্দশার কথা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যই তাঁহার জন্য দুঃখ হয়। যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেহের শেষ রক্তবিন্দুদানের জন্য স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সেই মূরবীরকে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে নিতান্ত অবসন্নভাবে ফরাসী আড্ডার অভিমুখে ফরাসীর কৃপাপ্রার্থী হইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া কাহার না কষ্ট হয়? আবদুল করিম তৎপূর্ব্বেই ফরাসী আড্ডায় তাঁহার পরিবারবর্গকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কেন এমন হইল? ইতঃপূর্ব্বে 'রিফের রাণা প্রতাপ' প্রবন্ধে আমরা আবদুল করিমের জীবন-কথা ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় দিয়াছি; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই বিবরণ হইতে জানা যায়, আবদুল করিম ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বর নায়ক নহেন, তিনি শিক্ষিত, সভ্যতালোকপ্রাপ্ত, আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী দলপতি। তাঁহার বীরত্বেও কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। তিনি বীর না হইলে এত দিন একাকী য়ুরোপীয় শক্তিদ্বয়ের বিপক্ষে সমান তেজে যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন না। যখন মাঝে একবার ফরাসী ও স্পেনীয়রা

তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাহারা তাঁহাকে যে সর্ত্ত দিয়াছিল, তাহা তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন না, ঐ সর্ত্তে তাঁহাকে মরক্কোর সুলতান মুলে ইউসুফকে কর্ত্তা বলিয়া মানিতে বলা হইয়াছিল—এই ইউসুফ য়ুরোপীয় শক্তিদিগের ক্রীড়নক ছিলেন। পরন্তু রিফদেশকে য়ুরোপীয় শক্তিদ্বয়ের রক্ষিত রাজ্য বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে বলা হইয়াছিল। এখন আত্মসমর্পণ করিলে যে ইহা অপেক্ষা তিনি সম্মানজনক সর্ত্ত পাইবেন, তাহার আশা নাই। তবে তিনি কি জন্য শেষ রক্তদান না করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন ?

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তাঁহার নিজের অনুচরগণের মধ্যে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া আসিতেছিল। প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শত্রুহস্তে পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পর বহু দিনব্যাপী যুদ্ধের ফলে রিফবাসিগণের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, ততই তাহারা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিতেছিল। আরও কথা এই যে, তাঁহার নেতৃত্বের কৃতকার্য্যতায় বহু রিফবাসী সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিল। এমনও জনরব রটিয়াছিল যে, তাঁহার দলস্থ লোকরাই যুদ্ধের অবসানের উদ্দেশে তাঁহাকে হত্যা করিবার অথবা শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই সকল কারণে আবদুল করিম পূর্ব্বাহ্ণে স্বয়ং উপযাচক হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

যে কারণেই হউক, রিফের স্বাধীনতা-সূর্য্য আবদুল করিমের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইল। ফরাসীরা তাঁহাকে অন্যত্র আশ্রয় দিবেন বটে, তবে রিফ অঞ্চলে আর থাকিতে দিবেন না। তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য একটা বন্দোবস্তও হইবে। স্পেনীয়রা কিন্তু এতটা দয়া দেখাইতেও সম্মত নহেন। তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করিতেছেন যে, তিনি নিতান্ত বর্ব্বরের মত যুদ্ধকালে নিষ্ঠুরতা আচরণ করিয়াছেন, যুদ্ধে বন্দীদিগের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে সাধারণ বন্দীর মত বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হউক। অথচ স্পেনীয়রা যুদ্ধকালে কিরূপ বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমর-সংবাদদাতাদিগের বিবরণেই প্রকাশ।

ভাগ্যনেমির আবর্ত্তনে আজ রিফের স্বাধীন সুলতান আবদুল করিমের এই পরিণাম! এই আবদুল করিমের সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখকই বলিয়াছিলেন,—If he is allowed to continue in peace as he has begun, the wealth and prosperity of the country will grow apace. The creation of a civilized nation among these people is the work of a man with really imposing gifts of leadership, কিন্তু তাহা হইবার নহে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী য়ুরোপীয় জাতিদিগের prestige ইহা অপেক্ষাও বড়। Prestigeএর সম্মান রক্ষা করিতে অনেকের স্বার্থবলির প্রয়োজন।

রিফের গর্ব্বোন্নত শির অবনত হইল, মিশরের জগলুল ভবিতব্য মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, মসুলে তুর্কী নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিলেন, ডুরুজরাও অচিরে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে জগতের 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার পথ সহজেই সুগম হইয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে No damned nonsense কথাটা সর্ব্বত্র সুচারুরূপেই যে প্রযোজ্য হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সুধীরকুমার ঘোষ

এই সন্তরণ-শিক্ষার্থী বালক গত ২৭শে মে তারিখে কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর-সম্মেলন

বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলন

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী রাজা ও রাজপুরুষের দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসিত হইয়াও বাঙ্গালী নিজের একটা ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছে, নিজের দৈনন্দিন জীবনে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরের যতই অনুকরণ করুক, নিজেকে অপর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আসিয়াছে। ধাতুতে যতই খাদ মিশুক না কেন, ধাতু বিকৃত হইতে দেয় নাই। মাঝে মাঝে অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছে। তবে এত দিন সে অগ্নিতে তেজ ছিল না—আজ সম্মুখে যে অগ্নিপরীক্ষা তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, এত তাপ পূর্ব্বে আর কোনও অগ্নিতে সে পায় নাই। এই অগ্নিপরীক্ষায় যদি তাহার ধাতু আবার তাহার মৌলিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হইয়া আইসে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ চির-উজ্জ্বল, বাঙ্গালী সত্যসত্যই ভারতকে চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারে আলো দেখাইয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইবে।"

কথাটা সভাপতি মহাশয় আরও খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন ;— "যত দিন না ভারতের প্রত্যেক জাতি তাহার নিজের বিশিষ্টতার সন্ধান পায়—তাহাকে আয়ত্ত করে, তত দিন ভারতীয় মহাসঙ্ঘ বা মহাজাতি গড়িয়া উঠিতে পারিবে না—ভারতের সভ্যতার বিশিষ্ট স্ফূর্ত্তি হইবে না।"

সভাপতি বাঙ্গালীকে এবং ভারতের প্রত্যেক জাতিকে আপন বৈশিষ্ট্য রাখিতে উপদেশ দিতেছেন বটে, তবে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, "সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা যে একত্র থাকিতে পারে না, ইহা সত্য নহে।"

কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার বটে। বরিশাল কনফারেন্সে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথম বাঙ্গালীকে অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলেন, সেই সময়ে সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তারস্বরে 'বাঙ্গালায় বৈশিষ্ট্যের' কথা কহিয়া বাঙ্গালীকে গুজরাটের রাজনীতিকের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদবধি প্রায় সকলেরই মুখে 'বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের' কথা শুনা যায়। বাঙ্গালার চিন্তার ধারার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। বাঙ্গালার সামাজিক, রাজনীতিক ও ধর্ম্মগত সমস্যা যে অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সকলেই জানে, বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। যদি বাঙ্গালী ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। অন্য প্রদেশের কর্ম্মকুশল অধিবাসীরা যে সময়ের মধ্যে বাঁধাধরা কার্য্যের মধ্য দিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে, বাঙ্গালী ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহার শতাংশের একাংশ সময়ের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। এইখানে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য আছে। নির্ম্মল বাবু বাঙ্গালীকে তাহার চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্যের এই দিক্‌টা ফুটাইয়া তুলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন কি না, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে দিক্‌টায় তাহার সামাজিক, ধর্ম্মসম্পর্কিত এবং রাজনীতিক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া ও জলাভাব বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যা, এ সমস্যা অন্যান্য প্রদেশে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং নির্ম্মল বাবু যদি বাঙ্গালীকে তাহার এই সমস্যার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভালই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, অস্পৃশ্যতা সমস্যা অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, বাঙ্গালায় তাহা করে নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে এ সমস্যা প্রতীকারসাধ্য। বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কিত রাজনীতিক ও ধর্ম্মগত সমস্যাও অধিক দিন প্রবল আকার ধারণ করে নাই। ইহার অস্তিত্ব অল্পদিন হইতে অনুভূত হইতেছে। কতকগুলি অস্বাভাবিক কারণে এ সমস্যা সম্প্রতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। সুতরাং এ দিকেও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালার সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ দিকে বাঙ্গালীর চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র খাতে পরিচালিত করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

বোধ হয়, নির্ম্মল বাবু এই সকল কথা ভাবিয়া বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশ যে ভাবেই তাহাদের সামাজিক, রাজনীতিক অথবা ধর্ম্মগত সমস্যার সমাধান করুক্, বাঙ্গালীকে তাহার সমস্যার সমাধান তাহাকে নিজেই করিতে হইবে, নির্ম্মল বাবুর ইহাই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

এ সকল সমস্যার সমাধান করিয়াও যে বাঙ্গালী জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারে, তাহাও নির্ম্মলচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিয়া জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার বোধ হয় ইহাই মর্ম্ম।

কিন্তু একটা কথা নির্ম্মল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে কে ? গত ২ বৎসরে বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালায় ব্যক্তিত্বের প্রভাবের বিশেষ অভাব হইয়াছে। সার আশুতোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ যে সকল বাঙ্গালী বিরাট পুরুষ চিরতরে অস্তমিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতির নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা কাহার আছে ? বিরাট কর্ম্মীতে যাহা সম্ভব, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সে ক্ষেত্রে বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িকতা (বৈশিষ্ট্য) রক্ষা করিতে গেলে কেবল দলাদলি ও ভাঙ্গাভাঙ্গিই বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিবে। উহা দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলকর নহে। এখনই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার কেহ কাহাকেও মানে না, নেতৃত্বের দাবী বহুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন অবস্থায় বৈশিষ্ট্য বা সাম্প্রদায়িকতার দিকে অধিক ঝোঁক না দিয়া জাতীয়তার পুষ্টিসাধনে বাঙ্গালীর তৎপর হওয়া কি অধিক কর্ত্তব্য নহে ? বর্ত্তমানে বাঙ্গালার সমস্যাগুলিকে ভারতের সমস্যার মধ্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইলে নিখিল ভারতের সমবেত চেষ্টার ফলে সে সকল সমস্যা সমাধান করা সহজসাধ্য হইতে পারে।

বঙ্গীয় যুবক-সম্মেলন

কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালার তরুণ-সঙ্ঘকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ তরুণ-সঙ্ঘের অতীতের অসাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,— "দেশের নেতারা ও কর্ম্মীরা যে আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, সে কায ও কর্ম্মপন্থা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বাহির হয় নাই। প্রেরণাটা আসিয়াছিল বাঙ্গালার বাহির হইতে, কর্ম্মপন্থাও উদ্ভূত হইয়াছিল বাঙ্গালার

বাহিরে।" পরে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর প্রকৃতির সহিত এই সব আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা ঠিক খাপ খায় কি না, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাই নাই। কাযেই পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই।"

তাই উপেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার তরুণসঙ্ঘকে উপদেশ দিতেছেন,—"বাঙ্গালী ছেলেদের প্রতি আমার অনুরোধ—এই দলাদলি আর পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া দিউন।……বাঙ্গালার রাজনীতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের করায়ত্ত করুন। বাঙ্গালার প্রতি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের বুদ্ধির—সামর্থ্যের উপর একটু নির্ভর করিতে শিখুন। বাঙ্গালীর চিন্তার একটা নিজস্ব ধারা আছে, প্রকৃতির একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।……দেশ বা সমাজের সেবা করিতে গেলে চিন্তার ও কর্ম্মের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্তই দরকার।"

যে কথাটা নির্ম্মলচন্দ্রে অপরিস্ফুট ছিল, উপেন্দ্রনাথে তাহা খোলসা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উভয়েরই লক্ষ্য এক,—বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলা, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে বলা। নির্ম্মলচন্দ্র কথাটা বলিয়াই দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন, উপেন্দ্রনাথ পন্থাও সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—বাঙ্গালীকে বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজেই নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপেন্দ্রনাথের পরামর্শমতে যদি বাঙ্গালী নিজের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে ত ভাল কথা, কিন্তু তাহা কি বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব? বড় বড় কথা বক্তৃতায় বলা যায়, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করা সহজ নহে। বাঙ্গালীর সে কাঠখড়—সে মালমশালা কোথায়? বাঙ্গালার গণ্ডীর মধ্যে বাঙ্গালীকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া, বাঙ্গালার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশের প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালার দেশ ও সমাজ-সেবার শক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইবে কি? উপেন্দ্র বাবু যে দলাদলির সংস্রব হইতে বাঙ্গালীকে দূরে বেড়ার মধ্যে রাখিতে চাহিতেছেন, বেড়ার মধ্যে থাকিতে গেলে বাহিরের ভারতের সহিত সেই দলাদলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না কি? মুক্তির সংগ্রামে কি বাঙ্গালী কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিবে না?

উপেন্দ্র বাবু যে 'বাহিরের প্রেরণার' কথা তুলিয়াছেন, তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিই যে ইহাতে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই বুঝিতে পারেন। মহাত্মার এই "বাহিরের প্রেরণা" কেন সাফল্যমণ্ডিত হইল না, তাহা কি উপেন্দ্র বাবু বুঝেন না? সে প্রেরণা বাহির হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই কি তাহাতে সত্য নিহিত ছিল না? যদি তাহাতে সত্য নিহিত থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী কি বিশেষ মন্দ কায করিয়াছিল, না নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছিল? মন্ত্র ও মন্ত্রদাতা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে মন্ত্রের অসাফল্য মন্ত্রগ্রহীতার অকর্ম্মণ্যতারই পরিচয় প্রদান করে, মন্ত্র বা মন্ত্রদাতার নহে।

উপেন্দ্র বাবু নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন,—"দেশের রাজনীতিক আন্দোলন যাঁহারা চালান, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক দল বলেন, ইংরাজকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বল, তাহারা যে অন্যায় করিতেছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই ইংরাজ ক্রমশঃ একটা সুরাহা করিয়া দিবে। দ্বিতীয় দল বলেন, ইংরাজকে বুঝাইয়া বলিয়া কোন লাভ নাই, উহারা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে না; অতএব উহাদের কোন রকমে জব্দ কর। কিন্তু জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিলেই সামর্থ্য থাকে না। আর সামর্থ্য যে নাই, তাহা এত দিনের রাজনীতিক আন্দোলনে বেশ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।"

উপেন্দ্র বাবুর মতে তাহা হইলে মডারেট ও স্বরাজ্য—উভয় দলের কর্ম্মপদ্ধতিই বিফল হইয়াছে। তাহার পর বিপ্লবপন্থীদের সম্বন্ধে উপেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—"যাঁহারা বিপ্লবপন্থী বলিয়া নিজেদের মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। বিপ্লব ঘটাইবার ইচ্ছা আর বিপ্লব ঘটাইবার সামর্থ্য এক জিনিষ নহে।" তাহা হইলে উপেন্দ্র বাবুর মতে বিপ্লববাদও বিফল হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহাত্মার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে আপনার করিয়া লইয়া অভিনব পন্থার সাফল্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা কিসে নিন্দনীয় হইল? জমী ভাল করিয়া প্রস্তুত না হইলে ফসল হয় না, এ কথা সকলেই জানে। যে মানসিক অবস্থা অসহযোগের পক্ষে অনুকূল, তাহা উপস্থিত করাই প্রথম ও প্রধান কার্য্য। মহাত্মা সে অবস্থা আনয়নে বহুল পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে জনমতকে জাগ্রত করিয়াছিলেন, এমন কেহ তাঁহার পূর্ব্বে পারেন নাই, কিন্তু অসময়ে ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইয়াছিল বলিয়া এবং মহাত্মা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সে বীজ মহীরুহে পরিণত হইতে পায় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া বীজ মন্দ, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অথবা বীজ বাঙ্গালার বাহির হইতে আসিয়াছিল বলিয়া কিরূপে উহা দ্বারা মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? আমাদের মনে হয়, প্রেরণা যেখান হইতেই আসুক, উহা যদি জাতির মুক্তির পক্ষে সহায়ক হয়, তাহা হইলে বৃথা বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া উহাকে মাথা পাতিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, উহাতে বাঙ্গালীর 'জাতি যায় না'।

তবে উপেন বাবু উপসংহারে বাঙ্গালার তরুণসঙ্ঘকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সময়োচিত ও সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষীয় সমাজের আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়া ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে।' এ কথা ঠিক। কেন এই সামর্থ্য ছিল না, তাহাও উপেন বাবু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এমনই ভাবে গঠিত যে, তাহাতে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ত হয়-ই না, বরং মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়। হিন্দুসমাজ বলিতে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সমাবেশমাত্র। মুসলমানদিগের মধ্যে যে একপ্রাণতা আছে, তাহা যত দিন না হিন্দু-সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, হিন্দু-সমাজের ভিন ভিন্ন খণ্ডসমাজগুলি মিশিয়া যত দিন না একটা বিরাট প্রাণবন্ত সমাজে পরিণত হয়, তত দিন হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য গজাইবে না। এখন হিন্দুর পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার শক্তিসঞ্চয়ই একমাত্র রাজনীতি।

কথাগুলি খাঁটি সত্য। বস্তুতঃ আমরা এ যাবৎ হিন্দুসমাজকে শক্তিসঞ্চয় করিতেই অনুরোধ করিয়াছি। এই শক্তিসঞ্চয় বলিতে অপরের বিপক্ষে একটা ষড়্‌যন্ত্র করা নহে, ইহার অর্থ আত্মরক্ষার উপায়বিধান করা। যখন সকল সম্প্রদায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবে এবং তখন প্রকৃত মিলন ও সহযোগ ঘটিবে। উহার ফলে দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত হইবে না।

কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন

এবার কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলন নানা ঘটনার সমাবেশে স্মরণীয়। বর্ত্তমানে এ দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত বড় সমস্যা আর কিছু নাই। সুতরাং সকলে আশা করিয়াছিল, কৃষ্ণনগরে জাতির প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া এ বিষয়ে একটা সুমীমাংসা করিয়া দিবেন। এ জন্য এই সম্মেলনের অধিবেশনের ফলাফলের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার

দুর্ভাগ্য. এ বিষয়ে কোনও সুমীমাংসা হয় নাই. বরং তৎপরিবর্ত্তে সমস্যা আরও অধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মেলনে একটা একমতের প্রতিষ্ঠা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। দেশের প্রতিনিধিগণ একযোগে দেশের রাজনীতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া দেশবাসীকে একটা কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেন, ইহাই দেশের লোক আশা করিয়াছিল। সে আশায় তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। একমতপ্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে দলাদলি আরও পাকিয়া উঠিয়াছে, এমন কি, কৃষ্ণনগরে সুরাটের পুনরভিনয় হইয়া গিয়াছে। সভাপতির সহিত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি একমত হইতে পারেন নাই, পরন্তু সভাপতিকে সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে। সভাপতির কোন কোন মন্তব্যে কনফারেন্সে এবং বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে অধিকাংশ প্রতিনিধি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সেই সকল মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বলিয়াছিলেন। সভাপতি একটি মন্তব্য প্রত্যাহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য একটি মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে সম্মত হয়েন নাই এবং সে জন্য সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাত্যাগের পর উপস্থিত সদস্যরা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলেন, এরূপ কার্য্য কংগ্রেসের আইনানুগ পদ্ধতির অন্তর্গত নহে, সুতরাং ঐ সভা কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে না। এ জন্য তিনি সদলবলে সভা ত্যাগ করিয়া যায়েন। অপর পক্ষে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসের আইন অনুসারে সভারম্ভের পূর্ব্বে যদি নির্ব্বাচিত সভাপতির পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণ ঘটে, তবে সে ব্যাপার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিকে জানাইয়া সমিতির মতানুসারে কায করিতে হইবে—সভারম্ভের পর আর সে নিয়ম বাহাল থাকিতে পারে না। তিনি President-elect কথাটির উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী সভা সমর্থন করিতেছেন। যাহা হউক, এইরূপে কনফারেন্সে ভাঙ্গাভাঙ্গি উপস্থিত হয়।

শ্রীযুত বসন্তকুমার লাহিড়ী

শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

অবশ্য সম্মেলনের অধিবেশনে কোনও ত্রুটি হয় নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত বসন্তকুমার লাহিড়ী আদর-আপ্যায়নে সকলকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার কোনও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই।

কিন্তু বাঙ্গালীর আশা পূর্ণ হয় নাই। যে বাঙ্গালা এক দিন ভারতে রাজনীতিক্ষেত্রে নেতার দণ্ড ধারণ করিয়া আসিয়াছে, যে বাঙ্গালার নেতারা এ যাবৎ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন,—কৃষ্ণনগর বাঙ্গালার সে নেতৃত্ব অটুট রাখিতে পারিল না। বাঙ্গালার বিশেষত্ব রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গালা ভাষায় কার্য্যপরিচালনের নিয়ম করা হইয়াছে—বাঙ্গালার অবস্থা বুঝিয়া বাঙ্গালার সমস্যাসমূহের সমাধান করা আজ কয়েক বৎসর হইতে সম্মেলনের লক্ষ্য হইয়াছে। কৃষ্ণনগর সে বিশেষত্বরক্ষায় পশ্চাৎপদ হইয়াছে। সিরাজগঞ্জে দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গালাকে যে পদে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন,—কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালা তাহা হইতে অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িল। বস্তুতঃ কৃষ্ণনগরের ব্যাপারে বাঙ্গালীর শোচনীয় আত্মকলহ এবং নেতৃত্বের অভাব দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশ বোধ হয় লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন,—এমনই বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা। যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক দিন বাঙ্গালী রাজেন্দ্রলাল, রামগোপাল, উমেশচন্দ্র, কালীচরণ, মনোমোহন, লালমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব যেন চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে! কৃষ্ণনগরে তাহার পরিচয় পরিস্ফুট।

অভিভাষণ

ইংরাজীতে কথায় বলে,—যে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়। বীরেন্দ্রনাথ ত্যাগী ও কর্ম্মী পুরুষ, স্বদেশ-প্রেমে তিনি কাহারও ন্যূন নহেন, যখন প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন তিনি দেশের জন্য কারাবরণ করিতে ও অশেষ ক্ষতিস্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ

হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাঙ্গালী কৃষ্ণনগরের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়া যোগ্য জনেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। বাঙ্গালী তাঁহার ন্যায় ত্যাগী ও কর্ম্মী দেশ-প্রেমিকের নিকট এই সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে অনেক কিছু আশার কথা শুনিবার আশা করিয়াছিল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের আশাও যে তাহারা না করিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু দুঃখের কথা, তাহাদের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছে, সভাপতি মহাশয় সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিতে গিয়া কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, পরন্তু তিনি বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের সমাধান না করিয়া বরং ভাঙ্গাভাঙ্গি আরও পাকাইয়া তুলিয়াছেন।

অবশ্য বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্সে নিছক বাঙ্গালার কথা থাকিবে—নিখিল ভারতীয় সমস্যার কথা কিছুই থাকিবে না, এমন অন্যায় কথা কেহ বলিবে না, কারণ, প্রাদেশিক কনফারেন্স কংগ্রেসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র, এই হেতু কংগ্রেসনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রাদেশিক কনফারেন্সেও অভিভাষণ পঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। তথাপি বাঙ্গালায় যে সঙ্কট-সঙ্কুল সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। সে বিষয়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উহাও সহনযোগ্য হইত, যদি সভাপতি মহাশয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যকেও অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও নূতন আদর্শ বাঙ্গালীর সমক্ষে উপস্থিত না করিতেন। মহাত্মা গন্ধী ও দেশবন্ধু দাশ প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এ যাবৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া দেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য। সভাপতি শাসমল মহাশয় সে আদর্শেও তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। তিনি হিংসা বা রক্তপাতের পথ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, অথচ জনগত আইন অমান্য করার উপরেও পূর্ণ বিপ্লব ঘটাইতে চাহেন। অবশ্য ইহা তাঁহার বর্ত্তমানের কার্য্যপদ্ধতির অন্তর্ভূত নহে, তবে ইহা ভবিষ্যতের আদর্শ। কিন্তু কেমন করিয়া অহিংসার পথে পূর্ণ বিপ্লব ঘটাইতে পারা যায়, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন নাই, কেবলমাত্র ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, সেই পূর্ণ বিপ্লবাবস্থার অনুকূল মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা দ্বারা তিনি যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপ্লবপন্থীদিগের মন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপরপক্ষে সরকার ও য়ুরোপীয় সমাজকে বিপ্লবের বিভীষিকা দেখাইয়া বাঙ্গালীর আদর্শের একটা মন-গড়া চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার অভিভাষণের অসাফল্য সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে বিপ্লবপন্থীরাও তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, সরকারও তাঁহার বৃথা বাহ্বাস্ফোটে কণামাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত হয়েন নাই। যাহা অসম্ভব, তাহাকে বাস্তবের মূর্ত্তি দিতে গিয়া তিনি দুই কুলই হারাইয়াছেন। যাহারা বিপ্লবপন্থী, তাহারা হিংসা বা রক্তপাতরহিত বিপ্লবের কথা বুঝিতে পারে নাই। সরকারও ভবিষ্যতের এই ভাসা-ভাসা আদর্শের কথা বুঝিতে পারেন নাই। তবে এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল কি?

তাহার পর অভিভাষণের এক স্থানে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"আমাদের সকল কর্ম্মী এক মনে ও এক প্রাণে প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তাঁহারা গোপনের অন্ধকারে কখন কিছু করিতে পারিবেন না।" কথাটা যে বিপ্লবপন্থীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা এই হেঁয়ালির ভাষা হইতেও বেশ বুঝা যায়। সত্য বটে, কোন কোন বিপ্লবপন্থী তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে আইনানুগ পথে স্বায়ত্তশাসনাধিকারলাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহারা পূর্ব্বে 'গোপনের অন্ধকারে কিছু' করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মতপরিবর্ত্তনের পরেও যে তাঁহারা 'গোপনের অন্ধকারে কিছু করিবেন', এমন কি প্রমাণ আছে? যাঁহারা ভ্রান্তপথে চালিত হইয়া পরে সেই ভ্রম সংশোধন করেন, তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবার কি কারণ আছে? সুতরাং অযথা তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন আছে? বিপ্লবপন্থী ব্যতীত অসংখ্য বাঙ্গালী কংগ্রেসকর্ম্মী আছেন। তাঁহাদিগকেও প্রয়োজন হইলে 'গোপনের অন্ধকারে কিছু' করিতে হয়, কেন না, গোপনে বোমা-রিভলভার সংগ্রহ না করিয়াও মন্ত্রগুপ্তির অনেক সময়ে প্রয়োজন হয়, সুতরাং তাঁহারা মন্ত্রগুপ্তির পথ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কি জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন? যাহারা অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদিগকে নানা কারণে নানা সময়ে মন্ত্রণা গুপ্ত রাখিতে হয়। তাঁহারা শাসমল মহাশয়ের কথায় এই অধিকার ত্যাগ করিবেন কেন?

ইহার পর সভাপতি শাসমল মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন, "যাঁহারা ইতোমধ্যে যে কারণে হউক মার্কামারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল কর্ম্মক্ষেত্র (কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠানসমূহ) হইতে দূরে থাকিবেন।" 'মার্কামারা' কাহাকে বলে, সভাপতি মহাশয় তাহা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান নাই। মার্কামারা হয় কাহার দ্বারা এবং কাহাদিগকেই বা মার্কামারা করা হয়? যদি কংগ্রেসের দ্বারা কাহাকে মার্কামারা হইয়া থাকে, তাঁহাকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে দূরে রাখিলে কোনও ক্ষতি নাই, দূরে রাখাই কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয় যে সে হিসাবে মার্কামারা কথা ব্যবহার করেন নাই, তাহা তাঁহার কথার ভাবেই বুঝা যায়। তিনি মার্কামারা কথাটা সরকারের মার্কামারা হিসাবেই বুঝিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, সরকার এ দেশের বহু কর্ম্মী দেশপ্রেমিককেই মার্কা মারিয়া দিয়াছেন। সার সুরেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মহামতি তিলক, মহাত্মা গন্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল, অশ্বিনীকুমার, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কোন না কোন সময়ে সরকারের মার্কা লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ দেশসেবক বহু কর্ম্মী এখনও সরকারের মার্কা ধারণ করিয়া আছেন। সভাপতি মহাশয় কি ইঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই (অবশ্য যাঁহারা জীবিত আছেন) কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে বলেন? শাসমল মহাশয় যত বড় সাহসী স্পষ্টবক্তাই হউন না কেন, এ সকল দেশকর্ম্মীকে কংগ্রেস হইতে সরাইবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই, দেশবাসী এ কথা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কনফারেন্সে ঘটিয়াছিলও তাহাই। বহুসংখ্যক সদস্য তাঁহার এ কথায় ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। করিবারই কথা।

ফল কথা, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালীকে এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে প্রকৃত পথ দেখাইতে পারেন নাই। তিনি লিবারল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ও প্রতিবাদমূলক অসহযোগীদিগকে একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন, কাউন্সিলে চীৎকারে স্বরাজলাভ হইবে না। কাউন্সিলগামী অসহযোগিগণ তাঁহার মতে স্বাবলম্বনবিহীন হইয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহাদের সকল আর্ত্তনাদ মরুভূমিতে ক্রন্দনের মত ফলপ্রস্য হইতেছে না। তাঁহার বিশ্বাস,—স্বাবলম্বনের 'চূড়ান্ত উৎকর্ষ' অহিংস অসহযোগের দ্বারা "য়ুনিয়ন স্বাতন্ত্র্য, জিলা স্বাতন্ত্র্য, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য, এমন কি, হয় ত সাম্রাজ্যিক অধিকার বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদারী লাভ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জ্জন করা যাইতে পারে না।" এই হেতু তিনি উপদেশ দিতেছেন যে, এ সকলের পরিবর্ত্তে পূর্ণ বিপ্লবের (অথচ অহিংস) জন্য মনোবৃত্তিকে প্রস্তুত করিতে হইবে। কথাটা খুব 'গালভরা' হইলেও উহাতে প্রকৃত কার্য্য বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইবে না। শাসমল মহাশয় বৃথা মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া নিজে ভ্রান্ত হইয়াছেন, দেশবাসীকেও ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

গ্রীষ্মের প্রতাপ

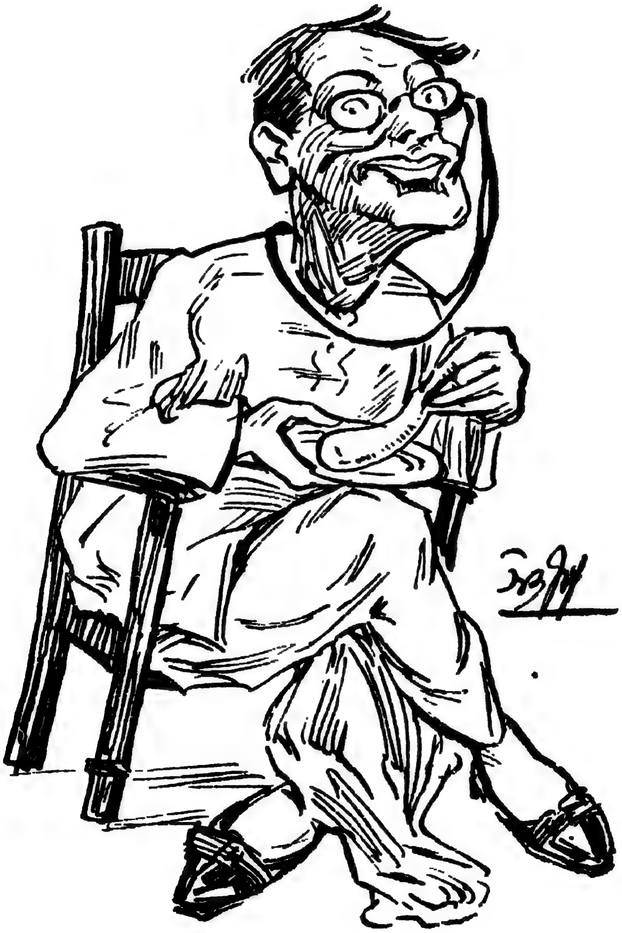

মেজাজটা সৌখীন বটে তল্পী তেমন নয়,
অল্প ব্যয়ে কুলপী খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

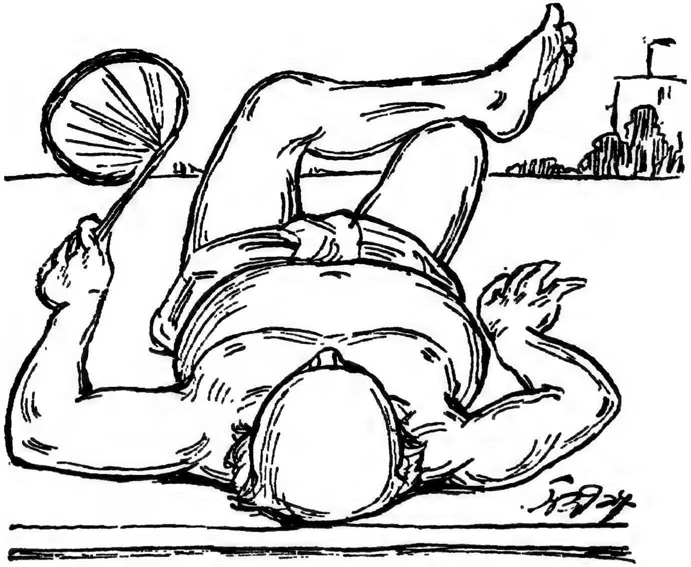

রেখে দে তোর সভ্যতা তাতে মারা যাই,
তে পোড়ে গুড়িয়ে কাপড় করি আইঢাই

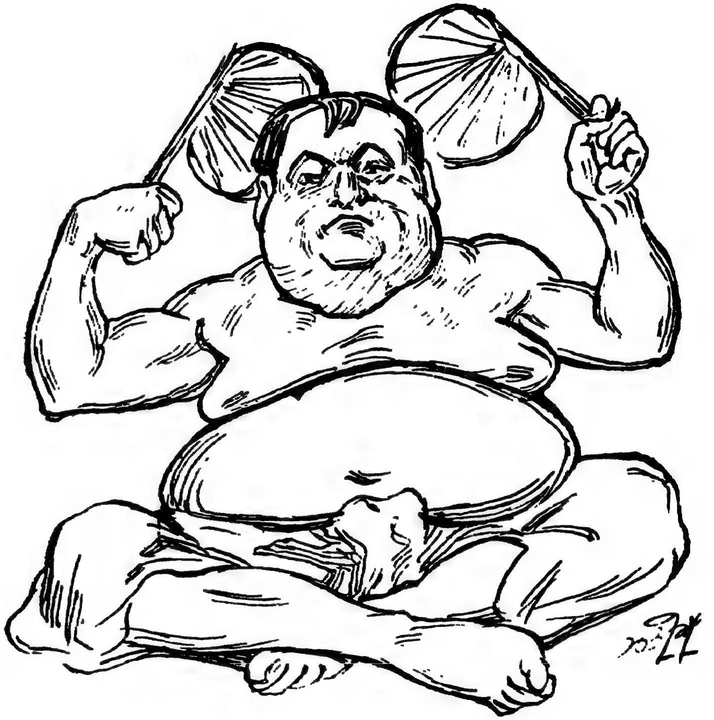

এঁর সিন্দুকেতে বন্ধ করা আছে অনেক টাকা,
কাযেই গরম কাটে না, না নাড়লে দু’ দু’খানা পাখ

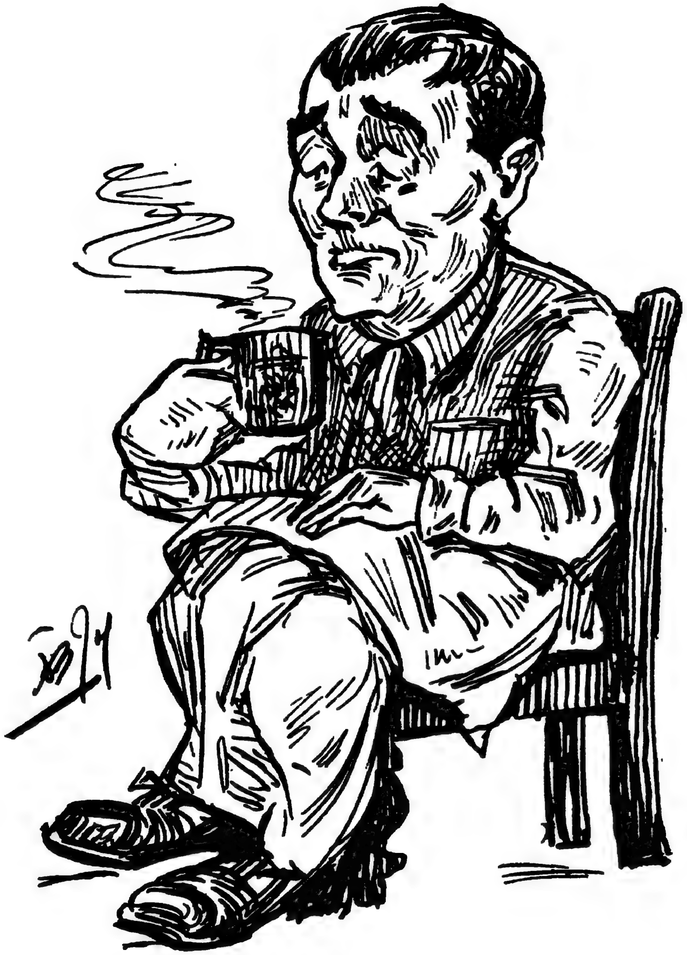

ইনি [illegible]রম দিয়ে গরম কাটান চায়ের বাটি ভ'রে,
ছ[illegible]ন নাকো জামা-জোড়া গেলেও [illegible] ম'রে

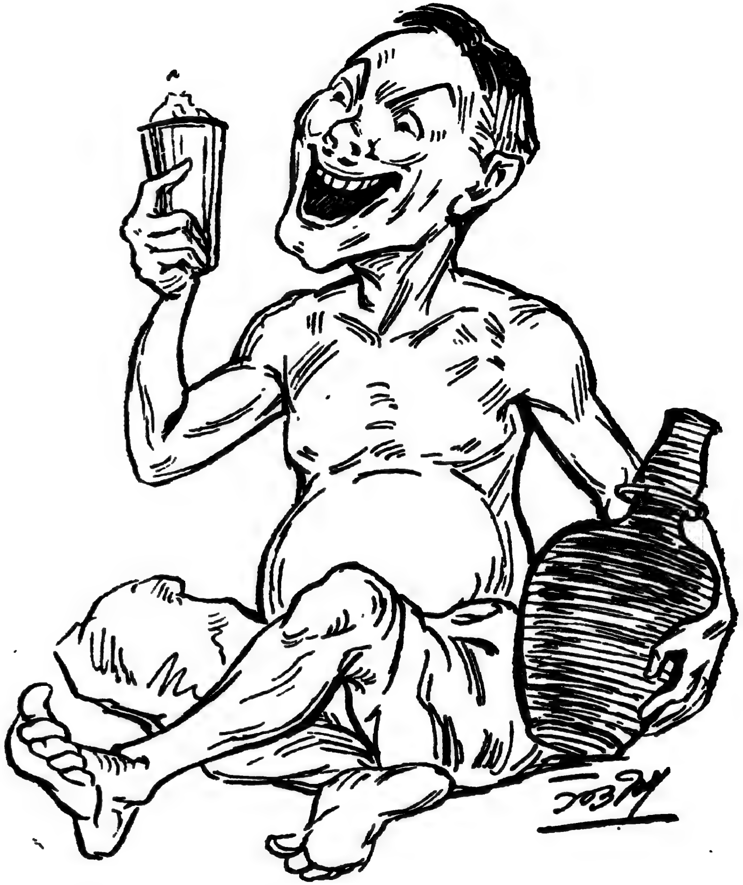

দেখতে দেখতে এক কুঁজো জল হয়ে গেল পার,
ওরে কেষ্টা, তবু তেষ্টা যায় না যে আমার।

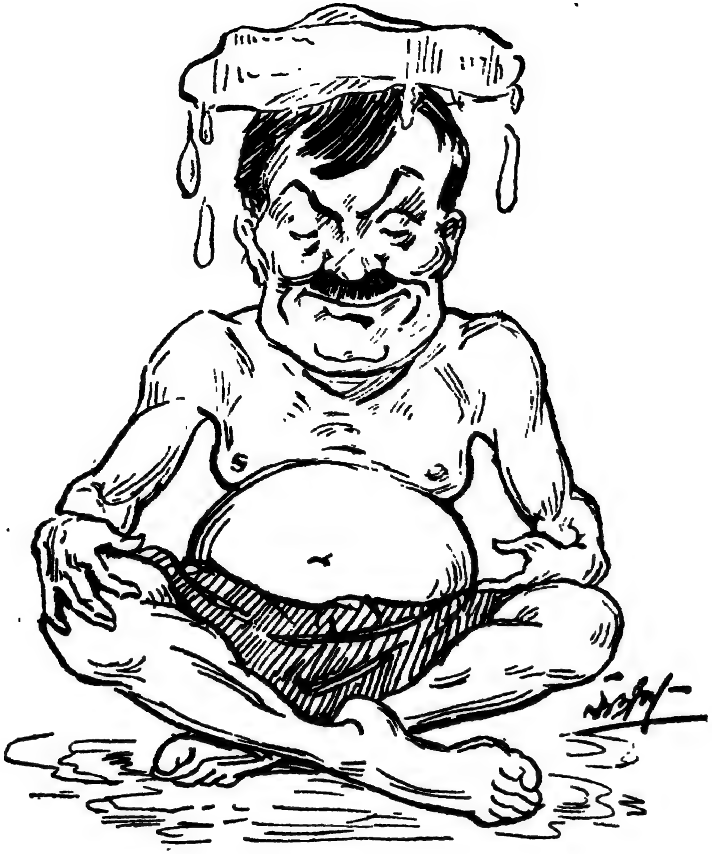

ব'সে আছেন জা বাবু সেজে হিমালয়,
দিয়ে মাথায় বরফ করছেন পরফ কিসে ঠা হয়

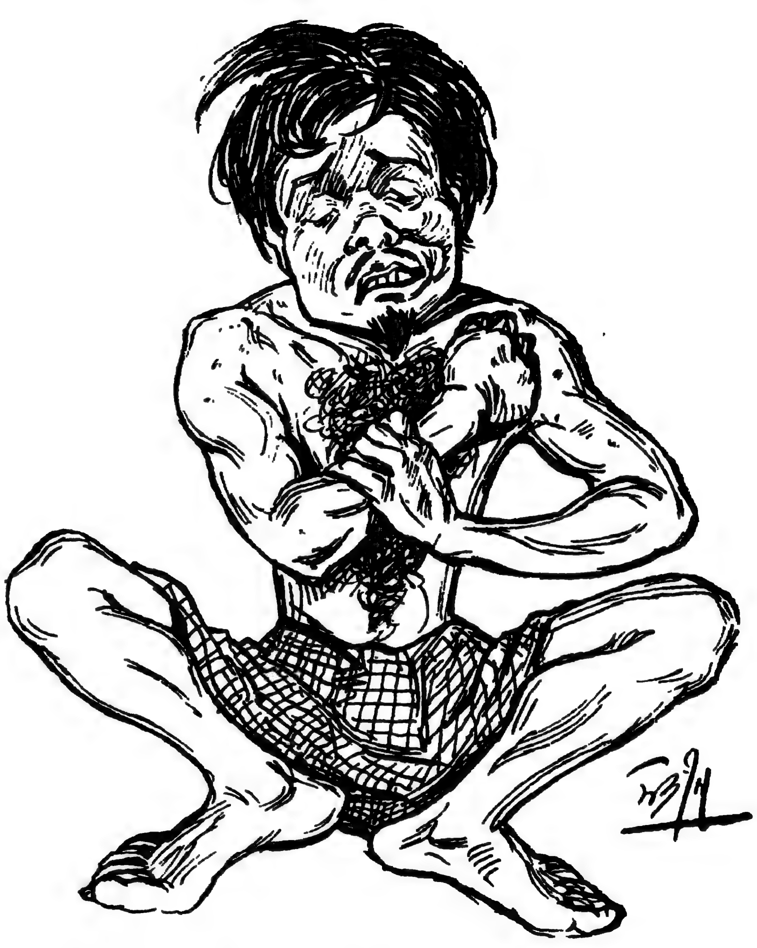

ঘামাচির চোটে চাচার আমার গা'টি জ্ব'লে যায়,
বুকেতে দঙ্গল ঝোড় নখ বসান দায়।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

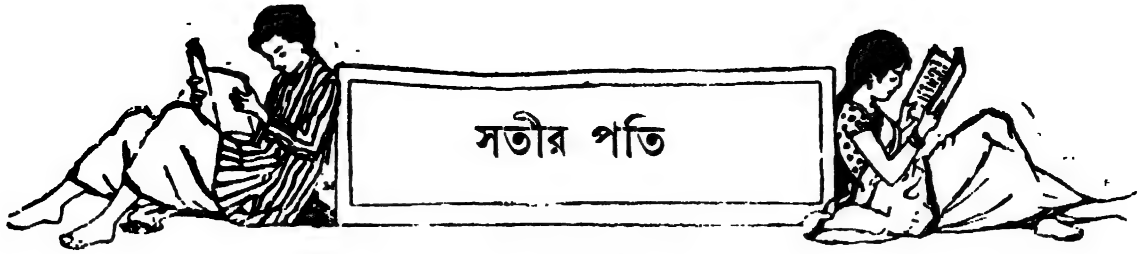

সতীর পতি

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়

হীরালাল পূর্ব্বেও কত বার কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু এবার আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহা অপূর্ব্ব। যে বড়বাজারের চৌড়া রাস্তা ট্রাম, ট্যাক্সি, লরী, ছক্কড়, গোরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীতে সর্ব্বক্ষণ গিজ-গিজ করিত, রাস্তার এ পার হইতে ও-পারে যাওয়া সঙ্কটজনক ছিল, সে রাস্তা যেন মাঠের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। কচিৎ দুই এক-খানি ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ী যেন প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে—অন্যান্য যানাদি একেবারেই অদৃশ্য। উভয় পাশের দোকানপাট আগাগোড়া বন্ধ। দোতালা তেতালায় রাস্তার ধারের দুয়ার-জানালাগুলি সবই বন্ধ—চৌতালা পাঁচতালা হইতে কচিৎ কোথাও দুই এক জন বালক-বালিকা দুয়ার বা জানালা খুলিয়া উঁকি মারিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ সভয়ে বন্ধ করিয়া দিতেছে। হীরালালের সঙ্গী মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল, "দেখছেন সাহেব, কাফের শালারা আমাদের ডরে দোকানপাট সব বন্ ক'রে দিয়েছে।"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু হিঁদুরাও শুন্‌লাম, আমাদেরও অনেক নোকসান করেছে!"

যুবক বলিল, "হাঁ, থোড়াবহুৎ করেছে বৈ কি! মালও নোকসান করেছে, জান্‌ও নোকসান করেছে। টেরিটি-বাজারে আমাদের দোকান ছিল, লুঠ ক'রে নিয়েছে। কয়েকটা দোকান জ্বালিয়েও দিয়েছে।"

হীরালাল বলিল, "মসজিদও ভেঙ্গেছে শুন্‌লাম?"

"ভাঙ্গেনি, তবে অনেক জিনিষ ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে। অল্প যে ক'জন মুসলমান সেখানে ছিল, তাদের মাইর-পীট করেছে—কারু কারু জান্‌ও নিয়েছে! এখন আমাদের মস্‌জিদে মস্‌জিদে বহুৎ মুসলমান জমায়েৎ হয়ে আছে—তারা সব জান্ কবুল মস্‌জিদের খবরদারী করছে—এইবার একবার তারা আসুক না দেখি!"

ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়া ট্যাক্সিখানি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। হীরালাল বলিল, "ভাই সাহেব, আপনার নামটি কি, তা ত জান্‌তে পারিনি।"

যুবক বলিল, "আমার নাম সেখ রহিম বক্স।"

"কি কাম করেন আপনি?"

"ঐ যে বল্লাম, টেরিটিবাজারে আমাদের দোকান আছে। আমার চাচার দোকান, আমি সেই দোকানেই থাকি। আপনি কি কাম করেন?"

হীরালাল বলিল, "দেশে কিছু জমী-জমা আছে, তাই তদারক করি, কিসের দোকান ছিল আপনাদের?"

রহিম একটু যেন লজ্জিতভাবে বলিল, "জুতার দোকান। তা এখন কলকাতায় এসেছেন কি মতলবে?"

কি প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার সঙ্গী যদি সে কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে হীরালাল কি বলিবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই সে মনে মনে ভাঁজিয়া রাখিয়াছিল। কল্পিত কাহিনী যাহাতে তাহার মুসলমানত্বের প্রতিপোষক হয়, এই উদ্দেশ্য তাহার ছিল। বলিল, "আমাদের পড়শী এক মুসলমান মাস ছয় হ'ল ইন্তেকাল করেছে—তার একটি বেওয়া আছে, কমসিন্, আর বেশ খাপসুরতি—তারই সঙ্গে আমি নিকা বসবার বন্দোবস্ত করেছি। তারই জন্যে কিছু জেওর খরিদ করতেই এখানে আসা। কিন্তু তখন কি জানি কলকাতায় এ রকম হাল্লা—তা হ'লে আসতাম না। যা হোক, এসে যে আপনাদের পাত্তা পেয়েছি, এই খয়ের, নৈলে নসীবে কি হ'ত বলা যায় না! ভাগ্যিস্ খেলাফৎ এই বন্দোবস্তটি করেছিল।"

ট্যাক্সি এই সময় চীৎপুর রোডের মোড় পার হইতেছিল। মোটর-লরী বোঝাই এক দল গুর্খা সৈন্য বড় মসজিদের দিকে যাইতেছে দেখা গেল। রহিম হাসিয়া বলিল,

"খেলাফৎ কোথা? ওটা একটা বাহানা। হাটের মাঝখানে পুষিদা বাৎ তো খুলে বলা যায় না! তাই ষ্টেশনে ও রকম বলেছিলাম। এ আমাদের নিজেদেরই বন্দোবস্ত। যেখানে যত মুসলমান পাই, আমরা সব জড় করছি। আজ রাত্রে আমরা ঠনঠনিয়ার কালী-মন্দির ভাঙ্গবোই ভাঙ্গবো! আপনাকেও সাথে নিয়ে যাব। আপনাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দেখবেন, মন্দির ভাঙ্গবার জন্যে হাজারো মুসলমান জমা হয়েছে।"

শুনিয়া ভয়ে হীরালালের বুকটি দুর দুর করিতে লাগিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

যুবক বলিল, "গেঁড়াতলায় আমাদের আড্ডা-বাড়ীতে।"

গেঁড়াতলা যে বহু গুণ্ডা মুসলমানের আস্তানা, তাহার কাছাকাছি যে অনেক অসহায় হিন্দু খুন হইয়াছে, সে কথা হীরালাল অদ্যই ট্রেণে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভাবিল, "কি সর্ব্বনাশ! সেই আড্ডায় নিয়ে গিয়ে আমায় ফেলবে? যদি তারা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আমি মুসলমান নই, হিন্দু কাফের, তা হ'লে তখনই আমায় কোর্ব্বাণি ক'রে ফেলবে! এমন জান্‌লে কে মুসলমান সাজতো? দুটো চারটে উর্দ্দু বুলি জানা আছে, তারই জোরে এ পর্য্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে তারা যখন আমায় নামাজ পড়তে ডাকবে? নামাজ ত আমার চৌদ্দপুরুষেও কখনও পড়েনি--তখনই যে গুমর ফাঁক হয়ে যাবে! এখন উপায়?"—হীরালাল মনে মনে বিপত্তৌ মধুসূদনঃ স্মরণ করিতে লাগিল।

ট্যাক্সি ক্রমে গেঁড়াতলার একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

একটা বৃহৎ মাটকোঠার সামনে নামিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান এক প্রৌঢ় মুসলমানকে দেখিয়া রহিম বলিল, "করিম চাচা, শোন।" একটু আড়ালে লইয়া গিয়া চুপি চুপি তাহাকে কি বলিল, তাহার পর হীরালালের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সাহেব, এই ডেরাতে আপনি এখন আরাম করুন, কোনও অসুবিধা হবে না। আপনি যা খাবেন, পয়সা দেবেন, এখানকার লোকেরা আপনাকে সব চীজ এনে দেবে। আমি আবার সন্ধ্যার পর এসে আপনার সাথে মোলাকাৎ করবো—সেলাম।"—বলিয়া রহিম চলিয়া গেল।

দুইটা মুসলমান ছোকরার সাহায্যে হীরালালের বাক্স-বিছানা বহন করাইয়া, প্রৌঢ় মুসলমানটি হীরালালকে ভিতরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ ও রেবতী

এক্সপ্রেস গাড়ী অপরাহ্নসময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে। রিজার্ভ করা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়, ষ্টেশনের দিকের বেঞ্চখানিতে একটি বাঙ্গালী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। পুরুষটির বয়স অনুমান ৪০ বৎসর, গায়ে সিল্কের পঞ্জাবী, হাতে সোনার রিষ্ট ওয়াচ বাঁধা। স্ত্রীলোকটি তাহার অপেক্ষা অন্ততঃ ১০ বৎসরের ছোট হইবে। গায়ে অনেকগুলি মূল্যবান্ অলঙ্কার।

ট্রেণ দাঁড়াইলে, পুরুষটি উঠিয়া বলিল, "কেলনারে দু' পেয়ালা চা ব'লে আসি। ক্ষিদে পেয়েছে কি রেবী? কিছু টোষ্ট আর ডিমও দিয়ে যেতে বলবো?"

রেবী অথবা রেবতী বলিল, "এ ত বর্দ্ধমান? না, আমি ডিমটিম খাব না, সীতাভোগ খাব।"

"আচ্ছা"—বলিয়া পুরুষটি নামিয়া গেল।

ফিরিওয়ালা হাঁকিল—"চানাচুর গরম!"

রেবতী ডাকিল—"এই চানাচুরওয়ালা! ইধার আও।"

চানাচুরওয়ালা আসিলে, রেবতী দুই আনার চানাচুর কিনিয়া, শালপাতার ঠোঙাটি রুমালে বাঁধিয়া, উপরের বঙ্কের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল।

মিনিট পাঁচ পরে পুরুষটি ফিরিয়া আসিল। তাহার বামহস্তে শালপাতা-ঢাকা মিষ্টান্ন এবং চাদরের ভিতর দক্ষিণহস্তে আর একটা কি জিনিষ উঁচু হইয়া রহিয়াছে। প্লাটফর্ম্ম হইতেই খাবারের ঠোঙ্গাটা রমণীর হস্তে দিয়া, দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "চা নিয়ে আসছে।" মাঝখানের বেঞ্চে বসিয়া, সম্মুখের বেঞ্চের নিম্নদেশ হইতে একটা টিফিন-বাস্কেট টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর চাদরের ভিতর হইতে কাগজে জড়ানো একটা বোতল বাহির করিয়া, বাস্কেটের ভিতর পূরিল। রেবতী বলিল, "আবার কেন? ছিল ত কালকের খানিকটে—আধখানার কাছাকাছি!"

পুরুষ বলিল, "কি জান, সংগ্রহ থাকা ভাল। কলকাতায় গিয়ে যখন আমরা পৌঁছব, তখন মামাদের সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। যদিই ধর ২।১ জন বন্ধু-বান্ধবই দেখা-শুনো করতে আসে, তাদের খাতির করতে হবে ত! তার করা হয়েছে, অনেকেই ত জানে, আজ আমরা ফিরছি।"

রেবতী বলিল, "বন্ধুবান্ধবের নাম ক'রে আন্‌লে, গাড়ীতে ওটা কিন্তু খুলতে পাবে না, তা ব'লে দিচ্ছি সতীশ! শেষে যে হাওড়া ষ্টেশনে নামবে, 'পা টলো-টলো'—সে হবে না।"

সতীশ বলিল, "না না—ট্রেণে এটা খুলবোই না?"

কেলনারের খানসামা এই সময় ট্রের উপর দুইটি পেয়ালা, চিনি, দুধ ও একটি ছোট চাদানী লইয়া আসিল। সতীশ জানালা গলাইয়া ট্রেখানি তাহার হস্ত হইতে লইয়া বেঞ্চের উপর উভয়ের মধ্যস্থানে স্থাপন করিল ও দুই পেয়ালা চা তৈরী করিয়া, এক পেয়ালা রেবতীকে দিয়া অপরটি নিজে গ্রহণ করিল।

রেবতী এক চুমুক চা পান করিয়া, উহা অত্যন্ত গরম দেখিয়া, মিষ্টান্নের ঠোঙাটির প্রতি মন দিল। শালপাতার আবরণ খুলিয়া দেখিল, সীতাভোগ ও মিহিদানা দুই-ই আছে। দেখিতে দেখিতে তিনটা সীতাভোগ ও দুইটা মিহিদানা সে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি দুই একটা খাও।"

"আবার ওগুলো খাব? আচ্ছা, দাও না হয় একটা!" বলিয়া সতীশ চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে লাগিল। রেবতী তাহার হস্তে একটা সীতাভোগ দিয়া, নিজে আর একটা মিহিদানা ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ট্রেণের বরফওয়ালা ছোকরা হাঁকিল,—"সোডা, লেমনেড, বরফ!"—কামরার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আউর বরফ চাহিয়ে বাবু?"

বাবু বলিল, "ভিতরে এসে বরফের বাক্সটায় দেখ্ না—যদি না থাকে ত দিয়ে যা।"

বরফওয়ালা ভিতরে আসিয়া, বাথরুমের ভিতর গিয়া বরফের বাক্সে হাত পুরিয়া, ছোট এক টুকরা বাহির করিয়া বলিল, "এহি এৎনা ত হায় বাবু।"

বাবু বলিল,—"এক সের দিয়ে যা।"

ছোকরা নামিয়া গিয়া, বরফ আনিয়া, সেই বাক্সর মধ্যে পুরিয়া গুঁড়া চাপা দিয়া, হাত ধুইয়া বাহির হইল।

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কেৎনা হুয়া রে?"

ছোকরা বলিল, "চারঠো লেমনেড, তিনঠো সোডা,—আউর দু' সের বরফ। চারঠো লেমনেড সাত আনা—"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, "যা যা, লেলুয়ায় এসে হিসেব নিয়ে যাস্।"

"বহুৎখু"—বলিয়া ছোকরা নামিয়া গিয়া, আবার "সোডা, লেমনেড, বরফ"—হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া গেল।

চা-পান-শেষে হাত-মুখ ধুইয়া, কেলনারের বিল মিটাইয়া দিতেই ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সতীশ টিফিন-বাস্কেট টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে পাণের ডিবা, জর্দ্দার শিশি ও সিগারেটের কৌটা বাহির করিল। পাণ খাইয়া দুই জনেই এক একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার পর সতীশ পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া, তাহার মোড়ক ছিঁড়িতে লাগিল। রেবতী বলিল, "খবরের কাগজ পেলে কোথা?"

"হুইলার থেকে একখানা ষ্টেটস্‌ম্যান কিনে আনলাম। আজকের খবরটা কি রকম দেখি। দু'জন বাবু ত বলাবলি করছিল যে, দাঙ্গা এখনও থামে নি।"

রেবতী আগ্রহের স্বরে বলিল, "দেখ দেখ।"

খবরের কাগজ খুলিয়া বাবুটি পড়িতে পড়িতে সহাস্য-বদনে বলিয়া উঠিল, "হুব্বাবা!—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি! এখন পথে এস।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি সতীশ?"

বাবু বলিল, "কেল্লা থেকে গোরা সৈন্য এসেছে রেবী! গোরা সৈন্য এসেছে! সঙীন উঁচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছে! গোরা সৈন্য-ভর্ত্তি মোটর-লরি তৈরী বন্দুক হাতে ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! কর এবার দাঙ্গা! গুণ্ডারা সব কে কোথায় সটকে পড়েছেন! হুব্বাবা! বেরোও না এক বার লাঠি-সোটা হাতে ক'রে।"

রেবতী বলিল, "দাঙ্গার তা হ'লে আর কোনও ভয় নেই বল?—কিন্তু বন্দুক নিয়ে গোরা সৈন্য বেড়াচ্ছে—আমাদের যদি কিছু বলে?"

"কেন? আমাদের কেন বলবে? আমরা কি গুণ্ডা ক্লাসের লোক? আমরা কি দাঙ্গাকারী?"—বলিয়া সতীশ সংবাদপত্র পড়িতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "মনে মনেই পড়ছ, খবরগুলো আমায় বল।"

সতীশ বলিল, "বলি। আগে কতকটা প'ড়ে নিই দাঁড়াও। (হাই তুলিয়া)—আঃ—হাই উঠছে কেন?"—বলিয়া কৌতুক ও মিনতিভরা চোখে তার সঙ্গিনীর দিকে চাহিল।

রেবতী বলিল, "যাও যাও, আর ন্যাকামো করতে হবে না। এই ত চা খেলে, এখনই আবার হাই উঠছে কেন?—সব খবর আমায় আগে বল্‌বে, তার পর দেবো। দাও—আর একটা সিগারেট দাও।"

বাবুটি তাহার সঙ্গিনীকে সিগারেট দিয়া, আবার কাগজ পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখের পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা ম্লান হইয়া আসিল। পড়া শেষ করিয়া, কাগজ রাখিয়া বলিল, "কিছু বুঝতে পারছিনে!"

"কেন? কি পড়লে?"

"কালকেও অনেকগুলো খুন হয়ে গেছে। এক জন শিখ মোটর ড্রাইভারকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে, তার ট্যাক্সি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আবার হিন্দুরাও এক জন মুসলমান কোচম্যানকে, দু'জন মুসলমান তরকারীওয়ালাকে খুন ক'রে ফেলেছে। গোরারা তখনও বোধ হয় কেল্লা থেকে বেরোয় নি। আজ সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চয়!"

রেবতী বেঞ্চের পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া হতাশভাবে বলিল, "কে জানে বাবু! আমার ত ভারী ভয় করছে। তোমার ভয় হচ্ছে না?"

সতীশ বলিল, "দেখ, আমার মাথায় কিন্তু একটা প্ল্যান (ফন্দী) এসেছে।"

"কি প্ল্যান?"

"দাঁড়াও, প্ল্যানটা আগে মাথার মধ্যে বেশ ক'রে মেচিওর (পাকা) করি, তবে বলবো। সন্ধ্যে ত পেরিয়ে গেছে, এইবার একটু বরফ কাটি, কি বল?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "চোরের মন পুঁই-আদাড়ে! আচ্ছা, কাট।"

সতীশ বাথরুমে গিয়া, বরফ কাটিয়া, সোরাইয়ের জলে তাহা ধুইয়া লইল। বাথরুমের ট্যাপের জলে ধুইল না,—কারণ, পূর্ব্বে এইরূপ ধুইতে গিয়া ঠকিয়াছে;—সারাদিন সূর্য্যের তাপে সে জল প্রায় 'গরম জল' হইয়া থাকে, ধুইতে ধুইতেই অর্দ্ধেক বরফ গলিয়া যায়।

রেবতী ইতোমধ্যে টিফিন-বাস্কেট হইতে আধখালি একটা হেনেসির বোতল, একটা বড় গ্লাস এবং একটা সোডা বাহির করিয়া রাখিয়াছিল। আউন্স তিনেক ব্রাণ্ডির সহিত আধ বোতল সোডা ও বরফের টুকরাটা মিশাইয়া উভয়ে সেবন করিতে লাগিল। একটু পরে রেবতী বলিল, "কি প্ল্যান, বল্লে না সতীশ?"

সতীশ বলিল, "আমি বলি কি, আজ আমরা কলকাতায় না গিয়ে, চল, চন্দননগরেই নামি। সেই হোটেলটায় গিয়ে ওঠা যাবে। কলকাতায় দাঙ্গা না থামা পর্য্যন্ত সেইখানেই কাটানো যাবে। খাসা খাসা জিনিষ রাখে তারা—নয় ভাই?—আর দামেও কত সস্তা দেখেছ? ফরাসী গভর্ণমেণ্টের জয়-জয়কার হোক! চল, চন্দননগরেই নেমে পড়া যাক্, কি বল?"

রেবতী গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়া, সেটা সতীশের হাতে দিয়া বলিল, "অসম্ভব!"

"কেন? দু'মাস বিদায়ের পর কাল তুমি আবার নামবে কথা আছে, সেই জন্যে?"

রেবতী বলিল, "নিশ্চয়! কেন, তুমিই ত সে টেলিগ্রাম প'ড়ে আমায় শুনিয়েছ সতীশ! ম্যানেজার কি লিখেছে, বল না!"

সতীশ বলিল, "টেলিগ্রামে ছিল, দু'মাস অবকাশের পর কাল তুমি আবার মক্ষিরানার ভূমিকায় নেমে কলকাতার দর্শকবৃন্দকে নাচে গানে মাতোয়ারা ক'রে দেবে, এ কথা সহরময় প্ল্যাকার্ড করা হয়েছে, কাগজে কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—এমন কি, সে রাত্রির অধিকাংশ আসনই আগাম বিক্রী হয়ে গেছে; আজ তোমার কলকাতায় এসে পৌছন চাই-ই।—তা হলেও প্রাণটা ত ভাই আগে!"—বলিয়া সতীশ গ্লাসটা খালি করিয়া ফেলিল।

রেবতী বলিল, "না, সে হয় না। আমি তাদের টেলিগ্রাম করেছি—নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে ফিরবো। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারা বড় খারাপ। আর বোধ হয়,

তারা হাওড়ায় এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে—আমায় নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা তারা করেছে। নাও, আর একটু বরফ কাট।"

দ্বিতীয় গ্লাস ঢালা হইলে, রমণী বলিল, "একটা জিনিষ খাবে?"—বলিয়া, রুমালে বাঁধা চানাচূরের ঠোঙ্গাটি বাহির করিয়া দিল।

সতীশ বলিল, "বাঃ—বাঃ—এ পেলে কোথায়?" এক মুঠা মুখে পূরিয়া চিবাইয়া বলিল, "খাসা মুচমুচ করছে—আর বেশ ঝাল ঝাল।"

রেবতী চানাচূব ক্রয়ের ইতিহাস বলিল। সতীশ বলিল, "একেই বলে পাকা গিন্নী! সত্যি ভাই, তুই যদি আমার ওয়াইফ হতিস্ ত—হুব্বাবা! ক্যা ফূর্ত্তি!"

রেবতী এক চুমুক খাইয়া গ্লাসটা সতীশের হাতে দিয়া বলিল, "আমি যদি তোর ওয়াইফ হতাম ত কি করতাম জানিস? উঠতে বসতে তোকে ঝাড়ু লাগাতাম।"

সতীশ বলিল, "তা লাগাতিস লাগাতিস; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই গানটাও গাইতিস ত?"—বলিয়া সতীশ তাহার বে-সুরে আরম্ভ করিল—

"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!
এত্বা বড়া মোকামমে
এত্তা জঞ্জাল!"

রেবতী ষ্টেটসম্যানখানা লইয়া সতীশের পিঠে তালে তালে ছপাছপ মারিতে মারিতে, তার কিন্নরী-বিনিন্দিত কণ্ঠে গাইল—

"হরদম লাগাতা ঝাড়ু, তব ভি এসা হাল!"

"গা না ভাই—গা—থাম্‌লি কেন? আমি নাচি।"—বলিয়া সতীশ গ্লাস হাতে উঠিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

রেবতী বলিল, "না—না, এখন নাচে না। গেলাস দে, খাই।"

সতীশকে গানে পাইয়াছিল। রেবতীর হাতে গ্লাস দিয়া, সে বলিল, "তার পর কি রে? মনে ক'রে দে না। হ্যাঁ—অন্দরমে বাহিরমে সবমে সোমান!—আহা, নাট্যকার ভায়ার কি হিন্দীজ্ঞান রে!—তার পর কি ভাই?"

কিন্তু রেবতী তার স্মরণশক্তির কোনও সাহায্য করিল না। অগত্যা সতীশ আবার বসিয়া গ্লাসে চুমুক দিল। দাঙ্গা-প্রসঙ্গ বারুণী-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গেল। চন্দননগর পার হইয়া গাড়ী শ্রীরামপুরে আসিয়া দাঁড়াইল। সোডা নিঃশেষিত, বোতলও ইতোমধ্যে খালি হইয়া গিয়াছে।

রেবতী বলিল, "হ্যাঁগা, সোডা আর নেই বোধ হয়?"

সতীশ মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "সোডার দুঃখ কি? আমি এখনই আনাচ্ছি"—বলিয়া কামরা হইতে নামিয়া টলিতে টলিতে বরফ-গাড়ীর দিকে ছুটিল। সোডা হুকুম করিয়া ফিরিতে ফিরিতেই ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। বরফওয়ালা ছোকরা যখন সোডা লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং ছোকরা নামিতে পারিল না—ইহার পর লিলুয়ায় গাড়ী থামিবে, সেইখানে নামিবে।

বর্দ্ধমানে ক্রীত নূতন বোতলটি খোলা হইল। ছোকরাই বরফ কাটিয়া ধুইয়া আনিল। পান করিতে করিতে সতীশের কি খেয়াল হইল, বলিল, "এই শালা, সোডা পিয়েগা?"

ছোকরা বলিল, "গালি কাহে দেতেঁহে বাবু?"

সতীশ বলিল, "শালা বল্লে তোর গাল হ'ল বুঝি? তুই কার ভাই হলি জানিস্? এই যে বিবি বৈঠা হায়,—তুই তার ভাই হলি। এ বিবি কোন্ হায় জানতা হায়? কচু জানতা হায়। হুব্বাবা! এ যে সে বিবি নেহি হায়! রঙ্গালয়-জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সাম্রাজ্ঞী—অদ্বিতীয়া গায়িকা ও নাচিকা রেবতীসুন্দরীকা নাম শুনা হায়? ইনি সেই রেবতীসুন্দরী হায়, হামারা ওয়াইফ—ফাইভ হণ্ড্রেড রুপীজ এ মন্থ হাম ইনকো সেলারি দেতা হায়—শরীর অসুস্থ হুয়াথা, হাওয়া খানেকো চুনারমে লে গিয়াথা! টু থাউজাণ্ড রুপীজ্ হাম খরচ কিয়া। ইন্‌কা ভাই হোনেমে তুমারা এৎনা আপত্তি?"

"আঃ সতীশ, কি মাৎলামি করছিস!"—বলিয়া রেবতী সতীশের পিঠে এক থাবড়া মারিল। মাতালের কাণ্ড দেখিয়া ছোকরাও দুই পাটি দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

লিলুয়ায় ট্রেণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রেবতী বোতল, গেলাস প্রভৃতি লুকাইয়া ফেলিয়া, ছোকরার হিসাব চাহিল। ছোকরা সোডা প্রভৃতি যত দিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া

তাহার দেড়গুণ, দ্বিগুণ ফর্দ্দ দিল, এবং টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া রেবতী ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কৈ, থিয়েটারের কোনও লোকই ত তাহাকে লইতে আসে নাই! তখন সে বলিল, "সতীশ, বুঝেছ,—কোনও শিখের ট্যাক্সি নয়, মুসলমানের ট্যাক্সি নয়, হিন্দু ড্রাইভারের ট্যাক্সি দেখে ওঠ।"

সে দিন প্ল্যাটফর্ম্মে ট্যাক্সি অতি অল্পসংখ্যকই ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক ড্রাইভারকে হিন্দু বলিয়া বোধ হইল। মাথাটি তার একেবারে কামানো—মস্ত এক টিকি ঝুলিতেছে।

উভয়ে গিয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিল। সতীশ হুকুম দিল—"চিৎপুর রোড জয় মিত্তিরকা গলি।"

ট্যাক্সি ছুটিল। সতীশ বসিয়া ঢুলিতেছিল, রেবতী সজাগ ছিল। চিৎপুর রোডের মোড় পার হইয়া ট্যাক্সি যখন হ্যারিসন রোড দিয়াই চলিল, রেবতী বলিয়া উঠিল, "এই—এই—কাঁহা যাতা হায়? ঘুমাও ঘুমাও—চিৎপুর রোডসে চলো।"

ড্রাইভার বলিল, "উধার বহুৎ গোলমাল মাইজী! নয়া রাস্তামে লে চলেঙ্গে।"

কিন্তু গাড়ী যখন নূতন রাস্তা সেণ্ট্র্যাল এভিনিউও ছাড়িয়া চলিল, রেবতী তখন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এই উল্লুক, কাঁহা যাতা হায়? উধার নেহি—উধার নেহি!"

রেবতীর চেঁচামেচিতে সতীশ জাগিয়া উঠিল। ট্যাক্সি-চালক রূঢ়স্বরে বলিল, "এই মাগী! চিল্লাও মৎ—ঠিক যাতা হায়।"—বলিতে বলিতে ট্যাক্সি গেঁড়াতলার এক গলীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কতকগুলা গুণ্ডা-গোছের মুসলমান, শিকার জুটিয়াছে দেখিয়া উল্লাসের ধ্বনি করিতে করিতে ট্যাক্সির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

দেখিয়া রেবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সতীশেরও নেশা ছুটিয়া গেল। ব্যাপারটা সে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সেই মাটকোঠার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

দুই তিন জন মুসলমান রূঢ়স্বরে বলিল, "উৎরো।"—এক জনের হাতে একখানা মস্ত ছোরা। অপর সকলের হাতে লাঠি।

সতীশ প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "এজী, হামলোককো হিঁয়া কাহে লায়া?"

"চলো—আভি মালুম হোগা।" বলিয়া তাহারা উভয়কে হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইল।

দ্বারস্থ সেই প্রৌঢ় মুসলমান করিম চাচা, মুণ্ডিতমস্তক টিকিধারী সেই ড্রাইভারকে বলিল, "আলিজান—আর একবার হাওড়া ষ্টেশনে যা না—যদি আর কোনও শিকার মেলে!"

টিকিধারী বলিল, "বড় ভুখ লেগেছে করিম চাচা! আর ষ্টেশনে মোশাফিরও খুব কম উৎরাচ্ছে খোদা কসম্। এখন ট্যাক্সি আস্তাবলে রাখি গে।"

"আচ্ছা যা, কাল বিহান হতেই আসিস"—বলিয়া করিম শেখ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমসংশোধন

বৈশাখ-সংখ্যায় "শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধের ৩টি ভ্রমসংশোধন—(১) mistaken—পরিবর্ত্তে mystic (২) Extatic—Ecstatic (৩) Latter—Later.

বর্ত্তমান সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ) ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় "শিল্পমঞ্জরী"র লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের নামটি ভ্রমক্রমে বসান হয় নাই এবং ২৯৫ পৃষ্ঠায় "ভাবের অভিব্যক্তি—থিয়েটার-দর্শক"এ অভিনেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্থলে ভ্রমবশতঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

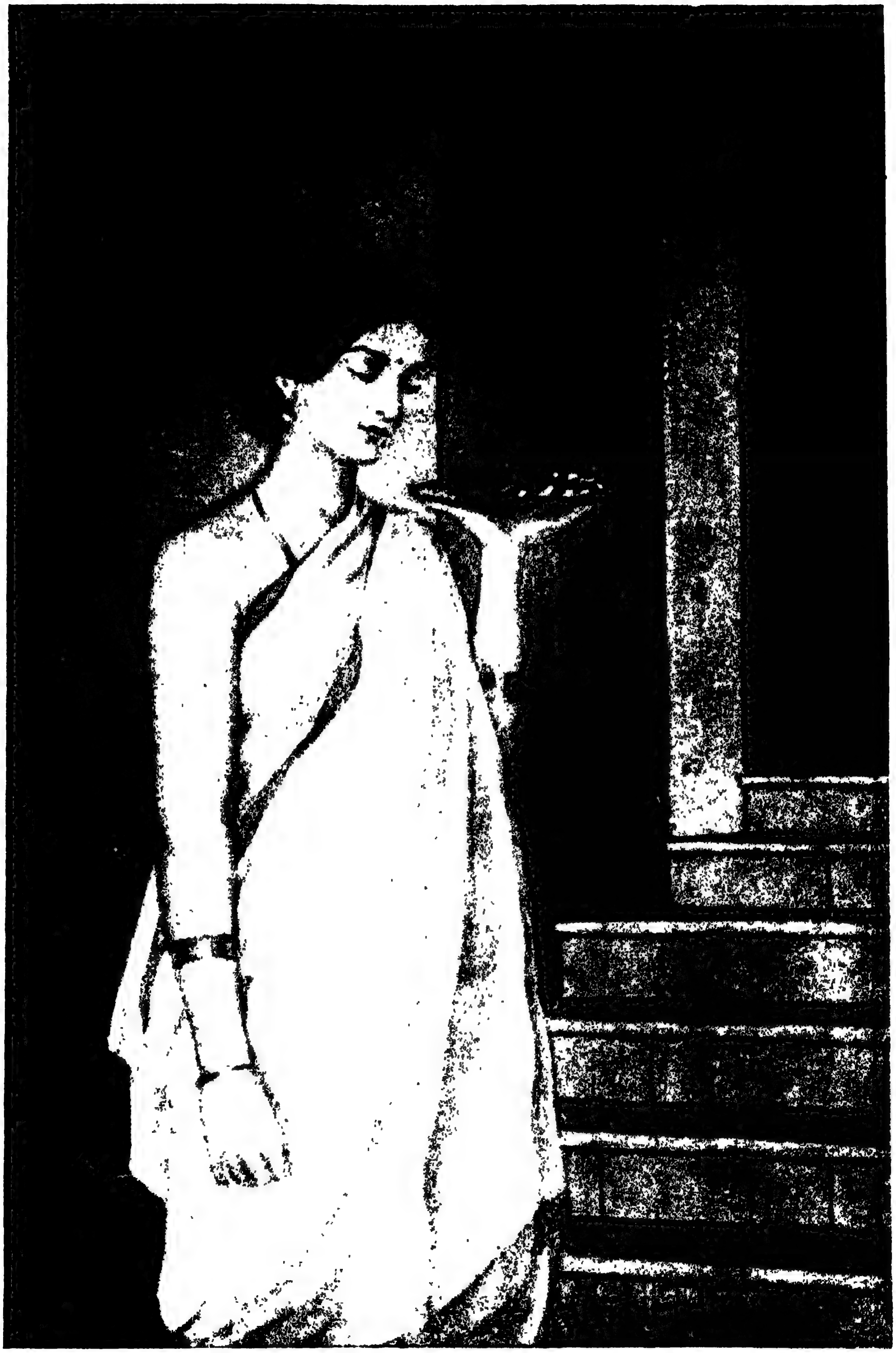

পূজার্থিনী

বসুমতী প্রেস]

শিল্পী—শ্রীসত্যেশচন্দ্র [illegible]

৫ম বর্ষ]   আষাঢ়, ১৩৩৩   [৩য় সংখ্যা

জয়শ্রী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র

চণ্ডদেব	...	অবন্তীর রাজা
প্রভুগুপ্ত	...	ঐ মন্ত্রী
পুরোহিত	...	
উদ্দালক	...	পুরোহিত-পুত্র
উদয়ন	..	কৌশাম্বীর রাজা
প্রবরসেন	...	মালবের যুবরাজ
মহিরঙ্গ	...	ঐ হস্তিচালক

মণ্ডল, পুরবাসিগণ, পরিচারক, রঙ্গী, রক্ষিগণ।

পাত্রী

জয়শ্রী	...	চণ্ডদেবের কন্যা
রাণী	...	চণ্ডদেব-পত্নী
সুমিত্রা	...	উদয়নের মাতা
সুষেণা	...	নারীসেনা-প্রধানা
দেবসেনা	...	ঐ দ্বিতীয়া
যশমা	...	মহিরঙ্গের পত্নী

নারীসেনাগণ, পুরনারীগণ, পরিচারিকা,
রঙ্গিণীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনবেষ্টিত বিহারভূমি

বল্লমহস্তে নারীসেনাগণ

(গীত)

আয়স-কঠোরা উর-বন্ধনী, রক্ত-গরবী নিশানা
চ'লে চল্ রণে রঙ্গিণী, গা যেন পা যেন টলে না।
প্রতিপদভরে বুঝাও নারী
আমরা চলিলে চলিতে পারি,
অবলা নহি অবলা নহি—জাতির স্বাস্থ্য আমরা।
পুত্র মোদের অজর অমর, অজরা আমরা অমরা।
স্থির লক্ষ্যে জাতির সাধনা পারিব না যেন বলে না।
যেখানে আমরা, শুন হে তোমরা, সে জাতি মরেনি মরে না।

(নারী-সেনানায়িকা সুষেণার প্রবেশ, তাহাকে নারীসেনাগণের অভিবাদন)

সুষেণা। রাজা এ দিকের গণ্ডী এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করবে, পুরুষই হোক কি নারীই হোক, তাকে বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলবে। রাজার আদেশের অপেক্ষা করতে হবে না। তার কোন প্রার্থনা, কোন আর্ত্তনাদ কাণে তুলবে না।

১মা। রাজা ও রাজকুমারী উভয়েই বিচরণ করতে করতে এই দিকে আসছেন।

সুষেণা। সুতরাং এখন থেকেই অতি সাবধানে প্রহরীর কার্য্য কর। যেন কোনও মতে অযোগ্যতার দুর্নাম কিনো না। পুরুষ রক্ষীরা যেন আমাদের রহস্য করবার অবকাশ না পায়।

২য়া। তুমি যখন আমাদের প্রধানা, তখন দুর্নাম কি জন্য কিন্‌বো?

সুষেণা। রাজাদের শত্রুর অভাব নেই।

২য়া। আর বলতে হবে না প্রধানা, আমরা থাকবো।

(সকলে ঐ কথা পুনরুচ্চারিত করিল)

সুষেণা। তোমাদের সাবধান করবার প্রয়োজন ছিল না, তবে বল্লম হস্তে করলেও তোমরা নারী।

১মা। পুরুষ যদি বৃদ্ধ হয়, নারী যদি বৃদ্ধা হয়?

সুষেণা। বধ করতে তোমাদের যদি সঙ্কোচ হয়, আমার কাছে ধ'রে নিয়ে যাবে। কেমন ক'রে বধ করতে হয়, আমিই দেখিয়ে দেবো।

২য়া। তা আর দেখাতে হবে না প্রধানা, তুমি যদি ঠিক থাকতে পার, আমরাও পারি।

(অন্য সকলে বলিল, আমরাও পারি।)

১মা। রাজা—রাজা!

(চণ্ডদেব ও জয়শ্রীর প্রবেশ)

চণ্ড। বলেছ সুষেণা, গণ্ডীরক্ষার কথা?

সুষেণা। বলেছি রাজা।

চণ্ড। এটাও ব'লে দাও, যে কর্ত্তব্যে ত্রুটি করবে, তাকে শাস্তি নিতে হবে।

সুষেণা। কি শাস্তি ব'লে দাও, রাজা।

চণ্ড। সেটা অপরাধ অনুসারে বিবেচ্য, সুষেণা।

সুষেণা। না রাজা, ব'লে দাও, যে কর্ত্তব্যে আজ সামান্যমাত্রও ত্রুটি করবে, তাকেও বল্লমে বিঁধে মরতে হবে।

চণ্ড। এতটা সুষেণা?

২য়া। নিশ্চয়, নারী ব'লে আপনি শাস্তিদানে কুণ্ঠা দেখাবেন না।

চণ্ড। উত্তম, তাই রইল আমার আদেশ। এই বারে কিছুক্ষণের জন্য তোরা একবার অন্তরালে যা দেখি।

[নারীগণের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

সুষেণা। আমি?

চণ্ড। তোমাকেও একটু যেতে হবে, সুষেণা। জয়শ্রী আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে। আর কেউ শোনে, তার ইচ্ছা নয়।

[সুষেণার প্রস্থান।

জয়শ্রী। ওরা চ'লে যাবে, এমন গোপন কথা আমি কি কইব পিতা?

চণ্ড। কি বলতে ইচ্ছা করেছ, বল। মালবের যুবরাজ সম্বন্ধে কি কোনও কথা?

জয়শ্রী। না।

চণ্ড। তবে তোমাকে প্রশ্ন করবার সঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি, সে যুবক আমার সম্পূর্ণ মনোমত হচ্ছে না। ভবিষ্যতে রাজ্যাধিকারী হবার গুণ তাতে যথেষ্ট আছে,

রূপও তার তোমার শ্রীর যোগ্য। কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি, সে পট্টমহাদেবীর গর্ভজাত নয়। রাজার সাধারণী স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছে।

জয়শ্রী। তার কথা আমি মনেও আনিনি।

চণ্ড। আমি ভারতের বহু রাজ্যে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানে দূত পাঠিয়েছি।

জয়শ্রী। আমি কিন্তু আপনার ভাবী জামাতার দৃষ্টি এড়াবার জন্য পৃথিবীর কোনও গুপ্ত গৃহের সন্ধান করছি। (হাস্য) আপনি ও-সব কথা কইছেন কেন? মিথ্যা বলছি না পিতা, ও প্রসঙ্গ আমার ভালই লাগছে না।

চণ্ড। তোমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য কি?

জয়শ্রী। উদ্দেশ্য কিছুই নয়, আমি আজ এখানে এসে মনে শান্তি পাচ্ছি না। আপনি নীতিজ্ঞ রাজা। আপনার রাজ্যে এ বর্ব্বর প্রথা কেন?

চণ্ড। কোন্ প্রথা?

জয়শ্রী। আপনার এই উৎসব!

চণ্ড। প্রথা বর্ব্বর?

জয়শ্রী। শুধু বর্ব্বর, কি নীতিহীন, কি নিষ্ঠুর!

চণ্ড। তুমি কি এই প্রশ্ন করতেই আমাকে নির্জ্জনে ডেকে নিয়ে এলে?

জয়শ্রী। শুধু এই জন্য। এর পূর্ব্বে আর কখনও আমি আসিনি। সুতরাং এ প্রথা যে কিরূপ হীন, তা আমি জানতুম না। দেখে আমার মনে অশান্তি আসছে, ভয় হচ্ছে।

চণ্ড। (হাস্য) ওঃ, বুঝতে পেরেছি! বিড়াল-তপস্বী মন্ত্রীর উপর তোমার যে শিক্ষার ভার দিয়েছি, সেটা আমার মনে ছিল না।

জয়শ্রী। মন্ত্রীর শিক্ষাকে রহস্য কেন পিতা? যার সামান্যমাত্র নীতিজ্ঞান আছে, সেই এই প্রথাকে হীন বলবে। পুরবাসী নর-নারীদের আজিকার এই মত্ত আচরণ দেখে কোনও সভ্য রাজার অন্তঃপুরে কল্পনাতেও প্রবেশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

চণ্ড। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও জয়শ্রী, ঐ সামান্যমাত্র নীতিজ্ঞানও আমার নেই?

জয়শ্রী। আমি প্রশ্নমাত্র করেছি, আমার উপর ক্রোধ করবেন না, পিতা!

চণ্ড। এখনও আমি মত্ত হইনি জয়শ্রী, তোমার উপর ক্রোধ করব কেন? তবে ক্রোধ হচ্ছে সেই বৃদ্ধের উপর।

জয়শ্রী। না পিতা, তাঁর উপর ক্রোধ করবেন না। নিজের ইচ্ছায় আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি।

চণ্ড। দাস-জাতির ভিতর থেকে সে বেরিয়েছে, স্বাধীনের চিত্তের প্রসারতা সে বুঝবে কি? আমার রাজ্যে দুর্নীতির অতি কঠোর দণ্ড, তা জানো?

জয়শ্রী। জানি না।

চণ্ড। যে ব্যভিচারী, তার প্রাণদণ্ড। যে সুরাপানে হয় মত্ত, তার রসনাচ্ছেদ।

জয়শ্রী। জানতুম না।

চণ্ড। জানতে না, জেনে রাখ। যোগ্য গুরুর উপর তোমার শিক্ষার ভার দিয়েছি। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য হ'লেও যে জাতির ভিতর থেকে সে এসেছে, বহুকাল হ'তে সে জাতি বিদেশীর অধীন। সেই দাসভাবপূর্ণ দেশের বদ্ধ বায়ুতে তার জন্ম। যেখানে তুমি এক দণ্ডের জন্যও নিশ্বাস ফেলতে অশক্ত, সে কেমন ক'রে বুঝবে, জাতির স্বাধীনতা স্মরণে উৎসব বস্তুটা কি? সুতরাং তার মতামত অবলম্বন ক'রে আমাদের এই স্বাধীন জাতির রীতি সমালোচনা করতে এস না। রাজশাসনের ভয়ে অন্তঃপুরে বসেও যারা অন্তরের সত্য মুখ দিয়ে বাহির করতে সাহস করে না, তাদের নীতি তোমার ঘরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে তার ক্ষমতা নেই। মা, এইটুকু শুধু জেনে রাখ।

জয়শ্রী। আপনার কথার অর্থ এইবারে যেন বুঝতে পেরেছি। এটা হচ্ছে দেশের চিরাচরিত প্রথা। এ প্রথার বিলোপ আপনার ইচ্ছাধীন নয়।

চণ্ড। আজ এখানে বিধি রাজা, আমি নই। বৎসরের মধ্যে মাত্র এই একটি দিন জাতীয় উৎসব। বৎসরের এই শুভদিনে বিদেশীর শাসন থেকে এ জাতি মুক্তি পেয়েছিল। স্বাধীনতার গৌরব নিয়ে এই একটি দিনমাত্র তারা এই বনে এসে অবাধ আনন্দভোগের অধিকার পায়।

জয়শ্রী। না, প্রথার বিলোপ আপনি করতে পারেন না।

ণ্ড। কেমন ক'রে পারব জয়শ্রী? এই একটি দিনের উৎসব-মাদকতা এই জাতিটাকে আজও জীবিত রেখেছে। আমি এ প্রথার বিলোপ করতে পারি না। আমার জন্যও পারি না, তোমার জন্যও পারি না। আমার পুত্র নাই, ভবিষ্যতে এ রাজ্যের রাণী হ'তে যদি তোমার অভিলাষ থাকে—

জয়শ্রী। সেই জন্যই কি আপনি আমাকে সঙ্গে এনেছেন?

চণ্ড। সে জন্যও বটে, অন্য কারণেও বটে। সেটা তোমাকে বলবার এখনও সময় হয় নি। আর কিছু তোমার জিজ্ঞাস্য আছে?

জয়শ্রী। ভাল, এ নিষ্ঠুরতা কেন, পিতা?

চণ্ড। যদি কেহ গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করে, তার মৃত্যুদণ্ড কেন, এই কথা জানতে চাচ্ছ?

জয়শ্রী। ওটাও কি জাতীয় প্রথা?

চণ্ড। না জয়শ্রী, ওটি শুধু আত্মরক্ষার জন্য। ওতে কিছু নিষ্ঠুরতা আছে।

জয়শ্রী। কিছু? পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ—যে কোন বিদেশী গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করবে, তখনই বিনা বিচারে তার হত্যা। এ যে নিষ্ঠুরতার চরম, পিতা!

চণ্ড। আমি এ প্রথার প্রবর্ত্তক নই জয়শ্রী, এ প্রথাও বহুকাল থেকে চ'লে আসছে। আমার প্রপিতামহ বিক্রমদেব এক বার এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা জয়শ্রী, যে দিন তিনি শাস্তি তুলে দিয়েছিলেন, সেই দিনেই হয়েছিল তাঁর হত্যা।

জয়শ্রী। সেই দিনেই?

চণ্ড। সেই দিনেই। সে দিনে আজিকারই মত জাতীয় উৎসব। আর তাঁকে হত্যা করেছিল কে জান? এক খঞ্জা বৃদ্ধা নারী। রাজার এক গুপ্ত শত্রু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে রাজশিবিরে প্রবেশ করেছিল। সেখানে সে কোনও উপায়ে রাজার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে। আহার করেই রাজার মৃত্যু হয়। তাই এত কঠোরতা—পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ—সকলেরই অপরাধের সমান দণ্ড মৃত্যু।

জয়শ্রী। শুধু আত্মরক্ষার জন্য—নিষ্ঠুর—প্রথা বড় নিষ্ঠুর!

চণ্ড। না, শুধু আত্মরক্ষা নয়। তা হ'লে বার বার যখন তুমি নিষ্ঠুর বলছ, আজই আমি এ প্রথার উচ্ছেদ ক'রে দিতুম। শুধু আমার জীবন নয় মা, মদিরাপানের ফলে অনেকেই আজি একটা ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণেও আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হবে। তাদের জীবনের জন্য আমি দায়ী।

জয়শ্রী। (কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া) আমাকেও কি এই উৎসবে যোগ দিতে হবে?

চণ্ড। শুধু পুরুষ তোমার প্রজা নয়, নারীও তোমার প্রজা। উৎসবে যোগ দিলে তাদের সম্মান রক্ষা করা হয়।

(জয়শ্রী অত্যন্ত চিন্তান্বিতার মত মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল)

তোমাকে এ উৎসবে সঙ্গে আনা, এখন দেখছি, বড়ই আমার ভুল হয়ে গেছে, জয়শ্রী।

জয়শ্রী। আমাকে আপনি আবার নগরে পাঠিয়ে দিতে পারেন না?

চণ্ড। এখন? আর কিছুতেই পাঠাতে পারি না। সমস্ত পুরবাসিনীই তোমার আগমনবার্ত্তা জেনেছে। বিশেষতঃ তোমার বিমাতা।

জয়শ্রী। এ আনন্দে যোগ দিতে আপনি কি আমাকে অনুমতি করছেন?

চণ্ড। তোমার এ প্রশ্ন করবার উদ্দেশ্য কি?

জয়শ্রী। আমি কুমারী।

চণ্ড। তুমি উজ্জয়িনীর পট্টমহাদেবীর কন্যা, তোমার নিজকৃত আত্মরক্ষায় আমাকে কি সন্দেহ করতে বল?

(জয়শ্রী দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইল)

আমার দেহরক্ষিণী নারীসেনার সকলেই কুমারী।

জয়শ্রী। তারাও কি আজ সুরাপানে মত্ত হবে?

চণ্ড। যাও, তা হ'লে আর ইতস্ততঃ বিচরণ ক'র না। একবারে চ'লে যাও তোমার শিবিরে। সেখানে উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মগোপন ক'রে থাক। সাবধান, লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে চ'লে যাবে। পথে কেহ যদি তোমাকে দেখে মদিরাপানের অনুরোধ করে, তুমি অনুরোধ অমান্য করতে পারবে না। যদি কর, আর সে আমার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়, তোমাকে শাস্তি নিতে হবে। আজ এখানে আমি রাজা নই, রাজা বিধি।

জয়শ্রী। কি শাস্তি পাব?

চণ্ড। বিচারক্ষেত্রেই তার মীমাংসা হবে, জয়শ্রী। তবে এটা স্থির জেনো, ভবিষ্যতে তোমাকে উজ্জয়িনীর রাজ্যাধিকার দিতে কেহই আর সম্মত হবে না।

জয়শ্রী। আমাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার সময় দিন।

চণ্ড। উত্তম। সুষেণা!

(সুষেণার প্রবেশ)

জয়শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে তুমি তার শিবিরে রেখে এস।

[জয়শ্রী ও সুষেণার প্রস্থান।

(উদ্দালকের প্রবেশ)

উদ্দালক। রাজা, দেবীর প্রসাদ গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। সমস্ত পুরবাসী পুরনারী আপনার প্রতীক্ষায়

চণ্ড। চল উদ্দালক।

উদ্দা। রাজকুমারী যে আপনার সঙ্গে এসেছিলেন!

চণ্ড। তার প্রতীক্ষায় থাকতে হ'লে সময় আরও উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, উদ্দালক।

উদ্দা। সমস্ত পুরনারী তাঁর প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। তাঁকে নিয়ে তারা আনন্দ করবে।

চণ্ড। পুরোহিত-পুত্র! সে কুমারী।

উদ্দা। আপনি কি এই উৎসবের উপর অপবিত্রতার আরোপ করতে চান? বলুন রাজা! তা হ'লে পিতাকে বলি। তিনি ঘোষণা ক'রে দিন, আজ থেকেই এ জাতীয় উৎসবের অবসান হোক।

চণ্ড। নিয়ে এস উদ্দালক, দেবীর কারণপ্রসাদ। এ জাতীয় উৎসবের উচ্ছেদ করতে যে পুরুষকারের প্রয়োজন, তা আমার নাই।

[উদ্দালকের অগ্রে প্রস্থান।
পশ্চাতে চিন্তিতভাবে চণ্ডদেব।

(নারীসেনাগণের প্রবেশ)

(গীত)

মাতিবে মাতিবে রে—
এরা মাতিবে আজি রণরঙ্গে!
হাসিবে কাঁদিবে নাচিবে গাহিবে
লাজ-তটিনী-তট ভঙ্গে।
উঠিবে পড়িবে প'ড়বে উঠিবে,
আবার পড়িবে নয়ন মুদিবে,
শেষে শয়ন করিবে ধরা-অঙ্গে!

[সকলের প্রস্থান।

(যশমা ও মহিরঙ্গের প্রবেশ)

যশমা। চ'লে গেল, চ'লে গেল—এমন সুযোগ আর পাবি না। এই বেলা—এই বেলা গিয়ে ধ'রে ফেল্।

মহি। আমার কেমন ভয় হচ্ছে, যশমা।

যশমা। অনাহারে যে ম'রে যাচ্ছে, তার আবার কিসের ভয় রে? যা—যা, ধ'রে ফেল্,—ও রাজা না হয়ে যায় না। ধ'রে ফেল্—জোর ক'রে পা দুটো জড়িয়ে। এই বেলা—এই বেলা।

মহি। তাই ত তাই ত!

যশমা। তাই ত কি রে?

মহি। যাব?

যশমা। এখনও যাব যাব করতে লাগলি? এর পর সহজে কি রাজার কাছে আর তুই উপস্থিত হ'তে পারবি! মালবের রাজহস্তিচালক হয়ে তুই না খেয়ে ম'রে যাবি?

মহি। যদি আমাকে মেরে ফেলে—ঐ মেয়েগুলো?

যশমা। তোর দেখছি মরণই মঙ্গল। যা, সেই গাছতলায় ব'সে থাক্ গে। আমি যাচ্ছি।

মহি। না, না।

যশমা। না কি, আমি কি তোর মত মরণের ভয় করি? মরতে ত বসেইছি।

মহি। ঐ যে ওরা কি বললে রে—গণ্ডী পার হ'লে ঐ যে মরণের কথা।

যশমা। বলুক।

[যশমার প্রস্থান।

মহি। সত্যি যাবি? সত্যিই গেলি? আর না, আর না, ঐ গণ্ডী, ঐ গণ্ডী! যাস্‌নি যশমা—যাস্‌নি।

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। এই, কে তুই রে এখানে? ফিরে যা বেটা! এ দিকে আর এক পা এগুলে মরবি।

মহি। প্রভু, আমার স্ত্রী—

রক্ষী। তোর স্ত্রী কি? উৎসব দেখতে গিয়েছে? সর্ব্বনাশ, তা হ'লে ত সে মরেছে!

মহি। ফিরিয়ে আনো প্রভু, তাকে ফিরিয়ে আনো।

রক্ষী। কে ফেরাবে? আর প্রভুর বাপেরও ক্ষমতা নেই। স্বয়ং শমন তাকে ডেকেছে।

মহি। আমি যাব, আমি যাব—

রক্ষী। যাবি ত—যেতে কে দেবে? ফিরে চল্, ফিরে চল্। জোর করলে প্রহার করতে করতে নিয়ে যাব। (নেপথ্যে কোলাহল) ঐ তোর স্ত্রীর হয়ে গেল!

মহি। আমি যাব—আমাকে যেতে দাও, যেতে দাও।

রক্ষী। এই যে দিচ্ছি।

[মহিরঙ্গ ও রক্ষীর প্রস্থান।

—

দৃশ্যান্তর

(পরিচারক-পরিচারিকা স্থানপরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত।

(দ্বৈত-গীত)

১ম। মনের গোপন কথা বলব রে তোরে।
২য়। সময় আছে সময় আছে কায সেরে নে টুপ ক'রে ॥
যেখানে দেখবি কাঁটা দে ঝাঁটা দে ঝাঁটা!
১ম। তাই ত রে তাই ত রে—করে যে কেমন গা'টা।
২য়। বাকি আছে জল ঢালাটা, এখন স'রে যা দূরে,
তার পরে—তার পরে—তার পরে।
১ম। কথার তবে এইখানে শেষ।
২য়। বেশ বেশ বেশ—
১ম ও ২য়। কে যেন আসছে ওরে
পড়্ স'রে—পড়্ স'রে—পড়্ স'রে ॥

(মদিরাকুম্ভ স্কন্ধে পুরোহিতের প্রবেশ, পশ্চাতে মণ্ডলপত্নী ও নারীগণ)

পুরো। ব'স শুভে, তোমরা সকলে।

ম, প। কি জন্য তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনলে, পুরোহিত?

পুরো। ব'স ভদ্রে, ব'স তোমরা ক্ষণেকের জন্য। বিশেষ প্রয়োজনে নিমন্ত্রণ করেছি। সুধাপাত্র নিজে তোমাদের জন্য বহন ক'রে এনেছি—যে সুধা একমাত্র রাজার সেব্য।

২য় না। তোমার পুত্র বললে—বহু পুরবাসিনীকে উদ্দেশ ক'রে, আজ এখানে আসবে এক জন অতিথি। আমাদের আনন্দ দেখে যেন বর্ব্বর ব'লে না যায় চ'লে সে।

পুরো। মূর্খ, মূর্খ—বুদ্ধিহীন। তোমাদের মর্য্যাদা সে জানে না। এক জন অতিথি আসবে সত্য, কিন্তু তোমাদের বর্ব্বর ব'লে ঘৃণা দেখাতে পারে, এমন সভ্য জাতি ভারতের আর কোথাও আছে, আমি জানি না।

ম, প। কে সে অতিথি, পুরোহিত?

পুরো। কে সে এবং কি জন্য আজ এই উৎসবক্ষেত্রে সে অতিথি, তোমাদের বলব বলেই আমি আমন্ত্রণ ক'রে তোমাদের আনিয়েছি। নাও, অগ্রে তোমরা প্রত্যেকে এক এক পাত্র এই রাজসেব্য অমৃত পান কর।

(প্রত্যেককে পুরোহিত সুরা বিতরণ করিতেছিল, ইত্যবসরে মণ্ডল-প্রমুখ পুরবাসিগণ সেই স্থানে আগমন করিয়া পুরোহিতকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া মত্তভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিল)

মণ্ডল। এ কি পুরোহিত, এ তোমার কি একচক্ষুতা!

পুরো। কিছু নয় পুরবাসী, অনন্ত সুধার ভাণ্ডার, এসো, সকলে এসো।

ম, প। ধিক্, নারীর সুখে ঈর্ষ্যান্বিত পুরুষ!

(তখন পুরুষগণের মধ্যে কেহ বলিল, ওঃ, তোমরা নারী? কেহ বলিল, মনে ছিল না সেটা মদিরলোচনে, এখনও তোমরা নারী)

পুরো। এসো পুরবাসী, এ শুভদিনে শুভোৎসবের প্রারম্ভে কোমলভাষী ললনার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'র না।

ম, প। বিশেষতঃ এই সুধাশীকর-জর্জ্জর বসন্তানিলের প্রথম প্রবাহে।

পুরো। এসো পুরবাসী, এসো, সুধার অনন্ত ভাণ্ডার, রাজসেব্য—তোমাদের জন্যে এনেছি।

ম। ক্ষমা, ক্ষমা, স্মিত-বিচ্ছুরিতাননে, ক্ষমা।

ম, প। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ—ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ—

১ম না। ইহ সন্নিধেহি।

২য় না। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (প্রথম পুরুষকে নিবেদন করিতে পাত্র তুলিল)।

৩য় না। অতি মত্ত হয়ো না রে সখী রে, যেন বর্ব্বর ব'লে না যায় চ'লে সে।

পুরো। কেউ বলবে না, বালা! এমন সাহসী এ ভারতে কেউ নেই। নাও ভদ্র, তোমরাও গ্রহণ কর।

(সকলে উপবিষ্ট হইলে পুরোহিত সুরা পরিবেষন করিতে লাগিল এবং বলিল, একমাত্র রাজসেব্য। তোমাদের জন্য সংগ্রহ করেছি, গ্রহণ কর)।

ম। তাই ত পুরোহিত, এ কি অমৃত আমাদের পান করালে?

ম, প। সত্য পুরোহিত, কোলাহলময়ী নিস্তব্ধতাভরা এ কি দেবপেয় সোমরস?

(তখন কেহ বলিল, একটা বিরাট কম্পনসংলগ্ন ভূমি। কেহ বলিল, একটা পতনময় উত্থান। কেহ বলিল, একটা প্রচণ্ড হুঙ্কারময় চুপ্। কেহ বলিল, একটা অনন্ত অস্থিরতাভরা অবসাদ ইত্যাদি। সকলে পুরোহিতকে ধন্যবাদ দিল এবং পুনর্ব্বার পাত্র প্রার্থনা করিল। পুরোহিত পরিবেষন করিল)।

ম। বল পুরোহিত, এই বারে বল, কি জন্য আমাদের এই নিভৃতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছ?

১ম না। বল পুরোহিত, বল, তুমি এই অমৃতদানে আমাদের ক্রয় ক'রে ফেলেছ।

২য় পু। তৎপূর্ব্বে, পুরোহিত (পাত্র প্রদর্শন করিল)।

১ম না। হাঁ, হাঁ—আমাদেরও ঐ মত, পুরোহিত (পাত্র প্রদর্শন করিল)।

২য় পু। আমি পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পতামি ভূতলে।

১ম না। আমি উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা—

২য় পু। পুনঃ পতামি ভূতলে।

৩য় না। অতি মত্ত হয়ো না রে সখী রে, যেন বব্বর ব'লে না যায় চ'লে সে।

(পুরোহিত মদিরা পরিবেষন করিল)

পুরো। তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনেছ, কৌশাম্বীরাজের পট্টমহাদেবীর সেই কারুণ্যপূর্ণ কাহিনী?

ম। সে প্রসঙ্গ এখানে কেন, পুরোহিত?

পুরো। বলবার প্রয়োজন হয়েছে পুরবাসী, পুরনারী।

ম, প। শুনেছি পুরোহিত, বড় করুণ কাহিনী সে!

১ম না। বড় করুণ! গর্ভবতী রাণী—প্রাসাদের ছাদে রৌদ্রসেবন—সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো কম্বল।

২য়, না। কোথা থেকে উড়ে এলো কি এক প্রকাণ্ড পক্ষী! ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে গেল সেটা রাণীরে!

৩য় না। বড় করুণ, আর আমি শুনতে না চাই সখী রে!

ম। আমরাও শুনতে চাই না, পুরোহিত। এই জমাট আনন্দের সময় এই করুণ প্রসঙ্গের অবতারণা কেন, পুরোহিত?

ম, প। তাই ত, সুধাপাত্র মুখে তুলে আবার তা ভেঙে দিচ্ছ কেন, পুরোহিত?

পুরো। না শোন, তোমাদেরই ক্ষতি।

ম। ক্ষতি! ক্ষতি আমাদের?

পুরো। তোমাদের ক্ষতি, আমাদের ক্ষতি, রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি।

ম, প। তবে বল পুরোহিত—অ।

সকলে। আমরা সকলে অবহিত—অ।

পুরো। তা হ'লে শোনবার জন্য অধিকতরভাবে প্রস্তুত হও, লও আর এক এক পাত্র।

ম। আন পুরোহিত, আন।

ম, প। আমরা সর্ব্বদাই ওর জন্য শুভাগত।

(সকলের পাত্র গ্রহণ ও উল্লাস প্রকাশ)

পুরো। এই বারে আবার আরম্ভ করি? (সকলে মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল) যত দিন রাজা পরন্তপ জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর সন্ধান করেছিলেন। সারা ভারতের ভিতর এমন স্থান ছিল না, যেখানে তাঁর প্রেরিত লোক যায় নি।

১ম, না। এখানে এসেছিল, পুরোহিত?

পুরো। এক বার? বহু বার, এইরূপ সারা ভারতে। যত দিন রাজা জীবিত ছিলেন, পত্নীর সন্ধানে বিরত হন নি। মৃত্যুদিবসের কিছু পূর্ব্বে মাত্র তিনি হতাশ হয়েছিলেন। স্থির বুঝেছিলেন, এই ভারতবর্ষের কোনও স্থানে তাঁর পত্নী এবং তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শুনছ তোমরা?

১ম, না। আগ্রহান্বিত হয়ে, পুরোহিত।

সকলে। বল, পুরোহিত।

পুরো। সুতরাং মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা ক'রে যান। ভবিষ্যতের সিংহাসন দিয়ে যান তাঁর অন্যতমা পত্নীর গর্ভজাত এক

পুত্রকে, রাজার জীবদ্দশায় কেউ তাঁর কার্য্যের প্রতিবাদ করেনি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও করেনি। সমস্ত পৌরজন, মন্ত্রী, অমাত্য একবাক্যে তাকে রাজা ব'লে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার অভিষেকের দিন কোথা হ'তে উপস্থিত হ'ল এক অজ্ঞাতকুল-শীল যুবক। বর্ব্বরযোগ্য তার আচার, বর্ব্বরযোগ্য তার ব্যবহার। সে এসে ঐ পট্ট-মহাদেবীর পুত্র ব'লে দিলে আপনার পরিচয়। অমনই রাজ্যের কতকগুলো বিশ্বাসঘাতক অমাত্য তাকে পরন্তপের পুত্র ব'লে গ্রহণ করলে। তাদেরই সাহায্যে ঐ অজ্ঞাত-কুল-শীল—হয় ত কোনও হীনজাতি—অধিকার করলে কৌশাম্বীর সিংহাসন।

ম। করুক, আর এক পাত্র দাও, পুরোহিত।

ম, প। না না মূর্খ পুরুষ, অপেক্ষা কর। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কি বল, পুরোহিত?

পুরো। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বেই বলেছি ত ভদ্রে, কল্যাণ। তোমাদের কল্যাণ, আমাদের কল্যাণ, অবন্তীর কল্যাণ।

ম। সেই যুবকই কি আজ উৎসব-ক্ষেত্রে অতিথি?

পুরো। আগে আমার বক্তব্য শেষ করি, নাগরিক।

সকলে। শেষ করতে দাও, শেষ করতে দাও। বৃথা সময়ক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে।

পুরো। সেই ছদ্ম, সেই কপট শুধু অন্ত্যজ নয়। সে আবার বিধর্ম্মী অথবা সনাতনধর্ম্মদ্বেষী। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সেই যে নাস্তিক গৌতম, ঐ দুরাচার রাজ্যাপহারী তার ধর্ম্ম অবলম্বন করেছে। পরম ধার্ম্মিক পরন্তপের প্রাসাদ এখন নাস্তিকপূর্ণ। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য একবারেই বিলুপ্ত। যেখানে নিত্য সহস্র আচারনিষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্নপানে তৃপ্ত হ'ত, সে স্থান অধিকার করেছে সহস্র সহস্র অনাচারী নাস্তিক শ্রমণ: তাদের ভিতরে আছে কত অস্পৃশ্য শবর চণ্ডাল। দেশের সমস্ত যজ্ঞশালা সেই সকল শ্রমণের বিহারে পরিণত হয়েছে। যজ্ঞে পশুবলি লোপ পেয়েছে।

ম। রাজা কি তাকেই কন্যাদানের ইচ্ছা করেছেন?

পুরো। ইচ্ছা? তোমরা যদি বিরোধী না হও, সেই সনাতনধর্ম্মদ্বেষী অন্ত্যজই হবে অবন্তীরাজের জামাতা।

সকলে। ঘৃণা—ঘৃণা!

ম। সেই অন্ত্যজই কি আজ উৎসব-ক্ষেত্রে অতিথি?

পুরো। সে যদি অতিথি হয়, তোমরা তার কিরূপ অভ্যর্থনা করবে, পুরবাসী?

ম। আমরা উৎসব-ক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে চ'লে যাব। কি বল তোমরা?

সকলে। বলাবলি কি—নিশ্চয়।

ম, প। আমরা উঠে পড়েছি।

পুরো। উঠতে হবে না। তোমাদের দেখে, তোমাদের কথা শুনে, পরম সন্তুষ্ট, পুরবাসী। ব'স ব'স। দেখছি, উজ্জয়িনীতে মর্য্যাদাবান্ পুরুষ ও মর্য্যাদাময়ী নারীর আজও অভাব হয় নি। আশ্বস্ত হও তোমরা। সে পিতৃ-পরিচয়হীন রাজ্যাপহারী অতিথি নয়। আমি ধর্ম্মের মুখ চেয়ে, তোমাদের মুখ চেয়ে, রাজ্যের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই যুবকের আগমন রোধ করেছি। তৎপরিবর্ত্তে এনেছি যাকে, তার পিতা সনাতনধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর গৃহে এখনও নিত্য সহস্র ব্রাহ্মণের সেবা হয়। তাঁর যজ্ঞশালায় নিত্য সহস্র পশুর বলি হয়। তাঁর যজ্ঞমন্দিরের যোজন দূরের মধ্যে অস্পৃশ্য দাস, শবর, চণ্ডাল প্রবেশ করতে পায় না।

১ম পু। কে তিনি মহাত্মা, পুরোহিত?

পুরো। তাঁর পরিচয়ের পূর্ব্বে তোমাদের সকলকে আমার অনুরোধ—

১ম না। বল, পুরোহিত বল—আমরা সেই মহাত্মার নাম জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

পুরো। তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাবে—পুরুষ এবং নারী। তার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণের সংস্রবেই বুঝতে পারবে তার প্রকৃতি। তার পিতা যদি হয় সনাতনধর্ম্মের ইষ্টক-স্তম্ভ, এ যুবক হবে স্ফটিক-স্তম্ভ। এই অপধর্ম্মের আক্রমণ হ'তে উজ্জয়িনীকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে, সে ঐ একমাত্র পুরুষকারবিজড়িত বীর।

সকলে। পরিচয় পুরোহিত, পরিচয়। নাম পুরোহিত, নাম।

পুরো। তৎপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হও সকলে, যদি সর্ব্বতোভাবে সেই যুবক তোমাদের মনোমত হয়, রাজকুমারীকে তাকে দানের জন্য রাজাকে তোমরা অনুরোধ করবে!

সকলে। একবাক্যে।

পুরো। আমার এ আবেদন তোমাদের কাছে বৃথা হবে না ?

সকলে। না পুরোহিত, না।

ম। আমরা প্রাণপণে তার মর্য্যাদা রক্ষা করব।

সকলে। প্রাণপণে।

ম, প। এখন থেকেই আমরা রক্ষা আরম্ভ করলুম। দাও পুরোহিত, পরিচয়।

পুরো। তিনি উজ্জয়িনীর চিরসুহৃদ্ প্রবলপরাক্রান্ত মালবরাজের পুত্র। প্রবরসেন তাঁর নাম।

সকলে। একবাক্যে। পুরোহিত, চাই আমরা প্রবরসেন।

পুরো। কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্।

নারীগণ। চাই আমরা রূপবান্।

পুরো। ভীমের ন্যায় বলবান্ –

পুরুষগণ। চাই আমরা বলবান্।

পুরো। অর্জ্জুনের ন্যায় বীর্য্যবান্—

নারীগণ। ধন্য পুরোহিত, ধন্য—রাজকুমারীর জন্য আমরা ঐরূপই পাত্র চাই।

ম। আমরা কন্দর্প চাই, ভীম চাই, অর্জ্জুন চাই।

১ম, না। আমরা আরও চাই। চাই নকুল, চাই সহদেব।

সকলে। মহাভারত চাই।

২য় না। কেবল ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরকে চাই না।

৩য় না। অতি মত্ত হয়ো না রে সখী রে, যেন বর্ব্বর ব'লে না যায় চ'লে সে।

পুরো। সে তোমাদের প্রীতির ভিখারী। কখন তার মুখ হ'তে ওরূপ অসংবদ্ধ প্রলাপবাক্য নির্গত হ'তে পারে না, বালা! এইবারে চাই তোমাদের অনুমতি। যুবরাজকে এই উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ ক'রে আনতে পারি ?

ম। যদি সত্যই পুরোহিত, সে ঐ সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হয়।

পুরো। তোমাদের প্রতারিত ক'রে পুরোহিতের লাভ ?

ম, প। নিয়ে এস, পুরোহিত।

পুরো। সর্ব্ববাদি-সম্মত ?

সকলে। নিয়ে এস পুরোহিত।

পুরো। তা হ'লে এই শেষ আশীর্ব্বাদপাত্র গ্রহণ কর।

[সকলকে মদিরাবণ্টন করিয়া পুরোহিত প্রস্থান করিলেন। উল্লাস করিতে করিতে পুরুষগণ তাঁহার অনুগমন করিল।

(নারীগণের গীত)

বসন্ত খেলিছে গাছে গাছে!
তার রঙিন অধর পাখীর মুখে বলছে রে ওই আয় কাছে।
আয় চ'লে আয় তারে নিয়ে পূরণ করি প্রাণ,
ফুলের হাসি অঙ্গে জড়াই গন্ধে ভরাই গান।
সে রূপ এনেছে, সুর এনেছে
সকল গায়ে গন্ধ মেখেছে
চল্ না গিয়ে দেখে আসি আর কিছু কি তার আছে।

(উদ্দালকের প্রবেশ)

উদ্দা। যাও পুরনারী, তোমরা সকলে মণ্ডপে। রাজা পান-প্রসাদ তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণে আনন্দ কর।

ম, প। কোথায় রাজকুমারী, পুরোহিতপুত্র ?

উদ্দা। তার সংবাদ আমার অপেক্ষা তোমাদেরই অধিক রাখা কর্ত্তব্য, পুরনারী।

১ম না। উৎসবক্ষেত্রে আসার সময় একবারমাত্র তাকে আমরা দেখেছি।

উদ্দা। আবার তাকে তোমাদের দেখতে হবে। দেখবার প্রয়োজন হয়েছে। আগেই ত তোমাদের বলেছি, আমাদের উৎসবক্ষেত্রে এমন এক জন অতিথির শুভাগমন হবে, যে রাজকুমারীর রূপদর্শনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা চোখে পুরে শত ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছে।

ম, প। আমরা জেনেছি উদ্দালক, সে অতিথিটি কে।

উদ্দা। তবে আর কি পুরনারী, আনন্দ, আনন্দ!

২য় না। সঙ্গে চাই রাজকুমারী।

ম, প। কর সন্ধান - রাজকুমারীকে।

[পুরনারীগণের প্রস্থান।

(চণ্ডদেবের প্রবেশ)

চণ্ড। এ উৎসবদিবসে আতিথ্য নিতে এখানে কে আসছে, উদ্দালক ?

উদ্দা। এ প্রশ্ন আপনি করছেন, রাজা!

চণ্ড। এই ত শুনতে পাচ্ছ। বুঝতে পারছি না ব'লে প্রশ্ন করছি।

উদ্দা। রাজকুমারীর ভাবী পতি।

চণ্ড। কে সে ?

উদ্দা। তাও জানেন না ?

চণ্ড। না, তাও জানি না। আর, আমি জানি না, অথচ তুমি জানো, এ জেনে আমি বড়ই বিস্মিত হচ্ছি।

উদ্দা। আমিও বিস্মিত হচ্ছি, রাজা। পুরবাসীরা যা জেনেছে, একরূপ নগর শুদ্ধ লোকও যা জেনেছে, আপনি তা জানেন না।

চণ্ড। কে সে ?

উদ্দা। মালবের যুবরাজ—ভবিষ্যৎ রাজা প্রবরসেন।

চণ্ড। কে তোমাকে এ কথা বললে ?

উদ্দা। আমার পিতা।

চণ্ড। তোমার পিতা কি তাকে একবারে রাজকুমারীর ভাবী পতি ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন ?

উদ্দা। আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে, তিনি সে মালবরাজ্যে গিয়ে তাকে বাগ্দান ক'রে এসেছেন !

চণ্ড। আর তুমিও অমনি তাকে এই জাতীয় উৎসবে পুরনারীদের মত্ততা দেখাবার নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছ ?

উদ্দা। কেউ প্রমত্ত হবে না, রাজা !

চণ্ড। উত্তম, অতিথি আসে, যথাযোগ্য তার সৎকার কর। তবে তুমি ও তোমার পিতা—উভয়েই জেনে রাখ, উজ্জয়িনীর পট্টমহাদেবীর কন্যা এক দাসীপুত্রের আশ্রয়ে যেতে পারে না।

উদ্দা। দাসীপুত্র ? কোন্ নরাধম আপনার কাছে এ কুৎসা রটনা করলে, দাসীপুত্র কি যুবরাজ হয়, রাজা ?

চণ্ড। আরও শুনে রাখ, তোমার পিতার ইচ্ছায়, তোমার ইচ্ছায়, এমন কি, আমারও ইচ্ছায় এ বিবাহ হ'তে পারবে না।

উদ্দা। তবে কার ইচ্ছায় রাজা ?

চণ্ড। জয়শ্রীর নিজের ইচ্ছায়।

উদ্দা। উজ্জয়িনীরাজ কি আজ থেকে কন্যার ইচ্ছায় চলাফেরা করবেন ?

চণ্ড। যাও উদ্দালক, উৎসবমুখে আর বাগ্‌বিতণ্ডা ক'র না। তোমার মস্তিষ্ক এখন ঠিক নেই।

উদ্দা। বিলক্ষণ আছে, রাজা। ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক এ –

চণ্ড। ভাল—এখন যাও—যদি অতিথিকে তোমরা এনেই থাকো—হোক আমার অনভিমতে, তার সংবর্দ্ধনায় সঙ্কোচ করো না। নিজকৃত নিমন্ত্রণ ব'লেই আমি তা স্বীকার করলুম।

উদ্দা। তা হ'লে তাকে নিয়ে আমরা অবাধ আনন্দ করতে পারি ?

চণ্ড। অবাধ আনন্দ মানে কি ?

উদ্দা। অর্থাৎ—যদি—অর্থাৎ রাজকুমার যদি—অর্থাৎ রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করতে চান ?

চণ্ড। উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে ? উৎসবের প্রারম্ভেই দেখছি তুমি মত্ত হয়েছ।

উদ্দা। আরও অর্থাৎ—যদি রাজকুমার রাজকুমারীর মুখের কাছে (পাত্র প্রদর্শন)।

চণ্ড। চ'লে যাও যুবক, তুমি অতিমত্ত হয়েছ।

উদ্দা। আমি মত্ত ? যে এমন ক'রে দাঁড়াতে পারে, রাজা, সে মত্ত ? যে এমন ক'রে চলতে পারে, সে মত্ত ? যে এমন ক'রে ধাবমান হ'তে পারে, সে মত্ত ?

[উদ্দালকের প্রস্থান।

চণ্ড। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র !

(প্রভুগুপ্তের প্রবেশ)

প্রভু। ষড়যন্ত্র ? কিসের ? কে করলে, মহারাজ ?

চণ্ড। এ কি, প্রভুগুপ্ত, ফিরে এলেন যে ?

প্রভু। চরমুখে সংবাদ পেয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করলুম না, মহারাজ। সে যুবকের নাম উদয়ন বটে। অসাধারণ পুরুষকারে কৌশাম্বীর সিংহাসন সে অধিকারও করেছিল বটে, কিন্তু পিতৃ-পরিচয়ের কোনও নিদর্শন প্রজাদের দেখাতে পারেনি ব'লে সে আবার রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

চণ্ড। যাক্, নিশ্চিন্ত। এলেও তাকে আমি কন্যাদান করতে পারতুম না।

প্রভু। কেন, মহারাজ ?

চণ্ড। আপনার বিদ্বেষী পুরোহিতকুল আপনার শিষ্যাকে আর এক রাজপুত্রকে দানের ব্যবস্থা করেছে। সে কোনও মতে তোমার শিষ্যার যোগ্য নয়।

প্রভু। অযোগ্য যদি জানেন, তবে তাকে আপনি কন্যাদান করবেন কেন ?

চণ্ড। আজকের উৎসবের বিধি জেনেও অজ্ঞ হচ্ছেন কেন, প্রভুগুপ্ত ? উৎসবান্তে যদি পৌরজন সকলে একমত হয়ে তাকেই কন্যা দিতে আমাকে অনুরোধ করে, চিরাচরিত প্রথা, আমি দিতে বাধ্য। বিধির এখানে প্রভুত্ব—আমার নয়।

প্রভু। নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাজ ! অপাত্রে জয়শ্রীকে দান করতে আপনাকে তারা অনুরোধ করবে, এমন মত্ত তারা কখনই হবে না।

চণ্ড। ভালো—দেখা হবে আবার উৎসবান্তে। এখন চ'লে যান। এখানে আর থাকবেন না, এখানে আপনাকে পেয়ে যদি কোনও নাগরিক আপনার মুখে সুরাপাত্র তুলে ধরে, আমি রোধ করতে পারব না। অথচ তা গ্রহণ না করলে অবন্তীর অপমান করা হবে।

প্রভু। চললুম, মহারাজ !

চণ্ড। আমারও দুরবস্থা আপনি দেখেন, এটা আমার অভিপ্রেত নয়।

প্রভু। নমস্কার, অবন্তীপতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

জয়শ্রী।

রঙ্গিনীগণ

(গীত ।

ফুলের ঘরে ও কে প্রবাসী ?
চেয়ে আছে আকাশ পানে স্থির নয়নে—
হয় গো মনে যেন উদাসী !
সে বুঝি মরম মানে না,
মনের কথা মনেই রাখে খুলতে জানে না,
ফুলের চুমায় ঘুমায় সে কি, পান করে কি ফুলের হাসি ?

জয়শ্রী। দেখতে দেখতে সকলেই মত্ত হয়ে উঠলো, কি পুরুষ, কি নারী।

(সুষেণার প্রবেশ)

কি দেখে এলি, সুষেণা ?

সুষেণা। তোমার শিবিরের পথ রোধ ক'রে এখনও পুরনারীরা ব'সে আছে।

জয়শ্রী। তাদের স্থানত্যাগের কোনও লক্ষণ দেখতে পেলি না ?

সুষেণা। দেখে ত বুঝতে পারলুম না কোন লক্ষণ।

জয়শ্রী। তা হ'লে উপায়, সুষেণা ?

সুষেণা। উপায় আমি কি বলব, রাজকুমারি !

জয়শ্রী। সমস্ত পুরবাসিনীরা আজ আমাকে সুরাপান করাবার ষড়যন্ত্র করেছে। অতি হীন উদ্দেশ্য নিয়ে আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। আমার মুখে পাত্র ধ'রে তারা সকলেই আমাকে মত্ত দেখতে চায়।

সুষেণা। আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে।

জয়শ্রী। তুমি আমাকে নগরে রেখে আসবার উপায় করতে পারো ?

সুষেণা। আমি নারী বটে, রাজকুমারি, কিন্তু হৃদয়হীন সৈনিকের কার্য্যই আমার ব্যবসায়। সৈনিকের শাসন অমান্য করতে আমাকে আদেশ করা, আর আমার অপমান করা এক কথা। নগর ত অনেক দূর, এই উৎসবক্ষেত্রের সীমায় একটা রেখা পর্য্যন্তও আমি উল্লঙ্ঘন করতে পারব না।

জয়শ্রী। উত্তম, যাব সুষেণা শিবিরে।

সুষেণা। যাব ব'লে আবার মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালে কেন ? চল।

জয়শ্রী। সুষেণা ! মন আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলছে !

সুষেণা। কি রকম অদ্ভুত কথা, আমরা কি শুনতে পাই না, রাজকুমারি ?

জয়শ্রী। অদ্ভুত কথা ! ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের মিথ্যা আবরণ নিয়ে জাতির এই মত্ততা, ভগবান্ গৌতমের কৃপায় মনে হচ্ছে, আমা হ'তেই আজ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

সুষেণা। দুটো চক্ষু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রইল, রাজকুমারি ! যদি না অন্ধ হই, দেখবো।

জয়শ্রী। নইলে আমার মনীষী পিতার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল কেন ? উৎসবের সমস্ত রীতি জেনেও কেন তিনি তাঁর কুমারী কন্যাকে এখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন ?

সুষেণা। পুরোহিতের প্ররোচনায়, রাজকুমারি !

জয়শ্রী। চল সুষেণা, আমার স্থির সঙ্কল্প। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব, তবু মদ্যপাত্র মুখে তুলব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদ্দালক ও প্রবরসেনের প্রবেশ)

উদ্দা। নাও পাত্র, নাও পাত্র রাজকুমার! চ'লে যায়, চ'লে যায়।

প্রবর। আহা, আহা!

উদ্দা। ও কি? ও দিকে আহা কি? আহা, উহু, হা হতোস্মি সব এই দিকে—এই দিকে—

প্রবর। এই দিকে! তাই ত সখা, হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি।

উদ্দা। পাত্র নাও—পাত্র! 'হা হতোস্মি' এর পরে যত পারো। পাত্র—পাত্র—চ'লে যায়, এমন সুবিধা আর পাবে না!

প্রবর। সাহস হচ্ছে না, সখা!

উদ্দা। কেন হবে না? রাজার অতিথি তুমি—আনন্দের আজ অবাধ স্রোত - সে স্রোতে ভাসতে তোমার পূর্ণ অধিকার। কোনও সঙ্কোচ করো না, রাজকুমার।

প্রবর। আমি যে এখনও সকলেরই অপরিচিত, উদ্দালক!

উদ্দা। কোনও সঙ্কোচ নেই—রাজকুমারীর মুখে পাত্র ধরলেই এক মুহূর্ত্তে তুমি এ দেশের একটা ক্ষুদ্র কীটের সঙ্গে পর্য্যন্ত পরিচিত হয়ে যাবে। বিলম্ব নয়—বিলম্ব নয়—সত্বর। চ'লে যায় রাজকুমারী।

প্রবর। দাও উদ্দালক, পাত্র আমার হাতে।

উদ্দা। নাও, কোন সঙ্কোচ নেই। আজ এখানে বিধি রাজা। রাজা রাজা নয়।

(দেবসেনা প্রবেশ করিয়া দ্রুত সেই দিকে ছুটিয়া গেল এবং দূর হইতেই বলিয়া উঠিল, আসবেন না, হে অপরিচিত, আসবেন না। নিকটে উপস্থিত হইতেই উদ্দালক সহাস্যে বলিল, কে রে, তুই? দেবসেনা?)

দেব। কে উনি অপরিচিত, পুরোহিত-পুত্র?—গণ্ডীর ও দিকে পা দেবেন না, মহাত্মন্! হাঁ, ঐখানে, ক্ষণেকের জন্য। কে উনি বিদেশী, পুরোহিত-পুত্র?

উদ্দা। তোমাকে স্বতন্ত্র পরিচয় দেবার আমার সময় নেই, পরিচয় রাজার নিকটে গিয়ে জেনে এসো। আসুন আপনি, যুবরাজ।

(দেবসেনা বল্লম ধরিয়া দাঁড়াইল)

প্রবর। ফিরে এসো উদ্দালক, এ পথে যাবার এখন আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই।

উদ্দা। অশিষ্টা! রাজা যে কার্য্য করতে স্বপ্নেও সাহস করে না, তুই সেই কার্য্য করলি—পুরোহিতের অসম্মান!

দেব। কিয়ৎক্ষণের জন্য উনি ঐ স্থানে অপেক্ষা করুন। আপনি রাজার অনুমতিপত্র নিয়ে ফিরে আসুন।

উদ্দা। হীনা, দেখে বুঝতে পারছিস না, কাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি?

দেব। বোঝবার অধিকার নেই, ব্রাহ্মণ। চাই অনুমতিপত্র।

উদ্দা। ক্ষণেক এইখানে অপেক্ষা করুন, রাজকুমার।

প্রবর। প্রয়োজন কি, উদ্দালক? চল মণ্ডপে।

উদ্দা। না—না, অপেক্ষা, ক্ষণেকের জন্য। প্রয়োজন আমার। এখনই আমি ফিরে আসছি। এসে আপনারই সম্মুখে এই দুর্ব্বিনীতার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করছি।

প্রবর। উত্তেজিত হয়ো না, সখা!

উদ্দা। না—না সখা, না। আমাকে নিরস্ত করবেন না। আমার পিতাই হচ্ছেন আজ এ উৎসব-ক্ষেত্রের অধিপতি। ধর্ম্মের চাবি যাঁর হাতে। আর ও একটা অতি তুচ্ছ শত মুদ্রার ক্রীতদাসী। সেই তুচ্ছের হাতের ঐ তুচ্ছ বল্লমকে আমি ভয় করব? অপেক্ষা, অপেক্ষা, অপেক্ষা—আপনারই সম্মুখে ওর হবে শিরশ্ছেদ।

(প্রস্থানোদ্যত)

রহস্য করিনি সখা, যদি ওর মস্তক আমি ভূমিতে লুণ্ঠিত করতে না পারি—

দেব। অধিক বিলম্ব করতে পারব না, ব্রাহ্মণ! তোমার সখাকে তা হ'লে পুরুষ প্রহরীর হাতে সমর্পণ ক'রে আসতে হবে।

উদ্দা। অপমানের উপর অপমান!

[বেগে প্রস্থান।

(কটিবন্ধন মুক্ত করিয়া দেবসেনা গণ্ডীর বাহিরে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল,—ঐ আস্তরণ বিছিয়ে ঐখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করুন।)

প্রবর। প্রয়োজন নেই, ভদ্রে! (কটিবন্ধ নিক্ষেপে দেবসেনাকে প্রত্যর্পণ করিল।)

দেব। সামান্যা নারী আমি, সৈনিকার কার্য্য করি। ক্রটি গ্রহণ করবেন না, প্রভু!

প্রবর। না চার্ব্বঙ্গি, ত্রুটির কার্য্য তুমি কিছু করনি, বরং সত্য বলতে গেলে তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যদি আমি তোমার মত শরীর-রক্ষী পাই—

দেব। (কটিবন্ধ পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিয়া) আপনি বসুন। সঙ্কোচ করবেন না।

প্রবর। না শুচিস্মিতে, না।

দেব। না নয়, হাঁ। আপনি সঙ্কোচ করবেন না, প্রভু। যেহেতু, আপনি রাজকুমারীর বর।

প্রবর। তুমি জেনেছ?

দেব। অগ্রে আপনি উপবেশন করুন। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, এমন ব্যবসায় আমি গ্রহণ করেছি যে, আপনাকে পরমাত্মীয় জেনেও আমাকে আপনার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার দেখাতে হয়েছে।

প্রবর। কিছু নয়—কিছু নয় চঞ্চলাপাঙ্গি, মুগ্ধতার উপর মুগ্ধতা। (উপবেশন) তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি বিচলিত, বিজড়িত, বিমুগ্ধ। তোমার ব্যবহারের মধুরতা অনুভব ক'রে আমি বিগলিত, ব্যাকুলিত, বিদগ্ধ।

দেব। পাত্র হাতে আপনার বসতে বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। ওটা ভূমিতে রক্ষা করুন।

প্রবর। কিছু অসুবিধা নয় প্রিয়ংবদে, বরং এরূপভাবে এটিকে ধ'রে থেকে আমি প্রবলানন্দ অনুভব করছি।

দেব। ওটি বুঝি রাজকুমারীর মুখে তোলবার অভিপ্রায়ে ধ'রে আছেন?

প্রবর। বুঝতে পেরেছ—বুঝতে পেরেছ, মদিরলোচনে? শুনলুম, এ উৎসবের বিচিত্র প্রথা। যদি কোনও নাগরিক অন্য কোনও নাগরিকের মুখে সুধাপাত্র তুলে ধরে, তার প্রত্যাখ্যান করবার উপায় নেই।

দেব। সত্য। তাতে রাজা-প্রজার ভেদ নেই, নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই। অন্ততঃ সে পাত্র হ'তে এক বিন্দুও গ্রহণ ক'রে পাত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হবে।

প্রবর। সেই আশ্বাসে, সেই আশ্বাসে—মদিরলোচনে, একমাত্র সেই আশ্বাসে এই পাত্র আমি ধ'রে আছি। রাণী আমাকে পাত্র দিয়ে আমার অভিবাদন করেছেন। আমি এই পাত্র রাজকুমারীকে দিয়ে অভিবাদন করব।

দেব। কতক্ষণ ধ'রে থাক্‌বেন?

প্রবর। যত কাল না তাঁর দেখা পাই।

দেব। অনন্তকাল যদি তার দেখা না পান, অনন্তকাল আপনি ধ'রে থাকবেন?

প্রবর। অনন্ত কি রম্ভোরু, অনন্তের পরেও যদি কাল থাকে, তত দিন ধ'রে থাকবো—অনন্তান্ত।

দেব। আপনি প্রেমিক বটে! রাজকুমারীর ভাগ্যের তুলনা নাই। তাকে আপনি দেখেছেন?

প্রবর। সুস্পষ্ট দেখা এখনও ঘটেনি মনোরমে, আভাসমাত্র দেখেছি।

দেব। তাতেই তার প্রতি এত আকর্ষণ! আপনি প্রেমিক-চূড়ামণি

প্রবর। ব'স অমিয়ভাষিণি, ব'স অনিন্দিতাঙ্গি, ব'স চঞ্চলাপাঙ্গি, ব'স।

দেব। হায়! যে ব্যবসায় অবলম্বন করেছি, তাতে বসবার কি আমার অধিকার আছে!

প্রবর। অধিকার নেই?

দেব। বসবারও নেই, আর যে সামগ্রীটি আপনার পাত্রে বিরাজ করছে, ওটি গ্রহণেরও নেই।

প্রবর। আমি যদি রাজার কাছে এ অধিকার প্রার্থনা করি?

দেব। রাজার কাছে? আমার জন্য? কেন? এ দীনার প্রতি এত অনুগ্রহ কি হেতু, প্রভু?

প্রবর। তুমি আমার নিকটে এসো। অত দূর থেকে তোমার কথার মিষ্টতা পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছি না।

দেব। নিকটে গিয়ে কি লাভ হবে আমার, প্রভু! কতক্ষণই বা আপনার কাছে থাকবো? আপনার সখা আমার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে গেছে।

প্রবর। সে বাতুল—সে উন্মত্ত। তার কথায় কোনও আস্থা দিও না, সুদতি। আমি একটা স্বাধীন দেশের রাজপুত্র—এখানে অতিথি। আমার আশ্বাস-বাণী তুচ্ছ মনে ক'র না। এসো, তুমি আমার কাছে ব'স নিঃশঙ্কচিত্তে। আমার শির মাটীতে লুণ্ঠিত হবার পূর্ব্বে কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। এসো—এসো কোকনদেক্ষণে, এসো—

দেব। হাঁ—হাঁ, উঠবেন না—গণ্ডী পার হবেন না। (বল্লম তুলিয়া ধরিল) চলুন, আপনাকে পুরুষ প্রহরীর

হস্তে সমর্পণ ক'রে আসি। কেন না, অধিকক্ষণ আর আমি এখানে থাকতে পারব না।

প্রবর। সত্যই কি মনোরমে, ওই বল্লমে তুমি আমার বক্ষ বিদ্ধ করতে পার ?

দেব। আমি প্রেমহীনা, প্রাণহীনা, প্রধানার আদেশে যন্ত্রবৎ পরিচালিতা সৈনিকা।

প্রবর। তাই ত সুন্দরি, অমিয়মাখা বাক্যে আমাকে পরিতুষ্টি দিয়ে শেষে আমাকে অপদস্থ করলে !

দেব। আর ঐ পাত্রস্থ সুধা আপনিই পান করুন, অথবা ভূমিতে নিক্ষেপ করুন। রাজকুমারীর দর্শনলাভ আপনার পক্ষে দুরূহ।

প্রবর। দুরূহ ?

দেব। আমার মন বলছে রাজকুমার, মদিরাপাত্র তিনি মুখে তুলবেন না।

প্রবর। তোমার প্রলাপী মনকে তোমার হৃদয়ের ভিতরেই লুকিয়ে রাখো। আমি এক স্বাধীন রাজ্যের রাজপুত্র। তোমার বল্লমের মুখে দাঁড়িয়ে আছি দেখে মনে ক'র না, আমি প্রাণভয়ে ভীত। আমার অধীন লক্ষ পদাতিক, অযুত অশ্ব, সহস্র গজ। আমি যদি ইচ্ছা করি, তা হ'লে এই ক্ষুদ্র অবন্তীকে আমার এই অবস্থাতেই এক মুহূর্ত্তে –(নেপথ্যের দিকে তীব্রদৃষ্টি)

দেব। একবারে রসাতলে পাঠাতে পারেন ?

প্রবর। রহস্য করছ কি কিসলয়কোমলে ! সত্যই পারি।

দেব। রহস্য করব কেন, প্রভু ! তা যদি পারেন, তা হ'লে আমাদের উপর আপনি পরম দয়ালের কার্য্য করেন। আমরা এই সব অপ্রিয় কার্য্য হ'তে নিস্তার পাই।

প্রবর। তাই করব, করব -(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ) আর করব তা অচিরে। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া পাত্র ভূমিতে রাখিয়া) অচিরে। তোমরা সব নিশীথে নিদ্রা যাবে। প্রভাতে উঠে দেখবে, তোমাদের রাজার প্রাণ হ'তে প্রিয় অবন্তীকুসুম পরহস্তগত হয়ে গেছে।

নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে প্রস্থানের উদ্যোগ।
উদ্দালকের হস্ত ধরিয়া চণ্ডদেবের প্রবেশ)

ণ্ড। যেয়ো না মালব-রাজকুমার—চৌরের আচরণ দেখাতে হবে, এমন কোনও কার্য্য তুমি করনি। কিসের লজ্জা—ফিরে এসো। অবন্তীর পুত্র-কন্যা সকলে তাদের এই জাতীয় উৎসবে তোমাকে নিমন্ত্রণ করছে। এস মালব-গৌরব, আমি তাদের প্রতিনিধি।

প্রবর। ন্যায়বান্ অবন্তী-পতি, আর আমি সলজ্জ হব না।

উদ্দা। উঃ ! সলজ্জ হ'তে এখন আমারও বড় লজ্জা হচ্ছে।

চণ্ড। দেবসেনা, নবাগত অতিথিকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ক'রে যজ্ঞ-মণ্ডপে নিয়ে যা। যাও উদ্দালক সঙ্গে—শত মুদ্রার ক্রীতদাসীর উপর অকারণ ক্রোধ না দেখিয়ে এই তোমাদের অসহায় অবস্থায় তার সাহায্য গ্রহণ কর।

উদ্দা। অন্যায় করেছি, রাজা।

চণ্ড। শত মুদ্রার ক্রীতদাসীর বিশ্বস্ততার উপরই আজ তোমাদের অমূল্য জীবন নির্ভর করছে। যাও—আর ওর মুণ্ডটাকে স্কন্ধচ্যুত করবার আগ্রহ দেখিও না। যাও কুমারকে নিয়ে মণ্ডপে। কিন্তু সাবধান, তৎপূর্ব্বে মালবকে সন্তুষ্ট করতে অবন্তীর মর্য্যাদানাশের আগ্রহ দেখিও না। কুমার ! যখন তুমি আবাহিত, তখন পূজ্য। রাজকুমারীকে দেখবার যদি একান্তই অভিলাষ হয়ে থাকে, দেখতে পাবে তাকে যথাযোগ্য সময়ে মণ্ডপে।

[চণ্ডদেবের প্রস্থান।

দেব। শত মুদ্রার ক্রীতদাসী আমি। তোমাদের যোগ্য অভ্যর্থনা আমি কি জানি ?

উদ্দা। খুব জানিস্—খুব জানিস্—আর আমাদের প্রচণ্ড সলজ্জ করিস্‌নি—হাত ধর।

প্রবর। ধর কমলকিসলয়কোমলে—ধর। আমার হাত পর্য্যন্ত সলজ্জ—.

(দেবসেনার গীত)

চন্দ্রালোকিত কুঞ্জে কুসুমকোমল অঙ্গ।
লুকাইয়া রাখো, ওগো প্রিয়তম, এ ত নহে প্রেমরঙ্গ ॥
এ নহে তোমার ফুলের দেশ,
কেন হে পুরুষ নারীর বেশ
কেন হে তোমার চল-কুন্তলে কুঞ্চন তরঙ্গ ॥
হাস্যে তোমার নারীর লাস্য কথাগুলি মৃদু অতি,
নিকটে এসো না জাতি লাঞ্ছনা ফিরাও তোমার গতি,
উজল চক্ষে মাগি কজ্জল পৌরুষে কর ব্যঙ্গ
যাও দূরে আরো দূরে প্রিয়তম সমরে দিয়া ভঙ্গ ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উৎসব-ক্ষেত্র

নারীগণ

(গীত)

কোথা কি বীণার তারে কি যেন নাচিছে গান,
কাণে না পশিতে সুর কেঁপে ওঠে কেন প্রাণ।
কেবা সে নিপুণ কবি
গানে বেঁধে দিল ছবি,
আলসে লালস মাপি দিতেছে সে টান।
দোর খুলে গেল গো,
যেতে বুঝি হ'ল গো,
আর বুঝি থাকে না গো জাতি-কুলমান।

(পুরবাসিগণসহ চণ্ডদেবের প্রবেশ)

চণ্ড। শোন তোমরা, উজ্জয়িনীর পুত্র-কন্যা! তোমাদের কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যে গৌরবের দিন স্মরণে আমাদের এই উৎসব, তাতে তোমাদের আদেশ করতে আমার কোনও অধিকার নেই।

১ম না। আদেশ করতে অধিকার তোমার নেই, রাজা?

চণ্ড। সামান্যমাত্রও নেই, পুরনারী!

২য় না। তুমি কি তবে রাজা নও, রাজা?

চণ্ড। এখানে রাজা রাজা নয়, বিধি রাজা। তোমাদের আদেশ করতে অধিকার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, অনুরোধ করতে অধিকার আছে।

১ম পু। বল রাজা, বল।

চণ্ড। আমাকে তোমাদের যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুরোধ করবার ইচ্ছা থাকে, করবে তোমরা মণ্ডপে—উৎসবান্তে যজ্ঞতিলক গ্রহণ করতে যখন আমরা সকলে সেখানে সমবেত হব।

১ম না। বুঝতে পেরেছি রাজা, করব না।

সকলে। না রাজা, করব না।

চণ্ড। এখানে করবে শুধু আনন্দ।

সকলে। আনন্দ—কেবল আনন্দ।

চণ্ড। (কিঞ্চিৎ মত্তভাবে) এইটি আমার অনুরোধ।

১ম না। ও কি রাজা—ও কি রাজা!

সকলে। আদেশ বল রাজা।

চণ্ড। না—অনুরোধ—

১ম না। আমরা ও কথা আবার শুনলে কেঁদে ফেলবো, রাজা!

(নারীগণ ঐ কথা পুনরুচ্চারিত করিল।
পুরুষগণ বলিল, আমরা কাঁদতে আরম্ভ
করলুম রাজা।)

চণ্ড। ইচ্ছা হয় কাঁদো। তবু আমার অনুরোধ। এখানে আজ রাজা রাজা নয়, বিধি রাজা। এখানে আজ রাজা, প্রজা, পুরুষ, নারী সকলেরই এক অভিধান—অবন্তী—অবন্তীর পুত্র-কন্যা। রাজার এখানে প্রাধান্য নেই—প্রাধান্য বিধির। আমিও যদি আজ বিধি অমান্য করি, তোমরা সকলে মিলে আমারও শাসন করতে পার।

(সকলে ওরূপ বাক্য পুনরায় না কহিতে চণ্ডদেবকে
অনুরোধ করিল এবং প্রসাদ প্রার্থনা করিল।
চণ্ডদেব পূর্ব্ববৎ প্রসাদ দান করিলেন)

১ম পু। উঠ—সকলে এইবার, অবন্তীর পুত্র-কন্যা! এই শেষ প্রসাদ গ্রহণ। এইবারে চল, কেবল করি আমরা সকলে আনন্দ।

২য় না। এইখান থেকেই অঞ্চলে কটি-বন্ধন কর, সব অবন্তীর কন্যা!

৩য় না। হাঁ রাজা!

চণ্ড। বল ভদ্রে—

৩য় না। বলব রাজা?

চণ্ড। মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না!

৩য় না। বললে দোষ গ্রহণ করবে না?

চণ্ড। না বললে, গ্রহণ করব নারী!

৩য় না। বিধিরই যদি প্রাধান্য, তবে তোমার কন্যা আমাদের সঙ্গে আনন্দে যোগ দিচ্ছে না কেন?

চণ্ড। অবশ্য দেবে। সে কোথায় আছে, অন্বেষণ কর।

২য় না। যদি আমরা তার মুখে সুধাপাত্র তুলে ধরি?

চণ্ড। সে সুধা পান করবে। অবশ্য করবে।

১ম না। না রাজা, আমরা তা করব না।

চণ্ড। তোমরা মনে করছ, সে পান করবে না?

১ম পু। মূর্খা নারী, ওরা তোমার মহত্ব বুঝতে পারেনি রাজা, ক্ষমা কর।

চণ্ড। অন্বেষণ কর, তার মুখে পাত্র ধর, দেখ সে পান করে কি না।

১ম পু। ক্ষমা কর রাজা, ক্ষমা কর!

চণ্ড। আমার কন্যা? এখানে আজ কে কার কন্যা, কে কার পিতা?

১ম না। ক্ষমা কর রাজা, সত্যই মত্তা, মূর্খা নারী আমরা।

চণ্ড। আর কিছু তোমাদের জিজ্ঞাস্য আছে?

১ম পু। কিছু নেই, কিছু নেই রাজা—চল মূর্খা, চল।

চণ্ড। যদি না সে পান করে?

৩য় না। না বুঝে অপরাধ করেছি রাজা, ক্ষমা কর।

চণ্ড। না, না, কেউ তোমরা অপরাধ করনি। তবে অপরাধ করেছি আমি—উৎসবক্ষেত্রে সঙ্গে এনে আমার ঐ কুমারী কন্যাকে।

১ম না। আমরা কেউ তার মুখে সুধাপাত্র তুলবো না, রাজা!

সকলে। জীবন থাকতে নয়, রাজা!

চণ্ড। যদি তোলো, তাকে পান করতেই হবে। যদি না করে—

১ম পু। আমরা তুলতে দেবো না।

১ম না। আর যদি ও কথা তোলো রাজা, তোমার পায়ে আমরা মাথা দিয়ে মরব।

১ম পু। আমরাও ঐ সঙ্গে রাজা—

চণ্ড। (মত্তভাবে) তার পিতা যে বিধির কাছে মাথা হেঁট করে—

(সকলে চণ্ডদেবের পদতলে মাথা দিয়া শয়ন করিল)

ওঠো—সে বিধি অমান্য করতে পারে না। সে জানে, বিচারের সময় অবন্তীর সে এক জন প্রজা মাত্র।

১ম পু। চল—চল—আমরা সকলেই সন্তুষ্ট।

১ম না। আমরা—অবন্তীর পুত্র-কন্যা। প্রণাম ন্যায়বান্ অবন্তীপতি।

(সকলে প্রণামানন্তর প্রস্থান করিতেছিল, এমন সময় নেপথ্য হইতে রাণীর স্বর শুনিয়া সকলে বিস্মিতের মত দাঁড়াইল, কিঞ্চিৎ মত্তভাবে রাণী প্রবেশ করিল)

রাণী। রাজা—রাজা! প্রিয়তমা কন্যাকে দিয়ে অপমান করাবার জন্যই কি আমাকে আজ এখানে এনেছিলে?

চণ্ড। কি সে করেছে, রাণি?

রাণী। তোমরা যেয়ো না, অবন্তীর পুত্র-কন্যা! রাজার সঙ্গে তোমরাও শুনে যাও। এর পর ভবিষ্যতে আমাকে না তোমরা অপরাধী মনে কর।

চণ্ড। কি অপমান করলে সে?

রাণী। অপমান সে ত অনেক দিন থেকেই ক'রে আসছে! আমি তোমার সাধারণী স্ত্রী। সে পট্টমহাদেবীর গর্ভে জন্মেছে। আমি তার চোখে দাসীমাত্র—অপমান সে ত চিরকালই ক'রে আসছে। আমি বিমাতা। পাছে লোকে আমাকেই দোষ দেয়, এই জন্য সে অপমান আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি।

চণ্ড। আজ সে কি করেছে, বল।

রাণী। কিন্তু আজ—সমস্ত পুরনারীর সুমুখে—

১ম না। রাজা যা জিজ্ঞাসা করছেন, তার উত্তর দাও, রাণি!

রাণী। আমি যেন নীতি কাকে বলে, জানি না। আমি যেন নারীত্বের মর্য্যাদা বুঝি না। শীলতা যেন সে একাই শিখেছে। এরা জানে না, ওরা জানে না, তারা জানে না, পুরোহিত পর্য্যন্ত জানে না—একমাত্র জেনেছে সে।

চণ্ড। তোমার প্রলাপ-বাক্য শোনবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারি না। অন্যত্র পুরবাসীরা আমার দর্শন-প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে অবস্থান করছে।

১ম পু। নিশ্চয়—রাজাকে দর্শন সকলেরই অধিকার।

১ম না। বল রাণি, রাজকুমারী কি করেছে।

রাণী। স্নেহপরবশ হয়ে আদর ক'রে একপাত্র সুধা আমি তার মুখে তুলতে গিয়েছিলুম—

চণ্ড। সে গ্রহণ করলে না?

১ম না। উত্তেজিত হয়ো না অবন্তীপতি, আমরা জিজ্ঞাসা করছি।

চণ্ড। না, তোমাদের জিজ্ঞাসা করবার অধিকার কি? গ্রহণ করলে না?

রাণী। গ্রহণ না করলেও আমার আক্ষেপ ছিল না রাজা, আমার (হস্ত দেখাইয়া) মণিবন্ধে প্রহার ক'রে সে সেই পাত্র আমার হাত থেকে ফেলে দিয়েছে।

চণ্ড। যখন জানো তুমি, সে তোমাকে বিদ্বেষ করে, তখন সুধাপাত্র তার মুখের কাছে উপস্থিত করা তোমার ভুল হয়েছিল, রাণি !

রাণী। তোমার অন্তঃপুরে যত পারে সে বিদ্বেষ করুক, এখানেও সে বিদ্বেষ করবে, রাজা ?

চণ্ড। তোমার এ কথা বলবার অধিকার আছে। আমি তাকে ধ'রে আনছি, রাণি !

রাণী। এই সব পুরমহিলা নগরে শতপদ দূর থেকে তোমাকে দেখলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়। তারা আজ কি সাহসে তোমার মুখে পাত্র ধরছে, রাজা ?

১ম, পু। তোমার বলবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, রাণি !

(সকলে উক্ত বাক্য স্বীকার করিল।)

চণ্ড। ক্ষোভ ক'র না—আমি তাকে ধ'রে আনছি।

(তখন পৌরজনদের মধ্যে সকলেই জয়শ্রীকে আনিবার ও তাহাদের সঙ্গে একত্র পানভোজন করিতে আদেশ দিবার অনুরোধ করিল। ঈষৎ চঞ্চলভাবে চণ্ডদেব প্রস্থান করিলেন। পুরুষগণ তাঁহার অনুসরণ করিল)

১ম, পু। ক্ষোভ ক'র না রাণি, ক্ষোভ ক'র না। রাজার আজ বিষম পরীক্ষার দিন।

১ম, না। আমরা কটিবন্ধন ক'রে দাঁড়িয়েছি,—তোমার মর্য্যাদা রাখতে, রাণি ! দেখবো আজ এখানে রাজা রাজা, না বিধি রাজা !

(নারীগণের গীত)

অনলে যোগাতে ইন্ধন।
দিয়ে অঞ্চল অতি চঞ্চল কর রে কটিবন্ধন ॥
গাহিব আমরা বিধির জয়,
কি ভয় কি ভয় কি ভয়—
তবে যদি হয় পরাজয়
তথাপি মা ভৈঃ—কি ভয়,
পাতি অঞ্চল প'ড়ে ভূমিতল করিব ক্রোধে ক্রন্দন।
এবং ওদের উদর পুরাতে আর না করিব রন্ধন।

দৃশ্যান্তর

(নেপথ্যে বিপুল কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ বলিতেছে, সাবধান সাবধান পুরবাসী, পুরনারী ! কেহ বলিতেছে, শত্রু, ভীষণ শত্রু উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কেহ বলিল, ও পুরোহিত, শত্রু আসে কেন ? নেপথ্যে বহু কণ্ঠে শব্দ উঠিল — মণ্ডপে মণ্ডপে, যে যেখানে আছ, মণ্ডপে মণ্ডপে)

(পুরোহিত ও ভীতিব্যাকুল পৌরজনের প্রবেশ)

পুরো। যাও মণ্ডপে—মণ্ডপে। এখানে তোমরা হত হ'লে রাজা দায়ী হবে না। সুতরাং মণ্ডপে—মণ্ডপে। চ'লে এসো—চ'লে এসো।

(সকলে, চ'লে এসো—চ'লে এসো—মণ্ডপে মণ্ডপে বলিতে বলিতে ছুটিল। রাণী চলিতে গিয়া ভূপতিতা হইল)

রাণী। পুরোহিত ! পুরোহিত !

পুরো। চ'লে এসো—চ'লে এসো—

রাণী। পুরোহিত, আমি অশক্ত।

পুরো। কোন ভয় নেই শক্তা হও, উত্থিতা হও—বিক্রান্তা হয়ে আমার অনুসরণ কর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[রাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে উদ্দা। মণ্ডপে—মণ্ডপে ভয় নেই রাজকুমার—আমরা ঠিক যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

জয়শ্রী। এ কি মা ! উন্মত্ত জনসঙ্ঘ নিজের নিজের প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে তোমাকেই নিক্ষেপ ক'রে চ'লে গেল ? ওঠো, এসো আমার সঙ্গে শিবিরে।

রাণী। কে শত্রু, কোথা থেকে কেমন ক'রে এলো, জয়শ্রী ?

জয়শ্রী। জানি না—জানবারও আমার প্রয়োজন নেই। সে যত বড়ই শত্রু হ'ক, ভিতরের শত্রুর বিভীষিকার কণামাত্রও সে আমার কাছে উপস্থিত করতে পারেনি। চল আমার শিবিরে। ইচ্ছা হয়, আবার আমার মুখের

কাছে সুধাপাত্র তুলে ধর। তোমার স্নেহের দান নিক্ষেপ ক'রে পান না ক'রেও আমি মত্তার আচরণ দেখিয়েছি। যদি ঠিক বুঝে থাক অমৃতপাত্র—তোমার কন্যার মুখে তুলে ধর। পান ক'রে আমি অপ্রমত্ত হই। আমি এদের দুর্নীতি দেখা আর সহ্য করতে পারছি না।

রাণী। আর আমাকে বাগ্‌বিদ্ধ ক'র না। তোমার মুখে মাতৃসম্বোধন! আমার চৈতন্য ফিরেছে, জয়শ্রী! তোমারই শিবিরে মা আমাকে আশ্রয় দাও। তোমার অপ্রমত্ততার আবরণে ঐ সব মত্তদের দৃষ্টি থেকে আমাকে লুকিয়ে রাখি। এখন রাজার কাছে মুখ দেখাতে আমার—

জয়শ্রী। এসো মা এসো—একটু দ্রুত—কোলাহল যেন আরও নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। [উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল, দূরে যশমার সন্তর্পণে প্রবেশ ও কুঞ্জাদির অন্তরাল দিয়া প্রস্থান।

(চণ্ডদেবের প্রবেশ)

চণ্ড। এ কি? সত্যই কি করছে এরা ষড়যন্ত্র—নিজেদের প্রাধান্যনাশের ভয়ে—ঐ সব যথেচ্ছাচার পুরোহিতকুল? ও কি! ও কি!—ঐ শত্রু? ওরই ভয়ে অবন্তীবাসী ব্যাকুলভাবে চারিদিকে পলায়ন করছে? ধিক্ ধিক্ তোদের, ওরে ও মত্ত অধঃপতিত জাতি!

(নারীসেনাগণ প্রবেশ করিয়া চণ্ডদেবকে বেষ্টন করিল)

কে শত্রু, কিরূপ শত্রু, দেখতে পেলি?

১ম সে। না রাজা, আমরা কেউ দেখিনি।

চণ্ড। আমি দেখেছি রে—আমি দেখেছি।

১ম সে। কোথায় রাজা?

(সকলে উক্ত প্রশ্ন করিল)

চণ্ড। ভীষণ রে সে ভীষণ! ভাগ্যে তোরা আমাকে ঘেরাও ক'রে ফেললি, নইলে কাঁপতে কাঁপতে মাটীতে আছাড় খেয়ে আমার প্রাণ বহির্গত হয়ে যেতো।

১ম সে। কোথায় রাজা, কোথায় সে ভীষণ?

(নেপথ্যে।—ভয় নেই পুরবাসী, একটা নারী, পরদেশী। গণ্ডী পার হয়েছে। ভয় নেই—ভয় নেই।)

সকলে। নারী?

(সুষেণার প্রবেশ)

সুষেণা। রাজা! শুনছি, এক পরদেশী নারী গণ্ডী পার হয়েছে। কি করব, আদেশ করুন।

(নেপথ্যে—কেহ বলিল, হত্যা কর। কেহ বলিল, নারী। কেহ বলিল, হোক্, হত্যা কর।)

চণ্ড। ওই ত জানলে জনমণ্ডলীর অভিপ্রায়। সুষেণা, আমি বিধি অমান্য করতে পারব না।

[সুষেণার প্রস্থান।

১ম সে। নারী?

চণ্ড। ভীষণ—অতি ভীষণ। দেখে বোধ হ'ল, অন্নাভাবে কঙ্কালসার।

১ম সে। আমরা কি করব?

চণ্ড। আমার যখন জীবনরক্ষা হয়েছে, তখন আমার স্কন্ধে উঠে নৃত্য কর।

[নারীসেনাগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে. কেহ বলিল, নারী বৃদ্ধা। সমবেত কণ্ঠে স্বর উঠিল, বল্লমে বিঁধে ফেল, নারীসেনা!)

(নেপথ্যে সুষেণা বলিল, নারী পালিয়ে যাচ্ছে। চ'লে আয় জয়সেনা, বীরসেনা, শান্তিসেনা, মুক্তিসেনা চ'লে আয়, চারিদিক থেকে তার পালাবার পথ রোধ কর।)

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

জয়শ্রী। পিতা—পিতা, ওই নিষ্ঠুরাকে নিষেধ করুন। এক বৃদ্ধা, অন্নাভাবে কঙ্কালসারা নারী—

চণ্ড। আমি তাকে দেখেছি, জয়শ্রী।

জয়শ্রী। দেখেও এই অতি নিষ্ঠুর কার্য্য আপনি অনুমোদন করলেন?

চণ্ড। আবার ভুলে যাচ্ছ কেন জয়শ্রী—আমি কিছু করিনি।

(নেপথ্যে—হ'ক বৃদ্ধা, হ'ক কঙ্কালসার—হত্যা না ক'রে ফিরে এসো না নারীসেনা! আমরা আজ বিধির প্রাধান্য দেখতে চাই)

জয়শ্রী। এই ঘৃণিত, পাশবিক উৎসবের কবে বিলোপ হবে, রাজা?

চণ্ড। হয়, আজই হ'ক। কিন্তু যত দিন না হবে, তত দিন আমি রাজা থাকতে এ উৎসবের একটা তুচ্ছ বিধিরও লঙ্ঘন হ'তে দেবো না।

জয়শ্রী। আমি কি করব?

চণ্ড। উৎসবের বিধি—গণ্ডীর ভিতরে যথেচ্ছা বিচরণ

কর। কিন্তু এখনও নিজেকে মনে ক'র না মুক্ত। প্রতিক্ষণেই স্মরণ রাখবে, আজ এখানে আমিও জনমতের আজ্ঞাকারী—অবন্তীর পুত্র। আমার স্বতন্ত্র অভিধান নেই।

জয়শ্রী। যদি আমি বিধির পারে যাই ?

চণ্ড। অর্থাৎ ?

জয়শ্রী। অর্থাৎ এই নীচ, এই বর্ব্বর নিষ্ঠুরতার সীমার বাইরে যে কোনও স্থানে—যে কোনও অন্ধকারে—

চণ্ড। অর্থাৎ ?

জয়শ্রী। আর অর্থাৎ আমি জানি না। আমি আর এ নীচতা নিষ্ঠুরতা দেখতে পারি না। পিতা, রাণী দিলে না, আপনি দিন তুলে ঐ অমৃত আমার মুখে।

চণ্ড। অর্থাৎ, আর অবন্তীতে তুমি ফিরতে চাও না ?

জয়শ্রী। হায়, তা করবার যদি আমার উপায় থাকতো! প্রথা কি নীচ, কি বর্ব্বর, কি নিষ্ঠুর !

চণ্ড। সে আক্ষেপ গণ্ডীর বাইরে গেলেই মিটে যাবে, জয়শ্রী। উৎসবের বিধি, জাতিকে অবজ্ঞা করে', এখানে এসে আজ যে গণ্ডীর বাইরে আত্মগোপন করবে, সে অবন্তী থেকে চির-নির্ব্বাসিত হবে।

জয়শ্রী। করুক তবে সেই বিধি সমস্ত কঠোরতা নিয়ে আমার শাসন। আমি আত্মগোপনই করবো।

(প্রস্থানোদ্যত)

চণ্ড। কোথায় যাবে ? তোমার কথা শুনে আমি ত তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। যেও না, জয়শ্রী।

(প্রস্থানোদ্যত)

জয়শ্রী। আসবেন না মত্ত রাজা, ফিরে যান, আমি নিজে না ধরা দিলে এখানকার কোনও মত্ত আমাকে ধরতে পারবে না।

[প্রস্থান।

চণ্ড। সত্যই হয়েছি আমি মত্ত। অপ্রমত্ত জয়শ্রী, তাই তোমাকে আমি ধরতে পারলুম না। তোমাকে বলি দিলে যদি এ প্রথার অবসান হয়, তাই হ'ক। নিজেকে বলি দিয়ে তুমি তোমার জয়শ্রী নাম সার্থক কর।

(টলিতে টলিতে চণ্ডদেব কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেবসেনা প্রবেশ করিয়া বলিল, রাজা।)

কি রে দেবসেনা, রাজা ব'লে চুপ করলি কেন ?

দেব। তাই ত রাজা, এরই মধ্যে তুমি এত মত্ত হয়েছ ! আর এই অবস্থায় তোমাকে একা ফেলে সকলে আত্মরক্ষা করতে পালিয়ে গেছে !

চণ্ড। বলবার তোর কি কিছু আছে ?

দেব। ছিল রাজা, কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে বলতে যে সাহস হচ্ছে না !

চণ্ড। তুই বল। এ বনে আজ সকলেই মত্ত ;—কেউ পান ক'রে, কেউ পান না ক'রে।

দেব। এক অনাহারে কঙ্কালসার বৃদ্ধ, মনে হচ্ছে যেন আত্মহত্যার জন্য বার বার গণ্ডী পার হবার চেষ্টা করছে। তোমার সঙ্গে দেখা করাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি তাকে গণ্ডীর বাইরে বসিয়ে এসেছি।

চণ্ড। নিয়ে চল দেবসেনা, নিয়ে চল।

দেব। সে যে অনেক দূর রাজা। এ অবস্থায় তোমাকে কেমন ক'রে নিয়ে যাই !

চণ্ড। নিয়ে চল, নিয়ে চল। এখানে তাকে আনাতে আমার সাহস নেই। এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ এতক্ষণে বোধ হয় মরেছে, এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ মরবে। প্রথা—প্রথা। নিয়ে চল। না পারিস্, কোথায় সে ব'লে দে, আমি নিজেই যাচ্ছি।

দেব। চল রাজা। (চণ্ডদেবের হাত ধরিল)

চণ্ড। (অর্দ্ধজড়িত স্বরে) প্রথা নিষ্ঠুর। শুধু নিষ্ঠুর ? নিষ্ঠুর—বর্ব্বর—হেয়। দেবসেনা ! একটা ব্যাকুল বিষণ্ণতা পাহাড়ের ভার নিয়ে অন্তরটাকে আক্রমণ করলে ! অনেক দিন তোর মুখের গান শুনিনি, একটা শুনিয়ে দে।

দেব। যথা আজ্ঞা প্রভু।

(দেবসেনার গীত)

খুলে দাও ঘরের দুয়ার।
কপট বাহির মোরে করেছে ছলনা গো,
সেথা ফিরে যাব নাকো আর ॥
যাহাকে আপন বলি
নিকটে গিয়াছি চলি,
শতভাবে সে লাঞ্ছনা করেছে আমার।
সে লাজ-কাহিনী আর শুনাতে না চাই গো !
খোলো দুয়ার খোলো দুয়ার
ফিরিয়া আপন ঘরে যাই গো।
এখন বুঝেছি আমি ওহে মৌন গৃহস্বামী
এক তুমি আপনার হ'তে আপনার ॥

দৃশ্যান্তর

(বিস্মিত-নেত্রে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া শবরবেশী উদয়ন প্রবেশ করিলেন। চলিতে চলিতে যেই তিনি সীমাচিহ্নের সমীপে উপস্থিত হইলেন, অমনি প্রভুগুপ্ত প্রবেশ করিলেন এবং উদয়নের স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। চমকিতের মত উদয়ন মুখ ফিরাইলেন)

প্রভু। ও দিকে কোথায় চলেছ ?

(বলিয়াই প্রভুগুপ্ত উদয়নের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন)

উদ। কি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখলুম ! এই বনের মাঝে কতকগুলো পুরুষ ও নারী মত্তভাবে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে চ'লে গেল !

প্রভু। এ আর আশ্চর্য্য কি ? তারা সকলে মদিরা পান করেছে।

উদ। তার পর এল এক প্রৌঢ় পুরুষ। দেখে তা'কে ক্ষমতাশালী ব'লে বোধ হ'ল। কিন্তু তা'কে ঘিরে ফেললে কতকগুলো নারী। সকলেরই হাতে বল্লম। দেখে বোধ হ'ল যেন, এক একটা রণ-রঙ্গিণী। ঐ ঐ—এখনও তাদের দেখতে পাচ্ছি।

প্রভু। আর ও আশ্চর্য্য দেখতে হবে না—ফিরে এস।

উদ। কেন ?

প্রভু। মরণের পথে ছুটেছিলে তুমি।

উদ। মরণের পথে ?

প্রভু। ওই তোমার সুমুখে ভূমিতে কিছু দূরে পথের এক চিহ্ন দেখছ ?

উদ। দেখতে পাচ্ছি।

প্রভু। ওইটি পার হলেই হ'ত তোমার মৃত্যু।

উদ। তুমি ক্ষিপ্ত।

প্রভু। না রে বর্ব্বর, ক্ষিপ্ত নই। বৃথা জীবনটা নষ্ট করতে চলেছিস দেখে তোকে রক্ষা করতে করুণা-পরবশ হয়ে ছুটে এসেছি। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না ?

উদ। পার হলেই মৃত্যু ?

প্রভু। শুধু মাত্র তাদের দেখার অপেক্ষা। ওই যে পুরুষকে দেখলে, উনি এ দেশের রাজা। আর ওই যারা ওঁকে ঘিরে চলেছে, ওরা হচ্ছে ওঁর দেহরক্ষী।

উদ। রাজার দেহরক্ষী নারী !

প্রভু। এ দেশের এই প্রথা। বহু প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চ'লে আসছে। আজ ওদের জাতীয় উৎসব। জাতির পরাধীনতা-মোচন স্মরণে বৎসরের এই এক নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা মৃগয়া উপলক্ষ ক'রে বনে আসেন। সঙ্গে আসে সৈন্য, সামন্ত,অমাত্য, বন্ধু,পৌরজন—পুরুষ ও নারী। এসে এখানে তারা গীত, বাদ্য, পান-ভোজনে সারাদিন আনন্দ করে। দিন-শেষে আবার তারা রাজধানীতে ফিরে যায়। ওই পৌর-নর-নারীদের যখন দেখেছ, তখন বুঝতে পেরেছ তাদের অবস্থা ?

উদ। সকলেই মত্ত।

প্রভু। উৎসবক্ষেত্রে প্রথামত প্রথমে যজ্ঞ হয়। যজ্ঞশেষে সকলেই অল্প-বিস্তর মদিরা পানে আনন্দ উপভোগ করে।

উদ। নারী পর্য্যন্ত ?

প্রভু। ওই ত দেখলে। তবে শুধু আজ। অন্য দিন করলে সেটা দূষ্য। যে করে, রাজ-বিধানে হয় তার শাস্তি। ওদেরই মর্য্যাদারক্ষার জন্য রাজার এই কঠোর বিধান। উৎসবক্ষেত্রের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। যে কোন বিদেশী রাজার অনুমতি বিনা ওই সীমা পার হবে, তখনি হবে তার মৃত্যু।

উদ। মারবে কে ?

প্রভু। ওই যে দেখলে—ওই সব নারী-রক্ষী। ওরা কেউ এ দেশীয় নারী নয়। কেউ বদাকৃসনী, কেউ ইস্তনানী, কেউ বাহ্লীকী, কেউ ইরাণী, কেউ আসিরী। বিদেশীয়া ব'লে ওরা সকলেই হয় অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ওদের দিয়ে রাজার কোনও গুপ্তশত্রুর ষড়্‌যন্ত্রের সুবিধা হয় না। নারী-রক্ষী রাখবার কারণ বোধ হয় এইবারে বুঝতে পেরেছ ?

উদ। ওরাও কি মত্ত ?

প্রভু। বলতে ভুলে গেছি। পান করে না তারা, যারা বালক। আর করে না ওরা ওই সব রাজার দেহরক্ষী। ওদের মদিরা স্পর্শ করবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই।

উদ। ওই নারী ভিন্ন কি রাজার আর কোন রক্ষী নেই ?

প্রভু। নিশ্চয় আছে। ওরা শুধু গণ্ডীর ভিতরে থেকে রাজার দেহরক্ষা করে। গণ্ডীর বাহিরে চারিদিকে প্রহরীর কার্য্য করছে বল্লমধারী সৈনিকের দল। তুমি তাদের দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে কেমন ক'রে এত দূর অগ্রসর হ'লে, বুঝতে পারছি না।

উদ। আমি যেখান থেকে আসছি, সেখানে রাজার কোনও বল্লমধারী প্রবেশ করতে সাহস করবে না।

প্রভু। কি প্রকার ?

উদ। প্রকার আবার কি—বুদ্ধি থাকে, বুঝে নাও।

প্রভু। প্রকাশ করেই বল। অত বুদ্ধি আমার নেই।

উদ। এই বনের যেখানে সহস্র সহস্র হস্তী বিচরণ করছে।

প্রভু। তুমি সেখানে ছিলে ? (উদয়ন মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল) এই অবস্থায় ?

উদ। (দুই হস্ত মুক্ত ও প্রসারিত করিয়া) এই অবস্থায়।

প্রভু। বুঝতে পেরেছি, উন্মত্ত বর্ব্বর—চ'লে এসো।

উদ। এ দিকে যাব না ?

প্রভু। না—কদাচ না—গেলেই মরবে। ওই সকল স্ত্রীলোক তোমাকে বল্লমে বিঁধতে, পুরুষদের মত কিছুমাত্র বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করবে না।

উদ। এ দিকে যেতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রভু। অর্থাৎ, মরতে ?

উদ। আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে ওই রাজাকে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব, স্ত্রীলোকের বেড়ার ভিতর থেকে সে কোন্ জন্তু শিকার করে।

প্রভু। আমার যা বলবার, তোমাকে ব'লে শেষ করলুম। তোমার প্রাণের কিছুমাত্রও যদি মূল্য নেই মনে কর, তা হ'লে যাও। আমি কিন্তু আর অধিকক্ষণ এখানে থাকতে পারব না।

উদ। প্রাণের মূল্য। কথাটা মনে লাগছে।

(নেপথ্যে উল্লাস-কোলাহল)

প্রভু। তা হ'লে আর কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এস। উল্লাস করতে করতে হয় ত ওরা এই দিকে আসতে পারে। আমার ইচ্ছা নয়, ওরা তোমাকে দেখে।

উদ। কেন ? এখানে দেখলেও কি ওরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে ?

প্রভু। অসম্ভব নয়। তোমার পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি শবর। তোমার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার বলছে শবর। কিন্তু তোমার মূর্ত্তি—

উদ। মূর্ত্তি কি বল্‌ছে ?

প্রভু। তোমার মত সুশ্রী, সুগঠিত যুবা কোন রাজগৃহেও কদাচ দর্শন করেছি।

উদ। হুঁ—চল।

প্রভু। তোমাকে দেখলে ছদ্মবেশী ব'লে ভ্রম হয়। ওদেরও সেই ভ্রম হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তারা মত্ত।

উদ। চল বৃদ্ধ, আমি ফিরেই যাচ্ছি। আমি ধরতে চলেছিলুম—যে কোন একটা বল্লমধারিণী নারীকে—ওই নারী-বেষ্টন-রহস্যটা জানবার জন্য।

প্রভু। গেলে তোমার প্রশ্ন করবার অবকাশ হ'ত না, বৎস। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষ্ঠুরা বল্লমে তোমার এই সুন্দর বিশাল বক্ষঃ বিদ্ধ ক'রে তোমার বাক্‌শক্তি বিলীন ক'রে দিত। নাও, এই ত সব শুনলে, এইবারে চ'লে এস।

উদ। চল।

প্রভু। হাঁ! এমন সুন্দর যুবা তুমি, নিতান্ত মত্তের মত অনর্থক প্রাণটা নষ্ট করা কি ভাল ?

(নেপথ্যে যশমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে তাহা শুনিয়া উদয়ন উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে উক্তরূপে অবস্থিত দেখিয়া প্রভুগুপ্ত বলিলেন, ও কি ! চলতে চলতে আবার থম্‌কে দাঁড়ালে কেন ? ওদিকে কাণ দিয়ো না)

উদ। শুনতে পেলে না, কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো ?

প্রভু। ও তোমার শোনবার বিষয় নয়। যদি কেহ ওখানে প্রবেশ ক'রে থাকে, সে মরেছে।

(নেপথ্যে যশমা পুনঃ চীৎকার করিল। উদয়ন গমনের ভাব দেখাইলেন)

তুমি তাই ব'লে আত্মহত্যা করো না।

(উদয়নের হস্তধারণ)

উদ। ধিক্ তোমাকে বৃদ্ধ। তোমার কথা এক, কার্য্য আর। বললে প্রাণের মূল্য, দেখাচ্ছ রূপের মূল্য ! আমার যদি প্রাণের মূল্য থাকে, তার নেই ?

[প্রভুগুপ্তের হস্তমুক্ত করিয়া প্রস্থান।

প্রভু। দেখতে দেখতে দেখার বাইরে শোনার বাইরে চ'লে গেল। আর তোমাকে ফেরাবার চেষ্টা বাতুলতা। হয় তুমি অতি-মত্ত, নয় তুমি অপ্রমত্তের রাজা।

(সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা। ওরে ও উন্মত্ত শবর, আমাকে জনশূন্য স্থানে একা রেখে কোথায় গেলি?

প্রভু। ও কি তোমারই পুত্র?

সুমিত্রা। আপনি তা'কে দেখেছেন?

প্রভু। শীঘ্র যাও মা, শীঘ্র যাও। এই দিকে এইমাত্র চ'লে গেছে সে। পুত্রকে ফিরিয়ে আনো—নইলে তাকে হারালে।

সুমিত্রা। হারালুম!

প্রভু। আগে ফিরিয়ে আনো—তার পর প্রশ্ন। নতুবা আর তাকে জীবিত ফিরতে দেখবে না।

সুমিত্রা। কোন্ দিকে গেল সে?

প্রভু। এসো, দেখিয়ে দিই। আমার শতনিষেধ সত্ত্বেও সে চ'লে গেছে। এই দিকে, মা, এই দিকে। শীঘ্র যাও মা, শীঘ্র ফিরিয়ে এনে অপঘাত-মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা কর।

(সুমিত্রা বেগে প্রস্থান করিল। প্রভুগুপ্ত উদ্গ্রীবভাবে তার গমনপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন)

প্রভু। এ দিকে রাজ-বধূর মূর্ত্তি ওদিকে মূর্ত্তি রাজ-পুত্রের। অথচ সে বললে আমি শবর। এ নারীও পুত্রকে সম্বোধন করলে শবর। কি প্রহেলিকার মূর্ত্তি এই মাতা-পুত্র! কি মা—কি মা? অমন ক'রে ছুটে আসছ কেন?

(সুমিত্রার পুনঃ প্রবেশ)

পুত্রকে পেয়েছ?

(সুমিত্রা হস্তের ইঙ্গিতে উত্তর দিবার আশ্বাস দিয়া বেগে বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন। তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার গন্তব্যপথের দিকে চাহিয়া প্রভুগুপ্ত দাঁড়াইলেন। বস্ত্রাধার কক্ষে সুমিত্রা পুনঃপ্রবেশ করিলেন)

সুমিত্রা। পুত্রের অনুসন্ধানে কিছু দূর গিয়ে মনে পড়লো, এইটে ফেলে এসেছি। তাই আমাকে ফিরে আসতে হ'ল, মহাত্মন্!

প্রভু। (সবিস্ময়ে) তোমার পুত্রের প্রাণের অপেক্ষা এই কাপড়ের পুঁটুলিটে কি তোমার কাছে বেশী মূল্যবান্ হ'ল?

সুমিত্রা। আমার ব্যবহার দেখে বুঝতে পারছেন না? মুখের দিকে অমন ক'রে কি দেখ্ছেন? আমি মত্ত নই।

প্রভু। আমার যদি বিজ্ঞতার এতটুকুও অভিমান থাকে, তা হ'লেও আমাকে ঐ কথা বলতে হবে—যেটা বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল—তুমিও মত্ত।

সুমিত্রা। আমার পুত্র নিতান্ত শিশু নয়। তার যথেষ্ট হিতাহিতজ্ঞান জন্মেছে। সে যদি, কি বুঝে জোর ক'রে মরণের পথে যায়, আমি রোধ করতে পারব না। ম'লে পুত্রশোকে কাঁদবো মাত্র। কিন্তু মহাত্মন্, নারীর সম্ভ্রম—আমার মর্য্যাদা! আমার মর্য্যাদারক্ষক হয়ে ওই বীরপুত্র শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়ে আমাকে এত দূরে নিয়ে এসেছে। আমার মন্দভাগ্যে এখানে যদি মরে সে, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করবে এই বস্ত্রাধার। পুত্র জীবিত ফিরে আসে, আবার আমার সঙ্গী হবে। না আসে, এইটিকে অবলম্বন ক'রে আমি গন্তব্য পথে চ'লে যাব। (কিছু দূর গমনের পর ফিরিয়া) সত্যই পুত্রকে হারালুম?

প্রভু। আমার তাই মনে হচ্ছে। সে যে কেমন ক'রে জীবিত ফিরে আসবে, আমি বুঝতে পারছি না।

সুমিত্রা। কোথায় সে গেল?

প্রভু। এ রাজ্যের রাজা এই বনে উৎসব উপলক্ষে বিহার করতে এসেছেন। সঙ্গে আছে পৌরজন—নর ও নারী।

সুমিত্রা। বুঝেছি—সেখানে বিদেশীর প্রবেশের অধিকার নেই।

প্রভু। বিহার-ভূমির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। রাজার বিনানুমতিতে যে বিদেশী সেই সীমা অতিক্রম করবে, তার ভাগ্যে মৃত্যু।

সুমিত্রা। প্রবেশ করলে আমারও ত মৃত্যু?

প্রভু। আশঙ্কা মা! রাজ্যের বিধান—শাস্তি দিতে এরা নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধের ভেদ রাখে না।

সুমিত্রা। এরূপ মত্ততা তার কেন এল প্রভু? প্রকৃতি

ত তার মত্তের নয়! কোনও রূপ-শালিনীর সৌন্দর্য্যের মোহে—

প্রভু। না না না! বনমধ্যে এক নারীর আর্ত্তস্বর শুনে, তার রক্ষার ইচ্ছায় সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেছে।

সুমিত্রা। তবে আমার পুত্র মরেছে বলছেন কেন?

প্রভু। সমস্ত কথাই তোমাকে বলেছি। সে মরেছে কি না, তুমিই অনুমান কর।

সুমিত্রা। সকলেই মত্ত?

প্রভু। পৌরজনের মধ্যে কে যে মদিরা-পানে বিরত থাকবে, তা ত বুঝতে পারছি না। থাকতে পারে এক জন।

সুমিত্রা। কে সে মহাত্মন্?

প্রভু। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না, নারী।

সুমিত্রা। রাজা?

প্রভু। জানি তাঁকে মনীষী, মহৎ, প্রজ্ঞাচক্ষু, কিন্তু আজ কি তিনি, আমি বলতে পারব না।

সুমিত্রা। আমারও এ অদ্ভুত উৎসব দেখতে কৌতূহল হচ্ছে।

প্রভু। মৃত্যুভয় দেখিয়ে তোমার পুত্রের কৌতূহল আমি নিরস্ত করেছিলুম। তুমি তার মা। তোমাকে আমি যেতেও বলব না, গেলে নিরস্তও করব না।

সুমিত্রা। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আপনি একা থাকতে দেবেন? বুঝতে পারছেন, আমি উভয়-সঙ্কটে পড়েছি?

প্রভু। থাকো—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

[প্রস্থান।

সুমিত্রা। তোমায় সকল কথা বলতে পারলুম না, বৃদ্ধ। কে সে এক জন, যার নাম তুমি আমার কাছে বলতে সাহস করলে না, তা'কে দেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। (কিয়দ্দূর গমন) কিন্তু—সমস্ত প্রমত্তের মধ্যে এক সেই অপ্রমত্তকে খুঁজে কি আমি বার করতে পারব—জীবনের সমস্ত আশঙ্কা সঙ্গে নিয়ে? দূর ছাই ভাবনা করা চললো না, আমাকেও যেতে হ'ল।

দৃশ্যান্তর

[উদয়ন প্রবেশ করিয়া অন্বেষণের ভাবে প্রস্থান করিলেন।

(নারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কেন চাও না পিছন পানে।
শুধু চাওয়া, চেয়ে চ'লে যাওয়া—
তাও কি কাতর দানে?
কথা ত কখন কইনি, কব না,
চাহিলে ফিরে নিকটে যাব না,
তখন যদি হে প্রেম আলাপনে ভুলাইতে এসো মনে।
স্থির শুন, ওহে মধু-বান্ধব, কথা তুলিব না কানে॥

[গীতান্তে নারীগণের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

(দেবসেনা বল্লম স্কন্ধে লইয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছিল)

দেব। উৎসবের প্রারম্ভটা কেমন ভালো লাগছে না। এক দিকে অপ্রমত্ত রাজকুমারী, অন্য দিকে বনভরা মাতাল। রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা, সে সুরাপান করবে না। মাতালদের চেষ্টা, তাকে পান করাবে, একটা যেন নূতন ধরণের যুদ্ধ রঙ্গমূর্ত্তি ধরবার উদ্যোগ করছে।

(দূরে একটা উল্লাস-কোলাহল শুনিয়া সে একবার উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল)

এ উল্লাস আর কারো নয়, ঐ দুষ্ট পুরোহিত-পুত্র আর তার মত্ত সঙ্গীদের। তারা ঐ রাজপুত্রটাকে নিয়ে আমোদ করছে। তাই ত, আমাদের সোনার রাজকুমারী ঐ পুরোহিতগুলোর কুচক্রে ঐ অপদার্থটার হাতে পড়বে? পড়বে কেন, পড়েছে বললেই হয়। কে রোধ করবে এই মরণের মত ছুটে আসা অনর্থকে? দূর ছাই, ও ভাবনায় আমার কি? প্রাণহীনা প্রেম-হীনা সৈনিকা আমি। আমি আমার প্রিয়তমের সঙ্গে একটু আলাপ করি।

(দেবসেনার গীত)

চেয়ো না মুখপানে হে চিরলুকানো সখা।
রয়ো না পথপাশে, দিও না আমারে দেখা॥
যদি বা কভু ভুলি তোমারে দেখে ফেলি,
নয়ন মুদে তুমি সুদূরে যেও চলি;
আমার এ বন-ঘরে রহিতে দিও মো'রে
তুমি হে যেমন আছ একা॥

(পশ্চাৎ হইতে উদয়ন প্রবেশ করিলেন এবং সন্তর্পণে দেবসেনার নিকটে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন। দেবসেনা ফিরিয়া উদয়নের মুখের পানে বিস্মিতার মত চাহিল)

উদ। আমাকে পথ ছেড়ে দেবে, না বল্লমে বিঁধবে?

দেব। (কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতার মত দাঁড়াইয়া) কে তুমি?

উদ। প্রশ্ন ক'র না, উত্তর দিতে পারব না। আমাকে পথ ছেড়ে দেবে, না বল্লমে বিঁধবে?

দেব। (কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া) পথ ছেড়ে দেবো।

উদ। তোমাকে নমস্কার, দেবি! বার বার নমস্কার!

(দেবসেনা বল্লম নিম্নমুখ করিয়া উদয়নকে প্রস্থানের পথ দিল। উদয়ন প্রস্থান করিল)

দেব। এ কি দেখলুম!

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

জয়শ্রী। এ কি দেখলুম, দেবসেনা?

দেব। তুমিও দেখলে?

জয়শ্রী। শবর-বেশী কে ও? (দেবসেনা নীরব রহিতে জয়শ্রীকে ইঙ্গিত করিল) করিস কি, ফেরা। নইলে মরবে যে।

দেব। মরবে কি, বল না মরেছে।

জয়শ্রী। উন্মত্তার মত এ কি বলছিস, ফেরা—ফেরা।

দেব। ফেরাতে হয়, তুমিই ফেরাও রাজকুমারি!

[জয়শ্রীর প্রস্থান।

হাঁ, হাঁ—অত দ্রুত নয়—ধীরে—ধীরে।

(দেবসেনার গীত)

চল স্থির ধীর-মন্থর গমনে,
সঙ্কিত ছায়া-শীত ওই বন-ভবনে—
গতি যেন কেহ না জানে!
ওই যে নদীর কূলে, ছায়াঘন তরুমূলে
বসন্ত খেলা খেলে নয়নে।
মুখরমধীর: ত্যজ মঞ্জীর,
ব্রজ বনভবন-গোপনে
নহি চঞ্চলচরণে, ললনে, গতি যেন কেহ না জানে।

[জয়শ্রীর গন্তব্য দিকে দেবসেনার প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া চণ্ডদেব ও মহিরঙ্গের প্রবেশ)

চণ্ড। তাই ত, কি নাম বললে তোমার?

মহি। এ দাসের নাম মহিরঙ্গ, প্রভু!

চণ্ড। তাই ত মহিরঙ্গ, তোমাকে যে আমি কোনও আশ্বাস দিতে পারলুম না! তোমার স্ত্রী যদি গণ্ডী পার হয়ে থাকে, যদি কোন দেবতা এসে তাকে রক্ষা করে, নচেৎ, তার জীবিত থাকবার কোনও সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

মহি। না প্রভু, আর আমার আক্ষেপ করবার উপায় নেই, যখন জানতে পারছি, বিধি অমান্য করলে আপনার কন্যার পর্য্যন্ত মুক্তি নেই।

চণ্ড। পৌরজন যদি তার বন্ধন চায়, তা'কে বন্ধন করতে হবে, যদি নির্ব্বাসন চায়, নির্ব্বাসিত করতে হবে। মৃত্যু চায়, দিতে হবে তাকে মৃত্যু। বিধি অমান্য করতে আমার সাহস নেই।

মহি। আক্ষেপ নেই, অন্য কোনও আর আক্ষেপ নেই ধর্ম্মাবতার! যদি সে ম'রে থাকে, তা হ'লে সে শান্তি পেয়েছে—যা এখনো আমি পাই নি। মনে হয়, আর আমি পাবও না। একমাত্র আক্ষেপ, মালবের রাজহস্তিচালকের স্ত্রী হয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় সে আগুনে পতঙ্গের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে।

চণ্ড। মালবের রাজহস্তি-চালক—কে? তুমি?

মহি। এই হতভাগা।

চণ্ড। এ দশা তোমার কি হেতু, মহিরঙ্গ?

মহি। আর জিজ্ঞাসা করবেন না প্রভু, সে অতি দুঃখের কাহিনী। অভাগীকে আমি যেতে মানা করেছিলুম। সে শুনলে না, আমার কষ্ট দেখে শুনলে না। আপনাকে দেখতে পেয়ে চরণে ধরবে ব'লে ছুটে গেল সে।

চণ্ড। আমার দুঃখের মাত্রা বাড়িও না। বল মহিরঙ্গ, বল, মালবের রাজ-হস্তি-চালক হয়ে তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?

মহি। এক দুর্ব্বৃত্ত মালবের যুবরাজ হয়েছে। তারই অত্যাচারে, প্রভু, আমার এই অবস্থা। তাকে আমি রাজ-হস্তীতে আরোহণ করতে দিই নি, এই অপরাধে—এই অপরাধে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। মালবের কোনও গৃহে আমরা আশ্রয় পাই নি!

চণ্ড। অপরাধ ত বটেই, মহিরঙ্গ। সে যখন যুবরাজ, রাজহস্তীতে আরোহণ করতে তার ত যথেষ্ট অধিকার আছে।

মহি। পাপিনি ধর্ম্মাবতার, পট্টমহাদেবীর পুত্র যার পৃষ্ঠে আরোহণ করবার একমাত্র যোগ্য, সে পাষণ্ড

দাসীপুত্রকে তার উপর বসতে দিতে পারি নি। দুর্ব্বৃত্ত আমাদেরই স্বজাতি এক নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে।

চণ্ড। সত্য বলছ, মহিরঙ্গ?

মহি। আর অধিক সত্য কি বলব ধর্ম্মাবতার, সে নারী আমারই এক জ্ঞাতি-ভগিনী। রাজা এক প্রকাণ্ড দিঘী করিয়েছিলেন। সেই সময়ে ওই নারী মাটী-বহা কাযে নিযুক্ত ছিল। রাজা তা'কে দেখে মত্ত হয়েছিলেন। ওই দুর্ব্বৃত্তই হচ্ছে সেই মত্ততার ফল। এখনও রাজা সেই নারীতে মত্ত। রাজ-অন্তঃপুরে সেই হয়ে আছে সকল নারীর প্রধান। পট্ট-মহাদেবীরও সেখানে আদর নাই।

চণ্ড। (উত্তেজিতভাবে) মহিরঙ্গ মহিরঙ্গ!

মহি। কি ধর্ম্মাবতার!

চণ্ড। তথাপি—তথাপি—তথাপি তথাপি—(বক্রভাবে দাঁড়াইলেন) কিছু বুঝতে পারছ, মহিরঙ্গ? পারছ না? আমাকেও মত্ত মনে ক'রে বিস্মিত নেত্রে দেখছ? তথাপি মহিরঙ্গ,আমি বিধি লঙ্ঘন করতে পারবো না। তোমার স্ত্রী আজ যখন গণ্ডী পার হয়েছে, তখন সে মরেছে। ভাল মহিরঙ্গ, তোমার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ যখন শুনবে, তখন তুমি কিরূপ ভাবে কাঁদবে?

মহি। ধর্ম্মাবতার! দাসকে এইবারে বিদায় দিন।

চণ্ড। দেখাও মহিরঙ্গ, একবার দেখাও। অবশ্যই তুমি কাঁদবে। বহুকালের সঙ্গিনী—জীবন দিলে তোমারই জন্য। দেখাও মহিরঙ্গ, দেখাও—কিরূপ ভাবে তুমি তার জন্য আক্ষেপ করবে? একটি বার দেখাও। পারবে না? দেখাতে পারবে না? কিন্তু মহিরঙ্গ, আমি তোমাকে দেখাতে পারি। পট্ট-মহাদেবীর শোকে কেমন আমি কেঁদেছিলুম। আমাকে কি মত্ত দেখছ, মহিরঙ্গ?

মহি। রাজা, রাজা! আমি দীন দাস, নীচজাতি—চরম দুঃখের তাপে আমার ভিতরটা পুড়ে গেছে—আমার দৃষ্টি-শক্তি লোপ পেয়েছে।

চণ্ড। মহিরঙ্গ, সেই পট্ট-মহাদেবীর শোক আজ আবার শতগুণে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু মহিরঙ্গ, বড়ই দুঃখের কথা, আজ আমি চোখের জল এক ফোঁটাও ফেলতে পারব না।

মহি। কেন রাজা?

চণ্ড। মহিরঙ্গ, সেই পট্টমহাদেবীর কন্যা—সুবর্ণ-প্রতিমা আমার জয়শ্রী—তাকে ধ'রে দিতে হবে তোমার ওই শূদ্রাণীর গর্ভজাত ওই চণ্ডালাধম দুর্ব্বৃত্তকে।

মহি। না—না। ওরূপ নিষ্ঠুর কথা আর মুখে আনবেন না, রাজা!

চণ্ড। উপায় নেই—কোনও উপায় নেই—আমি বিধি অমান্য করতে পারব না। দিতেই হবে মহিরঙ্গ, দিতেই হবে। আমি বিধি অমান্য করতে পারবো না।

মহি। দিতেই হবে? পট্ট-মহাদেবীর ওই সুবর্ণ-প্রতিমা কন্যা—ওই নীচকে—ওই পাষণ্ডকে—

চণ্ড। দিতেই হবে। আজ আমাদের এ জাতীয় উৎসব। সমস্ত জাতির—পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধের সমবেত চেষ্টায় বৎসরের এই দিনে আমাদের দেশ পরাধীন নাম বিলুপ্ত করেছিল! তাই আজ এখানে সকলের অবাধ আনন্দভোগে অধিকার। কেউ কারও আনন্দে বাধা দিতে পারবে না। দিলে তার অপরাধ হবে। সে অপরাধের বিচার আছে, মহিরঙ্গ। উৎসবশেষে মণ্ডপে যখন সকলে একত্র হবে, তখন হবে সেই বিচার। এই সময় পৌরজনরা চিরাচরিত প্রথাগত রাজার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে। সর্ব্ববাদিসম্মত হ'লে সে প্রার্থনা পূরণ করতে রাজা বাধ্য।

মহি। তারা কি প্রার্থনা করবে ওই পাপিষ্ঠের জন্য আপনার ওই কন্যা?

চণ্ড। ও কি বৃদ্ধ, কোমর বাঁধছ যে! কঙ্কালের ভিতর থেকে দাবানল জ্ব'লে উঠলো না কি?

মহি। তোমাদের বিধি তোমাদেরই কাছে থাক, রাজা। আমি সে নিষ্ঠুর কথা শুনতে পারব না।

চণ্ড। দাঁড়াও -দাঁড়াও—কোথায় যাচ্ছ?

মহি। তোমাদের বিধি, আমার অঙ্কুশ। তোমাদের বিধি এক দিকে, আর হাতীর মাথা চূর্ণ করা আমার এই অঙ্কুশ আর এক দিকে।

[মহিরঙ্গের প্রস্থান।

(দেবসেনার প্রবেশ)

চণ্ড। দেবসেনা—দেবসেনা! ধর্, ধর্ ওই বৃদ্ধকে। ও আবার আত্মহত্যা করতে ছুটলো।

দেব। ও মরুক। আশ্চর্য্য রাজা, আশ্চর্য্য !

চণ্ড। কি আশ্চর্য্য রে ?

দেব। এক রাজপুত্র।

চণ্ড। কোথায় রে, কোথায় রে, দেবসেনা ?

দেব। একটু পূর্ব্বে গণ্ডী পার হয়ে এই দিকে সে চ'লে গেল।

চণ্ড। যদি দেখতে পেলি, তখন তাকে বল্লমে না বিঁধে আমাকে সংবাদ দিলি কেন, অভাগী নারী ?

দেব। ভুল হয়ে গেল, রাজা।

চণ্ড। প্রধানা কি বলেছে, শুনেছ ?

দেব। শুনেছি বই কি রাজা, এই ভুলটুকুর জন্য আমাকে বল্লমে বিঁধে মরতে হবে।

চণ্ড। নিশ্চয় হবে দেবসেনা, আমি বিধি অমান্য করতে পারব না।

দেব। এখনই কি বিঁধবে, রাজা ?

চণ্ড। উচিত—উচিত দেবসেনা ! সে যদি আমার বুকে বল্লম বিঁধতো ?

দেব। ভুল নয়—প্রচণ্ড অপরাধ আমার, রাজা। আমাকে এই মুহূর্ত্তেই বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলো।

চণ্ড। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র !

দেব। কিসের ষড়যন্ত্র প্রভু ?

চণ্ড। আমার বিনাশের। আমি তোমাকে মেরে ফেলি, আর সে আমাকে রক্ষিশূন্য দেখে মেরে ফেলুক। পরে—পরে—বিচারে। আমি বিধি অমান্য করতে পারব না। নে, আমার হাত ধর।

দেব। তাই ত, কেমন ক'রে সে আপনাকে মেরে ফেলবে রাজা, তার হাতে ত কিছু নেই !

চণ্ড। কিছু নেই ?

দেব। তার দুই হাতে শুধু সুন্দর দশটি অঙ্গুলি। বল্লম কাঁধে আমি প্রহরায় নিযুক্ত ছিলুম। কোথা থেকে কেমন ক'রে পিছন দিক থেকে এসে সে আমার পিঠে হাত দিলে। চমকে উঠে যেমন আমি তার দিকে মুখ ফেরালুম, সে আমাকে বললে - হাসতে হাসতে রাজা—'আমাকে বল্লমে বিঁধবে, না পথ ছেড়ে দেবে ?' আমি কি উত্তর দেবো, ঠিক না করতে পেরে বললুম, পথ ছেড়ে দেবো। বলেই যেমন তাকে আমি পথ ছেড়ে দিলুম, অমনি আমাকে সে দেবী-সম্বোধনে নমস্কার ক'রে মাতঙ্গ-গতিতে চ'লে গেল।

চণ্ড। কোথায় গেল ?

দেব। তা বলতে পারব না, রাজা। তুমি আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটলেও না।

চণ্ড। কেমন ক'রে বুঝলি, সে রাজপুত্র ?

দেব। তার মতন আর একটিও যে এখানে নেই রাজা—এত রূপ তার ! কিন্তু—

চণ্ড। কিন্তু কি ? কিন্তু ব'লে নীরব হলি কেন ?

দেব। বেশ তার শবরের।

চণ্ড। (সক্রোধে) তোকে—তোকে—প্রাণ দিতে হবে, অভাগী ! বিধি আমি অমান্য করতে পারব না।

দেব। এখনি যে নিতে বললুম, রাজা।

চণ্ড। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত। পুরুষ-রক্ষিগণের প্রবেশ) ওরে, এক শবরবেশী যুবক গণ্ডী পার হয়ে—কোন্ দিকে গেল, দেবসেনা ?

দেব। দিক্ নির্ণয় ওরাই করবে রাজা ! শতগুলো পুরুষ, আর সবেমাত্র চারটে দিক্।

চণ্ড। অনুসন্ধান কর—অনুসন্ধান কর। এই বনের মধ্যে আছে। সে নিরস্ত্র। সুতরাং তাকে বন্দী করতে তোদের কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করতে হবে না। যেখানে যে অবস্থায় তাকে দেখতে পাবি, সেই অবস্থাতেই ধ'রে আমার কাছে উপস্থিত করবি। (রক্ষিগণ প্রস্থানোন্মুখ হইল) কিন্তু সাবধান, এক জন নিরস্ত্র সদম্ভে গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ ক'রে যদি তোমাদের মত অস্ত্রধারীর হাত এড়িয়ে চ'লে যায়—তা হ'লে বুঝেছ ?

দেব। তোমাদের সব বল্লমে বিঁধে মরতে হবে।

চণ্ড। হাঁ—প্রত্যেককে—বল্লমে বিঁধে মরতে হবে।

দেব। রাজা বিধি-লঙ্ঘন করতে পারবে না।

চণ্ড। না—কিছুতেই না। বিধি লঙ্ঘন করতে পারব না।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

দেব। কিন্তু তুমি এ কি করলে, রাজা ?

চণ্ড। কি করলুম, দেবসেনা ?

দেব। এই যে বিধি লঙ্ঘন করলে !

চণ্ড। কেমন ক'রে ?

দেব। তুমিও ত ওদের বলতে পারলে না, যেখানে যে অবস্থায় তাকে দেখতে পাবি, বল্লমে বিঁধে মেরে ফেলবি। তাকে অক্ষত-শরীরে ধ'রে আনতে বললে কেন ?

চণ্ড। তাই ত রে, আমিও যে ভুল ক'রে ফেললুম! এখন বুঝতে পারছি, আমি মত্ত। দেবসেনা! ওই বল্লম দিয়ে আমার বুকটাকে বিঁধে দিতে পারিস্ ?

দেব। তা পারবো না কেন রাজা—নারী হয়ে যখন মানুষমারা বিদ্যা অভ্যাস করেছি, নারীর আকার নিয়ে যখন দানবী হয়েছি! কিন্তু তোমাকে বিঁধলে আমার বিচার কে করবে, রাজা ? বিশেষতঃ তোমার দেহ-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে, তোমাকে বিনাশ ক'রে অপরাধের উপর অপরাধ কেন করব ?

চণ্ড। এ ভুল কেন করলুম, বলতে পারিস্, দেবসেনা ?

দেব। পারি, কিন্তু ব'লে আমার কোনও লাভ নেই।

চণ্ড। এ ভুলের যদি সংশোধন করতে না পারি, তা হ'লে আর ত আমার রাজদণ্ড হাতে করা চলবে না!

দেব। ভুলের সংশোধন মানে কি ? তাকে যদি ওরা ধ'রে আনতে পারে, তুমি কি তার হত্যার বিধান করবে ?—সত্য রাজা ?

চণ্ড। প্রশ্ন করিস্‌নি, প্রশ্ন করিস্‌নি—হয় চণ্ডদেবের রাজত্বের শেষ, নয় এই প্রথার বিলোপ।—মদিরা—মদিরা—নিয়ে আয় দেবসেনা, মদিরা।

দেব। এখনও আপনি যথেষ্ট মত্ত--আর পান করবেন না।

চণ্ড। না—নাঃ! মদিরা। ভুলের সংশোধন—চাই মদিরা। হয় চণ্ডদেবের রাজত্বের অবসান, নয় অবসান ওই প্রথার। 'প্রথা কি বর্ব্বর, কি নিষ্ঠুর!' উঠছে কাণে এখনও ঝঙ্কার! কিন্তু মন, আজ উৎসব। জাতির স্বাধীনতাস্মরণে উৎসব। মদিরা—মদিরা।

দৃশ্যান্তর

(উল্লাস করিতে করিতে পুরবাসিগণের প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া প্রস্থান)

(রঙ্গিণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

এরা সব আছি ভালোর দল।
এরা ভোজন জানে শয়ন জানে জানে কোলাহল ॥
তবে সবাই জানে দিতে উপদেশ,
এইটে কর, ওইটে কর, নইলে গেল দেশ,
কিন্তু, কার্য্যকালে হস্ত-গালে এক সুরে কয় কর্ম্মফল।
সে যার ঘরের নিভায় আগুন ফেলে অজস্র অশ্রুজল ॥

দৃশ্যান্তর

(অন্বেষণের ভাবে উদয়ন প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই নেপথ্যে অনুচ্চকণ্ঠে শব্দ উঠিল, ওরে ও নির্ব্বোধ শবর! উদয়ন মুখ ফিরাইল না। জয়শ্রী প্রবেশ করিয়াই বলিল, ওরে ও হতভাগ্য, যাস্‌নি ও দিকে। ফিরে যা, ফিরে যা। তথাপি উদয়ন মুখ ফিরাইল না। তখন জয়শ্রী সত্বর তার সমীপস্থ হইয়া স্কন্ধে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ অনুচ্চস্বরে বলিল, ফিরে আয় বর্ব্বর, মৃত্যুমুখে চলেছিস! চমকিতের মত উদয়ন মুখ ফিরাইতেই বিস্মিত ও অপ্রতিভভাবে জয়শ্রী বলিল, এ দিকে কোথায় চলেছ ? উদয়নও প্রথমে কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। মুগ্ধের মত একবার জয়শ্রীর মুখের পানে চাহিয়া আপনার পরিচ্ছদের যথাসম্ভব পারিপাট্য করিয়া লইলেন। ইত্যবসরে জয়শ্রীও তাঁহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল)

উদ। এই দিকে কে এক জন আর্ত্তনাদ করলে।

জয়শ্রী। তুমি কি তা'কে রক্ষা করতে এসেছ ?

উদ। সত্যই তা হ'লে এক জন বিপদে পড়েছে ?

জয়শ্রী। তুমি ফেরো—এই স্থান থেকেই—এখনি।

উদ। কেন ?

জয়শ্রী। সে মরেছে, আবার তুমি মরবে কেন ?

উদ। সে মরেছে ?

জয়শ্রী। তোমার সঙ্গে কথা কইবার অবসর নেই। পালাও—পালাও—এখনি এ স্থান ত্যাগ কর!

উদ। সে মরেছে ? তুমি স্বচক্ষে দেখেছ ?

জয়শ্রী। যদি না ম'রে থাকে, এখনি মরবে। এমন ব্যক্তি এখানে কেউ নেই যে, তার জীবন রক্ষা করতে পারে। যদি তোমাকেও দেখতে পায় –

উদ। আমাকেও মেরে ফেলবে ?

জয়শ্রী। নিশ্চয়—দেখামাত্র। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ফিরে যাও—

উদ। তুমি ইচ্ছা কর, ফিরে যাও। আমার মৃত্যুর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

জয়শ্রী। ওরে ও মত্ত, মতিহীন ! ওরে ও বর্ব্বর শবর ! আজ এই উৎসবের দিনে কেন অপঘাত-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াতে এলি ? ফের্—(ছুটিয়া উদয়নের হস্ত ধরিল) আমি তোকে কিছুতেই—(উদয়ন মুখ ফিরাইল) আমি—আমি—তোমাকে বুঝতে পারছি না। হাতজোড় করছি—ফেরো। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তোমাকে আমি যেতে দেবো না। কিছুতেই দেবো না। আবার হাতজোড় করছি—ফেরো।

উদ। আমার কি অপরাধে এরা আমাকে মেরে ফেলবে ?

জয়শ্রী। যে অপরাধ সে করেছে –তুমিও নিষিদ্ধ স্থানে পা দিয়েছ। গণ্ডী পার হয়ে এখানে আজ কোনও বিদেশীর আসবার অধিকার নাই।

উদ। এ দেশের রাজা এত নিষ্ঠুর ?

জয়শ্রী। রাজা নিষ্ঠুর ন'ন, এ উৎসবের বিধি নিষ্ঠুর। রাজা সেই বিধিকে শাস্ত্র-শাসনের মত মান্য করেন। আর দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে না—ফিরে যাও। কারও দৃষ্টিতে পড়তে না পড়তে আবার গণ্ডীপারে চ'লে যাও। —কে যেন আসছে—সত্যই আসছে—পালাও, পালাও। এই পথ আমি অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি -

(নেপথ্যে সুষেণা উচ্চহাস্যে বলিল, পেয়েছি - পেয়েছি— দেখতে পেয়েছি)

যাঃ ! আত্মহত্যা করলে হতভাগ্য ! এখনও—এখনও—এই পথ। যাবে না ?

উদ। না ! তোমার দয়া আমার ভালো লাগছে না। এ রাজ্যের প্রজা হয়ে তুমি বিধি-লঙ্ঘন করতে এসেছ কেন ? আমি বহু পূর্ব্বে গণ্ডী পার হয়েছি।

(নেপথ্যে সুষেণা বলিল, দেখতে যখন পেয়েছি, তখন আর কোথায় লুকিয়ে বাঁচবি অভাগী ?)

উদ। ওই—ওই ! ওরই জন্য নারী ! বেঁচে আছে—এখনও বেঁচে আছে।

(উদয়ন প্রস্থান করিতেছিলেন। জয়শ্রী তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া বলিল, না না। নেপথ্যে এই সময় যশমা বলিল, ওগো কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারলে না ? শুনিয়া উদয়ন জয়শ্রীর হস্ত হইতে বস্ত্রপ্রান্ত উন্মুক্ত করিতে করিতে বলিলেন, ধিক্ তোমার দুর্ব্বল করুণাকে। একটা স্ত্রীলোক যে অপরাধে মরছে, ঠিক সেই অপরাধ ক'রে পুরুষ হয়ে আমি পালিয়ে যাব ? বলিয়াই বস্ত্রপ্রান্ত মুক্ত করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন)

জয়শ্রী। (কিছুক্ষণ উদয়নের গমন-পথের দিকে চাহিয়া) ধিক্ আমার করুণাকে নয় বিদেশী,ধিক্ দেওয়া তোমার উচিত ছিল আমার মত্ততাকে। আজ এ উৎসবক্ষেত্রে অন্য সকলে পান ক'রে মত্ত। আমি পান না ক'রে তাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রমত্ত। (ক্ষণেকের জন্য পুনর্ব্বার উদয়নের গমন-পথের দিকে চাহিয়া, অতি চিন্তিতভাবে মুখ ফিরাইল) আমি মত্ত হব—মত্ত হব ! আকণ্ঠ সুরাপানে আজ আমার মস্তিষ্ক ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দেবো !

(জয়শ্রী অন্য পথে কিয়দ্দূর গমন করিল। সহসা ফিরিয়া বলিল—না - না—এখনি কেন ? মত্তই যদি হ'তে হয়, আগে দেখবো ওই অদ্ভুত প্রহেলিকাময়ের পরিণাম –তার পর—তার পর। বলিয়া উদয়নের অবলম্বিত পথের দিকে দ্রুত প্রস্থান করিল)

দৃশ্যান্তর

রঙ্গিনীগণ

(গীত)

কুঞ্জ-তীরে শুনি মধুর নূপুরধ্বনি—
কোকিল রণ-গীতি গায়।
কুসুম-শয়নে ওই বেজে ওঠে কিঙ্কিণী,
তিমিরে লাজ লুকায় ॥
কুতূহলী সৈকতে কল কল হিল্লোল,
কুসুম পরশে দোলে কায়।
কাণে কাণে মৃদু মলয়জ বাহিনী
কত কি যে কাহিনী শুনায় !
চ'লে আয়, চ'লে আয়, চ'লে আয়, চ'লে আয় !
অবসাদে শয়নে তারা স্বপনে—
নিশ্বাস-পবনে ঘুম না তা'দের ভেঙ্গে যায় !

দৃশ্যান্তর

(কণ্টক-গুল্মকুঞ্জের ভিতরে যশমা ও গুল্মের বাহিরে বল্লম উঠাইয়া সুষেণা)

সুষেণা। তুই আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছিস্—বড় ছুটিয়েছিস্—বেরিয়ে আয়।

যশমা। ওগো, তোমার চরণে ধরি, আমাকে মেরো না।

সুষেণা। বাইরে এসে চরণে ধর্। ওখানে কি আমার চরণ আছে?

যশমা। ওগো, আমি ক্ষুধার জ্বালায় গণ্ডী পার হয়েছি।

সুষেণা। বেশ করেছিস্। বেরিয়ে আয়, তোর সকল ক্ষুধা মিটিয়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে আয়। শুনছিস্ না? খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবো বলছি। তবে রে অভাগী!

যশমা। মেরে ফেলো না· মেরে ফেলো না।

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। দাঁড়াও।

(চমৎকৃতার মত সুষেণা মুখ ফিরাইল। কুঞ্জের ভিতর হইতে যশমা বলিল, ওগো দেবতা, আমাকে রক্ষা কর। অঙ্গুলিসঙ্কেতে উদয়ন সুষেণাকে স্থির থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং নিকটে আসিয়া সুষেণার অব্যবহিত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যশমাকে বলিলেন, কাঁটাবন ত্যাগ করে' বাইরে এস। যশমা কাঁপিতে কাঁপিতে কুঞ্জের বাহিরে আসিল।)

যাও মা, আর তোমার কোনও ভয় নেই।

(শুনিয়াই যশমা মূর্চ্ছিতাবৎ ভূপতিতা হইল। তাহাকে উঠাইতে উদয়ন সুষেণাকে ইঙ্গিত করিলেন। বল্লম ভূমিতে রাখিয়া সুষেণা যশমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইল)

কোনও ভয় নেই, যাও। যাও এই পথ ধ'রে। এই পথের শেষে দেখতে পাবে আর এক জন নারী, এইরূপই সুন্দর—কিন্তু তার বেশ স্বতন্ত্র। তা'র কাছে উপস্থিত হলেই সে তোমাকে প্রস্থানের নিরাপদ পথ দেখিয়ে দেবে।

যশমা। তুমি পৃথিবীর রাজা হও।

[বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে যশমা প্রস্থান করিল।

উদ। নাও, এইবারে বল্লম তোলো। ওর পরিবর্ত্তে আমাকে বিঁধে মেরে ফেল। ও নারী যে অপরাধে প্রাণ দিচ্ছিল, আমিও সেই অপরাধ করেছি। তোমাদের গণ্ডী পার হয়েছি।

সুষেণা। তুমি কে?

উদ। আমার পরিচয়ে তোমার কোনও প্রয়োজন আছে মনে করি না।

সুষেণা। কেন তুমি ওকে মুক্তি দিলে?

উদ। মুক্তি আমি দিলুম কৈ নারী? মুক্তি দিলে তুমি। দিলে তার আদেশে, আবর্জ্জনার ভিতর থেকে ফুটে ওঠা সৌরভময় ফুলের মত যে এই স্থানের সমস্ত নিষ্ঠুরতার উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করছে। তার নাম নারীত্ব। নাও এই বারে বল্লমে বিঁধে আমাকে মেরে ফেল। (বল্লম তুলিয়া সুষেণার সম্মুখে ধরিলেন) ওকে দেখে মনে হ'ল, যেন কত কালের খেতে না পাওয়া বৃদ্ধা। ওকে হত্যা ক'রে তোমার এ বীরবেশের কি গৌরব হ'ত? এইটাকে বিঁধে ফেলো—তোমার গৌরব লোকে দেখবে (অঙ্গুলি দ্বারা নিজের বক্ষ স্পর্শ) এখানে।

সুষেণা। তুমি যাও।

উদ। আমাকে বিঁধবে না?

সুষেণা। না।

উদ। বিঁধতে পারবে না? (সুষেণা উত্তর না দিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি দিয়া দাঁড়াইল) ওই দরিদ্রা বৃদ্ধাকে—আবার যদি ওকে দেখতে পাও?

সুষেণা। আর আমাকে বিদ্রূপ ক'র না। আর বুঝি একটি ছোট কীটকেও বিঁধতে পারব না।

উদ। এর উপর আর আমার উত্তর নাই। শুধু তোমাকে দিতে পারি, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। তা হ'লে এটা?

সুষেণা। ফেলে দাও।

উদ। (বল্লম দূরে নিক্ষেপ করিয়া) এই বারে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

সুষেণা। তোমার ইচ্ছা।

উদ। আমি কৃতকার্য্য হয়েছি—সুখী হয়েছি। দেবি! তোমাকে নমস্কার।

(উদয়ন কিয়দ্দূর গমন করিতেই সুষেণা মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিল এবং উপবিষ্ট হইয়া জানুদ্বয়ে মস্তক আবৃত করিল। চলিতে চলিতে উদয়ন ফিরিলেন)

ভাল কথা, তুমি যে রাজার আদেশ পালন করতে এসে অকৃতকার্য্য হলে, তোমার কি হবে? ও কি! তুমি কাঁদছ?

সুষেণা। (মাথা না তুলিয়াই বলিল) তুমি চ'লে যাও।

উদ। তুমি কাঁদছ।

সুষেণা। (মাথা তুলিয়া সস্মিত মুখে বলিল) কাঁদবো কেন? কাঁদতে কি আমরা জানি? (সুষেণা পুনর্ব্বার মস্তক আবৃত করিয়া বসিল)

উদ। তোমার কি হবে?

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

জয়শ্রী। তোমার তা জেনে কি হবে?

(জয়শ্রীকে দেখিয়াই উদয়ন প্রথম মুগ্ধের মত নির্ব্বাক্, কেবল তাহার আগমন দেখিতে লাগিল। জয়শ্রী সুষেণার সমীপস্থ হইল। তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিল, ওঠ সুষেণা, মুখ লুকিয়ে রাখতে হবে, এমন কোনও কায করিস্‌নি তুই। তোর যা দশা, আমারও তাই; সুতরাং আমাদের পরস্পরের মুখ দেখা-দেখিতে আপত্তি কি? ওঠ।)

উদ। আমার মনে হচ্ছে, রাজা ওকে জীবিত রাখবে না।

জয়শ্রী। নিশ্চয় রাখবে না!

উদ। নিশ্চয় রাখবে না?

জয়শ্রী। শুধু কি ওকে! তোমার জন্য আজ কত লোকের জীবন বিপন্ন হ'ল, তা জান? বন্য সৌন্দর্য্য দেখিয়ে একটা যুবতীকে মুগ্ধ ও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ক'রে তুমি তোমার কারুণিকতার গর্ব্ব করতে পার, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর করুণাকে আমার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে অভাগী সমস্ত বিধান জেনে, এমন কি, তার স্বামীর আদেশ অমান্য ক'রে গণ্ডী পার হয়েছিল। তার মৃত্যুর জন্য ধর্ম্মতঃ কারও দুঃখ করবার কিছু ছিল না। কিন্তু তার জীবনের পরিবর্ত্তে, হায়, কত লোককেই যে প্রাণ দিতে হবে! ওঠ সুষেণা, ওঠ। নিজের প্রচ্ছন্ন নারীত্বকে অবজ্ঞা ক'রে রাজার সম্মুখে তখন দম্ভ দেখিয়ে নিজেই যে মৃত্যুকে আবাহন করেছিলি! এখন তাকে বরণ করতে ভয়ে মাথা গুঁজে বসলি না কি?

সুষেণা। (মাথা তুলিয়া) না, না! আনন্দে! আজ আমার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হবে।

জয়শ্রী। তবে আর বিলম্ব করছিস কেন? উঠে আয়। তোর যদি মৃত্যু হয়, অগ্রে হবে আমার। আমিও যে বিধি অমান্য করেছি, সুষেণা!

সুষেণা। (উঠিয়া) চল।

জয়শ্রী। চল্—আমার জীবন তোর চেয়েও অবসন্ন।

(উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই উদয়ন ডাকিল, এক বার তুমি ফের ত! জয়শ্রী মুখ ফিরাইয়া বলিল, কে?)

উদ। তুমি। এক বার ফেরো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

জয়শ্রী। (সমীপস্থ হইয়া) বল।

উদ। সেই বৃদ্ধাকে আমি তোমারই আশ্রয়ে পাঠিয়েছিলুম।

জয়শ্রী। তার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সে নিরাপদ।

উদ। যাও, আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করবার কিছু নেই।

[উদয়নের প্রস্থান।

সুষেণা। ও দিকে আর কি দেখছ রাজকুমারি, চ'লে এস।

জয়শ্রী। কি এ সুষেণা?

সুষেণা। কি, তা কেমন ক'রে বল্‌ব, একান্ত বোধশক্তিহীন নারী আমি। কেবলমাত্র বলতে পারি, আশ্চর্য্য!

জয়শ্রী। আশ্চর্য্য!

(দুই জনে কিছু দূর চলিল। অগ্রে সুষেণা, পশ্চাতে জয়শ্রী। চলিতে চলিতে জয়শ্রী ডাকিল, সুষেণা!)

সুষেণা। কি?

জয়শ্রী। তুই মৃত্যুকে আহ্বান করেছিস্। আমি ত করিনি, সুষেণা! আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু জাতির মত্ততা আমাকে বাঁচতে দিচ্ছে না। যেমনই আমি তোর সঙ্গে ফিরবো, অমনই তারা আবার আমার মুখের কাছে মদিরাপাত্র তুলে ধরবে।

সুষেণা। তা ধরবে।

জয়শ্রী। তা হ’লে, সুষেণা ?

সুষেণা। কি বল।

জয়শ্রী। চায় তারা আমাকে মত্ত করতে। করেছে তারা ষড়যন্ত্র। দিতে চায় তারা আমাকে এমন এক নীচের হাতে, যার নাম মুখে আনতেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে। তারা জানে, আমার অপ্রমত্ত অবস্থায় কিছুতেই তাদের কার্য্যসিদ্ধি হবে না।

সুষেণা। তুমি কি করতে চাও ?

জয়শ্রী। আমি পালাতে চাই।

সুষেণা। ওই শবরের সঙ্গে ?

জয়শ্রী। ও কি শবর ?

সুষেণা। এই যে দেখছি, তুমিও মৃত্যুকে আবাহন করছ, রাজকুমারি ! সত্যই যদি ও নীচ শবর হয় ?

জয়শ্রী। তবে কি মত্ত হব ?

সুষেণা। হবে কি, পান না ক’রে এখনই তুমি মত্ত হয়েছ। (জয়শ্রী হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইল) চ’লে এস, আমি আর বিলম্ব করতে পারছি না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছি। তবে তুমি থাক, আমি চ’লে যাই।

[জয়শ্রীকে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিল।

জয়শ্রী। সত্যই ত, যদি ও নীচ শবর হয় ?—আমি মত্ত হব—মত্ত হব। মত্ত হব ? মত্ত ত হয়েছি ! আমার অপেক্ষা মত্ত—কই ? কে ? কোথায় ? ঐ সব মদ-বিহ্বলা ? এ মত্ততা তাদের মস্তিষ্কেও ত প্রবেশ করেনি ! ঐ—ঐ—এখনও দেখতে পাচ্ছি ! এইবারে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে চলেছে। কি সুন্দর ওর পদক্ষেপ—কি সুন্দর বঙ্কিম ওর গ্রীবা ! দেখি না ! দেখতে দোষ কি ?

উদয়নের গন্তব্যপথের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই নেপথ্য হইতে প্রভুগুপ্ত ডাকিলেন, জয়শ্রী ! সলজ্জভাবে জয়শ্রী দুই পদ পিছাইয়া মুখ ফিরাইতেই প্রভুগুপ্ত প্রবেশ করিলেন)

প্রভু। আমি গণ্ডী পার হ’তে ইচ্ছা করি না। এই দিকে এসো।

(জয়শ্রী নিকটে আসিতেই প্রভুগুপ্ত হস্তসঙ্কেতে তাহাকে ভিন্ন দিকে যাইতে আদেশ করিলেন)

জয়শ্রী। চৈতন্য ফিরেছে, আর ও দিকে যাব না, আচার্য্য।

প্রভু। হ’তে পারে, ঐ যুবক কোনও মহিমান্বিত পুরুষ, হ’তে পারে ও সর্ব্বপ্রকারে তোমার মত রাজকন্যার পূজার যোগ্য, কিন্তু ওর ঐ নীচবেশ ওকে তোমার নিকট হ’তে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেছে।

জয়শ্রী। এই আমি ফিরে যাচ্ছি, আচার্য্য।

প্রভু। ফিরে যাও। আজ এই বনের মধ্যে একমাত্র অপ্রমত্ত তুমি। সাবধান মা, ঐ সব পুরবাসিনীদের মত্ততা তোমার অপ্রমত্ততাকে যেন ধিক্কার দিয়ে চ’লে না যায়। তোমারও মহিমান্বিত পিতা। দেখো, তোমার আজ কোনও ভুলে তাঁর উচ্চশির যেন ভূলুণ্ঠিত না হয়।

জয়শ্রী। চৈতন্য ফিরেছে, আচার্য্য।

(জয়শ্রী প্রস্থান করিতে করিতে সহসা উদয়নের প্রস্থানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, আচার্য্য !)

প্রভু। দেখতে পেয়েছি জয়শ্রী, যাও, একটু দ্রুত—দ্রুত।

[জয়শ্রীর প্রস্থান।

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। আর একটা কথা।—ও ! তুমি ? তারা চ’লে গেছে ?

প্রভু। গেছে।

উদ। কোন্ দিকে, কত দূর গেল, বৃদ্ধ ?

প্রভু। তাদের তোমার কি প্রয়োজন ?

উদ। তাদের মধ্যে এক জনকে প্রয়োজন, যে ছিল সেই বল্লমধরা মেয়েটার সঙ্গে।

প্রভু। কিছু তোমার বলবার থাকে, আমাকে বলতে পার।

উদ। তুমি বলতে পারবে ?

প্রভু। কাকে ?

উদ। এ দেশের রাজাকে ?

প্রভু। কখন্ ?

উদ। এখনি—তুমি কি শোননি ওদের মুখে, আমার জন্য আজ বহু নিরীহের প্রাণ যাবে—পুরুষ, নারী ?

প্রভু। কি বলতে হবে ?

উদ। আমি ফিরে আসবো—এখনি। একবারমাত্র কেবল আমার মায়ের সঙ্গে দেখা—আর তাঁর অনুমতি। রাজাকে বলতে পারবে? আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে যেন কারও প্রাণহানি না করে—পারবে?

প্রভু। (নেপথ্যাভিমুখে) একবার ফিরে এসো ত—একবার ফিরে এসো—রাজকুমারি!

উদ। ও রাজকুমারী?

প্রভু। (ইঙ্গিতে উদয়নকে নিস্তব্ধ করিয়া) এসো—কোনও শঙ্কা নেই।

(জয়শ্রীর প্রবেশ)

উদ। রাজকুমারী?

(বিস্মিত-নেত্রে জয়শ্রী প্রভুগুপ্তের
মুখের দিকে চাহিল)

প্রভু। কোনও উত্তর না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমাকে তোমার পরিচয় প্রকাশ করতে হয়েছে। এ শবর তোমাকে আবার কি বলতে চায়।

উদ। ঐ যা বলেছি, বৃদ্ধ, তোমাকে—জিজ্ঞাসা কর।

প্রভু। তোমার পিতাকে বলতে হবে, এই যুবকের ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অপরাধের বিচারে কারও যেন তিনি প্রাণহানি না করেন।

উদ। হাঁ, ঐ কথা।

জয়শ্রী। এ কথা বলার মূল্য কি, আচার্য্য?

উদ। মূল্য আছে। তুমি বলতে পারবে? পারবে না? অতি তুচ্ছ অপরাধে কতকগুলো নিরীহের প্রাণ যাবে?

প্রভু। যদি যায়, রক্ষা করতে পার কি তুমি?

উদ। তুমি বল, রাজকুমারি!

জয়শ্রী। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে ও নারীর প্রাণদণ্ড হবে—নিশ্চয়। কেউ রোধ করতে পারবে না।

উদ। তুমি পার, রাজকুমারি!
(জয়শ্রী মুখ অবনত করিয়া চোখে অঞ্চল দিল)
কাঁদবার এ কথা নয়।

প্রভু। প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। তুমি এইবারে চ'লে যাও, রাজকুমারি!

উদ। তুমি চুপ কর, বৃদ্ধ। তুমি—একমাত্র তুমি এই অনর্থ রোধ করতে পার।

জয়শ্রী। কি রকম ক'রে, আচার্য্য?

উদ। শুধু তাই নয়, তুমি ইচ্ছা করলে এই নীচ নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ করতে পার—চিরদিনের জন্য।

জয়শ্রী। কি রকম ক'রে, কি রকম ক'রে, আচার্য্য?

উদ। আমি বলছি। তোমার আচার্য্য কি বলবে? শোনো, তোমার পরদুঃখকাতরতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু শুধু পরদুঃখে কাতর হ'লে কি হবে? তোমার ও চোখের জলের কোনও মূল্য নাই, যদি পরদুঃখ দূর করবার শক্তি ও সাহস তোমার না থাকে। থাকে, উত্তর দাও। না থাকে, চ'লে যাও। তোমার সেই অভাগীর মৃত্যুর জন্য আমার আর কোনও আক্ষেপ থাকবে না। তার সঙ্গে আরও শত অভাগ্যের মৃত্যুতেও আমার আক্ষেপ থাকবে না।
(জয়শ্রী কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিতার মত দাঁড়াইল)
আমি বিলম্ব করতে পারব না, উত্তর দাও। আমার মা'কে আমি গভীর অরণ্যে একা বসিয়ে চ'লে এসেছি।

জয়শ্রী। এই হীন বর্ব্বর প্রথার উচ্ছেদ হবে?

উদ। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো?

প্রভু। কে তুমি?

উদ। বল, রাজকুমারি!

জয়শ্রী। পারি।

উদ। সাহস আছে?

জয়শ্রী। আছে।

উদ। তা হ'লে আমার অনুগমন কর।

প্রভু। না না, চ'লে যাও, চ'লে যাও, এখনি—পিতৃসমীপে, রাজকুমারি!

উদ। রাজকুমারি! (জয়শ্রী উত্তর দিল না) আমি আর বিলম্ব করতে পারব না। চ'লে যেতে ইচ্ছা কর, আমার কোনও আপত্তি নেই। সমস্ত প্রমত্তের মধ্যে আছ এ বনের মধ্যে এখনো অপ্রমত্ত তুমি। দেখে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। ফিরে যেতে চাও, চ'লে যাও। কিন্তু সাবধান, যেন কোনও মতে সুরাপাত্র মুখে তুলো না। তুললে, কোনও মর্য্যাদাবান্

শক্তিমান্ রাজা তোমাকে, পট্টমহাদেবীর আসন দেওয়া দূরে থাক্, দাসীরূপেও তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেবে না।

প্রভু। কে আপনি ছদ্মবেশী মহাভাগ?

উদ। বল রাজকুমারি, চ'লে যাবে, না আমার অনুগমন করবে?

জয়শ্রী। অনুগমন করব।

উদ। তোমার কর গ্রহণ করতে পারি?

[জয়শ্রী হস্ত প্রসারিত করিল। উদয়ন তাহার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মণ্ডপ ও চতুর্দ্দিকস্থ বনাংশ

রঙ্গিণীগণ

(গীত)

পদ্মরাণী ওই যে গো পলায়।
ভোমরা পাগল ভেঙে আগল, সঙ্গে যায় সঙ্গে যায়॥
তারে ধরবি যদি আয়।
এতক্ষণে পগার পার, একটু পরেই বনের ধার—
আর কি ধরা যায়!
তবে রইলো কি উপায়!
হাস্য রসের 'হিহি' কিম্বা করুণ রসের 'হায়'।
আর আদ্য রসের নৃত্য যোগ দুটি যুগল পায়॥

[সকলের প্রস্থান।

(উদ্দালকের প্রবেশ)

উদ্দা। তাই ত, রাজকুমারীকে যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এর মানে কি? ঐ যে, ঐ যে রাজকুমারী! এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন—বটে! আমার চোখ এড়িয়ে যাবে - বটে! একটু সুধা বেশি পেটে ঢেলেছি ব'লে মনে করেছ কি আমি কাণা হয়েছি? (পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল) এস—এস—আসছে—আসছে!

(জনৈকা নারীর প্রবেশ)

নারী। এই কি, এই কি সেই? এই দিকেই ত সে এল? ঠিক যেন রাজপুত্তুর! সেই বটে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। কি গো ভদ্র, এই একান্ত নির্জ্জনে, কার অন্বেষণে?

উদ্দা। তোমার, ওগো, তোমার অন্বেষণে।

নারী। কি আপদ, এ যে পুরোহিতপুত্র!

উদ্দা। ভারী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে। ভেবেছিলে, কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না! কি রাজকুমারি, আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

নারী। কি! আমি তোমাকে চিন্‌তে পারব না রাজকুমার! কিন্তু আমি যে একটা অচেনা দেশের রাজকুমারী, তুমি দেখামাত্রই কেমন ক'রে চিন্‌লে?

উদ্দা। বাঃ বাবা, গোলমাল হয়ে গেল। (বিশেষভাবে নিরীক্ষণ) চীন দেশের রাজকুমারী নও ত? বস্, তা হ'লে বস্, তোমাকেই ত। বস্, ঠিক চিনেছি। মদিরবিহ্বলে! শোন তবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

(গীত)

দিনদুপুরে দেখেছি স্বপন, ঘন বিজন বন।
তার ভিতরে একটা ঘরে একটি মেয়ে তোর মতন।
ব'সে আছে হাত দিয়ে গালে—
সকালে কি বিকালে,
সাঁঝের বাতির একটু আগে ফুটছে যখন লাল বরণ—
এখন সেটা নাই স্মরণ, নাই স্মরণ, নাই স্মরণ।
মিছে কথা কইতে না জানি, ওগো মানিনী,
এমনি মুখ তার এমনি হাসি এমনি দু'টি ফুল-নয়ন॥

এই বারে বুঝতে পেরেছ, শরীরসাদাদসমগ্রভূষণে?

নারী। খুব বুঝেছি, দন্তরুচিকৌমুদী!

(গীত)

স্বপন কি আর মিথ্যা হয়।
একটু তবে এ দিক ও দিক বাদ বাকি ঠিক সমুদয়॥
ঘর সেটা নয় ফুলের দোলা,
দিন সেটা নয় রাতে,
আমি নয় সে একটা বামন, চাদ ছিল তার হাতে।
হয় সে বামন, নয় সে বানর, নয় সে কিছুই নয়—
আর, হয় যদি হ'ক তুমিই আমি আমিই তুমি রসময়॥

(মহিরঙ্গের প্রবেশ)

মহি। হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ। করেছ কি—করেছ কি তোমরা? এসে পড়েছ একেবারে গণ্ডীর বাইরে!

উদ্দা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—গণ্ডী? তার বাইরে? ঠিক এসে পড়েছি?

মহি। দেখতে পাচ্ছ না? এখনি যে মরেছিলে!

উদ্দা। চোপ্—কে মারবে আমাকে? আমি পুরোহিতপুত্র।

মহি। ডাকাতে মারবে! মারবে কেন, মারলে? ভয়ঙ্কর শবর-তুমি চুরি হলে', আর তুমি মলে'।

নারী। চ'লে এসো - চ'লে এসো — ভয়ঙ্কর শবর। মনে হচ্ছে যেন চুরি করতে আসছে। এমনি ক'রে—দ্রুত দ্রুত।

[নারীর প্রস্থান।

উদ্দা। হে মা গণ্ডী, পায়ে ঠেক্; হে মা গণ্ডী, পায়ে ঠেক্।

[উদ্দালকের প্রস্থান।

(যশমার প্রবেশ)

যশমা। আর ভয় নেই রে, তারা সকলের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছে।

মহি। তথাপি—তথাপি যশমা, এই পথ আগ্‌লে দাঁড়াই আয়। ওরে আমাদের জীবনদাতা সে। তার পথের বাধা-বিঘ্ন প্রাণ দিয়েও আমাদের দূর করতে হবে।

যশমা। এখন সে হতভাগা ভাগ্‌নেটার উপর আমার মায়া হচ্ছে।

মহি। আমারও হচ্ছে যশমা, এখন মনে হচ্ছে, তারই জন্য আমরা ওই শবররূপ-ধরা মহাপুরুষের দয়া পেয়েছি।

পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

দৃশ্যান্তর

পুরনারীগণ

(গীত)

ঠিক যেন চ'লে গেল গো,
ইঙ্গিতে করে' ছলনা।
মন বলে কেন কেন
কোন দিকে গেলো যেন,
দেখেও ত দেখা হ'ল না।
কে যেন কি যেন কারে যেন লয়ে গো,
চোখ না মেলিতে গেল উধাও হয়ে গো,
গেছে যাক্ সুখে থাক্,
লাভ কি তা কয়ে গো,
ব'ল না, ব'ল না, আর কথা তুলো না,
মুখ বুজে চল শুধু, দুলো না, হেলো না॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

(জয়শ্রীর হস্ত ধরিয়া উদয়নের প্রবেশ)

জয়শ্রী। এ দিকে কোথায় চলেছ? দেখছ না সম্মুখে? ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে।

উদ। থাক্, ওদের দেখেই ত তোমাকে এই দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, রাজকুমারি! জাতির এই প্রকার অন্ধ-মত্ত উল্লাসের মধ্য দিয়েই আমাদের সুগম পথ। বুঝতে পারছ না, তোমাকে ধরতে এখনই চারিদিকে সৈনিক ছুটোছুটি করবে। তারা সব দিকে যাবে, আসবে না কেবল এই দিকে। একচক্ষু হরিণ—তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না, তাদের শত্রু এই পথ দিয়ে চলাচল করতে পারে।

জয়শ্রী। যদি আসে, কোন দিকে আমাদের না দেখে, তারা এই পথে?

উদ। আর একটু অগ্রসর হ'লেই আমরা নিরাপদ। এই স্থানটা অতিক্রম করতে পারলেই একবারে নির্জ্জনতার রাজ্য। সেখানে অবন্তীর সমস্ত রক্ষী একত্র হ'লেও আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। (নেপথ্যে পদশব্দ)

জয়শ্রী। অগ্রসর হ'তে দেয় কই, শবর—ওই শুনতে পাচ্ছ?

উদ। কোনও শঙ্কা নেই তোমার। সমস্ত অলঙ্কার তোমার দেহ থেকে উন্মোচিত ক'রে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দাও। সত্বর—সত্বর।

জয়শ্রী। তুমিও সাহায্য কর।

(উভয়ে অলঙ্কার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিল)

উদ। যাক—এস। হতভাগ্যদের জীবন রক্ষা হয়ে গেল।

জয়শ্রী। তাদের, না তোমার ?

উদ। এর উত্তর এখানে দিতে পারব না। দেখছি তোমার দেহ কাঁপছে। চলতে না পার, আমি তোমাকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে যাব।

(নেপথ্যে পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইল)

জয়শ্রী। না—না।

উদ। তবে আমার হাত ধর, আমি তোমাকে ছাড়ব না —যখন ধরেছি—ছাড়ব না জীবন থাকতে। আমি শবর—বর্ব্বর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সৈনিকগণের প্রবেশ ও চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)

১ম সৈ। তাই ত রে, এ কি রকমটা হ'ল বল দেখি !

২য় সৈ। তোর যেমন গাড়োল-বুদ্ধি, নিজেও ম'লি, আমাদেরও মারলি। এ দিকে পৌরজন, লোক-কোলাহল, আনন্দ-উল্লাস ! বেছে বেছে পলাতক চোরকে ধরতে এলি তুই এই দিকে !

১ম সৈ। আমি ঠিক দেখেছি। শবর—শবর নিশ্চয় শবর সে এক নারীর হাত ধ'রে চলেছে।

৩য় সৈ। এ ও তা নারী কেন, বল্ না রাজকুমারীরই হাত ধ'রে।

১ম সৈ। বল্‌তে সাহস করছি না, কিন্তু ভাই, ঠিক যেন সে রাজকুমারী ! (ভূপতিত অলঙ্কার দেখিয়া) তবে কি জানিস্, তবে কি জানিস্, চোখ যেটা, সেটা চিরকালই দেখে না—কাণ যেটা, সেটা চিরকালই শোনে না—কি যেন কোথা থেকে কি ক'রে—কি যে—চল্, ফিরে চল্, অন্য দিকে—অন্য দিকে—দৌড়ে যা—দৌড়ে যা—যা—যা—যা—যা।

(তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতেই ১ম সৈনিক ত্বরিত উপবিষ্ট হইয়া একটি অলঙ্কার কুড়াইয়া গোপন করিল)

২য় সৈ। তুই ?

১ম সৈ। আমি একটু ব'সে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবি।

২য় সৈ। কি ভাববি ? ভাববার কি আছে ? তুইও চল্—চল্—

১ম সৈ। আছে রে—ভাই আছে—ভাববার অনেক আছে। রাজার যে মান গেল, এতেও ভাবি না—তোদের যে প্রাণ গেল, তাতেও ভাবি না—ভাবছি যে, হ'ল কি।

২য় সৈ। (অলঙ্কার পতিত দেখিয়া) ঠিক বলেছিস্ ভাই, ঠিক বলেছিস্—ভাববার অনেক আছেই ত বটে রে ! আমাকেও তা হ'লে একটু ভাবতে হ'ল। যা ভাই, যা - তোরা যা—ধ'রে ফেল্ ভাই, ধ'রে ফেল্—ভাবনা ! কি অফুরন্ত—দুরন্ত ভাবনা—হ'লো কি !

১ম সৈ। বর্ব্বর শবর—কোথায় পালাবে ? ঠিক ধরবো। —যা- যা।

২য় সৈ। ধরবো কি, ধরা হয়ে গেছে—এই পথে—এই পথে—তুই এই পথে—

১ম সৈ। ও সে পথে—সে ও পথে।—যা—যা—যা—

(তখন সকলেই দেখিতে পাইল পতিত অলঙ্কার, দেখিয়া ব্যগ্রতার সহিত সেগুলা কুড়াইতে লাগিল। কেহ বলিল, বটে—বটে— ভাববার কথা বটে—কেহ বলিল, ভাবতে জানো কেবল তোমরা ! কেহ কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, বড়ই ভাবনা- আর ভাবতে পারি না ইত্যাদি। তখন ওটা আমি আগে ছুঁয়েছি, সাবধান—তুই সাবধান ইত্যাদি কলহব্যঞ্জক বাক্য। ক্রমে পরস্পরের প্রহারাদি)

(প্রভুগুপ্তের প্রবেশ)

প্রভু। কি রে—কি রে—হতভাগারা কি করছিস ? আপনাআপনির ভিতর—এ কি ! এ কি তোদের নীচ বর্ব্বরের ব্যবহার !

(সৈনিকগণ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল)

২য় সৈ। ও কিছু নয় প্রভু, একটা শবর উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। রাজা তাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন। আমরা প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী বীর কি না! কে আগে তাকে বন্দী করবে, এই কথা নিয়ে আমাদের ভিতরে একটা তর্ক-কলহ চলছে। চল্—চল্ আমরা সকলেই তাকে একসঙ্গে বন্দী করব।

(একসঙ্গে একসঙ্গে বলিতে বলিতে
সৈনিকগণ প্রস্থান করিল)

প্রভু। হায়! মস্তিষ্ক যখন বিকৃত হয়, হস্ত-পদ এই প্রকারই চলাচল করে। অবন্তীর সৈনিক আজ অবন্তীর মত্ততানুযায়ীই কার্য্য করেছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

হতভাগ্য পুরবাসী—এখনও বুঝতে পারলে না!—এখনও তোমাদের চৈতন্য এলো না। আর রাজা! তোমারও কি আজ এদেরি মত মত্ততা? তুমিও কি উৎসবের উল্লাসে তোমার প্রিয়তমা কন্যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ?—মহারাজ! মহারাজ!

(চণ্ডদেবের প্রবেশ)

চণ্ড। চীৎকার ক'র না প্রভুগুপ্ত! আক্ষেপের শব্দে পুরবাসীর আনন্দের ব্যাঘাত উৎপাদন ক'র না।

প্রভু। মহারাজ! কন্যার উদ্ধারের কি কোনও উপায়-বিধান করবেন না?

চণ্ড। যাক্-যাক্ কন্যা—যাক্ অবন্তী—চীৎকার করবেন না, সচিব-প্রধান। তারা আজ জাতির স্বাধীনতা স্মরণে উৎসব করছে। কোনও বিষাদের কাহিনী আজ যেন তাদের কাণে না ওঠে। কি—আমাকে কি মত্ত মনে হচ্ছে, প্রভুগুপ্ত?

প্রভু। মতিমান্ রাজা, এ কথা কল্পনাতেও আনতে যে সাহস করি না!

চণ্ড। আপনি আমার কন্যার অপহরণ দেখেছেন—আমি আরও দেখেছি, প্রভুগুপ্ত! এখনও দেখছি, যা আপনি দেখতে পান নি। (ভূমি হইতে অলঙ্কার তুলিয়া) এই—দেখছেন প্রভুগুপ্ত? আপনার শিষ্যার দেহের অলঙ্কার—সে পথে নিক্ষেপ ক'রে গেছে। আর এই বস্তুরই লোভে অবন্তীর সৈনিক তাদের অনুসরণ করতে করতে পথ থেকে ফিরে এসেছে।

প্রভু। তাই ত মহারাজ, এ ত আমি দেখি নি!

চণ্ড। শবরবেশী বলছেন কেন প্রভুগুপ্ত, বলুন শবর—বন্য বর্ব্বর—অস্পৃশ্য শবর।

প্রভু। কিছুতেই বলতে পারব না মহারাজ, আমি সে অদ্ভুতকে দেখেছি। সেই বস্ত্রাধার কক্ষে করা তার মা'কে দেখেছি। যদিও কিছু বুঝতে পারি নি—তথাপি -

চণ্ড। কোনও তথাপি নেই প্রভুগুপ্ত, বলুন শবর—শবর। জয়শ্রী আমার কন্যা, কিন্তু আপনার শিষ্যা। একবার বলুন, এক হেয় যুবকের হাতে হাত দেবার ভয়ে সে শবরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যখন সে জেনেছে, তার এই লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া তার পিতারও সাধ্য নাই। বুঝেছে, সেই হীনের চেয়ে একটা শবরেরও মর্য্যাদা আছে। বলুন প্রভুগুপ্ত! আমি তার পিতা, কিন্তু আপনি তার আচার্য্য। বলতে পারবেন না? যান তবে। এ স্বাধীন জাতির উৎসব। অনুরোধ, এইরূপ বিষাদের কাহিনী বহন ক'রে এনে তাদের আনন্দের বিঘ্ন উৎপাদন করবেন না।

প্রভু। বুঝতে পেরেছি, আর করব না, মহারাজ!

[প্রস্থান।

চণ্ড। আনন্দ—আনন্দ—আমার যদি বুদ্ধির বিকার না হয়, তা হ'লে আমাকে বল্‌তেই হবে, তুমি—তুমি হে শবর, তুমি আর কেহ নও—তুমি কৌশাম্বী-রবি উদয়ন। তুমি রাজ্য জয় করেছ, কিন্তু পিতৃপরিচয় দিতে পারো নি। পরিচয় আনতে তুমি জন্মভূমি শবরের দেশে গিয়েছিলে। যদি আমি একান্ত মত্ত না হই, তুমি আর কেহ নও—সেই—নিশ্চয়—সেই পিতৃরাজ্য-জয়ী উদয়ন। মন বল্‌তে সাহস না করলেও, প্রাণ বলছে, তুমি এসেছ—তোমার মা'কে সঙ্গে নিয়ে।

(সুমিত্রার প্রবেশ)

এসো—এসো শবরমাতা শবরী—অবন্তীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

সুমিত্রা। মহাত্মন্!

চণ্ড। বলুন মহিমময়ী শবরী!

সুমিত্রা। আমাকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন?

চণ্ড। প্রয়োজন?

সুমিত্রা। আপনার কাছে বলব?

চণ্ড। তোমার ইচ্ছা।

সুমিত্রা। আর কারও কাছে বলি, আমার ইচ্ছা নয়। কোথায় রাজা, দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিন!

চণ্ড। কোথায় রাজা, আমিও অন্বেষণ করছি, মহিমময়ী শবরী!

সুমিত্রা। আমার পুত্র আজ এই উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল।

চণ্ড। ক'রে থাকে, যদি সে রাজাদেশ অমান্য ক'রে, তার পরিণাম কি জানো?

সুমিত্রা। শুনেছি, যদি সে ধৃত হয়, তার মৃত্যু।

চণ্ড। সে ধৃত হয়েছে।

সুমিত্রা। ধৃত হয়েছে?

চণ্ড। শুধু ধৃত নয় শবরী, তোমার পুত্র ধৃত, শৃঙ্খলাবদ্ধ।—রাজার কাছে তুমি কি তার জীবন-ভিক্ষা করতে চলেছ?

সুমিত্রা। না।

চণ্ড। না?

সুমিত্রা। না মহাত্মন্! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) যে উদ্দেশ্যে সে গণ্ডী পার হয়েছিল, এক দুর্ব্বলা নারীর রক্ষা, সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে। বিজয়ী বীরের প্রাণ এক পরাজিতের কাছে প্রার্থনা করব কেন?

চণ্ড। তোমার কথা শুনে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকতে পারলুম না, নারি!—তোমার সঙ্গে যে একটি বস্ত্রাধার ছিল?

সুমিত্রা। আপনিই কি রাজা?

চণ্ড। শুনেছি, সে না কি তোমার পুত্রের জীবনের অপেক্ষাও মূল্যবান্।

সুমিত্রা। আপনিই কি মহিমময় অবন্তীপতি?

চণ্ড। যদি না হই, কি প্রয়োজনে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও, এখানে বলতে কি আপত্তি আছে?

সুমিত্রা। পথচারিণী নারী আমি। তার উপর, পুত্রের অবস্থা যা আপনার মুখে শুনলুম, তাতে আমার চিত্ত বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যা বলবার, পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি, মহাত্মন্! যদিই আমার অনুমান মিথ্যা হয়—আপনি রাজা না হ'ন, দয়া ক'রে রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

চণ্ড। তোমার অনুমান সত্য কি মিথ্যা, পরে বলছি। অগ্রে আমাকে বল, কিছুমাত্র সত্য গোপন না ক'রে, তুমি কি কৌশাম্বীর পট্টমহাদেবী সুমিত্রা?

(সুমিত্রা বস্ত্রাধার চণ্ডদেবের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া নতজানু, করযোড়ে বলিলেন)

সুমিত্রা। প্রয়োজন এই, হে চমৎকারকারী, প্রজ্ঞাচক্ষু অবন্তীনাথ। প্রয়োজন এই বস্ত্রাধার। যখন আমাকে না দেখে আপনি নাম নিয়ে আমাকে সম্বোধন করেছেন, তখন আমার ইতিহাস আপনার অবিদিত নেই।

চণ্ড। জানি দেবি! আপনার অনুসন্ধানে বহুবার আপনার স্বামীর প্রেরিত দূত আমার কাছে এসেছিল।

সুমিত্রা। কি ক'রে সেই ভীষণ শকুনের মুখ থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম, সে কথা বলবার সময় এ নয়, রাজা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে উপস্থিতবুদ্ধিবলে নিজের জীবন রক্ষা করেছি, গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষা করেছি। সেই সন্তান পুরুষকারে তার পিতৃরাজ্য অধিকার করেছে। কিন্তু সে পিতৃপরিচয়ের নিদর্শন প্রজাদের দেখাতে পারে নি। এর ভিতরেই তার নিদর্শন—স্বামী ও আমার নামাঙ্কিত কম্বল, আর তাঁর সেই সময়ের প্রতিকৃতি, সর্ব্বদা আমি যেটিকে বুকে ক'রে রাখতুম। ঐটি আপনার আশ্রয়ে রাখতে এসেছি। যদি পুত্রকে আমার জীবিত না রাখেন, আমার ভিক্ষা, আমার পবিত্রতার নিদর্শন-স্বরূপ ঐটিকে আপনি কৌশাম্বীতে প্রেরণ করবেন।

চণ্ড। ওটিকে তুলে নাও।

সুমিত্রা। আপনি রাখতে পারবেন না?

চণ্ড। আমার কাছে রাখায় ওর কোন মূল্য নেই।

সুমিত্রা। এতে বুঝলুম, আপনি আমার পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

চণ্ড। তোমার পুত্র আমার ক্ষমার অপেক্ষা রাখেনি।

সুমিত্রা। বুঝতে পারলুম না, মহারাজ!

চণ্ড। সে অবন্তীর বক্ষে শেল বিদ্ধ ক'রে চ'লে গেছে। অবন্তীর উৎসবক্ষেত্র আর একটু পরেই ঘন বিষণ্ণতায় ভ'রে যাবে।

সুমিত্রা। এখনও বুঝতে পারলুম না যে, মহারাজ !

চণ্ড। তোমার পুত্র আমার একমাত্র কন্যা জয়শ্রীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে। শুন দেবি, যখন তোমার পুত্রকে শবর মনে করেছিলুম, তখন নিজেকে আমার সান্ত্বনা দেবার উপায় ছিল। এখন আর উপায় রইল না—তোমার পুত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা। যাও রাণী সুমিত্রা—তোমার ঐ পুত্র আর তার স্ত্রীকে নিয়ে তোমার সেই পূর্ব্বযুগের স্বামীর রাজ্য কৌশাম্বীতে চ'লে যাও। অবন্তীর দিকে আর মুখ ফিরিও না।

[প্রস্থানোদ্যত।

সুমিত্রা। (বস্ত্রাধার তুলিয়া) যদি ফেরাই রাজা ?

চণ্ড। (মুণ্ডচ্ছেদের ইঙ্গিত) তোমার, তোমার পুত্রের, আর জাতির অমর্য্যাদাকারিণী সেই কন্যার।

[প্রস্থান।

চণ্ড। (পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া) কিন্তু সেই চোর শবর পুত্রকে ব'ল, তার আগম-নিগম আমার এই প্রমত্তের দৃষ্টির কাছেও সে গোপন করতে পারে নি।

সুমিত্রা। তুমিই তাকে ব'ল, রাজা।

দৃশ্যান্তর

পরিচারক ও পরিচারিকা

দ্বৈত-গীত

কি করি কি করি, কি গান গাই !
কি যেন কি যেন আমরা চাই !
করিতে নারিনু বর্ণন,
হয়ে গেল মাথা ঘূর্ণন,
এই সাজনের পাগল নাচন এনে দেবে বুঝি ভাই !
যদি না যায় রে পাওয়া,
ওরে ও পাগল হাওয়া !
আমাদের এই গাওয়া
উড়িয়ে নে' যা সেইখানে, শুনিয়ে দে রে সেই কাণে
যেখানে সে কি জানি কে ব'সে আছে ভাই ॥

(প্রবরসেন ও উদ্দালকের প্রবেশ)

প্রবর। পরিচারিকে, পরিচারিকে ! অহো—তোমার কি সুকণ্ঠ !

উদ্দা। কি অদ্ভুত সু—

প্রবর। তোমার ঐ মৃদু কঠোর—

উদ্দা। সেটা কি মৃদু—আর কি কঠোর—অহো—

(সুরে) যেন অসীম থেকে ঝরা।
আর সসীমে এসে আত্মহারা।
যেন উদার সিন্ধুকূলে,
অচিন দেশের ফুলে—অহো !

প্রবর। রহস্য নয় সখা, সত্যই এদের গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্য বলছি—বিদ্রাবিত, বিপ্লাবিত—

উদ্দা। বিপর্য্যস্ত। যখন রাজকুমারীকে নিয়ে দেশে যাবে, তখন এ দুটিকেও সঙ্গে নিয়ে যেও সখা।

প্রবর। নিশ্চয় নিয়ে যাব। যে সময় যৌব-রাজ-সিংহাসনে বসবো, সেই সময়- পরিচারিকে, তুমি দাঁড়াবে আমার বামপার্শ্বে, আর তুমি দাঁড়াবে পরিচারক—তুমি দাঁড়াবে—তুমি দাঁড়াবে—

উদ্দা। না-না—তুমি একবারেই দাঁড়াবে না—অথবা দাঁড়াবে গৃহদ্বারের বহির্ভাগে।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। রাজকুমার ! (সকলের সাবধানে অবস্থিত হইবার চেষ্টা) পুরমহিলারা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

প্রবর। হ'ন তাঁরা সুস্বাগত, পুরোহিত !

পুরো। তাদের মান-মর্য্যাদা, রাণীর মান-মর্য্যাদা হ'তে ভিন্ন নয়।

প্রবর। মালবের যুবরাজ মর্য্যাদা দিতে কৃপণ হবে না, পুরোহিত !

[পুরোহিতের প্রস্থান।

উদ্দা। সখা ! সসম্ভ্রম !

(মণ্ডল-পত্নী ও পুরনারীদের লইয়া পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

প্রবর। স্বাগত—সুস্বাগত। পরিচারিকে, আসন—আসন।

পুরো। এই—এই সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা মালবরাজের পুত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবরসেন।

প্রবর। আসন—আসন। বিস্তীর্ণ কর আসন।

ম, প। না না—প্রয়োজন নেই—কোনও প্রয়োজন নেই

রাজকুমার ! এই স্থান থেকেই আমরা তোমাকে দেখছি ।

প্রবর । যদিও এখন আমি হংসমধ্যে বকো যথা ।

উদ্দা । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি কেকা-শব্দকারী বিস্ফারিত পুচ্ছধারী পক্ষিরাজ শিখণ্ডী ।

পুরো । উদ্দালক ! (উদ্দালকের মস্তক অবনমন)

ম, প । না না প্রিয়দর্শন, তুমি বক হ'তে যাবে কেন ? মহিমান্বিত মালবরাজপুত্র, সত্যই তোমাকে দেখে আমরা প্রীত হয়েছি । তুমি সুন্দর, সুসভ্য, সুশান্ত ।

উদ্দা । সুদৃশ্য—সুস্পৃশ্য—নিতান্ত ।

পুরো । উদ্দা—উদ্দা—

প্রবর । না না— তোমরা ভারতের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতি—রাজহংসী তোমরা—তোমাদের তুলনায় সত্য সত্যই আমি বক ।

ম, প । না না –যে জাতি থেকে তোমার উদ্ভব হয়েছে, তার তুলনায় আমরা বর্ব্বর ।

প্রবর । তোমাদের বর্ব্বর বলব আমি—মহিমান্বিত মালবেশ্বরের পুত্র হয়ে ? বক ব'লে কি আমি ঝিলের বক, বিলের বক—

উদ্দা । উনি সিন্ধু-বক—রাজ-বক ।

প্রবর । ওগো, ভ্রূভঙ্গবিলসিতে, মদিরলোচনে, জীবন থাক্‌তে আমি তোমাদের বর্ব্বর বল্‌তে পারব না ।

উদ্দা । ওগো মলয়ানিলস্পর্শশিহরিতে শোভনে -- মা ভৈঃ, বর্ব্বর তোমাদের আর কেউ বলবে না ।

পুরো । যাক্‌ । অবন্তীর মহীয়সী কন্যা, দেখলে তোমরা যুবরাজকে ?

ম, প । দেখলুম । দেখে পরম প্রীত হলুম । কেমন, তোমাদের অভিমত ?

সকলে । ঐ মত মণ্ডলপত্নী । রাজকুমারীর সুযোগ্য বর এই মালবরাজকুমার ।

পুরো । রাজকুমারী জয়শ্রীকে দানের কথা এইবারে আমি রাজার কাছে উত্থাপন করতে পারি ?

ম, প । বিলম্ব ক'র না পুরোহিত ! আমরা সকলে একবাক্যে অনুরোধ করব । (নেপথ্যে দামামাধ্বনি) এ সময় হঠাৎ দামামা বেজে উঠলো কেন, পুরোহিত ? এখনো ত উৎসবান্তের সময় হয় নি ।

পুরো । (উৎকর্ণ হইয়া) ওটা নাগরিকের উল্লাসের একটা অভিব্যক্তিমাত্র । সংবাদটা নিয়ে এসো, উদ্দালক ।

[উদ্দালকের প্রস্থান ।

পুরো । উঠে এসো ভাগ্যবান্‌, অবন্তীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন তোমার হাতে তুলে দিতে সমস্ত পৌর-নর-নারীর প্রতিশ্রুতি ।

ম, প । আজ এখানে বিধি রাজা । রাজকুমারীর প্রাপ্তিতে তুমি নিশ্চিন্ত হও, যুবরাজ ।

সকলে । হও নিশ্চিন্ত—

প্রবর । ধন্যবাদ পুরমহিলে ! আমার অন্তরের অন্তরতমের ধন্যবাদ ।

(নেপথ্যে ঘন ঘন দামামাধ্বনি)

ম, প । পুরোহিত—পুরোহিত ! নিশ্চয় কোনও অমঙ্গল ঘটেছে ।

(মণ্ডলের প্রবেশ)

মণ্ডল । কোথায় তুমি—কোথায় তুমি মণ্ডলানী ?

ম, প । কি—কি মণ্ডল ? (মণ্ডল তাহার কর্ণে কহিল) অ্যাঁ !

সকলে । কি মণ্ডলানী ? (মণ্ডলপত্নীর তাহাদের কর্ণে কথন) । (সকলের বিস্ময়সূচক শব্দ)

[মণ্ডল, মণ্ডলপত্নী ও নারীগণের প্রস্থান ।

পুরো । কি হয়েছে—কি হয়েছে ? ব'লে যাও, মণ্ডল ।

(উদ্দালকের প্রবেশ)

উদ্দা । বাবা—বাবা—বাবা !

পুরো । কি সংবাদ ? কি—কি ?

[উদ্দালক পুরোহিতের কর্ণে কহিল । বিপুল বিস্ময় দেখাইয়া পুরোহিত প্রস্থান করিল ।

প্রবর । এ সমস্ত ব্যাপার কি, উদ্দালক ?

উদ্দা । ব্যাপার—একটা ব্যাপার । যুবরাজ, একটা, কি বলব, ব্যাপার । আসছি -আসছি—এখনি আমি ফিরে আসছি · উঠো না—যতক্ষণ না ফিরে আসি—এখান থেকে উঠো না । পরিচারিকে—পরিচারিকে, দেখবি এঁকে ।

[প্রস্থান ।

(নেপথ্যে দামামাধ্বনি)

প্রবর। তাই ত পরিচারিকে, কেবল যে বাজে রে! দামামা কেবলি যে বাজে রে!

১ম পরি। তাই ত প্রভু, কেবলই যে বাজে।

২য় পরি। আপনার বিবাহ—একটা তুমুল ব্যাপার—তাতে কত কি বাজবে! শুধু দামামা বাজে কেন?

প্রবর। বাজুক দামামা, তোরা একটা গান গা।

(দ্বৈত-গীত)

কেন দামামা বাজে!
ঢাক কেন বাজে না, ঢোল কেন বাজে না,
খোল বেটা আছে কোন্ কাযে!
বাঁশী বেটা ছিছি, কাঁসি বেটা করে কি?
হাসবো নাকি কাঁদবো নাকি মরব নাকি লাজে?

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। (পরিচারকদের প্রস্থানের ইঙ্গিত। উভয়ের প্রস্থান) রাজকুমার! তোমাকে বলতে মুখে কথা আস্‌ছে না। অবন্তীর আজ লাঞ্ছনা। কোথা থেকে এক শবর দস্যু, আমাদের মত্ততার রন্ধ্র দিয়ে উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে রাজকুমারীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

প্রবর। রহস্য? নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমাকে রহস্য?

পুরো। তোমাকে রহস্য করবার আমার কি প্রয়োজন, রাজকুমার!

প্রবর। তবে প্রতারণা—হীন প্রতারণা।

পুরো। কোনও প্রয়োজন নেই—আমি স্বাধীন দেশের রাজপুরোহিত।

প্রবর। তবে আমাকে এই নীচ কথা শোনাতে এসেছ কেন?

পুরো। তুমি শক্তিমান্ পিতার পুত্র। নিজেকেও পরিচয় দিয়েছ শক্তিমান্। তাই এসেছি বলতে—সে শবর এখনও অনেক দূর যেতে পারে নি—যদি তাকে বিনাশ করতে অবন্তীর সাহায্য কর। সেই দুরাত্মাকে বিনাশ ক'রে, রাজকুমারীকে তুমি মালবে নিয়ে যাও।

প্রবর। বিনাশ সহজেই করতে পারি সেই শবর-দস্যুকে পুরোহিত, কিন্তু সেই শবরানুগামিনীকে মালবে নিয়ে যেতে পারি না। মালবের একটা অসাধারণ মর্য্যাদা আছে।

পুরো। তা হ'লে তোমার কর্ত্তব্য কর, রাজকুমার!

প্রবর। বিনা মূল্যের উপদেশরাশি আমার কর্ণের কাছে না তুলে তোমরাও সেই শবরের অনুসরণ কর।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

ধিক্ অবন্তী, ধিক্ অবন্তীর রাজা, ধিক্ অবন্তীর পুরোহিত! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

দৃশ্যান্তর

উদয়ন ও জয়শ্রী

উদ। আর কি! সর্ব্ববাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছি। কিন্তু রাজকুমারি, আর যেন তুমি চলতে পারছ না। এখনও তোমার শরীর কাঁপছে।

জয়শ্রী। অপরাধ নেই আমার। কারণ অসংখ্য। কত স্থানেই না পৌরজনরা আমাদের পথরোধ করেছিল!

উদ। করলেই বা। তারা প্রমত্ত, আমরা অপ্রমত্ত!

জয়শ্রী। অপ্রমত্ত তুমি, আমি নই।

উদ। আমার সঙ্গে চ'লে আসা এখন তোমার মত্ততা ব'লে কি মনে হচ্ছে?

জয়শ্রী। কোথায় তোমার মা?

উদ। আরও একটু যেতে হবে রাজকুমারি!

জয়শ্রী। আরও?

উদ। এখানেও মানুষ চলাচল করতে পারে। মা'কে আমি এমন স্থানে রেখে এসেছি, যেখানে মানুষ কদাচ প্রবেশ করেছে।

জয়শ্রী। তুমি তাকে সেখানে একাকিনী রেখে এসেছ?

উদ। আছে কতকগুলি তার সঙ্গী। তারা মানুষ নয়, কতকগুলি বন্যজন্তু।

জয়শ্রী। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ) চল।

উদ। না, তুমি ক্লান্ত, কিছুক্ষণের জন্য এইখানে ব'স।

জয়শ্রী। না—না, তুমি চল। বসলে আর উঠতে পারব না। হাসছ কি শবর, এ আমার দুর্ব্বলতা নয়।

উদ। তা বলব কেন, রাজকুমারি! এ তোমার—সেই 'প্রচ্ছন্ন নারীত্ব'। করুণার তাড়নায় একটা অভাবনীয় অবস্থায় প'ড়ে একটা পূর্ণ অপরিচিতের শুধু কথার

উপর বিশ্বাসে সব ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ। ফেলে এসেছ পথে বিপুল মান, বিপুল মর্য্যাদা, স্নেহ, মমতা—রাজকন্যার সম্ভ্রম। দুর্ব্বলতা কেমন ক'রে বলব, রাজকুমারি? তবে তোমার মনে জেগে উঠেছে সংশয়। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চ'লে এসেছ। এইবারে অবিশ্বাস তোমার হৃদয় আশ্রয় করছে।

জয়শ্রী। অবিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। (নেপথ্যে, দূরে উল্লাস-কোলাহল) হায়, ওরা এখনও জানতে পারেনি, ওদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

উদ। তুমি কি ফিরে যেতে ইচ্ছা কর? বল, এখনও ফিরে যাবার সময় আছে। এখনও ওরা মত্ত। বল, ওদের সর্ব্বনাশ বোঝবার শক্তি ফিরতে না ফিরতে আবার তোমাকে যথাস্থানে রেখে আসি।

জয়শ্রী। আমি নিজেই ফিরে যাই না কেন?

উদ। তা কি হয়? যদি এখনি ফিরে যাবার শক্তি থাকে—এস। না থাকে, মুহূর্ত্তের জন্য এই স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ কর।

জয়শ্রী। আর কারও না হ'ক, আমার পলায়নবার্ত্তা নিশ্চয় এতক্ষণে রাজার কর্ণগোচর হয়েছে।

উদ। উত্তম, তোমাকে তা হ'লে রাজার সম্মুখেই উপস্থিত করব।

জয়শ্রী। তোমার তা হ'লে কি হবে?

উদ। নারী-সুলভ প্রশ্ন ক'র না রাজকুমারি! আমার কি হবে, পূর্ব্বেও যখন জানতে না তুমি, পরেও কি হবে, জানতে তোমার অধিকার নেই। আমার জীবন-নাশের আশঙ্কায় এমন আগ্রহে তুমি আমাকে আকর্ষণ করেছিলে যে, যদি সে সময় তুমি আর কারও দৃষ্টিতে পড়তে, তা হ'লে এই হীন শবরের প্রতি তোমার নির্লজ্জ আসক্তি ভিন্ন সে ব্যক্তি তোমার সে কার্য্যের অন্য কোনও অর্থ করতে পারতো না। হ'ক সে পুরুষ, হ'ক সে নারী; হ'ক সে তোমার পিতা, হ'ক সে তোমাদের আচার্য্য। সে করুণার ব্যাকুলতা কেবল বুঝেছিলুম আমি। আমার জীবন-রক্ষার জন্য তোমার সে অসম্ভব আত্মবিস্মৃতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমার অনুমান মিথ্যা হয়ে গেছে। আমি মরিনি। তার পরিবর্ত্তে তুমি আমার সঙ্গে এখানে—যা তোমার স্বপ্নও কল্পনা করতে সাহস করে না। যা এখন তুমি মনে করছো, তোমার পক্ষে মৃত্যু।

জয়শ্রী। আপনি কে?

উদ। ওরূপভাবে আমাকে সম্বোধন ক'র না। পূর্ব্বে যা আমাকে বলেছ, তাই বল। আমি মানুষ—আমি রাজাও নই, ভিখারীও নই; ব্রাহ্মণও নই, চণ্ডালও নই।

জয়শ্রী। তুমি বিচিত্র। ভাল, এ প্রশ্ন করতেও কি আমার অধিকার নেই? আমরা উভয়ে চ'লে গেলে তোমার মায়ের কি হবে?—(উদয়ন অপ্রতিভবৎ হইল) সেই মা, যাকে তুমি বনের ভিতরে কি জানি কিরূপ সঙ্গীর কাছে রেখে এসেছ?

উদ। (চঞ্চলভাবে পাদচারণ) তুমি বোসো।

জয়শ্রী। আর তুমি? আমাকে আবার সেই রকম কতকগুলি সঙ্গীর কাছে রেখে চ'লে যাবে না কি?

উদ। না, তুমি বোসো।

জয়শ্রী। তুমি বোসো। হাঁ, তুমি না বসলে আমি বসি কেমন ক'রে? তুমিও ত আমা অপেক্ষা কম ক্লান্ত নও!

(গীত)

করুণার চোখে অত চেয়ো না!
মু'দে রও আঁখি, ভালো ক'রে দেখি,
দেখিবার সাধ কেড়ে নিয়ো না।
বিলোল-নয়নে চাহ যদি সখা,
আঁখি মুদে যাবে হবে না দেখা,
অমন করুণা সবার সহে না—
প্রাণটি গলায়ে দিয়ো না।

(গীতান্তে জয়শ্রী বলিল, কি হবে?)

উদ। তাই ত, রাজকুমারি,—

জয়শ্রী। আমার নাম বাসবদত্তা। উৎসবে রাজা-প্রজা আমার নাম দিয়েছে জয়শ্রী।

উদ। তোমার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করব?

জয়শ্রী। ক্ষণপূর্ব্বে তোমাকে আমি মতির অস্থিরতা দেখালুম, তাতে আমার নাম কি তোমার মুখে উচ্চারিত হবার যোগ্য?

উদ। আমি যদি বিচিত্র হই, তুমি অপূর্ব্ব। তাই ত জয়শ্রী, আমার মায়ের কি হবে? মা প্রতিমুহূর্ত্ত

আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। আমার পিতার শোকে দিন-রাত কেঁদে মা একরূপ অন্ধ।

জয়শ্রী। আর তুমি কে, আমি জানতে চাই না। তোমার মত পুরুষ যদি শবর হ'তে পারে, তা হ'লে আমার মত নারীর শবরী হওয়ায় জগতের কোনও অনিষ্ট হবে না। এখন রাখতে চাও আমাকে, থাকি। না রাখতে চাও—

উদ। ও কথা আর মুখেও উচ্চারণ ক'র না। এ রাজ্যে আজ পদার্পণ ক'রে আমি ধন্য। এখন আমি সেই নারীকে দেখতে পাই—সেই বৃদ্ধা! সে যদি আমার সর্ব্বস্ব চায়, আমি তাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারি। তার প্রাণের মূল্য তুমি। আর তোমাকে ছলনা করব না। আমি কৌশাম্বীর অধীশ্বর উদয়ন।

জয়শ্রী। (প্রণতা হইয়া) মহারাজ, আজ আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার জাতিকে রক্ষা করুন। আর ঐ সব অভাগ্য নর-নারী, অর্থের জন্য দাসত্ব গ্রহণ ক'রে যারা প্রাণহীন যন্ত্রের মত কার্য্য করে—

উদ। তা হ'লে চল, সর্ব্বাগ্রে মায়ের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।

জয়শ্রী। ব্যবস্থা মানে কি রাজা?

উদ। বলছি। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বীণা বাহির করিয়া) আগে এই বীণা গ্রহণ কর।

জয়শ্রী। তাই ত, পূর্ব্বে এটিকে ত দেখিনি! অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু এ কি অপূর্ব্ব বীণা!

উদ। এই আমার শক্তি। এর নাম হস্তিকান্ত বীণা। কৌশাম্বীরাজের পট্ট-মহাদেবীর ইতিহাস কিছু শুনেছ?

জয়শ্রী। বহুবার—মায়ের মুখে, পিতার মুখে, ধাত্রীর মুখে। এক প্রকাণ্ড পক্ষী তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বহুবার শুনেছি সে করুণকাহিনী।

উদ। আমি কে, এইবারে বুঝতে পেরেছ?

জয়শ্রী। আমি ধন্য—আমি ধন্য।

উদ। তবে আর সে করুণকাহিনীর পুনরাবৃত্তি ক'রে সময় বৃথা নষ্ট করব না। অল্লকল্পক নামে এক ঋষির আশ্রমে মা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেইখানেই হয়েছিল আমার জন্ম। সেই ঋষি মৃত্যুকালে অপূর্ব্ব দৈবশক্তির আধার এই বীণা আমাকে দান ক'রে যান। এর সাহায্যে সমস্ত আরণ্য হস্তীকে আমি এক মুহূর্ত্তে পালিত কুক্কুরের মত বশে আনতে পারি। ইচ্ছা করলে ঐ তোমাদের উৎসবক্ষেত্র ঐরূপ এক মুহূর্ত্তে হস্তিপদভরে মথিত ক'রে দিতে পারি।

জয়শ্রী। তোমার নিরস্ত্রতার মর্ম্ম এইবারে বুঝতে পেরেছি। অপূর্ব্ব দৈবশক্তি ছিল তোমার পশ্চাতে।

উদ। ছিল, কিন্তু তুমি ত দেখেছ জয়শ্রী, আমি তার প্রয়োগ করিনি। তোমার অলঙ্কারশূন্য অঙ্গ পর্য্যন্ত তার সাক্ষী। এই বিদ্যাদানকালে ঋষি আমাকে বলেছিলেন, মানুষী শক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে দৈবী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'র না। মানুষী শক্তি দৈবশক্তি অপেক্ষা হীন নয়; বরং অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ শক্তির নাম সত্য। তারই সাহায্যে এইমত নিরস্ত্র আমি পিতৃরাজ্য অধিকার করেছি। আর এখানে কি করেছি, এই বনভূমি আলো-করা অবন্তীর শ্রেষ্ঠ রত্নই তার সাক্ষী।

জয়শ্রী। কিন্তু এবারে?

উদ। আর প্রশ্ন ক'রো না, রাজকুমারি!

জয়শ্রী। এবারে কি সংহারমূর্ত্তি নিয়ে উৎসবক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছ, প্রভু?

উদ। উত্তর এর পরে দিচ্ছি। (পরিক্রমণ ও স্থান পরিদর্শন) ঐ অদূরে দেখা যাচ্ছে একটি বনফুলের গাছ। পুষ্পভারে সে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। শীঘ্র ওর পত্র-পুষ্প নিয়ে এসো।

[জয়শ্রীর প্রস্থান।

সত্বর—সত্বর। মুহূর্ত্ত বিলম্ব অসহ্য হচ্ছে, রাজকুমারি!

(অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পপত্র লইয়া জয়শ্রীর প্রবেশ)

উদ। নাও, আমাকে গুরুস্বীকার ক'রে এই পত্র-পুষ্পে আমাকে বরণ কর।

জয়শ্রী। অগ্রেই ত তা স্বীকার করেছি, স্বামিন্!

উদ। না, না—মন্ত্রের গুরু—বরণ কর—সত্বর—সত্বর। এই বিদ্যা আমি তোমাকে দান করব।

জয়শ্রী। আমাকে? কেন?

উদ। আগে গ্রহণ কর—পরে বলছি।

জয়শ্রী। দান মানে কি?

উদ। তুমি বুঝেছ, আর বিলম্ব ক'র না। ঐ উৎসবক্ষেত্রে কোলাহল উঠলো। এইবারে তোমার পলায়নবার্ত্তা মত্তরা জানতে পেরেছে। ঐ দামামা বেজে উঠলো।

জয়শ্রী। অর্থাৎ, তোমার শক্তিতে অধিকারী হব আমি? তুমি নিঃস্ব হবে? আর ঐ সব হীন মত্ত বিনা ক্লেশে বধ করবে তোমাকে?

উদ। মমতায় আত্মহারা হয়ো না জয়শ্রী! মায়ের মর্য্যাদা, তোমার মর্য্যাদা, আমার সত্য। রক্ষা কর—রক্ষা কর আমার সত্য।

জয়শ্রী। দাও, প্রিয়তম।

(উদয়নের পদে পত্র-পুষ্পদান)

উদ। বীণার এই তারে ঝঙ্কারে উচ্চারণ করবে এই মন্ত্র। আক্রমণকারী বন্যহস্তী সুদূরে পলায়ন করবে। মধ্যের তারে ঝঙ্কারে এই মন্ত্র। যতদূর সুর যাবে, হ'ক তা সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম—তত দূর থেকে বন্য হস্তিযূথ তোমার কাছে ছুটে আসবে। তৃতীয় ঝঙ্কারে এই মন্ত্র—পালিত কুক্কুরের মত তারা তোমার আদেশ পালন করবে। ধর দেবি, আজ হ'তে এ হস্তিকান্ত বীণা তোমার। সত্যই আজ আমি নিঃস্ব। এই নিঃস্বতা নিয়ে ফিরে চল্লুম। তখন প্রয়োজন হ'লে আমার শক্তি প্রয়োগের উপায় ছিল, সে উপায় পর্য্যন্ত ত্যাগ করলুম। আমি চল্লুম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর জয়শ্রী, এ শক্তির অযথা প্রয়োগ করবে না। কৌতূহলপরবশ হয়ে শক্তির পরীক্ষা করবে না।

জয়শ্রী। করব না, গুরু।

উদ। যদিই হয় আমার সেই দুর্ভাগ্য—হত্যা, এই শক্তিপ্রয়োগে তার প্রতিশোধ নেবে না।

জয়শ্রী। প্রতিশোধ পর্য্যন্ত নিতে পারব না? কেন তবে অনর্থক আমাকে এই অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী করলে?

উদ। করেছি, আমার অবর্ত্তমানে আমার মায়ের ভার নেবার জন্য, আমার নাম নিয়ে কৌশাম্বীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করবার জন্য।

জয়শ্রী। কিন্তু, যে জন্য নিজের মর্য্যাদা, পিতার মর্য্যাদা, জাতির মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়ে এক শবরের হাতে হাত দিয়েছিলুম, তার ত কোনও মীমাংসা হ'ল না! তোমাকে বধ করেও যদি তাদের মত্ততা দূর না হয়, যদি ঐ হীন নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ না হয়?

উদ। এর উত্তর আমি দিতে পারলুম না, জয়শ্রী। তবে এইটুকুমাত্র তোমাকে বলতে পারি, আর তুমি অবন্তী নও—কৌশাম্বী।

জয়শ্রী। যাও।

[উদয়নের প্রস্থান।

সুমিত্রা। (নেপথ্যে) কোথায় গেলি, উদয়ন!

জয়শ্রী। ও-দিকে না মা, এ-দিকে এস।

সুমিত্রা। (নেপথ্যে) কোথায় গিয়েছিলি রে বর্ব্বর শবর, তোর মা'কে এই নির্জ্জন দেশে একা ফেলে?

(সুমিত্রার প্রবেশ)

জয়শ্রী। শবর নই মা, শবরী।

সুমিত্রা। বা! বা! কি অপূর্ব্ব তুমি! কাছে এসো—কাছে এসো। দুই যুগ-সঞ্চিত চোখের জল সহসা আমার চক্ষুর মর্ম্মরোধ ক'রে দিলে! আর আমি অগ্রসর হ'তে পারছি না। কাছে—কাছে—আরও কাছে—(জয়শ্রীকে আলিঙ্গন) বা! বা! কি কোমল, কি মধুর তুমি!—কিন্তু তুমি শবরী ব'লে নিজের পরিচয় কেন দিলে, মা?

জয়শ্রী। তুমি তোমার পুত্রকে শবর সম্বোধন কেন করলে, মা?

সুমিত্রা। মা! দেখছ আমার অবস্থা? আমার কাছে কোনও সত্য গোপন ক'র না।

জয়শ্রী। আমি অবন্তীরাজকন্যা, নাম আমার জয়শ্রী।

সুমিত্রা। কেমন ক'রে আমার পুত্র তোমাকে লাভ করলে? তুমি যে তোমার গর্ব্বময় পিতার দান—ঐ বর্ব্বরবেশী যুবককে—এ ত আমি কোনও মতে বিশ্বাস করতে পারি না!

জয়শ্রী। পিতা আমাকে দান করেন নি।

সুমিত্রা। তবে?

জয়শ্রী। আমি স্বেচ্ছায় তার অনুগমন করেছি।

সুমিত্রা। তোমার পিতা জানেন?

জয়শ্রী। বোধ হয়, এতক্ষণে জানতে পেরেছেন।

সুমিত্রা। ঐ বর্ব্বর শবরের হাত ধ'রে তোমার পলায়নবার্ত্তা?

জয়শ্রী। যা বল।

সুমিত্রা। সে চোর কোথায় গেল ? আমার সঙ্গে দেখা করতে কি তার ভয় হচ্ছে ?

জয়শ্রী। না।

সুমিত্রা। তবে ?

জয়শ্রী। আপনার সেবাকার্য্যে আমাকে নিযুক্ত ক'রে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন।

সুমিত্রা। নিশ্চিন্ত করলে মা। নাও, এই বস্ত্রাধার কক্ষে কর। কর আমার অনুগমন। তবে তোমাকে বলি, পুত্রের ফিরে আসতে অসম্ভব বিলম্ব দেখে আমি ধৈর্য্য ধরতে পারি নি। তার অনুসন্ধানে গিয়েছিলুম। পথে তোমার মহিমান্বিত পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি তোমার পলায়ন-কথা জেনেছেন। জেনে তোমার বধে, আমার পুত্রের বধে উদ্যত-অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দেখবার কৌতূহল হয়েছে, কেমন ক'রে তিনি ঐ শবরকে আর তাঁর জাতির অমর্য্যাদাকারিণী এই কন্যাকে বধ করেন।

জয়শ্রী। কৌতূহল বলছ কেন মা ? মনে করছ কি আমার স্বামীকে বধ করতে আমার পিতা কুণ্ঠিত হবেন ?

সুমিত্রা। তিনি কুণ্ঠিত না হ'তে পারেন। কিন্তু আমার পুত্রের নিধন তাঁর সাধ্যাতীত। পুত্র আমার অমানুষী শক্তির অধিকারী।

জয়শ্রী। সে শক্তি নিঃশেষে আমাকে দান ক'রে তিনি নিঃস্ব হয়ে চ'লে গেছেন। এই দেখ মা। (বীণা প্রদর্শন)

সুমিত্রা। তবে আর কি! তুমি ত সেই দৈবী শক্তির অধিকারিণী !

জয়শ্রী। কিন্তু প্রয়োগের অধিকার নেই। তোমার পুত্র আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর জীবন-রক্ষার্থে আমি একটি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করতে পারব না। কি মা, কি চিন্তা করছ ?

সুমিত্রা। চিন্তা করবার আর যে কিছুই রাখলে না, জয়শ্রী !

জয়শ্রী। বল মা, এখন আমি কি করতে পারি ?

সুমিত্রা। কৌশাম্বীর রাজমহিষী তুমি। কি করতে পার, তুমিই স্থির কর মা।

জয়শ্রী। তবে এস মা, আমার সঙ্গে এস।

(যশমার প্রবেশ)

যশমা। ওরে—ওরে—ওরে !

(মহিরঙ্গের প্রবেশ)

মা ! এই তোমার সন্তান। নাম বল্।

মহি। মহিরঙ্গ।

যশমা। কি করিস বল্।

মহি। ছিলুম মালবের রাজহস্তিচালক।

জয়শ্রী। মালবের রাজহস্তিচালক ছিলে যখন, হস্তি-লক্ষণ নিশ্চয়ই জানো তুমি।

মহি। এই অঙ্কুশ আমার মাথায় মারলে যত না আঘাত লাগবে, তার চেয়ে শতগুণ আঘাত লাগবে, যদি কেউ আমাকে বলে হস্তি-লক্ষণ জানি না।

জয়শ্রী। মহিরঙ্গ ! এসো, এই বনের ভিতরের সমস্ত হস্তী তোমার সম্মুখে উপস্থিত করি, তার মধ্য হ'তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী নির্ব্বাচন ক'রে, তার পৃষ্ঠে আমাদের আরোহণ করিয়ে—কোথায় যাব মা ?

সুমিত্রা। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজার মহিষী তুমি, কোথায় যাবে, আমি বলব কেন, জয়শ্রী !

জয়শ্রী। তার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে নিয়ে চল মহিরঙ্গ কৌশাম্বীর রাজমাতা ও আমাকে অবন্তীর উৎসবক্ষেত্রে।

দৃশ্যান্তর

দেবসেনা

(গীত)

ছায়াভরা বনপথে আপনারে লয়ে সাথে
সভয়ে চলেছি ওগো বিজন দেশে।
জাগিল পথমুখে মনোমত সুন্দর
মনোমত মনোহর সে।
সেও যে আমারি মত (ওগো) চলেছে একা,
বনপথে লুকাইয়ে সকল দেখা,
দেখে লাজে দাঁড়াইনু পথের পাশে।
কখন্ যে ঘুমায়েছি চলিতে চলিতে গো,
কখন্ যে চোখোচোখি নারিনু বলিতে গো,
গানে গেলো বন ছেয়ে, ভাঙা ঘুমে দেখি চেয়ে,
দুই জনে আছি শুয়ে পথের শেষে॥

দেব। ঠিক যেন বনের গোপন কথা! কাকে যেন বলছে, কে যেন শুনছে! বলা-শোনার যেন বিরাম নেই। কর্ম্মদোষে নারীত্ব হারিয়ে ঐ সূক্ষ্ম সুর শোনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তনের কাহিনী, যেন ঘটনার সঙ্গে ঘটনান্তরের আলাপ। তাই ত, সে অভাগীর মৃত্যুর কথা ত এখনও শুনতে পাওয়া গেল না। প্রধানা কি তাকে বল্লমে বিঁধতে পারলে না? আর তুমি, সুন্দর তুমি, হেঁয়ালি তুমি! দাঁড়িয়েছো কি ঐ প্রাণহীনা প্রেমহীনার বল্লমের মুখে?

(চণ্ডদেবের প্রবেশ)

চণ্ড। পাপিষ্ঠা!

দেব। কি হেতু আমাকে এ নিষ্ঠুর সম্বোধন, রাজা?

চণ্ড। তুই না বলেছিলি, সে নিরস্ত্র, তার হাতে কেবলমাত্র দশটি সুন্দর অঙ্গুলি?

দেব। এখনও ত বলছি, রাজা!

চণ্ড। সে নিরস্ত্র?

দেব। আর আমি উত্তর দেবো না। আমি সৈনিকা। কথায় আমার অবিশ্বাস হয়ে থাকে, এই নাও আমার বল্লম, আমাকে হত্যা কর।

(সুষেণার প্রবেশ)

সুষেণা। ওকে আর প্রশ্ন করো না রাজা, আমি বলছি। সত্যই ছিল সে নিরস্ত্র। আর এই নিষ্ঠুরার হাতে শাণিত বল্লম। সত্যই কখনো ছিল না দয়ার লেশমাত্র এই হৃদয়ে। কিন্তু আজ হ'তে রাজা, এ হাত দিয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী, এমন কি, একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হবে না। আমার দ্বারা আর তোমার কোনও নিষ্ঠুরতার কার্য্য হ'তে পারবে না। সুতরাং এখনি তুমি আমাকে বিনাশ কর।

চণ্ড। বিনাশ তোর হয়ে গেছে সুষেণা। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার বল্, কোন্ অস্ত্রে সে তোর বল্লমকে চূর্ণ ক'রে দিলে।

সুষেণা। বলতে পারব না রাজা। আপনি তা' শোনবার অধিকারী ন'ন। আমি ইউনানী নারী। আপনারই সম্মুখে সদম্ভে নিজের মরণ-গান শুনিয়ে গেছি! এখনি বল্লমে বিঁধে আপনি আমাকে মেরে ফেলুন। আমি সে নারীকে বল্লমের মুখে পেয়েও হত্যা করতে পারিনি।

চণ্ড। মদিরা, দেবসেনা, মদিরা।

দেব। আর পান করবেন না, রাজা।

চণ্ড। দে অশিষ্টা, মদিরা। (দেবসেনা মদিরা-পাত্র চণ্ডদেবকে প্রদান করিল। চণ্ডদেব পাত্র নিঃশেষ করিয়া) এইবারে দে বল্লম। জাতির স্বাধীনতা স্মরণে উৎসব। আমি বিধি লঙ্ঘন করতে পারব না। প্রথা কি বর্ব্বর, কি নিষ্ঠুর, কি নীতিহীন! এখনও কর্ণে ঝঙ্কার! তথাপি—তথাপি—যতক্ষণ থাকবে এ জীবন, আমি বিধি লঙ্ঘন হ'তে দেবো না। দে বল্লম।

দেব। না রাজা, আমি দেবো না।

চণ্ড। সাবধান, অশিষ্টা।

দেব। কিছুতেই দেবো না।

সুষেণা। ধিক্ তোমাকে মরণ-ভীতা। দাও বল্লম রাজার হাতে।

দেব। মূর্খ সৈনিকা, বুঝতে পারছ না? তুমি আমি রাজার লক্ষ্য নই। লক্ষ্য তার নিজের প্রাণ। রাজা আত্মহত্যা করবে।

সুষেণা। তুমি আত্মহত্যা করবে? আমাদের অপরাধে? কেন রাজা? রাজা!

চণ্ড। কে রাজা? এখানে আজ আবার রাজা কে? কোথায় সে শ্যালিকা-ভ্রাতা? যে বিধি লঙ্ঘন করবে, সেই মরবে। দে বল্লম, দে বল্লম।

দেব। দেবো না, কিছুতেই দেবো না।

চণ্ড। এখনো বলছি, দে দেবসেনা।

দেব। বৃথা চেষ্টা, মত্ত রাজা!

চণ্ড। দিবি না? রাজা মত্ত? (এক লম্ফে দেবসেনাকে ধারণ)

দেব। দেখছ কি প্রধানা, ধর ধর—সিংহরাজ মৃগীর গ্রীবা ধারণ করেছে।

(সুষেণা চণ্ডদেবকে ধরিল ও তাঁহাকে বল্লম গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল)

সুষেণা। সত্যই ত দেবসেনা, সিংহের বল।

(চণ্ডদেব দেবসেনার হস্ত হইতে বল্লম গ্রহণ করিল।
সুষেণা তার পদ ধরিয়া বলিল, ক্ষান্ত হও,
রাজা, আত্মহত্যা করো না।)

(নেপথ্যে কোলাহল)

চণ্ড। আত্মহত্যা এ নয় রে অভাগী, এ চণ্ডদেবের রাজত্বের অবসান। তার ঘরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সশস্ত্র প্রহরী থাকতে একটা নীচ শবর, নিরস্ত্র তার কন্যাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেল। ছাড়্, হাত ছাড়্, রূপ-অস্ত্রে পরাজিতা নারী!

সুষেণা। সে আসবে বলেছে রাজা, আসবে বলেছে।

চণ্ড। অভাগী, অভাগী—রূপমুগ্ধা, মন্ত্রমুগ্ধা! চোর সে—সে আসবে, আসবে?

দেব। এসো, কে কোথায় এখানে শক্তিমান, এসো রাজাকে রক্ষা কর, রাজা আত্মহত্যা করে।

চণ্ড। সে আসবে, আসবে? আসতে পারে?

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। আমি এসেছি, রাজা।

(চণ্ডদেব মুখ ফিরাইয়া বিস্মিতনেত্রে কেবল উদয়নের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নেপথ্যে নরনারীগণের আগমনের কোলাহল)

দেব। শুধু দাঁড়িয়ে মুখের পানে চেয়ে থাকলে কি হবে, রাজা! এইবারে বিধি পালন কর।

চণ্ড। ধর, বল্লম।

দেব। না, না, বলপ্রয়োগে তুমি কেড়ে নিয়েছ রাজা! প্রধানা ত্যাগ করেছে, সে আর ধরবে না। আমারও প্রতিজ্ঞা, হস্তচ্যুত বল্লম আর গ্রহণ করব না।

সুষেণা। বেঁধো রাজা, বেঁধো। কি রাজা, কোথায় তোমার সংজ্ঞা? মুগ্ধতায় এই সব অভাগিনী নারীকেও যে তুমি পরাস্ত করলে! তোলো রাজা বল্লম। ধর ওই দস্যুর বুকে। এখনও সে সেইরূপই নিরস্ত্র।

উদ। আমি এসেছি—এসেছি সর্ব্ব অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

(মণ্ডল-প্রমুখ পুরবাসী, মণ্ডল-পত্নী-প্রমুখ
পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

চণ্ড। পুরবাসী, ঐ তোমাদের সম্মুখে তোমাদের মণিমুকুট অপহারী দস্যু। ঐ বল্লম নিয়ে তোমাদের যে কেহ—যে কেহ ওর বক্ষ বিদ্ধ কর। যে কেহ—যে কেহ—বালক-বৃদ্ধ-পঙ্গু-ব্যাধিগ্রস্ত—কোনও আয়াস তোমাদের স্বীকার করতে হবে না।

দেব। নাও—কে নেবে বল্লম—নাও।

ম, প। কেউ নেবে না, দেবসেনা!

চণ্ড। বল্লম ফেলে দিই?

সকলে। ফেলে দাও, রাজা! ফেলে দাও।

(উদ্দালকের বেগে প্রবেশ)

উদ্দা। রাজা! রাজা! অদ্ভুত—অদ্ভুত!

চণ্ড। কি অদ্ভুত, উদ্দালক?

সকলে। কি অদ্ভুত, পুরোহিতপুত্র?

উদ্দা। কি তোমাদের বলব! রাজা, রাজা, সে কি প্রকাণ্ড অদ্ভুত! তোমার কন্যা এক হস্তি-পৃষ্ঠে—সে প্রকার হস্তী—কি বলব রাজা! কি বলব পুরবাসী! এরূপ অপূর্ব্ব পুষ্পদন্ত হস্তী আজও পর্য্যন্ত দেখি নি, রাজা! তার পিঠে না আছে সাজ, না আছে শয্যা—কিন্তু সে কি আশ্চর্য্য গজপতি! তোমার কন্যা নড়েও না, চড়েও না—

চণ্ড। বেঁচে আছে ত, উদ্দালক?

উদ্দা। কি! আমাকে রহস্য করছ রাজা! তোমার কন্যা ম'রে গেলে আমি কি এই তীব্র লম্ফে ছুটে আসতে পারতুম!

(প্রভুগুপ্তের প্রবেশ)

প্রভু। মহারাজ! কোশাম্বীর রাজমাতা উৎসব-মণ্ডপে অতিথি।

চণ্ড। যাও সুষেণা, রাণীকে বল, সংবর্দ্ধনা ক'রে তাঁকে নিয়ে আসতে। (সুষেণার প্রস্থান) প্রভুগুপ্ত! অবন্তীবাসী কি মৃত?

প্রভু। এ উৎসবের অদ্ভুত পরিণাম দেখে, আমার জ্ঞানের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে, রাজা!

চণ্ড। কে ইনি, এইবারে বুঝতে পেরেছ, মণ্ডল-প্রমুখ অবন্তীর পুত্র, কন্যা।

মণ্ডল। আর বলতে হবে না মহারাজ, আমরা ধন্য।

(প্রবরসেনের প্রবেশ)

প্রবর। কোশাম্বীপতি উদয়ন, আমি মালব-রাজপুত্র। রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী, সুতরাং তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী

হ'য়ে আমি এই উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলুম। তোমার অসামান্য পুরুষকারের সম্মুখে শির নত ক'রে আমি তোমার সখার স্থান ভিক্ষা করি।

উদ। এসো সখা, এসো আমার আলিঙ্গন মধ্যে। আমি মনুষ্যত্বের পূজক। তা হ'লে শোনো মহিমান্বিত অবন্তীপতি, আর অবন্তীর মহিমান্বিত পুত্র-কন্যা। যখন আমি এই উৎসবক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করি, তখনও আমি ছিলুম নিরস্ত্র। কিন্তু তখন আমার আয়ত্তে এমন এক অদ্ভুত দৈবশক্তি ছিল, যা প্রয়োগ করলে তোমাদের এই উৎসব-উল্লাস এক মুহূর্ত্তে হাহাকারে পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু এবারে রাজা, সেই শক্তি নিঃশেষে তোমার কন্যাকে দান ক'রে নিঃস্ব হ'য়ে চ'লে এসেছি। এসেছিলুম সত্যই সর্ব্বঅবস্থার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে। আমার সর্ব্বঅনুমান মিথ্যা হ'য়ে গেল! আমার পিতৃরাজ্যজয়ে প্রজাদের সম্মুখে তার উল্লেখের প্রয়োজন হয়েছিল। এখানে তাও আমাকে করতে হ'ল না। যথার্থই এখনও পর্য্যন্ত আমি বর্ব্বর। রাজা, তোমার এবং তোমার সুমুখের এই সকলের মনুষ্যত্বের সম্পর্কে এসে আমি ধন্য।

[চণ্ডদেব ও দেবসেনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চণ্ড। তুইও যা দেবসেনা। বিধি আজ নিজের চলার পথ নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছে। তোদের সঙ্গিনী-সেনাদের শুনিয়ে দে, আজ থেকে আমার শরীর-রক্ষা কার্য্য তোদের শেষ হয়ে গেল। আজ থেকে তোরা অন্য পুরনারীদের ন্যায় অবন্তীর কন্যা—মুক্ত।

[চণ্ডদেবের প্রস্থান।

দেব। মুক্তি—মুক্তি? মন্দ কি! ওগো আমার তুমি! আর তুমি বিষণ্ণ হয়ো না, আজ থেকে আমি মুক্ত।

(গীত)

ভুলো না বীণার তারে বিষাদ ঝঙ্কার আর !
ধর না নয়ন দ্বারে ম্লান ছবি আপনার !
গেয়ো না এমন গান যা এসে মরমে বাজে,
কয়ো না এমন কথা যাহা শুনে মরি লাজে ;
বেছে বেছে হিয়া হ'তে, প্রিয় যা আছে তোমার,
লয়ে এসো, ওগো প্রিয়া, মালাটি র'চ আমার !

শেষ দৃশ্য

মণ্ডপ

উদয়ন ও জয়শ্রী

(চারিদিক বেষ্টন করিয়া প্রভুগুপ্ত,
উদ্দালক ও পৌরবর্গ)

সকলে। নবদম্পতির জয় হোক্।

প্রভু। উদয়নের জয়।

উদ্দা। আমাদের জয়শ্রী বাসবদত্তার জয়। কি কৌশাম্বীপতি উদয়ন, এখনও কি আমরা অপ্রকৃতিস্থ?

উদ। না—না। তোমাদের এ আর্য্যের প্রকৃতি, উদ্দালক! অপ্রকৃতিস্থ হওয়া তোমাদের আজকের একটা লীলা। তোমরা জগৎকে দেখালে, জাতির মুহূর্ত্তের মত্ততাতেও কেমন ক'রে তাদের চোখের উপর দিয়ে জয়শ্রী দেশত্যাগ ক'রে চ'লে যায়।

জয়শ্রী। আবার, জাতি প্রকৃতিস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে, উদয়ন অর্থাৎ নবোদিত সূর্য্যকে সঙ্গে নিয়ে জাতির সেই শ্রী কেমন ক'রে সস্মিতমুখে ফিরে আসে।

(চণ্ডদেব, পুরোহিত, রাণী ও সুমিত্রার প্রবেশ)

চণ্ড। জাতির কল্যাণকামী পুরোহিত, অর্ঘদানে উদয়নকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সুমিত্রা। তৎপূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করি, আপনার এই কন্যা-রত্ন কার হাতে হাত দিয়েছে, রাজা?

চণ্ড। দেবী সুমিত্রা, মনের আবেগে বলা আমার পূর্ব্বকথায় ক্ষুণ্ণ হয়ো না। নবোদিত সূর্য্যের পরিচয় দিতে হয় না। উদয়ই তার পরিচয়। দেবি, কিন্তু তার নাম অদিতিপুত্র আদিত্য। কেউ তাকে কশ্যপপুত্র বলে না। উদয়ন তোমারই পুত্র। শক্তিময়ি, তুমিই তার জীবন রক্ষা করেছ, তুমিই তাকে পালন করেছ, তুমিই তাকে বিশ্বজয়ী হবার শক্তি দিয়েছ। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের উপাধি সৌমিত্রি।

সুমিত্রা। শুনে ধন্য হলুম, মহিমময় রাজা। উদয়ন! যে জন্য তুমি আমাকে কৌশাম্বীতে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর-

তার প্রয়োজন হ'ল না। কৌশাম্বীতে যাবার আমার আর সার্থকতা নাই। ভারতের এক শ্রেষ্ঠ কুলীন রাজার কন্যা—ঐ জীবন্ত পরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে চলেছ। সুতরাং আমার মর্ম্মভাঙা পূর্ব্বস্মৃতির এই বস্ত্রাবরণ আমি তোমার পট্টমহাদেবীকে দান করলুম। ধর মা, কৌশাম্বীর রাজভাণ্ডারে সযত্নে এটিকে রক্ষা ক'র। আমি—আমি—রাজা, এই পবিত্র উজ্জয়িনী-তীর্থে এই মনোহারিণী শিপ্রাতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, শেষ জীবন যাপনের জন্য আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

চণ্ড। আমি ধন্য হব, অবন্তীর পুত্র-কন্যা ধন্য হবে, অবন্তী ধন্য হবে।

রাণী। এসো অবন্তীর শ্রেষ্ঠ কন্যা।

(উদয়ন ও জয়শ্রীকে পুষ্পাদি দ্বারা অভিনন্দিত করিতে করিতে পুরবাসিনীগণের গীত)

মিলন দেখিতে ঐ নিশি আগুয়ান।
ধর গান ধর গান ত্যজি,অভিমান, মান,
অঞ্জলি পূরে দাও প্রকৃতির দান।
দাঁড়ায়েছে বধূ-বর
আলো করি বন-ঘর
কারে রেখে কারে দেখি সমানে সমান।
পিকতান-মুখর বিতান
ফুলবাণ তুলেছে নিশান.
চঞ্চল দিবসের ধীর অবসান॥

যবনিকা-পতন

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অভিনয়ের সৌকর্য্য ও সময়সংক্ষেপের জন্য স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী বীর যুবকদ্বয়

(যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেব)

কে বলে বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ?—
জীবনের মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
যথা অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করি—
পশিলা সমরে বীরের মতন!

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ একবার?
মাতঙ্গের প্রায় জনতার মাঝে,—
দুইটি যুবক কি অকুতোভয়ে,
যুঝিছে সদর্পে স্বজাতির কাযে!

অসহায় যত পল্লীবাসিগণ
ভয়ে ভীত সব শত্রু-আক্রমণে,
বাঁচাতে তাদের ধন-মান-প্রাণ
কি বীরত্ব আজ দেখাইলা রণে!

হাজার হাজার উত্তেজিত লোক
তাড়াইলা সব লাঠির আঘাতে,
নিরখি সকলে স্তম্ভিত অবাক্,
পরাজিত সবে এ দোঁহার হাতে?

এ বীরত্ব-কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখি
রাখিবে নিশ্চয় ভাবী বংশধর,
চন্দ্রকান্ত আর যতীনের খ্যাতি—
গাইবে সকলে যুগযুগান্তর!

যুবকের রক্তে সঞ্চারিবে শক্তি
বাঙ্গালীর দেহে—শিরায় শিরায়,
দেখুক জগৎ বাঙ্গালী-বীরত্ব
কেশরীর বল যুবকের গায়!

হে বঙ্গজননি—রত্নগর্ভা তুমি
ধরিয়া উদরে এ হেন সন্তান,
মুছে ফেল মা গো নয়নের জল
পুত্রশোকে কেন এত ম্রিয়মাণ?

ভীরু কাপুরুষ নহে এ বাঙ্গালী
দেশের কাযেতে করি আত্মদান
চিরস্মরণীয় হইলা জগতে
বাড়ালে দেশের কতই সম্মান?

দুর্ব্বল বাঙ্গালী—এ ঘোর কলঙ্ক
ঘুচালে যতীন্দ্র চন্দ্রকান্ত আজ,
মরিয়া অমর হইলা এ ভবে
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি ধরামাঝ!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

বৈজ্ঞানিক
প্রসঙ্গ

(১) হীরা কাটা

হল্যাণ্ডের এম্ষ্টার্ডাম নগর আকরোথ হীরা কাটার নৈপুণ্যের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ। খনিজাত হীরা অসমান থাকে; তখন তাহার কিছুই সৌন্দর্য্য থাকে না; হীরার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় পল তুলিয়া কাটাতে। কিন্তু পল তোলারও বহুপ্রকার প্যাটার্ণ আছে, কোনটি চৌপলা, কোনটি বা অষ্টদল ইত্যাদি আকৃতিতে কাটা হয়। কোন্ হীরাটিকে কি আকৃতিতে কাটিলে তাহার শ্রী খুলিবে, বিচক্ষণ জহুরী তাহা বিচার করে। যদি বিচারে একটু ভুল হয়, যদি কাটিতে একটু খুঁৎ হয়, তবে হাজার হাজার বা লক্ষ টাকাই ক্ষতি হইতে পারে; তাই হীরা কাটা বিলক্ষণ কঠিন বিদ্যা।

হীরক কাটিয়া ছাঁটিয়া ব্যবহারোপযোগী করিবার পূর্ব্বে চিহ্নিত করা হইতেছে

বহুকালের কায়মনের নিবিষ্ট সাধনায় এই বিদ্যায় যাহারা নিপুণতা অর্জ্জন করে, তাহাদের হাতেই দামী হীরা কাটিবার ভার দেওয়া হয়। অনেক সময় বড় হীরার মধ্যে এমন সব খুঁৎ থাকে যে, তাহাকে নিখুঁৎ করিবার জন্য কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া ফেলিতে হয়। প্রসিদ্ধ কোহিনূর হীরা যখন মুসলমান সম্রাটের মুকুট হইতে খসাইয়া ইংরাজ সম্রাটের মুকুটে বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন সেটিকে কাটিয়া সংস্কার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। হীরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন পদার্থ; সুতরাং হীরা কিছুতেই কাটে না; তাই হীরাকে কাটা হয় হীরা দিয়া; গোল দাঁতহীন করাতের উপর হীরার গুঁড়া তেল দিয়া মাখিয়া হীরা কাটিতে হয়। হীরা কাটার সময় হীরার সমস্ত কিছুই

ঘূর্ণ্যমান চক্রযন্ত্রে হীরক ছাঁটা হইতেছে

হীরকের দ্বারা হীরক কর্ত্তিত হইতেছে

কর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ধারকযন্ত্রে হীরক

যন্ত্র-সাহায্যে হীরকের ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি

যে খুব যত্ন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য— হীরার গুঁড়া পর্য্যন্ত কুড়াইয়া রাখা হয় অপর হীরা কাটিবার জন্য। অগ্রে হীরার গায়েই তেল আর হীরার গুঁড়া মাখাইয়া সেই হীরা দিয়া ধীরে ধীরে ধৈর্য্য সহকারে ঘষিয়া ঘষিয়া অপর হীরা কাটা হইত; এখন করাত প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু হীরার গুঁড়ার সাহায্য ছাড়া হীরা কাটিতে পারে, এমন অস্ত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

হীরাকাটার ক্রম এইরূপ,—প্রথমে খনিজ হীরার এবড়ো-খাবড়ো আকৃতির ভিতর হইতে কয়টি সুদৃশ্য নিখুঁৎ আকৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া হীরাটিকে কাটিয়া তত খণ্ড করা হয়, তাহার পর সেই খণ্ডগুলি কাটিয়া ছোলং আকার বা চৌপল করা হয়, তাহার পর আট-পলা করিয়া কাটা হয়। যত বেশী পল তোলা হয়, কারিগরকে তত সাবধান হইতে হয়, একটু হাত কাঁপিয়া গেলেই সমস্ত হীরাটি নষ্টশ্রী হইয়া যাইতে পারে। অতি সাবধানে ধৈর্য্যের সহিত কায করিতে হয় বলিয়া একটি হীরা কাটিতেই অনেক দিন লাগে।

হীরা কাটিতে খনিজ হীরার ওজন শতকরা ষাট ভাগ কমিয়া যায়। হীরার আকার বা ওজনেই তাহার মূল্যাধিক্য নির্ভর করে না, হীরার জল (উজ্জ্বলতা) ও নিখুঁৎ কাটাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহত্ত্ব

কমল কহে 'মৃণালে কাঁটা'
বলুক সর্ব্বজন,
তথাপি আমি সুবাস সবে
করিব বিতরণ।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

জাতিতত্ত্ব প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর *

'মাসিক বসুমতীর' মাঘ সংখ্যায় জাতিতত্ত্বের দ্বিতীয়াংশ এবং শ্রীযুত ভবতারণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্নকৃত প্রথমাংশের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল। যদিও আমি প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছি—পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাহির না হইলে কেহ প্রতিবাদ করিবেন না এবং আমি অসার প্রতিবাদের উত্তর দিব না, তথাপি বিদ্যারত্ন মহাশয় ততটা সময় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যখন প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন অগত্যা আমাকে তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল।

প্রতিবাদ ঃ—বৈদ্যরা কোনও স্থলেই ব্রাহ্মণজাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমান বা কুৎসা রটনা করেন না……।

উত্তর ঃ—তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের কুৎসা রটনা করেন না, শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু 'বৈদ্যপ্রবোধনীতে' (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে, "দ্বিজাতিদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এবং "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-নামের অনধিকারী।"—এ সকল কথা কি ব্রাহ্মণজাতির ও প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমানসূচক নহে? মহাভারতের যে দুইটি বচন তুলিয়া ঐরূপ অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা ঐ মাঘ সংখ্যাতেই মূল প্রবন্ধের ৫ নম্বরে দেখুন।

ভট্টাচার্য্য উপাধি দেখিয়া প্রতিবাদকারী মহাশয়কে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু 'বৈদ্য-প্রবোধনীর' ঐরূপ উক্তিতে তিনি যখন স্বাবমাননা বোধ না করিয়া, তাহার স্বপক্ষে থাকিয়া, আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন মনে হইতেছে—তিনি হয় ত বৈদ্য, ('বৈদ্যপ্রবোধনীতে' বৈদ্যদিগের ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রদর্শিত হইয়াছে—৭ পৃঃ)।

'বৈদ্য-প্রবোধনীতে' বৈদ্যগণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য বলা হইলেও বিদ্যারত্ন মহাশয় এখন ব্রাহ্মণজাতিকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া সে কথাটা চাপা দিতে প্রয়াসী হইতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রতিঃ—বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন "অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য"……।

উ ঃ—"অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য" নাম দিয়াছি, বিদ্যারত্ন মহাশয় কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন? আমি ত "অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য" নাম দিয়াছি। "বৈদ্য-প্রবোধনীতে' (২২ পৃঃ) "বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" ইত্যাদি লিখিত হওয়ায় বৈদ্য শব্দের শাস্ত্রোক্ত অর্থ দেখাইয়াছি।

প্রতি ঃ—লেখক কটিদেশে উপবীতধারী বৈদ্য কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই…।

উ ঃ—৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যগণকে কোমরে পইতা রাখিতে, কেবল আমি নহি—সকলেই সর্ব্বত্র দেখিয়াছেন বলিয়া অনাবশ্যকবোধে, কোথায় দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করি নাই। কটিদেশে যজ্ঞোপবীত রাখা অবিহিত হইলেও তাঁহারা কেন রাখিতেন, তাহা ১১ নম্বরে দেখিতে পাইবেন।

প্রতিঃ—বৈদ্যজাতির আভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কার ও উন্নতিতে ব্রাহ্মণজাতির কোনও ক্ষতি আছে কি?

উ ঃ—কোনও ক্ষতিই থাকিত না, যদি তাঁহারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে "ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" না বলিয়া অন্য উপায়ে আপনাদের সমাজ-সংস্কারে ও উন্নতিসাধনে সযত্ন হইতেন।

প্রতি ঃ—মনু কোথাও বলেন নাই যে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর। অনুলোমবিবাহজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায় না। মনু-বচনে স্পষ্ট আছে,—"ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্…।" মোট কথা, অবৈধ সন্তানই বর্ণসঙ্কর বা নিকৃষ্ট (সঙ্কর = নিকৃষ্ট, মিশ্রণ নহে)।

উ ঃ—বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি অমরকোষে শূদ্রবর্গের প্রথম শ্লোকটাও দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—বিলোমজাত অবৈধ সন্তানের ন্যায় অনুলোমজাত বৈধ সন্তানও বর্ণসঙ্কর। যথা—"আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ" (এই বর্গে অম্বষ্ঠ ও করণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে সকল জাতি উক্ত হইবে, তাহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর)। যে কোনও একখানা বাঙ্গালা অভিধানে সঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থ দেখিলেও তিনি উহা জানিতে পারিতেন। "মনু অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বলেন নাই", ইহা কি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত কথা হইয়াছে? অসবর্ণ-স্ত্রী-পুরুষজাত সন্তান যে বর্ণসঙ্কর, এ কথা বলিবার প্রয়োজনই নাই; তথাপি মনু স্পষ্ট করিয়া "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" হইতে "নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্" পর্য্যন্ত বলিয়া, পরে বলিয়াছেন, "সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ" বর্ণসঙ্কর বিষয়ে মাতাপিতার নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সকল জাতি বলা হইল (১০।৮—৪০)। "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি বচনের অর্থ—(অসবর্ণ-স্ত্রী পুরুষজাত সন্তান ত বর্ণসঙ্কর হয়-ই, পরন্ত) সবর্ণের মধ্যেও ব্যভিচারে, সগোত্রাদি অবিবাহ্যার বিবাহে এবং উপনয়নাদি স্বকর্ম্ম পরিত্যাগের পরে যে সকল সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহারাও বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য। বিদ্যারত্ন মহাশয়কেও যে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইল, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সবিস্তর বিবরণ তিনি প্রবন্ধমধ্যেই দেখিতে পাইবেন। এ স্থলে আর একটা কথাও বক্তব্য—'বৈদ্য-হিতৈষিণী' প্রভৃতিতে দেখা যায়, এক্ষণে অনেক বৈদ্যসন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন: সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি বচনটিকে বর্ণসঙ্করত্বের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বহু অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব সুপ্রতিপন্নই হইতেছে।

সঙ্কর শব্দের অর্থ যে নিকৃষ্ট, তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সঙ্কর শব্দ বিশেষ্য, নিকৃষ্ট শব্দ বিশেষণ; সুতরাং সঙ্করের অর্থ নিকৃষ্ট হইতেই পারে না, ইহা বালকরাও জানে। অবৈধ সন্তানই যদি বর্ণনিকৃষ্ট, তবে মনু অনুলোমজাত বৈধ সন্তানদিগকেও অপসদ (নিকৃষ্ট) এবং বিলোমজাত অবৈধ সন্তানদিগকে অপধ্বংসজ (অধম) বলিয়াছেন কেন? (১০।১০ ও ৪৬)।

প্রতি ঃ—(বিদ্যা + অণ্ = বৈদ্য ও বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য) এ স্থলে দুইটি মত উল্লিখিত হইয়াছে; একটি পাণিনির মত, অপরটি অন্য ব্যাকরণের মত। ষ্ণ ও ষ্ণ্য প্রত্যয় পাণিনির ব্যাকরণে নাই, তাহাও কি সমালোচকের জানা নাই?

উ ঃ—জানা না থাকার কি পরিচয়টা লেখক পাইয়াছেন? 'প্রবোধনী'-লেখক "মতান্তরে বেদ + ষ্ণ্য → বৈদ্য" লিখিয়াছেন বলিয়া আমি লিখিয়াছি—"উক্ত অর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই।" কোন্ অন্য ব্যাকরণের মতে বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য হয়, বলুন ত?

প্রতিঃ—বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "বেদজ্ঞ বা

---

* প্রতিবাদের উত্তরটি বহু দিন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে অনেক দিন বিলম্ব হইল।—মাঃ বসুঃ সঃ।

বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই।" যে বাক্যটি দেখিয়া বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পিত্ত চটিয়াছে, সেই মহাভারতের বাক্য—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" কালী সিংহের মহাভারতে বিশ জন পণ্ডিত উহার অনুবাদ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ মহাপুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ।" যে কোনও সংস্কৃত অভিধান খুঁজিয়া দেখুন, বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত অর্থের সহিত চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে। ...শব্দকল্পদ্রুম কি বলিতেছেন দেখুন—"বৈদ্যঃ পণ্ডিতঃ। যথা কাত্যায়নঃ—নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।" যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি (পণ্ডা + ইতচ্) আছে, সেই ত পণ্ডিত ?

উঃ—নীলকণ্ঠের টীকায় আছে "বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ" (৫ নং দেখুন)। মহাভারতের অনুবাদক বিশ জন কেন—শতাধিক পণ্ডিত অপেক্ষাও নীলকণ্ঠের প্রামাণ্য যে অধিক, তাহাও কি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে ?

কালী সিংহের অনুবাদ এবং শব্দকল্পদ্রুমের অর্থই যদি অধিকতর প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় একচক্ষু হইয়া, বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের জন্য 'বৈদ্যপ্রবোধনী'-লেখকের কৃত উক্ত মহাভারতীয় শ্লোকের "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এই অনুবাদে এবং উক্ত কাত্যায়নবচনের "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না" এইরূপ ব্যাখ্যায় (৫ নং দেখুন) দোষদর্শী না হইয়া আমার লেখাতেই খরদৃষ্টি হইয়াছেন কেন ?

অমরকোষাদি কোন্ সংস্কৃত অভিধানে বৈদ্য শব্দের "বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত ও চিকিৎসক" অর্থ পাশাপাশি আছে ? বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার "সংস্কৃত অভিধান—শব্দকল্পদ্রুম" হইতে বৈদ্য শব্দের যে অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ত 'পণ্ডিতঃ'ই আছে, বেদজ্ঞ নাই। উদ্ধৃত কাত্যায়নবচনটি মাত্র তুলিয়াই বিদ্যারত্ন মহাশয় হাত গুটাইয়াছেন কেন ? উহার পরেই রহিয়াছে "বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্" অর্থাৎ কাত্যায়নবচনস্থ বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান্ (কাত্যায়নবচনের বিশদ ব্যাখ্যা ৫ নম্বরে দেখুন)। এতাবতা শব্দকল্পদ্রুম 'বিদ্বান্' অর্থেই 'পণ্ডিত' লিখিয়াছেন, বেদজ্ঞ অর্থে লিখেন নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ৬ নম্বরে আমি বৈদ্য শব্দের বহু প্রয়োগ ও টীকা উদ্ধৃত করিয়াছি ; কোনও টীকাকারই কুত্রাপি বৈদ্য শব্দের 'বেদজ্ঞ' অর্থ করেন নাই।

পণ্ডা শব্দের অর্থ 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি' এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থ 'বেদজ্ঞ'—কোনও অভিধানে এবং অন্য কোনও শাস্ত্রে দেখাইতে পারেন কি ? সর্ব্বসংগ্রহকারক শব্দকল্পদ্রুমেও ত দেখা যায়—

"**পণ্ডা**—বুদ্ধিঃ ইতি মেদিনী। তত্ত্বানুগা বুদ্ধিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ।

পণ্ডিতঃ—পণ্ডা বুদ্ধিঃ, সা জাতা অস্য। শাস্ত্রজ্ঞঃ।...যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ইতি মহাভারতে বনপর্ব্ব।...শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্। তৎপর্য্যায়ঃ—বিদ্বান্, বিপশ্চিৎ...ইত্যমরঃ। বিধিজ্ঞঃ, দূরদৃক্, বেদী...ইতি শব্দরত্নাবলী। বিজ্ঞঃ, মেধাবী ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।" (বিদ্যারত্ন মহাশয় 'বেদী'র অর্থও যেন বেদজ্ঞ' মনে না করেন ; যেহেতু শব্দকল্পদ্রুমেই আছে—

"**বেদী**—পণ্ডিতঃ। ব্রহ্ম ইতি কেচিৎ। জ্ঞাতরি।)"

সকলেই জানেন—বেদ ভিন্ন বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাকে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলা যায়।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর দ্বারা দেখা যাইতেছে, পণ্ডা শব্দের অর্থ কেবলই বুদ্ধি (জ্ঞান)। পাণিনীয় উণাদি বৃত্তিতেও আছে "পণ্ডা বুদ্ধিঃ।" যাঁহার বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্য প্রভৃতির কোনও একটা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই পণ্ডিত শব্দের ব্যুৎপত্তিতে—পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, স্মৃত্যুজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, তন্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বা কাব্যোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ ইত্যাদি বলিতে হয়।

প্রঃ—মহাভারতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই ঋষি বাক্য শুনিয়াও বিদ্যাবারিধি মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন...।

উঃ—বিচলিত হইয়াছি বটে ; কিন্তু ঐ ঋষিবাক্য শুনিয়া ও দেখিয়া হই নাই ; যেহেতু উহার প্রকৃত অর্থ ৫ নম্বরে দেখাইয়াছি। 'বৈদ্যপ্রবোধনী'-লেখক উহার অপব্যাখ্যা করিয়া অসঙ্কোচে তাহা প্রচার ও তদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করায় এবং বিদ্যারত্ন মহাশয় কালী সিংহের অনুবাদকেও প্রমাণ বলায়, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দর্শনে বিচলিত হইয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য—অন্যের কৃত এরূপ আমার প্রতিবাদের উত্তর লিখিয়া নিজের সময় এবং 'বসুমতী'র স্থান আর বৃথা নষ্ট করিব না। এখন আমার এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'বৈদ্যপ্রবোধনী'-লেখকের স্বনামাঙ্কিত স্বয়ংকৃত প্রতিবাদ এবং বৈদ্যকুল-প্রদীপ—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ এম-বি মহোদয় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন শর্ম্মা, সরস্বতী এম-এ এল্-এম্-এস্ মহোদয়ের অভিমত সাদরে ও সাগ্রহে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

বরষায়

এস ঘন শীতল এলায়িত কুন্তল
শ্যাম বরষা !
তব স্নেহ বিনা হায় ধরণী মূরছি পায়
মরণ দশা !
গ্রীষ্ম দাহন পর
পীযুষে বিরাম কর,
বিহ্বল চরাচর—
কর সরসা।

স্নিগ্ধ সমীর আসি বাজাল আশার বাঁশী
কাজল মেঘে—
দিগন্ত এস ঢাকি' জুড়াক তাপিত আঁখি
মূরতি দেখে !
পরশি সলিল-কণা
ফিরে যেন সুচেতনা,
ঢাল সুধা সান্ত্বনা—
প্রাণ-পরশা !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাবনায় তাণ্ডবলীলা

লর্ড অলিভিয়ার 'টাইম্‌স্' পত্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও সংঘর্ষ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা ভারতের বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ভারতে বৃটিশ চাকুরীয়ারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতিতা করিয়া থাকেন। ইহার দুইটি কারণ আছে:—(১) মুসলমানদের প্রতি তাঁহাদের নানা বিষয়ে সহানুভূতি থাকিবার কথা, (২) হিন্দু জাতীয়তা আন্দোলনের বিপক্ষে মুসলমানের প্রতি তাঁহাদের অধিক ঝোঁক থাকিবার কথা, কেন না, মুসলমানের দিকে এই ঝোঁক থাকে বলিয়া হিন্দু জাতীয়তার প্রভাবের শক্তি অনেকটা হ্রাস হয়।" লর্ড অলিভিয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সচিব ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মুখে এই কথার বিশেষ মূল্য আছে, ইহা হিন্দু চরমপন্থীর কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দিনে লর্ড অলিভিয়ারের মুখে এমন কথা ভারতীয় ব্যুরোক্রেশীর পক্ষে কিরূপ কলঙ্কজনক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। কলিকাতার দাঙ্গার ও পাবনা অঞ্চলের মুসলমানের জেহাদের মূল কি তাহা হইলে এই উক্তিতে খুঁজিয়া লইতে হইবে? অনেকের অভিমত—দাঙ্গার প্রথম মুখে সরকারপক্ষ যদি বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে দাঙ্গা এত ভীষণ হইত না, অথবা এত দূর গড়াইত না। কেন তখন সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই, তাহা ব্যুরোক্রেশীই বলিতে পারেন। বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র কলিকাতার দাঙ্গায় লর্ড লিটনের অকর্ম্মণ্যতার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। অবশ্য লর্ড বার্কেণহেড (বর্ত্তমান ভারত সচিব) তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম মুখে যে লর্ড লিটন গ্রীষ্মাবাস হইতে কলিকাতায় আসা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, এ কথা ত লর্ড বার্কেণহেড অস্বীকার করিতে পারেন না। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার উপস্থিতি যে দাঙ্গার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা সকলেই বলিবে। ব্যাপার দেখিয়া লর্ড অলিভিয়ারের উক্তি যদি কেহ সত্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় কি ?

পাবনার ব্যাপার দেখিয়া এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে যে, লর্ড অলিভিয়ারের উক্তি একবারে ভিত্তিহীন নহে। যদিও এখন সরকারী কর্ম্মচারীরা পাবনায় মুসলমান অত্যাচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং শান্তিস্থাপনে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু মুসলমান অভ্যুত্থানের প্রথম মুখে পাবনায় যে অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল—পাবনায় যে মোপলা দেশের মত বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনেকের ভ্রম হইয়াছিল, পরন্তু মুসলমান গুণ্ডারা দলবদ্ধ হইয়া সংখ্যায় অল্প নিরীহ হিন্দু অধিবাসিগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

সে কি ভীষণ অবস্থা! মনে হইয়াছিল, বুঝি সত্যই পাবনায় মুসলমানরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম লুঠ, হাটের পর হাট লুঠ, হিন্দু অধিবাসিগণের ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া পলায়ন, হিন্দু-নারীদিগের সতীত্বরক্ষার্থ—মান-মর্য্যাদারক্ষার্থ জঙ্গলে ও পাটের ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ,—ইহা ইংরাজ রাজত্বে সম্ভবপর, স্বপ্নেও কি কেহ মনে করিয়াছিল ? হাজার দেড় হাজার মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল, সম্ভ্রান্ত ধনবান্ হিন্দু গৃহস্থের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল, অনাচার-অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিল,—এ সকল ত সমস্ত দেশীয় দৈনিক সংবাদপত্রেই প্রকাশ। যদিই বা এ সকল সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ত সরকারী ইস্তাহারে অবিশ্বাস করা যায় না। সে ইস্তাহারেও মুসলমানের অত্যাচার, হাট লুঠ, হিন্দুর সর্ব্বনাশসাধন,—কত কথাই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ ইস্তাহারেই প্রকাশ, ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত লুণ্ঠন অপরাধে ১ শত ১০ জন মুসলমান ধৃত হইয়াছে। পরন্তু ৬ই জুলাইয়ের ইস্তাহারে প্রকাশ, সুজানগর হাট লুঠ সম্পর্কে চর তারাপুরে দুর্ব্বৃত্তগণকে ধরিতে গেলে এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পুলিসকে বাধ্য হইয়া গুলী চালাইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ মুসলমানদের এত বুক বলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা পুলিসের কর্ত্তব্যপালনেও বাধা দিয়াছিল।

সংবাদপত্রে এমনও প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাবনার সরকারী প্রধান কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ মুসলমান জনতার ক্রোধশান্তির জন্য যোড়হস্তে কাতর আবেদন করিয়াছিলেন, নতজানু হইয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই। আরও প্রকাশ, প্রথমাবস্থায় নিপীড়িত হিন্দুরা প্রতীকার চাহিয়াও পায় নাই। এ সকল জনরব সত্য কি না, সরকারপক্ষ ঘোষণার দ্বারা এ যাবৎ প্রকাশ করেন নাই। আশা করি, যথাকালে ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

কিন্তু এ সকল জনরবের কথা বাদ দিলেও সরকারী ঘোষণাপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। পাবনার লোকসংখ্যার শতকরা ৭৯ জন মুসলমান। তাহারা দল বাঁধিয়া হিন্দুদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে—তাহাও এক স্থানে নহে, নানা স্থানে, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গ প্লাবনে হিন্দুদের নিকট দরিদ্র বিপন্ন মুসলমান কিরূপ সাহায্য পাইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিদ্বেষের ফলে পাবনার মুসলমানরা সে কথা ভুলিয়া গিয়া যে অমানুষিক অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার মূল কোথায় ? লর্ড অলিভিয়ার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার কোনও সংস্রব আছে কি না, লর্ড অলিভিয়ারই বলিতে পারেন। এখন এ দেশের আমলাতন্ত্র কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ষিত পাবনাবাসী হিন্দুকে রক্ষা করিয়া এবং দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারী মুসলমানদিগের কঠোর দণ্ডবিধান করিয়া সেই কলঙ্ক অপনোদনে যত্নবান্ হইলে লর্ড অলিভিয়ারের ন্যায় অপর কাহারও এ কলঙ্ক রটনার সুযোগ থাকিবে না।

মিলন

ভুবনে যা কিছু নিরখি সকলি
মিলনের কথা প্রকাশে
কুসুম-গন্ধ মিশিছে সমীরে
শব্দ মিশিছে আকাশে।

তটিনী ছুটিয়া লুটিছে সাগরে
ভক্তি হরির চরণে।
আঁধার মিশিছে আলোকের কোলে
জীবন মিশিছে মরণে।

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

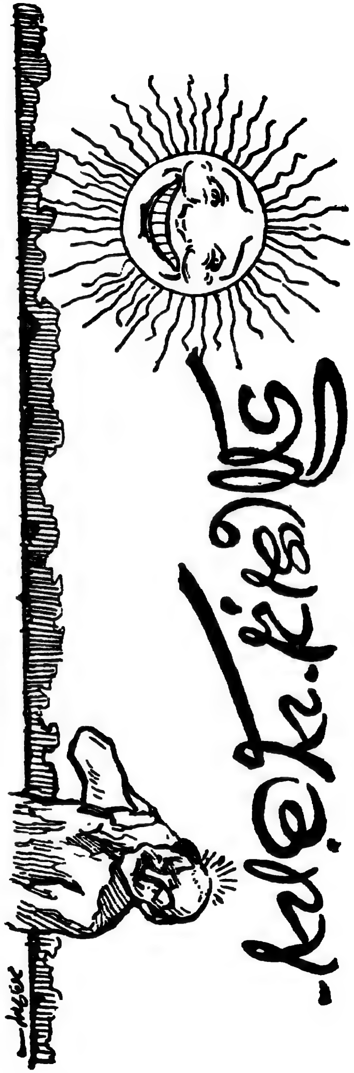

রূপের গরম—

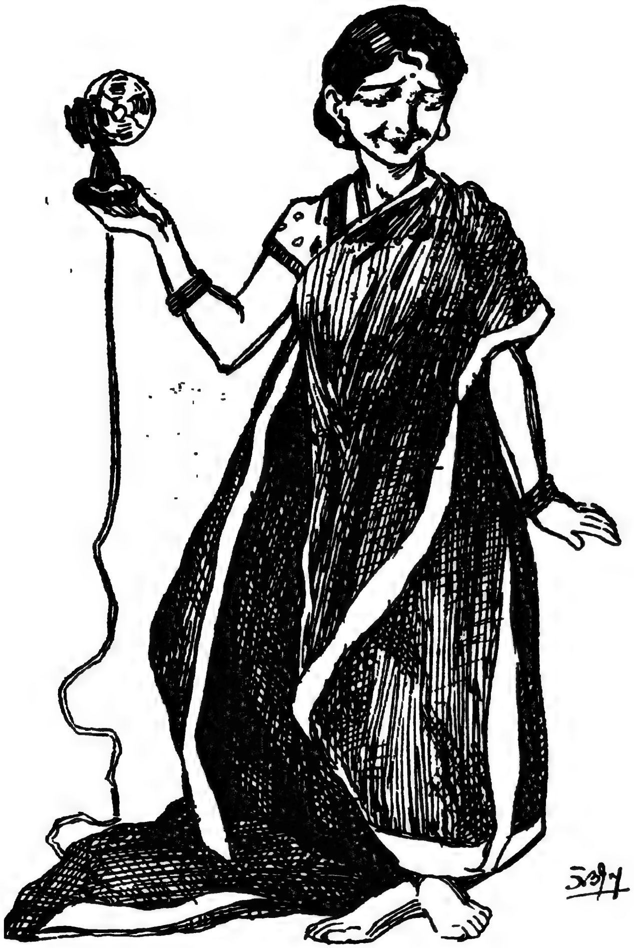

মুখের কাছে ধর্‌ছি পাখা, তবু যে গো ঘামি,
অলক তিলক নষ্ট—হ্যাঁ গা কাঁদ্‌বো না কি আমি !

গিন্নীপ রম

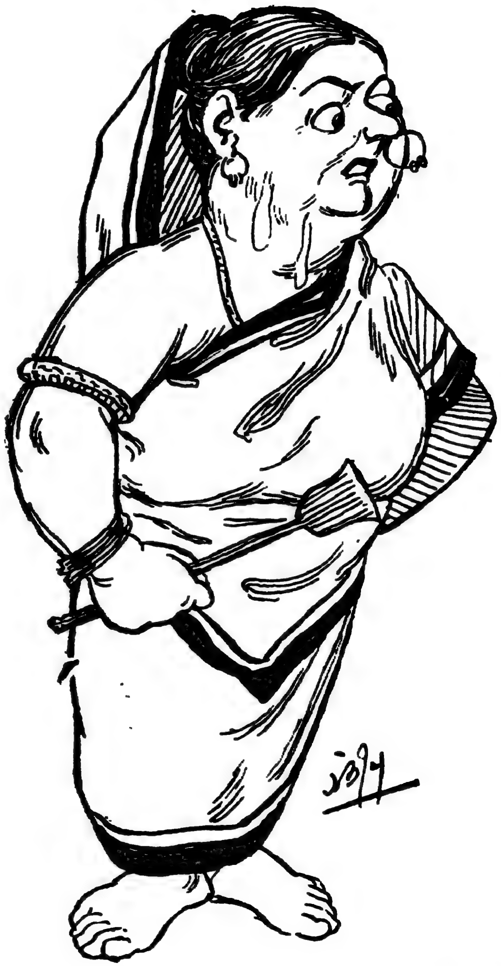

আমায় শেখায় গিন্নীপনা, বাঁদীর বেটি বাঁদী,
আমার বৌকে আমি মারি, তোর কি হারামজাদি

নেশার গরম—

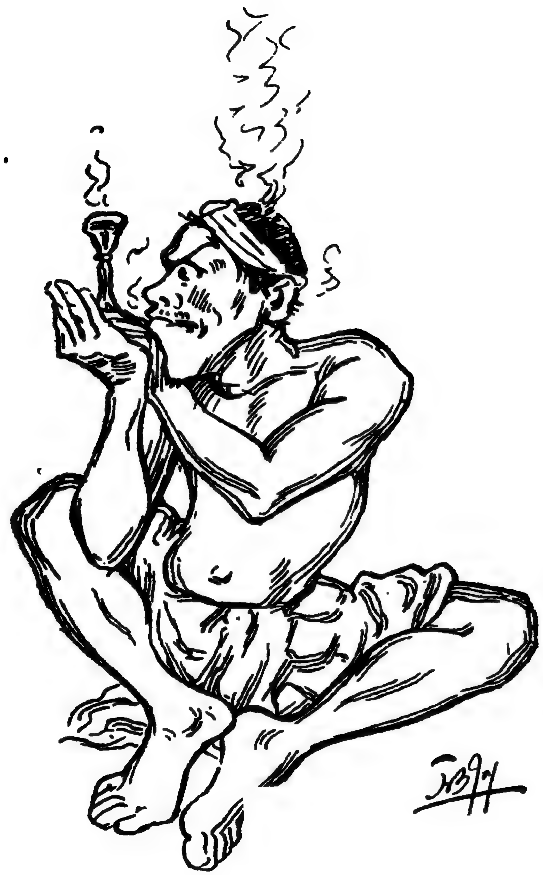

প্রাণ করি, গাঁজায় লাগাই দম,
ব্রহ্মরন্ধ্রে ধুঁয়া—হর-হর বম্-বম।

বিদ্যার গরম—

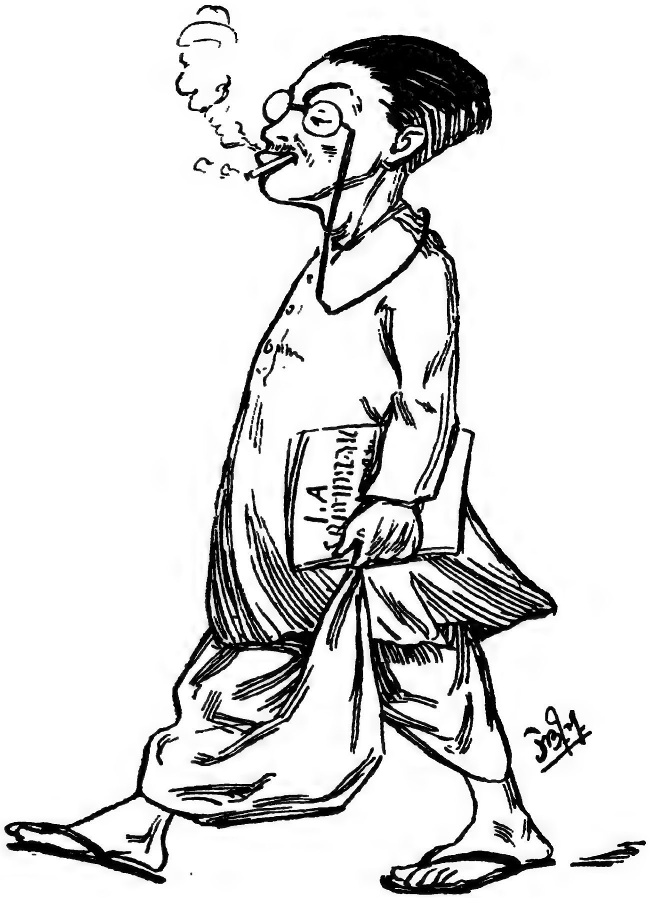

যত ছিল বিদ্যা, আমি সব পূরেছি পেটে,
বিদ্যার ধূম বেরোয় আমার মুখের সিগারেটে।

হাকিমী গরম

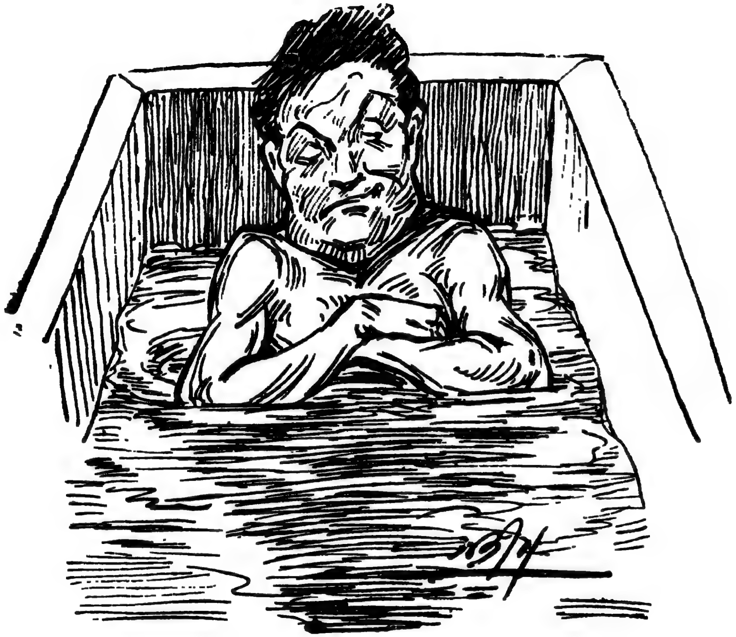

হোল্ ডে কাছারী ক'রে বাড়ী ফিরে জজ,
লাঙ্গা ধড়ে হৌজে পোড়ে বিচার করছেন কজ

কুড়ের গরম

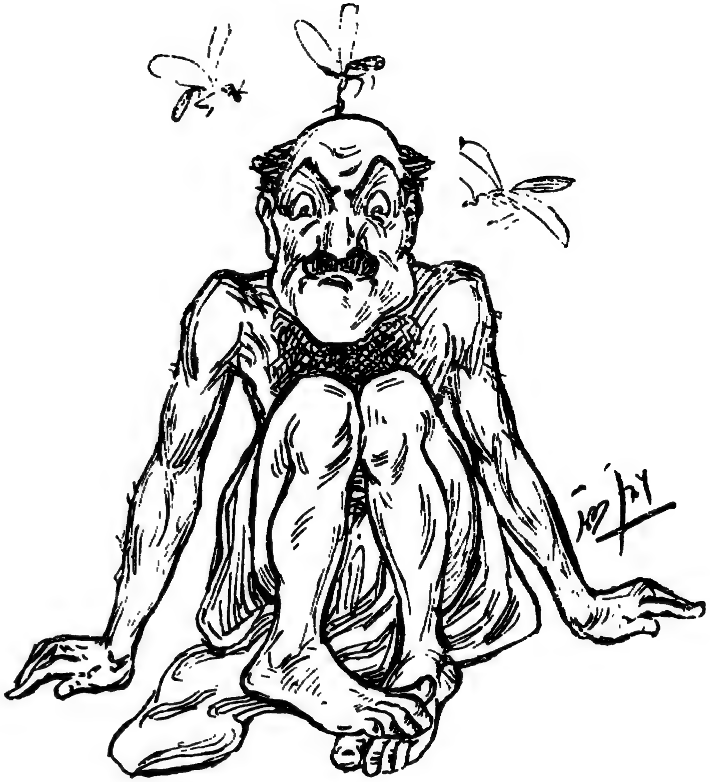

এই গরমে মাছি তাড়াতে ল্যাজ দেন নি বিধি,
হাঁটু মুড়ে হদ্দ কুড়ে ঐ ভাবছেন গুণনিধি।

পুরাণে আয়ুষ্কাল

কর্ম্মবহুল বৈজ্ঞানিক যুগ অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারবার্ত্তা বিঘোষণ পূর্ব্বক দিগন্ত আলোড়িত করিতেছে। বিজ্ঞানের নবসম্পদ্, শিল্পকলা ও সাহিত্য মানব-জীবনকে নিত্য নূতন লালসায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। এই উন্মাদনার যুগে আমরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া "সম্মুখে" ছুটিয়া চলিয়াছি; ক্ষণকালের জন্য আজ একবার "পশ্চাতে" ফিরিয়া দেখিতে চাই, কত দূর আসিয়াছি, বা সুপথে চলিতেছি কি না? আমরা আজ "নবীন" দৃষ্টিতে সেই "সুপ্রাচীন" ভারতীয় চিত্রফলকের একাংশ বুঝিয়া লইতে চাই। সূত-শৌনকের কথাপ্রসঙ্গে, শুকদেব-পরীক্ষিতের তত্ত্বালোচনায় বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতের যে সকল নয়নাভিরাম বিচিত্র আলেখ্য অধুনা পুরাণ-সাহিত্যরূপে আমাদের স্থূল-দৃষ্টির গোচর হইতেছে, তাহার অংশবিশেষের উপর বৈজ্ঞানিক আলোকরেখা নিপতিত হইয়া তদীয় সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলি আমাদের নিকট সম্যক্ প্রতিভাত হউক, ইহাই একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কার্য্যকরী হউক বা নাই হউক, ইহা অন্ততঃ দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"পুরাণ" শব্দটি শ্রুতিগোচর হইবামাত্র অনেকের মনেই কতকগুলি ঘোরতর সামঞ্জস্যহীন বা অপ্রাকৃত বিষয়ের কথা উদিত হয়। তাঁহারা কতকগুলি বৃত্তান্ত এতই অনৈসর্গিক মনে করেন যে, উহা বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা করেন না। যে অগস্ত্যমুনি এক গণ্ডূষে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ম কোনও জীবগর্ভে নহে, কুম্ভের মধ্যে; তাই তিনি "কুম্ভসম্ভব।" এক দিন মনুর নাসিকাবিবর হইতে সহসা এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, সে সন্তান স্বয়ং ইক্ষাকু—রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। এতাদৃশ বর্ণনা এবং শুকদেব, ঔর্ব্ব, দ্রোণ, কৃপ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম প্রভৃতি অদ্ভুত উপাখ্যান পুরাণে দুই দশটি নহে, বহুতরই আছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে বাস্তবিকই ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস নষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ বিস্ময়কর আখ্যায়িকা-নিচয়ের নানাবিধ ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা অধুনা বিবিধ উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রত্যেক দেশেই সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন,—"যাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছ, তাহার মধ্যেও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, উহা বুঝা সহজ নহে; ভক্তিভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর, সময়ে বুঝিতে পারিবে।" পুরাণ শাস্ত্রকে তাঁহারা 'রহস্যবাদ' (Mysticism)এর লীলা-নিকেতন করিতে চাহেন। অপর এক দলের সরল বিশ্বাস, পুরাণ—শাস্ত্র; সুতরাং তাঁহাদের পুরাণে অচলা ভক্তি। তাঁহারা বলেন যে, পুরাণ—ঋষিবাক্য এবং উহার সমস্ত বর্ণই সত্য, ইত্যাদি। সে যাহাই হউক না কেন, আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই; এ সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন বলিবেন, তাহার প্রতিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

পুরাণে আমরা বহু ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য পাইয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণকে একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া চলিবে না। বিরাট্ সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পুরাণ বড় অল্প স্থান অধিকার করে নাই। বহুকাল যাবৎ এই পুরাণই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজকে জীবিত রাখিয়াছে।

পুরাণগুলি যে বিদ্যাভাণ্ডার, পুরাণে যে বহুল পরিমাণে উপাদেয় সামগ্রী আছে, তাহা যিনি কিছুমাত্রও পুরাণপ্রসঙ্গে আসিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রাজনীতি, ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিশিষ্ট শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা যে পুরাণকারদিগের সুগম ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু তাদৃশ মনীষিগণের লেখনী হইতে সাম্বের মুষল প্রসব, হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম, মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর উৎপত্তি, যুবনাশ্বের গর্ভে মান্ধাতার উদ্ভব, হিরণ্যকশিপুর দশসহস্র বৎসর যাবৎ দিতির গর্ভে অবস্থিতি (১), বালক হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক ক্রীড়ায়

---

(১) দশ বর্ষসহস্রাণি দিত্যা গর্ভে স্থিতঃ পুরা।

স্কন্দ পুঃ, প্রভাসখণ্ড, ২০।৫।

জন্য সূর্য্য আনয়ন (১), বৃক্ষ হইতে রূপ-যৌবনশালিনী নারীর উৎপত্তি (২), জন্মমাত্রই হনুমান্ কর্তৃক ফল ভাবিয়া সূর্য্যকে হস্তদ্বয়মধ্যে ধারণ (৩) ইত্যাদি আখ্যায়িকা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক, মুষলাদি লইয়া আমাদের কোনও আবশ্যক নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় পুরাণের "কালমান।"

পুরাণে বর্ণিত বয়সের আলোচনায় আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। পুরাণোক্ত মানবনিচয়ের বয়স সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত কথা দেখিতে পাই। এ অদ্ভুত কথা সকলেই কিছু না কিছু জানেন। তথাপি আমরা কয়েকখানিমাত্র পুরাণ হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি কালমান উপস্থাপিত করিতেছি।

(১) বিষ্ণুপুরাণ :—

কণ্ডুমুনি "প্রম্লোচা" নাম্নী অপ্সরার সহিত ৯ শত ৭ বৎসর ৬ মাস ৩ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (৪) রাম ১১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। (৫) পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত ৬০ হাজার বৎসর যাপন করেন। (৬) অলর্ক ৬৬ হাজার বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। (১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ৮৫ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরশুরামের হস্তে নিহত হয়েন। (২) দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে এক দিন সেই "ঋভু" শিষ্য নিদাঘ কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে গমন করিলেন। (৩) কুশস্থলীর রাজা রৈবতক, তাঁহার কন্যা রেবতী "কাহার উপযুক্তা," এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেখানে সঙ্গীতমুগ্ধ হইয়া বহুযুগ অতিবাহিত করেন। সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইলে অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের দ্বাপরযুগে প্রায় ১২ কোটি ৫ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর পরে ব্রহ্মা ঐ কন্যা বলদেবকে সমর্পণ করিতে বলেন। রৈবতক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া সকল পুরুষকেই হ্রস্ব, অল্পতেজাঃ, অল্পবীর্য্য ও হীনবিবেক দেখিলেন এবং বলদেবকে কন্যা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বলদেব রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া খর্ব্বাকার করিলেন। এই উপাখ্যান সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, রেবতী বহুলক্ষ বৎসর জীবিতা ছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলরামকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (৪)

(২) শিবপুরাণ :

মহর্ষি গৌতম, পত্নী অহল্যার সহিত দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। (৫) হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর লাভ করিবার জন্য অযুত বর্ষ তপস্যা করেন। (৬) অন্ধকাসুরকে ব্রহ্মা বর দিলেন যে,

---

(১) হিরণ্যাক্ষশ্চ বালো বৈ ক্রীড়ার্থং সূর্য্যমানয়ৎ।
শিব পুঃ, জ্ঞান সং, ৪৯।২০।

(২) শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ।
মনঃশস্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ ॥ ৪৮।
যানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ ॥ ৪৯।
রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা, ৪৫ সর্গ।
প্রাদুর্ভবুস্তাসাঞ্চ বৃক্ষান্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুঃ, ৮।৮৭।

(৩) যো জন্মমাত্রসময়ে বলবান্ গভস্তে-
বিম্বং নিরীক্ষ্য ফলমিত্যবিচার্য্য সম্যক্।
জগ্রাহ পাণিযুগলে সহসা মুমোচ
শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্ ॥

(৪) সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নব বর্ষশতানি তে।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥
১ম অংশ, ১৫।৩২।

(৫, যথোচিতমভিষিক্তো দাশরথিঃ কোশলেন্দ্রো রঘুকুলতিলকো জানকীপ্রিয়ো ভ্রাতৃত্রয়প্রিয়ঃ সিংহাসনগত একাদশাব্দসহস্রং রাজ্যমকরোৎ। ৪র্থ অংশ, ৪।৯৯।

(৬) তয়া চ সহাবনিপতিরলকায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মখণ্ডেষু অভিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু অভিরমমাণ এব ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোঽনয়ৎ ॥
৪র্থ অংশ, ৬।২৯।

(১) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥
৪র্থ অংশ, ৮।৮ এবং ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ১৭।৭।

(২) সঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ।
৪র্থ অংশ, ১১।৭।

(৩) দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেঽস্য তৎ পুরম্।
জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ ॥
২য় অংশ, ১৫।৮। এবং অগ্নি পুঃ ৩৮০।৪৭।

(৪) ৪র্থ অংশ, ১ অঃ ; শিব পুঃ, ধর্ম্ম সং ৬০ অঃ ; এবং দেবী-ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৮ অঃ।

(৫) তয়া সহ ঋষিশ্রেষ্ঠস্তপশ্চক্রে সুশোভনম্।
তত্র তেন তপস্তপ্তং বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥৫২।৩।

(৬) বর্ষাণামযুতং তেপে ব্রহ্মণো বরকাম্যয়া ॥৫৯।৩০।

তুমি ৮ কোটি ৯৬ বৎসর দানবদিগের উপর আধিপত্য কর। (১)

(৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণ :—

সূর্য্যের আরাধনা করিয়া “রাজ্যবর্দ্ধন” পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য প্রভৃতির সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে স্থিরযৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (২)

(৪) পদ্মপুরাণ :—

এই প্রকারে প্রভু রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে ১১ এগার হাজার বর্ষ পৃথিবী পালন করিলেন। (৩) ঊর্দ্ধদিকে সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সেই দৈত্য (রাবণ) দশ সহস্র বর্ষ উগ্র তপস্যা করে। (৪) ভৃগুর পুত্র চাবন রেবানদীর তীরে অযুত বর্ষ তপস্যা করেন, তাঁহার অংসদ্বয়ে কিংশুকবৃক্ষ জন্মে এবং দেহ বল্মীকাবৃত হয়। (৫) উগ্রতপা মুনি ধ্যানাবস্থিত হইয়া শত-কল্পান্তে দেহ বিসর্জ্জন করেন। (৬) সত্যতপা মুনি ১০ কল্প তপস্যা করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। (৭) তারা রামচন্দ্রকে বলিতেছেন,—ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বালীর অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দুন্দুভি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে সুগ্রীব বালীর রাজ্য অপহরণ করে; এক বৎসর পরে বালী যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাগত হইলে, সুগ্রীব পলায়ন করে; তখন বালী ক্রোধে সুগ্রীবের ভার্য্যা এবং রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। সেই দিনে আপনার পিতা দশরথের রাজ্যাভিষেক হয়। (৮)

(৫) মৎস্যপুরাণ :—

যযাতি পুরুকে বলিতেছেন,—সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে তোমাকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়া আমি পুনর্ব্বার জরা গ্রহণ করিব। (১)

(৬) অগ্নিপুরাণ :—

ধর্ম্মব্রতা অযুতও সহস্র সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন। (২)

(৭) স্কন্দপুরাণ :—

গালব মুনি দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন। (৩) চন্দ্রাঙ্গদ রাজা ও রাজা ভদ্রায়ুঃ দশ সহস্র বর্ষ সংসারসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। (৪) দিবোদাস আশী হাজার বৎসর কাশীতে রাজ্যশাসন করেন। (৫) গৌতম ও ভৃগু দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। (৬) ধ্রুব ও রাজা ভরত দিব্য সহস্র বৎসর মহেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন। (৭) দুর্ব্বাসার জন্য বিশ্বামিত্র পায়স হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, দিব্য সহস্র বৎসর পরে

---

(১) ততঃ স দৈত্যঃ পরিপূর্ণকামস্তমষ্টকোটাস্বথ ষন্নবত্যাঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজ্যং কুরু দানবানাং শ্রুত্বা গিরং তাং স সুখী বভূব ॥
ধর্ম্ম সং, ৪।৩৬।

(২) দশ বর্ষসহস্রাণি পুত্রপৌত্রাদিভিঃ সহ।
ভৃত্যৈঃ পৌত্রৈঃ সমুদিতঃ সোঽভবৎ স্থিরযৌবনঃ ॥১১০।২৪।

(৩) ইত্থং পালয়তস্তস্য ধর্ম্মেণ ধরণীতলম্।
সহস্রাণি ব্যতীয়ুর্বৈ বর্ষাণ্যেকাদশ প্রভো ॥
পাতালখণ্ড, ৩।৯৯ ; এবং স্কন্দ পুঃ নাগরখণ্ড, ৯০।১২।

(৪) অথোগ্রং স তপো দৈত্যো দশবর্ষসহস্রকম্।
চকার ভানুমক্ষ্ণা চ পঞ্চাগ্ন্যূর্দ্ধ্বং পদে স্থিতঃ ॥৪।৪৪।

(৫) গত্বা তত্র তপস্তেপে বর্ষাণামযুতং মহান্।
অংসয়োঃ কিংশুকৌ জাতৌ বল্মীকোপরিশোভিতৌ ॥৪।১১৬।

(৬) এবং ধ্যানপরঃ কল্পশতান্তে দেহমুৎসৃজন্ ॥৪১।৫।

(৭) দশকল্পান্তরে চায়ং জাতো নন্দবনাদিহ ॥৪১।১২।

(৮) রামেণ বালিনিধনানন্তরং রামং প্রতি তারাবাক্যম্ :—
ষষ্টিসহস্রাদর্ব্বাগশীতিতমে বর্ষে রক্ষোযুদ্ধে সুগ্রীবেণ রাজ্যমপহৃতং, পুনশ্চ বর্ষান্তরে প্রাপ্তেন বালিনা সুগ্রীবঃ পলায়িতোঽপহৃতা তস্য ভার্য্যা, রাজ্যঞ্চাপহৃতম্। তস্মিন্নেব দিনে ভবতঃ পিতুর্দ্দশরথস্যাভিষেকঃ। প, পুঃ, পাতালখণ্ড, ৭১।১৯১।

(১) পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ত্বদীয়ং যৌবনস্ত্বহম্।
দত্ত্বা সম্প্রতিপৎস্যামি পাপ্মানং জরয়া সহ ॥৩৩।৪।

(২) তপশ্চচার বর্ষাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ ॥১১৪।১৮।

(৩) ততাপ সুমহাতেজা গালবো মুনিপুঙ্গবঃ।
এবং ত্বযুতবর্ষাণি সমতীতানি বৈ মুনেঃ ॥
ব্রহ্মখণ্ড, সেতুমাহাত্ম্য, ৩।২০।

(৪) দশবর্ষসহস্রাণি সীমন্তিন্যা স্বভার্য্যয়া।
সার্দ্ধং চন্দ্রাঙ্গদো রাজা বুভুজে বিষয়ান্ বহূন্ ॥
উত্তরখণ্ড, ৮।১৭৫।

কৃত্বা বর্ষাযুতং রাজ্যমব্যাহতবলোন্নতিঃ।
রাজ্যং পুত্রেষু বিন্যস্য ভেজে শম্ভোঃ পরং পদম্ ॥ ঐ, ১৪।৭৪।

(৫) দিবোদাসস্য তস্যৈবং কাশ্যাং রাজ্যং প্রশাসতঃ।
গতমেকদিনপ্রায়ং শরদাময়ুতাষ্টকম্ ॥
কাশীখণ্ড, ৪৩।২৪।

(৬) গৌতমেন তপস্তপ্তং তত্র তীর্থে যুধিষ্ঠির।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু ততস্তুষ্টো মহেশ্বরঃ ॥
রেবাখণ্ড, ১৭৯।২।

দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু সংশুষ্কো মুনিসত্তমঃ।
নিরাহারো নিরানন্দঃ কাষ্ঠপাষাণবৎ স্থিতঃ ॥ ঐ, ১৮১।৭।

(৭) দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্।
সম্পূজয়তি সদ্ভক্ত্যা স্তৌতি স্তোত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥
প্রভাসখণ্ড, ১৩১।৫।

দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্।
পুত্রকামো নরশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ঐ, ১৭২।৩।

দুর্ব্বাসা আসিয়া সেই পায়স ভক্ষণ করিলেন। (১) মহেন্দ্র নামক দানব কোটি বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। (২) বাণের পৌত্র এবং শম্বরের পুত্র কম্বু দশ কোটি বৎসর মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। (৩) হিরণ্যকশিপু ১০ কোটি ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৭২ বৎসর রাজত্ব করেন। (৪) রাবণ ১১ কোটি ১০ লক্ষ ৬০ হাজার বৎসর যাবৎ রাজ্য ভোগ করেন। (৫) দীর্ঘায়ুঃ জীবের তালিকায় দেখা যায়,—মার্কণ্ডেয় ৭ কল্প, বক ১৪ কল্প, উলূক ২৮ কল্প, গৃধ্র ৫৬ কল্প, কূর্ম্ম ৯৬ কল্প জীবিত থাকিবেন। (৬)

ঐরূপ দীর্ঘায়ুঃ সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গও কোনও সংশয় জ্ঞাপন করেন নাই; বক্তাও কোনও কথা বলেন নাই। ঋষিরা ঐরূপ কথা নিঃসন্দেহে শুনিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতের ১২।৮ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় কিরূপে সপ্তকল্পজীবী হইলেন, শৌনকের এই প্রশ্নের উত্তরে সূত মায়িক প্রলয়ের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্তৃক অনুভূত ভগবানের এই অদ্ভুত মায়াবৈভব আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। যাঁহারা মনুষ্যদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়-স্বরূপা ভগবন্মায়া না জানেন, তাঁহারা বলেন—"মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত এই মায়া বহুকাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত।" যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কিন্তু মনে করেন—"ইহা আকস্মিক।" (১)

সংসারটা যে পরমাত্মার মায়া, তাহা অবিদ্বান্‌রা জানেন না। তাঁহারাই এইরূপ আয়ুঃ ব্যক্তিবিশেষের অসাধারণ বলিয়া থাকেন। বিদ্বান্‌রা কি বলেন, তাহা যদিও সূত বলেন নাই, কিন্তু স্বামী বলিয়াছেন,—মার্কণ্ডেয় মায়াশিশুর নাসাবিবরে সাত বার ঢুকিয়া সাত বার বাহির হইয়া মায়িক প্রলয়জলে পড়িয়াছিলেন, ইহাতেই বিদ্বান্‌রা তাঁহাকে সপ্তকল্পজীবী বলেন; সুতরাং সপ্তকল্পজীবিত্বপক্ষে কোনও বিরোধ নাই। (২)

শৌনকের স্বকীয় কুলে মার্কণ্ডেয়ের জন্ম। তাঁহার সপ্তকল্প আয়ুর কথা প্রাচীনগণ বলিয়াছেন। শৌনক এ স্থলে প্রশ্ন করিতেছেন যে—অবিচ্ছিন্ন একই কুলে জন্মলাভ করিয়া কল্পাবসান না হইতেই মার্কণ্ডেয়ের সপ্তকল্প জীবন কিরূপে হইতে পারে এবং কিরূপেই বা বৃদ্ধবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা হয়? এই মীমাংসার জন্যই "এতৎ কেচিৎ" ইত্যাদি শ্লোক। স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত ভগবানের নানাকল্পরূপ মায়াবৈভব 'কাদাচিৎক' অর্থাৎ তাহা তাঁহার সম্বন্ধেই কেবল আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছিল; উহা সর্ব্বসাধারণ নহে। কেহ কেহ ইহাকে অনাদি (বহুকাল) অর্থাৎ দৈবযুগ-সহস্রদ্বয় (কল্প) রূপে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত বলেন। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা মানুষের 'সংসৃতি' (সর্গপ্রলয়লক্ষণরূপ ব্যাপার) যে ভগবন্মায়া, তাহা জানেন না।

অন্যান্য পুরাণ পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিরা বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। অনেক বরাঙ্গীর পূর্ণ সহস্র বৎসর গর্ভধারণ করিবার কথা এবং লোমশ মুনির এক একটি গাত্রলোমপতনের সহিত এক একটি কল্পের অবসান এবং তাঁহার সমগ্র আয়ুষ্কালের

---

(১) বিশ্বামিত্রস্তপোনিষ্ঠস্তদা সানুরিবাচলঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রং স তস্থৌ স্থিরমতিস্তদা॥
পুনরাগত্য স মুনির্দুর্ব্বাসা গতকল্মষঃ।
ভুক্ত্বা চ পায়সং সদ্যঃ স জগাম নিজাশ্রমম্॥
অযোধ্যা-মাহাত্ম্য, ৫ম অঃ, ১০।১২।

(২) আসীন্মহেন্দ্রনামা চ দানবো রৌদ্ররূপধৃক্।
কোটিবর্ষাণি তেনৈব তপস্তপ্তং পুরা প্রিয়ে॥
প্রভাসখণ্ড, ৩৩৪।৮।

(৩) স্নাত্বা নিত্যং ধৃতিপরো নর্ম্মদাজলমাশ্রিতঃ।
পূজয়ংস্তু মহাদেবমর্ব্বুদং বর্ষসংখ্যয়া॥
রেবাখণ্ড, ১২০।৮।

(৪) হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামর্ব্বুদং বভৌ।
তথা শতসহস্রাণি হ্যধিকানি দ্বিসপ্ততিম্॥
অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরোঽভবৎ।
প্রভাসখণ্ড, ২০।১,২।

(৫) পঞ্চকোটাস্তু বর্ষাণাং সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া প্রিয়ে।
নিযুতান্যেকষষ্টিঞ্চ সংখ্যাবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি বর্ষাণাং স হি রাবণঃ॥
প্রভাসখণ্ড, ২৯।৩০।

(৬) সপ্তকল্পস্মরো নাম মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
বক উবাচ—সপ্তদ্বিগুণিতান্ কল্পান্ স্মরামাহমসংশয়ম্।
উলূক উবাচ—অষ্টাবিংশৎপ্রমাণেন কল্পা জাতস্য মে স্থিতাঃ।
গৃধ্রঃ—ষট্‌পঞ্চাশৎপ্রমাণেন কল্পাশ্চাস্য মহাত্মনঃ।
কূর্ম্মঃ—ষণ্ণবতিপ্রমাণেন কল্পা মে জীবতো গতাঃ॥
নাগরখণ্ড, ২৭১ অঃ, ৪০।৫৮।১৩৭।৩২২।৩৩০।

(১) অনুবর্ণিতমেতৎ তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্॥৪০।
এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিরাত্মনঃ।
অনাদ্যাবর্ত্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে॥ ৪১।
১২ স্কন্ধ, ১০ অঃ।

(২) "বিদ্বাংসস্তু মায়াশিশোঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসাভ্যাং সপ্তকৃত্বস্তদুদরপ্রবেশনির্গমতঃ সপ্তকল্পত্বং তৎক্ষণমাত্রেণেতি বদন্তি, অতো ন বিরোধঃ।

মধ্যে ৬ জন ব্রহ্মার বিনাশের কথাও আমরা পুরাণে দেখিতে পাই। (১)

স্কন্দপুরাণ, কুমারিকাখণ্ড ১২।২৬ এবং প্রভাসখণ্ড ১৩৬।৫।

পঞ্জিকায় দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-যুগের পরমায়ুঃ যথাক্রমে লক্ষ, দশ হাজার, হাজার ও এক শত কুড়ি বৎসর। সত্যযুগের রাজন্যবর্গের পুরুষানুক্রমিক যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষ বৎসর পরমায়ুঃ হইলে সত্যযুগাবস্থিতির বর্ষ হইতেও সত্যযুগায়তন বহু বর্ষ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। (১)

প্রমাণের আর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যে সকল আয়ুষ্কাল, তপস্যাকাল, রাজত্বকাল ইত্যাদির কথা পুরাণকারদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পৌরাণিক গ্রন্থমাত্রেই যে এই প্রকার কথা আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, মহাভারতে ইহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন মানব শতায়ুঃ বলিয়া কথিত, তখন বাল্য-কালেও মৃত্যু হয় কেন? উদ্যোগপর্ব্ব ৩৭ অধ্যায়ে বিবৃত রহিয়াছে,—যখন সকল বেদমধ্যেই পুরুষ শতায়ুঃ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত লোক সমগ্র আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না? ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বিদুর কতকগুলি অকালমৃত্যুর কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রশ্ন হইতে

---

(১) মানবীয়	১ মাসে	…	পিত্র্য ১ দিন-রাত্রি
ঐ	১ বর্ষে	…	দৈব ১ দিন-রাত্রি
ঐ	৩০ বর্ষে	…	পিত্র্য ১ বর্ষ
ঐ	৩৬০ বর্ষে	…	দৈব ১ বর্ষ
ঐ	৪ যুগে	…	দৈব ১২ হাজার বৎসর।

যুগ	মানবীয় বর্ষ	পিত্র্যবর্ষ	দৈববর্ষ
সত্য	১৭,২৮,০০০	৫৭,৬০০	৪,৮০০
ত্রেতা	১২,৯৬,০০০	৪৩,২০০	৩,৬০০
দ্বাপর	৮,৬৪,০০০	২৮,৮০০	২,৪০০
কলি	৪,৩২,০০০	১৪,৪০০	১,২০০
চতুর্যুগ	৪৩,২০,০০০	১,৪৪,০০০	১২,০০০
ব্রাহ্মদিন	৪,৩২,০০,০০,০০০	১৪,৪০,০০,০০০	১,২০,০০,০০০
অহোরাত্র	৮,৬৪,০০,০০,০০০	২৮,৮০,০০,০০০	২,৪০,০০,০০০ কল্প
ব্রাহ্মবর্ষ	৩,১১,০৪,০ কোটি	১০,৩৬৮ কোটি	৮৬৪ কোটি
ব্রাহ্ম আয়ুঃ	৩,১১,০৪,০০০ কোটি	১০,৩৬,৮০০ কোটি	৮৬,৪০০ কোটি

লিঙ্গ, অগ্নি, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে যুগমানাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বৈদিক গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গমাত্রও নাই।

চতুর্দ্দশমন্বন্তরৈর্ব্রহ্মণ একং দিনং ভবতি। তন্মানুমানেনৈকঃ কল্পঃ, ত্রিংশৎকল্পৈর্ব্রহ্মণ একো মাসো ভবতি। এতাদৃশৈর্দ্বাদশমাসৈর্ব্রহ্মণঃ সংবৎসরো ভবতি। এবং বর্ষশতং ব্রহ্মণ আয়ুঃ। তত্র পঞ্চাশৎ বর্ষা ব্যতীতাঃ। একপঞ্চাশদারম্ভেঽধুনা শ্বেতবরাহকল্পঃ। অত্র মন্বন্তরাণি ব্যতীতানি ষট্। অধুনা বৈবস্বতমন্বন্তরং বর্ত্ততে। (ভাগবত)

৮ শত ৬৪ কোটি মানববর্ষে বা ২ কোটি ৪০ লক্ষ দৈববর্ষে ১ কল্প। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে। ১ মন্বন্তর ইন্দ্রের আয়ুঃ। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার ১ দিন; ইহারই নামান্তর "কল্প।" (গীতা, ৮।১৭; শান্তিপর্ব্ব, ২৩১।৩১)। ব্রহ্মার দিন সহস্র-চতুর্যুগ-পরিমিত। তাঁহার রাত্রির পরিমাণও সহস্র চতুর্যুগ। যে সকল সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগবলে উহা জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। বর্ত্তমান কল্পের নাম "শ্বেতবরাহ।" অন্যান্য কল্পের ন্যায় এ কল্পেও ১ হাজার সত্য, ১ হাজার ত্রেতা, ১ হাজার দ্বাপর এবং ১ হাজার কলিযুগ আছে। তন্মধ্যে ২৮ সত্য, ২৮ ত্রেতা, ২৮ দ্বাপর এবং ২৭ কলি গত হইয়া গিয়াছে; এখন অষ্টাবিংশ কলিযুগ চলিতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "শব্দকল্পদ্রুমে" কল্প ও প্রলয় শব্দ দেখিবেন। এই কল্পের শেষে প্রলয়। তাহার পূর্ব্বে প্রলয় হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মবর্ষের কালপরিমাণেও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই। তাহার পরে আরও দেখিতে পাইতেছি,—"ব্রহ্মণো বর্ষমাত্রেণ দিনং বৈষ্ণবমুচ্যতে। বৈষ্ণবেন তু বর্ষেণ দিনং মাহেশ্বরং ভবেৎ॥" আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে এই কালের ধারণা করিতে পারি না।

দিনৈঃ পঞ্চদশৈঃ পক্ষঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ গীয়তে।
পক্ষদ্বয়েন মাসঃ স্যাৎ পিতৄণাং তদহর্নিশম্॥ ১।
ঋতুর্মাসদ্বয়েনৈব ষণ্মাসৈরয়নং স্মৃতম্।
অয়নদ্বিতয়ং বর্ষো দেবানাং বাসরো নিশা॥ ২।

তদ্দ্বাত্রিংশৎসহস্রৈস্তু চতুর্লক্ষৈঃ কলিঃ স্মৃতঃ।
শেষং যুগত্রয়ং জ্ঞেয়ং কলের্দ্বিত্রিচতুর্গুণম্॥ ৩।
চতুর্ভির্ব্বর্দ্ধিতৈঃ কল্পং দ্বাত্রিংশদ্ভিশ্চ কোটিভিঃ।
চতুর্দ্দশ সুরেন্দ্রাশ্চ পতন্তি ব্রহ্মণোঽহনি॥ ৪।
চতুর্যুগসহস্রেণ কল্পাখ্যং ব্রহ্মণো দিনম্।
তৎপ্রমাণা তথা রাত্রিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী॥ ৫।
স্বকালপরিমাণেন পূর্ণে বর্ষশতে কিল।
ব্রহ্মাদীনাং তথা শক্তেঃ ক্ষয়ো জন্ম পুনঃ পুনঃ॥

যোগরসায়ন।

(১) যেরূপ এক বর্ষ শেষ হইয়া অন্য বর্ষের আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ এক যুগ শেষ হইয়া অন্য যুগ প্রবৃত্ত হইলে কোনও পরিবর্ত্তন না হওয়াই সম্ভব। কলিযুগের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সত্যযুগে জীবিত থাকিবে, তাহার আয়ুর পরিমাণ কত হইবে? সে কি কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ ১ শত ২০ বৎসর ভোগ করিবে, অথবা সত্যযুগের লক্ষ বৎসর পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইবে? পরীক্ষিৎ দ্বাপরের শেষে জন্মিয়া কলির প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। যে দিন শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনে তখনই কলিযুগ দেখা দিয়াছে। (ভাগবত, ১২।২।২৯); কিন্তু মহাভারতের শল্যপর্ব্ব ৬০ অধ্যায়, ২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন,—

প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আনৃণ্যং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ॥

সহজেই অনুমান করা যায় যে, শতবর্ষই আয়ুষ্কাল এবং ইহাই মহাভারতকারের ধারণা। ভীষ্ম অভিমন্যুর (অর্থাৎ শান্তনু হইতে পঞ্চম পুরুষের) কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। শান্তনুর সমকালে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু হইতে সপ্তম পুরুষ—জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞেও তাঁহাকে দেখিতে পাই। দেড় শত বৎসর বাঁচিলেই সপ্তম পুরুষ দেখা যায়। দেড় শত বৎসর জীবিত থাকা অসম্ভব নহে। আজকালও পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত জীবিত ব্যক্তি দেখা যায়। কথিত আছে—কাশীধামের তৈলঙ্গস্বামী ২ শত ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে হেনরী জেঙ্কিন্স নামক এক ব্যক্তির বয়ঃক্রম ১শত ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ‘পার’ সাহেব ১ শত ৫৩ বৎসর এবং রিচার্ড লইড ১ শত ৩০ বৎসর বয়সেও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল ছিলেন।

ত্রয়োবিংশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় “মহাভারতের সময়” নামক প্রবন্ধে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন—১শত ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করেন; এবং ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবকে হারাইয়া ১ শত ৮০ বৎসর বয়সে হিমালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩৭ অধ্যায় ১৩ শ্লোক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল (“বর্ষাণামধিকং শতম্”) পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সমুপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভীষ্ম ও দ্রোণের বয়োঽধিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রোণের বয়স তখন ৮৫ বৎসর। (১) পরীক্ষিতের ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়; তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। (১) ইহা বর্ত্তমান যুগের আয়ুষ্কালের অনুরূপ। তবে মহাভারতেও অন্যান্য পুরাণের ন্যায় ১০ হাজার, ২০ হাজার বৎসর বয়সের কথাও পাওয়া যায়। যযাতির সহস্র বৎসর জরা ভোগ করিবার কথা, (আদিপর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়) মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘ জীবন, (বনপর্ব্ব ১৮৮ অঃ,) রামের ১১ হাজার বৎসর রাজ্য করার কথা। (২) শিশুহত্যার জন্য অশ্বত্থামার ৩ হাজার বৎসর পূয়শোণিতলিপ্ত থাকার কথা, (সৌপ্তিক, ১৬ অ। ১২ শ্লোক) মহর্ষি তণ্ডির দশ সহস্র বৎসর মহাদেবের আরাধনার কথা, (অনুশাসন, ১৬ অঃ) ইত্যাদি অনেকেই জানেন। মহাভারতের মূল চরিত্রগুলিতে আমরা সম্ভবপর আয়ুষ্কালের সংবাদ পাইলেও অন্যান্য পুরাণে সাধারণের কল্পনাতীত কালপরিমাণ দেখিতে পাইতেছি। ভীষ্মপর্ব্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, উত্তর-কুরুর লোক সকল ১১ হাজার বৎসর জীবিত থাকে; ভদ্রাশ্ববর্ষের লোকদিগের পরমায়ুঃ ১০ সহস্র বর্ষ। রমণক বর্ষে ১১ হাজার ৫ শত বৎসর; হিরণ্ময় বর্ষে ১২ হাজার ৫ শত বর্ষ; এবং ঐরাবতবর্ষের লোকরা ১৩ হাজার বৎসর জীবিত থাকে। পদ্ম-পুরাণ স্বর্গখণ্ড ২য় অধ্যায়েও ঠিক এইরূপ কথা আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।

---

(১) আকর্ণপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যচরদ্ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥
দ্রোণপর্ব্ব, ১২৫।৭২।১৯১।৭৩।

(১) প্রজা ইমাস্তব পিতা ষষ্টিবর্ষাণ্যপালয়ৎ।
ততো দিষ্টান্তমাপন্নঃ সর্ব্বেষাং দুঃখমাবহন্॥
আদি, ৪৯।১৭।

ষষ্টিবর্ষাণি জন্মতঃ ষষ্টিবর্ষপর্য্যন্তং ন তু রাজ্যলাভাৎ, অপালয়ৎ পালিতবান্। ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে লব্ধরাজ্যশ্চতুর্ব্বিংশতিবর্ষপর্য্যন্তং তৎপালনস্য দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ।

পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥ আদি, ৪৯।২৬।

(২) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
সর্ব্বভূতমনঃকান্তো রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥
দ্রোণপর্ব্ব, ৫৭।২১।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥
শান্তিপর্ব্ব, ২৯।৬১।

জমীর মোহ

[কাউণ্ট টলষ্টয়]

১

দুই বোন্—বড় বোন্ থাকে সহরে—গাড়ীঘোড়া, লোক লস্কর, আমোদ-প্রমোদ লইয়া। আর ছোট বোন্ থাকে পাড়াগাঁয়ে—ধান ভানে, রাঁধে বাড়ে, আর ছেলেপুলে মানুষ করে।

কত দিন পরে সহুরে বোন্ আসিয়াছে পাড়াগেঁয়ে বোনের বাড়ী। এ কথা সে-কথা কত কথার পর তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা উঠিল। বড় বোন্ বলিল, "ভাই, আমাদের কত সুখ, রোজ থিয়েটার, বায়স্কোপ, গান-বাজনা—অষ্ট প্রহর একটু সময় পাই না। আর কাযের কথা ভাই, আমাদের ত নড়ে বসতেও হয় না। দিব্যি আরামে আছি—গায়ে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে না।"

ছোট বোন উত্তর করিল, "আমরা ও সব হুজুগ কোথায় পাব দিদি? তবে কি জান, ও সব সুখ-সম্পদের মূল্য কি? আজ আছে, কাল নাই। আমরা দিদি পাড়াগেঁয়ে—আমাদের টাকা-পয়সাও যেমন কম, অভাবও তেমনই অল্প। আমাদের সুখ, দুঃখ, ভরসা সব ঐ জমী—ঐ জমীর দিকে চেয়েই আমরা বেঁচে আছি। এক এক বার কি ভাবি জান? ভাবি, আমরা বেশ ভালই আছি, নিজেদের খামার জমী আছে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য ত আর পরের দ্বারস্থ হ'তে হয় না—এই আমাদের সুখ।"

পাড়াগেঁয়ে বোনের স্বামী প্যাখম পাশে বসিয়া ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, সে কথা খুবই সত্য, আছি বেশ, তবে খামারের জমী আমাদের বড়ই কম। যদি আরও কিছু জমী পাই, তবে কি আর কারুর তোয়াক্কা রাখি? কারুর তোয়াক্কা রাখি না, স্বয়ং শয়তানেরও না।"

আলোর পিছনে শয়তান ছিল বসিয়া, সে শুনিয়া একটু হাসিল, ভাবিল, "চমৎকার! তোমাকে লইয়াই এখন খেলা যাউক। জমী তোমাকে আমি দিব—বিস্তর জমী, কিন্তু সব আবার কাড়িয়া লইব।"

২

সেই দেশে এক জন মহিলা জমীদার ছিল, তাহার অনেক জমী। মেয়েমানুষ, নিজে সব দেখিয়া শুনিয়া উঠিতে পারিত না, তাই তাহার জমী দেখাশুনার ভার সে এক জন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের উপর দিয়াছিল। সৈনিকের মেজাজ—সে আশেপাশের চাষীদের উপর ভারী অত্যাচার করিত। প্যাখমও সেই সৈনিকের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

হঠাৎ এক দিন চাষীরা খবর পাইল, সেই মহিলা জমীদারটি তাহার সমস্ত জমী জমা সেই সৈনিকের নিকট বিক্রয় করিবে। তাহারা প্রমাদ গণিল। এখন উপায়? গ্রামের যত সব চাষী তখন দলবদ্ধ হইয়া জমীদার-গিন্নীর নিকট যাইয়া দরবার করিল; বলিল, "আমরা সব চাষী মিলিয়া আপনার জমী বেশী দরে কিনিয়া লইব, আপনি ঐ সৈনিককে ও জমী দিবেন না, দিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।"

জমীদার-গিন্নী সম্মত হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর চাষীরা স্থির করিল, যে যতটা পারে, জমী কিনিবে। প্যাখমের খামার-জমী ছিল কম, হাতে নগদ পয়সা ছিল তার চাইতেও অল্প, কিন্তু জমীর উপর লোভটা ছিল ষোল আনার উপর আঠার আনা।

জমীর লোভে প্যাখমের দিনরাত্রি ঘুম হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে শেষে স্থির করিল, তাহার গাই, বলদ, বাসন, কাপড় প্রভৃতি কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া সে টাকার জোগাড় করিবে। প্রায় এক শ বিঘা জমী তাহার চাই-ই—অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল। অর্দ্ধেক টাকার জোগাড় তাহার হইয়াছিল, বাকি অর্দ্ধেক সে ধার করিবে। জমী কিনিবার সময় তাহার লোভ আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। সে প্রায় ১ শত ৫০ বিঘা জমী কিনিল।

সে বৎসর জমীতে আশাতীত ফসল হইল। এক বৎসরেই প্যাখম তাহার ঋণের টাকা শোধ করিয়া দিল।

প্যাখমের মত সুখী আজ কে? সে এখন স্বামী—ভূ-স্বামী। যখনই সে তাহার খামার জমীর দিকে চাহিত, তখনই তাহার দু' নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িত। এই জমীতেই ত সে পূর্ব্বে দিন-মজুর-ভাবে কত খাটিয়াছে! সেদিন আর এদিন! সে-ও জমী আর এ-ও জমী!

৩

মানুষ ভাবে একরূপ আর হয় অন্যরূপ। প্যাখম ভাবিয়াছিল, জমী কিনিলেই তাহার সুখ-শান্তি হইবে, গ্রামে প্রতিবেশীদের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা বাড়িবে; ফলে কিন্তু দাঁড়াইল অন্যরূপ। প্যাখমের জমী ছিল বেশী, তাই যখন তখন প্রতিবেশীদের গরু, ছাগল তাহার জমীতে চরিয়া বেড়াইত। এই লইয়া প্রতিবেশীদের সহিত তাহার বচসা আরম্ভ হয়। এই বচসা হইতে বিবাদ, ক্রমে বিবাদ লইয়া মামলা-মোকর্দ্দমা হয়। ফলে প্রতিবেশীদের সহিত তাহার মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

কত দিন যায়, প্যাখমের মনে আর সে সুখ নাই—মামলা-মোকর্দ্দমা, চারিদিকেই অশান্তি। এই সময়ে এক দিন এক আগন্তুকের সহিত তাহার দেখা। কোন এক দূরদেশ হইতে সে আসিয়াছে। সে দেশে বিস্তর জমী, কিন্তু চাষ করিবার লোক নাই, তাই সে দেশের জমীদার দূরদেশ হইতে লোক আনিয়া জমী বিলি করিতেছে। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো প্রত্যেক লোক মাথা পিছু প্রায় এক শ বিঘা জমী নিষ্কর বিনা সেলামীতে পাইবে। তাহা ছাড়া সামান্য কিছু সেলামী দিলেই আরও অনেক জমী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়। আর সে কি উর্ব্বরা জমী! কি সুন্দর ফসল! এ দেশের আর সে দেশের জমীতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

প্যাখমের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাই ত, এমনই যদি সুন্দর সে দেশ হয়, তবে কি কায আর এ ঝগড়াঝাটির মধ্যে থাকিয়া? শেষে সে স্থির করিল, এক বার দেশটা সে দেখিয়া আসিবে।

এক দিন ষ্টীমারে করিয়া সে দেশ দেখিয়া আসিল। যেমনটি আগন্তুক পথিক বলিয়াছিল, ঠিক তেমনটিই সে দেশ। প্যাখম আর কালবিলম্ব না করিয়া জমী-জমা যাহা ছিল, সব বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিল, তাহার পর বিদেশের মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া নূতন দেশের উদ্দেশে সপরিবারে দেশ ছাড়িয়া গেল।

৪

নূতন যায়গায় প্যাখম অনেক জমী পাইল, অনেক জমী কিনিল, কিন্তু তথাপি তাহার লোভের নিবৃত্তি নাই। নিজের খামার জমী ছাড়া সে অন্যের জমী এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাহাতে আশাতীত ফসল পাইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার লোভ কমিল না। তখন তাহার মনে হইল, পরের জমী বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত লইলে লোকসান অনেক—সবটা নিজের হইলেই ভাল হয়। ক্রমেই তাহার অবস্থা ভাল হইতেছিল, সুবিধাও জুটিয়া

যাইতেছিল তেমনই। এক দিন সে শুনিল, খুব সুবিধা দরে এক জন বিস্তর জমী বেচিবে। প্যাখমের লোভের অন্ত নাই—তৎক্ষণাৎ সে স্থির করিল, সে সেই জমী কিনিবে।

এক দিন প্যাখম বসিয়া আছে, এই সময়ে এক পথিকের সহিত তাহার দেখা। এ-কথা সে-কথার পর তাহাদের আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। তখন পথিক তাহার পরিচয় দিল—বহুদূরদেশ হইতে সে আসিতেছে। সে দেশে নামমাত্র মূল্যে বিস্তর জমী পাওয়া যায়। সে দেশের লোকদের প্রকৃতি ভারী সরল কি না, তাই কিছু খাবার পরিবার জিনিষ উপহার দিলেই অপর্য্যাপ্ত জমী তাহারা লেখাপড়া করিয়া দেয়। আগন্তুক একখানি দলীল দেখাইল, কয়েক টাকার জিনিষ কিনিয়া সে সেই দেশী লোকদিগকে উপহার দিয়াছে, আর তাহার ·বিনিময়ে প্রায় ৫০ হাজার বিঘা জমী তাহাকে তাহারা কোবালা করিয়া দিয়াছে। নদীর উপর জমী—অপর্য্যাপ্ত ফসল—যেন সোনার ক্ষেত্র। এমন বোকাদের দেশও পৃথিবীতে থাকে!

প্যাখমের লোভ আবার মাথা নাড়িয়া জাগিয়া উঠিল। প্যাখম ভাবিল, তবে এখানে আর জমী কিনিয়া কি লাভ? সেই আহম্মকদের দেশেই যাইতে হইবে। সেখানে আর কোন অভাবই থাকিবে না।

৫

প্যাখম অজানা দেশের উদ্দেশে রওনা হইল—সঙ্গে উপহার দিবার জন্য নানা প্রকার সুন্দর সামগ্রী লইল। সাত দিন পরে সে নূতন দেশে যাইয়া পৌঁছিল। যাইয়া দেখিল, সে দেশের লোকরা ভারী সরল ও অতিথিভক্ত। প্যাখমের নিকট হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উপহার পাইয়া তাহাদের মুখে হাসি আর ধরে না। তাহাদের মধ্য হইতে এক জন বলিল, "আপনার জিনিষ পাইয়া আমরা ভারী সন্তুষ্ট হইয়াছি, কি চাই আপনার, বলুন, আমাদের থাকে ত তাহা নিশ্চয়ই আপনাকে দিব।"

প্যাখম সোজা কাযের কথা পাড়িল; বলিল, "আপনাদের বিস্তর ভাল জমী ·পড়িয়া আছে, আমার জমী তেমন নাই, আমাকে যদি জমী দেন ত—"

তাহার উত্তরে এক জন বলিল, "নিশ্চয়ই সামান্য কিছু মূল্য দিলেই আপনি এই সব জমী পাইবেন। কোন্ জমী আপনার চাই, বলুন।"

প্যাখম ভাবিল, লেখাপড়াটা পাকা করিয়া লওয়া দরকার, তাই বলিল, "দলীল লেখাপড়াটা কোথায় বসিয়া হইবে?"

তাহাদের দলপতি হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দলীলের কিছু আবশ্যক নাই। আমাদের কথাই দলীল, তবে দরকার মনে করিলে সহরে যাইয়া লেখাপড়া করিয়া লইতে পারেন!"

প্যাখম সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "কত জমী আমি পাইব?"

গম্ভীরভাবে দলপতি সামনের সীমাহীন অনন্ত অখণ্ড জমী দেখাইয়া দিল। বলিল, "এক দিনের জমী আপনার, বাছিয়া লউন আপনি।"

"সে কি রকম?"

"সূর্য্যোদয়ের পর হইতে দিনের মধ্যে যতটা জমী হাঁটিয়া আসিবেন, ততটা জমীই আপনার। যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যেই আবার এই স্থানে ফিরিয়া না আসিতে পারেন, তবে জমীর নির্দ্ধারিত মূল্য আমরা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব।"

প্যাখম ত রাজি হইয়াই আছে। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই যাত্রা করা হইবে স্থির হইল।

৬

সমস্ত রাত্রি প্যাখম কত কি আকাশ-কুসুম ভাবিয়াছে, একবারের জন্যও চোখ বুজে নাই। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, শেষ রাত্রিতে তন্দ্রার ঘোরে সে এক বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

দূরে—সে দেখিল, সেই দেশের লোকদের দলপতি যেন অট্টহাসি হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে তাহার পেটে খিল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য সে নিকটে যাইতেই দেখিল, সে ত দলপতি নয়, সে সেই আগন্তুক—যে তাহাকে এই দেশের সংবাদ দিয়াছিল। আরও নিকটে যাইতে দেখা গেল, এ সে আগন্তুকও নয়, এ সেই প্রথম পথিক—যাহার কথায় সে প্রথম দেশের মায়া কাটায়। শেষে খুব ভাল করিয়া দেখিতে দেখা গেল যে, ও সব কিছুই নয়, সে শয়তান—তাহার মুখে শয়তানের সেই অট্টহাসি। কিসের দিকে চাহিয়া সে হাসিতেছে? সম্মুখে কে এক জন উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে—পরিধানে জামা-জুতা নাই, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ছিন্ন-ভিন্ন; মুখে এক বিন্দুও রক্ত নাই—ফ্যাকাসে অসাড়। কে সে? নিকটে চোখ আনিতেই দেখে, সে যে তাহারই অসাড় দেহ!

স্বপ্ন দেখিয়াই সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ভোর হইতে আর দেরী ছিল না। যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য তখন সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

৭

ভোর না হইতেই প্যাখম যাইয়া দলপতির সঙ্গে দেখা করিল। দলপতি বলিল, "হাঁ, সব প্রস্তুত—এই স্থানে আমি বসিয়া রহিলাম। সম্মুখে যত জমী দেখিতেছেন, সব আমাদের, ইহার মধ্য হইতে যে জমী আপনার ভাল মনে হইবে, তাহাই আপনি নির্দ্দেশ করিয়া আসুন—তাহাই আপনার হইবে। আর আপনার টাকা এইখানে আপনার অনুচরের নিকট রহিল। সূর্য্যাস্তের মধ্যে এই স্থানে ফিরিয়া আসিলে আপনার নির্দ্দিষ্ট সমস্ত জমীই আপনার হইবে, আর ফিরিয়া না আসিতে পারিলে আপনার ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।"

প্যাখম আর বৃথা কালব্যয় না করিয়া তখনই তাহার গন্তব্য পথে চলিল।

জমীর লোভ বড় লোভ। যেখানেই ভাল জমী দেখে, সেইখানেই দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্যাখম যায়। বেলা যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, প্যাখমের গতি ততই দ্রুত হইতে লাগিল। প্রখর রৌদ্রের তাপে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করিয়া প্যাখম পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দূরে এখনও কত উর্ব্বরা জমী পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্যাখমের পা যে আর চলে না, সর্ব্বশরীর ক্লান্তি ও অবসাদে কাতর হইয়া আসিতেছিল। খাবার তাহার সঙ্গেই ছিল, কিছু খাইয়া সুস্থ হইয়া প্যাখম আবার দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। যে দিকেই ভাল জমী দেখে, সেই দিকেই প্যাখম ছুটিয়া যায়, আবার দূরে আরও ভাল জমী দেখে—আবার সেই দিকে ছোটে!

এমনই করিয়া বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। কিন্তু প্যাখমের লোভের আর অন্ত নাই। আবার যে দিকে সে ভাল জমী দেখিল, অমনই সেই দিকেই ছুটিল। সূর্য্য তখন ডুবিয়া আসিয়াছে—সূর্য্যাস্তের আর বড় দেরী নাই। তখনই তাহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে—না হইলে তাহার সব শ্রম, সব আশা-ভরসা পণ্ড হইয়া যাইবে।

কিন্তু ঐ দূরের ক্ষেতখানিতে কি সুন্দর ফসল হইয়াছে, এমন উর্ব্বরা জমী ত সে জীবনে দেখে নাই! বৃথাই সে এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছে, ও জমী তাহার চাই-ই। সূর্য্য প্রায় অস্তগত, প্যাখমের ক্লান্ত অবসন্ন দেহ প্রায় ঢলিয়া পড়িতেছিল, কণ্ঠনালী হইতে স্বর বাহির হইতেছিল না। কিন্তু জমীর মায়া জীবনের মায়াকেও ছাপাইয়া উঠিল—জীবন হাতে লইয়া সে কোন প্রকারে ঐ ক্ষেতে পৌঁছিল।

কাঁটা গাছে, পাতরের কুঁচিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া

গিয়াছিল, কিন্তু এ দিকে আর সময়ও নাই, সূর্য্য প্রায় ডুবিয়া গেল। প্যাখম তখন অনন্যোপায় হইয়া ফিরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্ষত দিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে দিকে তখন তাহার দৃষ্টি ছিল না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে দৌড়াইতে লাগিল। তাহার নিশ্বাস আর বহে না—জামা-জুতা সে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—ঊর্দ্ধশ্বাসে সে দৌড়িতে লাগিল, কিন্তু পা যে আর চলে না। কামারের হাপোরের মত তাহার নিশ্বাস বহিতেছিল, বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। একবার ভাবিল, আর দৌড়িয়া কায নাই, মারা যাইব। তখনই কিন্তু জমীর লোভ জীবন্ত হইয়া অতৃপ্ত সুখের মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পা একবারেই অবশ, কিন্তু সূর্য্যকে যে আর দেখা যায় না—তবে কি তাহার সব শ্রম, সব আশা পণ্ড হইয়া যাইবে? দূরে দলপতিকে দেখা যাইতেছিল—সেখানে হয় ত সূর্য্য এখনও ডুবে নাই, এখনও হয় ত ভরসা আছে। তাই একবার সে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল, প্রাণপণে টলিতে টলিতে কোন-ক্রমে সে দলপতির নিকট যাইয়া পৌঁছিল। তথায় তাহার অবসন্ন শিথিল দেহ দলপতির পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পড়িতে পড়িতেও সে দলপতির নির্দ্ধারিত স্থানটির দিকে হাত বাড়াইয়া দিল, কিন্তু দলপতির নির্দ্ধারিত স্থানটিতে সে তখনও পৌঁছে নাই—জীবনের অবসান-মুহূর্ত্তে এই চিন্তাই তাহার বড় হইয়া উঠিল।

দলপতি হো হো করিয়া এক অট্টহাসি হাসিল, "জমীর লোভ, অনেক জমী পাইয়াছ পান্থ!"

প্যাখমের অনুচর শশব্যস্তে চাহিয়া তাহার প্রভুর দেহ উঠাইল, কিন্তু সে দেহে আর প্রাণ ছিল না।

দলপতি তখনও বীভৎস হাসি হাসিতেছিল—সম্মুখে প্যাখমের আড়ষ্ট মৃতদেহ!

দলপতি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখের একখানি কুঠার দেখাইয়া অনুচরকে বলিল, "কবর দাও।"

অত জমীর কিছুই আবশ্যক হইল না—দরকার হইল মাত্র সাড়ে তিন হাত জমী—তাহাতেই তাহার শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

পদ্মা

তুমি পদ্মা তুমি কীর্ত্তিনাশা,
বক্ষে উঠে মেঘমন্দ্র শুনি উচ্ছ্বসিত উল্লাসের ভাষা!
তুমি রুদ্রা মহাভয়ঙ্করী!
প্রলয়ের চণ্ড-মূর্ত্তিরূপা, খান খান উর্ব্বীরে সংহারি'
প্রকাণ্ড তাণ্ডব লাস্যে তুমি ছুটে চল অম্বুধির পানে,
মদে মত্তা দৃপ্তা চিরজয়ে অট্টহাস্যে সংহারের গানে।

এ কি দেখি ওলো রঙ্গময়ি!
স্নিগ্ধ নীল চন্দ্রাতপ-তলে আজি হেরি পঞ্চশর জয়ী
বাসনার ঊর্ম্মিকা চঞ্চল
শান্ত বুকে কাঁপে মৃদু মৃদু অন্তরের সোহাগে উজ্জ্বল।
তন্দ্রাজড় নিমীল নয়নে
দিগন্তের কোলে রাখি' মাথা স্বপ্ন দেখ প্রেমের শয়নে।
প্রেমাস্পদে মুগ্ধ নেত্রে হেরে নীল ব্যোম চেয়ে নত আঁখি,
কানে কানে প্রেম-গুঞ্জরণ মৃদু হেসে করে কর রাখি।

নিদাঘের রৌদ্র-তপ্ত প্রাণে
প্রথম দেখেছি পদ্মা তোরে বিদ্ধ তুই ফুল-শর-বাণে।
লজ্জাবতী প্রেমে কম্র মুখ,
যৌবনের আবেশ পরশে শ্বাস-রুদ্ধ বিক্ষোভিত বুক।
অলস শিথিল অঙ্গ হ'তে লুপ্ত হয় বিশ্ব চরাচর—
পূর্ণে অন্ধ আঁখি আগে জাগে প্রেমাস্পদ-পরশ-সুন্দর।

মেঘে মেঘে ছাওয়া বরষায়
উচ্ছ্বসিত হেরিয়াছি তোরে উল্লাসের পরিপূর্ণতায়।
সংহারের উঠে কলরব।
অট্টহাস্যে লক্ষ-দীপ্তিপ্লুত বক্ষে তোর করিছে উৎসব।
ভেঙ্গে-চূরে লুটে নিতে চায পুত্তলিকাসম ত্রিসংসার
এ তাণ্ডব ছন্দে ছন্দে উঠে তারি ধ্বংসে আনন্দ হুঙ্কার।

ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ রে বন্ধন
ভূ-মাঝে যে শান্ত করি রাখে তার কণ্ঠে উঠুক ক্রন্দন,
প্রতিবাদী কূলরেখা ওই গণ্ডী দিয়া রহে দাঁড়াইয়া,
হান শিরে বজ্রদণ্ড তোর আপনারে চল বাড়াইয়া।
মুক্তি চাই মুক্তি চাই ওরে চাই চাই মুক্তির উল্লাস,
হোক্ বিশ্ব ধ্বংসে চূর্ণ চূর্ণ হোক তোর আত্মসর্ব্বনাশ!

এ উল্লাস-গীতি সর্ব্বনাশা
শুনে বিশ্ব কাঁপি থর থর কণ্ঠে শুষ্ক চীৎকারের ভাষা।
তোর এই তাণ্ডব স্পন্দন
চিত্ত মোর স্পর্শ করিয়াছে ছেদ করি কায়ার বন্ধন।
কায়ারে ছুড়িয়া ফেলি দূরে মোর প্রাণ মিশিবারে চায়,
ভীমরঙ্গে হ'য়ে অণু অণু তরঙ্গের মাথায় মাথায়।
একবার শুধু একবার—
গণ্ডীবদ্ধ শৃঙ্খলিত চায় করিবারে সফেন চীৎকার,
করে করে তালি দিয়া দিয়া
এ অসীম সংহারেতে চায় একবার বিছাইতে হিয়া।

শ্রীচন্দ্রবিনোদ দাস।

মুক্তা-সংগ্রহ

বন্দরে অবস্থিত শুক্তিসংগ্রহকারী নৌকাশ্রেণী

সিংহলেব মুক্তার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বিজয় সিংহ সিংহলে গমন করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তদীয় শ্বশুর মদুরাপতির নিকট বহুসংখ্যক মূল্যবান্ মুক্তা উপঢৌকনস্বরূপে প্রেরণ করেন। সিংহলী মুক্তা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্লিনী বহু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

সিংহলে দীর্ঘকাল হইতে মুক্তা-সংগ্রহের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে নানা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ মুক্তা-শিকার বন্ধও হইয়াছিল। কোন কোন সময়ে স্রোতোবেগে তরুণ শুক্তিসমূহ অন্যত্র নীত হইত, কখনও বা এমন হইয়াছে যে, কোন কোন জাতীয় মৎস্য শুক্তিগুলিকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছিল।

এইরূপে সিংহলের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে শুক্তি-সংগ্রহ-পর্ব্ব মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত হইত। শেষ দুর্ঘটনার পর ১৯ বৎসরকাল সিংহলে মুক্তা-সংগ্রহের কার্য্য বন্ধ ছিল। বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উহা পুনরায় আরব্ধ হইয়াছে। সিংহল সরকারের নিযুক্ত ডাক্তাব পিয়ারসন্ ও মিঃ মালপাস্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধুনা শুক্তিশিকার—মুক্তা-সংগ্রহ করিতেছেন।

বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতে নানা বিষয়ে ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু সিংহলের মুক্তা-সংগ্রহ কার্য্যে ডুবুরীরা বিজয় সিংহের যুগে যে ভাবে শুক্তিশিকার করিত, সেই সুপ্রাচীন প্রণালীর কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সিংহলের সর্ব্বত্র শুক্তি পাওয়া যায় না। সমুদ্রের উপকূলের যে যে অংশে কোটি কোটি শুক্তি জন্মগ্রহণ করে ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে 'মুক্তা উপকূল' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। শুক্তিসমূহ সাধারণতঃ ৩০ ফুট হইতে ৪৫ ফুট গভীর জলের নিম্নে অবস্থিতি করে।

৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া শিকারীরা শুক্তিসংগ্রহে যাইত, বর্ত্তমানেও ঠিক সেই শ্রেণীর তরণী সহযোগে শুক্তি সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক তরণী সমুদ্রবক্ষে ছড়াইয়া পড়ে। 'মাণ্ডক'গণ (ইহারা রজ্জুসহযোগে ডুবুরীদিগকে সমুদ্রগর্ভে নামাইয়া দেয়) রজ্জুগুলি পরীক্ষা

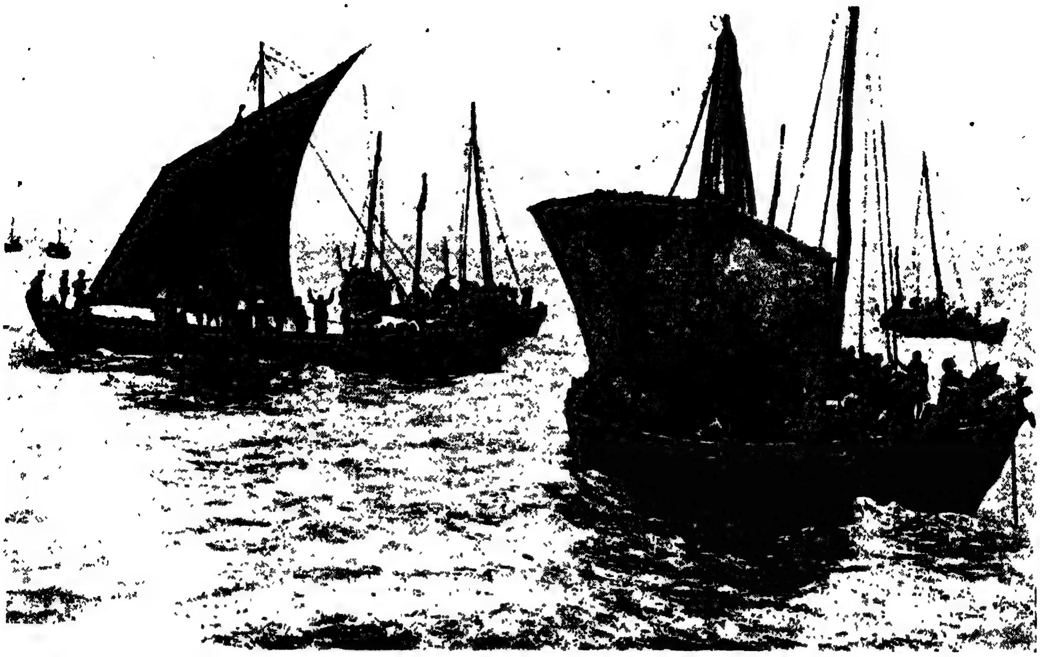

পাল তুলিয়া নৌকা শুক্তিসংগ্রহে চলিয়াছে

করিয়া ডুবুরীদিগের প্রতীক্ষায় স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। ডুবুরীদিগের অধিকাংশই দক্ষিণ-ভারতের তামিল ও আরব। শুক্তি-শিকারে আরব ডুবুরীরা তামিলদিগের অপেক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উভয় শ্রেণীর ডুবুরী একই ভাবে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গেলেও তাহাদের প্রণালীতে পার্থক্য আছে। 'মাণ্ডক' দুইটি রজ্জু জলের মধ্যে নামাইয়া দেয় একটিতে পাতর বাঁধা থাকে, অপরটিতে জাল-বেষ্টিত একটি ঝুড়ি সংলগ্ন থাকে। ডুবুরী পাতরের উপর একটি পা রাখিয়া, ঝুড়িসংলগ্ন রজ্জু হস্তে ধারণ করিয়া জলের মধ্যে নামিয়া যায়। সমুদ্রতলে পৌঁছিয়া সে শুক্তিগুলি ঝুড়ির মধ্যে সংগ্রহ করে। কার্য্য শেষ হইলেই সে রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করে, অমনই মাণ্ডক তাহাকে উপরে টানিয়া তুলে।

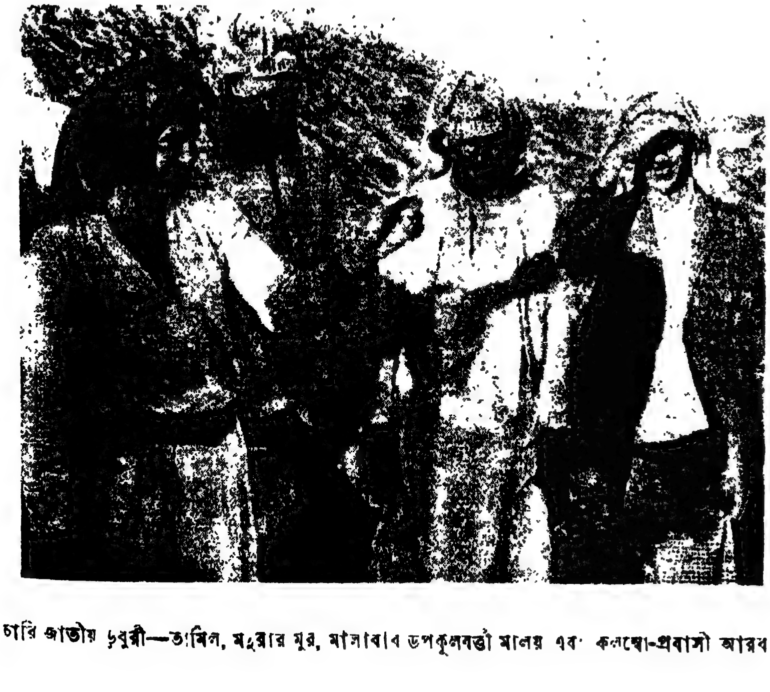

চারি জাতীয় ডুবুরী—তামিল, মদুরার মুর, মালাবার উপকূলবর্ত্তী মালয় এবং কলম্বো-প্রবাসী আরব

তামিল ডুবুরী উপরে না উঠা পর্য্যন্ত রজ্জু ধরিয়া থাকে না, সে

সাঁতার দিতে থাকে। আরব ডুবুরী রজ্জু ধারণ করিয়া উপরে উঠে। ইহাতে অনেকটা সময় অপব্যয় হয় না। আরবগণ নাসিকারন্ধ্র এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা বন্ধ করে। তামিলগণ দুই অঙ্গুলীর সাহায্যে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া রাখে।

জলের মধ্যে সাধারণতঃ ডুবুরীরা ১ হইতে ১ মিনিট ১০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত অবস্থান করে; কিন্তু এমনও শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ২ মিনিট পর্য্যন্ত তাহারা জলের নীচে রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট ডুবুরীরা সমস্ত দিনের মধ্যে ৪০ হইতে ৫০ বার জলের মধ্যে ডুবিয়া শুক্তিসংগ্রহ করিতে পারে।

সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনও ডুবুরী প্রাণ দিয়াছে, এমন কাহিনী শুনা যায় নাই। প্রাচীন যুগে হাঙ্গর বশীকরণ করার প্রথা ছিল। মন্ত্রবলে হাঙ্গরকে বশ করা যায়, এইরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বকালে ডুবুরীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আরবগণ কোরাণের কোনও একটি 'বয়েৎ' লিখিয়া বাহুমূলে, কণ্ঠে অথবা কটিদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিত; ইহাতে হাঙ্গরগণ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিত না।

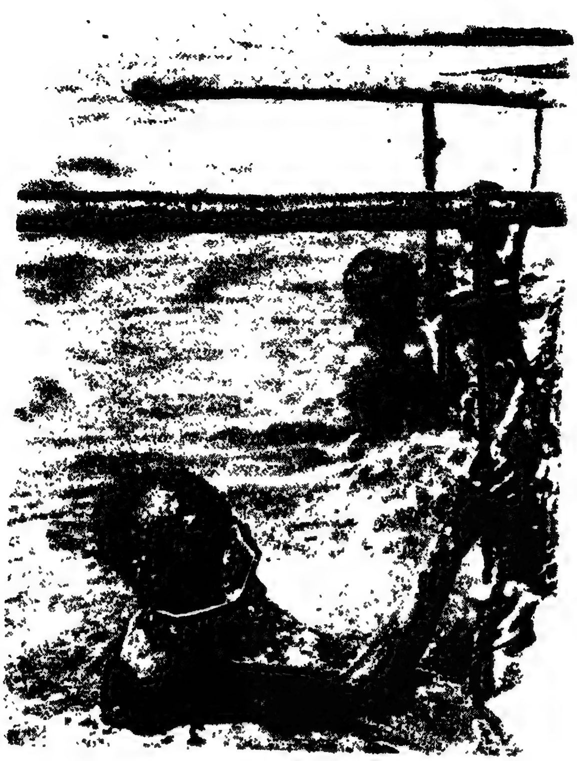

আরব ডুবুরী নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে

বাষ্পীয় পোত শৃঙ্খলিত নৌকাগুলি টানিয়া আনিতেছে

বেলা দ্বিপ্রহরের পর আর শুক্তি-সংগ্রহ কার্য্য চলে না। সাঙ্কেতিক শব্দ হইবামাত্র কার্য্য বন্ধ হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা লঞ্চে আরোহণ করিয়া প্রত্যেক নৌকায় গমন করেন এবং শুক্তিপূর্ণ থলিয়াগুলি মোহরাঙ্কিত করিয়া বন্ধ করেন। তখন নৌকাগুলি বাষ্পীয় পোতের সহিত রজ্জু-বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কূল হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে আসিবার পর বাষ্পীয় পোত হইতে নৌকাগুলি মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে তীরে পৌঁছিবার জন্য নৌকাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। যে অগ্রে পৌঁছিবে, তাহার শুক্তিসমূহ সরকারী 'কোট্টু'তে (Kottu) - প্রাচারবেষ্টিত স্থান, এইখানে শুক্তি গণনা হইয়া থাকে—অগ্রে নীত হইবে।

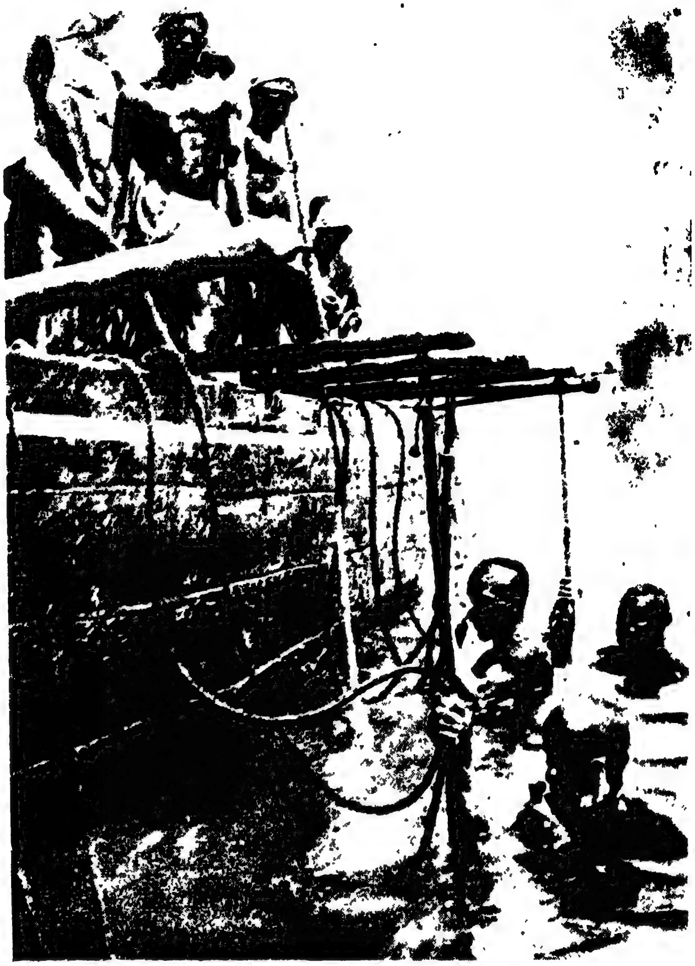

তামিল ডুবুরী—জলে ডুবিবার পূর্ব্বে

মারীচচুকাড়ি (মুক্তাসহর) নামক স্থানে শুক্তিগুলি সঞ্চিত হয়। এই সময়ে তীরদেশে দর্শকের ভীড় হয়। যখন শুক্তি-সংগ্রহের কার্য্য বন্ধ থাকে তখন এই পরম রমণীয় স্থানটি জনবর্জ্জিত দেখায়—শুধু এখানে সেখানে কয়েকখানিমাত্র পর্ণ-কুটীর ও দুই চারিটি অট্টালিকা ছাড়া মনুষ্যাবাসের আর কোনও চিহ্ন থাকে না। শুক্তি-সংগ্রহের সময় এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০।৪০ হাজার হয়। বৎসরের মত যখন শুক্তি-শিকার বন্ধ হইয়া যায়, তখন এই বিরাট জনতার কোনও সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

বোঝা মাথায় ডুবুরীর দল

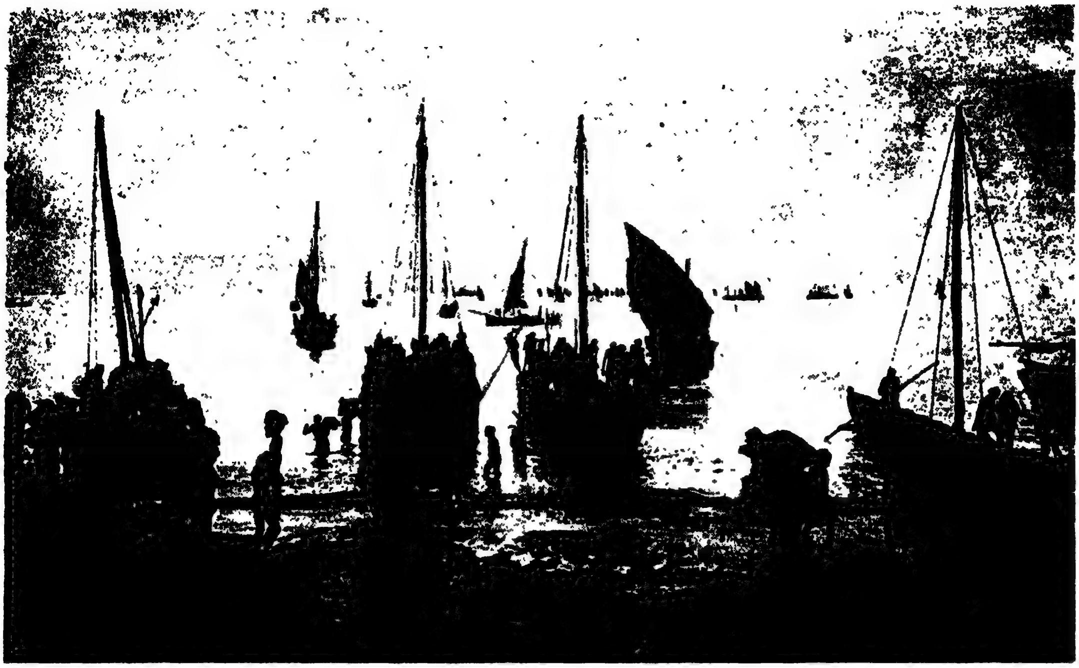

প্রতিযোগিতায় নৌকাসমূহ

ক্রেতৃগণ শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার সন্ধান করিতেছে

নৌকাগুলি তীরে লাগিবামাত্র ডুবুরীরা যে যাহার শুক্তির বস্তা মাথায় করিয়া লয়। জনৈক মার্কিণ লেখক এই বিষয়ের বর্ণনার সময় লিখিয়াছেন,—"ইহাদের দেখিলেই মনে হয়, যেন আলাদীনের প্রদীপ-গল্পের দাসগণ রত্নাধার বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে! সে কথা মিথ্যাও নহে।"

'কটুর' অভ্যন্তরে শুক্তিগুলি ঢালিয়া ফেলিয়া গণনা করা হয়। সরকারপক্ষ ৩ ভাগের দুই ভাগ লইলে বক্রী তৃতীয়াংশ ডুবুরীকে তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হয়। ডুবুরী নিজের অংশ লইয়া বাহির হইলেই চারিদিক্ হইতে শুক্তিক্রয়কারীরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে—প্রায় সকল জাতীয় ক্রেতাই সেখানে উপস্থিত থাকে। ডুবুরীরা সমুদয় শুক্তি বিক্রয় করে না, কিছু কিছুমাত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ডুবুরীরা প্রত্যেক শুক্তির জন্য ১৲ টাকা করিয়া পাইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

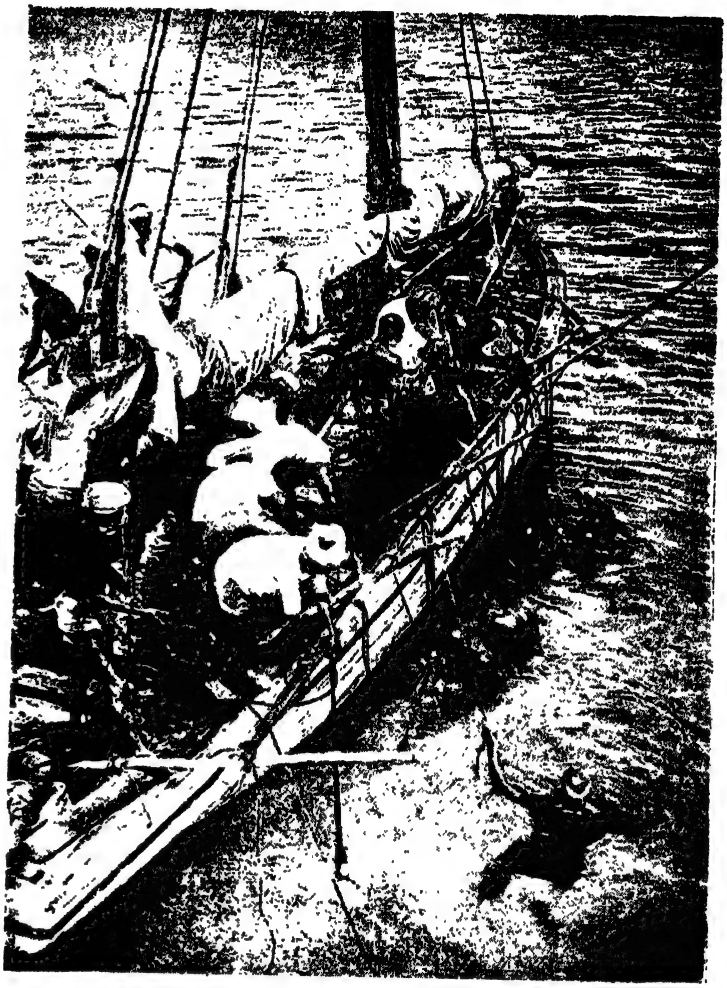

ম্যানার উপসাগরে শুক্তি সংগ্রহ

মুক্তাসহরের মুক্তা-বণিকের দল

ক্রেতৃগণ শুক্তিগুলি তালপত্র-নির্ম্মিত ঝুড়ির মধ্যে রাখে এবং কার্য্য শেষ হইলেই ছুরিকা-সাহায্যে শুক্তি-অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া সাগ্রহে মুক্তার সন্ধান করিতে থাকে। কোনও কোনও শুক্তির মধ্যে ১১টা পর্য্যন্ত মুক্তা থাকে, এমন কথা শুনা গিয়াছে।

মুক্তাসহরে শিকারপর্ব্বোপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের

বৃহৎ মুক্তা হস্তে ক্রেতা

অস্থায়ী দোকানও প্রতিষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল, ডাকঘর, বিচারালয় এবং পুলিস-থানা প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন অপরাহ্নকালে সরকারপক্ষ শুক্তি বিক্রয় করিয়া থাকেন। দর করিয়া নহে—নীলামে যে সর্ব্বোচ্চ হারে ডাকিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই এক একটা স্তূপের শুক্তি ক্রয় করিয়া লয়। তামিল, সিংহলী ও আরব্য ভাষায় দ্বিভাষীরা সমবেত ক্রেতৃগণকে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া থাকে। প্রত্যেক স্তূপে ১ হাজার করিয়া শুক্তি থাকে।

প্রতি হাজার শুক্তি যখন উচ্চ হারে বিক্রীত হয়, তাহার দাম ১ শত ১০ টাকা হইয়া থাকে। সরকারপক্ষ শুক্তি বিক্রয় করিয়া একবার ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

যাহারা অধিক পরিমাণে শুক্তি ক্রয় করে, তাহারা এক স্থানে উহা জমা করিয়া রাখে। ক্রমে উহা পচিয়া গেলে লক্ষ লক্ষ কীট শুক্তির মাংসভাগ ভক্ষণ করিয়া ফেলে। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা

শুক্তি ধৌত করিবার ব্যবস্থা

আরব ডুবুরী

পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হয়। এমন কি, ধূলি পর্য্যন্ত উত্তমরূপে পরীক্ষা না করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় না। এইরূপে অতি ক্ষুদ্র মুক্তাও বাদ পড়ে না।

মুক্তাপূর্ণ শুক্তিগুলি সাধারণ শুক্তির মত নহে। উভয়ের আকৃতিতে কিছু পার্থক্য আছে। মুক্তা-শুক্তির অঙ্গে এক প্রকার কণ্টকবৎ সূত্র আছে। শুক্তি ইচ্ছানুসারে সেই কণ্টকবৎ সূত্র ত্যাগ করিতে পারে অথবা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ। এই কণ্টকবৎ সূত্রসাহায্যে শুক্তিগুলি পাহাড়ের দেহ অথবা অন্য কোনও আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে।

বৎসরে দুই বার করিয়া শুক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে ও শেষে এই দুই ঋতুতেই সাধারণতঃ শুক্তির জন্ম হইয়া থাকে। কোটি কোটি শুক্তি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে। কাষেই বৎসরে দুই বার করিয়া অসংখ্য শিশুশুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ডিম্বকোষ হইতে শুক্তিশিশুর জন্ম হইবার পর প্রথম কয়েক দিবস ইহারা জলের উপরে সন্তরণ করিতে থাকে। তখন ইহাদের উপরিভাগে আবরণ-পট থাকে না। ক্রমে আবরণ-পট গঠিত হইলেই উহারা জলের নিম্নে তলাইয়া যায়। তখন গাত্রস্থিত তন্তুর সাহায্যে অন্য শুক্তি অথবা অপর কোনও আশ্রয় সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে। যদি কোনও ক্রমে শিশুশুক্তি বালুকার উপর নিপতিত হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ উহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। যে সকল শুক্তি পাহাড়ে পতিত হয়, সেইগুলিই ডুবুরীরা সাধারণতঃ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

সরকারী কর্ম্মচারী শুক্তপূর্ণ থলি মোহরাঙ্কিত করিতেছে

পূর্ব্বকালের শুক্তি-সংগ্রহের বিস্তীর্ণ ইতিহাস ভালরূপ নাই। পর্ত্তুগীজগণ সিংহল অধিকার করিবার পর (১৫১৭—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) তদানীন্তন কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে মুক্তা-সংগ্রহের বিশদ

বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের শুক্তি-শিকার সংক্রান্ত যে সকল বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যায় এবং পর্ত্তুগীজ অধিকারের পরবর্ত্তীকালের বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সিংহলের শুক্তি-শিকার পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মিঃ এ, এইচ, মালপাস বলেন যে, বিগত ২ হাজার হইতে ৩ হাজার বৎসরের মধ্যে শুক্তি-শিকার প্রণালী অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে রহিয়াছে।

পর্ত্তুগীজদিগের আমলে 'ম্যানার'ই শুক্তি-সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ যখন শুক্তিসংগ্রহ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল, তখন উহার প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল।

মুক্তা-ছিদ্রকারী শিল্পী

ওলন্দাজগণের নিকট হইতে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শক্তি সিংহল অধিকার করেন। তাহার পূর্ব্বে ওলন্দাজগণ শুক্তি-সংগ্রহে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, উহারা সিংহলের যাবতীয় শুক্তি-শিকার কেন্দ্রে একাধিপত্য করিত। তদানীন্তনযুগে সুবৃহৎ মূল্যবান্ মুক্তা সমূহ বিক্রয় করিয়া ওলন্দাজগণ বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শুক্তি-শিকার ৩৭ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু প্রতিকূল প্রাকৃতিক ঘটনাবশতঃ বেশী শুক্তি সংগৃহীত হয় নাই। মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ শুক্তি ধরা পড়িয়াছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সার্থক ভিক্ষা

দেশে পড়িয়াছে দারুণ আকাল
রাজভাণ্ডারে নাহিক ধন।
ক্ষেত্র ঊষর, ধূম্র-ধূসর—
চারিদিকে শুনি হা হা রোদন।

সে দিনো ভিখারী ঝুলি লয়ে কাঁধে
গুন্‌গুনি একতারাটি তার,
মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া মাগিয়া
ফিরিছে নগর-পথের ধার।

তিন দিন নিজে করেনি আহার,
আপনার ক্ষুধা চরণে ঠেলে,
রাজপুরী পানে চলিল ভিখারী
বেঁধে লয়ে চাল যে কটি পেলে।

রাজার চরণে ঝুলি রেখে কয়—
হে রাজা আপনি ধন্য মানি,
রাজার চরণে ভিক্ষা দিয়াছি
দিনের সকল ভিক্ষা আনি।

ধন্য আজিকে একতারা মোর
ধন্য হয়েছে এ দু'টি হাত,
ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা দিবারে
চির দিও বল নিখিলনাথ!

ভিখারীর ঝুলি রাজা নিলা তুলি
শ্রদ্ধার সাথে ঠেকায়ে শিরে
এ ভিখারী দীন থেকো চিরদিন
কহিলা ভাসিয়া নয়ন-নীরে।

শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রলয়ের আলো

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

হার্ মোজে

বর্ত্তমান আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভভাগে আমরা যে কাহিনীর অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিভিন্ন ঘটনা-সূত্রের অনুসরণ করিতে করিতে আমাদিগকে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতে হইয়াছিল। উচ্চাভিলাষিণী দাম্ভিকা আনা স্মিট তাহার সুন্দরী কন্যা বার্থাকে কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবন সফল মনে করিতেছিল ; কাউণ্টের শাশুড়ী হইয়া তাহার কৌলীন্যাভিমান পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর নবদম্পতির দাম্পত্য-জীবন কিরূপ সুখে অতিবাহিত হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিতে হইলে পাঠক-পাঠিকাগণকে সুইট্জারল্যাণ্ডে ও জুরিচে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

বার্থার বিবাহের পর তাহার মাতা কোন দিন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত না, সর্ব্বদা তাহাকে 'কাউণ্টেস্' বলিয়া সম্বোধন করিত ; বার্থার প্রসঙ্গে কাহাকেও কোন কথা বলিতে হইলে 'আমার কন্যা কাউণ্টেস্' ভিন্ন 'আমার কন্যা বার্থা'—এ কথা কখনও বলিত না। তাহার অসার দম্ভের পরিচয় পাইয়া অনেকে মুখ টিপিয়া হাসিত ; কিন্তু বুড়ী তাহাদের বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিত না। আনা স্মিটের মনে হইত, তাহার আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা তাহার নবার্জ্জিত কৌলীন্যের হিংসায় শীঘ্রই পেট ফাটিয়া মরিয়া যাইবে! কিন্তু তাহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরুক, ইহাই সে প্রার্থনীয় মনে করিত।

কিন্তু স্বদেশে কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থায়ী করিতে হইলে কুলীন জামাইকে জুরিচে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ; নতুবা আনা স্মিট যে 'কাউণ্টেসের মা,' এ কথা দেশের লোক কিছু দিন পরে ভুলিয়া যাইতে পারে। এই জন্য আনা স্মিট তাহার কন্যা-জামাতাকে জুরিচে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ; কিন্তু তাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান, এ জন্য কাউণ্টকে 'ঘরজামাই'রূপে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করা সে সঙ্গত মনে করিল না।

জুরিচনগরের এক প্রান্তে, পাহাড়ের ধারে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহুকাল হইতে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া ছিল ; এই অট্টালিকাটির নাম 'সাটু।' শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কোন সৌখীন ধনাঢ্য ব্যক্তি এই অট্টালিকাটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন যুগের দুর্গের আদর্শে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যিনি এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধররা কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া নগরের অন্য অংশে দীনভাবে কালযাপন করিতেছিল ; বহু অর্থব্যয়ে এই অট্টালিকার জীর্ণ-সংস্কার করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল ; এমন কি, অর্থকষ্টে পড়িয়া তাহারা বহু দিন হইতে এই অট্টালিকাটি বিক্রয়েরই চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু ক্রয়ের জন্য কেহই কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বার্থার বিবাহের পর আনা স্মিট 'কাউণ্টেসের' বাসের জন্য অল্পমূল্যে এই অট্টালিকাটি ক্রয় করিয়া তাহারই নামে দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিল। বুদ্ধিমতী আনা স্মিট কাউণ্টকে যথেষ্ট স্নেহ ও বিশ্বাস করিলেও, বিদেশী জামাতার নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা সঙ্গত মনে করিল না।

বিবাহের অল্পদিন পরে প্রচুর অর্থব্যয়ে এই অট্টালিকা বাসোপযোগী করিয়া, আনা স্মিট কন্যা-জামাতাকে 'সাটু'তে প্রতিষ্ঠিত করিল। বিবাহের পর কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ কাউণ্টেস্কে সঙ্গে লইয়া যুরোপের বিভিন্ন দেশদর্শনে যাত্রা

করিয়াছিলেন। তাঁহারা জুরিচে প্রত্যাগমন করিয়া ‘সাটু’তে বাস করিতে লাগিলেন।

বার্থা তাহার স্বামীর সহিত য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জার্ম্মাণীতেও গমন করিয়াছিল। সেখানে তাহার স্বামীর দুই চারি জন জ্ঞাতির সহিত তাহার পরিচয়ও হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা এতই দরিদ্র ও এরূপ দীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল যে, তাহাদিগকে স্বামীর আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করা বার্থা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় মনে করিল। বার্থা জুরিচে প্রত্যাগমন করিলে আনা স্মিট অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে কাউণ্টের ‘ঘরের খবর’ জিজ্ঞাসা করিল। কন্যার নিকট বৈবাহিকের বংশের ‘চাল-চুলার’ সংবাদ শুনিয়া আনা স্মিটের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং এই লজ্জাজনক সংবাদ আত্মীয়-বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিয়া কাউণ্ট জামাইকে ‘খেলো’ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ, সে ত জানিয়া শুনিয়াই উপাধিমাত্রসম্বল দরিদ্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং বৈবাহিকবংশের দুর্গতির কথা শুনিয়া তাহার আক্ষেপের কোন কারণ ছিল না।

নবদম্পতি ‘সাটু’তে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এক দিন এক জন বিদেশী ‘সাটু’তে উপস্থিত হইয়া কাউণ্ট ও কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। আগন্তুক কাউণ্টের সুপরিচিত হইলেও বার্থার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাউণ্ট সে সময় গৃহে না থাকায়, আর্দালী তাহার নামের কার্ডখানি বার্থার নিকট লইয়া গেল। কার্ডখানির উপর লেখা ছিল :—

“রডল্‌ফ মোজে,
মিলিটারী এজেণ্ট ;
ফ্রাঙ্কফোর্ট-আঁ-মেইন।”

বার্থা কার্ডখানি দেখিয়া মনে করিল, হার্ রডল্‌ফ মোজে যখন ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে আসিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই কাউণ্টের বন্ধু; অতএব স্বামীর অনুপস্থিতিতে আগন্তুকের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করা তাহারই কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া বার্থা হার্ রডল্‌ফ মোজের সহিত সাক্ষাৎ করিল; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বার্থার মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইল; তাহার ধারণা হইল, লোকটা নিতান্ত অভদ্র ও ইতর। বস্তুতঃ, লোকটার চেহারা দেখিলে অশ্রদ্ধা হইবারই কথা। মোজে অস্বাভাবিক মোটা; জালার মত প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং মুখখানা যেন একটা ‘তোলো’ হাঁড়ি! উদরের তুলনায় হাত-পাগুলি অত্যন্ত সরু; মাথাটা বেলের মত গোল এবং চুলগুলি এরূপ ছোট করিয়া ছাঁটা যে, মাথাটা ন্যাড়া দেখাইতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া বার্থার ধারণা হইল—লোকটা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর, কুটিল ও অসচ্চরিত্র। লালসার অগ্নি সে তাহার চঞ্চল চক্ষুতে পরিস্ফুট দেখিল।

বার্থা তাহার সম্মুখে আসিলে মোজে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মাদাম লা কম্‌টেসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম।”—সে ‘হাঁ’ করিয়া বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ক্ষুধিত লোলুপ দৃষ্টি দ্বারা যেন সে বার্থাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

লোকটাকে অভদ্রের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বার্থা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল; সে মনের ভাব গোপনের চেষ্টা না করিয়া নীরস স্বরে বলিল, “মহাশয়, কাউণ্ট এখন কুঠীতে অনুপস্থিত। বোধ হয়, আপনি কোন বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ?”

রডল্‌ফ মোজে দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “হাঁ মাদাম, আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু আমি যে আপনার স্বামীর অতি ঘনিষ্ঠ ‘ইয়ার’, এ কথাও সত্য। তাঁহার সঙ্গে আমার যে সকল গোপনীয় জরুরী পরামর্শ আছে, তাহা এতই মজাদার যে, তাহা শুনিলে খুসী হইয়া তিনি আমার খাতির-যত্নের চূড়ান্ত করিবেন।”

লোকটার অশিষ্ট ভঙ্গী; কথাগুলাও ইতরের মত। ক্রোধে বার্থার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল; আগন্তুক ভদ্রসমাজে মিশিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। বার্থা অতি কষ্টে ক্রোধ গোপন করিয়া বলিল, “কাউণ্টের সঙ্গে আপনার বুঝি অনেক দিনের আলাপ ?”

রডল্‌ফ মোজে চক্ষু দুটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বলিল, “হাঁ, মাদাম, কাউণ্টের সহিত আমার বহুদিনের পরিচয়।”

বার্থা বলিল, “আপনি কি কোন বৈষয়িক কাযের জন্যই কাউণ্টের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ?”

রডল্‌ফ মোজে বার্থার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া

বলিল, "হাঁ, কায ত আছেই; তা ছাড়া তিনি যে জুয়িচে আসিয়া ফাঁকতালে এত বড় একটা 'দাঁও' মারিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আপনার মত অপরূপ সুন্দরীকে লাভ করিয়া এখানে 'গ্যাট' হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার এই সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিব, ইহাও আমার এখানে আগমনের একটি উদ্দেশ্য বটে।"

লোকটার কথা শুনিয়া বার্থার মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল; সে অবজ্ঞাভরে বলিল, "মহাশয়, আমি চলিলাম; ইচ্ছা হইলে আপনি এখানে বসিয়া আমার স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে পারেন। আমার পরিচারক আপনাকে কফি ও চুরুট দিয়া যাইবে।"

বার্থা তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

বার্থার বয়স অল্প হইলেও এবং লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে রডল্‌ফ মোজের যে দুই চারিটি কথা শুনিয়াছিল, তাহাতেই তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে তাহার স্বামীর বন্ধু নহে—শত্রু এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার আগমন!—তাহার এই ধারণার কারণ কি, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও স্বামীর অনিষ্টের আশঙ্কায় সে উৎকণ্ঠিত হইল। প্রায় আধঘণ্টা পরে কাউণ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিলে বার্থা তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিল, "জালার মত ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক তোমার সঙ্গে দেখা করিবার আশায় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে। লোকটার নাম রডলফ মোজে; সে ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে আসিয়াছে।"

বার্থা কথাগুলি বলিয়াই তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার কথা শুনিয়া কাউণ্টের মুখভাবের কোন পরিবর্তন হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। বার্থার কথা শুনিয়া কাউণ্টের মুখ বিবর্ণ হইল, তাঁহার চক্ষুতে উৎকণ্ঠা ও বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তিনি রডলফের নাম শুনিয়া হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া লইলেন, বার্থা ইহাও লক্ষ্য করিল। সে তাঁহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই অধীরভাবে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সচল জালা রডলফ মোজে লোকটা কে?"

বার্থার প্রশ্নে কাউণ্ট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে এই ভাবে আমার কৈফিয়ৎ চাহিতেছ? আমি কি তোমার চাকর? তুমি টাকা খরচ করিয়া আমার খেতাব কিনিয়াছ বটে, কিন্তু আমি তোমার নিকট আমার স্বাধীনতা বিক্রয় করি নাই, আমার উপর মুরুব্বিগিরী ফলাইবারও তোমার কোন অধিকার নাই। রডলফ মোজে আমার পরিচিত ব্যক্তি, তাহার চেহারা তোমার পছন্দ না হইতে পারে, কিন্তু সে জন্য তাহাকে ও ভাবে বিদ্রূপ করিবার কারণ কি? সে বা আমার পরিচিত অন্য যে কোন ব্যক্তি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারে, তাহাদের অভ্যর্থনা করা না করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। এ সকল বিষয়ে তোমার অনধিকার-চর্চ্চা অসহ্য।"

কাউণ্ট অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, স্বামীর এইরূপ রূঢ় ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বার্থা কয়েক মিনিট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে জীবনে কোন দিন এ ভাবে অপমানিত হয় নাই, এরূপ কঠোর দুর্ব্বাক্য তাহাকে আর কখন শুনিতে হয় নাই। তাহার স্বামী সম্বন্ধে তাহার যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে বিলুপ্ত হইল। বার্থা বুঝিতে পারিল, বিবাহ করিয়া সে দুঃসহ অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশেরও অধিকার নাই। স্বামী অকারণে তাহার অপমান করিলে, রূঢ় অভদ্র ভাষায় তিরস্কার করিলে তাহা তাহাকে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাহার মনে হইল, সুখের আশায় সে অনন্ত দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহার মা খেতাবের মোহে ভুলিয়া একটা পশুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

বার্থার ইচ্ছা হইল, সে তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার স্বামীর এই নিষ্ঠুরাচরণের কথা প্রকাশ করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না, হয় ত তাহার মা কাউণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করিবে, এই সন্দেহে হৃদয়ভার লঘু করিবার আশায় মায়ের নিকট যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে চক্ষুর জল মুছিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তকে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিল,

কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না, পাঠে বিরক্তি বোধ হইল। সে পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখিয়া গালে হাত দিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি ভাবিতে লাগিল।

প্রায় ১ ঘণ্টা পরে কাউণ্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বার্থার মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কঠোর ব্যবহারে সে অত্যন্ত আহত হইয়াছে। একটি পয়সার জন্য যাহাকে শাশুড়ীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহার অতখানি দম্ভ প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই বুঝিয়া কাউণ্ট কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে অকারণে বড়ই রূঢ় কথা বলিয়াছি, ইহাতে তুমি মর্ম্মাহত হইয়াছ। তোমার মনে কষ্ট দিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা কর, প্রিয়তমে!"

বার্থা নতমুখে বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে।"

কাউণ্ট বলিলেন, "এখানে একা বসিয়া থাকিলে তোমার মন খারাপ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় চল, বার্থা! সেখানে আমার বন্ধু মোজের সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় হইবে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-পরিচয় হইলেই বুঝিতে পারিবে, সে অতি চমৎকার লোক! যদিও তাহার কথাবার্ত্তায় সুরুচির তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু লোকটা খাঁটি।"

বার্থা স্বামীর কথায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিল, "সে যদি সত্যই তোমার বন্ধু হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু এখন তুমি যাও, আমি একটু পরে যাইতেছি।"

কাউণ্ট বলিলেন, "কিন্তু অধিক বিলম্ব করিও না।" বলিয়াই তিনি একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বার্থা কাউণ্টের 'বন্ধুর' সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও সেই কক্ষ ত্যাগ করিল না; শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া সে কৌচে শয়ন করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আহারের সময় পরিচারিকা আসিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে সে উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল।

ভোজনের টেবলে ছয় সাত জন লোক উপস্থিত থাকায় হার রডল্‌ফ মোজে বার্থার সহিত মন খুলিয়া আলাপ করিবার সুযোগ পাইল না; তথাপি সে বার্থাকে যে দুই চারিটি কথা বলিল, তাহা এরূপ ইতর রসিকতায় পূর্ণ যে, বার্থার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; লোকটা যে অত্যন্ত অশিষ্ট ও দুশ্চরিত্র এবং ভদ্র-সমাজে মিশিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই ধারণাই বার্থার মনে বদ্ধমূল হইল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বার্থার এতই ঘৃণা হইল যে, ভবিষ্যতে মোজে আর কখনও 'সাটু'তে আসিতে না পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার স্বামী এরূপ ইতর লোককে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার সহবাস প্রার্থনীয় মনে করেন, এ কথা ভাবিয়া স্বামীর প্রতিও বার্থার অশ্রদ্ধা হইল; কিন্তু পরদিন অপরাহ্নে কাউণ্টের কথা শুনিয়া বার্থার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কাউণ্ট বার্থাকে বলিলেন, "দেখ প্রিয়তমে, তুমি হার মোজেকে মিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে; দেখিও, যেন তাহার আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়। আমি তাহাকে দুই তিন সপ্তাহ আমার গৃহে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি।" কাউণ্টের কথা শুনিয়া বার্থা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভুজঙ্গের গতি

হার রডল্‌ফ মোজে কাউণ্টের অতিথিরূপে 'সাটু'তে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার-বিহারের ঘটা দেখিয়া বন্ধু-গৃহ ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে স্থির করিল, যত দিন পারে, সেখানে থাকিয়া সুখভোগ করিবে। সে দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল, কাউণ্টেস্ তাহার প্রতি প্রসন্না নহেন; এমন কি, কাউণ্ট তাহাকে গৃহে আশ্রয় দান করায় কাউণ্টেস্ স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রণয়-বন্ধন শিথিল হইতেছে। মোজে ইহাতে সঙ্কোচ বোধ না করিয়া আনন্দই অনুভব করিতে লাগিল; তাহাদের পারিবারিক অশান্তিতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় কাউণ্টের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং তাঁহার সহিত দিবারাত্রি গল্প করিয়াও শ্রান্তি বোধ করিত না। কাউণ্টের সহিত সর্ব্বদা ফুস-ফুস

করিয়া তাহার এত কি কথা হয়, বার্থা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

তথাপি বার্থা তাহার স্বামীর অনুরোধে বা আদেশে আন্তরিক বিতৃষ্ণা গোপন করিয়া, মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে মোজের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত; কিন্তু মোজের ইতর রসিকতায় ও অভদ্র ইঙ্গিতে বার্থা এরূপ মর্ম্মাহত হইল যে, কয়েক দিন পরে মনের ভাব গোপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে মোজের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইল না। তাহার মা প্রতিদিন অপরাহ্ণে 'সাটু'তে বেড়াইতে আসিত; কিন্তু বার্থা কয়েক দিন তাহার মাতার নিকট এই অপ্রীতিকর বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই; অবশেষে মোজের ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিলে বার্থা প্রতীকারকামনায় মোজের ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কথাই তাহার মাতার গোচর করিল।

কন্যার অভিযোগ শুনিয়া আনা স্মিট বলিল, "এই সকল সামান্য ব্যাপারে তুমি যে কেন এরূপ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তোমার একটু বুদ্ধি থাকিলে তোমার স্বামীর অতিথির এই সকল তুচ্ছ ত্রুটি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিতে। তোমার স্বামী বন্ধু-বান্ধবদের উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি তোমার পশ্চাতেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়। তোমার পছন্দ অনুসারে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের অভ্যর্থনা করিবেন, তুমি যাহাদের দেখিতে পার না, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবেন না, তোমার এরূপ আশা করাও সঙ্গত নহে। মোজের সহিত আমারও পরিচয় হইয়াছে; তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ত অভদ্র বলিয়া ধারণা হয় না, বরং তোমার কথাগুলিই অত্যুক্তি মনে হয়। লোকটি সম্ভবতঃ সুশিক্ষিত নহে; কিন্তু তাহার সাধুতায় আমার এক বিন্দু সন্দেহ নাই। আমি স্বীকার করি, বন্ধু-গৃহে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে তেমন গৌরবের বিষয় নহে; কিন্তু তোমার মত সচ্ছল অবস্থা ত সকলের নহে। এখানে আসিয়া তাহার দিনগুলি সুখে ও নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইতেছে। এই জন্যই শীঘ্র তোমাদের আশ্রয় ত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। কাউণ্টের যত দিন ইচ্ছা, তাহাকে এখানে রাখিতে পারেন, সে জন্য তোমার অসন্তুষ্ট হইয়া লাভ নাই।"

মায়ের কথা শুনিয়া বার্থার মন দুঃখে ও অভিমানে উদ্বেল হইয়া উঠিল; সে বুঝিল, কুলীন জামাতার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা তাহার মাতার সাধ্যাতীত। মাতার নিকট সহায়তা দূরের কথা, বিন্দুমাত্র সহানুভূতি লাভেরও আশা নাই। সুতরাং অতঃপর বার্থা মোজের দুর্ব্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কয়েক দিন পর কাউণ্টের কয়েক জন বন্ধু তাহাদের সঙ্গে হ্রদে মৎস্য-শিকার করিতে যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। কাউণ্ট ছিপে মাছ ধরিতে ভালবাসিতেন; তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। স্থির হইল—কাউণ্টেসও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। কাউণ্ট তাঁহার বন্ধু মোজেকেও সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মোজে বলিল, জলের ধারে বসিয়া, শিকারের প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া 'ফাৎনার' দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকা তাহার অসাধ্য, সেরূপ উৎসাহও তাহার নাই। সে মৎস্য শিকারে যাইতে অসম্মত হইল। কাউণ্ট বার্থাকেও সঙ্গে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বার্থা হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় স্বামীর সহিত যাইতে পারিল না। বার্থা বাড়ীতেই থাকিল। তাহার স্বামীর অতিথি-বন্ধু মোজে ঘরে বসিয়া সরাপ ও চুরুটের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

বার্থা নিজের খাস-কামরায় বসিয়া ছিল। তাহার মাতা সেই কক্ষটি কাউণ্টেসের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য বহুমূল্য সুরুচি-সম্মত আস্‌বাবপত্রে সুসজ্জিত করিয়াছিল; বস্তুতঃ, য়ুরোপের কোন রাজমহিষীর উপবেশন-কক্ষ বার্থার উপবেশন-কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্, সুদৃশ্য ও দুর্লভ বিলাসোপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত নহে। কাউণ্ট সদলে মৎস্য-শিকারে যাত্রা করিলে, বার্থা সেই কক্ষে একাকিনী কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিল; অবশেষে অপরাহ্ণকালে সে তাহার মাতার সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিবে, এমন সময় রডল্‌ফ মোজে তাহাকে কোন সংবাদ না দিয়াই হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মোজের এই অশিষ্ট ব্যবহারে বার্থার মুখ ঘৃণায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হার মোজে, আপনার এ কিরূপ আক্কেল? আমার অন্দরমহলে এই

ভাবে প্রবেশ করা যে অমার্জ্জনীয় বেয়াদপি, ইহাও কি আপনার বুঝিবার শক্তি নাই ?"

মোজে তখন মদে চুর। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "কাউণ্টেস্, অত রাগ কেন ? আমি ত বাঘ-ভালুক নহি যে, তোমাকে ধরিয়া খাইব ? মানুষ মানুষের ঘরেই যায়, তাহাতে দোষ কি ?"

বার্থা দ্বারের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া সরোষে বলিল, "এই মুহূর্ত্তে চলিয়া যান ; আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে চাকর ডাকিয়া আপনাকে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইব।"

মোজে বলিল, "ঐ কার্য্যটি না করিলেই ভাল হয়। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, গোপনীয় কথা। সে কথা তোমাকে তোমার চাকরের সাক্ষাতে বলিলে তুমিই লজ্জা বোধ করিবে ; আমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

মোজের কথায় বার্থা ভীত হইল ; সে মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ, চাকর ডাকিবার প্রয়োজন নাই ; আপনার কি বলিবার আছে, বলিয়া এই কক্ষ ত্যাগ করুন।"

মোজে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে তোমার পছন্দ হয় না ?"

বার্থা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না। কোন ভদ্র লোকের মুখ হইতে এরূপ প্রশ্ন বাহির হয় না।"

মোজে বলিল, "কিন্তু আমিও ভদ্র লোক এবং তোমাকে আমার পছন্দ হইয়াছে ; ভদ্র লোকের যাহা অসাধ্য, তোমার জন্য আমি তাহাও করিতে পারি। তোমার প্রেমে আমি জরজর।"

বার্থা সক্রোধে বলিল, "মহাশয়, আপনি কি এখানে আমার অপমান করিতে আসিয়াছেন ?" বার্থা তাহার ভৃত্যকে ডাকিবার জন্য বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিল।

তাহা দেখিয়া মোজে বলিল, "বলিয়াছি ত, ঐ কার্য্যটি করিও না ; করিলে তোমাকে পস্তাইতে হইবে।"

মোজের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বার্থা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার অবাধ্য হইতে সাহস করিল না ; ক্ষোভে, ক্রোধে, অপমানে বিহ্বলপ্রায় হইয়া বলিল, "মহাশয়, যদি আপনি ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, যদি আপনার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ থাকে, রমণী সম্মানের পাত্রী বলিয়া যদি আপনার ধারণা থাকে, তাহা হইলে আপনি দয়া করিয়া অবিলম্বে এই কক্ষ ত্যাগ করুন। এখানে আমি একাকিনী আছি ; আপনি গোপনে আমার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কেহ জানিতে পারিলে আমাকে বড়ই অপদস্থ হইতে হইবে। আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া এই কক্ষে আপনাকে দেখিলে কি মনে করিবেন ? তাহার ফল কিরূপ অপ্রীতিকর হইবে, তাহা কি আপনার বুঝিবার শক্তি নাই ?"

মোজে বলিল, "দেখ সুন্দরি, তুমি আমাকে আর যাহাই মনে কর, নির্ব্বোধ মনে করিও না। বুঝিবার শক্তি আমার বিলক্ষণ আছে। তোমার স্বামী আমাকে তোমার ঘরে আসিয়া আলাপ করিতে দেখিলে রাগ করিবে ? প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া তাহার ঈর্ষা হইবে ? সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমরা পরস্পরকে বেশ চিনি, তোমার স্বামী সে প্রকৃতির লোক নহে।"

মোজে আর একটু অগ্রসর হইয়া বার্থার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইল।

বার্থা মুহূর্ত্তে দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি এতই ইতর যে, আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! আপনার এই ধৃষ্টতা অসহ্য। আপনার কি বলিবার আছে, ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিয়া চলিয়া যাউন, নচেৎ আমি চীৎকার করিয়া আমার পরিচারকদের সাহায্য চাহিব। আপনার ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া না দিলে কি আপনি যাইবেন না ?"

মোজে মুচকুড়ি দিয়া বলিল, "তোফা মেয়েমানুষ বাবা ! বুঝিলাম, তুমি ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না ! তা অত ভয় দেখাইয়া ফল কি ? তোমার চাকরদের ডাক, কিন্তু স্মরণ রাখিও,সে জন্য তোমাকে চিরজীবন পস্তাইতে হইবে।"

বার্থা ক্ষিপ্তবৎ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আপনার কি বলিবার আছে, বলিয়া চলিয়া যাউন, আপনার মুখদর্শন করিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে। আপনি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্যলাভের অযোগ্য ; মানুষ এত ইতর হইতে পারে, এরূপ আমার ধারণা ছিল না।"

মোজে বলিল, "কিন্তু আর কিছু দিন পরে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে ; আমরা পরস্পরকে ভাল করিয়াই চিনিতে পারিব। সে কথা যাক, তুমি বসিয়া আমার সকল কথা মন দিয়া শোন।"

বার্থা বলিল, "না, আমার বসিবার প্রয়োজন নাই। আপনি সংক্ষেপে সকল কথা শেষ করিয়া আমার গৃহ ত্যাগ করুন, স্মরণ রাখিবেন, আমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।"

মোজে গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, ঘৃণা করিতেছ দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, কিন্তু এই ঘৃণা স্থায়ী হইবে না, ক্রমে আমাকে তোমার ভাল লাগিবে। বুনো বাঘ দু'দিনে পোষ মানে না, ক্রমে মানুষের বশীভূত হয়। দেখ মাদাম, আমি গরীব লোক, আর তোমাদের অনুগ্রহে কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ এখন বড় লোক; ভুয়ো খেতাবের জোরে এখন সে পয়সার মুখ দেখিয়াছে। দুই দিক্ দিয়া সে ভাগ্যবান্, তাহার ভাগ্যে বিস্তর টাকা আর পরীর মত সুন্দরী একটি মেয়েমানুষ জুটিয়াছে। বেচারার কি জোরের কপাল! সত্যই আমার হিংসা হইতেছে।"

বার্থা বলিল, "আপনি যদি এই রকম বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করেন, তাহা হইলে আমি এই কক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।"

মোজে অপাঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল, "বাজে কথা কি বলিয়াছি? তোমার মত পরমা সুন্দরী যুবতীকে সে ফাঁকি দিয়া হস্তগত করিয়াছে, ইহা কি বাজে কথা? যাহা হউক, এখন কাযের কথা বলি, শোন। তোমার স্বামী তোমাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত গরীব ছিল, তাহা বোধ হয় শুনিয়াছ। সেই সময় আমি নানা ভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম, এমন কি, আমার সাহায্য না পাইলে কাউণ্ট বেচারাকে হয় ত অনেক দিন উপবাস করিতে হইত। কাউণ্ট ভয়ঙ্কর জুয়ারী ছিল; জুয়াখেলায় তাহার প্রায় ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক ঋণ হইয়াছিল; সেই টাকা আমিই তাহাকে কর্জ্জ দিয়া তাহার মান রক্ষা করিয়াছিলাম। তুমি বোধ হয় জান, জুয়ার দেনার নালিশ চলে না; কিন্তু নালিশ না চলিলেও তাহা দেনা ত বটে। সেই দেনা পরিশোধ করা যত দিন তাহার সাধ্যাতীত ছিল, তত দিন আমি টাকার জন্য তাহার উপর জুলুম করি নাই; ধৈর্য্য ধরিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পরে হঠাৎ জানিতে পারিলাম, সে টাকার ঘরে বিবাহ করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছে; এখন সে বড় লোক। এই জন্যই আমি টাকাগুলি আদায় করিতে আসিয়াছি। আমি তাহার দেনার কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু আমি তাহাকে দেনা শোধ করিতে অনুরোধ করিলে সে আমাকে বলিয়া বসিল, তাহার হাতে নগদ টাকা নাই; শাশুড়ীর নিকট হইতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সে বৃত্তি পায়, তাহাতেই তাহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু আমি ত অতগুলি টাকা নিঃস্বার্থভাবে ছাড়িয়া দিতে পারি না; এই জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও সকল কথা তোমাকে বলিতে হইল। তাহার ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা তোমার বিবেচনাসাপেক্ষ।"

কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ কি প্রকৃতির লোক এবং কিরূপ ইতর লোকের সংসর্গে কালযাপন করিতেন, তাহা জানিতে পারিয়া বার্থা মর্ম্মাহত হইল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আপনার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমার স্বামীর নিকট কিছু টাকা পাইবেন, তাহা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বন্ধু সাজিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছেন এবং এখনও তাহা আদায় করিতে পারেন নাই বলিয়া অতিথির কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আমার অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আপনি মানুষ না শয়তান, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না! যাহা হউক, আমার স্বামী ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আপনার নিকট তাঁহার দেনার কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে সে টাকা আপনি পাইবেন। এখন আপনি স্থানান্তরে যাইতে পারেন; আপনাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত ঘৃণা হইতেছে।"

মোজে সক্রোধে বলিল, "দেখ সুন্দরি, তুমি আজ আমার যে অপমান করিলে, এই অপমানের যদি প্রতিফল দিতে না পারি, যদি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি পুরুষমানুষ নহি।"

মোজে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। বার্থা দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবসন্নভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ডাক্তারের জন্য যোগাড়

গৃহে ডাক্তার আনিবার প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ডাক্তার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে—

১। হাত ধুইবার জন্য পরিষ্কার জল ১ বাল্‌তি ও ঘটী ১টি।

২। হাত ধুইবার জন্য সাবান ১ খান।

৩। হাত মুছিবার জন্য পরিষ্কার তোয়ালে ১ খান কিংবা পরিষ্কার শুকনা কাপড়। হাত মুছিবার জন্য ব্যবহার করা গামছা ডাক্তারকে কখনও দিতে নাই। কারণ, ইহাতে তেল ও অসংখ্য কীটাণু থাকে।

৪। ব্যবস্থাপত্র (প্রেস্‌ক্রপসন্) লিখিবার জন্য ২।৩ খান সাদা কাগজ এবং দোয়াত-কলম। এই দোয়াত-কলমে লেখা যায় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কেন না, ব্যবস্থাপত্র লিখিবার সময় কখন কখন দেখিয়াছি, হয় ত দোয়াতে কালি নাই কিংবা কলমে লেখা যায় না।

৫। আলোকপূর্ণ একটি ঘরে চৌকির উপর রোগীর জন্য একটি পরিষ্কার বিছানা পাতা থাকিবে এবং তাহার গায়ে ঢাকা দিবার জন্য একটি পরিষ্কার মোটা চাদর কিংবা আলোয়ান সেই বিছানার উপর রাখিতে হইবে।

৬। রোগের আরম্ভকাল হইতে ডাক্তার দেখার সময় পর্য্যন্ত, রোগের আমূল বিবরণ যতদূর সম্ভব লিখিয়া রাখিতে হইবে। ইহার সুবিধা এই যে, চিকিৎসকের উপস্থিতি-কালে রোগের সকল কথা যদি তাঁহাকে একসঙ্গে জানাইতে মনে না পড়ে, তাহা হইলেও তিনি সকল কথা জানিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া স্ত্রীরোগ-সংক্রান্ত কোন কথা মুখে বলিতে লজ্জা হয়, লিখিয়া রাখিলে তাহা ডাক্তারকে জানান হয় অথচ লজ্জার কোন কারণ থাকে না।

প্রসবের রোগী, কলেরার রোগী বা অন্য কোন জরুরী 'কেস্' হইলে—

৭। ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পরিষ্কার পাত্রে (পিত্তলের বা অন্য ধাতুনির্ম্মিত কিংবা মাটীর হাঁড়ী বা টিন্) ৩।৪ সের পরিষ্কার জল আধঘণ্টা-কাল উত্তমরূপে ফুটাইয়া, যে পাত্রে ফুটান হইয়াছে, সেই পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। জলের পাত্রে ঢাকা দিয়া জল ফুটাইতে হইবে, নচেৎ তাহাতে ময়লা পড়িতে পারে। পাত্র বদলাইয়া ফুটান জল অন্য পাত্রে কদাচ ঢালিয়া রাখা সঙ্গত নহে। কেন না, ঐ জল অশোধিত পাত্রে ঢালিয়া রাখিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা ডাক্তারের কাযে লাগে না। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি, পিতলের হাঁড়ী বা অন্য পাত্রে জল ফুটাইয়া ঐ জল, ডাক্তারের ব্যবহারের জন্য অন্য পাত্রে (বাল্‌তি বা মাটীর গামলায়) ঢালিয়া রাখা হয়। সকল পাত্রেই বিষ [রোগের কীটাণু] থাকে। আগুনে [স্পিরিট দ্বারা] পুড়াইয়া কিংবা জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া পাত্র শোধন না করিয়া তাহাতে জল রাখিলে জল বিষাক্ত হইয়া যায় এবং সেই বিষাক্ত জল রোগীর জন্য ব্যবহার করিলে রোগীও বিষাক্ত হইয়া যায়। পিতল-কাঁসার পাত্রই হউক, টিনের 'ক্যানিষ্টারে'ই হউক বা শক্ত মাটীর হাঁড়ীতেই হউক, পরিষ্কার পাত্রে ঢাকা দিয়া জল ফুটাইতে হইবে, যেন তাহাতে ময়লা প্রবেশ না করে। আধ ঘণ্টার কম ফুটাইলে জলের বিষ সকল সময় নষ্ট হয় না, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

আধ ঘণ্টা ফুটাইবার পর জলের হাঁড়ী আগুনের উপর হইতে নামাইয়া আর এক পাত্র [৩।৪ সের পরিমাণ] পরিষ্কার জল ঢাকা দিয়া ফুটাইতে দিতে হইবে এবং ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত ঐ পাত্রটি আগুনের উপরই থাকিবে। সঙ্কটাপন্ন রোগের [যথা, প্রসবকালে রক্তস্রাব, বা কলে

ইত্যাদি] চিকিৎসাকালে ফুটান জল অমনোযোগ বশতঃ নষ্ট করিয়া ফেলিলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট করা হয়; এমন কি, কোন কোন সময় শোধিত [ফুটান] গরম জল সময়ে না পাওয়ায় চিকিৎসার এত দেরী হয় যে, চিকিৎসক বাড়ীতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার অভাবে রোগী মারা যায়।

৮। দুই একখানি পরিষ্কার পুরাতন কাপড় আধ ঘণ্টাকাল জলে ফুটাইয়া, যে পাত্রে ফুটান হইবে, সে পাত্রে ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে।

৯। রাত্রিকাল হইলে দুইটি উজ্জ্বল আলো ঠিক করিয়া রাখা প্রয়োজন।

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)।

পাহাড়িয়া প্রেম

পর্ব্বত অরণ্যচারী   বর্ব্বর গারোর নারী—
তাহারি একটি প্রেম-কথা,
আজি বহু দিন পরে   থেকে থেকে মনে পড়ে
হৃদয়ে জাগায় ব্যাকুলতা!
তখন বর্ষার শেষ   মেঘমুক্ত সানুদেশ—
কুয়াশায় দিক্‌চক্র ঢাকা,
রৌপ্য-আভা রবি-করে   বুনিতেছে তারি পরে
বর্ণ-জলে বহু চিত্র আঁকা।
বিচিত্র ফুলের রাশি   হাসিছে বিচিত্র হাসি
শৈবাল আচ্ছন্ন গিরি-গায়ে,
নন্দন-নর্ত্তকী জিনি   নেচে চলে নির্ঝরিণী
শিলার নূপুর পরি পায়ে।
সারি সারি অভ্রমেঘ   পরিপূর্ণ নভোদেশ
শৃঙ্গ তুলি দাঁড়ায়ে পর্ব্বত,
তারি তলে মেষপালে   চরাইয়া সন্ধ্যাকালে
গিরি-নারী ফিরে গৃহ-পথ।
অদূরে চড়াই পরে   সহসা বিস্ময়ভরে
হেরে পূর্ব্ব প্রণয়ী তাহার,
সৈনিক উষ্ণীষ শিরে   অশ্ব পরে ধীরে ধীরে
তারি দিকে হয় আগুসার!
প্রথম যৌবন পারে   সর্ব্বস্ব সঁপিয়া যারে
মেনেছিল মনের মানুষ;
দীর্ঘ সাত বর্ষ শেষ   একেবারে নিরুদ্দেশ
পলাতক ভীরু কাপুরুষ।
জীবন যৌবন তার   ব্যর্থ করি চতুর্ধার
অমূল্য প্রণয়-রত্ন লুটি'
রমণী-হৃদয় কাড়ি   পলায় সে গৃহ ছাড়ি'
তারো এই বীরত্ব ভ্রূকুটি!
যাহারে ফিরিয়া খুঁজি'   দুরাশার সঙ্গে যুঝি
কাটিয়াছে দীর্ঘ বর্ষ সাত,
দেশে দেশে মৃতপ্রায়   অনাহারে অনিদ্রায়
অরণ্যে পর্ব্বতে দিবারাত।
যার সুখ-সঙ্গ-তৃষা   মর্ম্ম-রক্তে আজো মিশা,
আজ সেই সন্ধ্যা অন্ধকারে,
গা ঢাকিয়া কোনমতে   ফিরে ওই বনপথে
না জানি সে কার অভিসারে!
কিন্তু তবু সেই মুখ   পরিপূর্ণ সেই বুক
সেই আঁখি মনমোহনিয়া,
স্মরিতে পুরানো কথা   যুবক নামিল তথা
গিরিকাটা খাড়া পথ দিয়া!
চিনিতে কি না চিনিতে   বল্গা ধরি আচম্বিতে
সমুখে দাঁড়াল নারী আসি',
রাগ মিশে অনুরাগে   পরশে বেদনা জাগে
নয়নে ঘনায় বাষ্পরাশি!
রশি ছাড় দাও পাশ,   কহিলা কর্কশ ভাষ
অশ্বারোহী রশ্মি তার টানি,
সুদীর্ঘ বরষ পরে   প্রাণ কাঁপে কণ্ঠস্বরে,—
এই কি প্রথম প্রেম-বাণী!
জানি না কোথায় লাগি   মুহূর্ত্তে উঠিল জাগি'
প্রণয়ের সুপ্ত অভিমান,
বক্ষের কুক্রীখানি   চকিতে লইয়া টানি'
দাঁড়াইলা বাঘিনী সমান!
ক্রুদ্ধ নারী বজ্রস্বরে   গর্জ্জিলা অবজ্ঞাভরে,
শেষ কথা কহি সে তোমারে,
জগতে দোঁহার স্থান   দেন যদি ভগবান্
এ জীবনে কিংবা পরপারে,—
রহিবে তা এক সাথে   ঝড়-ঝঞ্ঝা বজাঘাতে
আজি এই করিনু শপথ,
যে বা বাঞ্ছি লহ মনে   জীবনে কিবা মরণে
এক ছাড়া ভিন্ন নহে পথ!
হিংসাবৃত্তি পশু বুকে   যে আকৃতি ধরে মুখে,
বদনে তেমনি বিকটতা,
শ্বাসে যেন সর্প-ফোঁসে   রাঙা চক্ষু রুক্ষরোষে
বক্ষে বহে আগ্নেয় বারতা!
নিমেষে সম্বরি নিজে   যুবক ভাবিলা কি যে—
লাগাম টানিয়া বেগভরে,
চালাইতে অশ্ব তার   অসিসম তীক্ষ্ণধার
ছুরিকা সে বিঁধিল পঞ্জরে।
পর্ব্বতে উদিল ঊষা   শারদীয়া নিষ্কলুষা
অরুণের রক্তরাগ রেখা,
গিরিমূলে শিলাতলে   হেরিলা সে কৌতূহলে
গাঢ়তর নররক্ত লেখা!
ধীরে ধীরে বেলা হ'লে   পাহাড়ীয়া দলে দলে
হেরে ভীতিবিস্মিত নয়নে,
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ি'   দু'টি মৃত নরনারী
দৃঢ়বদ্ধ গাঢ় আলিঙ্গনে।
পাহাড়ের কর্ণফুল   ফুটি নানাবর্ণ ফুল
তেমনি ছড়ায় সুধাহাসি,
প্রণয়ের দীপ্তরোষে   দু'টি প্রাণ-উল্কা খসে'
কে জানে কোথায় গেল ভাসি'!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

বেদান্তের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

(ক) ভোগ ও মোক্ষ

জীবের হাতে দুটি আছে, ভোগ আর মোক্ষ। ঈশ স্রষ্টা।

জগৎ ঈশসৃষ্ট ও জীবভোগ্য, যেমন রমণী পিতৃজন্যা ও ভর্তৃভোগ্যা। আর জীব ভোক্তা। জীবের হাতে সৃষ্টি পালন লয় নাই। জীব ইচ্ছা করিলে ভোগ না করিয়া মুক্ত হইতেও পারে।

ভোগ কর্ম্ম-সাপেক্ষ। মোক্ষ ত্যাগ-সাপেক্ষ। কর্ম্ম না করিলে ভোগ হয় না। কর্ম্ম দ্বিবিধ;—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা লৌকিক ভোগ লাভ হয়। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা পারলৌকিক ভোগ লাভ হয়। ত্যাগ না করিলে মোক্ষ হয় না।

পূর্ব্বমীমাংসায় পারলৌকিক ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, উত্তর-মীমাংসায় মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষ দৃষ্টফল, কারণ, জীবিত অবস্থায় লাভ হইতে পারে। লৌকিক ভোগে খুব অল্প সুখ আছে। পারলৌকিক ভোগেও সেইরূপ কিছু সুখ আছে। কিন্তু মোক্ষ পরমানন্দ বা ভূমানন্দ।

(খ) গুণত্রয়

গুণ ত্রিবিধ;—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

তমোগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) ক্রোধ, (২) লোভ, (৩) অনৃত, (৪) হিংসা, (৫) যাচ্ঞা, (৬) দম্ভ, (৭) ক্লান্তি, (৮) কলহ, (৯) শোক-মোহ, (১০) দুঃখ-দৈন্য, (১১) নিদ্রা, (১২) আশা, (১৩) ভয়, (১৪) অনুদ্যম।

রজোগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) কাম, (২) কর্ম্ম, (৩) মদ, (৪) তৃষ্ণা, (৫) গর্ব্ব, (৬) আশীঃ অর্থাৎ ধনের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা, (৭) ভেদবুদ্ধি, (৮) বিষয়-ভোগ, (৯) মদোৎসাহ, (১০) স্তুতিপ্রিয়তা, (১১) উপহাস, (১২) বীর্য্য, (১৩) বলের সহিত উদ্যম।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ এইগুলি—(১) শম, (২) দম, (৩) তিতিক্ষা, (৪) বিবেক, (৫) তপঃ, (৬) সত্য, (৭) দয়া, (৮) স্মৃতি, (৯) তুষ্টি, (১০) ব্যয়শীলতা, (১১) বৈরাগ্য, (১২) শ্রদ্ধা, (১৩) লজ্জা, (১৪) দান, (১৫) আর্জ্জব, (১৬) বিনয়, (১৭) আত্মরতি।

সত্য বটে, সকলেই কিছু কিছু কর্ম্ম করে এবং সকলেরই কিছু কিছু সুখের আস্বাদ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে, অতএব তমঃ কোথায়? কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকের কর্ম্ম করিবার প্রণালী ও সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন।

কর্ম্মকর্ত্তা ত্রিবিধ;—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক।

> "অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
> বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥"

অসমাহিত, অনম্র, শঠ, পরাপমানী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল, দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস।

> "রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
> হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

স্নেহশীল, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, পরপীড়ক, অশুচি, হর্ষশোকান্বিত কর্ত্তা রাজস।

> "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥"

মুক্তসঙ্গ, গর্ব্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তা সাত্ত্বিক।

সেইরূপ সুখও ত্রিবিধ।

> "নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥"

নিদ্রা, আলস্য, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবধানতাপ্রযুক্ত যে সুখ, সে সুখ তামস।

> "বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ।"

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ দুঃখ-সহ-সুখ রাজস।

> "আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।"

সংযমাধীন আত্মবুদ্ধ্যুৎপন্ন সুখ সাত্ত্বিক।

অতএব জীবের ব্যবহার এক একটি গুণকৃত নহে, কিন্তু ত্রিগুণের সন্নিপাত বা মিশ্রণহেতু।

(গ) বন্ধন ও মুক্তি

বন্ধন ত্রিবিধ;—তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব।

তমোগুণের বন্ধন। তমঃ অজ্ঞানজ ও ভ্রান্তিজনক।

> "প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তং নিবধ্নাতি ভারত!"

প্রমাদ, আলস্য অর্থাৎ অনুদ্যম ও নিদ্রা—এই কয়টির সহিত তমঃ দেহীকে বদ্ধ করে।

রজোগুণের বন্ধন—রজঃ রাগাত্মক অর্থাৎ রঙিয়ে ফেলে। রজঃ তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক।

"তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।"

সে জন্য দেহীকে কর্ম্মে বদ্ধ করে।

সত্ত্বগুণের বন্ধন—সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, সে জন্য প্রকাশক ও শান্ত।

"সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।"

সত্ত্ব সুখে ও জ্ঞানে দেহীকে বদ্ধ করে।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের একটি সনাতন সত্য যে, তমঃ রজঃ দ্বারা নাশ হয়, রজঃ সত্ত্ব দ্বারা নাশ হয়, সত্ত্ব উপশম দ্বারা নাশ হয়।

"সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি।"

সত্ত্বগুণ দ্বারা তমঃ ও রজঃ নাশ করিবে, আর দয়াদি সত্ত্ববৃত্তি, উপশম বা শান্তি দ্বারা নাশ করিবে।

এই কয়টি ভগবদ্‌বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, অনুদ্যম, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি তমোভাব কর্ম্ম দ্বারা নাশ করা যাইতে পারে। তৃষ্ণা ও আসক্তি কর্ম্মের প্রচোদক।

সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তির নাশ হইতে পারে। সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি শান্তি দ্বারা নাশ হইলে, তবে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হয়।

(ঘ) ত্যাগের প্রকৃত অর্থ

প্রশ্ন হইতেছে, যে তমশ্ছন্ন, তাহাকে সত্ত্বগুণের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না? তাহা হইতে পারে না, কারণ, যে ঘোর তমশ্ছন্ন, তাহাকে বৈরাগ্য উপদেশ দিলে, সেই উপদেশ ভিক্ষা, নিদ্রা ও আলস্যে পর্য্যবসিত হইবে। এ বিষয়ে ভগবদ্‌বচন প্রমাণ—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

যার কর্ম্ম নাই, সে ত্যাগ লাভ করিতে পারে না। ভোগ লাভ করিতে কর্ম্ম যেরূপ আবশ্যক, ত্যাগ লাভ করিতে তাহা অপেক্ষা কর্ম্ম অনেক গুণ বেশী আবশ্যক। ত্যাগ মানে যদি আলস্য বা নিদ্রা হইত, সুষুপ্তিকালের অপেক্ষা ত্যাগ হইতে পারে না, তাহা হইলে ত সকলেই অনায়াসে মুক্ত হইত।

ত্যাগের প্রকৃত অর্থ ভোগেচ্ছারহিত হওয়া, কর্ম্ম বা রজোগুণরহিত হওয়া নহে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,

"যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।"

কর্ম্মফল অর্থাৎ ভোগ। যে ভোগত্যাগী, সেই ত্যাগী; কর্ম্মত্যাগী ত্যাগী নহে।

বিশেষতঃ যজ্ঞ, দান আর তপস্যা সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়; কারণ—

"যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম পাবনানি মনীষিণাম্।"

যজ্ঞ, দান আর তপস্যা চিত্তশুদ্ধি করে।

(ঙ) অদ্বৈতসাধনা

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ যে, ধর্ম্ম কথার কথা নহে, সাহিত্য নহে, দর্শন নহে, সামাজিক নিয়ম নহে, বর্ণাশ্রম নহে, যৌন-পাংক্তেয় নহে, শুদ্ধি অশুদ্ধি নহে, ভাবুকতা নহে, কিন্তু ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাক্ষাৎকার বা বস্তুলাভ। যে মহাশক্তি এই জগৎ রচনা করিয়া ইহার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, সেই শক্তির সহিত সাক্ষাৎকারই ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনা আবশ্যক। সাধনা নানা। ঠাকুরের মতে যে সাধনা কর, অদ্বৈতজ্ঞান প্রথমে অর্জ্জন করিলে, ফল ভাল হইবে। তিনি বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও।" অদ্বৈতজ্ঞান অভ্যাস করিলে, পদস্খলনের শঙ্কা কম হইবে। কারণ, বেদমত বড় শুদ্ধ; দীর্ঘকালীন বাসনার হ্রাস হইবে, এইটি অদ্বৈতাভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষতঃ অদ্বৈতসাধনা স্বাভাবিক। এই অদ্বৈতজ্ঞান বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

(চ) বেদান্ত কি?

বেদের তিন ভাগ;—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ। মন্ত্রভাগে দেবতার উপদেশ। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্ম উপদেশ। আর উপনিষদে জ্ঞান উপদেশ। বেদের অন্ত বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎরাশিই বেদান্ত। উপনিষদের অর্থবোধের অনুকূল ব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রও বেদান্ত, আর ভগবদ্গীতাও বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে উপনিষদের বিষয়গুলি

বিশদ করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভাষ্য শারীরক আখ্যায় বিখ্যাত।

(ছ) প্রস্থানত্রয়

অতএব দেখা যাইতেছে, বেদান্তের তিন প্রস্থান ;—শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান, আর ভগবদ্‌গীতা স্মৃতিপ্রস্থান।

(জ) বেদান্তের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

বেদান্তের অনুবন্ধচতুষ্টয়—(১) প্রমাতা, (২) প্রমাণ, (৩) প্রমেয়, (৪) প্রয়োজন।

প্রমাতা অর্থাৎ অধিকারী। প্রমাণ বা সম্বন্ধ। প্রমেয় বা বিষয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি সম্মুখে অন্ন দেখিলে অন্ন ভক্ষণ করে, ভক্ষণ করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি হয় ও তুষ্টি হয়। এখানে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রমাতা বলা যাইতে পারে। অন্ন প্রমেয়। অন্ন দেখা অন্ন ভক্ষণ প্রমাণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও তুষ্টিলাভ প্রয়োজন। সেইরূপ বেদান্তের প্রমাতা জীব, প্রমেয় ব্রহ্ম, প্রমাণ চিত্তবৃত্তি, প্রয়োজন মোক্ষ বা অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দলাভ।

(১ও২) প্রমাণ ও প্রমাতা

জীবমাত্রেই প্রমাতা হইতে পারে না। যে মুমুক্ষু, সে বেদান্তের প্রমাতা বা অধিকারী। যে স্বর্গকাম, সে বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে না; কারণ, তার প্রমেয় স্বর্গ, তার প্রমাণ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি, তার প্রয়োজন স্বর্গসুখ বা অমৃতভোগাদি। স্বর্গকামের চিত্তবৃত্তি বা মনোবুদ্ধি কর্ম্মশাস্ত্রের অধীন। মুমুক্ষুর চিত্তবৃত্তি উপনিষদের অধীন।

(৩) প্রমেয়

বেদান্তের প্রমেয় বা বিষয় জীবব্রহ্মৈক্য, অর্থাৎ বেদান্ত প্রমাণ করে যে, জীব ও ব্রহ্ম এক। ইহা প্রতিপাদন করিবার তিন রকম প্রণালী আচার্য্যগণ অনুমোদন করেন। প্রথম—শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বুঝাইবেন, জীব ও ব্রহ্ম এক, যেমন "তত্ত্বমসি", এই শ্রুতিবাক্য উপদেশ দিতেছে জীব ও ব্রহ্ম এক। দ্বিতীয়—যুক্তির দ্বারা দেখাইবেন, আমাদের আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ অর্থাৎ আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ ও নিত্য। শ্রুতিতেও আছে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। অতএব আত্মা ও ব্রহ্ম এক। তৃতীয়—অনুভব, জ্ঞানীরা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করেন, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। এইরূপ শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব অর্থাৎ আগমপ্রমাণ দ্বারা, অনুমানপ্রমাণ দ্বারা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিবেন, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। এই জীবব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনই বেদান্তের বিষয়।

(৪) প্রয়োজন

প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়, এই ত্রিবিধ ভেদ নিরসন করাই বেদান্তের প্রয়োজন। জীব প্রমাতা, অন্তঃকরণ প্রমাণ, ব্রহ্ম প্রমেয়, এই ত্রিবিধ ভেদ অপগত হইলে মুক্তি হয়। মুক্তি অর্থাৎ সর্ব্ব-অনর্থ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। অর্থাৎ জীব যদি জানিতে পারেন যে, তিনিই ব্রহ্ম, তাহা হইলে সকল অনর্থ দূর হয়, আর তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। মোক্ষ, পরমানন্দ, ব্রহ্ম একই জিনিষ। অতএব বেদান্তের প্রয়োজন মুক্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ও সর্ব্ব-অনর্থ-নিবৃত্তি। লক্ষ্য করিতে হইবে, কেবল অনর্থনিবৃত্তি হইলেই যথেষ্ট হইল না, কিন্তু পরমানন্দপ্রাপ্তি মহালাভ। এইটি বেদান্তের বিশেষত্ব। ন্যায়, সাংখ্য, বৌদ্ধ সাংসারিক অনর্থনিবৃত্তিতেই পর্য্যবসিত। ঐ সকলে আনন্দের উল্লেখ নাই।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

চুরি

চোরে যদি করে চুরি সর্ব্বস্ব আমার,
সকলি আনিতে পারি কিনিয়া আবার।
কিন্তু মনচোর! যদি চুরি কর মন,
কেমনে ফিরায়ে আনি, সে মোর রতন?

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ

স্মৃতির বোঝা

১

সে দিন 'উদ্বোধন সমিতি' হইতে আমরা কয় জন দাক্ষিণাত্যের বন্যাপীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। সমস্ত দিনটাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সংগৃহীত চাউল, বস্ত্রাদি এবং অর্থ সমিতিতে জমা দিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিলাম, তখন সমস্ত আকাশ ভরিয়া ভাদ্রের ঘনীভূত মেঘ বর্ষণের জন্য উন্মুখ হইয়া যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গৃহে ফিরিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার পড়িবার ঘরে যাইয়া দেখি, তিনি আমার পিসীমা'র সহিত গল্প করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া পিসীমা বলিয়া উঠিলেন; "উঃ! কতক্ষণ ধ'রে যে ব'সে আছি তোর সঙ্গে দেখা করব ব'লে সুসী"—

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "কি ক'রে জানব বলুন পিসীমা, আজ আপনি এ দিকে আস্‌বেন"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

পিসীমা কহিলেন, "তোরা ত একবার ও দিকে যাবিনি; সুধার বিয়েতে এত ক'রে যেতে বললুম—গেলিনি।"

"যেতে পারিনি, পিসীমা,—ব'লে আর লজ্জা দেবেন না—সুধা এখন কোথায়?"

"সুধাকে আর নূতন জামাইকেই ত নিয়ে এসেছি তোদের দেখাব ব'লে—তারা বোধ হয় পাশের ঘরে।"

"চলুন, চলুন; আগে তা'দের দেখে আসি, তা'র পর কথা হবে" বলিয়া পিসীমা'কে লইয়া পাশের ঘরে যাইতেই দেখি, তাহারা নির্জ্জন ঘরখানি হাসি-গল্পে ভরিয়া তুলিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই সুধা অবগুণ্ঠন টানিয়া লজ্জায় অপর দ্বার দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আমি ডাকিলাম, "এই সুধা, পালাচ্ছিস্ কেন? বেশ মেয়ে ত—ঘরে কি বাঘ ঢুকতে দেখলি?" কে কার কথা শুনে! সে ততক্ষণ বাড়ীর কোন্ স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছে, কে জানে!—"ও মা, মেয়ের লজ্জা দেখ,"—বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, ওরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে—আর আমরা ব্রাহ্ম। হাসিয়া পিসীমা'কে বলিলাম, "সুধা ত পালাল;—ইনিই বুঝি আমাদের নূতন জামাই?"

"হ্যাঁ, মা,—যোগেন, তোমার দিদিকে প্রণাম কর।"

যুবকটি উঠিয়া আমাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে আমি সরিয়া গিয়া কহিলাম, "কি যে বলেন, পিসী-মা! আমায় আবার প্রণাম কিসের?"

"ছি, মা, তুই যে সুধার দিদি,—আশীর্ব্বাদ কর, ওরা যেন সুখী হয়।"

পিসীমা'র সহিত সে দিন অনেক কথাই হইল। তাঁহাদের স্বাস্থ্যের কথা, সংসারের কথা, এমনই কত কি,—শেষে পিসী-মা কহিলেন, "তুই ত মা, বিয়ে-থা' কিছু করলি না—কি জানি মা তোদের কেমন ধারা। এমন মেয়ে তুই—যেন লক্ষ্মী! দাদাকে তাই ত বল্‌ছিলুম। এত বিষয়-আশয় ভোগ করবে কে? আর আমার দাদাটিও সেই রকম—বলেন কি না, সুসী যে বলে বিয়ে করবে না, কি করি? আর ঐ মানুষটি কি আর সংসারের মানুষ আছে? বৌ-দিদি যখন মারা গেলেন, তখন ত দাদা ছেলেমানুষ—মোটে ৩০।৩২ বছর বয়েস, আর তুই ১ বছরের মেয়েটি; সেই যে তখন থেকে বই নিয়ে বসলেন, আর মুখ তুলে চাইলেন না সংসারের দিকে। ওঁকে দেখলে আমার সেই সব কথা মনে পড়ে"—তাঁহার গলা ভারী হইয়া উঠিল। আমার চোখের কোণেও জল দেখা দিল।

"তুই বিয়ে কর মা, ঐ বইয়ের রাশ থেকে সংসারের কেউ যদি দাদাকে ফেরাতে পারে ত একটি দুরন্ত সুন্দর শিশু, তোদের এত বড় বিষয়ের মালিক—আমার দাদার

নাতি—" পিসীমা হাসিয়া আমার চিবুক নাড়িয়া দিলেন। লজ্জায় আমার মুখ বোধ করি রাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। বিবাহের কথায় নহে—মাতৃত্বের ইঙ্গিতে। আমি কি আর উত্তর দিব, চুপ করিয়াই রহিলাম।

পিসী-মা তখন বলিলেন, "আজ তবে আসি—তোদের সঙ্গে দেখা হ'লে ভারী ভাল লাগে আমার।"

তাঁহারা পিতার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া গেলেন। কাকা তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ভাদ্রের সেই সন্ধ্যাটি যেন বড় ফাঁকা, বড়ই নির্জ্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ছুটিয়া পিতার ঘরে গিয়া বসিলাম। তিনি এক বার পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কেমন কায হ'ল মা, আজ?"

আমি উত্তর করিলাম, "মন্দ নয়, আজ অনেক টাকা সংগ্রহ হয়েছে।" কথা পিতার কানে গিয়া পৌঁছিল কি না, জানি না। তাঁহার মন ইতোমধ্যেই বোধ করি, পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্য দিয়া পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ অতীত অজ্ঞাতের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল। ধীরে ধীরে আমার ঘরে ফিরিলাম; শয্যায় গা এলাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পিসীমা'র কথা—"বিয়ে-থা' ত করলিনে মা!" কিন্তু করিলাম না কেন? কেন? স্মৃতির রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ৩ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া উঠিল।

২

বাবা আর কাকা—দুই ভাই যে দিন বিলাত হইতে ডিগ্রীর ঝুড়ি মাথায় করিয়া দেশে ফিরিলেন, সমাজ তখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার দ্বার আটকাইয়া দাঁড়াইলেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে মা এবং কিছু দিন পরে কাকী-মা আসিয়া তাঁহাদের সংসারের ভার মাথায় করিয়া লইলেন। মা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলে পিতা সংসার ভুলিয়া পুস্তক-পর্ব্বতের ভিতর দিয়া জ্ঞানভাণ্ডারের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। আমার কাকাও এ দিকে কুবেরের ভাণ্ডারের আবিষ্কারে তাঁহার সমস্ত উৎসাহ নিয়োজিত করিলেন। আমার লালন-পালনের ভার পড়িয়াছিল কাকীমা'র উপরে। দিনের পর দিন অবস্থার উন্নতির সহিত কাকা একেবারে পুরা "সাহেব" হইয়া উঠিতেছিলেন এবং আমাকেও পাশ্চাত্য আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সকল বন্দোবস্তই করিয়াছিলেন। আমার জীবনের ২০টি বৎসর এমনই করিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। সে আজ স্বপ্নের মত। তখন গানে গল্পে চায়ের মজলিসে আসর জমকাইয়া টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলিয়া, বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখিয়া কত আনন্দেই না আমার দিন কাটিতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের সমাজের সকলেরই প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করিতেছিলাম। ধরণী তখন আমার নিকট সুখ-সৌন্দর্য্যের তীর্থভূমি, সবই সুন্দর, সবই নবীন। জীবনের এমনই একটা দিনে পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে ধূমকেতুর মতই সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে দিনের আকাশ এমনই বর্ষণোন্মুখ মেঘে আবৃত। শনিবার—কাকা একটি চায়ের মজলিসের আয়োজন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে ছিলেন আমার কয়েক জন বন্ধু ও কাকার কয়েক জন বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সস্ত্রীক। সে দিনের মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। কাকার এক বন্ধু ভাল গান গাহিতে পারিতেন। তিনি তখন গান গাহিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন মধুর, তাঁহার চেহারাটিও তেমনই সুন্দর। আমি মুগ্ধ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিলাম। এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া ডাকিল—"হুজুর!"

কাকা তাহার দিকে চাহিতেই সে আসিয়া কাকার হস্তে এক টুকরা কাগজ দিয়া কহিল, "আপকো সাথ মোলাকাৎ করনে মাঙ্গতা হায়।"

কাকা কাগজের লিখিত নামটি দেখিয়া কহিলেন, "বোলো, অভি মোলাকাৎ নেই হোগা—যাও—"

এমন কত লোকই কাকার সহিত সাক্ষাতের জন্য আইসে। তিনি ত সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুনরায় গানে মন দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গান শেষ হইল; সকলে তখন গান গাহিবার জন্য আমাকেই ধরিয়া বসিল। এ ভার যে আমার উপর পড়িবে, তাহা জানিতাম; কাযেই দ্বিধা না করিয়া পিয়ানোর নিকটে যাইয়া বসিলাম। সবেমাত্র পিয়ানোর চাবি টিপিয়াছি,

সেই সময়ে দরজার পর্দ্দা সরাইয়া সম্পূর্ণ বিলাতী পরিচ্ছদ-পরিহিত এক জন লোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই সম্পূর্ণ বিলাতী কায়দায় সকলকে অভিবাদন জানাইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, “আমি ভারী অভদ্রের মত এসে আপনাদের আনন্দে ব্যাঘাত দিলাম। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি মিষ্টার রায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। দেখা করাটা যে কত বড় দরকার, তা বুঝতেই পারছেন।”

তিনি যদি কথা না কহিতেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালী কি না, তাহা বুঝা আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইত। কাকা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন, “আপনাদের সঙ্গে দেখা করা ভারী শক্ত, আগে ত দুদিন ফিরেই গেছি, আজও ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। দয়া ক’রে যদি আমার একটু উপকার করেন ”

এই উপকারের অনুরোধ লইয়া কত লোকই ত কাকার নিকট আইসে! কাকা যেন একটু বিরক্ত হইয়াই কহিলেন, “উপকারের প্রত্যাশা করলে আপনি অন্য সময়ে এসে দেখা করলেই পারতেন!”

তাঁহার মুখখানি সরল হাসিতে ভরিয়া উঠিল। কহিলেন, “ঐ ত বললুম—আপনাদের দেখা পাওয়াই যে শক্ত! আমার প্রয়োজন আপনার কাছে সামান্য। শুনেছি, আপনাদের একটা লাইব্রেরী আছে, আমি কয়েকখানি বই পড়তে চাই, তাই আপনার কাছে এসেছিলাম।”

কাকা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, “লাইব্রেরী আছে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার দাদাই সব জানেন। আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।”

কাকা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার কক্ষে গেলেন। তখন গান গাহিবার জন্য আবার সকলের অনুরোধ আসিয়া আমার উপর পড়িতে লাগিল। গান জিনিষটির ভিতরে ইতঃপূর্ব্বে যে আনন্দের রূপ দেখিয়াছিলাম, তখন আর সে রূপ দেখিবার মত মনের ভাব নাই। গান গাহিলাম বটে, কিন্তু ভাল জমে নাই। জমিবেই বা কি করিয়া? মনে মনে কেবলই চিন্তা করিতেছিলাম, য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে বাঙ্গালীকে এরূপ নিখুঁত দেখায়, ইহা আশ্চর্য্য। লোকটি কি সত্যই বাঙ্গালী? তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য অন্তরের ভিতরে একটা তীব্র আগ্রহ জন্মিল। কিছুক্ষণ পরেই কাকা ফিরিয়া আসিলেন।

মিষ্টার বসু কাকার লোহার কারবারের অংশীদার। তিনি তাঁহার স্বরটি যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিলেন, “লোকটা কে হে?”

কাকা উত্তর করিলেন, “কি জানি, কখন ত আগে দেখিনি। নাম সৌরেন সেন, রাজনীতি-সম্বন্ধীয় কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন দেশের পুস্তক সম্প্রতি দাদা সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সংবাদ লোকটি কোথা থেকে পেয়ে ছুটে এসেছে; সেগুলি পড়বার জন্য ব্যস্ত। দাদার সঙ্গে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল। তিনি ত সেনকে পেয়ে ভারী খুসী।”

মিষ্টার বসু কহিলেন, “কি করে?”

“বল্লে ত কিছুই করে না।”

“ওঃ! তা হ’লে Vagabond, এক ক্লাসের লোক আছে বটে ঐ রকম।”

কথাটা আমার অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে হইল। এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইল না। পুনরায় সকলে খোসগল্পে মাতিয়া উঠিলেন।

আমার বন্ধু নমিতা বলিল, “সুসী! লোকটি অদ্ভুত; কিন্তু সুন্দর চেহারা। আমার বোধ হয়, উনি বাঙ্গালী ন’ন।”

রেণু কহিল, “যাই হোক্, বড় অভদ্র।”

আমি বলিয়া উঠিলাম, “অভদ্র তোমরা কিসে বল? উনি নিশ্চয়ই বিশেষ কাযে এসেছিলেন।”

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, “ছিঃ ভাই—প্রথম দেখাতেই এতটা ভাল নয়।”

সকলে হাসিয়া উঠিল, কথাটা নিতান্ত সাধারণ পরিহাস হইলেও আমার প্রাণের কোথায় যেন আঘাত করিল। সেই সঙ্গে সমস্ত অন্তরখানি লজ্জায় রঙ্গীন হইয়া উঠিল। বাহিরে সে লজ্জার বিন্দুমাত্র আভাসও প্রকাশ হইতে দিই নাই, শুধু উত্তরে বলিলাম, “রেণু, তুমি ভারি দুষ্টু—”

গানে-গল্পে, হাস্য-পরিহাসে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যাটি অতিথিরা আমাদের গৃহে অতিবাহিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩

এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সেই লোকটির কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সে দিন কাকার সহিত বায়স্কোপ দেখিয়া যখন বাড়ীতে ফিরিলাম, তখন বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। গাড়ীবারান্দায় গাড়ী থামিলে

সম্মুখে দেখি, তিনি "সাহেবী" পরিচ্ছদে। আমাকে দেখিয়াই হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া তিনি কহিলেন. "নমস্কার।"

আমি প্রতিনমস্কার জানাইলাম। কাকা গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে মিষ্টার সেন—বৃষ্টিতে আট্‌কা পড়েছেন বুঝি?"

তিনি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, কি করি।"

"বেশ ত, বলেন ত আমার গাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারে।"

"ধন্যবাদ, থাক, এই একটু পরেই ত বৃষ্টি থেমে যাবে।"

কাকা তখন বলিলেন, "তবে এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চলুন ঘরের ভেতরে।"

তাঁহাদের কথায় বুঝিলাম, ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের দুই জনে আলাপ হইয়া গিয়াছে।

ড্রয়িংরুমে আমরা যাইয়া বসিলে কাকা তাঁহাকে বলিলেন, "মিষ্টার সেন, সুসীর সঙ্গে বোধ হয় আপনার আলাপ নাই, এটি আমার দাদার মেয়ে।"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি ওঁকে চিনি. মিষ্টার রায়ের মুখে প্রায়ই ওঁর কথা শুনি, বড় ভালবাসেন তিনি ওঁকে। তবে আলাপ নাই।"

তাঁহার সহিত কাকা আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। কাকা ছিলেন পূরা "সাহেব", তাই ইহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "আপনারা গল্প করুন, আমি কাপড় ছেড়ে এসে গল্পে যোগ দিচ্ছি।"

ঘরটি যেন আজ অস্বাভাবিক নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। কেন জানি না, আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল। সম্মুখে একখানি কৌচে তিনি বসিয়াছিলেন, আমি কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দিকে চাহিতে পারিতেছিলাম না বা কোন কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল না। ঘরের জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনিই প্রথমে কহিলেন, "সে দিন থেকে ত রোজ বিকেলে আপনার বাবার কাছে আসি। কিন্তু আপনার দেখা পাইনি বলেই আলাপ করতে পারিনি।"

আমি কোন কথা তখনও বলিতে পারি নাই। তিনি একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন, "ঐ দেখুন, আপনার নামটি পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার মোটেই নেই" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। কি সরল সুন্দর প্রাণখোলা হাসি! ঐ হাসির ভিতর দিয়া বোধ করি, তাঁহার মনের সবটুকুই দেখা যায়।

আমি কহিলাম, "আমার নাম সুসী।"

তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এই দেখুন, কার ঘাড়ে কি চাপিয়েছেন। এমন সুন্দর চেহারা আপনার, বোধ হয়, বাঙ্গালীর ঘরে এমনটি দেখা যায় না, তাকে কি এই বিদেশী নামটায় মানায়? বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর নামের কি অভাব আছে? আজকাল নভেলে যে কত সুন্দর সুন্দর সব নাম দেখি, তারই একটা আপনাকে বেশ মানাত। আচ্ছা, আমি ত সারা য়ুরোপটাই ঘুরে এলুম, তা'দের কোনও মেয়েকে ত কখনও শুনিনি বিদেশী নামে ডাক্‌তে। আমরা থাক্‌তেও যে কেন ধার ক'রে মরি, তা বুঝি না।"

এই সরল কথাটায় আমি সত্যের একটা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল, কথাটাকে চাপা দিবার জন্যই কহিলাম, "আপনি য়ুরোপে বেড়াতে গিয়েছিলেন?"

"ঠিক বেড়াতে নয়, পড়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণীতে প্রথমে যাই সায়েন্স এসোসিয়েসন থেকে স্কলারসিপ্ নিয়ে, সেখানে বছর তিনেক থেকে পড়া শেষ ক'রে অন্য দেশগুলো এই এক রকম বেড়িয়েই দেশে ফিরেছি বছর দুই।"

কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার পশ্চিম-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কত কথাই আমাকে বলিতে লাগিলেন। যুদ্ধের ইতিহাস, জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অবস্থা, রুসীয় ইতিহাস, সকল দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি শুধু স্তব্ধ হইয়া সে সকল শুনিয়া বুঝিলাম, সাধে কি তিনি ছুটিয়া আসেন পিতার নিকট পড়িবার জন্য? কথার শেষকালে তিনি কহিলেন, "এই দেশগুলির এমন এক দিন ছিল—যখন সাধারণের উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা অটুট রাখা; কিন্তু দেশের শাসকের কাছে, জমীদারের কাছে তারা নিজেরা যে পরাধীন, সেই পরাধীন! তার পরে দেখুন, তারা এক জনের হাত থেকে ক্রমে শক্তি কেড়ে নিয়ে পাঁচ জনের কাঁধে ফেলে দিলে, এখন দেখছি, সাধারণে তাতেও সন্তুষ্ট নয়। এ দেখে মনে

হয় কি জানেন? মনে হয়, এমন এক দিন আসবে যখন প্রত্যেক মানুষ নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে উদ্যত হবে। তা'রা সবাই চাইবে স্বাধীন হ'তে, জমীদার, প্রজা, ধনী, গরীব, এমন কি, স্ত্রী-পুরুষ তারা প্রত্যেকে জন্মাবে স্বাধীন।"—আমাদের দেশের অবস্থার কথাও তিনি সরল এবং সুন্দরভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি একটু থামিয়াই কহিলেন; "উঃ, পাগলের মত কত কি ব'কে যাচ্ছি!—আপনারা যে রকম বিলাতী ঘেঁষা, আপনাদের ত এ সব ভাল লাগতেই পারে না।" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

আমার মনে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। বিলাতী ঘেঁষার উপরে দোষারোপ করিয়া তিনি কি বলিতে চাহেন যে, আমাদের দেশ নাই, দেশের কথা পর্য্যন্ত আমাদের শুনিতে নাই? বলিলাম, "আপনারা কি দেশকে আমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসেন? আপনি ত নিজে দেখি, কম বিলাতী ঘেঁষা নন?"

তিনি তাঁহার সেই সরল হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বুঝতে পেরেছি, আমার কথায় আপনি আঘাত পেয়েছেন। আচ্ছা, আমার বাইরের দিকটা অনেকটা 'সাহেবী' ধরণের, নয় কি?"

আমি একটু জোর করিয়াই কহিলাম, "নিশ্চয়ই।"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

এই সময়ে কাকা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিলেন। আমিও ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেলাম। কাকীমা তখন ছিলেন না। তিনি তাঁহার পিতার সহিত রাঁচিতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাবা ও কাকার আহারাদির সুবন্দোবস্তের ভার পড়িয়াছিল আমারই উপরে। তাহার আয়োজন করিতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। বাহির-বাড়ীতে আসিয়া দেখি, ড্রয়িংরুম শূন্য; তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার পড়িবার ঘরের দিকে যাইতেছিলাম। সেই সময় দেখি, তিনি যে কৌচটির উপরে বসিয়াছিলেন, সেখানে এক টুকরা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িতে চেষ্টা করিলাম, না পারিয়া পিতাকে সেটি দেখাইলাম। তিনি দেখিয়াই কহিলেন, "আরে এ একটা ফরমুলা।" কাগজখানি আমি আমার নিকট রাখিয়া দিলাম।

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই সংবাদ আসিল, পিতা ডাকিতেছেন। তাঁহার কক্ষে যাইতেই দেখি, তিনি পিতার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। আমার দেখা পাইবামাত্র তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কাল ভুলে ভারী একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি। একটা slipএ কতকগুলি দরকারী কথা লেখা ছিল; সেটা হারিয়ে ফেলেছি। কত খুঁজে শেষে এখানে এসে মিষ্টার রায়ের কাছে সন্ধান পেলুম। দয়া ক'রে এখন সেটা এনে দিন না? ভারী দরকার।"

তাঁহার সরল মুখের উপর উৎকণ্ঠার একটা ছায়া পড়িয়া মুখখানি আমার চোখে বড়ই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। এই লোকটিকে আরও একটু উৎকণ্ঠিত করিয়া, বোধ করি, তাঁহার সেই সুন্দর সরল মুখখানি দেখিবার জন্যই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই নিতান্ত গম্ভীরভাবে পিতাকে কহিলাম, "বাবা, আপনি আমায় ডেকেছেন?"

পিতা পুস্তক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন, "কৈ, না"—পরে তাঁহার দিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, "ওরে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

"কেন বাবা?"

কারণ বোধ করি বাবা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; তিনি এক বার বইয়ের দিকে ও এক বার আমার দিকে চাহিয়া শেষে কহিলেন, "আচ্ছা মা, এক কপ্ চা আর কিছু খাবার নিয়ে আয় এঁর জন্যে"

আমি ফিরিতেছিলাম। তিনি নিতান্ত অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মিষ্টার রায়, আমার সেই slipটার কথা বল্লেন না?"

পিতা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ হো! এই সুসী, চা দরকার নেই—তুই যে কাগজটা আমায় দেখিয়েছিলি, সেটা এনে দে এঁকে।"

আমি গম্ভীরভাবেই কহিলাম, "সেটা যে ওঁর, তার প্রমাণ কি?"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, আনুন না আপনি সেটা। আপনার প্রমাণের চেয়ে কাগজটা বেশী দরকারী আমার।"

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া একেবারে ড্রয়িংরুমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও

আমার অনুসরণ করিয়া নিকটে আসিয়াই কহিলেন, "আপনি খুব আনন্দ অনুভব করছেন, কিন্তু কত বড় দরকারী জিনিষ আমি হারিয়ে ফেলেছি, তা যদি আপনাকে জানাতে পারতুম! যাক্, আপনি এখন দয়া ক'রে সেটা ফিরিয়ে দিন।"

আমি হাসিয়াই উত্তর করিলাম, "আচ্ছা, আপনি ত কত কথাই ব'লে গেলেন, এক টুকরা কাগজ আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু সেটা যে নিঃসন্দেহে আপনার জিনিষ ব'লে ভেবে নিলেন, এর মানে কি?"

"উঃ, কি ভয়ানক আপনি -মানে আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব; আপনার পায়ে পড়ছি, দিন।"

কাযেই আর বাক্যব্যয় না করিয়া সেটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। সেটি পাইবামাত্র তাঁহার মুখে এমনই এক আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম—যাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমায় তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ধন্যবাদ আপনাকে—ধন্যবাদ আপনাকে—এ উপকার আপনার ভুলবার নয়।"

আমি কহিলাম, "ধন্যবাদের এতে ত কিছু নেই। আপনি যেখানে বসেছিলেন, উঠে যাবার পরেই সেখান থেকে এটি পেয়েছি। ও সব কথা এখন থাক—আপনি একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।"

"নাঃ, চায়ে আমার প্রয়োজন নেই। তা'র চাইতে আপনি বসুন, আপনাকে একটা গান শুনিয়ে দিই। আজ সকালটি আমার ভারী ভাল লাগছে।"

আমি হাসিয়া শুধু কহিলাম, "আর একটু আগে?"

"সে ত বুঝতেই পারছেন। উঃ, সত্যি আজ আপনি আমার প্রাণ দিলেন।" বলিতে বলিতে তিনি পিয়ানোর সম্মুখে গিয়া বসিলেন। সেখানে একটি নোটের বই ছিল। তিনি সেখানি দেখিয়া কহিলেন, "এটা ত পুরোনো—নতুন নেই?"

আমি একটি নূতন নোট আনিয়া দিলাম। তিনি একটি জার্ম্মাণ সুর বাজাইতে লাগিলেন। আমি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রেষ্ঠ ডিগ্রীর বোঝা যাহার ঘাড়ে এবং বিভিন্ন পুস্তকের বিচিত্র শব্দ ও তাহার ভাব যাহার মগজে কিলবিল্ করিতেছে, সুরের সাধনা করিবার সময় সে পাইল কোথায়?

বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ তিনি থামিয়া কহিলেন, 'নাঃ—আপনাকে মার্সেলিস্‌টা একবার শুনিয়ে দিই। উঃ, এই গান আর এই সুর এক দিন সারা ফ্রান্সে আগুন জালিয়েছিল।"

তিনি বাজাইতে বাজাইতে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আমার বোধ হইল, তাঁহার সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চে শিহরিয়া উঠিতেছে। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া শুনিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, যেন এমনই এক জন সেই দুর অতীতে এইরূপ আপন-ভোলা হইয়া এই গান গাহিতেছে আর তাহারই চতুষ্পার্শ্বে জাগরণের স্পর্শে চঞ্চল বালক, বৃদ্ধ, যুবা দলে দলে আসিয়া মিলিত হইতেছে। সেই মহামিলনের ক্ষেত্রে সেই সুর তাহার আহ্বানবাণী প্রচার করিতেছে—"ওরে মানুষ, তোরা আয় ছুটে আয় মিলনের ক্ষেত্র আলো ক'রে।"

চমক ভাঙ্গিতেই দেখি, তিনি বাজনা বন্ধ করিয়া বাহিরে শরতের তরুণ-রঙ্গীন-কিরণ-ভরা নীল আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর।

আমি কহিলাম, "গাইবেন বল্লেন যে—"

তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এর পরে আর কি গান গাইব।"

"কেন, কত গান আছে, যা হয় একটা। রবি বাবু জন্মে ত এ দেশে গানের দুঃখু আর রাখেন নি!"

"আমাদের দেশে গান আছে—ভাষা আছে, ভাব আছে; কিন্তু সে সুর নেই—যা এখন প্রাণকে খাড়া ক'রে রাখতে পারে।"

"বলেন কি? আমাদের দেশে সুরের অভাব? বাবা বলেন, সুরের জন্মভূমিই আমাদের এই দেশ। প্রথম যে দিন ওঁকারধ্বনি জেগে উঠেছিল, সে দিন থেকেই ত গানের সুরের সৃষ্টি। তবে সে সাধনা এখন নেই।"

"সে সাধনা নেই, সে সাধক নেই, সে প্রাণ নেই—সব গিয়েছে। আছে শুধু তার জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার প্রতিমূর্ত্তি। সেই প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার করবার মত সাধক চাই, সেই মন্ত্র চাই, সেই সুর চাই—যা'তে শক্তির বিপুল বেগে সব এক নিমেষে চঞ্চল হয়ে ওঠে—যেমন এই মার্সেলিস এক দিন সারা ফ্রান্সকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল।"

এই পুরা "সাহেবী" ধরণের লোকটির মুখ হইতে এই

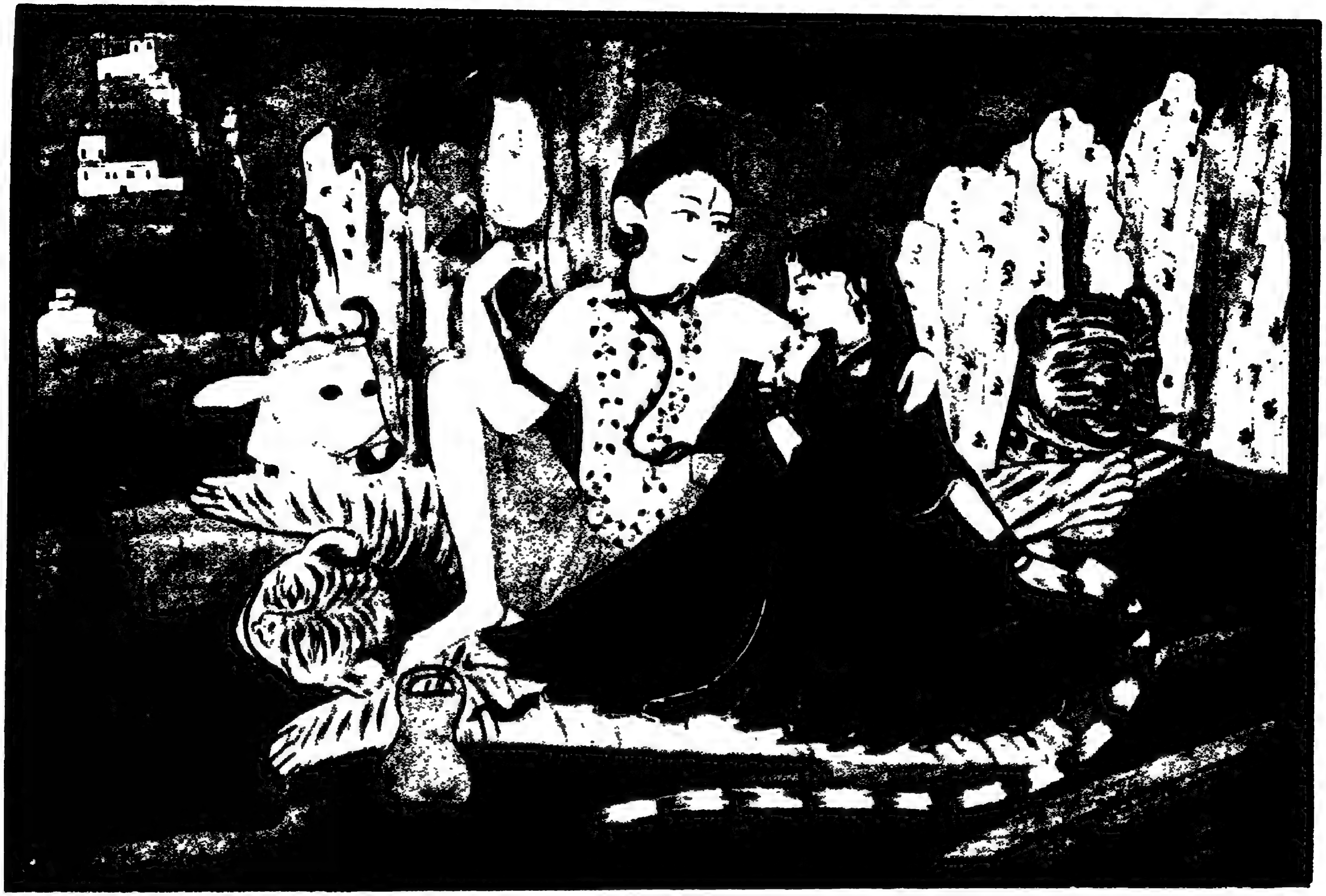

শিব-দুর্গা

বসুমতী প্রেস।

প্রাচীন চিত্র হইতে।

সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। কেন জানি না, বলিয়া ফেলিলাম, "যা চাই, তা হচ্ছে না বলেই বুঝি আপনারা নিজের সব ছেড়ে দিয়ে পরের ভাষা, পরের বেশ, পরের যা কিছু সব নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

তাঁহার সমস্ত মুখখানি ব্যথার রেখায় ভরিয়া উঠিল। শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আপনার মুখে এ কথা শুনে ভারী আনন্দ হ'ল। আপনারা মায়ের জাত, নারী—শক্তি, এই রকম কথা যদি দিনরাত কাণের কাছে বেজে ওঠে, তা হ'লে এ সব ছাড়তে কতক্ষণ?"

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে কাকা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; ফিরিয়াই আমাদের দেখিয়া কহিলেন, "এই যে মিষ্টার সেন! Good morning, তা'র পর হঠাৎ আজ সকালেই--"

তিনি কহিলেন, "বিশেষ একটা কাযে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম। কায আমার শেষ হয়ে গেছে, এখন এঁর সঙ্গে একটু গল্প করছি।"

কাকা কহিলেন, "বেশ বেশ, গল্প করুন।" বলিয়া বেশপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

কাকা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, আর না বসিয়াই কহিলেন, "আজ আসি"—একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন, "আপনাকে আমি বিশ্বাস করি—ঐ কাগজটির কথা আর উত্থাপন করবেন না।" বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার ঠিক তিন দিন পরে মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যা --রেডরোডের পশ্চিমদিকে লাল-সুরকীর সরুরাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলাম। সঙ্গে কেহই ছিল না। সন্ধ্যার শান্ত বাতাস আমার শরীর ও মনকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল তাঁহার উপর— একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া তিনি সম্মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। মন তাঁহার বোধ করি কোন গভীর চিন্তার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকট যাইয়াই কহিলাম, "এই যে মিষ্টার সেন এখানে ব'সে!"

তিনি আমার মুখের উপর দুই চোখ রাখিয়া কহিলেন, "তাই বলুন—আপনি—একাই না কি?"

"হ্যাঁ, একাই।"

"তা'র পর হঠাৎ এ দিকে যে?"

"এ প্রশ্নটা আমিও আপনাকে করছি—আমি ত দেখছেনই বেড়াতে এসেছি—আপনার মত ব'সে থাক্‌তে ত আসিনি?"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আপনি বেশ কথাগুলি বলেন—হাঃ হাঃ হাঃ—আমিও বেড়াতেই এসেছিলুম। তবে এখন একটু বসেছিলাম।"

"বসেছিলেন, না জেগে ঘুমুচ্ছিলেন?"

তিনি একটু গম্ভীরভাবেই কহিলেন, "হয় ত জেগেই ঘুমুচ্ছিলুম—আপনি এসেই জাগিয়ে দিলেন। এমনই জেগে-ঘুমন্তদের আপনারা সত্যিসত্যি জাগাতে পারেন?"

তাঁহার কথাটা অনেকটা হেঁয়ালীর মত। আমি কহিলাম, "কি যে বলেন আপনি, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। কবির মত ব'সে ব'সে কি অত ভাবেন, বলুন দেখি?"

"ভাবি নি কিছু মিস্ রায়, তবে দেখছিলুম—চেয়ে শুধু দেখছিলুম—বিলাসের ঐ শোভাযাত্রা—ধ্বংসের উপর বিলাসের শোভাযাত্রা।"

আমি খুলিয়াই বলিলাম, "আপনার সবটুকুই হেঁয়ালী, আপনি বুঝি স্পষ্ট ক'রে কিছু বল্‌তে পারেন না?"

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়াই তিনি সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; আমিও চুপ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। এইরূপে কয়েক মিনিট কাটিলে তিনি আমায় বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা মিস্ রায়, এত যে লেখাপড়া শিখলেন, সঙ্গীতের সাধনা করলেন, ঘোড়ায় চড়লেন, মোটর চালালেন এর কি কোন উদ্দেশ্য নেই? শুধু কি বিলাসিতাকে, বড় লোকের খেয়ালকে চরিতার্থ করাই এর উদ্দেশ্য?"

হঠাৎ আবার এই কথায় আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, "মিষ্টার সেন, জ্ঞানসঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কি শুধু বিলাসিতা চরিতার্থ করা?"

তিনি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তাই ত ভাবি, আজকাল নবীন যুগের নারীদের মধ্যে এই যে শিক্ষার—এই যে জ্ঞানের একটা পিপাসা জেগে উঠেছে, সে কি শুধু

তার বিলাসের একটা অঙ্গ—একটা খেয়াল? এ শিক্ষা কি অন্য কোন কাযে তাঁরা লাগাতে পারেন না? সান্ধ্য সমিতিতে গান গেয়ে, মেয়ে-মজলিসে বক্তৃতা দিয়ে, রাস্তায় একটু মোটর চালিয়ে তাঁরা লোকের বাহবা কিন্‌তে চান, না অন্য উদ্দেশ্য এর আছে? আমার মনে হয়, এ যুগের এই যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের পিপাসা, এ যদি নারীর নারীত্বকে, তাঁদের অন্তরের শক্তি—যা'কে আমরা এত দিন টুঁটি চেপে কণ্ঠাগত-প্রাণ ক'রে ছেড়েছি, তা'কে প্রাণের বলে বলীয়ান্ ক'রে তুল্‌তে পারে, তবেই সব সার্থক।"

আমি একটু জোর করিয়াই কহিলাম, "প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে উন্নতির পথেই নিয়ে যায়।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "রাগ করবেন না, মিস্ রায়; প্রকৃত শিক্ষা বুঝি তা হ'লে তাঁ'দের হয় না? তা' না হ'লে বিলাসের স্রোত তাঁদের সব তেজ, সব শক্তি হরণ ক'রে শুধু ভোগবাসনার একান্ত অনুগত ক'রে তোলে কেন? অহঙ্কারে তাঁ'রা এমনই স্ফীত যে, নীচের দিকে তাঁ'দের নজরই পড়ে না। আচ্ছা, বলুন ত, আপনি এত যে শিক্ষা পেলেন, বিলাসিতার মোহ কি কাটাতে পেরেছেন? না ভবিষ্যৎ জীবনেই কাটাতে পারবেন?"

এ কথার উত্তরে আমার মুখে কোন কথাই বাহির হইল না। সত্যই ত, শিক্ষা যাহা পাইয়াছি, তাহার তলে তলে কোন ফাঁকে বিলাসিতার বীজ উপ্ত হইয়া এখন তাহা অন্তরে এরূপ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, সহজে তাহা দূর করা দুষ্কর।

তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আপনারা কি সত্যি এমনই আনন্দে হেসে জীবন কাটাতে চান? পারবেন কি?"

আমি কহিলাম, "যদি হেসে কাটাতে পারি, তা'র চাইতে সুখের আর কি আছে?"

এক ঝলক শুষ্ক হাসি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মা'র মরা ছেলেটির বদলে সেই রকম একটি পুতুল নিয়ে কি তাঁ'র জ্ঞান থাক্‌তে আর হাসি আসে? স্বপ্নে হ'তে পারে বটে। আমাদের যে কিছু নেই, শুধু কতকগুলো ঝক্‌ঝকে আলো, তক্‌তকে বাড়ী, চক্‌চকে টাকাকে আমার আমার ব'লে হেসে বেড়াচ্ছি বই ত নয়? সত্যিকারের ঘর আমাদের কোথায়?—নেই। জানেন না কি, বোঝেন না কি?"

আমি কহিলাম, "শুধু ত নারী নারী করেই ক্ষেপে গেলেন, আপনাদের দিকটা একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন ত?"

"নারীর কথাই আগে মনে পড়ে। তাঁ'রা যে আমাদের মা, তাঁ'দের শক্তিতেই আমাদের শক্তি। আমাদের কথা আর বল্‌বেন না—আমরা সব জানি, সব বুঝি, তবুও নিশ্চিন্ত আরামে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমরা জানি পেট, আমরা জানি স্ত্রী, আমরা জানি মাথা গুঁজবার একটু যায়গা—ব্যাস্। কোন রকমে একটি চাকরী জোগাড় ক'রে টাকাটি এনে বাড়ীতে ফেলে দিলেম। স্ত্রীরা সব জ্বালা, সকল কষ্ট সহ্য ক'রে সংসারের বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আমাদের আরামের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতেই ব্যস্ত। এই দেবতার আসন থেকে আরামের রাজ্য ছেড়ে কি কেউ সহজে নামতে চায়? এই নিশ্চিন্ত আরামই ত আমাদের বিলাসের গহ্বরে ধাপে ধাপে নামিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ত অন্য চিন্তার অবসর নেই, শক্তি নেই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া আবার আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আপনারাই ত পুরুষগুলোকে এমনই ভেড়া বানিয়ে পুষে রেখেছেন। তাদের দাসী—ক্রীতদাসী সেজে সংসারের সব জ্বালা, সব ঝঞ্ঝাট, যত রকম দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন—আমাদের আরামের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে। আপনাদের এই আশ্রয় পেয়েই ত আমরা সব ভুলে আছি। কৈ, এই আশ্রয় একবার ভেঙ্গে দিন ত দেখি—আমরা কোথায় যাই? কি তখন করি? সত্যি, আপনারা এ ঘর ভেঙ্গে দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন; দেখবেন, আমরাও বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হব। আর কি দেরী করবার সময় আছে? সমস্ত দেশ, সারা জাতির ভিতরে যে মড়ক লেগেছে!—এই দেখুন বন্যা, এই দেখুন মহামারী—ধ্বংসের সহচর এমনই আরও কত কি আমাদের গ্রাস করতে আসছে!—ধীরে সুস্থের কায নয়। আপনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

তাঁহার গৌর মুখখানি উত্তেজনায় রক্তের আভায় রঙ্গীন হইয়া উঠিল। আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সেই বাণী শুনিতেছিলাম।

এরূপ ত কথনও শুনি নাই, এমন করিয়া ত কেহ আমাকে শুনায় নাই! সেই মুহূর্ত্তে প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সম্পূর্ণ নূতন এক ভাব জাগিয়া আমায় আকুল করিয়া তুলিল। তিনিও স্তব্ধ, আমিও স্তব্ধ; পৃথিবীর নিস্তব্ধতা যেন সেই ফাঁকে স্থানটি আশ্রয় করিয়া বসিল। চমক ভাঙ্গিল ঘড়ীর শব্দে। অদূরে গির্জ্জায় সময়নিরূপণ যন্ত্রটি দ্বিতীয় প্রহর সূচনার সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল। ঘড়ীর শব্দে তাঁহারও চমক ভাঙ্গিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, ৯টা—দেখুন দেখি, পাগলের মত ব'কে আপনাকে হয় ত কত কষ্ট দিয়েছি। কিছু মনে করবেন না—আপনাকে বলেই এতগুলো কথা ব'লে ফেলেছি। বলবার ত ইচ্ছে করে সকলকে—চীৎকার ক'রে; কিন্তু মুখ যে আমার বন্ধ!"

তাঁহার মুখখানি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম,—"সবাইকে যদি এই রকম ক'রে ব'লে বেড়াতেন, তা হ'লে কায হ'ত। মুখ আপনার বন্ধ কি জন্যে?"

সে কথা তাঁহার কানে গেল কি না, জানি না; তিনি কহিলেন, "আজ উঠি মিস রায়, আপনি যান, ঐ ত আপনার গাড়ী?"

"হ্যাঁ"।

তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সে রাত্রিতে শয্যায় গিয়া কত কথাই মনে পড়িয়া গেল। জীবনের অতীত দিনগুলা সত্যই ত আমার কাটিয়াছে বিলাসের মাঝখানে,—কৃত্রিমতার ছায়ায় ঘেরা মিথ্যার আশ্রয়ে। কৈ, কোন দিন ত এ সকল কথা ভাবি নাই, চিন্তা কার নাই! সভাসমিতির বক্তৃতা সংবাদপত্রের সাহায্যে পড়িয়াছি অনেক, কিন্তু প্রাণ ত তাহাতে সাড়া দেয় নাই? দিব্য আরামেই, নিশ্চিন্ত বিলাসের বিষাক্ত রঙ্গমঞ্চে এত দিন নৃত্য করিয়া ফিরিয়াছি। আজ হঠাৎ এই লোকটি আসিয়া মনের তিমির-যবনিকা সরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, বুঝি রঙ্গীন আলোর প্রথম স্পর্শ সোনার কাঠীর মতই সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া দিয়া গেল।—সে রাত্রিতে প্রথম অনুভব করিলাম, একটা তীব্র অভাব। সে অভাব স্বামী, পুত্র, ধনদৌলত, সংসার মিটাইতে পারে না।

৪

রাঁচি হইতে সংবাদ আসিল, কাকীমা পীড়িত। কাকাকে এবং আমাকে সেখানে যাইবার জন্য তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। কাকা বাবাকে সেই সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। পিতা উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "মা'র আমার অসুখ; বল কি? তোমায় ত যেতেই হবে! আর সুসীও যাবে।" তিনি একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন, "দেখ, মিষ্টার সেনকে যদি বলতে পার যে, এ কয় দিন না হয় রোজ একবার ক'রে আসেন—আহা, ছেলেটি বেশ! সে হ'লে তোমাদের অভাবে বিশেষ কষ্ট হবে না আমার।"

এ কয় দিন তিনি প্রত্যহই আসিবেন শুনিয়া আমার রাঁচিতে যাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু কাকীমা'র অসুস্থতার সংবাদ, এবং তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কি এখানে থাকা উচিত? ছিঃ!

পিতার অনুমতি পাইয়া কাকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে দিন ছিল বুধবার, শুক্রবারে আমাদের যাওয়া স্থির হইল। বুধবার, বৃহস্পতিবার এই দুই দিনই কেন জানি না তিনি আইসেন নাই। আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শুক্রবার দিন প্রভাতেই আমি কাকাকে বলিলাম, "কাকা, মিষ্টার সেনকে ত বলা হ'ল না; বাবা যে বলেছিলেন।"

কাকা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত—আচ্ছা চল্‌, আজ বেড়িয়ে ফেরবার সময় সৌরেন বাবুর বাড়ী হয়ে আসব।"

তাঁহার সেই হাসি যেন আমায় লজ্জার গভীরতম প্রদেশে টানিয়া লইয়া গেল। আমি কহিলাম, "না—আমি যাব না, কাকা, আপনিই যান। আমার এ দিকে কায আছে।"

কাকা কহিলেন, "সে ওরা সব করবে অখন।"

গাড়ীতে কাকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাঁ'র বাড়ীটা জানেন ত?"

"বাড়ীটা চিনি না বটে, তবে রাস্তা আর নম্বর জানি।"

কাকা নিজেই মোটর চালাইতেছিলেন। একটা বাড়ীর দ্বারে নম্বর দেখিয়া তিনি কহিলেন, "সিকস্‌টিন বি। হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে।" বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া

দ্বারের নিকট যাইতেই চার পাঁচটি যুবক দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। কাকা তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “এখানে মিষ্টার সেন থাকেন কি?” তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন কাকার প্রতি না চাহিয়াই ইঙ্গিতে জানাইলেন—থাকেন। কাকা ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই দেখি, সেই সরল হাসিভরা মুখখানি লইয়া তিনি গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিলেন, “উঃ, আজ আমার সুপ্রভাত,” বলিয়া বিলাতী কায়দায় আমার হাতটি ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া তিনি কহিলেন, “কত যে আনন্দ হ’ল আজ আপনাকে দেখে—”

উপরে যাইয়া দুই একটি কথার পরেই কাকা তাঁহাকে আমাদের রাঁচি যাইবার কথা এবং পিতার ইচ্ছার কথাটি জানাইলেন।

তিনি একটু গম্ভীরভাবেই কহিলেন, “তাঁকে আমি যে কত ভক্তি করি, তা’ আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমার বিশেষ কায না থাকলে নিশ্চয় যা’ব।”

ফিরিবার সময় ভাবিতেছিলাম—পিতা ইঁহাকে যেরূপ ভালবাসেন, ইনিও পিতাকে সেইরূপ ভক্তি করেন। অন্তরটা, কেন জানি না, দুলিয়া উঠিতেছিল।

সারা দিন যাইবার বন্দোবস্ত করিতেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যায় ট্রেণ। যাত্রা করিবার তখন অধিক দেরী নাই। গাড়ী-বারান্দায় মোটর প্রস্তুত ছিল। আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ তিনি ঝড়ের মতই সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “আমার কতকগুলি টাকা ব্যাঙ্কে জমান ছিল, আপনার নামে সব চেঞ্জ করিয়ে নিয়েছি; এই সেই কাগজ, দরকার হ’লে খরচ করবেন। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।” বলিয়া যেরূপ ঝড়ের মত আসিয়াছিলেন, তেমনই ঝড়ের মত চলিয়া গেলেন। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। আবার এ কি ব্যাপার! ডাক আসিল, “সুমী”। “যাই”—বলিয়া কাকার নিকট গেলাম, পরে পিতার নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলাম। আমার কিন্তু সারা পথটি মনে এই প্রশ্নই বার বার জাগিতেছিল—ইহার অর্থ কি?

৫

সকল অর্থ, সকল জটিলতা এক দিন নিঃশেষে পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন আমরা রাঁচিতে। প্রথম যে দিন কাকীমা’র পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলাম, তাঁহার বুভুক্ষু অন্তরের মাতৃত্ব যেন নিমেষে সজাগ হইয়া উঠিল। কত প্রকারেই তিনি আমায় তাঁহার অন্তরের গভীর স্নেহ জানাইয়া শেষে কহিলেন, “তোকে ছেড়ে কি আমি দু’দিন কোথাও থাকতে পারি? তা’ এই দেড় মাস! মন আমার হাঁফিয়ে উঠেছিল।”

এবার আসিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতে একটি যুবক অতিথিরূপে বাস করিতেছেন। আর কয়বার রাঁচিতে কাকীমা’র পিতার এই বাড়ীতে আসিয়াছি, কিন্তু ইঁহাকে কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, ইনি কাকীমা’র ভ্রাতার এক বন্ধু, ধনী পিতার একমাত্র পুত্র; বিলাত হইতে আই. সি. এস. পাশ করিয়া সবেমাত্র দেশে ফিরিয়াছেন। শীঘ্রই বাঙ্গালার বাহিরে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে। বন্ধুর অনুরোধে কয়েকটা দিন রাঁচিতে কাটাইবার জন্য আসিয়াছেন। বেশ সুপুরুষ। কাকীমা পরের দিনই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, “এরি কথা তোমায় বলেছিলাম অধীর—আমার ত আর নিজের একটা নেই, এ আমারই মেয়ে।”

সেখানে দিনগুলি আমার বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। কখন সবুজ পাহাড়, কখন ছোট ফাঁকা মাঠ, কখন আবার বনস্পতির রঙ্গভূমি বন—এই সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তিতে আমার মন ভরিয়া উঠিত। সেই যুবকটি সুবিধা পাইলেই গল্পে, রসিকতায় আমাকে হাসাইতে চেষ্টা করিতেন। এক দিন সত্যসত্যই তিনি বলিয়া বসিলেন, “মিস রায়! আপনার হাসি আমার ভারী ভাল লাগে।”

কয় দিন তাঁহার হাসি-গল্পে বেশ যোগ দিতেছিলাম। সে দিন এই হাসির কথায় হঠাৎ আর এক জনের হাসি চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। অমনই অতীত দিনগুলির কথা পুরুভুজের শুঁড়ের মতই আমার মনকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরিল। সে চিন্তা হইতে কখনও পরিত্রাণ পাই নাই—পাইব কি না, কে জানে?

সেই রাত্রিতে আহারাদির পর আমার ঘরে শুইতে যাইতেছিলাম। কাকীমা’র ঘরে তাঁহার হাসির শব্দে আমার মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দ্বারের নিকট

যাইতেই শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন, "সুসী আমার ভারী দুষ্ট—সে আবার শান্ত ধীর হ'ল কবে? তবে আজকাল কেন জানি না, একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে- যেন কি ভাবে।"

অধীর বাবু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আপনাকে ত সবই খুলে বললুম। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমি প্রপোজ করতে পারি।"

ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না, শয্যায় যাইয়া শুইলে আর এক চিন্তা মনকে অস্থির করিয়া তুলিল।

পরদিন প্রভাতে বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়াছিলাম। অধীর বাবু আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন এবং গল্প আরম্ভ করিলেন। চা আসিল—ক্রমে তাঁহার গল্পও বেশ জমিয়া উঠিল। এমন সময়ে কাকীমা'র ভ্রাতা একখানি সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে ঘরে আসিয়াই কহিলেন, "শুনেছ অধীর—আবার বোমা! উঃ, কি ভয়ানক, প'ড়ে দেখ?"

কথাটা শুনিয়াই কেন জানি না অধীর চাঞ্চল্যে আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল; আমি কহিলাম, "কৈ, কৈ, কাগজখানা একবার দেখি?"

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দাঁড়ান, আমিই প'ড়ে যাচ্ছি" বলিয়া ধীরে ধীরে সব সংবাদটি পড়িয়া গেলেন।

* * * *

উঃ, তাই সৌরেন সেন জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী লাভ করিয়াও vagabond সাজিয়া বসিয়াছিলেন! এই জন্যই সেই হারান স্লিপটি ফিরিয়া পাইয়া তিনি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার মুখ বন্ধ! তাঁহার সকল কথাই একে একে আমার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমার মুখের রক্তস্রোতঃ বোধ করি, হৃৎপিণ্ডে আসিয়া সে স্থানটিকে যেরূপ আলোড়িত করিতেছিল, মুখের অবস্থাকেও সেইরূপ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ করি, আমি মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িতেছিলাম। অধীর বাবু চীৎকার করিয়া আমায় ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আহা! এ সব nasty জিনিষ এঁর কাছে পড়াই বা কেন? এই রাস্কেলগুলোই ত আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে! যাক্! রমণ, একটু জল আন শীগ্‌গির।" কাকীমা ও কাকা তথায় আসিয়া সবই শুনিলেন।

একটু সুস্থ হইলে দেখি, কাকা, কাকীমা, অধীর বাবু, রমণ বাবু সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। আমি চক্ষু চাহিতেই কাকীমা বলিয়া উঠিলেন,—"সারা জীবনটাই হাসি, গানে, গল্পে কাটিয়েছে—ওকে ও সব জিনিষ প'ড়ে শোনান কেন?"

রমণ বাবু নিতান্তই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তখন আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। সে সময় হইতে যে আমার মনে কি হইল, বুঝিতে পারি না। সারা দিন কেবলই তাঁহার চিন্তা। লোকটি কি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ আত্মীয়-স্বজন, মাতাপিতা, গৃহ ছাড়িয়া অসাধ্য-সাধন প্রয়াসে ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছিলেন? তাঁহার সেই অতিমানুষ শক্তি, সেই রূপ, সেই জ্ঞান সমস্তই নিঃশেষে এই অনিশ্চিতের এই মায়ামরীচিকার পশ্চাতে নষ্ট করিলেন? তাঁহার গানে, গল্পে, ভাষায় তাঁহার অন্তরের বাণী ধ্বনিয়া উঠিত? কিন্তু তিনি যে এত বড় রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন, এ কথা ত কল্পনাও করিতে কেহ পারে নাই। একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল—তাঁহার মনের কথা শুনিতে—তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে।

আমার এ ভাব আর কেহ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু বুঝিলাম, কাকা আমার অন্তরের কথা অনেকটা অনুমান করিয়াছেন।

এক রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময় কাকীমা'র কণ্ঠস্বর পুনরায় আমাকে তাঁহার ঘরের দ্বারের নিকট টানিয়া লইয়া গেল। অন্তরালে থাকিয়া শুনিলাম, তিনি কাকার সহিত আমার বিবাহের কথা কহিতেছেন।

কাকীমা বলিতেছিলেন, "এমন সুপাত্র- এতে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। আর সুসীকেও আমি অবিবাহিত রাখতে আর চাইনে। তুমি কি বল?"

কাকা শুধু উত্তর করিলেন, "হুঁ—"

কাকীমা কহিলেন, "হুঁ নয়! তোমার মতটা খুলে বল?"

কাকা দুই বার কাসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আমার মতের চেয়ে সুসীর মতটাই এ ক্ষেত্রে বেশী দরকার।"

কাকীমা একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে ভার আমার উপরে।"

হায়, অদৃষ্টের কি পরিহাস! এই সময়েই সকল দিক্ হইতে সাড়া পড়িল! এ সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় আমার ছিল না। সেই একই চিন্তা আমার মনে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে কাকার নিকট যাইয়া কহিলাম, "কাকা, আমি বাবার নিকট যা'ব—আমার মন কেমন করছে!"—

কাকা গম্ভীরভাবেই কহিলেন, "দেখি—"

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা! কাকা এবং কাকী-মা উভয়কেই অস্থির করিয়া তুলিলাম—অন্ততঃ এক সপ্তাহ কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আবার আসিব। শেষে তাহাই স্থির হইল। কাকীমা কাকাকে কহিলেন, "মেয়ে ত চিরকালই একগুঁয়ে—কি করি বল?"

কলিকাতায় ফিরিয়া দেখি, সারা সহর বোমার সংবাদে গরম হইয়া রহিয়াছে। গৃহে ফিরিয়াই কাকা কহিলেন, "চল মা, দাদার সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি!"

পিতার কক্ষে যাইয়া দেখি, তিনি পূর্ব্বের মতই পুস্তকের স্তূপের মধ্যস্থলে বসিয়া যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। আমাদের প্রবেশ তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। কাকার কাসিবার শব্দে বোধ করি, তিনি ঘরে মানুষের প্রবেশের কথা জানিতে পারিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "কে, মাষ্টার সেন না কি? এত দিন কোথায় ছিলে? উঃ, আজ তোমাকে এমন একটা আশ্চর্য্য জিনিষের কথা বলব, যা তুমি কখনও শোনোনি।—রুসিয়ায় যখন নিহিলিষ্ট"—বলিয়া তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তোমরা!" ক্রমে সে গম্ভীরভাব আনন্দের রেখায় মধুর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বাঁচিয়েছ আমায় তোমরা এসে। সেন আর আসেন না, হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গেই বুঝি বেশী ভাব তার, সুমী? এইবার আসবে ত? কয় দিন তার কথাই ভাবছিলাম।"

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ঘরে ফিরিয়া শয্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। শরীরের রক্তস্রোতঃ যেন চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। হঠাৎ মস্তকে কাহার করস্পর্শে চমকিয়া দেখি—কাকা।

তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "বুঝেছি আমি সব, সুমী! তা'কে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করব।" আর থাকিতে পারিলাম না। অন্তরের রুদ্ধ আবেগ অশ্রু হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ঝরিয়া পড়িল! কাকা প্রস্থান করিলেন।

পরদিন আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া তাঁহার প্রদত্ত ব্যাঙ্কের সেই কাগজগুলি বাহির করিয়া দেখিতেছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম, সব দিক গুছাইয়া তিনি কাযে নামিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাকা আসিয়া কহিলেন, "অনেক চেষ্টা ক'রে তা'র সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি।" আমি সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "আমিও যা'ব—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে, কাকা।"

৬

য়ুরোপীয় জেলার আমাদিগকে বন্দীর কক্ষে লইয়া গেলেন। আলো ও বায়ুর স্বাধীন গতিহীন ঘরখানির এক কোণে একটি টুলের উপরে বসিয়া তিনি উপরদিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা যাইতেই তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাঁহার স্বভাবসুন্দর মুখখানি সরল হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"নমস্কার মিস রায়, নমস্কার মিষ্টার রায়। উঃ, আপনারা এলেন কি ক'রে?" আমি ভাবিলাম, মরণপথের যাত্রীর মুখে এত সহজে হাসি আসে কি করিয়া!

"এসে ভালো করেন নি—জানতেই ত পেরেছেন, আমার সঙ্গ এখন কতদূর ভয়ানক—অন্ততঃ পুলিসের চোখে?"

কাকা কহিলেন, "এর বিন্দুবিসর্গও ত আগে জানতে পারিনি—তা হ'লে—"

তিনি হাসিয়াই উত্তর করিলেন, "তা হ'লে আগেই আমাকে ধরিয়ে দিতেন বুঝি?—শুনুন মিস রায়—"

কাকা কহিলেন, "তা নয়। তবে আপনাকে ত এ রকম একটা কিছু ভাবতেও পারিনি, অন্ততঃ আপনার বাইরের চাল-চলনে। আপনাকে খদ্দর বা দিশী জিনিষও কখনও পরতে দেখিনি?"

তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "জীবনে একটা দুঃখু রয়ে গেল, খদ্দর পরতে পারলুম না! পারি কি ক'রে—খদ্দরের ভেতরে যে মন্ত্রশক্তি নিহিত রয়েছে, পাছে

তা আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে, সেই ভেবেই পারিনি। দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, আমরা কোন্ মতাবলম্বী। অথচ সেই মহাত্মার বাণী জেগে উঠেছে—অহিংসার বাণী নিয়ে আর এই খদ্দর নিয়ে! খদ্দর দেখলেই সেই শান্ত স্থির ধীর যোগী মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে।" কিন্তু আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারিনি, ধরবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। সে আমার শিক্ষার দোষ—বুঝবার ভুল। আমি চেয়েছিলুম,—সব একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে—সারা দেশটায় একটা বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি করতে—আগুন জ্বালাতে—একটা দাবানলের সৃষ্টি করতে—সেই আগুনে আমাদের অগ্নিপরীক্ষা শেষ করতে। ধীরে ধীরে সয়ে সয়ে এ রকম মরণের পথে—সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে যেতে আমি চাইনি। সে ধৈর্য্য আমার ছিল না।" একটু থামিয়া তিনি কহিলেন, "খদ্দর পরলেই আমার কি মনে হ'ত জানেন? মনে হ'ত, বুঝি মহাত্মাজীর কথা অমান্য করছি—তাঁকে অবমাননা করছি। অথচ আমার প্রাণে তখন আগুন জ্বলেছে। তাই সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পুরো 'সাহেব' সেজেছিলাম।—" তিনি আবার কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "—আর এ আমার একটা ছদ্মবেশের কাযও করত? কি বলেন?" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

কাকা কহিলেন, "কাগজে পড়লুম, আপনি ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছেন। কেন, পালালেই ত পারতেন?—"

"পারতুম বৈ কি। পালালে আমাদের ধরে, পৃথিবীতে এমন সাধ্য কারও ছিল না। তবে সে দিন আমাদের পালাবার যে বন্দোবস্ত ছিল, কায হাসিল ক'রে আমরা সকলেই সেই বন্দোবস্ত অনুসারে কায করতে পেরেছিলুম—পারে নি কেবল এক জন, সে আবার আমাদের দলের সব চেয়ে ছোট ১৫।১৬ বছরের একটি ছেলে। সে বোধ হয়, এ সকল কাণ্ড বরদাস্ত করতে পারে নি; একটু নারভাস্ হয়ে পড়েছিল, ধরা পড়েছিল আর কি! সে ধরা পড়লে আমাদের সকলেরই একটু মুস্কিল হ'ত। কাযেই তাকে পালাবার সুযোগ দিতে আমি অনুসরণকারীদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিলাম—তা'র পর এই দশা।—"

কাকা ও আমি স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। জেলার সাহেব জানাইলেন, সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কাকা তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন। আমি এইবার তাঁহার দিকে তাকাইতেই কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এইটুকুতেই আপনাদের কান্না! এ আর বেশী কি? একটা বড় বাড়ী ছেড়ে ছোট বাড়ীতে বাসা নিয়েছি। আর আমার জীবনেরই বা কটা দিন! রাজদ্রোহীর শাস্তি যে কত বড়, কত ভীষণ, জানেন ত? এখন আমার নূতন জন্মের অপেক্ষায় দিন গুণছি—আর কি? যান, আর বেশী দেরী করবেন না—নমস্কার—"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতে গেলাম। তিনি আমার হাত দু'টি ধরিয়া কহিলেন, "থাক্-থাক্। ও আবার কি? এই বিদায়ের সময় ভাইবোনের আর অত নমস্কারের ঘটায় কায নেই। দুঃখটা কিসের, যান—বিদায়।"

তাঁহার মুখের দিকে একবার শেষবারের জন্য চাহিলাম—সেই সরল, সুন্দর, ভাবনার লেশবর্জ্জিত মুখ, সেই প্রাণখোলা হাসির রেখায় পরিপূর্ণ। ধীরে ধীরে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

শেষ

দুই এক দিন পরেই কাকীমা হঠাৎ অধীর বাবুকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আমার বিবাহের কথার একটা শেষ মীমাংসা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। অধীর বাবুও এ দিকে প্রেমের নূতন স্পর্শে যেন দিশাহারা হইয়াই আমার চতুর্দ্দিকে ভাবে, ভাষায়, গানে প্রেমের নিকুঞ্জবন রচিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আমার কাছে সে সবই বিস্বাদ, সবই তিক্ত।

যে দিন তাঁহার ফাঁসীর সংবাদ সারা সহরটি চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে দিন আমি আর না থাকিতে পারিয়া ছুটিয়া কাকার নিকটে যাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, "কাকা, আমায় রক্ষা করুন! আমায় বিয়ের কথা কেউ যেন আর না বলে।—" অন্য কোন কথা মুখে বাহির হয় নাই; চক্ষুর জল আমার স্বররোধ করিয়াছিল।

* * * *

যাক্—নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে কোন অনুরোধ, উপরোধ বা আদেশ এ সম্বন্ধে আর আমার

উপরে আইসে নাই। কিছু কালের মধ্যেই আমার অন্তরের সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া, সুপ্ত শক্তিকে প্রাণের বলে বলীয়ান্ করিবার কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছিলাম—"উদ্বোধন-সমিতি" তাহারই ফল।

সেই রাত্রিতে পিসীমা'র একটি কথায় আমার মন স্মৃতি-পথ বহিয়া এমনই করিয়া বুঝি অতীতের মাঝখানে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। সে স্মৃতি যে আজ আমার জীবনে বোঝা হইয়া রহিয়াছে। সেই স্মৃতির বোঝাই ত আমার সকল দৌর্ব্বল্যের টুঁটি চাপিয়া আমাকে সোজা হইয়া দাঁড়াবার শক্তি দিয়াছে। হঠাৎ বজ্রধ্বনি অতীতের রাজ্য হইতে আমার চিন্তাবিক্ষিপ্ত মনকে তীব্র কশাঘাতের মতই বর্ত্তমানের মাঝখানে চালাইয়া চেতন করিয়া দিয়া গেল। এ কি! বাহিরে এ কি দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে! ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুক চিরিয়া চপল আলোর ক্ষণিক খেলা, বজ্রের গুরু নিনাদ, বর্ষার অবিরল ঝর ঝর ধারা, উদাস হাওয়ার মত ক্রীড়া সারা বিশ্বে তখন প্রলয়েরই সূচনা করিতেছিল।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

গ্রীষ্মে

দুর্দ্দম চির-দুঃসহ ভীম এসেছে দারুণ গ্রীষ্ম,
দ্বিপ্রহরের নর্ত্তনে তা'র স্তম্ভিত সারা বিশ্ব।

যেন—রুদ্রের কাছে তাণ্ডব লয়ে,
খাণ্ডব-দহা বহ্নিরে ব'য়ে,
সাহারা মরুর সহোদর হয়ে
মাধবে করিয়া নিঃস্ব;—
দুর্দ্দম চির-দুঃসহ ভীম আসিল চণ্ড গ্রীষ্ম।

ক্ষিপ্ত রোদের উদ্দাম হাসি,
উদ্গারে কালকূট রাশি রাশি;
উষ্ণ বায়ুর নিদারুণ অসি
করে খান খান অঙ্গ;
দুর্দ্দমনীয় যাহা দুরন্ত, জেনো তা' গ্রীষ্ম-রঙ্গ।

এবে—পক্ষীরা সব নীরব বৃক্ষে
নিদ্রিত পশু ছায়ার বক্ষে
নর-নারী রয় শীতল কক্ষে
বন্ধ করি' গবাক্ষ।
আজিকে যেন এ দারুণ গ্রীষ্ম সেজেছে ভীষণ রক্ষ।

দুর্ব্বার ঘোর তৃষ্ণা-দাপটে
শুষ্ক বক্ষ যায় বুঝি ফেটে
বটের তলায় ঘাটে মাঠে বাটে
হা-হুতাশ করে পান্থ,
সবারে ক্লান্ত করিতে জগতে, গ্রীষ্ম এ'ল অশান্ত

কোমলকান্তি কুসুম-রূপসী
রৌদ্র-ঝলকে উঠিছে ঝলসি'
বন্ধন হারা পড়িছে বা খসি'
তপ্ত ধূলার বক্ষে,—
আজিকে সকলি অসার তুচ্ছ গ্রীষ্ম-দানব-চক্ষে।

অয়ি—ক্ষুব্ধ জগৎ, ক'রো না ভ্রান্তি;
মাথা পাতি লও এ তাপ-ক্লান্তি,
অচিরে দেখিবে মধুর কান্তি
নবীন-নীরদ-আস্য,
শ্যামল শস্যে ভরিবে ক্ষেত্র, ভুবনে ভরিবে হাস্য।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বুদ্ধ-গয়া

ফা-হিয়ান্ তদীয় লোকবিশ্রুত ভারত-ভ্রমণকালে রাজ-গৃহ এবং নালান্দা অতিক্রম পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম যে গয়ায় উপনীত হয়েন, তাহা বর্ত্তমান গয়া সহর এবং বুদ্ধগয়া নহে, বস্তুতঃ গয়া সহরের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন গয়া। তিনি উক্ত সহরের অভ্যন্তরভাগ তৎকালে রাজ-গৃহের মতই জন-বিরল, মরুসদৃশ দেখিয়াছিলেন। পুরাতন গয়া হইতে তিনি দক্ষিণ-দিকে ক্রমশঃ বিংশতি লী (li) বা চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যে স্থানে উপনীত হযেন, সেই স্থানে বোধিসত্ত্ব পূর্ণ ৬ বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানই সুবিখ্যাত উরুবিল্ব গ্রামের পূর্ব্ববাহিনী নিরঞ্জনা নদীর তটভূমি এবং বর্ত্তমানে বুদ্ধ বা বুধগয়া নামে পরিচিত। (১)

ফা-হিয়ান্ অতঃপর বলিয়াছেন, "এই স্থান হইতে আরও কিছু দূর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আমরা যে স্থানে উপনীত হইলাম, তথায় বোধিসত্ত্ব নিরঞ্জনা-সলিলে অবগাহনকালে দেবতারা একটি বৃক্ষের শাখা নোয়াইয়া দেন এবং বোধিসত্ত্ব সেই শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হয়েন।" এই প্রসঙ্গে ফা-হিয়ান্ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—পল্লীবালাগণ কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বকে দুগ্ধ এবং তণ্ডুল দান, বৃক্ষ-বিশেষের নিম্নে পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া তাঁহার দুগ্ধ ও অন্নগ্রহণ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, এই সকল ঘটনা পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেই সংঘটিত হইয়াছিল। অনন্তর ফা হিয়ান্ উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া একটি প্রস্তর-গুহা দেখিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, উক্ত গুহার দ্বারদেশে আসীন হইয়া বুদ্ধ ভাবিয়াছিলেন —"যদি সত্যই আমি পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকি, তবে এখন হইতেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।" এইরূপ চিন্তার উদয় হইতেই গিরিগাত্রে ত্রিহস্ত-পরিমিত বুদ্ধের এক ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ভক্ত ফা-হিয়ান্ সহস্র বর্ষ পরেও উক্ত ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। (২) এই স্থানে আরও একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বোধিসত্ত্ব যখন ঐরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ স্বর্গ-মর্ত্ত কম্পিত হইয়া উঠে এবং দেবগণ দৈববাণী করেন,—"বোধিসত্ত্বদিগের পূর্ব্বজ্ঞানলাভের জন্য এই স্থান নিরূপিত হয় নাই। এই স্থান হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে পী-তো (Pei-to) বৃক্ষের (১) মূলদেশই বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান। অনন্তর দেবগণ মধুর গীতধ্বনি দ্বারা পথিপ্রদর্শন করত তাঁহাকে পী-তো বৃক্ষের নিকট লইয়া যান। এই স্থলে ফা-হিয়ান্ কর্ত্তৃক অপর একটি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। যিনি অনতি-বিলম্বে জীবন্মুক্ত, সিদ্ধার্থ হইতে যাইতেছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে পুনঃ পুনঃ অলৌকিক ঘটনা-সমূহ ঘটিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কথিত আছে যে, পঞ্চদশ পদ গমন করিতে না করিতে পঞ্চশত নীল বিহঙ্গ অঙ্গুরীয়ের আকারে বোধিসত্ত্বকে তিন বার পরিবেষ্টন করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। (২) অতঃপর বোধিসত্ত্ব আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়েন এবং পী-তো বৃক্ষের নিম্নে শান্তি-প্রদত্ত কুশাসন (৩) বিস্তারিত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া উপবেশন করেন। ইহাই তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ যোগাসন এবং এই যোগাসন ও যোগের নিমিত্তই বুদ্ধগয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

অতঃপর বোধিসত্ত্বের পরীক্ষা আরম্ভ। যেমন কঠোর ব্রত, তেমনই কঠোর পরীক্ষা। ধ্যানভঙ্গের জন্য স্বয়ং মার রাজ (৪)

---

(১) As for the place Buddha-Gaya, it was formerly known as the "Urubeta-ban" (more correctly, uruvilva-van) or the forest of the village named Uruvilva, the modern Urela;—and it, like the tree, derives its present name very properly from the Buddha who made it known to the whole world.—The Buddha Mimansa by Jogirajah's disciple Maitreya—page 31.

(২) This shadow is still distinctly visible—Travels of Fah-Hian and Sun-yun by S. Beal, page 122.

(১) পী-তো বৃক্ষ সম্বন্ধে Julian লিখিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ সাধারণতঃ মগধদেশেই জন্মিয়া থাকে, ইহার উচ্চতা ৬০ কিংবা ৭০ ফুট এবং ইহার পত্রে লেখাকার্য্য হইয়া থাকে। অন্যান্য বিবরণে পী-তো স্থলে পিপ্পল অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষ ধরা হয়।—See Footnote, Beal page 122.

(২) Then, 500 blue birds came flying towards him and having encircled Bodhisatwa three times, departed—Travels of Fah-Hian &c, by S. Beal, p. 123.

(৩) দেবগণ কর্ত্তৃক শান্তিপ্রদত্ত কুশাসন প্রদান। On his way he was met by the Brahman Santi who gave him eight bundles of kusa grass, as he knew they would be required and prove a great benefit. Manual of Buddhism, p. 170.

(৪) খৃষ্টধর্ম্মের Satanএর সহিত বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত মারের তুলনা করা হয়। Mara the tempter and prince of this world, the demon of passions, of lust and of death, in short the personification of evil, plays in Buddhist legend about the same part as the Christian Satan, the prince of darkness. According to the evangelical legend Jesus was also tempted by the devil in the wilderness just as the Buddha by the Mara. The Message of Buddhism by Subhadra Bhikkhu Edited by J. E. Ellam, p. 9.

দক্ষিণদিক হইতে প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিপুঞ্জ সংগৃহীত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শক্তিবাহিনী দৈর্ঘ্যে এক শত চৌষট্টি মাইল হইল। গৌতম আর এখন সাধারণ মানব নহেন। তিনি এখন মায়া-জগতের সীমান্তে উত্তীর্ণ। তিনি মারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। মারও দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানরহিত হইয়া বিপুলবিক্রমে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ফলে ঘোর প্রলয়ের সৃষ্টি! বিদ্যুৎ, বজ্র, ভূমিকম্প, বারিধারা, ঝটিকা, এককালে সকলেরই আবির্ভাব। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য, তন্মধ্যে ধ্যানী যোগী গৌতম যোগাসনে স্থির-ধীর পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্ট। মার রাজের সকল প্রয়াস বিফল হইল। বলে পরাজিত হইয়া মার ছলের আশ্রয় লইলেন। এবার তিনি রূপলাবণ্যসম্পন্না, নৃত্যকুশলা তন্‌হা, অরাতি এবং রাগনাম্নী কন্যাত্রয়কে গৌতমের নিকট প্রেরণ করিলেন। (১) দেখিতে দেখিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ কানন-ভূমি রমাবিলাসকুঞ্জে পরিণত হইল,—কুসুমসুবাস, বিহঙ্গকাকলী, রূপোপজীবিকার গীত-নৃত্য, ইহাপেক্ষা চিত্তবিমোহন বস্তু আর কি আছে? কিন্তু এবারও মারের পরাজয় হইল। ধ্যানস্থ গৌতম প্রকৃতির কুটিলতা উপলব্ধি করিয়া পদাঙ্গুলি দ্বারা তিন-বার ভূমি স্পর্শ করিতেই মার-দুহিতৃগণ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। মায়াকাননও অদৃশ্য হইয়া গেল। মার পলায়নপর হইলেন। কোথায় তিনি গৌতমের চিত্তজয় করিয়া বীরদর্পে প্রস্থান করিবেন, আর কোথায় পরাজয়ের নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। নর-হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার একাধিপত্যের সিংহাসন আজ গৌতম কাড়িয়া লইতেছেন! গৌতম এইক্ষণ সিদ্ধমুক্ত, তাঁহার জীবনের ব্রত সফল হইয়াছে। (২) তাঁহার হৃদয় আজ পরম জ্ঞানের সংস্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠিল—নয়ন হইতে অজ্ঞানতিমির অপসৃত হইল। আজ তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন—"বুদ্ধ" হইলেন। গৌতম তপস্যার ফলে জন্মজরামৃত্যু, রোগশোকতাপ প্রভৃতির কারণ অবগত হইলেন। শুধু অবগত হওয়া নয়, কি উপায়ে মানব ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। একমাত্র নির্ব্বাণই সর্ব্বব্যাধির মহৌষধ, নির্ব্বাণ ভিন্ন মানবের অন্য গতি নাই।

কথিত আছে যে, দিব্যজ্ঞানলাভের পরও বুদ্ধ সপ্ত দিবসকাল বোধিবৃক্ষের নিম্নে সমাধিমগ্ন ছিলেন। সপ্তদিবসান্তে তিনি বোধিদ্রুম পরিত্যাগ করত অজপাল বৃক্ষের (the tree of the goatheards) (৩) নিকট গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি সেই দুর্ব্বোধ মুক্তিতত্ত্বের সমাধান করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু এই তত্ত্বের আলোচনা হইতে কেবল জ্ঞানী লোকই শান্তি পাইবে। মূর্খ কিংবা অজ্ঞ লোক ইহার মর্ম্ম বুঝিবে না। আমি কি তবে সাধারণ লোকের নিকট ইহার প্রচার করিব? মানব ত বাসনার দাস, যে কারণপরম্পরার উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা, জগতের নিয়ম বড়ই জটিল। আমি যদি তাহাদিগকে কেবল এই উপদেশ দিই, তোমরা বাসনা পরিত্যাগ কর, হিংসা-দ্বেষরাগাদি রিপুর অধীন হইও না, তাহা হইলে পরমশান্তিপ্রদ মুক্তির পথে উপনীত হইবে,—তাহা হইলে হয় ত অতি সামান্য লোকই আমার কথায় কর্ণপাত করিবে। অধিকন্তু, লোকে হয় ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে।" ক্ষণকাল তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় রহিলেন, শ্রান্ত এবং দুঃখভারগ্রস্ত সমগ্র মানবজাতির প্রতি অনুকম্পায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। "সমগ্র মানবজাতির নিকটই তবে এই তত্ত্ব প্রচারিত হউক। সকলেরই নিকট মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হউক,—যাহার কর্ণ আছে, সে এই মুক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করুক।"

অতঃপর বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারার্থ গয়া হইতে বারাণসীর পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্মমত, তাঁহার নির্ব্বাণতত্ত্ব হিন্দুভারতে নূতন না হইলেও তৎকালে এক নূতন জ্ঞানেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। কি উপায়ে এই ধর্ম্ম বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে প্রথম প্রচারিত হইয়া, শাখাপ্রশাখাক্রমে মহামহীরুহের ন্যায় দিক্‌বিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, কিরূপে ইহা তদীয় শিষ্য-সেবকগণ কর্ত্তৃক ভারতে এবং বহির্ভারতে,—চীন, কোরিয়া, মোঙ্গলিয়া, তাতার, তিব্বত, সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাপান, পশ্চিম-এসিয়া, এমন কি, মিশর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া কোটি কোটি মানবহৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধ জগতে, শুধু বৌদ্ধ জগতে কেন, সর্ব্বত্র সমগ্র মানবজাতির নিকট কেন এত সম্মানিত, এ স্থলে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল।

ভারতে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষ জন্মিয়া তাঁহাদের জন্মভূমিকে পূত ও চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। গৌতমবুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তুও পূত এবং চিরস্মরণীয়; তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মক্ষেত্র সারনাথ এবং শেষ নির্ব্বাণক্ষেত্র কুশীনগরও চিরস্মরণীয়। নালান্দা প্রভৃতি আরও অনেক স্থান পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার স্থান এ-সকলেরই উচ্চে। এই স্থানেই তাঁহার জীবনের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ না হইলে লোকপূজ্য হইতে পারিতেন না। যে পরমজ্ঞান লাভ করিয়া এবং যাহার প্রচার করিয়া তিনি জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন, স্বয়ং জগন্মান্য হইয়াছিলেন, আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ (১) লোক যে কারণে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, বুদ্ধগয়ায় সেই মহাতত্ত্বেরই উদ্ভব হইয়াছিল।

বুদ্ধগয়ার আর এক মাহাত্ম্য এই যে, বুদ্ধের তিরোধানের পর তদীয় স্মরণার্থ যে চারিটি প্রধান প্যাগোডা বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল,

---

(১) Then Mara has recourse to his last and most dangerous weapon. He sends his magically beautiful daughters Tanha, Arati and Raga (craving desire, hatred and sensuality).—The Message of Buddhism, p, 16.

These three women are spoken of as the daughters of Mara and named Tanha, Rati and Ranga.—Footnote, Beal, p, 123.

(২) রাগ-দ্বেষের আধার, সৎকর্ম্মের প্রতিরোধক, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের অধিপতি-মারের সহিত বোধিসত্ত্বের বিরোধ একটি রূপক বা allegory ভিন্ন আর কিছু নয়। The Buddhist scriptures in a magnificent brilliantly coloured allegory represent the inward struggle (the struggle against delusion, love of the world) of the solitary sage, as a fight of Gotam and Mara.—The Message of Buddhism, p. 15.

(৩) The Buddha remained at the foot of the Bodhi tree for seven days in deep meditation. Then he arose and went to the Ajapal fig tree. (the tree of the goat herds.)—Ibid p. 17.

(১) To this day Buddhism has still more adherents than Christianity of all denominations together, namely, some 405 millions, therefore, nearly one-third of the entire human race, although in the last 1500 years the propagation of its doctrine has been at a stand still.—The Message of Buddhism, p. 25.

তাহাদের একটি এই স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান। (১) ইহার চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি স্তূপ আছে। প্রধান মন্দিরটিকে মূল পুরাতন মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক স্থলেই বৌদ্ধ পূর্ত্তনিদর্শনের আবিষ্কার হইয়াছে এবং হইতেছে। সে সকল হইতে বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত মন্দির এবং স্তূপাদির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের অধিকাংশ আজও অখণ্ডাবস্থায় রক্ষিত হইয়া দর্শকের মনে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশমাত্রেই বুদ্ধের বিশাল প্রতিমূর্ত্তি নয়ন-পথে পতিত হয়। মন্দিরের বহির্ভাগে প্রবেশপথে ব্রহ্মদেশীয় কয়েকটি সুবৃহৎ ঘণ্টা রক্ষিত হইয়াছে। ইহারই বামপার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তর-ক্ষোদিত বুদ্ধের চরণযুগল। মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে বোধিদ্রুমের (২) নিম্নে বুদ্ধের যোগাসন। প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটি সুসংস্কৃত জলাশয়। ইহারই জলে বুদ্ধ স্নান করিতেন। প্রধান মন্দির, সঙ্ঘারাম, স্তূপ, মঞ্চ, ঘণ্টা, বেদি, চরণ, জলাশয় এবং বৃক্ষাদিসমন্বিত চত্বরটিতে অবতরণ করিলেই মনে হয়, যেন বহু অতীতের —বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালের কোন এক বিশিষ্ট বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হইয়াছি। সেই ঠাটঠাট, সেই পূজোপকরণ, ধূপধুনা, প্রদীপদান, ফা-হিয়ানের অমর গ্রন্থে অন্যত্র যাহার বিবরণ উজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণিত দেখা যায়, সবই যেন সেইরূপ নয়নসমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সার্দ্ধসহস্র বর্ষ পরেও আজ যিনি সেই ভারতে বুদ্ধের চরণস্পর্শপূত মহাতীর্থে প্রকৃত বৌদ্ধমঠের সহিত পরিচিত হইতে চান, তিনি যেন বুদ্ধগয়া দর্শন করেন। সর্ব্বোপরি ইহাও স্মরণের বিষয় যে, এই স্থানেই গৌতম সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোগাসন, সেই বোধিদ্রুম, মারের সহিত পরীক্ষার নিদর্শনস্বরূপ প্রস্তরফলকসমূহ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত কত অতীত কাহিনী জড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে!

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

---

(১) The sites of the four great Pagodas have always been associated together from the time of the Nirvana. The four great Pagodas are those erected on the place where he was born, where he obtained emancipation, where he began to preach and where he entered Nirvana.—Travels of Fah-Hian and Sun Yun. by S. Beal, p, 126.

(২) Dr. Buchanan ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ-গয়ার বোধিবৃক্ষটিকে সতেজ ও পূর্ণাবয়ব দেখিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দেও উহার তিনটি শাখাসহ একটি কাণ্ড জীবিত ছিল। বর্ত্তমান বৃক্ষটি অল্পদিনের বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষটি যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহার মূল একই হইতে পারে।

বোধিদ্রুম নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তর্ক আছে। অমরকোষে বোধিদ্রুম পিপ্পল বা অশ্বত্থের নামান্তরমাত্র, যথা—"বোধিদ্রুমশ্চলদলঃ পিপ্পলঃ কুঞ্জরাশনঃ। অশ্বত্থেঽশ্ব" ইত্যাদি Buddha Mimansa গ্রন্থের লেখক যোগিরাজশিষ্য মৈত্রেয় বলেন যে, অমরকোষকর্ত্তা অমরসিংহ বোধিদ্রুমের অর্থ অশ্বত্থ করিলেও উহা স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, ইচ্ছাপূর্ব্বকই কেবল বুদ্ধ-গয়ায় যে অশ্বত্থমূলে বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তাহাকেই বোধিদ্রুম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সংগঠনের সদুপায়

(৪)

এ দেশবাসীর একখানি কর্ম্মক্ষম হস্তও যাহাতে কর্ম্মের অভাবে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য না হয়, তাহার যথাযথ বিধিব্যবস্থা প্রথমে করিয়া, পরে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনানুরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সংসদের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ দেখিতে পাইবেন যে, এ দেশের সাধারণ কৃষকাদি কর্ম্মীরা কৃষিকর্ম্মের অবকাশে বৎসরের কয়েক মাসই কর্ম্মাভাবে বে-কার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তাহাদের এই বে-কারত্ব ঘুচাইবার জন্য যথাযোগ্য কাযের বন্দোবস্ত সংসদসমূহকেই করিতে হইবে। এ দেশের অপরিমেয় তৈলপ্রদ শস্য কাঁচা মালরূপে বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে সেই সব শস্য সংসদের হস্তগত হইলে পর কৃষকদের ঘরে ঘরে গো-মহিষ অশ্বাদি চালিত ঘানিগাছ বসাইয়া, উক্ত শস্য হইতে তৈল ও খৈল উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিলে, দরিদ্র কৃষকদের একটি সুন্দর আয়ের পথ মুক্ত হইতে পারে। সংসদসমূহকে তাহার বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংসদের পরিচালকরা আরও দেখিতে পাইবেন,—কৃষকাদির গৃহে গৃহে মহিলাদের কর্ম্ম-শক্তি সুযোগ সুবিধার অভাবে পঙ্গু ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। আরও দেখিবেন—বহু অনাথা বিধবা উপেক্ষিত অবস্থায় আহারাদির অভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

দেশের যাবতীয় বিক্রেয় ধান্য সংসদের গোলাজাত হইলে পর, ঢেঁকি আদি আবশ্যক যন্ত্রপাতি দিয়া উক্ত মহিলাদিগকে চাউল-উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলে—দেশের বিপুল নারী-কর্ম্ম-শক্তির সার্থকতায় তাহাদের যেমন অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান হইতে পারে—চাউলের জন্য দেশের বুকে বিরাট বিপুল কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা না করিয়াও তেমনই দেশের চাউলের দারুণ অভাব পূরণের একটা সুব্যবস্থা হইতে পারে। সংসদসমূহকে এইটিতেও সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।

দেশীয় কর্ম্মী সম্প্রদায়ের আদম-সুমারী তৈয়ার করাইলেই কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিতে পাইবেন—যোৎ-জমা-বিহীন বে-কার কৃষককর্ম্মীর দেশে অভাব নাই। তাহারা কৃষিকার্য্যে নিপুণ—কায করিতেও প্রস্তুত; কিন্তু সর্ব্ববিধ অভাববশতঃ অক্ষম।

তাহাদের জন্য সংসদসমূহকে নূতন নূতন উপনিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে। উপযুক্ত জমীখণ্ড বন্দোবস্ত লইয়া সেখানে তাহাদের বসবাসের জন্য অভিনব পল্লীর রচনা করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা খাটিয়া খাইতে পারে—তাহার সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের জন্য প্রথমে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া, পরে অবসরকালের জন্য যথাযোগ্য শিল্প-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উক্তরূপ বে-কার কৃষক-কর্ম্মীদের জন্য যে কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা হইবে —তাহার মধ্যে খেজুর ও ইক্ষু চাষের বন্দোবস্তই বিশেষভাবে করিতে হইবে। আর খেজুর-রস ও ইক্ষু-রস হইতে গুড় ও চিনি প্রভৃতি মিষ্ট খাদ্যের উৎপাদনেই তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লাক্ষা চাষেরও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য খেজুর, ইক্ষু ও লাক্ষা চাষের উপযোগী দেখিয়াই অভিনব উপনিবেশের ভূমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

কৃষক নয়—অথচ বিশেষ কোনও শিল্পিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও নয়—এমন ধরণেরও বহু বে-কার কর্ম্মী দেশে দৃষ্ট হইবে। এই কর্ম্মীদের লইয়া সংসদ ঘৃতাদি গব্যের জন্য গো মহিষাদি এবং ডিম্বাদির জন্য হংস-কুক্কুট

প্রভৃতি প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করিবেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে—কাছাড় অঞ্চলে বহু তৃণাদি পশু-খাদ্যপূর্ণ মালভূমি, অধিত্যকা ও উপত্যকা প্রভৃতি নিপতিত আছে, সুন্দরবনেও পশুখাদ্যের অভাব নাই, সে সব স্থানে বা ভারতের যে কোনও স্থানে সম্ভব—উপযুক্ত গোচারণ-ভূমি নির্ব্বাচিত করিয়া—আধুনিক প্রথামতে গবাদি পশু-পালন এবং উপযুক্ত ও সুনির্ব্বাচিত স্থানে হংসাদি পক্ষি-পালনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহাও সংসদসমূহের অন্যতম অবশ্য সাধনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার কর্ম্মীদের কর্ম্মাভাবজনিত সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানও সংসদের কর্ম্মকর্ত্তাদের করিতে হইবে। শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালী—তাহারা সংসদসমূহের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মি-রূপেই গৃহীত হইবে। অবশিষ্ট সাধারণ কর্ম্মীদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যোগ্যতানুসারে বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্ম্মে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া দিতে হইবে।

ছত্র-শিল্প একটি স্থূল অথচ সহজ সরল শিল্প। যে সে কর্ম্মীই অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই শিল্পটি আয়ত্ত করিয়া স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের উপার্জ্জন-পথ মুক্ত করিতে পারে।

ছাতির বাঁটের জন্য বংশের কঞ্চির প্রয়োজন। এই বংশ-কঞ্চি বর্ত্তমানে একমাত্র ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী রঘুনন্দন নামক পর্ব্বতেই সমুৎপন্ন হইতেছে। উপযুক্ত স্থানে কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত কঞ্চি সংগ্রহ পূর্ব্বক ছত্র-শিল্পের কার্য্যারম্ভ করিলে বহু শিক্ষিত বে-কার কর্ম্মীর, এমন কি, অন্তঃপুরবাসিনী বহু মহিলা-কর্ম্মকারিণীরও অন্ন-সংস্থানের উপায় হইতে পারে। ছত্র-শিল্পের অনেকাংশ মহিলারা অনায়াসে গৃহে বসিয়াই সম্পাদন করিতে পারিবেন। ইহার প্রতিও সংসদের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের অনুষ্ঠানেও সংসদসমূহ সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন।

এ দেশে প্রয়োজনানুরূপ কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা

অন্যান্য দেশের মত এ দেশে বিরাট বিপুল বৈজ্ঞানিক কল-কারখানা—বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশবাসীকে কুলী-মজুররূপে যন্ত্রাদির অংশবিশেষে পরিণত করিবার ভাব যথাসম্ভব পরিবর্জ্জন করিয়া, কর্ম্মকর্ত্তারা কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

লৌহ-ইস্পাতাদি যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূলক শিল্পের জন্য বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার নিতান্ত প্রয়োজন, আবশ্যক বোধে, টাটার লৌহ-কারখানার মত কারখানা, সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ; কিন্তু সে সব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি না হইয়া কালে যাহাতে আপনা হইতেই জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়, গোড়া-পত্তনের সময় মূল হইতেই সেইরূপ বিধিব্যবস্থা করিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক কল-কারখানাসমূহ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের ধন-সম্পদ অযথারূপে বর্দ্ধিত করিবার উপায়স্বরূপমাত্র না হইয়া, উক্ত কল-কারখানার প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিক কর্ম্মীদের কর্ম্ম-শক্তির বাহুল্যসাধন পূর্ব্বক তাহাদের আয়ের পথ যাহাতে যথাযথভাবে উন্মুক্ত করিতে পারে, সে দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রয়োজনমত কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কাচ, কাগজ এবং বিলাসের বহু উপকরণ বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক কলের সাহায্যেই প্রস্তুত করাইতে হইবে। তাহার জন্য দেশে অল্পসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট কয়েকটিমাত্র বিরাট কলের প্রতিষ্ঠা না করিয়া কৃষক পল্লী-মণ্ডলী নির্ব্বাচন করত, সেই সব পল্লী-মণ্ডলীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে বহুসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সংসদের পরিচালকরা সে সব প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন।

সাধারণ কৃষক কর্ম্মীরা নিজ নিজ কৃষিকার্য্যের অবকাশে অবসর-সময়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানে আসিয়া যোগ্যতানুরূপ কাযে খাটিবে ; তাহাতে তাহারা সম্বৎসরকালই তাহাদের আয়ের পথ মুক্ত রাখিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত ৬ষ্ঠ প্রকরণের ১৫শ দফা অনুসারে যে সকল পুরাতন কাচ, কাগজ ও যন্ত্রখণ্ড সংসদের হস্তগত হইবে, সেই সকল উপাদানেই উক্ত পল্লী-প্রতিষ্ঠানসমূহের কায অনেকটা চলিয়া যাইবে। অভাবপক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ-উপাদান অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

উক্ত দফামতেই যে পুরাতন লৌহ সংগৃহীত হইবে, তাহার সাহায্যে পল্লী-প্রতিষ্ঠানেই লৌহ-ঢালাইএর কাযও বেশ চলিতে পারিবে।

বর্ত্তমান কৃষিকার্য্যের জন্যও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কলের প্রয়োজন। গো-মহিষাদি পশুচালিত লাঙ্গলের দ্বারা আজকাল, আর উপযুক্তরূপে জমীর চাষ আবাদ হইয়া উঠিতেছে না। মড়কাদির জন্য গবাদি পশুর অভাবেও চাষ আবাদের অসুবিধা বড় কম হইতেছে না। এই সব অসুবিধার প্রতীকারের জন্য দেশে যন্ত্রচালিত কলের লাঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

সংসদসমূহের পরিচালনায় পল্লী মণ্ডলীসমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মটর-চালিত কলের লাঙ্গল রাখিতে হইবে। উহা পরিচালনের জন্য সুশিক্ষিত এক দল কর্ম্মী নিযুক্ত থাকিবেন। নির্দ্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক লইয়া উক্ত কর্ম্মি-সম্প্রদায় মাঠে গিয়া যথাকালে কৃষকদের জমী, ঐ সব কলের লাঙ্গলের সাহায্যে চষিয়া দিবেন ; পরে কৃষকরা স্বহস্তে তাহাতে বীজাদি বপন করিবে।

এই কলের লাঙ্গলের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সেচকলের বন্দোবস্তও রাখিতে হইবে। জলের অভাবে যে স্থলে চাষ আবাদের অসুবিধা বা ফসলের অনিষ্ট হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে, নির্দ্দিষ্ট মাশুল গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সকল স্থলে কর্ম্মীরা উক্ত সব কলের অর্থাৎ দমকলের সাহায্যে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত করিবেন।

এক কথায়, চাষের বা জলের অভাবে যাহাতে দেশের এক আধ বিঘা আবাদযোগ্য জমীও বৃথা পতিত না থাকে, অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা, অলসতা এবং সারাদির অল্পতা ও বীজাদির হীনতাহেতু—যথা-উপযুক্তরূপ ফসল উৎপাদনে যাহাতে বাধা বা বিঘ্ন না ঘটে, সে দিকে সংসদসমূহকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কার্য্য চালাইতে হইবে।

সাবান, খেলনা, পুতুল, আয়না, চিরুণী, বোতাম, সিগারেট, মোজা প্রভৃতি পণ্য প্রস্তুতের জন্যও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির দরকার। পল্লীতে পল্লীতে গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত প্রকার যন্ত্রপাতিরও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞ কর্ম্মি-সমবায়ে সংগঠিত সমিতি দ্বারা উক্ত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান, প্রণালী-নির্ব্বাচন, শিক্ষার সুব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে।

আবশ্যক বোধে এ দেশীয় উপযুক্ত কর্ম্মীদের বিদেশে পাঠাইয়া কল-কারখানার পরিচালনাদির কার্য্যে এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-সাধনার কার্য্যে সুশিক্ষিত করিয়া আনিতে হইবে। কিংবা বিদেশীয় শিক্ষক আনাইয়া এ দেশেই কর্ম্মীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

স্থূল কথা, সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষা, সুব্যবস্থাদির অভাবে এ দেশের বিন্দুমাত্র কর্ম্ম-শক্তিও যাহাতে ব্যর্থ বা ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকে সর্ব্বদাই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে পুরুষকার ও স্বাদেশিকতা

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালা ভাষা আকার গ্রহণ করে নাই, যখন তাহা প্রাকৃত ও পালি সংমিশ্রণে এক নূতন কলেবর ধারণ করিতে উপক্রম করিতেছিল, তখন সহজবোধ্য সংস্কৃতে তন্ত্র-গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছিল। তন্ত্র-সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীর মধ্যে পুরুষকার একেবারে লোপ পায় নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের হীন অবস্থা; বৌদ্ধগণ ভূত প্রেত গাছ পাথর প্রভৃতির পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তান্ত্রিকতার বীজ বহুদিন হইতে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু এখন তাহা ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালার পঞ্চ"ম"কার প্রভৃতির সাধনায় পর্য্যবসিত হইল। সংস্কৃত তখন পণ্ডিতগণের (লিখিত বা) লেখ্য ভাষা ছিল, কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায়, পত্রাদি-ব্যবহারে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে তন্ত্র-গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে এবং তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও আরাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জাতীয়তার ভাব কতকটা পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিক উপাসনা ও আরাধনা বাঙ্গালীর নিজস্ব বস্তু। তন্ত্রশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হইলে বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় লোকলোচনের সমক্ষে উন্মুক্ত হইবে। সমাজ-মঙ্গলকামী ও স্বদেশসেবী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ এই তন্ত্রশাস্ত্রের গহন-কাননে প্রবেশলাভ করিয়া ইতিহাস পঠনোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিলে দেশের বাস্তবিক উপকার হইবে। তান্ত্রিক যুগের পূজা ও দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত সাময়িক ইতিহাসের একটা গূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাই। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে মা মহিষমর্দ্দিনী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ভক্তহৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতেন। মেকলে-কথিত ভীরু বাঙ্গালী রাজ্যলাভ ও শত্রুজয়ের জন্য রণচামুণ্ডার পূজা করিয়া ভৈরব-মূর্ত্তিতে নরশোণিত-প্লাবিত সমরাঙ্গনে উদ্দাম নৃত্য করিত। এক সময় এই মহিষমর্দ্দিনীর স্তোত্র বাঙ্গালী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া কত ভীরুকে রণোন্মাদে উদ্দীপ্ত করিত। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্তোত্র কত যোদ্ধাকে অবশ্যম্ভাবী বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইত ও মহাহবে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে প্ররোচিত করিত। কিন্তু মাতৃত্বের কুসুম-পেলব ভাব সাহায্যে পরবর্ত্তী কবিগণ ভাষার কমনীয়তা আনয়ন করিয়াছিলেন। আদ্যাশক্তির ভীষণতাকে বৈষ্ণব-কবি প্রেমের মধুরতায় পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। সেই মধুর রসকে তন্ত্র ভীষণ ভাব দিয়া বিবিধ আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভীষণতা কালীর করালভাবে পরিস্ফুট, ছিন্নমস্তার শোণিত-ধারায় পুরুষের আত্মদানের ভাব ফুটাইবার চেষ্টায় প্রকট। ভারতের ভাগ্যস্রোতের ভাটার টানের সহিত এই আদ্যাশক্তির রুদ্রমূর্ত্তি আদিরসসিক্ত হইয়া মোহন আকার ধারণ করিল—পুরুষকারের স্বাতন্ত্র্য ভাব মধুর রসে ডুবিয়া গেল। তন্ত্র মাতৃত্বে ভীষণতা আরোপ করিয়াছেন। কালে তাহা আবার আদিরসের সুধামাখান গূঢ় গুপ্ত আনন্দের অতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হইল। তাই বৈষ্ণব-কবি আত্মহারা হইয়া গাহিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। নাথপন্থের যোগী ও বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য্যগণের রচনার সময় (৮ম বা ৯ম শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালাদেশ পরাজিত ও অধিকৃত হইবার কাল (ত্রয়োদশ শতাব্দী) পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যের শৈশবকাল বলিতে হইবে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ বাঙ্গালায় একটি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লুই প্রমুখ বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যগণের দোঁহা ও গানে, গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে ও রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে বৌদ্ধ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের নিদর্শন অল্পপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী-সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার আদিযুগের গ্রন্থসমূহ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও বাঙ্গালার রাজগণের গুণগরিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর পুরুষকারের উল্লেখ আছে। গোপীচন্দ্র রাজার গানে তাঁহাকে ২২ দণ্ড স্থানের অধিপতি বলা হইয়াছে। "বাইশ দণ্ড রাজা হৈয়া করিমু হাড়িক প্রণাম" অর্থাৎ বাইশ দণ্ডস্থানের রাজা হইয়া আমি হাড়িকে কিরূপে প্রণাম করিব? গোবিন্দচন্দ্র বিস্তৃত দেশের অধীশ্বর ছিলেন। গ্রাম্য কবি বাইশ দণ্ডে যতখানি স্থান পাওয়া যায়, তাহাকেই অত্যন্ত বিস্তৃত মনে করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ার্থ যখন বিপুল সৈন্যের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র তখন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। কবি বলিয়াছেন—

মহা প্রতাপী রাজা বলে বলিয়ারো।
তিন কোশ আয়তন কটক ইহারো॥

এই বর্ণনা গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচায়ক। তিনি মহাবলে বলীয়ান্ ও প্রতাপশালী ছিলেন। "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" নামক কাব্যের অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—

নব লক্ষ বঙ্গ তোর তের শত হাতী।
ষোল শত তুরঙ্গ উট শতে ছত্তি॥

গৌড়েশ্বরের এই নব লক্ষ বঙ্গীয় সৈন্যের উল্লেখ দেখিলে সেই সময়ের বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্যের কথা আমাদের কর্ণে স্বপ্নের মোহন-বাণীর ন্যায় ধ্বনিত হয়। বঙ্গরাজগণ বাঙ্গালাদেশেই এই সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অরাতি ধ্বংস করিতেন। বাঙ্গালার প্রজার সমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। তখন বেতন লইয়া লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা 'সচ্ছল' ছিল। তাই কবি বলিয়াছেন—

"বেতনা করি যে ভাত যোত্র তার দুআরত ঘোড়া" কিন্তু দক্ষিণদেশের 'বাঙ্গালের' আগমনে প্রজার কষ্টের অবধি রহিল না। কবি বলিতেছেন—

দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি॥

বাঙ্গালীর বিশাল সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহা জাতীয়তারূপ মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয় নাই। ব্রাহ্মণগণের সামাজিক অত্যাচার জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করিয়াছিল। সদ্ধর্ম্মিগণ ও তাঁহাদের আচার্য্য ধর্ম্মপণ্ডিতগণ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের উষ্মা" অংশটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গৌড়দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ায় কবি আনন্দিত হইয়াছেন। বিদেশী কর্ত্তৃক দেশ অধিকৃত হইল, কিন্তু কবি তাহাতে দুঃখিত বা মর্ম্মপীড়িত না হইয়া বরং পুলকিত হইয়াছেন। সদ্ধর্ম্মিগণের উপর অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া যেন দেবগণ মুসলমানবেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম হৈল শূলপাণি।
গণেশ হইলা গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জম মুনি॥

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥"

বাঙ্গালার ন্যায় এত বড় একটা দেশ বিজিত হইল, এত বড় একটা পুরাতন জাতির স্বাধীনতা লোপ পাইল, কিন্তু কবি স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়াও দেশবাসীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া স্বদেশরক্ষাকল্পে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন না এবং তাহাদের সুপ্ত প্রাণহীন দেহে উদ্দীপনার বীজ ছড়াইয়া দিলেন না—ইহা জগতের ইতিহাসে বিরল। মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশ অধিকৃত হইবার সময় বাঙ্গালার ভাট ও চারণগণ প্রাচীন গাথা গাহিয়া সাধারণের মধ্যে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বাঙ্গালার কোন কাব্যে স্থান পায় নাই। রামাই সৃষ্টি-তত্ত্ব-কথা ও ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য শূন্যপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণের লক্ষ্য বৌদ্ধ মহাযানদিগের শূন্যবাদ। খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রসঙ্গ এই শূন্যপুরাণে বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী কালেও কবিগণ সেই একঘেয়ে তত্ত্বকথা, দেবদেবীর জন্মকথন প্রভৃতি লইয়াই গৌড়ের জনসাধারণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল কবিই ধর্ম্ম ও প্রেমের কথা অল্পবিস্তর বলিয়াছেন। প্রেমের পূর্ণবিকাশ চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে। অজয়ের অমর কবি যে প্রেমসঙ্গীত-লহরী তুলিয়া নিজ হৃদয়-দেবতার পূজা করিয়াছিলেন, তাহার উন্মাদনী শক্তি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

পঞ্চদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হউক আর না হউক, ঐতিহাসিকগণ তাহাকে ঠান্‌দিদির গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিন আর না দিন, শূন্যপুরাণের উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ ও সমসাময়িক সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালাদেশ গৃহকলহে বিধ্বস্ত হইতেছিল এবং বাঙ্গালী জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জয়দেব প্রমুখ কবিগণের "ললিত-লবঙ্গলতা—পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে" প্রভৃতি গান শ্রবণ করিয়া গৌড়বাসিগণ তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। প্রণয়ের নবনীত-কোমল পদাবলী "কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ" করিয়া বাঙ্গালীকে অন্তঃসারহীন করিয়া দিয়াছিল। দুর্ব্বলতা ও আত্মকলহ জাতীয় চরিত্র কলুষিত না করিলে বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজনৈতিক দাসত্ব সম্ভবপর নহে। আবার স্বাধীনতা হারাইবার সহিত বাঙ্গালী অত্যাচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অত্যাচার-জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কোমল ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বালকের শক্তি ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। তাই বোধ হয়, বাঙ্গালী কবি চিরকাল কাঁদিতে শিখিয়াছে। তাই বুঝি বাঙ্গালী কবি অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ হৃদয়ের কোমল ভাব কোমল মৃদু ভাষায় প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। ইহার সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের আর একটি স্বাভাবিক গুণ আত্মশক্তি জাহির করিয়াছে—তাহা প্রেম। ক্রন্দন ও প্রেমরূপ দুইটি স্রোত বাঙ্গালী-চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবাহিত। এই প্রসন্নতোয়া প্রেম-ভাগীরথীর পবিত্র বারিসেকে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র তপ্তমরুমধ্যস্থিত কুঞ্জবনের ন্যায় মধ্যে মধ্যে নয়নাভিরাম শ্যামল লতাপত্রে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যেও সত্যপীর, মাণিকপীর, ষষ্ঠী, শীতলা, শিব, চণ্ডী, মনসা, শনি প্রভৃতি দেবতার প্রচলিত ব্রতকথায় ও গানে বাঙ্গালী-হৃদয়ের সেই চিরন্তন ভাব দেখা দিয়াছে। এই সাহিত্যে পৌরুষ ও বীরত্বের অভাব। সাধারণের মুখরোচক করিয়া কথা-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ব্রতকথা ও গান শুনিবার জন্য লোকে আসর পূর্ণ হইয়া যাইত। এই সঙ্গীত-রসাস্বাদ করিবার জন্য অসংখ্য নরনারী সমবেত হইত, গায়কগণ চণ্ডী-মণ্ডপে ও মুক্তনীলাম্বরতলে চামর-মন্দিরা সহযোগে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। সাধারণ গৃহস্থের কার্য্য-কলাপে, তাহার পূজা-অর্চ্চনায়, তাহার আরাধনা-প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের করুণরস বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্তরে স্তরে কখনও বা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায়, কখনও বা বিশাল বিপুল স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে।

গৌড়দেশ বিজিত হইলে মুসলমানগণ দেখিলেন যে, বাঙ্গালাদেশ সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা এবং ইহার অধিবাসিগণও "নবনীত-কোমল" স্বভাবাপন্ন। ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপ সামসুদ্দীন ইলায়স্ শাহ দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইলেন। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। সামসুদ্দীন গৌড় ত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। সামসুদ্দীনের বংশধররা কংসনারায়ণের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইলেন, কিন্তু কংসনারায়ণের পুত্র যদু ভূতপূর্ব্ব গৌড় সুলতানের কন্যা আশ্‌মানের প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হইলেন এবং জেলালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-স্বাধীনতা ক্ষণিকের জন্য উদিত হইয়া ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। হিন্দুরাজত্ব স্বপ্নের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। এই সময় হিন্দু-মুসলমানে আদান-প্রদান চলিতেছিল। দুই জাতি ভাষা ও সামাজিক ব্যবহারে এক হইতে লাগিল। মুসলমান নরপতি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে এবং সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে মূল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট "গুণরাজ খাঁ" উপাধি পাইয়াছিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারিগণ বহু অর্থব্যয়ে বাঙ্গালী হিন্দু কবিগণকে মহাভারত অনুবাদ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর সাহায্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রায় সমস্ত মহাভারতের ও ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দী দ্বারা অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস ও কাশীদাস মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মধুকরগণের সংগৃহীত মধু গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কাব্যে তাহার ঘনতা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজ-সংস্কারক বা রাষ্ট্র-সংস্কারকের আসনে উপবিষ্ট হয়েন নাই। তাঁহারা সাহিত্যের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন আদর্শে পরিচালিত হইয়া যে রস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমাজ চিরকাল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। সংসার-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানব বাঙ্গালা-সাহিত্যবৃন্তে এই দুইটি প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভি আঘ্রাণ করিয়া সংসার-জ্বালা নিবারণ করিয়া থাকে। বহুকালাবধি আপামর জনসাধারণ এই দুই বিশাল মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের শান্তিবারি পান করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর এই দুই মহাকাব্যে দেশপ্রীতি কিংবা স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যসমূহের যে মনোহর বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, কবিদ্বয় স্বদেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী এক মহামানবের বিপুল সঙ্ঘে পরিণত হইয়া একভাব একপ্রাণ হইয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে, কিংবা বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক একতায় সংবদ্ধ হইতে পারে, তাহার আভাষ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময় স্বজাতি-প্রীতি বা দেশপ্রীতি কবিদ্বয়ের মনে স্থান পায় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য থাকিলেও মুসলমানগণ এই দেশে বাস করিয়া কতকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি,

'সত্যপীর' 'সত্যনারায়ণ' হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণও হিন্দুর শীতলা ও কালীপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ও যবনের মধ্যে কুটুম্বিতা ও স্নেহবন্ধন চলিতে লাগিল। হিন্দুপ্রীতি ও হিন্দুশাস্ত্র এবং দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধার জন্য বাঙ্গালার মুসলমানরাজগণ হিন্দুদিগের ভালবাসা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগকে দেশবাসী বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষের অবসর ছিল না। জাতীয় কবিগণ যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রীতির ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই, তাহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুসলমানগণ দেশ জয় করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও শাসন বিস্তার করিলেও, অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী তাহা বিধাতার স্বাভাবিক বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা নিষ্ঠুর নির্ম্মম ভাগ্যদেবতার কঠিন নিয়ম বলিয়া আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার আর এক কারণ আছে। রামায়ণ, মহাভারতে আর্য্য কর্ত্তৃক অনার্য্য জয়, আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ স্থাপন, শাসন-কার্য্য পরিচালন প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণের স্বকপোলকল্পিত থিওরিগুলি অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে পরিচালিত করে নাই—তাঁহাদিগকে কাব্যাদর্শের উচ্চতম সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। এই জন্য কৃত্তিবাস ও কাশীদাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের কিরীটমণি। বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় বিশাল, উন্মুক্ত ও বিরাট ছিল। বাল্মীকি ও ব্যাসের ন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাপুরুষ-চরিত গানে—উহার মাহাত্ম্য ও গরিমার কাহিনী উদ্‌ঘাটনে—উহার সর্ব্বজয়ী শক্তির পূর্ণতার মহাসঙ্গীতের উদ্বোধনে। কাব্যশিল্প-সাধনার সাফল্যলাভ ইহার প্রকৃষ্ট ফল। যাহা হউক, কৃত্তিবাসের রামায়ণে ও কাশীদাসের মহাভারতে একটি বস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহা ভক্তি। ভক্তিরূপ চাবির সাহায্যে বাঙ্গালী-হৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠ খুলিয়া গিয়াছে। কাশীদাসের ব্রাহ্মণভক্তি স্থানে স্থানে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কৃত্তিবাস বীরবাহুকে বৈষ্ণব সাজাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ধরণী লটায়ে রহে গড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥"

তরণীসেনের অতিভক্তি দেখিয়া বানরগণ উপহাস করিতেছে—

"অঙ্গে লেখা রাম-নাম রথের চারি পাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥"

এই জন্য শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—এই সব পড়িয়া রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিকরেণুরঞ্জিত সংকীর্ত্তন-ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল-বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চক্ষুজল এতদ্দেশের একটি প্রধান শক্তি। বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। এই বৈষ্ণবীয় ভাব, এই কোমলতা বাঙ্গালী-চরিত্রের কমনীয়তা সম্পাদন করিয়াছে—ইহাই রামায়ণ ও মহাভারতকে বাঙ্গালীর নিজস্ব করিয়াছে—ইহা বাঙ্গালীর হৃদয়ের, প্রাণের বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবিদ্বয় তাঁহাদের দেশের লোকের হৃদয়ের ভাবরাশির উৎসস্বরূপ মধুর সরস ভক্তিবারি সেচন করিয়া বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত পরিমাণে অনুবাদক হইলেও, পূর্ব্বসূরিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলেও প্রকৃত কবিযশের অধিকারী।

প্রাচীনকাল হইতে এই সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত দেশাত্মবোধের বিশেষ কোন ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি কোন কোন চরিত্রে ক্ষাত্রদৃঢ়তা ও রজোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চগৌড়েশ্বরের প্রবল প্রতাপ, সিংহল-বিজয় প্রভৃতি বীরত্বের কাহিনী মাঝে মাঝে কাব্যের উপজীব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত কবিত্বের উজ্জ্বল ভালকাসাহায্যে চাঁদের চরিত্রে বীরত্ব ও দৃঢ়তার ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাদির বর্ণনা মামুলি বাঁধিগতের গতানুগতিক ভাবযুক্ত। তাহাই বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিত এবং তাহাদের মানস-নয়নে প্রাচীন আদর্শের অস্পষ্ট ক্ষীণ ছবিগুলি প্রতিবিম্বিত হইয়া এক সুন্দর ভাবের অবতারণা করিত। বাঙ্গালী যে নিস্তেজ, অলস ও উচ্চাভিলাষশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিস্ফুট।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রেমাবতার কৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমাশ্রু-বিধৌত বাঙ্গালা-সাহিত্য সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্তস্তলবাহী প্রেম-ভক্তি-স্রোত চৈতন্য-চরণ-স্পর্শে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার মাটীকে প্রেম-সম্পদে গৌরবান্বিত করিয়াছে। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির গভীর প্রেম যেন মূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যে পুরামাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। সেই চিরপুরাতন বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতা—সেই রাধাভাব ও আত্মনিবেদন—সেই বৈষ্ণব-তন্ময়তা ও নৈবেদ্যলক্ষণ শ্রীচৈতন্যে যেন অনাবিল প্রতিমা ও প্রতিমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবের সহিত যে বিরাট সাহিত্যের স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছিল, তাহার কবিত্বের উচ্ছ্বাসে কিংবা ভাষায় দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা নাই—তাহা কেবল তাঁহার অলৌকিক প্রেমের আভাষ দিতে চেষ্টিত—তাহা তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ও আত্মোৎসর্গের উন্নয়নে ব্যস্ত। পদাবলী সাহিত্য চৈতন্যদেবের নির্ম্মল অশ্রুধারাসিক্ত রহস্যমধুর প্রেমের গন্ধে ভরপুর—তাহাতে সংসারভাবের অবসর নাই। প্রেম ভক্তি-প্রবণ জাতি চৈতন্যদেবের অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের পর বঙ্গদেশে আর একটা ব্যাপার ঘটিতেছিল। পূর্ব্ব হইতে অস্পৃশ্য ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণগণ অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বহু লোক সুযোগ বুঝিয়া রাজার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়া সামাজিক নির্যাতনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ দলে দলে হিন্দু-সমাজের সংস্রব হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। এক্ষণে চৈতন্যের প্রেম পতাকাতলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল সমস্ত জাতি সমবেত হইল। অদ্য জাতীয় জীবনে যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন ও অস্পৃশ্যতা দূর করিতে সকলে চেষ্টিত, তাহা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে হরিনাম-মাহাত্ম্যে সংসাধিত হইয়াছিল। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" এই অর্দ্ধশ্লোক মানবের দেবত্ব প্রকাশ করিতেছে।

"মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে ॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

প্রভৃতি অস্পৃশ্যতানাশক পদ দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। অনেক মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ও পতিত জাতি হরিনামের গুণে সমাজে স্থান পাইল। মুসলমান কবিগণের হৃদয়ও শ্রীচৈতন্যের অমল-ধবল ভক্তিপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। তাঁহাদের কাব্যরচনা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। আলওয়াল কবি লিখিয়াছেন—

প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে।
মলয় সমীর, সুসৌরভ সুশীতল, বিলোপিত পতি অতি রসভাষে ॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চূতলতা কোরকজালে।
যুবজন-হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, বঙ্গলতিকা মালতী থালে ॥

এইরূপ কবিতায় পুলকিত ভাব জয়দেবের প্রেমরসসিঞ্চিত পদাবলীর কথা মনে আনিয়া দেয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বঙ্গীয় সমাজে

চৈতন্যযুগের শ্রেষ্ঠ দান—চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে প্রীতি—নিম্ন ও উচ্চজাতির মধ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতি।

পরবর্ত্তী যুগ মুকুন্দরামের যুগ। দামুন্যার কবি পুরুষানুক্রমে তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীর ছায়াশীতল পর্ণকুটীরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদ সরিফের অসহ্য অত্যাচারে বিতাড়িত হইলেন। মামুদ সরিফের দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ষাপ্রপাতসিক্ত অযত্ন-সম্ভূত তরুলতাশোভিত বহুপল্লী—"যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে" এবং "অনিলে মলয় সদা বহমান"—সেই পল্লীর ফুল্ল সজীব মনোমোহিনী মূর্ত্তি প্রবাসী কবির সকরুণ অতৃপ্ত কামনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। স্বগ্রামের নাম স্মৃতিপটে উদিত হইলে তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিয়াছেন—

গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ-জল
পান কৈনু শিশুকাল হ'তে।
সেই সে পুণ্যের ফলে কবি হৈনু শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥

স্বদেশের নরগণ বীর্য্যশালী ও ভক্তিপ্রাণ—সে স্থানের রমণীগণ অতুল সৌন্দর্য্যভূষিতা—সে স্থানের সমস্ত বস্তু তুলনারহিত।

"দামুন্যায় লোক যত, শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী।"

স্বদেশপ্রীতির অঞ্জন তথাকার সমস্ত দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের আবছায়া আনিয়া দেয়। কোমল ও মধুর ভাব ফুটাইতে—প্রেম ও দারিদ্র্যের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য অঙ্কন করিতে মুকুন্দরাম সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সময় হিন্দুগণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। শৌর্য্যবীর্য্যে তাহারা হীন ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পশুযুদ্ধের বর্ণনায় মুসলমানগণের অত্যাচারের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক॥"

সিংহ বলিতেছে—

"বীর ক্ষত্রী অদ্ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত
সমরে হানয়ে বীর রথ।
দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান,
পলাইতে নাহি পাউ পথ॥"

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মকার, চামার, এমন কি, ব্রাহ্মণও পাইকের কার্য্য করিত। বঙ্গসাহিত্যে যুদ্ধাদির বর্ণনা অল্প নহে। কিন্তু কাব্যের চরিত্রসমূহে সেরূপ সাহস ও বীরত্বের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কালকেতু এক জন বীর, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্রীর মন্ত্রণায় ধনাগারে লুক্কায়িত রহিল। এই জাতীয় দুর্ব্বলতা ও বিলাসপ্রিয়তা ভারতচন্দ্রের ও তাৎকালিক অন্য কবির মধ্যেও পরিস্ফুট। সরল ও স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্ত্তে এ সকল পাণ্ডিত্য ও অস্বাভাবিক রচনার পারিপাট্য পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। অবগুণ্ঠনবতী পল্লীবধূ রাজসভায় আনীতা হইল। স্বভাবসৌন্দর্য্য-ভূষিতা বঙ্গভাষা নাগরিক জীবনের কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিতা হইল। ফার্সী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন সাজ পরাইয়া বিলাসব্যসনপূর্ণ অমার্জ্জিতরুচি ও বিকট রসালাপের তরঙ্গ-হিল্লোলে ছাড়িয়া দিলেন। ভারতচন্দ্র অতুলনীয় শব্দমন্ত্র ও ছন্দোমাধুর্য্যপ্রভাবে সমাজ-বাঁধনের শক্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক প্রেমমিলনের যে ছবি প্রেম-প্রবণ বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিলেন, তাহা বাঙ্গালী আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যাসুন্দর গীত হইতে লাগিল। অমার্জ্জিত রসিকতার বন্যায় বাঙ্গালার গ্রাম প্লাবিত হইতে লাগিল। কূটনীতি-বিশারদ চতুর কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র স্থান পাইলেন।

কিন্তু এই অবসাদ ও অবনতির মধ্যেও বাঙ্গালীর শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি গঙ্গারাম তাঁহার "মহারাষ্ট্রপুরাণে" জনগণের হৃদয়ে সাহস জাগাইয়া দিয়া বর্গীর অত্যাচার ও চৌথ আদায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিতেছেন,—

"আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে।
বরগী সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে॥"

আলীবর্দ্দীর সময় হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া বঙ্গদেশকে বর্গীদিগের হস্ত হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়াছিল। নবাবের হিন্দু-প্রীতি ইতিহাসে সুপরিচিত। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য পুরস্কার দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু-মুসলমান প্রীতি ও বিশ্বাসসূত্রে পরস্পর বদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দু কর্ম্মচারী মনসবদার ও সেনানায়কের পদ পাইত। রাজা জানকীরাম, রাজা রামনারায়ণ, কীর্ত্তিচাঁদ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ দায়িত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু সৈন্যগণ মুসলমান সৈন্যের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইত না। এইরূপে প্রায় দশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর হিন্দু-মুসলমান বঙ্গদেশকে বর্গীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা Lenophone-এর The Retreat of the Ten Thousand নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রীক-বীরগণের যুদ্ধকৌশল ও বীরত্বের প্রশংসা করি, কিন্তু আমাদের নিজের দেশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বাঙ্গালী সৈন্যের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য, অসংখ্য বর্গীর বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যের প্রাণপণ যুদ্ধ ও তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতার বিষয় পাঠ করিলে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইতে হয়। পশ্চাতে শত্রুর আক্রমণ সত্ত্বেও বাঙ্গালী সৈন্য অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়া জন্মভূমি রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ অবিচলিত হৃদয়ে বুকের রক্ত ঢালিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহা আমরা কয় জন জানি? অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্য-সাহিত্য যখন রাজসভায় রাজানুগ্রহে পরিপুষ্ট হইয়া দেশবাসীর রুচি কলুষিত করিতেছিল, তখনও উপযুক্ত নায়কের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালী শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, কিন্তু জাতীয়তার ভাব বর্ত্তমান না থাকায় এই শৌর্য্যবীর্য্য কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে নাই।

পলাশীর যুদ্ধের সময় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ জীবিত ছিলেন, কিন্তু জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধানের সময় তাঁহাদের সারস্বত বীণা বাজিয়া উঠে নাই—তাহা রুদ্রভাবে জাতীয় মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করে নাই—বঙ্গীয় কবির "বীণার তারে" দেশমাতৃকার প্রিয় নাম ঝঙ্কৃত হইয়া বাঙ্গালী জাতির সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দেয় নাই। ভারতচন্দ্র পদলালিত্যের মোহনভাবে তাঁহার আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। রামপ্রসাদ তাঁহার নিভৃত পল্লীতে বসিয়া অশ্রুসিক্ত নির্ম্মল ভক্তি-বিহ্বলতাপূর্ণ শ্যামাসঙ্গীতে ভরপুর থাকিতেন এবং অপরকে মুগ্ধ করিতেন।

ভারতচন্দ্রের পর এবং সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সেই প্রেমভক্তি, যাহা তাহার প্রাণের প্রাণ—তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি—তাহার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য বস্তু—যাহাতে সে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্বজগতের অনন্ত ভাবসমুদ্রে ডুব দিয়াছে—সেই প্রেমভক্তি তাহার মুসলমানী রুচিপ্রসূত দৃষ্টির আবিলতা, মলিনতা ও অন্ধকার অপনীত করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ।

আধুনিক স্থাপত্য

মানুষের প্রত্যেক সৃষ্টিতে তার আনন্দরসস্বরূপতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের সতত চেষ্টা,—তার মধ্যে যে অসীমের আভাস আছে, সেইটিকে সীমার মধ্যে ধ'রে লোকলোচনের গোচর করা এবং তার দ্বারা নিজের অসীম উপলব্ধির আনন্দ অপরকে পরিবেষণ করা। যে যেই পরিমাণে এই অসীম অভিব্যক্তিতে সমর্থ হয়, সে তত বড় শিল্পী, সে তত বড় আর্টিষ্ট, সে তত বড় স্রষ্টা।

নূতন ধরণের 'ভিলা' বাড়ী

মানুষের আত্মার আনন্দরস-স্বরূপতা দেশে ও কালে শিক্ষায় ও সাধনায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এই জন্য একই শিল্প একই সময়ে নানা দেশে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। তাই চীন-জাপানের স্থাপত্য-রীতি, ভারতীয় দ্রবিড় স্থাপত্য-রীতি, হিন্দু সারাসেনীয় স্থাপত্যরীতি, গ্রীক স্থাপত্য-রীতি প্রভৃতি কেউ কারও সদৃশ নয়, অথচ সবগুলিকেই সুন্দর বল্‌তে হয়। প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে এক এক যুগের এক এক জাতি তার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধকে প্রকাশ করে এবং সমগ্র জাতীয় সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে বিশেষ শিল্পীর ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যবোধও প্রকাশ পায়। এইখানেই অসীমের অসীমত্বের পরিচয়; তাকে নানা জনে নানা দিক্ থেকে দেখেও তার রূপের বৈচিত্র্যের ইয়ত্তা করতে পারে না।

মানবাত্মার সকল প্রকার প্রকাশ-চেষ্টার মধ্যে স্থাপত্য-রীতিই বিশেষ দৃষ্টি-আকর্ষক। যে দিন আদিম বর্ব্বর মানব বন্যজন্তুর সহচর থাক্‌তে থাক্‌তে বুদ্ধি প্রকাশ ক'রে চারটা খুঁটির উপর একটা আচ্ছাদন চাপিয়ে নিজেদের রৌদ্র-বৃষ্টির অত্যাচার থেকে বাঁচাবার প্রথম চেষ্টা করেছিল, সেই দিনই সে নিজের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যেরও ভিত্তি-পত্তন করেছিল। সেই কুঁড়ে ঝোঁপড়ী পেকে আরম্ভ ক'রে মিশরের পিরামিড ও ভারতের তাজমহল পর্য্যন্ত যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের আত্মার আনন্দরসস্বরূপতা কতরূপে প্রকাশ পেয়েছে; তার কোনটা কায-চলা গোছের সাদাসিধা, কোনটা বা বিরাটের জাঁকালো ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত, আর কোনটা বা ফুলের মত অথবা তন্বী তরুণীর মত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর!

প্রত্যেক দেশের এক এক যুগের স্থাপত্য সেই দেশের সেই সময়-কার মানবসমাজের শিক্ষাদীক্ষার সাক্ষী। প্রত্যেক জাতির দেব-মন্দির পারিপার্শ্বিক সমস্ত গৃহের চেয়ে উচ্চচূড় ও স্বতন্ত্র পদ্ধতির হয়ে এই ঘোষণা করে যে, ধর্ম্ম নব-জীবনের প্রধান সামগ্রী; সেইখানেই তার সঙ্গে অনন্ত অসীমের বিশেষ যোগ, নীল অসীম আকাশের পট-ভূমিকার সম্মুখে উচ্চচূড় মন্দির মানবাত্মার সতত ঊর্দ্ধমুখী-নতাই নির্দ্দেশ করে। অট্টালিকার সরল সমুন্নত স্থূল স্তম্ভ-গুলি মানব-চরিত্রের অটল গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তা সূচনা করে; সুসমঞ্জস গম্বুজ মানব-চরিত্রের অগাধতারই প্রতীক।

প্রাচীন কালের গ্রাম ও নগর প্রায়ই সুবিন্যস্ত নয়; মানুষ যখন দেখলে যে, একা থাক্‌লে তার আত্মরক্ষা করা দুষ্কর, তখন তারা স্বার্থপরতা থেকেই দলবদ্ধ—সমাজবদ্ধ

আধুনিক বাসভবন

হয়ে একত্র বাস করতে আরম্ভ করলে; কিন্তু সেই বাসস্থাপনের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা বা পারিপাট্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতো না। তাই প্রাচীন গৃহগুলি প্রায় একবিধ, পথ আঁকা-বাঁকা অপরিসর, সিঁড়ি সঙ্কীর্ণ ও খাড়া, ছাদ অনুচ্চ, কপাট কপাল-ভাঙা; কিন্তু এর মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে দেউল, মঠ, মন্দিরের চূড়া! যেন মানবাত্মা তুচ্ছতার উর্দ্ধে উঠে হাত বাড়িয়ে অনন্ত অসীমকে আলিঙ্গন ক'রে ধরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে মানবের ধারণা ছিল, মানব-জীবনটা যেন অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা শাস্তি; তাই তারা ইহকালের চেয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করত; এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাদের বেশী লক্ষ্য ছিল না; কোনও মতে দিনগতি পাপক্ষয় ক'রে সংসারযাত্রা চুকিয়ে পরলোকে গিয়ে পড়তে পারলেই যেন তারা বাঁচে—জীবনান্তে তারা অনন্তধামে নিত্যসুখে বাস করবে। ভারতবর্ষে ইহজীবনের অনিত্যতা যেমন প্রবলভাবে মানুষের মন অধিকার করেছিল, এমন আর কোনও দেশে নয়; তাই আদিম আর্য্যজাতির স্থাপত্য-নিদর্শন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগের এবং হিন্দু অভ্যুত্থানের সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালা-সাহিত্য থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বাঁশখড়, কাঠ-কুটা দিয়ে নির্ম্মিত হ'ত। বাসগৃহ স্থায়ী কর্‌বার দিকে কারও চেষ্টাই ছিল না; প্রত্যেক গৃহস্থের আদর্শ ছিল লোমশ মুনি- যাঁর গায়ের লোমসংখ্যা অনুসারে অসংখ্য ব্রহ্মার পতন ও অসংখ্য প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও যিনি রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে একটি তালপাতা আচ্ছাদন দিয়ে ব'সে ছিলেন, সামান্য ক'টা দিনের জন্যে চালা বাঁধার ক্লেশ স্বীকার করেন নি। সে কালের লোকরা নিজেদের তুচ্ছতা ও অনন্ত অসীমের সত্যতা ঘোষণার জন্যই যেন নিজেদের বাসগৃহ অকিঞ্চিৎকর ও বিরাটের মন্দির বিরাট করেই গঠন করত; গৃহ তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, কিন্তু মন্দির সমাজের সকলের।

তাহার পর সৌন্দর্য্যবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য-রীতির পরিবর্ত্তন ঘটল। পথ প্রসর হ'ল, অট্টালিকা উন্নত, দৃঢ়, সুন্দর, সুবিন্যস্ত হয়ে উঠল। স্রষ্টার আনন্দ ও সৌন্দর্য্যবোধ বিবিধ কারু-বৈচিত্র্যে প্রকাশ পেতে

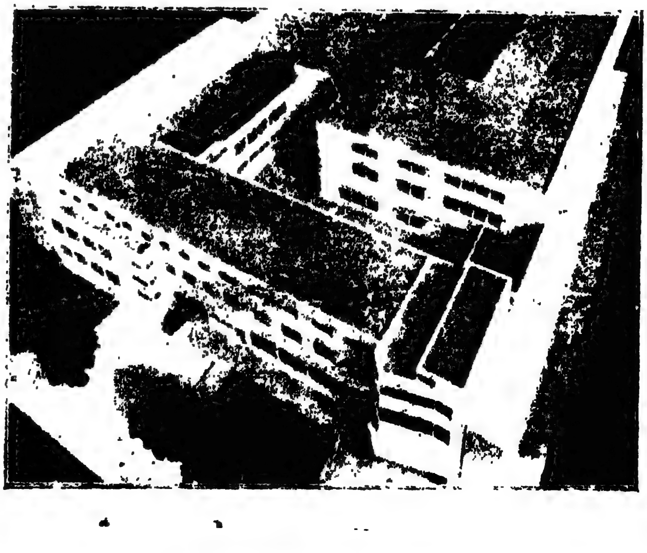

বালিনের আধুনিক বিরাট 'গ্যারাজ'

লাগল। প্রাচীন অপরিসর উচ্চ মন্দিরের স্থানে আয়ত বহুস্তম্ভধৃত মন্দির প্রস্তুত হ'ল, পুরাতন মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, জগমোহন জোড়া হ'তে লাগল। পরলোকের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকটাও আমল পেতে আরম্ভ করলে। আগে প্রকাশ পেতো কেবল সমাজের সমষ্টীভূত অস্তিত্ব, এখন ব্যক্তিত্বও সমাদর পেতে লাগল।

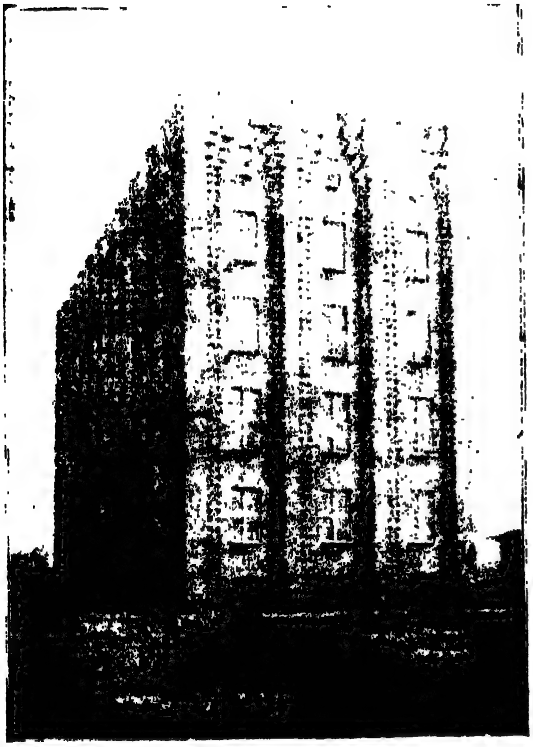

হানোভারের সন্নিহিত একটি কারখানার আপিস-ভবন

ক্রমে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ সমাজে প্রবল হয়ে উঠল, তার ফল ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-বিপ্লব ও রাজপদের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা, ইংরাজ দার্শনিকদের গণপ্রাধান্য ঘোষণা, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব, ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতি। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল ব'লে শিল্পপদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। আগে বক্র কুণ্ডলীপাকানো জটিল রেখাজালের ভিতর দিয়ে শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ আত্মপ্রকাশ করত, এখন কেউ কারও তোয়াক্কা রাখতে চায় না ব'লে রেখাও সরল সমান্তরাল অসংলগ্ন হয়ে সৌন্দর্য্যকে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পেয়েছিল আমেরিকায়, তাহার পরে য়ুরোপে। তাই আমেরিকার স্থপতিরা যে স্থাপত্যরীতি উদ্ভাবিত করেছে, তাতে বক্ররেখা বর্জ্জন ও সরলরেখার প্রাধান্য স্থাপনের সুস্পষ্ট চেষ্টা দেখা যায়।

হাল সহরে নূতন ধরণের আপিস-বাটী

অট্টালিকা থেকে স্তম্ভ বিদায় নিয়েছে, অলিন্দ বারান্দা কার্ণিশ অনাবশ্যকবোধে নির্ব্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক অট্টালিকাই অভ্রভেদী হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পর্দ্ধাভরে প্রকাশ করছে। আধুনিক ইমারতগুলির দেয়ালের গায়ে মানুষের মুখের ছায়াপাতে যে ছবি হয়, সেই ছায়া ছবির মত, মণ্ডনবিহীন কেবলমাত্র একটা আদ্রা মাত্র। মস্কো থেকে শিকাগো এবং বুডাপেষ্ট থেকে প্যারিস পর্য্যন্ত সকল স্থানের স্থাপত্য এইরূপ বাহুল্যবর্জ্জিত একবিধ হয়ে উঠে জগতে এক মহাগণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার সূচনা করছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফলের ব্যবসা

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আমাদের দেশের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপের বন্দনা করিয়াছেন। বাস্তবিক এমন সুলভ জল, অযত্নসঞ্জাত ফল আর প্রচুর শস্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ফল মানুষের একটি প্রধান খাদ্য। তাই যাহা কিছু পরিণাম, সুপরিণত, যাহা লাভযোগ্য, আকাঙ্ক্ষিত, তাহাকে আমরা ফলের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকি। ফলের মধ্যেই ষড়্‌রসের সমাবেশ আছে; রসনাতৃপ্তি ব্যতীত ফলের মধ্যে যে লবণ ও অম্লরস আছে, তাহা পাকাশয়, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতি পাক-যন্ত্রের বিশেষ উপকারী।

এই তত্ত্বগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া য়ুরোপ-আমেরিকার উদ্‌যোগী পুরুষসিংহরা ফলের নানাবিধ ব্যবসায় করিয়া ধন আহরণ করিতেছেন। ফ্রুট-সল্ট্ বা ফলের লবণ, ফ্রুট্-সিরাপ বা ফলের সরবৎ, ফলের রস বিদেশ হইতে আমদানী হয়, আর আমরা দুঃসহ দুঃখে অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া সেগুলি ক্রয় করি। কতক ঔষধ-স্বরূপ এবং কতক বিলাসসামগ্রীস্বরূপ। এনো প্রভৃতির ফ্রুট-সল্ট্, ক্যালিফর্ণিয়ার ডুমুরের সিরাপ রেচকরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত; লেবুর ও জামের রস হজমী ও শীতলতা-সম্পাদক; অন্যান্য ফলের রস সরবৎ পানীয় প্রস্তুতে সমাদৃত হইয়া থাকে!

বিদেশ হইতে ফলও কম আমদানী হয় না। কাবুল অঞ্চল হইতে নানাবিধ মেওয়া কাঁচা বা শুষ্ক অবস্থায় এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। সর্দা, তরমুজ, আঙ্গুর কাঠের বাক্সের মধ্যে তূলার স্তবকের মধ্যে রক্ষিত হইয়াও এ দেশে আনীত হয়; পেস্তা, বাদাম, আখ্‌রোট, কিস্‌মিস, মোনক্কা (কচি আঙ্গুর শুকানো), খোবানি, আলুশকর, চালগিজা, বেদানা প্রভৃতি শুষ্ক অবস্থায় এ দেশে কাবুল হইতে রপ্তানী হয়। ফল বহু দিন থাকে।

আরব, মিশর অঞ্চল হইতে খেজুর আমদানী হয়।

য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বহুবিধ ফল টিনের কৌটায় সুরক্ষিত হইয়া এ দেশে আনীত হয়।

পাকা ফল শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, পচিয়া যায়। তাই ফলের ব্যবসায় বিশেষ শঙ্কাজনক। তাই ফলকে পচন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা দেশে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ফল শুষ্ক করিয়া রক্ষা করার কৌশলে কাবুলীরা বিশেষ ওস্তাদ্। টিনে ফল রক্ষায় য়ুরোপ-আমেরিকা দক্ষ।

আমাদের দেশে সকল রকম উপায়ই অল্পস্বল্প প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র ঝুনা নারিকেল ও পাকা কুম্‌ড়া শুষ্ক অবস্থায় অধিক দিন রাখার রীতি আছে। অনেক ফল আচার বা মোরব্বা করিয়া রাখা হয়। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ ফলই মরসুমকালে সুপক্ক হইলে অল্প-দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়; দোফলা গাছের ফল ছাড়া অসময়ে সেগুলি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশের মোরব্বা খোলা পাত্রে থাকে, তাহার সঙ্গে বাতাসের অবাধ সংযোগ ঘটে, এ জন্য সেগুলিকে গাঢ় শিরকা (চিনির রস) দিয়া রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ফলের আস্বাদ অনেকটা অন্যরূপ হইয়া যায়, গুণেরও তারতম্য ঘটে।

য়ুরোপে, আমেরিকায় ফলের মোরব্বা করা একটা খুব লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার ব্যবসাদাররা খুব পাতলা চিনির রসে ফল পাক করিয়া বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় মোরব্বা বন্ধ করিয়া রাখে, এ জন্য সেগুলি বহুকাল অবিকৃত থাকে; আমাদের দেশের মোরব্বার মত ঐগুলিকে মাঝে মাঝে রৌদ্রপক্ক করিয়া দিয়া বাতাস হইতে সংক্রামিত জীবাণু ধ্বংস করিতে হয় না।

বিদেশের এই প্রণালীতে ফল-রক্ষার কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়া আমাদের দেশেও দুই এক জন উদ্‌যোগী

পুরুষ বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ধনপতি হইয়াছেন। ইঁহারা আম, লিচু, আনারস মোরব্বা করিয়া বিদেশে রপ্তানী করেন। একটি ব্যবসাদার আমাদের দেশী সন্দেশ-রসগোল্লাও টিনে পুরিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতেছেন।

আমাদের দেশে এমন কতকগুলি ফল হয়, যাহা অন্য দেশে হয় না, যেমন আম, অথবা অন্যদেশ হইতে আমদানী ফল তাহার মাতৃভূমি হইতেও দত্তক মাতৃভূমিতে উৎকৃষ্ট হয়, যেমন মজঃফরপুরের গোলাপ-গন্ধী বীজহীন লিচু। বিদেশে এই সব ফল খুব সমাদৃত। তাহা ছাড়া আনারসের আদর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অম্লমধুর ফল রসনাতৃপ্তিকর বেশী। আমাদের দেশে শ্রীহট্টের আনারস মিষ্টত্ব ও স্বাদুতার জন্য প্রসিদ্ধ। যশোহর খুলনারও অনেক স্থানে খুব বড় সুমিষ্ট আনারস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বেকার কর্ম্মপ্রার্থী শিক্ষিত যুবকদিগের এই ব্যবসার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। প্রথম কিছু দিন বিদেশের বা দেশের মোরব্বার কারখানায় শিক্ষানবিশী করিয়া সমস্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলে এই ব্যবসায়ে লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

আমরা এই সঙ্গে আমেরিকার অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনোলুলু দ্বীপস্থ একটি আনারস-মোরব্বার কারখানার কথা উল্লেখ করিতেছি। এই কারখানায় হাওয়াই, ফিলিপিনো, চীনা, জাপানী, কোরিয়ান, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি নরনারী কায করিয়া থাকে। এখানে কলে আনারস ছাড়ানো হয়; কিন্তু হাতে করিয়া ছুরী বা নখ দিয়া আনারসের চোখ তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং দুই ধারের খোসা চাঁচিয়া দিতে হয়। ফল বা আনারসের চাকী হাত দিয়াও স্পর্শ করা হয় না; পাছে কারিগরদের হাতের স্পর্শে জীবাণু সংক্রামিত হইয়া মোরব্বা নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সকল কারিগর মেয়ে-পুরুষই রবারের দস্তানা বা হাত-মোজা পরিয়া কায করে। রবারের দস্তানা ও ছুরী প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই ডাক্তারী অস্ত্রচিকিৎসার উপকরণের মত শোধন-করা জীবাণু-মুক্ত থাকে; কারিগরদের জামা-কাপড়ও শোধন করা নির্ম্মল রাখা হয়। আমরা শুচিতার বড়াই করি, কিন্তু আমাদের শুচিতা এখন অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই প্রাচীন শুচিতাজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মোরব্বা-চাটনির একটি নাম প্রচলিত আছে—আচার!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশাল শণ-শিল্প

অনেকেই অবগত আছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে জলাভাবে কয়েক বৎসর হইতে চাষের জমী কমিয়া আসিতেছে। এই সমুদয় জমীতে জলসেচনের ব্যবস্থা বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীত উহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নহে। এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর জমী বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলায় দৃষ্ট হয়, যেগুলি লাল কাঁকর অথবা ঘুটিংময়। সচরাচর এরূপ জমীতে কোন চাষ হয় না এবং অধিকাংশ স্থলেই উক্ত প্রকারের জমী সাধারণ ফসলাদি উৎপাদনের উপযোগীও নহে। এইরূপ কঠিন অনুর্ব্বর জমীর সদ্ব্যবহারের উপায় কি?—কেবল এক জাতীয় ফসলই এই সমস্ত অঞ্চলে উৎপাদিত হইতে পারে এবং উহা অনাবৃষ্টিসহ, স্থূলপত্রবিশিষ্ট, কঠিনপ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাও আছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত প্রকারের কঠিন অনুর্ব্বর জমীতে কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে ব্যবহারিক হিসাবে সূঁচমুখী, মুর্গা, বিলাতী কেয়া প্রভৃতিই প্রধান। সূঁচমুখী স্থূল, গোলাকার, সূচ্যগ্রপত্রবিশিষ্ট গাছ; ইহা বঙ্গদেশের প্রায় সকল জিলাতেই দেখা যায়; পক্ষান্তরে, মুর্গা-জাতীয় উদ্ভিদ প্রায়ই পাথুরে মাটী-সমন্বিত জিলাগুলিতেই আবদ্ধ। তন্তু উৎপাদনে এই প্রকার গাছের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। কতিপয় জাতীয় সূঁচমুখী ও মুর্গা ভারতের আদিম অধিবাসী; অন্য কতকগুলি প্রথমতঃ বিদেশ হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেও এখন এতদ্দেশে সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। 'শিশাল' শণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট হিসাবে এই সমুদয় উদ্ভিদ হইতে নানা শ্রেণীর তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তৎসমুদয় নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগ করা হয়—তন্মধ্যে দড়ি-দড়া, থলে-চট, মাদুর, গালিচা, বিশেষ কার্য্যোপযোগী বস্ত্রাদিই অন্যতম। তন্তু-নিষ্কাশন উপলক্ষে পত্র হইতে যে প্রভূত পরিমাণ

পিণ্ড অথবা শাঁস (pulp) বাহির হয়, তাহা সাধারণ ক্ষেত্রজ সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া মূল্যবান্ ফসলে প্রয়োগ করাও চলে। মেক্সিকো দেশে 'শিশাল' শণের পুষ্পদণ্ডনিঃসৃত রস হইতে এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মরিচদ্বীপ, মধ্য-আমেরিকা, মিশর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশে শ্বেতাঙ্গগণ বড় বড় বাগিচা প্রস্তুত ও তন্তু-নিষ্কাশনের কারখানা স্থাপন করিয়া এই শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। এতদ্দেশেও জমীদার অথবা ধনিগণ উপযুক্ত চেষ্টা করিলে পতিত জমীতে মুর্গা প্রভৃতির চাষ ও তন্তু উৎপাদন করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন।

মুর্গা ইত্যাদির উৎকৃষ্ট জাতি

তন্তুর উৎকর্ষ ও পরিমাণাধিক্য হিসাবে কেবল কয়েকটি-মাত্র জাতি চাষের উপযুক্ত; তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। সুঁচমুখী (Sansivieras) পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলাতেই দৃষ্ট হয়; ফরিদপুরে ইহার দড়ি-দড়া ও জালও প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ইহার তন্তু চক্‌চকে ও দেখিতে রেশম সদৃশ, কিন্তু হ্রস্ব; অধিকাংশ জাতিরই তন্তু ৩ ফুটের অধিক হয় না। কেবল S. Trifascita জাতির তন্তুই ৪ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। চাষ করিতে হইলে ইহারই চাষ করা ভাল; কলিকাতার উপকণ্ঠে এই জাতি বিরল নহে। মুর্গা অপেক্ষা সুঁচমুখীর জন্য ঈষদধিক সরস জমী আবশ্যক হইলেও ইহার চাষে অন্য সুবিধা আছে;—ফসল কাটিতে দেরী হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং কর্ত্তিত ফসল কিছু দিন রাখা চলে; সঙ্গে সঙ্গে তন্তু-নিষ্কাশন আবশ্যক হয় না।

২। মুর্গা (Agaves); তিন জাতীয় মুর্গা ভারতের আদিম অধিবাসী এবং দাক্ষিণাত্য হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে; দেশভেদে উহাদের নানা নাম রহিয়াছে।

A lurida, A. Americana ইহার তন্তু উইপোকার আক্রমণসহ; মরিচদ্বীপে ক্রমাগত ইক্ষুচাষ দ্বারা জমী নীরস হইয়া পড়িলে তথায় মুর্গা চাষ করা হয়। মুর্গার পিণ্ড কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

A. Vivipara বোম্বাই প্রদেশে ইহার অল্পবিস্তর চাষ হয় এবং ইহা বোম্বাই মুর্গা নামে পরিচিত।

A. Rigida Var. longifolia (হাতী মুর্গা) মধ্য-প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য বারিপাত-বিরল অংশে এই জাতি দেখা যায়। ইহার পত্রে তন্তুর পরিমাণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক, কিন্তু তন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

'শিশাল' পূর্ব্বোক্ত জাতিরই একটি উপজাতি, A. Rigida Var. Sisalana। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইহা বেশ জন্মায়, কিন্তু ইহার চাষের পক্ষে শুষ্ক পাথুরে জমীই ভাল। 'শিশাল' শণ নিজেকে এত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে যে, ইহা যে কোন স্থানে জন্মান যাইতে পারে। অবশ্য মূল্যবান্ ফসলের জমীতে শিশাল শণ জন্মান অযৌক্তিক। আজকাল পৃথিবীর তন্তু-বাজারে ইহার প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। বিলাতী কেয়া (Fourcroya gigantea) মরিচদ্বীপ ইহার জন্মস্থান বলিয়া ইহাকে মরিচদ্বীপের শণ বলা হয়; ইহার তন্তু সর্ব্বাংশে শিশালেরই সমতুল্য। শিশালের জমী অপেক্ষা নিকৃষ্টতর জমী হইলেও ইহার ক্ষতি হয় না। বরং জমী যত কঠিন ও অনুর্ব্বর হয়, ততই তন্তুর পরিমাণ অধিক হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গ আসামজাত পত্রে মোটে শতকরা ২—২½ ভাগ আঁইশ থাকে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর অঞ্চলের পত্র হইতে ৪—৪½ ভাগ তন্তু পাওয়া যায়। ইহার পত্রগুলি ৬।৭ ফুট লম্বা ও ৫।৬ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলের খড়্গপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া লাইনের ধারে অনেকেই স্থানে স্থানে এই উদ্ভিদ দেখিয়া থাকিবেন। ইহার ১৫।২০ ফুট উচ্চ পুষ্পদণ্ড সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আমরা এ স্থলে যে কয়েকটি জাতির আলোচনা করিলাম, সেগুলি একই বর্গের (Natural order) অন্তর্ভুক্ত—উহার বৈজ্ঞানিক নাম—Amaryllideaet। সুঁচমুখী, মুর্গা ও বিলাতী কেয়া প্রভৃতির চাষ অথবা তন্তু-নিষ্কাশন সম্বন্ধে জাতি হিসাবে পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ প্রণালী প্রায় একইরূপ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিশাল শণকেই প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু অনেক উক্তিই মুর্গা ও বিলাতী কেয়া সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযুক্ত।

চাষের উপযুক্ত স্থান

সরস পলি মাটীতে মুর্গা সতেজে জন্মাইয়া থাকে বটে, কিন্তু পত্রে তন্তুর মাত্রা কম হয়। সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী বালুকাময় অনুর্ব্বর জমি, লাল কঙ্করময় মাটী ও ঘুটিংযুক্ত নিকৃষ্ট মৃত্তিকা,—এই সমুদয়ই মুর্গা চাষের উপযুক্ত। ফলতঃ যে স্থলে অন্য ফসল জন্মাইতে পারা যায়, সে স্থলে মুর্গা রাষ নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চুণযুক্ত অনুর্ব্বর জমিতেই মুর্গা উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশে মুর্গা চাষের উপযুক্ত অনাবাদী জমি অনেক পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে মুর্গা চাষ অবিদিত নহে। চা-বাগানওয়ালাগণও এক সময়ে গৌণ ফসলরূপে মুর্গা চাষ করিতেন। কিন্তু উক্ত স্থানসমূহে মুর্গা চাষ তেমন লাভজনক হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চাষের খরচ অধিক পড়িয়াছিল এবং উৎপাদিত তন্তুর মাত্রা কম হইয়াছিল। আবার তন্তুর মাত্রা কম হইবার হেতুই অনুপযুক্ত জমিতে চাষ। সরস মৃত্তিকা, আর্দ্র বায়ু এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণ বারিপাতও মুর্গা চাষের প্রতিকূল। মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুপুর (অনন্তপুর জিলা) নামক স্থানে সরকার কয়েক বৎসর মুর্গা চাষ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন নাই; মৃত্তিকা ও জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে এত অবহেলা প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, দেশী lurida, শিশাল ও বিলাতী কেয়া হইতে যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১·৪, ৩·০ ও ৩·৪ ভাল তন্তু পাওয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ-ত্রিবাঙ্কুরে দেশী longifolia জাতি চাষ করিয়া বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; বস্তুতঃ তদ্দেশে মুর্গাজাত সুতলী, দড়ি ও কাছি লইয়া একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালোর সহরের নিকটে গঞ্জুর ফাইবার কোম্পানী দেশী ও বিলাতী মুর্গা চাষ দ্বারা বেশ লাভ করিতেছেন। বোম্বাই প্রদেশেও এইরূপ ২।৩টি কোম্পানী আছে। ফলতঃ যদি স্থান উপযুক্ত হয়, তন্তু-নিষ্কাশনের আধুনিক প্রথা অবলম্বিত হয় এবং নিকটবর্ত্তী বাজার অথবা বন্দরে মাল পৌঁছাইয়া দেওয়ার খরচ অত্যধিক না হয়, তাহা হইলে মুর্গা চাষে লোকসান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুর্গা চাষের জন্য তত জল আবশ্যক না হইলেও, তন্তু প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট জল আবশ্যক। সেই জন্য বাগিচার ভিতর অথবা নিকটে যাহাতে জলাশয় থাকে, তাহাও দেখা দরকার।

চাষ-প্রণালী

সামান্য জমিতে মুর্গা চাষ করিয়া ব্যবসায়ের হিসাবে কোন লাভ নাই। বড় বড় বাগিচায় এক একটি ক্ষেত্রের পরিমাণ অন্যূন ১ শত ২০ বিঘা, এইরূপ কয়েকটি ক্ষেত্র লইয়া একটি বাগিচা হয়। এতদ্দেশেও যাঁহারা প্রথমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও ১ শত বিঘার কম আয়তনের ক্ষেত্র রচনা করা উচিত নহে; কারণ, তাহা হইলে চাষ ও তন্তু-নিষ্কাশনের খরচের অনুপাতে লাভের মাত্রা কম হইবে। আবার ক্ষেত্রসংলগ্ন এমন জমিও থাকা চাই—যেখানে আবশ্যক হইলে চাষ বাড়াইতে পারা যায়। ক্ষেত্রনির্ব্বাচনের পর একবার জমি কর্ষণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সকল জাতীয় মুর্গার তেউড় (Sucker) হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন পুষ্পদণ্ডের ফুলগুলি মুখীতে পরিণত হয়। চাষের জন্য এই সকল মুখী অথবা তেউড় চারা-ক্ষেত্রে পুতিয়া রাখিতে হয়। এক বৎসরে এই তেউড়গুলি প্রায় ১ হাত বড় হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বিঘা প্রতি ২ শত ৫০টি চারা হিসাবে চারাগুলি তুলিয়া বসান দরকার। পত্রপ্রান্তে কাঁটাযুক্ত জাতির পক্ষে অধিক এবং কাঁটাবিহীন জাতির পক্ষে অল্প ব্যবধান আবশ্যক হয়। কিন্তু জাতি হিসাবে ব্যবধানের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, চারা-সারিগুলি ঠিক সোজা হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে পাইট ও পাতা কাটা উভয় কাযেরই অসুবিধা হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মাটী কোপাইয়া বর্ষার প্রারম্ভেই চারা বসাইতে পারা যায়। ক্ষেত্রে চারা বসাইবার তৃতীয় বৎসর পরেই পাতা কাটিবার উপযুক্ত হয় এবং তৎপরে ১০।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ফুল হইলেই গাছ মরিয়া যায়। সমতল প্রদেশে ৪র্থ কিংবা ৫ম বৎসরেই কোন কোন স্থানে ফুল হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে চাষীর সমূহ ক্ষতি। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, তৃতীয় বৎসর হইতে পাতা কাটিতে আরম্ভ করিলে এবং ঘুটিংযুক্ত মাটীতে চাষ করিলে পুষ্প বিলম্বে

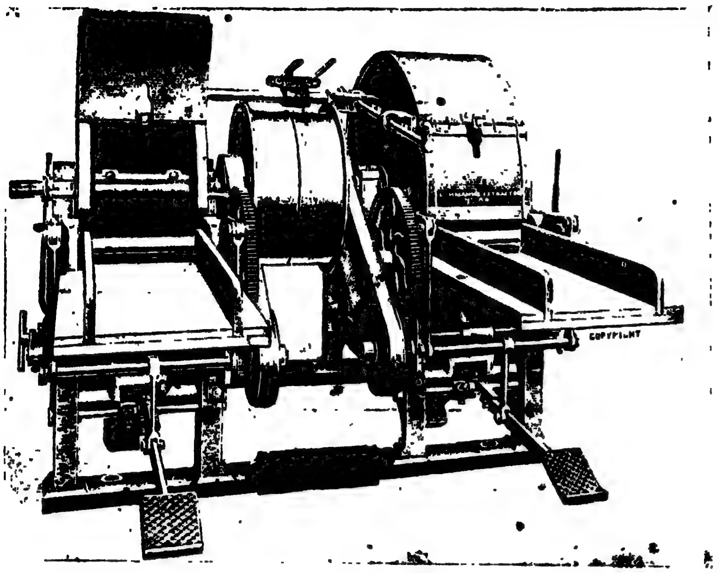

তন্তু-নিষ্কাশনের বড় কল

প্রকাশ পায়। পাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে গাছের নীচের তেউড়গুলি তুলিয়া চারা-ক্ষেত্রে রোপণ করা দরকার; তেউড় থাকিলে গাছ হীনবল হইয়া পড়ে। পাতা যখন হেলিয়া পড়ে, তখনই উহা কাটিবার উপযুক্ত হয়। প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে প্রায় ৩০টি পাতা পাওয়া যায়। ছোট বড় বাছাই করিয়া ৫০টি পাতা দ্বারা এক একটি বাণ্ডিল বাঁধা উচিত। ইহাতে পরে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। এক জন মজুর দিনে প্রায় দেড় হাজার পাতা কাটিতে পারে। 'শিশাল' শণের ১ হাজার পাতায় প্রায় ৩০সের পরিষ্কৃত তন্তু পাওয়া যায়। পাতায় তন্তুর অনুপাত অনুসারে বিঘা প্রতি ৫ মণ হইতে ৭ মণ তন্তু পাওয়া যাইতে পারে। অন্য জাতীয় মুর্গার তন্তুর উৎপাদনের হার ৩—৪ মণ। একবার চারা রোপণের পর সময় সময় নিড়ান ভিন্ন মুর্গার অন্য কোন 'পাইট' নাই।

তন্তু-নিষ্কাশন

মুর্গার পাতা কাটা হইলে উহা আর ফেলিয়া রাখা চলে না। অবিলম্বে তন্তু-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশীয় প্রথায় একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের উপর রাখিয়া পাতাকে কাঠের মুগুর দ্বারা উত্তমরূপে ছেঁচিয়া দেওয়া হয়; পরে ২।৪ দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিলেই উহা নরম হইয়া যায় এবং কাঠের তক্তার উপর পিটিয়া তন্তু বাহির করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এই প্রথায় দুইটি অসুবিধা আছে; প্রথমতঃ মুর্গাপত্রে ৯৫ ভাগই শাঁস এবং ৫ ভাগ তন্তু; উক্তরূপে পত্র ছেঁচিলে শাঁসের অপচয় হয়; দ্বিতীয়তঃ পাতা পচাইবার জন্য জলাশয়ও খারাপ হয়। পক্ষান্তরে, Softening Machine নামক যন্ত্র দ্বারা উক্ত কার্য্য করিলে অপচয় বন্ধ হয় এবং তন্তুও সহজে নিষ্কাশিত হয় ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। এইরূপ একটি কলের মূল্য প্রায় ১ হাজার ৪ শত টাকা।

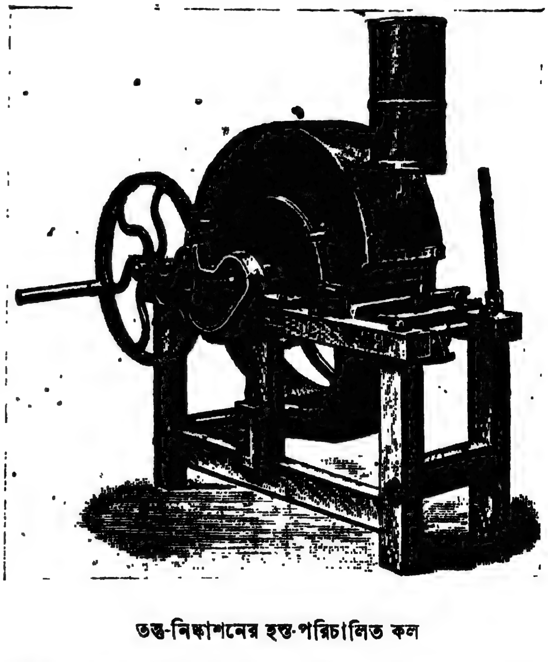

তন্তু-নিষ্কাশনের হস্ত-পরিচালিত কল

পত্র নিষ্পেষিত হইলে উহাকে নিষ্কাশন যন্ত্রে দিতে হয়। ইহাতে তন্তু পৃথক্ হইয়া বাহির হইয়া আইসে। বড় বড় কারখানায় বাষ্পপরিচালিত যেরূপ নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার একটি চিত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। কিন্তু এতদ্দেশে সকলে ইহা ব্যবহার করিবার মত মূলধন সংগ্রহ না করিতে পারেন; যাঁহাদের অল্প মূলধন, তাঁহাদিগের পক্ষে ২ জন মজুর দ্বারা পরিচালিত ছোট কলই ভাল;

ইহাতেও দৈনিক কিছু কম ২ মণ তন্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারও একটি চিত্র এ স্থলে দেওয়া হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তন্তু-নিষ্কাশনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল আবশ্যক। বড় কলের জন্য উপরে জলের চৌবাচ্ছা রাখিয়া পত্র পরিষ্কার করিবার পাত্রে জল যোগাইতে হয়। ছোট কলে জল যোগাইবার একটি টব রহিয়াছে, তাহা চিত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাও কল চালাইবার সময় যাহাতে সর্ব্বদা জলপূর্ণ থাকে, তাহা দেখিতে হইবে। এক শত বিঘার ক্ষেত্রের জন্য ছোট কলই যথেষ্ট এবং পাতা নরম করিবার কল যদি না লওয়া হয়, তবে আক-মাড়া কল দ্বারা সে কায চলিতে পারে; অবশ্য, আকমাড়া কলের রোলারগুলি নালীযুক্ত (grooved) না হইয়া সমান (plain) হওয়া চাই। কিন্তু একটি Softening Machine ১০টি নিষ্কাশন যন্ত্রকে নিষ্পেষিত পত্র যোগাইতে পারে। আকমাড়া কল দ্বারা সেরূপ সুচারু অথবা প্রচুরভাবে কায হয় না। একটি ছোট নিষ্কাশন যন্ত্রের মূল্য ১ হাজার ২ শত টাকা।

নিষ্কাশন যন্ত্র হইতে তন্তু বাহির হইয়া আসিলে উহাকে উত্তমরূপে শুষ্ক করা আবশ্যক। শুষ্ক তন্তুকে খুঁটির গায়ে আছড়াইয়া পরিষ্কার করা হয়; তাহাতে ব্রুস করার কার্য্য হইয়া থাকে, ব্রুস করার বিশেষ কলও আছে। বলা বাহুল্য যে, কল দ্বারা ব্রুস করিলে তন্তুর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্রুস করার পর তন্তুকে ৩।৪ ইঞ্চ মোটা বাণ্ডিল করিয়া বাঁধিতে হয়। বাঁধিবার জন্য অন্য দড়ি অপেক্ষা মুর্গাতন্তু ব্যবহার করাই ভাল। বাণ্ডিলগুলিকে আবার চাপ দিয়া ২।৩ হন্দর ওজনের গাঁইট বাঁধা দরকার। লোহার পাত দ্বারা গাঁইট মুড়িতে হইলে তাহার নীচে চট প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক, নতুবা তন্তুর ক্ষতি হওয়া সম্ভবপর। শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিলেও উপরে চট দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া ভাল; তাহা হইলে তন্তুর শুভ্রবর্ণ অবিকৃত থাকে। মুর্গা-তন্তুর স্থানীয় কাটতি অপেক্ষা বিলাতী চালানই অধিক।

আমরা এ স্থলে 'শিশাল' শণ প্রস্তুতের যে প্রণালীর উল্লেখ করিলাম, তাহা এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র ধনিগণের উপযুক্ত। কেবল যে স্থলে কল ব্যবহার না করিলে খরচ অনেক বাড়িয়া যায় ও অপচয় হয়, সেরূপ স্থলেই হস্তপরিচালিত কল ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের বাগিচাওয়ালারা কিন্তু বহু বিস্তৃতভাবে অন্ততঃ ৫।৬ হাজার বিঘায় মুর্গা চাষ করেন এবং তন্তু প্রস্তুতের সমস্ত কার্য্যই কল দ্বারা সম্পন্ন হয়। এঞ্জিন, বয়লার, কোমলকরণ, নিষ্কাশন, ব্রুস দেওয়া ও শুষ্ক করিবার কল ও গাঁইট বাঁধার যন্ত্রসহ একটি পূরা 'সেট' কলের মূল্য এরূপ স্থলে প্রায় এক লক্ষ ১৫ হাজার টাকার কম পড়ে না। সেরূপ ভাবে কার্য্য করিবার সময় এখনও এতদ্দেশে আইসে নাই; কারণ, মুর্গার তেমন বিস্তৃত চাষই অদ্যাবধি নাই।

অন্যান্য দেশে যেখানে মুর্গা উৎপাদন ও তন্তু-নিষ্কাশন স্বতন্ত্র কারবাররূপে পরিচালিত হয়, সেখানে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি ২০ টন পাতার মূল্য ১ শত ৩৫৲ টাকা পড়ে; কলওয়ালাগণ উহা হইতে ১ টন তন্তু নিষ্কাশন করেন। তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার খরচ মায় মূলধনের সুদ হিসাব করিয়া প্রতি টন তন্তুতে ৭৫৲ টাকা খরচ পড়ে। সুতরাং এক টন শিশাল শণ প্রস্তুতের মোট ব্যয় হয় ২ শত ১০৲ টাকা; ইহার মধ্যে বিলাতের বাজারে পাঠাইবার জাহাজ ভাড়া, বিক্রয়ের কমিশন ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। মধ্যম শ্রেণীর তন্তুর বিক্রয়ের হার টন প্রতি ৩ শত টাকা; ইহা গড়পড়তা হিসাব। সময় ও তন্তুর উৎকর্ষভেদে দর কমিয়া ২ শত ১০৲ অথবা বাড়িয়া ৪ শত ৫৲ টাকা টন হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত অপকৃষ্ট জাতীয় মুর্গা চাষ না করিলে এবং অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক প্রথায় তন্তু না প্রস্তুত করিলে সাধারণতঃ ২ শত ৪০৲ টাকা দরের কমে টন বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুতঃ মুর্গা চাষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, পাতা হইতে শতকরা ৫ ভাগ তন্তু পাওয়া যায়; তাহা না হইলেও অন্ততঃ ৪।৪½ ভাগ পাওয়া উচিত। তন্তুর অনুপাত শতকরা ৩ ভাগের কম হইলে মুর্গা চাষে কোন লাভ নাই। যে গাছ হইতে তেউড় লওয়া হইবে, তাহাতে তন্তুর পরিমাণ কিরূপ, তাহা প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া লওয়া ভাল। অন্যান্য ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত জমিতে মুর্গা চাষ যে লাভজনক, তাহা অনেক স্থলেই প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অথবা ভারতে সেইরূপ না হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ *

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

বাল্যকালে অনেকের মুখে বাঙ্গালার ভক্তকবি রামপ্রসাদের গান শুনিতাম—

কে জানে গো কালী কেমন
ষড়্দর্শনে যার না পায় দর্শন॥

গ্রামের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ ঐ গান শুনিয়াই অশ্রুপাত করিতেন, আমি অবাক্ হইয়া তাহা দেখিতাম। উহার কারণ কিছু বুঝিতাম না। "ষড়্দর্শনে"র অর্থও তখন বুঝিতাম না। তখন মনে হইত, বুঝি বৃদ্ধ না হইলে উহা বুঝা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধনার অভাবে উহা বুঝিতে পারিলাম না। তথাপি ষড়্দর্শনেও যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহারই ইচ্ছায় আজ আমিও এখানে আপনাদিগের নিকটে দর্শন বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ

জৈন দার্শনিক প্রাচীন হরিভদ্র-সূরি-বিরচিত "ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়" প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে ষড়্দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রকাশিত (১) সাংখ্যদর্শন, (২) বৈশেষিকদর্শন, (৩) ন্যায়দর্শন, (৪) পাতঞ্জলদর্শন, (৫) পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন এবং উত্তরমীমাংসা বা (৬) বেদান্তদর্শনই ষড়্দর্শন বলিয়া এতদ্দেশে পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এ বিষয়ে একটি প্রাচীন শ্লোকও কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

"কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ।
জৈমিনের্ব্যাসদেবস্য দর্শনানি ষড়েব হি॥"

বেদান্তসূত্রাবলম্বনে এবং পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণে ভারতে যে সমস্ত বৈষ্ণবদর্শনের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা ষষ্ঠদর্শন বেদান্তদর্শনেরই অন্তর্গত বলা যায়। কারণ, সমস্ত বৈষ্ণবদার্শনিক আচার্য্যই তাঁহাদিগের মতকে বেদান্তদর্শনের মত বলিয়াই সমর্থন পূর্ব্বক নিজ নিজ মতানুসারে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শেষে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের—(২।২।৪২।৪৩)—দ্বারাই পাঞ্চরাত্র-সম্মত "চতুর্ব্যূহবাদ"কে কোন অংশে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া খণ্ডন করিলেও রামানুজ প্রভৃতি সেই বেদান্তসূত্রের দ্বারাই উক্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রামানুজের পূর্ব্বে যামুনাচার্য্যও "আগমপ্রমাণ" গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের বৈদিকত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, ব্যাখ্যাভেদে মতভেদ হইলেও বৈষ্ণবদর্শনও যে বেদান্তদর্শনেরই প্রকারবিশেষ, ইহা স্বীকার্য্য। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের প্রাচীন শৈবদর্শনও আছে। আবার বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃ এত দিন পরে নানাদর্শনপরমাচার্য্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের সাধনা ও অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে ব্রহ্মসূত্রে শাক্ত দর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইরূপ ন্যায়াদিদর্শনেরও ব্যাখ্যাভেদে যে সকল মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও সম্প্রদায়ভেদে ঐ সমস্ত দর্শনের মত বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী ভাসকবির "প্রতিমা" নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহাও আমরা গৌতমের ন্যায়দর্শন বলিয়াই বুঝিয়াছি। কারণ, মেধাতিথি যে ন্যায়দর্শনকার অহল্যাপতি গৌতমেরই নামান্তর, ইহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে—(মোক্ষধর্ম্ম ২৬৫ অঃ ৪৫ শ)—বচনের দ্বারা বুঝা যায়; এবং অক্ষপাদও যে তাঁহারই নামান্তর, ইহাও স্কন্দপুরাণের—(মাহেশ্বর কুমারিকাখণ্ড ৫৫শ অঃ ৫ম)—বচনের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়দর্শনোক্ত উপমান-প্রমাণকে ত্যাগ করিয়া প্রমাণত্রয়বাদী ভূষণ প্রভৃতি যাঁহারা "ন্যায়ৈকদেশী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মত ন্যায়দর্শনের মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। শৈবাচার্য্য ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞ "গণকারিকা" গ্রন্থে যে মতের সূচনা করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত কোন দর্শনের মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে দর্শনের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত ষড়্দর্শনের কোন দর্শন বলিয়া বুঝা যায় না। "সুশ্রুত-সংহিতা"য় পুরুষের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিশিষ্টতা আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে কিরূপ দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক এখন অতি বিরল। তন্ত্রের "মহার্থমঞ্জরী" "চিদ্গগন-চন্দ্রিকা" "ত্রিপুরা-রহস্য" "যোগিনী-হৃদয়" "মালিনী-বিজয়" এবং অগস্ত্যকৃত "শক্তিসূত্র", ভোজরাজকৃত "তত্ত্ব-প্রকাশ" ও অভিনব গুপ্তপাদের "পরাত্রিংশিকা" এবং গৌড়পাদকৃত "শ্রীবিদ্যারত্ন-সূত্র" প্রভৃতি বহু গ্রন্থে তন্ত্রোক্ত দর্শনের অতি গভীর দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বামকেশ্বর-তন্ত্রে"র "সেতুবন্ধ" টীকাকার মহাদার্শনিক ভাস্কর রায় যে ভাবে

---

* বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

দার্শনিক বিচার ও নানাদর্শনের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুধীগণের অবশ্য পাঠ্য। মহামতি উড্রফের তন্ত্রব্যাখ্যা পাঠ করিলেও আপনারা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের কিছু পরিচয় পাইবেন। সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার অধিকার নাই।

পূর্ব্বকথিত "ষড়্দর্শনে"র উৎপত্তির কাল ও পৌর্ব্বাপর্য্য বিষয়ে অনেক দিন হইতে এ দেশেও শিক্ষিত সমাজে প্রতীচ্যভাবে অনেক আলোচনা হইতেছে। আপনাদিগের নিকটে সে সকল কথার আলোচনা বা পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ। তবে আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে ইহা অবশ্যই বলিব যে, বেদাদি সমস্ত বিদ্যাই সেই পরব্রহ্মের নিঃশ্বসিত, অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম হইতেই অনায়াসে সকল বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। ঋষিগণ তাহা লাভ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থ মুনিগণ যে নানা কর্ম্ম-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং পরে তাঁহারাই আবার সৃষ্টির আদিতে অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করেন এবং সেই সমস্ত মুনিগণ হইতে তখন বেদ, পুরাণ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রই প্রকাশিত হয়,—ইহা যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে মুনিগণ হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভে "সূত্র" ও "ভাষ্যে"রও প্রকাশ হয় বলিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। * পরন্তু দার্শনিক সূত্রকার মহর্ষিগণের যোগবলে সুদীর্ঘজীবিতবশতঃ পূর্ব্বে অনেক তীর্থে তাঁহাদিগের মহাসম্মেলন হইত। তখন তাঁহাদিগের পরস্পর "বাদ" বিচার হইত। তাই আমরা এক দর্শনে অপর দর্শনের মতের উল্লেখ ও সমালোচনা দেখিতে পাই। এক দর্শনে অপর দর্শনের সূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারা শিষ্যগণের অধিকার অনুসারে তাঁহাদিগের আশ্রয়ণীয় সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় নিষ্ঠাসম্পাদনের জন্য তাঁহাদিগের নিকট অপর সিদ্ধান্তের খণ্ডনও করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সুদীর্ঘজীবনে বিশ্বাস করিলে ঐতিহাসিক রাজ্যে অনেক গোল মিটিয়া যায়। এখনও কোন স্থানে অপ্রকটভাবে "ঋষিসঙ্ঘ" বিদ্যমান আছেন। আমরা পুনরায় ভারতের বক্ষে তাঁহাদিগের শুভপদার্পণের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমাদিগের তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস করিতে হইবে। প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী হইয়া তাঁহাদিগের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিলে আমাদিগেরও অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদিগের দর্শনচর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋষিগণই প্রথমে অজ্ঞানের সূচিভেদ্য অন্ধকার নিরাকরণের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র জ্ঞানের সমুজ্জ্বল দীপাবলী জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রথমে ভারতে মুক্তির বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছিলেন। মুক্তিই তাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্রের পরম প্রয়োজন। দার্শনিক রাজ্যের সুবিশাল প্রাঙ্গণে আমাদিগের সকলে মিলিয়া চিরকাল মল্লযুদ্ধ করিয়া তর্কশক্তির বৃদ্ধি অথবা জিগীষা সফল করিয়া আনন্দানুভব করা তাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ও প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ব্যতীত কখনও দার্শনিক তত্ত্ব বুঝা যায় না; জিগীষা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জিজ্ঞাসার অভিনয় করিলেও উহা বুঝা যায় না। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের ন্যায় অধিকারীকেও বলিয়াছিলেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্রের পরম প্রয়োজন যে মুক্তির কথা বলিলাম, তাহার স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও উহার অস্তিত্বে কাহারও কোনও বিবাদ হয় নাই। আমরা ঋগ্বেদসংহিতা—(৭ম মণ্ডল ৫ম অষ্টক চতুর্থ অঃ ৫৯ম সূক্ত ১২শ মন্ত্র) এবং যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় "ত্র্যম্বকং যজামহে"—ইত্যাদি মন্ত্রের শেষে "মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ"—এই বাক্যে "অমৃত" শব্দের দ্বারা মুক্তির সংবাদ পাই। সায়ণাচার্য্যও ঐ "অমৃত" শব্দের দ্বারা সাযুজ্য-মুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলেই জরা ও মৃত্যুর অত্যন্ত উচ্ছেদ হওয়ায় আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়। উহাই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত" শব্দের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা চরম প্রার্থ্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—"জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।" ১৪।২০।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সকাম অধিকারীদিগের জন্য প্রধানতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করায় তাহাতে তিনি মুক্তির কোন বিচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত কর্ম্ম যে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তিরই প্রযোজক হয়, ইহা তাঁহারও সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে। মীমাংসাচার্য্য আপোদেব তাঁহার "ন্যায়প্রকাশ" গ্রন্থের সর্ব্বশেষে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু বেদান্তদর্শনের শেষপাদে ব্রহ্মলোকগত মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণন করিতে এবং তৎপূর্ব্বে অন্যবিষয়েও মহর্ষি বাদরায়ণ জৈমিনির যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জৈমিনিও যে বাদরায়ণের ন্যায় উপনিষদের বাক্যানুসারেই মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মতবিশেষের ব্যাখ্যা করিতেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার মতেও স্বর্গ ভিন্ন পরমপুরুষার্থ মুক্তির অস্তিত্ব আছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবর স্বামী ও বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টও জৈমিনির মতের ব্যাখ্যা করিতে স্বর্গ ভিন্ন মুক্তি এবং উহার কারণের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তবে কুমারিলের মতে মুক্তির স্বরূপ কি, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা মহামীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে ঐ মতভেদের স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে মুক্তিতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় না। "ভাট্টচিন্তামণি"র তর্কপাদে গাগা ভট্টও উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে (প্রমেয় পঃ ২৬শ শ্লোকে) মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে নিত্য সুখের অভিব্যক্তিই কুমারিলের সম্মত মুক্তি। সে যাহাই হউক, মুক্তি হইলে যে চিরকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম মুক্তির যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া গোতমের মতে মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিও হয়, এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা নানা কারণে বুঝিয়াছি। বাৎস্যায়ন বিশেষ বিচার পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক পরে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থে আগম পরিচ্ছেদে বাৎস্যায়নের মতের বিশেষ বিচার পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য, তিনি তাঁহার সমর্থিত ঐ মতকে গোতমের মত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার "ন্যায়-পরিশুদ্ধি" গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মতেও যে মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, উহা সমর্থন করিতে শেষে উক্ত বিষয়ে ভূষণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভূষণ ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সারে"র অষ্টাদশ টীকার মধ্যে প্রধান টীকাকার। আমরা আজ পর্য্যন্ত এই ভূষণের টীকা দেখিতে পাই নাই। পরন্তু "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থের শেষে—(১৩ অঃ ৬৮।৬৯)—মাধবাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক তাঁহাকে গর্ব্বের

---

* যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চ কিঞ্চন বাঙ্ময়ম্।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—অধ্যাত্মপ্রকরণ। ১৮৯।

সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তাহা হইলে কণাদ-সম্মত মুক্তি হইতে গোতম-সম্মত মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল, নচেৎ সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর।" তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "কণাদের মতে আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত বিনাশপ্রযুক্ত আকাশের ন্যায় জড়ভাবে স্থিতিই মুক্তি, কিন্তু গোতমের মতে ঐ অবস্থায় আনন্দানুভূতি থাকে।" শঙ্করাচার্য্যকৃত "সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে"ও নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় ঐরূপ সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। আমাদিগের মনে হয়, শঙ্করাচার্য্যের নিকটে প্রশ্নকারী নৈয়ায়িক ভাসর্ব্বজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুসম্প্রদায়ের কোন নৈয়ায়িক হইতে পারেন। অথবা তিনি গোতমের সম্মত মুক্তিবিষয়ে বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন মতবিশেষই শঙ্করাচার্য্যের নিকটে শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ সকল মত-বিজ্ঞতার পরীক্ষা করিতেই উক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে কোন সম্প্রদায় যে গোতমসম্মত মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতিও সমর্থন করিতেন, ইহা আমরা নানা কারণে বুঝিয়াছি। মাধবাচার্য্য দার্শনিক সিদ্ধান্তে নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ একটা অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। এইরূপ মুক্তির স্বরূপবিষয়ে আরও নানা মতভেদ পাওয়া যায়। বেদান্ত-দর্শনের শেষপাদে মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মলোকগত মুক্ত পুরুষের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও নানা সুখসম্ভোগের বর্ণন করিয়া শেষে ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষোক্ত "ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সর্ব্বশেষ সূত্রে বলিয়াছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" অর্থাৎ সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষমাত্রের সম্বন্ধেই তিনি ঐ সূত্র বলেন নাই, এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই তাঁহার মতে চরম মুক্তি নহে। যাঁহারা উপাসনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার ফলে মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহকৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন, তাঁহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই বেদান্তদর্শনের সর্ব্বশেষ সূত্রে বলা হইয়াছে। নারায়ণ উপনিষদেও—"তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও পূর্ব্বে (৪।৩।১০।১১) দুই সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলেই মুক্তি হয় না। উহা প্রকৃত মুক্তি নহে। নির্ব্বাণমুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। উহা হইলে তখন সেই মুক্ত পুরুষের কিরূপ অবস্থা হয়, এই বিষয়েই নানা মতভেদ হইয়াছে, এবং নানা কারণে তাহা হইতে পারে।

কিন্তু ভক্তগণ নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত কোন প্রকার মুক্তিই দান করিলেও গ্রহণ করেন না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও (৩।২৯।১৩) কথিত হইয়াছে। শ্রীরামভক্ত শ্রীহনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, "যে মুক্তিতে আপনি প্রভু ও আমি দাস, এই ভাব বিলুপ্ত হয়, সেই মুক্তি আমি চাই না।" শাক্ত ভক্ত রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন :—

> "নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
> ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এই জন্য সাধ্যভক্তি প্রেমকেই পরমপুরুষার্থ বা চরমপ্রার্থ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেম কি, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না। মূক ব্যক্তি যেমন কোন রসের আস্বাদ করিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ প্রেমও ব্যক্ত করা যায় না। তাই প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঋষি ও সূত্র বলিয়াছেন "মূকাস্বাদনবৎ।" সুতরাং যাহা আস্বাদ করিয়াও ব্যক্ত করা যায় না, তাহার নামমাত্র শুনিয়া কিরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিব? পরন্তু যেখানে প্রেমাবতার শ্রীমান্ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যেখানে অমরকবি জয়দেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া "ললিতকোমলকান্তপদাবলী"র দ্বারা প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের পীযূষধারা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, এবং যেখানে প্রেমমূর্ত্তি চণ্ডিদাস প্রেমময় সঙ্গীতের দ্বারা প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই বীরভূমিতে আসিয়া ভক্তিহীন অতি দুর্ব্বল আমি প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব, ইহা ত ভাবিতেও পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে, যাঁহারা প্রেমই চাহেন, তাঁহারাও মুক্তিই চাহেন। কারণ, তাঁহাদিগের ঐ প্রেমলাভ হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ প্রেমই মুক্তি। তাই স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জ্জনার্দ্দন।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আবার শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুক্তি দ্বিবিধ ;—নির্ব্বাণ ও হরিভক্তি অর্থাৎ প্রেম। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণ প্রেমরূপ মুক্তিই চাহেন। অন্য সাধুগণ নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন। সেখানে নির্ব্বাণ-প্রার্থীদিগকেও সাধু বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সেই বচনদ্বয় "শব্দকল্পদ্রুমে" (মুক্তি শব্দে) উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

পূর্ব্বোক্ত ষড়্দর্শনের দ্বারা নানাবাদের প্রকাশ হইলেও তন্মধ্যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বুঝিলে অনেক বাদই বুঝা হয়। যে মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবভেদ আছে, সেই মতকেই আমি এখানে "দ্বৈতবাদ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিও দ্বৈতবাদ। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে যে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদই পরিগৃহীত হইয়াছে, এ বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কেহ কেহ অদ্বৈতমতে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আমরা কখনও মনে করিতে পারি না। কারণ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সূক্ষ্মশরীরের কোন উল্লেখ হয় নাই। পরন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে মনের গুণ নহে, উহা জীবাত্মারই বাস্তব বিশেষ গুণ, ইহা বিশেষ বিচার পূর্ব্বক স্পষ্টভাবেই সমর্থিত হইয়াছে। আরও অনেক কথার দ্বারা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং অসংখ্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং এই মতে অসংখ্য জীবাত্মার সহিত এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার বাস্তব অভেদ বা ভেদাভাব কোনরূপেই সম্ভব হয় না। পরন্তু বাস্তব ভেদই সিদ্ধ হয়। আবার শাস্ত্রে অনেক স্থানে যেমন জীবাত্মাকে বিভু অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে, তদ্রূপ অনেক স্থানে জীবাত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রপাঠে সরলভাবে বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বেদস্তুতির মধ্যেও এই মতভেদের সূচনা আছে। চরকসংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতায় এই মতভেদ ব্যক্ত আছে। অধিকারিবিশেষের অধ্যাত্মভাবনাবিশেষের জন্যও শাস্ত্রেই ঐরূপ সিদ্ধান্তভেদ হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। ভক্তিলিপ্সু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবাত্মার অণুত্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের মতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য জীবাত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী এক পরমাত্মার বাস্তবভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এইরূপ যে ভাবেই হউক, সুপ্রাচীনকাল হইতেই দ্বৈতবাদের প্রকাশ হইয়াছে। অধিকারিবিশেষের জন্য দ্বৈতবাদও শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত। মহর্ষি দক্ষ নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও (দক্ষসংহিতার শেষে) অধিকারিবিশেষের পক্ষে দ্বৈতবাদও যে একটি পক্ষ বা সিদ্ধান্ত, ইহা

ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি অনেক দ্বৈতবাদী আচার্য্যই দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বহু শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ অদ্বৈতবাদও শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত। স্মৃতি ও পুরাণেও অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। অধিকারিবিশেষের জন্য উক্ত উভয় বাদই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সুতরাং কোন দিন কেহই উহার কোন বাদকেই বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণব মহাদার্শনিক মাধবমুকুন্দ "পরপক্ষ-গিরিবজ্র" নির্ম্মাণ করিয়া অদ্বৈতবাদের সুকঠিন সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গে প্রাণপণে বহু বজ্রনিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতেও উহা ভস্মীভূত হয় নাই। আবার কাশ্মীর হইতে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি"র বলে দ্বৈতবাদের সুকোমল মণিমন্দিরে বহু "মুদ্গর প্রহার" করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও উহা বিচূর্ণ হয় নাই। অধিকারিবিশেষের জন্য দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সর্ব্বদেশে চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। এই বঙ্গদেশেও পূর্ব্বকালে দ্বৈতবাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদেরও বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার অদ্বৈতবাদী শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী, এই মতেরও এখন অনেক প্রমাণ শুনিতেছি। বঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুল্লূকভট্ট মীমাংসাদিশাস্ত্রের ন্যায় বেদান্ত-সমূহেরও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তিনি মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের তার্কিক-শিরোমণি রঘুনাথ শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা করিয়া অদ্বৈতবাদ-বিদ্যার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ব-বিবেকে"র টীকার শেষে তিনি উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গের বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার মলমাসতত্ত্বাদি গ্রন্থে শারীরকভাষ্যাদির সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং "আহ্নিকতত্ত্বে" তিনি অদ্বৈতমতানুসারেই গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্গের বরিশাল জিলার মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দাক্ষিণাত্যে কাবেরীতীরে "মায়রপুরম্" গ্রামের রমণী কামাক্ষী দেবীও ঐ অদ্বৈতসিদ্ধির কিয়দংশের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা এখনও পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী-কালেও বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজে অদ্বৈত সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতার ফলে সাধারণের মধ্যেও উহার প্রচার হইয়াছিল। তাই আমরা তৎকালীন অনেক বাঙ্গালা সাহিত্যেও কোন কোন স্থলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রকাশ দেখিতে পাই। এমন কি, ভক্তকবি যে রামপ্রসাদ নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন নাই, তাঁহার "বল দেখি ভাই কি হয় মলে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানের মধ্যেও আমরা অদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাই। তাই বলিয়াছি, পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশেও পণ্ডিত-সমাজে অদ্বৈতবাদেরও বিশেষরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল।

আর একটি বাদ আছে, তাহার নাম "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।" অনেক দিন হইতেই শুনিয়াছি এবং আধুনিক অনেক বাঙ্গালা পুস্তকেও এইরূপ কথা পড়িয়াছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"স্বমতে তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদাদেব",—তাহা জগতের উপাদানকারণ, ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য জগতের সম্বন্ধে,—জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে নহে, ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা আবশ্যক। শ্রীজীব গোস্বামী যে ঐ গ্রন্থে অনেক স্থানেই স্পষ্ট ভাষায় মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদই সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার "তত্ত্বসন্দর্ভের" টীকা ও "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে আরও স্পষ্ট করিয়া মধ্বাচার্য্যের মতানুসারেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা আবশ্যক। তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিরূপেই অভেদ বলিয়াছেন। উহা কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নহে। কোন প্রবাদ বা সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া দার্শনিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা উচিত নহে।

দর্শনশাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তা

অনেক দিন হইতেই "স্বাধীন চিন্তা" এই শব্দটি শুনিতেছি। কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু "স্বাধীন চিন্তা" বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি, তাহা কখনও মানবের মুক্তির কারণ হইতে পারে না। মানব অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তার অনন্ত পথে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে মুক্তির পথ ধরিতে পারে না, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। বৈশেষিক দর্শনোক্ত ষট্ পদার্থতত্ত্বজ্ঞান, অথবা ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শপদার্থতত্ত্বজ্ঞান যাহা মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাও কোন স্বাধীন চিন্তা বা কেবল তর্ক-বিচারের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাহাতেও যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মসংস্কার আবশ্যক, নির্ব্বিকল্পক সমাধি আবশ্যক, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে মহর্ষি গোতম নিজেও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতের দার্শনিক রাজ্যে স্বাধীনচিন্তারও কোন দিন অভাব হয় নাই, অনেক অংশে স্বাধীনচিন্তার ফলেই সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে বিবিধ বেদবাহ্য দর্শনেরও উদ্ভব হইয়াছে। মনু-সংহিতার শেষে "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ" (১২-৯৫) ইত্যাদি শ্লোকে "কুদৃষ্টি" শব্দের দ্বারা বেদবাহ্য নাস্তিক দর্শনশাস্ত্রই আমরা বুঝি এবং উহার দ্বারা সুপ্রাচীন কালেও যে দর্শনশাস্ত্র অর্থেও "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ হইত, ইহাও আমরা বুঝি। ন্যায়দর্শনের (৩।২।১)—ভাষ্যে বাৎস্যায়নও দর্শনশাস্ত্র অর্থে "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি "দর্শন" শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও লিখিয়াছেন, "ত্রয়ীদর্শনবিপরীতেষু শাক্যাদিদর্শনেষু" (কাশী সংস্করণ ১৭৭ পৃঃ)। এখানে মৈথিল টীকাকার উদয়নাচার্য্য এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর বাঙ্গালী টীকাকার শ্রীধরভট্ট উভয়েই "দর্শন" শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিশেষই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সুপ্রাচীনকাল হইতেই যে, বেদবাহ্য নানাবিধ "কুদৃষ্টি"রও সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা আমরা মনুসংহিতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝি। পরন্তু উপনিষদেও আমরা "নৈরাত্ম্যবাদ" "স্বভাববাদ" "কালবাদ" "নিয়তিবাদ" ও "যদৃচ্ছাবাদে"র সূচনা দেখিতে পাই। কঠোপনিষদে "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" (১।২০) এই কথার দ্বারা নৈরাত্ম্যবাদ সূচিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "কালস্বভাবো নিয়তিযদৃচ্ছা" (১।২) এবং "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ" (৬।১) এই বাক্যের দ্বারা কালবাদ ও স্বভাববাদ প্রভৃতি নাস্তিকমতের উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীনকালেও যে ঐ সমস্ত নাস্তিকমত স্বাধীন চিন্তার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সুশ্রুত-সংহিতায় "স্বভাবমীশ্বরং কালং" (শারীর ১।১১) ইত্যাদি শ্লোকেও স্বভাববাদ, ঈশ্বরবাদ, কালবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও পরিণামবাদের উল্লেখ দেখা যায়। টীকাকার ডল্হনাচার্য্য সেখানে ঐ স্বভাববাদ প্রভৃতিকে আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়া উদাহরণের দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্তই আয়ুর্ব্বেদের মত কিরূপে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। পরন্তু তিনি সেখানে "যদৃচ্ছাবাদের" যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও আমরা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমরা "আকস্মিকত্ববাদ"কেই "যদৃচ্ছাবাদ" বলিয়া বুঝিয়াছি। "স্বভাববাদে" স্বভাব বলিয়া একটা কিছু কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। "আকস্মিকত্ববাদে" কার্য্যের কোন কারণই স্বীকৃত হয় নাই। কোন মতে কার্য্যের উপাদান-কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্তকারণ নাই, ইহাও এক প্রকার আকস্মিকত্ববাদ। ন্যায়দর্শনের (৪।১।২২) ভাষ্যে বাৎস্যায়ন ঐরূপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (নবম সর্গে) আকস্মিকত্ববাদের ন্যায় ঈশ্বরবাদেরও বর্ণন আছে। ন্যায়দর্শনেও (৪।১।১৯) ঈশ্বরবাদের

উল্লেখ হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের (২৩১ অঃ ৫৩) টীকায় নীলকণ্ঠও পূর্ব্বোক্ত “কালবাদ” ও “স্বভাববাদ” প্রভৃতির এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থে ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বৈনয়িকবাদ, উচ্ছেদবাদ, হেতুবাদ, প্রতীত্যসমুৎপত্তিবাদ, অধীত্যসমুৎপত্তিবাদ, অমরাবিক্ষেপবাদ প্রভৃতি বহু বাদের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ “ব্রহ্মজাল সুত্তে” ৬২ প্রকার বাদের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে (৪।১।১০) এবং যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (১।১৫) পূর্ব্বোক্ত উচ্ছেদবাদ ও হেতুবাদের উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে ঐ সমস্ত বাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বকালীন অনেক মতের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। শুনিয়াছি, জার্ম্মান্ ভাষায় ডাক্তার অটোশ্রেডার বুদ্ধ ও মহাবীরের-সমসাময়িক দার্শনিক মতসমূহের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা কিরূপে জানিব? এইরূপ এই ভারতবর্ষে যে সুপ্রাচীনকাল হইতে কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস আমরা কিরূপে জানিব? শারীরক ভাষ্যের (২।২।৩৭) টীকায় শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্তী এবং কাপালিক, এই চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। আবার ঐ স্থলেই বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্যের টীকাকার গোস্বামী পুরুষোত্তম, “কালামুখ” নামে এক প্রকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ ও তাহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উঁহাদিগের সমস্ত ইতিহাস কিরূপে জানিব? বহুবিজ্ঞ স্বর্গত অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে”র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালায় ভারতের অনেক সম্প্রদায় স্থান পান নাই। ইহা কি আমাদিগের বড় দুঃখের কারণ নহে?

পূর্ব্বে যে স্বাধীন চিন্তার কথা বলিয়াছি, তাহা ভারতীয় বেদ-বিশ্বাসী দার্শনিকগণের মধ্যেও ছিল। যাঁহারা এই বেদের রাজ্যে বড় রাজভক্ত প্রজা ছিলেন, তাঁহারাও অনেক স্থলে স্বাধীন-চিন্তা দ্বারা বেদের নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াও বেদের সম্মানরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কুমারিলের “তন্ত্রবার্ত্তিক” দেখিলে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। “প্রজাপতি নিজ কন্যায় উপগমন করিয়াছিলেন,” “ইন্দ্র অহল্যাজার”—ইহাতে দোষ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্রবার্ত্তিকে কুমারিল বলিয়াছেন যে, ঐ “প্রজাপতি” শব্দের অর্থ সূর্য্য, উষঃকালে সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়, এ জন্য ঐ কালকে তাঁহার কন্যারূপে কল্পনা করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে এবং “ইন্দ্র” শব্দের অর্থও ঐ স্থলে সূর্য্য, “অহল্যা” শব্দের অর্থ রাত্রি, সূর্য্য রাত্রির জরণ অর্থাৎ ক্ষয়ের কারণ হওয়ায় ঐ বাক্যে সূর্য্যকেই বলা হইয়াছে “অহল্যাজার।” এইরূপ পরবর্ত্তী কালে নৈয়ায়িক পণ্ডিত-সমাজে আরও স্বাধীনচিন্তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতমের “সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা” (১।১।৩৩) এই সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য অসঙ্কোচে লিখিয়া গিয়াছেন। আবার রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মহর্ষি গৌতমের মতবিরুদ্ধ অনেক মতসমর্থন করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম “পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।” আমাদিগের দেশে বৃদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ উহার নাম বলিতেন—শিরোমণির পদার্থখণ্ডন। এই রঘুনাথ শিরোমণি অল্পবয়সেই মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইয়া স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মিথিলায় পূর্ব্বপ্রচলিত অনেক মতের খণ্ডন করিয়া তাঁহার গুরু পক্ষধর মিশ্রকেও নিরস্ত ও অনুরক্ত করিয়াছিলেন। যে সময়ে মিথিলায় ভক্ত কবি বিদ্যাপতি শ্রীভগবানের নিকটে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতেন—“মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে”—সেই সময়ে “প্রসন্নরাঘব” ও “অমৃতোদয়” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটকের প্রণেতা মহাকবি ও অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র (জয়দেব)—“তত্ত্বচিন্তামণির আলোক” নামে টীকা প্রণয়ন করিয়া শত শত বিদ্যার্থীকে নিজ গৃহে অন্নদান পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধরের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াও স্বাধীন চিন্তার দ্বারা তাঁহার মতখণ্ডন পূর্ব্বক নূতন গবেষণার দ্বারা অনেক নূতন মতের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি “তত্ত্বচিন্তামণি” গ্রন্থের “দীধিতি” নামে টীকা প্রণয়ন করিয়া নবদ্বীপে নবন্যায়ের প্রকাশ করেন। পরে মথুরানাথ, ভবানন্দ, জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্য ঐ দীধিতির টীকা করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রে এক নবযুগ আনয়ন করেন। সেই যুগে তাঁহাদিগের স্বাধীনচিন্তা ও প্রতিভার প্রভায় মিথিলার পক্ষধরের প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত আলোকও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তখন হইতেই বঙ্গদেশ ন্যায়শাস্ত্রে সমগ্র ভারতের গুরুস্থান হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য ও ধন্য হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ এই বঙ্গদেশে নানা স্থানে বহু মহানৈয়ায়িকের উদ্ভব ও ন্যায়শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ-রচনা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কোলব্রুক ‘সাহেবের’ বন্ধু শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের বহু টীকা করিয়া গিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহাভক্ত মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে “দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ,” “জগদীশন্যূনতাবাদ” ও “গদাধরন্যূনতাবাদ” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বাধীন চিন্তার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অনেক প্রবন্ধে ও পুস্তকে পড়িয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যদেবও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠা-রক্ষার জন্য উদারতাবশতঃ দয়া করিয়া তাঁহার নিজকৃত টীকা এক দিন রঘুনাথের সমক্ষেই গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। “অদ্বৈত-প্রকাশ” গ্রন্থে বৈষ্ণব ঈশান দাসও লিখিয়াছেন,—“সেইক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল। নিজকৃত টীকা গঙ্গামাঝে ডারি দিল॥” কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশে ঐ ঘটনায় রঘুনাথের নামের কোনই উল্লেখ নাই। তবে যদি কোন কড়চায় রঘুনাথের নাম করিয়াই ঐরূপ ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব, উহা গোবিন্দদাসের কড়চার ন্যায় অপ্রমাণ। কারণ, আমরা বুঝিয়াছি, পক্ষধর মিশ্র ও তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নবদ্বীপের নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে পুরীধামের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভিন্ন ব্যক্তি। বাহুল্য ভয়ে এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে আমি আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি প্রস্তাব জানাইতেছি যে, আমাদিগের মাতৃভাষায় ভারতীয় ও বিদেশীয় সমস্ত দার্শনিক মত ও সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া এক বৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হউক। ঐ গ্রন্থে “বিশ্বকোষের” ন্যায় অকারাদিক্রমে সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায় ও তাঁহাদিগের সমস্ত মতের নাম উল্লেখ করিয়া উহার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি লিখিতে হইবে, এবং একটি বৃহৎ সূচী এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ বৃহৎ গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবেশিত করিতে হইবে যে, উহার সাহায্যে—যাহার যেটুকু জানা প্রয়োজন, তিনি সহজে তাহা জানিয়া লইতে পারিবেন। যাঁহাদিগের নানা ভাষা জানিবার উপায় নাই এবং নানা গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ ও সামর্থ্য নাই, তাঁহারা ঐ গ্রন্থের সাহায্যে সকল মতই জানিতে পারিবেন। যাঁহারা সকল মতের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থের সাহায্যে তাহা করিতে পারিবেন। যাঁহারা নানা মত জানিয়া সংশয়গ্রস্ত হইবেন, তাঁহারা যদি ঐ সংশয়ের ফলে জিজ্ঞাসু হয়েন, তাহা হইলে কালে জ্ঞানলাভও করিতে পারেন। কারণ, জিজ্ঞাসা মানবের জ্ঞানলাভের মূল। যে মানবের জিজ্ঞাসা হয় না, তিনি জ্ঞানরাজ্যের বহুদূরে আছেন। জিজ্ঞাসা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সোপান। সুতরাং যে সংশয়ের ফলে মানবের জিজ্ঞাসা জন্মে, তাহা তত্ত্বনির্ণয়ের

পরম সহায়। প্রস্তাবিত গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য যেখানে যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের সাহায্য লইতে হইবে। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাকে সেই বিষয়ে লিখিবার ভার দিতে হইবে। আমি এই কার্য্যের জন্য অনেক সুযোগ্য দার্শনিক পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহারা উৎসাহ পাইলে সকলেই বিশেষ পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন। যদিও এই কার্য্য বহু ধনজনসাধ্য, তথাপি চেষ্টা করিলে এখনও উহা আমি অসম্ভব মনে করি না। আর যদি আমরা এইরূপ কার্য্যের জন্য একটা চেষ্টাও না করি, তাহা হইলে আমাদিগের মাতৃভাষার এই বার্ষিক পূজার বড় অঙ্গহানি হইবে। মাতৃভাষার চির সাধক অনেক সুশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী মহানুভব ব্যক্তির নিঃস্বার্থ সাধনার ফলে মাতৃভাষার দ্বারে যে মঙ্গলময় অক্ষয়বটের এবং পরে তাহার চারিটি মহাশাখারও উদ্ভব হইয়াছে, ঐ চারিটি মহাশাখা তুল্যভাবে সর্ব্বাংশে ফলবতী না হইলে আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে না।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

অভাগা

খোঁড়া পা তার খানায় পড়ে
আঁধারে চোক বালিতে,
ভবনে তার আগুন লাগে
সাঁজের প্রদীপ জ্বালিতে।
ঝলসি যায় ফুলের বাহার
মুকুল-ধরা গাছ ভাঙ্গে তার,
দিন দুপুরে সূর্য্য লুকায়
মেঘের কাল কালীতে।

মাথাতে তার বজ্র পড়ে
দংশে তারেই অহিতে,
জনম তাহার জমাট করা
দুঃখরাশি বহিতে।
তার পোড়া শোল নিত্য পলায়,
ফাঁস লাগে তার নিত্য গলায়,
ঠুন্‌কো কপাল খাম্‌কা ভাঙ্গে
আঙ্‌টী গেলে রোহিতে।

পাকা ধানে কে এসে তার
মই দিয়ে দেয় ত্বরিতে,
সপ্তমীতে ঠাকুর ভাঙ্গে
পায় না সময় গড়িতে।
দুর্ঘটনা তাহার মিতা,
জীবন ব্যাপি সাজায় চিতা,
জল বদলে আগুন মেলে
বরুণদেবে বরিতে।

অমা মঘায় যাত্রা তাহার—
রিক্তা প্রহর গণিছে,
পঞ্চমেতে মঙ্গল তার
রন্ধ্রগত শনি যে।
অশ্রু তাহার বুকের সাথী,
অনিদ্রাতে কাটায় রাতি,
তবু অভয়-মন্ত্র তাহার
কানের কাছে ধ্বনিছে।

অলক্ষ্যেতে মুক্তা হয়ে
উঠছে তাহার বেদনা,
গঙ্গারে হায় টানছে ধীরে
ভগীরথের সাধনা।
পুণ্য তাহার দুখের পাকে,
নূতন ক'রে গড়ছে তাকে,
কয়লা গ'লে হচ্ছে হীরা
নাইক তাহার চেতনা।

ভাগ্য যখন আঁধার হ'ল—
ভয় কি রে তোর খেয়ালী,
উঠবে জ্ব'লে হাজার প্রদীপ
মায়ের স্নেহের দেয়ালি।
কামনা তোর শিউলী হয়ে,
ফুটবে বুকের অর্ঘ্য লয়ে,
বুঝ্‌বি তখন মধুর কতই
চতুর বিধির হেঁয়ালি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সাহিত্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম

অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক শ্রেণীর লেখকের চিন্তার ধারা এমন খাতে প্রবাহিত হইতেছে, যাহা আমাদের দেশের সনাতন ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই সকল লেখকের আদর্শ যে বিজাতীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলেন, সামাজিক হিসাবে যে গ্রন্থ অতি নিন্দনীয়, রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তাহা পরম রমণীয় হইতে পারে। তাঁহারা সমাজধর্ম্ম বিষয়ে (সাহিত্যে) মতামতগঠনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। তাঁহাদের মতে চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টির ফলে কোনও 'নূতন সত্য' আবিষ্কার করিলে পরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাসের জোরে সে মতকে টিপিয়া মারিবার বা গালি দিয়া নিপীড়ন করিবার কাহারও অধিকার নাই। অর্থাৎ সাহিত্যে কোনও নূতন কথা বা প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম্মের নীতিবিরুদ্ধ কথা থাকিলেই তাহা অধর্ম্ম বলিয়া কেহ নিন্দা করিতে বা গালি দিতে পারিবে না। কথাটা তাঁহারা আরও খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন,—"যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকে, তবে কবিকে স্বচ্ছন্দতা দিতে হইবে—তার আটঘাট বাঁধিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার হুকুম দিবার অধিকার স্বয়ং ধর্ম্মেরও নাই। শাসন দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় না, ধর্ম্মের সার্থকতা স্বচ্ছন্দতায়। সমাজ ধার্ম্মিক বলিয়াই ধর্ম্ম টিকিয়া আছে—শাসন আছে বলিয়া টিকিয়া নাই।"

ইহার সরল ব্যাখ্যা করিলে এই কয়টি সার সত্য পাওয়া যায়,—

(১) সমাজের অনিষ্টকর হইলেও রসসৃষ্টির খাতিরে সাহিত্যে আবর্জ্জনা আনয়ন করিতে হইবে।

(২) সাহিত্যের উপর ধর্ম্মের প্রভাবের প্রয়োজন নাই, সমাজধর্ম্ম বিষয়ে মতামত গঠনে লেখককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চাই।

(৩) পরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিচরণক্ষেত্র যেখানেই থাকুক, তাহাকে 'নূতন সত্য' আবিষ্কারক লেখকের মতের ক্ষেত্রে চরিতে দেওয়া উচিত নহে।

(৪) নূতন কথা বা প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম্মের নীতিবিরুদ্ধ কথার আটঘাট বাঁধিয়া দিবার অধিকার স্বয়ং ধর্ম্মেরও নাই।

(৫) সমাজে ধর্ম্মের শাসন আছে বলিয়া ধর্ম্ম টিকিয়া নাই, সমাজ ধার্ম্মিক বলিয়াই ধর্ম্ম টিকিয়া আছে।

অর্থাৎ সহজ ও সরল কথায় বন্ধন জিনিষটাকে যেখানেই পাওয়া যায়, গলা টিপিয়া মারিয়া অবাধ স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিলেই সাহিত্যের রস ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিবে, অন্যথা সাহিত্যের দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হইবে না! এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে কথাটা কাহারও কাহারও মুখরোচক হইতে পারে বটে, কিন্তু এখনও যে সকল 'সেকেলে' সাহিত্যিক সাহিত্যেও বন্ধনের সমর্থন করেন, তাঁহাদের পক্ষে দেশের পক্ষে এই অভিমত পরম অনিষ্টকর বলিয়া অনুমিত হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিবেন, 'নূতন সত্য যখন জাহাজে করিয়া এ দেশে আমদানী হয় নাই, তখনও বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এ দেশে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, গিরিশ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে যে রসসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কত যুগযুগান্তরে যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহাও তাঁহাদের ধারণায় আইসে না।'

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, 'নূতন সত্যটা' কি? এই অপরূপ পদার্থের স্বরূপব্যাখ্যা কেহ করিতে পারেন কি? সত্য কখনও নূতন বা পুরাতন হয় না, সত্য চিরদিনই সনাতন। সুতরাং 'নূতন সত্য' আবিষ্কার করার অর্থ কি? নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সত্যের অস্তিত্ব সৃষ্টির আদিকাল হইতেই আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হয় না। এ দেশে যাহা সনাতন সত্য বলিয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে গৃহীত হইয়াছে, সে সত্যের প্রভাব চিরদিনই থাকিবে, ভাড়া-করা জাহাজের আমদানী 'নূতন সত্যের' প্রভাব তাহাকে দুই চারি দিন মোহিত করিতে পারে, কিন্তু কখনও অভিভূত করিতে পারিবে না।

'নূতন সত্য' আবিষ্কারকের দল সাহিত্যে রসসৃষ্টির খাতিরে কোনও বাধা মানিতে চাহেন না, সমাজ ও ধর্ম্মের নীতিবিরুদ্ধ কথার আটঘাট বাঁধিয়া দেওয়া হয়, ইহাও সহ্য করিতে চাহেন না,—এমন কি, স্বয়ং ধর্ম্মকেও সে অধিকার দিতে সম্মত নহেন। কেন, এত অধৈর্য্য কেন?

এই শ্রেণীর লেখক কি স্বীকার করিতে চাহেন না যে, আমাদের দেশ চিরদিন ত্যাগের আদর্শকেই বড় বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে, ভোগের আদর্শকে নহে? ত্যাগে যে সংযমের প্রয়োজন, অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে বাধার প্রয়োজন, তাহা কি উঠাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দ ও অবাধগতি অসংযমের ও স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডব-লীলার প্রশ্রয় দিতে হইবে? সাহিত্য ধর্ম্ম নহে, এ কথা স্বীকার করিলেও কি অস্বীকার করা যায়, দেশের ভবিষ্য বংশধরগণের উপর সাহিত্যের কোনও প্রভাব নাই? সাহিত্য কি লোকচরিত্রগঠনে সহায়তা করে না? যদি করে, তবে তাহার আদর্শ ও লক্ষ্য কি হওয়া প্রয়োজন? স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার বুঝিতে হইবে, এমন কি 'ধনুকভাঙ্গা' পণ আছে?

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারের প্রয়াসীর দল বলিয়াছেন, "এমন কোনও আচার অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস নাই যার সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাহা সকল দেশে সকল যুগে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, যে আচারকে আমরা ঘৃণিত, কদাচার ও নিদারুণ অধর্ম্ম বলিয়া দমন করিতে চাই, সেই আচার অন্য দেশে বা অন্য সামাজিক আবেষ্টনে প্রশংসিত। নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস সুসভ্য জাপান বা ইংলণ্ড কিংবা নায়র জাতির বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—আরব বেদুইনদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তিব্বতে তার ধারণা আমাদের চক্ষে (?) অদ্ভুত ঠেকিবে।" তাহাতে কি আইসে যায়? অন্য দেশে বিজাতি বিধর্ম্মীর সতীত্বের আদর্শ কি অথবা তাহাদের আচার অনুষ্ঠান ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, তাহা দেখিবার আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা ত সেগুলিকে আমাদের আদর্শ করিতে চাহিতেছি না। আমাদের দেশের সনাতন ভাবধারার মধ্য দিয়া আমাদের জাতির সাহিত্যের রসসৃষ্টি ফুটিয়া উঠুক, আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণের চরিত্র গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা। পরের মন্দ দিক্‌টা অনুকরণ করিয়া কোনও জাতি কখনও বড় হইতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আছে কি? এইরূপ শ্রেণীর লেখকের মতে "ভিন্ন ভিন্ন যুগে ধর্ম্মের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের এই ভারতভূমিতেই দেখা যায়, নারীর সতীত্বের মত একটা মৌলিক ধর্ম্ম লইয়াও ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে।"

জাতির প্রথমাবস্থায় অথবা প্রথম গঠনের যুগে তাহার ধর্ম্মে ও আচার অনুষ্ঠানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার যে সনাতন আদর্শ থাকে, তাহা কখনও লোপ পায় না। তাহাকেই Sheet-anchor করিয়া ধরিয়া থাকিয়াই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তবে প্রাচীন যুগের আচার-ব্যবহার আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবারই বা প্রয়োজন কি?

সত্যযুগেও এই ভারতেই দক্ষযজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। উহাই যুগে যুগে ভারতে হিন্দুর সতীত্বের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সে আদর্শ হইতে আমরা বিচ্যুত হইব কেন? অন্য দেশের সাহিত্যে সতীত্বের অন্যরূপ আদর্শ আছে বলিয়া আমরা সেই বিকৃত আদর্শ গ্রহণ করিতে যাইব কেন? এই শ্রেণীর লেখক বলেন, "বাল্মীকি হইতে সেক্সপীয়র পর্য্যন্ত অনেক বড় কবির রচনাই আদ্যোপান্ত পিতাপুত্র একসঙ্গে পড়িতে পারে না, তাই বলিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য যে কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, সে কথা বলিতে যে কুণ্ঠিত হয় সে কাপুরুষ।" এ কথা সকলেই জানে, জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনায় আদিরসের বিকাশ চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ সেক্সপীয়রের 'Rape of Lucrece', 'Venus and Adonis', বাইরণের 'Don Juan,' বোকাসিওর 'ডেকামেরণ', কালিদাসের কুমারের 'রতিবিলাপ', 'মেঘদূত', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'," ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আদিরসের এইরূপ বিকাশ থাকিলেও এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে আদর্শ মহান্। আদিরস সাহিত্যামোদীর উপভোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই আদিরসের খাতিরে শ্রেষ্ঠ কবিরা কোথাও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। বাল্মীকির কাব্যে আদিরসের অভাব না থাকিলেও তাহার আদর্শ সীতার সতীত্ব, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি। সেক্সপীয়রের কাব্যেও আদিরস আছে, কিন্তু তাহার আদর্শ ডেসডিমোনার অগাধ অপরিমেয় অনন্ত স্বামি-প্রেম, কেণ্টের প্রভুভক্তি, ওথেলোর সরল বিশ্বাস। কালিদাসের অতুলনীয় রস-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আছে উমার ও রতির পতিপ্রেমের আদর্শ, শকুন্তলার প্রেমোন্মাদনা ও ত্যাগের আদর্শ, রঘুবংশের প্রজাবাৎসল্যের আদর্শ।

রসসৃষ্টি করিতে হইবে বলিয়াই যে উহাকে উচ্চ আদর্শের উপরেও স্থান দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভিক্টোরিয়া ক্রশের চেটাইওয়ালা পাঠানের সুঠাম সুগঠিত দেহ দেখিয়া ইংরাজ-সেনানীর দুহিতা উদ্দাম লালসায় একেবারে অসংযতবসনা: তাহার মন চাহিতেছে তাহারই মত শিক্ষিত মানসিক শক্তিতে সমতুল ইংরাজ সিভিলিয়ান যুবককে, কিন্তু দেহ চাহিতেছে সুন্দর সরল বলিষ্ঠ পাঠান যুবকের সঙ্গ; দেহের বুভুক্ষা মনের বুভুক্ষার উপরে স্থান লাভ করিল; নায়িকা পাঠান যুবককে দেহ দান করিল। ইহা স্বাভাবিক, ইহা জগতে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যাহা 'Truth,' তাহা চিত্রিত করিলে প্রকৃত artএর সম্মান রক্ষা করা হইল। শুনিয়াছি, এই আদর্শে এ দেশেও এক বাঙ্গালী শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতীর এক সাঁওতাল যুবকের দেহ-কামনার চিত্রও বাঙ্গালা সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা বিদেশী বিজাতির আদর্শ হইলেও আমাদের আদর্শ নহে, আমাদের আদর্শ এ যুগে ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, দলনী, প্রফুল্ল। যাহাদের চরিত্র-চিত্র মনে পড়িলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে ভরিয়া উঠে, মন একটা পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়,—উহাই আমাদের আদর্শ।

মার্কিণের রবার্ট ডব্লিউ চেম্বার্স এক জন খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ্ উপন্যাসকার। তাঁহার Common Law বলিয়া একখানি উপন্যাসে তিনি তাঁহার নায়িকা Valerie Westএর যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, অন্ততঃ এ দেশের আধুনিক তথাকথিত মনস্তত্ত্ববিদ উপন্যাসকারগণের রচনার মধ্যে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না, তবে তাহার ছায়াপাত আছে বটে। নায়িকা Valerie West তাহার প্রেমের পাত্রকে হৃদয়-মন--সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে, কিন্তু প্রেমের পাত্র (নায়ক) বিবাহবন্ধনের মধ্যে যাইতে সম্মত নহে। তাহাকে অদেয় ভ্যালেরির কিছুই নাই। নায়ক যখন ভ্যালেরির দেহ উপভোগের জন্য অতিমাত্র লালায়িত, তখনও ভ্যালেরি বিবাহ ব্যতিরেকেও তাহাকে দেহদানে সম্মত,—এতই গভীর অপরিমেয় তাহার প্রেমোন্মাদ, কিন্তু উপন্যাসকার তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলে সে পাপের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। ভ্যালেরি বা তাহার প্রেমিক কতবার বলিয়াছে যে, বিবাহের বন্ধন মানুষের গড়া একটা বাধা মাত্র, উহাতে মানুষের মনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, উহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উপন্যাসকার শেষে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের যে একটা Common Law আছে, সে আইনের বন্ধন না মানিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না, পশুর সমাজ ও মানুষের সমাজে কোনও প্রভেদ থাকে না। সংসার-বন্ধন—পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামি-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধ লোপ পায়, পৃথিবী তাহা হইলে মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে।

মার্কিণের বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ উপন্যাসকার যেথা পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই, আমাদের দেশের 'নূতন সত্য' আবিষ্কারকরা কি তথায় ধাবমান হইতে ইচ্ছা করেন? যেমন অন্ধকার না থাকিলে আলোকের সার্থকতা থাকে না, তেমন বন্ধন বা বাধ্যতা না থাকিলে স্বাধীনতার সার্থকতা থাকে না। বন্ধন বা বাধ্যতা না থাকিলে সমাজ অচল হয়। সমাজ না থাকিলে সকল বিষয়ে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অথচ মজা এই যে, এই বন্ধন বা বাধ্যতা ভক্তি বা প্রেমের উৎস হইতে সৃষ্ট। ভয় বা লোভ প্রদর্শনে ভক্তি আদায় করা যায় না; উহাতে দাসত্বের সৃষ্টি হয় মাত্র। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসা যে বন্ধনের বা বাধ্যতার মূল, তাহা অবিনশ্বর, তাহার বিনাশ নাই,—সে বন্ধন অচ্ছেদ্য। উহাতে আত্মত্যাগের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বিখ্যাত ইংরাজ নারী ঔপন্যাসিক এথেল, এম, ডেলের একটি ছোট গল্পের নায়িকা-চরিত্রে দেখা যায়, নায়িকা বালিকা, বাপের সোহাগে সোহাগিনী, গরবিণী, স্বেচ্ছাপরায়ণা; সাংসারিক কারণে সেই বালিকাকে এক অধিক বয়স্ক পাত্রের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে; পিতার অর্থকষ্ট ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে বালিকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বিবাহে সম্মত হইয়াছে; কিন্তু স্বামীকে সে আদৌ ভালবাসে না, পছন্দ করে না, তাঁহার দক্ষিণ-আফ্রিকার ঘর করিতে যাইতে চাহে না, কিন্তু তাহার পর নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দৃঢ়চিত্ত স্বামী তাহাকে কখনও কঠোর ব্যবহারে, কখনও বা সদয় ব্যবহারে আপন মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তিনি এক বিষয়ে কখনও কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যপালনে তিনি এক দিনও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, বরং কঠোরতার মধ্যে তাঁহার পত্নীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে ফল্গুস্রোতের ন্যায় প্রচ্ছন্ন গতিতে প্রবাহিত হইত, শেষে দুরন্ত বাঘও বশ হইয়াছিল, লেখিকা শেষে এমন অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন যে, এই স্বেচ্ছাপরায়ণা দুরন্ত বালিকা স্বামীকে অম্লানবদনে বলিতেছে,—"কৈ, তুমি ত আমায় ভালবাস না; আমি তোমার প্রভুত্ব দেখিতে চাই: তুমি আমায় বেত্রদণ্ডে শাসন করিলে আমি সুখী হই: তুমি পুরুষমানুষ,—এই পরিচয় দাও, আমি তাহা হইলে আজীবন তোমার বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় লইব।"

এই বন্ধন কিসের বন্ধন? ইহা কি ভক্তিশ্রদ্ধা-ভালবাসার বন্ধন নহে? এ বন্ধনের হাত এড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতার শাসনে গেলেই কি সাহিত্যের রস-সৃষ্টি হয়? অন্যথা হয় না?

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ ঔপন্যাসিক হার্ডি ও ওয়েলসের ন্যায় গ্র্যাণ্ট অ্যালেনেরও খ্যাতি আছে। তিনি তাঁহার The British Barbarians নামক উপন্যাসে ভবিষ্যতের স্বামি-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধনের চিত্র এইরূপে ফুটাইয়াছেন,—

ফ্রাইডা নায়িকা; তাহার স্বামী মনটিথ, সে নগণ্য ভূমিকার চরিত্র মাত্র। প্রকৃত নায়ক বার্ট্রাম, ফ্রাইডার প্রণয়ের পাত্র। নায়ক-নায়িকার কথোপকথন হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

ব্রাট্র্াম। তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কখন বলিতে পার না, তুমি মনটিথকে ভালবাস।

ফ্রাইডা। না, বিবাহের পর প্রথম কয় মাস ছাড়া তাহাকে ভালবাসি নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সে আমার স্বামী, আমায় অবশ্যই তাহার বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

বার্ট্রাম। না, তোমায় এমন কায করিতে হইবে না। তুমি তাহাকে আদৌ ভালবাস না, অতএব তোমার ভালবাসার ভাণ করাও উচিত নহে, ইহা অন্যায়, ইহা পাপ।

বার্ট্রাম আর এক স্থানে ফ্রাইডাকে বলিতেছে, "ইংলণ্ডে অনেকে বিনা যুক্তি-তর্কে মনে করে যে, যদি নরনারী নিজেদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নিজেরা বাছিয়া ঠিক করিয়া লইত—সমাজের বা সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা না রাখিত, তাহা হইলে সামাজিক জীবন ও শৃঙ্খলা একবারে রসাতলে যাইত, পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড নরকে পরিণত হইত এবং সমাজটা একবারে ধ্বংস হইয়া যাইত। এই মনগড়া অসম্ভব অশুভ-ফল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানা কঠোর বন্ধন দিয়া নর-নারীর পরস্পরের জীবনকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে এবং নরনারী এই বন্ধন অতিক্রম করিলেই অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। বন্ধনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও অপকৃষ্ট হইতেছে বিবাহের বন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত নরনারীঘটিত অন্যান্য বন্ধন।"

অন্য কয়েক স্থানে বার্ট্রাম বলিতেছে,—"বিবাহবন্ধন নৈতিক বলে উন্নত পবিত্র সমাজের উপযোগী নহে। প্রকৃতি আমাদের অন্তরে প্রেমের এমন ঐশী প্রেরণা দিয়াছেন, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, কাহার সহিত আমরা স্বেচ্ছায় মিলিত হইতে পারি। আমার মতে প্রত্যেক নরনারী নিজ দেহ সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইহাই মূল ভিত্তি।"

গ্র্যাণ্ট অ্যালেন তাঁহার দেশের আধুনিক নরনারীর 'দ্রুতোন্নতি' লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের নরনারীর যে চরিত্রচিত্র কল্পনা করিয়াছেন, আমাদের 'নূতন সত্য' আবিষ্কারকরা কি সেই চিত্র আদর্শরূপে ধরিয়া সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রত্যেক নরনারীর নিজ দেহ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারকে স্বাধীনতার মূল ভিত্তি করিতে চাহেন ?

'নূতন সত্যের' আবিষ্কারক দলের কোন কোন লেখক দম্ভভরে বলিয়াছেন, "যাঁরা আধুনিক সাহিত্যে অধর্ম্ম ও দুর্নীতির উপর সব চেয়ে বেশী খড়্গহস্ত, তাঁহাদের দৈনিক জীবনে তাঁদের প্রশংসিত সেই ধর্ম্ম বা নীতি তাঁরা দুই পায়ে দলিত করিতেছেন।"

এত বড় একটা 'নূতন সত্য' তাঁহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ দুঃখের কথা, এই sweeping generalisationএর কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ তাঁহারা দেন নাই ; অথচ স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। হাতের কলম আর দোয়াতের কালির জোরে তাঁহারা মামলা ডিক্রী-ডিসমিস করিয়া ফেলিলেন, আর বেচারা accusedরা তাহাদের বিপক্ষে অপরাধের একটা সাক্ষ্য-প্রমাণও পাইল না! ইহা কি প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সরকারের ৩ রেগুলেশানের মত বিচার নহে ? যাঁহারা অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন (যথা,—"অন্য কেহ যদি ভিন্নরূপ বিশ্বাস করে, তবে সে যে অধর্ম্ম করিতেছে, সে কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না") তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীদের মতের বিপক্ষে এত অসহিষ্ণু ও এত অধীর হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে একসঙ্গে বিনাবিচারে তাঁহাদের ক্রোধের ঠাণ্ডাগারদে কারাদণ্ড ভোগ করিতে পাঠাইলেন—তাহাদের দৈনিক জীবনের গুহ্যতম ঘটনাগুলিও অত্যদ্ভুত মনস্তত্ত্বের জোরে জানিয়া লইয়া সে সম্বন্ধে ডিক্রীজারি করিলেন। ইহাই কি এই শ্রেণীর 'সত্য' আবিষ্কারকদের নিরপেক্ষ সমালোচনার নমুনা ?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

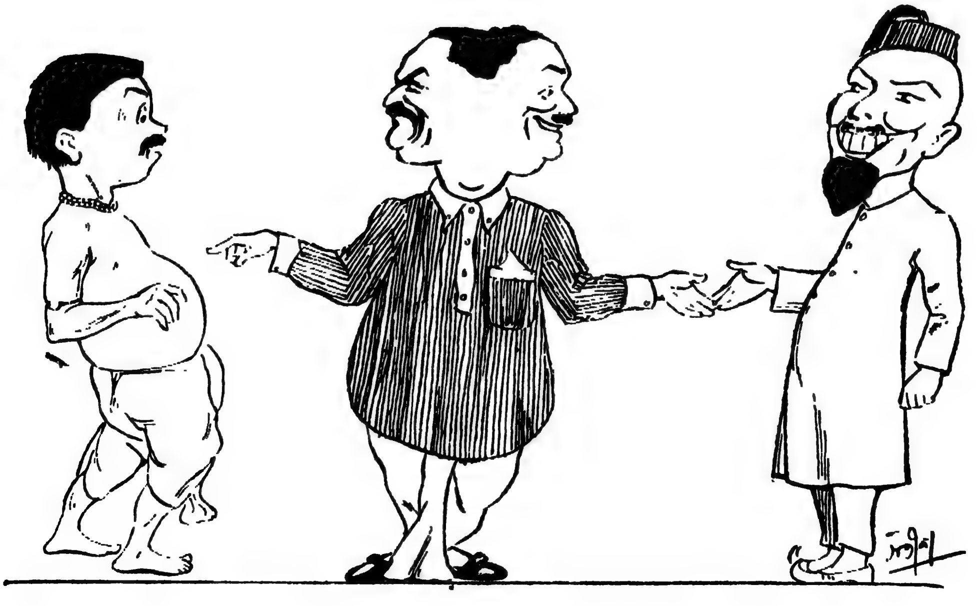

আ মোলো ! আপদ এল—দূর, দূর ! সরি।
কণ্ঠী টিকি থাকলই বা—ছুঁলেই নেয়ে মরি ॥

আইয়ে মিঞা, দোস্ত মেরা, সালাম আলেকাম
ইরাণ তুরাণ বেহেস্ত মেরা, ম্যায় তেরা গোলাম

ত্রিবেণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ষার মেঘব্যাপ্ত নিবিড় নিশীথ। মেঘের প্রাকারে আকাশের সমুদায় আলো পৃথিবীর দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। চারিদিক্ গভীর নিস্তব্ধ, সুপ্তিসমাচ্ছন্ন, কেবল নির্ব্বাত নিষ্কম্প বৃক্ষশাখা সকলের মধ্য হইতে অতি তীক্ষ্ণ ও প্রবল স্বরে ঝিঁঝিঁর অশ্রান্ত রব শুনা যাইতেছিল, আর বর্ষাজলধারাপুষ্ট ভেককলরবও সেই নিদ্রাচ্ছন্ন রাজধানীর অনাবিল স্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন ও বিভেদ করিয়া দিতেছিল। ইহা ব্যতীত মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে আরও একটি শব্দ কাণে আইসে, তাহা রাজকীয় সুদৃঢ় দুর্গ-পাদদেশে সুপ্রশস্তশরীরা পূর্ণাবয়বা নদী করতোয়ার অস্ফুট বিলাপ-কল্লোল। গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ-অন্তঃপুরে নদীতীরস্থ একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে গন্ধতৈলে তখনও দীপ জ্বলিতেছে। একটি তরুণবয়স্ক যুবক সন্তর্পণে সেই কক্ষদ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিল ও কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই যেখানে সুসজ্জ পালঙ্কে কোমল শয্যাতলে অঙ্গ ঢালিয়া একটি সুন্দরী কিশোরী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহারই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সে মুগ্ধ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সুপ্তি-সুন্দর মুখখানি চোখ ভরিয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নত হইয়া তাহার ঈষদ্ভিন্ন আরক্ত অধর স্পর্শ করিতেই নিদ্রানিমগ্না সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল ও ত্রস্তে কহিল, "না—যাও!"

যুবক ততক্ষণে এক লম্ফে পালঙ্কে উঠিয়া পড়িয়াছে, লজ্জিতা সুন্দরীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া সে তাহার আরক্ত গণ্ডে দুই অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক কহিল—"হ্যাঁ, যাবে বই কি! ঠাকুরাণীর ত বেশ একটি নিদ্রা দিয়ে নেওয়া হলো। আর আমি বেচারী ব'সে সারাদিন আর এই অর্দ্ধেক রাত্রি ধ'রে হাঁ ক'রে পথটি চেয়ে আছি। তা বাড়ীর লোকের চোখে ছাই ঘুমও কি আসে না যে, রাত দুপুরের আগে একটি দিনও চ'লে আসবো? আমি কিন্তু আর এমন ক'রে পারবো না, তা ব'লে দিচ্ছি, রাণি!"

কিশোরী সস্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, "কি করবে শুনি?"

"সে তখন দেখতেই পাবে। মেজ রাজার মত আমিও কাল থেকে দেখো তুমি, ঠিক সকাল সকাল চ'লে আসবো। আর—"

ভীষণ লজ্জার প্রবল উচ্ছ্বাসে আরক্তমুখী তরুণী সবেগে বলিয়া উঠিল—"না, না, যাও, তা হ'লে আমি লজ্জায় ম'রে যাব।"

কিন্তু স্ত্রীর এই প্রবল প্রতিবাদে স্বামীর দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুমাত্র শিথিল হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। সে লজ্জা-রঞ্জিত মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সকৌতুক হাস্যের সহিত জবাব দিল—"ইস্ ম'রে অমনি গেলেই হলো কি না! কেন, মেজ রাণী কি রোজ রোজ মরেই যাচ্ছে না কি যে, তুমি যাবে? সে আমি শুন্‌ছি নে, দেড় প্রহর রাত হলেই ব্যস্—সশরীরে সাম্‌নে এসে উপস্থিত।"

সন্ধ্যারাণী স্বামীর এই দুর্দ্ধর্ষ সাহসের কথায় এবার শুধু লজ্জিতাই নয়, ঈষৎ ভীতাও হইল। সে স্বামীর আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টায় ঈষৎ বল প্রকাশ করিল ও অভিমান দেখাইয়া বলিল, "তা হ'লে আমিও তোমায় মজা দেখাব; ঠাকুরঝির ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবো, এ ঘরে আর আসবোই না।"

নিজের শালযষ্টিবৎ কঠিন বাহু দিয়া সেই ক্ষুদ্র অসহায় দেহলতাকে ধরিয়া রাখিয়া হাসিমুখে যুবক কহিল, "তা হ'লে কি হবে জানো?"

ঠোঁট ফুলাইয়া সন্ধ্যা বলিল—"যাও, আমি জান্‌তে চাইনে।"

সেই ফুলানো ঠোঁটে চুম্বন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে

পরিপূর্ণচিত্ত তাহার স্বামীটি তাহার এই শ্রবণ-অনাসক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল,"আরে, একটু শুনেই রাখ্ না, না হ'লে তখন একেবারেই চম্‌কে যাবি। শোন্ না বলি—আমি তা হ'লে—আমি তা হ'লে পা টিপে টিপে না গিয়ে আর এম্‌নি ক'রে আমার সন্ধ্যারাণীকে কোলে তুলে না নিয়ে দে ছুট।"

এই বলিয়া হঠাৎ বিছানার উপর 'তড়াং' করিয়া উঠিয়া বসিয়া যুবক তাহার মহাভুজদ্বয়ে অবলীলাক্রমে ঐ কিশোরী তন্বীর দেহটুকু উঠাইয়া লইয়া নিজ বাক্যের সম্ভবতা দেখাইয়া দিল।

আকাশের মেঘ আর আকাশের কোন প্রান্তে যায়গা খুঁজিয়া না পাইয়াই বুঝি শেষকালে ধরণীবক্ষে ধারাকারে নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অচেনা পথে পথ দেখাইতে বুঝি বিজলীবালারা সহস্র সহস্র দীপশিখা জ্বালাইয়া গগনপথের ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। রুদ্ধবায়ু এতক্ষণের পর নবীন অতিথিবর্গের সহিত স্বাগত-সম্ভাষণে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, হা হা হা হা হা।—ভোর হইয়া আসিয়াছিল, নদীপরপারে আকাশের কিনারায় ঘন কালো মেঘের নীচে গোলাপের পাপড়ির মত গোলাপী রেখা দেখা দিয়াছে; সুপ্ত পুরীর প্রাসাদ-শিখরে বসিয়া দুই একটা ভিজা কাক ডানা ঝাড়া দিতে দিতে প্রভাতী গাহিতেছিল। নহবতে তখনও ভৈরবের আলাপ আরম্ভ হয় নাই।

আধভাঙ্গা ঘুমঘোরে পাশ ফিরিতেই স্বামীর ঘুমন্ত মুখের গম্ভীর সৌন্দর্য্য সন্ধ্যারাণীর অর্দ্ধজাগ্রত চিত্তে সহসা যেন একটা কিসের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সে আর তাহার মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। চিত্রার্পিতবৎ বহুবার দৃষ্ট সেই প্রিয় মুখখানি সে তাহার দেখার সুখে সম্পূর্ণ অতৃপ্ত দুই বুভুক্ষিত চোখের দৃষ্টি মেলিয়া পান করিতে লাগিল। দুই জনায় চোখে চোখে চাহিয়া এমন করিয়া ত কোন দিনই দেখা ঘটে না। তাহার মনে হইল, কেন সে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া, চুরি করিয়া, এই মুখ এত দিন এমন করিয়া দেখে নাই? গত রজনীগুলাকে তাহার একান্ত ব্যর্থ ও অভিশপ্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর সে দুঃসাহসিকা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াও এই কথাটা মনে মনে বলিল, 'উনি যা বল্লেন, যদিও আমি তাতে ভারী মুস্কিলে পড়বো, সবাই নিন্দে করবে, ঠাট্টা করবে, তবুও তা যদি করেন, সে কিন্তু এক রকম বেশ হয়। ঐ ত মেজ রাণীদিদি এবারে এসে পর্য্যন্ত মেজ রাজাকে দিনের বেলাতেও তাঁর মহলে মহল্লিকাদের দ্বারা ডেকে পাঠাচ্ছেন। ছিঃ! সে কিন্তু ভারী লজ্জা করে!'

নহবতের আলাপ আরম্ভ হইবার সূত্রপাত করিতেই সন্ধ্যা ব্যস্ত হইয়া ঘুমন্ত স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিল—"ওঠো ওঠো, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

"কৈ বেলা হয়েছে?" বলিয়া ঘুমের ঘোরেই সন্ধ্যার হাতটা টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া যুবক আবার দিব্য একচোট ঘুম দিবার উপক্রম করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া সন্ধ্যা আর স্থির থাকিতে পারিল না, দুই হাতে স্বামীকে নাড়া দিয়া সে ঈষৎ ভীতভাবে ডাকিল, "এখনই যে বাড়ীর লোকরা উঠে পড়বে, করছো কি? উঠে পড়ো।"

যুবক এবার ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। "আঃ, একটু কি ভাল ক'রে ঘুমুবারও যো নেই, এরই মধ্যে অম্‌নি সকাল হয়ে ব'সে আছে? সন্ধ্যা! যেমন আমায় আর ঘুমুতে দিলি না, দেখিস্, আজ তোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি যদি না তোর ঘরে এসে উপস্থিত হই ত আমার—"

সভয় লজ্জায় স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যা আতঙ্কে কহিয়া উঠিল—"কর কি?"

"তাই ত রে, কি করছিলুম! খুব বেঁচে গেলি রে রাণি! রামপালের মুখ দিয়ে একবার খেলাচ্ছলেও যে প্রতিজ্ঞা বার হবে, সে যে আর ফিরতে পারে না, সে তুই ঠিক বুঝে নিয়েছিস,—না? আচ্ছা, দু একটা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এখন বেরিয়ে পড়া যাক্ গে, তা হ'লে এখন সারাদিন এবং অর্দ্ধরাত্রির মত।"

এই বলিয়া গৌড়পতি মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী পরমভট্টারক পরমসৌগত মহীপালদেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজকুমার রামপালদেব তথাকথিত "পাথেয়" সংগ্রহ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে অথচ অনিচ্ছা-মন্থর-পদে পুনঃপুনঃ পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-বিভাগের অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম প্রাসাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ। কক্ষভিত্তি অতি সুন্দর ও সুনিপুণভাবে রামায়ণ-কথিত চিত্রাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন। বহুবিধ বর্ণসমাবেশে অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে রাজ্য-লাভ অবধি সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনাবলীই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে, করে নাই কেবল এই দুঃখলব্ধ সুখের অব্যবহিত পরে যে অধিকতর মহাদুঃখের অশনি অকস্মাৎ রঘুকুলপ্রধানকে আজ সর্ব্বলোকচক্ষুতে চির-জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সীতাবর্জ্জন ঘটনা। অসহনীয় বোধে এই দুঃখময় কাহিনীটিকে বর্জ্জন করিয়া শ্রীরামসীতার মিলন-মধুর মূর্ত্তি দুইটিকেই ইহার শেষ চিত্র করা হইয়াছিল।

রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত আরক্ত কক্ষভূমিতে সুরঞ্জিত মাদুর বিছাইয়া পট্টমহাদেবী মহারাণী লজ্জাদেবী দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন; এক জন মহল্লিকা তাঁহার পদ-সেবায় নিরত রহিয়াছে, এক জন মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার আর্দ্র কেশপাশ ধূপদানী হইতে উত্থিত ধূপের ধূমে সুবাসিত এবং শুষ্ক করিয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে কোন সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল, এমন সময় ঘরের বাহির হইতে তৃতীয়া মহল্লিকা সসম্ভ্রমে আসিয়া জানাইল—মহা-রাজকুমার রামপালদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতাভিলাষী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান।

নিজের বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা সংযত করিয়া লইয়া মহাদেবী তাঁহাকে আনিতে আদেশ পাঠাইলেন।

রামপালদেব গৃহ-প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃজায়া মহাদেবীকে সম্ভ্রমের সহিত প্রণাম করিয়া উঠিয়াই অপ্রসন্ন-মুখে মহল্লিকাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মহাদেবী তাহাদের দিকে চাহিয়া এক জনকে বলিলেন, "পহুনা! তুই শীঘ্র ক'রে ছোট ঠাকুরপুত্রের জন্য কেয়াখয়ের দিয়ে পাণ সেজে আন।" অপরাকে বলিলেন, "ঠাকুরকন্যার মহলে আজ ভাগবতপাঠ কোন্ সময় বসিবে, তার খবর জানিয়া আয়", এবং আর এক জনকেও বিদায় দিয়া বলিলেন, "খেতুরি! তোমার ধূপদানী সরিয়ে নাও, গন্ধ বড় কড়া লাগছে।"

রামপাল হাসিমুখে মহাদেবীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া তাঁহার আলতাপরা একখানি পা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া নিজের বিশাল উরুর উপর স্থাপন করিলেন ও দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। লজ্জাদেবী মহা-বিব্রত হইয়া বার বার বারণ করিলে, পা টানিয়া লইতে গেলে, জোর করিয়া পা-খানি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহার এই বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ দেবরটি টিপি টিপি হাসিয়া বলিলেন "আপনার একটু সেবা করলামই বা, তাতে পাপ হবে না—বিশেষতঃ মহল্লিকাদের আমারই জন্য উঠিয়ে দিতে হলো যখন।"

নিরুপায় দেখিয়া মহাদেবী নিজের পাখানি উঁহার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি আমার পদসেবা করবার জন্যই এসেছ বোধ হয়? মনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই ত?"

রামপালদেব ঈষৎ অপ্রতিভভাবে অধোমুখ হইলেও আবার তখনই মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আর একটা খবর দিবারও আছে।"

"কি খবর?" লজ্জাদেবী ঈষৎ শঙ্কিতভাবে চাহিলেন. "আবার কোন কিছু কি—?"

রামপালদেব কহিলেন, "না, সে সব কিছু নয়; আমি শীঘ্রই মহোদয়ে যুদ্ধ কর্‌তে যাচ্ছি, এই খবরটা মাত্র আপনার চরণে দিতে এসেছিলাম।"

"মহোদয়ে যুদ্ধ বেধেছে না কি?"

রামপালদেব মুখ একটুখানি নত করিয়া বলিলেন, "না, এখনও বাধেনি বটে; কিন্তু বাধতে আর কতক্ষণ! আমি মনে কর্‌ছি, সৈন্য-টৈন্য নিয়ে গিয়ে ওদের রাজধানীটা হঠাৎ আক্রমণ করবো, আর তা হ'লেই ত যুদ্ধ বাধতে বাকী থাকবে না। তখন খুব লেগে পড়া যাবে। এমন নিরুদ্যমভাবে ব'সে থাক্‌তে আর পারা যায় না।"

পট্টমহাদেবী ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল কি! মহোদয় আক্রমণ ক'রে তুমি জয়ী হ'তে পারবে, আশা কর? সে যে অসমসাহসের কায! তা ছাড়া তোমাদের সে রকম সৈন্যবলই কি আছে? আর রাজাধিরাজ কি এটা সমর্থনই করবেন?"

রামপাল শান্তস্বরেই উত্তর দিলেন, "হলোই বা? ঘরে ব'সে ব'সে দিন-রাত কাটেই বা কেমন ক'রে? তা ভিন্ন

সন্ধ্যাবেলাতেই বেজায় রকম ঘুম পেয়ে যায়। সে হ'লে ত আর ঘুমাবারই কোন উপায় থাকবে না, সেই বেশ হবে। ক্ষত্রিয়ের ছেলের আবার সাহসের অভাবটা কি? রাজা না পছন্দ করেন, একাই যাব।"

এবার মহাদেবী হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সমাগতা তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খেতুরি! যা দেখি, একবার ছোট রাণীকে ব'লে আয় গে, তার সেই সূজনীর সেলাইটা নিয়ে আমার কাছে যেন এখনই চ'লে আসে, কি রকম হচ্ছে, খারাপ ক'রে ফেল্‌ছে কি না, আমি একবারটি দেখতে চাই।"

মল্লিকা চলিয়া গেলে সোনার বাটায় সাজান তাম্বুলগুলি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া চাপা হাসির মধ্যে লজ্জাদেবী বলিলেন, "দেখ, যে ক'দিন মহোদয়যাত্রা ঘ'টে না উঠে, তুমি যদি এম্‌নি সময় একবার করে আমার মহলে এসো, আমি তোমায় একটি ভাল রকম কাণ দিই।"

রামপাল মহাদেবীর দুই পায়ের তলায় হাত দিয়া, সেই হাতখানি নিজের মাথায় ঠেকাইয়া অতিশয় ভক্তি-নম্রস্বরে উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে! আপনার আদেশ পালন ত করতেই হবে।"

পশ্চাদ্দ্বারে নূপুর ও কিঙ্কিণীর রুণ্‌-ঝুনু শব্দ হইতেই সেই শব্দের তালে তরুণ মহারাজকুমারের সর্ব্বশরীরের শোণিতের ধারা বিপুল বেগে নাচিয়া উঠিল। তাহা যে ছোট রাণীর পায়ের নূপুর, হাতের কাঁকন, সে খবর আর কাহারও দিবার প্রয়োজন ছিল না।

খেতুরি আসিয়া ছোট রাণীর আগমনবার্ত্তা জানাইলে মহাদেবী তাহাকে বলিলেন, "দেখ্, তুই বাছা এই সময় তারাদেবীর পূজার জন্য সব দাসীদের কাপড় ছাড়িয়ে চারটি চারটি গুয়া বানাতে বসিয়ে দে গে। আমার কাছে এখন আর কারুর থাকবার দরকার হবে না, ছোটুকে নিয়ে এখন আমায় ব্যস্ত থাকতে হবে।"

খেতুরি কহিল, "তাই যাই মা, মাগীগুলো ত গা মেলে মেলে মোষের মতন প'ড়ে প'ড়ে ঘুম দিচ্ছে, উঠতে পারলে এখন বুঝি। আমারই যেমন দিনে-রাতে পোড়া চোখে একটুক নিদ্‌লী লাগেনি, তেমনটি ধারা ত আর সব্বাইকার নয়। কুশী মাগীকে ডেকে দে যাই, তোমায় হাওয়া দেক্।"

লজ্জাবতী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন—"তাকে গুগ্‌গুলের ধূপ তৈরী করবার জন্য ব'লে রেখেছি, সেই কথা তাকে মনে করিয়ে দিস।—যা, এখন তুইও যা।"

খেতুরি প্রস্থান করিলে লজ্জা ও আনন্দের আভায় স্মিত ও সমুজ্জ্বল অথচ নতমুখ পরম স্নেহভাজন দেবরটির দিকে ফিরিয়া কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে অথচ সহজভাবেই মহাদেবী কহিলেন, "যাও ত ছোট রাজা! ছোট রাণীকে ব'লে এস ত যে, এখন আমি ঘুমুবো, ঘণ্টাখানেক পরে আমার ঘুম ভাঙ্গলে তার সেলাই আমায় দেখাবে, ততক্ষণ ঐ ঘরে ব'সে সে যেন আমার ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষা করে—যাও, তুমি ও ঘরে যাও—আমার ঘরের এই দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে যেও—না হ'লে কেউ এসে প'ড়ে আবার আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে পারে।"

রামপাল একটি কথাও না কহিয়া নিঃশব্দে হাসিমুখে তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ঘর হইতেই ইতঃপূর্ব্বে কিঙ্কিণী ও মঞ্জীরের রব শ্রুত হইয়াছিল।

তাঁহাকে দেখিয়াই ঘোর লজ্জায় চমকাইয়া উঠিয়া রক্তবর্ণ মুখে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি! তুমি কেন এলে?"

ততক্ষণে তাহার বল্লরীকোমল ক্ষুদ্র দেহ নিজের বিশাল বক্ষে টানিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দ, কৌতুক-হাস্য কষ্টে রোধ করিতে করিতে রামপালদেব উত্তর করিলেন, "মহাদেবী যে কত বড় মহাদেবী, তা ত জানো না, রাণি! আমি যে তাঁকে দশ বছরে মা-হারা হয়েই পেয়েছিলুম এবং মা'র কাছে ছেলের যা পাওনা, তার উপর আবার বন্ধুর প্রাপ্যটাও তাঁরই কাছ থেকেই পেয়ে আস্‌ছি। তুমি ভয় পেও না, মেজ রাজার মত আমি বোকা নই, বৌ-মহারাণীর পূর্ণ অনুমতি নিয়ে এসেছি, কেউ জানবে না।"

কিন্তু এ সান্ত্বনাতেও এই অতর্কিত মিলনের সকলটুকু আনন্দকে আড়াল করিয়া যে সশঙ্ক লজ্জা তীব্র হইয়া উঠিয়া সন্ধ্যার ক্ষুদ্র শরীরটুকু সরমে মুদিয়া দিতে চাহিতেছিল, তাহা অপগত হইল না। সে ফাটিয়া-পড়া পাকা ডালিমের মত আরক্ত গণ্ডে নামিয়া-আসা পাতার আড়ালে আধ-ফোটা কমল-কলির মত নতচোখে, মিনতিভরা ভাঙ্গা গলায় কেবলই বলিতে লাগিল, "আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? না, তুমি যাও।"

রামপাল সেই ঘরে রক্ষিত একখানা আসনের কাছে সন্ধ্যাকে টানিয়া আনিয়া বসাইয়াছিলেন, নিজে তাহার পার্শ্বে আসন-গ্রহণ পূর্ব্বক ঈষৎ দুঃখিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাঁর কাছে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে ভাবছ? তা হ'লে তুমি তাঁকে আজও ভাল ক'রে চিন্‌তে পারনি, রাণি! লজ্জা তাঁর নামে লজ্জা পায়! তিনি যে মূর্ত্তিমতী দেবী। আমার দুর্ভাগ্য, জ্যেষ্ঠ তাঁর মত স্ত্রীর অত বড় অবমাননা যে কেমন করেই করতে পারেন, সে আমার কাছে এক মহা প্রহেলিকা! অথবা অত উচ্চকে অতি নৈকট্য দিতে সাধারণ মানুষের মন হয় ত ঐ রকমই সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। দেবীকে হয় ত নারী মনে করা সহজ নয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৌবনের সুখ-স্বপ্ন কি বিচিত্র মায়াজালের মত সমস্ত পৃথিবীর উপর কত অল্পেই যে বিস্তৃত হইয়া যায়; প্রেমিকের তৃষিত অন্তর তাহার প্রেমপাত্রীর মুখারবিন্দ ইচ্ছাসুখে দর্শনলাভ করিয়াই যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভের আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকে; নবীন যৌবনের আশা-আনন্দ যে কত সহজেই সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে শুদ্ধ চির-জ্যোৎস্না-জড়িত সন্তানক-পারিজাত-সৌরভামোদিত নন্দন-কাননে কল্পনা করিয়া লইয়া ভূতলে স্বর্গসুখানুভব করিতে থাকে, তাহা সেই নবীন জীবনই শুধু জানে—অথবা সেও বুঝি তাহা জানে না। মহারাজকুমার রামপালদেবের নবীন চিত্তের আশা-স্বপ্ন পূর্ণ হইয়া তাঁহার সুখের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। পট্টমহাদেবীর অযাচিত করুণায় প্রতিদিনের দ্বৈপ্রহরিক মিলন-আনন্দে তাঁহার যৌবনসুখপূর্ণ তরুণ হৃদয় যেন উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়াই উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রহর গণনা করিতে থাকিতেন; আড়াই প্রহর বেলা-সমাগমের কত বিলম্ব আছে, জানিবার জন্য ক্রমান্বয়ে সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সুগৌর মুখ লোহিত হইয়া উঠিত। তাহার পর পট্টমহাদেবীর মহল্লিকা তাঁহার বিশ্রামাগারের দ্বারসন্নিহিত হইবামাত্র এক লম্ফে পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া হর্ষস্মিতমুখে অন্তঃপুরাভিমুখীন হইতেন। সেখানে প্রথমতঃ মহাদেবীর পাদবন্দনাদি যথারীতি সমাধা পূর্ব্বক তাঁহারই আদেশপালনার্থ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের দিকে আগ্রহভরা চিত্ত এবং ব্যগ্র বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া প্রবেশ করিতেন। সেখানে প্রবেশ করিবার পর? তাহা পূর্ব্বের সেই সলজ্জ তিরস্কারের সহিত সেখান হইতে "না, তুমি যাও" এ অভ্যর্থনা লাভের যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সহজে অনুমেয়। এমন কি, সে দিক্ দিয়াও যে একটি তরুণ হৃদয় এমনই অধীর প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এ সন্দেহ জন্মিবার পক্ষেও অবস্থা নিতান্তই প্রতিকূল ছিল না। এই নব-প্রেমমোহে ও ইহারই মায়াস্বপ্নে বিমোহিত হইয়া মহারাজকুমার রামপালদেব নিজের সাংসারিক লাভ-ক্ষতি সমস্তকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; মাথার উপর দোদুল্যমান মৃত্যুর খড়্গকেও।

এমনই সময় এক দিন বাহিরের দিক্ হইতে একটা অপ্রিয় জনরব ভাসিয়া আসিয়া, এমন কি, রাজবাড়ীতেও প্রবেশপথ করিয়া লইল। কথাটায় অবিশ্বাস করিবার বিরুদ্ধে বড় বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় না—অনেকেই ইহা নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিল, ইহাদের মধ্যে রামপালদেবও এক জন। কিন্তু তিনি সযত্নে এই জনরবটাকে অন্তঃপুর-প্রাচীরের সীমার বাহিরে রক্ষাচেষ্টা করিয়াই গোপনে ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। কঠিন প্রতিঘাতময় সংসার আবার যেন বাস্তব মূর্ত্তিতে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইল। স্বপ্নভঙ্গ হইল। হায়, অলীক সুখ, কি ক্ষণস্থায়ীই তুমি!

সে দিন যখন মহল্লিকা সিদ্ধা মহারাজকুমারের নিকট পট্টমহাদেবীর আহ্বানবার্ত্তা দিতে আসিল, তাঁহার মুখ তখন একটুখানি ম্লান দেখাইতেছিল। মহাদেবীকে তিনি প্রতিদিনের মতই পাদবন্দনা করিলেন, কিন্তু মুখে তাঁহার সে দিন আর সেই হৃদয়োৎসারিত হাস্যচ্ছটা মুহুর্মুহুঃ চকিত হইতেছিল না এবং রহস্যপূর্ণ সরস বাক্যাবলীও কণ্ঠসীমায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মহাদেবী উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ দেবরের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, সংশয়পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর ভাল আছে ত?"

নতমুখে ঈষৎ আগ্রহ দেখাইয়া রামপালদেব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

পুনশ্চ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি উঁহার সেই আনতমুখে প্রেরণ করিয়া লজ্জাদেবী কহিলেন, "রাত্রে ছোট রাণীর সঙ্গে ঝগড়া করেছ কি?"

এবার রামপালদেব সত্য সত্যই হাসিয়া ফেলিয়া মাথা াড়িলেন। কিন্তু সে হাসি দেখিয়াও তাঁহার কথায় লজ্জাদেবীর পুরাপূরি বিশ্বাস হইল না, তাই তিনি পুনশ্চ নির্ব্বন্ধ াহিত কহিলেন, "আমার দিব্য, কিছু ঘটে নাই?"

রামপাল এবার বিশেষ বিপন্ন বোধ করিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে তিনি মাতৃবৎ ভক্তি ও সম্মান করিতেন, মাতৃহীন রামপালকে ভ্রাতৃজায়াও তেমনই ভালবাসিতেন। সেই লজ্জাদেবী যখন তাঁহার দিব্য দিয়া বিষণ্ণতার কারণ জানিতে চাহিতেছেন, তখন উঁহার নিকট হইতে তাহা লুকাইয়া রাখা তাঁহার পক্ষে যে বড়ই কঠিন। অথচ বলিবেনই বা তিনি কি? ঈষৎ চিন্তা করিয়া চেষ্টা করিয়া হাসি আনিয়া মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার দিব্য মহাদেবি! ঝগড়া আমি করিনি এবং কখন করি-ও না। আপনার যে ঐ ক্ষুদ্র দাসীটি—ঐ ছোট বোন্‌টিকে যে দেখতে পান, ওটি আপনাদের সাক্ষাতে নিতান্ত শান্তভাবেই থাকে, কিন্তু মোটেই উনি ভালমানুষটি নহেন, ঝগড়া ঐ উনিই ক'রে থাকেন, আমার কোন দোষ নাই।"

এই উত্তর মহাদেবীর লজ্জা-সংশয়ভারাক্রান্ত চিত্ত লঘুতর করিয়া দিল, স্নেহকোমল কৌতুকহাস্যে তাঁহার কোমল অধর অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রীতিমধুর স্বরে তিনি সহাস্যে কহিলেন, "তুমি ভাই মোটেই ঝগড়াটে নও, তা নইলে আর বাড়ীতে ব'সে তোমার ঝগড়ার সাধ মেটে না, ঝগড়া বাধাতে মহোদয় পর্য্যন্ত তোমায় ছুটতে হয়? তা যাও, এখন কোন্দল ভেঙ্গে ভাব-সাব ক'রে ফেল গে, আজ কিন্তু একটু সকাল সকাল ক'রে ছুটীটা দিয়ে দিও। বিকালে ভাগবতকথা শুনতে পায় যেন।"

রামপাল বিনীতভাবে "যে আজ্ঞে" বলিয়া পুনশ্চ তাঁহার পদধূলি লইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাদেবী ঠিক এমনটি না কি প্রত্যাশা করেন নাই, তাই তাঁহার এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যবহারটাও তাঁহাকে কিছু বিস্মিত করিয়াছিল। তিনি আশা করিতেছিলেন, তাঁহার এই চাঞ্চল্যময় তরুণ দেবরটি এখনই হাসিমুখে বলিয়া বসিবে, "ভাগবতকথা শুনে আর কি হবে, তার চেয়ে আমার কথাই বরং বেশী ক'রে শুনিয়ে দেবো এখন," এবং এইরূপ বেফাঁস কথা বলার জন্য তিরস্কৃত হইয়া অধিকতর হাসিতে থাকিবে।

সন্ধ্যা সে দিন সবিস্ময়ে দেখিল, সে প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেও তাহার ক্ষুদ্র দেহ তাহার স্বামীর সবল ভুজদ্বয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বিশাল বক্ষের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ হইল না। তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার উভয় বাহুই নিজের বক্ষোবদ্ধ হইয়া রহিল, তাঁহার হাস্যসরস ওষ্ঠাধর ম্লান ও পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত হইয়া রহিল, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা সকল সুস্পষ্ট আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তিতে সমুজ্জ্বল আয়ত চক্ষুতে ব্যথার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া রহিল, কি যেন একটা নিদারুণ দুশ্চিন্তার ভারে বক্ষ তাঁহার গভীর ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছিল। সন্ধ্যার আজ কয়েক বৎসরকাল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্নেহময় সদানন্দ স্বামীর এমন চিন্তা-গভীর মুখ ও নির্লিপ্তভাব সে কোন দিনই প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই আজ তাঁহাকে ও ভাবে থাকিতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ সংশয়ে ও ভয়ে দুলিয়া উঠিল, মনে মনে বুঝি একটুখানি অভিমানও জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাই ঈষৎ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে সে পায়ের আঙ্গুল দিয়া কক্ষভূমির মর্ম্মর প্রস্তর খুঁটিতে লাগিল। স্বামী নিশ্চয়ই তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, মনে করিয়া তাহার আদরপ্রত্যাশী স্নেহচ্ছায়ারক্ষিত ভীরু চিত্ত কুণ্ঠাজড়িত হইয়া গেল, দুইটি চোখ তাহার অভিমানে ছলছল করিয়া আসিল।

রামপাল লজ্জাদেবীর নিকট অতি কষ্টে যে ধৈর্য্যের বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে আসিয়াই তাহার বেগ সংবরণ করা তাঁহার মত সবলচিত্ত পুরুষেরও পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাই ক্ষণকাল নিঃশব্দ বেদনায় স্তব্ধ থাকিয়া সযত্নে আত্ম-সংবরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঐ পবিত্রচরিত্রা ও মধুরস্বভাবা মহীয়সী নারীর একান্ত দুর্ভাগ্য-জীবনের কথা স্মরণে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক মনে মনে সখেদে কহিলেন—'তুমি আমায় সবই দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমার একটুখানি ঋণও যে শোধ করতে পারলাম না,—আমার মনে এই বড় খেদ রইলো!'

সেই গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা গভীরভাবে চমকিয়া উঠিল। এত বড় দীর্ঘনিশ্বাস সে ত আর কখন কাহাকেও ফেলিতে শুনে নাই? সে জানে—শুধু এইটুকুই জানে যে,

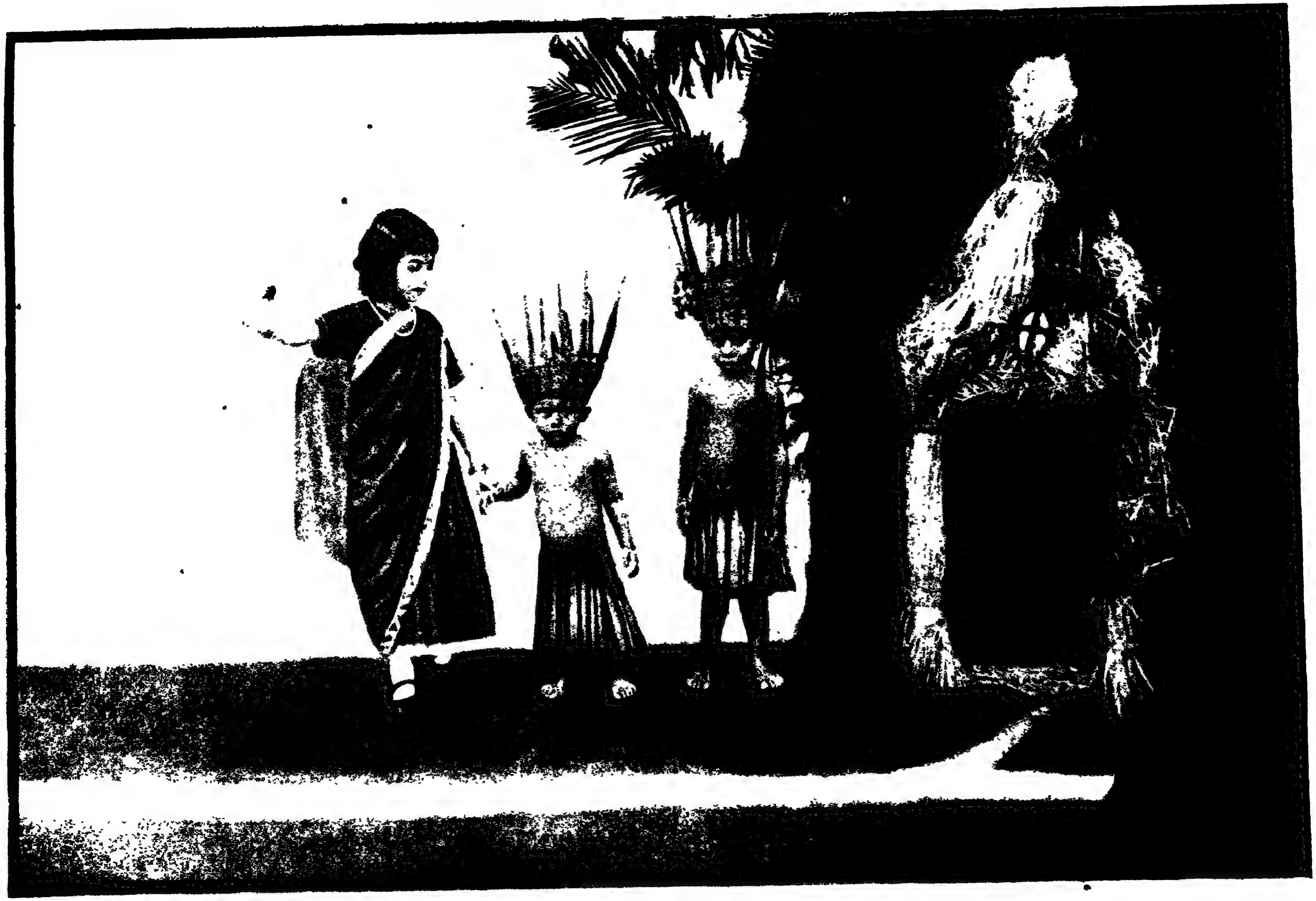

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে]

আলোকের পথে

শিল্পী--জি, সি, দে।

অনেকখানি দুঃখ না পাইলে কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। আর এত বড় নিশ্বাসের মূলে যে অনেক বড় ব্যথা নিহিত আছে, সেই বালিকার মনে তৎক্ষণাৎই এই সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। সে নিজের অনাদরের ব্যথাভিমান নিমেষমধ্যে বিস্মৃত হইয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—এ কি! তাহার স্বামীর সেই সুন্দর সৌম্যমুখ কি অপরিসীম বেদনাম্লান!

"কি হয়েছে তোমার? অমন ক'রে কেন তুমি চেয়ে আছ?" এই কথা কয়টি অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিতে বলিতে সন্ধ্যারাণী স্বামীর খুব কাছের দিকে সরিয়া আসিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, নিজের ক্ষুদ্র দুইখানি হাত দিয়া তাঁহার সেই সকল চিন্তাম্লানতাকে এক মুহূর্ত্তেই সে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়। কিন্তু যতই হউক, হৃদয়ে তাহার যত বড়ই প্রেমের উৎস সহস্র ধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্য উন্মত্ত হইয়া থাকুক, তবুও সে বালিকা। ক্ষীণা, দুর্ব্বলা, লজ্জাবতী নবোঢ়া, সে অফুরন্ত স্নেহধারার অজস্র বর্ষণকে ইচ্ছাসুখে সে ত এখনও উৎসারিত করিয়া দিতে ভরসা করে না। সরমে বাধিয়া যায়। তাই মনের বাসনা মনের মধ্যেই সংযত রাখিয়া সে শুধু তাহার করুণ ডাগর চোখ দুইটিকে মেলিয়া দিয়া, বিমলিন ঊর্দ্ধমুখে স্বামীর মুখের পানেই চাহিয়া রহিল।

ততক্ষণে মহারাজকুমারেরও সহসা নিজ ব্যবহারের অসঙ্গতি বোধগম্য হইয়াছিল। অনর্থক একটি সুকুমার কোমল চিত্তে বেদনা দিয়া ফেলিয়াছেন বুঝিয়া তিনিও তখন ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন ও যথাসম্ভব আত্মদমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া স্ত্রীর হাতখানি ধরিয়া কহিলেন,—"দেখছিলুম, তুই কি করিস্।"

"কক্ষনো নয়, তুমি নিশ্চয় আমার উপরে রাগ করেছ—বল, আমি তোমার কি করেছি?"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে অভিমানিনী আদরিণীর নীলোৎপলনেত্র অভিমানাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ও দেখিতে দেখিতে শুক্তি-শুভ্র স্বচ্ছ গণ্ডের উপর সেই নির্ম্মল অশ্রুবিন্দুগুলি যেন অম্লান নিটোল মুক্তাগুলির মতই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রামপালদেব ব্যথিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তোর উপর তোর শত্রু যে, সে-ও যে রাগ করতে পারে না, রাণি! আমি কেমন ক'রে পারবো?"

সন্ধ্যা সলজ্জ হাস্য-স্মিত মুখে চোখ মুছিয়া গভীর লজ্জাভরে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

"তুই সত্যি সত্যি ক'রে কেঁদে ফেল্লি, রাণি! ভারী কিন্তু ছেলেমানুষ তুই! আচ্ছা, কাঁদ্‌লি কেন বল্?"

সন্ধ্যা তাহার অরুণাভাযুক্ত মুখখানাকে স্বামীর বিশেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াও জোর করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া সুখোৎফুল্ল কণ্ঠে অথচ কৃত কার্য্যের জন্য ঈষল্লজ্জিত ও ভগ্ন স্বরে মৃদু স্খলিত বাক্যে উত্তর করিল, "কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না? আমার বুঝি ভয় করে না, হ্যাঁ!"

সন্ধ্যার এই অভিমানপ্রচ্ছাদিত সরল অভিব্যক্তিতে সহসাই রামপালদেবের আহত হৃদয়ের ঈষৎ উপশমিত বেদনা-বহ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কি জন্য যে তাঁহার আজ তাঁহার একমাত্র প্রাণতমার নিকট অনবধানতার অত বড় ত্রুটি ঘটিতে পারিয়াছিল, সেই বিষম স্মৃতি-জ্বালা তাঁহার বক্ষতলে আবার ধিক ধিকি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেই কথাটাই ভাবিয়া আবার একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"ঐ দেখ" বলিয়া সন্ধ্যা সচমকে স্বামীর বক্ষে লুকানো মুখ আপনা হইতেই ত্রস্তে উঠাইল।

"ঐ দেখ, আবার তুমি তেম্‌নি ক'রেই নিশ্বাস ফেল্‌ছো! আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, তোমার মন ভাল নেই। তুমি রাজপুত্র, তোমার কিসের অভাব? তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার কোন দোষের জন্যই তোমার মনে দুঃখ হয়েছে, তাই—"

বলিতে বলিতে সন্ধ্যার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল ও তাহার সুন্দর মুখখানি সান্ধ্য কমলের মতই ম্লান হইয়া গেল।

তখন মহারাজকুমার পুনশ্চ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী আসনে বসিয়া পড়িয়া ব্যথাক্ষুব্ধ কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিলেন, "রাজপুত্র হ'লেই কি সুখী হয়, সন্ধ্যা! আমার মনে হয়, রাজপুত্র, রাজরাণী এরাই সংসারে বেশী অসুখী! বসো, রাণি! আমার দুঃখের কথা তা হ'লে তোমায় আজ একটু বলি, শোন। আমি তখন ভাবছিলুম, আমাদের বাড়ীতে এই যে নিত্য নিত্যই দেবতার অবমাননা ঘটতে দেওয়া হচ্ছে, এর পরিণাম কখন কি ভাল হ'তে পারে? এর কি সত্যই কোন প্রতীকার নেই? অথবা নিতান্ত

স্বার্থপর আমরা, শুধু নিজেদের সুখ-স্বার্থটুক আগলে ব'সে থেকে এর কোন প্রতিবিধানের চেষ্টা করছি না ? তা যদি হয়, তবে রামপালের বেঁচে থাকাকেই শত ধিক্ !"

সন্ধ্যা এ কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া ম্লানভাবে চাহিয়া রহিল। রামপালদেব আপনার মনের উচ্ছ্বাসেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"যখন আমার জ্যেষ্ঠের বিবাহ হয়, আমি তখন নিতান্ত শিশু; জন্মাবার পর মা দেখিনি। সৎমা ছিলেন, তিনি আমাদের চেয়ে-ও দেখতেন না। নিজের মায়ের মুখ ভাল ক'রে মনে পড়ে না, 'মা' শব্দটা মনে হ'লেই আমার মনে আসে—চোখে ভাসে, আমার ওই জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর করুণাপূর্ণ মুখ; আমার রাজরাজেশ্বরী জননীর স্নেহভরা মুখখানি। ও মুখ সুন্দর কি কুৎসিত, যুবতীর কি প্রৌঢ়ার, তা আমি জানিনে, রাণি। আমি জানি, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহিমা, সকল গরিমা আমার ঐ মায়ের মুখে ভরা আছে! লোকে কি চোখ নিয়ে দেখে, জানিনে, আমি ত আমার ঐ দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে মহামায়ার মহিমময় ভাব, বাণীর বুদ্ধিমত্তা, কমলার কোমলতা একাধারে সবটুকু পরিপূর্ণই দেখতে পাই। এর কোথায়ও কোন অপূর্ণতা আমি কল্পনা করতেও পারি নে। আর আমার সেই মা'কে যখন অবমানিতা অনাদৃতা দেখি, রাণি! সন্ধ্যা! ভেবে দেখ দেখি, তখন কি আমার মাথার ঠিক থাকতে পারে ?"

সঙ্কুচিতা সন্ধ্যা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহার যোদ্ধৃ-পুরুষোচিত সবলচিত্ত স্বামীর কণ্ঠ ও নেত্র সজল এবং স্বর বাষ্পাবেগে প্রায় অবরুদ্ধ ও কম্পিত। তাহারও ক্ষুদ্র করুণ চিত্ত স্বামীর এই সুস্পষ্ট চিত্তচাঞ্চল্য দর্শনে আবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত সহানুভূতি জানাইবার প্রবল ইচ্ছা জাত হইল, কিন্তু সরলা বালিকা কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিবে, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, তাই নিরুপায় অসহিষ্ণুতায় বিপন্ন হইয়াও নীরব রহিল এবং নীরব থাকার কুণ্ঠায় নিজের প্রতি মনে মনে দারুণ বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামপালদেব ক্ষণপরে পুনশ্চ একটা দীর্ঘতর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি জান না, রাণি! তাঁর জন্য মনের মধ্যে আমার কত অশান্তি! তোমার কাছে আদর পেলেও আমার মনের মধ্যে ক্ষোভের হাহাকার হা হা ক'রে উঠে, মনে হয়, আমার স্নেহময়ী মহাদেবী কোন দিনই হয় ত এমন ক'রে স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসা জানাতে অবসর পাননি! এই মনে ক'রে বুকে আমার যে ব্যথা লাগে, তাতে আমার সুখের রাত্রি কতবার বিষাদ-নিশায় পরিণত হয়ে উঠেছে। নাঃ, থাক, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে! বালিকা তুমি, সরলা তুমি, এ সব অসহ্য দুঃখের ভার তুমি সইবে কি ক'রে ? অথচ তোমরা সকলেই দেখছো, যাঁর জন্য আমার এই দুঃখ, নিজে তিনি লোকচক্ষুতে নিজের কোন গৌরবকেই এতটুকু খর্ব্ব হ'তে দেন নি। তাঁর অন্তরের কন্দরে কন্দরে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিজ্বালা অহরহঃ উথলিত হচ্ছে, সে কি কেউ ধারণা করতে পেরেছে ? আমার নিজের অভাব- নিজের দুঃখ আমি তাঁর কথা মনে হ'লে একেবারে ভুলে যাই।"

সন্ধ্যা অত্যন্ত ভীরুভাবে স্বামীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া পড়িল, একখানি হাত তাঁহার জানুর উপর স্থাপন করিয়া সেই হাতটির উপর নিজের চিবুক রাখিয়া অত্যন্ত মৃদু ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি কোন উপায় হয় না ?"

রামপালদেব অকস্মাৎ এই প্রশ্নে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নাবস্থা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। "এর কোন উপায় ? হ্যাঁ, এর কোন উপায় যা'তে হয়, তাই আমায় এবার করতে হবে—আর যে যা করুক না করুক—তা না হ'লে আমার বিবেকই আমায় যে কৃতঘ্ন ব'লে ধিক্কার দিচ্ছে, সে আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এস রাণি! আজকের মত আমরা বিদায় লই। আজ আমায় একবার কোনক্রমে রাজাধিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে। অবশ্য তা'তে যে বেশী কিছু ফল হবে, এমন কোন আশা দেখি না, তথাপি এ যেন আমার কর্ত্তব্য। পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরও এখন অতীত হয়নি, অথচ এরই মধ্যে সাম্রাজ্যের এ কি শোচনীয় অবস্থা হয়ে এল! আর গৃহের মধ্যে গৃহদেবী সতত লাঞ্ছিতা হ'তে লাগলেন। এতে কি রাজ্যের মঙ্গল হ'তে পারে ? তা তিনি যাই ভাবুন, আমি ত তাঁরই ভাই, আমারই এর প্রতিবিধান-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দাঙ্গা ও সংস্কার আইন

কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে উপলক্ষ করিয়া বিলাতের 'টাইম্‌স্‌' পত্র লিখিয়াছেন,—ভারতের অতীত ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর ভাব আদানপ্রদানের বা বোঝাবুঝির পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়াই সকলের বিদিত। পরস্পরের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষের প্রাবল্য দেখিয়া মনে হয় যে, সংস্কার আইন অনুযায়ী আর এক দফা অধিকার রাজনীতিক ও ধর্ম্মগত স্বার্থ নিরাপদ রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতের লোক রাজনীতিক্ষেত্রে এখনও এমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে এই স্বার্থ নিরাপদ না রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায়। যত দিন না ভারতের জাতীয় একতা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়, তত দিন আকস্মিক বিপদ ও দাঙ্গা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারসমূহের হস্তে সংরক্ষিত বিভাগগুলি রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

কথাটা নূতন নহে। এ দেশের লোককে রাজনীতিক অধিকার দিবার কথা যখনই উঠিয়াছে, তখনই এমনই ভাবে অন্তরায়ের কথা উঠিয়াছে। অধিকার দানের পূর্ব্বে ঠিক এই ভাবের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে, ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারের অনুগ্রহ-নিগ্রহের (যেমন চাকুরী বা কাউন্সিলারী দান) সহিত যে সম্প্রদায়গত বা ধর্ম্মগত দাঙ্গাহাঙ্গামার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা নানা ঘটনাতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশেও এরূপ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংঘর্ষের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও সে দেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভে কোন বিঘ্ন ঘটে না। আয়ার্লাণ্ডেও 'উত্তর' ও 'দক্ষিণে' বহুকাল যাবৎ এমনই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল, সেখানে সরকারী অনুগ্রহ-নিগ্রহের সহিত এই সংঘর্ষ সম্পর্করহিত ছিল না। কিন্তু সেখানে এই হেতু স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারদানে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। আয়ার্লাণ্ডেও ভারতের মত সংঘর্ষ ও রক্তারক্তির অভাব ছিল না; সেখানে এখনও পরস্পর বিরোধ ও বিবাদের একেবারে অবসান হয় নাই। তথাপি সেখানে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারদানে কার্পণ্য করা হয় নাই। যাহা এক দেশের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয়, অন্য দেশে অবস্থা একইরূপ হইলেও তাহা হয় না কেন?

আসল কথা, ইহার 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি' 'টাইমস্‌' চাপা দিয়া ভারতীয়দের স্কন্ধে ষোল আনা অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিলেও তাঁহার দেশবাসী উচ্চপদস্থ পুরুষরা মাঝে মাঝে উত্তেজনার ঝোঁকে জগতে উহা জাহির করিয়া থাকেন। সেবার কোনও বিশিষ্ট ইংরাজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—ইংরাজ মাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ের খাতিরে ভারতে অবস্থান করিয়া থাকেন, ভারতের স্বার্থের খাতিরে নহে। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বুঝিলেই অধিকার দেওয়া বা ফিরাইয়া লইবার ভয় দেখান,—সবই পরিষ্কার হইয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড রেডিং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর "ক্যালকাটা ডিনারে" অতিথিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতেও চেষ্টা করিলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বের সুধাবিন্দু আহরণ করা যায়। তিনি বক্তৃতায় কলিকাতার সুখ্যাতি করিবার সময়ে খোলাখুলি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, British rule is identified with Calcutta, অর্থাৎ কলিকাতার কথা মনে হইলেই ভারতে বৃটিশ-শাসনের কথা মনে পড়ে; এই জন্যই লর্ড রেডিংএর কলিকাতা এত প্রিয়। লর্ড রেডিংএর নিকট কলিকাতা A tribute to British Character and enterprise, কলিকাতা বৃটিশ-চরিত্র ও উদ্যমশীলতার জ্বলন্ত নিদর্শন; পরন্তু কলিকাতা তাঁহার নিকট a monument of civilization and culture, সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার (অবশ্য পাশ্চাত্য) স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ। অর্থাৎ লর্ড রেডিংএর দৃষ্টিতে ভারতের প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন তত প্রীতিপ্রদ নহে, যত প্রতীচ্যের সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন। কলিকাতায় ইহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—সেখানে 'বৃটিশ চরিত্র' জাজ্বল্যমান; এই হেতু কলিকাতা তাঁহার এত প্রিয়। তাঁহার ন্যায় ভাবুক তাঁহার দেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই।

সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এই 'বৃটিশ চরিত্র' অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষকে যতটুকু অধিকার দেওয়া সম্ভবপর, লর্ড রেডিংএর ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী (তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক) ইংরাজ তাহারই পক্ষপাতী। যাহাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙ্গে, ইঁহারা তাহাই দেখিতে চাহেন। এক দিকে ভারতবাসীর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অসন্তোষ ও দাবী, অপর দিকে শাসনে বৃটিশ চরিত্র, সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা,—এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া গো-শকটের গতিতে যতটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ততটা অগ্রসর হইতে ইঁহারা সম্মত, তাহার অধিক এক পদও নহে। যদি গতি একটুকু দ্রুত করিবার কথা উঠে, তখনই অমনই নানা অন্তরায়ের কথা উঠে, তন্মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যাই প্রধান।

বক্তৃতায় লর্ড রেডিং ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন, বলিয়াছেন, এই ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। কেবল একটা অন্তরায় আছে, ইংরাজ ও ভারতীয়ে পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহ। উভয়ে উভয়কে না বুঝিতে পারার জন্য এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। নতুবা পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারিলেই আর ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিবে না, উভয়ে একযোগে একমনে একপ্রাণে সংস্কার আইন সফল করিবার জন্য চেষ্টা করিবে, আর তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি সহজে করায়ত্ত হইবে।

তবেই হইল, যত দোষ পরস্পরে না বুঝার। কিন্তু ইহার ত আমরা কারণ খুঁজিয়া পাই না। পরস্পর বোঝাপড়া ত বহু দিন হইয়া গিয়াছে। লর্ড রেডিং এই বক্তৃতাতেই যে Glorious Civil Service-এর শত মুখে সুখ্যাতি করিয়াছেন, পরন্তু যে European Association-এর বন্ধুত্ব ও সাহায্যদানের কথায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, সেই সরকারী ও বে সরকারী য়ুরোপীয় সমাজের মনের মত হইয়া চলিলেই ভারতবাসীরা তাঁহাদিগকে বুঝিবেন পড়িবেন এবং ভারতীয়রা ঐ ভাবে চলিলেই য়ুরোপীয় সমাজ তাহাদিগকে বুঝিবেন পড়িবেন, ইহাই হইল পরস্পর বুঝার সূক্ষ্মতত্ত্ব। এ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহারা ভারতের রাজনীতির 'ক খ'ও শিখেন নাই।

শাসনে 'বৃটিশ চরিত্র' অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বৃটিশ বাণিজ্য ও কলকারখানার স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া যতটুকু সম্ভব অধিকার দেওয়া যায়, তাহাই সংস্কার আইনে ক্রমে ক্রমে দিবার কথা ধার্য্য হইয়াছে। অধিকার কতটুকু দেওয়া যাইবে এবং ভারতীয়রা কতটুকু অধিকারের

উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিচারের ভার বৃটিশ পার্লামেণ্টের অর্থাৎ বৃটিশ জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, উহাতে ভারতীয়ের কথা কহিবার কোন হাত থাকিবে না। হিন্দু-মুসলমানে মিলন বা বিরোধ, যাহাই হউক না, এ সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মিলন হয় ভালই, বৃটিশ জনসাধারণ সে কথা স্মরণ রাখিয়া, শাসনে বৃটিশ-চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া যতটুকু অধিকার দেওয়া দেশকালপাত্রোপযোগী মনে করেন, ততটুকু অধিকার প্রদান করিবেন। যদি বিরোধ হয়, তাহা হইলে সেই অধিকারটুকু দান করিবার পক্ষেও অন্তরায় উপস্থিত হইবে।

কিন্তু লর্ড রেডিং বা তাঁহার মতাবলম্বী সাম্রাজ্যবাদী শাসক-জাতির লোক যাহাই বলুন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মুক্তির অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, ইহা দানের সামগ্রী নহে। এই মুক্তি-ধন পাইতে হইলে জাতিকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া লইতে হয়। হিন্দু-মুসলমানে প্রকৃত মিলন হইলে কেহ ভারতীয়কে মুক্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। সে মিলন কাগজে-কলমে চুক্তি বা প্যাক্ট করিলে হয় না, সে মিলন ঘটাইতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হয়। উভয় সম্প্রদায়ই শক্তি সঞ্চয় করিয়া একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে। এই হেতু ভারতবাসিমাত্রেরই এখন গ্রামগঠন ও জনসাধারণের জাগরণবিধান করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। সে বিষয়ে ভারতবাসী সফলকাম হইলে দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ থাকিবে না, পরন্তু তাহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইবে না।

আপনি মোড়ল

"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!" সার আবদর রহিম আলিগড়ে যে বারুদের স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্ধন সংযোগও হইয়াছে। তাঁহার লীলাখেলা তাহার পর বাঙ্গালায়ও প্রকট হইয়াছে। তিনি একাই এক শত। এখন আবার তাঁহার এক দোসর জুটিয়াছেন,—তিনি মিঃ গজনবি। ইঁহারা উভয়ে বাঙ্গালায় মুসলমানপক্ষের বক্তা ও নেতা সাজিয়াছেন। এ পদে ইঁহাদের কে বসাইল, জানা যায় নাই, বরং কোনও কোনও মুসলমান সার আবদরকে নেতা বলিয়া মানিতেই চাহিতেছেন না। স্থানীয় কোনও দৈনিক মুসলমান পত্র ত তাঁহাকে একেবারেই নেতার পদে বসাইতে চাহেন না, বরং বলিতেছেন, মুসলমানপক্ষের হইয়া কথা বলিবার অধিকার তাঁহার আদৌ নাই। মিঃ গজনবিও হঠাৎ বর্ষার ব্যাঙ্গের ছাতার মত মুসলমান-সমাজের অঙ্গে গজাইয়া উঠিয়াছেন। এত দিন তাঁহার বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজে বক্তা ও নেতারূপে কোনও স্থান ছিল বলিয়া কেহ জানে না। কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলন প্রবর্ত্তনকালে যেমন বহু মওলানা ও মৌলভী গজাইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই কলিকাতার দাঙ্গার পর হইতে তিনিও সার আবদরের সঙ্গে হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছেন। মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজিবে কি না, এ সম্বন্ধে ইঁহারা মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে ফতোয়া জারি করিতেছেন। দাঙ্গার সময়ে কোন কোন অজানা অচেনা মুসলমানকে হঠাৎ নেতা সাজিয়া মুসলমান পল্লী ও মসজেদে ঘুরিতে ফিরিতে দেখা গিয়াছে। সার আবদর ও মিঃ গজনবিও এ রসে বঞ্চিত ছিলেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। মিঃ গজনবি আবার লাটপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভ পর্য্যন্ত নানা স্থানে মসজেদের সম্মুখে বাজনার কথা লইয়া নেতৃত্ব করিয়াছেন। এখন আবার ইঁহারা উভয়ে জোড়ে সংবাদপত্রের স্তম্ভে জাহির হইয়া পঞ্জাবের মুসলমান নেতা ডাক্তার সয়িফুদ্দিন কিচলু এবং বাঙ্গালার কৃতবিদ্য মৌলভী আবদুল করিমের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন এবং বাঙ্গালা ও তথা অন্যান্য স্থানের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ডাক্তার বা মৌলভী যাহা বলিতেছেন, তাহা মুসলমান-সমাজের কথা নহে, বরং তাঁহারা নিজে যাহা বলিতেছেন, তাহাই মুসলমান-সমাজের অন্তরের কথা—কোরাণের বাক্য। ডাক্তার কিচলু ও মৌলভী আবদুল করিমের অপরাধ, তাঁহারা সার আবদর ও মিঃ গজনবির মনের মত কথা বলেন নাই, বরং তাহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। শুনা যায়, ময়মনসিংহে ডাক্তার কিচলু বলিয়াছেন,—

(১) তিনি মুসলমান-নির্ব্বাচনমণ্ডলীতেও মিশ্রিত নির্ব্বাচন (অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত নির্ব্বাচন) চাহেন,

(২) মসজেদ বা মন্দির ভগ্ন হওয়াটা একটা বিশেষ প্রয়োজনের সমস্যার কথা নহে,

(৩) ক্রীতদাসদিগের কোন ধর্ম্ম নাই।

মৌলভী আবদুল করিমও না কি বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্যে মুসলমানরা কখনও আপত্তি করে নাই।

আর যায় কোথা! ইহাতেই রহিম ও গজনবি সাহেবের ক্রোধবহ্নি ঘৃতাহুত হুতাশনের মত চটচটা রবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে গজনবি-রহিমমিশ্রিত ফতোয়া বাহির হইয়াছে যে, উহা ডাক্তার কিচলু ও মৌলভী আবদুল করিমের ব্যক্তিগত অভিমত, ঐ অভিমতের সহিত বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজের কোনও সম্পর্ক নাই; বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজ ঠিক উহার বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। কেবল ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কিচলু ও মৌলভী করিমের উদ্দেশ্যের প্রতিও কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঞ্জিম আন্দোলন প্রচারকল্পে সকল সম্প্রদায়ের রাজনীতিকের মন যোগাইবার জন্য এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ডাক্তার কিচলু ও মৌলভী করিম 'মনে এক মুখে আর' করিয়া অপর সম্প্রদায়ের লোককে এই অভিমতের প্রলোভন দেখাইয়া তাঞ্জিমের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কেন, ডাক্তার কিচলু বা মৌলভী করিমের স্বাধীন মত বলিয়া কি কোনও দ্রব্য থাকিতে নাই? উহা কি রহিম-গজনবি কোম্পানীর একচেটিয়া সম্পত্তি? রহিম গজনবির মত লোকের মুসলমান নেতারূপে মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে কথা কহিবার অধিকার ডাক্তার কিচলু বা মৌলভী করিম হইতে কিসে বড়? রহিম-গজনবি এ যাবৎ মুসলমান-সমাজের হইয়া কি কায করিয়াছেন, ঐ সমাজের কি উপকার করিয়াছেন? ডাক্তার কিচলু খেলাফৎ আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ পঞ্জাবে কাহা করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য—দেশের জন্য কারাবরণ করিয়াছেন। আপনার সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ নিয়োগ করিয়া খেলাফৎ আন্দোলন সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রহিম-গজনবি এ সকল কাযের কোন্‌টা করিয়াছেন? তবে যদি বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজ এই প্রকৃতির 'ভুঁইফোঁড়' নেতাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

স্বরাজ্য দলের ভাঙ্গন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণনগরেই বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলের ভাঙ্গন আরম্ভ হইল। এখন দেখিতেছি, সে কথা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে স্বরাজ্য দলপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও তাঁহার প্রধান সহচরবর্গের মধ্যে মতবৈধ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু স্বরাজ্য-দলীয় লোক তাঁহার নেতৃত্বাধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছেন; পরন্তু বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সভার আমূল

পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহার মতাবলম্বীদিগের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে জয় হইয়াছে, তাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের আইনানুগ ও ন্যায়সঙ্গত। অপর পক্ষ বলিতেছেন, যতীন্দ্রমোহন যাহা করিয়াছেন, তাহা আইনানুগ নহে, পরন্তু তিনি গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁহার স্বৈরাচারমূলক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; নির্ব্বাচনের স্থলে মনোনয়ন আনয়ন করিয়াছেন। এই মত-বিরোধের এই স্থানেই অবসান হয় নাই। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবর্ত্তিত স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রের মূলনীতি পর্য্যন্ত ইহার তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে; ফলে পত্রের সম্পাদক পদত্যাগ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ ৫ জন ডিরেক্টার পত্রের মূলনীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদপত্রে যতীন্দ্রমোহন ও অপর পক্ষের বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষই আপন আপন যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপর পক্ষ অন্যায় করিয়াছেন। ফল কথা, স্বরাজ্য দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এ ভাঙ্গনের ফল যে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনে ও তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার কর্ম্মীদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে এই কথা বলিতেছেন। এই কর্ম্মিদলের মধ্যে কয়েক জন ভূতপূর্ব্ব আটক আসামী আছেন। কৃষ্ণনগর সম্মেলনের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, যাহারা বিপ্লববাদের সহিত সংশ্লিষ্ট—যাহারা 'অন্ধকারে' কায করে, তাহাদিগকে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখিতে হইবে। ইহাই প্রথম বিরোধের সূত্রপাত। ফলে সভাপতি সভা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিরোধী দল সভার কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহন সেই সভাকে নিয়মানুগ নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া সদলবলে সভাস্থল ত্যাগ করেন। তখন হইতেই ভাঙ্গন পাকাপাকি হইয়া যায়।

তাহার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন। কেহ কেহ বলেন, যতীন্দ্রমোহন মফস্বলের সদস্যের ও মুসলমান সদস্যের ভোটের জোরে সেই অধিবেশনে জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এক দিকে যেমন তিনি বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার শক্তিক্ষয় হইয়াছে; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচরণ গোস্বামী প্রমুখ স্বরাজ্য দলের প্রধান সেনাপতিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। যে পঞ্চ জন স্বরাজ্য-সেনানী দলপতির বিপক্ষে বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য নহেন, তাঁহাদের উদ্যোগে ও সাহায্যে স্বরাজ্য দল এত দিন দৃঢ়মূল ও শক্তিশালী হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের দলপতিত্যাগ দলের পক্ষে অল্প অনিষ্টকর নহে।

যে ক্ষণজন্মা শক্তিশালী বিরাট পুরুষ নিজের অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠনের শক্তির বলে স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অভাব স্বরাজ্য দলে সম্যক্ অনুভূত হইতেছে। তিনি এক দিন অপ্রতিহতশক্তি ও অবিসংবাদী নেতৃরূপে বাঙ্গালার তিনটি প্রধান পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একরূপে তিনি কাউন্সিলের স্বরাজ্য দলের নেতা, অন্যরূপে কলিকাতার মেয়র এবং তৃতীয়রূপে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষসিংহের পক্ষেই এই তিন পদে যোগ্যতা-প্রদর্শন সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার সহচর অনুচররা তাঁহার কিরূপ গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাহা সকলেই বিদিত। মিঃ হাসান সুরাবর্দ্দীর মত লোকও তাঁহাকে পিতা ও গুরুর ন্যায় দেখিতেন। তাঁহার আদেশ স্বরাজ্যদলীয় লোকের নিকট আইন বলিয়া স্বীকৃত হইত। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্গালার Dictator বা নিয়ামক হইয়াছিলেন। গণতন্ত্রমূলক নীতির পরিবর্ত্তে স্বৈরাচারমূলক নীতি যতীন্দ্রমোহন অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া আজ যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে, এক দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উহাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচর ও শিষ্য-সেবকরা অবিচারিতচিত্তে তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহনও তাঁহার পূর্ব্বতন স্বরাজ্য দলপতির ন্যায় কলিকাতার মেয়র, কাউন্সিলে লিডার এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট। স্বরাজ্য দলই তাঁহাকে এই সকল পদে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ সেই স্বরাজ্য দলের প্রধান সেনানীরা তাঁহাকে স্বৈরাচারী বলিয়া তাঁহার নেতৃত্ব অস্বীকার করিতেছেন! ইহাকে 'প্রকৃতির পরিহাস' কি বলা যাইতে পারে না? সুতরাং যতীন্দ্রমোহন স্বৈরাচারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যে স্বরাজ্য দলে বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহা বলা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, যতীন্দ্রমোহনের নির্ব্বাচন প্রথমাবধি স্বরাজ্য দলের প্রধান সেনানীদিগের মনঃপূত হয় নাই, কেবল মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা যাইতে চাহেন নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর দেহান্তরের পর মহাত্মা গন্ধী যতীন্দ্রমোহনকেই তাঁহার পরিত্যক্ত স্বরাজ্য-সিংহাসনে বসাইয়া স্বরাজ্য দলের ভাঙ্গন রক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা বাঙ্গালার সকলেই জানেন। বস্তুতঃ যতীন্দ্রমোহনের সমতুল যোগ্য ব্যক্তি তখন বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলে অন্য কেহ থাকিলে মহাত্মা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিতেন না। মহাত্মা দেশবন্ধুর সাধে গড়া স্বরাজ্য দলের মঙ্গলকামনা করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরাজ্য দলের বহু সেনানী তখন ঔষধ বলিয়া যাহা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা আর উদরে রাখিতে চাহিতেছেন না। তাহারই ফলে এই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সকল কারণে এ ভাঙ্গন উপস্থিত হয় নাই। ভাঙ্গন যে হইবেই, তাহা ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা গন্ধী বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় যাঁহারা কাউন্সিলের কার্য্য-সাফল্যে সন্দিহান, তাঁহারাও তাহা জানিতেন। আজ না হউক, দুই দিন পরে এ ভাঙ্গন ধরিতই। যাহা সত্য পথ নহে, তাহা দুই দিন লোক অনুসরণ করিতে পারে,—দুই দিন তাহার মোহে আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন পারে না। কাউন্সিলের মোহ আমাদিগকে গ্রাম ও জাতিগঠন কার্য্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, দেশকে প্রস্তুত হইতে দিবার পথে বাধা দিয়াছে। আজ কাউন্সিলের মরীচিকায় আকৃষ্ট হইয়া আমরা সাম্প্রদায়িক কলহদ্বন্দ্বে উন্মত্ত হইয়াছি, চাকুরীর এঁটো-কাটা ও ভোটের টুকরা-টাকবার লোভে প্রকৃত জাতিগঠনের কথা বিস্মৃত হইয়াছি। এ মিথ্যা মেকী কয় দিন চলিতে পারে? আজ তাই পঞ্চ স্বরাজ্য-সেনানীর মুখে গ্রামগঠনের কথা শুনা যাইতেছে, তাঁহারা এ দিকে যতীন্দ্রমোহনের ত্রুটির কথা তুলিয়া নূতন উদ্যমে স্বরাজ্য দলকে গ্রামগঠনে উদ্যোগী করিবার সুর তুলিয়াছেন!

ইহার পর জানা গিয়াছে যে, উভয়পক্ষে একটা আপোষ-রফা হইয়া গিয়াছে। এ রফা যদি স্থায়ী হয় এবং উভয়পক্ষ একযোগে গ্রামগঠনে অবহিত হয়েন, তাহা হইলে দেশের ও দশের মঙ্গল হইতে পারে।

জেলে হত্যার বিচার

গত ২৮শে মে তারিখে আলিপুর জেলে গোয়েন্দা পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিহত হইয়াছেন। সেই অপরাধে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত কয় জন কয়েদীর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারকরা আসামীদের মধ্যে ৩ জনের (১। অনন্তহরি মিত্র, ২। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন এবং ৭ জনকে (১। হরিনারায়ণ চন্দ, ২। নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়,

৩। ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৫। রাখালচন্দ্র দে, ৬। অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, ৭। সুধাংশু চৌধুরী) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড দিয়াছেন। জেলের মধ্যে পূর্ব্বে একবার বোমার বাগানের কয়েদীদিগের দ্বারা নরেন গোস্বামী নিহত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে আসামী কানাই ও সত্যেন্দ্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

নিহত পুলিস কর্ম্মচারী ভূপেন্দ্র বাবু যখন ঘটনার দিন অপরাহ্ণ প্রায় ৬॥ টার সময় 'বোমা'র কয়েদীদের' প্রাঙ্গণ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন উক্ত আসামীরা পরামর্শ করিয়া দ্বারের দিকে ছুটিয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে ৪ জন জেল ওয়ার্ডার রামরাজ পাঁড়েকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে, ১ জন তাহার নিকট হইতে চাবী কাড়িয়া লইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করে, অবশিষ্ট কয় জন ভূপেন্দ্র বাবুকে সাংঘাতিক প্রহার করে, প্রহারের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়,—ইহাই অভিযোগ।

ভূপেন্দ্র বাবুর ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস-কর্ম্মচারীর প্রাণনাশ অতীব গর্হিত কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুর দৃষ্টিতে নরহত্যাই পাপ, বিশেষতঃ, এরূপভাবে নৃশংস নরহত্যা হিন্দু কখনই সমর্থন করে না। সুতরাং যাহারা ভূপেন্দ্র বাবুকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া সমাজের পক্ষে নিশ্চিতই প্রয়োজন।

কিন্তু কথা এই, যাহারা 'বিশেষ বিচারালয়ে'র সিদ্ধান্ত অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা যথার্থ অপরাধী কি না—তাহাদের অপরাধ উপস্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে কি না। যে দণ্ডের ফলে ৩ জন যুবকের ফাঁসী-কাষ্ঠে জীবন অবসান হইবে এবং অপর ৭ জন যুবক যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হইবে, সে দণ্ড উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলে জনসাধারণ সন্তোষ লাভ করিবে, অন্যথা নহে।

এ বিচারে আইনের মারপেঁচ লইয়া তর্ক তুলিবার প্রয়োজন নাই সত্য ঘটনার পরিপোষক সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। সাক্ষ্য দুই প্রকারের,—(১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ, (২) ঘটনার সহিত সংবদ্ধ অনুমানমূলক প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে বিচারকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, অনুমানমূলক (circumstantial evidence) প্রমাণের উপর তদপেক্ষা অধিক নির্ভর করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছে ৩ জন সাক্ষী, তন্মধ্যে ওয়ার্ডার রামরাজ পাঁড়ে প্রধান এবং য়ুরোপীয় কয়েদী হাফহাইড ও ক্যাম্বেল রজার্স অন্য ২ জন।

প্রধান সাক্ষী ওয়ার্ডার রামরাজের সাক্ষ্যে প্রকাশ ;—

(১) অনন্ত ও ধ্রুবেশ তাহার নিকট চাবী চাহিয়াছিল, কিন্তু সে চাবী দেয় নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে খানাতল্লাস করে এবং রাখাল তাহাকে ভূতলে পাতিত করে, (২) সুধাংশু তাহার পকেট হইতে চাবী লইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করে, (৩) তাহার বাঁশীর আওয়াজে অনন্তহরি তাহার বুকে পা রাখিয়া বাঁশী কাড়িয়া লয়, (৪) হরিনারায়ণ দ্বার রক্ষা করিতে থাকে, (৫) প্রমোদ প্রমুখ ৫ জন বাহির হইয়া যায়, (৬) ৪ জন তাহাকে ধরিয়া রাখে এবং ১ জন দ্বারে পহরা দেয়।

য়ুরোপীয় কয়েদী হাফহাইড সাক্ষ্যে বলিয়াছে,—সে দেখিয়াছে, ৩ জন লোক নিহত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে ৩ জন (১) অনন্তহরি, (২) দেবীপ্রসাদ ও (৩) প্রমোদ।

অন্যতম য়ুরোপীয় কয়েদী রজার্স সাক্ষ্যে বলিয়াছে, ৪ জন লোক নিহত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে ৪ জন (১) অনন্তহরি, (২) বীরেন্দ্র, (৩) দেবীপ্রসাদ, (৪) হরিনারায়ণ।

ওয়ার্ডার বলিতেছে, অনন্তহরি তাহার বুকে পা রাখিয়া চাবী কাড়িয়া লয়, হরিনারায়ণ দ্বার রক্ষা করিতে থাকে এবং প্রমোদ প্রমুখ ৫ জন বাহির হইয়া যায়। অথচ য়ুরোপীয় কয়েদীরা সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাহারা অনন্তহরিকে নিহত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়াছে। ওয়ার্ডার বলিতেছে, হরিনারায়ণ দ্বার রক্ষা করিতে থাকে, অথচ য়ুরোপীয় কয়েদী রজার্স বলিতেছে, সে হরিনারায়ণকে নিহত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়াছে।

য়ুরোপীয় কয়েদীরা উভয়েই অনন্তহরি ও দেবীপ্রসাদকে আক্রমণকারী বলিয়া সনাক্ত করিতেছে, অথচ হাফহাইড বীরেন্দ্র ও হরিনারায়ণকে সনাক্ত করিতে পারে নাই এবং রজার্স প্রমোদকে সনাক্ত করিতে পারে নাই।

৩ জন সাক্ষীই প্রত্যক্ষদর্শী। তবে তাহাদের সাক্ষ্যে এত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় কেন ?

ওয়ার্ডার রামরাজের নিকট যখন কয়েদীরা চাবী চাহে, তখন সে বাঁশী বাজাইয়া আশু বিপদের কথা অন্য ওয়ার্ডারকে জানায় নাই কেন ? যখন কয়েদীরা তাহাকে চাবীর জন্য খানাতল্লাস করে, তখনও সে নীরব ছিল কেন ? তাহার পকেট হইতে চাবী সংগৃহীত হইলেও সে বাঁশী বাজায় নাই। দ্বার মুক্ত হইবার পর সে বাঁশী বাজায়। রামরাজ পুলিস ইনস্পেক্টর হইতে আরম্ভ করিয়া আদালত পর্য্যন্ত নানা প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে, এরূপ সাক্ষীর কথা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য ?

য়ুরোপীয় কয়েদীরা ঘটনার দিনে রাত্রিকালে কোন কথা বলে নাই। এত বড় একটা বীভৎস কাণ্ড তাহাদের সমক্ষে ঘটিয়া গেল, অথচ যখন তাহাদিগকে রাত্রিবাসের জন্য কোটরে (cell) রুদ্ধ করা হইল, তখন তাহারা কাহাকেও এ কথা বলিল না, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে ? আরও এক আশ্চর্য্যের কথা, এই কয়েদী সাক্ষীরা সম্মুখে খুন দেখিয়াও চীৎকার করে নাই বা কাহাকেও ডাকে নাই।

ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছেন, অন্ততঃ দুই প্রকার অস্ত্রে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। অথচ এক প্রকার অস্ত্রের এ যাবৎ কোনও সন্ধানই হয় নাই। জেলের কড়া পাহারার মধ্য হইতে উহা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল ? বিচারকরা স্বয়ং সরকারপক্ষের এ ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

আর এক অস্ত্র কোবার বা সাবল। এখানা হত্যার পর আসামীদের হস্তে কেহ দেখে নাই। হত্যার ২ দিন পরে আসামীদের কোটরের নিকট উঠান খুঁড়িয়া ঐ অস্ত্র পাওয়া যায়। হত্যার পরেই আসামীরা কখন উহা ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিবার সময় পাইল, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। লুকাইতে গেলে ওয়ার্ডার নিশ্চয় দেখিতে পাইত। আরও একটা আশ্চর্য্য কথা, আসামীদিগকে ২৯শে মে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়, আর ৩০শে মে অস্ত্র খুঁড়িয়া বাহির করা হয়। ইহা কি বিশেষ সন্দেহজনক নহে ? আসামীপক্ষের কাউন্সেল বলিয়াছেন, উঠানের ঠিক এক স্থানে খুঁড়িয়া অস্ত্র বাহির হইয়াছিল, নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। ইহাও কি সন্দেহজনক নহে ? এরূপ সাক্ষ্য দেখিয়া কি মনে হয় না যে, সাবলখানা হত্যাব্যাপারে হয় ত আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই ?

রাসায়নিক পরীক্ষক আসামীদের বস্ত্রে রক্তের দাগ দেখিতে পায়েন নাই। স্বয়ং জেলার ঘটনার পর ২।৩ মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত হয়েন, তিনিও তাহাদের রক্তের দাগ লুকাইতে দেখেন নাই। তবে তাহাদের কাপড় ভিজা ছিল বটে। বিচারকরা ইহাতে সন্দেহান্বিত হইয়াছেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণে কয়েদীরা স্নান করিতে বা গা ধুইতেও ত পারে। ইহাতে কাপড় ভিজা বিস্ময়ের কথা নহে।

ফল কথা, আসামীদের বিপক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে। যেখানে মানুষের জীবন-মরণ লইয়া খেলা, সেখানে এরূপ সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকিলে আসামীদিগকে অন্ততঃ সন্দেহের সুযোগ (Benefit of doubt) দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। সে হিসাবে দণ্ডের কঠোরতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের মনে হয়, আসামীদের প্রতি সুবিচারের অভাব হইয়াছে। সুতরাং যেরূপেই হউক, তাহাদের পুনর্বিচার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণই আছে।

বিরোধের প্রয়াস কেন ?

সক্কর সহরে সিন্ধুপ্রদেশের খেলাফৎ কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সিন্ধুদেশের মুসলমানরা অতঃপর হিন্দুর নিকট হইতে কোনওরূপ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবেন না। এতদ্ব্যতীত অপর একটি প্রস্তাবে ধার্য্য হইয়াছে যে, উক্ত কনফারেন্স নিখিল ভারতীয় খেলাফৎ কমিটীকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিবেন যে, শেষোক্ত কমিটী যেন ভারতের সর্ব্বত্র ঔরঙ্গজেবের অভিষেকোৎসব এবং মহম্মদ বিন কাসিম কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের বাৎসরিক উৎসব প্রবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করেন।

সিন্ধুপ্রদেশের মুসলমানদিগের এ প্রচেষ্টার মূলে হিন্দুদিগের সহিত একটা চিরন্তন বিচ্ছেদ ও বিরোধের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কেবল সিন্ধুপ্রদেশে নহে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশেও অনেক স্থানে হিন্দুদিগের সহিত সম্পর্ক রহিত করিবার একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে বলিয়া আমরা জানি। এ চেষ্টা কোথাও ব্যক্ত, কোথাও বা গুপ্ত—ফল্গুস্রোতের ন্যায় অন্তঃসলিলা। এই সহর কলিকাতার কোনও কোনও মুসলমান পল্লীতে হিন্দু মুদী, হিন্দু ময়রা, হিন্দু গোপ ইত্যাদি ব্যবসাদারের দোকান হইতে খাদ্যাদি ক্রয় করা নিষিদ্ধ হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। কোথাও কোথাও মুসলমান দোকানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু যেখানে এই প্রবৃত্তির ভিত্তি জাতিগত বিদ্বেষ বা হিংসা, সেখানে উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বহুকাল যাবৎ হিন্দু-মুসলমান এ দেশে সদ্ভাব ও সম্প্রীতিতে বসবাস করিয়া আসিয়াছে, প্রতিবেশিরূপে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে। আজ রাজনীতির গন্ধবিশিষ্ট ধর্ম্ম বিরোধের ক্ষণিক উত্তেজনার ফলে এই যে সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইতেছে, ইহার পরিণাম কোথায়, তাহা কি এই বিরোধের উত্তেজকরা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল বাঙ্গালার কথায় বলা যায়, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর না করিলে এক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। অথচ এই বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে মন্দ অভিসন্ধির প্রচারক গোপনে নিরীহ নিরক্ষর পল্লীবাসিগণের মনে বিরোধের বিষ ছড়াইতেছে; কোথাও বা তাহাদের বিষের-বীজ ফলপ্রদ হইতেছে, কোথাও বা অঙ্কুরে নষ্ট হইতেছে, কিন্তু এ প্রচেষ্টা কেন? সামান্য দুই চারিটা সরকারী চাকরী বা কাউন্সিলের নির্ব্বাচনের লোভে এই বিষ বিসর্পিত করা কি দেশের পক্ষে—হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে মঙ্গলকর হইতেছে? মফঃস্বলে কৃষক, দিনমজুর বা জোলা নিকিরি মুসলমানের হিন্দু নিয়োক্তা বা খরিদদার না হইলে চলে না। হিন্দুরা এ সকল কাযে মুসলমানকে পরিত্যাগ করে নাই। সহরে কোচম্যান, গাড়োয়ান, কুলী-মজুর, মিস্ত্রী-দরজী মুসলমানকেও হিন্দু বাঙ্গালী বর্জ্জন করে নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বাঙ্গালী হিন্দু সে বিরোধের কথা অন্তরে পুষিয়া রাখে নাই। উত্তেজনার কালে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই উভয় পক্ষের কর্ত্তব্য। হিন্দু বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তবে অপর পক্ষে এ প্রচেষ্টা কেন?

নিজের ধর্ম্ম বা মান-ইজ্জৎ রক্ষা করা পুরুষের লক্ষণ। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। আমরা এ জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে পরস্পর দ্বেষ-হিংসা বা বিরোধ-বিসংবাদ চিরতরে পাকাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি আসে কেন? কাহারও ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করা বা কাহারও ধর্ম্মে আঘাত প্রদান করা হিন্দু-বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা হিন্দুর দ্বারা মসজেদ ভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু এ যাবৎ বাঙ্গালার কোনও মুসলমান নেতাকে মন্দিরভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে শুনি নাই। ডাক্তার কিচলু পঞ্জাব হইতে এ দেশে আসিয়া এই প্রতিবাদ না করিলে বোধ হয়, বাঙ্গালায় মন্দিরভঙ্গের প্রতিবাদ মুসলমানের মুখে শুনা যাইত না। ইহার কারণ কি? এই ভাবে জাতি বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিয়া দেশের কি মঙ্গল সাধিত হইতেছে?

আমাদের কোনও শ্রদ্ধেয় কৃতবিদ্য মুসলমান মৌলভী বন্ধু আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে গির্জ্জা, মন্দির, সিনাগগ প্রভৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে উপদেশ আছে। মসজেদের কথা কোরাণে সর্ব্বশেষে আছে। এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ডাক্তার কিচলু বলিয়াছেন, কোরাণে সকল ধর্ম্মস্থানের মর্য্যাদারক্ষা করিবার কথা আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুসলমানপক্ষের যাঁহারা নেতৃরূপে প্রকট হইয়া এ যাবৎ মন্দিরভঙ্গের বিপক্ষে আন্দোলন করেন নাই, তাঁহারা কি তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছেন? তাঁহাদিগকে নেতা বলিয়াও বা মুসলমান-সমাজ স্বীকার করেন কেন? হিন্দুদিগের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ ও দ্বেষ-হিংসাই কি ইহার কারণ?

এরূপভাবে বিরোধ পাকাইয়া তুলিয়া লাভ কি? সিন্ধুদেশের মুসলমান খেলাফতীরা ঔরঙ্গজেবের ও কাসিমের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে আকবরের ন্যায় উদারহৃদয় বাদশাহদের স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস না পাইয়া এ প্রচেষ্টা কেন? যাঁহারা হিন্দু-মুসলমান-মিলনে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া মুসলমানের হস্তে হিন্দুর পরাজয় ও লাঞ্ছনার স্মৃতিপূজার এ আয়োজন কেন? ইহাতে কি জাতি-বিদ্বেষ হইতেছে না?

হিন্দুরা যে শিবাজী বা প্রতাপাদিত্যের স্মৃতিপূজার উৎসব করে, সেই শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য নিজরাজ্যে হিন্দু-মন্দিরের সহিত মুসলমান মসজেদও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মুসলমান মক্তব স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিধ উপায়ে হিন্দুর ন্যায় মুসলমান প্রজার হিতসাধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ন্যায় প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার বিদ্বান্ মুসলমানের গুণের পুরস্কারস্বরূপ জায়গীর দান করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণও আমরা দেখাইতে পারি। কিন্তু ঔরঙ্গজেব অথবা কাসিম হিন্দুর কি উপকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সিন্ধুদেশের খিলাফতীরা দেখাইতে পারেন কি? তবে তাঁহাদের স্মৃতি পূজার জন্য এত উদ্যম—এত আয়োজন কেন? তাঁহারা হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু ছিলেন বলিয়া কি? তাঁহারা আবার ভারতে হিন্দু-মুসলমানে একটা বিষম বিরোধ পাকাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে হইবে কি?

মসজেদের সম্মুখে গীত-বাদ্য

বাঙ্গালা সরকারের ইস্তাহারে কলিকাতায় মসজেদের সম্মুখে গীত-বাদ্যের যে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। চতুর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ বলিতেছেন, যখন কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তখন ব্যবস্থা যে নিরপেক্ষ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অদ্ভুত যুক্তির মর্ম্ম পাওয়া ভার! তাঁহাদের যুক্তি এই যে, Compromise বা একটা মাঝামাঝি পথ যখন হিন্দু মুসলমান স্বয়ং খুঁজিয়া পাইল না, তখন সরকার তাহা বাহির করিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এই Compromise কথাটা যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই, অথবা থাকিলেও তাহা স্বার্থের খাতিরে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ইতোমধ্যেই এই Compromiseরূপ অস্ত্রের জোরে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুর গৃহদেবতার পূজার শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে অথবা সত্যনারায়ণ-পূজার বাজনায় প্রতিবেশী মুসলমান আপত্তি উত্থাপন করিতেছে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু Concessionএর উপর Concession করিয়া আসিতেছে,

কিন্তু অপর পক্ষের আকাঙ্ক্ষার আর তৃপ্তি নাই, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের উহা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার পর ইহার পরিণতি কোথায় হইবে, তাহা কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমালোচকরা বলিয়া দিতে পারেন ?

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, এ দেশের এক শ্রেণীর হিন্দু রাজনীতিক সংবাদপত্রের মারফতে হিন্দুদিগকে এই 'তুচ্ছ' ব্যাপারে মুসলমানদিগকে ক্ষমাঘৃণা করিয়া কিছু কিছু অধিকার ছাড়িয়া দিতে এবং তাহার ফলে উৎকোচস্বরূপ মুসলমানের মন পাইতে উপদেশ দিতেছেন। অন্যে পরে কা কথা, দেশবাসীর শ্রদ্ধেয়া নেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নানা স্থানে বক্তৃতায় ও রচনায় এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন যে, 'বাজনাটা' নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার, উহার জন্য হিন্দু-মুসলমানে প্রীতিবর্দ্ধন ক্ষুণ্ণ করা সঙ্গত নহে। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতার আবরণে উপদেশের কদর্য্যতা আচ্ছন্ন হইলেও হিন্দুর ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্থান উচ্চ হইলেও হিন্দুর ধর্ম্মগত ও সামাজিক অধিকার নির্ণয় করিয়া দিবার পক্ষে তাঁহার অধিকার আদৌ নাই। স্বরাজ্য দলের আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনের পথ প্রস্তুত করার পক্ষে এ সকল যুক্তি সময়োপযোগী হইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে উহা অসার অন্তঃসারশূন্য বলিয়াই গৃহীত হইবে।

নজীর

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছেন যে, এ যাবৎ অবাধে মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য চলিয়া আসিয়াছে, তবে এখনও সেই চিরাচরিত আচার চলিবে না কেন ? এই প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখা কর্ত্তব্য, ইহার বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপন করা সমীচীন নহে। পণ্ডিতজীর এ কথার উত্তরে অপর পক্ষ বলিতেছেন, পণ্ডিতজী যাহা চিরাচরিত প্রথা বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ অবসানের দাবী করিতেছেন, উহা চিরাচরিত প্রথা বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং উহার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কিরূপে অবসান হইতে পারে ? তাঁহার যুক্তির মূলই যখন ভিত্তিহীন, তখন তাঁহার অভিমতের কোনও মূল্যই থাকিতে পারে না। কিন্তু সত্যই কি পণ্ডিতজীর উক্তি যুক্তিহীন ? তিনি দিল্লী সহরের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সকল মসজেদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যধ্বনিসহ শোভাযাত্রা হইত। তখন জুম্মা মসজেদের সোপানোপরি উপবিষ্ট মুসলমানরা বাদ্যধ্বনিসহ রামলীলার শোভাযাত্রা দর্শন করিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে একটা গোলযোগ হওয়ায় জুম্মা মসজেদ ও ফতেপুরী মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনিসহ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু এ যাবৎ দিল্লীর অন্য সমস্ত মসজেদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যধ্বনিসহ শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাতে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। মালবীয়জী ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বানাইয়া বলেন নাই, যাহা অতীতের প্রকৃত ঘটনা, তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। দিল্লীর ন্যায় মুসলমানপ্রধান 'বাদশাহী' সহরের জুম্মা মসজেদের ন্যায় প্রধান মসজেদের সম্মুখে যদি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামলীলার শোভাযাত্রা দেখা মুসলমানগণের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে এবং অন্যান্য মসজেদের সম্মুখে যদি বাদ্যাদিসহ শোভাযাত্রায় আপত্তি উঠিয়া না থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায়, চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মসজেদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যাদিসহ শোভাযাত্রা আপত্তিকর ছিল না। এ আপত্তির কথা আধুনিক। পণ্ডিত মদনমোহন আরও বলিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদিসহ শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দুরা এই সমস্ত পবিত্র ধর্ম্মস্থানের প্রতি কোনওরূপ অসম্মান প্রদর্শনের কথা মনে স্থান দেয় না। এ কথা সত্য। হিন্দুর পক্ষে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সকল ধর্ম্মস্থানই পবিত্র,—অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে ত বটেই। বহু হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মস্থানে পূজা দিয়া থাকে, অধিকন্তু পীরের দরগায় 'মানত' করে। সুতরাং তাহারা বাদ্যাদি দ্বারা যে মসজেদের অসম্মান করে না, ইহা নিশ্চয়। বাদ্যাদি হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া করিয়া থাকে। মুসলমানরা যদি নিরপেক্ষ বিচার করিয়া হিন্দুর পক্ষের এই কথায় কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে বিরোধের আর কোনও কারণ থাকে না।

দাতা চিরঞ্জীবতু

বারাণসী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, শেঠ গৌরীশঙ্কর গোয়েঙ্কা সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারকল্পে ৫৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পরন্তু তিনি বারাণসীতে তাঁহার পিতা ও পিতামহের স্মৃতিসম্মানরক্ষার উদ্দেশে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এ দানের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শেঠজীর নাম এ দেশের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। জ্ঞানপ্রচারের জন্য দান জগতের যে কত উপকারসাধন করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীতে ভারতে এমন দানশীল মহাজনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্ত্তমানে এ ভাবের দানের প্রবৃত্তি যেন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চ্চা এ দেশে যখন একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে, তখন শেঠজীর দান যে জনসাধারণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সাহিত্য-সাগরে যে সকল অমূল্য মণিমাণিক্য লুক্কায়িত আছে, যথাযোগ্য উৎসাহ ও উদ্যমের অভাবে তাহা অধুনা ক্রমশঃ লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া যাইতেছে। শেঠজীর দানের ফলে যদি সে সকলের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে দেশের ও দশের মঙ্গল। কি ভাবে এই বিপুল দানের অর্থ ব্যয়িত হইবে, এখনও তাহার সবিশেষ তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। তবে উহার মূল উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাহাতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। প্রধান অভাব উপযুক্ত শিক্ষকের। আশা করা যায়, সংস্কৃত জ্ঞান-প্রচারের জন্য সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সংস্কৃত শিক্ষকগণকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইবে।

বৈদিক সন্ধ্যা

সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই দুর্দ্দিনে হিন্দুকে আবার হিন্দু হইতে হইবে; কেবল মুখের কথায় হিন্দু নহে, সজীব হিন্দুধর্ম্মের সাধক, সজীব হিন্দু হইতে হইবে। যে মন্ত্রশক্তি হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ, তাহাকে আবার মূর্ত্তি দিতে হইবে, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। নৈত্যিক সন্ধ্যার তুল্য অবশ্য কর্ত্তব্য, অপরিত্যাজ্য, বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বিজ জীবনে আর কিছু নাই। সেই সন্ধ্যাকৃত্য বর্ত্তমানে অনাদৃত, পরিত্যক্ত-প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হেতু আমরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণকে আবার ঋষিপ্রদর্শিত নৈত্যিক সন্ধ্যার উদ্দেশ্য, অর্থ এবং উপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে অনুরোধ করি। এ বিষয়ে ২০নং নলগোলা ঢাকা, এস, সি আডিড এণ্ড সন্স এবং ৩৫নং সুরি লেন হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুত সোমেশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত "বৈদিক সন্ধ্যা" নামক গ্রন্থখানি বহু পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করিবে সন্দেহ নাই। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য দেহভুক আত্মাকে যে ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক, তাহার সমস্ত উপাদানই সন্ধ্যায় একাধারে বিদ্যমান। ইহা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির উদ্রেক করে। ইহার অনুশীলনে হিন্দুর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন সত্য, সুন্দর ও ধর্ম্মানুকূল হয়। এই দুর্দ্দিনে হিন্দু ১।০ টাকা মূল্য দিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানি গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন।

পরলোকে

গত ১৭ই জুন বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমোদানাথ রায় ৫৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। রাজসাহী কলেজে শিক্ষারম্ভ করিয়া পরে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাঠদ্দশায় সাবালক হইয়া তিনি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস হইতে স্বীয় জমীদারী গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা জমীদার ছিলেন বলিয়া দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেন। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় অন্যায় আইনের সমর্থন করেন নাই। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরূপে তিনি সরকারের চণ্ডনীতিমূলক ব্যবস্থাসমূহের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আজ তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশ এক জন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক এবং সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত জমীদার হইতে বঞ্চিত হইল। বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এই শোকে নিশ্চিতই সমবেদনা প্রকাশ করিবে।

রাজা প্রমোদানাথ রায়

কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রবীণ এটর্ণি নিমাইচরণ বসু পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ব্যবহারাজীব হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সৌখীন লোক ছিলেন। তাঁহার গৃহে নানাজাতীয় মূল্যবান্ কুকুর ছিল; গ্রীষ্মকালে কুকুরগুলি তাঁহার সহিত দার্জ্জিলিঙ্গ যাইত। তাঁহার পানিহাটি গ্রামস্থ গঙ্গাতটবর্ত্তী প্রাসাদোপম পৈতৃক বাসভবন যত্নাভাবে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। নিমাইচরণ কৃতী হইয়াও এ দিকে কেন অমনোযোগী ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

নিমাইচরণ বসু

গত ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন শনিবার রাত্রিকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন তাঁহার শ্বশুর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই (দেশবন্ধু গত বৎসর ১৬ই জুন তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন) তাঁহার বিধবা পত্নীর নয়নের মণি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন, ইহা যে বিধাতার কি দারুণ আঘাত, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। বাসন্তী দেবী ইন্দ্রতুল্য স্বামী হারাইয়া তবু পুত্রের মুখ চাহিয়া শোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। এখন তিনি এই দারুণ আঘাত কিরূপে সহ্য করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাই না।

চিররঞ্জন দাশ

তবে তিনি আদর্শ হিন্দু-গৃহিণী, পৃথিবীর মত সর্ব্বংসহা, এ শোকেও ধৈর্য্যধারণ করিবেন, এ আশা করিতে পারি। সমগ্র জাতি আজ তাঁহার এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, ইহাও তাঁহার পক্ষে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার কথা। চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী সুজাতা দেবীর অকাল-বৈধব্যের কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

আর এক জন কৃতী বাঙ্গালী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কৃতী চিত্রশিল্পী যোগেশচন্দ্র শীল মাত্র একত্রিংশৎ বৎসর বয়সে এ জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জুবিলি আর্ট একাডেমিতে তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ, তাহার পর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে তাঁহার শিক্ষার পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছিল। তিনি তৈলচিত্রাঙ্কনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'বোম্বাই সোসাইটী অফ আর্টস্' হইতে মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় যে 'ফাইন আর্টস সোসাইটীর' প্রদর্শনী হইয়াছিল, তিনি তাহার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও সরল প্রকৃতি সকলকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।

অনাচারের মূল কোথায় ?

মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য সমস্যা উপলক্ষে বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল কতটা বহুদূরবিসারী হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহে নিত্যই প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতায় মুসলমানরা ইতঃপূর্ব্বে টাউনহলে বিরাট সভা করিয়া মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্বন্ধে সরকারের নিদ্ধারণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে দিন হিন্দুরাও টাউনহলে তাহার পাল্টা জবাব দিয়াছেন। ফল কথা, কোন সম্প্রদায়ই যে সরকারী নির্দ্ধারণে সন্তুষ্ট নহেন, ইহাতেই তাহা জানা যাইতেছে। এ সমস্যা বহুদিনের নহে, আন্দোলনও স্বাভাবিক নহে, মনে হয়, যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক তিলকে তাল করিয়া তুলা হইতেছে। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, কোনও 'নূতন নেতা' বন্ধুবর্গের নিকট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত এই আন্দোলন জাগাইয়া রাখা হইবে, তাহার পর ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কাউন্সিলের ও মন্ত্রিত্বের মোহই এই আন্দোলনের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধনের মূল, প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রীতি ইহার মূল নহে। ডাক্তার কিচলু কলিকাতার এলবার্ট হলের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "যদি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের অতীত ইতিহাস ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে এই অনর্থ ঘটিত না।" কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন করা, তাহারা এ জ্ঞানসঞ্চয়ের অনুকূলে শক্তি নিয়োজিত করিবে কেন ? বরং তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্ধতা জাগাইয়া রাখিয়া অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। হইয়াছেও তাহাই। এই ভাবে একটা হুজুগ তুলিয়া ধর্ম্মান্ধতা জাগাইয়া তুলার ফলে বাঙ্গালার নানা স্থানে এক সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যায় অধিক অপর সম্প্রদায়ের অনাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। পাবনা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের অনাচার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুষ্টিয়ায় ৩টি হিন্দু মহিলার ইজ্জৎ নষ্ট হইয়াছে, শ্রীযুক্ত প্রতাপ গুহরায় মহাশয় কলিকাতার সংবাদপত্রে এই বিশিষ্ট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। সকল স্থানের সকল ঘটনাই যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা আমরা বলিতেছি না। কুষ্টিয়ার অনাচার সম্বন্ধে সরকারপক্ষ এক প্রতিবাদমূলক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও জানা যায়, কয়েক জন মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত লাঠিহস্তে নিরীহ তীর্থযাত্রী হিন্দু নরনারীকে আক্রমণ ও লাঞ্ছনা করিয়াছিল। সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ :—"রাত্রি ১টার সময় ১০টি হিন্দু পুরুষ ও ২১টি হিন্দুনারী ও বালকবালিকা গোড়ের পারঘাটায় (কুষ্টিয়া রেল ষ্টেশনের অপর তটে) চরের উপর অপেক্ষা করিতেছিল। ১০ জন মুসলমান বদমাস লাঠি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং ৩টি যুবতী হিন্দুনারীকে বলপূর্ব্বক ধান্যক্ষেত্রের দিকে ধরিয়া লইয়া যায়। মধু সেখ ও তাহার প্রতিবেশী মুসলমানরা তাহাদের উদ্ধারসাধন করে।"

বাঙ্গালায় যে মধু সেখের মত হৃদয়বান্ মুসলমান আছে, ইহা বাঙ্গালার সৌভাগ্য। মধু সেখ এ জন্য হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু আজ মধু সেখকে বিপন্না হিন্দুনারীকে রক্ষা করিতে হয় কেন ? বৃটিশ রাজত্বে প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ, এই কথাই শুনা যায়। এ জন্য প্রজাকে আত্মরক্ষা করিতে হয় না, কেন না, রাজাই সুশাসনের দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন বলিয়া সর্ব্বত্র গর্ব্বানুভব করা হয়। প্রজা যদি আত্মরক্ষার্থ লাঠিসোঁটা বা অন্য অস্ত্র লইয়া দলবদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহা হইলে তাহারা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ অবস্থায় এই হিন্দুযাত্রীরা নিরস্ত্র হইয়া গমন করিয়াছিল বলিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ফলে কি হইয়াছে ? জনসাধারণ যদি এই ঘটনা উপলক্ষে হতাশ হইয়া বলে, সরকারের শান্তিরক্ষক অকর্ম্মণ্য, পরন্তু সরকার প্রজাকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত করিতে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় ? যে সকল হিন্দু পুরুষ যাত্রী 'সাথী' হইয়া নারীগণকে মেলায় লইয়া যাইতেছিল, তাহারাও মনুষ্য নামের অযোগ্য। যাহারা প্রাণভয়ে নিজের নারীকে পিশাচ রাক্ষসের হস্তে ফেলিয়া পলায়ন করে, তাহারা নারী লইয়া পথে বাহির হয় কেন ? এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা তাহাদের মরণই মঙ্গল নহে কি ? এই জন্য আমরা বার বার বলি, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সকল সম্প্রদায়েরই শক্তিসঞ্চয় করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, মুসলমান গুণ্ডারা লাঠি লইয়া নিরস্ত্র হিন্দু-নরনারীকে আক্রমণ ও মারপিট করিয়াছিল, নারীর অমর্য্যাদা করিয়াছিল। কেন ? এই সকল তীর্থযাত্রী তাহাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই, তাহাদের সহিত কোনও বিবাদ-বিসংবাদও করে নাই। তবে হঠাৎ তাহারা তাহাদিগের উপর অনাচার আচরণ করে কেন ? ইহার মূলে কি কোনও গুপ্তরহস্য লুক্কায়িত নাই ? এই যে মসজেদের সম্মুখে গীত-বাদ্যের সমস্যা হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং যে সমস্যা স্বার্থপর লোক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাগাইয়া রাখিয়াছে, ইহা কি এই সকল অনাচারের মূল কারণ নহে ? ধর্ম্মান্ধতার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইলে তাহার ফল কি হইয়া থাকে ? যাহারা মেঘের আড়ালে থাকিয়া কাপুরুষের মত গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণের মধ্যে এই ভাবে ধর্ম্মান্ধতার বিষ ছড়াইতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দমন না করিলে বাঙ্গালায় অনাচারের স্রোত রুদ্ধ হইবে না, এ কথাটা সরকার বুঝিয়া রাখিলে ভাল করিবেন। কেবল দুই একটা মামলায় ক্রীড়নকদিগের দণ্ডবিধান করিলে কোন ফল হইবে না।

বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলন

গত ১১ই ও ১২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়া 'বঙ্কিম-ভবনে' উক্ত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামপ্রসন্ন তর্করত্ন মহোদয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে সম্মেলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান অধিবেশন পর্য্যন্ত কালের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করিয়া উদ্যোক্তৃগণের কর্ম্মসাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যে সকল উদ্যোগী ও উৎসাহী কর্ম্মীর প্রাণপণ চেষ্টার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বঙ্কিমের

বাৎসরিক স্মৃতিরক্ষার এমন একটি প্রতিষ্ঠান সজীব ও সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় বাঙ্গালীমাত্রেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। সম্মেলনের মূল সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও তথা তাঁহার চরিত্রচিত্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কথা-সাহিত্যের ত কথাই নাই, বঙ্কিমচন্দ্র দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ধর্ম্মের ও সামাজিক সমস্যাসাধনে যে সকল গভীর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অতুল সম্পত্তিরূপে সুরক্ষিত হইবে, সুপণ্ডিত সভাপতি মহাশয় তাহাও সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গবিজয় বর্ণনা যে ইতিহাস নহে, অলীক গল্প, তাহা যখন তিনি বিশিষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন তখন বস্তুতই সভার সজীবতা সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। এ সভা যে বার্ষিক একটা অবসর-বিনোদনের স্থান নহে, যে মহাপুরুষের স্মৃতিসম্মান রক্ষার্থ এ সভার প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী যে যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সত্য আহরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে,— ইহাতে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। আশা করি, প্রতি বর্ষে আধুনিক বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মৃতিসম্মান রক্ষার্থ বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালী এই ভাবে সমবেত হইয়া সত্য তথ্যের আবিষ্কারে ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইবে।

KRISHNAVABINI NARISIKSHA MANDIR

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির

সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত সভায় মানকুমারীর একটি কবিতা পঠিত হইয়াছিল এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরন্তু শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীর 'রামচরিত' নামক নাটকের 'লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র' সম্বন্ধে রচনার আবৃত্তি সাহিত্যিকগণকে তৃপ্তি প্রদান করিয়াছিল। বঙ্কিম-স্মৃতিপূজার সম্পাদক গুরিফানিবাসী ললিতকুমার ঘোষাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ আলমায়রা ও ৩টি র‍্যাক সমেত ৭ শত গ্রন্থ সম্মেলনকে দান করিয়াছিলেন। যিনি বাঙ্গালা ভাষাকে সজীবতা দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিপূজায় এই ভাবের দান যতই হইবে, ততই সাহিত্যের মঙ্গল।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ", এ দেশের ইহাই আদর্শ। বস্তুতঃ আর্য্য গৌরবের দিনে কন্যাকে পুত্রের মত শিক্ষিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা পিতৃগৃহে গুরুজন, মুনিঋষি ও সাধু সজ্জনের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া শিক্ষিত হইত—শিক্ষা অর্থে যে 'পাততাড়ি বগলে' করিয়া পাঠশালায় শুভঙ্করী শিক্ষা করিতে যাওয়া বুঝায়, তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রামায়ণ হইতে সীতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারি। সীতা একাধিকবার বলিয়াছেন,— "আমি গুরুজন ও সাধুসজ্জনের নিকট শুনিয়াছি, ইত্যাদি।"

সাবিত্রী বিষয়বণ্টন ব্যাপারে স্মৃতির (ব্যবহারিক) বিধি উদ্ধৃত করিয়া যে ভাবে পিতাকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বুঝা যায়, সেকালে নারী কিরূপ শিক্ষালাভ করিতেন।

কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই হেতু এখন এ দেশে নারীকে শিক্ষিতা করিবার জন্য আবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। চন্দননগরের 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির' ইহারই ফল। যে শিক্ষায় নারী একাধারে মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া সংসার, সমাজ ও দেশের কাযের উপযোগী হইতে পারে, সেই শিক্ষা দেওয়া এবং সাধারণ ভাবে নারীজাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতির সাহায্য করাই এই নারীশিক্ষা-মন্দিরের উদ্দেশ্য। এই মন্দিরে সাধারণ ও পুরস্ত্রী নামক দুইটি শিক্ষা বিভাগ থাকিবার কথা; সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরমধ্যে একটি ছাত্রীনিবাসও থাকিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তুলির কায, অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, clay modelling, সেলাই, অর্থকরী ছোট ছোট শিল্প, সূতাকাটা (চরকায়), রন্ধন, রোগীর পরিচর্য্যা, সন্তানপালন, গার্হস্থ্য নীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবের শিক্ষামন্দির এখন কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাতৃজাতির উন্নতি না হইলে জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হয় না। এ জন্য আমরা চন্দননগরের এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই নারীমন্দির-সংক্রান্ত নিয়মাবলী জানিতে হইলে "সম্পাদিকা, আশ্রম বিভাগ, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দির, চন্দননগর," এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

গুরুঠাকুর

১

গোবিন্দপুরের মৈত্রেরা সাত পুরুষ ধরিয়া গুরুগিরি ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় তাঁহারা কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া গুরুগিরির 'ট্রেড মার্ক'স্বরূপ 'অধিকারী' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই উপাধিটি তাঁহাদের বারেন্দ্র-সমাজে তেমন সম্মানজনক না হইলেও, পল্লীসমাজে গুরুগিরি-ব্যবসায়ের সম্মান অল্প ছিল না। এই ব্যবসায়ের মূলধন কয়েকটি মন্ত্র, কিন্তু উপার্জ্জন অপরিমিত! বৎসরান্তে শিষ্যগৃহে পদার্পণ করিয়া শিষ্য ও শিষ্যপত্নীর মস্তকে পদাঙ্গুলী স্পর্শ করিলে তাহারাও কৃতার্থ হইত, গুরুঠাকুরও সংবৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। যে তল্পিদারটি তাঁহাদের সঙ্গে শিষ্যগৃহে যাইত, বিভিন্ন শিষ্য-প্রদত্ত 'বিদায়ে'র ভার তাহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইলে, গুরুঠাকুর মহিষের গাড়ী (গরু ভগবতী,- গোশকটে আরোহণ ম্লেচ্ছাচার) ভাড়া করিয়া সেই বিপুল দ্রব্যসম্ভার গৃহে লইয়া যাইতেন। গৃহবিগ্রহ মদনমোহনের নিত্যসেবা, পুত্রের উপবীত, কন্যার বিবাহ, পিতামাতার 'বছরকি' প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম ও পার্ব্বণাদির সকল ভার শিষ্যরাই অম্লানবদনে বহন করিত। তাঁহারা বলিতেন—শিষ্যরাই তাঁহাদের জমীদারী। কিন্তু এই জমীদারী বজায় রাখিবার জন্য সরকারকে খাজনা, টেক্স, শেস্ প্রভৃতি কিছুই দিতে হইত না। শিষ্যগৃহে দুধ, ঘি, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন প্রভৃতি উপাদেয় গব্যরস সেবা করিয়া গুরুঠাকুরের উদরের পরিধি ক্রমেই শশিভূষণের মানচিত্রস্থিত ভূ-গোলকার্দ্ধের আকার ধারণ করিত।

কিন্তু সে কাল আর নাই। এ কালে পল্লী অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থগণের সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিবন্ধন গৃহস্থালীর ব্যয় প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু আয়বৃদ্ধির উপায় নাই। পল্লীগ্রামে বৎসরের অধিকাংশ সময় বার আনা মাছের সের, পৌষমাসেও এক সের বেগুনের মূল্য দশ পয়সা এবং এক টাকায় পাঁচ সের দুধ, তাহাও দুই সের জল মিশ্রিত। এ অবস্থায় পল্লীবাসীদের গুরুভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ নহে। যে শিষ্য উপযুক্ত প্রণামী দিয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, তাহার ভক্তির কোন মূল্য নাই; কিন্তু সংসার প্রতিপালন করিয়া শিষ্যের তহবিলে গুরুদেবের প্রণামীর টাকা সঞ্চিত থাকে না। তাহার উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ কালের ছেলেদের মন হইতে পিতৃভক্তিই অদৃশ্য হইয়াছে, গুরুদেবের প্রতি ভক্তি ত দূরের কথা! এ কালে গুরুদেব বৎসরান্তে একবার শিষ্যগৃহে পদার্পণ করিলেও শিষ্যরা আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করে এবং তাড়াতাড়ি এই উৎপাত বিদায় করিবার জন্য অনেকেই অধীর হইয়া উঠে। এ কালে দুই চারি জন জীবনোপান্তোপনীত বৃদ্ধের আজীবনের বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ গুরুভক্তি অক্ষুণ্ণ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের ভক্তি অর্থপ্রসূ না হওয়ায়, তাহাদের মৌখিক স্তুতিবাদে গুরুঠাকুরের চিঁড়া ভিজিতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ, গুরুঠাকুরদের 'জমীদারী' নীলামে না উঠিলেও প্রজাবিদ্রোহে তাঁহারা প্রায় ফেরার!

এই সকল কারণে অধিকারী মহাশয়রা গুরুগিরি-ব্যবসায়ে বীতস্পৃহ হইয়া, তাঁহাদের ছেলেদের ইংরাজী শিখাইয়া চাকরীর বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছেন; এ কালে চাকরীর মান গুরুগিরির সম্মান অপেক্ষা অধিক, ইহা তাঁহাদের সুবিদিত। রঘুনাথ অধিকারী মহাশয়ের বৈবাহিক শি বাগচী ওয়াটসন কোম্পানীর জমীদারী সেরেস্তায় নায়েবী করিয়া 'দেড়টা সদর-আলা'র বেতনের টাকা উপার্জ্জন

করিতেন ; তাঁহার মান-সম্ভ্রমের তুলনায় গুরুঠাকুরের মান-সম্ভ্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিরূপ তুচ্ছ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধিকারী মহাশয় বৃদ্ধবয়সে গুরুগিরি ত্যাগ করিলেন এবং পৈতৃক নামাবলী, ফোঁটা, তিলক ও কণ্ঠস্থিত তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা প্রভৃতি গুরুগিরির 'ইউনিফর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া, বৈবাহিকের সুপারিসে তাঁহার মনিব-সরকারে জমানবীশের পদে নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থ যুবকরা কেহ ডাকঘরে, কেহ জিলা বোর্ডে, কেহ বা গবর্মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে চাকরী আরম্ভ করিল। গুরুঠাকুরের পরিবারস্থ বধূরাও নাসিকার রসকলি ও বাহুমূলের 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত ছাপা মুছিয়া ফেলিয়া 'জ্যাকেট' ও 'সেমিজে' সজ্জিত হইতে লাগিল। অধিকারিবংশের যুবকরা সিদ্ধান্ত করিল, 'অধিকারী' পদবীটা তেমন সম্মানজনক নহে ; উহা গুরুগিরি-ব্যবসায়ের 'ট্রেড মার্ক' মনে করিয়া তাহারা উর্দ্ধতন সাত পুরুষের ব্যবহৃত 'অধিকারী' পদবী পরিত্যাগ করিল। এখন তাহারা পূর্ব্বপুরুষের 'মৈত্র' পদবী পুনর্গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারীর পুত্রের নাম এখন মদনমোহন মৈত্র। সুপ্রসিদ্ধ কামাল পাশা নব্য তুর্কীকে যে ভাবে ঢালিয়া সাজিয়াছেন, তাহার সহিত এই গুরুঠাকুরদের পারিবারিক সংস্কারের তুলনা চলিতে পারে।

২

গোবিন্দপুরের গুরুবংশীয় অধিকারি-নন্দনরা যখন সাত পুরুষের পেশা পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, তখন তাহাদের প্রতিবেশী চাটুয্যেবংশাবতংস শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্রের লোলুপ দৃষ্টি এই বিনা পুঁজির ব্যবসায়টির প্রতি আকৃষ্ট হইল।

বৃন্দাবনচন্দ্রের পিতা জমীদার ছিলেন ; তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রবলপ্রতাপে বিস্তীর্ণ জমীদারী শাসন করিতেন ; কিন্তু সরিকী বিবাদে ও সাহেব জমীদারদের সহিত দীর্ঘকাল মামলা করিয়া তাঁহাদের জমীদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। বৃন্দাবনচন্দ্রের পিতা তাঁহার সমগ্র জমীদারীর পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া যে পরিমাণ বার্ষিক মুনফা রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সিন্দুকে যে পরিমাণ নগদ টাকা ছিল, তাহা তাঁহাদের পাচ ভাইয়ের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবনচন্দ্র ও তাহার চারি ভ্রাতা পরস্পরকে ফাঁকি দিয়া অধিকাংশ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিল ; তাহার ফলে স্বর্গীয় গোবিন্দ চাটুয্যের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। টাকাগুলি উকীল, মোক্তার ও মামলার তদ্বিরকারকদের উদরসাৎ হইল ; যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইল, তাহা উমেশ শাহার 'আবকারী দোকানে' প্রবেশ করিয়া মদের বোতলে রূপান্তরিত হইল! বৃন্দাবনচন্দ্র ও রসে বঞ্চিত হইলেও তাহার দাদারা যৌবনারম্ভেই 'কাপ্তেন' হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দুই দাদা মদের বোতল শিয়রে লইয়া,পানানন্দে বিভোর হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিল। তাহার বড় দাদা পরকীয়ার প্রেমে মসগুল হইয়া ক্ষুদী নাপ্তিনীর গৃহে গোপনে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু শতমুখীর অমৃতরসাস্বাদনেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় নাই! সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কোন একটা উপলক্ষে 'ফ্যামিন্ রিলিফে'র সময় সরকারের তহবিল হইতে অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় এবং তাহার কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকায়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য 'ওয়ারেণ্ট' বাহির হইল। বড় দাদাকে জেল খাটিতে হয় দেখিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র তাহার জামিন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিল বটে, কিন্তু বড় দাদার দেনার দায়ে বৃন্দাবনের বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত নীলাম হইয়া গেল। বৃন্দাবন নিরাশ্রয় হইয়া তাহার মেজদাদার শরণাপন্ন হইল। মেজদাদা গিরিশ চাটুয্যে কলিকাতায় দালালী করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছিল ; সে নিরুপায় মূর্খ ছোট ভাই ও তাহার স্ত্রী-পুত্রগণকে ভাসাইয়া দিতে পারিল না। বৃন্দাবন গোবিন্দপুরে থাকিয়া সপরিবারে গিরিশের গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

বৃন্দাবন বাল্যকাল হইতেই সুকণ্ঠ ; গীত-বাদ্যেও তাহার অনুরাগ ছিল। বহুসংখ্যক 'মহাজন-পদাবলী' তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার সঙ্কীর্ত্তনের দলে যোগদান করিয়া সে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইত। কিছু দিন পরে সে একটি সঙ্কীর্ত্তন-দলের দলপতি হইল। তাহার দল গোবিন্দপুরে 'বাবুর দল' নামে খ্যাতি লাভ করিল।

চাটুয্যেদের গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের দোল ও রথ উপলক্ষে বা গ্রাম্য বারোয়ারী পূজা শেষ হইলে যখন প্রতিমা লইয়া মহাসমারোহে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইত, তখন 'বাবুর দল' সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিগ্রহের চতুর্দ্দোলের অগ্রগামী হইত। বৃন্দাবন ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া, 'রাধা-কৃষ্ণ'-নামাঙ্কিত নামাবলীখানি কোমরে জড়াইয়া, ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া, উভয় বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া গাহিত—

"সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে আমার গৌর নাচে।
গৌর নাচে ভক্ত সঙ্গে,
নিতাই নাচে প্রেমতরঙ্গে,
মুখে হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল ব'লে রে।"

সঙ্গে সঙ্গে চারিখানি মৃদঙ্গের 'বুজতা বুজাং বুজাং বুজাং' শব্দে ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইত। গ্রামের বহু বালক, যুবক, বৃদ্ধ বাবুর দলের অনুসরণ করিত। গান জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তাহারা দক্ষিণ-হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া সমস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিত, "কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ ক'রে হরি হরি বলো!"—কোন তেমাথা বা চৌমাথার মোড়ে বহু পল্লী-রমণীর সমাগম হইত। 'বাবুর দল' সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবের উচ্ছ্বাস দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত; সে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া, গীত-বাদ্যনিরত দলের লোকগুলিকে সেখানে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিত, তাহার পর নাচিয়া নাচিয়া, দেহের নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া গাহিত,—

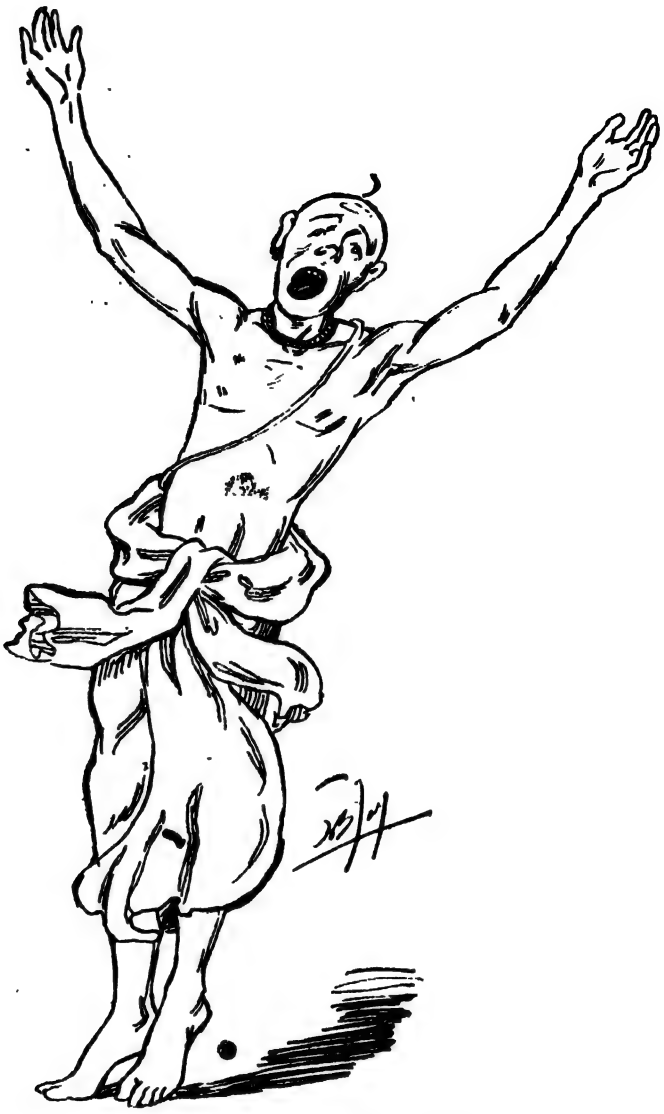

বৃন্দাবন উর্দ্ধবাহু হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছে

"হরি-নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে;
হরি-নামের গুণে, গহন-বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে—
মাধাই তাও কি তুমি জান না রে।"

সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি পঁচিশ জন দোয়ার মুখব্যাদান করিয়া খোলের তালে তালে ঝঙ্কার দিত—

"মাধাই তাও কি তুমি জান না রে!"

তখন বৃন্দাবন কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া সলম্ফে গাহিত,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
ঐ নারদ ঋষি, দিবানিশি বীণাযন্ত্রে গান করে।"

পল্লীরমণীগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া বৃন্দাবনের গান শুনিত, তাহার পর অঞ্চল দ্বারা কণ্ঠ পরিবেষ্টিত করিয়া পথের ধূলায় মস্তক স্পর্শ করিত। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, "ধন্যি ছোট বাবু! চাটুয্যেবাড়ীর মধ্যে উনিই মানুষ। কথক ঠাকুর পেল্লাদের কথা বলে না?

আমাদের ছোট বাবু এই কলিযুগের পেল্লাদ। ওঁর ওপর ঠাকুরের 'কেরপা' হয়েছেন, উনিই চাটুয্যেবংশের নাম বজায় রাখবে।"

কিছু দিনের মধ্যেই বৃন্দাবন গোবিন্দপুরের নারী-সমাজে পরম ভক্ত ও সাঁই নামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

৩

কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্রের ব্রাহ্মণী চঞ্চলা ঠাকুরাণী উপার্জ্জনাক্ষম স্বামীর এই 'ভিট্‌কিলিমি' দেখিয়া তাহার উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃন্দাবন নিরাশ্রয় হইয়া তাহার দাদা গিরিশের গলগ্রহ হইয়াছিল। গিরিশ তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্বগৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া দিবারাত্রি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়, চঞ্চলা ইহা সহ্য করিতে পারিত না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাহার ভাশুর তাহাদের দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে দিত বটে, কিন্তু যাহার তিন চারিটি ছেলে-মেয়ে আছে—হাতে টাকা না থাকিলে তাহার এক দিনও চলিবার উপায় নাই। চঞ্চলা অর্থাভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখিত এবং অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ স্বামীকে প্রায় প্রত্যহই দশ কথা শুনাইয়া দিত। চঞ্চলাকে তাহার ভাশুরের সংসারে পাচিকার কায করিতে হইত; গৃহকার্য্যে সামান্য ত্রুটি হইলে তাহার 'জা' তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিত। চঞ্চলা অভিমান করিয়া এক এক দিন অনাহারে থাকিত। জায়ের বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সে এক দিন তাহার স্বামীকে বলিল, "যে সংসার প্রতিপালন করতে না পারে—তার বে-থা করাই বা কেন, আর ছেলেমেয়েগুলোকে পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, দিনরাত্রি খোল-কর্ত্তাল বাজিয়ে কেত্তন ক'রে বেড়ানই বা কেন? তোমার আক্কেল দেখে আমার গালে মুখে চড়িয়ে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার হাতে প'ড়ে আমি জ্ব'লে পুড়ে মলাম। বিষ পাই ত বিষ খেয়ে মরি। এ যন্ত্রণা আর 'সজ্যি' হয় না।"

সে দিন রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত গ্রামের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবন ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তখনই বাড়ী আসিয়াছিল ও স্ত্রীর নিকট এক গ্লাস জল চাহিয়া, জলের পরিবর্ত্তে এই সুমধুর বচনামৃত লাভ করিল। বৃন্দাবনের ক্রোধানল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার কৃষ্ণপ্রেমের নেশা ছুটিয়া গেল। সে কঠোর স্বরে বলিল, "যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেয়, তুচ্ছ টাকা-পয়সার জন্যে গঞ্জনা দেয়, সে স্ত্রীর মুখদর্শন করা উচিত নয়। তোমার গালি-গালাজ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে; এ প্রাণ আর আমি রাখবো না। আজ রাত্রেই শ্রীপ্রভুর নাম স্মরণ ক'রে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। দেখি, কোন্ শালী আমাকে বাধা দেয়।"

বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ 'কুয়োতলা' হইতে কুয়ার দড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তাহা হাতে লইয়া সরোষে গিরিশের ঢেঁকি-ঘরে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল। স্বামী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া চঞ্চলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদে গিরিশের পরিবারস্থ অনেকে তাহার নিকট আসিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চঞ্চলা ঠাকুরাণী তাহার জাকে বলিল, "তোমার দেওর মিন্‌ষে আমার উপর রাগ ক'রে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার জন্যে কুয়োর দড়ি নিয়ে ঢেঁকি-ঘরে ঢুকেছে! ও মা, আমি 'কুতায়' যাব? মিন্‌ষের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকেছে। ঢেঁকি-ঘরে এতক্ষণ বুঝি গোহত্যে হ'ল, দিদি!"

চঞ্চলা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি ঢেঁকি-ঘরের দরজায় গিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। চঞ্চলার 'জা' কাত্যায়নী ডাকিল, "ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! দরজা খোল। এত রাত্তিরে ঢেঁকি-ঘরে কি করছো?" বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রাণ যেন তখন কণ্ঠাগত—এই ভাবে সে বিকৃত স্বরে বলিল, "গোঁ, গোঁ, আমি আত্মহত্যা করছি, এ প্রাণ আর রাখবো না। এই আমি আড়ায় ঝুল্‌লাম।" গিরিশের ছেলেরা তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে দরজার খিল ভাঙ্গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। কাত্যায়নী, চঞ্চলা ও তাহার ছেলেমেয়েরা তাহাদের অনুসরণ করিয়া দেখিল—ঢেঁকি-ঘরের এক প্রান্তে একটি কেরোসিনের ডিবা টিম টিম করিতেছে। বাঁশের আড়ায় কুয়ার দড়ি ঝুলিতেছে; দেই দড়ির প্রান্তভাগে একটি ফাঁস। ফাঁসটি গলায় আঁটিয়া দিয়া শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ঢেঁকির উপর দাঁড়াইয়া আছে। ঝুলিয়া পড়ে আর কি!

পরিজনবর্গকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিল, "তোমরা সব বেরিয়ে যাও, শীগ্‌গির চ'লে যাও, ছোট বৌর গঞ্জনায় জীবনের ওপর আমার ঘেন্না হয়েছে, এ প্রাণ আর রাখবো না। এই দেখো, আমি ঢেঁকির ওপর থেকে নেমে ঝুলে পড়লাম। গোপাল, গোবিন্দ, মধুসূদন, অধম দাসকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দিও; আত্মহত্যা করলাম ব'লে নরকে ঠেল না করুণাসিন্ধু।" কিন্তু তাহাকে আর ঢেঁকি ছাড়িয়া ঝুলিয়া পড়িতে হইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার গলার ফাঁস কাটিয়া ঢেঁকি-ঘর হইতে তাহাকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল।

বৃন্দাবন বলিল, "প্রভু হে! তোমার শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করতে গেলাম, পাতকী ব'লে চরণে স্থান দিলে না। তবে কি তোমার ইচ্ছে—লোটা, কম্বল আর গেরুয়া বস্তর নিয়ে সংসার ছেড়ে চ'লে যাই?"

কিন্তু সংসার ত্যাগ না করিয়া বৃন্দাবন পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ত্তনের দলে মিশিয়া নামগান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চঞ্চলা ঠাকুরাণী সেই দিন হইতে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল। মনের দুঃখে সে নিঃশব্দে রোদন করিত; এক এক সময় তাহার ইচ্ছা হইত, ঝিকে দিয়া এক ভরি আফিং আনাইয়া, তেলে গুলিয়া খাইয়া ফেলিবে; তাহার স্বামীর মত আত্মহত্যার অভিনয় না করিয়া, অন্যের অজ্ঞাতসারে প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাহিয়া আত্মহত্যা করিতে তাহার মন সরিল না। সে মরিলে ছেলেমেয়েদের কি উপায় হইবে?

৪

দাদা গিরিশ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিত, অবসর পাইলে মাসে দুই একবার বাড়ী আসিত। গিরিশ তাহার স্ত্রীর পত্রে জানিতে পারিল, বৃন্দাবন স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; ঢেঁকি-ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া, তাহার গলার দড়ি কাটিয়া অতি কষ্টে তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ঠাকুরপো কখন্ কি বিপদে ফেলিবে, বলা যায় না; অশান্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি।

গিরিশ কয়েক দিন পরে বাড়ী আসিয়া বৃন্দাবনকে বলিল, সে আর তাহার পরিজনবর্গের প্রতিপালনভার বহন করিতে পারিবে না। তবে গিরিশ তাহাকে বাড়ী হইতে না তাড়াইয়া, বৃন্দাবনের অংশের যে কয়েকটি কুঠুরী নীলামে কিনিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে বাস করিবার অনুমতি দান করিল। কুঠুরীগুলি খালি পড়িয়া থাকিত।

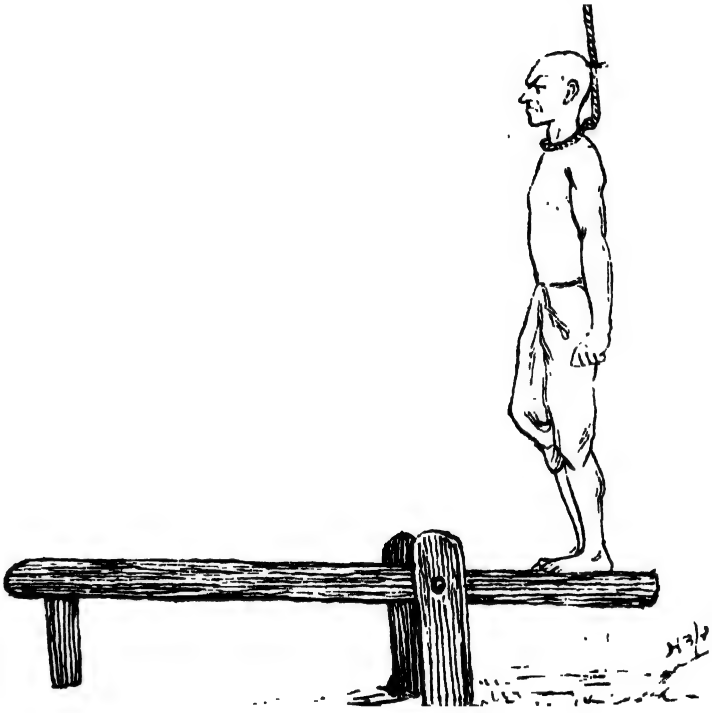

দড়ির ফাঁস গলায় ঢেঁকির উপর দণ্ডায়মান বৃন্দাবন

সংসার প্রতিপালনের ভার ঘাড়ে পড়ায় বৃন্দাবন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিল। গোবিন্দপুরে চাটুয্যে-বাড়ীর অদূরে একটি আমবাগানের মধ্যে একখানি খড়ের ঘর ছিল। প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বৃন্দাবন তাহার দলভুক্ত ভক্তবৃন্দকে লইয়া, এই ঘরে বসিয়া সঙ্গীতালাপ ও শাস্ত্রালোচনা করিত। এই কুটীরখানির নাম 'নন্দন-কুটীর।' একাদশীর দিন সন্ধ্যার পর এই কুটীরে গ্রামস্থ

অনেক শিক্ষানবীশ ভক্তের সমাগম হইত। ভক্তরা তন্ময়-চিত্তে ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য মিনিটে মিনিটে গঞ্জিকা সেবন করিত। সন্ধ্যার পর গঞ্জিকাধূমে নন্দন-কুটীরের সন্নিহিত পথের বায়ুস্তর পর্য্যন্ত সৌরভাকুল হইয়া উঠিত। সেই গন্ধে পথিকরা বুঝিতে পারিত, 'নন্দন-কুটীরে' মহা উৎসাহে ধর্ম্মালোচনা হইতেছে!

তারাপদ কুণ্ডু বৃন্দাবনের এক জন প্রধান ভক্ত ও তাহার সঙ্কীর্ত্তনের দলের দোয়ার। গোবিন্দপুরের বাজারে তাহার মিষ্টান্নের দোকান আছে। বৃন্দাবন তারাপদর ভিতর 'বস্তু' আছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার দোকানে গিয়া বসিত এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিত। তাহা শুনিবার জন্য সেখানে রাধু কামার, হারু বাগ্দী, লণ্ঠন-নির্ম্মাতা নীলু বৈরাগী, গোপলা ছুতোর, যদু ঘরামী প্রভৃতি অনেক মাতব্বর ভক্তের সমাগম হইত। এক এক দিন হরিবল্লভ বসাক এবং নটবর প্রামাণিকও সেখানে আসিয়া বৃন্দাবনের পদধূলি মাথায় লইয়া ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসিত ও ভক্তিভরে শ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তন শুনিত। হরি বসাক গোবিন্দপুরের ডাকঘরের 'ওভারসিয়ার', এবং নটবর প্রামাণিক নাপিত, কিন্তু সে ক্ষৌরকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুদীখানার দোকান করিয়াছিল। ইহারা সকলেই 'নন্দন-কুটীরের 'মেম্বর।' বৃন্দাবনের মধুর বক্তৃতা শেষ হইলে, তারাপদ পরম ভক্তিভরে মধুরতর গোল্লা ও রসগোল্লা দিয়া প্রভুর সেবা করিত; তাহার পর কারিকরদের ভিয়ানে নিযুক্ত করিয়া সদলে 'নন্দন-কুটীরে' যাত্রা করিত। তারাপদই বৃন্দাবনের প্রধান মুরুব্বী। বৃন্দাবনের সংসারপ্রতিপালনের কোন উপায় না দেখিয়া, তারাপদই তাহাকে বিনা পুঁজির ব্যবসায় গুরুগিরি আরম্ভ করিতে উপদেশ দিয়াছিল। মহামান্য চাটুয্যে-বংশের কুলপ্রদীপ ভক্ত-চূড়ামণি বৃন্দাবনচন্দ্র গুরুগিরি আরম্ভ করিলে, তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য বহু গৃহস্থ আগ্রহ প্রকাশ করিবে—এ বিষয়ে তারাপদর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কয়েক দিন পরে নটবর প্রামাণিক বৃন্দাবনের নিকট মন্ত্র লইল; এই উপলক্ষে নটবরের গৃহে মালসা-ভোগ হইল। বহু ভক্ত নটবরের গৃহে প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। বৃন্দাবনের স্ত্রী চঞ্চলা ঠাকুরাণীও কতকটা আশ্বস্তা হইল। বৃন্দাবন নবদীক্ষিত শিষ্যের নিকট যে প্রণামী পাইল, তাহাতে কয়েক দিন তাহার সংসার চলিল। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নটবর মহা উৎসাহে তাহার গুরুদেবের সঙ্কীর্ত্তনের দলে খোল বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বৃন্দাবন আচণ্ডাল সকলকে প্রেম বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের কানে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেছে শুনিয়া ক্রমে অনেক ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, হাড়ী, বাগ্দী, মালো, চাঁড়াল তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। গোবিন্দপুরের চতুর্দ্দিকস্থ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর লোক্ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তাহার অর্থ-কষ্ট প্রশমিত হইল। সে প্রত্যহ প্রভাতে দুই একখানি গ্রামে উপস্থিত হইয়া শিষ্যদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিত। শিষ্যদের কেহ তাহাকে এক ভাঁড় দুধ, কেহ ক্ষেতের বেগুণ, লাউ বা কুমড়া, কেহ এক পোয়া ঘি, কেহ কতকগুলি কৈ-মাগুর মাছ প্রণামী দিত। চাষী শিষ্যদের নিকট ধান, গম, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি শস্য প্রণামী পাওয়ায় তাহার সংসার বেশ সুখেই চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার চেহারাখানিও গোঁসাই-গোবিন্দের মতই হইল। ন্যাড়া মাথায় তরমুজের বোঁটার মত স্থূল টিকির গোছা, দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত মুখে প্রসন্ন হাস্য, গলাভরা মোটা তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণের চরণভরসার' ছাপ এবং পীতবর্ণ রেশমী নামাবলী, তাহার উপর গলার মালার সহিত রূপার আংটায় আবদ্ধ হরিনামের ঝুলিটি আবক্ষ প্রলম্বিত। সেই ঝুলিতে হরিনামের মালা ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ থাকিত, গাঁজার কল্‌কে পর্য্যন্ত!

বৃন্দাবনচন্দ্র গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কয়েকটি প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীকে দালাল নিযুক্ত করিল। তাহারা ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, কেহ বা হরিনামের ঝুলিটি হাতে লইয়া তাঁতি-পাড়ায়, কৈবর্ত্ত-পাড়ায়, বারুই-পাড়ায় ও গোয়ালা-পাড়ায় উপস্থিত হইত, এবং পাড়ার গিন্নীদের কাছে বসিয়া বৃন্দাবনের ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মজ্ঞানের প্রশংসা করিত। তাহাদের উপদেশে কেহ বৃন্দাবনের নিকট দীক্ষা লইত, কেহ বা ভাগবত শুনিবার জন্য বৃন্দাবনকে সদলে নিমন্ত্রণ করিত। ভাগবত পাঠ করিয়া ও কীর্ত্তনাঙ্গের গান শুনাইয়া বৃন্দাবন এক এক জন গৃহস্থের বাড়ী প্রতি রাত্রিতে তিন চার টাকা প্রণামী পাইত, এতদ্ভিন্ন সেখানে

জলযোগেরও প্রচুর আয়োজন থাকিত। বৃন্দাবন সুখের পারাবারে বটপত্রশায়ী শ্রীভগবানের মত ভাসিতে লাগিল।

৫

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী সদাগর গাণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়ার মাসতুতো ভাই গুণ্ডারাম গাঁটকাটিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া গোবিন্দপুরে ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিল। সে প্রথমে বাজারে একখানি চালাঘর ভাড়া করিয়া, সেখানে কয়েক জোড়া কাপড় লইয়া বসিত, এবং একটা বেতো ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তাহার পিঠে কাপড়ের বস্তা চাপাইয়া, হাটের দিন নিকটস্থ গ্রামসমূহে হাট করিতে যাইত। বর্ষাশেষে চৈতালী ফসল উঠিলে সে খামারে খামারে ঘুরিয়া, কখন নগদ টাকায়, কখন বা বস্ত্র-বিনিময়ে রবিশস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিত; তাহার পর মূল্যবৃদ্ধি হইলে কলিকাতায় চালান দিত। কোন দিন দুই মুঠা ছোলা চিবাইয়া, কোন দিন যবের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইত। সেই গুণ্ডারাম গাঁটকাটিয়া এখন গোবিন্দপুর বাজারের প্রধান দোকানদার। যে বাঙ্গালী দোকানদারের দোকান হইতে সে পাইকারি দরে কাপড় লইয়া হাটে হাটে ফেরী করিয়া বেড়াইত, সেই দোকানদারের মৃত্যুর পর তাহার 'অপগণ্ড' পুত্রের নিকট হইতে দোকানখানি ফাঁকি দিয়া লইয়া, সেখানে সে এখন প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এখন তাহার সুবিস্তীর্ণ কাপড়ের কারবার। হাজার হাজার মণ রবিশস্য ও পাট কলিকাতায় চালান দিয়া অগণ্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এখন গুণ্ডারাম বাবু গোবিন্দপুরের মাড়োয়ারী সমাজের কর্ণধার! পঁচিশ ত্রিশ জন বাঙ্গালী যুবক—যাহাদের পিতৃ-পিতামহ গোবিন্দপুরের বাজারে নানা পণ্যদ্রব্যের দোকান করিয়া স্বাধীনভাবে সম্মানের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদেরই পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্ররা পনের কুড়ি টাকা বেতনে গুণ্ডারাম বাবুর দাসত্ব করিতেছে! দোকানে বসিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 'পাইকেরদের' নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আনিতেছে; আট দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী খামারে খামারে ঘুরিয়া রবিশস্য ও পাট প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে। প্রতি সন্ধ্যায় গুণ্ডারাম বাবুর দোকানে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের মেলা বসিয়া যায়!

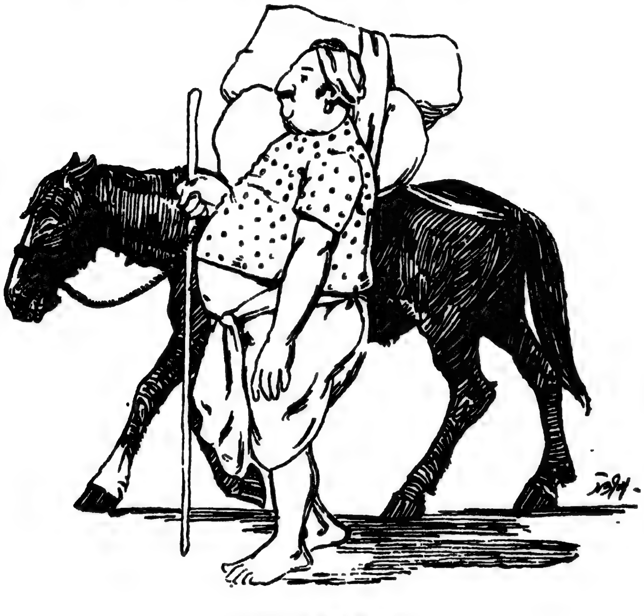

গুণ্ডারাম গাঁটকাটিয়া

গুণ্ডারাম বাবুর এখন চুল পাকিলেও এ কাল পর্য্যন্ত সে দারপরিগ্রহ করে নাই; প্রথম বয়সে ব্যবসায়কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিবাহ করিবার ফুরসৎ পায় নাই, কিন্তু সে ধনশালী হইয়া মধুর অভাবে গুড় সংগ্রহ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গাঁড়ারের রূপসী বিধবা কন্যা হেমাঙ্গিনী গুণ্ডারাম বাবুর অনুগৃহীতা, অথবা গুণ্ডারাম বাবুই হেমাঙ্গিনীর অনুগৃহীত। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দপুরের বাজারে তামাক, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় করিত; গুণ্ডারাম বাবুর নিকট কয়েক শত টাকা মূলধন লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গাঁড়ার তাহার কারবারটি পাকাইয়া তুলিয়াছে। গুণ্ডারাম সুদের পরিবর্ত্তে তাহার বিধবা কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে তাহার দোতালায় স্থাপন করিয়াছে!

বৃন্দাবনের একটি আড়কাটি ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, হরিনামের মালার ঝুলি লইয়া, গুণ্ডারামের অন্দরমহলে যাতায়াত আরম্ভ করিল। হেমাঙ্গিনীর যৌবনে তখন ভাটা পড়িয়াছে; সে বুঝিতে পারিল, সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে 'মনিষ্যি-জন্ম বৃথা।'—গুণ্ডারাম এক দিন

বৃন্দাবনকে ডাকিয়া হেমাঙ্গিনীকে শিষ্যা করিয়া লইতে অনুরোধ করিল। বৃন্দাবন জপের মালা কপালে ঠেকাইয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "রাধেকৃষ্ণ, একে গণিকা, তাহার উপর পতিতা, তোমার রক্ষিতা; উহাকে মন্ত্র দিলে ভদ্রসমাজে আমার দুর্নাম হইবে।"—গুণ্ডারাম বলিল, "কিন্তু তুমি যে ঠাকুর, মালো-চাঁড়ালদেরও মন্ত্র দাও, ও কি তাদেরও অধম?"—বৃন্দাবন মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিল, "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদি তাদের ভক্তি থাকে; কিন্তু হেমাঙ্গিনী বিলাসে ডুবে আছে,—তার ভক্তি কোথায়?"—যাহা হউক, বৃন্দাবন হেমাঙ্গিনীর ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ গুণ্ডারামের নিকট নগদ পঁচিশ টাকা প্রণামী পাইয়া হেমাঙ্গিনীকে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিল। গুণ্ডারাম এই উপলক্ষে বাজারের সকল দোকানদারকে 'পুরি-মিঠাই' খাওয়াইল। বৃন্দাবনের শিষ্য-সমাজে হেমাঙ্গিনী একটি কামধেনু। যে দিন সে নিঃসম্বল হইয়া বাজারে আসিত, সেই দিনই সে গুণ্ডারামের দোতালায় উঠিত। গুণ্ডারাম হাসিয়া বলিত, "কি ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্চে?"—বৃন্দাবন বলিত, "শিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি।"—গুণ্ডারাম বলিত, "উ-মোর ভক্তি-টক্তি কিছু হচ্চে?"—বৃন্দাবন বলিত, "প্রভুর ইচ্ছে! ঐ রকম ভক্তি যদি আমার সকল শিষ্যের হ'তো, তা হ'লে তাদের দীক্ষা দেওয়া সার্থক হ'তো।"—হেমাঙ্গিনী গুরুঠাকুরকে দেখিলেই গলায় আঁচল জড়াইয়া তাহার পায়ে মাথা ঠেকাইত এবং প্রণামীস্বরূপ তাহার পায়ের কাছে একটি টাকা রাখিত। বৃন্দাবন তাহার মাথার উপর উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিত, "রাধেকৃষ্ণ! গুরুপদে তোমার এমনই অটলা ভক্তি থাকুক; তোমার অক্ষয় স্বর্গের পথ কেউ আট্‌কাতে পারবে না, মা!"—টাকাটি 'করচে' গুঁজিয়া বৃন্দাবন তারাপদ কুরীর দোকানে গিয়া বসিত এবং সেখানে এক ছিলিম তামাক সেবন করিয়া, টাকাটি ভাঙ্গাইয়া লইয়া বাজার করিতে চলিত।

৬

এই ভাবের গুরুগিরি-ব্যবসায়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে তাহার সুনাম ছিল। গোবিন্দপুরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল; তাহারা নগরসঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলে মূল গায়করূপে দলের নেতৃত্ব করিবার জন্য বৃন্দাবনকে অনুরোধ করিত। বৃন্দাবন তাহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিত। তাহার কণ্ঠোচ্চারিত মধুর সঙ্গীত শুনিবার জন্য বহু গ্রামবাসীর সমাগম হইত; সকলেই তাহাকে বাহবা দিত। এই প্রশংসার লোভ সে

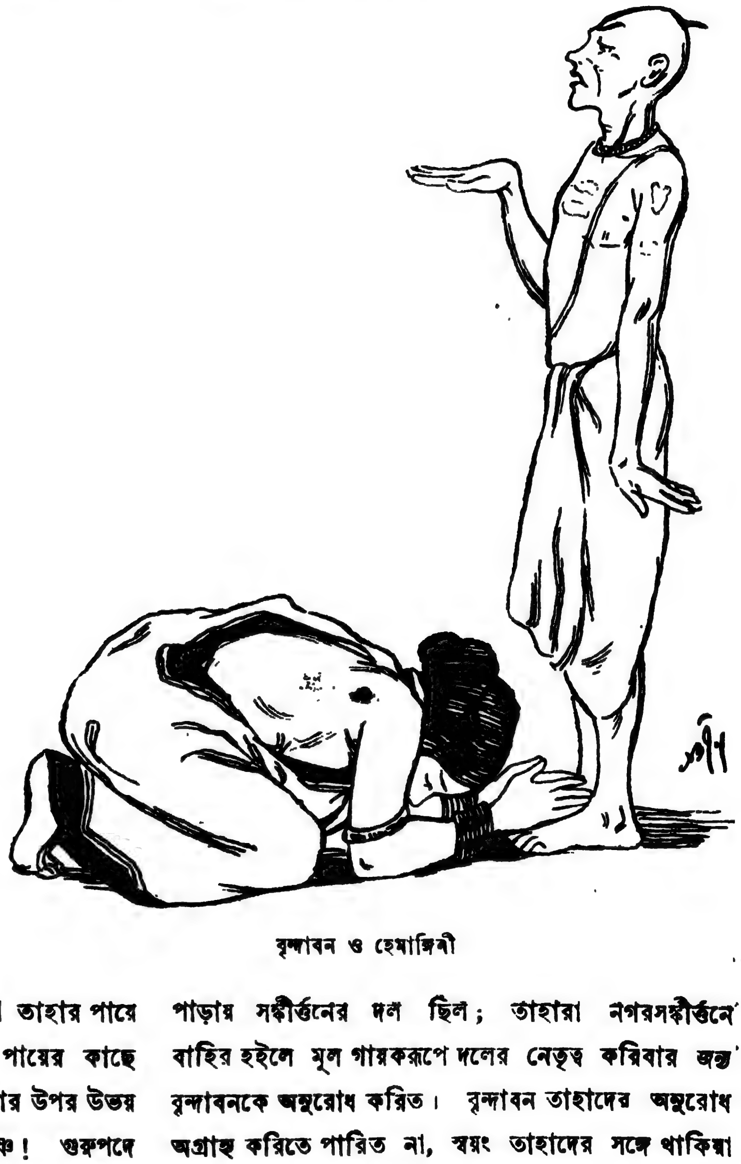

বৃন্দাবন ও হেমাঙ্গিনী

সংবরণ করিতে পারিত না; কিন্তু গুরুগিরি আরম্ভ করিবার পর কেবল মৌখিক প্রশংসার জন্য আর তাহার আগ্রহ রহিল না। সে সকল দলের দলপতিগণকে সংবাদ দিল—তাহাকে নাম-গান করিতে লইয়া যাইতে হইলে প্রতি রাত্রি দুই টাকা হিসাবে প্রণামী দিতে হইবে। প্রণামী ভিন্ন সে কোন দলের সঙ্গে গান করিতে যাইবে না। স্বগ্রামে ও ভিন্ন গ্রামে এই ভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াও প্রতি মাসে তাহার কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল।

বৃন্দাবন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মধ্যে মধ্যে 'টুরে' বাহির হইত; এক জন তল্পিদার সঙ্গে লইয়া ভিন্ন গ্রামের সচ্ছল অবস্থাপন্ন শিষ্যদের আশীর্ব্বাদ করিতে যাইত। সে সময় তাহার ফোঁটা, তিলক প্রভৃতির ঘটা দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেম-বর্জ্জিত অর্ব্বাচীনের দল তাহাকে 'তুলসীবনের বাঘ' বলিয়া উপহাস করিত। কেহ কেহ বলিত, "প্রভু যেন ডেড্‌লেটার আফিসের মালিকহীন চিঠি!"—গুরুগিরি-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সে মাংসবর্জ্জন করিলেও মৎস্যের সহিত 'নন্‌-কো-অপারেশন' করিতে পারে নাই; কিন্তু ভিন্ন গ্রামের শিষ্য-গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি শুনিত, শিষ্য প্রভুর জন্য মাছের ব্যবস্থা করিয়াছে—তাহা হইলে সে 'রাধামাধব' বলিয়া জিহ্বা দংশন করিত এবং উভয় কর্ণবিবরে অঙ্গুলীর ছিপি দিয়া সবেগে মস্তক আন্দোলিত করিত। শিষ্য ভাবিত, "উঃ, প্রভুর কি নিষ্ঠে!"—প্রভু জানিত, পল্লীগ্রামে চিংড়ি, পুঁটী বা চ্যাংমাছ ভিন্ন রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ পাইবার উপায় নাই; সুতরাং মৎস্যের লোভ সংবরণ করাই সঙ্গত।

কিন্তু একবার জ্যৈষ্ঠমাসে নারায়ণপুরে গদাধর ঘোষ নামক একটি 'শাঁসাল' গোপ-শিষ্যের গৃহে গিয়া বৃন্দাবনকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রভুর চরণ-বন্দনা করিয়া গদাধর তাহার গোয়াল-ঘরে রন্ধনাদির আয়োজন করিল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভুর কি মাছ সেবা হবে?"—প্রভু অভ্যাসমত কানে আঙ্গুল গুঁজিয়া ও জিহ্বা দংশন করিয়া সবেগে মাথা নাড়িল।

গোপনন্দন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "তাই ত! আজ পুকুরে ক্যাপ্‌লা জাল ফেলে একটা সের দশেক রুইমাছ—"

গদাধর ঘোষের কথা শেষ না হইতেই গদাধরের পুত্র রাধু একটা প্রকাণ্ড লাল রুইমাছ 'দড়াম্' করিয়া উঠানে ফেলিল; মাছটা তখনও নড়িতেছিল। মাছের চেহারা দেখিয়াই গদাধরের ইষ্টদেবতার রসনায় লালার সঞ্চার হইল; কিন্তু মাছের নাম শুনিয়া সে কানে আঙ্গুল দিয়াছে, এখন কি করিয়া বলে—মাছের মুড়াটি তাহার পরম মুখরোচক হইবে?

পাকা রুইমাছটির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃন্দাবন গদাধরকে বলিল, "কি রে গদাই, ইষ্টিদেবতার মাছ সেবা হয় না শুনে মুখখান যে শুকিয়ে গেল!"

গদাধর বলিল, "এজ্ঞে ইষ্টিদেবতা, আপুনি সেবা করবা বুল্যে পুকুর থেকে মাছটা ধরালাম, মাছ সেবার কতা শুন্যা আপুনি জিবে কাম্‌ড়ালে, আমার দুখ্‌খু হবে না?"

বৃন্দাবন বলিল, "দেখ গদাই, তোর দুঃখ হয়েছে শুনে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হ'ল। ইষ্টদেবতা হয়ে যদি তোর দুঃখই দূর করতে না পারলাম, তবে আর আমার গুরু হয়ে ফল কি? তা, এক কায কর। কাঁঠালের বীচি আছে ঘরে?"

গদাধর বলিল, "এজ্ঞে, আম-কাঁঠালের সময় গেরস্তঘরে কাঁঠালের বীচি থাক্‌বে না? বীচি, মুথ্‌লো, ভুতি যা হুকুম করবেন, তাই সেবা করতে দিতে পারব।"

বৃন্দাবন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কাঁঠালের মুথ্‌লো, ভুতিগুলো ত গরুতে খায়; আমি কি গরু যে, সেগুলো আমার সেবায় লাগাবি?"

গদাধর দন্তবিকাশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "হঃ, গুরু আর গরু ও একই কতা। দুই-ই দেব্‌তা।"

বৃন্দাবন বলিল, "বেটা ভেমো গোয়ালের আর কত বুদ্ধি হবে?—তা এক কায কর, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে আমি মাছ সেবা করব। পেটীর মাছ, মুড়ো আর গোটাকত কাঁঠালের বীচি ছাড়িয়ে দে; ঝোল রাঁধা যাবে।"

গদাধর কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "এজ্ঞে, ইষ্টিদেবতা, মাছ ত নিরিমিষ নয়; আমার মনোবান্‌চা পুন্ন্‌ করতে ওটা সেবায় নাগাবা, শেষে আমার পাপ হবে না ত?"

বৃন্দাবন বলিল, "যদি পাপই হবে, তবে কাঁঠালের বীচি দিতে বল্লাম কেন? আমাদের বৈষ্ণব-শাস্ত্রে কি লিখেছে জানিস্, শাস্ত্রে আছে,—'কণ্টকীফলযোগেন মৎস্যং ভবতি

নিরামিষঃ'—কাঁঠালের বীচি দিলে মাছ নিরামিষ হয়ে যায়—বুঝেছিস্ ?"

গদাধর বুঝিয়া গেল ! সে তাহার পুত্র রাধুকে 'ইষ্টিদেবতা'র সেবার জন্য কলাপাতা আনিতে বলিল ; তাহার হাতে একখানি কাস্তে দিয়া বলিল, "যা, চট্ ক'রে ঝ্যাড়ের কাঁচাকলার ঝাড় থেকে খানকতক কলাপাতা কেটে আন্।"

কলাপাতা আনীত হইলে বৃন্দাবন পাতাগুলি সক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিল।

গদাধর ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া করযোড়ে বলিল, "ঠাকুর, আমার অপরাদটা কি হ'লেন ?"

বৃন্দাবনের তল্পিদার ছিরু কামার দাওয়ায় বসিয়া স্নানান্তে মুড়ি চিবাইতেছিল। সে বলিল, "ঘোষজা, তুমি ভারী বব্বর। তোমার ছেলেকে কলাপাতাগুলো কেটে আন্‌তে বল্লে ; কি রকম তোমার আক্কেল ? 'কাটা' বল্‌লে কি গুরুঠাকুরের সেবা হয় ?"

গদাধর নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া বলিল, "তবে কি বুল্‌তে হবে ?"

এবার ছিরু খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "বুড়ো হচ্ছো, তাও শিখিয়ে দিতে হবে ? বল্‌তে হবে বিনিয়ে আন্। কাঁটালের বীচিগুলোও বিনিয়ে দিতে বল, নইলে প্রভুর সেবা হবে না।"

গদাধর-পুত্র আবার কতকগুলি কলাপাতা 'বিনিয়ে' আনিল।

সেবার 'জুৎ' দেখিয়া গুরুঠাকুর আরও এক দিন গদাধরকে কৃপা করিল। গদাধরের গঙ্গাজলটুকু পূর্ব্বদিনই ফুরাইয়া গিয়াছিল। সে 'ইষ্টিদেবতা'র জন্য গ্রামের জমীদার-বাড়ী হইতে গঙ্গাজল আনিতে রাধুকে আদেশ করিল। রাধু একটা পিতলের ঘটী লইয়া গঙ্গাজল আনিতে চলিল।

দুই ঘণ্টার মধ্যেও রাধুর দেখা নাই ! প্রভুর সেবার অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ; গঙ্গাজলের অভাবে প্রভু গণ্ডুষ করিয়া সেবায় বসিতে পারিতেছেন না। বাড়ীতে গোয়ালের জলো দুধ ভিন্ন প্রভুর সেবা সুসম্পন্ন হয় না ; কিন্তু গোয়ালা-শিষ্যের বাড়ী আসিয়া গঙ্গাজল ভিন্ন প্রভুর সেবা অচল !

যাহা হউক, রাধু ঘণ্টা দুই পরে গঙ্গাজল লইয়া বাড়ী ফিরিল। গদাধর সক্রোধে বলিল, "আহ্নু, তোর কি অকম আক্কেল বুল্‌তে পারিস্ ? গঙ্গাজল আন্‌তে গিয়েলি ত আজ নয় ! এত দেরী কর্‌লি ক্যানো ?"

রাধু বলিল, "তাঁতিপাড়া, বারুইপাড়া, দত্তপাড়া সাত নক্কা ঘূর‍্যা আস্‌তি হ'লো, দেরী হবে না ?"

গদাধর বলিল, "সোজা পথ থাক্‌তে অতো ঘুর্‌তে গেলি ক্যানো, হারামজাদা, পাজী, ছুঁচো !"

রাধু বলিল, "সাদ ক'রে ঘুর্‌তে গিয়েলাম কি না ? দত্তদের আমবাগানের ধারে মুচিরা একটা মরা গরু বিনোচ্চে, সে পথ দিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে আসা যায় ?"

গদাধর বলিল, "গরু বিনোচ্চে কি রে ?"

রাধু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তবে কি বুল্‌বো কাট্‌চে ? কাট্‌চে বুল্লে যে ইষ্টিদেবতার খাওয়া হবে না।—মুচিরা মরা গরু কাট্‌চে—চামড়াখানা নেবার জন্যে। ইষ্টিদেবতার সেবা হবে না বু'লে গরু বিনোচ্চে বুল্‌লাম। তাতে দোষটা হয়েছে কি ?"

ইষ্টিদেবতা 'রাধামাধব' 'রাধামাধব' বলিয়া গঙ্গাজল গণ্ডুষ করিয়া সেবায় বসিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে গদাধরের নিকট বিদায় লইয়া বৃন্দাবন নারায়ণপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বলরামপুরে উপস্থিত হইল। বলরামপুরের নবদ্বীপ মণ্ডল চাষী গৃহস্থ ; তাহার ছোট ভাই রামযাদু মণ্ডল সেই গ্রামের জমীদারের মেঠো আমীন। ইহারা দুই ভাই অল্পদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। বৃন্দাবন নবদ্বীপের গৃহে পদধূলি দিলে যে প্রণামী পাইত, তাহাতে মাসখানেকের জন্য তাহাকে মুদীর দোকানে যাইতে হইত না ; সুতরাং নবদ্বীপকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার জন্য শিষ্যবৎসল বৃন্দাবনের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

'ইষ্টিদেবতার' শ্রীচরণ দর্শন করিয়া নবদ্বীপ ভারী খুসী। বৃন্দাবন কিছুকাল বিশ্রামের পর স্নানাহ্নিক শেষ করিল। সে একটি ঘরে আহ্নিক করিতে বসিয়া দেখিল, সেই ঘরের একটি কুলুঙ্গীতে এক জোড়া নূতন চটি জুতা সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। কে, এম, দাসের দোকানের চটি, যেমন সুডৌল গড়ন, সেই রকম চক্‌চকে বার্ণিশ ! বৃন্দাবনের

শ্রীচরণের চটি জোড়াটা দীর্ঘকাল বিভিন্ন গ্রামের শিষ্য বাড়ী ঘুরিয়া অচল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং চটি জোড়াটা দেখিয়া বৃন্দাবনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; আহ্নিকের সময় সে লুব্ধ নেত্রে পুনঃপুনঃ চটি জোড়াটার কৃষ্ণকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; বোধ হয়, কোন্ বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন যুগের বৃন্দাবনের আভীরপল্লীর একটি মধুর দৃশ্য বৃন্দাবনচন্দ্রের মনে পড়িল।

তাহার আহ্নিকের সময় ভক্ত শিষ্য নবদ্বীপ করযোড়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল। বৃন্দাবন আহ্নিক শেষ করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "নবদ্বীপ, কুলুঙ্গীতে ও চটি-জোড়াটা কার?"

নবদ্বীপ বলিল, "আজ্ঞে ইষ্টিদেবতা, ও চটি আমার রামযাদুর। রামযাদুর মনিবের ছোটছেলে নবীন বাবু কলকাতায় গিয়েছিলেন কি না, রামযাদু তাঁকেই আড়াইটে টাকা দিয়েছিল; তিনি পরশুদিন ঐ চটি জোড়াটা তাকে এনে দিয়েছেন। সে মাঠে মাঠে আমীনী ক'রে বেড়ায়, চটি পায়ে দেবে কখন্? তাই চটি জোড়াটা ঐ কুলুঙ্গীতে তুলে রেখেছে; এখনও তার পায়ে ওঠেনি।"

বৃন্দাবন বলিল, "তোমাদের ছোট বাবুর কিন্তু পছন্দ বেশ! খাসা চটি। ঐ রকম এক জোড়া চটি এবার আমাকেও কলকাতা থেকে আনিয়ে নিতে হবে। আর চলে না।"

নবদ্বীপ বলিল, "তা চটিজোড়াটা দেখে যদি প্রভুর লোভ হয়ে থাকে, তা হ'লে ইষ্টিদেবতার সেবার জন্যে গাঁটরীতে বেঁধে দেব। ও চটি প্রভুর সেবায় লাগবে, এ কি আমার সামান্য সৌভাগ্য?"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "রাধে মাধব! এও কি একটা কথা। রামযাদু ব্যবহারের জন্যে এমন পছন্দসই চটি জোড়াটা কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়েছে, আর আমি তাই গ্রহণ করবো? আর সে এখন বাড়ী নেই. জুতো না দেখে সে-ই বা কি মনে করবে? নাঃ, তা হয় না নবদ্বীপ! কিন্তু কি চমৎকার চটি, চটি ত নয়, যেন পান্সী নৌকো!"

নবদ্বীপ বলিল, "রামা জরীপে গিয়েছে; তাতে ক্ষেতি কি ইষ্টিদেবতা? আপনার যখন মনে ধরেছে, তখন এই তুচ্ছ চটিজোড়াটা প্রভুর সেবায় লাগালে আমার 'জর্ম সাথক' হবে। রামা এলে বল্বো, তার চটি কুকুরে নিয়ে গিছে। আপনি চটিজোড়াটা নিয়ে যান, প্রভু।"

প্রভু চটিজোড়াটা প্রণামী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

৭

পরদিন শিষ্যবাড়ী হইতে বাড়ী ফিরিয়া বৃন্দাবন শুনিতে পাইল, ক্ষেন্তি ঘোষাণী দুই দিনের মধ্যে পাঁচবার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল!

ক্ষেন্তি ঘোষাণী গোবিন্দপুরে 'গোপ-সম্রাট' তক্ষক ঘোষের স্ত্রী অথবা অভিভাবিকা। তক্ষক ঘোষের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর; সুতরাং এখনও তাহার সাবালকত্ব লাভ করিতে বিলম্ব আছে; এই জন্য ক্ষেন্তি ঘোষাণীই তাহার নাবালক স্বামীটির অভিভাবকত্ব করে। তক্ষক ঘোষের গোয়ালে এক পাল গরু আছে; সেগুলি সে সারাদিন বনে-জঙ্গলে, পুকুরের ধারে, গৃহস্থের বাগানের মধ্যে চরাইয়া বেড়ায়; রাত্রিকালে গরুর পাল মাঠে লইয়া গিয়া চুরি করিয়া কৃষকের ফসল খাওয়ায়; এবং দৈবাৎ কোন দিন ধরা পড়িয়া ফৌজদারী-সোপর্দ্দ হইবার সম্ভাবনা দেখিলে, বাড়ী আসিয়া ঘোষাণীর অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘোষাণী বিপন্ন স্বামীকে অভয় দান করিয়া উকীল-মোক্তারের সহিত পরামর্শ করে, হাকিমের বাসায় গিয়া স্তবস্তুতিতে তাঁহার গৃহিণীকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। গৃহস্থবাড়ী দুধের যোগান দেওয়া, হিসাব রাখা, টাকাকড়ি আদায় করা—এ সমস্তই ক্ষেন্তির কায। তক্ষক ঘোষকে ক্ষেন্তির কথায় উঠিতে বসিতে এবং কোন অপকার্য্যের জন্য জমীদারের কাছারী হইতে তলপ আসিলে সর্ব্বাঙ্গে কাঁথা জড়াইয়া, ঘরের কোণে শুইয়া পড়িয়া কাঁপিতে হয়।

ক্ষেন্তি ঘোষাণী কয়েকবার খুঁজিতে আসিয়াছিল শুনিয়া বৃন্দাবন অবিলম্বে ক্ষেন্তির সহিত দেখা করিতে চলিল। ক্ষেন্তি তাহাকে জানাইল, পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে 'মালসা-ভোগের' আয়োজন করিবে। মালসা-ভোগের সকল আয়োজনের ভার প্রভুকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, বৃন্দাবন এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্ম

হইল। গুরুগিরি ব্যবসায় অবলম্বন.করিয়া বৃন্দাবন গোবিন্দপুরে মালসা-ভোগের অধিকারটি একচেটে করিয়া লইয়াছিল। একে সে ব্রাহ্মণ, তাহার উপর শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব। গ্রামের অধিকাংশ বৈষ্ণবের ক্রিয়াকর্ম্মের নেতৃত্বভার বৃন্দাবনই গ্রহণ করিয়াছিল। মালসা-ভোগ উপলক্ষে অন্ততঃ গ্রামস্থ বৈষ্ণব বাবাজীউদের নিমন্ত্রণ না করিলে ত চলে না। 'নন্দন-কুটীর' এই সকল বৈষ্ণবের প্রধান আড্ডা; সুতরাং ক্ষেন্তির গৃহে মালসা-ভোগের আয়োজনের ভার বৃন্দাবনের স্কন্ধে ন্যস্ত না করিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথানিয়মে মালসা-ভোগ শেষ হইলে ক্ষেন্তি বৃন্দাবনকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল। বৃন্দাবন টিকি নাড়িয়া, উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপেছ, ক্ষ্যান্ত! প্রসাদ আমার মাথায় থাক, তুমি ত জান, শিষ্য ভিন্ন কোন শূদ্রের বাড়ী আমি জলগ্রহণ করি নে।"

ক্ষেন্তি বলিল, "তবে যে আমার পয়সা খরচ করা বেনথা হ'ল, প্রভু! আপনি আমার বাড়ী জলগ্রহণ করবেন না বুল্চো; আমাগোর হুধে জল থাকলে তা সেবা হয়, আর হুটো গোল্লার সঙ্গে জল সেবা করলেই পাপ হবেন? আপুনি সেবা না করলে আপনার পায়ের কাছে মাথা কুটে মর্বো।"

বৃন্দাবন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "আহা, কথাটা বুঝে ভাখো। শিষ্য পুত্র তুল্য, তার গৃহে স্বপাকে অন্ন পর্য্যন্ত সেবা করা চলে। অনেক শূদ্র-শিষ্যের বাড়ীতে তা ক'রেও থাকি; কিন্তু তুমি ত আমার কাছে মন্ত্র নেও নি। তবে হাঁ, যদি আমার কাছে মন্ত্র নাও, তা হ'লে তখন তোমার বাড়ী সেবা করতে বাধা হবে না।"

তক্ষক ঘোষ বলিল, "ঠাকুর, কানে ফুঁ দিয়ে মন্তর দিবা ত? তা দিও, আমাদের গুরুঠাকুর আজ দশ বছর কেষ্টো পেয়েছে; শুনেছি, মা-ঠাকরুণ আছে, তা তিনি কখন শিষ্যি-বাড়ী আসে-টাসে না; সেই কোন্ কালে ইষ্টিদেবতা কি মন্তর দিয়েলো—তা ভুলে-টুলে গিয়েছি। তুমিই মন্তর দিও, এখন প্যাট ভ'র্য়ে স্তাবা করো।"

ক্ষেন্তি বলিল, "সত্তি কথা। মা-ঠাকরুণ এ দশ বছরের মদ্দ্যি আমাগোর বাড়ী আসে নি। তা দা-ঠাকুরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি, দা-ঠাকুর যদি আমাগোর বাপ-দাদার ইষ্টিদেবতা তেয়াগ ক'র্য্যে আপনার কাছে মন্তর নিতি বুলে, তা হ'লি আপুনি আমাগোর কানে মন্তর দিও; আপনাকেই ইষ্টিদেবতা কাড়বো। দা-ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না ক'রে আপনাকে কতা দিতে পারব না।"

বৃন্দাবন বলিল, "দা-ঠাকুরটা আবার কে?"

ক্ষেন্তি বলিল, "ঐ ও পাড়ার ডাকঘরের হেকিম; চিঠি বিলির কত্তা। দা-ঠাকুর, আহা, যেন সাক্ষেৎ মহাপেরভু, আর কি যে তেনার নিষ্ঠে! এই গোবিন্দপুরে এসে ইস্তোক দা-ঠাকুরকে আমিই হুদের যোগান দিয়ে এসেছি। এক পোয়া হুদে তিন পোয়া জল দিয়ে বরাবর তেনাকে নিষ্টে হুদের যোগান দিয়েছি, একটি দিনের জন্তে বলে নি—ঘোষাণী, হুদ পাতলা হচ্ছেন। তা দা-ঠাকুর আমার যোগান ছাড়িয়ে দিয়ে এখন মোছনমানের হুদ নিচ্ছে, আমি বুল্লাম, দা-ঠাকুর, মোছনমানের হুদ খাচ্চ, ওরা যে ডালের হাঁড়ীতে গরু দোয়; এঁটো হাত ধোয় না। দা-ঠাকুর রাগ ক'রে বুল্লে—'ডালের হাঁড়ীতে তাদের গরু হুইতে দেখিছিস্—আমার পা ছুঁয়ে বল ত!' তা বেরাহ্মণের পা ছুঁয়ে সে কতা বুল্বো ক্যানো? সে যা-ই হোক, দা-ঠাকুর গেয়ানী লোক। তিনি আপনার কাছে মন্তোর নিতে বুল্লে নিজ্জশ নেবো। এখন কিছু সেবা করেন, বাবা।"

বৃন্দাবন বলিল, 'উহু, তোর দা-ঠাকুর মোচনমানের হুধ খায়, সে ত ম্লেচ্ছ; তার কাছে ও কথা জিজ্ঞাসা করতে যাবি? যেমন তোর গোয়ালে বুদ্ধি!— তা দেখ—শাস্ত্রে বলেছে—'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতে।' দাম দিলেই জিনিষ শুদ্ধ হয়। যদি পাঁচ টাকা ভোজনদক্ষিণে দিতে পারিস্ ত তোর বাড়ী সেবা করলে তেমন অধর্ম্ম হবে না।"

অবশেষে হুই টাকা ভোজন-দক্ষিণা পাইয়াই বৃন্দাবন তাহার গৃহে সেবা করিল।

পরদিন ক্ষেন্তি ডাকঘরে গিয়া তাহার দা-ঠাকুরের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইল। দা-ঠাকুর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত অধ্যাপকের পুত্র; গোবিন্দপুরের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তাঁহার দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত মুখে হাসি লাগিয়াই থাকে; চৌদ্দ আনা পাকা ও হু'আনা কাঁচা চুলের মধ্যে একটি শিখা; তাহার উপর তিনি

আহ্নিকপূজা শেষ না করিয়া চায়ের পেয়ালায় ওষ্ঠ স্পর্শ করেন না। পরান্নগ্রহণ ত দূরের কথা!

প্রভাতে ক্ষেন্তিকে ভক্তিভরে চরণবন্দনা করিতে দেখিয়া দা-ঠাকুর সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রে ক্ষেন্তি, এত সকালে কি মতলবে এসে অত ভক্তি দেখাচ্ছিস্?"

ক্ষেন্তি দা-ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ দেখো দা-ঠাকুর! আমাদের গুষ্টীর যিনি ইষ্টিদেবতা, তিনি ত বছর দশেক হ'ল কেষ্ট পেয়েছে। কানে কি মন্তর দিয়েলো, তাও ভুলে গিয়েছি। তা ও পাড়ার বিন্দে ঠাকুর এখন আমাদের মন্তর দিতে চায়। আমাগোর ইষ্টি-দেবতার ইস্ত্রী—মা-ঠাকরুণ আছে শুনেছি, তিনি ত কখনও আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিলে না। তা বুল্চি কি, বিন্দে ঠাকুরের কাছে মন্তর নেবো?"

দা-ঠাকুর বলিলেন, "অ্যাঁ, তুই বলছিস কি? তুই শেষে গুরু ত্যাগ ক'রে আর এক জনের কাছে মন্তর নিবি?—তাতে কি হবে, জানিস্? যখন মরবি, তখন যমদূতরা তোকে আর তোর ঘোষকে রৈরব নরকে টেনে নিয়ে গিয়ে, লোহার জাঁতার নীচে ফেল্বে; তার পর তোর ঐ মূলোর মত লম্বা দাঁতগুলো সাঁড়াসী দিয়ে ধরবে আর পড়্‌পড়্‌ ক'রে উপড়িয়ে ফেল্বে—তার পর—"

ঘোষাণীর দাঁতগুলি কিছু লম্বা। সে সভয়ে বলিল, "আর বুল্তে হবে না দা-ঠাকুর! যদি আমাকে ভিটে-মাটী ছাড়তে হয়—তবু বিন্দে ঠাকুরের কাছে মন্তর নেব না। বাপদাদার ইষ্টিদেবতা ছাড়বো না।"

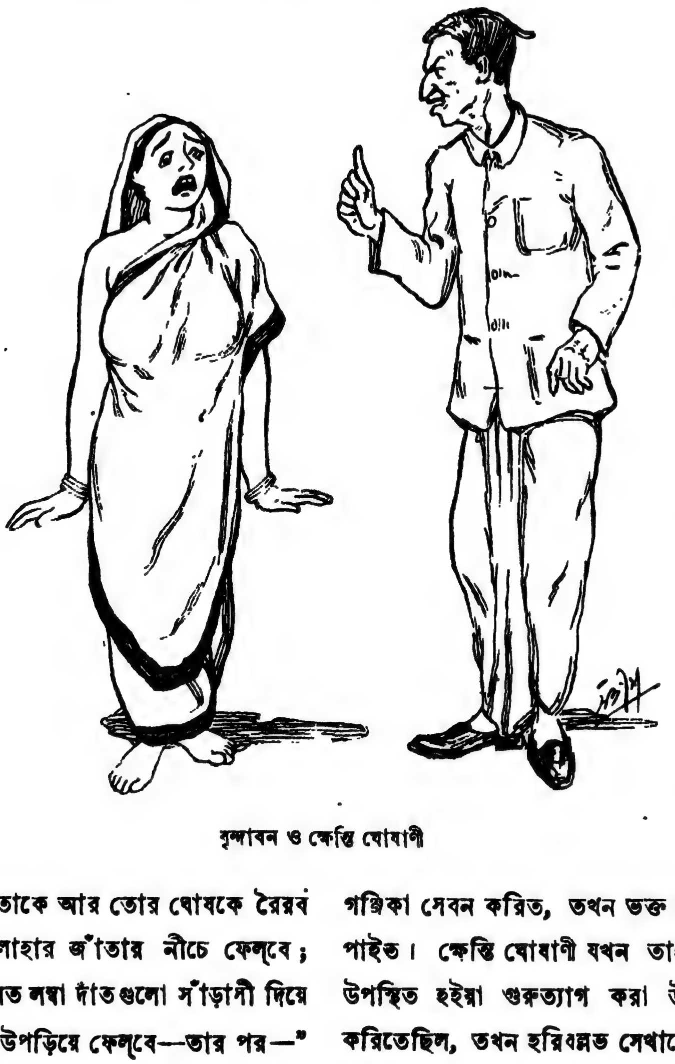

বৃন্দাবন ও ক্ষেন্তি ঘোষাণী

ক্ষেন্তি যমদূতের ভয়ে আর দা-ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইল না! সে বাড়ী আসিয়া তাহার নাবালক স্বামীকে সকল কথা বলিল।

তক্ষক ঘোষ সভয়ে বলিল, "তুই কি ক্ষেপেছিস্, ঘোষাণী! বাপদাদার ইষ্টিদেবতা তুই তালাক দিলেও আমি ছাড়ছিনে। যমদূতে লোহার জাঁতার নীচে ফেলিয়ে ছাতু করবে? ওরে বাপ্‌রে! দা-ঠাকুর মিথ্যে ক'বার মানুষ নয়। তুই বিন্দে ঠাকুরকে জবাব দিস্। তেনাকে ইষ্টি-দেবতা কাড়া হবে না। লোকে বুল্বে কি?"

৮

বৃন্দাবনচন্দ্র ক্ষেন্তিকে তাগিদ দিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেন্তি প্রথম দুই চারি দিন নানা রকম ওজর করিয়া কাটাইয়া দিল; শেষে বলিল, সে গুরুত্যাগ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দপুর ডাকঘরের ওভারসিয়ার হরিবল্লভ বসাক বৃন্দাবনের ভক্ত; 'নন্দনকুটীরে' ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে বসিয়া সপার্ষদ প্রভু যখন গঞ্জিকা সেবন করিত, তখন ভক্ত হরিবল্লভও প্রভুর প্রসাদ পাইত। ক্ষেন্তি ঘোষাণী যখন তাহার দা-ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুত্যাগ করা উচিত কি না জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তখন হরিবল্লভ সেখানে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিল।

ক্ষেন্তি ঘোষাণী কুলগুরু ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের নিকট মন্ত্র লইতে অস্বীকৃত হইলে, বৃন্দাবন ক্রোধে বিচলিত হইয়া এবং 'নন্দনকুটীরে' আসিয়া কয়েক ছিলিম গঞ্জিকা সেবনের

পর হরিবল্লভকে বলিল, "বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখিছিস হরি! ওর গোয়ালে বিস্তর গাই-গরু আছে, ওদের শিষ্য করতে পারলে নিত্য-সেবার ভারী সুবিধে হ'ত। দুধ, দই, ক্ষীর, ছানা দরকার হ'লেই পাওয়া যেত; কিন্তু বেটী ত রাজী হয় না; উপায় কি?"

হরিবল্লভ গাঁজার কলিকায় দম্ দিয়া বলিল, "না প্রভু, ও মাগী রাজী হবে না। আমাদের মাষ্টারমোশাই ওকে যে ভয় দেখিয়েছেন, তা শুনে ও বলেছে, ভিটে-মাটী ছাড়তে হয়, তা-ও স্বীকার, গুরুত্যাগ করবে না। তা আপনি ইচ্ছা করলেই ওকে ভিটে-ছাড়া করতে পারেন। তখন ভয় পেয়ে রাজী হতেও পারে।"

বৃন্দাবন সোৎসাহে বলিল, "বটে? কি ক'রে?"

হরিবল্লভ বলিল, "সে কথা ঐ নটবর পরামাণিককে জিজ্ঞাসা করুন। নটবর সব জানে।"

নটবর প্রভুর আর একটি ভক্ত। সে সঙ্কীর্ত্তনের সময় বৃন্দাবনের দলে খোল বাজাইত; অবশেষে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্যও হইয়াছিল।

নটবর বলিল, "তক্ষক ঘোষ আমার প্রতিবেশী। আমরা দীপু ভট্‌চাজের প্রজা; আমি আমার বাড়ীর জমীটুকু ভট্‌চাজ মহাশয়ের কাছে মৌরুসী ক'রে নিয়েছি; কিন্তু তক্ষক ঘোষ এখনও উট্‌বন্দী জমীতেই বাস করছে। দীপু ভট্‌চাজকে গোটাকত টাকা সেলামী দিয়ে ঐ জমীটি মৌরুসী ক'রে নিলেই কায হাসিল! তক্ষককে উঠে যাবার 'নুটিস' দিলেই ওর শত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢুকবে।"

বৃন্দাবন আনন্দে নটবরকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিল, "সাবাস্ বুদ্ধি! কথায় বলে—'নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্ত!' এ কায তোমাকে করতেই হবে।"

নটবর গাঁজার কলিকায় দম্ দিয়া বলিল, "নিশ্চয়, ইষ্টদেবতার আদেশ অগ্রাজ্জি ক'রে কি নরকে যাব? আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, প্রভু! আমি কালই দীপু খুড়োর সঙ্গে দেখা করবো।"

দশ টাকা সেলামী পাইয়া দীপু ভট্‌চাজ তক্ষক ঘোষের বাস্তভিটে নটবর পরামাণিককে মৌরুসী করিয়া দিল।

তক্ষক ঘোষ বা ক্ষেন্তি ঘোষাণী তাহা জানিতে পারিল না। দলীল রেজেষ্ট্রী হইলে হঠাৎ এক দিন তক্ষক ঘোষ উচ্ছেদের নোটিশ পাইল।

ক্ষেন্তি ঘোষাণী তখন নটবর পরামাণিকের তোষামোদ করিতে লাগিল—বাপ-দাদার ভিটা হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা না হয়; এত কাল পরে দুটো গরু-বাছুর লইয়া সে কোথায় উঠিয়া যাইবে?

নটবর মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও জমীটুকু আমি মৌরুসী ক'রে নিয়েছি। ঠাকুর প্রভুকে স্বপ্নে আদেশ করেছেন—ওখানে ফুলবাগান করতে হবে। তোর গোয়ালের গোবরের দুর্গন্ধে ঠাকুর বৈকুণ্ঠে অস্থির হয়ে উঠেছেন।"

নটবর পরামাণিকের কাছে দরবার করিয়া ফল হইবে না বুঝিয়া ক্ষেন্তি ঘোষাণী দুধের কেঁড়ে কাঁখে লইয়াই 'নন্দন-কুটীরে' উপস্থিত হইল; বৃন্দাবন তখন পার্ষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গুণগুণ স্বরে একটি ভজন গাহিতেছিল।

ক্ষেন্তি বলিল, "আপনার শিষ্যি নটা নাপতে আমার বাড়ীর জমীটুকু মৌরুসী ক'রে নিয়ে আমাকে উঠিয়ে দিতে চাচ্ছে। সাত পুরুষের ভিটে থেকে আমাকে তাড়িও না, ঠাকুর!"

বৃন্দাবন বলিল, "আমি কি করব বল, ঘোষাণী। নারায়ণ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেছেন, ওখানে ফুলবাগান হবে। তিনিই তোমাকে ভিটে-ছাড়া করছেন। হরি হে, তোমারই ইচ্ছে!"

বৃন্দাবন হাই তুলিয়া তুড়ি দিল। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখ ক্ষ্যান্ত, তুমিই তোমার দা-ঠাকুরকে বলেছিলে, ভিটে ছাড়তে হয়, তাতেও রাজী, আমার কাছে মন্ত্র নেবে না। তা তোমার সেই জেদই বাহাল রাখ; এখন কেন আমার কাছে এসেছ?"

ক্ষেন্তি বলিল, "ও কতা কক্ষনো আমি বুলিনি; দুটি চক্ষের মাথা খাই—যদি বু'লে থাকি।"

হরিবল্লভ বসাক গাঁজা টিপিতে টিপিতে বলিল, "মিথ্যে কথা ব'লে পাপের বোঝা বাড়িও না, ঘোষাণী! ঐ দুধের কেঁড়ে কাঁখে নিয়ে বলছ—ও কথা বলনি? আমি সে সময় আপিসে ছিলাম; নিজের কানে শুনেছি।"

বৃন্দাবন বলিল, "সে কথা যাক, দর্পহারী মধুসূদন তোমার দর্প চূর্ণ করেছেন। এখন যদি আমাদের নন্দন-কুটীরের মচ্ছবের জন্যে এক মণ শুকো দই ভেট দিতে পার, আর আমার কাছে মন্ত্র লও—তা হ'লে জমীটুকু

তোমাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যে নটবরকে অনুরোধ করতে পারি। গুরু-আজ্ঞে সে লঙ্ঘন করবে না।"

ক্ষেন্তি অগত্যা তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইল। সে ও তাহার স্বামী কুলগুরু ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের নিকট মন্ত্র লইল। এই উপলক্ষে বৃন্দাবনের বিলক্ষণ লাভ হইল। সেই রাত্রিতে 'নন্দন-কুটীরে' কুড়ি ছিলিম গাঁজা পুড়িল। 'নন্দন-কুটীরে' মহা উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। চারিখানি খোলের 'বুজতা বুজাং বুজাং বুজাং' শব্দে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; তাহা শুনিয়া অধিকারিপাড়ার কতকগুলা বকাটে ছেলে এক সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির করিয়া নন্দন-কুটীরের সম্মুখস্থ পথে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিল :—

"গাঁজার মতন মজার জিনিষ
কি ভাই আছে সংসারে ?
তার গুণ, গাও গুরুজী !
বাজখাঁই স্বরে।
গাঁজার মধুর ধূমে, মরুভূমে
মরীচিকা সঞ্চারে।
চার মুখে—টেনে গাঁজা, হয়ে তাজা
ব্রহ্মা আণ্ডা পয়দা করে।
আবার—শিব ত্যেজে কাশী, নওগাঁবাসী—
এক ছিলিম গঞ্জিকার তরে।
নারদ ঋষি, ঢেঁকিতে বসি
দিবানিশি, গাঁজার গুণ গান করে।
গুরুজী, তাও কি তুমি জান না রে ?
আবার —যত ন্যাড়ানেড়ী, বাড়ী বাড়ী—
গোপীযন্ত্রে গান ধরে—
(গাঁজা পিয়ে রে ! –প্রেমানন্দে নৃত্য ক'রে রে !)
বলে, 'ভিক্ষে দাও গো ব্রজবাসী !
হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।"

ছোঁড়াদের এই সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবার পর 'নন্দন-কুটীরে' গঞ্জিকার আমদানী যেন একটু কমিয়া আসিয়াছে !

শ্রীঃ—

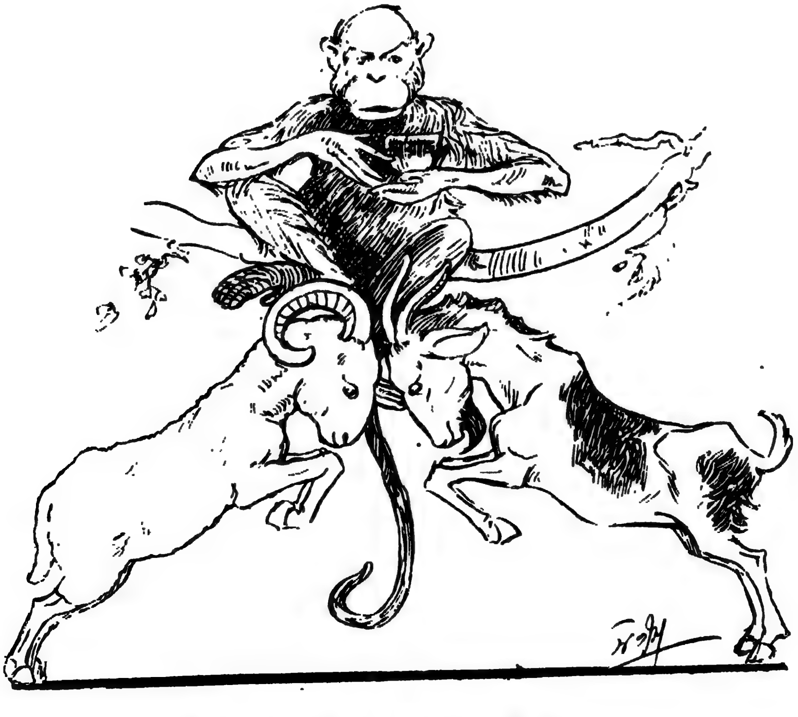

ছাগলে মেড়ায় লড়ে, ভাগাভাগি কাণ্ড।
শাখামৃগ গাছে চড়ে, লয়ে দধিভাণ্ড ॥

বন্দুকের আওয়াজের ফটোগ্রাফ

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের United States Bureau of Standards বন্দুক আওয়াজ হওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ তুলিয়া বন্দুকের মুখ হইতে নির্গত আগুনের ঝলক এবং শব্দের ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধ্বনি বাতাসের কম্পন ছাড়া আর কিছু নহে। বন্দুকের নলের ভিতর হইতে বারুদের হঠাৎ স্ফুরণের ঠেলায় নলের মুখ দিয়া যে আগুনের ঝলক বাহির হয়, তাহার ধাক্কায় নলের মুখের কাছের বাতাসে চাপ পড়ে এবং সেই ঘনীভূত বায়ুস্তরের ধাক্কায় শব্দ উৎপন্ন হয়। ছবিতে ঘনীভূত বায়ুমণ্ডলের সীমা-রেখা পর্য্যন্ত স্পষ্ট উঠিয়াছে।

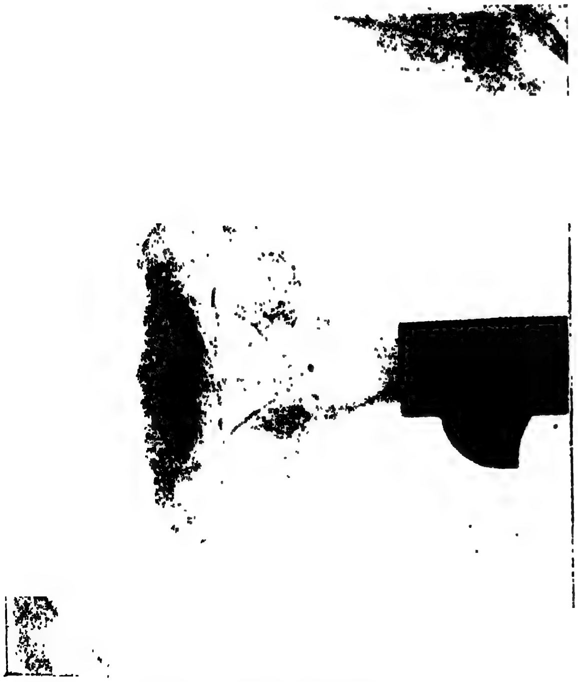

বন্দুকের আওয়াজের ফটোগ্রাফ

নবাবিষ্কৃত ঘুর্ণ্যমান আধার

পাশ্চাত্যদেশে অধিকাংশ গৃহস্থ বস্ত্রাদি স্বয়ং ধৌত করিয়া থাকে। পরিশ্রম ও সময় লাঘবের জন্য অধুনা এক প্রকার ঘূর্ণ্যমান আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বস্ত্রে সাবান

নবাবিষ্কৃত ঘূর্ণ্যমান আধার

ঘষা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে, তজ্জন্য গৃহস্থকে আদৌ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

প্রস্তর-ক্ষোদিত বিরাট মূর্ত্তি

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দক্ষিণাংশে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। এতদঞ্চলে কোনও জাহাজ গতায়াত করে না বলিয়া এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই অবগত নহে। কোনও অসমসাহসিক পর্য্যটক সংপ্রতি একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া মহাসমুদ্রের এই অংশে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কোনও মানব এই অঞ্চলে গমন করেন নাই। ইষ্টার দ্বীপে রাণা র‍্যরাকু নামক একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে পর্য্যটক কয়েকটি বিরাট প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। কোন অতীত যুগে কোন্ মানব শিল্পীর হস্ত এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এখনও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই।

আতিকায় প্রস্তরমূর্ত্তি

শতবর্ষজীবী বিরাট কুম্ভীর

আমেরিকাতে কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ কুম্ভীর ধৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এমন বিরাটদেহ কুম্ভীর কখনও জীবিত অবস্থায় ধৃত হয় নাই। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ ফুট এবং ওজনে প্রায় ২৮ মণ হইবে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, কুম্ভীরটির বয়স ১ শত বৎসরের উপর হইবে।

শতবর্ষবয়স্ক কুম্ভীর

পাথর-কুচি গাছ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় এক রকম গাছ আছে, যাহার আকৃতি ঠিক পাথরের খণ্ডের মত; তাই সে দেশে তাহার নাম পাথর-কুচি। আমাদের দেশে এক রকমের গাছের নাম আছে পাথর-কুচি; তাহার নাম পাথর-কুচি হইয়াছে এই বিশ্বাসে যে, তাহার রসে পাথুরি রোগের পাথর কুচি কুচি হইয়া ভাঙ্গিয়া নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু আফ্রিকার পাথর-কুচি আকৃতির জন্যই ঐ নাম পাইয়াছে। এই গাছ দেখিলে বুঝা শক্ত যে, সেগুলি উদ্ভিদ অথবা

পাথর। এই গাছ শুধু জলে ভরা অনেকটা নারিকেলের ফোঁপলের মত। তাই মরুবাসী নর ও পশু এই গাছ খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। গাছকে মানুষ ও পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পাথরের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছে।

ডুবুরীর শীত-নিবারক পরিচ্ছদ

সম্প্রতি ডুবুরীদিগের জন্য এক প্রকার পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পরিধান করিয়া তুষার-শীতল সলিলমধ্যে বহুক্ষণ নিমগ্ন থাকিলেও শীতে কষ্ট পাইতে হয় না। এই পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জলমধ্যে হস্ত-পদাদি ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারা যায়। সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, এক ব্যক্তি ১৫ ফুট গভীর বরফ-শীতল জলের মধ্যে ১৫ ঘণ্টা নিমগ্ন হইয়া ছিল; কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করে নাই। শীতের প্রভাব সে জয় করিয়াছিল।

ডুবুরীর শীত-নিবারক পরিচ্ছদ

বিচিত্র শিরস্ত্রাণধারিণী নারী

দক্ষিণ-আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমির সন্নিহিত নামি হ্রদের উপকূলভাগে এক জাতীয় নর-নারী বাস করে, তাহাদের নারীরা মস্তকে এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে। ত্রিশূলাকৃতি এই শিরস্ত্রাণগুলি দেখিতে বিচিত্র। হেরোডোটস্ তাঁহার গ্রন্থে এই জাতীয় শিরস্ত্রাণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে এইরূপ শিরস্ত্রাণযুক্ত নর-নারী কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধুনা জনৈক অধ্যাপক (Prof. Schwarz) এইরূপ শিরস্ত্রাণধারিণী নারী আবিষ্কার করিয়াছেন।

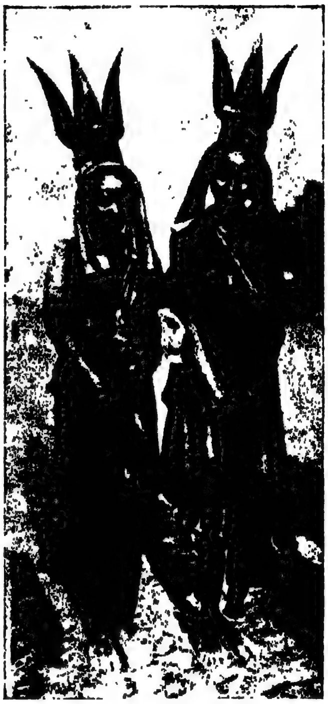

ত্রিশূলাকৃতি শিরস্ত্রাণধারিণী নারী

গাছের মশাল

দক্ষিণ-আফ্রিকায় একরকম মনসা-সীজের গাছ আছে, তাহার আঠা দাহ্য। এই গাছের একটা ডালে আগুন ধরাইয়া দিলে মোম-বাতির মত জ্বলিতে থাকে।

বংশপরিচয়জ্ঞাপক স্তম্ভ

উত্তর-আমেরিকার আদিম নিবাসীরা স্ব স্ব পল্লীতে বংশপরিচয়জ্ঞাপক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত। ইহা দৃষ্টে উত্তরকালের বংশধর নিজবংশের যাবতীয় ইতিহাস বিবৃত করিতে পারিত। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তম্ভগুলি ইদানীং অনাদৃত অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। কানাডা ও আলাস্কা অঞ্চলে এই সকল স্তম্ভ দ্রুত বিলুপ্ত হইতেছে। কানাডার 'জাসপার ন্যাশনাল' পার্কে একটি চমৎকার স্তম্ভ আছে, এমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন স্তম্ভ অন্যত্র নাই। এইরূপ স্তম্ভগুলি বিনষ্ট হওয়ায় অতীত যুগের বংশপরম্পরাগত ইতিহাসও বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

বৃহত্তম অট্টালিকা

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে একটি বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরের টেলিফোন কার্য্যালয় ঐ অট্টালিকার একাংশে অবস্থিত। আমেরিকা—বিশেষ নিউইয়র্ক নগর টেলিফোনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। লণ্ডন প্যারী, বার্লিন, ব্রুসেলস্, ভিয়েনা এবং রোম নগরের টেলিফোনের সংখ্যা একত্র করিলে যত হয়, শুধু নিউইয়র্ক সহ

বংশপরিচয়জ্ঞাপক স্তম্ভ

বৃহত্তম অট্টালিকা

তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক টেলিফোন যন্ত্র আছে। পৃথিবীর কুত্রাপি এত সংখ্যক যন্ত্র নাই। উল্লিখিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মণ ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য বিরাট অট্টালিকার ৬ তলার যাবতীয় স্থান শুধু টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ৬ হাজার কর্ম্মচারীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অট্টালিকার অন্যান্য অংশ বিভিন্ন কার্য্যালয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। ভূমির মূল্য ও গৃহনির্ম্মাণকল্পে অন্যূন সাড়ে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নির্ব্বাসিত চান-সম্রাট ও তাঁহার মহিষী

চীনের নির্ব্বাসিত সম্রাট অতি অল্পবয়স্ক। বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে ইনি চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নবীন সম্রাট স্বয়ান্ টং সিংহাসন ত্যাগ করেন; কিন্তু সম্রাট উপাধি তিনি তখনও ব্যবহার করিতেন এবং পিকিং নগরের প্রাসাদে তাঁহাকে অবস্থান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিছুকাল, মাঞ্চু দরবার ও সাধারণতন্ত্র সরকারের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং উভয়েব সম্পক প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১৬ বৎসর বয়সে সম্রাট, জং-যু-য়ান্ নামক জনৈক মাঞ্চু ওমরাহের কন্যার সহিত বাগ্‌দত্ত হন; ডিসেম্বর মাসে উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জেনারল ফেঙ্গ য়ুসিয়াং সম্রাট-দম্পতিকে নিষিদ্ধ নগরী পিকিং হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সেনানায়কের নির্দ্দেশক্রমে নির্ব্বাসিত সম্রাট মহিষীসহ তাঁহার পিতৃভবনে রাজবন্দিরূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেওয়া হইত না। মার্শাল চাং সো-লিন রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার পর কিছুদিন এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। সেই সুযোগে সম্রাটের শিক্ষক মিঃ আর, এফ, জনষ্টন সম্রাটকে স্থানান্তরিত করেন। জাপানী দূতনিবাসে নির্ব্বাসিত সম্রাট কয়েক মাস পরম সমাদরে অবস্থিতি করেন। জাপানী মন্ত্রী মিঃ যোশীগাওয়া চীন-সম্রাটকে সম্রাটোচিত গৌরবের সহিত অতিথিসৎকার করিতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট গোপনে রেলযোগে টিনসিন নগরে গমন করেন। জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী জেনারেল চ্যাং পায়ো ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের সময়ে সম্রাটপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নবীন চীন সম্রাট টিনসিনে আসিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত সেনাপতি তখন স্থানীয় জাপানী অধিকারে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। সম্রাট-মহিষী স্বামীর সহিত একত্র বসবাস করিতেছেন। ইঁহার বয়সও অতি অল্প; কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় ইনি প্রবীণার সমকক্ষ। নির্ব্বাসিত চীন

নির্ব্বাসিতা চীন-সম্রাট-মহিষী

বাম দিক হইতে—চীন সম্রাটের শিক্ষক, সম্রাট, জাপানী দর্শক এবং রাজপ্রাসাদের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী

সম্রাট সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ডে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত বহু নৃপতি আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

এ বৎসর এলাহাবাদে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় একটি বাঙ্গালী যুবক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীমান্ সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। সন্তোষকুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পর পর আই. এস-সি; আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার বয়স ২২ বৎসর। ভারতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রথার প্রবর্ত্তন হইবার পর এইবার প্রথমে বাঙ্গালী ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। ইহা বাঙ্গালার পক্ষে বলিবার কথা। সারা ভারতের প্রায় দেড় শত পরীক্ষার্থীর মধ্যে সন্তোষকুমার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং এক জন মাদ্রাজী ছাত্র দ্বিতীয় ও এক জন পাঞ্জাবী মুসলমান ছাত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই তিনটি কৃতী ছাত্র সরকার কর্ত্তৃক ভারত হইতে সিবিল সার্ভিসে যোগদান করিবার নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে অতঃপর সরকারী খরচায় বিলাত-যাত্রা করিয়া চাকুরীর জন্য ২ বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হইবে।

জাতিসঙ্ঘের স্থান

জাতিসঙ্ঘটা কি বস্তু, তাহা ক্রমেই জগতের লোক বুঝিতে শিখিতেছে। জাতিসঙ্ঘের mandate বা অনুজ্ঞাও যে কি চীজ, তাহাও কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিতেছে না। জাতিসঙ্ঘ "নরমের যম, গরমের মোম।" গ্রীস-ইটালীর বিবাদের ব্যাপারে মাসোলিনির ভ্রূকুটীভঙ্গে জাতিসঙ্ঘের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানিয়াছে। মিশরের ব্যাপারেও জাতিসঙ্ঘের কেরামতী জানা গিয়াছে। জানিয়াছে অনেকে, তবে য়ুরোপের রাজনীতি হইতে বহুদূরে অবস্থিত আফগানিস্থানও যে জাতিসঙ্ঘের স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এইটুকুই আশ্চর্য্য। কাবুলের "আমান-ই-আফগান" নামক পত্র লিখিয়াছেন,—"যে ভাবে বর্ত্তমান জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারা যায়, পরন্তু যে উদ্দেশ্যে এই জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহাও জানিতে বাকী নাই। জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইবার অল্পকাল পরেই প্রাচ্যদেশবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদী কয়েকটি শক্তির সমবায়ে তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য এই সঙ্ঘ গঠন করা হইয়াছে। এমন কি, যতঃ দিন যাইতেছে, ততই প্রতীচ্যের ক্ষুদ্র শক্তিরাও বুঝিতে পারিতেছে যে, জাতিসঙ্ঘ প্রবল বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীর হস্তের ক্রীড়নক মাত্র।" ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না। এ কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মার্কিণ জাতিসঙ্ঘে যোগদান করেন নাই। অথচ এই জাতিসঙ্ঘের দোহাই দিয়া জগতে কত অনর্থ ও অন্যায়ই আচরিত হইতেছে!

প্রবাসে ভারতবাসী

কথায় বলে, 'খেদাই নি তোর উঠান চষি।' দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সেই ব্যবহারই করিতেছেন। ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে যে কোণঠেসা আইন (Class Areas Bill) বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া এবং ভারত-সরকার ইহার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় ডেপুটেশান প্রেরণ করিয়া একটা রফার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ঐ আইন কিছু দিনের জন্য মুলতুবি রাখিতে সম্মত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ভারতীয়দিগকে 'উদ্বাস্তু' করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণ-বৈষম্য বিল (Colour Bar Bill) খানি কি? এই বিল বিধিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা কি ভারত-সরকারের নিকট প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছেন? ইহার উপর নাটালের প্রাদেশিক শিক্ষাসম্পর্কিত অর্ডিনান্স জারি করিয়া তথায় ভারতীয়দের যতটুকু শিক্ষার অধিকার আছে, তাহাও নাকচ করিয়া দিতেছেন। পরন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের য়ুনিয়ন কনসিলিয়েশান এ্যাক্টের ধারা অনুসারে যে জয়েণ্ট কাউন্সিলসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় কর্ম্মকর্ত্তা বা কর্ম্মচারীর প্রবেশাধিকার নাই। ঘরের আসবাবপত্র বা মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করা এবং গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে বহু ভারতীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। যে সকল ভারতীয় ঠিকাদার বা স্বত্বাধিকারী এই সকল কার্য্যে ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কাউন্সিল সমূহে তাঁহাদের স্থান নাই, শ্রমিকদিগের ত নাই-ই। ট্রেড য়ুনিয়ন সমূহ ও মাষ্টারস য়ুনিয়ন সমূহের সমবায়ে এই সকল কাউন্সিল গঠিত; এই সকল কাউন্সিলের যাঁহারা সদস্য, সেই সকল শ্বেতাঙ্গ, ধনী ও শ্রমিকদিগের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেন এবং শ্রমিকদিগের বেতন ও কার্য্যের সময়ও নিরূপণ করিয়া দিয়া থাকেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অথচ ভারতীয় ধনী বা শ্রমিকগণের সে অধিকার নাই। কাউন্সিলসমূহের য়ুরোপীয় সদস্যরা বেতনের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন, তাহা ভারতীয়দিগকে মানিয়া চলিতে হইবে, অথচ কাউন্সিলে তাঁহাদের কথা কহিবার কোনও অধিকার নাই। ইহা দ্বারা ভারতীয় ধনী ও শ্রমিকগণকে প্রকারান্তরে কি বাঁধিয়া মারা হয় না? কোণঠেসা আইন বিধিবদ্ধ না করিয়াও যে এই ভাবে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে জব্দ করা যায়, তাহা কি ইহাতে অনুষ্ঠিত হইতেছে না? এ অবস্থার প্রতীকার কি? আমরা নিজের ঘরেই পরস্পর বিবাদে উন্মত্ত, ঘরের বাহিরে স্বদেশীয়ের দুরবস্থার নিরাকরণ করিব কিরূপে?

করিমের পরিণাম

মূরদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতা আবদুল করিম ফরাসীশক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার পরেও মূর-যুদ্ধের অবসান হয় নাই, রিফের মূররা তাঁহাকে হারাইয়াও ফরাসীর মত প্রবল শত্রুর বিপক্ষে এখনও ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। ইহাতেই মনে হয়, এমন কোনও একটা ব্যক্তিগত আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার জন্য আবদুল করিম শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবদুল করিম গোপনে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় স্বদেশ পরিত্যাগ করায় এ সন্দেহ দৃঢ়মূল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যদি তাঁহার দেশের এমন অবস্থা উপস্থিত হইত যে, আর যুদ্ধ পরিচালনা করা অসম্ভব, তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বজাতীয় বীরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশের ও জাতির পক্ষ হইতে আত্মসমর্পণ করিতেন। বিশেষতঃ যখন তিনি পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি অধীনতা স্বীকার করিবেন না—ইহাতে যদি তাঁহার দেশের নারীদিগকে পুরোভাগে হত্যা করিয়া পুরুষগণকে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে একে একে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। যখন তিনি এই সমস্ত উক্তি করিয়াছিলেন, তখন সেই উক্তিতে তাঁহার অনুচরগণের সকলেরই নিশ্চিত সম্মতি ছিল, নতুবা তিনি এমন বাণী প্রচার করিতে পারিতেন না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তিনি সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখন গোপনে কাহাকেও না জানাইয়া করিলেন। ইহাতে কি মনে হয়? নিশ্চিতই তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে তাঁহার বিপক্ষে একটা আন্দোলন হইয়াছিল, হয় ত

তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্রও হইয়াছিল। যাহা হউক, হতভাগ্য করিম শেষে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ও নিজের জনের প্রাণরক্ষা করিলেন! ইহাতেও তাঁহার নিস্তার হয় নাই। স্পেনীয় বিজেতারা তাঁহাকে বিচার করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে চাহিয়াছিলেন! কেবল ফরাসীর দয়ায় তিনি এ যাত্রা সেই অপমানকর দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। এখন শুনিতেছি, ফরাসী ও স্পেনীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাদাগাস্কর দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবদুল করিমের ইহাই পরিণাম! এক দিন ফরাসীর শৌর্য্য (Chivalry) জগদ্বিখ্যাত ছিল। সে দিন আর ফরাসীর নাই। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর ফরাসী প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক দিন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার রণজয়ী হইয়াও বন্দী রাজা পুরুর সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সসম্মানে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুরাজগণের মধ্যে এমন শৌর্য্যের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। আজ ফরাসী যদি আবদুল করিমের বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাকে বন্ধুরাজারূপে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা হইলে কি শোভনই হইত! কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে তাহা হইবার নহে। সাম্রাজ্যবাদী প্রতীচ্য শক্তিসমূহের রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষানলে শৌর্য্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, এ আকাঙ্ক্ষা বিজেতা বা বিজিত—কাহারও পক্ষে পরিণামে মঙ্গলকর নহে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বলশেভিক প্রভাব

কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে এক বিরাট সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। সে ধর্ম্মঘট সফল হয় নাই, বিলাতের সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই উহার অবসান হইয়াছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষের বিবরণে প্রকাশ, এই ধর্ম্মঘটের পশ্চাতে রুসিয়ার বলশেভিকদিগের গুপ্ত সাহায্য ছিল। বিলাতের অন্যতম মন্ত্রী চেম্বার্লেন প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, রুসিয়ার বলশেভিকরা বিলাতের কোনও কোনও শ্রমিকসঙ্ঘকে বিপুল অর্থসাহায্য দানের চেষ্টা করিয়াছিল। এ জন্য তিনি রুসিয়ার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পাছে উহা হইতে জগতে আবার অশান্তির সৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কায় তিনি উহা ঘটিতে দেন নাই।

যাহা হউক, রুসিয়ার বলশেভিকরা যে জগতের নানা স্থানে অরাজকতা ও বিপ্লব ঘটাইতে চাহিতেছে, তাহা ইংরাজ রাজপুরুষগণের উক্তিতেই প্রকাশ। প্রাচ্যের মধ্য-এসিয়ায়, আফগান রাজ্যে, চীন-দেশে ও ভারতে না কি বলশেভিকরা নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে। সে দিন ভারতের অস্থায়ী Director of Military Operations এবং Director of Military Intelligence কর্ণেল সণ্ডার্স কলিকাতার য়ুরোপীয় এসোসিয়েশানে বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—“বলশেভিকরা ভারতে ইংরাজের উচ্ছেদসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এতদর্থে তাহারা মধ্য-এসিয়ায় চারিটি সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং আফগানিস্থানের উড়োকল বিভাগটা একরূপ হস্তগত করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা ঐ দেশে ক্ষিপ্রগতিতে Strategic রেল লাইন সমূহ পাতিবার চেষ্টা করিতেছে।” চীনের সাংহাই, কাণ্টন প্রভৃতি স্থানে বলশেভিকরা আপনাদের মতবাদ প্রচার করিতেছে, ইহার না কি বিশেষ প্রমাণ আছে। সাংহাই সহরে এই বলশেভিক প্রভাবের বিপক্ষে ইংরাজপক্ষ হইতে এক প্রচার-সমিতির প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ফল কথা, অতীতের জার-শাসিত রুস-ঋক্ষের আতঙ্কের পরিবর্ত্তে এখন বলশেভিকাতঙ্ক অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বলশেভিকবাদ পদার্থটা কি? রুসিয়ার ভাষায় ‘বলশেভিক’ অর্থে ‘অধিকসংখ্যক’ বুঝায় এবং ‘মেনশেভিক’ অর্থে ‘অল্পসংখ্যক’ বুঝায়। যে বলশেভিক কথার অর্থ অধিকসংখ্যক, তাহার সহিত আতঙ্কের সম্পর্ক আসিল কোথা হইতে? ইংরাজ লেখকরা বলেন, Communismএর সহিত Bolshevismএর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

কারল মার্কস Communism মন্ত্রের ঋষি। তিনি প্রুসিয়ার এক ইহুদী ব্যবহারাজীবের পুত্র। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী নগরীর তন্তুবায়ের পুত্র ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সহিত একযোগে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্রই Communismএর বেদ, বাইবেল, কোরাণ। কারল মার্কসের মূলনীতি এইরূপ :—

বহু প্রাচীনকাল হইতে জগতে নানা শ্রেণীর মনুষ্যসমাজের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে প্রাচীন Slave days, তাহার পর মধ্যযুগের Feudalism এবং বর্ত্তমানের Capitalismএর যুগ। এই তিন যুগেই এক শ্রেণীর মানবের সহিত অপর এক শ্রেণীর মানবের প্রাধান্যলাভের সংঘর্ষ হইয়াছে ও হইতেছে। এ সকলের মধ্য হইতে দেখা যায়, এক শ্রেণীর ধ্বংসের উপর অন্য শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে। বর্ত্তমানে Capitalistic societyর প্রাধান্যের যুগ, কিন্তু এই প্রাধান্য চরমশিখরে উত্থিত হইয়াছে। এই প্রাধান্যের ফলে দ্রব্য উৎপাদনের উপর চরম লক্ষ্য রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বণ্টনের দিকে সম্যক্ দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না। উৎপাদনের প্রাবল্যে এবং বণ্টনের অভাবে জগতের সর্ব্বত্র বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহারই ফলে অসন্তোষ ও অশান্তি। ইহা দূর করাই Communismএর উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইবে? সারা জগতে বর্ত্তমান প্রথার বিপক্ষে বিরাট বিপ্লব উপস্থিত করিয়া সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যাহারা পণ্য উৎপাদন করে, সেই শ্রমিক শ্রেণী যে কেবল বিপ্লব দ্বারা বর্ত্তমান সু-প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টসমূহকে ভূমিসাৎ করিয়া শক্তি করায়ত্ত করিলেই এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিলেই Communismএর সার্থকতা সম্পাদিত হইল, তাহা নহে। ইহার উপর উৎপাদকগণের (শ্রমিকগণের) Proletariat (কার্য্যকরী সমিতি)কে সর্ব্বেসর্ব্বা (Dictator) হইতে হইবে। এই সর্ব্বেসর্ব্বা সমিতি অন্য সকল শ্রেণীকে আপন মতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি কেহ সহজে বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইতে হইবে, তাহাও না হইলে বিরুদ্ধবাদীদিগকে একে একে নিঃশেষ করিতে হইবে। তাহার পর ধন-সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্য জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

কারল মার্কসের এই Communism নীতি তিনটি প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন দ্বারা বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে সফল করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, ইহাদের নাম “Three Internationals.” যে সময়ে মার্কসের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে প্রথম ‘International’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারল মার্কস নিজে নীতির প্রবর্ত্তক হইলেও এই আন্দোলনে তাঁহার অংশ ছিল না। এই আন্দোলন কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধের স্বদেশপ্রেমের তুফানে ভাসিয়া যায়। দ্বিতীয় ‘International’এর প্রতিষ্ঠা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। রুসিয়ার Social Democratic দলের ব্রাসেলস ও লণ্ডনে ঐ সময়ে এক কমিউনিষ্ট বৈঠক বসে। ঐ সময়ে সদস্যদিগের মধ্যে এক বিবাদের ফলে দুইটি দল হইয়া যায়। অধিকসংখ্যক সদস্যের নাম হয়

Bolshevic এবং অল্পসংখ্যক সদস্যের নাম Menshevic। লেনিন Bolshevic দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু লেনিনের আন্দোলনও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জার্ম্মাণ-যুদ্ধের প্রভাবে চাপা পড়ে। মহাযুদ্ধের অবসানের পর আবার ঐ আন্দোলন রুসদেশে সজাগ হইয়া উঠে। রুস-কৃষক অতীব ভাবপ্রবণ ; বিশেষতঃ (জার আইভ্যানের সময় হইতে এ যাবৎ) বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা জারের শাসনের বিপক্ষে অন্তরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাযেই লেনিন তাঁহার মন্ত্রপ্রচারের উর্ব্বরক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রুসিয়ায় ভীষণ বিপ্লব দেখা দিল। এই বিপ্লবের সহিত কেরেণস্কির নাম পরে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।

বিপ্লব উপস্থিত হইলে নির্ব্বাসিত লেনিন জার্ম্মাণী হইতে রুসিয়ায় প্রবেশ করিলেন। ট্রোটস্কি মার্কিণ দেশ হইতে রুসিয়ায় আসিলেন। তাঁহাদেরই ভাবের ভাবুক রাডেক, লুনাচারস্কি, জিনোভিয়েফ প্রমুখ অন্যান্য কমিউনিষ্ট ঐ সময়ে রুসিয়ায় দেখা দিলেন। ফলে তাঁহাদের চক্রান্তে মধ্যপন্থী বিপ্লববাদীদিগের হস্ত হইতে রুসিয়ার শাসনদণ্ড চ্যুত হইল এবং বলশেভিকরা উহা করতলগত করিলেন।

উহা হইতেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তৃতীয় International এর প্রতিষ্ঠা হইল। উহার অন্য নাম Red International. আবার এই Third বা Red Internationalই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নাম ধারণ করিয়া রুসিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। উহাকে ঠিক গণতন্ত্র শাসন বলা যায় না। কেন না, এই নব গঠিত গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের ন্যায় বহুর উপর অল্পের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। লেনিন স্বয়ং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"আমরা স্বাধীনতার কথা কখনও বলি না। আমরা অল্পের নামে নিয়ামকত্ব (Dictatorship) উপভোগ করিতে চাহি. কারণ, যত দিন না রুসিয়ার কৃষকশ্রেণী আমাদের বলশেভিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তত দিন এইরূপ ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা না করিলে গভর্ণমেণ্ট অচল হইবে।" ট্রোটস্কি ইহার অপেক্ষা আরও খোলাখুলিভাবে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, "গণতন্ত্র শাসন কথাটার কোনও মূল্য নাই, উহা দ্বারা কেবল সাধুতার মুখোস পরা হয় মাত্র। পার্লামেণ্ট অনুযায়ী গণতন্ত্র শাসনের দ্বারা শক্তিশালী হওয়া যায় না। বলপূর্ব্বক শাসনযন্ত্র আয়ত্ত করা শক্তিশালী হওয়ার একমাত্র পথ।"

এই মনোবৃত্তি লইয়া বলশেভিকরা রুসিয়ার সমস্ত শক্তি হস্তগত করিয়াছে। তাহারা সমস্ত সম্পত্তি, যথা ব্যাঙ্ক, জমী প্রভৃতি জাতীয় ধনে পরিণত করিয়াছে। এত দিন যেমন Capitalist শক্তি কেবল উৎপাদনের দিকে সকল সামর্থ্য ও উৎসাহ নিয়োজিত করিয়া আসিতেছিল, তেমনই বলশেভিকরা এখন পণ্যের বণ্টনের দিকে সমস্ত সামর্থ্য নিয়োজিত করিল। অবশ্য ইহার পরে সকল সম্পত্তি ও পণ্য জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার পক্ষে বহু বিঘ্ন দেখিয়া এবং উহা হইতে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় দেখিয়া বলশেভিকরা তাহাদের নীতির নানা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও বলশেভিক নীতি যে এখনও বহু কালের প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক শাসননীতির বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই হেতু প্রতীচ্যেই কি, আর প্রাচ্যেই কি, বলশেভিকবাদের প্রভাব কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আর এই হেতু বলশেভিকবাদের বিপক্ষে নিয়মতান্ত্রিকদিগের প্রচারকার্য্য তুমুল তেজেই চলিতেছে।

বর্ষায়

মীনকটাক্ষে পীনপয়োধরে পুলিনের শ্রোণিতটে,
কলতরঙ্গে প্রকৃতি-অঙ্গে যৌবন-জয় রটে।
করি স্নান-শেষ পরি রাণী-বেশ ধূপ-ধূমে কেশ খুলি'
কেতকীর রজে তনুখানি মেজে শোভে বন-বধূগুলি।
দিগ্‌বালিকার লীলা শালিকায় বলাকামালিকা দুলে
সর্জ্জকাননে অর্জ্জুন-বনে কলতান তারা তুলে।
ত্যজি ফুলধনু ধরি জলধনু স্মর ধারা-শর হানে,
ত্যজি ধূলিভার ফুল-রেণু-হার সমীরণ বহি আনে।
মৃণাল-কন্দ পাথেয় সঙ্গে মরাল মানসে চলে,
দাদুরী মদির মাধুরী বিলায় তমাল তিমিরতলে।
বন্যার পরে তরণীরা দোলে পণ্য-পীবর বুকে,
ধন্য আদরে ধরণীর কোলে কৃষক ধীবর সুখে।
ডাহুক-ডাহুকী চাতক-চাতকী, সরোবরে চখাচখী
মুখোমুখি আজি চঞ্চু মিলায় মিলে যত সখাসখী।
চন্দ্রকজালে আজি শিখণ্ডী বিথারে ইন্দ্রজাল,
মেঘরাগ-ঘন সঙ্গীত সনে নেচে নেচে দেয় তাল।
বিলোলা বল্লী তরুরে জড়ায় পীবর পাণির ডোরে,
ব্রজের স্মৃতিতে নীপের অঙ্গ উঠে রোমাঞ্চে ভ'রে।
কৃপাভাণ্ডার করিয়া উজাড় ছড়াইছে ভগবান্,
মেঘ-মৃদঙ্গে তালে তালে উঠে শত তরঙ্গ তান।
দধিমঙ্গলে চরাচর আজি নেচে দেয় গড়াগড়ি,
বন-কীর্ত্তনে দ্রুমে দ্রুমে প্রেমে বুকে বুকে জড়াজড়ি।
পল্লী-নগরে ক্ষেতে তরী'পরে উল্লাস কলরোল,
এক সাথে যেন মিলেছে ঝুলন রাস রথ আর দোল।
জাতীপ্রিয়ঙ্গু কলিদের কেহ ফুটিতে কি আছে বাকী?
আজিকার এই উৎসব-দিনে কে মুদে রহিবে আঁখি?
ইন্দ্রধনুর তোরণের তলে নামে ইন্দ্রের রথ,
চক্রপীড়নে গুরুগর্জ্জনে চপলাচকিত পথ।
উটজে উটজে ইন্দ্রবরণে কুটজ ছড়ায় লাজ,
সিত-ফেন দধি-ঘট শিরে নদী হুলুরব দেয় আজ।
কবি, ধর গান মল্লার তান উল্লোল বরষায়,
ভামিনীরা আজ মানিনী থেক না শুভখণ বয়ে যায়।
ঢালো গ্রামবধূ কাজরীর মধু স্বরট পুরট পুটে।
নাগর জীবন নিগড়ে বেঁধেছ কে আজ সৌধ-কূটে?
কামিনী-কানন আজিকে শোভন কামিনী আনন চেয়ে,
যূথিকা-বীথিকা ডাকে তোমা আজি সুরভি গীতিকা গেয়ে।
এস আশাভরে আষাঢ়-বাসরে কায লাজ সাজ ফেলি',
পুরকামিনীরা সুরতটিনীতে কর আজ জলকেলি।
লীলা-তরঙ্গে ধারা-সঙ্গমে জড়জঙ্গমে জুটে
বরষা আজিকে হরষ ছড়ায় সবে এস লও লুটে।

শ্রীকালিদাস রায়।

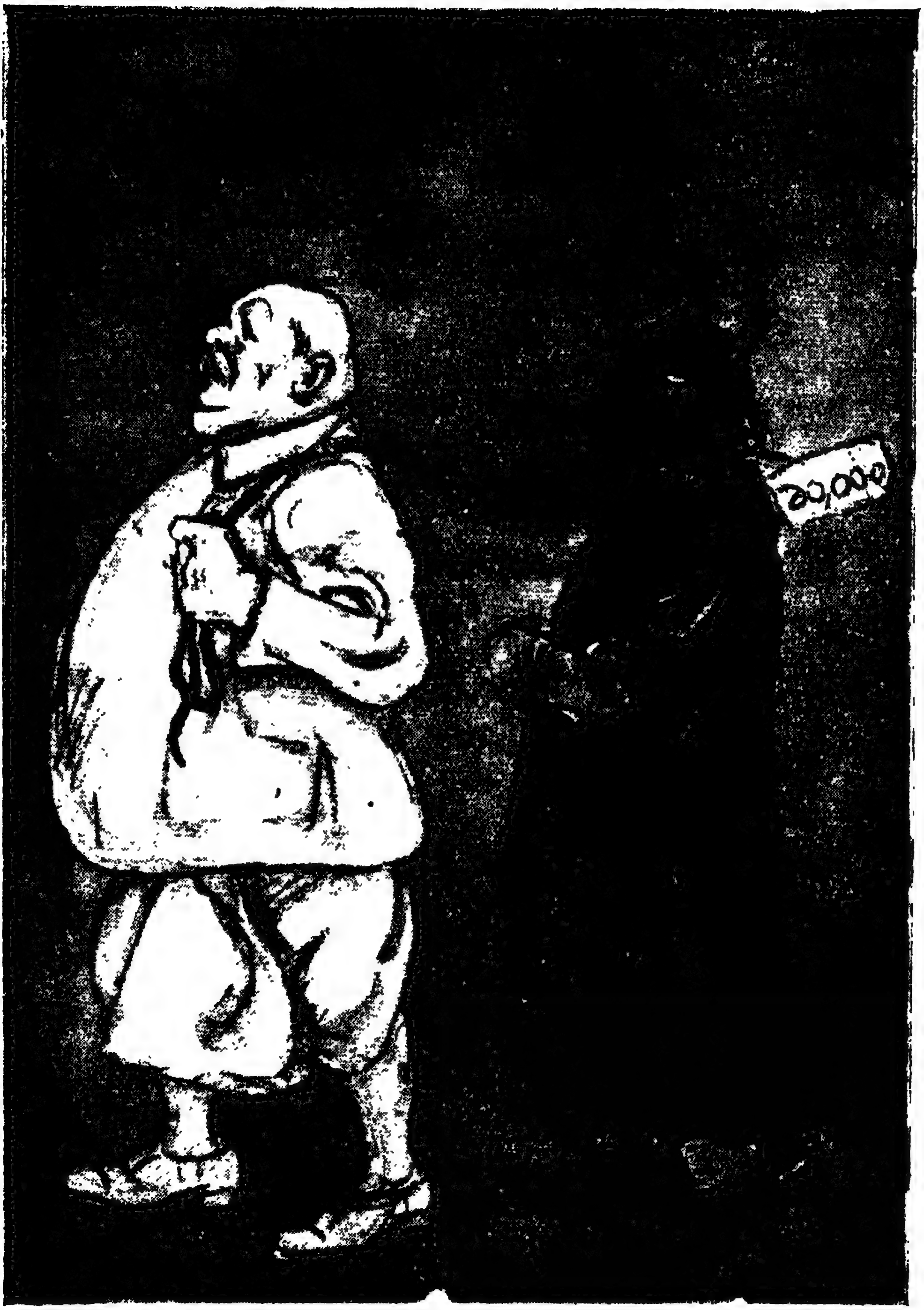

মেয়ের বাবা কোন্‌খানে কে, আয় দৌড়ে আয়,
পাশ-করা এই রত্ন আমার দশ হাজারে যায়।

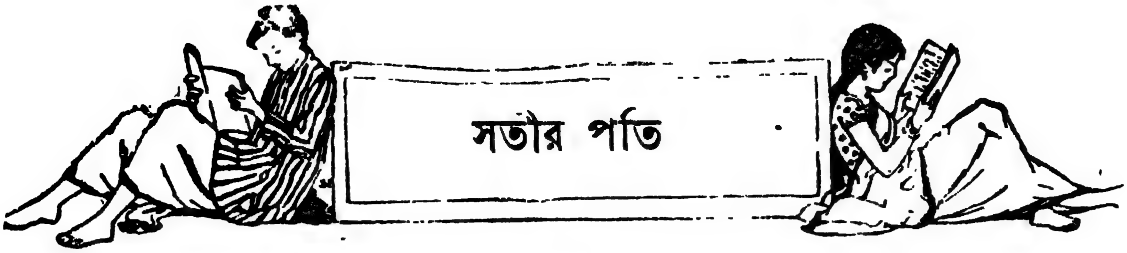

সতীর পতি

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুণ্ডারাজার দরবারে

এই করিম চাচা আর কেহ নয়, প্রসিদ্ধ গুণ্ডা-সর্দ্দার করিম সেখ। এই আড্ডা-গৃহের করিমই মালিক; দলস্থ সকল গুণ্ডাই করিমের আজ্ঞাধীন।

এই মাটকোঠার চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। নিম্নতলটা প্রকাণ্ড একটা হলের মত—সেখানে ২০।২৫ জন মুসলমান, কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া আছে—কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ বদনার নলে মুখ দিয়া জল পান করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে এসিটেলিন গ্যাসের একটা আলো জ্বলিতেছিল। দুইটি নূতন শিকার লইয়া সর্দ্দারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লোকগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্যাসের আলো রেবতীর মুখের উপর পড়ায় তাহারা অবাক্ হইয়া সে দিকে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়ির নিকট দাড়াইয়া করিম হাঁকিল -"এরফান্!"

"জী!"—বলিয়া, লুঙ্গিপরা ষণ্ডা গোছের এক ব্যক্তি বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল।

"ঐ বাকস্ দুটো, বিছানা-টিছানা সব উপরে নিয়ে আয়।"—বলিয়া সতীশ ও রেবতীকে লইয়া করিম উপরে উঠিল।

দ্বিতলে মাঝখানটা একটা হলের মত, তাহার দুই পাশে কয়েকটা কামরা। দুই দিকে দুইটা দেওয়াল-আলো জ্বলিতেছিল। এখানেও ১০।১২ জন মুসলমান, অপেক্ষাকৃত ভদ্রগোছের চেহারা, কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া ছিল। তাহারাও নবাগতদ্বয়কে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছদ্মবেশী হীরালালও ইহাদের মধ্যেই ছিল।

করিম পার্শ্ববর্ত্তী একটা কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিল। ইটিই এ আড্ডা বাড়ীতে করিমের খাস-কামরা। ঘরের দুই দিকের দেওয়ালে, ছোট বড় নানা আকারের ছোরা ছুরি ঝুলিতেছে। এক কোণে একটা তেপায়া টেবলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছে। মেঝের উপর একটা ময়লা বিছানা পাতা। করিম টেবলের আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, বিছানায় বসিয়া, একটা ময়লা তাকিয়ায় ভর দিয়া অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "বোস্ তোরা ঐখানে।"

সতীশ ও রেবতী খালি মেঝের উপর বসিল। ভয়ে উভয়েই কাঁপিতেছিল। করিম বলিল, "কে তোরা, বল্ দেখি!"

সতীশ হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমরা—বাঙ্গালী, হুজুর।"

করিম দাঁত খিচাইয়া বলিল, "হারামজাদা!—বাঙ্গালী, সে ত সবাই জানে। নাম কি তোর? বাড়ী কোথা?"

সতীশ নিজের মিথ্যা নাম ও ঠিকানা বলিল—"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীহারাধন পাল। বাড়ী শ্যামবাজার।"

"কোন্ ইষ্টিট, কত লম্বর?"

"আজ্ঞে, ৩৪ন জগমোহন লেন।"—বলা বাহুল্য, ইহাও মিথ্যা।

"এই ঔরৎ তোর কে হয়?"

"আজ্ঞে, আমার পরিবার—স্ত্রী।"

"বিয়াহী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোর জরুর ঐ জ্যাবরগুলো কি সোণার? না রোলগোল?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে, সমস্তই খাঁটি গিনি সোণার তৈরী।"

"আর ঐ লেকলেসটা? পাতরগুলা আসল, না ঝুটো?"

সতীশ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, সমস্তই আসল। দেড় হাজার টাকা দিয়ে লাভচাঁদের বাড়ী থেকে ওটা কিনেছিলাম।"

করিম বলিল, "ওঃ, তুই তা হ'লে আমির লোক! অনেক টাকা তোর! আচ্ছা—নেকলেসটা দেখি।"—বলিয়া করিম হাত বাড়াইল।

রেবতী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, "নেকলেসটা খুলে দাও রেবী, হুজুর দেখতে চাইছেন।"

দেওয়ালে টাঙ্গানো ছোরা-ছুরীগুলার প্রতি একবার সভয়ে নেত্রপাত করিয়া, রেবতী কম্পিত হস্তে নেকলেস উন্মোচন করিয়া করিমের বিছানায় রাখিল। নেকলেসটি লইয়া করিম বলিল, "চুড়িগুলো, তাগা যোড়াটা, মাথার কাঁটা-চিরুণী, কাণের টাপ, হীরের নাক-ছাবি, আংটিগুলো কোমরের বিছে—সব খুলে দে।"

রেবতী প্রাণের দায়ে একটি একটি করিয়া অলঙ্কারগুলি সবই খুলিয়া দিল। দুই তিন হাজার টাকার গহনা।

এই সময় এরফান্ ও অপর এক জন মিলিয়া বাক্স প্রভৃতি লইয়া আসিল। করিম বলিল, "বাক্স খোল্।"

সতীশ ও রেবতী আপন আপন বাক্স খুলিয়া দিল। কাপড়-চোপড় ছাড়া নগদ টাকা বেশী বাহির হইল না—শ'খানেক মাত্র। গহনা ও টাকাগুলি লইয়া করিম পুঁটুলী বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কাপড়ালেত্তা সব বন্ কর।"

বাক্স বোঝাই ও বন্ধ হইলে সতীশ বলিল, "আর ত আমাদের কিছু নেই হুজুর। যা ছিল, সমস্তই হুজুরে নজর দিলাম। এখন, হুকুম হয় ত আমরা আসি।"

করিম হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আসবে বৈ কি দোস্ত!—পুলিস সাথে নিয়ে ত?"

সতীশ জিভ কাটিয়া বলিল, "না হুজুর, সে কি কথা! পুলিস? পুলিসের ছায়াও আমরা মাড়াব না। দোহাই হুজুর, আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা বাড়ী চ'লে যাই—অনেক রাত হয়ে গেল!"

করিম বলিল, "টাকা?"

"আবার কিসের টাকা হুজুর?"

"তোর জান-কিম্মৎ। পাঁচ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা তুই বাড়ী থেকে আনিয়ে দে, তোদের খালাস দিচ্ছি।"

সতীশ বলিল, "আবার পাঁচ হাজার টাকা?—যা ছিল সবই ত নিলেন হুজুর!"

"এ ত এই ঔরতের জান-কিম্মৎ। তোকে ছাড়বো, তার টাকা চাইনে? বাড়ীতে খৎ লিখে দে—আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি—টাকা নিয়ে আসুক, তার পর তোকে ছাড়বো।"

সতীশের মনে একটু যা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে বসিয়া ঘামিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, "হুজুর, আমরা সামান্য লোক, সামান্য টাকা-কড়ি যা আছে, তা কারবারে খাটে, বাড়ীতে বেশী টাকা থাকে না, তা ছাড়া আজ দু' মাসের উপর আমি বাড়ী ছাড়া—ঘরে টাকা-কড়ি কি আছে না আছে, তাও জানিনে; তবে যদি মেহেরবানি ক'রে আমায় ছেড়ে দেন, আমি কাল সারাদিনে টাকাটা যোগাড় ক'রে আপনাকে এনে দিতে পারি।"—বলিয়া সতীশ মিনতির চিহ্নস্বরূপ হাত কচলাইতে লাগিল।

করিম বলিল, "কি কারবার করিস্?"

"আজ্ঞে, পোস্তায় আমার লোহা-লক্কড়ের দোকান আছে।"

"কত টাকার কারবার?"

"আজ্ঞে, কম হলেও, লাখ্ টাকার হবে। দোকানে টাকা মজুত থাকে ভাল, না থাকে, ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে এনে টাকা দিয়ে যাব। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই এসে আমি বেবাক টাকা হুজুরে দাখিল ক'রে যাব—কথার আমার খেলাপ হবে না।"

করিম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে ওয়াদায় তোকে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু তোর জরুকে জামিনস্বরূপ এখানে রেখে যেতে হবে। রাজি আছিস্?"

সতীশ সাগ্রহে বলিল, "তা, হুজুর যা হুকুম করবেন।"—সে এখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে! আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি—উপ-দারের আর কথা কি?

রেবতী মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, সতীশ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, যথাসময়ে টাকা না আনে; কিংবা অত টাকা যদি সে সংগ্রহ না-ই করিয়া উঠিতে পারে, তবে আমার কি দুর্গতিই না হইবে! ইহারা রাগিয়া হয় ত আমাকে খুনই করিয়া ফেলিবে! মনে করিল বলি. "না হুজুর, আমি ওর জামিন ফামিন হ'তে পারবো না—

আমার ত সর্ব্বস্ব নিয়েছেন, আমায় ছেড়ে দিন।” কিন্তু, কোনও বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর প্রতি এরূপ আচরণ কি সন্দেহজনক হইবে না? বিশেষ, সতীশ যখন তাহাকে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তখন সে ত প্রতিবাদ করে নাই। সুতরাং রেবতী কিছু বলিতে পারিল না।

করিম কিয়ৎক্ষণ ভাবিবার পর বলিল, “আচ্ছা, তাই মঞ্জুর করা গেল। তুই কা’ল সাঁঝ ৬টার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এনে এখানে দাখিল করবি। যদি না আনিস, তবে তোর পরিবারের ইজ্জৎ বাঁচবে না - এ কথা সাফ্ সাফ্ তোকে ব’লে রাখলাম। আরও বলি শোন। তোর জরুকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বো না। এখনি একে দোস্‌রা বাড়ীতে চালান ক’রে দেবো। যদি কোনও বেইমানী করিস্—পুলিসে খবর দিস্ বা পুলিস আনিস্, তবে তোর জরুকে খুঁজে ত পাবিই না! যে বাড়ীতে পাঠাচ্চি, সেইখানেই তাকে আমরা খুন ক’রে ত ফেলবই—তোরও জান্ আমরা না নিয়ে ছাড়বো না। দু’ দিনে হোক্, দু’ মাসে হোক—তোর বুকে আমার লোকেরা ছুরি বসাবেই বসাবে! তুই যদি সান্ত্রী-পাহারা-ঘেরা সাত মহল বাড়ীর মধ্যেও লুকিয়ে থাকিস্, তা হ’লেও আমার লোকেরা তোকে মারবেই মারবে। আচ্ছা—এখন তা হ’লে তুই যেতে পারিস্।”

সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “আজ্ঞে হুজুর, আমার কথার কোন মতেই নড়চড় হবে না। কা’ল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আমি টাকা এনে দাখিল ক’রে আমার পরিবারটিকে উদ্ধার ক’রে নিয়ে যাব। আর পুলিস—পুলিসের ধারে—কাছেও যদি আমি যাই, তবে আমি—তবে আমি—এক বাপের বেটা নই!” তার পর রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা রেবী—আচ্ছা ওগো, তুমি কিছু ভয় পেও না, আমি কা’ল টাকা এনে তোমায় উদ্ধার ক’রে নিয়ে যাব। কোনও ভয় নেই তোমার। এই করিম সাহেব অতি ভদ্রলোক। আদত পাঠান কি না! ইনিই এখন তোমার বাপ। ইনি তোমাকে যেখানে পাঠাচ্ছেন, সেইখানেই তুমি যেও, কিছু ভয় নেই তোমার, নিশ্চিন্ত হয়ে থেক।”

“আদত পাঠান” করিমের চৌদ্দ পুরুষও নয়। মার্কেটে বাজার করিতে গেলে ছেঁড়া পাৎলুন ফিরিঙ্গিকে দোকানদারেরা যে উদ্দেশ্তে “বড়া সাহেব” বলিয়া ডাকে, সতীশের উদ্দেশ্যও তাহাই।

আভূমি নত হইয়া, করিমকে সেলাম করিয়া সতীশ বিদায় গ্রহণ করিল। রেবতী চোখে আঁচল দিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ৫।৬ জন লোক দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; তাহার মধ্যে আমাদের জাল আবু মিঞাও ছিলেন।

সুন্দরী যুবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া করিম গুণ্ডার পাষাণ হৃদয়ও গলিল। সে কোমল স্বরে বলিল, “কেন কাঁদ বিবি, চুপ কর। কা’ল তোমার শ্বশুর টাকা এনে দাখিল করলেই তোমায় ছেড়ে দেবো। আর যদি তোমার শ্বশুর বেইমানীই করে, না আসে,—তা হ’লেও তুমি ভেসে যাবে না—আমার বিবি হয়ে আমার ঘরে তুমি থাকবে - আমি তোমায় নিকা করবো। তুমি বেশ খাপসুরৎ আছ—তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কেঁদ না—কেঁদ না বিবি, চুপ কর, তোমার কোন ভয় নেই।”

রেবতী চোখের আঁচল খুলিয়া বলিল, “আমায় আর কোথায় যে পাঠাবেন বল্লেন, সেখানে তারা যদি আমার উপর কোনও অত্যাচার করে?”

করিম হাসিয়া বলিল, “না বিবি, তোমায় আর কোথাও যেতে হবে না। তোমার স্বামীকে ঐ ভাঁওতা দিলাম, যাতে সে বুঝতে পারে যে, পুলিস এনে তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করা বেফায়দা। তুমি এই ঘরেই থাক, আমি বাইরে তালা বন্ধ ক’রে দিয়ে যাব, চাবি আমারই কাছে থাকবে, কেউ তোমার উপর কোনও জুলুম করতে পারবে না। কিছু খাবার আনিয়ে দেবো কি?”

রেবতী সীতাভোগের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল, “আজ্ঞে না, খাবার আমার সঙ্গেই আছে। কেবল জলেরই অভাব।”

করিম সোরাইদান দেখাইয়া বলিল, “তোমাদের ওতে জল নেই?”

রেবতী বলিল, “আজ্ঞে, জল আছে বৈ কি! তবে—কিছু মনে করবেন না মিঞা সাহেব, আপনার লোকেরা ও জল ছুঁয়ে দিয়েছে কি না, আমরা হলাম হিঁদু, ও ত আর চলবে না; দয়া ক’রে বোতল দুই সোডা যদি আনিয়ে দিতেন ত ভাল হ’ত।”

মুসলমানের ছোঁয়া জল অচল, কিন্তু সোডা সচল, ইহা শুনিয়া করিম একটু হাসিল। দ্বারে দণ্ডায়মান এরফানকে তৎক্ষণাৎ দুই বোতল সোডা আনিতে হুকুম করিল। অবিলম্বে সোডা আসিয়া পৌঁছিল -যুদ্ধাস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার জন্য বহু বোতল সোডা সেই বাড়ীতেই সঞ্চিত ছিল!

"আচ্ছা বিবি, এখন তবে আসি। সেলাম।"—বলিয়া করিম বাহির হইয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিল।

রেবতী সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। অদৃষ্টে কি আছে, চিন্তা করিয়া কোনও কূল-কিনারা পাইল না। সতীশ টাকা লইয়া তাহাকে খালাস করিতে আসিবে কি? সে রেবতীর উপর যে পরিমাণ টাকা খরচ করিয়া থাকে, সতীশের আর্থিক অবস্থা যে তদনুযায়ী নহে, ইহা রেবতী অবগত ছিল। চুনারে বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যয় জন্য সতীশকে উচ্চ সুদে হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হইয়াছে, ইহাও সে জানিত। তাই তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইচ্ছা থাকিলেও সতীশ হয় ত টাকাটা যোগাড় করিতে পারিবে না। তাহা হইলে? করিম গুণ্ডার ভাবভঙ্গী দেখিয়া এ আশঙ্কা তাহার মনে হয় না যে, করিম তাহাকে খুন করিবে। করিম যে তাহার রূপলাবণ্যে একটু মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য রেবতীর বুঝিতে বাকী নাই সুতরাং প্রাণের আশঙ্কা তাহার নাই। কিন্তু যদি তাহাকে সত্য সত্যই নিকা-ই করিয়া বসে, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে গো!—কলা-লক্ষ্মীর কৃপা-যশের যে মুকুট এত দিন তাহার শিরে শোভমান ছিল, সে মুকুট ধুলায় লুটাইবে! নিশি নিশি সহস্র দর্শকের যে নয়নানন্দবিধায়িনী, সে কি না হইবে পর্দ্দানসীনা মুসলমান-ঘরণী! তাও ঐ কদাচারী কদাকার প্রৌঢ় গুণ্ডার! মুখের পেঁয়াজের গন্ধে যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবে! কত রকম দুর্গতি ও অপমান তাহার ঘটিতে পারে, তাই বা কে জানে!

করিম দ্বারে কুলুপ দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় আধঘণ্টা রেবতী বসিয়া এই প্রকার ভাবিল। তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া দ্বারের নিকট গিয়া ভিতর হইতে খিলটি বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া, আহারের কোনও সূচনা সে করিল না; টিফিন-বাক্সটি খুলিয়া বর্দ্ধমানে কেনা ভিণ্টেজ ব্রাণ্ডির সেই বোতল ও একটা গেলাস বাহির করিল। বোতল আলোর দিকে ধরিয়া দেখিল, তাহাতে তখনও বারো আনা আন্দাজ "মাল" মজুদ আছে। সোডার বোতলের মুখে রিঙের একটা চাবি বসাইয়া, তাহাতে কিল মারিয়া সোডা খুলিল এবং বড় এক ডোজ্ ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া লইয়া পান করিতে লাগিল। দ্বিতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া, নেশায় বিহ্বল হইয়া রেবতী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল এবং অবিলম্বে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুণ্ডার প্রেম

রেবতীকে চাবি বন্ধ করিয়া করিম দোতলা হইতে নামিয়া গেল। বহির্দ্বার খুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, এরফান আসিতেছে। সে নিকটস্থ হইলে করিম চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, এরফান, ঠন্‌ঠনিয়ার কালীমন্দিরের খবর নিতে কাউকে পাঠালি?"

এরফান বলিল, "হ্যাঁ, আলিজানকেই পাঠিয়ে দিলাম। মাথা কামিয়ে টিকি রেখে সে যে রকম হেঁদু সেজেছে, তাকে কেউ সোবে করতে পারবে না। ব'লে দিয়েছি, মন্দিরে ভিড়ের ভিতর ঢুকে, সকলকার কথাবার্ত্তা শুনে আসবে।"

"বেশ করেছিস। আচ্ছা, আমি ততক্ষণ বাড়ী থেকে খানা খেয়ে আসি, তুই এখানে খবরদারী কর।"

"জী আচ্ছা।"—বলিয়া এরফান ভিতরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

এক ঘণ্টা পরে করিম ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে ধাক্কা মারিল। এরফান দ্বার খুলিয়া দিল। করিম জিজ্ঞাসা করিল, "আলিজান ফিরেছে?"

"জী, হুজুর।"

"কি বল্লে?"

"বল্লে, সেখানে বহুৎ হিন্দু জমায়েৎ হয়েছে। প্রা পাঁচশো আদমি হবে। সকলে 'জয় মা কালী' ব'লে চিকরাচ্ছে। কোমর বাঁধা—হাতে সব মোটা মো লাঠি। বাঙ্গালী আছে, মাড়োয়ারী আছে, পঞ্জাবী আছে সবাই বলছে, আনে দেও শালালোগকো—দেখেঙ্গে!"

শুনিয়া করিম প্রায় এক মিনিট কাল চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল, “তবে কি করা যায় ক’ দেখি ?”

এরফান বলিল, “আমি ত কই হুজুর, আজ রাতটে গুম্ খেয়ে যান।·কি রকম ক’রে গুজব রটে গেছে, আজ আমরা কালীমন্দির ভাঙ্গতে যাব। তাই অত হেঁদুলোক জমায়েৎ হয়েছে। আজ কিছু হ’ল না দেখলে তারা ভাববে বাজে গুজব। কাল আর অত লোক আসবে না। আমরা কাল তখন গেলেই ঠিক হবে। এখন হুজুর যা হুকুম করেন।”

করিম বলিল, “তোর সলাই ঠিক। না—আজ আর দরকার নেই। কাল তখন দেখা যাবে। আচ্ছা, আমি তবে এখন চল্লাম, তুই এখানেই থাক—কাল বিহানে আবার আমি আস্‌বো। আর দেখ, তুই শুবি কোথায় ?”

এরফান বলিল, “দোতালাতেই—আমার কামরায়।”

করিম বলিল, “না—আজ তুই হলটায়, যে ঘরে সেই বিবিকে বন্ ক’রে রেখেছি, সেই ঘরের দরজার কাছে শুয়ে থাকিস। খুব হুঁসিয়ার, সে কোন রকমে যাতে পালাতে না পারে। যদি চিল্লাচিল্লি করে ত খুব শাঁসাবি ধমকাবি—বলবি খবরদার হারামজাদি—টুঁ শব্দ করবি কি ভিতরে গিয়ে তোকে জবা ক’রে ফেলবো—সর্দ্দার আমার কাছে চাবি রেখে গেছে !”—বলিয়া করিম নিজ পকেটে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া চাবি স্পর্শ করিল। আবার ভাবিল,—না, বাঘের হাতে ছাগল সমর্পণ করিয়া কায নাই।

এরফান তাহার সর্দ্দারের অঙ্গচালনা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার মনোভাব বুঝিল, বুঝিয়া গোপনে একটু হাসিয়া বলিল, “চাবি রেখে যাবার দরকার নেই হুজুর—ঐ বাত ব’লে শাঁসালেই কাফি হবে ? হিম্মৎ কি তার যে ফের চিল্লায় !”

“আচ্ছা”—বলিয়া করিম প্রস্থান করিল। এরফান দ্বার বন্ধ করিয়া, সর্দ্দারের আদেশ অনুযায়ী স্থানে গিয়া শয়ন করিল।

করিম নিজাবাসে গিয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু অনেক রাত্রি অবধি তাহার চোখে ঘুম আসিল না। রেবতীর সুন্দর মুখখানি ক্রমাগতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। “বাঃ—বাঃ—কি রঙটি—যেন বৃষ্টিতে ধোয়া বসরাই গুল্ ! বড় বড় টানা টানা কি চোখ দুটি—তার উপরে ভুরুর কি বাহার ! ওর সেই পাজী স্বামীটা টাকা দিয়ে ওকে খালাস ক’রে নেবে নাকি ? না আসে ত ভালই হয়। দেখি খোদার কি মর্জ্জি ! নাঃ—সে আর দরকার নেই, পাঁচ হাজার টাকা আসে, সেই ভাল !”—একবার রূপ—একবার রূপার লালসা করিমের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

পর দিনও করিমের মনের ভাব ঐ প্রকারই রহিল। বন্দিনীর আহারের বন্দোবস্ত করিবার অছিলায়, প্রাতেই গিয়া করিম তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। আহারের জন্য রেবতা ফল-মূল ও সোডা-পানি প্রার্থনা করিল। দিনের মধ্যে আরও কয়েক বার, নানা অছিলায় বিবির খোঁজ লইতে করিম তালা খুলিল। বিবির কিন্তু সেই একই ভাব—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি জবার ফুল করিয়াছে পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একটা কথার উত্তর দেয়।

বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, করিমের বুকটা ততই ধড়ফড় করিতে লাগিল—“খোদা করুন, স্বামীটা যেন না আসে !”—এই হইল এখন তাহার অন্তরের প্রার্থনা।

ঘড়িতে ক্রমে ৬টা বাজিল—ওয়াদার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, খোদা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন সতীশ আসিল না। বাতি জ্বালা হইল, দুই দণ্ড রাত্রি হইল—তখনও সতীশ নাদারৎ ! এক এক বার করিমের মনে হইতে লাগিল, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হাত পিছলে গেল রে ! হায় হায় হায় ! টাকার শোকে বুকের ভিতরটা কটুকটুও করিতে লাগিল। ইয়া আল্লা ! পাঁচ হাজার টাকায় খরিদা চিড়িয়া, পোষ মানবে ত ?—সে চিড়িয়া কোনও দিন করিমের গলা জড়াইয়া, “তু মেরে জানকা পিয়ারা হায় !”—বলিবে কি ? এত সুখ কি তগ্‌দিরে আছে ?

রাত্রি ৮টার সময়, করিম আবার রেবতীর দ্বার খুলিল। পশ্চাতে এক ভৃত্য কতকগুলা শয্যাদ্রব্য বহন করিয়া আনিয়াছে। করিম বলিল, “বিবি সাহেব, তোমার বিস্তারা বদ্‌লে দিক, ময়লা হয়েছে।” ভৃত্য বিছানা বদলাইয়া দিল। ধবধবে চাদর পাতিয়া—বালিসগুলিতে ধবধবে ওয়াড় পরাইয়া দিল। আর এক ভৃত্য একটা ছোট টুকরী ভরা মেওয়া ফল, দুই পাতা বেলফুলের মালা, কয়েকটা আতরের শিশি, একটা রূপার আলবোলা প্রভৃতি ও কয়েক বোতল সোডা লেমনেড রাখিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে করিম প্রীতিপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "রেবতী বিবি! তোমার সে শওহর কি রকম বেইমান, দেখলে ত? সে টাকা দিয়ে তোমায় খালাস ক'রে নিতে এল না। কি ওয়াদা তার সাথে আমার ছিল, তা তোমার মনে আছে ত?—এখন তুমি ত আমারই হ'লে। ষোল আনাই আমার। আমি তোমায় নিকা করবো পিয়ারী! তোমায় আমি খুব—খুব—সুখে রাখ্‌বো। আমি করিম সেখ—গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আমার নাম জানে। সোণা-রূপা বল, টাকা-পয়সা বল, করিমের কোনও জিনিষের অভাব নেই!"

এই কথা শুনিয়া রেবতী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। করিম বলিল, "না—না—কেঁদ না বিবি! তোমায় কাঁদতে দেখলে আমার ছাতি ফেটে যে দোফাঁক হ'য়ে যায় নাজ্‌নী! তুমি চুপ কর—খাও দাও। আমি এখন চল্লাম, আবার আস্‌বো!"—বলিয়া করিম রেবতীর প্রতি প্রেমপূর্ণ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, বাহির হইয়া দ্বারে তালা লাগাইল।

এক মিনিট পরেই রেবতী উঠিয়া, দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মৌতাতের সময় হইয়াছিল; হাই উঠিতেছিল। টিফিন বাক্স খুলিয়া, বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, সোডা ভাঙ্গিয়া, পান আরম্ভ করিল!

নেশাটি বেশ গোলাপী গোছের হইলে, সে বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "আ মরে যাই রে! নবীন নাগর রসের সাগর—প্রেমে তনু জর জর হয়েছেন। বিছানা বদলিয়েছেন, ফুলের মালা, আতর গোলাপ আনিয়েছেন—আমার সঙ্গে ফুলশয্যা করবেন মৎলব করেছেন বুঝি? হতভাগা মুখপোড়া—বুকে তোমার মাটী চাপা দিই আমি—মরবে তুমি কবে? মিনষের আস্পদ্দাও ত দেখি কম নয়।"

দ্বিতীয় গেলাস আরম্ভ করিয়া, রেবতীর মনে হইল, গুণ্ডা যদি সত্য সত্যই তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার উপক্রম করে, তবে কি উপায়ে সে আত্মরক্ষা করিবে? এই সময় দেওয়ালস্থিত ছোরাছুরি গুলার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ মাথায় একটা মৎলব আসিল। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে সে বিমলা সাজিয়াছিল। কৎলু খাঁর জন্ম দিনে, নৃত্যোৎসব রজনীতে, নৃত্য-গীত করিতে করিতে, কৎলু খাঁর প্রেম-আহ্বানে, "দাসী চরণে"—বলিয়া রেবতী যাহা অভিনয় করিয়াছিল, তাহাই স্মরণ হইল। গেলাস হাতে, বুক চিতাইয়া, মাথাটি দুলাইয়া রেবতী আপন মনে বলিল, "হাঁ—এই ঠিক হয়েছে! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! ষ্টেজের উপর যা অভিনয় করেছি, আজ গ্যাড়াতলার গুণ্ডারাজ-গৃহে তাই কাযে করবো, দাড়াও!"

তৎক্ষণাৎ গেলাস রাখিয়া, রেবতী উঠিয়া, দেওয়ালের ছোরাছুরি গুলার তীক্ষ্ণতা একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিল। একখানি বাছিয়া, সেখানি পাড়িয়া লইল। বস্ত্রমধ্যে সেখানি লুকাইয়া, গেলাসের বাকি ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে রবিবাবুর গান একটু পরিবর্ত্তন করিয়া, ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মৃদুস্বরে গাইতে লাগিল,—

ওহে বান্দর, তব কোটরে আজি
নরকোৎসব রাতি,
আমি রেখেছি বক্ষ-বসন মাঝে
শাণিত ছুরিকা পাতি!

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

'অর্ঘ্য'

পূজা নিতে এসেছ হে
দাঁড়াও আমার কাছে এসে;
কি দিব আজ তোমার পূজায়
বিশ্ব যাঁহার পদে লুটায়,
তোমার দেওয়া প্রাণটুকু আজ
তোমায় দিব ভালবেসে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেব।

দেশবন্ধু স্মৃতি-বাসর

গত ১১ই জুলাই রবিবার সমগ্র ভারতে পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-স্মৃতি-বাসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্মৃতি-পূজা ইহার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের অকালমৃত্যু হেতু স্মৃতি-বাসরের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ দিবসে ভারতের দিকে দিকে দেশবন্ধুর স্মৃতি-সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। যে ক্ষণজন্মা বিরাট পুরুষ তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেশে নব-জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং দেশের জন্য বিরাট ত্যাগ-স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-সম্মানরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেশবাসী তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিল মাত্র; এখন তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিলে তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্মৃতির সম্মানরক্ষা করিবে। আজ সমগ্র দেশ দেবী বাসন্তীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, ইহাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা।

স্মৃতিস্তম্ভ

খাঁটী বাঙ্গালার শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া গ্রামে গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছিল, সাহিত্যামোদী বাঙ্গালীর নিশ্চিতই এ কথা স্মরণ আছে। সেই উৎসবে

স্মৃতিস্তম্ভ উৎসবে সভাপতি কমিশনার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সাহিত্যিকগণ

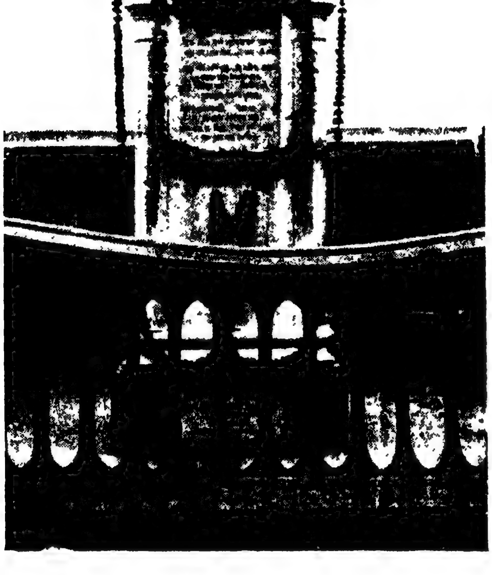

ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিস্তম্ভ

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং বহু সুধী সাহিত্যিক কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবির স্মৃতির পূজা করিয়াছিলেন। যে স্থানে কবির স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ঘন-জঙ্গলাবৃত স্থানটি গুপ্ত কবির ভিটা ছিল বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর চেষ্টায় যে অমর কবির ভিটার স্থান পরিষ্কৃত হইল এবং সেই স্থানে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের পরিচায়ক। যে জাতি তাহার শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের স্মৃতি-পূজা করে, সে জাতি মনুষ্যত্বের দাবী করিতে পারে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

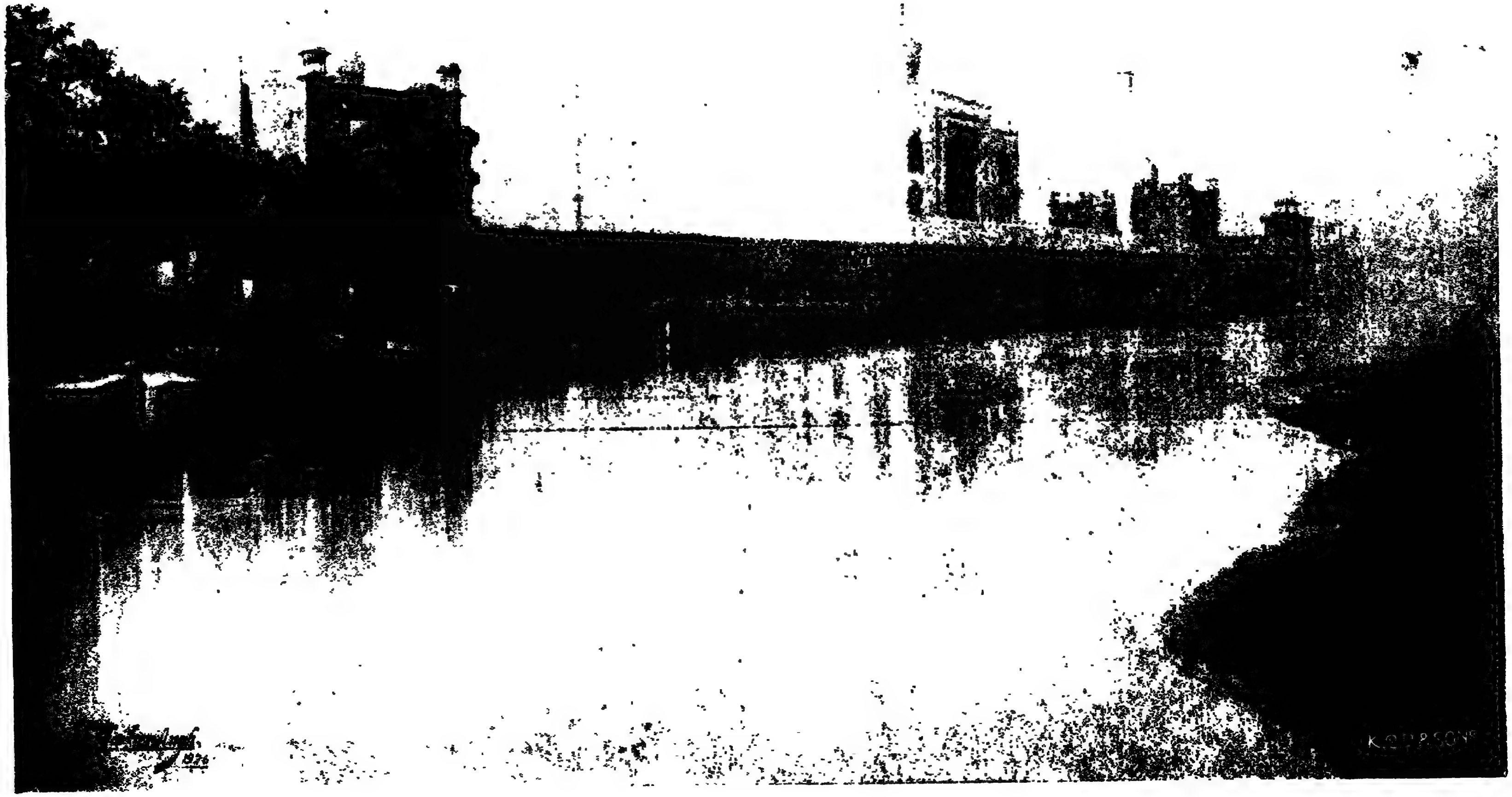
1926

৫ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৩ [৪র্থ সংখ্যা

রসশাস্ত্র

৬

কোন্ রসে কিরূপ সঞ্চারী ভাব, অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়া থাকে, তাহা জানিবার পূর্ব্বে, রস প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে আস্বাদিত হইয়া থাকে, তাহা জানা আবশ্যক। এই বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের রসাস্বাদ সম্বন্ধে যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণা বা মত আছে, তাহাও জানিতে হইবে; সুতরাং তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা অনুভব-সংবেদ্য যে, নাটকাদি দর্শন করিতে যাইয়া রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এই আনন্দ আইসে কোথা হইতে? অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কাহারও আনন্দ হয় না বা হইতেও পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই অভিলষিত বিষয়কেই আমরা ভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। প্রাকৃত রাজ্যে বা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, এই ভোগ্য প্রধানতঃ পাচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পাচটি ভোগ্যের মধ্যে প্রথম যে শব্দ, তাহার ভোগ্যতা দুই প্রকারে হইয়া থাকে;—প্রথম সাক্ষাৎভাবে, দ্বিতীয় পরম্পরায়। যেমন বংশীর স্বর বা মধুর বীণাযন্ত্রাদি হইতে সমুত্থিত স্বর অথবা কোকিল, পাপিয়া ও ভ্রমর প্রভৃতির কলস্বর, এই সকল স্বর আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অন্তঃকরণে এমন এক প্রকার বৃত্তি বা ভাবকে উৎপন্ন করিয়া দেয়, যাহার দ্বারা আমাদের আত্মস্বরূপ আনন্দের আবরণ অপসৃত হইয়া যায় এবং তাহারই ফলে আমরা আমাদের আনন্দরূপ আত্মার অনুভব করি এবং নিজেকে সুখী বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। এই কারণে এই বংশী প্রভৃতির স্বর, আমাদের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আর এক জাতীয় শব্দ আছে, যাহাকে পরম্পরায় আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যথা—প্রেমিকের কর্ণে প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর, বৎসল পিতা বা মাতার কর্ণে পুত্র বা

দুহিতার কণ্ঠস্বর, সখার কর্ণে প্রিয়সখার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি। প্রিয়তমার, পুত্রের, দুহিতার বা প্রিয়সখার কণ্ঠস্বর যে সাক্ষাদ্‌ভাবে আনন্দের স্বাভাবিক অভিব্যঞ্জক, তাহা বলা যায় না; কারণ, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, তাহা সকল মনুষ্যেরই সর্ব্বদা আনন্দের অভিব্যঞ্জক হইত। বাস্তবপক্ষে, কিন্তু, তাহা সকলের নিকট আনন্দদায়ক নহে। কাহারও কাহারও নিকটে তাহা সুখ বা দুঃখের হেতু না হইতে পারে, আবার কাহারও নিকটে তাহা নিতান্ত কর্কশ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে; সুতরাং সে স্থলে তাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে দুঃখেরই হেতু হইয়া থাকে। আবার কোন উদাসীন ব্যক্তির নিকটে তাহা সুখেরও হেতু হয় না, দুঃখেরও হেতু হয় না, কিন্তু প্রেমিক প্রভৃতির কর্ণে তাহা সর্ব্বদাই আনন্দের অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। কেন এই প্রকার হয়? ইহার কারণ অন্য কিছু নহে, ইহার কারণ ইহাই হইয়া থাকে, ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেম, স্নেহ বা সখ্যময় ভাবগুলিকে জাগাইয়া দেয় এবং সেই উদ্‌বুদ্ধ প্রীতিময় ভাবের যে আলম্বন প্রিয়তমা প্রভৃতি, তাহাদেরই সহিত এই প্রকার স্বরসমূহের অসাধারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, উহার উপরও আমাদের প্রিয়তাজ্ঞান বা ভোগ্যত্ব-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ জাতীয় শব্দসমূহ আমাদের নিকট তখন আনন্দের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা উদাসীন বা যাহারা প্রতিকূলভাবাপন্ন, তাহাদের নিকট ঐ সকল শব্দ তাদৃশ অনুরাগময় অন্তঃকরণবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণে তাহাদের নিকট ঐ সকল শব্দ সুখের কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হয় না, প্রত্যুত দুঃখ বা ক্রোধ প্রভৃতির হেতু হয়। এই ত হইল ভোগ্য শব্দের দুই প্রকার বিভাগ।

বিচার করিয়া দেখিলে, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের ভোগ্যতা এই প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারে, বিস্তার-ভয়ে তাহা এখানে প্রদর্শিত হইল না।

কাব্য আমাদের নিকটে এক প্রকার ভোগ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত, সেই কাব্যকে আলঙ্কারিকগণ শব্দের অন্তঃপ্রবিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নব্য আলঙ্কারিক আচার্য্য বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।'

রস যাহার আত্মভূত, এইরূপ বাক্যকেই কাব্য বলা যায়। বাক্য বলিলে সাকাঙ্ক্ষ শব্দসমষ্টিই বুঝা যায়। এই যে শব্দসমষ্টি, ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার শব্দের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যে আমাদের উপভোগ্য হয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, কাব্যরূপ শব্দ নির্ব্বিশেষে বীণা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় যে সকল মনুষ্যের শ্রুতিসুখবিধান করে, তাহা বলা যায় না। যে ব্যক্তি সহৃদয় নহেন অথবা কাব্যরূপ শব্দের অর্থবোধে যাঁহার সামর্থ্য নাই, তাঁহার নিকট কাব্যরূপ শব্দ কোন সময়েই সুখের কারণ হইতে পারে না। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের যে ভোগ্য শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, প্রিয়তমের কর্ণে প্রিয়তমার স্বরের ন্যায় ইহা আমাদিগের শ্রুতিসুখাবহ হয় না। কে কাব্যের রচয়িতা, বা কে কাব্যের উচ্চারয়িতা, তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকিলেও সৎকাব্যরূপ শব্দ আমাদের রসাস্বাদরূপ আনন্দানুভূতির হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে কাব্যকে দ্বিতীয় প্রকারের ভোগ্য শব্দ বলিয়াও অঙ্গীকার করা সম্ভবপর নহে।

এই কারণে কাব্যরূপ শব্দকে লৌকিক উপভোগ্য শব্দরাশির শব্দের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অলৌকিক উপভোগ্য শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

কাব্য স্বয়ং শব্দস্বরূপে উপভোগ্য না হইলেও অর্থপ্রতীতিকে জন্মাইয়া আমাদের উপভোগ্য হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই অর্থ কি? দার্শনিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, শব্দের অর্থ দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথম অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ, দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থ: যেমন গঙ্গা শব্দের নদীবিশেষরূপ যে অর্থ, তাহা অভিধেয় বা বাচ্য; কিন্তু যে স্থলে এই অভিধেয় অর্থ বাধিত বা বাক্যার্থে অন্বিত হইবার অযোগ্য হয়, সেই স্থলে অন্বয়ের যোগ্য যে অর্থ পরে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই লক্ষ্য অর্থ বলা যায়। যেমন কেহ যদি বলে, গঙ্গাতে গোয়ালপাড়া আছে, এখানে গঙ্গা শব্দের যাহা বাচ্য অর্থ, অর্থাৎ জলপ্রবাহ, তাহা প্রতীত হইলেও বাধিত বা অন্বয়ের অযোগ্য হয়, কারণ, গোয়ালপাড়া জলপ্রবাহের মধ্যে থাকিতে পারে না। এইরূপে অন্বয় অযোগ্য বলিয়া বোধ হইবার পরে, অন্বয়ের যোগ্য হইতে পারে বলিয়া, সেই জলপ্রবাহের সমীপবর্ত্তী তীররূপ অর্থ—যাহা পরে আমাদের

মনে উদিত হয়, তাহার সহিত গোয়ালপাড়ার আধারাধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়', সেই তীররূপ অর্থ ই লক্ষ্য অর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে বাচ্য বা লক্ষ্য অর্থ যাহা কাব্যরূপ শব্দের দ্বারা প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা কিন্তু কাব্য আমাদের প্রীতি বা সুখের আস্বাদন করাইতে পারে না, অর্থাৎ কাব্যের আত্মস্থানীয় যে রস, যাহাকে সৃষ্টি না করিলে কাব্যের কাব্যত্বই অসিদ্ধ হয় এবং যে রস সাক্ষাৎ প্রকাশমান আনন্দস্বরূপ, সেই রস কাব্যের অভিধেয় বা লক্ষ্য—এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে কেহই নহে।

এই রসরূপ অলৌকিক অর্থের প্রকাশ করিতে পারে বলিয়াই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাগু বা ভোগ্য হইয়া থাকে, অথচ এই রস বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে। আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন, এই রসরূপ কাব্যের আত্মভূত যে অর্থ, তাহা বাচ্য বা লক্ষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইলেও তাহাকে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কাব্যের সহিত এই প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্যরূপ অর্থের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহারই নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'ধ্বন্যালোক' নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচয়িতা আনন্দবৰ্দ্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব, বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং, বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই - মহাকবিগণের বাণীসমূহে যে বিলক্ষণ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা লৌকিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ঐ বিলক্ষণ অর্থ কাব্যের অবয়বরূপ বাচ্য প্রভৃতি অর্থ হইতে অতিরিক্ত। যেমন সুন্দরী রমণীসমূহের লাবণ্য তাহাদিগের অবয়বসমূহ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্, এই প্রতীয়মান কাব্যের অর্থও কাব্যের শরীর হইতে সেইরূপ পৃথক্ই হইয়া থাকে।

এই স্বকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আনন্দবৰ্দ্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যথা হি অঙ্গনাসু লাবণ্যং পৃথক্ নির্বর্ণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যদেব সহৃদয়লোচনামৃতং বস্তন্তরং তদ্বদেব সোঽর্থঃ।"

যেমন অঙ্গনাসমূহের অঙ্গে যতই প্রণিধান সহকারে দেখা যায়, ততই তাহাদের সকল অবয়ব হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান, সহৃদয়গণের নয়নসমূহে অমৃতের ন্যায় আস্বাদ্য যে বস্তুবিশেষ, তাহাই লাবণ্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে, সেইরূপই কাব্যসমূহে এই প্রতীয়মান বস্তু, কাব্যের সকল অবয়ব হইতে পৃথগ্ভাবে প্রতীত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই আহ্লাদকর হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে লাবণ্য কাহাকে বলে, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া ধ্বন্যালোকের টীকাকার আচার্য্য অভিনব গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য, যথা—

"লাবণ্যং হি নাম অবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যং অবয়বব্যতিরিক্তং ধৰ্ম্মান্তরমেব। ন চাবয়বানাং নির্দোষতা ভূষণযোগো বা লাবণ্যং, পৃথঙ্ নির্বর্ণ্যমান-কাণাদিদোষশূন্য-শরীরাবয়বযোগিন্যামপি অলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশূন্যেয়মিতি, অতথাভূতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহারাৎ।"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—শরীরের অবয়বসমূহের যে বিলক্ষণ সন্নিবেশ, তাহা দ্বারাই এই লাবণ্য অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু ইহা যে শরীরের কোন অবয়ববিশেষ, তাহা নহে, প্রত্যুত অবয়বসমূহ হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ ধৰ্ম্মবিশেষ। অবয়বসমূহের যে নির্দোষতা বা অবয়বসমূহের সহিত ভূষণসমূহের যে সম্বন্ধ, তাহাকেও লাবণ্য বলা যায় না, কারণ, প্রণিধান সহকারে ভাল করিয়া দেখিলে, যে অঙ্গনার কোন অবয়বে কোন প্রকার কাণত্বাদি দোষের লেশমাত্রও অনুভূত হয় না অথচ যাহার দেহ সকল প্রকার অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত, তাহাকে দেখিয়াও লোক ইহাতে লাবণ্য নাই, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আবার ঈষৎ দোষসম্পর্ক থাকিলেও, বা কোন অলঙ্কার দ্বারা কোন অবয়ব ভূষিত না হইলেও, কোন কোন ললনা সহৃদয়গণের নিকট এ যেন 'লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকা' এই ভাবে প্রতীত হইয়া থাকে।

ললনাদেহে লাবণ্য যেরূপ অনির্ব্বচনীয় অথচ অনুভবমাত্রবেদ্য, সেইরূপ সৎকবিপ্রণীত কাব্যে প্রতীয়মান বস্তুও এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় এবং একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিগণেরই স্বানুভবমাত্রবেদ্য। এই প্রতীয়মান বস্তু যে সকল সময় রসই হইবে, তাহা নহে, ইহাকে আলঙ্কারিকগণ বস্তু, অলঙ্কার ও রস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বস্তু ও অলঙ্কাররূপ যে দ্বিবিধ ব্যঙ্গ্য, তাহাদের কথা পরে বলা যাইবে, আপাততঃ রসরূপ যে ব্যঙ্গ্য, তাহারই কথা বলা হইতেছে।

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব যাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে এবং সেই ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, যাহা আস্বাদিত হয়, সেই স্থায়ী ভাবকেই রস কহে। এই প্রকার রসের লক্ষণ পূর্ব্বে ভরতমুনির মতানুসারে উক্ত হইয়াছে; এই লক্ষণটির বিশদ ব্যাখ্যা না হইলে রসের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্য দুই প্রকার ;—শ্রব্য ও দৃশ্য, শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য হইতে রসাস্বাদ শীঘ্র ও প্রচুরভাবেই হইয়া থাকে। এই কারণ দৃশ্য কাব্যকেই অবলম্বন করিয়া এই রসের আস্বাদ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহাই আপাততঃ দেখাইব।

মনে কর, আমরা বহু লোক একত্র মিলিত হইয়া কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বা অহমিকার অনুভূতি ছিল, রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইলেই যে সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বিলুপ্ত হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়াও আমরা আমাদের সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণকেই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ পার্শ্ববর্ত্তী সহচরগণের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় হঠাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইল। আমাদের সকলের দৃষ্টি যুগপৎ দীপালোকে প্রকাশমান রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কি দেখিলাম? দেখিলাম, প্রশান্ত পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর অমল-ধবল সৈকতের উপকণ্ঠে, স্নিগ্ধ শ্যামল তপোবনের পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত রথ হইতে পরিণত-গর্ভ-ভার-বিবশা জানকী মন্থরভাবে অবতীর্ণ হইলেন। পশ্চাতে বিষণ্ন সৌমিত্রি ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বাষ্পনিরুদ্ধ গদগদকণ্ঠে অযোধ্যাধিপতি প্রজারঞ্জনব্রত মহারাজ রামচন্দ্রের নিদারুণ বিবাসনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন, অমনি কঠোর তীব্রবেগ বাত্যায় অকস্মাৎ উন্মূলিত কদলীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে দেবী জানকী ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইল।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সামাজিকগণের মনোবৃত্তি বাহিরের সকল বিষয় হইতে হঠাৎ প্রত্যাহৃত হইল। আমি ও আমার বলিয়া যে একটা প্রবল ব্যবহারিক আত্মা বা আত্মীয়ের অনুভূতি—এতক্ষণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ কোথায় বিলীন হইয়া গেল—সকলের হৃদয়ে যেন সমবেদনার একতানতা ফুটিয়া উঠিল, তুমি বা আমি, বা তোমার বা আমার, এই প্রকার ব্যবহারমূল সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের আকস্মিক বিলয় বশতঃ, সকলের হৃদয়েই আত্মবিস্তারের প্রসাদময় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার মানসিক বিক্ষেপ ও অবসাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিক সত্য বস্তুগুলি অসত্যে পরিণত হইল, আর মিথ্যা বলিয়া চিরাভ্যস্ত বস্তুনিচয় যেন জাজ্বল্যমান সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের ও মনের সম্মুখে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল, বর্ত্তমানও যেন অতীতের নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুনিচয় বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গেল, অতীত যেন বর্ত্তমানের আকার ধারণ করিল, আর সেই সঙ্গে চিরবিস্মৃত বস্তুনিচয় যেন প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল, তখন সেই বহুকালের অতীত—কল্পনা-জালজড়িত মূর্ত্তি—বাল্মীকির তপোবন, জানকী ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির সত্তায় যেন পৃথিবী ভরিয়া গেল। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, তৎকালে এক অপ্রাকৃত ভাবময় রাজ্যের আবেশময় সম্পর্কে আমরা সকলেই যেন অপ্রাকৃত হইয়া উঠিলাম। এইরূপ অবস্থাই হইতেছে রসাস্বাদের পূর্ব্বাবস্থা, ইহারই নাম সাধারণীকরণ। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া আলঙ্কারিকগণ বলেন —

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

ইহা পরের বা ইহা পরের নহে—ইহা আমার, বা ইহা আমার নহে—এইরূপ যে পরিচ্ছেদ, তাহা বিভাব প্রভৃতির আস্বাদকালে সর্ব্বথা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরিচ্ছিন্ন লৌকিক প্রমাতৃভাব দূর হইলে, সকল সামাজিকেরই অন্তঃকরণে এক প্রকার সাম্যাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইলেই সকল সামাজিকেরই মনোবৃত্তি একাকারতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এরূপ একীভাব না হইলে অভিনয়ক্ষেত্রে রসসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

রূপের মোহ

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্র দেখিল, দুই দিনেই সে ডাক্তার বাবুর যেন আপনার জন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, রমেন্দ্রকে কোন কুণ্ঠাই বোধ করিতে হইত না। অন্তঃপুরে একত্র ভোজন হইত। অবশ্য ডাক্তার-গৃহিণী তাহার সম্মুখে বাহির হইতেন না; কিন্তু তথাপি সে বুঝিতে পারিত, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁহারও দৃষ্টি আছে। প্রভাতে জলযোগের পর ডাক্তার হাঁসপাতালে চলিয়া যাইতেন, রমেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইত, অথবা বাহিরের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিত। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার গৃহে ফিরিয়া আসিলে একত্র স্নান-ভোজন হইত। কোন রোগী দেখিতে ডাক্তার চলিয়া গেলে নির্জ্জন মধ্যাহ্নে রমেন্দ্র আবার খাতা বা বই লইয়া বসিত। সন্ধ্যায় ভ্রমণ বা খোস-গল্প। এইরূপে এই দুই দিন কাটিয়াছে।

রমেন্দ্রের মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, অনুশোচনার গ্লানি তাহার চিত্তে যে অবসাদের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল কি? নিশ্চয় নহে। তাহার প্রাণে শান্তি ছিল না। সে একখানা নূতন খাতা কিনিয়াছিল। তাহাতেই সে আত্মজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দিনলিপির আকারে লিখিয়া যাইতেছিল। ইহাতে মনের যন্ত্রণা সামান্য উপশম হইত।

সে দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ডাক্তার বাবু অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি লিখিতেছিল।

ডাক্তার-গৃহিণী আহার-শেষে স্বামীর কাছে আসিলেন। আলবোলার নল মুখে করিয়া ডাক্তার একখানা মাসিক পত্র পড়িতেছিলেন। পান চিবাইতে চিবাইতে পত্নী স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আজ দু'দিন তোমায় একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছিলাম।"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া স্বামী বলিলেন, "খুব জরুরী কথা বটে! দু'দিনের মধ্যে বলবারই সময় পেলে না!"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই। হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম কি, তোমার এই নূতন বন্ধু শিশির বাবু—এঁকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি। আজ আবার ভাল ক'রে দেখলুম—"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! এর মধ্যেই গোয়েন্দাগিরী আরম্ভ করেছ? শাস্ত্রকাররা ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু দেখ, এ বেচারীকে শেষে যেন মজিও না!"

পত্নীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা মেয়েমানুষকে কি ভাব, বল ত? নিজেদের মত দুনিয়ার সকলকে দেখ, না? যাও, আমি কোন কথা তোমাকে বল্‌ব না।"

স্বামী তখন পত্নীকে আদর করিয়া বলিলেন, "কি ঠুনকো জিনিষই তোমরা; বাতাসের আঘাতও সহ্য হয় না। এখন যা বল্‌ছিলে, বল।"

সন্ধি স্থাপিত হইলে পত্নী বলিলেন, "সত্যি বল্‌ছি, এ মুখ আমি যেন কোথায় দেখেছি। ওঁর পরিচয় নিয়েছ, বাড়ী কোথায় বলেছেন?"

"ও সবের কোন খোঁজ আমি করি নি। দেখলুম বাঙ্গালী, এ দেশে বেড়াতে এসেছেন। জানই ত, বাঙ্গালী দেখলে আমার প্রাণ কি রকম অস্থির হয়। তাই এখানে নিয়ে এলাম। অত খোঁজ-খবর নেই নি। তবে মনে হয়, বাড়ী থেকে রাগ ক'রে বেরিয়েছেন। আচ্ছা, আমি ওঁর পরিচয়টা জেনে নেব। ছোকরাটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়।—তুমি কি ভাবছ, বল ত?"

সুরমা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কোথায় দেখেছি, সেই কথা মনে করবার চেষ্টা করছিলুম। বড় চেনা-মুখ বলেই মনে হচ্ছে। ওঁর বাড়ী কোন্ দেশে, খোঁজ নিও ত।"

স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। এই সেবাপরায়ণা পরদুঃখকাতরা নারীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। তাঁহার পরিহাস-রসিকতার সঙ্গে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার অনেক সময় চমৎকৃত হইতেন। যাহা কিছু অন্যায়, অসঙ্গত ও অসত্য, সুরমা তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বামীর জীবনযাত্রাকে এই নারী এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী যেন একপ্রাণ। কোনও প্রকার সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইলে তখনই পরস্পর তাহা পরস্পরকে জানাইতেন।

নবাগত অতিথি সম্বন্ধে পত্নীর কৌতূহল ডাক্তারের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। তিনি ভাবিলেন, এই কৌতূহল অহেতুক না-ও হইতে পারে। রমেন্দ্র সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিয়া লওয়া দরকার।

পাণ চিবাইতে চিবাইতে ডাক্তার বলিলেন, "আমি কিন্তু এঁকে আগে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। তবে শিশির বাবুর মনে যে কোন ব্যথা আছে, তা ডাক্তারী বিদ্যার বলে আমি বুঝতে পেরেছি। ওঁর বাড়ী-ঘরের সব খবর আমি কৌশলে বার ক'রে নেব, তবে বেশী কৌতূহল দেখাব না। ছোকরাকে যত্ন ক'রে আরও দিনকতক রাখতে হবে।"

সুরমা তখনও যেন কি মনে করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "দেখ, তুমি অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? হয় ত শেষে দেখা যাবে, কোন দিনও ওঁকে তুমি দেখনি।"

"না গো না, আমি মনে করতে পারছি না ঠিক; কিন্তু এ মুখ আমার পরিচিত।"

"আচ্ছা, আমি খবর নিচ্ছি।"

সুরমার ললাটের চিন্তার রেখা বিলুপ্ত হইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"শিশির বাবু, চলুন, আজ আমার অবকাশ আছে, আপনাকে লক্ষ্ণৌয়ের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ভাল ক'রে দেখিয়ে আনি।"

রমেন্দ্র একখানি বাঙ্গালা উপন্যাসে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চলুন।"

ডাক্তার কোচম্যানকে গাড়ী জুতিয়া আনিতে বলিলেন।

আজ সকালবেলা মা'র জন্য রমেন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়াছিল। পুরী হইতে আসিবার পথে সে মাতাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। আর কোনও সংবাদ দেয় নাই। এখন তাহার অজ্ঞাতবাস। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর তাঁহাকে সংবাদ দিবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল, অথচ মনের মধ্যে নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে নিতান্তই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন অবস্থায় বাহিরের দৃশ্য-বৈচিত্র্যে যদি মনটা কিছু স্থির হয়।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে রমেন্দ্র গ্লাডষ্টোন ব্যাগ খুলিয়া মুদ্রাধারটি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার তখন গাড়ীর কাছে।

সুরমার মনটা আজ তেমন ভাল ছিল না। বাড়ীতে কেহ নাই, একা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। একখানা বই আনিবার জন্য তিনি বাহিরের ঘরে আসিলেন। সবই পড়া, তবু উহার মধ্যে একখানা বাছিয়া লইতে হইবে।

আলমারী খুলিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইলখানা' বাহির করিলেন। অনেকবার পড়া হইলেও এখানি তাঁহার প্রি গ্রন্থ ছিল।

অতিথির ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ভৃত্যরা ঘর ঝাঁ দিয়া জিনিষপত্রগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে ত?

কর্ত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। টেবলের উপর বাতিদানে বাতি ঠিক আছে। জলের কুঁজা ভরা। কাচের গ্লাসটি ঠিক যায়গায় আছে বটে। না, কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বাঃ! ভদ্রলোকটি ত ভারী অসাবধান! ব্যাগের চাবিটা গায় লাগানই আছে! চাকর-চাকরাণীরা বিশ্বাসী সত্য; কিন্তু তবু ত বলা যায় না। সুরমা ধীরে ধীরে ব্যাগটির দিকে অগ্রসর হইলেন। চাবিটা খুলিয়া লইবার পূর্ব্বে ব্যাগ বন্ধ আছে কি না, পরীক্ষা করিতে গেলেন। সহসা একটা কৌতূহল দুর্দ্দমনীয়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অতিথির পরিচয়জ্ঞাপক কোন কিছু এই ব্যাগের মধ্যে নাই? কিন্তু অধিকারীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোনও জিনিষ দেখা উচিত কি? সুরমার কর্ত্তব্যজ্ঞান—বিবেক তাঁহাকে বাধা দিল। পাশের চেয়ারে তিনি বসিয়া পড়িলেন। কি করা কর্ত্তব্য, তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

নারীর কৌতূহল যেমন প্রবল, তেমনই দুর্দ্দমনীয়। যাহা রহস্যময়, তাহাই কৌতূহলোদ্দীপক। কৌতূহল একবার জাগিয়া উঠিলে নারীকে অনেক সময় উদ্দাম করিয়া তুলে। সুশিক্ষা, সংযম, শালীনতা—সকলকে অতিক্রম করিয়া সুরমার প্রকৃতিদত্ত কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। সংশয় দূর করিবার বাসনাকে সংযত করিবার সামর্থ্য তাঁহার রহিল না। যুক্তির দ্বারা সুরমা মনকে বুঝাইলেন, তিনি ত চুরি করিতেছেন না; শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন। আজ তিন দিন ধরিয়া মনের মধ্যে যে সংশয় জাগিয়াছে, তাহার মীমাংসার কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। এ সব ক্ষেত্রে পরের দ্রব্য পরীক্ষায় অপরাধ হয় না।

খট্ করিয়া চাবি ঘুরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাগের ভিতরের জিনিষগুলি সুরমার আগ্রহ-কম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। খানকয়েক কাপড়, জামা ও দুইখানা খাতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উপরেই রমেন্দ্রের দিনলিপি।

সুরমা উঠিলেন, বাহিরের ঘরের চারিদিকের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া অন্যের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিলেন। তাহার পর খাতা খুলিয়া স্পন্দিতবক্ষে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বাঃ! চমৎকার হাতের লেখাটি ত! ভাষাও কি সুন্দর! সুরমা রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও কোন নামোল্লেখ নাই। শুধু অন্তরের ভাবগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া নির্ম্মমভাবে তাহার আলোচনা আছে। পড়িতে পড়িতে সুরমার মুখ গম্ভীর হইল। ভাবের আতিশয্যে চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। এই অপরিচিত অতিথির অন্তরের ব্যথা যেন রক্তের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

অসন্তুষ্ট চিত্ত, দুষ্প্রাপ্য আদর্শের পশ্চাতে—মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেমন করিয়া পথভ্রান্ত হয়—আর সেই ভ্রান্তির পরিণাম কি শোচনীয়, কি ভীষণ, কি মর্ম্মভেদী, অতিথি তাহা কি অভ্রান্তরূপেই না বর্ণনা করিয়াছেন!

সহানুভূতিতে সুরমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। বুকের মধ্যে দুঃখ ও অনুশোচনার আগ্নেয়গিরিকে লইয়া বাহিরে অটল ধৈর্য্যের সহিত অবস্থান করা শক্তিমানের কায। আহা! মানুষটি কি দুঃখী! কিন্তু কেন এই দুঃখ? কে ইনি? ইঁহার পরিচয়ের জন্য প্রথমাবধিই সুরমার এত আগ্রহই বা কেন? দিনলিপিতে অতিথির পরিচয়ের কোন সূত্র ত আবিষ্কৃত হইল না।

দিনলিপির শেষের দিকে লেখা রহিয়াছে, "মা'র জন্য প্রাণ অস্থির। কিন্তু তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তির সম্মুখে এ অপবিত্র মন লইয়া দাঁড়াইতে পারিব না। তাই পলাইয়াছি। আর সেই বেচারা—অভাগী! তাহার জীবনে অভিশাপের মতই বুঝি আমি আসিয়াছিলাম। ভাল যদি বাসিতেই না পারিব, তবে এমন গুরু দায়িত্ব কেন মাথায় করিয়া লইয়াছিলাম? সে যে কেমন, তাহার পরিচয় লইবার কোন ইচ্ছাই কখন হয় নাই। তাহার মূর্ত্তি কিরূপ, তাহাও ত মনে পড়ে না! আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চমৎকার বটে! অথচ লোকাচার, সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট সেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধন। এ পরিহাস, এ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কি মর্ম্মান্তিক! এক এক বার মনে হয়, মনটাকে তাহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাই; কিন্তু তখনই যেন কেহ চীৎকার করিয়া বলে, নির্লজ্জ! ভণ্ড! যাহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ, সেই অনাদৃতার কাছে তোমার পাপকলুষিত মন লইয়া দাঁড়াইবে কোন্ অধিকারে? না, তোমার কোন অধিকার নাই।"

সুরমা দিনলিপি রাখিয়া দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় খাতাখানি তুলিয়া দেখিলেন, কবিতার খাতা। শিশির বাবু কবি? কৌতূহলভরে সুরমা উপরের মলাটের দিকে চাহিলেন। নীচের কোণে ছোট অক্ষরে লেখা—"রমেন্দ্র।"

যুবতী সহসা চমকিয়া উঠিলেন। রমেন্দ্র! শিশির বাবুর নিকট এ খাতা কেন? সুরমার মুখমণ্ডলে গাঢ় চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। খাতাখানি খুলিয়া দুই একটি কবিতা পড়িলেন। পাকা হাতের সুন্দর রচনা। কিন্তু দিনলিপি ও কবিতার খাতার হস্তলিপি, এ যে একই হাতের লেখা!

ঘড়ীতে ৪টা বাজিয়া গেল। সুরমা উঠিলেন; কম্পিত-হস্তে খাতা দুইখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। চাবি খুলিয়া লওয়া হইল না। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

সন্দেহ ঘনীভূত হইল; কিন্তু মীমাংসা সুনিশ্চিত নহে। সুরমা দ্রুতহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের দ্বারা তখনই তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নভোজে প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এমন মাঝে মাঝে হইত। পাচক থাকা সত্ত্বেও সুরমা প্রায়ই নানাবিধ সুখাদ্য নিজে রাঁধিয়া স্বামীকে ভোজন করাইতেন। তাহাতে তিনি কি তৃপ্তি পাইতেন, তাহা যাঁহারা স্বামিসোহাগিনী, গৃহিণী, তাঁহারাই ভাল বুঝিতে পারিবেন। ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ, জ্যোৎস্না-রজনীতে 'মলয়'বায়ু (অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে তাহার একান্তই অভাব) সেবন করিতে করিতে 'পিয়া-মুখচন্দ্র' নিরীক্ষণ এবং কবির ভাষায় প্রেম-সম্ভাষণ অপেক্ষা রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যের অধিক প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট বলিতেন, "ভরা-পেটে প্রেমচর্চ্চা কর, আপত্তি নাই; কিন্তু খালি পেটে—ওতে আমি রাজি নই।" তাই পত্নীর স্বহস্তপ্রস্তুত নানা রসপূর্ণ ভোজ্যের মধ্যে তিনি প্রচুর প্রেম ও স্নেহ রসের সন্ধান পাইতেন। কিন্তু আজিকার ভোজে সংখ্যা ও প্রাচুর্য্য যেন পূর্ব্বের সকলগুলাকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার রমেন্দ্রনাথকে বাহিরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ একটু শীঘ্রই শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গুরু ভোজনে আজ আর বসিবারও ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

দুই চারি বার ধূমোদ্গিরণের পরই তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। কতক্ষণ তিনি এমনই আরামে দিবা-নিদ্রার সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, ঠিক স্মরণ নাই। একটি কোমল হস্তের মিঠা, মৃদু ধাক্কায় তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। ভাবিলেন, এই দ্বিপ্রহরে বুঝি কোন রোগী আসিয়াছে, তাই বুঝি পত্নী তাঁহাকে জাগাইয়া দিতেছেন। নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রঘুয়াকে দিয়ে ব'লে পাঠাও, আমি এখন কোথাও যেতে পারব না। ৫টার সময় যার দরকার থাকে, যেন আসে।"

ডাক্তার পাশ ফিরিয়া শুইতেই আবার মৃদুকরতাড়নায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল।

"তুমি দিনে কোন দিন ঘুমোও না, আজ যে বড় ঘুমুচ্ছো। অসুখ করবে না?"

হাই তুলিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে খাইয়ে দিয়েছ আজ, ব'সে থাক্‌বার কি আর উপায় রেখেছ? একটা পাণ দাও।"

আলস্য পরিহার করিয়া ডাক্তার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

বাস্তবিক তিনিই ত সকলকে দিবানিদ্রার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন।

সুরমা স্বামীর দিকে পাণের ডিবা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, তোমার বন্ধুটির সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"ঐ যাঃ! সে একেবারে ভুলে গিয়েছি গো!"

"এই কয় দিনের মধ্যে খোঁজটা নিতে পার্‌লে না?"

স্বামী বলিলেন, "তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন বল দেখি? কোন মতলব-টতলব আছে না কি?"

ক্রূর হাস্যে সুরমা বলিলেন, "তা ত আছেই। অম্‌নি কি আর সন্ধান নিচ্ছি।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যাপারটা কি, বল ত?"

মৃদু-গমনে দেরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া সুরমা বলিলেন, "ব্যাপার ভীষণ। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।"

দেরাজের টানা খুলিয়া কাগজ-মোড়া একটা জিনিষ লইয়া সুরমা স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"দেখ ত, তোমার চেনা কেউ আছে কি না।"

পত্নী স্বামীর সম্মুখে একখানা ফটোগ্রাফ ধরিলেন। গিরীন্দ্রনাথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বাঃ! এ ছবিতে তুমিও আছ দেখছি। তোমার বাবা-মাও আছেন। এই যে টুনি; তার পাশে ও কে? শিশির বাবুর মত দেখছি না?"

বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন।

"ব্যাপারটা ত বুঝলাম না—এ কি রকম হ'ল?"

সুরমা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। ভাল করিয়া তিনি আর একবার আলোকচিত্রখানি দেখিলেন।

সুরমা বলিলেন, "আমার প্রথম দিনই সন্দেহ হয়েছিল। তবে শুধু বিয়ের সময় দেখেছিলাম, তাও বেশী দিন নয়—মাত্র বিয়ের রাত্রি; আর তার পরদিন। কিন্তু তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; তথাপি ভরসা ক'রে তোমায় বল্‌তে পারি নি; কি জানি, যদি আমারই ভুল হয়ে থাকে। তুমি ত টুনির বিয়েতে যেতে পার নি। আর রমেন বাবুকে তুমি আগে দেখ নি। কেমন ক'রে তোমার মনে সন্দেহ হবে? তার পর সে দিন—"

বলিতে বলিতে সুরমা স্বামীর দেহে অঙ্গ ঢালিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি। তোমাকে না জানিয়ে—যে দিন তোমরা দু'জনে দুপুরবেলা সহর বেড়াতে গিয়েছিলে—বাইরের ঘরে গিয়ে ওঁর ব্যাগ খুলে ডায়রী আর কবিতার খাতা পড়েছিলুম। তাইতে আমার সন্দেহ বেশী হয়। তোমাকে সে দিন বলি নি, পরে সব বলব ঠিক করেছিলুম। এতে আমার উপর তোমার রাগ হয় নি?"

পত্নীকে আদর করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "পাগলী! এতে আমার রাগ হবে কেন? আমি হ'লে ঠিক তোমারই মত গোয়েন্দাগিরি করতুম। তার পর?"

সুরমা তখন দিনলিপিতে যাহা পড়িয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম স্বামীকে বলিলেন। "তখনই এসে বাবাকে পত্র লিখে দিলাম—বিয়ের পরদিন যে ছবি তোলা হয়েছিল, সে ছবি আমি পাই নি, বাবা যেন পত্র পাঠ একখানা ফটো পাঠিয়ে দেন। আর রমেন বাবু কোথায়, তাও জান্‌তে চেয়েছিলাম। বাবা লিখেছেন যে, তিনি রমেন বাবুর মা'র চিঠিতে জান্‌তে পেরেছেন, পুরী থেকে রমেন বাবু পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন। এখন বুঝলে সব?"

"কিন্তু ভায়া এমন নাম ভাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এত বৈরাগ্যই বা কেন?"

সুরমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাবা ও মা প্রায়ই চিঠি লেখেন। তা থেকে এখন বুঝতে পারছি, বিয়ের পর হ'তে রমেন বাবু আমাদের বাড়ীতে খুবই কম গিয়েছেন। পড়াশুনার ক্ষতি হবে ব'লে বাবাও তাঁকে আনবার চেষ্টা করেন নি। রমেন বাবুর মাও না কি মা'কে এ বিষয়ে বেশী পীড়াপীড়ি না করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তারপর রমেন বাবুর ডায়রী প'ড়ে আমি যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, টুনির সঙ্গেও ওঁর—"

"প্রেমের আদান-প্রদান হয় নি!—বুঝেছি, ভায়া আমার মরীচিকার পেছনে এত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

খোলা জানালা দিয়া আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, মানুষ নিজের মনের দোষেই নিজে কষ্ট পায়। অমন স্ত্রী পেয়েও বেচারা এত দিন সুখী হ'তে পারে নি, এ কি কম দুর্ভাগ্য? কি চমৎকার এই মেয়ে টুনি! এমন মধুর স্বভাব, ধীর বুদ্ধি; দেখতেও চমৎকার। ভায়া রত্ন চেনেন নি। বাস্তবিক বেচারার দুর্ভাগ্যে আমি দুঃখিত। প্রতিভার মত মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া কঠিন।"

তখন স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া নানা পরামর্শ চলিল। স্থির হইল, রমেন্দ্রকে এখান হইতে কোনমতেই যাইতে দেওয়া হইবে না। অথচ সে যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে, তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। শ্বশুরালয়-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে সে যেরূপ উদাসীন, তাহাতে সে যে শ্যালিকার গৃহে অতিথি, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। গিরীন্দ্রনাথকে সে কোনও দিন দেখে নাই, নামও হয় ত জানে না। জানিলেও মীরট হইতে এলাহাবাদ, তথা হইতে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি বদলী হইয়া আসিয়াছেন, সে সন্দেহ তাহার মস্তিষ্কে সহসা প্রবেশ করিবার সম্ভাবনাও অল্প।

তবে সুরমাকে খুব সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। বিবাহের সময় সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল, এখন দেখিলে সে হয় ত তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারে। সুতরাং রমেন্দ্র যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, এমনভাবে চলাফেরা করিতে হইবে।

কিন্তু ডাক্তার-দম্পতির এত সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে মানসিক অবস্থায় রমেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল এবং পরে শ্বশুরালয় সম্বন্ধে সে যেরূপ উদাসীন ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবার সম্ভাবনা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা পশ্চিমের কোথাও আছেন, হয় ত এইটুকুমাত্র সংস্কার তাহার মনের প্রান্তে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ সকল বিষয়ে তাহার কোন খেয়ালই ছিল না।

অনেক আলোচনার পর দম্পতি পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ষ্টীমার চলিতেছিল —দ্রুততালে, প্রশস্ত নদীর বিপুল জলরাশি ভেদ করিয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া চলিতেছিল। সরযূ ও অমিয়া কেবিনের বাহিরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে নদীর পরপারস্থ গ্রামের শোভা দেখিতেছিল। প্রভাত-সূর্য্য কি মধুর! শিশির-স্নাত গাছের উপর তরুণ-রবির কনক-কিরণের নৃত্য কি চমৎকার! নদীবক্ষে জেলেডিঙ্গীগুলি তরঙ্গাঘাতে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সরযূর মুখে একটা অম্লানজ্যোতিঃ, আনন্দের প্রবাহধারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "বৌদি! বাঙ্গালাদেশের শোভা এত মধুর, তা ত জান্তাম না!"

অমিয়া নিবিষ্ট-মনে কি ভাবিতেছিল। সে সরযূর প্রশ্নে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া বলিয়া উঠিল, "বড় চমৎকার!"

ষ্টীমারের গতি ক্রমে কমিয়া আসিল। তীরে ষ্টেশন — একখানি টিনের ঘরমাত্র। প্রায় পাড়ের কাছে আসিয়া ষ্টীমার থামিল। একখানি কাঠের সিঁড়ি ষ্টীমার হইতে তীরদেশে সংলগ্ন হইল। গ্রামের যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটুলিসহ তীরে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সহসা সরযূর মুখ বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তীরদেশে কি দেখাইল। প্রায় ৩০।৪০ জন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ ও ছিন্নবসনা নারী কাতরভাবে কি বলিতেছে। সকলেরই দেহ অস্থি-চর্ম্মসার, মুখে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা! কোনও রমণীর জীর্ণ বক্ষোদেশে শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু। যাত্রিগণের নিকট যুক্তপাণি হইয়া তাহারা ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করিতেছে! কণ্ঠ হইতে কথাও যেন বাহির হয় না, এমনই ক্ষীণ তাহাদের কণ্ঠস্বর!

তাহাদের দুর্দ্দশা ও কাতরতা যেন যুবতীদিগের অন্তরকে বিদ্ধ করিল। তাহারা মুখ ফিরাইতেই পশ্চাতে সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। তাঁহার মুখ গম্ভীর, নয়নে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। গাঢ় কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি দেখছ? আমার দেশের রূপ?—হাঁ, সুজলা সুফলা বাঙ্গালার—অন্নপূর্ণামূর্ত্তির আদর্শ ছবি এই বটে!"

সুরেশচন্দ্র দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া গেলেন। সরযূ ও অমিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। সুরেশচন্দ্র তীরে নামিলেন। ষ্টীমার তখনও কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবে।

ক্ষুধিত নর-নারীদিগের কাছে আসিয়া তিনি হাত তুলিয়া সকলকে নীরবে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাঁহার আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া সম্ভ্রমভরে সকলেই একটু দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। উঃ! তাহাদের নয়নে ক্ষুধার কি বিকট জ্বালা! তাহাদের মূর্ত্তিতে দারুণ অভাবের কি শোচনীয় নিদর্শন!

মুদ্রাধার খুলিয়া সুরেশচন্দ্র তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া টাকা দিলেন। এক জন রমণী ক্ষীণ ও কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবু, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন; কিন্তু আমাদের কিছু খেতে দাও, বাবা। আজ ৩ দিন আমার এই ছেলেটির পেটে "

উদ্গত অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। অমনই সেই জনতা হইতে সম্মিলিত কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "খেতে দাও, খেতে দাও। এটা গরীবের গ্রাম, বানে সব ভেসে গেছে। আমরা খালি গাছের পাতা—পাতা খেয়ে আছি!"

"দাদা !—"

সুরেশচন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অমিয়া ও সরযূ তাঁহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভ্রাতার কাণে কাণে অমিয়া কি বলিল। সুরেশচন্দ্র সম্মতি দিলেন। সকলকে ডাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, খাবার দিচ্ছি।"

ষ্টীমারের মাঝি, মাল্লা, সারেঙ্গ এবং অন্যান্য যাত্রী সবিস্ময়ে সুরেশচন্দ্র, অমিয়া ও সরযূর কার্য্যপ্রণালী দেখিতেছিল। সুরেশচন্দ্র সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্টীমার এখানে আর কতক্ষণ থাক্‌বে?"

সম্ভ্রমভরে সে বলিল, "আর মিনিট দশেক।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করা যায় না?"

"পরের ষ্টেশনে সময়ে না পৌঁছুলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে যে, বাবু।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তবে কাযেই আমাদের এখানে নাম্‌তে হবে। এদের কিছু না খাইয়ে আমরা ত যেতে পারি নে।"

সারেঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখানে কোথায় থাক্‌বেন আপনারা? এ গ্রামে কারও বাড়ীতে থাক্‌বার যায়গা আছে ব'লে আমি জানি নে।"

অমিয়া তখনও দাদার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "কিন্তু এই সব অভুক্তকে না খাইয়ে চ'লে গেলে এরা মারা যাবে—সে মহাপাপ আমাদেরই হবে।"

সারেঙ্গ কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, আমি এদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার ছাড়ব না। এতে কৈফিয়ৎ দিতে হয় দেব; কিন্তু আপনাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া—না, সে হ'তেই পারে না।"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ষ্টীমারে আর কেহই ছিল না। বিশেষতঃ সুরেশচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ও ধনী বলিয়া সারেঙ্গের ধারণা জন্মিয়াছিল। ইঁহাকে খুসী করিতে পারিলে চাই কি ভাল বকশিসও মিলিতে পারে। ষ্টীমার সময়ে যাওয়া না যাওয়া নদীর স্রোতের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং সে জন্য কৈফিয়ৎ দিবার দুর্ভাবনা তাহার ছিল না।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কয়েক হাঁড়ি ভীম নাগের সন্দেশ ও ভাল রসগোল্লা, এক ঝুড়ি ফল, চায়ের জন্য কয়েক কৌটা জমান দুগ্ধ সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রির আহারের জন্য প্রচুর লুচিও ছিল। অধিকাংশই তাহাদের ব্যবহারে লাগে নাই। অমিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া বড় কেৎলিতে জল চড়াইল। জমান দুগ্ধ গরম জলে মিশাইয়া অভুক্ত শিশুদিগকে পান করাইতে হইবে। দশ মিনিটের মধ্যে কায সারিয়া, সনাতন ও সৌরভীর সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যগুলি সহ অমিয়া ও সরযূ তীরে নামিয়া গেল।

সমবেত জনতা অবাক্‌বিস্ময়ে কলিকাতা হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা-যুগলের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। গ্রামের যাত্রীরাও গন্তব্যপথে না গিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষুধিত নরনারীদিগকে বসিতে বলিয়া অমিয়া ও সরযূ চায়ের পাত্রে সুমিষ্ট পানীয় দুগ্ধ ঢালিয়া শিশুদিগকে সযত্নে ধীরে ধীরে পান করাইতে লাগিল। কত দিন পরে যে শিশুদিগের ভাগ্যে দুগ্ধপান জুটিল—তাহা মনে করিয়া সরযূ ও অমিয়ার নয়নে অশ্রুবাষ্প সঞ্চিত হইতেছিল। অনাহার-পীড়িত নরনারী বা শিশুর শোচনীয় অবস্থা পূর্ব্বে তাহারা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই।

শিশু ও বালকদিগের দুগ্ধপান শেষ হইলে অমিয়া, সরযূ ও সুরেশচন্দ্র অতি সতর্কতার সহিত বুভুক্ষু নরনারীদিগকে আহার্য্য পরিবেষণের উপক্রম করিলেন। সুরেশচন্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই, আগে একটু জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেও।" ভৃত্য সনাতন দৌড়িয়া ষ্টীমারে উঠিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে দুইটা বাল্‌তি ও দুইটা ঘটী লইয়া হাজির হইল। নদীর মিষ্ট জল তুলিয়া প্রত্যেককে দিবার পর মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় অমিয়া ও সরযূ ধীরে ধীরে একে একে আহার্য্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। পাত্রাভাবে হাতের উপরেই খাদ্য পড়িতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা অন্তর্হিত হইতেছিল। ক্ষুধার প্রচণ্ড তাড়নায় সুরেশচন্দ্রের সতর্ক বাণী ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একটি সন্দেশ, একখানি লুচি, পরে ফলের একটু অংশ, এমনইভাবে পরিবেশনের ফলে গোগ্রাস-ভোজন কতকটা সংযত হইতেছিল। আপনাদের

জন্য কিছুই না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত খাদ্যই সরযূ ও অমিয়া বিলাইয়া দিল। ইহাতে অনশনক্লিষ্ট নরনারীর পূর্ণ তৃপ্তি হইল না বটে, কিন্তু প্রবল ক্ষুধার তাড়না কিছু কমিল। আহারশেষে তাহারা যুক্তপাণি ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া অমিয়া, সরযূ ও সুরেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

আরক্ত আননে যুবতীরা ষ্টীমারে ফিরিয়া গেল। অনুসন্ধানে সুরেশ জানিতে পারিলেন, সেই ষ্টীমারে জনৈক চাউল-ব্যবসায়ী কয়েক শত মণ চাউল লইয়া নগরে চলিয়াছে। তিনি তাহার সহিত দেখা করিয়া কয়েক মণ চাউল কিনিয়া লইলেন।

গ্রামের যাত্রীরা তখনও সেখানে জটলা করিতেছিল। এক জন দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ-যাত্রী অন্যত্র যাইবেন বলিয়া ষ্টীমারের টিকিট কিনিতেছিলেন। অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে খালাসীরা চাউলের বস্তাগুলি তীরে লইয়া গেলে, সুরেশচন্দ্র সেই সঙ্গে আবার নামিয়া আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণ যাত্রী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আপনি কে, জানি না, আমি এতক্ষণ আপনার কায দেখছিলাম। আপনি সত্যি আজ আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। বিদেশী হয়েও আপনি আমাদের এ অঞ্চলের এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষার জন্য যা করলেন, তাতে আমার সঙ্কল্প বদলে গেছে। পরের গ্রামেই আমার বাস; যথাসাধ্য বিহিত করবার আশায় আমি সহরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু—"

সুরেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কে, তাও আমি জানি নে, জান্‌বার তেমন দরকার আছে ব'লে ত মনে হয় না। আপনি যদি আমার সাহায্য করেন, তবে বড় উপকার হয়। আপাততঃ ১০ মণ চাউল কিনেছি। আপনি অভাব-গ্রস্তদের মধ্যে বিবেচনা ক'রে বিতরণ করবার ভার নিলে আমি বেঁচে যাই।"

ব্রাহ্মণ উৎসাহভরে বলিলেন, "নিশ্চয়; যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রে ভার দেন, সানন্দে আমি করব; কিন্তু আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত!"

সুরেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর্ত্তের সেবার পরিচয়ের বালাই নেই। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এত বড় কাষ হ'তে পারে না। গ্রামের পাঁচ জনের সাহায্য না হ'লে এ সকল কাষ চল্‌তে পারে না। আমি আপাততঃ এই দিলাম, পরে আবার এখানে আসব।"

গ্রামের কতিপয় যুবক নীরবে সকল ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহারা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরকে আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন। ওঁর শেষ কপর্দ্দক উনি অভাবগ্রস্তের সেবায় দান করেছেন। এ অঞ্চলের সকলেই ওঁকে ভালরূপে চেনে। ওঁর উপর ভার দিন, আমরাও কাযে লেগে যাব।"

উন্নতদেহ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমাদের দরিদ্র পল্লীতে টাকা নেই; কিন্তু কায করবার লোকের অভাব হবে না। এক মাস ধ'রে কোন রকমে নিরন্ন গ্রামের হতভাগ্যদিগকে বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিল; আজ ৪।৫ দিন—"

বাধা দিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "বুঝেছি; আচ্ছা, এই ৪।৫ খানা গ্রামে নিরন্ন লোকের সংখ্যা কত হবে?"

"তা কম নয়। প্রায় ৪শ হবে।"

সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মণ ও যুবক কয়েক জনকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি রীতিমত ব্যবস্থা করতে পারেন, আমিও যথাসাধ্য টাকা যোগাড় ক'রে দেবার চেষ্টা করতে পারি।" মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপাততঃ আমি ৫শ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। এই নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপনারা কায আরম্ভ করুন; পরে আরও চেষ্টা দেখব।"

নোট-কেস্ হইতে ৫ খানা ১ শত টাকার নোট বাহির করিয়া সুরেশচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার হাতে দিলেন। চেক্ লিখিয়া দিলে আপাততঃ টাকা পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বোধে সুরেশচন্দ্র সে পথে গেলেন না।

ব্রাহ্মণের নেত্র অশ্রুভারে পূর্ণ হইল। যুবকদিগের নয়নও শুষ্ক রহিল না। ব্রাহ্মণ গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, বয়সে তুমি আমার অনেক ছোট—ছেলের মত। এই গ্রামের জন্য তুমি যা অযাচিতভাবে করলে, তার জন্য ভগবান—"

মুখ ফিরাইয়া সুরেশ বলিলেন, "আপনি প্রণম্য, আমার প্রণাম নিন। মানুষের যা কর্ত্তব্য, তার বেশী এ ত কিছুই নয়। ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা?"

সুরেশচন্দ্রের নোটবহিতে মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুর এবং যুবকগণ আপন আপন নাম, ঠিকানা এবং ৫ শত টাকার প্রাপ্তির কথা লিখিয়া দিলেন।

সারেঙ্গ আসিয়া জানাইল, আর বিলম্ব করা অসম্ভব।

সুরেশচন্দ্র দ্রুত ষ্টীমারের দিকে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, আপনার নামটা—"

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সুরেশ বলিলেন, "পরে জানাব, পত্র লিখব--আবার এখানে আসতেও হবে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে বাসায় ফিরিয়াও সরযূ এবং অমিয়ার প্রসন্নতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যাইত না। সুরেশচন্দ্রের আননে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা যাইত—সেবা-কার্য্যে রত হইবার পরও কোনও ভাবের রেখা আজও দেখা গেল না। নগরের এক প্রান্তে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। জেলার হাকিমের সহিত সুরেশের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। উভয়ে একই বৎসরে বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস্ পাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে জয়েণ্টের কায করিবার পর পূর্ব্ববঙ্গের এই জিলার ভার পাইয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে দুর্ভিক্ষ ও পীড়ার প্রকোপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল—সরকার 'রিলিফের' কায খুলিয়া সে ভীষণ অবস্থার প্রতীকার করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় সুরেশচন্দ্রের অযাচিত সাহায্য পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র নগরকে কেন্দ্র করিয়া সরযূ ও অমিয়ার সাহায্যে কোথাও পদব্রজে, কোথাও বা নৌকা কিংবা গোযানে চড়িয়া দূরবর্ত্তী গ্রামের অবস্থা দেখিতে যাইতেন। স্থানে স্থানে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—চারি পাঁচখানা গ্রামকে লইয়া এক একটা অস্থায়ী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কায পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।

দেশের ভীষণ দুর্দ্দশা—নর-নারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চির-সুখলালিতা নবীনাদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কর্ম্মানুরাগ ও সেবাপ্রবৃত্তির এমনই শক্তি যে, একবার যদি কোনও চিত্তে তাহারা জাগিয়া উঠে, তবে সহসা তাহার দীপ্তি নিষ্প্রভ হয় না। ষ্টীমার-ঘাটের দৃশ্যেই অমিয়ার স্বভাবকোমল, উন্নত নারীহৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তখনই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, পীড়িতের সেবায়, আর্ত্তের শুশ্রূষায় এবং ক্ষুধিতের ক্ষুধাপ্রশমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। স্বামীজীর কথাগুলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—"মা, জীবসেবায় মানুষের সকল ধর্ম্ম সার্থক হয়!"

স্বহস্তে পাক করিয়া স্বামীজীকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার পর স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "মা, একটা কথা মনে রেখ, যত্র জীব, তত্র শিব। জীবের সেবায় তিনি পরিতৃপ্ত হন, তাঁরই সেবা হয়। আর তাঁর সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। জীবসেবায় আত্মনিয়োগ কর, অমৃতের স্বাদ পাবে, অনন্ত সুন্দরের পরিচয় তখন গোপন থাক্‌বে না।" কথাগুলি তখন হইতেই অমিয়ার হৃদয়ের তারে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে।

স্বয়ং আহার্য্য বিলাইয়া, রোগীর সেবা করিয়া, এই কয় দিনেই অমিয়া আনন্দের আভাস পায় নাই কি? কোমরে কাপড় আঁটিয়া বাঁধিয়া যখন সে ক্ষুধিত নরনারীদিগকে সিদ্ধান্ন পরিবেষণ করে, তখন তাহার হৃদয়ে কে যেন আসিয়া আবির্ভূত হয়! তখনই তাহার মনে হয়, সে যেন জননী—বুভুক্ষু সন্তানদিগকে সে ক্ষুধার সময় অন্ন পরিবেষণ করিতেছে। পীড়িতের পার্শ্বে বসিয়া যখন সে তাহার রোগযন্ত্রণা প্রশমিত করিবার জন্য শুশ্রূষা করে, তখন সংসারের কোন কথাই ত মনে পড়ে না! শুধু যেন মাতৃত্বের অমৃত-প্রবাহধারা তাহার সমগ্র চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শুশ্রূষার ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির মুখে যখন শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মনে হয়, এমন তৃপ্তি—এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

মানব-হৃদয়ের তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাণ স্বামীজীর কথা কত সত্য!—না, তাহার হৃদয়ে আর কোন গ্লানি নাই, অশান্ত হৃদয় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। যন্ত্রণাভরা মানসিক চাঞ্চল্য কর্ম্ম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—ক্লেদমলিন মনোবৃত্তির রেখা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে!

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্ষুদ্র গৃহের অপরিসর কক্ষে ফিরিয়া, সাধারণ শয্যায় শয়ন করিয়া, অমিয়ার মনে অনেক পুরাতন কথা নূতন করিয়া দেখা দিত। অধিকাংশ সময় স্বামীর কথাই মনকে অধিকার করিত। কথাপ্রসঙ্গে

স্বল্পভাষী বৈজ্ঞানিক যখন বলিতেন, "অমিয়া, বিজ্ঞানের সেবায় জীবনটা উৎসর্গ করেছি ব'লে, অনেক সময় গৃহীর কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করতে পারি না। সে জন্য দুঃখ ক'র না। আমার সামর্থ্য বড় কম, তবু চেষ্টা কচ্ছি, যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার দেশের ভাইদের জন্য কোন পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারি। এ যুগে আমাদের দেশ বড় দরিদ্র, বড় অসহায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের নিদারুণ অর্থনীতিক সমস্যার কোন সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা যায় কি না, এই বইখানাতে তারই মীমাংসার চেষ্টা কচ্ছি।" অমিয়া তখন স্বামীর এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এ কথা স্বীকার করিতে এখন তাহার এতটুকু লজ্জা নাই। সত্যই সে তখন স্বামীর মনের গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। কিন্তু ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে, নানাবিধ অবস্থার চিত্র দেখিবার পরে এই কয় দিনে সে তাহার স্বামীর কথার মর্ম্ম যেন অনেকটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। দেশ বলিতে এত দিন সে কিছুই বুঝিত না, দেশের লোক বলিতে সে বিশেষ কোন অর্থ করিতে পারিত না। কিন্তু এখন?

ষ্টীমার-ষ্টেশনের দৃশ্যের পর অমিয়া ষ্টীমারে উঠিয়াই সুরেশচন্দ্রকে তাহার সংকল্পের কথা জানাইয়াছিল। মৃদু হাসিয়া সুরেশচন্দ্র তখনই বলিয়াছিলেন, "তুই যে কি ধাতুতে গড়া, তা আমি জান্‌তুম, অমি।"

তাহার পর কেবিনের মধ্যে গিয়া সুরেশচন্দ্র অমিয়া ও সরযূর নিকট আপনার ভাবী কার্য্যপদ্ধতির কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন।

"বাবা ৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে গেছেন। ব্যাঙ্কেও আমার অংশে ৪ লাখ টাকা মজুত। এত দিন প্রজার অর্থে বিলাসভোগ করা গেছে। এখন যদি আমারই দেশের, আমারই ভাই-বোনরা না খেতে পেয়ে মারা যায়, আর যদি সাধ্যমত তার কোন প্রতীকারের চেষ্টা না করা যায়, তবে অমি, তুইও কি আমায় মানুষ ব'লে ভাবতে পারবি?"

দাদার মুখে সে দিন সে যে ভাব-প্রবাহের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়াছিল, অমিয়া কখনও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারিবে না।

"আমাদের নামে ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে, দাদা?"

হাসিয়া সুরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সে টাকা ত তোমার একার নয়, অমিয়া! বাবার উইল অনুসারে সুনীল ও তোমার নামে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ ব্যাঙ্কে ৮০ হাজার টাকা জমা আছে।"

অমিয়ার আনন তাহাতে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে বলিয়াছিল, "সে টাকার কথা আমি বল্‌ছি না, দাদা! তুমি আমার নামে আলাদা যে টাকা জমা রেখেছিলে, সেই টাকার কথাই বল্‌ছি।" সুরেশচন্দ্র উত্তরে বলিয়াছিলেন, সে টাকা সুদে আসলে প্রায় ২০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অমিয়া দাদাকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিল যে, সুরেশচন্দ্রের অনুষ্ঠানে তাহার ঐ টাকাটাও যেন ব্যয় করা হয়। নহিলে সে মনে বড়ই ব্যথা পাইবে। তখন তাহার মনে হইয়াছিল, টাকায় তাহার প্রয়োজন কি? তাহার স্বামী কৃতী পুরুষ, তিনিও দরিদ্র নহেন। তবে স্বামীর অনুমতি লওয়া দরকার। যদিও উহা ব্যয় করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে, তথাপি জীবন-পথের যিনি চিরসঙ্গী, নারীর যিনি সর্ব্বস্ব, তাহার ইহকাল পরকালের সকল অবস্থায় যিনি একমাত্র সুহৃদ্, তাঁহার কাছে লুকাইবার কিছু নাই, থাকিতেই পারে না। সুতরাং সে তাঁহার অনুমোদন আনাইয়া লইয়াছিল। সুনীলচন্দ্র শুধু অনুমোদন করেন নাই, তাহার এই প্রচেষ্টায় তিনি আন্তরিক সহানুভূতি ও আগ্রহও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

আজ অমিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য সনাতনের সঙ্গে নগরের সন্নিহিত কেন্দ্রে চাউল বিতরণ ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গিয়াছিল। সুরেশ ও সরযূ ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী হাঁসপাতালে রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন একই স্থানে ৩ জনই উপস্থিত থাকিতে পারিত না—সুবিধা হইত না। এমনই ভাবে কয় সপ্তাহ তাহারা লোক-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই অমিয়া কায শেষ করিয়া ফিরিয়াছে সুরেশ ও সরযূর এখনও দেখা নাই। হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সে বাতায়নের ধারে আসিয়া বসিল।

ক্ষীণচন্দ্রের মৃদু আলোক-রেখা মেঘলেশ-শূন্য গাঢ়নীল গগনে যেন স্বপ্নলেখার মত বোধ হইতেছিল। সারাদিনের

কর্ম্মশ্রান্তি, অবসাদের পরিবর্ত্তে যেন একটা সজীব প্রসন্নতা, আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। মুগ্ধার মত বসিয়া বসিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল। সদ্যঃপ্রাপ্ত স্বামীর পত্রখানির কথাই আজ যেন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল। ইদানীং স্বামীর চিন্তা তাহার অবসরকালকে ব্যাপৃত রাখিত। সে চিন্তাতে যেন তাহার একটা বিশুদ্ধ আনন্দ জন্মিত। পূর্ব্বেও যে এমন হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু আগে যেন একটা চেষ্টা করিতে হইত; এখন আপনা হইতেই মন সেই চিন্তায় ভরপুর হইয়া উৎফুল্ল ভাব ধারণ করে।

স্বামী লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কলেজের দীর্ঘ অবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ-সত্ত্বেও আরব্ধ কার্য্য শেষ হইতেছে না—তিনি তাহাদের সহিত যোগ দিতে পারিতেছেন না। পত্রখানি দীর্ঘ নহে; কিন্তু প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে কি আন্তরিকতা ও গভীরতার পরিচয় সুস্পষ্ট! বাহুল্যবর্জ্জিত লিপির মধ্যে সুগভীর ভালবাসা ও অকপট শ্রদ্ধার নিদর্শন যেন জমাট হইয়া উঠিয়াছে!

অমিয়া পুনঃ পুনঃ স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

তন্ময়

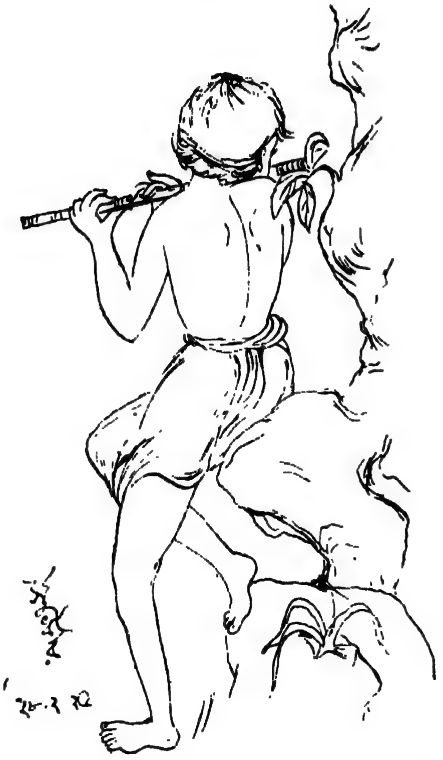

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর।

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

৬

সভা হইল ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারস্থান; দ্যূতক্রীড়া হইল অক্ষ-দ্যূত, অর্থাৎ তর্ক বা বিচার। এক পক্ষে যুধিষ্ঠির পণ রাখিতেছেন, অপর পক্ষে শকুনি পাশা ফেলিতেছেন। কবি শকুনি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—‘শকুনিঃ নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ’—শকুনি নিকৃতি অবলম্বন করিয়া খেলিতেছেন। এখানে একটু কথার খেলা আছে; নিকৃতি অর্থে কপটতা হয়, আর বচনও হয়।. যুধিষ্ঠির প্রথমেই বলিতেছেন—

“নার্য্যা ম্লেচ্ছন্তি ভাষাভির্মায়য়া ন চরন্ত্যত।”

১১-৫৯, সভাপর্ব্ব।

আর্য্যপুরুষরা ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার ও কপটতাচরণ করেন না।

মহাভারতে কপটতা ও মায়া কথা আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। মায়া কথার অর্থ ছল, এই ছল কথা বিশেষ রহস্যপূর্ণ; পরে দেখিব, লিখিত আছে,—বেদে অনেক ছল আছে : বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে ছল বলে। মায়া কথার আর এক তাৎপর্য্য, ‘অদ্ভুতার্থ’ প্রদর্শনব্যঞ্জনপূর্ব্বকঃ পরবঞ্চনম্।’ ১৬-১২৩, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

উপরের ম্লেচ্ছন্তি ভাষা কি? ম্লেচ্ছ কথার সাধারণ অর্থ নীচ, কিন্তু ইহার অপর অর্থও হইতে পারে। মহাভারত-মধ্যে অনেক স্থলে গ্রীক্‌দের সহিত পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে। যুধিষ্ঠিরের কথায় গ্রীক্‌ধর্ম্মের বা গ্রীক্‌দর্শনের যে কোনরূপ ইঙ্গিত নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা পরে ‘ম্লেচ্ছাচার্য্য’ কথা দেখিতে পাইব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের কথায় উত্তর দিতেছে—

“শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ানেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ॥”

৪৪-৫৯, সভাপর্ব্ব।

শকুনি কহিলেন, যুধিষ্ঠির, দেখ, জিগীষারূপ নিকৃতি সহকারে শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়দিগের নিকট গমন করেন; তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিকৃতি সহকারেই অতত্ত্বজ্ঞের নিকটে উপনীত হন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিকৃতি সহকারে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে যাইয়া থাকেন; তাদৃশী নিকৃতিকে লোক নিকৃতি বলে না। এ স্থলে নিকৃতি কথার দুই অর্থ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং কিরূপ দ্যূতক্রীড়া হইতেছে, তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

দ্যূত আরম্ভ হইল, যুধিষ্ঠির একে একে যাহা কিছু তাঁহার ঐশ্বর্য্য-রত্ন ছিল, তাহা হারিলেন।

“কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।”

“কাশীরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন”, ধন অর্থে যে সুবর্ণ, রজত নয়, তাহা বলা বাহুল্য এবং ‘কাশীরাজ’ কথার তলে যে বিশেষ অর্থ আছে, তাহাও বলা বাহুল্য।

কাশী কথার অর্থ শীঘ্রই বুঝিতে চেষ্টা করিব। কি প্রকার দ্যূতক্রীড়া হইতেছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা হইতে পারে। যখন বিদুরকে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দ্যূতসভায় কোন কোন কিতব উপস্থিত আছে, তখন বিদুর তাহাদের মধ্যে বিবিংশতির নাম উল্লেখ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে জন কয়েকের নাম দিলাম। দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, বিকটানন, সুবাক, উগ্রশ্রবা, বহ্বাশী, বিরাবী। ইহাদের সকলেরই নাম সহিত আনন ও শ্রবণের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সভামধ্যে যুধিষ্ঠির ও শকুনি দ্যূত সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, তখন শকুনি বলিল---

“যো বেত্তি সংখ্যাং নিকৃতৌ বিধিজ্ঞ-
শ্চেষ্টাস্বখিন্নঃ কিতবোঽক্ষজাসু।
মহামতির্যশ্চ জানাতি দ্যূতং
স বৈ সর্ব্বং সহতে প্রক্রিয়াসু॥”

৭-৫৯, সভাপর্ব্ব।

শকুনি কহিলেন, যে মহামতি কিতব জয়-পরাজয় বিবেচনায় অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের প্রতারণায় প্রতীকারজ্ঞ এবং অক্ষসম্বন্ধীয় বহুবিধ চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত, তিনিই দ্যূতের মর্ম্ম জানেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে সকলই সহ্য করেন। এ স্থলে টীকাকার সংখ্যাং শব্দের অর্থ করিতেছেন, সম্যক্‌খ্যানং জয়-পরাজয়-দ্বার-বিবেকম্। এই বিবিংশতি ও সংখ্যাং কথার তলে যে সাঙ্খ্যমতের প্রতি ইঙ্গিত নাই, তাহা বলা যায় না।

যখন যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্যূতক্রীড়া করিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি ‘ব্রহ্ম-পুরঃসর’ হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-পুরঃসর কথার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া যাইতেছিলেন, আর দ্বিতীয় অর্থ যুধিষ্ঠির বেদকে অগ্রে করিয়া দ্যূত-সভায় যাইতেছিলেন; অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারস্থানে যুধিষ্ঠির বৈদিক মত সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির হারিলেন, ‘গান্ধারবিদ্যয়া’, গল্পের অর্থ গান্ধাররাজপুত্রের বিদ্যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল। কিন্তু গান্ধারবিদ্যয়া কথার আরও কিছু অর্থ হইতে পারে। বুদ্ধদেবের দুইটি বৃহৎ প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তি আছে, একটি ব্রহ্মদেশে ও যেটি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইটি বর্ত্তমান কাবুলের চল্লিশ ক্রোশ পশ্চিমে বামিয়ান নামক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমান আফগানিস্থান এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।

দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সভামধ্যে আনিয়াছিল। ‘প্রতিগৃহ্য কেশেষু কৃষ্ণেষু কৃষ্ণায়াঃ’;—এই কেশ কথার তলে যে রহস্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। ‘কৃষ্ণেষু কেশেষু’ ইহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ কেশ; কিন্তু ইহার অন্য প্রকার অর্থও হইতেও পারে। কেশ কথার নামান্তর কচ, কচ হইল দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। সঞ্জীবনীমন্ত্র শিখিতে তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করেন; অসুরগণ এ কথা জানিতে পারিয়া কচকে বহু বার বধ করিয়াছিল—কিন্তু শুক্রাচার্য্য নিজ কন্যা দেবযানীর অনুনয়ে প্রতিবার কচকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

একবার অসুরগণ কচকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রকে তাহা পান করায়। কচ যখন শুক্রাচার্য্যের জঠরে, তখন শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন—

“সংসিদ্ধরূপোঽসি বৃহস্পতেঃ সুত
যৎ ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী।
বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং
ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমস্য ॥

৫৮-৭৬, আদিপর্ব্ব।

তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও। অসুরগণ চিরদিনই যজ্ঞাভিমানী ইন্দ্রের শত্রু, অর্থাৎ বৌদ্ধরা চিরকাল যজ্ঞ-বিরোধী। এ স্থলে যজ্ঞাভিমানি-দেবতা ইন্দ্র হইল কচ। দুঃশাসন অর্থাৎ কুশাস্ত্র, সেই কচ আকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীর ধর্ষণ করিতেছে; ইহা এক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

মহাভারতের সন্ধি-লোপের উদাহরণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, “সন্ধি-লোপো আর্ষঃ।” এই কথা অনেক স্থলে আছে. কেশ কথা যদি সেই ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে কঃ+ঈশ হইতে পারে। আমরা এখনই দেখিব যে, ঈশ কথা লইয়াই বিদুর ও দ্রৌপদী সভাতে প্রশ্ন করেন। যুধিষ্ঠির সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর হইয়া দ্রৌপদীকে পণে হারিলেন, তাহাই হইল ইঁহাদের প্রশ্ন, অর্থাৎ সেশ্বরবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী ধর্ম্মের সহিত বেদের যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধ কি?

ক শব্দের অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে।

“একো নৈকঃ স বঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্।”

৯১-১৪৯, অনুশাসনপর্ব্ব।

এ সব কথা ভগবানের বিশেষণ। এ স্থলে ক কথার অর্থ সুখ অথবা ব্রহ্মারূপে ক; স্থানান্তরে লিখিত আছে, যাহার নাম ক, তাহারই নাম খ; খ অর্থে স্বর্গ। তাহা হইলে ক কথা হইতে যজ্ঞফল স্বর্গ কিংবা বেদের নামান্তর ব্রহ্মা এই দুই ভাব আইসে। ঈশ অর্থে যদি প্রধান করা যায়, তাহা হইলে কেশ কথার অর্থ যজ্ঞ প্রধান হইতে পারে।

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

“ত্রৈলোক্যং সর্ব্বভূতেশে চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।
যত্তদক্ষরমব্যক্তমমৃতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
বদন্তি পুরুষব্যাঘ্র কেশবং পুরুষর্ষভম্ ॥”

১৪-২১০, শান্তিপর্ব্ব।

আদি এবং অন্তহীন যে পরম শ্রেষ্ঠ কালচক্র, তাহাকেই পণ্ডিতরা অক্ষয়, অব্যক্ত, অমৃত, শাশ্বত, ব্রহ্মচৈতন্য, রশ্মিদ্বারা সর্ব্বব্যাপী অন্নময়াদি পঞ্চপুরুষের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। উৎপত্তি ও প্রলয়ক্ষণ এই ত্রৈলোক্যচক্রারূঢ় পীপিলিকার ন্যায় সেই সর্ব্বভূতেশ্বরে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ স্থানে টীকাকার কেশব শব্দের অর্থ করিতেছেন,—

"কেশৈরিব চিদ্রশ্মিভির্ব্বাতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি কেশবঃ।"

কেশ কথার অর্থ চিৎ অথবা জ্ঞানরূপ রশ্মি। তাহা হইলে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দ্বারা ধর্ষণের তাৎপর্য্য এই ভাবে হইতে পারে যে, জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা অথবা জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা যজ্ঞ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ষণ কু-শাস্ত্র দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভায় আনিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন। রজস্বলা কথার এক অর্থ স্ত্রীধর্ম্মানুসারিণী। সভাস্থ দর্শকদিগের সহানুভূতি এবং করুণা উদ্রেক করিবার নিমিত্ত বোধ হয় কবি দ্রৌপদীকে এই অবস্থায় চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু এই কথার তলে বিলক্ষণ একটু রহস্য আছে। কথাটা রজস্বলী অর্থাৎ রজোগুণ যাহার বল; বেদের কর্ম্মকাণ্ড রজোগুণপ্রধান। কবি এই অর্থে রজস্বলা কথা স্থানান্তরে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"ধর্ম্মাচ্ছরীরসংগুপ্তির্দ্ধর্ম্মার্থং চার্থ উচ্যতে।
কামো রতিফলশ্চাত্র সর্ব্বে তে চ রজস্বলাঃ॥"

৬-১২৩, শান্তিপর্ব্ব।

ধর্ম্মহেতু শরীররক্ষা অর্থাৎ আরোগ্যার্থ ধর্ম্মসেবা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মের নিমিত্তই অর্থ উপার্জ্জিত বিহিত হয়, আর কামের ফল রতি, অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিতয়ই রজোগুণপ্রধান।

এ স্থলে আরও একটু রহস্য আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, ইঁহারাই দ্রৌপদীর বলস্বরূপ; আর রজোগুণও পঞ্চ প্রকার।

তখন দ্রৌপদী একবস্ত্রা ছিলেন, বোধ হয়, সে সময়ে লোক ঐ অবস্থায় একবস্ত্রা থাকিত। এই বস্ত্র কথার লে যে রহস্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। এ বস্ত্র কি? বস আচ্ছাদনে। এ আচ্ছাদন কি? যখন নল অর্দ্ধবস্ত্রা দময়ন্তীকে বনে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি বলিতেছেন, তুমি ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত আছ। স্থানান্তরে ১১-১৪৮, শান্তিপর্ব্ব—

কবি লিখিতেছেন—'আবৃতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ।' আর এক স্থলে ২-৯১, শান্তিপর্ব্ব -

কবি 'বস্ত্রাণাং' কথার শুক্লানাং বস্ত্রাণাং এই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। শুক্ল শব্দের অর্থ নিষ্পাপ, এই অর্থ পূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছি। তাহা হইলে বস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের ও পুণ্যের সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধ শ্রুতিমূলক।

উপমন্যু মহেশ্বরকে স্তব করিতেছেন :—

"গণকর্ত্তা গণপতির্দ্দিগ্বাসাঃ কাম এব চ।
মন্ত্রবিৎ পরমো মন্ত্রঃ সর্ব্বভাবকরো হরঃ॥"

৪২-১৭, অনুশাসনপর্ব্ব।

টীকাকার দিগ্বাসা শব্দের অর্থ করিতেছেন---

দিগ্বাসাঃ দারুকাবনে মুনিপত্নীমোহনার্থং নগ্নত্বং প্রাপ্তমিতি জ্ঞেয়ম্, বস্তুতস্তু দিশাম্ অনন্তানামপি বাস ইব বাস আচ্ছাদকঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি।"—ঈশা ঈশ্বরেনাবাস্যমাচ্ছাদনীয়মিতি অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বাচ্ছাদক। সেই কারণেই ধর্ম্ম অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দ্রৌপদীকে আবরণের নিমিত্ত বস্ত্র প্রদান করিতেছিলেন। স্থানান্তরে দুর্য্যোধন বলিতেছেন।

"অয়ং হ্যেষাং মহাবাহুঃ সর্ব্বেষাং শর্ম্ম বর্ম্ম চ।"

৭-১৬০, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

এই মহাবাহুই (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক এবং সকল কল্যাণের মূল।

দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাক্। বিদুর ও দ্রৌপদী উভয়ে সভাসদ্‌গণের নিকট প্রায় একই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিদুর বলিয়াছিলেন -

"অনীশেন হি রাজ্ঞৈষা পণে ন্যস্তেতি মে মতিঃ।"

যুধিষ্ঠির প্রভুত্ববিহীন হইয়া তাঁহাকে (দ্রৌপদীকে) পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ইহার এক প্রকার তাৎপর্য্য অতি সহজ। দ্রৌপদীও ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"কস্তেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী।
কিংনু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবাপি মাম্ ॥"

১০-৬৭, সভাপর্ব্ব।

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি (যুধিষ্ঠির) কি অগ্রে আপনাকে হারিয়াছেন, না আমাকে ?

তাহা হইলে উভয়ের প্রশ্নের মর্ম্ম হইল যে, যুধিষ্ঠির সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর হইয়া দ্রৌপদীকে পণে হারিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের কথায় উভয়ের প্রশ্নের গূঢ়-রহস্যের সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—

"অনীশ্বরং বিক্রবন্ত্বার্য্যমধ্যে
যুধিষ্ঠিরং তব পাঞ্চালি হেতোঃ ভোঃ।
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে চানৃতং ধর্ম্মরাজং
পাঞ্চালি ত্বং মোক্ষ্যসে দাসভাবাৎ ॥"

৪-৭০, সভাপর্ব্ব।

হে পাঞ্চালি! তোমার নিমিত্ত ইঁহারা সকলেই আর্য্যগণমধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুন এবং মিথ্যাবাদী করুন, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে।

কথাগুলি একবার করা যাক্। যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্ম্মের পুত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ। প্রশ্ন হইতেছে, সেই ধর্ম্ম সেশ্বর না নিরীশ্বর? পণের সামগ্রী হইতেছে যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা যাজ্ঞসেনী। সেশ্বর ধর্ম্ম যজ্ঞকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু নিরীশ্বর ধর্ম্ম রজোগুণপ্রধান যজ্ঞকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারে। এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারিল না, যাঁহার বাক্য বেদতুল্য, সেই পিতামহ ভীষ্মও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—

"উক্তবানস্মি কল্যাণি ধর্ম্মস্য পরমা গতিঃ।
লোকেন শক্যতে জ্ঞাতুমপি বিজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ ॥"

১৪-৬৯, সভাপর্ব্ব।

ভীষ্ম বলিলেন, হে কল্যাণি! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের পরমা গতি; লোকমধ্যে মহাত্মা বিজ্ঞ মানবরাও জানিতে পারেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—

"ন ধর্ম্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং
শক্লোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ। ৪৭"

আমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তোমার এ প্রশ্নের যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। এই সকল প্রশ্ন ও উত্তর পড়িলে সকলেরই মনে একটি কথা স্মরণ হইবে।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।"

তাহা হইলে যেন একটু অর্থের আভাস পাওয়া যাইতেছে। নিরীশ্বরবাদী সাঙ্খ্যমত, সেশ্বরবাদী পাতঞ্জলমত, বেদের যজ্ঞকাণ্ড এই সকল লইয়া বিচার হইতেছে। ভীষ্ম যাহা পরে বলিলেন, তাহাতে এ সন্দেহ আরও গাঢ়তর হয়। তিনি বলিলেন,—

"যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।"

এই প্রশ্নে যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রমাণ; ইহাই আমার মত। অর্থাৎ ধর্ম্ম অথবা বেদ হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

মহাভারতে যে সময় চিত্রিত আছে, সেই সময়ে বৈদিক ও অবৈদিক মতের মধ্যে যজ্ঞই ছিল বিবাদের প্রধান মূল। মহাভারতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ ও যোগ এই দুই বিষয় লইয়া অনন্ত বিচার আছে এবং তাহাদের সমন্বয়ও আছে। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে এই বিচারের ও সিদ্ধান্তের ফল আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এ প্রশ্নের আলোচনা হইবে।

পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, মহাভারতের যুদ্ধকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বলে কেন, এখন সে প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

দুর্য্যোধন ও তাহার পক্ষীয়গণকে কি কারণে বিশেষ করিয়া কুরু বলিত। 'এতে হি সর্ব্বে কুরবঃ' এ স্থলে দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।

'রুরুদুঃ সুস্বনং সর্ব্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন্ ভৃশংবর।' এ স্থলে কুরু ও কৌরব একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ "মধ্যে কুরূণাং ধর্ম্মনিবদ্ধমার্গং গৌর্গৌরিতি স্মাহ্বয়ন্ মুক্তলজ্জঃ। ১৯-৭৭ সভাপর্ব্ব।

এ স্থলেও কুরূনাং অর্থে কৌরবগণ মধ্যে।

ইহৈবৈতামানয় প্রাতিকামিন্ প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রুবন্তু। ২৩-৬৭, সভাপর্ব্ব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, প্রাতিকামিন্, এইখানেই উহাকে (দ্রৌপদীকে) আনয়ন কর, কৌরবরা প্রত্যক্ষে উহার প্রশ্নের উত্তর করুন। এই স্থানে কুরব ও কৌরব একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ……

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্॥

৪০-৬৭, সভাপর্ব্ব।

সমুদয় কৌরব যখন সভামধ্যে অবলীলাক্রমে স্বধর্ম্ম-সীমা উল্লঙ্ঘিত হইতেছে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভরতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্র-ধর্ম্মজ্ঞদিগেরও চরিত্র দূষিত হইয়াছে। এ স্থলেও কুরব ও কৌরব এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"মৃষ্যন্তি কুরবশ্চেমে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্।"

৭-৬৯, সভাপর্ব্ব।

দেখিয়াও সহ্য করিয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ—

"তথাহি কুরবঃ সর্ব্বে লোভমোহপরায়ণাঃ।"

১৭-৬৯, সভাপর্ব্ব।

যখন সকল কৌরবই লোভ-মোহপরতন্ত্র হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কুরব ও কৌরব এই দুইটি শব্দ কবি একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইটি যে একই কথা, তাহা বুঝা কঠিন নহে। স্বার্থে তদ্ধিত, এ বিষয়ানুসারে কুরব কথা সাধিত হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিশম্পায়ন, বৈশম্পায়ন, দ্বীপায়ন, দ্বৈপায়ন একই কথা। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুরু, কুরব ও কৌরব এ তিনই এক কথা। কু এবং রব লইয়া গঠিত হইয়াছে, এ রব আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাবণের রব, মহাভারতে রব সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না, ইহা কু—রব, মন্দ অথবা দুষ্টরব। সেই দুষ্টরব হইল এক পক্ষে, ও অপর পক্ষে হইল ধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ বেদপন্থা-সেবী পাণ্ডবগণ। কৌরবরা অর্থাৎ কুরবকারীরা যে ধর্ম্মের বিপক্ষে, সে সম্বন্ধে বিদুর এক স্থলে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন। যখন সভামধ্যে এইরূপ কাণ্ড হইতেছিল, তখন বিদুর বলিলেন—

"পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ
তদ্বুধ্যধ্বং পার্থিবাঃ প্রাতিপেয়াঃ।
"দৈবেরিতো নূনময়ং পুরস্তাৎ
পরোঽনয়ো-ভরতেষুদপাদি॥"

১৬-৭১, সভাপর্ব্ব।

তখন বিদুর বলিলেন, হে প্রতীপবংশীয় পার্থিবগণ এই দেখুন ভীমসেন হইতে মহাভয় উপস্থিত, অতএব আপনারা ইহা নিশ্চয় বোধগম্য করুন, ভারতগণমধ্যে এই যে পরম অনয় উৎপন্ন হইল, তাহা দৈবই অগ্রে প্রেরণ করিলেন। সভাতে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও অপর কৌরবগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদুর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন প্রাতিপেয়া, এক পক্ষে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ প্রতীপবংশীয়। কিন্তু প্রতীপ কথার অপর অর্থ প্রতিকূল, কু—রব ও প্রতিকূলবাদী এই দুই কথার মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরের উদ্ধৃত শ্লোকে আরও দুইটি কথার প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। উপরে ভরত কথা, ভরতবংশীয়গণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অনয় কথা, আমার মনে হয়, ন্যায়দর্শনের সহিত এই অনয় কথার সম্বন্ধ আছে।

মহাভারতে অন্ততঃ এক শত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে এই রব কথার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পরে কতকগুলির উদাহরণ দিব। এ স্থলে দুই একটা শ্লোক হইতে রব কথার প্রকৃত তাৎপর্য্যের কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। সভাস্থলে গান্ধারী বলিলেন—

"ব্যনদজ্জাতমাত্রো হি গোমায়ুরিব ভারত।
অন্তো নূনং কুলস্যাস্য কুরবস্তন্নিবোধত॥"

৩-৭৫, সভাপর্ব্ব।

এই কুলপাংশন পুত্র জন্মিবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকট-স্বরে যখন চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন এ অবশ্যই এই কুলের ধ্বংসকারী হইবে। বাস্তবিকই দুর্য্যোধন জন্মিবা-মাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল।

"স জাতমাত্র এবাথ ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ।
রাসভারাবসদৃশং রুরাব চ ননাদ চ॥
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ॥"

২৮-১১৫, আদিপর্ব্ব।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল। আবার যখন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হইতেছিল—

ততো রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য গেহে
গোমায়ুরুচ্চৈর্ব্যাহরদগ্নিহোত্রে।

তং রাসভাঃ প্রত্যভাষন্ত রাজন্
সমন্ততঃ পক্ষিণশ্চৈব রৌদ্রাঃ ॥”

২২-৭১, সভাপর্ব্ব।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে একটা গোমায়ু অগ্নিহোত্রগৃহে উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং গর্দ্দভ ও বিকটাকার পক্ষী সকল সেই রবের প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। এই শ্লোকটি যে রহস্যপূর্ণ, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সকল কাণ্ড ঘটিল ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে, অর্থাৎ যজ্ঞগৃহে। পক্ষী কথায় দ্বিজ অর্থাৎ কোন প্রকার ব্রাহ্মণদিগের ইঙ্গিত আইসে। গোমায়ু ও রাসভ এই দুইটি কথা কেবল নিন্দাবাচক কিংবা ইহাদের মধ্যে অন্য প্রকার অর্থ আছে কি না, তাহা বলা যায় না।

দ্রৌপদী বেদের যজ্ঞ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের অভিমানিনী দেবতা, সে বিষয়ে কবি একটি সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার ফলে যখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী সভা ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুঃশাসন ভীমকে উপহাস করিয়া গবি গবি বলিয়া চারিদিকে নৃত্য করিতেছিল।

“এবং ব্রুবাণমজিনৈর্ব্বিবাসিতং,
দুঃশাসনস্তং পরিনৃত্যতি স্ম।
মধ্যে কুরূণাং ধর্ম্মনিবদ্ধমার্গং,
গোগৌরিতি স্মাহ্বয়ন্ মুক্তলজ্জঃ ॥”

১৯-৭৭, সভাপর্ব্ব।

অজিনবাসিত বৃকোদর ধর্ম্মানুরোধে বৈরনির্য্যাতনের পথবদ্ধ থাকায় কেবল বাক্য দ্বারা এই প্রকার ভৎর্সনা করিতেছেন, এমন সময় দুঃশাসন তাঁহাকে “ওরে গরু, ওরে গরু” এইরূপ আহ্বান করত নির্লজ্জ হইয়া কুরুগণমধ্যে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

এ শ্লোকের রহস্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল, অতএব তাহারা পশু সদৃশ, এই কারণে তাহারা গরু। দ্বিতীয়, তাহারা বিচারে পরাজিত হইল, অতএব তাহারা বুদ্ধিতে গরু সদৃশ। তৃতীয়, গো অর্থে বেদ, পাণ্ডবরা বৈদিক মত অনুসরণকারী অতএব দুঃশাসন অর্থাৎ (কুশাস্ত্র) বেদ উদ্দেশ করিয়া গবি গবি বলিয়া শ্লেষ উপহাস করিতেছে, তাহা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদীর যখন লাঞ্ছনা হইতেছিল, তখন

“ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে।”

২২-৮১, সভাপর্ব্ব।

দ্রৌপদীর অবমাননায় ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইলেন। যজ্ঞের অবমাননায় ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে, দ্রৌপদীর পিতা হইলেন দ্বিজগণের আশ্রয় দ্রুপদ।

বিপদে পড়িয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন, এ বিলাপটি যেমন করুণরসাত্মক, তেমনই ভাবপূর্ণ।

“কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।”

৪২-৬৮, সভাপর্ব্ব।

কৌরবরূপ (অবৈদিক) সাগরে আমি (যজ্ঞকাণ্ড) নষ্ট হইলাম, হে জনার্দ্দন, আমাকে উদ্ধার করুন।

সে সময়ে দেশে অবৈদিক মতের যে খরস্রোত বহিতেছিল, সে সম্বন্ধে কবি স্থানান্তরে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদুর দৌত্যকার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন ফিরিতেছেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার দ্বারা হস্তিনাপুরের সকলকে অভিবাদন পাঠাইতেছেন।

“অশ্রোত্রিয়া যে চ বসন্তি বৃদ্ধা, মনস্বিনঃ শীলবলোপপন্নাঃ।
আশংসন্তোঽস্মাকমনুস্মরন্তো, যথাশক্তি ধর্ম্মমাত্রাশ্চরন্তঃ ॥”

১০-৩০, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

মনস্বী ও শীলবলসম্পন্ন যে সমস্ত বৃদ্ধ বেদাধ্যয়নবিরহিত হইয়াও যথাশক্তি ধর্ম্মাংশের আচরণ করত অবস্থান করেন এবং আমাদের অভ্যুদয় আশংসা ও অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিও।

এ সময়ে দেশে বেদের অবস্থা বুঝিতে এ শ্লোকটি বিশেষ উপযোগী. তখন ব্রাহ্মণরাও বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

দ্রৌপদী যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা, আর পাণ্ডবরা বেদ অথবা পরমাত্মসেবী। সে সম্বন্ধে কবি এক স্থানে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন।

“যথা চ বেদান্ সাবিত্রী যাজ্ঞসেনী তথা পতীন্।
ন জহৌ ধর্ম্মতঃ পার্থান্ মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥”

৫-৮১, বনপর্ব্ব।

যে প্রকার সূর্য্যপ্রভা সুমেরুকে ও সাবিত্রী বেদ

সকলকে পরিত্যাগ করেন না, সেই প্রকার যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবপতিদিগকে ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাগ করেন না।

এতক্ষণ দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, পাণ্ডবদিগের পরাজয়, এই সকল বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আবছায়ার মত যেন দেখিতে পাইলাম যে, ইহা সাধারণ পাশা-খেলা নয়, এ সভাস্থল হইল ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের স্থান। কি লইয়া বিচার হইল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন, তবে বেদের যজ্ঞকাণ্ড, ঈশ্বরবাদ, বৈদিক পন্থা এই সকল বিষয় লইয়া যে বিচার চলিতেছিল এবং বৈদিক মত, অন্ততঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এ বিচারে পরাজিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন দেখা যাক্, ইহার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক রহস্য আছে কি না? কাশী কথা হইতে মনে হয় যেন, সে সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু সংবাদ পাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দ্যূত আরম্ভ হইলে যুধিষ্ঠির একে একে তাঁহার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যরত্ন ছিল, তাহা হারিলেন। উপরে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

"কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্‌দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।"

'কাশিরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন' এ স্থলে কাশিরাজ কথার প্রয়োগে মনে একটু চিন্তা হয়; চিন্তা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। কাশী কথার অর্থ বর্ত্তমান বারাণসী হইতে পারে। আবার যজ্ঞ দ্বারা উপলক্ষিত কাশী নামে স্থান হইতে পারে।

যখন যুধিষ্ঠির পণের পর পণে হারিতেছিলেন, তখন প্রতিবারই শকুনি বলিতেছে – এই আমার জয় হইল।

"ইত্যেবংবাদিনং পার্থং প্রহসন্নিব সৌবলঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥"

১৮-৩১, সভাপর্ব্ব।

কিন্তু যখন দ্রৌপদীকে হারিলেন, তখন কবি জিত কাশী কথা ব্যবহার করিলেন।

"সৌবলস্ত্বভিধায়ৈবং জিতকাশী মদোৎকটঃ।
জিতমিত্যেব তানক্ষান্ পুনরেবান্বপদ্যত ॥"

৪৫-৬৫, সভাপর্ব্ব।

জয়াভিমানী মদোদ্ধত সুবলতনয় 'এই ত জিতিলাম' এই বলিয়া সেই অক্ষ সকল পুনরায় গ্রহণ করিল। টীকাকার জিতকাশী অর্থে জয়শোভী করিয়াছেন।

টীকাকার দীপ্তি পায় অর্থে কাশ্ ধাতু হইতে কাশী কথা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাশী কথার যে অন্য অর্থ হয়, তাহা সহজেই বলা যায়। স্থানান্তরে লিখিত আছে :—

"ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥"

১-২৮৬, বনপর্ব্ব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইয়া দেখিল, সেই সমর-বিজয়ী কপি-সৈন্য অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে।

এ স্থলে অনুবাদক জিতকাশী শব্দের অর্থে সমরবিজয়ী করিয়াছেন ও টীকাকার দৃঢ়মুষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ করিতে টীকাকারকে বৈদিক ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

আরও এক স্থলে জিতকাশী কথার উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ শাল্ব অসুরকে বিনাশ করিতে যাইতেছিলেন,—

"প্রয়াতোঽস্মি নরব্যাঘ্র বলেন মহতা বৃতঃ।
ক্লপ্তেন চতুরঙ্গেন যুক্তেন জিতকাশিনা ॥"

১৭-১০, বনপর্ব্ব।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, সংযত কাশীদেশজয়ী প্রসিদ্ধ নিয়মিত চতুরঙ্গযুক্ত মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলাম।

এ স্থলে অনুবাদক জিতকাশী শব্দের অর্থ কাশীজয়ী ও টীকাকার জয়শোভী এই দুই অর্থ করিয়াছেন।

জিতকাশিনা—জয়শোভিনা, কিন্তু তিনি আরও এক অর্থ দিতেছেন। 'জিতাঃ কাশয়ো দেশবিশেষা যেনেতি বা' অর্থাৎ কাশীদেশজয়ী।

এই যে নানা স্থানে কাশী কথার উল্লেখ হইল, ইহা কি স্বনামখ্যাত কাশীদেশ অথবা এই কাশী কথার পশ্চাতে কোন প্রকার রহস্য আছে?

আমাদের ইতিহাসে কাশী হইল বৈদিকধর্ম্মের কেন্দ্র-স্থল। পরে দেখিব, প্রধানতঃ কাশীর জন্য বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে। আর একখানি গ্রন্থের সাহায্য লইলে বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা করিতে কাশীর স্থান কিছু বুঝিতে পারা যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক মহাভারত লিখিবার অনেক পরে লিখিত হয়, উহার অভিনয়স্থান হইল কাশী।

উহা কোন্ সময়ের কাশী, গ্রন্থমধ্যে তাহারও কোন পরিচয় নাই। তথাপি হিন্দুধর্ম্ম-জগতে কাশীর কি স্থান, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। নিম্নে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে কিয়দংশ মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধৃত অংশ অতি দীর্ঘ হইলেও উহা পড়িবার বিশেষ উপযুক্ত। যে মহাবিপদ হইতে বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে, সে মহাবিপদ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না বলিলেও চলে, অথচ আমাদের দেশের বর্ত্তমান ইতিহাস সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের ফল। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা দেশের প্রকৃত ইতিহাস কিছু বুঝিতে পারিব এবং ইহা বুঝিলে দেশমধ্যে কি প্রকার বিপ্লব চলিতেছিল, তাহারও কিছু ইঙ্গিত পাইব ও সেই সঙ্গে মহাভারত যে কি প্রকার গ্রন্থ, তাহারও প্রকৃত পরিচয় পাইব।

দম্ভ।—

"অস্য পৃথিব্যাং পরমং মুক্তিক্ষেত্রং বারাণসী নাম নগরী তত্রবাস্তত্র গত্বা চতুর্ণামপ্যাশ্রমানাং নিঃশ্রেয়সবিঘ্নায় প্রযততামিতি। তদিদানীং বশীকৃতভূয়িষ্ঠা ময়া বারাণসী নাম নগরী,সম্পাদিত-নির্দ্দিষ্টশ্চ স্বামিনো যথা নির্দ্দেশঃ,তথাহি মদধিষ্ঠিতৈরিদানীম্—

বেশ্যাবেশ্মসু সীধুগন্ধিললনাবক্ত্রাসবামোদিতৈ-
র্নীত্বা নির্ভরমন্মথোৎসবরসৈরুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্ব্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি
ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবা ধূর্ত্তৈর্জ্জগদ্ বঞ্চ্যতে॥"

২য় অঙ্ক প্রবোধচন্দ্রোদয়।

দম্ভ বলিতেছে—"পৃথিবীর সকল তীর্থের উৎকৃষ্ট মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী নগরীতে গমন করিয়া ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর মুক্তিবিঘ্নের নিমিত্ত যত্ন কর। আমি মহারাজের আজ্ঞা অনুসারে বারাণসীতে আগমন করিয়া এই নগরী বিশিষ্টরূপে শাসিত করিয়াছি। আমার শাসিত জনগণ এখন ধূর্ত্ততা আশ্রয় করিয়া রজনীযোগে বেশ্যালয়ে মদ্যপানে মত্ত ও নিরন্তর বারাঙ্গনা-সেবনে উন্মত্ত থাকিয়া সমস্ত রজনী যাপন করিয়া দিবাভাগে আমরা সর্ব্বজ্ঞ, আমরা দীক্ষিত, আমরা চির-অগ্নিহোত্রী, আমরা তপস্বী, আমরা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া জগৎকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে।"

তাহার পরই অহঙ্কার কাশীতে প্রবেশ করিয়া বলিতেছে।

অহং। অহো! মূর্খবহুলং জগৎ। তথা হি—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো! ন সালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নৈব মহোদধেরধিগতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃ-পশুভিঃ সুস্থৈঃ কথং স্থীয়তে॥

(বিলোক্য) এতে তাবদর্থাবধারণবিধুরাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব। (পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ ভিক্ষামাত্রার্থং গৃহীতযতিব্রতা মুণ্ডিতমুণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বেদান্তশাস্ত্রং ব্যাকুলয়ন্তি। (বিহস্য)

প্রত্যক্ষাদি-প্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥

তদেতৈঃ সহ বাঙ্মিশ্রণমপি গুরুতরদুরিতোদয়ায়। (পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ শৈবপাশুপতাদয়ো দুরভ্যস্তাক্ষপাদমতাঃ পশবঃ পাষণ্ডা এবামীষাং সন্দর্শনাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি, তদেতে দর্শনপথাদ্দূরং পরিহরণীয়াঃ।

(পুনরন্যতো গত্বা)

এতে চ

গঙ্গাতীরতরঙ্গসঙ্গতশিলা বিন্যস্তভাস্বদ্‌বৃষী-
সংবিষ্টাঃ কুশমুষ্টিমণ্ডিতমহাদণ্ডাঃ করণ্ডোজ্জ্বলাঃ।
পর্য্যায়গ্রথিতাক্ষসূত্রবলয়প্রত্যেকবীজগ্রহ-
ব্যগ্রাগ্রাঙ্গুলয়ো হরন্তি ধনিনাং বিত্তান্যহো দাম্ভিকাঃ॥

(পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ ত্রিদণ্ডোপজীবিনো দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা ভ্রান্তা এব। (পুনরন্যতো গত্বা) অয়ে! কস্যেদং দ্বারোপান্ত-নিখাতাতি-প্রাংশুবংশকাণ্ডতাণ্ডবিত-ধৌতসিত-সূক্ষ্মাম্বর-সহস্রমিতস্ততো বিন্যস্তকৃষ্ণাজিন-দৃশদুপল-চমসোদূখল-মুষলমনবরত--হুতাজ্যাগ্নিধূম--শ্যামলিত--গগন-মণ্ডলমমরসরিতো নাতিদূরে বিভাত্যাশ্রমপদম্। নূনমিদং কস্যাপি গৃহমেধিনো গৃহং ভবিষ্যতি। তদ্ভবতু যুক্তমিদমস্মাকমতিপবিত্রমেতদ্দ্বিত্রিদিবসনিবাসায় স্থানম্।

(ইতি প্রবেশং নাটয়তি)

(বিলোক্য) অয়ে!

মৃদ্‌বিন্দুলাঞ্ছিত-ললাটভুজোদরোরঃ-
কণ্ঠৌষ্ঠপৃষ্ঠ-চিবুকোরু-কপোল-জানুঃ।

চূড়াগ্র কর্ণকটিপাণি-বিরাজমান-দর্ভাঙ্কুর
স্ফুরিত মূর্ত্ত ইবৈষ দম্ভঃ॥
তদ্ভবতূপসর্পামি তাবদেনম্।

অহঙ্কার। কি আশ্চর্য্য। জগতের প্রায় সকল লোকই মূর্খ। যে হেতু, এই নরদেহধারী পশুরা গুরু প্রভাকর মীমাংসকের মত শ্রবণ করে নাই। তুতাত ভট্ট-কৃত ন্যায়দর্শন জানে না, বাচস্পতি-বাক্যের তাৎপর্য্যজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, সালিক নামক গ্রন্থকারের বাক্যের তত্ত্বও অবগত নহে; মহোদধি নামক দর্শন জানে না, যজ্ঞ-মীমাংসা দেখে নাই। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে বস্তুর তত্ত্বনিরূপণ হইতে পারে না; অতএব ইহারা কিরূপে সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতেছে, বলিতে পারি না। (এক দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সে সকল কেবল অধ্যয়নমাত্র, শাস্ত্রের অর্থাবধারণ করিতেছে না, বেদের বিপ্লব ঘটাইতেছে। অর্থোপার্জ্জন করিবে বলিয়াই ঐরূপ করিতেছে। (স্থানান্তরে গমন করিয়া) অরে! ইহারা ভিক্ষালাভের নিমিত্ত যতিব্রত ধারণ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ও আপনাদিগকে জ্ঞানী জ্ঞান করিয়া বেদান্তশাস্ত্রকে ব্যাকুলিত করিতেছে। (হাস্য করিয়া) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রমাণ দ্বারা যাহার জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহার বিপরীতার্থবাদী বেদান্ত যদি শাস্ত্রপদবাচ্য, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের অপরাধ কি? কেন আমরা তাহাকে নাস্তিক গ্রন্থ বলিয়া নিন্দা করি? সে যাহা হউক, উহাদের সহিত বাক্যালাপেও গুরু পাপের স্পর্শ হয়। অতএব এ স্থানে না থাকাই মঙ্গল। (অন্যত্র গমন করিয়া) এই শৈব-পাশুপতাদি পশুরা অক্ষপাদের মত কষ্টেসৃষ্টে অভ্যাস করিয়া পাষণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মুখাবলোকনে লোক নিরয়গামী হয়। অতএব ইহাদের দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করাই উচিত। (স্থানান্তরে গমন করিয়া। ওহে! ইহাদিগকে যে নিতান্ত দাম্ভিক দেখিতেছি, দিবাভাগে প্রতিগ্রহ দ্বারা, রাত্রিতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনিগণের ধন হরণ করাই ইহাদের নিত্যব্রত। ইঁহারা যে গঙ্গাতীরে তরঙ্গ-সঙ্গত শিলাতলে কুশাসন পাতিয়া উপবিষ্ট আছেন, ইঁহাদিগের দণ্ড যে কুশমুষ্টি দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, ইঁহাদের সম্মুখে যে সুন্দর কমণ্ডলু বিদ্যমান আছে, ইঁহারা যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপমালার বীজগুলি এক একটি করিয়া স্পর্শ করিতেছেন, সে কেবল ধার্ম্মিকতার ভাণ ও ধন হরণের সদুপায়। (অন্য স্থানে গমন করিয়া) ইহারা ত নিতান্ত ভ্রান্ত, যজ্ঞসূত্রমাত্র ইহাদিগের জীবনোপায়, ইহারা দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ওহে! ঐ গঙ্গার অনতিদূরে ও কাহার আশ্রম? বোধ হয়, উহা কোনও গৃহস্থের গৃহ হইবে। কারণ, উহার দ্বারদেশে প্রোথিত অত্যুচ্চ বংশদণ্ডে সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল আন্দোলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে উপবেশনার্থ মৃগচর্ম্ম, শিলা ও প্রস্তর সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে, চমস, উদুখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে, অগ্নিতে অনবরত আজ্যাহুতি প্রদান করায় তাহার ধূমে গগনমণ্ডল শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; অতএব ঐ পবিত্র স্থানে দুই তিন দিবস অবস্থিতি করা বিধেয়। (অবলোকন করিয়া) ওহে! ইনি কে? ইঁহাকে যে মূর্ত্তিমান্ দম্ভের মত দেখিতেছি। ইঁহার ললাট, বাহু, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, চিবুক, উরু, গণ্ড ও জানু মৃত্তিকাতিলকে এবং কেশাগ্র, কর্ণচ্ছিদ্র, কটিদেশ ও হস্ত কুশাঙ্কুরে শোভিত হইয়াছে। তাহা হউক, ইঁহার নিকটে ত যাই।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে উপরের দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হইল। লেখককে আধুনিক বলিলে বলা যায়। নাটকমধ্যে তুরস্ক দেশ নামের উল্লেখ আছে। দম্ভের পিতামহ অহঙ্কারের বাস লেখক দক্ষিণরাঢ়ে ভাগীরথীতীরে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অভিনয়স্থল হইল বারাণসী। এ স্থলে বলা প্রয়োজন, কাশী হইল দেশ, বারাণসী হইল পুরী বা নগর। কোন্ সময় লক্ষ্য করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক-প্রণেতা বারাণসী পুরীর এই চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত লইয়া দেশমধ্যে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল এবং বারাণসী এই বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল। দার্শনিক মতগুলি যে কেবল বিচারের বিষয় ছিল, তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাঁহাদের ভিতর ভিন্ন সম্প্রদায়ও গঠিত হইয়াছিল, চতুরাশ্রম তখনও প্রচলিত ছিল, গৃহস্থ-আশ্রম যজ্ঞপ্রধান ছিল; তবে নানা

সম্প্রদায় সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল। দেশমধ্যে দার্শনিক মত লইয়া, সম্প্রদায় লইয়া, ধর্ম্মপন্থা লইয়া, যজ্ঞ লইয়া, আশ্রম লইয়া আত্মবিচ্ছেদের অসংখ্য পন্থা গঠিত হইতেছিল। মহাভারতের সময়ে দেশের অবস্থা বুঝিবার সময়ে এই ভাবই দেখিতে পাইব।

উপরে লিখিয়াছি, মতবিরোধ ও ধর্ম্মবিরোধের কাশী ছিল প্রধান রঙ্গভূমি; তাহা হইলে আমরা এখন বুঝিতে পারি, যখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন, তখন কবি শকুনিকে কেন জিত-কাশী বলিলেন। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ চিরদিন যজ্ঞের নিন্দা করিত। ধর্ম্মের পুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা দ্রৌপদীকে হারিলেন অর্থাৎ বেদের যজ্ঞকাণ্ডসমর্থনকারীদিগের হার হইল, ইহা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের বিশেষ উল্লাসের বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুশ-কাশ-উপলক্ষিত যজ্ঞ ও কাশী ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞকাণ্ডের পরাজয় ও কাশীজয় একই কথা।

মার্কণ্ডেয় কুম্ভকর্ণের নিজ পুর হইতে যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিতে বলিয়াছিলেন, সমরবিজয়ী কপি-সৈন্য। এ স্থলে জিতকাশী অর্থে অনুবাদক সমরবিজয়ী করিয়াছেন। এইরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না; জিতকাশী অর্থে কাশীজয়ী হইতে পারে, সমর কথার স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশী অর্থে যদি কাশী দেশ করা যায়, তাহা হইলেও কতকটা অর্থ হয়; কিন্তু বানরেরা কখন কাশী দেশ জয় করিয়াছিল, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। বলা বাহুল্য, কপি অর্থে বানর নয়, এই কথার অর্থ ধর্ম্ম। তাহা হইলে এ স্থলে আমরা বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত পাই; ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার যেন একটু আভাস আইসে। টীকাকার জিতকাশী অর্থে দৃঢ়মুষ্টি করিয়াছেন। উপরে দেখিয়াছি, এইরূপ করিতে তিনি বৈদিক যাস্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কেন এরূপ করিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ, তিনি 'কাশয়ো দেশবিশেষা' নিজেই লিখিয়াছেন। যে দিন কুম্ভকর্ণ ঐ ভাবে অভিযান করিতেছিল, সেই দিন যুদ্ধে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিহত করেন। অর্থাৎ বেদরূপ অস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ও তাঁহার সহায় ধর্ম্ম কৌশিকী শ্রুতিকে অর্থাৎ নাস্তিক মতকে খণ্ডন করে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শাল্ব অসুরকে বিনাশ করিতে যাইতেছিলেন, তখনও তিনি কাশীদেশজয়ী প্রবল সেনার সহিত যাত্রা করেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্য কাশী জয় করিয়াছিল অর্থাৎ কাশীতে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ স্থাপিত অথবা বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের রথের একটি অশ্বের নাম ছিল শৈব্য, আর একটির নাম ছিল সুগ্রীব। প্রথম নামটির সহিত শিব কথার সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সুগ্রীব কথায় রাবণের দশ গ্রীবা ও কু-রব এই উভয়েরই সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কাশীজয় কি প্রকার, কবি আর এক স্থলে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

> "অয়ং কপাটেন জঘান পাণ্ড্যং তথা কলিঙ্গান্ দন্তকূরে মমর্দ্দ।
> অনেন দগ্ধা বর্ষপূগান্ বিনাথা বারাণসী নগরী সংবভূব ॥"
>
> ৭৬-৪৮, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

ইনি বক্ষস্তটের আঘাত দ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত এবং দন্তকূর-সমরে কলিঙ্গদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। ইঁহা কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া বারাণসী নগরী বহু বর্ষ পর্য্যন্ত রাজশূন্যা ছিল।

এ স্থলে বারাণসী নগরী দগ্ধ ও রাজশূন্যা হইয়াছিল। দগ্ধ কথার অর্থ পরে দেখিব, কথাগুলির সহজ অর্থ কাশীতে বৈদিক মত স্থাপিত হইয়াছিল ও তথা হইতে ক্ষাত্র অর্থাৎ বৌদ্ধমত দূরীকৃত হইয়াছিল।

এখন জিতকাশী শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা হইতে নিরস্ত হওয়া যাক্। পাণ্ডবদিগের হার হইল, দ্রৌপদী দাসী হইলেন। কবি শকুনিকে জিতকাশী বলিলেন; ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল, আবার আর এক দিন আসিবে, যখন পাণ্ডবরা জিতকাশী হইবে। সে কথা পরে দেখিব।

আর একটি কথা অবশিষ্ট রহিল; দুর্য্যোধন কল্পনার মূল কি? দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির এই উভয় শব্দই যুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই যুধ্ কথার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বে যুদ্ধার্থাঃ শব্দাঃ যজ্ঞার্থাশ্চ ইতি যাস্কঃ। সকল যুদ্ধার্থ শব্দ যজ্ঞার্থক। ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধে দোষ বা হীনতার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুর্য্যোধন কল্পনার কি মূল? সে সম্বন্ধে কবি পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়াছেন। যখন দুর্য্যোধনের জন্ম হইল, তখনই

চতুর্দ্দিকে কু—রব ধ্বনি শব্দিত হইল; শ্লোকটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

"স জাতমাত্র এবাথ ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ।"

২৭-১১৫, আদিপর্ব্ব।

"রাসভারাবসদৃশং রুরাব চ ননাদ চ।
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ॥"

২৮-১১৫, আদিপর্ব্ব।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল।

এ স্থলে তাঁহার জন্মের সহিত কু-রবের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া গেল, কি প্রকার কু-রব, তাহারও ইঙ্গিত শীঘ্রই পাইব।

উরু ভগ্ন হইয়া কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন পড়িয়া আছেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সকলেই নিহত হইয়াছেন; আত্মীয়, স্বজন, মিত্র, সুহৃৎ সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে, ভগিনীপতি জয়দ্রথ, নিজপুত্র লক্ষ্মণ হত হইয়াছে। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে; একাকী অসহায় অবস্থায় তখন দুর্য্যোধন ভগ্ন-উরু হইয়া কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন, এ অবস্থায় সঞ্জয়ের নিকট বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড়্ বাগ্বিশারদঃ।
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোহপচিতিং মম॥"

৩৮-৬৪, শল্যপর্ব্ব।

বাক্যবিশারদ পরিব্রাট্ চার্ব্বাক যদি আমার এ অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈরনির্য্যাতন করিবেন।

দুর্য্যোধন কল্পনার সম্বন্ধে আলোচনা পুনরায় পরে করিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)।

উড়িষ্যার বঙ্গবিজয়

বাঙ্গালী, কি কর্‌ছ ব'সে—হয়ে এমন বুদ্ধিহারা ?
বাঙ্গালা দেশ যে ক'ল্লে বিজয় 'রঘুয়া' ও 'নিধিয়া'রা !
পাণ-ওয়ালা বল্‌ছে এবার পাণের ক্রেতা ভোক্তারে—
"দিব বল কোন্ সে পাণে —সাদা কিংবা দোক্তারে ?"
'গুণ্ডি'র ছিল মৌরসি বাস 'দাসো'দিগের বটুয়াতে
জর্দ্দা এবং স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তিবদল পটু হাতে।
দোক্তা বিনা হয় না রুচি পাণ-বিলাসীর তাম্বূলে,
উড়ের ধরণ কর্‌লে বরণ বাংলা দেশের নাম ভুলে !
গ্রীবা এবং জুল্পি হ'তে ক'ল্লে সাবাড় চুলগুলি,
সজ্জা এবার 'টেরিকাটা' ঝুঁটিওলা বুল্‌বুলি !
উৎকলীদের 'চটা' আজি বিড়িরূপে সুপ্রচার,
হুকা এবং আলবোলাদের বনেদি মান রয় না আর।
ভাত না পেয়ে খাচ্ছি 'পখাল' উদর-জ্বালা নিবন্ধন—
তিন্তিড়ী ও লঙ্কাযোগে—উড়ের যাত্রা চিরন্তন !
রান্নাঘরের লক্ষ্মীর আসন উড়ে 'ব্রহ্ম' কর্‌লে দখল ;
পাণের পিক আর সর্দ্দি ঘাম নাচার হয়ে গিল্‌ছি সকল !
জলও দিচ্ছে উড়ে বাহক—অন্ন-জলের ভাণ্ডারী গো !
তীর্থযাত্রার পাণ্ডারূপে ভবার্ণবের কাণ্ডারী গো !
মালঞ্চে সে ফুলের মালিক,—প্রিয়ায় আনে স্কন্ধে বহি ;—
দুল্‌কি তালে পাল্কী চলে বিরহিপ্রাণ ছন্দে মোহি' !
উড়ে মুটে বটুয়া এঁটে কোমরেতে মোটটি তোলে,
বঙ্গের যোয়ান টেরি কেটে, মুচকি হাসে ঠোঁঠটি খোলে।
'বাঙ্গালী জাত মার্‌ছে' ব'লে জগন্নাথে ডাকৃত যা'রা,—
বাঙ্গালীদের 'বাঙ্গালীত্ব' রাখল না আর আস্ত তা'রা !
উড়ে বস্‌লো বাংলা যুড়ে ;—কর্‌ছি ফাঁকা তর্ক খালি !
ভাত জাত দু-ই নিচ্ছে কেড়ে – কোথায় আছ রক্ষ কালী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

ভুল বোঝা

প্রায় সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে রঙ্গের খেলা একরকম শেষ হইয়া আসিয়াছে; কেবল তাহারই একটু ক্ষীণ আভা দূর দিগন্তে ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা-বাতাস পরপারে শালের বনে ঝুরু-ঝুরু ফুল ঝরাইয়া, পাতা কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদিক্ শান্ত নীরব। কেবল কয়েকটা পাখীর অশ্রান্ত কলকাকলীর সঙ্গে দূর কুলী-ধাওড়া হইতে একটা বাঁশীর মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

মণিয়া নদীর জলে গা ধুইতে আসিয়াছিল। পাথরের কোল ঘেঁসিয়া ছোট নদীটির ক্ষীণ স্রোতোধারা যেখান দিয়া কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দে নাচিয়া যায়, সেইখানটায় গা মুক্ত করিয়া দিয়া সে নদীর শীতল জলে কোমর অবধি ডুবাইয়া বসিয়া ছিল; জল লইয়া খেলা করিতেছিল,—পাথরের উপর ছিটাইতেছিল, কখনও বা নিজের গায়ে ছড়াইতেছিল। প্রকৃতি-মায়ের স্নেহদুলালী সে, প্রকৃতিরাণী নিজের মেয়েটিরই মত সযত্নে তাহার সুচিক্কণ দেহলতাকে যৌবনের প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছিলেন, কোথায়ও তিলমাত্র বঞ্চিত করেন নাই। গায়ের রং কালো হইলেও, পরিপূর্ণ যৌবনশ্রীতে তাহার সমস্ত দেহখানি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নিটোল মুখখানি এক অপরূপ লাবণ্যশ্রীতে সর্ব্বদাই ভরিয়া থাকিত, কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটি হইতে হাসিরাশি যেন সব সময়েই ঠিক্‌রাইয়া পড়িত। বাস্তবিক মণিয়াকে তাহার অটুট স্বাস্থ্য, নিটোল গড়ন, সর্ব্বোপরি তাহার স্ফুট যৌবনশ্রীর উপর তরুণী নারীর কোমলতাটুকুতে সুনিপুণ শিল্পীর হাতে ক্ষোদাই করা কাল পাথরের মূর্ত্তিটিরই মত সুন্দর শোভন দেখাইত। তাহার দেহের প্রতি ভঙ্গীতে এমন একটা মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত যে, সবাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত।

মণিয়া আন্‌মনে বসিয়া বাঁশী শুনিতেছিল। সে বাঁশীর সুর যে তাহার চির-পরিচিত। নানকু এতক্ষণে বাড়ী আসিয়াছে, তাহার পথ চাহিয়া আছে,—দেরী দেখিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। মণিয়া তাড়াতাড়ি গা-মাজা শেষ করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বাঁশী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবার সে নিজেই আপন মনে বাঁশীর শেষ তানটুকু ধরিয়া গুণ গুণ করিতে আরম্ভ করিল। সে নিজেকে লইয়াই এমন তন্ময় হইয়াছিল যে, পাশের উঁচু পাথরের আড়াল হইতে যে আর এক গোড়া তরুণ চোখের তীব্র লুব্ধ দৃষ্টি ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহের প্রতি চাহিয়া আছে, সে তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। মণিয়া অসঙ্কোচে গা-মাজা শেষ করিতে লাগিল। গা ধুইয়া সে সবেমাত্র উঠি উঠি করিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে মৃদুকণ্ঠে কে ডাকিল, "মণিয়া!"—মণিয়া প্রথমটা চকিতা হইয়া উঠিয়াছিল, ত্রস্তে নগ্ন বুকের উপর বসন টানিয়া দিতে দিতে বিস্মিতভাবে বলিল, 'ছোটকু!'—পরক্ষণেই তাহার লোলুপ-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া রাগ দেখাইয়া বলিল, "তুই হেথাকে কেনে রে?"

ছোট্‌কু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, কোনও উত্তর দিল না। মণিয়া আরও চটিয়া গেল; আর কোন কথা না বলিয়া, পাশের জলভরা কলসীটাকে কাঁখে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। সে চলিয়া যায় দেখিয়া ছোট্‌কু আবার ডাক দিল। মণিয়া ঘুরিয়া বলিল, "কেনে রে?—ঝট্ বল্, আমার এখন রিণন্‌তে হবেক।"

ছোট্‌কু একটু চুপ থাকিয়া বলিল,—"আমি কোথাকে গিছলাম জানিস্?"

মণিয়া কুতূহলী হইয়া বলিল, "না—আমি কেমন ক'রে জানব রে?"

'ঐ হোথাকে, ওই পারে।' -ছোট্‌কু দূরের পাহাড়টার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিল।

মণিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিল, "অত্ত ধূরে!—কেনে?"

তাহাকে বিস্মিতা হইতে দেখিয়া ছোট্‌কু মনে মনে আনন্দ বোধ করিতেছিল; একটু হাসিয়া বলিল, "কেনে

কি রে ? টাকা আন্‌তে হবেক না? এত্ত টাকা লিয়ে এসেছি।"—ছোট্‌কু দুই হাত অঞ্জলি করিয়া দেখাইল।

মণিয়া কালো চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বলিল, 'এত্তো !—কি হবেক রে ?"

"তোকে দেবো, তু লিবি ?"

মণিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "খুব ত ! তোর টাকা আমি লিতে যাব কেনে রে ?"

"লিবি না ?"

"না।"—ছোটকুর আরও কিছু তখন বলিবার ছিল, কিন্তু মণিয়ার দৃঢ়স্বরের কাছে চুপ করিয়া গেল। মণিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল; ছোটকুর মুখে কোন রা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "লে, কিছু থাকে ত ঝট্ বল্, বড় জাড় লাগছেক।"

ছোটকু এবার মুখ তুলিয়া করুণ-দৃষ্টিতে চাহিল। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "মণিয়া ! চল্ না আমরা পালাই যাই।"

মণিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিল, "আ মর্ ! তোর সাথে কোথাকে ভাগব রে ! নানক্ নাই না কি ?"

"চল্ না, ওই সুন্দর গাঁকে পালাই যাই। তোর আর আমার বিঁয়া হবে, লিয়ে দু গোটা আরাম সে থাকব। আমি বহুৎ টাকা লিয়ে দেবো।"—একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "মণিয়া ! তু আমার ঘর কর্‌বি না গে ?" তাহার কালো মুখের করুণ দৃষ্টি আশা-নিরাশায় ভরিয়া উঠিল।

মণিয়া চটিতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোর লাজ লাগছে নাই রে ? নানক্ শুন্‌লে তোর জান্ লিয়ে লিবেক, খবরদার !"

ছোটকু ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আনিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "তু বল্ না, আমি নানকুকে সাবড়ে দিই।"

মণিয়ার নিটোল মুখখানি এবার রাগে লাল হইয়া উঠিল, চোখ হইতে আগুন ছুটাইয়া বলিল, "তোর মুখে আমি লাথাই দিই, জানিস্ ? জানের ডর থাকে ত ফের বলিস্ নাই—হুঁ !"

"কি ! আমাকে ডর দেখলাচ্ছিস ?—আমার সাথকে হারামজাদ্‌গি !" ছোটকু মণিয়াকে ধরিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। পলক ফেলিতে না ফেলিতে মণিয়াও সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছোটকু ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মণিয়ার রাগ কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ছোটকুকে ভিজা গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে দেখিয়া আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না, বিদ্যুদ্‌গতিতে, কলসী কাঁখেই উঁচু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ছোটক্ রাগে ফুলিতেছিল; তাহার দুই একটি ক্রুদ্ধ স্বর মণিয়ার কানে আসিল। –'দেখে লিব তোকে আর নানকুকে—হুঁ !' মণিয়া আর কিছু শুনিতে পাইল না।

কিছু দূর আসিয়া মণিয়া আবার সহজ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল, কাঁখের কলসীটা মাথায় তুলিয়া লইয়া কাপড়টা ঠিক করিয়া লইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া শুক্লা চতুর্দ্দশীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ ভরিয়া উঠিয়াছে। আশে-পাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা, দূরে খাদের বড় বড় চিমনিগুলি সমস্ত সাদা হইয়া উঠিয়া রজতধারায় ঝলমল্ করিতেছে, চারিদিকে মায়াপুরীর মত বোধ হইতেছে। নানক্ আবার বাঁশী বাজাইতেছিল, বাঁশীর সুরে সুরে মণিয়ারও বুকখানি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। একটা পুলকচাঞ্চল্যে সমস্ত দেহমন অধীর করিয়া লইয়া সে-ও গায়িতে গায়িতে চলিল,—

"চাঁদ করে ঝিকির-মিকির সুরয করে আলা,
কোন্ বনেতে বাঁশী বাজে ডাকে আমায় কালা রে,
ডাকে আমায় কালা ॥"

মণিয়া গান গাহিতেছিল বটে, কিন্তু অন্য দিনের মত আজ কিছুতেই তাহার মনের সহজ সরল অবস্থা ফিরাইয়া পাইল না। ধাওড়ার কাছে আসিয়া আরও গম্ভীর হইয়া পড়িল। নানকু ঘরের দাওয়ায় একটা খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল; বাঁশী নামাইয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, "মণিয়া !"

"হুঁ"—

"এত দেরী হ'ল কেনে রে ?"

মণিয়া কোন উত্তর দিল না। বারান্দার কোণে, উনানে কয়লার আগুন গন্‌গন্ করিতেছিল; তাহারই পাশে ঘড়াটা রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল, তাহার পর বাহিরে আসিয়া একটা ছোট্ট হাঁড়ি ধুইতে ধুইতে বলিল, "আগটা গন্‌গন্ করছে, ডালটা চাঁপাই দিস্ নাই কেনে ?"

নানকু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোর হাঁথের না হ'লে মিঠ্ লাগে না গে !"

মণিয়া ডাল চড়াইতেছিল, ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি চাপিতে চাপিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্—দেখিস্ রে।—"

নানকু হাসিতে লাগিল। স্বামীর সোহাগে মণিয়ারও সমস্ত অন্তরখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবুও কেন জানি সে সহজে স্বামীর হাস্যে যোগ দিতে পারিতেছিল না, ডালটা চাপাইয়া নীরবে বাটনা বাটিতে লাগিল। নানকু একটু বিস্মিত হইল,—"মণিয়া আজ এমন কেন ?"—মণিয়া বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল, চাঁদের শুভ্র কিরণ তাহার নাকে, মুখে, হাতে, চাঁদির তাগা বাজু, খোঁপা-বাঁধা কালো চুলের উপর পড়িয়া চিক চিক্ করিতেছিল,—নানক্ কোন কথা না বলিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মণিয়া হাতের কাযটুকু সারিয়া রান্না করিতে লাগিল, নানকু চুপ করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুই জনে খাটিয়ার উপর বসিয়াছিল। মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র সহস্রধারায় সুধা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে অসীম সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছিল, চাঁদের হাসিতে চারিদিক্ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। মণিয়া ভাবিতেছিল, বিকালের কথাটা নানকুকে বলিবে কি না। সে যে রকম মানুষ, হয় ত ক্ষেপিয়াই যাইবে। তাহাকে তুচ্ছ একটা অপমানের কথা হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, মণিয়া তাহা ভালরূপেই জানিত। তাহাকে চুপ দেখিয়া নানকুই আগে কথা কহিল, তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "মণিয়া, আজ তু এমন কেনে রে ?"—মণিয়া কিছু বলিতেও পারিতেছিল না, অথচ, একটা অমূলক আশঙ্কার ছায়া যেন তাহাকে বার বার চাপিয়া ধরিতেছিল ; অকারণে চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিতেছিল। নানক্ এবার তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, -একটু বিস্মিত হইল। ব্যথিত হইয়া হাতটা টানিয়া বলিল, "কানছিস্ কেনে গে ?"—নানকুর আদরে মণিয়ার নিটোল গালের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িয়া মুক্তাবিন্দুর মত চক্ চক্ করিতে লাগিল। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "আমার বড় ডর লাগছেক।"

নানকু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ডর কিসের গে ?"

"তোর কাছকে কেউ যদি আমায় ছিনে লিয়ে যায় !"

নানকু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই যত্ন-পালিত ক্ষুদ্র কপোত-শিশুটির মত মণিয়াকে তাহার কালো বুকের উপর টানিয়া লইয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিতে করিতে বলিল, "কে লিবেক রে পাগ্‌লী, ত্যর জানের ডর নাই ?"

মণিয়া অনেকক্ষণ পরে বড় আরাম অনুভব করিতেছিল, নানকুর বুকে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। স্বামীর আদরে তাহার চোখের কোণের সঞ্চিত অশ্রুকণাগুলি টপ্ টপ্ ঝরিয়া পড়িতেছিল। নানকু তাহার কালো খোঁপায় গোঁজা ফুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল। দুই জনে সেই ভাবেই বসিয়া ছিল ; ধাওড়া হইতে কোন এক শিশুর কাতর ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, মণিয়া আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুর ঐ ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে সে দিনকার আর একটি কচি মুখের কথা মনে করাইয়া দিতেছিল। সে-ও অমনি কাঁদিত, কাছে গেলেই কচি দুই হাতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিত, কান্না থামাইয়া ছোট মুখখানি তাহার বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিত। অতটুক্ শিশু দুই জনের মাঝে কতটা আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল কত দিন এমনই রাতে তাহারা বসিয়া থাকিত, ক্ষুদ্র শিশুটি তাহাদের দুই জনের মাঝে খেলা করিত, একবার নানকুর কোলে, একবার মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কখনও বা কৌতুকদৃষ্টি তুলিয়া দুই জনের পানে চাহিত, অকারণে মধুর হাসিয়া উঠিত,—সেই সঙ্গে মণিয়ারও সমস্ত অন্তরখানি এক অপূর্ব্ব মাতৃ-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত। শিশু শ্রান্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলে মণিয়া তাহাকে গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিত, শিশুটি বুকের দুধ খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু আজ ?—আজ সে কোথায় ? তাহার বেদনাতুর মাতৃহৃদয়ের উন্মুখ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্য সে ত আর চাহিয়া থাকে না ! সে যে চিরকালের জন্য ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। মণিয়ার বুক ঠেলিয়া কান্না বাহির হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঐ ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাহার

বুকের উপর চাপিয়া ধরে, সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া ঘুম পাড়াইয়া আইসে।

মণিয়া কেন কাঁদিতেছিল, নানকুর তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। তাহারও বুকখানি ফুলিয়া উঠিতেছিল ;—একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নানকু গভীর সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "পাগ্‌লী, মহাদেওজীর ফুল, লিয়ে গেছেন। তু কি তাকে রাখতে পারতিস্ গে ?"

এ সান্ত্বনার বাণী মণিয়া অনেক দিন শুনিয়াছে। কিন্তু, ব্যথাতুর মাতৃ-হৃদয় কি ইহাতে কখনও বাধা মানে ?—মণিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সকালে আহারের পর নানকু খাদে নামিয়া গিয়াছে. সেই সন্ধ্যায় উঠিয়া আসিবে। মণিয়ার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল, কি একটা বিপদের ছায়া যেন তাহাদের চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। অথচ, এ কথাটা সে নানকুকেও বলিতে পারিতেছিল না। ভয় হইতেছিল, নানকু যে রকম মানুষ, —হয় ত বিপদটা এ দিক্ দিয়াই আসিয়া পড়িবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। মণিয়া তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল ; শেষে কি ভাবিয়া উঠিয়া পড়িল। দূরের বড় বড় চিম্‌নীগুলা হইতে ধুঁয়া উঠিয়া চারিদিক কালো করিয়া তুলিতেছিল, মাঝে মাঝে খাদের ঘড়-ঘড় আওয়াজও কানে আসিয়া ঢুকিতেছিল ; মণিয়া ধাওড়ার সামনের লালমাটীর পথটা ধরিয়া চলিতে সুরু করিল, কিছু দূর গিয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর ঘুরিয়া রাস্তায় উঠিয়া 'সাহেবের' বাংলার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

বাংলায় আসিয়া মণিয়া দেখিল, 'সাহেব' তখনও ফেরে নাই। বারান্দার মেঝেতে পড়িয়া বৃদ্ধা আয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, আর তাহারই পাশে ছোট্ট একটি দোল্‌নায় কচি-কচি গোল-গাল হাত-পাগুলি ছড়াইয়া সাহেবের সদ্য মাতৃহারা শিশুকন্যাটি ঘুমাইয়া আছে—যেন জড় করা এক রাশ বেলের কুঁড়ি। যেমন রং, তেমনই নিটোল গড়ন ; কোঁকড়ানো রেশমী চুলের মাঝে কচি মুখখানি পাতার কোলে চাঁপাফুলটির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। ঘুমের ঘোরে ক্ষুদ্র বুকখানি কাঁপিতেছে, কখনও আরক্ত ঠোঁট দুইটি নড়িয়া উঠিতেছে। মণিয়া অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল ; কচি-কচি হাত-পা লইয়া নিজের গালে-মুখে ঠেকাইতে লাগিল, আঙ্গুরের মত কচি গাল দুইটি টিপিয়া টমাটোর মত রাঙ্গা করিয়া তুলিল। ঘুমন্ত শিশু হাতের নাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল ; নীল-নীল চোখ মেলিয়া মধুর হাসিয়া উঠিল, দুই হাতে মণিয়ার কালো আঙ্গুল জড়াইয়া ধরিল। মণিয়া এবার তাহার সন্তানহারা বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি উন্মুক্ত ধারায় ঢালিয়া দিল ; সযত্নে দোল্‌না হইতে তুলিয়া লইয়া, শিশুকে নিবিড় স্নেহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় তাহার সমস্ত নাক-মুখ অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। অবোধ শিশু সুযোগ পাইয়া কচি হাতের দুই মুঠা ভরিয়া মাই খাইতে সুরু করিয়া দিয়াছিল ; শিশুকে বুকে চাপিয়া মণিয়ার দুই গাল বহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ হইবে ঠিক খেয়াল নাই, ক্ষুদ্র শিশু মাই খাইতে খাইতে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ; মণিয়া সযত্নে তাহাকে দোল্‌নায় শোয়াইয়া দিল, কচি গালে ছোট আর একটি চুমু খাইল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, সিঁড়ির উপর একটা ফুলের টবের পাশে দাঁড়াইয়া বড় সাহেব ; ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ছায়া সুপরিস্ফুট। সাহেবের বিস্ময়-দৃষ্টির সাম্‌নে মণিয়ার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া সে মুখ নত করিল। মণিয়াকে মুখ তুলিতে দেখিয়াই সাহেব নিজের কামরায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, ঘরের খোলা জানালাটা দিয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞাতসারে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু আসিয়া চোখের কোণে টল্-টল্ করিতে লাগিল। আহা ! মাতৃহারা ছোট শিশুটি ; এমন প্রাণঢালা অনাবিল স্নেহ ত কখনও পায় নাই। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল। মণিয়া দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "সাহেব !" সাহেব মুখ ঘুরাইতেই চোখে-মুখে জলের রেখা দেখিয়া বিস্মিত, ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া মণিয়া বলিল, "সাহেব. তুঁ কানছিস্ ?" একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "তোর কাছকে আমার একটা নালিশ আছে, কা'ল বিকালকে ছোটক্ আমায় বড় দিক্ করেছেক্।"

সাহেবের সমস্ত মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে চুপ দেখিয়া মণিয়া আবার বলিল, "ছোটকুকে চিনিস্ নাই? পাঁচ নম্বরের খালাসীর বড় বেটাটা—"

Bloody, Bugger! সাহেব নিজের মনেই গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া রাগে নিজের ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। মণিয়ার ভারি হাসি পাইতেছিল, খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাহেব অপ্রস্তুত হইয়া নিজেকে দমন করিতে করিতে বলিল, "আচ্ছা, তুই যা।" মণিয়া আর অপেক্ষা করিল না; একবার ঘুমন্ত শিশুটির কচি মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। সাহেব তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "তু এখানকে থাক্‌বি?"

মণিয়া দৃষ্টিতে মৃদু ভৎসনার রেখা আনিয়া বলিল. "তোর এখানকে থাক্‌তে যাব কেনে রে? লোকে গাল দিবেক্ না?"

"এখানকে কাম করবি।"

"না, আমার আদ্‌মী আমায় কাম কর্‌তে দিবেক্ না।" মণিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। এই অশিক্ষিতা কুলী-বালিকার সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে সাহেব যতটা বিস্মিত, ততোধিক মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মণিয়ারও অন্তরখানি আজ এক অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ণ বুকখানি যেন একটা প্রকাণ্ড তৃপ্তির নিশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল.—যেন কি একটা হারানো জিনিষ সে আজ খুঁজিয়া পাইয়াছে। গেট পার হইয়া বাগানের বেড়া হইতে সে কতকগুলি ফুল ছিঁড়িল, কতক মাথায় গুঁজিল, কতক রাস্তায় ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। কিছু দূর আসিয়া আবার মাঠে নামিয়া পড়িল। সাম্‌নেই একটা আমগাছ অজস্র মুকুলে ভরিয়া উঠিয়া চারিদিকে মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছিল। তাহারই উঁচু ডালে বসিয়া, একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছিল; মণিয়া দুই তিনবার তাহার স্বরের অনুকরণ করিল, শেষে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিয়া নিজেই গাহিতে গাহিতে চলিল, "বিদেশী ভাইয়া, হামার বিদেশী ভাইয়া!"—গানের সুরে সুরে, তাহার যৌবন-পুষ্পিত দেহখানি লীলায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পথ চলিতে চলিতে মণিয়া হঠাৎ দেখিল. ছোটক্ একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। গান বন্ধ করিয়া সে পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, ছোটকু পথ আগ্‌লাইয়া বলিল, "বড় সাহেবের বাংলাকে গেইছিলি কেনে রে?"

মণিয়া তীব্রদৃষ্টি হানিয়া বলিল, "পথ ছাড়্—হামার খুসী।"

ছোটকুর মুখে কুৎসিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, মণিয়ার ওষ্ঠাধর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, ছোটকু খপ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। মিনতির স্বরে বলিল, "হাঁ গে, আমার সাথকে যাবি নাই!" মণিয়া এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "খবরদার!"

ছোটকু এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, গর্জ্জন করিতে করিতে শাসাইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমিও নানকুকে জানাই দিব।" মণিয়া সে কথায় কান দিল না, হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। খানিক দূর আসিয়া ধাওড়ার পথ ধরিল।

সন্ধ্যার সময় নানকু খাদ হইতে উঠিতেছিল; দেখিল, খাদের মুখে দাঁড়াইয়া ছোটকু। এমন অসময়ে তাহাকে সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া নানকু জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকে?"

"তোরই কাছকে।"

"আমার কাছকে! কেনে?"

"একটা বাত আছে"—ছোটকু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নানকুর ভাল বোধ হইতেছিল না। ছোটকুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাত আছে - কি?"

"তু বিশ্বাস করবি নাই।"

"তু বল্ না।"

ছোটকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মণিয়া আজ সাহেবের বাংলাকে গেইছিল।"

নানকু বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "বাংলাকে, কেনে?"

"উয়াকেই শুধাগে না!" ছোটকুর মুখে আবার সেই

কুৎসিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, রাগে নানকুর কালো মুখখানি তামার মত লাল হইয়া উঠিল। ছোটকু কি বলিতে যাইতেছিল, নাকের কাছে ঘুসী তুলিয়া নানকু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার!"

"আমি কি ঝুট বল্‌ছি?"

"চোপ্! জান্ লিয়ে লিবো"—নানকুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। ছোটকুর আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকিবার ভরসা হইতেছিল না, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

রাত্রিতে চাঁদের আলোকে মণিয়া ও নানকু দুই জনে বসিয়া ছিল; মণিয়া নানকুর গলা জড়াইয়া আব্দারের সুরে বলিল, "কা'ল তোর রাত পইলে, আমায় খাদকে লিয়ে যাবি নানকু?" নানকু বিস্মিত হইল, এমন আব্দার ত সে কখনও করে না। হঠাৎ বলিল, "আজ তু সাহেবের বাংলাকে গিছ্‌লি?" মণিয়া হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল, গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কে কহলেক্ রে?"

"কে আর—তোর মাথাকে ফুল গোঁজা আছে নাই?" মণিয়া আশ্বস্তা হইল। ভয় হইতেছিল, ছোটকু হয় ত কি বলিয়া দিয়াছে। চোখ তুলিয়া দেখিল, নানকুর দৃষ্টিতে কোন সন্দেহের ছায়া আছে কি না। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "ঐ ফুল লান্‌তেই রে।" নানকু আর কোন প্রশ্ন করিল না, মণিয়ার ঐ কৈফিয়তই যথেষ্ট। ঘর হইতে বাঁশীটা বাহির করিয়া নানকু বাজাইতে সুরু করিল। মণিয়া বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ রে! আমায় খাদ্‌কে লিয়ে যাবি না?" নানকু সে কথায় কোন কানই দিল না। মণিয়া দুই তিনবার বলিল, শেষে অভিমান করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

এক, দুই, তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসের মধ্যে নানকুর অমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহটা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সকলে বলে, "ভূত লাগিয়াছে।" মণিয়া কত ভূত-পূজা দিল, মহাদেওজীর পায়ে ফুল দিল, কিন্তু কৈ, কিছুই ত হইল না। এ দিকে মণিয়ার হাতের পুঁজি ফুরাইয়া গেল, শেষে একে একে গলার হাসলী, হাতের তাগা, বাজু বিক্রয় করিল। তাহার পর ধার ছাড়া আর অন্য উপায় রহিল না। কিন্তু, তাই বা লোক কয় দিন দিবে? আজ সারাদিন সে উপবাসী, যা কিছু ছিল, ও বেলায় রুগ্ন নানকুর মুখে দিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কা'ল? নিজে না হয় উপবাসী থাকিতে পারে, কিন্তু পীড়িত নানকু, তাহার মুখে কি তুলিয়া দিবে? মণিয়ার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নানকু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আজ তু রাঁধবি না গে?"

"না!"

"কেনে?"

"খুসী।"

নানকুর বুঝিতে বাকী রহিল না, শুধু একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হায়! এমন দিন ত তাহাদের ছিল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; মণিয়া উঠিয়া বলিল, "ঘরকে চল্ নানকু, বড় জাড় লাগছেক্।" নানকু আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। মণিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, নানকু হাতটা টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ-স্বরে বলিল, "বিহ্‌নে কি হবেক্, মণিয়া?" মণিয়ার কিছু বলিবার ছিল না, চুপ করিয়া রহিল। সে যেন কি ভাবিতেছিল। নানকু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "কা'ল আমি খাদ্‌কে যাব।"

"হুঁ।"

মণিয়ার মুখে রা না পাইয়া নানকু একটু বিস্মিত হইল, মুখ তুলিয়া বলিল, "কি ভাবছিস্ গে?"

"কিছুই লয়। তু একটু নিদ্ যা ত, কা'ল দেখে লিব।" নানকু চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

নিঝুম রাত। নানকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মণিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। হঠাৎ কিসের একটা মৃদু আওয়াজ হইতেই মণিয়ার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কান খাড়া করিয়া রহিল; দেখিল, নানকু ঘুমাইতেছে কি না। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল ছোটকু,—তাহার মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। ছোটকু মণিয়াকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক ত?"

"হুঁ।"

"তবে ?"

"চল্"—একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "কৈ—যা বলেছিলি !" ছোটক্ কোমর হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া মণিয়ার হাতে দিল, "এই লে, তিন কুড়ি আছে। এবারকে চল্।" ছোটকুর আর দেরী সহিতেছিল না।

'একটু সবুর,—একটুক্ !" মণিয়া আবার নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল, অতি সন্তর্পণে দেখিল, নানক্ ঘুমাইতেছে কি না। কম্পিত হস্তে টাকাগুলি নানকুর শিয়রের কাছে রাখিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল; সঙ্গে সঙ্গে একটা কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের প্রত্যেক পঞ্জরকে মোচড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।—'না—আর না !' – ঘুমের ঘোরে নানক্ একবার নড়িয়া উঠিয়াছিল; মণিয়া উৎকর্ণভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, তার পর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পা দুইটা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল,—একটা দুর্জ্জয় রোদনবেগ উচ্ছ্বসিত বুকটাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই মণিয়া অন্ধকারে নামিয়া পড়িল। বাহিরে ছোটকু অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, মণিয়া আসিতেই তাহাকে লইয়া নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ভোরের দিকটায় কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নানক্ জাগিয়া উঠিয়াছিল; চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, মণিয়া ঘরে নাই। ভাবিল, বোধ হয়, বাহিরে গিয়াছে। নড়িয়া চড়িয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল শিয়রের কাছে টাকাগুলির দিকে। "এ কি! এতগুলি টাকা কিসের?" তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া টাকাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল —"তবে কি —না না, তা কখনই হইতে পারে না। মণিয়াকে কি সে চেনে না?—তবে?" যে সন্দেহটা তাহার মনের ভিতর বার বার উঁকি মারিতেছিল, সেটাকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, অথচ মনটা বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। বেলা যতই বাড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই সে অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। "কিন্তু কৈ, মণিয়া ত এখনও ফিরিল না।" তবুও সে তাহার সন্দেহটাকে কিছুতেই মনের ভিতর স্থান দিতে পারিল না; উৎকর্ণভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া হেমন সর্দ্দার। তাহার মুখে কিসের একটা ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মণিয়াকে লইয়াই এই হেমন সর্দ্দারের সহিত তাহার এক দিন মারামারি হইয়া গিয়াছিল। আজ সুযোগ পাইয়া সে তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছিল; বেশ করিয়া নানা রসে ভিজাইয়া, সে নিজে মণিয়াকে ছোটকুর সাথে পলাইতে দেখিয়াছে, এই খবর দিয়া গেল। তাহার প্রত্যেক কথাটি নানকুর বুকে যেন শূল বিঁধিতেছিল; সর্দ্দার চলিয়া গেলে সে একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া পড়িল। এও কি সত্য! মণিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, এ কথা তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে! না—না, অসম্ভব, এ অসম্ভব! কখনই হইতে পারে না। তাহাকে যে সে এতটুকু হইতে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। আজ না হয় সে রুগ্ন, কিন্তু তাহার এই বিশাল বুকটার আশ্রয় ছাড়া যে মণিয়া এক তিলও থাকে নাই, তবে আজ কি করিয়া সে বিশ্বাস করিবে? নানকু তাহার অন্তরের ভিতরটুকু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কৈ, মণিয়ার প্রতি তাহার অনাবিল স্নেহের ত কোথায়ও একটু কম্‌তি নাই। তবে? না, না—সে নিশ্চয়ই যায় নাই, কোথায় লুকাইয়া আছে। 'মণিয়া—দুলারী আয় গে!' বার বার উৎকর্ণভাবে কান খাড়া করিয়া রহিল। ওই বুঝি তার পায়ের শব্দ—ওই না?

পাঁচ মিনিট উৎকণ্ঠিতভাবে নানকু চুপ করিয়া রহিল। কোথায়? কেহ ত নয়! শেষে সে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিয়া, সবলে কান্না চাপিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলা নানকু শীর্ণ মুখে বসিয়া ছিল। সারা দিন সে ভাবিয়াছে, -"মণিয়া কেন এমন বেইমানী করিল?" টাকাগুলি সে রাখিয়া গিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য, কিন্তু সে ত তাহা চায় নাই। আজই ত সে কাযে যাইবে বলিয়াছিল। তবে? না না, কেন সে এমন ভুল করিল? নানকুর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে সে বসিয়া রহিল। তাহার বার বার কেবলই মনে পড়িতেছিল, সেই যৌবনের স্বপ্নময় তরুণ দিনগুলির কথা, সেই ছোট গ্রামখানি; পাথরের আড়ালে ঘন শালবনের ছায়ায় ছায়ায় সকলের অসাক্ষাতে চুরি করিয়া দুই তরুণ-তরুণীর গোপন মিলন;—কত স্তব্ধ দ্বিপ্রহর অনলস আলাপন, ছেলেখেলায় কাটান। নীরব বনানীর

অন্তরালে ঘুঘু পাখী করুণ সুরে কূজন করিয়া উঠিত,—মণিয়া তাহার অনুকরণ করিত। কখনও নানকু বাঁশীতে ফুঁ দিত; বাঁশীর সুর সমস্ত বন ছাপাইয়া দূর হইতে দূরে ভাসিয়া যাইত, সুরের রেশটুকু আবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসিত। কখনও সবুজ ঘাসের উপর দুই জনে মুখোমুখী বসিয়া থাকিত,—তরুণ বুক দুইটি কত সুখ-দুঃখ, হাসিখুসীর গল্পে জমিয়া উঠিত। মাথার উপর দিয়া টিয়া পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল, দুই জনে গণিবার চেষ্টা করিত, কখনও সমস্ত ভুলিয়া আশে-পাশে কাঠ-বিড়ালীগুলির ছুটাছুটি দেখিত। হঠাৎ একটু মৃদু আওয়াজ,—গাছের পাতাটুকু নড়িয়া উঠিল, দুই জনই চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইত,—"ওই বুঝি কেউ আসিয়া পড়িল!" পরক্ষণেই নিজেদের ভুল বুঝিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিত। বিদায়-বেলায়, দুই জনে একসঙ্গে খানিকটা পথ চলিয়া আসিত, নানকু পথের ধারের লতা হইতে রঙ্গীন ফুল তুলিয়া মণিয়ার খোঁপা সাজাইয়া দিত। শেষে, একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া,দুই জনে ঘন বনশ্রেণীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। তাহার পর এক দিন, এক উৎসবময় প্রাতে, চারিদিককার কলকোলাহলের মাঝে এক রঙ্গীন অবসরে দুই জনে পরস্পরকে একান্ত নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া লইয়াছিল। সেই হইতে, এত দিন পর্য্যন্ত দুই জনে একান্তভাবে আপনারই ছিল; তাহাদের এই কুলী জীবনের শত দুঃখ-সুখ, বাধা-বিঘ্ন.এক তিলের জন্যও তাহাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদের রেখা টানিয়া দিতে পারে নাই; কিন্তু আজ?—নানকুর সমস্ত বুকটা হু হু করিয়া উঠিল. একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। সে আর বসিতে পারিতেছিল না; আজ সারা দিন উপবাস;—ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

রবিবার। সকাল হইতেই নানকু জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই কয় দিন সে এক তিলও স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহার খালি বুকের বিরাট শূন্যতা যেন, তাহাকে অনবরত চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভোরবেলাতেই হেমন সর্দ্দার খবর দিয়া গিয়াছিল,—"আজ মণিয়ার সাধি!"—নানকু স্থিরভাবেই সে আঘাতটা সহ্য করিয়া লইল। একটু বেলা বাড়িতেই নানকু উঠিয়া পড়িল, তাহার মনে পড়িতেছিল সেই টাকাগুলির কথা। যেমন করিয়া হউক, মণিয়াকে তাহা ফিরাইয়া দিতেই হইবে। ব্যস্! তাহার পর সে নিশ্চিন্ত। ঘর হইতে তেল-খাওয়ানো পাকা বাঁশের লাঠিটা বাহির করিয়া লইয়া ঘরে তালা লাগাইল। তাহার পর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া যখন সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রায় অপরাহ্নের শেষ। তরঙ্গায়িত রূপালী মেঘের ধারে ধারে জরির আঁচল, ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরা, আর স্তিমিত অপরাহ্নের বিক্ষিপ্ত সিন্দুরটুকু তখন সমস্ত গ্রামখানার উপর একটা রঙ্গীন ছায়া ফেলিয়া নূতন নেশায় ভরিয়া তুলিয়াছিল। নানকু অনেক কষ্টে তাহার এই রুগ্ন শরীরটাকে এত দূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছিল, আর চলিতে পারিতেছিল না; অবসন্নভাবে একটা পাথরে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল। কত লোক পথ দিয়া চলিতেছিল;—সকলের মুখেই উৎসবের কথা। দূর—অনেক দূর হইতে চারিদিককার কল-কোলাহল, মাদলের আওয়াজের সঙ্গে কতকগুলি বাঁশীর সুর রণিয়া রণিয়া কানে আসিয়া ঢুকিতেছিল; নানকু আর শুনিতে পারিতেছিল না। ঐ না উৎসবের বাঁশী বাজিতেছে? হাঁ, ঐ ত উৎসবশেষের গান! না, না—ও বুঝি তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য কোন রক্তপিপাসু দানবের বিকট উল্লাস। আর ঐ বেলা-শেষের রক্তিম আভাটুকু? ও বুঝি তাহার রক্তিম চোখ। উঃ! ঐ,—ঐ যে উন্মত্ত লোকগুলির হাসি-গান, আনন্দের হুর্‌রা, মাদলের শব্দ, বাঁশীর সুর,—আর ঐ মাঝে মাঝে বিকট উল্লাস! ও বুঝি কোন ভীম সাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গ-গর্জ্জন আর তাহার সঙ্গে সেই সৃষ্টিশেষের ভৈরব প্রলয়োল্লাস। উঃ! কি ভীষণ! নানকু আর সহিতে পারিতেছিল না, চারিদিক্ হইতে মৃত্যুর করাল ছায়া বিরাট পাষাণস্তূপের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। উঃ! কি নির্ম্মম!—কঠিন, বড় কঠিন! নানকু অবসন্নভাবে এলাইয়া পড়িল। তখনও একটুখানি স্নিগ্ধতার রেশ নানকুর শ্রান্ত বুকখানিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ঐখানে সে, এত কাছে! মণিয়া—দুলারী—আয় গে!

উৎসব-আসরের মাঝে বধূবেশে মণিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ সে নাচগানের মধ্য হইতেও দূরাগত কাহার করুণ-স্বর শুনিতে পাইল,—সে স্বর যেন অতি পরিচিত, অতি আপনার। দুই হাতে উৎসবোন্মত্ত জনসঙ্ঘকে ঠেলিয়া দিয়া সে উন্মত্তের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিল, মুহূর্ত্তে পরিত্যক্ত অনাদৃত নানকুর ধূল্যবলুণ্ঠিত মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'নানকু! নানকু! দেখ, তোর মণিয়া এসেছে।'

ধীরে, অতি ধীরে মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট নয়ন দুইটি উন্মীলন করিয়া নানকু একবার শেষ উদ্যম করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'মণিয়া, এই তোর টাকা নে—আমারে না বলিয়ে এলি কেনে? তোরে ত ধরিয়ে রাখতেম না।'

নানকু হাঁপাইতে লাগিল। তাহার চোখের সম্মুখে বিরাট অন্ধকার ফুটিয়া উঠিল, কানে সে তখন কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না। ধীরে ধীরে তাহার শিথিল মাথাটি মৃত্যু-শ্রান্ত বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। মণিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে তাহার ক্লান্ত জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিল।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ।

বর্ষণান্তে

শ্রাবণের মেঘ-ঘন বৈকালে বৃষ্টি গিয়াছে থেমে,
অস্ত-রবির শেষ-আলোধারা ধরায় এসেছে নেমে,
রবির কনক-রেখা   প্রভাতে দেয় নি দেখা
দ্বিপ্রহর ছিল মগ্ন আজিকে সজল-জলদ-প্রেমে।

ঝুম-ঝুম আর ঝুপ ঝুপ ধ্বনি থেমেছে মেদিনী-বুকে,
ফিস্-ফিস্ কথা কহে বারিধারা ধরা সাথে চুপে-চুপে,
নবীন জলদ-দল   ঢেকেছে গগনতল
শুনি' গুরুধ্বনি শিখিনী সুখিনী—নাচিছে পুলক-সুখে।

বেণুর কুঞ্জে পাগলা বাতাস বাজায় বেণুর সুর,
সর্ সর্ আর মর্ মর্ ধ্বনি পরাণ করিছে পুর,
বরষা-পরশ-বশা   কেতকী বিবশ-দশা
কবরী এলায়ে পড়েছে,—সমীর-সৌরভে ভুর-ভুর।

মন পাখী উড়ে পলায়েছে ঐ হীরা-মতিময় দেশে,
কল্পনা মাথা নোয়ায়েছে আজ বাস্তব-কাছে এসে,
সবুজ পাতার কোলে   অশ্রু-মাণিক দোলে
সজ্জিত ওরে সারাটি বিশ্ব অপরূপ রাজবেশে।

সিক্ত তরুর সবুজ শোভায় গোধূলি ঢেলেছে ফাগ্,
অশ্রু-ধৌতা-তরুণী-বয়ানে সলাজ হাস্যরাগ,
বাদল-পরশ-ভরে   নীপের কেশর ঝরে
পবন হাঁকিছে মল্লিকা-বেল যুঁই তোরা ত্বরা জাগ্।

দেবদারু আর চম্পক গাছে জ্বলে হীরকের গুঁড়া,
দোদুল দোলার নেশায় মেতেছে মাধবী কৃষ্ণচূড়া,
বুঝি বা প্রহরী ভুলে   স্বরগের দ্বার খুলে
অমরার শোভা হেথা ঝরে এল—ওরে ধরাবাসী, কুড়া।

বাদলের পরে রৌদ্রের আভা—অশ্রুর শেষে হাসি,
অগ্নিকোণের নীলিমায় ঐ রামধনু এল ভাসি,
ধরাতে বায়ুতে মেঘে   গেছে এ কি রং লেগে
স্বপ্নপুরীর রঙিন নেশায় মাতাল কে এক আসি,
বিশ্ববাসীর মনেতে ঢালিল সোণালি রংয়ের রাশি।

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বেদ—বেদের অন্যতম অঙ্গ জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বেদের নির্ম্মল চক্ষুঃস্বরূপ।

"বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্।'

সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে কোন শাস্ত্রই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্র সাধারণতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা :—(১) সিদ্ধান্ত, (২) সংহিতা, (৩) হোরাশাস্ত্র। এই সকল বিভাগ আবার বহু শাখাপ্রশাখায় প্রশাখিত বা বিভক্ত। ভারতে অসংখ্য জ্যোতিষগ্রন্থ ছিল। কতক মুদ্রিত হইয়াছে, কতক বিলুপ্ত হইয়াছে এবং কতক প্রাচীন পণ্ডিতগণের গৃহে কীটদষ্টাবস্থায় পতিত আছে।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের নামান্তর গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy)। ইহা আবার ৩ ভাগে বিভক্ত :—সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও করণ। বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপভাবে জ্যোতিষের সমাবেশ হইয়াছে, যাহা জ্যোতিষানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "আদিত্য যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হয়েন। আদিত্য যত কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল পশ্চিমে উদিত ও পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েন। আদিত্য যত কাল পশ্চিমে উদিত ও পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হইয়া থাকেন। আদিত্য যত কাল উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল ঊর্দ্ধে উদিত ও অধঃ অস্তমিত হইয়া থাকেন।

অনন্তর এই স্থান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উদয়ের পর আর উদয়াস্ত ভোগ করিতে হয় না। এই স্থানে ক্রমিক উদয়াস্ত নাই।"

এই সকল বিষয় বলিয়া ঋষি বলিতেছেন,—"দেবতারা শ্রবণ করুন, আমি সত্য বাক্য বলিতেছি।" পূর্ব্বোক্ত উক্তিগুলি পাঠ করিলে অনেকে গাঁজাখুরি মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন অনুবাদকের কয়েকখানি ছান্দোগ্য দেখিলাম, কিন্তু কোনখানিতে ইহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়া থাকে, তাহা গণনা দ্বারা ঠিক করিতে পারেন, এরূপ গণিতজ্ঞ ব্যক্তি এক্ষণে ভারতে আছেন, কি না জানি না। যদি থাকেন এবং এই প্রবন্ধ যদি তাঁহার গোচরীভূত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ উদয়াস্তের স্থানগুলি গণনা-পন্থাসহ আমাদিগকে জানাইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব এবং কলিকাতা ১নং ক্রষ্টোফার রোডস্থ-এষ্ট্রো একাডেমি হইতে তাঁহার পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

সংহিতা জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ-সংহিতা বা রাষ্ট্র-জ্যোতিষ (Mundane Astrology)। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ গ্রন্থে গ্রহগণের সঞ্চারাদি দ্বারা দেশের সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ, সংগ্রামাদি এবং সকল প্রকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের শুভাশুভ ফল গণনার বিষয় প্রকটিত। বিবিধ বিষয়ের গণনার সংযোগ হেতু এই শাখার নাম সংহিতা হইয়াছে। স্বরশাস্ত্র, শাকুনশাস্ত্র, যাত্রা-বিবাহাদি কালনির্ণয়, মুহূর্ত্তশাস্ত্র এবং সামুদ্রিকশাস্ত্রে এই শাখার অন্তর্গত।

হোরাশাস্ত্র বা জাতক শাস্ত্র ঃ—(Astronomy)। এই শাস্ত্র দ্বারা জন্মসময়ের গ্রহসংস্থান দ্বারা মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ঃ—অষ্টাদশ ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ছিলেন :—(১) ব্রহ্মা, (সৃষ্টিকর্ত্তা আদি ব্রহ্মা নহেন, দেবদেবী ও ঋষিবংশাবলী ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) (২) সূর্য্য, (আকাশের সূর্য্য নহেন, সূর্য্য-নামধেয় জনৈক মহর্ষি), (৩) বশিষ্ঠ, (৪) অত্রি, (৫) মনু, (৬) পৌলস্ত্য, (৭) লোমশ, (৮) মরীচি, (৯) অঙ্গিরা, (১০) ব্যাস, (১১) নারদ, (১২) শৌনক, (১৩) ভৃগু, (১৪) চ্যবন, (১৫) যবন (গ্রীকজাতীয়), (১৬) গর্গ, (১৭) কশ্যপ, (১৮) পরাশর।

ইহা ভিন্ন সেকালের সমস্ত যোগী, মুনি ও ঋষিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থের সারাংশ ও ঐতিহাসিকাংশ ব্যতীত বিষয় সকল সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না।

ভারতের বাহিরে পরবর্ত্তী কালে টলেমি, সক্রেটিস্, এারিষ্টটল্, কেপ্লার, পারট্রিজ প্রভৃতি বহু ঋষিকল্প পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতও জ্যোতিষে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া অনেক জ্যোতিষিক সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে য়ুরোপ ও আমেরিকায় জ্যোতিষের প্রভূত উন্নতি ও আদর হইয়াছে। ভারতকে এক্ষণে ঐ সকল দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ বা যোগ জ্যোতিষ নামে পৃথগ্‌ভাবে আলোচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে একত্র অন্যান্য বিষয়ের সহিত ইহার আলোচনা আছে। আমরা এই প্রবন্ধে পৃথগ্‌ভাবে অধ্যাত্ম জ্যোতিষ নামে ইহার আলোচনা করিব।

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ ঃ—সমুদ্রবিশেষ জ্যোতিষের যে অংশ অধ্যয়ন করিলে অধ্যাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মবিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই অধ্যাত্ম জ্যোতিষ নামে অভিহিত। ইংরাজীতে Astrothelogy, Astrophilosophy, Astrofsychology যে অর্থ-ব্যঞ্জক, বাঙ্গালাতে অধ্যাত্ম-জোতিষ শব্দ সেই অর্থ-দ্যোতক। এই অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ শিক্ষার নিমিত্ত সিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষের প্রাথমিক জ্ঞান কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্বিত দ্বাদশরাশিবিশিষ্ট রাশিচক্র এবং ৯টি গ্রহ দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ পরমেশ্বরের ক্রীড়া চলিতেছে।

কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীব এই চক্রের

আবর্ত্তনে জন্মিতেছে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কুম্ভকারের একই কুলালচক্রে ছেলেদের খেলার দ্রব্য ছোট ছোট ভাঁড়, খুরি, কলসী হইতে বড় বড় হাঁড়ী, কলসী, জালা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, সেইরূপ রাশিচক্রে জগতের সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। সেই রাশিচক্রের মহিমা অদ্ভুত। সেই রাশিচক্রের নামান্তর বিশ্বচক্র, কালচক্র, দিব্যচক্র এবং বিষ্ণুহস্তস্থ সুদর্শনচক্র।

> "বিশ্বচক্রং কালচক্রং দিব্যচক্রং সুদর্শনম্।
> বিষ্ণুকরাম্বুজবাসমীড়ে তজ্জ্ঞানভূতম্॥"—বৃঃ পরাশর।

বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুহস্তে যে সুদর্শনচক্র দৃষ্ট হয়, তাহাই এই রাশিচক্র। বিষ্ণুরূপী ভগবান্ এই চক্র ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার নাম চক্রধর, চক্রপাণি এবং চক্রভৃৎ হইয়াছে। সূর্য্যের নামান্তর চক্রভৃৎ ও চক্রবন্ধু। সূর্য্য রাশিচক্রের কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া রাশিচক্র ধারণ করিয়া অবস্থিত। বিষ্ণুর পরমপদ বা আশ্রয়স্থান নভোমণ্ডলস্থ মার্ত্তণ্ডের মধ্যে। রাশিচক্রের মধ্যেই গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্ত বিশ্ব অবস্থিত। কল্পিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুহস্তে শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম ন্যস্ত হইয়াছে। বিষ্ণুর বা ব্রহ্মের কিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রবাহ চলিতেছে, তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে। বহু জন্ম যোগ-তপস্যা করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে যে জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি জন্মে, এক জন ভক্তিসহকারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও নিঃস্বার্থভাবে আলোচনা করিলে, সেই দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ আলোচনা করিতে হইলে নিম্নোক্ত জ্যোতিষিক সংজ্ঞা, সূত্র ও নামগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

প্রথম অধ্যায়—নক্ষত্রতত্ত্ব

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঃ—(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

এই সকল নক্ষত্রের নাম ও সংখ্যা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। নামের পরিবর্ত্তে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় ও হইবে। গগনমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র থাকিলেও প্রাচ্য জ্যোতিষে পুরাকাল হইতে জ্যোতিষগণনা-সৌকর্য্যার্থ উক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেরই প্রচলন আছে। ইহা ব্যতীত আর একটি নক্ষত্র আছে, তাহার নাম অভিজিৎ। তাহার সংখ্যা নাই, অর্থাৎ ০। উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার মধ্যে সেটিকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঐ নক্ষত্রগুলির গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

সত্ত্বগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—১,৫,৭,৮,১৩,১৫,১৭,২২ ও ২৭।
রজোগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—২,৪,৬,১১,১২,২০,২১,২৫ ও ২৬।
তমোগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—৩,৯,১০,১৪,১৬,১৮,১৯ ২৩ ও ২৪।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

"প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব"

(সমালোচনা)

গত মাঘ মাসের "বসুমতী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ-লেখক একটিও মৌলিক কথা বলিতে পারেন নাই; অধিকন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণের কতকগুলি ভুলের পুনরাবৃত্তিমাত্র। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বঙ্গলিপির প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"খৃষ্টের পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কথাটি আছে বটে, এবং বোধ হয়, ঐ পুস্তক হইতেই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ললিতবিস্তরে ইহার উল্লেখ আছে বটে; এই বিষয়ে আর কোনই প্রমাণ নাই। এই অবস্থায় একটিমাত্র উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচনাধীন। তদ্ব্যতীত গ্রন্থখানিকে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। বরং ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ হইতে উহা যদি প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে, তবে উক্ত লিপির প্রাচীনতা প্রমাণিত না হইয়া এই গ্রন্থখানিরই অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রমাণিত হইতেছে—এইরূপ মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই অবস্থায় ললিতবিস্তরের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গলিপিকে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

সম্রাট অশোকের সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশসমূহে খরোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন বা প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মী লিপি। কেবল তাহাই নহে, এই বঙ্গদেশেও প্রাচীনতম কাল হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মী লিপি হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রাহ্মী হইতে স্বতন্ত্র বঙ্গলিপির অবকাশ রহিল কোথায়?

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনের জন্য যে কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।" এ যুক্তিটি আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ভাষার উৎপত্তি আগে এবং সেই ভাষায় কবিতা রচিত হয় পরে, আমরা ইহাই জানিতাম। কিন্তু কবিতা হইতে ভাষার উৎপত্তি, ইহা নূতন কথা বটে!

প্রবন্ধলেখকের মতে গোরক্ষনাথ মীননাথের প্রধান শিষ্য, এবং গোরক্ষনাথ না কি "পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই কথাটি লিখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই মত প্রকাশ করিতে তিনি একমাত্র 'মীনচেতন' পুথিখানির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের পক্ষে দীনেশ বাবুর পুস্তক হইতে ইহা গ্রহণ করা অসম্ভব নহে; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায় মীননাথের শিষ্যের নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ এই মৎস্যেন্দ্রনাথেরই শিষ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথের অপর নাম মৎস্যান্ত্রাদ অথবা লুইপাদ। তিনি মাছের অন্ত্র (আঁতড়ী) খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় মৎস্যান্ত্রাদ। পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার বাড়ী ছিল বরিশালে, এবং তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, কেহ কেহ হয় ত নামের অর্থের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া মীননাথ ও

মৎস্যেন্দ্রনাথকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ; মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যক্তি। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা' হইতে জানা যায় যে,চৌদ্দ জন নাথ ছিলেন। ইহার একটি শ্লোক এই :—

"শ্রীআদিত্যনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ॥"

ইহা হইতে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'গোরখ্‌বোধ' নাথদের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা গোরক্ষপুর দরবার লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। ইহাতে মীননাথের অনেক কথা আছে, এবং তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য নহেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির ইহাই মত। *

বৌদ্ধগণের হাষিতী দেবী বলিয়া কোন দেবী ছিলেন কি না, তাহা আমাদের স্মরণ হয় না। তাঁহাদের হারিতী দেবী আমাদের শীতলাতে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের হারিতী দেবী ছাপার ভুলে হাষিতী দেবী হইয়া যাওয়াও খুব বিচিত্র নয়।

প্রবন্ধ-লেখকের মতে "রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে এই কথাই লিখিয়াছেন এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থান হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই বিষয়ে আমাদের দুইটি প্রশ্ন আছে :—প্রথমতঃ, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিতে তিনি কাহাকে বুঝেন ? দ্বিতীয়তঃ, রামাই পণ্ডিতকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ের লোক বলা হইল কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত মুখবন্ধে যে সব প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অমীমাংসিত এবং সন্দেহজনক। মহারাজ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপিতে আমরা দণ্ডভুক্তির এক ধর্ম্মপালের উল্লেখ পাইতেছি : তাহাতে আছে, রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। কিন্তু কি কারণে তাঁহাকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই ধর্ম্মপালকে মহীপালের কোন আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। †

"খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দচন্দ্র পাল বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন", এই তথ্য তিনি কোথায় সংগ্রহ করিলেন ? শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে'র ২৭ পৃষ্ঠায় ঠিক এই কথাটি আছে দেখিতে পাইতেছি। তিনি কি ঐ স্থান হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন ? বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে উক্ত নৃপতি পালরাজবংশীয় ; কিন্তু পালরাজবংশের মধ্যে ঐ প্রকার নাম আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। গোবিন্দপাল বলিয়া এক রাজা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (কাহারও কাহারও মতে তাহারও পরে) বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পালবংশীয় নরপতি বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেন। আবার মহারাজ রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয় শিলালিপিতে আমরা 'বঙ্গালদেশের' গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া এক নৃপতির উল্লেখ পাইতেছি। তিনি না কি এ চোলরাজের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পলায়ন করেন। মহারাজ রাজেন্দ্র চোল ১০২১ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরপথ আক্রমণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই দুই নরপতির নাম খিচুড়ি করিয়া এক অনৈতিহাসিক নাম উপস্থিত করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, উক্ত দুই নরপতির মধ্যে 'গোপীচন্দ্রের গানে' কে স্থান লাভ করিয়াছেন ? উত্তরে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছুই বলা চলে না, তবে নানা কারণে বঙ্গদেশের নৃপতিকেই উপলক্ষ করিয়া এই সব গান রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

শ্রীসুধীরা দেবী।

মহতের সম্মান

এ জগতে যে জাতি আপন জাতির মহতের সম্মান করিতে শিখিয়াছে, সেই জাতি যথার্থ আত্মসম্মানজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। সেই জাতিই যথার্থ দেশ ও দশের মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশান কলিকাতার শ্রেষ্ঠ রাজবর্ত্ম 'সেন্‌ট্রাল এভেনিউর' নাম 'চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে' পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া যথার্থই মহতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুহীন শবের শোভাযাত্রার দিনে যেমন অনুভূত হইয়াছিল, তেমনই আজ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অভাবে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুভূত হইতেছে। ত্যাগের আদর্শ এই বিরাট পুরুষের প্রতি কলিকাতাবাসী আজ শ্রদ্ধাপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকেই যে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা নহে, আপনারাও সম্মানিত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই নাম-পরিবর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেন্‌ট্রাল এভেনিউ নাম এত পরিচিত হইয়া গিয়াছে যে, উহার পরিবর্ত্তন বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন 'সেন্‌ট্রাল রোড' 'হ্যারিসন রোড' নামে পরিচিত হইয়াছিল, তখনও ত এমন ভাব কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আজ কয় জন 'সেন্‌ট্রাল রোডের' নাম মনে করিয়া রাখিয়াছেন ? 'হ্যারিসন রোড' নাম কি এখন কাহারও নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় ? তবে ? হ্যারিসন কি চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা বড় ছিলেন ? তবে চিত্তরঞ্জন নামে আপত্তি কিসের ? চিত্তরঞ্জন কলিকাতার প্রথম মেয়র—সেই মেয়রের কার্য্য তিনি কিরূপ গাম্ভীর্য্য, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। মাত্র এই হিসাবে তাঁহার নাম এইভাবে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ এই হিসাবেই শ্যামবাজারের পার্কের নাম চিত্তরঞ্জন পার্ক রাখা হইবার কথা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতার বস্তীর দরিদ্রগণের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য কর্পোরেশানের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। যে পুরুষপ্রবর চাঁদপুরে বিপন্ন দরিদ্র কুলীদের জন্য তরঙ্গভঙ্গভীষণা পদ্মার দুস্তর তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরণীবক্ষে পাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই, তিনি যে কলিকাতার দরিদ্র বিপন্ন আতুরের জন্য চিকিৎসা, সেবা, শিক্ষা ও বস্তীর উন্নতির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। এই দরিদ্র-বন্ধুর স্মৃতিসম্মানরক্ষার্থ কলিকাতাবাসী যদি তাঁহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে, তাহা হইলে কি তাহারা বিশেষ অপরাধে অপরাধী হয় ?

---

* প্রবাসী—১৩২৮, ফাল্গুন ও চৈত্র, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "নাথপন্থ" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 1919, Vol v, Part II. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Literary history of the Pala period প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৪৮ ও ২৪৯।

সার আশুতোষের অভাব

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কলিকাতার জনগণ পরলোকগত সার আশুতোষ সরস্বতীর স্মৃতি-পূজা করিয়াছিলেন। মহতের প্রতি—জাতির পুরুষ-ব্যাঘ্রের প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শনে বাঙ্গালী নিশ্চিতই গৌরবান্বিত ও ধন্য হইয়াছে। সার আশুতোষ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কত বড় শ্লাঘার জিনিষ ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কেবল বাঙ্গালীর কেন, সার আশুতোষের ন্যায় গভীর জ্ঞানী, পরম চরিত্রবান্, বিরাট স্বাধীনচেতা পুরুষ সকল দেশের সকল জাতিরই গৌরবের পদার্থ। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-প্রীতির অঞ্জলি দান করিলে কোনও দেশের কোনও জাতিরই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আজ বাঙ্গালার এই বিরাট পুরুষের অভাব বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিক দলাদলির অতীত বিচক্ষণ মেধাবী পুরুষের অভাব, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে সত্যই বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এ সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ বা মনোমালিন্য সমাধানে বিশেষ সহায়তা করিত, আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। তিনি হিন্দু হইলেও মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার মুসলমান গুণগ্রাহীর অভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নিকট সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই কারণে এ সময়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ উভয় সম্প্রদায়েরই পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইত।

আর এক বিষয়ে তাঁহার অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রভাবের অভাব এতই অনুভূত হইতেছে যে, উহাকে যেন বীচিবিক্ষোভিত মহাসমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণী বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্বাধীনতা ও শক্তি প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার অভাবে এই প্রতিষ্ঠান যেন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইতে বসিয়াছে। অনেকে এখন শিক্ষার সংস্কারের প্রয়াসী। কেহ বলিতেছেন, পরীক্ষা কঠিন করা হউক, কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, স্কুলের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক, কেহ বা বলিতেছেন, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হউক, আবার কেহ বা তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, ইংরাজী শিক্ষার বাহন না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর যে সম্মানটুকু আছে, তাহাও কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে। এইরূপ নানা মুনি নানা মত দিতেছেন। এ দিকে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও ক্রমশঃ অপহৃত হইতেছে। এ সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-রক্ষা করিবার নিমিত্ত সার আশুতোষের উপস্থিতি কত প্রয়োজনীয়, তাহা কি কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয়?

সার আশুতোষ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানব। তাঁহার বিরাট মস্তিষ্ক অনেক ক্ষেত্রে অকূলেও কূল খুঁজিয়া বাহির করিত। যখন অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছিল, তখনও অনেকবার সার আশুতোষ বিপৎসাগরে কর্ণধার হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-তরণীকে কূল দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় কালেও তাঁহার মস্তিষ্ক একটা না একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিত সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রমশঃ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহার অকালে মৃত্যু না হইলে এত দিন সে শুভ-কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

অধুনা জাতীয়ভাবে শিক্ষার সংস্কার (Back to the Vedas) প্রার্থনা করিবার একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। লর্ড সিংহের মত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট মনীষীও আমাদের বর্ত্তমান বিদেশী বিজাতীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে খাঁটি দেশীয় এবং জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনের কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি আইন কলেজের দুয়ারে তালা লাগাইতেও পরামর্শ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন,—আমাদের সেই 'সেকেলে' যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, চণ্ডীপাঠ ভাগবতপাঠ প্রভৃতির পুনরুদ্ধার করিয়া লোকশিক্ষার পথ সহজ, সরল ও অনায়াসলব্ধ করিতে হইবে, অন্যথা শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার সম্ভবপর হইবে না। সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্বরচিত জীবন-কথা হইতেও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিনিও যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদিকে আমাদের লোকশিক্ষার প্রধান ও প্রথম উপকরণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সার আশুতোষ বাঁচিয়া থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে এই ভাবের লোকশিক্ষার সহায়ক সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মধ্যপন্থী শিক্ষার সঙ্গে যে ক্রমশঃ এই ভাবের সংস্কারের ব্যবস্থা হইত, তাহা সার আশুতোষের কার্য্য-প্রণালী অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। তিনিই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রাধান্য দানের সঙ্কল্প করেন এবং নিজের জীবদ্দশায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক কয় জন বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব

এত কাল লোকের ধারণা ছিল, সতীত্ব একটি সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয়, মহামহিমান্বিত ও কঠোর তপস্যার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন পদার্থ, আর সাধ্বী নারী সমাজের পূজার্হ। কিন্তু কিছুকাল হইল, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সূক্ষ্ম-চিন্তার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সতীত্ব নিখুঁত ভাল জিনিষ নহে, ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়। প্রধানতঃ মাসিক পত্রাদিতেই এই অভিনব মত প্রচারিত হইতেছে। এই মতটি সত্য হইলে সীতা, সাবিত্রী, সতী, গান্ধারী, বেহুলা, দময়ন্তী প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগকে তাঁহাদের গৌরবের আসন হইতে নামাইয়া দিতে হয়, রাজস্থানের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জহরব্রতগুলিকে বর্ব্বরতার নিদর্শনমাত্র মনে করিতে হয়, সাবিত্রী-ব্রত, পীঠ-মাহাত্ম্য প্রভৃতিকে কুসংস্কারের পর্য্যায়-ভুক্ত করিতে হয় এবং ভারতীয় সভ্যতার যাহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—যাহা বিদেশীয় পরিব্রাজকেরও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকে বিস্মৃতি-গর্ভে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হয়।

এত বড় বড় অতগুলি কার্য করিবার পূর্ব্বে উক্ত অভিনব মতটি একবার আলোচনা করিয়া দেখা সাহিত্যিক, সামাজিক সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

সতীত্বের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান :—

(১) এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে জোর করিয়া খাঁচায় পুরিয়া রাখার দরুণ তাহারা বাধ্য হইয়া সতী থাকে, উহা যথার্থ সতীত্ব নহে, উহার কিছু মূল্য নাই।

(২) গুণের আদর ও পূজা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও উন্নতি-জনক, কিন্তু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মধ্যে সদ্‌গুণ দৃষ্ট হইলে তৎপ্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সমাজ দূষ্য মনে করে, ইহাতে মনুষ্যত্বের অবাধ বিকাশ হইতে পারে না।

(৩) মানসিক অপবিত্রতা বর্ত্তমান থাকিলে দৈহিক সতীত্ব অর্থহীন হয়।

(৪) সতীত্ব যদি খুব প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণই হয়, তবে উহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

এই আপত্তিগুলির মধ্যে মাত্র শেষোক্তটি ছাড়া অন্যগুলি কত দূর সঙ্গত ও বিচারসহ, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

(১) সতীত্ব ও অবরোধ-প্রথা

স্বভাবের উপর অভ্যাসের প্রভাব :—আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযমের শক্তি ব্যতিরেকে কেহই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু এইরূপ জিতেন্দ্রিয়তা সংসারে একান্ত বিরল। মানুষ যে পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ প্রেয় এতদুভয়ের পার্থক্য ও আপেক্ষিক মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া নিয়মাধীন রাখিতে পারিলে এই নিয়মানুবর্ত্তিতা ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া অবশেষে তাহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব-নীতিবিজ্ঞানবিৎ ডাঃ মার্টিনো এইরূপ বাধ্যতামূলক নিয়মানুবর্ত্তিতার নৈতিক মূল্য ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও এই অভ্যাসযোগের উপকারিতা বর্ণিত আছে। বালকবালিকাগণের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনকার্য্যে মনোবিজ্ঞানের এই অতি প্রয়োজনীয় নিয়মটির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। চঞ্চল শিশু পাঠশালায় আসিয়া কিছুদিনের মধ্যেই স্থির হইয়া বসিতে ও পাঠে মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা করে। ড্রিল শিখিয়া আদেশ পাওয়ামাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রয়োজনমত সন্নিবেশিত করিতে পারে। অরুচি-গ্রস্ত জ্বররোগীকে জোর করিয়া এক আধটুকু মিছরি খাওয়াইলে যেমন তাহার মুখে রুচি আইসে, স্বভাবতঃ ভগবদ্-বিমুখ লোক শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরে সন্ধ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলেও ক্রমে ভগবানের নামে তাহার রুচি হয়। ইহার সঙ্গে সাধুসঙ্গ বা সদ্গ্রন্থাদির প্রভাব যোগ হইলে ঐ রুচি স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

দণ্ডভয়ে কায করা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ :—প্রথম হইতেই আন্তরিক ইচ্ছাবশতঃ সৎপথে কয় জন লোক থাকে? প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকা, প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকা,—গুরুজন-সান্নিধ্যে লোকলজ্জা ও গঞ্জনার ভয়, সুযোগের অভাব ইত্যাদি কারণেই অধিকাংশ লোক পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সদনুষ্ঠান একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে উহা হইতেই ক্রমে অন্তঃশুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও কবি Wordsworth তাঁহার Ode to Duty শীর্ষক কবিতার মধ্যে কর্ত্তব্যানুরাগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—From Vain temptations dost set free, And calmest the weary strife of frail humanity"—"দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যে প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনর্থক ক্লান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে, হে কর্ত্তব্য, তুমিই তাহাকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধের অবসান করিয়া থাক।" বস্তুতঃ, সর্ব্বদা কর্ত্তব্যে তন্ময়চিত্তে ডুবিয়া থাকিলে অসচ্চিন্তা মনে উদিত হইবার অবকাশই পায় না। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান-বীর Newtonএর নাম উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার মনে কামের প্রভাব ছিল না। বেদান্ত-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া কামপ্রভাব খর্ব্ব করিবার উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে আছে।

সাধু সাবধান! ফাঁদে পা দিও না :—"যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে" বলিয়া প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি যাহাদের নাই, উহা হইতে দূরে থাকাই তাহাদের পক্ষে কল্যাণজনক। খৃষ্টীয়ানদিগের প্রাতঃকালীন প্রার্থনার মধ্যে আছে, "হে ভগবন্, আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না।" রূপের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই আকর্ষণের ফলে নরনারী পরস্পরের সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য লালায়িত। রূপজ মোহ মদ্যের মতই মত্ততা আনয়ন করে। মদ্য মুখের ভিতর দিয়া আর রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। এই স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে তেজোহানি অনিবার্য্য। এই জন্যই শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন কালের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ পুরুষপ্রধানরা নরনারীকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিনা দোষে ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব যে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল নিয়মের মর্য্যাদারক্ষা ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। বিষয়টি খুব গুরু বলিয়াই এ সম্বন্ধে এতদূর কড়াকড়ি ব্যবস্থা মহাপুরুষমাত্রেই করিয়া গিয়াছেন। গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রূপজ-মোহের প্রেরণাবশে কার্য্য করিলে ঠকিতে হয় এবং ঐ মোহ-সম্ভূত প্রণয়ও স্থায়ী হয় না, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রও হরদেব ঘোষালের মুখে আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। Shakespeareএর Merchant of Venice নামক নাটকেও এই বিষয়ের উপদেশ আছে। কালিদাসের শকুন্তলাতেও শার্ঙ্গরবের "এবং দহতি চাপলং" ইত্যাদি বাক্যে সেই উপদেশই পাওয়া যায়। লোলুপ নয়নকে শাসনাধীনে রাখিতে না পারিলে কিরূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে, কুন্দ, শৈবলিনী, দেবযানী ও নগেন্দ্র, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে প্রকাশ্য রাজপথে, দিবালোকে, সর্ব্বজনসমক্ষে, জনৈক পার্শী যুবতীর লাঞ্ছনাও অন্যতম উদাহরণ। "That thou wert beautiful and I not blind, Hath been the fault which shuts me from mankind"—ট্যাসোর এই উক্তিতেও ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন,—"সমস্তটা শরীর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেওয়ার অপেক্ষা চক্ষু দুইটিকেই বরং উৎপাটিত করিয়া ফেলা শ্রেয়স্কর।" বিল্বমঙ্গল তাহাই করিয়াছিলেন।

প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা প্রথম বড়ই কঠিন। রূপজ মোহ যখন এত আপদবহুল, তখন উহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করাই নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত। যে দেখাদেখি ও চাওয়া-চাওয়ি হইতে উহার উদ্ভব ও পুষ্টি হয়, তাহাকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক। অবরোধপ্রথাই সেই ব্যবস্থা। যে কার্য্য মন্দ ও অকল্যাণকর, তাহা যত দুষ্কর হয়, ততই মঙ্গল। গাছ যত দিন চারা থাকে, তত দিন উহাকে বেড়ার মধ্যে রাখাই নিরাপদ,—পরমহংসদেবও ইহা বলিয়া গিয়াছেন। গাছ বড়, দৃঢ় ও প্রতিরোধক্ষম হইলে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। এই কলিকাতা সহরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের বালকবালিকাদের চরিত্রের উপর ফিরিওয়ালাদের কিরূপ প্রভাব, তাহা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি অবরোধবিহীনা মেয়েদের অবস্থাও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চাট ভাজা, অবাক্ জলপান, চানাচুর, কুলপী বরফ, কাঠী বরফ, গোলাপছড়ি, জয়নগরের মোয়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বাগবাজারের রসগোল্লা, ঢাকাই ক্ষীর ইত্যাদি নাম দিয়া রকম বে-রকম খাদ্য, অখাদ্য, ছাই-মাটী, পচা, বাসি জিনিষ একটির পর আর একটি ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা ফিরিওয়ালারা দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া যায়, সেই কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করিলে অরক্ষিত বালকবালিকাগণ আর স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আইসে, আর অর্থ ও স্বাস্থ্য বিনিময়ে বিষ কিনিয়া উদরস্থ করে। যখন তখন সম্মুখে ঐ সমস্ত প্রলোভনের বস্তু পাইয়া তাহারা সামলাইতে পারে না, তাহাদের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তিটি উন্মেষিত হইবার অবকাশই ঘটে না। কর্ত্তা আফিসে, কর্ত্রী তাস বা কলের গান লইয়া ব্যস্ত। ছেলের আবদার উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দুই চারিটি পয়সা ফেলিয়া দেন, মিটিয়া যায়। হতভাগ্য বালকবালিকাগণের ভবিষ্যৎ কে চিন্তা করে? অবরোধমুক্ত নারীদিগের অবস্থাও কতকটা এইরূপ। সংযমবিষয়ক শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের চরিত্র সম্যক্‌রূপে গঠিত ও সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অন্তঃপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পুরুষও নারীর মতই দুর্ব্বল ;—অবলাও আত্মসংযমে অশক্ত বলিয়া অপবাদটা কেবল স্ত্রীজাতির আছে। Shakespeareএর Hamlet, Richard III প্রভৃতি কাব্যে স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতার বিশেষ

পরিচয় পাওয়া যায় (Frailty ! thy name is woman !), বাইবেলেও তাহার অভাব নাই। আমাদের দেশে ব্যাস, মনু, রঘুনন্দন, তুলসীদাস প্রভৃতির গ্রন্থে এবং শাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ আছে। কিন্তু ইহাতেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে যে, পুরুষও দুর্ব্বলচিত্ত, নচেৎ স্ত্রীলোককে রাক্ষসী, বাঘিনী, সর্পীর মত ভয় করিবার বা নরকদ্বারের মত ঘৃণা করিবার কোন কারণ ছিল না। মোহিনী-মূর্ত্তিরূপিণী বিষ্ণুমায়া দ্বারা কন্দর্প-জয়ী মহাদেবের চিত্ত-বিভ্রম, উগ্রতপা ঋষিদিগের নিকট পরতপোভীরু দেবরাজের পুনঃ পুনঃ অপ্সরা প্রেরণ দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ ইত্যাদি ব্যাপার হইতে এই সিদ্ধান্তই হয়, যদিও শাস্ত্রকাররা মুখে স্পষ্টতঃ এ সম্বন্ধে কোন উক্তি করেন নাই। কোন শাস্ত্রকারিণীর হস্তে চিত্রফলক পড়িলে পুরুষের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত হইত, বলা যায় না। কিন্তু ইহা বোধ হয়, নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে যে, ভগবতী মায়ার প্রভাব স্ত্রী, পুরুষ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না,—উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী লজ্জার বাঁধ অনেক সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু "অবরোধের উচ্চ প্রাচীরটি" ভাঙ্গিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জারূপ বাঁধটিও ভাঙ্গিয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। অবরোধপ্রথাকে সতীত্বরক্ষার অনুকূল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

সাধ্বী নারী ও সাধু পুরুষদের আচরণ :—রূপজ মোহ হইতে যে অনর্থ ঘটে, জগতের দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই রূপের অনলেই স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কা ও ট্রয় নগরী ভস্মীভূত হইয়াছিল। রূপের এই মাদকতা-শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া ভাগ্যবিপর্য্যয়বশতঃ অবরোধের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াও নানা উপায়ে অনেক সাধ্বী নারী স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা দেবী সূর্য্যের নিকট কুষ্ঠব্যাধির বর ভিক্ষা করিয়া পরাধীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বেহুলা সতী নিজকে ডোমের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া পরপুরুষস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক রাজমহিষী ও বেগম ধর্ম্মরক্ষার শেষ উপায়স্বরূপ বিষ, বিষাক্ত অঙ্গুরী বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা গুপ্তভাবে সঙ্গে রাখিতেন। আর রাজস্থানের পদ্মিনী ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-ললনাগণ যুদ্ধকালে শত্রুহস্তে পড়িবার আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই চিতা সাজাইয়া রাখিতেন।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারীগণের পক্ষে উৎসবাদি হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, সেগুলিও সতীত্বরক্ষার অনুকূল।

তেজস্বী পুরুষরা তাঁহাদের নয়নদ্বয়কে এরূপ শাসনে রাখেন যে, তাঁহাদের আনতদৃষ্টি কখনও পরস্ত্রীর মুখের দিকে উন্নমিত হইতে পারে না। "অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্" এই শাস্ত্রীয় আদেশ তাঁহারা মানিয়া চলেন। তাঁহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা স্বরচিত একটি অবরোধ বা অবগুণ্ঠনের মধ্যে প্রতিনিয়ত চক্ষুর্দ্বয়কে রক্ষা করেন। রামানুজ লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর এই নিয়ম পালন করিয়া অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, সীতাদেবীর মুখের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না। মাতার আদেশ ছিল, "মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্"—"সীতাকে সুমিত্রা বলিয়াই জানিবে।" তাই তিনি সীতাদেবীর মুখের দিকে কখনও চাহিতেন না। নারীর মুখের মধ্যে তেজোহানিকর কিছু যদি না-ই থাকিবে, তবে লক্ষ্মণাদি বীরের ও অন্যান্য মহাপুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ কি পাগ্‌লামী মাত্র ? কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহাতে লক্ষ্মণাদির আত্মসংযমশক্তির অভাবই সূচিত হইতেছে। মানিয়াই লইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সাধারণের মধ্যে সেই শক্তির অসদ্ভাব আরও অধিক কি না ? মদ্য ও স্ত্রী-প্রসঙ্গ দ্বারা অবিকৃত থাকা তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে কি তাহা সম্ভবপর ?

হইতে পারে, বর্ত্তমান সময়ে মুষ্টিমেয় মহিলা অবরোধের সাহায্য ব্যতিরেকেও সর্ব্বাংশে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। ইঁহাদের স্থান বেহুলা, দময়ন্তী প্রভৃতির পার্শ্বে। কিন্তু নিয়মের কড়াকড়ি সাধারণের জন্য। তবে দশের মঙ্গলার্থ অসাধারণকেও নিয়মের শৃঙ্খল স্বীকার করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাই অবরোধকে কঠোর বিধি-নিষেধের "লৌহ-বেষ্টনী" তুল্য অপ্রীতিকর মনে করেন না ; বরং যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, তাঁহাদের "লেখা দেখিয়া লজ্জানুভব" করেন ও "ক্রোধান্ধ চিত্তে" প্রতিবাদ করেন। পক্ষান্তরে, তেজস্বী পুরুষ-প্রবররা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত একটি সংযমের লৌহ-বেষ্টনীমধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রতিনিয়ত নিবদ্ধ রাখেন, পরস্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। আত্মকল্যাণকামী পুরুষ কিংবা নারী, কেহই অবরোধ-বিদ্বেষী হইতে পারেন না।

(২) সতীত্ব ও মনুষ্যত্ব,—

মহত্ত্বের পূজা মনের স্বাভাবিক গতি

সদ্‌গুণের পূজা-পদ্ধতি :—সতীত্বে ও যথার্থ মনুষ্যত্বে বিরোধ থাকিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে এ কথা শুনা যায় নাই ;—উভয়ই নিবৃত্তিমূলক। পরপুরুষের গুণে মুগ্ধ হওয়া দূষ্য, সুতরাং সতীত্ব মনের স্বাভাবিক গতিরোধ করিয়া মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত ও জড়ে পরিণত করে, এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সদ্‌গুণের পূজা কিরূপে করিতে হয় ? উহাতে সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা কোথায় ? ধর্ম্মবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, যুদ্ধবীর ইঁহাদের সকলের পূজাই এ দেশের নরনারী আবহমানকাল করিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, উশীনর, পৃথু, দাতাকর্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নল-দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, শ্রীবৎস, চিন্তামণি ইঁহারা নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই পূজার্হ। এই বীর-পূজা বা গুণের আদর দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয় সন্দেহ নাই। ইঁহাদের কীর্ত্তি ও অবদান-কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিবার সময় নরনারী অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু এই বীর-পূজায় বা গুণ-পূজায় সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা কেহ কোন দিন করিয়াছেন কি ? রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ করিবার সময়ও নরনারীমাত্রের হৃদয় বিস্ময়-ভক্তিতে পূর্ণ হয়। ইদানীন্তন কালের বিদ্যাসাগর, রামদুলাল, ভূদেব, বঙ্কিম, গুরুদাস, আশুতোষ, মহাত্মা গন্ধী, অরবিন্দ প্রভৃতি আমাদের সকলেরই বিস্ময়-ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে কোনরূপ আশঙ্কার কথা কাহারও মনে উঠিয়াছে কি ?

'রামের মত পতি পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, দশরথের মত শ্বশুর ও কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই' ইত্যাদি কামনা—প্রার্থনা এ দেশের কুমারীগণের মধ্যে চিরপ্রচলিত। যাঁহারা বিবাহিতা, তাঁহারা অমুকের মত সন্তান, অমুকের মত জামাই পাই, এইরূপ কামনাই করিয়া থাকেন।

গুণের আদর বা মহত্ত্বের পূজা বলিতে এই বুঝায় যে, ভক্তিপ্রভাবে সেই গুণ ও মহত্ত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য একান্ত আগ্রহপূর্ণ সাধনা। ইহাতে গুণীর সান্নিধ্যলাভ স্থলবিশেষে বাঞ্ছনীয় হইলেও একান্ত আবশ্যক নহে। মৃত বা দূরস্থিত গুণী ও মহতের প্রতিও এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইতে পারে এবং তাহাতে আত্মার উন্নতিও হয়, এমন কি, সেই সদ্‌গুণ ন্যূনাধিকপরিমাণে লাভ হইয়া থাকে। 'ধ্যাতা ধ্যেয় পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়', পাতঞ্জলদর্শনে ইহা উক্ত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য্য নিয়মের ফলেই একলব্য দ্রোণের

মূর্ত্তি-পূজা করিয়া দ্রোণের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, দ্রোণাচার্য্য ইহা জানিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূজার্হ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও তাঁহার পূজা সম্ভবপর। এরূপ পূজায় সতীত্বহানির আশঙ্কা কোথায়? আর সতীত্বের সহিত আত্মসম্প্রসারণের বা মনুষ্যত্ববিকাশের বিরোধই বা কোথায়?

তবে যেখানে 'রূপ লাগি আঁখি ঝোরে গুণে মন ভোর';—যেখানে 'পূজার তরে হিয়া, উঠে যে ব্যাকুলিয়া, কি দিয়া পূজিব তারে গিয়া?'—এবং 'মন-প্রাণ যা ছিল সব সঁপে দিয়েছি'—এইরূপ অবস্থা, সেইখানেই হৃদয়ের দেবতাকে সাক্ষাৎভাবে প্রীতি-নৈবেদ্য দিতে না পারিলে তৃপ্তি ও চরিতার্থতা আইসে না; আকাঙ্ক্ষা মিটে না। দেহ দ্বারা দাস্যভাবে সেবার স্পৃহাও ইহার সঙ্গে জড়িত থাকিতে পারে। ইহা গুণের পূজা বা ভক্তি নহে—মোহ। পরপুরুষের প্রতি এই ভাব কুলস্ত্রীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা এবং মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তির অভাব রহিয়াছে, সুতরাং ইহা স্বাধীনতা নহে—স্বেচ্ছাচার বা প্রবৃত্তির সেবা। প্রবৃত্তির সেবাতেই অবশ্য "জীবনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা" কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান, কিন্তু সে প্রফুল্লতা মত্ততা মাত্র,—যথার্থ আনন্দ নহে। "যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ;—লোলুপ ভোগীর কাছে নয়; সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মধ্যে সতীত্বের সংযম না থাকিলে সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে।"

এইরূপ "সতীত্বের সংযম" কি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া……মনের স্বাভাবিক গতিরোধ করত…স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও জড়ে পরিণত করে?" না ইহাতেই যথার্থ স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তির পরিচয়? অন্ধ-রাজমহিষী গান্ধারী দেবী যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ়বস্ত্রাবরণে নিজের চক্ষু দুইটি বাঁধিয়াছিলেন,—ভগবানের দান চক্ষু-রত্নের অধিকারিণী হইয়াও স্বেচ্ছায় অন্ধত্বের দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে কি তাঁহার আত্মার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল? না সমধিক শক্তিমত্তাই সূচিত হইয়াছিল? "মধুপাত্রে হত-প্রাণ পিপীলিকার মত ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকাতেই" বেশী শক্তি? না, "রোগ-শোক-ব্যথিতের হাহাকার ধ্বনিতে" অস্থির ও লুপ্তধৈর্য্য হইয়া রোগি-শুশ্রূষার জন্য কুষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ ও কুষ্ঠযন্ত্রণাকে বরণ করাতেই বেশী শক্তি? স্বয়ং-কৃত আত্মনিগ্রহ ও আত্মসঙ্কোচেই যথার্থ স্বাধীনতা। নিবৃত্তিতেই আত্মীয়শক্তির প্রকাশ।

এই সংযমমূলক পাতিব্রত্যধর্ম্ম প্রায় রূপগুণনিরপেক্ষ। বস্তুতঃ, রূপগুণাদি ভিত্তির উপর যে পতিপ্রেম প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্থায়িত্ব কত দিন?—যত দিন পুরুষান্তরের উৎকৃষ্টতর রূপগুণ হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। এই প্রকার বিচারবিহীন অন্ধ-ভক্তি ও অটুট নিষ্ঠা সহজ কথা নহে। আর সহজ কথা নহে বলিয়াই সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, বেহুলাদির পাতিব্রত্যপ্রভাব উগ্রতপাঃ ঋষিদিগের তপঃপ্রভাব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। যম-নিয়ম-শমদমাদি তপস্যার সমস্ত অঙ্গই পাতিব্রত্যব্রতের মধ্যে নিহিত আছে। নেত্র-শ্রোত্রাভিরাম রূপ ও শব্দাদি হইতে নেত্র-শ্রোত্রাদিকে প্রত্যাহৃত করিয়া গৃহপ্রাচীরের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করা, প্রতিনিয়ত একই কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকা অসাধারণ ধৈর্য্য ও শক্তিসাপেক্ষ। প্রফুল্ল ("দেবী চৌধুরাণী") সন্ন্যাস ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশের সময় বলিয়াছিলেন,—"কঠিন ধর্ম্ম এই সংসারধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নহে।" বস্তুতঃ উপযুক্ত শিক্ষা, বল ও প্রীতি না থাকিলে এই "কঠোর কর্ত্তব্য-কারাগারের" নিয়মাবলী যথাযথরূপে পালন করা যায় না। সাধ্বী নারী পতিকে ঠিক প্রত্যক্ষ দেবতার মতই দেখেন। পতির পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাই, এরূপ নারী এই প্রবন্ধ-লেখক দেখিয়াছেন।

মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতিরোধ করিলেই যে মানুষ জড়ে পরিণত হয়, ইহা ঠিক নহে। অভ্যাসবলে স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত করা এবং অস্বাভাবিককে স্বাভাবিকে পরিণত করাতেই মনুষ্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অভ্যাস এই জন্য দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া অভিহিত হয়। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্য করাও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতিকে স্থলবিশেষে রুদ্ধ, স্থলবিশেষে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়া মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বরহস্য-উদ্ঘাটন-প্রয়াসে বিজ্ঞান ও দর্শন-জগতে জ্ঞানযোগিগণের একাগ্রতাও তন্ময়ত্বলাভ; কাম, ক্রোধ, লোভাদিকে জয় করিয়া ভক্তিযোগী বা ধর্ম্মবীরগণের আধ্যাত্মিক বললাভ;—ইন্দ্রিয়-নিরোধ বা প্রত্যাহারাদি দ্বারা তাপসদিগের তপঃপ্রভাবলাভ;—এ সমস্তেরই মূলে মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতির রোধ বা নিয়ন্ত্রণ শুধু মনোবৃত্তি নহে, ক্ষুন্নিদ্রাতৃষ্ণাদি শারীর বৃত্তি, এমন কি, শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত আয়ত্তাধীন করিয়া মানুষ নানাপ্রকার অসাধ্যসাধন ও আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভাদির স্বাভাবিক গতিরোধ যে সকল নরনারী করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা কি জড়ে পরিণত হয়েন, না মনুষ্যত্বের অভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া থাকেন? কুলপাবন পুত্র-কামনা থাকিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংযমাভ্যাস করিতে হয়। পতিব্রতা নারী পতির জীবদ্দশায় ও পতি-বিয়োগের পর সংযত হইয়া চলেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সংযম ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হইত? ইন্দ্রিয়সংযমের ও ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহমরণ অপেক্ষাও প্রশংসনীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সহমরণে ধৈর্য্যের অভাব সূচিত হয়।

(৩) সতীত্ব—শারীরিক ও মানসিক

মানসিক অশৌচ ও হিন্দুশাস্ত্র:—কায়মনোবাক্যে যাঁহারা সতী হইতে পারেন, তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবের বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন। সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, সাবিত্রী ও বেহুলার মৃত পতির পুনর্জ্জীবনলাভ, গান্ধারীর বাক্‌সিদ্ধি,—এ সমস্তই সতীত্বপ্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এরূপ সতীত্ব সম্ভবপর নহে। মানসিক অপবিত্রতা দণ্ডপ্রায়শ্চিত্তার্হ হইলেও অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া গণ্য নহে। মহাভারতীয় আখ্যায়িকায় বৃন্তচ্যুত আম্রকে বৃন্তারূঢ় করার জন্য কৃষ্ণার গুপ্ত-কামনাপ্রকাশজনিত নিদারুণ লজ্জা ক্ষণিক নরকযন্ত্রণাতুল্য প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-সৃষ্ট শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দ্বিতীয় জন্মলাভ, চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক তাহার পুনর্গ্রহণ প্রভৃতিও এ স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

মানসিক সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, চিরযৌবনা কুন্তীদেবী সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি";—অন্য পরে কা কথা? স্বভাবতঃ পাপপ্রবণ মনকে বিবেক-সাহায্যে সংযত করিতে হয়, কিন্তু এই পাপপ্রবণতাকে মনের স্বাভাবিক গতি মনে করিয়া সাংখ্যের "আকৃতি" বা গীতার "মিথ্যাচার" নিন্দাকারী শ্লোকটির দোহাই দিয়া ঐ পাপপ্রবণতা বা প্রবৃত্তি অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা বাহির করিলে সাংখ্য, গীতা বা নিজবুদ্ধি এ সকলেরই অপব্যবহার ও অবমাননা করা হয়। মানুষ ও পশুর পার্থক্যবিধানকারী সংযমকেও অনাদর করা হয়। জোর করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিলেই যথেষ্ট হয় না, অভ্যাসবলে অন্তঃশুদ্ধি লাভ করাও দরকার, ইহাই গীতার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযমকেই সম্ভবতঃ প্রাধান্যও দেওয়া হইয়াছে। ঐটি বর্ত্তমান থাকিলে, স্বভাবের উপর অভ্যাসের যে প্রভাব আছে, তৎসাহায্যে অন্যটিও লাভ করা যায়। মানবচরিত্রের অন্তস্তলদর্শী কবি বলিয়াছেন,—"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের

পথ বোধ কর।……মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে,—তাহাতে স্থির হইবে।" তাই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা,—একনিষ্ঠ সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা, অসাধ্যসাধন হইল,—"শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল।" 'কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযম'রূপ সম্বলটি না থাকিলে শৈবলিনীর কি উপায় হইত?

শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

ঢাকায় ছাত্র-সম্মিলন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সম্মিলনে বক্তৃতাকালে ছাত্রগণকে সৎসাহস ও জ্ঞানানুশীলনের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "বালকদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহাদের জননীগণ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করেন না।"

কথাটা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ছেলেকে বালাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়,—লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে। সুশীল সুবোধ ছেলে কেবল লেখাপড়া লইয়া থাকিবে, তাহাতে তাহার শরীর ও মন লেখাপড়ার পাষাণচাপে অবসন্ন হইয়া পড়ুক বা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উৎসন্নের পথে যাউক, ক্ষতি নাই। তাহাকে শারীরিক শক্তি-চর্চ্চা যে সঙ্গে সঙ্গে করিতে দিতে হয়, মনের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণের যে অবসর ও সুযোগ দিতে হয়, তাহা কোনও জননী একবার চিন্তা করেন কি না সন্দেহ। ছেলে একটু জলে ভিজিলে বা রৌদ্রে পুড়িলেই সর্ব্বনাশ,—ধরা বুঝি রসাতলে গেল! ছেলে বিদেশে যাইতে চাহিলেই তাহাকে পুতু-পুতু করিয়া ঘরে আটক রাখা-ই পরম যুক্তিসঙ্গত! ছেলে দুধ খাইতে না চাহিলে তাহাকে পুতুল কিনিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া পরে পুতুলের কথা উড়াইয়া দেওয়ার স্বভাবও অনেক জননীর আছে। তাঁহারা এটা ভাবেন না যে, ইহা দ্বারা ছেলেকে প্রথমাবধি মিথ্যাকথনে অভ্যস্ত করা হয়। এ দেশের ছেলের বাপ যদি জমীদার মহাজন হইল, তাহা হইলে বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধু লইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া তাসপাশায় সময় অতিবাহিত করিলেই ছেলের মানবজীবনের সফলতা সম্পাদন করা হইল; ইহার উপরে যেটুকু আছে, তাহার চিত্র আর নাই-ই অঙ্কিত করিলাম! কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অতি বড় অভিজাত-সম্প্রদায়ের ছেলেরাও বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে দেশ-ঘর ছাড়িয়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে—আফ্রিকার কালাজঙ্গলে সিংহ শিকারে অথবা বাঙ্গালার সুন্দরবনে বাঘ শিকারে যায়, পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠে, নির্ভয়ে সমুদ্রে বিচরণ করে। উহা দ্বারা তাহারা যে জ্ঞানসঞ্চয় করে, যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞানে অভ্যস্ত হয়, সে সুযোগ এ দেশে কোথায়? বিলাতের অভিজাত-শ্রেণীর কনিষ্ঠ পুত্রগণ যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ, বোধ হয়, জগতে এমন আর কোথাও নাই। তাহারা সর্ব্ববিধ ব্যায়ামে অভ্যস্ত হয় এবং তাহারাই মূলতঃ সামরিক ও নৌ-সামরিক বিভাগে সেনানীর পদ গ্রহণ করিয়া জগতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজবংশের রাজকুমারেরা যৌবনকাল হইতেই সামরিক বা নৌ-সামরিক বিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে Sailor King আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার পুত্ররাও নানা কার্য্যে দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া আরাম উপভোগ করেন না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

কথা হইতেছে, আমাদের মা জননীদের পুত্রের শিক্ষাদীক্ষাদানে অনেক গলদ আছে। শ্রীমতী নাইডু এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ছেলেকে যে কেবল জ্ঞানানুশীলনই করিতে হইবে, সৎসাহসে অভ্যস্ত হইতে হইবে না, এমন কোনও কথা নাই। শক্তিসঞ্চয় অর্থে গুণ্ডামী করা নহে, আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। যে প্রকৃত শক্তিশালী, সে কখনও শক্তির অপব্যবহার করে না;

যে বুনীয়াদী বড়লোক, সে কখনও টাকার বড়াই করে না। বাঙ্গালীর জীবনে নূতন যুগের উষোদয় হইতেছে, এ সময়ে শ্রীমতী নাইডুর কথায় বলি. বাঙ্গালীর জননীদিগকে তাঁহাদের সন্তানগণের শক্তিসঞ্চয়ের দিকে—আত্মসম্মান-জ্ঞান-উন্মেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা জাতি হিসাবে আমরা কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিব না।

সংগঠনের সদুপায়

৫

পাট ও পাটজ-পণ্যের কথা

পাট এ দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি। বিদেশের বাজারে পণ্য বিকাইয়া তদ্বিনিময়ে এ দেশে টাকা আনিবার যতপ্রকার পণ্য আছে, তন্মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু কেবল কাঁচামালরূপ পাট সরবরাহ করিতে বাধ্য হওয়াতে বিনিময়ের সম্পূর্ণ অর্থ এ দেশে আসিতে পারিতেছে না। বিনিময়ের সম্পূর্ণ মূল্যটা যাহাতে এ দেশবাসীরই হস্তগত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ দেশে পাট উৎপাদনের জন্য মূলধনিরূপে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে মূলধন নিয়োগ করিতে হয় না। বাঙ্গালার কৃষকরা নিজ নিজ মূলধন ও শ্রমসহযোগে নিজেদের দায়িত্বেই পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। উৎপাদনে কোনও গোলযোগ নাই— গোল যত বিনিময়ের ব্যাপারে। বিশ্বের বাজারে পাট বিনিময়ের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সংসদসমূহকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সংসদের বিধানানুসারে অন্যান্য পণ্যের মত পাটও যথাস্থানে রপ্তানীর জন্য সংসদসমূহেরই হস্তগত হইবে। হস্তগত সেই পাট কাঁচামালরূপে ভিন্ন দেশীয়দের নিকট বিক্রয় না করিয়া, এ দেশীয় কর্ম্মীদের দ্বারা পাকা মাল চট-বস্তাদিতে পরিণত করত দেশ-বিদেশের বাজারে উপস্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

চট-বস্তাদির শিল্প অতি স্থূলতর শিল্প। পাটের সূতা করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূল তাঁত প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দেশের স্ত্রী-পুরুষ সাধারণ কর্ম্মীরা অল্প আয়াসেই নিজ নিজ গৃহে বসিয়াই চট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে।

গৃহে গৃহে চটের তাঁত প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই গৃহ-শিল্পটির অনুষ্ঠান ঘটাইলে, দেশের বহু বেকার কর্ম্মীরই অন্নাদি সংস্থানের একটি সুন্দর উপায় হইবে। আর এই উপায়ে কাঁচা পাটকে পাকা মালে পরিণত করিয়া বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিলে জাতির ধনভাণ্ডারেও প্রচুর অর্থাগম হইবে।

বিশ্বজোড়া ব্যবসায়ের পণ্য বলিয়া পাটের কারবার বড়ই বিরাট ব্যাপার। পৃথগ্‌ভাবে দেশের সমস্ত পাটের গোটা কারবারটিকে এক হস্তে লইয়া পরিচালিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তাহার জন্য অপরিমেয় মূলধনেরও প্রয়োজন। তাহা সংগ্রহ করিয়া এই ঘোর প্রতিযোগিতার যুগে পাট ব্যবসায়টি নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন ব্যাপার। জাতীয় সংসদের সেই পন্থা অবলম্বনীয় নহে।

সংসদসমূহ পল্লীমণ্ডলীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনমত পাট হইতে চটের সূত্র উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করিবেন। স্থানীয় কৃষককর্ম্মীরা অবসরসময়ে তাহাতে খাটিয়া পাটের সূত্র উৎপাদন করিবে।

যথাসম্ভবরূপে পল্লীর গৃহে গৃহে চটের তাঁত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সূত্র সরবরাহক্রমে, প্রধানতঃ বালকবালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও মহিলাদের দ্বারা চট ও বস্তা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংসদসমূহ কর্ম্মীদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়া সেই সব চট ও বস্তা সংগ্রহ পূর্ব্বক বিদেশের বাজারে রপ্তানী করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

স্থানীয় যাবতীয় পাট যাহাতে স্থানীয় তাঁতের কাযেই নিঃশেষে লাগিয়া যাইতে পারে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

চট ও বস্তা ব্যতীত পাটের দ্বারা দড়ি-দড়া কাগজাদি আরও যে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, অনুসন্ধানক্রমে সে সকলেরও তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ক্রমে সেই সকল পণ্যও দেশেই উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের অন্যতম বিরাট বে-ওয়ারিশ সম্পদের কথা

এ দেশের গো-মহিষাদি পশুর মৃতদেহ উপেক্ষিত অবস্থায় ভাগাড়ে পরিত্যক্ত হয়। সেই সকল মৃতদেহ অযথা নষ্ট হইতে না দিয়া, যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিলে পর, তাহাদের দেহের প্রতি অংশ হইতেই মূল্যবান্ পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত পল্লীমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে এ দেশীয় চর্ম্মকার ও কসাই শ্রেণীর কর্ম্মীদের এই মৃত পশুবিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া দেশের যাবতীয় মৃত পশু সংগ্রহ ও চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, ক্ষুর, রক্ত, চর্ব্বি প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরে সেই সব বস্তু লইয়া যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্দিষ্ট কারখানাসমূহে উপযুক্ত কর্ম্মীদের দ্বারা অনুরূপ পণ্য উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

কর্ম্মীদের যোগ্য পারিশ্রমিকাদি খরচ বাদ দিয়া এই ব্যবসায়ে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, কেহ ওয়ারিশ নাই বলিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিশুদ্ধ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। জাতীয় সংসদের উন্নতি ও স্থায়িত্বসাধনসংকল্পে উক্ত অর্থ, সংসদের কর্ম্মকর্ত্তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে, অবাধেই ব্যবহার করিতে পারিবেন।

সংসদের নিজস্ব ভাণ্ডারে এই বিপুল অর্থরাশি সংগ্রহ করিবার জন্য জাতীয় সংসদকে অনতিবিলম্বে ইহার বিধি-ব্যবস্থায় অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে।

ভারতীয় চা ও খনিজ পণ্যের কথা

ভারতীয় চা ও খনিজ-পণ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষে এ দেশবাসী শ্রমিক কর্ম্মীদের সম্পদরূপে পরিণত হইলে, দেশের দৈন্য-দারিদ্র্য বহুলরূপে উপশমিত হইতে পারে। চা এবং খনিজ-পণ্যজাত অর্থের অধিকারী যাহাতে এ দেশীয় শ্রমিক-কর্ম্মীরাই হইতে পারে, জাতীয় সংসদকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চা বাগিচার প্রতিষ্ঠা ও খনি-খননের প্রাথমিক ব্যয়ভার সংসদকেই বহন করিতে হইবে। কালক্রমে সুদে আসলে সংসদের দেওয়া সেই প্রাথমিক মূলধন, যখন উঠিয়া আসিবে, খাসে পতিত তখন সেই সব বাগান এবং খনিকর্ম্মী শ্রমিকদেরই স্বকীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে ;— এই মূল সূত্রটির অবলম্বনে চা-বাগান ও খনিখননের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞ কর্ম্মিসমবায়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসমূহের সংগঠন করিয়া জাতীয় সংসদ উক্ত কার্য্য পরিচালনের বন্দোবস্ত করিবেন।

দেশের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহের কথা

দেশের প্রয়োজনীয় লবণ দেশবাসীরা দেশেই যাহাতে সমুৎপন্ন করিয়া লইতে পারে, সরকারের সঙ্গে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি চেষ্টা সফল হয়, ভাল, না হয়—অন্যান্য প্রদেশীয় সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও

সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। এক দল দেশীয় কর্ম্মী যাহাতে এই লবণ উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারে, জাতীয় মহাসংসদকে বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন-যাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই যাহাতে দেশবাসিমাত্রই আত্মনির্ভরশীল হইয়া চলিতে পারে, তৎপ্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সংসদকে কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

ভারতীয় বনজ সম্পদের কথা

ভারতের বিরাট বিশাল বনে জঙ্গলে যে পণ্য-সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তৎসমুদয় আহরণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মূল্যবান্ কাঠ ভাল ভাল কাজের জন্য বাছাই করিয়া রাখিয়া, বাজে কাঠ 'চুয়াইয়া' তাহা হইতে আল্‌কাত্‌রা প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভেষজ-জাতীয় ফল-মূল লতা-পাতা প্রভৃতি হইতে যথোপযুক্ত বিধানে এ দেশেই ঔষধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশের বনজ সম্পদ যাহাতে সামান্য রকমেও নষ্ট হইতে না পারে, সংসদকে সে দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

মৎস্য চাষের কথা

মৎস্য এ দেশবাসীর অনেকেরই অন্যতম প্রধান খাদ্য। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই প্রায় মৎস্যের দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মৎস্য যাহাতে সমধিকরূপে সমুৎপন্ন হয়, পল্লীমণ্ডলীগুলির সহায়তায় সংসদকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ধীবরাদি মৎস্যজীবী কর্ম্মিসম্প্রদায়কে মৎস্য চাষে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত করিয়া, ধৃত মৎস্যের ব্যবসায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেশবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় মৎস্যের অভাব মোচন করিতে হইবে।

এই মৎস্য চাষের সৌকর্য্যসাধনোদ্দেশ্যে সংসদসমূহকে দেশের যাবতীয় হাজা-মজা পুরাতন দীঘি ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে ; প্রয়োজনবোধে নূতন নূতন পুষ্করিণীর খনন-ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহাতে এক দিকে যেমন মৎস্যের অভাব দূরীভূত হইবে, অপর দিকে তেমনই দেশের পানীয় জলের অভাবও ঘুচিয়া যাইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

জীবন-যাপন

[বর্ষা হইতে আরম্ভ]

রাত পোহালে কোথায় যাব ছুটে,—
করবো কি তার ঠিকানা নাই মোটে,
চারদিকেতেই অভাব—খালি অভাব ;
বাদ্‌লা দিনে 'লাকড়ি' নাহি ঘরে,
গিন্নী বলেন, "রাঁধবো কেমন ক'রে ?"
ভেবে না পাই কি দিব তার জবাব।

ছিদাম মুদীর অনেক দেনা রাখি,—
সওদা দিতে চায় না—বেজায় বাকি,
দুধের হিসাব করতে আসে গয়লা ;
কাপুড়ে কয় "পাল মশাইর কাছে
তিন বছরের সাবেক বাকি আছে,
আজকে কড়ার—আজকে মাসের পয়লা।"

এই ত দু'দিন বাদেই ভাদ্র মাসে
জমীদারের লাটের কিস্তী আসে,
মহাজনের খত তামাদি আবার ;
শ্বশুরবাড়ীর বাক্স ঘটা-লোটা,
দাদার-কেলে জমিন দু'চার কোঠা
বেচ্‌তে বেচ্‌তে করব না কি কাবার ?

সারাটা দিন ক'রে ছুটাছুটি,
সোজাসুজি কোন রকম দু'টি—
ভাত মিলে ত মিলে না ভাই কাপড় ;
উপায় যত, খরচা তাহার দেড়া,
বুঝে না তা কিচ্ছু বাড়ীর এরা,
ভেবে ভেবে একেবারে ফাঁপর !

রাত পোহাতে মাথার উপর পূজা,
ছেলেপুলের কাপড় জুতা মোজা—
প্রিয়তমার দু'একখানা গয়না ;
মালী, মেথর, নাপিত, ধোপার টাকা
ভাড়ায়ে আর ক'দিন যাবে রাখা ?
এবার ও সব না দিলে আর হয় না।

তাহার পরেই ফের কার্ত্তিক মাসে
ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ-তিথি আসে
আবার খরচ, তাতেও নাহি খালাস ;
মেয়ের বয়স পার হয়েছে বারো,
ঘরে রাখা যায় কি তারে আরো ?
ছুট্‌তে হবে করতে বরের তালাস !

পিয়ন ডাকে "পত্র আছে বাবু",
এই হয়েছে—এইবারেতেই কাবু—
শ্যালক চাহে এক্‌জামিনের ফি,
গিন্নী বলেন, "দিতেই হবে ওটা,
তা না হ'লে শুন্‌বে নানান খোঁটা,
ছাড় কিছু জমী—উপায় কি !"

ভাই-বেরাদার স্বজন প্রতিবাসী—
সুখের কথা কয় না কেহ আসি'
দুখের দিনে হয় না কেহ আপন ;
এ কি শুধু আমার কথাই ?—না না—
বাংলা দেশের সাড়ে চৌদ্দ আনা
লোকেই করে এমন জীবন-যাপন !

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

উৎকলিঙ্গ

মুহুর্মুহুঃ উৎপীড়িত উৎসাদিত হে উৎকল ভূমি
উদ্ধত উদ্দণ্ড ভুজে যুগে যুগে উপদ্রুত তুমি।
এমনি দুর্ব্বল দীন দুঃস্থ দুঃখী দুর্ভিক্ষদলিত
চিরদিনই ছিলে না ত। ইতিহাসে নহ অনাদৃত।
গৌরব-সৌরভে তব আমোদিত ঐতিহ্য পুরাণ,
ওদন্তপুরীর কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তে আজো দীপ্যমান।
গজদন্ত মঞ্জুষায় বুদ্ধদন্ত করিয়া পোষণ,
হ'লে অর্দ্ধ জগতের বন্দনীয়, হে ভক্ত শ্রমণ!
রাজসূয় যজ্ঞে তুমি যোগাইতে গিরি গজঘটা
তোমারি পঞ্জরে জাত ভারতের কিরীটের ছটা।
তোমার ঔষধি দারু, হীরা, ক্ষৌম-কৌষেয় দুকূল,
আনিত মালয় চীন ব্রহ্ম হ'তে ঐশ্বর্য্য প্রতুল।
তব কূল হ'তে স্রোতে পোতশ্রেণী বহি পণ্যভার
দেশে দেশে ভেসে ভেসে পার হ'য়ে যেত পারাবার।
পতিত উৎকল তব বিস্মৃত সে অতীতগৌরব,
শিলা শুধু ভুলে নাই, বুকে এঁকে রাখিয়াছে সব।

অশোকে করিল লুব্ধ হে কলিঙ্গ, তোমার সম্পদ্‌,
প্রথম পীড়ক তব সার্ব্বভৌম লোলুপ মগধ।
গ্রাসিল সে শৌর্য্যচন্দ্রে মৌর্য্য-রাহু দুর্জ্জয় দারুণ,
ওড্রপুষ্প সম ওড্র তব বক্ষ হলো রক্তারুণ।
সে আহবে আত্মাহুতি দিল তব অসংখ্য সন্তান,
চণ্ডাশোক দণ্ডদাতা, শ্রীভাণ্ডার হইল শ্মশান।
ফুটিল অহিংসা পদ্ম তব হিংসা-শোণিতের স্রোতে
উঠিল অশোকামৃত তব শোকপারাবার হ'তে,
সে সুধা এসিয়াব্যাপী ধর্ম্ম-ক্ষুধা করিল হরণ,
আজিও 'ধৌলীর' মৌনি সাক্ষ্য তার করিছে বহন।

কৃতী পুত্র মহামেঘবাহনের মগধবিজয়ে
ভুলিলে কি সে লাঞ্ছনা? জেগেছিলে আবার নির্ভয়ে?
অর্হতেরা জৈনমন্ত্রে দিল তোমা প্রবোধসান্ত্বনা
হে কলিঙ্গ ভুলিলে কি মর্ম্মন্তুদ শোকের যন্ত্রণা?
নাগার্জ্জুন বোধিমন্ত্রে দিল তোমা সুধার প্রলেপ,
মুছিল কি অশ্রু তব? ঘুচিল কি সে খেদ আক্ষেপ?
শান্তি স্বস্তি শুভ নিয়ে অন্ধ্ররাজ এলো তব বুকে
হে শোকান্ধ চাহিলে না একবার তবু হাসিমুখে।
বঙ্গেশ শশাঙ্কভয়ে সারানিশি সশঙ্ক রহিয়া
হ'লে ভৃত্য শিলাদিত্য-সূর্য্যোদয়ে শাসন বহিয়া।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তব রিক্ত নহে তখনো উৎকল,
বেসাতী করিত হাট মুক্তা দিয়ে উৎকলী সকল।
তখনো আছিলে তুমি রত্নপ্রসূ শিল্পের সাধক,
এ কথা বলিয়া গেছে বৌদ্ধবন্ধু চীন পর্য্যটক।

আবার কেশরিবংশ ফিরাইল গৌরব তোমার,
সিংহল বিহার গৌড় চৌড়ে করি শৌর্য্যের বিস্তার।
উদ্ধত কেশরিসম শূরবর উদ্দ্যোত কেশরী
দিগ্বিজয়ে গজমুক্তা-জয়মাল্য আনিল আহরি'।
দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে তার দণ্ডভুক্তি হইল দণ্ডিত,
দাসত্ব-কলঙ্কসূত্রে নখে তার হইল খণ্ডিত।
চন্দ্রকুল-"চন্দ্র" পুন উজলিল তব সিন্ধুতীরে
সৌভাগ্যকুমুদ তব প্রস্ফুটিল পুনঃ ধীরে ধীরে।
মন্দিরশিখর-শৃঙ্গে ভ'রে গেল নীলাচলভূমি
শিল্পী রূপদক্ষদের হ'লে বন্দ্য পুণ্যতীর্থ ভূমি।
ঘোর অন্ধকূপ হ'তে ধীরোদাত্ত 'যযাতি' তোমার
দেবযানী সম তব কীর্ত্তি পুন করিল উদ্ধার।
ভাস্কর্য্যে শৃঙ্গারবেশ রচি তব রাজ্ঞী কলাবতী
শ্রীধামে রাখিয়া গেল স্বনামের সার্থক সঙ্গতি।
অম্বুগোদ ভূমি হ'তে চোলরাজ গঙ্গবংশকেতু
এলো কুশভদ্রাতীরে রুদ্রতেজে দিগ্বিজয়হেতু,—
এলো গঙ্গবংশধারা উত্তুঙ্গ গঙ্গাধারা প্রায়,
ঐরাবত-জয়ী যত কেশরীরা সব ভেসে যায়।
বিপ্লব বিদ্রোহ দ্বন্দ্ব মুহুর্মুহুঃ রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়
গৃহভেদ, ভ্রাতৃবধ, শিরশ্ছেদ, জয়-পরাজয়
হে উৎকল, তব বক্ষ যুগে যুগে ধ্বস্ত দীর্ণ করি,
শোণিত ঢালিয়া গেছে মহাকাল পানপাত্র ভরি'।

তবু নমি গঙ্গগণে, নহে তারা তোমার পীড়ক
লুণ্ঠিতে আসেনি তারা গজদন্ত মুকুতা হীরক।
পদ্মক্ষেত্রে অভ্রচুম্বি শঙ্করের শ্রীমন্দির গড়ি
তোমার সকল বিত্ত রেখে গেছে পুঞ্জীভূত করি।
তব রস-সম্পদেরে, যশোধনে, কলা-প্রতিভারে,
অর্কক্ষেত্রে রেখে গেছে কোণারক মন্দিরপ্রাকারে।
তোমার প্রেমাশ্রুধারা হেমপাত্রে জমায়ে প্রস্তার
বিন্দুসরোবরতীরে রেখে গেছে মহামেঘেশ্বরে।
তখন কি ভেবেছিলে শিলাময় নৈবেদ্য তোমার
অসুরের ভোগ্য হবে—অর্ঘ্য যাহা বিশ্বদেবতার?
শ্রীসম্ভার সমারোহ এত সব কার আয়োজন?
অর্থ-শ্যেন ধর্ম্ম-বৈরী দস্যুদের শুধু নিমন্ত্রণ।

শক্তিমত্ত রক্তবীজ বক্তিয়ার অগ্রদূত হয়ে
যেই ধ্বংস-বন্যা দেশে দিল্লী হ'তে এসেছিল লয়ে
ব্যাহত করিলে তারে। বঙ্গসম হওনি বিনত,
অনঙ্গভীমের গদা মদগর্ব্বে তখনো উদ্যত।

মাতঙ্গসম্পদ তব লুব্ধ করি রাজদস্যুগণে
লয়ে এলো শুণ্ডে টানি গিরিগাহে গজাঢ্য গহনে।
বঙ্গীয় তুগ্রেল এলো, ব্যাঘ্র সম এলো তোগলক
মালবী হোসাঙ এলো বাহ্‌মনী ফেরোজ লুণ্ঠক।
শতাব্দী ধরিয়া হলো তব গজশক্তির লুণ্ঠন,
তার সাথে গেল তব মদমত্ত প্রফুল্ল যৌবন।
কেমনে সহিলে তুমি ফতে খাঁর নির্ম্মম নিগ্রহ?
দুর্ম্মদ কামাল হস্তে কলঙ্কিত দেবের বিগ্রহ?
দহিল প্রভুর রথ কেশোমারু কেশীর সমান
মূর্ত্ত অকল্যাণ সম ধূর্ত্ত ক্রূর আসিল 'কল্যাণ'।

শতাব্দী নিশান্তে পুন ঊষা এলো, উদিল তপন,
চন্দ্র হ'তে সূর্য্যকুলে এলো তব রাজসিংহাসন।
বিজয়রাজীব বনে পুন শ্রুত চারণ-ঝঙ্কার
আবিদভ গৌড়বঙ্গে হলো তব শক্তির বিস্তার।
উড়াল কপিশ কেতু গঙ্গাতটে কপিলেন্দ্র ভূপ,
কৃষ্ণা-কাবেরীর কূলে রচি যত জয়যজ্ঞযূপ।

বিজয়নগর যুঝি পরাজয় করিল স্বীকার
পুরুষোত্তমের কীর্ত্তি, সাক্ষী—সাক্ষিগোপাল তাহার।
প্রতিহত পদে পদে ইস্মাইল হোসেনের সেনা—
সে সৌভাগ্য-সূর্য্য তব অস্তমিত, আর ফিরিবে না।

তার পর চিরতরে ঘনাইল ঐহিক দুর্দ্দিন
রাজর্ষি প্রতাপ-রুদ্র রাজৈশ্বর্য্য-ভোগে উদাসীন
গৌরপ্রেমে ত্যাগমন্ত্রে নিল দীক্ষা ; হরিনামতৃষা
ভুলাইল রাজ্যলোভ ক্ষতি ক্ষোভ জিঘাংসা জিগীষা।
গজমতি জয়মালা দূরে ফেলি দিল 'গজপতি',
তুলসীর জপমালা দিল তারে ব্রজরজে মতি।
শ্যামে রাজবেশ সঁপি নিল চীর, চিরদাস্যধন,
সারাদেশ তার সাথে প্রেমাবেশে করিল নর্ত্তন।
মন্ত্রণার ছলে কর্ণে মহামন্ত্র অর্পিয়া রাজার
করিল সার্থক ধন্য মন্ত্রিনাম রামানন্দ রায়।
কীর্ত্তন তাণ্ডবতলে হলো রাজ 'প্রতাপ' মর্দ্দিত,
ত্যাগের বিজয়বার্ত্তা হলো মধ্যে মৃদঙ্গে মন্দ্রিত।
প্রভুর রথের আগে রাজা করে ধূলায় লুণ্ঠন,
শ্যেনদস্যুগণে করে শুকরাজকুলায়-লুণ্ঠন।
চৌদিকে তুলিল মৌলি এ সুযোগে যত বৈরিগণ
পৌরযুদ্ধে সৌরবংশ হারাইল গৌরবকেতন।
রণঝঞ্ঝা, রক্ত-বন্যা, প্রজাদ্রোহ, রাজমুণ্ডপাত
হরিয়া পৌরুষ তব ক্রমে তোমা করিল অনাথ।

দক্ষিণে জাগিল বৈরী ইব্রাহিম, বঙ্গে সুলেমান,
শৃঙ্গযুগে রণষণ্ড আক্রমিতে হলো ধাবমান।
এলো কালাপাহাড়ের কালান্তক হিংসার বাহিনী
শরীর শিহরি উঠে স্মরি সেই ধ্বংসের কাহিনী !
তিল তিল রক্ত দিয়ে ভক্তি দিয়ে যুগ যুগ ধরি,
যা কিছু গড়িয়াছিলে ছিলে বক্ষ-পঞ্জরে আঁকড়ি
করিলে সর্ব্বস্ব পণ যার লাগি হে দুর্ভাগা দেশ,
সকলি হইল চূর্ণ কলঙ্কিত, ধ্বস্ত ধূলিশেষ।
দেবতা শুদ্ধির লাগি চিতাগ্নিতে করিলেন স্নান,
রাবণের চিতাসম সেই চিতা আজো অনির্ব্বাণ।
মর্ম্মাহত 'মুকুন্দের' মর্ম্মভেদী মৃত্যু হাহাকার,
'গোবিন্দের' আর্ত্তনাদ আজো বক্ষে গুমরে তোমার।
কেবল তোমারি বৈরী-নহে—নহে সে কালাপাহাড়,
মহামানবের শত্রু—বৈরী সে যে জ্ঞান সভ্যতার।
দেশকাল, ইতিহাস, কাব্য, প্রত্ন, শিল্প, ধর্ম্ম, জাতি
সবারি অমিত্র সে যে,—সৃষ্টিত্রাস, স্রষ্টারো অরাতি।
চিতাভস্মে নৃকঙ্কালে সারাদেশ করিয়া শ্মশান,
তাণ্ডব-উৎসবলীলা আরম্ভিল প্রমত্ত পাঠান।
দাউদ, কতলু খাঁন, ওস্‌মান, খাঁজাহান লোদী
তার মাঝে একে একে বহাইল শোণিতের নদী।
ভূমিসাৎ পুরসৌধ ভস্মসাৎ পল্লী-জনপদ,
শস্যশূন্য ক্ষেত্রভূমি রক্তারুণ নদীনদ হ্রদ।
শুণ্ডহীন গণপতি, ষণ্ডহীন অচল শঙ্কর,
তুণ্ডহীন নবগ্রহ, মুণ্ডহীন ভক্ত কপিবর।
থামিল মৃদঙ্গ-শঙ্খ, স্তব্ধ—গীতি-গোবিন্দের গান,
পলাইল দলে দলে গিরিবনে তোমার সন্তান।

এ দুর্দ্দিনে পরিত্রাতা শূরসিংহ মানসিংহ রায়
ফিরিল ক্ষণিক শান্তি তাঁর শৌর্য্যে তাঁর করুণায়।
আকবরী উদারতা স্মরো তুমি কৃতজ্ঞতাভরে,
তোমার সন্তানগণ বন ত্যজি ফিরেছিল ঘরে।
তার পর উদাসীন কিছু দিন দিল্লীর মোগল,
শোষক হইল তব যত উপপাসকের দল।
কুলী খাঁ কুলিশসম তব বক্ষে করিল বিহার
শা সুজা তোমার স্কন্ধে চাপাইল গুরু করভার।
রসিদ রসদ হরি' সারাদেশে করিল ভিখারী,
পিইল শোণিত তব তখা খাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি।
নদীর মন্দির ভিত্তি নিরমিল মস্‌জিদের চূড়া,
আক্রমি নৃসিংহমঠ খাঁ আক্রাম ক'রে দিল গুঁড়া।
বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁর কু-শাসনে বর্গী এলো দেশে।
সিন্ধুতীরে হিন্দু এলো মন্দভাগ্যে লুণ্ঠকের বেশে।
হিন্দুরেও বন্ধু বলি হায় তুমি পারনি গণিতে,
মাধোজীর মধুপর্ক ভ'রে দিলে হৃদয়-শোণিতে।
চৌথ লাগি বর্ষে বর্ষে মারাঠার শোষ নির্য্যাতন,
সারাদেশ ভরি শুধু হাহাকার—লুণ্ঠন—লুণ্ঠন।
শ্মশান করিয়া গেল ধ্বংস-নৃত্যে অহিন্দুর দল,
শৃগাল-কুকুরগণ অস্থি নিয়ে বাধাল কোন্দল।
হিন্দুসনে অহিন্দুর তব ভাগ্যে কি রাজযোটক।
কটকে কটক রচি, ছুটাইল মারাঠা ঘোটক,—
চিল্কাতীরে উল্কাসম নিস্বনিল বর্গী তরবার,
খণ্ডগিরি গুম্ফা হলো যত দস্যুশুল্কের ভাণ্ডার।
ইহারা হরিল সবি মাটী খুঁড়ি ধূলিবালি ছাঁকি,
পিত্তল কাঁসা বা তামা এক তোলা রাখিল না বাকী।
নাসা-কর্ণ ছিঁড়ে এরা স্বর্ণরতি করিল হরণ,
বঁটিতে কাটিয়া নিল শিশুদেরো কটির ভূষণ।
কেড়ে নিল কোশাকুশী ছিঁড়ে নিল কবচ-মাদুলী,
একটি মাথার মূল্য শুধুমাত্র সিকি কি আধুলী।
তীর্থপ্রবেশের আগে যাত্রীদের লুটিল সকল,
মন্দিরে কি মণিবন্ধে শঙ্খ ছাড়া ছিল না সম্বল।
তীর্থপথ রুদ্ধ হলো ভক্তদের করোটিকঙ্কালে,
দোলমঞ্চ পূর্ণ হলো গৃধ্র-কাক-কুকুর-শৃগালে।
এড়াইতে শ্যেনদৃষ্টি মারাঠার লুব্ধ ক্ষুধাতুর,
শ্রীসৌষ্ঠব সারাদেশ বিনাশিল আপন তনুর।
উপবাসে অনাদরে অঙ্গপুষ্টি ধ্বংস করি শেষে
হইল কুটীরবাসী পৌরগণ বাউলের বেশে।

আজো তুমি রহিয়াছ সেইরূপই শ্রীবিলাসহীন
শীর্ণ রূঢ় ভীতিমূঢ় দীনবেশ কুণ্ঠিত মলিন।
ভবানী পণ্ডিত, সাহু, রাজারাম, মাধোজীর ডরে,
সশঙ্ক শশকসম কাঁপিতেছ আজো ঘরে ঘরে !
পঙ্গু জড় হীনবল করি তোমা বর্গীর অঙ্কুশ—
নির্য্যাতনে নিপীড়নে হরিয়াছে সতেজ পৌরুষ।

শুধু কি মানুষ বাদী ? তোমা পরে দেবতাও বাম।
নিসর্গের উপসর্গ পীড়িতেছে তোমা অবিরাম।
অতিবর্ষ, অনাবর্ষ, ঝঞ্ঝা-বন্যা লবণ-পাথার
পুরজনপদ তব ধ্বংস করি তুলে হাহাকার।
পলে পলে দগ্ধ তুমি শস্যাভাবে তুষের অনলে,
সবল সন্তান তব গ্রস্ত মহামারীর কবলে।
লক্ষ্মীর দুলাল ছিলে অন্নদার বদান্য ভাণ্ডারী,
একমুষ্টি অন্নতরে জনারণ্যে আজিকে ভিখারী।

তব দেউলেরি মত ছিল তুঙ্গ তব অন্নকূট,
নিরন্ন ঘুরিছ এবে মঠে মঠে পাতি করপুট।
আজি দগ্ধোদর লাগি মসীদিগ্ধ তোমার তনয়,
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে উঞ্ছবৃত্তি করেছে আশ্রয়।

হায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ, উপদ্রুত প্রহ্লাদের মত,
ধর্ম্মে বক্ষে ধরি তুমি অসি-বনে উগ্রতপোরত।
সিদ্ধার্থের যেই বাণী সুপ্ত ছিল তব পুণ্য বুকে
ধ্বনিল দীক্ষার মন্ত্রে তাই গুরু উপগুপ্তমুখে।
আপন সন্তানগণে বলি দিয়া সমরের যূপে—
ভিক্ষুর গৈরিক দণ্ড ধরাইলে ভারতের ভূপে।
সহস্র লাঞ্ছনা পীড়া উপদ্রব উৎপীড়ন লাজে,
ধর্ম্মে তুমি ভেলা করি ভাসিয়াছ ব্যথাসিন্ধুমাঝে।
দৈত্যে হরিয়াছে অর্ঘ্য—সমর্পিত দেবের মন্দিরে,
আজ্যপুষ্ট যজ্ঞানল বার বার নিভেছে রুধিরে।
দারুণ পরীক্ষা-দণ্ডে বার বার করি দর্প চূর,
রাজসিক অর্ঘ্য তব লননিক কাঙাল ঠাকুর।
নশ্বর বৈভবে অর্ঘ্য যত তুমি করেছ অর্পণ,
বিলায়ে দেছেন প্রভু, অর্ঘ্য চা'ন সনাতন ধন।
তোমার ভক্তির বশে তুষ্ট হয়ে প্রেমের ঈশ্বর,
দুঃখমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষা দিল চির-দৈন্য বর।
দীনে তিনি রাজ্য দেন, আঢ্যে দেন দৈন্য মহাধন,
দুর্ব্বলেরে দেন বল, প্রবলের করেন হরণ।
দৈন্য যেথা শ্রেষ্ঠ ধন সেথা তুমি সকলের বড়,
প্রেমিকের ভিক্ষাপাত্র তুমি তাই অশ্রু দিয়ে ভরো।
সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ লভিলেন তব মাধুকরী,
শত শত বাহুপাশে তাঁরে তুমি ছিলে বক্ষে ধরি'।
কত রাজ-রাজেন্দ্রেরা পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ,
তোমারে সঁপিয়া গেছে শেষের সম্বল দৈন্য-ধন।
শঙ্কর সর্ব্বস্ব হরি' দিল তোমা মহাশঙ্খহার,
আচার্য্যের রূপে পুন ভুলাইল অনিত্য সংসার।
হারায়েছ সৌধহর্ম্ম্য, আছে মঠ-মন্দির-গৌরব,
সাধু মহাগুরুদের অস্থি তব প্রোথিত বৈভব।
প্রেমের আতিথ্যে তব তুষ্ট হয়ে দুঃখীর ঠাকুর,
করিয়া রেখেছে তোমা চিরতরে কাঙাল বিদুর।

এই দুঃখ-দীক্ষা মন্ত্র এ দারিদ্র্যে করিয়া সম্বল,
জাগো পুনঃ সুপ্তবীর, তোল' শির পতিত উৎকল!
পশুবল পেশীবল বিশ্বজয়ী নহে নহে আর,
পূজার শঙ্খের পাশে নমে অসি ভগ্ন তরবার।
গ্রীষ্মে মহানদী-সম আজি তুমি বালুকা-পাথার,
স্মরো সেই দিন যবে হলো নামকরণ তাহার।
শৈলশিরে আরোহিয়া হের অই দিগন্তসীমাতে,
নাহি আর শত্রুচিহ্ন, দেবতারে হবে না লুকাতে।
রক্তসিন্ধু শুকায়েছে—প্রেম-সিন্ধু হের নীলিমায়,
তার সনে মৈত্রী কর—বিশালতা শিখাবে তোমায়!
নবযুগ-প্রভাতের স্বস্তিগীতি কবিকণ্ঠে শুন,
কুণ্ঠিত শঙ্কিত ভীরু এ প্রভাতে আঁখি মেল' পুনঃ।
চরম সাধন'পথ বিশ্বমাঝে নিঃস্বতায় স্থরু,
এ কথা তোমারে নিত্য শুনায়েছে শত ধর্ম্মগুরু।
শক্তির শ্মশান তুমি ঐশ্বর্য্যের সমাধিনিলয়,
জান তুমি রাজশক্তি বৈভবের কোথায় বিলয়?
এবার ঐশ্বর্য্যে নহে, জাগো তুমি প্রজ্ঞার জগতে,
যাত্রা কর মৈত্রীলোকে সত্ত্বপুণ্য রজঃশূন্য পথে।
দূর কর সংকীর্ণতা, জীর্ণপ্রথা, ভ্রমের সংস্কার,
জড়তা মূঢ়তা ভীতি তামসিক হীন মিথ্যাচার।
জগতের প্রেমযজ্ঞে পান কর সোমের মাধুরী,
হে উৎকল, ভুলো নাক তব বক্ষে **জগন্নাথপুরী**

শ্রীকালিদাস রায়

হিন্দু-বিধবা

পুণ্য শুক্লাম্বর-পরা   রূপে বিশ্ব আলো করা,
তৈলহীন রুক্ষকেশ মুক্ত বিলম্বিত,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা মহিমামণ্ডিত।

সন্ধ্যার ললাটে হায়   দীপ্ত নক্ষত্রের প্রায়
স্নিগ্ধ কান্তি, বিস্ফারিত আঁখি যুগ স্থির,
কপোল পাণ্ডুর, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর।

অঙ্গে নাহি অলঙ্কার   কাঞ্চী, বাজু, বালা, হার,
তবু কত দীপ্তিময়ী যেন অরুন্ধতী,
অনল হৃদয়-গতা স্বাহা মূর্ত্তিমতী!

সীমন্তে সিন্দুর নাই   আশা তৃষ্ণা—ভস্ম ছাই,
কি দিব্য স্বর্গীয় প্রভা স্বর্গীয় কিরণ,
জীবনের প্রেমরাশি সম্বল মরণ।

স্বামিপূজা স্বামী ধ্যান   বিশ্বরূপ স্বামী-জ্ঞান
দলিছ অশিব সব পতি প্রেম বলে,
বিরাজিতা বিশ্বমাতারূপে মহীতলে।

উপবাস একাহার   জীর্ণ তনু সুকুমার
নির্ব্বাপিত কামনার দৃপ্ত পরাক্রম,
বিলাস-বাসনা-জিত বিশুদ্ধ সংযম।

কি মহান্ আত্মজয়   পরার্থে জীবন ক্ষয়
ধন্য বসুন্ধরা তব পদখানি সেবি।
হিন্দুর বিধবা তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ভৌ

ইটাজাতির ইতিবৃত্ত

বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে ও বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধকে সংক্ষুব্ধ করিবে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। স্থাবর ও জঙ্গম উভয় রাজ্যেই এই নিয়মের সমান প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি পূর্ণায়তন খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষের কাণ্ডসংলগ্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি অশ্বত্থবীজ কালক্রমে নিজ অঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অসময়ের আশ্রয়দাতা উক্ত খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষকে মূল বন্ধনী দ্বারা পিষ্ট ও ধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আবার মুষ্টিমেয় আর্য্য-জনসঙ্ঘ নদ নদী-বহুল উর্ব্বর প্রদেশবাসী অনার্য্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। প্রবলের সহবাসে দুর্ব্বল অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় জনসঙ্ঘ পর্য্যায়ক্রমে আগমন পূর্ব্বক অত্রস্থ আদিম অধিবাসিপুঞ্জকে বিতাড়িত বা বশীভূত করিয়া নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, পৃথিবীস্থ অনেকানেক ভূখণ্ডসমূহে সেই প্রকার জনসঙ্ঘের গতিবিধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জবাসী ইটা নামক একটি ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্ত এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য বহু অনার্য্য জাতি বাস করে, কিন্তু ইটারাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম জাতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই জাতি পুরাকালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্ব্বত্রই বসবাস করিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিব্রাজকবর্গের সংসর্গে ও শিক্ষাগুণে ইহাদের অমার্জ্জিত অনার্য্য চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছিল—উহা ইহাদের ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার, অগ্ন্যুৎপাদক প্রক্রিয়া, রোগ-প্রতীকারার্থ ঔষধি-নির্ব্বাচন, অঙ্গাচ্ছাদন প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহারপ্রবৃত্তি, পশুহননান্তর উহা অগ্নিতে পাককরণ, কাষ্ঠাদির উপর কারুকার্য্য, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং বিবাহাদি বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতির অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি আর্য্যজনোচিত কার্য্যকলাপ দর্শনে কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কালক্রমে মার্কিণ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সভ্য মালয়, পম্পাঙ্গান প্রভৃতি জাতিবর্গের অভ্যুদয় হয় এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে এবং মার্কিণ ঔপনিবেশিকগণের বুদ্ধি-কৌশলে ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে নিকৃষ্ট অস্ত্রধারী, হীনবুদ্ধি এই আদিম জাতিবর্গ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ দুর্গম অরণ্যানীপ্রদেশে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। এই জাতির নামকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পম্পাঙ্গান ভাষায় "ইটা" শব্দের অর্থ উচ্চতর—অর্থাৎ ইহাদিগকে ক্রমাগত প্রপীড়িত করিতে করিতে ফিলিপাইন দ্বীপের উচ্চতর দুর্গম প্রদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এই জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিগ্রিটো, বেলুচা, বুকাইল, সিমাং প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

ইটাগণ যে প্রদেশে পর্য্যটন করে, উহা নিতান্ত দুর্গম ও নির্জ্জন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যে উপকূল বিভাগে সুনীল প্রশান্তমহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা জলমগ্ন প্রবাল-গঠিত প্রাচীরশ্রেণীর উপর অপ্রতিহত প্রভাবে প্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতেছে ও একমাত্র নদী-মোহনা ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যে প্রদেশে প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেই অত্যুচ্চ পার্ব্বতীয় উপকূলস্থ চিরহরিৎ বিজন অরণ্যানীপ্রদেশ ইটাদিগের প্রিয় আশ্রয়স্থান। এই বন্যভূমি এতই দুর্গম ও নিবিড় যে, ইহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও বন্যভূমির তুলনা হইতে পারে না। এই অরণ্যস্থিত মহীরুহসকল অত্যন্ত ঘন-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহাদিগের কাণ্ড মূলদেশ হইতে ষষ্টি, সপ্ততি হস্ত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখাবিহীন হইয়া থাকে। তদূর্দ্ধে ঐ সকল শাখাপ্রশাখা সুদূর-প্রসারিত হইয়া যেন পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি নানাজাতীয় উপবৃক্ষসকল (orchids) উদ্ভূত হইয়া ফল ও পুষ্পসজ্জায় ঐ অরণ্যের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে শৈবালরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ স্বভাবসুন্দর পত্রান্তরগুলিকে এরূপ ঘনসংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যালোক সর্ব্বতোভাবে সংবৃত করিয়াছে। এমন কি, মধ্যাহ্নকালেও উহার তলদেশ ঊষালোকাপেক্ষা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আদিম সুদূরব্যাপী অরণ্যপ্রদেশে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী, বানর ও নয়নরঞ্জন কীট-পতঙ্গাদি বহু পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। অশেষ প্রকার নৈসর্গিক অসুবিধা প্রযুক্ত এবং বোধ হয় আশানুরূপ অর্থাগমের সম্ভাবনা না থাকায় এই সকল প্রদেশ অদ্যাপি সভ্যসম্প্রদায়ের লোলুপদৃষ্টির বহির্ভাগে রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ স্বভাবসম্ভূত বৃক্ষলতাদিগঠিত চির-হরিৎ চন্দ্রাতপের আশ্রয়ে বসবাসের ফলে ইটাগণ গৃহনির্ম্মাণ ও শয্যারচনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও কচিৎ ইহাদিগকে অস্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু দুইটি বংশদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক খণ্ড বংশ ও যৎসামান্য শুষ্ক তৃণ বিছাইয়া দিয়াই উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহা আশ্রয়স্থান হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং প্রবল বায়ুবেগে উহা কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

ইটাগণ কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। ইহারা ভারতবর্ষীয় বেদে নামক যাযাবর সম্প্রদায়ের ন্যায় ভ্রমণশীল জাতিরূপে কালাতিপাত করে এবং দৈনন্দিন খাদ্য আহরণোদ্দেশ্যে যে স্থানে যে দিন উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই সে দিন বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে অবস্থান করে। শুষ্ক ঋতুতে ইহারা সমুদ্র-উপকূলে প্রান্তরাদিতে বা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিচরণ করে, কিন্তু বর্ষাসমাগমে ইহারা সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে এবং বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে শরীররক্ষার্থ কোন প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে, কোন পর্ব্বতের অন্তরালে বা গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় লয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষা হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত সহযোগে প্রবল বায়ুপ্রবাহ বন্যভূমি বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে, তখন হতভাগ্য ইটাগণ উভয় জঙ্ঘার মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া এবং তদুপরি হস্তদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কুণ্ডলীকৃত ও নিশ্চলভাবে ঝঞ্ঝাবাত নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক স্থানে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটিয়া যায়। জন্মাবধি এবম্প্রকার নানাবিধ নৈসর্গিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হওয়ায় ইটাগণ অত্যন্ত স্বল্পায়ু হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ ৪০ বৎসরের মধ্যেই জীবলীলা সংবরণ করে। এই জাতির মধ্যে মৃত্যুর পরিমাণ জন্মের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা এখানে আগমন করেন, তখন ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই ইটাগণ বসবাস করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২০ সহস্রের অধিক হইবে কি না সন্দেহ।

ইটা জাতির স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাপনোপায় ও আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অনার্য্য জাতি সমূহের সহিত কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদিগকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা বড়ই সমস্যার বিষয়। তবে ইহাদিগকে আদিম নিগ্রো-বংশোদ্ভূত খর্ব্ব যাযাবর সম্প্রদায় আখ্যা প্রদান করিলে বোধ হয় ঠিক হয়।

তব দেউলেরি মত ছিল তুঙ্গ তব অন্নকূট,
নিরন্ন ঘূরিছ এবে মঠে মঠে পাতি করপুট।
আজি দগ্ধোদর লাগি মসীদিগ্ধ তোমার তনয়,
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে উঞ্ছবৃত্তি করেছে আশ্রয়।

হায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ, উপদ্রুত প্রহ্লাদের মত,
ধর্ম্মে বক্ষে ধরি তুমি অসি-বনে উগ্রতপোরত।
সিদ্ধার্থের যেই বাণী সুপ্ত ছিল তব পুণ্য বুকে
ধ্বনিল দীক্ষার মন্ত্রে তাই গুরু উপগুপ্তমুখে।
আপন সন্তানগণে বলি দিয়া সমরের যূপে—
ভিক্ষুর গৈরিক দণ্ড ধরাইলে ভারতের ভূপে।
সহস্র লাঞ্ছনা পীড়া উপদ্রব উৎপীড়ন লাজে,
ধর্ম্মে তুমি ভেলা করি ভাসিয়াছ ব্যথাসিন্ধুমাঝে।
দৈত্যে হরিয়াছে অর্ঘ্য—সমর্পিত দেবের মন্দিরে,
আজ্যপুষ্ট যজ্ঞানল বার বার নিভেছে রুধিরে।
দারুণ পরীক্ষা-দণ্ডে বার বার করি দর্প চূর,
রাজসিক অন্য তব লননিক কাঙাল ঠাকুর।
নশ্বর বৈভবে অর্ঘ্য যত তুমি করেছ অর্পণ,
বিলায়ে দেছেন প্রভু, অর্ঘ্য চা'ন সনাতন ধন।
তোমার ভক্তির বশে তুষ্ট হয়ে প্রেমের ঈশ্বর,
দুঃখমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষা দিল চির-দৈন্য বর।
দীনে তিনি রাজ্য দেন, আঢ্যে দেন দৈন্য মহাধন,
দুর্ব্বলেরে দেন বল, প্রবলের করেন হরণ।
দৈন্য যেথা শ্রেষ্ঠ ধন সেথা তুমি সকলের বড়,
প্রেমিকের ভিক্ষাপাত্র তুমি তাই অশ্রু দিয়ে ভরো।
সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ লভিলেন তব মাধুকরী,
শত শত বাহুপাশে তাঁরে তুমি ছিলে বক্ষে ধরি'।
কত রাজ-রাজেন্দ্রেরা পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ,
তোমারে সঁপিয়া গেছে শেষের সম্বল দৈন্য-ধন।

শঙ্কর সর্ব্বস্ব হরি' দিল তোমা মহাশঙ্খহার,
আচার্য্যের রূপে পুন ভুলাইল অনিত্য সংসার।
হারায়েছ সৌধহর্ম্ম্য, আছে মঠ-মন্দির-গৌরব,
সাধু মহাগুরুদের অস্থি তব প্রোথিত বৈভব।
প্রেমের আতিথ্যে তব তুষ্ট হয়ে দুঃখীর ঠাকুর,
করিয়া রেখেছে তোমা চিরতরে কাঙাল বিদুর।

এই দুঃখ-দীক্ষা মন্ত্র এ দারিদ্র্যে করিয়া সম্বল,
জাগো পুনঃ সুপ্তবীর, তোল' শির পতিত উৎকল!
পশুবল পেশীবল বিশ্বজয়ী নহে নহে আর,
পূজার শঙ্খের পাশে নমে অসি ভগ্ন তরবার।
গ্রীষ্মে মহানদী-সম আজি তুমি বালুকা-পাথার,
স্মরো সেই দিন যবে হলো নামকরণ তাহার।
শৈলশিরে আরোহিয়া হের অই দিগন্তসীমাতে,
নাহি আর শক্রচিহ্ন, দেবতারে হবে না লুকাতে।
রক্তসিন্ধু শুকায়েছে—প্রেম সিন্ধু হের নীলিমায়,
তার সনে মৈত্রী কর—বিশালতা শিখাবে তোমায়।
নবযুগ-প্রভাতের স্বস্তিগীতি কবিকণ্ঠে শুন,
কুণ্ঠিত শঙ্কিত ভীরু এ প্রভাতে আঁখি মেল' পুনঃ।
চরম সাধনাপথ বিশ্বমাঝে নিঃস্বতায় সুরু,
এ কথা তোমারে নিত্য শুনায়েছে শত ধর্ম্মগুরু।
শক্তির শ্মশান তুমি ঐশ্বর্য্যের সমাধিনিলয়,
জান তুমি রাজশক্তি বৈভবের কোথায় বিলয়?
এবার ঐশ্বর্য্যে নহে, জাগো তুমি প্রজ্ঞার জগতে,
যাত্রা কর মৈত্রালোকে সত্ত্বপুণ্য রজঃশূন্য পথে।
দূর কর সংকীর্ণতা, জীর্ণপ্রথা, ভ্রমের সংস্কার,
জড়তা মূঢ়তা ভীতি তামসিক হীন মিথ্যাচার।
জগতের প্রেমযজ্ঞে পান কর সোমের মাধুরী,
হে উৎকল, ভুলো নাক তব বক্ষে **জগন্নাথপুরী!**

শ্রীকালিদাস রায়।

হিন্দু-বিধবা

পুণ্য শুক্লাম্বর-পরা রূপে বিশ্ব আলো করা,
তৈলহীন রুক্ষকেশ মুক্ত বিলম্বিত,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা মহিমামণ্ডিত।

সন্ধ্যার ললাটে হায় দীপ্ত নক্ষত্রের প্রায়
স্নিগ্ধ কান্তি, বিস্ফারিত আঁখি যুগ স্থির,
কপোল পাণ্ডুর, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর।

অঙ্গে নাহি অলঙ্কার কাঞ্চী, বাজু, বালা, হার,
তবু কত দীপ্তিময়ী যেন অরুন্ধতী,
অনল হৃদয়-গতা স্বাহা মূর্ত্তিমতী!

সীমন্তে সিন্দুর নাই আশা তৃষ্ণা—ভস্ম ছাই,
কি দিব্য স্বর্গীয় প্রভা স্বর্গীয় কিরণ,
জীবনের প্রেমরাশি সম্বল মরণ।

স্বামিপূজা স্বামী ধ্যান বিশ্বরূপ স্বামী-জ্ঞান
দলিছ অশিব সব পতি প্রেম বলে,
বিরাজিতা বিশ্ব-মাতারূপে মহীতলে।

উপবাস একাহার জীর্ণ তনু সুকুমার
নির্ব্বাপিত কামনার দৃপ্ত পরাক্রম,
বিলাস-বাসনা-জিত বিশুদ্ধ সংযম।

কি মহান্ আত্মজয় পরার্থে জীবন ক্ষয়
ধন্য বসুন্ধরা তব পদখানি সেবি।
হিন্দুর বিধবা তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী॥

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক।

ইটাজাতির ইতিবৃত্ত

বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে ও বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধকে সংক্ষুব্ধ করিবে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। স্থাবর ও জঙ্গম উভয় রাজ্যেই এই নিয়মের সমান প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি পূর্ণায়তন খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষের কাণ্ডসংলগ্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি অশ্বত্থবীজ কালক্রমে নিজ অঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অসময়ের আশ্রয়দাতা উক্ত খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষকে মূল বন্ধনী দ্বারা পিষ্ট ও ধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আবার মুষ্টিমেয় আর্য্য-জনসঙ্ঘ নদ-নদী-বহুল উর্ব্বর প্রদেশবাসী অনার্য্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। প্রবলের সহবাসে দুর্ব্বল অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় জনসঙ্ঘ পর্য্যায়ক্রমে আগমন পূর্ব্বক অত্রস্থ আদিম অধিবাসিপুঞ্জকে বিতাড়িত বা বশীভূত করিয়া নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, পৃথিবীস্থ অনেকানেক ভূখণ্ডসমূহে সেই প্রকার জনসঙ্ঘের গতিবিধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জবাসী ইটা নামক একটি ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্ত এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য বহু অনার্য্য জাতি বাস করে, কিন্তু ইটারাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম জাতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই জাতি পুরাকালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্ব্বত্রই বসবাস করিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিব্রাজকবর্গের সংসর্গে ও শিক্ষাগুণে ইহাদের অমার্জ্জিত অনার্য্য চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছিল—উহা ইহাদের ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার, অগ্ন্যুৎপাদক প্রক্রিয়া, রোগ-প্রতীকারার্থ ঔষধি-নির্ব্বাচন, অঙ্গাচ্ছাদন প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহারপ্রবৃত্তি, পশুহননান্তর উহা অগ্নিতে পাককরণ, কাষ্ঠাদির উপর কারুকার্য্য, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং বিবাহাদি বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতির অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি আর্য্যজনোচিত কার্য্যকলাপ দর্শনে কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কালক্রমে মার্কিণ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সভ্য মালয়, পম্পাঙ্গান প্রভৃতি জাতিবর্গের অভ্যুদয় হয় এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে এবং মার্কিণ ঔপনিবেশিকগণের বুদ্ধি-কৌশলে ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে নিকৃষ্ট অস্ত্রধারী, হীনবুদ্ধি এই আদিম জাতিবর্গ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ দুর্গম অরণ্যানীপ্রদেশে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। এই জাতির নামকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পম্পাঙ্গান ভাষায় "ইটা" শব্দের অর্থ উচ্চতর—অর্থাৎ ইহাদিগকে ক্রমাগত প্রপীড়িত করিতে করিতে ফিলিপাইন দ্বীপের উচ্চতর দুর্গম প্রদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এই জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিগ্রিটো, বেলুচা, বুকাইল, সিমাং প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

ইটাগণ যে প্রদেশে পর্য্যটন করে, উহা নিতান্ত দুর্গম ও নির্জ্জন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যে উপকূল বিভাগে সুনীল প্রশান্তমহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা জলমগ্ন প্রবাল-গঠিত প্রাচীরশ্রেণীর উপর অপ্রতিহত প্রভাবে প্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতেছে ও একমাত্র নদী-মোহনা ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যে প্রদেশে প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেই অত্যুচ্চ পার্ব্বতীয় উপকূলস্থ চিরহরিৎ বিজন অরণ্যানীপ্রদেশ ইটাদিগের প্রিয় আশ্রয়স্থান। এই বন্যভূমি এতই দুর্গম ও নিবিড় যে, ইহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও বন্যভূমির তুলনা হইতে পারে না। এই অরণ্যাস্থিত মহীরুহসকল অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহাদিগের কাণ্ড মূলদেশ হইতে ষাটি, সপ্ততি হস্ত ঊর্দ্ধ্ব পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখাবিহীন হইয়া থাকে। তদূর্দ্ধে ঐ সকল শাখাপ্রশাখা সুদূর-প্রসারিত হইয়া যেন পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি নানাজাতীয় উপবৃক্ষসকল (orchids) উদ্ভূত হইয়া ফল ও পুষ্পসজ্জায় ঐ অরণ্যের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে শৈবালরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ স্বভাবসুন্দর পত্রান্তরগুলিকে এরূপ ঘনসংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যালোক সর্ব্বতোভাবে সংবৃত করিয়াছে। এমন কি, মধ্যাহ্নকালেও উহার তলদেশ ঊষালোকাপেক্ষা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আদিম সুদূরব্যাপী অরণ্যপ্রদেশে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী, বানর ও নয়নরঞ্জন কীট-পতঙ্গাদি বহু পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। অশেষ প্রকার নৈসর্গিক অসুবিধা প্রযুক্ত এবং বোধ হয় আশানুরূপ অর্থাগমের সম্ভাবনা না থাকায় এই সকল প্রদেশ অদ্যাপি সভ্যসম্প্রদায়ের লোলুপদৃষ্টির বহির্ভাগে রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ স্বভাবসম্ভূত বৃক্ষলতাদিগঠিত চির-হরিৎ চন্দ্রাতপের আশ্রয়ে বসবাসের ফলে ইটাগণ গৃহনির্ম্মাণ ও শয্যারচনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও কচিৎ ইহাদিগকে অস্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু দুইটি বংশদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক খণ্ড বংশ ও যৎসামান্য শুষ্ক তৃণ বিছাইয়া দিয়াই উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহা আশ্রয়স্থান হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং প্রবল বায়ুবেগে উহা কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

ইটাগণ কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। ইহারা ভারতবর্ষীয় বেদে নামক যাযাবর সম্প্রদায়ের ন্যায় ভ্রমণশীল জাতিরূপে কালাতিপাত করে এবং দৈনন্দিন খাদ্য আহরণোদ্দেশ্যে যে স্থানে যে দিন উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই সে দিন বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে অবস্থান করে। শুষ্ক ঋতুতে ইহারা সমুদ্র-উপকূলে প্রান্তরাদিতে বা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিচরণ করে, কিন্তু বর্ষাসমাগমে ইহারা সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে এবং বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে শরীররক্ষার্থ কোন প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে, কোন পর্ব্বতের অন্তরালে বা গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় লয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষা হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত সহযোগে প্রবল বায়ুপ্রবাহ বন্যভূমি বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে, তখন হতভাগ্য ইটাগণ উভয় জঙ্ঘার মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া এবং তদুপরি হস্তদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কুণ্ডলীকৃত ও নিশ্চলভাবে ঝঞ্ঝাবাত নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক স্থানে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটিয়া যায়। জন্মাবধি এবম্প্রকার নানাবিধ নৈসর্গিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হওয়ায় ইটাগণ অত্যন্ত স্বল্পায়ু হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ ৪০ বৎসরের মধ্যেই জীবলীলা সংবরণ করে। এই জাতির মধ্যে মৃত্যুর পরিমাণ জন্মের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা এখানে আগমন করেন, তখন ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই ইটাগণ বসবাস করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২০ সহস্রের অধিক হইবে কি না সন্দেহ।

ইটা জাতির স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাপনোপায় ও আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অনার্য্য জাতি সমূহের সহিত কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদিগকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা বড়ই সমস্যার বিষয়। তবে ইহাদিগকে আদিম নিগ্রো-বংশোদ্ভূত খর্ব্ব যাযাবর সম্প্রদায় আখ্যা প্রদান করিলে বোধ হয় ঠিক হয়।

ইহাদিগের পূর্ণবয়স্ক পুরুষগণ দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ ৩ ফুট হইতে সার্দ্ধ ৪ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকরা আরও খর্ব্বাকৃতি হয়। ইহারা শৈশবকালে অতিশয় ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রাকারবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরিণতবয়সে বাহ্যদৃশ্যে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখায়, তবে ইহাদের আকারানুযায়ী বলবীর্য্যের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। বরং সাধারণতঃ ইহারা আলস্যপরতন্ত্র দুর্ব্বল, আত্মগোপনতৎপর, নির্ব্বোধ এবং ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের গাত্রের বর্ণ পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, ক্বচিৎ গাঢ় খদিরবর্ণও হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে যেরূপ “মেড়ুয়া” নামক এক প্রকার শস্য খাদ্যরূপে প্রচলিত থাকায় উক্ত মেড়ুয়া শব্দ জাতি-বিশেষের উদ্দেশে শ্লেষোক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ “উবি” নামক এক প্রকার গাঢ় বেগুনী রংয়ের মূল ইটাগণ অত্যধিক ব্যবহার করে বলিয়া উক্ত “উবি” শব্দও বর্ণবিচারার্থ ফিলিপাইনদ্বীপবাসীদের মধ্যে একটি শ্লেষোক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। ইটাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগের ওষ্ঠ মাংসল ও সম্মুখদিকে উল্টাইয়া পড়ে। ইহাদের মস্তকের কেশ এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে যে, ইহা প্রাকৃতিক প্রকোপ হইতে মস্তকরক্ষার্থ যথেষ্ট সাহায্য করে। এমন কি, তদ্দেশীয় দুরন্ত বর্ষাকালে ইটাগণ সামান্য একটি তালপত্র ব্যতীত কোনরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না।

ইটা পুরুষদ্বয় ফলাহরণ নিমিত্ত বৃক্ষারোহণ করিতেছে

ঝরণাপার্শ্বে মৎস্য-সংগ্রহরতা ইটা রমণীদ্বয়

ইটাগণের মধ্যে যাহারা বিলাসী, তাহারা সৌন্দর্য্যশালী হইবার জন্য একটি উত্তপ্ত বংশ-শলাকা দ্বারা নিজ বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ ও বক্ষোদেশে বিচিত্র ছাপ অঙ্কিত করে এবং এই চিহ্ন ইহাদিগের মধ্যে সাতিশয় সৌন্দর্য্যের পরিচায়করূপে পরিগণিত হয়। ইহারা বেশ-বিন্যাসার্থ বংশনির্ম্মিত এক প্রকার চিরুণী ব্যবহার করে এবং মস্তকের উত্তাপ বাহির হইয়া গিয়া উহা শীতল হইবে, এইরূপ মনে করিয়া প্রায়শঃ মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। উহারা সম্মুখ-দন্তগুলির উভয় পার্শ্ব ভগ্ন করিয়া সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট করে। এই কার্য্য নিতান্ত কৌশলহীন উপায়ে নিষ্পন্ন হয়। যে দন্তটি সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট করিতে হইবে, উহার নিম্নে একটি কঠিন কাষ্ঠখণ্ড রাখা হয় এবং একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উক্ত দন্তোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা আঘাত করা হয়। এইরূপে দন্তের উভয় পার্শ্ব ভগ্ন করিবার পর বালুকা-প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মসৃণ করা হয়। এইরূপ করিবার সময় প্রায়ই দন্ত-মূল হইতে প্রভূত রক্তপাত হইয়া থাকে এবং কখন কখন দন্তটি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যসকল ইটাদিগের বড় প্রিয়। ইহারা কান্তিমান নামক একপ্রকার রক্তবর্ণ বস্ত্র অত্যন্ত পছন্দ করে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ অল্পসংখ্যক ইটাই এই বস্ত্র ক্রয় করিতে সমর্থ। অঙ্গাচ্ছাদনার্থ ইহারা সাধারণতঃ কৌপীনমাত্র পরিধান করে। উক্ত কৌপীন একপ্রকার বৃক্ষতন্তু হইতে প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে পাট-গাছ হইতে যেরূপ উপায়ে তন্তু বাহির করা হয়, ইটাগণ ঠিক সেই উপায়ে একপ্রকার বৃক্ষ-ত্বক্ হইতে তন্তু বাহির করিয়া উহা বিনাইয়া কৌপীন প্রস্তুত করে। ঐ কৌপীন-বস্ত্র ধৌত করা হইলে ঠিক সংস্কৃত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের (chamois leather) ন্যায় দেখায়। ইটাগণ উক্ত

কৌপীন একবার পরিধান করিলে যত দিন পর্য্যন্ত না উহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, তত দিন পর্য্যন্ত উহার জীর্ণ-সংস্কার বা উহা পরিত্যাগ করে না।

ইটাগণের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনার শক্তি নিতান্ত হীন। এমন কি, দশ সংখ্যা গণনা করিতে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলির সাহায্য লইতে হয় এবং দুই দশ গণনার আবশ্যক হইলে হস্ত ও পদাঙ্গুলী উভয়ই আবশ্যক হয়। গণিতশাস্ত্রে ইহাই ইহাদের চরম ব্যুৎপত্তি। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যৎসামান্য কৃষিকার্য্যও করে, কিন্তু ইহারা কাষ্ঠফলকের উপর কারুকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করে এবং এই প্রকার কার্য্য করার নিমিত্ত ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। ইটাদিগের শ্রবণশক্তিও অতিশয় প্রবল। এই হেতু বহু দূরবর্ত্তী দৃশ্য ও অতি ক্ষীণ শব্দ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত, উহা তাহারা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে।

ইটাগণের প্রিয় বিজন বনপ্রদেশের এক পার্শ্ব

ইটাগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না, বা এক স্থানে অধিক দিন অবস্থান করে না। এক একটি দলে সচরাচর ১৪।১৫ জন মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সকলে সম্মান করে এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার অনুমতি লইয়া কার্য্য করে। ইটাগণ এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত যে, উহারা নিজ নিজ দলস্থ লোক ব্যতীত কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন কি, ইহাদের স্বজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক যদি বিশেষ পরিচিত না হয়, তবে তাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে।

ইটাগণ কচিৎ জনপদে আগমন করিয়া থাকে এবং দুর্গম অরণ্যানী-প্রদেশ দিয়া এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে গমনাগমন করিয়া থাকে যে, কোন স্থানে ইহাদের আগমনের বিষয় কেবলমাত্র বন্য গুল্ম উৎপাটন-চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহারা প্রকাণ্ড বৃক্ষান্তরালে বা উহার ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রপুষ্পের মধ্যে অথবা কোন পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্তরাদির পার্শ্বে এরূপভাবে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে যে, অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজকগণ ইহাদিগের কিছুমাত্র সন্ধান পায় না। পরন্তু উহারা দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ বহু দূরবর্ত্তী বস্তুসমূহ অনায়াসে দেখিতে পায়। ইহাদিগের এই প্রকার আত্মগোপন-তৎপরতা এবং চঞ্চল চক্ষুর ভীতিব্যঞ্জক দৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা দৃঢ়তররূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা ফিলিপাইনদ্বীপস্থ অন্যান্য সভ্যতাভিমানী জাতিসঙ্ঘের নিকট বহুকাল যাবৎ অন্যায়রূপে উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছে।

ইটাদিগের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। উদ্ভিজ্জগতের প্রায় সর্ব্ববিধ ফল-মূল, লতা-গুল্মাদি এবং জীবজগতের ক্ষুদ্রতম কৃমি-কীট হইতে নরভুক্ ব্যাঘ্রভল্লুকাদি ভূচর, খেচর ও জলচর সমস্ত জন্তুই ইহাদের খাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তাম্রকূট ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং ইহারা উহা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে। অন্য কোন খাদ্য থাকুক আর না থাকুক, তাম্রকূট অপরিহার্য্য। কোন বৃক্ষে মধুচক্রের সন্ধান পাইলে ইহারা ঐ বৃক্ষতলে অগ্নিপ্রজ্বালন দ্বারা মধুমক্ষিকাগণকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত মধুচক্র সংগ্রহ করে এবং সকলে মিলিয়া মধুপান করিয়া মধুথসকল বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দেয়। পশুপক্ষিগণ যেরূপ সদ্যোলব্ধ খাদ্যদ্রব্য তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলে, পরক্ষণের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখে না, ইহারাও তদ্রূপ। এমন কি, প্রাতঃকালের সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য মধ্যাহ্নভোজনেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে, সান্ধ্য-ভোজনের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করে না। যখন অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং কোনরূপ আহার্য্য বস্তু আহরণ করিতে না পারে, তখন ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উষ্ণ জল পান করে এবং কুক্ষিদেশ একগাছি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। বলা বাহুল্য, ইহারা খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে না। কেবলমাত্র অগ্নি-সন্তাপে সামান্য ঝলসাইয়া লয়। অর্দ্ধদগ্ধ মাংসাদি দন্ত দ্বারা বলপূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে।

পর্য্যটনকালে ইটা-জাতীয় স্ত্রীলোকগণ শিশুসন্তানসন্ততিগণকে এক

প্রকার লতা-নির্ম্মিত আধার-(ঝুলী) মধ্যে বসাইয়া পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া থাকে। ইটা শিশুগণ অত্যন্ত চতুর হয়, কিন্তু ক্ষুধা ও নানাবিধ প্রাকৃতিক তাড়নার এবং অধিকাংশ সময় অগ্নিকুণ্ডোদ্ভূত ধূমরাশির সন্নিকটে বসবাস করায় অল্পবয়সেই প্রবীণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইটা বালকগণের একটি বিশেষ স্বভাব এই যে, ইহারা কখনও ক্রন্দন করে না; কষ্ট নিতান্ত অসহ্য হইলে এক প্রকার মৃদু কাতর ধ্বনি করে মাত্র। এজন্য কোন ইটাদল অন্যের অলক্ষিতে কোন নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইটা বালকগণ এরূপ শান্তপ্রকৃতির যে, এক খণ্ড উজ্জ্বল প্রস্তর বা একটি রঙ্গীন পুষ্প পাইলে প্রহরাধিক কাল হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে ক্রীড়া করিয়া থাকে।

ইটাগণের ভাষা অন্যান্য সমস্ত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। তবে উহার মৌলিকতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিবার সুবিধা অদ্যাপি কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই।

বামপাশে জনৈক সভ্য ইটা। দক্ষিণপাশে বন্য ইটা বালকগণ—ফটোগ্রাফ লইবার কালে ক্যামেরার মধ্যে “অনিতো” প্রেতচ্ছায়া বিদ্যমান আছে, এই ধারণায় ভয়বিহ্বল চিত্তে দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে লম্বমান দণ্ডটি একটি বনজাত বংশের আদর্শ

ইটাগণ লতা, বংশ, মৎস্যাস্থি, পশুকঙ্কাল প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে। ইহারা লৌহাদি ধাতুসকলের ব্যবহার বিষয়ে এক প্রকার অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একখানি সামান্য ছুরিকা বা তীরের ফলক পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। ইটাগণের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বল্লম, ধনুর্ব্বাণ এবং দুই একখানি অমার্জ্জিত ছুরিকা মাত্র সম্বল। উক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত আরও কয়েকটি দ্রব্য ইহারা সঙ্গে রাখে, যথা—কয়েকটি মৃন্ময় পাত্র, তামাকু, চকমকি, মৎস্য ধরিবার জন্য সূত্র ও বঁড়শী এবং দুই একটি অর্দ্ধশিক্ষিত কুকুর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত সামগ্রী ইহাদের সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ ইহারা ভূসম্পত্তি বা অন্য সহায়-সম্বল কিছুই চাহে না, বা পৃথিবীর মধ্যে কোনও অনাটনই গ্রাহ্য করে না।

মৃণ্ময়পাত্রনির্ম্মাণ ও ইহার ব্যবহার বিষয়ে ইহাদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে। ইহারা এক প্রকার তালবৃক্ষের কাণ্ড বিশ্লিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা ধনু এবং বংশ-শলাকা বা কোন লতা বা বৃক্ষতন্তু দ্বারা উহার জ্যা প্রস্তুত করে। তীরের ফলক সাধারণতঃ মৎস্যকঙ্কাল বা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কাহারও কাহারও বংশপরম্পরাগত লৌহফলকও আছে। ইহাদের প্রত্যেকের অল্পসংখ্যক তীর থাকে, এই জন্য উহা ব্যবহারান্তে পুনঃ পুনঃ সংগ্রহ করিতে হয়। বন্য শূকরাদি বড় বড় জন্তু বধ করিতে হইলে ইটাগণ ‘ক্রোটন টিগলিয়ম’ নামক এক প্রকার বন্য ঔষধির নির্য্যাস দ্বারা তীরগুলি বিষাক্ত করে এবং যে অঙ্গবিশেষে ঐ তীর বিদ্ধ হয়, তাহারা ঐ স্থানের মাংস কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ইটাগণ পশু-পক্ষী শিকার করিবার জন্য নানাপ্রকার চাতুর্য্য অবলম্বন করে। কখন বা বন্যফলবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বানরের স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে এবং তচ্ছ্রবণে বন্য শূকরশ্রেণী নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করে। বনজাত নানাবিধ ফল যখন পরিপক্ক হইয়া উঠে, সেই সময় শুক, কপোত প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী দলে দলে ঐ সকল বৃক্ষে সমবেত হইলে ইটাগণ বিশেষ উৎসাহ সহকারে পক্ষি-শিকারে তৎপর হয়। কখন কখন বন্য হরিণ বা বরাহ শিকারার্থ ইহারা সংকীর্ণ বন পথে তীরসকল গুপ্তভাবে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কোন গুল্মশ্রেণীর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং হরিণ-বরাহাদি জন্তু দ্রুত গমনকালে যখন উক্ত তীরসকল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইটাগণ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া উহাদিগকে সংহার করে।

ইহাদিগের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি কখন কখন সাহসে নির্ভর করিয়া পশুচর্ম্ম, মধূখ ও অন্যান্য দুই একটি বনজাত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ জনপদে আগমন করে এবং ইহাদের মূল্যস্বরূপ কোনরূপ মুদ্রা না লইয়া কেবলমাত্র যথাসম্ভব তামাকু, লবণ ও রঙ্গিন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সত্বর বনমধ্যে প্রবেশ করে। এই কয়টি দ্রব্যই ইটাদিগের বিলাসোপকরণ-মধ্যে পরিগণিত হয়।

ইটাদিগের প্রায় প্রত্যেক দলেরই নিকট অগ্ন্যুৎপাদনার্থ এক খণ্ড

প্রস্তর ও ইস্পাত থাকে। এতদ্দেশেও দীপশলাকা আমদানীর পূর্ব্বে এই প্রকার "চকমকির" প্রচলন ছিল। প্রস্তর-চকমকির অভাব হইলে ইটারা নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করে। যথা :—এক খণ্ড সুপরিপুষ্ট শুষ্ক বংশের গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি ত্রিকোণাকার গর্ত্ত করিয়া ঐ বংশমধ্যস্থ শূন্যাংশ কোন সহজদাহ্য কাষ্ঠরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ করে। পরে উক্ত ত্রিকোণাকার গর্ত্তের পরিসরমত আর এক খণ্ড বংশ প্রস্তুত করিয়া উহা ঐ গর্ত্তের উপর দ্রুত ঘর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপ ভাবে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে করিতে বংশদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া ১০।১২ মিনিট কালের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া বংশমধ্যস্থ কাষ্ঠরেণুতে সংযুক্ত হওয়ায় উহা ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

ইটাগণ যখন যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ এক বা ততোধিক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া রাখে। এই সকল কাষ্ঠবহুল বনপ্রদেশে এতদুদ্দেশ্যে ইন্ধনসংগ্রহার্থ ইহাদিগকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

ইহারা অতিশয় নৃত্য-গীতপ্রিয়। তবে এই নৃত্য সভ্যজনমণ্ডলীর দৃষ্টিতে যেন এক প্রকার শৃঙ্খলাবিহীন উল্লম্ফন-ক্রিয়া এবং গীত যেন এক অদ্ভুত ক্রন্দন-ধ্বনির অভিব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নৃত্যকালে ইহারা পরস্পর এক জন অন্য জনের কোমরের বস্ত্র ধারণ করিয়া বৃত্তাকারে নানা ভঙ্গীতে ঘুরিতে থাকে এবং কখন কখন লম্ফ দিয়া উঠে। নৃত্যকালে অবিরত একপ্রকার খোনাস্বরে শব্দ করিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বীভৎসভাবে চীৎকার করে। এই নৃত্য-গীতের মাধুর্য্য ইহারা ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ।

ইটাগণ বংশনির্ম্মিত এক প্রকার বংশী নাসিকার সাহায্যে বাদন করে। উহাও উপরি-উক্ত নৃত্য-গীতের ন্যায় তাল-লয়-বিহীন। বংশ ও বংশতন্তুর সাহায্যে ইহারা ইহুদীদিগের 'হার্প' নামক বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু যখন ঐ যন্ত্র বাদন করে, তখন মনে হয়, যেন কোন বেহালাদার তাহার বেহালার সুর মিলাইতেছে। তাহা হইলেও ইহাদের কিছুমাত্র তাল-লয়-বোধ নাই। কিন্তু তথাপি ইহারা অনেক সময় নৃত্য-গীতাদিতে মত্ত থাকে এবং এতদ্দ্বারা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে।

এতদ্দেশীয় অনার্য্য জাতিগণকে অনেক স্থলেই অতিশয় মদিরাসক্ত হইতে ও নানাবিধ মত্ততা-উৎপাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কিন্তু ইটাগণ একমাত্র তামাকু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না বা তদ্বিষয় কিছুমাত্র অবগতও নহে। আর একটি বিষয়ে ইহারা অনেক সভ্য জাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা বা ব্যভিচার আদৌ প্রচলিত নাই।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে জনৈক বৃদ্ধ ইটা সন্তান সমভিব্যাহারে নিজ কুটীরপার্শ্বে উপবিষ্ট

ইটাদিগের বিবাহপ্রথা এক প্রকার রহস্যজনক ঔপন্যাসিক ব্যাপার। কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিবাহাভিলাষী হইলে, উহার দলস্থ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুমতি গ্রহণ করে। পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকটি দ্রুতপদবিক্ষেপ সহকারে নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, পরে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশানুযায়ী কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুরুষটি স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া থাকে। যদি স্ত্রীলোকটির আন্তরিক মিলনেচ্ছা না থাকে, তবে সে বনমধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, অথবা বন হইতে বনান্তরে ধাবমানা হইয়া পুরুষটিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কোন প্রকারে যদি স্ত্রীলোকটি পুরুষটির অলক্ষিতে নিজদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তবে উহাদের জাতীয় প্রথানুযায়ী উক্ত বিবাহ না-মঞ্জুর হইয়া যায় এবং ঐ স্ত্রীলোকটি অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইতে পারে। কিন্তু যদি এই মিলন স্ত্রীলোকটির মনোমত হয়, অথবা পুরুষটি কোন প্রকারে উহাকে বনমধ্যে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে উভয়ে সারাদিন বনমধ্যে বিহারাদি করিয়া সূর্য্যাস্তের পর দলমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপরে উক্ত দলস্থ বয়োবৃদ্ধ দম্পতি সমারোহ সহকারে আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া উহাদিগকে আহারাদি করাইয়া রাত্রিযাপনার্থ একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে রাখিয়া আইসে। এইরূপ কার্য্যাদির পর উহাদের উদ্বাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল বলিয়া পরিগণিত হয় এবং পর দিন হইতে ঐ নব-দম্পতি সাধারণভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

ইহারা বিশেষ কোন ধর্ম্মাবলম্বী নহে। কেবল "অনিতো" নামক দুষ্ট প্রেতযোনির প্রতি উহাদিগের অটুট বিশ্বাস এবং এই কুসংস্কার-বশে শোক-দুঃখাদি-প্রশমনার্থ উহারা ঐ উপদেবতার নানাবিধ উপাসনাদি করিয়া থাকে।

ইটাগণ মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া থাকে। দলস্থ কাহারও মৃত্যু হইলে, অনতিবিলম্বে উহারা নিকটস্থ স্থানে একটি অগভীর কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ স্থান হইতে পলায়ন করে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, উহাদের

বিশ্বাস, ঐ স্থানে কালবিলম্ব করিলে অন্যান্য ব্যক্তিগণও মৃত্যুকবলিত হইবে এবং ঐ মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তাহাদিগকে সহগামী করিয়া লইবে।

ইটাগণ কয়েকটি বন্য ওষধির রোগ-উপশমন-শক্তির বিষয় জ্ঞাত আছে। প্রেম-সঞ্চারার্থ, বশীকরণার্থ, ভীতিপ্রদর্শনার্থ এবং কাহারও প্রতি ঘৃণা বা ক্রোধ প্রশমনার্থ ইহারা কয়েক প্রকার বন্য লতা ও গুল্ম ব্যবহার করে। ঐ সকল লতা ও গুল্ম উক্ত উদ্দেশ্যসাধনার্থ কখনও মুখমধ্যে বা ওষ্ঠে এবং কখনও বা অঙ্গবিশেষে ধারণ করে। আমাদের দেশেও এই সকল প্রক্রিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকায় বিষয় তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত অনেক বিদুষী ভদ্রমহিলাও ভ্রান্ত বিশ্বাসবশে বিষাক্ত ওষধির অপব্যবহার করিয়া স্বামীর সোহাগলাভের পরিবর্ত্তে তাহাকে চিরজীবনের জন্য উন্মাদরোগগ্রস্ত ও জড়বুদ্ধি করিয়া দেয়।

ইটাগণের বাসভূমি—অরণ্যমধ্যস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

ইহাদের আচার-ব্যবহারাদির বিষয় বিগত ২ শত বৎসরের চেষ্টায় যত দূর পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিবৃত হইল। কিন্তু উহাদিগের জীবনের আরও বহুতর গূঢ় রহস্য অদ্যাপি অপ্রকাশিত থাকা সম্ভব। উহাদিগের আত্মগোপন-তৎপরতা, সভ্যজন-মণ্ডলীর সংসর্গ-পরিহার-পরতন্ত্রতা এ বিষয়ে এরূপ অন্তরায় যে, সে রহস্য কেহ কোনকালে জ্ঞাত হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, মানবের বাসনার নিবৃত্তিই যদি মুক্তির সোপান হয়, তবে এ বিষয়ে ইটাগণ যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ইহারা নির্জ্জন অন্ধকারময় অরণ্যাবাসে ইহাদের জাতীয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিবার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইটাগণ কোনক্রমেই সভ্যসম্প্রদায়ের সংস্রবে আসিতে চাহে না। কারণ, এইরূপ সংস্রব তাহাদের পক্ষে যেন মৃত্যু-মিলনস্বরূপ। ইটাগণ স্বভাবজাত বিশাল বিটপিকুঞ্জে নৃত্য-গীতাদি আমোদ-প্রমোদে সন্তান-সন্ততি পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মনের সুখে বিচরণ করে। ইহারা ভগবানের অনন্ত বিশ্বরাজ্যের অন্য কোন সুখৈশ্বর্য্যেরই প্রত্যাশী নহে। কেবলমাত্র দৈনন্দিন আহার্য্যবস্তু সংগৃহীত হইলেই সন্তুষ্ট।

এক কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ এবং গ্রীসের প্রাচীন হেলেনীয় জাতি এইরূপ ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তবে তাঁহারা মার্জ্জিত-বুদ্ধি এবং ওজস্বিতাপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিষয়েই চরম উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অতিবৃদ্ধ আদিম ইটাজাতি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। যদি কখন উন্নতি অবনতির নিয়ন্তা ইহাদের উদ্ধারসাধন করেন, তবেই রক্ষা, নতুবা এই পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব-প্রাঙ্গণ হইতে ইহারা কালক্রমে কোন্ অনন্তের এক কোণে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সান্ধ্য-প্রদীপ

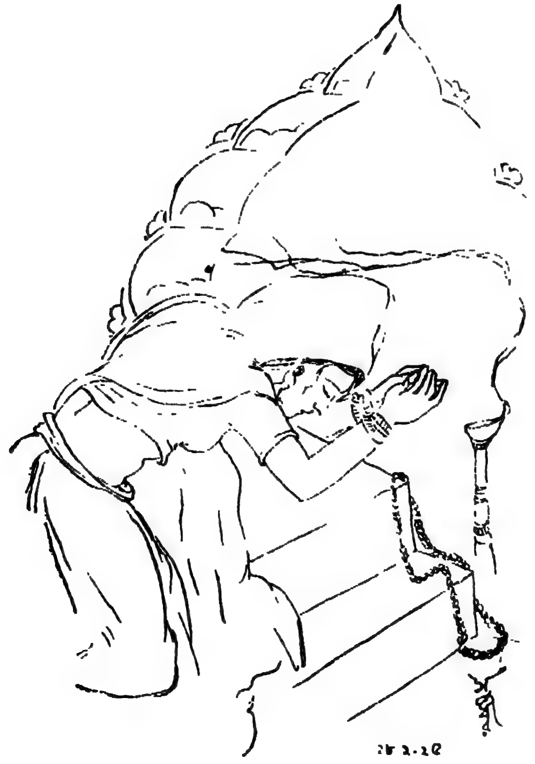

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর।

প্রলয়ের আলো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুদৃঢ় শৃঙ্খল

কাউণ্ট ভন আয়েনবার্গ সেই দিন সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্থার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রফুল্লমনে তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন; তাহাকে বলিলেন, সে তাঁহার সঙ্গে যাইলে দিনটি আরও অধিক আনন্দে কাটিত।

কিন্তু বার্থা তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিল না; তাহার মন তখন স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধায় পূর্ণ। যেন রঙ্গীন চশমার ভিতর দিয়া সে এত দিন তাহার স্বামীকে দেখিয়া আসিতেছিল, সেই চশমা তাহার চক্ষু হইতে হঠাৎ অপসারিত হওয়ায় কাউণ্টের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কাউণ্ট কিরূপ ইতর, অব্যবস্থিতচিত্ত ও ব্যসনাসক্ত, তাহার প্রমাণ পাইয়া বার্থার হৃদয় বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। এরূপ স্বামীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা অসম্ভব বলিয়াই তাহার মনে হইল। স্বামীকে বিশ্বাস করিতেও আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কাউণ্ট বার্থার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন; তাহার বিষাদের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সাদরে বলিলেন, "বার্থা, তোমাকে ও রকম বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে, বল।"

স্বামীর প্রশ্নে বার্থার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর ধারা বহিল; সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "সে সকল কথা কা'ল শুনিও; এখন তুমি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করিতে যাও।"

বার্থার কথা শুনিয়া কাউণ্টের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইল, তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তিনি মুখভার করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কি হইয়াছে, বল। কোন দুঃসংবাদ আছে না কি?"

বার্থা অবনত মুখে বলিল, "এখন কোন কথা জানিতে চাহিও না। আমি এখন কিছুই বলিব না, বলিতেও পারিব না।"

বার্থার কথাগুলি রহস্যপূর্ণ; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কাউণ্ট আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় ঘামিয়া উঠিলেন। তিনি সকল কথা শুনিবার জন্য বার্থাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পীড়াপীড়ি করিয়া কোন ফল হইল না। বার্থা সেই রাত্রিতে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সম্মত হইল না; অগত্যা কাউণ্ট ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহার শয়নকক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন। বার্থা সে রাত্রিতে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

বার্থা সারারাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিল; তাহার মনে হইল, 'সুখ গেছে, আছে মিছে আদর।' নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে হতভাগ্য জোসেফ কুরেটের কথা তাহার স্মরণ হইল। অশ্রুপ্রবাহে তাহার উপাধান সিক্ত হইল। রাত্রিশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সে স্বপ্ন দেখিল, জোসেফ তাহার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপভরে বলিতেছে, "কেমন শাস্তি! তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে ত? দম্ভ ও অসার গর্ব্বের পাদমূলে তুমি তোমার সুখশান্তি উৎসর্গ করিয়াছ; এখন চিরজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হও।"

পরদিন প্রভাতে বার্থা স্থির করিল -তাহার স্বামীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার মাতার সহিত পরামর্শ করিবে।—সে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল —তখন পর্য্যন্ত কাউণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। স্বামীর অজ্ঞাতসারে সে 'বো-সিজোরে' যাত্রা করাই সঙ্গত মনে করিল এবং তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া, একখানি গাড়ী লইয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

তত সকালে বার্থাকে ম্লানমুখে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আনা স্মিট, সভয়ে বলিল, "ব্যাপার কি কাউণ্টেস্? রাত্রে কি তুমি শ্রীমান্ কাউণ্ট বাপাজীবনের সঙ্গে কলহ করিয়াছিলে?"

মায়ের প্রশ্নে বার্থার চক্ষু দুইটি অশ্রুপ্লাবিত হইল; কয়েক মিনিট সে কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে মন স্থির করিয়া, চক্ষু মুছিয়া, পূর্ব্বদিন মোজে যে ভাবে তাহাকে অপমানিত করিয়াছিল, যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তাহার মাতার নিকট প্রকাশ করিল। তাহার সকল কথা শুনিয়া আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "কি জ্বালা! তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল—না জানি কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে! এই তুচ্ছ কারণে তুমি মন খারাপ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছ? আমি স্বীকার করি, কাউণ্টের এই বন্ধুটির রসিকতা একটু মোটা রকমের, তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী তেমন সুরুচি-সঙ্গত নহে; কিন্তু সে জন্য এরূপ মর্ম্মাহত হওয়া নিতান্তই ছেলেমানুষী! সংসার-সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প বলিয়াই তুমি এই তুচ্ছ ব্যাপারকে এইরূপ সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছ! তোমার স্বামীর বয়স অল্প, তাহার উপর কাউণ্ট বড়লোকের ছেলে; তাঁহার মত লোকের বিবাহের পূর্ব্বে নানা রকম বদ্খেয়াল থাকে, তাঁহারও বোধ হয় এক-আধটু ছিল; সে কথা শুনিয়া তোমার মর্ম্মাহত হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জুয়া খেলিতে গিয়া তাঁহার কিছু দেনা হইয়াছে, অর্থাভাবে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই; ইহা আদৌ গর্হিত কার্য্য নহে। কাউণ্ট জুয়ায় হারিয়া এই লোকটির নিকট ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক কর্জ্জ লইয়াছিলেন। আমি স্বীকার করি, টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু কাউণ্টকে ত ঋণমুক্ত করিতে হইবে। মোজেকে টাকাগুলি দিয়া বিদায় করিলেই ফ্যাসাদ মিটিয়া যাইবে। তবে কাউণ্টের এই ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিব; তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব—টাকা গাছের ফল নয় যে, গাছ নাড়িলেই টাকা কুড়াইয়া বস্তা বোঝাই করিতে পারা যাইবে। অতঃপর তিনি যেন তাঁহার অপব্যয়ের বহর একটু খাটো করেন। চল, আমি তোমার সঙ্গেই যাইতেছি। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের শীঘ্রই মীমাংসা করা দরকার।"

বার্থা তাহার মাতার এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু তাহার মা তাহার অপমানে এই প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করায় ক্ষোভে ও দুঃখে সে অধিকতর ম্রিয়মাণ হইল। সে মাতার সহানুভূতিলাভের আশায় আসিয়া উপহাসমাত্র লাভ করিল! সে মনে মনে বলিল, "পরমেশ্বর কি ইহাদের সকলেরই হৃদয় অভিন্ন উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কি লজ্জা!"

আনা স্মিট বার্থার সহিত যখন 'সাটু'তে উপস্থিত হইল, তখন কাউণ্ট রডলফ মোজের সহিত কফি-পান শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

কাউণ্ট প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রত্যূষে কাউণ্টেসের গৃহত্যাগের সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন; কয়েক ঘণ্টার পর তাঁহার পত্নীকে তাহার মাতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার মন দারুণ দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। মোজেও কাউণ্টেসের গৃহত্যাগের সংবাদ জানিত না। ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনা স্মিট বারান্দায় উঠিয়া, গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কাউণ্টকে অভিবাদন করিল; তাহার পর নিম্ন স্বরে বলিল, "কাউণ্ট, যদি তোমার বন্ধুর তোমাকে কয়েক মিনিটের জন্য ছাড়িয়া দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে গোপনে তোমাকে দুই একটি কথা বলি।"

মোজে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিল; সে বুঝিল, পূর্ব্বদিন কাউণ্টেসের সহিত সে যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেই ঘটনার সহিত কাউণ্টেস-জননীর আকস্মিক আবির্ভাবের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু কাউণ্ট সে সকল কথা জানিতেন না, এ জন্য শাশুড়ীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া থাকিয়া ম্লান মুখে বলিলেন, "নিশ্চয়ই মা, আপনার আদেশ পালন করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

কাউণ্ট শাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার খাস-কামরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বার্থা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল; মোজে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বার্থার পশ্চাতে উপস্থিত হইল এবং তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "কা'ল আমি তোমার ঘরে ঢুকিয়াছিলাম, এ কথা

তুমি কাউণ্টের নিকট প্রকাশ করিও না। এ কথা প্রকাশ হইলে তোমারই ক্ষতি। আমি কাহারও নিন্দা গ্রাহ্য করি না।”

বার্থা কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর সে তাহার স্বামীর ও মাতার অনুসরণ করিল।

কাউণ্টের খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া আনা স্মিট কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, “কাউণ্ট, আমি জানিতে পারিলাম, তোমার ঐ ভদ্রবেশী বন্ধুটি, যে হার রডল্ফ মোজে নামে নিজের পরিচয় দিয়া তোমার অতিথি হইয়াছে, জুয়াখেলার ঋণ বলিয়া তোমার নিকট ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী করিতেছে, এ কথা কি সত্য?”

শাশুড়ীর এই প্রশ্নে কাউণ্টের মুখ হঠাৎ সাদা হইয়া গেল; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “জুয়াখেলার জন্য দেনা! ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক মোজের কাছে আমি ধার লইয়াছি? এ অতি অসম্ভব, অবিশ্বাস্য মিথ্যা কথা।”

আনা স্মিট কাউণ্টের উত্তর শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর কাউণ্টের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঘৃণাভরে বলিল, “কি? তুমি বলিতে চাও, এই মোজে যে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিচয়ে তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছে, যাহাকে তোমার স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে দিতে, এমন কি, অভদ্র রসিকতা করিতে দিতেও তোমার আপত্তি নাই—সে মিথ্যাবাদী?”

কাউণ্ট শাশুড়ীর এই তীব্র শ্লেষে আহত হইয়া, অপরাধীর মত মাথা গুঁজিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, “হাঁ, ইয়ে, তা কি বলে, তাহাকে ঠিক মিথ্যাবাদী বলা যায় না।” তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, “এ কথা তুমি কিরূপে জানিলে? মোজে কি কা’ল তোমাকে বলিয়াছিল, সে আমার কাছে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে? জুয়ায় হারিয়া তাহার কাছে ধার লইয়াছিলাম?”

বার্থা বলিল, “হাঁ; সে কা’ল চোরের মত হঠাৎ আমার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া এই সুসংবাদটি আমাকে জানাইয়াছিল।”

কাউণ্ট অতঃপর কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “মোজে একটা ‘রাস্কেল’।”

বার্থা বলিল, “রাস্কেল কি, পশু বলিলেও তাহার সম্মান করা হয়; সে পশুরও অধম এবং সয়তান তাহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ জীব।”

আনা স্মিট বলিল, “সে পশুই হউক আর সয়তানই হউক, যাহাকে বন্ধুভাবে গৃহে আশ্রয় দিয়াছ, তাহার অসাক্ষাতে এ ভাবে নিন্দা করিয়া লাভ কি? কাউণ্ট, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও, এই লোকটা তোমার নিকট সত্যই ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে? না, তাহার দাবী মিথ্যা?”

কাউণ্ট এই প্রশ্নে একবারে কোণ-ঠেসা হইলেন; ‘হাঁ’ বলাও শক্ত, ‘না’ বলিলেও বিপদ। এই জন্য তিনি মাথা চুলকাইয়া ম্লানমুখে বলিলেন, “হাঁ, সে কিছু টাকা পাইবে বটে; কিন্তু কত টাকা, আমার ঠিক স্মরণ নাই। মোজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি আপনাকে ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছি না।”

আনা স্মিট বলিল, “তোমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তোমার ঋণ সত্য। আমার অনুমান সত্য হইলে, ঋণ পরিশোধ করিতে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; টাকাগুলি দিয়া আজই তাহাকে বিদায় করিয়া দাও। যে বন্ধু তোমার স্ত্রীর—কাউণ্টেসের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না, যাহার ব্যবহারে কাউণ্টেসের সুনামে ও সম্মানে কলঙ্ক আরোপিত হইবার আশঙ্কা অমূলক নহে, তাহাকে আর এক দিনও তোমার গৃহে আশ্রয় দান করা অকর্ত্তব্য; তাহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করাও তোমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন। আমি আজই টাকাগুলি তোমাকে পাঠাইয়া দিব; তাহার পরও সে এখানে আছে—এ কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়। কাউণ্টেসের অসম্মান! সে কি মানুষ?”

শাশুড়ীর স্পষ্ট কথা শুনিয়া কাউণ্ট ক্ষোভে ও লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিলেন না। কাউণ্টকে নীরব দেখিয়া আনা স্মিট বলিল, “এই দেনা-পাওনার কথা লইয়া সেই

লোকটির সহিত কোন প্রকার আলোচনা বা তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। যে দোষ করিয়া ফেলিয়াছ, এখন তাহার অন্য কোন প্রতীকারও নাই। তোমার এ দোষ আমি মার্জ্জনা করিলাম; আশা করি, কাউণ্টেসও তোমার গত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু কাউণ্ট, এই অপ্রীতিকর ঘটনায় তোমার চৈতন্যোদয় হইলেই আমি সুখী হইব। তোমার স্মরণ রাখা উচিত, জুরিচে আমাদের পরিবারের সম্মান ও সম্ভ্রম সর্ব্বজন-বিদিত; তোমার কোন কার্য্যে বা ব্যবহারে আমাদের পারিবারিক সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইলে কেবল আমাদের নহে, তোমারও লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। আর এ কথাও স্মরণ রাখিও যে, আমাদের ধনভাণ্ডারের অর্থ অফুরন্ত নহে; অপব্যয়েরও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।"

কাউণ্ট অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "আপনার এই উপদেশ চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। আজ আপনি দয়া করিয়া আমাকে যে দায় হইতে—"

আনা স্মিট বাধা দিয়া বলিল, "না, না, তোমার ধন্যবাদ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। আমার উপদেশ স্মরণ রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি তদনুসারে কায কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

আনা স্মিট কন্যা-জামাতার মুখচুম্বন করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কাউণ্ট বার্থাকে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বড়ই লজ্জার বিষয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি।"

বার্থা বলিল, "দুঃখিত হইবারই ত কথা। আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে. আমাকে প্রতারিত করিতেও তুমি কুণ্ঠিত হও নাই। আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে যদি এই ঋণের কথাটা আমার বা আমার মায়ের নিকট প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে সেই সময় তোমার এই জুয়ার ঋণ পরিশোধেরও ব্যবস্থা হইত; মা তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, এই সামান্য টাকাও ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু তুমি যে একটা পাকা জুয়াড়ী, এ কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তখন তোমার লজ্জা হইয়াছিল; তাহার ফলে তুমি ত অপদস্থ হইলেই, কা'ল আমাকে যেরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে। তোমার কপটাচরণের জন্য আমাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে।"

কাউণ্ট লগুড়াহত কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিলেন, তাহার পর মিহি আওয়াজে বলিলেন, "তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

বার্থা ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা একটু করিয়াছি বৈ কি। ও ভাবে অপমানিত হইলে রাগ না হয় কার? এই ইতর লোকটাকে আজই তুমি বিদায় করিয়া দাও; নতুবা তোমার সহিত আলাপ করিতে বা তোমাকে ক্ষমা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না। যে কাপুরুষ তাহার স্ত্রীর অপমান নীরবে সহ্য করে, তাহার কাপুরুষতা ক্ষমার অযোগ্য।"

কাউণ্ট আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বার্থা সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। বার্থার সুতীব্র তিরস্কার চাবুকের ন্যায় কাউণ্টকে আঘাত করিল। তিনি সেই কক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বড়ই বিশ্রী ব্যাপার! আমার শাশুড়ী বিরক্ত হইয়াছেন, আমার স্ত্রী অপমান বোধ করিয়া রাগে ফুলিতেছে; অথচ আমি নিরুপায়! এখন আমি করি কি? যেরূপেই হউক, এই অশান্তি দূর করিতে হইবে।"

কাউণ্ট বারান্দায় আসিলেন। মোজে তখনও গদীআঁটা সুবৃহৎ 'সোফা-চেয়ারে' বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট-ধূম পান করিতেছিল। সে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার স্ত্রী ও শাশুড়ী এক দিকে, তুমি আর এক দিকে! খুব মজা উপভোগ করিয়া আসিলে, কি বল?"

মোজের রসিকতায় কাউণ্ট দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি তাহার মুখের কাছে ঘুসি তুলিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তুমি সয়তানই এই সকল উপদ্রবের মূল! ইচ্ছা হইতেছে এক ঘুসিতে তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিই। তোমার মতলব কি? তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ না করিয়া আমার কাঁধ হইতে নামিবে না?"

মোজে নিশ্চিন্ত ভাবে কাউণ্টের মুখের উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, অচঞ্চল স্বরে বলিল, "মুখসামাল করিয়া

কথা বল বন্ধু! আমাকে চটাইয়া লাভ নাই। তোমার সর্ব্বনাশ হউক, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু তুমি যে সুমিষ্ট ফলের শাঁসটুকু নিজেই ভোগ করিবে, আর আমি ছোব্‌ড়া চুষিয়াই তৃপ্তিলাভ করিব, আমাকে তত দূর নির্ব্বোধ মনে করিও না। আমি যে সয়তান, ইহা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উঁচু দরের সয়তান।"

কাউণ্ট মোজেকে আর অধিক ঘাঁটাইতে সাহস করিলেন না; তিনি উত্তেজিত ভাবে বারান্দায় পদচারণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর মোজের সম্মুখে হঠাৎ থামিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শোন মোজে! তুমি যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়াছ, তাহা আমার শাশুড়ী তোমাকে দিবেন বলিয়াছেন; ইহাই তোমার শেষ দাবী ত?"

মোজে অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করিয়াছ আমি এতই নির্ব্বোধ যে, এই সামান্য অর্থ লইয়াই তোমাকে নিষ্কৃতি দান করিব? না বন্ধু, আমি তত নির্ব্বোধ নহি। তুমি নিরাপদে যে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছ, আমি আজীবনকাল তাহার বখরা আদায় করিব; তোমার বা আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার নিষ্কৃতি নাই।"

কাউণ্ট ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "রক্তল্‌ক মোজে! তোমার অত্যাচারে যদি আমাকে জীবিত অবস্থায় নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য হয় ত এক দিন আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে; কিন্তু স্থির জানিও, তাহার পূর্ব্বে তোমাকেও খুন করিব। যদি মরিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে আর অধিক শোষণের চেষ্টা করিও না। সময় থাকিতে আমি তোমাকে সতর্ক করিলাম।"

মোজে যে ভাবে সোফায় বসিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া থাকিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "বেশ বন্ধু, বেশ! দেখিতেছি জুরিচে আসিয়া তুমি হঠাৎ নবাব হইয়াছ; তোমার কথায় ও ব্যবহারেও সেই রকম নবাবীর ঝাঁঝ বাহির হইতেছে! খুব লম্বা লম্বা বুলি ছাড়িতেছ! কিন্তু তোমার ঐ ফাঁকা আওয়াজে আমি ভয় পাইবার পাত্র নহি। তোমার প্রলাপ আমার অগ্রাহ্য। তোমার মত কাপুরুষ আত্মহত্যা করিবে? অসম্ভব! কিন্তু পুনর্ব্বার যদি আমাকে হত্যা করিবার কথা মুখে আন, তাহা হইলে আমি তোমাকে জেলে না পুরিয়া ছাড়িব না। আমি সোজা কথার মানুষ।"

কাউণ্ট ক্রোধে অপমানে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া নিজের মাথার চুল দুই হাতে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন কেশগুলির মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই তাঁহার অন্তর্যাতনার অবসান হইবে! কিন্তু তিনি সেই চেষ্টায় বিরত হইয়া অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে বলিলেন, "শোন মোজে! আমি তোমার সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু আমার সঙ্কট বুঝিয়া দয়া করা উচিত। তুমি আজই আমার নিকট তোমার দাবীর ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে; তাহা হস্তগত হইলে তোমাকে অবিলম্বে এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

মোজে সবিস্ময়ে বলিল, "চলিয়া যাইব? বাঃ! এত সুখ, এই ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছ? না বন্ধু, ও কথা মুখে আনিও না। আমি এখানে বড়ই সুখে আছি। আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিবে না। আমি এখান হইতে নড়িতেছি না।"

কাউণ্ট কাতরভাবে বলিলেন, "না, আমি তোমাকে তাড়াইতেছি না; আমি তোমাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার স্কন্ধ পরিত্যাগ কর। যত দিন আমার কিঞ্চিৎ সম্বল থাকিবে, তুমি তাহার অংশে বঞ্চিত হইবে না, আমি সাধ্যানুসারে তোমাকে সাহায্য করিব, যখন যাহা পারি তোমাকে পাঠাইয়া দিব, কেবল দয়া করিয়া এই গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ কর। আমাকে একটু শান্তিতে থাকিতে দাও। মনে করিও আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্যদানে কখন বিমুখ হইব না।"

মোজে সোফার উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "তুমি এই অঙ্গীকার পালন করিবে তাহার প্রমাণ কি?"

কাউণ্ট বলিলেন, "অঙ্গীকার পালন না করিলে তুমি আবার আসিয়া, আমার কান মলিয়া টাকা আদায় করিও।"

মোজে বলিল, "তা বটে ; কিন্তু আমি তোমার কানও মলিতে চাহি না, এখান হইতে যাইতেও চাহি না। এখানে বেশ সুখে আছি, এ সুখ ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই।"

কাউণ্ট অধীর স্বরে বলিলেন, "তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি না যাইলে আমাদের উভয়েরই ক্ষতি। এখানে আসিয়া তুমি আমার যে ক্ষতি করিয়াছ, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুমি লাভবান্ হইবে, এ আশা ত্যাগ কর।"

মোজে বলিল, "তোমার কথা অসঙ্গত না হইলেও আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে, ইহাও আমি সঙ্গত মনে করি না। অন্ততঃ, আরও দুই এক দিন আমাকে থাকিতেই হইবে। আমি যে দিন এখানে আসিয়াছিলাম, সেই দিনই যদি আমার প্রাপ্য টাকাগুলি মিটাইয়া দিতে, তাহা হইলে আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না; কিন্তু তখন বলিয়াছিলে, তোমার হাতে টাকা নাই, কিছু দিন অপেক্ষা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। অগত্যা আমি এখানে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলাম। এখানে বেশ সুখেই আছি ; তাহার উপর তোমার মেয়েমানুষটিকে দেখিয়া আর আমার এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাকে পাইলে টাকার দাবী ছাড়িয়া দিতেও আমার আপত্তি নাই। তাহার রূপ-রজ্জুতে আমি—"

মোজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাউণ্ট তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার গালে এক প্রচণ্ড চড় মারিলেন; তাহার পর তাহার ভুঁড়ির উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। বোধ হয়, সেই স্থানেই কীচকবধ হইত।

কিন্তু শ্রাদ্ধটা আর অধিক দূর গড়াইল না। বার্থা কাউণ্টের অনুসরণ করিয়া, বারান্দার পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল; মোজের সহিত কাউণ্টের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া তাহার মন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে কাউণ্ট মোজেকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিলে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে দ্রুতবেগে বারান্দায় প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "কাউণ্ট, স্বামী, আমার অনুরোধে এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দাও।"

কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণ মুখে হতাশভাবে বার্থার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল, বার্থা হয় ত তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছে। ঘৃণায় ও লজ্জায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল।

মুক্তিলাভ করিয়া মোজে অতি কষ্টে সোফায় উঠিয়া বসিল। সে আরক্ত নেত্রে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বার্থা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "মহাশয়, জানি না, আপনি কে। আপনি কোথা হইতে আসিয়া আমার স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছেন, তাহাও আমার অজ্ঞাত; তবে আপনার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি পশুরও অধম। আমি আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আপনি যে গৃহে বাস করিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন, সে গৃহ আমার; আমিই এই বাড়ীর একমাত্র অধিকারিণী। আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাউন। এখানে আর আপনার স্থান নাই।"

এই অপমানে মোজে ক্ষিপ্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল, এবং চোখ-মুখ লাল করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বার্থাকে বলিল, "তুমি? তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ? উত্তম, আমার কায শেষ হইলে চলিয়া যাইব; কিন্তু মাদাম, স্মরণ রাখিও, আমার যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক প্রাপ্য আছে, আর তাহা লইব না; এই অপমানের মূল্য এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক আদায় না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না। দেখি, কে আমাকে তাড়ায়।"

মোজের কথায় বার্থার মুখ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল; হঠাৎ তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। সে পড়িয়া যায় দেখিয়া কাউণ্ট তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া লইয়া উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বার্থা আত্মসংবরণ করিয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিল এবং কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এই সয়তানটা তোমাকে মুঠায় পুরিয়াছে, তুমি তাহার গোলাম হইয়া পড়িয়াছ! ইহার কোন গুপ্ত কারণ আছে, ইহা নিশ্চয়ই কোন পৈশাচিক

ষড়যন্ত্রের ফল; যে পর্য্যন্ত এই গুপ্তরহস্য তুমি আমার নিকট প্রকাশ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার স্ত্রী নহি।"

বার্থা ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কাউণ্ট প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাবুক

কাউণ্ট দুই এক মিনিট সেই স্থানে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর হঠাৎ স্কন্ধে কাহার কর-স্পর্শ হওয়ায় তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া মোজেকে দেখিতে পাইলেন। মোজের মুখও মলিন; দারুণ উত্তেজনায় সে তখন কাঁপিতেছিল।

মোজে বলিল, "শোন কাউণ্ট, তুমি আমার যে অপমান করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে।"

কাউণ্ট ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?"

মোজে বলিল, "না, ক্ষেপি নাই, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তবে পাগলের মত কথা বলিতেছ কেন? আমাকে নষ্ট করাই কি তোমার ইচ্ছা?"

মোজে সরোষে বলিল, "নষ্ট কি? তোমাকে কীটের মত পদদলিত করিয়া চূর্ণ করাই আমার ইচ্ছা; আমি তাহা করিবই।—তবে যদি আমার দাবী পূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিতেও পারি।"

কাউণ্ট হতাশভাবে বলিলেন, "তোমার দাবী এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক; এই বিপুল অর্থ দিয়া তোমার সহিত সন্ধি করিব—সে সামর্থ্য আমার নাই।"

মোজে বলিল, "তাহা হইলে আমার নিকট দয়ার প্রত্যাশা করিও না, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে চূর্ণ করিব।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি তোমার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?"

মোজে সরোষে বলিল, "অনিষ্ট? তুমি আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, আমার শ্বাস রুদ্ধ করিয়াছিলে; আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! এই অপমানের—এই অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া আমি তোমাকে ক্ষমা করিব, ততখানি ক্ষমা আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত নাই; আমি সেরূপ অপদার্থও নহি। এই ভাবে উৎপীড়িত হইয়া যাহারা শত্রুকে ক্ষমা করে—তাহারা কি মানুষ?"

কাউণ্ট বলিলেন, "তুমি কাউণ্টেসকে লক্ষ্য করিয়া যে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলে, তাহা শুনিয়া আমি ক্রোধ দমন করিতে পারি নাই; আমার দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান ছিল না। সুতরাং আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া যে অন্যায় কায করিয়াছি, সে জন্য আমাকে দায়ী করিতে পার না। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর; জীবনে অন্ততঃ একটিবার উদারতা প্রকাশ কর। আমি তোমাকে যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে চাহিয়াছি—তাহাই লইয়া চলিয়া যাও; আমাকে একটু শান্তিতে থাকিতে দাও। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই তোমাকে সাধ্যানুযায়ী অর্থ-সাহায্য করিব।"

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে বিদ্যুদ্বিকাশের মত মোজের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বুকের পকেট হইতে সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিল এবং একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া আর একটি কাউণ্টের হাতে দিতে উদ্যত হইল। কাউণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; তখন সে মিনিট দুই নাক-মুখ দিয়া ধূম উদ্গিরণ করিল, তাহার পর ধীরভাবে বলিল, "তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া দেখিব; তাহা সময়-সাপেক্ষ। ঐ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আজই আমাকে দেওয়া হইবে—এইরূপই কথা আছে না?"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, আজই তাহা পাইবে।"

মোজে বলিল, "কিন্তু আমি তোমার লাভের বখরা-দার, সৌভাগ্যের দিনে এ কথা ত তোমার ভুলিলে চলিবে না। যদি তুমি আজ সোনার খনি আবিষ্কার করিতে, তাহা হইলে পূর্ব্বের সর্ত্ত অনুসারে আমাকে তোমার লাভের বখরা দিতে হইত। তুমি সোনার খনি আবিষ্কার করিতে না পারিলেও যে ধন-দৌলত তোমার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে; আমি তাহার বখরা চাই। কিন্তু যদি তুমি আমাকে আমার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নামে

শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার এই লাভের কারবারটি আমি বিধ্বস্ত করিব।”

কাউণ্ট একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

মোজে তাঁহার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, “আমি তোমাকে যত দূর নির্ব্বোধ মনে করিতাম, তুমি তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্ব্বোধ; কেবল নির্ব্বোধ নহ, তুমি একটি গণ্ডমূর্খ! তুমি সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ, এই সংবাদ শুনিয়া যখন এখানে আসিলাম—তখন তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিলে যে, আমি তোমার সুখ-সম্পদের বখরা না লইয়াই অক্ষম ভিক্ষুকের মত শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইব?”

কাউণ্ট মুখ তুলিয়া বলিলেন, “না, সে ধারণা মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমার বিশ্বাস ছিল—এত দিন তোমার মৃত্যু হইয়াছে, না হয় আমি কোথায় আছি, তাহা তুমি জানিতে পার নাই।”

মোজে বিদ্রূপভরে বলিল, “উঃ, কি হিতৈষী বন্ধু তুমি আমার! তুমি আশা করিতেছিলে—আমি মরিয়া গিয়াছি! আমি মরিলে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে, ইহা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু পরমেশ্বর তোমার মত পাপিষ্ঠকে নিশ্চিন্ত হইবার সুযোগ দিবেন, তোমার মত নির্ব্বোধ ভিন্ন অন্য কেহ ইহা প্রত্যাশা করিতে পারে না। তুমি জীবনে অনেক ভ্রম করিয়াছ; ইহাও তোমার সেই সকল ভ্রমের অন্যতম! যে শয়তানীর সাহায্যে তুমি ধনবান্ হইয়াছ, আমি তোমার সেই শয়তানীর সুযোগ ত্যাগ করিয়া চিরজীবন অভাবের কষ্ট সহ্য করিব, ইহা তুমি প্রত্যাশা করিতে পার না।”

কাউণ্ট বিকৃত স্বরে বলিলেন, “শয়তানী?”

মোজে বলিল, “হাঁ, একশ বার শয়তানী।—কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনই বিচিত্র যে, শয়তানকে শয়তান বলিলে তাহার রাগ হয়। তুমি কি আশা কর—তোমার শয়তানীর পরিচয় পাইয়াও তোমাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিব? স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমার তোষামোদ করা আবশ্যক হইলে, আমি তোমাকে দেবতা বলিতাম; মহাপুরুষ বলিয়া তোমার স্তুতিবাদ করিতাম; মিথ্যা কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; শয়তানের গালে চড় মারিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই আমার অভ্যাস।”

মোজের বিদ্রূপে আহত হইয়া কাউণ্ট সরোষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আর তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না, মোজে!—বখরা আদায়ের জন্য তুমি আমার সঙ্গে যদি নরকে যাইতে চাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি অসঙ্গত দাবী করিলে তোমার সে দাবী কিরূপে পূর্ণ করিব? তাহাতে তোমার কোন লাভ নাই, অথচ আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এই সহজ কথা কি বুঝিতে পারিতেছ না?”

মোজে বলিল, “সহজ কথা কি শক্ত কথা, তাহা পরে ভাবিয়া দেখিব।”

কাউণ্ট বলিলেন, “ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়া আজই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইবে কি না, জানিতে চাই।”

মোজে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না; এই জন্য আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। টাকাগুলা লইয়া আজই চলিয়া যাইব।”

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “উত্তম। আজই তোমাকে টাকাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি; আর ভবিষ্যতে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, এরূপ একটি উপায়ও স্থির করিব।”

কাউণ্ট অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন। বার্থা তখনও নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল। কাউণ্ট তাহার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, “বার্থা, আমার নির্দ্দয় ব্যবহারে তুমি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছ। তুমি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা কর। আমি বড়ই মনের কষ্টে আছি; আমার অবস্থা বুঝিয়া তুমি আমাকে দয়া কর। আমি নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়াই তোমাকে কঠোর কথা বলিয়াছিলাম। সে জন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি।”

বার্থা সরোষে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, “বল ত এই মোজে লোকটা কে, আর কোথা হইতে আসিয়াই বা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে? সে যে তোমাকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, বানরের মত তোমাকে নাচাইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? তাহার ভয়ে তুমি

দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছ, ইহা কি আমি বুঝিতে পারি না? আমি তোমার স্ত্রী, তোমার গুপ্ত কথা শুনিবার আমার অধিকার আছে। যদি তুমি তাহার কোন জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া থাক, তাহা হইলে সে কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে তোমার সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহা আমার জানা দরকার। তাহা জানিতে পারিলে এখনও হয় ত তোমাকে সেই শয়তানের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিব। আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তোমার কোন লাভ নাই। কপট ব্যবহার করিলে, তোমার সঙ্গে কখন আমার মনের মিল হইবে না। তুমি আমাকে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না; যদি কোন সম্বন্ধ থাকে—সে কেবল নামেই থাকিবে, তাহার অধিক নহে।"

কাউণ্ট বার্থাকে কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া অসহিষ্ণুভাবে দুই হাত কচলাইতে লাগিলেন; শেষে অভিমান ও ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "বার্থা, তুমি আমাকে বড় শক্ত শক্ত কথা বলিলে! হয় ত সত্যই আমি তোমার এইরূপ ভর্ৎসনার পাত্র। মোজে যখন এখানে আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে খুলিয়া বলিলেই ভাল করিতাম; কিন্তু সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আমার লজ্জা হইয়াছিল। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ—চক্ষু-লজ্জাটা আমি একেবারে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি যখন সমরবিভাগে চাকরী করিতাম, সেই সময় আমি একটু উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিলাম, শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক ছিলাম না; সাধুতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল না, এ কথা শুনিয়া, আশা করি, তোমার 'হিষ্টিরিয়া' হইবে না। সত্যই সে সময় আমার নীতিজ্ঞান টন্‌টনে ছিল না। আমি মধ্যে মধ্যে জুয়ার আড্ডায় ঢুকিয়া জুয়া খেলিতাম; ভারী বদ নেশা! জুয়ায় হারিলেও সে নেশা ছাড়িতে পারিতাম না এবং টাকার অভাব হইলে মোজের নিকট অনেক বেশী সুদে টাকা ধার করিতাম। উহার নিকট বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিলাম। আমি মেয়েন্স হইতে চলিয়া আসিবার সময় উহার ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতে পারি নাই। আমি উহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু মোজে, কি উপায়ে জানি না—জানিতে পারিয়াছিল, আমি একটি কামধেনুকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে ঘরজামাইগিরি করিতেছি, আর দুই হাতে টাকা উড়াইতেছি! তাহার পর সে এখানে আসিয়া আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে এবং আমার সেই সকল বদখেয়ালের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, এই ভয় দেখাইয়া আমাকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।—সকল কথাই তোমাকে বলিলাম, শুনিয়া খুসী হইলে ত?"

বার্থা অবিশ্বাসভরে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুধু কি এই জন্যই তুমি তাহাকে এত ভয় কর? আর কোন কারণ নাই?"

কাউণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। আমার অসংযত প্রথম যৌবনের এই কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিবে?"

এই সময় এক জন পরিচারক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাউণ্টের হাতে একখানি পত্র দিল। লেফাপায় নিজের নাম দেখিয়া কাউণ্ট পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন; তাহার পর বার্থাকে বলিলেন, "পত্রখানা মা লিখিয়াছেন; তিনি আমাকে বো-সেজুরে যাইতে লিখিয়াছেন বার্থা! আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া সেই ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়া আসি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। হাতের কাছে কোন লোক না থাকায় তিনি টাকাগুলি এখানে পাঠাইতে পারেন নাই; এই জন্য আমাকেই যাইতে হইবে।"

বার্থা বলিল, "টাকা ত আনিবে, তাহার পর ও হতভাগাকে তাড়াইবার কি ব্যবস্থা করিবে?"

কাউণ্ট বলিলেন, "কে, মোজে? টাকাগুলি লইয়া সে আজই চলিয়া যাইতে রাজী হইয়াছে।"

বার্থা এ কথায় যেন একটু খুসী হইয়া বলিল, "সে এখন আছে কোথায়?"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি যখন এখানে আসি, তখন সে বারান্দায় ছিল।"

বার্থা বলিল, "এখনই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাও; শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিতে

পারিলে বাঁচেন! তিনি আর কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বার্থা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, কাউণ্ট গাড়ী লইয়া দেউড়ী পার হইলেন; তখন সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখ মুছিল, চুলগুলি ঠিক করিয়া লইল; তাহার পর একখানি হাঁসিয়াদার শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইল। মোজে বার্থাকে সে সময় বারান্দায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং মুগ্ধ-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে দৃষ্টি লালসাপূর্ণ। তাহার মনে হইল, এরূপ অপরূপ রূপবতী যুবতী আর কখন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কেবল এক জন ভিন্ন!

মোজে চেয়ার হইতে উঠিয়া, আর একখানি চেয়ারে বার্থাকে বসিতে অনুরোধ করিল। বার্থা তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ মোজে! আমি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার স্বামী কোন কাযে বাহিরে গিয়াছেন; তিনি এখানে এখন উপস্থিত নাই, এই সুযোগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার এমন কি সম্বন্ধ—যাহার খাতিরে তুমি তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছ?"

মোজে বার্থার বাক্যবাণে আহত হইল, একটু অপমানও বোধ করিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ স্বরে বলিল "সম্বন্ধ আর কি? কাউণ্ট আমার বহু দিনের বন্ধু, এই জন্য তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি। আমার ভারে তাঁহার শক্ত ঘাড় ভাঙ্গিবার আশঙ্কা নাই; ছোকরার ঘাড় খুবই শক্ত।—তুমি অনর্থক ভয় পাইতেছ, মাই ডিয়ার!"

বার্থা চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিল, "তুমি কি রকম লোক! ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কহিতে জান না? ভদ্রভাবে বল। তোমার ইতর ব্যবহারে আমরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছি। তুমি যে কোন ভদ্রলোকের বন্ধু হইবার যোগ্য—ইহা তোমার ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করা কঠিন! এই জন্য আমার ধারণা, তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে কোন জটিল রহস্য আছে। যদি আমার স্বামীর নিকট তোমার ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সত্যই পাওনা থাকে, তাহা হইলে সে টাকা আজই তোমাকে দেওয়া হইবে। টাকাগুলি লইয়া তুমি অবিলম্বে আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাও; ভবিষ্যতে কখন যেন আমাদিগকে তোমার মুখ দেখিতে না হয়।"

মোজে বলিল, "তোমার সরলতার পরিচয় পাইয়া আমি সত্যই মুগ্ধ হইলাম। এ রকম স্পষ্ট কথা আমি বহু দিন শুনি নাই। কিন্তু আমিও তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া রাখি· আমার সহিত শত্রুতা করিলে তোমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না; আমি কাউণ্ট সম্বন্ধে তোমাকে এরূপ কোন গুহ্য কথা বলিতে পারি—যাহা শুনিলে তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে! আমি তোমাকে অনেক গুপ্ত কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পার?"

বার্থা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মোজের মুখের দিকে চাহিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "মনুষ্যদেহে তুমি পিশাচ।"

মোজে বলিল, "তুমি রূপবতী পিশাচী—এই জন্যই আমি তোমাকে লাভ করিতে চাই।"—সে বার্থার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল, তাহার পর তাহার মুখচুম্বন করিল।

বার্থা হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া লজ্জায়, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া দুই জন পরিচারক তাড়াতাড়ি বারান্দায় উপস্থিত হইল।

বার্থা মোজের বাহুপাশ হইতে সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "ওরে নরকের কুকুর! তোর এত সাহস? তোর এত দূর ধৃষ্টতা?"—তাহার পর সে স্তম্ভিত পরিচারকদ্বয়কে বলিল, "কোচম্যান ও সহিসকে ডাকিয়া এই নির্লজ্জ শয়তানটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দে।"

মোজে তৎক্ষণাৎ তীব্রস্বরে বলিল, "থাম, সুন্দরি! যদি আমাকে এই ভাবে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আমি তোমার ঔদ্ধত্য, তোমার গর্ব্ব এ ভাবে চূর্ণ করিব যে, তোমার অভিশপ্ত জীবনের ভার অসহ্য মনে হইবে। তুমি জীবনে কখন মাথা তুলিয়া ভদ্রলোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব।"

মোজের কথায় বার্থার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার বিশ্বাস হইল, মোজের এই স্পর্দ্ধা অমূলক নহে। সে তাহার স্বামীর এরূপ কোন গুপ্ত কথা জানে, যাহা প্রকাশিত হইলে তাহার জীবন বিষময় হইবে, সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না!”

বার্থা মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমার স্বামী তোমার এই পাশবিক আচরণের শাস্তি দিবেন; আমি আর এক মুহূর্ত্ত তোমার সম্মুখে থাকিয়া আপনাকে কলুষিত করিব না।”

বার্থা পরিচারকদ্বয়কে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বারান্দা পরিত্যাগ করিল।

বার্থা প্রস্থান করিলে মোজে সরোষে বলিল, “আমি শয়তান, আমি কুকুর! তুই আজ আমায় যে অপমান করিয়াছিস্, তাহার প্রতিফল না দিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না। তোর অহঙ্কার চূর্ণ করিব; তোর মাথা মাটীর ধুলার সঙ্গে মিশাইয়া দিব।”

কাউণ্ট তিন ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরিলেন; তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বার্থা উপুড় হইয়া শয্যায় পড়িয়া, দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। কাউণ্ট সস্নেহে বার্থার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বার্থা ক্ষুব্ধ স্বরে সকল কথাই কাউণ্টের গোচর করিল, কোন কথা গোপন করিল না। বার্থার কথা শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে কাউণ্টের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বার্থা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “যদি তোমার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তোমার নিজের ও তোমার পত্নীর সম্মানের প্রতি যৎসামান্যও শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চাবুক মারিয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হাঁ, এ কায তোমাকে করিতেই হইবে। যদি তুমি এ কায না কর, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি তাহাকে ভয় কর; বুঝিব, সে তোমাকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে! তাহা হইলে, যে বাড়ীতে বাস করিয়া আমাকে পদে পদে অপমানিত হইতে হইতেছে এবং যেখানে আমার স্বামীর ও আমার সম্মান রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, সে বাড়ীতে আমি আর এক মুহূর্ত্ত বাস করিব না। হাঁ, আমি আমার মায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইব এবং এ জীবনে তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব না; তোমার সহিত বাসও করিব না। তোমার মত কাপুরুষ অযোগ্য স্বামীর মুখদর্শন করিতেও আমার ঘৃণা হইবে।”

বার্থার এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কাউণ্ট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, দুই চারিটি নীতি-কথাও বলিলেন; কিন্তু বার্থার সঙ্কল্প টলাইতে পারিলেন না।—বার্থা তাঁহাকে কাপুরুষ, মোজের ক্রীতদাস বলিয়া উপহাস করিল, ধিক্কার দিল। পত্নীর বিদ্রূপে ও ধিক্কারে কাউণ্টের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল; তিনি আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া কম্পিত পদে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং একগাছা চাবুক লইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় উপস্থিত হইলেন।

মোজে তখন চেয়ারে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে ধূম-পান করিতেছিল। কাউণ্ট তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিলেন; সেই বাণ্ডিলে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট ছিল। কাউণ্ট সেই নোটের তাড়া সবেগে মোজের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া চাবুক দ্বারা প্রচণ্ডবেগে তাহার অঙ্গ-সেবা করিতে লাগিলেন; শপাশপ শব্দে চাবুক পড়িতে লাগিল!

মাথায় ও মুখে দুই এক ঘা চাবুক পড়িতেই হতবুদ্ধি মোজে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, বিব্রত স্বরে বলিল, “এ কি! এ আবার কি রকম রসিকতা? আহা, থামো না!”

কাউণ্ট চাবুক চালাইতে চালাইতে বিকৃত স্বরে বলিলেন, “রসিকতা নয়; আজ তোমাকে খুন না করিয়া নিশ্চয়ই ছাড়িব না। তোমার অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করিয়াছি, করিতেছি; কিন্তু কাউণ্টেসের অপমান আমি সহ্য করিব না। তোমাকে খুন করিয়া সেই অপমানের প্রতিফল দিব। কাপুরুষ! বর্ব্বর!”

চাবুক প্রচণ্ডবেগে মোজের মুখে পড়িলে তাহার ললাটের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। ক্ষতমুখ হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল।

মোজে এক লম্ফে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে ললাটের রক্ত মুছিতে মুছিতে তীব্রস্বরে বলিল, “শোন্ মূর্খ! আমার এই রক্তপাতের ফল কিরূপ ভীষণ, তাহা তোর

বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোকে চূর্ণ করিব; কীটের ন্যায় এই পদতলে নিষ্পেষিত করিব। আজ হইতে আমি তোর শত্রু,—অতি ভীষণ শত্রু। তোর শাশুড়ীর সমস্ত সম্পত্তি আমার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেও আমি তোকে ক্ষমা করিব না। তোর এই নবাবী—এই ঘরজামাই-গিরি ঘুচাইয়া দিব। তোকে পথে বসাইব।”

মোজে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; নোটের তাড়াটা সে পূর্ব্বেই পকেটে পূরিয়াছিল। সে কাউণ্টের গৃহত্যাগ করিলে কাউণ্ট চাবুক ফেলিয়া দিয়া, একখানি কৌচের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

লাঞ্ছিতা

১

বঙ্গভূমে ছিল এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী,
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহারা—রূপে গুণে
রমণী পার্ব্বতীসমা, ষোড়শী তরুণী,
সতী-সাধ্বী—পতি ছাড়া দেব নাহি জানে।
শাশুড়ী, ননদী, তার সেবে সযতনে.
পিতৃ-গৃহে পিতামাতা ভাই-বোন সবে
বাঁধা ছিল স্নেহডোরে তার; কোনক্ষণে,
শোক, তাপ, অভাবের জ্বালা, এই ভবে
স্পর্শে নাই তারে। কিন্তু তার রূপরাশি
হ'ল তার কাল। এক সন্ধ্যাকালে বালা
মন্দিরে করিয়া পূজা, সাথে প্রতিবাসী,
ফিরিলা আপন গৃহে। গলে ফুলমালা,
হাতে ফুল-ডালা, রক্তবর্ণ বস্ত্র অঙ্গে,
যেন ত্রিদিবের কোন দেবী! পথে তার
হ'ল দেখা লম্পট যবন যুবা সঙ্গে।
ত্রাসেতে কাঁপিল বক্ষ—অতি ত্বরা ক'রে
গেল চলি গৃহে—নমিলা পতির পদ,
জপিলা অভয়া-নাম, শুচি ভক্তি-ভরে,
কি জানি ঘটে বা বুঝি, বিষম বিপদ।

২

কাম-বহ্নি উঠে জ্বলি' পিশাচ-হৃদয়ে।
যবে পতি-অঙ্কে বালা নিদ্রা যায় সুখে,
ঘোর অন্ধকার নিশি, অনুচর লয়ে,
দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত মত, আবরিত মুখে,
সেই ম্লেচ্ছ যুবা আসি পশিল সে কক্ষে,
জাগিল দম্পতি, করিল বিষম রব,
প্রাণাধিকে আবরিল পতি নিজ বক্ষে।
দারুণ আঘাতে তারে করিয়া নীরব,
দুরন্ত পশুর দল উঠায়ে বামায়—
সংজ্ঞাহীন দেহ তার—আনিল বর্ব্বর
পাষণ্ড আপন গৃহে। কাম-লালসায়,
নীচ মনোরথ সিদ্ধ করি, তারপর—
সতীর অমূল্য রত্ন করিয়া হরণ,
অচৈতন্য দেহখানি রাখিল প্রান্তরে।
কালনিশি হ'ল ভোর; গ্রামবাসিগণ
পাইয়া সতীর দেহ লয়ে গেল ঘরে।

৩

মর্ম্মভেদী হাহাকার গ্রামের মাঝারে,
কাঁদিল সবার হৃদি অবলার দুঃখে,
পাইল পাষণ্ড দণ্ড, রাজার বিচারে,
তবুও অবলা গৃহে থাকে ম্লানমুখে।
প্রাণেশ্বরী ছিল যার—মুহূর্ত্তের তরে,
নারিত রাখিতে তারে নয়নের আড়ে.
আজি সেই পতি নাহি আসে তার ঘরে,
যবন-দূষিতা ব'লে, হেয় জ্ঞান করে।
যেই শ্বশ্রূ বধূ লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলি
করিত আদর, আজি সেই গুরুজন
চাহে না তাহার পানে—দূরে যায় চলি.
বধূহস্তে অন্নজল করে না গ্রহণ।
ঘুচে গেল অবলার স্বামি-গৃহ-সুখ,
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন চিরদিন তরে,
আরাধ্য দেবতা তার হইল বিমুখ,
মনোদুঃখে গেল বালা মাতা-পিতা-ঘরে।
দেখিয়া লাঞ্ছিতা সুতা, মাতার পরাণ
বিদরিল শতধানে, কিন্তু পিতা তার,
জাতিনাশ-ভয়ে তারে, দিল নাকো স্থান;
ঘুচে গেল শেষ আশা, আহা, অবলার!

৪

আজি পুনঃ অন্ধকার নিশি। পাগলিনী
প্রায় বালা উতরিল জাহ্নবীর তীরে,
মর্ম্মভেদী আঁখি-জলে ভাসায়ে ধরণী,
ঘনমুক্ত কেশজাল হেলায় এলায়ে।
খরস্রোতে বহে গঙ্গা পদতলে তার,
বরষার বারিরাশি কাঁপাইয়া তীর,
তরঙ্গ ধাইছে ধরি ভীষণ আকার,
মুছিয়া আঁখির ধারা, বামা হ'ল স্থির।
মাতা, পিতা, পতিপদে প্রণমিয়া সতী,
করযোড়ে জাহ্নবীরে কাতর পরাণে,
জানাল হৃদয়-ব্যথা—বলে “মা গো! পতি
বিনা অন্য দেব তব দাসী নাহি জানে,
অশুচি, অস্পৃশ্যা আমি সেই পতি-ঘরে!
সমাজে নাহিক স্থান, আমি মা! পতিতা,
পতিতপাবনী তুমি! আজি তব নীরে
দাও স্থান, দাসী চাহে এই ভিক্ষা, মাতা!”
এই বলি অভাগিনী তরঙ্গ-ভিতরে
পড়ে ঝাঁপাইয়া দ্রুত যেন সৌদামিনী,
শুভ্র দেহখানি ভাসে ক্ষণেকের তরে,
উত্তাল তরঙ্গ এক গ্রাসিল তখনি!

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার বাল্যজীবন সম্বন্ধে সোজাসুজি এই কয়েকটি কথা মাত্র বলিয়াছেন—

"ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা।—ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যান-ভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। ····কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া, ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র।" (১।৮)

যখন অধিকারী কপালকুণ্ডলার এই পরিচয়টুক্ দিয়াছিলেন, তখন সে ষোড়শী যুবতী। কাব্যের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলার বাল্য-জীবনের আরও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার বাল্যলীলার নিকেতন "অপ্রফুল্ল" অরণ্যময়। "রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপ-শ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপ-শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নে সূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ-বৃক্ষ জন্মে না, স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাঁটি, বন-ঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।" (১।৩)

এই বনবাসিনী কিশোরীর প্রতিপালক কাপালিক যে কি প্রকারের মনুষ্য, প্রথম সন্দর্শনেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী গভীরা। একটি অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নির নিকটে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। "শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল; সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষ-মালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।" (১।৪)

এই প্রকার বিকট বীভৎস সাধন যাঁহার নিত্যকর্ম্ম, সেই কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রতিপালন যে করিয়াছিলেন, সে-ও দয়াপরবশ হইয়া নহে, আপন যোগসিদ্ধি-মানসে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কপালকুণ্ডলা কাপালিকের আচরণে স্নেহ-মমতার কোন লেশ পান নাই এবং প্রতিপালকের স্নেহ বা অপত্য-স্নেহের সংস্পর্শে বালক-বালিকার মনে যে সুকুমার ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, কপালকুণ্ডলার মনে সেই সকল ভাব ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। পক্ষান্তরে, আশৈশব অপত্য-স্নেহে বঞ্চিতা, নরবলি এবং শবসাধনা যেখানকার নিত্য ঘটনা, সেখানে বর্দ্ধিতা হইয়াও কপালকুণ্ডলা যে পিশাচী হইয়া উঠেন নাই, তাহার কারণ আর এক জনের প্রভাব, সেই কাননাভ্যন্তরস্থ মন্দিরের কালীর পূজারী অধিকারীর প্রভাব। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং মাতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি কপালকুণ্ডলাকে একটু লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে দেবীভক্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে ষোড়শী কপালকুণ্ডলার চিত্তে দুইটি বৃত্তি প্রবণতা লাভ করিয়াছিল; একটি ঔদাসীন্য, আর একটি দেবীভক্তি। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অধিকারীর আশ্রমে রাখিয়া অসঙ্কোচে সমুদ্রতীরে কাপালিকের সাক্ষাতে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

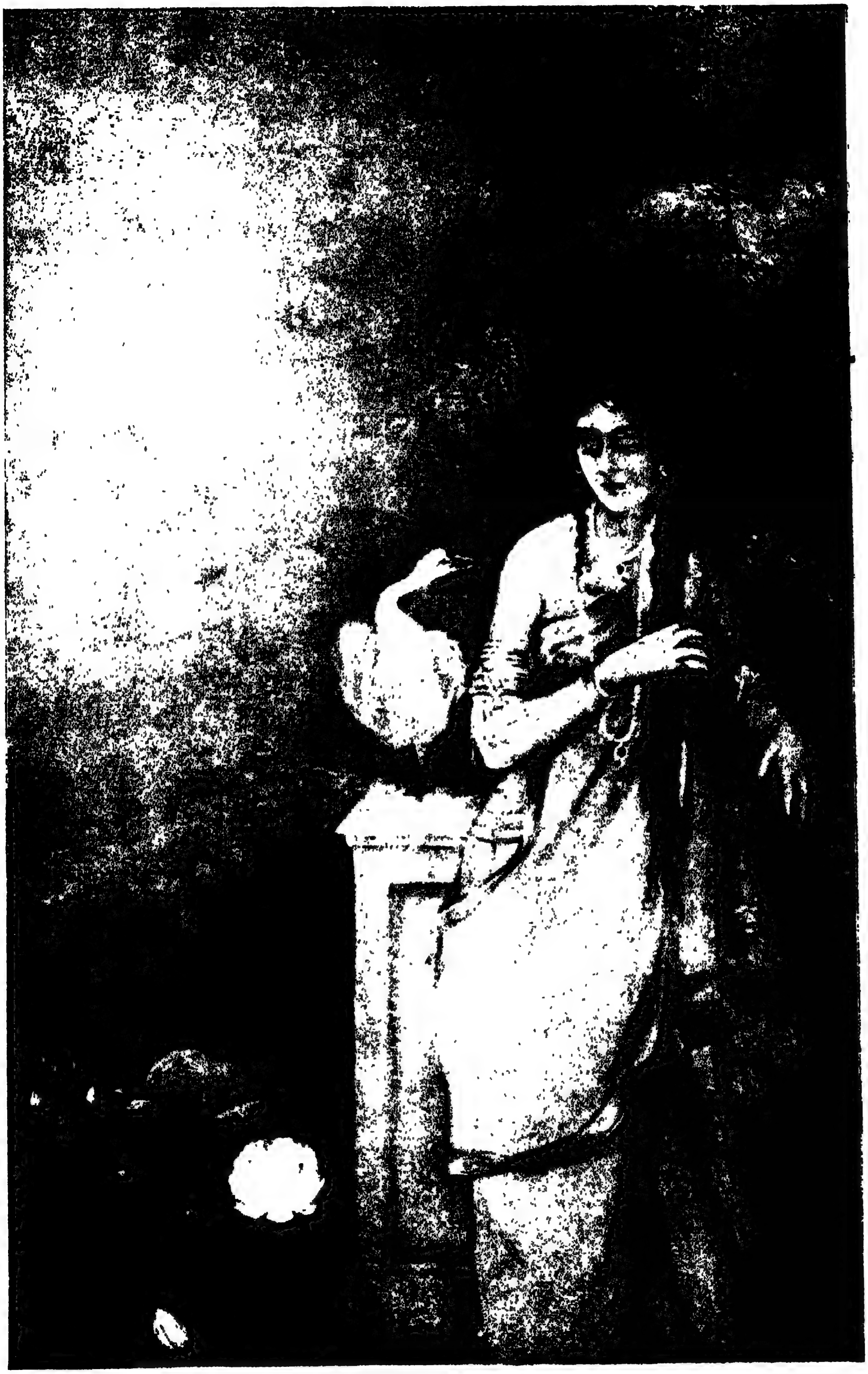

দময়ন্তী

বসুমতী প্রেস

শিল্পী — শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

"অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'যাইও না, ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।'

কপালকুণ্ডলা। কি ?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না ?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন ?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব ?" (১৮)

এই দৃঢ়বদ্ধ ঔদাসীন্যকে শিথিল করিবার একমাত্র উপায় হইতে পারিত প্রেমোন্মেষ। বালিয়াড়ির মধ্যে বর্দ্ধিতা উদাসিনী কপালকুণ্ডলার বালিয়াড়িকল্প হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ সহজ নহে ; নায়ককে দেখিবামাত্রই শকুন্তলা বা মিরন্দার মত কপালকুণ্ডলার প্রেমাতুর হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু যদি প্রথমদর্শন অবধি নায়কের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তবে বোধ হয়, সেই রসধারা বালিয়াড়ির শিখরকেও ভিজাইয়া তুলিতে পারিত, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময় থাকিতে সে সুযোগ ঘটিল না। উদাসিনী কপালকুণ্ডলা নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন এবং যাঁহাকে অগত্যা বিবাহ করিলেন, সেই নবকুমারও তখন সংসারবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। নবকুমার সপ্তগ্রামনিবাসী বন্দ্যঘটী গাইয়ের ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসর, তখন সে পুরীর পথে পিতা-মাতার সহিত পাঠানসেনা কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নবকুমারের পিতা অবশ্যই জাতিচ্যুতা পুত্রবধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পদ্মাবতীর পিতা রাজপ্রসাদলাভের আশায় সপরিবারে রাজমহল গেলেন। "নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না।" এই ব্যাপারের হয় ত ১০।১৫ বৎসর পরে এবার নবকুমার গঙ্গা-সাগরে আসিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে সহযাত্রিগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হইলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহার বৈরাগ্যকে আরও তীব্র করিয়া তুলিল। নবকুমার কাঠ লইয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকা সেখানে নাই। নদীতে তখন জোয়ার আসিয়াছে। প্রথম ভরসা করিলেন, জোয়ার শেষ হইলে নৌকা ফিরিয়া আসিবে। জোয়ার শেষ হইল, তার পর ক্রমশঃ ভাঁটাও শেষ হইল, কিন্তু নৌকা ফিরিল না। তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল, হয় নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নয় সঙ্গিগণ তাঁহাকে বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। নবকুমার বালিয়াড়ির মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। বহুদূরে আলো দেখিতে পাইলেন। আলোর নিকটবর্ত্তী হইয়া ছিন্ন-শির গলিত শবের উপর ধ্যানমগ্ন কাপালিককে দেখিতে পাইলেন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কাপালিকের আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে নানা কারণে একান্ত বিরাগী নবকুমারের সম্মুখে পরদিন সন্ধ্যার আধ আঁধারে অপরূপরূপা ষোড়শী-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই ষোড়শী কপালকুণ্ডলা। নবকুমার দেখিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া চকিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ষোড়শী উদ্বেগের সহিত অর্থাৎ সকরুণ নয়নে নবকুমারের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ষোড়শী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এই প্রশ্নের কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, নবকুমারের কিছুই মনে হইল না। কিন্তু সেই মৃদু মধুরধ্বনি যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

উত্তর না পাইয়া কপালকুণ্ডলা "আইস" বলিয়া আগে আগে চলিলেন ; নবকুমার কলের পুত্তলিকার ন্যায় পাছে পাছে চলিলেন। কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিতা হইলেন। "এ কি দেবী না মানুষী, না কাপালিকের মায়া মাত্র! নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া

হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।" কপালকুণ্ডলার কমনীয় কান্তি দেখিয়া এবং তাঁহার হৃদয়ের রমণীয়তার পরিচয় পাইয়া সাধারণ নায়কের মনে যে ভাবের উদয় হওয়া উচিত ছিল, নবকুমারের মনে কিন্তু সেইরূপ ভাবের উদয় হইল না। নবকুমারের মনে প্রেমের সঞ্চার হইল না; নবকুমার আত্মহারা হইয়া সেই রমণীমূর্ত্তির ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলেন না। যদি প্রথম দেখার সময় নবকুমার নিজে মজিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, কপালকুণ্ডলাকেও মজাইতে পারিতেন এবং উভয়ের দাম্পত্য-জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হইতে পারিত। কিন্তু নবকুমারের সে সামর্থ্য ছিল না। নবকুমার বিরাগী, সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যখন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন আর যাহাই হউক, পঞ্চশর শরসন্ধানের অবসর পাইল না। তখনই বিয়োগান্ত কাব্যের সূত্রপাত হইল।

পরদিন প্রাতে স্নান-আহ্নিক করিবার জন্য নবকুমার সমুদ্রতীরে গেলেন। "তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমন আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল, বলিতে পারি না. কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না।" (১৬)

এই ভাবে সমুদ্রতীরে দিন কাটাইয়া সূর্য্যাস্তের পর হতাশ-হৃদয়ে নবকুমার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। বিরক্ত-হৃদয় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে প্রেমনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই, চিনিতে পারেন নাই। তাই কপালকুণ্ডলা এখনও তাঁহার কাছে মায়াবিনী এবং মায়াবিনীকে আর একবার দেখিবার কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি সমুদ্রতীরে দিনটা কাটাইয়া দিলেন। কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তথায় কাপালিক বসিয়া আছেন। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া পূজার স্থানে চলিলেন। কাপালিক আগে চলিলেন, নবকুমার পাছে। তখনও সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই। এমন সময় কি জানি কাহার সুকোমল কর নবকুমারের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। নবকুমার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেই বনদেবী-মূর্ত্তি। নবকুমার চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক খানিকটা দূরে সরিয়া গেলে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কানে কানে 'যাইও না। ফিরিয়া যাও,—পলায়ন কর,' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এবারও বিরাগী নবকুমারের মন গলিল না। তিনি শুধু ভাবিলেন,—'এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে।' তাহার পর নিজের বাঁচিবার কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবকুমার তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা দেবী না মায়াবিনী না কি, নবকুমার তাহা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। নিজের প্রাণপণ করিয়া কপালকুণ্ডলা যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা অবশ্যই নবকুমারের বুঝিবার আর বাকী নাই। তথাপি যখন বনমধ্যে সেই "ষোড়শীর" অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন নবকুমার কি ভাবিতেছিলেন? নবকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "এও কপালে ছিল!" কবি এখানে ভাষ্য করিয়াছেন, "নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না।" যিনি মন্দিরমধ্যে দেখাদেখিমাত্রই তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই উক্তি সেই কবিরই লেখনী-প্রসূত। সংসারবিরাগী সংযমী প্রৌঢ় ব্যক্তিকে যদি একাকী রজনীতে বনপথে ষোড়শীর পাছে পাছে দৌড়াইতে হয়, তবে সে কপালের দোষ দেওয়া ভিন্ন আর কি করিতে পারে!

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া বনমধ্যস্থ কালীমন্দিরসংলগ্ন পূজারী বা অধিকারীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। অধিকারী নবকুমারকে নিজ রন্ধনশালায় শোওয়াইলেন। তখন কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করায় অধিকারী যে বাধা দিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অধিকারী যখন কপালকুণ্ডলার 'না গিয়া কোথায় যাইব?' প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও, সে প্রস্তাবে কপালকুণ্ডলা সহসা সম্মত হইতে পারিলেন না, কেন না, যখন অধিকারীর এক শিষ্য মন্দিরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন, যুবতীর যুবা-পুরুষের সহিত যাওয়া

অনুচিত। তাহার পর অপরিচিত পথিকের সঙ্গে যাওয়া উচিত কি অনুচিত, তদ্বিষয়ে কালীমাতার অভিমত জানিবার জন্য গুরু ও শিষ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীমূর্ত্তির পদে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিলেন। বিল্বপত্র মূর্ত্তির পদের উপর হইতে পড়িয়া গেল না। তখন উভয়ে সিদ্ধান্ত করিলেন, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে পথিকের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন। এইবার অধিকারী আর একটি খট্‌কা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় গেলে লোকালয়ে বিপদ হইতে পারে। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্যা, নবকুমার ব্রাহ্মণ-সন্তান। সুতরাং উভয়ের বিবাহান্তে যাওয়াই সঙ্গত। বিবাহ কি, কপালকুণ্ডলা সবিশেষ জানিতেন না। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য অধিকারী যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম “বিবাহ—বিবাহ ছাড়া আর কিছু নয়।” কপালকুণ্ডলা ইহাতেই সব বুঝিলেন মনে করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিলেন ; তিনি বলিলেন, প্রতিপালক কাপালিককে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার মন সরে না। তখন অধিকারী পাকে-প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তান্ত্রিক সাধনের অঙ্গস্বরূপ কোনও দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য কাপালিক তাঁহাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এ সকল কথায়ও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল ; সুতরাং “বি-বা-হে” সম্মত হইলেন।

কপালকুণ্ডলাকে সম্মতা করিয়া ঘটক ঠাকুর নবকুমারের নিকট গেলেন। গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। সুতরাং এই কন্যার প্রাণরক্ষার কোন উপায় তিনি বিবেচনা করিয়াছেন কি ? নবকুমার অমনই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য তিনি কাপালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকারী উত্তরে বলিলেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে কন্যার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গিয়া আত্মপরিবারস্থ করিয়া রাখিতে সম্মত হইলেন। অধিকারী আপত্তি করিলেন, যদি অন্য সঙ্গী না লইয়া তাঁহাদের মত যুবক-যুবতী ১৫ দিনের পথ একত্র যায়েন, তবে লোকে অপবাদ ঘোষণা করিবে এবং তিনি নিজেও এক জন অজ্ঞাতচরিত্র যুবকের সহিত কপালকুণ্ডলাকে একাকিনী দূরদেশে পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন। নবকুমার বলিলেন, “আপনি সঙ্গে আসুন।” কিন্তু ভবানীর পূজা ফেলিয়া অধিকারীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সুতরাং প্রস্তাব করিলেন, নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাউন। প্রস্তাব শুনিয়া—

“নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।” (১।৮)

কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকারী বিদায় লইলেন। পরদিন “প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন, দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এখন কি কর্ত্তব্য’ ?”

নবকুমার কহিলেন, “আজ হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহা করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে ?” তাহার পর—“গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।”

“যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

“কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমা-চরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, “এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।” (১।৯)

কালীপ্রতিমা কপালকুণ্ডলার কাছে জাগ্রত দেবতা। যখন সেই প্রতিমার চরণ হইতে তাঁহার প্রদত্ত বিল্বপত্র পড়িয়া গেল, তখন কপালকুণ্ডলা বুঝিলেন, ভগবতী তাঁহাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। তথাপি যে গেলেন, তাহার কারণ, তাঁহার ভক্তিমার্গের শিক্ষাগুরু অধিকারী তাঁহাকে যাইতে আদেশ দিলেন। যাইতে যাইতে একান্ত ভগবতী-ভক্তিপরায়ণা কপালকুণ্ডলা

নিশ্চয়ই ভাবিতে লাগিলেন, যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেইখানেই যাইতেছি।

কপালকুণ্ডলা দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া নবকুমারের কণ্ঠলগ্না হইয়াছিলেন; নবকুমার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণিগ্রহণ করিবার পর অবশ্য নবকুমার সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, কি অমূল্য রমণী-রত্ন তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় অনুরাগ-রসে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা যদি গৃহে এবং পল্লীসমাজে সাদরে গৃহীতা না হয়েন, তবে কি দশা হইবে, এই আশঙ্কায় সংযমী ব্রাহ্মণ অনুরাগ-সাগরে তরঙ্গ উঠিতে দেন নাই। "পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই।" করিলে বোধ হয় ভাল হইত। কালীপ্রতিমার চরণ হইতে বিল্বপত্র-বিচ্যুতির কথা কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার অবকাশ পাইত না। কিন্তু নবকুমার সে পাত্র ছিলেন না।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহা সমাদরে বধূবরণ করিয়া গৃহে লইলেন। তখন নবকুমারের প্রণয়-সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। "আর কপালকুণ্ডলা? তাঁহার কি ভাব?"

দুঃখের বিষয়, নবকমারের উচ্ছ্বসিত প্রণয়-তরঙ্গ কপালকুণ্ডলার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ, কপালকুণ্ডলার হৃদয় ভবানীর চরণচ্যুত অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রে 'আচ্ছাদিত ছিল। নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু শত তরঙ্গ তুলিয়াও সে মরমে পশিতে পারিল না। ননদী শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা কত দিন যোগিনী থাকিবেন, কবে গৃহিণী হইবেন? কপালকুণ্ডলা উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহিণী হইয়া বা জননী হইয়া সুখ কি? শ্যামাসুন্দরী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি না হইল, —তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?"

মৃন্ময়ী (কপালকুণ্ডলা) কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" "বলিতে পারি না", এই কয়টি কথাতে কপালকুণ্ডলার মনের প্রকৃত ভাব সূচিত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তার পর শ্যামাসুন্দরী বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় কপালকুণ্ডলা মনের কথা এই ভাবে খুলিয়া বলিলেন—

"শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মা'র পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল, ভাল মন্দ জানিতে মা'র কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না, অতএব কপালে কি আছে, জানি না।" (২।৬)

এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। আমরাও যেন শিহরিয়া উঠি। অহেতুক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া কপালকুণ্ডলা সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কপালকুণ্ডলা যেন নিজের সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন দিয়া স্বামীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি ছিল কি? কপালকুণ্ডলা সে চেষ্টা না করিয়া অন্যায় করেন নাই কি? কবি এরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিয়া স্ত্রীধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই কি? বঙ্কিমচন্দ্র যদি দেবী চৌধুরাণীর মত কপালকুণ্ডলাকে আর একটু পোষ মানাইতেন, তবে বড় সুন্দর হইত। হয় ত কাহারও কাহারও কাছে সুন্দর হইত; কিন্তু তাহাতে বালিয়াড়ির এবং কাপালিক ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হইত কি?

আর এক কথা। কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে পোষ মানিবার অবকাশই বা জুটিল কৈ। শ্যামাসুন্দরীর সহিত কপালকুণ্ডলার যে কথোপকথন উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা স্বামিগৃহে আসিবার অনতিকাল পরে। তার পর এক বৎসরমাত্র চলিয়া গিয়াছে। যোগিনী বহিরঙ্গে গৃহিণী সাজিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ রাত্রিকালে বনে ঔষধ আনিতে হইবে। কপালকুণ্ডলা ঔষধ আনিতে না গিয়া পারিলেন না। স্বামীর নিষেধ মানিলেন না। বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণবেশীর অনুরোধমত তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সেখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন এবং অনেকক্ষণ পরেও ব্রাহ্মণবেশী ফিরিল না দেখিয়া গৃহে

ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে নবকুমার নাই। তার পর প্রভাতে অপ্রগাঢ় ঘুমঘোরে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি যেন প্রবল ঝটিকা-বিক্ষোভিত সাগরমধ্যে নৌকায় আরোহণ করিয়া আছেন। কাপালিক সেই নৌকা ধরিয়া ডুবাইতে চাহিতেছে; ব্রাহ্মণবেশধারী নৌকা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?" কপালকুণ্ডলা বলিয়া ফেলিলেন, "নিমগ্ন কর।" নৌকাও তাঁহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। (৪।৩) কপালকুণ্ডলার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশীর একখানি চিঠি হাতে পড়িল। কপালকুণ্ডলা চিঠি পাঠ করিয়া জানিলেন, ব্রাহ্মণবেশী আবার তাঁহাকে সন্ধ্যার পরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সারাদিন কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন কি না, শেষে স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। কারণ, পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনার সহিত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ঐক্য দেখিতে পাইলেন। নিবিড় বনে ভগ্নগৃহে কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশীর মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর কথোপকথন হইতেছিল; ব্রাহ্মণবেশী ত তাঁহাকে বাঁচাইতেই চাহিতেছিলেন। এখনও কপালকুণ্ডলার মরিবার ইচ্ছা হয় নাই, বাঁচিবার সাধই প্রবল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়াই কপালকুণ্ডলা পতঙ্গের মত অগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন এবং বাঁচিয়া গৃহধর্ম্মপালনের ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া কপালকুণ্ডলা মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন। কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "নিমগ্ন কর।" জাগ্রৎ অবস্থায়ও কি সেইরূপ বলিলেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষা হেতু উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; ব্রাহ্মণবেশীর সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইতে হইবে। অতএব কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। অন্যে এই অবস্থায় স্বামীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু ভগবতী-পরায়ণা কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে ভগবতীর উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সুতরাং পতির সহিত পরামর্শের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। পতঙ্গ অগ্নির দিকে অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যার পর কপালকুণ্ডলা বনে গেলেন; ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহার পরিচয়ও পাইলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ভীষণ সংবাদ শুনিলেন। কাপালিকের স্বপ্নের কথা শুনিলেন। শুনিলেন, মা ভবানী কাপালিককে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন, "সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে।" "স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।" এরূপ চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিবার কারণ, কপালকুণ্ডলা কাপালিকের স্বপ্ন-কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিলেন। কাপালিক যে ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য এই বনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, এই সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার নিকট স্বামী নবকুমারকে ফেরত চাহিলেন। প্রথমতঃ কপালকুণ্ডলা আপত্তি করিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" কিন্তু "অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?" তাই অসঙ্কোচে স্বামী ফেরত দিতে সম্মতা হইয়া সপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া—

"কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন।" আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণে নবকুমারকে দেখিতে পান নাই। আত্মজনের বিসর্জ্জন না দিয়া কেহ আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইতে পারে না। কাপালিকের স্বপ্নাদেশ শুনিবার পর কপালকুণ্ডলা নিজের অন্তঃকরণে নবকুমারকে দেখিতে পান নাই বলিয়া যে উহার পূর্ব্বে সেই অন্তঃকরণে নবকুমারের কোন স্থান ছিল না, এমন অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> কপালকুণ্ডলা অন্তঃকণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; ·· কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহনিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে

সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী, মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষমতে প্রতীত হইয়াছিল। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন ?......

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই এই শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব ? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে ?" (৪।৮)

এই প্রকার চিন্তায় ভারাক্রান্ত চিত্তে চলিতে চলিতে কপালকুণ্ডলা আকাশবাণী শুনিলেন, "বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি।" চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলেন, "যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন। কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন।" ভৈরবী আকাশপথে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার দিকে চাহিয়া চলিলেন। এমন সময় ভীমনাদে নবকুমার কর্ত্তৃক উচ্চারিত 'কপালকুণ্ডলা!' ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমার কর্ত্তৃক শ্মশানে কাপালিকের পূজাস্থানে নীত হইলেন। কাপালিকের পূজা শেষ হইল। তখন তাঁহার আদেশমত নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে নবকুমারের মদের নেশা ছুটিতে লাগিল, আবার কপালকুণ্ডলার চিত্তও নবকুমারের অবস্থা দেখিয়া দ্রব হইতে লাগিল। শেষে নবকুমার কপালকুণ্ডলার পদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিলেন, "কিন্তু আমি আর গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।" তখন তটাভিঘাতী গঙ্গাতরঙ্গ আসিয়া বালিয়াড়ির সেই বনফুল মায়ের পদে অর্পণ করিবার জন্য তুলিয়া লইয়া গেল। ভক্তির জয় হইল।

সমাজের অঙ্কে, পরিবারের অঙ্কে প্রতিপালিতা যুবতীর হৃদয়ে এরূপ সকল প্রকার সংশয়রহিত ভক্তিবিশ্বাসের উদয় সম্ভব নহে। নির্জ্জনে বালিয়াড়ির মধ্যস্থ বনে নির্ম্মম কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন বলিয়াই কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে এমন অহেতুকী ভক্তি-বিশ্বাস বিকশিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। দেবীর পদধৃত অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রের আবরণ সেই ভক্তি-বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার পর যখন মা স্বয়ং ডাকিলেন, তখন আর বাধা দিবে কে? নবকুমার চরণে লুটাইয়া বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। কপালকুণ্ডলার পক্ষে ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইল। এমন সময় তটাভিঘাতী গঙ্গাতরঙ্গ এই সমস্যার সমাধা করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিল। ভগবতী চরণ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া স্বপ্নযোগে কাপালিককে কপালকুণ্ডলার বলিদানের আদেশ দিয়া এবং অবশেষে আকাশপথে স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া হাত তুলিয়া মরণের পথ দেখাইয়া দিয়া, কপালকুণ্ডলার পক্ষে ভগবতীভক্তির সহিত পতিভক্তির সামঞ্জস্যসাধন অসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অন্ধ বিশ্বাসের অথবা বিচারবুদ্ধিবিহীন, সংশয়শূন্য অহেতুকী ভক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

প্রত্যাবর্ত্তন

কত দিন পরে আজ এসেছ ফিরে!
গিয়েছিলে অভিমানে সে দিন ব্যাকুল সাঁঝে,
একেলা ফেলিয়া মোরে আকুল বাদল-মাঝে,
এখন সে রাগ বঁধু, পড়েছে কি রে?

দেখনি ব্যথায় মোর ম্লান হয়ে গেল মুখ,
বিপুল বেদনাবশে কাঁপিতে লাগিল বুক,
কাঁদন বাঁধন হারা নয়ন-নীরে!

তোমার তরণী গেল মিলায়ে জলের সাথ,
মিলায়ে আসিল আলো, ঘনায়ে আসিল রাত,
আঁধারে কাঁদিতে র'নু জলধি-তীরে!

তোমার সে অভিমানে গেল মোর যত সুখ,
বড় জ্বালা যাতনায় ভরে গেল ভাঙা বুক,
মরণ সকল জ্বালা জুড়া'ত ধীরে!
কেন আর এত দিনে আসিলে ফিরে?

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

শিল্প-মঞ্জরী

গোল গলা সেমিজ—(Round Collar Chemise) রকমারী সেমিজের মধ্যে এইটির টাইট ফিটিং সেমিজের ন্যায় ব্যবহার চলে। এই সেমিজে গলার অংশে ও মোহোড়ার অংশে সরু চিকণ বসাইয়া নীচের অংশে ৩" বা ৪" ইঞ্চি চওড়া চিকণ বসাইলে বেশ সুন্দর দেখায়।

সরঞ্জাম—(Materials) কাপড় ডু'লম্বা ২½ গজ।

সেমিজের মাপ - লম্বা ৪৫" ছাতি ৩২" কোমর ২৮" সেস্ত ১৪" পুট ৬½"।

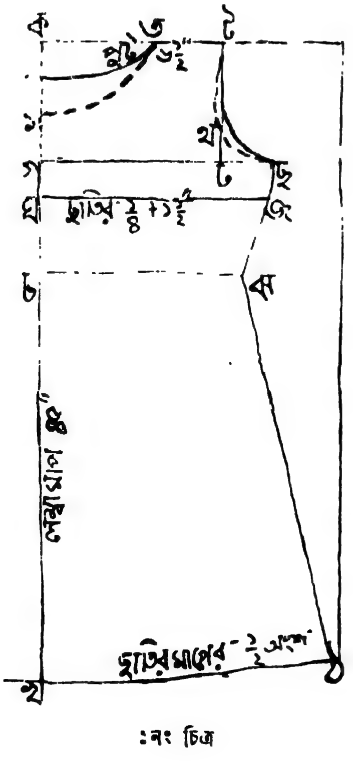

১নং চিত্র

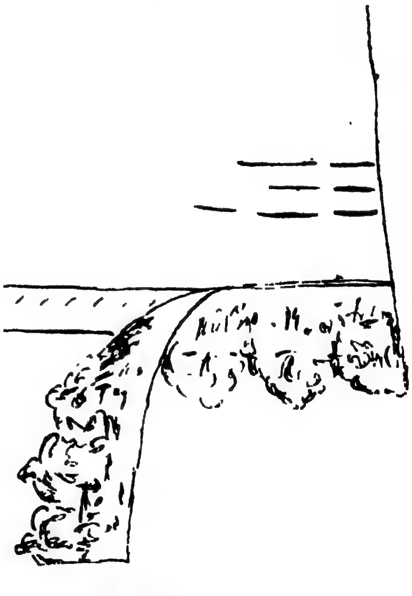

২নং চিত্র

সেমিজ কাটিবার প্রণালী—যে কাপড়ের সেমিজ হইবে, কাপড়কে এড়োয় ডবল ভাঁজ করিয়া লম্বা মাপে ডবল ভাজ করিতে হইবে। এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ভাজ ছাতির মাপের অর্দ্ধেক হওয়া চাই (মনে কর খ, ঠ ছাতির মাপের অর্দ্ধেক ১৬" ইঞ্চি) চিত্র দাগিবার প্রণালী ক, খ লম্বা মাপ ৪৫" ক বিন্দু হইতে ছাতির ¼ অংশ ৮" —১½" ইঞ্চি ৬½" ইঞ্চি স্থানে গ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ বিন্দু হইতে ১½" ইঞ্চি নীচে ঘ বিন্দু চিহ্ন করিতে হইবে। ক বিন্দু চ বিন্দু সেস্ত ১৪" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া গ ও ঘ বিন্দু হইতে ছাতির ¼ অংশ ৮"+১½"=৯½" ইঞ্চি স্থানে ছ ও জ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ, ছ ও ঘ, জ সম লাইনে টানিতে হইবে। চ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭"+১½"=৮½" ইঞ্চি ঝ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ছ, জ ও ঝ বিন্দু সংযোগ করিয়া খ বিন্দু ছাতির মাপের ½ অংশ ১৬" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া খ লাইন হইতে ১" ইঞ্চি উপরে ঠ বিন্দু চিহ্ন করিতে হইবে। ঝ, ঠ চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। এখন ক বিন্দু হইতে ট বিন্দু পুট মাপ ট বিন্দু হইতে ঢ বিন্দু নিম্নদিকে সোজা টানিয়া গ লাইনে সংযোগ করিয়া ট ও ছ চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। কাঁধের অংশ জোড়া থাকিবে। গলার অংশ কাটিতে হইলে ছাতির ⅙ অংশ

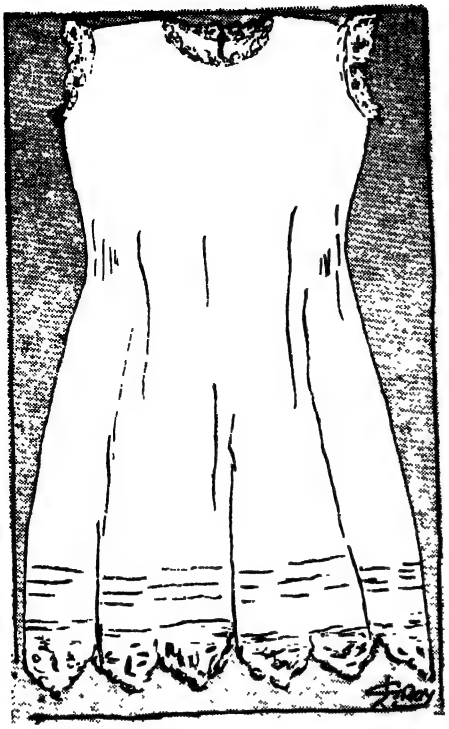

৩নং চিত্র

ত বিন্দু চিহ্ন করিয়া ক বিন্দু হইতে ড বিন্দু ১½" ইঞ্চি নীচে ত, ড চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইতে হইবে। এখন ত, ড দাগে গলার অংশ কাটিয়া ট, ছ, জ, ঝ, ঠ, ঙ, থ দাগে কাটিয়া লইলে পেছনকার অংশ সম্পূর্ণ কাটা হইল। সাম্নের অংশ কাটিতে হইলে উপরের দু'হাত ভাঁজ করা কাপড় লইয়া সাম্নের অংশ কাটিতে হইবে। ড বিন্দু হইতে আরও ১½" ইঞ্চি নীচে ১ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ত, ১ বিন্দু চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া ত ১ বিন্দু দাগে কাটিয়া মোহোড়ার অংশে ট বিন্দু হইতে থ বিন্দু ১" ইঞ্চি ভিতরে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত চিত্রের ন্যায় দাগিয়া দাগে কাটিয়া লইলে সাম্নের অংশ কাটা শেষ হইল।

সেমিজ সেলাই—এ সেমিজের পেছনের দিকে বোতাম বুটী ও বোতাম ঘর বসাইতে হইবে। সেস্ত পর্য্যন্ত গলার অংশ হইতে সোজা লাইনে কাটিতে হয়। বোতাম বুটী ও বোতাম ঘরের পটী বসাইয়া গলায় সরু চিকণ বসাইয়া লইয়া মোহোড়ার অংশে চিকণ বসাইয়া লইতে হয়। সেমিজের নীচের অংশে ৩" বা ৪" ইঞ্চি চওড়া চিকণ বসাইয়া কলের বকেয়া দিয়া দু' দিকের পাশ সেলাই করিয়া সেমিজের মাপ হইতে অর্থাৎ ৪৫" ইঞ্চি মাপ হইতে যে কয় ইঞ্চি লম্বা মাপ আছে, তাহাতে চিকণ যেখান হইতে বসান হইয়াছে, তাহার ২½" ইঞ্চি উপরে তিনটি সরু লাইনে প্লেট সেলাই করিয়া লইতে হইবে। এখন পশ্চাদ্ভাগে বোতাম-পটী ও বোতাম-ঘর পটী বসান হইয়াছে, তাহাতে ৪টি বোতাম-ঘর করিয়া বোতাম-পটীতে সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "গোল গলা সেমিজ" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

গুরু

ভ্রান্ত আজি কোথা যাও দেশ-দেশান্তরে—
অতৃপ্ত হৃদয়-মাঝে অশান্তির বোঝা,
সংসারশৈবালদাম রাখিয়া অন্তরে
পর্ব্বতে কন্দরে তব মিথ্যা গুরু খোঁজা।

কুটিল তর্কের জালে পণ্ডিত সজ্জনে
ঘিরিতে বাসনা তব পাণ্ডিত্যের বলে,
অজ্ঞান বোঝ না তুমি গর্ব্ব-স্ফীত মনে
আপনি পড়েছ বাঁধা আপনার জালে।

যে অস্ত্রে বুঝিতে চাহ শক্তি অপরের
সে আয়ুধ করে তব ঘোর অপকার।
পতঙ্গ রচিয়া গৃহ সূক্ষ্ম রেশমের
বন্দী রহে সেই ব্যূহে—মুক্তি কোথা তার?

গভীর শাস্ত্রের সূক্ত উচ্চারণ করি'
পরীক্ষা করিতে যদি যাও গুরুজনে,
গুরুর চরণ আশা মূলে লয় করি'
নিষ্কাম নিস্তব্ধ থেক নিজ গৃহ-কোণে।

শুদ্ধচিতে অহঙ্কার তমোনাশ করি'
যাহার চরণে কর আত্ম-সমর্পণ,
ইষ্ট জ্ঞানে যারে লহ যুক্তি পরিহরি'
উৎসর্গ করিবে যারে চিত্ত হৃদি মন।

আপন হৃদয় হ'তে হৃদয় যাহার—
যাহার অন্তর তব সর্ব্বসুখাধার,
তাহার চরণে কর কোটি নমস্কার
সে জন তোমার গুরু সর্ব্বশাস্ত্র সার!

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

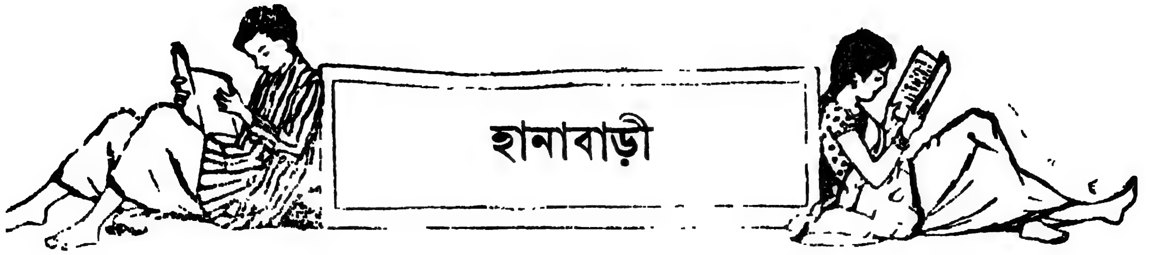

হানাবাড়ী

৩২

নিতাই এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আড়ে আড়ে আমার দিকে দেখিতেছিল। এখন বলিল, "এজ্ঞে, ও বাড়ীতে মই-সিড়ি লাগালে পরে, যাওয়া যেতে পারে। আপনিও বোধ হয় ঐ রকমে ও বাড়ীর ছাতে উঠে, তার পর এ বাড়ীর পায়খানার ছাতে এসেছিলেন? কিন্তু এ দিক্ হ'তে কেউ কখনও সে রকম উপায়ে ও বাড়ীতে নেমেছিল কি না, তা আমি জানি নে। তবে, এক দিন এক জন লোক আমাদের আঙ্গনার ঐ কেঠো সিঁড়ি বেয়ে, পায়খানার ছাতে উঠবের লেগে যোগাড় করতেছিল, তা' আমি দেখে'ছিলেম।"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে লোক?"

"সেই চীনা সাহেব।"

"চীনা সাহেব আবার কে?"

"ঐ যে ন্যাস্-ম্যামের সাথে, পালওয়ানী গোঁফওলা সাহেব আসত, সে।"

আমি গোঁসাইজীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ন্যাস্-ম্যামটা কি বস্তু, তা' আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

গোঁসাইজী বলিলেন, "ও বেটার যেমন কথার ভঙ্গী! বেটা ভদ্রঘরের মেয়েকে বলে কি না ন্যাস্-ম্যাম! স্মৃতিরত্নের কাছে যে স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে আসত, আপনাকে বলেছি, সে যেমন নব্য-ধরণের পোষাক প'রে আসত, আমাদের দেশী 'নার্স' ও ধাইরাও ঐ ধরণেই পোষাক প'রে বেড়ায় না? তাই ও বেটা ঐ রকম পোষাক-পরা সব মেয়েদেরই 'নার্স-মেম' বলে।"

আমি পুনরায় নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে চীনা সাহেব কবে ঐ রকমে ওঠবার যোগাড় কচ্ছিল, তা' তোর মনে আছে?"

"হেঁ! ও বাড়ীতে যে দিন খুন হয়, তার আগের দিন সাঁঝের পরে;—এই তখন আন্দাজ রাত সাড়ে ৮টা হবে। আমি ঘরের কায সেরে, (গোঁসাইজীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া) এনাকে তামুক সেজে দিয়ে, পায়খানা যাবার লেগে আঙ্গনার খিড়কীর দিকে এস্তেছিলেম,—তখন দেখলেম, ঐ সিঁড়ি ধ'রে সাহেব উঠতে লেগেছে। আমার সাড়া পেয়ে ঝাঁ ক'রে নেমে প'ড়ে খিড়কীর কপাট খুলে গলি দিয়ে পেইলে গেল।"

"তার সঙ্গে সেই মেমও ছিল কি?"

"এজ্ঞে না; সে একেলাই ছিল। সে পেইলে যাবাব পর ম্যামও ঐ গলি দিয়ে বা'র হয়ে চ'লে গেল।"

"তারা এসেছিলও কি ঐ পথ দিয়ে?"

"না; সদর খোলা থাকলে, তানারা সদর দিয়ে আসত। যাবার কালে বুড়ো ওনাদেরকে ঐ গলি দিয়ে বার ক'রে দিত।"

"তারা কি প্রায়ই আসত?"

"না; মোট আন্দাজ ৫।৭ বার এসেছিল।"

"শেষ কবে এসেছিল?"

"ঐ সে দিন তেনারা যে চ'লে গেল, তার পরে আর এসে নি। বুড়ো বামুনও তার দু' দিন বাদে ভাড়া চুকিয়ে, ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল। আমাকে কত বস্কিস্ দিবে কয়েছিল, তাহা ত দিলেক না,—কেবল ঐ ছাতাডা রেখে যেয়ে আমারে ফেঁসিয়ে গেল!"

"বক্সিস্ দেবে বলেছিল কেন?"

"ঐ যে সেই রেতের বেলা চীনা সাহেব সিঁড়ি বেয়ে উঠতেছিল, আর আমারে দেখে স'রে পড়লো, না? সে কথা, ন্যাস্-ম্যাম চ'লে যাবার পর, বুড়োরে আমি কয়েছিলেম। তখন বুড়ো আমারে ও কথাডা গুম্ খেয়ে যেতে কইলেক; আর কত মিঠে কথা ক'য়ে আমারে অনেক ট্যাকা দিবে বল্লেক।

"তা' বুড়ো যখন ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল, তখন তুই বক্‌সিসের টাকা আদায় ক'রে নিলি নি কেন ?"

"আমি কি তাগিদ কর্‌তে ছেড়েছিলেম, বাবু ? তেনার বাক্স-বিছেনা পর্য্যন্ত এট্‌কে রেখেছিলেম। কিন্তু তেনার ভারি মিঠে বুলি কি না ! আমার হাতে দুটো ট্যাকা দিয়ে, মিঠে কথা ক'য়ে বুঝুলে যে, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তেনার হাতের ট্যাকা সব ফুইরে গেল ; তা' ঐ ছাতাডা আমার কাছে থাকৃল : ন্যাস্‌-ম্যাম যে দিন ওডারে নেবার লেগে হেথাকে এস্‌বে, সে দিন তেনার হাতে বুড়ো আমার বস্‌কিসের সব ট্যাকা পেঠিয়ে দিবেক। আমি বুড়োর কথায় ভুলে বোকা ব'নে গেলেম। তার পর যখন কত দিন কেটে গেল, ন্যাস্‌-ম্যামও এলো না, বুড়োও এলো না, তখন বুঝ্‌লেম যে, বিট্‌লে বুড়ো আমারে ফাঁকি দিয়ে পেইলেছে।"

"বুড়ো ঐ খুনের পরে হঠাৎ ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল কেন ?"

উত্তরে গোঁসাইজী বলিলেন, "ভাড়া চুকিয়ে দেবার সময় আমি তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা'তে সে বল্লে, বাড়ীর পিছনেই ঐ রকম একটা খুনের ব্যাপার হওয়ায় তার বড় ভয় হয়েছে, সেই জন্ত সে আর এখানে থাকৃতে ইচ্ছা করে না। তাই ঘর ছেড়ে দিলে।"

আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটি যে আস্‌ত, তার পরণের শাড়ীখানা রেশমী কি সাধারণ সূতী কাপড়ের, তা বল্‌তে পারেন কি ?"

"আমি ঠিক বল্‌তে পারি না। কারণ, আমি তাদের ভাল ক'রে কখনও দেখি নি ; তা' ছাড়া তারা সন্ধ্যার পরে আস্‌ত ব'লে ও সব লক্ষ্য কর্‌বার সুবিধাও হয় নি। তবে আমার বোধ হয়, শেষবাবে মেয়েটি একখানা চওড়া পাড়ের ঢাকাই শাড়ী পরেছিল।-- কেমন রে, নিতাই ? নয় কি ?"

"এজ্ঞে,- সে ত ঐ একই রকম ডাগর পেড়ের কাপড় প'রে এস্‌তো।"

"মেয়েটিকে দেখতে কেমন, তুই বল্‌তে পারিস্‌ ?"

নিতাই ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "দেখতে আর কেমন, বাবু ? যেমন সবাই হয়, তেম্‌নি। তবে রংডা গোরা ; গায়ে মাসও আছে, কিন্তু মাথায় কিছু খাটো। আর, ম্যাম হ'লে কি হয়,—আমাদের ভাশের মেয়ে ত ? একটু লাজ-সরমও ছিল। আমি তেনার মুখের বাগে তাকালে, মাথার কাপড় টেনে মুখ ফিইরে স'রে যেত।"

তাহার পরে দুই জনকেই আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া যখন আর বিশেষ কোন নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম না, তখন গোঁসাইজীর নিকট বিদায় লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। ছাতাটা অবশ্য সঙ্গে আনিতে ভুলি নাই।

৩৩

ওকালতীতে নূতন ব্রতীর পক্ষে আমি ইদানীং যেরূপ কায-কর্ম্ম পাইতেছিলাম, তাহা বেশ সন্তোষজনক হইলেও দিন দিন তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার কিছু কমে নাই এবং সপ্তাহে কাযের পরিমাণ যেরূপ হইতেছিল, তাহাতে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট আশাও পাইতেছিলাম। এমন কি, নিয়ত কাযে ব্যাপৃত থাকায়, সপ্তাহের দিন কয়টা কাটিয়া পুনরায় শনিবার আসিতে যে অযথা বিলম্ব হইতেছে, এরূপ মনে করিবার অবসর পাই নাই,– এ কথা পূর্ব্বে বোধ হয় বলিয়াছি। তথাপি কাযে নিবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শনিবার আসিতে আর কয় দিন বাকী আছে, তাহা যে প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়াও গণনা করি নাই,—এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে প্রস্তুত নহি।

আজ শনিবার। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মনে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিল এবং সে দিনের জন্য হাতে যে কয়টা কায ছিল, সে সব সারিয়া বৈকালে ৩টার ট্রেণ ধরিতে পারিব কি না, উৎকণ্ঠিত মনে তাহাই বিবেচনা করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিলাম।

কথাগুলা পড়িয়া হয় ত অনেকে হাসিবেন। অনেকে হয় ত বলিবেন, আমি বড় 'বেহায়া।' যিনি যাহাই বলুন,—আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে আমার 'নজীরের' অভাব নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, পূর্ব্বে যখন 'মেসে' থাকিতাম, তখন সেখানকার নব-পরিণীত বন্ধুগণ শনিবারের প্রত্যাশায় দিন গণনা করিতে করিতে অবশেষে ঐ দিনটা যখন আসিত, তখন সকাল হইতেই তাঁহারা মহা উৎসাহে ব্যাগ গুছাইতে বসিয়া যাইতেন এবং

কলেজ হইতে আর 'মেসে' না ফিরিয়াই যাহাতে সটান শ্বশুরালয় অভিমুখে অভিযান করা যায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।—তবে আপনারা হয় ত আপত্তি করিবেন যে. ও 'নজীর' আমার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না; কেন না, আমি এখনও অবিবাহিত। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত মূল নীতিটা একই। 'বিবাহিত' বা 'অ-বিবাহিত',--সে কেবল বাহ্য অবস্থার পার্থক্য মাত্র।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়াও ৩টার ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না। নিতাই-প্রদত্ত ছাতা ও ·আমার ব্যাগ লইয়া যখন "নন্দন-কুঞ্জে" উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বিশ্রামান্তে যোগীন বাবুর নিকট শুনিয়া প্রীত হইলাম যে, কাকলীর সে 'গান-মা' আজ দিন-দুই হইল, এখানে আসিয়াছেন।

যোগীন বাবুর নিকট আরও শুনিলাম যে, 'গান-মা'র সহিত কথাবার্ত্তায় জানা গিয়াছে যে, সরস্বতী-পূজার আগের দিন বেলা প্রায় ৪টার সময় যমুনা কলিকাতা হইতে তাঁহার এক পঞ্জাবী বন্ধুর অসুস্থতাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কান সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং তাহার পরদিনেই আন্দাজ বেলা ১২টার সময় উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, যমুনার সেই বন্ধুর অসুস্থতা উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু সে ভোজালীখানা ঘোষজা মহাশয়ের পাঠাগার হইতে কোন সময় অপহরণ করিয়াছিল, তাহা গান-মা ঠিক বলিতে পারেন না; কারণ, স্বয়ং তিনি কাহাকেও তাহা লইতে দেখেন নাই। তবে তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, যমুনাই তাহা লইয়াছে। কেন না, সরস্বতী-পূজার প্রায় ২।৩ দিন আগে – যে দিন সেন সাহেব কলিকাতায় যান, তাহার পূর্ব্বদিন — যমুনা পুস্তকের আলমারিগুলা গুছাইবার ছলে ঐ ঘরে বহু সময় কাটাইয়াছিল; এবং তাহার পরদিন হইতে গান-মা ভোজালীখানা ছবির নীচে আর দেখিতে পান নাই। তাঁহার মুখে এই সকল নূতন সংবাদ শুনিয়া অবধি আর কাহারও (বিশেষতঃ কাকলীর) কোন সংশয় নাই যে, যমুনা এবং কান সাহেব পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া উভয়েই একযোগে,—অথবা উহাদের মধ্যে এক জন,—ঘোষজা মহাশয়ের হত্যা-সাধন করিয়াছে।

বাহিরে বসিয়া যোগীন বাবুর সহিত এই সব কথা বার্ত্তার পরে তিনি আমাকে জলযোগের জন্য ভিতরে লইয় গেলেন। তথায় পিসীমা ও কাকী উপস্থিত থাকিয়া নান কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাকলীকে এব বারও দেখিতে পাইলাম না। এমন কি, তাহার সম্বে কোন কথাই কেহ উল্লেখ পর্য্যন্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বোধ হয় সেই জন্যই,—অথবা কি কারণে ঠিব বলিতে পারি না,—আজ ইঁহাদের বাক্যালাপে আমা ক্রমেই চিত্তগ্রাহিতার বড়ই অভাব বোধ হইতে লাগিল।

জলযোগ সমাপ্ত হইলে, কাকী 'গান-মা'কে লইয় আসিয়া আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। শুনিলাম, তাঁহার নাম কুমারী দীপ্তি বিশ্বাস। কুমারী হইলেও মুখ দেখিয়া তাঁহার বয়সের হিসাব করা আমার পক্ষে অসাধ্য বোধ হইল। তবে, তাহা যে ৩০শের কম নহে, এবং ৪০শের বেশীও নহে, এইরূপ একটা অনিশ্চিত .ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম বটে। কিন্তু, তাঁহার "দীপ্তি" নামের সার্থকতা, মুখাবয়বের কোথাও বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। বর্ণে গৌরের সামান্য আভাস থাকিলেও, তাহা বড়ই মলিন; এবং চক্ষুর্দ্বয় সুদীর্ঘ ও বিস্ফারিত হইলেও, কিঞ্চিৎ কোটরগত ও কালিমা-মণ্ডিত হওয়ায় সহজ অবস্থায় কিছু ম্রিয়মাণ। তবে, ক্রমে দেখিলাম যে, কথা-প্রসঙ্গে যমুনা ও কান সাহেবের নামোল্লেখের সময় তাঁহার চোখের সেই সহজ ভাব তিরোহিত হইয়া, দৃষ্টিটা যেন কিছু অপ্রীতিকররূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল বটে।

৩৪

কুমারী দীপ্তির সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল;—অথবা ঠিক বলিতে গেলে, তিনি নিজেই এত কথা কহিতে লাগিলেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহার বাক্যস্রোতঃ সংহত করিতে আমাদিগকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল। অথচ পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ কয়টি সংবাদ ব্যতীত তাঁহার এত কথার মধ্যে আর নূতন বার্ত্তা কিছুই পাওয়া গেল না! তাঁহার অপর সমস্ত কথার মর্ম্ম এই যে, যমুনা নিতান্ত চরিত্রহীনা; কান সাহেবের প্রতি তাহার অবৈধ আসক্তিই তাহার স্বামীর প্রতি সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারের মূল কারণ ও সেই লজ্জাহীন আসক্তিই ঘোষজা

মহাশয়ের গৃহত্যাগেরও কারণ। সেই আসক্তির মোহে অন্ধ হইয়া যমুনা কান সাহেব সম্বন্ধে অপর সকল রমণীকেই —এমন কি, ইদানীং দীপ্তিকে পর্য্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। এই সন্দেহের বশে ক্রমে তাহার অসদাচরণ এতই বাড়িতে লাগিল যে, দীপ্তি অবশেষে কার্য্যে অবসর লইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যমুনারও সন্দেহ যে শুধু অমূলক, তাহা নহে; সত্যের একেবারে বিপরীত। কেন না, কান সাহেব যে গোপনে দীপ্তির প্রতি নিদারুণ আসক্ত হইয়াছিল এবং দীপ্তি সামান্যমাত্র সম্মতি প্রকাশ করিলেই যে কান সাহেব তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিত, তাহাতে দীপ্তির কোনই সংশয় নাই। কিন্তু না! কুমারী দীপ্তি চিরকুমারী থাকিবেন, ইহাই তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা; এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি এক দিনের জন্যও কান সাহেবকে ইঙ্গিতেও প্রশ্রয় দেন নাই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কুমারী দীপ্তির এই সুদীর্ঘ বাক্যস্রোতঃ ক্রমে এতই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িতে লাগিল যে, তাহা রোধ করিবার অভিপ্রায়ে অবশেষে আমি ও যোগীন বাবু সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া ঘোষজা মহাশয়ের পাঠাগারে আসিয়া বসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কাকী ও পিসীমাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাকলী ত এখনও দেখা দিল না! তাহার মাসী এবং মেসো এবং আমার পিসীমাও বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও সহাস্য মুখে আমার সহিত গল্প করিতে বসিয়া গেলেন,—অথচ তাহার অনুপস্থিতির কারণটা প্রকাশ করা, এমন কি, তাহার নামটা পর্য্যন্ত একবার উল্লেখ করাও আবশ্যক বোধ করিলেন না। তা বেশ! আমিই বা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব, এরূপ কোন কারণ ত ছিল না! আমি ত এই হত্যাসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত লোক মাত্র এবং ঐ বিষয়ের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যই ত আজ এখানে আসিয়াছি। আর কোন উদ্দেশ্য ত নাই! কাকলী দেখা দিউক আর না দিউক, তাহার কথা কেহ বলুক আর না বলুক—তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? অতএব অবিলম্বে এখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করাই আমার এখন কর্ত্তব্য নহে কি?

সেই জন্য আর বৃথা কথায় সময় নষ্ট না করিয়া কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে আমার তদন্তের ফল আনুপূর্ব্বিক ইঁহাদিগকে জানাইলাম এবং পরে সেই ছাতাটাও দেখাইলাম। ঘরের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে একটা টেবলের উপর বেশ বড় একটা কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। ছাতাটা সেই আলোর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহারা তিন জনেই তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় হঠাৎ সেই দ্বারের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম যে, তৎসংলগ্ন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে একখানি কমনীয় মুখের আংশিক আবির্ভাব হইয়া প্রথমে সেই ছাতার দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল এবং পরক্ষণে তাহা আমার দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইবামাত্র মুখখানি ঈষৎ লজ্জা ও হাসিতে মণ্ডিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সেই পর্দ্দার অন্তরালে বিলীন হইয়া গেল।

মুখটি যে কাহার, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক নাই এবং এই চকিত দৃশ্যাভিনয়ের ফলে আমার মনে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যে সকল ভাবের উদ্রেক হইতেছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেও ইচ্ছা করি না। মোটের উপর এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কাযের কথাগুলা শেষ করিয়া আজ রাত্রিতেই অথবা অন্ততঃ কাল সকালে এখান হইতে প্রস্থান করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলাম।

এ দিকে কাকী ও পিসীমা ছাতাটা লইয়া বাহিরে গেলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া কাকী বলিলেন, "ওটা যমুনার ছাতা কি না, ঠিক বলা যায় না। বুড়ী ওটা আগে কখনও দেখেছে কি না, তার মনে নাই। তার অনুমান যে, সে এখান থেকে যাবার পরে হয় ত যমুনা ওটা কিনেছিল! জিনিষটা দেখেও প্রায় নূতন বলেই বোধ হয়। দীপ্তি ত নেহাত অবজ্ঞাভরে বল্লে যে, যমুনার কোন সামগ্রীর দিকে সে কখন চেয়েও দেখতো না।"

যাহা হউক, আমার সঙ্কল্প অনুসারে হত্যাসম্বন্ধে আলোচনাটা শীঘ্র শেষ করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিলাম, "অনুসন্ধান করবার যা কিছু ছিল, তা' বোধ হয় এইবার শেষ হয়েছে? এখন আমাকে আর কি করতে হবে, তা' বলুন।"

কাকী বলিলেন, "সে কথা বোধ হয় এখনই স্থির করা যাবে না। সবাই মিলে ভাল ক'রে বিবেচনা করতে হবে

ত? তা' আজ এখন আর এ সব কথা থাক। কাল সকালে কি দুপুরে এ বিষয়ে কথা কইবার অনেক সময় থাকবে। আজ বরং এখন দীপ্তির একটু গান শুনে নাও। সে বেশ গাইতে পারে।"

আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিলাম, "না, এবারে তা'র উপায় নাই। আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে।"

৩৫

আমার কথা শুনিয়া তিন জনেই বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, "একটা কাযের জন্য কাল সকালেই আমার কলকাতায় উপস্থিত থাকা দরকার। তাই আজ রাত্রিতেই এখান থেকে যেতে হবে।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আরে, না, না! তা কি কখন হয়? আজ রাত্রিতে কোনমতেই যাওয়া হ'তে পারে না। কাল সকালের কোন একটা গাড়ীতে না হয় যাবে এখন!"

কাকী ও-কথার প্রতিবাদ করিয়া, যোগীন বাবুকে বলিলেন, "বাঃ! তুমিও ত বেশ লোক দেখছি! কাল সকালেও যাওয়া হবে না। বিমলা দিদিও যে অরুণের সঙ্গেই কাল যাবার স্থির করেছেন, তা' কি ভুলে গেছ? সকালের গাড়ীতে ছেলেদের শুদ্ধ সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তে পারে কি কখন?" তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, অরুণ, তা' হবে না, বাপ! সেই কাল বিকালের আগে আমরা তোমাকে ছাড়ছি না। তোমার ও-সব কায-কাযের কথা আমি শুনব না!"

"কিন্তু তা হ'লে আমার বড় ক্ষতি হবে।"

"না, না; কোন ক্ষতি হবে না। তুমি মনে করলে এক দিনের জন্য কাযটা নিশ্চয়ই পেছিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তা ত নয়! আসল কথা আমি বুঝেছি। মা-মাসীগুলা বুড়ো-হাবড়া হলেও, ছেলেদের মনের ভাব একটু আধটু বুঝতে পারে না কি?"

"তা' হতে পারে; কিন্তু তাঁরা বাস্তবিক বুড়ো-হাবড়া না হ'লে ছেলেদের কাছে সব কথা যে স্পষ্ট ক'রে খুলে বলেন না, তা'তে কথাগুলার মানে বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। অন্ততঃ আপনার এখনকার এই কথাগুলা আমার যেন হেঁয়ালির মত বোধ হচ্ছে।"

কাকী আবার যোগীন বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যে একেবারে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে রইলে?—তোমাকে যে সব কথা বলতে বলেছিলাম, তা' বুঝি কিছুই বলনি ওকে?"

যোগীন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও সব কথা বলবার সময় পেলাম কৈ?—তা' ছাড়া আমার দ্বারা ও সব মেয়েলী কথা—"

কাকী বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা' জানি। আমাদের সব কথাই তোমার কাছে মেয়েলী! বেশ লোক যা হোক!" পরে আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখছো ত অরুণ! আমাদের কোন দোষ নাই, বাপু! তোমার এই মেসো-বাবুটিই যত গোল পাকিয়ে বসেছেন!"

যোগীন বাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "হেঁয়ালিটা যে আরও বেশী দুর্ব্বোধ হয়ে পড়ছে দেখছি!—আমার মেসোবাবুই বা কে,—আর তাঁর দোষই বা কি, কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

যোগীন বাবু পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "এঃ! কল্লে কি? রাম না হ'তেই রামায়ণ গেয়ে ফেল্লে যে! তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

"তা' হবে না কেন বল? আমি অত গুছিয়ে কথা কইতে পারি না, তা' কি করবো?—সেই জন্যেই ত তোমার উপর ভার দিয়েছিলাম। আর তুমি বেশ মজা ক'রে নিজের ভারটি আমারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এখন হাসতে লেগে গেলে!—বেশ যা' হোক্!"

পিসীমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা' তুই যদি না পারিস্ ত আমিই না হয় বল্‌ছি।" তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কথাটা কি জান, বাবা অরুণ! আমরা সবাই মিলে একটা ষড়্‌যন্ত্র ক'রে তোমার আড়ালে একটা কায ক'রে ব'সে আছি!—'আমরা' মানে আমি আর প্রিয়ম্বদা, আর তোমার দিদিরাও কতকটা; আর মিত্তির মশায়ও যে একেবারে বাদ, তা' নয়।"

কাকী। ও মা! বাদ আবার কি? উনিই ত নাটের গুরু!—তোমার সেই প্রথম চিঠি পেয়ে ওঁকে যখন প'ড়ে শুনালাম, তখন উনিই ত আহ্লাদে নেচে উঠে আমাকেও নাচিয়ে তুল্‌লেন!

যোগীন বাবু। আর, তা'র পরে? কথাটা পাকা ক'রে ফেল্‌বার জন্য আমাকে দিন-রাত উদ্বাস্ত ক'রে তুলেছিল কে, মশায়?

কাকী। হাঁ, তা ত আমি করেছিলাম বটেই; কিন্তু তুমি কি তা' শুনেছিলে?—তা হ'লে ত এত দিনে কোন্‌কালে কায মিটেই যেতো!

পিসীমা। আচ্ছা, তুই একটু চুপ কর্ না, ভাই, প্রিয়ম্বদা! কথাটা আগে শেষই হ'তে দে -

কাকী। কথা শেষ হবার আর বাকী কি আছে দিদি?—আমিই না হয় শেষ ক'রে দিচ্ছি!

৩৬

কিন্তু কাকী যত সহজে কথাটা বলিলেন, কাযে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে তাহা তত সহজ হইল না। কারণ, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিয়া শেষে আমাকে বলিলেন, "দেখ, বাবা,—আমাদের এ ষড়যন্ত্রের যোগাড়-যাগাড় সব ঠিক হয়ে গেছে। দিনটিও এক রকম ঠিক হয়েছে। কেবল তুমি এখন প্রফুল্ল মনে রাজী হয়ে কাযটি উদ্ধার ক'রে দিলেই আমরা সবাই সুখী হই!—কেমন, কর্‌বে ত?"

আমি একটু বিদ্রূপচ্ছলে হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা মন্দ নয়! কিসের ষড়যন্ত্র, তা' আমাকে বল্লেন না; অথচ কাযটি সমাধা কর্‌বার হুকুম দিচ্ছেন আমাকে! এ প্রস্তাব খুব যুক্তিসঙ্গত বটে!—তা' আমি বলি, আপনারা আমার অজ্ঞাতে যখন ষড়যন্ত্র—যোগাড়-যাগাড় সবই করেছেন, তখন শেষটায় আর আমাকে এর ভিতর না জড়িয়ে, আপনারাই বাকী কাযটুকুও সমাধা ক'রে ফেলুন না কেন?"

যোগীন বাবু পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ বাবাজী!—কিন্তু তা' যে হবার যো নাই, তাই ত ওঁদের মুস্কিল হয়েছে! তোমাকে বাদ দিয়ে এ কায হবার উপায় নাই। তা হ'লে শিবহীন যজ্ঞ হয়ে পড়বে যে!"

কাকী ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "নাও, নাও! তোমাদের আর রঙ্গ কর্‌তে হবে না! এ কি ঠাট্টা-তামাসার কথা না কি?—দেখ, বাবা অরুণ! তুমি ওঁর কথায় কান দিও না। এখন আমি যা' বল্লাম, তাই কর্‌বে ত? কেমন?—লক্ষ্মীটি!"

"বাঃ! আপনি ত আমাকে বেজায় গোলযোগে ফেল্‌লেন দেখছি! আপনার কথাটা কি, তাই ত এখনও জান্‌তে পার্‌লুম না,—তা তার জবাব কি দিব, বলুন?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন? মিত্তির মশায়রা কল্‌কাতায় পৌঁছাবার পর তোমার হাত দিয়ে যখন প্রিয়ম্বদাকে চিঠি পাঠিয়েছিলুম, তখন কি তোমায় বলি নি যে, আমার একটা ফন্দি আছে?"

আমি একটু চিন্তার ভাণ করিয়া পরে বলিলাম, "হাঁ, তা' বলেছিলেন বটে; কিন্তু ফন্দিটা যে কি, তা ত বলেন নি? তখন বলেছিলেন যে, পরে জান্‌তে পারবো।"

"বেশ,—তা' এখন ত জান্‌তে পেরেছ, বাবা! তোমার দিদিরা তোমাকে সব কথা খুলে লেখেন নি কি?"

আমি এইবারে 'কোণ-ঠাসা' হইয়া গোলযোগে পড়িলাম। আর কথা কটাকাটির উপায় নাই দেখিয়া বলিলাম,—"ও-ওঃ! সেই কথা বল্‌ছেন? তা কি ক'রে বুঝবো বলুন? এতক্ষণ খুলে বল্‌লেই ত হতো!"

কাকীও অমনি সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা' হোক্, এখন ত বুঝেছ? এইবারে আমার কথার জবাবটা দাও!"

আমি কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম, "দিদিদের চিঠি প'ড়ে মনে হয়েছিল, তাঁদেরই বুঝি মাথা খারাপ হয়েছে। আবার আপনাদেরও যে সেই অবস্থা হয়েছে, তা' জান্‌তুম না।"

"মাথা খারাপ আবার কিসে দেখলে?"

"তা, না হ'লে শুধু এক পক্ষের সম্মতির জন্য আপনারা এত উৎসুক হয়েছেন কেন? আর একটা পক্ষও ত আছে?"

"ওঃ! তাই? তা' সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা না বুঝে এত দূর অগ্রসর হই নি। তা' ছাড়া আমরা ত সাহেব নয় যে, পাত্র-পাত্রীর এত মতামতের অপেক্ষা করতে হবে?"

"তবে আমারই বা মতামত জান্‌তে চাইছেন কেন?"

"আজকালকার ছেলেদের কত রকম সাহেবী ঢং হয়েছে

কি না,—তাই তাদের একবার জিজ্ঞাসা না করা চলে না।”

“আর মেয়েদেরি বুঝি তা’ হয় নি? তা’ না হ’লে, যখন আপনাদের প্রথম থেকেই এই রকম অভিসন্ধি হয়েছিল, তখন পাত্র-পাত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় করানটা একটু সাহেবী ব্যবস্থা হয় নি কি?”

“না; সেটা তোমার ভুল। এর ভিতর সাহেবী ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। প্রথম দিন, ক’নে দেখাবার হিসাবে, আমি বুড়ীকে তোমার সাম্‌নে বা’র করেছিলাম। পরে এই খুনের সব কথা আলোচনার সময় ওর উপস্থিতি নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই আমরা ওকে তোমার কাছে বা’র হয়ে কথা কইতে দিতেও বাধ্য হয়েছিলাম। তখন আমাদের এই গুপ্ত অভিসন্ধির কথা তোমরা দুজনেই জান্‌তে না বলেই সেটা সম্ভবও হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা’ হ’তে পারে না। এ সপ্তাহে তোমার বড় দিদির চিঠি পেয়ে, আমরা বুড়ীকে আভাসে কথাটা একটু জানিয়েছি। কাযেই, তোমার সাম্‌নে বেরুতে এখন তা’র ভারি লজ্জা। তা’ ওটা যখন স্বাভাবিক, তখন আমরা তাকে জিদ ক’রে বা’র করতে চাই না।”

উত্তরে আর বলিবার কিছু না পাইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই! কাকী অমনই জিজ্ঞাসা করিলেন, “চুপ ক’রে রইলে যে? আমার কথার জবাব না দিলে আমি ছাড়ছি না!”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “মতামতের যখন কোন অপেক্ষাই করেন নি, তখন আমার এ বিষয়ে কোন কথা বলবার অবসর আছে ব’লে মনে হয় না। তবে দিদিরা যে রকম লাফালাফি কচ্ছেন, সেটা যেন একটু বাড়াবাড়ি বোধ হয়। কিছু দেরি হ’লেই বা ক্ষতি কি? অন্ততঃ এই খুনের তদন্তটা আগে শেষ হতেই দিন না কেন?”

আমার কথায় সকলেই প্রীত হইলেন, বোধ হইল। কিন্তু কাকী বলিলেন, “সে আমরা যেমন ভাল বুঝবো, তাই করবো;—ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা ক’বার আমাদের দরকার নাই।—এখন কিন্তু আজ এখান থেকে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না, তা’ ব’লে দিচ্ছি। কাল বিকেলে বিমলা দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।”

কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর তাহাই স্থির হইল। যোগীন বাবুরাও সকলেই আগামী সপ্তাহেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন শুনিলাম।

পরদিন, সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষপত্নীর সহিত দেখা করিব এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলা সম্বন্ধে কথা কহিয়া তাঁহার ভাব-গতিক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণি)।

রহিব দেশের হিন্দু

কোরো না ঠাট্টা, কোরো না ব্যঙ্গ, রহিব দেশের হিন্দু,
হ’তে চাও হও বিদেশী সভ্য পার হয়ে নীর-সিন্ধু;
সুখ পাও পর ‘প্যাণ্ট’ ‘কোট’ ‘টুপী’ গোঁফেতে লাগাও মোম,
গৃহিণীরে দাও সাহেব সঙ্গ, বিলাতেরে কহ ‘হোম’।
হুট-হাট করি যত পার যাও ঘুরাও করেতে ছড়ি,
আমরা আনন্দে রহিব অটুট সনাতন ধুতি পরি’।
লাগে ভাল খাও পেঁয়াজ মোরগ, জাতিভেদে দাও গালি—
‘এই জাতিভেদে গিয়াছে ভারত’ ব’লে দিয়া করতালি।
সেখ মুরুল্লার পক্ক—পশু-মাস বদন-বিবরে দিয়া,
চর্ব্বণ-সুখ-নিমীলিত চোখে শান্ত কর গে হিয়া।
আমরা আনন্দে রহিব অটুট জননীর হাত হ’তে
পাওয়া পুরাতন ঝোল অম্বল আর সেই ডাল ভাতে।

অবরোধ-সুখ না পার সহিতে দাও হে পরদা খুলি’,
মুক্ত বাতাস খাউক রমণী প্রেমের ঝটিকা তুলি’।
ছুটুক সে প্রেম-তরঙ্গ-প্রবাহে দেশের দশের মাঝে,
রেলের গাড়ীতে বাষ্পীয় পোতে প্রভাতে দুপুরে সাঁঝে।
দিক্ উড়াইয়া মাথার বসন সরমের বাঁধ টুটি,
যাউক তোমারে ফেলিয়া প্রেয়সী জীবন-সংগ্রামে ছুটি,
মোদের আনন্দ পুরাতন সেই ফল্গুর বালুতলে,
নয়নের কোণে মনের নিকণে ঘোমটার অন্তরালে।
যেখানে যাই না যে কোন করমে চিন্তা করিয়া দূর,
ভাবিব গৃহিণী আছেন গৃহেতে ভরিয়া অন্তঃপুর।

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

হীরক

প্রত্যেক মূল্যবান্ প্রস্তরে আমরা তিনটি গুণ দেখিতে পাই ;—সৌন্দর্য্য, স্থায়িত্ব ও অপ্রাচুর্য্য। সুকর্ত্তিত একটি হীরকখণ্ডের সহিত অন্য কোন রত্ন তুলনীয় হইতে পারে না।

কোথায় বা কোন্ সময়ে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ভারতেই যে ইহা আবিষ্কৃত হয় ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রথম ইহার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহু প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে ভারতীয় হীরক-খনির কথা লিখিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু প্রাচীন গ্রন্থে হীরকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে হীরক কর্ত্তিত করিতে পারা যাইত না বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। কাযেই দেখা যায়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও পারস্যবাসী কর্ত্তৃক হীরকের আসন অন্যান্য রত্নাপেক্ষা নিম্নেই দেওয়া হইত। পরন্তু সে সময়ের বহুপূর্ব্বে ভারতীয় মণিকাররা আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হীরকচূর্ণ-সাহায্যে হীরককে কর্ত্তন করিয়া ঔজ্জ্বল্য বিকাশ করিতে পারা যায়। কর্ত্তিত হওয়ার পর হীরকের দ্যুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নদীগর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সহিত প্রাপ্ত হীরকের বহিরাবরণ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, ইহাই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত হীরক ; কিন্তু বহিরাবরণ কর্ত্তিত হইবামাত্র স্বতঃই মনে হয়, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক যষ্টির স্পর্শে উহাকে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে পরিণত করা হইল। ভারতীয় মণিকাররা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে মুক্ত করিয়াই সম্ভবতঃ নিরস্ত হইতেন ; প্রস্তরাদিকে কোন বিশিষ্ট আকারে কর্ত্তন করিতেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে, প্রতীচ্যের মণিকাররা ১৪৭২ খৃঃ অঃ অথবা আরও কিছু পূর্ব্ব হইতেই মূল্যবান্ প্রস্তরাদির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগকে কোন না কোন বিশিষ্ট আকারে কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বহু রত্ন ডি বারকোয়েম (De Berquem) আবিষ্কৃত প্রণালী অবলম্বনে কর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৫৬২ খৃঃ অঃ কেন্তাউর (Kentaur) সেই সময়ে চলিত দুই প্রকার—"বিন্দু" (Point) ও টেব্‌ল্ (Table) কর্ত্তনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে "গোলাপ" (Rose) আকারে কর্ত্তন-প্রথা প্রচলিত হয় ; ১৬৬৫ খৃঃ অঃ বিখ্যাত "মোগল" হীরক ভিনিসীয় মণিকার বর্‌গিস (Borghis) কর্ত্তৃক গোলাপ আকারে কর্ত্তিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্য এক জন ভিনিসীয় পেরুজি (Peruzi) হীরক কর্ত্তনে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ব্রিলিয়াণ্ট্ আকারে কর্ত্তিত হইলে হীরকের দ্যুতিমত্তা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট হীরকখণ্ডের বৃহত্তম পরিধিকে গারডেল (Girdle), গার্‌ডেলের উপরিভাগকে ক্রাউন (Crown), নিম্নভাগকে কুলাস্ (Culasse), ক্রাউনের সর্ব্বোচ্চ পৃষ্ঠভাগকে টেবল্ ও কুলাসির সর্ব্বনিম্নস্থ পৃষ্ঠভাগকে কলেট (Collet) বলা হইয়া থাকে। ক্রাউনে সর্ব্বসমেত ৩৩টি পৃষ্ঠভাগ—টেব্‌ল্ (১) ; (ক চিহ্নিত) ত্রিভুজাকৃতি (৮) (খ চিহ্নিত) ; লজেঞ্জাকৃতি (৮) (গ চিহ্নিত) ; সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি (১৬) (ঘ চিহ্নিত), এবং কুলাসিতে সর্ব্বসমেত ২৫টি ত্রিভুজাকৃতি (১৬) (প চিহ্নিত) ; পঞ্চভুজাকৃতি ৮ (চ চিহ্নিত) ও কলেট ১ (ছ চিহ্নিত) সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ (চিত্র ১) ব্রিলিয়াণ্ট্ আকারে কর্ত্তিত হীরককে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮টি পৃষ্ঠ সংযোজিত করা হয়। টেবল্ ও কলেট পৃষ্ঠভাগ গার্‌ডেলের সহিত সমান্তরালে অবস্থিত থাকে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কলেটের ব্যাস গার্‌ডেলের ব্যাসের এক-নবমাংশ ও টেব্‌লের ব্যাসের এক-পঞ্চমাংশ হইলে এবং টেব্‌ল্ ও গার্‌ডেলের দূরত্ব, টেবল্ ও কলেটের দূরত্বের অর্দ্ধেক হইলে হীরক অধিক পরিমাণে প্রভা বিকিরণ করে ; সুতরাং হীরক কর্ত্তনের সময় এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।*

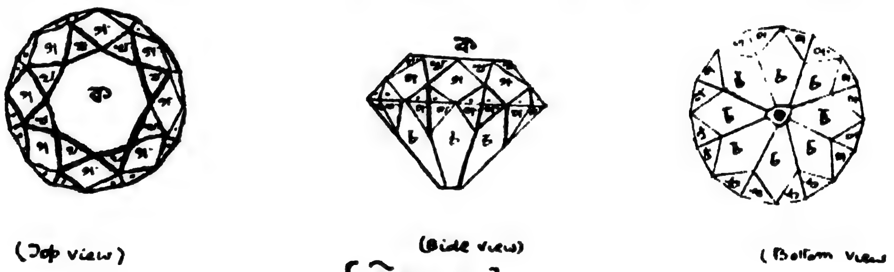

(Top view) (Side view) (Bottom view)

[চিত্র ১]

হীরকের উপাদান বহুদিন পূর্ব্বে গ্যাসিয়ট (Gassiut) ও বারজেলিয়াস (Barzeleus) কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়। ১৭৭২ খৃঃ অঃ ল্যাভইসিয়ার দেখান যে, হীরকের কঠিনতার (hardness) তারতম্যানুসারে ৭৬০° ডিগ্রী হইতে ৮৭৫° ডিগ্রী পরিমাণ তাপ প্রদান করিলে হীরক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং বাতাসে বর্ত্তমান অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গারদ্রাবক (Carbonic acid) সৃষ্টি করে। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ স্মিথ্‌সন্ টেনাণ্ট্ (Smithson Tennant) প্রমাণ করেন যে, প্রজ্বলিত হীরক হইতে একমাত্র অঙ্গারকদ্রাবক প্রস্তুত হয়। ১৮১৪ খৃঃ অঃ ডেভি এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন এবং তিনিই প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, প্রজ্বলিত হীরকে শতকরা ০·০৫ ভাগ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে ; রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত পদার্থ কয়টি ভস্ম হইতে পাওয়া যায় :—(১) লৌহ, (২) চূণ, (৩) ম্যাগনিসিয়া, (৪) সিলিকা, (৫) টাইটানিয়ম ; কিন্তু পরিমাণে এইগুলি এতই অল্প যে, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র অমিশ্র অঙ্গার হীরকের উপাদান। যে অঙ্গার কয়লায় বর্ত্তমান, যে অঙ্গার হইতে গ্র্যাফাইট সৃষ্ট হয়, সেই অঙ্গারই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া হীরকে পরিণত হয়। একই পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হইল, ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই ; প্রকৃতির রাজ্যে অত্যাশ্চর্য্যময় ঘটনাপুঞ্জ অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, ইহা তাহারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অঙ্গার কখনও উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও কঠিন হইয়া হীরকে পরিণত হইতেছে, আবার কখনও বিপরীত গুণাবলম্বন করিয়া গ্রাফাইটে পরিণত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড অবিন্যস্তভাবে একত্র হইলে তাহাকে "বোর্‌ট" বলা হয়। হীরক ও বোর্‌টে প্রভেদ এই যে, বোরটের কঠিনতা হীরকাপেক্ষা অধিক, ইহাতে ফাটল (Cleavage) থাকে না এবং ইহার বর্ণ ধূসর হইতে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ

---

* Precious Stores by Goodchild.

হয়, ইহা দেখা যায়। অলঙ্কাররূপে ব্যবহারের অযোগ্য হীরকখণ্ডকে মণিকারেরা এক কথায় বোর্ট বলিয়া থাকেন। নিকৃষ্টতম হীরক কারবোন্ডাডো (Carbonado) নামে অভিহিত হয়। ইহার কঠিনতা হীরকাপেক্ষা অধিক ; দেখিতে ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ। স্বচ্ছ, নিখুঁত, বর্ণহীন হীরকখণ্ড প্রথম শ্রেণীর হীরক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এরূপ হীরক সমগ্র হীরকের এক-চতুর্থাংশ ; অপর চতুর্থাংশ ঈষৎ বর্ণবিশিষ্ট ; অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ভাগ অল্পবিস্তর বহুবিধ বর্ণে রঞ্জিত। সাধারণতঃ বর্ণসম্পন্ন হীরকের মূল্য বর্ণহীন হীরকের মূল্যাপেক্ষা অল্প হয় ; কিন্তু কোন বর্ণের ঈষৎ আভা হীরকে বর্ত্তমান থাকিলে মূল্য হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়। হরিদ্রাভ হীরক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেগুলি তাদৃশ সমাদৃত হয় না। সবুজ বর্ণের উত্তম হীরক সংখ্যায় অল্পই আছে। পিঙ্গল বর্ণের হীরক দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাওয়া যায় ; গোলাপী হীরক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না ; লোহিতাভ ও নীলাভ হীরক ক্বচিৎ কখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

কঠিনতা (hardness) মণি, চূর্ণি, হীরকাদি রত্নরাজির একটি প্রধান গুণ ; মণি-মুক্তা-খচিত অলঙ্কার ব্যবহার করিবার সময় আমাদিগের অজ্ঞাতসারে বায়ুতে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার সহিত রত্নাদির গাত্র ঘর্ষিত হয়, ইহার ফলে রত্নরাজির পালিশ ও উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, যদি না বালুকার কঠিনতা অপেক্ষা রত্নের কঠিনতা অধিক হয়। মোহ (Mohs) দশটি বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে কঠিনতার তারতম্যানুসারে দশটি স্থান দিয়াছেন। মোজের মতে হীরকের স্থান সকলের উপরে ; সর্ব্বনিম্নস্থ স্থান "ট্যাল্‌ক্‌" (Talc) কর্ত্তৃক অধিকৃত। এখন কোন একটি ধাতুর কঠিনতা কত, ইহা অবগত হইতে হইলে এই দশটি ধাতুর সহিত তুলনা করিতে হয়। বালুকণার কঠিনতা ৫ ; হীরকের কঠিনতা ১০ বলিয়া বালুকণার দ্বারা হীরকের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক মূল্যবান্ প্রস্তরের কঠিনতা ৮ হইতে ১০-এর মধ্যে। একটি প্রস্তরাপেক্ষা অন্য প্রস্তরকে কঠিন বলা হইয়া থাকে, যদি শেষোক্ত প্রস্তরখণ্ডের তীক্ষ্ণ শলাকা-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরের উপর রেখা টানিতে পারা যায়। ইস্পাতের কঠিনতা সাধারণতঃ ৭ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ ইস্পাত-শলাকা সাহায্যে কোন মূল্যবান্ প্রস্তরের উপর দাগ কাটিতে পারা যায় না ; কেন না, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন রত্ন অঙ্গ-শোভাবর্দ্ধনের জন্য সংগৃহীত হয় না—যদি না তাহার কঠিনতা ৭ অপেক্ষা অধিক হয়। স্ফটিকীকৃত (criysallised) হীরকের কঠিনতা অস্ফটিকীকৃত হীরক—বোর্ট, কারবোন্ডাডো—অপেক্ষা ঈষৎ অল্প। স্ফটিকীকৃত হীরকের কঠিনতা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকার হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি, বিভিন্ন পৃষ্ঠের কঠিনতা একরূপ নহে ; বহিরাবরণ সাধারণতঃ মধ্যভাগ অপেক্ষা কঠিনতর। বিভিন্ন খনি হইতে উত্তোলিত হীরকের কঠিনতায় অল্প প্রভেদ থাকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ার হীরক কঠিনতর। হীরকের কঠিনতা প্রতিপন্ন করিতে হইলে দুই খণ্ড ইস্পাতের মধ্যে এক টুক্‌রা হীরক রাখিয়া চাপযন্ত্র সাহায্যে প্রবল চাপ দিলে দেখা যাইবে যে, হীরক নিখুঁত অবস্থায় ইস্পাতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কেহ যেন অনুমান না করেন, হীরক ভঙ্গপ্রবণ নহে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কত হীরকখণ্ড যে চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। লৌহ-উদূখলে রাখিয়া মুষল আঘাতে হীরককে অতি আয়াসে চূর্ণ করিতে পারা যায়।

ধাতু, মণি, রত্ন ইত্যাদিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে,—প্রথম কাচ, দ্বিতীয় স্ফটিক (crystal)। কাচ বলিতে সচরাচর আমরা বুঝিয়া থাকি, বালু ও ক্ষার উভয় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন এক পদার্থবিশেষ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কাচের আভ্যন্তরিক অণুগুলি সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অণুগুলি কোন বিশেষ নিয়মে সজ্জিত নহে। সাধারণ কাচের এই গুণটি যে পদার্থে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকেই ধাতুশাস্ত্রে (Mineralogy) কাচ বলা হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত গুণ, অর্থাৎ যে কোন পদার্থে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত, তাহাকে "স্ফটিক" (crystal) বলা হয়। স্ফটিকীভূত ধাতুমাত্রেই একটি বিশিষ্ট জ্যামিতির ক্ষেত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। একই উপাদানে গঠিত কোন ধাতু কাচ ও স্ফটিক উভয় আকারই অবস্থাভেদে ধারণ করিতে পারে। প্রভেদ এই—একের মধ্যে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত, অপরটির মধ্যে অণুগুলি অবিন্যস্তভাবে সজ্জিত। হীরকের মধ্যে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত বলিয়া হীরক স্ফটিক-পর্য্যায়ভুক্ত। স্ফটিক-তত্ত্বে (crystallography) স্ফটিকীভূত ধাতুগুলি অঙ্গবিন্যাসে তারতম্যানুসারে ৩২ প্রকারে বিভক্ত ; ইহারা আবার সাত শ্রেণীর অন্তর্গত। হীরক যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর সুক্রমিকতা (Symmetry) অন্যান্য শ্রেণীস্থ ধাতুগুলির সুক্রমিকতা অপেক্ষা অধিক ; এই শ্রেণীকে সমমান শ্রেণী (Isometric system) বলে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত স্ফটিকগুলির ক্ষেত্র প্রধানতঃ চারি প্রকার হইয়া থাকে। অষ্ট ত্রিভুজাবচ্ছিন্ন ঘনক্ষেত্র (Octahedron) আকারে হীরক স্ফটিকীভূত হয়। ইহার পৃষ্ঠগুলি (faces) পূর্ণাবয়ব থাকে, কিন্তু তাহাদের ধার (Edge) সাধারণতঃ বক্রাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। কতকগুলি স্বাভাবিক হীরক স্ফটিকের চিত্র এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য) ১। ৪৮টি অসমবাহু ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘন ক্ষেত্র (Hexakis Octahedron)।

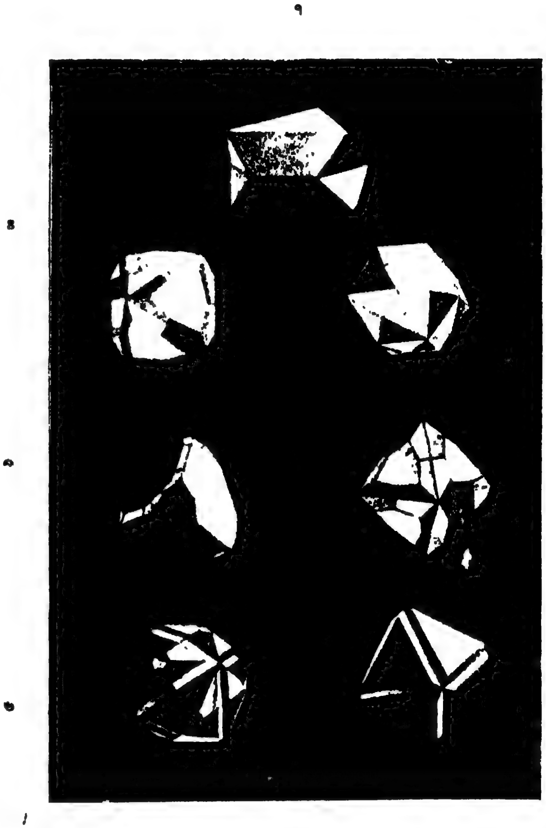

[চিত্র ২]

২। অসমবাহু ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র ও অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র উভয়ে একত্র মিলিত। ৩। খণ্ডিত অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র। ৪। ব্রেজিল খনি হইতে প্রাপ্ত হীরক। ৫। কিম্বারলে হীরক। ৬। ব্রেজিল হীরক। ৭। যমজ হীরক স্ফটিক (Twin crystal)। কোন কোন হীরক স্ফটিকের পৃষ্ঠে সুন্দর সুন্দর সমবাহুসম্পন্ন ত্রিভুজ অঙ্কিত থাকে। *

স্ফটিকীভূত ধাতুমাত্রের আভ্যন্তরিক অণুগুলি কোন এক বিশিষ্ট নিয়মে সজ্জিত বলিয়া একটি ধাতুর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকার গুণের বিকাশসাধন হয়। একটি গুণ এই যে, এক সমতলে অণুগুলির পরস্পর সংযোগ অপরতলস্থ অণুগুলির পরস্পর যোগাপেক্ষা নিবিড় হওয়ার ফলে শেষোক্ত তলে ধাতুকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প আয়াসে বিদীর্ণ করা যাইতে পারে। এইরূপ তলকে 'ভঙ্গতল' (cleavage) বলা হয়। হীরকে এইরূপ চারিটি ফাটল বর্ত্তমান থাকায় অসংস্কৃত হীরককে অতি অল্প আয়াসে চারিদিক হইতে বিদীর্ণ করিয়া অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। এই তথ্য অবগত হওয়ায় হীরক-কর্ত্তকদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। অসংস্কৃত হীরকের ফাটলের সহিত খুঁতবিশিষ্ট চালতার খোলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। চালতার খোলা যেরূপ ৩।৪ দিক্ হইতে খুলিয়া ফেলিলে ভিতরকার পরিষ্কার খোলা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ হীরকেরও উপরিস্থ ক্ষতপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলে ভিতরকার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা (Specific gravity) ৩·৫১৪ হইতে ৩·৫১৮ পর্য্যন্ত হয়; এই আপেক্ষিক গুরুতা বহু উপায়ে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

সূর্য্যকিরণে কিয়ৎক্ষণ রাখার পর অন্ধকারে আনয়ন করিলে অনেক হীরক হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতে থাকে: এই গুণকে ফস্ফরেসেন্স (Phosphoresence) বলে। অপর কতকগুলি হীরক সূর্য্যালোকে দুগ্ধাভ বর্ণ ধারণ করে। ফস্ফরেসেণ্ট গুণটি ছোট ছোট হীরকখণ্ডে কেবলমাত্র সূর্য্য-কিরণে বিকাশ লাভ করে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হীরকখণ্ডে এই গুণটি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শূন্য পাত্রে রাখিয়া উচ্চাঙ্গের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারণ করিলে সকল হীরকখণ্ডই নানাপ্রকার আলোক—লাল, নীল, হরিদ্রাভ—প্রদান করিতে থাকে। সার উইলিয়াম ক্রুক্স্ মহোদয় তাঁহার লিখিত "হীরক" পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এমন একটি হীরকখণ্ড আছে, যাহা হইতে এত অধিক পরিমাণে আলোক নির্গত হইতে থাকে যে, তৎসাহায্যে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যায়। এই আলোকপ্রদানের ক্ষমতার সহিত হীরকমধ্যস্থ তাড়িতকণার (Electron) উপরিভাগে সংঘাতের নিশ্চিতই কোন সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ হীরকমধ্যস্থ তাড়িত কণাগুলি নেগেটিভ প্রান্ত হইতে বিদূরিত হইলে বিপুল গতিতে উপরিস্থ তলের সহিত সংঘর্ষ ঘটায় ও তাহার ফলে আলোক নির্গত হইতে থাকে। ইহার অন্তর্বল এত প্রবল যে, যদি এই শক্তি প্ল্যাটিনম্ (Platinum) ও ইরিডিয়মের মত ধাতুকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহারাও গলিয়া যায়। ·বিপুল শক্তিশালী নলের (Radiant matter tube) মধ্যে রাখিলে ইহা হইতে কেবলমাত্র যে আলোক নির্গত হইতে থাকে, তাহা নহে, পরন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ইহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই কৃষ্ণতা কেবলমাত্র পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত থাকিলেও, অর্থাৎ অগভীর হইলেও হীরকচূর্ণ সাহায্যে পালিশ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না। † এই অগভীর কৃষ্ণাবরণ যে গ্রাফাইট, তাহা মিঃ ক্রুক পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন। ময়েজান (Moissan) দেখাইয়াছেন যে, এই গ্র্যাফাইট্ ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রী সেন্টিগ্র্যাড পরিমাণ তাপের সংযোগফলে সৃষ্ট হইতে পারে; সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সংঘাতকারী তাড়িত-কণা হীরকের সহিত এত প্রবলবেগে সংঘর্ষ ঘটায় যে, উপরিস্থ আবরণের তাপ ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রীতে উত্থিত হইয়া গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়। অপর পক্ষে হীরকের তাপপরিচালন-শক্তি এত প্রবল যে, হীরকের সাধারণ তাপ অল্প থাকায় নলটি অল্প উষ্ণ থাকে। গ্র্যাফাইটকে আমরা হীরকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি না, হীরককে গ্র্যাফাইটে পরিণত করিতে পারি। বৈদ্যুতিক বৃত্তাংশকার মহানস (Electric arc furnace)এ উত্তপ্ত করিলে ইহার তাপ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রী পরিমাণ হইবামাত্র হীরক ভগ্ন হইয়া স্ফীত হইতে থাকে ও অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণবর্ণ মূল্যহীন গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়।

ঘর্ষণ করিলে কোন কোন হীরক হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে—যদিও এ আলোক তত সতেজ নহে ও শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া যায়। শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণফলে হীরক যোগাত্মক বিদ্যুৎ (Positive Electricity) গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার অঙ্গার—গ্র্যাফাইট্ ও কোক যেরূপ বিদ্যুৎপরিচালক, হীরক তদ্রূপ নহে; ইহা প্রতিরোধক মাত্র।

হীরকের কঠিনতা ইত্যাদি গুণাবলী উল্লিখিত হইল; এতদ্ব্যতিরেকেও নয়নপ্রীতিকর অপর কতকগুলি গুণাবলী বর্ত্তমান আছে বলিয়া হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পরিগণিত। ইহাদিগকে এক কথায় আলোক-গুণাবলী বলা হইয়া থাকে; কেন না, ইহারা আলোকরশ্মির উপর নির্ভর করে। যাহাতে এই গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে, মণিকর্ত্তকদিগের সমস্ত উদ্যম যত্ন সেই পথে পরিচালিত হয়। কোন একটি রত্নোপরি আলোক-রশ্মি পতিত হইলে তাহার গতি ও কার্য্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) প্রতিফলিত হওয়া, (২) পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়া, (৩) ফস্ফরেসেন্স গুণ বিকশিত করা। এই তিন প্রকার কার্য্যের ফলে যে কয়েকটি গুণ রত্নমধ্যে বিকশিত হয়, তাহা একে একে আলোচিত হইবে। বর্ণ ও উজ্জ্বলতা প্রথম গুণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ হীরকখণ্ডে কোন প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে, শ্বেত আলোকের সমুদায় রশ্মি হীরকখণ্ডের উপর যে পরিমাণে পতিত হয়, সেই পরিমাণেই প্রতিফলিত হইয়া যায়, অপর ক্ষেত্রে গ্র্যাফাইটে এই রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয় না বলিয়া ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। সবুজ হীরকে সবুজ রশ্মি ব্যতীত অপর রশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়া ইহা দেখিতে সবুজ। বর্ণ দ্বারা প্রস্তর-পরিচয় সম্ভবপর নহে; একই প্রস্তরের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। লাল, নীল, পীত ইত্যাদি বহুবিধ বর্ণের হীরক পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

উজ্জ্বলতার তারতম্যানুসারে প্রস্তরাদিকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়। উজ্জ্বলতায় হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আভা-বিকিরণ ক্ষমতায় হীরক অদ্বিতীয়।

আলোকের দ্বিতীয় কার্য্যের উপর প্রস্তরের স্বচ্ছতা এবং আলোক-বক্রতা ও পোল্যারিজেসন (Polarisation) ক্ষমতা নির্ভর করে। হীরক স্বচ্ছ, কেন না, আলোকরশ্মি ইহার ভিতর দিয়া পূর্ণমাত্রায় চলিয়া যাইতে পারে। আলোকরশ্মির দিক্পরিবর্ত্তনফলে (Refraction) হীরকমধ্যে কতকগুলি গুণের বিকাশ-সাধন হয়। দিক্পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ। প্রথম ক্ষেত্রে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় মাত্র (Single refraction), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিয়া থাকে। (Double refraction), হীরকে আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হয় না, ইহার পথ পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। শ্বেত আলোকরশ্মির উপাদানগুলি

---

* Diamond by Sir William Crooks.

† Diamond—Crooks.

সমান্তরালে অবস্থিত কাচপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইবার সময় সমভাবে বিচলিত হয় না বা দিক্ পরিবর্ত্তন করে না ; কিন্তু দ্বিতীয় পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহারা পুনরায় বিচলিত হইয়া প্রাথমিক দিকের সমান্তরালে চলিয়া থাকে। (চিত্র ৩) কিন্তু এই রশ্মি ত্রিপার্শ্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ ঘন পদার্থের (Prism) মধ্য দিয়া চলিবার সময় ইহার দিক অধিকতর বিচলিত হইয়া যায়। ইহাকে বিক্ষেপশক্তি (Dispersion) বলে। হীরকের বিক্ষেপক্ষমতা অত্যন্ত বলবতী। হীরকের সৌন্দর্য্য এই গুণের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, কেন না, আলোকরশ্মির সমস্ত উপাদানের দিক্ বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহারা বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়া হীরকমধ্য হইতে বাহির হইয়া আইসে। (চিত্র৪) আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত ও দিক পরিবর্ত্তিত (Refraction) করিতে হীরক অদ্বিতীয়। হীরক কর্ত্তিত করিবার সময় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তন করিবার সময় নিম্নস্থ পৃষ্ঠগুলি আনত করিয়া রাখা হয়, যাহাতে আলোক-রশ্মি ২৪'১৩' কোণে পতিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। হীরকের সম্মুখভাগে পতিত আলোক-রশ্মি যে কেবলমাত্র প্রতিফলিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু হীরকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মি অভ্যন্তরস্থ পৃষ্ঠের সংস্পর্শে প্রতিফলিত হইয়া নির্গত হইবার কালীন দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়া বহুবিধ বর্ণ ধারণ করে। ইহারই ফলে হীরকখণ্ড আলোক বিচ্ছুরিত করিতে থাকে। (চিত্র ৫) 'ক' আলোক-রশ্মি হীরকপৃষ্ঠে পতিত হইয়া হীরকঅভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দিক্ পরিবর্ত্তন করে ; পরে তাহারা 'খ' রেখায় চলিতে থাকে ও আভ্যন্তরিক তিনটি পৃষ্ঠের ('গ' 'চ' 'ছ') সংস্পর্শে আসায় পূর্ণমাত্রায় ৩ বার প্রতিফলিত হইয়া পরিশেষে পুনরায় দিক পরিবর্ত্তিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বাহির হইয়া আইসে।

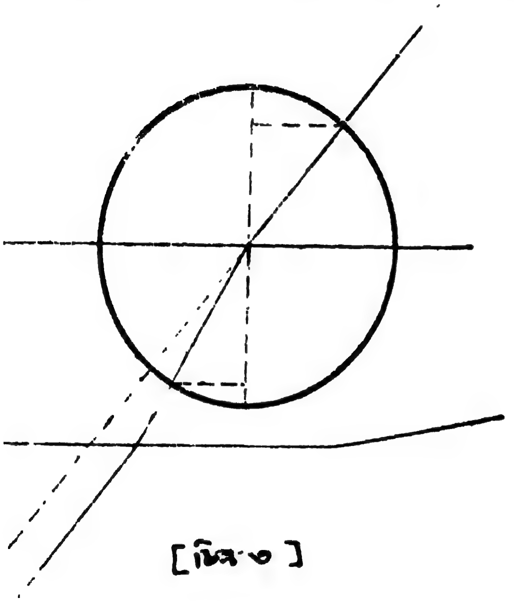

[চিত্র ৩]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হীরকে আলোক-রশ্মি দ্বিপথে চালিত হয় না। কাযেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যুক্ত নিকলের (Crossed Nicol) মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে হীরকখণ্ড প্রতিভাত হয় না। হীরকখণ্ড রাখিবার পূর্ব্বে অণুবীক্ষণের আধার (Rotating Stage) যেরূপ অন্ধকার থাকে, হীরকখণ্ড রাখার পরও সেইরূপ অন্ধকার থাকে, কিন্তু কোন কোন হীরকখণ্ডে ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় ; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অণুগুলির পরস্পর প্রবলবেগে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করায় ইহার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে। কোন কোন হীরকে এইরূপ আকর্ষণের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পোলারিস্কোপ (Polariscope) যন্ত্রে দেখা যায়। সার উইলিয়াম ক্রুকস্ বহু হীরক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পরস্পরের আকর্ষণই মূল কারণ। সময়ে সময়ে হীরকমধ্যস্থ আকর্ষণ এত প্রবল থাকে যে, খনি হইতে উত্তোলিত করিয়া উপরে আনিবামাত্র প্রবলবেগে বিদীর্ণ হইয়া যায়! অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, সদ্যোত্থিত হীরকখণ্ড মুঠার মধ্যের রাখায়, হস্তের ঐ সামান্য উষ্ণতার সংস্পর্শে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

আলোকের তৃতীয় কার্য্য—ফস্‌ফরেসেন্স গুণের বিকাশ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ওয়াল্‌টার নামক বিশেষজ্ঞ হীরকমধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি পাতিত করিয়া স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক বর্ণহীন এক ক্যারাট অপেক্ষা অধিক ওজনের হীরকের ৪১৫৫ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (Wave length) শোষণ বেষ্টনী (absorption Band) দেখিতে পাইয়াছেন।

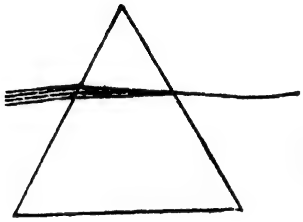

[চিত্র ৪]

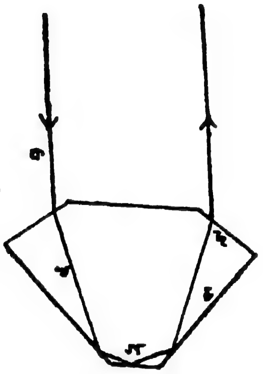

[চিত্র ৫]

আর এক বিষয়ে হীরক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রণ্টজেন রশ্মিতে হীরকের স্বচ্ছতা হ্রাস পায় না, অপর পক্ষে কৃত্রিম হীরক (কাচ) অস্বচ্ছ প্রতীয়মান হয়। রেডিয়াম হইতে নিঃসৃত রশ্মি (B-rays) সংস্পর্শে হীরক আভা বিকিরণ করিতে থাকে। কতকগুলি বর্ণহীন হীরকখণ্ড রেডিয়াম ব্রোমাইডে নিমজ্জিত করিয়া প্রায় ১ মাস পরে মিঃ ক্রুক দেখিয়াছেন যে, তাহারা রেডিয়ামের সংযোগফলে নীলাভ সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, এই বর্ণের জন্য হীরকের মূল্য হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তভাবে হীরকের প্রধান প্রধান গুণাবলী উল্লিখিত হইল ; এই গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া অকৃত্রিম হীরক চেনা সহজ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক
প্রসঙ্গ

গরু-মহিষ

আমেরিকা পশুপালনে কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে বড় বড় বাথানে গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পালন করা হয়, বংশবৃদ্ধি করা হয়, জাতির উৎকর্ষসাধন করা হয়। সম্প্রতি ক্যানাডার গভর্মেণ্ট সরকারী গোষ্ঠে গাই-গরু ও ষাঁড়-মহিষ সংযোগে এক নূতনবিধ সঙ্কর জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তার নাম তাঁরা রেখেছেন ক্যাটালো (cattalo); আমরা তাকে গরু-মহিষ বল্‌তে পারি।

এই সঙ্কর পশু তাহাদের জনক-জননী উভয়ের গুণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাচ্ছে; ইহার ফলে ইহাদের চামড়া মহিষ ও গরুর মাঝামাঝি রকমের শক্ত অথচ কোমল হচ্ছে এবং লোমশ হচ্ছে; এই লোম কোঁকড়ানো, অলকগুচ্ছ-বিন্যস্ত ও চক্‌চকে; এই জন্য এই চামড়ায় চাষী মজুররা তাদের জামা তৈরী করাচ্ছে। এই পশু খুব কষ্টসহিষ্ণু হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টি এবং ব্যাধির আক্রমণে ইহারা বেশ অপ্রতিহত থাকে। ইহারা যা-তা খেয়ে বেশ সুস্থশরীরে জীবন-ধারণ কর্‌তে পারে, সে রকম খাদ্য খেয়ে কেবল গরু বা কেবল মহিষ সুস্থ-সবল থাকে না। বরফ পড়ার সময়ও ইহারা খোলা যায়গায় স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতিগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক ব'লে গরু ও মহিষের সঙ্কর শাবক প্রায়ই বাঁচে না, বাঁচলেও তাদের সন্তানোৎপাদনের শক্তি থাকে না। ঘোড়া ও গাধার সঙ্কর শাবক খচ্চরের অবস্থাও এই রকম।

তাহার পর গরু-মহিষে মিলন ঘটানোও এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে জানা গেছে যে, মহিষ ও গরুর বাছুর শৈশব থেকে একত্র প্রতিপালিত হ'লে তাহাদের মধ্যে মিথুনভাব সহজেই সঞ্জাত হয়।

ক্যানাডায় এখন চেষ্টা চলেছে এসিয়ার য়্যাক দিয়ে গরু বা মহিষ থেকে কোন রকম সঙ্কর শাবক উৎপাদন

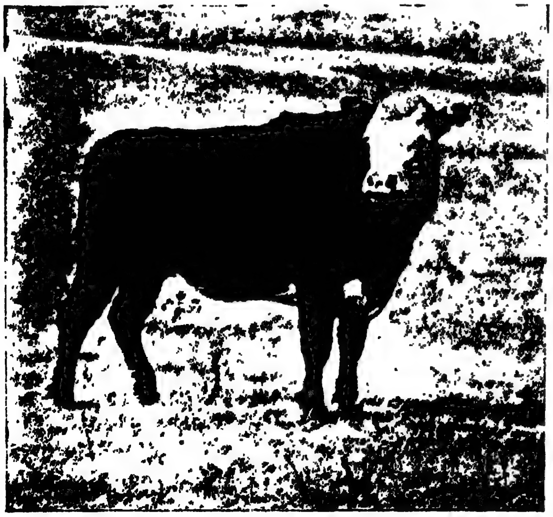

গাইগরু ও ষাঁড়মহিষ সংযোগে সঙ্কর জন্তু 'ক্যাটালো'

সঙ্কর মহিষ

করার। য়্যাক জনক ও মহিষী জননী থেকেও উৎকৃষ্ট সঙ্কর প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে।

এই সাঙ্কর্য্য-সাধন খুব যত্ন ও ধৈর্য্য-সাধ্য। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, এ কথা পাশ্চাত্য জাতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছে। তাহাদের নিরন্তর চেষ্টার ফলে জগতে বহুবিধ নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে ও হবে।

আমাদের দেশেও গরু ও মহিষের বিবিধ শ্রেণী ও বর্গ আছে; আসামের মিথান, তিব্বতের য়্যাক, দেশী গরু মহিষ প্রভৃতির সম্মিলনে আমাদের নষ্টপ্রায় পশু-সম্পত্তির উন্নতি করার চেষ্টা দেশের কর্ম্মী যুবকদের কর্ত্তব্য।

মরুভূমিতে মাছ

মরুভূমিতে মাছ

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মরুভূমি। এক কালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমুদ্রের তলে ছিল; সমুদ্রের জল স'রে গেছে, প'ড়ে আছে দিগন্তবিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর—ধূসর উষর জলশূন্য উদ্ভিদ্‌বর্জ্জিত। সাহারা-পারের যাত্রীরা বালির ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে মাটীর উপর সটান হয়ে শুয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে; তখন অনেকে মাটীর উপর কান পেতে থেকে শুনেছে, সাহারার শুষ্ক তপ্ত বুকের তলা দিয়ে ফল্গু-নদীর প্রবল জলস্রোত কলকল রবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ বড় বিষম অবস্থা—তপ্ত-বালুকা-দগ্ধ পথিক মরুভূমির বুকের উপরে জলাভাবে তৃষ্ণায় মুমূর্ষু আর মরুভূমির বুকের তলা দিয়ে অনাবশ্যক জলস্রোত মুমূর্ষুর কানে নিষ্ঠুর পিশাচের অট্টহাসির মত কলকল শব্দ ক'রে ছুটে চলেছে, তার একটি বিন্দুও কারও পাবার জো নেই!

মরু-যাত্রীদের পিপাসা-নিবারণের জন্য ফরাসী গভর্মেণ্ট প্রথম সাহারার স্থানে স্থানে কূপ খনন করান। এই সব কূপ প্রায় দেড়-শ ফুট গভীর। প্রথম কূপটি খনন করতে করতে মরুতলবাহী ফল্গু-স্রোতের সঙ্গে গর্ত্তের যেই যোগ হয়ে গেল, অমনই হাজার হাজার ট্রাউট-মাছের পোনা কূপের জলে খলখল ক'রে লাফাতে লাগলো। এই মাছগুলির আকার ও রং নদীর মাছের মতই;—যদিও নিকটতম নদী সেই কূপ থেকে অনেক মাইল দূর দিয়ে প্রবাহিত।

আমেরিকার কেণ্টকী জিলার গুহাবাসী মাছেরা অন্ধকারে থেকে অন্ধ; কিন্তু মরুতলের নদীর মাছেরা সে রকম অন্ধ নয়, খোলা নদীর মাছের মতই চক্ষুষ্মান্। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাবে জীবের শারীরিক গঠনের তারতম্য ঘটে। এই বালুকা-তল-বিহারিণী নদীর মাছেদের অন্ধ হওয়ারই কথা; কিন্তু তাহারা চক্ষুষ্মান্ হয়ে অনেক বৈজ্ঞানিকের চক্ষুস্থির ক'রে দিয়েছিল। এখন কিন্তু তাঁহারা ইহার কারণ আবিষ্কার করেছেন।

আরবদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী চলিত আছে যে, যখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা সপ্তম শতাব্দীতে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন সাহারা এখনকারমত মরুস্থলী ছিল না; সেখানে জল ও গাছপালা ছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জল একেবারে শুষ্ক ও গাছপালা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমাদের বাঙ্গালা-দেশের চব্বিশ-পরগণার অনেক স্থানে যেমন লুপ্ত গঙ্গার খাতে সঞ্চিত জল এখন অধিকারীদের নামে, ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা নামে পরিচিত হয়, তেমনই সাহারার মধ্যেও স্থানে স্থানে যে জলাশয় এখন শুষ্ক হয়ে আছে, সেই সব গর্ত্তকে আরবেরা এখন নদী বলে। ইহা হইতে অনুমান হয়, এক সময়ে যে নদী মাটীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত,

তা কালে বালির তলায় চাপা প'ড়ে গেছে এবং নদীর মাছেরা সেই ফল্গু-স্রোতে এখনও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে।

এই সব মরু-কূপে যে সব মাছ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সমজাতীয় মাছ প্যালেস্টাইনের নদীতে ও আফ্রিকার নদী হ্রদে দেখতে পাওয়া যায়। অতএব ইহাও সম্ভব যে, এই সব নদী-হ্রদের সঙ্গে মরুতলবাহিনী নদীর সংযোগ আছে এবং বালির তলে তলে স্রোত বেয়ে মাছেরা খোলা নদী-হ্রদে যাতায়াত করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুতব-মিনার

কীর্ত্তির সু-উচ্চ স্তম্ভ, সৃষ্ট হ'লে যবে
স্তম্ভিত হইল লোক। দানবে-মানবে
কত কীর্ত্তি বিনাশিল ধরণী-ধূলায় ;
অতীতের ইতিহাস হৃদয় ভুলায়
তা'দের গৌরব-গাথা নতশিরে গাহি'।
অতীতের কীর্ত্তি-লীলা-জয়-গীতি বাহি'
তুমি এলে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
উন্নত—উষ্ণীষ শিরে হাসিতে হাসিতে!
দিল্লী-ভূমে নাই আর সে প্রভাত-আলো,
কবর-গালিকা-ঢাকা শর্ব্বরীর কালো।
নাই সেই সুমহান বিরাট কল্পনা,
সম্রাটের অন্তরের দোহদ বেদনা
কীর্ত্তি তরে। ঘরে ঘরে কোথা সে উল্লাস,
নব নব চমৎকার কীর্ত্তির প্রয়াস!

* * *

সাত শত বৎসরের ঝঞ্ঝা, বজ্ররাশি
গর্ব্বোদ্ধত শিরে তব পড়িয়াছে আসি'—
তুমি অবহেলাভরে হেলাইয়া গ্রীবা
সেই হ'তে দাঁড়াইয়া আছ রাত্রি-দিবা!
আজি আমি আসিয়াছি বহু আশা ক'রে,
সোপানের বাহু মেলি' লহ তুলি মোরে।
দৈত্য-বীর, আসিয়াছি বিস্ময়—নির্ব্বাক্—
ইতিকথা যাক্ আজি, স্তব্ধ হয়ে থাক্!
চাহি না মানিতে আমি, নর-হস্ত দিয়া
মূর্ত্তি তব সৃষ্ট হ'ল প্রস্তর গাঁথিয়া।
মোর কাছে তুমি শুধু দম্ভের প্রতীক
হে অটল শিলাস্তম্ভ, এই কথা ঠিক!
সৃষ্টির প্রারম্ভ তব মহিমা মণ্ডিত,
সে মহিমা চিরোজ্জ্বল, হ'বে না অতীত।
নীচ, নিম্ন, অল্পতুষ্ট নহ তুমি বীর!
নহ তুমি ঝঞ্ঝাতীত, তুমি চির-স্থির।
নব নব শিশুদল তোমার চৌদিকে
ভীড় ক'রে তোমা' পানে চাহে অনিমিখে!
তা'রা শুভ্র, মঞ্জুবেশ, সে দিন জনম,
মানবের তুলিকায় রূপ অনুপম ;
তোমার প্রাচীন চক্ষে উঠে তা'রা ভাসি'
শিশুসম ; পিতামহ, তুমি উঠ হাসি'!

* * *

স্মিতহাস্যে চেয়েছিলে কখন্ কে জানে
নৃত্যোচ্ছল, নিত্যোজ্জ্বল দিল্লী-পুরী পানে!
তা'র পর ম্লানমুখে, ব্যথিত-অন্তরে,
দৃষ্টি তব বদ্ধ হ'ল পাণিপথ'পরে।
বৃদ্ধ বীর, অশ্রু তব করিয়া সংযত
ধ্বংস-লীলা নেহারিলে পাষাণের মত।
তোমার আদর যা'রা করিত, সকলে
বক্ষোরক্ত মিশাইল যমুনার জলে!
নিভে গেল হীরকের মাণিক্যের দ্যুতি,
নূপুর-নিক্বণ মূক, স্তব্ধ অনুভূতি!
তা'ও তুমি অচঞ্চল দেখিলে দাঁড়ায়ে,
সে স্মৃতি দিতেছে আজি বেদনা বাড়ায়ে।
যেথা ছিল সুবিশাল অট্টালিকামালা,
প্রমোদ-মালঞ্চ শত, গন্ধ-গীতি ঢালা,
একে একে তাহাদের বক্ষের উপর
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে হ'ল নির্ম্মিত কবর।

* * *

যাহাদের কীর্ত্তিভরে পৃথ্বী টলমল,
অনুপম সুখৈশ্বর্য্য, অতুলন বল,
আজি তা'রা একে একে তোমার সম্মুখে
শায়িত হয়েছে মৃৎ কবরের বুকে!
শুয়ে আছে বাদশাহ, নবাব, সম্রাট,
শেষ হয়ে গেছে ভোগ, শেষ রাজ্য-পাট ;
গোলাপজলের উৎস রুদ্ধ চিরতরে,
নৃত্য-গীত বন্ধ রঙমহলের ঘরে,
বেগমেরা চির-সুপ্ত। আতর-সৌরভ
মুক্তবায়ে বিলায়েছে আপন গৌরব।
মর্ম্মর-প্রাসাদ, আর কক্ষ চমৎকার
অতীতের সাক্ষ্য দেয়, বক্ষে হাহাকার!
শূন্য নভে বৃথা আজ কাঁদিছে বাতাস,
কবরের রাজ্য জুড়ে বিরাজে হুতাশ!
হুতাশের হু-হু শ্বাসে পঞ্জরে তোমার
বেদনা কাঁদিয়া উঠে। ভেদি রন্ধ্রদ্বার
মেঘমন্দ্র দীর্ঘশ্বাস বাজে অহরহ,
তোমার বিপুল ব্যথা মোরে কিছু কহ!
হে বিরাট শিলা-স্তম্ভ, সমীপে তোমার
আসিয়া দাঁড়ানু আজি, চাহ একবার—
তোমার অটল বক্ষে যে বেদনা বাজে,
তা'র প্রতিধ্বনি শুনি মোর হিয়া-মাঝে ;
ভ্রমিয়াছি বহু-দূর সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে,
যেথা যাই, যেথা চাই, চক্ষে অশ্রু বহে!
নিজ ধ্বজা গর্ব্বভরে বহি' উচ্চশিরে
ধ্বংসহীন দাঁড়ায়েছ মহাকাল-তীরে!
যত ব্যথা বক্ষে চাপি' আছ হে সংযমী!
সংসারের রণ-গুরো, নমি তোমা' নমি!
তব মাঝে বাজে সুর অশ্রুত বীণার—
ক্রন্দন-ও শুনেছি তব, কুতব-মিনার!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সচিত্র য়ুরোপ *

হ্বিয়েনায় বিশ্বমেলা

করাসীদের মুখোস মিছিল (নিস নগরে অনুষ্ঠিত—
নিস ভূমধ্যসাগরের কিনারায় দুনিয়ার এক বিলাস-কেন্দ্র)

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হ্বিয়েনায় এক আন্তর্জ্জাতিক মেলা বসিয়াছিল। কি য়ুরোপে, কি এসিয়ায় মেলা ছিল মধ্যযুগের সওদা কেনা-বেচার প্রধান প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য জগতে মেলার আবার আদর বাড়িয়াছে।

হ্বিয়েনার এই মেলার প্রধান কথা এই যে, মহা লড়াইয়ের ফলে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। কাযেই বাদশাহী সহর হ্বিয়েনার আর সে কালের রাষ্ট্রীয় গৌরব নাই। কিন্তু মধ্য-য়ুরোপের সর্ব্ব বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে নবীন অষ্ট্রীয়ান রিপাব্লিকের রাজধানী আজও দুনিয়ার ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অষ্ট্রীয়ার শিল্পকর্ম্ম জার্ম্মাণীদের সঙ্গে চিরকালই টক্কর দিয়াছে। বহু অষ্ট্রীয় মাল ভারতে জার্ম্মাণ মাল নামেই লড়াইয়ের পূর্ব্বে পরিচিত ছিল। লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাচ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়ার কায ইত্যাদি বহু দিকে অষ্ট্রীয়ান কারখানাগুলা য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। সেই সব মাল যোগাইবার ক্ষমতা অষ্ট্রীয়ার আজও আছে। হ্বিয়েনার এই মেলায় তাহাই প্রচারিত হইল।

হ্বিয়েনার সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন বাড়িলে মধ্য-য়ুরোপের সকল দেশেই ভারতসন্তানের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিবে। মধ্য-য়ুরোপের সঙ্গে কারবার চালাইতে হইলে ভারতবাসীকে বিলাতের মারফৎ অথবা জার্ম্মাণীর মারফৎ যাইবার দরকার নাই। ভারতসন্তান সোজাসুজি হ্বিয়েনার কারখানা ও ব্যাঙ্কগুলা স্পর্শ করিলেই সুফললাভ হইতে পারিবে।

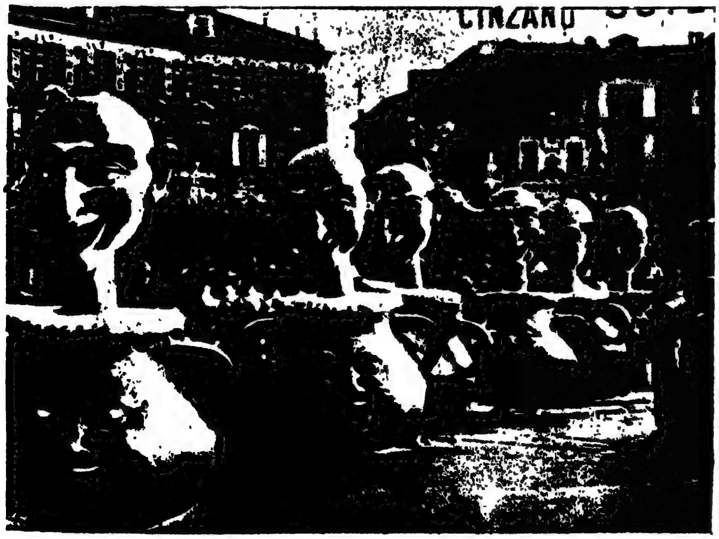

করাসীদের মুখোস-মিছিল (নিস নগরে অনুষ্ঠিত)
·("শোআইট্‌সার ইলুষ্ট্রির্টে ৎসাইটুঙ" হইতে উদ্ধৃত)

---

* হ্বিয়েনার ছবিগুলা "সেন্ট্রাল য়ুরোপীয়ান্‌ রিহ্বিউ" হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

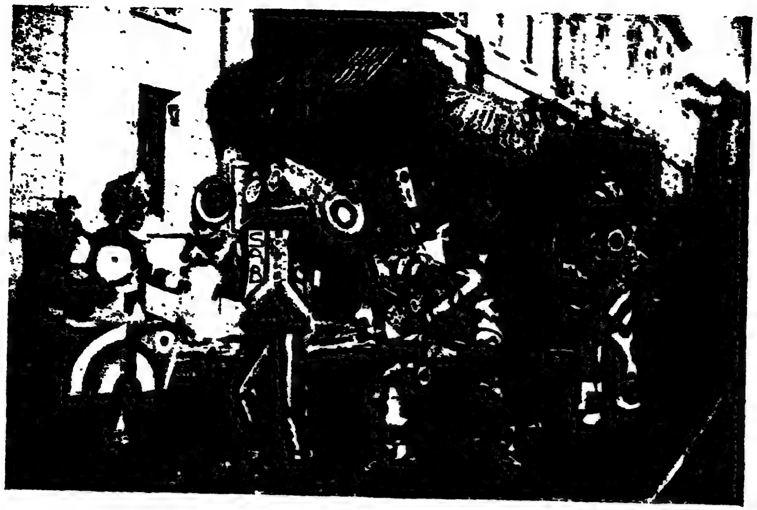

বাজেল সহরে মুখোস-মিছিল (বাজেল সুইস সহর, জার্ম্মাণীর কিনারায়)

জুরিচে মুখোস-মিছিল ("ধোআইট্‌সার ফামিলিয়ে" হইতে উদ্ধৃত)

সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে মুখোস-মিছিল (বাজেল)
("শ্বেআইট্‌সার ইলুষ্ট্রীর্টে ৎসাইটুঙ" হইতে উদ্ধৃত)

টিরোলীদের মুখোস-নাচ (টিরোল অষ্ট্রিয়ার আল্পস্ প্রদেশ)
("ধোআইট্‌সার ফামিলিয়ে" হইতে উদ্ধৃত)

য়ুরোপে মোখা-নাচ

চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঙ্গালী গাজন-গম্ভীরায় মুখোস নাচিতে অভ্যস্ত। য়ুরোপেও দেখিতেছি তাই। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে য়ুরোপের নামা দেশেই "কার্নিহ্বাল"উৎসবের রেওয়াজ প্রচলিত। এই নাচ-গান হল্লার ভিতর মুখোস ব্যবহার করিবার এবং ছদ্মবেশ পরিবার আনন্দই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

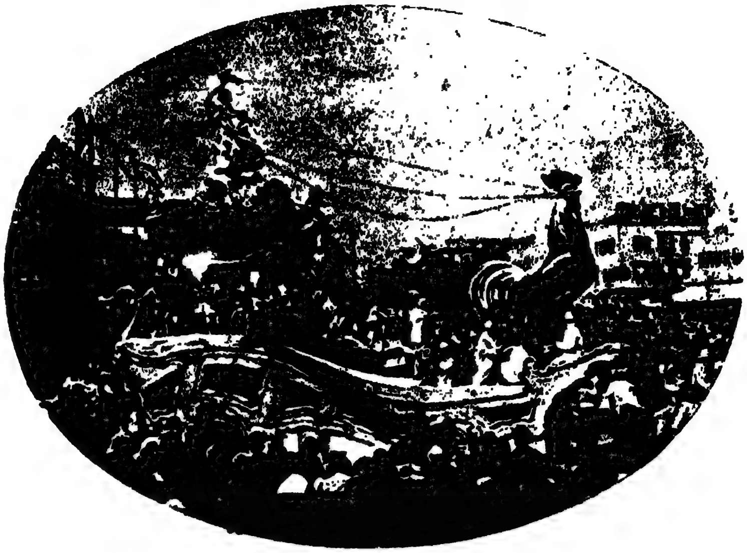
বসন্ত-রথ (নিস নগরের মুখোস-মিছিলে ব্যবহৃত)

ইতালীর পাদোহ্বা, হ্বেনিস ইত্যাদি নগরে মুখোস-নাচের মিছিল দেখিয়া আসিয়াছি। সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে ফিরিয়া দেখি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া (টিরোল), জার্ম্মাণী, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে সকল দেশের কাগজেই মুখোস-মিছিলের ছবি।

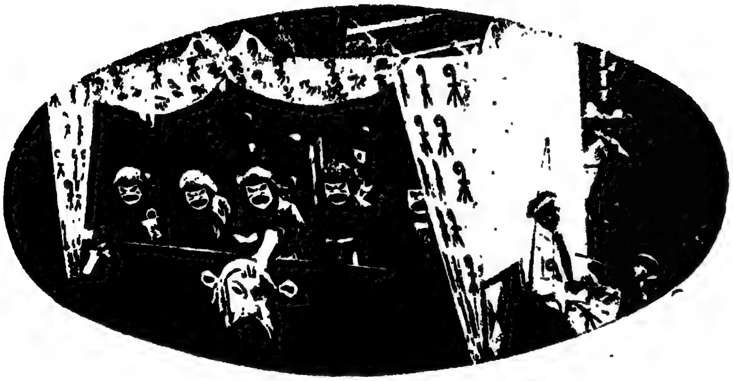
মুখোস-মিছিলের এক দৃশ্য (বাজেল)

খৃষ্টানদের "ইষ্টার" তিথিতে খৃষ্ট সশরীরে পুনরায় দেখা দিয়াছিলেন। এই তিথির পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ দিনকে বলে "লেণ্ট।" এই দিনগুলা চরম বিষাদের যুগ। উপবাস, রোজা ইত্যাদি পালন করিতে হয়। ঠিক যে দিন লেণ্ট আরম্ভ হইবার কথা, তাহার আগেকার সাত দিন নর-নারী আমোদ-প্রমোদ, যথেচ্ছ ব্যবহার এবং সকল প্রকার সামাজিক "স্বাধীনতা" ভোগ করিতে অভ্যস্ত।

পাশ্চাত্য মুখোস-নাচের উৎসবে, সাত দিন জাপান ভারতের তদনুরূপ কাণ্ডে "তত্ত্বকথা" একই।

বনয়কুমার সরকার।

তখন ও এখন

(আইরিস্ কবি ইয়েট্‌স্ অবলম্বনে)

আমার সাথে মিল্‌ল সে যে ঘন বকুল-ছায়,
কেয়া-রঙা গালটিকে তার বাতাস চুমে যায়—
বল্লে হেসে, "ভাবনা কেন, মোদের ভালবাসা
এ যেন গো শীতের শেষে বসন্তেরই আসা।"
গাছে যেমন পাতা গজায়, বাগানে ফুল ফোটে,
তেমি সহজ—সেই পুলকই বুক ভরে ওর ছোটে।
মূর্খ আমি—তার কথাতেও ঘুচলো নাকো ভয়,
কোথায় যেন রয়ে গেল এক কণা সংশয়।

নদীর ধারে সারা মাঠটি ভরা সবুজ ঘাসে,
তার পরেতে এলিয়ে সে যে বস্‌লো আমার পাশে ;
বুকের পরে রাখলে মাথা জড়িয়ে হাতে হাত,
সরসরিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে পূর্ণিমারই রাত !
বীণার সুরে বল্লে, জীবন জ্যোছনা দিয়ে বোনা।
বৃথা কেন ভবিষ্যতের দিনগুলো সব গণা ?
মূর্খ আমি—তার কথাতেও ঘুচলো নাকো ভয়,
তাই ভেবে দু'চোখে আজি শ্রাবণ-ধারা বয়।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য।

কৃষি
শিল্প
বাণিজ্য
সতীশ

নারিকেল-ছোবড়ার ব্যবহার

নারিকেলবৃক্ষ এত প্রকারে মানুষের উপকারে আইসে যে, ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গেলে একখানি ছোটখাট গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লণ্ডন সহরে উদ্ঘাটিত Indian and Colonial Exhibitionএ বোম্বাইবাসী মিঃ পেরিরা নামক জনৈক ভদ্রলোক নারিকেলজাত ৮৩ প্রকারের বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শন করেন। উহার মধ্যে আহার্য্য, পরিধেয়, পানীয়, গৃহসজ্জা, গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান, সুগন্ধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। কিন্তু নারিকেলবৃক্ষের প্রায় সকল অংশই অল্পবিস্তর ব্যবহারোপযোগী হইলেও ফলই ইহার প্রকৃষ্ট অংশ। ফলের শস্য হইতে তৈল এবং ছোবড়া হইতে দড়ি-দড়া ও অন্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই উভয়েরই ব্যবসায়িক প্রাধান্য প্রায় সমান। এ স্থলে শেষোক্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রতি বৎসর যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ওলন্দাজশাসিত দেশসমূহ, মালয়, সিংহল, ভারত, ফিলিপাইন, নিউগিণি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের ছোবড়া পৃথিবীর বাজারে আমদানী হয়। ভারতের উপকূল অংশে প্রায় সর্ব্বত্রই গৃহ-শিল্প হিসাবে অল্পবিস্তর নারিকেল-ছোবড়ার দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহে ছোবড়ার যেরূপ ও যে পরিমাণ সদ্ব্যবহার হইতেছে, এতদ্দেশে এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সেই জন্য নারিকেল-ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালীর উপর সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছোবড়া প্রস্তুত

এ স্থলে নারিকেলবৃক্ষের চাষ-প্রণালী বিবৃত করা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চারা রোপণের সময় ২।১ বৎসর ব্যতীত লোক নারিকেল-গাছের আর কোন যত্ন করে না। সার, বীজ ও মৃত্তিকা অনুসারে বৎসরে গাছ প্রতি ৪০ হইতে ৭০টি নারিকেল হইতে পারে। বঙ্গদেশে সচরাচর প্রথমোক্ত সংখ্যাই গড়পড়তা ফলনের হার। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই নারিকেল-বৃক্ষের ফুল হয় এবং ফল পরিপক্ক হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। কিন্তু ছোবড়া প্রস্তুত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইলে দশম মাসেই ফল সংগ্রহ করা ভাল। ইহার অধিক সময় ফল গাছে থাকিলে উহার তন্তু শক্ত হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় উক্ত প্রকার তন্তুকে আবার নরম ও বয়নোপযোগী করিতে অনেক শ্রম ও অর্থব্যয় হয়। অন্য দিকে কম বয়সের নারিকেলের ছোবড়াও কম মজবুত হয়। সেই জন্য একবারে 'নেয়াপাতি' ডাবের ছোবড়া স্বতন্ত্রভাবে কম কাযেই লাগিয়া থাকে, যদিও ইহা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য নহে। কিন্তু একটু শাঁসাল ডাবের ছোবড়া অনেক কাযেই লাগে। যাহা হউক, উপযুক্ত বয়সের নারিকেল সংগ্রহের পরই প্রধান কার্য্য—খোলা হইতে ছোবড়া পৃথক্ করা। এক খণ্ড মোটা তক্তার উপর ৬।৮ ইঞ্চ লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র লোহার শিক সোজা করিয়া দৃঢ়ভাবে বসান হয় এবং তক্তাটিকে মৃত্তিকা অথবা মেঝের সহিত খুব শক্ত করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর নারিকেল লইয়া সজোরে উহার উপর আঘাত করিয়া একটু 'চাড়' দিলেই ছোবড়া আল্‌গা হইয়া যায়। তখন হস্ত দ্বারাই সহজে ছোবড়া ছাড়াইবার কার্য্য চলিতে পারে। ছোবড়াকে নরম করিবার অর্থাৎ পচাইবার দুইটি দেশীয় প্রথা আছে—প্রথম প্রথায় পৃথক্ করা ছোবড়াকে নদী, খাল অথবা অন্য জলাশয়ের ধারে মাটীতে প্রায় এক বৎসরকাল প্রোথিত করিয়া রাখা হয়; বলা বাহুল্য যে, লবণাক্ত জলাশয়ই এই কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত। অন্য প্রথায় ছোবড়াকে কিছু কাল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে তুলিয়া লইয়া এক খণ্ড পাথরের উপর কাঠের মুগুর দিয়া 'থেঁতো' করা হয়। আধুনিক প্রথায় ছোবড়া পচানর সময় অনেক

সংক্ষেপ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ছোবড়ার কারখানায় সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান বড় বড় চৌবাচ্চা থাকে। তাহাতে আবশ্যকমত জল পূর্ণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ছোবড়ার উপর ভারযুক্ত তক্তা দিয়া উহাকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখার বন্দোবস্ত আছে। ষ্টীম এঞ্জিনের উদ্বৃত্ত বাষ্প দিয়া চৌবাচ্চার জল গরম করা হইয়া থাকে; তাহাতে ছোবড়া সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া আল্‌গা হইয়া যায়। ছোবড়ার প্রকৃতি হিসাবে উহাকে নরম করিতে ৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টা সময় গরম জলে ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক হয়। জল অধিক ময়লা হইয়া গেলে উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার পরিষ্কার জল দেওয়া এবং মাঝে মাঝে ছোবড়াগুলিকে নাড়িয়া দেওয়া দরকার। তাহা না হইলে উপর ও নীচের সমস্ত ছোবড়া সমভাবে আল্‌গা হইয়া যায় না। ঠিক কোন্ সময়ে জল হইতে ছোবড়া তুলিয়া লইতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রভূত অভিজ্ঞতা আবশ্যক হয়। অল্প অথবা অধিক উত্তপ্ত করিলে ছোবড়ার গুণের লাঘবতা ঘটিয়া থাকে।

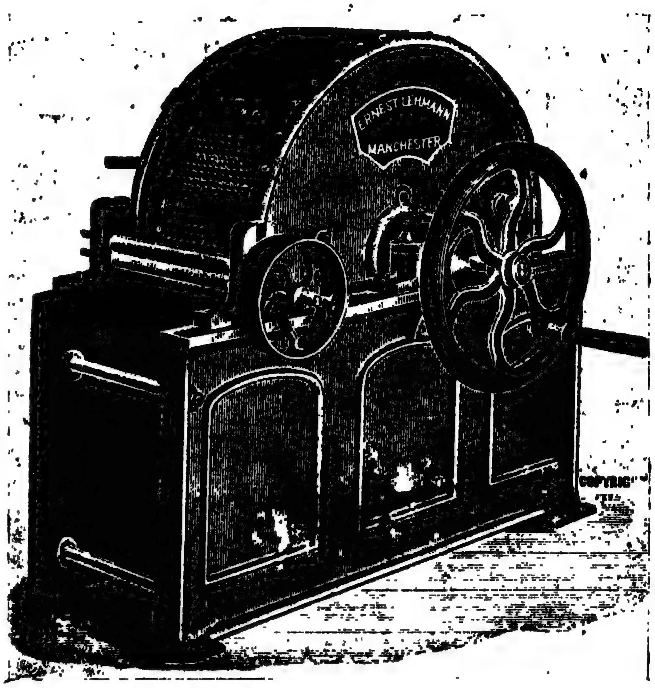

তন্তু-নিষ্কাশণ যন্ত্র

তন্তু-নিষ্কাশন-প্রণালী

উপরি-উক্ত প্রকারে ছোবড়া গরম করিয়া লইবার পর উহাকে Husk Crusher নামক যন্ত্রে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রে ছোবড়া উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহার কঠিনাংশ প্রভৃতি (যেমন ফলের নিম্নাংশ) ভাঙ্গিয়া গিয়া এবং ছোবড়া সোজা হইয়া পরবর্ত্তী কার্য্যসমূহের সুবিধা হইয়া থাকে। পিষ্ট ছোবড়া হইতে তন্তু বাহির করিবার জন্য দুই প্রকার তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্র (Fibre Extractor) ব্যবহৃত হয়। প্রথম প্রকার যন্ত্রে ব্রুস্, সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযোগী দৃঢ় ও মোটা তন্তু হইতে মাদুর ও দড়ি-দড়া ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার তন্তু পৃথক্ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রুসের তন্তু কলের ভিতর টানা হইয়া যায় না; যে মজুর কলে ছোবড়া দিতে থাকে, তাহার হাতে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের কলে সমস্ত ছোবড়াকেই বয়নোপযোগী তন্তুতে পরিণত করা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর নিষ্কাশন-যন্ত্র ব্যবহার করিবার সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত তরুণ নারিকেল লইয়া ইহাতে কায চলে। এতদ্ভিন্ন এই কলে অন্যান্য অনেক বৃক্ষের ছাল হইতেও তন্তু-নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার ও সকল অবস্থার

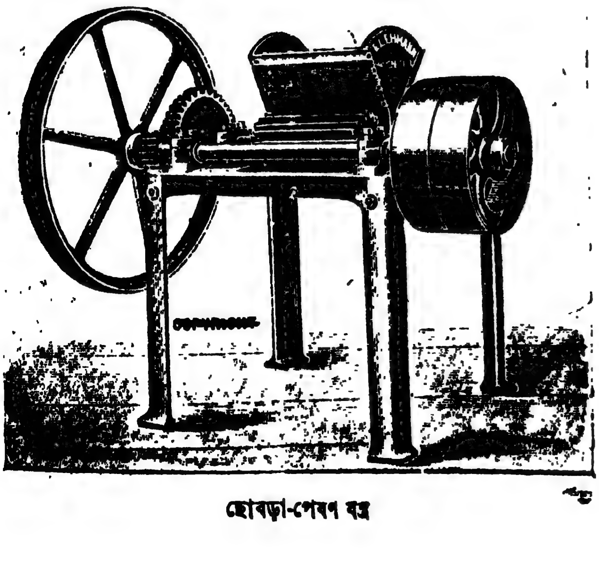

ছোবড়া-পেষণ যন্ত্র

নারিকেলে ছোবড়ার মাত্রা সমান নহে। কিন্তু মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, ১ হাজার নারিকেল হইতে দেড় হইতে দুই মণ বয়নোপযোগী তন্তু এবং ১২ হইতে ১৮ সের ব্রুসের তন্তু বাহির হইয়া থাকে। তন্তু নিষ্কাশিত হওয়ার পর ঐগুলিকে ঝাড়াই কলে (Willowing machine) দেওয়া হয়। উক্ত কলে তন্তু হইতে ধূলা, বালি ও অন্যান্য অবান্তর পদার্থ পৃথক্ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কঠিন তন্তুও পৃথক্ হইয়া পড়ে। ঝাড়িয়া লইবার পর তন্তুগুলিকে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া গাঁইট বাঁধা হইয়া থাকে। ব্রুসের তন্তু, যাহা পূর্ব্বে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলিকে গাঁইট বাঁধার পূর্ব্বে আঁচড়ান এবং দৈর্ঘ্য ও গুণানুসারে পৃথক্করণ আবশ্যক। নারিকেল-ছোবড়ার কারখানায় নিষ্কাশন-যন্ত্রই অধিক। একই সময় কায করিতে হইলে একটি পেষণ-যন্ত্র যে পরিমাণ ছোবড়া ছাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ৮টি তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্রের কায চলিতে পারে। আবার উক্ত কয়টি নিষ্কাশন-যন্ত্রের পক্ষে একটি ঝাড়াই কলই যথেষ্ট।

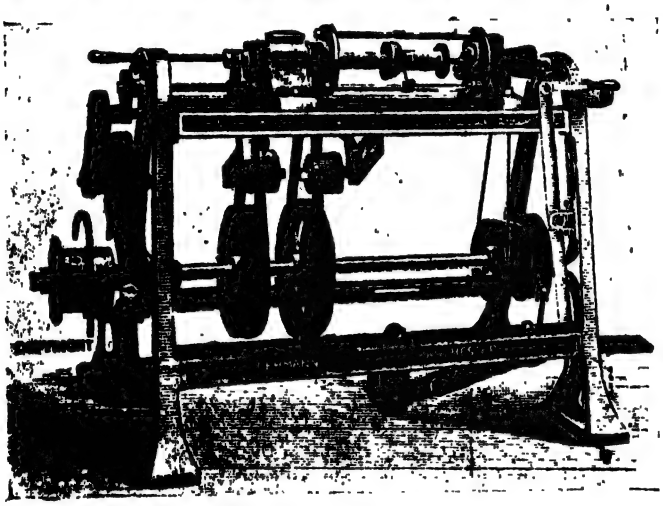

সূতা কাটার যন্ত্র

তন্তু-বয়ন

ক্ষুদ্র কারবারীর কার্য্য তন্তু বাহির করিয়া গাঁইট বাঁধিলেই শেষ হইয়া গেল; তাহার পর গাঁইট বাজারে চালান দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কায নাই। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়িগণ তন্তু প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না। তাঁহারা তন্তু হইতে সূতা প্রস্তুত করেন এবং কেহ কেহ দড়ি-দড়াও তৈয়ারী করিয়া থাকেন। সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ তন্তু গাঁইট বাঁধা থাকিলে কার্ডিং (Carding) যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে খুলিতে হয়। পরে তন্তুকে সরল করিয়া নমনীয় ও নরম করিয়া লইতে হয়। এতদর্থে তিন প্রকার সোজা করিবার যন্ত্র (hackle) ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—মোটা, মধ্যম এবং সূক্ষ্ম। সাবানের জল, তৈল প্রভৃতি দ্বারা নরম করিয়া এবং যথাক্রমে মোটা হইতে সরু hackleএর মধ্য দিয়া টানিয়া এক জন সুদক্ষ মজুর ১২ ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৩ মণ বয়নোপযোগী তন্তু প্রস্তুত করিতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকরাই এই কার্য্যে যথেষ্ট পটুতা দেখাইয়া থাকে। তন্তুকে বয়নোপযোগী করার পর সূতা কাটার বন্দোবস্ত। সূতা কাটার দুই রকম কল আছে। একটিতে মোটা কাছি, রশি প্রভৃতির উপযোগী স্থূল সূত্র প্রস্তুত হয়; অন্যটিতে যে সূতা তৈয়ারী হয়, তাহা মধ্যম ও সূক্ষ্ম শ্রেণীর। সেরূপ সূত্র দড়ি, সূতলি, মাদুর, চট ইত্যাদি বয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সূতা কাটা কলের (Spinning machine) কার্য্য-প্রণালী বর্ণনা করা এ স্থলে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত উভয় প্রকার কল পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত; উহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে চালান যায়। প্রত্যেক দিবস মোটা সূতার কল হইতে প্রায় ৫০ সের ও সরু সূতার কল হইতে ২০।২৫ সের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। সূত্র যেমন প্রস্তুত হইতে থাকে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মাকুতে জড়াইয়া যায়। কার্য্যের এই স্তরে এক থাই সূতাই (one ply) প্রস্তুত হয়। বাজারে যে নারিকেল-ছোবড়ার সূতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই থাই। উক্তরূপ সূতা প্রস্তুত করিতে আর একটি কলের ব্যবহার হয়—উহার নাম Cabling machine অর্থাৎ সূতা পাকাইবার যন্ত্র। Cabling machineএ সূতা পাকান হইলে পুনরায় আর একটি কলের সাহায্যে সূতার বাণ্ডিল (hank) বাঁধা হয়। ১০টি মাকুর সূতা দ্বারা এক একটি বাণ্ডিল প্রস্তুত হইয়া

থাকে। বাণ্ডিলগুলি টানিয়া সোজা করিলে প্রত্যেকটি ২ ফুট লম্বা হয়। গাঁইট বাঁধিবার সময় উক্ত প্রকার বাণ্ডিলগুলি একত্র করা হইয়া থাকে; সূত্র হয় বিদেশে রপ্তানী হয় কিংবা নানাবিধ ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারকগণ কর্ত্তৃক ক্রীত হয়।

আবশ্যক কল ইত্যাদি

যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রভূত পরিমাণে নারিকেল উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সচরাচর সূত্র অথবা দড়ি-দড়া প্রস্তুত করিয়া ছাড়িয়া দেন। দড়ি প্রস্তুতের কল অবশ্য স্বতন্ত্র। মেঝের ও সিঁড়ির জন্য মাদুর, চট্, থলে, ব্রুস্ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকারের কল আছে। যাঁহারা উক্ত প্রকার ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন, তাঁহারা বাজার হইতেই সূত্রাদি ক্রয় করেন; নিজেরা প্রায়ই প্রস্তুত করেন না। এই বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্যাদির প্রস্তুত-প্রণালী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আরও এক শ্রেণীর ছোবড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত—উহা পর্দ্দা উদ্দেশ্যে ব্যবহারোপযোগী চট। শত্রুপক্ষকে ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া (Camoublage) জন্য এইরূপ চট বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হইত।

সেই সময়ে অনেকে ছোবড়ার চট প্রস্তুত ও সরকারকে সরবরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে নারিকেল-সূত্রের সূক্ষ্ম শিল্প সামান্যমাত্রই অগ্রসর হইয়াছে—যে সকল দ্রব্য এখন প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে দড়ি ও মাদুরই প্রধান এবং সে সমুদয় অনেক স্থানেই হাতের দ্বারা কিংবা দেশীয় মোটামুটি যন্ত্রাদির সাহায্যে তৈয়ারী হয়। কলের প্রবর্ত্তন হইলে যে অনেক অধিক পরিমাণে নারিকেল-ছোবড়ার সদ্ব্যবহার হইতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ছোবড়া-শিল্পের তরুণ অবস্থায় অধিক মূল্যবান্ অথবা জটিল কল-কব্জা ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। নারিকেল-চাষের অথবা আমদানীর যে সকল প্রধান কেন্দ্র আছে, সে সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যয়ে তন্তু প্রস্তুত করাই বিধেয়। তন্তুপ্রস্তুত কার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মিলে তৎপরে সূত্র ও সূত্রজাত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারিবে। বড় বড় নারিকেল-ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদকগণ তন্তু প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন। ইহাতে খুব বেশী মূলধন আবশ্যক হয় না। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কল লইয়া একটি মধ্যম গোছের কারখানা চালাইতে পারা যায়:—

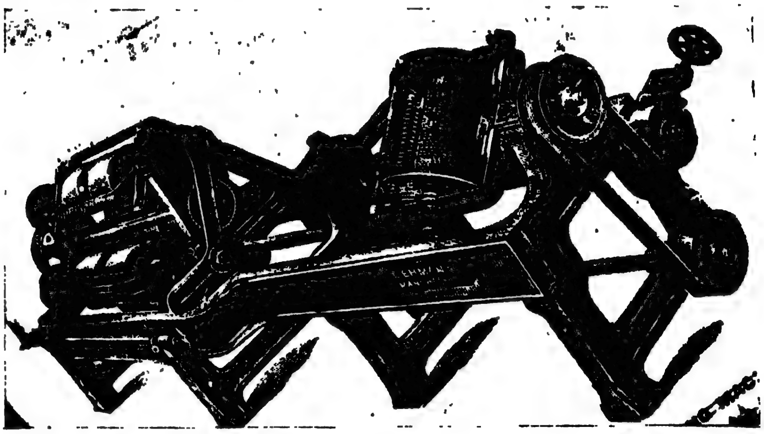

দড়ি প্রস্তুতের যন্ত্র

১টি ছোবড়া-পেষণ যন্ত্র	...	৯৭৫৲
৫টি তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্র (৫ × ১০৫০)	...	৫২৫০৲
১টি ঝাড়াই যন্ত্র	...	১১২৫৲
১টি গাঁইট বাঁধিবার যন্ত্র	...	২৯২৫৲
	একুন	১০,২৭৫৲

উক্ত সমস্ত যন্ত্রই হাতে চালান যায় এবং যাঁহারা প্রথম প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এইগুলি উপযোগী। অবশ্য যেখানে প্রত্যহ এক হাজার নারিকেল-খোলা যোগাড় না হইবে, সে স্থলে কল বসাইয়া সুবিধা নাই। নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও বাঙ্গালার উপকূলে অন্য ২।৪ স্থানে বড় রকমের ছোবড়ার কায চলিতে পারে। নারিকেল-ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কল ও এঞ্জিন

বসাইতে প্রায় লক্ষ টাকা পড়ে। সেরূপ বড় বড় কাযে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে শুদ্ধ তন্তু প্রস্তুতের কায করাই ভাল। এরূপ কাযে প্রাথমিক খরচ প্রায় ১২ সহস্র টাকার অধিক পড়া সম্ভব নহে। নির্ম্মাতা হিসাবে কলের মূল্যের অবশ্য কিছু তারতম্য আছে। কারখানা বাড়াইতে হইলে crusher, extractor প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইয়া বাষ্প অথবা তৈল এঞ্জিনের সাহায্যে কার্য্য করিতে পারা যায়।

শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি

ভারতে প্রতি বৎসর ৮।৯ লক্ষ টাকার ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দ্রব্য আমদানী হয়। কিন্তু উক্ত শ্রেণীর দ্রব্যের পরিমাণ অনেক অধিক। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ ছোবড়া, দড়ি-দড়া ও অপরাপর ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মূল্য ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। দাক্ষিণাত্যই ছোবড়া-শিল্পে অগ্রগণ্য। ভারতীয় ছোবড়া ও তজ্জাত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ কোচিন ও ক্যালিকট্ বন্দর হইতেই বিদেশে রপ্তানী হয়। তন্তু ও সূতা প্রস্তুত উভয় কার্য্যেই মালাবার উপকূলবাসিগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকরা সুনিপুণ। আলেপ্পি ও কোচিনে কুটীর-শিল্পরূপে অনেক গৃহস্থই তাঁতে মাদুর প্রভৃতি তৈয়ারী করে। মালাবারে ১০।১২ শ্রেণীর সূতা প্রস্তুত হয়; তাহার মধ্যে 'আলাপাত' নামক সূতার ন্যায় চমৎকার সূতা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিলাতী বাজারেও ইহার দর অন্য শ্রেণীর সূত্র অপেক্ষা অধিক। মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশে নারিকেল-বৃক্ষের স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য অধিক বলিয়াই এই সমুদয় স্থানে বহুকাল হইতে ছোবড়া-শিল্পের প্রচলন রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেল-ছোবড়াজাত দ্রব্য এতদ্দেশে একটি কারাশিল্পের (Prison industry) মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। আণ্ডামানদ্বীপে নারিকেলবৃক্ষের অভাব নাই এবং তদ্দেশে নির্ব্বাসিত অনেক ভারতবাসীই ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। দেশ-প্রত্যাগত এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে ছোবড়ার কারখানায় নিয়োগ করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। ভারতের বিশাল উপকূলভাগের অনেক স্থলেই নারিকেল-বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং কতিপয় স্থলে স্থানীয় অভাবমোচনের জন্য যে অল্পবিস্তর নারিকেলকাতা প্রস্তুত না হয়, তাহা নহে। কিন্তু এই সমস্ত কারবারের পরিসর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের অভাব থাকায় ছোবড়া-শিল্প আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অনেক পরিমাণ নারিকেল-খোলা কার্য্যে না লাগিয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিত ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের এই বিষয়ে মনোনিবেশ করার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

অসময়ে

যে দিন ডাকিনু তোমা'
আসিলে না বঁধু হে!
শুনিলে না মিনতি আমার,
সে দিন প্রভাত বেলা
অফুরন্ত মধু, হে!
না ধরে পরাণে সুধাভার।

সে দিন অরুণ-আলো
মোর আঁখি পরে, হে!
গিয়েছিল বুলায়ে মাধুরী,
সে দিন আমার কণ্ঠ
প্রভাতীর সুরে, হে!
উচ্ছ্বসিত, উঠেছিল পূরি।

আজি আসিয়াছ বঁধু
ম্লান-সন্ধ্যাবেলা, হে!
ফুটে উঠে বিদায়ের গান,
ফুরায়ে গিয়েছে মধু
ভেঙে গেছে মেলা, হে!
কণ্ঠ তার হারায়েছে তান।

এবে বিদায়ের রবি
পরায়েছে বঁধু হে!
বিদায়ের গৈরিক বসন,
নাহি হাসি, নাহি গান,
ফুরায়েছে মধু, হে!
এলে সখা! কি দিব এখন।

শ্রীবীরেশচন্দ্র মি॰

হামিদের হিম্মৎ

১

কলিকাতা সহরের উত্তরে গ্রে ষ্ট্রীট ও দক্ষিণে বিডন ষ্ট্রীটের মধ্যে যে বর্ত্মবহুল ঘন-জনাবাসপূর্ণ স্থানটি আছে, তাহার অনেকটা অংশ দর্জ্জিপাড়া নামে খ্যাত। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও ইংরাজী শিক্ষার সূতিকাগার কলিকাতায় সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কাটা কাপড়ের ব্যবহার অত্যন্ত অল্পই প্রচলিত ছিল। এত বড় সহরের ভিতর এই স্থানটিতেই সীবন-শিল্পপটু মুসলমানজাতীয় দর্জ্জিগণ একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পল্লীটিকে দর্জ্জিপাড়া নামে খ্যাত করার হেতু হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলেই তখন অনেক কীর্ত্তিমন্ত বড়লোকের বাস ছিল।

বলিয়াছি, সন ১২ শত সালের মধ্যভাগেও সাধারণ গৃহস্থ লোকের বাটীতে কাটা কাপড়, এমন কি, শীতকালে সাদাসিদে আঙ্‌রাখা পিরহানাদি ব্যবহারের প্রচলনও বড়ই অল্প ছিল। বড়লোকরা কিন্তু দরবারে দেওয়ালে, মহ্‌ফেলে মজলিসে, আদালতে, কাছারী, কুঠী প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যাইবার সময় পোষাক পরিধান করিতেন।

সমাজে রাজব্যবহারের অনুকরণ যেন প্রাকৃতিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যেমন বসনে ভাষণে, চলনে উপবেশনে, ভোজনে সাজনে ইংরাজী ধরণের অনুকরণ সকলে করিতেছে, তখন তেমনই মুসলমানী কায়দার অনুকরণ বড়লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বড়লোকদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল, তাহার কারণ, বাবুয়ানা সে কালে সস্তায় সম্পাদিত হইবার সুযোগ ছিল না। পরিচ্ছদ প্রস্তুতের উপকরণ—কিংখাপ্, মখমল, সাটিন, মলমল, তাঞ্জাব, জামদান্ প্রভৃতি বস্ত্র এবং সল্‌মা, চুম্‌কি প্রভৃতি জরীর সাজের বস্তুগত মূল্যও যেমন গৃহস্থজনের সঙ্গতির সাধ্যাতীত ছিল, সুনিপুণ চিত্রকুশল সীবন-কার্য্যের বানিও ধনিগণমাত্রেই দিতে সমর্থ হইতেন।

যোড়াসাঁকো পাথুরেঘাটার সিংহ, মল্লিক, ঠাকুর-গোষ্ঠী ও সান্ন্যালবাবুরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নিমতলা, তথা হাটখোলার দত্তবংশ, সিমলার ছাতুবাবু লাটুবাবু, কাশী ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বংশী মিত্র, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, নীলমণি মিত্র, বটতলা অঞ্চলের চন্দ্র মিত্র, মদন মিত্র, কালীশঙ্কর ঘোষ, বৃন্দাবন বসাক প্রভৃতি, শ'বাজারের রাজারা, চূড়ামণি দত্ত, গঙ্গানারায়ণ বসু, নস্করেরা, শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসু, তুলসীরাম ঘোষ, কাঁটাপুকুরের বোসেরা, বোস্‌পাড়ার কাশী বোস্, বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখুর্য্যে, ভগবতী গাঙ্গুলী, কুমারটুলীর অভয়চরণ মিত্র, বনমালী সরকার, ভৈরব মিত্র প্রভৃতির নাম অদ্যাপি পূজা-পার্ব্বণ কীর্ত্তিকলাপ ও ঐশ্বর্য্যের জাঁক-জমকের সহিত জড়িত।

ভোজনে-ও তাঁরা ব্রাহ্মণ পাচক-প্রস্তুত পোলাও, কালিয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা, শল্য-মাংস প্রভৃতি নবাব-নজর-গ্রাহ্য ভোজ্যবস্তু ব্যবহার করিতেন। ইংরাজ-রাজ্যে আমরা সুলভে চাঁদনীর হ্যাটকোট পরি, আশী টাকা ভরি আতরের পরিবর্ত্তে দেড় টাকা শিশির ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করি, পিরুর দোকানে বা প্যারাগন হোটেলে বসিয়া গোপনে মুরগীমাংস আহার করি; গোপনটা কতক রঙ্গমঞ্চের স্বগতের ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত।

ঐ দর্জ্জিপাড়া পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীগণ পাশাপাশি বাটীতে প্রতিবেশীর আত্মীয়ভাব রক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেন, এবং এখনও অনেকে করিতেছেন। প্রথমে দর্জ্জি উপনিবেশ হইলে-ও অনেক পদস্থ মুসলমান-ও ক্রমে আসিয়া ঐ পল্লীতে বাস করেন এবং দর্জ্জিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত ভদ্রাসনের অধিকারী হইয়া বসেন। এখনও রাস্তা, গলির নামগুলি সেই পরস্পরের প্রতিবেশিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে; যথা—দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট;

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, জয়মিত্রের গলি, ইমামবক্স থানাদারের লেন, গুলু ওস্তাগরের লেন, লাল ওস্তাগরের লেন; তারক চ্যাটার্জ্জির লেন, জরিফ লেন।

তখন কোক্ কয়লার নাম-ও কেহ শোনে নাই, ইন্ধনের জন্ম সুঁদরী কাষ্ঠের চেলাই ব্যবহার হইত। আমাদের বাটীর পার্শ্বেই একটি খালি জমীর উপর একখানি খোলার ঘরে সোনাউল্লার চেলাকাষ্ঠের দোকান। অনেক কালের দোকান; আমরা যখন সোনাউল্লাকে দেখিয়াছি, তখন তা'র বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে; বেলেঘাটার নৌকা হইতে গুঁড়ি সুঁদরী কাঠ আনাইয়া তাহার দোকানের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ জমীতে উড়ে কাঠুরে দ্বারা তাহা চেলা করাইয়া লইয়া খুচরা বিক্রয় করিত।

জমীর সম্মুখের ভাগে কাঠ চেলা হইত, তাহার পশ্চাতে একটি কূয়ার ধারে একটি বকফুলের গাছ, কূয়ার উত্তর ধারে একখানি খোলার ঘর, সেখানি সদানন্দ সার্ব্বভৌমের টোল।

সোনাউল্লা বৃদ্ধ হইলেও তখন-ও বসিয়া একখানি ক্ষুদ্র কুঠার দিয়া সরু চেলা প্রস্তুত করিত এবং তাহার ত্রিশ বত্রিশ বছরের ছেলে বছরদ্দি দোকানদারী করিত।

বছরদ্দির ছেলে হামিদের তখন বয়স বছর নয় হবে। হামিদ শিশুকাল থেকেই আমাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এসে খেলা করতো। আমাদের বাড়ীর তার খেলুনী দু' একটি ছেলে ইস্কুলে যেতে আরম্ভ কর্লে দেখে সোনাউল্লা আমার পিতামহকে এসে ব'ল্লে, "কি হুকুম করেন কর্ত্তা, হামিদটারে-ও ইক্‌স্কুলে দিয়ে দিই, যা হোক্ ক'রে আল্লা দু' পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন, তিন পুরুষ ধ'রে আর কাঠ চেলা করাই কেনে?"

দাদা বল্লেন, "ভাল-ই ত, তা দাও না, একটু সভ্য-ভব্য হোক্।"

সোনাউল্লা ব'ল্লে, "তবে গরীবের একটা আর্জ্জি আছে কর্ত্তা, ইক্‌স্কুলের মেইনেটা যা হোক্ ক'রে দিয়ে দেব, কিন্তু জুদো ম্যাষ্টের-পণ্ডিত রেখে ঘরে পড়া করাতে পারবো না। বছরদ্দির ছাবাল্‌টাকে কালুবাবু ভুলুবাবুর সাথেই আপনকার এহানে ব'সে পণ্ডিতের কাছে ক্যাতাব মথন করাতে এজ্ঞে দেবেন।"

দাদা বল্লেন, "এর আবার কি, ও ত ওদের সঙ্গে খেলে-ধোলে, তা' পড়লেই বা।"

একে পাশাপাশি বাস, তাতে বল্‌তে গেলে হামিদ দিন-রাত্তিরই ছেলেদের সঙ্গে বসা, দাঁড়া, খেলা করে, সুতরাং বাড়ীর মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে তার ছোঁয়া-ন্যাপাটা বড় আর বেশী গ্রাহ্য করতেন না। বিশেষতঃ তাঁরা দেখতেন যে, প্রায় প্রত্যহ সকাল-বিকেল পাড়ার নাজিরদের বাড়ীর ছোট মিঞা মোক্তার শোভান্ সাহেব, দারোগাদের জামাই দেদার বক্স প্রভৃতি মুসলমান ভদ্রলোকগণ বাইরের মহলে কেউ বা কর্ত্তার কাছে, কেউ বা বাবুদের বৈঠকখানায় ব'সে আপন আপন ফুর্সিতে তামাক খেতেন ও গল্পসল্প করতেন।

বাঙ্গালা পড়তে পড়তে হামিদেরও মন ক্রমে এম্‌নি বদ্‌লে গেল যে, সে এক দিন লুকিয়ে আমার ভাইপো লালুকে বল্লে, "কি ভাই, তোরা আমায় হামিদ হামিদ করিস্, আমার ভাল লাগে না, তোদের মত আমার একটা বাঙ্গালা নাম ক'রে দে।"

লালুর ভেতরে বোধ হয় একটু কবিত্ব-শক্তি লুকোনো ছিল, সে চট্‌পট্ ব'লে ফেল্লে যে, "আজ থেকে তুই হেম হয়ে গেলি—যা।"

লালু যেই হামিদকে হেম ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্লে, ভুলু, কালু, পুঁটি, নিমি, এমন কি, কাকীমা পিসীমা সবাই তাকে হেম ব'লে ডাক্‌তে সুরু কর্লে। ইস্কুলের লিষ্টিতে তার হামিদ নাম থাক্‌লেও বেঞ্চির ফিস্‌ফিসে ও খেলার উঠোনে সে হেম বই আর কিছু নয়।

প্রকৃতিগত মেধাশক্তি, বাঙ্গালী ভদ্রলোক হইবার বিপুল বাসনার চালনায় হামিদকে শিক্ষালাভে এত সযত্ন করিল যে, অতি শীঘ্রই সে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বালক বলিয়া খ্যাত হইল। বিদ্যালয়ের পরিণাম-পরীক্ষায় সে প্রথম হইয়া একখানি সুবর্ণ-পদক পাইল এবং মাইনর একজামিনে স্কলারশিপ পাইয়া হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

২

চার বৎসর চ'লে গেল, হামিদ হিন্দু স্কুল থেকে ফাষ্ট ডিভিসানে এন্‌ট্রান্স পাশ ক'রে একটি স্কলারশিপ পেলে। স্নেহের ন্যায্য গর্ব্বে আহ্লাদে গদগদ হয়ে সোনাউল্লা, ল্যাড়্‌কা বছরদ্দি ও পোতা হামিদকে সঙ্গে ক'রে এসে

দাদামশায়কে সেলাম ক'রে বল্লে—"কর্ত্তা বাবু, আপনাগোর হামচন্দর ত আল্লার মর্জ্জিতে আর ঐ কদনের দওয়ায় ভালয় ভালয় পাশটা মেরে দিয়েছে আর জলপানিও ট্যাকা পনেরো না কি জানি কি পাবে, এখন আমায় কি এজ্ঞে করেন ?" ছোট কাকা বল্লেন, "লালুও ত স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজে যাচ্ছে, হেমাকেও ওর সঙ্গে সেইখানে ভর্ত্তি ক'রে দাও।" সোনাউল্লা বল্লে, "আমি-ও তাই বলি ছোট বাবু যে, এক সাথে ক-এ আঁকড়ি—খিও থেকে স্বরু করেছিস্, খালিজি-ই যাওয়া করিস্ আর গলিজি-ই যাওয়া করিস্, বাবুদের বাড়ীর ছাবালরা যেথ্যাকে যাবেক, তুই-ও সাথে সাথে যাবি ; তা কি বল্বো কর্ত্তা বাবু, ওকে যাস্তি কসুর-ও দিতে পারি নি, ইনজিরি এলেমের গর্ম্মিও বটেক্ আর হিন্দি ইক্সুলের বড়মানুষির বাড়ীর ছাবালদের সাথে মেলা-মেশার দরুণ হামদে'র ম্যাজাজটা ওঁনার নানার কাঠ চেলা করা কুড়ুলটা ছেড়িয়ে উঠে পড়েছে ;—বল্ না রে হাম্, কর্ত্তা বাবুর গোড়ের কাছে যা না, সে রাজার ছাবাল্ তোরে কি বল্ছে বল্।"

হামিদ। রাজা না, রায় বাহাদুর।

সোনা। আমার অত বড় বড় কথা কি আসে রে বাপজান্, না হয় রায় বেয়াদপ-ই হ'লো ;—কি বল্ছে বল্।

হামিদ। আজ্ঞে, রায় কুমার ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—

ছোট কাকা। রায় কুমার ?

হামিদ। রায় বাহাদুর গৌরসুন্দর বাবুর পৌত্র ব'লে উনি রায় কুমার লেখেন।

সোনা। তা কুমোরদের রায় বাবু বলেছেন, তাঁর সাথে হামিদকে সেই পিসিধনকে কালেজ না কি, সেইখানেই ভর্ত্তি হ'তে।

হামিদ। প্রেসিডেন্সি কলেজ—সেখানে পড়াটা বেশী respectable।

সোনা। ঐ এক বুলি পেয়েছে, রেস-ফেস আস্তাবল। আমার ঐ বস্তীর বিচে ত্রিশ সনের খাপ্‌রেলের ঘর, আজ ও বলে কি না রেস-ফেস আস্তাবল নয়।

ছোট কাকা বল্লেন, "তাই দাও গে, স্কলারশিপ ত পাবে, মাইনেটা আর ঘর থেকে লাগবে না।" বাপ ব্যাটায় সেলাম ঠুকিয়া বিদায় হইল, হেম বলিল, "আমি বাড়ীর ভিতর হইতে কাকীমা জ্যাঠাইমাদের প্রণাম ক'রে যাচ্ছি।"

৩

মাণিক বোসের ঘাটের সাম্নে যখন গৌর পালের চুটকির দোকান ছিল, সে অনেক দিনের কথা, এখনকার লোক তা জানে না, যারা জান্‌তো, তারা ভুলে গেছে ; ২৫।২৬ বছর ধ'রে গৌরসুন্দর বাবুকে ও অঞ্চলে এক জন বড় মহাজন বলেই জেনে আসছে। মস্ত কারবার, তার ওপর দশ পনেরো লাখ টাকা হ্যাণ্ডনোটে ও বন্ধকি কারবারে হামেসা খাটে। আকৃতি, প্রকৃতি, ভুষিমালের ধুলো, বিষয়বুদ্ধি-চিন্তা-জনিত হাস্যের অভাবযুক্ত কঠোর মুখে কোথাও কোন সৌন্দর্য্য না থাকায়, "সুন্দর"টা এঁরা নিজেদের নামের সঙ্গেই যোগ ক'রে দিয়েছেন। গৌরসুন্দর তস্য পুত্র নরহরিসুন্দর, তস্য পুত্র ব্রজসুন্দর। গৌরসুন্দর পরম বৈষ্ণব, ধর্ম্মকর্ম্মে অতিশয় নিষ্ঠা ; ব্রাহ্মণকে কপালে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করেন ; কিন্তু বৈষ্ণব বাবাজী দেখিলেই পদধূলি লইয়া বুকে, মুখে ও মাথায় দেন ; বৈষয়িক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে মিথ্যা কথা কন না ; বারো হাজার টাকা ধার দিয়া ১৪৩১৩॥/১০ সুদে শেষ কিস্তি জমা লইবার সময় কাকুতি-মিনতি করিলেও ঐ ॥/১০ বাদ দেন না বটে, তথাপি দান আছে, ভিখারী আসিয়া হাত পাতিলে গদি হইতে প্রতি জনকে এক কড়া করিয়া দিবার হুকুম আছে। আজ বছর পাঁচেক পূর্ব্বে ব্রজসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি একটু ঘটা করিয়া খরচপত্র করেন ও সেই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেশে একটি থিয়েটারের দল লইয়া গিয়া আপন ধনৈশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য সদর হইতে কালেক্টার সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও দিশি হাকিমদেরও নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে অভ্যর্থনা করেন। সাহেবরা শ্যাম্পেন, স্যাণ্ডউইচ আদি ভোজনান্তে বৈষ্ণবভবন পবিত্র করিয়া পুলকিতচিত্তে সপুত্র গৌরসুন্দর বাবুর সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করেন ও এমন কি, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী সয়ারাম শা মহাশয়ের পিঠ চাপড়াইয়া তাঁহাকে Ha'd'd' Hippopotamus বলিয়া আপ্যায়িত করেন। অই সেক্‌হ্যাণ্ড-ই গৌরসুন্দর বাবুর কাল হইল। এখন থাকে থাকে শ্বেত করপদ্মের স্পর্শলাভ-পিপাসায় তাঁর কালো-কোলো কড়া-পড়া ডান হাতখানি মাঝে মাঝে চুলকাইয়া উঠে

এবং দেশে গেলেই সদরের সাহেবদের সেলাম করিতে না যাইয়া পারেন না আর সেই অবধি দেশে কিছু ঘন ঘন যাইতে আরম্ভ করেন।

যে গৌরসুন্দর কলিকাতা সহরে থাকিয়াও সন্ধ্যাকালে গঙ্গা দর্শনে যাওয়া ছাড়া আর কোন সময়ই প্রমাণ দশ হাত থান-ধুতি ব্যবহার করিতেন না, নরহরি গদি-বাড়ীতেও নয় হাত কাপড় পরিয়া থাকিত বলিয়া কত ভর্ৎসনা করিতেন এবং ব্রজসুন্দর লাট্টু মার্কা কোরা কাপড় পরিতে চাহিত না বলিয়া কত বিরক্ত হইতেন, সেই গৌরসুন্দরকে ডাক্তার সাহেবের চাপরাশীর পরামর্শে সাহেবদের সেলাম দিতে যাইবার পূর্ব্বে এক সুট কালো বনাতের প্যাণ্টুলেন, চাপকান, চোগা প্রস্তুত করাইতে হয় ও মাথায় পরিবার জন্য একটা গঙ্গাজলী শাল-মোড়া আমামাও ফরমাস দিয়া বাঁধাইয়া লইতে হয়। কিন্তু গৌরসুন্দর বাবুর একটা সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; পুত্র এবং পৌত্র বারবার জিদ্ করিয়াও কর্ত্তাকে ফটোগ্রাফ তোলাইতে রাজী করাইতে পারে নাই; এ অসম্মতির কারণ যে গৌরসুন্দরের নিজের চেহারার প্রতি অবিশ্বাস, তা ঠিক বলা যায় না; তাঁহার মনে মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ফটোগ্রাফ তোলাইলে বা লাইফ ইনসিওর করিলে তিনি ছয় মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবেন। কিন্তু সিংহি বাবুদের বন্ধকি জমিদারী সালুই পরগণাখানি ফোরক্লোজ করিয়া লইবার পূর্ব্বে এবং ব্রজসুন্দরের বিবাহ দিয়া তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে কমিশনার সাহেবের পায়ের ধুলা বাড়ীতে পড়িতে না দেখিয়া তিনি কখন-ই ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাহেবসম্ভাষণ সূত্রে কাটা কাপড় প্রস্তুত ও ফলফুলের ডালিতেই যে গৌরসুন্দরের বাজেখরচের অবসান হ'ল, এমন নয়; যেমন খোস্ গল্পের ছলেও উকীলবাড়ীতে হামাসা যাওয়া আসা কর্‌লেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটা কিছু মোকর্দ্দমা বাধাইবার লালসা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে; যেমন ঠাকুরবাড়ীতে গেলেও কিছু না কিছু প্রণামী না দিয়ে থাকা যায় না; তেম্‌নি সরকারী সাহেবদের কাছে হামাসা গেলেই সৎকর্ম্মের পর সৎকর্ম্ম করিবার দারুণ পিপাসা প্রাণে জাগিয়া উঠে। এ সৎকর্ম্ম অর্থে পিতামাতার শ্রাদ্ধও নয়, অতিথিশালা পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদিও নয়, বিধবা মাসীকে মাসিক তিন টাকা হবিষ্যি খরচ দেওয়াও নয় আর পিতৃহীন নাবালক ভাইপো ভাগ্নেকে বাড়ীতে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করাও নয়; পৌরোহিত্য দৌরাত্ম্যের সমর্থন বা আলস্যের প্রশ্রয়দান সভ্যতা অনুমোদিত সৎকর্ম্ম নয়।

বৈশ্যরাজ্যে বাণিজ্যে বিপুল বিস্তারের সাহায্য করাই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ধার্য্য। একটি পুষ্করিণী কাটাইতে হইলে বড় জোর পঁচিশখানা বিলাতী কোদাল কিনিতে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র খরচ হইতে পারে; কিন্তু একটি টিউব ওয়েল বসাইতে অন্ততঃ প্রথমে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ এবং বছর তিনেক বাদে তাহার কল বিগড়াইয়া যাইলে ম্যাকৃলকে এখন আর চলে না—হাজার তের টাকা দিয়ে একটা ল্যাকারষ্টির্ণ আনালে নিদেন ৭।৮ বৎসর নিশ্চিন্ত;—তার পর ক্রমশঃ। এক বছরের ভিতরেই গৌরসুন্দর সদরে চারটে আর নিজ গ্রামে ১টা টিউব ওয়েল বসাইয়া দিলেন।

এক দিন ডাক্তার সাহেব সাতিশয় বিমর্ষভাবে গৌরসুন্দর বাবুকে বলিলেন,—"রায় বাহাদুর Ah ! excuse me—বাবু"— ; গৌরসুন্দর চমকিয়া উঠিলেন, কেবল যে ভাবিলেন, ডাক্তার সাহেব আমাকে রায়-বাহাদুর বলিয়া ফেলিলেন কেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিবার জন্য তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করিলেন। উত্তরে ডাক্তার বলিলেন—"ও একটা—কালেক্টার সাহেবের—যাক্, পরে বল্‌ব। এখন বড় দুঃখের বিষয়, মিস্ জেফারসান এখান হ'তে চ'লে যাচ্ছেন।"

গৌর। মেম্ ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তের শ' টাকা মাসে ওঁর মর্য্যাদা রক্ষা হয় না! বিলাতে গেলে ওঁর কত আয় বেশী হ'তে পারে; সেখানে চাঁদি না, চাঁদি না, খালি সোনার সবারেন্।

গৌর। মিসেস্ চাটুয্যেকে ত সবাই ভাল ডাক্তার বলে, শুনি তিনিই ত সব কাযকর্ম্ম দেখেন। ওঃ বাবু—Supervision ? Supervision—পরিদর্শন European supervision না থাকলে নেটিভ—ইণ্ডিয়ানরা কি কোন কায কর্‌তে পারে—তা বটে—তা বটে—

ডাক্তার। মিসেস জেফারসানের জন্য ভাবনা কচ্ছি না, বিলাত গেলে উনি তের শ' টাকা নয়, তের শ' পাউণ্ড

মাসে রোজগার কর্ত্তে পারবেন; আমার ভাবনা এ দেশের নারীজাতির জন্য। একে চার দেওয়ালের মধ্যে কয়েদী. তার উপর কোন এক্সারসাইজ নাই, পায়ে জুতা পর্য্যন্ত পরতে পায় না; তার ওপর যখন স্ত্রী ব্যাধি হবে, যখন সন্তান—আঃ, কেবল এ দেশের নারীজাতির মঙ্গলের জন্য উনি হোমের সকল সুখ সকল স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ ক'রে এই সর্প ব্যাঘ্র জঙ্গল ম্যালেরিয়া উত্তাপের দেশে এসেছিলেন।

গৌর। তা—তা উনি কি হ'লে থাকতে পারেন?

ডাক্তার। কম্‌সে কম্ another সাত শত টাকা ওঁকে অধিক দিতে হবে। মুদীখালীর চৌধুরী বাবুরা দু' লাখ টাকা জমা দিতে স্বীকার আছেন, তাহার সুদ—

গৌর। ভাববার কথা হুজুর—ভাববার কথা। একবার নরহরির সঙ্গে পরামর্শটা ক'রে—

ডাক্তার। তোমাকে বাবু আমি বড় ভাল বলি, সেই জন্য কথাটা—সা বাবুদের মুকুণ্ড আসছিল –

গৌর। এক সপ্তাহ পরে হুজুরের সঙ্গে এসে দেখা করবো; এই কটা দিন মেম সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

ডাক্তার। ভয় নাই, ভয় নাই! নরহরি বাবু সব বুঝবে।

ডাক্তার সাহেব গৌরসুন্দরের সঙ্গে ফটক অবধি এসে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিলেন, আজ তিনবার সেকহ্যাণ্ড—প্রথম ঘরের ভিতর, দ্বিতীয় বারান্দায়, তৃতীয় এক পা পথে, এক পা রথে গাড়ীর কাছে। সপ্তাহ পরে গৌরসুন্দর ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন, সে দিন হঠাৎ কালেক্টার সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন; একটামাত্র দুঃখের কথা, দুটি শ্বেতমুখের হৃষ্ট হাসি ও একখানি কৃষ্ণ মুখের কষ্ট হাসির ফটোগ্রাফ তুলিয়া কেহ লয় নাই; তবে তৎপরবর্ত্তী রাজজন্মতিথির দিনে উপাধিতালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর বৈকাল হইতে মাণিক বোসের ঘাটে রায়-বাহাদুরের গদির বারান্দায় যে নহবৎ বাজতে আরম্ভ হয়, রাত দুপুর পর্য্যন্ত তার বেহাগের সুর ঘুস্‌ড়ির কলের কুলীরা পর্য্যন্ত শুনতে পেয়েছিল।

নরহরিসুন্দর যখন আহিরীটোলা বাঙ্গালা স্কুলে পড়েন, তখন তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; সেই অবধি নিজেদের পাল পদবী ও ইতিহাস-বর্ণিত পাল-বংশের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা বরাবরই মনে মনে ভাবতেন; বাবার রায় বাহাদুর হবার পরই তিনি যে কেবল পরিষ্কার মুখে লোককে বলতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁরা সেই প্রাচীন পালবংশেরই একটা বর্ত্তমান শাখা, তা' নয়, বাড়ীর প্রাইভেট টিউটার একটি ছোকরাকে দিয়ে "পাল-বংশের হালখাতা" নামক একখানি পুস্তিকাও প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং টিউটারটিকে পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে নগদ ছয় টাকা খরচ করিয়া একখানি রজত-পদক প্রদান করিলেন।

আর দু একটা পুল, সারকুটহাউস কি স্যানাটোরিয়ম নির্ম্মাণে চাঁদা দিলেই ব্রজসুন্দরের রাজপৌত্র হবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু রাজপুত্রই হোন অথবা বক্ষে যজ্ঞসূত্রই ধারণ করুন, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গোত্র-ভুক্ত না হ'লে টি-পার্টিতেও আসন পাবার অধিকার লাভ হয় না; সুতরাং রায়কুমার নিজে প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হবার সময় হামিদকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিলেন।

কাঞ্চন-কৌলীন্যের লীলাভূমি প্রেসিডেন্সী কলেজে সকল সময় মাত্র মোটা মাইনে দাখিল করলেই সীট পাওয়ার সুবিধা হয় না; সময়ে সময়ে প্রবেশার্থী ছাত্রকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেসিডেন্সীতে পড়িবার তাহার অধিকার কি, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ক'জন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সীতে পড়েছেন বা কে কত সরকারী চাকরী বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন এবং বংশের মর্য্যাদা কেমন উচ্চ ও কত পুরাতন। রায় বাহাদুরদের গদি-ঘরে ও দেশের বৈঠকখানায় ইদানীং বংশ-চর্চ্চাটা ভাল রকমই হয়; সুতরাং তিনি তাঁহার দোস্ত হামিদেরও একটা বংশ-বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী হইলেন। হামিদ যে চেলা-কাঠ-বেচা সোনাউল্লোর নাতি, এ কথা অবশ্য সে স্কুলে কখন-ও খুলে বলে নাই; তার গ্র্যাণ্ড ফাদারের একটা বড় টিম্বার ইয়ার্ড আছে, এইটিই সে প্রকাশ করিত। নিরামিষ-ভোজী গোঁড়া বৈষ্ণব গৌরসুন্দরের পৌত্র যে দিন প্রথম হামিদের বস্তীর ভিতরের খোলার বাড়ীতে লুকিয়ে গৃহস্থ-বাড়ীর রান্না ফাউল-কারি খেতে আসেন, সে দিন হামিদ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দেশের জমি-জারাৎ, বাড়ী, ইমারত সব বরবাদ যাবে, কেউ আর সেখানে যেতে চাইবে

না, এই আশঙ্কায় তার নানা কোনমতেই কল্‌কেতায় কোঠা বানাতে রাজী হন না।

ব্রজসুন্দর চৈতন্ত লাইব্রেরীতে ঢুকে অনেক বই ঘেঁটে ঘেঁটে আর গালিফ মিঞার পোতা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এক জন ড্রাফটসম্যান মৌলানাজাদা মামুদ ফকিরুদ্দীন সাহেবের সাহায্যে হামিদের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করলেন, তা' কতকটা এইরূপ :—বহু পূর্ব্বে হামিদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল খাস খোরাসানে; লড়াই ফতে কর্‌তে কর্‌তে তাঁহাদের আদিপুরুষ মহম্মদ বেন আবদাল্লা বেন আবদুল মুতালিব পাশা বাহাদুর ইরাণে এসে বাস করেন; সেখান থেকে বংশের এক শাখা আফগানিস্তান দখল ক'রে আমিরী করেন, পরে যখন বাবর বাদশা কাবুলে যান, তখন হামিদের অষ্টতম ঊর্দ্ধপুরুষ মালিকে উলুমুলুক ফতেজান ডার্ডেনেলিস্ খাঁ বাহাদুরকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে আনেন এবং তাঁর বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নিজের এক জন সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। ডার্ডেনেলিস্ খাঁ রাজা আদিশূরের শ্বশুর নবীন নিয়োগী মহাশয়কে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে যশোহর বিভাগ জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে সুঁদরিগাছ রোপণ করিয়ে দেন, ডার্ডেনেলিস্-বিজিত সেই সহরের নাম এখন হয়েছে সুন্দরবন। পূর্ব্বগৌরব স্মরণ ক'রে এখন সাধারণের কাছে এঁরা সামান্য জমীদার ব'লে পরিচয় দেন না, অতি সামান্ত সংক্ষিপ্ত নামেই সতত সন্তুষ্ট, যথা—পিতামহ পিতামহ হাজী মামুদ সোণোয়ার উদ্দীন আলিউল্লা খাঁ; পিতা—পিতা মৌলভী গাজি কুদরৎ বসহর্‌উদ্দিন খাঁ সাহেব; পুত্র—পুত্র মিষ্টার নবাবজান্, মামুদ হামিদ সা।

এই পরিচয়েই হামিদ প্রেসিডেন্সীতে কলেজ লাইফে প্রবেশ করিল; কিন্তু হেম নামের মায়া সে এখনও কাটাতে পারে নাই। এখনও আমাদের বাড়ীতে সেই আসা যাওয়া, এখনও আমাদের ছেলেদের সঙ্গে আগেকার মতই বাড়ীর ভিতর গিয়ে সন্দেশ, আম, নাড়ু প্রভৃতি চেয়ে খাওয়া, সে এখনও আমাদের সেই হেম, সেই বাঙলা ধুতি, জামা, চাদর—লম্বা শির।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পল্লী-জননী

সৌধ-কিরীট না আছে তাঁহার
না আছে সোনার দেহ,
তরুবর—শির মুকুট তাঁহার
শ্যামলবরণা সেহ!
অঞ্চল তাঁর ভরিয়া ধান্তে—
তটিনী বহিয়া যায়,
আয়ুবলপ্রদ স্বাদু নীরে যার
তৃষিত পরাণ পায়!
চরণ পরশে বিপুল হরষ সেবায় শান্তি পাই,
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

বসন্তে সেথা আকুল পরাণ
চূত-মুকুলের গন্ধে,
অশোক মুঞ্জরে বকুল ঝরে গো,
কোকিল কুহরে ছন্দে;
নিদাঘে তাঁহারে সাজায় চম্পক
স্বর্ণ-আভরণ দিয়া,
তড়াগের তীরে দাঁড়ায়ে হিজল
শতেক মালিকা নিয়া!
বর্ষায় শোভে কুমুদ-কহ্লার
মাঠে ঘাটে ভরা জল,
উৎসব-কল-মুখর শরতে
হাসে চাঁদ নিরমল!
অন্নপূর্ণারূপিণী তাঁহারে হেমন্তে হেরিতে পাই,
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

নারিকেল তাল নীপ বেলে ঘেরা
পর্ণকুটীর-মাঝে
কর্ম্ম-নিরতা সাধ্বী বধূর
কাঁকণ দু'খানি বাজে!
বিপদে সম্পদে বামা ঠাকুরাণী
হলধর দাদা আর
দাড়ায়ে দুয়ারে ক্ষুধা নিদ্রা নাই,
করুণার অবতার!
কোথা আছে আর সহরালি চাচা গোয়ালা কবুত ভাই?
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

সকাল সন্ধ্যায় প্রতি গৃহে তথা
ঘণ্টা-কাঁসর বাজে,
আঙ্গিনার কোণে তুলসী-তলায়
ক্ষীণ দীপটি রাজে!
অতিথির সেবা হরি-কীর্ত্তন
নিত্য ভিক্ষা দান,
পুকুর-প্রতিষ্ঠা পাঠকের কথা
বাউল-প্রসাদী গান!
বার মাসে হেন তের পার্ব্বণ আর কোথা গেলে পাই?
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

বৌদ্ধযুগে সমাজচিত্রের একাংশ *

এই প্রবন্ধের উপাদান বিমানবত্থুঅর্থকথা নামক পালিগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম যুগের বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইবার পরবর্ত্তী কালে এই ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়। পেতবত্থু (প্রেতবস্তু), অপদান (অবদান), জাতক প্রভৃতি গল্পের যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ইহাও সেই শ্রেণীভুক্ত। মাঝে মাঝে এই গ্রন্থে যে চিত্র ধরা পড়িয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

উৎসব

প্রাচীন ভারতে আনন্দের উৎস প্রতিনিয়ত ক্ষরিত হইয়া জীবনপ্রবাহকে কিরূপ সরস ও গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নিদর্শন বহুলভাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। উপরি-উক্ত পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই—"এক দিন রাজগৃহে সকলে ঘোষণা করিল—আজ হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত নক্ষত্র-ক্রীড়া হইবে (নকখত্তং কীলিতব্বং)। নাগরিকগণ রাজবীথিসমূহ সম্মার্জ্জিত করিয়া, তাহার উপর বালুকা বিকিরণ করিয়া দিল এবং পঞ্চবিধ লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিল। প্রতি গৃহদ্বারে পূর্ণঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল। নানাবর্ণের ধ্বজ-পতাকা পত-পত শব্দে বায়ুতে হিল্লোলিত হইতে থাকিল। নিজ নিজ বিত্তানুযায়ী সকলেই সেই দিন উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষা আভরণে সজ্জিত হইল। এইরূপে অলঙ্কৃত হইয়া রাজগৃহ দিব্য (স্বর্গ) নগরের শোভা ধারণ করিল। (প্রাক্তন সুকৃতির ফলে) রাজা বিম্বিসার প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া—রাজশ্রীমণ্ডিত হইয়া, রাজসম্পদের জ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া, বহু অনুচরজনগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া—নগর প্রদক্ষিণ করিলেন।"

নক্ষত্র দেখিয়া শুভমুহূর্ত্তে উৎসবের আরম্ভ হইত। প্রথমতঃ প্রতি মাসের প্রারম্ভে মাসিক উৎসব হইত—পরে যে কোনও উৎসবকেই নক্ষত্র বলা হইত। জাতকগ্রন্থে ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে। নক্ষত্র বিচার করিয়া শুভক্ষণে উৎসব স্থিরীকৃত হইত বলিয়া উৎসবের অপর নাম ক্ষণ, পালিভাষায় ছণ, যথা—"অথ একদিবসং নগরে ছণং সজ্জয়িংসু; মহন্তং ছণং ঘোষয়িংসু।" সুরাপানই প্রধান ব্যাপার যে উৎসবে হইত—তাহার আবার নাম ছিল সুরাছণো। স্ত্রী-পুরুষ অবাধে কয়েকদিন ধরিয়া বারুণী-দেবীর উপাসনায় প্রায় লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়িত (সামি, পুব্বে ইমস্মিং কালে সুরাছণো নাম হোতি; কুম্ভজাতকে—সাবত্থিয়ং কির সুরাছণে ঘুট্ঠে তা পঞ্চসতা ইত্থিয়ো সামিকানং ছণকীলাবসানে তিক্খসুরং পটিয়াদেত্বা "ছণং কীলিস্সামা" তি সব্বাপি ইত্যাদি)।

রাজা সেই উৎসবে নগর প্রদক্ষিণ করিতেন, ইহার উল্লেখ জাতকেও আছে। (সুসীম জাতক—একদিবসং নগরং সজ্জাপেত্বা সক্কো দেবরাজা বিয়...মত্তবরবারণস্স খন্ধে নিসীদিত্বা নগরপদক্খিণং অকাসি)।

বাতমিগ জাতকে দেখি যে, রাজগৃহে উৎসব ঘোষিত হইলে পুত্রের অনুপস্থিতিতে মাতাপিতার মনে সুখ নাই—উৎসবসময়ে তাহাদের পুত্র যে অলঙ্কার পরিয়া উৎসব দেখিতে যাইত আজ তাহা রৌপ্য-পেটিকায় বদ্ধ। তাহা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

কখনও বা দেখি যে, এমন উৎসবেও শ্রমিকদিগের ভিতরে কেহ কেহ উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেছে না।—আমরা পাঠ করি যে, "এক দিন রাজগৃহে ঘোষিত হইল যে, সাত দিবস ধরিয়া উৎসব চলিবে। এক শ্রেষ্ঠী তাঁহার মজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ত্বং কিং নকখত্তং কীলিস্সসি উদাহু ভতিং করিস্সসি (তুমি কি নক্ষত্র-ক্রীড়া করিবে না খাটিবে?) ভৃত্য উত্তর দিল—'প্রভু, নক্ষত্র ধনবানের জন্য; আমার গৃহে কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই—যবাগূ-তণ্ডুলের কণামাত্র নাই। নক্ষত্রের সহিত আর আমার সম্পর্ক কি'?"—কিন্তু জাতকে অন্য রকম চিত্রও দেখিতে পাই। উৎসব উপভোগ করিবার আবার "মেজাজ" থাকা চাই। গঙ্গমাল জাতকে দেখি যে, এক জন দরিদ্র শ্রমিক জল উঠাইয়া (উদকভতিং কত্বা) একটা অর্দ্ধমুদ্রা (অড্ঢমাসকং) পাইয়াছিল। উৎসবের

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত।

দিনে এক জন দুর্দ্দশাপন্না স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হইল - তাহারও মূলধন অর্দ্ধমাসক। তৎপরে দুই জন তাহাদের এই মহামূল্য মূলধন একত্র করিয়া উৎসব পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার নিমিত্ত মালা, গন্ধ, তীক্ষ্ণ সুরা প্রভৃতি সরঞ্জাম কিনিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। দেখা গেল যে, ভোগ শুধু ধন থাকিলেই হয় না, মনও চাই।

উৎসবে মালা, গন্ধ, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার, প্রেম আলাপন প্রভৃতির ছড়াছড়ি ছিল য়ুরোপীয় Carnivalএর কথা মনে পড়ে। ইহাতে কোথাও দেখি, ঐন্দ্রজালিক মায়া রচনা করিতেছে, বাজীকর বাজী দেখাইতেছে, নট নৃত্য করিতেছে, কুশীলব অভিনয় করিতেছে, বীণাবাদক বীণাবাদন করিতেছে, শঙ্খধ্মামক শঙ্খনিনাদ করিতেছে, ভেরীবাদক ভেরী বাজাইতেছে, অহিতুণ্ডক সাপ খেলাইতেছে। সকলেই নিজ নিজ শিল্পপ্রদর্শন করিয়া উৎসবকে সার্থক করিত। জাতকে পাঠ করি—পটল নামক নট ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বারাণসী গমন করিয়া নাচিয়া গাহিয়া (নচ্চিত্বা, গায়িত্বা) ধনলাভ করিয়া উৎসবান্তে সুরাভক্ত গ্রহণ করিল। এতৎসম্পর্কে ভেরীবাদক, শঙ্খধমন ও অহিগুণ্ডিক জাতক দ্রষ্টব্য।—জৈনগ্রন্থ 'কল্পসূত্রে'ও এই উৎসবের চাঞ্চল্য দেখিতে পাই। সকল কথা বলা চলে না - দুই একটা কথা বলি, "এই উৎসবে অভিনেতৃগণ অভিনয় করিত, নর্ত্তক নাচিত, দড়ির উপরে নাচিবার ও বাজী দেখাইবার লোকও থাকিত, কুস্তিগীর, মুষ্টিযোদ্ধা, ভাঁড়, চারণ জাতীয় লোক (ballad singers), গল্প বলিবার লোক, (আখ্যায়কা) কুশীলব (লসকা ভাণ্ড), বাঁশবাজী দেখাইবার লোক, "আরক্ষক" (messenger) তলার, (?) ব্যাগ-পাইপ বাজাইবার লোক, বীণাবাদক ও তালাচরণগণ (অর্থাৎ যাঁহারা হাতে তালি দিয়া তাল রাখিতেন) উৎসবকে জমাইয়া তুলিত। উৎসবের অন্যান্য আরও কি কি অঙ্গ ছিল, তাহার একটি তালিকা দীঘনিকায়ে দেখিতে পাওয়া যায় নৃত্য, গীত, বাদিত্র (কনসার্ট), প্রেক্ষা (থিয়েটার), আখ্যান (আবৃত্তি), বেতাল (যন্ত্রবাদ্য) প্রভৃতি থাকিত। বাঁশবাজীও বোধ করি হইত—দীঘনিকায়ে "চণ্ডালং বংসধোপনং" কথাটা আছে। বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিতেছেন, "বেণুং উস্সাপেত্বা কীলনম্।" বাঁশ উঠাইয়া এই খেলাটি যে কি, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না—বাঁশে চড়িয়া balance রাখিবার খেলাও হইতে পারে। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি এই খেলা দেখাইত। দিব্যাবদানে বংশঘটিকা নামক ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। ফ্রাঙ্ক 'সাহেব' অর্থ করেন, "বংশধমনং" অর্থাৎ বেণুবাদন। যাহা হউক, বাঁশ লইয়া খেলা হইত, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। তবে তাহার উপর চড়া হইত, না তাহা লইয়া বেণুবাদন হইত, ইহাই মীমাংসার বিষয় হইয়া আছে। আর দেখা যায়, নানা প্রকার যুদ্ধ—যথা হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ, মেণ্ডকযুদ্ধ (মেড়ার লড়াই), কুক্কুটযুদ্ধ (মুরগীর লড়াই), বট্টকযুদ্ধ (বটের পাখীর যুদ্ধ—তুলঃ টুনটুনির লড়াই), দণ্ডযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ। কস্তী, উয্যোধিক (তলোয়ার খেলা) ইত্যাদিও বেশ চলিত।

উৎসবও একটা আধটা ছিল না -নানা উৎসবের নাম পাওয়া যায়। রাজগৃহে একটি উৎসব হইত, তাহার নাম গিরগ্গসমজ্জ। এই উৎসব পাহাড়ের উপর হইত। কর্ষণোপলক্ষে, অর্থাৎ হলচালনে উৎসব হইত। বৈশালীতে 'সর্বরাত্রিচারো' (সব্বরত্তিবারো ?) নামক উৎসব হইত—তাহাতে "তুরিয়-তাড়িত-বাদিত নির্ঘোষশব্দ" শুনা যাইত। কুমারক ও কুমারিকাদের একটা মিলনোৎসবও সেকালে দেখা যায়। Mrs. Rhys Davids বলেন,— "The festival was a kind of St. Valentine's Day. Clansmen's daughters arrayed in their best, held a parade, the youths having also foregathered, and presents or at least flowers were presented, Festival cakes were also handed about.।" ইহা ছাড়া ছিল হস্তিমঙ্গল (Elephant Festival)। আর ছিল কত্তিকছণম্। ইহার বর্ণনা এই— "অথ তসস নগরে কত্তিকছণম্ ঘোষয়িংসু, কত্তিকপুণ্ণমায় নগরং সজ্জয়িংসু · অথ সুরিয়ে অত্থং গতে উপগতে পুণ্ণচন্দে দেবনগরে বিয় অলঙ্কতে নগরে সব্বদি- সাসু দীপেসু জালন্তেসু রাজা সব্বালঙ্কারপটিমণ্ডিতো আ- এ্এ রথবরগতো নগরং পদক্খিণং করোন্তো ·· সূর্য্য অস্ত যাইলে ও পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে দেবনগরের ম- অলঙ্কৃত নগরে সর্ব্বদিকে দীপ জ্বালিত হইলে সর্ব্বালঙ্কা- প্রতিমণ্ডিত রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিলেন। কোজাগ-

পূর্ণিমা ও দীপাবলী (দেওয়ালী) এই দুই উৎসবের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শালবনেও ক্রীড়া হইত।

চোরভীতি—রাজগৃহ ছিল রাজধানী। কিন্তু তথাচ চোরভীতি কম ছিল না। এমন কি, চোরের ভয়ে গৃহস্থ দিনের বেলাতেও কবাট দিয়া রাখিত। এক জন উপাসক (গৃহস্থ) চারি জন ভিক্ষুকে প্রতিদিন ভোজন করাইত। কিন্তু তাহার চোরের ভয় এমন ছিল যে, দিনেও দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত। ফলে ভিক্ষুগণকে কখন কখন অভুক্ত থাকিয়া ফিরিয়া যাইতে হইত, "তস্‌স পন গেহপরিয়ন্তে ঠিতং চোরভয়েন যেভুয্যেন পিহিতদ্বারং এব হোতি।" অবশেষে তাহাকে দ্বারপাল রাখিতে হইয়াছিল। জাতকেও এই কথা দেখিতে পাই। প্রত্যন্তবাসী চোর ও দস্যু দমন করিবার জন্য রাজাকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইত। নগরকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত নগরগুত্তিক (নগররক্ষক) নিযুক্ত হইতেন। Fiek বলেন,—"Judging from the in security which on account of the frequent mention of robbers and thieves in the Jatakas and other folk literature must have existed in the Indian cities in ancient times, he (নগরগুত্তিক) was no small personage."

নগরশোভিনী—রাজগৃহে সিরিমা নামক এক জন প্রধানা গণিকা ছিল, তাহার দর্শনী ছিল দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ। (সিরিমা নামক গণিকা হোতি, দেবসিকং সহস্সং গণ্‌হতি) সিরিমা রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সভাচিকিৎসক জীবকের ভগিনী। জীবক নিজেই গণিকা-পুত্র। ভারহুতস্তূপের সিরিমা দেবতার সহিত এই সিরিমার একত্ব প্রতিপাদন করিতে কানিংহাম 'সাহেব' যত্নবান্ হইয়াছেন।

এই গণিকা তাহার নিজগৃহে প্রত্যহ আট জন ভিক্ষুকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল (অট্‌ঠসলাকভত্তানি পট্‌ঠপেসি)। এক জন ভিক্ষু তাহার রূপে মোহিত হইয়া আহার পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধদেব তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সিরিমার মৃত্যু হইলে তাহাকে পোড়ান হইল না। পচিয়া গলিয়া দেহ কৃমিতে ভরিয়া গেল, এত রূপের পাত্রকে এখন কেহ বিনা পয়সাতেও লইল না, সকলেই নাক সিটকাইয়া সরিয়া গেল। ইহারই জন্য এত মোহ ?

বৈশালীর গণিকা অম্বপালীর ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া রাজা বিম্বিসার কুমারী সালাবতীকে রাজগৃহের প্রধানা গণিকা করিলেন, (অথ খো রাজগেহকো নেগমো সালাবতীং কুমারিং গণিকং বুট্‌ঠাপেসি মহাবগ্‌গ—৮, ১,২,৩,)। এই সালাবতীই জীবকের মাতা। গণিকাদের স্থান অতি উচ্চ ছিল। রাজসভায় একাদশ বর্গের ভিতর গণিকা অন্যতম। বিধুরপণ্ডিত জাতকে দেখি, রাজান্তঃপুরেও তাহার স্থান আছে। বারাণসীতে শ্যামা গণিকার দর্শনী এক সহস্র কার্ষাপণ। তাহার রূপ অসামান্য ও সে রাজার অনুগ্রহপাত্রী। নগরশোভিনী শুলসার 'ফী' (fee) ও এক সহস্র মুদ্রা। রাজভাণ্ডারে অর্থাগমে তাহার দরকার হইত। রাজগৃহের নাগরিকগণ অম্বপালীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে পাছে অর্থ দেয়, এই ভয়ে রাজা সালাবতী কুমারীকে রাজগৃহে প্রধান গণিকা করিয়া স্থাপিত করিলেন, তাহা বলিয়াছি। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। স্নানাগারে, সম্বাহনে, শয্যাগৃহে, মাল্যগন্ধ যোগাইতে ও অন্যান্য কার্য্যে তাহার দরকার পড়িত। গণিকাধ্যক্ষ রূপযৌবনশিল্পসম্পন্না গণিকাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া রাজসভায় রাখিতেন। অর্থশাস্ত্রে দেখি, তাহারা রাজচ্ছত্র ধরিত, চামর ব্যজন করিত, স্বর্ণভৃঙ্গার উপস্থিত করিত। সরভঙ্গ জাতকে গণিকা রাজার নিকট কিরূপ সম্মান পাইত, তাহা দেখা যায় (লদ্ধ সক্কারম্ গণিকাঃ)।

বৈশালীর অম্বপালী স্বয়ং বুদ্ধদেবকে সঙ্ঘ সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার উদ্যান দান করিয়াছিলেন। থেরী গাথায় অম্বপালীর উল্লেখ দেখা যায়। দেবমন্দিরে দান অথবা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে দান গণিকাগণ করিত। এই সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের hetaeraদের কথা মনে পড়ে। তাহারাও রূপযৌবনসম্পন্না ও উদারপ্রকৃতি ছিল, দান-ধ্যানেও খুব নাম ছিল। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে (২৫০ খৃষ্টাব্দ) বেশ্যাদের সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। তাহারা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। গণিকার স্থান ছিল প্রধান। রাজা তাহার সম্মান করিতেন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ

তাহার সঙ্গলাভ শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। মৃচ্ছকটিকে ধনসম্পন্না উদারপ্রকৃতি বসন্তসেনার সহিত ব্রাহ্মণ চারুদত্তের কোর্টশিপ ও বিবাহ হইয়াছিল। দণ্ডীপ্রণীত দশকুমারচরিতে বেশ্যার শিক্ষার কথা আছে। নৃত্য, গীত, অভিনয়, বাদ্য, চিত্রশিল্প, গন্ধ-দ্রব্য তৈয়ার করা, কৃত্রিম পুষ্পরচনা, কথাবার্ত্তা কহিবার কায়দা প্রভৃতি শিক্ষা ত করিতেই হইত; পরন্তু ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শনেও কিছু কিছু তালিম দেওয়া হইত। নানাবিধ ক্রীড়াতেও তাহারা পারদর্শিনী হইত। রূপ-যৌবনসম্পন্না, সুবেশা, নানাশিল্পাভিজ্ঞা, দর্শনীয়া, মনোহারিণী, বাক্পটু, মিষ্টরসনা, সুরসিকা গণিকার সঙ্গলাভ অনেকের পক্ষে প্রেয় ছিল। রাজাও গণিকার সহিত যোগ দিয়া মাঝে মাঝে উৎকট Practical joke করিতেন, তাহাও দেখা যায়। কথাকোষে দেখি, বসন্ততিলকা রাজকুমারী রত্নমঞ্জরীর প্রিয়সখী; রাজান্তঃপুরে যাতায়াত আছে। গণিকা মাগধিকা রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইল যে, সন্ন্যাসী কুলবালককে তাহার নিকট আনিয়া দিবে। নানাবিধ প্রকারে মোহজাল বিস্তার করিয়া মাগধিকা কুলবালককে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিল। রাজা কোণিক তাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিল—বৈশালী তাহার করগত হইল। বেশ্যাদের সম্বন্ধে উত্তরকালে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, যথা—দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমতম্, কল্যাণমল্লের অনঙ্গরঙ্গ, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা। স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব।

কখনও কখনও দেখি, তাহার প্রকৃতি রূঢ় ও নির্ঘৃণ। অট্ঠানজাতকে পাঠ করি যে, এক শ্রেষ্ঠিপুত্র ঠিক সময়ে প্রতিশ্রুত সহস্র কার্ষাপণ উপস্থিত করিতে পারে নাই বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহাকে রাস্তায় তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল - পূর্ব্ব-প্রেম ও ধনদান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। তক্কারিয় জাতকে গণিকা কালী এক ধনবান্ শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বেশ-ভূষা কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। দেখা যায় যে, পুত্রসন্তান যদি (ভুলক্রমে) জন্মিত, তাহা হইলে তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিত। মহাবগ্‌গে (৮,১,৭) দেখি, সালাবতীকুমারী দাসীকে আজ্ঞা করিতেছে—"ইমং দারকং সঙ্কারকূটে ছড্ডেহি" এই বালককে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া এস। ধর্ম্মপদ অর্থকথায় ও পেতবত্থুতে (কুমারবত্থুতে) ইহার দৃষ্টান্ত আছে— 'সা চ নং জাতমত্তম্ এব দারকো তি ঞত্বা সুসানে ছড্ডাপেসি'—সে জাতমাত্র পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাহাকে শ্মশানে পরিত্যাগ করিল।

পালি-সাহিত্যে পঞ্চশীল-রক্ষয়িত্রী, ধর্ম্মপরায়ণা, বুদ্ধ ও সঙ্ঘে ভক্তিমতী গণিকার দৃষ্টান্তও আছে।

গৃহস্থালীর চিত্র

(ক) এক জন রমণী স্বামীর নিকট হইতে এক পক্ষের জন্য সহবাসমুক্তিলাভোদ্দেশ্যে রাজগৃহের প্রধানা গণিকা সিরিমাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়া স্বগৃহে অধিষ্ঠিত করিল। তাহার পুণ্যকর্ম্মে (পুঞ্ঞ কম্ম) যাহাতে বাধা না পড়ে, সেই হেতু এই বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। গণিকার দর্শনীর মুদ্রা ঐ রমণীর পিতা দিয়াছিলেন।

(খ) বন্ধ্যা রমণীর আত্মোৎসর্গের একটি মনোরম দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। বন্ধ্যা দেখিলেন যে, পুত্রের অভাবে স্বামীর বংশনাশ হইতে পারে। সেই জন্য তিনি স্বামীকে বলিলেন—প্রভু, আমার কনিষ্ঠার নাম সুভদ্রা, তাহাকে আনুন; যদি তাহার পুত্র হয়, সে আমারও পুত্র হইবে এবং আপনার কুলবংশও নাশপ্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার স্বামী 'সাধু' বলিয়া তাহাই করিলেন। পেতবত্থু অর্থ-কথায় দেখি যে, এক বন্ধ্যা রমণীর অনুরোধে স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়া গর্ভধারণ করিলে, সাপত্ন্য ঈর্ষাবশে প্রথমা এক পরিব্রাজকের সাহায্যে তাহার গর্ভপাত করিল।

(গ) বধূর প্রতি শাশুড়ীর ব্যবহার

আমরা দেখি যে, আমাদের সমাজে শাশুড়ী যেন রায়বাঘিনী হইয়া পুত্রবধুদের হৃৎকম্প উপস্থিত করেন। কখনও কখনও অজ্ঞাতে পুলিস সাহেবের সহিত তুলনা আসিয়া পড়ে। সামান্য অপরাধের জন্য বধূ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইত। দ্বারে ভিক্ষু দাঁড়াইয়া আছে—অপরাধ—তাহাকে কিছু ইক্ষুরস, অথবা দুই একটি পিষ্টক দেওয়া। এই না দেখিয়া শাশুড়ী মুষল লইয়া ধাওয়া করিয়া ঘাড়ে এক ঘা বসাইয়া দিল; অংসকূট ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বধূ

সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কোথাও বা পিঁড়া ছুড়িয়াই মারিয়া দিল। এইরূপ বর্ণনা আছে—"তটতটায়মানা কোধাভিভূতা যথাযুত্তং অচিন্তেত্বী অংসকূটে পহরি" (অর্থাৎ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গিয়া ক্রোধাভিভূত হইয়া যথাযুক্ত বিচার না করিয়া স্কন্ধদেশে প্রহার করিল)। কোথাও বা দেখি, এক ঢিলেই বধূকে বধূলীলা সংবরণ করিতে হইল।

"একবগ্‌গা" বৌকে বশ করিবার নিমিত্ত কোটিল্য হুকুম দিয়াছেন—"বেণুদল-রজ্জুহস্তানামন্ততমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ," (অর্থাৎ কি না—বাঁশের ছিলা দিয়া অথবা চপেটাঘাত করিয়া তিনবার মারা যায়,—প্রাণে মারিবার 'ঢালা হুকুম' তিনি দেন নাই।)

(ঘ) **শাশুড়ীর প্রতি বধূর ব্যবহার**—বধূর মন শাশুড়ীর ব্যবহারে তিক্ত হইয়া থাকিত; দিন পাইলে সেও এক হাত লইত। পিতামাতা বৃদ্ধ হইয়া পুত্রকে বলিতেছেন, "বাবা, বৌ আন—আমাদের সেবা করুক।" পুত্র জানিত, বৌ আনিয়া বিপদ্ হইবে, সেই গৃহকর্ত্রী হইয়া রাজত্ব করিবে, পিতামাতার 'অবস্থা' হইবে (ইত্থিয়ো নাম পতিকুলে ঠিতা ইস্‌সারিয়ং করোন্তি, সস্সুসস্সুরানং মনাপচারিনিয়ো দুল্লভা তি মাতাপিতুন্নং চিত্তদুক্‌খং পরিহরন্তো দারপরিগ্‌গহং অকত্বা··)। সে বিবাহ করিল না।

জাতকে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তিক্ত-বিরক্ত নির্য্যাতিত হইয়া যখন লোক সহায়হীন হইয়া পড়ে, তখন ভাবে, সে ধর্ম্ম আর নাই—ধর্ম্ম মরিয়াছে। কচ্চানীজাতকে দেখি যে, বধূর ব্যবহারে শাশুড়ীর এমন অবস্থা হইয়াছে যে, প্রতীকারের কোন আশা না দেখিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের নামে "বহুতমজ্জ" করিতেছে। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে কৃত্য করিতে হয়, ধর্ম্ম মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে লাগিল। অন্য স্থলে শাশুড়ী বিলাপ করিতেছে—"চন্দনমালা বিলেপন-গন্ধ দিয়া যে কন্যাকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলাম সেই আজ আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।" বধূ নিদ্রিত শাশুড়ীকে কুমীরভরা নদীতে ফেলিয়া দিতে চাহিল, আর একবার শ্মশানে জ্বলন্ত পোড়াইয়া মারিতে চাহিল। কোথাও বা দেখি, মায়াবিনী স্বামীকে তাহার পিতামাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত নানা কল-কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে। শ্রাবস্তীর এক মহাশাল ব্রাহ্মণ তাঁহার অষ্ট পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইল। বেচারী আট ছেলের আটটি বগলার তাড়া খাইয়া গৃহত্যাগ করিল।

পুত্রবতী জননী পুত্রধনে গরীয়সী হইয়া স্বামীকে উপেক্ষা করিতেছেন দেখা যায়। স্বামীও রাগিয়া গিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া শোধ লয়েন। "তেসং মাতা পুত্তবসেন ভত্তারং অতিমঞ্‌ঞতি, সো ভরিয়ায় অবমানিতো নিব্বিন্ন মানসো অঞ্‌ঞং কঞ্‌ঞং আনেসি।"

উপরে যে চিত্র দেখান হইল, তাহা নিয়মের ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। "সস্সুদেবা পতিব্‌বতা" নারীর চিত্র বিরল নহে। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, পতিব্রতা নারীর যত্নে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। শিক্ষিতা, মেধাবিনী কন্যা শিক্ষাগৌরবে স্ফীত না হইয়া গৃহস্থালীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিপুণ-হস্তে শ্বশুর, শাশুড়ী ও পরিজনস্থ যাবতীয় ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মহৎ-হৃদয়ের পরিচয় দিত। লতাবিমানে দেখি—"উপাসকস্স ধীতা লতা নাম পণ্ডিতা ব্যত্তা মেধাবিনী পতিকুলং গতা। ভত্তু সস্সুসস্সুরানাঞ্চ মনাপচারিণী পিয়বাদিনী পরিজনস্স সংগহকুসলা।"

বিবাহ

মাতুল কন্যার সহিত বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল দেখিতে পাই। (অথ গস্স মাতাপিতারো সম্মুখগেহতো মাতুলধীতরং রেবতীং নাম কঞ্‌ঞম্ আনেতুকামা অহেসুং)। পেতবত্থু কথা ও জাতকে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখি। উত্তর-ভারতে কিন্তু এইরূপ বিবাহ এখনকার কালে নিন্দিত। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। Weber তাঁহার *Indische Studien* Vol x. এ (Die Kastenverhaltnisse in dem Brahman und Sutra) এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। Westermarck তাঁহার History of Human Marriage নামক পুস্তকে (পৃঃ ৩০৪) বলিয়াছেন—"Yet in the older literature marriage with the daughters of the mother's brother and sons of the father's sister is permitted।" প্রদ্যুম্ন তাঁহার মাতার ভ্রাতা রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধে পড়ি—

> "যদ্যপ্যনুস্মরন বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ।
> ব্যতরৎ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্ব্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥"

অর্জ্জুন মাতুল-কন্যা কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাকবি ভাসের অবিমারক নামক নাটকে দেখি—অবিমারক মাতুল কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ আর্য্য ছিলেন কি অনার্য্য ছিলেন, সে বিচার এখানে করিবার উপযুক্ত সময় নয়। দেখা যাইতেছে যে, মাতুল-কন্যা-বিবাহ এক সময়ে উত্তর-ভারতে চলিত। পরাশর-সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বলেন যে, মাতুল-কন্যা-বিবাহ "উদীচ্যশিষ্ট-গর্হিতং" হইলেও দাক্ষিণাত্যে ইহার খুব চলন. উত্তর-ভারতেও ইহা একেবারে "অবিনীত" নহে। শ্রুতিও ইহার বিরুদ্ধ নহে—"মাতুলসুতাবিবাহস্যানুগ্রাহকাঃ শ্রুত্যাদয়ঃ।" কুমারিল ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিক এবং বীরমিত্রোদয়-সংস্কার-প্রকাশেও ইহার অনুমোদন আছে। বুদ্ধদেবও তাঁহার মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বে কোলিবংশের রামের দ্বাত্রিংশ পুত্রগণ শাক্যবংশভুক্ত মাতুলগণের কন্যা বিবাহ করেন। সেই অবধি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ বিবাহকে Cross Cousin marriage কহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বিবাহ দাক্ষিণাত্যের বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত - তামিল, তোড়, সিংহলীয়, Torres Straits দ্বীপবাসী, হেব্রাইডিজ, ফিজি প্রভৃতি অধিবাসিগণের মধ্যেও প্রচলিত। ইহার সূত্র আবিষ্কৃত হইলে—একটা চমৎকার ধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

উদয়ভদ্দজাতকে দেখি, উদাভদ্দ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিতেছেন। দশরথজাতকে রাম তাঁহার সহোদরা সীতাকে বিবাহ করিতেছেন—"সীতং অগ্‌গ মহেসিং কত্বা উভিন্নং পি অভিসেকং করিংসু।" দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠাসুত্তে লিখিত আছে যে, হিমালয়-প্রবাসী ওক্কাকোর (ইক্ষ্বাকুর) পুত্রগণ স্বীয় ভগিনীগণকে অন্যথা রক্তদুষ্টির আশঙ্কায় বিবাহ করিয়াছিলেন। মাতুল-কন্যা-বিবাহের উদ্দেশ্যও বোধ হয় রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা করা। পুরাতন মিশরের ইতিহাসে দেখি যে, রাজকুলে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহজাত পুত্রই Pharoah হইতেন—এই বিবাহ শুদ্ধ বিবাহ ছিল। ইরাণে Magiদের ভিতর এই বিবাহ প্রচলিত ছিল।

কিন্তু মাতুল-কন্যা-বিবাহ যে কখনও অপবাদের হাত এড়ায় নাই, এমন নহে। কুণালজাতকে দেখি যে, কোলিয়-বংশের কর্ম্মকরগণ (labourers) শাক্যবংশীয়দিগকে বলিতেছে—"যে তোমরা সোণ-শৃগালাদির মত নিজ ভগিনীর সহিত বাস কর।"

দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার

রজ্জুমালা বিমানে দেখি যে, বধূ দাসী-কন্যাকে অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত করিতেছে।

হতভাগী গালাগালি খাইয়াই বড় হইয়া উঠিল। তখন চড়-চাপড়ের বরাদ্দ আরও বাড়িয়া গেল। দাসীর চুলের মুঠি ধরিয়া বধূ খুব এক প্রস্থ হাত-পায়ের কসরত করিয়া লইল। এইরূপ দৈনিক আপ্যায়নে দাসী বিপর্য্যস্ত হইয়া এক বুদ্ধি করিল। নাপিত-বাড়ী গিয়া সে মাথা মুড়াইল। ন্যাড়া মাথায় একগাল হাসিয়া যখন সে কর্ত্রীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বধূর রাগ দেখে কে? সে গর্জ্জিয়া উঠিল—"তবে রে পোড়ামুখী, ন্যাড়া হয়ে তুমি রক্ষে পাবে?" তাহার ন্যাড়া মাথায় দড়ির পাক ঘুরিয়া গেল। উঠিতে বসিতে হেঁচকা মারিয়া বধূ দাসীর চরম অবস্থা করিয়া তুলিল। হতভাগীর নূতন নাম হইল—রজ্জুমালা! আর সে বাঁচিতে চাহে না। গলায় দড়ি দিয়া সে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। বনে গিয়া গলায় ফাঁস দিবার সময় বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে সে বাঁচিয়া গেল। দাসদাসীর এই ভাগ্য নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। উরগজাতকে শক্র দেবরাজ ও দাসীর কথোপকথনে ইহাই প্রমাণিত হয়। কোথাও বা দাসের প্রতি অনুগ্রহও দেখা যায়।

নাগবিমানে পড়ি যে, এক ব্রাহ্মণের ইক্ষুক্ষেত্রপাল কতকগুলি ভিক্ষুকে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী লগুড়-প্রহারে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়—(তং সুত্বা ব্রাহ্মণো কুপিতো অনত্তমনো তটতটায়মানো কোধাভিভূতো তস্‌স পিটিঠতো উপধাবিত্বা মুগ্‌গরেণ তং পহরন্তো একপ্‌পহারেণে ব জীবিতা বোরোপেসি।)

পেতবথ্থুতে দেখি যে, এক দাসীকন্যাকে প্রভুপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্রবধূ হইবার সম্মান দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যের দৃষ্টান্ত বিরল। দাসীগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহার প্রমাণ "দাসীপুত্র" নামক সংস্কৃত ও পালি শব্দে—"দাসীপুত্র" ছিল গালাগালি।

মজুরদের ভিতর কেহ কেহ (কম্মকরা) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বগৃহে নিজ পুত্র-পরিবার লইয়া থাকিত—তবে 'ভতি' মজুরী করিয়া সংসার চালাইত ; অর্থাৎ তাহারা ছিল free labourers। আবার এমন দুঃস্থ মজুরও ছিল যে, সে 'পেটভাতায়' কায করিত তাহাকে বলিত "ভত্তবেতনভটো।"

জাতকে চারি প্রকার ক্রীতদাসের বর্ণনা আছে। "Some are slaves from their mothers, others are slaves bought for money, of their own will, and those driven by fear।" বিস্তৃত আলোচনার জন্য মনুসংহিতা ৮,৪১৫ এবং অর্থশাস্ত্র "দাস কর্ম্মকার কল্প" দ্রষ্টব্য।

দৈনন্দিন জীবনের দুই একটা চিত্র—

(ক) স্বামী মাঠে কাযে গিয়াছে—স্ত্রী তথায় মধ্যাহ্নে অথবা তৎপূর্ব্বে তাহার জন্য ভাত লইয়া যাইতেছে।

(খ) আমাদের গৃহে দেখি যে, ভোজ্য বস্তু ধরিয়া দিবার পূর্ব্বে গোবরজল দিয়া নিপুণভাবে যায়গাটি পূত করা হয়। এইরূপে 'ঠাই' করার প্রথা পুরাকালে প্রচলিত ছিল। রেবতীবিমানে দেখি যে, রেবতীর শাশুড়ী বধূকে বলিতেছেন যে, যেখানে ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে বসিবেন, সেখানটা যেন বেশ করিয়া কাঁচা গোবর দিয়া লেপা হয়, জল ছিটাইয়া ধূলা মারিয়া পরিষ্কার স্থানে যেন আসন করিয়া দেওয়া হয়—(অম্ম, ত্বং ইমং গেহং আগন্ত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘস্‌স নিসীদনট্‌ঠানং হরিতেন গোময়েন উপলিম্পিত্বা আসনং পঞ্ঞএঞাপেহি অন্যত্র সিত্ত সমট্‌ঠপ্পদেসে আসনং পঞ্ঞাপেত্বা)। জাতকেও এইরূপ দেখা যায়

গোময়লিপ্ত করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ শুদ্ধ-পূত করা আমাদের গ্রামের গৃহস্থের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। ব্রত-নিয়মাদি পালনের স্থান, বিবাহমণ্ডপ, শ্রাদ্ধবাসর, জাতকর্ম্মস্থলগুলিকে শুচি করিবার অন্যতম উপায় গোময়লেপন। মৃতাশৌচে 'গোবর তড়তড়া'র কথা সকলেই জানেন। শুধু এই কাযেই যে গোময় ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে, ইহার আরও "সম্মানজনক" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ঘুঁটে করিয়া পোড়ানর ব্যবস্থা সেকালে ছিল। নেত্তিপকরণে "গোময়গ্‌গি" (গোময়াগ্নি) ও জাতকে "গোহণুবেট্‌ঠনেন"—এই দুই শব্দের দ্বারা ইহার ব্যবহার প্রমাণিত হয়। কুম্ভকার তাহার 'পাঁজায় আগুন' দিতে ইহার ব্যবহার করিত। এ সব ব্যবহার উচ্চ অঙ্গের নহে। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের ব্যবহারও ছিল বলিয়া ছ। অর্থশাস্ত্রে দেখি—অশুদ্ধ সুবর্ণ গোময়যোগে সংস্কৃত হইতেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখি, বাদ্যযন্ত্রের সংস্কারে ইহার ব্যবহার হইতেছে। শ্রীকুমারের শিল্পরত্নে দেখি, পর্ব্বতগাত্রে ও ভিত্তিগাত্রে আলেখ্য রচনার জমী তৈয়ার করিতে (fresco paintings) ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

(গ) এক জন ব্রাহ্মণকন্যা অবকাশ পাইয়া জননীর মাথা হইতে উকুন বাছিতেছে। (কেশকারী নাম গেহদ্বারসমীপে মাতু সীসতো উকা গণ্‌হন্তি ।)

শ্রীকালীপদ মিত্র (অধ্যাপক)

প্রেমিক

বরষার কালে আষাঢ়ের মেঘে,
গগন ছাইয়া গেল,—
প্রেমিক ভাবিছে 'বাদর ধারায়
তাঁহারি আশিস্—এল।'

শ্রীফণিভূষণ সরকার

প্রতারক

২৩.

আজ শেষ দিন। আজ রাত্রিশেষে ইভের ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের শেষ যবনিকাপাত হইবে। প্রদীপ যেমন নিভিবার পূর্ব্বে এক বার শেষ মুহূর্ত্তের জন্য দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই ইভের জীবন-প্রদীপ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এক বার শেষ জ্বলিয়া উঠিল।

ইভ এমন প্রফুল্ল বহু দিন হয় নাই, তাহার মুখে চোখে একটা অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়াছিল। সে সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছিল। এত কথা সে রোগ দেখা দিবার পর হইতে কখনও কহে নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, অতি শীঘ্রই দীপ-নির্ব্বাণ হইবে। কেবল বিমলেন্দুর মনে কে যেন বলিয়া দিতেছিল, সে আজ সর্ব্বস্বহারা হইবে।

যখন ইভ সকলের সহিত কথা কহিয়া সকলকে বিদায় দিয়া কেবল স্বামীকে কাছে থাকিতে বলিল, তখন বিমলেন্দুর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। ইভ পুলকিত প্রেমভরে বিমলেন্দুর একখানি হাত ধরিয়া মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ। কাঁদছ কেন? তুমি পুরুষমানুষ, তোমার কি কান্না সাজে? এই দেখ, আমি তোমার কথা শুনছি, তোমার মুখের আলো দেখছি, তুমি কাছে থাকলে স্বর্গের সুখের আনন্দে আমার সমস্ত মন যেমন ক'রে ভ'রে ওঠে, এখন তেমনই ক'রে ভ'রে উঠছে, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে আমার কি সুখ আছে?"

বিমলেন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ইভ, কি ব'লে আমায় ভোলাবে? আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না, আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে?"

ইভ বিমলেন্দুর হাতখানা লইয়া নিজের ললাটে ও গণ্ডে বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিল, "দেখ, এই ভোগের দেহ ক'দিনের? এই দেখ, আমার শীর্ণ হাত; এই দেখ, আমার শীর্ণ শরীর। এ শরীর নিয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার যন্ত্রণার বৃদ্ধি করবো বই ত নয়। তার চেয়ে শয্যাগত না হয়ে এই বেলাই তোমায় ভালবাসতে বাসতে যদি এই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে পারি, তার চেয়ে কি সুখ আছে?"

বিমলেন্দু তাহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইভ তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া আপনিই বলিয়া যাইতে লাগিল, "ইন্দু, বড় ইচ্ছে ছিল, তোমার মত ঐ রকম সুস্থ সবল সুন্দর দেহ নিয়ে তোমার সেবা করতে বেঁচে থাকব। কিন্তু তা হবার নয়। আমার মায়ের দিক থেকে আমাদের সবাই অল্পবয়সে সংসার ছেড়ে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। আমার মায়ের মা আমার মত অল্পবয়সে মারা যান. আমার মা-ও তাই, কেউ অনেক দিন বাঁচেন নি। আমি যদি বুঝতুম, তুমি তোমার সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আমায় যা দিতে পারবে, আমি বেঁচে থেকে তেমনই তার প্রতিদান দিতে পারব, তা হ'লে আমার বেঁচে থাকা সার্থক হ'ত। কিন্তু কেবল শয্যাগত হয়ে দুর্ব্বহ জীবনভার নিয়ে এই শীর্ণ শরীরে বেঁচে থেকে লাভ কি?"

বিমলেন্দু বলিল, "ইভ, এ সব কথা ব'লে কেবল আমার মনে ব্যথা দিয়ে লাভই বা কি?"

ইভ বলিল, "তোমায় ব্যথা দেব? তোমাদের কত কায আছে, তোমরা কত কাযে ডুবে থেকে এই দুঃখের জীবনের ভার হাল্‌কা করতে পার। আমাদের কি আছে? আমাদের কেবল ভালবাসা আছে, আমরা কেবল ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকি।"

বিমলেন্দু ব্যথিত স্বরে অনুযোগ করিল, "তবে? তবে সেই ভালবাসা থেকে আমায় বঞ্চিত করবার কথা বলছ কেন?"

ইভ আবার বিমলেন্দুর হাত দুইখানা ধরিয়া আপনার ললাটে বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমায় ভালবাসি বলেই ত মরণ কামনা করছি। আমি চিররুগ্ন হয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের পথে কাঁটা হব কেন? সেইটেই কি ভাল? তার চেয়ে—"

বিমলেন্দু আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া বাধা দিয়া বলিল, "এই রকম করেই কি আমার সুখের পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চাও? যদি তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস, তা হ'লে কি আমার মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পাবে?"

ইভ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার সুখ? আমি কে? তোমার সুখ যাতে হয়, তাই করা কি আমার প্রথম কায নয়? কিসের দুঃখ, ডার্লিং? এই পৃথিবীর দুদিনের ছাড়াছাড়িতে কি দুঃখ প্রিয়তম? ঐ ওপারে আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা ভালবাসবো, সে ভালবাসায় ত ছাড়াছাড়ি থাকবে না। তবে দুঃখ কি? কিন্তু যদি এখানে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের অন্তরায় হই, তা হ'লে সেখানে কি তুমি আমায় আর ভালবাসবে?"

ইভ এতক্ষণে হাঁপাইতে লাগিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "চুপ কর ইভ, আর কথা কোয়ো না—আর সহ্য করতে পারি না।"

বিমলেন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

ইভ আবার কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, কাঁদে না। এ পৃথিবীতে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবেই, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটা খুব কষ্ট হবে। ডার্লিং! সহ্য কর, মানুষের মত বুক বাঁধ, ধৈর্য্য ধর।"

বিমলেন্দু চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "না, না, পারি না, আর—"

ইভ বাধা দিয়া বলিল, "ডার্লিং! সব ভগবানের হাত, তুমি আমি কি করতে পারি?"

বিমলেন্দু বলিল, "যদি তোমায় আমায় দেখা না হ'ত, তা হলেই ভাল হ'ত।"

ইভ দুঃখিত হইয়া বলিল, "না, না, ও কথা বোলো না। যে দিন তোমায় আমায় প্রথম দেখা হয়েছিল, এখনও সে দিনের জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই—আবার সে দিন বার বার ফিরিয়ে আনতে প্রার্থনা করি। সে দিন যা আমি পেয়েছি, তা আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কখন পাই নি। এই মরণের দোরে এসে পৌছে শেষ ছাড়াছাড়ির দিনেও বলছি, সে দিনের সুখের বদলে আমি জগতের অন্য কোনও সুখ চাই নি। ইন্দু! জান কি, তোমায় ভালবেসে আমি কি সুখ পেয়েছি, তোমার এক দিনের ভালবাসাও আমার কি গৌরবের জিনিষ?"

ইভ আরও হাঁপাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর জ্যোতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ইভ! ইভ! অমন করছ কেন? সত্যই কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চললে?"

ইভের মৃত্যুযাতনা-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোকরেখাপাত হইল, সে তখনও ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "ইন্দু, সুখী হও। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর তোমার সাজান সংসারে কেমন সুস্থ, সুন্দর, সবল বালকরা আনন্দে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে; যেন দেখছি, তোমার ফুটফুটে সুন্দর মেয়েদের সুন্দর গণ্ডে গোলাপ ফুটে রয়েছে, তারা তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে পাখীর মত মিষ্টি সুরে তোমায় তাদের হাসিকান্নার কথা শোনাচ্ছে,—আর তাদের সুন্দরী মা হাসি হাসি মুখে তোমায় সংসারের কত সুখ-দুঃখের কথা জানাচ্ছে। যেন তুমি তোমার সন্তানের জননীকে বুকে ধ'রে কত ভালবাসার কথা বলছ। আমার কথা মনে ক'রে প্রতিমা কি তোমায় আমার মত ভালবাসবে না—এই দুঃখিনী বোনের জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না?—ইন্দু, ইন্দু, ডার্লিং।"

ইভ আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার দেহ অবশ হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

আতঙ্কে বিমলেন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ইভকে দুই বাহুতে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া ডাকিল, "ইভ! ইভ! ডার্লিং ইভ!"

ইভ মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; অতিরিক্ত শ্রমে সে কিছুক্ষণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি ইন্দু! এখনও মরি নি।"

বিমলেন্দু কাতর কণ্ঠে বলিল, "পরীক্ষার কি এখনও শেষ হয় নি ইভ? বল, কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে, আমার মোহক্ষয় হয়েছে?"

ইভ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছি ইন্দু! এই শেষ মুহূর্ত্তে আমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ কেন? তুমি কি ভাব, আমি তোমার ভেতরটা সব দেখতে পাচ্ছি নি—সব জানতে পাচ্ছি নি? তা হ'লে এত দিন তোমায় কি ভালবাসলুম? ও আমার ডালিং, তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে কি চিন্তা কর, কি চাও, কি অভাব বোধ কর, তা যদি না বুঝতে পারব, তা হ'লে বৃথা তোমায় ভালবেসেছি, বৃথা তোমাতে আমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। এ জগতে তোমার সে মোহ কাটবার নয়, তা জেনেই ত মরণ কামনা করেছি,—যদি অনন্ত জীবনে তোমায় পাই, সেই আশায়। ইন্দু! কথাটা বড় ঘোলা হোলো, না? তা হোক, তবু সত্যি।"

বিমলেন্দুর ব্যথিত মন আলেখ্যে অর্পিত আপনার চিত্র স্পষ্টই দেখিতে পাইল, লজ্জায়, অপমানে, মরমে সে মরিয়া গেল। সে কোনও জবাব দিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ইভ আবার বলিল, "লজ্জা পেয়েছ? লজ্জা কি? মনের উপর ত কারও জোর নেই। তাই ত তোমায় সুখী করবো বলেই মরতে চাইছি। ইন্দু! ডালিং! মুখ তুলে কথা কও-বোধ হয়, এ জগতে তোমায় আমায় এই শেষ দেখা—"

ইভ অত্যন্ত হাঁপাইতে লাগিল, তাহার চক্ষুর তারকা কেমন হইয়া গেল। বিমলেন্দু বিষম ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ইভ! ইভ! এ কি, এমন করছ কেন?"

তখন তাহার চীৎকারে সকলে সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া একটা উত্তেজক ঔষধ ফুটাইয়া দিলেন, কিন্তু কোন আশার কথা বলিতে পারিলেন না।

তাহার পর সারা রাত্রি ইভ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করিল, কিন্তু আর কথা কহিল না। শেষ রাত্রিতে যখন ইভের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন এক বার মুহূর্ত্তকালের জন্য ইভের চৈতন্য হইল। সে চারি দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "ইন্দু!"

বিমলেন্দু শয্যা-পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, তাহার মুখে একটি কথাও সরিল না। শেষ একবার ইভ স্বামীর মস্তকে কম্পিত হস্ত রাখিয়া ডাকিল, "ইন্দু! ডার্লিং!"—তাহার পর সব শেষ হইয়া গেল।

বিমলেন্দু পাগলের মত শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহাকে ধরিয়া সেই কক্ষ হইতে সরাইবার চেষ্টা করা হইলেও সে এক পদ নড়িল না, তেমনই অবস্থায় ইভের স্পন্দনহীন হাত দুইখানি ধরিয়া শয্যা-পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল। তখন পৃথিবীতে কি হইতেছিল, বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ।

যখন পূর্ব্বাকাশ রক্তরাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, যখন কক্ষমধ্যে বিমলেন্দু একাকী ইভের প্রাণহীন দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তখন সে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, উষার অস্পষ্ট আলোকে আকাশপথে আলোকমণ্ডলের মধ্যে তাহার চক্ষুর সম্মুখে ইভ যেন দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে মৃদুমন্দ হাস্য; জীবনেও যেমন, মৃত্যুর পরও তেমনই সে অলোকসামান্য রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাহার গলিত সুবর্ণপ্রভ আলুলায়িত কুন্তল বায়ু-তাড়নায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার নীলোৎপল নয়ন দুইটি হইতে স্বর্গীয় অপরিমেয় প্রেমের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতেছে।

বিমলেন্দুর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া ইভকে ধরিতে গেল, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ইভ! আমার সর্ব্বস্ব ইভ! আমায় ফেলে যেয়ো না, তুমি যেখানে আছ, আমায় সেখানে নিয়ে যাও, এ জ্বালাময় জগতে আমি থাকতে চাইনে।"

বিমলেন্দু যেমন অগ্রসর হইতে গেল, অমনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

২৪

শুদ্ধ-গৈরিকধারিণী এক জন যুবতী মঠের দেবতার পূজার আয়োজনে তন্ময় হইয়া কার্য্য করিতেছে, নিকটে কেহ নাই। সে প্রতিমা। তাহার কার্য্যতৎপরতায় মঠের মাতাজী ও তাঁহার শিষ্য-শিষ্যারা সকলেই তৃপ্ত। প্রতিমা স্বহস্তে পূজার বাসনগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল, সেগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছিল।

প্রতিমার ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য ছিল। রামপ্রাণ বাবু তাহাকে গৈরিক লইতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন, সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মত জীবনযাপন

করিতে কত বাধা দিয়াছিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি হতাশ হইয়া পুরীতেই বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতিমা অধিকাংশ সময় মঠেই থাকিত, পূজা-অর্চনায় কাল হরণ করিত, কদাচিৎ পুরীর বাসায় পিতার নিকট যাইত, শৈলকে আদর করিত।

ইভের মৃত্যুর পর মিস্ বেল পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক দিন প্রতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন প্রতিমা তাহাদের বাসায় থাকিত। মিস্ বেল যে সময়ে দেখা করেন, সে সময়ে মাতাজী ও রামপ্রাণ বাবু বাসায় উপস্থিত ছিলেন। মিস্ বেল সকলকে ইভের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "এমন মধুর কোমল মন এ জগতে কারও হয় ব'লে জানি নি। মরবার আগে সকলের কথা ভেবেছিল, সকলকার খোঁজ নিয়েছিল। তার উইল যখন পড়া হ'ল, তখন দেখা গেল, সে কাকেও ভোলেনি। নিজের আত্মীয়স্বজনের ত কথাই নেই, যারা তার সেবা করেছিল—যারা তার ঘরের লোকজন ছিল, তাদেরও কিছু না কিছু দিয়ে গিয়েছে, এমন কি, আমাকেও বাদ দেয় নি। আর তার বাকী যা কিছু সম্পত্তি ছিল, যা কিছু নগদ টাকা-কড়ি ছিল, সব মিঃ রায়কে দিয়ে গিয়েছে। কি ভালবাসত মিঃ রায়কে! এমন ক'রে সর্ব্বস্ব-হারা হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে কাউকে দেখি নি। আহা! সব বিলিয়ে দিয়ে শেষে আপনার প্রাণটাও বলি দিলে!"

কথাগুলি বলিয়া মিস্ বেল প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতিমার দৃষ্টি মাটীর উপরে ছিল, তাহার দুইটি চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল; সে নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল।

মিস্ বেল ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং মাতাজী কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া রামপ্রাণ বাবু সংক্ষেপে ইভের উইলের কথা বুঝাইয়া দিলেন। মাতাজী সমস্ত শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামপ্রাণ বাবুকে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, বিমলেন্দু বাবু এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন।"

প্রতিমার মাথা আরও নত হইল, সে প্রায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার মত হইল। জিজ্ঞাসিত হইয়া মিস্ বেল বলিলেন, "মিঃ রায় দার্জ্জিলিঙ্গেই আছেন, অন্ততঃ আমি তাই দেখে এসেছি। আছেন, ঠিক বলা যায় না, কেন না, তিনি থেকেও নাই। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, কারুর সঙ্গে মেশেন না, সময়ে খান বা ঘুমোন কি না, তাও কেউ বলতে পারে না। যে দিন উইল পড়া হয়, সে দিন ইভের এটর্ণী তাঁকে জোর ক'রে ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিলেন, কিন্তু উইলের কোনও কথা তাঁর কানে গিয়েছিল ব'লে আমার মনে হয় না; তিনি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। আমার ভয় হয়, হয় ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন, না হয় আত্মহত্যা করবেন। এ সময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর কেউ খুব আপনার জন কাছে থাকলে ভাল হ'ত। আমার আত্মীয় মরিস এ সময়ে বন্ধুর মত কায করছে, অথচ ইভ যখন বেঁচে ছিল, তখন সে মিঃ রায়কে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। সে আপনাদের নেটিভের উপর বড় সন্তুষ্ট নয়, এ কথা জানেন ত?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "কেন?"

মিস্ বেল বলিলেন, "সে বলে, আপনাদের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই, নৈতিক সাহস নেই। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে যে তার একটা মন্দ ধারণা ছিল, এটা তার কথাবার্ত্তায় আর ব্যবহারে জান্তে পারতুম। তবে ভিতরের কথাটা কি, বুঝ্তে পারি নি। কথার ভাবে বুঝেছিলুম, মিঃ রায় না কি ইভের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। কি প্রতারণা, তা জান্তে পারি নি। মরিস্ এই জন্যে মিঃ রায়ের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ইভের মৃত্যুর পর ইভের উইল শুনে আর মিঃ রায়ের অবস্থা দেখে মরিসের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে এখন ভায়ের মত মিঃ রায়কে যত্ন করে, নানা বিষয়ে ব্যস্ত রেখে ইভের শোক ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে কত দূর সফল হবে, বুঝ্তে পারি নি। আমি যতটা দেখে এসেছি, মিঃ রায় যে আবার কখনও আগের অবস্থা ফিরিয়ে পাবেন, এমন ত মনে হয় না। তবে রেভারেণ্ড ডেনিস্ বলেছিলেন, যদি কখনও মিঃ রায় এমন কোনও জিনিষ পান, যাতে ক'রে তাঁর মনের শূন্যতা পূর্ণ হয়, তা হ'লে হয় ত কালে সুখের মুখ দেখতে পারেন। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে আমার এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল

না। প্রথম প্রথম আমিও মরিসের মত তাঁকে ভাল চোখে দেখতুম না। কিন্তু তার পর ইভের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যে যাতনা পেতে দেখেছি, যে ক'রে ইভের কাছে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিন-রাত ব'সে থাকতে দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি সমবেদনায় আমার মন ভ'রে গেছে। আহা, বড় দুঃখী মিঃ রায়! শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ আছে। যদি আপনারা পাঁচ জনে তাঁর এই অবস্থায় দেখাশোনা করেন, তা হ'লে ইভের আত্মার তৃপ্তি হয় ব'লে আমি মনে করি। বিশেষ, মিস্ চক্রবর্ত্তীকে ইভের খুব বন্ধু ব'লে জানি, তিনি এ বিষয়ে খুব সাহায্য করতে পারেন।"

প্রতিমার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে আর একবার মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। রামপ্রাণ বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা এতে আমার কন্যা কি করতে পারেন? আমাদের হিন্দুদের পুরনারীরা ত পরপুরুষের সঙ্গে আপনাদের মত বন্ধুতা পাতাতে পারেন না, বা দুঃখে শোকে সমবেদনা জানাতে পারেন না। আমার মেয়ে ইভের খুব বন্ধু ছিলেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু তা ব'লে ইভের স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও রূপ সম্পর্ক ত থাকতে পারে না।"

মিস্ বেল বলিলেন, "তা ঠিক। কিন্তু তবও যদি এ সময়ে আপনারা কিছু করতে পারতেন, তা হ'লে ভাল হ'ত। জানেন ত, ইভ তার স্বামীকে কি ভালবাসত! এখন তার স্বামী পাগলের মত হয়ে রয়েছে, এ কথা জেনে তার আত্মা স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি পাবে না।"

এই কথাবার্ত্তার পর প্রায় দুই মাস যাবৎ প্রতিমারা দার্জ্জিলিঙ্গের কোনও সংবাদই পায় নাই। সংসারের জন্য প্রতিমা যে খুব আগ্রহান্বিত, তাহা তাহার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে জানা যাইত না। তবে রামপ্রাণ বাবুর স্নেহময় মন বুঝিতে পারিত, প্রতিমা প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিলেও তাহার মুখ-চোখ অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে, সে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দিন দিন কি একটা অব্যক্ত চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক এক সময়ে তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কি একটা অব্যক্ত যাতনায় তাহার মুখমণ্ডল ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে সময়ে রামপ্রাণ বাবুর মনটা হাহাকার করিয়া উঠিত। কি করিলে ভগবান্ তাঁহার ননীর পুতলীর মনে পূর্ব্বের শান্তি ফিরাইয়া দেন। তিনি জানিতেন, প্রতিমা স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতি—স্বল্পভাষিণী। তাহার অন্তর কোমল হইলেও তাহার বাহিরটায় একটা কেমন অস্বাভাবিক ঝাঁঝ ছিল, যাহার কাছে ভৃত্য, পরিজন ভয়ে ভক্তিতে সর্ব্বদা নতমস্তক থাকিত। এই প্রকৃতির লোক নীরবে অন্তরে কষ্ট সহ করে, বুক ফাটিয়া গেলেও কখনও মুখ ফুটিয়া অপরকে আপনার যাতনার কথা বলে না। তাই রামপ্রাণ বাবু তাহার কথা ভাবিয়া মনে অত্যধিক ব্যথা পাইতেন। সে যদি তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিত বা ভাবভঙ্গীতেও অন্তরের কামনার কথা জানাইত, তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের বিশেষ কারণ থাকিত না।

দুই মাস পরে প্রতিমার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ঐ সময়ে সে একখানি পত্র পাইল. পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে। শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়াই রামপ্রাণ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন,—সে হস্তাক্ষর বিমলেন্দুর। পত্র পাইয়াই রামপ্রাণ বাবু ভাবিলেন, পত্রখানা প্রতিমাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না। এক বার তিনি পত্রখানা অগ্নিসাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া উহা হইতে নিরস্ত হইলেন। প্রতিমাকে পত্রখানা দিবার সময় বলিলেন, "আমি ঠিক করতে পারছি না, এ পত্র তোমার পড়া উচিত কি না। তবে তুমি বুদ্ধিমতী, তুমিই বুঝে দেখ, তোমার কর্ত্তব্য কি। যদি ভাল মনে কর, পত্র পাঠ কোরো, না হ'লে ছিঁড়ে ফেলো।"

প্রতিমা একান্তে পত্র পাঠ করিল। সে পত্রে কি ছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জানিল না। তবে রামপ্রাণ বাব লক্ষ্য করিলেন, পত্রপাঠের পর প্রতিমা কয় দিন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর, স্থির ও ধীর প্রকৃতির অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কয় দিনে প্রতিমাকে কলিকাতায় ঐ পত্রের উত্তর পাঠাইতে দেখিলেন না। ইহার পর যখন মাসাধিক কাল অতীত হইল, অথচ প্রতিমা কোনও প্রত্যুত্তর দিল না, তখন তিনি কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন।

কিন্তু এক বিষয়ে রামপ্রাণ বাবুর ভাবনা দূর হইল না। যদি বিমলেন্দু পত্রের উত্তর না পাইয়া স্বয়ং পুরীতে উপস্থিত হয়! এ কথাটা ভাবিতেই তাঁহার মন অস্থির হইয়া

উঠিল; কি যে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে, এই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে তিনি আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া এক দিন প্রকাশ্যে প্রতিমাকে বলিলেন, "চল না মা, দিন কতক বেড়িয়ে আসি। তুমি ত অনেক দিন থেকে সেতুবন্ধে যাবে ব'লে আসছ, চল না, সেতুবন্ধেই যাই। দক্ষিণের মন্দিরের মত মন্দির ভূভারতে কোথাও নেই। শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী, মদুরা, রামেশ্বর, এ সব তীর্থে যা দেখবে, তার তুলনা কোথাও নেই। এখানে ত অনেক দিন রইলে।"

প্রতিমা প্রথমে নীরব রহিল, তাহার পর অবনত-মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "না বাবা, কোথাও যাবার আর ইচ্ছে নেই। এই এখানে মঠের কাযেই লেগে যাব। মঠের ঠাকুরবাড়ী আর ধর্ম্মশালা প্রায় শেষ হয়ে এলো, এ সময়ে আমি চ'লে গেলে বাকী কাযটা প'ড়ে থাকবে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "বেশ যা হ'ক, তুমি ত সব বন্দোবস্তই ক'রে দিয়েছ, মাতাজীর হাতে টাকাও দিয়ে রেখেছ, তিনিই বাকীটা সেরে নেবেন। তোমার থাকবার এখন আর বিশেষ দরকার কি? তার চেয়ে বরং বেড়িয়ে এসে এখানে ফিরে একবারে তৈরী মঠ দেখে কত আনন্দ পাবে। কেমন, তাই ভাল না?"

প্রতিমা এ কথার কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই একটা ছুতা খুঁজিয়া বাহির করিল; বলিল, "আমরা এমন ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে শৈলর পড়াশুনোর কি হবে? ওকে ত ফেলে যেতে পারব না।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব। পয়সা খরচ করলে কিছুরই অভাব থাকে না। কি বল?"

প্রতিমা দৃঢ় স্বরে বলিল,"না বাবা, তা হয় না, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। বিশেষ, আমি মনে করছি, আসছে মাস থেকে আমি মঠেই থাকব, তবে রোজ এসে তোমাদের দেখে যাব।"

রামপ্রাণ বাবু প্রমাদ গণিলেন। তিনি এক আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহার উপর আর এক আশঙ্কা দেখা দিল। তাঁহার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। অন্যায় জিদের বশে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরে পরিণত হইয়া এখন পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন, ভগবান্ পতি-পত্নীর যে বন্ধন স্বয়ং ঘটাইয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বহস্তে ছিন্ন করিতে গিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই ফলে এই পরিণতবয়সে তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। অনুতাপানলে তাঁহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

প্রতিমা তাঁহার কাতর দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; দেখিল, তাঁহার মুখে চোখে গভীর দুঃখের ও অনুশোচনার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে স্নেহভরে তাঁহার পাকা চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাবা, কেন এত ভাবছ? আমি মঠে দেবতার সেবায় বড় আনন্দ পাই, মাতাজীর উপদেশ শুনে মনে বড় শান্তি পাই, আমার কোনও কষ্ট নেই। তুমি ভাবছ, তোমার মেয়ে মাতাজীর মত তপস্বিনী হয়ে যাবে? তপস্বিনী হওয়া কি সহজ কথা!"

রামপ্রাণ বাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তার আর বাকী কি? মঠে গিয়ে বাস করবে, এত দিন যে আরাম আর সুখে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছ, তা ছেড়ে এর মধ্যেই একাহারী হয়েছ, শয্যা ত্যাগ করেছ, গৈরিক পরতে আরম্ভ করেছ,—ভাব কি, এতে তোমার বুড়ো বাপ মনে ব্যথা পায় না? আমার আর কে আছে, মা? আমার এ সব বিষয়সম্পত্তি কার জন্যে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। প্রতিমার নয়ন দুইটিও সে সময়ে অনার্দ্র ছিল না। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথা হইল না। তাহার পর রামপ্রাণ বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার যা বলবার, তা বললুম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ কর। দেখ মা, তোমায় আমায় আর রেখে ঢেকে কথা কওয়া চলে না। আমার আরও কিছু বলবার আছে, সবই খুলে বলছি। তুমি যে ভাবে থাকতে চাও, সেই ভাবেই থাক, আমার জীবনের বাকী কটা দিন এক রকমে কাটিয়ে দেব। আর বাধা দেবো না, একবার বাধা দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, আমার আর কটা দিন? কিন্তু তার পর? নিজের ভবিষ্যৎ কিছু ভেবেছ কি? কলকাতা থেকে যে চিঠি

এসেছিল, তাতে কি ছিল, জানি না। তোমার ভাব দেখে মনে হয়েছে, তাতে এমন কিছু ছিল, যাতে তোমায় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, তুমি এখনও তাকে ক্ষমা কর নি। হয় ত ইভের সঙ্গে তার প্রতারণাই এখন তোমাদের মিলনের পক্ষে বাধা দিচ্ছে। তাই মনে ভেবেছিলুম, যখন তোমাদের আপাত-মিলনের সম্ভাবনা নেই, তখন কলকাতা হ'তে দূরে চ'লে যাওয়াই ভাল, না হ'লে কোন্ দিন হয় ত সে এখানে এসে পড়বে। তখন তুমি এই মনের অবস্থা নিয়ে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবে, যাতে ইহকালে আর তোমাদের মিলনের সম্ভাবনা থাকবে না। সেটা কি ভাল? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তোমার সুমুখে এখন আস্ত জীবন প'ড়ে রয়েছে। এ বয়সে সংসার ছেড়ে দিয়ে তপস্বিনী সেজে কি পরে সমস্ত জীবনটা এই রকমে কাটিয়ে দেবে? তা হ'লে তোমার বিষয়-আশয়ের কি হবে? শৈলর কি হবে? যাতে তোমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা একবারে পাকা হয়ে না যায়, তারই জন্যে এখন কিছু দিন তীর্থে নিয়ে যেতে চাইছি। পরে সময়ে হয় ত তোমার মন ফিরতে পারে। তখন কি হবে? হাতের পাশা এক বার ফেললে ত আর ফেরে না। আমি স্বীকার করছি, আমিই এই অনিষ্টের মূল, কিন্তু এখন আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে। আমি কায়মনে বলছি, এখন যদি সে ফিরে এসে তোমায় নিয়ে সংসার করতে চায়, তাতে আমি খুবই আনন্দ পাব।"

প্রতিমা এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিয়া যাইতেছিল, এই বার অতি মৃদুস্বরে বলিল, "যে এক জনকে প্রতারণা করেছে, সে যে আর কাউকে করবে না, তা কি ক'রে বিশ্বাস করবো?"

রামপ্রাণ বাবু আগ্রহভরে বলিলেন, "তাই ত এখন তীর্থে তীর্থে বেড়াতে বলছি। যদি তোমার প্রতি তার টান সত্যি হয়, তা হ'লে সে কোথাও থাকতে পারবে না, যেখানেই যাও, তোমার সন্ধান করবে। সে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ক্ষতি কি?"

প্রতিমা স্বামীর সম্পর্কে প্রায় কোন কথা পিতার সহিত কহিত না। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার ভাবপরিবর্ত্তন হইল, সে একটু উচ্চস্বরে বলিল, "আজ তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি, বাবা। এক দিন দার্জ্জিলিঙ্গে সেধে যখন তার মন ফিরুতে গিয়েছিলে, তখন সে কি ব্যবহার করেছিল, মনে আছে কি? আজ ইভ নেই বলেই কি তার সব দোষ কেটে গেছে? না বাবা, আর উপরোধ-অনুরোধ কোরো না। যেমন আছি, তাই ভাল। এখানে এলেই যে একটা বিষম কাণ্ড ঘট্‌বে, তা ভেবো না। যদিই বা তাই হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। যাক্, আসছে বুধবারে মঠে বষ্টুম-ভিখিরী খাওয়ান হবে, তাতে তোমাকেও যেতে হবে। বল, যাবে?"

রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হইলেও তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা, যাব বৈ কি? আমরাও ত বষ্টুম-ভিখিরী, মার মঠে প্রসাদ পেতে যাব না?"

প্রতিমা বলিল, "না বাবা, তামাসা না, সত্যি যেতে হবে। শুধু যাওয়া না, তোমায় দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য উদ্ধার ক'রে দিতে হবে। মাতাজী আর আমি মেয়েমানুষ, আমরা এত বড় যজ্ঞির কি বুঝি? তুমি এমন কত যজ্ঞি বাড়ীতে দিয়েছ।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা আর জানি নি! আমার মা অন্নপূর্ণা হয়ে সে সব যজ্ঞিতে না দাঁড়ালে যজ্ঞি ত পণ্ড হয়ে যেত! মাতাজীকে বোলো, এ যজ্ঞির সব খরচটা এই বুড়োই দেবে। কি কি লাগ্‌বে, কত লোক হবে, তার একটা ফর্দ্দ দিও। তার পর আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। কেমন, সেই ভাল না?"

প্রতিমার মুখখানি মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মত হাসিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মাতাজীকে এই সংবাদ দিতে গেল।

প্রতিমা চলিয়া গেলে রামপ্রাণ বাবু কিছুক্ষণ একা সেখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রতিমা থাকিতে তাঁহার মুখে যে হাসি বা আনন্দের রেখা দেখা দিয়াছিল, প্রতিমা চলিয়া গেলে তাহা মুহূর্ত্তে অন্তর্ধান করিল; মুখমণ্ডল আবার অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। তিনি এক বার অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"যার দাঁড়িয়ে থেকে সব করবার কথা, সে আজ কোথা? নিতান্ত অপরিচি অজানার মত সে আজ কত দূরেই রয়েছে! অদৃষ্ট!"

নিষ্ফল আক্রোশে ও ক্ষোভে রামপ্রাণ বাবুর সম অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যাহারা তাঁহা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়,—মনে করে, তিনি কতই

সুখে আছেন,—তাহারা কি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সহিত অবস্থার বিনিময় করিতে অভিলাষী হইতে পারে? ছার ঐশ্বর্য্য! এই ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত মনের সুখ দিতে পারিতেছে না। তবে এই ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? অতি দুঃখী দিনান্তে শাকান্ন খাইয়াও যদি মনের তৃপ্তিতে থাকিতে পায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যে তাহার প্রয়োজন কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, আরাম, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি সবই দিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে যাহা দুর্লভ—সেই মনের তৃপ্তি মনের সুখ দিতে পারে কি? দূর হউক ঐশ্বর্য্য, এখন হইতে দুই হস্তে সাহারার বালুকার মত উত্তপ্ত অসার ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিব। কাহার জন্য ঐশ্বর্য্য? কাহার জন্য ভোগ? কাহার জন্য প্রভুত্ব?

বৃদ্ধের নয়ন-প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বহিষ্কার

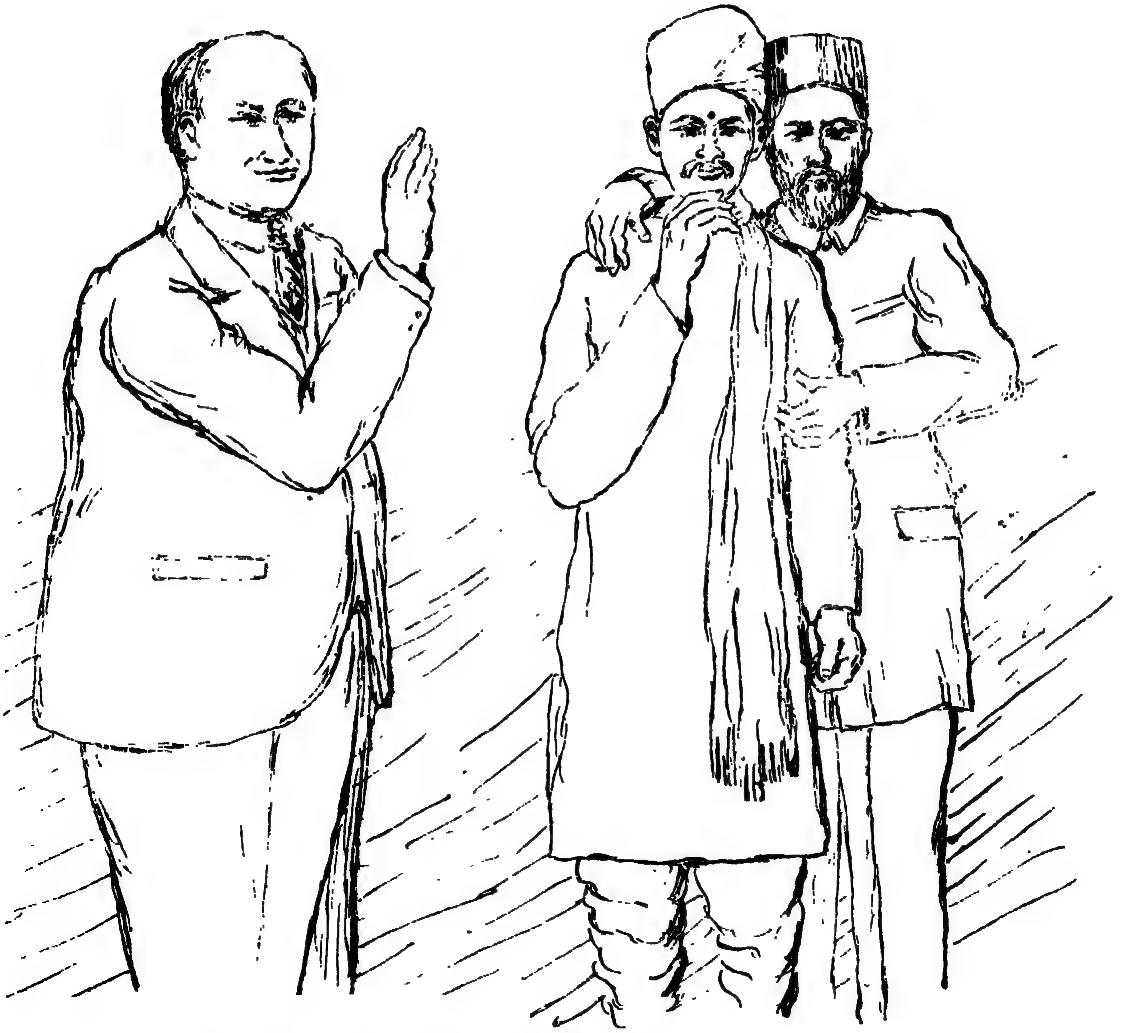

মডার্ণ বৃন্দা।—"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক কুঞ্জে যেতে আর পাবে না,
প্রতিজ্ঞা করেছে রাই কাল বদন আর হেরবে না।"

বিবাগীর বিড়ম্বনা

(নেহাৎ গল্প নয়)

"নিশ্চয়ই।"

"কখ্‌খনো না। বা রে বা, পড়া-শুনো করব আমি, আর সর্দ্দারি করবে তুমি?"

"ছোট ভাইয়ের তদারক করা বড় ভাইয়ের একটা কর্ত্তব্য। যখন বড় দাদা হয়েছি—"

"গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল। আগে নিজের চরকায় তেল দাও গে, দাদা।"

"কি! বড় দাদার সঙ্গে এই ভাষায় কথা কইতে হয়? যত কিছু না বলি, তত বাড়িয়ে তুল্‌ছিস যে!"

"যত কিছু না বলো? রক্ষে কর দাদা—এই যদি তোমার কিছু না বলা হয়, তা হ'লে বলা না জানি কি বস্তু। এইতেই জীবন দুর্ব্বহ—সে দিন রামা খান্‌সামাও বল্‌ছিল।"

"ফের? বারণ ক'রে দিয়েছি না, কথায় কথায় চাকর-বাকরের নাম না কর্‌তে? রামা খান্‌সামার সঙ্গে নাম করা আমি হেন দাদার?—সাক্ষাৎ টইটুম্বুর ব্যারিষ্টার দাদা—"

"হ্যাঃ, ঢের ঢের অমন ব্রীফলেস ব্যারিষ্টার দেখেছি।"

"তবে রে?"—ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্। "বেরো বল্‌ছি বাড়ী থেকে। রামা—এই রামা, দে ত ছোঁড়াকে বাড়ী থেকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে, দেখি একবার কিসে ওর অত মুরদ।"

তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে সেণ্টজেভিয়ার কলেজে সবে আই এস সি পড়তে আরম্ভ করেছি। একেই সে সময়ে রাগটা মাথায় একটু চট্ ক'রেই ফুটে ওঠে, তার ওপর এক জন বেলজিয়ান প্রফেসর আমাদের 'জেণ্টল্‌ম্যান' ব'লে সম্বোধন করার ফলে মনের নিহিত প্রদেশে আত্মসম্মান বা সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট বস্তুটির অঙ্কুর হু হু শব্দে প্রায় বনস্পতিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

কাউকেই বড় ব'লে মান্‌তাম না—এক বাবাকে ছাড়া। মান্‌বার বিশেষ কেউ ছিলেনও না। বাড়ীতে সব শুদ্ধ আমরা চারটিমাত্র প্রাণী—বাবা, পিসীমা, দাদা ও বৌদি। বাবার ছিলাম আমি আদুরে ছেলে ও পিসীমার কাছে ত আমার সাত খুন মাফ। কাযেই দাদা বয়সে আমার চেয়ে ৭।৮ বৎসর বড় হ'লেও তাঁকে ত এক রকম গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তাম না বল্‌লেও হয়। ফলে আমার মস্তকটি যে অতি সন্তোষজনকরূপে চর্ব্বিত হচ্ছিল, সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ ছিল না।

সে দিন শীতের সকাল। পৌষমাসের মাঝামাঝি। কিন্তু রামা খান্‌সামাকে দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়ানর প্রস্তাবে আমার মেজাজের টেম্পারেচার একেবারে সড় সড় ক'রে 'ফীবার হীটে' চ'ড়ে গেল। আমি সেই এক কাপড়ে ছেঁড়া চটি পায়েই বাড়ী ছাড়লাম।

২

পাশের গলির একটা বাড়ীতে থাক্‌ত আমার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী পারুল। সে ডায়োসিসান স্কুলে পড়ত। তার তের বছর বয়স। পাড়ার সকলেই বল্‌ত ফুট্‌ফুটে মেয়েটি। অনেক দিন থেকেই আমাদের প্রতিবেশিনী। তার ছিল কেবল দিদিমা ও এক বিপত্নীক মামা। ছেলেবেলায়ই সে পিতৃমাতৃহীনা। কিন্তু দিদিমা ও মামার কাছে বড় আদরে মানুষ। পারুলের দিদিমাকে আমি দিদিমা ডাক্‌তাম ও মামাকে মামা ডাক্‌তাম। আমাদের বাড়ীতে তাঁদের খুবই আসা-যাওয়া ছিল। মামা ছিলেন বাবার বন্ধু ও দিদিমা ছিলেন পিসীমার ভারি ভক্ত। লাঠির ওপর ভর ক'রে এই সপ্ততিবর্ষীয়া বৃদ্ধা প্রায়ই দুপুরে আমার পিসীমার কাছে আস্‌তেন—কাশীরাম দাসের অমৃত সমান কথা শুনে পুণ্য অর্জ্জন করতে।

"অমিত দা—ও অমিত দা, কোথা যাচ্ছ ভাই, এই অবেলায়? আজ ত ছুটী।"

"কোথাও না।" হন্ হন্ হন্। (পারুলের গলি দিয়ে আমি ইচ্ছে ক'রেই যাচ্ছিলাম। কারণ, সকালবেলাটা ছুটীর দিন সে প্রায়ই পা এলিয়ে গলির উপরকার বারান্দায় ব'সে পড়া মুখস্থ করত।)

"শোনো শোনো অমিত দা একটি বার—"

"না না, সময় নেই।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, বিশেষ দরকার—"

"আঃ কি মুস্কিল।" ফির্‌লাম।

"কোথায় যাচ্ছিলে অমিত দা, এ অসময়ে স্নান-টান না ক'রে? দুটো মুখে না গুঁজে টোক্‌লা মাথায়, ছেঁড়া চটি পায়ে—তার ওপর এক ওভারকোট চাপিয়ে? এ কি বেশের ছিরি বল ত?"

"এই পাশের দোকান থেকে দাদার জন্যে একটা সানাটোজেন কিনে আন্‌তে যাচ্ছিলাম।"

"বাজে কথা। দাদা সাত জন্মেও সানাটোজেন খান না।"

"এই দরকারের জন্যে আমাকে তিন ক্রোশ পথ থেকে ডেকে আনা হ'ল?"

"অমিত দা, রাগ কর কেন ভাই?"

একটু নরম হয়ে বল্‌লাম, "দাদা খান কি কে খান, সে বিচারের ভার ত আমার নয়। দাদা বল্‌লেন—যাচ্ছি।"

পারুল মুখ টিপে একটু হেসে বল্‌ল, "ওঃ, কি আমার শিষ্ট শান্ত লক্ষ্মী ছেলেটি রে! তোমাকে ত আমি চিনি না। আহা, এমন দাদার নেওটো ছেলে কি কলিযুগে কেউ সাত জন্মেও দেখেছে গা?"

দিদিমার বেশী আদরে পারুলটার মাথা খাওয়া হচ্ছে। নইলে বার বছরের মেয়ের মুখে এমন পাকা পাকা কথা! আমার উষ্ণ মস্তিষ্ক পারুলের কাছে সমবেদনার পরিবর্ত্তে এই ঠাট্টায় একেবারে আগুন হয়ে উঠল। আমি বল্‌লাম,—"মেমসাহেবের কাছে একটু ইংরিজি পড়লেই মানুষ চেনা যায় না। আর দিশী স্কুল-কলেজে পড়লেই কিছু মানুষ এমন অসভ্য হয় না যে, তাদের মুখ দেখ্‌লেই চাষা ব'লে ভুল হয়।"

পারুল আমার তর্জ্জন-গর্জ্জনে অনেকটা অভ্যস্ত হলেও এতটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে,—"তোমার আজ বাড়ীতে কি হয়েছে অমিত দা যে, তুমি একটা তুচ্ছ ঠাট্টায় হঠাৎ এমন অগ্নি-শর্ম্মা হয়ে উঠলে? আমি কি ভাই তোমাকে অসভ্য বলেছি, না বল্‌তে পারি কখনও?"

রাগটা একটু পড়ল। একটু নরম সুরে বল্‌লাম,—"তবে কেন সময় অসময়ে অমন বাঁকা বাঁকা কথা বল? বিশেষ ক'রে আজকের দিনে যখন আমি জন্মের মত বিবাগী হয়ে চ'লে যাচ্ছি।"

"ও মা, কি হবে! জন্মের মত বিবাগী হয়ে—এ সব কি কথা অমিত দা? কোথায়ই বা যাচ্ছ?"

আমি চুপ।

তার চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল।

"লক্ষ্মীটি ভাই, বল না কোথায় যাচ্ছ, কি হয়েছে?"

একটি নারীহৃদয়কে এতটা শঙ্কিত ক'রে 'তোল্‌বার ক্ষমতা আমার আছে! মনে একটা বিরাট পৌরুষ-গৌরব অনুভব কর্‌লাম। কিন্তু পারুলকে আরও ব্যস্ত করতে হবে ভেবে সমানে চুপ ক'রে রইলাম।

"বল্‌বে না অমি-দা, কোথায় যাচ্ছ?"

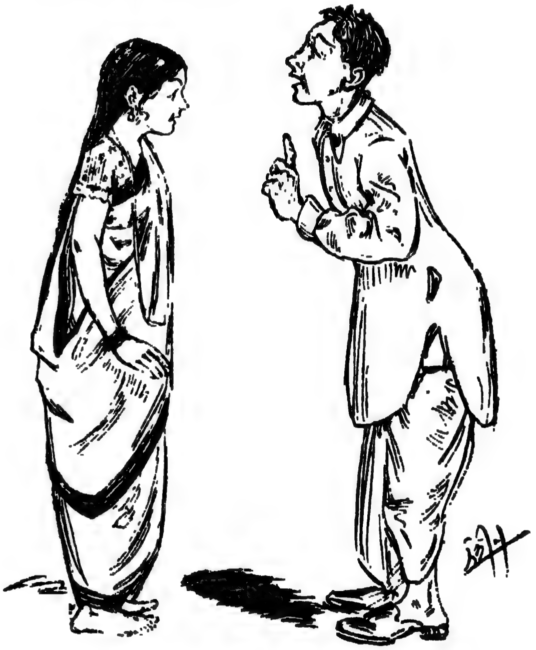

বলবে না অমিদা, কোথায় যাচ্ছ?

"জানি না।"

পারুলের চোখ দুটি এবার জলে উপছে পড়ল। কিন্তু সে বড় অভিমানী মেয়ে। ঠোঁট ফুলিয়ে শুধু "বেশ" ব'লেই মাদুরে ব'সে হাতের বইখানি আবার খুলে বস্‌ল।

আমার ইচ্ছে ছিল, পারুলকে দিয়ে আরও একটু সাধিয়ে তবে সব কথা বল্‌ব। কিন্তু তার অভিমানের দৃশ্যে আমারও মনে কেমন একটা অভিমান এল। জগতের হৃদয়হীন অত্যাচারে খিন্ন হয়ে যখন আমি তার কাছে

ছুটে এসেছিলাম দুটো সান্ত্বনার কথা শুন্‌তে, তখন তার নিজের অভিমানটাই তার কাছে এত বড় হ'ল ? বেশ !—"চল্‌লাম।"

পারুল কোনও কথা বল্‌ল না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, সে অনেক চেষ্টা ক'রে তার উচ্ছল অশ্রু নিরোধ ক'রে আছে। মনে হ'ল—কাযটা ভাল হ'ল না। কিন্তু পারুল আর এক বারও জিজ্ঞাসা কর্‌তে ত পার্‌ত !

রাস্তায় বেরিয়েই মনে হ'ল, দোষটা আমারই বেশী। সে দিন কি একটা নভেলে পড়েছিলাম যে, মেয়েদের অভিমানই একমাত্র সম্বল। তাই এ অভিমানের মর্য্যাদা না রাখাটা পৌরুষ নয়—চাষামি। ভাবলাম ফিরি। কিন্তু ভারী বাধ বাধ ঠেক্‌তে লাগল।

এমন সময়ে পারুলের আনত মুখখানি চোখে পড়ল। সে বইখানি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের উপরে দুটি হাত রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হ'ল, সে ইতস্ততঃ করছে আর একবার ডাক্‌বে কি না। তার এলো চুলের দু'চারটে গুচ্ছ শীতের ঝির্‌ঝিরে বাতাসে এ-ধার ও-ধার উড়ছিল। হঠাৎ তা'র কালো চোখ দুটির মৌন আহ্বানে আমার মনটিও যেন দুলে উঠল। ভাবলাম, সে একবার অমিত-দা ব'লে ডাক্‌লেই আমি ফিরি।

এমন সময়ে—ওরে বাবা রে—এ কি এ! একটা লাল ট্যাক্সি যে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে! হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলাম। মোটর-চালক ঘনশ্মশ্রু শিখ-প্রভু আমার অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই আমার সঙ্গে আপত্তিকর সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন ক'রে নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে গেলেন।

লজ্জায় অপমানে আমার কর্ণযুগল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমার 'একমেবাদ্বিতীয়' বিশ্রব্ধা পূজারিণীর ঠিক নাকের সামনেই কি আমার সযত্ন-পুষ্ট পৌরুষ-অভিমান বিধাতার এম্‌নি ক'রেই ধূলিশায়ী ক'রে দিতে হয়! পারুল হেসে উঠল। আমি দ্রুতপদে তা'দের গলির মোড় বেঁ'কে হরিশ মুখুয্যের রোডে পড়লাম—তার কৌতুক-দৃষ্টি হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্যে।

৩

আলিপুরের পুল, বর্দ্ধমানের রাজবাটী, বেহালার পথ, বেহালা, বঁড়শে বেহালা। লক্ষ্যহীন ভাবে চ'লেইছি।...

বেলা তিনটে। হঠাৎ দু'টি গভীর সত্য আবিষ্কার করা গেল। (১) উদর-প্রভুর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে ও (২) মাথার মধ্যে যা কিছু জমাট বস্তু ছিল, বেমালুম জলবৎ তরল হয়ে পড়েছে। পকেটে হাত দিতেই একটি সিকি হাতে ঠেকল। পাশেই একটি ময়রার দোকান। মনে হ'ল, সিকিটিও কেন এমন হৃদয়হীন যে, আধুলি না হয়ে তার সিকিত্বটিকেই এমন একান্তভাবে অবলম্বন ক'রে রইল? তবু মন্দের ভাল ভেবে সিকিটি হাতে ক'রে মিষ্টান্ন-আপণির দিকে অগ্রসর হলাম।

এমন সময়ে "হঠ্ যাও সাম্‌নেওয়ালা, হঠো হঠো" শব্দ ও পিঠে শপাং ক'রে এক চাবুক। সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শনে আমার উল্লম্ফন প্রদান ও পাশেই একটি খানায় পতন এবং জুড়িগাড়ীর সারথি-প্রবরের মুখে আমার আকৃতির সঙ্গে এমন এক চতুষ্পদ ভারবাহীবিশেষের সাদৃশ্যবর্ণন যে, সাদৃশ্যের চিন্তাও দ্বিপদীমাত্রেরই আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানের একটু পরিপন্থী না হয়ে পারে না।

"উঃ", ব'লে উঠে দেখলাম যে, কনুয়ের এক যায়গায় ও চিবুকের নীচে দু' যায়গায় বেশ একটু ছ'ড়ে গেছে। কিন্তু সে জন্য যতটা ক্ষোভ হোক্ না হোক্, পাশের একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতীর সমবেদনার দৃষ্টিপাতে যেন একটু বেশী রকমই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। সহানুভূতির স্পর্শ যে স্থান, কাল ও পাত্রীভেদে তৃপ্তিদায়কের ঠিক উল্টো গোছের অনুভূতির প্রদায়ক হ'তে পারে, এ কথা সে দিন যেমন উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, তেমন বোধ হয় জীবনে আর কখনও করিনি।...

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সৃষ্টিতত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করা গেল। সেটি এই যে, দুর্ভাগ্য একা আসে না। কারণ, খানা থেকে উঠতে না উঠতে সিকিটি হাত ফস্‌কে গড়াতে গড়াতে একটি ড্রেণের মধ্যে প'ড়ে গেল।...

মাথার মধ্যে একটু আগের তরলতা যেন অকস্মাৎ 'সলিড' হয়ে গেল। ফলে সেটা ঋজুভাবে না থেকে একটু নুয়ে পড়বারই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বস্‌ল। তাড়াতাড়ি পাশের একটি দাওয়ায় বস্‌লাম। সেখানে একটু ছায়া ছিল।

খট্ খট্ খট্। "দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর" গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে গাইতে খড়ম পায়ে মোটা নামাব

গায়ে এক বিপুলকায় বৃদ্ধ দাওয়ায় এসে তারস্বরে ডাকলেন, "রেমো, ও রেমো—রামচরণ আঃ! বেটা মরেছিস্ না কি? না হয় সেইটেই খুলে বল, আমার হাড় জুড়ুক।"

ব'লে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুপস্থিত নিষ্ঠুর পরিচারকসম্প্রদায়কে উদ্দেশ ক'রে নানা সারগর্ভ তিরস্কার বিড় বিড় ক'রে আওড়ে যেতে লাগলেন;—"তোদের শরীরে কি দয়া-ধর্ম্ম একটুও নেই? ডেকে ডেকে কাহিল মানুষ আমি—"

ব'লেই আমার উপর তাঁ'র চোখ পড়ল ও তিনি সবিস্ময়ে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠলেন।

"অ্যাঁ! ওখানে কে হে ছোকরা! আমার নাকের ডগার সাম্‌নে আমারই দাওয়ায় বেহায়ার মত ব'সে! কলিযুগে দিন দিন হ'ল কি? কোন্ জাত, তাই বা কে জানে? দূর হও, দূর হও বল্‌ছি! নইলে পুলিস ডাকব।"

"একটু ব'সে আছি মশয়। আপনার ত ও-তে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই?"—

বৃদ্ধ মুখ ভেঙিয়ে বল্‌লেন, "না, ক্ষতি-বৃদ্ধি থাকবে কেন? সে দিন নগদ এগার টাকা সাড়ে তের আনা দিয়ে আমি নিজে ব'সে থেকে দাওয়াটি সিমেণ্ট করিয়েছি। বসলে সিমেণ্ট ক্ষ'য়ে যায় না? দূর হও বল্‌ছি নইলে—পাহারাওয়ালা, এই পাহারাওয়ালা সাহেব, দয়া করকে একবার ইধারকে আস্‌নেকো আজ্ঞে হয়।"

"যাচ্ছি মশয়, যাচ্ছি। খুব দয়াধর্ম্মওয়ালা লোক যা হোক। একটা লোক শুধু ছায়ার জন্য একটু বসেছিল—"

"ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে! তোমার জিরণোর জন্যেই আমি খাটের পয়সা খরচ ক'রে দাওয়াটি মেরামত করিয়েছি কি না? এটা কি মেড়োর চটি, না খেষ্টানের বেঞ্চি যে, যে আসবে, সেই একবার ক'রে ব'সে জিরিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার—"

"থামুন মশায়, থামুন, আমি যাচ্ছি।"

আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। পথে একটা জলের কলে এক পেট জল খেয়ে নিলাম। তাতে ক্ষুধার একটু সাময়িক নিবৃত্তি হ'ল; কিন্তু মাথাধরাটা কম্‌ল না।

যাই হোক্, বরাবর ডায়মণ্ড হারবারের দিকে সোজা চল্‌তে আরম্ভ করলাম।...ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে ঢ'লে পড়লেন। দেখতে দেখতে শীতের ক্ষণস্থায়ী গোধূলিতে সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘনিয়ে এল। কেবল আকাশে দু'একটি পলাতক মেঘখণ্ড তপনদেবের নেপথ্যের আলোর দিকে আশা-রক্তিম হয়ে চেয়েছিল—যদি এ অভিনন্দনে তাঁ'র অদৃশ্যমান রাঙা আলোটির চুম্বনকে একটুও ধ'রে রাখা যায়। কিন্তু হিমের গাঢ় ছায়ায় আসন্ন অন্ধকারের আভাস বড় শীঘ্র ফুটে উঠল।...

ফিরব?...নাঃ! বিশেষতঃ এতক্ষণ বাড়ীতে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে ও যেটা সব চেয়ে বড় কথা, পারুলও জেনে গেছে যে, দাদা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার নষ্ট মানের পুনরুদ্ধার করতে হ'লে একমাত্র পন্থা হচ্ছে মানুষ হয়ে দেশের দশের এক জন হয়ে বাড়ী ফেরা। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। তখন যশো-জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে কেমন ক'রে দাদাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাব, ভাবতে ভাবতে দৈহিক ক্লান্তিও ভুলে বিভোর হয়ে চলতে লাগলাম। হঠাৎ বাঁ দিকে একটা ট্রেণের আওয়াজে চমকে উঠলাম। দেখলাম, একটা রেল-ষ্টেশন।

ষ্টেশনে একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সাইডিঙে প'ড়ে ছিল। একটু শীত শীত করছিল। দুর্গা ব'লে ঢুকে পড়লাম। হায়, রোজ এ সময়ে পিসীমার যে উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না, পাছে ঋতুপরিবর্ত্তনরূপ সঙ্কটসময়ে হিম লেগে চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় কালব্যাধি আমার শরীর-রূপ মন্দিরে মৌরুসী পাট্টা নেয়! (পিসীমার কাছে কোনও ঋতুই কখনও স্থায়ী হ'ত না। ঋতুমাত্রই তাঁ'র কাছে গাঢ় আশঙ্কার বিষয় ছিল, তার পরিবর্ত্তনশীলতা-রূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতার দরুণ।)

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, যেন আমার বাঁ পা-টা ডান পায়ের সঙ্গে তার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধটি অস্বীকার ক'রে ধীরে ধীরে ব্যোম-পথে ধাবমান হচ্ছে। মনটা বেশ একটু খারাপ হয়ে গেল। রাজনীতিতে আমার মত উৎকট অসহযোগ-প্রবণ হ'লেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অসহযোগের এ দৃশ্যে আমার চিত্ত একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ার দরুণ আশা করি, কপটতার অভিযোগে পড়ব না।

এমন সময়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুক টিপ টিপ করছিল। জেগে বাঁ পায়ে হাত দিয়ে তাকে যথাস্থানে অবস্থিত দেখে

ভারী আরাম বোধ হ'ল —"আঃ, কি বিশ্রী স্বপ্ন...যদি সৃত্যি হ'ত..."

এমন সময়ে হঠাৎ আবার সেই অনুভূতি। কি ভয়ঙ্কর। বাঁ পা-টা যে সত্যি সত্যিই উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে! কি সর্ব্বনাশ। আমি জেগে, না এখনও স্বপ্ন দেখছি। আমার বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা লাল পাগ্ড়ী—কি হবে? শেষটা কি না পুলিসের হাতে পড়লাম!—"পিসীমা —"

"আরে—হিঁয়া পিসীমা কঁহা মিলেগা? সমুরা মিল্ সকৃতা।" ব'লে সে নিজের অনুপম রসিকতায় খুব এক চোট নিঃর্চায় হেসে নিল।

পাহারাওয়ালাও তা হ'লে রসিকতা করার প্রয়াস পায়! এক দিন বিবাগী হয়েই এ অভাবনীয় অভিজ্ঞতা!...পরে না-জানি কপালে আরও কত কি কর্ম্মভোগ আছে!···

একটু সাহস ক'রে বল্লাম, "পাহারাওয়ালাজী! ওঠো, হামারা পা হ্যায়। বুঝা?"

"আরে বুঝা ত বটে! বাকি হিঁয়া পা রখ্নেকা জগা নেহি?"

"কাহে?'

"আরে—কেয়া মুস্কিল—অর্ডার নেহি।"

হা অদৃষ্ট! একটা ভাঙ্গা প'চো গাড়ী। তা'র মধ্যে একটা রাত কাটালেও কোম্পানীর মহা ক্ষতি!...

কিন্তু কোথায় যাই! প্ল্যাটফরমের এ-ধার ও-ধার ঘুরে শেষটা হঠাৎ চোখে পড়ল যে, দুই সারি মালের মধ্যে একটু যায়গা আছে। মালগুলির উপরে একটা টার্পলিন বিছানো ছিল। তার মধ্যেই অগত্যা আশ্রয় নিতে হ'ল।...

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, দাদা অনুতপ্ত স্বরে বল্ছেন, "অমিত, মাপ কর ভাই আমাকে। আমি বুঝতে পারিনি তুই কে—তুই ছল্তে এসেছিস্, তা কে জানত?"

আমি উত্তরে যেন দাদার পিঠ চাপড়ে বল্লাম, "দাদা, কথায় বলে না যে, দাঁত থাক্তে লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না? যাক্, চল, আমি তোমাদের মাফ করলাম, কিন্তু দেখো, আর কখনও যেন —"

এমন সময়ে মনে হ'ল, দাদা যেন আমার গলা টিপে ধরেছেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আর কি! কাসতে কাসতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মাথার কাছে অরুণালোকে রাশি রাশি ধূলি-কণা চক্ চক্ ক'রে উড়ছে ও এক জন স্থূলকায়া ঝাড়ুদারিণী ধুলারাশিকে একত্র ক'রে কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার নাসারন্ধ্রদ্বয়ের দিকেই প্রেরণ করতে বদ্ধপরিকর।

ধড়মড় ক'রে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। অকস্মাৎ একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এ হেন অপ্রত্যাশিত স্থান হ'তে গজিয়ে উঠতে দেখে স্থূলাঙ্গিনী বিপুলকায়া হওয়া সত্ত্বেও লাফিয়ে সার্দ্ধ তিন হাত দূরে ছিট্কে পড়লেন।

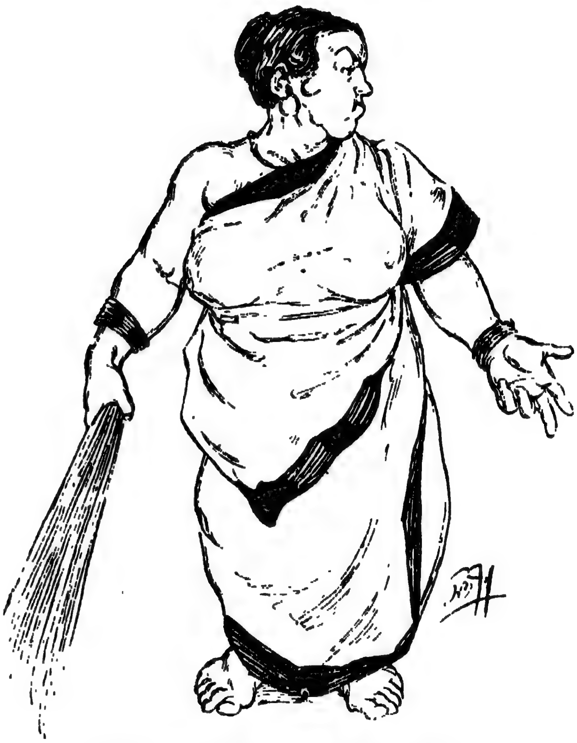

ও মা! একৃখানে যে এক মিন্ষে বট্টেক গো!

"ও মা, একৃখানে যে এক মিন্ষে বট্টেক গো! আমি বলি বুঝি শূয়র বা ভূত হবেক। একৃখানে কি করতেছেলে গো বাছা? হেথা কি নাক ডাকাবার যায়গা না কি গো?"

৪

সেখান থেকে আবার কল্কাতার দিকেই ফিরলাম; আবা চলেইছি। দেখতে দেখতে বেলা সাড়ে আটটা।···কিন্তু চা কৈ? ক্ষুধার তাড়না বরং সওয়া যায়, কিন্তু চা-তৃষ্ণ যে বাঙ্গালী-সন্তানের কাছে অসহ্য। বিশেষতঃ গ রাত্রে অনিয়মে অত্যাচারে মাথাও বেশ ধরেছিল

একটু অন্নভাব আমার গ্রন্থিতে বেদনাসঞ্চার ক'রে আমার চা-পিপাসাকে আকণ্ঠ ক'রে তুলে'ছল।

এমন সময়ে একটা ট্রামের মধ্য থেকে "বাঁধো বাঁধো" শব্দ কানে গেল। দেখলাম, এক বিশালবপু, অসীম-উদর, ক্ষুদ্র-মস্তক, বিরলকেশ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ট্রামের পাদপীঠে (foot board) ভর ক'রে "কুলী কুলা" ক'রে মহাচীৎকার করছেন।

মনে করলাম, বুঝি কাছে কোনও কুলী তাঁ'র নয়নপথের পথিক হয়েছেন। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে কোনও কুলীকেই দেখতে না পেয়ে তাঁ'র ধারে ফিরে তাকাতেই রাগে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল।...তিনি যে হাতছানি দিয়ে আমাকেই ডাকছেন! সাক্ষাৎ নিকষ কুলীনের বংশধরকে কি না কুলী মনে ক'রে ডাকা!

"আমি কুলী না কি?" ব'লে অন্য দিকে বিরাট্ আত্ম-সম্ভ্রমের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলাম।

"আরে ভেইয়া। সরম কোথা? দেখছ না, হামি বুঢ়া মানুষ হচ্ছি। আট ঠো পুইসা দিব। আইসো না।"

"বুডা। উত্রো না। ট্রাম কতক্ষণ তোমার জন্যে দাড়িয়ে থাকবে?"

"আরে কণ্ডক্টর সাব, গোসা করছ কেনে? একটু ঠারো না ভেইয়া।...আইসো না ছোকরা। এগারটা পুইসা--"

পাশেই একটা দোকানে লেখা ছিল, "আপনাদের হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের চিরপরিচিত উচ্চাঙ্গের চা। দুই পয়সায় মূর্ত্তিমতী সুধা। এক চুমুক দিলেই প্রমাণ পাবেন।"

রক্ত-মাংসের শরীর ত।...মোট নামিয়ে নিলাম।

৫

এগার পয়সার মধ্যে দশ পয়সায় দু' পেয়ালা চা, দু' খণ্ড রুটী ও একটা ডিম খেয়ে আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম।

ভাবতে ভাবতে, না না করতে করতে অথচ কি এক অনির্দ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষার টানে হঠাৎ দেখি যে, আমি আমাদের বাড়ীর একটু আগের গলিতে ঢুকে প'ড়ে ধীর-মন্থরগতিতে পারুলদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে চলেছি। মনটা ভারী খুশীতে ভ'রে উঠল। সদ্যস্নাতা পারুল কালকের মতই রেলিঙে ভর ক'রে চুল এলিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে বিষণ্নমুখে তাকিয়েছিল।

"অমিত-দা, অমিত-দা—কি ছেলে তুমি গো—ভিতরে এসো না ভাই লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি..." তার শুষ্ক মুখখানি মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তখন বেলা বারোটা হবে। জান্‌তাম, পারুলের দিদিমা তাঁর তিনতলার ঘরে কাঁথা সেলাই করছেন ও মামা জলের কল দেখতে টালায় বেরিয়ে গেছেন। কাযেই পারুলের সঙ্গে একটু নিরালায় দুটো প্রাণের কথা বল্‌বার সুযোগ হবেই হবে। তড় তড় ক'রে উপরে উঠে গেলাম।

৬

"মা গো! কি চেহারা হয়েছে বল ত? কা'ল কোথা ছিলে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত? আর মেসোমহাশয় ও দাদা কা'ল সমস্ত দিন পুলিস আর বিজ্ঞাপন, এ পাড়া আর সে পাড়া ক'রে সারা। তুমি কি? আমরা ভেবে ভেবে সারা—"

একক আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এতখানি বিক্ষোভ আন্‌তে সমর্থ? মনটা নেচে উঠল, বিশেষতঃ পারুল ভেবে সারা মনে ক'রে।

"চুপ ক'রে যে? যাক্, এখন বাড়ী যাচ্ছ ত?"

"বাড়ী, পারুল? এ জন্মে আর নয়।"

"ও মা, সে কি ভাই! দাদার ওপর রাগ ক'রে তুমি কি পাগল হ'লে?"

আমার কালকের রাগের উদ্দীপনা এল।

"পারুল, তোমার মুখে এই কথা! একটা ব্রীফলেস ব্যারিষ্টার আমাকে অপমান করল, আর তুমি কি না আমাকেই পাগল ব'লে বসলে?"

"ছি অমিত-দা, এমন কথা কি বল্‌তে আছে? যে দাদা তোমায় হাতে ক'রে মানুষ—"

পাখার শীতল হাওয়ায়ও চুল্লীর আগুন জ্ব'লে উঠে থাকে। আমি তীব্রকণ্ঠে বল্‌লাম, "মানুষ করেছেন? পারুল! থাক্—আর না। বুঝেছি, তুমিও আজ আমার বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছ।...তবে আর কেন? যাই, আজ এখনই গিয়ে 'বুড়ীগঙ্গায়' ঝাঁপ দেই।"

"ওঃ! অমিত-দা, তুমি ঠাট্টা করছ। 'বুড়ীগঙ্গায়' কি এখন ডুব জল আছে?"

ভারী রাগ হ'ল। বড় গঙ্গার কথা কেন মনে হ'ল না। মুখ ফিরিয়ে অভিমানের সুরে বল্‌লাম, "ঠাট্টা করবারই আমার মনের অবস্থা বটে। যে কা'ল থেকে কিছু খায় নি—"

পারুলের মুখখানি মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার চোখ দুটি ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে কাতর স্বরে বল্‌ল, "অমিত-দা, মাপ কর ভাই যে, প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞেসা করি নি, তোমার খাওয়া হয়েছে কি না। একটু বোসো ভাই, মাথার দিব্যি রইল যদি পালাও। আমি যা হয় দুটো মুখে দেবার যোগাড় ক'রে "

বাধা দিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে আমি বল্‌লাম, "না, পারুল, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার যদি সহানুভূতি না পাই, তবে সেবাও চাই না।"

"ও মা! সহানুভূতি, সেবা এ সব আবার কি অমিত-দা! তুমি আজ যে খাঁটি বঙ্কিমী ঢঙে কথা কইছ। দেখি —" ব'লে সে আমার কপালে হাত দিয়েই বল্‌ল, "মা গো! তোমার যে জ্বর হয়েছে অমিত-দা। ও! তাই। এসো, আপাততঃ এই ফরাসের ওপর মামার ঐ আলোয়ানটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড় ত। ডাক্তার-বদ্যি আনা ও মেসোমশায়কে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি'খনি।"

"খবর্দ্দার পারুল। বাবাকে কি দাদাকে যদি আমার সম্বন্ধে একটা কথাও বলো, তা হ'লে তোমার আর আমি এ জন্মে মুখ দেখব না জেনো।"

"কিন্তু তোমার যে জ্বর হয়েছে, অমিত-দা!"

আমি বীরের মত অগ্রাহ্যভরে বল্‌লাম, "ও কিছু না। ওকে আমরা আমলই দিই না। আর ..আর ..তা ছাড়া আমার জ্বর হলেই বা কি, আমি মলেই বা কি? আর আমার জন্যে কাঁদবারই বা কে আছে, বলো?"

জান্‌তাম, এ ব্রহ্মাস্ত্র পারুলের উপর ব্যর্থ হ'তেই পারে না। নিমেষে তার দু' চোখে জল উপ্‌ছে পড়ল। সে কাতর স্বরে বল্‌ল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি অমিত-দা, অমন অলক্ষুণে কথা ব'লে আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমার বড্ড কষ্ট হয় "

বল্‌তে বল্‌তে সে তার আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল। ·· আমার মনটা এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভ'রে উঠল। আমার অন্তরাত্মা আমার কানের কাছে গুণ্‌গুণিয়ে গেয়ে উঠল যে, আমার কালকের ও আজকের সমস্ত কষ্ট সার্থক।

রোমান্টিক সুরে বল্‌লাম, "পারুল, মুখ তোলো ভাই। আমি অতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন—অতি — অতি—"

কি মুস্কিল —ঠিক কি এ হেন সময়েই বাক্য হ'রে যেতে আছে! কিন্তু শতচেষ্টায়ও আর যে কথা যোগায় না! এমন ফ্যাঁসাদেও মানুষ পড়ে! শেষে মহা বিব্রত হয়ে বল্‌লাম. "যাক্ গে। আমার একটা কথা রাখবে?"

আঁচল থেকে মুখ না তুলেই পারুল বল্‌ল, "কি কথা?"

"যদি রাখো ত বলি।"

সে রুদ্ধস্বরে বল্‌ল, "তোমার কথা আমি কতখানি শুনি, তা কি তুমি জানো না অমিত-দা আমি " কথাটা সে শেষ করতে পার্‌ল না।

বীরগর্ব্ব ও কারুণ্যের এক খিচুড়ি ভাবে আমার মনটা ভ'রে গেল।

"পারুল, মুখ তোলো ভাই। লক্ষ্মীটি! কেঁদো না। শুন্‌বে না কথা? শোনো। ছি! কান্না কি? শোনো আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমায় চিঠি লিখব — কিন্তু আমার কথা তুমি কাউকে বোলো না। এখন আমি চল্‌লাম।"

এবার সে তার অশ্রুনিসিক্ত মুখখানি তুলে তার কালো চোখ দুটি আমার মুখের ওপর অচঞ্চলভাবে স্থাপন ক'রে বল্‌ল, "না।"

"সে কি?"

সে দৃঢ়ভাবে বল্‌ল, "তুমি যেতে পাবে না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই। পারু, শোনো। আমাকে যে ভাই যেতেই হবে—মানুষ হ'তে। এখন কি আর আমার মানুষ না হয়ে বাড়ী ফির্‌লে আত্মসম্মান বজায় থাকে? কিন্তু তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, তোমাকে আমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখব ও দেখা দেব, যদি তুমিও কথা দাও যে, আমার কথা কাউকে বল্‌বে না।"

একটু চুপ ক'রে কি ভেবে পারুল বল্‌ল, "আচ্ছা, কিন্তু তুমিও কথা দাও যে, তুমি তোমার শরীরের অযত্ন করবে না বা বুড়ীগঙ্গায় ঝাঁপ দেবে না।"

শেষ কথাটার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার ভাব ছিল

না কি? না—না—তার চোখ ছুটি এখনও যে ক্ষান্তবর্ষণ অশ্রুস্ফীত হয়ে আছে। যথাসাধ্য গম্ভীর স্বরে বল্‌লাম, "আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু...কিন্তু ..যত দিন না আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করতে পারি, তত দিন ..তত দিন...তুমি...আমাকে . মানে ."

"আমি তোমাকে কি?"

এ প্রশ্নে আরও বিব্রত হয়ে পড়লাম। ভারী রাগ হ'ল। এ হেন সময়ে এমন গদ্যময় প্রশ্ন করতে আছে? অসহায়ভাবে বল্‌লাম, "এই বল্‌ছিলাম কি, আমাকে... মানে আমাকে মাঝে মাঝে...কি জানো · তোমাকে আমি যে কতটা ..."

হঠাৎ তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল, "দাঁড়াও, আগে দুখানা লুচি ভেজে আনি।"

কুণ্ঠায় আমি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম। কেন মরতে পারুলকে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের কথা বল্‌তে গিয়ে এমন হাস্যাস্পদ হলাম?—যখন পারুলের হৃদয়ের গভীরতা এতটুকুও নেই। ভারী রাগ হ'ল তার ওপর। শেষটায় দার্শনিকের মত এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিলাম যে, অপাত্রের কাছে মনের গভীর ভাব ব্যক্ত করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। যাই হোক্, পারুলের হাতের লুচি সে জন্য কম তৃপ্তিদায়ক মনে হ'ল না।

৭

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল যে, আমার বিরাট মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণাহীনা মেয়েটাকে একবার দেখিয়ে দিতেই হবে আমি কে।...কিন্তু তা করতে হ'লে শুধু যে মানুষ না হয়ে বাড়ী ফেরা চল্‌বে না, তাই নয়, তা করতে হ'লে পথে পথে ঘোরা ছেড়ে মানুষ হ'তে লেগে যেতে হবে—অদম্য, বিরাট, দুর্জ্জয় উৎসাহে।...

কিন্তু কেমন ক'রে মানুষ হ'তে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া যায়? হঠাৎ মনে হ'ল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলে পড়িয়ে মস্ত লোক হয়েছিলেন। সুতরাং পন্থা—প্রাইভেট টিউটর হওন।

কিন্তু কোথায় প্রাইভেট টিউশন? কেমন করেই বা তা যোগাড় করা যায়?...

দিশেহারা হয়ে অন্যমনস্কভাবে চল্‌তে চল্‌তে বীডন ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখি, এক বিরাট জনসমুদ্র একটি শবদেহের পিছনে মহাকীর্ত্তন করতে করতে চলেছে নিমতলার ঘাটের দিকে।

এক জন প্রবীণ গোছের টিকীধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মৃত ভাগ্যবান্ মনুষ্যটি কে?

তাঁহার অশ্রুপূর্ণ চোখ ছুটি বিস্ময়ে চক্ চক্ ক'রে উঠল। তিনি ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"বলেন কি? আমাদের প্রভু যে!" আরও মূঢ়ের মত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এর পরও আর একবার জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না "প্রভুটি কে?"

পাশের একটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"বল কি ছোক্‌রা? জান না? প্রভু যে আধ্যাত্মিকচূড়ামণি তর্কচঞ্চু! বাঙ্গালীর শেষ অবতার। কে হে তুমি?"

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "শেষ অবতার চূড়ামণিটিকে কি রোগে অবতারলীলা সাঙ্গ করতে হ'ল?"

বৃদ্ধের প্রধূমিত বাগ্মিতানলে হঠাৎ যেন ঘি-মাখানো অরণী-কাঠের গুচ্ছ কেউ গুঁজে দিল। তিনি চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন, "রোগ? বাপু হে, কি বল্‌লে? রোগ হবে আমাদের প্রভুর আধ্যাত্মিক তর্কচঞ্চুর? ছোক্‌রা ..আর মুখ দেখিও না; জানো না কি যে, আমাদের ইচ্ছামৃত্যু প্রভু দেহরক্ষা করেছেন শুধু আবার শীঘ্রই জন্ম নেবেন ব'লে?"

একটু বিস্ময়ান্বিত হয়ে বল্‌লাম, "ইচ্ছামৃত্যু?"

বৃদ্ধ চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লেন, "ইচ্ছামৃত্যু নয় ত কি? একশ বার ইচ্ছামৃত্যু, হাজার বার ইচ্ছামৃত্যু, লক্ষ বার ইচ্ছামৃত্যু। যিনি গো-ব্রাহ্মণ ও শিবা-গীতার মহিমা প্রচার ক'রে তর্কে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদের তূলো ধুনে ছেড়ে দিলেন; যিনি বেদবেদাঙ্গ হ'তে যুক্তিবারিধি মন্থন ক'রে হাঁচি টিক্‌টিকীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবিশ্বাসী চূড়ামণিদেরও চোখ ফুটিয়ে দিলেন; যিনি আজীবন বরফ খান নি ও ম্লেচ্ছ করপোরেশনের কলের জল স্পর্শ করেন নি;—এক কথায় যিনি বাঙ্গালার মাথার মণি, না না, ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা, না না, জগতের বিস্ময়, তাঁর ইচ্ছামৃত্যু, তাঁর সম্বন্ধে তুমি সন্দেহ প্রকাশ কর্‌লে! এই পাপেই আমরা যাচ্ছেতাই হয়ে গেলাম।"

পাশের একটি জোয়ান ভক্ত হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "ভটচায মশায়, কেন বক্‌ছেন ঐ একরত্তি ফাজিল ছেলে-টার সঙ্গে? তার চেয়ে বরং দুটো চাপড় দিয়ে ওকে ডিশমিশ ক'রে দিন!"

বিবাগীর একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করাও এমন বিপদ! তাড়াতাড়ি সে স্থান হ'তে অপসৃত হয়ে দুটি পুলিসের সহযাত্রী হয়ে শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে চল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম।

৮

নিমতলার ঘাটে আধ্যাত্মিক-চূড়ামণি তর্কচঞ্চুর অজস্র ভক্ত-বৃন্দ ফুল ছড়িয়ে, কাপড় বিতরণ ক'রে, আশেপাশের লোককে ধাক্কা দিয়ে, নাচানাচি ক'রে, কীর্ত্তন গেয়ে, কারণ-বারি পান ক'রে, দাহকার্য্য সমাধা ক'রে যখন প্রস্থান করলেন, তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

এতক্ষণ জনসঙ্ঘের বিচিত্র ভাবমাতামাতি, হৈ-চৈ প্রভৃতির দৃশ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম ব'লে খেয়াল ছিল না যে, জঠরদেশে পারুলের লুচি-সন্দেশ বহুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পকেটে একটিমাত্র পয়সা ছিল। কিছু বাতাসা কিনে নিমতলার ঘাটের গঙ্গাজল পান ক'রে একটু সুস্থ বোধ হ'ল। বাতাসে ব'সে এ ধার ও ধার তাকাতে লাগলেম।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল নিমতলার ঘাটের এক কোণে। একটি জটাধারী সাধু ধুনী জ্বালিয়ে আসীন ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বক্তৃতাদানে তৎপর। সাধুজীর বপুটি সাধন-ভজনের কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে বেশ পুষ্ট দেখা গেল।

হঠাৎ তাঁহার এক ভক্ত নিমীলিত-নেত্রে গান গেয়ে উঠলেন—

"সেই সময় হে দীনবন্ধু দিলাম তোমায় ভার,
যে দিন মোহকূপে হাতড়ে হাতড়ে দেখব অন্ধকার।
(হরি) জ্ঞাতি-বন্ধু-সুতদারা,
কাম অর্থে মাতোয়ারা,
হয়ে থাকি ভাবি না যে দুস্তর পারাবার।

পা—রা—বা—হরি হে দুস্তর পারা—হাঁ। ঐ সম্। কেমন প্রভুজী?"

কর্কশকণ্ঠে সাধুজী বল্‌লেন, "জিতা রহো বেটা। ঠিক আয়েসে। এই রোকম কোরে ভজনানন্দের সহিত গাঞ্জিকানন্দ-লহরীতে সন্তরণ কোরতে কোরতেই এ ভোবো পারাবার তোরে যাবি রে বেটা। তোর হোবে—হোবে। লে অউর এক ছিলিম ফুঁকে লে।"

ব'লে তিনি তাঁর আর এক টাকওয়ালা কোটরগতচক্ষু ভক্তকে ইঙ্গিত করলেন। সে গাইল;—

"তব নীরে স্নান তব জল পান যেই করে
মা গো সেই ভাগ্যবান্,
সায়াহ্নেতে গাঁজা খেয়ে স্নানে তাজা (সে যে)
বেরহ্মদর্শনের প্রথম সোপান।"

সাধুজী কলিকায় এক বিরাট টান দিয়ে এক মুখ ধূমোদ্গার পুরঃসর বল্‌লেন, "হাঁ—ঠিক ঠিক। গাঁজা না খেলে হোবে না। মোহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখা আসে!"

সাধুজীর ডান-পাশে হাত দশেক দূরে চার জন উড়ে একটা নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার কাছে ব'সে একটা ভাঁড় থেকে সন্দেহজনক কি একটা তরল পদার্থের চর্চ্চা কর-ছিল। তার মধ্যে এক জন হঠাৎ প্রেরণাবশে গেয়ে উঠল;—

"তু লাগি গোপদণ্ড মোনা রে কালিয়া সোনা!
দধি-দুধ-সর খাও রে কালিয়া দধি-দুধ-সর খাও,
(আর) কৌড়ি মাঙ্গিলে অমনি কালিয়া মুরলী বজাও,
রে কালিয়া সোনা—গোপদণ্ড রে কালিয়া
রে মোনা রে—কালিয়া সোনা তু লাগি হঃ।"

৯

ঘাটের চাতালের উপর থেকে নিমতলার শ্মশানে আরও দুটি শব ধীরে ধীরে পুড়তে দেখা যাচ্ছিল ও মাঝে মাঝে একটু বাতাসের ঝট্‌কার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্ব্বাণোন্মুখ লেলিহান শিখা যেন বাতাসকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, তারা নিজ কার্য্যের প্রতি মোটেই উদাসীন নয়।

একটি ছোট্ট চিতার পাশে একটি কুড়ি একুশ বয়সের ছেলে ব'সে ছিল ও একদৃষ্টে চিতার শিখার দিকে চেয়ে ছিল। তার যেন সময়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার সাম্‌নের চিতাটি ছোট। বোধ হয়, তার কোনও ছোট ভাই…

হঠাৎ হৈ হৈ করতে করতে যুবকটির ঠিক ডান ধারেই একটি শবদেহের সঙ্গে আট দশ জন লোক তিন চারটে কালো রঙের বোতল হাতে ক'রে এসে হাজির। চিতার দাহনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অতি দ্রুত 'রেটে' সকলে তরল পদার্থের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার মধ্যে এক জন একটি বড় বোতল একাই একচেটে ক'রে বসেছিলেন ও সঙ্গীরা চাইলে জোরে ঘাড় নেড়ে যেন জানাইলেন যে, তাদের সে অমিতাচারের প্রশ্রয় আর যে-ই দিক্ না কেন, তিনি যে দিতে পারেন না, সেটা নিশ্চিত। মাথায় বড় বড় চুল। খাসা টেরি কাটা। গায়ে মোটা একটা ধোসা ও কপালে প্রকাণ্ড এক তিলক। রং বেশ ফরসা।

খানিক বাদে বোতলটি উপুড় ক'রে মুখে সংশ্লিষ্ট ক'রে "হুত্তোর" ব'লে সেটি ছুড়ে ফেলে দিয়েই দাঁড়িয়ে উঠলো। বোধ হয়, তাঁর হঠাৎ বৈরাগ্যসঞ্চার হয়েছিল। তিনি অবিলম্বে জড়িত কণ্ঠে কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন,—

"ওরে এই অসার
সংসার ছেড়ে
আয় সবে তোরা,
দেখ্ নদীয়ায়
আজ এসেছেন
গোরা।"

দেখতে দেখতে তাঁর আরও দু'চার জন শ্মশান-বন্ধুরও গৌরাঙ্গ-প্রেমের উদয় হ'ল। তাঁরাও প্রাণের মায়া ছেড়ে দোয়ারকি সুরু ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আঁখরও চলতে লাগল।

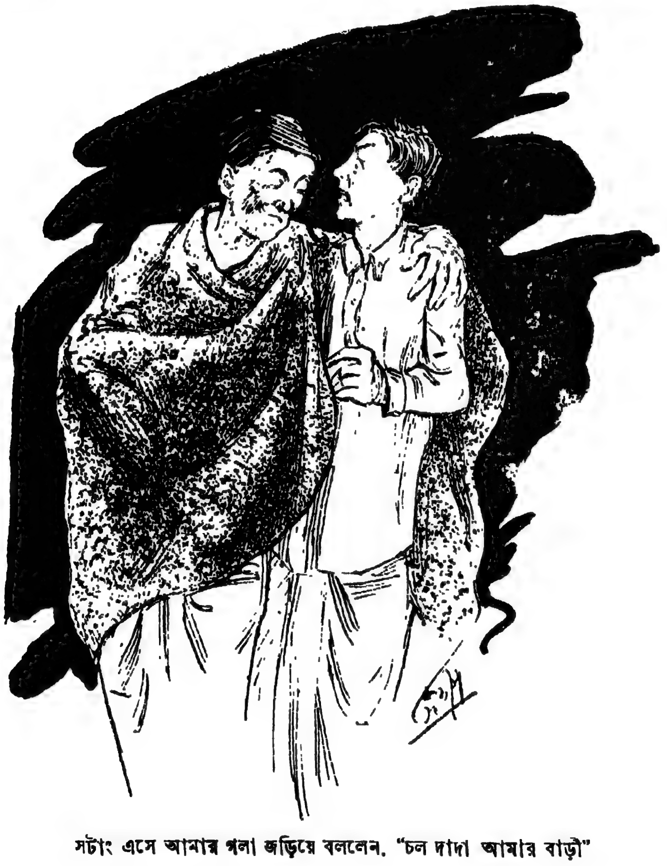

সটাং এসে আমার গলা জড়িয়ে বললেন, "চল দাদা আমার বাড়ী"

"সখি রে—এ সংসারে বল্ কি বা আছে?
শুধু আঁটি আর চামড়া এ সংসার-গাছে।
বৈ ত নয় ওরে · প্রাণসখি—বই ত নয়।"

সাধুজী আর সইতে পারলেন না। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে এ সম্বুরা! হিঁয়াপর চিল্লাতিছিস্ কেনে? তার চেয়ে গঞ্জিকানন্দে লেগে যা।"

তাঁর পাশের উৎকলবাসি-চতুষ্টয়ের মধ্যে এক জন ব'লে বসল, "হঃ ষড়া যেন ষণ্ড গো। পুকারিছন্তি দেখ না।"

তিলকাঙ্কিত গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গভক্ত ভদ্র লোকটি হঠাৎ সাধুজীর দিকে তাকিয়েই করযোড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "আরে কে ও? বাবা বিশ্বেশ্বর যে! তুমি এখানে কেন বাবা! তাই বলি, গৌরাঙ্গের ওপর নইলে আর এত আক্রোশ কার? তা ত হবেই বাবা। ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে বলে struggle for existence হবেই ত। যাক্, আমি চুপ করলাম, বাবা। নইলে কেন মিথ্যে মিথ্যে তোমাদের রাজায় রাজায় যুদ্ধ'র মাঝে আমাদের মত উলুখড়ের প্রাণ যাবে? বিশেষতঃ যখন খাঁটি পৈতৃক প্রাণ!"

তাঁর হঠাৎ কি মনে হ'ল—তিনি ঘাটের দিকে টলতে টলতে ঠিক্ আমার সাম্‌নে এসে হাজির। এসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"কে? মা গঙ্গা? পায়ে রেখো মা। বাবা বিশ্বেশ্বরের উপদ্রবে আজ ত আর গৌরাঙ্গ

ভজা হ'ল না। তাই তোমায় ডেকেই পুণ্যি ক'রে নিই। শোনো মা—

'রেখো ও চরণে মা গো গঙ্গে—
মিনতি তোমায় দোহাই ফেলো না পাপ-পঙ্কে'—"

হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল।

"কেমন দাদা? সম্‌টা ঠিক্ হয়েছে? বলুন, নইলে ছাড়ছি নি।"

বড় দুঃখেও হাসি এল।

"বুঝে'ছ দাদা বুঝেছি। ও হাসির মানে কি আমি বুঝিনি ভাবছেন? সাপের হাঁচি, বেদেয় চেনে। আপনার গোঁফ দেখলেই বোঝা যায় যে, আপনি তালিম লোক।"

বল্‌তে না বল্‌তে সটাং এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন, "চল দাদা—আমার বাড়ী। তুমি যে আমার সহোদর দাদা, তা আমি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছি। নইলে ঠিক সমের মাথায় এমন মোহন হাসি কি আর কেউ হাস্‌তে পারে?"

বারুণীর তীব্র গন্ধে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। এ আবার কি নতুন বিড়ম্বনা! অতি কষ্টে আমার হঠাৎ-লব্ধ ভ্রাতাটির নিবিড় কণ্ঠালিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বল্‌লাম, "আরে মশাই! ছাড়ুন ছাড়ুন। লোকে ভাববে কি?"

তৎক্ষণাৎ আমার পা জড়িয়ে ধ'রে ভ্রাতৃবর বল্‌লেন, "দাদা—ভাবুক গে, তোকে আমি ছাড়ব না। চল্ আমার বাড়ী। যেতেই হবে তোকে। দাদা-হারা হয়ে আর কত দিন থাকব? ওরে মাধব, যেদো, পুণ্ডরীক! দাদাকে আমার গাড়ীতে তুলে দে ত।"

দেখতে দেখতে আমার অগ্নিময় অভিশাপ ও লজ্জাকর হস্তপদোৎক্ষেপ সত্ত্বেও আমাকে সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে একটি দিব্য পাল্কী-গাড়ীতে তুলে দিল।

১০

বেশ একটি তক্‌তকে গদিওয়ালা ফরাসের ওপর আমার নবলব্ধ ভ্রাতাটি আমাকে শুইয়ে দিয়েই আমার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে আমার পাশে শুয়ে দেখতে দেখতে নাসিকা গর্জ্জন সুরু ক'রে দিলেন। ঘোর বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না করতে আমিও আমার অবিশ্বাস্য অবস্থার কথা নিদ্রা দেবীর কোমল হস্তাবলেপে ভুলে গেলাম।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেলা বোধ হয় আটটা হবে, বিমল প্রভাতী অরুণকিরণে সমস্ত ঘরটা প্লাবিত হয়ে গেছে ও বাইরে গাড়ী, মোটরকার ও লোক-চলাচলের কলরব-মুখর হয়ে উঠেছে। আমার পাশেই আমার আশ্রয়দাতা তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন। দেখলাম, লোকটি সুপুরুষ। তবে চোখের নীচে গভীর কালিমার রেখা অতি স্পষ্ট। বোধ হয় অমিতাচারের গুণে।

আমি চারদিকে তাকাতে না তাকাতেই পুণ্ডরীক এসে বাবুর পা টিপতে ব'সে গেল।

"বাবু চা খেয়ে থাকেন ত?"

"হ্যাঁ।"

খানিক বাদে চা ও সন্দেশ এসে হাজির। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। এ এক রকম মন্দ অভিজ্ঞতা নয়। কাল এ সময়ে আমি কোথায় আর আজ কোথায়! কাল এক মাড়োয়ারীর মোট বয়েছিলাম আর আজ এক শ্মশানচারীর বাড়ীতে জামাই আদরে সন্দেশের সদ্ব্যবহারে ব্রতী! মনে হ'ল, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

চা খেতে খেতে পুণ্ডরীকের সঙ্গে গালগল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। তাতে জানা গেল যে, বাবুর নাম নীলমণি সেন, দেশে জমীজমা আছে, এখানে আলিপুরে কি এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজীর। দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। তাদের জন্যে একটি গৃহশিক্ষক খোঁজা হচ্ছে। আমি সোৎসাহে পুণ্ডরীককে বল্‌লাম যে, আমিও ঐ মাষ্টারীই খুঁজছি!

পুণ্ডরীক ভারী খুসী হয়ে আর কথাবার্ত্তা না ক'য়ে সটাং মা-মণির কাছে আমাকে নিয়ে গেল। কেন না, এ সংসারে মা-মণি অর্থাৎ কর্ত্তাবাবুর মা-ই না কি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা।

একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখি, জরাজীর্ণা এক বুড়ী চশমা নাকে রামায়ণ পড়ছেন।

"কে বাছা তুমি?"

আমি হঠাৎ একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বস্‌লাম; আমার নাম অরবিন্দ দত্ত, পিতার নাম শ্রীকালিদাস দত্ত।

"উত্তর-রাঢ়ী না দক্ষিণ-রাঢ়ী?"

অকূল পাথার। দুর্গা ব'লে ব'লে ফেল্‌লাম,—"উত্তর-রাঢ়ী।"

"কুলীন না বংশজ ?"

"জানি না !"

"বংশ-পরিচয় জান না কি গা ? নবাবপুত্তুর না কি ?"

ভাবলাম, বলি যে, কোনও কিছু না জানার উপরই নবাবপুত্র হওয়া নির্ভর করলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। কারণ, তা হ'লে জীবনে অনেক সমস্যার সহজেই মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু সাহস হ'ল না।

"চুপ ক'রে কেনে গো ? যাক্, শোনো বাছা, চুরি-টুরি ক'রে পালাবে না ত ?"

রাগে, ক্ষোভে চোখে জল এল। দাঁতে ঠোঁট চেপে রইলাম। ঘরের এক ধারে একটা পর্দ্দা ছিল; তার ও পাশে শাড়ীর খস্-খস্ শব্দ ও ফিস্-ফিস্ কথা কানে এল। শেষ কথাটা ধরতে পারলাম।

"ভদ্দর লোকের ছেলেকে কি মা অমন কথা—"

মা-মণি পর্দ্দার দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খন্-খন্ ক'রে উঠলেন, "আরে থামো না বৌমা তুমি। তোমার দয়াধর্ম্ম চুটিয়ে কোরো যখন আমি গঙ্গাযাত্রা কর্‌ব। শোন গো ছেলে। দেখ, চুরি-টুরি কর্‌লে চল্‌বে 'নি এখানে, তা আগে থেকেই ব'লে রাখনু। কারুর চিঠি আছে ?"

"আজ্ঞে না।"

"ও মা! তবে কেমন ক'রে জান্‌ব যে, তুমি গলায় ছুরি দেবে না, বাছা ? যাও, কোনও রাজারাজড়ার কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে এসো।"

বৌমা আবার পর্দ্দার অন্তরাল থেকে ফিস-ফিস ক'রে বল্‌লেন, "রাজারাজড়ার চিঠি ছেলেটি কোথায় পাবে বলুন মা ? তা হ'লে চাক্‌রী করতে আস্‌বেই বা কি দুঃখে ?"

"আঃ—থাম বৌমা—তোমার বাক্যির ছটা পরে শুনিও। শোনো গো ছেলে,—আচ্ছা, তুমি নিজেই বল ত' গা, কেমন ক'রে জান্‌বো যে, ঘটিটা-বাটিটা শালটা-দোশালাটা তুমি হাতটান ক'রে লম্বা দেবে নি ?"

এবার আমি আর থাকতে পার্‌লাম না;—"আজ্ঞে, আমাদের বাড়ীতে শাল-দোশালার অপ্রতুল নেই।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে বৃদ্ধা বল্‌লেন,—"তবে চাকরী করতে এয়েছ কেন গা বাছা ? বাপের

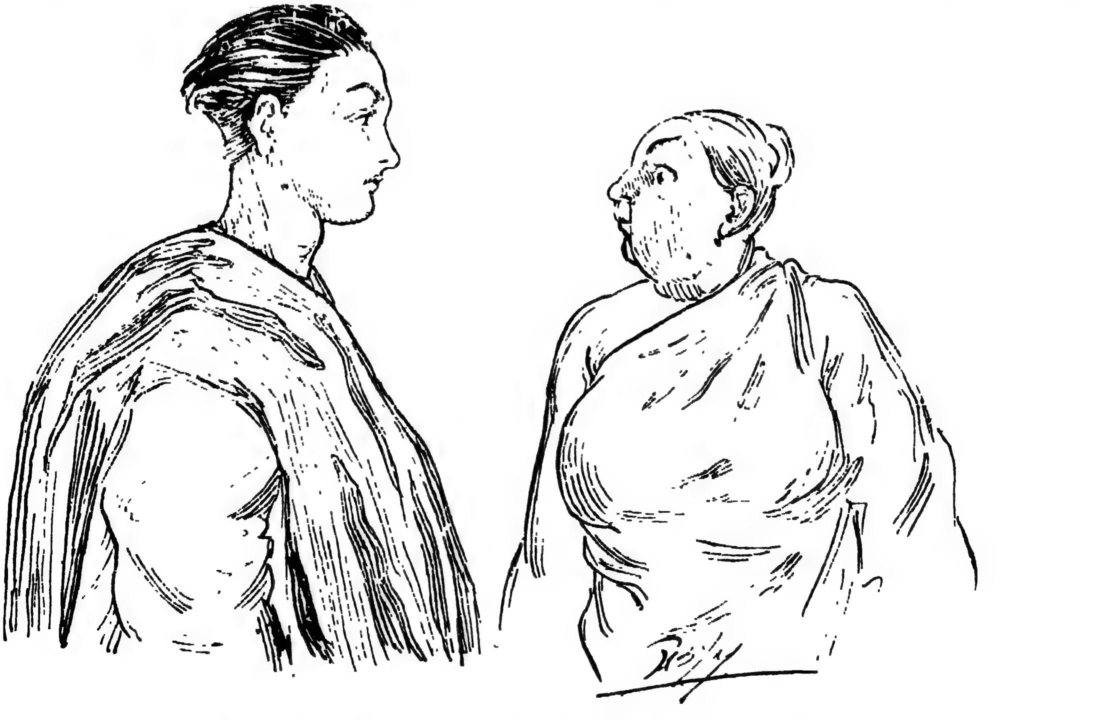

ও মা, তবে কেমন ক'রে জানব যে, তুমি গলায় ছুরি দেবে না, বাছা !

সুপুত্তুর হয়ে বাড়ীতে শাল-দোশালা মুড়ি দিয়ে নবকার্ত্তিকটি সেজে ব'সে থাক্‌লেই ত পারতে? ইস্! শাল-দোশালার না কি আবার ওঁদের বাড়ীতে ছড়াছড়ি! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। আবার মুনিবের সঙ্গে মুখোমুখি করার আস্পর্দ্ধাটুকুর গুণে ঘাট নেই।"

ভাবলাম, বলি যে, তাঁকে বিধাতা আমার মুনিব করেই ছাঁচে ঢালেন নি। চাকরী না নিতেই এই!

মা-মণি আমার মুখের পানে চেয়ে মুখ বক্র ক'রে বল্‌লেন, "আহা, দুলালের আবার মুখ ভার ক'রে দাঁড়ানো হ'ল। আধিখ্যেতা দেখ না। আমি যেন কি সব্বনেশে কথাই বন্নু। শোন না ছেলে! এই ছেলে! বল ত দেখি, তোমাদের যদি অবস্থা এতই ভাল, তবে তোমার আজ এ-রকম হন্তেকুকুরের মতন চেহারার ছিরি বেরিয়েছে কেন—যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে পেইলে এসেছ?"

কেন জানি না, হঠাৎ মুখে এসে গেল—"আমার বাবা দ্বিতীয় পক্ষ করেছেন, তাই।" ব'লেই আক্ষেপ হ'ল। কেন এ নির্জ্জলা মিথ্যে কথাটা বল্‌লাম? পর্দ্দার অন্তরাল থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ও একটা ছোট্ট আহা শুন্‌তে পেলাম।

এবার বোধ হয় মা-মণিরও একটু দয়া হ'ল। "আচ্ছা! তোমাকে চাকরীতে বাহাল করা গেল। দশ টাকা মাইনে ও খাওয়া-দাওয়া। বছরে এক জোড়া কাপড় ও এক-খানি ক'রে গামছা। কাযের মধ্যে ছোট খোকা ও খুকীমণিকে পড়াতে হবে ও বাজার করতে হবে।"

হা অদৃষ্ট, বাজার করতে হবে? অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আজ্ঞে, বাজার—"

"হাঁ গো হাঁ। নইলে কি খোকা-খুকীর গায়ে ফুঁ দিয়ে দুটো 'নীল জল, লাল ফুল' পড়াবার জন্যে তোমায় দশ দশখানি টাকা দেওয়া হবে না কি? চাকরে চুরি ক'রে ছন্নছার ক'রে দিলে, তাই ত খোকা-খুকীর ম্যাষ্টের দরকার হয়ে পড়ল। নইলে এত কি সাত তাড়াতাড়ি ছিল?"

"অগত্যা—"

"আচ্ছা। বাইরে যাও এখন! হ্যাঁ, ভাল কথা, বিছানা এনেছ ত?"

"আজ্ঞে না।"

"ও মা! এমন ম্যাষ্টের ত সাত জন্মেও দেখি নি মা। তা হ'লে থেকো বাইরে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। যেমন কুকুর, তেম্‌নি মুগুর হবে তা হ'লে।"

পর্দ্দার ভিতর থেকে কোমল কণ্ঠে ফিস্-ফিস্ শব্দ এল, "আহা, ছেলেটিকে আজ না হয় বৈঠকখানা-ঘরের সতরঞ্চের ওপরেই শুতে দেওয়া হোক্ না মা!"

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আর কালই ভোর-বেলা সেখানি নিয়ে স'রে পড়ুক। না না, ও সব-টোসব হবে নি। সে সব মনের সাধ মিটিয়ে কোরো বৌমা—দু'দিন বাদে আমি চক্ষু বুজলে।"

ব'লে বিড় বিড় ক'রে খানিক কি বক্‌লেন। তার পরে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "যাক্. সে পরের কথা পরেই হবে না হয়। এখন শোনো বাছা! বাজার ক'রে আন্‌তে পারবে? এই নেও আট আনার মাছ এক সের, ছ-আনার আলু এক সের, তিন আনার পটোল, শোন বাপু, আমি ওজন ক'রে নেব কিন্তু। চুরিটি করেছ কি ক্যাঁক্ ক'রে গলা টিপে ধরেছি। আমি যে-সে মেয়ে নই। সাক্ষাৎ কড়োরাম গুঁইয়ের নাত্‌নী ও ছিদাম গুঁইয়ের মেয়ে। এই বাজারের এক টাকা সাড়ে ন আনা নিয়ে যদি গা-ঢাকা দেও, তবে আমি পুলিসে খবর দিয়ে তোমায় ছ ছ মাস ছিরিঘরে পাঠাবো। বুঝলে ত?"

ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল এল। ঢোক গিলে বল্‌লাম, "কার মাথায় দেব জিনিষ-পত্র? একটা ঝাঁকামুটে ভাড়া করব কি?"

"কর্‌বে বই কি? ওরে আমার নবাবপুত্তুর রে! দু' আনা ক'রে রোজ আমি ঝাঁকামুটের খরচ যোগাই। এতে ওঁর মান্তির গায়ে কাদার ছিটে লাগে। নইলে আর কলিকাল বলেছে কেন? ঐ ত চেহারা—আবার মান-অপমানের জ্ঞান সাড়ে সতর আনা। আহা, যেন ধামা কাঁধে ক'রে আন্‌লে ঐ চেহারায় কিছু বেমানান হবে!"

ভাবলাম, এক টাকা সাড়ে ন আনা ছুড়ে ফেলে দিই। কানের মধ্যে শোঁ শোঁ করতে লাগল। অতি কষ্টে মুখ নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

পর্দ্দার আড়াল থেকে চাপা-কণ্ঠে, "মা, পরাণে ত যেতে

পারে। ভালমানুষের ছেলে কেমন ক'রে রোজ রোজ ধামা কাঁধে ক'রে—"

খন্ খন্ ক'রে এবার সুর সপ্তমে চড়িয়ে বৃদ্ধা বল্‌লেন, "ওরে আমার ননীর গোপাল রে! ওঁকে আমরা কুলুঙ্গিতে সাজিয়ে রেখে দেখার জন্যে রাখনু। বৌমা, এম্‌নি ক'রেই তোমরা আমার রোগাছেলের টাকাগুলো লুটিয়ে-পুটিয়ে দিচ্ছ। পরাণে গেলে কি আর রক্ষে আছে না কি? ষড় করার সর্দার সে। না না। ও-সব-টোসব হবে নি। আর অত নজ্জাই বা কি? আজ্‌কাল ত সায়েবরাও নিজেরা বাজার করে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

বাইরের ঘরে গিয়ে নিরালায় আর চোখের জল রাখতে পারলাম না। কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি? আর সারাদিন ধ'রে গত দু'দিনের মত টো-টো ক'রে খা'ল পেটে ঘুরে বেড়াবার শক্তি নেই। মাথার ভিতরটার দপ্‌দপানিও থামে নি। তা ছাড়া নিজে থেকে সুড় সুড় ক'রে বাড়ী ফেরা? সে যে আরও লজ্জা,—বিশেষতঃ পারুলের কাছে দেশের ও দশের এক জন হবার বড়াই ক'রে আসার পর। অন্ততঃ এখান থেকে আর্ট-এ পাশ না দিয়ে বাড়ীমুখো হওয়া কল্পনাতীত। (দেশের ও দশের এক জন না হয়েও ফেরাটা এখন আর কল্পনাতীত ছিল না!)

টালার হাটে বাজার ক'রে ধামা কাঁধে অতি সঙ্গোপনে সেই ধামাটার আড়ালেই নিজের মুখ ঢেকে ফিরছি, এমন সময়ে একটা মোটর-গাড়ীর সাম্‌নে প'ড়ে গেলাম। মোটরচালক "গিয়া গিয়া, শালা গিয়া," ব'লে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি লাফ দিতে যেতেই ধামাটা মোটরের 'হুডে' ঠেকে প'ড়ে গেল—আমার চক্ষুস্থির! গাড়ীতে স্বয়ং পারুলের মামা! তিনি টালায় জলের কল দেখতে বেরিয়েছিলেন।

"অ্যাঁ! অমৃতে যে! এখানে ধামা কাঁধে! এ কি কাণ্ড রে!"...

আমি নিরুত্তর।

"আয়, গাড়ীতে ওঠ।"—

১১

বাবা বল্‌লেন, "কলেজে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই মাথা গরম, পরে বি-এ এম-এ পাশ করলে না জা'ন কি হবে? চেহারাটা একবার আয়নায় দেখেছিস্ কি? যা এখন হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসে দুটো ভাত খা। তার পর দুপুরে সব কথা হবে।"

অনুতপ্ত দাদা তখনই আমার জন্যে একটা আদ্দির পাঞ্জাবী, একটা রেশমী চাদর ও একটা সাদা কিড্‌স্কিনের জুতো কিনে নিয়ে এলেন।

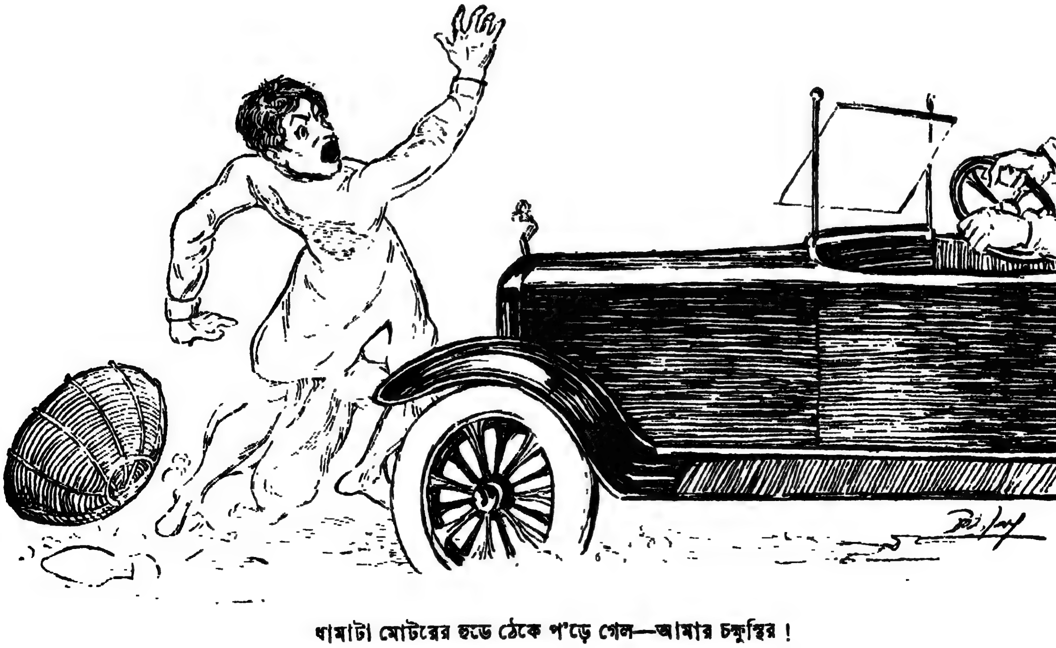

ধামাটা মোটরের হুডে ঠেকে প'ড়ে গেল—আমার চক্ষুস্থির!

"অমিত, আজ বিকেলে আমার মোটরে ক'রে বায়স্কোপ দেখে আয় গে যা।"

১২

সেই আদ্দির পাঞ্জাবী চড়িয়ে, রেশমী চাদর উড়িয়ে ও কিড্‌স্কিনের জুতো পায়ে দিয়ে দশ বার টাকার খেল্‌না কিনে সেই দিনই বিকেলবেলা পাঁচটার সময় দাদার মোটরে আসীন হয়ে বায়স্কোপ না গিয়ে বুড়ীকে একটু শিক্ষা দিতে গেলাম।

পুণ্ডরীক লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, -"আরে মাষ্টার বাবু যে! এমন বাবু চেহারা? ব্যাপার কি বলুন ত? কোথায় উধাও হয়েছিলেন সমস্ত দিন? মা-মণি ত আপনি তাঁর এক টাকা সাড়ে ন আনা চুরি ক'রে পালিয়েছেন ব'লে সারা বাড়ী মাথায় ক'রে আমাদের শাপমন্যি দিয়ে—"

উঠোন থেকে সেই চিরপরিচিত কাঁসরবিনিন্দিত গলা শোনা গেল; "হ্যাঁ রে পুণ্ডে—কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে, আমার সম্বন্ধে?"

পুণ্ডরীক চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিস্-ফিস্ ক'রে বল্‌ল, "সর্ব্বনাশ—মাষ্টার মশায়—মা-মণি যে এখন নীচে নেমে এসেছেন, তা খেয়ালই ছিল না।"

"পুণ্ডে, কে রে? কথা কইছিস্ না যে?"

"আজ্ঞে মা-মণি, মাষ্টার মশায়।"

"অ্যাঁ! ম্যাষ্টের! সেই চোরের সদ্দার! বাজারের ট্যাকা - এ দিকে নিয়ে আয় ত।"

আমি গম্ভীরভাবে খোকা-খুকীর জন্যে সেই স্তূপীকৃত খেল্‌না যে সুটকেসের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম, সে সুটকেসটা হাতে ক'রে উঠানে গিয়েই দেখি, সাক্ষাৎ চামুণ্ডারূপিণী রাগে গর্ গর্ করছেন;—"ম্যাষ্টের! এ সব কি ব্যাপার—"

কর্ত্তাবাবু মা'র তীব্রকণ্ঠ শুনে চোখ মুছতে মুছতে হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে এলেন। রবিবারের ঘুম কি না।

"কি মা-মণি—হয়েছে কি মা?" এমন সময়ে আমাকে দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

"কি আবার? তোমাদের আমি ত তখনই পই-পই ক'রে বলেছিনু খোকা যে, চরিত্তির জানা নেই, এমন এক দুর্ভিক্ষির মড়াকে রেখো নি, রেখো নি। তা তোমরা ত শুন্‌লে নি; এখন আমার এক ট্যাকা সাড়ে ন আনার কিনারা—বাছা, ভাল চাও ত ট্যাকা দিয়ে বিদেয় হও। নইলে আমিও কুড়োরাম গুঁইয়ের নাতনী - ছিদাম গুঁইয়ের মেয়ে—"

"মা-মণি! চুপ কর, চুপ কর। দেখছ না, ইনি বড়মানুষের ছেলে। পোষাক দেখছ না? সাম্‌নে প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ী।"

সেতারের খুব চড়া পর্দ্দায় বাজাতে বাজাতে হঠাৎ তারের কান আল্‌গা হয়ে গেলে স্বর যেমন মুহূর্ত্তে তীব্র নিখাদ থেকে কোমল রেখাবে নেমে আসে, মা-মণির কানে বড়লোকের ছেলে কথাটি প্রবেশ করামাত্র তাঁহার স্বরও তেমনই অকস্মাৎ মোলায়েম হয়ে এল। তিনি এতক্ষণ রাগের মাথায় আমার বেশ-ভূষার দিকে লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পান নি। এখন থতমত খেয়ে আমার আপাদ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করতে ব্রতী হলেন।

"ও মা! তাই ত গা!—এই কি সকালবেলাকার ম্যাষ্টার না কি গা? আমি ছাই বুড়োমানুষ—চোখেও কি ভালো দেখতে পাই?"

আমি হাসি চেপে বল্‌লাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সেই সকালবেলাকার খোকা-খুকীর মাষ্টারই বটে—তাতে ভুল নেই। এখন এই নিন আপনার বাজারের দরুণ এক টাকা সাড়ে ন আনা, আর এই নিন খোকা-খুকীর জন্যে যৎসামান্য কিছু খেল্‌না।"

ব'লে হাতের 'সুটকেস'টা থেকে স্তূপাকৃতি ক'রে দশ বার টাকার খেল্‌না উজাড় ক'রে দিলাম।

মা-মণি এবার ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "তবে তোমাকে তোমার সৎমার যন্ত্রণায় ঘর-ছাড়া হ'তে হওয়া-টওয়া—"

আমি এবার একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু ক'রে বল্‌লাম, "মাপ করবেন - সব মিথ্যে। মা মারা যাওয়ার পর বাবা আর বিয়েও করেন নি—তাঁর নাম কালিদাস দত্তও নয়। তাঁর নাম শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী—তিনি এখন আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট।"

মা-মণি ও কর্ত্তাবাবু। অ্যাঁ, ম্যাজিষ্টরের ছেলে তুমি?

কি ছেলে বাছা তুমি? তুমি দেখছি সব করতে পার—ম্যাজিষ্টর—"

কর্ত্তাবাবু। আপনি প্রফুল্ল লাহিড়ী মশায়ের ছেলে?

আমি হাসি চাপতে না পেরে বল্‌লাম, "আজ্ঞে হাঁ। কেন? আপনি কি তাঁকে চেনেন?"

কর্ত্তাবাবু বিদ্যুদ্বেগে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। "আমরা বণ্ডি—আপনারা বেরাহ্মণ—মহাপাপ হয়ে গেছে। লাহিড়ী মশায়কে এ কথা বল্‌বেন না, দোহাই আপনার। আমি—"

"আহা হা! করেন কি? করেন কি? আপনারা ত আর জেনে কিছু করেন নি। তা ছাড়া বাবাকে বল্‌লেই বা ক্ষতি কি? তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে না কি?"

কর্ত্তাবাবু কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লেন, "আজ্ঞে—আমি যে তাঁরই নাজীর।"

মা-মণি এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, "ও মা রক্ষে-কালী, রক্ষে কর মা। কি হবে গো? আমি তাই পরাণেকে তখনই বলেছিনু—ছেলেটির চেহারা বড় ভদ্দর রে—ছেঁড়া কাপড় দেখে বেবজ্ঞা করিস্ নি—বেবজ্ঞা করিস্ নি। তা পরাণেটা কি শুন্‌ল? ভালমানুষের পো'কে বাজারে পাঠাল তবে ছাড়্‌ল। অমন রাজপুত্তুরের মতন নধর কান্তি কি ম্যাষ্টেরের হয় গো? না, যে আমি কুড়োরাম গুঁইয়ের নাতনী, ছিদাম গুঁইয়ের মেয়ে সে আমার ভুল হয়? আমি মানুষ চিনি নি? আর, বড়ঘরের ছেলে যে শিকারী বেড়াল গো—গোঁফ দেখলে চেনা যায়—তখনই বলেছিনু..."

১৩

সন্ধ্যাবেলা পারুলকে সব কথা খুলে বল্‌লাম। সে মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে গড়িয়ে পড়ল।—"ধন্যি ছেলে তুমি।"

নবোদ্ভিন্ন গুম্ফদেশে যথাসাধ্য চাড়া দিয়ে বিজ্ঞভাবে হেসে বল্‌লাম, "এখন থেকে সমীহ ক'রে কথা কোয়ো। বুঝলে ত? প্রিন্সিপলের জন্যে কষ্ট স্বীকার—সাধে কি সেক্ষপীয়র বলেছেন, 'The child is the father of man!' জানো ত পিসীমা সর্ব্বদাই বলেন—ও ছেলে সামান্যি নয়—কেবল তোমাদের কপালে বাঁচলে হয়।"

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

বর্ষার মাঠে

ছোট্ট একখান ডিঙী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাল বিকেলে
বর্ষা-ভরা পল্লী-মাঠের মাঝে,—
পরাণ আমার প্রজাপতির মতন পুলক-পক্ষ মেলে'
কাঁপতে লাগল বুকের কাছে!

আউস আমন ধানের গাছের দু'টি সবুজ পাশাপাশি
জড়িয়ে আছে দু'টি ভাইয়ের মত,
পড়েছে তার ওপর স্নিগ্ধ দিবস-শেষের আলোক আসি'—
মায়ের চোখের দৃষ্টি স্নেহ-নত!

ধানের গাছের ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র-রঙ ফড়িংগুলি
আস্‌ছে যাচ্ছে—বস্‌ছে পাতার ডগায়,
শিশুর রঙীন হর্ষ হেন।...মাঝে মাঝে মুণ্টি তুলি'
'পানকৌড়'রা আবার সে মুখ লুকায়।

দিকের কণ্ঠে মালার মত বকের শ্রেণী দুল্‌ছে দূরে,
হোথায় কুমুদ সম্ভাবনা 'নালে,'
একটা পান্‌সীর কয়টা দাঁড়ী গাচ্ছে 'সারি' মধুর সুরে,
বুড়ো মাঝি শুন্‌ছে ব'সে হালে।

হাট-ফের্‌তা মানুষরা সব ফির্‌ছে ছোট-বড় 'না'য়ে
নানান্ কথাবার্তা-কোলাহলে,
তারি মাঝে নীরব আমি মুগ্ধ—মৌন সাঁঝের ছায়ে,
তারি মাঝে আমার ডিঙা চলে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

'বরষা'র কবিকুঞ্জ

বাদল

১

সিক্ত মাটীর গন্ধে, আজিকে, ভরেছে সজল হাওয়া
সুনীল আকাশ কাজল মেঘের উত্তরী দিয়ে ছাওয়া ।
নদী কূলে কূলে মাথা তুলে কেয়া ;
জলস্রোতে ঘন দুলে উঠে শেয়া,
গ্রাম পথে পথে থেমে গেছে আজ পথিকের আসা-যাওয়া,
সিক্ত মাটীর গন্ধে, আজিকে, ভরেছে সজল হাওয়া ।

২

বর্ষায় স্নাতা রজনীগন্ধা উঠিয়াছে মাথা তুলে,
ভুঁইচাঁপা আজ বাহির হয়েছে ভূমি কারাদ্বার খুলে !
ঝরিছে বরষাসিক্ত বকুল,
চামেলির বন পুলকে আকুল,
সোনার কাঠির পরশনে গেছে, সুপ্তির দ্বার খুলে,
কুঞ্জের মাঝে হেনা-মঞ্জরী বায়ে সঞ্চরি দুলে ।

৩

মালতী লতাটি কাহারে বন্দে ঝরায়ে পুষ্পরাজি ?
কাহার হাতের একতারাখানি ছন্দে উঠেছে বাজি ?
তাই শুনি আজি সারাদিন ভর,
বাদল ঝরিছে ঝর্-ঝর্-ঝর্,
নূপুর বাজিছে বিরহ-কাতর—বাদল এসেছে আজি ।

শ্রীলীলা মিত্র ।

বর্ষায়

বর্ষায় যবে ঝর্-ঝর্ ধারা
দিগ্ দিগন্ত ছায়,
সিক্ত শাখীর অঞ্চল-তলে
পল্লী লুকায় কায় ;
বিরহ দীর্ঘ দিনগুলি মোর
তোমার চরণ-তলে,
ছুটে যায় দেবী জীবনে মরণে
শরণ লভিবে ব'লে ;
ক্লান্ত ব্যাকুল সিক্ত পরাণে
কার পথ চেয়ে থাকি,
চঞ্চল কার মঞ্জীরতালে
জুড়ায় শ্রবণ আঁখি ।

রোজী ।

বর্ষাগমে

হেরিনু দাড়ায়ে বর্ষা কালিন্দীর তীরে—
প্রাবৃট ঘনাল দূর নভো বৃন্দাবনে ।
সিক্ত হ'ল শ্যাম গোষ্ঠ সুশীতল নীরে—
উঠিল বিপুল হর্ষ রক্ত-গুঞ্জা বনে ।
কদম্বের গন্ধ-ভরা বনবীথি-তল
ব্যাকুল বাতাস বহে বিটপি কম্পনে
কলাপে ঝঙ্কারে শিখী দিবা ঝলমল ।
সুদূর নিরালা হ'তে বাঁশী যেন স্বনে ।
চলিয়াছে বিরহিণী তাই অভিসারে
কুমুদ-কহ্লারে ডালি সাজায়ে মোহন,
বিরহ ভুলিবে আজ মিলনাশ্রু ধারে—
হর্ষ-উচ্ছলিতা রম্য কুঞ্জ-নিকেতন ।
মোহিত হইয়ে আমি চেয়ে থাকি দূর—
বাজিছে শ্রবণে চির-মিলনের সুর ।

শ্রীস্ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জীর্ণ দীঘি

পুরান দীঘিটি দেহখানি তার ভরিয়া গিয়াছে পাকে,
চারি পাশ দিয়ে ঘুরে মরে শিশু মাছরাঙা ঝাঁকে ঝাঁকে ।
মৎস্যলোলুপ পল্লী-বালক বারে বারে যায় ফিরে,
অকেজো লতায় ভাঙা ঘাটটিরে ক্রমে ফেলিতেছে ঘিরে ;
দূর অতীতের পুরাতন স্মৃতি কত হাসা কত কাঁদা,
দীঘিটির জলে মিশায়ে রয়েছে কত না বিষাদ-গাথা ।
মাথার আঁচল কত গরবীর ঢেউগুলি গেছে ছুঁয়ে,
সিক্ত দেহের ফোঁটা ফোঁটা জলে ঘাটখানি গেছে ধুয়ে ।
ভরা কলসীর দাগগুলি আজো ধাপে ধাপে আছে জেগে,
ফাটলের ফাঁকে আল্‌তার রেখা আর ত রহে না লেগে ।
দীঘিধার হ'তে ছায়া-ঘেরা বীথি আকুল কলসী-জলে,
পল্লী-বধূরা মুখর করে না বারির ছলাৎছলে ।
নিদাঘে তপ্ত বিদেশী পান্থ কত দিন পথ ভুলে,
ক্লান্ত-হৃদয়ে শান্তি লভেছে দীঘি-ঘাটে ছায়া-মূলে ।
অতীত কীর্ত্তি ডুবিয়া গিয়াছে লুপ্তির পারাবারে,
জীর্ণ দীঘির বুকখানি শুধু ভ'রে আছে হাহাকারে ।
সব সম্পদ্ হেলায় বিলায়ে দীন করি আপনারে,
গাঁয়ের দীঘিটি দাঁড়ায়েছে আজি মরণ-নদীর ধারে ।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ।

বাদল বেলায়

বাদল মেঘে শুনি তোমারি গরজন,
বাদল মেঘে হেরি তোমারি তরজন।
বাদল দিনে আজি লুণ্ঠিত ফুলবালা,
ছিঁড়িয়া ফেলে কেঁদে কুসুম গল-মালা।
বিটপী পানে চাহি—ঝরিছে নয়ন বাহি'
জলধারা,—পড়ে মনে অশ্রু-বরষণ।

বাদল গগনেতে চপলা ঝিলিমিলি,
মনে লয় নিতি দোঁহে থাকি নিরিবিলি,
সুখ-দুখ-কথা, বলিব মরম-ব্যথা,
লভিব দোঁহে মিলি দোঁহার পরশন।

নিবিড় হেরি আজি বসুন্ধরা সজলা,
হেরিয়ে জলধরে চিত্ত মম উতলা,
ঘন-কেশরাশি,—জাগিছে অধর-হাসি,
লভিতে বাসনা জাগে মুখ-দরশন।

শ্রীললিত।

আষাঢ়ের প্রথম দিন

বর্ষাঋতুর প্রথম দিনে নির্ব্বাসিতের মর্ম্ম-ব্যথা,
জাগিয়ে গেল পূর্ব্ব স্মৃতি অতীতের সে দুঃখ-কথা।
আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবস—কালিদাসের কাব্য-দিন ;
যক্ষসাথে মিলিয়ে সুর ডাক্‌ল প্রিয়ার কণ্ঠ ক্ষীণ।

এম্‌নি দিনে জলদ ভরা আকাশ-মাঝে তাকিয়ে দেখে,
দৈন্যভরা ভগ্ন-মনে কালো মেঘে বল্‌লে ডেকে,—
'যাও গো প্রিয় বন্ধু আমার, দূতরূপে সেই হর্ম্যপুরে,
যেথায় আমার প্রিয়তমা কাঁদ্‌ছে সদা করুণ-সুরে,
স্মৃতির আলো বক্ষে ধরি' চক্ষে পড়ে জলের ধারা,
কত আশায় মনকে বেঁধে রাখছে চেপে প্রাণের সাড়া ;
সেথায় গিয়ে বল গে দূত ! আমার প্রাণের গোপন ধ্বনি,
চম্‌কে যেন ওঠে না সে প্রিয়তমের দুঃখ শুনি'।'

সার্দ্ধ হাজার বছর গেছে অতীত মাঝে চিহ্ন দেগে,
কবি চিরনিদ্রাগত—কাব্য তাহার আছে জেগে !
বাদল ধারার সঘন পাতে আজও মোদের মনে পড়ে,
যক্ষজনের মর্ম্মবাণী ক্ষীণস্বরে ওই পড়ছে ঝরে'।
সৌদামিনী চমক্ হানি' মেঘ বিদারি ছুটে যায়,—
মনে ভাবি ওই বুঝি দূত চল্‌ল যক্ষ-প্রিয়ার পায় ;
শব্দ শুনি মনে করি সইতে বুঝি পারল না আর,
প্রিয়তমের দুঃখ শুনি দীর্ণ হ'ল বক্ষ তার।
বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতে বদ্ধজীবের রুদ্ধ মন,
কি যেন সে খুঁজে বেড়ায় গুম্‌রে মরে সারাক্ষণ ;
প্রিয়জনের করুণ অভাব জাগিয়ে দেয় যে বিয়োগ-গান,
পবিত্র এই বর্ষা ঋতু ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুরাণরত্ন।

বর্ষায়

গাঢ় বেদনার মত গগনে ঘনায় মেঘ
নয়ন ছাপায়ে ঝরে বারি,
হৃদে মোর দুরু-দুরু কম্পিত কি আবেগ
চাপিয়া রাখিতে নাহি পারি।

কেতকী সুবাস মাখি ছুটে আসে বেণু-বনে
সিক্ত ব্যাকুল পূবে হাওয়া,—
প্রাণে মোর কত ব্যথা দেয়, দোলা অকারণে—
অবিরাম ক'রে আসা-যাওয়া ;

বিরহী এ হিয়াখানি আশায় চাহিয়া থাকে
কোন্ সে সুদূর পথপানে,
যেথায় অজানা প্রিয়া নাম ধরি' ডাকে তাকে
—ঠিকানা তাহার নাহি জানে।

তাহারি করুণ আঁখি নিবিড় হইয়া আসে
মেঘের নিবিড় নীলিমায়,
তাহারি বিরহ-ব্যথা পবনে গুমরি ভাসে,
মোর তরে কেঁদে ফেরে হায় !

কামনার ফুলসাজে পরাণ আমার আজি
সাজিয়া চলিল অভিসারে,
লঙ্ঘিয়া হ্রদ-নদী শত প্রান্তর-রাজি
বনগিরি পর্ব্বত পারে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ছলনা

ওগো,   একটিবার বল না !
কেন তুমি দিন-রজনী
আমায় কর ছলনা !
তোমার মুখের মধু হাসি
দেখ্‌ব ব'লে কাছে আসি,
কুণ্ঠিত ওই ঘোমটাখানি
খুলেও তুমি খোল না !—
দেখি দেখি এই দেখি নে—
নিতুই এ কি ছলনা !

মর্ম্ম-কথা কইতে গিয়ে
গোপন কর সব কথা—
সদাই কেন ছলায় হেন
প্রাণে আমার দাও ব্যথা ?
বুঝতে নারি তোমার ছলা,
প্রেমিক জনে মিছে বলা—
খেলছ সদা এ কোন্ খেলা
লো কুহকী ললনা !
এবার কেন ছলা ভুলে
সরল পথে চল না !

শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ।

ত্রিবেণী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পালবংশীয় গৌড়াধিপ নরপালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, দেখিবার আগ্রহে সজ্জনগণ তাঁহাকে যেন লোচনপুটে পান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। "শত্রুকুল-কালরুদ্র" প্রভৃতি বাক্যেও তাঁহাকে বিশেষ প্রতাপশালী বলিয়াই জানা যায়।

> "পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা,
> সংগ্রামে চতুরোঽধিকঞ্চ হরিতঃ কালে কুলে বিদ্বিষাম্।
> চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপুঞ্জৈর্জগদ্রঞ্জয়ন্
> শ্রীমদ্ বিগ্রহপালদেবনৃপতির্জজ্ঞে ততো ধামভৃৎ॥"

তাঁহার শুভ্র যশঃপ্রভায় জগৎকে তিনি সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন এবং চন্দনবারি সুশীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রাজ্যারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতার পুরাতন শত্রু চেদিরাজ কর্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। কর্ণের পূর্ব্বতন গৌরবোজ্জ্বল দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বতন পরাজিত শত্রুগণ—পাণ্ড্য, চোল, মুরল, কুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কীর, হূণ,, গুর্জ্জর, গৌড় প্রভৃতি সকলেই একে একে বা একসঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেছিল।

পালশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া কর্ণরাজ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন ও বিগ্রহপালের হস্তে নিজ কন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই মাহিষী মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল দেবের দ্বিতীয়া মহিষী। ইনি পট্টমহাদেবী নহেন। কারণ, ইঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তিনি রাষ্ট্রকূট-রাজবংশীয়া মদনদেবের ভগিনী ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ্যদেবী সপত্নীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিন পরেই মহাদেবী বুঝিলেন, নামে ভাগ্যদেবী হইলেও কার্য্যতঃ সৌভাগ্য তাঁহার সপত্নীকেই আশ্রয় করিয়াছে। বর্ষমধ্যে পুত্রবতী হইয়া যৌবনশ্রী ভবিষ্যৎ রাজমাতা ও পতির সোহাগিনী পত্নী হইয়া বসিলেন, নামে পট্টমহিষী হইলেও ভাগ্যদেবীই দুর্ভাগা স্ত্রীরূপে গৃহশোভার উপকরণমাত্র হইয়া থাকিলেন।

যৌবনশ্রীর পুত্র মহীপালের বয়স যখন আট বৎসর, তখন ভাগ্যবতীর গর্ভে একে একে সুরপাল ও তাহার চারি বৎসর পরে রামপালের জন্ম হইল। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুন্দর শিশু। পুত্রমুখ দেখিয়া নৃপতি গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে সুগত! ইহাকেই কেন তুমি প্রথমে পাঠাইলে না!"

প্রিয়তমা যৌবনশ্রীকে ভয় করিলেও মনের মধ্যে বিগ্রহপালদেব সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ভাগ্যদেবীকে শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষতঃ শৈশবাবধি মাতৃ দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত মহীপালের ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচারে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ প্রেয়সীর গঞ্জনা-ভয়ে মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিবারও উপায় নাই। যথাকালে মহীপালদেব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ও তাঁহার অনতিক্রান্ত কৈশোরেই তাঁহার সহিত কর্ণাট-রাজকন্যা লজ্জাদেবীর শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ইতোমধ্যেই রামপালজননী ভাগ্যদেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বধূ লজ্জাদেবী শ্বশুরালয়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার এই মাতৃহীন বালক দেবরটির প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বয়সে তিনিও তখন বালিকা। সুরপাল রামপাল অপেক্ষা চারি বৎসর মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ তিনি রামপালের ন্যায় জনপ্রি ও আনন্দময় প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন না। শৌর্য্যে, বীর্য্যে,

বিদ্যাবত্তায় প্রভৃত উন্নতিশীল থাকিয়াও রামপালদেব নিজের মধুর স্বভাবগুণে ইতর ভদ্র সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। রাজবধূ লজ্জাও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য রামপালের বিমাতা বধূকে এ কার্য্যে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, বধূর কার্য্যে রামপাল তাঁহার সমধিক বিরাগভাজনই হইলেন, তথাপি ভ্রাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিতা লজ্জাদেবী যে অনাস্বাদিত স্নেহের স্বাদ এই ভ্রাতৃপ্রতিম বালকের প্রতি ভালবাসায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। মহাদেবী যৌবনশ্রীর বিরাগভাগিনী হইয়াও গোপনে গোপনে ঐ সুদর্শন বালক দেবরটিকে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ মহীপালদেব প্রথমাবধিই লজ্জাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন নাই। এই কর্ণাট-কুমারীটি তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে যে উচ্চশিক্ষা ও মহাপ্রাণতা লইয়া তাঁহাদের মাতা-পুত্রের সঙ্কীর্ণতার মাঝখানে সমাগতা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের কালিমা দিয়া ইঁহার দিকের আলোক-শিখাকে ইঁহারা নিয়তই আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেন এবং যেটুকুকে পারিতেন না, সেই তীক্ষ্ণ তীব্র অথচ কোমল রশ্মিচ্ছটায় নিজেদের মনের কালো যখনই কয়লার রঙে ফুটিয়া বাহির হইত, তখনই ঐ আলোকশিখাটারই পরে তাঁহাদের মনের জ্বালা ধরিয়া যাইত। যৌবনশ্রী এই বধূর প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার নামে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ছেলের কাছে লাগাইতে ছাড়িতেন না এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া ছেলেকে নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালার সাহচর্য্যে সময়ক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিয়া বধূর প্রতি শত্রুতাসাধন করিতেন।

লজ্জা গোপনে তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনায় ভরা দুই বিন্দু অশ্রু নীরবে মুছিয়া ফেলিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার সেই স্থির-ধীর গাম্ভীর্য্যময় ভাব ও অটুট কর্ত্তব্যপরায়ণতার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিতে কোন অবস্থাতেই দেখা যাইত না। স্বামীর অনাদর ও শ্বশ্রূর স্নেহহীনতায় মনের ভিতর তাঁহার যতই যাহা হউক্, বাহিরে সেই একই প্রশান্ত গম্ভীর অথচ সহজ সানন্দ ভাব।

কর্ণাট-কন্যা বৈদিকধর্ম্মমার্গপরায়ণা। শ্বশুর বিগ্রহপাল নিজে সৌগত হইলেও তাঁহার রাজ্যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্তে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মচর্য্যায় কাহাকেও বাধা দিতেন না। নব-বধূও সেইমত নিজ উপাস্যদেবতার আরাধনায় অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, মহারাজাধিরাজ ইঁহার পূজার জন্য অন্তঃপুর-সান্নিধ্যে একটি দেবালয়ও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এক দিন শান্ত নির্ম্মল প্রভাতে লজ্জাদেবী পূজাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কুমার রামপাল একগাছি অম্লান পুষ্পমাল্য লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর সুগৌর মুখখানি যেন ঈষৎ শঙ্কিতভাবাপন্ন, তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্র দুইটিতে সংশয়ের ঘন ছায়া। লোহিতালোক-মণ্ডিত বালসূর্য্যের প্রদীপ্তাভায় বালসূর্য্যেরই মত তাঁহাকে সুন্দরতম দেখাইতেছিল। লজ্জাদেবীকে দেখিয়া বালক ছুটিয়া কাছে আসিল—

"দেখুন, আমি কেমন সুন্দর মালা গেঁথেছি।" তাহার পর ঈষৎ স্বর নামাইয়া বলিল, "আমার মালা কি আপনার ঠাকুর নেবেন না? দিলে কিছু দোষ হবে কি?"

লজ্জাদেবী এই প্রশ্নে ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোষ হবে কেন?"

ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া রামপাল উত্তর করিলেন, "আমি যে সৌগত।"

লজ্জাদেবী স্মিতহাস্যে বালকের মাথায় হাত রাখিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "তাহাতে কিছু দোষ হয় না। সুগতও দেবাবতার।"

রামপাল এবার বধূরাণীর খুব কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আপনার ঠাকুরের মাথায় দিয়ে ঐ মালাটা আপনি দাদার গলায় পরিয়ে দিবেন, তা হ'লে দাদা আপনাকে ভালবাসবে। কাল আমি মহামন্ত্রীর বাড়ী গেছলুম, সেখানে এক জন পণ্ডিত বলছিলেন, দেবতার অনুগ্রহ হ'লে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হয়।"

এই কথা চুপি চুপি বলিয়া মালাগাছি হাতে দিয়াই রামপাল ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। আর রাজবধূ, যুবরাজ্ঞী লজ্জাদেবী—তিনি তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ বালকটির তাঁহার প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসার অপূর্ব্ব পরিচয়ে যেন

বিস্ময়বিহ্বলতায় কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহার পর তাঁহার চক্ষু হইতে হঠাৎ দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

যদিও এই দেব-প্রসাদী ফুলের মালা লজ্জা তাঁহার দুর্ল্লভদর্শন স্বামীর গলায় পরাইবার অবসর খুঁজিয়া না পাওয়াতে তাহা তাঁহার শয়ন-গৃহের প্রাচীরবক্ষে দুলিয়া দুলিয়া শুকাইয়া গেল, কিন্তু এই শুভমুহূর্ত্তটুকুকে তিনি কোন দিনই আর ভুলিতে পারিলেন না। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছাটুকু যেন একটি অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধন হইয়া তাহাদের দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধটিকে এমনই মধুরতর ও দৃঢ় করিয়া তুলিল যে, মহাদেবী যৌবনশ্রী তাহা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন; এমন কি, তাঁহার মরণকালেও সুখ হইল না।

এই সময় সহসা মহারাজাধিরাজের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহামাত্যকে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে সুরপালকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "এর ভাল-মন্দ তুমি দেখ।" লজ্জাদেবীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা! রামুকে আমি তোমার দিলাম।"

মহীপাল গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সুরপালকে মগধে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, রামপালকেও সুরপালের সঙ্গে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। মহাদেবী ইহার বিরোধী হইয়া বলিলেন, "রামপালের পাঠ সমাধা না হইলে সে কোথাও যাইবে না।"

স্বামি-স্ত্রীতে এই লইয়া বেশ একটুখানি কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল। মহীপাল যখন কোনমতেই স্ত্রীকে রামপালের বিরুদ্ধে লওয়াইতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ওকে নিয়েই থাক, আমায় আর কখনও কিন্তু চেও না।"

বিষাদ-গম্ভীর মুখ সুধীরে উত্তোলন পূর্ব্বক ধীর শান্ত-কণ্ঠে লজ্জাদেবী ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাকে ত আমি চেয়েও কোন দিন পাই নি। আপনি ত তা জানেন।"

মহীপালের ললাট বিরক্তির কুঞ্চনে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গের আভাস দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "ওঃ, তারই জন্য বুঝি আমার পরম শত্রুর পদতলে আত্মসমর্পণ ক'রে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।"

এই বলিয়াই তিনি রুষ্ট-বিদ্রূপে তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈর্ষা-কুটিল হাস্য করিলেন।

এত বড় পরীবাদেও মহাদেবীর এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি যথাপূর্ব্ব অবিচলিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধীর-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাজাধিরাজ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই দুইটা কথাই আপনার একান্ত ভিত্তিহীন।"

মহীপালের মুখ ক্রোধারক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনিও আত্মদমন করিলেন; বলিলেন, "কোন্ কথা আমার ভিত্তিহীন?"

লজ্জাদেবী কহিলেন, "মহাকুমার রামপালদেব আপনার পরম শত্রু নহেন এবং আমিও যে সেই পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ বালকের চরণে আত্মসমর্পণ করি নাই, এ দুইটাই আপনার অবিদিত নয়।"

মহীপালের গর্ব্বিত চিত্ত এই অনবনত অথচ শান্ত, তেজস্বী অথচ অচঞ্চল নারীচিত্তের সমাহিত অথচ অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ কথায় নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিতেছিল, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মহাদেবি! কি বলিব, তুমি স্ত্রীলোক এবং আমার স্ত্রী, নতুবা রামপাল আমার শত্রু নয়, এ কথা অন্য কেহ উচ্চারণ করিলে আমি তার জিভ কেটে আর কপালে তপ্ত লোহ দ্বারা 'মিথ্যাবাদী' এই ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিতাম। রামপাল আমার পরম শত্রু। সাম্রাজ্য শুদ্ধ লোক তারই পক্ষপাতী কেন? তার কুটিল ষড়যন্ত্রে। তার গভীর দুরভিসন্ধির ফলে। সে এতটুকু সুযোগ পেলেই কোন্ দিন সিংহাসন অধিকার ক'রে বসবে। আর তাতে তুমিই তাকে সাহায্য কচ্ছো? জেনে রেখ, আমি যদি তাকে না মারি, সে আমায় মারবে।"

লজ্জাদেবী সহসা কম্পিতকণ্ঠে বাধা দিলেন, "মহারাজাধিরাজ!"

মহীপাল তাঁহার সেই আর্ত্ত-কাতরতায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়াই ক্রূরকণ্ঠে নির্দ্দয়ভাবে কহিলেন, "হয় স্বামীর ছিন্ন শির, না হয় প্রিয়বন্ধুর, কোন্‌টা তোমার সহনীয় হবে বোধ কর, বিবেচনা ক'রে দেখ।"

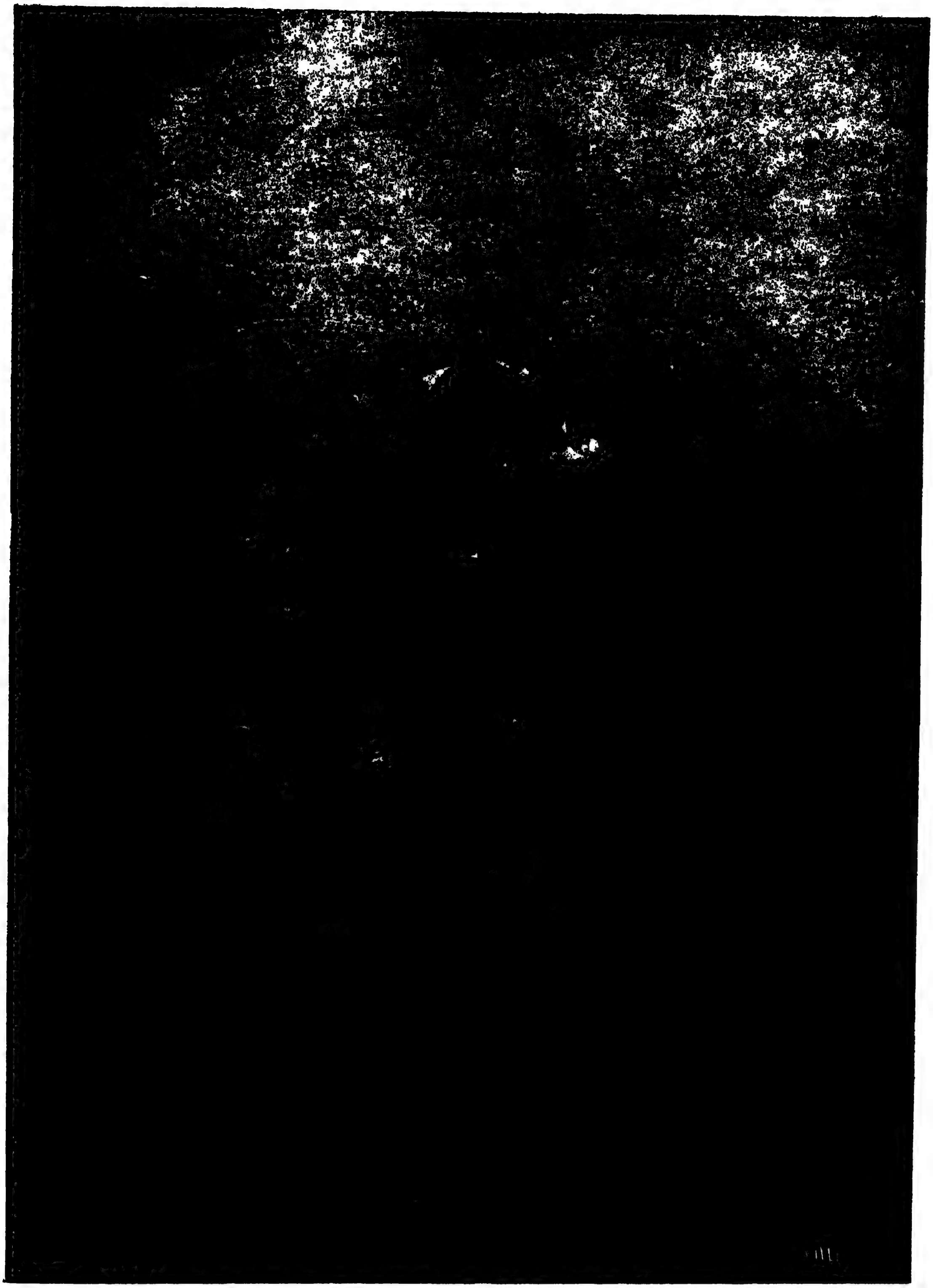

রক্তনেত্রে স্তব্ধ অসাড় নতনেত্রা নারীমূর্ত্তির প্রতি বারেক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেব সগর্ব্ব পাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

স্বামী পত্নীসম্ভাষণ সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জাদেবী সেই স্থানে সেই একই ভাবে তাঁহার অসাড় দেহ ও মন লইয়া বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণই যে তাঁহার এ ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। যখন সেই সুগম্ভীর চিন্তাজাল ভেদ করিয়া তিনি মুখ তুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি তখনও একা। ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা তাহার কৃষ্ণা প্রতিপদের পূর্ণ সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই স্মিতরশ্মি মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া একরাশি শুভ্র মল্লিকা-পুষ্পের অঞ্জলির মতই হর্ম্ম্যতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। দূরে-অদূরে দেবায়তনে সন্ধ্যারতির গম্ভীর ধ্বনি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে অদূরস্থ মহাবিহার-মধ্য হইতে সমবেত সুধীকণ্ঠে মহাধার্ম্মিক ভিক্ষুগণের ত্রিশরণ-মন্ত্র ঘন ঘন উচ্চারিত হইতেছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

এই মহাবাক্যত্রয় সুগম্ভীর ঘণ্টা ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে উত্থিত হইয়া ভূলোকবাসীর জন্য দুর্লভ স্বর্গদ্বার অনাবৃত করিয়া দিতেছিল। ধীরে ধীরে একটি গভীর শান্তি যেন সকলেরই প্রাণের তীরে নামিয়া আসিতেছে।

একটা হৃদয়ভেদী গভীরতর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক গৌড়েশ্বর-মহিষী মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন—"হায় প্রভু! সকলই যখন ঊর্দ্ধগামী, তখন মানুষের মনটাকেই শুধু এমন নিম্নগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ কেন? দীপ ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলে, ধূপ উপরেই গন্ধ বিলায়, ফুলও তার সৌরভের ডালি ঊর্দ্ধ পথেই প্রেরণ করে, শুধু নদীর জল, আর মানুষের মনই কি কেবল তার নিজের গতিপথ খুঁজিতে নীচুর দিকেই ছুটিবে! না না, নাও দেব! এই হীনতার প্রবৃত্তি তার দূর ক'রে কেড়ে নাও, দাও তাকে মহত্ত্বের, উদারতার, ত্যাগের মহিমময় ঊর্দ্ধচরণশীল উন্নত হৃদয়। উঃ, নতুবা এ বিশ্বরচনা যে তোমার নিরর্থক হয়ে যায়।"

* * "মহাকুমার! আমার একটি অনুরোধ রাখবে?"

"আদেশ করুন, মহাদেবি!"

"তোমার পক্ষে যতই প্রার্থনীয় হোক্, তবুও তুমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহী হ'তে পাবে না, এই কথা দাও।"

মহাকুমার রামপালদেব স্মিত-গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন, "এ কথা আপনি আমায় না বল্লেও আমি কখন তা করতাম না, মহাদেবি! তার কারণ, তিনি যে আপনার স্বামী।"

মহাদেবীর চোখের মধ্যে অশ্রুর মেঘ বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল, তিনি তাহা অতি কষ্টে রোধ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহার পর জ্যেষ্ঠ মহীপালদেবের সকল অন্যায়-অবিচারই কনিষ্ঠ কুমার রামপালদেব নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহাকর্ষণ করিতে পারিলেন না। এখানকার শিক্ষা সমাধা করিয়া তিনি বিক্রমশিলায় কিছু দিন ধর্ম্ম-শিক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া তৎপরে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন এবং নিজেদের রাজ্যসীমা সকল সন্দর্শন করিয়া তাহার পর রাষ্ট্রান্তরেও পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গাধিপ মাতুল মদনদেব ও সুবর্ণদেব প্রিয় ভাগিনেয়কে সযত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় মহীপালের কথা উঠিতে মদনদেব বলিলেন, "তোমার পিতৃরাজ্যে তোমারই সিংহাসনপ্রাপ্তি সঙ্গত হইত এবং তাহা হইলে পালসাম্রাজ্য আরও কিছু দিন গৌরবোন্নত থাকিতে পারিত। কেন তুমি নির্ব্বোধের মত দেশ-ছাড়া হইয়া বেড়াইতেছ, বল ত আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

রামপাল নতমুখে নীরব রহিলেন। তাঁহার নিজ দেশেও তাঁহাদের সুহৃদ্বর্গ যথা—মহামাণ্ডলিক, বীরদেব, এমন কি, মহাসেনানায়ক কর্ণভদ্র পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহাকে এই পরামর্শই দিয়াছিল।

তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া মদনদেব কহিলেন, "কি বল? আমার সমস্ত বল, আর তা ভিন্ন আমার যত দূর বিশ্বাস, তোমার নিজ দেশেও তুমি অধিকাংশ লোকেরই সহায়তা লাভ করিতে পারিবে। চেষ্টা করিবে না কি?"

রামপাল গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন,—"না।"

"চিরদিনটা এম্‌নি ছন্নছাড়া হয়েই কি বেড়াবে? অথচ তিন জনের মধ্যে তুমিই শক্তিমান। আর সে কথা বোধ করি তুমি ছাড়া আর সকলেই জানে।"

রামপাল বিষণ্ণমুখেই মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিলেন, "সে কথা আমিও না জানি, তা নয়। কিন্তু মামা, আমি আমার যতই ক্ষতি হোক্, সে বরং সহ্য করতে পারবো, কিন্তু মহাদেবীর স্বামীর অণুমাত্র ক্ষতি করতে পারবো না।"

মদনদেব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা বটে!" তাহার পর কিছু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তিনিই তবে তোমার সকল উন্নতির অন্তরায় হয়ে রইলেন! এই স্নেহই তোমার পক্ষে আপদ্ হ'ল!"

মাতুলরাজ্য হইতে বাহির হইয়া বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে রামপাল ছদ্মবেশে সমতটে প্রবেশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বণিক বলিয়া সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল এবং সুদর্শন-মূর্ত্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উচ্চশিক্ষা, তেজস্বিতা ও অমায়িকতার একত্র সমন্বয় প্রভৃতি গুণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুত্রগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। রামপাল ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব দুই জনেই অতিথিরূপে কয়েক মাস সমুদ্রতীরে বাস করিলেন।

এক দিন, সে দিন বসন্তের সায়াহ্নে আকাশ নীলোজ্জ্বল, পশ্চিমের প্রান্ত সুবর্ণে ও কালিমায় মিশ্রিত হইয়া অভিনব বর্ণবৈচিত্র্য ধারণ করিয়াছে, সেই আলো অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্রবক্ষে পতিত হইয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়াছিল।

সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে বালুরাশির উপর আরণ্যক গুল্মজাত জন্মিয়াছে। সেই রাঙ্গা আলো তাহাদের শ্যামশোভার উপর তাহার স্বর্ণ-রেণু মাখাইয়া দিয়া তাহাদেরও স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যকে বৰ্দ্ধিততর করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা হইয়াছিল, সেই বালুকাময় বেলাভূমির উপর উপবিষ্টা এক অপূর্ব্বদর্শনা কিশোরীর দেহজ্যোতিকে সংবৰ্দ্ধিত করিয়া। তরুণী তন্বী, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা ও তপ্তগৌরাঙ্গী। সঙ্গিনী তাহার এক বর্ষীয়সী নারী। নারী তাহাকে অপ্রসন্ন মুখে মৃদু মৃদু অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিতেছিল, আর সেই বিধাতৃ-সৃষ্টির আত্মাভূতা অপূর্ব্বদর্শনা সুন্দরী ভীত-চকিত নেত্রে স্তব্ধ থাকিয়া সেই উপদেশগুলি শ্রবণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া অশ্রু-ভারাকুল-নেত্রে অনন্ত জলধির পানে চাহিতেছিল। তাহার শান্ত করুণ মুখখানিতে একান্ত ভীতি-বিহ্বলতা।

রামপাল বিমুগ্ধ নির্ব্বাক্ নেত্রে সেই সকরুণ সুন্দর মুখখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল, এত দিনের দেশপর্য্যটন যেন তাঁহার আজ সফল হইয়া গেল। অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু এমনটি যেন কখন তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

একটুখানি নিকটবর্ত্তী হইতেই তাঁহার কানে আসিল, "তুমি নিতান্ত অবোধ! রাজরাজ্যেশ্বরী হবে, এতে তুমি অমত করছো? ছি ছি, এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই! এস, আর বিলম্ব করো না, যাত্রার কাল উপস্থিত হয়েছে।"

তরুণী যথাপূর্ব্ব নিশ্চেষ্ট ও নীরবভাবে বসিয়া রহিল, শুধু তাহার বিশাল নেত্র দুইটিতে অশ্রুজল পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়া তাহা পতনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, রামপালের নেত্রে তাহা অদৃশ্য রহিল না।

নারী কহিতে লাগিল, "জ্যোতিষী তোমার করকোষ্ঠী গণনা করেও যখন তোমার জন্ম-পত্রিকার লিখিত বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন ত আর আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। মহারাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তোমার বিবাহকাল আসন্ন হয়েছে এবং তিনি প্রত্যক্ষ তোমায় দেখে নিজে হ'তে আগ্রহ জানিয়ে বিয়ে করবেন, এই তাঁর অভিমত। তখন নিশ্চয়ই আমাদের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যাওয়া সঙ্গত। মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেবই যে এই আমাদের ঈপ্সিত মহারাজচক্রবর্ত্তী, তা'তে কোনই সংশয় নেই। এ অবস্থায় আমরা তোমার আপত্তি শুনতে পারি না।"

মেয়েটি বারেক তাহার অশ্রুসজল চোখ দুইটি ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "শুনেছি, তিনি লোক ভাল নন।"

আর কিছুই তাহাকে বলিতে হইল না, বর্ষীয়সী মহিলাটির সক্রোধ তিরস্কারে তরুণীর এই ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু কোথায় ডুবিয়া গেল। নারী তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে সরোষে কহিয়া উঠিল,—"লোক ভাল নন? মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব কত বড় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা, তা'র তুমি খবর রাখ? এক ফোঁটা মেয়ে, ছোট মুখে তোমাদের বড় কথা! এ বিবাহ হ'লে তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষ যে উদ্ধার

হয়ে যাবে, তার তুমি জানো কিছু? সাবধান! এমন অসংলগ্ন কথা আর বলো না। এ কথা তোমার পিতার কর্ণগোচর হ'লে তিনি তোমার মুখদর্শনও করবেন না।"

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পশ্চাতের তরু-বীথিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সুশ্যাম পত্রাবলী দেখিতে দেখিতে তাহার শ্যামলতা হারাইয়া নীলাভ হইয়া গেল। তখন সেই আগমনশীলা যামিনীর অবরোহণ-পথের মহাসন্ধিস্থলে সমুদয় বিশ্ব যেন মহানীল-সরস্বতীর মহানীলিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। তখন জলে নীল, স্থলে নীল, আকাশের নীলিমা, অনাদি-নীল অনন্তভাবেই সুবিস্তৃত হইয়া রহিল। কুমার রামপালের হৃদয়রাজ্যও বুঝি ঐ অসীম নীল সাগরের মতই তমসাবৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

রামপালদেবের সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, বন্ধু বোধিদেবের সপরিহাসবাক্যে—"সখে! দ্রষ্টব্য চ'লে গেলেও কি দৃষ্টি তার সঙ্গী হয়ে চক্ষু ছেড়ে চ'লে যায়?"

রামপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, নারী দুই জন কোন্ সময়ে চলিয়া গিয়াছে। তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেও তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"সখা যদি ব্রহ্ম-সূত্রধারী না হতেন, তবেই তাঁর দৃষ্টির বল বুঝতে পারতেম।"

"বটে! দৃষ্টি বুঝি আবার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভেদবুদ্ধিটুকও হিসাব ক'রে চলে? তবে ত সে বিবেকী দেখছি! কিন্তু কাব্য-নাটক ঠিক উল্টা কথাই রটনা ক'রে থাকে।"

রামপাল ঈষল্লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন,—"দৃষ্টিকে যে প্রেরণা দিয়েছে, তারই কথা আমি বলেছিলাম, কিন্তু এও বলি সখা! কাব্য-নাটকে প্রায়ই দেখা যায়, নিজ নিজ জাতি বজায় রেখেই নায়ক প্রেমে পতিত হয়ে থাকে। কদাচ কখন ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র।"

বোধিদেব সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, এস তবে এখন আমরা সেই বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধেই কথা কই! শুনলে ত, ঐ মেয়েটির কোন রাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিবাহ হবে, এই কথা উপযুক্ত জ্যোতিষিক গণনায় স্থির হয়েছে। আবার দৃষ্টিকে যিনি প্রেরণা দান করছেন, তিনিও না কি সম্পূর্ণ উৎসুক হয়েছেন, তাও দেখা যাচ্ছে, অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তার যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনে আর অযথা বিলম্ব ঘটানটাও ত সঙ্গত হয় না, কেমন না? আজ্ঞা কর, যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে ফেলি?"

রামপাল এতক্ষণ পরে এই বার তাঁহার আনত দৃষ্টি তুলিয়া প্রিয়সখার মুখে তাহা স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার মু হইতে আনন্দের সমুদয় স্মিতরশ্মিটুকু সন্ধ্যাগমে দিবালোকের ন্যায় একবারে নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল।

"বোধিদেব! তুমি ত জানই যে, আমার পিতৃরাজ্যে আমার স্থান একটা পথের ভিক্ষুকেরও চেয়ে অনেক নীচে এবং জীবনও আমার বৃক্ষচ্ছায়ার মতই অনিশ্চিত, তবে কেন রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষীপদপ্রাপ্তিরূপ ভাগ্যবতীর সঙ্গে আমার মত দুর্ভাগার মিলনরূপ অসম্ভব কল্পনা করছ, বন্ধু?"

রামপালের এই যথার্থ সত্য এবং খেদপূর্ণ কথ শুনিয়া বোধিদেব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না তিনি তাঁহার স্বভাবমৃদু স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন "ভাল, এই ঘটনাতেই তোমার ভবিষ্যতের আভা পাওয়া যাবে। যদি ঐ কন্যা যথার্থই রাজরাজ্যেশ্বরী সৌভাগ্য লয়ে জন্মে থাকে, তোমার হাতে পড়ে উহার ভাগ্যফলের পরিবর্ত্তন ত আর ঘটতে পারে না।"

"কিন্তু বিবাহ ত শুধু তোমার আমার ইচ্ছাতে হবে না, বন্ধু। তুমি পাগল! যারা পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের হস্তে কন্যা দান করতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যাত্র করছে, তারা কিসের দুঃখে আমার মত একটা পথের পথিককে সেই নিরুপমা কন্যারত্ন সঁপে দেবে? না না, কায নেই বন্ধু! রামপাল যেমন চির-দুর্ভাগ্যকে আশ্র ক'রে জন্মেছে, তার তাই থাক, বৃথা আশায় নিজে সন্তপ্ত করা তার স্বভাব নয়।"

"দেখ সখা! গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফলে নাই। অতএ কাযটাই আগে ক'রে দেখাই যাক্ না কেন। ফলানুসন্ধান না-ই বা করা গেল?"

রামপাল প্রীতনেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যের সংশয়-মেঘ যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার ক্ষণমাত্র পরেই উচ্চারিত বাক্য হইতে জানিতে পারা গেল।

"কিন্তু তুমি কেমন ক'রে জানবে, তারা কে?"

রামপালকে সন্দিগ্ধ দেখিয়া বোধিদেব এবার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"মহারাজপুত্র! বৃথাই কি দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র,

প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করেছি? এক দিন কি আমারও নামে রাজকবি আমার পূর্ব্বপুরুষের মতই শ্লোক রচনা ক'রে বলবেন না,—

'আ-রেবা-জনকান্মতঙ্গজমদৈস্তাম্যচ্ছিলাসংহতে-
রা-গৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্রী—'

এখানে দেবপালের পরিবর্ত্তে বসবে শ্রীরামপালো নৃপঃ।"

"আঃ, কি যে প্রলাপ বকছো, বুধ! যা অসম্ভব, তা' নিয়ে বৃথা পরিহাস কেন? কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৃহস্পতি-নিন্দিত মন্ত্রিবংশধর যে কোন্ নীতিকুশলতায় পরিচয় দিলেন, তা ত বুঝলাম না?"

"কেমন ক'রে বুঝবে? তাই যদি ক্ষাত্রবুদ্ধিতে প্রবেশ করতো, তা হ'লে কি আর—নানা মদমত্ত মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত ধরণীতলবিসর্পি ধূলিপটলে দিগম্বরাল সমাচ্ছন্ন ক'রে দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনা-সমূহ যাঁকে নিরন্তর ছুর্দ্দিলোক ক'রে রাখতো, সেই দেব সদৃশ দেবপাল নৃপতি উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁর দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান থাকতেন? না প্রশস্তিকার রাজকবি বিষ্ণুভদ্র এমন কথাটার উল্লেখ করিতে ভরসা ক'তেন?—

'দত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ।'

আমার ঘোর সন্দেহ হয়, তুমি হয় ত আমার কাছে তোমার পূর্ব্বপুরুষের মত 'সচকিত' ভাবে থাকতে পারবে না! নাঃ, তোমার সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব করাটা একেবারেই আমার সঙ্গত হয় নি।"

কুমার রামপাল এবার আর তাঁহার অন্তরের অসহিষ্ণুতা ও আগ্রহ রোধ করিতে না পারিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"ভবিষ্যতে তখন এক দিন তোমার সাক্ষাতে না হয় আমি সচকিত হয়েও আসন গ্রহণ করবো না, এই প্রতিজ্ঞাই রইলো, কিন্তু সে সকল আকাশ-কুসুম কল্পনার রহস্য-কথা যেতে দাও, এখন কি উপায়ে এদের সন্ধান নিতে পারবে, বল দেখি?"

মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব হাসিয়া কহিলেন,—"সন্ধান আমি নিয়েছি। তুমি যে তখন দৃষ্টি-ক্ষুধায় আত্মহারা হয়েছিলে, তাই শুনতে পাও নাই, ঐ মেয়েটির পিতৃনাম বন্ধুভট্ট, মেয়েটির নাম সন্ধ্যারাণী।"

মহাকুমার রামপালদেব কোন বিখ্যাত রাজবংশের পরিবর্ত্তে মাত্র সামন্তরাজ সমতটনিবাসী বন্দিক্ষু নাগরিক-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনাতে আর যাহারই যাহা মনে হয় হউক, তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজাধিরাজের চিত্ত কতকটা যেন সুস্থির হইয়াছিল। অঙ্গাধিপ মাতুল মদনদেব একেই রামপালের পক্ষে বর্ত্তমান, ইহার পর অপর কোন প্রবল রাজশক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলে যে রামপালের পক্ষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা আদৌ কঠিন হইবে না, তাহা মহীপাল বুঝিতেন এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিয়াই চলিতেন। বিশেষতঃ রামপালের দেশভ্রমণে তাঁহার মনের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় জন্মিয়াছিল যে, এই পরিভ্রমণের ভিতর কোন গূঢ় রাজনীতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে। কিন্তু তাহাকে এই হীন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে এত দিনে একটুখানি বিশ্বাস হইল যে, হয় ত বা রামপাল প্রজা-বর্গের পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তাঁহার অনিষ্টচেষ্টায় চেষ্টিত নহে। নতুবা যে অনায়াসেই গুর্জ্জর, প্রতিহার, মহোদয় প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ রাজন্যসুতা গ্রহণে স্বপক্ষকে যথেষ্ট বলশালী করিতে পারিত, সে কেনই বা এমন সামান্য ঘরে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বসিল? ঈষৎ প্রসন্ন চিত্তে তিনি কনিষ্ঠের জন্য সামান্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামপালও জ্যেষ্ঠের উদারতায় অনুগৃহীত বোধ করিলেন। বধূর সুন্দর মুখ দেখিয়া লজ্জাদেবী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

কেবল মহামন্ত্রী যোধদেব অন্যের অজ্ঞাতে নিজপুত্রকে ভৎ'সনা পূর্ব্বক কহিলেন, "তুইটা নির্ব্বোধ বালকে মিলে একটা অসঙ্গত কার্য্য করে এসেছো! কলিঙ্গপতি অনন্তবর্ম্মা, পীঠিপতি দেবরক্ষিত, মহোদয়াধিপ এ সকলেই রামপালের হস্তে কন্যাদানে সমুৎসুক থাকতে কোন্ অজ্ঞানিত সেনানায়কের কন্যা এনে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার সাহায্য করা বিখ্যাত পালমন্ত্রিবংশীয়ের উপযুক্ত হয় নাই।" [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভাবের অভিব্যক্তি

অভিনয়-কলাকুশল জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী একই সময়ে বিভিন্ন বয়সের মনোভাব পরিবর্ত্তনের স্বরূপ ফটো মুখের ভঙ্গীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক ভাব-বিকাশ-নৈপুণ্য মুখ-দর্পণে কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দর্শকমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ ফিলিম কোম্পানী ধীরেন্দ্রনাথের এই ফটোগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।—মাঃ বঃ সম্পাদক।

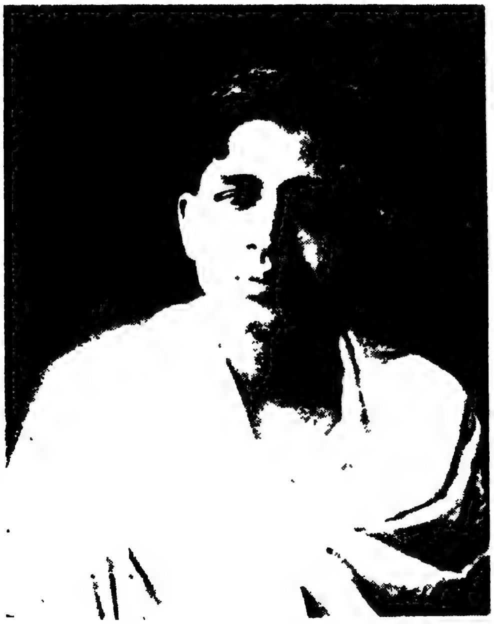

কুড়ি বৎসরে

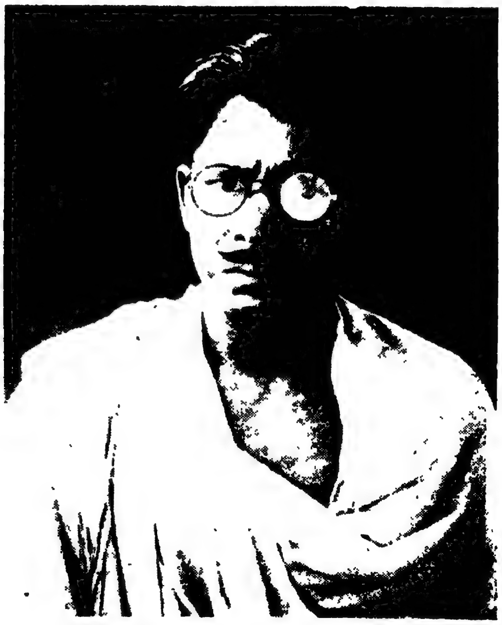

পঁয়ত্রিশ বৎসরে

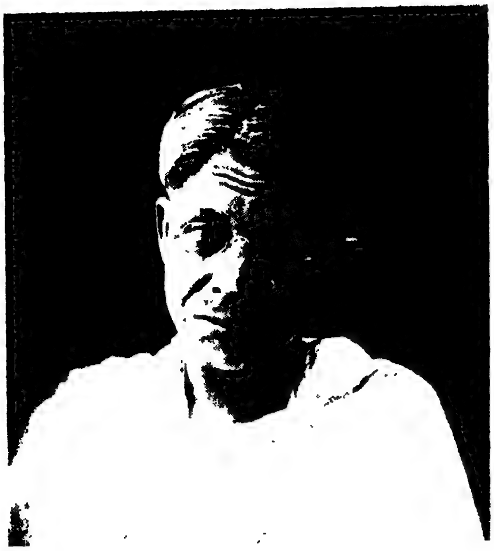

পঁয়তাল্লিশ বৎসরে

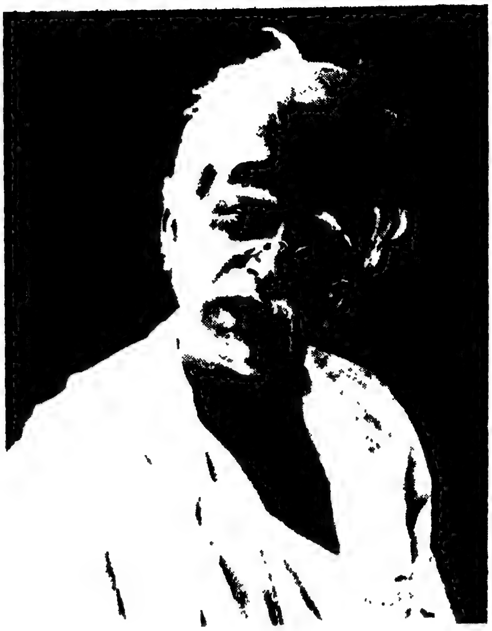

পঞ্চান্ন বৎসরে

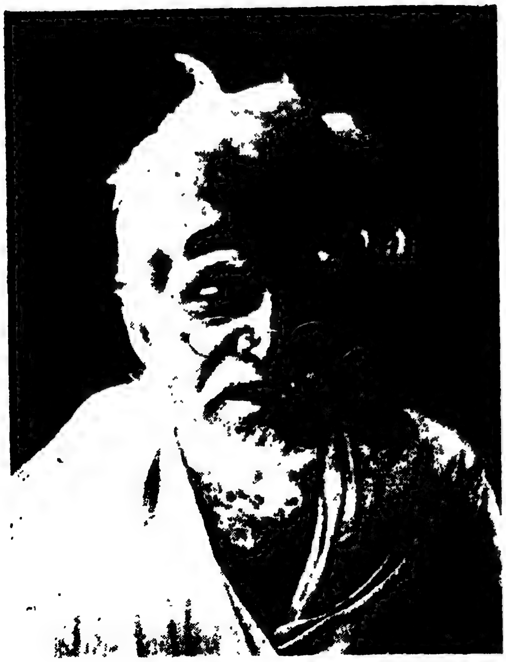

পঁচাত্তর বৎসরে

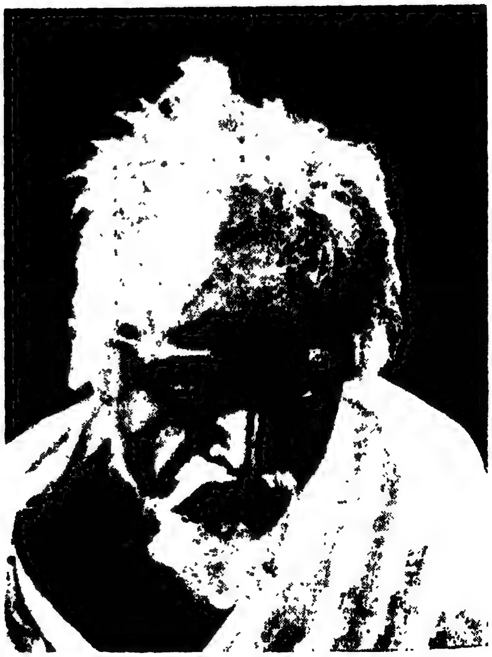

পঁচানব্বই বৎসরে

ফটো শিল্পী—কর্ণওয়ালিস ষ্টুডিও। অভিনেতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

ফুটবল ম্যাচ দর্শকের আনন্দ-রঙ্গ !

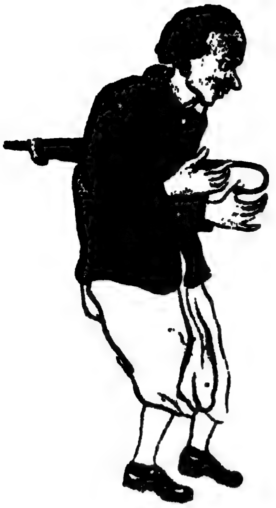

‘এই যে—এই যে, দিলে,—দিলে বুঝি গোল !”

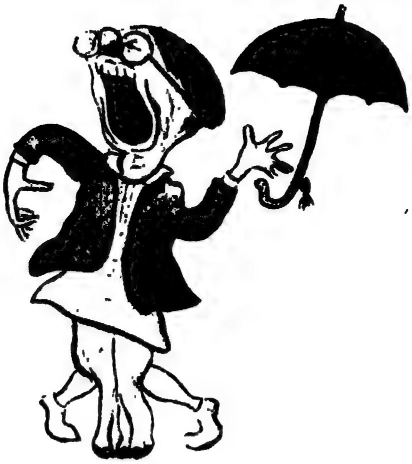

“বাগ্ আপ্—মোহনবাগান !’

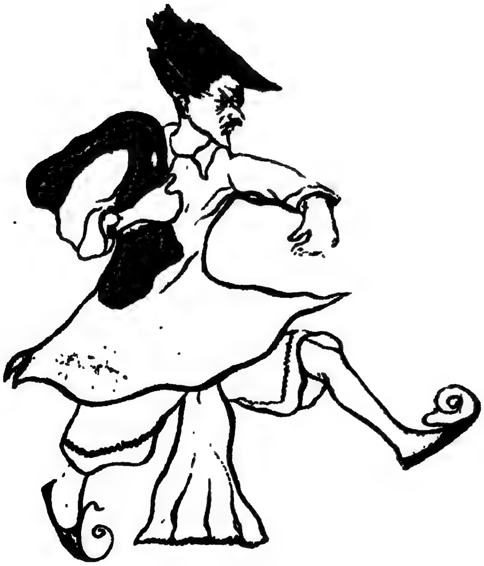

‘কিক্ কিক্—ফরোয়ার্ডটা একেবারে—ইয়ে !”
(এই ব’লে ভদ্রলোকটি সামনের লোকটিকে
মেরে দিলেন এক লাথী)

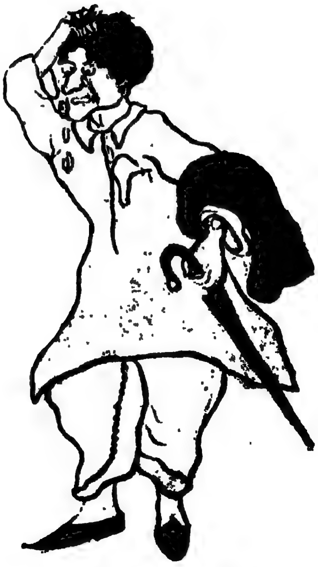

“এ কি হলো—মোহনবাগান গোল খেলে—
গোল !—ও মা !”

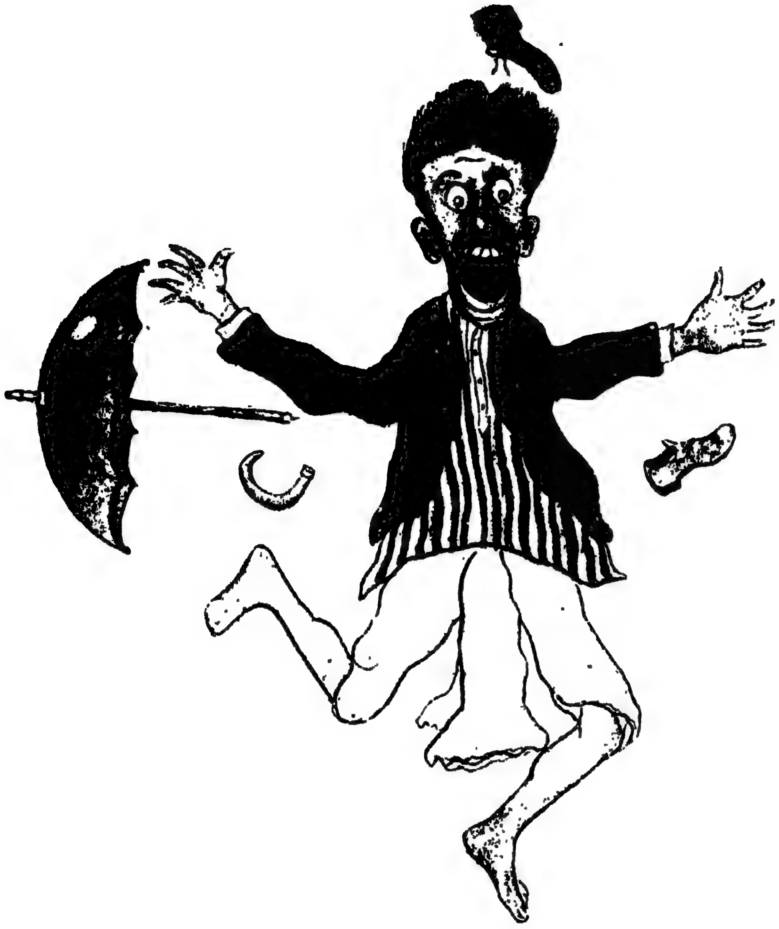

(পরক্ষণেই ক্যালকাটা একখানি সুন্দর গোল ভক্ষণ করিলেন]

“গো — ল !”

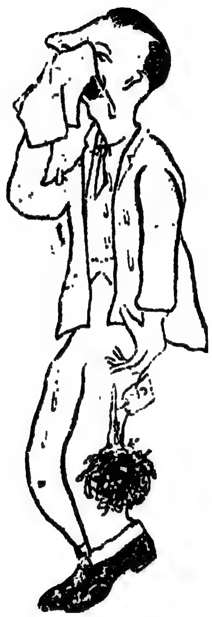

[ক্যালকাটা একটি গোল উদরস্থ করাতে বেচারীর হাতের ফুলটি পপাত ধরণীতলে !)

“ওঃ ক্যালকাটা !”

শিল্পী— শ্রীকিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভুঁইফোঁড় 'নেতা'

বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপলক্ষে মুসলমান-সমাজের মধ্যে যে কয়টি ভুঁইফোঁড় নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, হাজী গজনবি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য, এই ভাবের নেতৃত্বে যদিও তিনি এখন সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন, তথাপি এ বিষয়ে সার আবদর রহিমকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কেন না, সার আবদর রহিম সাহেব তাঁহার অনেক পূর্ব্বে আলিগড়ে গজাইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে সার আবদর আলিগড়ে যে কল টিপিয়া দিয়াছেন, তাহার 'খবর' আওয়াজ এখনও শুনা যাইতেছে। তাহা হইলেও বর্ত্তমানে হাজী গজনবি সাহেব সকলকে ছাপাইয়া—মূল গায়েনকে ছাপাইয়া গান ধরিয়াছেন। সে গানের তানে সারা বাঙ্গালা বুঝি ভাসিয়া যায়!

লম্বা লম্বা দেড়গজি ইস্তাহার বাহির করা এই 'হঠাৎ নেতার' যেন এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই 'হঠাৎ নেতা' হঠাৎ বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজের মস্ত মুরুব্বী ও সুহৃদ হইয়া পড়িয়াছেন—সে মুরুব্বীআনার এমনই টান যে, শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ প্রমুখ যে সকল বন্ধুদিগের প্রতি তিনি এ যাবৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সে সকল বন্ধুর কথাও ভুলিয়া গিয়া তিনি এখন মুসলমান পক্ষে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধের ওকালতী করিতেছেন। এই 'হঠাৎ নেতার' এই 'হঠাৎ দাবীর' কথা অপর কোনও মুসলমান নেতার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও তিনি কিন্তু এই দাবীর কথা জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং সে জন্য সিমলাশৈলে লাটদরবারে আরজী পেশ করিতেও গিয়াছেন। যে পাবনায় হিন্দুর উপর মুসলমানের ভীষণ অনাচার আচরিত হইয়াছে এবং যেখানে হিন্দু-মুসলমানে আদৌ সদ্ভাব নাই, সেই পাবনার আঞ্জুমান ইসলামিয়ার সম্পাদক খাঁ বাহাদুর মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন আমেদ এক ইস্তাহারে বলিযাছেন,—"বর্ত্তমান সময়ে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধ করিবার রীতি নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু এখন মুসলমানগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, সুতরাং তাহারা আর বর্ত্তমান রীতি অনুসারে অনুশাসিত হইতে বাধ্য নহেন।" মুসলমানরা বর্ত্তমানে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া অন্য সমাজের ন্যায্য অধিকার পদদলিত করিয়া চিরাচরিত প্রথার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ; তবে মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন যে স্বীকার করিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধ করিবার রীতি নাই," ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন হাজী গজনবি হইতে অধিক শরিয়ৎ জ্ঞানহীন মুসলমান, এ কথা গজনবি সাহেব জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? তবে তিনি কোন্ সাহসে কিসের জোরে এই বাদ্য বন্ধের দাবী জাগাইয়া রাখিতেছেন? এই ব্যাপার হইতেই কি বুঝা যায় না যে, হাজী গজনবির আন্দোলন কৃত্রিমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? কেবল ওয়াসিমুদ্দীন নহে, মিঃ নুরুদ্দীন নামক এক মুসলমান উকীল "বেঙ্গলী" পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমার বিবেচনায় মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি অতি তুচ্ছ ব্যাপার, ইহার জন্য কোন সম্প্রদায়েরই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ মুসলমানগণের ঐ ভাবে ক্রোধোন্মত্ত না হওয়া উচিত। কারণ, কোরাণ ধর্ম্মমতসহিষ্ণুতার এবং শান্তিরক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করে।" এক জন শিক্ষিত মুসলমান যে বাজনাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, আর এক জন শিক্ষিত মুসলমান উহাকে পাকাইয়া তাল করিয়া তুলিতেছেন কেন? ইহার মূলে কি রহস্য নিহিত আছে? উকীল মিঃ নুরুদ্দীন যাহাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলিতেছেন, ভুঁইফোড় নেতা মিঃ গজনবি তাহাকে প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? মিঃ নুরুদ্দীন আরও বলিয়াছেন, "মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি-সম্পর্কিত ব্যাপার পরস্পর আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সরকারী নির্দ্দেশই নিরপেক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যদি মিঃ নুরুদ্দীনের ধর্ম্ম না গিয়া থাকে, তবে মিঃ গজনবির যায় কেন? না হইলে তিনি কলিকাতায় সরকারী নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পরেও সিমলাশৈলে মনের ক্ষোভে দৌড়ান কেন? ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ মানের কান্না কাঁদিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?

আসল কথা, মিঃ নুরুদ্দীনের কোনও স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্য নাই। তিনি কাউন্সিল এসেমব্লিতে যাইতে আগ্রহান্বিত নহেন, বাঙ্গালায় মুসলমান মন্ত্রিসভা বাঁধিবার জন্যও কোমর বাঁধেন নাই। স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তিলকে তাল পাকাইয়া বাঙ্গালায় একটা বিরাট ব্যাপার বাধাইতে তিনি অগ্রসর নহেন, তাই তাঁহার মুখে সত্য কথা শুনা যাইতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে লইয়া একটা স্বতন্ত্র দল পাকাইয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার লালসায় উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মসজেদের সম্মুখে বাজনাকে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত করিতেছেন।

এই যে সে দিন কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ার রথযাত্রা ও উল্টা রথযাত্রা উপলক্ষে মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাইল ও রক্তস্রোত বহাইবার কারণ হইল, তাহার মূল কারণ কে বা কাহারা? শত বৎসর ধরিয়া পাইকপাড়ার লালাবাবুদের রথ এই পথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাতায়াত করিয়া আসিতেছে। এত দিন মুসলমানদের তাহাতে আপত্তি হয় নাই, আজই বা হয় কেন? 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেটসম্যান' প্রমুখ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহও মুসলমানগণকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতেছেন। আজ যদি গজনবি রহিম কোম্পানী এই বাজনা বন্ধের আব্দারটাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া জাহির করিবার প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে এই রক্তপাত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত না। এই সমস্ত ভুঁইফোড় নেতার প্রভাব হইতে সরকার কবে সমাজকে রক্ষা করিবেন?

— —

বড়লাটের উপদেশ

নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন এত দিন পরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে কথা কহিয়াছেন। তিনি যে অন্যান্য অবস্থাভিজ্ঞ ভারতের মঙ্গলকামী মনীষীর ন্যায় এই শোচনীয় অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিবেন, ইহা জানা ছিল। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে যে ভারতের ও তথা ইংলণ্ডেরও মঙ্গল নাই, এ কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কিসে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই এখন সমস্যার

বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারই ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতায় আসিয়া উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড়লাট যে বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা তুলিয়াছেন, তাহাতে সমস্যা-সমাধানের একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হয় ত মধ্যস্থতার ফলে আপাততঃ একটা রফা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিরোধের জড় মরিবে না। যদি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ আপনাদের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন, তবেই ভাল। নতুবা সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু উহাও বিরোধের জড় মারিতে পারিবে না। চিরকালের জন্য বিরোধের অবসান করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়কেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন (Change of heart) করিতে হইবে।"

লর্ড আরউইন

কথাটা ঠিক। কিন্তু যে মনোবৃত্তির ফলে এই বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তন করা সহজসাধ্য নহে। আলিগড়ে সার আবদর রহিম যে বোমা ফেলিয়াছেন ('ষ্টেটস্‌ম্যান' তাঁহার আলিগড়ের বক্তৃতাকে Aligarh Bomb আখ্যা দিয়াছিলেন), তাহা যে মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। এই যে কলিকাতার রাজরাজেশ্বরীর দ্বিতীয়বারের শোভাযাত্রায় মুসলমানরা সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রায় বাধা প্রদান করিয়াছিল এবং শোভাযাত্রা ও পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, এ যাবৎ সার আবদর রহিম প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কি?—উহা যে অন্যায় ও আইন-বিগর্হিত, এমন কথা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন কি? এই যে পাবনায় সংখ্যায় অসম্ভব অধিক মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুর উপর অনাচার অত্যাচারের একশেষ করিল, হিন্দুর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল,—এ যাবৎ কয় জন মুসলমান নেতা সেই গর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন? এই যে কুষ্টিয়ায় অসহায় হিন্দুনারীর মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে লাঞ্ছনা অবমাননা হইল, সার আবদর রহিম প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ সে বিষয়ে নীরব কেন? যে মনোবৃত্তির ফল এইরূপ, তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে কিসে?

মসজেদের সম্মুখে বাজনা অধুনা বহু মুসলমানের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে। হিন্দুরা কোনও কালে মুসলমানের নিকট অন্যায় আব্দার করে নাই। কিন্তু এই বাজনার ব্যাপার লইয়া মুসলমানপক্ষ হইতে অনেক অন্যায় আব্দার ও দাবীর কথা উঠিতেছে। এক পুরুষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে আব্দারের বা দাবীর কথা কখনও শুনা যায় নাই, এখন তাহা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এ কথা কি মুসলমানরাও অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের বাল্যকালেও দেখিয়াছি, হিন্দুরা মুসলমানের মহরমে আনন্দে যোগ প্রদান করিয়াছে, আবার মুসলমানরাও হিন্দুর দুর্গোৎসবে বা সরস্বতী-পূজায় আনন্দে যোগদান করিয়াছে। আজ সেই আনন্দপ্রদ অবস্থার পরিবর্ত্তন কে ঘটাইয়াছে? পাবনার মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন এবং উকীল মিঃ নুরুদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ রাখিবার রীতি ছিল না, উহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অথচ ঐ প্রচলিত রীতির বিরোধী তুচ্ছ ব্যাপারকে কে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিতেছে? কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় সরকারের অসংখ্য ফৌজ কুচকাওয়াজ করিয়া বাদ্য বাজাইয়া নানা মসজেদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। সে সময়ে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা পড়িতেছে বলিয়া মুসলমানপক্ষ হইতে কোনও আপত্তি উঠে নাই। সে সময়ে 'ধর্ম্মপ্রাণ' মুসলমান গরমের কাছে 'মোম' হইয়াছিলেন। তবে কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রার সময়ে তাঁহারা নরমের 'যম' হইয়া দাঁড়ান কেন? ইহাতেও কি তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না?

ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুর পক্ষ হইতে কয়েকটি সরল সত্য কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, যদিও ইংরাজ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, ইংরাজরা মারাঠা ও শিখ শক্তির নিকট হইতে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তথাপি এখন মুসলমানরা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, ইংরাজের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষ তাঁহাদেরই ছিল, ইংরাজ তাঁহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ জয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজের পূর্ব্বে ভারতে 'রাজার জাতি' ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, দিল্লীর বাদশাহ মারাঠা রাজা সিন্ধিয়ার হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, পরন্তু রণজিৎ সিংহ পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ মুসলমানদের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। গায়ের জোরে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা যায় না। তথাপি কেন যে মুসলমানরা এই অন্যায় দাবী করিতেছেন, তাহার মূলে এক গূঢ় রহস্য আছে। তাঁহারা এই দাবীর জোরে এখন ইংরাজের সংস্কার-আইনের শ্রেষ্ঠ অংশের অধিকারী হইতে চাহেন। ইহাই হইল বিরোধের মূল কারণ।

ডাক্তার মুঞ্জের কথাগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। লর্ড আরউইন তাহা হইলে কিরূপে মুসলমানের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন? উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুবিচার করিতে হইলে লর্ড আরউইনকে এ কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

কংগ্রেস-নেতার নিরপেক্ষতা

কংগ্রেস এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতবাসীর পক্ষে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ দান কংগ্রেসের নেতৃত্ব। সুতরাং যিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেন, তাঁহার পক্ষে সাধারণভাবে কোনও অভিমত প্রকাশ করা, কতটা ওজন বুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া 'ধীরে-সুস্থে' করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ বৎসরের কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছিলেন এবং আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত—অর্থাৎ কংগ্রেসের

অধিবেশন আর না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। সুতরাং এ দেশের রাজনীতিক সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার পরম নিরপেক্ষভাবে 'ধীরে-সুস্থে' অভিমত প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত—অন্ততঃ দেশের লোক তাঁহার নিকট এই আশা করিতে পারে। তিনি বিদুষী, কবি, তাঁহার জ্বলন্ত দেশপ্রেমে কাহারও সন্দেহ নাই। এ জন্য তাঁহার প্রতি দেশবাসী বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। বিশেষতঃ তিনি নারী, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনিই বলিয়াছিলেন, এ দেশ চিরদিন মাতৃত্বের সম্মান করে, এই হেতু এ দেশবাসী তাঁহাকে প্রেসিডেণ্টরূপে বরিত করিয়া মাতৃত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়াছে।

এ হেন প্রেসিডেণ্ট যদি নিজের পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া দেশের কোন রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে অন্তর ক্ষোভে ও দুঃখে ভরিয়া যায়। তিনি স্বরাজ্য দলের আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষে বাঙ্গালার জিলায় জিলায় প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য দেশবাসীর কিছু বলিবার নাই। তিনি স্বয়ং কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যদি স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশ দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন এবং উহার জন্য প্রচারকার্য্যে আত্মশক্তি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রচারকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই দিয়া এখনও হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের অনুকূলে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেন, তাহা হইলে তাহাতে হিন্দু বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে অপরাধিনী করিতে পারে না।

কিন্তু তিনি যদি এই প্যাক্টের খাতিরে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একপক্ষের সম্বন্ধে অনৃতবাণী প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না।

পাবনার খাঁ বাহাদুর ওয়াসিমুদ্দীন আমেদ বলিয়াছেন,—"গত ২১শে জুলাই তারিখে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পাবনায় আসিয়া সকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অকুণ্ঠকণ্ঠে হিন্দু নেতৃবর্গের ব্যবহারের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই ব্যবহারের ফলেই পাবনায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ও হিন্দু-মুসলমানের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" মৌলভী সাহেবের এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এই উক্তি একান্ত পক্ষপাতিতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে হইবে। তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে জাতীয়তার বড়াই করেন, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যাক্ট বজায় রাখিবার জন্য ওকালতী করেন, অথচ তাঁহার মুখে কেবল হিন্দুদিগের প্রতি এই কোপ-কটাক্ষ কেন? তিনি পাবনার ব্যাপারের বিষয়ে অল্পসময়ের মধ্যে কতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? পাবনায় যে হিন্দু দেবমূর্ত্তি সমূহ অপবিত্র ও ভগ্ন হইয়াছিল, এ কথা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দুরা যদি সেই সকল মূর্ত্তি শোভাযাত্রা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে গিয়া থাকে এবং সে বিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া থাকে, তবে কি তাহারা বিশেষ অপরাধ করিয়াছে? তবে মুসলমানরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হিন্দুগণকে আক্রমণ করে কেন? এ বিষয়ে কি মুসলমানগণের কোনও অপরাধ নাই? কেবল হিন্দুরাই অপরাধী?

আমরা শুনিয়াছি, পাবনার মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের অনুমতিক্রমে পাবনায় হিন্দুদিগের এক সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা নির্গত হইবার কথা স্থির হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বেলা ১০টা হইতে ১টার মধ্যে শোভাযাত্রার পাশ দেন। শোভাযাত্রার দিন প্রাতঃকালে স্থানীয় এক মুসলমান নেতা (সরকারী কর্ম্মচারী) ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া শোভাযাত্রার পাশ প্রদানে আপত্তি উত্থাপন করেন। ওজুহৎ—শোভাযাত্রার পথে দুইটি মসজেদ পড়িবে। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং মুসলমান, সুতরাং তিনি মসজেদে নামাজের সময় জানিতেন। তাই তিনি বলিলেন, যে হেতু বেলা ১০টা হইতে ১টার মধ্যে ঐ দিন নামাজের সময় নাই, সেই হেতু শোভাযাত্রায় আপত্তি থাকিতে পারে না। তথাপি সেই মুসলমান নেতা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভয়প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, যদি শোভাযাত্রার পাশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে হাঙ্গামা ঘটিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। ফলে সেই নেতার মেজাজ ১০৫ ডিগ্রী ফারেণহিট হইতে ৯৫° ডিগ্রীতে নামিয়া যায়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ ক্ষেত্রেও কি হিন্দুদিগকে অপরাধী করিতে চাহেন? কলিকাতায় দ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রায় যেমন মুসলমানরা সরকারের আদেশ ও নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল, পাবনায় ঠিক তাহাই হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃঢ়চিত্ততায় ব্যাপার অধিক দূর গড়াইতে পায় নাই। এ ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ দোষী ছিল, তাহা শ্রীমতী নাইডু বুঝাইয়া দিবেন কি?

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। সিরাজগঞ্জ রেল-লাইনের উল্লাপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে এক গ্রামে ৫ শত মুসলমানের মধ্যে ৫০ জন হিন্দুর বাস ছিল। বকরিদের দিন রাত্রিকালে কোনও মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত চারিটি নিহত গরুর পদ গ্রামস্থ হিন্দু-মন্দিরের বিগ্রহের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। এই ঘটনার কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রামে উপস্থিত হইয়া মুসলমান মণ্ডলগণকে বলেন, যদি তাঁহারা অপরাধী ধরাইয়া না দেন, তাহা হইলে সমগ্র মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে এবং ভবিষ্যতে গ্রামে কোরবাণি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ভয়প্রদর্শনের ফলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান পিশাচ ধৃত এবং দণ্ডিত হয়।

এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানই প্রথম অপরাধী। হিন্দুরা মুসলমানের ধর্ম্মের বা দেবস্থানের কোনও অসম্মান করে নাই, মুসলমান হিন্দুর দেবস্থানের অমর্য্যাদা করিয়াছিল। শ্রীমতী নাইডু এ কথার উত্তরে কি বলিতে চাহেন?

শ্রীমতী নাইডু 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট যে ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালার হিন্দুগণের নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, মুসলমান প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং মুসলমান নেতৃবর্গই (বিশেষতঃ সার আবদর রহিমের মত) কেবল বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ। এই ভাবের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া আমার নামে রটনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যাহা যথার্থ বলিয়াছি, তাহা এই:—যে সকল হিন্দু-সাম্প্রদায়িক নেতা হিন্দু-সংগঠনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ভিন্ন খাতে পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে রাজনীতিক ও কাউন্সিল নির্ব্বাচন সম্পর্কিত আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধ সংঘটনের কারণ হইয়াছেন। অথচ হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা ছিল না, হিন্দুর সামাজিক সংস্কার এবং একতা-বিধানই সংগঠনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং হিন্দু নেতারা এ বিষয়ে মুসলমান নেতাদিগের মত সমান দায়ী।" শ্রীমতী নাইডু এ 'অভিনব বারতা' কোথায় সংগ্রহ করিলেন জানি না। তিনি বাঙ্গালী হইলেও জীবনের অধিকাংশ সময় মুসলমান-প্রধান দেশে (হায়দ্রাবাদে) অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মুসলমান-প্রীতি বিস্ময়ের বিষয় না হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান নেতাদিগের সহিত হিন্দু নেতাদিগকে একাসনে বসাইবার কি কারণ পাইয়াছেন? হিন্দু নেতারা হিন্দু-সংগঠনের কার্য্য ভিন্ন খাতে পরিচালনা করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা ঝাঁকাইয়া তুলিবার মূল কারণ কে, তিনি কি জানেন না? আলিগড়ে সার আবদর রহিম যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যে বক্তৃতাকে

'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রও Aligarh Bomb shell বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বক্তৃতাই কি যত অনর্থের মূল নহে? সার আবদর আলিগড়ে যে আগুন জ্বালাইয়াছেন, মিঃ গজনবি কি মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধের আন্দোলন তুলিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন না? হিন্দু-সংগঠনের নেতৃবর্গ এই আগুনের ঝাঁজ হইতে আপনাদের সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহারা কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী হন?

হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে Pan-Islamic প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা শ্রীমতী নাইডু অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন খেলাফৎ আন্দোলন হয়, তখন মিঃ সৌকৎ আলি ও মিঃ মহম্মদ আলি প্রমুখ মুসলমান নেতারা হিন্দুগণের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া খেলাফৎ আন্দোলনকে সজীব ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বলকান যুদ্ধের সময় সৌকৎ আলি তাঁহার Servants of the Caba অর্থাৎ কাবার সেবিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুসলমানের ধর্ম্মস্থান রক্ষা তাহার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা সমিতির Prospectus ও appeal হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 'Comrade' পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নিখিল জগতের মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। খেলাফৎ কমিটীর প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই আন্দোলন আরও দৃঢ়মূল হয়। মিঃ সৌকৎ আলি তাঁহার 'কাবার সেবিসঙ্ঘের' জন্য ১০ লক্ষ সভ্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই কি বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রথম পর্ব্ব নহে? হিন্দুরা যখন সংগঠনের স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই, তখন হইতে এই নিখিল মুসলমান সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তবে হিন্দু-সংগঠনের প্রবর্ত্তয়িতারা কিরূপে মুসলমান কাবা সেবিসঙ্ঘ ও খেলাফৎ প্রবর্ত্তয়িতাদের সহিত তুল্য অংশে অপরাধী হইয়াছেন?

পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় অত্যধিক মুসলমানরা যে ভাবে হিন্দুদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হঠাৎ বঙ্গের কোন মুসলমান-প্রধান স্থানে মুসলমানরা ক্ষেপিয়া উঠিলে সরকারের পক্ষে আশু সাহায্যদানের বা শান্তিরক্ষা করার ক্ষমতা নাই। হিন্দুর ধনপ্রাণ অথবা মান-ইজ্জৎ নষ্ট হইবার পর স্থানান্তর হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সরকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটাইতেছেন বটে, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম মুখে হিন্দু সংখ্যায় অল্প বলিয়া প্রহৃত ও হতমান হইতেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য কি? সে কি চিরদিনই কৃপার পাত্ররূপে দাঁড়াইয়া মার খাইবে? এ অবস্থায় যদি হিন্দু রাজনীতিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে, তবে তাহারা দোষী হইবে কেন? শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্বয়ং নারী হইয়া কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দু নারীর অপমান-নির্য্যাতনের কথা শুনিয়াও কি এখন হিন্দু-সংগঠনের নেতৃবর্গকে অপরাধী স্থির করিবেন?

কিন্তু শ্রীমতী নাইডু বিদুষী, কবি, দেশপ্রেমিকা বা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট—যাহাই হউন, তাঁহার এই অযাচিত উপদেশ হিন্দু গ্রহণ করিবে না। জাতি হিসাবে হিন্দু মরিতে পারে না। যে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, সার আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও যে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সার জগদীশ, সার প্রফুল্ল ও রবীন্দ্রনাথ জীবিত রহিয়াছেন,—সেই বাঙ্গালী হিন্দু মরিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেই হইবে। কংগ্রেস, কাউন্সিল, স্বরাজ,—এখন দূরের কথা, এখন হিন্দুর হিন্দু হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এ জন্য হিন্দু-সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন। সে সংগঠন যদি রাজনীতির দিক দিয়াও করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে।

নির্য্যাতিতা হিন্দু-নারী

এত দিনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা একটা কাযের মত কায করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান স্থানে পশুপ্রকৃতির মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে হিন্দু-নারীর লাঞ্ছনা অবমাননা নূতন নহে। এত দিন এই সকল নির্য্যাতিতা নারী সমাজের কঠোর শাসনে সমাজের বক্ষে স্থান পাইতেন না। ফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অথবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। গত ২৫শে জুলাই তারিখে কলিকাতার ব্রাহ্মণ-সভা-গৃহে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা কয়টি মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। মন্তব্যগুলি এই :—

(১) যে সকল হিন্দুনারী বলপূর্ব্বক অথবা কৌশলক্রমে ধৃত ও অপহৃত হইয়া থাকেন, অথবা বলপূর্ব্বক ধর্ষিত বা সতীত্বরত্নে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের পর আবার হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা হইবে। এ সম্বন্ধে পবিত্রভাবে গঙ্গাস্নানই দেহশুদ্ধির উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) শালগ্রাম-শিলার চক্র যদি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে উহা নদীগর্ভে অর্পণ করিয়া নূতন শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শিলার চক্র যদি ভগ্ন না হয়, তাহা হইলে কেবল নদীগর্ভে ডুবাইয়া লইলেই হইবে। যদি গৃহের দেব-বিগ্রহ বিকলাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা নদীগর্ভে অর্পণ করিয়া নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৩) কেবল কলমা পড়া হিন্দুর পক্ষে পাপ বলিয়া গৃহীত হইবে না। যদি হিন্দুকে বলপূর্ব্বক নিষিদ্ধ অন্ন বা অন্য খাদ্য আহার করান হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের পর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে।

ব্রাহ্মণ-সভার জয় হউক। তাঁহারা যে কালের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, ইহা পরম সুখের কথা। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান এখন আর পূর্ব্বের মত না হইলেও হিন্দু ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রকার ও ব্যবস্থাদাতা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষ হইতে এই সমস্ত সময়োপযোগী ব্যবস্থা হওয়ায় সমগ্র হিন্দু-সমাজ প্রীতিলাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ-সভার নিকট আমাদের আর একটি আবেদন আছে। বাঙ্গালায় অস্পৃশ্য অন্ত্যজগণের সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা (মাদ্রাজের মত) নাই। অথচ যেটুকু আছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু বন্ধন কালের উপযোগী করিয়া শিথিল করিয়া দিলে হিন্দুর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। আমরা কখনও বলি না যে, 'রোটী বেটী'র বন্ধন উঠাইয়া দিয়া একাকারের প্রতিষ্ঠা করা হউক। কিন্তু তাহা না করিয়াও হিন্দুর সকল জাতির মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন অনায়াসে স্থাপন করা যায়। কি ভাবে সে বন্ধন স্থাপিত হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ-সভাই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করুন, ইহাই কামনা।

সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা

পাবনায় পিশাচ দস্যুর তাণ্ডবলীলার পর কলিকাতা হইতে কয়েক জন বাঙ্গালী হিন্দু অত্যাচারিত উৎপীড়িত বিপন্ন হিন্দু ভ্রাতৃবর্গকে ভরসা ও সাহায্যদানের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন প্রত্যক্ষদর্শী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পাবনার বাঙ্গালী হিন্দুর সম্বন্ধে ক্ষোভ ও দুঃখে হৃদয় ভরিয়া যায়। তিনি

বলিয়াছেন,—"আমরা পাবনা সহরে উপস্থিত হইয়া হিন্দু জনসাধারণকে যেরূপ সন্ত্রস্ত, ভীত ও বিচলিত দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গালী হিন্দু মনুষ্যত্বশূন্য হইয়াছে। তখন পাবনা সহর মিলিটারী পুলিস ইত্যাদিতে ভরিয়া গিয়াছে। মুসলমান গুণ্ডার অত্যাচারের ভয় তখন একবারেই নাই। সত্য বটে, পূর্ব্বে স্থানীয় সরকারী রক্ষক দুর্ব্বৃত্ত উত্তেজিত মুসলমান জনতাকে যোড়হস্তে কাকুতি-মিনতি করিয়া হিন্দুদিগকে ক্ষমা-ঘৃণা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; সত্য বটে, সে জন্য মুসলমান গুণ্ডারা মনে করিয়াছিল, পাবনায় বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইয়াছে, অতএব তাহারা ঐ জিলার সহরে-মফঃস্বলে সংখ্যায় অল্প হিন্দুগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারে, সত্য বটে সেই সময়ে পাবনা জিলার গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ গুণ্ডা মুসলমান তথায় মুসলমানরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে মনে করিয়া লুঠ-পাঠ ও অত্যাচার অনাচারের চূড়ান্ত করিয়াছিল,—কিন্তু যে সময়ে আমরা পাবনায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন মুসলমান অত্যাচারী দস্যুর বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের নিকট কোনও আশঙ্কার কারণ ছিল না। তথাপি আমরা আতাইকোলার বাজারে যাইবার জন্য এক জনও স্থানীয় পথিপ্রদর্শক পাইলাম না। কেহই ভয়ে মফঃস্বলে যাইতে চাহে না। পরে বহুকষ্টে আমরা ৩টি বাঙ্গালী যুবককে সম্মত করাইলাম। তাহারাও ভয়ে ভয়ে আমাদের সহিত অগ্রসর হইল। পথে এক স্থানে এক জন পথিক সংবাদ দিল, মাত্র ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রায় সহস্রাধিক মুসলমান একটা হাট লুঠ করিয়া আমাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শুনিবামাত্র পাবনার সেই ৩ জন যুবক প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পাবনার দিকে ছুট দিল। পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল, সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

"পথে কোন কোন গ্রামে আমরা হিন্দু অধিবাসীদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম। কেহই দেখা করিতে চাহে না, সকলেরই মুখে আশঙ্কার চিহ্ন,—যেন আমরা চলিয়া গেলেই তাহারা স্বস্তি লাভ করে। অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহাদের ভয়, পাছে তাহারা আমাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছে শুনিয়া মুসলমানরা আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করে!

"সর্ব্বত্রই দেখিলাম, হিন্দুর গৃহ বিধ্বস্ত, বাজার হাট লুণ্ঠিত—সবই যেন শ্মশান সদৃশ! কাহারও গৃহে আহার্য্য বা অর্থ কিছুই নাই। পাষণ্ড মুসলমান দস্যুরা নির্য্যাতন ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা অযথা বহু আহার্য্য ও গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি পথে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

"অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। তাহাদের গলদেশে তুলসীর মালা, কণ্ঠী ও টিকিরও অভাব নাই! যে কয় জন হিন্দুকে আমরা কথা কহাইতে পারিয়াছিলাম, তাহাদের সকলেরই মুখে একই কথা শুনিয়াছি :—'সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছায় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে যখন, তখন ও সর্ব্বনাশ আমাদের মঙ্গলের জন্য।' কথাটা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। যদি যথার্থ সরল বিশ্বাসে তাহারা এ কথা বলিত, তাহা হইলে উহাতে হাসিবার বা দুঃখ করিবার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আপনার অকর্ম্মণ্যতার অপরাধের বোঝা দৈবের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া আমরা কোনমতে সমর্থন করিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না, তাহা পরে বলিতেছি।

"আমরা বলিলাম, 'শ্রীকৃষ্ণ কবে কোথায় জনগণকে কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—কবে তিনি হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছেন?' উহার কোনও সদুত্তর পাইলাম না। কাপুরুষতার কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দু যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা কোনও এক গ্রামে দেখিলাম, সেখানে অন্যান্য হিন্দুর সহিত আমরা ১২।১৪ ঘর নমঃশূদ্রকেও দেখিলাম। আশ্চর্য্যের কথা, গ্রামের তাবৎ হিন্দুর গৃহই আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু নমঃশূদ্রগণের গৃহের একটি গাছের পাতাও ছিন্ন হয় নাই। আমরা নমঃশূদ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা গ্রামে থাকিতে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণকে বাধা প্রদান করে নাই কেন? উত্তরে তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তাহারা বলিল, 'কেন আমরা বাধা দিব? আমরা হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, কাযেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধে আমরা থাকিব কেন?' আমরা বলিলাম, 'তোমরা ত হিন্দু, তবে হিন্দুর বিপদে তাহাদের সহায় হইলে না কেন?' তাহারা বলিল, 'আমরা- কিসের হিন্দু? আমাদের এই গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানকে তাঁহাদের ঘরের দাওয়ায় মাদুরে বসিতে দেন, তাঁহাদের হুঁকা হইতে কলিকা খুলিয়া লইয়া তামাক খাইতে দেন, আরও কত কি করেন ; কিন্তু আমরা দেখা করিতে গেলে ঘরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেন না। সুতরাং আমরা তাঁহাদের আপনার, না মুসলমানরা তাঁহাদের আপনার? এই কথাটা উঁহাদেরই জিজ্ঞাসা করুন না।' আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ইহার উত্তর কি দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। পরন্তু অন্য হিন্দুগণকে এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তাঁহারা বলিলেন, 'নমঃশূদ্র যে অস্পৃশ্য, তাহাদিগকে কিরূপে বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া যায়?' আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। এখনও এই কথা! হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতন কে রোধ করিবে?"

প্রত্যক্ষদর্শী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কি মনে হয়? বাঙ্গালী হিন্দু কি এইরূপে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ও গণ্ডীর গণ্ডী দিয়া জাতির বেড়া বানাইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে? হিন্দু কি সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কোনও চেষ্টা করিবে না? বাঙ্গালার অনেক স্থানে 'নিম্নশ্রেণীর' হিন্দুরাই দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ রক্ষা করিয়াছে, তথাকথিত উচ্চজাতি সে বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারাই হিন্দুয়ানীর বড়াই করিয়া 'নিম্নশ্রেণীদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিতে চাহেন! ইহা কি বিড়ম্বনা নহে? কেহ হিন্দুকে জাতির বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একাকার করিতে বলে না। 'রোটী ও বেটী' অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া কি সম্ভবপর হয় না? আমরা শুনিয়াছি, চট্টগ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমীদার ও ব্যবসাদার তাঁহার এলাকার মধ্যে এক কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তথায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর অবাধ গতির ও পূজার অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। এমনও ব্যবস্থা হইয়াছে যে, 'নিম্ন জাতির' লোকও যদি অগ্রে মন্দিরে গমন করে, তবে পূজার অধিকার তাহার সর্ব্বাগ্রে। এতদ্ব্যতীত নামসঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদি দ্বারা সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একটা হৃদ্যতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি করা হইতেছে। এই ভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিলে হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হইতে কয় দিন লাগে? এত লাঞ্ছনা ও অবমাননার পরেও কি হিন্দুর চৈতন্য হইবে না?

তাই বলিতেছি, হিন্দুকে এখন বৃথা দর্প ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুর সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ইহাতেই তাহার মুক্তি, ইহাতেই তাহার মঙ্গল। অন্যথা অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার নাম মুছিয়া যাইবে।

আবদারের বন্যা

এই বর্ষায় নদীসমূহে যেমন জলস্রোতের বন্যা বহিতেছে, তেমনই বাঙ্গালার মুসলমানদিগের আকাঙ্ক্ষার নদীতে আবদারের স্রোতের বন্যা দেখা দিতেছে। সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র যদিও বে-সরকারী ভাবে

কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু-মুসলমানে একটা আপোষ বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা সকলেরই বিদিত যে, বড়লাট লর্ড আরউইন সরকারী ভাবে না হইলেও এই মিলন-সংঘটনের মূলে ছিলেন, পরন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে সার ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং আশা করা গিয়াছিল যে, যে রহিম-গজনবি কোম্পানী মসজেদের সম্মুখে হিন্দুর বাজনা শুনিলে ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করেন, অথচ সরকারের মিলিটারী ব্যাণ্ড সদর্পে সেই মসজেদের সম্মুখে ঝম ঝম বাজনা বাজাইয়া গেলে বিবরে লুকাইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেই কোম্পানী সার ভূপেন্দ্রের মান রাখিয়া সম্ভবমত একটা রফায় সম্মত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা সার ভূপেন্দ্রকে যে তিনটা রফার সর্ত্ত দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের আবদারের মাত্রার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কলিকাতার মসজেদগুলিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করিতে চাহেন :—(১) যে সকল মসজেদ মুসলমান-প্রধান পল্লীমধ্যে অবস্থিত ; (২) যে সকল মসজেদ সমান অংশে বিভক্ত হিন্দু-মুসলমান পল্লীর মধ্যে অবস্থিত, (৩) যে সকল মসজেদ হিন্দু-প্রধান পল্লীমধ্যে অবস্থিত। প্রথম শ্রেণীর মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে তাঁহাদের ফতোয়া এই যে, সারা দিন-রাত্রি উহাদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত এই যে, মুসলমানদিগের ৫ বার নামাজের সময় ৫ ঘণ্টা বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা এই যে, ঐ ৫ বার নামাজকালে মোট ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট কাল বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে।

ইহাই কি আপোষের উপযোগী সর্ত্ত? বৃটিশ সরকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালত প্রিভি কাউন্সিল যে আইন (Ruling) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুরা তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? বৃটিশ রাজার প্রত্যেক প্রজার রাজপথের উপর সকলের সহিত সমান অধিকার আছে। কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোক সে অধিকার ত্যাগ করিতে পারে না। যদি মসজেদের সম্মুখে বাজনা এত দিন পরে মুসলমানের ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে রাজপথ হইতে দূরে মসজেদ সরাইয়া লইয়া যাইলেই হয়। এ সম্বন্ধে পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশকে নজীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। দিল্লীর বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ গত ইদের সময় গো-কোরবাণী সম্বন্ধে যেরূপ নিরপেক্ষ আইন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কলিকাতায় মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে রাজার শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের আইন ত বাঁধিয়া দিলেই হয়। মুসলমান যদি বলিতে পারে, মসজেদের সম্মুখে বাজনা তাহার শরিয়তের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে হিন্দুও ত বলিতে পারে, গো-কোরবাণী তাহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ—গঙ্গায় মাঝিমাল্লার মলমূত্র ত্যাগ তাহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তবে কি সরকারকে মুসলমানের শরিয়তের ও হিন্দু-শাস্ত্রের বিশেষ বিধির অনুযায়ী বিশেষ আইন গঠন করিতে হইবে, সাধারণ প্রজার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে? হিন্দু যদি বলে, মসজেদে আজান গান হিন্দুর ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে কি আজান উঠাইয়া দিতে হইবে? মুসলমান-প্রধান পল্লীতে বাজনা একবারে নিষিদ্ধ করিবার আবদার করা হইয়াছে। তবে আবদার গোরা-পল্টনের ঝম ঝম ব্যাণ্ড বাজনা সম্বন্ধেও করা হয় নাই কেন?

এই ভাবে আবদারের পর আবদার রক্ষা করিতে হইলে অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? রাজপথে বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রার যে অধিকার কলিকাতাবাসী হিন্দুরা কলিকাতার প্রতিষ্ঠা অবধি ভোগ করিয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা সরকার মুসলমানের আবদারে তাহা সঙ্কুচিত করিতেছেন, আদালতে তাহার মীমাংসা করিতে অবসরও দিলেন না; ইহাতে মুসলমানের আবদার কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা পর পর কতকগুলি ঘটনায় দেখা যায়।

প্রথম দফায় আমরা নারিকেলডাঙ্গার পোষ্ট মাষ্টারের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি হিন্দু। তিনি তাঁহার বাসায় সত্যনারায়ণ পূজা করিতেছিলেন। বাজনা শুনিয়া পল্লীর মুসলমানরা তাঁহাকে পূজার বাজনা বন্ধ করিতে বলে।

দ্বিতীয় দফায় ধর্ম্মতলার মোড়ের মসজেদের সম্মুখে হিন্দু মিঠাইওয়ালা রাত্রি ১০টার পর পূজার বাজনা বাজাইয়াছিল। এত দিন এই বাজনায় কোনও আপত্তি উঠে নাই। হঠাৎ মুসলমানরা বাজনায় আপত্তি করে। ঐ উপলক্ষে 'হঠাৎ' সেই সময়ে সাহিদ সুরাবর্দ্দী সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগকে "উল্লুৎ প্রতিমাপূজক" বলিয়া গালি পাড়েন।

তৃতীয় দফায় তালতলার ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় রোডের ৮৪ নং ভবনে এবং ৮২ নং ভবনে হিন্দুরা বহুদিন যাবৎ হরিসংকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। সংপ্রতি হঠাৎ রাত্রি ১০টার সময় সংকীর্ত্তনকালে নিকটস্থ মসজেদ হইতে মুসলমানরা আসিয়া সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলে। অথচ তখন নামাজের সময় নহে।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে? মুসলমানের আবদারের পর আবদার বাড়িয়া যাইতেছে না কি? এ আবদারের যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে? ইহার পর হিন্দুর গৃহদেবতার পূজায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজানও কি তাহা হইলে নিষিদ্ধ হইবে? ইহা ত মুসলমান রাজত্বেও কখনও সম্ভব হয় নাই।

মুসলমানদের এরূপ মনোবৃত্তি থাকিলে সার ভূপেন্দ্রনাথের শত চেষ্টাও সফল হইবে না। যদি যথার্থই মুসলমানদের আপোষের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা এ সকল অন্যায় আবদার ছাড়িয়া দিন। হিন্দু কাহারও ধর্ম্মে আঘাত করিতে চাহে না—সে প্রবৃত্তিই তাহাদের নাই, কেন না, তাহারা সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা উত্যক্ত না হইলে প্রতিশোধপরায়ণ হয় না। এ অবস্থায় মুসলমানরা যদি যুক্তিতর্কের দ্বারা আপোষে হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, কোনও কোনও মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইলে মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত লাগে অথচ সে সময়ে বাজনা বন্ধ করিলে হিন্দুর কোনও ক্ষতি হয় না, তাহা হইলে হিন্দু সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহাদিগকেও গো-কোরবাণী সম্বন্ধে এরূপ ভাবে কার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, যাহাতে উহার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মে কোনও আঘাত না লাগে। আমাদের মনে হয়, এই ভাবে কার্য্য করিলে আপোষ হইতে পারে, অন্যথা নহে।

অপরাধ কাহার?

যে সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে সোনার বাঙ্গালা ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, সেই বিরোধের জন্য মূলতঃ অপরাধী কে? মুসলমান বলিতেছেন, হিন্দুই মূল অপরাধী, সে মুসলমানকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সকল স্বার্থ নিজেই উপভোগ করিতেছে এবং তাহারই ফলে মুসলমানরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া নিজের গণ্ডা আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ হিন্দুই অপরাধী। কিন্তু পূর্ব্বাপর এ দেশের ইংরাজ রাজত্বের রাজনীতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি হয় না। হিন্দু যখন এ দেশে প্রথম রা নীতিক আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন মুসলমান-সম্প্রদায় সার সৈ আমেদের পরামর্শ অনুসারে সেই আন্দোলন হইতে দূরে ছি তাহার পর ক্রমে কতক মুসলমান হিন্দুর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। উহা সত্ত্বেও এ দে মসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং উহা যে কংগ্রেস হইতে স্ব প্রতিষ্ঠান, তাহা জগতের লোককে বুঝান হইয়াছিল। পরে এমন

অবস্থা উপস্থিত হয় যে, লীগের সার্থকতা হ্রাস হয়, কংগ্রেস উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, লীগের পরিবর্ত্তে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। অসহযোগ আন্দোলনকালে কংগ্রেস ও খিলাফৎ বৈঠক একরূপ একমতাবলম্বী হইয়াছিল। পরন্তু লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরাজ্য প্যাক্ট পর্য্যন্ত নানা রফার দ্বারা হিন্দু মুসলমানের অনেক দাবী স্বীকার করিয়া লয়। সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, নানারূপে মুসলমানের মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া জাতীয়তা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু মুসলমান মালাবার, কোহাট, সাহারাণপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিরোধ-ঘটাইয়া হিন্দুর স্বার্থহানি করিয়াছে, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। তবে আরায় হিন্দুরাও যে বিরোধ ঘটাইয়া মুসলমানের স্বার্থহানি করিয়াছে, এ কথাও স্বীকার্য্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দুকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থহানি করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর কলিকাতার সাম্প্রদায়িক বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। ২রা এপ্রেলের দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিস কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ, দীনু মিঞার মসজেদের সম্মুখে মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণ করে—The First militant act was committed by some Mahommedans. মুসলমানরা ঐ সময়ে জাকারিয়া ষ্ট্রীটের হিন্দুর মন্দির আক্রমণ করিয়া শিবলিঙ্গ চূর্ণ করে। উহার ফলে কলিকাতায় প্রথম শান্তিভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দফা—তুলাপটির হাঙ্গামা।—২২শে এপ্রেল বড়বাজার তুলাপটিতে কয় জন মুসলমান মাতালের ভাণ করিয়া হিন্দুদিগকে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। তাহার ফলে দ্বিতীয় বারের দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়।

তৃতীয় দফা—রাজরাজেশ্বরী মিছিল।—১লা জুন বড়বাজারের রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার পথে মুসলমানরা গোলযোগ ঘটায়। তাহারা রাজপথের উপর বসিয়া নামাজ করিবার ভাণ করে এবং শোভাযাত্রায় বাধা দেয়।

চতুর্থ দফা—রথযাত্রা।—১১ই জুলাই হিন্দুদিগের রথযাত্রার পর্ব্বে পাইকপাড়ায় মুসলমানরা রথের শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। 'ইংলিশম্যান' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান', এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহও এ বিষয়ে মুসলমানগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাইকপাড়ার াজবাটীর এই রথযাত্রার উৎসব শত বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া াসিতেছে, অথচ হঠাৎ এ বৎসর মুসলমানদের এ 'ধর্ম্ম প্রীতি' জাগিয়া ঠিল কেন, কেহ বলিতে পারে না।

পঞ্চম দফা—রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জন (২য় বার)।—১৫ই লাই পুলিস কমিশনারের অনুমতিক্রমে পাশ লইয়া ঐ শোভাযাত্রা র্গত হইলে মুসলমানরা দীনু মিঞার মসজেদ হইতে নির্গত হইয়া াজপথ আটক করে এবং শোভাযাত্রায় বাধা দেয়, এমন কি, পুলিসের পরেও চড়াও হয়। অথচ হিন্দুরা কমিশনারের আদেশমত নিরস্ত্র য়া যাইতেছিল, পাশের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যারও কম লোক শোভাযাত্রায় ইতেছিল, বাদ্যবাজনারও আড়ম্বর বা চীৎকার আদি কিছুই করে াই। পরন্তু যাহা কখনও হয় নাই, কমিশনারের আদেশমত (অপরাহ্নে না করিয়া) প্রভাতে তাহারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে সম্মত য়াছিল, কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই।

ষষ্ঠ দফা—উল্টা রথ।—১৯শে জুলাই উল্টা রথ পর্ব্বে পাইকপাড়ায় সলমানরা আবার রথের শোভাযাত্রা আক্রমণ করিয়াছিল, অথচ ন্দুরা কোনও মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি করে নাই। এই ইচ্ছাপূর্ব্বক ইনভঙ্গকারী মুসলমানদের উপর পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

সপ্তম দফা—মহরম।—এইটিই কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ২১শে জুলাই মহরমের শেষ দিনে সহস্র সহস্র উত্তেজিত মুসলমান পুলিস কমিশনারের (১৪৪ ধারার) নিষেধ সত্ত্বেও লাঠি ছোরা লইয়া নানা স্থানে হিন্দু পথিক ও পল্লী আক্রমণ করে এবং অযথা বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে গালি দিয়া তাঁহাদের গৃহের জানালা সাসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেয়। এই আক্রমণ হইতে কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সার জগদীশ বসু, পুলিসের শ্রীযুত নলিনীনাথ, মহারাজা কাশিমবাজার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন নাই। পরন্তু ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ, মূকবধির বিদ্যালয়, নারায়ণ কার্ম্মাসী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ অল্পবিস্তর আক্রান্ত হইয়াছিল।

অষ্টম দফা—পাবনা।—পাবনায় মুসলমানের অত্যাচারের তুলনা নাই। কষ্টিয়ায় জন আট দশ মুসলমান গুণ্ডা কয়েকটি অসহায়া হিন্দু নারীকে কাপুরুষ কুক্কুরের মত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে অন্য ভদ্র মুসলমান সেই দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডদিগকে দলন করিয়াছিল। কিন্তু পাবনায় মুসলমান যেন একযোগে হিন্দুর বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিল। সে যেন মালাবারের মোপলা মুসলমানের পিশাচ-লীলা! গ্রাম, জনপদ, হাট, বাজার, ধনী, মহাজন—হিন্দু অধিকারী হইলেই কেহ পরিত্রাণ পায় নাই। পাবনায় যেন মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয়, মুসলমান আমলেও এমন নৃশংস অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। পাবনার সে অত্যাচারের বিবরণ আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার কথা এইটুকু যে, পাবনায় অপরাধী মুসলমান।

পূর্ব্বাপর এই অষ্ট দফা অনাচারের আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মুসলমানের এত বুক বলিয়া গিয়াছে কিসে? প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় (কেবল কলিকাতার প্রথম দুই হাঙ্গামা ও পাবনা ব্যতীত) মুসলমানরা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়া হিন্দুগণকে আক্রমণ করিয়াছে। মুসলমান কেল্লা দীনু মিঞার মসজেদ হইতে নির্গত হইয়া মুসলমানরা দ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল, পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল। পাইকপাড়ায় সোজা ও উল্টা রথেও মুসলমানরা হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়াছিল, পুলিসের কার্য্যে বাধা দিয়াছিল, পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল।

মহরমের শেষ দিনের ব্যাপার আরও ভীষণ। পুলিস কমিশনার আদেশ দেন যে, মিছিলে কেহ লাঠি, ছোরা ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে না। সে আদেশ মুসলমানরা পদতলে দলিত করিয়াছিল। পথে তাহাদের তাজিয়ার মিছিল সকল হিন্দু পথিককে আক্রমণ করিয়াছিল, হিন্দু-গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। অথচ পুলিস তাহাদের সঙ্গে ছিল। কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কি মনে হইতে পারে? তাঁহার গৃহ হইতে মিছিলের উপর ইষ্টক বর্ষিত হইয়াছিল, এই ছুতায় মুসলমানরাও তাঁহার গৃহ আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, তাঁহার গৃহ হইতে কোনও অন্যায় আচরিত হয় নাই। কাহার কথা সত্য? যাহারা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়া লাঠি-সোটা লইয়া হিন্দু পথিক ও হিন্দু গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা, না কুমার নরেন্দ্রনাথের ন্যায় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দু জমীদার?

এখন হিন্দুর পক্ষ হইতে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যে মুসলমান দুর্গ দীনু মিঞার মসজেদ হইতে মুসলমানরা পুলিসকে উপহাস করিয়া, কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল এবং হিন্দু ও পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই মসজেদের ইমাম বা মাতোয়ালি এবং পার্শ্বস্থ সৈয়দ সালি

লেনস্থ মুসলমান বাসিন্দাগণের মধ্যে কাহাকেও ধৃত বা দণ্ডিত করা হইয়াছে কি? যে মসজেদ হইতে মুসলমানরা ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা খানাতল্লাস করা হইয়াছে কি? বড়বাজারের কয়েকটি মাড়োয়ারীর বাড়ী হইতে ইষ্টক ও বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই সন্দেহে বাড়ী খানাতল্লাস ও ১ শতের অনেক অধিক অবস্থাপন্ন লোককে ধৃত করা হইয়াছিল। দীনু মিঞার মসজেদ হইতেও ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, এ কথা আংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশ। সে মসজেদের মাতোয়ালি বা ইমামকে এ বিষয়ে দায়ী করিবার কি হইতেছে?

পাইকপাড়ায় রথযাত্রায় বাধাপ্রদানকারী আইনভঙ্গকারী মুসলমানগণের রীতিমত দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে ত?

মহরমের শেষ দিনে যাহারা তাজিয়ার মিছিল করিয়াছিল, তাহারা পুলিসের মা ামারা। কেন না, প্রত্যেক মিছিলের সম্মুখে নিশানে তাজিয়ার মহল্লা, অধিকারী সর্দ্দার, ও গন্তব্য পথের নাম লিখিত ছিল। যে যে তাজিয়ার মিছিল পথে অনাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুলিস দখিয়াছিল, কেন না, সঙ্গে পুলিসের সম্মুখেই অনাচার সংঘটিত হইয়াছিল, পুলিস প্রথমে অনাচার নিবারণ করিতে না পারিলেও বেটন দিয়া দল হইতে বিচ্ছিন্ন অনাচারকারীদিগকে আবার দলে ভিড়াইয়া দিয়াছিল। এই সমস্ত অনাচারী মিছিলের মহল্লা ও সর্দ্দারের নাম পুলিসের বিদিত। তাহাদিগকে শান্তিভঙ্গের জন্য দায়ী ও দণ্ডিত করা হইতেছে ত?

পাবনায় যে ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর অবশ্য সরকার শান্তিস্থাপনে উপযুক্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, পরন্তু সাজাই পুলিস বসাইতেছেন, ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড হইতেছে ত? শ্রীযুত যোগেশ চৌধুরীর মত মান্যগণ্য ভদ্রলোক কিন্তু সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, অনেক স্থলে লুঠের মালের কিনারার চেষ্টা হইতেছে না, অপরাধীকে ধরা হইতেছে না, সাক্ষীর কড়াকড়ি ব্যবস্থা করায়, অনেক স্থলে অভিযোগ ফাসিয়া যাইতেছে, ইত্যাদি। এ সকল কি সত্য কথা? সরকার নিরপেক্ষ বিচারক, তাঁহারা এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে একটা ঘোষণা করিলে ভাল হয় না?

—

পার্লামেণ্টে ওকালতী

কিছু দিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার 'টাইমস্' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীরা মুসলমানদিগকে আদর করেন বলিয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হয়। এ কথায় এ দেশে ও বিলাতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। প্রতিবাদ চরমে উঠিয়াছে পার্লামেণ্ট মহাসভায়। বর্ত্তমান ভারতসচিব লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছেন, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা; ভারত সরকার ও বড়লাটরা চিরদিন মহারাণীর ঘোষণামত সকল সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কাহারও প্রতি অধিক আদর দেখানর ফলে বিরোধ বাধিলে তাহা ইংরাজের ভারতশাসনের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে পরম অন্তরায়। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিংও নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলেন যে, লর্ড অলিভিয়ারের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন, তিনি স্বয়ং ভারতশাসনকালে দেখিয়াছেন যে, ভারত সরকারের কর্ম্মচারীরা সকল সম্প্রদায়কে সমান দৃষ্টিতে দেখেন ও সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন। লর্ড অলিভিয়ার এইরূপে আক্রান্ত হইয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং বলেন যে, ভারত সরকার বা বড়লাটরা পক্ষপাতিতা করেন, এমন কথা তিনি বলেন নাই, তবে ভারত সরকারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে পক্ষপাতিতা দোষ আছে।

লর্ড অলিভিয়ারের এই দোষ স্বীকারে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড অলিভিয়ার ভাজা চালকে মুড়ি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন নাই। তিনি দোষ স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন, কর্ম্মচারীদের মধ্যে পক্ষপাতিতাদোষ আছে।

যাউক সে কথা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, আমরা দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখি ও মজা উপভোগ করি। কিন্তু লর্ড বার্কেণহেড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মূল কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তিনি বলেন, "সংস্কার আইন ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে যে কোনও সম্বন্ধ নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কার আইন উহার মূল কারণ নহে। জার্ম্মাণযুদ্ধ অবসানের পর সরকারের শাসনের আসন যে একটু শিথিলমূল হইয়াছিল—যাহার ফলে পূর্ব্বের 'বাপ-মা' শাসনের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া ভারতীয়রা নিজেদের অধিকারের জন্য জোর তলবে দাবী করিতেছিল, তাহা হইতেই এই বিরোধ সঞ্জাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ভারতে নূতন নহে, বহু কালের।"

লর্ড বার্কেণহেড বলিতেছেন, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বহুকালের, উহা ভারতের অস্থিমজ্জাগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে বৃটিশ শাসিত স্থান ব্যতীত অনেক রাজন্য-শাসিত প্রদেশ আছে। সে সকল দেশীয় রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নাই কেন, লর্ড বার্কেণহেড তাহা পার্লামেণ্টকে বুঝাইয়া দিবেন কি? আর 'বাপ মা' শাসনের সময়েও গো-কোরবাণী লইয়া হিন্দু মুসলমানে কি দাঙ্গা হইত, তাহা সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল ও সার ব্যামফাইল্ড ফুলারের মত ইংরাজ শাসকদের শাসনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তিনি জানিতে পারেন। এই বিরোধ যে কেন বৃটিশ ভারতের অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই জানেন।

—

বাঙ্গালা সরকারের বুদ্ধিভ্রংশ

বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পর হইতে বাঙ্গালা সরকার পর পর এমন কতকগুলি কার্য্যব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে সহসা এমন মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, বুঝি বা তাঁহাদের বুদ্ধির কলকাঠিটি কোথাও খারাপ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের উপর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ ইহার চরম পরিণতি। ডাক্তার মুঞ্জে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, পরন্তু প্রবল ব্যুরোক্রেশী ও মুসলমানের বাধার বিপক্ষে হিন্দুকে একতাবদ্ধ হইতেও অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। হিন্দু হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ বা শক্তিসম্পন্ন হইতে বলিলে অথবা অপরের বাধাপ্রদানের বিপক্ষে আত্মস্থ হইতে বলিলে কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়, তাহা আমাদের ধারণায় আইসে না। জগতের সকল দেশের মুসলমানের সহিত ভারতের মুসমমান Pan-Islam সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার আয়োজন করে, অথবা ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ করিয়া ভারতের বাহিরে মুসলমানরাজ্যে 'মহাজের' হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দু কি হিন্দুস্থানে থাকিয়া সকল হিন্দুর সহিত একতাবদ্ধ হইতে পারে না? হিন্দু ইংরাজ-রাজের অবাধ্য হইয়া গোঁসা বা অভিমান ভরে বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে নাই, মুসলমানকে বর্জ্জন করিয়া ভারতে হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে নাই, তাহারা চাহিতেছে

শুধু বাঁচিতে, প্রবলের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করিয়া তিষ্ঠিতে। ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মহাপাতক হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অকস্মাৎ ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে। কেবল জারি নহে, তিনি এই অন্যায় ও বে-আইনী আইন না মানিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর শমন জারি হইয়াছে। স্বল্পবুদ্ধির দৌড় কতদূর হইতে পারে, তাহাই কি এই ব্যাপারে প্রদর্শন করা হইল ?

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহনের ব্যাপার আরও চমৎকার! তিনি আজীবন সরকারের সহিত সহযোগ করিয়া আসিয়াছেন। এখনও তিনি Responsive Co-operationist দলের অন্যতম দলপতি। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি এই পরিণতবয়সেও ইংরাজের ন্যায়বিচারে এবং শেষ সুবুদ্ধিতে পরম আস্থাবান। পরন্তু তিনি হিন্দু দলপতি হইলেও আজীবন হিন্দু-মুসলমানে মিলনবার্তা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই হিন্দুমুসলমানে মিলনের উপদেশ আছে।

ডাক্তার মুঞ্জে

অথচ হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁহার উপর কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া বসিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! সাধারণ লোকের নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলে তিনি নিশ্চিতই উহাকে মস্তিষ্কবিকৃতির ফল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; কিন্তু ইহা ত তাহা নহে—এ সিদ্ধান্তের ফলে জগতের সমক্ষে ঘোর অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয়। তিনি নির্দ্দোষ, ইহা তিনি নিজেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে এই অন্যায় আদেশ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি ডাক্তার মুঞ্জের পূর্ব্বেই কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি

হাওড়া ষ্টেশনে সংবর্দ্ধনা

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়াছেন। করিবেন বলিয়া পূর্ব্বাহ্ণে ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতাবাসীর সাদরসম্ভাষণ ও জয়স্তুতি লাভ করিয়া মধ্যপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সরকার তাঁহার আগমনে বাধাপ্রদানও করেন নাই, তাঁহাকে আইনভঙ্গ করার অপরাধে ধৃতও করেন নাই। কেবল তাঁহার যাত্রার পর তাঁহার উপর শমন জারি করিয়াছেন। ইহাতে জিতিল কে? ছোট হইয়া গেলই বা কে?

হঠকারিতা সুশাসনের পরিচায়ক নহে। আজ যে সারা ভারত জুড়িয়া হিন্দুর মুখে রব উঠিয়াছে, লর্ড অলিভিয়ারের কথা সত্য, সে রব নিবারণ করিবার কি যুক্তি-প্রমাণ আছে? স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দুরা প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, সার আবদর রহিম ও হাজী গজনবি প্রমুখ মুসলমানরা এ যাবৎ যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া আসিলেন, তাহার বিপক্ষে একটি কথাও উঠিল না, অথচ নিয়মানুগ পথে পরিচালিত হিন্দু-মুসলমানে প্রীতিকামী পণ্ডিত মদনমোহনকে আইনের বন্ধনে যথেচ্ছা কথা কহিতে বা চলিতে ফিরিতে নিষেধ করা হইল,—সাধারণ প্রজার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল,—এ কেমন বিচার? বাঙ্গালা সরকার এ অভিযোগের কি উত্তর দিতে চাহেন? আলী ভ্রাতারা হজে যাইবার পূর্ব্বে হিন্দুজাতিকে কাফের ও মরণভীত বলিয়া গালি পাড়িয়া মুসলমানের ক্রোধের ভয় দেখাইয়া যাওয়ার পর হইতে কত মুসলমান হিন্দুর বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে; কতক গোপনে পল্লী-মফঃস্বলে মৌলবী মৌলানার দ্বারা, কতক প্রকাশ্যে বক্তৃতা বা সংবাদ-পত্রের রচনা দ্বারা। সার আবদর রহিমই সর্ব্বপ্রথমে আলিগড়ে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করেন। উহাকে 'ষ্টেটসম্যানও' Aligarh Bomb-shell আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দোসর হাজী গজনবী আবার মসজেদের সম্মুখে বাদ্যবন্ধের যে আন্দোলন-আগুন জ্বালাইয়াছেন, তাহার তাপে বাঙ্গালা এখনও জ্বলিতেছে। মীনা পেশোয়ারীর দোস্ত হঠাৎ নেতা সাহিদ সাহেবের কথা না-ই উল্লেখ করিলাম। বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মত খেলাফতের প্রথম আমলে এ দেশে যে সব মৌলভী মওলানা গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও বাদ যায় না। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-সংঘটনে কত দিকে কত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ মজা এই, ১৪৪ ধারা চাপিল গিয়া হিন্দু-নেতা পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের স্কন্ধে!

এই বাঙ্গালা সরকার 'ফরওয়ার্ড' পত্রকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, একখানা মুদ্রিত বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করার জন্য। ঐ পত্রে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার উপাদান ছিল। নিম্ন আদালতে সেই অভিযোগে 'ফরওয়ার্ড' দণ্ডিত হয়েন। কিন্তু হাইকোর্ট সে দণ্ড নাকচ করিয়া দিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই ব্যাপার হইতেই বাঙ্গালা সরকারের 'দূরদর্শিতার' পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের ব্যাপারে ত আবার বাঙ্গালা সরকারের দূরদর্শিতার বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িল। বার বার এইরূপ অপদস্থ প্রতিপন্ন হওয়া কি সরকারের প্রেষ্টিজের হানিকর নহে? লর্ড আরউইন কি এ সব ব্যাপার নীরবে প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন?

পথে শোভাযাত্রা

পরলোকে

যামিনীভূষণ রায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা—বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ-সম্পাদক ও প্রণেতা যামিনীভূষণ রায় কর্ম্ম-জীবনের অবসানে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগকে উপেক্ষা করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত প্রভাব সঞ্জীবিত করিবার জন্য প্রাণপাত সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত ব্রত সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ২৬শে শ্রাবণ, বুধবার প্রাতে রোগের জয় হইয়াছে—তিনি বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু যেমন অতর্কিত—তেমনই দেশে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার মঙ্গলের ক্ষতিকর। তাঁহার বিয়োগে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগবেদনায় মর্ম্মাহত হইতেছি।

যামিনীভূষণের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার সমন্বয় হইয়াছিল। সাহিত্যে তিনি এম্, এ, চিকিৎসাবিদ্যাতে এম, বি, সংস্কৃত কলেজ হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত। স্বনামখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট তিনি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কবিরাজী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। মনীষী আশুতোষ সরস্বতী তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করেন এবং নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল, তিনি আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহু ছাত্রকে তিনি স্বগৃহে স্থান ও আহার প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেন; গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিবার জন্য বন্ধুগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।

যামিনীভূষণের পিতা খুলনা পয়োগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ পঞ্চানন রায় মহাশয় মনস্বী আশুতোষের বাড়ীর সম্মুখে ভবানীপুরে

বাস করিয়া চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি মেধাবী পুত্রকে সংস্কৃত ও ডাক্তারী পড়াইয়া কবিরাজী করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত দেখিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কালের আহ্বানে প্রস্থান করিতে হয়। যামিনীভূষণ পিতার সুযোগ্য সন্তান, তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদের গৌরব উদ্ধারের জন্ত তাঁহার শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।

পাঠ্য-জীবনে যামিনীভূষণ একদিন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অমর নাট্যকাব্য 'জনার' অভিনয় দেখিতে যায়েন, অভিনয়ের প্রথমেই—

"বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোর অরি,
মরি কিংবা মারি।
ঘুচুক সমরবাঞ্ছা মোর।"

এই 'মার কিংবা মারি' শুনিয়া তিনি আত্মজীবন সংগঠন সম্বন্ধে মত স্থির করেন—জীবনে তিনি কোন মুহূর্ত্তেই সে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয়েন নাই।

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

যে সময় যামিনীভূষণ কবিরাজী চিকিৎসা করিবার সঙ্কল্প করেন, সে সময় এলোপ্যাথি চিকিৎসার উপর দেশবাসীর আস্থা সমধিক—আয়ুর্ব্বেদের গৌরব লুপ্ত—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা কতকগুলি হাতুড়ে কবিরাজের উদরান্ন-সংস্থানের উপায় মাত্র। যামিনীভূষণ রীতিমত এম্, বি, পাশ করা ডাক্তার হইয়াও কবিরাজী চিকিৎসা করিবেন শুনিয়া অনেকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয়েন নাই। ভবিষ্য জীবনে কেবল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। আয়ুর্ব্বেদে লুপ্তগৌরব উদ্ধারকল্পে তাঁহার সাধনার মূর্ত্তবিকাশ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বে কলেজ হাঁসপাতাল। কিন্তু দেশে দুর্ভাগ্য— আমাদের দুর্ভাগ্য—আয়ুর্ব্বেদের দুর্ভাগ্য, তিনি অষ্টা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ-প্রতিষ্ঠা সম্পূ করিয়া যাইবার অবসর পাইলে না, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ করিবার মত দৃঢ়সঙ্কল্প অন্ত কাহারও আছে কি না, জানি না।

যামিনীভূষণ বলিতেন,—ডাক্তাররা হাল ছাড়িয়া না দিলে—চরম অবস্থা না হইলে রোগী আমাদের নিকট আইসে না সে অবস্থায় রোগীকে আরোগ করিতে না পারিলে আয়ুর্ব্বেদে অপযশ হয়—এ জন্ত আমাদে কত চিন্তা—কত সাধনা করিতে হয়, তাহা রোগী কি বুঝিবে ডাক্তার-পরিত্যক্ত আশাহীন বহ রোগীকে নিজ অলৌকিক কৃতিত্ব বলে নিরাময় করিয়াই যামিনীভূষ ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষিত নগণ্য আয়ুর্ব্বেদের উপ দেশবাসীর যুগপৎ অনাস্থা—অবিশ্বাস দূর করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির গঠনের জন্ত তিনি প্রাণপাত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমাগত চিন্তা ও অতিশ্রমে দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আত্মদান করিলেন।

দেশের সকল দিকের দুর্দ্দশার কথা না ভাবিয়া—বক্তৃতার স্রোতে

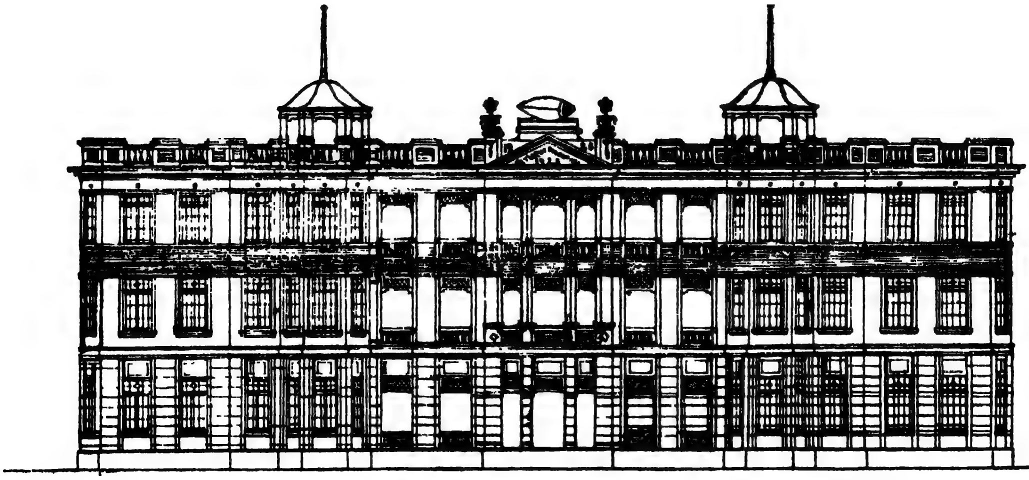

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

দেশ না ভাসাইয়া তিনি বলিতেন—বিলাতী ঔষধ বিক্রয়ের জন্য ইংরাজ হাজার হাজার ডাক্তার-দালাল সৃষ্টি করিয়াছেন—প্রতি বর্ষে মেডিক্যাল কলেজ হইতে নূতন নূতন অসংখ্য ঔষধ বিক্রয়ের জন্য দালাল সৃষ্ট হইতেছে—তাঁহাদের প্রেসক্রিপসনের কৃপায় প্রতি বর্ষে কোটি কোটি টাকার বিলাতী ঔষধ অব্যাজে বিক্রয় হইতেছে, তাহা দেশবাসীর স্বাস্থ্যের অনুকূল হউক বা না হউক! কিন্তু কত সুলভে সুচিকিৎসা বিতরণ হইতে পারে, কত সুলভে এ দেশে উৎপন্ন অকিঞ্চিৎকর গাছগাছড়া হইতে এ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোপযোগী ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে দেশবাসীর চক্ষুর উপর প্রমাণ করিবেন, প্রতি বর্ষে দেশের কোটি কোটি টাকার বিলাতযাত্রার পথ রুদ্ধ করিবেন। কিন্তু বিরাট বিশাল বিলাতী চিকিৎসা-বিজ্ঞান-অভিযানের সহিত একক সংগ্রাম করা দীর্ঘকাল তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। প্রথম যৌবনে দৃপ্ত 'জনার' প্রবীরের মতই তাঁহাকে বিপুল পাণ্ডব বাহিনীকে পরাজিত করিবার মুহূর্ত্তে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তগৌরব-প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। বারংবার রোগের আক্রমণে শয্যাগত অবস্থায় যখনই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, তখনই তিনি রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার সার্থকতা—আয়োজন—অনুষ্ঠান—সঙ্কল্পের কথায় শতমুখ হইয়াছেন। জীবনের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুহূর্ত্তেও জীবনের সেই একমাত্র চিন্তাকে তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই।

ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে সামান্যভাবে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে মহাত্মা গন্ধী কর্ত্তৃক ভিত্তিস্থাপন—কর্পোরেশনের জমী দান—বদান্যবর শ্রীযুত মনোমোহন পাঁড়ের লক্ষ টাকা দানে সৌধনির্ম্মাণ, সমস্তই তাঁহার একক প্রাণপাত চেষ্টা ও একনিষ্ঠার ফল। তাঁহার প্রচেষ্টার পর কলিকাতায় আরও দুইটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তিনি বহুবার মতভেদ সামঞ্জস্য করিয়া সম্মিলিত শক্তিতে বিরাট আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার এত সাধনার সুফল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ হইতেও এই দুঃখে আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান না পাইলে তিনি স্ত্রী-পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাড়ীখানি কলেজকে দান করিয়া যাইবেন, বহুবার আমাদের সহিত এ কথারও আলোচনা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন তিনি স্বেচ্ছায় উইল করিয়া নিজ অর্জ্জিত ২ লক্ষ টাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মে যামিনীভূষণের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—পূজা-অর্চ্চনা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। কোন শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দিলে তিনি কপালে স্পর্শ না করিয়া গ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ-ভক্তি তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থী হইলে সে দিনের সমস্ত উপার্জ্জন তিনি তাঁহাকে দান করিতেন। যামিনী-ভূষণের বাড়ীতে কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তিনি শত কায ফেলিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি সাদরে গ্রহণ করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে তিনি বার্ষিক ও মাসিক বৃত্তি দান করিতেন এবং সযত্নে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান করিতেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ সেন

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সম্পাদক রায় সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি স্বনামধন্য রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান মিরার" ও "সুলভ সমাচারের" সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় তিনি সরকারের পক্ষে 'পবলিসিটি' অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং 'জষ্টিস্ অব্ দি পিস'ও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার তিনটি পুত্র ও কয়েকটি কন্যা বিদ্যমান। আমরা তাঁহার বিয়োগে তাঁহার সন্তানদিগের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ সেন

জাতিতত্ত্ব গ্রন্থ

কাশীবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রণীত জাতিতত্ত্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসিক বসুমতীতে নিতান্ত স্থানাভাব বশতঃ সময়মত সমস্ত অধ্যায়গুলি প্রকাশ ঘটিয়া উঠিল না। কবিরত্ন মহাশয় অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। মাসিক বসুমতীতে এই প্রবন্ধের যে কয় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল—বৈদ্য মহাশয়রা সেই অধ্যায়ের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাসময়ে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর যাঁহারা এই বিচার সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের জন্য এবং যাঁহারা আলোচনা ও প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা—৮০ নং মিশির পুকরা বেনারস ঠিকানায় গ্রন্থকারের সহিত পত্রব্যবহার করিলে বাধিত হইব।

প্রথম দৃশ্য—কলিকাতায় জলপ্লাবন

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নৌকা-বিহার

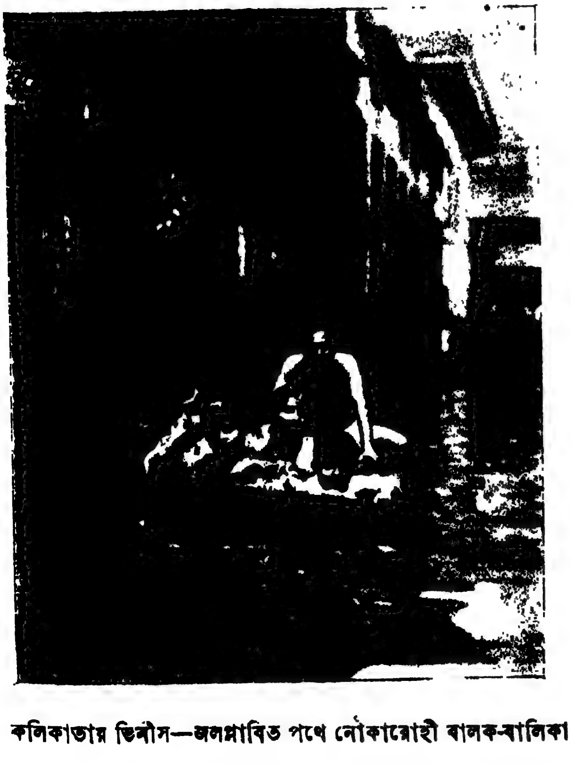

কলিকাতার ভিনীস—জলপ্লাবিত পথে নৌকারোহী বালক-বালিকা

বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের তরঙ্গলীলা

কালীতলার বিচিত্র দৃশ্য

কলেজ ষ্ট্রীট—প্লাবনে ফায়ার ব্রিগেডের অবস্থা

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের প্লাবন-দৃশ্য

জলপ্লাবিত রাজপথে মনুষ্যযান

এস্ গাঙ্গুলী মহোদয়ের সৌজন্যে।

কলিকাতা রাজপথে বাচখেলা

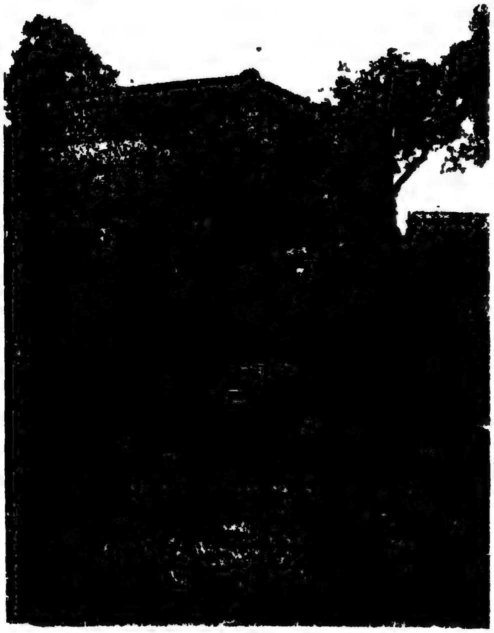

জলপ্লাবনে—অশ্বযান

শ্রীযুত শ্যামাদাস নাগের সৌজন্যে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—জলাভাব

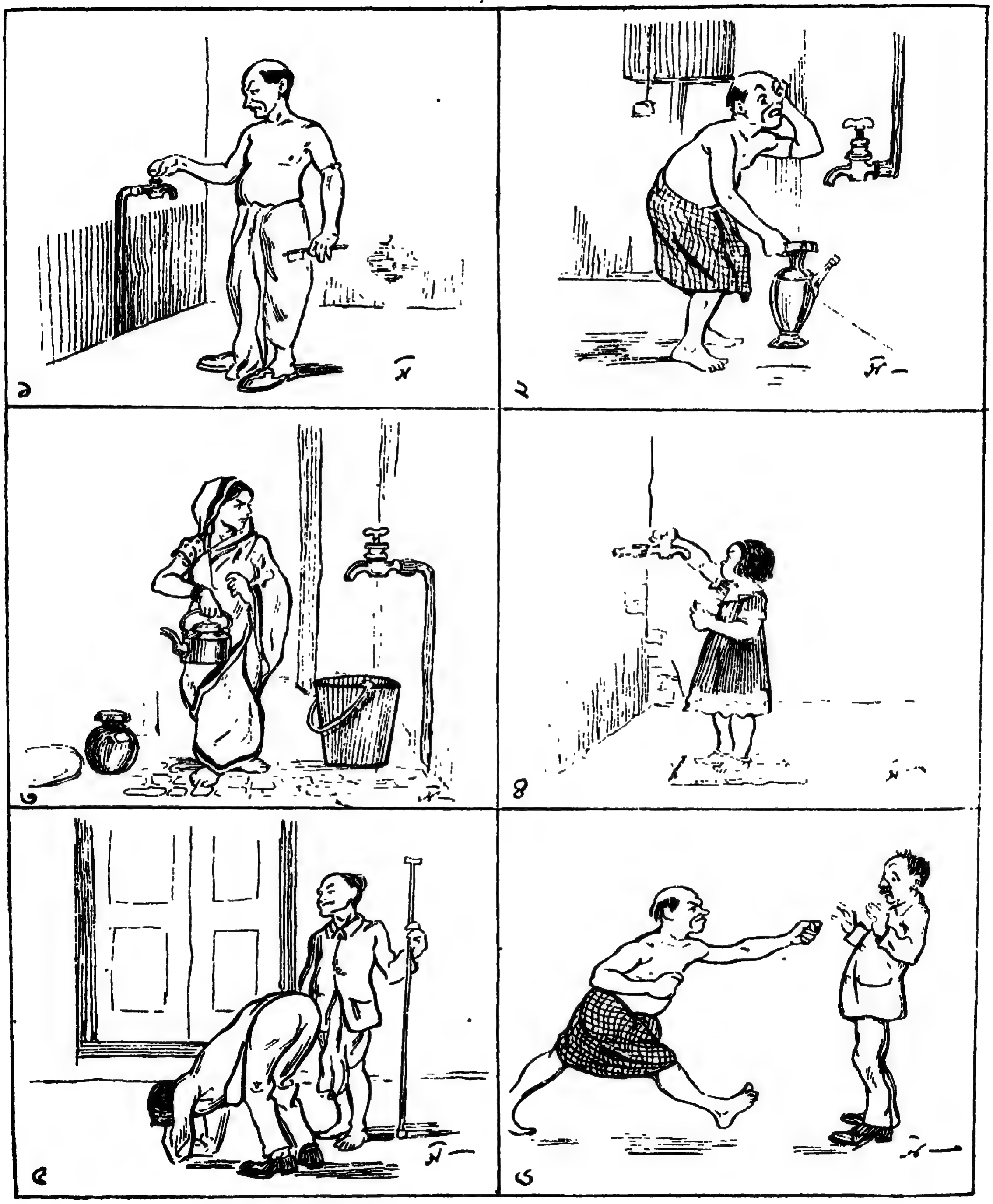
১
স
২
স—
৩
স—
৪
স—
৫
স—
৬
স—

বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা নগরের অধিবাসী শতকরা ১৯৷৷০ টাকা হিসাবে কর দিয়া কিরূপ আনন্দে দিনযাপন করিতেছে, উল্লিখিত দৃশ্যগুলি তাহার কতিপয় নিদর্শন। শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

তাম্র-বিনির্ম্মিত সঙ্গীতাগার

আমেরিকার সেণ্ট লুই পার্কে একটি তাম্র-নির্ম্মিত আগার স্থাপিত হইয়াছে। উহার মধ্যে বসিয়া বাদিত্রগণ নানাবিধ যন্ত্রযোগে সুরের আলাপ করিয়া থাকে। সঙ্গীতাগারটি তাম্র-নির্ম্মিত হওয়ায় ঝঙ্কার ও সুরের মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই আগার নির্ম্মাণে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে। আগারটির চারিধারে জলরাশি বিস্তৃত। উহাতে সঙ্গীতালাপে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে না।

তাম্র-নির্ম্মিত বিচিত্র সঙ্গীতাগার

চক্ষু-চিকিৎসার নূতন যন্ত্র

বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধনের জন্য নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আর একটা নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তিকে বর্দ্ধিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক এমনভাবে কতকগুলি কাচ একটি যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি সেই কাচগুলির মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করে, তখন ঘন-ঘন দৃষ্টিকেন্দ্রকে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তির নয়ন-সন্নিহিত পেশীগুলির ব্যায়াম হয়। চক্ষুরোগে পীড়িত নরনারীর পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চক্ষু-চিকিৎসার নূতন যন্ত্র

যন্ত্র-সাহায্যে চরিত্র-বিচার

আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক চরিত্র-বিচারের জন্য এক প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটি অন্ধকার

পরীক্ষক এক জন পরীক্ষার্থিনীর চরিত্র পরীক্ষা করিতেছেন

কক্ষে একটি স্ফটিক-গোলক রক্ষিত হয়। পরীক্ষার্থী গোলকের সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট থাকে। তাহাকে বলা হয়, সে যেন কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা না করে। শুধু স্ফটিক-গোলক-নির্গত সবুজ আলোকটির প্রতি যেন চাহিয়া থাকে। পরীক্ষার্থীর কানে একটি শব্দবহ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হয় এবং তাহার এক হাতে একটি বৈদ্যুতিক তারসংযুক্ত বোতাম থাকে। সন্নিহিত আর একটি কক্ষে পরীক্ষক অপর একটি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটির নাম Audiometer বা শব্দমাত্রানির্দ্দেশক যন্ত্র। পরীক্ষক প্রথমতঃ মাঝের 'C' মাত্রার শব্দ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। যখন তিনি বুঝিতে পারেন, পরীক্ষার্থী স্বাভাবিক শব্দ বেশ শুনিতে পাইতেছে, তখন ক্রমশঃ তিনি শব্দের মাত্রা বাড়াইতে থাকেন। পরীক্ষার্থী শব্দ শুনিবামাত্র হস্তস্থিত বোতাম চাপিয়া ধরে। ইহাতে পরীক্ষকের সম্মুখস্থ যন্ত্রে একটি লাল আলোক জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, পরীক্ষার্থী কোন্ মাত্রার শব্দ শুনিতে পাইতেছে। এইরূপে তিনি শব্দের মাত্রা কমাইয়া বা বাড়াইয়া পরীক্ষার্থীর নিবিষ্টতার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যদি সামান্য শব্দে পরীক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বিশেষ সামাজিক বলিয়া পরিগণিত হইবে; কিন্তু সামান্য শব্দ যে শুনিতে পায় না, তাহাকে অসামাজিক লোক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় নরনারীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যন্ত্রযোগে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

মুক্তা ও প্লাটিনম্-নির্ম্মিত দুর্গ

জাপানী শিল্পী মুক্তা ও প্লাটিনম্ সাহায্যে একটি মহা-মূল্যবান্ নকল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উল্লিখিত দ্রব্যটি ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা হইবে। প্রায় ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। আমেরিকার সহিত জাপানের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ জাপান উহা আমেরিকাকে উপঢৌকন প্রদান করিবে। বহুশত শিল্পী পাঁচ মাস ধরিয়া এই মুক্তার কৃত্রিম দুর্গটি

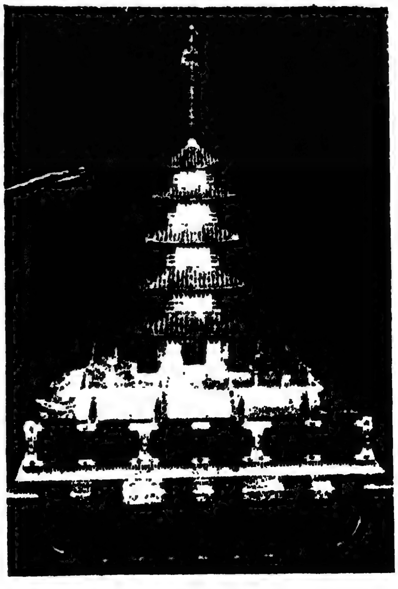

মুক্তা ও প্লাটিনম্-নির্ম্মিত দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাতে জাপানী শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।

সুটকেস বহনের অভিনব ব্যবস্থা

সুটকেস্, গল্‌ফখেলার সরঞ্জামপূর্ণ ব্যাগ প্রভৃতি বহন করিতে গেলে একটা হাতের দ্বারা অন্য কোন কায করিবার সুবিধা হয় না। এ জন্য সম্প্রতি ঐরূপ দ্রব্য বাহুর যে কোনও স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে দুইখানি করপুটই স্বাধীন অবস্থায় থাকে, অথচ দ্রব্য বহনের জন্য কোন প্রকার অসুবিধাও ঘটে না। আলোচ্য ছবিতে দেখা যাইবে, বাহু-সংলগ্ন বন্ধনীতে সুটকেস্ ঝুলিতেছে অথচ লোকটি পুস্তক পাঠ করিতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতেছে না।

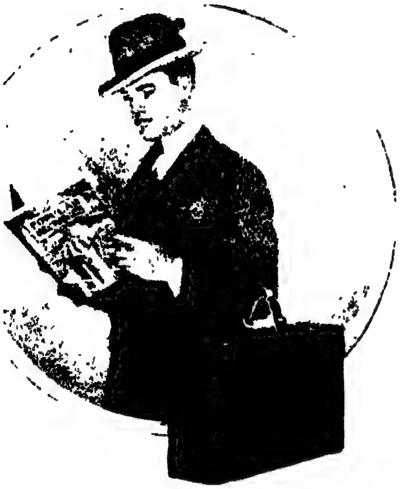

ভার বহনের নূতন উপায়

চীনের প্রাচীন ঘণ্টা

খৃষ্ট-জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে একটি ঘণ্টা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাটি সম্প্রতি আমেরিকার মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে। উল্লিখিত ঘণ্টাটি পূর্ব্বে কোনও চীনের দেবমন্দিরে ব্যবহৃত হইত। ইহার গঠন-প্রণালী অনেকটা ডিম্বাকার—গোলাকার নহে এবং দারু-খণ্ডের সাহায্যে ঘণ্টাধ্বনি হইত। ঘণ্টাটির দেহে অনেক-গুলি বোতামের মত বস্তু সন্নিবিষ্ট আছে। উহার এক একটিতে ক্ষুদ্র মুগুরের দ্বারা আঘাত করিলে এক এক প্রকার শব্দ নির্গত হয়।

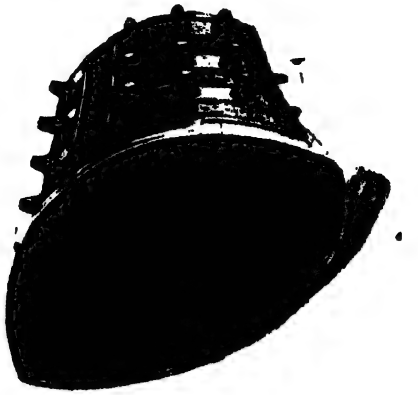

চীনের প্রাচীন ঘণ্টা।

পুলিসের অভিনব আয়ুধ

লস্ এঞ্জেল্‌সের পুলিস বিভাগের জন্য এক প্রকার নূতন আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্দুক পুলিস তাহার স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া থাকে। এক হস্তে ধৃত রিভলভার হইতে যে ভাবে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়, এই নব-নির্ম্মিত বন্দুক হইতে সেই ভাবে গুলী নিক্ষিপ্ত করা যায়। আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই বন্দুক পিস্তলের ন্যায় ব্যবহার করা যায়।

নূতন প্রণালীর বন্দুক

মানুষবাহী ঘুঁড়ি

লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার আর, ই, বায়ার্ড আর্কটিক প্রদেশে অভিযান করিতেছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে তিনি প্রকাণ্ড ঘুঁড়িও সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ঘুঁড়ি এমন বৃহৎ যে, এক জন মানুষের ভার বহন করিতে সমর্থ। ঘুঁড়ি যাহাতে স্থিরভাবে থাকে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে রেডিও যন্ত্র ঘুঁড়িতে সন্নিবিষ্ট করাও চলিবে, এমন ব্যবস্থাও আছে। বিমান-পোতে আরোহণ করিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য এই ঘুঁড়ির সাহায্যেও চলিতে পারিবে।

ঘুঁড়ির সাহায্যে মানুষ ঊর্দ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অষ্ট্রীচ ডিম্ব

আমেরিকার 'ফিল্ড মিউজিয়ম্ ষ্টাফের' জনৈক বিশেষজ্ঞ ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটি অষ্ট্রীচ পক্ষীর ভগ্ন ডিম্বের খোসা সুসন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই ভগ্নপাত্রে পানীয় রাখিয়া উহা পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়। উল্লিখিত ডিম্বটি কিস্এর ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চিত্রস্থ ব্যক্তি উল্লিখিত ডিম্বের ভগ্নাংশগুলি একত্র করিয়াছেন এবং স্বয়ং উহা হইতে পানীয় গ্রহণ করিতেছেন।

৬ হাজার বৎসরের প্রাচীন অষ্ট্রীচ পক্ষীর ডিম্বের খোসা।

অভিনব মোটর-বোট

আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ বন্দরে সম্প্রতি নব-নির্ম্মিত এক প্রকার মোটর-বোটের প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই নৌকায় ৬টি ফাঁপা বল বা গোলক সংলগ্ন—প্রত্যেক গোলকের পরিধি ৪ ফুট। পশ্চাতের গোলক দুইটির গাত্রে অনেকগুলি ডানা সংলগ্ন আছে। মোটর সাহায্যে গোলকগুলি আবর্ত্তিত হয়। ষ্টীমার বা জাহাজের চাকা আবর্ত্তিত হইলে যেমন জল কাটিয়া অগ্রসর হয়, এই ডানাগুলির সাহায্যে তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অভিনব মোটর-বোট

চুপ চুপ

সে দিন বঙ্গবাণীতে দেখছিলুম, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে,আজকাল মুখ ফুটে কোনও কথা বলা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেউ যদি এমন কোনও কথা বলতে উদ্যত হয়—যা পলিটিক্‌সের মামুলি বুলি নয়—তা হ'লেও চারিদিক্ থেকে বিজ্ঞ পলিটিসিয়ানরা ব'লে উঠেন "চুপ চুপ।"

পলিটিসিয়ানদের স্বধর্ম্মই হচ্ছে, কাউকে এমন কোনও কথা বলতে না দেওয়া—যা তাঁহাদের কথার পুনরাবৃত্তি নয়। মানুষে যাকে গবর্ণমেণ্ট বলে, সে বস্তু ত পলিটিক্সের একটা অঙ্গ বই আর কিছুই নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সব চাইতে বড় অঙ্গ। আর সকল দেশে সকল যুগে গবর্ণমেণ্টের প্রয়াস হচ্ছে—নীরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবৃদ্ধ হওয়া।

আর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উদ্দেশ্য, দেশে যে সকল পলিটিকাল সঙ্ঘ গঠিত হয়, সে সবও নৈসর্গিক নিয়মে গবর্ণমেণ্টের হালচাল সবই অবলম্বন করতে বাধ্য—কারণ, সে সব সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিন না এক দিন গবর্ণমেণ্টের স্থানাভিষিক্ত হওয়া। সুতরাং এমন কোনও কথা তাঁরা কাউকেও বলতে দিতে চান না, যাতে ক'রে তাঁদের উন্নতির পথে বাধা ঘটে।

এই যে পলিটিক্‌সের সনাতন ধর্ম্ম, সে কথা স্বয়ং মাকিয়াভেলি আজ পাঁচশ বৎসর আগে ব'লে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পলিটিসিয়ানের দল এক দিন গবর্ণমেণ্ট হবার আশা রাখে, তাদের জানা উচিত যে, লোকমত তারা উপেক্ষা করতে বাধ্য এবং সে মতকে ছলে বলে চেপে দেবার চেষ্টা তাদের করতেই হবে। এতে ভয় পেলে তারা কস্মিন্‌কালে শাসন-কর্ত্তা হ'তে পারবে না। কারণ, শাসনকর্ত্তার কাযই হচ্ছে জনসাধারণকে শাসন করা, তাদের সঙ্গে প্রেম করা নয়। মাকিয়াভেলির মতামত এ কালে অসাধু ব'লে গণ্য। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির কথা আজও যে লোকে শোনে, কারণ, সে সব কথা একেবারে অসত্য নয়। অপরকে চুপ করবার হুকুম কিন্তু একমাত্র পলিটিসিয়ানরাই দেন না। যেমন এক দলের লোক রাজ্যের দোহাই দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে চান, তেমন অন্য অন্য দলের লোকরা, কেউ বা নীতির দোহাই দিয়ে, কেউ বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে থাকতে আদেশ দেন। অর্থাৎ যাঁরাই পৃথিবীর কোনও একটা মহৎ ব্যাপার নিয়ে কথার ব্যবসা খোলেন, তাঁরাই কথা-বস্তুকে একচেটে করতে চান। কারণ, এ ভয় তাঁদের মনের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা জাগে যে, কে কোথায় কোন সত্য কথা ফস্ ক'রে ব'লে ফেলবে, আর অমনই তাঁদের ব্যবসা ঘা খাবে।

এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা, কেন না, এটা হচ্ছে মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি। আমরা কি দিনে দুবেলা ছোট ছেলেদের বলি নে—"চুপ চুপ।" আর তার কারণ কি এই নয় যে, তারা অস্থানে অসময়ে এমন সব সত্য কথা ব'লে বসে—যার দরুণ আমাদের বিপদে পড়তে হয়। সত্য কথাটা যে মারাত্মক, তা যিনিই ছোট ছেলে নিয়ে ঘর করেছেন, তিনিই জানেন। এখন আমাদের মধ্যে এক দল যদি এমন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক—যাঁরা আর সকলকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোট ছেলে মনে করেন, তা হ'লে তাঁরা উঠতে বসতে আমাদের মুখে হাত দিতে বাধ্য, কেন না, সেটা করা হচ্ছে তাঁদের কর্ত্তব্য। তাঁরা পরম কৃপা ক'রে লোকহিতের জন্য দল গড়তে বাধ্য। সুতরাং যাঁরা দল বাঁধেন, তাঁরাই তাঁদের মতামতকে শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য—আর যে মত তাঁদের দলের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি, তাকেই উচ্ছৃঙ্খল বলতেই বাধ্য। দল বাঁধাটাও মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি, এ কালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যে প্রবৃত্তিকে Herd instinct বলেন, তার পরিচয় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষে যাকে বলে দল, সে বস্তু হচ্ছে পশুরা যাকে বলে "পাল"—তারই নবসংস্করণ।

সুতরাং "চুপ চুপ" আদেশে কারও কোনও ক্ষতি নেই,—সেই অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া যারা নিজের আত্মাকে কোনও প্রকার দলের অন্তরে বিলীন করতে পারে না। এ শ্রেণীর দু' দশ জন লোক সব দেশে সব যুগেই থাকে। আর তারা সব বিষয়ে সত্য কথা বলবার জন্য লালায়িত। এ শ্রেণীর লোকদের সব দলের দলপতিরা আর সেই

সঙ্গে তাঁদের অনুচররা চিরকালই ভয় করেন, অন্ততঃ তাঁরা এদের উপর এ ভরসা পান না যে, এরা দেশ-কাল বিবেচনা ক'রে কথা কইবে না, ছোট ছেলের মত যখন যা মনে হয়, তাই ব'লে বসবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। যে সত্য কথা বলতে চায়, তাকে সে কথা বেপরোয়া-ভাবেই বলতে হবে। সত্য কথার ফলাফল কি হবে, সে কথার বিচার করতে বসলে কথা বলতে পারা যায়, কিন্তু সত্য বলা যায় না। গীতার একটি বচন একটু বদলে নিলে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সত্য কথা বলবার অধিকার আছে "মা ফলেষু কদাচন।" "যোগস্থো বদ বাক্যানি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করবার যাঁর সাহস নেই, তাঁর সত্য কথা বলবারও অধিকার নেই। এর প্রমাণ দর্শনের বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় আছে। আর পলিটিক-সই বল, আর ধর্ম্মই বল ও দুয়ের কোনটিই দর্শন-বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত নয়। সুতরাং যাঁর ইচ্ছে, তিনিই নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে যা সত্য ব'লে মনে করেন, তিনি অবাধে তাই বলতে পারেন;—যদি না তিনি কোনও দলবলের চোখ-রাঙ্গানি অথবা চোখ-ঠারা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জনৈক পেশাদার অভিনেতা আমাকে বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চে উঠে দর্শক-শ্রেণীকে বাঁদর মনে করলেই নির্ভয়ে ফূর্ত্তিসে act করা যায়। কথাটা যদি সত্য হয় ত আমার মতে একঘরে লেখকরা যদি দলকে herd ব'লে চিন্‌তে পারেন, তা হলেই তাঁদের কলম ফূর্ত্তিসে চলবে।

সে যাই হোক, "চুপ চুপ" আদেশটা আজকালকার দিনে মানাও কঠিন ও মানা সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বৈষ্ণবরা বলেন :—

"বিষয়-বালিসে আলিস্ রেখো
দেখো যেন ঘুমাও না।"

আমরা দেশশুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় গোটাকতক পলিটিকাল বুলির বালিসে আলিস্ রাখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর সেই জন্য দুদিন আগে সেই বুলির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌তে গেলেই সহৃদয় লোকরা অমনই ফিসফিস ক'রে বলতেন "চুপ চুপ।" কথা কইলেই যে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আর আধ্যাত্মিক লোকরা এ কথাও আমাদের বুঝিয়েছেন যে, এ ঘুম যে সে ঘুম নয়, একেবারে যোগ-নিদ্রা। আমরা যারা বিশ্বাস করি নি যে, শিক্ষিত সমাজ স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌছবে, আমরাও বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করি নি, কারণ, জানতুম যে, দেশের লোকের যোগনিদ্রা ভাঙ্গানো আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে অসাধ্য।

তার পর এক দিন মুসলমানদের এক ধাক্কায় হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে আমরাও বেশির ভাগ লোক এখন হতভম্ব ভাবে চোখ রগড়াচ্ছি আর জন কতক ঘুমের ঘোরে সেই সব পুরানো বুলিই এলোমেলোভাবে আওড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় যাঁদের দস্তুরমত চোখ খুলেছে, তাঁদের মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। এ সময়ে চুপ চুপ বলার কোনও সার্থকতা নেই; সে আদেশ যারা জেগে উঠেছে, তারা মানবে না। আজকের দিনে যাঁরা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পারেন, নিজের মনের কথা বলতে পারেন, তাঁদের কথাই আমরা শুনতে চাই—আর তাঁদের কথাই শোনবার যোগ্য। আর তাঁরা কথা কইতে আরম্ভ করছেন, চুপ-চুপ-ওয়ালারাও চুপ হয়ে যাবে। আর এ কায লেখকেরা নির্ভয়ে করতে পারেন। সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাকওয়ার ফলে, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে না আসুক, পিছিয়ে যাবে না।

বীরবল।

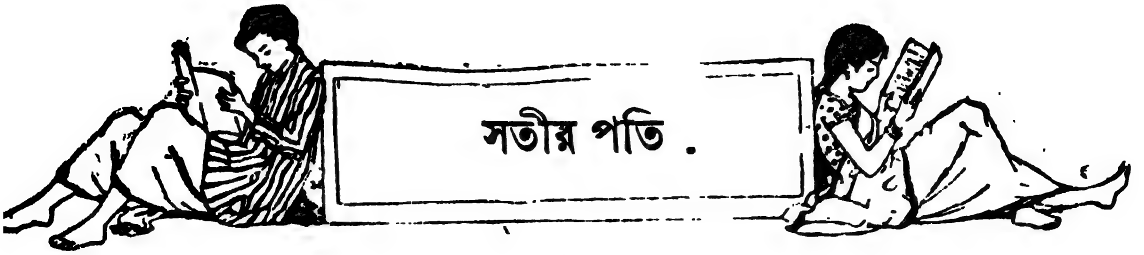

সতীর পতি

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করিমের বক্তৃতা

চাবি বন্ধ করিয়া করিম দোতালা হইতে নামিয়া গেল। নিম্নের হলে যেখানে বহু মুসলমান সমবেত ছিল; কেহ শুইয়া, কেহ বা বসিয়া ছিল, তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দারকে দেখিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাহারা শুইয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া বসিল; যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা একটু নড়িয়া চড়িয়া সর্দ্দারের মুখের পানে সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিল।

করিম বলিল, "জোয়ান সব, কা'ল রাত্রে আমাদের যা করবার সলা ছিল, তা কা'ল হয় নি, আজ হবে, সে খবর তোমরা জানো ত?"

অনেকেই বলিল, "হাঁ হুজুর, খবর পেয়েছি, আমরা সব তৈয়ার আছি।"

এক জন নিজ স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া সবিনয়ে বলিল, "হুজুর খাড়া রইলেন কেন, বসেন!"

করিম বলিল, "বসছি। এক জন যাও ত, এরফান মিঞাকে ব'লে আসো, আর আর যে সকল জোয়ান আমাদের সাথে যাবে কথা ছিল, তাদের সকলকে একাট্টা ক'রে নিয়ে আসে।"

"বহুৎখু, সাহেব"—বলিয়া এক যুবক ছুটিয়া বাহিরে গেল।

এক জন নিজের শতরঞ্চিখানা আনিয়া সর্দ্দারের জন্য বিছাইয়া দিল, করিম তাহাতে উপবেশন করিল। জন কয়েক মাতব্বর গোছের মুসলমান তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে অনেকগুলি মুসলমান আসিয়া, করিমকে সেলাম করিয়া বসিয়া পড়িল। অবশেষে এরফান আসিয়া বলিল, "সকলেই হাজির আছে হুজুর!"

করিম বলিল, "গিণ্‌তি কর্।"

এরফান এক দুই করিয়া গণনা সুরু করিল। শেষে দেখা গেল, ৯৮ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছে।

করিম বলিল, "আর দু' জন হ'লেই যে হয়। উপরে আর কেউ নেই?"

এরফান বলিল, "উপরে কেবল এক জন আছে। সেই যে আদমি কা'ল রেলে এসে পৌঁছেছিল। তাকে বলতেই সে অনেক নেহোরা মিন্‌তি ক'রে বল্লে, ভাই সাহেব, আজ আমায় মাফ করতে হবে; বিকাল থেকে আমার শির বড় দরদ করছে; তা ছাড়া আমি এ সহরে নূতন এসেছি, তায় রাত্রিকাল, পথ-ঘাট চিনি না, যদি পুলিসে তাড়া করে, তবে কোন্ দিকে পালাতে হবে, তাই আমি জানি না। তোমাদের খিদমতে আমি হাজিরই আছি—কা'ল দিনের বেলা যে কাম আমায় হুকুম করবে, আমি তাই তামিল করবো!"

করিম হাসিয়া বলিল, "মফঃস্বলের লোক কি না—ডরফোক্! আচ্ছা এরফান, দেখ্ দেখি, জহুরের বেটা আবদুল আর হোসেনির ভাঞ্জা গফুর ফিরেছে কি না। ফিরে থাকে ত তাদের ডেকে নিয়ে আয়, তা হ'লেই একশো পোরে।"

"বহুৎখু"—বলিয়া এরফান চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নির্দ্দিষ্ট যুবকদ্বয়কে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল।

করিম বলিল, "হাঁ রে গফুর, হাঁ রে আবদুল, কাষের সময় এতই তোদের আস্কতি! কি রকম জোয়ান তোরা?"

গফুর বলিল, "আস্কতি করিনি হুজুর! যে কামে আমাদের পেঠিয়েছিলেন, তা হাসিল ক'রে এসেছি। বড়ই থ'কে এসেছিলাম,—আধঘণ্টা পরেই এসে হুজুরে হাজির হতাম।"

"আচ্ছা, বোস তোরা!—শোন ভাই সকল! পাজি নালায়েক হেঁদুরা আমাদের সঙ্গে বড়ই বদিয়তি করেছে। লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের মস্‌জিদে ঢুকে ঝাড়-লণ্ঠন চুরমার করেছে, কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে—মুসলমানদের উপর মাইরপীট করেছে। তার বদলা আমরা লেবই লেবো—নইলে আমরা মুসলমান বাচ্চাই নই। ঠন্‌ঠনিয়ায় ওদের যে কালীমন্দির আছে, আজ আমরা সেই মন্দিরে চড়াও করব। বুতপরস্ত হালাদের জিভ বের করা ঠাউর কি খাপ্‌সুরৎ রে! হ্যাঃ।"—বলিয়া করিম মুখভঙ্গী করত নিজ জিহ্বাটি যথাসম্ভব বাহির করিল। দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

করিম পুনরায় বলিতে লাগিল, "কাফের শালারা আমাদের কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে। বেটাদের

ঠাউরের জিভটা ছিঁড়ে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াতে পারি, তবেই মনের দুঃখু যায়।”

অনেকে বলিয়া উঠিল, “খাওয়াব—খাওয়াব—আলবৎ খাওয়াব।”

করিম বলিল, “একটু ভুল হয়েছে আমার। সেটায় সোনার জিভ। কুত্তায় ত খাবে না। সোনাটা বেচে সেই টাকায় হালুয়া রুটী বেনিয়ে, এক দিন কুত্তাদের ভোজ লেগিয়ে দেওয়া যাবে। কি বল তোমরা ?”

অনেকে বলিল, “সেই বেহেতর - সেই বেহেতর।”

করিম বলিল, “শুন ভাই সকল! রাত এখন ১০টা। ঠিক ১২টা বাজলেই আমরা সব বাইর হব। একাট্টা নয়—দুই দলে। ৫০ জোয়ান আমার জিম্মা, ৫০ জোয়ান এরফান মিঞার জিম্মা। দুই দলে দুই দিক থেকে গিয়ে আমরা চড়াও হব। এক দল আমি নিয়ে যাব, মুক্তারাম বাবুর ইষ্টিট দিয়ে। এরফানের দল যাবে, হ্যারিসন রোড দিয়ে, কলেজ ইষ্টিট দিয়ে। মহল্লার হেঁদু ছোকরারা সব কা’ল থেকে মন্দিরে পাহারা দিচ্ছে—কা’ল তারা দু’ শো লোক ছিল। আজ রাত ৯টার সময় খবর পেয়েছি, সে যায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ যাইট জন আছে। রাত এগারোটা লাগাৎ—তাদেরও অনেকে ঘরে চ’লে যাবে। যারা পাহারায় থাক্‌বে, তারাও অনেকে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই আমাদের সময়। সেই সময় আমরা গিয়ে তাদের ঘাড়ের উপর লেফিয়ে পড়বো। কিন্তু হুঁসিয়ার, প্রথমে কোনও চিল্লাচিল্লি নয়—চুপ-চাপ গিয়ে তাদের উপর পড়তে হবে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, হালাদের মাথা ফেটিয়ে, মন্দির দখল ক’রে নেওয়া যাবে। লোহার ডাণ্ডা মেরে সেই জিভ বের করা কালো ভূতনীকে ভেঙ্গে চূরমার ক’রে দিয়ে, তার পর মন্দির ভাঙ্গতে হবে। কাফের বেটারা লালবাজারে টেলিফোন করবে—সেখান থেকে লরী-বোঝাই সিপাই আসবার আগেই, কাম হাসিল ক’রে ফেলতে হবে। একশো জোয়ান, একশো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, সামান্য একটা মন্দির ভাঙ্গতে কতক্ষণ সময় লাগে ? পুলিস এসে পড়বার আগেই দল ভেঙ্গে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। বড় রাস্তা দিয়ে নয়, গলি-ঘুঁজি দিয়ে। গলির মধ্যে ঢুকে আর ছুটাছুটি নয়—ধীরে-সুস্থে—বেচারা সিধে মুসলমানটির মত। ভাই সকল—তোমরা সব কথা বুঝতে পারলে ?”

সকলে বলিয়া উঠিল, “জি হুজুর! জি হুজুর!”

করিম বলিল, “বহুৎ আচ্ছা!—এখনও দেড় ঘণ্টা সময় আছে। তোমরা, যাদের খানাপিনা হয়নি, খানাপিনা সেরে নাও। আমি একবার ঘুরে আসছি।”—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ৫।৬ জন মুটিয়া শ্রেণীর মুসলমান, প্রত্যেকের মাথায় চটে জড়ান কতকগুলি কম্বিয়া লোহার ডাণ্ডা। দেখিলে বোধ হয়, এককালে সেগুলি জানালার গরাদে ছিল। প্রত্যেক জোয়ানকে এক একটি ডাণ্ডা দিবার জন্য এরফানকে আদেশ করিয়া করিম উপরে চলিয়া গেল। যে কক্ষে রেবতী তালাবন্ধ আছে, তাহা খুলিয়া দেখিল, রেবতী বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া খালি মেঝের উপর শয়ন করিয়া আছে।

দ্বার খোলার শব্দে রেবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং করিমকে দেখিয়া, বক্ষবস্ত্রে হস্তার্পণ করিল। করিম দেখিল, তাহার মুখখানি অশ্রুসিক্ত। বলিল, “এক মিনিটের জন্য একটা কথা বল্‌তে এলাম। আবার কান্না কিসের বিবি ? কার জন্যেই বা ? দেখলে ত, শওহর তোমার কি রকম বেইমান! এল না, টাকা দিয়ে তোমায় খালাস ক’রে নিতে এল না। ভাবলে বোধ হয়, এ আওরৎ ত পুরানী হয়ে গিয়েছে—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একে খালাস ক’রে আর কি হবে, তার চেয়ে দোসরা একটা সাদি করা যাক্, তাজা চিজ্ মিলবে। তার আশা তুমি ছেড়ে দাও। দেখবে, আমার বিবি হয়ে কত সুখে তুমি থাকবে। তোমার যে সকল জ্যাওর সে সব ত তুমি ফিরে পাবেই, তা ছাড়া আরও কত ভাল ভাল জ্যাওর আমি তোমায় কিনিয়ে দেবো পিয়ারী! আমার আরও দুটি বিবি আছে, কিন্তু তোমার মত খাপসুরতি কেউ নয়। আর, তোমায় দেখে অবধি, কা’ল থেকে আমার যে বেহাল হয়েছে—তা কেবল আমি জানি আর খোদা জানেন। এই ছাতির ভিতরটা হুহু ক’রে জ্ব’লে যাচ্ছে। এখন আমরা একটু জরুরী কাযে বেরুচ্চি—সে কাযটা হাসিল করেই, ঘণ্টাখানেক পরেই আমি আসছি—আমার দিল-আরামকে নিয়ে দিলখুস্ হব—আমার পিয়ারীকে নিয়ে কলিজা ঠাণ্ডা করবো—বেহেস্তের হুরীকে নিয়ে, বেহেস্ত কি জিনিষ, তা মালুম করবো। তুমি ততক্ষণ বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি এসে দুয়ারে ধাক্কা দিলেই খুলে দিও।”—বলিয়া করিম রেবতীর দাড়ীটি ধরিয়া সাদরে একবার নাড়িয়া দিল। এই প্রথম সে তাহাকে স্পর্শ করিল।

জাল আবু হোসেন নগ্নপদে আসিয়া এতক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল, এই সময় সে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া, ভাল ছেলেটির মত নিজের বিছানায় বসিল।

রেবতী কোনও কথা বলিল না—কোনও উত্তর দিল না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং— এই সূত্রের অনুরূপ কোনও সূত্র মুসলমান শাস্ত্রেও আছে বোধ হয়—কারণ, করিম যেন আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারে পূর্ব্ববৎ তালা বন্ধ করিয়া করিম দেখিল, নবাগত আবু মিঞা হলের প্রান্তভাগে নিজ বিছানায় বসিয়া আছে। তাহার ললাট বেষ্টন করিয়া রুমাল বাঁধা।

করিম তাহার নিকট গিয়া বলিল, “আবু মিঞা, শুনলাম, তোমার তবিয়ৎটা কিছু মান্দা আছে!”

হীরালাল বলিল, "হাঁ, সাহেব, বিকাল থেকে শির বড়ই দরদ করছে। আঃ, উঃ,—ইয়া আল্লা!" বলিয়া জাল-আবু নিজ রগ দুটি টিপিতে লাগিল।

করিম বলিল, "ব'সে কেন তক্‌লীফ করছ। শোও—শুয়ে আরাম কর। একটু নিদ হলেই শিরদর্দ্দি আরাম হয়ে যাবে।"

"জী হাঁ, তাই শুই।"—বলিয়া কপালে রুমালের ফাঁস আরও টান করিয়া হীরালাল শুইয়া পড়িল।

করিম বলিল, "দেখ মিঞা, একটা কথা তোমায় ব'লে যাই। আমরা ত আজ সবাই ঠনঠনিয়ার কালীমন্দির ভাঙ্গতে চল্লাম। তারা অনেক লোক সেখানে জমায়েৎ আছে—তাই বেশী লোক নিয়ে যাওয়াই আমাদের দরকার। তোমার তবিয়ৎ মাঁদা তাই তুমি রইলে, নইলে বাড়ী ত একবারে শূনাটা হয়ে গেল। ও দিকে ঐ যে কামরাটা রয়েছে, ওর ভিতর এক হিন্দু আওরাৎকে চাবি বন্ ক'রে রেখেছি—তোমরা ত দেখেছ। তুমি একটু হুঁসিয়ার থেক, কোন রকমে ও যেন না ভাগে। দুয়ার মজবুদ আছে, ভাঙ্গতে পারবে না। বোধ হয়, কোনও গোলযোগ করবে না—অনেকটা পোষ মেনে এসেছে বলেই মনে হ'ল। তবু বলা যায় না, আওরতের মন ত! যদি দোর ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, কি চিল্লাচিল্লি বাধায়, তবে তুমি খুব ধমকাবে শাসাবে বলবে, এই হারামজাদি, চুপ রহ্—নইলে এখনি ঘরে ঢুকে তোকে জবাহ্ ক'রে ফেলবো।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "তালা বন্ধ যে—ঢুকবো কি ক'রে?"

করিম বলিল, "ঢুকতে হবে না—ঐ কথা ব'লে ডর দেখালেই হবে। অনেকটা পোষ মেনেছে ব'লে বোধ হ'ল, চেঁচামেচি বোধ হয় করবে না—তবু, হুঁসিয়ার থাকা ভাল।"

"বহুৎখু"—বলিয়া হীরালাল নিজ রগ টিপিতে টিপিতে বলিতে লাগিল—"ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা!"

আর্ম্মাণী গিজ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিতে আরম্ভ হইল। করিম উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আবু সাহেব—এখন তবে চল্লাম! তুমি এস, নীচে নেমে সদর বন্ধ ক'রে যাও। একটু সজাগ থেক, আমরা এসে কড়া নাড়লে, নেমে গিয়ে খুলে দিও।"—বলিয়া করিম উঠিল। হীরালাল কাৎরাইতে কাৎরাইতে তাহার অনুসরণ করিল।

করিম ও তাহার দলবল সকলে বাহির হইয়া গেলে, হীরালাল দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া সেখানে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিটকাল অপেক্ষা করিল—কেহ আবার ফিরিয়া আসে কি না। কেহ ফিরিল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

হলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, "জয় মা কালী!"—বলিয়া হীরালাল কপালের রুমালটা খুলিয়া বিছানায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর রেবতীর কক্ষদ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে করিতে ডাকিল—"বলি শুন্‌ছেন!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পলায়ন

রেবতী মাথা তুলিয়া চাহিল। কে ডাকে? এ স্বর ত করিম পোড়ারমুখোর বলিয়া মনে হয় না। উত্তর না দিয়া রেবতী একদৃষ্টে বন্ধ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

"শুনছেন? এক বার দরজার কাছে আসুন, কথা আছে।"—বলিয়া আবার দুয়ারে ধাক্কা।

রেবতী উঠিয়া বলিল, "কে আপনি?"

উত্তর আসিল—"বল্ছি। দরজার কাছে আসুন।"

রেবতী উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বলছেন? কে আপনি?"

উত্তর আসিল, "আমি শত্রু নই বন্ধু। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তালাটা ভাঙ্গতে হবে। এ ঘরে অনেক ছোরা-ছুরি টাঙ্গানো আছে। একটা মজবুদ দেখে ছোরা কিংবা ভোজালী, পিছনের জানালার গরাদে গলিয়ে নীচে ফেলে দিন। আমি সেটা কুড়িয়ে এনে, এই তালা ভেঙ্গে, আপনাকে নিয়ে পালাবো—আপনার স্বামীর বাড়ী পৌঁছে দেবো।"

রেবতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি? আপনাকে কে পাঠিয়েছে? কোথা থেকে আসছেন?"

"আমার নাম শ্রীহীরালাল বসু। আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জিলার মাধবপুর গ্রামে। আমি ঘটনাচক্রে এখানে এসে প'ড়ে আপনারই মত বিপন্ন হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পালাবার সুযোগ উপস্থিত। আমি একলাই পালাতে পারতাম, কিন্তু আপনার সব কথা আমি জানি—আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই। আপনি কুলবধূ, কিন্তু এ বিপদের সময় আপনার লজ্জা পরিত্যাগ করা উচিত।"

রেবতী বলিল, "এরা সব কি বাড়ী নেই?—তালা ভেঙ্গে পালাতে বাধা দেবে না?"

হীরালাল বলিল, "জনপ্রাণী নেই। সবাই কালী-মন্দির ভাঙ্গতে গেছে। সাহসে বুক বাঁধুন। শীগ্‌গির যা বলি, তা করুন। একখানা ছোরা কি ভোজালী নীচে ফেলে দিন।"

রেবতী মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। সত্যই কি এ ব্যক্তি শত্রু নয়—বন্ধু, তাহাকে উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে? অথবা এ সমস্ত ছলনা মাত্র? করিমের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অপর কোনও দুর্ব্বৃত্ত কি তাহার উপর অত্যাচার করিবার মতলবে আসিয়াছে?—তাহার ফেলিয়া দেওয়া ছোরায় তালা ভাঙ্গিয়া, তার পর সেই ছোরা দেখাইয়া তাহার উপর যদি অত্যাচার করে?

"কি ভাবছেন ? দেরী করছেন কেন ? লজ্জার খাতিরে সব পণ্ড করবেন ? তবে এখানে থাকাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তা-ও বলুন, আমি গরীব স'রে পড়ি।"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, আমি ছোরা ফেলছি। আপনি নীচে যান।"

রেবতী একখানা মজবুত দেখিয়া ভোজালী পাড়িয়া লইয়া পশ্চাতের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিছু দূরে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি আসিতেছে। সে ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলমান, সেই অল্পালোকে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। মনুষ্যমূর্ত্তি কাছাকাছি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ফেলে দিন।"—রেবতী ভোজালীখানা ফেলিয়া দিল। মনুষ্যমূর্ত্তি আসিয়া সেখানা কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

রেবতী দুরু-দুরু বক্ষে আবার দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই পদ-শব্দ শুনিতে পাইল। পদশব্দ তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিলে আগন্তুক বলিল, "আমি ততক্ষণ তালা ভাঙ্গি আপনি ততক্ষণ আপনার জিনিষপত্রের মধ্যে বিশেষ ক'রে যা নেবার—বেছে নিন। যা সহজে হাতে নেওয়া যেতে পারে—তাই নিন, ভারি কিছু নেবেন না।"

"আচ্ছা, আপনি তালা ভাঙুন।"—বলিয়া রেবতী তাড়াতাড়ি তাহার ও সতীশের বাক্স খুলিল। অর্থ ও অলঙ্কার ত পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল। বস্ত্রাদির জন্য রেবতী মাথা ঘামাইল না। কেবল চিঠি ও কাগজপত্র যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া লইল, যাহাতে পরে এই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের নাম-ধাম প্রভৃতির কোনও সংবাদ না পায়।

দরজায় অস্ত্রাঘাতের শব্দ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ মড় মড় শব্দ—শেষে মড় মড় মড়াৎ—তালা ভাঙ্গিয়া গেল। রেবতী তখন খিলটি খুলিয়া দিল।

পরক্ষণেই ভোজালী-হস্তে হীরালাল প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া রেবতী পিছু হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বল্লেন, আপনি হিন্দু ?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "আমার এ বেশ দেখে ভয় পাবেন না। এটা আমি সেজেছি মাত্র—মুসলমান নই—আমি সত্যিই হিন্দু। আগে চলুন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। পুলিসের তাড়া খেয়ে হয় ত তারা এখনই ফিরে আসতে পারে।"—বলিয়া ভোজালীখানা মেঝের উপর ফেলিয়া হীরালাল বাহির হইল।

রেবতীও কম্পিতপদে দুরু-দুরু বক্ষে তাহার অনুসরণ করিল। বাটীর বাহির হইয়া উভয়ে গলি-পথে চলিল। কোনও লোককে দেখিতে পাইল না—এ পাড়ার অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমানই মন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছে।

নীরবে চলিয়া উভয়ে হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িল। হীরালাল চুপ চুপি বলিল, "আপনার বাড়ী কোথা বলুন দেখি ? ট্যাক্সি কিংবা গাড়ী ত একখানিও দেখছি নে। আর পেলেও উঠতে সাহস হয় না—হেঁটে যাওয়াই বোধ হয় নিরাপদ।"

রেবতী বলিল, "আমার বাড়ী জয় মিত্তিরের গলি।"

"সে কোথা ?"

"চিৎপুর রোডে। আহিরীটোলা ছাড়িয়ে—প্রায় শোভাবাজারের কাছাকাছি।"

"ওঃ—সে ত অনেক দূর। অত দূর কি হেঁটে যেতে পারবেন আপনি ?"

"উপায় কি ?"

"এখানে কাছাকাছি আপনাদের কোনও আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী নেই ? - তা হ'লে সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে—"

রেবতী বলিল, "না, কাছাকাছি তেমন কারু বাড়ী নেই।"

"তবে চলুন, নতুন রাস্তা ধ'রে যাই—বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে যাব।"

"চলুন।"

উভয়ে পদব্রজে নূতন রাস্তা দিয়া চলিল। এ রাস্তাটিও এ সময় জনশূন্য। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গোরা সৈন্য বোঝাই একখানা মোটর লরী পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইহারা একটু সাহস পাইল, এতক্ষণে মুখে কথা ফুটিল।

হীরালাল বলিল, "একটা কথা বলি। আপনাদের বাড়ীতে আজ রাতটুকুর জন্যে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিতে হবে।"

রেবতী বলিল, 'তা বেশ ত ! আপনি আমার এত উপকার করলেন,—এ ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব ? রাতটুকু কেন আপনার যত দিন ইচ্ছা আমার ওখানে থাকবেন।"

হীরালাল বলিল, "অতটা উপদ্রব আপনাদের উপর করবো না। কা'ল একটা বাসাটাসা ঠিক ক'রে নেবো।"

এই সময় রেবতীর প্রশ্নে হীরালাল নিজ কলকাতায় আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও বিবৃত করিল।

আর কিছু পথ চলিয়া হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, আপনার স্বামীর যে টাকা নিয়ে আসবার কথা ছিল, তিনি এলেন না কেন ? বোধ হয়, টাকার যোগাড় করতে পারেন নি।"

রেবতী বলিল, "তাও হ'তে পারে। কিংবা হয় ত ভেবেছেন, সারারাত সারাদিন আমি মুসলমান গুণ্ডার আড্ডায় ছিলাম, আমি কি আর ঘরে নেবার মত আছি !"

হীরালাল বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! না না—তা কি তিনি মনে করতে পারেন ?"

রেবতী বলিল, "সীতা দশ মাস রাবণের বাগানে ছিলে

ব'লে রাম যদি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পেরে থাকেন, তবে আমার স্বামী ও রকম মনে করতে পারবেন না কেন?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু আমি সাক্ষী আছি—আমি আপনার স্বামীকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলবো।"

"আপনার কথা যদি তিনি না বিশ্বাস করেন? তার পর দেখুন, আপনি এক জন যুবাপুরুষ, আমি এক জন যুবতী—এই গভীর নিশীথে মনোরমা আর হেমচন্দ্রের মত দু'জনে একত্র ভ্রমণ, এটাও লোকে দোষের চোখে দেখতে পারে ত!"—বলিয়া রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু হীরালাল সেটা দেখিতে পাইল না। ভাবিল, 'এ স্ত্রীলোক বেশ লেখা-পড়া জানে দেখছি। সাধুভাষায় কথা কয়, বঙ্কিম কোট করে।' তবে ইহাও তাহার মনে হইল, কথাবার্ত্তাগুলো কি রকম? এ ত লজ্জাশীলা হিন্দু-কুলবধুর মত নয়! ব্যাপার কি?

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হীরালাল বাবু, আপনার বিয়ে হয়েছে?"

"হয়েছে। কেন?"

"আপনার স্ত্রী কত বড়?"

"এই—১৫।১৬ বছরের।"

"ছেলে হয়েছে?"

"একটি মেয়ে।"

"কোথায় তারা?"

"আমার বাড়ীতে, মাধবপুরে।"

"আচ্ছা, আমার যেমন অবস্থা হয়েছে—আপনার স্ত্রীর যদি সেই রকম অবস্থা হ'ত,—এক রাত্রি এক দিন গুণ্ডার আড্ডায় কাটিয়ে তার পর অপরিচিত এক জন সুশ্রী যুবকের সঙ্গে রাত দুটোর সময় যদি সে বাড়ী এসে পৌঁছত, আপনি কি বিনা দ্বিধায় তাকে ঘরে নিতেন?"

তাহার সঙ্গিনী যে প্রকারান্তরে তাহাকে "সুশ্রী" বলিয়া সার্টিফিকেট দিল, ইহা হীরালাল লক্ষ্য করিল। উত্তরে বলিল, "তা নিতাম বৈ কি!"

রেবতী একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পৃথিবীর সবাই যদি আপনার মত ভাল হ'ত হীরালাল বাবু, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি বলুন। দেখি, আমাদের তিনি কি বলেন। যদি ধরুন, তিনি আমায় বাড়ী থেকে হাঁকিয়েই দেন, তা হ'লে কি উপায় হবে? আমি আপনার ঘাড়ে প'ড়ে গেলে আপনি আমায় নিয়ে কি করবেন বলুন দেখি?"

হীরালাল বলিল, "ছি ছি, ও সব অমঙ্গলের কথা কেন ভাবছেন আপনি?"

রেবতী বলিল, "বিপদের ছায়া দেখতে পেলেই, বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল নয়? বিপদ যদি না আসে, অমনি অমনি যদি কেটে যায়—ভালই! নইলে?"

"বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন? আপনার সন্তানাদি—"

রেবতী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হয় নি।"

"আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী?"

"মারা গেছেন।"

"ভাসুর, দেওর—অপর কোনও আত্মীয়-স্বজন?"

"কেউ নেই।"

"তা হ'লে বাড়ীতে শুধু আপনি আর আপনার স্বামী?"

"শুধুই আমি।"

"সে কি রকম?"

"আমার স্বামী দিনের বেলা থাকেন আপিসে, আর রাত্রে থাকেন কোন্ চুলোয়, তা জানিনে!" বলিয়া আবার রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল।

হীরালাল বুঝিল, এই নারী বড় দুর্ভাগিনী, ইহার স্বামী একটি নরপশু। স্বামী যে ইহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না কেন, তাহার কারণও অনুমান করিল। বলিল, "তা হ'লে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছব, আপনার স্বামীকে তখন বাড়ীতে পাব না?"

রেবতী বলিল, "সম্ভাবনা কম।"

ইহা শুনিয়া হীরালাল মনে মনে বিপদ গণিল। আজ বাকী রাতটুকু ইহাদের আশ্রয়ে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় ত আর তাহা চলে না। বলিল, "ওঃ, তা জানতাম না। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চ'লে যাব এখন।"

"কেন, এই যে বল্লেন, আমাদের বাড়ীতে রাতটুকু থাকবেন। কা'ল সকালে উঠে, চা-টা খেয়ে তখন যাবেন।"

হীরালাল বলিল, "তা আর সুবিধে হ'ল কৈ!"

"না না, কিছু অসুবিধে হবে না—চলুন। বিশেষ, আপনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, আমার স্বামীর কাছে

আমার নিষ্কলঙ্কতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। অসহায় অবলাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে এখন পালাতে চাচ্ছেন কেন? এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু হীরালাল বাবু।"

হীরালালের মনের সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইল। এরূপ ভাবের কথাবার্ত্তা—এক প্রকার বাচালতা বলিলেই হয়—এ কি সত্যই গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ, না কোনও ভ্রষ্টা রমণী? গৃহস্থ ঘরের বধূ কন্যা এক জন অপরিচিত পুরুষের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে, ইহা কি সম্ভব? তবে বলা যায় না—কলিকাতা সহর—আজকাল কলিকাতায় এইরূপই ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বোধ হয়!

রাস্তার দুই ধারে থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড—দুই মাস বিদায়ের পর অদ্য রজনীতে সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী রেবতীসুন্দরী মর্জ্জিয়ানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কি কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্ল্যাকার্ড রেবতী ও হীরালাল উভয়েই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। হীরালাল এই সময় সহসা বলিয়া উঠিল, "অদৃষ্ট দেখুন! এই সব বিপদ না হ'লে আজ রাত্রে আমি নিশ্চয়ই রেবতীর মর্জ্জিয়ানা দেখতে যেতাম। শুনেছি, তার অভিনয়, নাচ-গান একেবারে চমৎকার।"

রেবতী বলিল, "দেখেন নি কখনও?"

"না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কলকাতায় থাকেন, আপনি দেখেছেন নিশ্চয়? তার চেহারাও না কি খুব সুন্দর?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। সুন্দর না ছাই! রং টং মেখে রেবতী অমন পরীটি সাজে। কিন্তু আসলে বোধ হয় একটি কালপেঁচী!"

হীরালাল বলিল, "না, আমি শুনেছি, রেবতী নাচতে গাইতেও যেমন, চেহারাটিও তেমনই সুন্দর। এবার যে দিন হবে, আমি নিশ্চয়ই দেখতে যাব।"

এ সময় তাহারা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রেবতী বলিল, "ঐ দেখুন, ঐ বীডন ষ্ট্রীটে সামনে মনোমোহন থিয়েটার। এবার বাঁ-দিকে খানিকটা গেলেই চিৎপুর রোড।"

মিনিট ১৫।২০ পরেই উহারা জয় মিত্রের গলিতে পৌঁছিল। খানিক দূর গিয়া বামদিকের একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া, রেবতী দরজার কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে মোটা গলায় প্রশ্ন আসিল, "কৌন হায়?"

রেবতী বলিল, "হরি সিং, দরোয়াজা খোলো।"

খট্ করিয়া শব্দ হইল—প্রবেশপথে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়া উঠিল। দ্বারবান্ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। সেলাম করিয়া মহা বিস্ময়ে বলিল, "মা-জী—পাঁয়দল আয়া?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ হরি সিং—বড়ই বিপদে পড়েছিলাম। বাড়ীর সব ঠিক আছে ত?"

"হাঁ মাইজী, সব ঠিক হায়।"

"ঝি দুটো কোথা?"

"উপর মে শুতা হায়।"

"আচ্ছা, এ দরজা বন্ধ ক'রে উপরে গিয়ে আমার কামরা খোল। ঝিদের উঠিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে। আসুন হীরালাল বাবু।"

দ্বারবান্ ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার অর্গলিত করিয়া, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। হীরালাল বলিল, "আমি তা হ'লে এখন যাই—নমস্কার।"

"এত রাত্রে কোথায় যাবেন আপনি? এই ডামাডোলের বাজার। কোথায় এখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াবেন?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু—"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে যেতে নাহি দিব। আপনার কোনও সঙ্কোচেরই কারণ নেই হীরালাল বাবু! আমি পতিবিরহখিন্না কুলবধূ নই। কেন না, আমি থিয়েটারের নটী—রাস্তায় আসতে আসতে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে যার নাম দেখলেন—আমি সেই রেবতী।"

হীরালাল বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিল—"আপনি! আপনিই রেবতীসুন্দরী?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমিই সেই পোড়ারমুখী! সুন্দরী কি না, সেটা আপনি বিচার করবেন—তবে মুখে আমার রংমাখা নেই, এ আমি হলফ ক'রে বলছি! এখন আসুন দেখি লক্ষ্মীছেলেটির মত!" বলিয়া রেবতী অগ্রসর হইল।

হীরালাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ রেবতীর অনুকরণ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

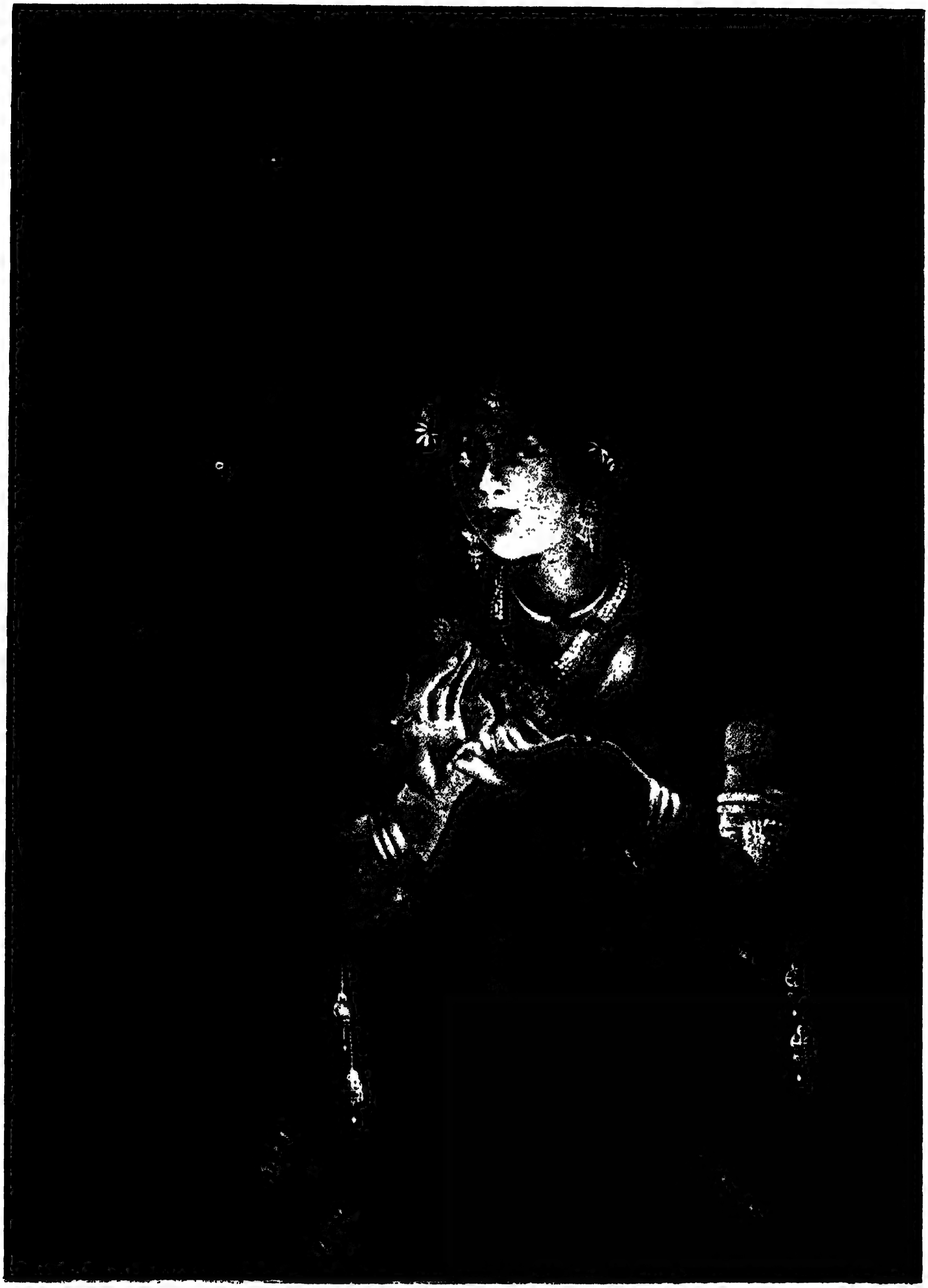

'নগরীর নটি চলে অভিসারে
যৌবন-মদে মত্তা—"

৫ম বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩৩৩　　[৫ম সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রীরাধা

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধিকার যে রসভাবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখ্য উপকরণ কোথা হইতে কি ভাবে আসিয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার স্থান অতি উচ্চে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার রসভাব-সমুজ্জ্বল বৈষ্ণবদর্শনের বা শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূল ভিত্তি শ্রীরাধা। পুরাণ এই ভিত্তির শিলান্যাস করিয়াছে, তন্ত্র ইহার সংগঠন করিয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অমর কবিগণ ইহাকে সুধা-লিপ্ত করিয়াছেন, আর সর্ব্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমময় তুলিকায় রসের বিচিত্র বর্ণরাজিতে ইহাকে সুচিত্রিত করিয়া, জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। একাধারে ভারতীয় সকল দর্শনের সারতত্ত্ব ও ভারতীয় রস-শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য যদি কেহ দেখিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে—গৌড়ীয় কবি ও ভক্ত দার্শনিকগণের কল্পনাময় ভাব-তুলিকায় সুচিত্রিত এই রাধাতত্ত্ব।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্তভাবে শ্রীরাধিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোন উদ্দেশই নাই, হরিবংশে বা মহাভারতের কোথায়ও রাধার নামগন্ধ নাই, পদ্মপুরাণের মধ্যে প্রচুরভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইলেও শ্রীরাধিকার অস্তিত্বের প্রমাণ নিতান্তই অল্প।* ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে এই রাধাতত্ত্ব বিশদভাবে কতকটা প্রস্ফুটিত হইলেও, উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন, কেবল বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব অতি বিস্পষ্টভাবে অথচ সূত্ররূপে মাত্র বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

> "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
> সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে—পদ্মপুরাণের বলিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

> "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
> সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রের এই মূল বচনটিকে অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভাবে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বিশদীকৃত ও বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহা পরে যথাস্থানে প্রতিপাদিত হইবে। পুরাণে, তন্ত্রে ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধাকে শ্রীভগবানের পরাশক্তিরূপে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধাকে আমরা কি ভাবে দেখিতে পাই এবং কোন্ সময় হইতে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার মূর্ত্তি চিত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা আপাততঃ করা যাইতেছে।

পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে — শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে শ্রীরাধার নাম কত দিন হইতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্গত বহু পুস্তকের নাম মাত্রই আমরা জানিতে পারিলেও ঐ সকল পুস্তক আমাদের এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু যে সকল প্রামাণিক সাহিত্য গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের পরবর্ত্তী নবম শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীরাধার নাম ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের আরম্ভাবধি এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত কবি অল্প বা বিস্তরভাবে স্বকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি বা হ্লাদিনীর সার প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বর্ণন করেন নাই; প্রত্যুত সকলেই তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী সমাজভয়বিহ্বলা পরকীয়া গোপরমণীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন জীবিত ছিলেন, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোকনামক অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা তাঁহার উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"দুরারাধা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজতঃ
তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ।"

এই শ্লোকটির রচনা-প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, ইহা কোন নাটকের অথবা কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্দ্ধন বলেন নাই অথচ ইহা আনন্দবর্দ্ধনের স্বরচিত শ্লোক নহে, তাহাও ঠিক। কারণ, ধ্বন্যালোক গ্রন্থে তাঁহার নিজ কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই তিনি "যথা মম" এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া তিনি কেবল 'যথা চ' এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এইরূপ —

"রাধার আরাধনা যে বড়ই দুঃখের, তাহা সত্য, কারণ, হে সুভগ! তোমার যে বড়ই প্রিয়তমা—তাহার পরিহিত বস্ত্রেরই অঞ্চল দিয়া তুমি আমার এই নয়নের পতিত অশ্রুধারা মুছাইতেছ, (আর বলিতেছ) স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই কঠোর, থাক, আর প্রিয় বচন বা নব নব সেবার উপচার-দ্রব্যের আবশ্যক নাই, তুমি বিরত হও। বহু বার অনুনয়-কালে শ্রীরাধা যাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।"

এই শ্লোকে অভিমানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অবিনয় দর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া অশ্রু পতিত হইতেছে আর শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিহিত বসনের অঞ্চল দিয়া সেই অশ্রু মুছাইতেছেন, দৈব-দুর্বিপাকে তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি নিজের নহে, কিন্তু উহা যে সৌভাগ্যবতী গোপললনার কুঞ্জে তিনি রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বসন, প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অবিশ্বস্ততার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাধা দলিতা ফণিনীর ন্যায় মর্ম্মন্তুদ মন্যুর আবেশে প্রিয়তমের সেবার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ইহাই হইল এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার চিত্র। আলঙ্কারিকগণ এই প্রকার প্রিয়তমের অবিনয়ে বিক্ষুব্ধহৃদয়া প্রেমবতী রমণীকে খণ্ডিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা,—

"পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা॥"

(সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

অন্য কোন বনিতার সহিত সমাগম যাহা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে, এইরূপ কোন চিহ্নযুক্ত প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে উপস্থিত হয়, সেই ঈর্ষ্যা-কষায়িতা রমণীকে পণ্ডিতগণ ‘খণ্ডিতা’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ধ্বন্যালোকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি এই,—

“তেষাং গোপবধূ-বিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পন-মৃদুচ্ছেদপ্রসঙ্গেঽধুনা
জানে তে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥”

মথুরায় অথবা দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেই সময় বৃন্দাবন হইতে সমাগত (খুব সম্ভব উদ্ধব) ব্যক্তি-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

হে ভদ্র! যমুনার তীরে সেই লতাগৃহ-সমূহের মঙ্গল ত? যে লতাগৃহ-সমূহ গোপবধূগণের নানাপ্রকার বিলাসের সুহৃদ্ এবং যাহারা শ্রীরাধার (হরিবিরহব্যাকুলতাময়) একান্ত স্থিতির সাক্ষী, (অথবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?) এখন সেই লতাগৃহ-সমূহে (রাধাকৃষ্ণের) মিলনের জন্য কোমল শয্যা রচনার্থ আর কোমল কিশলয়-সমূহের ছেদের আবশ্যকতা নাই, তাই আমার মনে হয়, ঐ সকল লতা-গৃহের পল্লব-সমূহ পাকিয়া কঠোর ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাদের সেই (নয়নমনোহর) নীল প্রভা নিশ্চয়ই আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটিতে বড়ই গূঢ়ভাবে বড়ই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রধান সহচরী শ্রীরাধার তত্ত্ব কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে! শ্রীরাধার প্রিয় সহচরী গোপবধূগণ সকল গৃহকৃত্যের উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বদা যমুনা-তীরের লতাকুঞ্জ-সমূহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য নব নব বিলাস-রচনায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত আর সেই বিলাস-রচনা-পরিশোভিত কুঞ্জমণ্ডপের কোন এক নিভৃত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সমাগমার্থিনী শ্রীরাধা একাকিনী প্রতি পল্লবকম্পজনিত শব্দে প্রিয়তমের আগমন-সূচক পদশব্দের সম্ভাবনায় কম্পিত-হৃদয়া হইয়া কত রাত্রি অপেক্ষা করিতেছেন—সেই সময়ে তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়-সমুদ্রের প্রতিক্ষণ আশা ও নৈরাশ্যের, আনন্দের ও বিষাদের উত্তালতরঙ্গমালার মধুর ঘাত-প্রতিঘাতের অপূর্ব্ব চিত্রগুলি যেন জীবন্ত চিত্রের আবেগময় ছায়াসমূহ প্রতি পুষ্পগুচ্ছে, প্রতি পল্লবস্তম্ভারে স্বপ্নময় নৃত্য করিতেছে। এই সকল সুখের স্মৃতি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত নূতন রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় হৃদয়-সমুদ্রের ভাব-তরঙ্গাবলীকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে; মিলনের সুখময় স্মৃতি ও বিরহের বিষাদময় বিবর্ত্ত এই পরস্পর প্রতিকূল ভাব-সমাবেশের অত স্পষ্ট অথচ এত সংক্ষিপ্ত মর্ম্মস্পর্শী চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের ‘দশাবতার-চরিতে’ শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীরাধার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বলি—

“ন স সখি যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে
গহনভুবি ভবত্যা মৎপ্রিয়ঃ ক্কাপি দৃষ্টঃ
সুমুখি ফলমিয়ত্তু স্নেহমোহাৎ ত্বয়াপ্তং
যত্তরসি লিখিতেয়ং কণ্টকোল্লেখরেখা॥ ১
ইত্যভূন্মদনোদ্দাম-যৌবনে কালিয়দ্বিষঃ।
গোপাঙ্গনানাং সংরম্ভগর্ভোপালম্ভবিভ্রমঃ॥ ২
প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা॥” ৩

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ কোন সহচরীকে যমুনাতীরে গহনবনে প্রেরণ করিয়া শ্রীমতী সঙ্কেতকুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহচরী ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাধা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করায় সহচরী উত্তর দিতেছেন—

“সখি! যমুনার তীরে গহনকাননের মধ্যে সেই বেতস-লতা-কুঞ্জে কোথায়ও তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া গেল না।” এই কথা শুনিয়া পরিহাসের ছলে সহচরীর প্রীতি-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন যে, “ও সুমুখি! (তাহার দেখা ত পাইলেই না।) কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার মোহে পড়িয়া তুমি কি ফল পাইয়াছ! আহা, গহনকাননের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে যাইয়া তোমার বুকের উপর এই যে কঠোর কণ্টকের ক্ষতরেখা অঙ্কিত হইয়াছে!” ১

“কালিয়দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মদনোন্মাদ-দুর্দ্দম যৌবনারম্ভকালে গোপাঙ্গনা-সমূহের তৎসংক্রান্ত

হর্ষমিশ্রিত তিরস্কারবাক্যসমূহ এই ভাবে প্রায়ই শ্রুত হইত।" ২

"যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তথাপি কিন্তু ভ্রমরের প্রীতি যেমন জাতী কুসুমের প্রতি অধিকই হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন।" ৩

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যে কৃষ্ণলীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে কোন পুরাণ বা সাহিত্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ, হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা যে ভাবে কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই, ক্ষেমেন্দ্র-রচিত কৃষ্ণচরিতের সহিত তাহার বহুস্থানে বৈপরীত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ক্ষেমেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্ররূঢ়যৌবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আমরা দেখিতে পাই,—যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ কিশোরাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাগবত প্রভৃতিতে দেখা যায়, নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দগণ গোকুলে নানাপ্রকার উৎপাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে ব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই বৃন্দাবনস্থিত ব্রজেই অক্রূরের আগমন হইয়াছিল এবং তিনি এইখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র-কৃত কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অক্রূর গোকুল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ভাগবত প্রভৃতিতে বর্ণিত রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতির নামও ক্ষেমেন্দ্র করেন না। এমন কি, তাঁহার কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে বৃন্দাবনের নাম পর্য্যন্তও দেখা যায় না। এই গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতির সহিত আর একটি গুরুতর বিষয়ে এইরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণকে কংসের ভাগিনেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই গ্রন্থে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী দেবকীকে কংসের পিতৃষ্বসা বলা হইয়াছে, যথা—

"পিতৃষ্বসুস্তে দেবক্যা যঃ সমুৎপৎস্যতে সুতঃ।
স সুরৈর্নিশ্চিতো হন্তা বিভূতের্জীবিতস্য তে॥"

ক্ষেমেন্দ্রকৃত কৃষ্ণাবতার-চরিত।

নারদ এক দিন গোপনে আসিয়া কংসকে বলিয়াছিলেন—

"তোমার পিতার ভগিনী দেবকীর যে পুত্র জন্মিবে, দেবগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে, সেই পুত্র তোমার ঐশ্বর্য্য ও জীবনকে বিধ্বস্ত করিবে।"

এইরূপ আরও কতকগুলি কৃষ্ণচরিত সম্বন্ধে কথা ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণাদি-প্রথিত কৃষ্ণ-চরিতের সহিত নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, বিস্তারভয়ে এ স্থানে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এই সকল কৃষ্ণচরিত-সংক্রান্ত মতভেদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং ইহার সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণচরিত বিষয়ে যে সকল ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সাধারণে প্রধান প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ক্ষেমেন্দ্রের সময় ঐ সকল পুরাণের প্রচার ছিল না বা প্রচার থাকিলেও ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির নিকট তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। যাহা হউক, ইহা স্থির যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে পূর্ব্বে এরূপ অনেক গ্রন্থ ছিল, যাহা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ঐ সময়ে প্রচলিত সেই সকল গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে শ্রীরাধার চরিত্রে এমন কিছু বর্ণিত হয় নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি প্রেমভক্তির পরম আদর্শ শ্রীরাধিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরবনিতা কৃষ্ণপ্রেমাথিনী সমাজভয়বিহ্বলা শ্রীরাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পড়িয়া যে অপূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই সমালোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করা যাইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

দাদাঠাকুরের নিষ্ঠা

১

অনেক আদরের মেয়ে হারাণী --সেই হারাণী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া, সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া, হাতের চুড়ী ভাঙ্গিয়া যখন মায়ের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, মা তখন ধূলায় লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হারাণী রে, তোর কপালে এই ছিল ?"

হারাণী চোখের জল মুছিয়া, মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কপালের লেখা, তুমি কি করবে মা !"

জেলের মেয়ে হইলেও হারাণী কুৎসিতা ছিল না। সুতরাং অনেকেই পরামর্শ দিল, "তোদের জাতে যখন রয়েছে, তখন হারাণীর সাঙ্গা দে, হারাণীর মা।"

হারাণীর মা-ও এই কথাটা লইয়া মনের ভিতর তোলা-পাড়া করিতেছিল। হারাণী কিন্তু ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিল, "ছি মা, পরাণ জেলের মেয়ে আমি, সাঙ্গা ক'রে বাবার মাথা নীচু করবো ?"

সদুঃখে মা বলিল, "সাঙ্গা করবি না ত খাবি কি ক'রে রে আবাগী ? তোর বাবা ত শুধু এই কুঁড়েটুক রেখে গিয়েছে।"

সদর্পে হারাণী উত্তর করিল, "গতর-মেহনত ক'রে দু'টো পেট কি চালাতে পারবো না ?"

কিন্তু গোবর কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, লোকের ধান ভানিয়া পেটের ভাত, পরণের কাপড় যোগান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বর্ষার বারিপাতে মাঠ-ঘাট যখন প্লাবিত হইয়া আসিল, তখন মায়ে-ঝিয়ে এক দিন উপবাস দিয়া দ্বিতীয় দিনে হারাণী জল খাইবার সম্বল ঘটীটি লইয়া তেলী-দিদির কাছে বাঁধা দিতে গেল। তেলী-দিদি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, "মর্ পোড়ারমুখী, গতর থাক্‌তে ঘটী-বাটি বেচে খেয়ে মচ্ছিস্ কেন ?"

হারাণী বলিল, "কি করবো দিদি, গতর খাটাব কোথায় ?"

তেলী-দিদি বলিল, "কলকাতায় গিয়ে চাকরী করবি ?"

হারাণী ইহাতে সম্মত হইল। তখন হারাণী মাতার অনুমতি লইয়া তেলী-দিদির সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল।

সেখানে এক বড়লোকের বাড়ীতে হারাণীর চাকরী হইল। খাওয়া-পরা বাদে মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। চাকরী পাইয়া হারাণী কৃতার্থ হইল।

এক মাস চাকরী করিয়া হারাণী তেলী-দিদির ভাইপোর মারফতে মায়ের জন্য একখানি কাপড় ও দুইটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

হারাণীর মাকে নূতন কাপড় পরিতে দেখিয়া লোক জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় কোথায় পেলি হারাণীর মা ?"

সাহ্লাদে হারাণীর মা উত্তর দিল, "আমার হারাণী পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"এই দশ দিন কলকাতায় না যেতেই তোর জন্যে কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে !"

অপরে বলিল, "তা আর পাঠাবে না ? হারাণী যখন কলকাতায় গিয়েছে, তখন তাকে আর পায় কে। আর দু' মাস বাদে দেখবি, হারাণীর মা গরদের শাড়ী পরেছে।"

তাহার এই উক্তির মধ্যে যে তীব্র শ্লেষটুকু নিহিত ছিল, হারাণীর মা তাহা বুঝিতে পারিল না। সে এক গাল হাসিয়া আহ্লাদ-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "তোমরা পাঁচ জন তাই বল মা, আমি গরদের কাপড় পরতে চাইনি, হারাণী আমার খেয়ে পরে সুখে থাক।"

২

হারাণীর নম্র স্বভাবে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সকলেই তাহাকে স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলা হারাণীর এত ন্যাওটো হইয়া পড়িল যে, না ঘুমাইলে অনেককেই হারাণীর কাছছাড়া করিবার উপায় ছিল না। গৃহিণী বলিতেন, "অনেক ঝি রেখেছি, কিন্তু হারাণীর মত ঝি কখনও দেখি নাই।"

বাড়ীর গৃহিণী যখন এত দূর সন্তুষ্ট, তখন সে বাড়ীতে হারাণী যে বেশ সুখেই ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সুখে থাকিলেও একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় হারাণীর বুকটা কিন্তু মাঝে মাঝে ধুক্ ধুক্ করিত। চাকরী করিয়া দিবার পর তেলী-দিদি তাহাকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, "খবরদার হারাণী, তুই যে জেলের মেয়ে, এ কথা কাউকে

বলিস্ না। কেউ জাতের কথা জিজ্ঞেস করলে বল্‌বি, তিলীর মেয়ে ; বাপের নাম পরাণ জেলে নয়, পরাণ পাল।"

বাড়ীর সকলের নিকট তেলী-দিদি পরিচিত ছিল, সুতরাং তাহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ; হারাণীকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করা বড় প্রয়োজন বোধ করে নাই। না করিলেও হারাণী কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে হারাণী এত বড় মিথ্যাটা কেমন করিয়া উচ্চারণ করিবে? বলিতে তাহার গলা বাধিয়া যাইবে যে? যদি কেহ ঘুণাক্ষরে তাহার জাতির পরিচয় জানিতে পারে, তাহা হইলে ত রক্ষা রাখিবে না। জেলের মেয়ে হইয়া কায়েতের ঘর মজাইতেছে ;—জল তুলিতেছে, বাটনা বাটিতেছে, পান-জল দিতেছে, দোকান হইতে খাবার আনিতেছে। কোনরূপে জাতির কথা প্রকাশ পাইলে তাহাকে কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে নিশ্চয়। হায়, কেন সে মাথা খাইয়া এখানে চাকরী করিতে আসিল? ইহা অপেক্ষা দেশে উপবাস দিয়া মরাও যে ভাল ছিল!

কিন্তু চার পাচ মাসেও কেহই যখন জাতি সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ করিল না, হারাণী তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আসিল। তাহার ভয়টুকু অল্পে অল্পে দূরীভূত হইয়া মনটাকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিল। নাঃ, এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও হারাণী অসঙ্কুচিত কণ্ঠেই উত্তর দিতে পারিবে, সে তিলীর মেয়ে।

এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া হারাণী যখন সকলের প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল, তখন সহসা এক দিন রান্নার জল তুলিতে তুলিতে হারাণী শুনিল যে, বাড়ীর গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের আগমনে গৃহিণী অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁহার আহ্নিকের উদ্যোগ, জলযোগ ও রন্ধনের আয়োজন—গৃহিণী ভক্তি ও সাবধানতা সহকারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

গুরুদেবের হবিষ্যান্নের জন্য আতপ চাউল কিনিতে হারাণী দোকানে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় কৌতূহলবশতঃ সে বাহিরের ঘরের জানালা দিয়া গুরুদেবের দর্শনাভিলাষী হইল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ, গুরুদেব যে তাহাদেরই গ্রামের ভট্‌চায্যি মশায়। ভয়ে হারাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে আতপ চাউলের ঠোঙ্গাটা পড়িয়া যাইতেছিল, হারাণী দুই হাতে সেটাকে কোলের কাছে চাপিয়া ধরিল।

গুরুদেব তখন তৈলমর্দ্দনান্তে ধূমপান করিতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি সহসা জানালার দিকে নিপতিত হইল। হারাণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বরপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

৩

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। হারাণী গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্মুখীন হইলে সে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "কে, হারাণী না কি?"

"হাঁ, দাদাঠাকুর।"

"তুই এখানে?"

শঙ্কা-কম্পিত কণ্ঠে হারাণী উত্তর দিল, "আমি এখানে চাকরী করি।"

"চাকরী? কি চাকরী করিস্ তুই?"

"ঝি-গিরী।"

"কোথায়?"

"ঐ বাড়ীতে।"

বলিয়া হারাণী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বাড়ীখানা দেখাইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাড়ীখানার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ বাড়ীতে? ও বাড়ী ত আমার শিষ্য দেবেন বোসের।"

হারাণী শঙ্কা-বিবর্ণ মুখে নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ক্রোধ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে তুই, ভদ্র লোকের জাত-কুল খাচ্ছিস্?"

ভীতিজড়িত স্বরে হারাণী বলিল, "জাত-কুল কিছু খাইনি দাদাঠাকুর, আমি শুধু এঁটো বাসন মাজি, জল তুলে দিই, আর দোকান থেকে খাবার-টাবার—"

রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর বাকী রইল কি? রামচন্দ্র! কলিতে দেখছি সব একাকার হয়ে গেল। আচ্ছা সাহস ত তোর হারাণী।"

ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে হারাণী বলিল, "কি করবো দাদাঠাকুর, পেটের জ্বালা।"

"ওরা বোধ হয় তোর জাতের খবর জানে নি ?"

"না।"

"জানে নি ব'লেই রেখেছে তোকে। এখন কিন্তু জান্‌তে পার্‌লে তোকে আস্ত রাখবে না।"

"আমাকে বাঁচাও দাদাঠাকুর।" বলিয়া হারাণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা দুটা জড়াইয়া ধরিতে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে, আমি গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

হারাণী একটু থতমত খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হবে, দাদাঠাকুর ?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "হবে আর কি, মেরে হয় ত গুঁড়ো ক'রে দেবে। আমি ত জেনে শুনে অধর্ম্ম কত্তে পারবো না।"

হারাণী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বোধ হয় দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি খানিক ভাবিয়া পরামর্শ দিলেন, "যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন যদি বাঁচতে চাস্, এখান থেকে পালিয়ে যা।"

হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "পালিয়ে কোথায় যাব ?"

সক্রোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চুলোয় যাবি। দেশে এত লোকের অন্ন জুটে, তোরই জুটবে না ? এই ত তিন পা তফাতে শিয়ালদা ইষ্টিশেন। যদি ভাল চাস্ ত আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়ীতে উঠে দেশে চ'লে যা।"

হারাণী বলিল, "আমার যে তিন মাসের মাইনে পাওনা আছে, দাদাঠাকুর।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মাহিনার আশা করিতে গেলে, তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ভয়েভয়ে হারাণী দেশে চলিয়া যাইতেই স্বীকৃত হইল। কিন্তু রেল-ভাড়া ত চাই। একটু ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নামাবলীর খুঁট হইতে ছয় আনার পয়সা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে · টিকিটের দাম। খবরদার, আর কক্ষনো এমন কায করিস্ না।"

পয়সাগুলি পেট-কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া, হারাণী শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে শিষ্য-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

৪

গুরুদেবের প্রমুখাৎ হারাণী ঝির জাতিতত্ত্ব অবগত হইয়া দেবেন বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ঝি-মাগীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া, তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হারাণী তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। গুরুদেব তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "হারাণীকে আর পাবে কোথায় ? আমাকে দেখেই ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে। এখন অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট জলাদি গ্রহণ করার জন্য তোমাদের সকলের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। নচেৎ এ বাটীতে আমি জলগ্রহণ করতে পারবো না।"

তাহাই হইল। নিতান্ত শিশু ব্যতীত আর সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইল। প্রায়শ্চিত্তের টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যের গৃহে জলগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গৃহিণী জানাইলেন যে, হারাণী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার তিন মাসের মাহিনা বারো টাকা তাঁহার কাছে জমা আছে। দেবেন বাবু বলিলেন, "ও টাকা কোন পুয়োর ফণ্ডে পাঠিয়ে দেব।"

গুরুদেব কিন্তু শিষ্যকে বুঝাইয়া বলিলেন, "গরীবের খাটুনির টাকা তাকে ফেলে দেওয়া দরকার। সে যতই দোষ করুক, টাকাগুলা তার ন্যায্য প্রাপ্য বটে ত।"

গুরুদেবের আদেশ দেবেন বাবু অমান্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু হারাণীকে টাকা পাঠান হইবে কিরূপে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমাকেই দাও। এক গাঁয়েই ত বাড়ী। গরীবের মেয়ের টাকা কটা না হয় বয়ে নিয়ে গেলাম।"

হারাণীর মাহিনার টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎফুল্ল চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, 'এবারে বাটী হইতে যাত্রাকালে তাঁহার বামদিক্ দিয়া শৃগাল চলিয়া গিয়াছিল কি না !'

দেশে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, হারাণী ঘরে ফিরে নাই। ফিরিলেও তিনি টাকাগুলা হারাণীকে দিতেন কি না সন্দেহ; কিন্তু ফিরে নাই যখন, তখন হারাণীর পরিশ্রমের টাকা তাহার খুড়া মাকে দেওয়া অসঙ্গত বোধ করিলেন। ইহার পর হারাণী যদি টাকার দাবী করিয়া বসে!

সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় টাকাগুলি নিজের বাক্সেই ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন, এবং মাস দুই পরে সেই টাকা দিয়া মেয়ের কানের মাকড়ী দুইটা গড়াইয়া দিলেন। দুই মাসের মধ্যেও হারাণী যখন ফিরিল না, তখন সে আর ফিরিবে কি ? যদি ফিরে, তখন দেখা যাইবে।

ইহার মধ্যে হারাণীর মা আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিল, "আমার হারাণীর তিন চার মাস কোন খবর পাই না, টাকা-কড়িও সে পাঠায় না। তাকে একখানা চিঠি লিখে দেবে, বাবাঠাকুর ? আমি এখানে খেতে পাই না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "মর্ মাগী, তোর মেয়ে কোথায় ঝি-গিরী কচ্ছে, আমি যাব তাকে চিঠি লিখতে ! ছোটলোকের বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ !"

৫

হারাণী শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইবার জন্য বাহির হইল বটে, কিন্তু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়াও তথায় উপস্থিত হইতে পারিল না। সে তেলী-দিদির সঙ্গে একবারমাত্র শিয়ালদহ হইতে আসিয়াছিল, সুতরাং রাস্তা ঠিক করিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে দিক্ ভুল করিয়া শ্যামবাজারের দিকে চলিয়া গেল। সেখানে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যখন জানিতে পারিল যে, শিয়ালদহ হইতে সে বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে বাছা ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে হারাণী উত্তর দিল, "আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি !"

"রাস্তা হারিয়েছ ? কোথায় যাবে তুমি ?"

"শিয়ালদা।"

"শিয়ালদা ত এখান থেকে অনেক দূর।"

হতাশভাবে গ্যাসের থামটা ধরিয়া হারাণী বলিল, "আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন ?"

ভদ্রলোক বলিল, "দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু রাস্তা চিনে তুমি যেতে পারবে কি ?"

রাস্তা চিনিয়া যাইতে পারিলে হারাণীর এ দুর্গতি হইবে কেন ? সুতরাং লোকটির কথায় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

হারাণী বলিল, "ফুলবেড়ে।"

ব্যস্ততা সহকারে ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিল, "ফুলবেড়ে ! সে ত আমাদেরই দেশের কাছে। জনারগাছা জান তুমি ?"

হারাণী জনারগাছার নাম কখনও শুনে নাই, সে উত্তর করিল, "কৈ না।"

সাতিশয় বিস্ময় সহকারে লোকটি বলিল, "কি আশ্চর্য্য, জনারগাছা তুমি জান না ? ফুলবেড়ের কোশ তিনেক দক্ষিণেই যে জনারগাছা।"

স্বীয় অজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া হারাণী বলিল, "তা হ'তে পারে।"

"তোমরা কি জাত ?"

"জেলে।"

"তোমার বাপের নাম কি বল দেখি।"

"পরাণ।"

অতিমাত্র উল্লসিতভাবে লোকটি বলিল, "কি আশ্চর্য্য, পরাণ জেলের মেয়ে তুমি ? পরাণের সঙ্গে আমার যে বেশ জানা ছিল। আমাদের বাড়ীতে কাম-কম্মে যত মাছের দরকার হ'ত, পরাণই সব দিয়ে আসতো। আহা, চমৎকার লোক ছিল সে। মাছের দরদস্তর নিয়ে কক্ষনো মনকষাকষি করেনি।"

এই বিপৎ-সমুদ্রে সহসা এমন একটা পরিচিত লোক পাইয়া হারাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দয়া ক'রে আমাকে ইষ্টিশানে পৌঁছে দেবেন ?"

লোকটি বলিল, "নিশ্চয় দেব। কিন্তু এখন ইষ্টিশানে গিয়ে ত কোন ফল হবে না, সেই ৫টায় গাড়ী। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তোমার ?"

"না।"

"তবে আমার বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে তার পর যাবে। এই কাছেই আমার বাসা। এস আমার সঙ্গে।"

হারাণী অগত্যা ভদ্রলোকটির সহিত তাহার বাসায় চলিল।

আহারাদির পরে হারাণী যাইতে চাহিলে লোকটি বলিল, "তাও কি হয়, পরাণ দাদার মেয়ে তুমি, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন আজকার দিনটা থাক্‌তে হবে।"

পরদিন লোকটির এত কায পড়িল যে, হারাণীকে লইয়া শিয়ালদহে যাইবার সময় পাইল না, প্রায় সমস্ত দিনটাই তাহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল।

তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া হারাণীকে লইয়া বাহির হইল এবং কতকগুলা গলী-রাস্তা ঘুরিয়া পরিশেষে এক সরু গলীর ধারে আসিয়া গাড়ী থামাইল। তাহার পর হারাণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া গলীর শেষ প্রান্তে একখানা বাড়ীর ভিতর আসিয়া ঢুকিল। বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র এক প্রৌঢ়াবয়স্কা স্থূলাঙ্গী রমণী হারাণীর হাত ধরিয়া উপরতলার একখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। সে ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া হারাণী চমৎকৃত হইল। একটু উদ্বিগ্নভাবে সঙ্গী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?"

লোকটি বলিল, "এখানে আমার একটু জরুরী কায আছে। বসো তুমি একটু, আমি এক্ষুনি আসছি।"

বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হারাণী বসিয়া সশঙ্কনেত্রে ঘরের আসবাবপত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার পর হারাণীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, তাহা না বলিলেও চলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাহাকে পাপের পথে পদার্পণ করিতে হইল।

৬

"দাদাঠাকুর যে। চিন্‌তে পাচ্ছো না আমাকে? আমি হারাণী।"

দৃষ্টিটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "হারাণী! তোর চেহারা যে একেবারে বদলে গিয়েছে।"

একটু মিষ্টি হাসি হাসিয়া হারাণী বলিল, "হাতে পয়সা হ'লে, গায়ে গয়না হ'লে চেহারা আপনি বদলে যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিতভাবে হারাণীর অলঙ্কারমণ্ডিত পরিপুষ্ট দেহখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মায়ের খবর কি, দাদাঠাকুর? মরেছে না বেঁচে আছে?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হারাণীর সহাস্য মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "মরে নি, তবে আধমরা হয়ে রয়েছে। চোখে ভাল দেখ্‌তে পায় না, পেটে খেতে পায় না।"

হারাণী নীরবে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুর বলিলেন, "তোর রকম কি হারাণী? নিজে দিব্যি গয়নাগাঁটি প'রে সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছিস্‌। কিন্তু আজ দু'বছরের মধ্যে বুড়ো মায়ের একটা খোঁজখবর নিলি না।"

বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে হারাণী উত্তর করিল, "মায়ের খোঁজ কোন্‌ মুখে আর নেব, দাদাঠাকুর? আমার পোড়ামুখ যে পুড়ে গিয়েছে।"

অতঃপর দাদাঠাকুরের প্রশ্নে হারাণী কিরূপ বিপদে পড়িয়া এই পাপপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিল। বলিতে বলিতে সে চোখের জল রাখিতে পারিল না। দাদাঠাকুর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "দুঃখ ক'রে কি করবি হারাণী, সকলই অদৃষ্ট। আর আমার মতে এতে তোর মন্দই বা এমন কি হয়েছে? বিশ বছর চাকরী কর্‌লেও এত গয়না তোর গায়ে উঠতো না বোধ হয়।"

দাদাঠাকুরের কথায় হারাণীর হাসি আসিল। সে চোখের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাবে, দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "আমাকে শিষ্যবাড়ীতে যেতে হবে। ছোট মেয়েটার বিয়ে। আজকাল বামুন-কায়েতের ঘরে মেয়ের বিয়ে কি ভয়ানক দায়, তা জানিস্‌ তো। সাত আট শো টাকা খরচ। দেখি, শিষ্যদের কাছে যদি কিছু সাহায্য পাই।"

হারাণী বলিল, "দয়া ক'রে একবার আমার ঘরে যাবে, দাদাঠাকুর? ধরতে গেলে আমিও ত তোমার এক রকম শিষ্য। তুমি সে দিন যদি আমাকে পালিয়ে আস্‌তে উপদেশ না দিতে, তা হ'লে আমাকে ত বরাবর বাসন মেজে—জল তুলেই খেতে হ'তো। তা আমারও ত কিছু পেন্নামী দেওয়া দরকার।"

কেশবিরল মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে দাদাঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বটে, বটে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উপর চিরকালই তোর অচলা ভক্তি, হারাণী। তবে কি জানিস্, দিনমানে—”

দাদাঠকুরের সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে পারিয়া হারাণী বলিল, “দিনমানে না হয়, সন্ধ্যার পর যেও। ঐ সাম্‌নে গলীর ভিতর ৭নং বাড়ী। ওখানে গিয়ে ডালিমমণির খোঁজ কর্‌লেই হবে।”

দাদাঠাকুর বলিলেন, “অবস্থার সঙ্গে নামটাও বুঝি বদলে ফেলেছিস্?”

হারাণী বলিল, “নইলে হারাণী নাম নিয়ে এ ব্যবসা চলে কি?”

হাসিতে হাসিতে হারাণী গঙ্গাস্নানের পথে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও হারাণীর প্রদর্শিত গলীটার দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হারাণীর ঘরে উপস্থিত হইলে হারাণী মহাসমাদরে একখানি কম্বলাসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। হারাণীর ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার পর হারাণী যখন এক শত টাকার নোট তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। এই কন্যাদায়ের সময় একেবারে এক শত টাকা! দোষের মধ্যে উহা বেশ্যার দান। কিন্তু স্বর্ণ বা রজতখণ্ড নহে ত, কাগজমাত্র। তাহা ব্যতীত বেশ্যার দান গ্রহণ করে না, কলিকাতা সহরে এমন ব্রাহ্মণ কয় জন আছে? মনে মনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নোটখানি মুড়িয়া পেটের কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

হারাণী মাকে দিবার জন্য আর পঁচিশটি টাকা দাদাঠাকুরের হাতে দিল। দাদাঠাকুর সে টাকাগুলিও পেটের কাপড়ে বাঁধিয়া হারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * * *

কলিকাতা হইতে কেহ দেশে ফিরিলেই হারাণীর মা তাহার নিকট গিয়া হারাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া হারাণীর মা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমার হারাণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বাবাঠাকুর?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “মর্ মাগী, তোর হারাণী বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে, আর আমি যাব তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে? রামচন্দ্র, রামচন্দ্র!”

হারাণীর মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি ধরিয়া স্বীয় কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক শত পঁচিশ টাকায় নবীন জামাতাকে ঘড়ী-চেইন উপহার দিয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া অজস্র সুখ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু এই ঘড়ী-চেইন কোথা হইতে আসিল, তাহা কেহ কখন অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পূর্ণিমায়

চাঁদের ভেলা চল্‌ছে ভেসে সুনীল সাগরে,
ঢুল্‌ছে যেন তারার আঁখি নিশার বাসরে;
দূর সুদূরে মেঘের কোলে,
নিভেও আবার উঠে জ্ব’লে,
ফুলের কলি ধরার বুকে চম্‌কে শিহরে।

গাছের পাতায় লুকোচুরি আলোয় ছায়াতে,
দীঘির জলে ঘুম লেগেছে কোন্ সে মায়াতে;
ঝাউএর শাখা সোনার রঙে,
হেলে দোলে নূতন ঢঙে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর ঝিমিয়ে বাজে রাতের আসরে।

শ্রান্ত প্রিয়া ঘুমিয়ে আছে বিছানায় পাশে,
পরাণ আমার মাতায় শিথিল চুলের সুবাসে;
আলোর লহর তারি মুখে,
খেলে বেড়ায় কি কৌতুকে,
জানে যে চাঁদ এত খেলা জান্‌বো কি ক’রে?

ভাব্‌ছি আমি চাঁদের হাসি মনের গোপনে,
প্রিয়ার মুখে মধুর ধারা ঢাল্‌ছে স্বপনে;
তাইতে আলোর ছলা দিয়ে,
সারা ভুবন ঘুম পাড়িয়ে,
আমায় শুধু জাগিয়ে রাখে একলা এ ঘরে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

অদ্ভুত প্রতিশোধ

পেয়োলো সেভারিণির বিধবা পত্নী তাহার একমাত্র পুত্রের সহিত কর্সিকা দ্বীপে বনিফেসিয়ো প্রণালীর ধারে পাহাড়ের উপর বনিফেসিয়ো নগরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। পর্ব্বত-গাত্রে সংস্থিত বিধবার এই কুটীরে বসিয়া সঙ্কীর্ণ বনিফেসিয়ো প্রণালীর সমস্ত অংশ ও অপর পারে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপেরও অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। এই নগরীটির অপর ধারে পর্ব্বত ভেদ করিয়া সমুদ্রের একটি খাড়ী, একটি প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দার মত বরাবর এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইটিই এই সহরের বন্দর। এই বন্দরে ইটালীর ও সার্দ্দিনিয়ার জেলেরা নৌকা লইয়া মাছ ধরিবার জন্য আসিত-যাইত এবং মাসে দুই ক্ষেপ করিয়া একখানি জীর্ণ যাত্রি-জাহাজও এই সহর হইতে যাত্রী ও মাল লইয়া যাওয়া-আসা করিত।

ধূসর পর্ব্বতমালার গায়ে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত শ্বেতবর্ণের বাড়ীগুলি দূর হইতে শ্বেতাভ জমীর উপর শুভ্র দাগের মত দেখা যাইত। সেগুলি দেখিলেই কতকগুলি শ্বেতবর্ণের পক্ষিকুলায় বলিয়া ভ্রম হইত। সেই বাড়ীগুলি যেন পর্ব্বত-গাত্রে দৃঢ়ভাবে কীলক দিয়া আঁটা। এই প্রণালীর দুই ধারেই পর্ব্বতমালা যেন সেই সঙ্কীর্ণ বিপৎসঙ্কুল জলপথের উপর দুই ধার হইতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ গিরিমালা-সঙ্কুল জলপথে নাবিকগণ পোত-পরিচালন ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। এই স্থানে সমুদ্র-বক্ষ সদাই ঝঞ্ঝানিনাদাকুল ও সমুদ্রতীর বন্ধুর, অনুর্ব্বর ও সজীবতার লেশশূন্য থাকিত। প্রণালীটির স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড জলাবর্ত্ত, স্থানে স্থানে বিশাল দহ। এই প্রণালীর সর্ব্বত্র কালো কালো পর্ব্বতের চূড়াগুলি সমুদ্র বক্ষে জলের ভিতর হইতে মাথা জাগাইয়া রহিয়াছে। সেই সকল পর্ব্বত-শৃঙ্গের চারধারে শুভ্র ফেনপুঞ্জ জমাট বাঁধিয়া ঘুরিতেছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন সমুদ্র-বক্ষে রাশি রাশি সাদা নেকড়ার টুক্‌রা ভাসিতেছে।

বিধবা সেভারিণির কুটীরটি যেন পাহাড়ের গায়ে ঝাল দিয়া জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। ইহার তিনটি জানালা, সে জানালা তিনটি হইতে দেখিলে সমুদ্রের অপর পারে দিক্‌চক্রবালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

বিধবা সেভারিণি তাহার পুত্র এণ্টোনিয়ো ও পালিতা কুক্কুরী সেমিলাণ্টিকে লইয়া সেই নির্জ্জন কুটীরে একান্তে বাস করিত। সেমিলাণ্টি ছিল একটি বড়জাতের কুকুর;—কৃশ, কিন্তু আকারে দীর্ঘ। তাহার গায়ে লম্বা লম্বা উস্কো-খুস্কো লোম। সেমিলাণ্টিকে লইয়া এণ্টোনিয়ো মাঝে মাঝে শিকারেও যাইত। * * *

এক দিন রাত্রিতে এণ্টোনিয়ো সেভারিণির সহিত নিকোলাস রেভোলাটির ঝগড়া হইল। রেভোলাটি এণ্টোনিয়োর বুকে ছুরি মারিয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং সেই রাত্রিতেই কর্সিকা হইতে পলাইয়া সার্দ্দিনিয়াতে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

রাস্তার লোকরা এণ্টোনিয়োর মৃতদেহ আনিয়া তাহার বৃদ্ধা জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া প্রথমে মাতা সেভারিণি এক ফোঁটাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না। সে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মৃত পুত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর সে তাহার জরা-শীর্ণ হস্তে পুত্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পুত্র-হন্তার উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিল। সেই রাত্রিতে সে অন্য কাহাকেও তাহার কাছে থাকিতে দিল না। সে একাকী তাহার পুত্রের মৃতদেহ ও পালিতা কুক্কুরীটিকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া ভিতর হইতে ঘরের দরজা অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল। কুকুরটি তাহার প্রভুর শোকে অধীর হইয়া কাতর চীৎকার করিতে লাগিল। সে তাহার প্রভুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মৃত পালকের মুখের পানে বার বার করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতদেহের কাছ ছাড়িয়া মর্ম্মাহতা জননীও নড়িল না, শোকগ্রস্তা কুক্কুরী সেমিলাণ্টিও নড়িল না। এণ্টোনিয়োর মাতা সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত পুত্রের মুখের নিকট মুখ লইয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র শোকাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মৃত যুবককে তাহার বিছানার উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার গায়ে একটি মোটা কাপড়ের জামা। সেই জামার বুকের কাছটা ছোরার আঘাতে ছিন্ন। যুবক ঠিক যেন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার জামা ও ইজারের স্থানে স্থানে ও হাতে রক্তের দাগ। কয়েক ফোঁটা জমাট-বাঁধা রক্ত তাহার দাড়িতে ও চুলে লাগিয়া রহিয়াছে।

মাতা সেভারিণি তাহার মৃত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কি কথা বলিতেছিল। সেই কথা শুনিয়া কুক্কুরীটি চীৎকার বন্ধ করিল।

বৃদ্ধা তাহার মৃত পুত্রকে কহিতেছিল, "বাছা! আশ্বস্ত হও; আমি এই হত্যার প্রতিশোধ লইব। পুত্র! আমি আততায়ীর উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও। আমার কথা কি শুনিতে পাইতেছ না? শুন,—যে দুষ্ট তোমাকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। ইহাই আমার পণ। তোমার মা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছে। তুমি জান ত বৎস! তোমার বৃদ্ধা জননীর যে কথা, সেই কায। ইহা তুমি বিলক্ষণ জান।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা এণ্টোনিয়ো-জননী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মৃত পুত্রের শীতল ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ মিলাইয়া একটি অতিদীর্ঘ চরম চুম্বন অঙ্কিত করিল।

বৃদ্ধা চুপ করিলে সেমিলাণ্টি আবার বিকট স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই নিরন্তর কাতর ক্রন্দনে নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথা সূচিত হইতে লাগিল। পরদিন সকাল হইতে বৃদ্ধা জননী ও কুক্কুরী সেমিলাণ্টি সারারাত্রি একভাবে তাহাদের উভয়েরই নিতান্ত প্রিয় সেই মৃতদেহটি আগুলিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন এণ্টোনিয়ো সেভারিণির মৃতদেহ সমাহিত করা হইল। বনিফেসিয়ো নগরে আর কাহারও মুখে এণ্টোনিয়োর কথা বা নাম-গন্ধ বড় একটা কিছু শুনিতে পাওয়া যাইত না।

এণ্টোনিয়োর সহোদর ভাই ছিল না। তাহার কোন নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভাইও ছিল না। তাহার এমন কোন আত্মীয়ও ছিল না, যে তাহার হত্যার প্রতিশোধ লইতে পারে। নিহত যুবক পুত্রের মর্ম্মাহতা স্থবিরা জননী বসিয়া বসিয়া প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একভাবে জানালার নিকট বসিয়া প্রণালীর পরপারে একটি সাদা বিন্দুর দিকে চাহিয়া থাকিত। এই শ্বেতবর্ণের বিন্দুটি হইতেছে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটির নাম—লংসার্দ্দো। কর্সিকা দ্বীপের চোর-ডাকাতরা যখন পুলিসের হাতে বেশী তাড়া খাইত, তখন তাহারা সমুদ্র পার হইয়া এই নির্জ্জন দ্বীপ সার্দ্দিনিয়ায় গিয়া

আশ্রয় লইত। লংসার্দ্দো গ্রামটির বারো আনা অংশ লোকই ছিল কর্সিকা দ্বীপ হইতে পলায়িত চোর-ডাকাত। এণ্টোনিয়োর মাতা খবর পাইয়াছিল যে, তাহার পুত্র-হন্তা নিকোলাস রেভোলাটি এই গ্রামে গিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে।

দিনের পর দিন, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত অভাগী জননী জানালায় বসিয়া সাগর-পারের সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত, আর মনে মনে তাহার পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ম উপায় অন্বেষণ করিত। সে কেমন করিয়া কি করিবে? তাহাকে তাহার কার্য্যে সহায়তা করে, এমন কেহই নাই। সে নিজে বৃদ্ধা, দুর্ব্বলা, মরণপথযাত্রী। কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ঈশ্বরের দিব্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহার মৃত পুত্রের গা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, সে প্রতিশোধ লইবেই লইবে। সে সেই কথা ভুলিতেই পারে না। সে আর দেরী করিতে পারে না। সে কি করিবে? কি উপায়ে সে তাহার পুত্র-হন্তার উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইবে?

* * *

সেই রাত্রিতে বৃদ্ধার চোখে আদৌ নিদ্রা আসিল না। কিছুতেই সে তাহার চিন্তা ও আবেগ প্রশমিত করিতে পারিল না। একমাত্র ভাবনা তাহার মস্তিষ্ক নিপীড়িত করিতে লাগিল। সেমিলাণ্টি তাহার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল ও মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিয়া যেন দূরে কাহাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। সেমিলাণ্টি তাহার প্রভুর মৃত্যুর পরে মাঝে মাঝে এইরূপ চীৎকার করিত, যেন সংস্কার তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিত—যে স্মৃতির দাগ মনুষ্যেতর জীবের মন হইতে কিছুতেই উঠিতে চাহে না। সেই স্মৃতির তাড়নে সে মাঝে মাঝে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিত।

এক দিন গভীর রাত্রিতে সেমিলাণ্টি হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মাতা সেভারিণির মাথার মধ্যে একটি নৃশংস কল্পনা, পুত্র-হন্তার উপর প্রতিহিংসা পরিতর্পণের একটি বর্ব্বরোচিত উপায় উদ্ভাবিত হইল। রাত্রি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত সেই কল্পনাটি লইয়া জল্পনা ও তোলাপাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই সে গির্জ্জায় চলিয়া গেল। গির্জ্জার পাথরের মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্ম একান্ত কাতরভাবে দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার বাড়ীর উঠানে একটি বড় কাঠের পিপা পড়িয়া ছিল। এই পিপাটিতে বৃষ্টির সময় উঠানের জল গড়াইয়া জমা হইত। বহু কাল ব্যবহারে পিপার কাঠগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মাতা সেভারিণি সেই পিপাটি উণ্টাইয়া দিয়া খালি করিয়া ফেলিল ও কাঠের ও প্রস্তরের টুক্রা জড় করিয়া তাহার চারিধারে সাজাইয়া সেটিকে খুব শক্ত করিয়া বসাইল। পিপাটি একটি সুন্দর কুকুর রাখিবার ঘরে পরিণত হইল। এণ্টোনিয়ো-জননী তখন সেমিলাণ্টিকে সেই পিপা-নির্ম্মিত ঘরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কুকুরটি সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় চীৎকার করিতে লাগিল। মাতা সেভারিণি সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে আর ঘরের বাহির হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া সে কুকুরটিকে একটু জলপান করিতে দিল, কিন্তু ঝোল রুটী কিছুই খাইতে দিল না।

আর এক দিন-রাত্রিও এই ভাবেই কাটিয়া গেল। সেমিলাণ্টি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবসন্নভাবে শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল। পরদিন সেমিলাণ্টির চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাহার গায়ের লোমগুলি সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া হইয়া উঠিল। সে বার বার তাহার শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তথাপি বৃদ্ধা তাহাকে আহার্য্য কিছুই দিল না। কুকুরটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একেবারে ক্ষেপিয়া যাইবার উপক্রম করিল এবং সমভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই রাত্রিটাও সেমিলাণ্টির সেইরূপ ভাবেই কাটিল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া মাতা সেভারিণি তাহার এক জন পাড়াপড়শীর বাড়ী হইতে দুই বোঝা খড় চাহিয়া আনিল। সেই খড় দড়ি দিয়া জড়াইয়া সে একটি সুন্দর কুশ-পুত্তলি প্রস্তুত করিল। ঘরে তাহার স্বামীর পরণের যে ছিন্ন পুরাতন ইজের, কামিজ ও কোট ছিল, সেই পোষাকগুলি সে এই কুশ-পুত্তলিটিকে পরাইয়া সেটিকে দিব্য একটি মানুষ সাজাইল। সে সেই কুশ-পুত্তলিটিকে উঠানের মাঝখানে একটি বাঁশ পুতিয়া সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া খাড়া করিয়া রাখিল।

সেমিলাণ্টি তাহার ঘরে বসিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখিতে লাগিল। যদিও ক্ষুধায় তাহার পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্য্যন্ত হজম হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি এই জাল মানুষটিকে দেখিয়া অবধি সে আর চীৎকার করিল না; চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধা তখন দোকান হইতে একটি লম্বা মাংসের কাবাব কিনিয়া আনিল ও সেমিলাণ্টির ঘরের সম্মুখে উঠানে একটি চুলা প্রস্তুত করিয়া কাঠের আঁচে সেই কাবাবখানি ভর্জ্জিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভাজা মাংসের গন্ধ পাইয়া সেমিলাণ্টি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই লাফাইতে ঝাঁপাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ হইতে শুভ্র ফেন নির্গত হইতে লাগিল, তাহার জিহ্বা হইতে টস্ টস্ করিয়া লালা ঝরিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুইটি সেই ভাজা মাংসের দিকে নির্নিমেষভাবে আবদ্ধ। মাংসের গন্ধে সেমিলাণ্টি পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃদ্ধা তখন সেই ভাজা মাংসের কাবাবটি লইয়া সেটিকে দড়ি দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া সেই কুশ-পুত্তলিটির গলায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। এই কাবাব-বন্ধন ব্যাপারটি শেষ করিতে বৃদ্ধার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। সেই ব্যাপার শেষ হইলে বৃদ্ধা গিয়া সেমিলাণ্টির শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল।

বাঁধন খুলিয়া দেওয়া মাত্র সেমিলাণ্টি এক লাফে গিয়া কুশপুত্তলিটির টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল এবং স্কন্ধে নখ বসাইয়া দিয়া সেটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। পুত্তলিটির গলায় জড়ানো রজ্জুগুলির ভিতরে দাত বসাইয়া দিয়া সে সেই কাবাবের একটা টুক্রা ছিঁড়িয়া লইয়া ভূতলে পতিত হইল। আবার দ্বিগুণ রাগের সহিত আর এক লাফ দিয়া সে সেই কুশপুত্তলিটির গলা কামড়াইয়া ধরিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কুশ-পুত্তলিটির স্কন্ধদেশ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

বৃদ্ধা নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্টভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। পরে সে কুকুরটিকে আবার তাহার সেই পিপা-নির্ম্মিত ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। দুই দিন দুই রাত্রি আর তাহাকে কোন আহার্য্য দিল না। তৃতীয় দিন প্রভাতে আবার তাহাকে পূর্ব্বের মত শিক্ষা দিল।

পূর্ণ তিন মাস ধরিয়া বৃদ্ধা সেমিলাণ্টিকে এই অদ্ভুত উপায়ে তাহার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে শিখাইল। ৩ মাস ধরিয়া এইভাবে শিক্ষা দিয়া বৃদ্ধা কুকুরটিকে ছাড়িয়া রাখিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং যখন ইচ্ছা তাহাকে কুশ-পুত্তলিটির দিকে লেলাইয়া দিয়া সেটিকে ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে শিক্ষা দিতে লাগিল। তখন সে আর সেই কুশ-পুত্তলিটির গলায় কাবাব বাঁধিয়া দিত না। সে কাবাব ভাজিয়া নিজের ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিত। সেমিলাণ্টি তাহার শিক্ষা শেষ হইলে পুরস্কারস্বরূপ সেই খাদ্য অর্জ্জন করিত।

কৃশ পুত্তলিটিকে দেখিবামাত্র সেমিলাণ্টি আহ্লাদে শিহরিয়া উঠিত ও মাতা সেভারিণির মুখের দিকে চাহিত। বৃদ্ধা তাহার জরাশীর্ণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কৃশ-পুত্তলিটিকে দেখাইয়া কর্কশকণ্ঠে ‘লে’ ‘লে’ বলিয়া তাহাকে লেলাইয়া দিত।

মাতা সেভারিণি যখন বুঝিল যে, তাহার কুকুরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন সে এক রবিবার প্রভাতে গির্জ্জায় দীর্ঘ উপাসনা করিয়া আসিল। উপাসনার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিল। এই পরিচ্ছদে তাহাকে এক জন বৃদ্ধ ভিখারীর মত দেখাইতে লাগিল। সার্দ্দিনিয়া দ্বীপের এক জন জেলে-নৌকার মাঝির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বৃদ্ধা বনিফেসিয়ো প্রণালী পার হইয়া অপর পারে গেল।

যাইবার সময় বৃদ্ধা খুব বড় এক টুকরা কাবাব প্রস্তুত করিয়া একটি কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে করিয়া লইল। সেমিলাণ্টিকে দুই দিন পূর্ব্ব হইতে উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধা মধ্যে মধ্যে সেমিলাণ্টিকে তাহার পুঁটলির ভিতরের কাবাবের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে দিতেছিল।

তাহারা লংসার্দ্দোতে গিয়া পৌছিল। এই বৃদ্ধা জরাগ্রস্তা কর্সিকান্ রমণী নেংচাইয়া নেংচাইয়া চলিতে লাগিল ও একটি নাপিতের দোকানে গিয়া নিকোলাস্ রেভোলাটির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। রেভোলাটির বাড়ী নিকটেই ছিল। সে একটি কাঠের কারখানা খুলিয়াছিল ও সূত্রধরের কায আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। রেভোলাটি তখন তাহার সেই কারখানার পিছন দিকে উঠানে বসিয়া কায করিতেছিল।

বৃদ্ধা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “কি হে নিকোলাস। কেমন আছ?”

নিকোলাস চমকিয়া উঠিয়া আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধা অমনই কুকুরটিকে ছাড়িয়া দিল ও নিকোলাসকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, “লে·! লে!”

ক্ষুধায় উন্মত্ত সেমিলাণ্টি এক লাফে গিয়া রেভোলাটির টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। রেভোলাটিও দুই বাহু দ্বারা কুকুরটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই জন কুস্তীগির পালোয়ানের মত আসল পশু ও মানুষ-পশু উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শেষে সেমিলাণ্টিই জয়লাভ করিল। সে নিকোলাস রেভোলাটির গলা দাঁতে করিয়া ছিঁড়িয়া তাহার পূর্ব্ব-অভ্যাসমত আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রেভোলাটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ও পা আছড়াইতে লাগিল। সেমিলাণ্টি তাহার গলার মাংসগুলি ছিঁড়িয়া ফিতার মত সরু লম্বা লম্বা টুকরা করিয়া ফেলিল। * * *

দুই জন পাড়ার লোক তাহাদের বাড়ীর দ্বারের নিকট বসিয়া দেখিল যে, এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষুক নিকোলাস রেভোলাটির কাঠের কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গে একটি কৃশ দীর্ঘাকৃতি ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাহার পুঁটলি হইতে কি জানি কি কালো কালো জিনিষ বাহির করিয়া কুকুরটিকে খাইতে দিতেছে ও পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সেই দিন সন্ধ্যাকালেই মাতা সেভারিণি তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। *

শ্রীমনোমোহন রায়।

---

* মোপাসার ‘ভেনডেটা’ গল্প হইতে অনূদিত।

কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলন

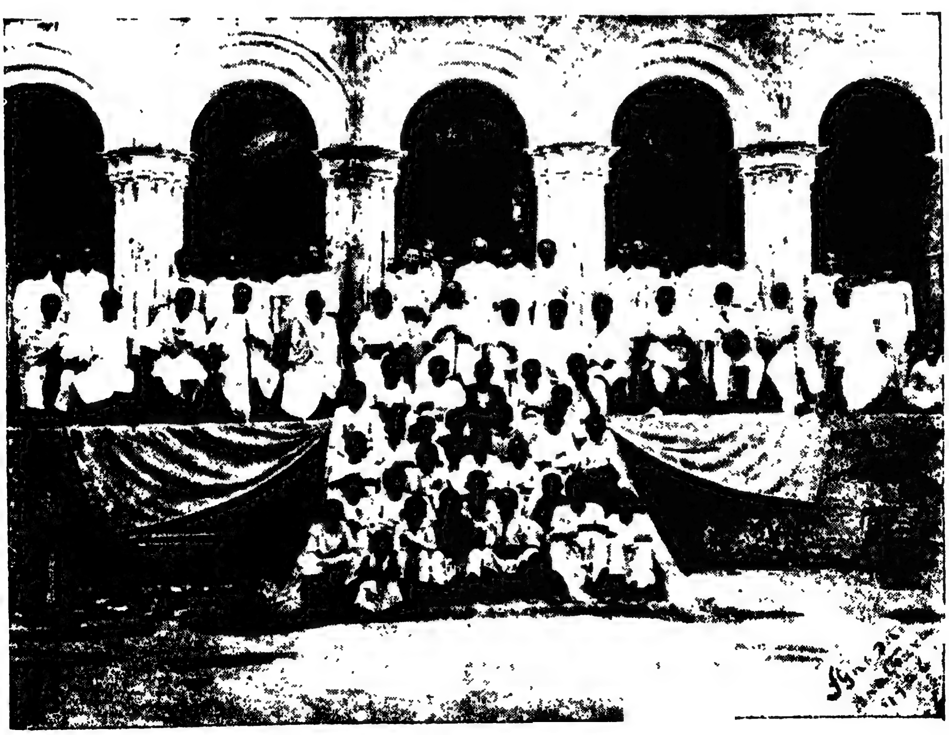

দেশীয় গন্ধ শিল্পের ভবিষ্যৎ

সুবাসের আদর সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে গন্ধোৎপাদক দ্রব্যের প্রাচুর্য্য অধিক, সেখানে যে সকল প্রকার সদগন্ধই বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। গন্ধ প্রাণিজ, খনিজ ও উদ্ভিজ্জ—তিন শ্রেণীর উপাদান হইতেই পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গন্ধ প্রস্তুতে শেষোক্ত শ্রেণীর উপাদানের প্রাধান্যই সমধিক। উদ্ভিদের গন্ধ যে শুধু পুষ্পেই থাকে, তাহা নহে: উদ্ভিদ্‌বিশেষে ফল (যেমন লেবু), বীজ (লতাকস্তূরী), মূল (খস্ খস্), পত্র (তেজপাতা), কাষ্ঠ (চন্দন) অথবা নির্য্যাস (ধূনা) গন্ধের আধার হইয়া থাকে। ভারতে গন্ধোৎপাদক দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। প্রাচীন জগতে ভারতের অগুরু, চন্দন, চূয়া, ধূপ ইত্যাদি তদানীন্তন সকল সভ্যজাতিই বহুমূল্য দিয়া ক্রয় করিত এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের দ্রব্যাদির মধ্যে গন্ধদ্রব্য একটি বৈশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের অনেক স্থানে গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বায়ি তৈল (Essential Oil) নিষ্কাশিত হওয়ায় তৈলের অপচয় কম হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি আল্‌কাতরা (Coal tar) হইতে যেমন নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিজ্জ রঙ্গের বহুল পরিমাণে উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, সেইরূপ উক্ত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত গন্ধশ্রেণীও স্বভাবজ গন্ধের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রণালীতে সংগ্রহ অথবা চাষ করিলে গন্ধদ্রব্য হইতে দেশবাসী অনেক লাভ করিতে পারে, কিন্তু দেশে প্রচুর পরিমাণ গন্ধদ্রব্য থাকিলেও সদ্ব্যবহারের অভাবে তৎসমুদয়ের অধিকাংশেরই অপচয় হইতেছে।

গন্ধ-নিষ্কাশন-প্রণালী

আমরা যে গন্ধ রুমালে অথবা পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যবহার করি, তাহা কাঁচা মাল হইতে কতিপয় স্তরের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে: তাহার প্রথম স্তর পুষ্প ইত্যাদি হইতে গন্ধ নিষ্কাশন করা। যাহাকে আমরা সৌরভ বলি, তাহা অধিকাংশ স্থলে উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষে সঞ্চিত বায়ি তৈল-জনিত। উহা যে কত সামান্য মাত্রায় থাকে, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কুড়ি হাজার গোলাপ-ফুলের পাপড়ি (প্রায় ১০ সের) চোঁয়াইলে মাত্র ১ তোলা বায়ি তৈল কিংবা আতর পাওয়া যায়। যাহা হউক, গন্ধ সংগ্রহের অর্থ গন্ধদ্রব্য হইতে এই বায়ি তৈল পৃথক্ করিয়া লওয়া। সুগন্ধযুক্ত স্থায়ি তৈল (Fixed Oil) নিষ্কাশনের জন্য প্রায়ই চাপ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ চারিটি উপায়ে বায়ি তৈল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

১। চোলাই (Distillation):—বকযন্ত্র (Still) জলের সহিত গন্ধদ্রব্য দিয়া অগ্নিপ্রয়োগে ফুটান হয়; তাহাতে গন্ধদ্রব্যের বায়ি তৈল জলীয় বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া আইসে এবং ঘন করিবার পাত্রে (Condensor) উহা জমিয়া গিয়া তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকে। যে স্থলে সাক্ষাৎভাবে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে গন্ধদ্রব্যের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সে স্থলে গন্ধদ্রব্য জলে না দিয়া বকযন্ত্রমধ্যে স্বতন্ত্র ও সচ্ছিদ্র পাত্রে এরূপভাবে রাখা হয় যে, উহার মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প প্রবাহিত হইতে পারে। গোলাপের আতর প্রস্তুত চোলাই প্রথার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

২। চাপ-প্রয়োগ (Expression):—কোন কোন প্রকার উপাদানের জন্য, যেমন কমলা ও অন্য লেবুর খোসা, চাপ-প্রয়োগই তৈল-নিষ্কাশনের সহজ উপায়। কিন্তু লেবু-খোসার তৈল বাহির করিয়া লইবার অন্য উপায়ও আছে। এক খণ্ড স্পঞ্জের উপর লেবুর খোসা 'নিংড়াইলে' বায়ি

তৈল স্পঞ্জ দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। অন্তর্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত পেয়ালা-সদৃশ যন্ত্রে লেবু দিয়া নাড়িলেও লেবুর তৈল কতক পরিমাণে বাহির হইয়া আইসে।

৩। নিমজ্জন (Maceration):—জলস্বেদন (Water bath) যন্ত্রে উদ্ভিজ্জ অথবা খনিজ চর্ব্বি গলাইয়া লইয়া তাহাতে ফুলগুলি নিমজ্জিত করিয়া কিছু সময় রাখিয়া দিলে গন্ধ চর্ব্বির মধ্যে চলিয়া আইসে, পরে বসার সহিত সুরাসার একত্র করিয়া নাড়িলে গন্ধ বসা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়।

৪। শোষণ (Absorption):— এই প্রথায় উপযুক্তরূপ কাচপাত্রে এক স্তর চর্ব্বি রাখিয়া উহার উপর পুষ্পগুলি বিছাইয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন নির্গন্ধ ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সেগুলির স্থানে টাট্‌কা ফুল দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ চর্ব্বি সুরভিত হইয়া উঠে।

পর্ব্বতগাত্রে পুষ্পিত চোহর গুল্ম

শিল্পের জন্য কাঁচা মাল

ভারতে গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের অভাব নাই। আমরা একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ভারতের নানা স্থানোৎপন্ন গন্ধদ্রব্যাদি একত্র করিলে ১ শতের কম হইবে না। তাহার তালিকা প্রদান করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, অনেকগুলিই বঙ্গদেশে পরিচিত অথবা সুলভ নহে। ব্যবসায়িক হিসাবে যে সমুদয় গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ অথবা উৎপাদন করিয়া এতৎপ্রদেশে লাভ আছে, কেবলমাত্র সেইরূপ কয়েকটির নাম এ স্থলে উল্লিখিত হইল। বলা আবশ্যক যে, কতকগুলি গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার সুগন্ধ প্রস্তুত অপেক্ষা মশলা হিসাবে অধিক। জীরকবর্গীয় (Umbelliperæ) জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, শুলফা, ধনিয়া, জোয়ান প্রভৃতি সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষরূপে প্রযুজ্য; এগুলি অবশ্য ক্ষেত্রজ ফসল, কিন্তু জীরকবর্গীয় দুই একটি উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়—সা-জীরা ও চোহর (Angelica glanca) তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামপুর-বুসায়র ও সিমলা পাহাড়ে এই দুইটি গন্ধোৎপাদক গাছ স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বন্য শ্রেণীর গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের মধ্যে ঘোড়বচ, বড় এলাচ, অগুরু, তেজপাতা, কর্পূর-কাচরী, গন্ধমাতৃ, চন্দ্রমূল, নাগকেশর প্রভৃতি বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। উদ্যান-পার্শ্বে দৃষ্ট হইলেও গুয়েবাবলা, গন্ধতৃণ, কেয়া ইত্যাদি অর্দ্ধ-বন্য উদ্ভিদ্‌রূপে পরিগণিত হয়। প্রকৃত উদ্যানজাত গন্ধোৎপাদক গাছের মধ্যে চামেলী, বেল, হেনা, চাঁপা, বকুল, কামিনী, সিউলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি সুপরিচিত।

বস্তুতঃ আমাদের বনজঙ্গল, বাগান-বাগিচা ও ক্ষেত্র হইতে যে পরিমাণ গন্ধদ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। বর্ত্তমান সময় উহাদের সদ্ব্যবহার না হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, উক্ত শ্রেণীর দ্রব্যের ব্যবসায়িক মূল্য এখনও পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় নাই।

সংগ্রহ ও চাষ

কোন শিল্পের আবশ্যক উপাদানস্বরূপ যখন কোন কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হয়, তখন ইহা জানা দরকার যে, কাঁচা মাল ঠিক শিল্পের উপযোগী করিয়াই বাজারে আনিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এতদ্দেশের ব্যবসায়ীরা সে দিকে আদৌ মনোযোগ দেয় না অথবা তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সেরূপ মনোযোগ প্রদানের প্রতিকূল। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাজারে অধিকাংশ গন্ধের মশলাতেই অত্যধিক ভেজাল। কারখানাওয়ালাগণ এইরূপ উপাদান সহজে লইতে চায় না, কিংবা লইলেও অনেক কম দর দিয়া থাকে। কারণ, এই সমুদয় দ্রব্য আবার বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। ভেজাল দেওয়া অপরিষ্কৃত মাল বিক্রয় করিবার জন্যই বিদেশীয় বাজারে অনেক ভারতীয় মালের অন্য দেশীয় সমশ্রেণীর মাল অপেক্ষা কম

মূল্য হইয়া থাকে ;—যদিও পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত ভারতীয় মাল কোন অংশে হীন নহে, বরং উৎকৃষ্টতর। এই প্রকার মাল লইয়া শুধুই যে বিলাতী চালানের ক্ষতি হয়, তাহা নহে, দেশমধ্যেও কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে এইরূপ মাল লইয়া লোক উত্তম ফল না পাইয়া, মূলতঃ ভাল জিনিষের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। গন্ধ-শিল্পের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই যাহাতে গন্ধ-দ্রব্য সমূহ বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অরণ্যজাত গন্ধ-দ্রব্য লইয়া কায করিবার ইহাই প্রধান অসুবিধা। অর্দ্ধ-বন্য ও উদ্যানজাত গন্ধ-দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলনের মূল অন্তরায় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে কোন এক স্থানে অথবা কেন্দ্রে অধিক মাল একত্র সংগ্রহ করার সুবিধা নাই। আবার ক্ষেত্রজ গন্ধ-দ্রব্যগুলিও সকল সময়ে সন্তোষজনক হয় না। উৎকর্ষতার পরিবর্ত্তে শুধু উৎপাদনের হারের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করায় দেশীয় কৃষি-জাত গন্ধ-দ্রব্য ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দেশোৎপাদিত ধনিয়া, মৌরী প্রভৃতিতে তৈলের ভাগ অন্য দেশীয় মাল অপেক্ষা কম। স্থানান্তর হইতে বীজ আনাইয়া অথবা উৎকৃষ্টতর বীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক চাষ করিলে ইহার প্রতীকার অচিরে হওয়া সম্ভবপর।

বাগিচার ফসল

একত্র বহু বিস্তৃতভাবে গন্ধ-ফসলের চাষ ভারতে খুবই কম। যুক্ত-প্রদেশের গাজিপুর এবং পঞ্চনদে, লাহোর ও অমৃতসহরের উপকণ্ঠে এবং হোসিয়ারপুর জিলায় অল্প-বিস্তর গোলাপের চাষ আছে। জৌনপুর ও কনৌজেও যুঁই, চামেলী প্রভৃতি কিয়ৎপরিমাণে উৎপাদিত হয়। ইদানীন্তন যুক্ত-প্রদেশের অন্য দুই এক স্থানেও ফুল-চাষ হইতেছে। এই প্রকারে উৎপাদিত ফুল গন্ধ-নিষ্কাশনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মধুপুর, বৈদ্যনাথ অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে গোলাপ উৎপাদিত হয়, কিংবা কলিকাতার নিকটে গড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে যে বেল, যুঁই ইত্যাদি জন্মান হয়, সেগুলি টাট্‌কা ফুলস্বরূপেই বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্যবসায় হিসাবে কার্য্যকর হইতে পারে, এরূপ ফুল-বাগিচা বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। কেবল উত্তর-বঙ্গে কালিমপং প্রভৃতি অঞ্চলে কমলালেবু বন্য ও কর্ষিত অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেরূপ স্থলে কমলালেবুর ফুল অথবা ফলত্বক্ হইতে গন্ধ-নিষ্কাশন-কার্য্য চলিতে পারে। ইতালী, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে গন্ধ-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সকল দেশেই প্রভূত পরিমাণে ফুল উৎপাদিত হইয়া থাকে। ফ্রান্সের grasse নামক বিশ্ব-বিশ্রুত গন্ধ-শিল্পকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ক্রোশ ক্রোশব্যাপী কুসুম-ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইংলণ্ডের মিচাম্ (Mitcham) নামক স্থানে ল্যাভেণ্ডার-ক্ষেত্র বিরল নহে। বঙ্গদেশেও গন্ধোৎপাদন উদ্দেশ্যে বাগিচা স্থাপন করিয়া লাভবান্ না হইবার কোন কারণ নাই। চাঁপা, বকুল, চামেলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি সমস্তই বাগিচায় চাষের উপযুক্ত। বিলাতী ফুলের মধ্যে দেরাহনে ল্যাভেণ্ডার ও নীলগিরিতে জিরানিয়ম চাষের চেষ্টা সুফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপযোগী দুইটি পুষ্পবৃক্ষ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :—

ল্যাভেণ্ডার-ক্ষেত্র

১। লতাকস্তূরী অথবা কস্তূরীবীজ (**Hibiscus Abelmoschus**); ইহা ঢেঁড়সের নিকট-আত্মীয় এবং গাছও প্রায় উক্ত প্রকার; ইহার ছোট ছোট কাল অথবা কটা বীজগুলি হস্তে ঘর্ষণ করিলে মৃগনাভির গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা হইতেই **Ambretta musk** নামক কৃত্রিম কস্তূরী প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশে ইহা কেবল উচ্চ-শ্রেণীর তামাক ও সুর্ত্তী প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বিলাতী বাজারে এই বীজের যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং মূল্যও সামান্য নয়; সময়ে সময়ে আশী টাকা মণ পর্য্যন্তও বিক্রয় হইয়া থাকে। আপাততঃ বিলাতী বাজারে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-জাত কস্তূরী-বীজের আমদানীই অধিক, কিন্তু চেষ্টা করিলে এতদ্দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে এই মূল্যবান্ বীজ জন্মাইতে পারা যায়। ডাঙ্গা জমী, সামান্য সারযুক্ত দোয়াস মাটী ও সারি বাঁধিয়া দেড় হাত অন্তর অগভীর গর্ত্ত করিয়া বর্ষার শেষে বীজ-রোপণ—ইহার পক্ষে আবশ্যক।

গুয়েবাবলা (**Acacia Farneaisna**) গাছ গ্রামাঞ্চলে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। শীতের শেষে যখন ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন অনেক দূর পর্য্যন্ত গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। গুয়েবাবলা অথবা বিলাতী কিকরের ফুলই সুপ্রসিদ্ধ **Cassie** নামক গন্ধের উপাদান। দক্ষিণ-ফ্রান্সে ইহার প্রভূত পরিমাণে চাষ হয়। বাগিচায় শ্রেণীবদ্ধভাবে উৎপাদন করিলে বিঘা প্রতি ৭ শত গাছ জন্মান যাইতে পারে এবং প্রতি বৃক্ষ হইতে গড়ে ১ সের ফুল পাওয়া সম্ভবপর। ফুলের মূল্য সের প্রতি ৮ আনার কম হইবে না; সুতরাং বিঘা প্রতি ২ শত টাকা আয় হইতে পারে। একই গাছ ১০।১২ বৎসর ফুল প্রসব করিতে সমর্থ; সেই জন্য উক্ত সময়ের মধ্যে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া ও বাগান পরিষ্কার রাখা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের খরচ নাই। অবশ্য গাছ পুঁতিয়া ২।৩ বৎসর ফসলের জন্য অপেক্ষা করার খরচ আছে। সকল প্রকার খরচ বাদ দিলেও বিঘা প্রতি দেড় শত টাকা আয়ের সম্ভাবনা থাকে। নৈনিতালের নিকট জনৈক শ্বেতাঙ্গ কয়েক বৎসর গুয়েবাবলার চাষ ও ফুল হইতে গন্ধ-নিষ্কাশন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার বাগিচায় প্রস্তুত গন্ধসার এমন কি ফরাসী দেশোৎপন্ন দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর সহিত উক্ত শিল্প বিলোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নিমজ্জন প্রথায় ২ সের ফুল এক সের চর্ব্বিতে ভিজাইয়া গুয়েবাবলার গন্ধ সহজে বাহির করিতে পারা যায়।

উক্ত দুইটি উদ্ভিদ ভিন্ন গন্ধ-তৃণ ও তজ্জাতীয় ঘাসের চাষও সহজ এবং বেশ লাভজনক। তৃণ-তৈলের বিশেষ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে (ফাল্গুন, ১৩৩০) প্রদত্ত হইয়াছে।

শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

সময় ও রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত দেশীয় গন্ধ-শিল্পের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গন্ধ-ব্যবহার পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন জনসাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহারের মাত্রা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি উক্তরূপ ভূরি-ব্যবহারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। পুরাতন ধরণের গন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে এতৎ-প্রদেশে 'মাথাঘসার মশলা', উত্তরপশ্চিমে আতর এবং দাক্ষিণাত্যে "অঙ্গরাগ" এই কয়েকটির সামান্য প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহার্য্য গন্ধ বলিতেই বিলাত হইতে আমদানী করা সুলভ কৃত্রিম গন্ধ সমূহের সংমিশ্রণ বুঝায়। নানাপ্রকার বিচিত্র নামযুক্ত এসেন্স, পমেটম, কেশ-তৈল, ক্রিম প্রভৃতি এই প্রকার গন্ধ দিয়াই সুবাসিত করা হয়। দেশীয় গন্ধ-দ্রব্যের প্রয়োগ অতি সামান্য পরিমাণেই হইয়া থাকে। দেশীয় গন্ধ-দ্রব্যাদির যে চাহিদা নাই, তাহা নহে; বিলাতী বাজারে ইহাদের আদর যথেষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর গন্ধ প্রস্তুত করিতে এইগুলি আবশ্যক হয় এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বভাবজ গন্ধ সংযোগ না করিলেও কোন কোন কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু দেশীয় বাজারে যাহার কাট্‌তি অধিক, সে সকল গন্ধ নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তৎসমুদয় প্রস্তুতের উপাদান অধিকাংশ স্থলেই কৃত্রিম গন্ধ। সেইরূপ উপাদান ব্যবহৃত হয় বলিয়াই এত অল্প মূল্যে চাক্‌চিক্যময় সুন্দর শিশিতে এক বা দেড় আউন্স গন্ধ বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। এইরূপ গন্ধের ব্যবহারও নিতান্ত কম নহে। বিগত তিন বৎসরের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গড়ে এতদ্দেশে প্রতি বৎসর কিঞ্চিদধিক প্রায় সাড়ে ২৩ লক্ষ টাকার সুবাসিত সুরাসার, প্রস্তুতীকৃত গন্ধ ও বায়ি তৈল আমদানী হয়। দেশ হইতে এই শ্রেণীর যে সকল দ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহাদের মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা হইবে; ইহার প্রায় অর্দ্ধেক কাঁচা মাল অর্থাৎ

বায়ি তৈল-বীজ : বায়ি তৈলের মধ্যে চন্দন-তৈলই প্রধান ; মৃগনাভিও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে গন্ধোৎপাদক পত্র, মূল, ফুল প্রভৃতি ধরা হয় নাই ; সেগুলির স্বতন্ত্র হিসাব পাইবারও উপায় নাই ; কারণ, তৎসমুদয় ঔষধের কাঁচা মালের সহিত গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ রপ্তানীর মালের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত নিতান্ত কম।

উন্নতির উপায়

বিদেশ হইতে সুলভ কৃত্রিম গন্ধ আনাইয়া সুরাসার, তৈল, চর্ব্বি অথবা অন্য উপাদান সহযোগে উহা হইতে ব্যবহার্য্য গন্ধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা যে কোন স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত গন্ধ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশীয় উপাদান সমূহের সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় যে, নব-জাগ্রত ভারতে এতদর্থে চেষ্টা চলিতেছে। মহীশূরের দুইটি চন্দন-তৈলের কারখানা ও Essenflor Company, গোয়ালিয়র রাজ্যে বিশুদ্ধ বায়ি-তৈল উৎপাদন, কানপুর ও কনৌজে আধুনিক প্রথায় তৈল-নিষ্কাশনের জন্য কল স্থাপন ইত্যাদি ভারতীয় গন্ধ-শিল্পে নবযুগ আগমনের সূচনা করিতেছে। এই সমুদয় নূতন প্রতিষ্ঠান যে সকল গন্ধসার অথবা বায়ি-তৈল বাজারে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে, তন্মধ্যে চন্দন, বকুল, চাঁপা, চামেলী, গোলাপ, হেনা, যুঁই, মোতিয়া, মগরা, সেফালিকা, কেওড়া, গুয়েবাবলা ও তৃণ-তৈলগুলির নাম করিতে পারা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদনের মাত্রা নিতান্ত কম এবং এক চন্দন-তৈল ব্যতীত অন্য কোন বায়ি-তৈল এত অধিক মাত্রায় প্রস্তুত হইতেছে না যে, উহা বিদেশীয় তৈলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ফলতঃ কাঁচা মালের প্রাচুর্য্যের অনুপাতে উক্ত দ্রব্যাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া ব্যবহারোপযোগী যে গন্ধ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নিতান্তই কম। কত বহুল পরিমাণে সুগন্ধ ফুল যে নষ্ট হইতেছে, তাহা যাঁহারা হিমালয়গাত্রে বর্ষার প্রারম্ভে অসংখ্য ‘কুজো,’ গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পের ঘন কুঞ্জ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। স্পেন ও ইতালীতে প্রচলিত বহনাবহনযোগ্য বকযন্ত্র দ্বারা মরসুমের সময় উৎপাদনস্থলে এইরূপ ফুল হইতে গন্ধ নিষ্কাশন করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু সেরূপ চেষ্টা এখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে, গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের বড় বড় বাগিচা না থাকিলেও স্থায়িভাবে গন্ধ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ফ্রান্স এবং ইতালী দেশে গন্ধ-শিল্পিগণের এক একটি সমিতি আছে ; উক্ত সমিতির কার্য্য বন্য অথবা অর্দ্ধ-বন্য গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও উপযুক্ত কেন্দ্রে উক্তরূপ মাল হইতে গন্ধ-নিষ্কাশনের সহায়তা করা, ফুলবাগিচাওয়ালাগণের সহিত গন্ধ প্রস্তুতকারকগণের সম্বন্ধ স্থাপন, এবং বাজারে যাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অথবা ভেজাল দেওয়া মাল বিক্রয় হইতে না পারে, তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। এতদ্দেশেও এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত গন্ধ-শিল্পের উন্নতির কোন আশা করিতে পারা যায় না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

লক্ষ্য

সংসারের কোলাহলে বধির শ্রবণ
শান্তি নাই তৃপ্তি নাই সদা শূন্য প্রাণ,
তারি মাঝে থেকে থেকে ধ্বনিছে হৃদয়ে
দূরদূরান্তর হ’তে মৃদু-মন্দ গান।

নীল আকাশের পানে চেয়ে থাকি যবে
মুগ্ধপ্রাণ ; মাঝে মাঝে যায় দেখা
পৃথিবীর পরপারে অজানা প্রদেশে
মধুর শান্তির ছবি অস্ফুট আলোক-রেখা।

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ এই জগতের মাঝে
মোরা স্বরগের শিশু, তাই স্বর্গ হ’তে
মাঝে মাঝে আসে গান, দেখা যায় ছবি
শান্তিহীন লক্ষ্যহীন জীবনের পথে।

এই আধ-দেখা ছবি, (এই) আধ-শোনা গান
লক্ষ্য রাখি চলি যাব, পূর্ণ হবে প্রাণ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

কাল-পূর্ণিমা

গল্প

১

পূর্ণিমাতে জন্ম হওয়ায় বাবা আমার নাম পূর্ণশশী রাখিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে এ মুখের তুলনা জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদা শুনিতাম আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত।

* * * *

হঠাৎ এক দিন শুনিলাম সে দিনও পূর্ণিমা ছিল—আমাদের শয়ন ঘরটিকে বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল, চারি দিকের খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার প্লাবনে প্রাচীর সংলগ্ন ঝুলান ছোট্ট প্রদীপটি যেন আপনা হইতেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল;—সে দিনও শুনিলাম, পূর্ণচন্দ্রও না কি এ মুখের উপমেয় নহে—শশাঙ্ক কলঙ্কিত এ পোড়া মুখ না কি নিষ্কলঙ্ক! এই নূতন কথাটি যাহার মুখে শুনিলাম, একটিবারমাত্র জীবনের এক অপূর্ব্ব স্মরণীয় মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এখন আর একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম—চুরি করিয়া। মনে হইল, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার সেই মুখে, চোখে, অধরোষ্ঠে—সর্ব্বাবয়বে কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে। দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। চারি চক্ষুর মিলন হইল, আমি দৃষ্টি নত করিলাম। মুহূর্ত্তে আমার মস্তক তাঁহার চরণে সংলগ্ন হইল। তিনি আনন্দভরে আমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন—আমার পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

২

আমাদের গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ—বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। গ্রামে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাবা যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল।

পিতা শুভদিনে ভগবতী বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনাতে আমার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। তদুপলক্ষে গ্রামের সকলকে আহারের নিমন্ত্রণও করিলেন। এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহ কোন আপত্তি করিলেন না। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এই ভোজের উৎসবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, এই অভ্যাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সে দিন তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—এই শ্লোকাঙ্কের ভাবার্থ লইয়া তর্ক আরম্ভ হয়। এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "কন্যা শিক্ষণীয়া, তা স্বীকার্য্য সন্দেহ নেই, শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাই হচ্ছে বিচার্য্য!" তাঁহার মতে, গৃহকার্য্যাদি শিক্ষাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট, বিদ্যা-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তর্কানুরোধে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও, কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নয়, কেন না, বিবাহ যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে আশানুরূপ শিক্ষালাভ অসম্ভব, আর অসম্পূর্ণ শিক্ষা অনন্ত দোষের নিদান। এই সব আপত্তির সমর্থন করিতে গিয়া আর এক জন বলিলেন যে, বিদুষী স্ত্রী সাধারণতঃ গৃহকার্য্যে ও স্বামিসেবায় উদাসীনা হইয়া থাকেন; আর এই উক্তির পোষক উদাহরণস্বরূপ গার্গী ও মৈত্রেয়ীর উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। বিদুষী-শিরোমণি গার্গী না কি চির-কুমারী; সুতরাং গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীও না কি গৃহিণী হইয়াও গৃহিণীপনা জানিতেন না। সংসারের ভার সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ পরমাত্ম-চিন্তায় তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্কের পর পিতা সুন্দরভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিলেন।

৩

বাবার বড় সাধ ছিল, তাঁহার কন্যা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী হয়; কিন্তু অভাগী আমি জীবনের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিলাম, তবু শিক্ষার প্রথম সোপান উত্তীর্ণ

হইতে পারিলাম না। কারণ, চেষ্টা আমার আদৌ ছিল না। পড়া-শুনায় আমার মন লাগিত না। মাঝে মাঝে বই লইয়া বাবার অনুরোধে পড়িতে বসিতাম বটে; কিন্তু মন আমার অন্যত্র বেড়াইয়া বেড়াইত। বাবা আমার পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া যদি কখনও কিছু বলিতেন, যাহারা নিকটে থাকিত, তাহারা বলিত, “এ মেয়ের বে' আটকাবে না—পড়াশুনো না হ'লেও না; যে দেখবে—আদর ক'রে নেবে।” এইরূপ প্রতিবাদে আমার স্বাভাবিক শৈথিল্য বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইত আর মনে হইত, আমার রূপরাশি সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া সকলের সুখ্যাতি ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিবে। পিতার ইচ্ছা ছিল, আমায় সুশিক্ষিতা করিয়া একটি সুপাত্রে সমর্পণ করেন। সমাজের অজস্র নিন্দাবাদ এবং কোন কোন বিষয়ে কথঞ্চিৎ নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও তিনি এত দিন আমার বিবাহের উদ্যোগ করেন নাই। শেষে যখন দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নহে, তখন “লক্ষ্মীর মত মেয়ে আমার, তাই বুঝি মা সরস্বতীর কৃপা হ'ল না”—বলিয়া এই শুষ্ক সান্ত্বনায় মনকে প্রবোধ দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমায় পাত্রস্থা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

আর্থিক অবস্থা আমাদের মন্দ ছিল না; এ জন্য আমাদের প্রতিবাসীদের অনেকেরই নিদ্রার বেশ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। আবার যখন সংবাদ আসিল, দাদা এম-এ ও ল' ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের গাত্র-দাহ অসহ্য হইয়া উঠিল। তবে এই অকথনীয় অথচ অসহনীয় মর্ম্ম-পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম অল্পদিনমধ্যেই হইয়াছিল। তাঁহাদের সমবেত যত্নে পর পর যখন তিন চারটি বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তবুও সম্বন্ধ আসিতে লাগিল—আশু পিতৃ-গৃহ-পরিত্যাগ-আশঙ্কায় প্রাণ আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে দিন রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ কথার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, বাবা ও দাদাতে কথা হইতেছে—আমারই সম্বন্ধে। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

বাবা বলিতেছিলেন, “আমি দেখেছি মন্মথকে; দিব্যি ছেলেটি। এম্-এ পাশ করেছে—ডেপুটীগিরী পরীক্ষা দিবে শুনেছি। বেশ বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ—পণের জন্যও তেমন পীড়াপীড়ি নেই।”

দাদা বলিলেন, “তাই ত আমি অবাক্ হয়ে গেলুম, এই সম্বন্ধেও আপনার মত নেই শুনে -তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।”

নিশীথ রজনীর স্তব্ধ নীরবতা ভেদ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাবা বলিলেন, “অমত কি সাধে হয় বাবা? তোমার কি বিশ্বাস হয়, এই এম্-এ পাশ ছেলে—যে হয় ত দু'দিন পরে এক জন হাকিম হবে—নিদেন একটা প্রফেসারের কায ত পাবেই, সে একটি নিরক্ষরা স্ত্রী নিয়ে ঘর ক'রে সুখী হবে? মন্মথের দাদা সে দিন প্রথমে পূর্ণাকে দেখে খুবই খুসী হলেন; কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুন্‌লেন, লেখা-পড়া খুব সামান্যই জানে, মুখখানি তখন একেবারে কালো হয়ে গেল।”

দাদা বলিলেন, “আমারও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমায় তিনি বল্লেন, তেমন ভাল লেখা-পড়া জানে না বটে, তবে একেবারে ত আর না জানে, এমন নয়? চলন-সই গোছ শিখিয়ে নিতে আর কত দিন লাগবে? বিশেষতঃ আমাদের বাড়ী ত আর তেমন কায-কর্ম্ম কত্তে হবে না—বেশ সময় পাবে শিখতে।”

আবার একটা চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাবা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “তবেই হ'ল, লেখা-পড়া ছাড়া চল্‌বে না—আর যেটুকু জানে, তাতেও চল্‌বে না—তবে তাঁরা কিছু সময় দেবেন, এই না। ওঁদের ধারণা, ওঁদের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখতে বেশী সময় লাগবে না; আর ওঁদের বিশ্বাস, আমি টোলের পণ্ডিত, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী নই, তাই মেয়ের শিক্ষার জন্য তেমন যত্ন করি নি। ওঁদের এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট, তা ত ওঁরা জানেন না? মেয়ের আমার যেরূপ অমনোযোগ ও অবহেলা, আমাদের পর্য্যন্ত বিরক্তি ধ'রে যায়, অন্যে সহ্য কর্‌বে কেন? এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই মনোমিলনই যদি না হ'ল, ত ঐশ্বর্য্যই বল, সৌন্দর্য্যই বল, পদগৌরবই বল—সব বৃথ নয় কি?”

দাদা বলিলেন, “তা হ'লে শিক্ষিত বরের আ

একেবারে ছেড়ে দিতে হয়। উচ্চ ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছেলেরই এইটুকু লেখা-পড়ায় মন উঠবে না।"

বাবা খানিক স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, "যেখানে লেখা-পড়ার জন্য তত বেশী পীড়াপীড়ি নেই, অথচ খেতে-পর্‌তে কোনরূপ কষ্ট হবে না, এমন কোন মধ্যবিত্ত ঘরের দুটো একটা পাশ-করা সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ ছেলের সন্ধান করা যাক্।"

দাদা বলিলেন, "সেই ভাল।"

বাবা বলিলেন, "আমি ওর কর পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, বেশ বিদ্যা হওয়ার কথা, মেধাও বেশ আছে দেখতে পাচ্ছি, তবু কেন যে এরূপ হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি।"

আলোচনা বন্ধ হইল। বোধ হয়, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমার কিন্তু আর ঘুম আসিল না। আমার রূপ-গর্ব্বে এই প্রথম আঘাত লাগিল।

৪

আমি স্বামি-গৃহে। "কন্যা বরয়তে রূপং" যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষোভের কারণ ছিল না, পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি; পিতাও মনোমত জামাতা পাইয়াছিলেন। দুইটি পরীক্ষা পাশ করিবার পরই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হইয়াছিল। হঠাৎ পিতৃবিয়োগ বশতঃ জমীজমার তত্ত্বাবধানের জন্য বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সংসারের ভার লইবার অন্য কোন পুরুষ ছিল না। বাড়ীটি বেশ বড়-সড়—চারিদিকে নানা রকম ফল ও ফুলের বাগান; তরি-তরকারি প্রচুর হইত। পুকুরভরা মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী। এক কথায় বলিতে গেলে, সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত বড় একটা কিনিতে হইত না। কিন্তু তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। এক শ্বশ্রূমাতা সকল দিক্ সামলাইতে পারিতেন না।

উনি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। দক্ষিণা বার্ষিক ৫ শত টাকা। ইহা ছাড়া মাসে আরও দশটি টাকা গৃহশিক্ষকতা করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। এই টাকার একটি কপর্দ্দকও সংসারে ব্যয়িত হইত না; প্রয়োজনও ছিল না। তবু না কি একটি পয়সাও সঞ্চিত থাকিত না। পুস্তক ক্রয়ে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইত। ওঁর পড়ার ঘরটি একটি ছোট-খাট পুঁথির দোকান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম যে দিন ঐ ঘরটি আমার চোখে পড়িল, কেন যেন আমার প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পিতা এই অর্দ্ধশিক্ষিত, বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, আড়ম্বরহীন সাদাসিধে অথচ শিষ্ট, শান্ত ও বুদ্ধিমান্ জামাতা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের এক নিভৃত কোণে অবস্থিত এই কৃষিজীবীর গৃহে শিক্ষার আলোক তেমনভাবে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং অশিক্ষিতা কন্যা এখানে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। বিবাহের পূর্ব্বে এই পুস্তকাগারটি যদি তাঁহার চোখে পড়িত, সম্ভবতঃ এ বিবাহ হইত না। কিন্তু "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

মাষ্টার বাবু স্কুলের ন্যায় বাড়ীতেও 'গুরুমহাশয়গিরী আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন গেল, কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে গৃহ-শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়া এই অনাবিষ্টা ছাত্রীটির প্রতি গভীর আগ্রহে মনোযোগ প্রদান করিলেন, ছাত্রী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ওঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া একটু বিরক্তভাবে আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "ভাগ্যিস্, সবে দুটি পাশ, তিন চারটে হ'লে না জানি"—এইটু বলিতেই উনি বাধা দিয়া বলিলেন, "বটে, চারটে পাশ হ'লে বুঝি পড়া-শুনো করতে?"

সমান ওজনে আমিও বলিলাম, "করতুম বই কি?"

"আচ্ছা, মনে থাকে যেন" বলিয়া উনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে এক দিন একখানি সংবাদপত্র আনিয়া আমার কোলের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি শুনে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে বল্‌তে পারি নে, আমি আরও তিনটে পরীক্ষায় পাশ হয়েছি।" সত্যই তিনটি যায়গায় ওঁর নাম দেখিলাম—লাল পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া—মনোবিজ্ঞানে অনার সমেত বি-এ আর সংস্কৃত কাব্য ও বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের তালিকার শীর্ষস্থানে। আমার যেন প্রথমে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল—অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম—তাঁহার আননে, নয়নে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথাটি আপনা হইতেই তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। "থাক, থাক, সাতটি বৎসরের পরিশ্রমের ফল—

পূর্ণ! সাতটি বৎসরের অক্লান্ত সাধনার—হাড়ভাঙ্গা খাটুনির এই পুরস্কার!"

"তুমি কখন্ পরীক্ষা দিলে? একবারে তিন তিনটে পরীক্ষা দিলে—এর বিন্দু-বিসর্গও আমরা জান্‌তে পাল্লুম না?"

"কাকেও কিছু বলি নি। কেউ জান্‌ত না—যদি ফেল হতুম। এরূপ ফল যে হবে, আমি কল্পনাও করি নি। এই বেলা, পূর্ণ! এইবার আমার কথা রাখবে?"

এতক্ষণ আত্ম-বিস্মৃত ছিলাম—আনন্দে; তাঁহার এই কথায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। কি দুর্ভাগ্য! এমন স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলাম না! মাথা তুলিতেই প্রাচীর-বিলম্বিত আয়নায় এই পোড়ারমুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইল, একটু হাসি, একটি মিষ্ট কথাই যথেষ্ট নহে কি? আমি ত ওঁকে ওঁর লেখাপড়া ছাড়াও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি—উনি কেন পড়াশুনার জন্য মিছামিছি আমাকে কষ্ট দেন! লেখাপড়া করা যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর, তাহা বুঝেন না কেন?

আমায় নীরব দেখিয়া উনি আবার বলিলেন, "এইবার পড়া-শুনো করবে ত, পূর্ণ?" যাচক যেমন অতি দীনভাবে অনুগ্রাহকের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়, ভয়ে-সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া, সেইরূপ কোমল ও করুণস্বরে আমায় এই কথাটি বলিয়া উদ্‌গ্রীবভাবে আমার মুখের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন। সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরের আকুল ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল। কি উত্তর দিব? তাঁহার মনোমত উত্তর দিবার সাধ্য আমার আছে কি? বাধ্য হইয়া শাঠ্যের আশ্রয় লইলাম। নত নেত্রে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—"চারটে পাশ হ'ল কোথা?

"চারটে কেন—পাঁচটা হ'ল?"

"ও—ওই সংস্কৃত পরীক্ষা? ওর মূল্য কি?"

এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর উপহাসে উনি যেন হঠাৎ সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া উঠিলেন। বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভে বলিলেন, "কেন তোমার পি—" যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা বলিলে খুবই উচিত উত্তর হইত সন্দেহ নাই। তবে, না বলাই মহত্ত্ব না বলাই পুণ্য! উনি সেই পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন। আর অভাগী আমি অপরাধিনীর মত অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আচ্ছা, এম্-এ পাশ কল্লে কথা রাখবে ত?" বলিয়াই উনি একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদা কি নিয়েছিলেন এম্-এতে জান?"

"ইংরেজী—ইংরেজী ব'লেই যেন মনে হয়।"

"ইংরেজী?—আচ্ছা।" এই বলিয়া অর্দ্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"কোথা চিঠি লিখছ?"

"বইয়ের দোকানে; এম্-এ পড়ব, তাই বইয়ের অর্ডার দিলুম।"

"যেখানা ছিঁড়ে ফেল্লে, সেখানা কোথা লিখেছিলে?"

"ওখানাও বইয়ের দোকানেই লিখেছিলুম; আগে মনে করেছিলুম সংস্কৃত নেব।"

"তার পর মত বদলে গেল?"

"হাঁ, ইংরেজীই নেব স্থির কল্লুম। খাটুনি একটু বেশী হবে, সে কি করব?"

"ইংরেজী নিলে কেন? দাদা নিয়েছেন ব'লে?"

"কতকটা সে জন্যও বলতে পার—তা ছাড়া, ঐ 'সংস্কৃত' যদি ধর্ত্তব্যের মধ্যে না হয়—সেই ভয়ে।"

৫

বাবা যখন শুনিলেন, তাঁহার জামাতা একসঙ্গে তিনটি পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটা সংস্কৃতের—তাঁহার অতি প্রিয় অতি আদরের দুইটি বিষয়ের, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। সেবার আবার তিনিই এই দুটি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন।

এক দিন তিনি কতকগুলি খাতা লইয়া আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এইগুলি কাব্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের পরীক্ষার খাতা। প্রথমতঃ আলাপ হইল, যে সব স্থানে ভ্রম-প্রমাদ ছিল, সে সব লইয়া; তার পর নানারূপ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং কোন কোন কবি ও কাব্যের সমালোচনা চলিল। শ্বশুর-জামাতার সে দিনের আনন্দ দেখিয়া এইরূপ আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণেও জাগিয়া উঠিল!

কথাপ্রসঙ্গে উনি পিতার নিকট বলিলেন, "আমি ওঁর অধ্যয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছি।" পিতার বুঝিতে

কিছু বাকী রহিল না। তিনি আমাকেই দোষী মনে করিয়া আমার আলস্য ও ঔদাসীন্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ; আর "এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হ'লে সব বজায় থাকে, তা নইলে পরিণাম অশুভ হ'তে পারে," এই বলিয়া একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতার এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আগুনের শিখার মত আমার অন্তস্তল দগ্ধ করিল। পর-মুহূর্ত্তেই যখন তিনি আবার বলিলেন যে, ওঁর ইচ্ছে নয়, আমি ওঁর কাছে থাকি—আমি বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! আমার রূপদর্পে এই দ্বিতীয় আঘাত! ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইলেও আমার দারুণ অভিমানের বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা-সম্পাদনেও সমর্থ হইল না। আমি ঐ দিনই পিতৃগৃহে যাইব প্রতিজ্ঞা করিলাম।

তাহার কাছে বিদায় লইবার সময় কেন যেন হঠাৎ আমার সেই আজন্ম-দুঃখিনী রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণী, পূর্ণগর্ভবতী জনক-নন্দিনীর কথা—তাঁহার সেই করুণ নির্ব্বাসন-বৃত্তান্তটি মনে পড়িল, আর সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! এই সময় আমাকে স্থানান্তরিত করা শ্বশ্রূমাতার সম্পূর্ণ অমত ছিল, পিতারও আমাকে বাড়ী লইবার জন্য তত মত ছিল না। কারণ, আমি মাতৃহীনা। কেবল আমারই ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সম্মত হইলেন—মা-ও আর আপত্তি করিলেন না।

* * * *

পরে সংবাদ পাইলাম, আমি চলিয়া আসিবার পরই মাকে কাশীধামে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জমীগুলি প্রজার হাতে দিয়া কাম-কর্ম্ম কমাইয়া এক বেলা স্বপাক ভাতে-ভাত রাঁধিয়া তিনি দিনরাত কেবল পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। এক একবার খুবই কষ্ট হইত, আবার যখন মনে করিতাম, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য এই কষ্ট নিজে পাইতেছেন এবং আমাকেও দিতেছেন, তখন মনকে আশ্বাস দিতাম, কত দিন আর এই ভাবে চলিবে? পড়াশুনা ছাড়িতে হইবে। কিন্তু তাহা হইল না—পড়াশুনা তিনি ছাড়িলেন না। স্নেহ-মমতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অনন্য-চিত্তে বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। বাবার মুখে যখন শুনিতাম, (তিনি প্রায়ই ওঁর সংবাদ লইতেন) কি অধ্যবসায়, কি একাগ্রতা, কি কষ্টসহিষ্ণুতা ওঁর—তখন আমার চক্ষু বাষ্পভারে দৃষ্টিশূন্য হইত, তবু আমার অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি হইত না।

আমার কাছে তিনি পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে একখানি লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাই নাই। খোকাকেও একবার দেখিয়া গেলেন না! বাবার ইচ্ছা ছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া যাই, কিন্তু উপযাচিকা হইয়া যাইবার পথে অভিমান বাধা দিল। আমার এত কষ্টের, এত যত্নের, এত সাধের, এত আদরের পত্রখানি—ক'খানা লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তবে একখানা খাড়া করিয়াছিলাম, হউক না ভ্রমপূর্ণ, হউক না দুষ্পাঠ্য, রচনার পারিপাট্যই কি কেবল দেখিবার? হৃদয়ের ভাব কি কিছুই নয়? আমার সেই চিঠিখানির উত্তর দিলেন না! আমার বড় দুঃখ বড় রাগ হইল! আর একটি কথা, ভাবিলাম, উনি ত বই লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন, আমাকে হয় ত ওঁর কৃপা-প্রতীক্ষায় তীর্থের কাকের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, সে আমি পারিব না। কখনই নয়।

* * * *

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল—পরীক্ষাও শেষ হইল ; কিন্তু উনি আসিলেন না। দাদার বিবাহের সময়ও কত করিয়া লেখা হইয়াছিল, তবুও আইসেন নাই। শুনিলাম, বিবাহ-সভায় না কি একবার হাজিরা দিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসেন নাই—আমার ভয়ে?

* * * *

খোকা বেশ বড়-সড় হইয়াছে—হাঁটিতে, কথা কহিতে পারে। একবার দেখিতে ইচ্ছাও হয় না? কি নিষ্ঠুর! আপন মনে নিরালায় বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দাদার তার পাইলাম, ওঁর পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এবারও উনি প্রথম হইয়াছেন। বাবা চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া ওঁকে সংবাদ দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, উনি বাড়ী নাই, কাশী গিয়াছেন। 'মা' নাকি ছেলের আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই আঘাতটি (এইটি তৃতীয়) আমায় একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। আমার ইচ্ছা হইল—কিন্তু শুদ্ধ খোকার মুখের দিকে চাহিয়া নিরস্ত হইলাম। তিন চারি দিন পরে উনি 'তার' করিলেন, মা খোকাকে দেখিতে

চাহিয়াছেন। ৫০টি টাকাও সেই সঙ্গে পাথেয় বাবদ আসিয়াছিল ; তবে বিবাহের সংবাদ সত্য নহে ?

৬

বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হইলাম। দাদা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মা খোকাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "গেনুর আমার শৈশব ফিরে এসেছে।"

ওঁর কাছে যাইবার সময় আমার পা কাঁপিয়া উঠিল। বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ওঁকে প্রণাম করিলাম।

"আমার পরীক্ষার ফল জানতে পেরেছ বোধ হয় ?"

"পেরেছি।"

"শুনে তুমি সুখী হবে না মনে ক'রে তোমায় লিখিনি।"

"তা তুমি যা ভাল মনে করেছ, তাই করেছ, এতে আর আমি কি বলব ?"

"বেশ, আমি যা ভাল মনে করেছি, তাই করেছি, এখন তুমি যা ভাল মনে কর, করতে পার।"

"কোন্ বিষয়ে ?"

"কোন্ বিষয়ে ? তা তোমায় মনে ক'রে দিতে হবে—কোন্ বিষয়ে ?"

"ও—তা দেখ, ঐ কথা ছাড়া কি আর তোমার কথা নেই ? ছু'টি বৎসর পর দেখা হ'ল, একবার জিজ্ঞেস করলে না, কেমন আছি, কেমন ছিলুম ?"

"সব শুনেছি ত তোমার দাদার কাছে, তুমিও সব শুনেছ মা'র কাছে। নূতন ক'রে আর কি জিজ্ঞেস করব ?"

"তা বটে, ওরূপ প্রত্যাশা করাই আমার অন্যায় হয়েছে।"

"এখন আসল কথার কি বল ? দুই বছর খাটালে, এখন পারিশ্রমিকের বেলা বাজে কথা ব'লে ভাঁড়ালে চলবে কেন ?"

"এইগুলো সব বাজে কথা ?"

এই সময় খোকা ছুটিয়া আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল।

"এই নাও পারিশ্রমিক" বলিয়া খোকাকে ওঁর কোলে তুলিয়া দিলাম। খোকা রহিল না, তাহার কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখিয়া ছাড়িয়া দিলাম। সে দৌড়িয়া মা'র কাছে চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, "ঐ গম্ভীর মুখ দেখে আমার ভয় করে—ও ছেলেমানুষ ভয় পাবে না ?"

আশা করিয়াছিলাম, একটি সরস অথচ উচিত উত্তর পাইব। কিন্তু উনি কথাটা কানেও তুলিলেন না।

"এখন তোমার অভিপ্রায় কি, খুলে বল।"

আমার বলিবার কিছুই ছিল না। হঠাৎ যেন মুখে আসিল, "দেখ, কালিদাস শুনেছি স্ত্রীর প্ররোচনায় লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত হয়েছিলেন, তুমিও—"

বাধা দিয়া উনি বলিলেন, "উপমাটা খাটল না। অত মূর্খ আমি ছিলুম না,—কালিদাস প্রথম যেমন ছিলেন। আর তোমার কথায়, বড় জোর একটা পরীক্ষা দিইছি—বলতে পার। তা এই পরীক্ষা আমি দিতুমই—তুমি বললেও দিতুম, না বললেও দিতুম। কথাটা বরং এক ভাবে কতকটা খাটে—তুমি যদি স্বামীর অনুরোধে লেখাপড়া শেখ, কালিদাস যেমন স্ত্রীর তাড়নায় শিখেছিলেন। বল, এখন তুমি তা করবে কি না ?"

"স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখার কি দরকার ?" বোধ হয়, একটু উচ্চ স্বরেই আমি এই কথাটা বলিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তির আভাসও ছিল। উনিও একটু রুক্ষস্বরেই বলিলেন, "সত্যানন্দ সার্ব্বভৌমের মেয়েকেও বুঝিয়ে দিতে হবে এর কি প্রয়োজন ?" পিতার নাম করিয়া এই শ্লেষটি করায় আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল ; তবু আমি বেশ মৃদু ভাবেই বলিলাম, "দেখ, কথা হচ্ছে তোমায় আমায়, এর ভিতর বাপ-মাকে টেনে আনছ কেন ?"

"সে কি ! তোমার পিতাকে আমি কি বললুম ? দেবতুল্য ব্যক্তি তিনি, আমার পিতৃস্থানীয়, আমি কি তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছি ? একটা সামান্য কথার মর্ম্ম গ্রহণ করবার যোগ্যতাটুকুও তোমার নেই ? এই স্বর্ণাবরণের নীচে কি ভগবান্ একরাশ ভস্ম পূরে রেখেছিলেন ?" তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

তিনি চারিদিন পরে একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আমায় বলিলেন, "আমি আজ এলাহাবাদ যাচ্ছি, সেখানকার কলেজে একটি কাজ খালি আছে, প্রিন্সিপ্যাল তার করেছেন, তাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে। মা-ও যাচ্ছেন আমার সঙ্গে—এই সুযোগে প্রয়াগটা দেখে আসবেন।"

এই কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হইল। কেন যেন একটু সন্দেহ—একটু শঙ্কাও হইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে ফিরবে ?"

"যে দিন তোমার চিঠি পাব।"

বুঝিতে পারিলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। বলিলাম, "যদি চিঠি না পাও ?"

"তবে আমার যে দিন খুসী" বলিয়া উনি অধোমুখ হইলেন। আমিও "আচ্ছা" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার যেন মনে হইল, কে আমার পশ্চাতে আসিতেছে। ইচ্ছা হইল ফিরিয়া দেখি, কিন্তু আমার কাঁধের ভূতটা বলিল, "ভয় কি, খোকাকে যখন একবার দেখেছেন, আর কি ছেড়ে থাকতে পারবেন ?"

কয়েক দিবস প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু তাঁহারা ফিরিলেন না। দাদা পত্র লিখিলেন, কোন উত্তর আসিল না। আমাকে একা কাশীর বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে অথচ তিনিও আর বিলম্ব করিতে পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া দাদার সঙ্গে পিত্রালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

এক বৎসর পরে তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম—এই তাঁহার প্রথম পত্র।

"পূর্ণ,

মাতাঠাকুরাণী আর ইহজগতে নাই। আমি আর ঘরে ফিরিব না। সম্ভবতঃ তোমার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমার যাহা কিছু আছে, তোমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার।

জ্ঞানেন্দ্র।"

এইবার আমার আশার সমাধি হইল। সেই দিনই কাশী যাইব স্থির করিলাম, কিন্তু দাদা বলিলেন, সেখানে তাঁহার দেখা পাইব না। আমার চোখে পড়ে নাই, পত্রের শেষভাগে লেখা ছিল, "পুনশ্চ ;—আমি অদ্যই স্থানান্তরে চলিলাম, পত্রের উত্তর দিলেও পাইব না।" কাযেই কাশী যাওয়া হইল না। পর-বৎসরে বাবাও আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। দাদা বৌদিদিকে লইয়া কর্ম্মস্থানে গেলেন, আমি তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে না গিয়া স্বামিগৃহেই আশ্রয় লইলাম।

৭

দেখিতে দেখিতে ১২ বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বাদশ বর্ষ যে অতীত হইয়াছে, আমাদের এক জন পরম হিতৈষী প্রতিবাসী একান্ত অযাচিতভাবে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন, পাছে আমাদের তদানীন্তন কর্ত্তব্যের কোনরূপ ত্রুটি হয় এবং আমরা ধর্ম্মে পতিত হই, সেই জন্য।

আজকাল করিয়া আরও ৫।৬ বৎসর চলিয়া গেল, উনি আসিলেন না, কোন সংবাদও দিলেন না। সমাজপতি-গণের উপদেশ তখন আদেশরূপে পরিণত হইল। তাঁহাতেও আমাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া গ্রাম্য দেবতারা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, আমাদের উপর ছোটখাট রকমের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল, কাজেই আমরা গ্রাম ছাড়িয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমি অনেক দিন হইতেই নিরামিষ ধরিয়াছিলাম, তাই আমাদের পাড়ার মোড়লরা কথঞ্চিৎ শান্ত ছিলেন।

আমরা চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া তাঁহাদের জন কয়েক মিলিয়া একটি মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন, শুনিয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহিতে লাগিল ; আমি স্পষ্ট বলিলাম, "তা হবে না, তা আমি পারব না।" আমি জানিতাম—আমার মন বলিত, আমার স্বামী জীবিত আছেন। খোকাও শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে দাদার কাছে রাখিয়া আসিল।

৮

খোকা (কেশব) এখন উকীল। হাইকোর্টে যাইতেছে, কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতেছে। আমরা কলিকাতায় আছি। উনি ফিরেন নাই, কোন পত্রও দেন নাই। কেশব অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদ পায় নাই।

* * * * *

হঠাৎ এক দিন কেশব আমার গলা ধরিয়া বলিল, "আমার একটা কথা রাখবে, মা ?"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া আমি বলিলাম, "তোর কথা আমি রাখব না, বাবা ? এর জন্য এত কাকুতি কেন ?"

"শুধু কাকুতি নয় মা, আমার মাথার দিব্য।" শরীর ও মন শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া আমি বলিলাম, "ছি বাবা, অমন ক'রে বলতে আছে ? বল, তোর কি কথা, আমি নিশ্চয়ই রাখব।"

"তোমায় লেখা-পড়া শিখতে হবে।"

বজ্রাহতের ন্যায় আমি স্তব্ধ হইলাম; আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় মুহূর্ত্তে নিশ্চল হইয়া গেল।

আমার দুরদৃষ্টের প্রকৃত কারণ দাদা ও বাবা ছাড়া আর কেহ জানিত না বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। সে জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও আমার প্রাণে একটু শান্তি ছিল। আমার আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবাসীদের মধ্যে এক এক জন এক একটি কারণ অনুমান করিয়া কেবল নিজ নিজ মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা-শক্তির পরিচয় দিত; আমি কিছু বলিতাম না। আমার বিশ্বাস ছিল, কেশব প্রকৃত কারণের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। প্রাণে আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, উহাকে কিছু জানিতে দিবও না। তাই এই ভীষণ আগ্নেয় গিরি বুকে করিয়াও আমি যথাসাধ্য হাসিয়া কথা বলিতাম। উহার মনে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না আসিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ সাবধান ছিলাম। আজ সব শেষ হইল। কেশবের একটি কথায় ধিক্কারে সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাণভরা একটা ক্রন্দন বুকের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। অনেক চিন্তার পর সঙ্কল্প স্থির করিলাম।

* * * * *

'অর্ঘ্য'—আমার প্রথম কবিতা—একটি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম না, আমার এই সাধের অর্ঘ্য—আমার সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা, ব্যথা-বেদনা, আশা-ভরসা, আদর-যত্ন দিয়া রচিত এই অর্ঘ্য যাঁহার চরণোদ্দেশে নিবেদিত হইয়াছিল—আমার সেই আরাধ্য দেবের পাদ-পদ্মে পৌঁছিল কি না?

* * * * *

এক দিন কোন একটি মাসিক পত্রে একটি সুন্দর সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িলাম। আমার যেন মনে হইল, ইহার কোন কোন কথা আমি কোথায় শুনিয়াছি। লেখকের নাম নাই, স্বাক্ষর "জনৈক সন্ন্যাসী।" এই সন্ন্যাসীর সন্ধান লইবার জন্য কেশবকে বলিবামাত্র সে বলিল যে, একখানি ইংরাজী মাসিকেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞানের তুলনা-সংবলিত একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহারও লেখক এক জন সন্ন্যাসী। এই উভয় প্রবন্ধের যে একই রচয়িতা, সে বিষয়ে কেশবের মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কত চেষ্টা হইল, তথাপি সেই প্রচ্ছন্ননামা সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

৯

আমি এখন কাশীতে আছি। জীবনের শেষ কয় দিন কাশীতেই থাকিব মনে করিয়াছি, এখানে আমাদের একখানি বাড়ী হইয়াছে। উপরে আমি এবং আমার একটি দূর-সম্পর্কীয়া পিতৃষ্বসা, একটি দাসী ও একটি পাচিকাও আছে। কেশবের জিদ, পাচিকা রাখিতেই হইবে। নীচে দুইটি ব্রাহ্মণ-পরিবার—ভাড়া দিয়া এক প্রকার স্থায়িভাবেই আছেন।

বাড়ীর সম্মুখেই সরকারী বড় রাস্তা। রাস্তার ও-পারে একটি সাধুর আশ্রম। বড় সুন্দর, বড় মনোহর, এ আশ্রমটি বেশ পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র বলিয়া মনে হয়। নান রকম ফুলের গাছে ঘেরা ছোট একটি একতলা ঘর। আশ্রমে প্রত্যহই বেদ-গান হইত। ভাড়াটেরা প্রায়ই শুনিতে যাইতেন। তাঁহাদের কাছে শুনিতাম, বহু লোক এখানে বেদাধ্যয়ন করিতেছে। এরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না কি কাশীতে অতি অল্পই আছেন। এক বৃদ্ধা বলিলেন, "সাধুকে দেখিলেই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়। যেমন কাঁচা সোনার মত বর্ণ, তেমনই দেবতার মত চেহারা। লোক বলে, দু'শ বৎসর বয়স। দেখে কিন্তু মনে হয় ত্রিশ পেরোয় নি।" স্বামীজীকে দেখিবার আগ্রহ সত্ত্বেও আমার যাওয়া হয় নাই; কারণ, সেখানে যেরূপ ভীড় হইত, তাহাতে আমার যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইত না।

১০

কেশব পূজার বন্ধে কাশী আসিয়াছে, সে স্বামীজীর কাছে বেদ পড়িতেছে। স্বামীজী না কি কেশবের মেধা ও শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র কেশবই গৃহী। আমি স্বামীজীকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় কেশব বলিয়াছিল যে, সে এক দিন তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার চেষ্টা করিবে। আজ সা আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

কেশবের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কারণ, তিনি কাহারও বাড়ী যাইতেন না, কত রাজা, কত জমীদার কত কাকুতি-মিনতি করিয়াছেন— তাঁহাকে গৃহে লইতে পারেন নাই।

তিনি আসিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, মাথায় সুদীর্ঘ জটাজূট—আবক্ষোবিলম্বিত শ্মশ্রু—পরিধানে নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র; গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা।

* * * * *

কেশব আমার কম্পিত হস্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া আমায় স্বামীজীর কাছে লইয়া গেল। তাঁহার দিকে চাহিলাম— সহসা চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, আকাশ ঘুরিতেছে, পৃথিবী টলিতেছে, পা যেন সরিয়া যাইতেছে। তার পর কি হইল, জানি না। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, একটি মাদুরে শুইয়া আছি, মেঝের উপর খোকা আমার শুশ্রূষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ এই ভাবে আছি?"

"বেশী নয়, দশ বারো মিনিট" বলিয়া কেশব চলিয়া গেল।

তিনি আবার আসিলেন। সে দিনও পূর্ণিমা ছিল, জ্যোৎস্নায় ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। আমার সেই ফুল-শয্যার রাত্রির কথা মনে পড়িল। সেই দিনের মতই ধীরে ধীরে আসিয়া তিনি শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সেই দিনের মতই সসঙ্কোচে আগে কথা কহিলেন। আমার চক্ষু মুদ্রিত, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

তিনি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি বেশ লেখা-পড়া শিখেছ, আমি জান্‌তে পেরেছি; তোমার কবিতা, তোমার প্রবন্ধ আমি পড়েছি, পড়েই তোমায় চিনেছি। তার পূর্ব্বেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলুম, তা নৈলে—"

"কথা শেষ হইল না। আমার যেন মনে হইল, তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে ঈষৎ স্পন্দনবেগ অনুভূত হইতেছে।

তখন আমার অবসাদ অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "তা নৈলে কি?"

কোনও উত্তর নাই। তখন আমিই আবার বলিলাম, "দেখ, ত্রিশ বৎসর কাঁদিয়েছ, এতেও কি আমার শাস্তি হয় নি? যদি না হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর, আর আমায় কাঁদিও না। বল, তা নৈলে কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?"

"দেখ, আমি সন্ন্যাসী, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে ও বাক্যালাপে আমার ব্রতভঙ্গ হয়। আমার ব্রতভঙ্গ করালে তোমারও প্রত্যবায় আছে, তোমারও পাপ হবে।"

"হোক হোক, আমার পাপ, এই বিশ্বনাথের চরণতলে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম স্মরণ ক'রে বল্‌ছি—তাই বা কেন, আমার বিশ্বনাথের পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, এতে যদি কোন পাপ হয়, সে পাপ আমার, আমি সব মাথা পেতে নিচ্ছি। দেখ, মন আমার বরাবর বলেছে, তুমি বেঁচে আছ, তাই এই অশ্রুরাশি—এই মর্ম্ম-বেদনার নৈবেদ্য সাজিয়ে দেশে বিদেশে পাঠিয়েছি, মাসিক পত্রিকার সাহায্যে—যদি কোন দিন আমার দেবতার দৃষ্টি এতে পতিত হয়, সেই আশায়। সে আশা আমার ফলবতী হয়েছে, এখন আমায় ফেলে যেও না। তুমি ঘরে না এসো, আশ্রমেই থাক, তোমার অনিচ্ছা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না, দূর থেকে তোমার বেদ-গান শুনব।"

"তা হয় না, তাতে উভয়তঃ—যাক্—দেখ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ। এই আমার পরম সুখ—চরম শান্তি। সংসারে আমার ঐ একটি সাধ অপূর্ণ ছিল, তুমি তা পূর্ণ ক'রে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করেছ; বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করবেন। আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা ক'র না, আমি এখন আসি।" তিনি চলিয়া গেলেন। কেশবের সঙ্গেও আর সাক্ষাৎ করিলেন না।

পূর্ণিমাতে আমার জন্ম, পূর্ণিমাতে আমার বিবাহ, আজ পূর্ণিমাতে আমি জীবন্মৃত হইলাম।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক
প্রসঙ্গ

রেডিও টেলিফোনি

অধুনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বে-তারবার্ত্তা-প্রেরণ সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাড়িত-পরিচালক তারের সাহায্যে এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। আজকাল বে-তারবার্ত্তা প্রেরণের বা রেডিও টেলিফোনির উপযোগী অনেক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানেও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা প্রেরিত হইতেছে; কোনও নগরে কোনও প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন, দূরবর্ত্তী নগরের অধিবাসীরা তাহা শুনিতেছে। এই সমস্ত কারণে ইহা জনসমাজে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা আর শুধু বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আবদ্ধ নাই। যাঁহারা কখনও বিজ্ঞানের ধার দিয়াও যান নাই, য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি দেশের এরূপ বহু সহস্র লোক কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য রেডিওবার্ত্তা-ধারণ-যন্ত্র (Radio receiving apparatus) সকল গৃহে রাখিয়াছেন। ইহার দ্রুত উন্নতি ও উপকারিতা হইতে আশা করা যায় যে, আর ২।১ বৎসরের মধ্যে ইহা আমাদের দেশের ও প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইবে। মানুষ বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে প্রকৃতিকে কিরূপে আয়ত্ত করিয়া আমোদ-প্রমোদের কার্য্যে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা প্রত্যেকের পক্ষে সঙ্গত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ বিষয়েই কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, রেডিওবার্ত্তা-প্রেরণ তাড়িত-শক্তিযোগে সম্পন্ন হয়, কিন্তু কিরূপে হয়; তাহা বলিয়া বুঝাইতে গেলে একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। শব্দ যেরূপভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছায়, ইহা তাহারই অনেকটা অনুরূপ। মনে করুন, একটি ছোট জলাশয়ের দুই বিপরীত দিকে দুইটি কাষ্ঠখণ্ড ভাসিতেছে। যদি একটিকে আঘাত করা যায় বা জলটা নাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, সেই স্থান হইতে ছোট ছোট তরঙ্গ সৃষ্ট হইতেছে ও ক্রমশঃ বড় হইয়া জলাশয়ের অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া তত্রত্য কাষ্ঠখণ্ডটিকে নাচাইতেছে। বক্তা বা শ্রোতার ভিতরে বা দুইটি বে-তার-বার্ত্তাবহ ষ্টেশনের মধ্যে এইরূপ ব্যাপারই চলে। প্রথম কাষ্ঠখণ্ডটিকে বার্ত্তাপ্রেরণস্থান (Transmitting Station), দ্বিতীয়টিকে বার্ত্তাগ্রহণস্থান (Receiving Station) ও জলকে বার্ত্তাবাহক আশ্রয় (medium) ভাবিতে পারা যায়। কোন জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই স্থান হইতে অসংখ্য তরঙ্গ সৃষ্ট হয় ও তাহারা আয়তনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জলাশয়ের অপর দিকে পৌছায় বা তৎপূর্ব্বেই জলে মিশিয়া যায়। সেইরূপ কোন স্থানে কোন কথা বলিয়া শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিলে সেই তরঙ্গ জলতরঙ্গের ন্যায় দূরে নীত হয় এবং অপর ব্যক্তি শুনিতে পায়।

বস্তুর ইতস্ততঃ আন্দোলনে শব্দের উৎপত্তি। অবশ্য যে-কোনরূপ আন্দোলনেই শব্দ উৎপন্ন হয় না, সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, শব্দের আন্দোলন বা কম্পনসংখ্যা (frequency) এক সেকেণ্ডে ৩০এর কম ও ৩০ হাজারের বেশী হইলে আমরা সে শব্দ শুনিতে পাই না। যে স্থান হইতে দোলন বা কম্পন আরম্ভ হয়, দক্ষিণে ও বামে যাইবার পর পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলে একটি সম্পূর্ণ দোলন হয় ও এক সেকেণ্ডে এইরূপ যতগুলি দোলন হইত, ততগুলি সেই বস্তুর কম্পনসংখ্যা (Frequency)। কোন বস্তু উল্লিখিতভাবে আন্দোলিত হইলে সেখান হইতে

তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয় এবং বায়ু বা অন্য কোন আশ্রয় (medium) দ্বারা ক্রমশঃ দূরে নীত হইয়া আমাদের কর্ণে পৌঁছাইয়া তাহার ভিতরে যে একটি পাতলা পর্দ্দা (Drum) আছে, তাহাকে আন্দোলিত করে ও তথা হইতে সেই শব্দচৈতন্য মস্তিষ্কে পৌছায় এবং তখন আমরা শুনিতে পাই। শব্দতরঙ্গ সর্ব্বদা কোন জড় বস্তুকে (material medium) আশ্রয় করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, এই আশ্রয় কঠিন (solid), তরল (liquid) অথবা বাষ্পীয় (gas) যে কোনরূপ হইতে পারে ; কিন্তু আলোক, উত্তাপ ও তাড়িত তরঙ্গ-প্রবাহ ব্যাখ্যা করিতে বৈজ্ঞানিকগণ "ইথার" নামক এক আশ্রয়ের (medium) কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কতকটা ইস্পাতের মত গুণবিশিষ্ট, অথচ ইহা জগতের প্রত্যেক স্থানে - এমন কি, প্রত্যেক বস্তুর অণু-পরমাণুর মধ্যস্থিত সংকীর্ণ স্থানেও বিরাজমান। ইহার গুণ সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানা গিয়াছে, এমন কি, ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আজকাল বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। যাহা হউক, আপাততঃ আমাদের কার্য্যের জন্য ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

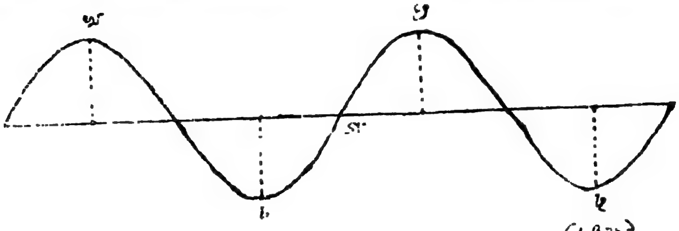

১ নং চিত্র

ইথার আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত কতকগুলি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। এক তরঙ্গের চূড়া বা খোল হইতে ঠিক পরবর্ত্তী তরঙ্গের চূড়া বা খোল পর্য্যন্ত যত মাপ হয়, তাহাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) বলে। সমুদ্রতরঙ্গ দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় যে, তরঙ্গের চূড়ার পর খোল ও খোলের পর চূড়া ঠিক এইরূপভাবে প্রবাহিত হয়। (১ নং চিত্র)

রঞ্জন-রশ্মি—আন্দাজ $\frac{১}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চ। যে কাগজে সিগারেট প্রস্তুত হয়, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ পুরু হইলে $\frac{১}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চ পুরু হয়।

দৃশ্যমান (visible) আলোক-তরঙ্গ-- $\frac{১}{৩০০০০}$ হইতে $\frac{১}{৬০০০০}$ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

তাড়িত-তরঙ্গ (ছোট)—.২৪ ইঞ্চ এবং যাহা বে-তার-বার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহার হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ১ হাজার ফুট হইতে ৫০ হাজার ফুট বা তাহারও বেশী হইতে পারে।

এই সমস্ত তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ইথারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় ; কিন্তু বায়ুর মধ্যস্থিত শব্দ-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে আন্দাজ ১ হাজার ৯০ ফুট। এই জন্যই বন্দুকের আওয়াজ হইলে শব্দ শুনিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে আলোক দেখা যায়।

বার্ত্তা-প্রেরণ ও বার্ত্তাগ্রহণ স্থানের কার্য্যাবলী ও কিরূপে তাড়িত-তরঙ্গ প্রস্তুত, প্রবাহিত ও গৃহীত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে দুই একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বিবরণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

আজকাল প্রায় প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে তাড়িত-শক্তির অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই শক্তি রাত্রিকালে ঘরে আলো দিতেছে, গরমে হাওয়া করিতেছে, রাস্তায় গাড়ী টানিতেছে এবং আরও নানাবিধ কায করিতেছে ; কিন্তু এই সমস্ত তাড়িতকে (electricity) কোন জড় বস্তু বলা চলে না।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুকেই বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য অংশ বলিয়া জানিতেন ; কিন্তু এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক অণু 'ইলেক্‌ট্রন' নামক কতকগুলি আরও ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি কোন আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া অণু বলিয়া পরিচিত হয়। ইলেক্‌ট্রনগুলি ঋণাত্মক (negative) তাড়িতকণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠনের আধুনিক মত অনুসারে পরমাণুগুলি ছোটখাট সৌরজগতের মত। সৌরজগতের সূর্য্যের মত ইহার মধ্যস্থলে একটি ধনাত্মক (positive) কেন্দ্র থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রনগুলি গ্রহসমূহের মত আবর্ত্তিত হয়। যদিও বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু সমূহের গুণও বিভিন্ন, তথাপি বিস্ময়ের বিষয় যে,

তাহারা একই ইলেক্‌ট্রন দ্বারা গঠিত। ইলেক্‌ট্রনগুচ্ছের আকার ও গঠনের উপর বিভিন্ন পরমাণুর পার্থক্য নির্ভর করে। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় ইচ্ছামত দলবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। জগতের প্রত্যেক বস্তুই অণু পরমাণুর সমষ্টি; কিন্তু যে কয়টি অণু-পরমাণু লইয়া ইহা গঠিত হয়, তাহা ছাড়াও অনেক বিচ্ছিন্ন ইলেক্‌ট্রন অণুকণা সকলের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ স্থানসমূহে অবস্থান করে এবং এই ইলেক্‌ট্রনগুলির সঞ্চালনই তাড়িত সৃষ্টি করে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, সাধারণ কোন যন্ত্র দ্বারা বলপ্রয়োগে ইলেক্‌ট্রনগুলি সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। কতিপয় রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বা চুম্বক-শক্তিপ্রভাবে এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়, যাহাকে তাড়িত-বিজ্ঞানে তাড়িতসঞ্চালনশক্তি (electromotive force) বা তাড়িত-চাপ (electric pressure) বলে। যেমন কোন জিনিষের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ 'গজ'এ বা ওজনের পরিমাণ 'সের'এ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তাড়িত-সঞ্চালন-শক্তির পরিমাণ Voltএ প্রকাশ করা হয়।

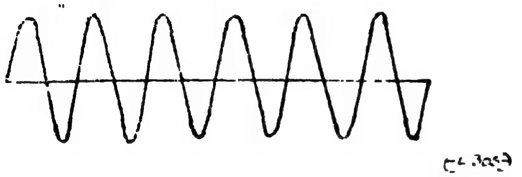

২নং চিত্র

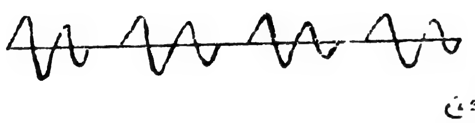

৩নং চিত্র

মনে করুন, একটি নলের ভিতর দিয়া জল যাইতেছে। এই জলকে ইচ্ছামত একই দিকে অথবা এক বার অগ্রে ও পুনরায় পশ্চাতে প্রবাহিত করিতে পারা যায়। সেইরূপ তাড়িতশক্তিও উল্লিখিত দুই প্রকারে প্রবাহিত হইতে পারে; প্রথমটিকে অবিচ্ছিন্ন (continuous) ২ নং চিত্র ও দ্বিতীয়টিকে পর্য্যায়—ক্রমাগত (alternate) তাড়িত প্রবাহ কহে। এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য আর এক প্রকারের তাড়িত প্রবাহিত হইতে পারে। ইহাতে তাড়িতশক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে না বহিয়া যেন ইতস্ততঃ বিকম্পিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ইহাকে দোদুল্যমান (oscillatory) তাড়িত প্রবাহ কহে। ৩নং চিত্র হইতে ইহার কতক ধারণা হইতে পারে।

কোন চক্রের (circuit) ভিতর তাড়িত প্রবাহের ফলে উত্তাপ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও চুম্বক-শক্তি সম্বন্ধে মাত্র দুই একটি কথা বলিব।

ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ কোন তারের নিকট একটি শূন্যে প্রলম্বিত চুম্বক শলাকা আনিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, (৪ নং চিত্র) উহা বিচলিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,ঐ স্থানে তাড়িত শক্তিদ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। একটি তারের কুণ্ডলীর (coil) ভিতর একখানি লৌহ রাখিয়া ঐ তারের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যখনই তাড়িত প্রবাহ বন্ধ হইবে, তখনই ঐ শক্তি অন্তর্হিত হইবে। ভিতরে তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ একটি তারের কুণ্ডলী 'ক' আনিলে দ্বিতীয় কুণ্ডলীর 'খ' ভিতর ক্ষণিক তাড়িত প্রবাহিত হইবে, যদি ইহার চক্র (circuit) সম্পূর্ণ থাকে অর্থাৎ ঐ তারের দুই মুখ যুক্ত থাকে। যখনই প্রথম কুণ্ডলীতে তাড়িতের শক্তির পরিবর্ত্তন হইবে বা দ্বিতীয়টি ঐ চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবে, তখনই দ্বিতীয়টিতে তাড়িত প্রবাহিত

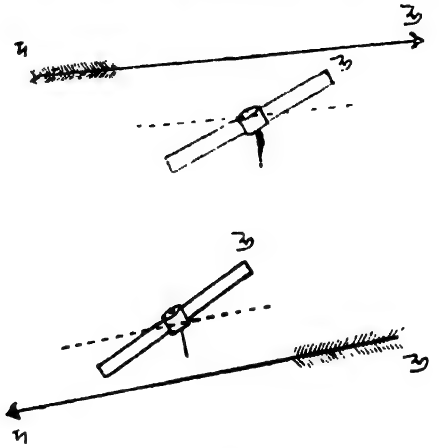

৪নং চিত্র

হইবে, এবং এই তড়িত্তকে (Induced) তাড়িত বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইটি কুণ্ডলীর ভিতর কোন যোগ না থাকিলে ও একটির ভিতর তাড়িত প্রবাহিত হইলে অপরটিতে তাড়িত স্রোত পাওয়া অসম্ভব। (৫ নং চিত্র)।

ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোন এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিবার পর পূর্ণগতি প্রাপ্ত হইতে কিছু সময় লাগে ও পুনরায় থামিবার সময়ও এঞ্জিনের বাষ্পশক্তি অন্তর্হিত করিলেও ইহার গতি সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে কিছু সময় লাগে। এই ব্যাপার ট্রেণে ভ্রমণকালে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবার বা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িবার সময় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

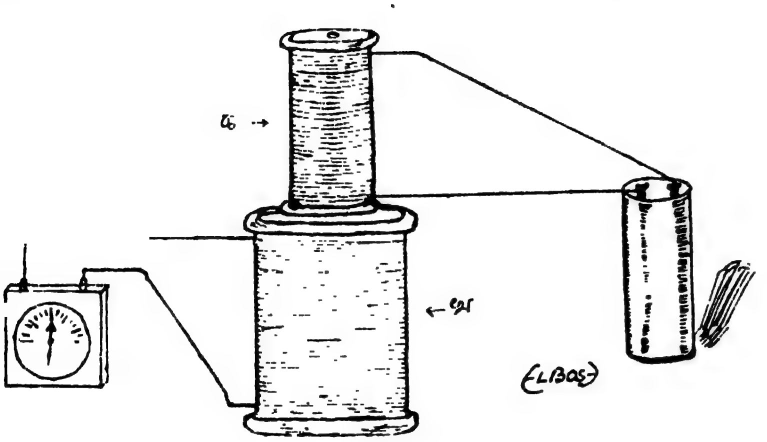

৫নং চিত্র

সেইরূপ কোন চক্রস্থিত কুণ্ডলীমধ্যে তাড়িত প্রবাহের সঞ্চালনকালে ঐ প্রবাহ একেবারেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, বা প্রবাহ বন্ধ হইবার সময় একেবারেই হঠাৎ বন্ধ হয় না। এই কুণ্ডলী যেন এই কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এই ধর্ম্মকে উহার (Inductance) বলে, এবং ইহা বেতার-বার্ত্তা-প্রেরণ কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কার্য্যে আর এক প্রকার যন্ত্রের দরকার হয়, তাহার নাম "কনডেন্সর।" ইহা তাড়িত শক্তিকে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে, এবং ইহার এই ধর্ম্মকে ইহার "তাড়িত-ধারণ-ক্ষমতা" (capacity) বলে। সামান্য পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত দুইটি ধাতুপাত্রের মধ্যে বায়ু, কাচ বা অন্য কোন তাড়িত অপরিচালক (Insulator) বস্তু থাকিলে সেই সবটাকে একটা সাধারণ "কনডেনসর" বলা হয়।

"কনডেন্সরের" কার্য্য অনেকটা কোন যন্ত্রের স্প্রীংএর কার্য্যের মত। ইহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

বেতার-বার্ত্তার বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সতার-বার্ত্তাপ্রেরণের (wire telephone) বিষয় ব্যাখ্যা করিলে ব্যাপারটা অনেক সহজ বোধ হইবে। ইহাতে বার্ত্তাপ্রেরণ-স্থানে (Transmitting end) একটি খুব পাতলা ধাতুর পর্দ্দার (diaphragm) সম্মুখে কথা বলিয়া তাহাকে কম্পিত করা হয়, এবং এই কম্পন তাড়িত-স্রোতেও কম্পন উপস্থিত করে। এই রূপান্তরিত তাড়িতস্রোত পরিচালক তারের ভিতর দিয়া বার্ত্তাগ্রহণস্থলে পৌঁছিয়া তথায় রক্ষিত অপর একটি পর্দ্দাকে সমভাবে কম্পিত করে, এবং এই কম্পন দ্বারা একই শব্দ পুনরুৎপাদন করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে শব্দতরঙ্গ দ্বারা তাড়িত-স্রোতে রূপান্তরিত হয়, এবং কিরূপেই বা তাড়িতস্রোত পুনরায় একই শব্দের সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপারের প্রথম কার্য্য "মাইক্রোফন্" (microphone) নামক এক যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। একটি সাধারণ ও সহজ মাইক্রোফনের ছবি (৬নং) দেওয়া গেল। 'ক' পর্দ্দাটি একটি কঠিন বেষ্টনের ভিতর খাড়া আছে, এবং ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি অঙ্গারের (carbon) বোতাম 'খ' সংলগ্ন আছে। আর 'চ' 'ছ' দুইটি পাতলা স্প্রীং দ্বারা 'খ'এর সহিত খুব সামান্যভাবে স্পর্শ করিয়া আর একটি বোতাম 'গ' আছে। ছবিতে যেরূপ আছে, সেইরূপ ভাবে একটি তাড়িত-উৎপাদক যন্ত্র (Battery) 'ব' সংযুক্ত করা হইলে ক, খ, গ, চ, এর ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্দ্দাটি স্থির থাকে অর্থাৎ বোতাম (খ, গ) দুইটি পরস্পর স্পর্শ করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাড়িত-স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পর্দ্দাটি সামান্য বিচলিত হইলেই খ ও গ এর ভিতরের চাপের পরিবর্ত্তন হয় ও ঐ স্থলে তাড়িত প্রবাহে বাধা (Resistance) উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা চক্রে প্রবাহিত তাড়িত শক্তির

হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহা সহজে বুঝা যাইবে যে, ঐ পর্দ্দার সম্মুখে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইবে, সেই শব্দের প্রকৃতি অনুযায়ী তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে এবং তদনুসারে পর্দ্দাটিও কম্পিত হইবে। এই কম্পনই পুনরায় চক্র-প্রবাহিত তাড়িতের প্রকৃতি তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিবে।

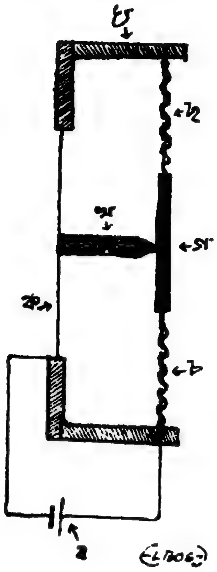

৬নং চিত্র

'মাইক্রোফন' দ্বারা সাধিত তাড়িতের এই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হইতে যে যন্ত্র দ্বারা পুনরায় উহা শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহার নাম বার্ত্তাগ্রহণ যন্ত্র (Teleph one reciver)। (৭নং চিত্র)। ইহার কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্ববর্ণিত তাড়িতের চুম্বক-শক্তির উপর নির্ভর করে। এই ছবিতে 'ক' একটি নিত্য চুম্বক (Permanent magnet); ইহার দুই প্রান্ত দুইটি তারের কুণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত যাহার ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত করিয়া ইহার চুম্বক-শক্তিকে আবশ্যকমত সংযত করিতে পারা যায়। একটি লৌহ-পর্দ্দা 'খ' ঠিক ঐ চুম্বকের সম্মুখে, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া, অবস্থিত আছে। যখন কুণ্ডলীর মধ্যস্থিত তাড়িত প্রবাহিত হয়, তখন চুম্বক-শক্তির আকর্ষণে লৌহ পর্দ্দাটি সামান্য সম্মুখদিকে সরিয়া আইসে এবং কুণ্ডলী-প্রবাহিত তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তন হইলে চুম্বকের আকর্ষণীশক্তিও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়।

পর্দ্দার স্থিতি-স্থাপকতা (elasticity) গুণবশতঃ সম্মুখে ও পশ্চাতে সঞ্চালিত হইয়া কুণ্ডলী-প্রবাহিত তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তনের অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করে। নিম্নের ৮নং ছবি হইতে সতারবার্ত্তা প্রেরণের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত বুঝা যাইবে। মাইক্রোফনের সম্মুখে শব্দতরঙ্গ সৃষ্ট হইলে উহার পর্দ্দা কম্পিত হয় এবং এই কম্পনের ফলে তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন চুম্বকের আকর্ষণীশক্তিরও অনুরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত করে, যদ্দ্বারা বার্ত্তা-গ্রহণ যন্ত্রের পর্দ্দাও প্রথম পর্দ্দাটির ন্যায় কম্পন সুরু করে। আর এই কম্পন শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

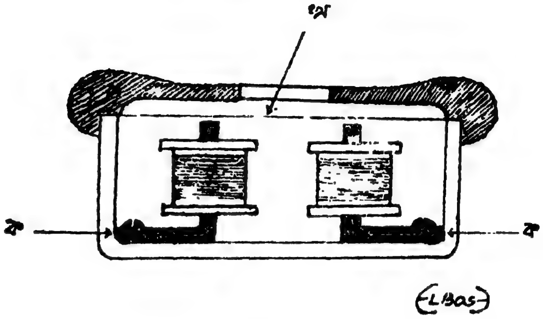

৭নং চিত্র

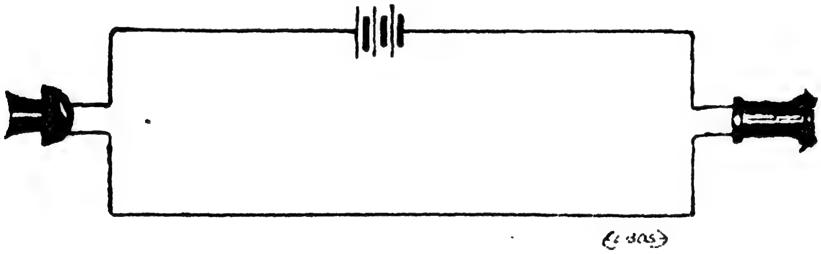

৮নং চিত্র

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী (অধ্যাপক)।

হীরক

এবার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম হীরকের মধ্যে প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিব। কৃত্রিম হীরক সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে।

প্রথম বর্ণহীন পোখরাজ, জারকন্, স্পাইনেল ইত্যাদি; দ্বিতীয় হীরকের অনুকরণে নির্ম্মিত কাচখণ্ড; তৃতীয় পরীক্ষাগারে নির্ম্মিত হীরক। প্রথম দুই প্রকারের কৃত্রিম হীরক বাজারে চালান হইয়া থাকে; পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হীরকের সহিত প্রকৃত হীরকের কোনরূপ পার্থক্য নাই, কিন্তু তাহারা আকারে এত ক্ষুদ্র ও অল্পকালস্থায়ী যে, তাহারা হীরক বলিয়া বিক্রীত হয় না। এই হীরক কিরূপে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। তবে এ কথা সত্য যে, ভবিষ্যতে হীরক-প্রস্তুতপ্রণালী এতদূর উন্নত হইতে পারে যে, তখন খনি হইতে প্রাপ্ত হীরকের অনুরূপ হীরক পরীক্ষাগারে নির্ম্মিত হইবে ও হীরক বহুমূল্য পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অপর দুই প্রকার কৃত্রিম হীরকের পরিচয় জ্ঞাত হইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১) হীরকের বিক্ষেপ শক্তি (Dispersive power) অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহার দ্যুতি পোখরাজাদি অপেক্ষা অধিক।

(২) হীরক ক্রয় করিবার সময় ইহাকে আধার হইতে ভিন্ন করিয়া 'কারবোর‍্যান্ডন্' দ্বারা ইহার কাঠিন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক; অকৃত্রিম হীরকের উপর কোন রেখা টানিতে পারা যায় না, কিন্তু কৃত্রিম হীরকে অতি সহজেই রেখা টানিতে পারা যাইবে। 'টেবল' ও 'কলেট' এই পৃষ্ঠদ্বয়ের কঠিনতা প্রথমেই পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(৩) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, হীরক সমমান শ্রেণীর অন্তর্গত স্ফটিক, অর্থাৎ আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া চলে না; একমাত্র 'স্পাইনেল'এর সহিত এই বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও স্পাইনেলের কঠিনতা হীরক অপেক্ষা যথেষ্ট অল্প।

(৪) হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা নিরূপণ করা আবশ্যক। হীরকের অনুকরণে কর্ত্তিত কাচখণ্ডের বিক্ষেপক্ষমতায় হীরকের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কঠিনতায় তাহা হীরকের সমতুল্য নহে। রণট্‌জেন রশ্মির কৃপায় কাচখণ্ডকে হীরক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণ নাই।

হীরকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু না বর্ণন করিলে হীরকের গুণাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। হীরক অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধনের জন্য অলঙ্কাররূপে যে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ইহার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাচ কাটায় হীরক ব্যবহৃত হয়, ইহাও অনেকে অবগত আছেন। কিন্তু হীরকের যে কোন অংশ দ্বারা কাচ কাটা যায়, এ ধারণা ভুল; তাহা দ্বারা মাত্র দাগ টানা যায়। সুচারুরূপে কাচ কাটিতে হইলে এমন একটি খণ্ড নির্ব্বাচন করা উচিত, যাহার স্বাভাবিক বক্র পৃষ্ঠদ্বয় স্থূল কোণে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মৃত্তিকা-গর্ভে মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান আছে কি না, ইহা অবগত হইতে হইলে প্রস্তর-স্তর ভেদ করিয়া কিছুদূর খনন করিয়া দেখিতে হয়; এই প্রস্তর-স্তর স্থানে স্থানে এত কঠিন যে, হীরকখণ্ড-সমন্বিত খনন যন্ত্রের (Diamond Drill) সাহায্য লওয়া ব্যতিরেকে খননকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই যন্ত্রে নিকৃষ্ট হীরক রোর‍ট্ ও কারবন্‌ডো ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারে সংযোজিত অন্যান্য রত্নে ছিদ্র করিতে হইলে হীরকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। হীরকের সাহায্য লইয়া অধুনা যন্ত্র ও খনিজবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু কার্য্য দ্রুত ও অল্প ব্যয়ে করিতে পারা যায়। কামানের জন্য ব্যবহৃত কঠিন ইস্পাতে ছিদ্র করিতে হইলে যন্ত্রের অগ্রভাগে হীরকখণ্ড সন্নিবিষ্ট থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স নির্ম্মাণে হীরক উপযোগী, কিন্তু মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ইহার প্রচলন হয় নাই। প্রাচীনকালে বিষের প্রতিষেধক ও উন্মাদ রোগের মহৌষধিরূপে হীরক ব্যবহৃত হইত। কোন রাজার নিকট সুন্দর এক খণ্ড হীরক থাকিলে সে রাজ্যে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা কখনও সংঘটিত হইত না। স্ত্রী-পুরুষের মনোমালিন্য দূর করিতে হীরক অদ্বিতীয়—শুনিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যাসত্য কেহ নিরূপণ করিয়া দেখিতে পারেন।

হীরকের মূল্য কোন বিশেষ নিয়মে নির্দ্ধারিত হয় না,—যদিও বহু নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মূল্য প্রধানতঃ বিক্রেতার বিক্রয়েচ্ছা ও ক্রেতার ক্রয়েচ্ছার উপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত আকারে বৃহৎ হীরকখণ্ড সংখ্যায় অল্পই আছে। কাযেই তাহাদের মূল্য অনেকাংশে বিক্রেতার ইচ্ছামত হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র হীরকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রতীচ্য মণিকারেরা হীরককে প্রথমে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ফার্ষ্ট ওয়াটার—বর্ণ ও দোষহীন স্বচ্ছ হীরক। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সেকেণ্ড ওয়াটার—দোষহীন অল্প বর্ণবিশিষ্ট অথবা বর্ণহীন অল্প দোষবিশিষ্ট। বর্ণের গভীরতা ও দোষের আধিক্যের জন্য হীরক যথাক্রমে থার্ড ও ফোর্থ ওয়াটার হীরক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথমে দেখিতে হয়, হীরক কোন্ শ্রেণী (Water) ভুক্ত ও কি আকারে তাহারা কর্ত্তিত, শেষে তাহার ওজন দেখিয়া মূল্য নিরূপিত হয়। হীরকের ওজন সাধারণতঃ ক্যারাটে হইয়া থাকে। ১ ক্যারাট্ = $৩\frac{১}{৫}$ গ্রেণ অথবা = ২০৫ মিলিগ্রাম; প্রায় $\frac{২}{২}$ রতি।

ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তিত ফার্ষ্ট ওয়াটার ১ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য সাধারণতঃ ২ শত ২৫৲ টাকা হইতে ৩ শত ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। 'রোজ' আকারে কর্ত্তিত হীরকের মূল্য তাহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ অর্থাৎ ১ শত ৬০ টাকা হইতে ৩ শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। মিঃ স্ক্রাউফ (Schrauf) নিম্নলিখিত নিয়মে যাহাতে হীরক বিক্রীত হয়, তাহার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে ৪ ক্যারাট ওজনের হীরকের মূল্য (৪+২)×১ ক্যারাটের যাহা মূল্য = ১২×১৫ পাউণ্ড অথবা ১২×২৫ পাউণ্ড = ১ শত ৮০ পাউণ্ড অথবা ৩ শত পাউণ্ড।

ট্যাভারনিয়েরের মতে ২ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য ২×২×৮ = ৩২ পাউণ্ড (৪ শত ৮০ টাকা)। ৩ ক্যারাট্ হীরক—৩×৩×৮ = ৭২ পাউণ্ড (১ হাজার ৮০ টাকা)।

প্রাচ্য মণিকারেরা হীরককে চারি বর্ণে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বিভক্ত করিয়া মূল্য নিরূপণ করিতেন। হেইলি এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারতের ওবালুম পল্লী খনির ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ১ মান্‌জলি অর্থাৎ ২ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য ১ শত ৩৫ টাকা ছিল; শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত হীরকের মূল্য ব্রাহ্মণ হীরকের অর্দ্ধেক। ৮ মান্‌জলি ওজনের ব্রাহ্মণ হীরকের মূল্য ২ হাজার ৭ শত টাকা। ঐ ওজনের শূদ্র-শ্রেণীর হীরকের মূল্য ২ হাজার ২ শত ২৫ টাকা হইতে তিনি দেখিয়াছেন। অন্যান্য খনির হীরকের মূল্য আমরা সঠিক অবগত নহি।

হীরকের উৎপত্তির বিভিন্ন মতাবলী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে

দেখা যাউক, পৃথিবীর কোথায় ও কি অবস্থায় হীরক পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে হীরকের জন্য জগতের সর্ব্বত্র ভারত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধুনা ভারতের সে সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। ভারতের আকরগুলি হইতে হীরক প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

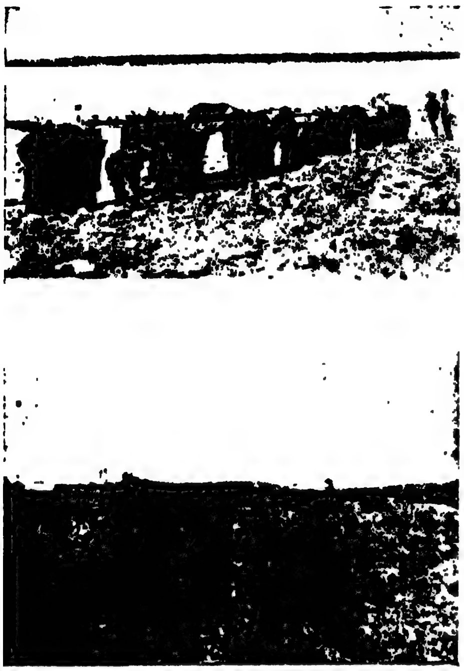

চিত্র নং ৬

বাৎসরিক যে পরিমাণ হীরক উত্তোলিত হয়, তাহার শতকরা ৯০ অংশ দক্ষিণ-আফ্রিকার খনি হইতে আইসে। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিয়া পরে জগতের অন্যান্য যে সকল স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে ভারতীয় খনিগুলির বিশদ বর্ণনা করিব।

দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক-আকরগুলি হীরক উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকৃত করিয়া আছে। কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কৃষক-বালক জ্যাকবের ক্রীড়নক প্রস্তরখণ্ডের প্রতি শাল্ক ভান্ নিকেরকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া হীরক আবিষ্কারের প্রথম সূত্রপাত করিয়া দেয় ও তাহার ফলে আজ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরক আফ্রিকার খনিগুলি হইতে উত্তোলিত হইতেছে। প্রথম প্রথম ভাল নদীর কিনারার পলিতে হীরক অন্বেষণ করা হইত ও তাহার ফলে সেই সময়ে বহু হীরক পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রমেই হীরকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নদী হইতে বহু দূরে এক স্থলে এক খণ্ড হীরক আবিষ্কৃত হইলে নদী-পলি ব্যতীত অপর কোন প্রস্তর-স্তরে হীরক পাওয়া যায় না, এ ধারণা জনসাধারণের মন হইতে দূর হইল। তখন অদম্য উৎসাহে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বহু ব্যক্তি হীরক অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি খনি আবিষ্কৃত হয়। "কিম্বারলে" ও "দবিয়ার" (De Beer) এই খনি দুইটি প্রধান। কিম্বারলের চতুর্দ্দিকে লোহিত লৌহময় মৃত্তিকা বিস্তৃত। ঐ মৃত্তিকার নিম্নে ক্ষয়-প্রাপ্ত অগ্নিজ ৩০।৯০ ফুট প্রস্তর বেসণ্ট (Basalt), তন্নিম্নে ২০০।২৫০ ফুট কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট তুল্য 'শেল' প্রস্তর, নিম্নে ১০ ফুট 'কন্‌গ্লোমারেট' প্রস্তর, তন্নিম্নে যথাক্রমে 'মেলাফায়ার', 'কোয়ার্টজাইট' 'শেল' বর্ত্তমান। উপর হইতে এই বিশিষ্ট স্তরের বিশেষত্ব সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এই স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। অল্প নিম্নে হীরক-স্তরের সহিত পারিপার্শ্বিক প্রস্তর-স্তরের বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ স্থানের হীরক-আকরগুলি ৩½ মাইল দীর্ঘ ব্যাসের বৃত্তমধ্যে অবস্থিত। এই খনিগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহারা প্রত্যেকটি প্রায় বৃত্তাকার নল সদৃশ ও মৃত্তিকার বহু নিম্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। এই নল অর্থাৎ গহ্বরগুলি আগ্নেয়গিরি যে কারণে সৃষ্ট হয়, সেই কারণেই সৃষ্ট হইয়াছিল, তবে সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির মধ্য হইতে গলিত প্রস্তরাদি যেরূপ ভীষণ বেগে বহির্গত হইয়া আইসে, ও চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া এক মহা অশান্তির সৃষ্টি করে, সেরূপ কোন ঘটনা এ ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নাই। অনুমান করা হয় যে, বহু নিম্নে নৈসর্গিক কোন কারণে জাত হীরক গলিত প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে উপরে উত্থিত হয় ও গহ্বরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলে। পার্শ্বস্থ ও নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরখণ্ডগুলি অবিন্যস্তভাবে এক প্রকার নীল মৃত্তিকায় দৃঢ়ীভূত হইয়া গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করে, এত বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর একত্র মিশ্রিত অবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নীল মৃত্তিকায় হীরক পাওয়া যায়; নীল মৃত্তিকা জল ও বায়ুর ক্রিয়ায় ফলে হরিদ্রা-বর্ণ ধারণ করিয়া উপরিভাগে অবস্থান করে। এই কঠিন নীল মৃত্তিকা উপরে উত্তোলিত হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে রক্ষিত হয়। কঠিন চ্যাঙ্গড়গুলি সূর্য্যের উত্তাপ ও বাষ্পের সংস্পর্শে নরম হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে এই মৃত্তিকাতে রীতিমত জলসেচন করা হয় ও লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করা হয় (চিত্র ৬)। কয়েক মাস পরে এই মৃত্তিকা ট্রলি-পূর্ণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও নিষ্কাশন যন্ত্র (Washing and Concentrating machine) মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া হীরক নির্ব্বাচিত হয়।

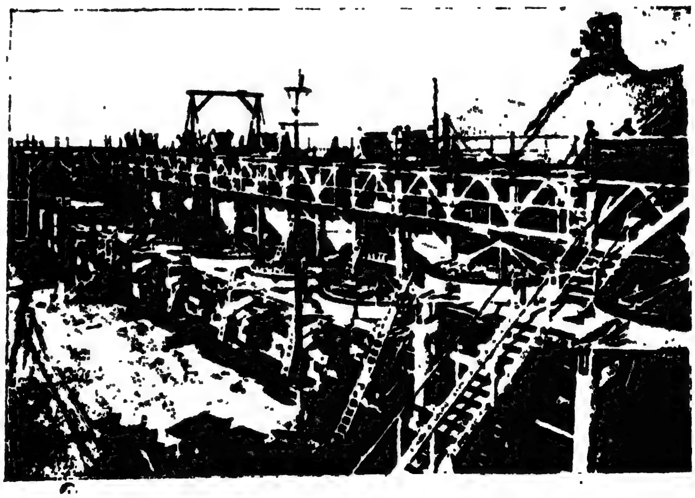

চিত্র নং ৭

এই যন্ত্রে (চিত্র ৭) জলের গতির বেগ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিয়া জলের সহিত হীরকাপেক্ষা হাল্কা চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড যাহাতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। প্রথম স্থান হইতে বহির্গত চূর্ণ প্রস্তর ও মৃত্তিকাকে পুনরায় কতিপয় স্থানে ধৌত করা হয়। হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা অধিক ; সুতরাং উহা নিম্নে অবস্থান করে ও তথা হইতে হীরক সংগৃহীত হয়। এই যন্ত্র এতদূর উন্নত যে, এক কণা হীরক ইহা হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে পারে না, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, শত শত মণ মৃত্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ধৌত করিয়া কয়েক খণ্ড মাত্র হীরক পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আফ্রিকার হীরক-খনির মধ্যে 'কিম্বারলে' ও "দবিয়ার সঙ্ঘ" এই দুইটি প্রধান। ওয়েসলেটন খনি "দবিয়ার সঙ্ঘের" অন্তর্গত। অন্যান্য হীরক-খনিতে যেরূপ উপরে আচ্ছাদন থাকে ও তন্নিম্নে হীরকের জন্য প্রস্তর-খননকার্য্য চলিতে থাকে, ইহাতে সেরূপ হয় না। (চিত্র ৮)

আফ্রিকার খনি আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রেজিলে তেজুকোর পশ্চিমে একটি স্থানে হীরক প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানটি পরে ডায়ম্যাণ্টিনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রেজিলের অন্যান্য কতিপয় স্থানে যথা—বাগাজেম্, বাহিয়া ইত্যাদি স্থানে হীরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

চিত্র নং ৮

য়ুরোপ ভূখণ্ডে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এ্যাডোলস্কয় স্বর্ণ (Adolfskoi) স্বর্ণের জন্য সংগৃহীত প্রস্তরের মধ্যে হীরক আবিষ্কৃত হয়। ল্যাপল্যাণ্ডে একটি উপত্যকামধ্যে হীরক পাওয়া যায়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আমেরিকায় ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রথম হীরক আবিষ্কৃত হয়, পরে নানা স্থানে পাওয়া যায়।

মালকা, জাভা, সেলিবিসেও হীরক পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের জন্য সংগৃহীত প্রস্তরে হীরক পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার হীরক আকারে ক্ষুদ্র।

ভারতের হীরক-আকরগুলির বর্ণনা প্রাচীন বহু সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। পুরাণ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ভারতে প্রাপ্ত রত্নরাজির গুণাবলী, আকরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ইত্যাদি বহু তথ্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার লিখিত 'মণিমালা' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত স্থান কয়টিতে হীরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

১। হৈম (হিমালয়)।
২। মাতঙ্গ (কৃষ্ণা, গোদাবরী অর্থাৎ গোলকোণ্ডা)।
৩। সৌরাষ্ট্র (সুরাট)।
৪। পৌণ্ড্র (ছোটনাগপুর) !
৫। কলিঙ্গ (উড়িষ্যা ও গোদাবরীর মধ্যস্থ প্রদেশ)।
৬। কোশল (অযোধ্যা)।
৭। বেণগঙ্গা (বাইন্ গঙ্গা)।
৮। সৌবীর (সারহিন্দ্ ও সিন্ধু নদের মধ্যস্থ প্রদেশ)।

উপরি-উক্ত প্রাচীন স্থানগুলির পার্শ্বে তাহাদিগের আধুনিক নাম লিখিত হইল। মিঃ বল্ কয়েকটি প্রবন্ধে উপরি-উক্ত স্থানগুলিতে বর্ত্তমানকালে হীরক পাওয়া যায় কি না, আলোচনা করেন। তাঁহার মতে মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় বৃহৎ সংহিতা হইতে উপরি-উক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ বল্ দেখান যে, হিমালয় প্রদেশে হীরক-আকর আধুনিক কালে নাই, তবে সিমলার নিকটবর্ত্তী এক নদীগর্ভে কয়েক খণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, প্রাচীনকালে এই সকল স্থানে হীরক-খনি থাকা অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় স্থান মাতঙ্গ অর্থাৎ গোলকোণ্ডার হীরক আকর সুপ্রসিদ্ধ। সৌরাষ্ট্রে কোন হীরক-আকর নাই ও অনুমান করা হয় যে, প্রাচীনকালে ঐ স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত মাত্র। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ পয্যটক ফিট্চ ও নিউবোল্ড বেলগাঁওসহরে যে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত, তাহার কথা প্রকাশ করেন। সম্বলপুর ও ছোটনাগপুরের কতক অংশের প্রাচীন নাম পৌণ্ড্র। এই দুইটি স্থানে হীরক পরে পাওয়া গিয়াছিল। মহানদীর মোহানা ও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কতিপয় স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত, ইহারই প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। বেণ-গঙ্গার আধুনিক নাম বৈরাগড় ; হীরক-খনি এ স্থানে ছিল। মিঃ বল দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র সৌবীর ব্যতীত বিবরণীর অপর সকল স্থল হীরকের সহিত সংশ্লিষ্ট ; কোথাও হীরক পাওয়া যাইত—আবার অপর কোথাও হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত।

পাশ্চাত্য ভাষায় ভারতের হীরকখনির বৃত্তান্ত ট্যাভারনিয়ের প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ১৬৬৫—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের হীরকখনিগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হেন্‌রী হাওয়ার্ড, পরে ডিউক অফ নরফোক কতকগুলি অপ্রকাশিত হীরকখনির বিবরণী ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। দুই শত বৎসর পরে মিঃ বল পূর্ব্বোক্ত হীরকখনিগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ট্যাভারনিয়েরের পর হইতে বহু পাশ্চাত্য পর্য্যাটক হীরক-আকরগুলি দর্শন করিয়া নিজ নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের হীরক-আকরের কথা হেন, রিটার, নিউবোল্ড লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমরা অবগত হই।

এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্ কোন্ স্থলে হীরক-প্রাপ্তির সঠিক খবর আমরা জ্ঞাত। ভারতবর্ষে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন তিনটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হীরক আবিষ্কৃত হয়, ইহা আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই। সকল স্থলেই হীরক বহু প্রাচীন ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রস্তরের সহিত পাওয়া যায়। এই তিনটি ভূখণ্ডের দক্ষিণে যেটি অবস্থিত, তাহাই বিখ্যাত গোলকোণ্ডা খনি বলিয়া পরিচিত।

খনিগুলি কিন্তু গোলকোণ্ডার বহুদূরে অবস্থিত; গোলকোণ্ডায় প্রকৃতপক্ষে কোন খনি ছিল না, এ স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত মাত্র। তোগলক্‌বংশের পতনের পর ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডায় মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এই রাজ্যের রাজধানী গোলকোণ্ডায়—অধুনা একটি পরিত্যক্ত দুর্গ ব্যতীত প্রাচীনকালের কোন গৌরব-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দক্ষিণ ভূখণ্ডে, মাদ্রাজ প্রদেশে পাঁচটি জিলায় (১) কুডাপা, (২) বেল্লারী, (৩) কারনুল, (৪) কৃষ্ণা, (৫) গোদাবরী হীরক সংগৃহীত হইত। এই পাঁচটি জিলার মধ্যে শেষোক্ত তিনটি জিলা হীরক উৎপাদনে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলার খনিগুলিই তথাকথিত গোলকোণ্ডার হীরকখনি বলিয়া পরিচিত। কুডাপা জিলার খনিগুলিকে তিনটি নাম দেওয়া হয়—১। চেন্নুর, ২। কুণাপরতি, ৩। ওবালুমপল্লি। চেন্নুরে পরিত্যক্ত অনেকগুলি হীরকের খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, এই খনি হইতে দুইটি হীরকখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে ৭৫ হাজার ও ৪৫ হাজার টাকা। কুণাপরতির খনিগুলি ডাঃ হেন ও নিউবোল্ড বর্ণিত কোণডাপেটা খনি। নিউবোল্ড লিখিয়াছেন যে, কোণডাপেটা খনিগুলি চতুষ্কোণাকার এবং ৪ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। উপরিস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ—স্থানীয় নাম রেগুর, ইহাতে তুলা জন্মে। ৩ হইতে ১০ ফুট গভীর রেগুরের নিম্নে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বহু প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়; ইহারই মধ্যে হীরক অবস্থান করে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; ইহারা নিকটস্থ অথবা দূরস্থ পর্ব্বত-গাত্র হইতে নদী কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এই স্থলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড খনন করিয়া উপরে উত্তোলিত হইত এবং উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত জলপূর্ণ আধারে সযত্নে রক্ষিত হইয়া তন্মধ্য হইতে হীরকখণ্ড নির্ব্বাচন করা হইত। হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা অধিক, সুতরাং আধারের তলদেশে পতিত হয়। পরে অপ্রয়োজনীয় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে পূর্ব্বোক্ত আধারের চতুষ্পার্শে বিস্তারিত করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হীরক অন্বেষণ করা হইত। জলনিষ্কাশনে সুবিধা ছিল না বলিয়া বর্ষাকালে খনির কার্য্য বন্ধ রাখা হইত।

ওবালুম পল্লীর খনিগুলি সম্ভবতঃ ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

(২) বেল্লারী জিলায় নিম্নলিখিত স্থান তিনটিতে হীরক পাওয়া যাইত। ১। মুনিমাদাগু। ২। ভাজরাকারুর। ৩। গুটি। বানাগানপিল্লীর ১৬ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে মুনিমাদাগুতে নাতিপ্রশস্ত হীরক-স্তর কুডাপা স্তরের উপর অবস্থিত। নিউবোল্ডের যাওয়ার বহু পূর্ব্বেই এই খনিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়েও বহু হীরক-পালিশকারক মুনিমাদাগুতে বাস করিত। যে যন্ত্র-সাহায্যে তাহারা হীরক পালিশ করিত, সে যন্ত্রের প্রতিচিত্র তিনি তাঁহার প্রবন্ধের সহিত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এখানকার পালিশকরেরা, হীরক-চূর্ণ দ্বারা হীরক-সংস্কার করিতে পারা যায় ও হীরক-কর্ত্তনের সময় স্বাভাবিক ভঙ্গ তলভাগের সাহায্য লইতে হয়, এই তথ্য দুইটি অবগত ছিল। মুনিমাদাগুতে যেরূপ স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়, ভাজরাকারুতেও সেরূপ স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়। এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর মৃত্তিকার উপর কখনও কখনও হীরক পতিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিঃ চ্যাপার এই স্থানের একটি প্রাকারপ্রস্তর-মধ্যে (Pegmatite Vein) দুই খণ্ড হীরক পাইয়াছিলেন।

মুনিমাদাগু ও ভাজরাকারুর মধ্যভাগে গুটি খনি অবস্থিত ছিল। এই খনির উল্লেখ ডাঃ হেইনের প্রবন্ধমধ্যে পাওয়া যায়।

(৩) কারনুল জিলায় বহু স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে; বানাগানপিল্লী তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই স্থানের হীরক-স্তর ‘বানাগানপিল্লী বালু-স্তর বলিয়া পরিচিত। উত্তর ভারতে রিওয়া-স্তর যেরূপ হীরক-উৎপাদক, দক্ষিণ-ভারতে বানাগানপিল্লী স্তরও তদ্রূপ। বানাগানপিল্লী কারনুলের ৩৭ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। হেইন, নিউবোল্ড, ম্যালকমসন, ভয়সে, কিঙ্গ প্রভৃতি পর্য্যটকগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এখানকার খনিগুলির বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ কিঙ্গ বলেন, “বানাগানপিল্লী ‘কোয়ার্টজাইট’ প্রস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত প্রাচীন ‘শৈল’স্তর ও অগ্নিজ প্রস্তর ট্র্যাপ (trap) এর উপর অবস্থিত। এই স্তরের গভীরতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। প্রায় ১৫ ফুট গভীর গহ্বর খনন করিয়া চক্রবালের সহিত সমান্তরালে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয় ও হীরক-স্তরের নিকট উপনীত হওয়া যায়। খনির মধ্যে ৬ ফুট গভীর এক প্রকার স্তর অপেক্ষাকৃত গভীর বালু-স্তরের সহিত অবস্থিত: ইহার মধ্যে হীরক পাওয়া যায় শুনিলাম; উপরে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, ইহা ‘কাংগলোমারেট’ প্রস্তর। এই স্থানের সমস্ত খনিতেই এই প্রকার প্রস্তরমধ্য হইতে হীরক পাওয়া যায়। ভূমিগর্ভ হইতে কাংগ্‌লোমারেট উত্তোলিত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা হয় ও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইবার জন্য বিস্তৃত করিয়া রাখা হয়; পরে শুষ্ক-বালু হইতে হীরক নির্ব্বাচন করা হয়। আকারে বৃহৎ হীরকখণ্ড এ স্থানে কখনও পাওয়া গিয়াছে, এমত শুনা যায় না। কারনুল জিলার অন্যান্য খনিগুলির মধ্যে রামুলকোটা, তিমাপুরম, গুরামনকোণ্ডা, ডেওমুরো, বস্‌ওয়াপুর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এ প্রদেশের রাওলকোণ্ডা হীরকখনির কথা পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, প্রাচীন রাওলকোণ্ডার বর্ত্তমান নাম রামুলকোটা। এই রাওলকোণ্ডার খনির বিষয় ট্যাভারনিয়ের এক স্থলে লিখিয়াছেন, “এই স্থানের হীরক-স্তর মাত্র অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পুরু। লৌহ-আঁকড়াশী দ্বারা এই স্তরটিকে উপরে উত্তোলন করা হয়। এই স্থানের এক একটি হীরকখণ্ডের মূল্য ২ হাজার হইতে ৬ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা হইতে দেখা গিয়াছে। হীরক কর্ত্তনের জন্য লৌহচক্র ব্যবহৃত হয়।”

(৪, ৫) কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলা (গোলকোণ্ডা হীরকখনি)। কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিলে প্রথমেই কোলার খনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে যথাক্রমে উপ্‌তা পিল্লী, কেণ্ডাভতিকালু, আংকুর, বারথেনপাড়ু, পারসিয়ান, মুলাভেলি, গোলাপিল্লী খনি আমরা দেখিতে পাই। আরও একটু পশ্চিমে ডামারপড় ও মালাভরমে পরিত্যক্ত খনি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের বিষয় কোন পর্য্যটক উল্লেখ করেন নাই। মিঃ বল বলেন যে, বর্ত্তমান কোলার খনিই ট্যাভারনিয়ের লিখিত গানিকুলুর ও অন্যান্য পর্য্যটকগণ লিখিত গানি খনি। এই কোলার খনি হইতেই সুবিখ্যাত ‘কোহিনুর হীরক আবিষ্কৃত হয়। ট্যাভারনিয়ের যে বৎসর হীরকখনি পরিদর্শন করিতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র ১ শত বৎসর পূর্ব্বে এই খনিটি আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, এক কৃষক জমী কর্ষণ করিতে করিতে ৫০ রতি পরিমাণ এক খণ্ড উজ্জ্বল প্রস্তর পাইয়া গোলকোণ্ডার এক হীরক-বিক্রেতার নিকট দেখাইলে সে তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তরটিকে হীরক বলিয়া চিনিতে পারে। তখন লোকমুখে ঐ প্রদেশে হীরকপ্রাপ্তির কথা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে বহু ধনী ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া মৃত্তিকা খনন করাইতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ২০ হইতে ৮০ রতি ওজনের বহু হীরক ঐ স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরকের ওজন ১ হাজার ৮ শত রতি পরিমাণ। এই হীরকখণ্ডটি মিরিসগোলা আওরঙ্গজেবকে উপঢৌকন প্রদান করেন। ট্যাভারনিয়ের এই স্থানে ৬০ হাজার মজুর লোককে হীরকখনন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদিগের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ট্যাভারনিয়ের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, প্রথমেই তাহারা এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইত, যাহার নিম্নে প্রস্তরস্তরমধ্যে হীরকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সেই স্থানের অনতিদূরে অপর এক খণ্ড জমী পরিষ্কার করিয়া প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন

করিয়া লইত। প্রাচীরের নিম্নভাগে জমীর উপর ২ ফুট অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত চতুর্দ্দিকে খনন করিয়া জলে পূর্ণ করিয়া রাখিত। ইচ্ছামত জল-নির্গমনের ব্যবস্থা ছিল। পরে ১৪ ফুট গর্ত্ত খনন করিয়া হীরকস্তরস্থ মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীর-বেষ্টিত জমীর মধ্যে আনয়ন করিয়া গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিত। ২।৩ দিন পরে জল-নির্গমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে কর্দ্দমমিশ্রিত জল বহির্গত হইয়া যাইত। এই ভাবে সমস্ত কর্দ্দম বাহির হইয়া গেলে মাত্র বালি পড়িয়া থাকিত। পরে রৌদ্রে বালি শুষ্ক হইয়া গেলে চালুনির দ্বারা চালিয়া হীরক সংগৃহীত হইত।

পারসিয়াল্ খনির সহিত উস্তাপিল্লী, কদাভেটি, কালু, মুগালুর, আটকুর খনিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যে অবস্থায় পারসিয়াল্ খনিতে হীরক পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেরূপ রূপান্তরিত (Metamorphosed) প্রস্তর-স্তরের উপর অবস্থিত নদী কর্ত্তৃক কারনুল প্রস্তর হইতে আনীত প্রস্তর-স্তরে হীরক পাওয়া যায়, সেই ভাবে উপরি-উক্ত প্রত্যেক খনিতে হীরক পাওয়া যাইত। মুলেলি ও গোলাপিল্লী এই দুইটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী খনিগুলি এক শ্রেণীভুক্ত। ডাক্তার হেইনী, ভয়সে, বেঞ্জা, নিউবোল্ড প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই খনির বিষয় কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সময়েই কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। মিঃ কিঙ্গ বলেন যে, ডুড়ুগট্ পাহাড়ের বালু-স্তর হীরকপ্রাপ্তির জন্য খনিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পর্য্যটকগণ হীরক-স্তরের সহিত অপর একটি কঙ্কর-স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার বেঞ্জারোর মতে সেই স্তরটি সামুলকোটায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সামুলকোটায় ঐ স্তর হইতে হীরক পাওয়া যায়। আরও একটু উত্তরে ভদ্রচেলমে গোদাবরী-তীরে হীরক-খনির কথা ভয়সে ও নিউবোল্ড উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড বেহার ও উড়িষ্যায় মহানদীর উপত্যকায়, পশ্চিমে মধ্যদেশে, উত্তরে শোণ নদীর একটি শাখা-নদীর উপত্যকায় বিস্তৃত। দ্বিতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত সম্বলপুরের নিকটবর্ত্তী হীরাকুণ্ডে হীরক পাওয়া যাইত। সম্বলপুর-রাজার অধীনে এই খনিটি ছিল। ঝুনাল্ গ্রামের এক বৃদ্ধা 'ঝি'র (হীরক-সংগ্রাহক) নিকট অনুসন্ধান করিয়া ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল লিখিয়াছেন যে, মহানদীর মধ্যভাগে ঝুনালের নিকট একটি দ্বীপ ছিল, এই দ্বীপটির নাম 'হীরাকুণ্ড।' দৈর্ঘ্যে ইহা ৪ মাইল। নদীস্রোত দ্বিখণ্ডিত হইয়া ইহার উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। বৈশাখের খরতপ্ত সূর্য্য-কিরণে নদীর জল যথেষ্ট হ্রাস পাইলে ৪।৫ হাজার লোক মিলিত হইয়া উত্তরের জলপ্রবাহের গতি বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিলে সমস্ত জল দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইত। তখন নদী-গর্ভের প্রস্তর-খণ্ডের মধ্য হইতে হীরক সংগ্রহ করা হইত। এই অনুসন্ধানকালীন স্বর্ণ পাওয়া গেলে তাহা 'ঝি'দিগের প্রাপ্য ছিল। যদি কোন 'ঝি'র ভাগ্যবলে এক খণ্ড হীরক পাইত, তাহা হইলে রাজা সেই হীরকটির পরিবর্ত্তে তাহাকে একখানি গ্রাম দান করিতেন।

গঙ্গা-গর্ভে হীরকপ্রাপ্তির কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু কোন বিবরণী লিপিবদ্ধ নাই। মিঃ ব্লচম্যান আইন-ই-আকবরি হইতে সঙ্কলন করিয়া বলেন যে, হিরপা গ্রামে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। এই গ্রামটি বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থিত।

সিমলার নিকটবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য নদীতে কয়েক খণ্ড হীরক পাওয়া যায়; কলিকাতার মিউজিয়মে ঐগুলি রক্ষিত আছে।

তিনটি মুখ্য স্থানের মধ্যে ২টির বৃত্তান্ত লিখিত হইল। তৃতীয়টি মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের একটি দেশীয় রাজ্য পান্নার নিকটে অধিকাংশ খনি অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের খনিগুলি 'পান্না খনি' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। নিম্নলিখিত স্থান কয়টিতে হীরক-প্রাপ্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা,—পান্না, কামারিয়া, ব্রিজপুর, মাজগোহা, উদ্সেনা, সাকারিয়া, এট্ওয়া ইত্যাদি।

পান্নার হীরক-খনির নাম ট্যাভারনিয়েরের ও অন্যান্য পর্য্যটকদের তালিকামধ্যে নাই, সুতরাং মনে হয়, ইহা বহু পরে আবিষ্কৃত হয়। পান্নায় অগভীর কন্গলোমারেট স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়, এই স্তরটি উপর কাইমুর বালুস্তর ও পান্না শেলের মধ্যে অবস্থিত; এই স্তরটি কোথাও ২ ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর নহে। এই স্থানের অপর একটি হীরক-স্তর রিওয়া বালু-স্তরের উপর ও ভাণ্ডের সিরীজের নিম্নে অবস্থিত। উভয় স্থানেই কান্গেলোমারেটে স্তর-মধ্যে হীরক পাওয়া যায়, তবে এই স্থানের কন্গলোমারেট বহু স্ফটিকখণ্ড ও জ্যাসপার আছে। কন্গলোমারেট স্তর ব্যতীত নদীগর্ভে ও পার্শ্বে কখনও কখনও হীরক পাওয়া যায়। ভূতত্ত্বে জলজ স্তরগুলিকে বয়স হিসাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। হীরক কিরূপ স্তরের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে লিখিত বিবরণী দৃষ্টে বোধগম্য হইবে।

ভাণ্ডের বিভাগ—গন্নুরগড় শেল।

হীরক-সমন্বিত কংগলোমরেট স্তর—

রিওয়া বিভাগ—উচ্চরিওয়া বালুস্তর, ঝিরি শেল, নিম্ন রিওয়া বালুস্তর, পান্না শেল।

হীরক-সমন্বিত—কংগ্লোমারেট স্তর—

কাইমুর বিভাগ—উচ্চ কাইমুর বালু-স্তর, কাইমুর কংগ্লোমারেট, বিজয়গড় 'শেল', নিম্ন কাইমুর বালুস্তর।

এই স্তরগুলির মধ্যে কাইমুর বিভাগীয় স্তরগুলি বয়সে সর্ব্ব-প্রাচীন। মিঃ ভ্রেডেন্বর এই প্রদেশে তিন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে হীরকখননকার্য্য দেখিয়াছিলেন।

(১) ৫০ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া কংগ্লোমারেট স্তর খনন করিয়া উপরে উত্তোলিত হয়। যথাসম্ভব হীরক বাহির করার পর খনি পরিত্যক্ত হয়।

(২) হীরক-স্তরের আবরণ শেল স্তর নদী কর্ত্তৃক ক্ষয় পাইয়া যাওয়ায় হীরক-স্তর উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে গর্ত্ত খনন করিবার প্রয়োজন হয় না। কার্য্য অত্যন্ত সহজ।

(৩) নদী-পলি যেখানে 'কংগ্লোমারেট' স্তরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সে স্থানে ৩০।৪০ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া প্রস্তর উপরে উত্তোলিত হয়, এই প্রস্তরের স্থানীয় নাম 'মুদ্দা।' *

মধ্যভারতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যত হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আর হীরক পাওয়া যায় না।

খৃষ্টাব্দ	ক্যারাট	মূল্য	লোক নিযুক্ত
১৯১৪	৫৪·৬৫	৭৯১	৯১৩
১৯১৫	৩৫·৯৯	৬০৩	৫৫৫
১৯১৬	২০·৪২	৩৬১	৬১৪
১৯১৭	২৮·৫২	১৭০০	৫১৯
১৯১৮	৭৩·২৯	২৬২৫	২৩৭৫ †

এই পান্না হীরকখনি হইতে পূর্ব্বে বহু হীরক আবিষ্কৃত হইত। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যামিল্টন এই স্থানের খনি হইতে প্রাপ্ত এক খণ্ড হীরকের ৫০ হাজার টাকা মূল্য হইতে দেখিয়াছেন। আকবরের সময়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক উত্তোলিত হইত। বাৎসরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক প্রাপ্ত হইতে ফ্রাঙ্কলিন সাহেব দেখিয়াছিলেন। ইহার এক-চতুর্থাংশ পান্নারাজের প্রাপ্য ছিল, অবশিষ্টাংশ বান্দা, চার্খারি, জয়েৎপুররাজের প্রাপ্য ছিল। ‡

---

* Rec. Geol. Survey of India vol xxxiii, by Vredenburg.

† Rec. Geol, Survey vollii, by Pascoe.

‡ Ball's The Ceology of India, part iii.

পৃথিবীর কোথায় কি অবস্থায় হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহা লিখিত হইল। কিন্তু কিরূপে তাহারা খনিমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস কি, এই তথ্য অবগত হইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন হইতে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ব্রিউষ্টার এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, উদ্ভিদাদি হইতে নির্গত এক প্রকার রন্ধন তুল্য পদার্থ জমিয়া হীরকে পরিণত হয়। পরে বহু মতবাদ সৃষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই এই বিষয়ে একমত হয়েন যে, উদ্ভিদাদি অথবা প্রাণি-শরীর পচিয়া যে অঙ্গার সৃষ্ট হয়, হীরক তাহারই উপাদান, কিন্তু কিরূপে অঙ্গার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া হীরকে পরিণত হইল, ইহার বিভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রবল উত্তাপ দ্বারা অঙ্গার হইতে হীরক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরে যখন দেখা গেল, প্রবল উত্তপ্ত অঙ্গার গ্রেফাইটে রূপান্তরিত হয়, তখন তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করেন যে, ভৌগর্ভিক মহাশক্তি-ক্রিয়ার ফলে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মিঃ প্যারটের ধারণা, অত্যুগ্র জলন্ত অঙ্গার সহসা শীতল হওয়ার ফলে হীরক সৃষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক-স্তরগুলি পরীক্ষা করিয়া লিউইস্ সাহেব অনুমান করেন যে, গলিত প্রস্তর ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হওয়া কালীন অঙ্গারক-শেল হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে এবং কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে অঙ্গার হীরকে পরিণত হয়।

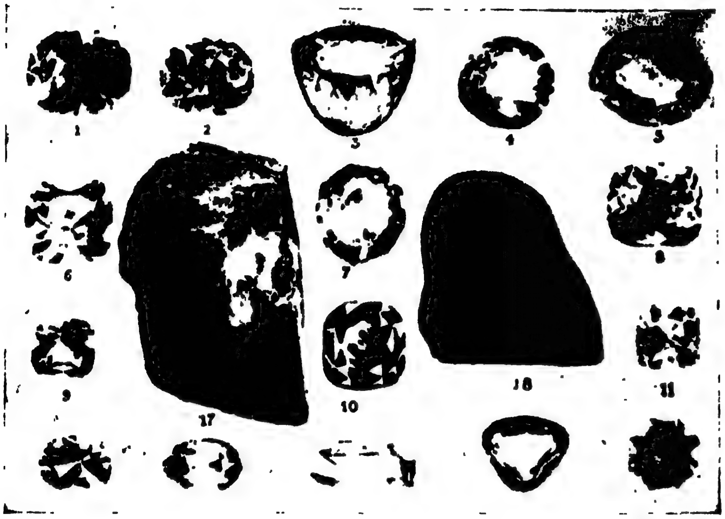

চিত্র নং ৯

এখন দেখা যাউক, পরীক্ষাগারে কিরূপে হীরক নির্ম্মিত হইতে পারে। ময়স্যান (Moissan) বৈদ্যুতিক চুল্লী (Electrical arc furnace) মধ্যে হীরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে সার উইলিয়াম ক্রুকস্ মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া ময়স্যান বৈদ্যুতিক মহানলে কয়েক খণ্ড হীরক প্রস্তুত করেন।

হীরক-প্রস্তুত-প্রণালী,—"অমিশ্র লৌহ, গন্ধক, সিলিকন্, ফস্ফরাস্ বিহীন ও শর্করাজাত অঙ্গার উভয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া অঙ্গার-পাত্রে (Carbon crucille) রাখিয়া বৈদ্যুতিক মহানলে ৪০ হাজার ডিগ্রী পরিমাণ তাপ প্রদান করিলে দেখা যায়, লৌহ মোমের মত দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে। পরে সেই অগ্ন্যুত্তপ্ত পদার্থটিকে বাহিরে আনয়ন করিয়া শীতল জলের মধ্যে স্থাপন করিলে গলিত লৌহ কঠিন হওয়া কালীন আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও মধ্যস্থ অঙ্গারকে প্রবলবেগে চাপিতে থাকে; অঙ্গারও আয়তনে বৃদ্ধি পায়; আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পদার্থের পাত্রমধ্যে স্থান না হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রবল শক্তিতে ঠেসিতে থাকে। এই ঠেসাঠেসি অর্থাৎ চাপনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড নির্ম্মিত হয়। আকারে ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বাহ্যাবয়বে, বর্ণে, স্বচ্ছতায় প্রকৃত হীরকাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।" * ভীষণ চাপনের ফলে সৃষ্ট হীরকখণ্ড কিছু দিন পরে আপনা আপনি ভগ্ন হইয়া যায়। আমরা জানি যে, বহু হীরকখণ্ড ভ হইতে উত্থিত করিয়া উপরে আনিবার সময় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আফ্রিকার হীরক-খনির বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত কয়েক অংশ হীরক একত্র সংযোজিত করিয়া একটি হীরকে পরিণত করা গিয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নীল মৃত্তিকা-স্তরে হীরক সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু বহু নিম্নে ভূগর্ভে অত্যধিক চাপের ফলে ঐগুলি সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে উপরে উত্থিত হওয়া কালীন চাপের হ্রাস হয় ও ঐগুলি বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করে।

মূল কথা, হীরকসৃষ্টির প্রকৃত রহস্য আমরা সঠিক অবগত নহি। যাহা অনুমান করা হয়, তাহা এখনও সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে যে এই বিষয়ে অধিকতর অবগত হইব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকের মতে উল্কাপতনের সহিত হীরক পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। যে সকল স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উল্কা পতিত হইয়াছিল; কোথাও মৃত্তিকা নরম বলিয়া গলিত পিণ্ড পৃথিবী-গর্ভে কিয়দ্দূর প্রবিষ্ট হইয়াছে, অপর কোন স্থানে মৃত্তিকা কঠিন বলিয়া পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরে জল, বাতাসের সংস্পর্শে তাহারা ক্ষয় পায় ও তাহাদের সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া ক্ষয় পায় নাই; বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এ্যারিজোনা প্রদেশের এক স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২ হাজার লৌহ খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। এক বৃহৎ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড কোন স্থলে পতিত হইলে যেমন একটি গহ্বর সৃষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ একটি গহ্বর এই স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা হইতে অনুমান করা হয়, কোন সময়ে এখানে উল্কাপাত হইয়াছিল। ডাক্তার ফুট এক খণ্ড লৌহমধ্যে হীরকের কণা আছে, ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন; পরে অধ্যাপক ময়জ্যান্ ফ্রিডেল্ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ কয়েকটি হীরক-কণা লৌহমধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরি-উক্ত তথ্য সত্য হইলে উল্কাপাতের বিভীষিকা আমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। হীরকখচিত উল্কার আগমন শুভ চিহ্ন বলিয়া সূচিত হইবে।

ঐতিহাসিক হীরক

আকারে বৃহৎ হীরক সচরাচর পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ কখনও যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কোন নাম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ হীরক ভারতের খনি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরকের (চিত্র নং ৯) সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিখিত হইল: —

(১) "কোহিনূর" :—১৩০৪ খৃষ্টাব্দে এই হীরকটি মোগল-সম্রাটের

---

* Diamond by Sir William Crookes.

হস্তে পতিত হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এই হীরকটি হস্তগত করেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর এই হীরকটি বিভিন্ন ব্যক্তির হস্ত ঘুরিয়া পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎ সিংহের অধীনে আইসে। শিখসাম্রাজ্যের পতন হইলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাকে হস্তগত করেন। লর্ড ডালহৌসী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার প্রদান করেন। এই ভাবে এই বিখ্যাত হীরকটি ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডের রাজমুকুটে শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, এই হীরকটি দক্ষিণ-ভারতের কোলার খনিতে আবিষ্কৃত হয়।

(২) "লোত্রি দ এ্যাঙ্গলেতর" :—ওজন ৪৯ ক্যারাট্।

(৩) "হাইদ্রাবাদ নিজাম" :—নিজামের সম্পত্তি। ইহার ওজন ৩ শত ৪০ ক্যারাট ছিল, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইহা ভগ্ন হইয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান ওজন ২ শত ৭৯ ক্যারাট্।

(৪) "অর্লফ" :—রুস রাজবংশ ধ্বংসের পর সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে এই হীরকটি আইসে। কথিত আছে, এই হীরকটি এক সময়ে ত্রিচিন্নাপল্লীর নিকটবর্ত্তী কাবেরীতটস্থ একটি মন্দিরে ব্রহ্মামূর্ত্তির নয়নরূপে বিরাজ করিত। সেই স্থান হইতে জনৈক ফরাসী সৈনিক ইহাকে অপহরণ করিয়া এক জাহাজের কাপ্তেনকে বিক্রয় করে। প্রিন্স অরলফ্ ৯০ হাজার পাউণ্ড মূল্যে এক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া জার-মহিষী দ্বিতীয় ক্যাথারিণকে উপহার প্রদান করেন।

৫। "কোহিনুর"—প্রথম কর্ত্তনের পর ওজন ১ শত ৭৯ ক্যারাট্।

৬। "পিট"—ওজন ১ শত ৩৭ ক্যারাট্। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পারসিয়াল (গোলকোণ্ডা) খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার ওজন তখন ৪০১ ক্যারাট্ ছিল। মাদ্রাজের গভর্ণর টমাস পিট ইহা ৩ লক্ষ ৬ সহস্র টাকায় ক্রয় করেন। পরে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ডে তিনি ইহাকে কর্ত্তন করান; কর্ত্তন করিবার সময়ে ইহার চূর্ণ বিক্রয় করিয়া তিনি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কর্ত্তনের পর ইহার ওজন ১ শত ৬৩ ক্যারাট্ হয়। তিনি পরিশেষে ফরাসী রাজপ্রতিনিধিকে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, কিন্তু ঐ দস্যু বিক্রয়ে অসমর্থ হইয়া অক্ষত অবস্থায় প্রত্যর্পণ করে। এই হীরকটি এখন প্যারিসের প্রদর্শনীতে রক্ষিত আছে।

৭। "টাস্কানি"—ওজন ১ শত ৩৩ ক্যারাট্। বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ; এই বর্ণের জন্য হীরকটির মূল্য হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা প্রথমে টাস্কানির ডিউকের সম্পত্তি ছিল, পরে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের হস্তগত হয়।

৮। "ষ্টার অফ্ দি সাউথ"—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে বাগাজেম হীরকখনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন—বর্ত্তমান ওজন ১ শত সাড়ে ২৫ ক্যারাট্। কর্ত্তনের পূর্ব্বে ৬ লক্ষ টাকায় ইহা বিক্রীত হয়।

৯। "পোল ষ্টার"—৪০ ক্যারাট্—ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তিত। জনৈক রুসীয় ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি।

। "টিফানি"—১২৫৩ ক্যারাট্। বর্ণ ঈষৎ লোহিতাভ পীত। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত জুয়েলার টিফানি এণ্ড কোম্পানীর সম্পত্তি।

১১। "হোপ"—নীলবর্ণ—৪৪ ক্যারাট্। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ের কোলার খনি হইতে সংগ্রহ করিয়া ফরাসী-সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। তখন ইহার ওজন ৬৭ ক্যারাট্ ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা অপহৃত হয়। বহু দিন পরে লণ্ডনের এক হীরক-ব্যবসায়ীর নিকট ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় টমাস্ ফিলিপ হোপ ক্রয় করিয়া, ১২ লক্ষ টাকায় হাবিব বেকে বিক্রয় করেন। এক বৎসর পরে পারিসের নীলামে হীরক-ব্যবসায়ী রোজিনাম্ মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড ম্যাকলিনকে ৯ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। একই প্রকার ৩ খণ্ড হীরক পাওয়া যায়, ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ট্যাভারনিয়েরের হীরকটি পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

১২। "সান্সি"—২৩টি হীরক এই নামে পরিচিত। চার্লস্ দে বোল্ডএর মৃত্যুর পর নিকোলাস্ সান্সি ইহাকে সংগ্রহ করিয়া রাণী এলিজাবেথকে বিক্রয় করেন; ১ শত বৎসর পরে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমস্ ফরাসী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা অপহৃত হয়।

১৩। "ইউজিন সাম্রাজ্ঞী"—৫১ ক্যারাট্। রুসের জার-মহিষী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ জনৈক ব্যক্তিকে ইহা উপহার প্রদান করেন। পরে তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁহার নব-পরিণীতা বধূর জন্য ক্রয় করেন। ফরাসী রাজবংশের ধ্বংস হইলে বরোদার গাইক্ওয়াড় ক্রয় করিয়া লয়েন।

১৪। "সা"—৮৬ ক্যারাট্। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই হীরকটি পারস্য-রাজপুত্র Chosroes জার নিকোলাসকে উপঢৌকন প্রদান করেন। সেই সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় যে, হীরকে ৩টি ভগ্ন পৃষ্ঠ ছিল ও তিন স্থলেই পারস্য-সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকে। কর্ত্তিত হওয়ার পর ইহার ওজন স্বভাবতঃ হ্রাস হইয়া যায়।

১৫। "নাসক"—ওজন ৯০ ক্যারাট্। দক্ষিণ-ভারতের একটি হীরকখনিতে আবিষ্কৃত হয় ও ভারতীয় জনৈক নৃপতি ক্রয় করেন। কিন্তু পরে সে স্থান হইতে অপহৃত হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের এক নীলামে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ডিউক ক্রয় করিয়া লয়েন।

১৬। "পাশা"—৪০ ক্যারাট্। ইজিপ্টের ভাইসরয় ইব্রাহিম ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ক্রয় করেন।

১৭। "কলিনন্"—৩ হাজার ২৫ ক্যারাট্। এই হীরকটি ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়া খনি হইতে আবিষ্কৃত হয়; ওজনে এত বড় হীরক আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ইহা ক্রয় করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মদিবসে উপহার প্রদান করেন। পরে এই হীরকটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। ইহা ইংলণ্ডের রাজমুকুট ও রাজদণ্ডের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

১৮। "এক্সেলসর"—কলিনন্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জগরেস্ফণ্টাইন্ হীরকখনি হইতে ইহা আবিষ্কৃত হয়।

উপরি-উক্ত হীরকগুলি ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ হীরক পৃথিবীর বহু স্থানে আছে। কয়েকটির কথা লিখিত হইল।

"মোগল"—ওজন ৭ শত ৮৭ ক্যারাট, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কোলার খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ট্যাভারনিয়ের ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"আকবর শাহ"—বরোদার গাইকওয়াড় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করেন।

"দারয়াই-নোর"—নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া ইহা হস্তগত করেন। এক আফগান সৈনিক অপহরণ করিয়া লয়। পরে বহু হস্তান্তরিত হইলে রুসিয়ার জার ক্রয় করিয়া লয়েন। রাজবংশ ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট আছে।

"নেপোলিয়ান", "কিমবরল্যাণ্ড" ইত্যাদি বহু হীরকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রতারক

১৫

তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রকৃতি গম্ভীরা। ইডেন উদ্যান ক্ষণপূর্ব্বে লোক-কোলাহলমুখরিত ছিল বটে, কিন্তু এই মাত্র জনশূন্য হইয়াছে। এই লোকবিরল রজনীতে সার্পেণ্টাইন খালের তটস্থ কাষ্ঠাসনে বসিয়া একা বিমলেন্দু রায়।

মেঘের পর মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছে, দুই একবার বিদ্যুৎ হানিতেছে, ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিবে। সে দিকে বিমলেন্দুর দৃষ্টি ছিল না! সে তন্ময় হইয়া খালের জলরাশির দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া ছিল। তাহার মনের মধ্যে তখন ভাবসমুদ্রের কি তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, সে-ই বলিতে পারে।

উদ্যানের এক জন শান্তিরক্ষক দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিল, নিকটে আসিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলিল, তখন রাত্রি গভীর। বিমলেন্দুর সমাধিভঙ্গ হইল, সে ধীরে ধীরে উদ্যানের বাহির হইয়া গেল!

তখন মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, মুহূর্ত্ত পরেই বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রবল বায়ুতাড়নায় মেঘ সরিয়া যাইতেছিল বলিয়া আশানুরূপ বারিপাত হইল না!

বিমলেন্দুর অঙ্গে বারি বর্ষিত হইল, কিন্তু তখনও তাহার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার গতির একটা লক্ষ্য ছিল বলিয়াও অনুমিত হইল না। সে ময়দানের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইল। তখন আবার আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছিল। বিমলেন্দুর সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত হইল, আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বোধ হয়, তখনও বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই,—সে আর্দ্রবসনেই লক্ষ্যহীন অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এমনই তন্ময় অবস্থায় সে কতক্ষণ পথ চলিয়াছে, তাহা জানিতেই পারে নাই। যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, সে কালীঘাটের আদিগঙ্গার ঘাটে উপনীত হইয়াছে। তখন ঘাট জনশূন্য। শ্রান্ত বিমলেন্দু ঘাটে উপবেশন করিল। গঙ্গায় তখন পূর্ণ জুয়ার। বৃষ্টি তখন থামিয়াছে বটে, কিন্তু বায়ুর বেগ উপশমিত হয় নাই। বায়ুতাড়নায় দেশীয় নৌকাগুলি গঙ্গাতরঙ্গে নাচিতেছিল তাহাদের দীপশিখাও সেই সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গাবক্ষে কত প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিতেছিল! নাতিদূরে নৌকার উপরে মাঝি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছিল, সেই বংশীধ্বনি নীরব নিশীথে মনের মধ্যে অতীতের কত সুখস্মৃতিই জাগাইয়া তুলিতেছিল!

বিমলেন্দুর সে দিকে তখন দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ। সে তখন কত কি ভাবিতেছিল! ভাবিবার তাহার অনেক ছিল। তাহার ইভ যে দিন তাহাকে ছাড়িয়া ইহলোক হইতে পরপারে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে আজ এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইয়াছে। সে দুষ্টগ্রহের মত লক্ষ্মীছাড়ার মত আজ এক বৎসরকাল পথে পথে ঘুরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় নাই। সুধাংশুর স্নিগ্ধ রশ্মি বলিয়া সে যাহাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল, গ্রহবশে জীবনে মরণে সে তাহার নিকট তপ্ত অঙ্গারের মতই অনুমিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম লেফটানেণ্ট সিবরাইট ও পাদরী ডেনিস তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছেন ও সংসারী করিবার নিমিত্ত কত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, সে ক্ষিপ্তের মত মন্দারমালাকে সর্পভ্রমে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষিপ্তের মত দুই মাসকাল সে ইভের প্রতি কৃত পাপের অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার পর এক দিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে।

সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে প্রতিমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুতাপের জ্বলন্ত রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।—ক্ষমা? কিন্তু এক বিন্দু করুণাও সে তাহার উত্তরে পায় নাই, প্রতিমা পত্রের উত্তরই দেয় নাই। তাহার পর সে ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। অশান্ত প্রেতাত্মার ন্যায় তাহার আত্মা কোথাও শান্তি পায় নাই। মাসে মাসে পুরীতে তাহার পত্র গিয়াছে, কিন্তু এ যাবং কোনও পত্রেরই প্রত্যুত্তর সে পায় নাই। বৎসরাধিক পরে কোথাও শান্তি না পাইয়া সে আবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কে বলে, ইহজীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?

বিমলেন্দু ভাবিতেছিল, তাহার প্রতারণার কথা,—তাহার পাপের কথা। মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া সে সরলা একান্ত-নির্ভরশীলা বালিকার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে পাপ বাসনা লুকাইয়া রাখিয়া কলুষিত মনে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাণ দেখাইয়াছে। তাহার এ পাপের—এ প্রতারণার শাস্তি কি, প্রায়শ্চিত্ত কি? ঐ ভাগীরথীর শীতল চঞ্চল বারিরাশির মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত হইলে কি এই অনুতাপের তুষানলের জ্বালার নিবৃত্তি হয়? কে বলিয়া দিবে তাহাকে, এ পথে সে শান্তি পাইবে কি না?

আর এক নারীকে সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর পশুর মত নির্য্যাতিত করিয়াছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ সে—নিজের আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও নির্ব্বন্ধাতিশয়তার যূপকাষ্ঠে সে তাহাকে বলি দিয়াছে। দলিত কীটও ফিরিয়া দংশন করে, কিন্তু সে ত নিপীড়িতা হইয়াও তাহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়হীন পিশাচ সে, তাহার অযাচিত প্রেমের অর্ঘ্য পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে; নিষ্ঠুর নরহন্তা সে, তাহার বুভুক্ষু আত্মার কাতর করুণা-ভিক্ষাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—জীবন-বিসর্জ্জন!

বিমলেন্দুর ভাবতন্ময়তা চরম অবস্থায় উপনীত হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নির্নিমেষ লোলুপ নয়নে আবিল গঙ্গা-বারির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, যেন জাহ্নবী তরঙ্গসঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বিমলেন্দুও কি এক অব্যক্ত শক্তির বলে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তকালমাত্র সে এমনই তন্ময় হইয়াছিল। তাহার পর সে সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার তন্ময়তা দূরে গেল, তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে বিমলেন্দু দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ-জটাজূট-মণ্ডিতা গৈরিকপরিহিতা সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি!

সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, পুরুষমানুষ কি এমনই ক'রে হা-হুতাশ ক'রে বেড়ায়, না গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়? ছিঃ ছিঃ!"

বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে মা আপনি?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি যে হই, তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। যাকে চাইছ, তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকলেই কি তাকে পাবে? পুরী যাও, শান্তি পাবে। আত্মঘাতী হয়ে আর পাপের মাত্রা বাড়িও না।"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া যাইতেছিলেন, বিমলেন্দু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "মা, আপনি কি অন্তর্যামিনী? পুরীর কথা আপনি জান্‌লেন কি ক'রে? কে আপনি মা?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "সে অনেক কথা। পুরী যাও, সব জান্‌তে পারবে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আর্দ্রবসনে আর থেকো না। যাও।"

সন্ন্যাসিনী আর দাঁড়াইলেন না, মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিমলেন্দু এই আশ্চর্য্য প্রহেলিকার কোন সমাধান করিতে পারিল না, সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, কে ইনি, কোথায় থাকেন, আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন?

২৬

'যাও মা, একবার শেষ দেখা ক'রে এস', মাতাজী কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে প্রতিমাকে কথা কয়টি বলিলেন।

প্রতিমা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কথার কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কক্ষও ত্যাগ করিল না। মঠের মাতাজীর কক্ষে উভয়ে কথা হইতেছিল।

মাতাজী আবার বলিলেন, 'যাও মা, কুণ্ঠা বোধ কোরো না।'

প্রতিমা মুখখানি না তুলিয়াই অস্ফুট স্বরে বলিল, "মা!"

মাতাজী সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "বুঝিছি, এ দেখায় কি বিপদ তোমার। কিন্তু এই একটিবারমাত্র বৈ ত নয়। বিশেষ সে কত আশা ক'রে এসেছে, তাকে বুঝিয়ে আসাও ত দরকার।"

প্রতিমা বলিল, "বোঝাবার কি আছে? দেখা আর না হ'লেই ত ভাল।"

মাতাজী বলিলেন, "না, তা ভাল না। তোমার কি বলবার আছে, তাকে জানবার অবসর দাও। যাও মা।"

মাতাজী এই কথা বলিয়া প্রতিমাকে দ্বারপথের দিকে আগাইয়া দিলেন, প্রতিমা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

প্রশস্ত দালান পার হইতে তাহার পা কাঁপিতেছিল। সম্মুখের কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল, সে কক্ষে প্রবেশকালে তাহার চরণ আর যেন চলিতে চাহে না! তাহার বক্ষ দুরু দুরু স্পন্দিত হইতেছিল, সে ক্ষণকাল দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে পাদবিক্ষেপ করিল।

কক্ষের অপর প্রান্তে এক জন লোক একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া ছিল, তাহার দৃষ্টি অনুক্ষণ দ্বার-পথেই নিবদ্ধ ছিল, সে যেন কি এক আশায় কাহার প্রতীক্ষায় তথায় অপেক্ষা করিতেছিল—সে বিমলেন্দু রায়।

দ্বার-পথে প্রতিমাকে দেখিয়াই সে মুহূর্ত্তে কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর তাহার শরীরের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া গেল, সে কেবল নির্নিমেষ-নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কতক্ষণ এই ভাবে রহিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কত কাল পরে এই দেখা—সে যে এক যুগ!

বিমলেন্দুরই প্রথমে চমক ভাঙ্গিল, সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "প্রতিমা!"

প্রতিমা শুনিয়াও যেন সে ডাক শুনিতে পাইল না, চিত্রার্পিত প্রতিমার মতই নিশ্চল, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলেন্দু এইবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার সম্মুখীন হইল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "প্রতিমা! অনেক আশা ক'রে এসেছি, কথার জবাবও দেবে না?"

প্রতিমা তথাপি নিরুত্তর রহিল। বিমলেন্দু ব্যথিত অভিমানাহত স্বরে বলিল, "জানি, আমার পাপের দণ্ডবিধান ক'রে রেখেছ, কিন্তু এ দণ্ডের কি সীমা নাই? বল প্রতিমা, একটি কথা বল, আমার এই বুভুক্ষু হৃদয় তোমার একটা কথা শোন্‌বার জন্যে হাহাকার করছে। তবুও কথা কইবে না? এই দেখ, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে বিমলেন্দু নতজানু হইয়া প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। প্রতিমা দুই হস্ত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আপনি পুরুষমানুষ, নারীর কাছে আপনার এ ভিক্ষা সাজে না।"

বিমলেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "তবে বল, আমায় ক্ষমা করেছ? আমি যতই অপরাধ ক'রে থাকি, তোমার স্বামী!"

প্রতিমা অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আবার ও কথা কেন? সে সম্বন্ধ ত ঘুচে গেছে।"

বিমলেন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা ইহকালে ঘোচবার নয়, তা তুমি আমি কি ক'রে ঘোচাব?"

প্রতিমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এখানে আপনার কি প্রয়োজন, তা ত আপনি বললেন না।"

বিমলেন্দু উন্মত্তের মত বলিল, "প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি এত নিষ্ঠুর! আমি সংসারের সকল আশা, সকল কামনা ত্যাগ ক'রে বৎসরের পর বৎসর কেবল তোমার আশায় সারা জগতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি—তোমার চিন্তাই ধ্যান, জ্ঞান, জপমালা করেছি, আমার রক্তে-মাংসে তোমার কামনা জড়িয়ে মাখিয়ে রেখেছি, তোমায় ভুল্‌তে না পেরে সব মান-অভিমান ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি,—তার কি এই প্রতিদান? তার কি এই পুরস্কার? উঃ, নারী কি এত নিষ্ঠুর! জান কি, তোমারই জন্যে আমি ইভকে হারিয়েছি? ইভ—সরলা অপাপবিদ্ধা ইভ—আমা বই সে ত কিছু জান্‌ত না, আমাকে তার উপযুক্ত কর্‌বার জন্যে হৃদয়ের সঙ্গে কত সংগ্রাম করেছি, কিন্তু তুমি, তুমি ত আমায় তার হ'তে দাও নি, অনুক্ষণ এই মনের মধ্যে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছিলে, মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে ভুল্‌তে দাও নি—"

প্রতিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কি আমার দোষ? আমি ত আমাকে দূরেই রেখেছিলেম, আপনার সুখের পথে আমি ত কণ্টক হই নি। তবে এখন কেন ও-সব কথা তুলছেন?"

বিমলেন্দু ক্ষিপ্রহস্তে প্রতিমার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "এক বিন্দুও দয়া নেই—অতি সামান্য এক ক্ষুদ্র বিন্দু? তা হ'লে জন্মের মত আমায় বিদায় দিচ্ছ? বল প্রতিমা! বল, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি।"

প্রতিমা বিমলেন্দুর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি সন্ন্যাসিনী!"

প্রতিমা আর দাঁড়াইল না, ত্বরিত-পদে দালানের দিকে অগ্রসর হইল। বিমলেন্দু কাতরকণ্ঠে বলিল, "দয়া কর্‌লে না? তবে চল্লুম, এই শেষ বিদায়!"

প্রতিমা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, বিমলেন্দু প্রায় টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তখন প্রতিমার মনের মধ্যে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। একবার সে দ্বারের দিকে হস্তপ্রসারণ করিল, তাহার যাতনাক্লিষ্ট অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা করুণ কাতর আহ্বানের ধ্বনি উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল।

২৭

যখন মাতাজী প্রতিমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, সে মেঝের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ তিনি নীরবে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সস্নেহে তাহার কুঞ্চিত আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের উপর হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ছি মা! তোমার কি সন্ন্যাসিনীর বেশ সাজে?"

প্রতিমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু মাতাজীর দিকে একবার চাহিয়াই অশ্রুসিক্ত মুখখানি নামাইয়া লইল। মাতাজী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুল্‌তে ত পার নি মা। তবে এ সাজ কেন? ভেতরে সন্ন্যাস না হ'লে বাইরে গেরুয়া রুদ্রাক্ষি কি কর্‌বে মা! সত্যি বল দিকি মা, স্বামীকে বাইরে রাখতে পেরেছো কি?"

প্রতিমা উত্তর করিবার পরিবর্ত্তে উপুড় হইয়া তাঁহার দুই পায়ে মাথা গুঁজিয়া কতকটা কাঁদিল মাত্র। মাতাজী আবার তাহার অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "তাই জানি বলেই ত কালীঘাটে তোমার স্বামীকে দেখে এখানে আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলুম—তাকে নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল কর নি মা।"

প্রতিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি মা?"

মাতাজী তখন সবিস্তারে কালীঘাটে বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করিলেন; শেষে বলিলেন, "তোমায় ভুল্‌তে পারে নি ব'লে সে সে দিন আত্মঘাতী হ'তে যাচ্ছিল। তার আগে জেনেছিলুম, তুমিও তাকে ভুল্‌তে পার নি। তাই তোমাদের মিলনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলুম। তোমার বুদ্ধি আছে মা, তুমিই ভেবে দেখ, এমন ক'রে এই বয়সে মিথ্যে অভিমান ক'রে দু'জনের জীবন বৃথা নষ্ট করা কি ভাল? যা ভগবানের অভিপ্রেত, তাতে মিথ্যে বাধা দিয়ে ফল কি? আর বাধা দিয়েও তা ধ'রে রাখতে পারবে না। আমি ব'লে দিচ্ছি, তোমাদের মিলন হবেই হবে।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনার কি তাই ইচ্ছে মা?"

মাতাজী বলিলেন, "পাঁচশ' বার। মনের মধ্যে বাসনা চেপে রেখে বাইরে ত্যাগ দেখালে কি হবে? সে ত ত্যাগ নয়, ত্যাগের ভাণ। আর দেখ, ভগবান্ তোমাদের মিলন ক'রে দিয়েছেন, তাতে অন্তরায় হয়ে কেবল পাপ সঞ্চয় কর্‌ছ বৈ ত নয়।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া বলিল, "পাপ?"

মাতাজী বলিলেন, "হাঁ, পাপ। তাই বল্‌ছি, এইবার সংসারাশ্রম কর, বিধাতার ব্যবস্থার উপর কলম চাল্‌তে যেও না।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কিন্তু মা—"

আর কথা সরিল না। মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি মা, আর বল্‌তে হবে না। ভাবছ, সে জন্মের মত চ'লে গেছে, আর আস্‌বে না?"

প্রতিমা তখনও অবনত-মস্তকে বলিল, "সে যে বড় অভিমানী—"

মাতাজী বলিলেন, "কিছু ভেবো না, বিধাতার বিধান কেউ এড়াতে পার্‌বে না। ঐ, বোধ হয় ফিরে আস্‌ছে।"

এই সময়ে শৈল মহাকোলাহল করিতে করিতে বিমলেন্দুকে হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া আসিল। তাহার চোখ-মুখ দিয়া কথার ফুলঝুরি ঝরিতেছিল,—"দেখ মা,আমাদের না ব'লে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি বালির চড়ায় খেলা কর্‌ছিলুম কি না, চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ধ'রে নিয়ে এলুম। আস্‌তে চায় না মা, বলে, তুমি না কি তাড়িয়ে দিয়েছ। হাঁ, তাই বুঝি? গল্প বল্‌বার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, না মা?"

বিমলেন্দু এতক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে মাতাজীর প্রতি তাকাইয়া ছিল, মাতাজীও তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছিলেন। বিমলেন্দু বলিল, "আপনি?"

মাতাজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমি। সেই কালীঘাটে দেখা হয়েছিল। আমিই সেই।"

বিমলেন্দু বলিল, "আপনি মা অন্তর্যামিনী—না হ'লে আপনি কি ক'রে জান্‌তে পেরেছিলেন যে, আমি তত রাত্রে ঘাটে যাব।"

মাতাজী বলিলেন, "ছি বাবা! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে অমন কথা বোলো না। আমার কালীঘাটে দরকার ছিল, তুমিও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, জগবন্ধু যোগাযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। আবার জগবন্ধুর দয়ায় এই তোমাদের যোগাযোগ হ'ল। প্রতিমা, তোমাদের যোগাযোগ ভগবান্‌ই ঘটিয়ে দিয়েছেন; শৈল নিমিত্তমাত্র। আয় শৈল! তোর বালির মন্দির গ'ড়ে দিই গে যাই।"

মাতাজী কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া শৈলকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। বিমলেন্দু কম্পিতচরণে প্রতিমার পার্শ্বে গিয়া মেঝের উপর উপবেশন করিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মাতাজী যা ব'লে গেলেন, তা কি সত্যি? বল প্রতিমা, এ স্বপ্ন নয়?"

প্রতিমাও বায়ুতাড়নায় বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল, সে বিমলেন্দুর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যে কিছুই নয়, মাতাজী আমায় সত্যি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি না বুঝে তোমার উপর মিথ্যে অভিমান করেছিলুম। বল, আমায় ক্ষমা করবে?"

বিমলেন্দুর বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বসংসার ঘুরিতেছিল, সে মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে প্রতিমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ক্ষমা? এই ভণ্ড প্রবঞ্চক স্বামীকে তুমিই ত ক্ষমা করবে প্রতিমা। তোমায় আমি যে যাতনা দিয়েছি, তার উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছি। কিন্তু তাতেও যদি—"

প্রতিমা বিমলেন্দুর মুখে করপল্লব আবৃত করিয়া বলিল, "ছিঃ! ও কথা বলে না।"

বিমলেন্দু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, এক একবার মনে হ'ত, আমি নিষ্ঠুর পশুর মত ব্যবহার করলেও, তুমি আমায় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে না,—এমন কি, এক একবার আমার অহঙ্কারের সীমা আকাশ স্পর্শ করত, মনে হ'ত, তুমি আমায় ভালবাস। সত্যি বলবে প্রতিমা, তুমি কবে হ'তে আমায় ভালবেসেছ?"

প্রতিমা—সদা গাম্ভীর্য্যময়ী স্বল্পভাষিণী প্রতিমা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তোমায় আমি গোড়া থেকেই ভালবেসেছিলুম।"

বিমলেন্দু পূর্ণ হৃদয়ে হর্ষ ও আগ্রহভরে বলিল, "যখন আমি ইভের অনুসরণ ক'রে তোমার অনাদর করেছিলুম—ত্যাগ করেছিলুম, তখনও?"

প্রতিমা এইবার মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, তখনও। ইভকে তুমি বুকে নিয়েছিলে, তাতে আমি প্রথমে কষ্ট পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু পরে ইভকে চিন্‌তে পেরে আমি তাতে সুখী হয়েছিলুম। অমন লক্ষ্মী তোমায় যে সুখী করতে পারবে, এই চিন্তাতেই সুখ পেতুম। আহা, সতী লক্ষ্মী ইভ!"

প্রতিমার দুই গণ্ড বহিয়া নয়নাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বিমলেন্দুর চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি অধম পাতকী, তার যোগ্য হবার আমার সাধ্য কি? জান প্রতিমা, ফাঁকি দিয়ে পালাবার আগে সে আমায় বলেছিল, আমি তোমায় না পেলে সুখী হব না বলেই সে অসময়ে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।"

প্রতিমাও ভারী গলায় বলিল, "জানি। যাবার আগে সে আমাকেও ব'লে গিয়েছিল, তোমার এই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে।"

কথাটা বলিয়া প্রতিমা আবার স্বামীর বিশাল উরসে

মস্তক ন্যস্ত করিল। তাহাদের উভয়ের নয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা এতই তন্ময় হইয়াছিল যে, কখন্ মাতাজী রামপ্রাণ বাবুকে লইয়া দ্বারের অপর প্রান্তে নিঃশব্দে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিতেই পারে নাই।

রামপ্রাণ বাবু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় চন্দ্রোদয়ে অম্বুধির মত আলোড়িত হইয়া উঠিল। মাতাজী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁহাকে নীরব থাকিতে বলিলেন। রামপ্রাণ বাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমায় আজ যে আনন্দ দিয়েছেন, তার প্রতিদানে আপনাকে দেবার আমার কিছু নেই। চলুন, আজ মঠে মহোৎসবের ঘোষণা ক'রে দিই গিয়ে।"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সমাপ্ত

পঞ্জাব চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসব

প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের আদর্শ

শিল্পী কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা শিল্পী বলি তাঁহাকে, যিনি তাঁহার চিন্তাকে আকার দান করেন, "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় তরল ভাবরাশিকে মূর্ত্ত আকার দিয়া, ভাবের সুকুমার কোমল মাংসপিণ্ডে অস্থি যোজনা করিয়া তাহাকে চলাফেরা করিবার উপযোগী করেন। এই আকার বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। বাক্য, রং, কিংবা স্বররূপে—সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য বা সঙ্গীতরূপে শিল্পীর মনোভাব ব্যক্ত হয়। শিল্প দ্বারা জাতির মনোভাব, জীবনযাত্রা-প্রণালী, সাজসজ্জা, রীতি পরিস্ফুট হইয়া লোকলোচনের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। এই জন্য কাব্য-শিল্প বুঝিতে হইলে কবিহৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে হইবে, কবির সহিত সমভাবাপন্ন হইতে হইবে। সেইরূপ চিত্র-শিল্পীকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সহিত সমভাবে চিন্তা ও অনুভব করিতে হইবে, ভাবগাহিতার চাবি সাহায্যে শিল্পি-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়, শিল্পীকে বুঝিবার অন্য কোন উপায় নাই।

শিল্পকলা জাতির উৎকর্ষ ও সভ্যতার নিদর্শন। শিল্পের সাহায্যে জাতি তাহার তরল মনোভাবকে স্থায়ী আকার দান করে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য, শিব ও সুন্দরের সহিত মানব-মনের যে নিত্য সম্বন্ধ, যে চিরন্তন সংযোগ, তাহা গানে ও ছন্দে, বর্ণবৈচিত্র্যে ও তুলিকা-সংস্পর্শে ফুটাইয়া তুলে। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি অযত্নপ্রসূত। ইহা স্বতঃ মানুষের হৃদয়কন্দর হইতে অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়া দুকূলপ্লাবী স্রোতস্বতীর ন্যায় জাতির ইতিহাস-ক্ষেত্রে নিজস্থান অধিকার করিয়া লয়। জাতির মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও উৎসাহ, আশা ও ভরসা তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া ঘনতা লাভ করে। জাতির সৌন্দর্য্যানুভূতি তাহার ভাস্কর্য্য, চিত্র ও স্থাপত্যে মূর্ত্ত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রাচীন জগতের শিল্পে আমরা একটি বিশেষ বস্তু লক্ষ্য করি। প্রাচীনের সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধপ্রসূত শান্তভাব ও ঔদার্য্য, স্থৈর্য্য ও নিস্তব্ধতা, অমৃতত্ব-পিপাসায়, ভূমায় পূর্ণ তৃপ্তিরসের বিরাট ও মহান্ ভাব—মানুষের অন্তরাত্মার বৃহত্ত্ব, ধ্যানের নিরবচ্ছিন্ন তন্ময়তা, সমাধির নিরুপম শান্তি তাহার শিল্পকে আধুনিকতায় ক্ষুদ্রতা, বহুমুখীত্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রাণাবেগের জটিলতা ও উদ্বেলতা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

অঙ্গসৌষ্ঠব ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে গ্রীক্ ও লাতিন স্থপতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্যকল্পনা প্রস্তরের লীলায়িত মূর্ত্তিতে অমর হইয়া রহিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য অনুভূতি মিশরে পিরামিড আকারে যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল এবং ভারতে বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত লোচনের অপার্থিব শান্তভাবে, সাধনা-প্রোজ্জ্বল হৃদয়ের প্রাণারাম অনুপম আত্মক্রীড় অবস্থায় যে মধুর পবিত্র আনন্দময়তা পরিমূর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই শান্তি, এই তৃপ্তি মহাসাগরের গম্ভীর প্রশান্তভাবের ন্যায়, আকাশচুম্বী হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় বিশাল, বিরাট ও উদার। ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব প্রকৃতির দৃশ্য বস্তুর অনুকরণ করিয়া, হুবহু নকল করিয়া নহে, উহার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জনা-শক্তিতে, জীবন্তভাবপ্রকাশে, নির্ব্বাচনী ক্ষমতায়, নব-নব ভাবোন্মেষণে। মিশরের ভাস্কর্য্যে শান্তরস বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের জীবন্তভাব প্রকটিত হয় নাই। সিংহলের সুন্দরামূর্ত্তিস্বামীর মূর্ত্তিতে যে অনুরাগ ও আনন্দ-ব্যঞ্জক ভাব—ধ্যানী বুদ্ধে যে শান্তভাব, ধর্ম্মপালের মূর্ত্তিতে যে উদ্বেলভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্য কোন দেশের ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট হয় নাই। শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য কেবলমাত্র মুখাকৃতি লইয়া ব্যস্ত নহে, ইহা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে, হস্ত-পদ ও দেহের সামঞ্জস্যে ও মিলনে। ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্যের পূর্ণতা সেই স্থানে—যে স্থানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহাবয়বের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে একটা অপার্থিব ভাব, মানবতার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে একটা স্বর্গীয় কান্তি, ধীশক্তি ও হৃদয়ের কোমলতার মধুর সমাবেশ, ঔদার্য্য, শান্তি ও কমনীয়তার রমণীয় মিলন।

এই বিরাট মহান্ ও ভাব প্রাচীন সাহিত্যেও প্রতিফলিত। আমরা মেকলে-প্রমুখাৎ শুনিয়া আসিতেছি যে, সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান

যুগ গীতি-কবিতা ও খণ্ড কবিতার যুগ। কথাটা খাঁটি সত্য না হইলেও একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রাচীনের বৃহত্ত্ব ও বিশালতা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্রতায় নাই। অতীতে জীবন-সংগ্রাম এত তীব্র ছিল না। তখন চিন্তার অবসর ছিল, একটানা জীবন-স্রোত মৃদুমন্দ গতিতে সংসার-খাতে প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমানে "প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত" হইতে হয়। এক্ষণে জীবনের গতি উদ্দাম, বহুধা বিচ্ছুরিত, আমাদের মন বিক্ষিপ্ত। এই জন্য কোন ব্যাপক কর্ম্মে আমরা নিযুক্ত থাকিতে চাই না, কালব্যাপিনী চেষ্টার নাম শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কর্ম্মধারা এক ভাবে পরিচালিত করিবার শক্তি আমাদের নাই, চিন্তা-প্রবাহকে দৈনন্দিন জীবনের কুটিল বক্রগতির মধ্যে স্থির রাখিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি। আমাদের সাহিত্য-সেবা চুট্‌কী গল্পে, শ্রুতিসুখকর চটুল কবিতার ফেনায়মান উচ্ছ্বাসে। বর্ত্তমানে আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখনীতে বড় একটা আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত হয় না, আদর্শ-সৃষ্টি সাহিত্য হইতে একরূপ বিদায় লইয়াছে। আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিক আদর্শ-চরিত্র অঙ্কন করিতে ভুলিয়াছেন, সময় ও সমাজের উপযোগী করিয়া নিপুণতার সহিত পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া দেশের নরনারীর মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন না, বরং বিলাসী ও সৌখীন জীবনের আলেখ্য, পতিতা ও কলঙ্কিনী নারীর চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া ইন্দ্রিয়লালসার উদ্রেক করিতেছেন, কামহোমানলে ঘৃতাহুতি দিতেছেন।

সাহিত্য মানব-জীবনের মুকুরস্বরূপ। যুগে যুগে বিশ্ব-মানবের মন সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে অনাবিল প্রশান্তি হোমর ও দান্তের মহাকাব্যে, সেক্ষপীয়রের অতুলনীয় নাট্যসাহিত্যে, বৈদিক ঋষিগণের অমল দিব্যভাবপ্রসূত উদাত্ত সঙ্গীতে, বাল্মীকির অফুরন্ত ছন্দের মহনীয় আবেগে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আমরা মিলটন ও কালিদাসের ক্ষুরধার ধীশক্তিপ্রসূত কাব্যে দেখিতে পাই না। পরবর্ত্তী কালে সাহিত্য শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিল। ইংলণ্ডে পোপ্ ও ফ্রান্সে বইলু ছন্দে নীতি-শিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই কবিতার ছন্দের বন্ধন সুদৃঢ়, ইহা গুরুগিরির দৌরাত্ম্যে প্রাণহীন। তাহার পর দেখি, সাহিত্যে বর্ত্তমানের অশান্তি ও চাঞ্চল্য। এখানে ভাবের বেগ উদ্দাম, কিন্তু ইহার গতি খণ্ড। ইহাতে আছে কালবৈশাখীর তর্জ্জন-গর্জ্জন, ধূর্জ্জটীর রুদ্র তেজ, বিদ্যুতের আলোকসম্পাত, দুরন্ত ভৈরব নর্ত্তন, কিন্তু ইহাতে নাই শান্তির আতিশয্য, সংযমের আনন্দধারা, তপস্যার গভীর সুখ, করুণা ও মৈত্রীর নির্ম্মল সাত্ত্বিকতা, এক কথায় চিত্তনৈর্ম্মল্যজাত "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।" বর্ত্তমানে শিল্পী ভাবাবেগের উচ্চতা হইতে, বিশালতার উচ্চ-শিখর হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি আত্মভাবে ব্যস্ত, তাঁহার বীণায় বিভিন্ন ছিদ্রে যখন যে ভাবের বাতাস খেলে, তখন সেই সুর ঝঙ্কৃত হয়—তাহাতে চৌতাল ও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ফুটে না, তাহাতে ছায়ানটের মূর্চ্ছনা মনপ্রাণ উতলা করিয়া দেয়।

মাইকেল এঞ্জেলো প্যানথিয়নের গম্ভীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত প্রাচীন শিল্পসম্বন্ধে প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহার কল্পনা মানুষে করে নাই, দেবদূতরা করিয়াছিল। বিশালতায় যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তাহা বৈদিক মন্ত্রে, সেক্ষপীয়র, গেটে, হোমর, দান্তে বাল্মিকীর মহাকাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল—তাহা মরুদেশের পিরামিডে, জগৎবিশ্রুত রোমের কলোসিয়মে ও ভারতীয় শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহা যেন 'অন্তস্তব্ধ মহাসাগরের বিপুল দোল'। খণ্ডতার যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য, তাহা দেখি বর্ত্তমানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে, শেলির কাব্যে ও ভিক্টর হিউগোর সাহিত্যে --প্রাণময়তায় যে রিপুর আবেগ, কল্পনার অদ্ভুত বিদ্যুৎ-খেলা, "নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা" সহ্য করিতে যে "অসীম ব্যাকুলতা" ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখি রবীন্দ্র-সাহিত্যে। খণ্ড-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ও তাহার মধ্য দিয়া চিরসুন্দরের ভজনা করিবার লিপ্সা প্রকাশ পাইয়াছে আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে।

চিত্রেই হউক, ভাস্কর্য্যেই হউক, কাব্যেই হউক, শিল্পীর অন্তরাত্মা সৌন্দর্য্যান্বেষণে বহির্গত হয়। এক জন কাব্যের সুষমা-মণ্ডিত উদ্যানে বিচরণ করিয়া কল্পনা-পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র রচনা করেন। কাব্যামোদী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই মধু পান করিয়া চিত্তবিনোদন করে। আর এক জন তুলিকা সাহায্যে কিংবা হাতুড়ির ঘা মারিয়া কুৎসিৎ প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদাই করিয়া প্রাণের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে মূর্ত্তভাব দান করেন। দুই জনই সৌন্দর্য্যপথের যাত্রী। এই সৌন্দর্য্য অন্বেষণে বহির্গত হইয়া যিনি সমস্ত

সৌন্দর্য্যের আধার, যাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যে কণামাত্র উষার সোনালী রংএ, মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডকিরণে, গোধূলির ধূসর বর্ণে, জ্যোৎস্নাস্নাত মুক্তাম্বরের রজতশুভ্র আলোকে, বসন্তের কোকিল-কাকলি গুঞ্জরিত কুঞ্জবনে, বর্ষাপ্রপাত ধৌত-শেফালির উদ্যানে প্রতিফলিত হয়—সেই সৌন্দর্য্যময়ের ভাবনা শিল্পীর মানসপটে উদিত হয় এবং সেই ভাবনা যে পরিমাণে খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে, যে পরিমাণে শিল্পী "অরূপরতন" লাভ করিবার জন্য "রূপসাগরে ডুব" দেন, সেই পরিমাণে তিনি শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যেখানে আনন্দের অনুভূতি যত প্রচুর, সেখানে বিকারের সম্ভাবনা তত কম। ঘন-সুষুপ্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থা, কিন্তু তৎকালে যে শান্তি অনুভূত হয়, তাহা অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয়। যে শিল্পী তাঁহার নিজ সত্তাকে শিল্পের মধ্যে যত দূর ডুবাইতে পারিয়াছেন, তিনি তত দূর মহান্। 'ভূমা বৈ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। এই ভূমাকে শান্ত উপাসীত—এষঃ আদেশঃ ; এষঃ উপদেশঃ ; এতদনুশাসনম্ ; এবমুপাসিতব্যম্—ইহাই আদেশ ইহাই উপদেশ, ইহাই অনুশাসন, ইহা এই রূপে উপাসনা করিবে। বিশ্বস্রষ্টা কামনা করিয়াছিলেন, বহু স্যাং প্রজায়েয় —আমি বহু হইব, আমি প্রভূত ভাবে উৎপন্ন হইব। এই জন্য স তপোইতপ্যত, তিনি তপস্যা করিলেন। 'স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ' তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু রহিয়াছে, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন এবং তৎ সৃষ্টা তদেবাণুপ্রাবিশৎ—তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সকল রসের আধার—'রসো বৈঃ সঃ'। এই লোক বা জীব সকল সেই রস বা সেই আনন্দলাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দপ্রচুর অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই আনন্দ ও তপস্যাই ভূমা—এই আনন্দ ও তপস্যায় বিশ্বসৃষ্টির বীজ নিহিত এই সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সংযমে নিবিড় শান্তি বর্ত্তমান এবং ইহাতেই শিল্পসৃষ্টির সুমহান অভিব্যক্তি।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ।

বিংশ শতাব্দীর যীশুখৃষ্ট

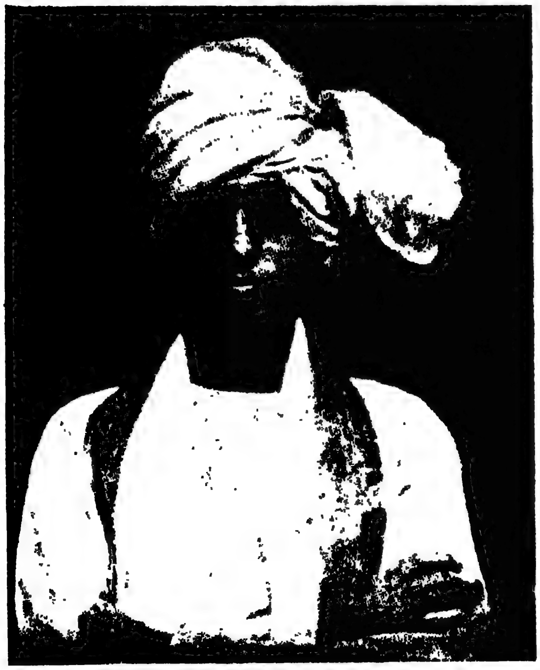

শ্রীমতী আনীবেসাণ্ট মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক ব্রাহ্মণ যুবককে বর্ত্তমান যুগের যীশুখৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেন

ভাব-প্রবাহ

সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়। কখনও জলরাশি বর্দ্ধিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাকল্লোলে সৈকত-ভূমি নিমজ্জিত করিয়া পুলিন-সীমা প্লাবিত করিয়া দেয়, আবার কখনও নিস্তেজ ও বিশীর্ণ হইয়া পরাজিত ও পলায়নপর সৈন্যশ্রেণীর মত কর্দ্দমাক্ত তটভূমি হইতে বহুদূর হটিয়া গিয়া স্থির হইয়া থাকে। পল্লীর নদীগুলিতে বৎসরে একবার করিয়া নববর্ষা-সমাগমে বন্যা আইসে। বর্ষাশেষে সে বান কমিয়া সরিয়া গিয়া দূরস্থিত সুবৃহৎ নদ-নদীর তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৈশাখের অপরাহ্নে চারিদিকে প্রকৃতি শান্ত স্থির; মৃদুমন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোল-স্পর্শে ঈষৎ সুখ-নিদ্রালস। সহসা কোথা হইতে একটি দুর্দ্দমনীয় বায়ুপ্রবাহ মত্তবেগে ছুটিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোড়িত, মথিত, ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া চলিয়া যায়।

এই সমস্ত ব্যাপার বাহ্যজগতের। অন্তর্জ্জগতেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বাহিরের প্রাকৃত ঘটনাগুলি সহজেই অনুভব করা যায়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাসমূহ বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া সহজে অনুভবগম্য হয় না। সুদূরপ্রসারিণী এবং শক্তিশালিনী অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ীভূত ব্যাপারসমূহ কেহই ধারণা করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি খুব সুলভ বস্তু নহে। পরন্তু বহির্জ্জগতের এবং অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারের মধ্যে এক প্রধান পার্থক্য এই যে, একটি প্রায়শঃই সঙ্কীর্ণ সীমাসমূহের মধ্যে আবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ সময়সাপেক্ষ; কিন্তু অপরটি দূরদূরান্ত ও দিগ্‌দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং সুদীর্ঘ যুগব্যাপী হইয়া থাকে। আর এক প্রধান প্রভেদ এই যে, আমরা একটির বাহিরে থাকিয়া উহাকে সকল দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, কিন্তু অপরটির মধ্যে মগ্ন হইয়া উহার অঙ্গীভূত হইয়া যাই। সুতরাং দেখিতেও পারি না, বুঝিতেও পারি না।

যোগদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, সময়ে সময়ে সমস্ত জগতের উপর দিয়া এক একটি মহাভাবের বিরাট প্রবাহ চলিয়া যায়, এক একটি সুমহতী শক্তির সুবিশাল বন্যা বহিয়া যায়। এই সব প্রবাহের এক প্রবাহ শেষ হইয়া অন্য প্রবাহ আরম্ভ হইতে ন্যূনাধিক ৫ শত বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ প্রতি ৫ শত বৎসর পর পর জগতে একবার করিয়া বিশ্বব্যাপী ভাবের জোয়ার আইসে। এই ভাব-প্রবাহ যখন জাগিতে আরম্ভ করে, তখন জগতে চৈতন্য বা অধ্যাত্মশক্তিসমূহের অপেক্ষাকৃত সাম্যাবস্থার মধ্যে সর্ব্বত্র বিক্ষোভ ঘটিতে থাকে।

দিনে দিনে স্থানে স্থানে বিবিধ "কম্পনে স্পন্দনে নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাবে-আভাসে গুঞ্জনে চমকে-ঝলকে" বিশ্ব-মানবের মন, বুদ্ধি, চিত্ত বিচলিত হইতে থাকে। অভিনব কর্ম্মের প্রেরণা মানবসমাজকে চঞ্চল করিয়া দিয়া নানা ধারায় নানা দিকে প্রবাহিত হয়। অতি মহৎ, অতি বৃহৎ, অচিন্তিতপূর্ব্ব কিছু সম্পাদন করিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রয়াস দেখা যায়। অপূর্ব্ব কল্পনা, বিচিত্র ভাবনা, নবীন চিন্তাস্রোত, জীবন্ত অন্তর্দর্শন বিচিত্র প্রকারে মনুষ্যসমাজে মূর্ত্তরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। কোথাও যুদ্ধবিগ্রহাদি মত্ত দৃপ্ত শক্তির ক্রিয়া, কোথাও সাম্রাজ্যগঠন, কোথাও সমাজ-সংস্কার, কোথাও অভিনব ধর্ম্ম-সংস্থাপন, কোথাও সাহিত্য, কোথাও শিল্প, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও বাণিজ্য, সর্ব্বত্রই কিছু না কিছুর সাধনা চলিতে থাকে।

একই ভাব-প্রবাহরূপ কারণ ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জাতিগত ও ব্যক্তিগত মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিবিধ ক্রম ও ভেদ অনুসারে নানা প্রকার কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। একই সূর্য্যকিরণ যেমন গ্রহণকারী বস্তুর সূর্য্যালোকাত্যন্তরস্থ সপ্ত প্রকার বর্ণোপাদান আত্মসাৎ করিবার শক্তির তারতম্যানুসারে কোথাও নীল, কোথাও শ্যাম, কোথাও লোহিত, কোথাও পীত, কোথাও পিঙ্গল প্রভৃতি রূপ ধারণ করে, অথবা একই জলীয় বাষ্পরূপে যেমন অবস্থাভেদে কখনও অদৃশ্য বায়ুভূত, কখনও কুয়াশা, কখনও মেঘ, কখনও তুষার, আবার কখনও বারিধারা হইয়া প্রকাশ পায়, এই ভাব-প্রবাহও সেইরূপ।

বর্ত্তমান যুগ হইতে ধরিয়া ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২ হাজার খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাবের প্লাবন আসিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই বাহ্যভাবে এবং সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে কোনও ঐতিহাসিক গবেষণা থাকিবে না। বিশ্বের অনেকগুলি বড় বড় ঘটনা-নিবহের উপর দিয়া শুধু দূর হইতে বহির্দৃষ্টিতে চক্ষু বুলাইয়া যাইব। ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব না।

১

২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি কি না, এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। যে বেদমন্ত্রগুলি এখন আমরা পাই, অর্থাৎ সংহিতাংশের ঋক্ ও সামগুলি, তাহা কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই ঋষিরা লাভ করিয়াছিলেন, এবং রম্য-পদ-পাঠ-পূর্ণ ভাষাময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে, তাহা নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসম্ভব। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপদেশ বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০তম শতাব্দীতে কিংবা তাহার অগ্র-পশ্চাৎ কোনও সময়ে পৃথিবীতে একটি পূর্ব্ব-বর্ণিত ভাব-বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের মত এই অমৃতচ্ছন্দগুলি সেই মহাবন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, এই প্রকার অনুমান করা যায়। এই বন্যাকে অভিনন্দিত করিয়া গ্রহণ করিবার মত মানুষ সে যুগে চীন, ভারতবর্ষ, বাবিলোনিয়া এবং মিশরের বাহিরে পৃথিবীতে কোথাও জন্মে নাই। এই বন্যা বিশেষ করিয়া ভারতীয় আর্য্যজাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আর আর্য্যজাতির পরে ইহা বাবিলোনীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগকে নূতন শক্তিতে ও নূতন সংকল্পে উত্তেজিত করিয়াছিল। ফলে তাহারা নবীন আশায়, নবীন উৎসাহে এবং নবীন উদ্যমে দলে দলে বাবিলোনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিরীয়া দেশে আসিয়া একটি নূতন সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, যে সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ সহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রবলপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই যুগেই আর্য্যদিগের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা এবং বেদানুগত জীবনযাপন-পদ্ধতির প্রচুর প্রচার হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ইহারই ফলে অথবা এই উদ্দেশ্যেই বেদের ব্রাহ্মণাংশ এবং বেদাঙ্গসমূহ ক্রমে ক্রমে রচিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় ছিল। এই সমস্ত যাগযজ্ঞের দুরূহ ব্যাপার ঋষি-সন্তানগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে ও সম্পাদন করিতে পারে, তাহারই সুবিধার জন্য যে সমস্ত ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, উপদেশাদি রচিত হইয়াছিল, সেই বৈদিক কর্ম্মসমূহের দর্পণ-স্বরূপ যে রচনা, তাহাই ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্মের' অর্থাৎ বেদের জন্য অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য যাহা, তাহাই ব্রাহ্মণ।

বিবিধ বৈদিক কর্ম্মরাশি, যাগযজ্ঞ, হোম, দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, বহু বৈদিক দেবতা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির জটিল জনতার মধ্যে পাছে মানুষ সেই এক, অদ্বিতীয়, সত্য, সদ্রূপ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সনাতন বস্তুকে ভুলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ঋষিগণ বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপূর্ণ উপনিষদ্‌রাজি এই সময়ে প্রকাশ করেন। ইহা জগতের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীতে যত ভাব-প্রবাহ আসিয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়। ইহা আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ে এমন এক উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের অন্তরে এমন এক সু-সূক্ষ্ম সুদূরগামিনী দৃষ্টি স্ফুরিত করিয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, জীবে-জড়ে, স্থাবরে জঙ্গমে, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে, আকাশে-বাতাসে, গ্রহ-তারকায়, তৃণে-গুল্মে, জলে-স্থলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। সেই যুগে তাঁহারা বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন,—“বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।” জানিয়াছি—জানিয়াছি, মহান্ পুরুষ সেই—হে জগদ্‌বাসী! তোমরা শুন, শুন। তাঁহারা তারস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—“যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।” এই যুগে ঋষিগণ ‘দেবতার উর্দ্ধে যেই মানবের স্থান’, সেই স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাযেই তখন তাঁহাদের কাছে—“শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্, ভূমের্ম্মহদায়তনং”—অথবা “ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা। নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।” সমস্তই ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন,—

“অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন বর্ণ রতি-প্রমোদয়
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।”

২

১১০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

এই সমস্ত ব্যাপারের ৫ শত বৎসর পরে আবার একটা ভাব-প্রবাহ পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে কি কি মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কিন্তু এই প্লাবনে মিশরদেশে এক আশ্চর্য্য শক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। এই শক্তির অধিনায়ক ছিলেন মহর্ষি মুশা (Moses)। এই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ইস্রেলবাসী হিব্রু জাতির মধ্যে এবং ইহার আঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল দুষ্কৃতকারী ফেরাও-নৃপতির রাজ্যসম্পদ্। ইস্রেলবাসীরা মিশররাজ্যে রাজা ফেরাওর অধীনে পদদলিত নিষ্পেষিত দাসজাতিরূপে বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায়ই ছিল না। তাহাদের মধ্যে যত পুত্র-সন্তান জন্মিত, তাহার প্রায় সমস্তই রাজার আদেশে নীল নদের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। এক দিন এক দুঃখিনী হিব্রু-জননী একটি অতি সুন্দর কুন্দ-ফুলের মত ফুটফুটে পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাজার অনুচরগণ জানিতে পারিলে এখনই শিশুকে লইয়া নীল-জলে নিক্ষেপ করিবে, এই ভয়ে হতভাগী উহাকে একটি ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া গোপনে কাশ-তৃণাচ্ছন্ন নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন,—কেহ দেখিয়া শিশুকে রক্ষা করিবে, এই ভরসায়। দৈবক্রমে এক রাজকুমারী এই ভাসমান শিশুকে দেখিতে পান এবং সহচরীদিগের সাহায্যে ইহাকে উঠাইয়া জননীর মত করিয়া ইহাকে পালন করেন। ইহা উপন্যাস নহে, ইতিহাস। এই শিশুই বিশ্ব-বিখ্যাত ঋষি ইস্রেলের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মুশা। ইনি ভগবানের আদেশ পাইলেন, হতভাগ্য চিরবন্দী মিশরপ্রবাসী ইস্রেলবাসিগণকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপে তিনি ঐ প্রকাণ্ড ভাব প্লাবনের একটি ধারা হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রাণে অসীম শক্তি উদ্দীপিত হইল। তাঁহার অন্তরে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। প্রথমে তিনি তাঁহার প্রতি ভগবানের নানা প্রকার ইঙ্গিত-ভঙ্গী অনুভব করিতে লাগিলেন। আর সাক্ষাৎভাবে ভগবানের বিভূতি-দর্শন এবং তাঁহার আদেশ লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, “তুমি ইস্রেলীয়দিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।” রাজা অবশ্য অস্বীকার করিলেন। তাহাতে তাঁহার ভয়ঙ্কর দৈব-দুর্ব্বিপাকজনিত শাস্তি আরম্ভ হইল। তখন একবার বলেন, তোমরা যাও; আবার বলেন, না, যাইতে পারিবে না। দৈব-দুর্ব্বিপাক চলিতে লাগিল। ব্যাধি, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, মহামারী নানারূপে রাজাকে ও মিশরীয় প্রজাবৃন্দকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে রাজার আদেশ পাইয়া মুশা ইস্রেলীয়দিগকে লইয়া ইস্রেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই এক দিন পরে আবার রাজার দুর্ব্বুদ্ধি হইল। সসৈন্যে রাজা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহার পর লোহিতসাগরের সেই সব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। সাগর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মুশা ও তাহার অনুবর্ত্তিগণের অতিক্রমণের জন্য শুষ্ক স্থলপথ সৃষ্টি করিয়া দিল। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেল। পরে সমুদ্রের অসীম জলরাশি দুই দিক্ হইতে গর্জ্জন করিয়া আসিয়া অনুসরণকারী ফেরাও ও তাঁহার সৈন্যসমূহকে মুহূর্ত্তমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিল। দেশে যাইয়া মুশা বিপুল উদ্যমে অল্পকালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র এবং একটি সুশৃঙ্খলানিবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডল সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়িয়া তুলিলেন একটি সুসম্মিলিত, সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী জাতি। এই জাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, বিধিপদ্ধতি, আইন-কানুন এবং ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালী কি প্রকার হইবে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রসমূহও তিনি অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। এক দিন দুই দিনের জন্য নয়, ১০১২০ বৎসরের জন্য নয়, যুগযুগ স্তরের জন্য। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টান ও য়িহুদীরা এই মুশার রচিত ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলিতেছে। সুবিশাল জগজ্জনীন ভাব-প্লাবনের মুখে না হইলে এমন সুমহৎ কার্য্যনিবহ কেহ কখনও একাকী সম্পন্ন করিতে পারে না।

মিশরীয়গণ আমন, অসিরিস, আইসিস, আপিস প্রভৃতি কাল্পনিক দেবতার পূজা করিত, কিন্তু এই সময় হইতে তাহারা অস্পষ্টরূপে বুঝিতে আরম্ভ করে যে, দেবতা-উপদেবতা সমস্তই এক পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। চতুর্থ আমেনহোটেসের রাজত্বকালে এই নব-ভাবের উদয় হয়।

৩

১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

ইহার ৫ শত বৎসর পরে জগতে আবার একটা জাগরণ আসিয়াছিল—একটা চেতনার বন্যা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই যুগেই ভারতের বৈদিক ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট সংস্কার হয়। বেদ, সংহিতা, উপনিষদাদি এবং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনেকাংশে তখন সুদূর অতীতের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক ভাষা তখন সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বেদোপনিষদের গূঢ় মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া ভগবানের মূর্ত্তরূপ ও মর্ত্ত্য লীলা এবং সাকারোপাসনাকে ভিত্তি করিয়া এবং তৎসঙ্গে শক্তিশালী প্রাচীন রাজন্যবৃন্দ এবং অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষগণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া এই সময়ে বিবিধ পুরাণ রচনা করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

পুরাণগুলি এক দিকে যেমন অসীম জ্ঞানের সমুদ্র, অন্য দিকে তেমনই অফুরন্ত কবিত্বের আধার। গভীর দার্শনিক গবেষণা, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, প্রাঞ্জল ঐতিহাসিক উপাখ্যান, মনোহর ভক্তি-রসাত্মিকা ভগবল্লীলা-কথা, নগর পল্লী সরিৎ সাগর গিরিদরী প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা, যোগী ভোগী রাজা ঋষি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চরিত্র-চিত্রণ এবং সর্ব্বত্র নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকারিণী স্বচ্ছন্দগামিনী কল্পনার অনায়াস লীলা সমস্তই একাধারে আমরা এই পুরাণসমূহে সমাবিষ্ট দেখিতে পাই। পুরাণের ভাষা এক অতি আশ্চর্য্য জিনিষ। কোথাও যেন এক বিন্দু আয়াস নাই। ভাদ্রমাসের ভরা নদীর জলপ্রবাহের মত আপনার পরিপূর্ণতার ভরে, শান্ত অথচ দ্রুতগতিতে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। কোমল অথচ তেজস্বী, সরল অথচ গভীর, সহজ অথচ মনোরম। মনে হয়, আমরা যেমন করিয়া কথা বলি, ঋষিরা তেমনই করিয়া পুরাণ লিখিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের জিনিষ। সকল পুরাণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। য়ুরোপীয়দের মতে পুরাণ অনেক পরের রচনা। কতক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীরও পরে রচিত। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। দুই চারিখানি পুরাণ বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত হইয়াছিল। যথা,—স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাহার পরেও কখন কখন কোনও বিশেষ যুগের ভাবে কথঞ্চিৎ ভাবান্বিত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ কোনও কোনও পুরাণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকিবেন, কিন্তু অধিকাংশ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণগুলির রচনাকাল বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগ। পুরাণে অনেক প্রক্ষিপ্ত জিনিষ আছে। সাধারণতঃ এই সমস্ত হইতেই পুরাণের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রমাণ করা হয়। যাহা হউক, যে সময়ে ভারতে পুরাণগুলি রচিত হইতেছিল, সেটা নিশ্চয়ই একটা আধ্যাত্মিক জাগরণের যুগ। সে সময়ে একটা প্রকাণ্ড ভাবের প্রবাহ ধরাতলে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই মহাপ্রবাহে না ভাসিলে ঋষিগণ কখনই গভীর জ্ঞান-গৌরবান্বিত এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্পন্ন একটা বিশাল ধর্ম্মসাহিত্য অমন করিয়া অবলীলাক্রমে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। এই প্রবাহের যুগ যদি আমরা মোটামুটিভাবে খৃষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করি, তবে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেও বহুদূরে যাইব না।

খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে গ্রীসদেশে হোমরের আবির্ভাব হইয়াছিল। হোমরের যুগ একটি মহাজাগরণের যুগ; একটি পরিপুষ্ট পৌরাণিক সাহিত্যসৃষ্টির যুগ। খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন উপকথা, রূপকথা, প্রচলিত কাহিনী এবং কল্পনা-রঞ্জিত ইতিহাস প্রভৃতি একটি তেজস্বিনী কল্পনাশক্তির সাহায্যে বাছিয়া গুছাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধান করিয়া তাহাতে অখণ্ড ভাব-রসের প্রাণসঞ্চার করিয়া হোমর দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কালজয়ী মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন—ইলিয়ড ও অডিসি। দেশময় মহা-উদ্দীপনার যুগে ভিন্ন এই প্রকার সাহিত্য কখনও জন্মে না।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভাব-প্লাবনের ও তাহাদের সময়ের কথা বলিলাম, তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এবং অনেকগুলি 'সম্ভবের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। কারণ, এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয়। ইহার পর হইতে আমরা ইতিহাসের স্থির-নির্দ্দিষ্ট দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারিব। অনুমানের নৈশালোকে অনিশ্চয়ের বালুকাভূমিতে আর অনির্দ্দিষ্টের অন্বেষণ করিব না। পরন্তু এতক্ষণ যে সব ভাব-বন্যার কথা বলা হইল, তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিলে তাহার সহিত তর্ক চলিবে না, কিন্তু এখন হইতে যে সমস্ত মহাভাবের উচ্ছ্বাসের কথা বলিব, তাহা যে বিশ্বব্যাপী, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকিবে না। এখন হইতে যে সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের উল্লেখ করিব, তাহাতে নিঃসন্দেহ সত্যের উজ্জ্বল আলোকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির সন্দেহের অন্ধকার কিয়দংশে দূর হইতে পারে। [ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সাহা।

ঊষার স্বপন

আজি শত চুম্বনে কে চুরি করিল
শত চুম্বন মোর,
আজি শত আলিঙ্গনে কে আলিঙ্গিলা মোরে
না হইতে রাতি ভোর।

মোর অধর হইল রঞ্জিত রাগে
কাহারি পরশ লাগি,
কাহার আঁখির কাজল মাখিল
সারারাতি আঁখি জাগি।

কাহারি সীঁথির সিন্দুর-রেখা
চুম্বিল মোর হৃদয়োপরি,
চন্দন-ফোঁটা কোথা গেল মোর
কোথায় লুকাল বুঝিতে নারি।

(আজ) পরিধেয় মোর কোথায় পাইলি
সোনালি চুমকা জরীর কায,
লোক-অপবাদ শুনাইয়া কানে
কোন্ সুখ তুই পাইবি আজ!

চন্দন কোথা অগুরু পাইলি
কোথা হ'তে তারে লইলি ডাকি,
ঊষার স্বপন শুধু প্রলোভন
আঁখি মিলে দেখি সকলি ফাঁকি।

বারিদবরণ

রূপের মোহ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"ডাক্তার বাবু, ছেলেটি বাঁচবে ত ?"

সাফল্যের আনন্দ চিকিৎসকের আননেও দীপ্তরেখা টানিয়া দিয়াছিল। তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "এমন নিপুণ শুশ্রূষা পেলে সকল রোগীই রক্ষা পেতে পারে। বাস্তবিক শিক্ষিতা ধাত্রীও এত যত্ন নিতে পারে না।"

আত্মপ্রশংসায় সরযূ লজ্জিতা হইল। বেলা ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত একবারও সে রোগীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নাই। আজ কয় দিন ধরিয়া এমনই ভাবে সে পীড়িত বালকটির শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। হাঁসপাতালের ৫০ জন রোগীর মধ্যে এই বালকের অবস্থাই সাংঘাতিক হইয়াছিল। তাই দিনের বেলা ধাত্রীকে অবকাশ দিয়া সে স্বয়ং ইহার শুশ্রূষার ভার লইয়াছিল। বালকের পীড়িতা মাতারও অবস্থা দিন দিন ভাল হইতেছিল।

সুরেশচন্দ্রের যত্ন ও অর্থব্যয়ে নগরোপকণ্ঠে এই হাঁসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৪ জন বিচক্ষণ ডাক্তার ও স্থানীয় শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত আরও ৪ জন নিপুণা ধাত্রীকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া পীড়িতদিগের সেবায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য চাউলাদি বিতরণ যেমন নিতান্তই প্রয়োজনীয় ব্যাপার, পীড়িতদের সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষারও তেমনই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

সরযূর অক্লান্ত সেবা ও নিপুণ শুশ্রূষা দেখিয়া সুরেশচন্দ্রও বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহারা চিরদিন ভোগবিলাসে, আরামে-বিরামে অভ্যস্ত, প্রয়োজন হইলে তাহারাও যে কত দূর আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহার পরিচয় তিনি অমিয়া ও সরযূর কার্য্যে পাইতেছিলেন। অমিয়ার সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। কারণ, পরলোকগতা জননীদেবীর গর্ভেই তাহার জন্ম। পিতা স্বকৃতভঙ্গ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা, পিতার কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই, স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার মতানুসারেই চলিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের চিরাচরিত সংস্কার হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আবহাওয়ায় আজন্মের দেশাচার ও লোকাচারের মহনীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব তাঁহার চিত্ত হইতে মুছিয়া যাইতে পারে নাই। জ্যাকেটে, জামায়, জুতা ও মোজায় তাঁহার স্বর্গগত জননী কখনও অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। শুধু যখন বাহিরে যাইতে হইত, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ না দিলে চলিত না, তখনই শুধু স্বামীর সন্তোষ-সাধনের জন্য যতটুকু না করিলে চলে না, তিনি ততটুকুই করিতেন। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশচন্দ্র সেগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। রোগীর সেবায়, অভাবগ্রস্তের দুঃখ-বিমোচনে তাঁহার দেবীরূপিণী জননী নির্ব্বিচারে যেরূপভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন, সুরেশচন্দ্র কখনও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অমিয়ার দেহে যখন জননীর পবিত্র রক্তস্রোত প্রবাহিত আছে, তখন প্রয়োজনকালে সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেবাপরায়ণতার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে। কিন্তু সরযূর সম্বন্ধে তেমন বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

কিন্তু কয় দিন ধরিয়া সরযূ যেরূপভাবে পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তের পর তাঁহার মনে একটা ধারণা

জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের নারীর বৈশিষ্ট্য তাহার রক্তে মিশানই আছে। প্রতীচ্যের অনুকরণ-দুষ্ট হইলেও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালার প্রাণধারা, স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন। অমিয়া এতক্ষণ বাসায় ফিরিয়া একা রহিয়াছে। শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া বালকের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল। রাত্রিতে সরযূর শুশ্রূষার প্রয়োজন হইবে না।

সুরেশচন্দ্র গাড়ী আনাইবার আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া সরযূ বলিল, "গাড়ীর কোন দরকার নেই, হেঁটে যাওয়া যাক্।"

"সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাঁট্‌তে কষ্ট হবে না?"

মৃদুহাস্যে সরযূ বলিল, "মাইল দুয়েক পথ—হাঁট্‌তে পারব না? আপনি কি সত্যই আমাদের মোমের পুতুল মনে করেন?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "না, না, আপনাদের সম্বন্ধে অতটা অবিচার চলে না। সন্ধ্যার বাতাসে হেঁটে গেলে শরীরের পক্ষে খুবই ভাল; তবে বল্‌ছিলাম, গাড়ীতে হ'লে শীঘ্র পৌঁছান যাবে, আর ক্লান্তিটা তেমন হবে না।"

সরযূ বলিল, "চলুন হেঁটেই যাই।" এই বলিয়া উত্তরীয়খানির দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

নদীর তীরে তীরে পথ। তখন সে পথে জনসমাগম বিরল। সহরটা খানিক দূরে। কদাচিৎ দুই চারি জন পথিক সহর হইতে গ্রামে ফিরিতেছিল। আকাশে নবোদিত ক্ষীণ শশাঙ্কের মৃদু আলোক-রেখায় চারিদিকে যেন একটা স্বপ্নময় ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সুরেশচন্দ্র অনেক দিন হইতেই সরযূকে দেখিয়া আসিতেছেন। এই বাক্‌চতুরা, সরলা ও সদানন্দময়ী কিশোরীকে তিনি চপলা, সুখভোগ-লালিতা, সাধারণ শিক্ষিতা নারীর মতই মনে করিতেন। সংসারের সুখের পথে, ভোগবিলাসের রাজ্যে তাহাদেরই মত এক জন। এ জন্য তাহার সম্বন্ধে গভীরভাবে তিনি কোনও দিনই চিন্তা করেন নাই। কিন্তু এই কয় সপ্তাহের কার্য্যে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। সরযূর দৃঢ়তা, কর্ম্মপ্রবণতা, অকুণ্ঠিত সেবা ও আত্মত্যাগে তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই তরুণী-সুন্দরীকে সাধারণ নারীর পর্য্যায়ে ফেলিলে তাহার সম্বন্ধে গুরু অবিচার করা হয়। নিম্নজাতীয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অসহায় ও পীড়িত বালককে সন্তানের মত স্নেহে সেবা করায়, সুরেশচন্দ্র সরযূর প্রকৃতিতে মাতৃত্বের যে বিকাশ দেখিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

"দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমার একটা বড় ভুল ধারণা ছিল, সে জন্য আপনি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন কি?"

বিস্মিতা সরযূ সুরেশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি রকম?"

ধীরকণ্ঠে সুরেশ বলিলেন, "আমি ভাবতুম, আপনারা যে রকম কোমলা, তাতে পৃথিবীর দুঃখ, ঝঞ্ঝা সহ্য করবার সহিষ্ণুতা আপনাদের নেই। শুধু ফুলের মতই আপনারা গন্ধ-ভরা—আলো-করা। একটু জোরে বাতাস বহিলেই আপনারা ঝ'রে পড়েন, প্রখর সূর্য্যতেজে ম্লান হয়ে যান।"

চলিতে চলিতে সরযূ উচ্ছল নদীর মত কলহাস্যে বলিয়া উঠিল, "কি অপরাধ করেছি আমরা যে, আমাদের সম্বন্ধে এমন মহৎ ধারণা আপনার হ'ল? সত্যই কি আমরা এত লঘুপ্রকৃতি?"

"সে ভুল ধারণার জন্য আমি আগেই ত ক্ষমা চেয়েছি! আমিও ত মানুষ, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

সহসা গম্ভীর হইয়া সরযূ বলিল, "দেখুন, আপনারা যত বড় পণ্ডিতই হন্ না কেন, স্ত্রীজাতিকে অতটা ক্ষুদ্রচেতা ও দুর্ব্বলা ভাববেন না। হ'তে পারে, আমাদের অনেক দোষ আছে; আমরা সহজে বিচলিতা হই, পুরুষের মত সকল কাযে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে পারি না; কিন্তু তার জন্য দোষ পুরুষের যত বেশী—নারীর তা নয়। আপনারা আমাদের গ'ড়ে তুল্‌তে পারেন নি। যেমন চেয়েছেন, তেম্‌নি পেয়েছেন।"

সুরেশচন্দ্র নদীর জলস্রোতের দিকে চাহিলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কথাটা খুবই সত্য। আমরা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গের প্রতি, শ্রেষ্ঠাঙ্গের প্রতি, আমাদের বিবেচনা-বুদ্ধির দোষে, কর্ত্তব্যপালন করিনি। ইদানীং আমরা ভুলে গিয়েছি যে, আমরা ভারতবর্ষের লোক—আমরা

বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে, প্রাচ্যের ব্যবস্থা-প্রণালীকে প্রতীচ্যের আদর্শে গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলাম। তাই প্রাচ্যকেও হারাতে বসেছি, প্রতীচ্যকেও পাইনি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা বলিল না। নীরবে পথ চলিতে লাগিল। প্রথম হেমন্তের আকাশ—গাঢ় নীল, বাতাসে ঈষৎ শৈত্য। উন্মুক্ত আকাশতলে, সন্ধ্যার বাতাসে শান্ত নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। প্রকৃতির অনবদ্য সুষমা যেন দিকে-দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুরেশচন্দ্রের মনে কি আজ উদাস ভাবের বান ডাকিয়াছিল?

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, সংসারের দীনতা, রিক্ততা—করুণ ক্রন্দনের শব্দ শুনে-শুনে মনটা এমন উদাস হয়ে যায়! কিছু যেন ভাল লাগে না। আমাদের জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রাণে মোটে শান্তি পাই না।"

সুরেশচন্দ্র সহসা থামিয়া গেলেন। আজ মনের এই ভাবধারাকে এই তরুণীর কাছে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসিল কেন?

সরযূ কি তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য দেখিয়া বিব্রত হইয়াছিল? সে একবার চকিতে সুরেশের দিকে চাহিয়া মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি চিরদিন এমনই সন্ন্যাসীর মতই বেড়াবেন?"

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। অন্ততঃ সুরেশচন্দ্র তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন না। বাস্তবিক গৃহধর্ম্মে তাঁহার আসক্তির অভাব, যে কোনও সুপরিচিত আত্মীয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। সুরেশচন্দ্র চলিতে চলিতেই বলিলেন, "সন্ন্যাসী?—না, সে রকম শক্তিও আমার নেই, ইচ্ছাও যে আছে, তাও বল্‌তে পারি না। গৃহীর কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠ, এ জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর যিনি সর্ব্বস্ব ভগবান্‌কে অর্পণ করতে পারেন, তাঁকে—সেই সন্ন্যাসীকে আমি মহাপুরুষ বোধে পূজা করি। সেরূপ সন্ন্যাসী হবার মত শক্তি বা মনোবৃত্তি আমার নেই। আমি গৃহধর্ম্ম পালনের সঙ্গে মানুষের কর্ত্তব্যপালনেরই পক্ষপাতী।"

নীরবে আরও কিছু পথ চলিবার পর তিনি আবার বলিলেন, "কি জানেন, আমাব জীবনটা যেন স্বপ্নময়! খালি একটা স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তুল্‌বার কল্পনায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ জন্য আমার বাস্তবতাশূন্য জীবনযাত্রার প্রণালীটা অন্যের চক্ষুতে আদৌ স্পৃহণীয় নয়। আমি কায ভালবাসি—কাযে মেতে থাক্‌তে চাই। সে কায সংসারীর পক্ষে অনেক সময় প্রেয় নয়। সংসারের অন্য সব বিষয়ের প্রতি আসক্তি যেন আমার কাছে বস্তুতন্ত্রহীন মনে হয়। তাই আমার এই জীবনযাত্রার পথে—শ্যামলতাহারা, শোভাসম্পদহীন যাত্রাপথে কাহাকেও চিরসঙ্গী করতে ভয় পাই। আর কেই বা এমন উদ্ভটপ্রকৃতি মানুষের সাহচর্য্য স্পৃহণীয় ব'লে মনে করবে?"

সরযূ একটু দ্রুত চলিল। এতক্ষণ সে নীরবই ছিল—তাহার দৃষ্টি নত।

সহসা সরযূ বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌লেন আপনি? এমন জীবনযাত্রা—এমন স্বার্থশূন্য মানুষের সঙ্গ কারও স্পৃহণীয় নয়?"

গম্ভীরভাবে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "না। মানুষ—পুরুষ বা নারী যেই কেন হোক না, এমন ভাবে সংসারযাত্রা করতে চায় না। সবাই চায় পার্থিব আমোদ। ভোজ, নৃত্য, সঙ্গীত—যা কিছু আরামের, যা কিছু ভোগের, সবাই তাই পেতে চায়। আমার হৃদয় চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—চাই সেবা। আর্ত্ত, পীড়িত, দুঃস্থের মুখে যাতে শান্তির হাসি ফুটে উঠে, তাই দেখবার জন্য আমার পাগল মন ব্যস্ত হয়ে উঠে। আমি যাকে গুরু ব'লে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করি, পূজা করি, তাঁর জীবনে এই মহত্তম অনুষ্ঠানের আদর্শ দেখেছি। গৃহে থেকে, গৃহী হয়ে সেই মহৎ আদর্শের কণামাত্র যদি পালন করতে পারি, তবেই না মানবজন্মটা সার্থক হয়ে উঠত! এখন বলুন, এমন লোকের সংস্রবে কে আস্‌তে চাইবে?"

গাঢ়কণ্ঠে সরযূ বলিয়া উঠিল, "আছে!—এমন লোক আছে—যারা এ রকম সঙ্গলাভের অধিকার পেলে চরিতার্থ হয়ে যায়!"

সুরেশচন্দ্র সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূর কণ্ঠস্বরে তিনি কি চমকিত হইয়াছিলেন? সরযূও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল। দূর-বিসর্পিত রাজপথ যেন স্তব্ধ হইয়া মৃদু চন্দ্রালোকস্পর্শের মাধুর্য্য অনুভব করিতেছিল। সুরেশচন্দ্র একবার দক্ষিণ বাহু উত্থিত করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তিনি উহা নামাইয়া লইলেন। সংযত মৃদু স্বরে বলিলেন, "না, থাক্। আপনার দাদার কাছেই বল্‌ব।"

সরযূর সুগৌর আননে যেন এক ঝলক্ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ে নীরবে দ্রুত পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজপথ জনবহুল হইয়া আসিল। অদূরে তাহাদের শুভ্র ভবনটি দেখা যাইতেছিল।

বহির্দ্বারে সনাতন দাঁড়াইয়া ছিল। নীরবে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।

অমিয়া ভ্রাতা ও ননদীর আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশচন্দ্র দুই একটা সাময়িক প্রশ্নের পর নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। উজ্জ্বলালোকে অমিয়া সরযূর মুখে কি দেখিল, সেই জানে। সে যেন সরযূর নিকট হইতে কোনও কথা শুনিবার জন্য মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিল; তাহার পর স্নেহভরে ননন্দার স্কন্ধদেশে একখানি হাত রাখিল। সরযূর মুখমণ্ডলে উত্তেজনার লোহিত আভা ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অমিয়া ডাকিল, "সরযু!"

সেই এক সম্বোধনে সমস্ত প্রশ্ন যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। "বৌদি!" -বলিয়া তরুণী, অমিয়ার বক্ষোদেশে মুখ লুকাইল।

অমিয়া তাহার মৃণাল-কোমল ভুজবন্ধনে স্পন্দিতা সরযূকে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার লজ্জানত আননে স্নেহের চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন বৈকালে বেশ ঝড় হইয়াছিল; বৃষ্টিও মন্দ হয় নাই। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা ছিল, তবে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঠিক নামিয়া আইসে নাই। মাধব কাজ সারিয়া বাহিরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, পথের উপর দিয়া কয়েক জন লোক যেন তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে। দূর হইতে মূর্ত্তিগুলি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইল।

সহসা তাহার মুখমণ্ডলে কৌতূহলের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিন জনের মধ্যে দুই জনকে স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইতেছে না? সত্যই ত! বেশভূষা এ দেশের মেয়েদের মত নয়। এ গ্রামের অথবা নিকটবর্ত্তী পল্লীর প্রায় সকলকেই ত সে চিনে। কে ইহারা?

মূর্ত্তিগুলি আরও কাছে আসিলে মাধব দেখিল, অগ্রবর্ত্তী দীর্ঘকায় পুরুষের বেশভূষা বাহুল্যবর্জ্জিত হইলেও সম্ভ্রান্ত-জনোচিত, পশ্চাতের মহিলারা ভদ্র-ঘরাণা। মাধব ভাবিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া অগ্রবর্ত্তী পুরুষ বলিলেন, "আমরা বড় বিপন্ন। ঝড়ে নদীতে নৌকা ডুবে গেছে। আমরা কোন রকমে রক্ষা পেয়েছি। মাঝি-মাল্লারাও বেঁচে গেছে। এ গ্রাম আমাদের অপরিচিত; আজ রাত্রির মত যদি কোথাও—"

মাধব এতক্ষণ বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। সহসা সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে!"

আগন্তুক মাধবকে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনাকেও আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি।"

অকস্মাৎ যেন কূল পাইয়া মাধব বলিয়া উঠিল, "ও! আপনি সুরেশ বাবু না? পুরীতে দেখা হয়েছিল। আসুন আসুন!"

সুরেশচন্দ্রও সেই দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ঠিক বটে!—আপনি রমেনের সন্ধানে গিয়েছিলেন, আপনাদের একই গ্রামে বাড়ী বলেছিলেন। রমেনের বাড়ীও এই গ্রামে না কি?"

সঙ্গের রমণী দুই জনও এই কথায় সবিস্ময়ে মাধবের দিকে চাহিলেন।

মাধব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "রমেন?—এটাই ত তাঁর বাড়ী!"

সুরেশচন্দ্র পুলকিতভাবে বলিলেন, "বটে! এই বাড়ী রমেনের? তবে আপনি—আপনি মাধব বাবু?"

রমেনের কাছে সুরেশ তাহার মাধব দা'র অনেক কথাই শুনিয়াছিলেন।

কুণ্ঠিতভাবে মাধব বলিল, "আমায় বাবু বল্‌বেন না। আমরা——"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিলেন, "আপনি রমেনের দাদা, তা হ'লে আমারও তাই। আচ্ছা মাধব দা, রমেন এখন বাড়ী আছে ত?"

"না, সে এখন বাড়ী নেই। সে সব কথা পরে হবে। ইস্, আপনারা যে তিন জনে একেবারে ভিজে ঢিব-ঢিবে হয়ে গেছেন। এতক্ষণ ভাল ক'রে দেখিনি। চলুন, শীঘ্র কাপড় ছাড়বেন। মা, আপনারা ভিতরে আসুন!"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "এটি আমার বোন্ অমিয়া, আর উনি অমিয়ার ননদ।"

"শীঘ্র ভিতরে চলুন, মা। ওঃ, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে ত!"

অন্তঃপুরের পথ দেখাইয়া মাধব সবিনয়ে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল। বাহিরের বসিবার ঘরে সুরেশচন্দ্র প্রবেশ করিলে, মাধব বলিল, "আপনারা সোজা ভিতরে চ'লে যান, মা। কোন লজ্জা করবেন না, এ আপনাদেরই বাড়ী।"

অমিয়া ও সরযূ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারপথে আসিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণমধ্যস্থ তুলসীতলে দীপ রাখিয়া, নতজানু কে ঐ তরুণী! নিমীলিত নয়নে সে যেন কাহার ধ্যানে তন্ময়! প্রদীপালোক-শিখা তাহার স্নিগ্ধ আননে প্রতিফলিত। উভয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিল, সেই শান্ত, সুন্দর আননে যেন শান্তির ছবি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তরুণী যুক্তকরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি নিবেদন করিতেছিল, কে বলিবে? কিন্তু এমন নিষ্ঠাভরা ঐকান্তিক পূজার ছবি, আত্মনিবেদনের চিত্র তাহারা কোন দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা দেখিল, যেন এক অপূর্ব্ব আলোকদীপ্তি এই পূজারিণী নবীনার আননকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

সরযূ সিক্তবসনে শীতে কাঁপিতেছিল, তখনই সে জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার, বৌদি!"

চমৎকার! এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। হায়! অমিয়া যদি কখনও আরাধ্য দেবতার চরণতলে মুহূর্ত্তের জন্যও এমনই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিত! অন্য সময় হইলে—অন্ততঃ আর এক মাস পূর্ব্বে হইলেও এমন পূজার দৃশ্য তাহার মনকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করিতে পারিত না। একটা গাছের কাছে মানুষ এমন ভাবে নত হইলে সেটাকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া সে হয় ত উপহাসও করিত। কিন্তু কয় সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় তাহার পূর্ব্ব-মতের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূজানিরতা তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধায় আজ তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।

ধ্যানরতা প্রতিভা মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই অদূরে দ্বারপার্শ্বে স্তব্ধ সুন্দরীযুগলকে দেখিতে পাইল। সহসা তাহার মনে হইল, দুই দেবকন্যা আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন কি?

তাহার বিস্ময়-বিমূঢ়ভাব দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই মাধব বাহির হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "মা, বাড়ীতে অতিথি এসেছেন। ওঁরা জলে ভিজে কষ্ট পাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় বদলাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

প্রতিভা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও সে তাড়াতাড়ি দ্বারবর্ত্তিনীদিগের নিকটে গিয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, "আসুন আপনারা।"

পরক্ষণেই পুরোবর্ত্তিনী অমিয়ার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। পরিচয়ের বালাই পল্লীগ্রামে বড় একটা নাই। বিশেষতঃ আতিথ্যসংকারের প্রচুর দৃষ্টান্ত সে পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকে। রাজধানীর নীরস লৌকিকতা, অথবা বিনীত, অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতার শিক্ষা তাহাদের ছিল না।

প্রতিভার মিষ্ট সম্ভাষণে আকৃষ্ট হইয়া অমিয়া ও সরযূ ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রমেনের মাতা তখনই পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাধবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মাধব, কি বল্‌ছিস্ রে?"

মাধব ক্ষিপ্রচরণে তখন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "মা, খোকার বন্ধু সুরেশবাবু ও তাঁর বোনেরা ভারী বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে এসেছেন। নদীতে নৌকা ডুবে গিয়েছিল। পরে সব শুনো, এখন আমাকে একখানা কাপড় ও একখানা র‍্যাপার-ট্যাপার দাও। মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছি, শীঘ্র তাঁদের ভিজে কাপড় ছাড়াবার ব্যবস্থা কর।"

গৃহিণী দ্রুতপদে ঘরের মধ্য হইতে একখানি ধৌত বস্ত্র ও একখানি আলোয়ান আনিয়া মাধবকে দিলেন। তাহার পর রাধারাণীকে কি আদেশ দিয়া তিনি অভ্যাগতাদিগকে দেখিতে চলিলেন। অকস্মাৎ পুরাতন অনেক কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

দেশে আসিলে রমেন্দ্র সকলের বড় ঘরখানি ব্যবহার করিত। সেই ঘরে প্রতিভা ও তাহার শাশুড়ী রাত্রিতে শয়ন করিতেন। প্রতিভা নবাগতাদিগকে সেই ঘরেই লইয়া গেল।

আলনা হইতে দুইখানি কোঁচান শাড়ী লইয়া সে হাসিমুখে অমিয়া ও সরযূর হাতে দিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া দুইটি সেমিজ বাহির করিয়া লইল। তোয়ালে তাহাদের ছিল না, তাহার বদলে দুইখানা গামছা লইয়া সে বলিল, "ঘাটে যাবেন ; না, এখানেই জল আনিয়ে দেব ? কাপড়গুলো আগে ছেড়ে ফেলুন।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় গৃহিণীর কানে বধূর কথার শেষ ভাগ প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বড় বৌকে ব'লে দিয়েছি, রোয়াকের পশ্চিমদিকে সে এতক্ষণ জল রেখে এসেছে, মা। ঘাটে যেতে হবে না। চল মা-লক্ষ্মীরা, সেইখানেই নিরিবিলিতে কাপড় ছাড়বে। আহা, ভিজে একেবারে সারা হয়ে গেছ যে, মা !"

সম্পূর্ণ অপরিচিতার সঙ্গে এ কি মিষ্ট আত্মীয়তা ! সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল। উভয়ে আর্দ্র বস্ত্রেই রমেন্দ্রের মাতাকে প্রণাম করিল।

"থাক্, থাক্ মা। ও সব পরে হবে। আগে তোমরা কাপড়-চোপড় ছাড়, বাছা ! আহা, কি কষ্টই পেয়েছ ! বৌমা, তুমি বড় বৌকে নিয়ে চট্ ক'রে চায়ের বন্দোবস্ত কর গে। রমেনের বন্ধু সুরেশ আজ মায়েদের নিয়ে অতিথি !"

অমিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না, মা, আমাদের জন্য অত ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমরা আগে চল ত বাছা, কাপড় ছাড়বে। বৌমা, নূতন টিনের চার কৌটোটা বা'র ক'রে নিয়ে এস। শীতে বাছারা থর থর ক'রে কাঁপছে, এখন গরম চা ভারী দরকার। যাও।"

সে বাড়ীতে চায়ের ভক্ত কেহ ছিল না বটে ; কিন্তু ব্যবস্থা সবই ছিল ! পুত্র চা-ভক্ত, সে জন্যও বটে এবং গৃহস্থের বাড়ী বলিয়াও বটে।

অমিয়া ভাবিতেছিল, "বৌমা !" এই লক্ষ্মী প্রতিমার মত চমৎকার মেয়েটি কি রমেন বাবুর স্ত্রী ? তিনি কি বিবাহিত ? কৈ, এ সংবাদ ত কোন দিন তাহারা শুনে নাই। রমেন্দ্রও বলে নাই !

উভয়কে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া গৃহিণী লণ্ঠনটি সেখানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সরযূ বলিল, "বৌদি ! রমেন বাবুর কি বিয়ে হয়ে গেছে ? কৈ, এ খবর ত কোন দিন আমরা শুনি নি ?"

অমিয়ার মনেও যে ঐ একই প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা সে প্রকাশ করিল না। রমেন বাবু বিবাহিত ! তথাপি—না, সে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। রমেন বিবাহিত কি চিরকুমার, তাহা জানিয়া তাহার লাভ-লোকসান নাই—সংস্রবই বা কি ? কিন্তু কি হতভাগ্য এই রমেন্দ্রনাথ ! এমন পত্নী থাকিতে, কেন তাহার মনের এমন অধঃপতন হইয়াছিল ?

বাঃ ! এ ত চমৎকার সমালোচনা ! রমেন্দ্রের মানসিক অধঃপতন সম্বন্ধে সে অকুণ্ঠিতভাবে সমালোচক হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারও ত দেবতার মত গুণবান্, রূপবান্ স্বামী। তবে সেই বা কেন যম-যন্ত্রণা, আত্মার কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়াছিল ?

সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, হাত-মুখ ধুইবার পর উভয়ে যেন অনেকটা আরাম বোধ করিল। তাহারা বালতির জলে কাপড়-জামা কাচিতে যাইতেছে, এমন সময় প্রতিভা সেখানে আসিল। সে বলিল, "ও সব থাক্। ও জন্য আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আপনারা অতিথি—দেবতা।"

সরযূ বলিল, "তা কি হয় ? অতিথি ব'লে কি আমরা কাপড় কাচলে আপনাদের আতিথ্যধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে—পাপ হবে ?"

সলজ্জ কণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "পাপ হবে কি না, জানি না ; কিন্তু তাতে সেবা-ধর্ম্মের ব্যাঘাত যে হবে, সেটা ঠিক। ও সব থাক্, এখন আপনারা চলুন ; চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

প্রতিভার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উভয়ে তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বস্ত্রত্যাগের পর এক একখানি পাতলা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া উভয়ের অত্যন্ত আরাম বোধ হইল। তখন তাহারা দীপালোকিত ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও কিছুমাত্র বাহুল্য নাই, অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই এমন শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত যে, রুচি, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও পরিচ্ছন্ন-প্রিয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীরগাত্রে কয়েকখানি চিত্র—অরণ্যে নলদময়ন্তী, ভীষ্মের

শরশয্যা, সীতার পাতালপ্রবেশ,—প্রত্যেক চিত্রেই শিল্পীর নিপুণতা সপ্রকাশ। বৈদেশিক শিল্পীর কয়েকখানি নিসর্গ-চিত্রও গৃহের শোভা বাড়াইয়া দিয়াছে। রমেন্দ্রের মাতা ও পত্নী ঘরখানিকে আপনাদের চিত্তবৃত্তির অনুযায়ী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুর পবিত্র, অনাবিল জীবনযাত্রার পরিচয় যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই পাওয়া যায়। সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল। সুদূর বঙ্গপল্লীর গৃহস্থ-ভবনে আজ তাহারা যাহা দেখিতেছে, তাহা সহরবাসিনী, পাশ্চাত্য-ভাবানুরাগিণী বহু বিলাসিনী মহিলার শয়নকক্ষে দুর্লভ-দর্শন নহে কি?

প্রতিভা দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাতে রমেন্দ্রের মাতা রেকাবীতে গরম লুচি, কচুরী ও ভাজা সাজাইয়া লইয়া আসিলেন। অমিয়া ও সরযূ যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গৃহিণী তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মীরা, তোমরা কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তোমরা শুধু অতিথি নও—এই বাড়ীর মেয়ে। রমেন ও সুরেশ ত আমার কাছে আলাদা নয়। মা'র কাছে মেয়ের লজ্জা থাক্‌তে পারে না। নাও মা, খাও।"

সরযূ প্রতিভার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার চা?"

আরক্ত মুখে, মৃদু কণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "আমি ত চা বড় একটা খাই না। কদাচিৎ কখন—'

বাধা দিয়া সরযূ বলিল, "তবে আমাদের জন্য কোন দরকারই ছিল না। আপনি না খেলে, আমরাও খাব না কিন্তু।"

সহাস্য মুখে প্রতিভা বলিল, "আপনারা জলে ভিজেছেন, আপনাদের এখন চা খুব দরকার।"

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হবে না, আর এক পেয়ালা আসুন। তিন জনে একসঙ্গে খাব।"

রমেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "ওঁরা যখন বল্‌ছেন, ওঁদের সম্মান রাখবার জন্যও তোমার খাওয়া উচিত, বৌ-মা। আমি আর এক পেয়ালা এনে দিচ্ছি, তুমি ব'স।"

অল্পক্ষণ পরেই এক পেয়ালা চা ও এক রেকাবী খাবার লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিভা শাশুড়ীর আদেশ অবহেলা করিতে পারিল না। সে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইল।

নবাগতাদিগের কোনও পরিচয়ই প্রতিভা জানিত না। কথাপ্রসঙ্গে সে শুধু বুঝিয়াছিল,অমিয়া স্বামীর বন্ধুর ভগিনী। সরযূ তাহার ননদ। অমিয়ার সহিত স্বামীর পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা আছে কি না, এ সকল সংবাদ জানিবার কোনও সুযোগ তাহার হয় নাই। স্বামীর নিকট সে নিজেই অপরিচিতা। বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সে কয়বারই বা স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে! স্বল্পসময়ের জন্য যে দেখা-সাক্ষাৎ, তাহাতে যে সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ, তাহাতে মনে রাখিবার মত কোন কথা কি সে স্বামীর নিকট হইতে পাইয়াছিল? সাধারণ যে দুই চারিটি কথা সে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, কৃপণের ধনের মত সে অতি সঙ্গোপনে মনের নিভৃত কক্ষে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐটুকুই তাহার সম্বল। তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটি অস্পষ্ট চিন্তা জাগিয়া উঠিত—তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বামী বোধ হয় সুখী হন নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের চরম শিক্ষা লাভ করিবার জন্য স্বামী তপস্যা করিতেছেন, পিতা, মাতা, শাশুড়ী প্রত্যেকেরই কথার ভাবে এই তত্ত্বটা প্রকাশ পাইলেও তাহার নারীহৃদয়ে মাঝে মাঝে যে চিন্তাটা এক একবার উঁকি মারিত, তাহাকে অতি কষ্টেই সে তাড়াইতে পারিত। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল; কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে, ৪ বৎসরের মধ্যে সে শুভ সুযোগ সে কোন দিনই পায় নাই। পত্র? স্বামীর পত্র কিরূপ, তাহা সে জানে না। লজ্জার মাথা খাইয়া, হৃদয়ের আবেগবশে সে উপযাচিকা হইয়া মাঝে মাঝে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু উত্তর কোনও দিন সে পায় নাই। শুধু একবার রমেন্দ্র স্বরচিত "যূথিকা" তাহাকে পাঠাইয়াছিল—'শ্রীমতী প্রতিভার করকমলে' শুধু এইটুকু ছাড়া স্বামীর কোনও হস্তাক্ষর তাহার কাছে নাই। স্বামীর প্রথম উপহার হিসাবে বইখানি তাহার বড় আদরের। কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রটি যে সে কণ্ঠাগ্রে রাখিয়াছিল, তাহার ইতিহাসই বা কে জানে?

স্বামী যে তাহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখেন না, এ সংবাদ সে ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দেয় নাই। সে যে বড় অপমান—বড় দীনতা! সে মরিয়া গেলেও এ রিক্ততার কথা প্রকাশ করিতে পারে না। শুধু এক দিন তাহার মাতৃসমা—মা'র চেয়েও বড়, অগাধ স্নেহময়ী শাশুড়ীর নিকট জেরায় পড়িয়া, তাহার উপেক্ষিত জীবনের আভাসমাত্র দিয়াছিল।

অমিয়াকে যে রমেন্দ্র এক দিন গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, সে ইতিহাস মাধব ও গৃহিণী ছাড়া আর কেহই জানিত না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সে কথা প্রকাশ পাইতে দেন নাই। এমন কি, মাধবের স্ত্রী রাধারাণী পর্য্যন্ত তাহার কোন আভাসই পায় নাই। সুতরাং প্রতিভা তাহার স্বামীর জীবনের এই অধ্যায়টুকুর কোন সন্ধানই পায় নাই। স্বভাবতঃ সে ধীর, গম্ভীর। অযথা কৌতূহলপ্রিয়তা তাহার ছিল না। পিতা-মাতার নিকট হইতে সে বাল্যকাল হইতেই সংযমশিক্ষা পাইয়াছিল। পিতা ও মাতার জীবনের আদর্শ তাহাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে প্রতিভার চরিত্রে ও ব্যবহারে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল যে, দর্শকের মনে তাহার সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিত।

অমিয়াদের কোনও বিশেষ পরিচয় তাহার জানা না থাকিলেও শুধু সামাজিক কর্ত্তব্য, গৃহস্থের ধর্ম্ম, মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সহজ, সরল ভাবে নবাগতাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রীতির জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। চা-পানে তাহার আসক্তি নাই, অথচ এই নির্দ্দোষ পানের দ্বারা যদি সে অতিথিদিগের তৃপ্তি-বিধান করিতে পারে, তবে কেন সে তাহা করিবে না?

গরম কচুরী মুখে ফেলিয়া সরযূ বলিল, "আপনারা এর মধ্যেই এমন সব আয়োজন ক'রে ফেলেছেন? বড় সুন্দর ব্যবস্থা ত?"

প্রতিভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ আর বেশী কি? আমরা পাড়াগাঁর লোক, আপনাদের রুচির মত ক'রে—কিই বা আমরা জানি!"

সরযূ বলিল, "আমি মৌখিক ভদ্রতা রাখার কথা বল্‌ছি না। সত্যি এ সময়ে কড়াইসুঁটির কচুরী পাড়াগাঁয়ে পাওয়া যেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। কড়াইসুঁটি কোথায় পেলেন বলুন ত?"

প্রতিভা বলিল, "আমাদের বাগানে। ভাশুর মশাই নিজের হাতে সব করেন।"

"ভাশুর?—রমেন্দ্র বাবুর বড় ভাই আছেন না কি?"

সরযূ মাধবের পরিচয় জানিত না। কিন্তু অমিয়ার কিছু কিছু জানা ছিল। সে বলিল, "রমেন বাবু মায়ের এক ছেলে। উনি সম্পর্কে রমেন বাবুর ভাই—মায়ের পেটের ভাইয়ের মত।"

প্রতিভা বিস্মিত হইল। বুঝিল, তাহার স্বামীর পরিচয় ইহাদের অনেক জানা আছে।

সরযূ নিবিষ্টমনে কিয়ৎকাল প্রতিভার দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি! রমেন বাবু এমন সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে দেশভ্রমণে গেলেন কি ক'রে?"

প্রশ্নটা খুব সরল, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু উহা তীক্ষ্ণমুখ শলাকার ন্যায় প্রতিভা ও অমিয়ার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। প্রতিভা যে স্বামিকর্ত্তৃক অনাদৃতা, তাহা এ সংসারের আর কেহই জানে না -ইহার দুঃখ সে নিজেই মনে মনে ভোগ করে; কিন্তু অন্যের মুখ হইতে সেই ভাবের কথা উচ্চারিত হইলে হৃদয়ে যন্ত্রণার সঞ্চার করে না কি? অমিয়ার মনেও প্রশ্নটা তীব্রভাবে বিদ্ধ হইল। এত দিন যাহা অপরিস্ফুট ছিল, আজ এই কথা কয়টিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পত্নীর প্রতি আসক্তি, ভালবাসা থাকিলে রমেন্দ্রনাথ কখনও—

চিন্তায় সহসা বাধা পড়িল। রমেন্দ্রের মাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার হয়েছে? একবার ও দিকে যেতে হবে, বাছা!"

"যাই মা", বলিয়া প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল। রেকাবী ও পেয়ালাগুলি সে গুছাইয়া লইল। তাহার অন্তরতলে যে শেলাঘাতের বেদনা বাজিতেছিল, আননে তাহার কোনও আভাস ছিল না।

গৃহিণী বলিলেন, "মা-লক্ষ্মীরা, তোমরা এই বিছানায় খানিক গড়াও। বই যদি পড়তে চাও, ঐ আলমারীতে অনেক রকম বাঙ্গালা বই আছে। আমরা একটু বাদেই আস্‌ছি। বৌমা, মাথার ধারের বড় আলোটা জেলে দাও ত; আলমারীটাও খুলে দাও।"

উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি বারান্দায় রাখিয়া প্রতিভা বড় আলোটা জালিয়া দিল। একটা আলমারী খুলিয়া সরযূকে বলিল, "অনেক রকম বই আছে, যা ইচ্ছে হয়, বেছে নিন্।"

এও এক বিস্ময়! কৌতূহলপরবশ হইয়া সরযূ আলমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বাঁধান পুস্তকে আলমারী পরিপূর্ণ। রমেন্দ্র সযত্নে নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি কিনিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মাতা বই পড়িতে ভালবাসিতেন। পূর্ব্বে সাধারণ পাঠের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, ইদানীং উপন্যাস প্রভৃতি

পড়া ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বেশীর ভাগ পড়িতেন।

সরযূ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরপরিচিত, অথচ চির-নূতন 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাহির করিয়া লইল। এই বইখানি তাহার বড়ই ভাল লাগিত।

"বৌদি, তুমি কি পড়বে বল ?"

অমিয়া বলিল, "তুমি পড়, আমি ততক্ষণ একটু গড়াই।"

সে দুগ্ধফেনশুভ্র শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। চারিদিকের জানালা খোলা। পার্শ্বের উদ্যান হইতে ফুলের গন্ধ ভিজা বাতাসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

শাশুড়ীর সহিত প্রতিভা চলিয়া গেল। আলোকের সম্মুখে বসিয়া সরযূ নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল।

অমিয়ার মনে একটা কথা আজ নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্মরণীয় দুর্য্যোগময়ী রজনীর স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। যদিও রমেন্দ্রের বুভুক্ষু, পঙ্কিল স্পর্শের স্মৃতির জ্বালা এখন তাহাকে তেমন পীড়িত করিতে পারিত না; কিন্তু স্মৃতির দাগ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। তাই সে অনেক সময় আপনার হৃদয়কে, মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত। নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায় সে আপনার কার্য্যপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করিত। আলোচনার ফলে সে মনে মনে অনেক বিষয়ের মীমাংসা একরূপ করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু একটা বিষয়ে সে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। রমেন্দ্রের অশিষ্ট আচরণকে সে একটু হাল্‌কাভাবে দেখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আজ আকস্মিক পরিচয়ের ফলে সে যখন সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিল, রমেন্দ্র বিবাহিত, গৃহে মধুরস্বভাবা, সুন্দরী স্ত্রী বর্ত্তমান, তখন রমেন্দ্রকে সে আর পূর্ব্বের মত লঘু অপরাধী বলিয়া ভাবিতে পারিল না। তাহার আচরণের অসামঞ্জস্য অমিয়াকে পীড়িত করিতে লাগিল।

তাহার প্রতি রমেন্দ্রের আকর্ষণ সামাজিক হিসাবে অসঙ্গত ও অশোভন হইলেও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাহাকে ভালবাসা বলা যায় না। যদি যথার্থই সে অমিয়াকে ভালবাসিত, তবে বিবাহ করিল কিরূপে?

মনের মধ্যে সমালোচকরূপে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! তাহাতেই রমেন্দ্র অপরাধী হইল? তবে সে-ও ত অপরাধিনী! সে-ও কি কৈশোরে রমেন্দ্রকে মনে মনে চিন্তা করে নাই? তবে সেই বা অনিলচন্দ্রকে তাহার পর বিবাহ করিল কিরূপে? এক জনের স্মৃতি মনের নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়া, সহস্র লোকের সম্মুখে ভগবানের নাম লইয়া সে কি অন্যকে হৃদয়-মন দান করিবার অঙ্গীকার করে নাই? তাহাই বা সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে?

না, না—যাহাকে পাওয়া যাইবে না, বিবাহিত জীবনে তাহার স্মৃতি যাহাতে মনকে অধিকার করিয়া না থাকে, ইহা ভাবিয়া সে তখন রমেন্দ্রের স্মৃতি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল, কৈশোরের অপরিণত মনোবৃত্তিকে মোড় ফিরাইয়া ভিন্ন পথে চালিত করিয়াছিল। দুর্ব্বলের ন্যায় সে মনের আবেগস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় নাই। জীবনসখারূপে সে কায়মনোবাক্যে যাঁহাকে বরণ করিয়াছিল, তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। রমেন্দ্রের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তখন মনোমন্দিরে সত্যই একটা আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। উপন্যাসের নায়িকার ন্যায়, রমেন্দ্র-লাভ হইল না বলিয়া সে জীবনকে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। বিবাহ হইলে হয় ত সে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইত; কিন্তু সে বিবাহ না হওয়াতে এমন কিছু বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল, এরূপ কোন ভাব তাহার মনে উদিত হয় নাই। প্রথম-যৌবনে মনে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়; কিন্তু সবগুলি কাহারই পূর্ণ হয় না। সে-ও তাহাই মনে করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মবিধান অনুসারে যাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল, তাঁহারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিল।

রমেন্দ্র কিন্তু তাহা করে নাই। সে যখন বিবাহ করিয়াছিল, তখন সেই জীবন-সঙ্গিনীকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পুরুষ—দৃঢ়চেতা শিক্ষিত মানুষ হইয়া রমেন্দ্র কি সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল? কখনই নহে, তাহা হইলে তাহার এমন মানসিক অধঃপতন হইবে কেন? নিরবলম্বচিত্তে অনেক রেখাপাত হয়, হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু যাহার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে কখনই মিথ্যা আশাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে না। যাহা ধ্রুব, যাহাকে

সত্য বলিয়া স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সহস্র দুর্দ্দমনীয় বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া না থাকাই গুরু অন্যায়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। না—রমেন্দ্রের কার্য্যকে লঘু বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। যাহার সহিত ইহলোকের কোন বন্ধন নাই, যাহার উপর সামাজিক বা নৈতিক কোন অধিকার নাই, ধর্ম্মজগতের সহিত যে বিষয়ের কোন সংস্রব নাই, তাহা যতই মধুর, যতই লোভনীয় হউক না কেন, সে বিষয়ে লোভ করা শুধু অসঙ্গত নহে, ঘোরতর অন্যায়—পাপ! অমিয়ার সংস্কার তাহাকে এই কথাই ভাবিতে শিখাইয়াছিল। পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমান, তবু রমেন্দ্র কেন তাহাকে চাহিয়াছিল? উহা কি প্রেম?- কখনই নহে। রমেন্দ্র শুধু তাহার দেহকে চাহিয়াছিল- তাহার বাহিরের রূপে মুগ্ধ, উন্মত্ত হইয়া সে তাহার স্থূলদেহকে লালসার দ্বারা অপবিত্র ও দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল মাত্র! উহাতে প্রেম ছিল না, ছিল শুধু ঘৃণিত লিপ্সা, নারকীয় আকর্ষণ! সেই পাপকলুষিত চিত্তের স্পর্শ তাই এত দিন তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে। আর সেই জন্য সে-ও এই স্মৃতির তাড়না হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। রমেন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহার প্রথম-যৌবনের সুষুপ্ত চিন্তাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

এখন সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখন আর তাহার চিত্তে দহনজ্বালা নাই। এখন সে আপনাকে বুঝিতে শিখিয়াছে; নিজের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কর্ম্ম-সমুদ্রের পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া সে আপনার নারীত্ব ও মাতৃত্বকে নূতনভাবে ফিরাইয়া পাইয়াছে। জীবসেবায় প্রেমময় অনন্তসুন্দরের আভাসমাত্র সে পাইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, প্রেম কত মধুর, কত মহান্, কি পবিত্র! তাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিকার থাকিতে পারে না। প্রেমেই মাতৃত্বের চরম বিকাশ হইয়া থাকে। সে এখন বুঝিতে শিখিয়াছে, এক জন আছেন, যিনি সর্ব্বজীবে—জড়ে ও চেতনে সমভাবে বিদ্যমান। জীবের সেবায়, পরিচর্য্যায় তিনি যে ভাবে মানুষের চিত্তে আবির্ভূত হন, তাহা অতি বিস্ময়কর আনন্দের দ্যোতক। অবশ্য তাঁহার রূপজ্যোতিঃ দর্শনের সৌভাগ্য তাহার হয় নাই—যুগ-যুগ ধরিয়া সাধনা করিলে তবে তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু এত দিনে সে পথের সন্ধান পাইয়াছে। তুলসীতলে প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে, মুক্ত গগনতলে একনিষ্ঠ উপাসিকার অকৃত্রিম প্রার্থনার মূর্ত্ত প্রকাশও সে দেখিয়াছে। সে দৃশ্য চিরস্মরণীয় হইয়া তাহার চিত্তে বিরাজ করিবে। সে যে পথের সন্ধান পাইয়াছিল, আজ তাহা বিশালতর হইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছে। সে স্বামীর প্রেমে মগ্ন হইয়া স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া তাহারই সাহায্যে বিশ্ববাসীকে ভালবাসিতে, স্নেহ বিলাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাই ভারতবর্ষের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য। এমনইভাবে সাধনা করিলে সে কি চিরসুন্দরের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ পাইবে না?

নিমীলিত নেত্রে অমিয়া তখন স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল। একমনে কোনও বস্তুকে চিন্তা করিলে তাহা যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। অমিয়ার মনে হইল, সে যেন স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে। এই কয় দিনে চিরন্তন সংস্কারের প্রভাব তাহার অন্তরতলে যেন ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার দাদা যে মাঝে মাঝে বলিতেন, প্রতি শোণিতবিন্দুতে যাহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে, চর্চ্চা করিলে তাহার প্রভাব সহজেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, ইহা গঞ্জিকাসেবীর খেয়ালের কথা নহে, বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া সান্নিধ্যলাভের আনন্দে তাহার চিত্ত পুলকিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কি হতভাগ্য এই রমেন্দ্রনাথ! পত্নীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া সে কোন্ অনিশ্চিত পথে, মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছে! রমেন্দ্রের জন্য সত্যই অমিয়া দুঃখিত হইল। সে তাহার বাল্যসখা, ভ্রাতৃবন্ধু। পথিভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহারও অন্যতম কর্ত্তব্য নহে কি? নিশ্চয়। অমিয়া চেষ্টা করিবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রমেন্দ্রের আচরণ-আলোচনায় তাহার মনে রমেন্দ্রের প্রতি ঘোরতর বিরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় তাহা অন্তর্হিত হইল। মানুষের প্রতি ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভ্রম সকলেরই হইতে পারে—হইয়া থাকে। সে জন্য দুঃখিত হওয়া চলে; কিন্তু রাগ বা ঘৃণা করা চলে না। তাহার মনও মুহূর্ত্তের জন্য পথিভ্রান্ত হইয়াছিল।

"কি কচ্ছেন,—পড়ছেন বুঝি? দিদি, ঘুমুলেন না কি?"

অমিয়া এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল যে, প্রতিভার প্রথম আহ্বান শুনিতে পাইল না।

সরযূ বলিল, "ওঃ! আপনার চোখ-মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে দেখছি! রাঁধছিলেন বুঝি? আমরা আপনাদের ভারী ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছি ত!"

অঞ্চলে আরক্ত আনন ও ললাটতলের স্বেদবিন্দুগুলি মুছিয়া ফেলিয়া প্রতিভা বলিল, "বাড়ীতে আপনার জন এলে যদিই বা একটু ব্যস্ত হ'তে হয়, সেটা কি মন্দ?"

লজ্জিতভাবে সরযূ বলিল, "না, তা বল্‌ছি না—বাঃ! বৌদি—তুমি বেশ ত ঘুমুচ্ছো!"

অমিয়ার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সচকিতে সে শয্যায় উঠিয়া বসিল। গায়ে র‍্যাপারটা টানিয়া দিয়া বলিল, "না, না, আমি ত ঘুমুইনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম।"

প্রতিভা বলিল, "শরীর ক্লান্ত হয়েছে, বেশ ত, খানিক ঘুমিয়ে নিন। আর আধ ঘণ্টা বাদে আপনাকে ডেকে তুল্‌ব।" সরযূর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাদের কাছে বেশীক্ষণ থাকৃতে পাচ্ছি না ব'লে অপরাধ নেবেন না।"

"না, না! সে কি কথা। আমরা বেশ আছি। আমাদের জন্য কিছু ভাববেন না।"

প্রতিভা গৃহকর্ম্মে ফিরিয়া গেল। কায থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অতিথির সংবাদ লইতে আসায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মান-ভঞ্জন

তোমায় কেন লিখ্‌ছি না ক' চিঠি—
শুধু তুমি এইটুকুরই তরে,
নিলে তোমার সরল আঁখি দুটি
অভিমানের অশ্রুজলে ভ'রে!
অমনি তুমি বুঝে নিলে আমি
স্মৃতিখানি গেছি তোমার ভুলে;
কেমন ক'রে, জানেন অন্তর্যামী,
আছ তুমি আমার হৃদয়-মূলে!
দিবস নিশি সকল কাযের মাঝে
তোমার মুখই জাগে আমার মনে,
বিরহ মোর মিলন-রূপে সাজে,—
মিশিয়ে যায় মিলন-স্মৃতির সনে।
সত্যি-কথা নিষ্ঠুরতা করি,
দিই নি তোমায় কদিন কোন চিঠি।
দিই নি কেন—কইতে লাজে মরি,
অশ্রুজলে ভ'রে আসে দিঠি।
সময় আমার অনেক আছে বটে,
শেষ মাসের এই দিনগুলো সব হেথা,
রিক্ত হাতে বড়ই দুখে কাটে
চিঠি লেখার পয়সা পাব কোথা!
দুঃখী ভেবে ক্ষমা ক'রো, যেন
ভুল ভেবে রোষ হয় নি আমার পরে;
আমি তোমার সাথী চিরন্তন
যতই কেন থাকি দূরান্তরে!
দুখের তরেই ছাড়াছাড়ি ভবে,
দুখের তরেই বিদেশ এসে থাকা!
পয়সা যদি থাক্‌ত সবার তরে,
কেই বা প'ড়ে থাক্‌ত একা একা!
ভাব্‌ছ তুমি একাই শুধু বুঝি
কষ্টটা সব সইছ আমার তরে!
তোমার তরে কতই ব্যথা পুঁজি
কর্‌ছি আমি আমার হৃদয় ভ'রে!
পয়লা তারিখ মাইনে আমার হবে;
ভাবনা কিসের? এই শনিবার এলে,
সত্যি যাব তোমার কাছে তবে
হেথায় আমার যা কিছু কায ফেলে।
প্রণাম তোমার পায়ে কেন মোর? —
তুলে নিলুম যত্ন ক'রে বুকে
ভালবাসা করবে হৃদয় ভোর—
বারেক কেন?—সদাই সুখে-দুখে।
ব্যারিং ডাকে দিলুম চিঠি, নিয়ো—
দুটি আনার ডাকের মাশুল দিয়ো;
শুধ্‌বো দিয়ে লক্ষ টাকার চুম,
সারাটা রাত হবে নাক ঘুম।
ইতি—
তোমারই "বী।"

কালিদাসের পক্ষিতত্ত্ব-জ্ঞান

আজ যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল বর্ণনা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে আর আমাদের মন ভিজে না। তিনি না কি সৌন্দর্য্যের কবি; তিনি না কি কেবলমাত্র 'ভারতের কালিদাস'; আবার কেহ কেহ তাঁহার সমস্ত রচনার ভিতর হইতে কেবল উপমাগুলি বাহির করিয়া লইয়া রসে মস্‌গুল হইয়া বলিয়াছেন—'উপমা কালিদাসস্য।' কত শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার জন্মস্থান, উজ্জয়িনীর রাজসভায় তিনি কত দিন ছিলেন, কাশ্মীরে তিনি গিয়াছিলেন কি না এবং সিংহলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল কি না—এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিতমহলে আলোচনা হউক, মহাকবির তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এই সমস্ত বর্ণনা তাঁহাকে খর্ব্ব করে কি না, এই সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের চিত্তকে কাব্যরস-প্রাচুর্য্যের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় কি না, সুধীগণের ইহাই বিবেচ্য। কালিদাসের কাব্য পড়িবার সময় এই সমস্ত প্রশ্ন কোনও রসজ্ঞ পাঠকের মনে উদিত হয় কি না, চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয়, কালিদাস সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সকলের মধ্যে বিলীন হইয়া আছেন। কোন্ অতীত যুগে তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বীণা বাজিয়াছিল, জানি না, কিন্তু আজিও তাহার সুর সমস্ত শিক্ষিত জগতের whispering galleryর ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তিনি সৌন্দর্য্যের অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। যেটি নিত্য, সত্য, সেইটিই তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। বিপুলা প্রকৃতির পটভূমিকায় আকাশ, মেঘ, পাহাড়, নদীসৈকতের মধ্যে তাঁহার তুলিকায় মানুষ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক লতাটি, গাছটি, পাখীটি, ফুলটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্যের একটা বিপুল সমন্বয়ের ভিতর আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সুখ, দুঃখ, বেদনা, হর্ষ বুঝিতে হইলে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর হইতে শুধু মানুষটিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া উপাড়িয়া লইলে চলিবে না, অন্য মানুষের সংঘর্ষে আনিলেও ঠিক ছবিটি, হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ফুটাইয়া তুলা যাইবে না; তাই মহাকবি বিরহী যক্ষের বেদনা বুঝিবার জন্য মেঘের দৌত্য লইয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। আর আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ভবনশিখী কেমন করিয়া বাসযষ্টির উপর বসিয়া আছে, নৃত্যপর কলাপী কি ভঙ্গিমায় কলাপবিস্তার করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে কেকারব করিতেছে, কোথায় গৃহবলভিতে পারাবত সুপ্ত, বর্ষাগমে বিস-কিসলয় মুখে করিয়া মানসোৎক রাজহংস কোন্ রহস্যময় মানস-সরোবরের দিকে যাইবার জন্য গিরিদরী লঙ্ঘন করিতেছে, ঋতুসংহারের দীপক রাগে মর্ম্মর-খচিত হর্ম্যতলে নায়িকার অলক্তরাগ-রঞ্জিত চরণে নূপুর-নিক্কণ শুনিয়া কবির মনে চঞ্চুচরণ-লোহিত হংসরুতি বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, শরৎলক্ষ্মী বিদায়ের কালে নারীর বদনে শশাঙ্ক-শোভা রাখিয়া আর মণিনূপুরে হংসকাকলী অর্পণ করিয়া বিদায় হইতেছেন, কেমন করিয়া শুকোদর সুকুমার নলিনীপত্রে শকুন্তলার প্রেমপত্র লিখিত হইল, উর্ব্বশীর বিরহে উন্মত্ত রাজা হংসকে দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, পাখীটি উর্ব্বশীর কল-গুঞ্জিত গতিভঙ্গীটুকু চোরের মত অপহরণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চাতক, গৃধ্র, সারস, কারণ্ডব, শ্যেন, কুররী, পরভৃৎ পুংস্কোকিল প্রভৃতি কত পাখীর ছবি তাঁহার কাব্য-নাটকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এত সূক্ষ্মভাবে বিহঙ্গ-জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ

করিয়াছেন যে, আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে তাহাদের কোনটাই মেকি বলিয়া মনে হইবে না। এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি, এমন সুসঙ্গত বিশ্লেষণ! শুধু সুন্দর হইলেই হয় না। সত্যের সহিত সুন্দরের একটা গভীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়ে যাঁহাদের কৌতূহল জাগিয়াছে, তাঁহারা কালিদাস-সাহিত্য হইতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গয়টের উচ্ছ্বাসের কথা আমাদের মনে আছে, কিন্তু গয়টে ত কালিদাসের অনুবাদ পড়িয়াছিলেন মাত্র। বড় বড় নামের উল্লেখ করিলে আমার মূল প্রতিপাদ্য কথাটা হয় ত চাপা পড়িয়া যাইবে; কিন্তু আমি পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে শুধু দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া মহাকবির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব। তাঁহার বর্ণিত যে পাখীটির কথাই মনে করি, সে পাখীটি যে আজিকালিকার আধুনিক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, এই কথা মনে হইলে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। কুররীর নাদ আর্ত্ত নারীর কণ্ঠস্বরের মত কি না, হংসরুতি মণিনূপুরনিক্কণকে স্মরণ করাইয়া দেয় কি না, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া রাজহংসের বিচিত্র যাযাবরত্বের কথা ভাবিয়া দেখিলেই আমি যে কথাটা বলিতে চাই, সেই কথাটা বোধ হয় ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইব। বিষয়টি যতই অনুধাবন করিয়াছি, ততই মহাকবির বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শিতায় বিস্মিত হইয়াছি। রাজহংসরা দলবদ্ধ হইয়া আষাঢ়মাসে ভারতের জলাভূমি হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মেঘরাজ্যে উঠিয়া পড়ে; কোন্ এক অন্ধ শক্তির প্রেরণায় সে উত্তর অভিমুখে গিরিরাজ হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হয়, তাহার ভিতর কিসের যেন একটা উৎকণ্ঠা আছে,—বর্ষাকালে যেখানেই এই রাজহংস-প্রয়াণের কথা দেখিতে পাই, সেইখানেই এই উৎকণ্ঠা সূচিত হইয়াছে

> “প্রবাসোৎসুকমনসা, মানসোৎসুকচেতসা,
> মানসোৎকা রাজহংসাঃ।”

কিন্তু যখন তাহারা আবার হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসে, তখনকার বর্ণনায় আর সেই উৎকণ্ঠা নাই। তখন তাহারা কেবলমাত্র মানস-সরোবরের স্মৃতিটুকু লইয়া ফিরিয়া আইসে। কবি তখন তাহাদের মাত্র—

> “প্রিয়মানসা, মানসরাজহংসী”

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রহস্য মন্দ নয়! গেলই বা কেন, আর আসিলই বা কেন? আর হিমালয় অতিক্রম করিবার জন্য কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় তাহারা “হংসদ্বার” বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া যাওয়া-আসা করিল? এ সমস্তই আগাগোড়া একটা রহস্যময় instinct বা ‘অশিক্ষিতপটুত্বম্’এর প্রক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। এই যে প্রবল instinct, এত দীর্ঘ পথপ্রব্রজন,—ইহার কারণ কি? বর্ষাগম বা বর্ষাপগমের সঙ্গে ইহার কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে কি? আছে বৈ কি, না হইলে সমস্ত বর্ণনাই ভ্রমাত্মক হইয়া যায়।

পাখীর এই যাযাবরত্বের মত আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ব্যাপার খুব কমই আছে। ঋতুবিশেষে সমগ্র উত্তর-য়ুরোপ হইতে কতকগুলি পাখী চঞ্চল হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, গভীর নিশীথে যখন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি সুপ্ত, তখন তাহারা কি একটা অন্ধ আবেগের তাড়নায় দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। আলোকরশ্মি-বিচ্ছুরণকারী সমুদ্রতীরস্থ Light houseএ ধাক্কা খাইয়া অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু তবুও তাহারা প্রতিবৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে যথাসময়ে এক প্রকাণ্ড উদ্দাম আবেগের বশীভূত হইয়া, অন্ধকার ভেদ করিয়া, ভূমধ্যসাগরের উপর পাড়ি দিয়া একেবারে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়া উপস্থিত হয়। মধ্য এবং উত্তর-এসিয়ার কতকগুলি পাখী সেইরূপ এক নিগূঢ় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া ঋতুবিশেষে প্রতিবৎসর হিমাচল অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে, শ্যামে, সিংহলে, যবদ্বীপে উপস্থিত হয়। য়ুরোপ মহাদেশের পাখীর পক্ষে যেমন ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করা চাই, এসিয়া ভূখণ্ডের কতকগুলি পাখীর পক্ষে সেইরূপ হিমাচল অতিক্রম করা একান্ত আবশ্যক। কেন আবশ্যক, সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু অহোরাত্র আলোকে আঁধারে কেমন করিয়া তাহারা এই সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া-আসা করে, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের ভিতর কেমন করিয়া তাহারা এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—যাহাকে কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত Niti pass বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন—আবিষ্কার করিল এবং কিছুতেই যাওয়া-আসার সময় এই গিরিসঙ্কট সম্বন্ধে তাহাদের একটুও ভুল

হয় না—এ রহস্যের মর্ম্মভেদ আজিও কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যাওয়া-আসা, এই যাযাবরত্ব যখন কতকগুলি পাখীর পক্ষে স্বাভাবিক, তখন বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কেন যায়, কেন আইসে, কিসের এই উৎকণ্ঠা?—এ সম্বন্ধে যতটুকু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা দেখি, কতকটা খাদ্যাভাবের তাড়না, কতকটা প্রজনন-ঋতুর তাড়না। বাহিরে গিয়া কোথাও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাকে নীড় রচনা করিয়া ডিম্ব প্রসব করিতে হইবে, তাই এই উৎকণ্ঠা। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন এক অননুভূত আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে। কোথায় উত্তর-য়ুরোপ, আর কোথায় দক্ষিণ-আফ্রিকা! কোথায় উত্তর ও মধ্য-এসিয়া আর কোথায় দক্ষিণ-ভারত, সিংহল, নবদ্বীপ! উত্তরে যাত্রার সময় কালিদাসের রাজহংস অল্পক্ষণের জন্য দশার্ণ-গ্রামে অবস্থান করিবে,—

"কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।"

Migration বা যাযাবরত্বের ইহাই একটি লক্ষণ। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ অতিক্রম করিতে হইবে। যে পাথেয়টুকু সম্বল করিয়া পাখীর ঝাঁক যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। পথের মধ্যে আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তাই স্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়। বর্ষা-ঋতু অনেক পাখীর গর্ভাধানকাল। এই সময়ে যে তাহাদের মনে কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহা নহে, তাহাদের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটে;—কালিদাস সেটিও লক্ষ্য করিয়াছেন। বলাকা দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িতে থাকে; সারস পটু মদকলে অন্তরীক্ষ কাঁপাইয়া তুলে। মানসোৎক রাজহংসের প্রয়াণের কথা কবি-কল্পিত বলিয়া ধরা চলে না। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌দের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে, মেঘের সঙ্গে হংসপ্রব্রজনের এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে; গ্রীষ্মাপগমে বর্ষার প্রাক্কালে তাহাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে; গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া, উত্তরে তিব্বত ও মধ্য-এসিয়ার হ্রদ-সান্নিধ্যে অনুকূল জলাভূমিতে গিয়া ডিম্ব প্রসব ও শাবকোৎপাদনাদি কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এই সময়ে এই পাখীগুলিকে আর ভারতবর্ষের মধ্যে দেখা যাইবে না। প্রজনন কার্য্য শেষ করিয়া তাহারা আবার শরৎকালে দক্ষিণে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। বাস্তবিক ঋতুসংহারে তাই দেখি—নিদাঘ-প্রকৃতির অন্তরালে যে হংস প্রচ্ছন্ন ছিল, বর্ষাগমে মেঘদূতের কবি যাহাকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মানসাভিমুখে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন, শরৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের নদীবক্ষে সন্তরণশীল সেই হংস বর্ষাশেষে ঈষন্মলিন নদীজলকে শুভ্র করিয়া, হিল্লোলিত কমল-রাগরঞ্জিত বীচিমালাকে মুখরিত করিয়া, সিতা শরৎলক্ষ্মীর বাহনরূপে আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মহাকবির কাব্যসাহিত্য মন্থন করিয়া অনেক সুধী সমালোচক সুধাভাণ্ড লাভ করিয়াছেন এবং আপামর সাধারণকে তাহার কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে আমি শুধু তাঁহার অপূর্ব্ব সূক্ষ্মদৃষ্টির একটু ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র। তিনি যে পাখীগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি, সে সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবসর আমাদের শিক্ষিত-সমাজে আছে। যে শব্দবিন্যাসে তিনি উহাদিগকে বিশেষিত করিয়াছেন, সেগুলি যে শুধু তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের উদাহরণ-স্বরূপ মাত্র, আর কিছু নহে, এই ভুল ধারণা বোধ করি কাহারও মনে হইবে না। যদি এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিছুমাত্র কৌতূহল জাগে, তাহা হইলেই আমি মনে করিব যে, মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে আলোচিত হইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখন আর আমরা শুধু মহাকবির জয়গান করিয়া ক্ষান্ত হইব না। যে প্রকৃতি-বিশ্লেষণ-সৌন্দর্য্যের দিকে তিনি তাঁহার তর্জ্জনীসঙ্কেতে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, অবনত মস্তকে দ্বিগুণ ভক্তিভরে আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা তখন সার্থক হইবে, আমাদের মাতৃভূমি ধন্য হইবে, আমরাও কৃতার্থ হইব। *

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

---

* কালিদাস-স্মৃতি দিবসে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত।

উলা

৮

মহামারীর পূর্ব্বে উলায় কয়েক জন ভোজনবিলাসী বা 'খাইয়ে' লোক ছিলেন, তন্মধ্যে বেণীমাধব মুস্তৌফী ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। বেণীমাধব অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তখনও তিনি সাধারণ ৭।৮ জন লোকের আহার্য্য অবলীলাক্রমে ভোজন করিতে পারিতেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য "মুনকে রোঘো" নামে খ্যাত। তিনি সর্ব্বপ্রকারে এক মণ আহার্য্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। দেনার দায়ে রঘুনাথ একবার কারারুদ্ধ হয়েন। সে সময়ের সস্তার দিনে দশ বার পয়সা দৈনিক খোরাকী এক জন লোকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রঘুনাথের পাওনাদার তাঁহার জন্ত ঐরূপ খোরাকী জমা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ জজ 'সাহেব'কে জানাইলেন যে, ১০।১২ পয়সায় তাঁহার খোরাকী হয় না, প্রত্যহ অন্ততঃ ২ টাকা হইলে তাঁহার খোরাকী হইতে পারে। ইহা শুনিয়া জজ 'স'হেব' নিজে দুইটি টাকা রঘুনাথকে পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, রঘুনাথ যেন প্রহরীর সঙ্গে যাইয়া স্বয়ং বাজার করিয়া আনেন; তাঁহার রন্ধন হইয়া গেলে জজ 'সাহেব' যেন সংবাদ পান, কারণ, তি.ন নি.জ রঘুনাথের আহার দেখিবেন। রঘুনাথ পরদিন নিজের অভিরুচিমত বৃহৎ মৎস্য, রাশীকৃত চাউল, দাইল, ঘৃত ও তৈলাদি আনিয়া রন্ধন শেষ করিলেন। তৎপরে তিনি কতকগুলি আস্ত কলার পাতা ভূমির উপর বিছাইয়া তদুপরি সেই সকল আহার্য্য স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। জজ 'সাহেবকে' সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি অশ্বারোহণে রঘুনাথের আহার দেখিতে আসিলেন এবং অদূরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সেই স্তূপাকার আহার্য্য এক জন লোকের পক্ষে খাওয়া কিরূপে সম্ভব, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রঘুনাথ গণ্ডূষ করিয়া আহারে বসিলেন এবং অল্পকালমধ্যে অর্দ্ধেক সামগ্রী খাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বিশাল বদনব্যাদান করিয়া দশ সের ওজনের রোহিত মৎস্যের মুড়া কামড়াইয়া লইয়া সশব্দে চিবাইতে লাগিলেন। অমনই জজ 'সাহেব' বলিয়া উঠিলেন, "এ দানা হ্যায়। হামকো মৎ খাও বেটা, দোসরা মুদ্দার হ্যায়, উস্‌কো খাও।" ইহা বলিয়া জজ 'সাহেব' বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে জজ 'সাহেব' পাওনাদারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে প্রত্যহ রঘুনাথকে ২ টাকা খোরাকী দিতে পারিবে কি না? সে ব্যক্তি অক্ষমতা জানাইলে জজ 'সাহেব' রঘুনাথের মুক্তির আদেশ দিলেন। রঘুনাথ আহারে কৃতিত্ব দেখাইয়া বহু ধনীর গৃহ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা তিনি সুখে সংসার প্রতিপালন করিয়া দুর্গোৎসবাদি পর্য্যন্ত করিতেন।

জঙ্গলাবৃত কয়েকটি স্তম্ভ

বনাকীর্ণ অট্টালিকা

৯

মহামারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উলায় কয়েক জন সাধক ছিলেন। রামেশ্বর মুস্তৌফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন মুস্তৌফী, এক জন সাধক ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে অনেক সিদ্ধ পুরুষের নিকটে দীক্ষিত হইয়া পরে নায়িকা-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গণনা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিতে পারিতেন। তাঁহার গণনার ফল তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার হস্তস্থিত লেখনী হইতে সংস্কৃত শ্লোকরূপে বাহির হইত। নদীয়ার রাজা গণনা করাইবার জন্ত রঘুনন্দনকে ঘন ঘন কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতেন।

রঘুনন্দনের সমসাময়িক কালে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত সাধক "আউলিয়া চাঁদ" উলায় মহাদেব বারুইয়ের গৃহে ছিলেন। আউলিয়াচাঁদ তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক।

ইহার পরে উলায় আর এক জন সাধক ছিলেন, ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী। ইনি উলার ব্রহ্মচারি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দলাল ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি গ্রামের মধ্যে গৃহস্থ-পল্লীতে শব ও নরমুণ্ডাদি লইয়া সাধনা করিতেন। তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে।

মহামারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিখ্যাত বিশ্বনাথ বা বিশে পাগলা জীবিত ছিলেন। ইনিই রজতখণ্ডকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই সময় উলার বেলিয়াডাঙ্গা পাড়ায় গোলোক নামক এক জন দীন সাধক ছিলেন। তিনি জাতিতে মুচি এবং কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি নির্ম্মল ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে জীবহত্যা, নানা দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তিনি মন্ত্র দ্বারা কঠিন ব্যাধি আরাম করিতেন। মহামারী আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোলোক ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন যে, সত্বর উলা ধ্বংসপ্রায় হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিতে বিলম্ব হয় নাই।

১০

মহামারীর পূর্ব্বে উলায় অনেকগুলি শিক্ষিত ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী নদীয়া জিলার শ্রেষ্ঠ অন্যতম জমীদার ছিলেন। তিনি মহানুভবতা ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উলার উত্তরপাড়ায় আর এক জন দাতা ছিলেন, তাঁহার নাম উমানাথ মুখোপাধ্যায়। শুনা যায় যে, ইনি নিজের কোশাকুশী পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়া রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন। উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় এক জন দাতা ছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জন্য ও নানা হিতকর কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। উলার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি উইল দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্পত্তি মিউনিসিপ্যালিটী উদ্ধার করিতে পারে নাই।

নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর প্রণয় ছিল। ইঁহারা উভয়ে ইংরাজী শিক্ষার ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। গীতবাদ্য, হাস্য-পরিহাস ও উৎসবে স্বচ্ছন্দতার আনন্দে যখন উলার জনগণ মগ্ন থাকিত, সেই সময় যমরূপী মহামারী উলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। ইহা ১২৬৩ সালের ভাদ্রমাসের কথা। সুস্থ লোকের সহসা ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর হইতে লাগিল, সেই জ্বরে কেহ ৪।৫ ঘণ্টা, কেহ বা ২।১ দিনের মধ্যে মরিয়া যাইতে লাগিল। এইমাত্র যে ব্যক্তি এক জন রোগীর জন্য বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, ক্ষণপরে তাহারই জন্য আর এক জন বৈদ্য ডাকিতে গেল। তখন ডাক্তার ছিল না, কবিরাজ ছিল। প্রত্যহ শত শত লোক মরিতে লাগিল। অবশেষে এত অধিক লোক মরিতে লাগিল যে, মৃতদেহ সৎকার করা দূরের কথা, উহা ফেলিবার লোক পাওয়া গেল না। গ্রামের বাহিরে ও গ্রামের মধ্যে খাল-বিল ও মাঠে, রাস্তার ধারে ও বাটীর প্রাঙ্গণে সৎকারাভাবে মৃতদেহ পচিতে লাগিল এবং শৃগাল, কুকুর ও গৃধিনীর ভক্ষ্য হইল। উলার লোকের দেহ পচিয়া পোকা পড়িয়া উলার মাটীতে মিশাইল। সে সময় পিতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে ও ভ্রাতা ভগিনীকে রোগশয্যায় বিজন গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল। অনেক গৃহে রোগক্লিষ্ট শক্তিহীন জীবিত ব্যক্তিকে শৃগাল ও গৃধিনীর দল গৃহমধ্যেই ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

মহামারীর ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল আর ফিরিয়া আসিল না। সে সময় গ্রামে এক প্রকার পক্ষী দেখা দিয়াছিল, তাহারা রাত্রিতে গম্ভীর স্বরে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিত। ইহাকে লোক অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। সে সময় উলার বাতাসে সর্ব্বদা যেন অমঙ্গলজনক এক প্রকার হাহাকার স্বর ভাসিয়া বেড়াইত। নানাপ্রকার ভৌতিক গল্প লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' হইতে জানা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট মহামারী হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট তখন সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত।

সে কালে লোক ইহাকে "মহামারী" ও "নূতন জ্বর" কহিত। প্রায় ৫ বৎসর কাল এই ব্যাধির সংহারক্রিয়া প্রবল তেজে চলিয়াছিল। তাহার পরেও ২।৩ বৎসরকাল ইহা গ্রামে ছিল, তখন ইহার তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের বিখ্যাত ঝড়ের পরে মহামারীর শান্তি হইল বটে, কিন্তু সেই হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর চিরতরে গ্রামে বাসা বাঁধিল। উলার এই মহামারী পরবর্ত্তীকালে সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তৎপরে উলার ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বঙ্গের পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মহামারীর পরবর্ত্তী মন্দীভূত অবস্থার নাম ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তৌফী
ইনি লণ্ডন সহরে কাশিমের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন

মহামারীর সংহার-লীলার ফলে কয়েক বৎসরমধ্যে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া উলা ধ্বংস হইয়া গেল। উৎসবের আনন্দকোলাহল নীরব হইল; শিল্প-বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চ্চা চিরতরে লোপ পাইল। লোকালয় জনশূন্য হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল।

১১

সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার "Statistical account of Nadia and Jessore" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উলার যে মহামারী

পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, উহা বিখ্যাত বীর সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দেখা দেয়। ঐ বৎসর ৫।৭ শত কয়েদী যশোহর-ঢাকা রাজবর্ত্মের যে অংশ মহম্মদপুরের রামসাগর দীঘি ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত, উহা মেরামত করিতে নিযুক্ত ছিল। উক্ত বৎসর মার্চ্চ মাসে মহামারী-জ্বর সর্ব্বপ্রথম উহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া নিমেষমধ্যে ১ শত ৫০ জন কয়েদীর প্রাণসংহার করে; ইহা দেখিয়া রক্ষিগণ কয়েদীদিগকে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ৭ বৎসর থাকিয়া উক্ত বৃহৎ নগরীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার এলিয়ট ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "Epidemic, Remittent and Intermittent Fever" নামক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে দেখা দিয়াছিল। (এই উক্তির সহিত স্থানীয় লোকের উক্তি ও হাণ্টার 'সাহেবের' বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এতদুভয়ের মতে মহম্মদপুরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহামারী প্রথমে দেখা দেয়।) তৎপরে এই মহামারী নলডাঙ্গায় ও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চাচড়া ও কসবায় দেখা দিয়া ঐ গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইহা তদানীন্তন সুবিস্তৃত নদীয়া জিলার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা ১৮৩২ এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃহৎ জনপদ গদখালিতে উপস্থিত হইয়া গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তৎপরে ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা বনগ্রাম ও চাকদহের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহকে ধ্বংস করিয়া ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয় এবং দেবগ্রাম, মুড়াগাছা প্রভৃতি করিয়া গ্রামগুলি উৎসন্ন দেয়।

উলা ডাক্তারখানা

তৎপরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে এই মহামারী উলায় উপস্থিত হয়। এলিয়ট লিখিয়াছেন যে, তৎকালে উলা সেঁৎসেঁতে স্থানে অবস্থিত ছিল এবং ৬ বৎসরের মহামারীতে অন্যূন ১০ হাজার লোক মরিয়াছিল। (এলিয়ট-বর্ণিত এই মৃত্যুসংখ্যা গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে স্থান পাইলেও উহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। উলায় মহামারীর ধ্বংস-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ বৃদ্ধ লোক আজিও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম তিন বৎসরেই উলায় ১৬ হাজার লোক মরিয়াছিল। ইহার পরেও মহামারীর ধ্বংসলীলা ৫।৬ বৎসর চলিয়াছিল, কিন্তু তখন উহা মন্দীভূত হইয়াছে।) তৎপরে উলাকে কেন্দ্র করিয়া উলা হইতে এই মড়ক নদীয়া জিলার দক্ষিণভাগে এবং হুগলী ও বারাসত জিলায় (তৎকালে বারাসত একটি জিলা ছিল, পরবর্ত্তী কালে উহা মহকুমায় পরিণত হইয়াছে) প্রবেশ করে। তৎপরবর্ত্তী ৩ বৎসর কালমধ্যে এই ব্যাধি উলার উত্তরে স্থিত বারাসত, বাদকুল্লা ও সিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ধ্বংসলীলা শেষ করিয়া কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমার অদূরে উপস্থিত হয় এবং ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপুর ও দিগনগর প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করে। ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাকদহে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরের গ্রাম ও নগরগুলি বিধ্বস্ত করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহামারী বারাসত, হুগলী এবং বর্দ্ধমান জিলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ বৎসর ইহা বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর ও ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে এবং ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া মগরা, সপ্তগ্রাম, এমন কি, হোসেনাবাদ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ইহা ত্রিবেণীর উত্তরে স্থিত জয়পুর, বাগাটি, নয়াসরাই, সিজে, ডুমুরদহ, জিরেট ও বলাগড়ে সংহারক্রিয়া শেষ করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই এলিয়ট কর্ত্তৃক লিখিত মহামারীর বর্ণনা। এলিয়ট লিখিয়াছেন যে, উলা ও নবলা প্রভৃতি গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, এই সকল গ্রামের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত—ইহাদিগের দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। এলিয়ট রোগোৎপত্তির যে সকল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে অস্বাস্থ্যকরভাবে বাস, অপরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার ও জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাবে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। এলিয়ট মহামারী উৎপত্তির কারণের যে বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ মহামারী উৎপত্তির কারণ নহে, পরন্তু মহামারীর ধ্বংসলীলার পরবর্ত্তী ফল। এই মহামারীর পরবর্ত্তী মন্দীভূত অবস্থা বর্ত্তমান কালের ম্যালেরিয়া। ডাক্তার পেনের (Payne) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরের যে রিপোর্ট ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে এই মহামারীর পরবর্ত্তী অবস্থাকে (অর্থাৎ ম্যালেরিয়াকে) "বর্দ্ধমানের জ্বর" (Burdwan Fever) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১২

মহামারীর বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জ্বরচিকিৎসার জন্য উলায় একটি অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। ইহা প্রধানতঃ সাধারণের চাঁদার উপরে নির্ভর করিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই ডাক্তারখানা স্থায়ী হয়। ডাক্তারখানার নিজস্ব একটি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭৫ টাকা মূল্যের ১৫ কাঠা নিষ্কর ভূমি দান করেন। ঐ ভূমিখণ্ডের উপর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারখানার বর্ত্তমান কোঠাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। উলার ডাক্তারখানায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১ হাজার ৩ শত ৩৪ জন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১ হাজার ৫ শত ৩৪ জন (গড়ে প্রত্যহ ৩৫·৫৫ জন) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মোট ৩ হাজার ৭ শত ৩২ জন (গড়ে প্রত্যহ ৪৭·৪৯ জন) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ হাজার ৮ শত ১৫ জন ম্যালেরিয়ায় রোগী। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারখানার মোট আয় ১ হাজার ৬ শত ৪৬ টাকা ও মোট ব্যয় ১ হাজার ৮ শত ৯২ টাকা হইয়াছিল। উলার বাহিরের বহু রোগী এই ডাক্তারখানায় বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারখানার সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে।

গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিটি ওয়ার্ডে গ্রামটি বিভক্ত। ইহার ১২ জন কমিশনার আছেন, তন্মধ্যে ৪ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার ইহার সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। সরকারী চেয়ারম্যানদিগের মধ্যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও সিভিলিয়ান শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে উলার মিউনিসিপ্যালিটীর নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর আফিস পর্ণকুটীরে ছিল। চেয়ারম্যান কবিবর

নবীনচন্দ্র ও ভাইস-চেয়ারম্যান বারাণসী বসুর আন্তরিক চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান কোঠাঘর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং উহার সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হয়। যে জমীর উপরে বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আফিস ও পুকুর আছে, উহা পূর্ব্বে তারানাথ, উপেন্দ্রলাল, বিজয়গোপাল ও শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ১২ জন সরিকের এজমালি সম্পত্তি ছিল। এই জমীর পরিমাণ ১৬ বিঘা ও মূল্য অনুমান ৭ শত টাকা। চেয়ারম্যান কবিবর নবীনচন্দ্র ও ভাইস-চেয়ারম্যান বারাণসী বসু বহু কষ্টে এই সম্পত্তির ১২ জন মালিকের মধ্যে ৮ জনের নিকট হইতে তাঁহাদের অংশের একখানি দানপত্র ১৩০১ সনে লিখাইয়া লয়েন। বাকী ৪ জন সরিক যখন শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে চেয়ারম্যান ও বারাণসী বসু ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের অংশের দানপত্র লিখিয়া দেন। এই শেষোক্ত দানপত্র ১৩০৪ সনে সম্পাদিত হয়।

মিউনিসিপ্যালিটী ও ডাক্তারখানা ম্যালেরিয়ার প্রতীকার করিতে অক্ষম বলিয়া গ্রামের কতিপয় ভদ্র-সন্তান গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া পূজার সময় "বীরনগর পল্লী-মণ্ডলী" নাম দিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি সমিতি গড়িয়াছেন। এ যাবৎ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইহাকে ১ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার প্রতি বৎসর ইহাকে ৫০ টাকা সাহায্য করিতেছেন। গ্রামবাসী-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ও প্রধানতঃ শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মিত্রের অর্থসাহায্যে এই পল্লীমণ্ডলীর কার্য্য চলিতেছে। বিভূতিভূষণ প্রথম বৎসর এক সহস্র মুদ্রা মণ্ডলীকে দান করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৫ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি রেটপেয়ার্স এসোসিয়েসন বা করদাতাদিগের সভা স্থাপিত হয়। এ দেশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে উক্ত সমিতি কিয়ৎকাল মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের গলদ বাহির করিয়া ও সভা সমিতি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে পল্লীমণ্ডলী হওয়ায় এই সমিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। স্কুলের ছেলে ও মাষ্টারদিগের চেষ্টায় গ্রামে একটি সেবা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। স্কুলের কতিপয় বালক ইহার জন্য চাউল ও অর্থ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করে; তদ্দারা অনাথ ও আতুরদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। এই নিঃস্বার্থ বালক কয় জন স্কুলের হেডমাষ্টার ও অন্যতম পরোপকারী শিক্ষক শ্রীমান্ সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ইহার সভ্যসংখ্যা ১৭ জন ছিল, এক্ষণে ৯৯ জন হইয়াছে। ইহার ৯ জন ডিরেক্টর আছেন।

এইগুলি ব্যতীত উলায় আর কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই।

উলার এক্ষণে ভয়াবহ অবস্থা। যে উলায় মহামারীর পূর্ব্বে প্রায় ৫০ সহস্র লোক ছিল, তথায় এক্ষণে লোক নাই বলিলেই হয়। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রামে ৪ হাজার ৫ শত জন লোক এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২ হাজার ৩ শত ৫ জন মাত্র লোক ছিল। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা আরও কমিয়া গিয়াছে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। গত ১১ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়ে প্রতি বৎসর জন্মের সংখ্যা ৫২ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৭২ জন। শিশুদিগের মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক, তাহারা অধিক দিন বাঁচে না। সাধারণতঃ গ্রামের লোকের দেহ শুষ্ক ও রক্তশূন্য, এবং প্লীহা-যকৃতে পরিপূর্ণ উদরের স্ফীতি অত্যন্ত অধিক। তাহারা জীবন্মৃত হইয়া আছে, কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই, কোন জিনিষের ভাল দিক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। তাহাদিগের অর্থের অভাব অত্যন্ত অধিক, সকলের নিয়মিত দুই বেলা অন্ন জুটে না। গ্রামের সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্য, বহুবিধ পক্ষীর কূজনে মুখরিত এবং ব্যাঘ্র, শূকর ও সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল। তাহারা নির্ভয়ে বিচরণ করে। গত ৬০।৭০ বৎসর মধ্যে যাহারা উলায় জন্মিয়াছে, তাহারা সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের শোভা কাহাকে বলে, জানে না। তাহারা বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোগভোগ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

স্মৃতির দাগ

প্রবাসে কত দিন সহিয়া কত ক্লেশ,
ফিরিয়া এনু যবে আপন গৃহ-দেশ,
গ্রামের বাঁকা পথে, সাঁঝের দীপ হাতে,
শুধা'ল শুধু হেসে, "ছিলে তো ভাল বেশ ?"

সে দিনও সাঁঝে পুনঃ গ্রামেরে পিছু রাখি,
প্রবাসে ফিরি যবে, চমকি চাহি দেখি,
কলস ছিল কাঁকে, সলাজ জোড়া আঁখে,
সজল ভাষে মোরে বিদায় দিল ডাকি।

কভু সে বাঁকা পথে ফিরেছি যদি আর,
এখনো মনে হয় দেখা কি পাব তার ?
শিবের ভাঙা মঠে, নদীর বাধা-ঘাটে,
"অভাগী বেঁচে নাই," কে বলে বারবার ?

আলোকে উজ্জ্বল তাহারি রাঙা মুখ,
কি রঙে রেঙে গেল আমার এ সারা বুক !
সলাজ জোড়া দুটি কাজল-আঁখি-জল,
বুকে যে জেলে গেল, দারুণ দাবানল !

এখনো ক্ষণে ক্ষণে পিছনে চেয়ে দেখি,
কুশল কিছু মোর, শুধা'বে কেহ না কি ?
ওই যে দীপ হাতে, ওই যে চ'লে যায়,
দেখিনু এই যেন, আর না দেখি তায় !

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রজাপতি ব্লাউজ

এই ব্লাউজে সূচের কায বেশ সুন্দর দেখিতে হয়, অথচ খুব সাদাসিদা। লংক্লথ ও চায়নীজ সিল্কজাতীয় কাপড়ে অধিকাংশ এই ব্লাউজ সেলাই হইয়া থাকে।

সরঞ্জাম ঃ—(Materials) কাপড় হ্' লম্বা ৩২"+৪"=৩৬" ইঞ্চি বা ১ গজ।

ব্লাউজের মাপ ঃ—লম্বা—১৬" ছাতি ৩২" কোমর—২৮" সেন্ত—১৪" পুট—৬½" পুটহাতা—১২½"।

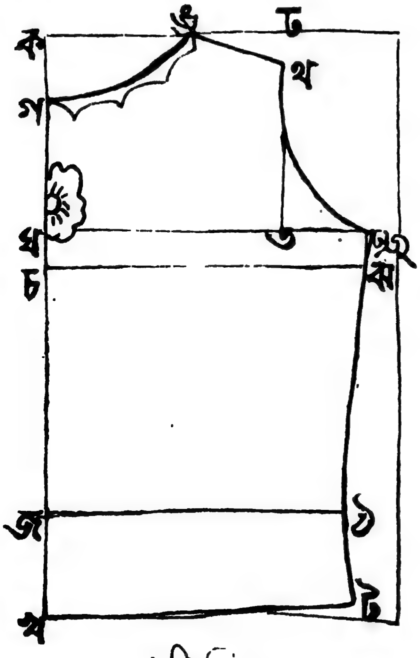

১নং চিত্র

ব্লাউজ কাটিবার প্রণালী ঃ—যে কাপড়ের ব্লাউজ হইবে, কাপড়কে এড়োয় ডবল ভাঁজ করিয়া পিছনের অংশ কাটিতে হইবে। ক, খ লম্বা মাপ ১৬" ক, ঘ ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"—১"=৭" ইঞ্চি ঘ, চ ১½" ইঞ্চি নীচের ছাতির মাপ লাইন। ক, জ সেন্ত মাপ ১৫" এখন ঘ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"+১½"=৯½" ইঞ্চি ছ বিন্দু চিহ্ন করিয়া চ, ঝ ঠিক ঘ, ছ সম লাইনে টানিয়া লইতে হইবে। এখন জ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭"+১½"=৮½" ইঞ্চি স্থানে ঠ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ছ, ঝ হইতে ঠ বিন্দু সংযোগ করিয়া খ বিন্দু হইতে ট বিন্দু ½" ইঞ্চি উপরে বাকা ভাবে সংযোগ করিয়া ঠ, ট সংযোগ করিতে হইবে। এইবার ক বিন্দু হইতে পুট মাপ ৬½" ইঞ্চির একটু বেশী ঢ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঢ বিন্দু হইতে ২½" ইঞ্চি ভিতরে ড বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঢ বিন্দু থ বিন্দু ১¼" ড, থ সংযোগ করিয়া লইলে পুটের অংশ দাগ দেওয়া হইল। এখন ক বিন্দু হইতে ২" ইঞ্চি নীচে বা ততোধিক পছন্দানুযায়ী চিহ্ন করিয়া ড, গ বাকা ভাবে সংযোগ করিতে হইবে। তাহার পর থ বিন্দু ত বিন্দু ছাতির লাইনে সংযোগ করিয়া থ বিন্দু হইতে বাকাভাবে চিত্রানুযায়ী ছ বিন্দু পর্য্যন্ত দাগিয়া লইলে মোহোড়ার অংশ দাগ দেওয়া হইল। এবার গ, ড, থ, ছ, ঝ, ঠ, ট ও খ বিন্দুর দাগে কাটিয়া লইলে পিছনের অংশ কাটা হইল।

সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিয়া পিছনের অংশ তাহার উপর রাখিয়া ছাতির, মোহোড়ায় ও কোমরের মাপের দাগে সোজা দাগ টানিয়া ঘ বিন্দু স্থানে ত বিন্দু চ বিন্দু ৪ বিন্দু ছাতির মাপের জ বিন্দু স্থানে ৯ বিন্দু কোমরের মাপের লাইন। এখন চ বিন্দু হইতে ঝ বিন্দু যত মাপ বাদ দিয়া ছাতির মাপ ৪ বিন্দু হইতে ৬ বিন্দু ½ অংশ ১৬"+৩"=১৯" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া কোমরের জ বিন্দু হইতে ঠ বিন্দু যত মাপ বাদ দিয়া ৯ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের অর্দ্ধেক ১৪"+৮"=২২" ইঞ্চি স্থানে এখন পাশের অংশ ৫ বিন্দু হইতে ৭ বিন্দু পর্য্যন্ত ৬ ও ১০ বিন্দুর

দাগে ঠিক রাখিয়া চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইতে হইবে। ২ বিন্দু হইতে ½" ইঞ্চি উপরে ৭ বিন্দু একটু বাঁকাভাবে দাগিয়া পুটের অংশ দাগিতে হইবে। পুট থ বিন্দু ৮ বিন্দু ½" ইঞ্চি উপরে ৬ ও থ স্থানে ১৩ ও ৮ চিত্রানুযায়ী কাঁদ অংশ দাগিয়া ৮, ১২ ও ৫ পিছনের অংশের দাগ হইতে ১" ইঞ্চি ভিতরে বেশ একটু বাঁকাভাবে দাগিয়া লইতে হইবে। সামনের অংশ একটু বেশী কাটিবার কারণ, তাহা হইলে মোহড়ার অংশ ভাল বসিবে। গ বিন্দু হইতে ১ বিন্দু আরও ৩" ইঞ্চি নীচে, অর্থাৎ ক বিন্দু হইতে ৫" ইঞ্চি নীচে সামনের গলার অংশ দাগিয়া ১৩ হইতে ১ বিন্দু পর্য্যন্ত চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে সংযোগ করিতে হইবে। সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় ১, ১৩, ৮, ১২, ৫, ৬, ১০, ৭ ও ২ চিহ্নিত দাগে কাটিয়া লইলে সম্মুখের অংশ কাটা শেষ হইল।

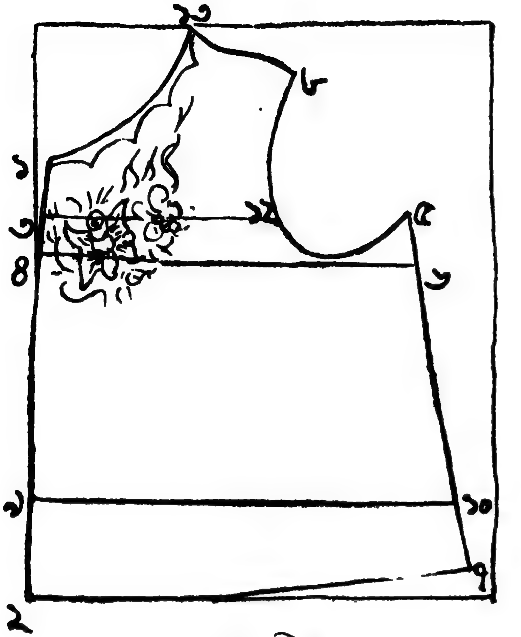

২নং চিত্র

হাতের অংশ কাটিবার প্রণালীঃ—অ বিন্দু হইতে পুট বাদ দিয়া ই বিন্দু পর্য্যন্ত ১২½" ইঞ্চি অর্থাৎ ৬" ইঞ্চি অ বিন্দু হইতে আ বিন্দু ছাতির ¼ অংশ ৮" ইঞ্চি পিছনের অংশে ত ও ছ বিন্দু যত ইঞ্চি অ, উ তত ইঞ্চি স্থানে দাগ দিয়া উ ও উ সোজাভাবে টানিয়া লইয়া অ ও উ সংযোগ করিয়া অ ও উ ১" ইঞ্চি বাহিরে, একটু বাঁকা ভাবে দাগ দিয়া সংযোগ করিয়া ঈ বিন্দু ½" ইঞ্চি ভিতরে হাতের (Shape) এর জন্য উ হইতে ঈ পর্য্যন্ত একটু বাঁকাভাবে সংযোগ করিয়া ই, ঈ সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। এখন অ, উ, ঈ ও ই চিহ্নিত দাগে কাটিয়া লইলে হাতের অংশ কাটা হইল।

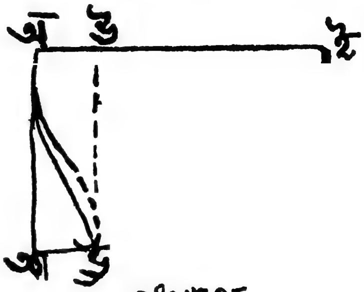

৩নং চিত্র

সেলাইয়ের প্রণালীঃ—ব্লাউজের পিছনের ও সম্মুখের অংশে যে গলার অংশ কাটা হইয়াছে, তাহাতে চিত্রে যেরূপ দাগ চিহ্নিত করা হইয়াছে, তদনুরূপ চিত্র করিয়া সম্মুখের অংশে দুই দিকের বুকে দুইটি প্রজাপতির চিত্র ও সামান্য লতাপাতার চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর স্থচের কায করিয়া লইয়া গলার অংশে ও হাতের অংশে মুখে প্রায় বোতামের যেরূপ কায-ঘর করা হয়, তদনুরূপ স্থচের

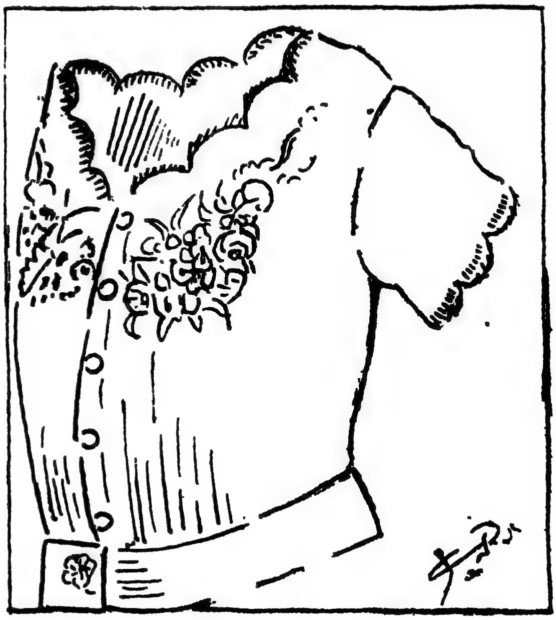

৪নং চিত্র

কায করিয়া কাঁচির সাহায্যে বাহিরের সাদা অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাও বলিয়া রাখি যে, ব্লাউজের সমস্ত সেলাইয়ের কায শেষ করিয়া কাঁচির সাহায্যে সূচের কাযের বাহিরের সাদা অংশ কাটিয়া ফেলা যায়। বোতাম-পটী ও কায-ঘরের পটী বসাইয়া পাশ ও কাঁধ সেলাই করিয়া নীচের অংশে কোমরের মাপের ২৮"+৫"=৩৩ ইঞ্চি লম্বা ও ৪" ইঞ্চি চওড়া একখানি পটী কাটিয়া ব্লাউজের নীচের অংশে জুড়িয়া দিবার সময় সম্মুখের অংশে কুচি দিয়া সেলাই করিতে হইবে। সম্মুখের বোতাম-পটী ও কায-ঘর পটীতে ৫টি বোতাম-ঘর তৈয়ার করিয়া বোতাম-পটীতে সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "প্রজাপতি ব্লাউজ" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ভাদরে

আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবনখানি।
কি যে মনে জাগে কি যে ভাল লাগে
সে কথা নাহিক জানি।
রহি রহি ওই উতলা পবন
ফেরে দ্বারে দ্বারে উদাসীন মন
কি জানাতে চায় বোঝা নাহি যায়
কি কহে অফুট বাণী?
আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবনখানি।

কত অতীতের বিনিদ্র রাতের
কাহিনী পড়িছে মনে।
ফুটিত বকুল আমের মুকুল
ঝরিত রে বনে বনে।
কুহু কুহু কুহু কুহরিত পিক,
দুঁহু মুখ চাহি দুঁহু অনিমিখ
প্রাণের গোপন যে কথা দু'জন
লিখিয়াছি নিরজনে,
নয়নের নীরে, আজি ফিরে ফিরে
সে কথা পড়িছে মনে।

আজি বার বার পরাণে আমার
জাগে সে সোনার স্মৃতি।
অমিয় পরশ উছল হরষ
বচন মধুর প্রীতি।
নিজ হাতে রচি মালিকাখানিরে
কার গলে দিছি নাহি ত জানি রে।
কত অনুরাগ অসীম সোহাগ
কুণ্ঠা সরম ভীতি।
আজি বার বার পরাণে আমার
জাগে সে সবার স্মৃতি।

ওরে, সে মনে আমার হিয়ার মাঝার
জাগে এ কি ক্রন্দন!
মনে হয় হেন ছিঁড়ে যায় যেন
মরমের বন্ধন।
আয় ফিরে সেই সোনার স্বপন!
লভি তারি মাঝে তারি দরশন!
আয় সে জীবন নব যৌবন
মধু-ঢালা গুঞ্জন!
সেই মধু মাস মলয়-বাতাস
তপ-তাপ-ভঞ্জন।

আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবন মোর।
যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই
প্রলয়ের ঘন ঘোর।
মুহু মুহু ওই চকিছে দামিনী
মনে হয় যেন সেই বিরহিণী
ভ্রমে একাকিনী দিবস-যামিনী
বাদলে বরষি লোর।
গগনে গগনে নিশসি সঘনে
পরাণ বিঁধিয়া মোর।

ওরে, চিনি চিনি চিনি ওই রিণি রিণি
নূপুরের ঝঙ্কার।
ওই যে এলায়ে আকাশের গায়ে
তারি সে চিকুরভার।
পেয়েছি তাহার আঁখির দরশ,
সজল হাওয়ায় হিয়ার পরশ,
সেই মধু বাণী ভুবন-ভুলানি,
ভুলিতে কি পারি আর?
পেয়েছি এবারে হৃদয়-মাঝারে
অমিয় পরশ তার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

হানাবাড়ী

৩৭

কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন পরে অবসরমত এক দিন কোর্ট হইতে বেলা ৩টার সময় প্রমাণের দ্রব্যগুলা সঙ্গে লইয়া ঘোষ-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। চাকরের হাতে 'কার্ড' পাঠাইয়া বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নিতাই-প্রদত্ত ছাতাটা সেই ঘরের মধ্যে একটা কৌচের আড়ালে রাখিয়া দিলাম। অল্পক্ষণ পরে ঘোষ-পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সহাস্য মুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "ইস্! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, এত দিন পরে হঠাৎ এ রকম অসময়ে আপনার দর্শন-লাভ হ'লো! একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন যে!"

"না, তা কি হ'তে পারে? আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনাকে বাদ দেওয়া বা ভুলে যাওয়া ত সম্ভব নয়!—সে যা হোক্, আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎটা আপনার পক্ষে একটুও প্রীতিজনক হবে না, মিসেস্ ঘোষ!"

তিনি কিছু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "কেন বলুন দেখি?"

"কারও কিছু হোক্ আর না হোক্, আপনার নিজের কিছু অমঙ্গলের সম্ভাবনা হয়েছে।"

"সে কি? আপনি যে আমাকে বড় ভয় লাগিয়ে দিচ্ছেন দেখছি! কি হয়েছে, সিধে করেই বলুন না!"

"হাঁ, তাই বলবার জন্যই আজ এখানে এসেছি।—দেখুন, মিসেস্ ঘোষ, এই খুনের বিষয় অনুসন্ধান ত এক রকম শেষ হয়েছে। খুনীর সম্বন্ধে যতগুলা প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পেয়েছি, সেগুলা সব আপনারই বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে,—সেই কথা আপনাকে জানাতে, আর এ বিষয়ে আপনার কি বলবার আছে, তাই জান্‌তে এসেছি।"

যমুনা প্রথমে নিতান্ত বিস্মিতভাবে আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া, পরে শ্লেষভরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রমাণ?—আমার বিরুদ্ধে? তা হ'লে আপনাদের এত দিনের এ সব মেহনত খুব সার্থক হয়েছে বল্‌তে হবে! আপনাদের তারিফ না ক'রে থাকা যায় না!—এ কোন্ গোয়েন্দার বাহাদুরী? আপনার, না, সেই গাঙ্গুলী বাবুর?"

"যারই হোক্,—সে খবর জেনে আপনার কোন লাভ হবে, তা বোধ হয় না। কিন্তু কথাটা এ রকম ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না, মিসেস্ ঘোষ! এখনও ব্যাপারটা আমাদেরই হাতে আছে; কিন্তু আপনি যদি আমার সব কথার সরলভাবে উত্তর না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে প্রমাণগুলা আমি 'সি-আই-ডি' পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য হব। তখন অবশ্য তারাই এ বিষয়ের উচিতমত ব্যবস্থা করবে।"

ঘোষ-পত্নী অসীম অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "তাতে আমি ডরি না, মিঃ দত্ত! আমি নিজে যখন জানি যে, এই খুনের ব্যাপারে আমার কোনই এলাকা নাই, তখন পুলিসের নামে আমার ভয় পাবার কোন কারণ নাই।"

তাঁহার এরূপ অবজ্ঞাভাব আমার সহ্য হইল না। আমি তাঁহাকে একেবারে স্তম্ভিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "খুনের সহিত যদি আপনার কোন সম্পর্ক নাই ত সেই হানাবাড়ীতে আপনি যেতেন কি জন্য?"

"হানাবাড়ী?—সে কোথায়?"

"রামপাল লেনের যে বাড়ীতে আপনার স্বামী খুন হয়েছিলেন, সেই বাড়ী। আপনার কাছে সব কথাই যে নূতন হয়ে পড়ছে দেখছি!"

"সেটা আমার বদ্-নসীব! ও বাড়ীটা যে হানা, তা আগে কখনও শুনেছি ব'লে মনে হয় না। সে যাই হোক্, সে বাড়ী ত আমি এ পর্য্যন্ত কখন চোখে দেখিনি,—সেখানে যাওয়া ত দূরের কথা।"

"বলেন কি? তা হ'লে ও-বাড়ীতে আপনার পোষাকের এই দুটো ছেঁড়া টুক্‌রা পাওয়া গেল কি ক'রে?" বলিয়া আমি সেই ঢাকাই শাড়ীর পাড় সমেত ছিন্নাংশ ও পেটিকোটের লেসের পাড়ের টুক্‌রাটা তাঁহাকে দেখাইলাম।

সেগুলা তাচ্ছীল্যভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "এগুলা আমারই পোষাকের টুক্‌রা, তা আপনি কিসে জান্‌লেন? এ রকম ঢাকাই কাপড় ও লেসের পাড় ত যে কোন স্ত্রীলোকেরই হ'তে পারে?"

"তা পারে, কিন্তু এগুলা যে আপনারই পোষাকের অংশ, তা যার ভাল রকম জানা সম্ভব, সে-ই চিনেছে।"

"আমি ছাড়া আমার পোষাকের সঙ্গে এত পরিচয় আর কার হ'তে পারে, তা বুঝতে পাচ্ছি না। কে সেই লোকটি, তা জানাতে কিছু ওজর আছে কি ?"

"না, কোন আপত্তি নাই। ইনি ঘোষজা মশায়ের মেয়ে।"

"কে ? কাকলী ?—ওঃ! তারা এখানে এসেছে বুঝি ? তা আমার উপর তার যে রকম ভয়ানক পেয়ার, তাতে আমার সব রকম পোষাকের বেওরা মনে ক'রে রাখা তার পক্ষে খুব সম্ভব বটে! দেখছেন না টানের বহরটা একবার ? এখানে হয় ত অনেক দিন হলো এসেছে;—কেন না, আস্‌বার পরে এত সব খানাতল্লাসী হয়েছে,—আপনার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে দেখছি,—অথচ এ পর্য্যন্ত আমাকে একবার আসার খবরটাও দিলে না!"

"তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কই যখন ঘুচে গেছে, তখন তার খবরাখবরে আপনার কি দরকার ?"

"তা হ'লেও আমি যখন এই খুনের কথা প্রথম জান্‌লাম, তখন ওকে চিঠি লিখে সব খবর দিয়েছিলাম। উইল প্রোবেট হবার পরেও ওকে চিঠি লিখেছিলাম।"

"ও-সব খবর না দিলে হয় ত প্রথম থেকে আপনার প্রতিই ওদের সন্দেহ হতো। সে যা হোক্, ও-সব বাজে কথায় এখন আবশ্যক নাই। আমার প্রশ্নের ত এখনও ঠিক ক'রে জবাব দিলেন না ?"

"জবাব আবার কি দেবো ? এগুলা কার পোষাকের টুক্‌রা, তা আমি জান্‌লে ত বল্‌বো ? আমার নয়, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি। শাড়ীখানা বোধ হয় ঢাকাই; কিন্তু নেহাৎ খেলো। লেসটাও বেজায় মোটা সূতার। আমি ও রকম খেলো কাপড় বা মোটা লেস কখনও ব্যবহার করি না। আমার পোষাকের কাপড় যে লোক বাস্তবিক ভাল ক'রে কখনও দেখেছে, সেই তা বল্‌তে পারবে।—না, মিঃ দত্ত! আপনার এ সব প্রমাণ আমার সম্বন্ধে খাট্‌তেই পারে না। ওগুলা আমার পোষাকের টুক্‌রাও নয়, আর আমি সে খুনের বাড়ীতে কোনকালে পদার্পণও করি নি।"

"তবে আপনি ৩৩ নং কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে যেতেন কেন ?"

অতিশয় বিস্মিতভাবে তিনি বলিলেন, "কানাই মল্লিক লেন ?—সে আবার কোথায় ?"

"ও রকম ঠাট করলে চল্‌বে না, মিসেস্ ঘোষ! ৩৩ নং কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী, সেই খুনের বাড়ীর ঠিক পিছনে, তা কি আপনি জানেন না ?"

"না, তা কি ক'রে জান্‌বো বলুন ? আমি ও খুনের বাড়ীও কখনও দেখি নি, তার পিছনের বাড়ীও কখনও দেখি নি। কানাই মল্লিক লেনের নামও এর আগে কখনও শুনি নি।"

আমি একটু শ্লেষ করিয়া বলিলাম, "আর ঐ কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে একতলার ঘরের ভাড়াটে স্মৃতিরত্ন মশায়কেও অবশ্যই চেনেন না ?"

"আপনি কি বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। স্মৃতিরত্ন মশায় আবার কে ?"

তখন বিদ্রূপচ্ছলে একটু হাসিয়া আমি সেই কৌচের অন্তরাল হইতে আমার শেষ ও অমোঘ অস্ত্র,—সেই ছাতাটা আনিয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আপনার এই ছাতাটা সেই স্মৃতিরত্ন মশায়ের ঘরে আপনি ফেলে এসেছিলেন কি ক'রে ?"

৩৮

ঘোষ-পত্নী কিন্তু ছাতাটা স্পর্শও করিলেন না। একবারমাত্র সেটার দিকে চাহিয়া দারুণ অবজ্ঞাভরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি কোথা হ'তে এ সব জিনিষগুলা সংগ্রহ করেছেন, তা জানি না, মিঃ দত্ত! হয় ত আপনাকে কেউ অপদস্থ করবার জন্য এগুলা আমার দ্রব্য ব'লে আপনার কাছে গছিয়েছে। সে যাই হোক্, ওগুলার কোনটাই আমার নয়। আমি এ পর্য্যন্ত কখনও ছাতা ব্যবহার করি নাই। আর ও ছাতাটা ত আমি এর আগে কখনও চোখেও দেখি নাই।" বলিয়া বিরক্তিভরে আমাকে বিদায় দিবার অভিপ্রায়ে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘোষ-পত্নী যে এ সকল দ্রব্য তাঁহার সামগ্রী বলিয়া নিজ মুখে স্বীকার করিবেন, সে আশা আমি কখনই করি নাই। তবে এটুকু আশা করিয়াছিলাম বটে যে, সহসা ওগুলা দেখিয়া হত্যা সম্বন্ধে তাঁহার সংস্রব ধরা পড়িয়াছে বুঝিলে, তাঁহার ভয় বা উৎকণ্ঠার ভাব নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু

প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের ভাবে বা আচরণে সেরূপ কোন লক্ষণের সম্পূর্ণ অভাবই দেখিলাম। বরং বিস্ময়, অবজ্ঞা ও বিরক্তি এত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছিল যে, আমার বেশ বোধ হইল যে, হয় ও সব সত্যই আন্তরিক, নয় তিনি অভিনয়-কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শী। এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আমিও বিরক্তি সহকারে বলিলাম, "বেশ! আপনি যখন আমার কাছে কিছুই স্বীকার করতে সম্মত নন, তখন এইবার আমি এ সব জিনিষ পুলিসের জিম্মায় গচ্ছিত ক'রে তাদেরই হাতে কার্য্যভার অর্পণ করবো। এখন থেকে আর এ বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

"সে আপনার যা' খুসী, তা'ই করবেন; আমার তাতে লাভ-লোকসান কিছু নাই।—তা'দের কিন্তু ব'লে দেবেন যে, ছাতাটা কোন্ দোকানের মাল, সেটা যেন তারা একটু খোঁজ ক'রে দেখে। কেন না, তা' হ'লে হয় ত, কে ওটা কিনেছিল তা' প্রকাশ হ'তে পারে।"

কথাটা খুবই সঙ্গত বোধ হইল। এরূপ অনুসন্ধানটা এতই আবশ্যক যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই ভাবিয়া, আমার নিজের উপর বড় বিরক্তি জন্মিল। যাহা হউক, ঘোষ-পত্নী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া, কাপড়ের টুকরা দুইটা পকেটে রাখিয়া ও ছাতাটা হাতে লইয়া আমিও উঠিলাম। পরে বলিলাম, "সে সম্বন্ধে পুলিসের লোক যা' ভাল বুঝবে, তাই করবে। সে জন্য আপনার বা আমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই। কিন্তু তা'দের কাছে যাবার আগে আপনাকে আরও দু-একটা কথা আমার বল্‌বার আছে।"

"আবার কি কথা? যা বলবার থাকে, শীঘ্র ব'লে শেষ করুন।" বিরক্তিভরে এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় বসিলেন। আমিও আবার বসিয়া বলিলাম, "যে ভোজালী দ্বারা ঘোষজা মশায় খুন হয়েছিলেন, সেটা যে তাঁর বর্দ্ধমানের বাড়ীর ভোজালী, এবং জরির কাযকরা যে ফিতা দ্বারা সেটা ছবির নীচে ঝুলানে থাক্‌তো, সেই ফিতা সমেত সেটা যে ঐ হানাবাড়ীতে আনা হয়েছিল, তার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

এইবারে যমুনা বেশ স্পষ্টই বিচলিত হইলেন দেখিলাম। তাঁহার মুখে 'পাউডারের' প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহার ভিতর হইতে একটু রক্তিম আভা দেখা দিল, এবং তিনি বেশ একটু উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি?—এ প্রমাণটা কি রকম?"

"ভোজালীখানা এখনও পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু সে ফিতাটি ঐ হানা বাড়ীতেই পাওয়া গেছে।"

যমুনা যেন কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "হয় ত আমার স্বামী নিজেই সেটা তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন।"

"না; তা যে আনেননি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘোষজা মশায়ের গৃহত্যাগের বহুদিন পরে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের বাড়ীর পুরানো মালী ফিতাবাঁধা ভোজালীখানা সে বাড়ীতে যথাস্থানে দেখেছে। কুমারী দীপ্তিও সেটা ঘোষজা মশায়ের খুনের প্রায় এক সপ্তাহ আগেও যথাস্থানে দেখেছিল। সেই সময় এক দিন আপনি না কি ঐ পড়বার ঘরে বই-এর আলমারী গুছাবার ছলে অনেকক্ষণ ছিলেন। তার পর থেকেই ভোজালীখানা আর দেখতে পাওয়া যায়নি।"

"ওঃ! দীপ্তি মাগীও আবার এসে যুটেছে বুঝি? আর এসেই আমার উপর দুষমনি করতে লেগেছে দেখছি! তা' ওরা যা'ই বলুক, ভোজালীখানা স্থানান্তর করা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তা' আপনাকে নিশ্চিত বল্‌তে পারি।"

"দীপ্তির কাছে আরও জানা গেছে যে, যে রাত্রে ঘোষজা মশায় খুন হন, সে দিন বৈকালে আপনি কান সাহেবের সঙ্গে কল্‌কাতায় এসেছিলেন, আর সমস্ত রাত এখানেই কাটিয়েছিলেন।"

"হাঁ, তা' ত ছিলামই বটে। আমার এক জন বাল্যবন্ধু অনেক দিন থেকে রোগের চিকিৎসার জন্য কল্‌কাতায় আছে। তা'কে আমি মাঝে মাঝে দেখতে যাই। সে দিন হঠাৎ তার অবস্থা খারাপ ব'লে এক টেলিগ্রাম পেয়ে কল্‌কাতায় এসে তাদেরই বাড়ীতে ছিলাম। পরদিন সকালে তার অবস্থা ভাল দেখে আবার বর্দ্ধমানে ফিরে গিয়েছিলাম।"

"আপনি এ কথা প্রমাণ করতে পারেন?"

"স্বচ্ছন্দে! সৌভাগ্যক্রমে তারা এখন এখানেই আছে। আমার সঙ্গে সেই জানুয়ারী মাসে দেখা হবার পর তারা কয়েক স্থানে হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিল। সম্প্রতি ফিরে এসেছে, খবর পেয়েছি। দু-একদিন পরে দেখা কর্‌তে যাব,

মনে করেছিলাম, তা না হয় আজই যাব। একসঙ্গে তুই কাযই হবে। চলুন আমার সঙ্গে, আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি। তারা ভবানীপুরে থাকে।”

আমি তৎক্ষণাৎ ঘোষ-পত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে একখানা খোলা গাড়ীতে ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৩৯

তখন বেলা প্রায় ৪টা। পশ্চিমের রৌদ্র বড় প্রখর ছিল বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই আমার হস্তস্থিত ছাতাটার যৎকিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে সেটা খুলিয়া শিষ্টতা সহকারে তাহা ঘোষপত্নীর হাতে দিলাম। তিনি কিন্তু আপত্তি করিয়া বলিলেন, “না, না, আমার ছাতার দরকার নাই। গাড়ীর ‘হুড’টা তুলে দিলেই হবে। ছাতা ব্যবহার করার অভ্যাস আমার নাই।” বলিয়া, তিনি সহিসকে গাড়ীর ‘টাপ’ উঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। সে-ও আজ্ঞাপালনে রত হইল।

ইত্যবসরে ছাতাটার ভিতরদিকে সোনালী অক্ষরে মুদ্রিত কলিকাতার এক বিখ্যাত বিলাতী দোকানের নাম আমাদের তুই জনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। যমুনা সেই নামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “বাঃ! বেশ হয়েছে। ও দোকানটা ত আমাদের পথে পড়বে। তা হ’লে চলুন না কেন, সেখানে এ ছাতাটার সম্বন্ধেও অমনি খোঁজ ক’রে যাওয়া যাক?”

আমি সোৎসাহে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই সে দোকানে উপস্থিত হইয়া, আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদের অনুরোধে ম্যানেজার অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে ঐ দোকানের ‘মাল সাবাড়ী’ বিক্রীর সময় ঐ ছাতা এবং আরও কয়েকটা সামগ্রী দোকানের এক জন কর্ম্মচারী ধারে খরিদ করিয়াছিল। তাহার নাম উইল্‌সন্। সে পূর্ব্বে ঐ দোকানের দার্জ্জিলিঙ্গের শাখা-দোকানে কায করিত, এবং এক বৎসর হইল, কলিকাতার দোকানে বাহাল হইয়াছে।

এই উইল্‌সনের নাম উল্লেখ হইবামাত্র আমার বোধ হইল, যেন ঘোষপত্নী ক্ষণেকের জন্য কিছু চকিত, এমন কি, একটু উৎকণ্ঠিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু লোকটির সহিত আমি দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ম্যানেজারের আহ্বানে সে যখন আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহার আচরণে এটুকু বেশ বুঝা গেল যে, ঘোষপত্নীর সহিত তাহার পূর্ব্বে কখনও পরিচয় ছিল না। পরে তাহার সহিত বাক্যালাপের ফলেও তাহাই জানিলাম। ছাতার সম্বন্ধে সে বলিল যে, সে উহা নিজের জন্য ক্রয় করে নাই। তাহার এক পুরুষ-বন্ধুর অনুরোধে সেই বন্ধুর পরিচিতা এক মহিলার জন্য ছাতাটা কিনিয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু উইলসন্ তাহার সেই বন্ধুর নাম, ধাম বা অপর কোন পরিচয়, তাহার বিনা অনুমতিতে বলিতে সম্মত হইল না। কেবল এইমাত্র বলিল যে, বন্ধু ও সেই মহিলা উভয়েই এদেশী লোক; কিন্তু মহিলাটির সম্বন্ধে সে নিজে কিছুই জানে না। সে ছাতা কিনিবার দিন তাহার বন্ধুর সঙ্গে উহাকে দেখিয়াছিল মাত্র। উইলসনের নামটা বিলাতী হইলেও, তাহার দেহের বর্ণ ও মুখাবয়ব খাঁটি এদেশী। বাক্যালাপে যতদূর বুঝা গেল, তাহাতে তাহাকে বেশ ‘সাদা-সিধা’ ধরণের লোক বলিয়া বোধ হইল, এবং তাহার কথাগুলা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিলাম না।

যাহা হউক, ছাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এক রকম শেষ হওয়ায় আমি উইলসনের উপস্থিত বাসস্থানের ঠিকানা লইয়া, এবং তাহাকে ও ম্যানেজার মহাশয়কে প্রভূত পরিমাণে ধন্যবাদে আপ্যায়িত করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইলাম। পরে, ঘোষজায়ার সহিত তথা হইতে পুনরায় ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে যমুনা তাঁহার সেই বাল্যবন্ধুর পরিচয় দিতে লাগিলেন। বন্ধুটি রমণী; তাঁহার পিতামাতা তুই-ই বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা পঞ্জাবী উন্নতিশীল সমাজের লোক এবং খুব সঙ্গতিপন্ন। বাপ বিলাত-ফেরত, এবং পরিবারের সকলেই অনেকটা বিলাতী ভাবাপন্ন। গত বৎসর বন্ধুর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর হইতে তিনি সূতিকা-রোগে বড়ই ভুগিতেছেন ও নানা স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিয়া আপাততঃ অনেকটা সুস্থাবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

এই সকল ও আরও পাঁচ রকম কথা কহিতে কহিতে আমরা অবশেষে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। যমুনা

তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, ও ভৃত্যের হস্তে নিজের নামের 'কার্ড' পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল ও সাহেবী ধরণে সুসজ্জিত; বাড়ীর অধিবাসিগণের মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই এক জন প্রবীণা মহিলা সত্বর নীচে আসিয়া যমুনাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় সাদরে সম্ভাষণ করিলেন, এবং যমুনার দ্বারা আমার সহিত পরিচিত হইয়া, আমাকেও সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া, দুই জনকেই উপরে লইয়া গেলেন। জানিলাম, তিনি বাড়ীর গৃহিণী, এবং যমুনার বন্ধুর মাতা। উপরে যাইবামাত্র তাঁহার কন্যাও যমুনাকে বাস্তবিকই বন্ধুর ন্যায় মহা আনন্দে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ক্রমে আমার সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। বন্ধুটি শীর্ণদেহ হইলেও বেশ সুন্দরী এবং যমুনার সমবয়স্কাই বোধ হইল। সকলে আসন গ্রহণ করিবার পর, দুই বন্ধুতে নানা বাক্যালাপ হইতে লাগিল; গৃহিণীও মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগিলেন এবং কথাবার্ত্তা অধিকাংশ ইংরাজীতে ও কখনও বা হিন্দীতে হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর গত জানুয়ারী মাসে যমুনা যে ইঁহাদের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি সে কথা উত্থাপন করিলেন। তখন সুবিধামত আমিও তাঁহাদের কথায় যোগ দিয়া, মাঝে মাঝে প্রশ্নাদির দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি এই যে, সে সময়ে ইঁহারা এ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী অপর একটা বাড়ীতে বাস করিতেন; যমুনার বন্ধুর পীড়া তখন বেশী ছিল বলিয়া যমুনা প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। জানুয়ারী মাসে যে দিন আসিয়াছিলেন, সে দিনটা ইঁহাদের বিশেষরূপে স্মরণ আছে; কারণ, যমুনার বন্ধুর সে দিনটা রোগের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাঁহার জীবনসংশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার পিতা যমুনাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যমুনা সন্ধ্যার পরেই এখানে পৌঁছিয়াছিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি বন্ধুর নিকটে থাকিয়া, সকালে তাঁহার অবস্থা বেশ ভাল দেখিয়া এখান হইতে বেলা ৯টায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যমুনার পিতার বন্ধু কান সাহেব সন্ধ্যার পরে যমুনাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং পরদিন সকালে ৮টার সময় পুনরায় আসিয়া, যমুনার সঙ্গেই বেলা ৯টার সময় চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহাদের নিকট আরও জানিলাম যে, যে দিন সকালে যমুনা ফিরিয়া যান, সেটা যে সরস্বতীপূজার দিন, তাহা ইঁহাদের বেশ মনে আছে। কারণ, তাঁহাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই সে দিন ঐ পূজা মহা সমারোহের সহিত হইয়াছিল। সে দিন দিবারাত্রি ও তাহার পরদিনেও বৈকাল পর্য্যন্ত সানাই ও ঢোল-কাঁসরের বাদ্যে, এবং লোকজনের কলরবে তাঁহারা মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। বিসর্জ্জনের দিন বৈকালে বাদ্যাদি লইয়া প্রতিমার সহিত লোকজনের শোভাযাত্রাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন।

৯০

এই সকল বাক্যালাপে ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল ইতোমধ্যে গৃহিণী আমাদিগকে চা ও মিষ্টান্নের দ্বারা রীতিমত অতিথি-সংকার করিতে ছাড়েন নাই। অবশেষে যমুন শীঘ্রই আবার দেখা করিতে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধুর নিকট সে দিনের মত বিদায় লইলেন।

ফিরিবার সময় গাড়ীতে বসিয়া যমুনা তাঁহার বন্ধুর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে লাগিলেন। কিন্তু আ ও সকল কথায় বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিলাম না ঘোষজা মহাশয়ের হত্যা সম্বন্ধে এত দিন এত অনুসন্ধানের ফলে যমুনার বিরুদ্ধে যে কয়টা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সম হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটা যমুনা ত অবলীলাক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতে সম হইলেন। তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলা ত সবই অসিদ্ধ হইয়া গেল! যমুনা যে এই হত্যাব্যাপারে বাস্তবিকই লিপ্ত নহে, তাহা অস্বীকার করিবার ত আর কো উপায়ই রহিল না! অথচ হানাবাড়ীতে কোন একটি রমণী যে নিশ্চয়ই আসিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং ঐ বাড়ীতে প্রাপ্ত কাপড়ের টুক্‌রা দুইটা ও কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে প্রাপ্ত ছাতাটাও যে সেই রমণীরই সম্পত্তি,ইহাও এ প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহ হইলে সে রমণী কে এবং ঘোষজা মহাশয়ের নিকট তাহা ওরূপ গোপনে যাওয়া-আসা করিবার এবং শেষে তাঁহাকে হত্যা করিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ইহাই ত সমস্যা! প্রথ

হইতেই ত এই একই সমস্যা চলিতেছে এবং এখনও সেই সমস্যাই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল !

কিন্তু রমণীটি যেই হউক, তাহার সঙ্গে কান সাহেবের যে কোনওরূপ সংস্রব ছিল, তাহাও ত হইতে পারে ? সে রমণীর এক জন পুরুষ সহচর যে সর্ব্বদাই থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, হানাবাড়ীর পর্দ্দার উপর সেই যে ছায়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই ছিল। আবার মল্লিক লেনের বাড়ীতে যে রমণী আসিত, তাহার সহিত প্রতি বারেই এক জন পুরুষ সঙ্গী থাকিত এবং খুনের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে কাঠের সিঁড়ি দ্বারা সেই পুরুষটাই ছাতে উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল। কান সাহেবই যে সেই পুরুষ, তাহা ত অসম্ভব নয় ? যে রাত্রিতে খুন হইয়াছিল, সে দিন সন্ধ্যার পরে যমুনাকে ভবানীপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া কান সাহেবের পক্ষে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে রাত্রি ৮টার সময় উপস্থিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় এবং তথায় যাইবার সময় সে হয় ত পথে অন্য কোথাও হইতে সেই অপর রমণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ঐ ছাতাটা উইলসন্ তাহার যে পুরুষ-বন্ধুর অনুরোধে ক্রয় করিয়াছিল, কান সাহেবই হয় ত সেই বন্ধু, তাহাও ত হইতে পারে ?—আচ্ছা, তা না হয় হইল ; কিন্তু খুনের সঙ্গে তাহার বা সেই রমণীর কি সংস্রব ? তাহারা ত উভয়েই রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই মল্লিক লেনের বাড়ী হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। অথচ 'পোষ্ট-মর্টেমের' ডাক্তারের মতে খুনটা রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে হয় নাই। তাহা হইলেই আবার সেই পুরাতন সমস্যা—খুন করিল কে ? এবং সে রমণীটিই বা কে, ও ঘোষজার সহিত তাহার সম্পর্কই বা কি ?

সমস্যাগুলার সন্তোষজনক মীমাংসার আপাততঃ আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ঘোষ-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সে রাত্রিতে কান সাহেব আপনাকে ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন ?"

"সে কলকাতায় এসে যেখানে থাকে, বোধ হয়, সেইখানেই ছিল।"

"সে কোথায় ?"

"শুনেছি, সেটা তার এক বন্ধুর বাড়ী। সেখানে তার জন্য একটা ঘর স্বতন্ত্র ক'রে রাখা থাকে। সে কলকাতায় এসে সেইখানে থাকে।"

"বন্ধুর নাম আর ঠিকানাটা বল্‌তে পারেন কি ?"

ঘোষ-পত্নী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না, আমি ঠিক জানি না। আমি সেখানে কখনও যাই নি। তবে শুনেছি, বাড়ীটা না কি শিয়ালদার কাছে। কিন্তু ঠিকানা জেনে কি হবে ? সেখানে তার সঙ্গে দেখা হওয়া মুস্কিল। কারণ, বাড়ীতে সে কখন্ থাকে, না থাকে, তার কিছুই ঠিক নাই।"

"কেন ?"

"থিয়েটারে তার ভারি ঝোঁক। সে অনেক রকম বাজনাও বেশ ভাল বাজাতে পারে। সেই জন্যে এখানে এলেই কোন-না-কোন একটা থিয়েটারে সে বাজনার দলে কায করতে লেগে যায়—আর তাতে দু' পয়সা রোজগারও করে। কিন্তু এ কাযে মহলা দেবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই ব'লে যখন তখন থিয়েটারে হাজির থাকতে হয়।"

"তিনি না দার্জ্জিলিং অঞ্চলে কোন্ একটা চা-বাগানে কায করেন শুনেছি ?"

"ওঃ ! সে কায ত অনেক দিন হলো সে ছেড়ে দিয়েছে। আপাততঃ তার স্থায়ী কোন চাকরী নাই। তবে মাস কয়েক থেকে সে আসামে একটা খুব বড় চা-বাগানের ম্যানেজারী পাবার চেষ্টায় ঘুরছে। সেই জন্য সেখানে প্রায়ই যেতে হয়। কাযটা এইবার না কি পাওয়া নিশ্চয় হয়েছে।"

৪১

আমাদের গাড়ীখানা এতক্ষণে ঘোষ-পত্নীর উপস্থিত বাসাবাড়ীর অঞ্চলে আসিয়া সেই দিকে মোড় ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ একটা নূতন কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি গাড়োয়ানকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিলাম এবং তৎপরিবর্ত্তে কানাই মল্লিক লেনে যাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে সেই অঞ্চলের দিকে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম। ঘোষ-পত্নী আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে আজ আমার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করতে হলো। কিন্তু আপনার উপর সন্দেহটা এমন বিশিষ্টভাবে পড়েছিল যে, এটুকু কষ্ট-স্বীকার না করলে পরে হয় ত আপনাকে অনেক বেশী বিরক্তি সহ্য করতে হতো। এখন আর একটু কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে

আর কিছু দূরে গেলে, আপনার উপর সন্দেহটা একেবারে নিঃসংশয়ে দূর হয়ে যেতে পারে।"

"আপনার সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতেও আমার কোন ওজর নাই। কিন্তু আপনাদের ও-সব সন্দেহ আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না, তা জান্‌বেন!—যাক্, এখন কোথায় যেতে হবে, বলুন দেখি?"

"সেই কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে।"

"সে এখান থেকে কত দূর?"

"বেশী নয়। বোধ হয় আর আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে পারবেন।"

"বেশ—চলুন।"

তখন আমি গাড়োয়ানকে আরও বেগে হাঁকাইতে আদেশ করিয়া ঘোষ-পত্নীর সহিত নানারূপ অবান্তর কথায় তাঁহার বিরক্তি দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে গাড়ীখানা যখন কানাই মল্লিক লেনে প্রবেশ করিয়া ৩৪ নং বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আমি যমুনার ভাব-গতিকের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে তিনি যে পূর্ব্বে এখানে কখনও আসিয়াছিলেন, তাহা বোধ হইল না।

গাড়ীখানার 'হুড' অনেক পূর্ব্বেই পুনরায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা যখন ৩৭ নং বাড়ী ছাড়াইয়া তাহার পরে প্রথম গ্যাস-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন আমি গাড়ী থামাইয়া ছাতা লইয়া অবতরণ করিলাম এবং ঘোষ-পত্নীকে গাড়ীতেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া ৩৪ নং বাড়ীর সদরে উপস্থিত হইলাম। দ্বার তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় দ্বার খুলিয়া স্বয়ং গোঁসাইজী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং বোধ হয়,তাঁহার প্রস্থানের পর দ্বার আবার বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাতেই নিতাই-ও তথায় উপস্থিত হইল।

গোঁসাইজী প্রথমে আমাকে চিনিতে পারেন নাই বোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে অপরিচিতের ন্যায় চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে চান মশায়?"

নিতাই কিন্তু আমাকে চিনিয়াছিল। সে বলিল, "সে কি কর্ত্তা! ওনাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? উনি যে পুলিসের সেই বাবু গো!"

তখন গোঁসাইজী বলিলেন, "ওঃ! বটেই ত! তা—আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "তাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি আপনার নিতাইকে দুটো কথা বল্‌তে এসেছি। আপনি উপস্থিত না থাক্‌লেও চল্‌বে।"

তৎপরে নিতাইকে আমার হস্তস্থিত ছাতাটা দেখাইয়া বলিলাম, "কি হে, নিতাইচাঁদ! এ ছাতাটার কথা মনে আছে ত?"

"এজ্ঞে, আছে বৈ কি!"

"আর ছাতাটার মালিককেও বেশ মনে আছে, বোধ হয়?"

"কে? সেই ম্যাস্-ম্যাম্ ত? ওঃ! তেনাকে কি ভুল্‌তে পারি, বাবু?"

"তাকে এখন দেখলে চিন্‌তে পারবি?"

"এজ্ঞে, তা কেনে পারবো না?"

"আচ্ছা, দেখ্ দেখি—ঐ যে গ্যাসের ধারে খোলা গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে যে মেয়েমানুষটি ব'সে আছে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিতাই সদর হইতে বাহির হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী অভিমুখে চলিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। নিতাই গাড়ীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তথায় দাঁড়াইবামাত্র যমুনা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিলেন এবং সম্ভবতঃ অপরিচিত বোধে আবার মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার মুখের উপর গ্যাসের আলো বেশ উজ্জ্বলভাবেই পড়িয়াছিল, অথচ নিতাইও সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কিছুক্ষণ যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া শেষে ফিরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে গলা বাড়াইয়া একেবারে যমুনার মুখের সম্মুখে নিজের মুখ লইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া যমুনা বোধ হয় কিছু ভীত হইয়া চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল, "কে তুমি? স'রে যাও বলছি! নয় ত এখনই পাহারাওয়ালা ডাক্‌বো।"

নিতাই মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "এজ্ঞে, তা নয়! পুলিস-বাবু বল্লেক কি না যে, আপনি ম্যাস্-ম্যাম্—তাই দেখতেছিলাম। তেনার হাতে সেই বুড়া বামুন আমার ট্যাকা পেঠিয়ে দেবে কয়েছিল কি না!"

“হ্যাস্-ম্যাম্, কে? কিসের টাকা? বুড়ো বামুনই বা কে?”

“এজ্ঞে, না; পুলিস-বাবু ভুল করেছে। আপনি সে হ্যাস্-ম্যাম্ নয়। তা আমি জান্‌বো কেম্‌নে? তাই ভাল ক'রে দেখবার লেগে আপনকার দিকে মুখ বাড়ায়ে তাকিয়েছিলেম।”

এই বলিয়া সে গাড়ীর নিকট হইতে ফিরিয়া আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, “না, বাবু, ও ত সে হ্যাস্-ম্যাম্ নয়! আপনি ভুল ক'রে আর কারে নিয়ে এসেছেন।”

“ওঃ! বটে? আচ্ছা, তা হ'লে আমি আবার আর এক দিন আস্‌বো এখন।” বলিয়া আমি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম এবং গাড়োয়ানকে বেগে হাঁকাইতে বলিয়া ঘোষ-পত্নীর সঙ্গে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণি)।

আকিঞ্চন

যেথায় যমুনা-জল
বহি যায় ছল-ছল,
কেলি করে কাল জলে হংস-মিথুন ;
ভাটিয়াল গান গেয়ে
পাল তুলে যায় নেয়ে,
বাতাসে মিশায়ে ব্যথা কণ্ঠে নিপুণ।

যেথায় বিটপী বট
শ্যামল করেছে তট,
সমীরে করেছে চির-শান্ত শীতল ;
যেথায় কানন-ছায়
বহিলে বাদল বায়,
ঠমকে চমকি নাচে ময়ূরীর দল।

শাখায় শাখায় যার
ত্রিদিবের রূপ-ধার,
মানস মুগধ করে নর-দেবতার ;
পাতার আড়ালে থাকি
অবিরত গাহে পাখী,
ফুলে ফুলে অলি করে প্রণয় প্রচার।

সুদূরে নদীর বাঁকে
পাখীকুল ঝাঁকে ঝাঁকে,
উড়ে পড়ে কুতুহলে নাহি ভয়-লেশ ;
যেথা ধরা নভপানে
চাহিয়া বিহ্বল প্রাণে,
সতত সাধক সম সমাহিত বেশ।

আবেগে পূরিত হিয়া,
রহে সদা প্রসারিয়া,
দিগন্তের ছায়াময় ক্ষীণ বাহুলতা :
সেই বনচ্ছায়াতলে,
দিনে দিনে পলে পলে,
রচিব কুটীর মা গো মুক্ত মলিনতা!

বিরলে বসিয়া একা
মরমের চিত্র-লেখা,
নেহারি মানস-নেত্রে, হৃদি-রক্ত-রাগে,—
আঁকিব মূরতি তব
এ জগতে অভিনব,
হাসিবে সে মুখপদ্ম নিত্য অনুরাগে।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়
বসি ও চরণ-ছায়,
ডাকিব তোমারে মা গো, উচ্চে মা মা বলি ;
ভকতি কুসুম-হার
চন্দন নয়নাসার,
অর্ঘ্য দিব পদতলে, দৈন্য দিব বলি।

স্নেহে মোর শির চুমি
কোলে তুলে লবে তুমি,
সোহাগে পরাবে নেত্রে জ্ঞানের অঞ্জন :
সোনার বীণাটি তুলে
বাজাইবে কর্ণমূলে,
অনাদি সে বিশ্ব-গীতি মানস-রঞ্জন।

নয়নে করুণা-জল
পরাণে অসীম বল,
হৃদয়ে ক'র মা মধু পরিমল দান ;
কণ্ঠেতে দিও মা সুর,
মাধুরীতে ভরপুর,
দিও মা সরস ভাষা জীবন্ত মহান্।

গাহিব পরাণ খুলে
কুটীরে প্রাসাদ-মূলে,
সুসুপ্ত এ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে ;
ভাসিব নয়ন-নীরে
দেখাব এ বক্ষ চিরে,
তোমারি মানসী মূর্ত্তি বরাভয় করে।

কব আমি ডেকে ডেকে,—
ওঠ্ তোরা ঘুমায়ে কে ?
ওই দেখ্ ডাকিছে মা মুক্তি-মন্ত্র নিতে ;
ওঠ্ তোরা ওঠ্ জেগে
চল্ প্রভঞ্জন বেগে,
প্রলয়পয়োধি জলে আজি প্রক্ষালিতে,—

অধীনতা হীনতার
কলুষ-কালিমা ভার,
পরিতে বিমল ভালে রক্ত জয়-টীকা !
মরে কে বাঁচিবি আয়,
আয় আয় ছুটে আয়,
দু'হাতে ডাকিছে মৃত্যু-লোল-বহ্নি-শিখা !!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

পুরাণে আয়ুষ্কাল

২

রামায়ণের অবস্থা মহাভারতের মত নহে। রামায়ণের কালপরিমাণ অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ। রাম ১১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন (১)। দশরথের ৬০ হাজার বৎসর বয়স হইয়াছিল (২)। মহীপাল সগর ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (৩)। অংশুমান্ হিমাচলশিখরে ৩২ হাজার বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন (৪)। রাজা দিলীপ বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ৩০ হাজার বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন (৫)। ভগীরথ ঊর্দ্ধবাহু ও পঞ্চতপাঃ হইয়া এবং মাসান্তে আহার করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন (৬)। বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন (৭)। অনসূয়া ক্রমে ১০ সহস্র বৎসর যোগাবলম্বনে অতিবাহিত করেন এবং কত শত তাপস ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া তপোবিঘ্ন নিবারণ করিয়াছিলেন (৮)। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সরোবরমধ্যে ১০ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন (৯)। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ প্রত্যেকেই ১০ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন (১)। কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলনসময়ে রাবণের ক্রন্দন করিতে করিতেই সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল (২)।

স্বয়ং বাল্মীকিও সীতার পাতালপ্রবেশোপক্রমে নিজের বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করার কথা বলিয়াছিলেন (৩)। ৫ হাজার বর্ষবয়স্ক বালকেরও (!) অকালমৃত্যু (৪)। কুম্ভকর্ণ বহু সহস্র বৎসর নিদ্রামগ্ন ছিলেন (৫)। জটায়ু বলিতেছেন,—"রাবণ! ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত রাজ্য পালন করিয়াছি (৬)।"

পুরাণোক্ত বয়স বা কালমান লইয়া যে সমস্যা, তাহা আমরা সপ্রমাণ উপস্থাপিত করিলাম। হাজার হাজার বৎসর মানুষ যে বাঁচিতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনাতেও সহজে আসিতে পারে না এবং ইহা সম্ভবপর কি না, তাহা প্রকৃতই সমস্যার বিষয়। এই সন্দেহের নিরসনই আমাদের প্রার্থনীয়।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় বলিয়াছেন,—"বৈদিক আখ্যায়িকার কিন্তু যাথার্থ্য নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে।" (শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের লেক্‌চার—২য় বর্ষ ১৮ লেক্‌চার ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা।)

পুরাণাদি সম্বন্ধে এই সন্দেহ যে বর্ত্তমান যুগের লোক বলিয়া কেবল আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা

---

(১) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥
বাল, ১।৯৮ ; উত্তর, ৬১।২১।

(ক) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্॥
বাল, ১৫।৩০।

(খ) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা॥ উত্তর, ১১৭।১২।

(২) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি॥ বাল, ২০।১০

(৩) ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ॥ বাল, ৪১।২৬।

(৪) হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্।
দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ॥ বাল, ৪২।৩।

(৫) দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্ব্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ বাল, ৪২।৮।

(৬) ঊর্দ্ধবাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ॥ বাল, ৪২।১৩।

(৭) বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি……………………৫১।২০।

(৮) দশবর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহত্তপঃ।
অনসূয়া ব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ॥ অযো, ১১৭।১১।

(৯) স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে॥ আরণ্য, ১১।১২।

(১) উত্তরকাণ্ড, ১০ সর্গ।

(২) সংবৎসরসহস্রস্তু রুদতো রক্ষসো গতম্। উত্তর, ১৬।৩৪।

(৩) বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াম্ ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥
উত্তর, ১০৯।১৯।

(৪) অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক॥ উত্তর, ৮৬।৫।
"বর্ষশব্দোঽত্র দিনপরঃ, তেন কিঞ্চিন্ন্যূনচতুর্দ্দশবর্ষমিত্যর্থঃ।"
—রামানুজ।

(৫) বহূন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে॥ উত্তর, ১৩।৭।

(৬) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ॥ আরণ্য, ৫০।২০।

নহে। শঙ্করাচার্য্যেরও (১) পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসক-প্রধান কুমারিল, তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্বরূপ "তন্ত্রবার্ত্তিকে" বলিয়াছেন—পুরাণ কেবল অর্থবাদ, উহা কেবল প্রশংসাপর। পৌরাণিক আখ্যানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা রাখা চলে না; কারণ, উহার সত্যতা অল্প (২)। অর্থবাদ প্রস্তাবে উপাখ্যান সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৩)। "ব্যবহারময়ূখ" পুস্তকে নীলকণ্ঠ ভট্টও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৩ অধ্যায়ে বিবৃত আছে,—ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, শুকদেব বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করাইয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন (৪)। তবে ইহার অনেক পরে তিনি পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইলেন কিরূপে? (৫) শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে পুরাতন কথা শুনাইয়াছিলেন, পরীক্ষিৎ তখন মাতৃগর্ভে।

পুরাণ অর্থবাদই হউক বা মিথ্যাবাদই হউক, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতে চাহি না; তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে সংক্ষেপে বলিয়াছি। পুরাণের কালমান আমাদের নিকট বিশেষ অসামঞ্জস্যমূলক লক্ষিত হইতেছে। পুরাণের বাস্তবতা যদি না-ই থাকে, ইহাতে অপ্রাকৃত কালমান থাকিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ,যদি ১০।২০ হাজার বৎসর বয়সের কথাও থাকে, তবে সমস্ত স্থলেই এরূপ যথাযোগ্য অনন্যসাধারণ কালমানের কথা থাকা উচিত এবং যাহাতে সমগ্র পুরাণগুলিতে কোনও অসামঞ্জস্য না থাকে, তাহাও দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম অনেক স্থলেই দেখা যায়। উপন্যাস স্বকপোলকল্পিত হইলেও বাস্তবের সহিত তাহার এতাদৃশ অসামঞ্জস্য থাকে না। পুরাণ সম্বন্ধেও আমরা অন্ততঃ তাহাই পাইতে চাই।

ভেক ও সর্প শ্বাসরোধ করিয়া অনেক দিন থাকিতে পারে। পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথা সকলেই জানেন। তিনি শ্বাসরোধ করিয়া মাটীর নীচে ১০ দিন ছিলেন। সুতরাং যোগিগণ যে দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। *

হাজার হাজার বৎসর বয়স সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে যাইয়া মীমাংসাদর্শন ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৭ম পাদে "সহস্র-সংবৎসর-শব্দস্য সহস্রদিনপরতাধিকরণম্" ইত্যাদি বলিয়া "সহস্র-সংবৎসরং তদায়ুষামসম্ভবাৎ মনুষ্যেষু" (৩১ সূত্র) প্রভৃতি

---

(১) "শঙ্কর মন্দার সৌরভ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিয়াছেন,—

কলিযুগের ৩ হাজার ৮ শত ৮৯ বৎসর গত হইলে শঙ্করের জন্ম হয়।

(২) তৎপরত্বাচ্চ নাতীব উপাখ্যানেষু তত্ত্বাভিনিবেশঃ কার্য্যঃ।

তন্ত্রবার্ত্তিক, ১৬।১৭ পৃঃ।

(৩) উপাখ্যানানি অর্থবাদেষু ব্যাখ্যাতানি। ঐ

(৪) শুকস্তু মারুতাদূর্দ্ধং গতিং কৃত্বান্তরীক্ষগাম্।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা ॥ ২০ শ্লোক।

(৫) শুকদেব যে পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইয়াছিলেন, ইহা কেবল ভাগবতের উক্তি নহে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৯৩-১৯৮ অধ্যায়ে যে ভাগবত মাহাত্ম্য আছে, তাহাতেও রহিয়াছে,—"শুকেনোক্তং কদা রাজ্ঞে"—"তাদৃশুকনবমাং বৈ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রের ৪ অধ্যায়, ২ পাদ, ১৪ সূত্রের ভাষ্যে শুকদেবের গতি সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

নন্থ গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য স্মর্য্যতে—শুকঃ কিল বৈয়াসকিঃ মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলম্ অভিপপাত, পিত্রা চ অনুগম্য আহূতঃ ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব ইতি। ন। সশরীরস্যৈব অয়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গ ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ। ন হি অশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ। তথাচ তত্রৈব উপসংহৃতম্—

"শুকস্য মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বান্তরীক্ষগাম্।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ ॥" ইতি।

ব্রহ্মভূতের গতি (পুনঃ সংসারে গমন, পুনর্জ্জন্ম) ও উৎক্রান্তি (দেহ হইতে প্রাণাদির নির্গমন) নাই, এই কথা বলিতে গিয়া সূত্রকার প্রথমে বেদপ্রমাণ দেখাইয়া, স্মৃতিপ্রমাণ দেখাইবার জন্য সূত্র করিয়াছেন "স্মর্য্যতে চ" অর্থাৎ স্মৃতিকাররাও এই কথা বলেন। ভাষ্যকার মহাভারতের বর্ণনা উপলক্ষে এই সূত্রের উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(আপত্তি) যদি বল, ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মভূত (সর্ব্বগত যে ব্রহ্ম তদাত্মভূত—তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও গতি ত অন্ততম স্মৃতি মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—মুমুক্ষু ব্যাসপুত্র শুক সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা অনুগমন করিয়া আহ্বান করিলে "ভোঃ" বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।

(সিদ্ধান্ত) তাহা নহে (অর্থাৎ শুক ব্রহ্মভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন নাই)। তিনি সশরীরেই যোগবলে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট স্থান পাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন জানিও, (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন)। যেহেতু, সর্ব্বপ্রাণীরা তাহাকে দেখিয়াছিল ইত্যাদির উপন্যাস (উল্লেখ) মহাভারতে আছে। যে দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করে, তাহাকে সর্ব্বপ্রাণী দেখিতে সমর্থ হয় না। (শরীরধারী আত্মাকেই অর্থাৎ আত্মাধিষ্ঠিত শরীরকেই সকলে দেখিতে পায়, শরীরত্যাগের পর তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না)।

সেই মহাভারতেই ঐ উপাখ্যানের উপসংহারে এইরূপ কথাই আছে, যথা,—শুক (সূর্য্যমণ্ডল হইতে) বায়ুলোকে গিয়া, সেখান হইতে আবার দ্রুতগমনে অন্তরীক্ষলোকে গিয়া, স্বীয় প্রভাব দেখাইয়া ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতে জড়ভরতকেও ব্রহ্মভূত বলা হইয়াছে। (৫।৯।১৭)।

মূলগ্রন্থ অপেক্ষা টীকাকারদিগের মতভেদে অধিকতর সংশয় জন্মে।

* "ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে যে এক জন সমাধিস্থ যোগী আনীত হইয়াছিলেন,—সমাধিভঙ্গের পর তিনি যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের কথা। এই সময়ে কোনও কোনও

সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শবরস্বামী বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, রসায়ন প্রভৃতি দ্বারা আয়ুঃ দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু এত দীর্ঘ হয় না যে, তদ্দ্বারা সহস্র বৎসর জীবিত থাকা চলে। অতএব সহস্র সংবৎসর শব্দকে সহস্র দিন ধরিতে হইবে। অর্থাৎ এ সকল স্থলে বর্ষ শব্দ দিনবাচক। (১)

"অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা। দশ বর্ষসহস্রাণি গতানি সুমহাত্মনোঃ॥" রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, ৫২ সর্গ, ২৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজও মীমাংসা-দর্শনের উপরি-উক্ত মত গ্রহণ করিয়া দশবর্ষসহস্রাণি দ্বারা ২৭ বৎসর ধরিয়াছেন। অর্থাৎ রামানুজের মতে রামায়ণের বর্ষ শব্দ অন্ততঃ এ প্রকার স্থলে দিনপর বুঝিতে হইবে। অতএব "দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥" এবংবিধ রামায়ণ (বাল, ১।৯৮ ; উত্তর, ৬১।২১) বা মহাভারতের (দ্রোণ, ৫৭।২১ ; শান্তি, ২৯।৬১) শ্লোক রামচন্দ্রের রাজত্বকালসূচক। ১১ হাজার বর্ষ অর্থাৎ তৎপরিমাণ দিনে প্রায় লৌকিক ৩০ বৎসর হয় এবং উহা রামের রাজত্বকাল; জীবনকাল নহে। কারণ, সর্ব্বত্রই "রাজ্যমুপাসিত্বা" ইত্যাকার শব্দগ্রহণ দেখা যায়। জীবনকাল বর্ণনা স্থলের উদাহরণ দশরথ সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, যথা —"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।" ইত্যাদি। অতএব রামচন্দ্রের জীবনকালের ৭১ বা ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে পাইতে পারি। ১৫ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন (২)। বিবাহের পর উভয়ে দ্বাদশবর্ষ অযোধ্যায় অতিবাহিত করেন (১)। এই ২৭ বৎসর পরে ১৪ বৎসর বনবাস হয় এবং তদন্তে (২৭+১৪=৪১) উভয়ে অযোধ্যায় আইসেন। তখন রামের বয়স ৪১ বা ৪২ বৎসর (২)। তৎপরে প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং ৪১+৩০=৭১ বা ৭২ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বোধ হয়, এ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার অব্যবহিত পরেই সরযূপ্রবেশ ঘটিয়াছিল এবং তখন রামচন্দ্রের বয়স ৭১ বা ৭২ বৎসর। এই হিসাবে সীতার ৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। এ স্থলে দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্দ্দশ বর্ষ ইত্যাদি কালপরিমাণ দ্বারা ১২শ ও ১৪শ দিন গণনা করা যে অতীব অসঙ্গত, তাহা রামায়ণের তত্তৎকালের বর্ণনা-পাঠকারীর নিকট যে প্রকার অসমঞ্জস বলিয়া বিবেচিত হইবে, অপরের নিকটেও প্রায় তদ্রূপই প্রতিভাত হইবে। পূর্ব্বে চান্দ্র, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র, সংবৎসর, পরিবৎসর, অনুবৎসর, ইদাবৎসর, উদাবৎসর প্রভৃতি অনেক বর্ষ বর্ত্তমান ছিল; ১০।১৫ দিনেও এক একটি প্রভবাদি বর্ষ শেষ হইত; কিন্তু ঐরূপ ক্ষুদ্র বৎসর ধরিলেও সমস্ত পুরাণের উপাখ্যান-সমূহের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এই প্রকার বিশেষ বর্ষগণনা সাধারণ গণনায় গ্রহণ করা সঙ্গতও নহে।

পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডের ৩১ অধ্যায় ১৭৪ শ্লোক হইতে সীতার নিকট শুকমিথুনের উক্তিতে রামায়ণের ভবিষ্যত্তা-কথন আছে। আরও বিবৃত আছে—সীতা যখন যুবতী, তখন রামের কথা দূরে থাকুক, দশরথেরও জন্ম হয় নাই। দশরথের ষাটি হাজার বৎসর বয়সে রামের জন্ম হয়। তাহা হইলে বিবাহের সময় সীতার বয়স কত হইয়াছিল?

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, যোগিবরের সমাধি-কালে জীবনীশক্তি স্তম্ভিত ছিল, তাই তিনি হয় ত অত দিন বাঁচিয়াছিলেন। জীবনীশক্তি যে এইরূপ স্তব্ধ হইয়া বহুকাল থাকিতে পারে, তাৎকালিক শারীরবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করিতেন না। কাযেই ভূকৈলাসের যোগিবর কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ডাক্তারদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।"

—দৈনিক বসুমতী, ১৩৩১, ২রা জ্যৈষ্ঠ।

(১) "আদিত্যো বা সর্ব্ব ঋতবঃ, স যদৈবোদেতি অথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোঽথ গ্রীষ্মো, যদা মধ্যন্দিনোঽথ বর্ষা, যদাঽপরোঽহ্নোঽথ শরৎ, যদাঽস্তমেতি অথ হেমন্তশিশিরৌ।" ইতি ব্রাহ্মণম্। অত্র খলু সর্ব্বান্ ঋতূন্ অহনি সম্পাদয়তি; সর্ব্বে চ ঋতবঃ সংবৎসরঃ। তস্মাদহঃ সংবৎসরশব্দেনোচ্যতে।—ইতি পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী।

(২) রাক্ষসগণের উৎপাত হইতে যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র যখন রামকে লইবার জন্য দশরথের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন রামের বয়স ১৫ বৎসর। ঐ সময়েই রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন,—

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ বাল, ২০।২।

(১) পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতাকে হরণ করিবার সময় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সীতা বলিয়াছিলেন,—আমি বিবাহের পর ১২ বৎসর শ্বশুর-গৃহে ছিলাম।

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে। আরণ্য, ৪৭।৪।

(২) ঈশ্বরস্য ধনুর্ভগ্নং জনকস্য গৃহে স্থিতম্।
রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে ষড়্‌বর্ষামথ মৈথিলীম্॥ ১৫।
ততো দ্বাদশবর্ষাণি রেমে রামস্তয়া সহ।
সপ্তবিংশতিমে বর্ষে যৌবরাজ্যমকল্পয়ৎ॥ ১৭।
দ্বিচত্বারিংশবর্ষে তু রামো রাজ্যমকারয়ৎ।
সীতায়াশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৎসরাণি তদাভবন্॥ ৭৭।

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ২১ অধ্যায় এবং
স্কন্দপুরাণ, ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ৩০ অধ্যায়।

"পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ। অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ ॥" (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১মসর্গ, ৯০ শ্লোক।) এই শ্লোকের টীকায় রামানুজ লিখিয়াছেন—"অনেন রাবণবধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকের্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে ॥" ইহারই বা সামঞ্জস্য কি? মহাকবি কালিদাসও লিখিয়াছেন—"পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ। কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদাময়ুতং যযৌ ॥" (রঘুবংশ, ১০ সর্গ, ১ শ্লোক।) কিঞ্চিদূন দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন। মহাকবিই বা এরূপ অসম্ভব কালপরিমাণ লিখিলেন কেন?

পৌরাণিক কালমানের সমাধানযোগ্য অপর কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে মনুষ্যের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা ইহার পরিপোষক নহে। বিরোধপ্রদর্শনকল্পে তাহার সামান্য উল্লেখ করিতে চাই। প্রথমতঃ বেদের কথা,—তাহা সকলের জানাও আছে এবং আমরাও পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ", "পশ্যেম শরদঃ শতম্", "জীবেম শরদঃ শতম্", এবং "ধান্যং ধনং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ" (শ্রীসূক্ত) ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিবাহের লাজহোমে নারী বলিতেছে—"দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবতু" ইত্যাদি (গোভিল গৃহ্য, ২য় প্রপাঠক, ২য় খণ্ড, ৫—১০ সূত্র)। উপনিষদেও "জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" আছে (ঈশোপনিষৎ)। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতির প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার জন্য বলিয়াছেন—"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব।" তন্ত্রেও শতায়ুর কথা পাওয়া যায় (১)। স্কন্দপুরাণে ৬০ বৎসর আয়ুর কথাও দেখিতে পাই (২)। আয়ুষ্কালনির্ণয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্ব্বেদে রসায়নের গুণকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক রসায়ন সেবনে মানব শতায়ুঃ হয়। কাযেই আয়ুর্ব্বেদমতেও আয়ুঃ শত বর্ষ (১)। যাহার শরীরস্থ পঞ্চবিধ বায়ু অব্যাহতগতি, স্বস্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া এক শত কুড়ি বৎসর পাঁচ দিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে (২)। এই কলিকালে মানবের আয়ুর পরিমাণ এক শত বৎসর (৩)। এক শত বৎসর পরে এক বৎসর করিয়া আয়ুঃ কমিয়া যাইতেছে (৪)। ৭৭ বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তমী রাত্রির নাম "ভীমরথী"; এই রাত্রি মনুষ্যদিগের দুরতিক্রমণীয়। যে সকল ব্যক্তি এই বয়স অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অতিশয় পুণ্যাত্মা (৫)।

প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থেও দেখা যায় যে, মানুষের আয়ুষ্কাল ১ শত ২০ বৎসর ৫ রাত্রি (৬)। সামুদ্রিক শাস্ত্রও উহারই সমর্থন করে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষের আয়ুষ্কালে মারাত্মক অসামঞ্জস্য নাই।

মনুসংহিতায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনুর মতে সত্যযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল ৪ শত বৎসর এবং তাহার পরে শত বর্ষ করিয়া কমিয়া কলিতে মাত্র ১ শত বৎসর (৭)। কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন, চতুর্ব্বর্ষশতায়ুঃ স্বাভাবিক। অধিক আয়ুঃপ্রাপক ধর্ম্ম তাঁহাদের ছিল, কাযেই এতদপেক্ষা অধিক আয়ুঃ সম্ভব; এবং এই যুক্তিতেই রামের ১১ হাজার বৎসর রাজত্ব করা অনৈসর্গিক নহে।

---

(১) শতং জীবিতমর্দ্ধাস্তু নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্॥
কুলার্ণবতন্ত্র ও শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ১ম উল্লাস।

(২) কিং ন পশ্যসি মাতস্ত্বং সহস্রস্যাপি মধ্যতঃ।
জনাঃ শতায়ুষঃ পঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তি বা॥ ১০৮।
অশীতিকা বিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকা নরাঃ।
পরমায়ুঃ স্থিতা ষষ্টিস্তদপ্যাপ্তি ন নিশ্চিতম্॥ ১০৯॥
কুমারিকাখণ্ড, ৪২ অঃ।

(১) বাল্যং বৃদ্ধির্বপুর্মেধা ত্বক্ দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥

(২) অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥ ৪৯
বাতব্যাধিনিদান।

(৩) "বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে।"
চরক-সংহিতা, বিমানস্থান, ৮।১৪৩।

(৪) সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে॥ বিমানস্থান, ৩।৩১।

(৫) সপ্তসপ্ততিবর্ষাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথী নাম নরাণামতিদুস্তরা।
তামতীত্য নরো যোহসৌ দিনানি যানি জীবতি।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সুবর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥

যদাহ বরাহঃ আয়ুর্নিরূপণে—

(৬) (ক) সমাঃ ষষ্টির্দ্বিঘ্না মনুজকরিণাং পঞ্চ চ নিশাঃ।
(খ) শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ।
পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ॥
(গ) পঞ্চাহা নখ-ভূ-সমা নৃকরিণাম্।

(৭) অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥ ১।৮৩।

"শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত ইহার বিরোধ নাই। কারণ, এই শ্রুতিতে শত শব্দ বহুত্বপর বা কলিপর। কাযেই কলির পূর্ব্বে শতাধিক বয়স সম্ভব, ইহাই যেন ধ্বনি (১)। আবার মনুর ৩য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা রূপবান্, ধনবান্, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, যশস্বী, ভোগসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হয় এবং শত বর্ষজীবিত থাকে (২)। মনুর সময়েও যে যক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধি ছিল, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক পাঠ করিলেই জানা যায়। ঐ সময়ে যে অকালমৃত্যু ছিল, দুই বৎসরের বালকও মরিত, তাহা ৫ম অধ্যায়ের ৬৭।৬৮ শ্লোকে উল্লেখ আছে। সত্যযুগের রাজা বেণের পাপাচরণের কথা সকলেই জানেন।

ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সকলেই ত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা চারি শত বৎসর পরমায়ুঃ ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথার উত্তরে ভৃগু বলিলেন—বেদাভ্যাস না করায়, সদাচার ত্যাগ করায়, অলস হওয়ায় এবং অখাদ্য অন্ন ভোজন করায় ব্রাহ্মণগণ অকালমৃত্যু কর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া থাকেন (৩)। কুল্লূকভট্ট বর্ষ শব্দ দিনপর ধরিতে চাহেন না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে কলির পূর্ব্বে ৪ শত বৎসর আয়ুষ্কালের কথা মানিয়া লইতে আপত্তির কোনও কারণ নাই; কেন না, উহা অসম্ভব বা কল্পনাতীত নয় বলিয়াই বিশ্বাস হয়। মনুসংহিতা ভিন্ন মহাভারত (১), স্কন্দ পুরাণ (২), বৈদ্যক (৩) প্রভৃতিতেও উহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতে আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা "Encyclopœdia Britannica" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে longevity (দীর্ঘায়ুঃ) শব্দে দেখিতে পাই যে,——

"An increasing number of persons have chance of reaching and do reach ages between 90 & 100 Careful investigation has thrown doubt, almost amounting to disprove, on the much quoted cases of great longevity. T. Parto, the Shropshire peasant, is supposed to have reached his hundred & fiftythird year (153) and although the existence of Centenarians is thoroughly established any ages exceeding 100 (hundred) bv more than two or three, are almost dubious. (11th Edition, pages 975-77).

অর্থাৎ অনেক লোকেরই ৯০ হইতে ১ শত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং বস্তুতঃ তাহা হইয়াও থাকে। দীর্ঘ-জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আমরা পাই, সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারা সেগুলি প্রায় ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্রপ্‌শায়ারবাসী টি পার্টো নামক জনৈক কৃষক ১ শত ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। অবশ্য শতবর্ষজীবীদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এক শত বৎসর অপেক্ষা মাত্র দুই বা তিন বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়া থাকিবার কথা সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয়।

ইহাই আমাদের প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য বিষয়। পুস্তকের অভাবে আশানুরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। বিচারের ক্ষমতা নাই, সুতরাং মীমাংসার যেটুকু উপকরণ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা সমাধান করিতে পারি নাই। আলোচনায় মীমাংসা হইবে, আশা করি। তত্ত্বনির্ণয়ই উদ্দেশ্য, পুরাণের প্রতি অভক্তি উৎপাদন উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞগণের নিকট আলোচিত বিষয়ের সুমীমাংসা প্রার্থনা করি। "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১৬।১)

পরিশেষে ঋগ্বেদের ভাষায় বলিতেছি—আমি তত্ত্ব জানি না। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না, না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।

(ক) রোগনিমিত্তাধর্ম্মাভাবাদরোগাঃ। সর্ব্বর্দ্ধিকামাফলাপ্রতিবন্ধকাধর্ম্মাভাবাচ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষ্ট্বঞ্চ স্বাভাবিকম্। অধিকায়ুঃপ্রাপক ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোঽপি ভবন্তি। তেন "দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ" ইত্যাদ্যবিরোধঃ। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ তু শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা। এবংরূপা মনুষ্যাঃ কৃতে ভবন্তি. ত্রেতাদিষু পুনঃ পাদং পাদমায়ুরল্পং ভবতি ইতি। "নিঘণ্ট" গ্রন্থেও শত শব্দ বহুত্ববাচক বলা হইয়াছে।৩।১।

(১) রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥

(২) অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ মনু, ৫।৪।

(৩) যমরাজ সাবিত্রীকে বর দিলেন,—সত্যবান্ তোমার সহিত ৪ শত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করিবেন।
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি। বন, ২৯৬।৫৭।

(ক) অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাযুগে হ্যেষাং পাদশো হ্রসতে বয়ঃ॥ শান্তি, ২৩১।২৫।

(খ) চত্বারি ত্রীণি চ দ্বে চ তথৈকৈকং শরচ্ছতম্।
জীবন্ত্যত্র নরা দেবি ! কৃতত্রেতাদিষু ক্রমাৎ॥ প্রভাসখণ্ড, ১১।১০।

(গ) পুরুষাঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিকেঽপ্যেবং পাদশো হ্রসতি ক্রমাৎ॥ বৈদ্যক।

ভারত ও প্রাচীন প্রতীচ্য গ্রন্থ

স্মরণাতীত কাল হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশের সংস্রব স্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের বার্ত্তা পাইয়া অনেক দিগ্বিজয়ী পাশ্চাত্য নরপতি এখানে রাজত্ববিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ভারত ও প্রতীচ্যদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই সংস্রবাধিক্য নিবন্ধন অনেক প্রতীচ্য পণ্ডিত স্ব স্ব গ্রন্থে ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে গ্রীকদিগের আদিকবি হোমার 'অডীসি' নামক যে মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাতে দুইটি ইথিওপিয়ান জাতির বর্ণনা করিয়াছেন : একটি পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ আফ্রিকানিবাসী, অপরটি পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় দেশের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য-সম্রাট দরায়ুস ভারতভূমিতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে বাহ্লীক দেশ হইতে কান্দাহারে উপস্থিত হয়েন। তিনি স্বীয় কর্ম্মচারী স্কাইলাক্স নামক এক জন গ্রীককে সিন্ধুনদ বাহিয়া সমুদ্রপথে পারস্যে যাইবার পথ আবিষ্কার করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। স্কাইলাক্স সিন্ধুনদ দিয়া আরবসাগরে উপনীত হয়েন এবং নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য করিয়া ৩০ মাস পরে লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া সুয়েজে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতিক্রান্ত উপকূলের আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণসহ তিনি ভারতবর্ষের একখানি ভূবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তক এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়।

মিলিটাস নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক হেক্‌টেয়াস্ খৃঃ পূঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে একখানি ভূবৃত্তান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যৎসামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত সাতটি ভারতীয় নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

(১) ইণ্ডাস (The Indus), (২) ইণ্ডিয়া (India), (৩) কাসপাপিরাস (The City of Kaspapyrus), (৪) গান্ধারের দেশ (The Country of the Gandarie), (৫) ওপিয়ে ও কাল্লিয়েটিক (The Opiae and Kalliactie), (৬) স্কিয়াপডী (The Skiapades), (৭) আরগান্টি (The City of Argante).

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডটাস (Herodotus) খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে হালিকার্ণাসাস (Halikarnassus) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের যে বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে যত জাতির বাস আছে, তাহাদিগের মধ্যে ভারতবাসিগণ সর্ব্বশেষ জাতি, পঞ্জাবের পর রাজপুতানার মরুস্থলী পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ভারতে নানা ভাষাভাষী লোকরা বাস করে। তিনি ভারতীয়গণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; এক শ্রেণীর লোকরা কৃষ্ণবর্ণ, অসভ্য ও যাযাবর, অপর শ্রেণীর লোকরা উত্তর-ভারতীয় কস্তপপুর ও পাখতু (Pakhtu) নিবাসী সুসভ্য আর্য্যগণের বংশোদ্ভূত। ইহা ভিন্ন তিনি ভারতের সুদূর দক্ষিণাংশনিবাসী ইথিওপিয়ানদিগের অনুরূপ এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা বোধ হয়, দ্রাবিড়দেশীয় লোক। ভারতের অসভ্য জাতিদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, সিন্ধুনদের জলাভূমিতে যে সকল আদিম জাতি বাস করে, তাহারা আমমাংস ভক্ষণ, তৃণাদি পরিধান এবং নদীতীরস্থ বংশজাতীয় বৃক্ষবিশেষে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উহার অদূরবর্ত্তী আর এক অসভ্য জাতি পীড়িত আত্মীয়গণকে নিধন করিয়া তাহাদিগের মাংসভক্ষণে অভ্যস্ত।

হিরোডটাসের বিবরণীতে ভারতের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা লিখিত আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকরা আদৌ জীব-হিংসা করে না, শস্য খাইয়া জীবনধারণ করে এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ ও দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে ইচ্ছুক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ইহা যে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গৌতম বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৪০৮ অব্দে হিরোডটাসের জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত দরদ (Dardistan) নামক দেশের এক প্রকার পিপীলিকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পিপীলিকাগুলি আকৃতিতে কুক্কুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু উল্কামুখী অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহারা শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার সময় উহারা যে মৃত্তিকা উত্তোলন করে, তাহাতে স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। পাছে কেহ ঐ মৃত্তিকা অপহরণ করে, এই জন্য তাহারা বিশেষ সতর্ক হয়, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে তাহারা গর্ত্তমধ্যে নিদ্রিত হইলে লোক দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া ঐ স্বর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। পিপীলিকা জানিতে পারিলে পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অপহরণকারীর প্রাণসংহার করে।

সিন্ধুদেশের প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, ঘোটকাদি নানাবিধ পশু, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির পক্ষী এবং সিন্ধুনদের কুম্ভীরের বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরোডটাসের পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য-সম্রাট আর্টজরাকসিসের কর্ম্মচারী এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ক্লীডস্-নিবাসী কিটসিয়াস (Ktesias) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে হিরোডটাস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে যে সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেলিউকস্ নিকেটস্ মেগাস্থিনীসকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূতরূপে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনীস একখানি উৎকৃষ্ট ভারত-বিবরণ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ান, ডায়ডোরাস এবং ফোসিয়াস্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তক হইতে যে যে অংশ স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, কেবল সেইগুলিই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে পাশ্চাত্য

দেশের লোকরা ভারতের প্রাকৃতিক শোভা-সম্পত্তি, ধনৈশ্বর্য্য এবং অধিবাসিগণের বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রবণতার বিষয় অনেক পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত মেগাস্থিনীসের বিবরণ বর্ত্তমানে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতের অবস্থার বিষয় যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

ভারতের সীমান্তপ্রদেশস্থ পুষ্কলাবতী হইতে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত রাজপথের দীর্ঘতা ৬০ মাইল, বিতস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ ১ শত ২০ মাইল এবং বিপাসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ ৩ শত ৯০ মাইল। বিপাসা হইতে হিসিড্রাস (Hisidrus), হিসিড্রাস হইতে যমুনা, যমুনা হইতে গঙ্গা এবং গঙ্গা হইতে রাধাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ১ শত ৬৮, ১ শত ৭৩, ১ শত ১২ ও ১ শত ১৯ মাইল। রাজপথের প্রত্যেক মাইল অন্তে দূরত্বাবোধক এক একখানি প্রস্তর-ফলক ছিল। তক্ষশিলা, কনৌজ, হস্তিনাপুর, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরগুলি রাজধানী পাটলিপুত্রের সহিত প্রশস্ত রাজপথের দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায়, কি বাণিজ্যব্যাপার, কি দূরদেশে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ, কি বিভিন্ন স্থানে সংবাদাদির আদান-প্রদান সকল বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ছিল। রাজপথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত থাকিত।

গমনাগমনের সুবিধা নিবন্ধন এবং চৌর্য্য-প্রতারণার অসদ্ভাব হেতু বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সিরি (Seres) হইতে রেশম, গাঙ্গেয় প্রদেশ হইতে সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র, আরব দেশ হইতে মসলা এবং সুবর্ণভূমি হইতে নানাবিধ বহুমূল্য পণ্য আনিয়া পাটলিপুত্রের পণ্য-বীথিকা পরিপূর্ণ হইত। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বৎসরে দুইবার শস্য উৎপন্ন হইত।

মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। উহা সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং চতুঃষষ্টিদ্বার ও পঞ্চশত সপ্ততিসংখ্যক দুর্গ-সমন্বিত সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই নগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে অশীতি ও পঞ্চবিংশতি ষ্টাডিয়ম।* নগরের দুই দিক্ নদী দ্বারা ও অন্য দুই দিক্ প্রশস্ত পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। ইহা পৃথিবীর তাবৎ নগর অপেক্ষা সুদৃঢ় হইলেও কাষ্ঠ ও অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে সমাচ্ছন্ন ছিল।

মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিদেশীয়া রক্ষিণী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। ঐ রক্ষিণীরাই তাঁহার পাচিকা ও তাম্বলপাত্রপ্রবাহিকা ছিল। সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইলে তাহারাই তাঁহাকে গৃহে বহন করিয়া আনিত এবং সঙ্গীতালাপে নিদ্রোৎপাদন করিয়া তাঁহার শ্রমাপনোদন করিত। ঘাতক হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে রাজা রাত্রির মধ্যে বহুবার শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। পূজোপলক্ষে বা মৃগয়ার্থ রাজা বহির্গত হইলে ঐ রক্ষিণীরা তাঁহার রথের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অশ্ব বা গজারোহণে অগ্রসর হইত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুই জন রক্ষিণী তাঁহার রথেও আরোহণ করিত, পথের দুই ধার রজ্জু দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইত এবং ভল্লধারিগণ শোভাযাত্রার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকিত।

দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, সামরিক, পর্য্যবেক্ষক এবং রাজকীয় মন্ত্রণাদাতা এই সপ্ত শ্রেণীর লোক ভারতে বাস করে। রাজধানীর দূরস্থিত পল্লীসমূহের শাসনভার এক দল রাজকীয় কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। উঁহারা রাজস্ব-সংগ্রাহকও ছিলেন। পয়ঃপ্রণালীর নির্ম্মাণ ও সংস্কার, ভূমির পরিমাণ নির্ণয় ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ, রাজপথের সংস্কার ও উহাতে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন সংস্থাপন, নূতন সেতু নির্ম্মাণ ও পুরাতনের সংস্কার, মৃগয়াকারী ও বনকর্ত্তকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং খনিসমূহের তত্ত্বাবধান উঁহাদিগের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইত।

রাজধানী পাটলিপুত্রে ছয়টি পঞ্চায়েৎ সভা ছিল। পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটি পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েৎ সভা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিত। প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্চায়েৎ সভা শিল্পাদির উন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত। পথিক, বণিক্, রাজদূত এবং বিদেশীয়গণের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ সভার কার্য্য ছিল। বিদেশীয় ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ, গতায়ু বিদেশীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের উপায়বিধান ও মৃতের আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ উক্ত সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইত। লোকসংখ্যা-গণনা এবং জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার তৃতীয় পঞ্চায়েৎ সভার উপর ন্যস্ত ছিল।

অপরাধের জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অতি গুরু দণ্ড প্রদান করিতেন। এই জন্য তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন না। সামান্য অপরাধেও লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত। দাসত্ব-প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল না। হিন্দুরা মিতব্যয়ী, সংযমী ও নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল না,কেবল পুরোহিতগণ ধর্ম্মকর্ম্মাদি সম্পাদনসময়ে সোমরস পান করিতেন। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু রমণীদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সহমরণপ্রথা কেবল কাথিয়ওয়ার ও তক্ষশিলার হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতের লোকরা এতদূর ধর্ম্মভীরু ও সজ্জন যে, প্রতারণা বা চৌর্য্য তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য গৃহের অর্গল বা তালকাদির প্রয়োজন হইত না। বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে কেহ বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিত না, স্থানীয় পঞ্চায়েৎ সভা চিরন্তন প্রথাক্রমে যাহা মীমাংসা করিয়া দিত, তাহাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইত।

পাটলিপুত্র নগরের ভদ্রলোকরা হীরকাদি-খচিত বিচিত্র কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহারা পদব্রজে গমন করিবার সময় এক জন ভৃত্য তাঁহাদিগের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া যাইত। ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। ভারতবাসীরা ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের ধর্ম্মানুসরণ করে। ব্রাহ্মণরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথিবী বর্ত্তুলাকার ও অনিত্য ; ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত বিশ্বের মূলস্বরূপ এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শ্রমণদিগের মধ্যে এক দল বানপ্রস্থ অবলম্বনে বনে বাস, বন্য ফলমূলে ক্ষুন্নিবারণ, বল্কল পরিধান, হস্তে জলপান এবং ইন্দ্রিয়সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন করিয়া থাকেন।

মেগাস্থিনীসের বিবরণ হইতে আরও অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিপিবদ্ধ করা হইল না। এক্ষণে অন্যান্য গ্রন্থে ভারতের কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

এসিয়া-মাইনরের-অন্তঃপাতী আমাসিয়া-নিবাসী ষ্ট্রাবো নামক এক জন গ্রীক পণ্ডিত ভারতের একখানি ভূগোল-বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে ভারতের বাণিজ্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি যখন মাওজ হরমজ নামক বন্দরে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় তথা হইতে ১ শত কুড়িখানি পোত বাণিজ্যার্থ ভারতে যাত্রা করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর ভারত-বিবরণ যাহা তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আলেকজান্দ্রিয়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইরাটস্থনীস

---

* এক ষ্টাডিয়ম ৫ শত ৮২ ফিটের সমান।

এবং সেকেন্দর সাহের অনুচর মেগাস্থিনীস, এরিষ্টবুলাস ও অনিসিক্রিটাস প্রভৃতির বিবরণের পুনরুক্তি মাত্র।

প্লিনি খৃঃ পূঃ ৭৭ অব্দে 'প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত' নামক যে পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে ভারতের ভূবৃত্তান্ত, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ এবং ভেষজ প্রভৃতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুস্তক-প্রচারের প্রায় সমকালেই পেরিপ্লস (Pariplus, Marıs Erythrari) মারিস ইরিথেরি অর্থাৎ আরব-সমুদ্রের দিগ্‌দর্শন নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহা কাহার রচিত, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে গ্রন্থকারের উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, লোহিতসাগরতীরস্থ বন্দর, আরব ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ যাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানসম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পেরিপ্লসে উল্লিখিত হইয়াছে, লোহিতসাগরের তীরস্থ যে সকল বন্দর ভারতের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, সেগুলির মধ্যে মোজা (বোধ হয় বর্ত্তমান মোচা) প্রথম। তাহার পরবর্ত্তী বন্দর ওকিলিস। প্রণালীর (বাবেলমাণ্ডব প্রণালীর) তীরস্থ কেন (Kane) নামক বন্দর হইতে দক্ষিণ-ভারতযাত্রী নাবিকরা খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইত। এই স্থান হইতে কোন কোন বাণিজ্যপোত একবারে সুখতরা বা সকোট্রা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপথে পরিচালিত হইত, আর কোন কোনটি উপকূল দিয়া গমন করিত। ঐ গ্রন্থকার ভারতের যে যে বন্দর দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সিন্ধুনদের মোহানার মধ্যস্থলে একটি বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বন্দর গ্রীকগণ কর্ত্তৃক বারবারিকন নামে অভিহিত হইত। এখানে প্রতীচ্যদেশীয় পণ্য পোত হইতে নৌকায় উত্তোলিত করিয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী মীননগরে প্রেরণ করা হইত। দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, উহা অন্ধ্র-রাজাদিগের রাজ্য ছিল। ঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর বহিঃস্থ ভূমি জঙ্গলপূর্ণ, নির্জ্জন এবং ব্যাঘ্র, বানর ও অজগর সর্প প্রভৃতির আবাসভূমি। তগর, শূর্পারক, প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণ নামক স্থানে মধ্যভারত হইতে পণ্যদ্রব্য আসিত। যে রাজপথ দৌলতাবাদ হইতে হায়দরাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা উক্ত নগর কয়েকটির মধ্য দিয়া গিয়াছে। পশ্চিম-তামিল রাজ্যের কেরলপুত্র দেশে মুজিরিস নামক নগর, পাণ্ডরাজ্যে নীলকুণ্ড, কুমারী অন্তরীপে কুমারী দেবীর মন্দির, চোলমণ্ডল উপকূলে কামারা, পণ্ডিচেরী এবং সুপাটন বা সপ্‌টম (Saptam) প্রভৃতি উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায়, চোলমণ্ডল (বর্ত্তমান করমণ্ডল) উপকূল হইতে অনেক পণ্যদ্রব্য রোমরাজ্যে প্রেরিত হইত। মছলিপট্টনে সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্রের এবং দরশনে হস্তিদন্তের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। তিনি গঙ্গার মোহানাস্থিত একটি বন্দরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা বোধ হয় তাম্রলিপ্তি বা তমলুক।

খৃঃ ১৫০ অব্দে টলেমির ভূগোল রচিত হইয়াছে। উহাতে কোন দেশের বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। শুদ্ধ ভারত কেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অক্ষ-রেখা, দ্রাঘিমা প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার উক্ত ভূগোলখানি গণিতের উপযোগী করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী আরও অনেক গ্রন্থে ভারতের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

সংগঠনের সদুপায়

১৬। ফল ও ফল-বাগানের কথা।

"সুফলা" হইলেও দেশে আহার্য্য ফলের দারুণ অভাব। ফলাহারের অভাবে এ দেশবাসীর শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের হানিও বড় কম হইতেছে না। সংসদসমূহকে আম, জাম, কলা, আনারস, কমলা, বেল, নারিকেল, আতা, কুল, পেয়ারা, ডালিম, লিচু, কাঁঠাল, লেবু আদি সুরসাল ফলের অভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীবাসীরা নিজ নিজ অধিকৃত ভূমিতে বাজে গাছ না রাখিয়া ফলের চাষে যাহাতে অবহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত কলম চারা বা বীজ দিয়া তাঁহাদের সহায়তা করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত সংসদসমূহ উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করত তাহাতে উক্ত প্রকার ফলের আবাদ করিয়া দেশের ফলাভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

১৭। দেশ-বিদেশে যাতায়াত ও মাল-সরবরাহের প্রণালী নির্দ্ধারণের কথা।

পল্লীমণ্ডলী-সমূহে যাতায়াত ও মাল-সরবরাহের জন্য প্রধানতঃ মানুষ ভারবাহী, গো-যান, মহিষ-যান, মটর-লরী, সাধারণ নৌকা বা মটর-বোটেরই বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত দূরদেশের জন্য বর্ত্তমানে রেলগাড়ীর সাহায্যই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধ্যমত অপরের জাহাজ-ষ্টীমারের সহায়তা গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। সংসদসমূহকে নিজেদের কাযের জন্য পৃথক্ এক নৌবহরের সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্তর্বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বহির্বাণিজ্য পরিচালনের জন্য জাতীয় সংসদকে ক্রমে দেশ-বিদেশগামী জাহাজাদির বন্দোবস্ত নিজেই করিয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসংসাধন জন্য বিশিষ্ট একটি কর্ম্মী দল সংগঠিত করিয়া লইতে হইবে।

১৮। পুষ্পচাষের ও পুষ্পজাত আতরাদি সুগন্ধ দ্রব্যের এবং মধু, মোম প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থার কথা।

পুষ্পচাষেরও এ দেশে দারুণ অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। প্রতি পল্লীতে পুনঃ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের চাষ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার উপায়বিধান করিতে হইবে।

শুধু সখের বা বিলাসিতার খাতিরে পুষ্পের চাষ করিবার মত অবস্থা বর্ত্তমানে এ দেশবাসীদের নহে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই যাহাতে কিছু না কিছু আয় হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এখন এ দেশের কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে।

তাই, পল্লীগুলির স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব-সাধন জন্য পল্লীতে পল্লীতে পুষ্পোদ্যান রচনার বিধান করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এমন মধু ও সুরভিময় পুষ্প নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে মধু, মোম ও সুগন্ধ আতরাদি পুষ্পসারের ব্যবসায় বেশ সুন্দররূপে পরিচালিত করা যাইতে পারে।

গোলাপ, বেলা, যূঁই, চম্পা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পের আবাদ বিশেষ কর্ম্মী সম্প্রদায়ের বিনিয়োগে, পুষ্পসারাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আতরাদি পুষ্পসার বিলাসী ধনীদের উপক্ষুধা-নিবৃত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। এতৎসূত্র অবলম্বনে ধনীদের বহু অর্থ দরিদ্র কর্ম্মীদের হস্তগত হইতে পারিবে।

তাহার পর মধু। মধু এক পরম পদার্থ, যেমনই উৎকৃষ্ট পেয়—তেমনই অতি উৎকৃষ্ট ভেষজ। মানুষের স্বাস্থ্য, শক্তি, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও কান্তির জন্য বিশুদ্ধ মধুর সবিশেষ প্রয়োজন। পরম উপাদেয় এই অমৃতকল্প মধুরও দেশে দারুণ অভাব ঘটিয়াছে। দেশে আবার মধুময় পুষ্পের চাষাবাদ বাড়াইয়া মধু উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুষ্পচাষের সঙ্গে সঙ্গে মধু-উৎপাদনের জন্য মৌমাছি পালনেরও বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসংসাধন জন্য বিশেষ এক কর্ম্মিসম্প্রদায়ের সংগঠন করিতে হইবে। যথাবিহিত বিধানে তাঁহারা এতদ্‌বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মধু উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন।

পদ্মমধু চক্ষুরোগের এক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; দেশে পদ্মফুলের চাষোপযোগী বিল, ঝিল, জলাশয়াদির অভাব নাই। সুনির্ব্বাচিত জলাভূমিতে পদ্মের চাষ করিয়া মৌমাছি দ্বারা পদ্ম হইতে বিশুদ্ধ পদ্মমধু উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছাতক, করিমগঞ্জ, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কমলার চাষ বেশ হয়। সে সব অঞ্চলে গিয়া কমলালেবুর চাষ-আবাদ, ক্রমে ফলের সঙ্গে সঙ্গে অতি উপাদেয় কমলা-মধু উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশের অভাব সম্পূর্ণরূপে সম্পূরণের পর এই সব বস্তু পণ্যরূপে যাহাতে বিশ্ববাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

উপন্যাস পাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা

উপন্যাসের সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ।

কাল্পনিক ঘটনাবলি আশ্রয় পূর্ব্বক মনুষ্যসমাজ ও চরিত্রের চিত্র গ্রন্থনিবদ্ধ করিতে গিয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণনা ও কথোপকথনের সাহায্যে অঙ্কিত চরিত্র-চিত্র এবং সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত প্লটই (plot) উপন্যাসের প্রধান উপাদান। নাটকের সঙ্গে রঙ্গালয়ের সম্বন্ধটুকু বাদ দিলেই তাহা উপন্যাসে পরিণত হয় (A novel is a drama minus the stage.)। বাস্তবজগতে যে সব ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল অথচ ঘটে নাই, যে সব চরিত্র সমাজে থাকা সম্ভবপর ছিল অথচ ছিল না, সেই সব ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাবলে একত্র গ্রথিত হইয়াই উপন্যাস রচিত হইয়া থাকে। এই উপন্যাসের আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। উপন্যাস প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত;—সামাজিক, ঐতিহাসিক, কৌতূহলোদ্দীপক বা ডিটেক্‌টিভ (sensational); 'নবন্যাস' বা romance উপন্যাসেরই একটি ক্ষুদ্র শাখা।

সংসার, সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

এক্ষণে নানা জাতীয় উপন্যাস পাঠের উপকারিতা কি, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ প্রথমতঃ জগৎকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করেন। পরে পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য সহায়ে উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাস অবাস্তবতা বা অতিরঞ্জন দোষ-দুষ্ট (unreal and exaggerated) হয় বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে গ্রন্থকারদিগের সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকবর্গ সেই সব উপন্যাস পাঠ করিয়া স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াও পারিপার্শ্বিক জগৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সকলের পর্য্যবেক্ষণশক্তি সমান নহে, আবার অনেকের ঐ শক্তিটা সুযোগাভাবে বিকসিত হয় না, কিন্তু নানারূপ উপন্যাস পড়িয়া তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিকাশের কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন। ভূয়োদর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত প্রবীণ ঔপন্যাসিকগণের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংসারানভিজ্ঞ পাঠকগণ লোক-চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতাও অর্জ্জন করিতে পারেন। জগতের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়—সকলে সমান দৃষ্টিতে ইহাকে দেখে না। উপন্যাসকারগণও প্রত্যেকে নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি অনুসারে সংসার ও সমাজকে পর্য্যবেক্ষণ করেন ও তাহা নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাই বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের পুস্তকে সংসার ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। নানা গ্রন্থকারের লিখিত উপন্যাস পাঠ করিয়া জগৎসম্বন্ধে একটা বাস্তবজ্ঞান (practical knowledge) পূর্ব্ব হইতে আহরণ করিয়া রাখিলে অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বিপৎ-সঙ্কুল সংসারপথে চলা কিঞ্চিৎ সহজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জগতের মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত সংস্পর্শ ও পরিচয়।

আধুনিক কালে জগতের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক উপন্যাসের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের মহান্ ভাবরাশি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপন্যাসই একচ্ছত্র সম্রাট্, সাহিত্যের বাজারে তাহার একচেটিয়া অধিকার। উপন্যাস এত অধিক লোকপ্রিয় হইয়াছে যে, যে কেহ মাতৃভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে, সেই উপন্যাস পাঠ করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উপন্যাসের পক্ষপাতী। এই কারণেই চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তিগণ উপন্যাসের ছদ্মবেশ পরাইয়া তাঁহাদের ভাব ও চিন্তা জগৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। পুং-স্ত্রী-সম্বন্ধ, ব্যক্তি ও সমাজ-সম্বন্ধ, পরলোকতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, সমস্যা, ধনিক-শ্রমিক-সমস্যা, ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব-সমস্যা, ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ, পিতামাতার শারীরিক মানসিক বৃত্তির সন্তানে বর্ত্তনবাদ (problem of heredity) প্রভৃতি জীবন-মরণের যাবতীয় সমস্যা ও জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবুকগণের সমাধানগুলি আমরা তাঁহাদের উপন্যাসপাঠে জানিতে পারি। এই বিষম জীবন-সংগ্রামের দিনে মহাব্যস্ততার যুগে অল্প অবসরের মধ্যে সহজপাঠ্য উপন্যাস পড়িয়া জগতের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক-প্রসূত গভীর চিন্তারাশির সংস্পর্শে আসিতে পারা বড় কম লাভের কথা নহে। অধিক কি, ভিক্টর হিউগো, কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, আঁতোল ফ্রাস, এইচ, জি, ওয়েলস্, ওয়েণ্ডেল হোমস্, ওয়াণ্টার স্কট, জর্জ্জ ইলিয়ট, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ঠাকুর, শরৎ চটোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমান ও অতীতের বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণের উচ্চ উচ্চ চিন্তাগুলি তাঁহাদের রচিত উপন্যাসসমূহ পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় আমরা এরূপ বিভিন্ন রকম উচ্চ চিন্তারাশির সমাবেশ দেখিতে পাই না। নানাজাতীয় উচ্চস্তরের লেখকগণ উপন্যাসকেই তাঁহাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন—যেন তাঁহারা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়াই বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস সাহিত্যের শিরোমণি করিয়াছেন। যে উপন্যাস জগতের চিন্তা-সমুদ্র হইতে বিবিধরূপ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আহরণ করিয়া আত্মকলেবর সুসজ্জিত করিয়াছে, তাহা পাঠের উপকারিতা সুধীবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা পাঠক এই সব বিভিন্ন চিন্তাপ্রবাহের উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন ও স্বয়ং একটি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন।

বিভিন্ন রকম উপন্যাস পাঠের ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা।

এক এক রকম উপন্যাস পাঠের এক এক প্রকার উপকারিতা। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে পাঠকের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ, স্বজাতি-স্বধর্ম্মপ্রীতি জাগিয়া উঠে। শুনিয়াছি, এ দেশে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ-মঠ" বঙ্গীয় যুবকগণের উপর আশ্চর্য্য রকম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। "দুর্গেশনন্দিনী" "দেবী চৌধুরাণী" "চন্দ্রশেখর" পাঠে বাঙ্গালীর অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া কোন্ বাঙ্গালী পাঠক না আত্মগৌরব অনুভব করেন? স্বদেশ—

স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে কোন্ বাঙ্গালীর মন-প্রাণ পূর্ণ না হইয়া যায়। সার ওয়াণ্টার স্কটের উপন্যাস পড়িয়া স্কটজাতির মধ্যেও না কি স্বদেশপ্রেম উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে অতীতকালের সামাজিক রীতিনীতি, রাজ্যশাসনপদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কি, কোথায় উভয়ের নাড়ী-সংযোগ ইত্যাদি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। মোট কথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস গতপ্রাণ নীরস ইতিহাসকেই সরস ও সজীব করিয়া প্রচার করে। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস খাঁটি ঐতিহাসিক সত্যকে রূপান্তরিত করে না বা ধামা-চাপা দেয় না, পরন্তু উহাকে মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর কল্পনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে। ইহাতে নিছক ইতিহাসের জ্ঞানই লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। রমেশ বাবুর "জীবন-সন্ধ্যা" ও "জীবন-প্রভাত," স্কটের "কেনিলওয়ার্থ" "ওল্ডমর্ট্যালিটি", কিংসলীর "ওয়েষ্টওয়ার্ড হো" প্রভৃতি অতীতের অস্থিকঙ্কালময় ইতিহাসকে পাঠকের মানস চক্ষুর নিকট সঞ্জীবিত ও সুস্পষ্ট করিয়া ধরে।

সামাজিক উপন্যাসসমূহ সমাজের দোষ ও গুণাবলী প্রকাশ করে ও সমাজসংস্কারের সহায়তা করে। পাঠকবর্গ ভাল ও মন্দ বিচার করিয়া যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজের স্তরে স্তরে যে সব ঘৃণিত দোষসমূহ লুক্কায়িত আছে, যে সব কুপ্রথা ধীরে ধীরে মানব-সমাজে ঢুকিয়া বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, সামাজিক উপন্যাস তাহাদের উপর সমালোচনার তীব্র কশাঘাত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "অরক্ষণীয়া" পাঠে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কন্যা-বিবাহপ্রথার অপকারিতা কি, তাহা জানা যায়। দরিদ্র বিধবা যে, বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজে মহা বিপদে পতিতা হয়, তাহা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকারের "দত্তা" পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ তাহা পাঠ করিয়া বকধার্ম্মিকদিগকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন ও তাঁহাদের বিবাহের কোর্টসিপ প্রথার সংস্কার করিতে পারেন। স্বর্গীয় তারকনাথ বাবুর "স্বর্ণলতা" পড়িয়া একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের দোষগুণ জানিতে পারা যায়। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে নিজেদের পরিবারের দোষগুলি সংস্কার করিতে পারেন। ইংরাজ মহিলা লেখিকা মিসেস্ হেনরী উড তাঁহার "ঈষ্টলীনে" ইংরাজসমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় যে গরল উত্থিত হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ইংরাজ পরিবারের গিন্নীগণ সময় সময় পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গুপ্তপ্রণয়ীর সহিত উধাও হইয়া যান। "ওলিভার টুইষ্ট" ও "ডেভিড কপারফিল্ড" নামক উপন্যাস দুইখানিতে ডিকেন্স দেখাইয়াছেন যে, দরিদ্র হইয়া ইংরাজ-সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে ভয়াবহ অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মহাত্মা টলষ্টয় তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সামাজিক সাম্যবাদ ও ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়াছেন। ব্যক্তি ও সমাজ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, বিশ্বালোড়নকারী বলশেভিকবাদ টলষ্টয়ের গ্রন্থ হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সামাজিক উপন্যাস এক দিকে যেমন সমাজের দোষ দেখাইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনই উহার গুণগুলিকেও বর্ণ ফলাইয়া উজ্জ্বলতর করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করে।

সমস্যা-পরিপূরক উপন্যাস-পাঠে (Problem novels) পাঠকগণ নানা দুরূহ সমস্যার সহজ সমাধান জানিতে পারেন। সমস্যা এখানে দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছি। প্রথমতঃ, সমাজ বা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা যথা স্ত্রী-শিক্ষা বা পল্লী-সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ, যেমন কোন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চরিত্র, মনের ভাব জানা আছে—অবস্থান্তরে ঘটনাবিপর্য্যয়ে তাহার জীবনের গতি কোন্ দিকে যাইবে, তাহার চরিত্রের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইত্যাদি জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে তাহাও সমস্যাপরিপূরণ হইবে। শরৎ বাবুর "পল্লী-সমাজ" প্রথমোক্তরূপ সমস্যা-পরিপূরক গ্রন্থ। এগুলি পাঠ করিয়া পাঠক পল্লীসংস্কার-সমস্যা সম্বন্ধে ইহাদের মতামত জানিতে পারেন। বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষ" দ্বিতীয় প্রকার সমস্যাপরিপূরক উপন্যাস। সচ্চরিত্র যুবক জমীদার নগেন্দ্র অবস্থান্তরে প্রলোভনে পড়িয়া নিজ চরিত্র সঠিক রাখিতে পারিবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরই বঙ্কিম বাবু দিয়াছেন। জর্জ্জ ইলিয়টের "সাইলাস মার্ণার," নিরুপমা দেবীর "দিদি", শরৎ বাবুর "বিন্দুর ছেলে" একই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। উহারা দেখাইতেছে যে, প্রতিকূল অবস্থাতেও নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশ্বগ্রাসী স্নেহ মানব-হৃদয়কে জয় করিতে পারে। শেষোক্ত সমস্যাপরিপূরক উপন্যাসগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। উপন্যাসের পাঠকগণ নানা সমাজের অবস্থা, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর ও রমেশ বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া আমরা অতীতের মুসলমানসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। প্রভাত বাবুর "দেশী ও বিলাতী"র বিলাতী গল্পগুলি পড়িয়া বিলাতী সমাজের অনেক গুপ্তরহস্য আমরা জানিতে পারি। রবি বাবুর উপন্যাসগুলি পাঠে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের অনেক কথা বাহিরের লোক জানিতে পারে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা গরীব বা মধ্যবিত্ত হইলে অভিজাত সম্প্রদায় তাহা পাঠ করিয়া গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার পরিচয় পায় এবং নায়ক-নায়িকা সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হইলে নিম্নশ্রেণীর পাঠকগণ তাহা পড়িয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা জানিতে পারে। যেমন ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠ করিয়া লোক লণ্ডনের গরীবের কথা জানিতে পারে ও থ্যাকারের উপন্যাস পড়িয়া বিলাতী সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা অবগত হইতে পারে। সকল সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তাই উপন্যাসপাঠে সকল সমাজের কথা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

উপন্যাস মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিতরণ করে ; পাঠক লোক-চরিত্র বুঝিয়া চলিবার ক্ষমতা লাভ করে।

অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিক গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। এমন কি, অনেকের উপন্যাসের মূলভিত্তি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ (study of psychology)। ইংরাজী সাহিত্যে জর্জ্জ ইলিয়ট ও মেরিডিথ এবং বঙ্গ সাহিত্যে শরৎ বাবু, অনুরূপা দেবী নিপুণ মনস্তত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস পাঠে এই লাভ হয় যে, স্ত্রীপাঠকগণ পুং-মনোভাবের সহিত পরিচিত হয় ও পুরুষ পাঠকগণ স্ত্রীমনোজগতের পরিচয় পায়। বাস্তব জীবনে পুরুষগণ নারীজাতির এবং নারীগণ পুরুষজাতির সংস্পর্শে আসিয়া উভয়ে উভয়ের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার সুযোগ নাও পাইতে পারে ; কিন্তু উভয় জাতির মনস্তত্ত্ববিৎ ঔপন্যাসিকগণের পুস্তক পড়িয়া নরনারীগণ তাঁহাদের মানবচরিত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে পারেন। পুরুষ লেখকগণ অনেক ক্ষেত্রে নারী-মনোভাবের লীলাখেলা সম্যক্ ধরিতে বুঝিতে পারেন না ; কিন্তু এই অভাবপূরণের জন্য বর্ত্তমান যুগে অনেক মহীয়সী মহিলা মসিজীবিনী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের জেন অষ্টেন্, এমিল ব্রোণ্ট, ইলিয়ট, বাঙ্গালায় স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপন্যাসগুলিতে স্ত্রীচরিত্রের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপে নারী যদি পুরুষের এবং পুরুষ যদি নারীর মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে, তাহা হইলে সংসারে ও সমাজে অনেক অনর্থের অর্থহীন কারণ দূর হইবে। আবার বুদ্ধিমান্

পাঠকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ধারণ করিবার শক্তি জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তিও বিকসিত হয়। প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্যের অনেক দুর্ব্বোধ্য মানব-চরিত্র বুঝিতে পারিলে পাঠক বাস্তবজগতে আসল ও মেকী, চিটা ও চিনি চিনিয়া লইতে পারিবেন। তাহা হইলে সংসারে প্রতারণা বা মায়া-মরীচিকার ফাঁদে পা দিতে হইবে না। উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?

নৈতিক চরিত্রের উপর উপন্যাসপাঠের প্রভাব।

ভাল ও মন্দ লইয়াই জগৎ। আবহমানকাল হইতে সংসার ও সমাজে এই দুই সুরাসুরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। প্রাচীন পারসীকগণ এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সু ও কুর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া শ্রদ্ধানতহৃদয়ে পূজা করিয়াছিলেন। উপন্যাস মানবসমাজের খাঁটি চিত্র বলিয়া তাহাতেও মানব-মনের সৎ ও অসৎ ভাব পাশাপাশি স্থান পাইয়া থাকে। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া সমাজ-চিত্র বা চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইলে তাহা একঘেয়ে একরঙা হইয়া পড়ে, ও তাহার কোন বর্ণবৈচিত্র্য থাকে না; সুতরাং তাহা নিখুঁৎ ও চিত্তাকর্ষক হয় না। তাই উপন্যাসলেখকগণ ভাল ও মন্দের চিত্র একাধারে স্থাপন করিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ঔপন্যাসিক পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসকে উদ্দেশ্যমূলক (purpose novels) উপন্যাস বলে। ইংলণ্ডের রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, থ্যাকারে, কিংসলী ও বঙ্গদেশের দামোদর বাবু প্রভৃতি এরূপ উপন্যাস লিখিয়াছেন। যাঁহারা আর্ট লইয়া চুলচেরা বিচার করেন না এবং যাঁহাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, সমাজের এমন অনেক সরল স্ত্রী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এই জাতীয় উপন্যাস ভাল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পাপের ভীষণ পরিণামের চিত্র উপন্যাসে দেখিতে পাইয়া বাস্তবজীবনেও তাঁহারা পাপকে ঘৃণা করিতে শিখেন। ইচ্ছা হইলে যে তাঁহারা সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণও করিতে পারেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন লেখক আবার কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার বা সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যেই উপন্যাস লিখেন। মহামতি ঈশপ বা হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্ম্মার ন্যায় তাঁহাদের কাহিনী বা গল্পাংশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতিকথা (sermons) বুঝাইবার জন্যই লিখিয়া থাকেন। গল্পের পাতলা আবরণের ভিতর হইতে তত্ত্বকথাগুলি যেন মাথা বাহির করিয়া উঁকি দিতে থাকে। মহাত্মা টলষ্টয় পৃথিবীর এই শ্রেণীর লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার গল্পকথাগুলি যে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আর একপ্রকার উপন্যাসলেখক আছেন—যাঁহারা পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ এই দুয়ের মধ্যে কোন একটির পক্ষসমর্থন না করিয়া, কোন একটির পক্ষে কোলটানা কথা না বলিয়া, সমাজ ও চরিত্রের ছবি জগতে যেরূপ দেখিতে পান, হুবহু তাহাদের তদ্রূপ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাহিত্যে 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির (Principle of art for art's sake) পরিপোষক। এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে পাঠকবর্গ নিজ অভিরুচি অনুসারে স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। গ্রন্থকারগণ নিজেদের মতবাদগুলি পাঠকের স্কন্ধে বোঝার মত চাপাইয়া দিতে চাহেন না। পাঠকের চরিত্রের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই সকল উপন্যাস কোন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে না, পরোক্ষভাবে করে। পাঠক সচ্চরিত্র হইলে এইরূপ উপন্যাস হইতে সৎশিক্ষাই লাভ করেন; কিন্তু কলুষিত-চরিত্র পাঠক মনে করেন, গ্রন্থকার বুঝি পাপকে প্রশ্রয় দিয়া পাপীকেই লাভবান্ করিতেছেন। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করিতে শিখেন না। অনেক নীতিবাগীশ ব্যক্তি শরৎ বাবুর "চরিত্রহীন" বা "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"র নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, "চরিত্রহীন" পড়িয়া সমাজে নূতন নূতন কিরণময়ী-দিবাকরের উদ্ভব হইবে। তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের আদর্শটা (Standard of morality), কিন্তু সংকীর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ; তাই তাঁহারা এরূপ অলীক ধারণা পোষণ করেন। কিরণময়ী-দিবাকর-স্রষ্টিকর্ত্তা কি ইচ্ছা করেন যে, সমাজ এইরূপ চরিত্রের আদর্শ অনুসরণ করুক? কখনই নহে। তাঁহারা সমাজের ঘোমটা খুলিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহারই অবিকল আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ এই সব চরিত্রকে শ্রেয়ঃ কি হেয় জ্ঞান করিবে, সেই ভার প্রকৃতপক্ষে তাহারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। মোট কথা, লেখকগণ এইরূপ ক্ষেত্রে পাঠকের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জ্ঞান-বুদ্ধির উপর হস্তক্ষেপ করেন না, পরোক্ষভাবে নৈতিক শিক্ষা দান করেন।

নাটকের ন্যায় উপন্যাসকেও বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক এই দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলিয়াছেন,—"Tragedy excites pity and terror in the mind" (বিয়োগান্তক নাটক দর্শকের মনে যুগপৎ করুণা ও ভীতির সঞ্চার করে)। বিয়োগান্তক উপন্যাসও পাঠকের চিত্তে এই দুই মহাভাবকে জাগ্রত করে। ইহাও পাঠকগণের নৈতিক শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে। কারণ, ঘটনার স্রোতে পর্য্যুদস্ত, বিধ্বস্ত, কুলোকের চক্রান্তে হৃতসর্ব্বস্ব, মন্দভাগ্য কাল্পনিক চরিত্রগুলির প্রতি সমবেদনায় অশ্রুপাত করিতে শিখিলে বাস্তব-জীবনেও পদদলিত, অত্যাচারিতগণের প্রতি মমত্ববোধ করিতে শিখা যায়। ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট পাপ-কালিমাময় নরকের কীটগুলির কীর্ত্তিলোপে ভীতির সঞ্চার হইলে আসল জগতেও পাঠক ভয়ে পাপের পথে পা বাড়াইবে না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক উপন্যাস ভিক্টর হিউগোর "লা মিজারেবল" পাঠে কোন্ পাঠক অশ্রুসংবরণ করিতে পারিয়াছে? জিন্ ভালজিনের শত্রুগণের অমানুষিক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কোন্ পাঠক ভয়ে শিহরিয়া উঠে নাই? বঙ্কিমবাবুর মানসী-কন্যা কপালকুণ্ডলা চৈত্রের বাত্যাবিক্ষোভিত নদীতে ঝাঁপ দিয়া নিমজ্জিতা হইল, আর উঠিল না,—এই কাহিনী পাঠ করিয়া কোন্ পাঠক-পাঠিকার হৃদয় করুণায় বিগলিত হয় না? সঙ্গে সঙ্গে দুষমণ কাপালিকের আচরণে ভীতির সঞ্চার হয়। শরৎবাবুর "অরক্ষণীয়া"র মাতা যখন গঙ্গাকূলে শ্মশানাগ্নিতে পুড়িয়া খাক্ হইতে থাকে, তখন পাঠকের নয়ন-কোণে সমবেদনার অশ্রু দেখা দেয় ও বাঙ্গালীর নিষ্ঠুর বিবাহপ্রথার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠে। নৈতিক চরিত্রের উপর এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রভাব বড় কম নহে।

ঔপন্যাসপাঠ কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশের একটি পন্থা। ইহাতে নির্দ্দোষ আমোদও পাওয়া যায়।

নানাশ্রেণীর উপন্যাস পাঠে পাঠকের কল্পনাশক্তি বিকাশ পায় ও বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়। যাঁহারা অবিরত ঔপন্যাসিকের কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পরিচিত লেখকের যে কোন নূতন বই পড়িতে আরম্ভ করিয়াই প্লটের পরিণতি কিরূপ হইবে, তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন। উপন্যাসের ঘটনাবলীর সুসঙ্গত বিন্যাস, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা, চটুল শ্লেষ (subtle humour) ইত্যাদি পাঠ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিও শাণিত হইয়া থাকে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়ার ন্যায় উপন্যাসপাঠও একটি নির্দ্দোষ মানসিক ক্রীড়াবিশেষ (intellectual pastime)। তাস, পাশা, প্রভৃতি অলস ক্রীড়ায় মত্ত না হইয়া ভাল ভাল উপন্যাস পাঠ করিলে সময়ের অপব্যবহার হয়

না। সময়ের বোঝা যখন দুর্ব্বহ বোধ হয় এবং যখন মন গভীর চিন্তা, পাঠ ইত্যাদির দরুণ অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন উপন্যাস পাঠ করিলে সময় ত কাটেই, মনের সজীবতাও ফিরিয়া আইসে। অনেক সময় দেখা যায় যে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শোকে-তাপে মুহ্যমান ব্যক্তি উপন্যাস পাঠ করিয়া মনের প্রফুল্লতা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায়। যখন পীড়া সারিয়া যায়, কিন্তু রোগীর পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব হয়, তখন রোগীর এমন একটা অবস্থা হয় (Convalescent stage) যে, সে আর কিছুতেই রোগশয্যায় গা রাখিতে চায় না অথচ সুস্থ লোকের ন্যায় চলাফেরাও করিতে পারে না। সেই অবস্থায় ডাক্তার-বৈদ্যগণও রোগীকে সরস উপন্যাস (light literature) পাঠ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে রোগীর অবসাদ অনেকটা লাঘব হয় ও সে শীঘ্র সবল হইয়া উঠে। তবে খুব উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস এই সময় রোগীর হাতে দিতে নাই। উপন্যাসপাঠের সার্থকতা আমরা এ স্থলে দেখিতে পারি।

ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গী শিখিবার উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মনস্বী সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। কাযেই কোন ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিতে হইলে উপন্যাস পাঠ করিতেই হইবে। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে লিখিবার ভঙ্গীও (style) শিখিতে পারা যায়। এক এক জন লেখকের ভঙ্গী এক এক প্রকার। বিভিন্ন লেখকের উপন্যাস পাঠ করিয়া নানারকম লিখিবার ভঙ্গী দেখিয়া শুনিয়া পাঠক একটি নিজস্ব লিখিবার ভঙ্গী গঠন করিতে পারেন। সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস পাঠেই বেশী আমোদ পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণ উপন্যাস পড়িয়াই ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। উপন্যাসের কথোপকথন সাধারণতঃ কথিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। অতএব কোন ভাষার কথিতাংশ (Colloquialism) শিখিতে হইলে সেই ভাষার উপন্যাস পাঠ করাই উৎকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য, উক্ত ভাষাভাষীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াও উহা শিক্ষা করা যায়। কিন্তু সে সুযোগ কালে-ভদ্রে মিলে। যেমন ইংরাজীভাষার Clloquialism শিখিতে হইলে ইংরাজদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ না পাইলেও আমরা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারি। উপন্যাস পাঠের ইহাও একটি উপকারিতা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস।

বারবিলাসিনী

রক্তলোলুপা রাক্ষসী আমি দয়ামায়াহীনা ভীষণা অতি ;
সখী ও প্রেমিকা নহি কেহ নহি নহি কল্যাণী নহি কো সতী।

শিকারের লাগি রয়েছি দাঁড়ায়ে এ ঘোর আঁধারে পথের পারে।
এই সীমানায় আসিলে পথিক নরকের তুমি আসিবে ধারে :

পালাও, পালাও, আসিও না পাশে মোর নিশ্বাস লাগিলে গায় ;
এক নিমেষেই প্রতি রোমকূপে বিষের প্রবাহ ছুটিবে হায় !

কি দেখিছ চাহি, এ মুখের পানে সুন্দরী আমি রূপসী বড় ?
নাগিনীর চেয়ে হিংস্র এ রূপ বাঘিনীর চেয়ে উগ্রতর !

আমার রূপেতে আমি পুড়েছি গোপনে তুষের অনল সম ;
কত সোনা ছাই হয়ে গেল হায় লাগিয়া দেহের আগুন মম।

মেজে-ঘষে হায় রূপসী হয়েছি স্বভাব-সুষমা নাহিকো কিছু ;
খুলে ফেলি যদি এ কপট সাজ চ'লে যাবে মাথা করিয়া নীচু।

আমারে হেরিছ ? আমি নাই হেথা নকলের খোসা ঢেকেছে দেহ :
ঘায়ের উপর লেপিয়া প্রলেপ লুকায়ে রেখেছি কীটের গেহ !

প্রেমের জ্যোতি ত নাহি মোর মুখে লাবণ্য-রেখা ললাটে কই ?
নয়নে নারীর মহিমা যে নাই তাই ত নারীর বাহিরে রই !

বিজলী-আলোকে হেরিছ আমায় দেখিও এ দেহ দেখিও দিনে ;
নিশি-খদ্যোত কত সুন্দর নিমেষে তখন লইবে চিনে !

কত দিন আমি দিবস-আলোকে দর্পণে যবে হেরেছি মুখ ;
সহসা নিজেই শিহরি উঠেছি কাঁদিয়া উঠেছে পাষাণ-বুক।

নিজ দেহ মোর বিদ্রোহ করে বিদ্রূপ করে নিজের রূপ ;
বুকে যেন কোথা লুকায়ে রয়েছে হীন কদর্য্য ক্লেদ-কূপ !

সেই দিন হ'তে দর্পণে আর পারি না চাহিতে দর্পভরে ;
তীব্র আঘাতে বিবেক আমার ক্ষণে ক্ষণে যেন বিদ্ধ করে।

ভ্রান্ত পথিক, শান্তি কি চাও সুখ কি গো চাও আমার পাশে ?
সুখ যে কেমন ভুলিয়া গিয়াছি ডুবিয়া এ ঘোর নরকবাসে !

তনয়বয়সী তরুণ এসেছে পিতার বয়সী এসেছে কত ;
জানি নাকো তা'রা কি সুখ পেয়েছে আমি শুধু হায় পেয়েছি ক্ষত !

পঁচিশ বছর কামনা-যজ্ঞে নিজের এ দেহ আহুতি দিয়া ;
মরমের কোণে মরিতে বসেছি পাপ-কালিমার পঙ্ক নিয়া !

আহা ফিরে যাও তরুণ পথিক করুণা জাগিছে তোমার হেরি,
বাঁচিবার তব রয়েছে সময় আমার নাহিকো মরণে দেরি !

প্রেমময়ী তব বধূ যে এখন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ;—
মন্দিরে গিয়ে তব দেব-বিগ্রহে প্রণাম করিছে ভকতি-ভরে।

আহা সে বালিকা জানে না তোমার এ হীন আচার ছলনাময় ;
প্রেম-গৌরবে তোমার উপরে নির্ভর করি' বাঁচিয়া রয় !

মায়ের যে তুমি স্নেহের পুতলী বধূর যে তুমি জীবন সম ;
ভগিনীর তুমি আদরের ধন সকলের তুমি নিকটতম !

গৃহ-পরিবার রয়েছে তোমার তুমি কেন হেথা ডুবিতে চাও ?
পরিজন-স্নেহ-স্বরগ-ছায়ায় যাও, যাও ওগো, ফিরিয়া যাও !

সামান্য গৃহ-মার্জ্জার হয়ে ঘরে ফিরে যদি থাকিতে পাই :
এ জীবন চেয়ে সেও বুঝি ভালো সে সুখেরো বুঝি তুলনা নাই !

ধরো না, ধরো না, ছুঁয়ো না আমায় আমায় পরশি কেমন ক'রে ;
সঙ্কোচ-হীন চরণে পশিবে ভগিনী ও মাতা বধূর ঘরে ?

এ পরশ-পাপ ছড়া'ও না তুমি মানবের মহাসমাজ-গেহে :
যেথায় রয়েছে সতী প্রণয়িনী নির্ভয় সুখে স্বামীর স্নেহে !

পাতকিনী আমি, বিলাসিনী আমি পথমাঝে মোরে মরিতে দাও ;
হে পথিক, তুমি গৃহ-সুখছায়ে স্বজনের বুকে ফিরিয়া যাও !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ত্রিবেণী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধানীর এক প্রান্তে দরিদ্রপল্লীর মধ্যভাগে দিব্বোক ও উদ্দোক জালিকদিগের কুটীর কয়খানি নিতান্তই দারিদ্র্যব্যঞ্জক নহে। মধ্যে বড় একখানি আটচালা, ইহার এক ধারে কয়েকখানা সুন্দরভাবে মার্জ্জিত সুসংবদ্ধভাবে অবস্থিত পর্ণগৃহ এবং অপর পার্শ্বে একটুখানি শাক-সব্জীর বাগান ও একটি ছোট ডোবা। তদ্‌ভিন্ন কয়েক বিঘা ধান-জমীও আছে।

পল্লীবাসীদিগের অধিকাংশই ধীবর;—প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ঘর হইবে। এই দিব্বোক ও তাহার ভাই উদ্দোক জেলে কৈবর্ত্ত-সমাজের সমাজপতি বা শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা বা এক প্রাণতা যে কোন ভদ্রসমাজেরই অনুকরণীয় ছিল। ইহাদের একের বিপদে সমস্ত পল্লীবাসী নিজের বিপদ এবং সম্পদে নিজ সম্পদ মনে করিয়া একত্র হইতে পারিত। এই জেলেপাড়ার পরই ডোম ও বাগ্দীপাড়া। বাগ্দী-জাতীয় অধিকাংশ পুরুষই পাইক-পেয়াদার কার্য্যে ভর্ত্তি থাকে। দৈহিক বল ও বিক্রমে ইহারা প্রায় ক্ষাত্র শক্তির পার্শ্ববর্ত্তী হইতে সমর্থ—আর তাহা হইয়াও ছিল। রাজা, জমীদার, ধনী সম্প্রদায় সকলেরই অধীনে বহু দিন অবধি বাগ্দী তীরন্দাজ পাইক বা দৌবারিক ও অপরিমিত পরিমাণে পোষিত হইত। প্রতিবেশী বাগ্দী পালোয়ানের নিকট কৈবর্ত্ত যুবকরা রীতিমত লাঠি-খেলা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা করিত। সে সময়ে উদ্দোক কৈবর্ত্তের ছেলে ভীম কৈবর্ত্তের সমকক্ষ পালোয়ান সে অঞ্চলে প্রায় ছিল না।

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। গত বর্ষায় বৃষ্টি কম হওয়ায় ছোট-খাট ডোবা, পুকুর এ বৎসর শীতারম্ভেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উদ্দোক জেলের বাড়ীর ক্ষুদ্র ডোবাটি বাসনমাজা ভস্ম-পঙ্কে ও তদুপরি পানায় এবং কলমীলতায় প্রায় মজিয়া উঠিয়াছে। পানীয় জলের সংস্থান সেখানে কোন দিনই হয় না, এখন এমন কি, যাবতীয় গৃহকার্য্যের জন্যই জল পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে দিন অপরাহ্ণে উদ্দোকের পুত্রবধূ ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলা গৃহকার্য্য ত্বরিত হস্তে সম্পাদন করিয়া সকল কার্য্যশেষে নিশ্চিন্ত শ্লথ গতিতে কলসীকক্ষে জল আনিতে চলিয়াছিল। প্রায়শঃই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে প্রায় দশ পনের জন মিলিয়া জল আনিতে নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থের গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীতে গিয়া থাকে; কিন্তু এ বৎসর বর্ষার অভাবে সকল পুষ্করিণীই সলিলশূন্য; কাযেই একটু দূরে মহীপালদীঘি নামক প্রকাণ্ড রাজকীয় দীঘিটি হইতেই ইহাদিগকেও জল আহরণ করিতে হয়। সে দিন উজ্জ্বলার গৃহকার্য্য সমাধায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল, কারণ, তাহার শাশুড়ীর চরকা কাটায় তাহাকে অনেকগুলি পাঁইজ পাকাইয়া দিতে হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ-শ্বশুরের জাল মেরামতের সাহায্য করিতে হইয়াছে, সাম্‌নে নবান্ন-পর্ব্ব আসিতেছে, তাহার জন্য ছোট জায়ের সঙ্গে মিলিয়া নূতন ধান কুটিতে হইয়াছে, ইহার মধ্যে নিত্যসঙ্গিনীগণ ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কাযেই আজ তাহার মনটা বেজার-বেজার ঠেকিতেছিল। পথটুকুও আর কম নয়, একাকিনী হাঁটিতে মন যায় কি! একটা তামার কলসী টানিয়া লইয়া সে বাহির হয়, এমন সময় উত্তর-দাওয়ার এক ধার হইতে উজ্জ্বলার দিদিশাশুড়ী ডাক দিয়া বলিল, "ওলো নাতবৌ, জলকে যাচ্ছিস্ ত, আমার লেগে একটু আগুন ক'রে দিয়ে যা না।"

উজ্জ্বলা এতক্ষণের খাটুনীর পরে বাহিরমুখো পা করিয়াই এই আদেশ পাইয়া মনে মনে একটু চটিয়া বলিল, "যাচ্ছি তা' কি আর জন্মের শোধ যাচ্ছি, এখুনি ত ফিরে এসে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিতে হবে, সেই সঙ্গে তোকেও আগুন দেবো।"

শীতভীতা বৃদ্ধা এই উত্তরে মুখ খিঁচাইয়া উঠিল—"আ মর্ মর্ ছুঁড়ী, রূপ-যৈবনের ভারে গুমরে যেন মেঝেতে পা

পড়ে না। ওলো, আমাদেরও এক দিন রূপও ছিল, যৈবনও ছিল, চিরকাল কারুর এক সমান যায় না। আগুন এক দিন তোর মুখেও কি না পড়বে ভাবছিস্ !"

"তার এখনও ঢের দেরী আছে, তোদের যে মাথার উপুরে ঘুনিয়ে এসেছে"--অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধা উজ্জ্বলা কতকগুলা লতাপাতা খড়-কুটায় আগুন ধরাইয়া একটা মাটীর ভাঙ্গা গামলায় করিয়া সেটা ব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধার পায়ের কাছে টিপ করিয়া নামাইয়া দিল ও তাহার পর একটি ছোট দেবর যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, অমনই তাহার গালে একটা চড় মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "যা যা, আর আদর কাড়াতে হবে না, জল না আন্‌লে এখুনি ত আবার 'হাক্কা' প'ড়ে যাবে। আগুন খেয়ে ত আর কারু ভর রাত কাটবে না।"

এই বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই প্রকাণ্ড তামার কলসীটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যায়, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রহৃত শিশুর গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, চুমা খাইয়া, তাহার কানে কানে মিষ্ট স্বরে কহিল, "চুপ কর বিশু, লক্ষ্মী দাদাটি আমার ! ফিরে এসে রান্‌তে রান্‌তে আজ তোকে একটা রূপকথা শোনাব।"

বিশু তখন আদর পাইয়া আদরদাত্রীকে পাইয়া বসিল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে জিদ করিয়া বলিল 'আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে চল্।'

উজ্জ্বলা ধমক দিয়া বলিল, "মা - মা --মা ! এ যে দেখি খেতে পেলে শুতে চায় রে ! ভাল ত জ্বালা হলো রে বাপু, এক পহর রাত হ'তে যায়, কখন্ অত পথখানি যাব, কখনই বা ফিরবো, যা—যা, ঘাড় থেকে নাম বল্‌ছি। ও মা, বাড়ড়ের মত গলা ধ'রে ঝোলে যে ! শীগ্‌গির নাম্, গেলে মেরে তোর হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেব'খুনি।"

বিশু তাহার ভ্রাতৃজায়ার আদরে শাসনে অভ্যস্ত হইয়াই এই চারি বৎসর বয়স কাটাইয়াছে, সে এই শাসনে ভীত না হইয়া তাহার আবদার বাড়াইয়া দিল। তখন অনুপায় হইয়া সেই দুরন্ত ছেলেটাকে কোলে ও কলসীটা হাতে ঝুলাইয়া লইয়া উজ্জ্বলা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, "চল্ তা হ'লে, রাজার দীঘিতে তোকে আজ ভাসিয়ে দিয়ে একেবারেই নিচ্ছিন্দি হয়ে ফিরে আসি গে।"

উহারা চলিয়া গেলে দিদিশাশুড়ী তাঁহার মেয়েকে ডাকিয়া সব কথা কয়টি আরও একটুখানি রঙ্গ চড়াইয়া জানাইলেন, এবং নিজেও সেই সঙ্গে মন্তব্য করিলেন---"কি ডাকাত মেয়ে-মানুষই ভীমে ছোঁড়া বে' ক'রে ঘরে আন্‌লে মা ! জ্যান্ত ছেলেটাকে বলে কি না 'আয় তোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি গে', একটু ডর-ভয়ও কি ওর পরাণটায় নেই ?"

মেয়ে কহিল, "মা, তুই পাগল না কি ? ওর যদি পরাণে ভয় ডরই থাক্‌বে, তা হ'লে এই রাত পহরে সেই কোন্ রাজার দীঘিতে জল আন্‌তে যায় ? দে না কেন ভীমের আর একটা বউ এনে, তোদের যেমন মায়ার শরীল। ভীমেকে ও যে পায়ের তলায় বেধে রেখেছে, তাই না অত তেজ ! সতীন এলে কেমন দপ্প চূন্ন্যি হয়, দেখি তখন।"

শাশুড়ী কহিল, "আমার কি মা অসাধ ! কত যে ভজাচ্ছি, তা না ভীমের মত আছে, না ওই অলপ্পেয়ে বুড়ো ড্যটোরই মত হচ্ছে ! ছুঁড়ী তুক করেছে মদ্দামানুষ কটাকে, তা কি তুই চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছিস্ নে যে, কেবল আমারেই দূষিস্ ?"

"ও মা, তা আর পাই নে ! কৈবর্ত্ত-পাড়ার ছাঁ-পো-ডিম সব্বাইকারই যে উজ্জ্বলী বল্‌তে মুখ দিয়ে নাল পড়ে। এক রত্তি ছোঁড়াগুলোই দেখিস্ নে, মার্‌ছে, কাটছে, তবু সেই বৌ আর বৌ. ও মা, কেন গো ?"

মসী বিনিন্দিতা ভীম-জননী একটুখানি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—"ও, ওই ভদ্দর নোকদের মতন কটা চামড়াখানার গুণে লো, মা !"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈত্য-বিহার-মন্দির-সৌধ-শোভাশালিনী বিপুলায়তন গৌড়-রাজধানী মহানগরী পৌণ্ড্র-বৰ্দ্ধনের আর এক প্রান্তভাগে মহীপালদীঘি অবস্থিত। দীর্ঘিকা অতি-বিস্তৃত, স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার তীরদেশ ও সোপান-শ্রেণী সুমসৃণ প্রস্তর-নির্ম্মিত ; তদুপরি সুদৃশ্য কারুযুক্ত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য বিশ্রামাসন। ঐ দীর্ঘিকার চারি পার্শ্বে সুরচিত ও সুরক্ষিত রাজকীয় উদ্যানসমূহ।

বর্ষা-সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই সেই জন-অধ্যুষিত জল-আহরণার্থিনী মহিলাকুলসমাবৃত দীর্ঘিকাতীর জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ভীম কৈবর্ত্তের তরুণী পত্নী উজ্জ্বলার যদিও দৈহিক শক্তির অভাব ছিল না, তথাপি অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত

সে আজ যে প্রকাণ্ড তাম্রঘট লইয়া আসিয়াছে, সেটি এমনই বৃহদায়তন যে, জলপূর্ণ কলস অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একা সে কক্ষে তুলিতে পারিতেছিল না। ইহার উপর সঙ্গে একটা ছোট ছেলে। এই দীর্ঘ পথ চলিতে অন্ততঃ তাহার হাতখানাও ধরিতে হইবে। বিপন্না উজ্জ্বলা সাহায্যার্থীর বৃথা অন্বেষণে এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিয়া কলসীটা আর একবার টানাটানি করিল, তাহার পর অনুপায়ের কোপে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করিয়া উঠিল, "গুষ্টীর পিণ্ডি চট্‌কানো যে আর শেষ হয় না, বেলাবেলি এলে ত আর এমন বিপদ্ ঘট্‌ত না। দুবার করেই যে নিয়ে যেতে পারি। এখন উপায় কি? থাক্ গে যা, সব তেষ্টায় মরে মরুক, নিয়ে যাব না ত জল।"

অনতিদূরের কামিনী ও কুরুবকের ঝাড় সহসা নড়িয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে এক সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক বাহির হইয়া জলের ধারে উজ্জ্বলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কোন উচ্চপদস্থ লোক বলিয়াই মনে হইল। উজ্জ্বলা এই আকস্মিক পুরুষ-সান্নিধ্যে ঈষৎ বিপন্না বোধ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভাব দূরে চলিয়া গেল, কারণ, সে সবিস্ময়ে শুনিল যে, সেই সহসাগত ভদ্র ব্যক্তি অতি কোমল সহানুভূতিপূর্ণ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "এসো, আমি তোমার কলসী উঠিয়ে দিচ্ছি।"

আহা! কে গো এই দয়াময়! কৃতজ্ঞতার হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া উজ্জ্বলা সাহ্লাদে কলসী ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বিশু ভীতভাবে তাহার গা ঘেঁসিয়া আসিল।

আগন্তুকের সবল হস্তে পূর্ণ কুম্ভ অবলীলাক্রমেই উঠিয়া আসিল। তিনি দুই হস্তে ধরিয়া তাহা কৈবর্ত্ত-যুবতীর ক্ষীণ কটিদেশে স্থাপন করিতে করিতে পুনশ্চ তেমনই মধুর স্বরে, পরন্তু করুণা-তরল-মুগ্ধ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"সুন্দরি! যে চারু নিতম্বে সুবর্ণ-মেখলা পরাতে পেলে এ জীবন ধন্য বোধ করতে পারতাম, সেখানে এই গুরুভার পূর্ণকুম্ভ প্রদান করা যে অত্যধিক নিষ্ঠুরতার কায। আজ্ঞা কর, দাসগণ ইহা বহন ক'রে নিয়ে যাক।"

সুরূপ, সুপরিচ্ছদধারী, সম্ভ্রান্ত পুরুষের মুখের এই স্তুতির বাণী, আকস্মিক অপরিচিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় দরিদ্র বধূর কর্ণে ষড়জ-গান্ধারে বাজিয়া উঠিল।

উজ্জ্বলা সুন্দরী, চতুরা, হাস্যময়ী, কর্ম্মনিপুণা এবং হৃদয়বতী। দরিদ্র অশিক্ষিত গৃহে পালিতা হইলেও তাহাতে ভদ্র-সংস্পর্শ থাকায় অন্তরের পূর্ণ আকর্ষণ তাহার ভদ্র-সমাজেরই সহিত। তাহার উপর জল আনার উপলক্ষে তাহার অতুলনীয় রূপের সহায়তায় ভদ্র পরিবারের বধূ-কন্যাগণের সহিত তাহার অল্প-স্বল্প বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিকট কু-ব্যবহার পাইলেও, সর্ব্বদা প্রাণান্তকর শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলেও, তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরে একটা প্রচ্ছন্ন কাব্য-কল্পনা আত্মগোপন করিয়া বাস করিত। স্বামী ভীম তাহার রূপে মুগ্ধ ছিল, সেই জন্য মাতা ও দিদিমাতার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে আর দুই চারিটা বিবাহ করে নাই; কিন্তু পালোয়ান ভীম নিজের বল-বিক্রমে এবং তাহারই উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায় এতই বিব্রত হইয়া বেড়াইত যে, একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের খবর লইবার অবসর তাহার বড় একটা থাকিত না। তদ্ভিন্ন ঘরের মধ্যে যে দুদ্ধর্ষ মাতা ও দিদিমাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ খড়্গ-হস্তে পাহারা দিয়া ফিরিতেছে, তাহাদিগকে এড়াইয়া পত্নী-সম্ভাষণ তাহার পক্ষে সম্ভবপরই নহে। কদাচিৎ এক এক রাত্রিতে সমস্ত সংসার নিশুতি হইলে পতিপত্নীর নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটিতে পায়। সে ঘটনাও কিন্তু সর্ব্বদা ঘটে না।

উজ্জ্বলা যে সুন্দরী, সে সংবাদে সে নিজে কিছুমাত্রই অজ্ঞ নহে, কিন্তু আজিকার পূর্ব্বে কোন পুরুষের মুখ হইতে তাহার সে অনন্যসাধারণ রূপরাশির এত বড় স্তবগাথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। তাই ইহা শ্রবণে একটিবারের জন্য তাহার সর্ব্বশরীর পুলক-লজ্জার তড়িৎস্পন্দনে শিহরিয়া নর্ত্তিত হইল, প্রবলোদিত আনন্দোচ্ছ্বাসে চোখের পাতা স্বতঃই নামিয়া আসিয়া নিটোল গণ্ড সরসরাগে রক্ত-কমলের শোভা ধারণ করিল।

সাহসপ্রাপ্ত আগন্তুক অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া তেমনই আবেগ-কম্পিত কোমল কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"আজ্ঞা কর, রূপরাণি! সহস্র দাস এখনই তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি পর্য্যন্ত পালন করিয়া ধন্য হইবে। ঐ বল্লরী-কোমল দেহলতা কি এই পর্ব্বতধারণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ পাষণ্ড বর্ব্বর এত বড় নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহার নামটা শুনিবার জন্য যে বড়ই কৌতূহল হইতেছে। সুন্দরি! তুমি

কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছ, এ হতভাগ্যকে তাহা জানাইবে কি?"

উজ্জ্বলা নির্ব্বোধ নহে। ত্বরিতচক্ষুতে বারেকমাত্র সে তাহার সাহায্যকারী সম্ভ্রান্তবেশী পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক সমাগত একটা মহাতঙ্কে তাহার আপাদ-মস্তক যেন কম্পিত হইয়া উঠিল ও সচকিতে দূরে সরিয়া গিয়া সে সভয় উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমি গরীবের মেয়ে গো, আপনাদিগের কাছে পরিচয় দেবার যুগ্যিই নই। আপনি আমার যে দয়া করেছেন, তার জন্যে আপনাকে এই গড় করছি। আয় রে বিশু, চ'লে আয়।"

বলিতে বলিতে গুরুভার কলসী বহিয়া যতটা সম্ভব দ্রুত-পদে উজ্জ্বলা সোপান অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল এবং কিছু দূর উঠিয়া কটাক্ষে পশ্চাতে চাহিয়া যখন আগন্তুককে যথাস্থানেই স্থির থাকিতে দেখিল, তখন যেন তাহার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। একটু দাঁড়াইয়া কলসী হেলাইয়া প্রায় অর্দ্ধেকখানি জল মাটীতে ঢালিয়া ফেলিল এবং রোরুদ্যমান বিশুর হাত ধরিয়া পুনশ্চ ত্বরিতপদে নিজ গন্তব্য পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। শিশু বিশু তাহার সহিত সমান গতিতে চলিতে না পারায় বারংবার পায়ে উচোট লাগিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল এবং এই সদ্য ভয় পাওয়ার সকলটুকু ক্রোধ,চিন্তা ঐ প্রিয় শিশুটির উপর প্রয়োগ করিতে করিতে উজ্জ্বলা তাহাকে টিপিয়া টানিয়া গালি দিয়া অস্থির করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল:—"আয় তোর গুষ্টির পিণ্ডি দিই গে আয়, লোকের মরবারও একটু সময় আছে, আমার তাও নেই। সকল সময় ওঁদের ছরাদের পিণ্ডি চটকাতেই হবে। কা'ল থেকে দেখবো, কে জলকে আসে। তেষ্টায় 'টা-টা' ক'রে গলা শুকিয়ে থাকবে সাত গুষ্টিতে মরে।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই সে বলিতে বলিতে বাড়ী আসিয়া ঢুকিল এবং ফিরিবামাত্রই শাশুড়ী ও দিদি-শাশুড়ী যেমন বিশুর পক্ষ লইয়া আক্রমণ করিতে আসিলেন, অমনই সে-ও তাঁহাদের দুই জনের সহিত রীতিমত কোন্দল সুরু করিয়া দিয়া শেষে শাশুড়ীর হাতের কিল খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল এবং রান্না-ঘরে আগুন জ্বালাইতে গেল।

সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখা দিয়াছে, লহরে লহরে নক্ষত্রমালা গগনপথের সর্ব্বত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুন্দ, কুরুবক, সেফালিকা প্রভৃতি উদ্যান-কুসুমরা উদ্যানের সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আগন্তুক সর্ব্বক্ষণই নিশ্চল হইয়া উজ্জ্বলার প্রস্থানপথের শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর যখন সেই অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নালোকের ক্ষীণ ছায়ায় সেই ভীত, ত্রস্ত, চলন্ত নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন নিজের দৃষ্টিকে সে দিক্ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়া মৃদু মৃদু আত্মগত এই কথা বলিলেন, "এমন রূপ অনেক দিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু কে এ নারী?"

সোপানোপরি কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। প্রত্যাশিত নেত্রে চাহিতেই চক্ষুতে পড়িল এক কর্ত্তিতকুন্তলা, মসি-বিনিন্দিতা, বর্ষীয়সী রমণীর কুদর্শন মূর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিয়া সেই রমণী লজ্জায় প্রায় আধ হাত ঘোমটা টানিয়া পাশের দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। বড়ই লজ্জাশীলা!

কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহার সেই নারীর ভূষণস্বরূপ লজ্জার আরাধনায় বিশেষ প্রীত হইলেন মনে হয় না এবং তাহার সম্মান রক্ষা করাও কর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়াই তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে! জল আহরণার্থ আসিয়া থাকিলে অনায়াসেই তাহা লইতে পার, সঙ্কোচ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

এই আমন্ত্রণের পর লজ্জাবতী যেমন অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া এক পা এক পা করিতে করিতে জলের ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অমনই কাছে আসিয়া তিনি সমবেদনা-পূর্ণভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"আহা, একটি পিত্তলের ঘটও কি আপনার নাই? এই নিন, ধরুন, একটি সুবর্ণ-নিষ্ক আপনাকে দিচ্ছি, ইহা দ্বারা আবশ্যকীয় তৈজস-পত্র ক্রয় ক'রে নেবেন," এই বলিয়া একটি উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ড প্রদর্শন করিলেন।

বর্ষীয়সী চন্দ্রালোকে সেই অপরিচিতমূর্ত্তি সুবর্ণ-মুদ্রাটি দেখিয়া বিস্মিত ও লোভে চমৎকৃত হইল। মুখের লজ্জাবস্ত্র অপসৃত করিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ দন্ত-বিহীন মুখ আনন্দ-হাস্যে বিকসিত করিয়া তুলিয়া সাগ্রহে করপ্রসারণ পূর্ব্বক সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "রাজা হও বাবা! তোমার সোনার দোত-কলম হোক, আহা, গরীবের প্রতি তোমার এত দয়া! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক।"

দাতা পুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আসিবার পথে কোন স্ত্রীলোককে দেখে এসেছ কি?"

"মেয়েমানুষ! না বাবা, কারুকে ত দেখলুম না, জনমনিষ্যির গন্ধটি পর্য্যন্ত কোথাও নেই বাবা, আমার কেমন পোড়া বরাত—তাই এই রাত দুপুরে জল আন্‌তে এসেছি বাবা, এমন ত আর কারুর হয় না বাবা, সবার ঘরেই বউ-ঝি আছে, দাসী আছে, আমার যেমন আগুন-লাগা বরাতে সব ম'রে-ত'রে উজোড় হয়ে গেল, তেমন ত আর রাজ্যের ভাল-খেকো ভাল-থাকীদের হয় না বাবা, আমার যেমন—"

আগন্তুক পুরুষ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া অধৈর্য্যের সহিত বাধা দিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "তাম্র-কলস কক্ষে শিশু সঙ্গে কোন নারীকে কি উদ্যানপথ দিয়ে ফিরতে দেখতে পাও নাই?"

"ও মা, তাই বলুন। সে দেখবো না কেন, দেওর সঙ্গে নিয়ে ও যে ভীমের বউ, বাড়ী ফিরছে দেখে এলুম।"

"ভীমের স্ত্রী! ভীম কৈবর্ত্তের স্ত্রী! না না, সে যে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী!"

এতক্ষণের পর সহসা এই অপরিচিত দাতার অপর্য্যাপ্ত করুণার গোপন রহস্য পূর্ব্বতন চৌরোদ্ধরণিকপত্নী, অধুনা বিধবা অবীরা রল্লার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। সে তখন মুখ টিপিয়া একটুখানি অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত উত্তর করিল, "হ'লে কি হয়, সে ভীম কৈবর্ত্তের বউ উজ্জলী।"

"তুমি নিশ্চিত জান, সে ভীমের স্ত্রী?"

"হ্যাঁ বাবা! তোমার শপথ, আমি আর ওকে চিনি নে? বাঘতটা গাঁয়ে ওর বাপের ঘরের পাশেই এক সময়ে আমরা থাকতাম।"

সেই পুরুষ তখন অন্যমনস্কভাবে মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে যেন কতকটা আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "অদ্ভুত! রাজান্তঃপুরেও যে এত রূপ নাই!"

প্রগল্‌ভা প্রৌঢ়া এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথাই বলেছেন বাবা, রাজবাড়ীতেও অমন রূপ নেই। তা হবে নাই বা কেন? ও-ও ত আর ছোট ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মায় নি, দস্যুতে ওর মা-বাপকে মেরে গেল, সেই দস্যুতেই না কি ওকে বাঘতটা গ্রামের ভভট কৈবর্ত্তের কাছে সাতট দ্রম্ম নিয়ে বিক্রী ক'রে যায়। ভীমের কপাল ভাল, তাই সে ওকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছে। তা শুধু কি রূপই? ওর শরীরে পাঁচটা হাতির বল আছে। ভীম পালোয়ানের বৌ হবার যুগ্যি বটে! তা হ'লে এখন আসি বাবা, ঘরে দুটো কচি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌমাটি রয়েছেন। ছেলেটা রাজার হুকুম পেয়ে তাঁর যশোধর্ম্মপুরের সৈন্যদলে কায করতে গেছে, ঘরে ত আর দুটি নেই।"

ক্ষুদ্র মৃৎ-কলস পূর্ণ করিয়া বর্ষীয়সী সোপানারোহণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, কতিপয় উল্কাধারী পাদমূলিক এবং রাজপাদোপজীবী যেন ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ কাহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকেই আগমন করিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া রল্লাকে দেখিতে পাইয়া সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "এই মাগী! এ দিকে কি মহারাজাধিরাজকে আসতে দেখেছিস্?"

রাজ-ভৃত্যবর্গের এরূপ অবমাননাজনক সম্বোধনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেও প্রকাশ্যে ভয়-সম্ভ্রমে জড়ীভূত-প্রায় হইয়া গিয়া অস্পষ্ট স্বরে রল্লা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল, "আজ্ঞে না, বাবামশাইরা সব, এ দিকে ত কৈ কোথায়ও—"

কিন্তু তাহার সবটুকু কথা বলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পশ্চাতে কাহার গুরু পদক্ষেপ শ্রুত হইল এবং তাহার সদ্যোপরিচিত সেই সুবর্ণদাতা পুরুষের কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ রাজ-ভৃত্যবর্গের জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপেই প্রত্যুত্তর করিল,—"শুভদাস, এই যে আমি।"

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া ভূতপূর্ব্ব চৌরোদ্ধরণিক-পত্নী তাহার পুত্রবধূ ইচ্ছাময়ীর নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিল যে, উদ্দোক কৈবর্ত্তের পুত্রবধূ উজ্জলা এই বার কোন্ দিন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে যদি না উঠিয়া বসে, তবে সে তাহার নাসিকা এবং কর্ণ স্বহস্তে ছেদন করিয়া আঁস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিবে।

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ পরদিন প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয় সহ অর্দ্ধ-পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই সুপ্রচারিত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৈবর্ত্তপাড়ায় উদ্দোক-দিব্বোক জালিকের গৃহস্থালীতে ভোর না হইতেই বিষম রকম একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কারণ, গৃহবাসী পুরুষগুলি প্রায় সকলেই ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে, উষার আলো অস্ফুট থাকিতে থাকিতে, আকাশের গ্রহ-তারা নিবিতে না নিবিতেই ছোট বড় বালক বৃদ্ধ মিলিয়া জাল-স্কন্ধে দলে দলে মৎস্য-শিকারে বাহির হইবে। আবার মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য্য মাথার উপর বসিয়া

যখন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার অগ্নিময় কশাঘাত করিতে থাকেন, মস্তকের কেশ হইতে পদগ্রন্থি অবধি যখন সেই কশাহত হইয়া রক্তস্রোতের মতই ঘর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন উদরের সমস্ত নাড়ীগুলার প্রচণ্ড ক্ষুধায় টান ধরিতে থাকে, তখনই তাহাদের বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িয়া যায়। তখন আবার শ্রান্ত-শরীরে ক্লান্ত-পদে দীর্ঘ পথ ফিরিয়া আসা! ইহার ভিতর কোন্ খালের ধারে, কোন্ বিলের মধ্যে, কোন্ নদীর বক্ষে এই ধীবর-পরিবারের বৃদ্ধ, যুবা এবং বালকের দলকে না দেখা যায়? ইহাদের ছোট ছোট জেলে-ডিঙ্গীগুলি মোচার খোলার মত নদীর স্রোতের বিপরীতে জাল টানিয়া লইয়া যায়। ধৃত মৎস্য আহরণে সমুৎসুক আরোহীর দল নদীবক্ষ মুখরিত ও সচকিত করিয়া তুলে। আবার মধ্যে মধ্যে কোন প্রকাণ্ডকায় রোহিত-কুলপ্রদীপের সন্দর্শন মিলিয়া গেলে তাহারই বিজয়ানন্দের উচ্চরোলে অপরাপর নৌকা-রোহী এবং স্নানার্থীর দলও চকিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখে এবং সমুৎসুক হইয়া তাহাদের সেই আনন্দ-গৌরব উপভোগও করিয়া লয়। "অত বড় মাছ নিয়ে কি করবে? কেটে বেচবে, না রাজ-বাড়ীতে আস্ত পাঠাবে?" এই জিজ্ঞাসার উত্তর তাহাদের বহুবার না দিয়া রক্ষা নাই। প্রৌঢ়ের দল এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় বিনীতভাবে "আজ্ঞে, রাজ-বাড়ীতেই এটা পাঠাব স্থির করেছি" এমনই ধারাই উত্তর দিত, কিন্তু উদ্দোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমের সাক্ষাতে এরূপ প্রশ্ন উঠিলেই সে সদম্ভে হয় ত জবাব দিয়া বসিত—"কেন, তাই বা রোজ রোজ দিতে চল্লুন ক্যান? রাজা ছাড়া কি ভাল মন্দ জিনিস্টা খাবার ক্ষমতাও কাউকে দেয় নি দেবতারা? এটাকে আজ ভাগা দিয়ে দিয়ে হাটের মধ্যে বেচতে পাঠাবো, যার যার খুশী হবে, সেই সেই কিনে কিনে খাক্ না।"

এই কথা শুনিয়া প্রবীণের দল ঈষৎ বিষণ্ণ হইত। "আহা, এত বড় জীবটেকে কেটে খণ্ড করবি, ভীমে! তার চেয়ে বরং রাজবাড়ীতে তাজা জিনিষটা দিয়ে এলে দামটাও নগদে হাতে আসবে, আর—"

যৌবন-বলদৃপ্ত ভীম তাহার কেশবহুল প্রকাণ্ড মাথাটাতে প্রবল বেগে একটা ঝাঁকানি দিয়া এই চিরন্তন যুক্তিকে তাহার মেঘগম্ভীর ও প্রতিজ্ঞা-স্থির দৃঢ়স্বরে তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিয়া বসিত, "না হোক্ নাই হোক্ গে নগদ পয়সা, তা ব'লে রোজ রোজই ভাল জিনিষটে যে ঐ এক জনকেই খেতে হয়, এমন ত কিছু কথা নেই, হাটে বেচে আমি তোদের নগদ পয়সাই এনে দেব, তাই হলেই হবে ত!"

ভীমের কথার যে নড়-চড় নাই, তাহা আজ আর নূতন করিয়া কেন, যে দিন হইতে এই শিশুটির তাহাদের ঘরে প্রথম বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাদের উত্তমরূপে জানা আছে; তাই তাহারা বিশেষ অনিচ্ছা থাকিলেও বড় সহজে তাহার কথায় বাদ-প্রতিবাদ করে না।

জালিকের দল বাড়ী ফিরিলে তাহাদের পরস্পর সংলগ্ন গৃহগুলি একসঙ্গে ব্যস্ততা ও কলরবের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভিজা জাল টাঙ্গানো, মৎস্য-সম্ভার হাটে পাঠানো, তাহার পর একটুখানি বিশ্রামান্তে ভিজা ছোলা ও গুড় দিয়া জলযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গোট কলাপাতে স্তূপীকৃতভাবে ঢালিয়া দেওয়া কখন আউস, কখন আমন ধান-কোটা আরক্তাভ অন্নরাশির ধ্বংস-সাধনে বসিয়া পড়া! এই সকল কার্য্য সমাধার পর কিছুক্ষণের জন্য গৃহস্থালী একটুখানি নিস্তব্ধ হইত, তবে দিব্বোকের বাড়ীতে না কি নিস্তব্ধতা জিনিষটার সহিত গৃহবাসীদিগের বিরোধ ছিল, তাই সে গৃহ দিবসোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া রাত্রি দেড় প্রহরাবধি সকল সময়েই প্রায় শিশু, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকল বয়সের নরনারীদিগের কর্কশ চীৎকারের কলহ-কোলাহলে ভরিয়া থাকিত। প্রথমতঃ উদ্দোক-পত্নী ও দিব্বোক-পত্নী এই জা-দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি আক্রমণের জন্য স্থানকাল কোন কিছুরই বাধা বাধিত করিতে পারে না। তাহার উপর উদ্দোকের শাশুড়ীঠাকুরাণীটির না কি কলহ-বিদ্যায় পারদর্শিত্ব ঐ অঞ্চলের মধ্যে একান্তই সুব্যক্ত, সেই ঠাকুরাণীটির নিজ গৃহখানিতে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় এবং অপর সেবাধিকারী বর্ত্তমান না থাকায় জামাতৃ-গৃহবাস-গৌরবে এ গৃহের কলহকাণ্ডের সুবর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলা যায়।

বাতব্যাধিতে অষ্টাবক্রাবস্থায় দড়ি-ছাওয়া খাটুলীতে বসিয়া বসিয়া তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে পৌরজনের ত্রুটি খুঁজিতে থাকেন, আর সুযোগ পাইবামাত্র সেই অনুসন্ধানফল-গুলিতে (প্রায় সমান সমান, কখন বা কিছু মাত্রাধিক্য

ঘটিয়া যায়) বর্ণসমাবেশ পূর্ব্বক সেগুলি তাঁহার শান্তপ্রকৃতিশালিনী কন্যারত্নের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত করেন। ফলে বাড়ীর মধ্যে সদাসর্ব্বদাই প্রায় রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়া থাকে।

সে দিন গৃহস্বামীদিগের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল। বিলের জলে দিব্বোকের কনিষ্ঠ জামাতাকে জোঁকে ধরে, তাহা ছাড়াইতে খানিকটা সময় লাগে। সচিব-পুত্র বোধিদেবের বিবাহ-ভোজের জন্য সে দিন প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাহরণের প্রয়োজনীয়তার জন্য একেই প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রি হইতে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা ব্যতীত মাথার উপর প্রায় আড়াই প্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপ ও নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ জ্বালা! গৃহাভিমুখীন জালিকরা সে দিন গৃহ-পথের দৈর্ঘ্যে যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই ঘন-ঘন অদূরস্থ ঘনায়মান নারিকেল-কুঞ্জের মাথার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীবর-পল্লীর দূরত্ব পরিমাপ করিতে করিতে চলিতেছিল, উহার পাশেই যে তাহাদের গম্যস্থান। —রাস্তায় তাহাদেরই মত কর্ম্মব্যস্ত অল্প-স্বল্প লোকজন গমনাগমন করিতেছিল, দুই ধারে বিপণি-শ্রেণীতে কেনা-বেচা ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, প্রাসাদ-ভবনে গৃহবাসিগণ দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখভোগে নিরত।

পথের প্রান্তে কুকুরগুলাও কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। জালিকের দল ধীবর-পল্লীর মধ্যে পা দিয়াই একটা ঘোরতর কোন্দলের সাড়া পাইল। শব্দটা যে উদ্দোক জেলের কুটীরের দিক্ হইতেই আসিতেছিল এবং ঐ কাংস্যকণ্ঠও যে ভীম-জননীর, তাহা অনুমান করিতে কাহারও অণুমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। আজ এই ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াই এমন অসময়ে কোন্দলের কচকচি শুনিয়া সকলকারই মন একটু দমিয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ বয়স্ক দুই জন ইহাতে বিশেষ বিপন্নই বোধ করিল। উদ্দোক নিজের কপালে একটা ঘা মারিয়া কহিয়া উঠিল, "ওকেও যমে নেবে না, আমারও মরণ লেখেনি দেবতায়! এই তেতে-পুড়ে তেষ্টায় টাটা করছে পরাণটা, এক্ষুনি আর ও বাজখেঁয়ে চীৎকার সয় কখনও!"

দিব্বোক জেলে গম্ভীর হইয়া জবাব করিল, "মাগী দুটোর গলা চিরে রক্ত ছোটে না যে কেমন ক'রে, আমি ব'সে ব'সে সেই কথাটারই বিচার করি! তা উহু, তোর আর ভাবনা কিসের, ভীমের বউবেটীটা তবু যা হোক্ একটা মানুষের মেয়ে আছে; ভাত-জলটা সেই ত এখন দেয় তোকে, বরাতে দুঃখু লেখা আছে এই আমারই! আবাগীর পেটের বেটী দুটোও ঐ আবাগীদের মতনই না কোঁদল করতে আছে। তেলরত্তি ছ্যায়, কি জলঘট্টে ছ্যায়, তারই যুগ্যতা নেই মোটে কারুর।"

নবম পরিচ্ছেদ

বাড়ী পৌঁছিয়া সে দিন দেখা গেল, ব্যাপার কিছু গুরুতর! গত রাত্রিতে দিদিশাশুড়ীর 'লাগানীর' দায়ে শাশুড়ীর হাতের ঠোনা খাইয়া উজ্জ্বলা আজ সকাল হইতেই বাঁকিয়া আছে, কিছুতেই সে আজ তাঁহার বাতে বাঁকা গায়ে-পায়ে তেল ডলিতে যায় নাই; বিশু ও-বাড়ীর ধনার ছোট ছেলেকে ইট ছুড়িয়াছিল বলিয়া তাহাকে দিয়া উহাদের কাছে সে মাপিয়া সাত হাত নাক-খত দেওয়াইয়াছে, ধান কুটিয়া প্রত্যহ প্রতিদিনের খরচের জন্য চাউল করার বেশীর ভাগ খাটুনী তাহার বিবাহের পর হইতে সে-ই খাটে; আজ কিছুতেই ঢেঁকি-ঘরে সে পা মাড়াইল না। শাশুড়ী রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমন বউকে ঢেঁকিতে ফেলে কুটে ফেলাই উচিত! উজ্জ্বলারও ত মুখখানি বড় কম নয়, সে-ও তৎক্ষণাৎ শাশুড়ীর মুখের উপর ফেরতা জবাব দেয়—"ঢেঁকিতে ফেলে আমায় কুটলে গুষ্টীশুদ্ধর কুঁড়ো পাথরটা ভরাবে কে গো? ধানের গাদা ভানাটি ত আর রোজ সোজা কথাটি নয়! তোমার আদুরে মেজুনী, সেজুনী, ছুটকী ওঁদের দিয়ে কি সে কাযটি এক বেলার তরে হবে?"

শাশুড়ী বলেন, "হয় কি না হয়, তুই পোড়ারমুখী ব'সে থেকে একটা বেলা দেখ ত দেখি, কেমন বা না হয়! মুখের উপর আবার চোপা শোন না? কেন, তুই যখন এ বাড়ীতে আসিস্ নি, তখন কি আমার স্বোয়ামী-পুত্তুররা সব উপোসীই থাক্‌তো না কি লা? শতেকখোয়ারীর ঝি! তোর দিব্যি রইলো, যদি তুই আজ কিচ্ছুটিতে আমার হাত ঠেকাবি!"

তাহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, বাড়ীশুদ্ধ মিলিয়া এতক্ষণে ধান ভানিয়া সেই ধান-ভানা চাউলের ভাত সবেমাত্র

উনানের উপর চড়ানো হইয়াছে, তাহার উপর আখায় দিবার কাঠ ফাড়া নাই এবং সেই মোটা কাঠের গুঁড়ি ফাড়িবার মত শক্তিও ইহাদের অপেক্ষা ঐ উজ্জ্বলারই বেশী। বিপন্ন হইয়া এখন উহাকে দু'খানা কাঠ চিরিয়া দিতে বলায় সে কথা যেন তাহার কানেই ঢুকে নাই—এমনই করিয়াই সে নীরব রহিল।

তাহার পর সকলকার কাঠ লইয়া ধস্তাধস্তি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সেখান হইতে উজ্জ্বলা গমনোদ্যতা হইল। ইহা দেখিয়া তাহার সেজ ও ছোট 'জা' মিনতি করিয়া কহিল, "দিদভাই, দুখান চেলিয়ে দিয়ে যা না ভাই, তোর পায়ে ধরি।"

উজ্জ্বলা কোন উত্তর করিল না। মেজবৌ নথ নাড়া দিয়া একটু তিক্তকণ্ঠে কহিল, "দিলে কি তোমার মান যাবে গা? স্বোয়ামী-শ্বশুর এসে খেতে পাবে না—সেটা কি খুব আহ্লাদের কথা হবে?"

উজ্জ্বলা এবার গর্ব্বিত তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর করিল, "তা না পায় না পাবে, আমার কি ব'য়ে গেল?"

এই বলিয়া সে দৃঢ় গম্ভীর পদক্ষেপে রান্নামহলের পিছন দিকে পগারের ধারে গিয়া ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও নিতান্ত শান্তভাবে বসিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া গৃহস্থবর্গের দুরবস্থার সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। মুখে গাম্ভীর্য্য থাকিলে কি হয়, মনের মধ্যে তাহার যথেষ্ট তৃপ্তির আনন্দ উঁকি দিয়া উঠিতেছিল।

এ দিকে কোন রকমে আধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ি দুই জনে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া ডাল চড়াইতে না চড়াইতেই পুরুষের দল আসিয়া বাড়ী পৌঁছিল এবং তাহাদের আসার সাড়া পাইবামাত্রই রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তি ধরিয়া ভীম-জননী সনকা গলা ফাড়িয়া বধূর উদ্দেশ্যে গালির ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া দিল।

"দূর ক'রে দে, দূর ক'রে দে; মুড়ো খ্যাংরা মার্‌তে মার্‌তে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে শতেকখোয়ারীকে দূর ক'রে দে—জ্যান্ত মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে আয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

উদ্দোক অঙ্গনে পা দিয়াই বিরক্তি-বিপন্ন কণ্ঠে উজ্জ্বলার উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিল,—"পাগলা বেটী! এক ঘটা জল নে' আয় ত, বাবা! তেষ্টায় গলা বুক কাঠ হয়ে গেছে। সব্বশরীরে টাঁক ধ'রে যাচ্ছে?"

সনকা বধূর প্রতি স্বামীর এই 'আধিক্যেতার' আদরে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াই থাকে, আজ আবার এ সময়ে তাহারই প্রতি এই অযোগ্য আদর দেখিয়া তাহার পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিল; কোপে কপিশবর্ণ ধারণ করিয়া কর্কশ চীৎকারে সে চেঁচাইয়া উঠিল—"দেবে, তোমার আদুরে বৌ তোমার ছেরাদ্দর পিণ্ডি চট্‌কে দেবে। বড় যে বলা হয়, আমি রাঁড়ীই যত না মন্দ, বেটার বৌ তোমার বড়ই না কি গুণবতী! এখন নিজের চোখ দুটোর যদি মাথাটা না একেবারে খেয়ে ফেলে থাক, তা হ'লে সে দুটোকে মেলে ধ'রে একবারটি নিজের চোখেই দেখে যাও দেখিন, তোমার বিদ্যেধরী পুতের বউ-ঠাক্‌রুণ এর ভেতর কোন্‌খানটায় আছেন! এত বড় দস্ত মেয়েমান্‌ষের—সকাল থেকে আজ একখানি কুটি ভেঙ্গে দুখানি করাতে পারলুম না, উনি কি না রাজার রাণী, আসনপীড়ি হয়ে ব'সে আছেন, আর আমি এই বুড়োবয়সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে খেটে মরতে লেগেছি। কেন, আমার কি একার সংসার? আর কি কেউ খাবে না, আর কি কেউ নিজে গব্‌গবিয়ে গিল্‌বে না যে, আমায় একাই সব ভার বইতে হবে?"

সহসা সেই সময়ে বিরক্তিপরুষ একান্ত গাম্ভীর্য্যময় ভীমের মুখের উপর চোখের দৃষ্টি পড়িতেই ভীম-জননীর কণ্ঠ হইতে আবার বর্ষাকাশের মেঘ গুরু গুরু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল;—"বলি ওরে ও হতভাগীর পুত! বলি, কটা চামড়াখানা কি এতই মিষ্টি যে, তার লেগে ওই দস্যি দামাল মেয়েমান্‌ষের পায়ের তলার ছুঁচো হয়ে প'ড়ে থাকতে হবে? এই তোকে ব'লে রাখলুম, ভীমে, যদি তিন দিনের ভেতর ওটাকে লাথি মেরে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে তুই আমায় আর একটা বউ এনে না দিবি ত তোর উপরে তোর বাপের দিব্যি রইলো।"

ভীমের জলদগম্ভীর মুখে এই কঠোর মাতৃ-আদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে একবারের জন্য একটা ব্যথার বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিল; পরক্ষণেই সরোষ লজ্জায় সেটা ঢাকা পড়িয়া গেল। সে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সবেগে বোধ করি মায়ের আদেশপালনেরই প্রতিজ্ঞা যেন তৎক্ষণাৎই করিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই উদ্যত কঠিন

প্রতিজ্ঞার কঠোর বাক্যপ্রবাহ তাহার ক্রোধস্ফুরিত ওষ্ঠাধরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। একান্ত বিস্ময়াশ্চর্য্যের সহিত সে শুনিতে পাইল, তাহার মায়ের কাছে চির-সহিষ্ণু বুড়া বাপ আজ সম্পূর্ণরূপেই তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—"খবরদার ভীমে! পাগলীর গায়ে হাত তুল্‌বি কি, আমি তক্ষুনি তার হাত ধ'রে বাড়ীর বা'র হবো! বুঝে কায করিস্ ব্যাটা, বুড়ো বয়েসে বাপকে তোর থানছাড়া করিস্ নে যেন।"

এই অলঙ্ঘ্য আদেশে রুদ্রপ্রকৃতি ভীম ঝঞ্ঝা-তাড়িত নদীস্রোতের মত চঞ্চল-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

"তা' হ'লে বউ নিয়ে আর বউ-সোহাগী বাপ নিয়েই তুই রৈলি ভীমে, পরব জেলের ঝি কারু পায়ে তেল দিয়ে তার আটচালাতে বাস করে না। এই রৈলো তোদের ঘর-কন্না, বুজে সমজে নিয়ে নিস সব, আমার বুড়ো মায়ের হাত ধ'রে গাছতলায় ব'সে ভিখ্ মেগে খাব, তবু তোর পিঙ্গীনাচন বউএর পা ধোয়ানো পারবো না?"—ক্রোধে কাঁপিয়া ফুলিয়া রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি সনকা স্বামি-পুত্রের উপর একটা অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী, যষ্টি-হস্তে কোনমতে দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে হাঁকিয়া উঠিল—"আয় লো মাই আয়, আমরা মায়ে-বেটীতে এ পোড়া বাড়ীর বা'র হয়ে যাই আয়। কিন্তু তুইও ভাল ক'রেই এই কথাটা আজ থেকে জেনে রাখিস্ ভীমে! ঐ বউ হ'তেই তোর যদি সর্ব্বনাশ না ঘটে, তবে আমি তোর মা নই। তুই কি ভেবেছিস্, ও চিরকাল ধ'রেই তোর ঘরেই ঘর করবে? তুই কি মনে ভাবিস, তোর প্রতি তার অন্তরের কোণেও একরত্তা একটু টান আছে? ও ভদ্দরলোক-ঘেঁষা কটা-চামড়ার ছুঁড়ী, ও হ'তে যদি না এই সদ্দার-বংশের নাম ডোবে, তা হ'লে আমায় তোরা—"

"থেমে থাকো, ফের যদি একটা কথা কবে, তা হ'লে ঐ জিভখানাকে সাত হাত ক'রে টেনে বা'র ক'রে আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব। শাউড়ী ব'লে মনের কোণেও তোমায় ক্ষ্যামা দেব না।"

ধীবর-পল্লীর দ্বিশতাধিক ব্যক্তি আজিকার এই রঙ্গভূমে সমবেত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ক্ষুৎপীড়িত শিশুর দল, ক্রীড়া-চঞ্চল বালক-বালিকাবৃন্দ, শ্রমকাতর বৃদ্ধসকল এবং কার্য্যপরায়ণা গৃহিণী, কন্যা ও বধূগণ সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া কেহ ভীত, কেহ বিস্মিত এবং কেহ বা পুলকিতচিত্তে এই কোন্দলের রসোপভোগ করিয়া লইতেছিল। উজ্জ্বলার দৃপ্তস্বভাব ও দীপ্তমূর্ত্তি এ সংসারের নারীদিগের মধ্যে—বিশেষ করিয়া আবার কম-বয়সীদের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুঃশূল; পথে, পল্লীতে, ঘাটে ও বাটে যে কেহ তাহাকে দেখে, সেই সবাইকে তুচ্ছ করিয়া তাহার রূপের প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠে। ভদ্রঘরের মেয়েরা তাহারই সহিত সাধিয়া কথা কয়। আবার নিজের ঘরের পুরুষরাও কি না তাহারই গৌরবে আত্মহারা! তাহার উপর, খাটিতে পারে সে অসুরের মত। তাহার নিজের শাশুড়ী ছাড়া অপর সমুদয় শাশুড়ীই নিজ নিজ বধূকে উঠিতে বসিতে তাহারই কর্ম্মশক্তির উপমা দিয়া লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন, বুড়া-বুড়ীদেরও সে যেন চোখের মণি, কাহারও জাল মেরামত করিয়া দিতে, কাহারও বা মাথার পাকা চুল তুলিতে, উকুন বাছিতে, কাঁথা সিয়াইতে—সকল কাযেই উজ্জ্বলী বউ আগে-ভাগে ছুটিয়া যাইবে। আবার ছোট ছেলেরাও কি না ঐ হতচ্ছাড়ীর তেমনই বশ! মার খায়, তবু সঙ্গ ছাড়ে না। কাহার গুলী-ডাণ্ডা তৈয়ারী করিতে হইবে, কাহার ভাঁটা গড়াইয়া দিতে হইবে, কাহার একটা ছাকুনি-জালের দরকার, সবাই ঘুর্‌বে ঐ উজ্জ্বলী বউয়ের পাছে পাছে। আর এ সব ছাড়া সব চেয়ে বেশীর ভাগ বিরাগ সকলেরই এই জন্য যে, অন্য জেলের ছেলেদের প্রায় সকলেরই ঘরে দুই বা ততোধিক করিয়া বিবাহিতা এবং তাহারও উপর আবার কাহারও কাহারও এক আধখানা উপসর্গ না কি আছে বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু কোন-কিছুই নাই না কি কেবল একমাত্র ঐ উজ্জ্বলী-বউয়ের বর ভীমের, এটা বড়ই অসঙ্গত ও যুবতীবৃন্দের পক্ষে একেবারেই অসহনীয়! তাই উপযুক্ত সন্তানের প্রতি যখন তাহার জীবিত ও সশরীরে সে স্থানে বর্ত্তমান পিতার দিব্য দিয়া স্ত্রীকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া বাহির করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্নেহময়ী জননী আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন, তখন অনেকগুলি নারীর ঠোঁটের পাশে হাসির বিজলী যে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল, তাহা বড়ই সুপ্রত্যক্ষ। উজ্জ্বলার দুই জা পিঙ্গলা ও সুখ্যি এই প্রস্তাব শুনিয়া পরস্পরে চোখ ঠারিল, দুই জনে দুই জনের কানের কাছে

ফিস-ফিস করিয়া বলিল—"তাই ব'লে অত বা'ড় ভাল নয়, ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।"

তাহার পর যখন কোথাও কিছু নাই, অমনই খামোকা গায়ে-পড়া হইয়া উদ্দোক বুড়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া ফণা তুলিল, তখন অনেকগুলা বুকের মধ্যেই উদ্যত আশার স্রোত ধাক্কা খাইয়া ছ্যাঁৎ করিয়া থমকিয়া পড়িল। কোন কোন নিরাশাহতা মহিলা ঐ অযাচিত করুণাপরায়ণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকটির উদ্দেশ্যে চোখের মধ্যে বিষ-বাণ হানিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল, "মরণ আর কি ডাকরা মিন্‌ষের!"

এমন সময় সেই দ্বিশতাধিক কৈবর্ত্ত-পরিবার যেন আকস্মিক বজ্রপাতরবে একসঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল। আজিকার এই রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী কোথায় অদৃশ্য থাকিয়া এতক্ষণের পর অতিশয় অতর্কিতেই আবির্ভূতা হইলেন। সকলেই যেন মনে মনে ইঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তবে নিতান্ত দুই এক জন হিতৈষী ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

উজ্জ্বলার এই আকস্মিক প্রবেশ ও স্বামীর ঐ প্রকার ভীষণ মন্তব্যে ক্ষণকাল অভিভূতাবৎ থাকিয়া অবশেষে বর্দ্ধিতরোষা ভীমজননী একবার স্বামিপুত্রের স্তব্ধমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর গগনবিদারী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওরে, এত কালের জেলে মরদগুলো ম'রে গেছে রে! ওরে আমার স্বোয়ামী-পুত্তুর বেঁচে থাক্‌লে আমার কখন বউএর হাতে মরণ ঘটে রে—"

একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, তাহার উপর এত বড় হাঙ্গামায় আজ ভীম মায়ের প্রতি একটু বিশেষভাবেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রের তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকায় ক্রোধের অধিকাংশই বধূর প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; এখন উজ্জ্বলাকে ঐ অতগুলি মান্যগণ্য পুরুষের সাক্ষাতে নির্লজ্জভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার মায়ের প্রতি অবমাননাজনক বাক্য প্রয়োগ ও আক্রমণোদ্যত ব্যবহারে তাহার বিরক্তিটা ক্রোধের আকার ধারণ করিল। উজ্জ্বলার সেই দৃপ্ত মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি হানিয়া সে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—"তোর কি মরণ হয় না, হতভাগী!"

উজ্জ্বলা স্বামীর মুখ হইতে এই তীব্র তিরস্কার লাভ করিয়া চঞ্চল তড়িৎমূর্ত্তির মতই সবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখে তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনমাত্র ঢাকা ছিল, তাহাতে তাহার বিদ্যুতে ভরা বিশাল নেত্র ঢাকা পড়ে নাই, সেই বড় বড় কালো চোখে তীব্র রোষের আলো জ্বালিয়া সে অকুণ্ঠিত মুখে স্বামীর ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তর করিল, "কেন, তা হ'লে মায়ের পছন্দসই আর একটা এনে দেবে? তা আমি মরি বা না মরি, তাতেই বা তোমাদের কি আটক হচ্ছে? কেন দশটা আর অমনিতেই এনে দাও না—বারণ করবে কে তোমায়? দিলেই ত হয়।"

ভীম তাহার বজ্রহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—"থাম শীগ্‌গির, ফের চোপা করছিস?"

উজ্জ্বলা নির্ভয়ে দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"কেন, মারবে না কি? তা মার না এসে, মায়ে যা কয়েছে, তাই করবে এস—বউটা মেরে দূর ক'রে দাওসে—"

"তোর মরণ ঘুনিয়ে এসেছে দেখছি"—বলিয়া ভীম সবেগে অগ্রসর হইয়া যাইতেই ভীমের জ্যেষ্ঠতাত দিব্বোক আসিয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইল;—

"ভেমা! ঘরের লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলিসনে, বাবা! আর যা করিস্ তা করিস্।" উজ্জ্বলার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোটলোকের মেয়ের মতন খাওয়া-খাওয়ি করা কি ভাল? যা', শাশুড়ীর পায়ে ধ'রে মাপ চা গে, নে, আয়।"

উজ্জ্বলা বিদ্যুতের মত ছিট্‌কাইয়া পিছনদিকে সরিয়া গেল, স্বামীর দিকে একটা তীব্র রোষদৃষ্টি হানিয়া লইয়া সে ক্রোধগম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—"আমার ব'য়ে গেছে পায়ে ধর্ত্তে, আমি আর এদের বাড়ী থাক্‌বো কি না।"

বলিয়া সে খর-চরণে খিড়কীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া তাহার কালিন্দী-সদৃশী শাশুড়ী দাঁতে-দাঁতে কিড়মিড় করিয়া কহিল—"যাবি কোন্ চুলোয় লো চুলোমুখী! কোন্ কুলে কে আছে যে সেইখানে যাবি? তবে যদি—"

শাশুড়ীর এই সুমন্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ দাঁতে-দাঁতে চাপিয়া পিছন ফিরিয়া উজ্জ্বলা ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, "চুপ!" তাহার পর পিছন ফিরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উদ্দোক তাহার দাদার দিকে ব্যাকুল চক্ষুতে চাহিল,

তাহার পর ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে নির্ব্বিকার দেখিয়া কাতর হইয়া কহিতে লাগিল—"কোথায় গেল দেখ্ দিকি রে—"

ভীম গুম্ হইয়া উত্তর করিল, "যাক্ গে, মরুক্ গে!" বলিয়া সেও দুম্‌দুম্ শব্দে তাহার বলিষ্ঠ পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীমের মা তখন নির্ভয় তেজের সহিত কটুক্তির বহু ভাষা বধূর উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে করিতে মন্তব্য করিলেন—"এখনই আবার আস্‌বে না ত যাবে কোথায়? তবে যদি—হুঁঃ তবে যদি—"

প্রবীণ দুই জনেই দুই হাতে দুই কান ঢাকা দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিয়া উঠিল—"আরে ছ্যা! মাগীর মুখে পোকা না পড়ে।"

দশম পরিচ্ছেদ

নগরীর বাহিরে ইহার উত্তরপূর্ব্ব ভাগে জনশূন্য নীরব প্রান্তর; বহু বহু—দূরে তাহার দিক্‌চক্রবালরেখা যেন নীল গিরিশ্রেণীর মতই অচল ও কঠিন হইয়া অনিমেষে চিরকাল চাহিয়া আছে। প্রান্তর-পথ তৃণহীন, গৈরিকবর্ণ তপ্ত বালুকা-মরুর মত দেখাইতেছে, তাহার আশে-পাশে কোথাও দুই একটা ক্ষুদ্রতম হরিদ্‌পুষ্পখচিত কাঁটাভরা আরণ্যগুল্ম; চলনপথের কোনখানে এতটুকু একটু ছায়া নাই, অনেক দূরে দূরে কচিৎ কোথাও এক একটা শাল, তাল প্রভৃতি যেন সেই বনপথের প্রহরিস্বরূপে একা-একা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উন্নত শিরের সমুচ্চ উষ্ণীষ রৌদ্রতপ্ত বায়ুর বেগে অতি সামান্যমাত্রই আনত হইতেছিল। পদতলে তাহাদেরই রৌদ্রবর্ণ দীর্ঘচ্ছায়া।

মধ্যাহ্নের সেই জ্বলন্ত সূর্য্য বিশ্বের অঙ্গ নিজের অগ্নিময় কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া শেষে নিজেও যেন সেই পরিতাপে অবসন্নশরীরে অবসানের পথে ঢলিয়া পড়িলেন। সেই দারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া জ্বরতপ্ত দগ্ধদেহে পাগলের মত জলারণ্য ও নির্জ্জন পথে পথে ভীম সারাদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ঐ ক্ষিপ্তমূর্ত্তি দেখিয়া পরিচিতগণ সবিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। অপরিচিতগণ তাহার দশা দেখিয়া 'আহা, কাদের বাছা রে! ক্ষেপে গেছে!' বলিয়া সহানুভূতি জানাইতেছিল। ভীম কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করিল না, সারাদিনের উপবাসে, উদ্বেগে ও পরিশ্রমে তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় ফাটিতেছিল, নদীর তীরে তীরে বালুকারাশির উপর দিয়া ছোট দুটি পদচিহ্নকে সে প্রাণপণে অনুবর্ত্তন করিতেছিল, পাছে সে রেখাটি হারাইয়া ফেলে, তাই নদীনীর নিতান্ত সমীপবর্ত্তী হইলেও এক বিন্দু জলও সে স্পর্শ করিল না। সারা অপরাহ্ন এমনই করিয়া একটা পথিভ্রান্ত দৈত্যের মতই সে সারা নদীকূল ও পরিশেষে নগরীসীমার পরপারে এই নির্জ্জন প্রান্তর-পথকে তন্ন তন্ন করিয়াছে, কোথাও তাহার হারানো বস্তু সে খুঁজিয়া পায় নাই।

উজ্জ্বলা যখন দুর্জ্জয় রোষভরে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, তখন ক্রোধাতিশয্যে ভীমের মনে তাহার জন্য এতটুকুও দুশ্চিন্তার উদয় হয় নাই। শাশুড়ী-বউয়ে ইহাদের প্রায়ই কলহ হয়, এবং অনেক দিন উজ্জ্বলাও রাগ করিয়া বলে যে, সে এ বাড়ীতে আর থাকিবে না এবং একটুখানি পড়সী-বাড়ী বা আদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার পর বিশু প্রভৃতিরা ডাকিতে গেলেই ভালমানুষটির মত চলিয়া আসিয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম আপনার হাতে-মাথায় তুলিয়া ত লইয়াই থাকে, উপরন্তু সে দিন তাহার কাজের ঝোঁক যেন আরও বাড়িয়া উঠে। কোথায় কি জঞ্জাল জমা হইয়া আছে, কোন্ কাপড়গুলা ক্ষারে চড়াইতে হইবে, ছেলেগুলার মাটীমাখা গায়ে খইল মাখাইয়া ধোয়াইয়া দেওয়া, এমন কি, দিদি-শাশুড়ীর বাতের ব্যথায় সেক-মালিসের সময়টাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া হয় ত বা তাঁহার মুখ হইতে একটা ভাল কথা আদায় করা-রূপ আশ্চর্য্য ঘটনাও কখন কখন ঘটাইয়াছে। এই সব দেখিয়া ভীম বরং কত দিন কৌতুক করিয়া তাহার কানের পাশাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিয়াছে,—"যদি সেই গুষ্টীশুদ্দুর খোসামোদ ক'রেই মরবি, তবে দশ হাত বুক ক'রে সবার সাতে যুঝতে যেয়ে মরিস্ কেন?"

উত্তরে উজ্জ্বলাও হয় ত ভীমের ঘনায়মান গোঁফের প্রান্তটা টানিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিয়া উঠিত—"খুব করি।" না হয় বলিত—"ওরা আমায় ঘাঁটায় কেন? সবাইকার জন্যে আমি রাত্তির দিন সাতটা গতর বা'র ক'রে খেটেও মরবো, আবার ওদের সব্বাইকার ঝ্যাঁটা-লাথিও খাবো, অত আমি পারিনে!"

ভীম কত দিন উজ্জ্বলার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার সেই ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে আদরের গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিয়াছে—"পারিস্ তুই সেই সবই—কেবল একবার শরৎ-কালের মেঘের মতন গর্জ্জে ওঠা তোর রোগ! আচ্ছা, আচ্ছা, যা করেছিস্, বেশ করেছিস্; শুধু আমার এই কথা, পেটে ধরেছিল, যাই হোক মা ত বটে, মন্দ হ'লেই বা করছি কি? একটু সামাল দিস্, বে-ধড়োক কিছু ব'লে বসিস্নি টসিসনে যেন ফস্ ক'রে।"

আজও ভীমের বিশ্বাস ছিল, এই রকমটাই ঘটিবে। বিশেষতঃ আজিকার এই বিবাদফলে বাড়ীশুদ্ধ সকলের অনাহার ঘটায় এবং নিজেকেও তাহার ফলভোগ করিতে হওয়ায় তাহার মনে উজ্জ্বলার প্রতি বিরক্তিটা কিছু অধিকতরই হইয়াছিল। সে বেশ জানে যে, এই কাযটার ভার সে না রাখিলে এই রকমই বিপ্লব ঘটে; অথচ জানিয়া শুনিয়া তাহার বুড়া বাপ হইতে শিশু ভাইটার পর্য্যন্ত উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিজে অনায়াসেই নির্লিপ্ত হইয়া রহিল। না, উজ্জ্বলার স্পর্দ্ধা সত্য সত্যই কিছু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ভীম ঘরে ঢুকিয়া দরজার হুড়কা টানিয়া দিল। ঘরের মধ্যে একখানা তালপাতার চেটাই বিছানো, তাহারই এক প্রান্তে লম্বা একটা বালিস ও দুখানা মোটা মোটা কাঁথা জড় করা আছে, বালিসটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া সে মনে মনে দৃঢ় করিয়া কহিল, "ওকে জব্দ করা দরকার হয়েছে।"

তাহার পর কয়েক দণ্ড ধরিয়াই স্ত্রীকে জব্দ করিবার নানারকম উপায় সে আবিষ্কারচেষ্টা করিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার মনঃপূত থাকিতে পারিল না। সর্ব্বপ্রথম সে স্থির করিল, উজ্জ্বলা বাড়ী ফিরিলে আজ সে তাহাকে ঘা কতক বসাইয়া দিবে; এই কথা মনে করিতে গিয়াই সে জিভ কাটিল। সেই রাজোদ্যানের মর্ম্মরমূর্ত্তির মতই শুভ্র ও সুকুমার দেহে আঘাত! মনে হইতেই নিজের লজ্জায় সে নিজেই নতমুখ হইল।

তাহার পর ভাবিল, 'না, ও-সব নয়; তবে বড় তার দেমাক হয়েছে। বুঝেছে যে, ওর ঐ রূপের পায়ে আমি বিকিয়ে গেছি, লোকে যা বলে, তা বড় মিথ্যেও ত নয়, হয় ত আমি তাই গেছিও। তা এইবার সেই গুমোরটাই তার ভাঙ্গতে হবে। আর একটা বিয়ে ক'রে দেখি, তা হ'লেই সত্যিকারের জব্দ হবে!' এই উপায়টার আবিষ্কারে ভীম মনে মনে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, 'এই ভাল; মা'ও খুসী হবে, বউও ঠাণ্ডা হ'তে পথ পাবে না, আর আমারও তা মন্দ কি? মনসাদেবীকে ত মাসের মধ্যে সাতাশ দিনই মান ভাঙ্গাতে প্রাণ যায়, দু'জন থাকলেই তখন মানের বদলে কচু আসবে! বাঃ, যাকে বলে এক ঢিলে দুটো পাখী মারা! সেই ভাল, এই আমি করবো—যাই মা'কে ক'নে ঠিক করতে ব'লে আসি।'

এই ভাবিয়া উঠিতে গিয়া ভীমের দৃষ্টি তাহার সম্মুখের গৃহভিত্তির উপরে পতিত হইল। ঐ দেওয়ালটির গায়ে আলিপনা দ্বারা একটি পদ্ম-সরোবর চিত্রিত হইয়াছিল; সরোবরে দুইটি মরাল ভাসিতেছে, সপত্র, সনাল, বিকসিত ও মুদিত কমলের শ্রেণী।

চিত্রটির অঙ্কন-সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গিয়া ভীমের চিত্ত হইতে সহসাই নব-পরিণয়ের উদ্দাম আগ্রহ অপসৃত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চিত্রার্পিতবৎ চাহিয়া থাকিয়া সে একটা মৃদু শ্বাস মোচন করিল ও আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "কোন্ কাযটায় তার আট্‌কায়! রূপেও যেমন, গুণেও তার জোড়া মেলা ভার! মন্দ আমার বাড়ীর লোকগুলোই, তাই তাকেও তারা ক্ষেপিয়ে তোলে! নাঃ, কাকে কোথা থেকে এনে ওর পাশে বসাব? কৈবর্ত্ত-পাড়ায় ওর পা ধোয়াবার মতনও কি কেউ আছে? আরে ছ্যাঃ, আমার কি ওর বদলে একটা কোন্ পেত্নীকে এনে পাশে বসাতে-শোয়াতে ঘেন্না করবে না? নাঃ, বিয়ে-টিয়ে আমি করছি নে। যাই, দেখি গিয়ে বউটা কি করছে।"

ভীমকে বাহির হইতে দেখিয়া তাহার ছোট বোন্ সল্লা আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ধর্ম্মঠের মেয়ে স্বণলার সহিত ভীমের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। তিন দিনের দিন গোধূলিসময়ে তাহাদের বিবাহ হইবে।

সংবাদ শুনিয়া মুখ খিঁচাইয়া ভীম উত্তর দিল, "তবে আর কি! আমি রাজা হয়ে গেছি!"

সল্লা এইটুকুতেই দমিবার পাত্রী নহে, সে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "রাজা না হও, আমাদের রাণীবৌয়ের এইবার ত দফা শেষ হ'ল ! যেমন কর্ম্ম, তার তেমনই ফল !"

একটি ক্ষুদ্র বালিকার এই একান্ত অনাবশ্যক ঈর্ষ্যা-সংযুক্ত অবজ্ঞা প্রকাশে ভীমের মুখ ক্রোধ-পরুষ হইয়া উঠিল, সে সক্ষোভ বিরক্তির সহিত "হোগ্ গে, তোর তাতে কি !" বলিয়া অগ্রসর হইল।

সনকা তখন রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মধ্যমা বধুর উপর শ্বশ্রূত্ব প্রকাশ করিতেছিল, ছেলের গলার সাড়া পাইয়া "অ ভীম ! আয়, ভাত খেয়ে যা রে", বলিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান জানাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পোড়া কাঠের মত নীরস মুখে অনেকখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সব ঠিক ক'রে এলাম, মুগলী মেয়ে খুব ঠাণ্ডা, মেরে যদি তাহাকে কুটেও ফেল, তবু সে একটু রা' কাড়তে জানে না, আপদটা যখন নিজে হ'তেই বিদেয় হলো, তখন এক রকম সে ভালুই হলো বল্‌তে হয়।"

ভীম অসহিষ্ণু চোখে চারিদিকে চাহিতেছিল, মায়ের ঐ কথাটা শুনিয়াই সে এক লম্ফে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর সেই শরতের রৌদ্রদীপ্ত তপ্ত-পথে তাহার বাকি দিনটাই কাটিয়া গেল। কোথাও সে উজ্জ্বলার চিহ্ন পাইল না। অবশেষে ভীমেরই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, বন্ধু সুস্মল তাহাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিল,—"ব্যাপার কি ভীমচন্দ্র ! উড়োপাখীর সন্ধানে ছুটেছ না কি ?"

ভীম দাঁড়াইয়া পড়িল, "দেখেছ কি, কোন পথে গেছে ?"

সুস্মল টিপি-টিপি হাসিতে হাসিতে মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, "যদি বলি রাজপ্রাসাদের পথে গেছে ?"

ভীম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ?"

বন্ধু কহিল, "সত্যি-মিথ্যে জানিনে, এই রকমই ত শুন্‌ছি। আর তাও বলি, সেইটেই কিন্তু ওর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক, আর সঙ্গত—বাপ্‌--"

ভীমের পালোয়ানী হাতের বিষম কিল খাইয়া বন্ধু তাহার রসিকতা অর্দ্ধপথেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ভীম তখন নদীকূল ছাড়িয়া প্রান্তরের পথ ধরিয়াছে।

উজ্জ্বলার প্রতি ভীমের মনের মধ্যে যে কতখানি প্রেম প্রসুপ্ত ছিল, সে বোধ করি নিজেও সেটা বেশ ভাল করিয়া জানিত না। সংসারে যে জিনিষটাকে আমরা বড় সহজেই পাইয়া বসি, সেটার বাস্তব মূল্য নিরূপণ করিতে আমরা বড় সহজেই ভুল করিয়া ফেলি। এমন কি, তাহার যে কোন মূল্য আছে, এমন কথাটাও হয় ত সকল সময় আমাদের মনে পড়ে না। তাই সে জিনিষটা যতই কেন দুর্ম্মূল্য হউক না, ভীমের ব্যাপারটাও সেই রকম ঘটিয়াছিল। এই অপরূপ-রূপসী বালিকা তাহাদের ঘরে এতই সহজে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার এই অযোগ্য বা অপ্রত্যাশিত আগমনের সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু আগ্রহ বা বিস্ময় জাগ্রত হইতে অবসরমাত্র ঘটে নাই। মাতৃ-পিতৃহীনা পরাশ্রয়-পালিতা অনাথাকে তাহারা নিজে যাচিয়াই তাহার নিতান্ত বাল্যকালেই সামান্যমাত্র পণ লইয়া ভীমের হাতে দিয়াছিল, সেই জন্যই ইহার অপরূপত্বটা তাহার কাছে অতি সহজ ও সাধারণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ভীম তাহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত না, তাহাও নয়, তবে তাহার মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস ছিল না। আজ সহসা তাহার প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে এককালে জাগ্রত, সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বলার সেই অবমাননায় আরও দলিতা সর্পীর মত ক্রোধ-ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে একটা ব্যগ্র-ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কোন্ প্রাণে তাহাকে—যাহার পক্ষে রাজপ্রাসাদই স্বাভাবিক ও সঙ্গত স্থান, তাহাকেই সে অবমাননার উপরে আবার অমন করিয়া অপমান করিল। যদি সত্যই তাহার উপর অভিমান করিয়া উজ্জ্বলা আজ মরিয়া গিয়া থাকে ? ভীমের পদনখ হইতে কেশাগ্রাবধি এই ভীষণ চিন্তায় একেবারে শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার তখনই মনে হইল, যেন বিশ্বসংসারটা এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কাছে এককালে অন্ধকারের মধ্যে ডুব খাইয়া ডুবিয়া গেল।

সে তখন ঘর্ম্মাক্ত-শরীরে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এক রকম ছুটিয়া চলিল। এই পথ দিয়া দিন দুই চলিলে ব্যাঘ্রতটীতে পৌঁছান যায়, এই খবরটুকু যে উজ্জ্বলার জানা আছে, সে কথা সেও জানিত। কারণ, রাগ করিলেই সে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে এখনই বাঘতটীতে চলিয়া যাইবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

অস্থি-নির্ম্মিত নকল জাহাজ

প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল জাহাজ গতায়াত করে, তাহার কোন একটি জাহাজের জনৈক নাবিক বড় দিনের উৎসব উপলক্ষে যে সকল 'টর্কী' মোরগ খানায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাহাজের ৩টি করিয়া নানাবর্ণ-রঞ্জিত মাস্তুল আছে। বুকের পঞ্জর-সাহায্যে জাহাজের খোল ও গলুই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলিতে জাহাজের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পক্ষীর অস্থিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জাহাজ

ক্রীড়া দর্শনের অভিনব ব্যবস্থা

আমেরিকায় ইভান্‌ষ্টন্‌ইলএ ছাত্রদিগের ফুটবল ক্রীড়া দর্শনের সুবিধার জন্য বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে দর্শকদিগের বসিবার জন্য যে স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ৭৫ হাজার দর্শক অনায়াসে আসন গ্রহণ করিয়া ক্রীড়ারঙ্গ দেখিতে পাইবে। ক্রীড়াক্ষেত্র বহু অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে।

ছিন্ন-বস্ত্র-রচিত চিত্র

ছিন্ন-বস্ত্রাংশ রচিত চিত্র

জনৈক মার্কিণ মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাংশ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছেন। চিত্রাধারে বস্ত্রাংশগুলি সু-সন্নিবিষ্ট করিয়া এই নিপুণা শিল্পী তাঁহার সৌন্দর্য্যানুরাগ ও কলা-কৌশলের যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে অভিজ্ঞগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

উভচর মোটর-চালিত যান

মার্কিণ দেশে সম্প্রতি এক প্রকার উভচর যান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যান ত্রি-চক্র-সংবলিত। সম্মুখের চাকা এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, জলের মধ্যে অবস্থানকালে উহা জাহাজ বা ষ্টীমারের চাকার ন্যায় জল কাটিয়া অগ্রসর হয়। এই মোটর-চালিত যান জলে ও স্থলে অবলীলাক্রমে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া থাকে। আমেরিকার 'মিচিগান' হ্রদে ও তত্রত্য রাজপথে ইহার গতিশক্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। দুই জন আরোহী ইহাতে আরোহণ করিয়া পরম আরামে স্থল ও জল-যাত্রার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

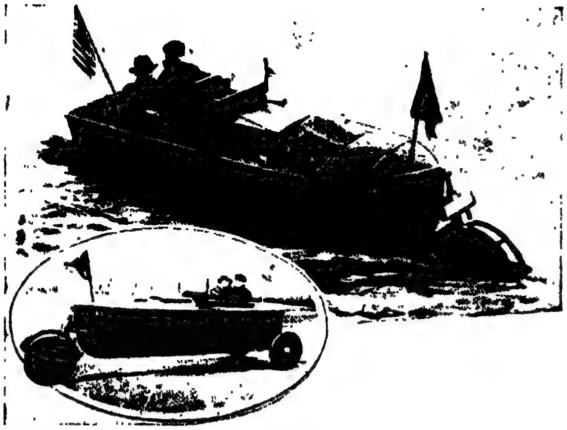

জল ও স্থল উভয় ক্ষেত্রে মোটর-যানের চিত্র

অভিনব উপায়ে দস্যু-দলন

দস্যু রাহাজানী করিবার সময় পথিককে পিস্তল দেখাইয়া ঊর্দ্ধে হাত তুলিতে বলিয়া থাকে। সে সময়ে পথিকের নিকট অস্ত্র থাকিলেও ব্যবহার করিতে পারে না, বাধ্য হইয়া তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় দস্যুকে দমন করিবার এক অভিনব উপায় জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করিয়াছেন। ক্যামেরার আকার-বিশিষ্ট একটি আধার শরীরে সংলগ্ন থাকে। সেই আধারের মধ্যে পিস্তল লুক্কায়িত রাখা হয়। পিস্তল হইতে আপনা হইতে গুলী নির্গত হইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দেহাভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। দস্যু হাত তুলিবার আদেশ করিলে, আক্রান্ত ব্যক্তি যেমনই ঊর্দ্ধে হাত তুলিবে, অমনই লুক্কায়িত পিস্তল হইতে গুলী নির্গত হইয়া দস্যুকে আহত করিবে।

চিত্রস্থিত নকল দস্যুর প্রতি পুলিস প্রহরী হাত তুলিয়া গুলী নিক্ষেপের অভ্যাস করিতেছে

ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া চালান

জার্ম্মাণীতে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া চালাইবার শিক্ষানবিশী করিবার নূতন ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের জন্য যেরূপ খেলার ঘোড়া আছে, ঠিক সেই প্রণালীতে নির্ম্মিত দোলায়মান ঘোড়ায় চড়িয়া প্রথম শিক্ষার্থী ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া চালান অভ্যাস করিয়া থাকে। যে ঈষৎ বক্র কাঠের ফ্রেমের উপর ঘোড়া অবস্থিত, তাহার তলদেশে চাকা

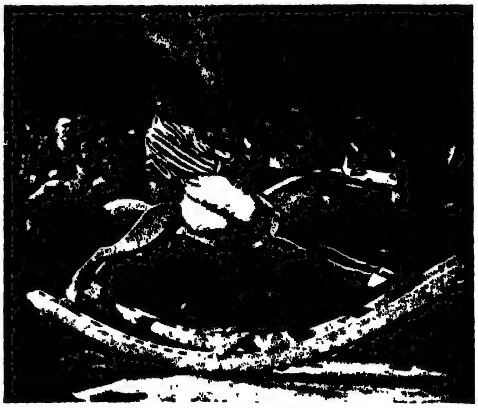

কাঠের ঘোড়ায় অশ্বচালনা শিক্ষা

সংলগ্ন থাকে। সেই চাকার সাহায্যে সম্মুখভাগে ঘোড়াটি বেশ অগ্রসর হইতে পারে। ঘোড়া হইতে পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। শিক্ষার্থী এইরূপ খেলার ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া চালানর কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়া লয়।

অগ্নি-নির্ব্বাণকল্পে জাহাজ

সমুদ্রবক্ষে জাহাজে আগুন লাগিলে, উহা নির্ব্বাপিত করা বড় কঠিন। এ জন্য অগ্নি-নির্ব্বাপক জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক প্রবাহে এই জাহাজ চালিত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে ৩৯টি প্রবল জলধারা নির্গত হইয়া অগ্নি-নির্ব্বাণে সহায়তা করে। এই জাহাজের গতি অত্যন্ত অধিক। জাহাজের অগ্নি-নির্ব্বাণে এই বিদ্যুৎ-চালিত জাহাজ বিশেষ উপযোগী।

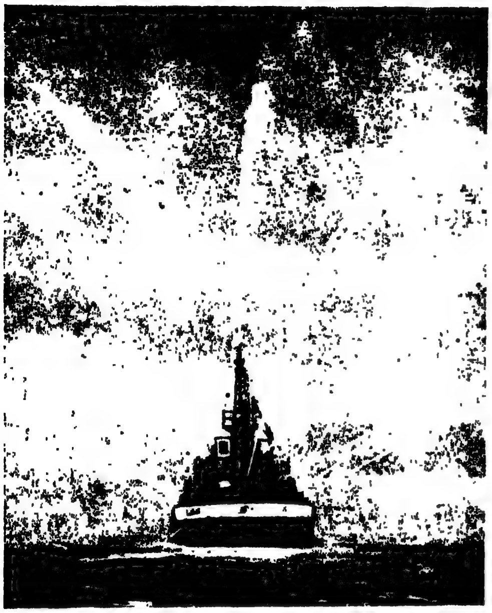

অগ্নি-নির্ব্বাপক জাহাজ

অন্ধের পুস্তক পাঠ

জনৈক ইংরাজ অধ্যাপক এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহার সাহায্যে অন্ধ মুদ্রিত পুস্তকাদি অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। যন্ত্রের উপর কোনও পুস্তক অথবা সংবাদপত্রের মুদ্রিত অংশ স্থাপন করিলে যন্ত্র-সাহায্যে অক্ষরগুলি শব্দায়মান হইয়া অন্ধের কর্ণে প্রবেশ করিবে। পাঠকের কর্ণে শব্দবহ যন্ত্র মস্তক বেষ্টন করিয়া সন্নিবিষ্ট থাকে। এই শব্দবহ যন্ত্রই অন্ধের 'নয়ন।' এই 'নয়ন'রূপ যন্ত্রটির মধ্যে একরূপ ধাতু আছে, তাহাকে 'সেলিনিয়ম্' বলে। ইহার উপর আলোকপাত হইলে, সেই আলোকের মৃদুতা বা তীব্রতার অনুযায়ী বৈদ্যুতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অপূর্ব্ব শক্তি এই সেলিনিয়মের আছে। শব্দ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা এই শব্দবহ যন্ত্রে বিদ্যমান। একটি ব্যাটারী বা তাড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র শব্দবহ যন্ত্র ও সেলিনিয়মের সহিত সন্নিবিষ্ট থাকে। কোন একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব বা গোলক হইতে যখন আলোক নির্গত হইয়া সেলিনিয়মে পতিত হয়, সেই সময় একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ শব্দবহ যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়, তাহার ফলে একটা মধুর শব্দ উৎপাদিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। শব্দের মধুর ধ্বনি আলোকস্পন্দনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রটির উপর একখানি কাচ আছে, কাচের নিম্নেই সেলিনিয়মের একটি চাকৃতি আছে। এই চাকৃতির উপরিভাগ এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, বৈদ্যুতিক আলোক তন্মধ্য দিয়া কাচে প্রতিফলিত হয়। সেই কাচের উপর পাঠক যে কোনও ছাপান বই অথবা কাগজ উপুড় করিয়া রাখিলে—অর্থাৎ লিখিত অংশ কাচের উপর স্থাপন করিলে, বৈদ্যুতিক আলোক-রেখা কাচ ভেদ করিয়া লিখিত অংশে পতিত হয়। মোটর

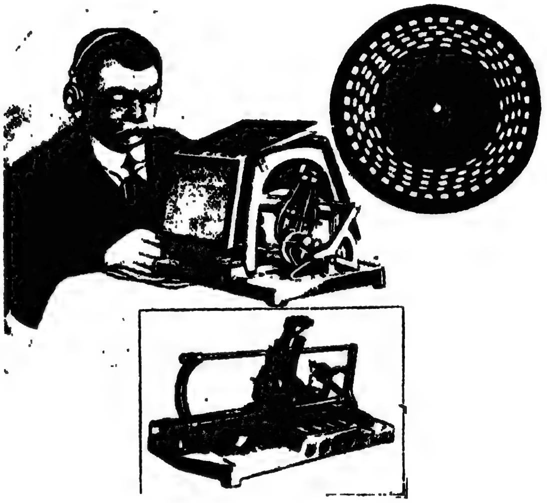

অন্ধ পুস্তক পাঠ করিতেছে—উপরে দক্ষিণভাগে চিত্র-সংবলিত চাকৃতি এবং নিম্নে সম্পূর্ণ যন্ত্রটি

সাহায্যে চাক্‌তিটি আবর্ত্তিত হয়। চাক্‌তির গাত্রে ৫ সারি ছিদ্র আছে। বৈদ্যুতিক গোলকসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত আলোক ছাপান পুস্তকের অক্ষরগুলির উপর পতিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরের বিভিন্ন শব্দ উৎপাদিত হইয়া কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। অন্ধকে শুধু শব্দের অক্ষরগুলির সহিত প্রথমে পরিচিত হইতে হইবে। ইহা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। ১২ হইতে ২০ ঘণ্টার মধ্যে উহা আয়ত্ত করা যায়। ৩।৪ মাসের মধ্যে প্রতি মিনিটে ৬০টি বাক্য পাঠ করিবার শক্তি যে কোনও অন্ধ ব্যক্তি অর্জ্জন করিতে পারে।

সুবৃহৎ বল্মীক-স্তূপ

অষ্ট্রেলিয়ার কোন শুষ্ক নদীর ধারে একটা বৃহৎ বল্মীক-স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপটি ৩২ ফুট উচ্চ। বল্মীক-কীটের (উই) খেয়াল বশতঃ এই স্তূপের দক্ষিণ ভাগে—পাদদেশে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্তূপের অভ্যন্তরে গোলোকধাঁধার ন্যায় পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। স্তূপটি এমন দৃঢ় যে, ইহার শীর্ষদেশে জনৈক পরিব্রাজক আরোহণ করায় উহার কোনও অংশ ভগ্ন হয় নাই।

আধার-সংলগ্ন ছত্র

জার্ম্মাণীতে এক প্রকার ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিলাসিনীদিগের পাউডার প্রভৃতি রাখিবার এক জাতীয় সুন্দর আধার সংলগ্ন থাকে। ছত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন না হইলে তাহাকে এমনভাবে ভাঁজ করিয়া রাখা যায় যে, বিলাসিনীরা অনায়াসে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এইরূপ আধার-সংলগ্ন ছত্র জার্ম্মাণীর নারীরা ব্যবহার করিতেছেন।

চীনের বিচিত্র ঘুড়ি

চীনদেশে ঘুড়ি উড়াইবার খেলা বিশেষভাবে প্রচলিত। চীনারা নানাবিধ জীব ও পতঙ্গের আকারে ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোনও কোনও উৎসব উপলক্ষে এইরূপ জীব-জন্তু ও পতঙ্গাকৃতি ঘুড়ি উড়াইবার প্রথা চীনদেশে প্রচলিত। এই সকল ঘুড়ি বিশেষ পুরু কাগজে নির্ম্মিত হয়। কোন কোন ঘুড়ির লাঙ্গূল প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। বাঁশের বাঁখারীর সাহায্যে ঘুড়ির সমগ্র দেহটি গঠিত হয়। এই সকল ঘুড়ি বিভীষিকাপ্রদ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলেও চীনারা উহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। ঘুড়ি যখন ব্যোমপথে ধাবিত হয়, তখন একখানি ঘুড়িকে

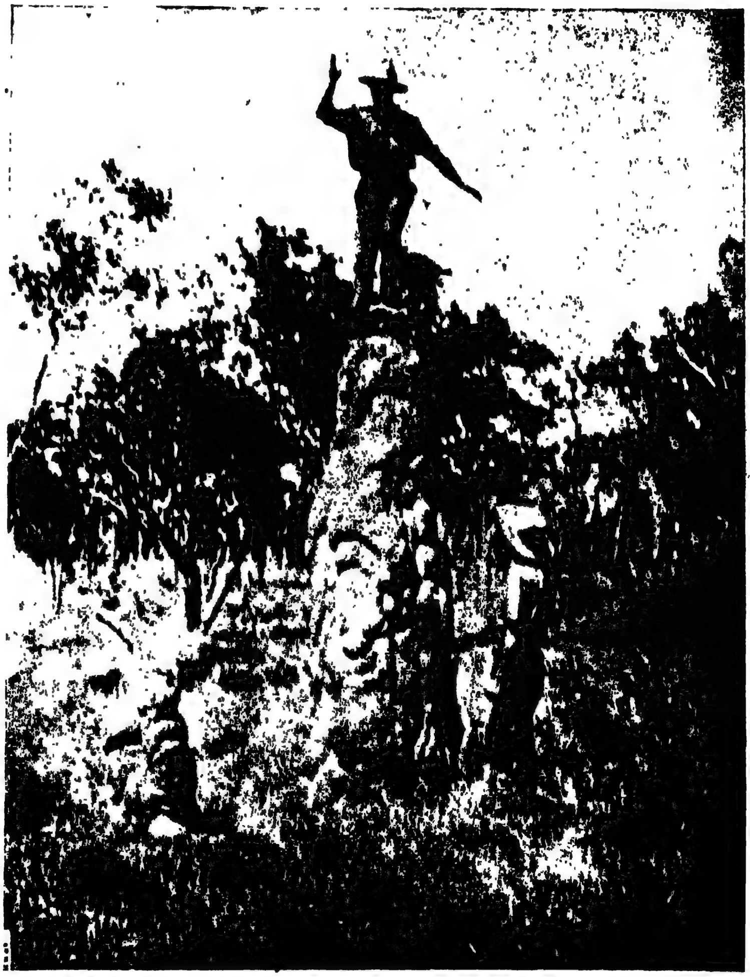

বিচিত্র বল্মীক স্তূপ

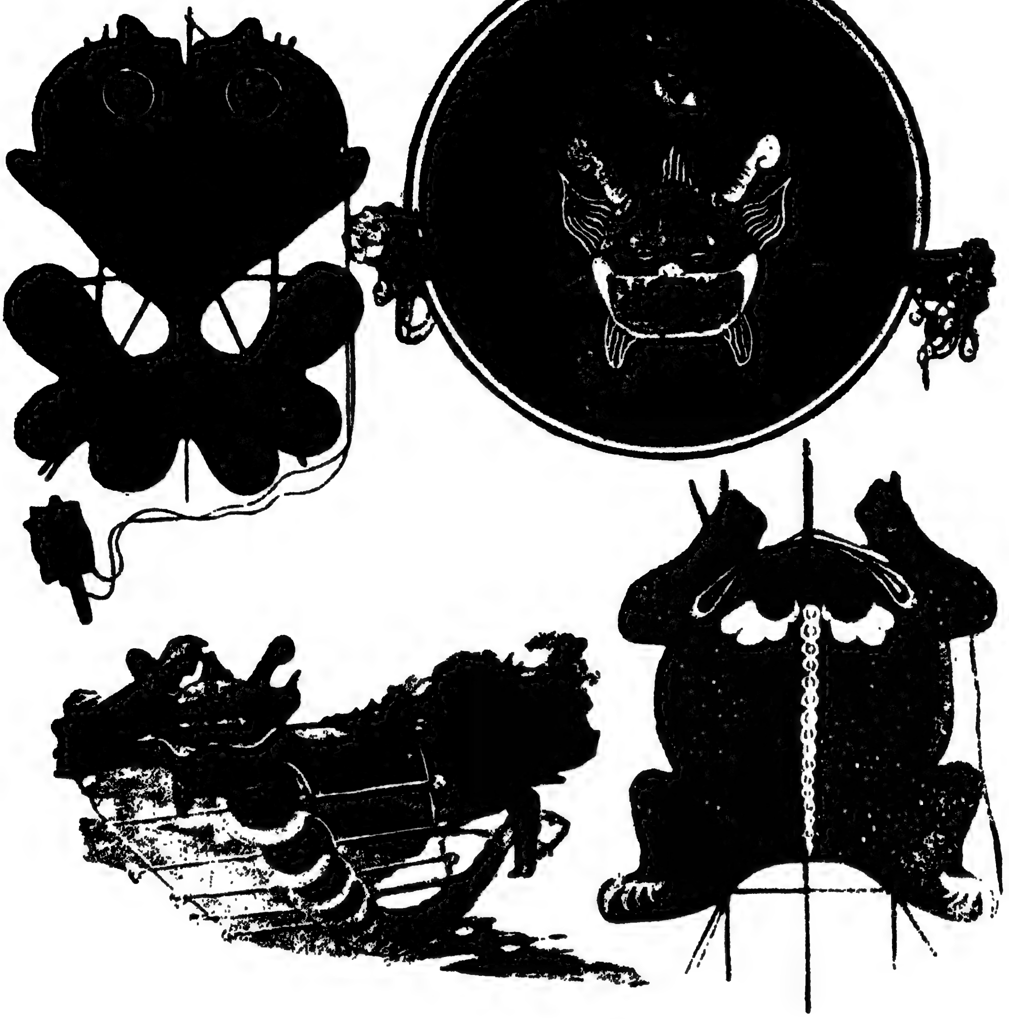

চীনের বিচিত্র ঘুড়ি

৪।৫ জন লোক ছাড়া অল্প লোক ধরিয়া রাখিতে পারে না। খৃষ্ট-জন্মের ৩ শতাব্দী পূর্ব্বে চীনদেশে ঘুড়ির প্রচলন হয়।

য়ুরোপে খৃষ্ট-জন্মের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম ঘুড়ি উড়িয়াছিল।

তবু

থেমে গেছে গান, তবু
আছে তার সুর—
ঝ'রে গেছে ফুল, তবু
গন্ধে ভরপুর!
ম'রে গেছে নদী, তবু
আছে তার রেখা,
অস্ত গেছে রবি, তবু
আছে রশ্মি-লেখা!

চুকে গেছে ভুল, তবু
আছে হাহাকার,—
ভেঙে গেছে স্বপ্ন, তবু
আছে মোহ তা'র!
মমতাজ গেছে, আছে
সাজাহান-প্রীতি,—
সে চ'লে গিয়েছে, তবু
আছে তা'র স্মৃতি!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

বর্ষামঙ্গল

(ক)

(ভবভূতির মালতী-মাধবের ভাবানুগত)

সানু-কন্দরে প্রতিমন্দ্রিত
গিরি-প্রপাত মিশিছে নদে,
যেন গজানন-কণ্ঠ গরজে
ভৃগুরাম সহ রণোন্মদে।

দাত্যুহ-নীড় ভেঙে ফেলে আজ,
কপোতেরা নব কুলায় রচে,
শিখিরাজ গিরি-নাট-মণ্ডপে
বারিদ-বিতানে মাণিক খচে।

বেতসী-কুসুমে বাসিত-সলিলা
কুঞ্জ-সরিৎ বেত্রবতী ;
বায়ু, গজাহত-শল্লকীদল-
গন্ধ বহিছে মন্দগতি।

পূর্ব্বপবনে গিরি-বনশ্রী—
বিহগী হইয়া উড়িতে চায়,
স্ফুট কদম্বে আজিকে তাহার
শত সহস্র ডিম্ব ভায়।

কেলি-কদম্বে কল-কাদম্বে
মেঘমালা আজ 'কাদম্বিনী',
পীন শিলীন্ধ্র কন্দলদলে
মেদিনী আজিকে মেদস্বিনী।

সাশ্রু-নয়না বিদ্যুন্ময়ী
'কৃষ্ণা' দিবস-রাণীর কেশে,
সর্জ্জের সাথে অর্জ্জুন আজি
বিজয়-মাল্য পরায় হেসে।

রাজ-গৌরবে বারিধর শোভে
শ্রীদামিনী তুমে আলিঙ্গনে,
কলাপি-চারণ, স্তুতি-সঙ্গীতে,—
প্রাচ্য সমীর সংবাহনে।

অশনি করিছে শাসন-ঘোষণা,
'দ্বিজ' চাতকেরা যাচক দ্বারে।
ইন্দ্রধনুটি রাজ-লক্ষ্মীর
শৌর্য্য-গরিমা দিয়াছে তারে।

গণ্ড-মদিরাসক্ত ভৃঙ্গে—
শ্রুতি-পল্লবে তাড়ায় গজ,
অবশাঙ্গের জড়িমা দূরিতে
মাখে মধুকর কেতকীরজ ;

কেতকীকুঞ্জে ক্ষত-বিক্ষত,
জুড়াইতে যায় কামিনীবনে,
পরশে পাখার—ঝরে দল তার—
মধুকর আজি প্রমাদ গণে।

(খ)

(মহাকবি মাঘের শিশুপাল-বধের ভাবানুসরণে)

নীলাম্বরের তমালবনে ফুট্‌ল তড়িৎ মঞ্জরী,
চন্দ্রকচূড় পীতাম্বর—আজ দোল খেলে তায় সঞ্চরি'।
গোঠে- গোপাঙ্গনা উন্নয়নে,
দেখ্‌ছে কি তাই ক্ষুণ্ণমনে ?
আজকে শিখী কোকিল হ'লো, চাতক হ'লো চঞ্চরী।

পুষ্পিতা আজ বন্ধ্যাভূমি, ফুট্‌ল কোমল কন্দলী,
মল্লিকাতে বল্লী আজি ভর্‌ল শ্যামল অঞ্জলি।
যূথী—শিলীন্ধ্র-সু-গন্ধভারে,
পথ খুঁজে পাই অন্ধকারে ;
চন্দ্র গলে, সূর্য্য গলে, বজ্রেরো যায় মন গলি'।

এমন দিনে বিদায় দিয়ে আপন প্রাণের বন্ধুরে,
নীপের শাখার দীপের শিখায় শলভ হয়ে মন পুড়ে।
বৃথা—কুটজ ছিটায় দধির কণা
পথিকবধূ অধীরমনা,
সর্প হয়ে তুল্ল ফণা স্মরের সায়ক বন জুড়ে।

"এমন দিনে কে রবে হায় বঁধুর 'পরে মান করি",
মধুপ আজি বল্‌ছে শোনো মধুর সুরে গান ধরি',
যেন—মেঘাবৃত শশীর কলা,
কোষাবৃত অসির ফলা,
কেতক, আজি গন্ধ হানে, কখন বা নেয় প্রাণ হরি'।'

(গ)

(মৃচ্ছকটিকের ভাবানুসরণে)

ভৃঙ্গনীলদেহে চপলাপীত পট,
বকালী-শঙ্খ শ্রী-হস্তে,
চরণ বিক্রম করে কি নারায়ণ
আজিকে বলিরাজ মস্তে ?

সঘন ব্যোম, ধৃতরাষ্ট্র সম, শিখী
দুর্য্যোধন সম গর্জ্জে,
কোকিল, দ্যূতজিত ধর্ম্মরাজ সম
নীরবে হৃতদেশ বর্জ্জে।

ভ্রাতারা অনুগামী হংস সম, ভেক
কর্ণসম মাতে হর্ষে,
ভীষ্ম দ্রোণ সম গ্রীষ্ম দ্রুমগণ
অশ্রু, নতশিরে বর্ষে।

বৃষ্টিধারা ঝরে রূপালি জরি যেন
দামিনীদীপালোকে ঝলিয়া,
ছিন্ন অম্বর-পটের দশাসম
বারিদ পড়ে আজি গলিয়া।

আর্ত্তনাদ করে বিরহি-হৃদি সম
নীরদ, ঢলি গিরি-শিখরে,
ব্যজন করে তারে শিখীরা শিখা মেলি,
মণির দ্যুতি তায় ঠিকরে।

হৃষ্ট দর্দ্দুর পঙ্ক ক্লেদ-জলে
মেতেছে ভূরি-ভোজে তড়াগে,
নীপের দীপ জ্বলে অটবীতমঃ হরি'
ষড়্‌জ গায় শিখী সরাগে।

মেনকালিঙ্গনে ঋষির তপসম
নিশীথনাথ আজি মগ্ন,
গণিকানারীসম চপলা চঞ্চলা,
রয় না এক দেহে লগ্ন।

প্রবল ধারা শরে, তড়িৎকেতু রথে,
অশনি-দুন্দুভি বাজিয়ে,
দিবসনাথে জিনি হরিছে 'কর' তার
বিজয়ী পয়োধর আজিকে।

সোমের আঁখি ঝুরে, ব্যোমের বনে বনে,
জ্যোছনা হৃতা মেঘাবরণে,
গলিত বল্মীক, গলিল বাল্মীকি-
চিত্ত যথা সীতাহরণে।

সুরেশ, নানা সুরে বাজায় বন-বীণা
দিবস-নিশা-ভেদ লুপ্ত ;
গগন দ্রবীভূত বজ্রানলে, মহী
কমল-আঁখি মুদি সুপ্ত।

(ঘ)

(কাজরীগানের অনুসরণে)

শোভন গহনে ঘন হরিৎ-ঘটা,
ত্বরা—বনে এস সই ;
সঘন গগনে হেন তড়িৎ-ছটা,
মোরা,—কোণে কেন রই ?

কি কথা শুনাল 'দেয়া' নীপের কানে
সে যে—শিহরে শাখে,
রজনীগন্ধা কেয়া-গন্ধ হানে,
অলি—বিহরে ঝাঁকে।

বুলবুল কূজে মৃদু গুলবাগানে
শিখী—ক্রৌঞ্চ ডাকে,
যোল সাজে সেজে এস বনের পানে,
নাচ'—তাথৈ তাথৈ।
ত্বরা—বনে এস সই ॥

কবরী দুলায়ে এস ঘাঘরা পরি
ভরা গাগরী কাঁখে,
মঞ্জীর-রবে সারা নগরী ভরি
এস—নোলক নাকে।

বরষা চলিয়ে যায়—এসেছে তরী,
ফিরে—পাইবে তাকে,
ফিরিবে না যৌবন বিশ-বছরী,
তুমি—কাঁদ না যতই।
ত্বরা—বনে এস সই ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

বলরামের দোল

বলরামের দোলের কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে মনে করিবেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ হলায়ুধ বলরামদেবের দোলযাত্রার বিবরণ লিখিতেছি। আমরা এই প্রবন্ধে যে বলরামের কথার আলোচনা করিতেছি—তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে বলরামী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বলরাম নদীয়া জিলার মেহেরপুর গ্রামে কোনও হাড়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে হাড়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার প্রসঙ্গে কোন কথা বলিবার সময় তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলে, 'বলরামচন্দ্র—হাড়ীরামচন্দ্র।' তাহারা আরও বলে, হাড়ীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি 'হাড়ী', এরূপ নহে, তিনি হাড় নির্ম্মাণ করিতেন, অর্থাৎ মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই 'হাড়ী!' তাহাদের বিশ্বাস, বলরামচন্দ্র ভগবানের অবতার; অবিশ্বাসী ও অধার্ম্মিক মানবজাতির মনে ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ উৎপাদনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। বলরামের শিষ্যরা তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিয়া থাকে এবং সেই সকল গল্প তাহারা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে।

বলরাম মেহেরপুরের মালোপাড়ার কোন অজ্ঞাতনামা হাড়ীর পুত্র। তাঁহার জন্মের সন-তারিখ জানিবার উপায় নাই। বলরামকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, এরূপ দুই চারি জন বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন, বলরাম বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন, হাড়ী-বাগ্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রূপবান্ সৌম্যমূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। তাঁহার মাথায় লম্বা চুল, মুখে দীর্ঘ দাড়ী ও গোঁফ ছিল; এ জন্য তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী অনেকেরই ঐরূপ দাড়ী, গোঁফ ও মস্তকে দীর্ঘ কেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ 'দরবেশ' নামে পরিচিত। মালোপাড়ার অদূরে ভৈরব নদের তীরে 'বলরামের আখড়া' প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় লোকরা এই আশ্রমটিকে 'দরবেশের আখড়া' বলে।

কথিত আছে, শৈশবকাল হইতেই বলরামের হৃদয় ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি মাছ-মাংস খাইতেন না, বাল্যকাল হইতেই নিরামিষভোজী ছিলেন। তাঁহার পিতার 'খোঁয়াড়ে' এক পাল শূকর ছিল, কিন্তু অন্যান্য হাড়ীর ছেলের মত সেগুলিকে তিনি চরাইতেন না, এই অস্পৃশ্য জীবগুলিকে স্পর্শ করিতেও তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। মুখুয্যে বাবুদের গৃহদেবতা গোপালদেবের আঙ্গিনায় সে কালে সর্ব্বদা কথকতা, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইত; বলরাম ভক্তিভরে তাহা শ্রবণ করিতেন, নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইলে সেই দলের অনুসরণ করিতেন, তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শৈশবে হাড়ীর ছেলের এইরূপ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, বলরামকে এ জন্য কখন কখন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রশমিত হয় নাই।

বলরাম শৈশবকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি, চিন্তাশীল ও সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল। প্রথম যৌবনে এক দিন তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে কোশা লইয়া তর্পণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনিও জলে নামিয়া অঞ্জলি-পূর্ণ জল পুনঃ পুনঃ তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে ব্রাহ্মণটি তর্পণ করিতেছিলেন, তিনি তর্পণান্তে বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার তোর কি খেলা রে, বলা? অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া ডাঙ্গায় ফেলিতেছিস্ কেন?"

বলরাম বলিল, "বাড়ীতে গোটাকতক শাক-ডাঁটার চারা লাগাইয়াছি—সেই শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি!"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "সাধে কি লোকে বলে তুই পাগল? তোর শাকের ক্ষেত কোথায়, আর তুই নদীর ধারে অঞ্জলি ভরিয়া জল ঢালিয়া ভাবিতেছিস—ঐ জলে তোর শাকের ক্ষেত ভিজিবে!"

বলরাম বলিল, "ঠাকুর, আপনি কোশা ভরিয়া জল তুলিয়া জলে ঢালিতেছিলেন কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাড়ীর ছেলের আর কত বুদ্ধি হইবে! আমি তর্পণ করিতেছিলাম, আমার পিতৃপিতামহদের জল দিতেছিলাম।"

বলরাম বলিল, "তাঁহারা কোথায় আছেন?"

ব্রাহ্মণ। তাঁহারা স্বর্গে আছেন।

বলরাম। স্বর্গে? সে ত অনেক দূর! আর তাঁহারা ঠিক স্বর্গেই আছেন, এ কথাও আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আপনার কোশার জল যদি তাঁহাদের কাছে যায়, তাহা হইলে আমার অঞ্জলির জল এক রশী তফাতে আমার শাকের ক্ষেতে যাইবে না কেন?

ব্রাহ্মণ হতাশভাবে বলিলেন, "ছোঁড়া একেবারেই ক্ষেপিয়া গিয়াছে!"

মেহেরপুরের অদূরে ভৈরবের অপর পারে গোভীপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; সে কালে এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এখন এই গ্রামখানি শ্মশানতুল্য হইয়াছে; অবস্থাপন্ন বড় বড় গৃহস্থ-পরিবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাহাদের ভিটা এখন অরণ্যপূর্ণ। যাহাদের সুপ্রশস্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ এক সময় ধান, গম, অড়হর, ছোলা, মসিনা প্রভৃতি নানা শস্যে পরিপূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ গোলায় মা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ন্যায় শোভা পাইত, সারি সারি গোশালা গাই-বলদে পূর্ণ থাকিত রাখাল, কৃষাণ, খাতক, পাইক প্রভৃতির কলরোলে যে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য মুখরিত হইত, এবং সন্ধ্যাসমাগমে সঙ্কীর্ত্তননিরত গ্রাম্য বালক ও যুবকবৃন্দের মিলিত কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত মৃদঙ্গধ্বনি মিশিয়া সমগ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত, সেই স্থান এখন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় শৃগালের সঙ্গীতালাপে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! গ্রামের বিভিন্ন অংশে যে দুই চারি ঘর গৃহস্থ এখনও বাস করিতেছে, সংবৎসরকাল রোগে ভুগিয়া তাহারা জীবন্মৃত।

কেবল গোভীপুর নহে, মেহেরপুর মহকুমার অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়; কিন্তু যখন গোভীপুরের শ্রী ও সমৃদ্ধি ছিল, সেই সময় এই গ্রামে এক জন ধনাঢ্য চর্ম্মকার বাস করিত। তাহার নাম সুবলচন্দ্র চৌধুরী। চর্ম্মের ব্যবসায়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, কমলার কৃপায় তাহার অবস্থা উন্নত হওয়ায়, মুচি হইলেও

তাহার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ভদ্রলোকের মত হইয়াছিল। চর্ম্ম-ব্যবসায়ী হইলেও সে কখন চর্ম্ম স্পর্শ করিত না।

সুবল চৌধুরী বলরামকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত। বলরাম হাড়ী, সুবল চৌধুরী মুচি; জাত্যংশে উভয়েই সমাজের একই স্তরের লোক, ইহাও তাহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধনের অন্যতম কারণ। সুবল চৌধুরী বলিত, "জাতিতে আমি মুচি, এ জন্য হিন্দুসমাজে আমি অচল, আমরা কুকুরেরও অধম! উচ্চ:শ্রেণীর হিন্দুর ঘরে কুকুর উঠিলে ঘর অপবিত্র হয় না, কিন্তু আমরা তাহাদের ঘরে উঠিলে ঘর অপবিত্র হয়, তাহাদের রান্নাঘরের ত কথাই নাই; কুকুর তাহাদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে পাকশালার হাঁড়ীকুড়ী ফেলিতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের পাকশালার ত্রিসীমায় আমাদের যাইবারও অধিকার নাই! হিন্দুর ধোপা আমাদের কাপড় কাচে না, নাপিত আমাদের কামায় না। হিন্দু ঘরামী আমাদের ঘর ছাইবে না! এমন কি, হিন্দুর দেবমন্দিরে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। হিন্দু হইয়াও আমরা—এই বাঙ্গালাদেশের লক্ষ লক্ষ মুচি উচ্চ বর্ণের হিন্দুর অস্পৃশ্য। হিন্দুর পূজার দালানে উঠিতে পাইব না, কিন্তু পূজা উপলক্ষে ঢাক-ঢোল বাজাইবার জন্য আমাদের ডাক পড়িবে। আমরা পূজা-বাটীতে ঢাক বাজাইব, কিন্তু উচ্চ সমাজের হিন্দুর সহিত মিশিয়া পূজা করিতে পাইব না! এই অবিচার, এই অত্যাচার অসহ্য মনে হয়। পাদরী সাহেব আমাকে সদলে খৃষ্টান হইতে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা হইলে অন্যান্য খৃষ্টান আমাদের সঙ্গে মিশিতে কুণ্ঠিত হইবে না। গীর্জ্জায় গিয়া তাহাদের সঙ্গে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে পাইব। অস্পৃশ্যবোধে কেহ আমাদের তাড়াইয়া দিবে না। 'সাভলিয়ের দরগার' ফকির সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন, আমি মুসলমান হইলে আর অস্পৃশ্য থাকিব না, তখন মসজেদে গিয়া মৌলবী সাহেবের পাশে বসিয়া নমাজ করিতে পারিব, হিন্দু ধোপা মুসলমানের কাপড় কাচে, আমার কাপড়ও কাচিবে, হিন্দু নাপিত ঘাড় হেঁট করিয়া আমার পায়ের নখ কাটিয়া দিবে। হিন্দু ঘরামী মৌলবী সাহেবের ও অন্যান্য মুসলমানের ঘর ছায়, আমারও ঘর ছাইবে। মুসলমান মোল্লা আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিব, অথচ হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য হইয়া থাকিব—এ অত্যাচার অসহ্য। যদি আমরা লক্ষ লক্ষ মুচি একযোগে খৃষ্টান বা মুসলমান হই, তাহা হইলে হিন্দু কি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না? আমার হাতের জল অস্পৃশ্য, হিন্দু আমার ঘরে জলস্পর্শ করিবে না; হিন্দু বলিয়া আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।"

বলরাম বলিলেন, "দেখ সুবল, এক কাজ কর। সম্মুখেই দীপান্বিতা কালীপূজা। তুমি মহাসমারোহে কালীপূজা কর। পূজার রাত্রে মায়ের প্রসাদ গ্রহণের জন্য গ্রামের সকল ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ কর। তাহারা কি বলে শোন।"

সুবল চৌধুরী বলিল, "কি যে বল! মুচির বাড়ীতে কেহ ফলার খাইতে আসিবে ভাবিয়াছ? এ যে অসম্ভব ব্যাপার! দশ জনে কটু কথা বলিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

বলরাম বলিলেন, "শিরোমণি ঠাকুর ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা। কা'ল সকালে চল, তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি কি বলেন, শুনা যাইবে।"

পরদিন প্রভাতে বলরাম সুবল চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া শিরোমণি ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি ঠাকুর তখন গৃহবিগ্রহের পূজা শেষ করিয়া, বাহিরের ঘরে আসিয়া ধূমপানের অভিপ্রায়ে হুঁকাটি হাতে লইয়াছেন মাত্র, 'প্রভাতে হাড়ী ও মুচি' দুই বেটা অস্পৃশ্য নারকীর মুখদর্শন হইল বলিয়া তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সুবল চৌধুরী টাকার মানুষ, প্রকাণ্ড ধনী, তাহার মুখের উপর দুই কথা শুনাইয়া দিতে তাঁহার সাহস হইল না। 'সত্যং ব্রূয়াৎ' শ্লোকটি হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহাদিগকে বসিতে বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না—যদিও তাঁহার উঠানে একখানি জলচৌকী পড়িয়া ছিল। তিনি সেই জলচৌকীতে বসিয়া পাদপ্রক্ষালন করিতেন, তাঁহার গৃহপালিত কুকুরগুলা অনেক সময় সেই জলচৌকির উপর শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিত বটে, কিন্তু কুকুরেরও অধম হাড়ী ও মুচিকে তিনি কি করিয়া সেই জলচৌকিতে বসিতে বলিবেন? অগত্যা সুবল চৌধুরী ও বলরামকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

শিরোমণি ঠাকুর শিখা আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "কি রে সুবল! এত সকালে কি মতলবে আসিয়াছিস্ বল্।"

সুবল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বলরাম বলিলেন, "সুবল এবার একটু সমারোহ ক'রে মা কালীর পূজা করতে চায়। আপনারা সকলে যদি দয়া ক'রে ওর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন, তা হ'লে—"

বলরামের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্রোধে বিস্ময়ে শিরোমণি ঠাকুরের শিখা কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সুবল এবার কালীপূজো করবে, তার বাড়ীতে আমাদের দশ জনকে ফলারের নেমন্তন্ন করতে চায়! ওর টাকা হয়েছে ব'লে আমাদের জাত মারতে চায়? মুচির বাড়ী ফলার করতে হবে! মহাভারত! মহাভারত! ঘোর কলি আসন্ন হয়েছে, তা না হ'লে মুচির এত সাহস হয়?"

বলরাম শান্তভাবে বলিলেন, "ঠাকুর মশায়, রাগ করছেন কেন? মুচির বাড়ী ফলার, এ কথা মনে না ক'রে মায়ের প্রসাদ মনে করলে দোষ কি?"

শিরোমণি সকোপে বলিলেন, "তুই বেটা হাড়ী, তোর আর বুদ্ধির দৌড় কতখানি হবে? মুচির বাড়ী মায়ের প্রসাদও যা, ফলারও তাই। যাকে বলে চালভাজা, তাকেই বলে মুড়ী। প্রাতঃকালে কি পাপ কথাই শুনতে হ'ল! রাম, রাম!"

বলরাম বলিলেন, "মা কালী কে?"

শিরোমণি কলিকায় ফুঁ দিয়া বলিলেন, "তুই বেটা মা কালীকে চিনবি কি ক'রে? তিনি শিবসীমন্তিনী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, জগজ্জননী।"

বলরাম। আজ্ঞে, আমরা সকলেই ত সেই মায়ের সন্তান?

শিরোমণি। অবিশ্যি; তিনি কেবল আমাদের কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা। এ গূঢ় তত্ত্ব হাড়ী-মুচির বুঝবার শক্তি নেই।

বলরাম। তা বটে, আমি আরও বুঝতে পারছিনে যে, মা যে সন্তানের ঘরে গিয়ে পূজো গ্রহণ করেন, যে সন্তানকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে ত্যাগ না করেন, মায়ের সেই সন্তানের ঘরে গিয়ে তাঁর অন্য সন্তানে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করলেই তাদের জাত যাবে, মহাভারত অশুদ্ধ হবে? এ কোন্ দেশী মহাভারত ঠাকুর মশায়? আপনারা দশ ঠাকুর যার বাড়ী পায়ের ধূলো দিতে ঘৃণা বোধ করছেন, মা ত মুচি ব'লে তার প্রতি বিমুখ হন না।

শিরোমণি। তুই বেটা সত্যই ক্ষেপেছিস, নৈলে মুচির বাড়ী ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন করতে আসবি কেন? না, এখনও ধর্ম্মের, সমাজের এত অধঃপতন হয় নি যে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা মুচি-বাড়ীতে পাত পাতবে। তা দেখ চৌধুরী, যদি তোমার এতই আগ্রহ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমাকে শ'দুই টাকা দিয়ে যেও, আমি এখানেই ফলারের আয়োজন করব। মায়ের প্রসাদটা এখানেই সকলে পাবে।

বলরাম বলিলেন, "জগজ্জননীর উপর যা আপনাদের ভক্তি, তা আপনার কথা শুনেই বুঝেছি! চল হে সুবল, এদের হৃদয়ে ভক্তি নেই, মুখে ভক্তির দোকানদারী।"

"যা কিছু ভক্তি হাড়ী-মুচির ঘরে ঢুকেছে"—বলিয়া শিরোমণি ঠাকুর

হুঁকায় এমন দম দিলেন যে, দপ্ করিয়া কলিকা জ্বলিয়া উঠিল। যাহা হউক, সুবল চৌধুরীর অর্থে সেবার অনেক ভদ্র-সন্তান স্থানান্তরে পেট ভরিয়া লুচির ফলার খাইয়া জাতি বাঁচাইয়াছিলেন।

মেহেরপুরের মল্লিক জমীদার বাবুরা 'আরিষ্টক্রাট', অর্থাৎ হাকিম ভিন্ন সাধারণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে তাঁহাদের অনেকেরই সম্মানের লাঘব হয়! তাঁহাদের গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারীর এক জন দ্বাররক্ষীর প্রয়োজন হওয়ায় এবং বলরাম বলবান্ লাঠিয়াল ও বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বলরাম অনেক দিন এই চাকরী করিয়াছিলেন, তাহার পর এক দিন রাত্রিকালে কোন তস্কর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি অপহরণ করে। বলরাম আনন্দবিহারীর দ্বাররক্ষী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, চোর সন্দেহে তাঁহার প্রতি উৎপীড়নেরও ত্রুটি হয় নাই। বলরাম বিবাগী হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। তাহার পর বহু বৎসর তিনি কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, স্থানীয় কোন লোক তাহা বলিতে পারে না। অনেকের ধারণা, এই সময় তিনি বিদেশে সাধন-ভজনে রত ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলার বিস্তর লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সকল শিষ্যের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু, এমন কি, ব্রাহ্মণেরও অভাব ছিল না।

প্রৌঢ়বয়সে দরবেশের বেশে তিনি বহু শিষ্য-সেবক-পরিবৃত হইয়া মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এবং নদীতীরে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি-পরিবেষ্টিত একটি নিভৃত স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমই এখন 'বলরামের আখড়া' নামে পরিচিত; অনেকে এই আখড়াকে 'দরবেশের আখড়া' বলে।

এই স্থানে বলরাম ধর্ম্মালোচনায় এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার একটি সেবাদাসী ছিল। তাহার নাম 'ব্রহ্মমালোনী।' ব্রহ্ম অতিশয় ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিত। বলরামের মৃত্যুর পর ব্রহ্মই তাঁহার আখড়ার কর্ত্রী হইয়াছিল। বলরামের সংস্রবে থাকায় ব্রহ্মের হৃদয়েও আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সে যে সকল ধর্ম্মকথা বলিত ও শিষ্যগণকে যে উপদেশ দান করিত, সাধারণ মালোর মেয়ের মুখে সে সকল উচ্চাঙ্গের কথা বাহির হইতে পারে না। বলরামের শিষ্যরা ব্রহ্মকে শক্তির অংশ জ্ঞানে ভক্তি করিত, এবং তাহার সকল আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হইত।

বলরাম সুদীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শিষ্যসেবকগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে কালযাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মেহেরপুরে যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তির ও আভিজাত্যের গৌরব করিতেন, তাঁহারা বলরামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। একটা অস্পৃশ্য হাড়ী—যে বহুদিন পূর্ব্বে চোর অপবাদে গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, গ্রামে আসিয়া বহু লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে, অনেকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করিতেছে, তাঁহাদের অপেক্ষা তাহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহাদের আভিজাত্য-গৌরব ইতর জনের এই স্পর্দ্ধায় যেন মলিন হইয়া গেল। তাঁহারা বলরামকে 'বুজরুক', 'প্রতারক', 'ভণ্ড' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এই সময় এক জন ব্রাহ্মণ জমীদার গ্রামের ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বাহুবলে এই অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত য়ুরোপীয় নীলকরগুলা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া, শঙ্কাকুল চিত্তে কালযাপন করিত; তাঁহার লাঠিয়ালরা নীলের কুঠী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিনি মেহেরপুরে রাজার ন্যায় বিরাজ করিতেন, এবং পিনাল কোড তাঁহার লাঠির সম্মান রক্ষা করিয়া চলিত।

এই সময় এক দিন প্রভাতে জমীদার বাবু রাজপথসন্নিহিত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সোনার ফরসীতে ধূমপান করিতেছিলেন, রূপো ও সোনা নামক দুই জন খানসামা তাঁহার মাথায় ও পায়ে তৈলমর্দ্দন করিতেছিল।

জমীদার বাবুকে দেখিয়া প্রত্যেক পথিক অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এক জন তেলের একটি ভাঁড় লইয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল, সে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না, অভিবাদন করা ত দূরের কথা!

জমীদার বাবু সোনাকে বলিলেন, "আমার সম্মুখ দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ও কে রে সোনা?"

সোনা পথের দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, ও বেটার নাম শিবু হাড়ী, ও বলরাম দরবেশের চেলা!"

জমীদার বলিলেন, "বটে! ব্যাটার ত ভারী আস্পর্দ্ধা, লাট সাহেবের মত মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, আমি যে একটা লোক ব'সে আছি, তা গ্রাহ্যি হ'ল না! যা ত তোরা দু'জন, বেটার কান ধ'রে এখানে নিয়ে আয়। ওকে একটু তরিবৎ শিখানো দরকার।"

জমীদার বাবুর আদেশে রূপো ও সোনা তৈলাক্ত হস্তেই শিবু হাড়ীকে ধরিতে চলিল, এবং তাহার দুই কান ধরিয়া টানিতে টানিতে বাবুর নিকট হাজির করিল।

বাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমাকে তুই চিনিস্?"

শিবু বলিল, "চিন্‌ব না কেন? আপনি আমাদের জমীদার বাবু।"

বাবু বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, জমীদার; তুই আমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেলি, একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করতে তোর অপমান বোধ হ'ল! তুই ভেবেছিস্ কি?"

শিবু বলিল, "বলরামচন্দরের পায়ের কাছে যে মাথা পেতে দিয়েছি, সে মাথা আর কারও কাছে নোয়াব না বাবু, তা তুমি বেরাম্ভনই হও, আর জমীদারই হও।"

বাবু ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বলিলেন, "সেই বুজরুক ভণ্ড বলা হাড়ীর চেলা হয়ে তোদের আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়ে গিয়েছে! দেবতা-ব্রাহ্মণ কাকেও গ্রাহ্যি করিস্‌নে। তোদের কি রকম সায়েস্তা করি—তা দেখাচ্ছি। তোর ভারী তেল হয়েছে!"

শিবু বলিল, "আজ্ঞে, আমার ভাঁড়ে এক রত্তিও তেল নেই, তেল আনতে কলুবাড়ী যাচ্ছি।"

বাবু বলিলেন, "আবার ঠাট্টা! বেল্লিক, বাঁদর, পাজী, উল্লুক!"

শিবু বলিল, "গাল দেবেন না বাবু! আমি কোন অপরাধ করিনি। গালেরও তোয়াক্কা রাখিনে।"

বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া ভৃত্যদ্বয়কে আদেশ করিলেন, "এই বদমায়েসকে ঘা কতক লাগা!"

রূপো ও সোনা শিবুকে মাটীতে ফেলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন তাহার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল, তখন তাহারা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া পথে ফেলিয়া আসিল। পথিকরা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া 'আহা' বলিতেও সাহস করিল না, পাছে বাবু রাগ করেন!

শিবু অতি কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে আখড়ায় ফিরিয়া গেল এবং বলরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া জমীদার বাবুর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা তাঁহার গোচর করিল।

বলরাম ধীরভাবে সকল কথা শুনিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তিনি স্নেহভাবে শিবুর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শিবু বলিল, "প্রভু, বিনা দোষে জমীদার বাবু আমার হাড় গুঁড়া

ক'রে দিয়েছে! তুমি এর বিচার কর, অপরাধীকে শাস্তি দাও। আমি জানি, তুমি সব পার।"

বলরাম বলিলেন, "না শিবু, আমি কিছুই পারি নে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কর্ত্তা আর এক জন। কিন্তু তুই আমার কাছে নালিশ করছিস কেন? কার নামে নালিস করছিস? এই জমীদারটা কি মানুষ? মানুষ কি মানুষকে মারে? মানুষ মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, স্নেহ-মমতা করে; দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, বিপন্নকে সাহায্য করে; আর্ত্তের চোখের জল মুছিয়ে দেয়, ইহাই মানুষের ধর্ম্ম। তুই যার কথা বলছিস, তুই দেখছিস সে মানুষ, আমি দিব্য চক্ষুতে দেখছি, সে একটা ক্ষ্যাপা কুকুর, বিষয়-বিষে ও অহঙ্কারে সে ক্ষেপে গিয়েছে! আমি তার দাঁত, নখ সকলই দেখতে পাচ্ছি! তুই কি পাগল যে, ক্ষ্যাপা কুকুরের নামে আমার কাছে নালিশ করছিস? আমার আশীর্ব্বাদে তোর গায়ের বেদনা সেরে যাবে। তুই আর দুঃখ করিস নে, শিবু।"

গুরুর কথায় শিবু সান্ত্বনা লাভ করিল। জমীদার বাবু বলরামের প্রতিও যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বলরাম ধীরভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহার অসহিষ্ণু শিষ্য-সেবকদের সংযত করিয়া রাখিতেন।

বলরাম মৃত্যুকালে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত দেহ যেন অগ্নিতে ভস্মীভূত বা ভূগর্ভে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া শৃগাল বা শকুনিরা তৃপ্তিলাভ করিলে তাঁহার মৃতদেহের সদ্ব্যবহার হইবে!

তাঁহার এই আদেশ পালিত হইয়াছিল। তাঁহার শব একটি অরণ্যে বটবৃক্ষমূলে সংরক্ষিত হইয়াছিল: তিন দিন পর্য্যন্ত সেই শব পশু-পক্ষীতে স্পর্শ করে নাই। চতুর্থ দিন সেখানে শবের চিহ্নমাত্র ছিল না।

বলরামের শিষ্যরা তাঁহার আখড়ায় একটি সুন্দর অট্টালিকা ও একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছে, এবং আখড়ার নীচে নদীতে একটি ঘাট বাঁধাইয়াছে। এই ঘাটটি 'দরবেশের ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ।

অট্টালিকায় একখানি খাটে বলরামের শয্যা প্রসারিত আছে। সেখানে বলরামের লাঠি, খড়ম, আসন প্রভৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামের মানত করিয়া অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছে। মৃতবৎসা রমণীগণ এখনও বলরামের 'মানত' করিয়া পুত্র লাভ করে এবং বলরামের প্রসাদে জীবনরক্ষা হওয়ায় পুত্রের নাম রাখে "বলরাম।" অনেকে গাছের ফল ও নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বলরামের আখড়ায় উপহার দিয়া আইসে। অনেকেরই বিশ্বাস, বলরাম দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বলরামের আখড়ার বর্ত্তমান সেবাইতের নাম জীবন দরবেশ।

প্রতি বৎসর বারুণীর সময় বলরামের আখড়ায় বলরামের দোল হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন জিলা হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। উৎসব তিন দিনস্থায়ী হয়। এক দিন লুচির ফলার, এক দিন চিড়ার ফলার, ও এক দিন "অন্ন-মচ্ছব" হইয়া উৎসব শেষ হয়। বারুণীর দিন আখড়ায় অনেক দোকান-পসারী পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে। আখড়ার আঙ্গিনাখানি অচিরে লাল হইয়া যায়। অনেক ভক্ত মন্দিরে মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়া বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; অনেকে সিকি, দুয়ানী, পয়সা দিয়া মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করে।

দেশবিদেশ হইতে দোলের সময় যে সকল নরনারীর সমাগম হয়, তাহারা নানা শ্রেণীর লোক; কিন্তু সকল জাতি একত্র বসিয়া আহার করে, যেন তাহারা জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছে! এই সকল যাত্রীর মধ্যে দুই চারি জন ব্রাহ্মণও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলরামের হাড়ী-বাগ্দী শিষ্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহারা সকলেই বলরামকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। স্থানীয় অনেক লোক তাহাদের এই বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আশ্রমে কয়েকখানি কুটীর আছে। কয়েকটি পুরুষ এবং কয়েক জন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সেখানে বাস করে। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখা যায় না। গৃহস্থ-রমণীগণ তাহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় অবজ্ঞা করেন না।

বলরামের দোলের তিন দিন আখড়ায় দিবারাত্রি খোল-করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত আলাপ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে বলরামের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, এবং বলরামের রচিত দেহতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক পদ গীত হইয়া থাকে, আর মুহুর্ম্মুহুঃ 'জয় বলরামচন্দ্র' 'জয় হাড়ীরামচন্দ্র'—বলরামের এই জয়ধ্বনিতে ক্ষুদ্র পল্লীখানি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জ্যোছনা রাতের ডাক

গভীর রাতে বেরিয়ে এলাম দোর খুলে' বাটটিতে
মনের কানে ডাক শুনে কার' কে জানে,
বকুলতলা পেরিয়ে গেলাম নদীর বিজন ঘাটটিতে—
ঢেউয়ের বেণী গাঁথ্‌ছে নদী উজানে!

নদী-পারের বনে থেকে বাজায় বাঁশী কোন্ জনা?
রেশ আসে—সুর যায় না বোঝা সবখানি;
কে ডেকেছে,—কোথায় সে জন? মন হ'ল যে উন্মনা··
গান হয়ে মোর ফুটতে যে চায় সব বাণী!

মিশিয়ে বকুল-ফুলের বাসে নিশীথ-নদীর জলকণা
দখিণ বাতাস বেড়ায় তৃণ চঞ্চলি';
ভিজে চুলের সুগন্ধ কার কর্‌ছি কেনই কল্পনা—
কাঁপ্‌ছে প্রাণে প্রণয়-ব্যথার অঙ্গুলি!

আকাশ থেকে আস্‌ছে নেমে নীল অসীমের বুক বেয়ে
নীলবসনা কোন্ রূপসীর রূপ ঘেমে;
আত্মহারা দিগন্ত ঐ আকাশ-পানে মূক চেয়ে—
আমিও উদাস কার যে অপরূপ প্রেমে!

একলা জাগি নদীর কূলে—শিথিল বেশে ঘুমায় গ্রাম—
বের করেছে আমায় ডেকে জোছনা-রাত;
গভীর রাতে ঘুরে বেড়াই,—কোন্ বিরহের শুনায় গান
রাত্রি আমায়, রাগিণী তার জ্যোছনা-পাত!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মহাচীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন

বলকানের বোসনিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভো সহরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এক দিন গ্রেভিলো প্রিন্সেপ নামক এক বালক এনার্কিষ্টের গুলীর আঘাতে সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই গুলীর আঘাতে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ নিহত হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। সামান্ত একটি ঘটনাসূত্র হইতে জগতে কত ভাঙ্গন-গড়নের আয়োজন হয়, তাহা এই ব্যাপার হইতে জানা যায়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাচীনের সাংহাই বন্দরে চীন নাশানালিষ্টদিগের বিপক্ষে বৈদেশিক দূতাবাস হইতে যে গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার পরিণাম কোথায় হইবে, কে বলিতে পারে?

স্বাধীনতা-প্রয়াসী চীনের নব্য সম্প্রদায় সেই মে মাসে বিদেশী পণ্যের বিপক্ষে যে বিরাট ধর্ম্মঘটের এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মহাচীনের বিরাটত্বের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছিল, বুঝি বা ইহাই চীনের স্বাধীনতাসমরের প্রকৃত সূত্রপাত। তাহার পর বহুদিন গত হইয়াছে, কিন্তু এখনও চীনে নাশানালিষ্ট আন্দোলনের গতি পূর্ণমাত্রায় রুদ্ধ না হইলেও চীন যে গৃহবিবাদের হলাহলে এতাবৎ জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, বরং তাহার ফলে অধিকতর দুর্ব্বল এবং বৈদেশিকের স্বার্থ-সঞ্জাত চক্রান্তে অধিকতর জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছে।

চীনের স্বাধীনতা-সূর্য্যের প্রতীক ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন যে দিন হইতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে চীনের গৃহবিবাদ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সান-ইয়াট-সেন রাজশক্তির উচ্ছেদ-সাধন করিয়া প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রবর্ত্তন করিবার পরেও যে চীনে গৃহবিবাদ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এমন কথা বলিতেছি না। অন্তর্হিত হওয়া দূরে থাকুক, একবার এই গৃহবিবাদের ফলে সানকে চীন ছাড়িয়া জাপানে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। চীনের শক্তিশালী War-Lords বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা (টুচুন) য়ুরোপের মধ্যযুগের ব্যারণদিগের মত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বহস্তগত করিয়াছিলেন। য়ুরোপে যেমন সে সময়ে রাজারা এই সকল শক্তিশালী ব্যারণের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, চীনের রাজশক্তি ও পরে প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টও তেমনই এই সকল টুচুনদিগের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মধ্যযুগে যেমন Warwick, Kingmaker হইয়াছিলেন, তেমনই চীনের টুচুনরা যাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিতেন, তিনিই চীনে কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ পাইতেন। চীনের রাজশক্তির প্রভাবের দিনে তাঁহারাই মাণ্ডারিণরূপে পরিচিত ছিলেন। কখনও কখনও এমন ঘটিত যে, মাণ্ডারিণ বা টুচুনরা নিজ নিজ এলাকায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেন, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বা প্রজাশক্তিকে গ্রাহ্য করিতেন না। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পর শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইতেন। ফলে চীনে গৃহবিবাদ লাগিয়াই থাকিত। মাণ্ডারিণ বা টুচুনরা আপন আপন সৈন্যদল পোষণের জন্য হয় নিজ এলাকার, না হয় অপর টুচুন বা মাণ্ডারিণের এলাকার প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেন। এ জন্য চীনের কোথাও প্রজার ধন-প্রাণ বা মান-ইজ্জৎ নিরাপদ ছিল না। সর্ব্বত্রই প্রায় অরাজকতা বিরাজ করিত।

ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের সময়েও চীনের এই অবস্থার কতকটা প্রতীকার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি উত্তর-চীনে বিফলমনোরথ হইয়া দক্ষিণ-চীনে কাণ্টনের দিকে যে প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই গভর্ণমেণ্ট এই অরাজকতার মধ্যেও কতকটা শৃঙ্খলা আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সেনা ও জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চীনের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকালমৃত্যুর ফলে চীনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইল।

তাঁহার সময়ে যে তিন জন War-Lord অস্ত্রত্র চীনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় 'মাসিক বসুমতীতে' একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে। জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন, জেনারল উ-পেইফু অথবা জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ যে বর্ত্তমানে চীনের তিন জন প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই তিন জন শক্তিশালী War-Lordএর পরস্পর কলহ ও দ্বেষ-হিংসার ফলে চীন আজ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, তাহার স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে কিরূপে? মার্কিণ দেশের লিবারল মতাবলম্বীরা যথার্থই চীনের স্বাধীনতা-প্রয়াসী। তাঁহারা চীনকে এই মুহূর্ত্তেই স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে চাহেন,—চীন যাহাতে কোনওরূপে কাহারও অধীন না থাকিয়া নিজের স্বাধীন শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারে, তাহারই কামনা করেন। কিন্তু মার্কিণের সাম্রাজ্যবাদী কনজারভেটিবরা তাহার উত্তরে ভয় দেখাইয়া বলেন, "তাও কি হয়? চীনে এখন যে জাতীয়তার অগ্নিশিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, উহা প্রকৃত দেশপ্রেম হইতে সঞ্জাত হয় নাই, যেমন অন্য অনেক সময়ে বিদেশী বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, তবে ভিন্ন আকারে। চীনের জনগণের মধ্যে আদৌ একতা নাই, সুতরাং তাহারা তুর্ক জাতির মত এক দিনে জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মদিরায় উন্মত্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারিবে না। চীনকে এখন স্বাধীনতা দিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। চীনের বিভিন্ন স্বার্থচালিত সম্প্রদায়সমূহ ও War-Lordরা স্বাধীনতা পাইলেই পরস্পর কেন্দ্র-শক্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত রক্তারক্তি করিবে এবং তাহার ফল অরাজকতা ও বিদেশীয়ের বাণিজ্যনাশ।"

ঠিক এই ভাবের কথাই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন। ইহাতে নূতনত্ব নাই। সুখের বিষয়, চীন ভারতের মত সকল বিষয়ে পরাধীন নহে। যদিও কয়েক মাস পূর্ব্বে চীনের নাশানালিষ্টরা মহাত্মা গন্ধীর নিকট সখেদে অনুযোগ করিয়াছিল যে, 'ভারত এক প্রভুর অধীন, চীন নানা প্রভুর অধীন', তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, Treaty ports অথবা Concessions ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যে

দিন চীনের War-Lordরা একযোগে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইবে, সেই দিন চীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে, অন্যথা নহে।

চীনের খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ-যুসিয়াঙ্গ এই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে য়ুরোপীয় প্রথায় রণশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিলেন এবং চীন হইতে বৈদেশিকের প্রভাব দূর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি গত এপ্রেল মাসে মাঞ্চুরিয়ার War-Lord চাঙ্গ-সো-লিন ও মধ্যচীনের জেনারল উ-পেইফুর সম্মিলিত শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার Kuomanching বা People's army অথবা জনগণের সেনাদল সমভিব্যাহারে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে মস্কৌ সহরে গিয়া রুসিয়ান বলশেভিক শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইয়াছে।

যে সকল চীন নর-নারী বিদেশীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কাণ্টনে প্রকাশ্য রাজপথে তাহাদের বিচার

এ দিকে মাঞ্চুরিয়ার War-Lord চাঙ্গ-সো-লিন ও জেনারল উপেইফু জাপানের সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে যাঁহারা একযোগে স্বদেশের মুক্তি-সাধনে সফলকাম হইতে পারিতেন, তাঁহারা পরস্পর দ্বেষহিংসার ফলে জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্ধ শক্তিসমূহের হস্তের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা চীনের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

জার্ম্মাণ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পতনের পরে এবং রুসিয়ার জার-শাসিত গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের পরে জগতে এখন তিনটি প্রধান Imperialistic বা সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব অনুভূত হয়;—বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপান। বলশেভিক রুসিয়া অথবা গণতন্ত্রবাদী মার্কিণ স্বয়ং প্রচার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী নহেন, তাঁহারা চীনের স্বাধীনতা-প্রয়াসী, চীন যাহাতে শক্তিশালী ও স্বাধীন হইয়া অন্যান্য জাতির ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা দেখিতে চাহেন। বলশেভিক রুসিয়া জার-শাসিত রুসিয়ার প্রায় সমস্ত অধিকার চীনে ছাড়িয়া দিয়া চীনের সহিত সমানে সমানে ব্যবহার করিতেছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বে অন্য সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। বলশেভিকরা জগতের অপর শক্তিগণকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা চীনকে অতঃপর কাহারও অধীন দেখিতে চাহেন না। যদি কেহ চীনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষে তাঁহারা চীনকে সাহায্যদান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই আপাততঃ সাধু উদ্দেশ্যে অন্যান্য শক্তি সন্দেহ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রুসিয়ান ভল্লুক এইরূপে মুখে চীনের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া চীনের রেল ও ব্যবসায়ে বিশেষ অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন।

মার্কিণ সর্ব্বদা আপনাকে চীনের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, তিনি কোনও কালে সাম্রাজ্যবাদী নহেন। তবে যে 'ফিলিপাইন' দ্বীপপুঞ্জ স্বাধিকারে আনিয়াছেন, তাহা কতকটা ইংলণ্ডের In a fit of absent mindedness সাম্রাজ্যবিস্তারের মত! তিনি এ যাবৎ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন,—(১) Integrity, (২) Open Door. চীনের Integrity অর্থাৎ স্বাধীনতা ও শক্তি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাই তাঁহার প্রধান কামনা। যদি অপরাপর শক্তি তাহাতে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিতে অগ্রসর হইবেন না বটে, তবে সকলের যাহাতে চীনে বাণিজ্য ও অধিকারের সমান অধিকার থাকে, তিনি তাহাতে অবহিত হইবেন; ইহাই তাঁহার Open Door policy. কোনও মার্কিণ রাজপুরুষ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"Our chief desire is to see firmly established the sovereignty, the independence and the territorial and administrative integrity of China. Though we have never been desirous of territory in China, we have had no intention of abandoning to other nations the great commercial possibilities of the Chinese market."

চীনের রাজনীতিক সমস্যা যে কত জটিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে। চীনের market হইল মধুচক্র, ইহার আশে-পাশে প্রতীচ্যের নানা শক্তিশালী জাতি মধুকরের ন্যায় মধুর আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং এ অবস্থা যত দিন থাকিবে, তত দিন চীনের মুক্তির আশা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? বিশেষতঃ চীন যেরূপ গৃহ-বিবাদে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাতে ত মধুকরদিগের মধু লুঠিবার বিশেষ সুযোগ। মার্কিণ তাঁহার সদিচ্ছার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ডের প্রতি একটু শ্লেষের কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইংরাজও তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "মার্কিণ বড় মজার লোক। তিনি সর্ব্বদা চীনের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাইয়া থাকেন। যাহাতে চীনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহার জন্য ওকালতী করিয়া থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অপরাপর বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ বা diplomatic সন্ধির ফলে চীনে কোনও কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই মার্কিণ অগ্রণী হইয়া তাহার ভাগ চাহিয়াছেন। তিনি নিজে কখন বীজ বপন করেন না, কিন্তু ফল উপভোগের সময়ে সকলের অগ্রগামী। তাঁহার এ ভণ্ডামীর অর্থ কি?"

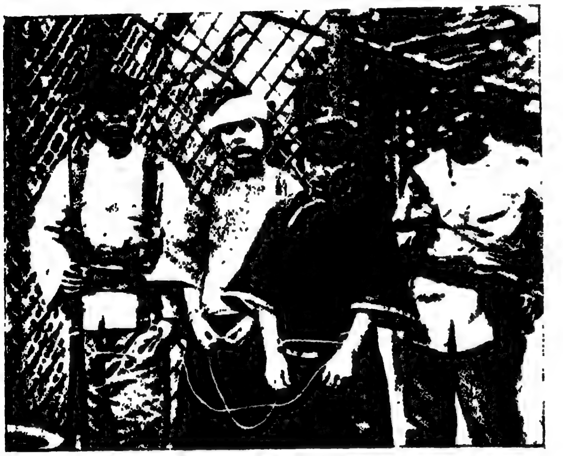

কাণ্টনে ধর্ম্মঘটভঙ্গকারিণী বন্দিনী চীনা যুবতী

মার্কিণ এই উত্তরের প্রত্যুত্তরও যোগাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন,—"মার্কিণ প্রথমাবধি চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিণ বিলক্ষণ বুঝেন যে, যদি তাঁহার এই নীতি সফল করিতে হয়, তাহা হইলে মার্কিণকে অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির মত চীনে সমান অধিকার দখল করিয়া রাখিতে হয়, অন্যথা মার্কিণ যদি অন্যান্য জাতিকে চীনে বিশেষ অধিকার উপভোগ করিতে দিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে পরে চীনের কোনও ব্যাপারে ন্যায় তাঁহাকে কোনও কথা কহিতে দেওয়া হইবে না। মার্কিণ-দূত ক্যালেব কাসিং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াংসিয়ার যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, তাহাতে এই সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিলেন যে, চীন অন্যান্য বৈদেশিককে যে অধিকার দিবে, মার্কিণকেও তাহা দিতে হইবে। তাহাই মার্কিণের Open Door Policy." মার্কিণের এ কথাটা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন রুসিয়া, জাপান, বৃটেন ও জার্ম্মাণী চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে সময়ে মার্কিণ ষ্টেট সেক্রেটারী হে যে কড়া ঘোষণা (Note) করিয়াছিলেন, তাহাতেই চীনের স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছিল। সেক্রেটারী হে জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, যদি শক্তিপুঞ্জ চীনকে এইভাবে ভাগাভাগি করিয়া লইতে যান, তাহা হইলে চীনে Open Door Policy অর্থাৎ সকলের সমান অধিকার রাখিতে হইবে। মার্কিণের এই হুঙ্কারে শক্তিপুঞ্জ পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন।

তাহার পর রুসজাপান যুদ্ধকালে 'ক্ষুদ্র' জাপান বিরাট জার-শাসিত রুসিয়ার সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সে সময়ে প্রেসিডেণ্ট রুসভেণ্ট জাপানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, জাপান প্রশান্তসাগরে মার্কিণের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও রুসিয়া চীনের মাঞ্চুরিয়া ও লাওটাঙ্গ উপদ্বীপ গ্রাসে উদ্যত হইয়াছিল এবং জাপান উহাতে বাধা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া মার্কিণ জাপানের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে চীনের প্রতি মার্কিণের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পরে জাপান যখন নিজে রুসিয়ার মত চীনের রাজ্য-গ্রাসেচ্ছায় উদ্যত হইল, চীনে Integirty অথবা Open door নীতি মানিতে সম্মত হইল না, তখন আবার মার্কিণ জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারই ফল Washington Conference-এর অধিবেশন। ঐ বৈঠকে ইংরাজ, ফরাসী ও জাপানও যোগদান করিয়াছিলেন। ফলে সকলেই মার্কিণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চীন-দেশে রাজ্যবিস্তারের অথবা অন্যায় অধিকারলাভের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাও মার্কিণের চীন-প্রীতির পরিচায়ক। মার্কিণ এইরূপে চীনের Integrity অথবা স্বাধীনতারক্ষায় অগ্রণী হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মার্কিণ Imperialistic শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগদান করেন নাই, বরং Imperialist শক্তিরা তাঁহার প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চীনের সহিত বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের সংস্পর্শ হওয়া অবধি এই সর্ব্বপ্রথমে চীন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনল হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

সর্ব্বশেষে মার্কিণ চীনের আরও একটি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মার্কিণের উদ্যোগে চীন সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক Consortium এর বন্দোবস্ত হইল। এই Consortium বা সমবেত শক্তিপুঞ্জ চীনকে কোন ঋণ দিয়া সাহায্য করেন নাই, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু অতঃপর কোনও দায়িত্বহীন সামরিক adventurerকে রেল ও অন্যান্য সম্পর্কে বিশেষ অধিকারদানের পরিবর্ত্তে চীন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এ কথা Consortium ধার্য্য করিলেন। জাপান এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী ছিলেন। তাঁহার Nishihara Loans ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি চীনকে এই ঋণ দিয়া চীনের সাম্রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষে জাপান গভর্ণমেণ্টের এই ঋণের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও পরোক্ষে যে ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

ওয়াসিংটন কনফারেন্সের আর একটি সুফল এই হইয়াছিল যে, চীন ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তচ্যুত অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাষ্টম টেরিফের বৃদ্ধি এবং অপরাধী বৈদেশিকগণের চীনের আইন ও আদালতের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকার-লোপ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাহাতে চীন এই সকল অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য মার্কিণের চেষ্টায় পিকিং কনফারেন্সের আয়োজন হইয়াছিল। পিকিংয়ে যে কাষ্টম কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মার্কিণ প্রতিনিধিরা ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপরেও চীনের জন্য অধিক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে শক্তিপুঞ্জ চীনকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কাষ্টম বিভাগে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ইহা চীনের পক্ষে অল্প লাভের কথা নহে।

মস্কৌ সহরে জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ। মধ্যস্থলে যিনি দণ্ডায়মান, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পুষ্টকায়, তিনিই ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ

মার্কিণ রাজনীতিকরা এই পর্য্যন্ত মার্কিণের সদিচ্ছার পরিচয় দিবার পর বলেন যে, তাঁহারা চীনে যে সংস্কারের শুভ বেদীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ চীনে বলশেভিক প্রভাব উহা শিথিল-মূল করিয়া দিয়াছে। বলশেভিকরা বন্ধুবেশে দেখা দিয়া চীনের সহিত সমানে সমানের ব্যবহারের ভাণ করিয়া, চীনে নিজের সকল প্রকার বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিয়া ভিতরে ভিতরে শত্রুরূপে জার-শাসিত রুসিয়ার মত ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান ও উত্তর-চীনে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

ইহার ফলে বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপান বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা অতঃপর আর ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা মার্কিণকে স্পষ্টই বলিলেন যে, রুসিয়া গোপনে চীন গ্রাস করিবে, আর তাঁহারা 'ভালমানুষি' করিয়া চীনে তাঁহাদের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিবেন, তাহা হইতে পারে না। মার্কিণ প্রমাদ গণিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা বিফল হইল। মার্কিণ দেখিলেন, তিনি যদি চীনের স্বার্থরক্ষার জন্য তখন জিদ করেন, তাহা হইলে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নূতন সন্ধিসর্ত্ত হইবে এবং উহার ফলে কেহই মার্কিণের ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্ত মানিবে না, পরন্তু রুসিয়া,—মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থান সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবে, জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইবে, ইংলণ্ড, তিব্বত এবং হংকংএর সান্নিধ্যে ইয়াংসি উপত্যকা অধিকার করিয়া লইবে, ফরাসী য়ুনান ও কোয়াংসি অঞ্চলে খেসারতের অছিলায় নূতন ভূমি গ্রাস করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বী War-Lordদের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে; ফলে চীনের সর্ব্বনাশ হইবে।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া মার্কিণ আপাততঃ চীনকে সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবার অর্দ্ধ-পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মার্কিণ বলিতেছেন, চীনের ভাগ্যদেবতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন, তিনি কি করিতে পারেন?

বস্তুতঃ মার্কিণের এই সদুদ্দেশ্য থাকুক বা না-ই থাকুক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, চীন ভারতেরই মত নিজেই নিজের শত্রু। নিজের ঘোর দুর্দ্দশার কথা চীনের দেশপ্রেমিক War-Lordরা একবার স্মরণ করেন না। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণের মত তাঁহারাও বোধ হয় মনে করেন, "চীন যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে আমার দ্বারাই হউক, অপরের দ্বারা হইতে দিব না।" চীনে তাঁহাদের বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান। ইহার ফলে বৈদেশিকের ধনপ্রাণ সেখানে নিরাপদ নহে। সে অবস্থায় বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনে তাঁহাদের স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টা না করিয়া পারেন না। চীন যত দিন নিজের ঘর সামলাইতে না পারিবে, তত দিন ভারতেরই মত তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে না।

ইবন সাউদ

জগতে অধুনা যে কয় জন ক্ষণজন্মা পুরুষ এক একটা দেশ বা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, আরবের সুলতান আবদুল আজিজ ইবন সাউদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা অথবা শা-ইন-শা মহম্মদ রেজা খাঁ পহ্লবী যেমন তুর্কী ও ইরাণের ভাগ্যবিধাতৃ-রূপে আবির্ভূত হইয়া তুর্ক ও ইরাণীকে নূতন জাতিতে পরিণত করিতেছেন, ইবন সাউদও তেমনই আরবের স্বাধীন মরুবাসীদিগকে এক সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর এক জন শক্তিশালী পুরুষও আর এক মুসলমান রাজ্যের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন—তিনি রিফের রাণা প্রতাপ আবদুল করিম। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি আজ প্রবল আততায়ীর হস্তে বন্দী—রাণা প্রতাপের মত স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া হাসিমুখে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এ সংসারে পাশার খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, কাহার ভাগ্যে লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হয়েন, তাহা কেহই কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু তাহা বলিয়া আবদুল করিমের পুরুষকারের অভাব ছিল না। তিনি আজ হৃতরাজ্য ও শত্রুর অধীনতা স্বীকার করিলেও তাঁহার উদ্যমের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

নেজদের সুলতান আবদুল আজিজ ইবন সাউদ ভাগ্যবান্ শক্তিশালী পুরুষ। তিনি অসিহস্তে নিজের ভাগ্য-পথ পরিষ্কার করিয়া আজ প্রায় সমগ্র আরবের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছেন, আরবজাতি এখন তাঁহার মুখ চাহিয়া আপনাদের উন্নতি-কামনা করিতেছে। জাতির প্রিয়পাত্র হইবার সৌভাগ্যলাভ কয় জন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে ?

গত জার্ম্মাণযুদ্ধকালে জার্ম্মাণ-বন্ধু তুর্কীর বিপক্ষে ইংরাজ যে সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সেই সময়ে মক্কার সরিফ হুসেন আপন প্রভু তুর্কীর বিপক্ষে ইংরাজকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ফলে ইংরাজের কৃপায় তিনি হজ্জ অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মস্থানসমূহের রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আরবরা কিন্তু তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। ইবন সাউদ অসন্তুষ্ট আরবদিগের দলপতিরূপে তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। কি জানি, কি কারণে ইংরাজ সে সময়ে রাজা হুসেনকে সাহায্য করেন নাই। ফলে ইবন সাউদ রাজা হুসেনকে রণে পরাস্ত করিয়া হজ্জের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করেন।

মিশরের মরুভূমিতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমীন রিহানী

সেই যুদ্ধে ইবন সাউদের গোলার আঘাতে মুসলমানের দৃষ্টিতে পবিত্র কয়েকটি সমাধিস্থান ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া জনরব রটিয়াছিল। ফলে মুসলমান জগতে উহার বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়! এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ ভারতবর্ষ হইতেও একটি ডেপুটেশান হজ্জে গমন করিয়াছিল। ডেপুটেশানের রিপোর্টে জানা যায় যে, সমাধিমন্দির ধ্বংসের কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। ইবন সাউদ সেই অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে গোলাগুলীর আঘাতে কোন স্থান ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে ঐ কার্য্য যে তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা নিশ্চিত। শত্রু ঐ সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে দূর হইতে গোলা মারিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিলে ন্যায়যুদ্ধের আইনের ব্যতিক্রম করা হয় না। তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যখন আর ফিরাইয়া আনা যায় না, তখন তাঁহার সাধ্যমত তিনি ঐ সকল স্থানের সংস্কারসাধন করিবেন। পরন্তু তিনি এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, মুসলমানের ধর্ম্মস্থান হজ্জের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসন-ব্যবস্থার জন্য তিনি জগতের সকল মুসলমানের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সম্মত আছেন।

তাঁহার এই কৈফিয়তে জগতের সকল মুসলমানই যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। এখনও বহু মুসলমান তাঁহার প্রতি ঘোর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মী ওহাবী আরবদিগের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকেই তাহাদের দলপতিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ ইবন সাউদ প্রকৃতপক্ষে আরবের অবিসংবাদী রাজা।

এ হেন ইবন সাউদের সবিশেষ পরিচয় জানিবার আগ্রহ সকলেরই মনে সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। ইবন সাউদ কে, তিনি কি প্রকৃতির লোক, কোন্ গুণে তিনি মরুভূর চিরস্বাধীন দুর্দ্ধর্ষ ওহাবী আরবের হৃদয় জয় করিয়াছেন ?

আমীন রিহানী জন্মে সিরিয়া দেশের আরব, তিনি [illegible] তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী। তিনি মার্কিণ দেশে বসবাস করিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মার্কিণ নাগরিক হইয়াছেন। ইরাকের ইংরাজ হাই কমিশনার সার পার্শি কক্স যে সময়ে ইরাক ও নেজদের মধ্যে এক সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিতে ইবন সাউদের সহিত নেজদে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমীন রিহানী নেজদে গিয়া ইবন সাউদকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপপরিচয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই ভূয়োদর্শনের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে ইবন সাউদের কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

আরবের মানচিত্রে পারস্যোপসাগরের দক্ষিণাংশে বাহরিণ নামে একটি দ্বীপ দেখা যায়। ঐ দ্বীপের পশ্চিমে আরবের স্থলাংশে একটি বন্দর আছে, উহার নাম ওজেয়ার। এই বন্দর হইতে হাসা, দাহনা, রিয়াধ, ওয়াসিম, সামার, কাসিম প্রভৃতি জনপদে যাওয়া যায়। এই বন্দর ও জনপদগুলি সুলতান ইবন সাউদের নেজদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সার পার্শি কক্স বাহরিণ দ্বীপ হইতে ওজেয়ার বন্দরে ইবন সাউদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমীন রিহানী তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার পূর্ব্বে ওজেয়ার যাত্রা করিয়াছিলেন।

বাহরিণ হইতে তিনি জালিবোটে করিয়া ওজেয়ারে উপস্থিত হয়েন। সেখানে জালিবোটের উপর এক পতাকা উড্ডীন করা হইল, তাহার বর্ণ হরিৎ, পাড় শ্বেত, উহাতে আরবীতে লিখা ছিল,—"লা ইলাহা এল্লেল্লা," আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহাই ইবন সাউদের জাতীয় পতাকা।

ওহাবীরা মুসলমানদের মধ্যে 'পিউরিটান' অর্থাৎ কঠোর ধর্ম্মবিশ্বাসী—কোনওরূপ ধারণা তাহাদের একেশ্বরবাদে আঘাত করিতে পারে না। এই হেতুই কি ইবন সাউদের পতাকায় কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি লিখিত ছিল ? কে জানে !

ওজেয়ারে সুলতানের শাসনকর্ত্তা ওজেয়ারের আমীর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমীর অর্থে এই স্থলে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত আমীর নহে, সুলতানের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার পদবী আমীর। নেজদের ওহাবীদের মত গণতন্ত্রবাদী জাতি ভূমণ্ডলে নাই। তাহাদের আমীর ফকীর নাই, আল্লার রাজ্যে সকলেই সমান। যাহাই হউক, ওজেয়ার হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে ৪০ মাইল মরুভূ-পথ পর্য্যটন করিয়া

আলহাসায় পৌঁছিবার কথা ; সেই স্থানে সুলতান ইবন সাউদ অপেক্ষা করিতেছিলেন ।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অর্দ্ধপথে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূর মধ্যস্থলে আমীন রিহানী সুলতানের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, সুলতানও স্বয়ং আলহাসা হইতে ওজেয়ারে আসিতেছিলেন।

প্রথম দর্শন রিহানীর মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। তিনি দেখিলেন, শ্বেত ও পীত বস্ত্রে আপাদ-মস্তক-মণ্ডিত, দীর্ঘ, বৃষ-স্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু, মহাভুজ মূর্ত্তি! তিনি যেন এক প্রকাণ্ড দানবের সম্মুখে বামনের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইবন সাউদ ৬ ফুট হইতেও উচ্চ। তাঁহার মাংসপেশী-সমূহ দৃঢ়, সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত, দীর্ঘ পুষ্ট শরীরে বসার লেশমাত্র নাই। তাঁহার দেহ শুভ্র অঙ্গরাখায় মণ্ডিত, তাহার উপর পীতবর্ণের 'আবা' আচ্ছাদিত ; শিরোদেশ রক্তাভ 'চেক'-বস্ত্রে মণ্ডিত, পাদদ্বয় পাদুকা-(sandal) শোভিত। তাঁহার নাসা তিলফুলের ন্যায় সুদীর্ঘ ও সরল, ওহাবী রীতি অনুসারে তাঁহার শ্মশ্রু ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত। দেখিলেই মনে হয়, তাঁহার মধ্য হইতে একটা শৌর্য্য, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শক্তির আড়ম্বর, বাদশাহের জাঁকজমক, প্রাচোর মণিমাণিক্যের ঘটা তাঁহাতে নাই! তিনিও যেন নেজদের এক জন সামান্য ওহাবী প্রজা! কেবলমাত্র তাঁহার শিরস্ত্রাণে একটি জরীর ফিতা শোভা পাইতেছিল, উহাই নেজদের রাজবংশীয়দের বিশেষ চিহ্ন।

ইবন সাউদের আরবদিগেরই মত বর্ণ, কিন্তু আরবদের মত তাঁহার কপোলাস্থি উন্নত নহে, পরন্তু তাঁহার নাসিকা সরল ও উন্নত। তাঁহার বয়স ৪৯ বৎসর হইবে। তিনি সর্ব্বদা সুগন্ধি দ্রব্যে অঙ্গ প্রসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা একটি বংশদণ্ড থাকে। যখন কোন কথার উপর জোর দিয়া বলেন, তখন তিনি সেই দণ্ডটি ভূমিতে সজোরে আঘাত করেন।

আমীন রিহানীকে দেখিয়া ইবন সাউদ বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে, আপনি মার্কিণ মিশনারী খৃষ্টান, আরবদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছে, আপনি কোনও মার্কিণ কোম্পানীর তরফ হইতে আরবদেশে ব্যবসায়ের বিশেষ অধিকার লাভের আশায় আগমন করিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক আমায় জানাইয়াছে যে, আপনি মক্কার সরিফ হোসেনের পক্ষপাতী ; তাঁহার হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতে আসিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি ? যদি এই লোকটার মধ্যে মন্দ থাকে, তাহা হইলে সেই মন্দ কিরূপে এড়াইতে হইবে, তাহা আমরা জানি। যদি উহার মধ্যে ভাল থাকে, তাহা হইলে উহার নিকট হইতে কি উপকার লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাও আমরা জানি। ওস্তাজ! (অধ্যাপক!) আমরা আপনার বিষয়ে অনেক খবরই রাখি। আল্লা আপনাকে রক্ষা করুন এবং আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এই কথা কয়টিতেই মানুষকে চিনিতে পারা কষ্টকর হয় না। তখনও মক্কার সরিফ হোসেনের সহিত ইবন সাউদের যুদ্ধ হইতেছে। সেই যুদ্ধের মধ্যেও ইবন সাউদ রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত অন্য কথা ভুলেন নাই। তিনি অতিথিসৎকার করিতেছেন, ইংরাজ হাই-কমিশনার সার পার্সি কক্সের সহিত ইরাকের ব্যাপার লইয়া আপোষ-কথা কহিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, আবার অন্যান্য আরব-সর্দ্দারদিগের দমনেও মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন। তাঁহার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব না থাকিলে এতগুলি কার্য্য একেবারে সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী কথা-বার্ত্তাতেই বুঝা যাইবে, কেন তিনি স্বয়ং আরব-সর্দ্দার হইয়া অন্যান্য স্বজাতীয় সর্দ্দারদিগের বিপক্ষে অসিধারণ করিয়াছিলেন।

যখন আমীন রিহানী বিনীতস্বরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, আমীর ইবন সাউদ যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমস্ত আরব-সর্দ্দারের মধ্যে একটা আপোষ-বৈঠক বসিতে পারে ও তাহার ফলে আরব জাতিদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইবন সাউদ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আরব কাহারা ?" তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল ; কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "আরব কাহারা ? আপনি কাহাদিগকে আরব বলিতে চাহেন ? জানেন, আরব কেবল আমরা। আমি ঐ সকল সর্দ্দারের সকলকেই জানি। তাহারা আমার মিত্ররূপে পরিগণিত। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন, তাহাদের মধ্যে আমার অতি বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্রও বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। আপনি আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর হইবেন না। সে একতা হইবার নহে।"

তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ইবন সাউদ আবার বলিলেন, "আপনি জানেন, আমিই প্রথমে আরবে একতা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্দ্দারগণকে বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ইহার প্রমাণ আমি দিতে পারি। কিন্তু সেই আমন্ত্রণের কি ফল হইয়াছে ?"

সুলতান ইবন সাউদ

ইবন সাউদের স্বদেশ-প্রেমিকতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি সরল, সত্যবাদী, কষ্টসহিষ্ণু: দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী আমীরদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী করা যায় না।

তিনি সামান্য আরব সৈনিকের ন্যায় কর্ত্তব্য ও শৃঙ্খলা-জ্ঞানসম্পন্ন। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, অতি অল্পসময় বিশ্রাম লাভ করেন। আমীন রিহানী বলিয়াছেন, তিনি সামান্য লোকের ন্যায় মরুভূর

বালুকাস্তরের উপর বসিয়া তাঁহাদের সহিত কাফি পান করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কয়েক জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও বন্দী আমীর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ, আমীর ফয়জুল ইবন রসিদ এবং হায়েলের আমীর আবদুল্লা ইবন মিতেরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া আমীর রিহানীকে বলেন, "ইহারাও আরব, আর এই আমার কষ্ট-সহিষ্ণু সেনারাও আরব। ইহাদের মধ্যে কত প্রভেদ! আমি আল্লার নিকটে ইহাদের সকলেরই জন্য দায়ী। আমরা নেজদ্‌বাসী আরব পয়গম্বরকে অনুসরণ করি। পয়গম্বর মুসলমানদের মধ্যে কোনও শ্রেণী বিভাগ করেন নাই, আমিও সকল মুসলমানকেই সমশ্রেণীভুক্ত দেখিয়া থাকি। সকলের উপরে আমি ধর্ম্ম ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া থাকি।"

তিনি ও তাঁহার ওহাবীরা অতীব ধর্ম্মপ্রাণ। সেই মরুভূর মধ্যে প্রার্থনাকালে তিনিও আরব ওহাবীদের সহিত একযোগে এক আসনে ভগবানের নাম-গান ও পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমস্বরে ইমামের প্রার্থনার পর 'আমীন' শব্দটি মরুভূমির গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সে প্রার্থনা এই:—"আল্লার জয় হউক। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে আল্লা, আমাদিগকে সত্য পথে পরিচালনা কর।"

ইবন সাউদের বিজিত আলহাসা প্রদেশের রাজধানী হোফাকের বাজার

ভয় কাহাকে বলে, তিনি জানেন না। যখন শুনিলেন, সার পার্শি তাঁহার সহিত কাউইটের ইংরাজ-দূত ও ওয়াদি-হারুণের শেখ ফাডদ-আল-হাজ্জালকে লইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি ক্রোধে অতি কঠোর ভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সার পার্শি শেখ ফাউদকে কেন আনিতেছেন? কাউইটের ইংরাজ দূতকেই বা কেন আনিতেছেন? তাঁহার সহিত ত এ কথা ছিল না। তিনি কি আমায় জোর করিয়া শেখ ফাউদের সহিত সীমানা সম্পর্কে সন্ধি করিতে বাধ্য করিতে চাহেন? না, কেহ আমাকে জোর করিয়া কিছু করাইতে পারিবে না। আমার পিতৃপিতামহ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমার জন্মগত অধিকার। যদি সে অধিকার আমি বন্ধুতা দ্বারা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে তরবারির দ্বারা রক্ষা করিব। অন্যে চক্রান্ত করিতে পারে। আমি চক্রান্ত জানি না। আমি কথার মানুষ, আমি সত্য পথে চলিয়া থাকি। যদি উহারা বন্ধুভাবে আমার সহিত কথা কহে, আমি তাহাতে সম্মত আছি। কিন্তু জোর করিয়া আমায় কেহ কিছু করাইতে পারিবে না।"

সে সময়ে তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল। অথচ অন্য সকল সময়ে তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক। তাঁহার হৃদয় কারুণ্য-রসে পূর্ণ। একবার যুদ্ধে তিনি হতাহত সৈনিকগণকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে বলিয়াছিলেন, "রাজার কর্ত্তব্য অতি কঠোর। আমি যদি রাজা না হইয়া সামান্য সৈনিক হইতাম!"

তিনি এ দিকে অতি রহস্যপ্রিয় লোক, সদালাপী, মিষ্টভাষী। যখন সার পার্শির গৃহে তাঁহার চা-পানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন 'সভ্য চা' পান করিতেছি, ইহা আমাদের মরুভূমির 'অসভ্য কাফিপান' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

মাত্র ২২ বৎসর পূর্ব্বে ইবন সাউদ অতি ক্ষুদ্র আমীর ছিলেন। সে সময়ে মধ্য-আরবে আমীর মহম্মদ ইবন রসিদ প্রবলপরাক্রান্ত। এখন ইবন সাউদ যেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি তখন সেইরূপ ছিলেন। সে সময়ে ইবন সাউদের পিতা আবদুল রহমান যুদ্ধে রাজধানী রিয়াদ হারাইয়া সপরিবারে কাউইটে নির্ব্বাসন বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজ (ইবন সাউদ) তখন মাত্র ২৪ বৎসরের যুবক। তিনি পিতার নির্ব্বাসনের ১০ বৎসর পরে কাউইটের শেখ মোবারকের সহিত যোগদান করিয়া ১৯০১ খৃঃ ইবন রসিদকে রণে পরাস্ত করেন। তখন হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য ধীরে ধীরে আরবের গগনে উদিত হইতে থাকে। মাত্র ২০ জন ওহাবী সৈন্য লইয়া প্রথমে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তুর্ক ও অন্যান্য আরব সর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়া তিনি আরবে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছেন।

আবদুল আজিজ ইবন সাউদের সম্বন্ধে যে যাহাই বলুক, তিনি যে এক জন মানুষের মত মানুষ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। তিনি সরল, সত্যবাদী, কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ওহাবী আরব। তিনি দূরদর্শী ন্যায়-বিচারক শাসনকর্ত্তা। তাঁহার মরুভূ-রাজ্যে পথঘাট, রেল, মোটর নাই বটে, কিন্তু তিনি এই বিশাল রাজ্য আপনার শক্তি ও মেধার দ্বারা সুশাসন করিতেছেন।

তাঞ্জিয়ার সমস্যা

পুরাণে আছে, রক্তবীজ মরিলে পর তাহা হইতে শত রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। মুর দেশের রিফ সর্দ্দার আবদুল করিমের সহিত যুদ্ধের অবসান হইল, আবদুল করিম বশ্যতা স্বীকার করিয়া মাদাগাস্কর দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলেন, তথাপি পরাজিত মুরদেশে বিজেতা ফরাসী বা স্পেন এখনও সর্ব্বরূপে অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। মুরদেশ হইতে যেন শত আবদুল করিমের উৎপত্তি হইতেছে। গোল উঠিয়াছে তাঞ্জিয়ার নামক স্থান লইয়া। স্থানটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অধিকার-স্বত্ব লইয়া ফরাসী ও স্পেনে বিশেষ মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্পেন হঠাৎ তাঞ্জিয়ার তাঁহার প্রভাবের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি জাতিসঙ্ঘের এসেমব্লিকে এবারকার অধিবেশনে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। ১লা সেপ্টেম্বর এই অধিবেশনের কথা। এই অধিবেশনে জাতিসঙ্ঘের

কাউন্সিলের পুনর্গঠন করিবার এবং জার্ম্মাণীকে জাতিসঙ্ঘে তুলিয়া লইবার কথা ছিল। হঠাৎ ইহার উপর স্পেনের নূতন প্রস্তাবে শক্তিপুঞ্জ বিচলিত হইয়াছেন,—তাঁহারা ভাবিতেছেন, যেন তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্পেন এ সম্বন্ধে শক্তিপুঞ্জকে এক নোটে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে পূর্ণরূপে তাঞ্জিয়ারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হউক। ইহাতেই গোল উঠিয়াছে।

তাঞ্জিয়ার উত্তর-আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলস্থ মাত্র ১৪০ বর্গ-মাইল জমী। জমী সামান্য, কিন্তু ইহার অধিকার-স্বত্ব সামান্য নহে ; কেন না, যে শক্তি এই জমীটুকুর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথের চাবিকাঠি তাহার হস্তে থাকিবে। ইংরাজের জিব্রাল্টার বন্দর ও দুর্গ যেমন য়ুরোপের উপকূলে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথের ও তথা প্রাচ্যের পথের চাবিকাঠি, তাঞ্জিয়ারও তেমনই আফ্রিকার উপকূলে ভূমধ্যসাগর ও প্রাচ্যে যাইবার পথের চাবিকাঠি। সুতরাং এমন strategic position এর স্থান কোনও শক্তিই সহজে অপরের হস্তগত হইতে দিতে পারেন না। বিশেষতঃ ইংরাজ ত একবারেই পারেন না। কেন পারেন না, তাহা বিলাতের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, স্পেন আবদার ধরিয়াছেন, তাঞ্জিয়ার তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতে। স্পেন চাহিয়াছেন, হয় তাঞ্জিয়ারকে তাঁহার মুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হউক, না হয়, তাঞ্জিয়ার শাসন করিবার অনুজ্ঞা তাঁহাকে দেওয়া হউক। বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে স্পেনকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, প্রথম সর্ত্তে বৃটিশ সরকার আদৌ সম্মত নহেন, তবে দ্বিতীয় সর্ত্ত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকার স্পেন ও ফরাসী সরকারের সহিত বিচার-আলোচনা করিয়া বলিতে পারেন, সর্ত্তে অনুজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে কি না। সার অষ্টেন আরও বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মুরদেশ সম্বন্ধে যে 'কনভেনশন' হইয়াছিল, তাহা ইংরাজ এখনও মানিয়া লয়েন নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে স্পেনের পক্ষের সকল কথা না শুনিলে এবং তাহাতে ফরাসীর কোন আপত্তি আছে কি না, না জানিলে কোনও সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন না।

মুরদেশ সম্বন্ধে ফরাসী ও স্পেনীয় শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কি কনভেনশন বা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। যদবধি ফরাসী ও স্পেনীয় শক্তিদ্বয় মুররাজ্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তদবধি তাঞ্জিয়ার নগর ও তৎসংলগ্ন ১৪০ বর্গ-মাইল ভূমি কাহারও প্রভাবান্তর্গত হয় নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও স্পেনে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে কেহই ঐটুকু জমীর উপর আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তার করিবেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তদবধি পর পর কয়টি রাজনীতিক সংসদ (Diplomatic Agency) দ্বারা তাঞ্জিয়ার শাসিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কনভেনসন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন উহার দ্বারা স্থির করেন যে, রাজনীতিক সংবাদগুলির অবসান করিয়া এক Committee of Control ও এক ব্যবস্থাপক সভার হস্তে তাঞ্জিয়ারের শাসনভার অর্পণ করা হইবে। উক্ত কমিটীতে আলজেসিরাস বৈঠকের স্বাক্ষরকারী শক্তিগণের আট জন দূত সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় ৪ জন ফরাসী, ৪ জন স্পেনীয় ও ৩ জন বৃটিশ প্রজা এবং ১৫ জন মুর সদস্যরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। মাত্র গত বৎসর হইতে ঐ কনভেনসন বলবৎ হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইটালী ও মার্কিণ উহা অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং ঐ কনভেনসন পুরামাত্রায় বলবৎ হইয়াছে বলা যায় না। যাহাই হউক, এই কনভেনসন অনুসারে তাঞ্জিয়ারে কোনওরূপ দুর্গাদি নির্ম্মাণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি তাঞ্জিয়ারে পর পর কয়েকটি হাঙ্গামা ও গোলযোগ ঘটিয়াছে। স্পেন এই অছিলায় তাঁহার দাবী পেশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন যে, তাঞ্জিয়ারে কনভেনসনের সর্ত্তানুসারে তিনি দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবেন না, অতএব তাঁহাকে তাঞ্জিয়ারে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অথবা শাসনের অনুজ্ঞা লাভ করিতে দেওয়া হউক। মুরদেশের যে অংশ স্পেনের প্রভাবের অধীন, তাঞ্জিয়ার সেই অংশে অবস্থিত। এ জন্য তাঞ্জিয়ারে যদি নিত্য গোলযোগ ও অরাজকতা অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্পেন উহা সুশাসন করিবার দাবী করিবার পূর্ণ অধিকারী। বিশেষতঃ ইটালী স্পেনকে সমর্থন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কিন্তু ফরাসী বা ইংরাজ যে কিছুতেই স্পেনকে এমন strategic position দখল করিতে দিবেন না, তাহা নিশ্চিত। মুরদেশে ফরাসীর বহুবিসারী স্বার্থ আছে ; তিনিও তাঞ্জিয়ারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন। সুতরাং সহজে তিনি অন্য শক্তিকে তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে দিবেন না। ইংরাজের ত কথাই নাই। এক জন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনীতিক স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“আমাদের সমুদ্র-সাম্রাজ্যের সকল পথ-ঘাট নিরাপদ রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তাঞ্জিয়ার কোন এক বিশিষ্ট শক্তির হস্তগত হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ ও ঐ পথ রক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র জিব্রাল্টার বিপন্ন হইবে। স্পেন বা অপর কোনও শক্তি মুরদেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করুক বা না করুক, তাহাতে ইংরাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যদি কোন শক্তি মুরদেশের উপকূলে তাঞ্জিয়ারের ন্যায় স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ পায় এবং যাহার ফলে জিব্রাল্টারের অবস্থান বিন্দুমাত্র বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে ইংরাজ তাহাতে কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারেন না।”

ইহা হইতে অধিকতর স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ? যে কারণে জিব্রাল্টারের প্রয়োজনীয়তা ইংরাজের নিকট অতীব মূল্যবান্, সেই কারণে মাল্টা, সুয়েজ ও এডেনও ইংরাজের নিকট মূল্যবান্। এ সকল সুরক্ষিত স্থান ইংরাজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের চাবিকাঠিস্বরূপ। ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজ এ সকল স্থান দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন।

সুতরাং স্পেনের আশা সুদূরপরাহত সন্দেহ নাই। মাসোলিনির ইটালী ফরাসীর বিপক্ষে চাল চালিয়া স্পেনকে তাঞ্জিয়ার লাভে উৎসাহিত করিতে পারে। কিন্তু সে পথে ইংরাজ প্রবল অন্তরায়। ইংরাজ ও ফরাসীর বিপক্ষে মাসোলিনির বজ্রমুষ্টি উত্তোলিত হইতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিশ্বস্ততার নিদর্শন

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে জুরিচ হইতে রুসিয়ায় লইয়া যাইব। যদিও রুসিয়া জুরিচ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, তথাপি এই উভয় স্থানের সহিত বর্ত্তমান উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

জোসেফ কুরেটের প্রতি কিরূপ কঠোর দণ্ডের আদেশ হইবে, রেবেকা কোহেন তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল বটে, তথাপি তাহার দণ্ডাদেশ শুনিয়া সে ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়াছিল। হতভাগ্য যুবকের প্রতি সমবেদনায় ও করুণায় তাহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। রেবেকা তাহার পিতার নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে কারাগারে জোসেফের নিকট একখানি পত্র পাঠাইতে পারিয়াছিল। সেই পত্রে সে জোসেফকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। জোসেফও সেই সকল নিহিলিষ্ট বন্ধুর সাহায্যে তাহার পিতা-মাতার নিকট পত্র পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই পত্রে সে তাহাদিগের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সে রেবেকাকেও এক ছত্রের একখানি পত্র লিখিয়াছিল; তাহাতে লিখিয়াছিল,—

"চিরবিদায়! আমাকে ভুলিয়া যাও।"

জোসেফ তাহার পিতামাতাকে লিখিয়াছিল, "বাবা, মা, তোমাদের কাছে এই পত্রই আমার প্রথম ও শেষ পত্র; আমি জীবনে আর কোন দিন তোমাদিগকে পত্র লিখিবার সুযোগ পাইব না, এই জন্য পত্রে তোমাদের আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি জানি, আমিই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের কারণ। আমার মত হতভাগ্য সন্তানের জনক-জননী না হইলে তোমাদের জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হইত, কিন্তু আমি তোমাদের কুপুত্র। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের এই অযোগ্য সন্তানকে বিস্মৃত হইও। কিন্তু আমি জানি, তোমরা আমাকে ভুলিতে পারিবে না। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবে, আমি নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া রাজকিঙ্করদের হাতে ধরা পড়িয়াছি; রাজবিধানে আমার প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই পত্রখানি যখন তোমাদের হস্তগত হইবে, তাহার পূর্ব্বেই আমাকে সাইবেরিয়ায় যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমার জীবন-স্বপ্নের অবসান হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই আমার জীবনের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ তোমাদের অজ্ঞাত নহে। আমার অনুরোধ, তোমরা যে কোন উপায়ে পার, বার্থা স্মিটকে জানাইবে, যে হতভাগ্য যুবক তাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, আরাধ্যা দেবীর ন্যায় তাহার পূজা করিত, তাহারই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে সাইবেরিয়ার শ্মশানে ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিল। বাবা, মা, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে ভুলিয়া যাও। আমি জীবিত থাকিয়াও এখন তোমাদের নিকট মৃত; জানি না, সেই দুর্গম, দুস্তর, ভীষণ প্রান্তরে জীবন্মৃত অবস্থায় কত দিন কাটিবে! তাহার পর মৃত্যু, চির-বিস্মৃত। বিদায় দাও বাবা, বিদায় দাও মা, তোমাদের অধম সন্তানকে।"

পত্রখানি গোপনে তাহার পিতার নিকট প্রেরিত হইবে, এই আশায় জোসেফ ইহা রেবেকার নিকট পাঠাইয়াছিল রেবেকা পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া রেবেকার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, সে চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়!

কয়েক মিনিট পরে রেবেকা হঠাৎ সোজা হইয়া বসিল, এবং উন্মাদিনীর ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখন সকল কথাই বুঝিতে পারিলাম! এই বার্থা স্মিট কে, জানি না, জোসেফ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই যুবতী জোসেফের প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় জোসেফ তাহার অমূল্য জীবন এই ভাবে নষ্ট করিল! সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া রুসিয়ায় আসিয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ। সে আমাকে

ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু যে হতাশ প্রেমিক অপরের প্রেমে আত্মহারা, আমি ত তাহার কেহই নহি। আমার প্রতি তাহার প্রেম মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আহা, হতভাগ্য! তোমার দুঃখের কথা ভাবিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যদি তোমার প্রাণরক্ষা আমার অসাধ্য না হয়, তাহা হইলে আমি জীবন দিয়াও তোমাকে উদ্ধার করিব।”

রেবেকা জোসেফের পত্রখানি লেফাপায় পূরিল এবং য়ং আর একখানি পত্র লিখিয়া জোসেফের পত্রের মধ্যে াখিয়া দিল। সেই পত্রে সে লিখিল,—“আপনাদের হিত আমি পরিচিত হইবার সুযোগ না পাইলেও আপনাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত পুত্র আমার সুপরিচিত। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তাহার ন্যায় মহৎপ্রকৃতি, উদারহৃদয় যুবকের এরূপ শোচনীয় পরিণাম বড়ই ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু আপনারা তাহার আশা ত্যাগ করিবেন না; এক দিন সে আপনাদের নিকট ফিরিয়া যাইতেও পারে; ই আশায় আমি আপনাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত তাহার প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি।”

রেবেকা পত্রখানি তাহার নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে থাস্থানে প্রেরণ করিল। তাহার পর কালনকি যে একরারনামায় তাহাকে নাম স্বাক্ষর করিতে বলিয়াছিল, তাহা করিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাহার পিতার সহিত পরামর্শ করিতে তাহার আগ্রহ হইল না; মন কি, তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ করাও সে সঙ্গত নে করিল না। কারণ, এরূপ বিপজ্জনক দলীলে তাহার াম স্বাক্ষরিত করিবার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন না, হা সে জানিত। রেবেকাও বুঝিয়াছিল—কালনকির ার্থসিদ্ধি না হইলে এই সাংঘাতিক অস্ত্র সে তাহাদের রুদ্ধে প্রযোগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু ই একরারনামায় স্বাক্ষর না করিলে সে কি উপায়ে ালনকিকে ভুলাইয়া রাখিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর রেবেকা কালনকির সহিত সাক্ষাৎ রিয়া তাহাকে বলিল, “একরারনামায় স্বাক্ষর করিবার ন্য তুমি আর আমাকে অনুরোধ করিও না, উহাতে স্বাক্ষর রিলে যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। একরারনামাই যে আমাদের মৃত্যুশর। তোমার এই য়াল ছাড়িয়া দিয়া, জোসেফকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা কর; এখনও তোমার চেষ্টা সফল হইতে পারে।”

কালনকি বলিল, “রেবেকা, জোসেফ কুরেটের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাহার আর নিস্তার নাই।—তাহার উদ্ধারের জন্য তুমি অত ব্যাকুল হইয়াছ কেন?”

রেবেকা বলিল, “তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে ত আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কথা ত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।”

কালনকি বলিল, “তুমি তাহাকে ভালবাস কি না, এই জন্যই তোমার এই ব্যাকুলতা।”

রেবেকা ক্ষুব্ধভাবে বলিল, “এ কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছ। আমিও কি তোমাকে বলি নাই, আমি তাহাকে বা অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না? অন্যের সহিত আমার মিলনের পথে দুস্তর বাধা বর্ত্তমান। সেই বাধা কি, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না; বিশ্বাস কর—আমার এ কথা সত্য। কুরেট এখানে আসিয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। জুরিচে তাহার মাতা পিতা এখনও জীবিত আছে। আমরা তাহার বহু সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছি। আমি তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করি। সে আমার সহোদর হইলে যে ভাবে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতাম, ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।”

কালনকি হাসিয়া বলিল, “তুমি বড় চতুর; কিন্তু তুমি হয় নিজেকে প্রতারিত করিতেছ, না হয় মনে করিয়াছ, আমি এতই সরল যে, তোমার সকল কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব! তুমি স্বীকার কর বা না কর—তুমি জোসেফ কুরেটকে ভালবাস—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ জন্য জোসেফ কুরেটকে আমি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি; তবে তুমি যে বাধার কথা বলিতেছ, সে বাধা থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বা শত্রুকে ভালবাসে, কিংবা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অম্লানবদনে স্বার্থত্যাগ করে—এরূপ উদারচেতা সদাশয় ব্যক্তি পৃথিবীতে দুই চারি জন থাকিতেও পারে, কিন্তু আমি সেই শ্রেণীর লোক নহি—

এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এ অবস্থায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ধারের জন্য আমি কেন চেষ্টা করিব—তাহা বলিতে পার কি ?”

রেবেকা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, “কারণ—কারণ, ইহা আমার অনুরোধ।”

কালনকি বলিল, “চমৎকার যুক্তি বটে! আর এরূপ যুক্তি নারীর মুখেই শোভা পায়। কিন্তু যুক্তি যেরূপ হউক, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিলে কিরূপ পুরস্কারের আশা করিতে পারি ?”

রেবেকা বলিল, “কৃতজ্ঞ নারীর আন্তরিক ধন্যবাদ।”

কালনকি মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ইহা ঐরূপ কঠিন কার্য্যের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নহে।”

রেবেকা বলিল, “পারিশ্রমিকই যদি তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে তুমি যত টাকা চাহিবে, তাহাই পাইবে। বল, কত টাকা লইবে ?”

কালনকি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, “তোমার টাকায় আমি পদাঘাত করি। আমার অর্থের অভাব নাই, আমি অর্থাকাঙ্ক্ষা করি না। আমি চাই তোমাকে। হয় ত আমার এই আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইবে না; কিন্তু আর এক জন তোমাকে লুফিয়া লইবে, ইহা আমার অসহ্য।”

রেবেকা বলিল, “আমি যে কথা বলি—তাহা তোমার মনে থাকে না কেন ? আমি ত বলিয়াছি, আমি কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না; তাহাতে যে বাধা আছে, তাহা অলঙ্ঘনীয়। সেই বাধা অতিক্রম করা আমার অসাধ্য।”

কালনকি বলিল, “হাঁ, এ কথা তুমি আমাকে একাধিকবার বলিয়াছ বটে; কিন্তু কুরেটকে ভালবাস, এ কথাও স্বীকার করিয়াছ! আবার এ কথাও বলিয়াছ, যদি আমি কোন উপায়ে কুরেটকে মুক্তিদান করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এ কি শুধু কথার কথা ?”

রেবেকা বলিল, “কুরেট আমার স্নেহের পাত্র—এ কথা আমি এখনও স্বীকার করিতেছি।”

কালনকি বলিল, “তুমি আমাকে বুঝাইতে চাও, ইহা তোমার ভ্রাতৃস্নেহ মাত্র! কিন্তু উহা যে তোমার ধাপ্পাবাজি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তোমার প্রণয়াস্পদের উদ্ধারের জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। যদি সে আমার সাহায্যে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার অলঙ্ঘনীয় বাধাও সে অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারিবে; আমার কেবল পরিশ্রমই সার হইবে! সেই গল্পটা জান ত? বিড়াল আগুনের ভিতর হইতে যে পোড়া বেল তুলিয়াছিল—বানর মহাশয় তাহা ভাঙ্গিয়া, ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, বোকা বিড়ালটার থাবা পোড়ানই সার হইয়াছিল; আমার অবস্থাও সেইরূপ হইবে।”

রেবেকা কালনকির বাচালতায় বিরক্ত হইয়া বলিল, “বেশ, তুমি জোসেফের উদ্ধারের চেষ্টা করিও না; তাহার নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছে, সেই দণ্ডই সে ভোগ করুক। তাহার উদ্ধারের জন্য আমি বৃথা তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি। তোমার যে সে সাধ্য নাই—ইহা পূর্ব্বেই আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল।”

কালনকি বলিল, “তোমার এই অনুমান সত্য নহে। আমি চেষ্টা করিলে এখনও তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারি, তাহা আমার অসাধ্য নহে।”

রেবেকা বলিল, “তোমার ও কথা বিশ্বাস করি না। ও তোমার অসার দম্ভ; ধাপ্পাবাজি বলিয়াই মনে হইতেছে।”

কালনকি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, “আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমি তাহার উদ্ধারে অসমর্থ—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তুমি খুসী হও, তাহাতে আমার আক্ষেপের কারণ নাই। জোসেফ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিলেও আমি তোমাকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিব না এবং আমার এই আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে; কারণ, তুমি জান, তুমি আমার অবাধ্য হইলে, আমি তোমাকে ও তোমার বাবাকে অতি সহজেই জোসেফের মত সাইবেরিয়ায় পাঠাইতে পারি। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। তোমাদের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে বহু পূর্ব্বেই তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতাম, কিন্তু তাহা করি নাই; কারণ, আমি জানি, সেরূপ করিলে আমাকে তোমার আশা চিরকালের মত ত্যাগ করিতে হইবে। জোসেফ

এখানে হঠাৎ আসিয়া যদি আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইত, আমাকে উপেক্ষা করিয়া তুমি যদি তাহারই পক্ষপাতিনী না হইতে, তাহা হইলে তুমি কোন দিন জানিতেও পারিতে না যে, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের দর্প চূর্ণ করিতে পারি। তোমার প্রত্যাখ্যান নীরবে সহ্য করিতাম।"

রেবেকা জানিত, তাহার এই উক্তি অতিরঞ্জিত নহে। কালনকি ইচ্ছা করিলে এত দিন তাহাকে ও তাহার পিতাকে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারিত; কিন্তু তাহা সে করে নাই, সে তাহাদের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। ইতর হইলেও সে কৃতঘ্ন নহে।

রেবেকা নতমস্তকে দুই তিন মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি, ঠিক উত্তর দিবে। তুমি বলিলে, জোসেফ কুরেটকে মুক্তিদান করা তোমার অসাধ্য নহে। কি উপায়ে তাহাকে মুক্তিদান করিবে, জানিতে চাই।"

কালনকি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি নাই; কারণ, তাহা শুনিলে তোমার একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। যে সকল প্রহরী জোসেফ কুরেট ও অন্যান্য নিহিলিষ্টদিগকে সাইবেরিয়ায় লইয়া যাইবে, আমার বৈমাত্র ভ্রাতা সেই প্রহরিদলের অধিনায়ক। আমার ভাই এই ভাবে তিন বার সাইবেরিয়ায় গিয়াছিল; এই চতুর্থ বার সে বন্দী লইয়া সাইবেরিয়ায় যাইতেছে।"

রেবেকা বলিল, "বোধ হয়, তোমার কথা সত্য; কিন্তু এক জন অপরিচিত, নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর জন্য সে নিজের জীবন বিপন্ন করিবে কেন? কোন কয়েদীকে পলায়নের সুযোগ দান করিলে, তাহাকে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, ইহা সে কি জানে না?"

কালনকি বলিল, "এইমাত্র জানিয়া রাখ, সে আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।"

রেবেকা বলিল, "কেহই কাহারও অনুরোধে নিজের জীবন বিপন্ন করে না; স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় না।"

কালনকি বলিল, "অনেক সময় তাহা করিতে বাধ্য হয়। আমি তাহার এরূপ কোনও গুপ্ত কথা জানি, যে কথা প্রকাশ হইলে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই। এমন কি, বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডেরও আদেশ হইতে পারে। আমি তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তা হইলেও কোন দিন তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী হই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি তাহাকে অনুরোধ করিলে সে জোসেফ কুরেটকে পলায়নের সুযোগ দান করিবে; আমার অন্যায় অনুরোধও সে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবে না।"

রেবেকা আগ্রহভরে বলিল, "আমি তোমার সেই একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিব। জোসেফকে মুক্তি দান করিতেই হইবে।"

কালনকি বলিল, "উত্তম। তুমি আমাকে সোনার চাবি দিবে বলিয়াছিলে ত? কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমাকে দুই হাজার রুবল আনিয়া দিতে হইবে।"

রেবেকা বলিল, "দুই হাজার রুবল! সে যে অনেক টাকা।"

কালনকি বলিল, "কাযটা কি রকম কঠিন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? অল্প টাকার কর্ম্ম নয়।"

রেবেকা মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই দিব; টাকাগুলি আজই সংগ্রহ করিয়া রাখিব।"

কালনকি বলিল, "একরারনামাখানা কি তোমার কাছে আছে? তাহা স্বাক্ষরিত করাই প্রধান কায!"

রেবেকা তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। কালনকি এক কলম কালি তুলিয়া লইয়া কলমটি রেবেকার হাতে দিল; বলিল, "এখনই উহাতে নাম সহি কর। বিলম্বে সকল সুযোগ নষ্ট হইতে পারে; তখন তোমার আক্ষেপ নিষ্ফল হইবে।"

রেবেকা কম্পিত হস্তে সেই দলীলে নাম স্বাক্ষর করিল, তাহার পর একরারনামাখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "তুমি আজ আমাকে মুঠার মধ্যে পূরিলে! ইহার শেষফল কি, তাহা পরমেশ্বরই জানেন।"

কালনকি একরারনামা পকেটে রাখিয়া, হঠাৎ রেবেকার সম্মুখে সরিয়া আসিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল! রেবেকা ইহাতে আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু দারুণ ঘৃণায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে মনের ভাব গোপন করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

কালনকি গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এই চুম্বন আমার

বিশ্বস্ততার নিদর্শন। তুমি কপটাচরণ না করিলে আমার দ্বারা তোমাদের অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, আমি এই চুম্বনের সম্মান রক্ষা করিব।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেবেকার গুপ্ত কথা

কালনকি প্রস্থান করিলে রেবেকার মন আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল—একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিয়া সে বড়ই অন্যায় করিয়াছে। যদি উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে তাহা কালনকির নিকট হইতে ফেরত লইত; কিন্তু কালনকি তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

রেবেকা পরদিন শুনিতে পাইল, জোসেফ কুরেট সেই দিন প্রভাতে অন্যান্য অপরাধীর সহিত সাইবেরিয়ায় যাত্রা করিয়াছে। তখন তাহার মনে হইল, একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করা তেমন অসঙ্গত হয় নাই; ইহার ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, কালনকি জোসেফের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিবে। ইহাও মন্দের ভাল। জোসেফ প্রহরিগণের কবল হইতে পলায়ন করিতে পারিলে আর কখন রুসিয়ায় ফিরিবে না, রেবেকার সহিত আর তাহার দেখা হইবে না; কিন্তু তাহার প্রাণরক্ষা হইবে ভাবিয়া রেবেকা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল; তবে কালনকি রেবেকাকে মুঠায় পুরিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিবে কি না, রেবেকা তাহা বুঝিতে পারিল না। কালনকির মুখ বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায়ই সে দেখিতে পাইল না। তখন সে ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালনকি অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর-প্রকৃতির লোক ছিল। সে তাহার মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, কোন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ক করিত না, এবং তাহার গুপ্ত-সঙ্কল্প কেহই জানিতে পারিত না। তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব রেবেকার অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য রেবেকার বিশ্বাস হইয়াছিল, একরারনামায় তাহার নাম-স্বাক্ষরের কথা কেহই জানিতে পারিবে না; কালনকি তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিবে না। অতঃপর কালনকির ব্যবহারে রেবেকা কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না, তবে একরারনামাখানি হস্তগত করিবার পর কালনকি সুযোগ পাইলেই রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিত, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশী কথা বলিত; দুই-চারিটি প্রেমের কথা বলিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। রেবেকা তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিত—সে বেচারার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সে প্রেমশরে জরজর! সে তখন রেবেকাকে লাভ করিবার জন্য সকল রকম কুকর্ম্ম করিতে প্রস্তুত ছিল বুঝিয়া রেবেকার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু রেবেকার আশঙ্কার তেমন কোন কারণ ছিল না। সে জানিত, কালনকি তাহার ও তাহার পিতার অনিষ্ট করিলে, তাহাদিগকে নিহিলিষ্ট বলিয়া ধরাইয়া দিলে তাহাকে লাভ করিতে পারিবে না।

ক্রমে কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল; সলোমন কোহেনের কায-কর্ম্ম যে ভাবে চলিতেছিল, সেই ভাবেই চলিতে লাগিল। জোসেফের গ্রেপ্তারের পর হইতে সলোমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিল। কালনকিকে সে বিশ্বাসের সম্পূণ অযোগ্য মনে করিলেও, তাহার সহিত ব্যবহারে সে ভাব প্রকাশ করিল না। কালনকিও যেন কিছুই জানে না—এই ভাবে কায-কর্ম্ম করিতে লাগিল। কালনকির সহিত রেবেকার যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহা সলোমন কোহেনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালনকি গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, ইহা জানিতে পারিয়া সলোমন কোহেন সসর্প-গৃহে বাসের ন্যায় অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মন অশান্তিপূর্ণ হইল।

সলোমন কোহেন কিরূপে কালনকিকে বিতাড়িত করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল; হঠাৎ কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে এক দিন সে কালনকিকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ কালনকি, তোমার মত সুযোগ্য ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর উপর আমার কাযকর্ম্মের সকল ভার ন্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, তুমিও যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্ন করিয়া আমার কারবারের উন্নতি করিয়াছিলে; কিন্তু ইদানীং আমার বৈষয়িক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, সরঞ্জামী খরচ না কমাইলে আর চলিবার উপায় নাই।

এই জন্য আমি তোমাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইতেছি। তুমি অন্য কোথাও একটি চাকুরী খুঁজিয়া লও।"

কালনকি সলোমনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা বেশ; আমি আপনার চাকর বৈ ত নয়; আমাকে রাখিয়া যদি আপনার না পোষায়, তাহা হইলে আমিই বা থাকিবার জন্য জেদ করিব কেন? আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।"

কালনকি কয়েক মিনিট পরে রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিল, "রেবেকা, তোমার বাবা আমাকে জবাব দিয়াছেন; আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিলাম।"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকা স্তম্ভিত হইল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সন্দেহ হইল, কালনকির সহিত তাহার পিতার কলহ হইয়াছে। ইহার ফল কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া রেবেকা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "বাবা তোমাকে হঠাৎ জবাব দিলেন! ইহার কারণ কি?"

কালনকি বলিল,—"কিরূপে বলিব? তিনি মনিব, আমি চাকর। তিনি আমাকে পদচ্যুত করিলে আমি চলিয়া যাইতে বাধ্য, আমি ত তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারি না; তবে তিনি স্বেচ্ছায় কৈফিয়ৎও একটা দিয়াছেন। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হওয়ায় সরঞ্জামী খরচ কমাইবেন। কিন্তু আমাকে তাড়াইবার ইহাই প্রকৃত কারণ কি না, তাহা তোমার জানা থাকিতেও পারে।" কথাটায় গূঢ় ইঙ্গিত ছিল।

রেবেকা বলিল, "না, আমি কিছুই জানি না। সত্যই তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই।"

কালনকি বলিল, "তোমার এ কথা বিশ্বাস করিলাম। তুমি আমার জন্য তোমার বাবার কাছে সুপারিশ করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমি তোমাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেও তোমার আশা ত্যাগ করিব বা তুমি আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে, এরূপ আশা করিও না। তুমি যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, সে বন্ধন তুমি কখন ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমাদের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; আমাদের জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিবে।"

কালনকির এ কথার মর্ম্ম রেবেকা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহাকে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিতেই হইবে। কালনকির কবল হইতে তাহার মুক্তিলাভের আশা নাই। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "জোসেফ কুরেট কি সত্যই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? তোমার কিরূপ ধারণা?"

কালনকি বলিল, "হাঁ, সে নিশ্চয়ই পলায়নের সুযোগ পাইবে এবং পলায়ন করিবে।"

রেবেকা বলিল, "কত দিন পরে?"

কালনকি বলিল, "সে কথা বলা অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, এত দিন সে পলায়নের সুযোগ পাইয়াছে এবং পলায়নে সমর্থ হইয়াছে। তোমার সহিত আমার যে চুক্তি হইয়াছিল, তদনুসারে আমার অঙ্গীকার আমি পালন করিয়াছি; আমার ভাই নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে। তবে যদি জোসেফ কুরেট পলায়নের সুযোগ অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, সে জন্য আমি দায়ী নহি। এখন তোমাকে তোমার অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

রেবেকা বলিল, "ঠিক বুঝিলাম না, তোমার কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

কালনকি হাসিয়া বলিল, "আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে?—আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি; এখন তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

রেবেকার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে মুখ চূণ করিয়া বলিল, "অসম্ভব। তোমাকে বিবাহ করা আমার অসাধ্য।"

কালনকি বিরক্তিভরে বলিল, "অসম্ভব? জানিতে চাই, কি জন্য অসম্ভব।"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তোমাকে বিবাহ করা আমার অসাধ্য। যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহা হইলেও আমি তোমার পত্নী হইতে পারিব না।"

এবার কালনকির ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; রেবেকা তাহার চক্ষুতে হিংস্র পশুর ক্রূর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ভীত হইল।

কালনকি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "রেবেকা কোহেন! তুমি দীর্ঘকাল হইতে আমার সঙ্গে ছলনা করিয়া আসিয়াছ; আর আমি তোমার ছলনায় ভুলিব না। তুমি তোমার চাতুরী বন্ধ কর। তোমাদের

মঙ্গলের জন্য এত দিন আমি মৌন ছিলাম। আমি তোমাদের অনেক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের অনিষ্টের আশঙ্কায় আমি যেন কিছুই দেখি নাই, কিছুই জানিতে পারি নাই—এইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। আমি বহুদিন পূর্ব্বে তোমাদের সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত করিতে পারিতাম, তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিতাম; কিন্তু তোমাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় তোমার ও তোমার পিতার সর্ব্বনাশসাধনে বিরত ছিলাম।"

রেবেকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "তোমার ঐরূপ আশা করাই অসঙ্গত হইয়াছিল। যে দিন তুমি তোমার মনের ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে—সেই দিনই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমাদের মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে; আমাকে তুমি পাইবে না।"

কালনকি বলিল, "হাঁ, তুমি প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলে বটে, এবং তাহা সত্য মনে করিয়া তোমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমার মনের বেদনা নীরবে সহ্য করিতেছিলাম। শেষে দেখিলাম, জোসেফ কুরেট হঠাৎ এখানে আসিয়া জুটিল এবং তোমাকে তাহার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল! তুমিও তাহার প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে, তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলে। তুমি তাহার প্রণয়ে বাধা দাও নাই, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। তাহার প্রতি তোমার অনুরাগের পরিচয় পাইয়াই আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেরূপে পারি, তোমাকে লাভ করিবই। ইচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছাতেও তুমি আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।—আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, তাহা খণ্ডন করা তোমার অসাধ্য।"

রেবেকা বলিল, "তুমি ভুল করিয়াছ; আমি জোসেফকেও বলিয়াছিলাম, সে যেন আমাকে পাইবার আশা না করে; আমাদের মিলন অসম্ভব। তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহাকেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছিলাম।"

কালনকি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যে জোসেফ কুরেটের অনুরাগিণী, ইহার অনেক প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছি। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার অসহ্য। তোমার সহিত আমার কলহ করিবার ইচ্ছা নাই। তোমার মনোরঞ্জনের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি তোমাকে এখন এরূপ একটি গুপ্ত কথা বলিব—যাহা শুনিয়া তুমি কেবল বিস্মিত নহে, স্তম্ভিত হইবে এবং আমি তোমার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, তাহাও বুঝিতে পারিবে। আমি বহুদিন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি, তুমি ও তোমার পিতা নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া নানা ভাবে তাহাদের সাহায্য করিয়া আসিতেছ; রুসিয়ার নিহিলিষ্টরা তোমাদের আশ্রিত, তোমাদের অর্থসাহায্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রুসিয়ার রাজসিংহাসন চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমাদের অপরাধের অকাট্য প্রমাণও আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, ইচ্ছা করিলে বহুপূর্ব্বেই আমি তোমাদের হাতে দড়ি দিয়া সাইবেরিয়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিতে না, তোমাদের সর্ব্বনাশ হইত। কিন্তু আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করি নাই; তোমাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় তোমাদের অনিষ্ট-সাধনে বিরত ছিলাম। গবর্মেণ্ট আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া—এত দিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আজ তুমি আমাকে নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ! ইহার কি ফল হইবে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই?"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকার মুখ বিবর্ণ হইল, সে ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "তুমি গবর্মেণ্টের গুপ্তচর? কি সর্ব্বনাশ!"

কালনকি বলিল, "হাঁ, আমি গবর্মেণ্টের গুপ্তচর, এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য এই নগরে আমার ন্যায় সরকারের বৃত্তিভোগী শত শত গুপ্তচর আছে।"

রেবেকার চক্ষুতে হতাশভাব পরিস্ফুট হইল; কিন্তু কালনকির কথায় সে না দমিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "গোয়েন্দাগিরীতে তুমি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছ! তুমি আমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছ। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের জন্যও যে আর একটি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছ, সে কথা কি তোমার স্মরণ নাই? তুমি গবর্মেণ্টের গোয়েন্দা হইয়া এক জন নির্ব্বাসিত নিহিলিষ্টের পলায়নের

ব্যবস্থা করিয়াছ,—তোমার এই অপরাধ সপ্রমাণ হইলে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবে—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?"

কালনকি হাসিয়া বলিল, "জোসেফ কুরেটের কথা বলিতেছ ? আমি তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছি—ইহার কোন প্রমাণ নাই ; এই অমূলক অভিযোগে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না। এ সকল কথা লইয়া তোমার সহিত তর্ক-বিতর্কেও আমার অভিরুচি নাই। রেবেকা ! আমি তোমার সহিত কলহ করিতে আসি নাই ; কলহ করিয়া আমার লাভ কি ? আমি তোমার গুপ্ত কথা গোপনে রাখিয়া তোমার বন্ধুর কায করিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলে এই বন্ধুত্ব চিরজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, চিরকালের জন্য আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতে পারিবে। এখন আমাকে ভাল না বাসিলেও কিছু দিন পরে ভালবাসিবে। আমার সুখ-শান্তির জন্য তোমাকে পাইতেই হইবে। তোমার অনুরোধে আমি আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে, আমার মহাশত্রুকে মুক্তিদান করিয়াছি, ইহাতেই তোমার প্রতি আমার অনুরাগের প্রগাঢ়তা বুঝিতে পারিতেছ। তুমি আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে তোমার স্বাক্ষরিত একরারনামা তোমার সম্মুখেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

কালনকি বলিল, "আমিও তোমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কারণে আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না ?"

রেবেকা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কারণ, আমি অপরের বিবাহিতা পত্নী !" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

তাজমহল

চমৎকার !
করাল কালের কণ্ঠে কে দুলা'লো কুন্দ-শুভ্র হার !
মহাকাল চিরকাল ভীষণ ভ্রূকুটিভরে সবার উপরে,
রাখিয়াছে আপনার ধ্বংস-দৃষ্টি, তবু
নারিবে সে প্রেমিকের অশ্রু-মুক্তা বিনাশিতে কভু !
সবুজ প্রান্তর,
প্রেমিকের অবুঝ অন্তর !
তা'র মাঝে মর্ম্মরের সুষমা-মন্দির !
প্রেম যেন মর্ম্মতলে সুন্দর সুস্থির !
বাগিচাতে ফুল্ল ফুল, উৎসে-স্বচ্ছ জল,
স্ফটিকের প্রতিবিম্ব তাহে টলমল !
আতর ফুরায়ে গেছে বিলায়ে সৌরভ,
মণি-মাণিক্যের দ্যুতি হারালো গৌরব।
তবু কি যে অনুপম গন্ধ আজি ফিরে
তাজমহলের প্রতি মহলেরে ঘিরে !
আকাশেরে নীল রঙে করিয়া উতল,
মন্দ বায়ে গন্ধ ভরি', জ্যোৎস্নায় ভূতল,
অমানিশা, পৌর্ণমাসী, রাত্রি দিবা যত
সবি মধুময় করে মাধবের মত !
অতুল প্রেমিক-রাজ পার্শ্বে শুয়ে থাকি'
প্রেমিকার কবরের 'পরে মেলে আঁখি !
প্রেমের প্রভায় তাহা মঞ্জু, শুভ্র ভালো,
কোথা মূল্যবান্ মণি-মাণিক্যের আলো।
সম্রাটের মর্ম্মদাহী বিরহ-বেদনা
মর্ম্মরের মূর্ত্তি ধ'রে লভেছে চেতনা !
হৃদয়ের সে কাতর ক্রন্দন আজিকে,
দীর্ঘশ্বাসে রাত্রিদিন ব্যাপ্ত দিকে দিকে !
প্রেমিক শাশ্বত, প্রেম চির-মৃত্যুহীন,
নশ্বর এ বিশ্বমাঝে বাঁচে চিরদিন !
জাতি, ধর্ম্ম, ভেদ নাই—আসিছে সবাই।
নিখিল-প্রেমিক-তীর্থ হইয়াছে আজ,
প্রেমিক কবির স্বপ্ন এ সুন্দর তাজ !
দলে দলে আসে হিন্দু, আসে মুসলমান,
জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক, ইহুদি, খৃষ্টান।
স্ফটিকের এই আঁখি-জল—
নহে শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রতীক কেবল,
নিখিল-প্রেমিক-তীর্থ, প্রেম-তীর্থ সার,
এই মঠ, চৈত্য, কাবা, মন্দির, বিহার !

হেথা সারা বর্ষ ধরি', সারা দিন রাত
ভিজিতেছে নিত্য নব নয়নের পাত ;
সপত্নীক আসিতেছে, কেহ বন্ধু সহ,
কেহ প্রিয়-শোকাতুর, আনিছে বিরহ !
নিশিদিন উঠিতেছে কাঁপায়ে মিনার
নিখিল বক্ষের সুর, বেদন-বীণার।
শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দেখেছি হেথায়,
প্রেমময় শ্যাম এল নীল যমুনায় !
যমুনা মোদের চির-প্রেমের চারণ,
কুলু কুলু গীতি তা'র হয়ে প্রাণ-মন !
হিন্দুর প্রেমের গীতি
বৃন্দাবন মধু-স্মৃতি,
ওতঃপ্রোত মিশানো তাহায়,
তাজের সোপান সে-ই ধৌত করি' যায় !

অনুপম সুষমায় মণ্ডিত মন্দির,
এই তাজ মহিমায় র'বে চিরস্থির,
নহে আজ কোন এক সম্রাটের ধন,
মুক্ত হয়ে গেছে এর জাতির বন্ধন,
মুক্ত হয়ে গেছে এর কাল-পরিমাণ
এক সুরে, এক স্বর্গে, চলিয়াছে এক প্রেম-গান !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

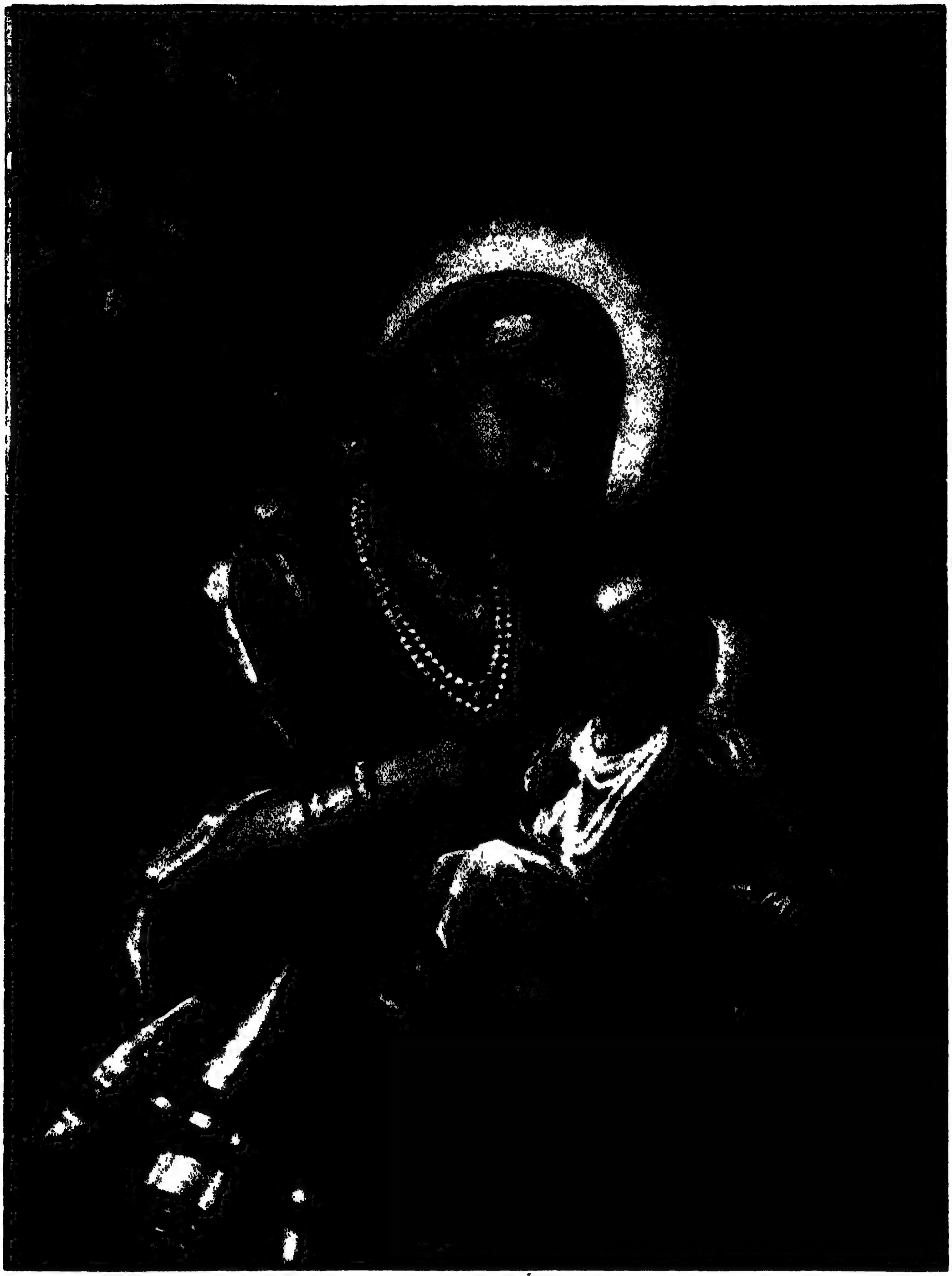

মাতৃ-মূর্ত্তি

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।

রাষ্ট্রনীতি *

বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ দুইটি বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি 'রাষ্ট্রনীতি'; আর একটি 'ঐতিহাসিক নীতি।' তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ শাসনের আদি ইতিহাস ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলিব।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রাজনীতি বলিয়া কোন কথা নাই, রাজধর্ম্ম কথাটা আছে, আর আছে নীতি। আমরা ইংরাজীতে যাহাকে পলিটিকস্ বলি, তাহা কতকটা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত, আর কতকটা প্রাচীনরা সংস্কৃতে যাহাকে নীতি বলিতেন, তাহার অন্তর্গত। আধুনিক বাঙ্গালায় আমরা ইংরাজী মর‍্যালিটী শব্দের অনুবাদ করিয়াছি নীতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতে ইংরাজী মর‍্যালিটী শব্দের প্রতিশব্দ ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য অথবা রাষ্ট্রের ভিতর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ যে সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হইত, তাহাকেই তাঁহারা নীতি বলিতেন, ইংরাজীতে যাহাকে 'ষ্টেট্ ক্র্যাফট' বলে, তাহাই আমাদের প্রাচীন ভাষায় নীতি ছিল। ইংরাজীতে যাহাদিগকে 'ষ্টেট্স্ম্যান' বলে, আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় তাঁহারা নীতিজ্ঞ ছিলেন। শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, চাণক্যনীতি---এই সকল ইংরাজী ষ্টেট্ ক্র্যাফটের অন্তর্ভূত। রাজধর্ম্ম কথা প্রচলিত ছিল। আমাদের কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হইলে, কোন বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিতে হইলে তিনটি প্রশ্ন উঠিত, অথবা একটা প্রশ্নের তিনটি শাখা ছিল;—(১) অভিধেয় (২) প্রয়োজন, (৩) সম্বন্ধ। সকল শাস্ত্রের প্রারম্ভেই আছে — ঐ শাস্ত্রের অভিধেয় কি অর্থাৎ বিষয়টা কি, শাস্ত্রের প্রয়োজনটা কি ---নিষ্প্রয়োজনে কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা হইত না। আর ঐ শাস্ত্রের সম্বন্ধটাই বা কি? এই তিন প্রশ্ন তুলিয়া শাস্ত্রকাররা প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আমরা আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাহার অভিধেয় কি? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। ইংরাজীতে যাহাকে পলিটিক্স্ বলে, তাহার 'সাবজেক্ট ম্যাটার' কি—এই প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ইহার প্রয়োজন কি, পলিটিক্স্ আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? তৃতীয় প্রশ্ন—এই পলিটিক্সের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, অথবা সমাজের বা জনগণের সম্বন্ধ কি। এখানে প্রথমেই আমি প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিতে চাহি। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা কি?

আপনারা যদি আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, নীতিশাস্ত্রকাররা প্রথমেই বলিয়াছেন, (শুক্রনীতিতে তাহাই বলিয়াছে) প্রয়োজন মোক্ষ, জীবের মুক্তি অর্থাৎ মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মানবশাস্ত্র—এ সকলের মূল প্রয়োজন হইতেছে জীবের মুক্তির সহায়তা করা। ইহারা মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, মুক্তিসাধনা প্রতিষ্ঠিত করে। উপনিষদাদি প্রাচীন যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ, আপ্তবাক্য বা তত্ত্ববিদ্যার শাস্ত্র আছে, তাহাদেরও প্রয়োজন মোক্ষ বা জীবের মুক্তিসাধন করা। নীতিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলে সকলের আগে এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের যাহা কিছু ব্যবস্থা—সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ব্যক্তিগত আচার আচরণের ব্যবস্থা, সকলেরই চরম লক্ষ্য ছিল মুক্তি। আপনারা জানেন, উপনিষদে গল্প আছে ---ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে পর যখন তাহার বনে যাইবার সময় হইল, যখন তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার উভয় পত্নী—মৈত্রেয়ী এবং গার্গীকে ডাকিলেন। আমরা কখন কখনও মনে করি যে, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীই ছিলেন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই ছিলেন, তাহারা বিষয়ের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা "কৌপীনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং" এই আদর্শের অনুসরণ করিতেন। ইহা সত্য নহে। প্রাচীনকালে যাহারা মহাজ্ঞানী মহাজন ছিলেন, তাঁহারাও বিষয়ের সাধনা করিতেন, বিষয় অর্জ্জন করিতেন, ভোগ করিতেন, কিরূপ ভাবে ভোগ করিতেন—

---

* থিওসফিকাল সোসাইটী হলে বক্তৃতা।

ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তৎসর্ব্বং ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা কস্যচিৎ ধনং।

উপনিষদ বলিতেছে—"এই চঞ্চল জগতে যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু আছে, ঈশ্বর দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিতে হইবে অর্থাৎ সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে, পরমপুরুষকে, ভগবান্‌কে বা ব্রহ্মকে অনুভব করিতে হইবে, আর ত্যাগের দ্বারা, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিষয় বা রাজ্য ভোগ করিতে হইবে।" তাহার পরেই বলিয়াছেন, –"কাহারও ধনে লোভ করিও না।" ইহাই তাঁহাদের পন্থা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদে বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু প্রার্থনীয় বস্তু আছে, একে একে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় নহে, আত্মার জন্য বিত্ত প্রিয়; পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে, আত্মার জন্য পুত্র প্রিয়; স্ত্রীর জন্য স্ত্রী প্রিয় নহে, আত্মার জন্য স্ত্রী প্রিয়।" এইরূপ ভাবে যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু, সকলের অন্তরালে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচেষ্টা, ব্রহ্মানুভূতির প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। এই ভাবে তাঁহারা বিষয় ভোগ করিতেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা কেবল কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ছিলেন না, মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহারা অনুসরণ করিতেন না। গীতাতেও তাহাই পাওয়া যায়। তাহাতে বাহিরের সন্ন্যাসের প্রশংসা করে নাই, গীতার সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ ফললিপ্সা পরিত্যাগ করা। কর্ম্মের যে ফল, তাহার প্রতি যে লোভ, সেই লোভ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাধন করা। তাহাকেই গীতায় সন্ন্যাস বলে।

"ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ......ন চ শোকভাক্।" যাঁহারা সমাজবন্ধন স্বীকার করেন নাই, যাঁহারা আত্মাশ্রয়ী, তাঁহারাই যে সন্ন্যাসী, তাহা নহে। যাঁহারা ভগবান্ বা ব্রহ্মে সব কর্ম্ম সমর্পণ করেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া বিষয়ের যে তাঁহার কোন অভাব ছিল, তাহা নহে। বিস্তর বিষয় তাঁহার ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। সেখানে তত্ত্ববিচার বা তত্ত্বমীমাংসা হইত, এই তত্ত্ববিচারে যাঁহারা জয়ী হইতেন, রাজারা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন, বহু গোধন—প্রত্যেক গোধনের শৃঙ্গে স্বর্ণ বাঁধিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন এবং বলিতেন—আপনারা—জ্ঞানীরা,—ঋষিরা বিচার করিয়া দেখুন, কে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, এই গোধন সকল রহিয়াছে, সুবর্ণ-অলঙ্কৃত এই গোধন আপনাদের প্রাপ্য। উপনিষদাদিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার উভয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি ত এখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব, আমার যে বিষয় আছে, তোমরা দুই জনে বণ্টন করিয়া লও।" গার্গী বলিলেন—"আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, তাহা ত বিষয়, বলুন ত, এই বিষয় দ্বারা আমার কি হইবে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "বিষয়ীরা যে সুখভোগ করে, তোমার তাহাই হইবে, তুমি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইবে না।" গার্গী বলিলেন—"এই যে ধন তুমি আমাকে দান করিতেছ, ইহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব কি না, অর্থাৎ আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"তাহা নহে। বিত্তশালী লোকরা যেরূপ সুখ ভোগ করে, তুমি তাহাই ভোগ করিবে।" গার্গী বলিলেন, "যেনাহং ন অমৃতস্য তেনাহং কিং করিষ্যামি,"—"যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব না, সংসার হইতে মুক্তি পাইব না, পরমার্থলাভ যাহা দ্বারা হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" এ কথাটি এখানে তুলিলাম এই জন্য যে, আমাদের প্রাচীন সাধনার প্রত্যেক বিভাগে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সকল শাস্ত্র—সকল বিদ্যার মূল লক্ষ্য মোক্ষ, প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শুক্রনীতি প্রথমেই বলিয়াছে –এই নীতির প্রয়োজন মোক্ষ—জীবকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। তেমনই রাজধর্ম্ম সম্বন্ধেও দেখিতে পাই। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাই—ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে,—"ইতি মহাভারতে অমুক পর্ব্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, অর্থাৎ রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়কে মোক্ষপর্ব্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে। পলিটিক্‌স্ আলোচনা করিবার সময় এ কথাটি সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা যাহাকে বলি, তাহা আমাদের প্রাচীন

সাধনার লক্ষ্য ছিল না। স্বাধীনতা যে হেয় ছিল, তাহা নহে। স্বাধীনতার প্রয়োজন প্রাচীনরা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বাধীনতা প্রিয় নহে, আত্মার জন্য স্বাধীনতা প্রিয়; স্বাধীনতা যখন মোক্ষের দিকে জীবকে অগ্রসর করে, তখনই স্বাধীনতার মূল্য আছে, অন্যথা নহে। পলিটিক্সের লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ, এ কথাটি মনে না রাখিলে আমাদের সাধনার, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি বা পলিটিকসের আলোচনা হয় না। কেবল আমাদের দেশেই যে ইহা সত্য, তাহা নহে, অন্য দেশেও তাই। আজকাল পলিটিকাল্ সায়ান্সের গ্রন্থ বিস্তর হইয়াছে। ৪০ বংসর পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালে পলিটিকাল সায়ান্স একরূপ অজ্ঞাত ছিল। আমার হস্তে পলিটিকাল সায়ান্সের যে গ্রন্থ পড়িয়াছিল, তাহা লর্ড ক্রমের গ্রন্থ। আর একখানা গ্রন্থ ছিল, নাম তাহার "ডিমক্রেসী ইন্ আমেরিকা।" এই দুইখান গ্রন্থমাত্র আমরা দেখিয়াছিলাম; এখন সেই দুই গ্রন্থের কেহ খোঁজ করেন না, কারণ, পলিটিকস্ বা রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক আলোচনা হইতেছে, সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, পরিপক্কতা কিয়ংপরিমাণে লাভ হইয়াছে। ক্রম তাঁহার পলিটিকাল ফিলজফিতে বলিয়াছেন—Politics is a department of Ethics রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি ধর্ম্মনীতির একটা অঙ্গ। এ কথার অর্থ এই যে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোক ও পরস্পরের প্রতি যে সমুদয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে, তাহা প্রদর্শন করা ইথিক্সের উদ্দেশ্য। যদি মানুষ একাকী থাকিত, মানুষ যদি সমাজবন্ধনে না থাকিত, তাহা হইলে ইথিক্সের প্রতিষ্ঠা হইত না, তাই ক্রম বলিয়াছেন, এই যে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের আলোচনা—যাহার বিষয় হইতেছে ইথিক্স—তাহারই এক অংশ পলিটিক্স্। এই জন্য পলিটিক্স্ও এই সম্বন্ধের আলোচনা করে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে ইথিক্স্, তাহারই আলোচনা করে। আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সমষ্টিভূত যে শক্তি, যাহাকে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি বা ষ্টেট বলা যায়, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের আলোচনা করে পলিটিক্স্। আর ষ্টেটের অন্তর্গত যে জনসমষ্টি, ষ্টেট সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও পলিটিক্সের অন্তর্গত। পলিটিক্সের এই দুই দিক, (১) সমাজের সমষ্টিভূত শক্তির যে প্রতীক—যাহাকে গভর্ণমেণ্ট, রাষ্ট্র বা ষ্টেট বলি, তাহার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধের আলোচনা করে পলিটিক্স্। (২) ষ্টেটের প্রজা বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারও আলোচনা করে পলিটিক্স্, এই জন্য পলিটিক্স্‌কে ইথিক্সের একটা অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে। এই পলিটিক্স্ আর মোক্ষের সার সম্বন্ধের বিচার করিতে যাইয়া কেন ঋষিরা বলিলেন—পলিটিক্স্ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র? এই জন্য বলিলেন যে, মানুষ যদি সমাজশৃঙ্খলার মধ্যে বাস না করে, তাহা হইলে তাহার দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব হয় না, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্ভব হয় না, তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশের সম্ভাবনা অত্যন্ত হ্রাস এবং লঘু হইয়া যায়। এই সমাজ আছে বলিয়া সমাজের সমষ্টিভূত যে জ্ঞান-ভাণ্ডার বহু প্রাচীনকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে, যে জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদাদিতে সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী আমরা হইয়াছি, আমাদের জ্ঞানপ্রবৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পাইয়াছি। আমরা যদি এমন অবস্থায় জন্মিতাম—যেখানে মানুষ নাই, পশ্চাতে কিছু নাই, প্রত্যেকে আমরা নিঃসঙ্গ পুরুষ—যদিও এমন অবস্থা সম্ভব নহে, তবু যদি তাহা একবার মানস-নেত্রে কল্পনা করি, তাহা হইলে মানুষের কি অবস্থা হইত? সে মানুষ বন্য পশু হইতে অধিক কিছু হইত না। পশুর যেমন পশ্চাতে কিছু নাই, সেইরূপ তাহারও পশ্চাতে ইতিহাস থাকিত না, সাধনার ধারা থাকিত না, পিতৃ-পিতামহদের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার থাকিত না, বহু পুরুষপরম্পরা যে ভাষার অনুশীলন করিয়া তাহার উৎকর্ষ সম্পাদিত করিয়াছে, যে ভাষার সাহায্যে সে আপনার মনোবৃত্তির বিকাশসাধন করিয়াছে এবং তাহাতে কত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি যদি মানুষের পশ্চাতে না থাকিত, তাহা হইলে বন্য পশুর মত সে জন্মগ্রহণ করিত, বন্য পশুর মত সে বাস করিত, বন্য পশুর মত সে মরিয়া যাইত। সুতরাং মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য সমাজের প্রয়োজন।

সমাজ বহু লোকের সমষ্টি, এক জনে সমাজ হয় না। ১০ জনে মিলিয়া একসঙ্গে বাস করিতে গেলে, পরস্পরের স্বার্থে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, পরস্পরের প্রবৃত্তির একটা রেষারেষি ভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ

প্রবৃত্তিকে এবং স্বার্থকে যদি সংযত করিয়া না চলে, তাহা হইলে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা জীবের সম্ভব হয় না। ইহাই সমাজের প্রথম কথা। আমরা যদি অনাচারী হই, যাহা ইচ্ছা তাহা করি, আমার প্রকৃতি যাহা চায়, তাহা যদি করি, তাহা হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই যে আমরা সহরে অথবা গ্রামে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, সেখানে আমরা যথেচ্ছাচারী হইতে পারি না, যদি হই, তবে আমার স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, আমার নিজের স্বার্থ-সাধনা করিতে গেলে, অপরের স্বার্থ-হানি হয়। আমার প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধনা করিতে গেলে, অপরের ইষ্টে ব্যাঘাত উংপন্ন হয়। সুতরাং সমাজে থাকিতে গেলেই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হইবে, প্রবৃত্তি সকলকে আমার সাধনাধীনে আনিয়া সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। এই জন্য সমাজ-শাসন দ্বারা জীবের দেহশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হয়, বনে গেলে তাহা হয় না, সুতরাং সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সমুদয় সমাজরক্ষণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে; যেমন বিবাহ-বন্ধন মানিয়া চলিতে হয়; ইহার আকার ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু বিবাহের যে একটা বন্ধন সকল সমাজেই আছে, তাহা যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয়। যেখানে এই নিয়ম নাই, সেখানে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। নানা দিক্ দিয়া সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির পুষ্টি হয় এবং তাহারা মানব-জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন মানুষকে শাসন করিবে; শাসনের প্রয়োজন মানুষকে সংশোধন করিবে, পশুত্বের ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া মানবত্বের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এ দিক হইতে যখন দেখি, তখন সমাজ-শাসনের ভিতর দিয়া আমরা যে মোক্ষের দিকে অগ্রসর হই, তাহা বুঝিতে পারি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি —যদি রাষ্ট্রের অধীন হইয়া চলি, রাষ্ট্রের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য, তাহা যদি পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার নিজের, আমার পরিবারের অথবা আমার গোষ্ঠীর স্বার্থকে সংযত করিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র সমাজের সমগ্রীভূত স্বার্থকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। আমার স্বার্থে আর আমার পরিবারের স্বার্থে যেমন বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, তেমনই আমার অথবা আমার পরিবারের অথবা আমার গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থেরও কোনও বিরোধ নাই। আমার পরিবারের সঙ্গে যখন আমি মিলিত হই, তখন আমাকে আমার নিজের খেয়াল কিছু কিছু ছাড়িতে হয়। পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা আমি করিতে পারি না। যুবক-যুবতী যত দিন অবিবাহিত থাকে, তত দিন তাহারা অনেকটা নিজের খেয়ালমত চলিতে পারে। দুই জনে মিলিয়া যখন তাহারা পরিবারের সৃষ্টি করে, তখন আর সেরূপ খুসীমত চলিতে পারে না। তখন পরস্পর পরস্পরের পছন্দ অনুসরণ করিয়া চলে, আপনার পছন্দকে খাট করিয়া অপরের পছন্দকে বড় করিয়া চলিতে হয়, না হইলে পরিবারবন্ধন থাকে না। স্বামী যদি যথেচ্ছাচারী হয়, তাহা হইলে যেমন দাম্পত্য-বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়, স্ত্রী যদি যথেচ্ছাচারিণী হয়, তাহা হইলেও তেমনই দাম্পত্য-বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়, স্বামি-স্ত্রীর বন্ধন পরস্পরের ব্যক্তিত্বকে সংযত করে; কেবল সংযত করে, তাহা নহে, তাহাতে আমরা লাভবানও হই, আমার পূর্ব্বতন নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্ব দ্বারা যাহা আমি পাইতাম, তাহা অপেক্ষা অধিক এখানে পাই। আমি যদি একাকী থাকি, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমাকে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে হয়, অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করিবার সময় আমার থাকে না; কিন্তু যখন পরিবারে আবদ্ধ থাকি, তখন দশ জন মিলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি। পরিবারের অন্যান্য লোকের সহযোগিতা যদি আমি প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার আমার অবসর থাকে না, তাহা হইলে মানুষের উন্নত-রঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অথবা ধর্ম্মসাধন সম্ভব হয় না। এই জন্য একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, মানুষ যখন দশ জন মিলিত হইয়া থাকে, তখন আপনাকে একটু খাট করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে সে যে অবসর ও সুযোগ পায়, তাহা উন্নততর বৃত্তির অনুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারে, ইহাই তাহার লাভ।

আমি যখন একাকী থাকি, তখন আমি অত্যন্ত স্বাধীন; পরিবারের মধ্যে যখন থাকি,তখন সেই স্বাধীনতা কিছু সংযত হয়। কারণ, পরিবারের অন্তর্গত ১০ জনের স্বাধীনতাকে আমার মানিয়া চলিতে হয়, অন্য দিকে তাহাদিগকেও আমার স্বাধীনতা মানিয়া চলিতে হয়; সুতরাং এখানে একটা রফা

হয়, পরিবারস্থ সকল লোক আপন আপন স্বাধীনতাকে কিছু কিছু বর্জ্জন করে। আমিও আমার স্বাধীনতাকে কিছু কিছু বর্জ্জন করি। এই জন্য বর্জ্জন করি যে, একাকী থাকিলে যে ক্লেশ আমাকে পাইতে হইত, তাহা পাইতে হয় না। ইহাই আমার লাভ।

আদিম অবস্থায় যখন পরিবারে পরিবারে ঝগড়া হইত, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে খাদ্য বা বাসভূমি লইয়া ঝগড়া হইত, সমাজের যখন এই সামরিক অবস্থা ছিল, তখন দেশের কি অবস্থা ছিল, আর যখন পরিবারের মধ্যে—গোষ্ঠীর বেষ্টনের মধ্যে একত্র হইয়া বাস করি, তখন দেশের যে অবস্থা হয়, এই উভয় অবস্থার যদি তুলনা করি, কল্পনার দৃষ্টিতে অবলোকন করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, আমি যে আমার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতেছি, একটু সংযত করিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে আমি আর একটা খুব বড় স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, পরিবারের অন্তর্গত হইয়া আমি একটা বৃহত্তর স্বাধীনতা সম্ভোগ করি। আবার যখন গোষ্ঠীর বেষ্টনের মধ্যে বাস করি, তদপেক্ষা বৃহত্তর স্বাধীনতা লাভ করি, আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টিতে যে জাতি গঠিত হয়, সেই জাতির ভিতর যখন বাস করি, তখন জাতির সমষ্টিভূত শক্তি দ্বারা আমার শক্তি ও স্বাধীনতাকে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করি বটে, কিন্তু তাহাতে একটা বৃহত্তর শক্তি আমার লাভ হয়। সুতরাং এই ব্যবসায়ে ক্ষতি নাই, এই ত্যাগে হানি নাই, ইহাতে কেবল লাভই হয়।

আবার সম্বন্ধ হইলেই কিছু কিছু যুদ্ধ বাধিবে, স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিবে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিবে, কেহ করিবে না, যে ইচ্ছা করিয়া সমাজ-শাসন মানিবে না, তাহাকে শাসনে রাখিবার ব্যবস্থা চাই, না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সমাজের সমষ্টিভূত শক্তি, যাহাকে ষ্টেট বা গভর্ণমেণ্ট বলা হয়—যেমন থাকিবে, সেই শক্তি সেখানে প্রত্যেককে তাহার ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে এবং প্রত্যেককে রক্ষা করিবে। আমার ধন রক্ষা করিবার জন্য তখন আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে না, আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে বেগ পাইতে হইবে না। সে ভার গ্রহণ করিবে কে? সমাজের প্রতিভূ বা প্রতিনিধিস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংযত, কেন্দ্রীভূত শক্তির আধারস্বরূপ রাষ্ট্র, ষ্টেট বা রাজা, তাঁহারাই এই ভার গ্রহণ করেন। এই ভাবে রাষ্ট্র মোক্ষপর্য্যায়ভুক্ত হয়। মোক্ষ আকাশ হইতে পড়ে না, সাধনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে হয়। মোক্ষ আর কিছু নহে, জীবের শিবত্বপ্রাপ্তিই মোক্ষ, মানুষের দেবত্বলাভই মোক্ষ। শিবত্ব বা দেবত্ব বাহিরের জিনিষ নহে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর এই শিবত্ব-দেবত্ব রহিয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন নিয়মানুসারে সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় যখন ব্রাহ্মণরা পূজা করিতে বসেন, তখন মন্ত্র আবৃত্তি করেন :—

অহং দেবো … … … ন চ শোকভাক্
সচ্চিদানন্দোঽহং … … … নিত্যমুক্তস্বভাববান্

ইহার অর্থ এই—এই যে আমি উপাসনা করিতেছি, কে কার উপাসনা করে? সমানে সমানে না হইলে উপাসনা হয় না। মানুষ যদি ব্রহ্মভাবাপন্ন না হইত, জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বজাতীয় বস্তু না হইত, যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের বা প্রেমের কোনরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইত না। ব্রহ্ম এবং জীব, জীব এবং শিব, মানুষ এবং ঈশ্বর স্বজাতীয় বস্তু। উপাস্য এবং উপাসক স্বজাতীয় বস্তু বলিয়াই উপাসনা সম্ভব হয়, সাধন-ভজন সম্ভব হয়, জীবের ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ব্রহ্মলাভ প্রভৃতি সম্ভব হয়। এই জন্য উপাসনার পূর্ব্বে যাহা পরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাকে ধ্যান করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এই জন্য সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রাহ্মণরা ধ্যান করেন—আমি দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার ভজনা করিতেছি, তিনি এবং আমি এক জাতীয়, আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ যে ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা করিতে আমি যাইতেছি, তিনি এবং আমি স্বজাতীয়, আমি শোকভাক্ নহি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর, ভগবান্ বা ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিও সেইরূপ। আর তিনি যেমন নিত্যমুক্তস্বভাববান্, আমিও সেইরূপ, আমি যে বন্ধনদশায় পড়িয়া আছি, আমি যে শোক ভোগ করি, ইহা মায়াবশে, অজ্ঞানতা নিবন্ধন। যদি আমার জ্ঞানের বিকাশ হয়, আমি যদি ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, ঈশ্বরকে যদি জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি শোকাতীত হইব, শোকাতীত ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হইব—এই বলিয়া ব্রাহ্মণরা সন্ধ্যা আরম্ভ করেন।

জীবকে যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতর যে সমুদয় পাপের বীজ আছে, যে সমুদয় অজ্ঞানতা আছে, যে সমুদয় ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে, সে যে আপনাকে

ছোট বা আংশিক বলিয়া ভাবে, তাহার যে দেহাত্মবোধ আছে অর্থাৎ সে যে দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, এই সকল নষ্ট না হইলে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। জীবের যে সমুদয় মোহ, অজ্ঞানতা বা সঙ্কীর্ণতা আছে, যে জন্য তাহার নিজের শিবত্বকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে সরাইয়া দেওয়া সমাজবন্ধনের ও সমাজধর্ম্মের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় বন্ধন এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। কেমন করিয়া রাজধর্ম্মের উৎপত্তি হইল, মহাভারতে তাহা সুন্দর বিবৃত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়া রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন—ইহা এক অদ্ভুত কথা। রামায়ণেও তাহাই আছে। রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে রাবণের প্রতি রামের কোন বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। রাবণ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, শ্মশানে উঠিবেন,রাম তখন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে রাজনীতি শিক্ষা দাও। তুমি ত চলিয়া যাইতেছ,আমি রহিলাম, আমাকে রাজনীতি পালন করিতে হইবে।" শ্রীরামচন্দ্র রাবণের কাছে রাজনীতি শিখিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং যুধিষ্ঠির যে জ্ঞানবৃদ্ধ, গুরুজন, পিতামহ ভীষ্মের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিতে চাহিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে গিয়াছেন, এখানে মহাভারতে রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির রাজনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। একটা প্রশ্ন এই,—"আপনি বলুন, রাজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, রাজধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল ?"

ভীষ্ম বলিলেন,—"আদিতে রাজাও ছিল না, দণ্ডও ছিল না, বিধিবিধান কিছুই ছিল না। তবে তখন সমাজ কিরূপে চলিত ? সেই সময় সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম্ম সহজে আপনারা প্রতিপালন করিত ; সুতরাং তখন শাসনের প্রয়োজন ছিল না। তখন সমাজে কোন বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হয় নাই। কেহ কেহ যখন অলসতা বশতঃ আপন ধর্ম্ম—আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিমুখ হইল, সমস্যা উপস্থিত হইল, তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের উপর তোমার যে স্বত্ব-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও রক্ষিত হইবে না। সমাজে তোমার যে 'রাইট' বা যে 'ডিউটী' আছে, সেই 'ডিউটী' তুমি যদি উপযুক্তরূপে প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে তোমার ডিউটীর উপর প্রতিষ্ঠিত তোমার রাইটও থাকিবে না। তোমার ডিউটী যে করিবে, সে তোমার রাইটও লইয়া যাইবে, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে যতটা ভূমি কর্ষণ করা প্রয়োজন, ততটা তুমি কর্ষণ করিবে, যদি না কর, সে ভূমি অনাবাদ থাকিবে না। তোমার প্রতিবেশী, যাহার কর্ম্মলিপ্সা প্রবলতর, যাহার শক্তি তোমা অপেক্ষা বেশী, সেই প্রতিবেশী ঐ ভূমি কর্ষণ করিবে। তাহাতে ভূমির উপর তোমার যে রাইট, দাবী বা স্বত্ব আছে, তাহা তাহার হস্তগত হইবে। এই ভাবে তুমি যদি কর্ত্তব্য পালন না কর, অপরে তোমার কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় লইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে তোমার স্বত্ব বা রাইটও লইয়া যাইবে, তুমি তাহার অধীন হইবে, সে তখন আপনার শক্তি দ্বারা, আপনার কর্ম্মের প্রভাব দ্বারা তোমার উপর উৎপীড়ন করিবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই ভীষ্ম বলিলেন, প্রথমে রাজাও ছিল না,দণ্ডও ছিল না,তখন প্রত্যেকে আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত, আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিত। ক্রমে কতকগুলি লোক আলস্যবশতঃ আপন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইল ; তখন সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া অন্য লোক শক্তিশালী বা প্রবল হইয়া উঠিল। সে যে প্রথম হইতেই প্রবল হইয়াছে, তাহা নহে। তোমার কর্ত্তব্যপালনে বিমুখতা হইতে তাহার শক্তিলাভ হইয়াছে ; বাহুবলে শক্তিশালী হইল, তাহা নহে, সমাজশাসনের দ্বারা সে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। শক্তিশালী হইয়া সে তোমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, মারামারি আরম্ভ করিল। এই ভাবে অরাজকতার উৎপত্তি হইল ; সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন না করে, তাহা হইলে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দুরা যদি তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হয়, মুসলমান অথবা শিখরা যদি তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে যে সেই কর্ত্তব্য পালন করিবে, সমাজধর্ম্ম বা সমাজশক্তি তাহাকে আশ্রয় করিবে ; যে কর্ত্তব্য পালন করিবে না, সে দুর্ব্বল হইবে, প্রবলের দ্বারা সে প্রপীড়িত হইবেই হইবে, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। এই ভাবে সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হয়, ইহাই প্রাচীন কাহিনী। অরাজকতা যখন উপস্থিত হয়, সর্ব্বংসহা ধরিত্রী সেই অধর্ম্মের ভার সহ্য করিতে পারেন না, তখন তিনি ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হইলেন। পালনকর্ত্তাকে

বলিলেন, এই অরাজকতার ভার হইতে আমাকে তুমি মুক্তি দান কর। তখন ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া কতকগুলি আইনের সৃষ্টি করিলেন, এই ভাবে "ল"এর সৃষ্টি হইল, জীবের কল্যাণকামনায় সমাজস্থিতির জন্য ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া, ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া, স্বত্ব বা রাইট মানস দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া কতকগুলি আইন রচনা করিলেন। শাস্ত্রকাররা "রচনা" বলেন নাই, বলিয়াছেন—কতকগুলি বিধি "সৃষ্টি" করিলেন। সৃষ্টি করিলেই হয় না, আইন চালাইবে কে, আইনের পরিচালক চাই, সেই জন্য আইন সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা আপনার মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন, যিনি প্রথম রাজা হইলেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! আমাদের নীতিশাস্ত্রমতে আইন আগে, রাজা পরে। প্রজা যেমন আইনের বশীভূত, রাজাও তেমনই বশীভূত, এক আইন, এক বিধি দ্বারা রাজা প্রজা উভয়েই শাসিত। প্রজা যে বিধি মানিয়া চলিবে, রাজাকেও সেই বিধি মানিয়া চলিতে হইবে। রাজা বিধি সৃষ্টি করেন নাই। বিধি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আজকাল, ধরুন, বিলাতে কি ব্যবস্থা দেখিতে পাই? পার্লেমেণ্ট যে আইন পাশ করেন, তাহাতে রাজার সহী চাই, 'এসেণ্ট' চাই। তিনি তাহা অনুমোদন করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন। আইন রচনা করিবার উপর রাজার যদি হাত থাকে, তাহা হইলে কি হয়? রাজা ইচ্ছামত—আপন খুসীমত আইন করিবেন, তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মমতে আইন করিয়াছেন বিধাতা পুরুষ বা ব্রহ্মা এবং সেই আইন চালাইবার জন্য সেই আইন, বিধান বা সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী সমাজশাসন ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য রাজার প্রয়োজন আছে। সেই রাজা কে? ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি, ব্রহ্মার মন হইতে যে রাজবিধান এবং সমাজবিধানের প্রতিষ্ঠা হইল, সে এই বিধান অনুযায়ী শাসন করিবে। ইহাই প্রাচীন কাহিনী।

এই কাহিনীর অন্তরালে একটা বিরাট সত্য রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্রস্বরূপ বিদ্যমান আছে। সেই সত্যটা এই,—রাষ্ট্রনীতির দুই অঙ্গ;—(১) কর্ম্মাঙ্গ বা শাসনাঙ্গ (২) বিধানাঙ্গ। একটি 'একজিকিউটিভ' আর একটি 'লেজিস্‌লেটিভ ফাঙ্কসান।' যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংপ্রসারণ হয়, যাহাতে রাজার যথেচ্ছাচার সংযত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সমাজবিকাশের ধাপে ধাপে কর্ম্মাঙ্গ এবং বিধানাঙ্গ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। এক সময় তাহা ছিল না। যথেচ্ছাচারশাসন যেখানে আছে, সেখানে তাহা নাই, সেখানে প্রজা-প্রতিনিধিসভা নাই, যখন যাহা ইচ্ছা, রাজা তাহাই জারী করিতে পারেন। স্বেচ্ছাচার-শাসিত রাজ্যে চিরদিন তাহাই হইয়া আসিয়াছে। রাজধর্ম্মপরিচালনের জন্য রাজস্বের প্রয়োজন; সুতরাং রাজকার্য্যের প্রয়োজন হিসাবে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইবে। স্বেচ্ছাচার রাজ্যে রাজা আপন খেয়ালমত, সুখভোগ বা বিলাসব্যসনের প্রয়োজনমত রাজস্ব পরিমিত করিতেন; যাহার কাছে যাহা পাইতেন, লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। যতই প্রজার স্বত্ব-স্বার্থ সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই কর্ম্মাঙ্গ এবং বিধানাঙ্গ পৃথক্ হইয়া গেল। বহু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে আধুনিক প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা যখন কল্পনাও করিতে পারে নাই, 'লেজিস্‌লেটিভ' এবং 'একজিকিউটিভ' এই দুই 'ফাঙ্কসান' পৃথক্ হওয়া উচিত, তখন আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র সেই বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের সাধনায় পলিটিক্‌স্ কি জিনিষ ছিল, বুঝিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে পলিটিক্‌সের প্রয়োজন মোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, পলিটিক্‌সের অভিধেয়—রাজশক্তি এবং প্রজামণ্ডলী ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই সম্বন্ধ যাহাতে উভয়ের ধর্ম্মের অনুমোদিত হয়, উভয়ের মুক্তির অনুমোদিত হয়, সেই ভাবে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। ইহা করিতে যাইয়া, প্রজার স্বত্ব-স্বার্থকে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির প্রতিকূলে রক্ষা করিতে যাইয়া 'লেজিস্‌লেটিভ' এবং 'একজিকিটিভ ফাঙ্কসান' পৃথক্ করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, আইন রাজা করেন নাই, তাহা ব্রহ্মার কৃত, অপৌরুষেয়। নিসর্গের আইন যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া দিয়াছেন, নিসর্গের পরস্পরের ভিতর যে সম্বন্ধ তাহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তিনি যেমন আইন করিয়া দিয়াছেন, তেমনই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং সমাজের সমষ্টিভূত রাজশক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পলিটিক্‌সের আলোচনা বা অনুশীলন মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্গত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কোনার্ক

কপিল-সংহিতাতে যে চারিটি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে কোনার্ক একটি। ইহার অপর নাম সূর্য্য, অর্ক, রবি বা পদ্মক্ষেত্র। পুরী হইতে সাড়ে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত; সমুদ্র হইতে ১ ক্রোশমাত্র ব্যবধান। চন্দ্রভাগা নামক একটি শুষ্ক নদীর খাত ইহার উত্তরদিকে অবস্থিত। পুরী হইতে গো-যানে বালুকা-প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইলে কোনার্ক পৌঁছিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এখন মোটর-গাড়ীর সাহায্যে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে পাল্কীর সাহায্যেও যাওয়া যায়।

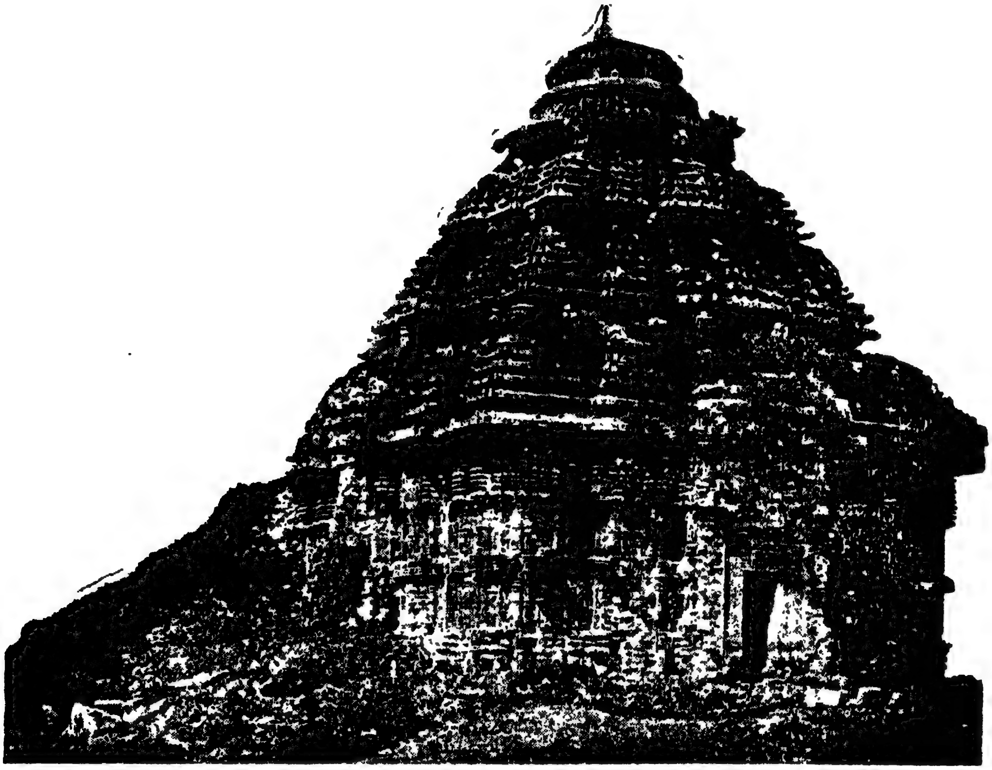

কোনার্ক

এই ক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের একটি সুবৃহৎ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাণকথিত প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নারদের কৌশলে পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং সূর্য্যের উপাসনা করিয়া শাপমুক্ত হয়েন। তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার সময়ে নদীমধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কপিল-সংহিতাতে এই ক্ষেত্রে অবস্থিত অনেকানেক দেব-মন্দিরের বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই এক সূর্য্য-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন অপর কোনটির বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

কোনার্কের সূর্য্যমন্দির বিমান, জগমোহন ও ভোগ-মণ্ডপ এই তিন অংশে বিভক্ত। জগমোহন ও ভোগ-মণ্ডপের মধ্যস্থলে নাটমন্দির নাই, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে এক খণ্ড উন্মুক্ত ও বিস্তৃত ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমানের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অল্পদিন হইল, ইহার কিয়দংশমাত্র মৃত্তিকার মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী বা সিংহাসন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই বেদীর উপরে এক সময়ে

সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিমানের প্রস্তর-নির্ম্মিত ভিত্তির গাত্রে অতি সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন ২৪ খানি রথচক্র ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখা যায়। অনুমান এই যে, এইগুলি সূর্য্যদেবের রথের চক্ররূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছে। বিমানের প্রাচীরের অন্তঃস্থলে তিনটি বৃহদাকার সূর্য্য-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। মধ্যের মূর্ত্তি বীরবেশে সজ্জিত ও অশ্বারূঢ়; ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ভগ্ন পুরুষমূর্ত্তি অবস্থিত।

পুরীমন্দিরের ইতিবৃত্তমধ্যে উল্লিখিত আছে যে, দেবদ্বেষী কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনার্ক আক্রমণ করিয়া সূর্য্য-মন্দির ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করে। একবারে ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ না হইলেও মন্দির ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকারে স্থান অপবিত্র করিয়া কালাপাহাড় দেবমন্দিরের বহুমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। মন্দির এইরূপে ভগ্ন ও কলুষিত হইবার পর হিন্দুগণও উহা দেবস্থান বলিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করে নাই এবং তদবধি ইহা এই ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বিমানের সম্মুখেই জগমোহন। ইহার ছাদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রস্তরময় প্রাচীরে অনেকানেক স্ত্রীমূর্ত্তি এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার; মধ্যের দরজার শিরোদেশে শিবমূর্ত্তি অবস্থিত। জগমোহনের কারুকার্য্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপরিভাগে নবগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

জগমোহনের সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে ভোগমণ্ডপ অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই উপরে উঠিবার সোপানাবলী আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে দুইটি বৃহদাকৃতি প্রস্তরের সিংহমূর্ত্তি বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ-প্রোথিতাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। ভোগমণ্ডপের প্রাচীরের গাত্রে বিস্তর প্রস্তরমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং ইহার মেঝের উপর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্য, বিষ্ণু, গঙ্গা, অগ্নি, মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং সীতার বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা-ক্ষোদিত প্রস্তরফলকসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূর্য্য-মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে রামচণ্ডী বা মায়াদেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার রাজা প্রথম নৃসিংহ দেবের রাজত্বকালে (১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) এই সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে তিনিই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত।

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে, উড়িষ্যার বার বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া কোনার্কের এই সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে পুরীর বার্ষিক রাজস্ব তিন ক্রোর টাকা ছিল। যাহারা ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যা সূক্ষ্ম বিচারকের চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে এই মন্দিরের বিশালতা, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উড়িষ্যার এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কারসাধন করিয়াছেন। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে অরুণস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনার্ক হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

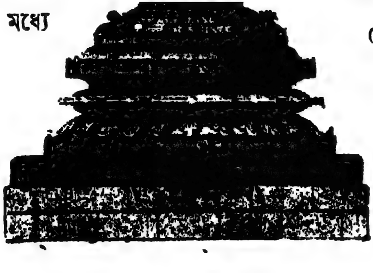

অরুণস্তম্ভ

চিল্কা

যাহারা পুরী গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চিল্কা-হ্রদ না দেখিয়া ফিরিয়া আইসেন না। তীর্থ হিসাবে তথায় কিছু না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় অনেক লোকের সমাগম হয়।

এই হ্রদ উড়িষ্যার পূর্ব্ব-উপকূলে সমুদ্রতটে অবস্থিত। মাদ্রাজের রেলগাড়ী

চিল্কা-হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। রেলগাড়ীতে যাইবার সময় বহু দূর পর্য্যন্ত চিল্কা-হ্রদের দৃশ্য নয়ন-পথে পতিত হয়। রেললাইনের এক দিকে উত্তুঙ্গ ঘন-পাদপরাজি-বেষ্টিত ঘাট-শৈলমালা, অপর দিকে চিল্কা-হ্রদের বাত্যা-সংক্ষুব্ধ বহুবিস্তৃত ধূসর বর্ণের জলরাশি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিল্কা দেখিতে হইলে রম্ভা নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে চিল্কা বেশী দূর নহে এবং এখানে বিশ্রাম করিবার স্থানের ব্যবস্থা আছে। এক দিনের মত খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

চিল্কা হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ ক্রোশ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। হ্রদের উত্তরাংশ, দক্ষিণাংশ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। কোন কোন স্থানে উত্তরাংশের প্রস্থ প্রায় ১০ ক্রোশব্যাপী, কিন্তু দক্ষিণাংশ প্রস্থে কোথাও ২৷৷০ ক্রোশের অধিক নহে। ইহা একটি অতি-বিস্তৃত স্বল্প-গভীর জলাশয়; ইহার গভীরতা কোন স্থানেই ৪ হাতের অধিক নহে। একটি বহু বিস্তৃত উচ্চ বালির বাঁধ ইহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে যে এই হ্রদ সমুদ্রের অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালে নৈসর্গিক ঘটনাসূত্রে বালুকারাশি এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া প্রাচীরের আকারে সমুদ্রের অখণ্ড জলরাশিকে খণ্ডীভূত করিয়া এই বিপুল হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিলাম, বালুকাময় প্রাচীরের মধ্য দিয়া সমুদ্রের সহিত এই হ্রদের যোগ আছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় এই হ্রদের জল সমুদ্রজলের ন্যায় লবণাক্ত থাকিলেও, স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হইলাম যে, বর্ষার পরে হ্রদের জলের লবণাক্ত দোষ কাটিয়া যায়, এমন কি, তখন ঐ জল পান করিবার উপযুক্ত হয়। আমি গ্রীষ্মকালে যখন হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন হ্রদের জল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল এবং দেখিতেও পরিষ্কৃত ছিল না। হ্রদের তীরে যাইয়া একটা অপ্রীতিকর 'আঁসটে' গন্ধ অনুভূত হইয়াছিল। সে সময়ে বায়ুসংযোগে অপার জলরাশিমধ্যে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া হ্রদটি সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া তীর হইতে বহু দূরে গমন করিয়াছিলাম। জলবিহারের ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্ব হইতে নৌকার ব্যবস্থা করিতে হয়। হ্রদের মধ্যে ৯৫টি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতা-শোভিত মনোরম ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত আছে। এই সকল দ্বীপে মনুষ্যের বাস নাই। আমরা কোন দ্বীপে নামিতে সাহস করি নাই। দ্বীপগুলি শরবনে আবৃত, ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে নৌকায় আসিয়া এই স্থান হইতে শর সংগ্রহ করে। এই দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে পারিকুদ্ নামক দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা বিবিধ পাদপরাজিতে পরিপূর্ণ এবং নানা জাতীয় সুকণ্ঠ বিবিধ বর্ণে চিত্রিত পক্ষিকুল তথায় বাস করে। অন্য দ্বীপ হইতে ইহা আকারে অনেক বড় এবং দৃশ্যে অতীব রমণীয়।

চিল্কায় বিস্তর মাছ আছে। ধীবররা নৌকাসাহায্যে জাল ফেলিয়া মাছ সংগ্রহ করে। মাছ এখানে খুব সস্তা দরে কিনিতে পাওয়া যায়। ছোট চিংড়ি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হ্রদের মধ্যে জন্মে।

এই হ্রদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে প্রকৃতির স্নিগ্ধ, শান্ত, নয়ন-মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া হ্রদের জলে পতিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচুর্ণীলাল বসু।

বিশ্ব-তীর্থ

যখন মগন সকল ভুবন মোহের অন্ধকারে,
প্রথম উষার আলোক ভাতিল ভারত-গগন-দ্বারে,
তাহারি পূজার অর্ঘ্য হইয়া কুসুম মেলিল আঁখি,
তাহারি প্রাণের ভকতি বহিয়া বিহগ উঠিল ডাকি',
সকল জগৎ চমকি চাহিল, পুলকে তাহারি মহিমা গাহিল,
তাহারি মন্ত্র মাগিয়া মানিল কৃতার্থ আপনারে।

সারা জগতের তীর্থ যে দেশ, সারা ভুবনের গুরু,
আজি সে সবার পিছনে পড়িয়া,—হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
যে আপন আলোকে জ্বালি' পন্থা দেখাল সকল নরে,
হায় আপনার পথ আপনি আজি সে খুঁজে খুঁজে শুধু মরে,
আপনার প্রতি নাহি বিশ্বাস,, আছে শুধু তার শেষ নিশ্বাস,
হরি দাও পথ দাও, নাও ডেকে নাও এই বিপদের পারে।

৺শরদিন্দুনাথ রায়।

কারেন্সি কমিশন

গত মাসে হিল্টন-ইয়ং কারেন্সি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রচলিত মুদ্রা 'টাকা'র বিনিময়-মূল্য অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। তাহার প্রতিক্রিয়াফলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য ঘন ঘন বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। সেই জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতে এবং সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেও থাকে। ভারতে এই ক্ষতি নিতান্ত অল্পকাল আরব্ধ হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকার সহিত বিলাতী সভারেণের বিনিময়ের হার বিপর্য্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। যে কারণে এই বিনিময়ের হার বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহার জন্য ভারতবাসী বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের আর কতকগুলি উন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণের এবং রৌপ্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভারতে সুবর্ণের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের প্রায় ১৫ গুণ ছিল। য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও সুবর্ণের ও রৌপ্যের মূল্যগত তারতম্য প্রায় এইরূপই ছিল। সুতরাং অতি পূর্ব্বকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়গত হার লইয়া কোন গোলই উঠিত না।

য়ুরোপে নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ এবং অন্যান্য হাঙ্গামা মিটিয়া যাইলে পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার বিলাতে রজতকে মুদ্রার আসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া কেবল সুবর্ণকে মৌদ্রিক ধাতুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন অর্থাৎ ঐ সময়ে বৃটেনে সভারেণই দেনা-পাওনার বৈধ মুদ্রা (legal tender) বলিয়া গণ্য এবং রজতমুদ্রা সিলিং সঙ্কুচিত হইয়া * সভারেণেরই ভগ্নাংশ মুদ্রা বা খুচরা মুদ্রা বলিয়া চলিত হয়। ভারতে তখন পর্য্যন্তও দুই ধাতুর মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা উহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া অনুযোগ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। শেষে সাব্যস্ত হয় যে, তখন মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত এক তোলা ওজনের রৌপ্য-মুদ্রাই ভারতের সর্ব্বত্র দেনাপাওনায় বৈধ মুদ্রা বলিয়া প্রচলিত হইবে এবং সুবর্ণ-মুদ্রাকে আর বৈধভাবে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও কোম্পানীর টাঁকশালে সুবর্ণ-মোহর প্রস্তুত করিবার কোন বাধা ছিল না। উহা কোম্পানীর টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়া জনসমাজে ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতের এবং বৃটেনের মুদ্রায় ধাতুগত পার্থক্যের ইহাই প্রারম্ভ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোটামুটি বিলাতী সুবর্ণ-মুদ্রার সহিত ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ব্যাপারে বিশেষ কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। ইতোমধ্যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতস্থ য়ুরোপীয় বণিকরা এবং ভারতীয় নেতৃবর্গ সরকারের নিকট ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সরকার কিন্তু ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা বা হৈমমুদ্রাশালা (gold mint) প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাঁহারা সরকারী আফিসের এবং পেপার কারেন্সির কর্ত্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র ১০ দশ টাকা মূল্যে সভারেণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়ে সরকার তদানীন্তন রাজস্বসচিব মিষ্টার লেংএর পরামর্শ অনুসারে মুদ্রা-ব্যাপারে যেন কতকটা অনিশ্চিত নীতি অবলম্বন করেন। ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনে সরকারের অরুচি প্রকাশ পায়। তদানীন্তন ভারতসচিব সার চার্লস্ উড হৈম-মুদ্রাকে বৈধ মুদ্রা (legal tender) করিতে অসম্মত হয়েন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তর্ক-যুক্তির দ্বারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "বহুকাল ধরিয়া ভারতে যে রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে সরকার তাহাদের খাজনা-খানায় একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুবর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারেন। সরকার সেই হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।"

কিন্তু এ ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। রূপার দর নানা কারণে হ্রাস পাইতে থাকায় সরকার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সভারেণের মূল্য ১০ টাকা ৪ আনা এবং অর্দ্ধ-সভারেণের মূল্য ৫ টাকা ২ আনা ধার্য্য করিয়া দেন।

---

(১) সিলিঙের ওজন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাই বাটা-বিভ্রাটের প্রারম্ভ। এই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সরকারের অবলম্বিত মুদ্রানীতির ফলে ভারতবাসীর যে কত ক্ষতি ও কত লোকসান হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কারণ, এই সময় হইতে প্রায় ক্রমাগতই রজতের মূল্য কমিতে থাকে। কচিৎ কখনও রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই রজতের মূল্য যে অধোগত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সরকার যদি এই সময়েও ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীকে কখনই এই দারুণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না।

এই ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হইয়াছে, তাহা টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত টাকার এই বিনিময় মূল্য কি ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহার পর টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে দাঁড়ায়।

খৃষ্টাব্দ	টাকার বিনিময় মূল্য
১৮৬৩-৬৭	১ শিলিং ১১ পেন্স ৩॥০ ফার্দিং
১৮৬৭-৬৮	১ " ১১ " ॥০ "
১৮৭১-৭২	১ " ১১ " ॥০ "
১৮৭৫-৭৬	১ " ৯ " ২॥০ "
১৮৭৯-৮০	১ " ৮ " ০ "
১৮৮৩-৮৪	১ " ৭ " ১ "
১৮৮৭-৮৮	১ " ৪ " ৩॥০ "
১৮৮৮-৮৯	১ " ৪ " ১॥০ "
১৮৯০-৯১	১ " ৬ " ॥০ "
১৮৯১-৯২	১ " ৪ " ৩ "
১৮৯২-৯৩	১ " ৩ " ০ "
১৮৯৩-৯৪	১ " ২ " ২ "
১৮৯৪-৯৫	১ " ১ পেনী ॥০ "
১৮৯৫-৯৬	১ " ১ " ২ "
১৮৯৬-৯৭	১ " ২ পেন্স ২ "
১৮৯৭-৯৮	১ " ১ পেনী ১॥০ "
১৮৯৮-৯৯	১ " ৪ পেন্স ০ "

পাঠক দেখুন, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার মূল্য প্রায় ২ শিলিং ছিল,তাহার পর ইহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা দ্রুত কমিতে থাকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টাকার মূল্য প্রায় ১ শিলিংএ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতকে বহু কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয়। বিলাতের হোম চার্জ্জ, বিলাত হইতে আমদানী পণ্যের মূল্য,—রেলওয়ে প্রভৃতির সাজ-সরঞ্জাম খরিদ প্রভৃতি বাবদ সেই জন্য ভারতকে প্রায় কোন কোন বৎসর দ্বিগুণ টাকা দিতে হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার জন্য সরকারকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই দরিদ্র দেশের অধিবাসীর উপর কত কর বসাইতে হইয়াছে; ভারতের ঋণ-পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া জমা-খরচ মিলাইবার কোন পথ দেখিতে না পাইয়া, "টাকা, টাকা, টাকাই আমার গানের **একমা**ত্র ধুয়া" (money, money, money is the burden of my song) বলিয়া দিগ্‌বধূকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড ডাফরিণের আমলে লবণ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে লর্ড ডাফরিণ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, Since my arrival in India, owing to the depreciation of silver, the annual accumulative loss to the Government has progressively increased year by year by a million pounds sterling অর্থাৎ "আমি ভারতে আসিবার পরে, রৌপ্যের মূল্য-হ্রাস হেতু সরকারের ক্ষতির পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ ১০ লক্ষ পাউণ্ডে (দেড় কোটি টাকার উপরে) পরিণত হইয়াছে।" ইহার উপর ঐ সময়ে এই দরিদ্র ভারতবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ, কেরাসিন প্রভৃতির উপর মাশুল বসান হইয়াছিল। সুতরাং এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে মূক জনসাধারণের ক্ষতি ও কষ্ট অল্প হয় নাই। অতএব মুদ্রামূল্য হ্রাসে যে ভারতের লাভ, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না।

এখন দেখিতে হইবে, যে সময়ে মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল, সেই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর উহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল। এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, টাকার মূল্য যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়।

তাহার কারণ, টাকা সস্তা হওয়াতে বিদেশে ভারতজাত পণ্য সস্তা এবং বিদেশ হইতে আমদানী পণ্য মহার্ঘ্য হইবেই হইবে। পণ্য স্বল্পমূল্য হইলে উহার কাট্‌তি অধিক হয়, আর দুর্ম্মূল্য হইলে উহার কাট্‌তি কমিয়া যায়, ইহাই মোটামুটি সাধারণ নিয়ম। পক্ষান্তরে, যদি বিদেশী মুদ্রার সহিত বিনিময়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত এবং আমদানী বাণিজ্য প্রসৃত হইয়া পড়ে। কারণ, বিদেশে দেশীয় (ভারতজাত) পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে আমদানী পণ্য হ্রাস পায়। ইহাই মোটামুটি আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধির একটা প্রবল কারণ। মত, বুদ্ধি এবং বিবেচনা অনুসারে এই নিয়মকে উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু তাহা হইলে এ কথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণের উহাই একমাত্র কারণ নহে। উহার আরও বহু কারণ বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সেই সকল কারণ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সেই কারণ-সমূহের কতকগুলি কারণ স্থায়ী, আর কতকগুলি কারণ অস্থায়ী। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-সম্পর্কিত ব্যাপারে সেই ভিন্ন কারণগুলি সমস্ত বা উহার কতকগুলি বিদ্যমান আছে কি না, তাহাও দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দেখা সহজ নহে। কারণ, পৃথিবীর সকল দেশেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তৃত ; সকল দেশের অবস্থাও সমান নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতে মুদ্রামূল্য যখন অতিশয় হ্রাস পাইয়াছিল, তখন ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

বাণিজ্যের হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, যে সময়ে টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল, সে সময়ে বিদেশে ভারতজাত পণ্যের রপ্তানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। অন্ততঃ কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী অধিক হয় নাই। বরং বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ঠিক যে সময়ে মুদ্রা-মূল্য অচল ছিল অথবা কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, যখন টাকার বিনিময় মূল্য অতি দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে, তখনও ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই। *

পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে য়ুরোপের যে যে দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই সেই দেশে তখন সুবর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হেতু পণ্য-মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি পাইলেই পণ্য-মূল্য হ্রাস পায়, ইহা স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন টাঁকশালে অবাধে মুদ্রাপ্রস্তুত কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অল্পদিন পরেই পঞ্চনদপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, বাঙ্গালাদেশে, বোম্বাই ও মাদ্রাজপ্রদেশে, আসাম অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশে, এক কথায় ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্য শস্য সস্তা হইয়াছিল।* সুতরাং মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি পাইলে খাদ্য শস্য সুলভ হয়, ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ফলে কেবলমাত্র টাকার মূল্য হ্রাস পাইলেই যে বিদেশে দেশীয় পণ্যের রপ্তানী অতিশয় বৃদ্ধি পায় অথবা বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের পরিমাণ অতিশয় বাড়িয়া যায়, তাহা মনে হয় না।

তবে এ কথা খুবই সত্য যে, যখন কোন দেশের মুদ্রামূল্য কমিতে থাকে, তখন যাহারা এ দেশ হইতে বিদেশে এ দেশী পণ্য রপ্তানী করিয়া থাকে, তাহারা সময় সময় প্রচুর লাভ করে। যে সময় এ দেশের টাকার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, তখন এ দেশের রপ্তানী-কারক বণিকরা টাকার দরে এ দেশে পণ্য কিনিয়া সভারেণের দরে উহা বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারাই প্রভূত লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বোম্বাইয়ের এবং কলিকাতার প্রায় সকল রপ্তানীকারক সওদাগরই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠে। সেই লব্ধ অর্থেই বোম্বাইয়ে কার্পাস-কলের এবং বাঙ্গালায় পাট-কলের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

এ দিকে এই ব্যাপারে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার এ পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পাঁচটি কমিটী ও কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। যথা—হার্শেল কমিটী, ফাউলার কমিটী, চেম্বারলেন রয়েল কমিশন, ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী এবং (আলোচ্য) হিল্টন ইয়ং রয়েল কমিশন। বার্ত্তাশাস্ত্রে বড়

---

* Vide Prof H Stanley Jevon's Banking and Exchange in India page 127.

* Vide Evidence of Late Mr. R. C. Dutta before the Fowler's Committee.

বড় বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত কমিশনগুলি পরিশ্রম সহকারে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের আলোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্তও করিয়া দিয়াছেন; সরকারও সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কায করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কমিশনের ফলই সন্তোষজনক হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের মতে, ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রার অবাধে প্রচলনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি কমিশনের একটি কমিটী ও কমিশনও তাহা করেন নাই। তাঁহারা জোড়তালি দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফাউলার কমিটী ভারতীয় টাকাকে নামে রজত-মুদ্রা রাখিলে কাযে পাউণ্ডের সহিত উহার মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ টাকাকে তাঁহারা আসল মুদ্রা না রাখিয়া উহাকে পাউণ্ডের সহিত মূল্য পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়া উহাকে অভিজ্ঞানমুদ্রা (token money) করিয়া দিলেন। অভিজ্ঞান অর্থে—যাহা দেখিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বিষয়কে মনে পড়ে। টাকা যদি নিজের পরিচয় না দিয়া পাউণ্ডের একটা ভগ্নাংশের (১ শিলিং ৪ পেন্সের) পরিচয় দেয়, তাহা হইলে টাকাও আসল মুদ্রা হয় না, অভিজ্ঞানমুদ্রাই হইয়া থাকে। ঐ হিসাবে নোটও অভিজ্ঞানমুদ্রা।

এই ক্ষেত্রে সরকার যদি ভারতে অবাধে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে, কথনই মুদ্রা লইয়া এত জটিলতার সৃষ্টি হইত না। সে কথা আমরা পরে বলিব. তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, উপস্থিত আমাদের দেশে টাকা ও নোট চলিত আছে। ঐ দুইটি ভাক্ত-মুদ্রা বা অভিজ্ঞানমুদ্রা (token coin) ভিন্ন এ দেশে আসল মুদ্রার দেখা নাই। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। কারণ, কেবল ভাক্তমুদ্রা বা অভিজ্ঞানমুদ্রা যে দেশে প্রচলিত থাকে, সে দেশের সরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে সেই ভাক্তমুদ্রা বাহির করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। তাহার ফলে মুদ্রামূল্য কমে এবং দেশে দুর্ম্মূল্যতা দেখা দেয়। বর্ত্তমান সময়ে সকল সভ্য দেশই সুবর্ণ-মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহার কারণ, পৃথিবীতে যত জিনিষ আছে, তাহার মধ্যে সুবর্ণের মূল্য অনেকটা স্থায়ী থাকে। সেই জন্য ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন অধিক। কেন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

ফাউলার কমিটী হইতে ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী পর্য্যন্ত চারিটি কমিটীর কথা আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব না। এ ক্ষেত্রে আমি কেবল ইয়ং কমিশনের কথাই বিশেষভাবে বলিব।

এই কমিটী তাঁহাদের পরামর্শদান সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের ১০ জন কমিশনারের মধ্যে ৯ জন একমত হইয়াছেন, আর এক জন অর্থাৎ সার পুরুষোত্তম দাস টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হইয়াছেন। সার পুরুষোত্তম দাস বোম্বাই অঞ্চলের রপ্তানীকারক বণিকদলের মুখপাত্র

কমিশনের সদস্য ছিলেন এই কয় জন :—

(১) মিষ্টার এডওয়ার্ড হিল্টন ইয়ং
(২) সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৩) সার নর্কট হেষ্টিং ইলস ওয়ারেণ
(৪) সার রেজিনাল্ড আর্থার ম্যাণ্ট
(৫) সার মানেকজী বৈরামজী দাদাভাই.
(৬) সার হেন্‌রী ষ্ট্রাকোশ্চ
(৭) সার আলেকজাণ্ডার রবার্টসন মারে
(৮) সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস
(৯) অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কুবেরজী কয়াজী
(১০) মিষ্টার উইলিয়ম এডওয়ার্ড প্রেষ্টন।

এই কমিশন সরকারকে মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ;—

(১) টাকার মূল্য এক শিলিং ৬ পেন্স অর্থাৎ ১৮ পেন্স ধার্য্য করিতে হইবে। এই স্থলেই কেবল সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস অন্য সকলের সহিত ভিন্নমত হইয়া টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স অর্থাৎ ১৬ পেন্স ধার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

(২) টাকার মূল্য বিলাতী সভারেণের সহিত গাথিয়া না দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুবর্ণের (সাড়ে ৮ গ্রেণ) মূল্যের সহিত গাথিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ সভারেণের বিনিময় মানে টাকার মূল্য ধার্য্য না করিয়া সুবর্ণের ধাতব মানে টাকার মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং টাকা অতঃপর আর বিলাতী পাউণ্ডের অংশবিশেষের অভিজ্ঞান না হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুবর্ণের অভিজ্ঞান হইবে।

(৩) টাকার নির্দ্দিষ্ট মূল্য এবং বাজার পসার অবিচলিত

রাখিবার জন্য একটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিতে হইবে ঐ ব্যাঙ্ক সরকারের অধীন হইবে না।

(৪) আর নূতন করিয়া রূপার টাকা প্রস্তুত করা হইবে না। যে রূপার টাকা আছে, বাজারে কেবল তাহাই চলিবে অতঃপর সরকার কেবল এক টাকার নোট প্রস্তুত করিতে থাকিবেন।

(৫) ভারতবাসীরা অত্যন্ত মুদ্রাসঞ্চয়প্রিয় উহারা ধাতু-মুদ্রা মাটীর মধ্যে পুতিয়া অথবা অন্য উপায়ে আটক রাখে। যাহাতে লোক আর ঐ ভাবে টাকা ফেলিয়া না রাখে, সেই জন্য কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাহারা ঐ সঞ্চিত মুদ্রা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবে, তাহাদিগকে সেই সঞ্চিত মুদ্রার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সেই সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইবার সময় হইলে সার্টিফিকেটের অধিকারী যদি তৎ-পরিবর্ত্তে স্বুবর্ণ চাহে, তাহা হইলে সেই টাকার পরিবর্ত্তে তাহার যে কয় তোলা সোনা প্রাপ্য হয়, সে সেই কয় তোলা সোনা পাইবে। অর্থাৎ এক তোলা সোনার মূল্য ২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই, এই হিসাবে তিনি যত টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তত টাকার সোনা পাইবেন। লোকের টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রবৃত্তি দমনের জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৬) নোটই আইন অনুসারে দেয় ও গ্রাহ্য মুদ্রা হইবে। খুচরা নোটের পরিবর্ত্তে কেহ স্বর্ণমুদ্রা পাইবেন না। তবে কলিকাতার, বোম্বাইয়ের এবং মাদ্রাজের ব্যাঙ্কে কেহ সুবর্ণের প্রার্থী হইলে ব্যাঙ্ক ৪ শত আউন্স অর্থাৎ ১ হাজার ৬৫ তোলা ওজনের সোনার বার ঐ দরে (২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই) পাইবেন। অর্থাৎ টাকা নামধেয় কাগজের বা রূপার নোটের অধিকারী ইচ্ছা করিলে তাহার সেই নোট ভাঙ্গাইয়া সে প্রতি টাকায় সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা পাইবে না। সে যদি প্রায় ২৩ হাজার টাকা যোগাড় করিয়া ঐ ব্যাঙ্কে হাজির হইয়া সোনা চাহে, তাহা হইলে সে সোনা পাইবে, অন্য কেহ তাহা পাইবে না। অর্থাৎ প্রায় ২৩ হাজার টাকার নোট একত্র না করিলে আর কেহ নোট ভাঙ্গাইতে পারিবেন না। রিপোর্টের সমস্ত গোলের কেন্দ্র এইখানেই।

ইহাই হইল কমিশনের মোট পরামর্শ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সরকার যদি এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর লাভ হইবে না ক্ষতি হইবে?

দেখা যাইতেছে যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইবে কি ১৬ পেন্স হইবে, তাহা লইয়াই দুই পক্ষে তুমুল তর্ক বাধিয়াছে। আমার মনে হয়, এ তর্ক উঠিতেই পারে না। কারণ, কমিশন যখন বলিতেছেন, টাকার মূল্য আর সভারেণের সহিত গ্রথিত থাকিবে না, সুবর্ণের সহিতই গ্রথিত হইবে, অর্থাৎ ভারতে Gold exchange standard না হইয়া Gold bullion standardই হইল, তখন এই প্রসঙ্গে মুখ্যভাবে পাউণ্ড অথবা তস্য ভগ্নাংশ মুদ্রা শিলিং পেন্সের কথা না তোলাই উচিত। এখন কথা হইতেছে, ভারতীয় মুদ্রায় যখন সুবর্ণমানই প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন টাকার মূল্য হিসাবে উহা কতখানি খাঁটি সোনার দরে বিকাইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য। এখন বুঝা যাইতেছে যে, সরকার টাকাকে সাড়ে ৮ গ্রেণ পাকা সোনারই প্রতিভূ বা অভিজ্ঞান করিতে চাহিতেছেন। তাহা হইলে আজকালকার বাট্টায় বাজারে উহার দর হইবে ১ শিলিং ৬ পেন্স বা ১৮ পেন্স। সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস বলিতেছেন, উহার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স বা ১৬ পেন্স করাই কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাঁহার মতে টাকার মূল্য শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে কম ধার্য্য করিতে হইবে। তাহা করা কিছুমাত্র কঠিন নহে. টাকার মূল্য হইতে যদি প্রায় ১ গ্রেণ সোনা বাদ দেওয়া যায়, অর্থাৎ টাকা যদি সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা না হইয়া ৭'৫৫ গ্রেণ সোনা হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স হইবে। কিন্তু সার পুরুষোত্তম দাসের পরামর্শমতে কার্য্য করিলে টাকার মূল্য শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে কমিয়া যাইবে টাকার মূল্য সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনার সমান হইবে কি ৭'৫৫ গ্রেণ সোনার সমান হইবে,—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় যত লোক টাকা পাইয়া থাকে বা টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা সকলেই টাকার মূল্য সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনায় পরিণত দেখিতে চাহে। বাজারে যদি কেহ সোনা কিনিতে যায়, তাহা হইলে পোদ্দার যদি তাহাকে এক টাকায় ৭·৫৫ গ্রেণ সোনা দেয়, তাহা হইলে তাহাতে খরিদদার খুসী হইবে, না যদি পোদ্দার তাহাকে সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা দেয়, তাহা হইলে সে অধিক খুসী হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধ হয় কেহ দ্বিধা বোধ করিবেন না। সকলেই সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনাই চাহিবেন। কিন্তু টাকার বিনিময়ে একটি শিলিং ৪টি পেনী পাওয়া যাইবে, কি ১ শিলিং ৬ পেনী পাওয়া

যাইবে, এই প্রশ্নে এত গোল উঠে কেন? সমস্যা ত সেই একই।

অবশ্য টাকার বিনিময় মূল্য বর্দ্ধিত হইলে যে কেবল টাকার বদলে সোনা এবং বিলাতী মুদ্রা অধিক পাওয়া যাইবে, তাহা নহে,—উহার বিনিময়ে সকল জিনিষই অধিক পাওয়া যাইবে। যত বিদেশী পণ্য এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে সস্তা পাওয়া যাইবে। বিলাতে যত টাকা দিতে হয়, তাহা শতকরা সাড়ে ১২ টাকা কম পাঠাইলেই তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। চাকুরিয়ার সুবিধা—তাহাদের আয় শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। তবে ক্ষতি কাহার? ক্ষতি দেনদারের। তাহার স্বল্প হিসাবে শতকরা সাড়ে ১২ টাকা অধিক দিয়া দেনা শোধ করিতে হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন তাহার পাওনা (বেতন প্রভৃতি) শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে অধিক পাইবে, তখন তাহার তাহাতে ক্ষতি বোধ হওয়া উচিত নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, টাকার মূল্য যাহাই হউক, উহার প্রভাবে দেশের পণ্য-মূল্যের ইতর-বিশেষ হইবে না। অর্থাৎ টাকার মূল্য ৭·৫৫ গ্রেণই হউক আর ৮·৫ গ্রেণই হউক, তাহাতে চাউল, দাইল, লবণ প্রভৃতির মূল্যের তারতম্য হইবে না। ইহা বিষম ভুল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্ণিয়াতে সুবর্ণখনি হইতে ভূরি পরিমাণে সুবর্ণ উত্তোলিত হওয়াতে ১৮৫১ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ বৎসর সুবর্ণ সস্তা হইয়াছিল। ঐ সময়ে যে কয়টি দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই কয়টি দেশেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে ফ্রান্সে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করা হয়। তাহার পর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যেমন সুবর্ণ দুর্ম্মূল্য হইতে থাকে, অমনই যে সমস্ত দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই সকল দেশেই পণ্য-মূল্য সুলভ হইতে থাকে। এখনও তাহাই হইতেছে। গত বৎসর বাঙ্গালায় শস্য অল্প জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও উহার মূল্য যেরূপ অধিক হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ অধিক হয় নাই, তাহার কারণ, গতবার টাকার মূল্য অধিক ছিল।

একটা আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি টাকার মূল্যবৃদ্ধিফলে পণ্য-মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে চাষীরা তাহাদের কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া অল্প টাকা পাইবে। তাহারা দৃশ্যতঃ অল্প টাকা পাইবে সত্য, কিন্তু যে টাকা পাইবে, তাহার মূল্য অধিক। তাহার বিনিময়ে তাহারা সকল পণ্যই সস্তায় পাইবে। সুতরাং তাহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে।

আর এক কথা। টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে শিল্পীদিগের ক্ষতি হইবে। উহার ফলে বিদেশী পণ্য সুলভ হইবে, সুতরাং তাহার সহিত দেশীয় শিল্পীরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। এই আপত্তিই সহসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে এই আপত্তি তত প্রবল বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে কুটীর-শিল্পের তাদৃশ ক্ষতি হওয়া উচিত নহে। কারণ, যদি জীবনধারণের জন্য আবশ্যক জিনিষের ও পণ্যের উপাদানের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় না। কল-কারখানায় প্রস্তুত পণ্যেরও যদি উপাদানের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য কতকটা সুলভে বিক্রয় করা যায়। তবে উহাদের মজুরের মজুরী হ্রাস করা বড় কঠিন। মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মজুরী-হ্রাসে বাধা দেয়। কিন্তু জীবনধারণের জন্য আবশ্যক পণ্য-মূল্য কমিলে মজুরীর মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পাওয়াই উচিত। তবে এই সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা এই যে, যদি মুদ্রা-মূল্যের সামান্য ইতরবিশেষ হয়, তাহা হইলে মুদ্রা-মূল্যের সহিত পণ্য-মূল্যের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। সেই জন্য কলকারখানা হইতে প্রস্তুত শিল্পজ পণ্যের পক্ষে কিছু অসুবিধা জন্মে; টাকার মূল্য ১৬ পেন্সের স্থানে ১৮ পেন্স করিলে যে সে অসুবিধা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হইবে না, তাহা নহে। বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা এই জন্যই টাকার মূল্যবৃদ্ধি প্রস্তাবে এত আপত্তি করিতেছেন।

যে সময়ে ভারতে টাকার মূল্য কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কয়েক বৎসর পর হইতেই বোম্বাই কার্পাস-কলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। যত দিন টাকার মূল্য কম ও চঞ্চল ছিল, তত দিন উহা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার মূল্য কমিতে থাকে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা কমিতে থাকে। টাকার মূল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হইবার ৩ বৎসর পরে ভারতে ৫৮টি মাত্র কার্পাস-কল ছিল, ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে

উহার সংখ্যা ১ শত ৭৪টিতে দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় বোম্বাই কার্পাস কলওয়ালাদের শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। তবে সে সম্বন্ধে সকল্ কথা বলিবার এবার স্থানাভাব।

আসল কথা, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য হইলে অর্থাৎ সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা হইলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবার কারণ নাই। সেই জন্য আমরা উহার সমর্থন করি। কিন্তু ইয়ং কমিশন যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন,—সরকার যে ভাবে ঐ সম্বন্ধে আইন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। কারণ, তাঁহারা নামে ইহা Gold Bullion Standard বা সুবর্ণমান মুদ্রা বলিলেও উহা কার্য্যে সেই Gold Exchange Standard বা সুবর্ণ-বিনিময় মুদ্রাই রহিয়া গিয়াছে। কমিশন সুবর্ণ-মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দেন নাই। সরকারও তাঁহাদের প্রস্তাবিত আইনে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং এ ব্যবস্থা টিকিবে না। ইতঃপূর্ব্বে ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী টাকার মূল্য ১১'৩০০১৬ গ্রেণ ধার্য্য করিয়া উহার বিনিময় মূল্য ২ শিলিং ধার্য্য করিবার এবং ভারতে অবাধে সুবর্ণ আমদানী রপ্তানী করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা কিছু দিনও টিকে নাই। তাহার কারণ, সরকার সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করেন নাই। তখন যদি সরকার ১৬৯'৫০২৪ গ্রেণ ওজনের খাঁটি সোনা দিয়া ১৫ টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মুদ্রা চালাইয়া তাহাই legal tender করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ টাকার মূল্য এত কমিয়া যাইত না এবং সেই মূল্য ঠিক রাখিবার জন্য ভারতের অর্থ এরূপ নিম্মমভাবে জলে যাইত না। এবারও যদি সরকার ১৩২'৫ গ্রেণ খাঁটি সোনা দিয়া পনর টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মোহর অথবা ১৭০ গ্রেণ খাঁটি সোনা-সংবলিত ২০ টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত না করেন, তাহা হইলেও টাকার এই মূল্য স্থির থাকিবে না। যদি সুবর্ণমানে মুদ্রা প্রচলিত করিবার সত্য সত্য ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণ-মুদ্রাকেই বৈধ মুদ্রা (legal tender) করিতে হইবে। ৪ শত ঔন্সের অর্থাৎ ১ হাজার ৬৫ তোলা ওজনের সোনার বার টাকায় সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনার দরে বিক্রয় করিলে টাকার মূল্য 'স্থিতিমান' হইবে না। সুতরাং এই টাকার দরের গোলও মিটিবে না। ব্যারিংটন কমিটী বাবদ খরচের ন্যায় এবারও ইয়ং কমিটীর খরচ বাবদ ৩ লক্ষ ৭১ টাকা ত জলে যাইবেই, অধিকন্তু আরও কত টাকা জলে যাইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথা বলিবার আছে। এবার স্থানাভাব। আসল কথা, আমরা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স ধার্য্য করিবার পক্ষপাতী হইলেও সরকার যে ভাবে উহা বহাল করিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহার সমর্থক নহি। উহা স্থায়ী হইবে না—উহা স্থায়ী হইতেই পারে না। কিছু দিন পরে আবার গোলযোগ ঘটিবে।

যে কমিশনে অধ্যাপক কয়াজীর মত সদস্য ছিলেন, সেই কমিশন যে কতকগুলি বাজে তর্ক করিয়া সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনে আপত্তি করিবেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতেই ব্যবস্থা পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত মুদ্রার (managed currency)র ফলে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে, এবারও যে তাহা হইবে না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এখন মুদ্রার পক্ষে সুবর্ণই প্রকৃষ্ট ধাতু, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতে সেই সুবর্ণই ধাতু-মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে সরকার বরাবরই অরুচি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এবারও বিলাতের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ভারতের পক্ষে মুদ্রার মূল্য হৈম বিনিময় মানে (Gold exchange standard) ধার্য্য করাই উচিত, তাহাদের পক্ষে সুবর্ণ-মুদ্রা বা হৈমধাতুমানে ধার্য্য মূল্যে মুদ্রা প্রচলন করিলে ভাল হইবে না। চক্ষুলজ্জা পরিহার পূর্ব্বক এমন ভাবে পক্ষপাতমূলক যুক্তি প্রদর্শন করা কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পক্ষেই সম্ভবে। বরং যে দেশ স্বাধীন, যে দেশে লোকমত দ্বারা রাজনীতিক ও আর্থিক সকল ব্যাপারই নিয়ন্ত্রিত হয়, সে দেশে বরং ব্যবস্থা পূর্ব্বক অবাধে নোট বা অভিজ্ঞানমুদ্রা চলিতে পারে—কিন্তু যে দেশে লোকমত অবজ্ঞাত, জনসাধারণের স্বার্থ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উপেক্ষিত বলিয়া দেশবাসীর বিশ্বাস, সেই পরাধীন দেশে কেবল ভাক্তমুদ্রা প্রচলিত করা কখনই বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইতে পারে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

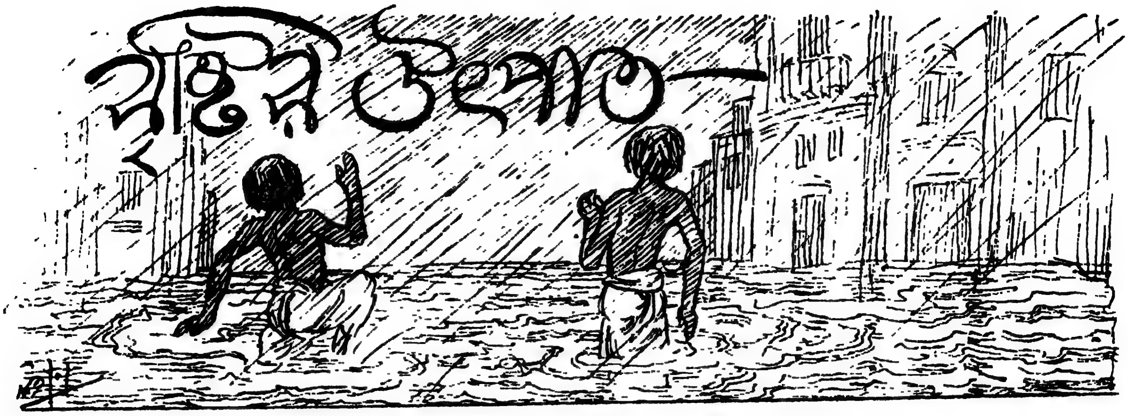

বাঃ রে বাঃ ! মুন্সীপাল—বাহবা স্বরাজ !
পাকা পথে খাল খুলেছে খেলতে মজা আজ ॥

কুঁপোকাৎ

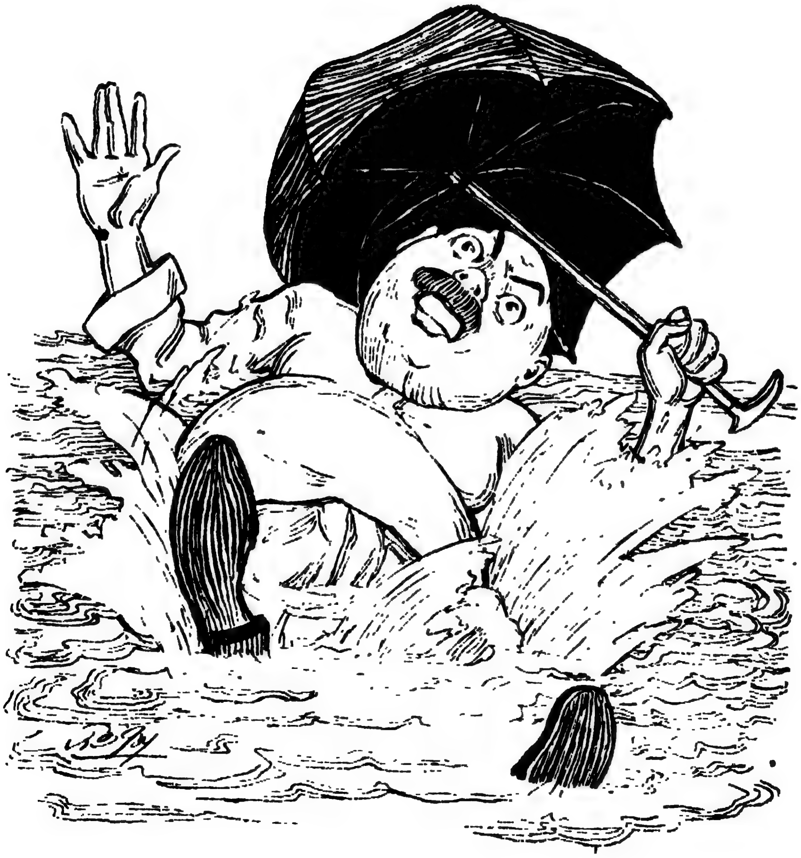

বৃষ্টি ত আর মুন্সীপালের নিজের সৃষ্টি নয়
ভুঁড়ি নিয়ে পথে কেন চল মহাশয় ?

আফিস যাত্রা

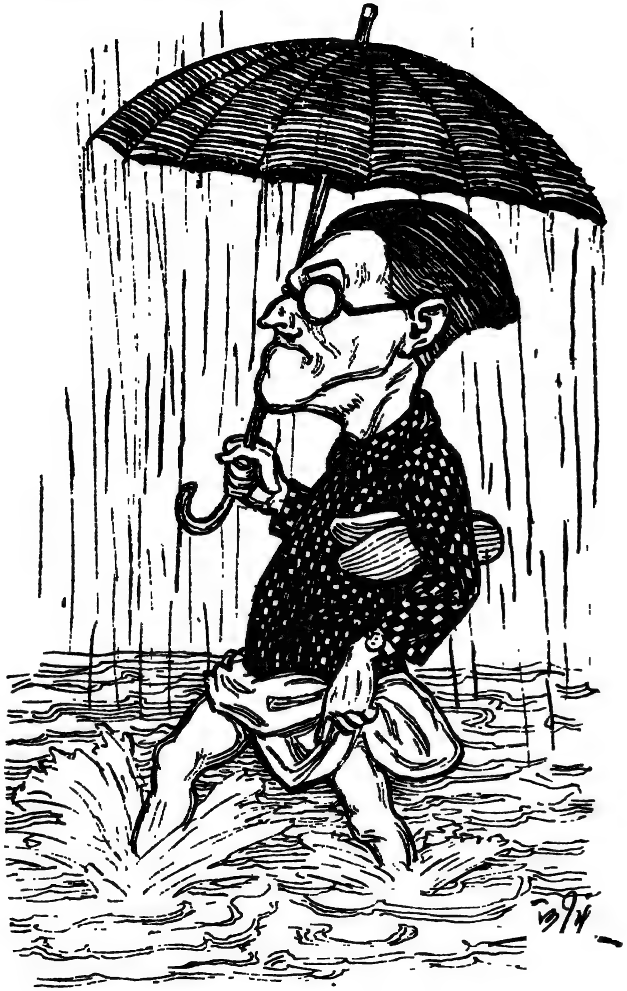

স্তা তৈরী পাটের গাড়ী মোটর লরীর জন্য
ারই তরে মোর এ দুর্গতি হা রে হা রে

ছাতার বিশ্বাসঘাতকতা

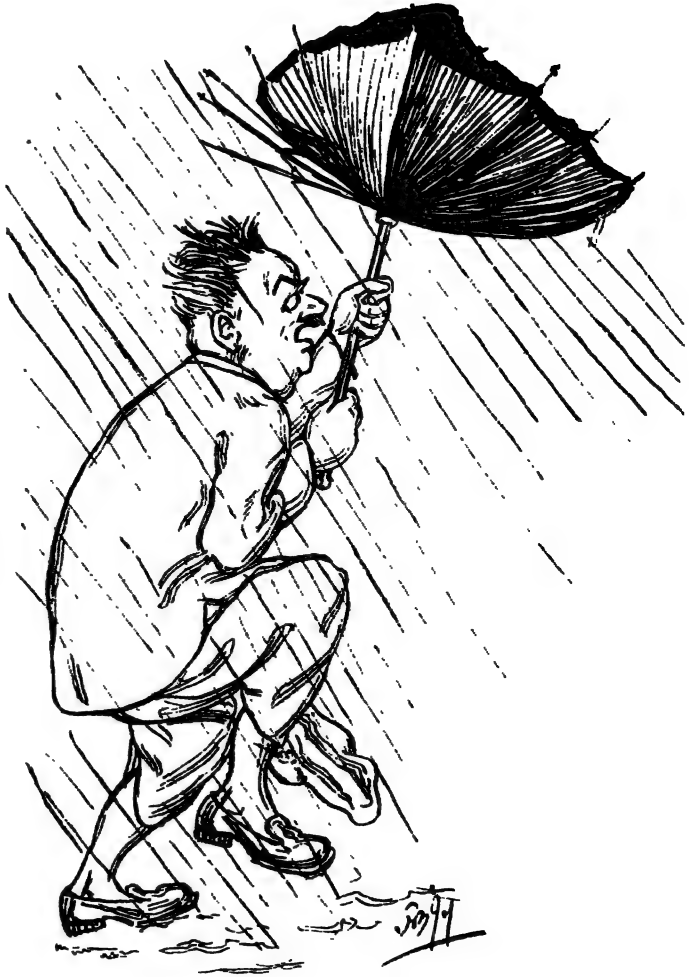

স্বাধীনতার দিনে সবার ঘুরে গেছে মাথা।
শীকে আটক রইলেন নাকো উল্টে পড়লেন ছাতা॥

বৃষ্টির বর্ম্ম

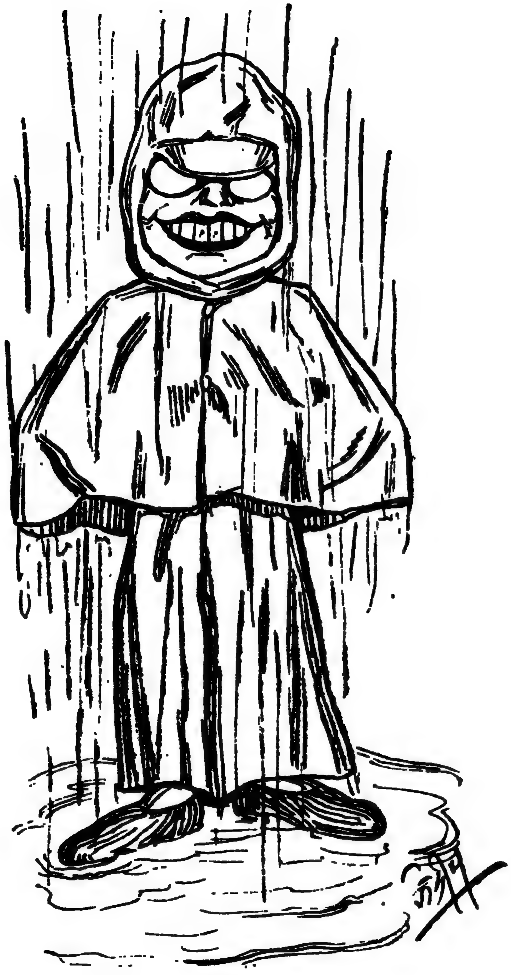

দেড়শ’র গ্রেডে উঠে আমি পেয়েছি পানি-কোট। ·
পাঁচশ’র পারে পৌঁছুলেই মিটিং মোটর ভোট॥ ·

লজ্জা রক্ষে

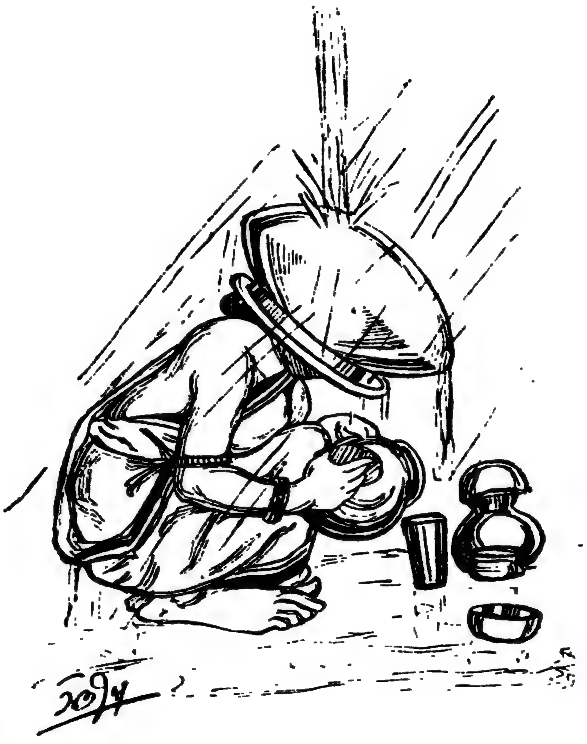

মাথা রক্ষে লজ্জা রক্ষে দুই-ই হ’ল লক্ষ্মী
এই বাজারে বাসন মাজে কোন্ বৌ সয় ঝক্কি ?

বাবুর বাহার

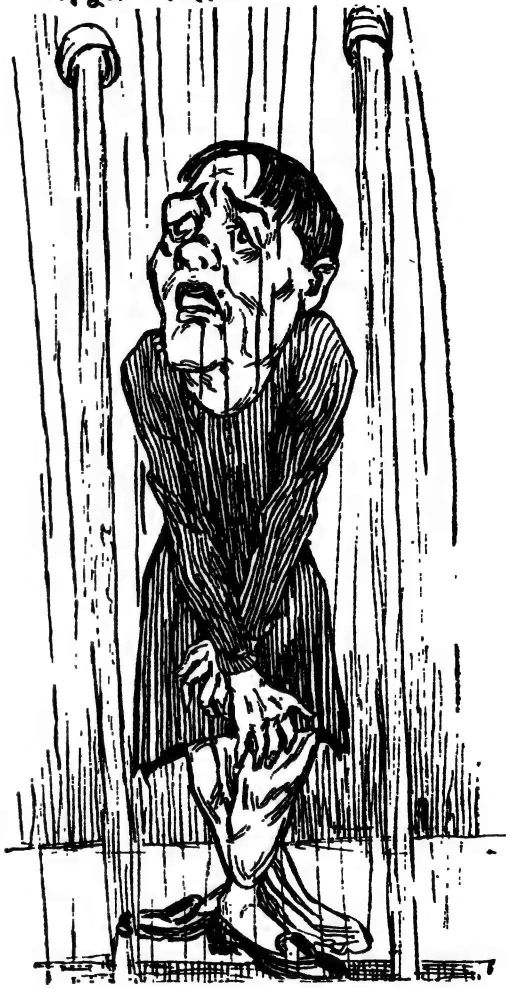

সাধের সাজান চুল, কোঁচার গোছান ফুল,
ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী মাঞ্জা করা জুতো।
মাটী হ্‌লো সব সজ্জা, কোথায় রাখিবে লজ্জা,
আল্‌সের আড়ালে খাড়া ভাবে তাই ভূতো॥

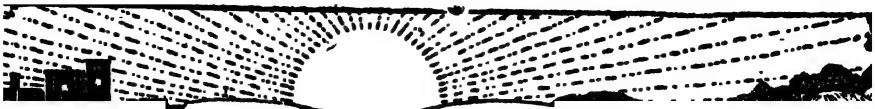

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালীর সংগঠন-শক্তি

কোনও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র সখেদে বলিয়াছেন,—আজ সহর কলিকাতার ২ শত ৩৬ বৎসর বয়স হইল, অথচ যে শক্তিমান পুরুষ এই সহরের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন, সেই জব চার্ণকের স্মৃতিপূজায় কোনও শাবস্থাই কলিকাতাবাসী করে নাই। জব চার্ণকের সমাধি-মন্দির কেহ পুষ্পমালা অথবা ধ্বজা-পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করে নাই, কেহ কোনও ক্লাবে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাবর্ষণ করে নাই, কেহ তাঁহার কোনওরূপ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে নাই! এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে?

যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র স্বজাতি স্বধর্ম্মী পুরুষ-প্রবরের স্মৃতিরক্ষার জন্য এত করুণরসের অবতারণা করিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ বাঙ্গালীর জনপদ-সংগঠনের শক্তি কখনও স্বীকার করেন না কেন, কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য অরণ্যকে গ্রাম-জনপদে গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে জব চার্ণকের দেশের লোকের নিজস্ব, তাহা নহে, বাঙ্গালীও এ বিষয়ে পথি-প্রদর্শকরূপে সাঁওতাল পরগণাকে কিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই।

সত্য বটে, প্রতীচ্যের স্বাধীন শক্তিশালী জাতিগণ জগতের দিগ্-দিগন্তে ভীষণ অরণ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মনুষ্যবাসযোগ্য করিয়াছে। সত্য বটে, বিলাতের Pilgrim fatherরা মার্কিণ মুলুককে বন-জঙ্গল কাটিয়া হিংস্র পশু ও তদপেক্ষা হিংস্র আদিমনিবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়া য়ুরোপের তুল্য সুন্দর গ্রাম জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সত্য বটে, কষ্টসহিষ্ণু সাহসী ওলন্দাজরা দক্ষিণ-আফ্রিকার কালা জঙ্গলে Trek করিয়া সিংহের এবং সিংহ অপেক্ষাও ভীষণ কালা নিগ্রোর সহিত যুদ্ধ করিয়া কত সুন্দর গ্রাম, নগর ও বাজার-গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সত্য বটে, অষ্ট্রেলিয়ায়, পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, পশ্চিম-আফ্রিকায়, উত্তর-আফ্রিকায়, নিউগিনিতে, নিউজিল্যাণ্ডে যব দ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে নানা য়ুরোপীয় জাতি জঙ্গলকে মনুষ্যবাসভূমিতে পরিণত করিয়া তাহাদের উপনিবেশ সংগঠনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর গ্রাম-জনপদ-গঠনের আশ্চর্য্য শক্তির কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? আজ সাঁওতাল পরগণা বিহার-সরকারের এলাকাভুক্ত হইয়াছে বলিয়া তথা হইতে বাঙ্গালীকে বিতাড়িত করিবার নানা পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। অথচ এই বাঙ্গালীই সাঁওতাল পরগণাকে নিজের অধ্যবসায়ে ও অর্থব্যয়ে গড়িয়া তুলিয়াছে! ইহাও কি জব চার্ণকের প্রতি অকৃতজ্ঞতার মত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয় নহে? সীতারামপুর, মিহিজাম, জামতাড়া, কারমাটার, মধুপুর, জেসিডি, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা, ঝাঁঝা,—কোথায় না বাঙ্গালীর সংগঠন-ক্ষমতার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়?

ইতিহাসের কথা ভুলিব না। সুদূর অতীতে বাঙ্গালী সিংহলে তাহার সভ্যতা ও সংস্কার লইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ধর্ম্মযাজক সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, তিব্বত, ইন্দো-চীন ও চীনদেশে তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। আজও তাহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও শ্যামদেশের নামে এবং শ্যাম-রাজবংশের ও প্রকৃতিপুঞ্জের আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে তাহার ছাপ অঙ্কিত আছে। পরলোকগত রাজা চূড়ালঙ্করণ অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ও রাণীগণের নামে ও পরিচ্ছদে বাঙ্গালার সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সকল ইতিকথার বিস্তারিত বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

মাত্র ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী তাহার সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির শীতল ক্রোড় হইতে বিদায় লইয়া গভীর গহন পার্ব্বত্য অরণ্যমণ্ডিত সাঁওতাল পরগণায় গমন করিয়া কিরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বর্ত্তমান কারমাটার ষ্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে করোর একটি বর্দ্ধিষ্ঠ জনপদ। এই করোরে প্রায় ৩ শত ঘর বাঙ্গালীর বাস। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, মোদক, পরামাণিক প্রভৃতি সকল জাতির লোকই দেখা যায়। তাহাদের মুখেই শুনা যায়, এই স্থানে তাহাদের পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ বসবাস করিয়া আসিতেছেন। করোর ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রামে এইরূপ বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহারা সংখ্যায় অল্প।

এ সমস্ত বাঙ্গালী কোথা হইতে আসিল? প্রায়শঃ বর্দ্ধমান, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষরা কৃষি বা শিল্প বাণিজ্যের উদ্দেশে এই সুদূর পার্ব্বত্য অরণ্যপ্রদেশে উদরান্ন সংস্থানের জন্য আসিয়াছিল। তাহারা স্থানীয় বন্য অসভ্য সাঁওতালদিগের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ 'আপনার' করিয়া লইয়া এই সকল স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অথবা জমীর মালিক হইয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা লক্ষ্মী-দেবীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে এ দেশে বসবাস করে নাই। তাহারা যেমন সাঁওতাল পরগণাকে জন্মভূমি করিয়া তাহারই পীযূষ-স্তন্যে পুষ্ট হইয়া আসিতেছে, তেমনই সেই জন্মভূমিকেও তাহাদের নিজস্ব অনেক দান করিয়াছে। তাহারা তাহাদের ভাব, ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম অসভ্য দরিদ্র নিরক্ষর সাঁওতাল ভ্রাতৃবৃন্দকে উপহার দিয়াছে। এখন সাঁওতাল পরগণার আদিম নিবাসীরা তাহাদেরই মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুমিষ্ট সুষ্ঠু বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর মনসাপূজা, কালীপূজা আপনাদের করিয়া লইয়াছে। শ্রাবণ মাসে কারমাটারে থাকিতে দেখিয়াছি, স্থানীয় আদিম নিবাসীরা মনসাপূজায় বাঙ্গালীর মনসার গানের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছে, বাঙ্গালী খোল-করতাল সহযোগে মনসাতলায় মনসার গান গাহিতেছে, আর বহুসংখ্যক সাঁওতাল নরনারী একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেই কীর্ত্তনের দল করোর গ্রাম হইতে আনীত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর সহিত একত্র বসবাসের ফলে আদিম নিবাসীরা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ভদ্র গৃহস্থের মত বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারাও বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পূজা-পার্ব্বণাদিতে যোগদান করিতেছে। ফল কথা, তাহারা বাঙ্গালী হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে যতদূর সম্ভব প্রভাবান্বিত হইয়াছে.

কারমাটার হইতে করোর যাইবার মাঝামাঝি পথে খৃষ্টান মিশনারীদের একটি বড় আস্তানা আছে। সেখানে মিশনারীরা স্কুল, হাঁসপাতাল, বাগ-বাগিচা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সেখানে গেলে দেখা যায়, সাঁওতাল খৃষ্টান নরনারী খৃষ্টান সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলে এই যে সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টান-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে প্রভাবের গতি বাঙ্গালী হিন্দুই রুদ্ধ করিয়াছে। এখন আর সাঁওতালরা খৃষ্টান হয় না। দুর্ভিক্ষের সময়ে যদিও বা দুই এক জন সাঁওতাল পেটের জ্বালায় খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আবার স্বচ্ছলতার সময় আসিলেই তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাঙ্গালী হিন্দুর এই প্রভাব বড় সামান্য নহে। আজ যদি বাঙ্গালী হিন্দু সাঁওতাল পরগণায় উপনিবেশ স্থাপন না করিত, তাহা হইলে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা যে খৃষ্টান হইয়া যাইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি এ জন্য বাঙ্গালীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী হিন্দু সাঁওতালদিগকে মুসলমান মৌলভী ও মোল্লার প্রভাব হইতেও রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালীর এ কৃতিত্ব সামান্য নহে।

এই যে মধুপুর, গিরিডি, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে সৌধকিরীটিনী নগরী সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মূলেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মধুপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। বৈদ্যনাথ বা গিরিডিরও অবস্থা তদ্রূপ ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যান্বেষণে বাঙ্গালী যে দিন হইতে এই সকল স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই সকল স্থানের সৌভাগ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মধুপুরে তখন ক্ষুদ্র বাজারের পরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বাঙ্গালীর মাত্র ৫।৬ খানি বাংলো নির্ম্মিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট প্রান্তরে গোরা সেনাদের Rest Camp ছিল। মধুপুরের বাজার-হাটও ক্ষুদ্রায়তন ছিল। কিন্তু এখন মধুপুর এত বড় সহরে পরিণত হইয়াছে যে, সেখানে পাওয়া যায় না, এমন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য নাই বলিলেও চলে। মিউনিসিপ্যালিটী, ষ্ট্রীট, লেন, পল্লী, স্কুল, হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, ক্লাব, হোটেল,—কিছুরই অভাব নাই। যেখানে রেষ্ট ক্যাম্প ছিল, সেখানে এখন বড় বড় বাড়ী হইয়াছে, এমন কি, মধুপুর হইতে ২ মাইল দূরে পাতরোল নদীর কিনারা পর্য্যন্ত লোকের বসতি হইয়াছে। কত লোক যে এখন মধুপুরে অন্নসংস্থান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গিরিডি ও বৈদ্যনাথও বড় বড় সহরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটি স্থানের সহরে পরিণতির অন্য কারণ আছে। গিরিডি কয়লার খনি ও অভ্রের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ, বৈদ্যনাথ দেবস্থান, হিন্দুর তীর্থ। সুতরাং এই দুই স্থানে সহর গড়িয়া উঠা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু মধুপুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই প্রকাণ্ড সহর বাঙ্গালীই গড়িয়া তুলিয়াছে। মধুপুরে বাঙ্গালীর উপনিবেশস্থাপনের সম্যক্ পরিচয়-পরিস্ফুট।

বাঙ্গালীর যে সাহস, উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় নাই, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। অন্ততঃ সাঁওতাল পরগণায় বাঙ্গালীর উপনিবেশসমূহ দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। কারমাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখান 'বাংলো' আছে, এ কথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। রেলষ্টেশনের অতি নিকটে বর্ত্তমান বাজারের গায়ে এই 'বাংলো'খানি অবস্থিত। খাপরার ছাদ-সমন্বিত প্রাচীন 'বাংলো' এখন আর নাই, কলিকাতার ধনী সিংহদাস মল্লিক মহাশয় এখানি ক্রয় করিয়া এখন একতল ইষ্টকালয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং এ ইমারতে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া দিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরের চরণাশ্রিত সিংহদাস মল্লিক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় নাই, তাহার 'বাংলো'ও হস্তান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার নাম কারমাটারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও সেখানে প্রাচীন অধিবাসীরা তাঁহার নাম করিয়া থাকে। স্থানীয় নীলাম্বর মিস্ত্রী পরিণত-বয়স্ক; সে শিশুকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এখানে দেখিয়াছিল। সে বলে, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরই এই কারমাটারের পার্ব্বত্য জঙ্গলকে জনপদে পরিণত করিবার মূল। তিনি এই স্থানে মাঝে মাঝে বাস করিয়া সাঁওতালদিগের সহিত মিলামিশা করিতেন, তাহাদের সুখে-দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহাদের মানসিক উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার পুণ্যময় সংস্রবে আসিয়া বহু সাঁওতাল বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছিল, বাঙ্গালীর মত থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রভাব সামান্য নহে। এখনও সেই জন্য এই 'বিদ্যাসাগর বাংলো' বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। প্রবাসী বাঙ্গালী এখানে আসিলেই 'বিদ্যাসাগর বাংলো' না দেখিয়া পারে না। বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের নামে এখনও বহু বৃদ্ধ সাঁওতালের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়।

বাঙ্গালীর এই প্রভাব ভারতের নানা দিকে বিসর্পিত। বাঙ্গালী যেখানে বসবাস করিয়াছে, সেইখানেই তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পশ্চিমের যে কোন সহরে যাওয়া যায়, সেইখানেই বাঙ্গালীর কালীবাড়ী, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব, বাঙ্গালীর ক্লাব-লাইব্রেরী, বাঙ্গালীর স্কুল, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, বাঙ্গালীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাঙ্গালীর মনীষা, বাঙ্গালীর যাত্রা-থিয়েটার, বাঙ্গালীর ব্যায়াম ও সঙ্গীতচর্চ্চা আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, অধিকন্তু তাহার প্রভাবে অপর জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর কলিকাতা বা মফঃস্বলে ভিন্নদেশীয় ভারতবাসী বহুদিন বসবাস করিলে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বহুলাংশ হারাইয়া ফেলে, এ দৃশ্য নূতন নহে। কলিকাতায় বহু মাদ্রাজী, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া,—বাঙ্গালীর সাজে সাজিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, বাঙ্গালীর মত খাইতে পরিতে শিখিয়াছে, প্রায় সকল বিষয়ে বাঙ্গালীকে অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অবশ্য অপর দেশের ভাষার প্রভাব যে বাঙ্গালীর উপর একবারে বিস্তৃত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, আমোদ-প্রমোদে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র বাঙ্গালীই আছে, অধিকন্তু অপর জাতিকে তাহার বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাজপুতানায় জয়পুরাদি সহরে বাঙ্গালী চাকরীয়া রাজ-সরকারে চাকুরী করিবার কালে স্থানীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যত্র ঘরে-বাহিরে বাঙ্গালী সাজিয়াই থাকে। এ দেশে কিন্তু মাড়োয়ারী বা উড়িয়া বাঙ্গালীর কাপড়েই ভূষিত হইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর এই যে Colonisationএর ক্ষমতা, ইহার অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বাঙ্গালী যদি এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে শিখে, তাহা হইলে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে চিরদিন আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

সম্পাদকের দায়িত্ব

কলিকাতায় দাঙ্গা ও হাঙ্গামা সম্পর্কে স্থানীয় কয়েকখানি সংবাদ-পত্রের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি মামলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য,—(১) 'ফরওয়ার্ড' পত্রের নামে অভিযোগ এবং (২) 'দৈনিক বসুমতী' পত্রের নামে অভিযোগ। 'ফরওয়ার্ড' পত্র একখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাহার উপর অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তিকা বা প্যামফ্লেটে মুসলমানদিগকে হিন্দুর

বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া উত্তেজিত করা হইয়াছিল। 'ফরওয়ার্ড' ঐ পুস্তিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার দ্বারা সমাজের পক্ষে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তাঁহারা আত্মপক্ষসমর্থনে এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথাপি নিম্ন আদালতে 'ফরওয়ার্ডের' দণ্ড হইয়াছিল। হাইকোর্টে আপীলের ফলে বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন রায়ে বলিয়াছিলেন, "এই ব্যাপারে 'ফরওয়ার্ড' পত্র সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। যদিও বা এরূপ সম্ভব হয় যে, কোন কোন লোক ইহা পাঠ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায়রূপে বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইতে পারে, তাহা হইলেও এই ভাবের সংবাদ প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্র কোনও অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না।" বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের বিদ্বেষবুদ্ধির কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহাকে পিনাল কোডের ১৫৩ ক ধারার আইনে অপরাধী বলিয়া মনে করেন নাই।

অপরটি 'দৈনিক বসুমতীর' মামলা। উক্ত পত্রে কলিকাতার দাঙ্গার সময়ে একটি তারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারের সংবাদের মর্ম্ম এরূপ যে, মরিশস দ্বীপের কোনও মুসলমান ভদ্রলোক নাখোদা মসজেদের ইমামকে তারে জানাইতেছেন যে, মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে দাঙ্গা চালান হউক, তিনি অর্থ লইয়া, মুসলমান গুণ্ডাদিগকে সাহায্যদানের জন্য শীঘ্র আসিতেছেন। এই সংবাদ ব্যতীত আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও মামলার অভিযোগের বিষয় ছিল। এই দুইটি সূত্র উপলক্ষ করিয়া 'দৈনিক বসুমতী'-সম্পাদকের ও প্রিণ্টারের নামে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ক ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। বিচারক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অভিযোগ হইতে সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে অব্যাহতি প্রদান করেন; কিন্তু তারের সংবাদ প্রকাশের জন্য উভয়কে দায়ী ও অপরাধী করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিয়া দেন।

এই দণ্ডের বিপক্ষে হাইকোর্টে আপীল হয়। বিচারপতি চোজনার ও ডুভালের বিচারে দণ্ডিত আসামীরা নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। বিচারপতি চোজনার রায়ে বলিয়াছেন, "মরিশস হইতে যে তার আসিয়াছিল এবং 'দৈনিক বসুমতীতে' উহার যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মিলাইয়া দেখিয়া ধারণা হয় যে, উক্ত তার পাঠ করিয়া তাহার এইরূপ অনুবাদ করা যায়। যদি তারের মর্ম্ম যথার্থই এইরূপ হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, সম্পাদক বা মুদ্রাকর উহা আইন অনুসারে প্রকাশ করিতে পারেন কি না। আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে, এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তদিগের বিপক্ষে দণ্ড দিবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনও কারণ ছিল না। এই হেতু আমি তাঁহাদিগের বিপক্ষে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে সতর্ক করিয়া দিবার দণ্ড নাকচ করিয়া দিলাম।"

এই দুইটি মামলার বিচারফল সংবাদপত্র-সম্পাদনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রতি যে বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, তাহাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন্ প্রবন্ধ বা কোন্ সংবাদ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হিন্দু বা মুসলমান,—যে কোন সংবাদপত্রে যদি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হয় না। কেন না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা স্বাভাবিক, কোথাও উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে যে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃই উৎসুক হয়েন। কিন্তু তাহাতেই যে পরস্পর বিদ্বেষবৃদ্ধির প্রকাশের গন্ধ পাওয়া যায়, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না।

দেখিতে হইবে, প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য কি। যে সংবাদপত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া আপন সম্প্রদায়ের লোককে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বিপক্ষে উত্তেজিত করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দাঙ্গা উপলক্ষে দেখা গিয়াছে যে, এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ক্রমাগত ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের কোনও চেষ্টাই করে নাই। অথচ এই সকল সংবাদপত্রের রচনা অভিযোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সকল সংবাদপত্র চিরদিন হিন্দু মুসলমানে মিলন-সংঘটনে প্রয়াস পাইয়াছে, যাহাদের লক্ষ্য,—হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ভিত্তির উপর ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, তাহাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ বা সংবাদের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে দেখা কর্ত্তব্য যে, কি উদ্দেশ্যে ঐ প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'দৈনিক বসুমতী' বা 'ফরওয়ার্ড' চিরদিনই হিন্দু-মুসলমান মিলন কামনা করিয়া আসিয়াছে, এ কথা উক্ত পত্রদ্বয়ের নিত্য পাঠক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এই দুই পত্রে কেন 'উর্দ্দু পুস্তিকার রচনা' অথবা মরিশসের সংবাদ প্রকাশিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা কর্ত্তব্য ছিল। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে যে, এই দুইটি বিষয় সম্পূর্ণ আইন ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত সংবাদপত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাবের পুস্তিকা প্রচারিত হওয়ায় দেশে কি অমঙ্গলের বিষ বিসর্পিত হইতেছে, তাহাই কর্ত্তৃপক্ষকে ও জনসাধারণকে প্রদর্শন করা 'ফরওয়ার্ডের' উদ্দেশ্য ছিল। পরন্তু মরিশসের তার যথার্থ কি না এবং ঐ সম্বন্ধে নাখোদা মসজেদের ইমাম কি কৈফিয়ৎ দিতে চাহেন, তাহাই নির্ণয় করা 'দৈনিক বসুমতীর' উদ্দেশ্য ছিল। এই ভাবের তার সেই দাঙ্গার সময়ে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমাজের সেই অনিষ্ট নিবারণকল্পে উক্ত সংবাদপত্র উহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে উক্ত সংবাদপত্রদ্বয়ের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা সম্ভবপর হয় না, বিচারালয়ে দণ্ডেরও অবসর হয় না। সরকার বাহাদুর যাঁহাদের উপর এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। অনর্থক নির্দ্দোষ সংবাদপত্রকে হায়রাণ করিয়া ও অনর্থক অর্থব্যয়ে বাধ্য করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। যে দুইখানি সংবাদপত্রের এই অনর্থক হায়রাণি হইল, তাঁহাদের যদি উচ্চ আদালতে বিচারপ্রার্থী হইবার সামর্থ্য না থাকিত, তাহা হইলে কি হইত? তাঁহাদের এই অনর্থক অর্থব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিবে কে?

পুলিপোলাও

এ দেশে যাহারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদিগকে পুলিপোলাও চালান দেওয়া হইয়াছে, এই কথা এ দেশের সাধারণ লোক বলিয়া থাকে। পুলিপোলাও চালানী ব্যাপার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

৬ বৎসর পূর্ব্বে জেল কমিটীর উপদেশ অনুসারে ভারত সরকার পোর্ট ব্লেয়ারের (আন্দামানের প্রধান সহর) কয়েদী উপনিবেশ একেবারে তুলিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে একবারে একসঙ্গেই যে সকল কয়েদীকে পোর্ট

ব্লেয়ার হইতে ভারতের জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে, এমন কথা ভারত সরকার বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের সকলের জন্য একসঙ্গে ভারতের জেলসমূহে স্থান সঙ্কুলান হইত না। এই হেতু স্থির হয় যে, ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েদীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া এই কয়েদী-নিবাসটিকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং প্রার্থীকে ঐ স্থানে স্বাধীনভাবে বাস করিয়া স্থানটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

কিন্তু জেল কমিটীর উপদেশ এ যাবৎ পালিত হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আন্দামান অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে, জ্বর ও ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি। ইহাও জানা গিয়াছে যে, আন্দামানের কয়েদীদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভারতে ফিরিয়া আসিতে চাহে। অথচ জেল কমিটীর পরামর্শ ও উপদেশ সত্ত্বেও এ যাবৎ কেন যে আন্দামানের কয়েদীনিবাস ভাঙ্গিয়া দিবার ভিত্তিপত্তন করা হইল না, ইহার একটা নিগূঢ় কারণ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারত সরকার যখন এই কয়েদীনিবাস তুলিয়া দেওয়া তাঁহাদের শাসন-নীতির অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবেও পালিত হইবে। কিন্তু এখনও আন্দামানে কয়েদী শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস করা হয় নাই; পরন্তু বহুসংখ্যক মোপলা কয়েদীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাদের চাষবাসের ও স্থায়ী বসবাসেরও জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

নৈতিক হিসাবে মানুষের চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করাই সকল সভ্য সরকারের দণ্ডপ্রদানের উদ্দেশ্য। কিন্তু আন্দামানে কয়েদীদিগকে যে ভাবে জীবন যাপন করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধনের উপায় থাকে বলিয়া মনে হয় না। আন্দামানে পুরুষ-কয়েদীর সংখ্যা স্ত্রী-কয়েদীর অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক। এই অবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী কয়েদীদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষরূপে বসবাস করা অসম্ভব হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, উহারা চরিত্রহীন হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করে। নৈতিক হিসাবে ইহা অতীব নিন্দনীয়। ইহা ছাড়া আন্দামানের স্বাস্থ্যও ভাল নহে। স্বরাষ্ট্রসচিবের মতে এই স্থান কয়েদীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টজনক। এই কারণে এখানে হইতে কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দেওয়াই বৃটিশ সরকারের মত সভ্য সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্যের পথে প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, এই কয়েদীনিবাস আজ ৪০ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের স্কন্ধে অতিরিক্ত ব্যয়ের ভার চাপাইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার কথা ধার্য্য হইয়াছিল। জ্বর ও আমাশয় রোগে কয়েদীদের মধ্যে প্রতি বৎসর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে, কয়েদীরা স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার অসামঞ্জস্য হেতু চরিত্রহীনও হইয়া থাকে। ইহাও কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু মূল কারণ যে ব্যয়াধিক্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার যে অনুপাতে এই কয়েদীনিবাসে ব্যয় করেন, সেই অনুপাতে লাভবান্ হইতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, যদি সরকার বুঝিতেন যে, কয়েদীনিবাসে আয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অন্য কারণ থাকিলেও সরকার কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিতেন না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সরকার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই কয়েদীনিবাস আয়ের কারণ হইতে পারে কি না। এতদর্থে সেই সময় আন্দামানের চীফ কমিশনার কর্ণেল ডাগলাসকে এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, যদি কয়েদীদিগকে এক এক কেন্দ্রে অধিক সংখ্যায় রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়; পরন্তু কলকব্জার আমদানী ও কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি কয়েদীদিগের শ্রমের দ্বারা কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা যায়, তাহা হইলে উহার ফলে সরকারের একটা বিশেষ আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। দ্বীপপুঞ্জে নারিকেলবৃক্ষের অভাব নাই। উহা হইতে দড়ী, তৈল ও ছোবড়ার ব্যবসায় চালান সম্ভবপর হইতে পারে। কয়েদীদিগের শ্রম বিনামূল্যে পাওয়া গেলে এবং এই কারবারের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ব্যবসায় সুন্দররূপে চালান যাইতে পারে। ইহা ছাড়া দ্বীপে রবারের চাষও অল্প নহে। জঙ্গলে সরকারের রক্ষিত গাছ হইতে কাঠের ব্যবসায়ও চলিতে পারে। অন্য স্থান হইতে পয়সা দিয়া কুলী-মজুর আনাইয়া ব্যবসায় চালান কষ্টসাধ্য, অধিকন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু যদি কয়েদীদিগের 'মূল্যহীন শ্রমের সাহায্যে ব্যবসায় চালান যায়, তাহা হইলে সরকারের বিশেষ আয়ের সুবিধা হইতে পারে। এই সকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাদের কল্যাণে বহু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়ের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই হেতু কর্ণেল গিড্‌নি আন্দামানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

যাহাই হউক, কর্ণেল ডাগলাস তাঁহার রিপোর্টে সরকারকে যে লোভ দেখাইয়াছেন, তাহা বিফল হয় নাই। আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও এবং আন্দামানে কয়েদীদিগের চরিত্রহীন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও যখন আন্দামানে আয়ের সম্ভাবনা আছে তখন জেল কমিটীর পরামর্শ যে শীঘ্র গৃহীত হইবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সভ্য সরকারের এ সম্বন্ধে বলিবার কি আছে?

নূতন শৃঙ্খল

এই ব্যুরোক্রেশী-শাসিত দেশে সংবাদপত্র-সেবীদিগকে কি বিপদ মাথায় করিয়া সংবাদ ও মতামত সরবরাহ করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রাজদ্রোহ আইনের ভীষণ খড়্গ সদাই তাহাদের মস্তকের উপর দোদুল্যমান—কখন Disaffection অর্থে want of affection-এর অনুযায়ী নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের রচনায় রাজদ্রোহ খুঁজিয়া বাহির করা হয়, তাহার স্থিরতা নাই। সেই রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহাদের কাগজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জেল হইতে পারে।

এ ভয় ত আছেই, আবার এ ভয়ের উপরেও আর এক জুজুর ভয় উপস্থিত। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে সংবাদপত্র এবং পুস্তক-পুস্তিকার জন্য আর একটি নূতন শৃঙ্খলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সরকার পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান করিতে অতিমাত্র ব্যগ্রতা দেখাইয়া ব্যবস্থা পরিষদে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, সংবাদপত্রে ও পুস্তক-পুস্তিকায় যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। অর্থাৎ রাজদ্রোহ আইনে সরকার যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন, এই আইনে তাহার উপর সম্প্রদায়গত বিরোধ সম্পর্কে দেশের সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সকলকে নূতন শৃঙ্খল পরাইবার ক্ষমতা হস্তগত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব আইনে পরিণত হইয়াছে।

কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে, তাহার দমনের জন্য বিচারালয় আছে। এবারের

কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষে এ বিষয়ে বহু সংবাদপত্রের বিচারালয়ে প্রকাশ্য বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে কোন কোন সংবাদপত্র দণ্ডিতও হইয়াছিল। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপীলের ফলে কোন কোন সংবাদপত্র নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি লাভও করিয়াছে। বোধ হয়, ইহাতে দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র সরকারের মনস্তুষ্টি হয় নাই। তাহারই জন্য সরকার বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বহস্তে দণ্ডের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের শাসন বিভাগ যদি দেখেন, তাঁহাদের মতে (In the opinion of the Government) কোনও সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা এ বিষয়ে অপরাধী হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ সকল সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। ইহার জন্য প্রকাশ্য বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, অথবা সরকারের দণ্ডাদেশের বিপক্ষে কোনও আপীলও থাকিবে না। ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে?

ব্যবস্থাপরিষদে এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন যে হয় নাই, তাহা নহে। শ্রীযুক্ত রঙ্গ চারিয়ার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ সদস্যগণ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন ও লালা লাজপৎ রায় সরকারের এই ক্ষমতালাভ ক্ষমতা অপব্যবহারের কারণ হইতে পারে বলিয়া নানা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার হরি সিং গৌর বিলখানি প্রচার করিয়া জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় বিলখানির বিচার-আলোচনার ভার এক সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অন্ততঃ উপযুক্ত বিচারক যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে, তাহা হইলে শাসন-বিভাগ দণ্ড দান করিবেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। স্বরাজ্য দল ব্যবস্থাপরিষদে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত না থাকায় সরকার পক্ষ ভোটের জোরে বিল আইনে পরিণত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে স্বরাজ্য দলের মনের ভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহারা কোন কোন বিলের আলোচনাকালে (যেমন কারেন্সী বিল) পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার আন্দামান বিল অথবা সংবাদপত্র-দলন বিলের আলোচনাকালে পরিষদের বাহিরে থাকিয়া আগামী নির্ব্বাচনের যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিতেছিলেন! এ লীলা-খেলার অন্ত পাওয়া ভার। এ মনোবৃত্তির মূল কি, কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? যে আইনে দেশের জনসাধারণের মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান করে, তাহা তাঁহাদের ঔদাসীন্যে পাশ হইয়া গেল, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? যদি বুঝিতাম, তাঁহারা সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়া সকল বিলের আলোচনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতির সামঞ্জস্য আছে বুঝা যাইত। কিন্তু তাঁহারা যখন কাউন্সিলে বাধাপ্রদাননীতি অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসের নামে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের এই ব্যবহারে দেশের লোকের নিকট তাঁহারা কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ায় দেশের কি ক্ষতি হইল, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। শাসন বিভাগ যদি নিজ হস্তে বিচারের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া কোনও সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ঐগুলিকে বাজেয়াপ্ত করিয়া দণ্ডিত করেন, তাহা হইলে উহারা প্রকৃত অপরাধী কি না, সাব্যস্ত করিবার কেহ থাকিবে না—সরকারই সে ক্ষেত্রে অভিযোক্তা, বিচারক ও দণ্ডদাতা। বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দুইখানি সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচারের জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল, অথচ উচ্চতর আদালতের আপীলের ফলে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল ও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। যদি উচ্চতর বিচারালয় ও আপীল না থাকিত, তাহা হইলে কি হইত? বর্ত্তমান আইনে 'সরকারের মতই' final, উহার উপরে কথা কহিবার কেহ রহিল না। ইহাতে কি ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে না? এমন কি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, “এমন অবস্থাও কল্পনা করা যাইতে পারে, যেখানে কোনও সম্প্রদায়ের নেতার বক্তৃতার রিপোর্ট অন্য সম্প্রদায়ের শত্রুতা ও হিংসাদ্বেষ সঞ্জাত করিতে পারে। যে সংবাদপত্র ঐ রিপোর্ট জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ ও প্রচার করিবে, সেই সংবাদপত্র আপনার ধ্বংসের কারণ আপনিই ডাকিয়া আনিবে। হয় ত আইনের ইহা উদ্দেশ্য না হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কীর্ণচেতা সরকারী শাসকের হস্তে পড়িলে এ ক্ষেত্রে যে আইনের অপব্যবহার হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?” রাজদ্রোহ আইনে Disaffection অর্থে Want of affection যদি করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে সাম্প্রদায়িক নেতামাত্রেরই বক্তৃতার বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যাইবে না কেন? সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য সকল প্রকার সংবাদ সরবরাহ করা। সে জন্য জনসাধারণ তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু বক্তৃতাদি প্রকাশ করা যদি এরূপ বিপজ্জনক হয়, তাহা হইলে অতঃপর কোন সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিতে এ সকল বক্তৃতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে? আর তাহা হইলে ক্রেতারাই বা কেন পয়সা খরচ করিয়া সংবাদপত্র ক্রয় করিবে? 'ষ্টেটসম্যানও' এ জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, “হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের যে কেহ কোন কথা লিখুন, তাহার মধ্যে যে বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে যে কোন কথা লিখিত হউক না, তাহার জন্য সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা এই আইনে দেওয়া হইয়াছে, এ কথা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে সাম্প্রদায়িক তর্ক-বিতর্কের রচনাকে রাজদ্রোহের অপরাধের সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলা যে আইনের বিপজ্জনক প্রসারবৃদ্ধির পরিচায়ক হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।”

“ষ্টেটসম্যান” সরকারের শত্রু নহেন, বরং তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারের মতের সমর্থক। সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া এমন কথা বলিতেছেন, তাহা সম্ভব নহে, বরং তিনি সরকারের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। সরকার এই ভ্রান্তি অপনোদন করিবেন কি? মনে ত হয় না। যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই নূতন শৃঙ্খল গড়িলেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইহাতে অবসান হইবে না। তবে এই নূতন শৃঙ্খল গঠনের অন্য উদ্দেশ্য কি? উহা কি দেশে অসন্তোষবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইবে না?

মহাত্মা গন্ধীর বাণী

কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমান নেতা দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় মহাত্মা গন্ধীকে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। দেশের লোক তাঁহার এই বাণী যদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুক্তির পথে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একবারে আপনাকে অপসারিত করেন নাই, মাত্র এক বৎসরের জন্য অবসর ও বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, এখনও কিছু দিন তাঁহাকে তাহার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাত্মার

সবরমতী আশ্রম এ দেশের মধ্যে একটি আদর্শ আশ্রম, সেখানে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলা হয়। মহাত্মাজীর মঙ্গল হস্তস্পর্শের অভাবে আশ্রমের প্রভূত ক্ষতি হইতেছিল। যে আশ্রমে য়ুরোপের বিলাস-লালসাময় ক্ষেত্রে লালিতা-পালিতা কুমারী স্লেডের মত বিদুষী গুণবতী মহিলা ভারতের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইতে আসিয়াছেন, যে আশ্রমে ভারতের বহু ত্যাগী কর্ম্মী পুরুষ সংযম ও শৃঙ্খলার অভ্যস্ত হইতেছেন, সে আশ্রমের উপকারিতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মহাত্মা সেই আশ্রমের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিতই বাঞ্ছনীয়। সেখানে মানুষ গড়িয়া উঠুক, ইহা কাহার না কামনা? পরন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহাত্মার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার শরীরের ভালমন্দ দেখা সমগ্র জাতি ও দেশের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া কিছু দিন বিশ্রাম গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা আবার যে দেশের রাজনীতির কর্ণ ধারণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপাততঃ তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলেও তিনি দেশবাসীকে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার প্রত্যেক বাণীতে তাঁহার আন্তরিক স্বাধীনতাকামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অন্তরের উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণে কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসা বা ক্রোধ নাই, সকলের জন্য তাঁহার মুখে ভালবাসার বা সহানুভূতির কথা আছে। এমন কি, তিনি স্যার আবদর রহিমের মধ্যেও স্বদেশ-প্রেমের বীজ দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যৎ একতা ও জাতীয়ত্বের বীজ নিহিত আছে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একান্ত সহায়হীনতা ও কাপুরুষতা অপেক্ষা রক্তের পথ—বিবাদ-বিরোধের পথ বাঞ্ছনীয়।" মানুষ জড়ের মত বসিয়া থাকে, পুরুষকারকে বর্জ্জন করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; বরং ইহা হইতে পরস্পর বিবাদে মনুষ্যত্বের ও শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই মনুষ্যত্বের ও শৌর্য্যের ভিত্তির উপরেই ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের সৌধ গড়িয়া উঠিবে।

যাহারা আজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় করিয়া পরস্পর বিরোধ ও বিবাদ করিতেছে, তাহারাই ভবিষ্যতে বুঝিবে, একযোগে দেশের কার্য্য করা ব্যতীত স্বরাজ বা মুক্তি লাভ হইবে না। মহাত্মা তাই দেশকে জানাইয়াছেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই, তিনি কেবল 'নীচের দিক' হইতে কার্য্য করিতেছেন, অর্থাৎ স্বরাজের ভিত্তি গড়িবার দিকেই বর্ত্তমানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের উপর তাঁহার আস্থা নাই। তাঁহার বিশ্বাস, চরকাই স্বাস্থ্যপ্রদ, অহিংস, গঠনমূলক কার্য্যের ভিত্তি। যাঁহাদের সে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা তাঁহাদের মনোমত পথে দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। ভারতের লোক নানা পথে নানাভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারেন। সকল কার্য্যই স্বরাজের সহায়ক হইতে পারে, যদি সকলের লক্ষ্য এক থাকে—দেশের মুক্তিসাধন।

ইহা অপেক্ষা সদুপদেশ কি হইতে পারে, আমরা জানি না। রহিম-গজনবি অথবা মালব্য-মুঞ্জে,—তিনি যে ভাবেই কার্য্য করুন, সকলের যদি লক্ষ্য এক হয়, যদি সকলে কায়-মনে দেশের মুক্তিসাধনে ব্রতী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত হইবে না।

মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতি 'মরিয়াছে', কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা দেখিয়া সে কথা মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অসহযোগনীতির প্রভাব এখনও ভারতের রাজনীতির সকল স্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও মার্কিণ পত্র লিখিয়াছেন,—"ভারতের অসহযোগনীতি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নূতন উদ্যমে প্রকট হইবার জন্য ইহা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। গন্ধী যে সুন্দর ধর্ম্মের উত্তেজনার আলোক জ্বালিয়াছেন, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তবে গন্ধী যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে ভারতের কার্য্যক্ষম জাতীয়তার গতি প্রসারিত হইবে, কি নিয়মানুগ পথে ব্যুরোক্রেশীর হস্ত হইতে ক্রমশঃ ক্ষমতা ও অধিকার কাড়িয়া লইবে, অথবা হিংসার পথে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া অসাফল্য লাভ করিবে, তাহা বলা এখন অসম্ভব।"

কথাটা ভাবিবার দেখিবার। যিনি যত বড় রাজনীতিকই হউন, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, অসহযোগ 'মরিয়াছে।' তাহা যদি হইত, তাহা হইলে দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃগণ অসহযোগের মন্ত্রগুরু মহাত্মা গন্ধীকে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, এবার যখন মহাত্মা রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিবেন, তখন তাঁহার নীতি সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইবে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ

যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। এ বিরোধ কতকাল স্থায়ী হইবে, তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। তবে কোনও মুসলমান নেতা তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ইহার স্থিতি বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

এ বিরোধ যে প্রকৃত ধর্ম্মগত, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। মসজেদের সম্মুখে বাদ্যের সমস্যা নূতন উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে আর কে বা কাহারা ঐ সমস্যা জাগাইয়া রাখিয়াছে, পরন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা অবস্থাভিজ্ঞ লোকমাত্রই জানেন। মূল কথা, ধর্ম্মের আবরণ না দিলে বিরোধ জাগাইয়া রাখা যায় না বলিয়া আজ এই সমস্যা তুলিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। গো-কোরবাণীর সমস্যা ভারতে নূতন নহে, বর্ত্তমানে এ সমস্যা নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার ধর্ম্মগত কারণ থাকিলে দেশীয় রাজ্যসমূহেও ইহার মন্দ প্রভাব অনুভূত হইত। মূল কথা, বর্ত্তমান বিরোধ ধর্ম্মগত নহে, ইহাকে অর্থ-সমস্যা ও রাজনীতিক সমস্যাগত বলিলেই প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

আরল উইণ্টার্টন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "সংস্কার আইনের পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সদ্ভাবে বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধের উদ্ভব আধুনিক।" ইহার অর্থ কি? সংস্কার-আইনই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল। যে দিন হইতে সংস্কার-আইন অনুসারে সংখ্যানুপাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যে দিন হইতে সরকার সংস্কার-আইন অনুসারে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি মোটা বেতনের চাকুরীর টোপ ফেলিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে ভোট ও চাকুরী লইয়া উভয় সম্প্রদায়ে রক্তারক্তির সৃষ্টি হইবে, তাহা ভবিষ্যদর্শিমাত্রেই বুঝিয়াছিলেন। তাই যুগাবতার মহাত্মা গন্ধী এ দেশবাসীকে যত্নসহকারে কাউন্সিল বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইংরাজ যখন মারাঠা, শিখ প্রভৃতি প্রবল হিন্দু শক্তির হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য জয় করিয়া লয়েন, সে সময়ে মুসলমান অতীত সাম্রাজ্য ও গৌরবের স্বপ্নে বিভোর ছিল। হিন্দু রাজ্য হারাইয়া নূতন অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনাকে অবস্থানুযায়ী করিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই সে ইংরাজের অধীনে ইংরাজী

শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া সরকারী চাকুরী ও সম্মান লাভে যত্নবান্ হইয়াছিল। মুসলমান তখনও আপনাকে 'রাজার জাতি' মনে করিয়া অতীত মোগল ও পাঠান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়া আপনাকে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারী চাকুরী ও সম্মান হইতে দূরে রাখিয়াছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

তাহার পর সার সৈয়দ আমেদের 'আলিগড়ের' সৃষ্টি। মুসলমান ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার প্রতি অথবা তাহারই অনুরূপ মুসলমান প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইল,—পরে হিন্দুরই মত "অধিকার," "চাকুরী" ও সম্মানের দাবী করিতে লাগিল।

তুর্কী ও খিলাফতের অপমানের দিনে মুসলমান ইংরাজের প্রতি ক্রোধের বশে হিন্দুর সহিত জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যখন তুর্কী বা খিলাফতের জন্ত আন্দোলনের প্রয়োজন অন্তর্হিত হইল, যখন ইংরাজ এ দেশে 'সংস্কার-আইনের' টোপ ফেলিলেন, তখন মুসলমান 'আপনার গণ্ডা' বুঝিয়া লইবার জন্ত ব্যগ্র হইল। তখন মুসলমানের মুখে রব উঠিল, "আমাদিগের রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক প্রাধান্যের অনুযায়ী অধিকার আমাদিগকে দিতে হইবে।" পেটনীতি ও রাজনীতি বিরোধের মূল হইয়া দাঁড়াইল, ধর্ম্মনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তবে পাছে ধর্ম্মের মোড়ক না দিলে কৃষাণ দিনমজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর লোক উহাতে না মজে, এই জন্ত সম্প্রতি ধর্ম্মের মোড়ক দিয়া বিরোধকে সাজান হইয়াছে।

মহাত্মা গন্ধীকে আমরা বিনা কারণে যুগাবতার ও ভবিষ্যদর্শী বলিয়া আসিতেছি না। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বহু পূর্ব্ব হইতেই কাউন্সিলের মোহের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এ জন্ত তিনি দেশের লোককে উহা বর্জ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রক্তমাংসে জড়িত মানুষ—সকলেই তাঁহার মত ত্যাগে অভ্যস্ত হইতে পারে না। তাই তাঁহার উপদেশ সত্ত্বেও অনেকে সেই মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, দেশের লোকের বিশ্বাস দাঁড়াইল, বর্জ্জন বা অসহযোগে কোন ফল নাই, উহাতে কয় বৎসর দেশের ক্ষতিই হইয়াছে, অতএব কাউন্সিল গ্রহণই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহার ফলে যে হলাহল উঠিয়াছে, তাহা আমরা দুই হস্তে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করিতেছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হইয়াছিল,—মহাত্মার উপদেশকেও ঠেলিয়া ফেলিয়া দেশকে কাউন্সিলের ও সংস্কারের মোহে আকর্ষণ করিতে। যদিও দেশবন্ধুর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, তথাপি উহা পরিণামে ফলপ্রদ হইবে না, ইহা মহাত্মার মত ভবিষ্যদর্শী জানিতেন। তাই তিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব অবগত ছিলেন, তাই তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই, বরং তাঁহার রাজনীতিক দ্বন্দ্বে নিজের প্রভাব দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহা মহাত্মাও নিবারণ করিতে পারেন না। তাই কাউন্সিলে বাধাপ্রদান ফলপ্রদ হয় নাই। দেশবন্ধু শেষ জীবনে কতকটা সহযোগের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সিরাজগঞ্জের বক্তৃতাতেই স্বপ্রকাশ।

দেশবন্ধুর অকালে ইহলোকত্যাগের পর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অন্তর্হিত হইলে কাউন্সিল প্রবেশের কুফল আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তখন দেশে নানা শ্রেণীর রাজনীতিক দেখা দিতে লাগিলেন। সহযোগের পরিমাণ কতটুকু হইবে, উহা লইয়া মতবিরোধ আরম্ভ হইল। কতটুকু সহযোগ কোন্ কোন্ বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়া চুলচেরাচিরি আরম্ভ হইল। দেশ হইতে একতা অন্তর্হিত হইল। সকলেই স্ব স্ব মতের পরিপোষক অসহযোগ, প্রতিদানমূলক অসহযোগিতা, পূর্ণ সহযোগিতা, অর্দ্ধ-সহযোগিতা ইত্যাদির সমর্থন করিতে লাগিলেন। ফলে কেবল যে হিন্দু কংগ্রেসপন্থীদিগের মধ্যে

মিঃ জয়াকর

মিঃ কেলকার

দলাদলি উপস্থিত হইল, তাহা নহে, মুসলমানরাও ইহার ফলে আপনাদের স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থের গণ্ডা বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন। যে একতার ভিত্তির উপর স্বরাজের প্রকৃত চণ্ডীমণ্ডপ গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা দূরে পরিত্যক্ত হইল। চাকুরী ও ভোটের জন্য তখন গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাহারই একটা অঙ্গমাত্র।

এই বিরোধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ও তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল মহা আনন্দিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বিরোধের ফলে ব্যুরোক্রেসীর জীবন যে আরও বহু বৎসর বাড়িয়া গেল, ইহাতে তাঁহাদের আনন্দিত হইবারই কথা। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র 'ষ্টেটসম্যান' মহা আনন্দে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত মালব্য পূর্ব্বে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেন, এখন প্রতিদানমূলক সহযোগী। লালা লাজপৎ পূর্ব্বে স্বরাজী ছিলেন, এখন প্রতিদানমূলক সহযোগী। ইঁহারা উভয়েই হিন্দু মহাসভার পাণ্ডা। ইঁহারা এক্ষণে মারাঠা নেতা জয়াকর ও কেলকারের সহিত প্রায়শঃ ভাবের মত আদান-প্রদান করিতেছেন। স্বরাজী দলপতি পণ্ডিত মতিলাল এই চারি জনের সহিত রফা করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে রফার দ্বারা আগামী নির্ব্বাচনে হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু মিঃ দাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; মিঃ গান্ধী মূক; পণ্ডিত নেহরু রাজনীতিক্ষেত্রে মৃতবৎ। তাঁহাকে ঠেলিয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটী সহযোগকর্ম্মী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে এ বৎসরের কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের পদে মনোনীত করিয়াছেন। এ সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, সরকারের প্রতিপক্ষেরা (left) এ কয়বৎসর বৃথা বাক্যের স্রোত বহাইয়াছেন। ভারতের এই দিনে—দলপতিহীন দল ও দলহীন দলপতিদিগের দিনে, কংগ্রেসের সদস্যদিগের কাউন্সিলে নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোনও মুসলমানের নাম দেখা যাইতেছে না। বরং মুসলমানরা হিন্দুদিগের সাহচর্য্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের স্বতন্ত্র দল গড়িবার আয়োজন করিতেছেন। সার আবদর রহিমের ঘোষণাপত্র ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সার আবদর তাহাতে স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের সাহায্য ত্যাগ করিয়া আপনাদের নিজস্ব দল গড়িবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।"

বস্তুতঃ ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা এমন স্পষ্টভাবে চিত্রিত কেহ করিতে পারেন নাই। মহাচীনেরও ঠিক এই অবস্থা। এ অবস্থায় দেশ যদি চিরদিন পরাধীন থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই।

এ ঘোর দুর্দ্দিনে কয়েক জন নেতা মহাত্মা গন্ধীকে আবার ভারতের রাজনীতিক দলপতিত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তারের সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আর একবার এমনই ভাবে তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান বিবাদে মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের হৃদয়তন্ত্রীতে করুণ সুরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "আমাকে আর ডাকা কেন? হিন্দু-মুসলমানের উপর আমার প্রভাব আমি হারাইয়াছি। এখন কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার মনে হয়, হিন্দু মুসলমান পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া মনের সাধ না মিটাইলে এবং ক্লান্ত না হইলে এ বিরোধের অবসান হইবে না। সুতরাং Let them fight it out," কত দুঃখে মহাত্মা এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত দেশহিতকামীমাত্রই বুঝেন। হিন্দু-মুসলমান যখন পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া বুঝিবে, এ রক্তারক্তিতে তাহাদের ক্ষতি বই লাভ নাই, তখনই তাহারা বিরোধে ক্ষান্ত হইবে। আজ হিন্দু মুসলমান সংস্কারের টোপ গিলিয়াছে—সে মোহে তাহারা আচ্ছন্ন, এখন শত হিতবাণীও তাহাদের কর্ণকুহরে পশিবে না। সুতরাং মনে হয়, মহাত্মা গন্ধী দেশের রাজনীতির কর্ণধার হইলেও শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা অল্প। বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলপতি ও স্বরাজ্য দলের একাংশ রহিম-গজনবির লীলাখেলা দেখিয়াও প্রাণপণে মুসলমানের মন যোগাইয়া চলিয়া আসিতেছেন—হিন্দুর স্বার্থের প্রতিকূলেও মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদলে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, আগামী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যাহাতে তাঁহাদের প্রিয় 'প্যাক্টের' মুখরক্ষা হয়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে? হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ন্যায় রহিম-গজনবির স্বার্থলালসা হু হু বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মহাত্মা গন্ধীও যে এই লালসানলের 'খাণ্ডব-ক্ষুধা' নিবারণে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আসল কথা, যত দিন না আমরা কাউন্সিল-মোহের—চাকুরী ও ভোটের মোহের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিব, যত দিন না আমরা বুঝিব, তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড়, তত দিন এ বিরোধের অবসান হইবে না। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের যে মনের অবস্থা, তাহাতে এ কথা বুঝিবার যে সময় আইসে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

অপরাধী কে?

এই বৎসরের জন্মাষ্টমী পর্ব্বের শোভাযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতার খিদিরপুর পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিবপুর, ঢাকা প্রভৃতি কয়েক স্থানে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইয়াছিল অথবা দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াই অঙ্কুরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে খিদিরপুরের দাঙ্গাই প্রধান। সুতরাং এই দাঙ্গা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খিদিরপুরে যে ভাবে মিছিল বাহির হইয়া থাকে, এ বৎসরও সেই ভাবে শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য হিন্দুরা পুলিসের নিকট পাশের আবেদন করিয়াছিল। এ সকল হিন্দুর অধিকাংশই পশ্চিমদেশীয় গাড়োয়ান ও ডকের কুলী-মজুর। উহারা বেলা ২টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত পাশ চাহিয়াছিল। কিন্তু পাছে মুসলমানের নমাজে ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় পুলিস শোভাযাত্রার সময় বেলা ১০টা হইতে ২॥০টা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। তদনুসারে হিন্দুরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সার্কুলার গার্ডেন্ রীচ হইতে শোভাযাত্রা করিয়া ভূ-কৈলাসের রাজবাটীর শিবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। একখানি লরীর উপর দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল এবং সঙ্গে বাদ্যাদি ছিল। বেলা প্রায় ১২ টার সময় ঐ মিছিল পাইপ রোড ও সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলে নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র মসজেদ হইতে এক জন মুসলমান আসিয়া তাহাদিগকে বাদ্যাদি বন্ধ করিতে বলে। টেলিফোনযোগে ওয়াটগঞ্জ থানার ইন্স্পেক্টর আবদুল হামিদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ঐ সময় নমাজের সময় নহে বলিয়া লাইসেন্সের সর্ত্তানুসারে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করেন।

তদনুসারে মিছিল বাদ্যসহ মসজেদের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয়। প্রকাশ, তখনই মসজেদের মধ্য হইতে শোভাযাত্রাকারীদের উপর ইষ্টকাদি বর্ষিত হয়; পরন্তু কয়েক জন মুসলমান লাঠি হস্তে হিন্দু শোভাযাত্রাকারীদিগকে আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য, পুলিসের হুকুমে হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই নিরস্ত্র ছিল। বাবুবাজারের নিকটে এবং আর একটি মসজেদের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি মুসলমানবস্তী হইতে হিন্দুদিগের উপর ইষ্টকাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এই ভাবের আক্রমণের ফলে কয়েক জন হিন্দু ও কয়েক জন পুলিস আহত হয়। তন্মধ্যে ওয়াটগঞ্জ থানার ৩টি কনষ্টেবল ও ১টি জমাদার এবং ইন্সপেক্টর আবদুল হামিদ অন্যতম।

ঘটনাটি এই। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, পূর্ব্বাপর যাহা হইয়া আসিতেছে, খিদিরপুরেও তাহাই হইয়াছে। গত রাজরাজেশ্বরী বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রায়, অথবা চীৎপুর-বরাহনগরের রথযাত্রায় বা মহরম পর্ব্বে যেমন ঘটিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। হিন্দুরা পূর্ব্বাপর পুলিসের আইন মান্য করিয়াছে, পুলিসের নির্দ্দেশমত চলিয়াছে, পরন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য সমাধা করিয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, মুসলমানরা অসহিষ্ণু হইয়া উদ্ধতভাবে পুলিসের আইন বা নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, লাঠি-সোটা ইট-পাটকেল লইয়া হিন্দুগণকে ও তথা পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছে। মহরমের সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, পুলিস হইতে তাজিয়ার নম্বর ও মহল্লা এবং মহল্লার সর্দ্দারের নম্বর ও ঠিকানা প্রত্যেক তাজিয়ার শোভাযাত্রার পতাকায় লিখিত থাকা সত্ত্বেও শোভাযাত্রার মুসলমানরা লাইন ছাড়িয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছে ও নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দু পথিককে প্রহার করিয়াছে। হিন্দুরা পূর্ব্বাপর শান্তিরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, মুসলমানরা ইচ্ছাপূর্ব্বক শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে! সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানরা যেন পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে।

মিঃ মহম্মদ আলি হজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর কোনও সংবাদসংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য ধর্ম্মের হানিকর নহে; তবে হিন্দুরা মসজেদের সম্মুখে বহুক্ষণ জোরে বাদ্যাদি করে বলিয়া মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত কথা সত্য কি না, বিচারসাপেক্ষ। অন্ততঃ খিদিরপুরে, রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায় অথবা রথের শোভাযাত্রায় যে তাহা হয় নাই, তাহা সকল রিপোর্টেই প্রকাশ। হিন্দুরা কুত্রাপি নমাজের নির্দ্দিষ্ট কালে বাদ্যাদি করে নাই। রাজরাজেশ্বরীর-বিসর্জ্জন চিরাচরিত প্রথানুসারে অপরাহ্ণে সমাহিত হইয়া আসিলেও এবার পুলিসের নির্দ্দেশ অনুসারে হিন্দুরা প্রাতঃকালে নমাজের সময় বাদ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। খিদিরপুরেও পুলিস যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, হিন্দুরা সেই সময়ে শোভাযাত্রা লইয়া গিয়াছিল। তথাপি মুসলমানরা অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদিগকে পুলিসের সাক্ষাতেই আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে রক্ষক পুলিসের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছিল। সুতরাং অপরাধী কে, বুঝিতে বিলম্ব হয় কি? মহম্মদ আলি ব্যতীত অন্যান্য কয়েক জন নিরপেক্ষ মুসলমান ভদ্রলোক বলিয়াছেন, মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না। মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, সঙ্গীত কোনও কালে মুসলমানের নিকট অনাদৃত ছিল না। মিঞা তানসেন মুসলমান ছিলেন, শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। মোগল দরবারে সঙ্গীতের আদর ছিল। মুসলমান শাসনকালে মসজেদের মধ্যেও গীতবাদ্য হইত। পারস্য, তুর্কী, আরব, মিশর প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যেও গীতবাদ্যে মসজেদের ধর্ম্মহানি হয় নাই। অথচ বর্ত্তমান মুসলমানের নিকট গীতবাদ্যে মসজেদের ধর্ম্মহানি হইতেছে কেন, কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি?

গীতবাদ্য হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ। মুসলমানের অন্যায় আবদারে হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। বাঙ্গালা সরকার কলিকাতার মসজেদের সম্মুখে বাদ্যের যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মের হানিজনক হইলেও হিন্দু শান্তির আশায় সেই নিয়ম পালন করিতেছে। তথাপি হিন্দুর উপর অযথা আক্রমণ হইতেছে, এমন কি, মসজেদ ব্যতীত অন্যত্রও মুসলমান হিন্দুর গীতবাদ্যে আপত্তি করিতেছে, বলপূর্ব্বক হিন্দুর সন্ধ্যা আরত্রিক বা সঙ্কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিবার জন্য আবদার করিতেছে। ইহার কারণ কি?

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানেও হিন্দুরা সরকারের আইন মানিয়া পুলিসের ব্যবস্থা অনুসারে মিছিল বাহির করিয়াছে, অথচ তাহাতেও আপত্তি উঠিয়াছে, ছোট-খাট হাঙ্গামাও বাধাইয়াছে অথবা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি?

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ ধর্ম্মগত নহে, কয়েক জন রাজনীতিক আন্দোলনকারী আপনাদের স্বার্থসাধনোদ্দেশে দাঙ্গা বাধাইয়া সরকারকে জানাইতে চাহিতেছে যে, তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ে 'কেও কেটা' লোক নহে, দাঙ্গা থামাইতে হইলে তাহাদের সাহায্য আবশ্যক।" ইহাই কি এই সকল অনর্থপাতের মূল? কিন্তু সরকার কি এতই নির্ব্বোধ যে, এ সকল সন্ধান রাখেন না? তাঁহারা জানিয়াও কি এই সকল স্বার্থানুসন্ধিৎসু নেতৃগণকে ছাড়পত্র দিয়া রাখিয়াছেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অজ্ঞ জনসাধারণ নিজের খেয়ালে এরূপ অকারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে না, উহাতে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদিগকে অন্তরাল হইতে কে বা কাহারা নাচাইতেছে, ইহাই মনে হয়। দেশের অনিষ্টকারী এই সকল অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দণ্ডিত করিবার সময় কি এখনও উপস্থিত হয় নাই? দাঙ্গার জড় না মারিলে কেবল দাঙ্গার ক্ষতের মুখে প্রলেপ দিলে কি হইবে?

হামিদের হিম্মৎ

৪

এক সময়ে বটতলায় আসাদ দপ্তরীর যেমন নাম, তেমন-ই পসার ছিল। বেণীমাধব দে কোম্পানী, নৃত্যলাল শীল প্রভৃতি বড় বড় পাবলিশারদের কাযে তার ত একচেটে অধিকার ছিল-ই, তা ছাড়া তার অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা লেখা-পড়া জানা ছিল এবং পুস্তকপ্রকাশ-কার্য্যে বুঝে চ'ল্‌তে পার্লে লাভবান্ হ'তে পারা যায় জেনে নিজে মুন্সী সরিফ-উদ্দীনকে দিয়ে মোছলমানী বাঙ্গালা পয়ারে হাতেম-তাই ও চাহার দরবেশ লিখিয়ে ছাপিয়ে বিক্রী কর্ত্তো, আর মহেশ ঘোষকে দিয়ে একখানা মৎস্তপুরাণ লিখিয়ে-ও ছাপিয়েছিল। অবশেষে আসাদ দপ্তরীর কাযের সঙ্গে গরাণহাটার বেশো-পটির কাছে একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে একটি বইয়ের দোকান-ও খোলে।

দপ্তরীর কায ক'রবে ব'লে ঢাকা থেকে কল্‌কাতায় পৌঁছে প্রথমে-ই আসাদ দর্জ্জীপাড়া অঞ্চলে একখানি খোলার ঘরে বাসা নেয়। উপার্জ্জনের সঙ্গে সঞ্চয়ের শক্তি সকলের থাকে না, কিন্তু আসাদের তা' ছিল, সুতরাং বইয়ের দোকান খোলবার অল্পদিন পরে-ই সে ছিদাম মুদীর গলির মোড়ে একখানি ছোট-খাটো কোঠা কিনে ফেলে। তখন কল্‌কাতায় ছোট-খাটো কোঠা কেনা আজকালকার মত দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত না। বাড়ী কেনার পর সে দেশে গিয়ে এখানে পরিবার আনে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্‌তে থাকে। কেবল একটি দুঃখ তার মনে ছিল যে, বিবির গর্ভে একমাত্র কন্যা-সন্তান ভিন্ন আর কিছুই হয় নি।

তালতলাবাসী লালবাজারের প্রসিদ্ধ চাবুক ও ছড়িওলা গোকুর মিঞার মেজ ছেলে বখতিয়ারের সঙ্গে আসাদ আপনার কন্যার বিবাহ দেয়। উপর্য্যপরি তিনটি সন্তানকে সূতিকাগারে হারিয়ে শেষে একটি দেড় বছরের মেয়ে রেখে আসাদের কন্যা নিজে মারা পড়ে।

এ শোক আসাদের বুকে বাজের মত বাজে, আর মন দিয়ে সে কাযকর্ম্ম চালাতে পারে না: কখন-ও তার বিবি কাঁদে, সে চোখ মুছিয়ে দেয়, আবার নিজে-ই কখন-ও মেয়েমানুষের মত ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে, বিবি তাকে বোঝায়।

সন্তান-শোক ত আছে-ই, তার ওপর সে কিছু সঙ্গতি ক'রেছে—দপ্তরীর কাযে, বই বিক্রীতে এবং কিছু কিছু ঘরোয়া তেজারতীতে-ও। লোকে বলতো যে, আসাদ মিঞার ঘরে যেমন ক'রে হোক্ বিশ তিরিশ হাজার টাকা জমা আছে; কারো কারো আন্দাজ বা তার ওপরে-ও যেতো। এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি 'আমরা ম'লে কার হাতে যাবে, কে ভোগ ক'রবে, মমতাজের ঐ লেড়কীটুকুকে আল্লা কি বাঁচিয়ে রাখবে' এই দুশ্চিন্তা সন্তান-শোকের চেয়ে জ্বালার ওপর যেন জ্বালা হয়ে দাঁড়ালো। যা হোক্, এই রকম ক'রে বছর তিনেক কেটে যাবার পর আসাদ নিজের বৈবাহিকের ওপর এখানকার বিষয়সম্পত্তি দেখবার ভার দিয়ে আপনার বিবিকে সঙ্গে ক'রে এক সন্ হজে যাত্রা কল্লে। ফের্বার পথে ওলাউঠো রোগে আসাদের মৃত্যু হয়, সহযাত্রীদের সান্ত্বনা ও যত্নে তার বিবি কল্‌কাতার নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে।

বেয়াই-বেয়ানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আসাদের বিবি আপনার দৌত্তুরীকে নিজের কাছে এনে রাখলে। হজ থেকে বিধবা হয়ে ফেরার পর আসাদের বিবি আপনার আপাদ-মস্তক সবুজ বোর্‌খায় আবৃত ক'রে পাড়ার চেনা-পরচের ঘরে আসা যাওয়া করতো, নাতনীটিকে-ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতো। হামিদ যেমন হেম হয়ে আমাদের বাড়ীর ছেলেপুলের মধ্যে এক জন হয়ে গেছলো, যাওয়া আসা করতে করতে ক্রমে নসীবন-ও অনেকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়ালো, বাড়ীর মেয়েরা কেউ বা তাকে নসী, কেউ বা নিশি ব'লে ডাক্‌তো।

টাকা জমাবার প্রবৃত্তি প্রবল থাক্‌লে-ও পাড়ার লোকজন দেখতো, আসাদের একটু আধটু দান-খয়রাৎ-ও আছে; কিন্তু তা'র মৃত্যুর পর সবাই বুঝতে পাল্লে, তা'র দয়ার উৎস বিদ্যমান ছিল—মক্কাবুড়ীর কোমল হৃদয়ে। হজ্জ থেকে ফেরার পর আসাদের বিবিকে সকলে মক্কাবুড়ী নামে অভিহিত কর্‌তো।

বছর সাতেকের মেয়ে নসীবনটি দেখতে যেন ছবিখানির মত ছিল; যেমনি টুক্‌টুকে রং, তেমনি সুডৌল গড়ন; বড় বড় চোখ দুটিতে কাজল প'রলে যেন আলো জল্‌তো; ঠোঁট দুখানিতে কে যেন হাসি মাখিয়ে রেখেছে আর এই বয়েসে-ই চুলগুলির যেমন গোছ, তেমনই বাহার; ঐ যা বল্লেম, মোছলমানের ঘরের মেয়ে হ'লেও সে যখন কপাল অবধি ঘোমটা টেনে বেড়াতো, তখন তাকে দেখে মনে হ'ত, যেন ছোট্ট একখানি ঠাকুরের প্রতিমা। বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে সর্ব্বদা মেশামিশি ক'র্‌তো, খেলা ক'র্‌তো, একসঙ্গে পড়তো শুনতো, কিন্তু এমন বুদ্ধি—এমন সাবধানী যে, কখন-ও কাকে-ও তাকে বল্‌তে হয় নি যে, নিশি এ দিকে আসিস্ নি, কি এখান থেকে স'রে যা।

লালুদা ভুলুদার মত হামিদ-ও নসীবনের তেমদা। মোছলমানের রান্নার গন্ধে আমাদের পাড়ার কোন-ও মেয়েছেলেকে-ই কখন-ও নাকে কাপড় দিতে হয় নি। আমরা যেমন কালে ভদ্রে পাঁঠাটা আসটা খেতুম্, তাদের-ও প্রায় তাই। বস্তির ভেতর কারুর কারুর ঘরে পালা মুরগী ছিল বটে, কিন্তু তার জন্যে কাউকে কখন-ও কোন-ও উৎপাত সহ্য কর্‌তে হয় নি; অনেকে-ই মনে কর্‌তো যে, ওটা বেশ গেরস্ত পোষা পাখী, তাই ওরা ওটা স্বচ্ছন্দের জন্যে রাখে। বাস্তবিক আমি এখন-ও মনে করি যে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা মুরগীটা নিষিদ্ধ ক'রে না দিলেই ভাল কর্‌তেন; এই মাছ্-দুধের অভাবের দিনে ছেলেপুলের দোহাই দিয়ে আমাদের দু মুঠো খেয়ে-ও তৃপ্তি হ'ত, গায়ে-ও গত্তি লাগতো।

প্রতি শুক্কুরবার সকালে মক্কাবিবির দরজায় শতাবধির ওপর মোছলমান ফকির ভিকিরী মেয়ে পুরুষ জমা হ'ত। দু'খানা ক'রে বড় বড় আটার রুটী আর খানিকটা গুড় প্রত্যেকে-ই পেতো; ইদ্ কি অন্য অন্য মোছলমানী পরবের দিনে বখরীর মাংসর কাবাব-ও হাতাখানেক ক'রে এক এক জনের ভাগে প'ড়তো।

আসাদের জীবিতাবস্থায় ভগবতীবাবু তার লেখাপড়ার কাজ অনেক দেখে শুনে দিতেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আসাদ প্রায় কোন-ও বৈষয়িক কাম-ই ক'রতো না; সম্ভ্রান্ত লোককে মাইনে বা মাসোহারা ব'লে কিছু দিতে আসাদ ভরসা করতো না বটে, কিন্তু ভগবতী অতি সাঁচ্চা লোক আর তাঁর সামান্য পেন্‌সন্ বই অন্য আয় নাই বুঝে আসাদ প্রায়ই কোন না কোন উপায়ে তাঁকে কিছু কিছু পাইয়ে দিত।

মক্কাবুড়ী ভগবতী বাবুকে বাবা ব'লে ডাক্‌তো এবং স্বামীর ন্যায় সব কাযে-ই তাঁর পরামর্শ নিতো। হিন্দু ভিকিরী কাঙালকে দিতে বা দুঃস্থ গৃহস্থকে সাহায্য ক'র্‌তে ভগবতী বাবু ছিলেন তার হস্তস্বরূপ। দু পাঁচ জন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ও মক্কাবুড়ীর সাহায্যে কন্যাদায় হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, এ কথা আমরা জানি। আজকাল এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তাঁদের উপলব্ধির জন্য আমরা একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ ক'র্‌বো, তাই যথেষ্ট হবে; যুক্তিটি এই, তখন ইউনিটি ইউনিটি বা একতা একতা ব'লে এত হাঁকডাক্ ছিল না আর মুসলমান প্রতিবেশী আত্মীয়দের আমরা চাচা ব'লেই ডাক্‌তুম্, ভাই ব'ল্‌তে সুরু করি নি, কাযে-ই একতা ও ভ্রাতৃভাব বস্তু দুটি মুখের উচ্ছিষ্ট না হয়ে সত্যি সত্যিই বুকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মক্কাবুড়ী নমাজ ক'র্‌তো, রোজা রাখতো, তস্‌বী ফেরাতো, আবার হিঁদুর ঘরের বিধবার মত নিরামিষ খেতো, গয়না পরতো না এবং কখন-ও কখন-ও চরণামৃত চেয়ে-ও ধারণ ক'রতো।

নারী যেমন চট্ ক'রে নিজের চাল্‌চলন্-চরিত্রাদি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে ঘুরিয়ে নিতে পারে, পুরুষ তত শীঘ্র তা' পারে না। দুঃখীর ঘরের মেয়ে-ও রূপ বা কৌলীন্যের জোরে রাজার ঘরে প'ড়লে অতি সত্বর-ই রাজবধূর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে সকলের সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হয়, এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত অনেকে-ই দেখেছেন; কিন্তু বড়মানুষের বাড়ীর ঘরজামাই মাথায় সিঁথি কাট্‌তে শেখে বটে, ফুলকোঁচা-ও দোলায়, কিন্তু আচরণে যে লাংলা সেই লাংলা; মাণিকপীর সেজে নকল দেখানর ওপর তার ইয়াকির মাত্রা আর অধিক দূর চড়ে না। সেই ইস্কুলে 'শর্টস্' প'রে গিয়ে এ, বি, চেনা থেকে সুরু ক'রে বিলেত ঘুরে আসা পর্য্যন্ত

এক জন বাবুকে সাহেব হ'তে কতটা সময় লাগে, কিন্তু তাঁর অন্তঃপুররুদ্ধা অবগুণ্ঠনবতী সহধর্ম্মিণী বিলাতপ্রত্যাগত স্বামীর হুজুরিমল্‌স্ ট্যাঙ্ক লেনস্থিত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যাবার পর বছরখানেক দেড়েকের মধ্যে-ই বেশ চলনসই মিসেস সো এণ্ড সো হয়ে পড়েন।

হামিদ ত বেশ ভাল রকম হেম হয়ে গেছল-ই, কিন্তু নসীবনের বালিকা-জীবনের দূর চতুঃসীমা থেকেও এতটুকু প্যাঁজের গন্ধ পাওয়া যেত না : কুমারীর দিদিমার শুদ্ধি, নিষ্ঠা এবং মহৎ হৃদয়ের সংদৃষ্টান্ত তা'র জীবনগঠনে অল্প সাহায্য করে নি।

উপাসনা, ধর্ম্মচর্চ্চা, দান-খয়রাৎই আজকাল মক্কাবুড়ীর জীবনের ব্রত হয়েছে বটে, তবে সাংসারিক একটি ভাবনা তার প্রাণকে সতত-ই উদ্বিগ্ন ক'রে রাখে। মাতৃহীন নাতনীটিকে কি ক'রে একটি সৎপাত্রের হাতে তুলে দেবে, এই তা'র দিবারাত্রির ভাবনা। বরের বাপের ঘরে পয়সা আছে কি না, তা' দেখবার দরকার নেই, বিবাহের সময় গয়না-গাটি, ভোজ-উৎসবাদিতে খরচ কর্ব্বার জন্যে যথেষ্ট সঙ্গতি দিদিমার হাতে আছে, আর ভবিষ্যতে নসীবন বলতে গেলে একটা বিষয়ের অধিকারিণী।

রূপ-ও আছে, রূপী-ও বিলক্ষণ আছে, তার ওপর এক জন পতি-পুত্রহীনা প্রাচীনা বিধবার বিষয়-সম্পত্তির অছি হবার সম্ভাবনা অনেক হোমরা চোমরা বুদ্ধিমান মিঞা-জানকে বেয়াই সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার আশায় আকর্ষিত ক'র্লে। এমন কি, ডিঙ্গেভাঙ্গার এক জন চামড়ার মহাজন হাজার আড়াই টাকার সোনা-চাঁদির জেওর আপনার ঘর থেকে এনে পরিয়ে মেয়েটিকে নিজের মাদ্রাসায়-পড়া ছোট ছাবালটির জন্যে নিয়ে যেতে-ও প্রস্তুত, কিন্তু কানাঘুষোয় মক্কাবুড়ী শুনেছিল, প্রার্থী কেবল শুক্‌নো চামড়ার-ই যে ব্যবসা করেন, তা নয়, স্বার্থের জন্যে আবশ্যক হ'লে নিজের চোখের চামড়াখানি পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে ফেল্‌তে পারেন ; আর তাঁর ছেলেটির প্রাণে ইস্‌লামধর্ম্মের আধিপত্য বেলকুল থাক্ বা না থাক্, চালে আর বোলে নবাবীর অস্তিত্ব বেশ ভাল রকম জাহির হয়।

অনেক দিন এক পাড়ায় বাস, সুতরাং সোনাউল্লার ঘরের চালচলন ও তার সাংসারিক অবস্থার কথা মক্কাবুড়ীর বেশ ভাল রকম-ই জানা ছিল : তার উপর আমাদের বাড়ীতে উভয় পক্ষের যাতায়াতে হামিদকে সে হামেসাই দেখতে পেত এবং বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র শান্ত ছেলে বোলে মনে মনে বিশ্বাস-ও ছিল। এ দিকে সার্ভৌম ঠাকুরকে পাড়ার অন্যান্য লোক যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ক'র্ত্তেন, তেমনি মক্কাবুড়ীর-ও ঐ ব্রাহ্মণটির প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল : বুড়ী জান্‌ত যে, ব্রাহ্মণ একান্ত নির্লোভ, কারণ, সার্ভৌম মশায়ের সুপারিশে বৃদ্ধা দু পাঁচ জন দুঃস্থ লোককে সময়ে সময়ে সাহায্য ক'র্লেও তাঁকে কখন-ও কিছু প্রণামীস্বরূপ দিতে চাইলে ব্রাহ্মণ অতি মিষ্ট বাক্যে বৃদ্ধার প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন।

সার্ভৌম ঠাকুরের চতুষ্পাঠী ও সোনাউল্লার কাঠের দোকান এক-ই জমীর উপর। সেই সার্ভৌম ঠাকুরের মুখে যখন বৃদ্ধা শুন্‌লে যে, মুসলমানের ছেলে হ'লেও বালকটির সদাচার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাশক্তি দেখে তিনি তাকে ডেকে নিজের টোলের দাওয়ায় ব'স্‌তে দেন ও তার কলেজের সংস্কৃত পড়া সম্বন্ধে উপদেশাদি-ও দেন, তখন মক্কাবুড়ীর মন থেকে সোনাউল্লার কাঠ চেলানর কুড়ুল খানিকটা স'রে গেল : বিশেষ সে নিজে ভোলে নি যে, তার স্বামী-ও দপ্তরীর কাযে অনেক কাগজ-কাটা কাতান চালিয়ে গেছেন, আর তার শ্বশুর মাণিকগঞ্জ মহকুমার পাঁচপাড়া গাঁয়ে স্বহস্তে জমীতে হল কর্ষণ ক'র্ত্তেন ও পূজাপার্ব্বণ বিবাহ আদি উৎসবে বাজাবার জন্য তাঁর একটি ঢুলীর দল ছিল।

ঘর-জামাই রাখার প্রস্তাব শুনে সোনাউল্লা এমন একটা অন্তর্ঘাতী "তোবা তোবা!" উচ্চারণ ক'রেছিল যে, শুনে-ই মক্কাবুড়ী ও সম্বন্ধে কেবল যে একবারে বোবা হয়ে গেল, তা নয়, তার চক্ষুতে সোনাউল্লার মূর্ত্তি কাঠ চেলান কুড়ুলের পরিবর্ত্তে স্বার্থের নীচতা বলিদানের খড়্গ-হাতে দাঁড়াল। তবে ইতঃপূর্ব্বে হামিদ বার বার অনুরোধ ক'রেছিল, তা স্মরণ কোরে আর অমন সুখের ঘরের মেয়ে এনে বস্তীর ভিতরকার সেই পুরানো ঝুঁকে পড়া খোলার ঘরের ভিতর রাখা ভাল দেখায় না ভেবে সোনাউল্লা রাস্তার ধারের খানিকটা জমী ইজারা কোরে নিয়ে সেইখানে একখানি বেশ ভাল উঁচু পোতাওলা সিমেণ্টের মেঝে-করা ভাল জানালা-দরজা বসানো ছোট-খাট খোলার বাড়ী প্রস্তুত করালে।

আবার আই, এ, পাশ, আবার জলপানি, তার উপর কুটুমের কাছে কেন ছোট হব বোলে মনে মনে একটু গরব-ও

ত আছে, সুতরাং নাতির বিয়েতে সোনাউল্লা দুপয়সা বেশ খরচ কোরে ফেল্লে। ইংরিজি বাজনা, মাদ্রাজি ব্যাগ্‌পাইপ, নবাবী রোসন-চৌকী, দিশি ঢোল, য়্যাসিটিলিনের আলো, রামবাগানের ময়ূরপঙ্খী পাহাড় পর্ব্বত কিছু-ই বাকী রইল না, আমাদের বাড়ীর বিন্দি ঝি, আর স্বপ্‌না উড়ে-ও ফাঁকতালে একখানা কোরে লাল কাপড় পেয়ে গেল। বরযাত্রা দেখ্‌তে ছাদে ছাদে বারান্দায় বারান্দায় যেমন মেয়েদের ভিড়, রাস্তার ধারে, বাড়ীর রকে, সদরে তেমনই ভদ্রেতর সমস্ত পুরুষের ভিড়। সোনাউল্লাকে সবাই ভালবাসে আর হামিদ ত অনেকের-ই বাড়ীর ছেলের মত; কাযে-ই যেখান দে' সেখান দে' বর গেল, মন্দির, মসিদ, দেবালয়, সব যায়গা থেকে-ই আশীর্ব্বাদ কুড়ুতে কুড়ুতে আমাদের হেম নদীর মত সুন্দর বৌ আন্‌তে অগ্রসর হ'ল।

বরের বাড়ী ক'নের বাড়ী, আত্মীয় কুটুম্ব স্বজাতির ভোজ, ধূমধামে পাঁচ সাত দিন ত চ'ল্ল-ই, তার উপর পাড়ার হিঁদুদের প্রায় অনেকের-ই বাড়ীতে ত বাড়ী থেকে-ই মাছ, দৈ ও মিছরির ওলার উপহার এসে পৌঁছল। আমাদের ন্যায় আর-ও দশ বার ঘর প্রতিবেশী বর-ক'নেকে আইবুড়ো-ভাতের কাপড় পাঠিয়েছিল; সোনাউল্লা বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাত জোড় ক'রে জানিয়ে গিয়েছিল, পত্র ছাপায় নি, সুতরাং "ত্রুটী মার্জ্জনা"র আদেশ-ও এসে আমাদের হস্তগত হয় নি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সমালোচনা

কলিকাতার স্বনামখ্যাত স্ত্রী চিকিৎসক ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ধাত্রী-বিদ্যায় তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিতে যাওয়া বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়।

বামনদাস বাবু সম্প্রতি 'প্রসূতি-পরিচর্য্যা' নামে একখানি চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে এই নুতন নহে। 'মাসিক বসুমতীর' গ্রাহকবর্গ ধারাবাহিকরূপে তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ-সংবলিত বহু সুষ্ঠু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বহু রচনা ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' স্থান লাভ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে একাধারে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা বিতরণ করিয়াছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে বামনদাস বাবু সূতিকা-গৃহে প্রসূতির পরিচর্য্যা এবং শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহার বহুদিনের সাধনালব্ধ বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে গর্ভস্থ বা গর্ভজাত সন্তানের শরীর সুস্থ ও সবল হয় না। অধুনা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারবশতঃ প্রসূতির ও শিশুর পক্ষে অবশ্যপালনীয় বহু নিয়ম ও ব্যবস্থা পালিত হয় না। এই সকল কারণে বাঙ্গালার সন্তান ও সন্তান-জননীদিগের নানারূপে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, প্রসূতি ও শিশুর অকালমৃত্যুও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কলিকাতার প্রায় শতকরা ৪৭ জন ১৬ বৎসর হইতে ২৫ বৎসরবয়স্কা জননী দুঃসাধ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতেছেন, এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রক্তহীনতা বা রক্তাল্পতা রোগও প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। অসুস্থ জননীর শিশুও যে স্বাস্থ্যহীন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা।

বিজ্ঞ চিকিৎসক বামনদাস বাবু এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া সহজ সরল সুখপাঠ্য ভাষায় সন্তান ও সন্তান-জননীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাহাতে সূতিকা-গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, যাহাতে প্রসূতি সুস্থ প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রসব করিতে পারেন, যাহাতে শিশু সুস্থ ও সবলকায় হয়, তাহারই উপায় ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগলক্ষণ বর্ণনাকালে প্রত্যেক রোগের মোটামুটি নিদান অর্থাৎ কারণ, যথাসময়ে চিকিৎসা না হইলে তাহার ফল অর্থাৎ পরিণাম, রোগ যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অর্থাৎ প্রতিষেধ এবং রোগ জন্মিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় অর্থাৎ প্রতীকার যথাক্রমে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুকালীন নিয়মপালন, গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন, প্রসবকালীন আবশ্যক নিয়মপালন, সূতিকা-গৃহের নিয়মপালন, প্রসূতি ও শিশুর মঙ্গলার্থ আঁতুড়ে অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া, শিশুপালন, শিশুর খাদ্য, শিশুর স্নান, সংক্রামক রোগে সতর্কতা, ডাক্তারের জন্য যোগাড় ইত্যাদি নানা বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, প্রসূতি ও শিশুর মঙ্গলের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা এই গ্রন্থে সহজ সরল কথায় বুঝান হইয়াছে।

এমন গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ উপকারী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তার বামনদাস বাবু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্য বিদ্যায় তিনি সম্যক্ পারদর্শী হইলেও হিন্দুর আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"মহাশক্তির অংশরূপিণী জননীগণ নীরোগ শরীরে জীবনযাপন করত নিজ নিজ সন্তান-দেহে পূর্ণশক্তি সঞ্চারিত করুন। সুস্থ বলিষ্ঠ চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে দেশ পূর্ণ হউক। ভারতের লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক!" তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের লোক তাঁহার উপদেশ অনুসারে সন্তান ও সন্তান-জননীগণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই কামনা।

সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, বাঁধাইও সুন্দর। এমন গ্রন্থের মূল্য মাত্র ২ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—১৩২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

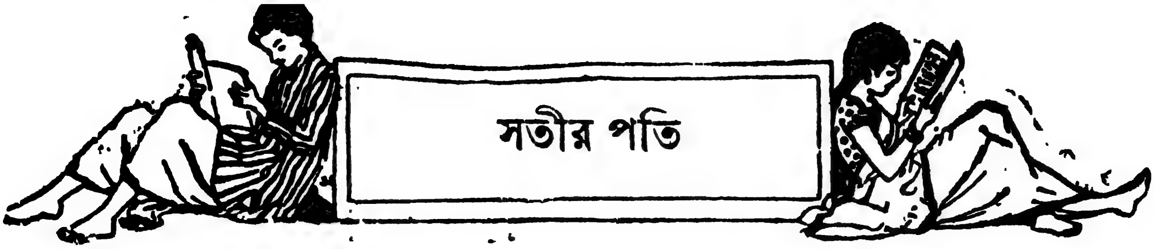

সতীর পতি

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

অতিথি-সংকার।

দ্বিতলে একটি সুদৃশ্য গালিচা-মোড়া সুসজ্জিত কামরার বাহিরে দাঁড়াইয়া রেবতী বলিল, "আপনি ঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি চট্ ক'রে গোসলখানা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় বদ্‌লে আসি। আপনিও হাত-মুখ ধোবেন নিশ্চয়—কিন্তু গোসলখানা আমার মাত্র একটি—আমি সেরে এসে ততক্ষণ দুটি ভাতের ব্যবস্থা করবো। দরোয়ান, বাবুকে বসাও. পাখা খুলে দাও।"—বলিয়া রেবতী বারান্দা দিয়া অদৃশ্য হইল।

হীরালাল বাহিরে আবুহোসেনের নাগরা জুতা ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, এখানি বসিবার কক্ষ। কয়েকটি সুদৃশ্য সোফা ও চেয়ার ইতস্ততঃ সাজানো রহিয়াছে। দরোয়ান পাখার নিকটবর্ত্তী একটা সোফা দেখাইয়া বলিল, "মিঞাজী বৈঠিয়ে।"

হীরালাল হাসিয়া ফেলিল। দ্বারবান্ তাহার পানে উৎসুক নেত্রে চাহিল। হীরালাল বলিল, "ওহে হরিসিং—আমি মিঞা-টিঞা নই—আমি বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে! এটা আমার থিয়েটরের পোষাক।"

হরিসিং বলিল, "ওঃ,—হুজুরভি থেটরমে হ্যাঁয়? হামারা গল্‌তি হুয়া! সিগ্রেট পিতে হেঁ?"

"পেলে খাই বৈ কি!"—বলিয়া হীরালাল 'আঃ' বলিয়া সোফার কোণে দেহ এলাইয়া দিল। দ্বারবান্ হীরালালের কাছে একটা ছোট টেবল সরাইয়া, দেওয়াল-আলমারী হইতে সিগারেট-পূর্ণ একটা রূপার কৌটা, দেশলাই ও ছাইদানি আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া, নীরবে প্রস্থান করিল।

হীরালাল উৎসুকনেত্রে কক্ষখানির চারিদিক দেখিতে লাগিল। সাজসজ্জাগুলি সমস্তই মহার্ঘ—ধনিজনোচিত। ভাবিল, হবে না কেন? একে এত বড় অ্যাক্‌ট্রেস্—তার উপর আবার উপরি পাওনাও বোধ হয় বিলক্ষণ! দেওয়ালে কতকগুলি বাঁধানো ফটোগ্রাফ টাঙানো রহিয়াছে—তন্মধ্যে গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস ও দানী বাবুকে চিনিল। অপরগুলি কাহার ছবি, চিনিতে পারিল না। ঐ ও দিকে—ঐ যে একখানি বড় ব্রোমাইড ছবি—ও-খানি বোধ হয়, রেবতীর সেই তথাকথিত স্বামীর—যিনি চাচা আপনা বাঁচা নীতির অনুসরণ করিয়া, চাচার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

হীরালাল কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অদূরে মাথার উপর অশ্লারের পাখা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—দেশলাই নিবিয়া গেল। দুই তিনটি কাঠি নষ্ট করিয়া, পাখা হইতে দূরে গিয়া সিগারেট ধরাইবার মানসে হীরালাল উঠিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রোমাইড ছবিখানির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া, সিগারেট ধরাইল। তাহার পর ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, ইহা সেই ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিই বটে। ছবির নিম্নভাগে কোণে হস্তাক্ষরে লেখা আছে—"তোমার প্রেমাকাংক্ষী সতীশ।" লোকটার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হীরালাল হাসিল। ফিরিয়া আসিয়া, সোফায় বসিয়া ধূমপান-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

এই অবসরে কয়েকটি চিন্তাও হীরালালের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ ত দেখিতেছি—একটা ইয়ে—অর্থাৎ কিনা—পতিতা স্ত্রীলোক। ভদ্রসন্তান হইয়া, ইহার গৃহে সাময়িক আতিথ্য-স্বীকার—এটাই বা কেমন? কিন্তু উপায়ই বা কি? এই ডামাডোলের বাজারে, এত রাত্রে যাই বা কোথায়? এক জন অভিনেত্রীর গৃহে আমি রাত্রিযাপন করিয়াছি, এ কথা যে শুনিবে, সে কি আমায় সুচরিত্র বলিয়া আর বিশ্বাস করিবে? একেই বলে দশচক্রে ভগবান্ ভূত! যা হোক, রাত্রিটা রাম রাম করিয়া কাটাইয়া, কল্য প্রাতে উঠিয়াই চম্পট দিতে হইবে। কিন্তু সে কার্য্যটাই বা কিরূপে হইবে? থিয়েটরে ঢুকিব উদ্দেশ্য করিয়া

আসিয়াছি, রেবতী এক জন প্রধানা অভিনেত্রী—তার যা হোক একটু কিছু উপকার আমার দ্বারা সাধিত হইয়াছে—সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার উদ্দেশ্যটি সফল করিয়া দিতে পারে -এ অবস্থায় তাহাকে চটানো কি নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে না? এ ত রীতিমত উভয়সঙ্কটে পড়া গেল দেখিতেছি!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হীরালাল উপর্য্যুপরি দুইটি সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি দুইটা বাজে। ক্ষুধাও পাইয়াছে—আবার এ দিকে ঘুমেও চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে। "চট্ ক'রে সেরে আসি"—বলিয়া গৃহ-স্বামিনী স্নানকক্ষে গেল—আধ ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনও ত ফেরে না! কাপড়-চোপড়গুলা ছাড়িয়া একটু স্নান করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয় শরীরের গ্লানি যায়। আহার কিছু জুটুক ভাল, না জুটুক নেই নেই -একটু ঘুমাইতে পাইলে এখন প্রাণটা বাঁচে।

হীরালাল উদ্ধমুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, রেবতী নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ক'খানা কড়িকাঠ গুণলেন, বলুন দেখি?" হীরালাল চমকিয়া, প্রশ্নকারিণীর পানে চাহিল। রেবতী সদ্য-স্নাতা, একখানি সাদাসিধা দেশী কালাপাড় শাড়ী পরিয়াছে, এলো চুলগুলি পৃষ্ঠ-বসনের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে, ঠিক যেন গৃহস্থ-ঘরের বৌটি! দেখিতে, হীরালালের বেশ মিষ্ট লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না, কড়িকাঠ গুণিনি, ভাবছিলাম, নীচে থেকে মুসলমানে আপনাকে আবার ধ'রে নিয়ে গেল না কি?"

রেবতী বলিল, "দৈত্য যদি উর্ব্বশীকে ধরতে আসতো, আমি চীৎকার করতাম, রাজা পুরূরবা হয়ে আপনি গিয়ে আমায় উদ্ধার করতেন।" -বলিতে বলিতে রেবতী পাখার ঠিক নিয়ে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। উভয় বাহু পৃষ্ঠের দিকে লইয়া গিয়া, শুকাইবার জন্য চুলগুলি চিরিতে চিরিতে বলিল, "ভেবেছিলাম, শুধু পা দুটো, মুখটো হাতটা ধুয়ে নেবো, কিন্তু জল দেখে, স্নান করবার লোভ আর সংবরণ করতে পারলাম না। এক রাত এক দিন ট্রেণে কেটেছিল—তার পর গুণ্ডা-গৃহে দু'দিন—প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। স্নানটা সেরে আসতে দেরী হয়ে গেল। গোসলখানা ঠিক ক'রে, ঝি এখনই এসে খবর দেবে। আমার এত দেরী হবে জানলে, আপনাকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিতাম—অতিথিকে বসিয়ে রেখে স্বার্থপরের মত নিজে স্নানে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি!"

হীরালাল বলিল, "কেন, তাতে কি হয়েছে? আপনি বেশ করেছেন—আমার এমন তাড়াতাড়িই বা কি?"

বেরতী বলিল, "ঐ যে, ঝি এসেছে। গোসলখানা ঠিক হয়েছে সদু?—আচ্ছা, বাবুকে নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ দুটো ভাতের যোগাড় দেখি। আপনি দুটি ভাত খাবেন ত হীরালাল বাবু?"

হীরালাল বলিল, "খেলেও হয়—কিন্তু—"

"কিন্তু কি? হ্যাঁ, তা বটে, আমার পাচিকাটি ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়—সদ্‌গোপের মেয়ে :—তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে সে চড়িয়ে দিক, আপনি এসে নামিয়ে নেবেন এখন!"

হীরালাল বলিল, "সে জন্যে কিন্তু বলিনি—ও সব প্রেজুডিস্ আমার নেই। কিন্তু এই রাত্রে আপনাকে কষ্ট দেবো? তাই সঙ্কোচ হচ্চে।"

রেবতী বলিল, "কষ্ট আর কি? আমিও খাব যে! ট্রেণে দু'দিন খাবার খেয়ে কেটেছিল, তার পর গুণ্ডাগৃহে মিহিদানা আর সীতাভোগ ভক্ষণে জীবনধারণ! তা খেয়ে কি বাঙ্গালীর মেয়ের প্রাণ বাঁচে? আচ্ছা, আপনি এ দু'দিন ওখানে কি খেলেন?"

হীরালাল বলিল, "মুসলমানী দোকানের রোটী গোস্ত!"

"তবে আপনিও দুটি ভাত খাবেন বৈ কি! কিন্তু ভাতে-ভাত, তাও ব'লে রাখছি। এত রাত্রে বেশী কিছু হয়ে উঠবে না। আলু ভাতে, মুগ্‌রীর ডাল ভাতে, হাঁসের ডিম ভাতে—আর মাখন-গলানো ঘি আছে ঘরে — ব্যস্।"

হীরালাল বলিল, "সে ত অমৃত!"

"ক্ষিধের সময় তাই বটে—তা হ'লে আপনার খুব ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। যান তবে, শীগ্‌গির সেরে আসুন। বাবুকে নিয়ে যা সদু, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ষ্টোভ জ্বেলে জল চড়িয়ে দিই—তুই এসে চা'ল ধুবি।"

দাসীর সঙ্গে হীরালাল গোসলখানায় গেল। ভিতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। পিপা-কাটা কাঠের চারিটি টব সারি সারি সাজানো—দুইটা খালি, দুইটা জলে ভর্ত্তি। গত

কল্য সন্ধ্যার ট্রেণেই গৃহস্বামিনীর ফিরিবার সংবাদ ছিল, ---তাই জল ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। সুগন্ধি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে, গন্ধতৈল, হেয়ার লোশন, চিরুণী, ব্রুষ, ---দেওয়ালে বেলোয়ারি আর্শি বাঁধা। ঝিকে বিদায় দিয়া হীরালাল গোসলখানার দ্বার বন্ধ করিল।

প্রাণ ভরিয়া স্নান করিয়া, ধুতি-গেঞ্জি পরিধান করিয়া, কেশসংস্কারান্তে হীরালাল উপরে গিয়া দেখিল, রেবতী তাহারই পূর্ব্ব-অধিকৃত সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট খাইতেছে, সম্মুখে টেবলের উপর আধ গেলাস একটা কি তরল পদার্থ। হীরালালকে দেখিয়া, বেরতী একটু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাঃ,—এইবার আপনাকে খাসা ট দেখাচ্ছে! ও পয়জামা-ফতুই প'রে বাঙ্গালীর ছেলেকে কি মানায়? আসুন, বসুন—ততক্ষণ একটু সিগারেট খেয়ে নিন। একটু ক্ষিধে ক'রে নেবার জন্যে---আর কিছু দেবে কি?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া রেবতী বক্রকটাক্ষে নিজ সম্মুখস্থ গ্লাসটির পানে চাহিল।

রেবতীর পানীয় কি পদার্থ, তাহা অবশ্য হীরালাল পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল; হাতযোড় করিয়া বলিল, "মাফ করবেন, আমার চৌদ্দ পুরুষেও কখনও ও-জিনিষ খায় নি।"

"আচ্ছা---নিন, তবে সিগারেট নিন"---বলিয়া সিগারেট-কৌটা ও দেশলাই হীরালালের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, রেবতী গ্লাসে মুখ দিল।

কথায় কথায় সতীশের প্রসঙ্গ উঠিল। সতীশের সহিত গত দুই বৎসর তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা রেবতী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিল, "উঃ, কি বিশ্বাসঘাতক লোক! আমায় বাঘের মুখে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে গা-ঢাকা দিলে!"

হীরালাল বলিল, "তিনি বোধ হয় ইচ্ছা ক'রে এ রকম করেননি। টাকা বোধ হয় সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারেন নি।"

"ক্ষেপেছেন আপনি হীরালাল বাবু! মস্ত কারবার তার—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা তার পক্ষে মোটেই শক্ত কথা নয়। আর ধরুন, যদি সব টাকাটা সংগ্রহ করতে না-ই পেরে থাকে, যতটা পেরেছে, ততটা এনে করিমকে দিয়ে, তার হাতে-পায়ে ধ'রে সময়টা বাড়িয়ে নিলেও ত পারতো। অক্ষমতা নয় হীরালাল বাবু--অনিচ্ছা! ভেবেছে বোধ হয়, সখ ত মিটে গেছে---আবার টাকা খরচ কেন? বিশেষ, তা'র কাছে আমার দু'মাসের মাইনে হাজার টাকা পাওনা আছে—সেটাও দিতে হবে না---সব দিক থেকেই লাভ। ফের যদি কোনও দিন আসে, মড়ো খ্যাংরা পেটা ক'রে তা'কে বিদায় করবো আমি!"

হীরালাল নীরবে বসিয়া সিগারেট পান করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সদু আসিয়া সংবাদ দিল, অন্ন প্রস্তুত। রেবতী বলিল, "এই ঘরেই দে।" ঝি একটা মাঝারি আকারের টেবলে ধোয়া টেবল-ক্লথ বিছাইয়া, কাঁটা চামচ প্লেট প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া খাবার আনিতে গেল। একটা ট্রের উপর ডিশে পূর্ণ ভাত, তিনটা প্লেটে কাঁচা লঙ্কা, ও পেঁয়াজের টুকরা মাখা তিন রকম "ভাতে"—এবং একটা ছোট মিল্ক-জগে ধূমায়মান সুগন্ধি গব্যঘৃত—এই সমস্ত দ্রব্য আনিয়া, টেবলে সাজাইয়া দিল। দুইটা কাচের গ্লাসে জল ভর্ত্তি করিয়া প্লেটের পাশে পাশে রাখিল। রেবতী তাহার গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করিয়া বলিল, "আসুন, হীরালাল বাবু---এইবার দু'জনে মিলে ক্ষুধাসুর বধ করা যাক!"

ভোজনান্তে, অতিথিকে তাম্বুল প্রদানের পর, "আমায় এক মিনিট মাফ করুন"---বলিয়া রেবতী বাহিরে গেল। দাসীর সঙ্গে নিজ শয়নকক্ষে গিয়া বলিল, "আজ এই ঘরেই বাবু শোবেন। আমার একটা বিছানা, বসবার ঘরে মেঝের উপর পাখার নীচে পেতে দিস্। এখানে খাবার জল, দেশলাই, সিগারেট—এই সব ঠিক ক'র রেখে গিয়ে খবর দিস।"

ঝি বলিল, "এই ঘরে আলমারীতে তোমার সব গয়নাগাটি রয়েছে—আনকা লোককে এখানে শোয়াবে দিদি বাবু? তার চেয়ে, বসবার ঘরের মেঝেতেই কেন বাবুটির জন্যে বিছানা পাতি না?"

রেবতী বলিল, "না সদু, তা হয় না। ভদ্রলোক—তায় অতিথি---শুধু তাই নয়---মহাবিপদ থেকে উনি আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছেন---উনি আমার জীবনদাতা!---সে সব অনেক কথা---পরে তোরা শুনবি এখন।"---বলিয়া রেবতী বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সদু গিয়া সংবাদ দিল, শয্যা প্রস্তুত। রেবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“আচ্ছা, তা হ’লে যান হীরালাল বাবু—বিশ্রাম করুন গে। গুড নাইট্।”—বলিয়া রেবতী হস্ত প্রসারণ করিল।

হীরালাল শেক্-হ্যাণ্ড করিয়া, “গুড নাইট্” বলিয়া ঝির সহিত শয়নকক্ষে গেল।

শুভ্র সুকোমল শয্যা—বিদ্যুৎপাখা ঘূরিতেছে—আলো নিবাইয়া দিয়া, অল্পক্ষণমধ্যেই হীরালাল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, অনেক বেলা হইয়াছে এবং এক ব্যক্তি তাহাকে ঠেলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে দাঁত খিচাইয়া বলিতেছে—“কে রে তুই ড্যাম রাস্কেল এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস্ ?”

হীরালাল লোকটার মুখপানে চাহিবামাত্র চিনিল, এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, রেবতীর সেই “প্রেমাখাংকী সতীষ।”

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সোজা দেখা ও উল্টা দেখা

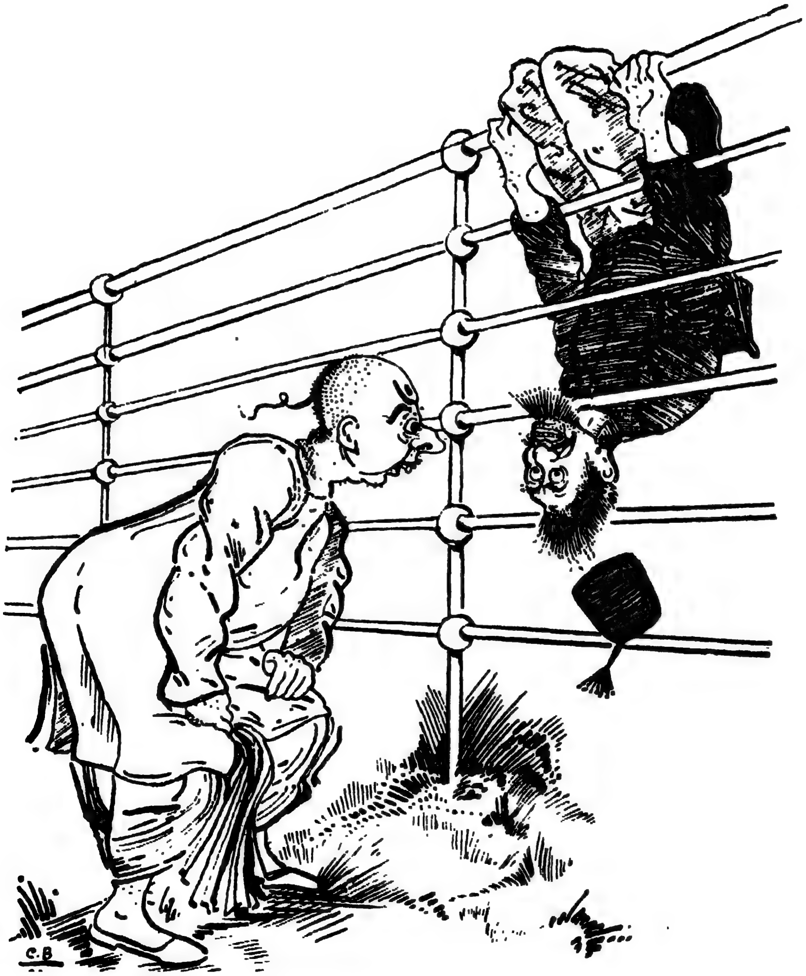

এক জেলে টিকি দাড়ি মিঞা ভট্‌চায! দুজনেরই “কিয়া খাঙ্গা” তবু দাঙ্গাবাজ॥

ইটালীতে রবীন্দ্রনাথ

বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন ইটালীতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সময় ইটালীর জনসাধারণ তাঁহাকে নানা স্থানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারিয়া ভারতে ফিরিয়া আইসেন। আসিবার কালে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের মে মাসে তিনি প্রতিশ্রুতিরক্ষার উদ্দেশে ইটালী যাত্রা করেন। নেপল্‌স্ সহরে পদার্পণ করিলে পর তত্রত্য ইটালীয় রাজপুরুষগণ, জনসাধারণ ও ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিনর ম্যাসোলিনীর পক্ষ হইতে কবিবরকে ইটালীর রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থিত করেন।

ইটালীর নানা স্থানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সমাদরে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রাণ্ড হোটেলে রবীন্দ্রনাথ

ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে—ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ফ্লোরেন্স্ সহরের এবং অন্যান্য স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং বহু বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী সভায় উপস্থিত থাকিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলণ্টীয়ার ছাত্রসেনা সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানশ্রেণী ও হলের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক বার্কি (Burci) তাঁহার সহকর্ম্মিগণপরিবৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে যুক্তকরে অভিবাদন করেন। ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট অভিবাদন-প্রণালীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পাভোলিনী ইটালীয় ভাষায় সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে কবির পরিচয় প্রদান করেন এবং কবির বক্তৃতা উক্ত ভাষায় অনূদিত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরে তিনি কবিবরকে একটি সংস্কৃত শ্লোক উপহার দেন। তাহার অর্থ :—ফ্লোরেন্স এত দিন পুষ্পপুর বলিয়া খ্যাত ছিল, এখন হইতে—গুরুর অমৃতময় বাণী শুনিবার পর—উহা ফলপুর বলিয়া বিদিত হইল।

রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে—রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিবরের অভ্যর্থনায় এমন জনতা হইয়াছিল যে, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও রাণী দেবীকে পশ্চাতের দ্বার দিয়া বক্তৃতা-সভায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কবিবর অতি কষ্টে সভায় নীত হইয়াছিলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সমবেত দশকদল আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ জনৈক ছাত্রের অনুরোধে তিনি যখন ইটালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন জনতা উল্লসিত হইয়া বক্তৃতাসভা জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইটালীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া গ্যালারী ও প্রাঙ্গণে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাঁহার হস্তলিপি পাইবার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিল। কবীন্দ্র যথাসাধ্য তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কলোসিয়মে—কবিবর যখন কলোসিয়ম দেখিতে যাত্রা করেন, তখন সেই স্থানে ন্যূনাধিক ৫০ হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিল। প্রায় ১ হাজার

ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

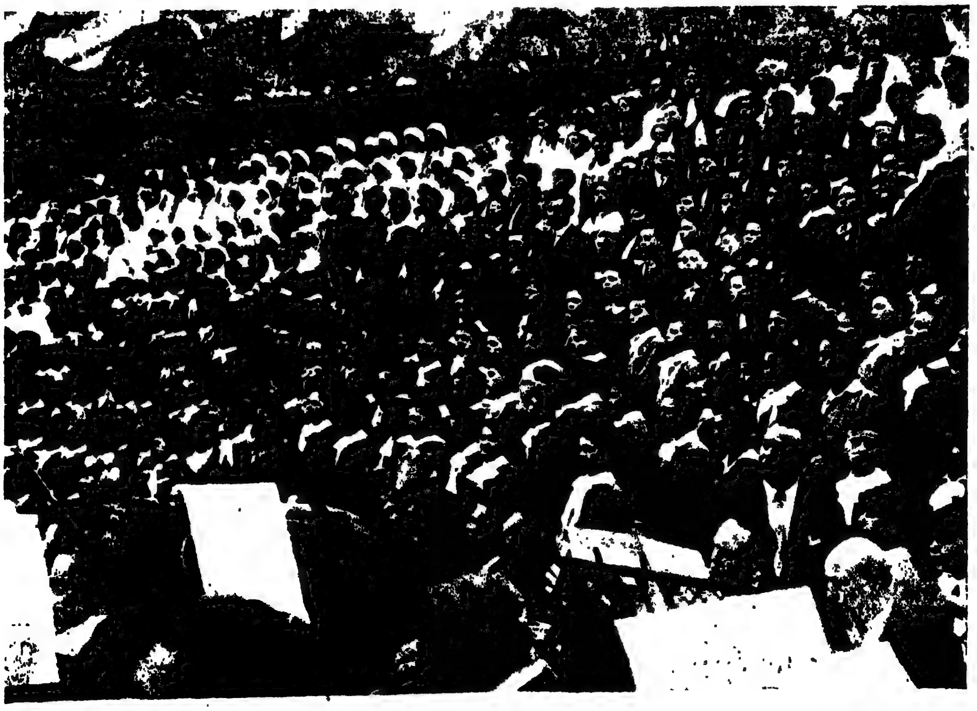

কলোসিয়মে রবীন্দ্রনাথ

রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

বালক-বালিকা সমস্বরে গান গাহিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

চিত্রার অভিনয়—ইটালীয় ভাষায় আর্জেনটাইন রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ-রচিত চিত্রা অভিনীত হয়। ইটালীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে কবি-রচিত বাঙ্গালা নাটকের রস-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাহাদের অভিনয়ে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল।

টিউরিণে—টিউরিণের "প্রোকলটুরা ফেমিনিল" নামক নারীসমিতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সমিতির সভানেত্রী ডাক্তার লিয়া মেজ কবিবরকে একখানি সুদৃশ্য বাঁধান 'এলবামে' করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র উপহার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলেন যে, আমাদের দেশের মহিলারা কোনও অতিথিকে সংবর্দ্ধনা অথবা বিদায়কালে বরণ করিয়া থাকেন। আপনারা সেই ভাবে আজ আমাকে বরণ করিতেছেন, আমার মনে হইতেছে, যেন আজ আমি ইটালীর হৃদয়-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আপনারা আমাকে আপনাদের নিজের কবি বলিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, কবির অধিকার জগতের সকল দেশের উপরেই—শুধু নিজের দেশে নহে।

রবীন্দ্রনাথ টিউরিণের কাসা-ডেল-সোল অর্থাৎ সূর্য্যমন্দিরও দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকারা উন্মুক্ত আকাশ-তলে সূর্য্যালোকে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভে অভ্যস্ত হয়। কবিবর তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

থিয়েটার কুইরিণো—এই স্থানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ললিতকলার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

ইটালীর রাজা, প্রধান মন্ত্রী সিনর মাসোলিনী প্রভৃতি কবিবরকে অভ্যর্থিত করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

থিয়েটার কুইরিণোতে রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

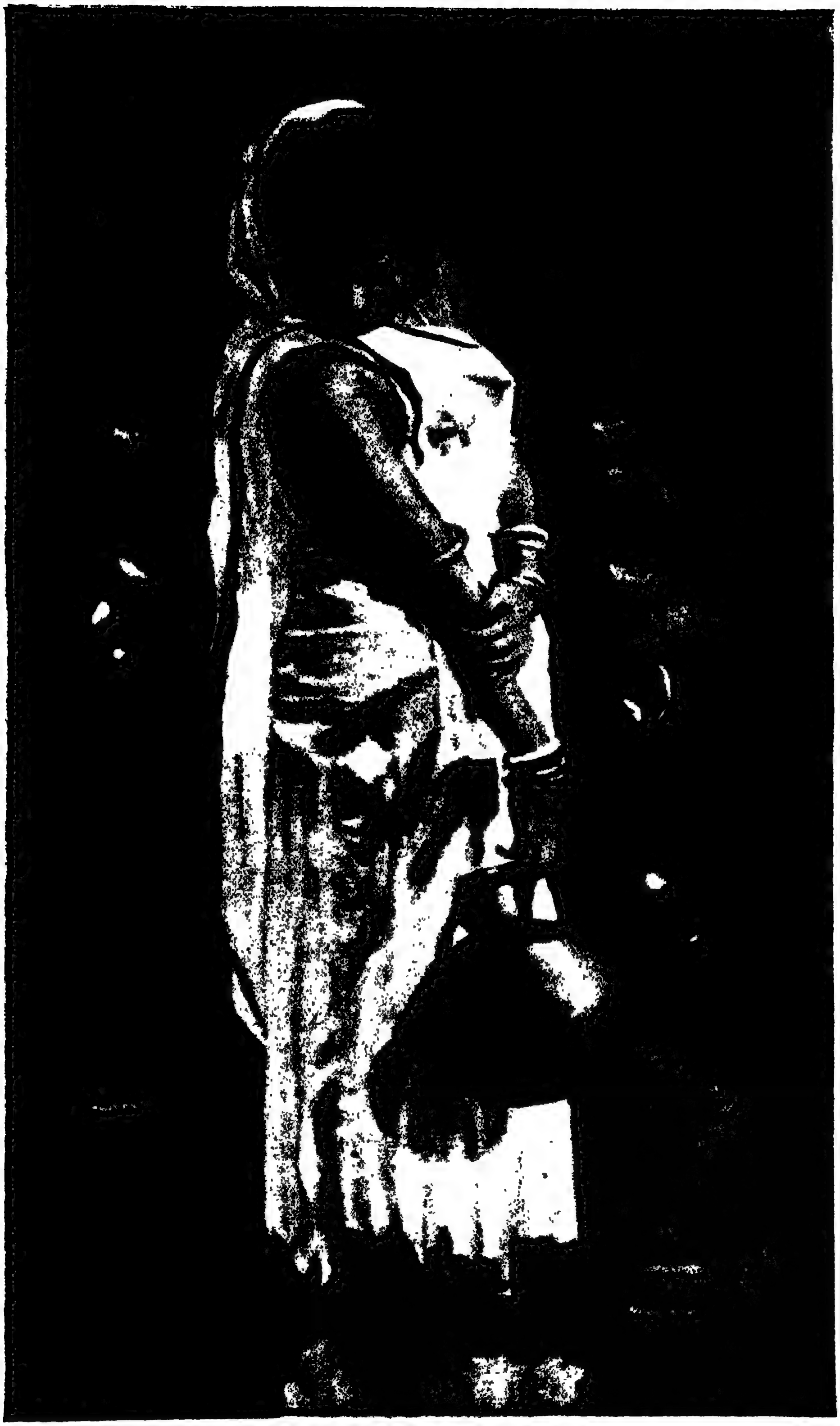

ছায়া

৫ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৩ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মিলনের রাতে

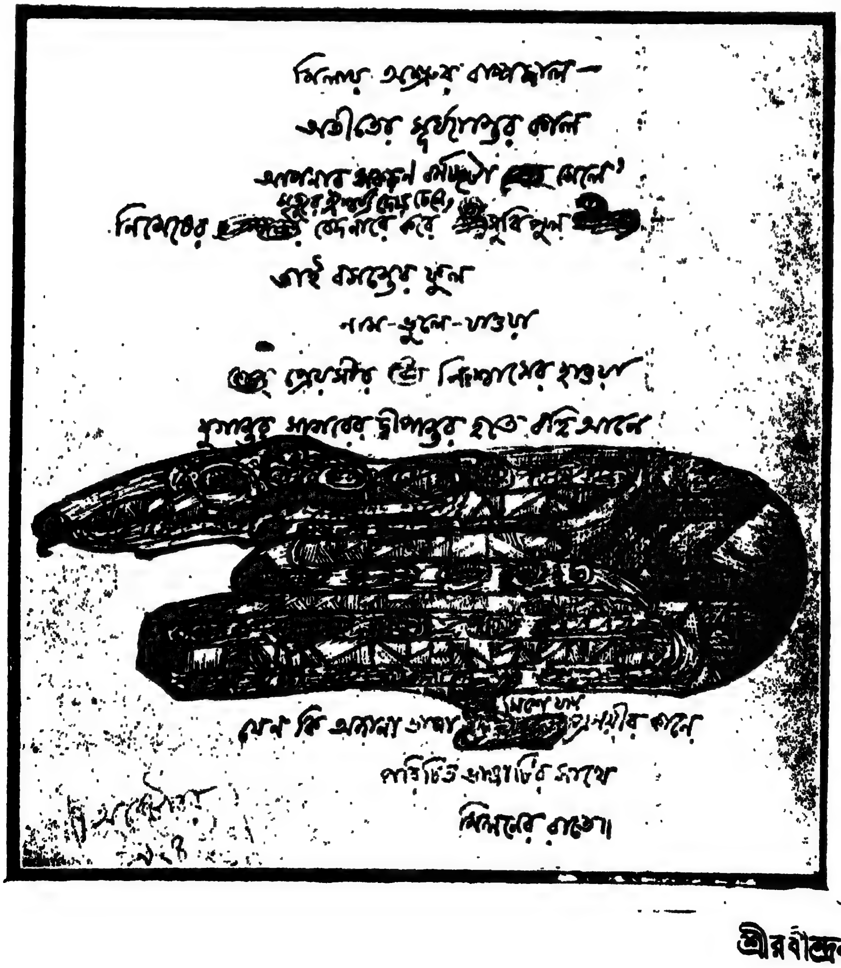

মিলনের অন্তরের বাণীখানি —
অতীতের দুর্গমপুর কোলে
আপনার অন্তরল শিকড়েতে মেলে'
মধুর ঐশ্বর্য্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের [illegible] জোনাকে করে সুবিপুল
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিশ্বাসের হাওয়া
সুদূর আকাশের দীপালির হতে বহি আনে
যেন কি অজানা ভাষা মনে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে
মিলনের রাতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংলণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার

এবার আমাকে আড়াই মাসের জন্য হঠাৎ য়ুরোপ যাইতে হইয়াছিল। একে বৃদ্ধবয়স, তাহার উপর সমসাময়িক প্রায় সকলেই পরলোকগত; কাযেই এখন প্রবাসযাত্রার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও মনে করিতে পারি নাই যে, এ বয়সে পঞ্চম বার আমার ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও জার্ম্মাণীর কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ হইবে। পূর্ব্বে যে কয় বার বিদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক বারই একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল; যথা, ল্যাবরেটরী গবেষণাগার দেখা, বড় বড় রাসায়নিকের সহিত ভাববিনিময় করা ইত্যাদি। কিন্তু এবার আমি নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি; তাই সাধ হইয়াছিল, বিদেশের সকল জিনিষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম যখন মার্সেল (Merseilles) সহরে নামি, তখন মনে হইল, সে দেশের ঘোড়াগুলি যেন হাতীর মত। সকালবেলা বারো হইতে পনের বছরের মেয়েরা স্কুলে চলিয়াছে, যেন নিটোল স্বাস্থ্যের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি! প্যারিস মার্সেল হইতে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টার পথ। ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গালা দেশকে কবিরা বলেন সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা; ফ্রান্সও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে এক টুকরা ভূমিও খালি পড়িয়া নাই। নানা নদনদী ও স্বভাবজ ঝরণার জলে ফ্রান্সের সমতল ভূমি সিক্ত হইতেছে; বরুণদেবও নিতান্ত বিরূপ নহেন। সুতরাং নানা প্রকার ফল, শস্য—যথা গম, যব, আলু, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। লিওঁর (Lyons) রেশমের চাষ (Sericulture) বিশ্ববিশ্রুত। গ্রাসে (Grasse) চামেলী প্রভৃতি নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্যারিসে যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার নিকটেই একটি প্রসিদ্ধ বাগান (বাগিচা) আছে। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাতঃ-সন্ধ্যা মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে। মুক্ত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার আশায় দলে দলে মিলিয়াছে আর আমাদের এই বৃহৎ সহর কলিকাতার যুবকবৃন্দের উন্মুক্ত মাঠে যাইবার খেয়াল হয় শুধু সেই দিন—যে দিন মোহনবাগান বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দলের খেলা ময়দানে থাকে। তাও যদি যাতায়াতের সময় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কিছু থাকিত না। ফুলের প্রতি সমগ্র ফরাসী জাতির অগাধ ভালবাসা। প্রতি মোড়ে ফুলের দোকান। এক পয়সা, দুই পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পাঁচ টাকা মূল্যের ফুল বা তোড়া যাহার যেমন সাধ্য কিনিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে খদ্দরপ্রচার উপলক্ষে অনেকে আমাকে দয়া করিয়া ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধিত করেন; কিন্তু সে সব বনফুলের তীব্র গন্ধে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে ফুলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। বরং ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক সৌখীন ব্যক্তি সখ করিয়া ফুলের বাগান করিতেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার ময়দানে ধনিসন্তানগণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে।

ক্যালে বন্দরে জাহাজে চড়িয়া ডোভারে আসিয়া নামিলাম। কে বলে, ইংলণ্ড শুধু ইট-কাঠ-পাতরের স্তূপ? ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত রেলের দুই

পার্শ্বে চাষের জমী; মাঝে মাঝে স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চরিতেছে বা শুইয়া আছে। আর আমাদের দেশের গোজাতির কি দুর্দ্দশা! ইংলণ্ডের শতকরা ৬০ জন লোক সহরে বাস করে, সেখানে বছরে যত শস্য হয়, তাহাতে ৩·৪ মাসের বেশী কুলায় না। কিন্তু যখনই রেলের দুই পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, তখনই যত দূর দৃষ্টি চলে, দেখি শস্যের ক্ষেত। লণ্ডন হইতে এডিনবর্গ যাইবার পথে মিডলাণ্ড রেলওয়ের দুই পার্শ্বে শুধু শস্য ও ঘাসের ক্ষেত।

সেখানে দুধই বা কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে! প্যারিসে খাঁটী দুধ টাকায় ৮ সের পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরে লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ; উত্তরে বারাকপুর আর দক্ষিণে বজবজ, পূর্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়, লণ্ডনের ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়।

এই লণ্ডন সহরে কেহ ১২টা ১টার আগে রাত্রিকালে শুইতে যায় না; সুতরাং সকালে উঠিতে একটু দেরী হয়। আর শীতপ্রধান দেশে ভোরও হয় একটু বিলম্বে। সেখানকার সকাল সাতটা আমাদের দেশের রাত্রি চারিটার সমান।

ভোর হইবার পূর্ব্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ টিনে বোঝাই হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠ বা গ্রাম হইতে রেলে আসিয়া হাজির হয়। আর সকাল ৭টার পূর্ব্বে টিনে বা বোতলে করিয়া এই দুধ লণ্ডনের অধিবাসীর দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে না। কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘরকন্না পাতাইতে পায় না। গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না। নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়। কোন রকম গোলযোগ নাই; গোয়ালার সহিত বকাবকি নাই; সবই যেন কলে চলিতেছে। আবার ১২টা ১টার মধ্যে খালি পাত্র সংগৃহীত হইয়া সহরতলীতে চালান হইয়া যাইতেছে। বৎসরের ৩শত ৬৫ দিন এই ব্যাপার যন্ত্রচালিতের মত চলিয়া যাইতেছে; এক দিনের তরেও বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডন বলিয়া নহে, এডিনবরা, ম্যানচেষ্টার যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট! কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব সকলেরই নজর আছে, যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সর্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে। যক্ষ্মা বা আন্‌থ্রাক্স (anthrax) রোগদুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারীতে পরিণত হয়। দুধও টিনে বা বোতলে পূরিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। দামও প্রায় কলিকাতার কাছাকাছি, টাকায় আড়াই সের হইতে তিন সের। আবার পাড়ায় পাড়ায় দুধের আড়ৎ (Dairy) আছে। সেখানে গব্যপ্রসূত সব জিনিষ যথা—পনীর, ননী প্রভৃতি এবং ডিম্ব যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। যাহার খুসী যখন তখন আসিয়া খাইয়া বা লইয়া যাইতেছে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরের অধিকাংশ দিন ৮ আনা সেরের কমে দুধ পাওয়া যায় না। ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত সেখানে আছে; বৎসরে দুই তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা হয়, যাহাতে শীতের সময় কম না পড়ে। তাহা ছাড়া গরুর জন্য শালগম, বীট্ প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। সে দিন আমি একটি ডেয়ারী ফার্ম্ম (গোশালা) দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল যে, যদি কেহ গরুর যত্ন ও সেবা করে, তাহা হইলে সে জাতি ইংরাজ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটা গরু এক মণ দুধ দিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়; অবশ্য সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গোখাদক জাতি; কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বার গোমড়কে যত গরু মরে, তাহার এক-চতুর্থাংশও ইংরাজ খায় কি না সন্দেহ। খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কমিতেছে, এ কথা মোটেই সত্য নহে। আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি

অসাধারণ ; কিন্তু গোজাতিকে আমরা যেরূপ তাচ্ছীল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতিও সেরূপ করে না।

আয়র্লণ্ডকে বলা হয় এমারেল্ড আইল্ ; আয়র্লণ্ড চিরসবুজ কৃষিপ্রধান দেশ। অজস্র গোল আলু, গোধূম, বার্লি, যব সেখানে জন্মে। গোপালনও সেখানে কৃষির আনুষঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গোময় কৃষির প্রধান সার। যথেষ্ট পরিমাণে মাখন, পনীর আয়র্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়।

যখন ডাবলিনে যাই, তখন কাষ্টম কর্ত্তৃপক্ষ আমার জিনিষপত্র আটক করিয়া দেখিয়া লইল যে, বে-আইনী কোন জিনিষ সঙ্গে আছে কি না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, বৃটিশ-শাসিত দেশে এ আবার কি নূতন উপদ্রব ! পরক্ষণেই মনে হইল যে, আইরিশ স্বাধীন রাজ্যে (Irish free state) আসিয়াছি। আবার ডবলিন হইতে বেলফাষ্টের রেলপথে ট্রেণের মধ্যে পরীক্ষক দেখা দিলেন। আমার জিনিষপত্রের বালাই কোন কালেই বিশেষ থাকে না, সহজেই রেহাই পাইলাম। কিন্তু কয়েক জন আমেরিকান্ সহযাত্রীর দুর্দ্দশার একশেষ হইল। তাঁহারা সখ করিয়া কিছু রেশম কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আর যাইবে কোথা ! শুল্ক বিভাগের প্রভুরা কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইলেন ; সহযাত্রিগণ দুঃখ করিতে লাগিলেন, এমন জানিলে কখনও রেশম কিনিতেন না।

আলষ্টারের রাজধানী বেলফাষ্টে গেলাম। আলষ্টার অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পূরা আয়র্ল্যাণ্ড রোমান কাথলিক মতাবলম্বী, শুধু আলষ্টারে ক্রমওয়েলের সময় হইতে প্রোটেষ্টাণ্টগণের লীলাভূমি। ব্যবসাবাণিজ্যে আলষ্টার ইংলণ্ড বা স্কট্লণ্ডের বড় বড় কেন্দ্রের তুলনায় নেহাৎ হেয় নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সূক্ষ্মকাপড়ের কারখানা আলষ্টারে। তিসির গাছ হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়, পাটের মত জলে ভিজাইয়া এই আঁশ বাহির করিতে হয়। কি করিয়া আঁশ হইতে সূতা হয়, সূতার সাধারণ লাল আভা কি করিয়া দূর করা হয়, এ সকল দেখিলে প্রচুর শিক্ষা হয়। পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ দড়ির কারখানাও আলষ্টারে ; শণের দড়ি, কাছি প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান হইতেছে। আলষ্টারে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাও আছে। কিন্তু আলষ্টারকে বাদ দিলে আয়র্লণ্ড পূরাদস্তুর কৃষিপ্রধান দেশ।

জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি নানা দেশে পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয়, এক ইংলণ্ড তাহার আঠার ভাগের এক ভাগ খাইয়া ফেলে। অথচ পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ড ত নগণ্য। ইংলণ্ডে .ধনবাহুল্য কেন হয় ? লণ্ডনে ২।৪ মিনিট অন্তর বাস্, রেল, টিউবরেল্ অনবরত চলিতেছে ; লোকেরও অভাব নাই। আমাদের দেশেও অবশ্য বাস্ ও মোটর আছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিলাতে লোকের এ সব জিনিষ নিজস্ব আর আমাদের অন্যের ধার-করা জিনিষ। সুতরাং এক জন ইংরাজ যখন দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া বাসে চড়ে, তখন দুই আনার সমস্ত অংশই দেশে থাকে। আর আমরা যে মোটরে চড়ি, তার কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই বিলাত হইতে আইসে। কিনিবার সমস্ত টাকাটাই বিদেশে যায়। পেট্রলের জন্যও বিদেশী কোম্পানীকে টাকা দিতে হইতেছে। কেবল সোফেয়ার,-- তাও বাঙ্গলাদেশে পাঞ্জাবী। সুতরাং যখন আমরা রেল, ষ্টীমার বা মোটরে চড়ি, তখন এক টাকার চৌদ্দ আনা যায় বিলাতী মহাজনের পকেটে, আর বাকী দুই আনা সারং, চালক, টিকিটবাবুর মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং দেশে অর্থের সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও বৈদেশিকের উদরস্থ হয়।

এক জন ইংরাজ গড়ে কত খায় ! শুধু মদই কত পান করে—হুইস্কী, বিয়ার,—সব তাহাদের নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু সাম্পেন্, শেরী ফ্রান্স হইতে আইসে। ইংলণ্ডে দুনিয়ার অর্থ ঝাঁটাইয়া আইসে। বাল্যে পড়িয়াছিলাম, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী (Milch Cow) ; আমার মনে হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সারা পৃথিবীই ত ইংলণ্ডের দ্বারে অর্থের ডালি লইয়া উপস্থিত। ভাগ্যবান্ জাতি ইহাকেই বলে ;—যদিও ইংলণ্ডের প্রতি আট জনের এক জনের অন্নসংস্থান ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে।

আসাম ও বাঙ্গালায় যত চা-বাগিচা আছে, তাহার শতকরা সাতানব্বই ভাগ ইংরাজের। শতকরা তিন ভাগ বাঙ্গালী ও আসামীর। অর্থাৎ যখন আমরা ১ শত

টাকার চা কিনি, তখন ৯৭৲ টাকার অধিক শ্বেতদ্বীপে গিয়া হাজির হয়। কয়লার খনি গিরিডি, ঝরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের মধ্যে গভীর খাদ যেগুলি, তাহা প্রায় সবই ইংরাজের। কেনিয়া কয়লা আমদানী হওয়ায় ইংরাজ মালিকের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

পাটের কল বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৮৩টি। দুইটা মাড়োয়ারীর আর বাকী সব ইংরাজের ও স্কটলণ্ডবাসীদিগের। বৎসরে ৫০।৬০ কোটি টাকার কাঁচা পাট (Raw jute) বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পর, সূতা ও বস্তায় পরিবর্ত্তিত হইলে ইহার মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। এ সব টাকা পায় স্কটলণ্ডের ডাণ্ডীর বণিকরা।

আসাম ও বাঙ্গালাদেশের উপকণ্ঠে তৈলের খনি আছে; কিন্তু মালিক ইংরাজ। বর্ম্মার সেগুণকাষ্ঠ, তৈলের খনি, মূল্যবান্ চুণি সবই ইংরাজের হাতে কেনা-বেচা হইতেছে। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার প্রদেশের স্বর্ণের খনি ইংরাজ চালাইতেছে ও শতকরা এক শত টাকা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর দিতেছে। কি অসাধারণ অধ্যবসায়! ২৮ মণ পাতর হইতে নানা প্রক্রিয়ার পর এক পেনীর ওজনের সোনা বাহির হয়।

পৃথিবীর মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই ইংরাজের। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ৬শত কোটি টাকার জিনিষের লেনদেন কারবার হয়। আর যে সকল জাহাজে এই সকল জিনিষ যাওয়া-আসা করে, তাহাদের দুই চারিখানি ছাড়া সমস্তই ইংরাজের। আর এক একখানি জাহাজের ভার বহনের ক্ষমতাই বা কি! ইংলণ্ডের Ocean Liner কোম্পানীর Vaterland* (Leviathan) জাহাজখানি পঞ্চাশ হাজার টনবাহী; আর একখানি ষাট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বাগান, নাচঘর, মজলিসঘর সমস্তই আছে। একবার ইহাদের এক একখানির দাম জানিবার বাসনা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৬ হাজার টন জাহাজের মূল্য অনুমান দেড় কোটি টাকারও অধিক ($1\frac{1}{4}$ million sterling); সুতরাং ত্রৈরাশিক নিয়ম অনুসারে পঞ্চাশ হাজার টন জাহাজের মূল্য কষিয়া বাহির করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে। লয়েডের খাতা (Llyod Register) হইতে জানা যায় যে, সুয়েজ প্রণালী দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার শতকরা নব্বইটি ইংরাজের।

মিশর ছিল পূর্ব্বে ফ্রান্সের করদ রাজ্য। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক জন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার (মুসিয়ে লিসেপ্স) উদ্যোগী হইয়া এই খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের কূটবুদ্ধি অসাধারণ। ডিসরেইলী তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। মিশরের সুলতান ইসমাইল পাশার চারি কোটি টাকার সেয়ার বেনামী করিয়া কৌশলে ইংরাজ হস্তগত করিল। ফলে সুয়েজ প্রণালীর উপর ইংরাজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশর আস্তে আস্তে ফ্রান্সের হাত হইতে খসিয়া পড়িল আর এখন মিশর, সুডান প্রভৃতি দেশে ইংরাজের প্রভুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জাহাজের শুল্ক হইতে সুয়েজে যথেষ্ট আয় হয়; প্রতি জাহাজ পিছু প্রায় দশ হাজার মুদ্রা দিতে হয়।

রবারের ব্যবসা ইংলণ্ডের একচেটিয়া বলিলেও হয়। মালয়, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রবারের বাগিচাগুলি ইংরাজের। দক্ষিণ-আমেরিকা যদিও ইংরাজের রাজত্ব নহে, তথাপি বাগানের মালিক অধিকাংশই ইংরাজ। কাঁচা মাল হইতে পাকা রবার (Finished product) করিবার কারখানা ইংলণ্ডে অনেকগুলি আছে। ইহাদের এক একটির মূলধন কয়েক কোটি টাকা।

রাসায়নিক মাল প্রস্তুতের কারখানাও ইংলণ্ডে অপ্রতুল নহে। অবশ্য সূক্ষ্ম রাসায়নিক মাল প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণী অদ্বিতীয়; কিন্তু Heavy chemicals ভারী রাসায়নিক মাল ইংলণ্ডের একচেটিয়া ব্যবসা। সোডা, গন্ধক-দ্রাবক, এসিড্, ব্লিচিং পাউডার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়। এক শত বৎসর আগে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগ্ বলিয়াছিলেন যে, এইগুলি রসায়নশিল্পের মূলসূত্র। ব্রানার মণ্ড কোম্পানীর সোডার কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। লেভার ব্রাদারের সাবানের কারখানার নাম কে না শুনিয়াছে? এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লেভার

---

* জাহাজখানি পূর্ব্বে জার্ম্মাণদিগের ছিল। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের করায়ত্ত হইয়াছে।

হিউম (Lord Lever hulme) ৫৫ বৎসর আগে মুদীর দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন আর এখন এই কোম্পানীর মূলধন ৬০ কোটি টাকা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল, পাম তেল জাহাজে বোঝাই হইয়া লিভারপুলের কাছে পোর্ট সান্‌লাইট দ্বীপে হাজির হয় এবং সেখানে সাবানে পরিবর্ত্তিত হয়।

কার্পাস-শিল্প ম্যানচেষ্টার ও লাঙ্কাশায়ারের একচেটিয়া। এক ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৬০ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানী হয়। লিড্‌স্ পশম প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। বার্মিংহামে সেফিল্ডে নানা প্রকার কলকব্জা, এঞ্জিন ও কামান সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছে। কয়লাও ওয়েলেস, নিউকাসলে প্রচুর। সুতরাং কারখানা চালাইবার আনুষঙ্গিক সব জিনিষই ইংলণ্ডে যথেষ্ট মিলে। পারস্যোপসাগরের কূলে যে সকল তৈলের খনি আছে, তাহাও এখন ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছে।

ফোর্ডের মোটরের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু অক্সফোর্ডের কাছে মরিস্ ব্রাদারের যে কারখানা আছে, তাহা নিতান্ত ছোট নহে। আমরা বিদেশী জিনিষ পাইলে পারতপক্ষে দেশী জিনিষ কিনি না, আর বিলাতে আমেরিকান বলিয়া ফোর্ডের গাড়ী কেহ কিনিত না। ফলে বাধ্য হইয়া ফোর্ডকে ইংলণ্ডে এক কারখানা খুলিতে হইয়াছে। তাহার মূলধনের কিয়দংশও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে মজুরীর টাকা সমস্তই ইংলণ্ড পায়।

নকল রেশম (Artificial silk) প্রস্তুতের জন্য কোর্টলেণ্ড ব্রাদার প্রসিদ্ধ। গত বৎসর এই কোম্পানী সাড়ে ছয় কোটি টাকা মুনাফা দিয়াছিল।

এখন দেখিতে পাইতেছি, ইংলণ্ডের ধনাগমও যেমন প্রচুর, ব্যয় করিবার শক্তিও সেইরূপ অসাধারণ। অর্থের কোন শাশ্বত বা নিত্য মূল্য থাকিতে পারে না,ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। সাঁওতাল পরগণার নিভৃত পল্লীবাসীর নিকট চারি পয়সার যাহা মূল্য, তাহা কলিকাতাবাসী আমাদিগের নিকট হয় ত চারি আনার সমান। সে হিসাবে ইংলণ্ডে যদি টাকায় ৴২৷৹ সের দুধ হয়, তবে কলিকাতায় হওয়া উচিত টাকায় দুই মণ। ইংলণ্ডে গড়পড়তা লোকের আয় ভারতবাসীর অপেক্ষা অন্যূন চল্লিশ গুণ বেশী; সুতরাং ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বেশী খরচ করিতে পারে। করাচী হইতে গম চালান হইয়া বিলাতে যাইতেছে আর সেখানে হইতেছে হন্দর পিছু মাশুল (freight) এক সিলিং। ইংলণ্ডের রুটীর দামের সঙ্গে আমাদের রুটীর দামে বিশেষ পার্থক্য হইবে না। অথচ ইংরাজের খরচ করিবার ক্ষমতা কত গুণ বেশী। সে দিন মার্সেলে Daily Mailএর ফরাসী সংস্করণে একটি তৈলচিত্র নীলামের সংবাদ পড়িলাম। যে চিত্রের দাম চিত্রকর রম্‌নির (Romney) জীবদ্দশায় ১০।১৫ পাউণ্ডের বেশী হয় নাই, নীলামে তাহার দর উঠিল ৬১ হাজার পাউণ্ড, আট লক্ষ টাকা। জাহাজে করেন্সী কমিসন্ ও স্কিন্ কমিটীর হোমরা-চোমরা সদস্যরা আমার সহযাত্রী ছিলেন। বোম্বাইয়ের ধনকুবের বণিকদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা বাঙ্গালাদেশের কথা ছাড়িয়া দিন, আপনাদের বোম্বাইয়ের ধনী বণিকমহলে কেহ কি এত টাকা দিয়া একটি তৈলচিত্র কিনিতে পারে?' বলা বাহুল্য, সকলেই নিরুত্তর রহিলেন।

স্বাবলম্বন ইংলণ্ডের মূলমন্ত্র। সেখানকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে না।

লণ্ডনে গাইস্, সেণ্ট বারথলমিউস্, কিংস হস্‌পিটাল প্রভৃতি কয়েক শত হাসপাতাল আছে। এক একটি ৫।৭ শত বৎসরের পুরাতন। কোনটা বা যক্ষ্মারোগের, কোনটা হৃদ্‌রোগের, কোনটা চক্ষুরোগের জন্য। হাজার বারো শত শয্যা প্রায় প্রত্যেকটিতেই আছে; এগুলি রাখিবার খরচ বছরেই বা কত! কিন্তু এই সব হাসপাতাল চলে সাধারণের দাতব্য অর্থে, লোক উপযাচক হইয়া টাকা দিয়া যায়। কোন কোন রবিবার হয় ত হাসপাতাল দাতব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; লোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া যথাসাধ্য অর্থ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। তাহার পর যখন টাকার প্রয়োজন হয়, টাইমস্, ডেলী মেল প্রভৃতি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হয়—'অমুক হাসপাতালের ৫০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বিশেষ দরকার।' অমনই কোন অজ্ঞাতনামা পুরুষ

হয় ত একখানি চেক কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া কৃতার্থ হইলেন। বারণার্ডোর হোম নামে ইংলণ্ডে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সহস্রের অধিক অনাথ, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এ সমস্ত চলিতেছে দানের উপর। যখনই ডাক্তার বারণার্ডোর অর্থের অভাব হইত, তিনি ভক্তিভরে উপাসনা করিতেন। পরদিন যেন যাদুমন্ত্রবলে টাকা আসিয়া উপস্থিত হইত। লণ্ডন টাইমস্, ইলাষ্ট্রেটেড্ লণ্ডননিউস্ প্রভৃতি কাগজে একটা পূরা কলম থাকে মৃতব্যক্তির উইল ও দানপত্র সম্বন্ধে। সে দিন দেখিলাম যে, এক জন লোক ৪৭ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আমাদের দেশে ধনসৃষ্টি করে একমাত্র কৃষক। মামলায় দেশে টাকা বাড়ে না; উকীল-ব্যারিষ্টারের টাকা বিদেশ হইতে আইসে না। শুধু দেশের টাকা এক হাত হইতে অন্য হাতে যায়; তাহাতে জাতীয় ধনাগম হয় না। ডাক্তার, দালাল বা ফড়িয়াও টাকা সৃষ্টি করে না। তাহারা দেশের টাকা বিদেশে চালান দেয় মাত্র।

ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা বড় কিসে? দৈববলে নহে নিশ্চিত। যাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা অনাহারী থাকে না, এ কথা অর্থনীতিক দিক দিয়া এবার লক্ষ্য করিয়াছি।

> "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
> দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

আমরা এখন নিশ্চেষ্ট, অলস, অথর্ব্ব ও জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি! আজ বাজারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, কেবল দেখি, 'বেলাতী' অর্থাৎ বিদেশী মালে দোকান বোঝাই। আমরা নিজেরা কিছুই প্রস্তুত করিতে পারি না। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার Bentinck streetএ অর্থাৎ কসাইটোলায়, ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট চীনাদের জুতার দোকান ছিল। এখন দেখিতেছি, কেবল Bentick streetএর দুই পার্শ্বে নহে, লালবাজার হইয়া চিৎপুর রোড্, ফৌজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান; মাঝে মাঝে লাকচাঁদ, লালচাঁদ প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় চামারদিগের দোকান। তাহা ছাড়া আবার লালবাজারের মোড় হইতে বহুবাজারের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে চলিতে হইলে, কেবল চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান। আবার এই চীনামিস্ত্রীদের টেংরা অঞ্চলে Tannery অর্থাৎ চর্ম্মসংস্কার করিবার কারখানা এবং সেই অঞ্চলে জাট মুসলমানদেরও অনেকগুলি চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা আছে। ইহারা মাসে ২ শত ৫ শত বা ১ হাজার পর্য্যন্ত টাকা উপায় করে। আর বাঙ্গালী চামার আজ কোথায়? কলিকাতার আশেপাশে, এমন কি, দমদমা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী চামার 'হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতেছে। এক জন জুতা "সেলাই"কারীর মূলধন কি? কতকগুলি ছেঁড়া জুতা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইলে, তাহারা সুকতালা বানাইতে পারে এবং এই শ্রেণী প্রত্যহ ১৲ টাকা ১৷৹ সিকা উপার্জ্জন করে।

তাই বলি যে, কেবল ইংরাজ ও বিদেশীর দোষ দিলে চলিবে না। এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে, হাত-পা কোলে করিয়া কেবল অদৃষ্টের দোষ দিলে বাঙ্গালীজাতি—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—অন্নাভাবে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সাধন-পথে

১

নিদাঘের জ্বালাময় দ্বিপ্রহর—চারিদিকে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বেলা প্রায় একটার সময় ঘর্ম্মাক্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া অবনী শ্রান্তকণ্ঠে এক বার "মা" বলিয়া ডাকিয়াই রান্নাঘরের সাম্‌নের বারান্দায় বসিয়া খদ্দরের অর্দ্ধ-মলিন ঘর্ম্মসিক্ত কামিজটা খুলিয়া অদূরে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। মা রান্নাঘরে ছিলেন, একখানা পাখা হাতে বাহির হইয়া আসিয়া ছেলেকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, তাহার পর পাখাখানা অবনীর হাতে দিয়া ঘর হইতে এক গ্লাস সরবৎ লইয়া আসিলেন। এই সময় হ্যাট-কোট পরিয়া অখিল বাড়ী ফিরিল—হ্যাটটা হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ছোক্‌রা চাকর কালীচরণকে ডাকিয়া ঘরে যাইবার সময় উগ্রকটাক্ষে অবনীকে দেখিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রীতিসুধা বর্ষিত হইল না!

অখিল, মৃত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদিনাথের প্রথম পুত্র; আদিনাথের প্রতি স্নেহশীল এক জন পদস্থ ইংরাজের অনুকম্পায় সম্প্রতি পুলিস বিভাগে মোটা বেতনে কাযে ভর্ত্তি হইয়াছে। অখিলের জননী পিতৃহীন অনেকগুলি সাবালক ছেলে-মেয়েকে বুক দিয়া ঢাকিয়া মানুষ করিতেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র উৎসাহের সহিত কলেজে পড়িতেছিল, কিন্তু সমস্যা বাধিয়াছে সম্প্রতি এই অবনীকে লইয়া।

দাদার উগ্রকটাক্ষ অবনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই—সে বক্রস্বরে মা'কে সম্ভাষণ করিয়া কহিল—"রোজগেরে ছেলে বাড়ী এলো, মা। এ দীন মজুরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও ফল নেই। চারটে পয়সা যা' রোজগার করেছিলাম, তা' একটা ভিখারীকে দিয়ে বাড়ী এসেছি, দেখ গিয়ে, ও ছেলে অন্ততঃ পাঁচ সাত টাকা এনেইছে।"

মা হাসি চাপিয়া কহিলেন—"তা' আসুক, তুই এখন সরবৎটুকু খেয়ে নে ত! ওর কাছে আমি যাই। তুই সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছিলি। এখন চান্ কর্—বড়দি ভাত দিয়ে তবে খেতে বসবে, কাল একাদশীর উপোস গেছে, আজ দ্বাদশীর পারণ।"

মা'রও উপবাস ছিল, ইহা ভাবিয়া অবনীর মন একটু নরম হইয়া আসিল। মা সরবতের গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়াছিলেন, ঠেলিয়া দিবার ইচ্ছা থাকিলেও দেহের মধ্যস্থ প্রবল তৃষ্ণা উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না, সুতরাং সে এক নিশ্বাসে সুগন্ধী লেবুর রস-মিশ্রিত সুমিষ্ট শীতল পানীয়টুকু পান করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিল। মা স্নান করিতে বলিয়া অখিলের কাছে আসিলেন, অখিলের সরবৎ টেবলের উপরেই ঢাকা ছিল। সে পান করিয়া টানা পাখার নীচে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল, মা'কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ মা, তোমার ছেলের জ্বালায় আমার মান-সম্ভ্রম আর রইলো না, শেষে চাক্‌রী নিয়েও না টান পড়ে।"

মা বুঝিলেন—কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি—এখন উত্তর দিলে কথা বাড়িবে, সুতরাং কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অখিল মা'র নিকট হইতে প্রশ্ন শুনিবার জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আপনা হইতেই কহিল, "স্বদেশী করছিস্, পিকেটিং করছিস্, তাই কর, আজ আবার করেছে কি না, আমারই থানার অফিসের সাম্‌নে গেছে হতভাগা খাবারের 'খুঞ্চা' নিয়ে খাবার বেচতে—না লজ্জা, না অপমান বোধ! কনেষ্টবলগুলো গিয়ে আমায় খবর দিলে। আমি বাইরে এসে রিপোর্ট লিখছি, 'বড় সাহেব' এলো, তবুও ছোঁড়া সর্‌লো না—এগিয়ে এসে খাবার বেচ্‌ছে ত খাবারই বেচ্‌ছে। 'সাহেব' ওকে চেনে ত। আমায় জিজ্ঞেস করলে—'রায়—ও তোমার ভাই না, ছোট রায়?' আমি আর কি বলি, শুধু একটু 'হুঁ' ব'লে মাথা হেঁট ক'রে কায করতে লাগ্‌লাম, 'সাহেব'

হেসে বল্‌লে—‘স্বদেশী করছে বুঝি? রায় সাহেবের ছেলের উপযুক্ত কায বটে।’ আমি তা’র সে টিট্‌কারী হজম ক’রে চুপ ক’রে রইলাম।”

পরিপাক যে মোটেই হয় নাই, এ পরিচয় স্পষ্ট জানিয়াও মা কেবল ধীরস্বরে কহিলেন—“দুদিনের পাগ্‌লামী কোথায় মিলিয়ে যাবে বাবা,—সবুর সয়ে থাক্‌, দেখতেই পাবি, রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে হাড়-মাস কালী ক’রে ফেলেছে, দেখি আর কদ্দুর গড়ায়।”

অসহিষ্ণুভাবে অখিল কহিল—“দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার চাক্‌রী যে শিকেয় উঠবে, তখন এত বড় গোষ্ঠীর অন্নের জোগাড় হবে কোত্থেকে?”

মা দেখিলেন, কথায় কথা বাড়ে, কিন্তু একটা কিছু না বলিলেও নয়; তাই বলিলেন—“মা’র পেটে পাঁচটা ভাই পাঁচ রকম হয়, এক জনের ত্রুটিতে আর এক জনের যদি অন্নের সংস্থান নষ্ট হয়, সে দোষ তা হ’লে নেহাৎ গ্রহবৈগুণ্যের—তুমি স্বচ্ছন্দে ‘সাহেবকে’ বল্‌তে পার—ও ভাই তোমার আশ্রিত নয়, ওর ভাল-মন্দর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে নেই—বাপ-পিতামোর ভিটের এক কোণে ও প’ড়ে আছে, সে আশ্রয় ঘোচাবার সাধ্য তোমারও নেই, আমারও নেই।” উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মা চলিয়া গেলেন। অবনী স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছিল। দেশের কাজে মাতিয়া পর্য্যন্ত সৌখীন আহার সে ত্যাগ করিয়াছিল, সরু চালের ভাত খাইত না, মা-ও জিদ করিতেন না, বুড়ী পিসীমা চাকরদের মোটা চাউলের ভাত অবনীকে বাড়িয়া দিয়া পাতের কাছে বসিয়া অনর্থক হা-হুতাশ করিতেন, মাছের মুড়া, দুধের সর অবনীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য হইলেও ইদানীং সে লোভ সংবরণ করিয়াছিল। এক টুক্‌রা মাছ দিয়াই এক থালা ভাত সে খাইয়া ফেলিত, দুধ-ক্ষীর পাতে পাড়িত না। আজ বাড়ীতে একটি বৃহৎ রুইমাছ ভেট আসিয়াছিল, উহার সংযোগে নানা উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। বৃদ্ধা পিসীমা কাছে বসিয়া তাই অনুরোধ করিতেছিলেন—“আমার মাথা খা অবনী—খানিকটা মুড়ো তোর জন্যে আলাদা ক’রে রেখেছি, খেয়ে দেখ্‌, বড় যত্ন ক’রে রেঁধেছি।” অবনীর জিহ্বা সরস হইয়া উঠিলেও সে সংযত স্বরে কহিল, “এই ত ছ্যাঁচড়া আর কলাইয়ের ডাল দিয়েই একরাশ ভাত ওড়ালাম পিসীমা, আর কেন—জান, পিসীমা, আমাদের দেশের পনেরো আনা লোকের কপালে এক বেলাও পুরোপেট আহার জোটে না, আর আমরা যে ভাতের উপর এত মাছ, মাংস, দুধ, ক্ষীরের শ্রাদ্ধ করি, তার মানে—তাদেরই মুখের ভাগ কেড়ে খাই।”

এতখানি দূরদর্শিতার ও লোভ-সংবরণের পরিচয় দিয়া গর্ব্বোজ্জ্বল হাস্যে অবনীর মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। পিসীমা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—“আঁপন আপন বরাতে সবাই খায়-পরে রে—অমুক পায় না ব’লে তুই হতভাগা কেন নিজের মুখের গ্রাস খোয়াতে যাবি? আপনার আত্মাপুরুষকে শুকিয়ে রাখলে নিজেরই যে অধর্ম্ম হয়।”

অবনী হটিবার পাত্র নহে। আই, এ, পড়িবার সময় ন্যায়ের পাঠ লইয়াছিল, আসন্ন পরীক্ষার সময় দেশমাতৃকার আহ্বানে পরীক্ষার আহ্বান অবহেলা করিয়া পূর্ব্বের ডাকটিতেই সাড়া দিয়াছিল। সে বলিল—“আচ্ছা, পিসীমা, এই যে কাঠফাটা রোদ্দুরে একাদশীর উপোস ক’রে আত্মারামকে তেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ করিয়ে মারো, এর অর্থ কি বল্‌তে পার? এতে তোমাদের আত্মনির্য্যাতন হয় না?”

পিসীমা বালবিধবা। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি জীবনের তিন ভাগ অতিবাহন করিয়াছেন, তাই ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—“এ যে বিধবার ধর্ম্ম বাবা, শাস্তর যে হুকুম দিয়েছে, তাই পালন করছি—আর আমাদের কপালের লেখনও বটে, একে খণ্ডাবার অস্তর আমাদের হাতে নেই।”

মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। অবনী ইচ্ছা করিলে ক্ষুরধার তর্কের মুখে পিসীমা’র যুক্তিগুলিকে খান খান করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু ইঁহাদের অভুক্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া হয় জানিয়া কহিল—“আমরাও ধর্ম্ম পালন করছি, পিসীমা, এতে তোমার দুঃখের কোনও কারণ নেই। কি বল মা?”

মা কহিলেন,—“তা বই কি—যার যখন যা ইচ্ছা হবে, অন্যের ক্ষতি না ক’রে তা করুক, তাতে হানি কি?”

অবনী উঠিয়া পড়িল। ননন্দা ভ্রাতৃজায়ার এ কথায় জলিয়া উঠিয়া কহিলেন—“বউয়ের আস্কারাতে ছেলেটা

এত বেড়ে উঠলো—তুমি জেদাজিদি করলে না খেতে ছেলে পথ পেতো কি?"

অখিল আসিয়া পড়িল। অবনী আর দাঁড়াইল না। পিসীমা শশব্যস্তে পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া অন্নের থালা সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। মা কহিলেন - "দিদি, তুমি ঝি-চাকরদের ভাত দিয়ে আমাদেরও বেড়ে নিয়ে বসো গে; আমি এলাম ব'লে। বড় বেলা হয়েছে, অত দেরী করো না।"

পিসীমা কহিলেন—"আমি সকালে সন্দেশ খেয়েছি, ফল খেয়েছি, তোমার মুখে কিছু রোচে নি, তুমি এসে আগে বসো।"

অখিল কহিল—"যাও না মা, আমার ত এই নিয়ে তিন বার হচ্ছে, তোমরা কাল থেকে উপোস ক'রে কেন যে হাঁ ক'রে আমার জন্যে ব'সে থাক, তা জানি না।"

মা কহিলেন—"এই যাচ্ছি এখুনি—তুমি গিয়ে ভাত বাড়ো দিদি, আমার দেরী হবে না।"

অখিল মাছের মুড়া ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে কহিল, "দেখো মা, বউকে তোমার একটু ধমক দেওয়া উচিত ছিল। স্বচ্ছন্দে স্বদেশী বক্তৃতা শুনতে গিয়ে হাতের চারগাছা চুড়ি খুলে দিয়ে এল! কম ক'রে তার দাম দেড়শো টাকা! আবার কোন্ দিন কোন্ গয়না খুলে দিয়ে আসবে। আজ যদি তুমি না ধমক-টমক কর, এর পর মোটেই মানবে না। আমায় জিজ্ঞেস না করুক, তোমার মত নেওয়া'ত উচিত ছিল।"

মা কহিলেন, "ওর নিজের জিনিষ ও যদি ইচ্ছে ক'রে দিয়ে সুখী হয়, তা'তে আমারও ত কিছু বলা সাজে না, বাবা,—বিশেষ আরও পাঁচ জন মেয়েতে দিয়েছে, ওটা কিছু মন্দ কাযও নয় যে অন্যায় করেছে।"

অখিল ঢোক গিলিয়া কহিল, "তবেই তুমি বৌ-ঝিদের দাবিয়ে রেখেছ! এর পর মানছে না ব'লে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসো না যেন।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "দাবতে গেলে তোরাই আবার উল্টো গাইবি, এম্‌নিতে যা রয়-সয়, সেই ভাল।"

অখিল হাল ছাড়িয়া কহিল, "তোমার আস্কারায় ছেলে, বৌ, মেয়ে সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমার কি! এর পর ভুগবে তুমি-ই।"

মা বুঝিলেন, বধূকে নিজে না আঁটিতে পারিয়া গহনা দানের জন্য তাঁহার নিকট আর্জ্জি পেশ করিয়া জিতিবার মৎলব অখিলের ছিল। তিনি সে কথা আর গ্রাহ্য না করিয়া শুধু কহিলেন, "তুই বাড়ীর বড় ছেলে, তুই যখন ব'য়ে যাস্‌নি, তখন তোর পথ ধরেই সবাই আস্‌বে, মিছে ভাবিস্ কেন?"

অখিল খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "অবনীটাই হচ্ছে রাস্কেল। বৌটাকে বেগড়াচ্ছে শুধু অই। কানে কেবল ফুস্ মন্তর আওড়াবে। দেশ উজাড় হ'তে আর দেরী নেই। দেখছি স্বরাজ হাতে হাতে মিল্‌বে এবার!"

মা উচ্চবাচ্য করিলেন না। অখিল মুখ-হাত ধুইয়া পান লইয়া বধূ শৈলজার ঘরে যাইয়া দেখিল, খোকাখুকী ঘুমাইতেছে, শৈলজা একমনে বসিয়া চরকা কাটিতেছে, অবনী কাছে বসিয়া। দাদাকে দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সে পলায়ন করিল, অখিল খাটের উপর বসিয়া কহিল, "দুপুর রোদ্দুরে ভেনর-ভেনর একটু থামাও, ছেলেরা ঘুমুচ্ছে, আর তুমি কানের কাছে আচ্ছা ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছ! ঘুম হবে কোত্থেকে?"

শৈলজা চরকা ঘূরাণ বন্ধ করিয়া হাসিয়া কহিল, "ছেলেরা এটাকে ঘুম-পাড়ানী গান ব'লে জেনেছে। তোমার কবে সে শুভমতি হবে, জানি না—যে দিন তা হবে, সে দিন আমি সওয়া পাঁচ টাকার হরির লুট দেব।"

অখিল একটা বালিস টানিয়া তাহার উপর কাৎ হইয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে কহিল, "যে দিন ইংরেজ সরকার তোমাদের স্বরাজ declare করবে, সেই দিনই সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমাদের চেলা ব'নে যাব—নইলে আমার পুলিসের চাকরীও থাকবে না—উঁচু পদটদ কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে ত তাও রদ্ হয়ে যাবে।"

শৈলজা উত্তর দিল না, নাটাই ঘূরাইয়া চরকার কাট সূতা জড়াইয়া তুলিতে লাগিল। বার দুই চার সিগারেটে টান দিয়া অখিল ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "তোমার বড়দা'র বোধ হয় রাজগৃহে শীগগিরই নেমন্তন্ন হবে গো—ইচ্ছে হয় ত তার আগে এক দিন এ বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পার। কেন না, সেখানকার খানাপিনা যা' হবে, তা' বিশেষ মুখরোচক হবে না।"

শৈলজা মুখ কালো করিয়া কহিল, "তোমার বাড়ীর এক দিনের কালিয়া-পোলাও দাদার রাজঘরের খাবার

দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে পারবে না, তবে খাবার দিকেই দাদার নজর থাকে না, এ খবর তোমার চাইতে বোধ হয়, আমিই ভাল জানি।"

অতঃপর আজিকার মধ্যাহ্ন অবসর সরস দাম্পত্যপ্রেমালাপে কাটাইবার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয় দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে অখিল দিবানিদ্রার সাধনায় মনোনিবেশ করিল।

২

সে দিন দ্বিপ্রহরের তপ্ত মধ্যাহ্নে হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়া এক পশলা শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য বাতাসে একটু স্নিগ্ধতার আমেজ লাগিয়াছিল, জানালা খুলিয়া দিয়া অবনী একটা বালিসের উপর কাৎ হইয়া শুইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিল, একটা ডাষ্ট বিনের চারি পার্শ্বে গৃহস্থবাড়ীর রাশি রাশি আবর্জ্জনা পড়িয়া সেটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; কতকগুলা এঁটো কলাপাতা এ দিকে সে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; গোটা দুই শীর্ণকায় কুকুর ক্ষুধার তাড়নায় বার বার উহা চাটিতেছিল; অদূরে একটি অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় কুকুর শুইয়া স্তিমিত নেত্রে বুভুক্ষুদের কাঙ্গালবৃত্তি দেখিয়া লেজ নাড়িতেছিল, আর বুঝি বা মনে মনে বলিতেছিল, আমি সমস্তই শেষ করিয়া আসিয়াছি, তোমরা শুধু চাটিয়া মর।

পাশের বাড়ীর এক জন ঝি এই সময় কতকগুলা ভুক্তাবশিষ্ট মাছের কাঁটা ও একরাশি অন্ন ঐ স্থানে ঢালিয়া দিয়া গেল, ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটার চোখ আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল, উহারা খাইতে লাগিল। ও দিকে ঐ স্থূলকায় কুকুরটির আর শুইয়া থাকা পোষাইল না, কাঙ্গালদের উপর কাঙ্গালবৃত্তি চালাইবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল, একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া গভীর গর্জ্জনে ঘেউ ঘেউ করিয়া সে ঘোষণা করিল—'সরিয়া দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।'

ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটা কিন্তু ভয় পাইল না, তবে সবল প্রতিদ্বন্দ্বী উপর-চড়াও হইয়া যখন খাইতে সুরু করিল, তখন কাছে ঘেঁসিতেও পারিল না—দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণস্বরে শুধু প্রতিবাদ করিতে লাগিল। ও দিকে আর একটা ডাষ্ট বিনের কাছে খুব হৃষ্টপুষ্ট এক বলদপুঙ্গব পাত চাটিতেছিল, তাড়িত কুকুর দুইটা উহার মুখের দিকে চাহিয়া বার বার কাতর স্বরে যেন আপনাদের আর্জ্জি পেশ করিতে লাগিল। বলদটি অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার গম্ভীরভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন বিচারক হইয়া আসিতেছে। সে মন্থরগমনে আসিয়া অন্নের স্তূপে নিজের মুখ লাগাইল, তাহার বিপুলকায় ও সুবৃহৎ শৃঙ্গ দুইটির দিকে চাহিয়া বলশালী কুকুরটিও এবার পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। ও দিকে ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটার ভিক্ষাপ্রার্থী করুণ সুরের একটানা জের চলিতেই লাগিল। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করে কে? বলদ-পুঙ্গব পাতাগুলি পর্য্যন্ত চিবাইয়া সব শেষ করিয়া যেমন মন্থরগমনে আসিয়াছিল, তেমনই ভাবেই চলিয়া গেল; যেন বলিয়া গেল, আর বিবাদের দরকার নেই, মূলশুদ্ধ মিটাইয়া দিলাম; দরকার হইলে আবার ডাকিও, এমনই করিয়া সব মিটাইয়া দিব।

অবনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, পাশে শুইয়া সুচারুভূষণ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো রে—হাসিস কেন?"

অবনী উঠিয়া বসিয়া ব্যাপারখানা সব খুলিয়া বলিল, সুচারু হাসিয়া কহিল—"তোর কল্পনাশক্তি মন্দ নয়, ইচ্ছা করলে গুছিয়ে একটু লিখতে টিখতে পারিস।"

অবনী কিছু গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যি সুচারু-দা, আমি কি ভাবছি জানো? এ ঠিক যেন আমাদের দশা, বিদেশীকে আমরা এক সময় ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার জন্য ডেকেছিলাম, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জের আজও চলছে—প্রায় হাজার বছরেও তার শেষ হয়নি।"

সুচারু উত্তর দিল না। অবনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"এবার বোধ হয়, শেষ হয়ে এসেছে, তোমার কি মনে হয়, সুচারু-দা, এ বছরের মধ্যেই স্বরাজলাভ হবে কি না?"

সুচারু গম্ভীরস্বরে কহিল—"আমি তা কেমন ক'রে বল্‌তে পারি, ভাই? ভবিষ্যতের ব্যাপার এখন গভীর অন্ধকারে, আলো না ফুটলে তাকে আবিষ্কার করি কি ক'রে?"

অবনী কহিল "বাঃ, মহাত্মাজী নিজে এই সত্য ঘোষণা করেছেন, এ কি না হয়ে যায়? আচ্ছা সুচারু-দা, তুমি বিশ্বাস কর কি না, তাই বল।"

সুচারু বলিল—"লোকের বিশ্বাসের উপর আমি হাত

দিতে চাই না, নিজে কিন্তু আমি খাঁটি কাযকে যতটা বিশ্বাস করি, অন্য কিছুতে ততটা বিশ্বাস করি না।"

অবনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিল না, কিন্তু সুচারুকে আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। সে সুচারু অপেক্ষা আট নয় বৎসরের ছোট। সুচারু গত বৎসর এম্-এ পাশ করিয়া পাটনা কলেজে প্রফেসারী লইয়াছিল, তাহার পর সব ছাড়িয়া দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে কংগ্রেসের কায লইয়া কাল কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ সকালে মামার বাড়ী দেখা করিতে আসিয়াছে। রাত্রিতেই চলিয়া যাইবে।

অবনী কহিল,—"আচ্ছা সুচারু-দা, এখন তুমি এই কাযেই লেগে থাকবে ত?

সুচারু কহিল—"তাই ত স্থির করেছি।"

অবনী কহিল—"আমায় সঙ্গে নিতে পার, সুচারু-দা? আমাকে নিয়ে বাড়ীতে ভারি গোলমাল চল্‌ছে, বড়দা বড় বিরক্ত হচ্ছেন—আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমন ক'রে পিষে ফেলে সব বিষয়ে তাঁর অনুগত হয়ে চলা—এ আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সুচারু কহিল—"কিন্তু দেশের কাযে যখন নিজেকে উৎসর্গ করবে, তখন ত নিজের অনেকখানি তোমায় দিয়ে ফেলতে হবে; তাতে তোমার স্বাধীনতা যে খর্ব্ব হবে না, তা নয়।"

অবনী উৎসাহভরে কহিল,—"সে কিন্তু অন্য জিনিষ—দাদা চান, আমি শান্ত-শিষ্ট হয়ে পরের গোলামী করি—দেশসেবায় না মাতি, খদ্দরের হাঙ্গামা না করি, পিকেটিংএ না যাই। কেন, সুচারু-দা, আমি কি কিছু অন্যায় কায করছি?"

এই সময়ে চাকর আসিয়া সুচারুকে বাড়ীর মধ্যে আহ্বান করিল। অবনী সুচারুকে লইয়া পিসীমা'র ঘরে আসিল। বৃদ্ধা আহারাদি সারিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। অবনীর মা কাছে বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছিলেন,; সুচারু আসিয়া কাছে বসিয়া এক টুকরা তেঁতুল মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিল—"বাবা রে, কি টক!"

অবনীর মা কহিলেন—"টক্ ত বটেই—কিন্তু অখিলের খোকাখুকীগুলো যেন অমৃত মনে ক'রে খায়, দুধে দাঁতে একটুও টক্ লাগে না। আচার খাবি? এনে দেবো? ছেলেবেলায় যে আচার খেতে ভালবাসতিস।"

সুচারু কহিল—"এখনও বাসি মাসীমা, কিন্তু আর পাই কৈ? মা ম'রে গিয়ে আর কেউ ক'রেও দেয় না, তোমরাও আর খবর রাখ না।"

পিসীমা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ষাট্ ষাট্—মা মরলেও মাসী রয়েছে। তোর ভাবনা কি বাপ! তুই নিজেই উড়ু উড়ু ক'রে বেড়াবি, একবার কি বুড়ো মাসীর খবর নিস্?—মরেছি কি বেঁচে আছি? এতগুলো পাশ করলি—অমন ছশো টাকার চাকরী পেলি, তবু বিয়ে করলি না—আবার এই হুজুগ ক'রে বেড়াচ্ছিস্—ঘরে কোন দায় নেই, মাথার উপর কেউ নেই যে, আটকে রাখবে!"—মাসীমা'র চক্ষুর পাতা অনুযোগের সুরে ভিজিয়া আসিল।

অবনীর মা পাতরবাটিতে করিয়া তিন চার রকম আচার আনিয়া সুচারুর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। সুচারু আস্বাদ লইতে লইতে কহিল—"তোমার দোহাই বড় মাসী, কেঁদো না—কেঁদো না—বিয়ের বয়স যায় নি, এর পর করতেও পারি। একটা কাযে লেগেছি, একটু লেগে প'ড়ে থাক্‌তে দাও। তুমি ত এখানে থাকবার মৌরসী পাট্টা নিয়ে আস নি। তা' যদি আস্‌তে, তা হ'লে এখনই বউ এনে তোমার জিম্মায় চিরকালের জন্যে রেখে নির্ভাবনা হ'তে পারতাম।"

তাহার মাসীমা কহিলেন—"তোর ভাবনা তুই নিজেই ভাববি, তার জন্যে ত পরের খাতির দরকার নেই, বাবা।"

সুচারু কহিল—"এখন যে ভাববার সময় নেই, মাসীমা! অন্য ভাবনা আপাততঃ ঘাড়ে চেপে বসেছে। কি বল মামী?"

মামীমা কহিলেন—"তা সত্যি কথা—এক দিক নিয়েই মেতে থাকা ভাল। নইলে এ কূল ও কূল দুকূলই যায়—তা আর দুদিন থেকে যা না সুচারু, পাঁচ ছ'বচ্ছর পরে ত এ দিক্ মাড়ালি।"

সুচারু কহিল, "না মামীমা, কায ত আছেই, তা ছাড়া অখিলের এই নতুন চাকরী, সে আমায় দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তার শঙ্কার মাত্রা আর বাড়াতে চাই নে, আবার দেখা হবে, ভাবনা কি?"

মাসী কহিলেন, "এই পাঁচ-ছ বচ্ছর পরে দেখা দিলি, আবার এদ্দিন পরে যদি আসিস্, আমাকে আর দেখতেও পাবি নে। কি সন্ন্যেসীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! এখন

কি এই সবের বয়েস রে? থিত্-ভিত্ হয়ে এক ঠাঁই বস—বে থা কর—যে বয়সের যা, তেমনটি না হ'লে মানাবে কেন?"

অবনী কহিল, "উঠে পড়, সুচারু-দা, পিসীমা'র কাছে ক্রমাগত এই ধরণেরই বক্তৃতা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে উঠবে।"

অবনীর মা কহিলেন, "না রে, ভয় পাস্ নি। তুই একা বিয়ে না করলে দেশে ঘরে এমন কিছু আজ অভাব প'ড়ে যাবে না—এখন তোদের কংগ্রেসের কাযের কথা একটু বল দেখি, শুনি।"

ও দিকে ভ্রাতৃজায়ার মন্তব্য শুনিয়া ননন্দার অনুনাসিক স্বরে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইল। তিনি স্বর টানিয়া কহিলেন, "বউ ত যত নষ্টের মূল—ঘরে নিজের এই একটি ছেলেকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে, ছেলে যেন কেমন এক রকম হয়ে যাচ্ছে, তবু চেতনা নেই—আজ যদি দাদা থাকত গো—"

বেগতিক দেখিয়া অবনী আগেই ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া হাঁকিয়া কহিল, "মা, একবার এ দিকে এসে শুনে যাও না—একটা কথা বলব।"

পিসীমা'র অনুযোগ চলিতে লাগিল, অবনীর মা তেঁতুলের ডালি উঠাইয়া সুচারুর সহিত পুত্রের আবেদন শুনিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

৩

মাস ছয় সাত পরে বিহারের কোন একটি ক্ষুদ্র নগরীতে স্থানীয় এক জন অবসরপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর গৃহে সুচারু অতিথি। সঙ্গে অবনী, এক বস্তা খদ্দরের কাপড় ও একটি ম্যাজিক লণ্ঠন। গ্রামে স্বদেশী প্রচারের জন্য তাহার আগমন, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—চারিদিকে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। এক যায়গায় পাঁচ জন লোক একত্র হইয়া কথা বলিলেই রাজ-অতিথি হইতে হইবে, এমনই কড়া আদেশ; আদেশের উপর এক ডুই কাঠি উঁচুতে চলিতেছে দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ—এমনই তাহাদের প্রখর কর্ত্তব্যজ্ঞান।

গৃহস্বামী শৈলেশ্বর হুজুগে মাতিবার লোক নহেন। তাহার উপর তিনি বিশেষ রাজভক্ত; স্বদেশীর ধাক্কা তাঁহাকে এতটুকু টলাইতে পারে নাই। গ্রামে গ্রামে যখন মহাত্মাজীর নামে বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রও সেইরূপ—অবশ্য বড় ছেলে শ্রীকান্ত ছাড়া। শ্রীকান্ত পাটনার কলেজে আইন পড়িতেছিল। সে ছিল আবার সুচারুর সহাধ্যায়ী। সে নিজের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রেও হঠাৎ বিপরীতপথাবলম্বী হইয়া যুগপৎ আত্মীয়-স্বজন সকলেরই হৃদয়ে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু যাহাই হউক, দূরে রাখিলে পাছে সে একবারে আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে, সেই জন্য পিতামাতা আপাততঃ ছেলের কলেজ বন্ধ রাখিয়া তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন এবং ছেলের মনটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিবার জন্য সাগ্রহে একটি সুরূপা তরুণী পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীকান্তেরই আগ্রহাতিশয্যে সুচারু তাহার পিতৃগৃহে অতিথি হইয়াছে। নহিলে এ গৃহে তাহার প্রবেশের সম্ভাবনা সুদুর্লভ। সুচারু সুশিক্ষিত, সুশ্রী, সুস্থকায় যুবক—শৈলেশ্বরের অনেক দিনেরই পরিচিত। তাঁহার শিক্ষিতা কন্যা মীরার জন্য তিনি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। সুচারুকে দেখিয়া তাঁহার চমক হইল। কিন্তু এ সব (ভ্যাগাবণ্ড) ধরণের ছেলের হাতে কন্যা-সমর্পণ অসম্ভব, তবে যদি এ পথ হইতে সে ফিরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে সুদূর-ভবিষ্যতের আশামুখ চাহিয়া ত বসিয়া থাকা চলে না।

সে দিন রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কোন বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ সারিয়া মীরা ও শ্রীকান্ত আসিয়া যখন পিতার বসিবার ঘরে ঢুকিল—দেখিল, শৈলেশ্বর ও তাঁহার এক বন্ধু গল্প করিতেছেন; অবনী ও সুচারু বসিয়া আছে। মীরা ঘরে ঢুকিয়াই সুচারুকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, "আপনি আজ বাঙ্গালীপাড়ায় খদ্দর বেচতে গেছলেন বুঝি—ক'খানা সাড়ী বেচতে পারলেন? শুনলাম, ৩০।৪০ ঘর ঘুরেছিলেন।"

মীরার প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল। সুচারুর কাছে উহা অস্পষ্ট রহিল না, সে শান্ত স্বরে কহিল, "বেচেছি মাত্র খান চার, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য নিরাশ হইনি।"

মীরা হাসিতে হাসিতে উচ্ছলভাবে কহিল, "ধন্য আপনার ধৈর্য্য—একেই বলে অধ্যবসায়!"

শ্রীকান্ত বসিয়া পড়িয়া কহিল, "এখন তোমারই মত সকলের খদ্দর পরলেই চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব, সেই ভয়ে পরতে সাহস করছে না। দিন কতক পরে গা ছিঁড়ে যাওয়া অভ্যাস হ'লেই খদ্দরও সইতে পারবে।"

সুচারু কহিল, "ক্রমেই খদ্দরের উন্নতি হবে জানবেন, এক দিন এ দেশের ঢাকার মস্‌লিন পৃথিবীর সমস্ত সৌখীনদের কাছেই কামনার বস্তু ছিল।"

বন্ধু সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, এখানকার হুজুগগুলো একটু কমাতে পারলে? ব্যাটারা ছাগল, ভেড়া সব বিক্রী ক'রে দেশ উজাড় ক'রে ফেল্‌ছে যে—এর পর শুনছি, মাংসও আর পাওয়া যাবে না। আমার মালী বেটা এই রবিবারে তার সাতটা ছাগল বিক্রী ক'রে ফেল্‌লে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গান্ধী বাবার হুকুম হয়েছে—মাংসও খাবে না, কাযেই ছাগল-ভেড়া আর পুষতে ত হবে না'—হাঃ,—হাঃ! এদের কি ভূতের মত বুদ্ধি!"

দেশবাসীর অজ্ঞতার কথায় শৈলেশ্বরও হাসিয়া উঠিলেন।

মীরা কহিল, "দোলের সময় মনে নেই বাবা—লোকগুলো সকলেই একটা ক'রে নতুন হাঁড়ি কিনলে, যা'তে দেড় সের দু'সের চালের ভাত হয়—ওদের মধ্যে আদেশ হয়েছিল, ঐ নতুন হাঁড়িতে এক পো চাল চাপালেই গান্ধী বাবার বরে সে হাঁড়ি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে—তবে যেন কিছু ছুঁৎ না হয়—কিন্তু এমন ব্যাপার, কা'রও হাঁড়ি ভরলো না। তবু বেটাদের কি বিশ্বাস! বলে নিশ্চয় কিছু ছুঁৎ-টুৎ হয়েছিল—একসঙ্গে কি দেশ শুদ্ধ লোকের নতুন হাঁড়িতে ছুঁৎ লেগে গেল!"

বেশ একটা হাসির সাড়া পড়িয়া গেল। অবনী ও শ্রীকান্তও হাসিতে লাগিল; সুচারুও কষ্টে ঈষৎ হাসিল—সে হাসি কিন্তু বেদনার হাসি—দেশবাসীর অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস অন্যের কাছে বিদ্রূপ উপহাসের রসদ যোগাইলেও তাহার নিকট সে খোরাক মোটেই যোগাইতে পারিল না। তাহাদের অজ্ঞতার দায়িত্ব যে শিক্ষিতদিগেরই, এটুকু বুঝিবার মত শক্তি বিধাতা তাহার চিন্তায় জাগাইয়াছিলেন, তাই সে মুখ নত করিয়া রহিল।

এক পক্ষ হইতে উৎসাহ না পাইলে অন্য পক্ষের হাসি বল, বক্তৃতা বল, টীকা-টিপ্পনী কিছুই তেমন জোর পায় না; সুতরাং মীরাদের সমালোচনাও নিস্তেজ হইয়া আসিল। তাহার পর এ কথা সে কথায় দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির কথা উঠিল। মীরা বলিল, "দেখুন সুচারু বাবু, ইংরাজী শিক্ষার কাছে আমরা যে কত দূর ঋণী, তা' যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌তেন, তা হ'লে অকৃতজ্ঞের মত কখনই অস্বীকার করতে পারতেন না। আজ যে এত স্বরাজ স্বরাজ ক'রে চীৎকার করছেন, এ স্বরাজ চাইবার আকাঙ্ক্ষার মূলেও এই ইংরাজী শিক্ষা—ওরাই আপনাদের দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।"

শ্রীকান্ত কহিল, "আপনাদের ব'লে বলিস্‌ নে, মীরা, বল্‌ আমাদের—তুই কিছু ইংরাজের দেশে জন্মাস্‌ নি।"

সুচারু কহিল, "'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এটা কিন্তু আমাদের দেশে শাস্ত্রকার ইংরাজী সভ্যতার বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই ব'লে গিয়েছেন।"

মীরা কহিল, "তা বলুন! কিন্তু মেনে ত আমরা কতই ব'সে আছি। স্কন্ধে একের পর এক বিদেশীর উপর দেশের ভার তুলে দিয়ে যুগ যুগ ধ'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে রয়েছি, ওরা এসে দিব্য সুশাসনে রেখেছে—নইলে আরও কি দুর্দ্দশা হ'ত, কে জানে। কি বল, বাবা?"

শৈলেশ্বর তামাক টানিতেছিলেন, সাড়া দিলেন না। সুরেনবাবু কহিলেন, "ঠিক বলেছ, মা। এখন ত রামরাজত্ব চলছে। এর আগে দিন-রাত্রি প্রাণ মান ধন কিছু নিয়েই মানুষ কি নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারত? তা'র উপর শত শত কু-প্রথা দেশের বুকে শিকড় গেড়ে ব'সে দেশের কি সর্ব্বনাশই না করছিল!"

সুচারু কহিল, "তা ব'লে যে আমাদের কোন কালেই আর স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাক্‌বে না, এমন প্রশ্ন বা সমস্যা ত উঠতে পারে না—দীর্ঘকাল জড়ের মত কাটিয়েছি ব'লে যে, আর আমাদের বেঁচে ওঠবার দাবী নেই, এমন কথা কি ক'রে স্বীকার করি?"

ইহার উত্তর সহসা কেহ দিলেন না, কেন না, মুখে হাজার প্রতিবাদ করিলেও অন্তরের মধ্যে স্বাধীনতার গৌরবকে স্বীকার করিবার জন্য হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকেই। মীরা কিন্তু তর্কে হার মানিতে চাহিল না; সে সুচারুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী যদি তা'র শয্যার আশ্রয় ছেড়ে নিষেধ-বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে

স্বাধীনতার দাবী জানাতে চায়, তবে সেটাকে রোগীর প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যায়?"

সুচারু উত্তর দিল না, তাহার মন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িতেছিল। দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় নব নব কর্ম্মিবৃন্দের সহায়তায় দেশবাসীর যে পরিচয় সে পাইতেছে, তাহাতে যতটা উচ্ছ্বাসের আভাস সে পাইয়াছে, প্রাণের সাড়া তেমন পায় নাই, আশু ফলের প্রতীক্ষায় দেশবাসী যেন উন্মত্ত উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে—যদি অচিরাৎ এ ফলপ্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে সত্যই ত' কোথায় রহিবে এ বিরাট উদ্দীপনা, এ বিপুল উত্তেজনা? কেবল গভীর অবসাদ মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার মত কি দেশের বুক জুড়িয়া নামিয়া আসিবে না? এ তিমিরাচ্ছাদনীর কল্পনায় সুচারুর মন শুকাইয়া আসিল--তাহার অন্তরাত্মা ত কিছুতেই ইহাকে স্বীকার করিতে চায় না; তবে কি সত্যই দেশের মুক্তি নাই? এমন নৈরাশ্যের বাণী সে শুনিতে প্রস্তুত নয়—লক্ষ কোটি জীবন যাহার দাসত্ব-পণে ব্যয়িত হইয়াছে, আজ ততোধিক জীবন-পণে অবশ্যই তাহার মুক্তি ফিরাইয়া আনা সম্ভব। তবে দুঃখ কিসের, কিসের নৈরাশ্য? সমস্ত জীবন দিয়া সে যেন শুদ্ধ-মনে একান্ত-চিত্তে স্বদেশের মঙ্গল-ব্রতে একনিষ্ঠ সাধকের মত সমগ্র চিন্তা, সমগ্র শক্তি উৎসর্গ করিয়া চলিতে পারে—নিজের জীবনের পক্ষে এই তাহার যথেষ্ট—মৃত্যুর পথে যাইবার সময় সে যেন অমৃত বিশ্বাস পাথেয় লইয়াই যাত্রী হয়—তাহার পর বিরাট ভবিষ্যৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের দেবতা আছেন, দেশে কালে সর্ব্বস্থানে তাঁহার বিচার—তাঁহার অমোঘ বিধান সর্ব্বজয়ী।

৪

রাত্রি দশটার সময় গ্রামবাসীর সমক্ষে সুচারু যখন ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখাইতেছে, তখন পুলিস-জমাদার আসিয়া তাহাকে দারোগার আহ্বান জানাইল। শ্রীকান্ত ও অবনীর উপর কার্য্যভার দিয়া সুচারু বাহিরে আসিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীকে নমস্কার জানাইল।

দারোগা হিন্দুস্থানী—তিনি ইংরাজীতে কহিলেন, "আপনি কাল হ'তে অন্যায়ভাবে রাজ-বিদ্বেষের মন্ত্র প্রচার করছেন, এখনই নিবৃত্ত হউন, আপনাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা আছে, কালই যদি উচিতমত জবাবদিহি না করতে পারেন, তা হ'লে খুব সম্ভব আপনার বিপদ হবে।"

সুচারু জানিত, এ অভ্যর্থনা অবশ্যম্ভাবী। সে কহিল, "একটা জিনিষের অনেক রকম অর্থ করা যায়। আমি পল্লীবাসীদের বিভিন্ন পল্লীর অবস্থা, কৃষির অবস্থা, এই সব শুধু জানাতে চেষ্টা করছিলাম। আপনাদের অভিধানে যে তাহার অর্থে রাজদ্রোহ প্রচার হয়, তা আমার মত মূর্খের জানা ছিল না।"

দারোগা কহিল, "জানা উচিত ছিল। রাজা আমাদের রক্ষক, পালক, দেবতার প্রতিনিধি—দেশের অবস্থা হেনো-তেনো সাত-সতেরো জানতে গিয়ে যদি ঘুণাক্ষরে সেই রাজদেবতার প্রতি আমাদের এতটুকু অশ্রদ্ধা, এতটুকু অবিশ্বাস আসে, তা অপরাধ ভিন্ন আর কিছু না।"

"সে অপরাধ তখন রাজা ও রাজভক্তের কাছে নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয়"—এই কথা বলিয়া সুচারু ভিতরে আসিয়া শ্রীকান্ত ও অবনীকে ম্যাজিক লণ্ঠন তুলিয়া লইতে বলিল। ক্ষুণ্ণ মনে সকলেই ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রাত্রি তখন গভীর, সুচারুর নয়নে নিদ্রা নাই। যে কার্য্যে সে অগ্রসর হয়—তাহাতেই বাধা; কিন্তু এই বাধার সহিত সংগ্রামে পৌরুষের আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে। সে কত কথাই ভাবিতেছিল। এই ত যাত্রার সুরু—এ দুর্গম পথে জয়-যাত্রার অভিসারে তাহাকে যাইতেই হইবে—নিত্য নব নব পথ আবিষ্কার করিয়া চলিবে, পরাজয়ের অপমানকে তবু স্বীকার করিবে না। রক্ত লেখায় যাত্রার পথ চিহ্নিত করিয়া যাইবে—যাহাতে ভবিষ্যৎযাত্রীর পক্ষে সে পথ সুগম হয়, সহজ হয়, তবু সে ফিরিবে না—ফিরিবে না। পাশে শুইয়া অবনীও নিদ্রাহীন নয়নে রাত্রির প্রহর গনিতেছিল। তাহারও মনে নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। সুচারু বহুক্ষণ নিজের চিন্তার মধ্যে তন্ময় থাকিয়া যখন অবনীর জাগ্রতভাব লক্ষ্য করিল, তখন সস্নেহে প্রশ্ন করিল—"কি রে, ঘুমুস্ নি কেন?"

অবনী কহিল—"ঘুম আসছে না।"

আজ সাত মাস পর্য্যন্ত অবনী সুচারুর পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে, মাস দুই সুচারুর সহিত জেল খাটিয়াও আসিয়াছে, নির্য্যাতন কিছু কম সহ্য করে নাই। তাহার

উপর নানা অনিয়মে দেহ শুষ্কপ্রায়। ইদানীং সুচারুর মনে হইতেছিল—অবনী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আগেকার উৎসাহের প্রেরণা আর তাহার মনের মধ্যে নাই। কথাটা মনে হইলেও উহাকে গুছাইয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর সুচারুর ছিল না, এখন নিভৃত অবকাশে তাহা মিলিল, সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "অবনী, তোর শরীরটা ভাল নেই, না রে?"

অবনী কহিল, "আচ্ছা, সুচারু-দা, তোমার কি মনে হয়, বল্‌তে পার? দেশের যা অবস্থা, স্বরাজ আমাদের ভাগ্যে নেই—দেখছ না, দেশব্যাপী কি অন্তর্বিদ্রোহ।"

সুচারু কহিল, "দেখে কি কর্‌বো, ভাই—আমাদের নিজের কায যেন সাধ্যমত করতে পারি, এ ছাড়া আর কি বলি?"

অবনী কহিল, "আমার কিন্তু শৈলেশ্বরবাবুর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। দেশ স্বরাজ পাবার উপযুক্ত হয় নি, এর স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা করা ধৃষ্টতা মাত্র, মহাত্মাজী ভুল বুঝেছেন।"

সুচারু শ্রদ্ধাভরে কহিল, "এ ভুল যেন যুগ যুগ ধ'রে সকল দেশবাসীই বুঝে আর সাধনা করে। যাক, আমি স্বরাজ পাবার জন্যে তেমন ব্যস্ত নই, সাধনার পথে যেন নির্ভয়ে চল্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার জন্ম সার্থক হবে জান্‌ব। এখন তোকে একটা কথা বলি, শোন্। তুই ছেলেমানুষ, তোর শরীরটাও ভেঙ্গে পড়েছে, তোর কিছু দিন মা'র কোলে বিশ্রামের দরকার। তুই বাড়ী ফিরে যা, মামীমাকে আমি চিঠি লিখে দিই, আমার সঙ্গ বড় সৎসঙ্গ নয়, দেখছিস্ না? আবার টিক্‌টিকি পিছনে লাগলে, ছুতো-নাতা ক'রে শ্রীঘরে পাঠাতে কতক্ষণ? তুই সঙ্গে থাক্‌লে তোরও এ দশা ঘটতে পারে, এ শরীরে কিন্তু রাজবাড়ীর আদর তোর সহ্য হবে না।"

অবনী উত্তর দিল না, মনটা তাহার গুমরিয়া উঠিতেছিল। মায়ের কথা অনেক দিন যাবৎ তেমন করিয়া ভাবে নাই, সে মায়ের কোলের ছেলে, বহু দিন যাবৎ বহু অত্যাচার আবদার করিয়া সে মায়ের কোলে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, দাদারা এ জন্য অনেক সময় মা'কে অনুযোগ করিত, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই কিছু কিছু বলিত, মা নীরবে শুনিয়া যাইতেন, দুরন্ত অশান্ত ছেলের আবদার সহিতে তবু কোন দিন তাঁহার শ্রান্তি বা বিরক্তি ছিল না, চিরটাকাল সে মায়ের কোল ছাড়া রাত্রিতে ঘুমায় নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের গলা ধরিয়া না শুইলে তাহার ঘুম হয় নাই, অথচ সে যখন মাকে ছাড়িয়া দেশমাতার সেবার জন্য বাহিরে আসিতে চাহিল, মা নিষেধ করেন নাই, চোখের জল ফেলেন নাই।—কিন্তু—কিন্তু অবনী জানে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, মা কোল পাতিয়া ছেলের ফিরিবার পথ চাহিয়া অশ্রান্তভাবেই বসিয়া আছেন। অবনীর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সুচারুর অবস্থিতি তাহার স্মরণ রহিল না, অবোধ শিশুর মতই সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সুচারু অবনীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টায় বেচারীর লজ্জার মাত্রা বাড়াইবার দুরাশা করিল না। নানা চিন্তার মধ্যে কখন্ সুপ্তির স্নেহস্পর্শে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * * * *

মাস কয়েক পরে মহাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নাই। স্বরাজ-স্বপ্ন বিফল হওয়ায় দেশের মধ্যে হঠাৎ বিপরীত স্রোত বহিতে সুরু হইয়াছে। অবনী শান্তশিষ্টভাবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া দাদার সুবোধ ভাইটির মত সেই পথেরই পথিক হইয়া ভাল করিয়া মাছ-ভাত খাইতেছে। তখন আর অরুচি নাই—বউ-দিদির উপহাস-পরিহাসগুলা পর্য্যন্ত সহজভাবেই পরিপাক করিয়া ফেলে, এমনই তাহার ক্ষুধার উত্তেজনা। আর সুচারু? মাস কয়েক আর একবার শ্রীঘরবাস করিয়া মুক্তিলাভের পর কিছুকাল ভগ্ন স্বাস্থ্যের সংশোধন করিয়া পুরা উদ্যমে আবার নিজের কাযে লাগিয়াছে; দিন, মাস, তারিখের মেয়াদ লইয়া তাহার সাধনা নয়, সুতরাং তাহার মধ্যে না আছে অবসাদ, না আছে আশাভঙ্গের ক্লান্তি। দেশমাতৃকার বেদীর সম্মুখে আরতির প্রদীপের মত সে তাহার নবজাগ্রত যৌবন-জীবন উৎসর্গ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। সে অম্লান দীপশিখার জ্যোতিতে তাই তাহার সম্মুখের পথ আলোকবিভাসিত—পূজার আনন্দ-দীপ্তিতে ললাট তাহার সমুজ্জ্বল, দুই নয়নে প্রীতির অক্ষয় শান্তদ্যুতি। জীবন-মরণের মধ্যে তাহার সেতু সম সন্ধি রচনা করিতেছে পবিত্রতম সাধনার শান্ত গভীরতা।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুর্গম পথের যাত্রী

জোসেফ কুরেট ও ষ্ট্রোভিল নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে কারাগারের একই কক্ষে আবদ্ধ ছিল, এ জন্য তাহারা পরস্পর গল্প করিয়া সময় কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। রুসিয়ার রাজনীতিক কয়েদীদের প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়নের বিরাম না থাকিলেও তাহারা পরস্পর গল্প করিতে পারে, তাহাদের মুখ বন্ধ করা হয় না।

নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ শুনিয়া জোসেফ কুরেটের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের অসাধ্য এবং আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণও তাহা বুঝিতে পারিবেন না। রেবেকা নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে কারারুদ্ধ জোসেফের নিকট যে সংক্ষিপ্ত পত্রখানি পাঠাইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া জোসেফ কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই; দুই এক দিন পরে মন পুনর্ব্বার গভীর বিষাদে ও অবসাদে অভিভূত হইয়াছিল। তাহার হতাশ হৃদয় হইতে সুখ-দুঃখের অনুভূতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ষ্ট্রোভিলের হৃদয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত; কঠোরতম দণ্ডের আদেশ তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাহার মানসিক ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। জোসেফের অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছিল। সে নানা কথায় জোসেফকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিত; তাহাকে বলিত, সাইবেরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই; সে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। দুঃখ-নিশার অবসানে আবার তাহার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। এই সকল কথা শুনিয়া জোসেফের মুখে অবিশ্বাসপূর্ণ বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিত; সে কোন কথা বলিত না।

অবশেষে এক দিন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীগণ সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইল। সাইবেরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে নির্ব্বাসনের জন্য তাহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করা হইল। কুরেট ও ষ্ট্রোভিল যে দলে ছিল, তাহাদিগকে সাইবেরিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ইর্খুটস্কের গবর্ণমেণ্টের সীমায় নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অন্য দুই দলের গন্তব্য স্থল সাইবেরিয়া হইলেও তত দুরে নহে; তাহাদিগের প্রতি সাইবেরিয়ার অন্য দুইটি প্রদেশে নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছিল।

সাইবেরিয়া রুস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল দেশ। এই দেশটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রদেশ তাহার প্রধান নগরের নামানুসারেই পরিচিত। সমগ্র সাইবেরিয়া যে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত, ইর্খুটস্ক তাহাদের অন্যতম। প্রত্যেক প্রদেশ স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন। ইর্খুটস্ক বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই হ্রদ কঠিন তুষাররাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় হ্রদের তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণ এই জমাট বরফের উপর দিয়া পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে; বরফের উপর দিয়াই গাড়ী-বোঝাই পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন গ্রামে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপ কিরূপ দুঃসহ, তাহা আমাদের কল্পনা করিবারও শক্তি নাই। বৃক্ষলতাদিবর্জ্জিত বরফাবৃত বিরাট বিশাল প্রদেশ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বৎসরের যে কয়েক মাস উত্তর মেরু-মণ্ডল হইতে তুষার-শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই কয়েক মাস স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রাণ হাতে করিয়া ঘরের বাহির হয়। এই সময় শীতের প্রকোপ এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, মধ্যাহ্নকালেও কোন রুদ্ধ গৃহের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হইলে, সেই গৃহস্থিত আর্দ্র বায়ু গৃহের বাহিরে আসিবামাত্র তুষারে পরিণত হইয়া মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করে! ইর্খুটস্ক নির্ব্বাসিত কয়েদীদের একটি

আড্ডা। ইহার উত্তরাঞ্চলে যে সকল কয়েদী নির্ব্বাসিত হয়, প্রকৃতির প্রতিকূলতায় তাহারা তিন বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নারীগণের প্রতিও বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শিত হয় না। তাহারা যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহার ভীষণতা ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই পাগল হইয়া যায়; তথাপি তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র করুণা লাভ করিতে পারে না। যাহারা পীড়িত হয়, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নাই। অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় যদি কেহ অবাধ্যতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হয়; কখন কখন অবাধ্যতার জন্য নির্ব্বাসিত অপরাধী কয়েদীদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, তাহার পর তাহাদিগের মৃতদেহ বরফে প্রোথিত করা হয়। যদি কোন নির্ব্বাসিতা নারী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে, সেই সদ্যোজাত শিশুকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। প্রহরিগণের সতর্কতা সত্ত্বেও, অনেক কয়েদী প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিয়াই পলায়ন করে; কিন্তু পলাতকগণের প্রায় কেহই সাইবেরিয়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, পথের কষ্টে, অনাহারে, অথবা নেকড়ের আক্রমণে তাহাদের প্রাণবিয়োগ হয়। গ্রন্থকার এক জন নির্ব্বাসিত নিহিলিষ্ট যুবকের নিকট এই সকল বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলেন। এই যুবকটি পাঁচ বৎসর নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগের পর মঙ্গোলিয়ার পথে সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত দশ সহস্রের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই নিহিলিষ্ট যুবক যে সময় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তখন তাহার বয়স ৩৩ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু দুঃখে, কষ্টে, উৎপীড়নে ও মানসিক উৎকণ্ঠায় তাহার মস্তকের কেশরাশি ও দাড়ি-গোঁফ তুষার-শুভ্র হইয়াছিল এবং দেহ এরূপ জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইত।

জোসেফ কুরেট ও ষ্ট্রোভিল কিরূপ ভীষণ স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন—এই উদ্দেশ্যে এখানে এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল।

নির্ব্বাসিত কয়েদীগণ ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত পথের কষ্ট বুঝিতে পারে নাই, কারণ, এই দীর্ঘ পথের অধিকাংশ রেলে ও কিয়দংশ ষ্টীমারে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে প্রথমে সেণ্টপিটার্সবর্গ (বর্ত্তমান নাম পেট্রোগ্রাড) হইতে রেলপথে মস্কৌ নগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখান হইতে তাহারা রেল-পথেই নিজনি নবগরদে নীত হয়। এই স্থানে রেল-পথের শেষ বলিয়া তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয়; সেই জাহাজ প্রথমে ভল্গা ও পরে ভার্না নদী দিয়া নিজনি নবগরদের সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী পার্ণ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। এই বন্দর হইতে ইউরাল পর্ব্বত-প্রদেশের রেলপথ একাটেরিনবর্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই নগর হইতে সাইবেরিয়ার সীমান্তপ্রদেশের দূরত্ব প্রায় দুই শত মাইল। একাটেরিনবর্গ হইতে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ বর্ত্তমান। এরূপ সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথ অতি বিরল; ইহা তিন সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ। নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগকে একাটেরিনবর্গের রেল-ষ্টেশনে নামাইয়া লইয়া, গরুর গাড়ীর মত স্প্রিং-বিহীন গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে এই শতাব্দী শেষ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত সুদীর্ঘ রাজপথ দিয়া ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ রাজনীতিক অপরাধী সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নিহিলিষ্ট বলিয়া ধৃত এবং রাজবিধানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

সাইবেরীয় সীমায় প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাসিত নরনারীগণ পথের ভীষণতা বুঝিতে পারিল। ইউরাল পর্ব্বতমালা ইউরোপীয় ও এসিয়াটিক রুসিয়ার ভৌগোলিক সীমা। কয়েদীরা এই স্থানে নীত হইলে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইল। এক দল উত্তরাঞ্চলে 'স্তব্ধতা ও মৃত্যুর রাজ্যে' পরিচালিত হইল। দ্বিতীয় দলের গন্তব্য স্থান এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে। তৃতীয় দল—জোসেফ ও ষ্ট্রোভিল যে দলে ছিল, পূর্ব্বমুখে চলিল। এই শেষোক্ত দলের প্রধান পরিচালক কালনকির বৈমাত্র ভাই ওরজেসকি।

ওরজেসকি দীর্ঘকায় বলবান্ যুবক; সে 'বুলডগ'-জাতীয় কুকুরের ন্যায় স্থিরলক্ষ্য, সিংহের ন্যায় সাহসী এবং কালনকি অপেক্ষাও স্বল্পভাষী। তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত গম্ভীর। তাহার স্বাস্থ্য অটুট এবং দেহ ইস্পাতের মত

সুদৃঢ়। বিপদে সে কখন বিচলিত হইত না এবং কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইত না। সে সুশিক্ষিত সৈনিক; কিন্তু তাহাকে যে কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সৈন্যপরিচালন অপেক্ষা কঠিন। তাহার হৃদয়ে দয়ামায়া বা করুণার স্থান ছিল না। নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য সে ষোল জন প্রহরীর কর্ত্তৃত্বভার পাইয়াছিল। প্রহরীরা সকলেই সশস্ত্র, প্রত্যেকের হস্তে সঙ্গীন সহ এক একটি রাইফেল, যে কোন মুহূর্ত্তে গুলী চালাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, এ জন্য প্রত্যেক রাইফেল টোটা-ভরা। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক প্রহরীকে এক একটি ছয়-নলা পিস্তল দেওয়া হইয়াছিল; কারণ, পথে নেকড়ের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল।

জোসেফ কুরেটকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কালনকি ওরজেস্‌কিকে প্রচুর উৎকোচদানে বশীভূত করিয়াছিল, এ সংবাদ জোসেফ জানিতে পারে নাই। যাত্রা আরম্ভ করিয়া জোসেফ ওরজেস্‌কির কঠোর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল এবং ওরজেসকিকে নরপিশাচ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে জোসেফের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কারণ, কাপ্তেনের ব্যবহারে সে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির পরিচয় পাইতেছিল। কিন্তু কাপ্তেন ওরজেস্‌কির নিকট সে বিন্দুমাত্র অনুগ্রহের আশা করে নাই। কয়েদীরা সকলেই অত্যন্ত হতাশ ও বিমর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ষ্ট্রোভিলের ভাব অন্য প্রকার; সে কাতরতা প্রকাশ করা দূরের কথা সঙ্গীদের প্রফুল্ল করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। তাহার স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত; কেহ কেহ তাহাকে পাগল মনে করিত! কিন্তু সেই দলে এরূপ লোক এক জনও ছিল না—যে তাহাকে ভাল না বাসিত। ষ্ট্রোভিল যেন তাহাদের হতাশ জীবনের অবলম্বন।

যখন তাহারা ইউরাল পর্ব্বত অতিক্রম করিল, সেই সময় হইতেই তাহাদের কষ্টের আরম্ভ। তাহাদের সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি চলে—তত দূর শুভ্র তুষাররাশি-সমাচ্ছন্ন নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তর। কোন দিকে জীবনের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। তাহার উপর ডিসেম্বরের অসহ্য শীত। এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া এক সপ্তাহমধ্যে দুই জন কয়েদী পথের কষ্টে ও নিদারুণ শীতে প্রাণত্যাগ করিল। রক্ষীরা তাহাদের মৃতদেহ শকট হইতে পথিপ্রান্তে তুষাররাশির উপর নিক্ষেপ করিবার অব্যবহিত পরেই নেকড়ের দল আসিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইল! নেকড়ের দল সেই পথের চারিদিকে আহারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কেবল প্রহরীদের গুলীর ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করে নাই। দূরে নেকড়ের দল দেখিলেই প্রহরীরা তাহাদিগকে গুলী করিতেছিল।

তাহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, পথের ভীষণতা তাহাদের মনে ততই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। দূর-দূরান্তরে পাইনের অরণ্য বরফে আবৃত হওয়ায়, বৃক্ষগুলি শুভ্র বস্ত্র-মণ্ডিত দীর্ঘাকার প্রেতযূথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল! সেই সকল অরণ্যে ক্ষুধিত নেকড়ের গর্জ্জন যেন নরশোণিত-লোলুপ পিশাচের লুব্ধ হুঙ্কার! সেই নিষ্পত্র পাইনের অরণ্য হইতে দলে দলে নেকড়েকে তাহাদের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, প্রহরীদের ষোলটা রাইফেল এক সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ এক দল নেকড়ের শোণিতে শুভ্র তুষাররাশি রঞ্জিত হইল; নেকড়েগুলার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিল। অন্য নেকড়েগুলা দূরে পলায়ন করিল বটে; কিন্তু কয়েদীর দল প্রায় এক শত গজ সম্মুখে অগ্রসর না হইতেই, পলায়নপর নেকড়েগুলা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া নিহত নেকড়েগুলার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটেই তাহাদের অস্থি ভিন্ন দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। অতি ভীষণ দৃশ্য!

ইহার উপর যে দিন উত্তরদিক্ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, সে দিন পথে অগ্রসর হওয়া তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল! তাহারা প্রান্তরমধ্যে আড্ডা করিয়া, তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের আশ্রয়-স্থানের চতুর্দ্দিকে বরফের প্রাচীর তুলিয়া, তাহার অন্তরালে বাস করিতে বাধ্য হইল এবং শীত-নিবারণের জন্য পাইনের অরণ্য হইতে শুষ্ক তরুশাখা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিল। তাহারা সেই আগুনের উত্তাপে শরীর গরম করিতে লাগিল। এই সময় প্রহরীদের সতর্কতা শিথিল হইত; কারণ, তাহারা জানিত—সেরূপ স্থান হইতে কোন কয়েদী পলায়নের চেষ্টা করিবে না, করিলেও অধিক দূর যাইতে পারিবে না। নেকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেও শীতে ও অনাহারে তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।

এই পথে কয়েদীদিগকে জমাট গোমাংস, কদর্য্য রুটীর টুকরা ও চা খাইতে দেওয়া হইত। বাজরীর রুটী। লম্বা লম্বা শুক্‌নো রুটী কাঠের চেলার মত আঁটি বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইত এবং ভোজনকালে তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইত।

এইভাবে কয়েদীরা সাইবেরিয়ার অভ্যন্তরে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের আতঙ্ক ও হতাশভাব ততই বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনেকেরই মনে হইল, যদি তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এইরূপ কষ্টভোগ করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে হইত না।

অনেক কয়েদী নির্ব্বাসিত জীবনের দুঃসহ কষ্ট অপেক্ষা মৃত্যুই প্রার্থনীয় মনে করিত। ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ কুরেটকে লইয়া যে দল সাইবেরিয়ায় যাইতেছিল—সেই দলে এক জন রুসীয় কয়েদী ছিল; তাহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহারও নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সাইবেরিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া তাহার উদ্বেগ ও আতঙ্ক এরূপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। এক দিন রাত্রিকালে প্রহরীরা শীতের প্রকোপে তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না পারায়, তুষারাবৃত একটি পাইন অরণ্যের অদূরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সদলে বহ্নিসেবনে প্রবৃত্ত হইল। প্রহরীদিগকে অসতর্ক দেখিয়া সেই কয়েদীটা হঠাৎ উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে অরণ্যের দিকে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না, ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল নরশোণিতের আঘ্রাণ পাইয়া শিকারের লোভে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা হতভাগ্য পলাতককে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য না থাকিলে সে নেকড়ে কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে—ইহা জানিয়াও রাত্রিকালে ঐ ভাবে পলায়ন করিত না।

এই শোচনীয় কাণ্ডের পর অন্যান্য কয়েদীরা তাহাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিয়া অধিকতর ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইল; কিন্তু ষ্ট্রোভিল সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার! সে নানা কথায় তাহাদের আতঙ্ক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। এই দুর্গম পথে সপ্তাহের পর সপ্তাহকাল দুঃসহ কষ্টভোগের পর কয়েদীর দল টোমস্ক নগরে উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে তাহারা লোকালয় দেখিতে পাইল।

টোমস্ক নগরের এক প্রান্তে একটি পুরাতন ‘ফাঁড়ি’ ছিল, তাহা প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কয়েদীদিগকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া প্রহরীরা আহারামোদে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিল। এখানে তাহারা দুই দিন বিশ্রামের অনুমতি পাইয়াছিল।

ফাঁড়ির প্রশস্ত ‘হলে’ সকল কয়েদীকে একত্র বাস করিতে দেওয়া হইল। সেই ঘরে শীতের প্রকোপ-হ্রাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না; ভিতরের দেওয়ালে কাঠের আবরণও ছিল না। ঘরের মেঝেতে তিন ফুট উচ্চ কাঠের পাটাতন, তাহার উপর কতকগুলা দুর্গন্ধময় নোংরা বিচালী প্রসারিত ছিল; কয়েদীগণকে সেই অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিতে হইল। শীত-নিবারণের জন্য লেপের পরিবর্ত্তে তাহারা কয়েকখানি মেষচর্ম্ম পাইল। তাহার দুর্গন্ধে সকলেরই বমনোদ্রেক হইল। সেগুলি যে কত কাল হইতে এই শ্রেণীর কয়েদীদের শীতবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছিল—তাহার ইতিহাস কেহই জানিত না। এই কক্ষের ছাদের নিকট একটি গোলাকার বাতায়ন ছিল, ঘরের মেঝে হইতে তাহার দূরত্ব ২০ ফিট। ঘরের দেওয়ালে লৌহ-নির্ম্মিত একটি ‘ব্র্যাকেটে’ একটি মাটীর গ্লাস সংস্থাপিত ছিল; মেষের চর্ব্বি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর একটি মোটা পল্‌তে বসাইয়া রাত্রিকালে তাহাই দীপরূপে ব্যবহৃত হইল। এই অপরূপ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইলে তাহা হইতে যে পরিমাণ আলোক নিঃসৃত হইত, তাহার দশ গুণ ধূম উদ্গত হইয়া সেই কক্ষে দৃশ্যমান অন্ধকারের সৃষ্টি করিত। মহাকবি মিল্টন-বর্ণিত নরকান্ধকারের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে! মেষের পচা কাঁচা চর্ব্বি অগ্নিসংযোগে যে সৌরভ উৎপাদন করিত, ধাপার মাঠ হইতে সংগৃহীত ও ক্যানেস্তারায় সংরক্ষিত ‘ঘৃত’ নামক পদার্থ লুচি ভাজিবার জন্য জালে চড়াইলে সেই প্রকার সৌরভই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে।

কয়েদীরা সেই নরকতুল্য কক্ষে শয়ন করিয়া নিমীলিতনেত্রে ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় এক জন প্রহরী নিঃশব্দে জোসেফ কুরেটের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

জোসেফ ও ষ্ট্রোভিল একখানি মেষচর্ম্মে দেহদ্বয় আবৃত করিয়া পাশাপাশি বিচালীর উপর শায়িত ছিল।—জোসেফ প্রহরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ষ্ট্রোভিলকে জার্ম্মাণ ভাষায় বলিল, "প্রহরীটা আমাকে উহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। উহার উদ্দেশ্য কি ?"—জোসেফের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হইল।

ষ্ট্রোভিল বলিল, "উহার মতলব আমিও বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু আমরা কয়েদী, উহারা যে আদেশ করিবে, আমাদিগকে তাহা পালন করিতেই হইবে। উঠিয়া উহার সঙ্গে যাও।"

প্রহরী কসাক সৈন্য। জোসেফ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে সেই কসাক প্রহরীর অনুসরণ করিল। এই কসাকটার বেশ-ভূষা দেখিয়া জোসেফের মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান। তাহার দেহে মেষচর্ম্মের পরিচ্ছদ। অমার্জ্জিত গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত 'বুটে' পদদ্বয় আবৃত। হস্তে সুদীর্ঘ রাইফেল, কোমরবন্ধে একটি পিস্তল আবদ্ধ ; এতদ্ভিন্ন কোমরবন্ধের দুই পাশে দুইখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা ঝুলিতেছিল, প্রত্যেক ছোরা আড়াই ফুট দীর্ঘ !

জোসেফ সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে বলিল, "আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইবে ?"

প্রহরী রুক্ষস্বরে বলিল, "মুখ বুজিয়া আমার সঙ্গে চল। কয়েদীর কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। আমি হুকুম তামিল করিতে আসিয়াছি।"

জোসেফ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না ; সে ত সকল আশা বিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, তবে আর বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া ফল কি ? সে একবার মনে করিল—ইচ্ছা করিলে সে ত মুহূর্ত্তমধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে ; পলায়নের চেষ্টা করিলে কসাকটা তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া মারিবে ; পলায়নের চেষ্টা না করিয়া পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলে কসাকটা ছোরার এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিবে ; তাহা হইলেই ত তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। আশাহীন, সুখহীন, শান্তিহীন ব্যর্থ জীবনের ভার বহম করিবার প্রয়োজন কি ? জোসেফ তখনই মরিতে পারিত, কিন্তু প্রহরীটা কি উদ্দেশ্যে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য জোসেফের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। সে মন সংযত করিয়া প্রহরীর অনুসরণ করিল।

প্রহরী জোসেফকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে আসিল। দ্বার রুদ্ধ ছিল ; প্রহরী তাহাতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কয়েদী হাজির।"

মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতর হইতে কে এক জন মোটা গলায় বলিল, "ভিতরে এস।"

জোসেফ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাপ্তেন ওরজেস্‌কির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নূতন আশার অঙ্কুর

জোসেফ ক্রুরেট যে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ লোহার ষ্টোভের আগুনে উত্তপ্ত এবং মেষের চর্ব্বির বাতির আলোকে আলোকিত।

ওরজেস্‌কি ষ্টোভের সম্মুখে বসিয়া ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া ধূমপান করিতেছিল। তাহার পাশে একটি ছোট টেবলের উপর একটা প্রকাণ্ড পেয়ালা, তাহা দুগ্ধবর্জ্জিত চা'য়ে পরিপূর্ণ ; তাহাতে কয়েক খণ্ড লেবু ভাসিতেছিল। চায়ের পেয়ালার পাশে এক বোতল ভডকা—অর্থাৎ রুসিয়াদেশের ধান্যেশ্বরী !

জোসেফকে দেখিয়া ওরজেস্‌কি উঠিয়া দাঁড়াইল ; সে দ্বারপ্রান্তে কসাক প্রহরীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, "প্রহরী, তুমি বাহিরে গিয়া দাঁড়াও।"

প্রহরী ওরজেস্‌কিকে অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইল।

কারারুদ্ধ হইবার পর জোসেফের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার কপালের ও গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, মুখ লাবণ্যহীন হইয়াছিল, চক্ষু দুইটি অবসাদবিজড়িত। কেশগুলি অযত্নে কপালে ও ঘাড়ে লতাইয়া পড়িয়াছিল এবং দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল। নিয়মিতভাবে স্নানের অভাবে সর্ব্বাঙ্গে ময়লা জমিয়াছিল ; তাহার উপর তাহার

বিবর্ণ ছিন্ন পরিচ্ছদে তাহাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইতেছিল।

ওরজেস্‌কি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জোসেফের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রুসিয়ান ?"

জোসেফ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

ওরজেস্‌কি। কোন্ দেশের লোক তুমি ?

জোসেফ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আমার বাড়ী; সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জুরিচে।

ওরজেস্‌কি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু প্রহরীটাকে দেখিতে পাইল না; সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষ্টোভের নিকট সরিয়া গেল। তাহার পর জোসেফকে তাহার কাছে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

জোসেফ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ওরজেস্‌কি তাহাকে মৃদুস্বরে বলিল, "জুরিচে তোমার বাড়ী; তোমার কি সেখানে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা আছে ?"

প্রশ্নটা শুনিয়া জোসেফের মনে হইতে পারিত, নির্ব্বাসিত বন্দীকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিবার জন্যই প্রহরিদলের নিষ্ঠুর অধিনায়ক এই ভাবে রসিকতা করিতেছে; কিন্তু জোসেফ ওরজেস্‌কির কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস পাইল না, বরং তাহার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য ওরজেস্‌কির প্রশ্ন জোসেফের হৃদয়স্পর্শ করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হতাশ হৃদয়ে নবীন আশা অঙ্কুরিত হইল; যেন মৃত দেহে জীবনসঞ্চার হইল! অব্যক্ত আনন্দে ও উৎসাহে তাহার জীর্ণদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; প্রাবৃটের মেঘান্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিশার সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে কনককান্তি উষালোকের সমাগম হইল। তাহার নিস্পন্দপ্রায় বক্ষে শোণিতের প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুর্দ্দিনে সে পরমেশ্বরকেও ভুলিয়া গিয়াছিল, ওরজেস্‌কির এই একটিমাত্র প্রশ্নে হঠাৎ তাহার মনে হইল, পরমেশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি সত্যই করুণাময়। তাঁহার করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

বিপুল চেষ্টায় মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া জোসেফ বলিল, "দেশে ফিরিতে কাহার অনিচ্ছা ? বিশেষতঃ আমার মত নির্ব্বাসিত কয়েদীর ত সে ইচ্ছা হইবেই। জানি না, হতভাগ্য বন্দীকে ডাকিয়া আনিয়া এরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপের কি প্রয়োজন ছিল !"

ওরজেস্‌কি নীরস স্বরে বলিল, "কাহাকেও আমার বিদ্রূপ করিবার অভ্যাস নাই।"—সে গ্লাসে খানিক ভডকা ঢালিয়া গ্লাসটা জোসেফের সম্মুখে ধরিল, বলিল, "ইহা পান করিয়া সুস্থ হও।"

জোসেফ বহুদিন ও রসে বঞ্চিত ছিল, সে ব্যগ্রহস্তে গ্লাসটা টানিয়া লইয়া সেই উগ্র মদিরা এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিল; তাহার পর গ্লাসটা টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "ধন্যবাদ।"

তরল অনলবৎ উগ্র সুরা পান করিবার মুহূর্ত্ত পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল; সে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আলোড়ন অনুভব করিতে লাগিল। জোসেফ বিস্ফারিত নেত্রে ওরজেস্‌কির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওরজেস্‌কি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশ সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে ?"

জোসেফ বলিল, "না। এ দেশে আমি অল্পদিন পূর্ব্বে আসিয়াছি। যদি আমি এই দেশ পরিত্যাগের সুযোগ পাই, তাহা হইলে এই অভিশপ্ত ভূমিতে জীবনে আর কখনও পদার্পণ করিব না।"

ওরজেস্‌কি মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব বেটা সয়তানই ঐ রকম কথা বলিয়া থাকে; তাহাদের কেহ কখন যদি দেশে ফিরিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অভ্যাস-দোষে আবার ফাঁদে পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে!"

জোসেফ ব্যাকুলস্বরে বলিল, "দোহাই তোমার, একটিবার আমাকে এই সুযোগ দান কর; তাহার পর যদি কখন এ দেশের মাটী স্পর্শ করি, তাহা হইলে—আমাকে ধরিয়া জীবন্ত অবস্থায় আমার শরীরের চামড়া ছুলিয়া লইও, আমি আপত্তি করিব না।"

ওরজেস্‌কি বলিল, "তোমার কথা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইতেছে।"

জোসেফ উত্তেজিতভাবে ওরজেস্‌কির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে বলিল, "তবে কি সত্যই আমি পলায়নের সুযোগ পাইব ?"

ওরজেস্‌কি হাত ছাড়াইয়া লইয়া জোসেফকে ধাক্কা

দিয়া বলিল, "সাবধান, মূর্খ! দেখিতেছি, তোমার মাথা বিগ্‌ড়াইয়াছে।"

এই তিরস্কারে জোসেফ সংযত হইয়া বলিল, "না, আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে; তুমি আমার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার, কাপ্তেন!"

ওরজেস্‌কি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "কোন কারণে আমি তোমাকে মুক্তিদান করিব; সেই কারণটি কি, তাহা জানিবার জন্য কখন আগ্রহ প্রকাশ করিও না। তাহা তোমার অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখানেই তুমি পলায়নের সুযোগ পাইবে; কারণ, আমাদের গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলে তোমার উপর আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। বিশেষতঃ, যদি তুমি ভবিষ্যতে কোন উপায়ে ইর্খুটস্ক হইতে পলায়ন করিতে পার, তাহা হইলেও পথের কষ্টে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আজ গভীর রাত্রিতে তুমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তোমাদের ঘর হইতে বাহির হইবে। ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করা হইবে না, কিন্তু দ্বারের বাহিরে ঐ কসাক প্রহরীটা পাহারায় থাকিবে। সে আমার অনুগত লোক হইলেও, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তুমি তাহাকে আক্রমণ করিবে; সে সহজেই তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, তুমি তাহার পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিবে। আঘাতটা সাংঘাতিক না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তবে একটু রক্তপাত হওয়া আবশ্যক। সেই আঘাতে সে মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে। সেই সুযোগে তুমি দক্ষিণদিকে পলায়ন করিবে। কোন নগরে প্রবেশ করিবে না; অরণ্য, প্রান্তর পার হইয়া আল্‌টাই পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে। তাহার পর দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে চলিতে চলিতে তুর্কিস্থানে পৌছিতে পারিবে। তুর্কিস্থানের বোখারা বা সমরকন্দ নগরে তোমার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। পথ সুদীর্ঘ, পথে বিপদেরও আশঙ্কা আছে, যদি তুমি পথশ্রমে কাতর না হও, যদি তোমার সহিষ্ণুতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকে, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। টেবলের উপর কাগজ-মোড়া কয়েকটা 'রুবল' (রুসিয়ার প্রচলিত মুদ্রা) আছে, লইয়া যাও। উহাই তোমার পাথেয়, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে এবং বিবেচনা করিয়া কায করিবে, যেন তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে বিপন্ন হইতে না হয়।"

জোসেফ টেবলের উপর হইতে টাকাগুলি তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু তখনও তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল ব্যাপার সত্য নহে, স্বপ্নমাত্র; স্বপ্নভঙ্গে সে জাগিয়া দেখিবে, ষ্ট্রোভিলের পাশে শায়িত আছে! এই ভাবে সে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা যে আশার অতীত, স্বপ্নেরও অগোচর!

ষ্ট্রোভিলের কথা স্মরণ হইতেই জোসেফ ওরজেস্‌কিকে বলিল, "তুমি কি কারণে আমাকে পলায়নের সুযোগ দান করিবে, তাহা জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না; কিন্তু আমার সঙ্গী, আমার সুখ-দুঃখের বন্ধু ষ্ট্রোভিলকেও আমি সঙ্গে লইতে চাই। সে যদি আমার সঙ্গে পলায়নের সুযোগ লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব না।"

জোসেফের কথায় ওরজেস্‌কি অত্যন্ত বিস্মিত হইল, বোধ হয়, তাহার একটু রাগও হইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ তোমার অসঙ্গত আবদার! তোমার বন্ধুপ্রীতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমি তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি না; ষ্ট্রোভিলকে আমি ছাড়িতে পারিব না। বিপদে পড়িয়া প্রাণ যায়, এখন নিজের পথ দেখ, পরের জন্য ব্যস্ত হইও না।"

জোসেফ দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমি পলায়ন করিব না!"

ওরজেস্‌কি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য সে জীবনবিসর্জ্জনে প্রস্তুত! ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্তে পিশাচ ভিন্ন সকলেই মুগ্ধ হয়, ওরজেস্‌কিও মুগ্ধ হইল। সে কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হউক, তোমরা উভয়ে পলায়ন করিলে আমাকেও বোধ হয় কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। ষ্ট্রোভিলকেও সঙ্গে লইও। এখন তোমার ঘরে যাও। ফাঁড়ির দেউড়ির শিকল খোলা থাকিবে। দেউড়ির পাশে একটা বাণ্ডিল পাইবে, তাহাতে শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার পিস্তলে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি টোটা

থাকিবে। পলায়নের ব্যস্ততায় তাহা লইয়া যাইতে ভুলিও না ; ভুলিলে পথে অনাহারে মরিবে।”

ওরজেস্‌কি দ্বার খুলিতেই কসাক প্রহরী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

ওরজেস্‌কি প্রহরীকে বলিল, “কয়েদীকে উহার বাসের ঘরে লইয়া যাও।”

প্রহরী কাপ্তেনকে অভিবাদন করিয়া জোসেফকে লইয়া চলিল। জোসেফ আড্ডা-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, অন্যান্য কয়েদীদের দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তাহারা পথশ্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। সকলেই মেষচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিল। জোসেফ ট্রোভিলের পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল ; তাহার পর তাহার কানে কানে বলিল, “আজ রাত্রে আমরা দু'জনে পলায়ন করিব। আমরা পলায়নের সুযোগ পাইব। এ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে চাহিও না। তুমি উঠিয়া নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করিবে। প্রহরীর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ; কিন্তু তুমি নির্লিপ্ত থাকিবে, তাহাকে আক্রমণ করিবে না। আমার কথা বুঝিয়াছ ?”

ট্রোভিল কিছুমাত্র বিস্ময় বা উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরে বলিল, “হাঁ, বুঝিয়াছি। ভালই হইবে।”

অতঃপর তাহারা মেষচর্ম্মে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইয়া লইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল ; কিন্তু তাহাদের নিদ্রা হইল না। তাহাদের হৃদয়ে তখন ঝটিকা বহিতেছিল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। অবশেষে জোসেফের মনে হইল, আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না। সে উঠিয়া বসিল এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; কান পাতিয়া নিদ্রিত কয়েদীদের নাসিকা-গর্জ্জনধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। চর্ব্বির বাতি তখন নির্ব্বাণোন্মুখ ; মিটমিট করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কয়েক মিনিট পরে দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

জোসেফ ট্রোভিলের মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, “ঘুমাইয়াছ কি ?”

ট্রোভিল বলিল, “না, জাগিয়াই আছি। সময় হইয়াছে কি ?”

জোসেফ বলিল, “হাঁ, উঠিয়া আমার অনুসরণ কর।”

ট্রোভিল বলিল, “চল ; দু'খানা মেষচর্ম্ম চুরি করিয়া লইয়া যাই, পথে কাযে লাগিবে। যে হাড়ভাঙ্গা শীত !”

তাহারা উভয়ে দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দ্বার খোলা আছে, প্রহরী বাহির হইতে শিকল বন্ধ করে নাই। তাহারা নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। বাহিরে খোলা-বারান্দা ; সেই বারান্দায় একখানি কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া প্রহরীটা ঢুলিতেছিল ; তাহার পাশেই একটা ‘ষ্টোভ’, তাহা না থাকিলে প্রহরীটা শীতে মরিয়া যাইত।

প্রহরী জোসেফকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল ; জোসেফও ওরজেস্‌কির উপদেশ স্মরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রহরী ইচ্ছা করিলে জোসেফকে অবলীলাক্রমে ভূতলশায়ী করিতে পারিত, সাহায্যলাভের জন্য চীৎকারও করিতে পারিত ; কিন্তু সে অতি সহজে জোসেফের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। জোসেফ তাহার পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া, পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিল। কসাকটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফাঁড়ির দেউড়ির পাশে একটা বোঁচ্‌কা পড়িয়াছিল ; জোসেফ তাহা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল, তাহার পর ট্রোভিলকে সঙ্গে লইয়া পথিপ্রান্তবর্ত্তী প্রান্তরে প্রবেশ করিল। মুক্ত প্রান্তরের তুষারশীতল সমীরণ-হিল্লোলে তাহারা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশীথে তাহাদের যে যাত্রার আরম্ভ হইল, তাহার শেষ কোথায় ? অনাহারে অনিদ্রায় শত শত বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অসংখ্য নদ-নদী, অরণ্য, মরু, পর্ব্বত, কান্তার পার হইয়া কোনও দিন তাহারা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিবে, কি পথিমধ্যেই তাহাদের দুর্ব্বহ জীবনের অবসান হইবে— এ চিন্তা তাহাদের মনে স্থান পাইল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নিশীথকালে তাহারা গগনবিহারী উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির আলোকে নির্ভর করিয়া দক্ষিণাভিমুখে

দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তাহারা কোন দিকে কোন জীবিত প্রাণী দেখিতে পাইল না।

তাহারা দুই ঘণ্টাকাল দ্রুতবেগে সুদীর্ঘ প্রান্তর-পথে ধাবিত হইয়া বুঝিতে পারিল, টোমস্ক নগর বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রহরীরা তাহাদের অনুসরণ করে নাই; তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল।

ষ্ট্রোভিল জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, নানাপ্রকার নির্য্যাতনে তাহার দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, তাহার মন পাষাণে পরিণত হইয়াছিল; সুখ-দুঃখের অনুভূতিও বিলুপ্ত হইয়াছিল। কেহ কোনও দিন তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে পায় নাই; মস্তকের উপর উদ্যত বজ্র মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সেই পাষাণহৃদয় ষ্ট্রোভিল, সেই রাত্রিশেষে অকূল সমুদ্রবৎ অসীম শুভ্র তুষারমণ্ডিত প্রান্তরবক্ষে চলিতে চলিতে হঠাৎ জোসেফকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, অশ্রুধারায় তাহাকে প্লাবিত করিতে লাগিল; কি একটা প্রচণ্ড বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মনের ভার লাঘব হইলে ষ্ট্রোভিল আবেগভরে বলিল, "ভাই, বন্ধু, প্রিয়তম! আমি জানি, আমি তোমার স্নেহের, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য; কিন্তু তুমি দেবতা, তোমার অনুগ্রহেই সমাধিগহ্বর হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির হইতে পারিয়াছি। এখন আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন; প্রাণ দিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা করিব,—মরিব, কিন্তু আর ধরা দিব না। বল, আমাদিগকে কত দূর যাইতে হইবে? কোন্ দিকে? কোথায়?"

ষ্ট্রোভিলের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া জোসেফ বলিল, "দক্ষিণ, দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়াই এখন আমাদিগকে সপ্তাহকাল চলিতে হইবে। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। জানি না, কবে আমাদের এই যাত্রার অবসান হইবে?—জানি না, এই সুদীর্ঘ পথের শেষ কোথায়!"

মেষচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পুনর্ব্বার তাহারা সেই তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে নিস্তব্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

শরতে

প্রাবৃটের জাল অপসারি' দূরে—শরৎ এসেছে ফিরে,
আজিকে জীমূত মন্দ্রিছে বৃথা, হারায়ে ফেলেছে নীরে;
সতেজ বিটপীগুলি দাঁড়ায়ে শীর্ষ তুলি
কভু বা নমিয়া শরৎ রাণীরে—অভিনন্দিছে ধীরে।

স্নিগ্ধ-মধুর-শিশু-রৌদ্রের ঝলমল আলোরাশি,
বরষার ঘন-তমোযবনিকা নিমেষে ফেলেছে নাশি',
অম্বুজ দলে দলে ফুটেছে সরসী-জলে
কহ্লার আর কুমুদীর দল—হিল্লোলে মৃদু হাসি'।

ওই দূরে দূরে কাশের ক্ষেত্রে সিত-উত্তরীখানি
কে দিল বিছায়ে?—নিপুণ কাহার পঙ্কজ দুটি পাণি?
শ্যাম-প্রান্তর আজি গলিত-স্বর্ণে সাজি'
সোনার ধানের মঞ্জরী পরি সাজিছে অরণ্যানী!

সোহাগী করবী বিরহিবালার কবরী-শোভার তরে
উঠে বিকশিয়া শত শত ঝাড়ে বিপুল পুলকভরে;
প্রিয় আশে বিরহিণী উন্মনা আমোদিনী
চম্পকে গাঁথে সুচারু মালিকা লাজ-কম্পিত করে।

হিন্দু-বিধবা সম পবিত্রা ক্ষুদ্র শেফালিদল
পড়িছে ঝরিয়া ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ পুঞ্জিত-তরুতল,
শ্যাম-শষ্পের পরে সারা নিশি পড়ে ঝ'রে
শতেক অধীরা ঝরিছে যেমতি বিতরিয়া পরিমল!

উর্দ্ধের ওই সুনীল সায়রে কেবা পাল তুলে যায়?
সিত-উত্তরী দুলায়ে নাবিক ওই ডাকে "আয়—আয়"!
"তাপিত পান্থ যারা ভাঙ নশ্বর 'কারা'
নাই ব্যাধি জরা—এ মধুরাজ্যে বহে আনন্দ বায়!"

বৎসর পরে এ শুভ শরতে মিলিছে আত্ম-জন,
কত দিনব্যাপী বক্ষোবেদনা হ'তেছে বিস্মরণ;
(মম) চিত্ত পাগলপারা অশ্রু—বাঁধন হারা—
অন্ধ কারা মোর উজলিবে কবে আসি অন্তর-ধন?

ঢালিছে ইন্দু রজতের ধারা—ব্যাপ্ত যে চারি ধার,
ওই যে তরুর শীর্ষে - পর্ণে ঝরিছে মুক্তা-হার!
এ মোর ব্যথার গান তুলিল স্বরগে তান?
শিশিরের বেশে তাই কি ঝরিছে বন্ধুর আঁখি-ধার?

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।

মহাজোড়

১

"আরে বাপ রে!—আঁধার রাতিয়ার মত আকাশ হ'তে মেঘ নামছে,—আয় ছুধিয়া, ঘরকে যাই।" মাথার উপরে একবার তাকাইয়া মুনিয়া ছুধিয়ার হাত ধরিয়া টানিল। তাহার পর যে দিকে সোনার বরণ গ্রামের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মহুয়া ও আম্রকুঞ্জের মধ্যে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া তীরের মত ছুট দিল। হু হু বায়ু-তাড়নায় তাহার রুক্ষ অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি উড়িতে লাগিল। ছুধিয়া তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। পশ্চিমে দিক্‌চক্রবালে যেখানে গাঢ়কৃষ্ণ মেঘের রাশি স্তরের পর স্তর ধূমায়মান পাহাড়ের শ্রেণীর সহিত মিশামিশির প্রয়াস পাইতেছিল, সেইখানে সতৃষ্ণ হর্ষ-বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন নিবদ্ধ করিয়া জীর্ণ সেতুর উপর বসিয়া রহিল।

মুনিয়া ছুধিয়ার প্রতিবেশিনী—উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা। উভয়েই কারমাটারের খৃষ্টান মিশনারীদের উপনিবেশে কায করে। সংসারে মুনিয়ার বাপ-মা থাকিলেও ছুধিয়ার কেহ নাই, কেবল ভ্রাতা ছোট্টু ও সে। প্রতিদিন সে যেমন মুনিয়ার সহিত দুই ক্রোশ হাঁটিয়া তাহাদের পাতায় ঢাকা পাখী-ডাকা গ্রাম হইতে কারমাটারে চাকুরী করিতে যায়, আজও তেমনই গিয়াছিল; ফিরিবার পথে জীর্ণ সেতুর উপর বসিয়া তাহারা পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল। মুনিয়া সত্যই ক্লান্ত হইয়াছিল—সে সেতুর উপর বসিয়া হাঁপাইতেছিল। ছুধিয়ার কিন্তু শরীরের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না—সে একমনে একপ্রাণে সমস্ত আগ্রহটুকু দৃষ্টির মধ্যে দিয়া দূরে দিক্‌চক্রবালে মেঘের শ্রেণীর উপর অস্তগমনোন্মুখ তপনদেবের সহস্ররশ্মির বিচিত্র ক্রীড়া দেখিতেছিল। মুনিয়া কখন্ চলিয়া গেল, সে দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না, এমনই তন্ময় হইয়া সে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল!

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আইসে নাই; তখনও সহস্রকিরণের লোহিত-রশ্মি গলিত সুবর্ণের ন্যায় মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া নানা রঙের রেখাপাত করিতেছিল, গোধূলির আলো-আঁধারের ভিতর দিয়া সোনার বরণ সূর্য্য-কিরণ ঝিকিমিকি খেলিতেছিল। মুহূর্ত্তে বহুরূপীর মত বর্ণ-পরিবর্ত্তনে মেঘগুলিকে কখনও পীতাভ, কখনও নীল, কখনও বা মখমলের মত, আবার কখনও বা রক্তজবার মত দেখাইতেছিল।

যত দূর চক্ষু যায়, সেতুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অনন্ত অবিশ্রান্ত তরঙ্গায়িত নিবিড়বিন্যস্ত দূরবিসারী ধান্যক্ষেত্র ও প্রান্তর,—স্তরের পর স্তর, কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, অবিচ্ছিন্ন হরিৎমণ্ডিত, সুন্দর, নয়নাভিরাম!

শ্রাবণের ধারাপাতে ঘাট, মাঠ, ক্ষেত্র, প্রান্তর স্নাত প্লাবিত। কলকল স্বরে ক্ষেত্রপ্রান্তরের জলধারা উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিতেছে, আবার সেই স্তর হইতে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর মত তীরবেগে নিম্নতর স্তরে আপতিত হইতেছে। অবিরাম অশ্রান্ত কলকলধ্বনি—সেই ধ্বনিতে বিশ্বব্যোম ছাইয়া গিয়াছে। উত্তরে ও দক্ষিণে সরল সুন্দর কারমাটারের রাজপথ কখনও উচ্চে উঠিয়া, কখনও নিম্নে নামিয়া করোর ও ছুমকার অভিমুখে ছুটিয়াছে। লোহিতাভ কঙ্কর শ্বেতাভ প্রস্তরখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পথের উপর যেন পুষ্পরাশির মত শোভা পাইতেছে। সে পথের কোথাও শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতেও এতটুকু কর্দ্দমক্লেদ নাই।

ক্রমে মেঘের পশ্চাতে মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, হু হু গর্জ্জনে বায়ু বহিতে লাগিল, দূরে ও নিকটে গাছ-পালা যেন ভূমিতলে মাথা লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রভঞ্জনের ভীম-গর্জ্জন জলকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন এক প্রলয়ের সূচনা করিয়া তুলিল।

ছুধিয়ার লক্ষ্য সেই দিকে ছিল। কিন্তু সে বহির্দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই ভীমকান্ত রূপ উপভোগ করিলেও তাহার মন কোথায় কোন সুদূর অতীতের স্মৃতিক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল; তাহার আচরণে ইহা সহজেই অনুমান

করা যায়। একে পার্ব্বত্য পথ, তাহাতে সন্ধ্যার অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি, সর্ব্বোপরি এখনও অর্দ্ধপথে নদী পার হইতে হইবে,—সে কোন্ সাহসে দুনিয়ার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে?

প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপসাগরে সে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেও মনটিকে কোন এক কল্পনারাজ্যে প্রেরণ করিয়া আপনহারা হইয়া অতীতের একটি দিনের কথা ভাবিতেছিল। সে কি দিন—তাহার ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যহীন জীবনে! সে যে এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই,—তাহার নারী-জীবনের প্রথম প্রভাতে সেই যে সেই এক জন এমনই ভীষণ দুর্য্যোগের দিনে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া মহাজোড়ের উদ্দাম উন্মত্ত খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—আজ 'সে' কোথায়? সেই যে সে দিন সেই এক জন—তাহার পরশে তাহার হৃদয়ের সুপ্ত নারীত্বকে সোনার কাঠির পরশে সুপ্ত রাজকন্যার মত জাগাইয়া তুলিয়াছিল,—এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দাবী করিবে বলিয়া গিয়াছিল, সে ত আজিও ফিরিয়া আইসে নাই! দিনের পর দিন গিয়াছে, সে ত তাহার অপেক্ষায় কার্য্যের সময় অথবা অবসরকালে অনুক্ষণ দিন গণিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ কোথায় সে? সংসারে ভ্রাতার অনুযোগ, প্রতিবাসিনীগণের তাড়না, কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, সে ত ধ্রুবতারার মত তাহারই স্মৃতির আলোকিত পথ ধরিয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। আবার কি সে মহাজোড়ের তটে তেমনই করিয়া গোচারণ করিতে আসিবে না?

মহাজোড়!—কড়-কড় শব্দে অশনি পতিত হইল, ঝম-ঝম রবে বারি বর্ষিত হইল, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। এ দারুণ দুর্য্যোগে মহাজোড় পার হইতে হইবে,—দুখিয়ার দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে সেই ঝড়ঝঞ্ঝার সহিত যুদ্ধ করিয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে মহাজোড়ের দিকে অগ্রসর হইল। নাতিদূরে পশ্চাতে মিশনারী পল্লীর মধ্য হইতে বিপদে বন্ধুর মত প্রীতির অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল। দুখিয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল,—সে তখন কেবল ভাবিতেছিল, কিরূপে এই দুর্য্যোগে মহাজোড় পার হইয়া ঘরে ফিরিবে। যদি মহাজোড়ে ঢল নামে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কয় দিন অতিরিক্ত বারিপাতে শীর্ণকায় উপলগর্ভ মহাজোড় স্ফীতোদর ও মহাশক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর আজিকার এই ধারাপাত,—আশ্চর্য্যই বা কি?

পথ উচ্চ-নীচ হইলেও সরল, দুখিয়া হন্ হন্ করিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া পথাতিক্রম করিতে লাগিল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, শালপত্রের সাঁই সাঁই শব্দ বারিধারাপাতের ভীম গর্জ্জনে মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অকস্মাৎ সেই শব্দকেও ডুবাইয়া দিয়া নদীর জলকল্লোল আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিল। দুখিয়ার বুক দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে সাঁওতালের মেয়ে, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত অথবা জলঝড়ে তাহার ভয় ছিল না, কিন্তু মহাজোড়!—সে স্বতন্ত্র কথা। মহাজোড় 'দেওতা' কি দানা, কখন্ কি মূর্ত্তি ধারণ করে সে,—জঙ্গলের সাঁওতাল তাহা ভালরূপই জানে!

হঠাৎ দুখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল, নাতিদূরে বিদ্যুদালোকে দেখিল, দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! মুহূর্ত্তমাত্র চারি চক্ষুর দেখা, কিন্তু তাহাতেই সে চিনিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই দুখিয়া শুনিল, সেই মূর্ত্তি বলিতেছে, "দুখিয়া, পণ রাখতে এল মুন্নু! আয় আবার তোরে নদী পার করি।" দুখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কেবলমাত্র বলিল, "মুন্নু!" তাহার পর সেই মূর্ত্তি দীর্ঘ বাহু প্রসারণ করিল, দুখিয়া তাহাতে ঢলিয়া পড়িল, তাহার পর আর তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

২

ভীষণ ঝড়ে বুঝি পাতার কুঁড়েখানা উড়িয়া যায়! কিন্তু শালের খুঁটির জান্ শক্ত, তাই এই ঝড়ের দেশে ছোটুর ছোট কুঁড়েখানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোটু পিছনের ঝাঁপখানা আগড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতেছিল, কিন্তু বাহিরের ঝড় ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। ছোটু প্রাণপণে ঝাঁপখানা চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া ডাকিল, "বুদ্ধুদা, ঝটকে আয়।"

বুদ্ধু চৌকীদার তখন পর্ণকুটীরের পাকশালে পশিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছিল, 'দুখিয়া', 'দুখিয়া'। এমন

অনেক দিন হয়, দুখিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইতে কায সারিয়া আসিয়া পাকশালায় পশিয়া আহারের উদ্যোগ করে। আজ ঝড়ে দুখিয়া যে বাহিরে থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত ; সুতরাং সে হয় ত নিঃসাড়ে পাকশালায় পশিয়াছে, অথবা পাকশালার কানাচে বাঁধা হাঁস, মুরগী ও গরু-ছাগলগুলাকে ঝড়বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধু তাই ছোট কুঁড়েখানায় ঢুকিয়া দুখিয়াকে ডাকিতেছিল। কিন্তু ছোট্টুর হাঁক শুনিয়া সে বড় কুঁড়েখানার ভিতর ছুটিয়া গেল। ছোট্টু বলিল, “সামাল দে ঝাঁপটা, শালার হাওয়া, বুদ্ধু দা, উড়িয়ে নে যাচ্ছে।”

উভয়ে কার্য্য সমাধা করিয়া ঝড়ে নির্ব্বাপিত দীপশিখা আবার জ্বালিয়া দিয়া মেঝের উপর মুখোমুখি হইয়া বসিল। বুদ্ধু বলিল, “বাত ঠিক? আর মাহিনার ১৭ দিনে সাদি?”

ছোট্টু বাধা দিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, “আরে থাম্, বুদ্ধ! জল হাওয়া, আঁধার রাতিয়া—দুখিয়া ত ফিরল না, কি হ’ল?”

বুদ্ধু হাসিয়া বলিল, “আরে দূর! না এলো, কি হ’ল? সাঁওতালের বেটী—ডর কি আছে রে? বিষ্টি নামছে, কোথাকে দাঁড়িয়েছে।”

ছোট্টু কিন্তু উহাতে শান্তি পাইল না, বলিল, “না, দেখে আসি : তুই দম ধর হেথা, চটকে আসছি।”

বুদ্ধু কিন্তু ঘরে রহিল না, বাহিরে গিয়া একবার বিশ্ব-প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল ; বলিল, “আরে না, এ বিষ্টিতে সে দাঁড়িয়েছে কুথাকে, ভাবিস না।”

উভয়ে আবার বসিল। বুদ্ধু কোন ভণিতাই না করিয়া বলিল, “আচ্ছা, শুন্ ত ছোট্টু, দুখিয়া দুষমণ শালার নাম না কর্‌ছে ত? শালা মুন্নু পালিয়েছে, ডাকাতী ক’রে পালিয়েছে, সে ত ভালই হয়েছে। দুখিয়ারে দিবি ত? কথা নাড়বি না, ছোট্টু?”

ছোট্টু বলিল, “ভাবিস না!, জান্ নড়চড় হবে, কথা নড়চড় হবে না।”

বুদ্ধু আশ্বস্ত হইল ; কিন্তু তথাপি তাহার বুকের স্পন্দন গেল না, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “আর দুখিয়া?”

ছোট্টু বলিল, “দুখিয়া কি বলবে? তার বি কথা নড়বে না।”

বুদ্ধু আনন্দে এক গাল হাসিয়া বলিল, “ঠিক, ঠিক, দুখিয়া বি কথার মানুষ আছে। দেখ, জমী-জমা যা আছে আমার—সব দুখিয়ার। আর তোরে যা কথা দিয়েছি—রাঙ্গী গাই, কুড়ি মুরগী, দশ ছাগল—”

ছোট্টু কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, “হাঁস কটা দিবি?”

বুদ্ধু বলিল, “ঐটে মাপ করতে হবে,—হাঁস মাঙ্গা।” কিন্তু ছোট্টুর মুখ ভারী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, “আচ্ছা, হাঁস বি দেবো।”

ছোট্টু বলিল, “তা যা হয় দিস।”

বুদ্ধু কিন্তু আবার কম্পিতস্বরে বলিল, “তুই ত বল্‌লি রে, কিন্তু দুখিয়া? ও ত মোদের সাঁওতালের মত না, পাদরীদের সাথে থেকে কেমন হইয়ে গিয়েছে। ঘরে মোর ছাওয়াল রইয়েছে, ঘর করবে ত? বড় ডর লাগে মোর। ডাগর আঁখে যখন আগ ঝাঁকে!”

ছোট্টু হো হো হাসিয়া বলিল, “তুই ত বড় মরদ চৌকীদার রে! দুখিয়ারে ডর? ছোঃ ছোঃ! কোলে পিঠে মানুষ করলুম। কথা দিল যখন, তখন পাহাড় ভেঙ্গে মাথায় পড়লেও কথা নড়বে না। যা।”

বুদ্ধু অতিরিক্ত আনন্দে ছোট্টুর হাত দুইখানা ধরিয়া বলিল, “মহাজোড় তোর ভাল করুক। মনসার কিরে, তোরে পাদরীর ঘরের দুধা খাওয়াব।”

ছোট্টু হাসিয়া বলিল, “দুধা আনবি কি ক’রে? চুরি ক’রে? হাঃ হাঃ! ভাল চৌকীদার আছিস্ তুই!”

বুদ্ধু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, “চুরি? দুখিয়ার লাগে কি না পারি? দুখিয়া মোর কলিজা।”

বলিতে বলিতে বুদ্ধুর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। ছোট্টু এতক্ষণ কথায় মগ্ন ছিল, তাই তত চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু সে আর নিশ্চেষ্ট নীরব রহিল না, ব্যস্তভাবে বলিল, “বুদ্ধু দা, দম ধর, আমি দেখি দুখিয়ারে।”

বুদ্ধু উঠিয়া বাহিরের ঝাঁপ খুলিয়া বলিল, “বা রে, আশমানে চাঁদিয়া ঝক ঝক করছে। হাওয়া মারছে না, জল ঝরছে না। দেখি দুনিয়ার বাড়ী খবর নিয়ে। সাদি ঠিক রইলো, ভাই। দুখিয়ারে ঘরকে না মিললে জানে বাঁচবো না, ছোট্টু।”

বুদ্ধু চলিয়া গেল, ছোট্টু তাহার কথার উত্তরে কেবল

একটি ছোট্ট হাঁ দিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। আশ্চর্য্য, তখন চাঁদের আলোয় চারি দিক কুটিপাটি। এই জলঝড়, এই জ্যোৎস্না, এ পাহাড় অঞ্চলের স্বভাবই এইরূপ! ছোট্টুর পক্ষে এ দৃশ্য নূতন নহে, সুতরাং সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না। তাহার মনটাও সে দিকে ছিল না, সে চঞ্চল-চরণে এক বার ঘর, এক বার বাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশেষতঃ বুদ্ধু চলিয়া যাইবার পর সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার মন নানা অমঙ্গল গাহিতে লাগিল,—যদি ছুখিয়ার কিছু হইয়া থাকে! বাপ রে! ছোট্টু দ্রুতপদে সদর পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তাহার ছুখিয়া—এ মুল্লুকে যাহার মত মেয়ে নাই, যাহার মত মেয়ে আর কখনও জন্মিবে না, জন্মিতে পারে না, সেই ছুখিয়া, শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হারা তাহার ছোট্ট ছুখিয়া—তাহার যদি কোনও বিপদ-আপদ ঘটিয়া থাকে! ছোট্টু দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে ছুট দিল। তাহার ছুখিয়া তাহাকে ভিন্ন সংসারে আর কাহাকেও জানে না, সে যে তাহার মা-বাপ! ছুখিয়া যে কেবল তাহারই কথায় বয়সে বড় বুদ্ধু চৌকীদারকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে—বুদ্ধুর ছেলেটারই বয়স ১০।১১ বৎসর। সে ছুখিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। বুদ্ধুর মত অবস্থাপন্ন সাঁওতাল এ অঞ্চলে নাই। সে সরকারের চৌকীদার, সরকারী বেতন পায়, তদ্ভিন্ন তাহার আয় অনেক প্রকার। তাহার বাড়ীতে যত গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, এত কার বাড়ীতে আছে? তাহার ধানের ক্ষেত আর তরিতরকারীর বাগান যত বড়, এত বড় এক পাদরী-সাহেবদের ছাড়া আর কাহারও নাই। ছুখিয়া সুখে থাকিবে। তাহার মত ছুখিয়াকে কে ভালবাসিবে—আদর-যত্ন করিবে?

কিন্তু একটা ভয় আছে, যদি সেই ছোঁড়াটা ফিরিয়া আইসে! তাহার কালো চেহারার ভিতর দিয়া কি একটা জ্যোতি বাহির হইত, যাহাতে তাহাকে সকলে ভাল না বাসিয়া পারিত না। মাথায় তাহার ছিল টোপরের মত এক রাশ কাল কুচকুচে কোঁকড়ান চুল, ভাসা ভাসা টানা ডাগর ছুটো চোখ,—আর ছিল গায়ে অসুরের মত শক্তি, আর বাঘের মত সাহস। মহাজোড়ের ধারে শালের জঙ্গলে সে গরু চরাইত, জঙ্গলের মধ্যে গরু পথ হারাইলে বাঘের মুখে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিত। তাহার পর যে দিন সে মহাজোড়ের কোল হইতে ছুখিয়াকে তুলিয়া আনিল, সে দিন তাহার দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া ছুখিয়া বলিয়াছিল, সে মুন্নুকে ভালবাসে—ছুখিয়া বাল্যকাল হইতে কোনও কথাই দাদার কাছে লুকায় নাই। ছোট্টুর মুখ গম্ভীর হইয়াছিল। চালচুলা নাই মুন্নুর, সে পরের গরু চরাইয়া উদরান্ন সংস্থান করে। কিন্তু ছুখিয়ার মনের বাসনা ত অসম্পূর্ণ রাখিতে পারে না। তাই সে মনের অনিচ্ছা ও অসন্তোষ চাপিয়াও সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। করোয়ে এক ডাকাইতী হইল, সে ডাকাইতীর সর্দ্দার মুন্নু। মুন্নু গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল, বিবাহের কথাও চাপা পড়িল। কিন্তু যে দিন মুন্নু গ্রাম ত্যাগ করে, সেই দিনও ছুখিয়া তাহার দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়াছিল,—“সে ব’লে গেছে, বছর না ঘুরতেই ফিরে আস্‌বে।”

কিন্তু দিনের পর দিন গিয়াছে, মুন্নুর কোন সংবাদ নাই, যেন এই পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। ছোট্টুও আশ্বস্ত হইল! সে জানিত, তাহার ছুখিয়া যদি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে না পায়, তাহা হইলে তাহার দাদা যাহারই হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকেই বিবাহ করিবে, কোনও আপত্তি করিবে না। তাই ধীরে ধীরে সে তাহার নিকট বুদ্ধুর কথা পাড়িয়াছিল। সে জানিত, বুদ্ধু বর্দ্ধিষ্ণু লোক, বয়স তাহার অধিক হইলেও সে অন্য অকর্ম্মণ্য যুবক সাঁওতাল অপেক্ষা ছুখিয়াকে সুখে রাখিতে পারিবে। ছুখিয়াও বহু দিন মুন্নুর জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া শেষে দাদার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বুদ্ধুর সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছিল। সে জানিত, মুন্নু যখন ফিরিয়া আসিল না, তখন যাহারই সহিত তাহার বিবাহ হউক না, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

ছোট্টুও তাহার মনের কথা জানিত। তাই সে যখন তাহার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইল, তখন সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রাজপথে অগ্রসর হইবার কালে মনের মধ্যে এই অতীত কথা আলোচনা করিতে লাগিল। সে এমনই তন্ময় হইয়া ছুটিতেছিল যে, মাত্র দুই হস্ত দূরে যখন ছুখিয়া তাহাকে ‘দাদা’ বলিয়া ডাকিল, তখন সে চমকিত হইয়া উঠিল। সে এক লম্ফে ছুখিয়ার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে

দুই হাতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইতেই দুখিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সে ফিরে আসলো, দাদা।"

ছোট্টুর শিরে যেন অশনিপাত হইল। সে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কে ফিরে আসলো? মুন্নু?"

দুখিয়া মুখ অবনত করিয়া নীরব রহিল।

ছোট্টুর মুখ গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ, তা, কোথায় দেখলি তারে? জলে ঝড়ে ছিলি কোথায়, দুখিয়া?"

দুখিয়া কোন কথাই গোপন করিল না। ছোট্টু সমস্ত শুনিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে ডাকাত, কোম্পানীর পুলিস তারে দেখলেই ধরবে।"

দুখিয়া বলিল, "না, ধরবে না। তেমন কায সে করে নি। আমারে সব বলেছে।"

ছোট্টু আরও গম্ভীর হইল, বলিল, "তা হ'লে—বুদ্ধু? - কি হবে?"

দুখিয়া তাহার বড় বড় ডাগর চোখ দুইটা ভ্রাতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কথার নড়চড় হবে না, দাদা। চল, ঘরকে যাই।"

দুখিয়া আর দাঁড়াইল না, চঞ্চল চরণবিক্ষেপে কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হইল, ছোট্টু বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাহার অনুসরণ করিল।

৩

শাল ও মহুয়া মহাজোড়ের উচ্চ তটভূমি জঙ্গল করিয়াছিল, সেই জঙ্গলে মুন্নু আবার পূর্ব্বের মত গরু চরাইতে লাগিল, যেন তাহার জীবনের অতীত ইতিহাসে এমন কিছু ঘটে নাই, যাহাতে সে ভীত বা লজ্জিত হইয়া চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবে। গ্রামের লোক তাহার ব্যবহারে বিস্মিত; তাহারা ভাবে, কোম্পানীর পুলিস এখনও তাহাকে ধরে না কেন? গ্রামের চৌকীদারের সহিত তাহার যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তাহাও জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। তথাপি চৌকীদার বুদ্ধু তাহার কোনও অনিষ্ট করে না কেন, এ প্রহেলিকা কেহই বুঝিতে পারিল না। মুন্নু স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতির ছিল,—তাহার অসুরের মত শক্তির কথাও কাহারও অবিদিত ছিল না; সুতরাং কেহ যে সাহস করিয়া তাহাকে এই প্রহেলিকার অর্থ সমাধান করিতে আহ্বান করিবে, এমন লোক এতদঞ্চলে ছিল না। চৌকীদার বুদ্ধুও তাহার বিষয়ে নীরব ছিল। কাযেই ডাকাইত মুন্নুর সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিবার ঔৎসুক্য হইলেও গ্রামবাসীর সেই ঔৎসুক্য নিবারণের কোনও উপায় ছিল না।

তবে কেন যে চৌকীদার বুদ্ধু তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুন্নুকে 'বাগে' পাইয়াও নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল।

এবার মুন্নুর গোধন ও অন্যান্য পশুপক্ষী নিজস্ব,—সে পরের গরু চরাইত না। সে গ্রামে আসিবার পূর্ব্বেই গোপনে বাবুলাল মাড়োয়ারীর সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইয়াছিল,—এ কথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন বড় কেহ জানিত না। বাবুলালের করোরে একখানা মুদীখানার দোকান ছিল; কয়েক বৎসর কারবারে লোকসান হওয়ায় সে দোকানপাট এবং গ্রামের আবাস-কুটীর, জমীজমা ও গৃহপালিত গোধন বিক্রয় করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছিল। মুন্নু যেখানেই থাকুক আর যেরূপেই সন্ধান পাউক, তাহার গ্রামের কুটীর, জমীজমা ও গোধন ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। এ সকল লেখাপড়া মহকুমা দুমকায় সমাহিত হইয়াছিল, সুতরাং গ্রামের লোক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

চৌকীদার বুদ্ধু এ সকল সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিষম মনঃপীড়া দিতে লাগিল—এঁ্যা, ডাকাত মুন্নু জেলে না গিয়া এত টাকার মালিক হইল কিরূপে! সে তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু একা অত বড় দুর্দ্ধর্ষ বলিষ্ঠ যুবককে ধরিতে সাহসী হইল না, বিশেষতঃ তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও ছিল না। সে এক দিন কারমাটারের পুলিস ফাঁড়িতে গিয়া দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিল; কিন্তু সেখানেও কোন ভরসা পাইল না। দারোগা বলিলেন, "মুন্নুর নামে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নাই—পূর্ব্বে যে পরোয়ানা ছিল, তাহা দুমকার হাকিম 'সাহেব' নাকচ করিয়া দিয়াছেন।"

দ্ধ হতাশ হইয়া পড়িল, এই দুষমন লোকটা গ্রামে থাকিতে তাহার আশা-ভরসা থাকিবে না। কেন না, দুখিয়া যে তাহাকে বহু পূর্ব্ব হইতে ভালবাসিত, তাহা সকলেই জানে, সে-ও জানে। বিশেষতঃ এখন তাহার হাতে পয়সা হইয়াছে, তাহাকে গ্রামের লোক ভয় ত করিতই, অধিকন্তু এখন মান্য করে। না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, যত শীঘ্র সম্ভব দুখিয়াকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিতেই হইবে। তবে তাহার পূর্ব্বে একবার মুন্নুর সহিত বোঝাপাড়া করিতে হইবে।

এক দিন সে মহাজোড়ের তটে শালবনে মুন্নুর সহিত সাক্ষাৎ করিল, মুন্নু তখন গরু চরাইতেছিল। সে ঠিক গরু চরাইতেছিল বলা যায় না, কেন না, সে দূরে গরু-ছাগল ছাড়িয়া দিয়া উচ্চ তটভূমে বসিয়া একদৃষ্টে মহাজোড়ের খরস্রোতের দিকে তাকাইয়া ছিল। বুদ্ধু পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "মুন্নু!"

মুন্নু চমকিত হইল না। সে জঙ্গলের মানুষ, চিরদিন জঙ্গলেই কাটাইয়াছে, সুতরাং সে দূর হইতেই বুদ্ধুর পদশব্দ শুনিয়াছিল, চকিতে একবারমাত্র বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়াছিল। সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পশ্চাতে না ফিরিয়াই সে বলিল, "কে বটে, চৌকীদার না? কি চাও?"

বুদ্ধু অগ্রসর হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল; হাসি হাসিমুখে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "ঘরকে ফিরেছ শুনে দেখতে এলাম এক বার। বেশ, বেশ, মুন্নু, ঘর-গরু হ'ল, এবার জরু ঘরকে তোল।"

মুন্নু গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ। তা মোরে ধরলি না চৌকীদার—মুন্নু ফেরার আসামী বটে না?"

বুদ্ধু বলিল, "আরে রাম! তুই মোর গাঁয়ের লোক, তোরে ধরিয়ে দেব? ছো ছো!"

মুন্নু হাসিল, পরে আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "জরুর কথা কি বল্‌ছিলি, চৌকীদার? মোর ত আর জরু হবার নেই। যে ছিল, সে ত তোর ঘরকে যাবে রে। যা, কথা ত হয়ে গেল, ঘরকে যা।" মুন্নু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

এত সহজে এই ব্যাপারের সমাধান হইবে, বুদ্ধু বুঝিতে পারে নাই, সে বিস্মিত হইল, মুন্নুর প্রতি কি জানি কেন একটা অজানা সহানুভূতির স্রোতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, সে ছলছল-নেত্রে মুন্নুর হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, "মুন্নু, ভাই, তোর কিসের দুঃখু? আমি তোরে ভাল জরু আনিয়ে দেব।"

হঠাৎ মুন্নুর শান্ত দুঃখভরা মুখখানা বিজাতীয় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে সজোরে বুদ্ধুর হাত দুখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশী-সমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বুদ্ধুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি মুন্নুর ক্রোধোপশমনের জন্য কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুন্নু তাহাকে কোনও অবসরই না দিয়া ক্রোধ-গম্ভীরস্বরে বলিল, "ঘরকে যা চৌকীদার। তোরে কথা যখন দিয়েছে, তখন সে তার নড়চড় করবে না,—মোরেও তার নড়চড় করতে দেখবি না। যা, ঘরকে যা।"

মুন্নু আর দাঁড়াইল না, জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। বুদ্ধু বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

৪

আজ গ্রামে মনসাপূজা, মহাধুম। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়া সকলেই সামর্থ্যমত মনসাতলায় পূজা দিতে আসিয়াছে। গ্রামে একখানা মুদীর দোকান, উহাই গ্রামের হাট-বাজার, যাহাই বল তাই। উহার পার্শ্বে একখানা চালাঘর গোময় ও কর্দ্দম দিয়া লিপ্ত করা হইয়াছে, এবং উহার মধ্যে পরিষ্কার ধবধপে চন্দ্রাতপতলে মনসার মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মনসা রক্তবসনা, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি উদ্যতফণা ভীষণ কৃষ্ণসর্প। ধূপ-ধুনায় ঠাকুর-ঘর আমোদিত হইয়াছে, করোর হইতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিতেছেন। করোর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, কারমাটার হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে প্রায় ৩ শত ঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ আজ ৭ পুরুষ ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, তাহাদের সংস্রবে সাঁওতালরা বাঙ্গালীর ভাষায়, আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম্মকর্ম্মে কতক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে।

হরিৎ ও পীত বস্ত্রে মণ্ডিতা দুই তিনটি হিন্দুস্থানী মহিলা পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। সাঁওতাল-নারীরা বহুদূরদূরান্তর হইতে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া মনসাদেবীর পূজায় নিবেদন করিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ পূজা দিয়াই চলিয়া যাইতেছে, কেন না, দূরের পথ—রাত্রির অন্ধকারে পথাতিক্রম করা কষ্টকর ও বিপজ্জনক। কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই পূজার ঘরের সম্মুখস্থ পরিষ্কৃত অঙ্গনে চন্দ্রাতপতলে সমবেত হইতেছে, কেন না, সন্ধ্যার পরে মনসার গান হইবে। করোর হইতে মনসার গান-গায়ক বাঙ্গালীর কীর্ত্তন দল আসিয়াছে। এ দিকে সাঁওতাল নরনারীরাও মাদল বাজাইয়া তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ফল কথা, সে দিন আশপাশের কয়খানা গ্রামের লোক মনসাতলায় পূজার আমোদে যোগদান করিয়াছে।

ছোট্টুর শরীরটা ভাল ছিল না, এ জন্য সে বুদ্ধুর সহিত দুখিয়াকে মনসাতলায় গান শুনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, যাইবার পূর্ব্বে বুদ্ধু ছোট্টুকে বলিয়া গিয়াছিল, "ছাওয়াল রইলো ঘরকে, মালোরি, হুঁস নেই। বুড়ী আই, কানে শুনছে না, চোখে দেখছে না, খবর নিস, ছোট্টু।"

ছোট্টু আপন মনে বসিয়া একটা বেতের চুবড়ী বুনিতেছিল ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিল, এমন সময়ে মুন্নু তাহার কুঁড়ে-ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছোট্টুদা, একটা কথা বলবো, শুনবি?" কথাটা বলিয়াই সে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ছোট্টু বিস্মিত হইল, গ্রামে ফিরিবার পর এ যাবৎ মুন্নু তাহার ঘরে পদার্পণ করে নাই। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া ছোট্টু জিজ্ঞাসা করিল, "গান শুনতে যাস নি, মুন্নু?"

মুন্নু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "ভাল লাগে না। যাক, কথা বলি, হয় ত সময় হবে না। গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি শীগ্‌গির। যাবার আগে আমার যা কিছু আছে, দুখিয়ারে দিয়ে যেতে চাই—তার জন্যে লিখাপড়াও ক'রে এনেছি। এই তার কাগজ।"

ছোট্টু এত দিন কখনও মুন্নুর উপর সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তাহার কথায় আনন্দিত হইলেও হৃদয়ে একটা অব্যক্ত ব্যথা পাইল, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, "কেন মুন্নু, ঘর ছেড়ে যাবি কেন? আমরা তোরে ছাড়ব না ত—তোরে ঘর-সংসারী ক'রে—"

মুন্নু বাধা দিয়া বিরক্তির সুরে বলিল, "তুইও মরেছিস, ছোট্টু? আমি দুখিয়ারে তার সাদির যতুক দিচ্ছি, তাতে তোদের কি?"

ছোট্টু তাহার প্রকৃতি জানিত, কাযেই সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "তা তখন দিস। আচ্ছা, বল দিকি কোথাকে ছিলি এদ্দিন, তোরে চৌকীদার ছাড়ান দিলে কেন? এত টাকা পেলি কোথা?"

মুন্নু বলিল, "সে ঢের কথা।"

ছোট্টু বলিল, "তবু শুনি।"

মুন্নু বলিল, "ফুল্লারে জানতিস ত?—ঐ যার ঘরকে ডাকাতি হ'ল? ও শালা পাদরী লোকের খানসামাগিরী করত না? তাই ওর বুকের পাটাটা এত বড় হয়েছিল! এক দিন মহাজোড়ের ধারে সাঁজের আঁধারে দুখিয়ার গায়ে হাত দিল মরবার জন্যে। তাই মহাজোড়ের গায়ে হাত দিয়ে কিরে করলুম দুখিয়ার কাছে, শালা খানসামার লৌ দেখবো!"

ছোট্টুর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?

মুন্নু বলিল, "তার পর এক দিন রাতে শালা খানসামার বাড়ী চড়াও হয়ে টাঙ্গীর চোপ বসিয়ে দিলুম। ভাবলুম, শালা মরেছে, তাই গাঁ ছেড়ে পালালুম,—একবারে হাঁটাপথে সীতারামপুরে। সেই রাতে খানসামার ঘরে ডাকাত পড়লো। আমি তা জানি নি।"

ছোট্টু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ডাকাতী করিস নি?"

মুন্নু বলিল, "না। সীতারামপুরে কয়লার খনিতে কুলীর কায মিল্‌ল। সবসে সেরা কায করতুম, সাহেব ভালবাসত। এক দিন সাহেব মাতাল হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লাগাম ফস্কেছিল, খানায় পড়ছিল, ছুটে গিয়ে ঘোড়া ধ'রে সাহেবকে বাংলায় দিয়ে এলুম। আমার মাথায় আর গায়ে চোট লেগেছিল। সাহেব হাঁসপাতালে মোরে দেখতে আসত। সেরে উঠলে বাংলার জমাদার ক'রে দিলে। এক দিন সাহেব একখানা ছবি দেখালে—তাতে মোর চেহারা, বললে,—'তুই ডাকাতি করেছিলি?'

সাহেবকে সব বল্লুম। সাহেব খোঁজ করলে। পাদরী খানসামা মরে নি, দুমকার হাঁসপাতালে সেরে উঠেছিল, সে সব সত্যি বল্লে। আমার সাহেব তাই দুমকার পুলিস সাহেবকে সব লিখে দিলে। ডাকাতীর নালিশ তাই পুলিস তুলে নিলে। খানসামা মারপিটের নালিশও করলে না। তাই চৌকীদার ছাড়ান দিয়েছে। নইলে —হুঁ!"

ছোট্টু বলিল, "তা যেন হ'ল, কিন্তু টাকা?"

মুন্নু বলিল, "টাকা? সাহেব ভালবাসত, অনেক দিত। তার পর সাদি করতে মুল্লুক চ'লে গেল। যাবার আগে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ গণ্ডা টাকা দিয়ে গেল—আরও কত কি দিয়ে গেল, আমিও ঘরকে এলুম।"

ছোট্টু বলিল, "সেই টাকায় বাবুলালের জমীজমা কিনলি? তা বেশ করেছিস, মুন্নু।"

হঠাৎ মুন্নু দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীত-চকিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও কি ছোট্টুদা, ও কি? আগদেওতা কারে দয়া করল—কার ঘরকে—"

ছোট্টুও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ে দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, নাতিদূরে এক পর্ণশালা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—অগ্নিদেব ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া সেই পল্লী ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ছোট্টু চীৎকার করিয়া উঠিল, "সত্যনাশ হ'ল! আরে বাপ রে, ও যে বুদ্ধুর ঘরের দিক—ঘরে বুড়ী কাণী আয়ী আর মালোরি ছাওয়াল—যাঃ, সব্বনাশ হ'ল!"

মুন্নু ততক্ষণ অগ্নিকাণ্ডের দিক লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুট দিয়াছিল; ছোট্টুর সকল কথা শুনিবারও তাহার অবসর হয় নাই।

ছোট্টু যখন বুদ্ধুর কুটীরের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন দেখিল, পল্লীর দুই তিনখানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, ক্রুদ্ধ বৈশ্বানর রক্তের আস্বাদ পাইয়া দ্বিগুণ তেজে চটচটা রবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বুদ্ধুর ঘরখানিও দাউ দাউ জ্বলিতেছে। পল্লী প্রায় জনশূন্য—সকলেই প্রায় মনসার গান শুনিতে গিয়াছে। যে দুই চারি জন অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য লোক পল্লীতে ছিল, তাহারা অগ্নি-নির্ব্বাণের কোন চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধুর কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাহুতাশ করিতেছে। ছোট্টু জিজ্ঞাসাবাদে জানিল, মুন্নু কাহারও নিষেধ না শুনিয়া, বন্য মহিষের মত গোঁভরে জ্বলন্ত কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ বাহির হইতে পারে নাই। তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই ছোট্টু আতঙ্ক ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল, সেই সপ্তজিহ্ব জাতবেদার লক্‌লক্‌ রসনার মধ্য হইতে উজ্জ্বল আলোকরেখামণ্ডিত হইয়া মুন্নু অসুরের মত অগ্নির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অঙ্কে বালককে ও স্কন্ধে বৃদ্ধাকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সে-ও কুটীরের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, অমনই কুটীরখানি আগুনে শেষ জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল।

* * * *

সংজ্ঞাহীন মুন্নুকে যখন ছোট্টুর কুটীরে আনয়ন করা হইল, তখন আগুন-লাগার কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে ও দলে দলে গ্রামবাসীরা মনসাতলা হইতে পল্লীতে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধু যখন অন্যান্য অনেকের সহিত দুখিয়াকে লইয়া কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন দুখিয়া কোনও দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া গিয়া মুন্নুর বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। সে যখন মুন্নুর অর্দ্ধদগ্ধ দেহ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কচি করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন সে ঘরে কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কেবল এক জন সেখানে অশ্রুশূন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল—সে বুদ্ধু!

৫

আজ গ্রামে মনসাপূজা হইতেও অধিক ধুম—আজ চৌকীদার বুদ্ধু ও ছোট্টুর ভগিনী দুখিয়ার বিবাহ। বুদ্ধু দুই হাতে পয়সা ছড়াইতেছে—কোন আমোদ, কোন পানভোজনের যেন ত্রুটি না হয়। দুই দিন হইতে 'হাঁড়িয়া' চলিতেছে, মহুয়ার 'মধু' আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। দুই দিন হইতে মাদলের বাদ্যে ও নৃত্য-গীতে পল্লী মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সাঁওতাল নর-নারীর যেন অন্য কাম নাই, বিবাহের আমোদে সকলেই গা ঢালিয়া দিয়াছে।

কেবল এক জন নির্জ্জনে আপন পর্ণকুটীরে বসিয়া

আছে—সে মুন্নু। তাহার শরীরের আসুরিক শক্তিই তাহাকে অগ্নিদাহের বিষময় ফল হইতে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছে। আর রক্ষা করিয়াছে বুদ্ধু ও দুখিয়ার অক্লান্ত সেবা। বস্তুতঃ চৌকীদার বুদ্ধু এবার তাহার যে সেবা করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। গ্রামের লোক অবাক্ হইয়া দেখিয়াছে, বুদ্ধু যেন আর পূর্ব্বের সে বুদ্ধু নাই, তাহার সহিত যে কোন কালে মুন্নুর মনোমালিন্য ছিল, এ কথা কেহ মনেও করিতে পারিতেছিল না। মুন্নুর শরীরের দাহজনিত ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল। দুখিয়া বনে জঙ্গলে গিয়া কত রকম লতাপাতা আনিয়া তাহার প্রলেপ লাগাইয়া দিত, সে সব প্রলেপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, সাঁওতাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কথা জানিত না।

মুন্নু আরোগ্যলাভ করিবার পরে দুখিয়াকে তাহার কুটীরে এক দিনও দেখে নাই, তবে চৈতন্যলাভের পরে তাহাকে মাঝে মাঝে যেন অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় তাহার ঘরে চলাফিরা করিতে দেখিয়াছিল। আরোগ্যলাভের পরে সে কেবল শুনিয়াছিল, আর ৭ দিন পরে দুখিয়ার বিবাহ হইবে। সে তখন দুখিয়াকে দান করিবার যৌতুকের কথাটা আবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল।

হঠাৎ কাহার ডাকে সে মুখ তুলিল, দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুদ্ধু। বুদ্ধু যে কখন্ নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

শয্যাগ্রহণের পর এই দুই সপ্তাহে বুদ্ধুর প্রতি মুন্নুর মনের ভাব অনেকটা নরম হইয়াছিল। সে অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিল, "এস, ব'স।" আজ বিবাহের দিন প্রাতে হঠাৎ বুদ্ধু কেন তাহার ঘরে আসিল, এ কথাটা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

বুদ্ধু নিকটে আসিয়া বসিয়া মুন্নুর অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিল, "মুন্নু, কেমন আছিস, ভাই?"

মুন্নু সরিয়া বসিয়া বলিল, "ভাল। তুই যা করেছিস, বুদ্ধু, তোর দেনা শুধতে নারব।"

বুদ্ধু আরও কাছে সরিয়া গিয়া সাগ্রহে বলিল, "সত্যি বলছিস, মুন্নু? তা হ'লে আমি তোর হাতে ধরিয়ে যা বল্‌ব, তা করবি বল্? না হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে।"

মুন্নু বেশী কথার মানুষ ছিল না,তাহার কথায় উচ্ছ্বাসও ছিল না, সে কেবল বলিল, "কি করতে হবে, বল।"

বুদ্ধু সাহস পাইয়া বলিল, "বেশী কিছু না, কেবল আজ আমার সাদিতে যাবি—ঐ দেখ, ঐ তোর মুখখানা কাল হাঁড়ির তলা হইয়ে গেল!"

মুন্নু গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমার এ কাঠের মত পোড়া শরীর নিয়ে সেখানে কি করব? তোরা আমোদ করবি. তার অন্দরে এ ভূতের চেহারা সবাইকে ভয় দেখাবে। হাঃ হাঃ!"

মুন্নুর হাসিতে প্রাণ ছিল না। বুদ্ধু তাহা বুঝিল। সে কাতর কোমল কণ্ঠে বলিল, "না মুন্নু, তোরে যেতেই হবে, সবাই আমোদ করবে, তুই একেলা ঘরে পড়িয়ে থাকবি?"

মুন্নু একটু বিরক্তির সুরে বলিল, "কেন, বুধিয়ারে সব লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তাতেও তোদের মন উঠল না? ছোঃ!"

বুদ্ধু বলিল, "তোরে যেতে দিচ্ছে কে রে? আমিও না, দুখিয়াও না। চল ভাই। তুই না গেলে আমি সাদি করব না, দুখিয়াও করবে না।"

মুন্নু সক্রোধে বলিল, "এ তোদের কি জুলুম রে! আমি যাবেই না।"

বুদ্ধু তাহার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, "এই তুই কি বল্লি রে ভাই—আমার দেনা শুধবি না?"

মুন্নু মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "চল্, তোদের সাদি দেখবো।"

মহাজোড়ের তটে গ্রামের নর-নারী সমবেত হইয়াছে, মাদলের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের মতই অনুমিত হইতেছে। মাদলের বাদ্যের সহিত বহু সাঁওতাল নরনারী তালে তালে নৃত্য করিতেছে—পুরুষরা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তালে তালে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন নারীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে তালে তালে পাদবিক্ষেপ করিয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছে, আবার পুরুষরা পশ্চাদাবর্ত্তন করিলে নারীরা অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ অগ্রগমন ও পশ্চাদাবর্ত্তন অবিরাম চলিতেছে। তাহার সহিত নর-নারীর মিলিত কণ্ঠে "আরে আরে বঁধুয়া, বঁধুয়া, বঁধুয়া রে!" সঙ্গীত কি মিষ্টই শুনাইতেছে!

পল্লীর সকলেই উপস্থিত। এখনই মহাজোড়ে পূজা ও স্নান, তাহার পর বিবাহ। মহাজোড়ের পূজা-স্নান না হইলে বিবাহ হয় না। ছোট্টু ভগিনীকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত ও নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, কেবল বুদ্ধু এখনও বরবেশে উপস্থিত হয় নাই। সাঁওতাল প্রথানুযায়ী ভূতসিদ্ধি ও নাগসিদ্ধির আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আছে, এখনই মহাজোড়ে স্নানের ও মহাজোড়পূজার অনুষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ হইবে। সকলেই আগ্রহের সহিত বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

অকস্মাৎ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বুদ্ধু মুন্নুকে লইয়া নদীতটে উপস্থিত হইল, তাহার অঙ্গে বরের পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল না। মুন্নু এ বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিবে না, এ কথা সকলেই জানিত, তাই মুন্নুকে দেখিয়া সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। একটা কিছু অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিল। মুন্নুকে দেখিবামাত্র ছুধিয়া জড়সড় হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধু কাহাকেও কথা কহিবার অবসর না দিয়া হাসিয়া বলিল—সে হাসিতে কি প্রাণ ছিল?—"এই যে সাদির যোগাড় সব ঠিক হ'ল। খালি বাকী মহাজোড়ের পূজা, দেওতার পূজা। ছুধিয়া! বল ত, ভূত-রাজার সামনে, বল ত নাগ-রাজার সামনে, বল ত এই মহাজোড়ের সামনে, কারে সাদি করতে তোর দিল চাইছে?"

সকলে বিস্ময়ে অবাক্। ছোট্টু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বুদ্ধু তাহাকে বাধা দিয়া নতবদনা আরক্তমুখী ছুধিয়ার দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "বলবি না, সরম লাগছে, না রে! আচ্ছা, মুন্নু, তুই বল ত ভাই, ছুধিয়া কারে চায়? তুই তারে চাস কি না? বল, এই মহাজোড়ের জল ছুঁয়ে।"

মুন্নুও অধোবদনে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন বুদ্ধু দিন পাইয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, "তুইও বলবি না? বেশ, তা হ'লে আমার যা বলবার, শোন্। এই মহাজোড় সাক্ষী, তুই ছুধিয়ারে পেয়ার করিস, তাই জমীজমা, গরু, ছাগল যতুক দিয়েছিস। আমিও ছুধিয়ারে পেয়ার করি, তাই তোরে তার হাতে যতুক দিচ্ছি। নে ছুধিয়া যতুক! ওরে, দে মাদলে ঘা!" বুদ্ধু এই কথা বলিয়া মুন্নুকে এক হস্তে এবং অপর হস্তে ছুধিয়াকে ধরিয়া মহাজোড়ের শীতল ক্রোড়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল এবং উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া মহাজোড়ের খরস্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া অবিকম্পিত ধীরস্বরে বলিল, "মহাজোড় তোদের সুখে রাখুক, তোরা সুখে থাক—আমি দেখব আর সুখ পাব।"

মুন্নুর চোখ দিয়া ঝরঝরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, মহাজোড়ে সেই অপূর্ব্ব বিবাহসভায় কাহারও নয়ন অনার্দ্র রহিল না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সার্থকতা

কুমার ধনীর পূজা-মণ্ডপে
দুর্গা-প্রতিমা গড়ে,
চাহিয়া রয়েছে নিঃস্ব ভক্ত
গণ্ডে অশ্রু ঝরে।

মনে মনে দেয় শত-ধিক্কার
অদৃষ্টে নিজ—কহে বার বার—
এলি নাক শুধু জননী আমার
এ দীনের কুঁড়ে-ঘরে!

সহসা আকাশ-সম্ভবা বাণী
কর্ণে পশিল তার,
স্তম্ভিত হয়ে শুনিল ভক্ত—
নয়নে অশ্রু-ধার।

দেশ-জননীর প্রতিমাটি আজ
গ'ড়ে তোল্ মনোমন্দিরমাঝ,
হেরিবি সেখানে পূর্ণ-বিকাশ
আমারি সে আত্মার!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

সহধর্ম্মিণী

১

হরিনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র বিমলকুমারের সহিত যখন অনুপমার বিবাহ স্থির হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল, সে সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। বৎসরখানিক পূর্ব্বে যে হরিনারায়ণ নগদ ও অলঙ্কারে দশ সহস্র মুদ্রা না পাইলে কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না বলিয়া কোট করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই হরিনারায়ণ আজ শুধু শাঁখা হাতে অনুপমাকে পুত্র-বধূরূপে বরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা! কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই ছেলের বিষম গলদ বার হয়ে পড়েছে, দু'দিন পরে তা জানা যাবে।" কেহ বলিল, "ছেলেটির চরিত্র-দোষ আছে।" কেহ বলিল, "কোন রকম কুৎসিত ব্যাধি আছে।" কেহ বলিল, "শুধু কুৎসিত নয়, মারাত্মক ব্যাধিই আছে।" ক্রমাগত এই ভাবেরই আলোচনা চলিতে লাগিল। এক জন সহৃদয় প্রতিবেশী বলিল, "যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে, মেয়েটি সেই রকম বরাত নিয়ে এসেছে, তাই এমন ঘরে বরে তার বিয়ে হচ্ছে।" এ কথার আর কেহ জবাব দিল না বটে, কিন্তু সকলের মুখই অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল।

যথাসময়ে বিমলকুমারের সহিত অনুপমার বিবাহ হইয়া গেল। বর দেখিয়া অনেকেই হাসিমুখে কানাকানি করিতে লাগিল,—"আগেই বলেছিলাম ত, এই রকম না হয়ে যায়!" বিবাহের পর এক জন দুঃখপ্রকাশচ্ছলে অনুপমার পিতাকে বলিল, "কি করলে ভায়া, একটা ঘাটের মড়া ধ'রে মেয়েটার বিয়ে দিলে। ছেলেটাকে বুঝি একবার চোখেও দেখ নি!" অনুপমার পিতা কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট! কি করব।"

কথাটা অনুপমার জননীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া বলিল, "মা, তুমি অমন ক'রে কাঁদছ কেন?" জননী কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যা সস্নেহে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ শুভ দিন, চোখের জল ফেল্‌তে নেই, মা, এতে যে আমার অমঙ্গল হবে, মা।" জননী শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি অঞ্চলপ্রান্তে চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অনুপমা বলিল, "একটা কিছু দোষ না থাক্‌লে তোমার মেয়েকে ওঁরা নেবেন কেন, মা, আমি ত এমন কিছু সুন্দরীও নই,—চার বছর চেষ্টা ক'রে দেখলে ত মা, শুধু হাতে কেউ কি তোমার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যেতে রাজি হ'ল? এঁরা যে দয়া ক'রে আমায় নিয়েছেন, এই যথেষ্ট নয় কি, মা?"

সম্প্রদান পর্য্যন্ত বিমলের জ্বরটা কোন রকমে চাপা ছিল, কিন্তু বাসরঘরে তাহাকে লইয়া যখন বসান হইল, তখন জ্বরে সে কাঁপিতেছিল, বসিতে আর পারে না, তবুও সে জোর করিয়া বসিয়াছিল। অনুপমা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহারই এক বাল্যসখীকে চুপি চুপি বলিল, "দেখছ না, উনি কি রকম জ্বরে কাঁপছেন, তুমি ভাই সবাইকে এ ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাও, উনি লজ্জায় শুতে পারছেন না, ভারী কষ্ট হচ্ছে ওঁর।" বাল্যসখী তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল,—"অ্যাঁ, এ বলে কি! বিয়ের কনেকে ত এমন কথা কেউ কখনও বল্‌তে শুনি নি। আমাদেরও ত বিয়ে হয়েছে, আমরা বরের সাম্‌নে মুখ তুলেই বস্‌তে পারি নি!" প্রকাশ্যে সে বলিল, "ধন্যি মেয়ে তুমি, ভাই,—" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অনুপমা তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অনুনয়ের

স্বরে বলিল, "আজকে তোমাদের একটা আমোদের দিন, তা আমি জানি, যদি ভগবান্ দিন দেন, আর এক দিন এর শোধ নিও; আজকে ওঁকে রেহাই দাও। একে এই কাহিল শরীর, তার ওপর জর এসেছে, ওঁর সত্যিই ভারী কষ্ট হচ্ছে।" বাল্যসখীটি আর কিছু না বলিয়া অপর সকলকে ডাকিয়া লইয়া বাসরঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার অনুপমা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে, তুমি শোও।"

বিমলের তখন বসিয়া থাকিতে সত্যই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, শুইতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু অনুপমার এই কল্পনাতীত ব্যবহারে ও কথায় সে এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, যন্ত্রণার কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেল এবং অনুপমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

অনুপমা বলিল, "ব'সে রইলে কেন, শোও!"

বিমল নিঃশব্দে শয়ন করিল।

বাহিরে তখনও কৌতূহলী প্রতিবেশীদের দল মজা দেখিবার জন্য জানালার ধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনুপমা তাহা বুঝিয়াও সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। সে স্বামীর শিয়রের আরও নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। জানালার পাশ হইতে চাপা হাসির শব্দ তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, সে তাহার কর্ত্তব্যে অচল অটল হইয়া রহিল।

এক জন আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া বসিল, "নিশ্চয়ই বিয়ের আগে থেকেই দু'জনের ভাবসাব ছিল, না হ'লে কি কখনও এমন হয়? অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, আমাদের তাড়াবার ফন্দী।"

অনুপমার মনে হইল, কথাটা সত্য, ইঁহার সহিত যেন তাহার কত দিনের পরিচয়।

প্রায় শেষরাত্রিতে বিমলের জরটা যখন কম পড়িল, সে চাহিয়া দেখিল, অনুপমা তখনও তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। বিহ্বলকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি সেই অবধি ঠায় ব'সে আছ; শোও নি?"

অনুপমা বলিল, "তোমার এই রকম অবস্থা দেখে আমি শুতে পারি?"

বিমল ক্ষুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমায় তা হ'লে ত ভারী কষ্ট দিয়েছি।"

অনুপমা বলিল, "আমার একটুও কষ্ট হয় নি। তা ছাড়া জর আসা না আসা আর ত তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। আজ থেকে ত তোমার সেবার ভার আমাকেই নিতে হবে, তাই প্রথম দিন থেকেই অভ্যাস ক'রে নেওয়া ভাল। এখন তুমি কি অনেকটা সুস্থ বোধ করছ?"

শুধু ছোট একটি "হ্যাঁ" বলিয়া বিমল চুপ করিল। অনেকগুলি কথা একসঙ্গে আসিয়া তাহার মনের দুয়ারে ঘা দিতে লাগিল। এক বৎসরের উপর ক্রমান্বয়ে জরে ভুগিয়া ভুগিয়া সে একেবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে। দেহের এই অবস্থায়ও সে কেবল পিতা-মাতার আগ্রহাতিশয্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কে এক জন জ্যোতিষী না কি কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পিতাকে বলিয়াছে, ঐ সব-লক্ষণযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে পারিলে তাহার পুত্র নিরাময় হইয়া উঠিবে। প্রথমে পিতা ধনীর গৃহেই পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ রুগ্ন পাত্রের সহিত কোন্ ধনী তাহার কন্যার বিবাহ দিবে? পিতাকে দুই এক যায়গায় অপমানিত হইয়াও ফিরিতে হইল। হতাশ হইয়া তিনি দরিদ্রের কুটীরেই পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা অনুপমার সন্ধান পাইয়া সেই দিনই বিবাহ পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। আজ বিমলের মনে হইল, মরণপথযাত্রী সে কেন এমন কায করিল? কেন সে এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা বহুগুণসম্পন্না নিরপরাধা বালিকার সর্ব্বনাশসাধন করিল? তাহার রোগজীর্ণ অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সে নিশ্বাসের শব্দ অনুপমার অন্তরে আসিয়া বাজিল। ব্যথা চাপিয়া সে বলিল, "জর হয়েছে, সেরে যাবে, তার জন্য ভাবনা কি? এমন কত লোক দু'চার-বছর জরে ভোগে, আবার সেরে উঠে।"

বিমল তেমনই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। খানিক পরে হঠাৎ অনুপমার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ তোমার কথা

শুন্‌বেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, আমি যেন সেরে উঠি। না হ'লে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনুপমা বলিল, "ওগো কেন তুমি ও কথা ভেবে নিজের মনকে কষ্ট দিচ্ছ? দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্মালেও তোমাকে যে আমার পেতেই হবে; তাই ত ভগবান্ তোমার দেহে ব্যাধির সৃষ্টি ক'রে তোমায় পাবার পথ আমার মুক্ত ক'রে দিয়েছেন!"

বিবাহের মন্ত্রের অত্যদ্ভুত শক্তির কথা ভাবিয়া বিমল মোহাবিষ্টের মত পড়িয়া রহিল।

২

তাহার পর মাস ছয় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে জ্বরটা ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইত এবং বিবাহের পর একটা মাস বিমলের জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পর জ্বরটা স্থায়িভাবে বিমলের দেহে জাঁকিয়া বসিল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ কেহই বড় আর বাকী রহিল না, কিন্তু বিষম জ্বর কিছুতেই বাগ মানিতে চাহিল না। রক্তপরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল, জ্বরের কোন কারণই ধরা পড়িল না। এক এক জন চিকিৎসক এক একটি রোগ অনুমান করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে লাগিলেন, এই পর্য্যন্ত, কিন্তু সমস্ত ঔষধকে ব্যর্থ করিয়া জ্বর সমভাবে দেহের উপর বিরাজ করিতে লাগিল। শেষে চিকিৎসকরা একযোগে মত প্রকাশ করিলেন, "ইহা থাইসিসেরই পূর্ব্বলক্ষণ, ঔষধ চলুক, তবে বায়ুপরিবর্ত্তন এখনই করিতে হইবে। ঔষধ ও বায়ু একত্র ক্রিয়া করিলে রোগ উপশম হইতে পারে।" চিকিৎসকরা গোপনে আর একটি পরামর্শ দিয়া গেলেন, স্ত্রীকে যেন কিছুতেই কাছে রাখা না হয়।

সত্বরই সে কথা অনুপমার কর্ণগোচর হইল। অনুপমা শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ডাক্তার-কবিরাজরা যাই বলুন, আমি যাব, মা। আমার স্বামীর ভালমন্দ কিসে হয়, আমি তা যত বুঝব, ডাক্তার কবিরাজরা বাইরের লোক, তাঁরা তার কি বুঝবেন, আমি তাঁদের কথা শুন্‌ব না, মা, আমি যাবই।"

শ্বশ্রূ বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু অনুপমা তাহার সঙ্কল্পে অচল অটল হইয়া রহিল। এখনও যাত্রার দিন তিনেক বাকী, তাই শ্বশ্রূ আপাততঃ আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু যাত্রার দিন অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে যখন তিনি জানাইলেন, অনুপমার যাওয়া হইবে না, তখন অনুপমা কাঁদিয়া কাটিয়া কোন গোল বাধাইল না, বেশ সহজ শান্তভাবে বলিল, "আমায় যে যেতেই হবে, মা।" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "মা, কথাটা খুব শক্ত হবে, কিন্তু আপনারা আমায় বলতে বাধ্য করছেন, মা, ডাক্তার-কবিরাজরা যে অসুখের কথা বলছেন, সে অসুখ যদি সত্যই হয়ে থাকে, তা হ'লে রক্ষার আশা খুবই কম, এ ত জানেন, মা, তখন জেনে শুনে সে কটা দিনই বা কেন সবাই মিলে আমায় স্বামি-সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন!" তাহার কথা শুনিয়া শ্বশ্রূ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

খানিক পরে বিমলকে ধরাধরি করিয়া যখন মোটরের উপর বসাইয়া দেওয়া হইল, অনুপমা ধীরপাদবিক্ষেপে মোটরে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

নূতন যায়গায় যাইবার তিন দিন পরেই বিমলের জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। যখন পনর দিন জ্বর হইল না, বিমলও দেহে একটু বল পাইল, তখন সকলেরই মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সম্মুখে শারদীয়া পূজা, প্রতি বৎসরই খুব ধূমধাম করিয়া মায়ের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু বিমলের জন্য হরিনারায়ণ এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এবার কোন রকমে পূজাটা সারিয়া ফেলিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এইবার পুত্র কতকটা সুস্থ হইয়া উঠায়, তিনি উৎসাহভরে গৃহিণীকে বলিলেন, "আর ক'টা দিন যদি বিমলের এই অবস্থায় কেটে যায়, তা হ'লে আরও ঘটা ক'রে এবার মা'র পূজা করতে হবে, কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত করতেই হবে। সত্যই আমাদের ওপর মা'র যথেষ্ট কৃপা, তাঁর কৃপা না হ'লে কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে আমরা পুত্রবধূরূপে পেতাম! এমন নিশ্চিন্ত হাসিমুখে আর কাউকে কখনও সেবা করতে দেখি নি।"

হরিনারায়ণ উজ্জ্বলমুখে বলিলেন, "বৌমা আমার সতী

লক্ষ্মী বটে! এঁকে ঘরে এনে বাঁধতে না পারলে আমরা বিমলকে ফিরিয়ে পেতাম না।"

তাহার পর আরও চারিটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সে দিন অপরাহ্নে বিমল বাড়ীর সংলগ্ন পরিচ্ছন্ন মাঠের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। অনুপমাও তাহার সঙ্গে ছিল, সে সব সময় স্বামীর কাছে কাছেই থাকিত।

বিমল বলিল, "অনু, তুমি তা হ'লে আমায় এ যাত্রা বাঁচিয়ে তুললে। তোমাকে না পেলে অনেক আগেই আমি চ'লে যেতাম, কেউ ধ'রে রাখতে পার্‌ত না।"

অনুপমা বলিল, "তুমি কি চ'লে যেতে পার! আমি যে সাবিত্রী-ব্রত আরম্ভ করেছি—তা কি কখনও নিষ্ফল হ'তে পারে!"

বিমল হাসিয়া বলিল, "ব্রত করলে যে কোন ফল হয়, এ বিশ্বাস আমার কোন দিন ছিল না, কিন্তু তুমি দেখছি, অনু, আমার অনেক বিশ্বাসই উল্টে দিয়েছ! যাক্, দেখ অনু, পূজোর সময় আমি কখনও বাড়ী-ছাড়া হয়ে থাকি নি, এখনও ত পূজোর মাসখানিক দেরী আছে, তত দিনে আমি ঠিক যেতে পারব, কি বল, অনু?"

অনুপমা উৎসাহভরে বলিল, "খুব পারবে, মা'র পূজোর ক'টা দিন তোমায় বাড়ীতে থাক্‌তেই হবে।"

৩

সেই রাত্রিতেই বিমল আবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল, এত বেশী জ্বর পূর্ব্বে কোন দিন হয় নাই। সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া দিল। স্থানীয় যে প্রবীণ চিকিৎসক প্রতিদিন দুই বেলা আসিয়া বিমলকে দেখিয়া যাইতেন, সংবাদ পাইয়া তিনি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ সে জ্বর নয়, নূতন জ্বর; এর জন্য কিছু ভাববেন না। বোধ হয়, কোন রকম অনিয়ম বা অত্যাচার হয়েছে; যাক্, এখনই ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খাওয়ালেই জ্বরটা যাবে'খন।"

ডাক্তারবাবুর মুখে অনিয়ম-অত্যাচারের কথা শুনিয়া অনুপমা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল এবং তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গেল। ঘৃণায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে যে এক দিন বড় মুখ করিয়া শ্বশ্রূকে বলিয়াছিল—'আমার স্বামীর ভাল-মন্দ কিসে হয়, আমি তা যত বুঝব, ডাক্তার-কবিরাজরা বাইরের লোক, তাঁরা তার কি বুঝবেন?' তাহার সে মুখে এমনই করিয়া কালী পড়িল, এমনই ভাবে তাহার সে দর্প চূর্ণ হইয়া গেল! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে, না হইলে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার সারাদেহ মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ঔষধ সেবন করিয়া বিমলের জ্বরটা সেই দিনই কমিয়া গেল বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িল না। সকলে মনে করিল, দুই তিন দিনের মধ্যে জ্বরটা ছাড়িয়া যাইবে, কিন্তু সপ্তাহখানিক কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না, প্রতিদিনই একটু একটু করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। অনুপমা এত দিন হাসিমুখে স্বামীর সেবা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এইবার তাহার সে মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহারই অপরাধের ফলে তাহার স্বামীর যে এই অবস্থা, এই কথাটি অহরহঃ অতি নিদারুণভাবে তাহার ধিক্কৃত অন্তরকে পীড়ন করিতেছিল এবং তাহাকে কেবলই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, একটা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তাহখানিক মাত্র বাকী। বিমল শয্যা গ্রহণ না করিলেও জ্বরটা সব সময় তাহার দেহে লাগিয়াই থাকিত। সকলেই মনে মনে বুঝিল, ইহা অত্যন্ত মন্দ লক্ষণ। চিকিৎসকরাও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। হরিনারায়ণও কোন রকমে পূজা সারিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনুপমা তাহার শ্বশ্রূর পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "মা, আমি যে সঙ্কল্প করেছি, এবার ঘটা ক'রে মা'র পূজোর আয়োজন করব; পূজোর সময় উনি কোন দিন বাড়ীর বাইরে থাকেন নি, এবারও ওঁকে আমরা বাড়ীর বাইরে রাখব না মা। আপনি বাবাকে বলে আমাদের সবাইয়ের যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন, মা।"

হরিনারায়ণ কথাটা শুনিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন, শেষে চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া বিমলকে দেশে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

বহু দিন পরে আবার অনুপমার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চমীর দিন হরিনারায়ণ সপরিবারে পল্লীভবনে গিয়া পৌঁছিলেন। ·বিমলের জন্য সকলে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, পথের কষ্টে জ্বরটা যদি বাড়িয়া যায়, বিমল যদি অবসন্ন হইয়া পড়ে! কিন্তু গৃহে পৌঁছিয়া বিমলকে অনেকটা সুস্থই দেখা গেল। জনক-জননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অনুপমা নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া মা আনন্দময়ীর উদ্দেশে বারংবার গভীর ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতে লাগিল।

সপ্তমীর দিন বিমল অনুপমাকে বলিল, "এখানে এসে শরীরটা আমার বেশ ভাল বোধ হচ্ছে। জ্বরের কোন গ্লানিই টের পাচ্ছি না, জ্বরটা বোধ হয় ছেড়ে গেছে, এক বার দেখ ত!"

অনুপমা বলিল, "আজ আর দেখে কায নেই। জ্বর ছেড়ে যাবে বৈ কি! পরশু সকাল থেকে তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বিমল বলিল, "আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে, অনু।"

পরদিন মহা অষ্টমীর বলির অব্যবহিত পূর্ব্বে অনুপমা যখন বুক 'চিরিয়া সরায় রক্ত ধরিয়া মা দশভুজার সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মা'র আরাধনায় বসিল, তখন কোলাহল-মুখরিত চণ্ডীমণ্ডপ সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সমস্ত স্থানটি প্রকম্পিত করিয়া বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। অনুপমা তেমনই ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রহিল।

তাহার পর দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিমল দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। ডাক্তার-কবিরাজরা নানা রকম করিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, "দেহে রোগ কিছু নাই বটে, কিন্তু আরও এক বৎসর বিশেষ সাবধান হইয়া থাকিতে হইবে। সামান্য অনিয়ম বা অত্যাচারে পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা। এই একটা বছর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করাই সমীচীন।"

চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই হইল। কেবল একটি বিষয়ে হরিনারায়ণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। তাঁহারা অনুপমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বিমলের সেবা যত্নের সমস্ত ভারই হরিনারায়ণ নিঃসঙ্কোচে সেই পুত্র-বধূরই উপর সমর্পণ করিলেন। অন্য লোক যাহাই ভাবুক, তিনি জানিতেন, এই লক্ষ্মীর কৃপায়ই তিনি পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন।

৪

নূতন যায়গায় আসিবার মাসখানিক পরে বিমল অনুপমাকে বলিল, "সত্যি, অনু, এখানে আসার পর থেকে তুমি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছ, আমার সেবাযত্ন সবই কর, তবু তুমি সব সময় আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাক।"

অনুপমা হাসিয়া বলিল, "তুমি ত বেশ কথা বলছ—সেবা-যত্ন কি দূরে থেকে করা যায়! সেবা-যত্ন করতে হলেই ত সব সময় কাছে কাছে থাকতে হয়।"

বিমল তেমনই গম্ভীরভাবে বলিল, "কথাটা তুমি মিথ্যে চাপা দেবার চেষ্টা করছ,—তুমি এমনই ভাবে আমার সেবাযত্ন কর, যেন তুমি মাইনে-করা নার্স।"

অনুপমা আবার হাসিয়া বলিল, "নার্সগিরি কখনও করি নি, নার্সের কাযের মর্ম্ম বুঝব কোত্থেকে! তা ছাড়া গরীবের ঘরে জন্মেছি, নার্স দেখবার সৌভাগ্য ত কখনও হয় নি। অথচ তুমি—"

বিমল বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার ও সব কথা আমি শুনতে চাই না; ক'দিন থেকেই আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি, তোমাকে কিছু বলতে গেলেই তুমি তার উল্টো উল্টো জবাব দাও। আমার এ ভাল লাগে না।"

অনুপমা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "বেশ, ভাল না লাগে, আমায় বিদেয় ক'রে দাও।"

বিমল দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি কি তাই বলছি না কি, এ রকম কথা বলা তোমার ভারী অন্যায়।" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনুপমার হাত ধরিল এবং অন্য হস্তে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর অমন কথা কিন্তু বলতে পারবে না।"

ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া অনুপমা স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিল। তাহার পর সহসা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বিমলের আহ্বানে অনুপমা যখন বিমলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিমল যতখানি বিস্মিত হইল, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাল অনুপমার সহিত বিমলের যখন দেখা হইয়াছিল, অনুপমার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া ছিল এবং প্রতিদিনই সে এমনই হাসিমুখেই বিমলের সব কায করিত, ফাই-ফরমাস খাটিত। হঠাৎ বিমলের একবার মনে হইল, হয় ত অনুপমার কোন অসুখ করিয়া থাকিবে। তাহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়া তাহার উচিত হয় নাই। তাই কুণ্ঠিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি আজ শরীরটা ভাল নেই, অনু?"

অনুপমা বলিল, "অসুখ করবে কেন? আমি বেশ ভালই আছি। কিন্তু তুমি কি জন্য ডেকেছ?"

বিমল ব্যথিত স্বরে বলিল, "শুধু শুধু কি ডাক্‌তে নেই, অনু?"

অনুপমা বলিল, "না, যখন তখন এমন ক'রে আর ডেক না। এখন তুমি ভাল হয়ে উঠেছ, তোমার না লজ্জা করতে পারে, কিন্তু আমার করে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিমলের সর্ব্বশরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অনুপমার এইরূপ আচরণ তাহার নিকট অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই বোধ হইল। আজ যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা কৈফিয়ৎ সে লইবেই।

সেই দিন মধ্যাহ্নে স্বামি-স্ত্রীতে অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে রীতিমত কলহ হইয়া গেল। অনুপমা বিমলকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল যে, আজ হইতে বিমল যেন তাহাকে নার্স ব্যতীত অন্যভাবে না দেখে। সে যে তাহার স্ত্রী, এ কথা সে যেন ভুলিয়া যায়, অন্যথা সেবার ভার অন্য কাহারও উপর দিয়া সে পিতৃগৃহে চলিয়া যাইবে।

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর রোষকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বটে, এতদূর! বেশ, আজ থেকে আমিও তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। নার্স রাখবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি মাকে বলব, তিনি নার্সকে যেন এখনই বিদায় ক'রে দেন।"

অনুপমা বলিল, "বেশ, সেই ভাল।" এই বলিয়া সে তাহার শ্বশ্রূর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

শ্বশ্রূ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাপমা'র জন্যে মন কেমন কচ্ছে বুঝি! তা করবারই কথা, সেই বিয়ের কনে এসেছ, আর ত যাও নি। আচ্ছা, ওঁকে বলব'খন।"

হরিনারায়ণ কিন্তু কিছুতেই এ সময় অনুপমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "বৌমা গেলে বিমলকে দেখবে কে? এমন সেবাযত্ন কি আর কেউ করতে পারবে? দেশে ফিরে বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। এখন না।"

অনুপমা কিন্তু একেবারে কোট করিয়া বসিল, সে যাইবেই। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী অনেক বুঝাইয়াও যখন কিছুতেই তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন হরিনারায়ণ রুক্ষকণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন, "তুমি বৌমাকে ব'লে দাও, তা হ'লে এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হবে, এ বাড়ীতে আর তার যায়গা হবে না।" তিনি মনে করিয়াছিলেন, এত বড় কথার পর অনুপমা আর বাপের বাড়ী যাইবার নাম মুখে আনিবে না, কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন।

তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন, নারী-জীবনের 'শ্রেষ্ঠ-তীর্থে' পুণ্য সঞ্চয়ের অধিকার হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হইতে হইলেও যে, অনুপমাকে যাইতে হইবে, সে যে নিজের উপর তাহার বিশ্বাস হারাইয়াছে। নিজেকে সে যে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

কথাটা শুনিয়া অনুপমা বেশ ধীর শান্তভাবেই বলিল, "এই শাস্তিই যদি বাবা আমার বিধান ক'রে থাকেন, তাই মাথা পেতে নেব, আমায় যে যেতেই হবে, মা।"

এইবার হরিনারায়ণ একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "গরীবের মেয়ের বরাতে রাজরাণী হওয়া সইবে কেন,—চিরদিনের জন্য বাপের কুঁড়েতে প'ড়ে থাকবার ব্যবস্থাই ক'রে দেব, এমন বৌ ঘরের কলঙ্ক! এখনই ওকে বিদেয় ক'রে দাও।"

হায় হরিনারায়ণ! তুমি যদি বুঝিতে, যৌবনের অসংযম হইতে ক্রমশঃ রোগমুক্ত স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তরুণী পত্নী কি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, তাহা হইলে তুমি এমন কথা মুখে আনিতে পারিতে না।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

রূপের মোহ

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিক্ত বস্ত্রাদিত্যাগের পর গরম চা ও জলখাবার খাইয়া সুরেশচন্দ্র সুস্থ হইলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক ইচ্ছে করেন কি?"

সুরেশচন্দ্র অতিরিক্ত পরিমাণে তাম্রকূটের ভক্ত; বিশেষতঃ অনেকক্ষণ তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটে নাই। প্রশ্নমাত্রেই তিনি বলিলেন, "আছে না কি?"

বাঙ্গালার পল্লীতে আবার তামাকের বন্দোবস্ত নাই? মাধব হাসিয়া বলিল, "এ কিন্তু আপনার বালাখানা-গয়ার তামাক নয়, সুরেশবাবু। আমার ক্ষেতে এ তামাক জন্মেছে; নিজের হাতে তৈরী দা-কাটা তামাক। আপনার ভাল লাগ্‌বে কি না, জানি না।"

"খুব ভাল লাগ্‌বে—সারাদিন তামাক জোটে নি, মাধবদা।"

বড় একটা কলিকায় তামাক সাজিয়া, রূপাবাঁধা হুঁকায় জল ভরিয়া মাধব সুরেশচন্দ্রকে তামাক দিল। তিনি বেশ আরাম করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। নানাবিধ মশলামিশ্রিত প্রসিদ্ধ বালাখানা অথবা গয়ার তামাক যে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, সুরেশচন্দ্রের মনে সে বিষয়ে সংশয় রহিল না। প্রকাশ্যে সে কথা তিনি স্বীকার করিলেন।

আলাপপ্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র জানিতে পারিলেন, রমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ অবগত নহে। প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে পশ্চিম হইতে একখানা পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে ঠিকানা ছিল না। রমেন্দ্র লিখিয়াছিল যে, সে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেছে। আপাততঃ তাহার অর্থাভাব নাই। প্রয়োজন হইলে জানাইবে। পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে যেন মা চিন্তিত না হন।

সকল কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, পুরী হইতে চলিয়া আসিবার সময় রমেন্দ্র দেশে যাইতেছে বলিয়া লিখিয়াছিল—এ কথা সত্য নহে! ধূমপান করিতে করিতে এই কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। এই আকস্মিক অনিশ্চিত প্রবাসযাত্রা কেন? কৈশোরের সখা, যৌবনের সুহৃদ, সতীর্থ রমেন্দ্রের মনের কোন্ কথাটা তাঁহার জানা নাই? সে যে কি ধাতুতে গড়া, তাহা কি তিনি জানেন না?—দোষ অংশতঃ তাঁহারই। কিন্তু রমেন্দ্র বিবাহ করিয়াছে, জীবনের এমন বড় ঘটনাটা সে কেন তাঁহাদের কাছে প্রকাশ করে নাই?

সুরেশচন্দ্র ঘটনার পর ঘটনার সূত্র ধরিয়া মনে মনে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া চলিলেন। মানবের মনোবৃত্তি, যৌবনের ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য,—না, নিজের বিধিব্যবস্থার ত্রুটিই অধিক, সে জন্য অন্যকে অপরাধী করা অন্যায়। খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। অগ্নি ও ঘৃতকে শাস্ত্রকারগণ দূরে রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, না শুনিলে পরিণাম অভ্রান্তরূপে একই হইবে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ সমাজ-স্থিতির জন্য সুস্থ ও অনুকূল নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গেলেই নানাবিধ অশান্তির উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে।

য়ুরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা দৃশ্য, নানা কথা বিভিন্নভাবে তাঁহার চিত্তে সমুদিত হইল।

ভারতবর্ষের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের বিচক্ষণতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। কি ভূয়োদর্শনই তাঁহাদের ছিল! মানব-মনোবৃত্তিগুলিকে তাঁহারা কিরূপ নিপুণভাবেই না বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন! এ বিষয়ে প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যদর্শন শিশুর মত নহে কি?

সহসা তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। মাধব বলিতেছিল, "আপনি একটু বসুন, আমি একবার বাগানের দিকে যাব।"

"কোথায় যাচ্ছ, মাধব দা?"

তাহার বাম হস্তে লণ্ঠন, দক্ষিণ স্কন্ধে একগাছা জাল।

"বাগানের পুকুরে এক ক্ষেপ জাল ফেল্‌তে হবে।"

অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া সুরেশ বলিলেন, "এই অন্ধকারে--মাছের কি দরকার? ঘরে যা আছে, তাই যথেষ্ট, মাধবদা।"

"সে কি হয়! কতক্ষণ লাগ্‌বে বলুন? ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব। অতিথ-দেবতার সেবা কি যা তা দিয়ে হয়, সুরেশবাবু? আমাদের অসভ্য পাড়াগাঁয়ে তা হয় না।"

হুঁকা রাখিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে মাছধরা দেখ্‌তে যাব, মাধবদা।"

মাধব আপত্তি করিল না, অগ্রে অগ্রে সে চলিল।

আকাশ তখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই; কিন্তু চাঁদ উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে খণ্ডমেঘ আসিয়া চাঁদের উপর পড়িতেছিল। অন্ধকার তেমন গাঢ় নহে। বৃষ্টিধারাস্নাত গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। লণ্ঠনের আলোকে সব স্পষ্ট দেখা যায় না, তথাপি সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, উদ্যানটি সযত্নবিন্যস্ত। পথের দুই ধারে নানাবিধ সব্জীর আবাদ। দূরে উন্নতচূড় বৃক্ষরাজি প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মাধব সানবাধান ঘাটের কাছে আসিয়া লণ্ঠন মাটীতে রাখিল। তাহার পর স্থান লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে জালখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। প্রথম বারে চারা মাছ কতকগুলি উঠিল। মাধব তাহাদিগকে সাবধানে জলে ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় বারে অনেকগুলি ছোট ও কয়েকটি বড় মাছ জালে পড়িল। মাধব একটা ৩ সের আন্দাজ রুই মাছ রাখিয়া বাকী সব জলে ছাড়িয়া দিল।

মাছ দেখিয়া সুরেশচন্দ্র প্রফুল্ল হইলেন; বলিলেন, "পুকুরে অনেক মাছ আছে, না, মাধবদা?"

মাধব বুঝাইয়া দিল যে, প্রয়োজন হইলে এই পুষ্করিণী হইতে ২০।২২ মণ মাছ পাওয়া যাইতে পারে।

"তোমরাই সুখী, মাধবদা।"

মাধব তৃপ্তির হাসি হাসিল। সে বলিল, "মানুষ কি সুখে সহরে থাকে, বল্‌তে পারি নে। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে কোন্ জিনিষের অভাব বলুন ত? এই বাগান—রাত্রিতে আপনার দেখার সুবিধে হবে না। সকালবেলা দেখ্‌বেন—যা খুঁজবেন, তাই পাবেন। আমাদের সংসারের পক্ষে যা কিছু দরকার, সবই আছে।"

মুগ্ধনেত্রে সুরেশ একবার প্রশস্ত বাগানের চারিদিকে চাহিলেন। বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু স্বল্পালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মাধবের কথা সত্য বলিয়া মনে হইল। কপির ক্ষেত, কড়াইশুঁটি, আলু, বেগুণ, নানাবিধ শাকের ক্ষেত তিনি পুষ্করিণীতে আসিবার সময় দেখিয়াছিলেন।

মাছটি তুলিয়া লইয়া, স্কন্ধদেশে জাল রাখিয়া মাধব আবার পথ দেখাইয়া গৃহে ফিরিল।

সুরেশচন্দ্র নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এই পল্লীজীবন, ইহার মত সুখের আর কি আছে! সহরে শুধু কোলাহল, অশান্তি ও ব্যস্ততা। অর্থের জন্য, যশের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতই না মারামারি, কাড়াকাড়ি—ইতরতা! না— সুরেশচন্দ্র যদি কখনও গৃহস্থ-জীবনযাপনের সুযোগ পান, তবে পল্লীর অঞ্চলচ্ছায়ায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত কোনও গ্রামে তিনি আদর্শ পল্লী স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। ম্যালেরিয়া? কৈ, পূর্ব্ববঙ্গের নদীমাতৃকপল্লীতে তাহার প্রাদুর্ভাব কোথায়? যদিও বা থাকে, সামর্থ্য ও অর্থ উভয়ের সমবায়ে পল্লীকে কি সুখের লীলা-নিকেতনে পরিণত করা যায় না? এই পল্লীই ত এক দিন সমগ্র বাঙ্গালার যাবতীয় সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের আবাস ছিল। কেন গেল? বাঙ্গালীর দোষ কি কিছুই নাই? বাঙ্গালার জমীদার, ধনিসম্প্রদায়ের উপেক্ষা কি পল্লীধ্বংসের অন্যতম কারণ নহে? সকলেই সহরের ইন্দ্রজাল, আরাম ও

ভোগবিলাসের উপকরণে মুগ্ধ হইয়া পল্লীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যদি গ্রামের উন্নতির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিত, তবে কি পল্লী এমন শ্মশান হইতে পারিত? না, এ অপরাধ হইতে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায় না। অন্যান্য মারাত্মক কারণ যাহাই থাকুক, বাঙ্গালী পল্লীকে বিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে। তাই সোনার বাঙ্গালা আজ শ্মশান, তাই বাঙ্গালী অধঃপতনের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে। কোথায় ইহার সমাপ্তি?

কলিকায় নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া মাধব তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। মাধব এতক্ষণ সুরেশদের এ অঞ্চলে আসিবার কারণ, নৌকাডুবীর ইতিহাস কিছুই জানিতে পারে নাই। সে এতক্ষণ অতিথি-সৎকারেরই চেষ্টা করিতেছিল। এ দেশে তাঁহাদের আসিবার যে সম্ভাবনাও আছে, ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। এখন একটু অবকাশ পাইয়া সে বলিল, "এত দেশ থাক্‌তে এই বাঙ্গালদেশে আপনারা হঠাৎ কেন এলেন, বুঝতে পাচ্ছি না, সুরেশবাবু!—নৌকাডুবী হ'ল কি রকমে, বলুন ত?"

সুরেশচন্দ্র সব কথা বলিলেন না। শুধু পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদে এ অঞ্চলে আসিয়া তিনি জিলা সহরেই আছেন, এইটুকু প্রকাশ করিলেন। কৌতূহলবশে এই দিকের গ্রামগুলি দেখিতে আসিয়াছিলেন। খালের মধ্যে হঠাৎ নৌকা বানচাল হইয়া যায়। তীর নিকটে বলিয়া সাংঘাতিক কিছু হয় নাই। সুরেশচন্দ্র আপনাকে অন্তরালে রাখিবার জন্য কোনও মতে অবস্থাটা বুঝাইয়া দিলেন।

মাধব স্থির দৃষ্টিতে সুরেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! বুঝেছি, আপনি তবে তিনি!"

সুরেশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রকম?"

মাধব শ্রদ্ধামিশ্রিত কণ্ঠে বলিল,—"শুনেছিলুম বটে, কলকাতা থেকে কে এক জন দাতা—মস্ত এক জমীদার এসে এ দেশে হাঁসপাতাল খুলেছেন, দীন-দুঃখীকে খাওয়াচ্ছেন—দু'হাতে অন্ন বিলুচ্ছেন! সে দিন সহরে গিয়ে শুনেছিলুম। কিন্তু আপনিই যে সেই দাতা, মহাপ্রাণ লোক, তা ত' জান্‌তাম না।"

অত্যন্ত লজ্জিতভাবে সুরেশ বলিলেন, "মানুষ বড় বাড়িয়ে বলে, মাধবদা। ও সব কথায় কান দিও না। তবে আমার দেশের, মা-ভাই-বোন্ না খেতে পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, আর ব'সে ব'সে দেখ্‌ব, এ কি হ'তে পারে, মাধবদা? তাই যৎসামান্য—"

বাধা দিয়া মাধব গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "এ আপনার মত লোকের উপযুক্ত কথা, সুরেশবাবু; কিন্তু আমি যা শুনেছি, আপনি যা করেছেন, এ পোড়া বাঙ্গালাদেশে তা করা দূরে থাক্, এমন ভাবে ক জন বল্‌তে পারেন? বিদ্যুতের গতিতে আপনার কীর্ত্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। এই আমাদের ২।৪ খানা গ্রাম ছাড়া, চারদিকে যে অন্নকষ্ট আর রোগের বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। শুনেছি, দু'জন দেবী না কি অন্ন বিলুচ্ছেন। তাঁরা তবে এঁরাই?"

মাধবের প্রশংসায় সুরেশচন্দ্র বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কথাটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আচ্ছা, মাধব-দা, তোমাদের এ দিকের ২।৪ খানা গ্রামে দুর্ভিক্ষ নেই বল্‌ছ; এমনটা হ'ল কি ক'রে?"

"ভগবানের নেহাৎ দয়া। আমাদের এখান থেকে পদ্মা অনেকটা দূরে। আপনারা যে খালের ভেতর দিয়ে এলেন, এর পাড় খুব উঁচু। বানের জল তাই এ দিকের কখানা গ্রামের তেমন অনিষ্ট কর্‌তে পারে নি। তা ছাড়া, আমাদের গাঁয়ে দলাদলি নেই। আমাদের এই লোচনগঞ্জ গ্রামে প্রায় ৩।৫শ ঘর গেরস্তর বাস। সব-রকম জাতই আছে। তার মধ্যে খোকা—আপনার বন্ধুকে আমরা খোকা বলেই ডাকি—তালুকদার, জমীদার, যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন। আমাদের কর্ত্তামশাই এ গ্রামকে এমন ভাবে গ'ড়ে বেঁধে রেখে গেছেন যে, সবাই এঁদের অনুগত। ঝগড়া, বিবাদ দূরে থাক্, এক জন অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য জান্ পর্য্যন্ত কবুল কর্‌তে পারে। কাযেই গ্রামের কারও অভাব হ'লে সকলে মিলে তার দুঃখ দূর কর্‌বার চেষ্টা করে।"

সুরেশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। পল্লী সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, তাহা এই বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামের মধ্যে দলাদলি, মন-কষাকষি, ইতরতা,

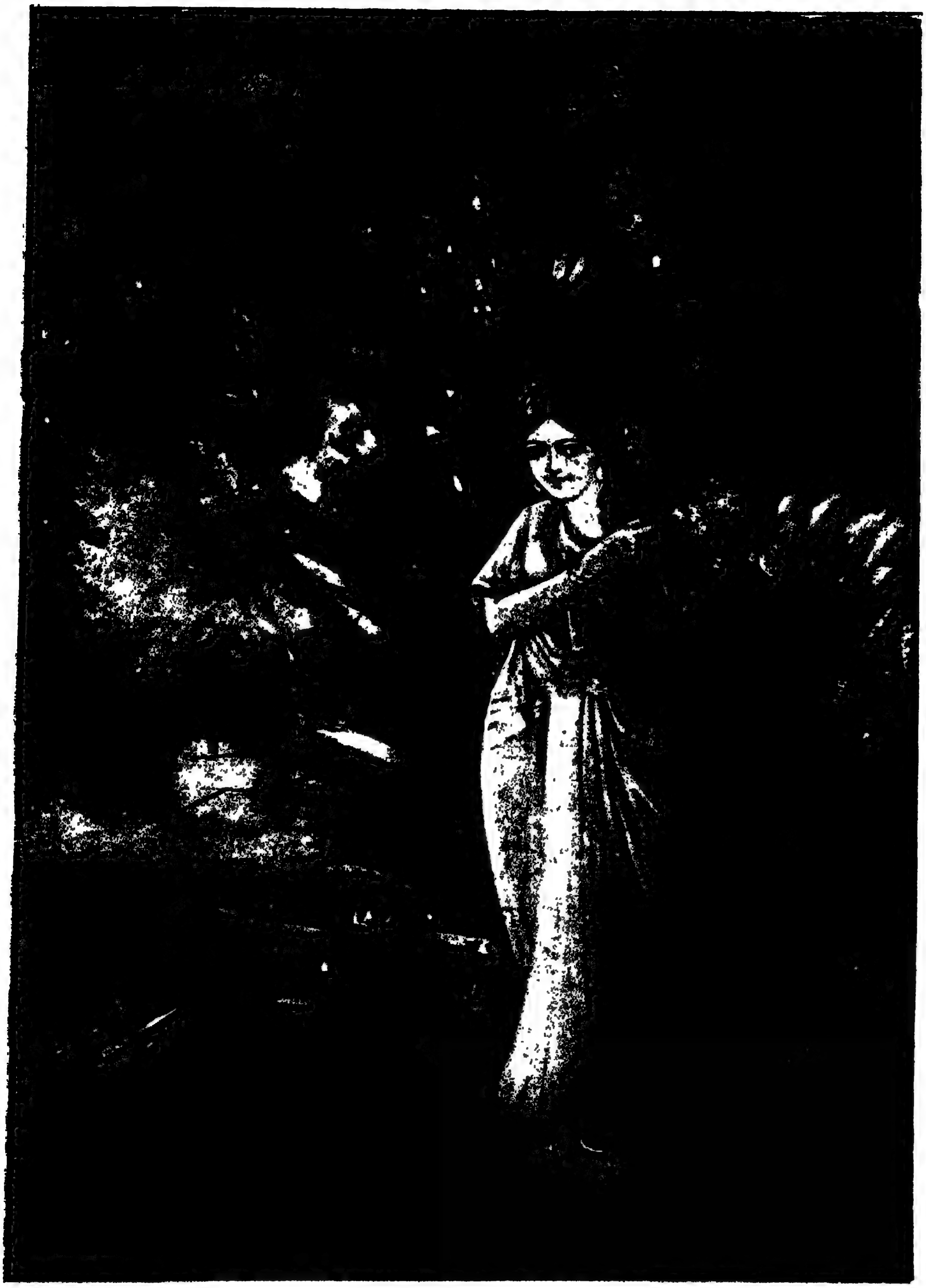

"বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো!
এ কি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
হেরিছে ফুলের ঘুম ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙা।"

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীপর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হিংসা-দ্বেষ দিনদিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহাই তিনি জানিতেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান পল্লীর অবস্থা এইরূপ। কিন্তু মাধব-দা আজ তাঁহাকে এ কি অবিশ্বাস্ত কথা শুনাইতেছে?

বুদ্ধিমান্ মাধব বোধ হয় তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কথাটা বিশ্বাস করবার মত নয়, না সুরেশবাবু? আপনারা পশ্চিমবঙ্গের লোক, পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করবেন না। সত্য বটে, আমাদের দেশে এখন সে যুগ আর নেই; কিন্তু বাঙ্গালার খাঁটি পল্লীর যদি সন্ধান পেতে চান, তবে তা এখনও পূর্ব্ববঙ্গেই পাবেন। আমাদের অনেক অবনতি হয়েছে সত্য, তবু একেবারে অধঃপাতে যায়নি। তা ছাড়া এ গাঁয়ের কথা আলাদা।"

মাধব আর কিছু বলিল না। তাহার মাতাঠাকুরাণীর অমায়িক, সদয় ব্যবহার; মাধবের দয়া, পরোপকার-প্রবৃত্তি, স্থায়নিষ্ঠা এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ গ্রামের সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সকলেই তাহার অনুরক্ত ভক্ত—সে কথাটা প্রকাশ করা সে অশোভন বলিয়া মনে করিল।

সুরেশচন্দ্র নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মাধব তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ভিতরে আহারের কত দূর যোগাড় হইয়াছে, দেখিতে গেল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"সুরেশবাবু, ভেতরে চলুন, ঠাঁই হয়েছে।"

তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের আলো—স্নিগ্ধ পল্লীর উপর চন্দ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। সে মধুর দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র সুরেশচন্দ্র মুগ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তাহার পর মাধবের সঙ্গে ভিতরের দিকে চলিলেন।

প্রশস্ত বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার একা বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পল্লীর—হিন্দুগৃহস্থের ব্যবস্থা অনুসারে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র স্থানে আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুরেশ বলিলেন, "তুমি বস্‌বে না, মাধবদা?"

মাধব যুক্তকরে বলিল, "তা কি এখন পারি? অতিথসেবা না হ'লে গেরস্থের খাবার অধিকার নেই। এ আমাদের চিরকালের পাড়াগেঁয়ে ব্যবস্থা। আপনি বসুন।"

সুরেশচন্দ্র এ প্রথায় অভ্যস্ত না হইলেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রথাটা ভাল কি মন্দ, তাহার আলোচনার প্রয়োজন কি? কিন্তু ব্যবস্থাটি যে বড়ই মধুর, সুরেশ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

মাধব অনতিদূরে উবু হইয়া বসিয়া অতিথির আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, আয়োজন পর্য্যাপ্ত; এত অল্পসময়ের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন ও সুপরিচালিত পল্লীগৃহস্থগৃহেই সম্ভবপর।

আহারে বসিয়া সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, শুধু আয়োজনই পর্য্যাপ্ত নহে, প্রত্যেক ব্যঞ্জনের স্বাদ অভিনব। তিনি বহুবার বহু স্থানে নানাপ্রকার ভোজসভায় যোগ দিয়াছেন, কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট এবং বিচিত্র স্বাদযুক্ত, রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছেন। মনে মনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া সুরেশ বলিলেন, "বড় চমৎকার রান্না, মাধবদা!"

মাধব হাসিয়া বলিল, "এ আমাদের গরীবখানা। আপনি যদি তৃপ্তি পান, সে আমাদের সৌভাগ্য। একটা কথা এখানে নিবেদন ক'রে রাখি, যা কিছু উপাদান দেখ্‌ছেন, সব আমাদের বাড়ীতেই জন্মেছে।"

সবিস্ময়ে সুরেশ বলিল, "বটে!"

মাধব বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ। মায় পোলাওয়ের চাউল পর্য্যন্ত। বাজারের ঘি, তেল কখনও কিনতে হয় না—অবশ্য ক্রিয়াকর্ম্ম ছাড়া। হলুদ, লঙ্কা, ধনে, সরষে, তেজপাতা সবই আমাদের বাগানে হয়। কোন জিনিষের জন্য দোকানে বা হাটে আমাদের যাবার দরকার হয় না। এক লবণ, তা যদি আইন থাক্‌ত, ঘরে তাও তৈরী করা যেত।"

অবাক্ বিস্ময়ে এই পল্লী-প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, এমন আর এক জন লোক তিনি জীবনে দেখিয়াছেন কি? স্বাবলম্বনের এমন উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সমক্ষে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিতে হয়।

শুভ্রবসনা গৃহিণী ধীরে ধীরে পুত্রবন্ধুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা সুরেশ, তোমরা বড়ঘরের ছেলে, আমাদের এ পাড়াগাঁয়ে তোমাদের যোগ্য আদর-যত্ন—"

বাধা দিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "মা, কি বল্‌ছেন? এমন চমৎকার রান্না আমি জীবনে খুব কমই খেয়েছি।"

গৃহিণী সহর্ষে বলিলেন, "এ সবই আমার বৌমার রান্না।"

"বটে! রমেনের স্ত্রী এমন চমৎকার রাঁধ্‌তে পারেন?—সে খুব ভাগ্যবান্‌।"

কথাটা বলিয়াই সুরেশ অন্যমনা হইলেন। এমন গুণবতী স্ত্রী থাকিতে—

মাতা বলিলেন, "বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী। কাযে-কর্ম্মে, দেখ্‌তে শুন্‌তে—এমন সকল রকমে ভাল মেয়ে খুবই কম দেখা যায়, বাবা। আমার ইচ্ছে ছিল, তোমরা যখন এসেছ, আর দিনকতক তাকে এখানে রাখি। কিন্তু তা' আর ঘটে উঠ্‌বে না দেখ্‌ছি। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, কালই ওকে নেবার জন্য লোক আস্‌বে।"

"রমেনের স্ত্রী বাপের বাড়ী যাচ্ছেন না কি?"

"হাঁ বাবা, কালই যাত্রার দিন।"

"তা বেশ ত। আমরা ত এ দেশে আর ২।১ দিন আছি। আমাদের জন্য তাঁকে আট্‌কে রাখবার কোন দরকারই নেই। কাল সকালেই আমাদের সহরে ফিরে যেতে হবে।"

"তা কি হয়, বাবা! তোমরা কখনও আস নি। এক দিনেই কি ছেড়ে দিতে পারি?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের বিলম্ব করবার কোন উপায় নেই, মা! আপনি মাধবদাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের হাতে কি রকম জরুরী কায রয়েছে। এ ত আমার নিজের বাড়ীর মত। পরে আবার আস্‌ব, তখন দিনকয়েক থেকে যাব।"

আহারশেষে সুরেশ বহির্ব্বাটীতে গেলেন। তাঁহার মন চিন্তাপূর্ণ।

"মাধব-দা, দয়া ক'রে একটা কাযের ভার নেবে?"

হুঁকাটা সুরেশচন্দ্রের হাতে দিয়া সে বলিল, "কি বলুন ত?"

"এ অঞ্চলে আমি বেশী দিন থাক্‌তে পারব না। ওঁদের নিয়ে শীঘ্রই এলাহাবাদে যেতে হবে। কিন্তু এখানে ঢের কায বাকী। আমি অবশ্য জিলার হাকিমের কাছে টাকাটা দিয়ে যেতে পারি; কিন্তু আমার ইচ্ছে, আমরা দেশের লোক মিলেই কাযটা করি। এ দেশে এখনও কিছু দিন হাঁসপাতাল ও অন্নসত্র রাখ্‌তে হবে। তুমি ভার নেবে, মাধব-দা?"

সুরেশচন্দ্র যেরূপ গভীর আগ্রহভরে প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে মাধবের উপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেন প্রকাশ পাইল। মাধব বলিল, "এত বড় কায কি আমরা চালাতে পারি? আমরা মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে ভূত।"

সুরেশ বলিলেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মত লোকের সংখ্যা দেশে বাড়্‌তে থাকুক। সত্যি মাধব-দা, লেখাপড়ার কথা তুলে বড় লজ্জাই দিলে। লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশে বড় একটা মানুষ তৈরী হচ্ছে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার মত মানুষ হ'তে পারি।"

তখনকার মত কথাটা চাপা রহিল। আহারশেষে মাধব বাহিরে আসিলে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে মাধব গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল। কথায় কথায় সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মাধব ঠিক করিয়াছে, গোলায় সঞ্চিত ধান্য হইতে হাজার মণ ধান সে দুর্ভিক্ষ-দান-ভাণ্ডারে দিবে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা দুস্থদিগের জন্য কি দান করিয়াছে, সে কথাটা কোনও মতেই তিনি মাধবের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিলেন না।

এই স্বল্পশিক্ষিত, বলিষ্ঠদেহ, হৃদয়বান্‌ প্রৌঢ়কে সুরেশচন্দ্র মনে মনে বহুবার প্রণাম করিলেন। এমন খাঁটি বাঙ্গালী এ যুগে থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবনটা কি সুধু প্রহেলিকা?—মন কি এমনই জটিল?—নহেই বা কেন? কবি, দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ্ বহু অভিজ্ঞতার ফলে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সে স্বয়ং কবি হইয়া নিজের জীবনেই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পায় নাই? বাল্য, কৈশোর, তরুণ যৌবনের মনের ইতিহাসটা আগাগোড়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ত বুঝা যায়—ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও মনের জটিলতা যেমন বিচিত্র, তেমনই অদ্ভুত! কোন্ প্রবৃত্তি কখন্ কি ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠিয়া, পূর্ব্বসঙ্কল্পকে দুর্নিবার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষ কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে? ষড়রিপু যেন স্ব স্ব দুর্গমধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, অকস্মাৎ কে কবে কোন্ দিক্ দিয়া আক্রমণ করিয়া বসিবে, বেচারা মন তাহার কোনও পূর্ব্বাভাসও পায় না। যখন অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়—অভিভূতের মত কায করিয়া যায়। পরে সংশয়, অনুশোচনা, নির্ব্বেদ জীবনকে ধিক্কারে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

চলিতে চলিতে রমেন্দ্র এমনই কত কি ভাবিতেছিল। আজ সে মধ্যাহ্নে আহারের পর একাই বাহির হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর কোনও আত্মীয় আসিবেন, তাঁহাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে যাইবেন বলিয়া তিনি রমেন্দ্রের সাথী হইতে পারেন নাই। রমেন্দ্র মুসলমান নবাবগণের অন্যান্য কীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন তখনও দেখে নাই, আজ তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। শাহানাজফ্, ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রভৃতি কয়েকবার দেখা থাকিলেও আবার সেগুলি দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গোমতীর লোহার পুল পার হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকক্ষণ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। রমেন্দ্র বাসার দিকে ফিরিল। সে ভাবিতেছিল, আর এখানে থাকা সঙ্গত নহে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ সে এখানে আসিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনাত্মীয়ের গৃহে সে যে এত দিন অতিথিরূপে বাস করিবে, ইহা এক মাস পূর্ব্বে তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। এখানে গৃহের অপেক্ষাও পর্য্যাপ্ত আদর-যত্ন পাইতেছিল, ডাক্তারবাবুর সরল, অনাড়ম্বর, সস্নেহ ব্যবহারে সত্যই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত বার সে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদর যেরূপ পবিত্র বন্ধনে কনিষ্ঠকে বাঁধিয়া রাখেন—সে বন্ধন এড়াইয়া যাওয়া যেরূপ সহজ নহে, রমেন্দ্রের পক্ষেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

রমেন্দ্র চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে স্নেহভরা অথচ যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা ডাক্তারবাবু তাঁহার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিতেন। অন্তঃপুর হইতে ডাক্তারবাবুর পত্নীর তরফ হইতে এমনই মিষ্ট অনুরোধ আসিত যে, তাহা উপেক্ষা করা নিতান্ত মূঢ়ের পক্ষেই সম্ভব। তাই, যাই যাই করিয়াও এত দিন সে যাইতে পারে নাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে? না—রমেন্দ্র এবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে—অচিরেই তাহাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। সত্যই আর ভাল দেখায় না। ডাক্তারবাবুর আত্মীয়-পরিজন আসতেছেন, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন? এত দিন কেহ ছিল না, সে এক কথা। এখন সমাগত আত্মীয়রা তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ ধারণা করিয়া লইতে পারেন, সে কেন তাহার অবকাশ দিবে?

ফটকের কাছে আসিতেই চমক ভাঙ্গিল। অনতিদূরেই গাড়ীর আস্তাবল ও দ্বারবানের গৃহ। রমেন্দ্রকে দেখিয়া দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেন্দ্র তাহার কাছে জানিতে পারিল, ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছেন।

রমেন্দ্র বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকিত কক্ষ জনহীন। সে অন্যমনস্কভাবে বাহিরে আসিয়া বাগানের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। বাগানে তখন কেহ ছিল না। অনেক সময় সে এই প্রশস্ত উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করিত। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কদাচিৎ বাগানে আসিতেন, অন্ততঃ রমেন্দ্র আসিবার পর সে কোনও দিন তাঁহার বসনের অঞ্চল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। কাযেই অসঙ্কোচে সে যখন তখন বাগানের মধ্যে বেড়াইত। বিবিধ ফলের গাছ ছাড়া, নানাবিধ ফুলের গাছ উদ্যানে ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্নিহিত একটা রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার

রজনীগন্ধার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার যত্নে অসময়েও টবের গাছে রজনীগন্ধা-ফুল ফুটিত। এই ফুল সম্বন্ধে তাঁহার এমনই পক্ষপাতিত্ব ছিল যে, বাগানে গাছ থাকা সত্ত্বেও শয়নকক্ষে, বসিবার ঘরে সর্ব্বত্রই টবে করা রজনীগন্ধার গাছ দেখিতে পাওয়া যাইত। রমেন্দ্রও রজনীগন্ধার বিশেষ অনুরাগী ছিল। আধ-আলো আধ-ছায়া-ঢাকা উদ্যানে রজনীগন্ধা গাছের কাছে দাঁড়াইয়া রমেন্দ্র প্রস্ফুটিত ফুলগুলি নাসিকার কাছে আনিয়া ঘ্রাণ লইতেছিল।

সহসা মৃদু সঙ্গীতের শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল। রমেন্দ্র উৎকর্ণ হইল। বড় মিষ্ট কণ্ঠস্বর ত! অজ্ঞাতসারে সে এক পদ অগ্রসর হইল। বাতাসে মধুর নারী-কণ্ঠে গান ভাসিয়া আসিল:—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে!"

বংশীরবে আকৃষ্ট হরিণের ন্যায় রমেন্দ্র ধীরে ধীরে অদূরবর্ত্তী বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইল। বহু দিন পরে তাহার প্রিয় কবির মধুর গানটি, সুকণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়া সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

"আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি,—
পাব জীবনে না হয় মরণে।"

ইহা ত শুধু গান নহে,—গায়িকা যেন প্রাণ কণ্ঠে আনিয়া, হৃদয় উজাড় করিয়া দিয়া গাহিতেছিল। কাহার এ কণ্ঠ? ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর? হইবে বা। রমেন্দ্র ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত দেখে নাই, গান শুনা ত দূরের কথা। রমেন্দ্র ভাল করিয়া শুনিবার জন্য নিঃশব্দে বাতায়নের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরে সুরে অন্তর্নিহিত ভাবধারা যেন গানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতেছিল। শিক্ষিত কণ্ঠের গান—গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনা চমৎকার! বাহিরের ঘরে রমেন্দ্র একটা টেবল-হারমোনিয়ম্ দেখিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কাহাকেও তাহা বাজাইতে দেখে নাই। তাহার গানের খুব সখ ছিল, সে বাজাইতে জানিত। কিন্তু মানসিক অশান্তির জন্য ও দিকে তাহার খেয়াল ছিল না।

আজি এ গানটি বড়ই মিঠা লাগিতেছিল:—

"হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে, পার কর ব'লে পাপী,
কেন ডাকে দীন-শরণে?"

সত্য, অতি সত্য!—কিন্তু কে এই গায়িকা? তাহার হৃদয়যন্ত্রে যে সুর—যে কথা অহরহঃ বাজিতেছে, গায়িকা যেন তাহারই মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে! সুন্দর! চমৎকার! অতি মধুর!

রমেন্দ্রের মন সঙ্গীতস্রোতে ভাসিয়া চলিল, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সঙ্গীতের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল।

গান থামিয়া গেল। রমেন্দ্র তখনও মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া।

ভিতরে একাধিক লোকের কথা শুনা গেল।

এক জন বলিতেছিল, "তুই রোজ গান গাইতিস্?"

উত্তরে আর এক জন বলিল, "না দিদি, গান গাইবার সময় কোথায়? তবে বাড়ী গেলে, বাবা যখন বল্‌তেন, মাঝে মাঝে গাইতাম।"

"তোর গলাটা কিন্তু আগেকার মতই আছে, টুনি। আর একটা গান কর্।"

"কে এসে পড়্‌বে, দিদি, আজ আর না।"

"কে এসে পড়্‌বে? উনি এলে গাড়ীর শব্দ হবে। আর ওঁর কাছে তোর ভারী ত লজ্জা! আগে কত গান গেয়েছিস্। নে, আর একটা ধর্।"

অপরা বলিল, "তবে আগে তুমি একটা গাও, কত দিন তোমার গান শুনি নি।"

"আমি আবার কি গাইব? তোর মত অমন গলা আমার যদি থাক্‌ত, গাইতাম। তোর বড় কষ্ট হচ্ছে বুঝি, টুনি? গাড়ীতে ঘুমুতে পেরেছিলি?"

"না, কষ্ট কিছুই না; সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ গাড়ী। মামাবাবু, মামীমা, মিনু আর আমি, কষ্ট হবে কেন? খুব ঘুমিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা, গান আজ থাক্। কিন্তু তোকে পেয়ে আমার আজ খালি বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে, ভাই।

সন্ধ্যাবেলা বাবার কাছে ব'সে গান, আবৃত্তি, শ্লোক রচনা—মনে পড়ে, টুনি ?”

“কি সুখের দিনই গিয়েছে, দিদি! মনে আবার পড়ে না ? ইচ্ছে করে, আবার সে যুগে ফিরে যাই!”

কক্ষমধ্যে খানিক নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। রমেন্দ্র সে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সে আবার শুনিতে পাইল,—“টুনি, সেই শ্লোকটা তোর মনে আছে ?—কুমারসম্ভবের মদনভস্মের পর রতিবিলাপের সেই শ্লোকটা ?—‘উপমানমভূদ্বিলাসিনাং’ শ্লোকটা একবার বল না ভাই, বাবা প্রায়ই তোর মুখে শ্লোকটা শুন্‌তে চাইতেন; আমার বড় ভাল লাগে।”

রমেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। সে কয় দিনে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ডাক্তার-গৃহিণী পাঠানুরাগিণী। আজকাল অনেক মেয়ে যেমন মাসিকপত্রিকার ভক্ত—উপন্যাসপাঠিকা, তাঁহাদেরই মত এক জন। কিন্তু শুধু ত তাই নয়! ইনি কাব্যানুরাগিণী—মহাকবি কালিদাসের ভক্ত। সে অনুমান করিয়াছিল, দুই ভগিনীতে কথা হইতেছে। আজ যাঁহার আসিবার কথা ছিল, ইনিই তিনি। হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের মধ্যে আজকাল পাঠস্পৃহা শুধু উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ নহে—কাব্য-সাহিত্যের আলোচনাও তাঁহারা করেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব পর্য্যন্ত।

তাহার মন বিমর্ষ হইল। হায়! তাহার পত্নীও যদি এমনই বিদুষী হইত!—চিন্তায় বাধা পড়িল। সে শুনিল, বামাকণ্ঠে মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় কাব্য-শ্লোক কি নির্দ্দোষভাবেই উচ্চারিত হইতেছে :—

“উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥”

কালিদাসের শোকমুহ্যমানা, পতিবিয়োগকাতরা রতির বিলাপগাথা, এই নারীর কণ্ঠে যেন বিলাপধ্বনির মতই করুণ, হৃদয়বিদীর্ণকারী বিষাদ-সঙ্গীতের মতই শুনাইতে লাগিল।

আবৃত্তির ভঙ্গী ও মাধুর্য্য কি চমৎকার! রমেন্দ্র মুগ্ধ হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান ও অধিকার না থাকিলে এমন অভ্রান্তভাবে আবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। সে স্বয়ং কবি; কিন্তু হয় ত সে-ও এমন ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিত না।

“ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥”

ব্যথা অনুভব না করিলে, বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব না করিলে এমন ভাবে বিধুরা নারীর শোকগাথাকে কে মূর্ত্তি দিতে পারে ?

রমেন্দ্র স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল,—

“রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়া-
স্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ ॥”

নারীকণ্ঠ হইতে বিলাপের আর্ত্তস্বর কবিতার ছন্দে ছন্দে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক—সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়ের অধ্যাপনাকালে আবৃত্তি শুনিয়া রমেন্দ্র মুগ্ধ হইত; কিন্তু এই তরুণীর কণ্ঠোত্থিত বিলাপগাথা আজ তাহার চিত্তকে যেমন অভিভূত ও বিচলিত করিল, এমন আর কোনও দিন হয় নাই। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়া একবার প্রতিযোগী পরীক্ষায় সে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল, কিন্তু রমেন্দ্রের মনে হইল, এমন ভাবলালিত্যের সাহায্যে সে কখনও আবৃত্তি করিতে পারে নাই।

এই অপরিচিতার প্রতি রমেন্দ্রের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। নিবিষ্টমনে শুনিতে শুনিতে সে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, আবৃত্তি শেষ হইবার পরও কণ্ঠরবের ঝঙ্কার, গুঞ্জনগীতি তাহার কানের কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল।

সহসা একটা শব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। বাতায়নের নিম্নভাগ বন্ধ ছিল; খড়খড়িগুলি খোলা ছিল না; সুতরাং ভিতরে কি হইতেছিল, দেখিবার উপায়

ছিল না। দ্বারোদ্‌ঘাটনশব্দে সে বুঝিল, ঘরের মধ্যে যাহারা ছিল, তাহারা স্থান ত্যাগ করিতেছে। কৌতূহলভরে রমেন্দ্র উপরের দিকে চাহিল; কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। রমেন্দ্র ভাবিল, কাযটা ভাল হইতেছে না। এমন গোপনে পরস্ত্রীকে দেখা ভদ্রতারীতিসঙ্গত নহে; কিন্তু সকল সময়ে বিচার পূর্ব্বক সকলে কি কায করিয়া থাকে?

"চল্, টুনি, মহারাজ কি রাঁধ্‌লে, দেখে আসি।"

চুড়ীর রিনি-রিনি ও অঞ্চলের খস্-খস্ শব্দে রমেন্দ্র বুঝিল, গৃহ লোকশূন্য হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইবার পর তাহার মনে হইল, কাযটা ভাল হয় নাই। ধীরে ধীরে সে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল।

গাড়ী-বারান্দায় পৌছিয়া সে দেখিল, ডাক্তারবাবু দাঁড়াইয়া। তিনি কখন্ ফিরিয়া আসিয়াছেন?

"এই যে, শিশিরবাবু, আপনি কতক্ষণ?"

রমেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "খানিক আগেই এসেছি। আপনি বাড়ী নেই, তাই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।"

সিগারেটে টান দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বেশ! বেশ!—আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এসেছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, গোমতীর ওপারে গিয়েছিলুম। বাস্তবিক, লক্ষ্ণৌ সহরটা দেখে শেষ করা কঠিন।"

"কথা মিথ্যা নয়। আসুন, ভিতরে বসা যাক্। আজ সারাদিনটাই পথে পথে কেটে গেল। আসুন, দুটো খোসগল্প করা যাক।"

পরিচিত আসনে রমেন্দ্র বসিল। ডাক্তার বলিলেন, "আজ বিকালে আপনার ভাগ্যে চা জোটেনি; সেই ১টায় বেরিয়েছিলেন ত? বেহারা!"

"হুজুর!" বলিয়া ভৃত্য হাজির হইল।

ডাক্তার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সবে ৭টা; এখনও খাওয়ার বিলম্ব ঢের। রামদীন, অন্দর যাকে কহ, দো পেয়ালা চা।"

দীর্ঘ পর্য্যটনের পর চা-পানের স্পৃহা রমেন্দ্রেরও প্রবল হইয়াছিল।

অল্পসময়ের মধ্যে চা ও রেকাবি-ভরা গরম সিঙ্গাড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোজনে ডাক্তারবাবুর আগ্রহ সর্ব্বদাই বিদ্যমান! উপস্থিতকে ত্যাগ করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না।

"আসুন, শিশির বাবু, সদ্ব্যবহার করা যাক্। আঃ!—সারা দিনটা খেটে খেটে এমন ক্ষিধেও পেয়েছে!—আপনি ত বেরিয়ে গেলেন; আমিও ষ্টেশনে গেলাম। আমার ছোট শ্যালিকা এসেছেন। প্রায় ৪ বছর দুই বোনের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমার মামাশ্বশুর জয়পুরে থাকেন কি না। এই পথেই যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁকে এত ক'রে বল্লাম, কিন্তু নাম্‌লেন না। দরবার না কি আছে, বিলম্ব করা চল্‌বে না। দেখুন, শিশিরবাবু, এই দাসত্বটা, তা বড়ই হোক্, আর ছোটই হোক্—সব সমান। কেমন, ঠিক নয় কি?"

দাসত্ব যে অতি হেয়, তাহাতে রমেন্দ্রের অণুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু মানবের এমনই অদৃষ্ট, এ দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে তাহার মুক্তি নাই! হয় মানুষের নিকট, নয় ত প্রকৃতির নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া তাহাকে জন্মজন্মান্তর চালিত হইতে হইতেছে! কোথায় মুক্তি! কবে ইহার অবসান!—কখনও তাহা সম্ভবপর হইবে কি?

চিন্তার ধারার সঙ্গে রমেন্দ্রের মন অনেক দূর—সুদূর অতীতে চলিয়া গিয়াছিল।

"শিশিরবাবু, আর খানকয়েক গরম সিঙ্গাড়ায় আপত্তি আছে?"

প্রকৃতিস্থ হইয়া রমেন্দ্র বলিল, "না।"

রামদীন ভিতর হইতে শুধু সিঙ্গাড়া নহে, নিম্‌কী সহ হাজির হইল।

ভৃত্য চলিয়া গেলে রমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি, ডাক্তারবাবু!"

গিরীন্দ্রনাথ নিম্‌কী চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "কি রকম?"

"আপনি আস্‌বার আগে বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মধুর কণ্ঠের গান শুন্‌তে পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। বোধ হয়, আপনার স্ত্রী গাইতেছিলেন। ভারী মিষ্ট লাগল, তাই শুনেছি। কিন্তু কাযটা ভাল হয় নি। স্ত্রীলোকের গান গোপনে শুনে অভদ্রতা করেছি।"

ডাক্তারবাবু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে রমেন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বক্তব্য শেষ হইলে ডাক্তার

উচ্চহাস্যে বলিলেন, "বাঃ! এতে অন্যায় কায কি হয়েছে? তাঁরা গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন, আর আমাদের শুন্‌তে দোষ?"

রমেন্দ্র বলিল, "আপনার পক্ষে দোষ নয়, সঙ্গত। কিন্তু অন্তঃপুরের দিকে, অনাহূত হয়ে শুন্‌তে যাওয়া অপরাধ নয়? শুধু গান নয়, কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছি। কাযটা অন্যায়, গোপন রাখা আরও অন্যায়। তাই আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌লাম।"

"বটে! আবার কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছেন? আপনার ভাগ্য ভাল বল্‌তে হবে। কি কবিতা, শুনি?"

ডাক্তারবাবু ব্যাপারটাকে সহজভাবে উপেক্ষা করিলেও রমেন্দ্র তাহাতে সায় দিতে পারিল না। সে ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ।"

"সংস্কৃত শ্লোক! কিন্তু আপনার বোধ হয় ভ্রম হয়েছে। আমার স্ত্রী গাইতে জানেন বটে, আবৃত্তিও মন্দ পারেন না; কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সে গান, সে আবৃত্তি আমার স্ত্রীর নয়। আমার শালী এসেছে, তারই হবে। সে চমৎকার গায়। আমি একবার তার মুখে রতিবিলাপের আবৃত্তি শুনেছিলাম।"

"যিনিই হ'ন,—আমার অনধিকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

ডাক্তারবাবু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রমেন্দ্রও একটু অপ্রতিভ হইল। হাসি থামিলে গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ক্ষমা?—আচ্ছা, যাঁদের কাছে আপনি অপরাধী, আপনার আরজি তাঁদের কাছেই পেশ করা যাবে। ক্ষমা করা না-করার মালিক ত তাঁরাই।—এখন ঐ নিম্‌কী ক'খানা শেষ ক'রে ফেলুন ত।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শোকাতুরা

নিঠুর কে গো কোল থেকে মোর
ছিনিয়ে নিলি দুলালী রে!
মায়াবী কোন্ নূতন খেলার
আশায় তারে ভুলালি রে!

আলোক দেশের পথে পথে
ফিরতেছিল সোনার রথে
চপলা সে ঝাঁপ দিয়ে যে
নাম্‌ল আমার কোলে,
ডাক্‌লে মা মা ব'লে,
(ওরে) কোন্ যাদুকর নয়নে তার
নিদের কাঠি বুলালি রে?

ঘুমুল সে কি কাল-ঘুম
চায় না যে আর স্নেহেরো চুম,
নাম-না-রাখা নাম ধ'রে তায়
ডাকি, 'আয় মা ঘুরে'
(ও তোর) মা যে সদাই ঝুরে
(ওরে) পাষাণ কে গো প্রথম হাটেই
বেচা-কেনাই তুলালি রে!

কোন্ ঝড়ে তা কে বলিবে,
জীবনের দীপ গেল নিভে,
আলো বাতাস, গন্ধ বরণ
মিশ্‌ল আঁধারমাঝে,
আজি দীপ হারানো সাঁজে,
(ওরে) কোন্ মায়াবী আমাকে হায়,
ব্যথার মদে ঢুলালি রে!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছুটী

১

গুরুমহাশয় লোচন সরকার ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্, যে যত সকাল সকাল পুজোর পার্ব্বণী দিতে পারবে, তার তত সকাল সকাল ছুটী। নইলে বুঝেছিস্?"

নইলে কি যে হইবে, তাহা গুরু মহাশয় স্পষ্ট না বলিলেও ছাত্ররা কিন্তু স্পষ্টই তাহা বুঝিয়া লইল এবং বুঝিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে পতিত বেতখানির দিকে সকলেই শঙ্কাকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। গুরুমহাশয় বামহস্ত দ্বারা দীর্ঘ গুম্ফরাশিকে সংযত করিতে করিতে বলিলেন, "পুজোর পার্ব্বণী কত জানিস্? দু'আনা। এ ত ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো নয় যে, দু' এক পয়সা পার্ব্বণী দিলেই চলবে। বড় পুজোর বড় পার্ব্বণী। বুঝেছস্ সব?"

কতকগুলি ছাত্র সমস্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে।" যাহারা মুখে কিছু বলিল না, তাহারা ঘাড় নাড়িয়াই এ উত্তরে সায় দিল। গুরু মহাশয় বলিলেন, "কাল-পরশুর মধ্যে পার্ব্বণী সব আনা চাই। শুক্রবারে ছুটী দিয়ে ছেলেদের জন্যে কাপড়-চোপড় কিনতে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে; বুঝেছিস্?"

পুনরায় উত্তর হইল, "আজ্ঞে।"

দুই দিন পরেই ছুটী। ছেলেদের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। পাঠশালার ছুটীর পর তাহারা হর্ষ-কোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল একটি ছেলে তাহাদের এই আনন্দ-কোলাহলে যোগ দিল না; সে ম্লান বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাতে চলিল।

বড় গরীবের ছেলে। বাপ বছরখানেক আগে মারা গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে দুই চারি বিঘা জমীজমা ছিল, বাকী খাজনার দায়ে জমীদার তাহা নীলাম করিয়া খাসে ডাকিয়া লইলেন। বিধবা মা বাড়ীর পুইশাক, লাউ-কুমড়া বেচিয়া, লোকের ঘরে ধান ভানিয়া কোনরূপে দুইটা পেট চালাইতে লাগিল।

বয়স বেশী না হইলেও সাত আট বৎসরের ছেলে, কিন্তু নিজেদের অবস্থা বুঝিল, মায়ের দুঃখ-কষ্ট বুঝিতে পারিল। মা যে তাহারই জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত ঢেঁকি টানিয়া আধ সের চাউল সংগ্রহ করিতেছে, নিজের ভাতগুলি তাহাকে দিয়া নিজে উপবাস দিয়া থাকিতেছে, বালক-বুদ্ধিতেও ইহা বুঝিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কাযেই সে কাহারও গরু চরাইয়াও নিজের পেটের খোরাকের যোগাড় করিতে ইচ্ছুক হইল। মা কিন্তু তাহা করিতে দিল না; বলিল, "না, বাছা, তাঁরও ইচ্ছা ছিল, আমারও ইচ্ছা, তুই দু'কলম লিখতে পড়তে শিখবি।"

ছেলে বলিল, "আমি লেখাপড়া শিখবো, আর তুমি ধান ভেনে বেড়াবে?"

মা হাসিয়া বলিল, "তা ধান ভান্‌লেই বা, কেব্‌লা। তুই লেখাপড়া শিখে দু'পয়সা রোজগার কত্তে পারলে আর ত আমাকে ধান ভান্‌তে হবে না?"

তাহাই হইল। গুরুমহাশয় লোচন সরকারের হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা বেতনে কেব্‌লাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। কেব্‌লা গুরুমহাশয়ের এঁটো বাসন মাজিয়া, তামাক সাজিয়া, পা টিপিয়া দিয়া, যতটুকু অবসর পাইত, লেখাপড়া শিখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

আপনাদের অবস্থার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেব্‌লা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিত না। পাঠশালার ছুটীর পর ছেলেরা রাস্তায় আসিয়া যখন খেলায় প্রবৃত্ত হইত, কেব্‌লা তখন পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া যাইত। কেহ খেলিবার জন্য ডাকিলে বলিত, "না ভাই, ঘরে গিয়ে বেলাবেলি পড়া মুখস্থ কত্তে হবে।"

"দূর বোকা, বেলাবেলি পড়া মুখস্থ করবি কেন? করবি রাত্রে।"

"রাত্রে পড়া কত্তে তেল কোথা পাব, ভাই?"

কেব্‌লার কথায় কেহ কেহ তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূ

করিতে থাকিত। কেব্‌লা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিত না।

আজ কিন্তু আসন্ন ছুটীর সম্ভাবনাতেও কেব্‌লাকে এমন নিরুৎসাহভাবে যাইতে দেখিয়া ঘোষেদের জানকী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, “কি রে কেব্‌লা, ছুটীর সময়েও পড়া মুখস্থ করবি না কি?”

কেব্‌লা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, “হুঁ।”

রায়েদের হরিধন বলিল, “কেব্‌লা হাজরা জজ-মেজেষ্টর হবেই হবে।

জানকী বলিল, “কাল পার্ব্বণী নিয়ে আসবি ত?

ঘাড় দোলাইয়া কেব্‌লা বলিল, “আন্‌বো।”

জানকী বলিল, “না আনলে কিন্তু মজাটা দেখবি।”

২

“মা!”

“কে রে, কেবলা এয়েছিস্? ঘরে আয়।”

“তুমি শুয়ে কেন, মা? জ্বর হয়েছে না কি?”

কাঁথার ভিতর হইতে মুখটা একটু বাহির করিয়া শীতকম্পিত স্বরে মা বলিল, “হাঁ বাছা, পোড়া জ্বর কিছুতেই ভুলতে চায় না। বোসেদের পূজোবাড়ীর ধান ভান্‌তে ভান্‌তে কাঁপুনি এলো।”

কেব্‌লা ঘরে ঢুকিয়া মায়ের মাথার কাছে গিয়া বসিল, এবং তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, “উঃ, তোমার কপালটা আগুনের মত গরম যে, মা।”

মা বলিল, “জ্বরটা এই এসেছে কি না।”

কেব্‌লা নিঃশব্দে গিয়া মায়ের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মা বলিল, “ব’সে রইলি যে, খাবি না?”

মুখ মচকাইয়া কেব্‌লা বলিল, “কি আর খাব?”

মা বলিল, “হাঁড়িতে ওবেলার ভাত রয়েছে, তাই জল ঢেলে খা।”

“খাচ্ছি।”

“কিন্তু তরকারী ত কিছুই নাই। কি দিয়ে খাবি বল দেখি?”

“কি দিয়ে আর? নুণ আছে ত!”

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিল, “ক্ষেপা ছেলে! শুধু নুণ দিয়ে কি ভাত খাওয়া যায়? গাছে একটা বেগুণ ঝুলছে; এক নুড়ো খড় জেলে সেটাকে পুড়িয়ে নে।”

কেব্‌লা বলিল, “আজ আমি বেগুণটা পুড়িয়ে খাব, কাল কি দিয়ে খাবে তুমি? জ্বরে জ্বরে তোমার মুখে ত কিছু রোচে না?”

জ্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতেও মা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার মুখে রোচে না ব’লে তুই শুধু ভাত খাবি? আমার পোড়া পেটে আগুন লাগুক্!”

কেব্‌লা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মা বলিল, “আচ্ছা, থাম্, আমার শীতটা একটু ক’মে এলে আমি নিজেই উঠে—”

ব্যস্ততা সহকারে কেব্‌লা বলিয়া উঠিল, “না না, তোমাকে আর উঠতে হবে না, আমি জোগাড় ক’রে নিচ্ছি।”

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, এবং বেগুণ পোড়াইয়া জলচালা ভাত খাইয়া পুনরায় মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর শীতটা কমিয়া আসিলে মা উঠিয়া বসিল। কেব্‌লা মায়ের কোলের কাছে শুইয়া বলিল, “দেখ মা, গুরু মহাশয়কে পূজোর পার্ব্বণী দিতে হবে।”

মা জিজ্ঞাসা করিল, “পার্ব্বণী কি রে, কেব্‌লা?”

কেব্‌লা বলিল, “পূজোর পার্ব্বণী গো, দু’আনা পয়সা। গুরু মশায় বলেছে, কাল-পরশুর ভিতর যে ছেলে পার্ব্বণী না আন্‌বে, তাকে ছুটী দেবে না। তা ছাড়া মেরে হাড় গুঁড়ো ক’রে দেবে।”

মা বলিল, “পার্ব্বণী দিতে আর সব ছেলেদের বলেছে। গুরু মশায় জানে, তুই গরীবের ছেলে, তোকে কিছু দিতে হবে না।”

মাথা নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, “কিন্তু না দিলে যদি মারে?”

মা বলিল, “না, না, মারবে না, তোর ভয় নাই।”

মায়ের কথায় কেব্‌লা অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক হইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, “দেখ মা, তিনে মাইতি বলছিল, পূজোর সময় তার বাবা তাকে ফুলপেড়ে কাপড় কিনে দেবে।”

দুঃখ-গম্ভীর স্বরে মা বলিল, “পূজোর সময় ছেলেপিলেকে নতুন কাপড় কিনে দিতেই ত হয়, বাছা। কিন্তু আমার যেমন কপাল! গাছে গোটা দশেক কুমড়ো

হয়েছিল। ভেবেছিলাম, দশটা কুমড়ো বেচলে কোন্ না পাঁচ সিকে হবে। তার ভেতর থেকে তোর কাপড় একখানা কিনে দেব। কিন্তু দীনু ঠাকুর এসে ধরলে, মায়ের কাছে বলির জন্যে তিনটে কুমড়ো দিতে হবে। বামুন মায়ের নাম ক'রে চাইলে, দিতে হ'লো। তার পর বোসেরা পাঁচটা নিয়েছে। তা ওরা কি লেহ্য দাম দেবে? বড় জোর দেয় ত গণ্ডা পাঁচেক পয়সা।"

মায়ের কাতরতা দেখিয়া কেব্‌লা বলিল, "আমার নতুন কাপড়ে দরকার নাই, মা। কেন, পুরানো কাপড় প'রে কি ঠাকুর দেখা যায় না?"

মা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখগাঢ় কণ্ঠে বলিল, "তা পুরানো কাপড়ই তোর কোথায়, বাছা? ঐ ত একখানি কাপড়, তার সাত জায়গায় ছেঁড়া।"

কেব্‌লা বলিল, "হোক্ ছেঁড়া। কাপড়খানা কেচে দিও, তা হ'লেই হবে। কিন্তু গুরুমশায়ের পার্ব্বণীর পয়সা না দিলে হয় ত ছুটী দেবে না।"

মা বলিল, "না দেয়, বোসেদের ঘর থেকে কুমড়োর দাম আদায় ক'রে এনে দেব তখন।"

মায়ের কথায় আশ্বাস পাইয়া কেব্‌লা নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

গুরুমহাশয় ডাক দিলেন, "কৈ রে, পার্ব্বণীর পয়সা সব এনেছিস্?"

ছেলেরা একে একে উঠিয়া পার্ব্বণীর পয়সা লইয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে হাজির করিল। সকলেই উঠিল, শুধু কেব্‌লা উঠিল না। ঘোষেদের রমা বলিল, "কেব্‌লা পয়সা আনে নি, গুরুমশায়।"

গুরুমহাশয় ডাকিলেন, "কেব্‌লা!"

"আজ্ঞে।"

"এ দিকে আয়।"

কেব্‌লা ধীরে ধীরে আসিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। গুরুমহাশয় বেত হাতে লইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পার্ব্বণীর পয়সা কোথায়?"

ভীতিবিবর্ণমুখে কেব্‌লা বলিল, "মা বলেছে, গুরুমশায়, আমাকে পার্ব্বণীর পয়সা দিতে হবে না।"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, "কেন, তুমি আমার গুরুপুত্তুর না কি?"

কেব্‌লা ভয়ে মুখ নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গুরুমহাশয় ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এক পয়সা মাইনে নাই, পার্ব্বণীর দুটো পয়সা দেবে না, বেয়ারিং-পোষ্টে লেখাপড়া শিখবে। ব্যাটা আমার আলালের ঘরের দুলাল রে! ধ'রে নিয়ে আয় ত ব্যাটাকে।"

কেব্‌লা গুরুমহাশয়ের সম্মুখে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। গুরুমহাশয়ের আদেশ পাইয়া একটি ছেলে আসিয়া তাহাকে খুব কাছে ঠেলিয়া দিল। কেব্‌লা ভয়ে চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। ভীতিবিজড়িত স্বরে বলিল, "মা বলেছে, গুরুমশায়—"

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া গুরুমহাশয় সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "তোর মা তোর মাথা খেয়েছে। ব্যাটা গাধা!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতের বেত সপাং করিয়া কেব্‌লার পিঠে পড়িল। কেব্‌লা "মা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই সকাতর চীৎকারে গুরুমহাশয়ের হৃদয় কিন্তু বিচলিত হইল না. তাঁহার হস্তস্থিত বেত্রদণ্ড কেব্‌লায় পিঠে, পায়ে, মাথায়, হাতে সপাং সপাং করিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলার সকরুণ চীৎকারে ক্ষুদ্র পাঠশালা-গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রহৃত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেব্‌লা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয় এতক্ষণে প্রহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া হাতের বেত উঠাইয়া বলিলেন, "বল্ ব্যাটা, পার্ব্বণীর পয়সা আন্‌বি কি না?"

কাঁদিতে কাঁদিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেব্‌লা বলিল, "আন্‌বো, গুরুমশায়, মা বলেছে. কুমড়োর পয়সা আদায় ক'রে—"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কুমড়োর পয়সা? তোদের গাছে কুমড়ো হয়েছে না কি?"

রমা বলিয়া উঠিল, "বিস্তর কুমড়ো ফলেছে, গুরুমশায়।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "এত কুমড়ো হয়েছে, কৈ, আমার জন্যে ত একটাও নিয়ে আসিস্ না। আজ গোটা দুই নিয়ে আসিস্।"

কেব্‌লা তাঁহার আদেশে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া স্বস্থানে বসিল। গুরুমহাশয় বলিলেন, "কাল থেকে সকলের ছুটী, শুধু কেব্‌লার ছুটী নাই। যদ্দিন না পার্ব্বণী নিয়ে আসবে, তদ্দিন তাকে দু'বেলা হাজিরী দিতে হবে।"

ছাত্রদিগকে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া গুরুমহাশয় পার্ব্বণীর পয়সা গণিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেব্‌লা মার খাইয়া ততটা কাতর হইল না, যতটা কাতর হইল অঙ্গের এই সকল প্রহারচিহ্ন লইয়া ঘরে ফিরিতে। বেত্রের নিষ্করুণ আঘাতে তাহার দেহের অনেক স্থানই ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দুই এক যায়গায় কাটিয়া গিয়া একটু একটু রক্তও পড়িতেছিল। এই সকল প্রহার-চিহ্ন লইয়া সে কিরূপে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবে? ইহা দেখিলে মা ত কাঁদিয়াই আকুল হইয়া পড়িবে। হায়, গুরুমহাশয় তাহার দেহকে এরূপে প্রহার-চিহ্নিত না করিয়া অন্য কোনরূপ কঠিন সাজা দিলেন না কেন? কেব্‌লা প্রহার-চিহ্নগুলাকে ঢাকিবার অভিপ্রায়ে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়া ঘরে ফিরিল।

দুপুরবেলা তাহাকে গায়ে কাপড় দিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে কেব্‌লা, গায়ে কাপড় দিয়েছিস্ কেন? কিছু অসুখ-বিসুখ কচ্ছে না কি?"

কেব্‌লা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "না না, অম্নি কাপড়টা গায়ে জড়িয়েছি।"

"কৈ, দেখি তোর গা।"

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া কেব্‌লার কপালে হাত দিয়া শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে কপালটা একটু গরম মনে হচ্ছে। এ কি. মাথার সাম্‌নেটা এত ফুলে উঠেছে কেন?"

কেব্‌লা মাথা নাড়া দিয়া মায়ের কাছ হইতে একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে প'ড়ে গিয়েছিলুম, তাই ওখানটা ফুলে উঠেছে। হাঁ মা, কুমড়ো দুটো কি হ'লো?"

মা বলিল, "সে দুটো গাছ থেকে তুলে রেখেছি। বোসেরা আরও দুটো কুমড়ো চেয়েছিল। বিকেলে নিয়ে যাব। দেখি, যদি সাতটা কুমড়োর দাম পাই, তোকে একখানা কাপড় এনে দেব।"

কাপড়ের নামে কেব্‌লার মুখখানা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা ম্লান হইয়া আসিল। বলিল, "কাপড় ত এনে দেবে, কিন্তু গুরুমশায় যে দু'টো কুমড়ো চেয়েছে।"

মা বলিল, "চেয়েছে—দেব। গাছে ত আরও অনেক ফল ধরেছে। বড় হ'লে দিয়ে আসবি।"

ঘাড় নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, "না মা, গুরুমশায় রাগ করবে। আমার কাপড়ে কায নাই।"

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিল, "তোর কায নাই, আমার কায আছে। সব ছেলে নতুন কাপড় প'রে ঠাকুর দেখতে যাবে, আর তুই আমার ছেঁড়া কাপড় প'রে বেড়াবি? কপালই না হয় মন্দ হয়েছে, কিন্তু সাধ-সয়াল ত যায় নি, বাছা! আজ যদি সে বেঁচে থাক্‌তো।"

বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। কেব্‌লা বলিল, "ভাত দেবে চল, মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

মা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ছেলেকে ভাত দিতে চলিল।

ভাত খাইতে খাইতে কেব্‌লা বলিল, "গুরুমশায়ের পার্ব্বণীর পয়সাটা দিতে হবে, মা। নইলে ছুটী দেবে না।"

মা বলিল, "তা হ'লে তোর কাপড় হবে কি ক'রে?"

কেব্‌লা বলিল, "কাপড় হোক্, না হোক্, পার্ব্বণী দিতেই হবে। সব ছেলে ঠাকুর দেখে বেড়াবে, আর আমিই কি পাঠশালে গিয়ে ব'সে থাকবো?"

মা বুঝিল, কথাটা ঠিক। বিষাদখিন্ন স্বরে বলিল, "তাই যা হয় হবে।"

কেব্‌লা বলিল, "যা হয় হবে নয়, দিতেই হবে। আজ তুমি গিয়ে কুমড়োর দাম আদায় ক'রে নিয়ে এস। কাল সকালে পার্ব্বণী দিয়ে ছুটী নিয়ে আসবো। আর ঐ কুমড়ো দুটোও গুরুমশায়কে দিয়ে আসতে হবে। নয় ত গুরুমশায় বড্ড রাগ করবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া মা কেব্‌লার এঁটো পাতর ধুইতে চলিল। কেব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল, "পাতর ধুতে যাচ্ছো, তুমি ভাত খাবে না?"

মা উত্তর করিল, "না। গেল রাত্রে অত জ্বর হয়েছিল, আজ আর ভাতটা খাব না।"

সন্দিগ্ধ স্বরে কেব্‌লা বলিল, "কেন, জ্বর ছেড়ে গেলেই ত তুমি ভাত খাও।"

গম্ভীর মুখে মা বলিল, "খাই ব'লেই ত পোড়া জ্বর ছাড়তে চায় না।"

মা ঘাটে চলিয়া গেল। কেব্‌লার সন্দেহ হইল। সে ঘরে ঢুকিয়া চাউলের হাঁড়ি খুঁজিয়া দেখিল, হাঁড়িতে এক মুঠাও চাউল নাই। মা ঘাট হইতে ফিরিলে কেব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, জ্বরের জন্যে ভাত খেলে না, না চাল নাই ব'লে উপোস দিলে ?"

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "জ্বরের জন্যেও বটে, চালও আজ বাড়ন্ত। সকালে ধান ভান্‌তে গেলে আধ সের চাল আসতো, তা রেতে জ্বরে হাড় ভেঙে দিয়েছে, সকালে আর ঢেঁকি টান্‌তে যেতে পারলুম না। দেখি, পারি যদি এ বেলা যাব।"

ভারীমুখে কেব্‌লা বলিল, "তা পারলে না যখন, তখন অতগুলো ভাত আমাকে না খাইয়ে তুমিও ত ওর এক মুটো খেলে পারতে ?"

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিল, "পাগল ছেলে! তোকে আধ-পেটা খাইয়ে তোর ভাত আমি খেতে যাব ?"

রাগতভাবে কেব্‌লা বলিল, "আর তোমাকে উপোস রেখে আমাকেই পেট ভ'রে খেতে হবে বুঝি ?"

স্নেহসজল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিল, "ওরে ক্ষ্যাপা, ছেলের পেট ভরলেই মায়ের পেট ভরে, তা জানিস্ ?"

রাগে মুখখানাকে ভারী করিয়া, জোরে মাথা নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, "হাঁ, জানি।"

বলিয়াই সে মায়ের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। মা স্নেহ-প্রফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'আমি বড় দুঃখী, কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও আমার মত সুখী কে ?. এমন মাতৃভক্ত ছেলে কোন্ ভদ্রলোকের ঘরে আছে ?'

বিকালে কেব্‌লার মা কিন্তু ধান ভানিতে যাইতে পারিল না। রাত্রিতে জ্বর ভোগ করিয়াছে, তাহার উপর সারাদিনের উপবাস। কিন্তু রাত্রিতে কেব্‌লা কি খাইবে ? কেব্‌লার মা ভাবিল, "দেখি যদি কুমড়োর দাম পাই, তা থেকেই না হয় এক আনার চাল কিনে আনবো। কাপড় কেনা ত হ'লো না।"

এইরূপ স্থির করিয়া কেব্‌লার মা কুমড়ার দাম আদায় করিবার জন্য বোসেদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সকালে ধান ভানিতে না আসায় বোস-গিন্নী তাহার উপর এতই রাগিয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং কেব্‌লার মা যে নেহাৎ ছোটলোকের মেয়ে, তাহার আদৌ কথার ঠিক নাই, তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বোস-গিন্নী দয়ে ডুবিতে বসিয়াছেন, বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেব্‌লার মা আপনার অসুখের কথা জানাইয়া তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অসুখে বোস-গিন্নীর কি আইসে যায় ? পূজায় দশ মণ চাউলের খরচ। কেব্‌লার মা ধান ভানিয়া এই চাউল তৈয়ার করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এখন অসুখের দোহাই দিয়া কথার খেলাপ করিলে চলিবে কেন ? শেষে কি তাঁহাকে লোকের কাছে 'অভ্রম' হইয়া পড়িতে হইবে ?

কেব্‌লার মা বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া, কাল সকালে নিশ্চয়ই ধান ভানিতে আসিবে বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিল। তাহার পর সে কুমড়া পাঁচটার দাম চাহিল। বোস-গিন্নী তখন আর দুইটা কুমড়া আনিবার কথা বলিলে কেব্‌লার মা জানাইল যে, সে দুইটা কুমড়া আপাততঃ দিতে পারিবে না। ইহাতে বোস-গিন্নী পুনরায় রাগিয়া উঠিলেন; ক্রোধভরে জানাইলেন যে, বাকী কুমড়া দুইটা না দিলে এক পয়সাও দিবেন না। কেব্‌লার মা কাতরতা সহকারে বলিল, "নিদেন আজ তিন গণ্ডা পয়সা দাও, মা। নইলে ছেলেটা পাঠশালে ছুটী পাবে না, আজ রাত্রে তাকে উপোস দিতে হবে।"

বোস-গিন্নী কিন্তু তাহার কাতরতায় বিচলিত হইলেন না; বলিলেন, "কাল সকালে কুমড়ো দুটো নিয়ে ধান ভানতে আসবি। সব পয়সা মিটিয়ে দেব।"

কেব্‌লার মা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অন্ততঃ এক আনা পয়সার জন্য বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। বোস-গিন্নী কিন্তু এই ছোটলোক মাগীর ঘ্যানঘ্যানানিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বাড়ীতে পূজা, তাঁহার কত কায; বসিয়া বসিয়া কেব্‌লার মা'র দুঃখের কাহিনী শুনিলে ত তাঁহার চলিবে না। কাযেই তিনি কেব্‌লার মাকে কল্য আসিবার জন্য আদেশ

দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কেব্‌লার মা চোখের জল চোখে চাপিয়া হতাশভাবে ঘরে ফিরিল!

কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিল, কেব্‌লার জ্বর আসিয়াছে, তাহার দেহের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে ছেঁড়া কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া ঘরের বাহিরে রোদে পড়িয়া রহিয়াছে। কেব্‌লার মা ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যগ্র, শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ সব কি রে কেব্‌লা?"

কেব্‌লা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিল, "ও সব কিছু নয়, কুমড়োর দাম পেয়েছ?"

মা বলিল, "আজ পাওয়া গেল না, বাছা, কাল দেবে বলেছে।"

কেব্‌লার জ্বরস্ফীত মুখখানা নৈরাশ্যে বিবর্ণ হইয়া আসিল; বলিল, "কাঁথাখানা এনে আমার গায়ে চাপা দাও, মা, বড্ড শীত কচ্ছে।"

সন্ধ্যার পর জ্বরটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। জ্বরের প্রকোপে কেব্‌লা সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল। মধ্যে মধ্যে করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে ছুটী দেবে না, মা গো, আমাকে ছুটী দেবে না!"

৮

সকালেও জ্বরের বেগ কমিল না দেখিয়া কেব্‌লার মা ভীত হইয়া পড়িল। শুধু জ্বর নয়, সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা, সারা দেহটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কেব্‌লার মা ছেলেকে ফেলিয়া রাখিতে সাহস করিল না, ডাক্তারের কাছে ছুটিল।

গ্রামে একমাত্র ডাক্তার হরিশ বোস। কিন্তু ম্যালেরিয়া আসিয়া দেশের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহার স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত ছিল না। লোক হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছিল না। এ অবস্থায় কেব্‌লার মা তাঁহার সহিত একটা কথা কহিবার অবকাশও পাইল না।

আধ ক্রোশ দূরে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কেব্‌লার মা অগত্যা ছেলেকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানেও রোগীর সমাগমে যেন রথযাত্রার মেলা বসিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু প্রত্যেক রোগীর নাড়ী দেখিবারও অবসর পাইতেছেন না। তিন জন কম্পাউণ্ডার ঔষধ যোগাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছে।

ডাক্তারবাবু কেব্‌লার হাতখানা একবার স্পর্শ করিয়াই জ্বর-মিক্‌শ্চারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেব্‌লার মা ছেলের গা-হাতের বেদনার কথা বলিতে গেল। কিন্তু এত কথা শুনিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি কেব্‌লার মাকে ধমক্‌ দিয়া অন্য রোগী দেখিতে ব্যস্ত হইলেন।

ঔষধ পাইতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। এখন শরতের রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। সেই রৌদ্রে সাত বছরের ছেলেকে কোলে লইয়া, জল-কাদা ভাঙ্গিয়া ঘরে ফিরিতে কেব্‌লার মা এতই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, রাস্তার মাঝে মাঝে না বসিয়া আসিতে পারিল না। সুতরাং ঘরে ফিরিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল।

ঔষধ ত পাওয়া গেল, কিন্তু পথ্যের উপায়? কেব্‌লার মা ছেলেকে ঘরে শোয়াইয়া বোস-গিন্নীর কাছে ছুটিল। সকালে ধান ভানিতে না আসায় বোসগিন্নী একে ত তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর এমন অসময়ে পয়সার তাগাদায় বিরক্ত হইয়া যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ছোটলোক মাগীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেব্‌লার মা সে সকল তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইয়া, স্বীয় দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া দুই গণ্ডা পয়সার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। অগত্যা বোসগিন্নী তাহাকে দুই গণ্ডা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া, ছোটলোকের যে আজকাল কিছুমাত্র আক্কেল নাই, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেব্‌লার মা সেই দুই গণ্ডা পয়সা পাইয়াই কৃতার্থ হইল। তাহা হইতে সে ছেলের জন্য সাবু-মিছরী কিনিয়া আনিল এবং দুই পয়সার মুড়ী আনিয়া নিজের দুই দিনের উপবাসের পারণা করিল।

সেই দিন বৈকালে কেব্‌লার মা নিজেও জ্বরে পড়িল। কিন্তু নিজের জ্বরকে সে গ্রাহ্য করিল না। পরদিন সে আবার কেব্‌লাকে কোলে লইয়া সরকারী ডাক্তারখানায় গেল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া, জলখাবার ঘটীটি বাঁধা দিয়া নিজের ও পুত্রের পথ্যের যোগাড় করিল।

সরকারী ঔষধে কেব্‌লার জ্বর কিন্তু কমিল না। আগে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইতেছিল। এখন কিন্তু দিনরাত

সমানভাবে জ্বর ভোগ করিতে লাগিল। গায়ের বেদনাও বাড়িয়া উঠিল, চোখ দুইটা লাল হইল; জ্বর যখন বেশী হইত, তখন নানাবিধ প্রলাপ বকিতে থাকিত। জ্বর একটু কমিয়া আসিলে নির্জ্জীবভাবে পড়িয়া থাকিত।

প্রতিবেশীরা কেব্‌লার অবস্থা দেখিয়া তাহার মাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল, "ও কেব্‌লার মা, তোর কেব্‌লার অসুখ শক্ত। হরিশ বোসকে এনে দেখা।"

কিন্তু হরিশ বোসের একে ডাক্তারীর ঝঞ্ঝাট, তাহার উপর বাড়ীতে পূজা। সুতরাং কেব্‌লাকে দেখিতে আসা দূরের কথা, কেব্‌লার মা'র কাঁদাকাটা শুনিবার অবসরও তাঁহার ছিল না।

সে দিন ষষ্ঠী। লোচন সরকার ছেলেদের কাপড়-চোপড় কিনিয়া মুটের মাথায় দিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিতেছিলেন। গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, রাস্তার পাশে বটগাছের তলায় কেব্‌লার মা কেব্‌লাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কেন, কেব্‌লার মা?"

ডাক্তারখানা হইতে ফিরিতে ফিরিতে কেব্‌লার মা'র জ্বর আসিয়াছিল। কাযেই সে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বটগাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; গুরু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিল, "কেব্‌লার আজ পাঁচ দিন জ্বর। ওকে নিয়ে কোম্পানীর ডাক্তারখানা গিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তার মাঝে মুখ-পোড়া জ্বর এসে আমাকে ধরেছে।"

তাহার কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কেব্‌লা বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জল, জল। আমাকে ছুটী দেবে না, মা গো, আমাকে ছুটী দেবে না।"

গুরুমহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কেব্‌লার অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া বলিল, "এক কায কর্, কেব্‌লার মা, বোস-গিন্নীকে গিয়ে ধর্। সে বললে ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আস্‌বে।"

বোস-গিন্নী তখন গা-কাপড় ধুইয়া বোধনের পূজার উদ্যোগ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কেব্‌লার মা গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা গো, আমার কেব্‌লাকে বাঁচাও।"

বোস-গিন্নী শশব্যস্তে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধ-রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মর্ মাগী, আমি নেয়ে-ধুয়ে পূজোর জো কত্তে যাচ্ছি, এমন সময় এসে ছুঁয়ে দিলি! পুকুরে আবার ডুব দিয়ে মরি। ছোটলোক মাগীর কি একটুও আক্কেল নাই?"

কেব্‌লার মা স্বীয় অন্যায় কার্য্যের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল। বোস-গিন্নী তাহাকে গালি দিতে দিতে পুনরায় স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সেই দিন ভোরের সময় বোসেদের বাড়ীতে সানাইটা যখন আগমনীর সুরে গ্রামখানাকে জাগরিত করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"দেখ না নয়নে গিরি গৌরী আমার সেজে এলো।
এত দিনের পরে আমার পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হ'লো।"

ঠিক সেই সময় কেব্‌লার মা'র ঘর হইতে একটা আর্ত্ত-চীৎকার উত্থিত হইয়া ঊষালোকপ্রফুল্ল শারদাকাশে বিলীন হইয়া গেল। কেব্‌লা ছুটী পাইয়া কোন্ অজানিত দেশে পূজা দেখিতে চলিয়া গেল!

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অপার করুণা-নিধি তুমি বিধি হরি-হর,
চিন্ময় পরমব্রহ্ম ধরি নর-কলেবর!

নির্গুণে সগুণ কায়া,
অরূপে সরূপ মায়া,
অভয় চরণ-ছায়া বাঞ্ছা-কল্পতরুবর!

অহেতুকি কৃপাসিন্ধু,
অজ্ঞান তিমির-ইন্দু,
অকিঞ্চন-জন-বন্ধু প্রেমার্ণব-সুধাকর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

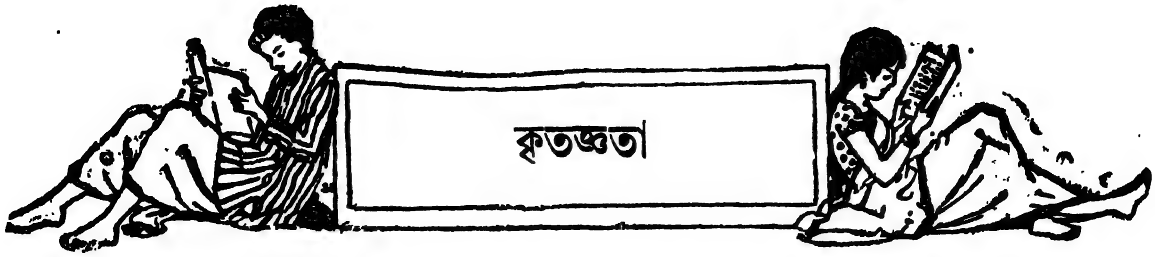

কৃতজ্ঞতা

স্তব্ধ গভীর রাত্রি। মেঘলা—থম্‌থমে অন্ধকার। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমীর চন্দ্রকলা অনেকক্ষণ অস্তমিত। ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল দুদিন আগে চুকে গেছে, কিন্তু নিরীহ হিন্দু পথিকদের বুকে গুণ্ডাদের ছোরা বিঁধার রক্তপাত এখনও বন্ধ হয় নি। তাই সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সকল বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হয়েছে; সন্ধ্যা-রাত্তেই পাড়া নিশুতি; এখন ত গভীর রাত্রি। কিন্তু কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পার্‌ছিল না, কখন্ কি হয়, এই ভয়ে সকলের গা ছম্‌ছম্ কর্‌ছিল, ছ্যাক্‌ছ্যাক্ ক'রে ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। গুজব রটেছে, গুণ্ডারা বাড়ী লুঠ কর্‌বে, স্ত্রীলোকদের বে-ইজ্জত কর্‌বে। মেয়েরা শিয়রের কাছে বঁটি রেখে শুয়েছে, পুরুষরা হাতের কাছে যা-হোক একটা কিছু হাতিয়ার রেখে দিয়েছে; কিন্তু কার ঘরে কিই বা হাতিয়ার আছে? একগাছা মোটা পোক্ত বড় লাঠিরও ত সঙ্গতি নেই। তাই, সকলের প্রাণ কি-হয় কি-হয় ভয়ে সদাই তুক্‌তুক্ কর্‌ছে।

এক বাড়ীর বারান্দায় ধুপ ক'রে কিছু পড়ার শব্দ হ'ল। কোমলা সেই শব্দে চম্‌কে জেগে উঠলো। কোমলা আজ রক্ষা-পঞ্চমীর ব্রত করেছে; স্বামি-সৌভাগ্য ও অবৈধব্য কামনায় সে উপবাসী আছে। উপবাসের ক্লেশে আর মুসলমান-উপদ্রবের উদ্বেগে তাহার নিদ্রা বেশ গভীর হয় নি। সে জেগে উঠ্‌তেই তার বুক ভয়ে ঢিপ-ঢিপ কর্‌তে লাগল। সে তাহার পার্শ্বে শয়ান স্বামীকে হাত দিয়ে নাড়া দিতে দিতে ভয়ে-ভয়ে চাপা স্বরে ডাক্‌লে—"ওগো, শুন্‌ছো? বারান্দায় ঢিল পড়ল কিংবা কোন লোক লাফিয়ে পড়লো!"

বীরেন্দ্র বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বিকট স্বরে চীৎকার কর্‌তে লাগল—"পাড়াপড়শী, জাগো জাগো! সাবধান! সাবধান! হুঁসিয়ার! ঢিল! ঢিল!"

নিমেষ-মধ্যে সমস্ত পাড়া উচ্চকিত হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে হারিকেন্-লণ্ঠন জ্বালাই ছিল, লণ্ঠনের প্যাঁচে মোচড় লেগে চকিতে শত শত শিখা উস্কে জ্ব'লে উঠলো।

সাহসী যুবকরা শাল, আলোয়ান, র‍্যাপার, দোলাই যে যা হাতের কাছে পেলে, তাই দিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। এক বাড়ীতে কাঁসর বেজে উঠল; সেই শব্দ শুনে দূরের এক বাড়ীতে শাঁখ বাজল। এম্‌নি ক'রে কাঁসরের ঝন্‌ঝনা আর শাঁখের শব্দ এক পাড়া থেকে আর পাড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে বহুদূরের লোককেও সজাগ ক'রে তুললে। কোন কোন বাড়ী থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হ'ল; কোন কোন বাড়ীতে বড় বড় পট্‌কা সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছিল, মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয় দেখাবার জন্যে তাতেও আগুন দিয়ে দমাদম্ শব্দ করা হ'তে লাগল। পাড়ার রায়-বাহাদুর মুক্তকচ্ছ হয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে পুলিসে টেলিফোন কর্‌তে লাগলেন। পাড়ায় বিষম গণ্ডগোল লেগে গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় কোন্ দিকে?" কেউ বলে—"ঐ দিকে। ঐ দিকে!" কেউ বলে—"না, না, শব্দটা ও-পাড়া থেকে এলো মনে হ'ল।" কেউ বলে—"চল্, বেরিয়ে দেখি।" কেউ বলে—"রোস্, গোঁয়ারতুমি করিস্‌নে, অন্ধকারে চোরা-গোপ্তা কে কোথায় ছোরা বসিয়ে দেবে!" কেউ বল্‌লে,—"বাছাধনরা ঢিল ফেলেছেন, এইবার পাট্‌কেলটি খেয়ে ফির্‌বেন।"

পাড়ার দু-চারখানা বাড়ীর ছাদ থেকে দুড়দাড় ক'রে ইষ্টকবৃষ্টিও হয়ে গেল—অন্ধকারে অদেখা দুষমনদের উদ্দেশে।

চারিদিকের হট্টগোলের মধ্যে কোমলার বারান্দা থেকে একটু কোমল শব্দ হলো—"মিউ!"

কোমলা সেই শব্দ শুনে আশ্বস্ত ও লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—"ও মা! ঢিল্ নয়! বেড়াল! বেড়ালটা পাশের বাড়ী থেকে বারান্দায় লাফিয়ে পড়েছে।"

কোমলা ঘরের দরজা খুলে দিতেই বিড়ালটা পথ পেয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

তা দেখে বীরেন্দ্র বল্‌লে—"তা হোক্,সাবধানের বিনাশ নাই। পাড়া সর্‌গরম থাক্‌লে শালারা আস্‌তে সাহস কর্‌বে না।"

কোমলা হেসে বল্‌লে—"ওরা আমার ভাই হ'লে অত ভুঁদে দজ্জাল গুণ্ডা হ'ত না।"

বীরেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললে—"তাও বটে! যারা অকারণে নরহত্যা করে, তারা সয়তানের সহোদর!"

কোন্ বাড়ী থেকে ঢিল পড়ার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, ঘুমের ঘোরে কেউ ঠাহর কর্‌তে পারে নি। সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল,—"কোন্ বাড়ীতে কোন্ দিক থেকে ঢিল পড়লো?"

কিন্তু চেঁচামেচিই সার হ'ল, কিছুই নির্ণয় হ'ল না। বীরেন্দ্র আর সাড়াশব্দ কর্‌ছিল না।

কোথায় ঢিল পড়েছে, জান্‌তে না পেরে এবং মুসলমানের কোনও পাত্তা না পেয়ে, সকলে যুগপৎ হতাশও হ'লো এবং আশ্বস্তও হ'লো। সকলে খানিকক্ষণ গোলমাল ক'রে আবার শুয়ে পড়বার জোগাড় কর্‌ছে, এমন সময় গলীর বুকের উপর উজ্জ্বল আলোক-ধারার দীর্ঘ স্রোত বইয়ে দিয়ে একখানা মোটরগাড়ী ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ছুটে এলো। সকলে সচকিত হয়ে দেখে ব'লে উঠল—"পুলিস! পুলিস!… …আরে!……পুলিস সাহেব নিজে এসেছেন!"

কাঁসর, শাঁখ, বন্দুক আর পট্‌কার শব্দ শুনে,আর রায়বাহাদুরের টেলিফোন পেয়ে পুলিস তৎপরতার সঙ্গে ছুটে এসেছে। তারা শব্দ ধ'রে আন্দাজ ক'রে এক পাড়ায় গিয়ে সন্ধান কর্‌তেই সে পাড়ার লোকরা ব'লে দিলে—"এ পাড়ায় ত নয়, ঐ দক্ষিণদিক থেকে শব্দ এসেছিল।" সেই পাড়ায় গেলে, সেই পাড়ার লোকরা বল্‌লে—"এ পাড়ায় ত নয়, ঐ পশ্চিমদিকে হবে বোধ হয়।"

পুলিস এম্‌নি ক'রে গলীর গোলকধাঁধায় ঘুর্‌পাক খেতে খেতে বীরেন্দ্রদের পাড়ায় উপস্থিত হয়েছে।

পুলিস ও পুলিস-সাহেবকে সমবেত দেখে সকল বাড়ী থেকে দুই এক জন সাহসী লোক বাইরে বেরিয়ে এল।

তাদের সমবেত দেখে পুলিস-সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ক্যা হুয়া?"

অনেকে একবাক্যে ব'লে উঠল—"বাড়ীতে ইটা ফেক্‌তা হ্যায়, হুজুর!"

সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোন্ কোঠীমে ইটা গিরা?"

সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল,—"সব বাড়ীমে হুজুর, সব বাড়ীমে!"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"নজদিক্‌মে কোই মুসল্‌মান হ্যায়?"

অনেকে ব'লে উঠল—"হ্যায়, হুজুর, হ্যায়, এই বগলমে বসিরুদ্দীন মিঞা রহতা হ্যায়……"

হিন্দু পাড়ার মধ্যে বসিরুদ্দীন ভয়ে-ভয়ে বাস কর্‌ছিল। তাহার স্বধর্ম্মীদের অপরাধে ক্রুদ্ধ হিন্দুরা কোন্ দিন বা তাকে লাঞ্ছনা করে। পাড়ায় গোলমাল শুনেই সে বেচারার ত্রাস-তরল নিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল; সে কান পেতে শুন্‌ছিল—ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের? যখন সে বহুলোকের মুখ থেকে তার নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুন্‌ল, তখন তার বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় কড়ায় করাঘাত এবং বজ্র-কণ্ঠের আহ্বান শুন্‌তে পেলে—"কোন্ হ্যায়, কেওয়াড়া খোলো …..”

বসিরুদ্দীন ঘরের কোণে অন্ধকারে লুকিয়ে আল্লার নাম স্মরণ কর্‌তে লাগল।

বাড়ীর ভিতর থেকে কারও সাড়া না পেয়ে, পুলিস দমাদম্ লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌লে। মড়াৎ ক'রে দরজা ভেঙ্গে খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসিরুদ্দীনের বাড়ীর মধ্য থেকে রমণীর ও শিশুর ভয়ব্যাকুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হ'ল, কিন্তু বসিরুদ্দীনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পুলিস রোরুদ্যমানা রমণীদের আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে—"রোও মৎ, রোও মৎ, জানানা ঔর বাচ্চোঁকা কুছ ডর নেহি হ্যায়। মরদ্ আদমী কোই হ্যায় ত বাৎলাও।"

রমণীরা ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—"নেহি, হুজুর, নেহি, কোই মরদ্-আদমী কোঠীমে নেহি হ্যায়।"

পুলিস এই কথায় প্রত্যয় না ক'রে সব ঘ

বিদ্যুৎ-মশালের আলো ফেলে ফেলে তল্লাস ক'রে দেখলে, কেউ কোথাও নেই।

তারা সব ফিরে আস্‌ছে, এক জন বল্‌লে—"পাইখানাটা দেখা হয় নি।"

অম্‌নি দুজন কন্‌ষ্টেবল পাইখানার সাম্‌নের ছেঁড়া চটের পর্দা সরিয়ে দেখলে, এক জন পুরুষ পাইখানার ফোকোর দিয়ে নীচে নেমে পড়বার চেষ্টা কর্‌ছে।

হিন্দু কন্‌ষ্টেবল মুসলমানের নাগাল পেয়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"ইহাঁ পর ছিপাকে হ্যায়, হুজুর!" এবং বসিরুদ্দীনের দাড়ি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে তাহাকে বাইরে নিয়ে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরে লাথি, কিল, চড় বর্ষণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হয়ে গেল।

সাহেব হুকুম দিলেন—"হাত বাঁধ্‌কে উস্‌কো থানামে লে যাও।"

বসিরুদ্দীন ভয়বিহ্বল কাতর স্বরে বল্‌লে—"আমার কি কসুর, হুজুর? আমি ত বাড়ীর বাইরে বি যাই নি…"

সাহেব ধমক্ দিলেন—"চোপ্, রও শূয়ার …"

এই সব শুনে ও বসিরুদ্দীনের লাঞ্ছনা দেখে ব্যথিত হয়ে কোমলা স্বামীকে ডেকে বল্‌লে—"ওগো, নির্দ্দোষী লোকটাকে অপমান কর্‌ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ? বলো না গিয়ে সাহেবকে যে, টিল্‌টিল্ কিছু পড়ে নি, একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়েছিল, তাতেই ঘুমের ঘোরে টিল পড়া ব'লে ভুল হয়েছিল…"

বীরেন্দ্র স্ত্রীর প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে বল্‌লে—"হ্যাঃ, আমি বল্‌তে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ি আর কি! যাক্ বেটা গরুখোর মোস্‌লা, মজাটা টের পেয়ে আসুক!"

কোমলা ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—"আহা, না না, নির্দ্দোষী মানুষ, তাতে আবার পড়শী, তাকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তুমি সাহেবকে গিয়ে বল…আমার নামেই দোষ দিয়ে বোলো, তা হ'লে সাহেব তোমাকে কিছু বল্‌বে না, আমি মেয়েমানুষ ব'লে আমাকেও কিছু বল্‌বে না · "

যে দেশের নীতিশাস্ত্রের উপদেশ "আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি" সেই দেশের বীরপুরুষ বীরেন্দ্র; সে মনে কর্‌লে—স্ত্রীর উপর দোষারোপ ক'রে আপনি বেঁচে যদি পরকে বাঁচানো যায় ত মন্দ কি? সে বাহিরে গিয়ে সাহেবকে লম্বা সেলাম ক'রে বল্‌লে—"হুজুর, আমার স্ত্রী বল্‌ছে, বাড়ীতে টিল-টিল কিছু পড়ে নি, একটা বিড়াল লাফিয়ে পড়েছিল, তাই ঘুমের ঘোরে সে মনে করেছিল, টিল পড়লো বুঝি।"

সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তা হ'লে কোন বাড়ীতে টিল পড়ে নি?

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আজ্ঞে না, হুজুর।"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তা হ'লে এই আদ্‌মীর কোন দোষ নেই?"

বীরেন্দ্র আবার বল্‌লে—"আজ্ঞে না, হুজুর।"

তখন সাহেব একটু হেসে বসিরুদ্দীনকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

বসিরুদ্দীন মুক্তি পেয়ে সাহেবকে দুহাতে সেলাম ক'রে পলায়নোদ্যত হ'ল।

সাহেব বসিরুদ্দীনকে ধম্‌কে বললেন—"এই বাবুকো সেলাম করো; বাবুকা ওয়াস্তে তোম্ খালাস পায়া .."

বসিরুদ্দীন যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে নত হয়ে পুনঃ পুনঃ সেলাম কর্‌তে কর্‌তে বীরেন্দ্রকে বললে—"বাবু, তোমার বড় মেহেরবানি বাবু! খোদায় দোয়া কর্‌বো! খোদায় তোমারে সেলামতে রাখবো! তোমার গাওগতর ভালা থাক্‌বো! সেলাম বাবু! আমরা ত তোমাগো পায়ের জুতি!……"

পুলিস মোটর ঘুরিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে চ'লে গেল।

পাড়ার লোকরা একবাক্যে বীরেন্দ্রকে তিরস্কার কর্‌তে লাগলো—"আঃ! তোমার আবার ধর্ম্মজ্ঞান চেগে উঠল! বেটা মোস্‌লাকে বাঁচিয়ে দিলে! বাছাধন একটু ঘোল খেয়ে টিট্ হয়ে ফিরে আস্‌তো!"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আহা, নির্দ্দোষী বেচারা!"

কেউ বীরেন্দ্রের বোকামীর ও কেউ বা তার সাধুতার সমালোচনা কর্‌তে কর্‌তে যে যার বাড়ীতে চ'লে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে পাড়া আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বীরেন্দ্র বাড়ী থেকে বাহির হতেই তাহার সঙ্গে বসিরের দেখা হ'ল। বীরেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—"সেলাম, মিঞা সাহেব, কাল একটা ভুলের জন্যে তোমার উপরে খামাখা জুলুম হ'ল, তুমি কিছু মনে ক'র না, ভাই …"

বসির বল্‌লে—"আমার তগদিরে যে-ইজ্জতি আছিলো, নসিবের লেখা, বাবু, ক্যাটা রদ কর্‌বো? তুমি কসুর কবুল না কোল্লে ত আরও বি বেইজতি অইতো। আল্লা তোমার জান্‌-মালের উপর দোয়া কর্‌বো; আমি তোমার গোলাম অইয়া রইলাম..."

যাহারা বসিরের এই কথা শুন্‌লে, তাহারা সবাই বল্‌লে—"লোকটা কিন্তু পাজি নয়।"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"মুসলমানদের মধ্যেও ত সাধু মহাত্মা আছেন; তাদের মধ্যেও ভাল লোকের অভাব নেই। কত হিন্দুকে মুসলমানের হাত থেকে মুসলমানই বাঁচিয়েছে। বদ্‌মায়েস গুণ্ডা সকল জাতের মধ্যেই আছে, হিন্দুর মধ্যেও আছে।"

এক জন প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে—"তা বটে, কিন্তু সংখ্যার বেশী আর কম দেখে জাতের ভাল মন্দ বিচার হয়। ওদের মত নির্দ্দোষী পথিককে খুন্‌ কর্‌তে হিন্দু সহসা পারে না।"

মুসলমানের পক্ষ নিয়ে বীরেন্দ্র বল্‌লে—"যত ডাকাইতী হয়, তা কি সব মুসলমানই করে?"

এই সব তর্ক-বিতর্ক শুন্‌তে শুন্‌তে বসির "ইয়া আল্লা!" ব'লে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল।

বসির চ'লে গেলে এক জন বীরেন্দ্রকে বল্‌লে—"তা যা বল, ভাই, 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু মোসলা-কুলেষু চ।' কারণ, দু-জনেরই কাছা নেই! সাবধান! সাবধানের বিনাশ নেই, ভাই।"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"সাবধান ত আছিই।"

পাড়ার লোক যে যার কাযে চ'লে গেল।

বীরেন্দ্র বাড়ীর ভিতরে আস্‌তেই কোমলা তাকে বল্‌লে—"ওগো, চাল বাড়ন্ত। কাছাকাছি কোনও দোকানে কি চাল পাওয়া যাবে?"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"কারও বাড়ী থেকে ধার ক'রে..."

কোমলা বল্‌লে—"কাল দুবেলা দু-বাড়ী থেকে ধার ক'রে এনেছি, আর কার কাছে..."

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আচ্ছা, তবে আমার জামা-ছাতা আর একখানা নোট এনে দাও দেখি..."

কোমলা জামা, ছাতা ও নোট এনে দিলে।

বীরেন্দ্র বাহির হয়ে চল্‌ল।

কোমলা বল্‌লে—"বেশী দূরে যেও না, খুব সাবধান হয়ে যেও .."

বীরেন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল—"হুঁ, সদর রাস্তা দিয়ে যাব, সদর রাস্তায় গুর্খা সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।"

বীরেন্দ্র সদর রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরেই বাজারের দিকে চল্‌ল। বীরেন্দ্রকে যেতে দেখে বসিরও চট্‌ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা গলীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কিছু দূর গিয়ে বসির গলী থেকে বেরিয়ে বীরেন্দ্রের সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল এবং হঠাৎ যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেল, এই ভাবে হেসে বল্‌লে—"এই যে বাবু, কুন হানে যাইবা?"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত, তাই চারটি চাল আন্‌তে চলেছি।"

বসির বল্‌লে—"একলা যাইবা? দিনকাল ভালা না। চলো আম্‌ বি যাই। মোছল্‌মান্‌ মার্‌তে আইলে তোমারে আমি বাঁচামু, আর হিন্দু মার্‌তে আইলে তুমি আমারে বাঁচাইবা।"

বীরেন্দ্র সাহস পেয়ে বল্‌লে—"তাই বেশ হবে, দুজনে যাই চল ..তোমার কোন কায আছে বাজারে?"

বসির বল্‌লে—"হাঁ, আমারও কিছু সওদা কর্‌তে অইবো—"

তাহারা দুই জনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সম্বন্ধেই আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল।

বসির বল্‌লে—"যতো হালা পাজি বদমায়েস কি কাণ্ডটাই কোল্লে, বাবু? আমরা সব পাড়া-পড়শী ভাই-বেরাদরের সামিল, আমাগো না অইলে তোমাগো চল্‌বো না, আর তোমাগো না অইলে আমাগো চল্‌বো না..."

বীরেন্দ্র বললে—"হ্যাঁ, তা ত বটেই! এক দেশের বাসিন্দা আমরা, এক মায়ের পেটের ভাই-ই ত।"

বসির এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"চলেন বাবু, এই গলী দিয়া জল্‌দি যাওন যায়..."

বীরেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—"গলী দিয়ে যেয়ে কায নেই, মিঞা, কি জানি, কোথা থেকে কে .."

বসির বল্‌লে—"ভয় কি, বাবু, আমরা দুই জনা, নিজেরা নিজেরা সামাল দিয়া ঝট কইরা চইলা যামু...... খোয়া পথ......"

বীরেন্দ্র এক বার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে অনিচ্ছা সত্বেও সম্মতি দিয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা চলো তবে ..”

গলীর মধ্যে ঢুকে বসির বল্‌লে—"এই গলীর মধ্যে পরশুকা খুব খুন-খারাপী আইয়া গেচে .....”

বীরেন্দ্রের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। সে বল্‌লে—"গলী-ঘুঁজিতে না আইলেই ভাল হইতো মিঞা......”

বসির বীরেন্দ্রের পাশ থেকে একটু পিছিয়ে প'ড়ে বল্‌লে—"ঐ......ঐ যে বাওদিগের চিপা গলীটা, ঐহান্ থেইকা একটা মোছল্‌মান্ লড়িয়া আইয়া এক হালা ইন্দু কাফেরেরে কেইশা দিচিলো......”

বীরেন্দ্র বাঁ-দিকের গলীর উল্লেখে বাঁ-দিকে চোখ ফিরিয়েছিল; পরক্ষণেই বসিরের বাক্যের মধ্যে হিন্দুর সম্বন্ধে কটূক্তি শুনে, আশ্চর্য্য হয়ে ও ভয় পেয়ে সে মুখ মার একটু পিছনদিকে ঘুরিয়ে বসিরকে দেখবার চেষ্টা যেই কর্‌লে, অমনই বসির বাঁ-হাতে বীরেন্দ্রের মুখ চেপে ধ'রে তাহার বুকে একখানা প্রকাণ্ড শাণিত ছোরা আমূল বসিয়ে দিলে!”

বীরেন্দ্র বসিরের বিশ্বাসঘাতকায় চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে কিছু বল্‌তে গেল, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ কর্‌বার আগেই সে গতপ্রাণ হয়ে মাটীতে প'ড়ে লুণ্ঠিত হ'তে লাগলো।

বসির এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দ্রুতপদে জনপ্রাণিহীন গলী পেরিয়ে বাজারের দিকে পলায়ন কর্‌ল, তাহার গায়ের হল্‌দে রঙের গেঞ্জিতে বীরেন্দ্রের তপ্ত রক্ত ছিট্‌কে লেগেছিল। সে গেঞ্জি খুলে ফেলে গাম্‌ছা দিয়ে গা মুছে সেই গেঞ্জি আর গাম্‌ছাখানা হাতে জড় ক'রে নিয়ে বাজারে গেল।

বসির জনমানবশূন্য বাজারে গিয়ে এক কসাইকে বল্‌লে—"দোস্ত, কিছু লৌ-মাখা গোস দাও ত, গামছায় বাইন্ধ্যে লইয়া যাই......এক হালা ইন্দু কাফেরেরে জহান্নামে দিয়া আইলাম। হালার খুন গাম্‌ছায় লাইগা রইচে...”

বসির খাসীর মাংসের রক্ত দিয়ে বীরেন্দ্রের খুন গোপন ক'রে দিব্য ভাল মানুষটির মত যেন বাজার ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরে চললো। সে তাহার পাড়ার কাছাকাছি এসে বিষম সোরগোল শুনতে পেলে। সে ছুটে এগিয়ে এসে দেখলে—এক-শো সওয়া-শো জন মুসলমান হল্লা কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আসছে। বসিরকে দেখেই সেই দলের এক জন ব'লে উঠলো—"এই যে বসির মিঞা! কোন্ হালা তোমার বে-ইজ্জত কোর্‌চে, বাতাও ত দেখি, হালারে—হালার জান্ লিয়া লিমু, ইজ্জত লিমু, বাড়ী লুট কর্‌মু . —”

রণোন্মত্ত মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে পাড়ার সব লোক লুকিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেখলে ও শুন্‌লে, বসির কানে হাত দিয়ে জিব কেটে বললে—"তোবা! তোবা! বেগর তস্কিরে কারো উপরে জুলুম কোর্‌লে গুণাহ অয়; খোদা বি নারাজ অয়। কেউ ত আমার নামে কিছু নালিশ করে নিকা, আর বি বীরেনবাবু নিজের দোষ কবুল কইরা আমারে বাচাইচে। ফিরা যাও ভাই সব; এ মহল্লার হগলেই আমার দোস্ত! এই হানে হক-নাজুক্ কোনো জুলুম অইতে আমি দিমু না—জান্ কবুল, খোদা কসম্!”

কোমলা মুসলমানের হল্লা শুনে ভয়ে কাঁপিতেছিল, সে বাড়ীতে একাকিনী; তাহার স্বামী বাহিরে। কিন্তু সে যখন বসিরকে উচ্চ চীৎকার ক'রে আক্রমণকারীদের নিষেধ কর্‌তে শুনলে এবং দেখলে যে, মুসলমানরা সব ফিরে চ'লে গেল, তখন সে আশ্বস্ত হয়ে গলায় কাপড় দিয়ে মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল—"হে ভগবান্, ভাগ্যিস্ বসির মিঞা এসে পড়েছিল! নইলে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ত, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! বসির মিঞা আমাদের প্রাণ আর ইজ্জত বাঁচিয়ে যে উপকার কর্‌লে, তার পুরস্কার তাকে তুমি দিও, প্রভু——তার যেন কখনও কোনও অকল্যাণ না হয়, ঠাকুর!”

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোড়ো বাড়ী

সেবার পূজার ছুটীটা কাশীতে কাটাইব স্থির করিয়া পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে পঞ্জাব মেলে আমি কলিকাতা হইতে বারাণসী অভিমুখে রওনা হইলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল চতুর্ভুর্জ পাণ্ডার। চতুর্ভুর্জকে কাশীর লোকরা 'চতুরী' 'চতুরী' বলিয়া ডাকে। বাস্তবিকই চতুরী চতুরতায় যেমন পাণ্ডা-মহলের অগ্রণী, শিষ্ট ব্যবহারে ও মধুর আলাপেও সে সেইরূপ ছিল। তাহার চেহারাটি বেশ নাহুস্ নুহুস্; তাহার মুখ হাসি-মাখান। চতুরী গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কোথায় যাই, কোথায় গিয়া বাসা লই, তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কাশীতে আসি নাই।

চতুরী কটাক্ষে আমার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া বহুকালের পরিচিত বান্ধবের ন্যায় হাস্য-প্রফুল্লমুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কহিল, "বাবুজী! আপনি বাসা খুঁজিতেছেন? আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে উত্তম বাসা দিব। সেখানে সকল রকম আরাম আপনি পাইবেন। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের অতি নিকটেই আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতেই আপনাকে বাসা দিব।"

আমি চতুরীর বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। চতুরীর পরিবারে লোকজন বেশী দেখিলাম না। চতুরী নিজে, তাহার স্ত্রী, এক জন প্রৌঢ়া বিধবা ব্রাহ্মণী ও এক জন অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী ব্রাহ্মণকন্যা। এই কিশোরীর নাম শুনিলাম—রেখিয়া। আমার পাকশাক প্রস্তুত করিবার জন্য চতুরী তাহার নিজের পরিবারভুক্ত সেই বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ঠিক করিয়া দিল ও হাট-বাজার ও পরিচর্য্যার জন্য এক জন ইতরজাতীয় পরিচারকও নিযুক্ত করিয়া দিল। সত্য সত্যই প্রবাসে আসিয়া যে এতটা আরাম পাইব, তাহা আমি আদৌ আশা করি নাই। প্রথম সাক্ষাৎকারমুহূর্ত্তে চতুরী আমার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল, তাহা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। কাশীতে আসিয়া আমি খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

* * * * *

ভাগীরথীর সহিত বরুণা-সঙ্গমের সমীপবর্ত্তী স্থানটি আমার নিকট অত্যন্ত মনোরম বলিয়া বোধ হইত। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একাকী এইখানে বেড়াইতে যাইতাম। বরুণার অপর পারে গঙ্গার ধারে এই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে চতুর্দ্দিকে মেহেদীগাছের বেড়া দেওয়া বাগানের মধ্যে একটি পুরাতন পোড়ো বাড়ী ছিল। সেইখানি আমার কাছে এত ভাল লাগিত যে, প্রতি সন্ধ্যাকালে নৌকাযোগে বরুণা পার হইয়া আমি এই বাড়ীটির কাছে গিয়া বসিতাম। এই বাগানবাড়ীটির ফটক বাহির হইতে প্রকাণ্ড একটি লৌহ-অর্গলে আবদ্ধ ও একটি দৃঢ় লৌহময় তালা দ্বারা আটকান। বহুকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় অর্গলে ও তালার উপরে পুরু হইয়া জঙ্গ ধরিয়া গিয়াছে। বেড়ার মেহেদীগাছগুলির ডালপালা বহুকাল ধরিয়া ছাঁটকাট না করায় জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখের বাগানের মধ্যে গোলাপ, মল্লিকা, যুঁই, কুরুবক, কুন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় কুসুমের গাছ ও পশ্চাদ্দিকের বাগানে আম, লিচু, পেয়ারা, সফেদা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন যত্নের অভাবে ফলপুষ্পহীন আগাছায় পরিণত হইয়াছে। বাগানের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার উপর-নীচের সমস্ত দরজা-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ। কেবল ইহার প্রবেশদ্বারটির বাহিরে মোটা মোটা লোহার কড়ায় একটি সুবৃহৎ লোহার তালা দিয়া আটকান। এই বাড়ীর ছাতগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দেওয়ালে বড় বড় ফাট ধরিয়াছে। সেই ফাটা যায়গায় বহু বট ও অশ্বত্থের গাছ জন্মিয়া দেয়ালের মধ্যে চারিধারে শিকড় নামাইয়া

দিয়াছে। খোলা বারান্দাগুলিতে অসংখ্য চামচিকা ও চটক পক্ষী আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ক্রমাগত রৌদ্র-বৃষ্টিতে ইহার দরজাজানালাগুলির রং ধুইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। বাহিরের সিঁড়িগুলি যায়গায় যায়গায় ধসিয়া গিয়াছে, ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটলে আগাছা ঘাস ও উলু খড় জন্মিয়াছে। অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা এখানে অব্যাহতভাবে রাজত্ব করিতেছে। চামচিকা, চড়াই, ইঁদুর, বাঁদর, টিকটিকি, অহি, নকুল এখানে অবাধে বিচরণ করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, কলহ করিতেছে, বসবাস করিতেছে। এই পোড়ো বাড়ীর সমস্তটা অংশই যেন একটি কুহেলিকাময় বিরাট রহস্যের আবরণে ঢাকা রহিয়াছে।

এই বাড়ীটি আমি দেখিতাম, আর ইহার এই শোচনীয় পরিণামের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতাম। এই বাড়ীখানির উপর কি কোন কারণে ভগবানের অভিশাপরূপ বজ্রানল বর্ষিত হইয়া গিয়াছে, না, এই বাড়ীর যে স্বত্বাধিকারী ছিল, সে কখনও কোন জাগ্রত দেবতাকে ছলনা করিয়াছিল, সেই জন্য এই বাড়ীর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে? সেখানে বসিয়া এই সকল প্রশ্ন স্বতই আমার মনে উদিত হইত। কিন্তু কে ইহার উত্তর দিবে? কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ বুকে হাঁটিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কিছুই দেয় না। এই জনশূন্য পোড়ো বাড়ীটির মধ্যে একটি ভয়ানক রহস্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু সেই রহস্যের সূত্র যে কোথায়, মানুষ তাহা জানে না। এই বাড়ীটি যে এখনও পর্য্যন্ত খাড়া রহিয়াছে, তাহাও যেন এক জন খামখেয়ালী লোকের ক্ষণেকের খেয়ালের উপর, এটুকু স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

আমি এই বাড়ীটির আশেপাশে বসিয়া থাকিতে থাকিতে এবং ইহার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে সময়ে সময়ে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িতাম যে, তখনই খেয়ালের বশে ইহার বাগানের বেড়া ফাঁক করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতাম। কাঁটায়-খোঁচায় লাগিয়া আমার পরিধেয় ছিন্ন হইয়া যাইত, গা-হাত কাটিয়া যাইত, সে দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। বাগানের মধ্যে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আমি অতুলনীয় তৃপ্তি লাভ করিতাম। আশ-পাশের লোকজনের নিকট হইতে আমি এই বাড়ীটির সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর লইতে চেষ্টা করিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, তাহারা হয় ত আসল কথা কেহই জানে না। হৃদয়হীন বিবেকহীন লোকের মুখের মিথ্যা গুজব শুনিয়া আমার কল্পনারচিত বিচিত্র স্বপ্নগুলিকে টুটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ইচ্ছা হইত না। এই জনহীন পরিত্যক্ত অভিশপ্ত উদ্যান-বাটিকাটি আমার নিকট, আজ এক, কালি অন্য, এখন এক, পর-মুহূর্ত্তে অপর কোন এক মূর্ত্তি প্রকটিত করিত। এই আমি ইহাকে দেখিলাম দেবতার মন্দিরের মত, পরক্ষণেই ইহাকে শবদেহপূর্ণ শ্মশানভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই আমি ইহাকে দেখিলাম, ঐশ্বর্য্যশালী রাজ-প্রাসাদের তুল্য, পরক্ষণেই ইহা আতুরাশ্রমের আকার ধারণ করিল। এখানে আসিলেই আমার কেবল কান্না পাইত, কখনও হাসি আসিত না। কত দিন প্রদোষে এই পোড়ো বাড়ীটির ছাতের কোণে পেচকের বিকট ঘুৎকার শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছে। আমি তখনই সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি।

এক দিন সেই বাগানের মধ্যে বসিয়া স্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে আমি এমন তন্ময় হইয়া পড়িলাম যে, কখন্ যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। সহসা একটা দমকা হাওয়া আসিয়া প্রাচারগাত্রে একটি ভগ্ন নলের মধ্যে প্রবেশ করাতে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যে, ঘরের মধ্যে কে যেন যন্ত্রণায় গোঙাইতেছে। আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম; তখনই ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম ও সোজা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি একাকী আমার ঘরে বসিয়া এই রহস্যময় পোড়ো বাড়ীটির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মার্জ্জারের ন্যায় সতর্ক পাদবিক্ষেপে চতুরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবুজী! জয়করণ বাবু আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে জয়করণ বাবু, পাণ্ডাজী?

পাণ্ডাজী যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "জয়বাবুকে

চেনেন না? এখানকার ফৌজদারী আদালতের এক জন ছঁদে মোক্তার।"

ফৌজদারী আদালতের নামে সত্যই আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সহসা চাহিয়া দেখি যে, এক জন পরিণত-বয়স্ক লোক আমার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। তাহার চোখের চাহনি উদ্ধত ও অবজ্ঞা-মিশ্রিত, আদালতে এক পক্ষের উকীল বা মোক্তার তাহার প্রতিপক্ষীয় লোক অথবা প্রতিপক্ষীয়ের উকীল বা মোক্তারের দিকে যেরূপ অবজ্ঞামিশ্রিত গর্ব্বিত কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, এই মোক্তারটিও আমার দিকে সেইরূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই লোকটির পরিধানে একটি লংক্লথের চুড়ীদার পায়জামা, গায়ে লংক্লথের আচকান, মাথায় পাগ্ড়ী। ইহার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটি বৃহদাকারের হীরার আংটী; আংটীর হীরাখানি বেশ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু তাহার পরিচ্ছদের সহিত সুসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

এই লোকটিকে আমার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চতুরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লোকটি বেশ সপ্রস্তুতভাবে আমার বিছানার উপর বসিয়া, আমারই তাকিয়ায় রীতিমত আরামে ঠেস দিয়া তাহার পক্ক গুম্ফে 'তা' দিতে দিতে কহিল, "আমার নাম হচ্ছে জয়করণ মিশ্র। আমি এখানকার ফৌজদারীর মোক্তার।"

আমি কহিলাম, "আপনার পরিচয় শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি কোন মামলা-মোকর্দ্দমায় পড়ি নাই যে, আপনাকে আমার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিব।"

সে কহিল, "পড়েন নি বটে, কিন্তু পড়াটা বিচিত্র নহে। মহাশয়! আগে আমার কথাটাই শুনিয়া লন।"

আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তাই ব'লে ফেলুন, শোনা যাক্।"

সে কহিল, "আপনি প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময়টা বরুণা-সঙ্গমের ঐ অঞ্চলে বেড়াতে যান?—না?"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ! কাশীর ঐ অঞ্চলটা আমার কাছে বেশ ভাল লাগে। এ ধারটা বড় ঘিঞ্জি আর অপরিষ্কার।"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "আপনি চুপ করুন, আগে আমার কথাটাই শেষ করতে দিন। বরুণার ওপারে যে একটি পুরানো পোড়ো বাগানবাড়ী আছে, আপনি সেই বাগানের মধ্যে রোজ সন্ধ্যের সময় গিয়ে ব'সে থাকেন?"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ! তা থাকি, তাতে হয়েছে কি?"

সে কহিল, "এমন কিছু হয় নি। তবে আপনার বোধ হয় জানা নেই যে, যে কোন ঘেরা যায়গায় মালিকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটাই হচ্ছে অনধিকারপ্রবেশ। আর অনধিকারপ্রবেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের একটি অপরাধ। ঐ বাড়ীটি কাহার সম্পত্তি, তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন না। ওটি হচ্ছে বিলাসপুরের মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি। আমিই তাহার উইলের অছি। আমি অবশ্য এমন ছোট লোক নহি যে, আপনাকে ফৌজদারীতে দিব। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনি ইচ্ছা হইলে ঐ বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও বেড়ার ফাঁক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবেন না। মৃতার ইহাই নিষেধাজ্ঞা। এই আদেশ যাহাতে পালিত হয়, তাহা করিতে আমি ন্যায়ত ও আইনত বাধ্য। আমি যে দিন এই উইলখানি রাখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি নিজেই ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি নাই। মহারাণীর মৃত্যুর পরে আমি তাঁহার ত্যক্ত অন্য সম্পত্তির আয় হইতে ইহার চৌকীদারী টেক্স, খাজানা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে চালাইয়া আসিতেছি। অবশ্য, এই উইল সম্বন্ধে কাশীর নানা লোকের মুখে নানাপ্রকার আজগুবি গল্প শুনিতে পাইবেন বটে, কিন্তু তাহার কোনটিই ঠিক নহে। আমি যাহা বলিতেছি, এইটিই ঠিক।"

এই কথা বলিয়া সেই বাক্পটু মোক্তার বাবুটি যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে না উঠিয়াই, আমার শয্যার অনতিদূরে নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমিও তাহার কথায় বা কার্য্যে কোনরূপ বাধা না দিয়া, তাহার চরিত্রের কোন্ দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে এই পরিত্যক্ত উদ্যানবাটিকাটির গুপ্ত রহস্যের সূত্র টানিয়া বাহির করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি বুঝিলাম যে, এই বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবের নিকট মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইল ভিন্ন যে

জগতে অন্য কিছু আবশ্যক বস্তু আছে, তাহা বলিয়াই বোধ হয় না। মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের চরমপত্রই বৃদ্ধ মোক্তার জয়করণের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কল্পনা, তাহার জীবনের গর্ব্ব, তাহার মরণের স্বর্গ।

আমি এত দিন এই পোড়ো বাড়ীটি দেখিতেছিলাম, আর মনে মনে কত লোমহর্ষণ কাল্পনিক নাটকের আখ্যানভাগ ছকিতেছিলাম, রচিতেছিলাম, ভাঙ্গিতেছিলাম, গড়িতেছিলাম, তাহা যে আজ এই প্রাণহীন মস্তিষ্কহীন ক্ষুদ্র জীব মোক্তারের মুখ হইতে নিঃসৃত একটিমাত্র বিশেষত্বহীন কথার আঘাতে চুরমার হইয়া গেল, সেই জন্য আমি মনে মনে সত্যই একটু বেদনা অনুভব করিলাম।

আমি কহিলাম, "মোক্তারবাবু! আমি যদি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, আপনাদের স্বর্গগতা মহারাণীর এরূপ অদ্ভুত খেয়ালের কারণটা কি, তাহা হইলে আমার এই প্রশ্নটিকে কি আপনি অশিষ্ট বা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন?"

সে কহিল, "আমরা আদালতে সাক্ষীর মুখে ইহা অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী অসঙ্গত প্রশ্ন শুনতেও অভ্যস্ত। তবে রাজারাজড়ার অদ্ভুত খেয়ালের কারণ খুঁজে বের করা সহজ নহে। আর মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের কৃত কার্য্যের বিচার করবার শক্তি আমার নাই, কারণ, আমি তাঁর নুণ খেয়েছি ও খাবার আশা করছি। এই যে হীরের আংটীটি আমার হাতে দেখছেন, এটি মহারাণীরই দেওয়া উপহার। বিশেষ, মহারাণীর সহিত আমার পরিচয়ও কয়েক ঘণ্টার জন্য। কাযেই আমি আপনার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অশক্ত। আমি মৃজাপুরে এক জন জজকোর্টের উকীলের মুহুরী ছিলাম। মাত্র চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে মোক্তারী পাশ ক'রে কাশীতে এসে মোক্তারী করতে বস্‌লাম। হঠাৎ এক দিন রাত্রিতে এক জন যুবতী পরিচারিকা এসে আমায় বললে, 'রাণীজী এখনই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মহারাণী তখন তাঁর গণেশ মহল্লার বাড়ীতে থাকতেন। দাসী আমাকে সঙ্গে ক'রে বরাবর রাণীর শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। ঘরে অন্য লোক কেহই ছিল না। চাদর দিয়ে ঢাকা একটি জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার নারীমূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর শুয়ে ছিল। ইনিই শুনলাম মহারাণী নর্ম্মদা বাই। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাণী অতি কষ্টে কহিলেন, 'এই নিন মোক্তারবাবু! এইখানি আমার উইল, প'ড়ে দেখবেন। আর এই আংটীটি আমার স্মৃতি-চিহ্ন। বাবা বিশ্বনাথ! আমায় পায়ে রাখ।'

"বাবা বিশ্বনাথ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের মহারাণীজীকে পায়ে স্থান দিলেন। আমার ফিস্‌টা যে মাঠে মারা গেল, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাড়ী গিয়া প্রথমেই আমার বসিবার ঘরে আলো জ্বালিলাম ও ঘরের দরজা-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া লেফাপার মুখ ছিঁড়িয়া উইলখানি বাহির করিলাম। বিস্ময়ের সহিত আমি দেখিলাম যে, মহারাণী তাঁহার উইলে আমাকেই একমাত্র অছি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বরুণাসঙ্গমের সন্নিকটস্থ বাগানবাড়ী সম্বন্ধে যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, 'উক্ত সম্পত্তির সীমানার মধ্যে কোন মনুষ্য যাইতে বা থাকিতে পারিবে না। ঐ বাড়ীর দরজা, জানালা, ফটক ইত্যাদি যেমন তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে, সেইরূপই থাকিবে। ইহার কোনরূপ সংস্কার করা হইবে না। অছি আমার অন্য সম্পত্তির আয় হইতে এই বাগানবাড়ীর টেক্‌স, খাজানা ইত্যাদি রীতিমতভাবে আঞ্জাম করিয়া যাইবেন। উইলকারিণীর মৃত্যুর তারিখ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক এই ভাবেই থাকিবে। উইলকারিণীর মৃত্যুর পর পঞ্চাশৎ বৎসরের শেষ দিন অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ একান্ন বৎসরের প্রথম দিবসে, এই উইলে নিয়োজিত অছি অথবা অছির বংশধর কেহ যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অথবা তাহাদের সংখ্যা একের অধিক হইলে তাহারা তুল্যাংশে এই সম্পত্তি পাইবে।' * * *"

এই কথা বলিয়া মোক্তার জয়করণ উঠিয়া দাঁড়াইল ও প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। যাইবার সময় সে সিঁড়ি হইতে আর একবার আমাকে শাসাইয়া যাইতে ছাড়িল না।

জয়করণ মোক্তার বাহির হইয়া গেলে পরই চতুরী ধীরে ধীরে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "জয়করণ মোক্তার বোধ হয় আপনার কাছে মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইলের গল্প করতে এসেছিল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ পাণ্ডাজী! তাই বটে। তবে

আপনি কি ক'রে জানলেন। লোকটা ঘরে ঢুকতেই ত আপ'ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আড়ালে লুকিয়ে সব শুনেছেন না কি ?"

চতুরী তাহার স্বাভাবিক সরল হাসি হাসিয়া কহিল, —"লুকিয়ে শুন্‌তে হবে কেন, বাবুজী ? আমার বাড়ীতে যে ভাড়াটেই আসুক না কেন, জয়করণ মোক্তার একবার এসে তাকে একটু বেয়ে চেয়ে দেখে যাবেই যাবে। আপনি ত বেফাঁস্ কোন কথা তার কাছে ব'লে ফেলেন নি ? দেখবেন। লোকটা কিন্তু ভয়ানক ফিচেল্।"

আমি কহিলাম,—"ফিচেল্ হ'ল ত আমার কি ?"

চতুরী কহিল,—"আপনার কিছু নয় বটে, বাবুজী। কিন্তু আমাদের ত কাশীবাস করতে হবে। তা ছাড়া আমার বেশী ভাবনা ঐ রেখিয়াটার জন্য।"

আমি কহিলাম,—"রেখিয়ার জন্য ভাবনা কেন, পাণ্ডাজী ? আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

চতুরী কহিল,—"আপনি বুঝবেন কি ক'রে, বাবুজী! আপনি ত ব্যাপারটা কিছুই জানেন না। ঐ রেখিয়াই রাণী নর্ম্মদা বাইয়ের কন্যা।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "রেখিয়া তাহা হইলে আপনার কন্যা নহে ?"

চতুরী আবার একগাল হাসি হাসিয়া কহিল, "না, বাবুজী! আমি নিঃসন্তান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেখিয়া রাজার কন্যা; সে আপনার আশ্রয়ে আসিল কেমন করিয়া ?"

চতুরী কহিল, "রেখিয়া রাজার কন্যা নহে, বাবুজী! রাণীর কন্যা।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "সে কি প্রকার ?"

চতুরী কহিল, "বাবুজী, বড় ঘরের বড় কথা: আমাদের গরীব গৃহস্থের ঘরে হ'লে জাত যায়; কিন্তু বড়লোকের জাতকুল সব লোহার সিন্দুকের মধ্যে। রেখিয়ার জন্ম আমার এই বাড়ীতেই হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা এক জন বাঙ্গালাদেশীয় পাচক ব্রাহ্মণ। যে প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণীটি আপনার পাকশাক করিতেছে, উহারই স্বামী।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, যে রহস্যের সূত্র সন্ধান করিবার জন্য আমি এতটা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি, সেই রহস্যময় নাটকের অনেকগুলি চরিত্রই ত আমার চোখের সামনে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তবে আর ভাবনা কিসের ?

আমি কহিলাম, "পাণ্ডাজী! এই ঘটনা সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমার নিকট খুলিয়া বলুন দেখি। কি জানি কেন, ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। আমা হইতে আপনাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।"

চতুরী কহিল, "আমাকে সে কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে না, বাবুজী! আমি মানুষ চিনি। যদি সত্য সত্যই এ কথা শুনিতে আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এ সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা বলিতেছি, শুনুন। আমি এ কথা আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এক জন দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে আইসে। সে আসিয়া আমার বাড়ীতেই একতলায় মাসিক আট আনা করিয়া ভাড়া বন্দোবস্তে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া থাকে। আমাদের কাশীর মত সস্তা-গণ্ডা যায়গায়ও এই নিঃস্ব পরিবারের দুই বেলা পুরা আহার জুটিত না। মাসেক দেড়মাস এই ভাবে কাটাইবার পর বাবা বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের বাড়ীতে ইহাদের দুই জনের কাযের যোগাড় হইয়া গেল। স্থির হইল যে, ব্রাহ্মণ পাচকের কার্য্য করিবে এবং তাহার স্ত্রী রাণীজীর নেপথ্যকারিণী ও সঙ্গিনী হইবে। এই ব্রাহ্মণ যুবকের চেহারাখানা বেশ সুন্দর ছিল। সে কথায়-বার্ত্তায়ও লোককে বেশ মুগ্ধ করিতে পারিত। মহারাণী তাহার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এই দরিদ্র দম্পতির ভাগ্য ফিরিল।

"মহারাজা বাহাদুর সে সময় বড় একটা এখানে থাকিতেন না। অধিক সময় তিনি বিলাতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, মহারাজা তখন মার্কিণ মুলুকে দীর্ঘ প্রবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে মহারাণী গর্ভবতী হইলেন এবং অতি গোপনে আমার এই বাড়ীতেই একটি সুন্দরী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। নির্ম্মম নিয়তির অদ্ভুত খেয়ালে এই কন্যাটির চেহারা হইল মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের অবিকল প্রতিকৃতি। কন্যার মুখ দেখিয়া মহারাণী ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

"অর্থেই সমস্ত মানাইয়া যায়, অর্থেই সকল দোষ—সকল পাপ ঢাকিয়া যায়। বাবুজী! আপনি সজ্জন ও বুদ্ধিমান্ লোক। আপনার নিকট আমি আমার নিজের দুর্ব্বলতার কথাও গোপন করিব না। অর্থে আমারও মুখ বন্ধ হইয়া গেল। অর্থে এই নবজাত শিশুর দরিদ্র বিমাতা সপত্নী-কন্যাকে নিজের গর্ভজাত বলিয়া সাদরে অঙ্কে স্থান দিল। অর্থে সর্পের ন্যায় খল, শার্দ্দূলের ন্যায় হিংস্র, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত মোক্তার জয়করণও বশীভূত হইল। এই কন্যার বয়স যখন দেড় বৎসর, মহারাজা তখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার রাজশ্রী যে তস্করের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই তিনি পাইলেন না। প্রায় দুই বৎসর এই ভাবেই চলিল। হঠাৎ এক দিন প্রাতে সহরে রাষ্ট্র হইল যে, বিলাসগঞ্জ রাজবাড়ীর পাচক মহারাণীর গহনার বাক্স চুরি করিয়া পলাইয়াছে। সহরের অনেকেই এই রটিত গল্পে বিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু আমি পারিলাম না, পাচকের স্ত্রীও না। ব্রাহ্মণকন্যা আমাদের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও এই ঘটনার পরদিনই কুশপুত্তলি দগ্ধ, ত্রিরাত্র্যন্তে স্বামীর প্রেতকৃত্য শেষ করিয়া বৈধব্য-বেশ পরিধান করিল। এই ঘটনার দুই মাস পরে মহারাজা পুনরায় বিলাতযাত্রা করিলেন। বিলাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে জাহাজেই তিনি বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিলেন। মহারাণীও মহারাজের মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পরে ভীষণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত যদি কেহ কিছু জানে, তবে সে পাচক ব্রাহ্মণের পত্নী। যে রাত্রে রাজবাড়ীতে গহনা চুরির রটনা হয়, সেই রাত্রে সে রাজবাড়ীতেই উপস্থিত ছিল।"

আমি কহিলাম, "আপনি তাহার নিকট হইতে আসল কথাটা বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই?"

চতুরী কহিল, "আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, বাবুজী! কিন্তু এই রমণী পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, পাষাণের ন্যায় শীতল ও পাষাণের ন্যায় মূক। সে আমা অপেক্ষাও চতুর।"

আমি কহিলাম, "আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি?"

চতুরী কহিল, "দেখিতে পারেন। তবে আপনাকে বলিয়া রাখি যে, সে কোন প্রলোভনেই ভুলিবার লোক নহে। পরলোকগতা মহারাণীর কৃপায় অর্থ কিংবা অন্য কিছুরই অভাব তাহার নাই।"

আমি কহিলাম, "প্রলোভনে ভুলে না, এমন লোক জগতে নাই। তবে প্রলোভন প্রলোভনের মত হওয়া চাই, এই মাত্র। যেমন করিয়া হউক, আমি আসল কথা বাহির করিবই করিব।"

আমার আরও কয়েক দিন কাশীতে কাটিল। এই কয় দিনে চতুরী ও তাহার পরিবারভুক্ত সকলের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। তাহারাও আমাকে চিনিয়া লইল, আমিও তাহাদের কাহার দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

শীঘ্রই আমি তাহা ধরিয়া ফেলিলাম। আমি যে কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন খ্যাতনামা কৌসুলী, তাহাও তাহারা সকলে জানিল। আমি যে আদালতে সওয়াল-জবাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা তাহারাও বুঝিল। আমি যে মোকর্দ্দমার কোন জোর না থাকিলেও হয়কে নয় করিয়া দিতে পারি, তাহাও তাহারা শুনিল। আমি তাহাদের সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম। বলিতে বাধা নাই, রেখিয়ার উপর আমার একটু অনুরাগও জন্মিয়াছিল। এই অনাঘ্রাত রমণীকুসুমলাভের জন্য আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা হইল।

আদালতে যে সকল সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে অনুকূল সাক্ষ্যপ্রদানে বাধ্য করিবার জন্য উকীল-কৌসুলীরা আদালতে এক প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশলের নাম browbeating অথবা ভ্রূকুটি দ্বারা ভড়কাইয়া দেওয়া। আমি এই কৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই নিরক্ষর পাচক-পত্নীর সম্পর্কে সেই উপায় অবলম্বন করিতে আমার আদৌ সাহসে কুলাইল না। অগত্যা আমি শলাইয়া কলাইয়া কথা আদায় করিয়া লওয়ার যে শাশ্বতী রীতি ব্যবহারাজীব-সমাজে প্রচলিত আছে, সেই রীতিই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

ব্রাহ্মণী নিত্যই আহারের সময় আমার কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস করিত। আমি এক দিন তাহাকে একাকী পাইয়া সেই পোড়ো বাড়ীটির রহস্য সম্বন্ধে সে কি জানে, তাহাই আমার নিকট প্রকাশ করিতে অনুরোধ

করিলাম। ভাবে ভাবে আমি ইহাও তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে,আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই ব্যাপারের মধ্যে একটা বা ততোধিক খুন ও বিরাট জালিয়াতী লুকানো আছে। আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, আমার ধারণা এই যে, তাহার স্বামীর নামে যে চুরির অপবাদ রটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর যে উইলের উপর ভিত্তি করিয়া মোক্তার জয়করণ এখন মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের অছিস্বরূপে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছে, সেই উইলও আসল উইল নহে—জাল। আমি ইহাও তাহাকে জানাইলাম যে, এই মামলা আদালতে সপ্রমাণ করিতে হইলে যে যে প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহাও আমি সংগ্রহ করিতেছি। এখন কেবলমাত্র সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী এই বিষয়ে কি জানে, সেইটুকু জানিতে পারিলেই যে আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া আমি মোক্তার জয়করণের হাত হইতে এই বিশাল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া রেখিয়াকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত করাইতে সমর্থ, ইহাও তাহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলাম।

ব্রাহ্মণী আমার কথায় ও আমার সামর্থ্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিল। সে আঁচলে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "আপনি এ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানেন, সমস্ত বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনাদিগের একটি মহদুপকার করিতে পারিব ও জয়করণ প্রভৃতি যে সকল দুষ্ট লোক এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আইনের কঠোরতম শাস্তিবিধান করাইতে পারিব।"

ব্রাহ্মণী আমার কথায় কতকটা শান্ত হইয়া কহিল, "মহাশয়, শুনুন। আমাদের বাড়ী বিষ্ণুপুরে ছিল। আমরা কুলের মুখুটি, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে জমা-জমী কিছু ছিল, কিন্তু আমার স্বামী সে সমস্ত উড়াইয়া পুড়াইয়া দেন। দৈন্য-দশায় পড়িয়া ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য আমরা কাশীতে আসিলাম। আমার স্বামী বিলাসপুরের রাজবাড়ীতে পাচকের কায পাইলেন। আমি রাণীমা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। মহারাণী আমাদের দুই জনকেই খুব ভালবাসিতেন। আমার স্বামীকে ভালবাসিতেন তাঁহার নিজের জন্য। আমাকে ভালবাসিতেন আমার স্বামীর জন্য। আমি কিন্তু মনে মনে তাঁহার উপর ভয়ানক চটা ছিলাম। মহারাণী বুদ্ধিমতী হইলেও রূপ-যৌবন ও ঐশ্বর্য্যের উন্মাদনায় এমনই অজ্ঞান ছিলেন যে, তিনি এই ক্ষুদ্র কথাটুকু বুঝিতে পারিতেন না যে,স্ত্রীলোকের স্বামী কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর ব্যথা আর নাই। কিন্তু কি করিব? আমরা দরিদ্র, তাহার উপর আবার আমার স্বামী লম্পট। আমার নিজের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় নিজেকেই জ্বলিতে হইত। মহারাজা তখন প্রবাসে। মহারাণী অবাধে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পাপের ফল হাতে হাতে। অচিরেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। রেখিয়াই এই পাপ সংসর্গের পরিণাম-ফল। মহারাণীর এই অবৈধ প্রেমব্যাপার চাপা দিয়া রাখিবার জন্য তাহাকে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে হইত। তাহার অনুগ্রহে আমাদের অর্থের কোন অভাব ছিল না, অভাব ছিল কেবল মানসিক শান্তির। আমরা যখন দরিদ্র ছিলাম, তখন আমি এখনকার অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সুখে ও শান্তিতে ছিলাম। এখন আমি রাতদিন দুঃখে, শোকে, অশান্তিতে ও দুর্ভাবনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। মহাশয়! আপনাকে আমরা যে কি চক্ষুতে দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমি আপনাকে আমার পেটের সন্তান অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করি। রেখিয়াও আপনাকে মনে মনে এত ভালবাসিয়াছে যে, তাহার হৃদয় নিরন্তর পুটপাকে দগ্ধ হওয়ার মত নিজের তাপে নিজেই দগ্ধ হইতেছে। মহাশয়! আপনি আমাদিগকে বাঁচান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে রাত্রিতে রাজবাড়ীতে চুরি হয়, সেই রাত্রির ঘটনা আপনি কি জানেন, বলুন দেখি।"

সে কহিল, "এই চুরির অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনার স্বামী এখন কোথায়?"

সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া প্রথমে ঊর্দ্ধে ও পরে নিম্নদিকে দেখাইয়া কহিল, "হয় স্বর্গে, না হয় নরকে; কোথায় যে, তাহা বিশ্বনাথই জানেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার স্বামীকে কি তাহা হইলে উহারা হত্যা করিয়াছে?"

সে কহিল, "কেবল হত্যা নয়! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! মহারাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাণীর চোখের সামনে, আমার চোখের সামনে, আমার স্বামীকে জীয়ন্তে কবর দিয়েছে। উঃ—কি নৃশংস হত্যা! ব্রহ্মহত্যা! মহাপাতক!"

ব্রাহ্মণী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "আপনি ঘটনাটি আমার কাছে খুলে বলুন দেখি।"

ব্রাহ্মণী কহিল, "বিলাত হ'তে ফিরে আসার পরে কেন জানি না, মহারাজা মহারাণী এক বাড়ীতে বাস করতেন বটে, কিন্তু একসঙ্গে থাকতেন না। মহারাজা থাকতেন দোতলায়, মহারাণী একতলায়। মহারাণী সেই সুবিধা পেয়ে প্রায় প্রত্যহই আমার স্বামীর সঙ্গসুখে মগ্ন হয়ে রাত্রি কাটাতেন। ঘটনার রাত্রিতে মহারাজের বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। সেই দিন কোন একটা রাজার ওখানে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। রাণীর শোবার ঘরে অত রাত্রিতে আলো জ্বালা দেখে সন্দেহ হ'ল। অন্য দিন তিনি সোজা উপরে চ'লে যেতেন, সে দিন আর তা গেলেন না। রাণীর শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন। তখন আমার স্বামীও সেই ঘরে ছিলেন। রাণীর ঘরের পাশেই একটা ছোট মালকুঠুরী ছিল, সেই ঘরে একটিমাত্র দরজা, জানালা, গবাক্ষ বা অন্য কোন রন্ধ্র নাই।

মহারাজা তখন বেশ একটু রঙের মুখে ছিলেন। তিনি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নর্ম্মদা, তুমি একলা আছ? তোমার ঘরে অন্য কোন লোক নেই?'

রাণী অম্লানবদনে কহিল, 'না মহারাজ!'

মহারাজ একবার ঘরের এদিকে ওদিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন ও মালকুঠুরীর দরজা খুলিতে গেলেন।

রাণী তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ কুঠুরীর দরজা খুলিয়া যদি কাহাকেও না পান, তাহা হইলে আজই আমার সহিত আপনার শেষ দেখাশুনা জানিবেন।'

মহারাজা কি জানি কি ভাবিয়া আর মালকুঠুরীর দরজা খুলিলেন না। শয়নকক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রাণীর চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাণি, তুমি ঠিক বলিতেছ যে, ওই মালকুঠুরীতে কোন লোক নাই?'

রাণী উত্তর দিলেন, 'না মহারাজ!'

বজ্রগম্ভীরস্বরে মহারাজ কহিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথের দিব্য করিয়া বল দেখি, রাণি! ঐ কক্ষে কোন লোক লুকাইয়া নাই?'

রাণী পূর্ব্ববৎ অবিচলিতভাবে কহিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথের দিব্য, ঐ কুঠুরীতে কোন লোক লুকাইয়া নাই।'

মহারাজা কহিলেন, 'উত্তম! কে আছিস্?'

সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া রাজারাণীকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল ও আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা প্রহরীকে কাছে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কি আজ্ঞা দিলেন।

দশ মিনিট পরেই এক জন রাজমিস্ত্রী একটি ঝুড়িতে করিয়া ইট, চূণ, সুরকী প্রভৃতি গাঁথনির সরঞ্জাম লইয়া সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহারাজ হুকুম দিলেন, 'এখনই ভিৎ গাঁথিয়া এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও। এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক বেনারস ব্যাঙ্কের উপর এই দশ হাজার টাকার চেক্। সর্ত্ত—আজ রাত্রেই কাশী ছাড়িয়া যাবজ্জীবন অন্যত্র গিয়া বাস।'

মহারাজের আজ্ঞা তখনই পালিত হইল। মিস্ত্রী একখানি একখানি করিয়া ইট গাঁথিতে লাগিল আর একখানি করিয়া আমার বুকের পাঁজরা খসিয়া যাইতে লাগিল। মহারাণীও তাহার হৃদয়মধ্যে সহস্র বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার নির্নিমেষ অশ্রুহীন চক্ষুর্দ্বয় দেখিতে দেখিতে জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল।"

গল্পটি শেষ করিয়া ব্রাহ্মণী আবার অঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ইতোমধ্যে আমি মনে মনে একটা মোকর্দ্দমার খসড়া করিয়া ফেলিয়া দিলাম।

* * * *

ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতে একসঙ্গে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া দিয়া আমি সর্ব্বপ্রথমেই পুলিসের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোক্তার জয়করণ ও স্থানীয় বহু গণ্য-মান্য লোকের সাক্ষাতে, আমি সেই পোড়ো বাড়ীর মহারাণীর শয়নকক্ষের সংলগ্ন মালকুঠুরীর দরজা বন্ধ

করিয়া, যে দেওয়ালটি গাঁথান হইয়াছিল, সেই দেওয়ালটি ভাঙ্গাইয়া দিলাম ও দরজা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, মেঝের মাঝখানেই একটি নর-কঙ্কাল পড়িয়া আছে। এই কঙ্কালটির কোন অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। সেই ঘরে একটি মজবুত লোহার সিন্দুকের মধ্যে বহু মূল্যবান্ জড়োয়া গহনা এবং এক তাড়া দলীল ও কাগজপত্র ছিল। সেই তাড়াটি খুলিয়া প্রথমেই পাওয়া গেল—মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইল। এই উইলখানি কলিকাতার নামজাদা এটর্ণী স্যাণ্ডারসন এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত ও কলিকাতার রেজেষ্ট্রী আফিসে রেজেষ্ট্রী করা। এইখানিই মহারাণীর আসল উইল। যেখানি মোক্তার জয়করণের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, সেইখানি জাল; আসল উইলে মহারাণী তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি অব্যূঢ় স্বত্বে তাঁহার একমাত্র কন্যা রেখিয়াকে দান করিয়া গিয়াছেন ও পাচকের পত্নী সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে উইলের একমাত্র একজিকিউটি্কস্ ও রেখিয়ার গার্জ্জেন 'নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

*　　　*　　　*　　　*

ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় মোক্তার জয়করণ ৫ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বিলাত পর্য্যন্ত লড়ালড়ি করিয়া সাত বৎসর পরে এই সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া যখন আমি বিধবা ব্রাহ্মণীর হাতে আমাদের পক্ষীয় বিলাতের এটর্ণীর টেলিগ্রামটি আনিয়া দিলাম, ব্রাহ্মণী তখন যৌবনভারাবনত-দেহা লজ্জাবনতমুখী রেখিয়ার বাঁ হাতখানি আমার ডান হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ব্যারিষ্টার সাহেব, এই নিন আপনার ফিস্।"

সেই দিনই আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পবিত্র হোমাগ্নির সম্মুখে ধীরোদাত্ত-স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমাদের বিবাহগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিলেন।

শ্রীমনোমোহন রায়।

শারদীয়া

সকাল বেলায় কানন-পথে
　　কে এসেছে আজ,—
শিউলী যে তার আঁচল থেকে,
　　ছড়ায় শুভ 'লাজ।'
ভুঁই-চাঁপা ঐ আসন পাতে,
রূপার ঝারি যূথীর হাতে,
অপরাজিতা দাঁড়িয়ে—নিয়ে
　　নীলাম্বরীর সাজ।

হৃদয়-ছেঁচা আল্‌তা দিলে
　　হিজল তারে আনি,
সাম্‌নে এসে ধর্‌লে জবা
　　সোনার সিঁদুর-দানী।
দূর্ব্বাদলের সবুজ থালায়
শিশির সাজায় মোতির মালায়,
'কাশের' চামর ঢুলিয়ে নদী
　　কয় স্বাগত বাণী।

সকালবেলা কানন-পথে
　　কে এসেছে আজ,—
ঘরের কথা গেলাম ভুলে,
　　আজ যেন নেই কায।
ঘুরে' বেড়াই কানন-পথেই,
আজ সকালের কায যেন এই,
বুকের মাঝে ছন্দে বাজে
　　কার নূপুরের বাজ' !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

মোহ-ভঙ্গ

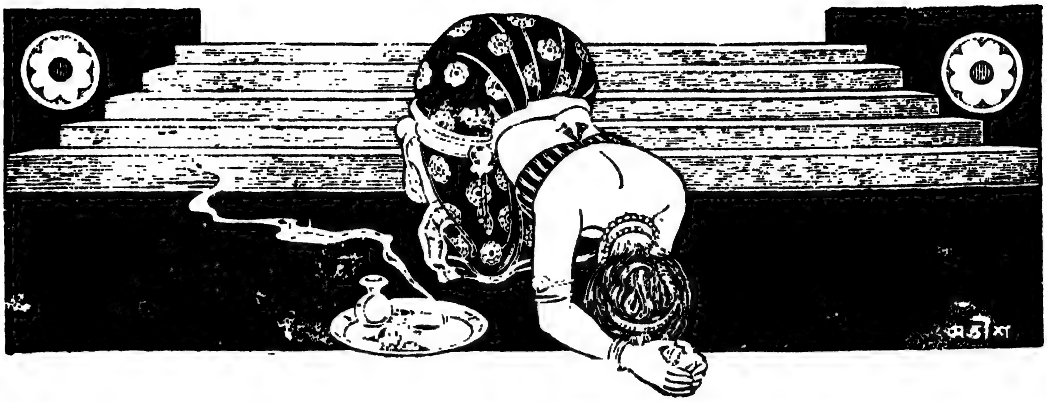

১

শীতের প্রভাত। হেমন্তকুমার বার বার ঘড়ীর দিকে চাহিতেছিল; ৭টা বাজিয়া যায়, এখনও ভিতর হইতে চায়ের আহ্বান আসিল না! কারণ কি?

নটবর অতি ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবলের উপর চায়ের পেয়ালা ও একখানি রেকাবিতে পরিপাটী করিয়া ভাজা চিঁড়া রাখিয়া দিল। চিঁড়া কয়টি গাওয়া ঘি মাখান। ঘরে তৈয়ারী টাট্‌কা ঘিয়ের গন্ধে কক্ষটি আমোদিত হইল।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"তুই নিয়ে এলি যে, ?"

নটবর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"মা পূজো কচ্ছেন।"

হেমন্ত এক মুঠা চিঁড়া মুখে দিল। পরে চায়ের বাটিতে এক চুমুক দিয়া বলিল—"চা কে করেছে রে?"

"আজ্ঞে, আমি।"

"চিঁড়ে কে ভাজলে?"

"কর্ত্তামা।"

"তুই কি ক'রে কত্তে শিখ্‌লি রে?"

"মা শিখিয়ে দিয়েছেন—সকালে আপনাকে চা ক'রে দিতে হবে, তাই।"

"ওঃ, আচ্ছা যা; এগুলো নিয়ে যা!"

"খেলেন না যে? ভাল হয় নি?"

"এই ত খেলাম; বেশ হয়েছে।"

নটবর একটু ক্ষুব্ধচিত্তে পাত্রগুলি উঠাইয়া লইয়া গেল।

হেমন্ত ভাবিতে লাগিল---মাত্র কয় মাস সে বাড়ী ছিল না, ইহারই মধ্যে অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ত! স্ত্রীর হঠাৎ ধর্ম্মে অনুরাগ, যে নটবর চা কি রকম খাইতে, তাহা বুঝিবার জন্য এক দিন সিদ্ধ করা কতকগুলি চায়ের পাতা চিনিসংযোগে খাইয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল যে, ইহার চেয়ে গুড় দিয়া মুড়ি খাওয়া ঢের ভাল, সেই নটবর স্বহস্তে চা পরিবেষণ করিয়া গেল!

এতক্ষণে স্ত্রীর পূজা সমাপ্ত হইয়াছে, অনুমান করিয়া অনেকক্ষণ পরে হেমন্ত ভিতরে আসিল। ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, স্ত্রী পূজান্তে গীতাপাঠ করিতেছে। একখানি গৈরিকবর্ণের রেশমী সাড়ী সৌষ্ঠবের সহিত অঙ্গ বেড়িয়া আছে।

হেমন্তের স্ত্রীর নাম সরোজিনী। স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া সরোজিনী একটু সলজ্জভাবে মুখ নীচু করিল বটে, কিন্তু গীতাপাঠ ত্যাগ করিল না। গীতা যাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী—শুধু তাঁহারই কাছে অগোচর রহিল না যে, স্বামী আসিয়া দেখিবেন—শুধু ইহারই অপেক্ষায় পূজারিণীর পাঠ এখনও সাঙ্গ হয় নাই।

হেমন্ত সেখানে না দাঁড়াইয়া বরাবর মায়ের ঘরে গেল। দেখিল, মা তাহার বৎসর দেড়েকের ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কি, মা?"

"কি বাবা?"

"তুমি দুধ খাওয়াচ্ছ, নটবর চা কচ্ছে, বৌ গীতাপাঠে ব্যস্ত, এই সব?"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"চা বুঝি ভাল হয় নি? তা বৌমা আর একবার ভাল ক'রে চা ক'রে দেবে'খন!"

"চা না হয় যাক্ দুধ খাওয়ানোর ভার তোমার ওপর কবে থেকে পড়ল?"

দুধ খাওয়ানো শেষ করিয়া খোকার মুখ একখানি গামছা দিয়া বেশ করিয়া মুছাইয়া মা বলিলেন—"এ আর ভার পড়া কি? ছেলেমানুষ, পূজো আচ্ছায় মন গিয়েছে—একবার না হয় আমিই দুধ খাইয়ে দিলাম।"

"পূজায় হঠাৎ এত অনুরাগ কেন হ'ল, মা?"

"সে কথা বৌমাকে সময়ান্তে জিজ্ঞাসা করিস্। আর তাতে রাগ কেন, বাবা?"

"রাগ ত কচ্ছিনে, মা! শুধু তোমার কাছে জিজ্ঞাসা কত্তে এসেছি, হঠাৎ এ সব কি হ'ল। তুমি উত্তর দিলে, চ'লে যাচ্ছি।"

হেমন্ত ফিরিয়া গেল।

মায়ের মনে ব্যথা বাজিল। তাঁহার হেমন্ত যে কাহারও কোন অসুবিধা রাখে না, নিজের দিকে না চাহিয়া যে অপরকে সব সুবিধা বিলাইয়া দেয়, সে আজ ব্যথা পাইয়াছে। কিন্তু এ ব্যথা দূর করিবার উপায় ত মায়ের হাতে নাই।

মাতৃ-অঙ্ক-প্রাণ শৈশব যখনই মানুষ অতিক্রম করে, তখন হইতেই তাহার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে মায়ের কোল ত্যাগ করিয়া জগতের নব রূপ, নব রস নব গন্ধ ও নব স্পর্শের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যথা পাইলেই সে মায়ের কাছে ফিরিয়া আইসে, মায়ের সান্ত্বনায় ব্যথা কমিলেই আবার সে বাহিরে ছুটিয়া যায়। যৌবনে তরুণী তাহাকে মুগ্ধ করে; তাহারই হাতে সে তাহার সুখ-দুঃখের ভাণ্ডার ছাড়িয়া দেয়। বিশাল বনস্পতির মত সে মাটী ছাড়িয়া আলোক, বাতাস ও আকাশের সন্ধানে বাড়িয়া চলে—কিন্তু মাটী তাহাকে সর্ব্বক্ষণ রস ও খাদ্য যোগায় এবং স্নেহ-মুগ্ধ-নেত্রে তাহার বর্দ্ধমান উন্নত দেহ ও ঘন শ্যামল মুখের পানে চাহিয়া থাকে। পুত্র ব্যথা যখন পায়, তাহার আঘাত মায়ের বুকে সব চেয়ে আগে ও সব চেয়ে বেশী করিয়া বাজে।

হেমন্তকুমারের কলিকাতাতেই বাড়ী। সে উচ্চশিক্ষিত যুবক; বয়স ত্রিশ- লাটদপ্তরে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত। হেমন্ত বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী কলিকাতাতে থাকে—অবশিষ্ট ভাগ দার্জ্জিলিংয়ে কাটায়। মা ও স্ত্রী বরাবরই সঙ্গে থাকেন। এইবার প্রথম তাহাকে একা দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, বিধবা মাতা বৃদ্ধাবস্থায় দার্জ্জিলিংয়ের শীত আর সহিতে পারেন না। আর মায়ের পক্ষে এ বয়সে একা কলিকাতায় থাকা সম্ভব নহে; সে জন্য স্ত্রীকেও মায়ের কাছে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল।

শরৎকালের প্রারম্ভেই হেমন্ত দার্জ্জিলিং হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! মাত্র গত কল্য অপরাহ্ণে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২

"সন্ধ্যাবেলা চা খেলে না কেন?"

"চা ছেড়ে দিলাম।"

"কেন?"

"এম্নি, কোন কারণ নেই।"

"কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। কি জন্য ছেড়ে দিলে বল?"

"সব কারণ বলা যায় না—অনুভব বা অনুমান ক'রে নিতে হয়।"

"আমি আজ চা ক'রে দিই নি ব'লে?"

"তা ঠিক নয়—তবে তার সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে বটে, মনের দুর্ব্বলতা টের পেলাম—অত সামান্য কারণে আমার কতদূর ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে পারে, তা বুঝতে পারলাম। এ রকম আর ঘটতে দেব না, তাই চা ছেড়ে দিয়েছি।"

"তুমি দেখতেই ত পেলে, আমি তখন পূজোয় বসেছিলাম।"

"দেখেছি ব'লেই ত ও প্রসঙ্গ আর তুলি নি। আর তোমার যে হঠাৎ পূজায় এত অনুরাগ হয়েছে, তা ত আমাকে আগে জানাও নি।"

"ভাল কথা, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। মা'র কাছে শোন নি?"

"পরচর্চ্চা করা মায়ের কখন অভ্যাস নেই, জান ত!"

"আষাঢ় মাসে আমি মন্ত্র নিয়েছি—তোমাকে লিখি লিখি ক'রে লেখা হয় নি। স্বামীর অনুমতি না পেলে মন্ত্র নেওয়া যায় না জানি, কিন্তু গুরুদেবের আদেশমত মা'র মত নিয়েই মন্ত্র নিয়েছি।"

"বেশ করেছ, কিন্তু এবার গুরুদেব এলে জিজ্ঞাসা কোরো দিকি—বুড়ো শাশুড়ীর ওপর ছেলের ভার আর

চাকরের ওপর স্বামীর ভার দিয়ে গীতাপাঠ করলে কতখানি পুণ্য লাভ হয়।”

স্ত্রী মৃদু হাস্যে বলিল, “কি যে বল, তার ঠিক নেই। চাকরে একবার চা ক’রে দিলেই বুঝি চাকরের উপর স্বামীর ভার দেওয়া হ’ল।”

“না, তা ঠিক হয় না। স্বামিসম্বন্ধে যেটুকু কষ্ট করতে হয়—শুধু তার ভার দেওয়া হয়। তা হঠাৎ যে মন্ত্র নেবার ইচ্ছা হ’ল! গুরুদেব বল্লেন?”

“আমি ত তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিই নি।”

“কার কাছ থেকে নিয়েছ তবে?”

“তিনি এক সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী—পুরীতে তাঁর আশ্রম; মাঝে মাঝে এখানে আসেন।”

“তিনি একে সন্ন্যাসী, তায় সংসারত্যাগী; অদ্ভুত বটে। কিন্তু আমাদের কুলগুরু কি অপরাধ কল্লেন?”

“এ ত অপরাধের কথা হয় না। ইনি বৌদিদির গুরু, কিরণবাবুর সঙ্গে দিদিও তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন। আমার ভক্তি হ’ল—আমিও নিলাম। তুমি তখন দেশে ছিলে না—তাই তোমার মত নেওয়া হয় নি। এতে এত ঠাট্টা কেন—গুরুনিন্দারই বা কি দরকার?”

“তোমার গুরু কে, তা যখন জানি নে—তখন তাঁকে নিন্দে কি ক’রে করব? তবে আমাদের গুরুকে জানি, তাই বলতে পারি, ও রকম সাধু পুরুষ দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, অন্য গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে তোমার লাভ হয় নি।”

“তাঁকে ত তুমি দেখ নি—তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানও না—তবে এ কথা কি ক’রে বল্‌তে পার?”

“যাঁর ওপর আমার ভক্তি, তাঁকে বড় বল্‌লে দোষের হয় না। যদি তোমার গুরুকে দেখে মত বদলায়, তখন তাঁর কাছে ও তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইব। আপাততঃ তাঁর যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর উপর শ্রদ্ধা হবার কোন কারণ হয় নি।”

স্ত্রীর মুখ গম্ভীর হইল, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “তার মানে?”

“যখন সংসারে রয়েছ, তখন সেটা বজায় রেখে তবে ত ধর্ম্ম করতে হবে। যাঁর উপদেশ শিশুকে বুভুক্ষু রেখে গীতাপাঠে প্রবৃত্তি দেয়, স্বামী শাশুড়ীকে চ’রে খেতে বাধ্য করে, তাঁর উপর কি ক’রে শ্রদ্ধা হয় বল।”

“তা হ’লে বল, শুধু গতরের সঙ্গেই সম্বন্ধ। পান থেকে চুণ খস্‌লেই সর্ব্বনাশ।”

“সম্বন্ধটা সেই রকমেরই বটে। পৃথিবীতে কোন জিনিষই একতরফা চলে না। আমার কর্ত্তব্য প্রাণপণে তোমাদের অসুবিধা দূর করা, তোমাদের খাবার পরবার সংস্থান করা, অর্থ অভাবে তোমরা কখন যাতে কষ্ট না পাও দেখা। আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তে তা না করি, তোমার টান ক’মে আসবে, আর যদি ক্ষমতা না থাকে, তা হ’লে হয় ত ঘৃণা করবে। তুমি যদি সংসারের দিক্ থেকে মন গুটিয়ে নিয়ে শুধু গীতা, গুরু ও পূজোর দিকে মন ছেড়ে দাও, আমার মনে তাতে কি হ’তে পারে, ভেবে দেখ।”

“ঘৃণা হয়, এই ত? তা বেশ। গুরু সত্যই বলেছেন,—সংসারে শুধু ধর্ম্মই সার আর ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু।”

“অতএব সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়ে শুধু গীতায় মন দাও—আর সময়মত খাও দাও, যাতে পূজাপাঠে ব্যাঘাত না ঘটে। অতি উঁচু কথা বলেছেন তোমার গুরু; সেই জন্যই ব’লে থাকে, সাধুরা শুধু তত্ত্বদর্শী নন—আত্মদর্শীও বটেন!”

সরোজিনী স্বামীর এই শ্লেষবাক্যে আগুন হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ক্রোধ একটু কমিলে সাশ্রুনেত্রে সরোজিনী ভাবিতে লাগিল—পাঁচ মাস পরে গৃহে ফিরিয়া একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া এই কাণ্ড!

হেমন্ত ভাবিল—এত দিন পরে গৃহে ফিরিলাম—কিসের জন্য?

এইরূপে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম ব্যবধানের সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

৩

সরোজিনীর ছোট বোন্ নলিনীর বিবাহও কলিকাতায় হইয়াছে। স্বামী উকীল—পসার নাই, কিন্তু পয়সা আছে।

শীতের দ্বিপ্রহরে এক দিন বেড়াইতে আসিয়া নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—“দিদি, যাবি ত?

“কি জানি, ভাই!”

“কি জানি কি? বেশ ত!”

"কি কর্‌ব, ভাই, এঁকে যে বল্‌তেই সাহস হয় না—হয় ত ব'লে বস্‌বেন,—'গিয়ে কায নেই।'"

"এ যে বড় জুলুম, দিদি! ওঁরা তিন্নী দিল্লী বেড়াতে যান, তখন কি একবার আমাদের কথা ভাবেন? আর আমরা যদি ধর্ম্মে কর্ম্মে একটা যায়গায় যেতে চাই, তাতে বাধা দিতে আসেন কেন?"

"সে কথা কে বলে, ভাই! এই, না ব'লে মন্ত্র নিইছি, তাই কত রাগ!"

"এ বড় অন্যায় রাগ, দিদি! মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি ব'লে কি ধর্ম্মকার্য্যেও অধিকার নেই?"

"কি কর্‌ব, আমার অদৃষ্ট!"

"তা বল্লে চলবে না, দিদি,—যেতে হবেই; বিশেষ গুরুদেব তোমার ও আমার কথা বিশেষ ক'রে লিখেছেন। বছরে একটা দিন তাঁর জন্মোৎসব, এ দিনটায় না গেলে তিনি কি ভাববেন, দিদি? মনে করবেন, সংসারই ওদের সব—আমি কেউ নই।"

"দেখি ব'লে আজ। নরেন সহজে রাজী হ'ল ত তোকে ছেড়ে দিতে?"

"তোর ওই এক কথা, দিদি! রাজী আবার হবে না কেন? আমি ত এই সে দিনও একবার ঘুরে এলাম। এবার বলেছি, মেয়েটাকে নিয়ে যাব না—তোমায় নিয়ে থাক্‌তে হবে। বলেছে, আচ্ছা।"

আর দুই একটা কথা কহিয়া নলিনী উঠিল।

স্বামীর উপর নলিনীর এই প্রভাব ও তাহার প্রতি এই যথেচ্ছাচারকে স্বামিসৌভাগ্য মনে করিয়া সরোজিনী আপনাকে নিরতিশয় দুর্ভাগিনী মনে করিল। আর এই দুঃখের কথা নলিনীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল, ইহার লজ্জা তাহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতেই সরোজিনী স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িল।

হেমন্ত বলিল,—"বেশ, যেও।"

সরোজিনী নলিনীর কথা তুলিয়া বলিল,—"নলিনী তার মেয়ে রেখে যাবে, নরেন দেখ্‌বে।"

হেমন্ত বলিল,—"নরেনের কোর্টে না গেলে চলে, কারণ, তার বাপের অগাধ পয়সা আছে। আমার ত আর আফিস্ কামাই ক'রে বাড়ী ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

গুরুদেবের জন্মোৎসব ব্যাপারটা কত বিশাল ও পবিত্র, এ প্রসঙ্গ সরোজিনী আর একবার তুলিল। কিন্তু হেমন্ত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

হেমন্ত ঘুমাইয়া পড়িলে সরোজিনী খানিকক্ষণ জাগিয়া রহিল। স্বামীর মত হইবে না,—এই তাহার আশঙ্কা ছিল। আজ এত সহজে মত পাইয়াও সে সুখী হইতে পারিল না।

হেমন্ত যদি এক কথায় রাজী না হইয়া প্রথমে একটু আপত্তি তুলিত ও তাহার পর সম্মতি দিত, তবে হয় ত সরোজিনীর ভিতরকার স্ত্রী ও শিষ্যা উভয়েই তৃপ্তি পাইত।

সরোজিনী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—"সত্যই সংসারের প্রতি তাহার আকর্ষণ বেশী—অন্ততঃ নলিনীর চেয়ে বেশী ত বটেই!

৪

"তুই যেতে দিলি কেন, বাবা?"—মা অশ্রুমোচন করিলেন।

"না দিয়ে কদিন তুমি ঠেকিয়ে রাখতে বল? ধর্ম্মের নামে যখন ঝোঁক চেপেছে, তখন তাকে জোর ক'রে নামান যাবে না, মা! তুমি কিছু দিন একটু শান্ত হয়ে থাক,—সব ঠিক হয়ে যাবে। শীঘ্রই ফিরে এসে তাকে বল্‌তে হবে—আমার ভুল হয়েছে, ধর্ম্মের পথ এ নয়।"

হেমন্তের কথায় মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি বলিলেন, "খোকাকে রেখে দিলেই পার্‌তিস্—খোকার টানে তাকে দুদিনেই ফিরে আস্‌তে হ'ত দেখতিস্।"

হেমন্ত লজ্জার মধ্যে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তা' হ'লে তাকে ফিকির ক'রে আনান হ'ত; আবার কিছু দিন পরেই যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত, আর দ্বিতীয় বার খোকাকে ছেড়ে কিছু দিন বেশীও থাক্‌তে পারত। সংসারেই তার কর্ত্তব্য আছে, বাবুয়ানী ধর্ম্মে নয়, এটুকু বুঝে সে যদি ফিরে আসে, তবেই সে আসুক,—নইলে আর কি হবে, মা?"

"ছিঃ বাবা, তুই এত জ্ঞানী হয়ে এই কথা বল্লি।

এ ত একটাও তোর মনের ব্যথা নয়,—অভিমান তোকে এই সব কথা বলাচ্ছে।"

হেমন্ত নিরুত্তরে ভাবিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহার প্রতিবাদ করিবার কিছু ছিল না।

মা কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"কাল থেকে ত বড়দিনের ছুটী, আজই তুই আফিস ক'রে বরাবর পুরী চ'লে যা। সেখানে না হয় ২।১ দিন থেকে বৌমাকে নিয়ে আয়।"

"এ যে বড় লজ্জার কথা মা যে, যেখানে সে যাবে, তার পিছনে পিছনে সেখানে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে!"

"সে কি কথা, বাবা! ছেলেমানুষ যদি ভুলে বিপথে গিয়ে পড়ে, তাকে তুই সেই পথে ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বি—তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আন্‌বিনে?"

"এ পথকে ওরা ত বিপথ বল্‌ছে না, —এ যে ওদের ধর্ম্মের পথ।"

"ছাই ধর্ম্মের পথ! স্বামী পুত্র সংসারের মঙ্গল ছাড়া যে পথ, সে মেয়েমানুষের ধর্ম্মের পথ কখন নয়। তুই যা, তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।"

"সে পথেও যে এক বিপদ, মা! ওদের গুরু যখন স্বামীদের যেতে অনুমতি দেবেন, তখন তারা যেতে পাবে, নইলে নয়।"

এবার মায়ের রাগ হইল। বলিলেন, "আমাদের সময় যদি কেউ এ কথা বল্‌ত, আমরা তার মুখ দেখতাম না। তা তিনি কেন যত বড়ই হোন না। এ ত কম আস্পর্দ্ধার কথা নয় যে, সে স্বামীর মত না নিয়ে স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, আর স্বামীদের যেতে হবে সেখানে তার মত নিয়ে!"

"এ যে তোমার অন্যায় রাগ, মা! তোমার নিজের লোকের উপর তোমার জোর নেই;—আর রাগ করবে বাইরের লোকের উপর!"

"তা করব না? সে কি সাধু? সে যে জুয়াচোর, ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে মেয়েমানষের মন ভোলাচ্ছে;—নইলে সাধ্যি কি তার বৌমার মত মেয়ের পায়ের নখ দেখতে পায়! তুই নিজের মনকে ভুল বুঝে আমার সঙ্গে বাজে তর্ক করিস্ নে।"

হেমন্ত চুপ করিয়া রহিল।

মা আবার বলিলেন,—"কালই তুই যা, বাবা! সে যখন নিজেকে সাধু বলে, সবারই তার সঙ্গে দেখা করবার অধিকার আছে। যদি সুবিধা বুঝিস্, তার আশ্রমে থাকিস্; না হয়, কাছাকাছি একটা বাসা নিবি।"

রাত্রিতে আহারাদির পর মাতাপুত্রে এই সব কথাবার্ত্তা হইল।

পরদিন ছুটীর পর হেমন্ত মায়ের কথামত পুরীযাত্রা করিল।

৫

বেলা দ্বিপ্রহর। হেমন্ত একাকী সমুদ্রতীরে বসিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একখানি বাড়ীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছিল।

বাড়ীখানি গৈরিক বর্ণের। সচরাচর এই বর্ণের বাড়ী বড় একটা চোখে পড়ে না। বাড়ীখানির নামটিও একটু অসাধারণ—'সাধনাশ্রম, তরুণ ও তরুণীর জন্য।'

একটি ৮।৯ বৎসরের বালক সেই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণেকের জন্য দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার পর হেমন্তকে দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া বলিল,—"দেখুন,—"শুন্‌ছেন? একটা কায করতে পারেন?"

হেমন্ত। কি বল।

বালক পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল, —"এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হবে, পারবেন?"

চিঠিখানি খামে বন্ধ, খামের উপর ঠিকানা লেখা।

বালকের ভঙ্গীতে কৌতুক অনুভব করিয়া হেমন্ত বলিল,—"হাঁ, বোধ হয় পারব।"

বালক বলিল,—"আমি ডাকঘর চিনি নে।"

"তা যিনি চিঠি ডাকে দিতে দেছেন, তাঁকে কি বলবে?"

বালক বলিল, "বলব, এক জন ভদ্রলোককে ডাকে দিতে দিয়েছি।"

হেমন্ত হাত বাড়াইয়া বালকের নিকট হইতে চিঠিখানি লইল। ঠিকানা পড়িতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারই নাম ও ঠিকানা এবং হস্তাক্ষর তাহার স্ত্রীর।

বালক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। বলিল, "আপনি

যে অবাক্ হয়ে গেলেন! তা ব'লে যেন চিঠি পড়বেন না, মেয়েমানষের চিঠি পড়তে নেই।"

হেমন্ত আপাততঃ চিঠিখানি খুলিবার কৌতূহল দমন করিয়া বলিল, "তাই না কি? তুমি কি ক'রে জানলে?"

বালক খুব সহজভাবেই বলিল,—"তা আর জানব না কেন? মেজ-দি বলেছে।"

"বটে! তা মেজ-দি হঠাৎ এত বড় কথাটা তোমাকে বল্‌লেন কেন? তুমি বুঝি তাঁর চিঠি পড়েছিলে কখন?"

বালক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হেমন্তের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"আপনি কি ক'রে জানলেন? আমি কিন্তু চিঠি পড়িনি, চিঠিতে ছবি ছিল, তাই দেখছিলাম।"

"ওঃ, তা হ'লে আর তোমার দোষ কি। তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"বাড়ী আমাদের বশিরহাট। আমরা এখানে এখন থাকি। ঐ যে হলদে বাড়ীটা দেখছেন, ঐটেতে আমরা থাকি। আমি এই বেলা যাই, নইলে মা আবার বক্‌বেন; তা হ'লে চিঠিখানা ঠিক যেন ফেলবেন। যাঁর ঠিকানা খামে আছে, তিনি যেন ঠিক পান।"

বলিয়া বালক এক ছুট্ দিল।

হেমন্ত বলিল,—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি পাবেন। ভয় নেই।"

বালক চলিয়া গেলে হেমন্ত খাম খুলিয়া চিঠিখানি পড়িল।

"সাধনাশ্রম।
স্বর্গদ্বার পুরী।
সোমবার—

শ্রীচরণকমলেষু,—

তোমার অমতে এখানে আসিয়া ভাল লাগিতেছে না। তুমি পত্রপাঠ আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না। এখানে তোমাকে পত্র লেখা বারণ, লুকাইয়া লিখিলাম ও অতি কষ্টে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিলাম। আসিতে কোনমতে অন্যথা করিও না।

পুনশ্চ—খোকার যত্ন হইতেছে না। রোগা হইয়া গিয়াছে। ইতি—

সেবিকা—সরোজিনী।"

হেমন্ত চিঠিখানি ৩।৪ বার মন দিয়া পড়িল। যত বার পড়িল, তত বারই মনে হইল, চিঠিতে যাহা সে লিখিয়াছে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী বলিবার আছে। 'ভাল করি নাই' কথাটা কাটিয়া দিয়া লিখিয়াছে, 'ভাল লাগিতেছে না।' সব শেষে আবার 'তাহাকে' কাটিয়া ইতি দিয়া শেষ করিয়াছে। খোকার সম্বন্ধে যেন আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল।

চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া হেমন্ত সাধনাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল।

সাধনাশ্রমের দ্বারবান্ গুরুর সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া হাল্‌কা কয়েকটি বাঙ্গালা গান তাহার নিজস্ব বাঙ্গালা ভাষায় শিখিয়াছিল। তাহারই একটা গান সে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে ছিল। এমন সময় এক জন ভদ্রলোককে আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া আপনাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া লইল।

হেমন্ত একেবারে সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দরোয়ানজী, সব কুশল মঙ্গল ত?"

দ্বারবান্ একটু সন্দেহের চক্ষুতে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, বাবু, ভাল। আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

হেমন্ত বলিল,—"আমি অন্য দেশ থেকে আসছি। তোমাদের এ আশ্রমের নাম খুব শুনেছি। একবার ভিতরটা দেখে যাব ব'লে এসেছি।"

দ্বারবান্ আবার গম্ভীর হইয়া বলিল,—"সে ত হবে না, বাবু। ঠাকুরজীর হুকুম আছে, মাইজী লোক ছাড়া কেউ ভিতরে যেতে পাবে না।"

হেমন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল,—"তার মানে? তোমাদের ঠাকুরজী কি স্ত্রীলোক না কি?"

দ্বারবান বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কি বোলেন আপনি, বাবু! আমার ঠাকুরজীর নাম তরুণানন্দ স্বামী—ক্রেতো লোকে তাকে জানে, আপনাদের ইস্ত্রিলোক ঠাকুরজীর হাতমে ছাড়িয়ে দেয়।"

"বটে। তবে ত তোমার ঠাকুরজী মহাপুরুষ। এতদূর এসে তাঁকে দর্শন না ক'রে গেলে যে, মহাপাপ হবে। আমি একটিবার যাব, আর তাঁকে দর্শন ক'রে কিছু প্রণামী দিয়ে আসব। আর তুমি যে আমাকে যেতে দিচ্ছ, তার জন্য তোমার পুরস্কার এই নেও।"

বলিয়া হেমন্ত বিস্মিত দ্বারবানের পুলকিত ও প্রসারিত হস্তে ৫টি উজ্জ্বল রৌপ্যমুদ্রা রক্ষা করিল।

দ্বারবান্ নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া টাকা কয়টি বস্ত্রমধ্যে সযত্নে রাখিয়া বলিল,—"আপনি ভিতরমে গিয়ে আশ্রমের সব আচ্ছা করিয়ে দেখিয়ে লিবেন। তার পর খবর ভেজিয়ে দিবেন। ঠাকুরজী দেখা কোর্‌বেন।"

হেমন্ত তখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

[illegible]

প্রথমেই বারান্দাযুক্ত দুইটি নাতিবৃহৎ কক্ষ, সম্মুখে প্রাঙ্গণ। একটি কক্ষে কয়েকটি শিশু লইয়া একটি ঝি বসিয়া আছে। কাহাকেও ঘুমের জন্য তাড়না করিতেছে, কাহাকে বা দুইটি চড় বসাইয়া দিয়া শান্ত করিবার পরিবর্ত্তে আরও অশান্ত করিয়া তুলিতেছে, কখন বা বলিতেছে,—"এমন মা-ও দেখিনি বাপু যে, ছেলে-মেয়ে ফেলে ওপরে মত্ত আছেন।" হেমন্ত সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার পুত্রও এই শিশু-কোম্পানীর মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। ঝি তাহাকে যেমন করিয়াই হউক, ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছে।

হেমন্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। ছেলেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ঝির কঠিন কার্য্যের জন্য সহানুভূতি দেখাইল। পরিশেষে ঝিয়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, "দুই টাকার মিষ্টান্ন কিনিয়া এই শিশুদিগকে দিবে এবং অবশিষ্ট ৩টি টাকা দিয়া যখন দেশে যাইবে, তখন তোমার আপন ছেলেমেয়েদের জন্য মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া যাইবে।" ঝির আপন কোন সন্তান-সন্ততি না থাকিলেও এই ব্যবস্থায় ঝি পরম সন্তোষ লাভ করিল এবং আশ্রমের কোন কার্য্যই হেমন্তের অজ্ঞাত রাখিল না।

বাড়ী দ্বিতল। নিম্নতল পাশাপাশি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রবেশ করিতেই শিশুখণ্ড—যেখানে শিষ্যাগণের শিশুগণ আশ্রয় পাইয়াছে। এই শিশুগণ মায়ের কাছে দিনান্তে একবারমাত্র যাইতে পায়। বেশীক্ষণ থাকিলে না কি তাহারা মাতৃগণের ধর্ম্মকার্য্য ও ধ্যানধারণাদির বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় খণ্ডে পুরুষগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা কেহ কেহ গুরুজীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে—কেহ বা অর্দ্ধাঙ্গিনীর মন্ত্র গ্রহণের জন্য বাধ্য হইয়া আছে। কেহই কিন্তু গুরুর অনুমতি না পাইলে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না।

তৃতীয় খণ্ড রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখান হইতে অন্ন শিষ্যাগণের জন্য উপরে ও শিশুগণের জন্য শিশুখণ্ডে যায়।

উপরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি শয়নকক্ষ। দুইটি গুরুর দ্বারা অধিকৃত, অপর ৫টি শিষ্যাগণ অধিকার করেন। এক কালে ৫টির বেশী শিষ্যা থাকিবার নিয়ম নাই। প্রাতঃকালে গুরুর কক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল শিষ্যা সমবেত হইয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। অন্য সময়ে শিষ্যাগণের কক্ষে গুরু স্বয়ং আসিয়া অধিকারভেদে উপদেশাদি প্রদান করেন। যিনি পুত্র, কন্যা ও স্বামীর প্রতি—অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষণ যত ত্যাগ করিতে পাবেন, গুরুর স্নেহ তাঁহার প্রতি তত আকৃষ্ট হয়।

হেমন্তের মনে হইল, এ কি সাংঘাতিক ব্যবস্থা! মেয়েরা উপরতলে একেবারে গুরুর করতলগত হইয়া আছে! ইচ্ছা করিলেও সহজে সন্তানের সঙ্গে দেখা করিবার তাহাদের উপায় নাই, কারণ, রন্ধনখণ্ড, পুরুষদের খণ্ড পার হইয়া তবে তাহাদিগকে আসিতে হইবে। হেমন্ত সন্ধান লইয়া জানিল, গুরু ঘুমাইলে রাত্রিতে যে কোন স্বামী তাহার স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দুই দণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করিয়া লইবে, তাহার উপায়ও নাই। কারণ, নীচে নামিবার দুয়ার গুরু প্রতি রাত্রিতে স্বহস্তে বন্ধ করিয়া চাবি নিজের কাছে রাখিয়া দেন—পাছে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কোন স্বামি-স্ত্রী দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ফেলে।

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিল—তবে কিসের লোভে বা প্রত্যাশায় হতভাগ্য স্বামীরা এখানে পড়িয়া থাকে! শুধু কি ধর্ম্মপিপাসায়? কৈ, এমন ধর্ম্মানুরাগ ত সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তবে ইহা কি?

হেমন্ত স্থির করিল, এ কয় দিনের মধ্যে ইহার সন্ধান লইতেই হইবে।

সন্ধান লইতে লইতে হেমন্ত একটি সূত্র পাইল—যাহা অবলম্বন করিয়া সে প্রকাশ্যে এই স্থানে অবস্থান করিতে পারে। আর ঘণ্টা দুই পরে গুরু নিম্নতলে নামিয়া কিছুক্ষণের জন্য শিষ্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন।

কেবল সেই সময়ে বাহিরের ধর্ম্মপিপাসু লোকজন তাঁহার কাছে আসিতে পারে ; সেই সময়ে তিনি ভক্তগণের ভবিষ্যৎ গণনাও করেন এবং এমন দুই একটি অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করেন—যাহা দেখিয়া লোক বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। তবে নিতান্ত অনুরোধে না পড়িলে তিনি গণনা-দিতে হাত দেন না ; যদি কোন ভক্ত অত্যন্ত ধরিয়া বসেন এবং আশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থও দিয়া ফেলেন, তবেই তাঁহাকে গণনায় হাত দিতে হয়।

হেমন্তের পকেটেই কলম, কাগজ সব ছিল! বাহির করিয়া সরোজিনীর নামে এক পত্র লিখিল :- "আমি আসিয়াছি। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, পত্র পাইয়া ভিতরে আসিয়াছি। ভয় নাই। খোকাদের বাহিরে আনিবার সময়ে সব শেষে তোমার খোকাকে আনিবে। সেই সঙ্গে তুমিও চলিয়া আসিবে। পুরুষ-মহলের ঠিক দুয়ারের কাছে আমি অপেক্ষা করিব।"

হেমন্ত ঝির সঙ্গে আরও একটু আলাপ করিয়া লইল ও তাহার হাতে চিঠিখানি দিয়া রাখিল। বুঝাইয়া দিল, যখন গুরু পুরুষ-মহলে আসিয়া বসিবেন এবং সে শিশুগণকে লইয়া তাহাদের মায়ের কাছে যাইবে, তখন ঐ চিঠিখানি সরোজিনীর হাতে দিতে হইবে। সরোজিনী কে, তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেই সে বলিল—"হ্যাঁ বাবু, তা আর চিনিনে। তিনিই ত হিরণকুমারের মা। আহা, তেনারই ত ছেলের জন্য বেশী কষ্ট দেখি ; আর সবাই ত দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে আছে।"

ঝিকে সব বুঝাইয়া দিয়া হেমন্ত কিছু কালের জন্য বাহিরে গেল। দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। হেমন্ত বলিল—"আমি একটু ঘুরে আসি ; এখনও তোমার ঠাকুরজীর নামতে দেরী আছে ত?"

দ্বারবান বলিল "জী হাঁ, এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরী।"

হেমন্ত চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে একটি প্রিয়দর্শন যুবক ও একটি ভৃত্য সঙ্গে হেমন্ত পুনরায় আশ্রমে ফিরিল।

৬

নিম্নতলে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, গুরুর নীচে নামিবার সময় হইয়াছে। পুরুষ-মহলের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয্যা বিছান ছিল। ঘর জুড়িয়া একখানি দামী কম্বল, মাঝখানে একখানি কোমল সুদৃশ্য গালিচা। গালিচার মধ্যস্থলে পশমের একটি প্রস্ফুট রক্ত-কমল ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; গুরু তাহারই উপর উপবেশন করিবেন। কমলের পশ্চাতে একটি উপধান—গৈরিক বর্ণের সূক্ষ্ম আবরণে তাহা আবৃত।

কয়েক জন শিষ্য বা শিষ্যার স্বামী সেখানে উপস্থিত আছেন ; বাহিরের দুই চারি জনও সমবেত হইয়াছেন।

গুরু আসিবামাত্র সকলে দণ্ডায়মান হইলেন ; গুরু মধ্যস্থলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ পদধূলি লইলেন।

গুরু যুবা পুরুষ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকেশ ; গৈরিক বর্ণের কৌষেয় পরিচ্ছদ : গাত্রাবরণী পুরাতন আঙ্গরাখা বা আজিকালিকার কোন প্রকার কোট, কামিজ বা পাঞ্জাবীর অন্তর্গত না হইলেও বেশ সুদৃশ্য ও মনোরম। বয়স দেখিলে ত্রিশের বেশী মনে হয় না।

গুরু মধুর হাসিয়া কুশলপ্রশ্নে সকলকে তুষ্ট করিলেন।

এক নবাগত ভদ্রলোক প্রণামান্তে পাঁচটি টাকা গুরুর পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু, একটু গণনার জন্য এসেছি।"

গুরু হস্তোত্তোলনে তাহাকে আর কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন ও ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পরে গণনার প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হইল।

গুরুর দক্ষিণ হস্তের কাছে কয়েকখান কাগজ এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া চাপা ছিল। তাহা হইতে এক খণ্ড কাগজ লইয়া একটি নীল পেন্সিল দিয়া গুরু কতকগুলি কি লিখিয়া উল্টাইয়া রাখিলেন।

তাহার পর নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা চলিল :—

"একটি ফলের নাম কর।"

"আনারস।"

"একটি ফুলের নাম।"

"পদ্ম।"

"নক্ষত্র।"

"শতভিষা।"

"নদীর নাম।"

"যমুনা।"

পরক্ষণে গুরু পূর্ব্বলিখিত কাগজখানি লইয়া ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। তিনি অগাধ বিস্ময়ে দেখিলেন,

যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম তিনি করিয়াছেন, ঠিক সেই নাম কয়টি গুরু পূর্ব্ব হইতে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

পরিপূর্ণ ভক্তিভরে ভদ্রলোক গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার অসাধ্য কি আছে?"

তখন গুরু ভবিষ্যৎ গণনা আরম্ভ করিলেন।

"তুমি কি কায কর? রাজকার্য্য?"

"আজ্ঞে, আমি হাঁটুভাঙ্গা পরগণার নায়েব।"

"হ্যাঁ, তা হলেই রাজকার্য্য হ'ল। আমাদের রাজা আর কে? জমীদারই ত? আর জমীদারদের রাজা হচ্ছেন ইংরাজ। নয় কি?

"আজ্ঞে, তা ত বটেই!"

"তোমাদের অবস্থা আগে খুব ভালই কেটেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক সময়ে দিন খুব ভালই কেটেছে।"

"এখন একটু মন্দা চল্‌ছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে, তাই আশীর্ব্বাদ করুন।"

"টাকা ত খুবই রোজগার কর দেখ্‌ছি। হাতে থাকে না কেন?"

"আজ্ঞে, কি করি বলুন,—প্রকাণ্ড সংসার, পাঁচ জনকে দেখ্‌তে হয়; কিছু রাখ্‌তে পারিনে।"

"তা হ'লে কি চলে? কিছু কিছু রাখ্‌বে। দেখি হাত আর একবার। ধর্ম্মস্থান খুব ভাল দেখছি যে! শেষবয়সে তীর্থ কিছু বাকী রাখ্‌বে না হে। তুমি ত ভাগ্যবান্ পুরুষ দেখ্‌ছি!"

"আজ্ঞে, যা কিছু আপনার আশীর্ব্বাদে।"

চার পাঁচ জনের ভবিষ্যৎ যৎসামান্য ইতরবিশেষ করিয়া গণনা করান হইল। কিন্তু যাহারা গণনা করাইতেছিল, তাহাদের মনে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিল না। ফুল ফল ইত্যাদির নাম আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেরই ভক্তি অটুট রহিয়া গেল।

হেমন্ত ব্যাপারটা খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার পর গুরুর কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমিও গণনার জন্য এসেছি—তবে দক্ষিণাটা আমি গণনা সত্য হ'লে তবে দেব।"

ভক্তগণ গর্জ্জিয়া উঠিল—বিশেষতঃ যাহারা আগে টাকা দিয়া ফেলিয়াছিল।

এক জন বলিল—"ঠাকুর অন্তর্য্যামী; নইলে আমরা কি ফুলের নাম কর্‌ব, তা উনি আগে থেকে কি ক'রে জান্‌লেন?"

হেমন্ত সবিনয়ে বলিল,—"উনি পারেন না, এ কথা ত আমি বল্‌ছিনে। যদি ফল ও ফুলের নাম ওঁর লেখার সঙ্গে মিলে যায়, নিশ্চয়ই দেব।"

এক ভক্ত বলিল,—"অবিশ্বাসী!" হেমন্ত মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বেশ ত, উনি আমার অবিশ্বাস দূর ক'রে দিন!"

গুরু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমন্তের মুখপানে চাহিয়া কাগজের উপর কতকগুলি নাম লিখিয়া রাখিলেন।

পরে একটু থামিয়া বলিলেন,—

"একটি ফুলের নাম কর।"

"যোজনগন্ধা।"

"ফলের নাম!"

"চাল্‌তা।"

"নক্ষত্রের নাম?"

"মৃগশিরা।"

গুরু এবার কাগজপত্র বাহির করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হেমন্ত হাসিয়া ফেলিল।

গুরু আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমন্তের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই অশুচি অবস্থায় এখানে আসিয়াছ, তাই তোমার কথা মিলিল না। তোমার ভবিষ্যৎ আমি গণিব না।"

হেমন্ত শান্তমুখে বলিল,—"আপনি গণনা জানেন না, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আপনি গণিতে চাহিলেও আমি আপনার কাছে গণাইতাম না। একটা ফলের নাম বা ফুলের নাম বলা কিছুই শক্ত নয়। এ অল্প চেষ্টাতেই হয়।"

গুরু শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"বিশেষ শক্ত নয়—করই না দেখি।"

হেমন্ত একটুখানি ভাবিয়া লইল। পরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক জনকে বাছিয়া লইয়া বলিল,—"আসুন ত, মহাশয়, দেখা যাক্, পারা যায় কি না।"

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আসুন!" হেমন্ত পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া কি লিখিল; পরে সেখানি ভাঁজ করিয়া অপর এক ভক্তের হাতে দিয়া প্রথম ভক্তকে ফল-ফুলাদির নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে-ও স্বেচ্ছায় উত্তর দিল।

হেমন্ত বলিল—"এবার খুলুন।"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—"কেবল নক্ষত্রের নাম ছাড়া সব নাম মিলিয়া গিয়াছে!"

গুরু অনেকখানি নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"লালসিং।"

লালসিং 'জী হুজুর' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই হেমন্তের সঙ্গে যে পরিচারক আসিয়াছিল, সে-ও আপনার হাতে লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া লাল-সিংহের সম্মুখীন হইল। হেমন্তের সঙ্গের যুবক মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিল।

পরক্ষণে আর এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। দুয়ারের কাছে যেখানে হেমন্ত দাঁড়াইয়া ছিল, ছেলে কোলে করিয়া সরোজিনী উৎকণ্ঠিতভাবে সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত স্বামীকে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সরোজিনী এখানে!"

সঙ্গে সঙ্গে দুই লাফে তিনি সরোজিনীর কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলেন।

সরোজিনী ভয়ে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল। খোকা ঝাঁপাইয়া বাপের কোলে গেল।

হেমন্ত এতক্ষণ পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"এই স্বভাব নিয়ে আপনি গুরুগিরী করেন? আমার স্ত্রী আজ থেকে শিষ্যা নন—এখনই আমরা আপনার এই অপবিত্র স্থান ত্যাগ করছি"

ক্রোধে গুরুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিলেন—"আমার আশ্রমে এসে আমার শিষ্যাকে নিয়ে যাও, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! স্বামী! কে জানে, তুমি এর স্বামী? বদ্ মৎলব নিয়ে তুমি আসনি, তার প্রমাণ কি? কি বল তোমরা?"

শেষের কথাটা যাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহাদের মনেও খট্‌কা লাগিয়াছিল।

হেমন্তের সঙ্গে যে প্রিয়দর্শন যুবক আসিয়াছিলেন, তিনি সঙ্গের পরিচারককে বলিলেন—"অর্জ্জুন, ও ঘরে গিয়ে ইনি যে ঘরে থাকতেন, সে ঘর থেকে এঁর জিনিষপত্র নিয়ে এস ত।"

হেমন্ত বলিল—"সেখানে ঝি আছে—তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সে দেখিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে, ক্রোধে গুরুর খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটু পরে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এ সব কি হচ্ছে তোমাদের? আমার বাড়ী এসে অত্যাচার, আমি এখনই পুলিসে খবর দিচ্ছি, এত বড়-"

বাধা দিয়া হেমন্তের সঙ্গী বলিলেন,—"আপনি অনর্থক ব্যস্ত হবেন না; আমি এখানকার সদর এস্, ডি, ও, আপনার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

হেমন্ত বিস্মিত ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"যাবার সময় আমি আপনাদের গোটাকতক কথা ব'লে যাই। আপনারা বিচার ক'রে দেখবেন। যাঁদের স্ত্রী এখানে আছেন, তাঁরা জানেন, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-শুনা এখানে মহাপাপ। এটুকু বোধ হয় জানেন না যে, রাত্রিতে সিঁড়িতে চাবি দিয়ে ইনি চাবি নিজের কাছে রাখেন, পাছে দৈবাৎ তাঁরা আপনাদের কাছে চ'লে আসেন।"

পরে হেমন্ত গুরুর দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"আমি এখানে অনেকের কাছে তোমার গুণগ্রাম রাষ্ট্র করেছি। কল্‌কাতা ফিরে গিয়েই আমি তোমার কীর্ত্তি সব কাগজে প্রকাশ ক'রে দেব। তোমার এ ভণ্ডামী আর বেশী দিন চলবে না।"

সরোজিনীর হাত ধরিয়া হেমন্ত সে কক্ষ পার হইয়া বাহিরে আসিল। উদ্বেগে ও লজ্জায় সরোজিনী তখন কাঁপিতেছিল।

অর্জ্জুন ততক্ষণে জিনিষপত্র আনিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

সদর S, D, O, গুরুকে বলিলেন,—"আপনি কালই এ স্থান ত্যাগ করবেন, নইলে বিপদে পড়বেন। মহিলাদের বাড়ী পাঠাবার আমি বন্দোবস্ত করছি।" বলিয়া ইনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন।

গুরু চিত্রার্পিতের মত চাহিয়া রহিলেন। ভক্তগণ একসঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গুরুর পানে চাহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

রূপ-পূজারী

রেবার চিররুগ্ন স্বামী তাহার বুকের পাঁজরগুলা নাড়াইয়া নাড়াইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে দিন তাহাকে চির-বৈধব্য দিয়া চলিয়া গেলেন, ঠিক সেই দিন হইতেই তাহার বাল্যসখা হেমেন্দ্রের রাশীকৃত ভালবাসা ও সমানুভূতি রেবার সমস্ত দুঃখটা ঢাকা দিয়া ফেলিতে চাহিল। যেখানটায় খুব ব্যথা, সেখানে খানিকটা বরফ দিলে যেমন স্বস্তি হয়, আবার অধিকক্ষণ রাখিলে তদপেক্ষা যেমন অধিক কষ্ট হয়, রেবার ঠিক তেমনই হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হেমেন্দ্র যখন তাহার দুঃখটাকে একটু লঘু করিবার জন্য ব্যগ্র হইল,তখন রেবা যে তাহাকে খুব আপনার মনে করিয়া একটু সান্ত্বনা না পাইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিল—মঙ্গলঘটের পার্শ্বে চারা কলাগাছটির মত তাহার জীবনের দ্বারে আসিয়া সে একেবারে ঝাড় বাঁধিয়া বসিয়াছে, তখন রেবার যেন কেমন একটু ভয় হইল। তাহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভৃত্য-পরিজনদের লইয়া বালবিধবা বেশ একরকম সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু যখনই সেই বিপুল সম্পত্তির মাঝখানে ছোট সংসারের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল হেমেন্দ্রের চলা-ফেরা দেখিত, তখনই সে শিহরিয়া উঠিত।

এক দিন হেমেন্দ্রকে নিরালায় পাইয়া রেবা সাহস করিয়া কহিল,—"হেমদা, তুমি বাড়ী যাও। তোমার বাড়ী থেকে এত চিঠি আসছে, তুমি যাচ্ছ না কেন?"

হেমেন্দ্র কেমন যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। মুখখানা ভার করিয়া বলিল,—"আপাল ঝাঁজের মোকর্দ্দমাটা না চুক্‌লে কেমন ক'রে যাই বল দেখি? আমি চ'লে গেলেই এ তিন শ টাকা যে জলে যায়।"

"তা যাক্, হেমদা, তুমি বাড়ী যাও, আমার জন্যে তোমার সংসারটা কেন মাটী কর্‌বে?"

"কি আর করব? এ ত শুধু আজকের কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে খুব আপনার ভেবে আসছি, আর চিরকাল তাই ভাব্‌ব। কত দিন না খেতে পেয়ে—সংসারের কষ্ট দেখে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি অকাতরে আমার সে অভাব মোচন করেছ, সে সব কথা আমি কি ভুলেছি, না ভুল্‌তে পারব?"

"ভুল্‌তে ত বল্‌ছি না, হেমদা,—তুমি বাড়ী যাও, মাঝে মাঝে এসে সব দেখা-শুনা ক'রো।"

বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল,—"তুমি কেমন মেয়ে গা, সারাদিনের পর কাঁচকলা-সেদ্ধ দিয়ে দুটো আলোচালের ভাত খাবে--তাতেও সাধাসাধি!"

রেবা তাহার খুব দরকারী সুখস্বাচ্ছন্দ্যগুলাকে অবহেলায় ফেলিয়া দিত আর এই পুরাতন দাসী সেইগুলা কুড়াইয়া তাহার কাছে লইয়া আসিত; ইহাতে রেবা সুখী কি অসুখী হইত, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

রেবা ফিরিয়া বলিল, "এই যে যাই, সব যোগাড় করেছিস্?"

"যোগাড় আবার কি করব? একরত্তি মেয়ের আবার ভিট্‌কেল্‌মি কত? কারও ছোঁয়া জলটি পর্য্যন্ত ব্যাভার করবেন না।"

হেমেন্দ্র হো হো হাসিয়া উঠিল। রেবা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিল। বলিল, "আমি না খেলে—তোদের আর বুঝি খেতে নেই?"

বড় এক ফোঁটা চোখের জল বৃদ্ধার কুঞ্চিত কপোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। রেবা ইঙ্গিতে হেমেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, বুড়ো ঝি আর একটু হইলেই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিবে।

বুড়ো ঝি ও রেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেবার কথায় হেমেন্দ্রের প্রাণটা কেমন যেন এক রকম হইয়া গেল। শরীরের কোনও স্থানে একটা কাঁটা ফুটিলে

যেমন খিচ্-খিচ্ করে, রেবার কথাগুলা ঠিক তেমনই করিয়া তাহার প্রাণের ভিতর খানিকটা অস্বস্তি দিতে লাগিল।

পরদিন সকালবেলা আপালকে অন্দর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া হেমেন্দ্র ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল, "এত সকালে একেবারে বাড়ীর ভিতরে কোথা গেছ্‌লি রে?"

বৃদ্ধ চাষী সেইমাত্র রেবার অভয়-নির্ম্মাল্য লইয়া বাহিরে আসিতেছে। কোন উত্তর করিল না।

হেমেন্দ্র পাঁড়েজীকে ডাকিয়া খুব খানিকটা ভৎ´সনা করিল; বলিল, "তোম্ কাঁহে ওস্‌কো অন্দরমে যানে দিয়া?"

পাঁড়েজী সেইমাত্র ভাঙটি ঘুঁটিতেছিল। হেমেন্দ্রের কথায় রাগিয়া গিয়া বলিল, "কেয়া করেগা-- মাইজীকা হুকুম!"

তখন লজ্জা ও অপমান আসিয়া হেমেন্দ্রের সমস্ত রোসটাকে একেবারে গলা চাপিয়া ধরিল। সত্যই ত! সে এ বাড়ীর কে? রেবাই যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন ঝি-চাকর তাহাকে মানিবে কেন? আপাল পাঁড়েজীকে একটা 'রাম রাম' দিয়া চলিয়া গেল।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে হেমেন্দ্র অন্দরমহলে চলিয়া গেল। রেবাকে বলিল, "আমি এখনই বাড়ী যাব।"

"কেন, হেমদা?"

হেমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যাব, এর আবার কেন কি? তোমার জন্যে আমার সংসারটি ত আর গোল্লায় দিতে পারি না!"

"আমি ত অনেক দিন থেকেই তোমায় যেতে বলছি, হেমদা, তা যেতে হয় যাবে,—এখন কি যায়, খেয়ে-দেয়ে যাবে'খন।"

"না, আমি এখনই যাব, পরশু আপালের মোকর্দ্দমা, যা হয় কোরো, আমি চল্লাম।"

"সে যা হয় আমি করব'খন। এখন কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, আমার মাথা খাও-- দুটি খেয়ে বরং বিকেলে যেও। উঠন্ত রদ্দুর মাথায় ক'রে কেউ কখনও যায়?"

রেবার কথায় হেমেন্দ্র ভারী খুসী হইল। বেলা দশটার সময় ভাত খাইয়া নিজের ঘরে একটু ঘুমাইয়া লইবার ভাণ করিয়া সমস্ত দিন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় রেবা আসিয়া বলিল, "হেমদা, সন্ধ্যে হয়েছে, ওঠ না! আমি মনে করেছিলুম—তুমি বুঝি আমায় না ব'লেই চ'লে গেছ!"

হেমেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অ্যাঁ! সন্ধ্যে হয়ে গেছে?"

"তা আর কি হয়েছে—না হয় কাল যাবে?"

হেমেন্দ্র আর কোন কথা কহিল না। রেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া গেল। আজ-কাল করিয়া আর এ পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রের যাইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আপাল এক দিন তাহার লাঙ্গল-গরু বিক্রয় করিয়া রেবার সমস্ত টাকা কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিয়া গেল। আপাল বিনা আপত্তিতে নেহাৎ ভালমানুষটির মত তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করায় হেমেন্দ্র একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। তাহার ক্রবুদ্ধির চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল,-- আর ত কোন ছল নাই। তবে কি করিবে! কেমন করিয়া সে রেবার মিথ্যা আত্মীয় সাজিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিবে?

বিজয়া-দশমীর দিন রেবা তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া কত কাঁদিল। স্বামীর ফটো, আর ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি যেন তাহার প্রাণের ভিতর ধাক্কা দিয়া বুকের খানিকটা ধ্বসাইয়া দিয়া গেল! রেবা বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, সহসা দরজা খোলার শব্দ হইল। রেবা তাড়াতাড়ি বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া বলিল, "কে ও, হেমদা? হঠাৎ আজ এ ধারে যে?"

হেমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কেন, রেবা? আস্‌তে নেই? এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

রেবা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না, হেমদা, তুমি বেরিয়ে যাও, আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারছি না।"

হেমেন্দ্র মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "সে কি, রেবা! তুমিই না বল্‌তে যে, তুমি আমায় খুব ভালবাস! আমি কোথাও গেলে তোমার মন কেমন করে?"

"ভালবাসার এ রকম অর্থ করবার সাহস ভগবান্ যেন কখনও আমায় আর না দেন। যাক্ সে কথা। বিধবা পরনারীর কাছে অমন বিশ্রী চোখ নিয়ে কেন এলে তুমি? কি সাহসে—কোন্ পশুত্বের প্রেরণায়?"

"রেবা, তুমি কি বল্‌ছ? ভগবান্ জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

"কিন্তু সে ভালবাসার ভিতর যে রাশীকৃত ময়লা জড় ক'রে নিয়ে এসেছ। আমার রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি ভালবেসেছ। আমার এগুলা বাদ দিলে আর তুমি ভালবাসবে না—বাস্‌তে পার না।"

হেমেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভুল বুঝেছ।"

"হ'তে পারে ভুল বুঝেছি—তুমি কিন্তু বেরিয়ে যাও।"

হেমেন্দ্র কহিল, "রেবা—আমি—"

"না, আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি বেরিয়ে যাও, যাও—যাও বল্‌ছি!"

হেমেন্দ্র একটু নরম হইয়া বলিল, "আমায় এমন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই?"

"কিছু না! বিধবার আবার কর্ত্তব্য? থান কাপড় প'রে জীবনটাকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলেই শেষ!"

রেবা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল। হেমেন্দ্র চীৎকার করিতে করিতে উঠিতে গিয়া নেশার ঝোঁকে ঘরের মেঝেতে বিগতচেতন হইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় হেমেন্দ্রের চেতনা হইলে—দেখিল, দরজা খোলা। হা-হা করিতেছে। বাড়ী যেন জনশূন্য নীরব। হেমেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। কৈ, কেউ ত নাই! উঠানে একটা গরু বাঁধা থাকিত, সেটা পর্য্যন্ত নাই। তবে কি রেবা বাড়ী একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? শত বৃশ্চিকের দংশন বুকে করিয়া হেমেন্দ্র নীচে আসিল। পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি—এরা সব কোথায় গেল?"

"ফজিরমে সবকোই কাশীজী চল্ গিয়া—আপ্ জান্‌তা নেই?"

"কুচ্ ঠিকানা দে গিয়া?"

পাঁড়েজী অবহেলার স্বরে 'নেহি' বলিয়া তাহার সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া গান ধরিল, "সীতারাম ভজ রে মনুয়া—"

হেমেন্দ্র সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া উদাস হৃদয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। সাড়ে পাঁচটার সময় কাশীর একখানা টিকিট করিয়া সে গাড়ীতে উঠিল।

কাশীতে গাড়ী হইতে নামিয়া হেমেন্দ্র প্রমাদ গণিল। সেই অচেনা দেশে লোকারণ্যের মাঝে কেমন করিয়া রেবার বাসা বাহির করিবে? বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিল। অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি তাহাকে যেন উপায় স্থির করিয়া দিতে পারিল না।

চার পাঁচ দিনের পর হেমেন্দ্র বিশ্বনাথের নাটমন্দিরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। সহসা রেবার বৃদ্ধা দাসীকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "বুড়ো ঝি, তোমরা কোথায় আছ?"

বুড়ো ঝি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি কেমন বামুনের ছেলে গা, হেথা পর্য্যন্ত তাড়া করেছ। যেও না দেখি এবার বৌমার কাছে, মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবোনি।"

মুখ বাঁকাইয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া বুড়ো ঝি চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র তাহার সমস্ত অপমানটাকে বেমালুম হজম করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রেবা ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়িয়া খোলা গায়ে গড়াইতেছিল। হেমেন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "রেবা!"

তাড়াতাড়ি রেবা উঠিয়া বসিল। কাপড়খানা বুকে মাথায় জড়াইয়া বলিল,—"এ কি? হেম-দা? তুমি কবে এলে?"

হেমেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কেমন একতর হইয়া গিয়া বলিল, "এ কি করেছ, রেবা?"

"কেন? কি করেছি, হেমদা, মাথা নেড়া করেছি! বেশ ত হয়েছে, পাঁশগাদায় আর ঘি ঢেলে কি হবে? চুলগুলো ভারী বোঝা হয়েছিল। এক দিন তেল না দিলে গুমো গন্ধ ছাড়ত। জ্বালাতন হয়ে তাই বিশ্বনাথের পায়ে দিয়ে দিয়েছি।"

হেমেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল। সে কোন কথা কহিল না। মুখখানা চূণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, রেবা বাধা দিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, হেমদা ?"

"চ'লে যাচ্ছি।"

"না, তা হবে না, যদি এসেছ, একটু বিশ্বনাথের প্রসাদ খেয়ে যাও।"

হেমেন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।"

"কেন হেমদা ? আমায় এবার ঘৃণা করেছ ব'লে বিশ্বনাথের প্রসাদকে পর্য্যন্ত অবহেলা করবে ?"

হেমেন্দ্র দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, "বুড়ো ঝি কোথায় ?"

"এই কি কিন্‌তে গেল। ভুলে দরজাটা খুলে রেখে গেছে, তাই ত তুমি আসতে পেরেছ, তা না হ'লে বাহিরে চাবি দিয়ে তবে সে যায়।"

হেমেন্দ্র কোন কথা কহিল না। ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর দেখিলে বুড়া ঝি তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দিবে, সে কথা তখনও সে ভুলে নাই।

রেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মেঝেতে আবার শুইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, সংসারে পুরুষগুলো কি ঝুঁটা রূপ নিয়েই উন্মত্ত হয় ! প্রাণ কি তাদের এত হেলাফেলার জিনিষ ?

হেমেন্দ্র দেশে ফিরিল। এক মাস পরে হেমেন্দ্র একটা নূতন মতলব আঁটিয়া রেবার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দলীলপত্র কোথায় কি থাকে, সবই ত সে জানে। এই অবসরে সেগুলা হস্তগত করিয়া জাল করিয়া ফেলিবে। সেখানে বৃদ্ধ দ্বারবান্ বাড়ী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। পাঁড়েজী হেমেন্দ্রকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত একটা অভিবাদন করিল। হেমেন্দ্র তাহার হাতে দশ টাকার একখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল,"অন্দরকা চাবী কাঁহা হায় ?"

পাঁড়েজী হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুলা হায়—আপকো জানানা লোক বিলকুল আ গিয়া বাবু।"

হেমেন্দ্র সব কথায় কান না দিয়া ভিতর-বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল ; দেখিল, তাহার সেই দারিদ্র্য শীর্ণ পুত্র-কন্যাগুলি বেশ সাদা ধবধবে পোষাক পরিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পুত্র-কন্যারা আহ্লাদে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হেমেন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। অন্দরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "এ কি, ব্যাপার কি ? তোমরা এখানে ?"

হেমেন্দ্র ঠাট্টা করিতেছে মনে করিয়া তাহার স্ত্রী মুচকিয়া হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। মাতাও পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। হেমেন্দ্র উদাসভাবে উঠানে বসিয়া পড়িল। বলিল, "মা, তোমরা হাসছ—কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে,—তোমার পায়ে পড়ি, বল, কি হয়েছে, তোমরা এখানে কেন ?"

বৃদ্ধা আরও একটু জোরে হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আবার লুকুচ্ছিস কি ? রেবা তোকে উইল ক'রে দিয়েই আমাদের আসতে চিঠি লিখেছিল। আহা, অমন মেয়ের এমন ভাগ্যও হয় !"

হেমেন্দ্রের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য সে তাহার সমস্ত কুটিল বুদ্ধিটি খরচ করিয়া কাশীতে ব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ সেই রেবা তাহার মতলবটাকে এত সহজসাধ্য করিয়া দিয়া তাহার মর্ম্মে বিষাক্ত তীর বিঁধিয়া দিয়াছে। সে যে শরীর, রূপ, যৌবন, ধনসম্পত্তিতে তাহার প্রেম লুটাইয়া দিয়াছিল। এতগুলার পিছনে এমন চিরমধুর পবিত্র প্রেম লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা যে সে এক দিনও দেখে নাই। তাহার চক্ষু টন্‌-টন্ করিতেছিল। প্রাণের ভিতর চোখের জলের ভিতর দিয়া রেবার মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

হেমেন্দ্র তখনই আবার কাশী রওনা হইবার জন্য দাঁড়াইল। বৃদ্ধা মাতা পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি রে, কোথায় আবার যাচ্ছিস ?"

হেমেন্দ্রের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "ভয় নেই তোমাদের, আমি শীগ্‌গির ফিরে আসব, আবার আমি কাশী যাচ্ছি।"

মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন, হেমেন্দ্র তাঁহার কথায় কান না দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

হেমেন্দ্র কাশীতে পৌঁছিয়া যে বাড়ীতে রেবা ছিল, সেই বাড়ীতে অনুসন্ধান লইয়া জানিল, রেবা সেই দিন সকালবেলা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীওয়ালা বলিল,

"মেয়েটির শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে ব'লে এখান থেকে চ'লে গেছে—এ বাড়ীতে তাদের না কি কষ্ট হ'ত।" সে ইহা ছাড়া তাহার আর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তিন চারি দিন হেমেন্দ্র সমস্ত কাশীসহর পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া কাশীতেই কোন রকমে তাহার জীবনের গণা দিন কয়টা কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল। দেশে রেবার ঘরে তাহার রাশীকৃত স্মৃতির মাঝখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতে তাহার আর আদৌ ইচ্ছা হইল না।

তিন চারি বৎসর পরে জটাজূটধারী হেমেন্দ্র রেবার বাড়ীতে এক বার আসিয়া দেখিল, উপরের ঘরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া রেবা। মরিবার জন্য আজ দুই তিন মাস সে কাশী ছাড়িয়া স্বামীর ভিটায় আসিয়াছে। হেমেন্দ্র হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খাটের পার্শ্বে জানু পাতিয়া বিছানার উপর রেবার শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তে তাহার অশ্রুপ্লাবিত রুক্ষ গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রেবা, রেবা, সত্যই কি আজ তুমি বিধবার কর্ত্তব্য শেষ করতে এসেছ? আমায় এত শিক্ষা দিয়েও কি হয় নি? তোমার মৃত্যুতেই কি আজ তার সমাধান ক'রে যাবে?"

রেবার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সে অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে স্বামীর ফটোখানি ক্ষীণ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হেমেন্দ্রের আর্ত্তনাদ সেই তুমুল রোদন-ধ্বনি ভেদ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুগ্ধবান্ ছাগ

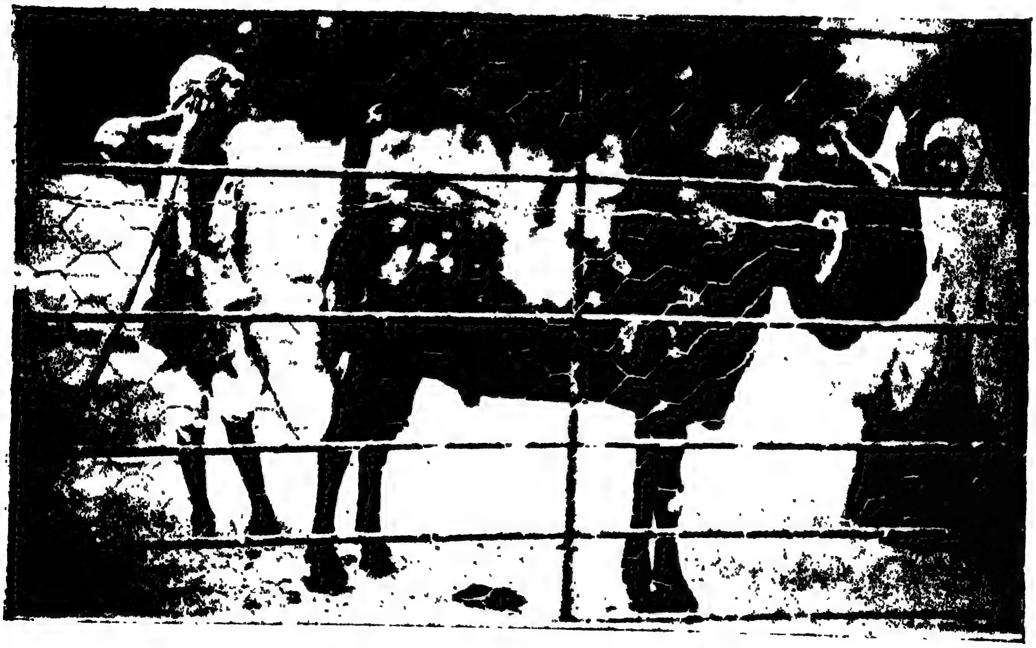

ছাগ কখনও দুগ্ধদান করে না—উহা ছাগীরই একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু বিংশশতাব্দীতে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। জয়পুরে রামনিবাস-উদ্যানে একটি ছাগ আছে, তাহার একটি বাঁট—সেই বাঁট হইতে দোহন করিলে প্রকৃতই দুগ্ধ নির্গত হইয়া থাকে। জয়পুর আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, এ, আর, সি, এ মহোদয় উল্লিখিত ছাগের ছবি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

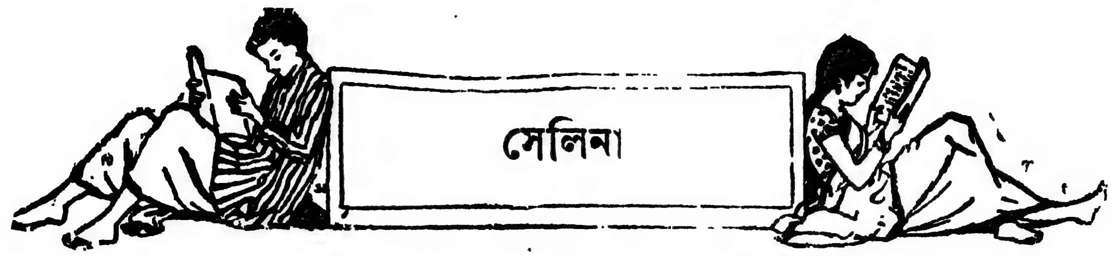

সেলিনা

জব্বর শিশুকাল হইতে লতিফের বাড়ীতে মানুষ। তাহার মা তাহাকে কোলে করিয়া পনর বৎসর পূর্ব্বে লতিফের বাড়ীতে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। মাঝে এক প্রথম বর্ষায় এক দিন জ্বর-গায়ে তিন চার ঘণ্টা ভিজার পরে তাহার সর্দ্দি-জ্বর যে কি করিয়া ডবল ন্যুমোনিয়ায় পর্য্যবসিত হইয়া তাহাকে ভবলোকের পরপারে লইয়া গেল, তাহা জব্বরের স্পষ্টভাবে মনে পড়িত না। এখন সে একবিংশবর্ষবয়স্ক যুবক। জব্বর লতিফের ডান হাত। সে গরুর তত্ত্বাবধান করে,. ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, বীজ ছড়ায়, বাগান দেখে, প্রয়োজন হইলে গরুর গাড়ীখানা লইয়া ভাড়া-ও বয়।

লতিফের দুই মেয়ে। দুই জনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে বিপত্নীক বলিয়া মেয়েদের বাড়ীতে আনার পর্ব্বটা বাদ দিয়াই চলিত। কিন্তু জগতে বেশীর ভাগ সময় আমরা যাহাকে বাদ দিয়া চলিতে চাই, সে-ই নানা ছলে আমাদের সমগ্র পথটা যোড়া করিয়া বসে। লতিফের-ও বড় মেয়ে এক দিন হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বামীকে সাপে কামড়াইয়াছিল —চব্বিশ বৎসর বয়সে সেলিনা বিধবা হইল।

লতিফ লোকটা সর্ব্বাংশে-ই মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে সন্তান-স্নেহ অপেক্ষা অর্থ-লিপ্সা বেশী যায়গা যুড়িয়া ছিল, তাহা যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিত।

এ দিকে জব্বরের সহিত সেলিনার বেশ বন্ধুত্ব হইল; অবশ্য পূর্ব্ব-বঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমান চাষীদের মধ্যে যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক! এক দিন লুব্ধ জব্বর সাহসে ভর করিয়া লতিফের নিকট তাহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিল। দরিদ্র ভৃত্যের এই স্পর্দ্ধায় সেলিনার পিতার মনের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। ক্রোধের সেই গলিত ধাতু-বৃষ্টি হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া জব্বর সেই দিনই লতিফের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জব্বর যে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী যুবক, তাহা সকলেই জানিত, সে সাধুতাতেও কাহারও অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না; তাহার পক্ষে কায জুটাইয়া লওয়া শক্ত ব্যাপার নহে।

কায পাইয়া অবধি জব্বর অর্থসঞ্চয়ে মন দিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিতে দেরী লাগিল না। জব্বর অল্পসময়েই বেশ কিছু জমাইয়া ফেলিল।

ইতোমধ্যে লতিফ তাহার মেয়ের 'নিকা' দিয়াছে। জব্বর যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তেমন সময় এক দিন ঘটা করিয়া তাহার কানে এই খবরটা পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সে দ্বিগুণিত উৎসাহে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

সেলিনার নিকা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ইসমাইলকে কেবল তাহার অর্থের জন্য ভালবাসা তাহার বয়সের মেয়েদের পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিক। তাহার মন পড়িয়া রহিল, সুন্দর-সুগঠিত-দেহ যুবক জব্বরের নিকট।

পদে পদে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তেমন সময় এক দিন রাগের মাথায় ইসমাইল বলিয়া ফেলিল, "যে মেয়ের ওপর বাপের দরদ নাই, সে আর কত ভাল হবে। এমনই ছেনাল বলেই ত লতিফ তোকে বিদেয় ক'রে বেচেছে।" এই কথা বলায় সেলিনা যাহা নয় তাই বলিয়া তীব্রভাষায় ইসমাইলকে সমস্ত দিন এমন গালাগালি করিল যে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ইসমাইল তাহাকে 'তালাক' দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

আবার এক অন্ধকার-শ্রাবণ-সন্ধ্যায় লতিফের বদ্ধদ্বারে ক্রন্দনরতা সেলিনার মৃদু হস্তের করাঘাত পড়িল। সমস্ত শুনিয়া লতিফের-ও রাগ হইল। সে বলিল, "বেশ হয়েছে, থাক্ তুই ঘরে।" এই হতভাগ্য মেয়েটাকে সে একটু ভালই বাসিত। কিন্তু মেয়েকে যতই ভালবাসুক ও তাহাকে মুখে যতই স্ব-গৃহবাসী হইবার জন্য অনুরো

করুক, যখন সদ্য-সমৃদ্ধ জব্বরের নিকট হইতে সেলিনাকে নিকা করিবার প্রস্তাব আবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর লতিফের চক্ষুতে যত দূর দৃষ্টি যায়, বাধা বলিয়া কোন কিছু নয়নগোচর হইল না। রজত-চক্রের এমনই মাহাত্ম্য যে, দুর্গমতম পথ-ও তাহার অনতিক্রমণীয় থাকে না; এ চক্রের গতিরোধ করে, এমন বাধা পৃথিবীতে দুর্লভ! সেলিনার মনোভাব লতিফের অজ্ঞাত ছিল না, এবং বিনা ঘটায় এক দিন সেলিনার সহিত জব্বরের নিকা হইয়া গেল।

* * * * *

এখন নিজের নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া সেলিনার মনে হইল, এই বুঝি তাহার প্রথম বিবাহ। সে পূর্ণোদ্যমে ঘর-সংসার গুছাইতে লাগিল। অক্লান্ত পরিশ্রমে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্তভাবে জব্বরের অর্থাগমের উপায় করিয়া দিত। সকালে গৃহকর্ম্ম করিয়া, স্বামীর পাঁজালীতে আগুন দিয়া, তাহার কাপড়ে গুড়-মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া সে স্নান করিতে যাইত। তাহার পর রান্না-বাড়া হইলে দারুণ রৌদ্রকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঠে জব্বরের জন্য একটা জামবাটিতে শান্‌কী ঢাকা দিয়া ভাত লইয়া যাইত। জব্বরের খাওয়া হইলে নিজের হাতে যত্ন করিয়া তাহার তামাক সাজিয়া দিত ও যতক্ষণ জব্বর তামাক টানিত, ততক্ষণ সে আপনার করণীয় কাযগুলি তাহার কাছে শুনিয়া লইত। বাড়ী গিয়া তাড়াতাড়ি দুটা মুখে দিয়া সে জব্বরের দেওয়া কাযগুলি করিতে বসিয়া যাইত। এইরূপে এক বৎসর গেলে তাহার একটি পুত্র হইল।

* * * *

সে বৎসর জব্বর আচার্য্য মশাইয়ের অনেকটা জমী 'ভাগে' লইয়াছিল; তাহাকে সেই জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একলা পারিয়া উঠিত না বলিয়া লোক-জনও রাখিতে হইয়াছিল। তাহার উপর সেইবারই সে দেড়শত টাকা দিয়া একযোড়া ভাল চাষের বলদ কিনিয়াছিল। পুঁজি-পাটা যাহা ছিল, সবই প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে আশানুরূপ ফসল হইলে যে এই সমস্ত খরচ সুদেমূলে দ্বিগুণিত হইয়া ঘরে উঠিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু হঠাৎ সেলিনার খুব অসুখ হইল। তাহার জ্বর আর ছাড়ে না। জব্বরের কাযের ক্ষতি ও অসুবিধা হইতে লাগিল; রুগ্ন সেলিনার দেখাশুনা করে, এমন লোক তাহার কেহ ছিল না, তাই তাহাকে ও চার বৎসরের পুত্রটিকে সে কতক দিনের জন্য লতিফের বাড়ীতে রাখিয়া দিবে ঠিক করিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কর্ম্মান্তে বিশ্রাম না করিয়াই সে লতিফের বাড়ী যাইত ও সেলিনার জন্য কিছু ঔষধ, পথ্য ও ফলমূল সঙ্গে লইত। এ দিকে লতিফ প্রত্যহ ডাক্তার ডাকিয়া মেয়ের রীতিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাহার পয়সা দিতে হইত জব্বরকে। স্ত্রীর অসুখে রোজই পাঁচ ছয় টাকা খরচ হইতে লাগিল।

এক দিন অনেকগুলা টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। জব্বরের মনটা তত ভাল নাই। তাহার উপর স্ত্রীর এই একটানা অসুখের মধ্যে সারিয়া উঠার কোন চিহ্নই না দেখিতে পাইয়া তাহার সহিষ্ণুতা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে শূন্য হাতে লতিফের বাড়ী ঢুকিল। তাহার ছেলেটা রোজ যেমন করিত, সে দিন-ও 'বাবা, বাবা' বলিয়া ছুটিয়া যেমন তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিতে যাইবে, জব্বর তাহাকে রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

লতিফ, জব্বরকে দেখিবামাত্র বলিল যে, ডাক্তারবাবু একটা কি "ইন্‌জিসিন্" (Injection) করিয়াছেন, তাঁহাকে ভিজিট বাদে আরও দুই টাকা দিতে হইবে ও এরূপভাবে আরও ছয় দিন দুই টাকা করিয়া লাগিবে। এতক্ষণ ধরিয়া নানা কারণে জব্বরের মনটা বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু 'ঝাল ঝাড়িবার' পাত্রের অভাবে সে চুপ করিয়া ছিল। লতিফের এই কথায় তাহার ক্রোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল ও সমস্ত তিক্ততা-তীব্রতা গিয়া পড়িল লতিফের উপর। লতিফ-ও রাগে কাহার-ও নিকট খাট নয়। সে-ও বলিল যে, যাহার স্ত্রীর অসুখের ব্যয় বহন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহার আবার বাহাদুরী করিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া কেন? কথায় কথা বাড়ে। রাগের মাথায় জব্বর-ও এমন সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল, যাহা সে কখনও বলিতে পারে বলিয়া ভাবে নাই। বাদানুবাদের উত্তেজনায় হার স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে ও তখন মুখ দিয়া এমন সমস্ত কথা-ও বাহির হইয়া যায়—যাহা পরে কেহ শুনাইয়া দিলে নিজের কথা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। পরিত্যক্তা ও বিতাড়িতা সেলিনাকে জব্বর যে দয়া করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ

করিয়াছে, এই কথাটা-ও তাহার মুখ দিয়া সেইরূপে বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটা মিথ্যা-ও ইহার সহিত যুক্ত করিয়া জব্বর নিজের মহত্ত্ব ও সেলিনার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত করিয়া দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, সেলিনা তাহাকে নিকা করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করে ও সেই জন্য লতিফের বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইহার পর যাহা হয়, তাহাই হইল। লতিফ উষ্ণভাবে জানাইয়া দিল, তাহার কৃতজ্ঞ হইতে দায় পড়িয়াছে। জব্বরের মত জামাই তাহার চাকর হইবার-ও উপযুক্ত নয়। এই কথায় জব্বরের হৃদয়ের একটা ক্ষতস্থানে নূতন করিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিল না। ছেলেটাকে কোলে লইয়া সটান সে লতিফের বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, যেন সেলিনাকে তাহার বাড়ী পাঠান না হয়।

* * * *

সে বৎসর ফসল ভালই হইল। জব্বর আশানুরূপ অর্থলাভ করিল। এইবার সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ও সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিবে ভাবিল। সে ভুলিয়া-ও লতিফের বাড়ীর দিক্ মাড়ায় না বা ছেলেটাকে-ও সেই দিকে পাঠায় না। জোর করিয়া সে এইবার সেলিনার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদিপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু মনোরাজ্যের নিয়ম এমন-ই অদ্ভুত যে, সেই দিন হইতে-ই সেলিনার স্মৃতি যেন তাহাকে বিশেষভাবে পাইয়া বসিল! এত দিন এক রকম ছিল ভাল। কায-কর্ম্মের মধ্যে মনোবৃত্তির হাঙ্গাম প্রবেশ করিবার ছিদ্রই পাইত না। কিন্তু ক্ষেত্রের ফসল ঘরে আসার পর যে হতভাগ্য কৃষকের সংসারে মন খুলিয়া আনন্দের ভাগ লইবার লোক থাকে না, তাহার শস্যসম্ভার, তাহার পরিপূর্ণ মরাই-খামার তাহাকে কোন সুখই দিতে পারে না। শুভ-নবান্ন তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়! জব্বরের-ও শ্রমজল সফল করিয়া যখন এই অসম্ভাবিত শস্য উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রচুর অর্থাগমের পথ খুলিয়া দিল, তখন তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। শস্য ঘরে উঠিলে যতটা আনন্দ হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল, সে আনন্দের কিছুই যখন সে অনুভব করিতে পারিল না, তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। শূন্য উঠান, শূন্য ঘর, শূন্য হৃদয়—সে অনন্ত শূন্যতার মধ্যে আপনাকে অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার পর ছোট ছেলেটা—তাহার অগণিত আব্দার-ঝঞ্ঝাটে ক্লান্তি আসিত না বটে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সেলিনার খুটি-নাটি স্মৃতিগুলিকে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে, জব্বর যে চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চাহিত, সেই চিন্তাই জীবন্ত শক্তিতে তাহার মনোমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। শেষে লতিফের প্রতি রাগটাই জব্বরের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাহাকে শাস্তি দিতেই হইবে।

এই শাস্তির সে এক অদ্ভুত উপায় ঠিক করিল। অনায়াসে এক পাত্রী সংগ্রহ করিয়া অনাড়ম্বরে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু হায়, এ বিবাহে তাহার অন্তর-মন যোগ দিল না; এ বিবাহ করিয়াছিল তাহার ক্রোধ, তাহার ভ্রান্ত আক্রোশ! সে দেখিল, না, যে শূন্যতা তাহাকে দিবারাত্র উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, তাহা ইহার দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। এমন কি, ছেলেটা-ও ইহার মধ্যে কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না। জব্বরের অন্তরাত্মা এই নিষ্ফলতা উপলক্ষ করিয়া অহোরাত্র তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিল। এ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হইতে দেরী লাগে না বা সে দেরীটুকু সহ্য-ও হয় না। এক এক দিন নিঝুম সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসিয়া উঠানের স্ফীত মরাইগুলার দিকে চাহিতে চাহিতে জব্বরের বিষণ্ণ অবসন্ন মন যেন শোকরাজ্যের কোন্ দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইত; দুইটি প্রীতি-মঞ্জুল চক্ষু স্মরণ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষ অশান্ত দীর্ঘশ্বাসে নাড়া দিয়া উঠিত; অসীম বেদনাময় ক্রন্দন-আলোড়নে তাহার সমগ্র হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত!

শীঘ্রই এই নব-পরিণীতার সহিত জব্বরের এক দিন মনোমালিন্য ঘটিল; প্রায় অকারণেই এবং সহসা সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তাড়াইয়া দিয়া বেশী দিন চলিল না। পরিবর্ত্তনের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সে পুনরায় আর এক জনকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু পাড়ার লোকরা সবিস্ময়ে দেখিল যে, জব্বর তাহাকে-ও অল্পদিন পরেই তাড়াইয়া দিল।

* * *

এক দিন শূন্যগৃহে ছেলেটাকে কোলে করিয়া জব্বর সন্ধ্যাকাশের স্পন্দমান তারকারাশির দিকে নিস্পন্দ নয়নে

চাহিয়া যখন মনটাকে একান্তই বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে, তেমন সময় কি খেয়ালের বশে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "খুশরু বাপ, মা'র কাছে যাবি ?" এক হাতে পিতার গলাটা আরও নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া অপর হাতখানা মুখে পুরিয়া ম্লান দৃষ্টিতে সে পিতার সজল চক্ষুর দিকে চাহিল ও নীরবে মাথাটি একবার খুব খানিকটা হেলাইয়া মৌন-ভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পরদিন সন্ধ্যায় লোকজন লইয়া জব্বর লতিফের বাড়ী হাজির হইল। গিয়া বলিল যে, সে সেলিনাকে লইয়া যাইবে। লতিফ প্রচণ্ডভাবে রুখিয়া বলিল যে, সে ছোট লোকের বাড়ীতে মেয়ে পাঠাইতে রাজী নয়। কিন্তু আজ তাহার এই অস্ত্র তীক্ষ্ণতা-হীন হইয়া পড়িল। আজ জব্বর সঙ্কল্প স্থির করিয়া, মনকে ভালরূপে যাচাই করিয়া আসিয়াছিল। সে জোর করিয়া সেলিনাকে লইয়া গেল।

জনবলে হীন থাকায় লতিফ কিছু করিতে পারিল না। ব্যর্থ ক্রোধে ফুলিয়া লতিফ জব্বরকে জানাইল যে, সে কত বড় মরদ, পরে দেখিয়া লইবে এবং কন্যাকে অভয় দিয়া বলিল যে, সে পরে তাহাকে তাহার পাষণ্ড স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যথেষ্ট লোকজন লইয়া লতিফ বিপুল আয়োজন সহকারে জব্বরের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ীতে তখন জব্বর ও সেলিনা ভিন্ন কেহ ছিল না। হঠাৎ লতিফ ও তাহার লোকদের হুঙ্কারে জব্বর তাহার প্রকাণ্ড লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটা রক্তারক্তি যখন নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তেমন সময় সেলিনা কোথা হইতে আসিয়া স্বামীকে টানিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল। পরিশেষে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, সে স্বেচ্ছায় জব্বরের সহিত আসিয়াছে ও এইখানেই থাকিবে; পিতৃগৃহে যাইবার তাহার কোন আগ্রহই নাই। বিপুল বিস্ময়ে লতিফ তাহার এই নূতন অভিজ্ঞতা স্তম্ভিতভাবে পরিপাক করিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

নিবেদন

হে মোর দেবতা তব
কেউ যদি করে অনাদর,
দৃপ্ত রোষে গরজিয়া
উঠে যেন আমার অন্তর।

হ'তে পারি আমি দীন
হীনমতি দুর্ব্বল মানব,
রাজরাজেশ্বর তুমি
বিশ্বজোড়া তোমার বিভব।

তোমার ন্যায়ের বাণী
মুক্তকণ্ঠে করিতে প্রচার,
নির্ভীক হৃদয়ে যেন
অবহেলি শত অত্যাচার।

শক্তি-মন্ত্রে দাও দীক্ষা
প্রভু মোরে কর বীর্য্যবান্,
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে
অকাতরে স'পি যেন প্রাণ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস বি, এ।

চাল

চাল জিনিষটা যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব, এমন আর কোন কিছুই নহে। বাঙ্গালী জাতি 'গেহু' বা ডাল-রুটীর ভক্ত নয়,কিন্তু চাল-ডালের ভক্ত। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হইতেছে চাল। সমগ্র আসিয়ায় বোধ করি বাঙ্গালার চালের মত চাল আর কোথাও হয় না। In India generally, rice is produced in every variety of soil at every altitude and in every latitude, * * * The finest is the Bengal table rice.[*] বাঙ্গালার চালের যত নাম আছে, সব সংগ্রহ করিলে একটা বহি হইতে পারে। এক চাল হইতে বাঙ্গালাদেশে কত রকমের খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হয়! চাল থেকে ভাত, পোলাও, খিচুড়ী, পায়স, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়া, খই, নবান্ন, পৌষ-পার্ব্বণের নানারকম পিঠে, আর কত নাম করিব, এই সকলই তৈয়ারী হয়,—ইহা ছাড়া মালপোয়া, মেঠাই, রসগোল্লা আদি নানা মিষ্টান্নে চালের সহযোগিতা চাই।[†] শরতে যখন ধানের অঙ্কুর হইবার সময় আইসে, তখনই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা হয়। আবার যখন শারদ ধান্যের নূতন উদ্গম হয়, তখন সর্ব্বত্র নবান্নোৎসবের ধূম পড়ে। সমস্ত পৌষমাসের যে পিঠে-পার্ব্বণের উৎসব, তাহা ঐ নূতন চালের আনন্দোৎসব ভিন্ন আর কিছু নয়।

বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য-সামগ্রী চাল যেমন না হইলে বাঙ্গালীর জীবন অচল হইয়া পড়ে, তেমনই 'চাল' শব্দেরও বাঙ্গালা ভাষায় এত বিবিধ প্রকারে ব্যবহার যে, 'চাল'কে বাদ দিলে বাঙ্গালীর 'বোলচাল' যেন নির্জ্জীব হইবার উপক্রম হয়। 'চাল' শব্দের এত রকমের বাঙ্গালাভাষায় প্রয়োগ যে, বাঙ্গালা দেশে যেমন চাল উৎপন্ন না হইলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আইসে,সেইরূপ বাঙ্গালা-ভাষা হইতে যদি 'চাল' শব্দকে হরণ করা যায় ত মনে হয়, বঙ্গ-ভাষায়ও ভাব-প্রকাশের দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নানা ভাব-ব্যঞ্জক এক 'চাল' শব্দ কত রকমে না বঙ্গ-ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে!

সংস্কৃত 'চল' ধাতু যদিও 'চাল' শব্দের মূলে, কিন্তু 'চাল' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি। অনেকের মতে উহা প্রাচীন সংস্কৃত 'তণ্ডুল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু প্রকৃত তাহা নয়। 'তণ্ডুল' যে অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোভিল-কৃত বৈদিক গৃহ্য-সূত্রে যেখানে চরু পাক করার বিধান লেখা আছে, সেখানে 'তণ্ডুল' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

> "স্থালী পাকাবৃতা তণ্ডুলানুপস্কৃত্য চরুং শ্রপয়তি।"
>
> (গোভিল গৃঃ সূত্র)

এমন কি, সুশ্রুতে তণ্ডুলের গুণাগুণ পর্য্যন্ত লেখা আছে—

> "সুদুর্জ্জরঃ স্বাদুরসো বৃংহনস্তণ্ডুলো নবঃ।"
>
> (সুশ্রুত-সংহিতা)

অর্থাৎ "নূতন চাল খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু অতি কষ্টে জীর্ণ হয়, এবং জীর্ণ করিতে পারিলে উহা খুব পুষ্টি-কারক।"

সংস্কৃত আমলে চালকে যে কেন 'তণ্ডুল' বলিত, তাহার কারণ এই—'তণ্ড' ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। নৃত্যার্থ-বাচক 'তাণ্ডব' শব্দও এই 'তণ্ড' ধাতু হইতে উৎপন্ন। পুরাকালে ধান হইতে চাল বাহির করিবার সময় যখন উদূখলে মুষল দ্বারা অবহনন করা হইত, তখন চালগুলি মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিয়া উঠিত, তাহা দেখিয়া সংস্কৃতে চালের নাম তণ্ডুল রাখা হইয়াছে।[*] কিন্তু আমাদের এই 'চাল' নামের সঙ্গে 'তণ্ডুল' নামের সম্পর্ক নাই। চালের নৃত্যের প্রতি ততটা দৃক্‌পাত না করিয়া উহার প্রকরণের উপর আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই লোক-প্রিয় খাদ্যের নাম রাখা হইয়াছে 'চাল।' আমরা বাঙ্গালায় শুদ্ধ ভাষায় সচরাচর লিখিয়া থাকি 'চাউল' 'দাইল' ইত্যাদি। এইরূপ লেখার কোন প্রয়োজন দেখি না – মধ্যের উকারের ও ইকারের আমদানী নিরর্থক। পশ্চিমারা শব্দের উচ্চারণে টান দিতে ভালবাসে বলিয়া 'চাল' না বলিয়া 'চাওল' বলিয়া থাকে। আমরা তাহারই অনুকরণে শুদ্ধ ভাষায় 'চাউল' লিখিয়া থাকি। 'চাল' শব্দের আসলে উৎপত্তি

---

[*] Encylopaedia India.

[†] চাল-ধোয়া জল ও চালের মণ্ড আদি চিকিৎসায় ও অনেক কাযে লাগে।

[*] পুরাকালে ধান্য হইতে কিরূপে যে তণ্ডুল বা চাল বাহির করা হইত, তাহার বিবরণ গৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট লেখা আছে।

চালন বা চালিয়া লওয়া হইতে। ধানকে তুষবর্জ্জিত করিবার জন্য সূর্প বা চালনীতে চালিয়া লওয়া হয় বলিয়াই উহার নাম 'চাল।' খোসা-সমেত যাহা, তাহা 'ধান'—খোসা বা তুষবর্জ্জিত ধান্যের যে সারভাগ, তাহারই নাম 'চাল।' এই কারণে শুধু যে ধানের সার ভাগকে চাল বলে, তাহা নয়; ধান ছাড়া অন্য কোন কোন সামগ্রীরও খোসা-বর্জ্জিত সারাংশকে বাঙ্গালায় 'চাল' বলা হয়ে থাকে। যেমন "ধনের চাল" ইত্যাদি। যখন ধনের খোসা পরিবর্জ্জনের জন্য চালিয়া লওয়া হয়, তখন তাহাকেও 'ধনের চাল' বলে।

বাঙ্গালা ভাষায় 'চাল' শব্দ যে চালিয়া লওয়া হইতে হইয়াছে, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়। "ঘরের চাল" কেন বলে?—খোড়ো ঘরের ছাদকেই 'চাল' বলা হয়—কোঠাবাড়ীর ছাদকে ত চাল বলে না—'ছাদ' বলা হইয়া থাকে। খোড়ো ঘরের ছাদ তৈয়ারীর সময় খড়গুলো চালিয়া চালিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয় বলিয়াই খড়ের চাল বলে। খোড়ো ঘরের এক নামই ত 'আটচালা।' খড়কে বিচালি বলা হয়। কেন না, 'বি' অর্থাৎ বিশেষ রকমে চালিয়া লওয়া হয় বলিয়া। এই কারণে আবার একটা কাঠকে টুকরা টুকরা করিয়া চালিয়া লইলে তাহাকে আমরা "চালা কাঠ" বলি।

এই এক 'চাল' শব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় যে কত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ কতকগুলিমাত্র উদাহরণ দ্বারা নিম্নে তাহা দেখান হইল—

বাঙ্গালীর আহারে বিহারে চাল, যথা—"অমুকের চাল বড় খারাপ", "চালচুলো", "চাল-চলন", "বেচাল", "চাল মারা", "চালবাজী", "চাল দেখানো" ইত্যাদি। এইরূপ কত ভাবেই যে এই এক চাল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালীর খেলাতেও চাল, যথা—'দাবার চাল' 'বড়ের চাল' ইত্যাদি। আমাদের রাজনীতিতে 'চাল'এর প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যথা—'খুব ভাল চাল চেলেছে, "diplomatic চাল" ইত্যাদি। সময়ে সময়ে ওজনেও চাল শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—'এক চাল ভর জাফরান।' চতুর লোককে যে আমরা 'চালাক' বলি এবং কাহারও সঙ্গে রহস্য করিলে যে 'চালাকি করা' বলিয়া থাকি, এই শব্দদ্বয়ের সঙ্গে 'চাল'-এর ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব।

'চাল' থেকে বঙ্গভাষায় আর একটি কথা আসিয়াছে, যাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দুর্গা-প্রতিমার পৃষ্ঠভাগে যে "চালচিত্র" করা হয়, তাহাকে "চালচিত্র" বলে কেন? হিমালয় অঞ্চলে ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী মেয়েরা প্রকৃতই দেখা যায়, দুর্গা-পূজার সময় চাল দিয়া ললাট প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকে। পুরাকালে খুব সম্ভবতঃ হিমালয়-কন্যা অন্নপূর্ণাকে প্রকৃতই হিমালয়-বাসী মেয়েদের মত চাল দিয়া চিত্রিত করা হইত—এখন আর সে প্রথা নাই, সার জিনিষ চালের পরিবর্ত্তে চাক্চিক্যশালিনী রাংতা চালচিত্রে শোভা পাইয়া থাকে।

এইবার দেখা যাউক, চালের ইংরাজী নাম 'rice' কোথা হইতে আসিল। য়ুরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই চালের নামটা ঠিক rice না হলেও, প্রায় তদনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—জর্ম্মণ ভাষায় 'reis', ফরাসী ভাষায় 'riz' ইটালীয় ভাষায় 'riso' ইত্যাদি। যখন এই সব নানা ভাষায় চাল অর্থবাচক শব্দগুলি শুনিতে প্রায় একই ধরণের, তখন নিশ্চয়ই ইহার গোড়া যে কোন একটি আদি ভাষার মধ্যে নিহিত, তাহাতে ভুল নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সকলেই মানেন যে, ভারতবর্ষ হইতে পারস্য অতিক্রম করিয়া এই চালের নামগুলি য়ুরোপে উপনীত হইয়াছে। চালের আদি স্থান এই ভারতবর্ষ হইতে কোন একটি শব্দ কোন্ যুগে ঐ সকল দেশে উপনীত হইলে, উহার আকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র। সেই আদি শব্দ সংস্কৃত ধান্য-বাচক "ব্রীহি" শব্দ। 'ব্রীহির' 'হ' 'স'র মত * উচ্চারিত হইলে, এবং আদ্যক্ষর 'ব'র লোপ হইলে, "রীসি"তে পরিণত হয়; 'রীসি' হইতে এইরূপ ক্রমে rice (রাইস) আদি শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। পারস্য ভাষায় চালকে 'Birinch বলে—'Birinch'এর সহিত সংস্কৃত "ব্রীহির" খুব সাদৃশ্য।

বাঙ্গালা দেশে চালের এত আদর কেন? চাল হইতে যে ভাত হয়, তাহা বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য বলিয়া ভাতের সংস্কৃত নাম 'ভক্ত'—

---

* কোন একটি শব্দ এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে গেলে 'হ' অক্ষর 'স'তে কিংবা 'স' 'হ'তে পরিণত হয়; তাহার নিদর্শনের অভাব নাই—যেমন, 'হপ্তা' সংস্কৃতে 'সপ্তাহ' ইত্যাদি।

"ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যম্"। *

বোধ হয়, পশ্চিমাদের আটার ন্যায় 'ভাত' অত রজো-গুণবর্দ্ধক নয়। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভক্ত লোকদের খাদ্য বলিয়াই হউক, অথবা সকলেই ইহার ভক্ত.কিংবা সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া ইহার 'ভক্ত' নাম হইয়া থাকিবে। লাটিন Victus শব্দ, যাহার অর্থ খাদ্য, সংস্কৃত এই 'ভক্ত' শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি মনে হয়।

খুব প্রাচীনকালে প্রাণধারক খাদ্যদ্রব্যমাত্রকেই 'অন্ন' বলিত। তাই বেদবচনে দেখা যায়—

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ অন্নং বৈ প্রাণাঃ"

বৈদিক যুগে 'অন্ন' বলিতে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি আটাইশ রকমের খাদ্যদ্রব্য বুঝাইত।

'অষ্টাবিংশতিরন্নম্'

মহাভারতে গয়রাজর্ষির যজ্ঞে যে অন্নকূট বা অন্ন-গিরির কথা আছে, তাহা কেবলমাত্র স্তূপাকার ভাত নয়, এ স্থলে অন্ন বলিতে পুঞ্জীভূত নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর কথা জ্ঞাপন করিতেছে। † কিন্তু ক্রমে 'ভাত' বা 'ভক্ত' ভারতবাসীর এত প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠিল যে, 'অন্ন' বলিতে একমাত্র 'ভাত'কেই বুঝাইতে লাগিল—

"ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনো"

(অমর-কোষ)

অমরকোষের আমলে 'ভক্ত' ও অন্ন একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে ভারতের ন্যায় চাল একটি প্রধান খাদ্যরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমেরিকার Coroline riceএর সুখ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। আমাদের "ভেতো বাঙ্গালী" বলে বলুক, কিন্তু আজকাল ইংরাজদের খানায় নিত্য "কারীভাত" না হইলে চলে না। অথচ ইংরাজরা কিছু কাল পূর্ব্বে চাল সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোম্পানীর আমলে যখন বড় "সাহেব" তাঁহার আফিসের বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, rice বা চাল কি করিয়া তৈয়ারী হয়—বড় বাবু তখন বেশ জবাব দিয়াছিলেন—

"Two man ধাপুস ধুপুস
One man সেঁকে দেয়
তবে সাহেব rice হয়"

অর্থাৎ "প্রথমে দুজনে ঢেঁকীতে ধাপুস্ ধুপুস্ করিয়া ধান কুটিয়া দেয়, তাহার পর এক জন সেঁকিয়া দেয়, তবে চাল তৈয়ারী হয়।"

শারদোৎসবে অন্নপূর্ণার পূজায় চালের নৈবেদ্য দেওয়া হিন্দুদের প্রথা—আজ তাই পূজার 'মাসিকে' এই 'চাল' প্রবন্ধ নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* বৈদিক নিঘণ্টু, পূর্ব্বাষ্টক, ৩য় অধ্যায়।
† মহাভারত বনপর্ব্ব।

* ভাবপ্রকাশ।

মাতৃ-পূজা

শুনেছি শাস্ত্রের উক্তি শক্তি-অংশ নারী।
মাতৃজাতি পুরুষের পূজা-অধিকারী॥
ভক্তি বিনা ডাকি তাই শক্তি রেখে ঘরে।
তুমি কি এস মা বঙ্গে মরা সিংহ'পরে?
নহিলে তুমি মা দুর্গা যথা বিদ্যমান।
নারীজাতি সহে সেথা কেন অপমান॥
সতীর সর্ব্বস্ব যায় লজ্জা দেহ-শুদ্ধি।
চক্ষে দেখি বক্ষে বাজে হই হতবুদ্ধি॥
শুদ্ধা ভক্তি মা জননী দেহ করুণায়।
মজা ত্যজি ব'সে যাই তোমার পূজায়॥
গভীর বিশ্বাসে লয়ে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা।
কর্ম্মফল ধর্ম্মবল করি পদে ভিক্ষা॥
নির্ভয় আশ্রয় জেনে জননীর কোল।
আনন্দ-উৎসব রবে বাজাইব ঢোল॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

টঙ্কনাথ

১

সব জজ অম্বিকাবাবু এইমাত্র আদালতের ধড়া-চুড়ো ছেড়ে বৈঠকখানার সম্মুখস্থ ফুলবাগানে পাইচারী করছেন। গণেশের ধ্যানের সঙ্গে তাঁর চেহারার খুব একটা নিকট-সাদৃশ্য বেরিয়ে পড়েছে। খর্ব্ব অর্থাৎ প্রমাণসই লম্বা নয়, স্থূল তনু অর্থাৎ ব্যাঘ্রজাতীয় জীবের লালানিঃসারক নাহুস-নুহুস ভাব, গজেন্দ্রবদন না হইলেও গজেন্দ্রমস্তক অর্থাৎ চুলের মধ্যে যথেষ্ট হাওয়া খেলার স্থান আছে—লম্বোদর অর্থাৎ নাভিনিম্নস্থ নীবিবন্ধের উপর সের দুই আন্দাজ নেয়াপাতি ভুঁড়ি।

তবে গণেশের ধ্যানের সঙ্গে কিছু পার্থক্যও যে না ছিল, তা নয়। পায়ে শুঁড়তোলা কটকী শ্লিপার, পিঠে অজস্র ঘামাচি—যা দূর হ'তে ইরিসিপ্লাসের মত দেখায় এবং হাতে সদ্য কল্‌কে-চড়ানো বাঁধানো হুঁকো—যা হ'তে স্নিগ্ধ অম্বুরী তামাকের মিঠে মিঠে খোসবুটুকু ঝির-ঝিরে হাওয়া চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে।

দু'পাশে ফ্যান্সী বাঁখারীর অনুচ্চ বেড়ার মধ্যে গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধার দল মাথা দুলিয়ে তাঁকে আম্‌লা-চাপরাসীর মত সেলাম করছে, মাঝখান দিয়ে একটি টুক্‌টুকে লাল পথ চুলের ভিতরকার তেড়ীর মত সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে সবুজ গেট পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছে।

'আপ এ্যাণ্ড ডাউন' পাইচারী করতে করতে অম্বিকাবাবু তাঁর জীবনের 'আপস্ এ্যাণ্ড ডাউনের' কথা চিন্তা করছিলেন। সেই প্রথম ওকালতী পাশ ক'রে কিছু দিন ঝাউতলায় ঘুরে বেড়াতেন, লাইব্রেরীর 'চিড়িয়াখানায়' ভর্ত্তি না হ'তে পেরে, আটপকা হাব্‌লা মক্কেলের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেন, কিন্তু বেশীর ভাগই ছিট্‌কে যেতো, চার টাকার কাযে সাড়ে তিন টাকা দস্তুরী চুকিয়ে দিয়ে, পান, বিড়ি, ট্রামভাড়ার সংস্থান ক'রে নিতেন এবং মাঝে মাঝে খোলার সেরেস্তায় ব'সে ব্রীফের বদলে এক আধখানা গোপনীয় পত্র পকেট হ'তে বের ক'রে লুকিয়ে প'ড়ে ফেলতেন। তার পর অনেক উপযুক্ত মুরুব্বী পাকৃড়ে নিয়ে মুনসেফীর জন্য কি লড়া-পিটাই না করলেন; কখনও নিউ মার্কেট হ'তে উপঢৌকন-ফুল কিনে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ জজের সঙ্গে এই ব'লে দেখা করতেন—'এ আমার বাগানের ফুল, ইওর লেডিসিপের পদপ্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ সম্মানের চিহ্ন'; কখনও নামডাক মরীচিকার পিছনে লুব্ধ হয়িণের মত রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পদব্রজে ঘুরে দেখে তার পর হাম্বে তার অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্যের দ্বাদশ সূর্য্য জ্ব'লে উঠলো। তিনি হাকিমী গদী পেলেন। দীর্ঘ কুড়িটি বছর উপর-আলার মন বুঝে ফাইল ক্লিয়ার করবার পর সবজজের পদে তাঁর প্রোমোশন হলো। ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পাঁচ বছর নির্ঝঞ্ঝাটে উক্ত পদের মর্য্যাদা রেখে চ'লে আসছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও তেমন কিছু জমিয়ে তুল্‌তে পারেন নি। খুব হিসাব ক'রে চলা সত্ত্বেও মোটে আধ লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ। তার ও পক্ষের ছেলেটা হয়েছে উড়নচড়াই বয়াটে, ভিখিরীকে পর্য্যন্ত পয়সা দেয়। আর এ পক্ষের যদিও ছেলেপিলে হয়নি ব'লে গৃহিণীকে প্রশংসা করা যায়, কিন্তু গৃহিণী নিজে একেবারে বিকচ্ছ। নৈলে জন্মতিথি ত বছর বছরই আসে। তার মধ্যে কি এমন উৎসবের কারণ থাকতে পারে যে, গৃহিণী আজ আত্মীয়স্বজনের বাড়ী ছুটেছে নিমন্ত্রণ করতে! না, আর কিছু জমাতেই হচ্ছে—নৈলে তিনিও চোখ বুজবেন, আর সব ফুঁকে দেবে। কিন্তু উপায় কি? বাঁধা মাইনের আঁটাসাঁটা বহর থেকে আর কতটুকু ছাঁট বেরোয়? কত হাকিম উপরিগণ্ডার জোরে দু'চার মাসেই লাল হয়ে গেল, আর তিনি—তাঁর যে বড়ই রাশভারি চেহারা, লোক এগোতে সাহস করে না, এখন থেকে একটু রাশ আল্‌গা দিতে হবে লোক বুঝে। তা লোক বুঝ্‌তে তাঁর মত আর কে পারে? পঁচিশ বছর হাকিমী ক'রে তাঁর আর কিছু না হোক, লোকচরিত্র

সম্বন্ধে একটা অসীম অভিজ্ঞতা জন্মেছে। এমন চরিত্রের মানুষ বোধ হয় হ'তেই পারে না—যা তিনি দেখেন নি বা বোঝেন নি। তাঁর স্বাভাবিক দ্বিধা ও মিতভাষিতা—যা ওকালতীর যুগে লোক মুখচোরামী ব'লে নিন্দা করতো, তাই যে তাঁর বিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য ও অন্তর্ভেদী প্রতিভার লক্ষণ, তা আজ তিনিও বুঝেছেন, লোকেও বুঝেছে। কত ধাপ্পাবাজ উকীল তাঁর সামনে আইনের মন্ত-ফেরেক্কা ঝাড়ে, কিন্তু পেরে উঠবে কেন? তুরপুনের গায়ে বিধ! তাঁর উপর টেক্কা দেওয়া কি যার তার কায! তিনি হাঁ করলে লোকের নাড়ী-নক্ষত্র দেখতে পান; মামলা পড়তে না পড়তেই তাঁর কাছে জল। হাতে নথী, মাথায় বুদ্ধি, তাঁর কাছে আবার সওয়াল-জবাব কি? ও দিকে জেরা হচ্ছে, তিনি রায় লিখছেন। তাঁর হাতে প'ড়ে কত জমীদার টিট হয়ে গেল—কত মামলাবাজ নাস্তানাবুদ নাকালের একশেষ। হেঃ! লোক আবার চেনা যায় না—লোক আবার ঠকায়! সব লোকই ত ঘষা পয়সার মত প্লেন। উপন্যাসে বটে অনেক আজগুবি লোক দেখা যায়; কিন্তু সে ত আর বাস্তব জগৎ নয়—সে মনগড়া খামখেয়ালের রাজ্য। বাস্তব জগতের মানুষগুলো নিয়ে তিনি খোলামকুচীর মত ছিনিমিনি খেলতে পারেন। অধরপ্রান্তনিবদ্ধ হাসির সঙ্গে অম্বিকাবাবু বৈঠকখানার সম্মুখস্থ একটি সান-বাঁধান বেদীর উপর ব'সে পড়লেন।

২

গেটের দরজা ঠেলে একটি লোক আঙ্গিনার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ত্রিবলীরেখান্বিত ভুঁড়িটিকে কিঞ্চিৎ সটান ক'রে অম্বিকাবাবু আগন্তুকের দিকে চাইলেন। কপালের চশমাটিকে নাকের মাঝামাঝি টেনে নামিয়েও তিনি সেই দশ বারো হাত দূরস্থ লোকটিকে চিন্‌তে পারলেন না—সুতরাং মন একটু বিশেষ রকম প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। যখন অচেনা, তখন অন্ন-ধ্বংসকারী আত্মীয় নয়—তখন চাই কি কাযের দরবারেই এসেছে—চাই কি সে কায আদালতের সম্পর্কিতও হ'তে পারে এবং খুব সম্ভব, হালে যে একটা সঙ্গীন উইলের মামলা চলছে—এই রকম একটা কার্য্য-কারণঘটিত চিন্তাস্রোত বানের জলের মত দ্রুতবেগে তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে যেই খেলে যাওয়া, অমনই তিনি রাশ আলগা দেবেন কি রাশ টেনে ধরবেন, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। গোড়াতেই রাশ আল্‌গা দিলে প্রত্যাশার মাত্রা কিছু কম হয়ে দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি চট্ ক'রে তাঁর প্রফুল্লতার বালিসকে গাম্ভীর্য্যের ওয়াড়ের মধ্যে পুরে ফেল্লেন এবং হাঁটুর কাপড়টাকে একটু টেনে নামিয়ে দিয়ে মৃদুমন্দ কাস্‌তে আরম্ভ করলেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, একটু রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেন 'কে?' কিন্তু পাছে মাছ ভয় পেয়ে চারে না ভেড়ে—এই সুবিবেচনা তাঁর স্বাভাবিক দ্বিধার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর উক্ত ইচ্ছাকে আর কাযে পরিণত হ'তে দিলে না।

আগন্তুকের ছিপছিপে লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল চোখ ও উস্কোখুস্কো চুল। একটি তিলে-ধরা সার্ট, শাড়ীপাড় ধুতি ও কান-ছেঁড়া পম্পসু—তার চেহারাতে বেশ একটু বিশেষত্ব এনে দিয়েছিল। সে অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়েই আধ-গাল আন্দাজ হেসে নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পটাপট্ ক'রে গোটা দুইচার মল্লিকা-ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে—অম্বিকাবাবুর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। অম্বিকা-বাবুর মা পূজার জন্য রোজ সকালে ৩টি ক'রে দোপাটি, ২টি ক'রে মল্লিকা এবং ১টি ক'রে জবাফুল তুল্‌তে পাবেন, এই ছিল অম্বিকাবাবুর বরাদ্দ। এ ছাড়া অন্য লোক দূরে থাক্—নিজেকেও কোন দিন একটি ফুল তুল্‌তে দিতেন না—অনুনয়েও নয়, মনের ভুলেও নয়। কাযেই তিনি শুধু বিরক্ত নন, একটু হতভম্ব হয়ে এই দুঃসাহসিক লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন এবং কিছু বলবার জন্য তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ কম্পিত হয়ে একবার বিকসিত ও একবার মুদিত হ'তে লাগলো। কিন্তু তাঁর কিছু বলবার পূর্ব্বেই আগন্তুক ব'লে উঠলো—'তার পর—মশায়ের নামটি কি?'

হুঁকোর মাথার চেয়েও সবজজ বাবুর মাথা বেশী গরম হয়ে উঠলো।—তিনি চোখ বুজে হুঁকোয় প্রকাণ্ড একটা টান দিয়ে ঠিক ক'রে নিলেন—যে চোখ চেয়েই ব'লে উঠবেন—'কোথাকার অসভ্য লোক আপনি!' কিন্তু চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুকের বিস্ফারিত তীব্র কটাক্ষের নীচে তাঁর অত বড় মানসিক সঙ্কল্পটা সঙ্কুচিত হয়ে একটা 'হুঁঃ' শব্দে পর্য্যবসিত হলো এবং সেটা শুনতে হলো—কোন বন্য জন্তুর অস্পষ্ট রুদ্ধ গর্জ্জনের মত।

হঠাৎ আগন্তুক হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, 'আরে ছ্যাঃ! আমিও ত আচ্ছা—দরজার গোড়ায় কাঠের প্লেটে

নাম দেখে এলুম—আবার জিজ্ঞাসা করছি। ও অম্বিকাবাবু, একটু হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি? খান খান—খাবেন বৈ কি, যে গরম—আষাঢ় মাস পড়লো, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই—তবে বাগানটি করেছেন খাসা—চমৎকার মল্লিকে ফুল—ডবল মল্লিকে কি না—গন্ধও তেমনই—শরীর জুড়িয়ে যায়—আর—এর গন্ধও বেশ—আপনার তামাকটির টাকা টাকা সের—কি বলেন? তার কমে আর পাননি—না, নিশ্চয়ই নয়—খাঁটি বিষ্ণুপুরের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর মেশাল আছে—দশ আনা ছ আনা ভাগ—আমি শুঁকেই বুঝেছি—এখানে এসে মনে করছেন? না, না, রাস্তা থেকেই। ও কি, টানুন টানুন—নিভে যাচ্ছে যে। কিংবা দিন, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি—আমিও ব্রাহ্মণ, আমার নাম টঙ্কনাথ চক্রবর্ত্তী—" এই ব'লে আগন্তুক বা টঙ্কনাথ অম্বিকাবাবুর হাতের হুঁকো ধ'রে টান দিলে। অম্বিকাবাবুর মুখ দিয়ে একটা 'আঃ' শব্দ বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর অবশ হাতের শিথিল মুঠো হ'তে হুঁকোটি যে টঙ্কনাথের শিরাবিজড়িত মোটা গাঁটআলা আঙ্গুলের মধ্যে চালান হয়ে গেল, তা নিঃসন্দেহ।—"দেখুন না, ঠিক ধরিয়ে দিচ্ছি, নিভলেই হলো?" ব'লেই টঙ্কনাথ হুঁকোয় মুখ দিয়ে গোণাগুন্তি তিনটি টান দিলে এবং তার মধ্যে কোন্‌টি সুখটান, তা ঠিক বুঝা গেল না। টঙ্কনাথের গাল দুটি একটা চচ্চড় শব্দের সঙ্গে চুপসে গেল, কলকের আগুন লাফিয়ে উঠে যেন দেখতে চাইলে কে টানে এবং তার পরই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে অম্বিকাবাবুর মুখ ঝাপসা হয়ে গেল। 'নিন্' ব'লে টঙ্কনাথ তার ডান-হাতের কনুয়ের তলায় বাঁ-হাত ঠেকিয়ে—হুঁকোটিকে অম্বিকাবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরলে। কাঠের পুতুলের মত অম্বিকাবাবু নলচেটিকে হাতে নিয়েই—"ও ব্বাবা" ব'লে ছেড়ে দিলেন। হুঁকোটি সশব্দে সানের উপর প'ড়ে গিয়ে বুগ্‌বুগ শব্দে সধূম দুর্গন্ধ জল ওগ্‌রাতে লাগলো। উল্টে-পড়া কলকের রক্তবর্ণ গুলের উপর ক্ষিপ্রহস্তে হুঁকোর জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে টঙ্কনাথ বল্লে, "ফেলে দিলেন যে—যাক্—অমন গিয়ে থাকে—কিছু ছিলও না দেখছি—কি ক'রে থাক্‌বে? একে নরম তামাক, তায় গুড় দিয়েছে কম—চোর বেটারা—জিনিষ ভাল হ'লে কি হয়—আর ও দোকান থেকে কিনবেন না।"

অম্বিকাবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন—বোধ হয় বাড়ীর ভিতর যাবার জন্য। এমন অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর জাগ্রত জীবনে ত কখনও ঘটেই নি, স্বপ্নজীবনেও ঘটেছে ব'লে তিনি মনে করতে পারলেন না। না, যা ভেবেছিলেন, তা নয়। স্খলিত কাছাটিকে যথাসম্ভব গুঁজতে গুঁজতে তিনি দ্রুতকণ্ঠে ডাকলেন—'বটু বটু।' বটুক নামে তাঁর ওপক্ষের পুত্রটি বেশ একটু 'বলিষ্ঠ গোঁয়ার' গোছের ছিল—এ তাকেই আহ্বান। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, বটুক এখনও আপিস থেকে ফেরে নি এবং এও ভুলে গিয়েছিলেন যে, বটুক তাঁর প্রায় সমস্ত আদেশই লঙ্ঘন দ্বারা পালন করতেন। টঙ্কনাথ কিন্তু 'বটু বটু' শুনেই ছাদের কার্ণিসের দিকে চেয়ে বল্লে—'বট কৈ মশায়—ও যে অশ্বত্থ—হাঃ হাঃ, গাছ চেনেন না অম্বিকাবাবু—তবে বটের চেয়েও বড় কম যায় না—এ বছর কিছু না বলুক, আসছে বছর দেয়াল শুদ্ধ ভেঙ্গে নামাবে—হাঁ, আলবৎ নামাবে, আমি লিখে দিতে পারি। এঃ, একটা আঁকুসী আছে? দিন, আমি ওর দফা সেরে দিচ্ছি। আর না থাকে ত ঐ পাঁচীলে উঠে হাত দিয়েই—অমন শত্তুর রাখতে আছে—দু' চারখানা ইট খ'সে পড়বে, এই যা—কি করবেন? শিকড় পর্য্যন্ত টেনে তুল্‌তে হবে ত। মিস্ত্রী ডাকিয়ে কাল গেঁথে নিলেই পারবেন।'

এইবার অম্বিকাবাবু হন্ হন্ ক'রে বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে গিয়ে চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন—'যান্—যান্—আশ্চয্যি—"

"কি আশ্চয্যি? গাছ ওপড়ানো? এইটে বিশ্বাস হ'ল না? ভারী ত একটা গাছ! রাগ ক'রে চল্লেন? টঙ্কনাথ মিথ্যা কথা বলে না—তার যে কথা, সেই কায—একটু দাঁড়িয়ে যান্—দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই কথাগুলো টঙ্কনাথ এক নিশ্বাসে ব'লে যেতেই অসহিষ্ণু অম্বিকাবাবু দরজার খিলে হাত দিয়ে বল্লেন—'না—না, ভাল আপ—।' টঙ্কনাথ হেসে উত্তর কর্‌লে—"ওঃ, আপশোষ হচ্ছে? নিজে ওপড়ান নি, তাই? তা বেশ ত, আপনিই ওপড়ান না। এক জন ওপড়ালেই হলো—আমিও যা, আপনিও তাই। আচ্ছা, আসুন, তা হ'লে যা হোক্ একটা কিছু নিয়ে আসুন—আঁকুশী কি দা যা হোক্—একটা কিছু নিয়ে আসুন, আমি আছি এখানে—যাচ্ছি না।"

সোঁ ক'রে একখানা মোটর-গাড়ী এসে গেটের সাম্‌নে

লাগলো। গুর্—র্—র্—ঝক্ ঝক্—ঝাঁ। সোফার ব্রেক টেনে দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমেই অম্বিকাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলো—"মোশায়, হামাকে ইস্তাফা দিন। হামি আপনার কায করতে পারবো না, হামার প্রাণটা কি প্রাণ আছে না? সেই দুপরবেলা সবে দুটি খেয়ে লিয়েছি, আর মাইজী বল্লে গাড়ী সাজতে। গাড়ী সাজলুম, তিন তিন যাগায় লিয়ে গেলুম, সাঁঝ ঘুরে গেলে। এখনও হাত-মুখে জল দিতে পারলুম নি, আর উনি বলে কি না, সিকদারপাড়া চল্। বুনের বাড়ী নিমন্ত্রণ করবো। হামি পারবো না, চল্লিশ টাকার লেগে জান্ দিব না কি?" এই বলেই সোফার তার তেলকালিমাখা ছেঁড়া আস্তীনে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

মাস তিনেক হ'ল অম্বিকাবাবু কিস্তীবন্দীমতে একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ী কিনেছিলেন। তাঁর এ পক্ষের গরবিণী গৃহিণী বিদ্যুদ্বালার নির্ব্বন্ধে প'ড়ে এ অপব্যয়টুকু তাঁকে করতেই হয়েছিল।

গৃহিণী গাড়ী হ'তে নামেন না দেখে অম্বিকাবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর অভিপ্রায়টা কি। তিনি বেরিয়ে এসে সোফারের প্রায় হাত ধরেই বল্লেন—"হরিসিং—বাবা! বুঝেছ—" কিন্তু হরিসিং তার কাকাতুয়ার ঝুঁটীর মত লম্বা চুলগুলোকে এক ঝট্‌কায় মাথার পিছনদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"হাঁ, খুব বুঝেছি, বাবু মোশা—হামি পারবো না—দুস্‌রা লোক দেখুন" বলেই হরিসিং বাগানের প্রান্তস্থিত একটি ছোট্ট টিনের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে এবং অনুচ্চস্বরে 'আজ কার মুখ দেখেই—' বলতে বলতে অম্বিকাবাবু গাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলেন এবং ঢোক গিলে নিয়ে মিহি আওয়াজে বল্লেন—"কি আর করবে? নেমে এসো—কাল তখন—"

এক জন অচেনা পুরুষ উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বিদ্যুদ্বালা ঠিক তাঁর নিজমূর্ত্তিটা ধরতে পারলেন না—ঠোঁট ঘুরিয়ে নাক নেড়ে একটা বিশ্রী চাপা সুরে ব'লে উঠলেন—"আহাহা! কাল তখন!"

ঘোর সমস্যা! অম্বিকাবাবু নিজে গাড়ী চালাতে জানেন না, বটুকেরও দেখা নেই, গৃহিণীও নাছোড়বান্দা। তিনি দুর্জ্জয় সাহসে ভর ক'রে আবার ব'লে ফেল্লেন—'শুনছো, নেমেই এসো না।" কথাটা করুণ মিনতির সুরে উচ্চারিত হলেও কেন জানি না, বিদ্যুদ্বালার কানে একটু কঠোর বলেই ঠেক্‌লো। তিনি 'আচ্ছা, এই জন্মের মত নামছি' ব'লে তাঁর জরীদার শান্তিপুরে আঁচলাটা চোখে দিয়ে নামবার উদ্যোগ করলেন।

টঙ্কনাথ সটান গাড়ীর কাছে এসে অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে—"কি হয়েছে? আপনার স্ত্রী ত? সিকদারপাড়ায় যাবেন?" তার পর বিদ্যুদ্বালাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে—'বসুন আপনি, নামবেন না।' থতমত খেয়ে বিদ্যুদ্বালা ফের সিটের উপর ব'সে পড়তেই টঙ্কনাথ চক্ষুর নিমেষে গাড়ীর মাথায় চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে চ'ড়ে বস্‌লো। 'আরে আরে করেন কি?' বলতে 'না বল্‌তেই গাড়ী হর্ণ বাজিয়ে পেট্রোলের ধোঁয়া উড়িয়ে উধাও হলো। অম্বিকাবাবু গাড়ীর পিছনে পিছনে থপ থপ ক'রে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ভাঙা-ভাঙা রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—'দাঁড়ান্ মশায়, থামান্ বল্‌ছি, আমিও যাব।" কিন্তু টঙ্কনাথ অম্লানবদনে মুখ বাড়িয়ে এই সান্ত্বনার কথাগুলি তাঁর দিকে ছুড়ে ফেলে দিলে—"আপনি আর কেন যাবেন? আমি এলুম ব'লে, আপনি ততক্ষণ অশথগাছটা।—"

হার্টের প্যালপিটেসন্ বশতঃ অম্বিকাবাবু অগত্যা দাঁড়িয়ে প'ড়ে ক্রন্দনের মত উচ্চৈঃস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—'থামান্ বল্‌ছি, নৈলে ভাল হবে না।' সে কথা বোধ হয় টঙ্কনাথের কানেই পৌঁছাল না। তা সত্ত্বেও সে আর একবার মুখ বাড়িয়ে ব'লে গেল-"কিছু ভয় নেই—আমি নিয়ে যাচ্ছি—"

গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চ'লে যেতেই অম্বিকাবাবু উন্মত্তের মত চেঁচাতে লাগলেন "নিয়ে গেল কি ভয়ঙ্কর—দিনে ডাকাতী—জেলে দেব—কোন্ হায়! চোর—চোর—পুলিস! পাক্‌ড়ো।" কিন্তু কোথায় বা পুলিস আর কে-ই বা পাকড়ায়? লাভে হ'তে দুচার জন নিকর্ম্মা কৌতূহলী লোক তাঁর চারদিকে জড় হয়ে তাঁকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তুললে। তিনি গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে হন্‌হন্ ক'রে বৈঠকখানায় ঢুকেই টেলিফোন চোঙ হাতে তুলে নিলেন। দু একবার 'হ্যালো হ্যালো' করবার পর তিনি যে নম্বরের সঙ্গে কনেক্ট করবার হুকুম দিলেন, সেটা থানার

নম্বরের ঠিক উল্‌টো। মন উল্‌টে গেলে, নম্বর উল্‌টে যাবে, সে আর বেশী কি? তিনি 'হ্যালো' ব'লে ডাকতেই এক জন ভারী গলায় উত্তর দিলে—"ইয়েস, কে আপনি?" অম্বিকাবাবু এতক্ষণ মনে মনে টঙ্কনাথ জপছিলেন, কাযেই "আমি টঙ্কনাথ বাবু, সবজজ।" উত্তর এলো,—"কোথাকার সবজজ?" অম্বিকাবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, "এইখানকারই, আবার কোথাকার? আপনি কি মহিমবাবু?" "ওঃ, মহিম বাবুকে চান্, ডেকে দিচ্ছি।" বলেই উত্তর নিবৃত্ত হলো। অবশ্য ইনস্পেক্টারের নাম ছিল—মদীন্দ্র বা মদীন। কিন্তু মদীন যে কোন্ মনোবিজ্ঞানের আইন অনুসারে মহিম হয়ে গেল, তা সুস্থ মনের পক্ষে আবিষ্কার করা একটু শক্ত। যাই হোক্, মহিম বাবু যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যালো, কি চাই?' তখন অম্বিকাবাবু তাঁকে অবিলম্বে অকুস্থানে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন, কেন না, ঘটনা অত্যন্ত সাংঘাতিক—লোমহর্ষণ বল্লেও চলে। এবার মহিমবাবুর তরফ থেকে বেশ একটু হাস্যোদ্দীপক পাল্টা জবাব এলো—

"বুঝলুম না। ব্রুকবণ্ড, না দার্জ্জিলিং না লিপটন? আমার কাছে তিনই আছে। আচ্ছা, আজ আর পারবো না, কাল সকালে তিন রকম স্যাম্পেল নিয়ে আপনার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব।"

অম্বিকাবাবু—"ধুত্তোর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"—ব'লে সক্রোধে চোঙ ছুড়ে ফেলে দিলেন।

৩

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ, হতভাগা?"

"ঐ ত তোমার দোষ। কথায় কথায় যা তা ব'লে গালাগালি দাও। জানো না, মা বলেছিলেন ফল আনতে? আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলুম—নিউমার্কেটে। এই এক বাজরা নিয়ে এসেছি—সব রকম আছে, আম, ম্যাঙ্গোষ্টীন, পিচ—"

"রেখে দে তোর পিচ—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে গেল। এ দিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তার খবর রাখিস্?"

"কিসের সর্ব্বনাশ? তুমি বড্ড মিছিমিছি হেদোও।"

"মিছিমিছি বৈ কি—দেখ গে ঘরে গিয়ে—তোর মা আর নেই।"

"সে কি!"

"আর সে কি!.নিয়ে পালিয়ে গেল—এক বেটা। ওঃ—তুই-ও যেমন ত্যাঁদোড়—সেও তেম্‌নই—ব্যাদড়া, বিট্‌কেল, বজ্জাৎ। বাড়ীতে এলো, ফুল ছিঁড়লে, তামাক পোড়ালে—তার পর তাঁকে নিয়ে লম্বা। আচ্ছা, আমি যদি টঙ্কনাথ—ধুত্তোর—সেই বেটারই নাম মনে আসে—আমি যদি অম্বিকা হই,তা হ'লে এই ব'লে রাখছি—আর একবার তার দেখা পেলে হয়—গুঁড়িয়ে পিষে ছেড়ে দেব।"

"তা তখন দাও নি কেন?"

"চুপ কর্, পাজী—মুখে মুখে উত্তর! তখন দিতে পারলুম কৈ? তিনিও মোটরে ক'রে এলেন—সোফার বেটাও চ'লে গেল—আর সে-ও লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে—ওঃ কোথায় না জানি নিয়ে গেল! পারিস্ ত এই বেলা খোঁজ কর্ গে যা—মান-ইজ্জত সব গেল—এখন প্রাণে রাখ্‌লে হয়। এক গা গয়না—এঃ, কেনই পাপ গাড়ী কিনেছিলুম। আর বেটা ইন্‌স্পেক্টার মহিম—ধুত্তোর মহিম কেন হবে, মদীন—তাকে টেলিফোঁয় ডাকলুম—আর এই বিপদে সে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে, যেন আমি তার কত কালের ইয়ার! আচ্ছা, আমি যদি ডিষ্ট্রীক্ট জজের ফেভারিট সবজজ হই, তা হ'লে সে কত বড় ইন্‌স্পেক্টার, আমি দেখে নেব।"

"কি যে পাগলের মত বকো, তার ঠিক নেই। তোমার মত ঘাবড়াতে যদি আমি আর কাকেও দেখে থাকি। আগে দেখ, কি হয়। সে আবার আসে কি না।"

"আর এসেছে—তুই ভাবছিস্, সে তাঁকে সিকদারপাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আবার লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরে আসবে? আরে, সেই ভাগ্যিই যদি আমার হবে, তা হ'লে তোর মত একটা উজবুক আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে কেন?"

"ঐ ত তোমার দোষ, খামকা গালাগালি দাও। সাধে তোমার ওপর চটি!—সে যে-ই হোক্, তার সাধ্যি কি যে আমার মা'র কোন ক্ষতি করে! আমার মা তেমন মেয়েই নয়। তবে হাঁ, ভয়ের লোক বটে, চাল চালতে জানে। বুকের পাটা আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তাকে একবার দেখতে।"

"দূর—দূর—দূর হয়ে যা—বেরিয়ে যা। তোর মুখ দেখতে নেই।"

বৈঠকখানায় ব'সে পিতা-পুত্রে এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় টঙ্কনাথ আধগাল আন্দাজ হাসি নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেই অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে, "এই নিন্, পাঁচ সিকে ফিরেচে। আমি ব'লে তাই পেরেছি, আর কেউ হ'লে—আপনিও বোধ হয় পারতেন না। কি ক'রে পারবেন? অশথগাছটাও ত এখনও পারেন নি দেখলুম। কি, বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, গোড়াগুড়ি থেকেই শুনুন।" এই ব'লে মবলগ এক টাকা চার আনা অম্বিকাবাবুর টেবলের উপর রেখে একখানা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লো।

অম্বিকাবাবু ভ্যাকাচাকাগ্রস্ত মুখে একবার টঙ্কনাথ ও একবার বটুকের দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাবা বটু—এই—এই সেই।"

বটুক টঙ্কনাথকে আপাদ-মস্তক শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে করতে বল্লে, "তা আমি দেখেই বুঝেছি।"

অম্বিকাবাবু বিরক্তির পরাকাষ্ঠাসূচক ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে বল্লেন, "জিজ্ঞেস কর্ না, তিনি কোথায়।"

টঙ্কনাথ ফরাসের উপর হ'তে একখানা হাতপাখা তুলে নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বল্লে, "কি অম্বিকাবাবু—আপনার স্ত্রীর কথা বল্ছেন? তিনি সিকদারপাড়ায় তাঁর বোনের বাড়ীতে।—যখন বলেছি পৌঁছে দেব—দেব না?—আপনিও যেমন পিছনে ডাক্লেন—হাতে হাতে ফল—পোয়াটেক পথ গিয়েছি কি লাগলো একখানা গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা। ট্রামের ডানদিকে বেরিয়ে যাব ব'লে একটু জোরে হাঁকিয়েছিলুম কি না।—আর এমনই কাণ্ড, এক লালপাগড়ী, যাদের অন্য সময় দেখাই যায় না—যেন ভুঁই ফুড়ে ঠেলে উঠলো। ভাবলুম, প্ল্যানটেন শো ক'রে বেরিয়ে যাই, তা সামনে পড়লো গোটা দু'তিন ছেলেমেয়ে—আর কি এড়াতে পারি? উঠলো বেটা এসে ফুটবোর্ডে। বল্লুম, জেনানা যাচ্ছে, নম্বর টুকে নিয়ে ছেড়ে দাও। তা শুনলে না। বুঝলুম, কিছু ট্যাকস্থ করতে চায়—নিজের কাছে কিছুই নেই—কি করি? চাইলুম আপনার স্ত্রীর দিকে। তিনি ঘোমটার ভিতর দিয়ে মাথা নাড়লেন। বুঝলুম, তাঁরও বকেয়া। বল্লুম, দু'গাছা চুড়িই খুলে দিন। বড় বংশের মেয়ে—বেশ বিয়ে করেছিলেন—বুঝলেন, মানের চেয়ে বড় কিছুই নয়—অমনই খুলে দিলেন—পাশেই ছিল পোদ্দারের দোকান—নাম মনে রেখেছি, রসীদও আছে—বাঁধা দিয়ে পেলুম সতের টাকা। কাল খালাস ক'রে আনতে পারবেন। সে বেটাকে দিলুম পাঁচ—বাকী রইলো বারো। আরও বেটা বলে, গলা ভিজিয়ে দাও। বুঝলুম দারু পিলাবার কথা। কি করবো? নৈলে থানায় যেতে হয়। নামলুম এক দোকানের সাম্নে—কিন্লুম এই এক পাঁট তের সিকে। খালি হয়ে গেছে, রেখে দিন, কাযে লাগবে, তবে সবটা বেটাকে টানতে দিই নি—চার আনা আন্দাজ সে, বারো আনা আন্দাজ আমি, তবু খানিকটা উসুল, ব্যস্—সেও ভাগলো, গুণে দেখি আছে আট টাকা বারো আনা, তাই নিয়েই দিলুম হাঁকিয়ে। আর কোন গোলমাল নেই, একদম সিকদারপাড়া, জিজ্ঞেস করলুম, নম্বর কত, উত্তর না দিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিলেন। দরজার গোড়ায় নামিয়ে দিলুম, দিয়েই আবার ফের রওনা। পথে তেল নেই, কিনলুম এক টিন—গেল তিন টাকা, তার পরই টায়ার বার্ষ্ট এঞ্জিন বন্ধ। ডাকালুম কুলী, ঠেলাতে ঠেলাতে নিয়ে গেলুম গ্যারেজে—কুলীভাড়া লাগলো বারো আনা, ম্যানেজার নিলে আগাম দু' টাকা—কাল আর ১০ টাকা দিয়ে নিয়ে আসবেন। ব্যস্, হাতে রইলো ৩ টাকা, তাই নিয়ে করলুম একখানা ট্যাক্সি ভাড়া, সটান গেটে এসে নামলুম। মিটারে উঠেছিল ২ টাকা ৮ আনা, দেব কেন? ক্ষুরণ করেছিলুম সাত সিকেয়, মুখটি চূণ ক'রে তাই নিয়েই লম্বা। ঐ নিন পাঁচ সিকে ফেরত, এই নিন পোদ্দায়ের নাম আর রসীদ, এই নিন গ্যারেজের বিল, আর ঐ পাঁটটাও আগেই দিয়েছি, ব্যস্, আর কিছু নেই, দেখুন, কত সস্তায় কায হাসিল ক'রে এলুম; এখন চলুন, দেখি আপনার অশথগাছটা।"

অম্বিকাবাবু অজগরের মত ফোঁস ক'রে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"বটু, দেখ ত টেলিফোঁ ক'রে, সিকদারপাড়ায় গেছেন কি না।"

টঙ্কনাথের চোখের তারা ধারালো ছুরির ফলার মত চক্চক্ ক'রে উঠলো। সে দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কামড়ে ধ'রে বল্লে, "ছি ছি, অম্বিকাবাবু, আমায় আপনি মিথ্যাবাদী পেলেন? টঙ্কনাথ মিথ্যে কথা বলে না। তার যে কথা, সেই কায। আপনি ভাবছেন, চোট লেগেছে কি না,

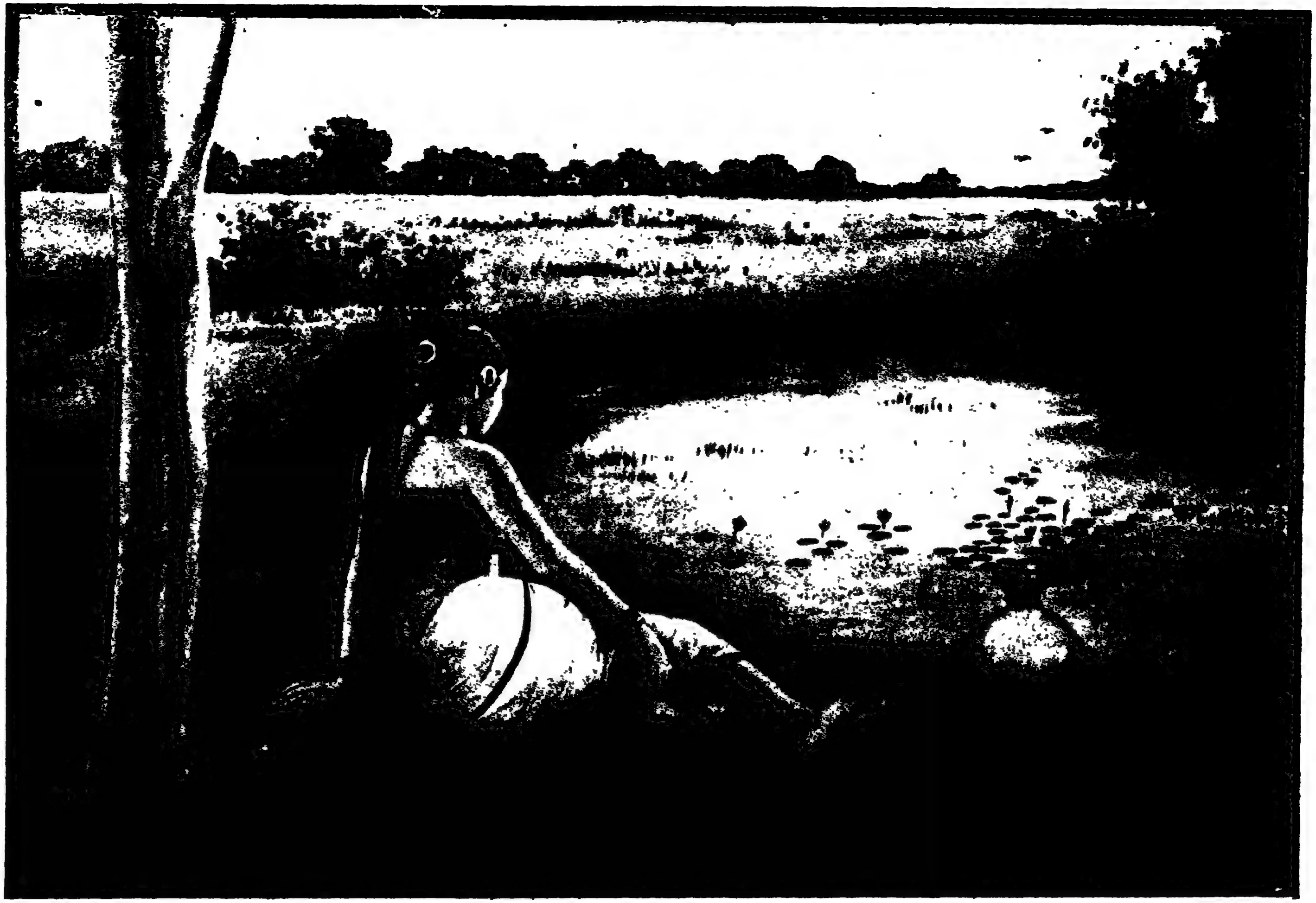

তন্ময়

বসুমতী প্রেস]

শিল্পী—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণ—ত্রিপুরা।

হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি কি না? তদ্দূর হ'তে পারতো কাঁচা ড্রাইভার হ'লে,—যেমন আপনার ঐ হরিসিং। গরুর গাড়ীও যেতো, আপনার স্ত্রীও যেতেন। আমি ঐ ব্রেক টেনে একেবারে চিৎ হয়ে পড়লুম কি জন্যে? তাঁকে বাঁচাবো বলেই না? বেশ, টেলিফোঁ করেই দেখুন। কিন্তু বাজী রাখুন; যদি শোনেন, আপনার স্ত্রী সিকদেরপাড়ায় আছেন আর কিচ্ছু চোট লাগে নি, তখন? বলুন, কি বাজী রাখবেন?" এই ব'লে টঙ্কনাথ একটা অস্বাভাবিক বিকট হাস্যে সমস্ত ঘর মুখরিত ক'রে তুল্‌লে। তার পর বটুকের দিকে চেয়ে বল্লে—"কি দাদা, একটু জল খাওয়াতে পারবে? একেবারে 'র' টেনেছি কি না—তার পর এই দৌড়-ঝাঁপ—তার পর এই এতখানি বক্‌লুম, তবু বেশী খাব না—স্রেফ এক চুমুক।"

বটুক এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌—বিস্ময়ে ও প্রশংসমান নিষ্পলক দৃষ্টিতে টঙ্কনাথের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ টঙ্কনাথের অনুরোধে সুপ্তোত্থিতের মত ব'লে উঠলো—"নিশ্চয় খাবেন—বসুন, এনে দিচ্ছি। আপনার সাকরেদী করতে ইচ্ছে করে।" এই বলেই এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর হ'তে এক গ্লাস কর্পূর দেওয়া ঠাণ্ডা জল ও এক রেকাবী সন্দেশ এনে টঙ্কনাথের হাতে দিলে।

অম্বিকাবাবু বটুকের কাণ্ড দেখে বিদ্রূপের সুরে বল্লেন—"দাও, ঐ ফলগুলোও দাও।"

টঙ্কনাথ হেসে বল্লে—"না অম্বিকাবাবু, মাপ করবেন, অতগুলো কি আর পারবো? আপনি কৃতজ্ঞতা না কি বলে, তাই দেখাচ্ছেন—খোস্‌মেজাজ হয়ে,—কেন না, আপনি দিলদরিয়া লোক। কিন্তু—দাঁড়ান, না খেলেও আপনি দুঃখিত হবেন, ভাববেন, অপমান করলুম। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা ক'রে।" ব'লে নিজেই ফলের বাজরা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বস্‌লে। এ অসহনীয় দৃশ্য অম্বিকাবাবুর চোখে সইলো না। তিনি বটুকের দিকে কটমট্‌ ক'রে চেয়ে গন্‌গন্‌ ক'রে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলেন।

দুই এক মিনিট পরে অম্বিকাবাবু যখন ফিরে এলেন, তখন রেকাবীতে একটিও সন্দেশ নেই, বাজরাতে একটিও ফল নেই। দেখেই তাঁর অন্তরাত্মার গায়ে কে যেন জলবিছুটী আর ধানী লঙ্কা একসঙ্গে ঘষে দিলে। তিনি ফরাসের উপর একটা তাকিয়ে পেড়ে দিয়ে বল্লেন- "এই বার এখানে একটু শুয়ে পড়ুন—আমি বাতাস করি।"

টঙ্কনাথ হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্লেন—"বুঝেছি, অম্বিকাবাবু, বুঝেছি। ইচ্ছেটা এইখানেই রাত কাটাই—ছুটিতে গল্পসল্প ক'রে। কিন্তু কি করবো, আজ আমায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে। হাঁ, একটা মস্ত কায মনে প'ড়ে গেল। আচ্ছা—তা তার জন্য দুঃখ কি? আর এক দিন আসা যাবে। হাঁ, টঙ্কনাথ মিথ্যা কথা বলে না—আজকের দোষটা—সে দিন বেশীক্ষণ থেকে পুষিয়ে দিয়ে যাব।"

এই বলেই টঙ্কনাথ হাসতে হাসতে তীরের মত বেগে বেরিয়ে পড়লো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

মরমের বীণা

আমার মরমের বীণা
মরমেই যেন বাজে গো
তব রাতুল চরণ, নিশি-দিন যেন,
আমার হৃদয়-আসনে রাজে গো।
শতেক আঘাতে হইয়ে কাতর,
বেদনায় যদি হই জর-জর,
মেনে লই যেন সেই সমুদায়,
তোমার কঠোর করুণা,
প্রলয়ের মেঘ ঘনায়ে আসিলে
অশনি গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিলে
তব চরণ-নূপুর রুণুধ্বনি যেন ঢালে কানে সুধা-মূর্চ্ছনা॥
আমার মরণের গান তুমি আর আমি
শুনি গো নীরবে ওগো প্রাণ-স্বামী
আর যেন কেহ নাহি জানে শুনে, আমারই হৃদয়-মাঝে গো,—
তুমি অনিবার হে বঁধু আমার থেকো পাশে চারু সাজে গো॥

শ্রীমাধবচন্দ্র শীকদার।

চপলার লীলা

বীজ

শিলিগুড়ি ষ্টেশনে একখানি গাড়ী দখল করিয়া সুশীলবাবু যখন শ্যালী ও পত্নীর সহিত গল্প-গুজবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একটি সুদর্শন যুবক ব্যস্তভাবে আসিয়া সুশীলবাবুকে কহিলেন, "মশাই. একটু যায়গা দেবেন? কোনখানে একটুও যায়গা পেলাম না, সেই জন্যে বাধ্য হয়ে—"

তাহার কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু কহিলেন, "তাতে কি হয়েছে, আপনি আসুন—তবে—কি জানেন, আমার এই শ্যালীটিকে নিয়েই মহা মুস্কিল—আছে—"

দূর হইতে সকোপ কটাক্ষে ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে সীতা কহিল, "যান—আপনি—ভারী—অসভ্য।"

গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সীতার দিকে চাহিয়া মৃদু-মন্দ হাসিতে হাসিতে সুশীলবাবু কহিলেন, "তোর কাছে ত চিরদিনই ঐ নামে পরিচিত রয়ে গেলাম। ভাল আর তুই বল্লি কবে?" এই বলিয়া নিজের হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি আগন্তককে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে বলিলেন এবং নিজে তাহাকে তাঁহার যায়গা ছাড়িয়া দিলেন।

অপরিচিতের আগমনে সীতা ও তাহার দিদি অত্যন্ত জড়সড়ভাবে এক দিকে সরিয়া বসিলেন।

সুশীলবাবুর কোষ্ঠীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন কালেই কেহ লেখে নাই। তিনি আগন্তককে এক ধারে পথের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেই উপযাচক হইয়া কহিলেন, "আপনিও দেখছি স্ত্রীলোকের বাড়া, পুরুষমানুষের অত লজ্জা? এই দুটি স্ত্রীলোককে আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পাল্লুম না, দেখুন না, দুজনে বসেছেন যেন ধোবার পুঁটুলী।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আগন্তকও আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উভয়েই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। শান্তি তখন স্বামীর উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল, সে ক্রূর দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিতেই সুশীলবাবু কহিলেন, "দেখলেন ত মশাই, উচিত বল্লেই রাগ, শাসনে শাসনেই আমি রোগা হয়ে গেলাম; ঐ অস্ত্রই শিখে রেখেছেন। দিন দিন তিল তিল ক'রে যে দেহ ক্ষীণ হচ্ছে, সে কেবল—"

আগন্তক আর নীরব থাকিতে না পারিয়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে কহিলেন, "আপনাকে দেখলে ত কেউ সহজে স্বাস্থ্যহীন বলতে পারে না!"

"ওহে ভাই, এ কি ওপরে দেখে কেউ বুঝতে পারে—যাই হোক, আর বেশী বলব না, তা হ'লে পরিণাম যে শুভ হবে,—তা বুঝতেই পাচ্ছ—স্ত্রী জিনিষটি—বড় ভয়ানক বি—"

আগন্তক কহিলেন, "মাপ করবেন, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বড় অবসর—পাই—" তাঁহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু কহিলেন, "এঁ্যা!. বল কি, বিয়ে করনি?"

ম্লান হাস্যের সহিত সে কহিল, "আপনি অত আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন? এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

"আরে, এতে আশ্চর্য্য হব না ত আশ্চর্য্য হব কিসে? তুমি ত তা হ লে দুনিয়ার সব রসেই বঞ্চিত আছ; বিয়ে না ক'রে কি মানুষ থাকতে পারে? এত অভাব-অভিযোগ—বিশেষ ধর, এই ঝগড়াটাই ত এক জন না থাকলে মহা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। তুমি জীবনটা কি ক'রে কাটাচ্ছ হে? জানই ত, গৃহিণীহীন গৃহ গৃহ নামেরই

অযোগ্য। আমি বোধ হয় এক মিনিটও শান্তি নইলে চলতে পারি না। এ দিকে ত দেখছি, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহাপুরুষও নও। তবে—স্ত্রীরত্নটি না থাকলে দুনিয়ায় চলা ফেরাই যে কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়!" এই বলিয়া তিনি একবার পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, শান্তির সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে এবং সে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। শান্তি তখন মনে মনে ভাবিল, ভদ্রলোক আর যাবার গাড়ী পেলেন না, এঁর সঙ্গে আবার মানুষে যায়!

আগন্তুক মনে মনে ভাবিলেন, লোকটা অত্যন্ত স্ত্রৈণ। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া ম্লান হাস্যের সহিত কহিলেন, "সবই অভ্যাস, আপনারা চিরদিন এই ভাবেই চ'লে এসেছেন, সুতরাং আপনাদের বোধ হয় অসুবিধা হয়। আমার তো—" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে চাহিতেই অদূরবর্ত্তিনী সীতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মুহূর্ত্তে তিনি আবার তাঁহার চক্ষু নত করিলেন; কিন্তু সুশীলবাবুর দৃষ্টি সেটুকু এড়াইয়া গেল না। তিনি কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে সুশীলবাবু কহিলেন, "তা হ'লে আপনি এক জন ভীষণ নারী-দ্বেষী দেখছি—"

একটুখানি হাসিয়া আগন্তুক কহিল, "সেটা ঠিক বলতে পারি না - তবে—"

গাড়ী ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ছুটিয়া চলিতেছিল। যে দিকেই দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই পাহাড়, স্তব্ধ অচঞ্চল ভীষণদর্শন ঘনান্ধকার পর্ব্বতসকল ভেদ করিয়া দীপশলাকার বাক্সের মত গাড়ীগুলি অমিতবিক্রমে ছুটিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গরাজিতে রৌদ্রালোক পড়িয়া পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষণলঘু পুঞ্জীভূত মেঘের রাশি বাত্যাতাড়িত হইয়া ছিন্ন-ভিন্নভাবে পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় লইয়া, যূথিকা-স্তবকের মত অপূর্ব্ব শোভায় হিমাদ্রির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল, হিমকণাবাহী শীতল সমীরণ আসিয়া বাঙ্গালাদেশের অগ্নিদগ্ধ দেহটাকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। পথের ধারে বন্য টিয়াগুলি তারের উপর বসিয়া কিচিমিচি করিতেছিল। সীতা একাগ্রচিত্তে ইহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে আরও দেখিতেছিল, গাড়ীখানি কিরূপ বক্রগতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে। পাহাড়ের পথে এই তাহার প্রথম যাত্রা, সুতরাং এ যাত্রা তাহার অবসাদগ্রস্ত মনকে বড়ই উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল।

পার্ব্বতীয় বালক-বালিকাগুলি মৃগশিশুর ন্যায় লম্ফে লম্ফে কখনও উর্দ্ধে, কখনও নিম্নে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফুল ও ফল আহরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের উচ্চহাস্য যেন মৌন পার্ব্বত্য বনভূমিকে জাগরিত করিয়া তুলিতেছিল। অদূরে পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত কত শত ঝরণা বর্ষার অপরিমিত বারিরাশিতে নাচিয়া নাচিয়া, ফুলিয়া, দুলিয়া রজতধারার মত পর্ব্বতের নিম্নপ্রান্তে ক্ষরিত হইতেছিল। পর্ব্বতগাত্রের নানাবিধ 'ফারণ' পুষ্পের একটি মৃদু মধুর সুগন্ধ সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল! সীতা মুগ্ধনেত্রে সেই দিকেই চাহিয়া ছিল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, "মশায়ের নাম? কি করা হয়?"

"আমার নাম রঘুপতি, আমি ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনীয়ার।"

সুশীলবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, আগন্তুকের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, "দার্জ্জিলিংয়ে কোথায় থাকা হবে?"

"আজ্ঞে, লিলি কটেজ। নম্বর দুই।"

গভীর আনন্দের সহিত সুশীলবাবু কহিলেন, "বাঃ বাঃ, এ যে—পরম সৌভাগ্য, মণিকাঞ্চনযোগ। এমন যোগাযোগ দেখাই যায় না। আমরাও ঐ এক নম্বর ভাড়া করেছি। আপনাকে যে সর্ব্বদা পাওয়া যাবে, সেইটাই বেশী আনন্দ মনে কচ্ছি।"

রঘুপতি ভাবিতেছিল, লোকটি বড় সরল, উদার। দুই চার মিনিটের পথের পরিচয়ে যে অপরিচিতকে এমন আপন করিয়া তুলিতে পারে, তাহার মন যে কতখানি উচ্চ, তাহা সে নিজের মনেই সম্যক্ উপলব্ধি করিল। গাড়ী ধীরে ধীরে দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

অঙ্কুর

এক দিন বাদলের ধারাবর্ষণ-প্রভাতে রঘুপতি জানালার ধারে নিজের ঘরটিতে একখানি বই লইয়া বসিয়া ছিল। প্রায় দুই মাসকাল সে দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। এই দুই মাস সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকল সময় সকল যায়গাতেই

সুশীলবাবুদের সঙ্গী হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া অবসরকালটুকুও সে প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে। নিজের মনটাকে সে যতটা সম্ভব উঁহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট হইত, কিন্তু কোন্ সম্মোহনশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে যেন চুম্বকাকৃষ্ট লোহের মত নিয়তই উঁহাদের নিকট গিয়া পড়িত, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। নিজের শত বাধা সত্ত্বেও তাহার বিদ্রোহী মন-প্রাণকে সে কিছুতেই দৃঢ় করিতে পারিত না।

সীতার সেই কলকণ্ঠের উচ্চ হাসি, নিমেষহারা লজ্জারুণ দৃষ্টি, মনোমোহিনী রূপরাশি তাহাকে মদিরাপায়ীর ন্যায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল, তাই এই নবোন্মেষিত যৌবনে তৃষিত হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম-অর্ঘ্য যে সে কবে কোন্ দিনে সীতার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বিশ্বের অন্তরালে থাকিয়া বিশ্বপিতা যে কাহার ভাগ্যে কি লিখিয়া থাকেন, জ্ঞানহীন মানবের বুঝিবার সাধ্য কোথায়?

সীতা যে তাহার পক্ষে দুর্লভ, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। কারণ, সীতার সীঁথিতে সিঁদূর দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, সীতা বিবাহিতা। তাই আজ নিজের মনকে প্রবলভাবে শাসিত করিয়া, একখানি বই লইয়া সে জানালার ধারে বসিয়াছিল। সে ঠিক করিয়াছিল, এ প্রলোভন তাহাকে জয় করিতেই হইবে। কিন্তু দুষ্ট মনকে সে প্রবলভাবে শাসিত করিয়া রাখিলেও, হৃদয়ের প্রতি অণু-পরামাণু আজ বিদ্রোহী হইয়া সকল বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া ঐ গৃহের দিকেই ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল।

এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে এস্রাজের সহিত সীতার সুমধুর কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহার কর্ণে আসিয়া বিক্ষিপ্ত মনটাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে শুনিল, সীতা গাহিতেছে—

"সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা,
কেমন ক'রে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমার
সেই কথা বলিয়ো
শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়!
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।"

সে ভাবিতেছিল, কি সুন্দর,এ কি তাহার প্রাণের কথা? সীতা গাহিতেছিল—

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তা'র
যা কিছু সঞ্চয়।"

বাদল বাতাসে সীতার গানের মধুর সুরটুকু ঘরের ভিতর যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গীতের মোহমন্ত্র যেন তাহাকে পাষাণে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন সুমধুর কণ্ঠ কি মানুষের হয়? কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সীতার প্রাণে এমন কি বেদনা সঞ্চিত আছে যে, সে নিত্য নিত্য এই রচিত গাথায় নিজের অব্যক্ত বেদনার ব্যথা মানুষের মন-প্রাণকে জাগরিত করিয়া তুলে? তবে মনের ভিতর একটা অমীমাংসিত জটিলতার সংশয় আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। গায়িকার হৃদয়ে কিসের এ প্রচ্ছন্ন ব্যথা, সে কাহার পরশ চায়? আজ বলিয়া নয়, সীতার গান যখনই সে শুনিয়াছে, তখনই যেন তাহার মনে হইয়াছে, গায়িকার অন্তরস্থ অকথিত বেদনারই এ সকরুণ ধ্বনি--নিশীথরাতের বাদলধারার মত এস্রাজের করুণ ঝঙ্কার তাহারই প্রাণের ভিতর এমন সুরে বাজিয়া উঠিতে চায় কেন? চির-পরিচিত মৌন কাতর সজল আঁখি দুইটি সততই হৃদয়াভ্যন্তরে ফুটিয়া উঠে কেন? তাহার সঙ্গ—তাহার সঙ্গীত এত মধুর বোধ হয় কেন? সে পরস্ত্রী, তাহার উপর এ অনুরাগ কি শিক্ষিত পুরুষের আদর্শ?

এই যে অতি পবিত্র শুভ্র চিত্তকে সে অতি যত্নে রক্ষাকবচের মত গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, ধরণীর অপবিত্র ধূলিকণাস্পর্শে পাছে সে কোনও দিন কলুষিত হইয়া উঠে। আর আজ সেই অনিন্দিত উন্নত সংযমী চিত্ত কিসের প্রলোভনে আকৃষ্ট? কি তাহার কাম্য? প্রাণ কেন ঐ দূরশ্রুত মধুর স্বরলহরীতে ডুবিয়া যাইতে চায়? অরুণকিরণ সদৃশ স্বচ্ছ মুখমণ্ডল—সেই নীলেন্দীবর তুল্য বিশাল নয়নদ্বয় কেন তাহার মানস-দর্পণে নিয়ত ফুটিয়া উঠে? এ কি—এ প্রলোভন? প্রতিদিন এই যে

অবসর-সময়ে কিসের আকর্ষণে এই জানালার ধারে কাহার প্রতীক্ষায় সে নিজের উৎকণ্ঠিত আঁখি দুইটিকে রুদ্ধ জানালার দিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়া থাকে? এ তৃষা লোকের অগোচর থাকিলেও তাহার অগোচর আছে কি?

এই প্রতীক্ষিত সুন্দর সময়টুকু তাহার কাছে এত প্রিয়,—এত মধুর ও সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত বলিয়া মনে হয় কেন? পর্দ্দার অন্তরাল হইতে নিজের সুন্দর দেহটিকে লুক্কায়িত রাখিয়া দুইখানি কুসুমপেলব হস্ত যখন রুদ্ধ জানালার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তখন তাহার মনে হইত, পূর্ণিমার স্ফুটন্ত জ্যোৎস্নার সুবিমল কান্তি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার নয়ন দুইটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দিল। এমনই ভাবে দুই মাস ধরিয়া সে তাহার পিপাসিত আঁখি দুইটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সীতার দৃষ্টির সম্মুখে নিজের দৃষ্টি স্থির রাখিতে তাহার অন্তরাত্মা যেন কম্পিত হইয়া পড়িত, আশা মিটাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়া লজ্জায় চক্ষু নত হইয়া যাইত—তাই এই গোপনতার অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া নিমেষহারা দৃষ্টিতে সে শুধু হাত দুইখানির দিকেই চাহিয়া থাকিত। এ প্রলোভন সে কিছুতেই দমন করিতে পারিত না।

কে সে—? কোন্ চিরপরিচিতা জন্মজন্মান্তরের কাঙ্ক্ষিতা প্রিয়তমা, কোন্ অদৃশ্য নিগূঢ় আকর্ষণে তাহাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে যে, সে আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করিয়া যাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেশাচার, সমাজ, ধর্ম্ম সমস্তই অতিক্রম করিয়া সর্ব্বহারা, রিক্ত প্রাণ আজ তাহারই বাহুবন্ধনে ধরা দিবার জন্য অসীম অনির্দ্দেশ্য পথে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে? কিন্তু বাধা, এই—অসীম—অনন্ত যোজনাধিকপরিমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—কে সৃষ্টি করিয়াছে? এই বাধা সে কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া যাইবে? বিবাহের আগে কেন সে সীতার সহিত মিলিত হইল না? এই কথা যখন সে ভাবিতে লাগিল, তাহার তৃষিত হৃদয়-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী অনুশোচনায় চিরদিনের রুদ্ধ অশ্রুরাশি নয়ন বাহিয়া অবিরল ধারায় ধরণীকে সিক্ত করিয়া তুলিল।

পল্লব

এই ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরেই সুশীলবাবু কি একটা কাযে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় রঘুপতিকে সকল সময়ে ইহাদের দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রঘুপতি যে এ ভারগ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহা তাহাকে দেখিলে বোধ হয় না।

এক দিন ভ্রমণ করিয়া আসিয়া সীতা বিশ্রাম করিতে করিতে তাহার দিদিকে কহিল, "আচ্ছা, দিদি, এই সীতা নামটা আমার কে রেখেছিল, বলতে পার?"

ভগিনীর অন্তরের ব্যথা নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া বেদনাবিদ্ধকণ্ঠে শান্তি কহিল, "নামের দোষ কি, সীতা, সবই অদৃষ্টের দোষ—দাদামশাই তোর ঐ নাম রেখেছিলেন। মাসীমা বারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বল্লেন, লোকের ভয় ভেঙ্গে যাবে বলেই আমি ওর এই নাম রাখছি, দেখ, ও কি রকম সুখী হয়।"

শুষ্ককণ্ঠে সীতা কহিল, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। সুখী যে কত, তার প্রমাণ ত পড়েই রয়েছে। এর চেয়ে আর বেশী কিছু কষ্ট মেয়েদের আছে কি না, তা ভগবান্ই বলতে পারেন। সব সময়ে অদৃষ্টের দোষ মেনে নেওয়া যায় না, দিদি।"

সীতার ম্লান গম্ভীর মুখখানির দিকে শান্তি তাহার সজল নয়নযুগল তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "তবে কি তুই নামেরই দোষটা ধরতে চাস, সীতা?"

বেদনাজড়িতকণ্ঠে সীতা বলিল, "কিছুই আমি বলতে চাই না, দিদি, তবু সময় সময় কি মনে হয় জান? মনে হয়, যে নামটা চিরদিন ধ'রে হিন্দুর মনে পরিত্যক্ত নারীর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, সেই নামটাই তিনি কেন জোর ক'রে রাখলেন?"

শান্তি ভগিনীর কথার যথার্থ সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে তাহাকে বলিল, "তিনি দেবতা ছিলেন, সীতা। তাঁর কথা—"শান্তির কথা শেষ হইল না। কক্ষান্তরে খোকার ক্রন্দন শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সীতা তখন ভাবিতেছিল, এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিয়া কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাকে যে স্থির নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে, তাহা কে জানে? চিরদিনই

কি তোমাদের বিধান জয়ী হইবে? বাল্যে পিতামাতা যাঁহার সহিত তাহার অদৃষ্টকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়া যে আশার বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ত সে প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। যে দেবতার পবিত্র স্পর্শে তাহার হৃদয়পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চির-কাঙ্ক্ষিত সেই পাদমূলে তাহার ভক্তিপূত অর্ঘ্য পৌছে না কেন? প্রাণের গভীর বেদনার নীরব নিবেদন তাঁহার কর্ণ স্পর্শ করে না কেন? হে আমার—জন্মজন্মান্তরের—প্রিয় দেবতা, একবার আমায় তোমার কাছে লইয়া যাও—আমি তোমার চরণতলে বসিয়া কেবল ক্ষণিকের জন্য বলিতে চাই যে, সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের বিচার করিয়া তবে আমার চির-নির্ব্বাসন দিও—আমি হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিব।

কোন্ পরশ্রীকাতর দুষ্টের কালকূটভরা রসনা হইতে কি বিষ নির্গত হইল যে, নির্ব্বিচারে আমাকে চির-পরিত্যক্তা করিয়া রাখিলে—অলীক রচনায় ভীত হইয়া সত্য, ধর্ম্ম সমস্ত ভুলিয়া গেলে?

যাহার সঙ্গে আজীবনের বন্ধন স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, সেই বাঞ্ছিত সর্ব্বস্বকে একান্ত দূরান্তরে রাখা যে কি নির্ম্মম, কি কঠিন, তাহা কেবল ভুক্তভোগী উপলব্ধি করিতে পারে।

অকরুণ নির্ম্মম কঠিন বর্ত্তমান যখন সর্ব্বদিক্ হইতে তাহাকে নাগপাশের মত বেষ্টন করিয়া ধরিত, সে তখন প্রাণপণে নিজের অদৃষ্টকেই ভর্ৎসনা করিত। উদয়ের আরম্ভ হইতে জীবনের অন্ত অবধি এই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, অলস জীবনটাকে বিশাল ধরণীর স্নেহমমতাহীন সংস্পর্শে লুণ্ঠিত করা ছাড়া আর তাহার কোন উপায়ই নাই। এ জীবনে অনাবিল স্নেহের স্নিগ্ধ ধারা দূরে থাক, বিন্দুমাত্র বারিদানেও কেহ কখনও তাহার আজন্ম-তাপিত দেহকে স্নিগ্ধ করিবে না, ইহাই বিধিলিপি।

দশ বৎসর বয়সের সময় সীতার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের এক মাস পরেই সীতার শ্বশুরের সঙ্গে তাহার পিতার একটা সামান্য কথায় মনোমালিন্য হইয়াছিল, সেই সামান্য বিবাদ ক্রমশঃ অসামান্য মনান্তরে পরিণত হইয়া সীতার শ্বশুর সীতার পিতৃবংশে একটা কলঙ্ক আরোপ করিয়া পুত্রবধূকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সীতার শ্বশুর পুত্র রমানাথকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন যে, এই নীচ বংশের মেয়েকে যদি তুমি কখনও গ্রহণ কর, তবে পিতার সহিত কখনও কোন দিন তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সপ্তদশবর্ষীয় মাতৃহীন রমানাথ শিশুকাল হইতে পিতার অশেষ যত্নে পালিত হইয়াছিল; সুতরাং পিতার সম্মুখে সে কোন দিনই কোন মত প্রকাশ করিত না। তাহা ছাড়া রমানাথের তখনও ভাল-মন্দ বিচার করিবার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় নাই, কৈশোরের প্রবল লজ্জা সে তখনও অতিক্রম করে নাই, সুতরাং ভয়ে বা লজ্জায়, যে কারণেই হউক, সে পিতৃ-আজ্ঞা নতমস্তকে মানিয়া লইয়া নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিল। সীতা তখন নিতান্ত বালিকা, সুতরাং ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতা তখনও তাহার জন্মায় নাই।

বৈবাহিকের এই অকারণ নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে সীতার পিতামাতা অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সীতা আশ্রয়হারা হইয়া মাসীর বাড়ী আসিল। তাহার মাসতুতো ভগিনী শান্তি নিজের গৃহে আনিয়া তাহাকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিল। নিরাশ্রয়া, পিতৃমাতৃহীনা, স্বামিবঞ্চিতা সীতা, শান্তির এবং তাহার স্বামীর অশেষ স্নেহযত্নে বৰ্দ্ধিতা হইতেছিল। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন নিজের চরম দুর্দ্দশার কথা প্রথমে জানিতে পারিল, তখন কি গভীর বেদনায় যে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

ভগবান্ যাহার উপর বিরূপ হন, সে আশাতীতভাবে সমস্ত পাইলেও তাহার আশা পূর্ণ হয় কি? সীতার অদৃষ্টেও তাহাই হইয়াছিল। গরীবের ঘরের মেয়ে রাজরাণী না হইলেও সে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার আশার অতীত বলিয়াই এখন মনে হয়। দুঃখী জনের নিকট দেবতার মন্দিরদ্বার চিরদিনই রুদ্ধ থাকে, তেমনই স্বামীর ভালবাসা কি সকল নারীর ভাগ্যে সকল সময় পরিমিতরূপে পাওয়া যায়? আবহমানকাল পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্য যাহার পিছনে পিছনে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, তাহার সুখ কোথায়?

সেই ঘনায়মান সন্ধ্যার গভীর অন্ধকারে বসিয়া সে তাহার বেদনাজড়িত রক্তারুণ হৃদয়পুষ্পে ও নয়নের পূত পবিত্র অশ্রুধারায় কোন্ দেবতার কৃপালাভের জন্য প্রতিদিন অর্চ্চনা করিত, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

কোরক

এক দিন সিঞ্চল পাহাড়ে মাউণ্ট এভারেষ্ট দেখিতে সুশীলবাবু সপরিবারে রওনা হইলেন। রঘুপতি তাঁহাদের প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে রহিল।

রঘুপতির মুখে মাউণ্ট এভারেষ্টের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া সীতা একান্ত জিদ ধরিল যে, দিদিকে লইয়া সে উহা দেখিতে যাইবে। সীতাকে সামান্য উল্লসিত করিবার জন্য শান্তি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিত, সুতরাং পথজনিত ক্লেশে তাহার অত্যান্ত কষ্ট হইবে বুঝিয়াও সে সীতার আবদারে 'না' বলিতে পারিল না। সীতার সন্তোষবিধানের জন্য খোকাকে বাড়ীতে রাখিয়া এক দিন রাত্রি চারিটার সময়ে সকলে সিঞ্চলের পথে যাত্রা করিল।

সীতা দ্রুতগতি উচ্চ চড়াই অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। সুশীলবাবু তাহাকে দ্রুতপদবিক্ষেপে যতই যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন, সে তাঁহার সেই স্নেহের নিষেধে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিজের অবাধ্যতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

ক্রমশঃ সে সিঞ্চলের উচ্চশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে রঘুপতি। কিন্তু জামাইবাবুর আর দিদির তখনও দেখা নাই দেখিয়া সীতা লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে রঘুপতি [illegible] করিল, "তাঁরা এখনও আসছেন না কেন?"

অবনত মুখে রঘুপতি বলিল, "আপনি যে দৌড়ে এসেছেন—ওঁরা কি তত শীগ্‌গির আসতে পারেন?"

পুনরায় সীতাকে চঞ্চলা হরিণীর মত পর্ব্বতের এধার ওধার অবধি ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া রঘুপতি অত্যান্ত ভীত হইয়া পড়িল; অথচ মুখে কিছু বলিতেও পারিতেছিল না। একা পরস্ত্রীর সহিত এই নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে আসিয়া সে নিজের মনের কাছে অত্যান্ত অপরাধী হইয়া পড়িতেছিল। সুশীলবাবুও আসিতেছেন না! সে এখন কি করিবে?

এমন সময় এমন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল যে, সে আর সীতার নিকটস্থ না হইয়া পারিল না। নিজের জুতার ফিতা বাঁধিয়া রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল, নিমেষের ক্রটিতে সীতা হয় ত গভীর খাদে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, সে এখন কি করিবে? এই ভাবিয়া সে তখনই দ্রুতপদধাবনে কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিল, কিঞ্চিৎ দূরে একখানি প্রকাণ্ড পাতরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সীতা একাগ্রচিত্তে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে এমন যায়গায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, সামান্য অসতর্কতায় যদি তাহার পদস্খলন হয়, তবে সীতা নাম জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

সে আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইয়া গিয়া সে সীতার একখানি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেই পাতরের ধাক্কা লাগিয়া সীতা একেবারে রঘুপতির অঙ্কে পড়িয়া গেল, তীব্র তাড়িতস্পর্শ মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষকে যেমন বিচলিত করিয়া তুলে, সীতার স্পর্শ সেইরূপ রঘুপতির অঙ্গে সহস্র বিদ্যুতের ধারা ছুটাইয়া দিল। নিদারুণ লজ্জায় সীতার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই রঘুপতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কি হ'ত বলুন দেখি? আপনি আজ কি সর্ব্বনাশই করেছিলেন।"

নিজের বিশাল নীলেন্দীবরতুল্য যুগ্ম নয়ন দুইটি রঘুপতির মুখে স্থাপিত করিয়া সীতা শান্ত অচঞ্চল স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "কেন—কি—আর—হ'ত, ভালই হ'ত—সব মিটে—যেত।"

ম্লান হাস্যের সহিত রঘুপতি কহিল, "এখন ত ও কথা বলবেনই। কিন্তু—এ এখুনি যে দুজনে পাষাণসমাধি লাভ কর্ত্তুম, দাদা দিদি এঁরা সব কি বলতেন—কি মনে করতেন?"

সীতা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "মনে আর কি করবেন হয় ত ভাবতেন, এদের দুজনে খুব ভাব ছিল, তাই—" তাহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, কথার শেষটুকু রঘুপতি আর শুনিতে পাইল না।

সীতার মুখে এই কথা শুনিয়া রঘুপতি একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিবাহিতা নারীর মুখে পরপুরুষকে এই সম্ভাষণ সে আর কোথাও কখনও শুনিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তবে—তবে কি সীতা—তাহারই মত বিপথে চলিয়াছে? সে-ও কি তাহার প্রতি মুগ্ধ? না না, এ তাহার ভুল ধারণা; বন্ধুও ত বন্ধুকে ভালবাসে,

ভগিনীও ত ভাইকে স্নেহ করে, সেই হিসাবেই যদি সীতা তাহাকে ভালবাসিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকে, ইহাতে দোষই বা সে ধরিতেছে কেন? সকাম লালসাতেই কি জগৎ ভরিয়া আছে? পবিত্র ভ্রাতা-ভগিনীর অকলুষ ভালবাসা কি বিশ্বজগতে দুষ্প্রাপ্য? বিচার না করিয়া মন্দ কথাটাই লোক ধরিয়া বসে কেন? সে পরস্ত্রী, সে কেন তাহাকে ভালবাসিতে যাইবে? হয় ত ঠাট্টাচ্ছলে সে তাহাকে ঐ কথা বলিয়াছে। তথাপি অপঠিত তাম্র-শাসনের মত সীতার কথাটা তাহার মনের ভিতর একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

ফিরিবার পথে রঘুপতিকে নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, "রঘুপতি যে আজ এত চুপ-চাপ? ব্যাপার কি?" রঘুপতি কহিল, "এমনিই।" শান্তি তখন বলিল, "তোমার শালীটি কি আজ আর রঘুপতি-বাবুর কথা বলবার শক্তি রেখেছে, ওঁকে যে রকম দৌড় করিয়েছে, তেমন মানুষে পারে না। সীতা আজকাল ভারী দুষ্ট হয়েছে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ড্রয়িংরুমে সকলকেই উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, "সীতা কোথায় গেল? তাকে দেখছি না যে?"

শান্তি কহিল, "সে সুটকেস গোছাতে গেছে, কাল কার্সিয়ং যাবে কি না।"

"ও!—ঠিক কথা, আমাকেও ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, সে কথা মনেই ছিল না। তা কবে আবার আসছে?"

শান্তি কহিল, "তা ত বলতে পারি না।"

নিজের অসম্ভব আগ্রহটাকে কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া রঘুপতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কার্শিয়ং যাচ্ছেন কেন?"

বিদ্রূপচ্ছলে সুশীলবাবু কহিলেন, "ও সব কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম, জান ভায়া, মালিকবিহীন জিনিষ যখন যা ইচ্ছে, তাই করেন। ওঁর আর দার্জ্জিলিঙ্গ ভাল লাগছে না। আর কি জান, ভাবনা ত নেই, দিদির যখন এমন দাসানুদাস রয়েছে যে, হাকিম নড়ে, তবু ওঁদের হুকুম নড়লেই মহা অনর্থ। জানই ত গৃহিণীর বোন্—সুতরাং গিন্নীর চেয়ে—"

শান্তি কহিল, "সকল সময়ই কি তোমার রঙ্গ।" এমন সময় এক মুখ হাসি লইয়া আসিয়া সীতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমার পিছনে আবার লাগলেন কেন, রায় মশাই, এ অভ্যেসগুলো এবার ত্যাগ করুন না।"

"কি জানিস, ভাই, তোর পিছনে না লাগলে আমার দিনটাই বৃথা মনে হয়। এখন তুই যদি একটা গান করিস, তা হ'লে আর তোর পিছনে লাগব না। আবার কবে আসছিস, বল্ দেখি?"

সীতা ঈষৎ হাসিয়া ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিল,—"তা কেমন ক'রে বলবো বলুন, তারা ছেড়ে না দিলে কি ক'রে আসবো। আপনিই ত যত নষ্টের গোড়া।"

"তা ত বলবিই এখন—যাক, তুই এখন গান শোনা।"

সীতা এস্রাজ লইয়া গাহিতে বসিল—

"দুজনে দেখা হলো মধু যামিনীরে,
কোন কথা কহিল না চলিয়া গেল ধীরে—
নিকুঞ্জে দখিণা-বায় করিছে হায় হায়,
লতা-পাতা হেলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।"

এমন সময় রঘুপতির চাকর আসিয়া একখানি টেলি-গ্রাম দিল, সে উৎকণ্ঠিতভাবে খুলিয়া পড়িল। সীতা তখন গান বন্ধ করিল। টেলিগ্রামে লিখিত ছিল,—"আমি বৌমাকে লইয়া অদ্য যাত্রা করিতেছি, তুমি ষ্টেশনে আসিবে।—পিতা।"

হঠাৎ তাহার জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বাসন্তী পূর্ণিমা মেঘের আড়ালে ঢাকিয়া গেল, কে যেন দারুণ আঘাতে তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় রঘুপতির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়গুলা যেন সাড়হীন জড়পদার্থে পরিণত হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে ভূতগ্রস্ত রোগীর মত নীরবে বসিয়া রহিল।

তাহাকে তদবস্থায় বহুক্ষণ থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত? তুমি অমন হয়ে গেলে কেন?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রঘুপতি কহিল, "না, কিছু না।" সুশীলবাবু কহিলেন, "তাই ভাল।" এই বলিয়া তিনি টেলিগ্রামখানি পড়িয়াই আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পুনরায় কহিলেন, "এ কি! আপনি বিবাহিত?—তবে সে দিন—" তাঁহার মুখের কথা না ফুরাইতেই রঘুপতি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে

কহিল, "বিয়ে করিনি, এ কথা ত আপনাকে সে দিন বলিনি, তবে সে অনেক কথা—"সে আর কিছু বলিল না দেখিয়া সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করা অনুচিত বোধে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রঘুপতির বাবা আর স্ত্রী আসছেন, এখানে খাওয়ার যোগাড় ক'রো ; নূতন আসছেন। আমিও সীতাকে পৌঁছে দিয়ে ওঁদের গাড়ীতেই ফিরে আসবো। তবে চেনাচিনি এখানে এসে হবে। তা' সীতা, তুই কালকের দিনটা থেকে যা না ?"

অবনত বদনে শান্তি কহিল, "সে কি ক'রে হয়, তাঁরা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন, চিঠি দেওয়া হয়েছে।"

"তবে আর কি হবে, তুই গানটা শেষ কর্। ঐ গানটা বড় সুন্দর।"

সীতা গাহিল—

"দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝ'রে,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল ম'রে,
আর ত হ'ল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে ॥"

সীতা একান্ত মন-প্রাণ দিয়া যখন এই গানটি গাহিয়া শেষ করিল, তখন গৃহস্থিত শ্রোতৃগণের কেহই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিল না।

কুসুম

রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া রঘুপতি কিছুই আহার করিবে না বলিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী তাহাকে একবারেই ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অন্ধকারের আশ্রয়ে বিছানায় শুইয়া আজ কেবলই সীতার উজ্জ্বল মুখখানি তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার সুকোমল দেহের মধুর স্পর্শ সে যেন এখন নিজের বক্ষে অনুভব করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সে-ও কি তাহাকে ভালবাসে ? আমারই মত সে-ও কি বিপুল বেদনায় জর্জ্জরিতা হইয়া অপ্রাপ্তির দারুণ যন্ত্রণায় পলে পলে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকে ? -হয় ত হইতে পারে, সে ভাবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে ? সিঞ্চল পাহাড়ের উপরে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে সেই সুগভীর কৃতজ্ঞতা-ভরা বিশাল ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন দুইটি যখন নিমেষের জন্য অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, তখন সীতার নয়ন দুইটি তারহীন তাড়িতবার্ত্তায় কি ভাষা প্রকাশ করিয়াছিল—শুধু সে কি প্রাণদাতার প্রতি প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা ? না, তাই কি ? সে যেন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল, এই কি জগতের সনাতন রীতি ? আরাধিতা প্রার্থিতা প্রিয়জনকে পাইবার জন্য বাসনা যখন শতধারায় হৃদয়ের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষার দাবাগ্নিতে প্রাণ-মন যখন জ্বলিতে পুড়িতে থাকে, কাম্য কি তখন এমনই করিয়া দূরে সরিয়া যায় ? অশ্রুর উৎস কোথায় লুক্কায়িত ছিল, আজ আর সে বাধা মানিল না। অবিরল অশ্রুধারায় তাহার উপধান সিক্ত হইয়া গেল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল ; সে যেন অনুভবের শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

কবে কোন্ দিনে কোন্ শুভ কি অশুভক্ষণে তাহার হৃদয়খানি যে সে কখন্ সীতার হৃদয়ের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা ত সে বুঝিতে পারে নাই। নিমেষের দৃষ্টিপাতে তাহার মানসী মূর্ত্তি তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কোন্ সুদক্ষ শিল্পী কখন্ অঙ্কন করিয়াছিল যে, সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতেই তাহার হৃদয়কুঞ্জের অফুটন্ত ফুলগুলি নিমেষমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া ব্যর্থ জীবনের নিবেদিত অর্ঘ মুহূর্ত্তেই সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতাকে সে ভুলিতে পারিবে না, চিরদিন ধরিয়া অন্তরের অন্তস্তলে অন্ধকারের গভীর গহ্বরে—এ স্মৃতি সে—গোপন করিয়া রাখিবে—এ আরাধনায়—যদি কিছু দোষ থাকে, সে তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবে।

ব্যর্থ হৃদয়ের গভীর ভালবাসা দান করিবার জন্য সে যখন একান্তই উন্মত্ত হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে, তাহার তাসের ঘর একই ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে ! চিরদিনের মত এক অপরিসীম অজেয় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাহাকে আবহমানকাল তৃষ্ণার্ত্তই করিয়া রাখিবে। হৃদয়ের এই দুর্জ্জয় উন্মত্ত আবেগকে সে যতই বাধা প্রদান করিতেছিল, ততই তাহার উপলরুদ্ধ প্রবল স্রোতোবেগ তাহার সমস্ত বাধাকে ক্রমশঃই পরাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। তরুণ জীবনের আকুল বাসনা ত সে মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, যাহাকে দুর্লভ জানিয়াও মৌন সাধকের মত সে নীরব পূজায় দিন-রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিল, বাসনার উন্মত্ত আবেগের সহিত সে অবিরত যুদ্ধ করিয়া নিজেকে পরাস্ত বোধ করিতেছিল,

আজ সেই সুপ্ত—নিদ্রিত চিত্তবৃত্তিগুলাকে আবার এমন করিয়া জাগরিত করিয়া দিল সে কে?

দীর্ঘ দিবসের পরে একান্ত প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ, এ কি—অসময়ে উপস্থিত হইল? নিয়তির এ কি নির্ম্মম পরিহাস —অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর খেলা?

সারারাত্রি চিন্তার অসহ্য দংশন সহ্য করিয়াও প্রতীকারের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—কোন উপায়ই নাই—সে অন্যাসক্ত—সীতার চিন্তা সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। আজ দুই দিন হইল সে মাধুরী লইয়া—কেহই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু প্রাণ-মন যেন সর্ব্বদাই তাহার দীপ্তিতে ভরিয়া আছে। তাহার স্ত্রী আসিলে সে সকল কথা বলিয়া এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে।

পরদিন বৈকালে দার্জ্জিলিং মেলে রঘুপতির পিতা ও স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিল। সুশীলবাবু ষ্টেশনেই ছিলেন। তিনি সেখান হইতেই রঘুপতির পিতাকে ও স্ত্রীকে লইয়া সাদরে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শান্তি রঘুপতিকে বলিল, "আপনি আজ এ বাড়ীতে শোবেন।" তাহার পর সুশীলবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাস্যোজ্জ্বলবদনে কহিল, "শুনছ গা, রঘুবাবুকে ঘরে দিয়ে এস, দেখো যেন, না পালান।"

বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে সুশীলবাবু কহিলেন, "কেন হে, লজ্জা কচ্ছে না কি? বটে বটে—তা হয়—সময় সময় হয়, অনেক দিন হলো কি না। তা যাই হোক, আজ এই আনন্দের দিনে মুখ এত ভার কেন হে ভায়া? ওঃ, বুঝেছি, আজকে ঐ রকমই লোককে দেখাতে হয়।"

ম্লানহাস্যের সহিত রঘুপতি কহিল, "আপনার সঙ্গে ত কথায় কেউ পারবে না।"

"এক জন আমার সঙ্গে পারে, কিন্তু সে আজ গরহাজির। এমন দিনে তার অভাবটা বড্ড বেশী মনে লাগছে।"

শান্তি কহিল, "এখন তর্ক রাখ। তোমার ঐ সব বকামীর জন্যেই আজ রঘুবাবুর বিছানা এখানে ক'রে দিয়েছি। বাবা রাত্রি জেগে এসেছেন, তোমার ত বড় ছোট, সম্বন্ধাসম্বন্ধ জ্ঞান নেই, ঠাট্টা কল্লেই হলো।"

সুশীলবাবু আর কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্ব্বল ও অবসন্ন মন লইয়া রঘুপতি ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৃহটি গভীর অন্ধকার, কাচের জানালায় কাল বনাতের পর্দ্দা দিয়া ঘরটির অন্ধকার আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধকারে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের আশঙ্কা প্রবল থাকিলেও সে ইচ্ছা করিয়া আলো জ্বালিল না। যাহাকে এত দিন সে ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পায় নাই, আজ এই চিরবিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে বিরহ ও মিলনের পথে ইহাকে না দেখাই ভাল।

এই রিক্তা সর্ব্বহারা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রাণ যে কাঁদিয়া না উঠিল, এমন নহে। চিরদিনের পরিত্যক্তা এই পত্নী যে কোন্ অশুভক্ষণে ধরণীতে প্রথম মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছিল, তাহা যদি সে একবার বিচার করিয়া দেখিতে পারিত, বহুদিনের আরাধনায় সাধনার সিদ্ধিটুকু লইয়া সে আজ কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ভরাইয়া স্বামি-সকাশে তাহার পূজার অর্ঘ্য লইয়া নিবেদন করিতে আসিয়াছে, সেই স্থানে সেই জনের নিকট হইতে সেই অর্ঘ্য যে পুনরায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে, তাহা এ জানে না। কে এ অঘটনের কর্ত্তা? চিরদিনের তরে চির-অদৃশ্য লোকে থাকিয়া উপায়হীন নরনারীকে কি তিনি চিরদিনই এমনই নির্য্যাতন করিবেন? এমন সুন্দর ধরণীতে এত অকরুণ বেদনা—জ্বালা কোন্ নাগিনীর মুখ হইতে কোন্ বিষাধার জগতের ধূলিকণাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে? চিরদিনই কি দুঃখী জন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে —এর নির্ব্বাণ আছে কি না, কে জানে?

তাহার পর সে ধীরে ধীরে খাটের পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী বসিয়া আছে। সে তখন সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ, লজ্জা ত্যাগ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "একটা কথা তোমায় বলি, তুমি স্থির হয়ে শোন। এ ঘরে তোমার স্থান পাবার আশাই ছিল না। জানি না, ভগবান্ কি মানুষের দয়ায় তুমি যখন এসেছ, তখন আশীর্ব্বাদ করছি, এ গৃহে তোমার স্থান চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'ক। কিন্তু—কিন্তু—আমি তোমার—অযোগ্য—আ—মা—য়—বি—দায়—দাও।"

তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে কিশোরী কহিল, "আমার

অপরাধ? আপনি কি আমায় আবার—ত্যা—গ—করছেন?"

রঘুপতি চমকিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর কি স্বাভাবিক? এত কর্কশ কণ্ঠ সে কোন নারীতে শুনে নাই।

হতাশভরা কণ্ঠে রঘুপতি কহিল, তা জানতে চেয়ো না, শুনলে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। আমি চ'লে যাবার পর তুমি সমস্তই হয় ত বুঝতে পারবে, তখ—ন—আমার—অবস্থা—বুঝে—পা—রো—ত আমায় ক্ষমা ক'রো—।"

রুদ্ধকণ্ঠে বিকৃতস্বরে কিশোরী কহিল, "তবে একটু অপেক্ষা করুন। জীবনে আমার—যে সৌভাগ্য হয় নি, আজ—আজ—যদি—সে—দিন—পেয়েছি—তবে—একটু—পায়ের—" বাকীটুকু সে আর বলিতে পারিল না, ইলেক্ট্রিকের তীব্র আলোকে ঘর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুক্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে যাইতেই রঘুপতি বিস্মিতভাবে কহিল, "সীতা—তু—মি—"

এক মুখ হাসি লইয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সীতা কহিল,—"হাঁ, আমি তোমার নির্ব্বাসিতা সীতা।" আর বলিতে হইল না, অন্তরাল হইতে সুশীলবাবু এক রাশ ফুল লইয়া তাহাদের অঙ্গে ও বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "ভায়া, এ শুভ মিলনের ঘটকালিটা আমারই প্রাপ্য। নাম জাল কল্লেও, আমার চোখদুটাকে তুমি ফাঁকি দিতে পার নাই। কাল সব বলবো এখন।" এই বলিয়া তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বহু দিনের কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমাকে তখন রঘুপতি ব্যাকুল বাহুবেষ্টনে নিজের বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

মনুষ্যগর্ভে ব্যাঘ্রশাবক

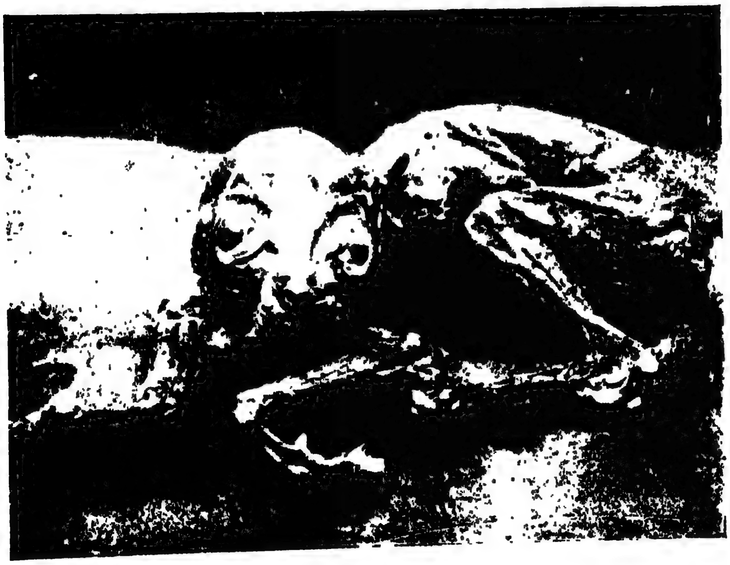

নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত সাহাপুর পোষ্ট আপিসের অধিকারভুক্ত করটসিল গ্রামে কোনও ভদ্রপরিবারে মৃতাবস্থায় একটি অপূর্ব্ব জীব প্রসূত হইয়াছিল। ইহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, দন্ত, নখ প্রভৃতি সমস্ত অবয়বই ব্যাঘ্রের ন্যায়। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চ। স্থানীয় মোস্‌লেম ফার্ম্মেসীতে শবদেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত আছে। প্রায় দেড় মাস পরে আলোক-চিত্র গৃহীত হওয়ায়, শবের মুখমণ্ডল একটু বিকৃত দেখাইতেছে।

শিক্ষার দান

১

"উমা, মা!"

"আমায় ডাক্‌ছেন, বাবা?"

অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী ধীর মন্থরপদে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর-জোড়া ফরাস পাতা শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া রমানাথবাবু আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন।

স্মিতাননা কন্যাকে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার খবর শুনেছ, মা?"

নত নেত্রে উমা গ্রীবা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দাদার পত্রে শুনেছি।"

রমানাথবাবু কন্যাকে কাছে ডাকিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার সাফল্যে আমি আনন্দিত। আই, এ, পরীক্ষায় তোমার ফল যে ভাল হবে, সে বিশ্বাস আমার ছিল; তার জন্য নয়। তুমি বোধ হয় এখনও জান না যে, বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্যপদক এবার তুমিই পাবে। বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক যিনি, তিনি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি লিখেছেন, তোমার মত বেশী নম্বর আর কেউ পায় নি।"

উমা পিতার নগ্ন পৃষ্ঠদেশে ঘামাচির সন্ধানে মনোনিবেশ করিল।

ছুটীর দিনে, দিবা দ্বিপ্রহরে পিতাপুত্রীর আলাপে বিঘ্ন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই নিঃসঙ্কোচে কন্যা পিতার বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়াছিল। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে রমানাথবাবু সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। জিলা-কোর্টে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। এ জন্য অন্য দিন অবকাশ তাঁহার অল্পই থাকিত। তাই ছুটীর দিন তিনি বাহিরের কোন কায করিতেন না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটাইতেন। উমা দ্বিপ্রহরে পিতার কাছে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেশ-বিদেশের নানা গল্প শুনিত, তাঁহার ভাগবতপাঠের সেই প্রধান শ্রোতা।

কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া রমানাথবাবু বলিলেন, বাঙ্গালা পরীক্ষায় তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মৃতি-পূজার পুরস্কার লাভ করবার যোগ্য হয়েছ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর বেশী কিছু হ'তে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল,—"বাবা, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় ভালবাসেন বুঝি?"

"হ্যাঁ মা, আমি তাঁর বড় ভক্ত। আমাদের হিন্দুর আদর্শ তিনি যেমন ক'রে সাহিত্যের নানা দিক্ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, কেউ তা পারে নি। হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতটাকে তিনি অনেক পুণ্যকথা নূতন ক'রে শুনিয়ে গেছেন। আমার কাছে তাঁর চেয়ে বড় লেখক আর কেউ নেই।"

উমা পিতার মনের গতির সহিত পরিচিত ছিল। আধুনিক জগতের বিভিন্ন মতবাদের সহিত রমানাথবাবু যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখিতেন এবং প্রাচীন যুগের মতবাদেরও যে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, ভক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই ভালরূপ অবগত ছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল, তাহাতে কখনও তিনি বাধা দিতেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, সকলেরই উপর যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভূত হইত। কাহাকেও তিনি জোর করিয়া কোনও কিছু করিতে বলিতেন না। অথচ প্রত্যেকেই যেন তাঁহার গোপন অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া ঠিক তাঁহারই মনোমত কার্য্য সম্পাদন করিত। স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেহ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। তাঁহারই চিন্তার ধারা অলক্ষ্যভাবে প্রত্যেকেরই জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অথচ কেহ তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিত না।

কন্যার মস্তকে সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে রমানাথবাবু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বাঙ্গালার মেয়ে যেন হ'তে পার।"

এমন সময় গৃহিণী পানের বাটা হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে গোটাকয়েক পান

দিয়া ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া বলিলেন, "দাদার চিঠির জবাব দিয়েছ ?"

রমানাথবাবু আলবোলার নলটা পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তাকে লিখে দিয়েছি, তুমি ও উমা মা আসছে রবিবার কল্‌কাতায় রওনা হবে।"

উমা বলিল, "আমি ও মা দুজনেই চ'লে গেলে আপনার কষ্ট হবে যে, বাবা !"

প্রসন্ন হাস্যে প্রৌঢ় রমানাথ বলিলেন, "কোন কষ্ট হবে না, মা ! বড় বৌ-মা, মেজ বৌ-মা দুজনকেই তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ক'রে তৈরী ক'রে তুলেছেন, তাতে তোমার বুড়ো বাবার কষ্ট হবার যো কি।"

দ্বারের কাছে চুড়ীর রিণিরিণি শুনা গেল। পরক্ষণেই মন্থর গতিতে পুত্রবধূযুগল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। ছুটীর দিন আপনা হইতেই সকলে আহারাদির পর রমানাথবাবুর কাছে আসিয়া বসিত তিনি কোনও দিন এইরূপ আদেশ কাহাকেও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের গতি বুঝিয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার অবসরসময়ে সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।

"আমার দাদাভাই কই, মা লক্ষ্মি ?"

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "সে আসছে।"

২

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধরণীনাথ মাতাকে বন্ধুর দ্বারা জানাইয়া দিল, বিবাহে এখন তাহার বেশ মত আছে, তবে মেয়ে সে স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিবে। পল্লীগ্রাম হইতে একটা অশিক্ষিতা বা অদ্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে আনিয়া তাহার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। সে চাহে—হাল ফ্যাসানে সুশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি ভব্যা জীবনসঙ্গিনী। তথাকথিত লজ্জাশীলা বঙ্গবধূ লইয়া সে জীবনযাত্রার দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে রাজী নহে।

বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। নাবালক পুত্রকে লইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাকে ধৈর্য্য ও বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইয়াছিল। অসহায় দেখিয়া প্রবল পক্ষ নানারূপে তাঁহাকে বিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু অসীম সহিষ্ণুতা এবং সবিশেষ বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে তিনি সকলকেই পরাজিত করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ও অর্থ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত, শ্বশুরালয়ের পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এ জন্য তাঁহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল, তবে পুত্রের কল্যাণের জন্য সে দুঃখও তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। এখন পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইয়াছে, সে যদি ইচ্ছামত পত্নী মনোনয়ন করে, তাহাতে দুঃখের কথা কি আছে ? মনের কোনও প্রান্তে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ করিলেও তিনি প্রসন্নমনে পুত্রকে স্বয়ং মেয়ে দেখিবার অনুমতি দিলেন।

ধরণী সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ভবানীবাবুর একটি ভাগিনেয়ী এবার আই, এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। কন্যার পিতাও মফঃস্বল কোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব। ভবানীবাবুর এক পুত্রের সহিত সে বি, এস, সি ক্লাসে পড়িয়াছিল। সে জানিত, আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও অর্থ-সম্পদে ভবানীবাবু কলিকাতার সমাজে গণনীয় ব্যক্তি। সামাজিক হিসাবে তাঁহার ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ সে যাহা চাহে, ভবানীবাবুর ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

ধরণীনাথের মত সুপাত্র—রূপ, গুণ, কুলশীল এবং অর্থ-সম্পদ সকল বিষয়েই প্রার্থনীয় এই যুবকটিকে ভবানীবাবু সমাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা দেখাইলেন। বন্ধুসহ ধরণীনাথ উমাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

সঙ্কোচবিরহিতা অথচ আত্মস্থা এই বিদুষী সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া ধরণীর চিত্ত পলকিত হইল। কলিকাতার আবহাওয়া অনুসারে পাশ্চাত্য রুচিপ্রিয় ভবানীবাবু তাহাকে এমন ভাবে সাজাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ধরণীনাথ এই পল্লীসহরবাসিনী তরুণীর মধ্যে বাহিরের দিক্ দিয়া অমনোনীত করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বরং, গোপন করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ব্যবহারে এমন ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কন্যাপক্ষ তাহাতে বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

ধরণী শুনিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসর বয়সে উমার কণ্ঠসঙ্গীত ‘রেকর্ডে’ উঠিয়াছিল ; সেই রেকর্ডের গান, বিবাহ সম্বন্ধ হইবার বহুপূর্ব্বে সে কতবার শুনিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বালিকার তরলকণ্ঠ তরুণীর আবেগময় ব্যঞ্জনায় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিলেও, সে গান শুনিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিল না। ভবানীবাবুর সম্মুখে ততখানি প্রগল্ভতা প্রকাশ করা সে সমীচীন মনে করে নাই। উমার সূচি-শিল্প এবং রেখাচিত্র কয়েকখানি কন্যাপক্ষ দেখাইলেন। ধরণী বুঝিল, তাহার ভবিষ্যজীবন সমুজ্জ্বল।

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল ; কিন্তু বিবাহ কলিকাতায় হইবে না, রমানাথবাবু দেশে নিজের বাড়ীতে বসিয়াই সম্প্রদান করিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প অচল, অটল। প্রথমতঃ কিছু আপত্তি করিলেও পরিশেষে ধরণীনাথকে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল

৩

বিবাহ করিয়া ধরণীনাথ আশাতীত সুখী হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মামাশ্বশুর ভবানীবাবুর চাল-চলন বাহির হইতে দেখিয়া তাহার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে সে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল, বার কয়েক তথায় যাইবার পর সে ধারণা তাহাকে বহুলাংশে বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

রমানাথবাবুর সহিত জিলার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মিলা-মিশা - ঘনিষ্ঠতা যেমন ভাবে ছিল, দেশের ধনী নির্ধন— সকল শ্রেণীর সকল লোকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার তেমনই সুদৃঢ় বন্ধন ছিল। তিনি য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে উপযুক্ত প্রথা বা প্রণালীতে অভিনন্দিত বা অভ্যর্থিত করিলেও,উহা তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরের প্রাচীরসীমা পার হইতে পারিত না। প্রাচ্যের যাহা কিছু সবই মন্দ এবং প্রতীচ্যের সবই ভাল, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বরং প্রাচ্যের বহু বিষয়েই তাঁহার শ্রদ্ধা ও একান্ত অনুরাগ ছিল।

ধরণীনাথ শ্বশুরালয়ের প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহারে প্রাচ্যভাবের প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্য মনোবৃত্তির অনুরাগী ছিল। কিন্তু সুপণ্ডিত শ্বশুর এবং শ্যালকদিগের মধ্যে উদারতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহারে, নিষ্ঠা ও সংযম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহাতে সে অতি-মাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী যুবকদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ব্বলতা সে আদৌ প্রত্যাশা করে নাই।

উমাও যদি ঐরূপ আচারপরায়ণা এবং প্রাচ্যানুরাগিণী হয়, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ! সে স্ত্রীকে লইয়া যে ভাবে জীবনপথে চলিবে বলিয়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা করিতে না পারিলে তাহার দাম্পত্য-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং পত্নীকে পিত্রালয়ের প্রভাব হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়া মনোমতভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহার বিবাহিত বন্ধুগণ খোলা মোটরে স্ত্রীকে লইয়া কেমন আনন্দে বায়ুসেবন করিয়া বেড়ায়, বক্সে বসিয়া থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে! প্রমোদ-উদ্যানে অসঙ্কোচে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ শোভা, নিশীথ রজনীর মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে! বন্ধু-বান্ধবের সহিত স্ত্রী যদি আলাপ-পরিচয় না করিল, আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে প্রীতিমুগ্ধ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সুখ কোথায়? সে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়নের অবকাশে বহু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গল্প—উপন্যাস,নাটক পড়িয়াছিল প্রতীচ্য ভাবধারা তাহার তরুণ মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে বিদেশীয় যাহা কিছু, সবই অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিত ; কলিকাতার বর্ত্তমান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া প্রতীচ্য প্রথানুরাগী এবং য়ুরোপীয় ভাবানুকারী বন্ধুদিগের সাহচর্য্যে তাহার ভিতরের মানুষটি এমন অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুবিধা পাইলেই সে আপনাকে সেই প্রণালীতেই পরিচালিত করিত। তবে নিষ্ঠাপরায়ণা স্নেহময়ী জননীর মনে আঘাত দিবার আশঙ্কায় সে আপনার মনের গতিকে সংযত করিয়া রাখিত।

বিবাহের পর তাহার মনের সাধগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হ্যারিসন রোডে সে ডিস্পেন্সারী খুলিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল সত্য ; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের দিকে তেমন মন দিতে পারিল না। প্রয়োজনও ছিল না। স্বচ্ছন্দজীবনযাত্রার পাথেয়

তাহার পর্য্যাপ্তই ছিল। কাযেই সে বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্য্যটুকু উপভোগের জন্য প্রায় সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিত।

অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক। হিন্দুনারী স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার আজন্মের সংস্কার অনায়াসে না হউক, স্বল্পায়াসেই ত্যাগ করিতে পারে। সে দেখিল, তাহার মনের অভিপ্রায় উমার কাছে প্রকাশ করিবার পর হইতেই স্বল্পভাষিণী তরুণী অকুণ্ঠিতভাবে স্বামীর মনোমত কার্য্যগুলি তাহারই অভিপ্রায়ানুরূপে পালন করিতে লাগিল—কোনও প্রতিবাদ করিল না। রিজার্ভ করা বক্সে বসিয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপ দর্শনে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। মোটরে বসিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বায়ুসেবনেও অপর পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইল না। তবে সকল ক্ষেত্রেই উমা তাহার শ্বশ্রূমাতাকে সঙ্গে লইত। ধরণী মনে মনে ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইত বটে; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না।

কিন্তু ধরণী একটা সাধ মিটাইবার উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে স্ত্রীকে বাহির করিয়া প্রতীচ্য নরনারীর ন্যায় বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ সে এখনও পায় নাই—মধুর সন্ধ্যা বা জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে খোলা ময়দানে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইবার আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা সে এখনও করিতে পারে নাই। তাহার মনে সন্দেহ ছিল, এ বিষয়ে তাহার জননীর পক্ষ হইতে প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে।

মনের এই সাধটা মিটিতেছে না বলিয়া সে প্রকৃতই মনে মনে অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে সে বন্ধুবান্ধবদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পাকে-প্রকারে মাতা ও পত্নীর কাছে মনের কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল।

তাহার মাতা ও পত্নী কথাটি বুঝিলেন কি না, তাহা সে জানিতে পারিল না। তবে কিছু দিন পরে তাহার জননী দেশে যাইতে চাহিলেন। সেখানকার একটা সম্পত্তির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েব দেশে যাইবার জন্য ধরণী অথবা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিল।

ধরণী নায়েবের শেষ পত্র পড়িয়া মাকে বলিল, "আমার হাতে কয়েকটা রোগী আছে, আমার যাওয়া ত হ'তে পারে না।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু না গেলে ত অনেকগুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাবে!"

পুত্র বিব্রতভাবে মাতার দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তা ত বুঝলুম; কিন্তু নায়েব মশাই যা লিখেছেন, তাতে দেশে অনেক দিন গিয়ে না থাকলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আমি বড় জোর ২।১ দিনের জন্য এর পর যেতে পারি। কিন্তু বিষয়-আশয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি গিয়েই বা কি ক'রব?"

বিধবা বলিলেন, "তা ব'লে ত এত টাকার জিনিষ নষ্ট করা যায় না। তা হ'লে আমাকেই যেতে হয়।"

জননী পুত্রের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ধরণীর নয়নযুগল সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে ত খুবই ভাল হয়, মা। তুমি কবে যাবে, কাল?"

কিন্তু মাতাকে এক দিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে এই ধরণীনাথ পূর্ব্বে কখনও রাজী হয় নাই।

প্রৌঢ়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই অদূরে দণ্ডায়মানা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টি পড়িল। শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল। ধরণীনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে সে তখন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

মাতা বলিলেন, "অনেক দিন দেশে যাইনি। এবার গেলে তাড়াতাড়ি আসতে পারব না। পূজো পর্য্যন্ত থাকতে হবে। ২০ বছর পরে সেখানে যাচ্ছি।"

ধরণীনাথ প্রফুল্লভাবে বলিল, "তা বেশ ত! কিন্তু পূজোর সময় আমি সেখানে যেতে পারব না, তা ব'লে রাখছি। নৌকো ক'রে না কি সেখানে এ বাড়ী ও বাড়ী যেতে হয়! সে আমার দ্বারা হবে না, মা। আমি দার্জ্জিলিঙ্গে যাব, ঠিক ক'রে রেখেছি।"

মাঘ হইতে আশ্বিন—৯ মাস মা দেশে থাকিবেন! ভাবী স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা মনে করিয়া ধরণীনাথ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই দীর্ঘ কয় মাস ধরিয়া সে

উমাকে লইয়া কি ভাবে সময় কাটাইবে, মনে মনে তাহার একটা খসড়া করিয়া লইল।

মাতা বলিলেন, "তবে কাল ভাল দিন আছে, আমার যাবার যোগাড় ক'রে দে। বৌমা একা থাকবেন, তুই তাঁকে ভাল ক'রে দেখিস্‌ "

"সে জন্য তুমি কিছু ভেব না, মা। কিন্তু তোমার শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখ। জর টর বাধিয়ে বসো না যেন।"

মাতার ওষ্ঠপ্রান্তে একটি মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল। তাহা হর্ষ বা বিষাদের দ্যোতক, কে বলিবে!

কক্ষত্যাগের সময় আবার প্রৌঢ়া ও তরুণীর দৃষ্টি-বিনিময় হইল। অবগুণ্ঠনের প্রান্ত মুখের উপর টানিয়া দিয়া উমাও শ্বশ্রূর পশ্চাতে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ধরণীনাথ তখন গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতেছিল।

৪

জমাট অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া ডাক-গাড়ী হু হু শব্দে ছুটিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পাখা খুলিয়া দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। পূজার বন্ধে অসংখ্য যাত্রী স্থানান্তরে ছুটীর অবকাশ কাটাইয়া আসিবে বলিয়া গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়। তখনও পূজার ৫।৭ দিন বিলম্ব ছিল।

ধরণীনাথ পত্নীকে লইয়া নৈনিতাল যাইতেছিল। সে শুনিয়াছিল, পূজার সময় সেখানে পরম আরাম লাভ করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিল। কাযেই তাহার গাড়ীতে যাত্রি-সমাগমের হাঙ্গামা ছিল না। মাতা দেশে যাইবার পর হইতেই সে আপনার সুপ্ত, অপরিতৃপ্ত সাধগুলিকে পূর্ণমাত্রায় মিটাইয়া লইতেছিল। উমা স্বামীর সকল কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত। কোন কোন বিষয়ে ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপন করিলে ধরণী যখন পরিপূর্ণ আবেগের সহিত বলিত যে, এমনই ভাবে না চলিলে তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে না, হৃদয়ে বড় বেদনা পাইবে, তখন সে অবিচারিতভাবে স্বামীর নির্দ্দেশ অনুসারে চলিত। আপনার স্বাতন্ত্র্যকে কোন ব্যাপারেই প্রকট হইতে দিত না।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে দরজা খোলার শব্দে ধরণীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সবিস্ময়ে সে দেখিল, গাড়ীর দরজায় 'রিজার্ভ' লেখা থাকা সত্ত্বেও দুই জন গোরা তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। সে এক লম্ফে উঠিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল।

তাহাদের অনধিকারপ্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবামাত্র গোরা দুই জন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে মারিতে উঠিল। ধরণীর রক্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে একা, এই দুই জন পানমত্ত—কথা কহিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে সুরার উৎকট গন্ধ নির্গত হইতেছিল—অসুরের সহিত সে কি করিতে পারে?

গোলমাল শুনিয়া উমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সুন্দরী তরুণীকে দেখিতে পাইয়া গোরা দুই জনের মধ্যে কি কথা হইল। সবটা শুনিতে না পাইলেও যাহা শুনিল, তাহাতেই ধরণীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।

উভয়ে উমার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ধরণী তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জনকে সজোরে ধাক্কা দিল। সে টাল সামলাইয়া লইয়া ধরণীকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়ের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল।

এ দিকে অপর গোরাটা স্খলিত চরণে উমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উমা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া মটকার ওভার-কোটটা তাড়াতাড়ি পরিধান করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

গোরাটা অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দৃঢ়স্বরে তাহাকে থামিতে বলিল। অসুরটা মুহূর্ত্ত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইল। উমার প্রদীপ্ত আননে উত্তেজনার আরক্ত আভা দেখিয়া মাতালটা উন্মত্ত হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিল।

পর-মুহূর্ত্তেই "মাই গড!" বলিয়া সে দুই পদ পিছাইয়া গেল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু সে টাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল।

উমার হস্তে তীক্ষ্ণধার ছোরা। গাড়ীর আলোকে তাহার শাণিত জিহ্বা লক্‌-লক্‌ করিয়া উঠিল। ভূপতিত মাতালটার দিকে ছোরা তুলিয়া ধরিয়া উমা দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বুঝাইয়া

দিল, সে নড়িবার চেষ্টা করিলেই উহা তাহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইবে। বাঙ্গালী তরুণীর এরূপ সাহস গোরার কাছে অভিনব দৃশ্য, সে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল।

উমা দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অপর গোরাটা তাহার স্বামীকে এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, ধরণীনাথ কোনও মতেই তাহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। উমার সমগ্র চিত্ত বিপদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হইয়া গেল। অপর গোরাটা তাহার সম্মুখে, সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। তখন সন্নিহিত বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ইন্দ্রসিং!"

"দিদিজী!"—

পর-মুহূর্ত্তেই দরজা খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দীপরা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি ভৃত্যের কামরা হইতে নির্গত হইয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া লোকটা প্রচণ্ড মুষ্টি উদ্যত করিয়া ধরণীর আক্রমণকারী গোরাটার পৃষ্ঠদেশে বজ্রের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিল। তাহার পর বলপূর্ব্বক তাহার আক্রমণ হইতে ধরণীকে মুক্ত করিয়া গোরাটার কটিদেশ ধরিয়া ব্যায়ামকৌশলে তাহাকে ভূপাতিত করিল।

এ দিকে অপর গোরাটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে ইন্দ্রসিংকে পশ্চাদ্দেশ হইতে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু স্বল্পায়াসেই ইন্দ্রসিং তাহার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার মুখে ও বক্ষোদেশে ঘুষি মারিতে লাগিল।

উমা চীৎকার করিয়া বলিল, "ইন্দ্রসিং, বাবুকে দেখ।" সঙ্গে সঙ্গে সে বিপদজ্ঞাপক শিকল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

ইন্দ্র দেখিল, ধরণীনাথের নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে। সে গোরাটাকে ছাড়িয়া দিয়া ধরণীর দিকে ছুটিয়া গেল।

গাড়ী থামিয়া গেল। তাহারা দেখিল, গোরা দুই জন অপর দিকের দরজা খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে।

ইন্দ্রসিং এক লম্ফে তাহাদের সন্নিহিত হইল এবং উভয়কে একসঙ্গে তাহার লৌহপেশীবৎ বাহুযুগলের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। গোরা দুই জনের মদের নেশা তখন তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে ঘুষি মারিয়া ইন্দ্রসিংএর কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আলোক-হস্তে মস্ মস্ শব্দ করিয়া গার্ড সেই কামরায় প্রবেশ করিল। ধরণী তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উমা বলিয়া উঠিল, "আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে ঐ দুটো পশু জোর ক'রে ঢুকে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। ওদের গ্রেপ্তার করুন।"

য়ুরোপীয় গার্ডের মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রমহিলার প্রতি অসম্মান! এইরূপ বর্ব্বর পশুর জন্যই ইংরাজের সুনাম ধূলায় লুটাইতেছে। সঙ্গের এক জনকে গার্ড আদেশ করিল, "উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।" গোরা দুইটা তখন আর পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

গার্ড ধরণীকে বলিল যে, পরের ষ্টেশনে সে উহাদিগকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে। যদি উহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিবার ইচ্ছা থাকে, সেখানে ধরণী ও তাহার স্ত্রী যেন এজাহার দেয়।

ধরণী উমাকে বলিল, "কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ কি? এই নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। সে বড় লজ্জা! কোর্টে সাক্ষী দেওয়া—সে অসম্ভব।"

উমা তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হবে না। মোকদ্দমা হয় হবে। এ সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করলে পাপের ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমি এজাহার দেব।"

ধরণী মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, "না, উমা, লক্ষ্মীটি, ও সব হাঙ্গামার কায নেই। ইন্দ্রসিং ওদের যে রকম মেরেছে, তাই যথেষ্ট শাস্তি। আর কেন।"

"না, যে তোমার শরীর থেকে রক্তপাত করেছে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি নে—কখনও না।"

গার্ড তখন গোরা দুই জনকে নীচে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং নামিয়া যাইতেছিল।

ধরণী পত্নীর করযুগল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, উমা, ওদের ছেড়ে দিতে ব'লে দিই। কেলেঙ্কারী আর বাড়িয়ে কায নেই।"

ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তবন্ধন হইতে তাহার করযুগল মুক্ত করিয়া লইয়া উমা স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তোমার সব কথাই শুনেছি, এ কথাও শুনব, কিন্তু বল, তুমিও আমার কথা শুন্‌বে?"

"সহস্রবার—নিশ্চয়।"

"তবে গার্ডকে ব'লে দাও, ওদের মুক্তি দিতে পারে। আমরা মোকদ্দমা করব না।"

ধরণী গার্ডকে তাহার অভিপ্রায় জানাইলে সে বলিল, "বাবু, তোমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই এই সব লোকের অনাচার বৃদ্ধি পায়। আইনতঃ আমি ওদের পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য; কিন্তু আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে ঐ মহিলার ইজ্জতহানি হ'তে পারে ভেবে আমি তোমার কথামতই ওদের ছেড়ে দেব। কিন্তু তাও ব'লে রাখি, এটা ঠিক ক্ষমা নয়, কাপুরুষের দুর্ব্বলতা মাত্র!"

ইন্দ্রসিং তাহার কক্ষে ফিরিয়া গেল। ৪৫ বৎসরবয়স্ক এই নেপালী ভৃত্যটিকে উমার পিতা ধরণীনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় তিনি উহাকে বাড়ী আনিয়াছিলেন। ইন্দ্রসিং উমাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ধরণীনাথের মতিগতির কথা রমানাথবাবু জানিতে পারিয়া কন্যা ও জামাতার পৃষ্ঠরক্ষকস্বরূপ এই সাহসী, বলিষ্ঠ ভৃত্যকে তিনি কন্যার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উমা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল।

যাত্রাপথে বাধা পড়ায় ধরণীনাথ পরের ষ্টেশনে নামিয়া কলিকাতাগামী গাড়ী চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

৫

ষষ্ঠীর প্রভাত। নীল আকাশের মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাদা মেঘ—তরুণ তপনের উজ্জ্বল মধুর আলোকধারায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শানাই আগমনীর করুণ তান বিলাইয়া শুভসুন্দর শরৎ-প্রভাতকে অভিনন্দিত করিতেছিল।

পট্টবেশ পরিধান করিয়া গৃহকর্ত্রী পূজার দ্রব্যসম্ভারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দাস-দাসীরা প্রভুর আদেশে কর্ম্মে ব্যস্ত। প্রৌঢ়ার সৌম্য আননে স্নিগ্ধ করুণ মৌন রেখা। কত যুগ পরে শ্বশুরের ভিটায়—স্বামীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত ভবনে বাৎসরিক মহাপূজার আয়োজনে তিনি আজ আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে—

"মা।"

জননী ফিরিয়া চাহিতেই তাঁহার আনন বিস্ময়ানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"আমরা এসেছি, মা!"

ধরণীনাথ মাতার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে উমা। তাহার লুণ্ঠিত শিরে প্রৌঢ়ার সজল নেত্র হইতে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বৃহৎ ভবনে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। বহু কালের পরিত্যক্ত জমীদার-গৃহে মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আজ নবীন শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে! কুললক্ষ্মীর অভ্যর্থনার আনন্দে নহবৎও যেন নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

* * * * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুপ্তির ছায়ায় সমগ্র গ্রামখানি যখন আচ্ছন্ন—পূজাবাড়ীর কর্ম্মকোলাহল স্তব্ধ, তখন পূজামণ্ডপে—প্রতিমার সম্মুখে পট্টাম্বরধারিণী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে নগ্নপদ ধরণীনাথ, তাহারও অঙ্গে পট্টাম্বর।

স্বামীর হাত ধরিয়া তরুণী প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোকধারা মাতার আননে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

উমা শান্ত, গাঢ় কণ্ঠে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে ফিরিয়ে আনব। ভগবান্ আমার মুখ রেখেছেন। আমরা সবাই বুঝেছিলাম, লেখা-পড়া শিখেও তোমার মন দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে বড্ড ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু আমরা যে বাঙ্গালী হিন্দু, লেখা-পড়া শিখে তা ভুলে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য কিছু নেই। আজ শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর কাছে—এস, আমরা প্রার্থনা করি, আমরা যেন নিজেদের ভুলে না যাই। তিনি শক্তি দিন।"

ধরণীনাথের হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহামায়ার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর স্ত্রীর করপল্লব দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া বলিল, "উমা, সার্থক তোমার লেখা-পড়া। তুমি আমাকে হাত ধ'রে এমনই করেই সংসারপথে চালিয়ে নিও—শক্তি দিও। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করলুম।"

মাতার প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে যেন আশীর্ব্বাদধারা ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রসাধন

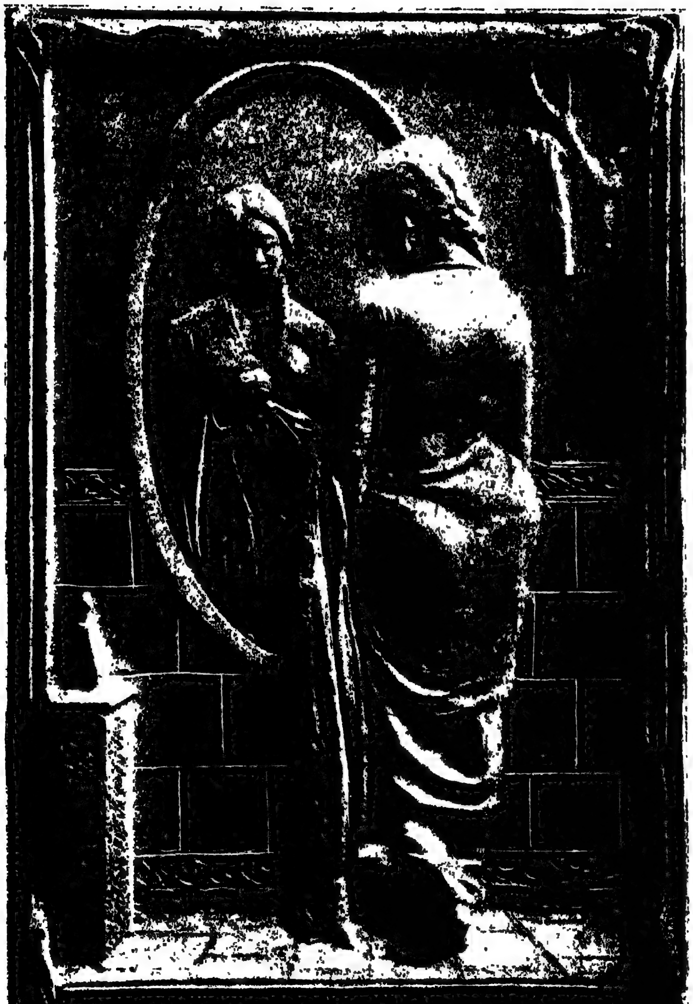

মৃন্ময় মূর্ত্তি]

[ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

গনির মা

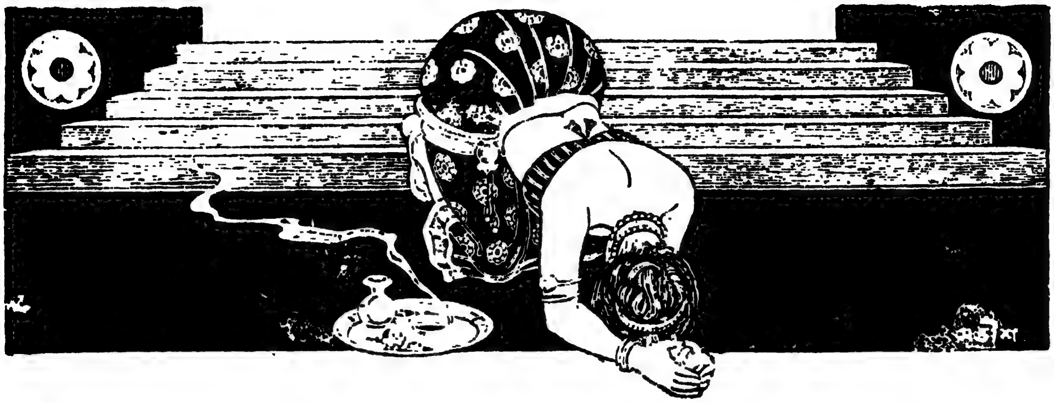

১

কুতুবপুরের রহম সেখ তাহার স্ত্রী ফুলজান বিবি ও একমাত্র শিশুপুত্র গনিকে রাখিয়া হঠাৎ মারা গেল। ফুলজানের বয়স তখন ২৫, দেখিতেও সে সুন্দরী। আবার রহম সেখ যে দশ বিঘা জমী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব ধান ও পাট জন্মায়। অল্পদিনের মধ্যেই ফুলজানের চারি পাশে অনেক মধুকর গুণ্ গুণ্ করিতে লাগিল! কিন্তু ফুলজান বলিল --"আমি কোনও গোলামের ধার ধারি না, আল্লার দোয়ায় আমার গনি বাঁচিয়া থাকুক্।"

ফুলজানের পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে কেফাতুল্লা সেখ সেই গ্রামের এক জন মাতব্বর। তাহার মত দাঙ্গাবাজ ও অত্যাচারী লোক আশেপাশে চারি পাঁচ গ্রামের মধ্যে ছিল না। তাহার বয়স প্রায় ৪৫, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার; কিন্তু খুব বলবান্। তাহার লাঠির জোরে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। এই মুসলমান-প্রধান গ্রামে তাহার একটা প্রবল দল ছিল। আবশ্যক হইলে এই দলের লোক অন্য লোকের বাড়ী লুঠ করিত, কেফাতুল্লার ভয়ে কেহ থানায় এজাহার দিতে যাইত না। এজাহার দিলেও কোন ফল হইত না, কারণ, পুলিস কি প্রকারে বাধ্য রাখিতে হয়, কেফাতুল্লা সে বিষয়ে এক জন ওস্তাদ ছিল।

এ হেন কেফাতুল্লা যখন ফুলজানের প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল, তখন সে বেচারী প্রমাদ গণিল। সে জানিত, কেফাতুল্লার আর দুইটি কবিলা আছে, তাহারা তাহার প্রহারের চোটে সর্ব্বদা চোখের জলে ভাসিত।

এক দিন বৈকালে ফুলজান তাহার উঠানে বসিয়া ধান ঝাড়িতেছিল, তখন সে কেফাতুল্লার চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার আট বৎসরবয়স্ক পুত্র গনি ভীত-চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, আর কেফাতুল্লা লাঠি হাতে করিয়া তাহাকে তাড়া করিতেছে।

"শালার বেটা শালা! গরু ছাইড়্যা দিয়া আমার পাট খাওয়াইস্! এই লাঠির বাড়িতে তোর পাট খাওয়ান বাইর কর্যা দেব! হারামজাদা!"

ইহা বলিতে বলিতে কেফাতুল্লা গনির অনুসরণ করিয়া ফুলজানের কাছে আসিল। গনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাতার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় লইল। তখন কেফাতুল্লা রোষ-কষায়িত নয়নে ফুলজানের দিকে তাকাইয়া বলিল—"মাগী, তোর গরু বাঁধতি পারিস্ না! হারামজাদী—শালী!"

ফুলজান মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল -"মাতুব্বরের বেটা, আমার গরু ত বাঁধাই থাকে, আজ ক্যামনে ছুটে গেছিল। আমি জান্তি পার্যা গরু ধরতি গনিরে পেঠেয়াছিলাম। আমার ছাওয়াল নিতান্ত নাবালক। আজকার কসুর মাপ কর।"

ফুলজানের এই কাতরোক্তিতে কেফাতুল্লা একটু নরম হইয়া বলিল—"আচ্ছা, আজকের কসুর যেন মাপ করলাম। কিন্তু ফুটি বড্ড, আমার সাথে আড়ি কর্যা কয়দিন তুই এখানে থাক্‌বি?"

ফুলজান কেফাতুল্লাকে বসিবার জন্য একখানা পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার উপর অনুরাগ করলে এক দিনও আমি এ গেরামে টিক্‌তে পারব না, তা ত আমি খুব জানি।" কেফাতুল্লা সেই পিঁড়িতে বসিয়া বলিল,

—"তবে আমার কথা শুনিস্ না ক্যান্? আমি ত তোর ভালোর জন্যিই কই, আমার সাথে নিকা বস্যা আমার বারীতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বি---আমার আর যে দুই কবিলা আছে, তারা তোর বাঁদী হইয়ে থাক্‌বে। ঐ যে রাণী রাসমণি যেমন খাটের উপর পা ছড়াইয়া বস্যা থাকে, তেনার দুই পাশে দুইটা চিনির বস্তা থাকে—একবার ডান হাত দিয়া এক মুঠো চিনি মুখে দ্যায়, আবার বাও হাত দিয়া আর এক মুঠো চিনি মুখে দ্যায়—তোরও সেই রকম সুখ হবে।"

ফুলজান তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, আমার কথা ত তোমারে আগেই বল্‌ছি। আমি রাণী রাসমণির সুখ চাই না। আমার জীবনের সুখ সেই এক জনের সাথেই গেছে। এখন খোদাতাল্লার মরজীতে নাবালক বাঁচ্যা থাক্।"

কেফাতুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে বলিল—"তবে তুই তোর ছাওয়াল নিয়ে থাক। আবার যদি আমার ক্ষ্যাতে তোর গরু যায়, তবে তার মাথা কাটাব, এ কথা আমি আগেই বল্যা গেলাম।"

এই বলিয়া ক্রোধভরে কেফাতুল্লা চলিয়া গেল।

২

ইহার তিন দিন পরে ফুলজানের গরু আবার ছুটিয়া গেল। গনি সারাদিন গরু খুঁজিয়া পাইল না। তাহাদের প্রতিবেশী তমিজদ্দী আসিয়া সংবাদ দিল, সেই গরু দুই মাইল দূরে রসুলপুর খোঁয়াড়ে আটক রহিয়াছে। ফুলজানের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা কেফাতুল্লার কারসাজি। সে তমিজদ্দীকে ধরিল—"চাচা, তুমি গনির সাথে যাইয়া আমার গরুডা খালাস কর্‌যা আন, যে পয়সা লাগে, তা আমি দিতেছি।"

তাহার অনুনয়ে বাধ্য হইয়া তমিজদ্দী গরু খালাস করিতে গেল। খোঁয়াড়ের মাসুল আইনানুসারে ।/০ আনা, গনি ॥০ আনা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই খোঁয়াড়ের মুন্সী বলিল, ৩ টাকা না পাইলে সে কিছুতেই গরু ছাড়িবে না। তমিজদ্দীও অগত্যা ফিরিয়া আসিল। ফুলজানের হাতে তখন টাকা ছিল না, সে তমিজদ্দীর নিকট একখানা "জেওর" অর্থাৎ রূপার মল বন্ধক রাখিয়া ৩ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা গরু খালাস করিয়া আনিল।

আর এক দিন ফুলজানের বর্গাদার আরজান আসিয়া তাহাকে জানাইল সে ফুলজানের বর্গা জমীতে যে আউস-ধান বুনিয়াছিল, কেফাতুল্লা লোকজন জুটাইয়া আনিয়া তাহা কাটিতেছে। সে জমীটা ফুলজানের বাড়ীর খুব নিকটে। ফুলজান আরজানকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখিল, তিন জন লোক সেই জমীর ধান কাটিতেছে, কেফাতুল্লা সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। ফুলজান কাঁদিতে কাঁদিতে সরকার বাহাদুরের দোহাই দিল। কেফাতুল্লা তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"ফুটি বড়ু, এখন কাঁদলি কি হবে? আমি তোর দোহাই মানি না। তোর খসম আমার কাছে এই জমী বন্ধক র‍্যাখা ৫০ টাকা কর্জ্জ নিয়াছিল। এর অর্দ্ধেক ফসল আমি পাব, বাকী অর্দ্ধেক বর্গাদার নেবে। এই দ্যাখ সেই দলীল।" এই বলিয়া কেফাতুল্লা একখানা ষ্ট্যাম্পে লেখা খত ফুলজানকে দেখাইল।

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, আমার খসম ত কোন দিনও টাকা কর্জ্জ করার কথা কয় নাই, সে বরাবর এই জমী নিজ হাতে চষিত, আমি এবার আরজানরে বর্গা দিছি। দোহাই তোমার খোদাতালার! আমি নিতান্ত কাঙ্গাল, কোন রকমে নাবালক ছাল্যাডা নিয়ে ভিটাডার উপরে আছি। তারে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত কইরো না।"

কেফাতুল্লা বলিল—"আমার এই দলীল বুঝি মিথ্যা? গ্রামের তিন চার জন লোক সাক্ষী আছে। হারামজাদী! মুখ সামলাইয়া কথা কহিস্।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা সেই জমীতে ফিরিয়া গেল। ফুলজান দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ী আসিয়া মুখে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ধান কাটা শেষ হইলে, কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার কাছে আসিল এবং মৃদু হাস্য করিয়া বলিল,---"কি বিবিজান! আমার আরজডা শুন্‌লে না, তোমার সেই ছিল ভাল, না এই ভাল?"

ফুলজান তাহার প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে সে এই দুর্দ্দান্ত

লোকের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে? তাহার অত্যাচারের মাত্রা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সে কি প্রকারে তাহার নাবালক পুত্রকে বাঁচাইবে? তবে কি সে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? কিন্তু তাহার মৃত স্বামীকে সে কিরূপে ভুলিবে? সে যে এখনও তাহাকে কত ভালবাসে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে চোখের জলে মাটী ভিজাইল। অবশেষে সে সঙ্কল্প করিল, যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু সে তাহার স্বামীকে ভুলিয়া আর কাহারও সঙ্গে নিকা বসিবে না। খোদা কি তাহার শিশুসন্তানকে রক্ষা করিবেন না?

৩

ইহার কিছু দিন পরে সেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল। গ্রামের মেনাজদ্দী সেখের প্রথমে ভেদবমি হয়; তাহাতেই সে দুই দিনের দিন মারা গেল। পরে তাহার কবিলার ও দুইটি ছেলের এই ব্যারাম হইল। কেফাতুল্লা গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ১০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া হেমাইতপুরের কেরামতালী ফকিরকে লইয়া আসিল। ফকির আসিয়া গ্রামের চারি কোণে চারিটা গাছের শিকড়মাত্র পড়িয়া পুতিয়া দিল, ইহাতে না কি এই গ্রামের কলেরা অন্য গ্রামে তাড়িত হইবে। আর মেনাজদ্দীর কবিলা ও ছেলেদিগকে জল পড়িয়া খাওয়াইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। এই তিনটি রোগীই মারা গেল এবং হেনাজদ্দীর বাড়ীতে আর দুইটির ব্যারাম হইল। ইহার পরে সেই কেরামতালী ফকিরের যখন এক দিন ভেদবমি আরম্ভ হইল, তখন সে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হেনাজদ্দী কতকটা অবস্থাপন্ন লোক, সে কেফাতুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রহমতপুর হইতে আবদুল করিম ডাক্তারকে আনিল। আবদুল করিম এক জন হাতুড়ে, সে সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া একটা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে দুই বৎসর কায করিয়াছিল। এখন সে নিজ গ্রামে বসিয়া চিকিৎসা করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া কেফাতুল্লার বাড়ীতে বাসা করিয়া রোগীদিগের চিকিৎসা আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যক্রমে হেনাজদ্দীর বাড়ীর একটি লোক আরাম হইল, অন্যটি মারা গেল। কিন্তু সেই দিনই আবার ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আর চারি জনের কলেরা হইল। কাযেই গ্রামের লোকরা চাঁদা করিয়া ডাক্তারকে গ্রামে রাখিতে বাধ্য হইল। ডাক্তার দেখিলেন, গ্রামের লোক যে পুষ্করিণীর জল পান করে, তাহার মধ্যে রোগীর কাঁথা-কাপড় কাচাতে উহার জল দূষিত হইয়াছে। তিনি সকলকে বলিলেন,—"তোমাদের ফকির আসিয়া গ্রামের চারিদিকে শিকড় পুতিয়া গ্রামবন্ধন করিয়াছিল, তাহাতে কলেরা থামে নাই। আমি বলি, তোমরা এই পুকুরের জল কেহ খাইও না। কলেরার বিষে ইহার জল দূষিত হইয়াছে। এই জল না খাইলেই কলেরা থামিবে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিল, কেহ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না, কারণ, তিনি ফকির নহেন, এক জন ডাক্তার।

এক দিন রাত্রি ৮টার সময় আবদুল করিম ডাক্তার কেফাতুল্লার "কাছারী-ঘরে" বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, কেফাতুল্লা তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিল। এই সময়ে তমিজদ্দী আসিয়া বলিল,—"ডাক্তার ছাহেব, আপনার একবার আসতি হবে।"

ডাক্তার বলিলেন,—"কোথায়?"

"ঐ রহম সেখের বাড়ী। তার ছাওয়াল গনির ভেদবমি হইছে।"

এই কথা শুনিয়া কেফাতুল্লা কান খাড়া করিয়া বলিল,—"গনির মা তোনারে পাঠাইছেন? ডাক্তারের টাকা দিতি পারবে?"

"কিসের টাকা? শোনলাম, ডাক্তার টাকা ন্যান না, গ্রামের লোকরা চাঁদা কর্যা তেনারে আন্‌ছে।"

কেফাতুল্লা একটু উষ্ণভাবে বলিল—"সে মাগী এক পয়সাও চাঁদা দেয় নাই। ডাক্তার তার বাড়ী যাবেন ক্যান্? যাবেন না। সে যদি দুই টাকা দেয়, তবে ডাক্তার যাবেন।"

এই কথা শুনিয়া তমিজদ্দী চলিয়া গেল। ফুলজান তাহার ঘরে গনির পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। গনি কেবল জল জল করিয়া প্রবল তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল। তমিজদ্দী যাইয়া কেফাতুল্লার কথাগুলি ফুলজানকে বলিল। ফুলজানের মুখ ঘৃণায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কেফাতুল্লা এত দূর পাষণ্ড যে, এই ঘোর বিপদের সময়

তাহার উপর নির্য্যাতন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু উপায়? তাহার হাতে একটি টাকাও নাই। সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তমিজদ্দীকে বলিল—"চাচা, আমার আর একখান জেওর আছে, তা' রাখ্যা আমারে পাঁচটা টাকা দিতি পার?"

তমিজদ্দী কহিল,—"আমার ঘরে ত আর টাকা নাই।"

ফুলজান কহিল,—"আর কারও কাছে পাওয়া যায় কি না দেখ।"

তমিজদ্দী কহিল,—"আর কোথায় টাকা পাব? গ্রামে ত আর কোন মহাজন নাই, কেবল কেফাতুল্লাই সময় সময় টাকা ধার দেয়। সে ত তোমারে দেবে না; আচ্ছা, আমি নস্কার মামুদের কাছে একবার যাই, যদি সে টাকা দেয়।"

এই বলিয়া তমিজদ্দী প্রস্থান করিল। এই সময় গনি আর একবার বাহিরে গেল, এবং ফুলজান তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময় সে দুর্ব্বলতার জন্য পিঁড়ার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফুলজান কাঁদিয়া উঠিল।

কেফাতুল্লা জানিত, গনির মা ডাক্তারের জন্য অবশেষে তাহারই শরণাপন্ন হইবে। তমিজদ্দী চলিয়া আসিলে, সে গরু খুঁজিবার ছলে বাহির হইয়া ফুলজানের কান্না শুনিয়া "ফুটি বড়ু. গণি কেমন আছে?" বলিয়া আসিয়া সে উঠানে দাঁড়াইল।

ফুলজান ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। একবার মনে করিল, ঐ পাষণ্ডের সঙ্গে কথাই কহিবে না। পরে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, তুমি আমার উপর বাদ সাধবার আর বুঝি সময় পাইলা না?"

কেফাতুল্লা কহিল,—"তোমারে সুখে থাকৃতি ভূতে কিলাবে, আমি তার কি করবো? আমার বাড়ীতে থাকলি তোমার এত দুঃখু-কষ্ট হবে ক্যান্?"

ফুলজান ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"ছিঃ!—আবার সেই কথা! আমার জান্ গেলেও তোমার মত লোকের সাথে নিকা বসবো না। আমার জমীর উপর তোমার লোভ হইছে, তুমি সেই জমী ন্যাও। আজ ডাক্তার আন্যা আমার গনিকে বাঁচাও। দোহাই তোমার আল্লার!"

কেফাতুল্লা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—'বিবিজান্, এত গরম হও ক্যান্? তোমার এত 'ত্যাজ' ক্যান্? আমি তোমার জমীর কাঙ্গাল না। আমি চল্লাম।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা বাড়ীর বাহির হইল। ফুলজান নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে বলিল,—"আল্লা! তোমার মনে এই ছিল!" এই বলিয়া এক মিনিটকাল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া কি ভাবিল। পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে আসিয়া কেফাতুল্লাকে ডাকিল,—"মাতুব্বরের বেটা!"

কেফাতুল্লা বেশী দূর যায় নাই, সে ডাক শুনিয়া ঘরের দুয়ারে আসিল। ফুলজান তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"মাতুব্বরের বেটা! আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমি রাজী; তুমি ডাক্তারকে বোলাও।"

এইরূপে সেই চির-মহিমময় মাতৃহৃদয় সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিল!

কেফাতুল্লা অমনই দৌড়াইয়া গিয়া সেই ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন। গনির নিতান্ত পরমায়ুর জোর ছিল, তাই সেই হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় সে বাঁচিয়া উঠিল।

ইহার এক মাস পরে কেফাতুল্লার সহিত ফুলজানের নিকা হইল। কেফাতুল্লা আসিয়া তাহার জমী বাড়ী দখল করিয়া বসিল।

৪

ফুলজান কেফাতুল্লার সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে রাণী রাসমণির সুখ ত নাই-ই, সামান্য কৃষকগৃহিণীর সুখও নাই। কেফাতুল্লার আর দুইটি স্ত্রীর যে দশা, তাহারও সেই দশা ঘটিল। নিজের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখানে সে সেই দুর্দ্দান্ত লোকের অধীন। কেফাতুল্লা তাহার অপর দুই স্ত্রীকে সামান্য ত্রুটির জন্য প্রহার করিত, ফুলজান তাহা দেখিয়া ভাবিত, কবে তাহার ভাগ্যেও সেই প্রকার আদর ঘটিবে। সে তাহার পূর্ব্বস্বামীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। সে তাহার জীবনের সম্বল শিশুটির প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় এই দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এখন কিসে সেই শিশুটি মানুষ হইবে, ইহাই সে সর্ব্বদা ভাবিত। সে গনিকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য কেফাতুল্লাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কেফাতুল্লা বলিল—

"চাষার ছাওয়াল ন্যাখাপড়া শিখ্যা বাবু হবে, সে আর ক্ষ্যাতখামারের কাম করবে না।" সুতরাং গনিকে স্কুলে দেওয়া হইল না। কেফাতুল্লা গনির ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ ঠিক করিয়া তাহাকে নিজের গরুর রাখাল নিযুক্ত করিল।

এক দিন মনিরদ্দী আসিয়া কেফাতুল্লার কাছে নালিশ করিল কেফাতুল্লার এক পাল গরু তাহার কলাইয়ের ক্ষেতে ঢুকিয়া সব ফসল নষ্ট করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কেফাতুল্লা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গনিকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। গনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সেই একমাত্র আশ্রয়-স্থান মাতৃ-অঞ্চলে লুকাইল। "শালার বেটা, আজ তোর এক দিন আর আমার এক দিন," ক্রোধভরে ইহা বলিতে বলিতে কেফাতুল্লা গনিকে লক্ষ্য করিয়া লাঠীর বাড়ি মারিল। ফুলজান তাহা ঠেকাইতে গিয়া নিজে আহত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এই রকম একটা লাঠীর বাড়ি খাইলে ও ত এখনই মরিয়া যাইত—ওর যে পুঁটীর প্রাণ। মারো—আজই ওরে ম্যার্যা ফ্যালো—তোমার আপদবালাই দূর হউক!"

কেফাতুল্লা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"উনি এক নবাবের বেটা নবাব! ওনারে কোন কামে দিলি এই রকম গাফিলি করবেন আর বস্তা বস্তা চারবেলা খাবেন। এত খাওয়া আসে কোথায় থেকে?"

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল—"ও তোমার ভাত খায় কি না? ওর যেন কিছুই নাই। ওরে ম্যারা ফেলতি পারলিই তুমি বাঁচ!"

কেফাতুল্লা ভয়ানক চটিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বল্‌লি, হারামজাদী! তোর ছোট মুখি বড় কথা? আমি ওনারে যতই খাতির কর্যা চলি, উনি ততই আসকারা পাইয়্যা গেছেন। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়লি এই দশাই হয়।"

এ দিনকার পালা এখানেই শেষ হইল।

৫

কুতুবপুর স্কুলে আজ বড় ধুম। আজ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার মৌলবী এমদাদ আলী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্কুলঘর লতা-পাতা দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে, শিক্ষক ও ছাত্রগণ যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে। এই মুসলমানপ্রধান স্থানে স্কুলের শিক্ষক তিনটিই মুসলমান, ছাত্রদের মধ্যেও অধিকাংশ মুসলমান। মৌলবী সাহেব একটি ক্লাসে বসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিতেছেন। সে ক্লাসে দশটি ছাত্র। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

"বল ত তাজমহল কোথায়?"

একটি ছাত্র বলিল "আগ্রায়।"

"তাজমহল কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন?"

একটি ছাত্র বলিল—"সম্রাট আকবর।"

"না, ভুল বলিয়াছ।"

এই বলিয়া তিনি অন্যান্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সদুত্তর দিতে পারিল না। এই সময়ে স্কুল-ঘরের বারান্দা হইতে উত্তর আসিল —

"সম্রাট সাজাহান।"

মৌলবী সাহেব সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি সৌম্যদর্শন বালক সেখানে বসিয়া আছে, তাহার কিছু দূরে মাঠে কতকগুলি গরু চরিতেছে। তিনি সেই বালকটিকে কাছে ডাকিলেন এবং শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছেলেটি বাহিরে বসিয়া আছে কেন? এ কোন্ ক্লাসে পড়ে?"

শিক্ষক বলিলেন—"আজ্ঞে, ও স্কুলে পড়ে না—এই মাঠে গরু চরায়, আর প্রায়ই এই বারান্দায় আসিয়া বসিয়া থাকে ও পড়ান শোনে।"

মৌলবী সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বই পড়তে পার?"

বালক বলিল- "না। আমি অক্ষর চিনি না।"

"আচ্ছা, সাজাহান কে, তুমি জান?"

"জানি- জাহাঙ্গীর বাদশার ছেলে সাজাহান।"

"জাহাঙ্গীরের বাপের নাম কি?"

"আকবর।"

"সাজাহানের কয় ছেলে ছিল?"

"দারা, মুরাদ, ঔরঙ্গজেব, সুজা।"

"ইহাদের মধ্যে কে বাদশা হয়েছিলেন?"

"ঔরঙ্গজেব।"

"তুমি এ সব কোথায় শিখলে?"

"এখানে বসিয়া। আমি যা' একবার শুনি, তা' কখনও ভুলি না। এই যে সব বই এখানে ছেলেরা পড়ে, আমি তা'ও কিছু কিছু শিখেছি।"

"আচ্ছা, কি শিখিয়াছ শুনি। একটা কবিতা মুখস্থ বল ত।"

অমনই সে মুখস্থ বলিল—

"ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘু গুরু ভেদ নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অসত্য বচন লোক ক্রোধকালে বলে॥
থাকুক অন্যের কাষ নিজে হয় অরি।
বিষ খায় ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধ হেতু মানুষের সর্ব্বনাশ হয়॥
হেন ক্রোধে যেই জন জিনিবারে পারে।
ধন্য তারে বলে সবে পৃথিবী-মাঝারে॥"

মৌলবী সাহেব এই রাখাল-বালকের অসাধারণ মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার আরত্তিও খুব চমৎকার। তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "আমার নাম গনি।"

মৌলবী সাহেব স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া রসুলপুরের ডাকবাংলায় গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যাইবার সময় এই রাখাল-বালকের অভিভাবক কেন উহাকে স্কুলে পড়িতে দেয় না, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং কেফাতুল্লাকে চৌকীদার দ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

কেফাতুল্লা যখন শুনিল, এক ডেপুটী সাহেব তাহার তলব করিয়াছেন, তখন সে ভাল এক ছড়া পাকা কলা ভেট লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মৌলবী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গনি ছেলেটি তোমার কে?"

"আজ্ঞে, হুজুর, সে আমার শ্বাষপক্ষর নিকার কবিলার প্রথম পক্ষের সন্তান।"

"তুমি তাকে স্কুলে পড়তে দেও না কেন?"

"হুজুর! আমি নিতান্ত গরীব, পড়ার খরচ দিতি পারি না।"

"আচ্ছা, যদি আমি উহার পড়ানর ভার লই, তবে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

কেফাতুল্লা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্কুলের শিক্ষক মুন্সী আদিলদ্দীন তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মিঞা, তোমার এই হাতুয়া ছেলের অদৃষ্ট খুব ভাল। সে হুজুরের নেকনজরে পড়িয়াছে। তুমি উহাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে দেও। ও লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হবে।"

সেই "হাতুয়া" ছেলের উন্নতির চিন্তায় কেফাতুল্লার রাত্রিতে ঘুম হইত না। সে মনে করিল, তাহার ঘাড় থেকে যদি একটা বোঝা নামিয়া যায়, তবে সে ত ভাল কথা। আর তার জমী ও বাড়ীরও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক হইবে। তবে তার মাতা ফুলজানকে রাজী করিতে পারিলে হয়। সে বলিল, "হুজুরের যে মর্‌জী। ওরে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে ওর মা রাজী হইলে হয়।"

মৌলবী সাহেব গনির মাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য আদিলদ্দীন মুন্সীকে কেফাতুল্লার সঙ্গে পাঠাইলেন।

ফুলজান যখন তাহার পুত্রের গুণগরিমার কথা শুনিল, তখন সে তাহাকে কোলে করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল। সে ভাবিয়া দেখিল, এখানে থাকিলে তাহার লেখাপড়া শেখার কোন আশা নাই, বরং কোন্ সময়ে কেফাতুল্লার লাঠীর আঘাতে তাহার প্রাণ বাহির হইবে। মৌলবী সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহাকে তাঁহার নিজের বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, তবে ত ফুলজান বাঁচিয়া যায়। তবে এক কষ্ট, সে তাহাকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিবে? কিন্তু কাছে রাখিলেও ত তাহার সুখ নাই। যাহাতে ছেলের ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

এই সকল বিবেচনা করিয়া সে গনিকে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিল। গনি মাতার নিকট হইতে যাইবার সময় কাঁদিল, ফুলজানেরও যেন তাহাকে দূরে পাঠাইতে কলিজা ছিঁড়িয়া গেল। মৌলবী সাহেব গনিকে বলিলেন, যখনই তিনি এখানে স্কুল দেখিতে আসিবেন, তখন তাহাকে সঙ্গে আনিবেন। এইরূপে গনিকে বিদায় করিয়া কেফাতুল্লা মনে করিল, তাহার ঘাড় হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

৬

গনি মৌলবী সাহেবের সঙ্গে জেলার সদরে আসিয়া একটা হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রথম প্রথম নূতন যায়গায় আসিয়া তাহার মন অস্থির হইল, পরে স্কুলে নূতন সঙ্গী পাইয়া পড়ার উৎসাহে ও খেলার আমোদে সে বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল। মৌলবী সাহেবের স্ত্রীর ছেলে হয় নাই, একটিমাত্র শিশু কন্যা। তিনি গনিকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে তাহার মাতার অভাবও কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইল। মৌলবী সাহেব বৎসরের মধ্যে দুইবার রসুলপুর ডাকবাংলায় গিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতেন। তখন তিনি গনিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাহার মাকে দেখাইয়া আনিতেন। গনি ভদ্রলোকের গৃহে থাকিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত শিক্ষিত হইতেছে দেখিয়া ফুলজানের কত আনন্দ হইত! এইরূপে ৩ বৎসর অতীত হইল। গনি অসাধারণ মেধাবী ও পরিশ্রমী বলিয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল এবং বিভাগের মধ্যে প্রথম হইয়া মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাইল। মৌলবী সাহেব এই সময়ে বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় বদলী হইলেন। গনি তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে বি, এ, পরীক্ষা দিলে মৌলবী সাহেব তাহার সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন।

গনি গত ৩।৪ বৎসর তাহার মাকে দেখিতে যায় নাই। তাহার কারণ, তাহার মা কেফাতুল্লার সংসারে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা তাহার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার মাতার দাসীত্ব মোচন করিতে না পারিলে সে আর মাকে দেখিতে যাইবে না। এ দিকে কেফাতুল্লার ঔরসে ফুলজানের আর দুইটি ছেলে হইয়াছে, ফুলজান তাহাদিগকে লইয়া সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে।

মৌলবী সাহেব গনির বিবাহের সময় কেফাতুল্লাকে গনির মাকে লইয়া আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলজান বলিল,—"আমার ছেলে বেঁচে থাকুক, সে রাজ্যেশ্বর রাজা হউক, আমি চাষার মেয়ে, চাষার বৌ, আমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে লজ্জা দিতে ও লজ্জা পাইতে যাব না। গনির যদি কখনও সাধ হয়, তবে আমাকে তার বৌ দেখাইবে।"

গনির পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন মৌলবী সাহেব তাহাকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ, পড়িতে পাঠাইলেন, এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিতে বলিলেন। গনি এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথম হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

৭

এক দিন বেলা ১০টার সময় কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর বাহিরের উঠানে ধান মলিতেছিল। সে দেখিল, একটি সাহেবের সঙ্গে এক জন লাল পাগড়ীওয়ালা ও অনেকগুলি চৌকীদার তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। কিছু দিন হইল, সে গয়াজদ্দীর সঙ্গে একটা জমীর ধান কাটা লইয়া হাঙ্গামা করিয়া গয়াজদ্দীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। গয়াজদ্দী থানায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছিল। তদবধি কেফাতুল্লা শঙ্কিত হইয়া আছে, কোন্ সময়ে তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। সে এখন মনে করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সদলবলে আসিতেছেন। সে অমনই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা ধানের গোলার মধ্যে আত্মগোপন করিল। এ দিকে সেই সাহেব দফাদার ও চৌকীদারগণ সহ আসিয়া তাহার উঠানে দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রঙ খুব ফর্সা, হ্যাট-কোট, কলার, নেক্‌টাই প্রভৃতি দ্বারা সে আগাগোড়া সজ্জিত। দফাদার হাঁকিল, "কেফাতুল্লা বাড়ী আছ? ও ভাই কেফাতুল্লা! ডেপুটী সাহেব তোমার বাড়ী আসিয়াছেন।"

কিন্তু কোথাকার কেফাতুল্লা কোথায়? একে ত সে আসামী, তাহার বাড়ীতে স্বয়ং ডেপুটী সাহেব আসিয়াছেন। সে কোন্ সাহসে তাঁহার সম্মুখীন হইবে?

দফাদারের ডাকের উত্তরে বাড়ীর মধ্য হইতে কে একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "সে বাড়ী নাই।"

ডেপুটী সাহেব ইংরাজী ভাষায় "Not at home" কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

দফাদার বলিল, "বাড়ীতে কে আছ, বসবার জন্য একটা চেয়ার কি মোড়া বাহির করিয়া দেও।"

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "না, সে সবের দরকার নাই। আমি ঐ কাছারী-ঘরের চৌকীর উপর বসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি কাছারী-ঘরে চৌকীর উপর বসিলেন এবং সুটকেশ খুলিয়া কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের বেশ পরিধান করিলেন।

এই সকল দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে কানাকানি চলিতে লাগিল এবং একটু পরেই কেফাতুল্লা বাহিরে আসিয়া "হুজুর, আদাব" বলিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ডেপুটী সাহেব তাহাকে সেলাম করিয়া পাশে বসিতে বলিলেন, কেফাতুল্লা বসিতে সাহস করিল না।

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "আমাকে চিনিলেন না? আমি গনি। মা-জী কোথায়?"

ফুলজান অদূরে দাঁড়াইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। সে অমনই দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিল এবং "বাপজান্, এই যে আমি! এত দিনে তোর দুখিনী মারে মনে পড়েছে? আয়, আমার কোলে আয়" বলিয়া সে গনিকে জড়াইয়া ধরিল। গনিরও চোখে জল আসিল।

কেফাতুল্লা হতভম্ব হইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল। এতক্ষণে তাহার মুখ ফুটিল। সে ফুলজানকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আলো মাগী, কি করিস্? হুজুরের গায়ে যে তোর হাতের গোবর-কাদা লাগল।"

গনি হাসিয়া বলিল—"লাগুক, লাগুক। আমি অনেক দিন মা'র কোলে যাই নাই।"

কেফাতুল্লা বলিল, "হুজুর, আপনি যে কত বড় লোক, ও মাগী তা কি বোঝে?"

গনি বলিল, "মা-বাপের কাছে ছেলে চিরদিনই ছোট। মা, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। মা, কাল রাত্রিতে আমার কিছু খাওয়া হয় নাই, এখন কিছু খেতে দেও।"

কেফাতুল্লা অমনই এক লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং গনির খাওয়ার যোগাড় করিতে চলিল। সে নিজে একটা ভাণ্ড হস্তে করিয়া গাভী দোহন করিতে গেল এবং বাজার হইতে মাছ কিনিয়া আনিবার জন্য এক জন চৌকীদারের উপর হুকুম জারি করিল। এবার তাহাকে পায় কে? সে ডেপুটী সাহেবের বাপ। সে মনে মনে ভাবিল, গয়াজদ্দীর ধড়ে কয়টা মাথা, তাহা সে এবার দেখিয়া লইবে। সে ডেপুটী সাহেবের বাপ! সে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল, তাহার পুত্র আবদুল গনি ওরফে গনি মিঞা ডেপুটী সাহেব অনেকগুলি "পুলুষ" লইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে। গ্রামবাসী সকলে সাবধান! কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না! এই সংবাদ শুনিয়া অনেক কৌতূহলী কৃষক ডেপুটী সাহেবকে দেখিতে আসিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে সেলাম করিল।

গনি আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার মা আসিয়া তাহার কাছে বসিল। গনি ফুলজানকে বলিল, "সে অনেক দিন যাবৎ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার একান্ত ইচ্ছা, তাহার মা এখন গিয়া তাহার সঙ্গে থাকেন। সে আর তাহার মা'র কষ্ট দেখিতে পারে না।"

ইহার উত্তরে ফুলজান বলিল—"বাপজান, তুই যে তোর দুঃখিনী মাকে মনে রাখিয়াছিস, ইহাতেই আমি সুখী। আমার আর এখানে কোন কষ্ট নাই। আমি চাষার মেয়ে, চাষার বৌ, আমি এই চাষার বাড়ীতেই বেশ আছি। এখানে তোর যে আর দুইটা ভাই হইয়াছে, তাদের নিয়ে আমি এখানেই থাকিব। তবে মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিয়া আসিব।"

অবশেষে মাতা-পুত্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, গনির পৈতৃক ভিটায় কেফাতুল্লা চাষ দিয়া বেগুণের ক্ষেত করিয়াছিল, গনি সেখানে একটা বাড়ী করিবে এবং তাহার মা সেখানে গিয়া বাস করিবে। কেফাতুল্লাও ইহাতে সম্মত হইল। কিন্তু গয়াজদ্দীর মোকদ্দমায় যখন তাহার তিন মাস জেল হইল, তখন সে গনির উপর রাগ করিয়া ফুলজানকে বলিল—"তোর প্যাটের ছাওয়াল ত, ও ডেপুটীই হউক আর জজই হউক, ওর তিন পয়সারও মুরাদ নাই।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

স্বরলিপি

জৌনপুরী তোড়ী—একতালা।

ও রাঙ্গা চরণ আজি কি দিয়ে পূজিব শ্যামা,
রাঙ্গা পদে সাদা ফুল দিতে মন জানে না।
মনে করি রাঙ্গা জবা দিলে সাজিবে কিবা,
কিন্তু এমনি চরণ রাঙ্গা, রাঙ্গা জবা তাও সাজে না।

সুর ও কথা— শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

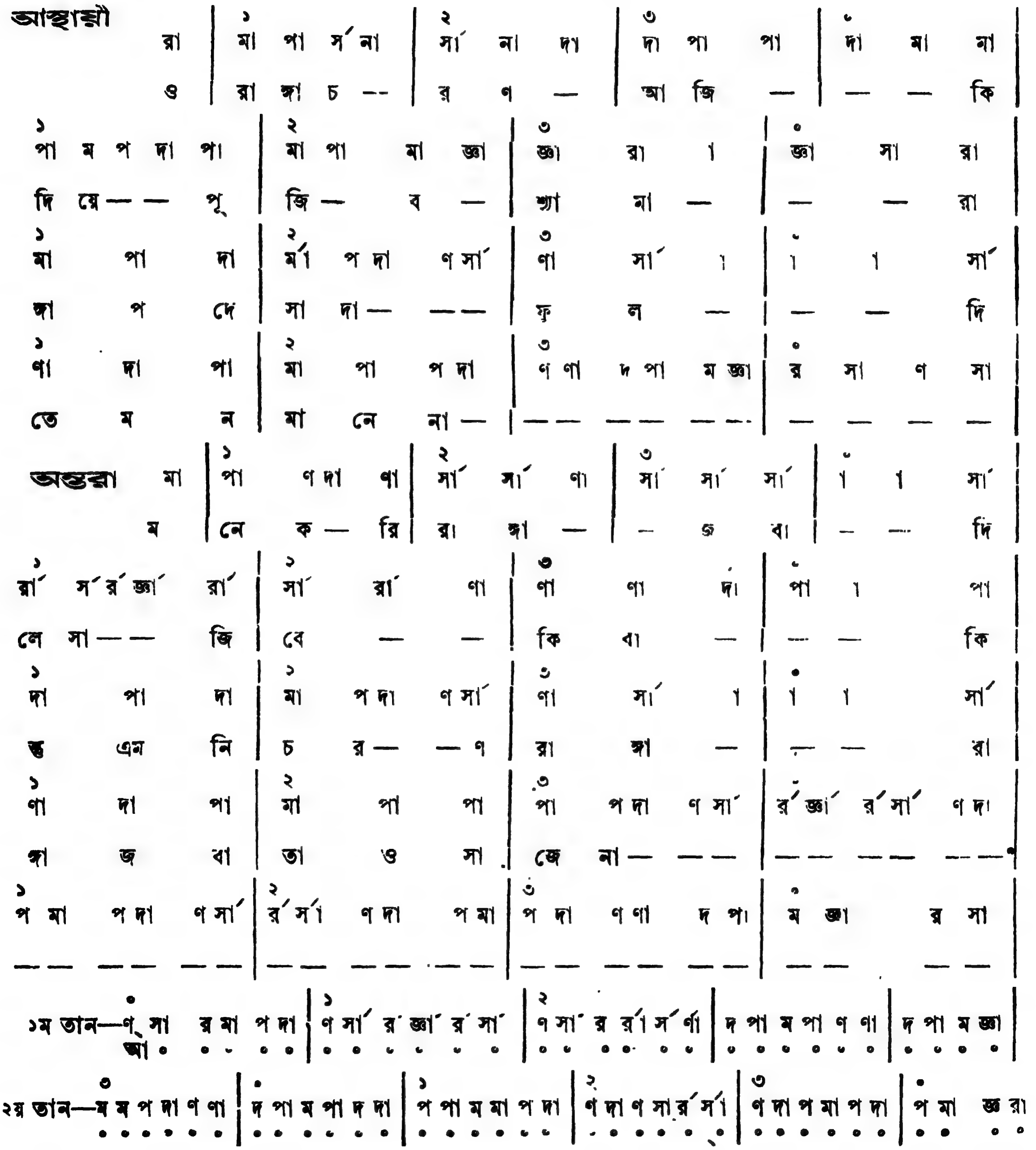
আস্থায়ী
অন্তরা
১ম তান—
২য় তান—

বিজ্ঞাপনে বিপত্তি

প্ল্যাকার্ড লাগাও !

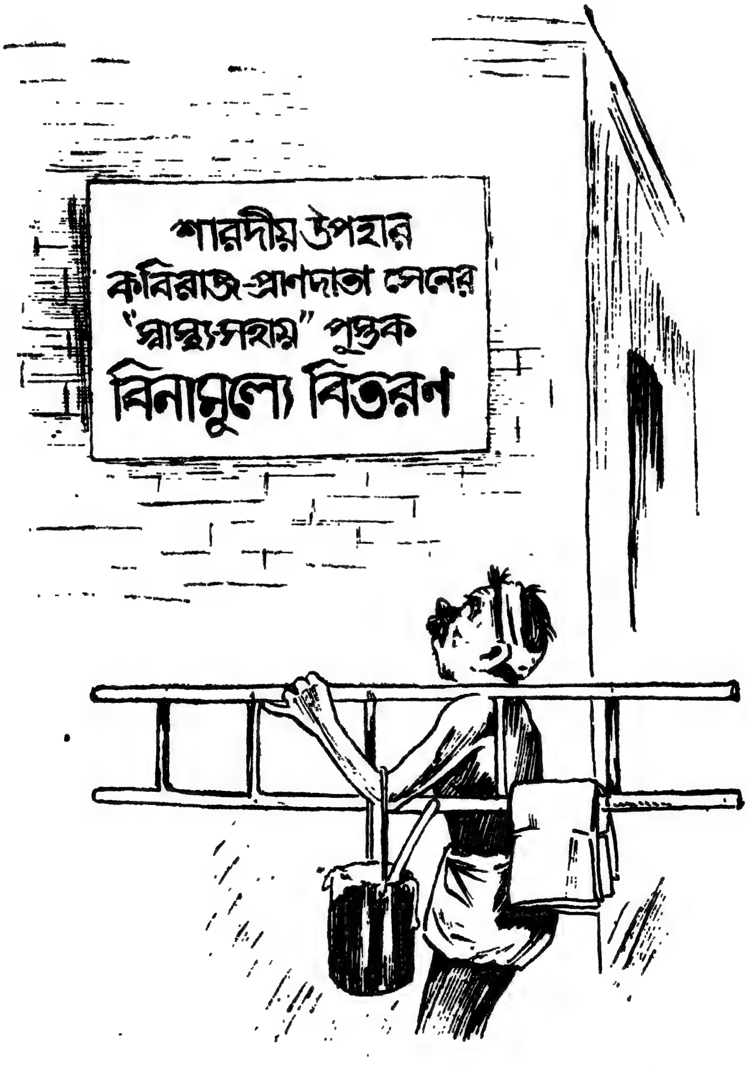
শারদীয় উপহার
কবিরাজ-প্রাণদাতা সেনের
"স্বাস্থ্য-সহায়" পুস্তক
বিনামুল্যে বিতরণ

পূজার বাজারে তাড়াতাড়ি প্ল্যাকার্ড কয়খানা মারিয়া
সরিতে পারিলেই বাঁচি !

প্ল্যাকার্ডের উপর প্ল্যাকার্ড !

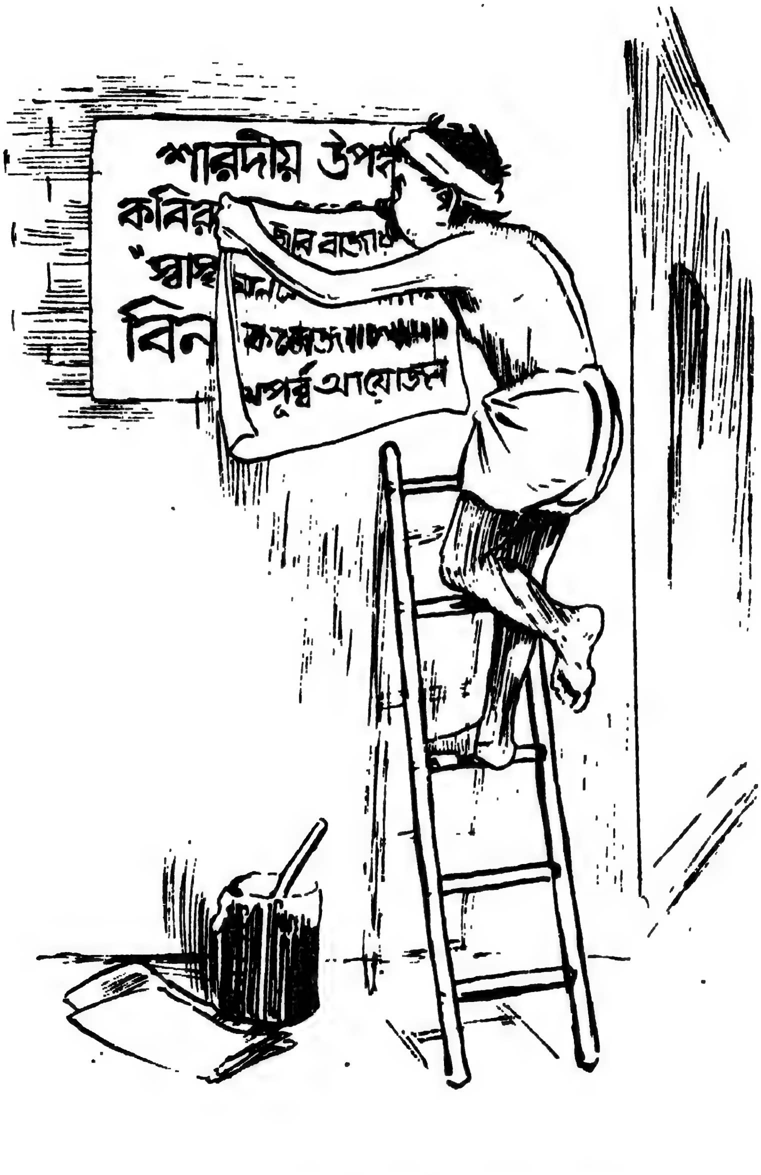
শারদীয় উপন্
কবির
"স্বাস্থ
বিন
রবাজার
সম্পূর্ণ আয়োজন

এই যে—এই একটা প্ল্যাকার্ড মারবার যায়গা—
প্ল্যাকার্ডের উপর প্ল্যাকার্ড মারলে আঠাটাও কম লাগবে

দৃষ্টি আকর্ষণ!

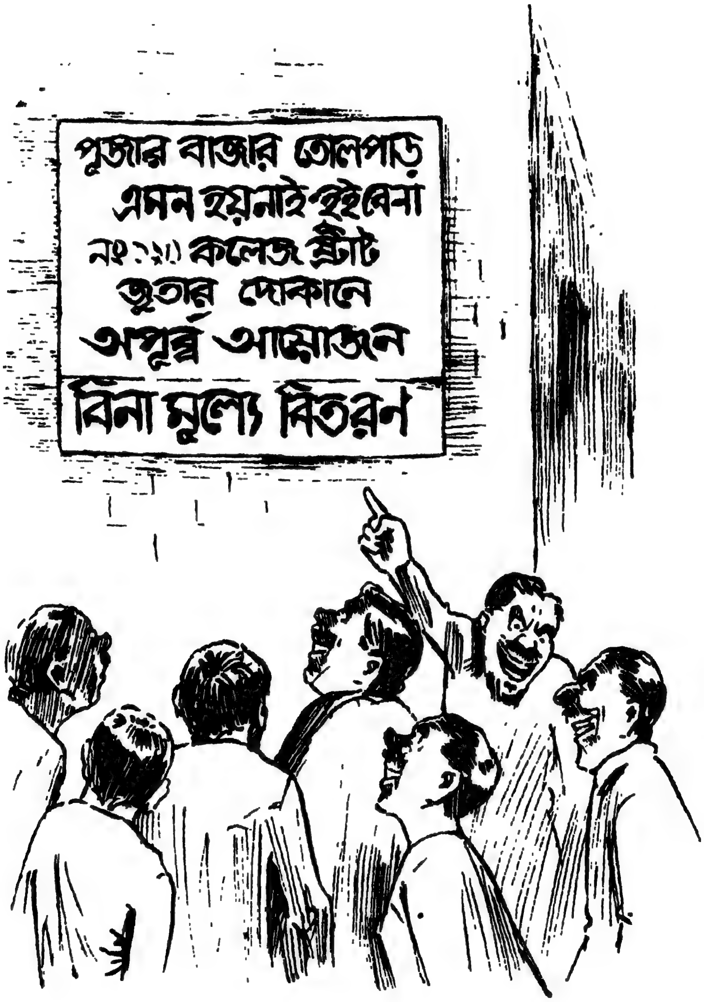
পূজার বাজার তোলপাড়
এমন হয়নাই হইবেনা
নং কলেজ ষ্ট্রীট
জুতার দোকানে
অপূর্ব্ব আয়োজন
বিনা মূল্যে বিতরন

লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—জুতার দোকানে 'বিনামূল্যে বিতরণ!'
'পূজার বাজার তোলপাড়ই' বটে—যে দেখিল, সেই ছুটিল।

আসুন ! আসুন

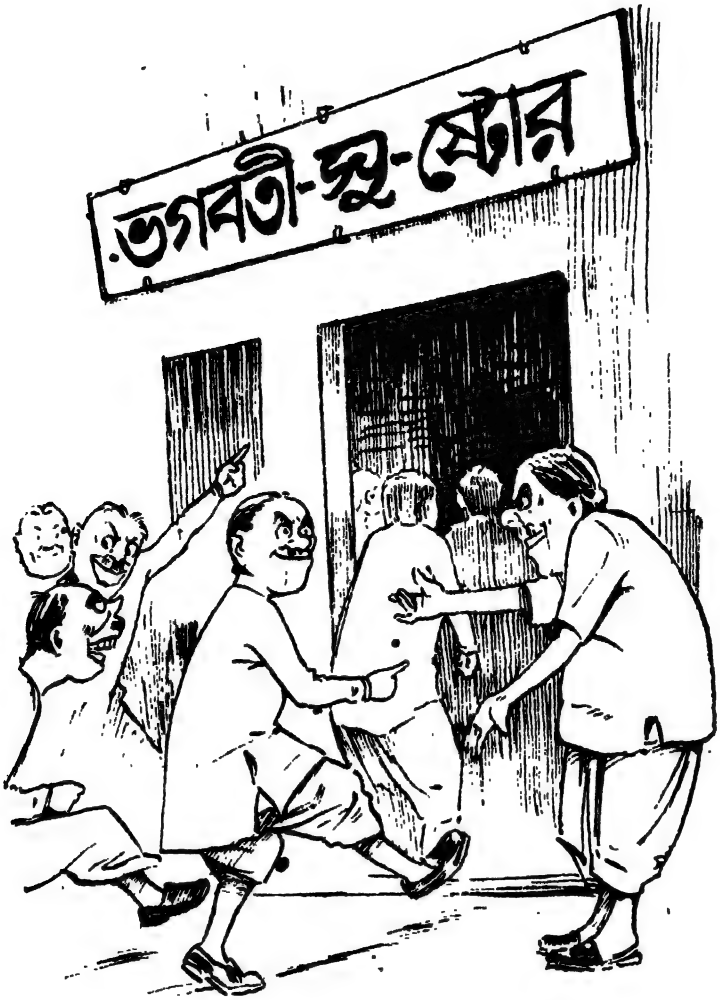

সকলে কাজকর্ম্ম ফেলিয়া একবারে 'ভগবতী-সু-ষ্টোরে' গিয়া হাজির·
আশাতিরিক্ত খরিদ্দার দেখিয়া----দোকানদারের হাসি আর ধরে না-
তিনি সাদরে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

দোকানে বিষম ভিড়।

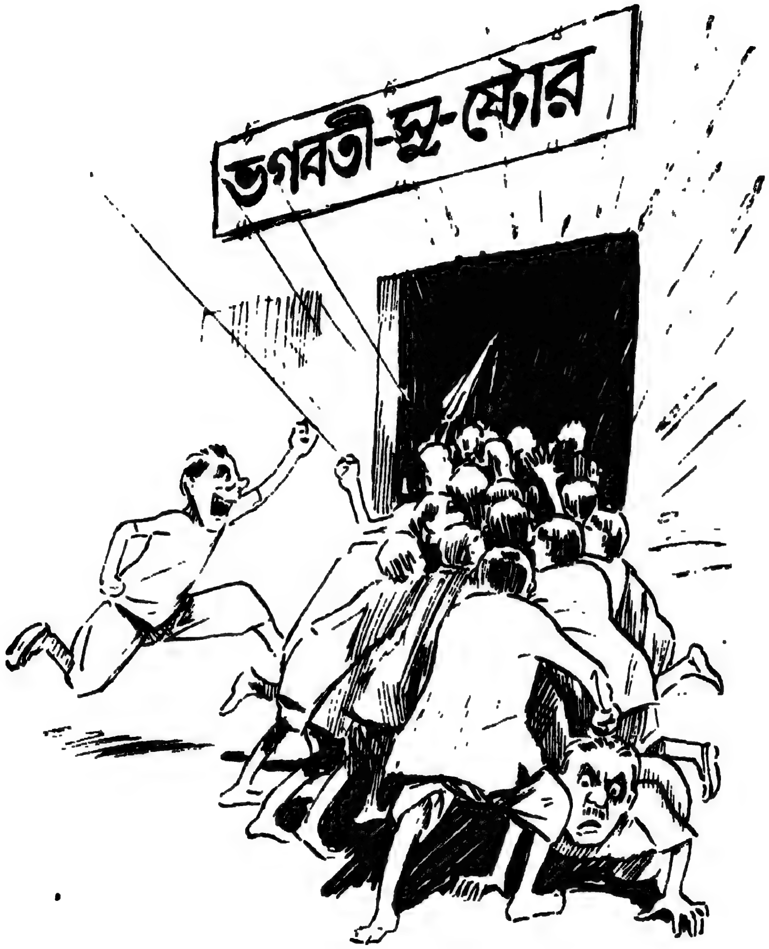

ঠেলাঠেলির চোটে প্রাণ যায়—তবু 'পেটে খেলে পিঠে সয়' ভাবিয়া
লাভের আশায় উৎফুল্ল দোকানদার সকলকে সযতনে
জুতা দেখাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনামূল্যে !

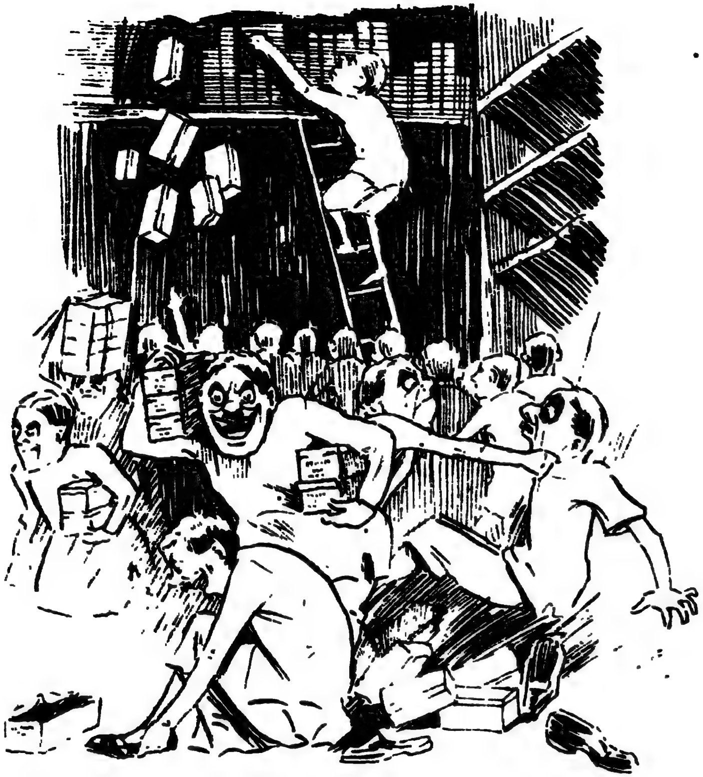

রিদ্দারদের কাণ্ড দেখিয়া দোকানদারের আক্কেল গুড়ুম—খদ্দেরের গাঁদি লাগিয়াছে—যাহার যাহা ইচ্ছা, নিজেরাই জুতার বাক্স পাড়িতেছে—পরিতেছে, বগলে পুরিতেছে, দাম দিবার নামটি নাই—চাইতে গেলেই ঘুসি—'তোম কোন্ হ্যায় ! বিনামূল্যে বিতরণ প্ল্যাকার্ড দিয়াছ, আবার দাম !'

দোকান ফাঁক !

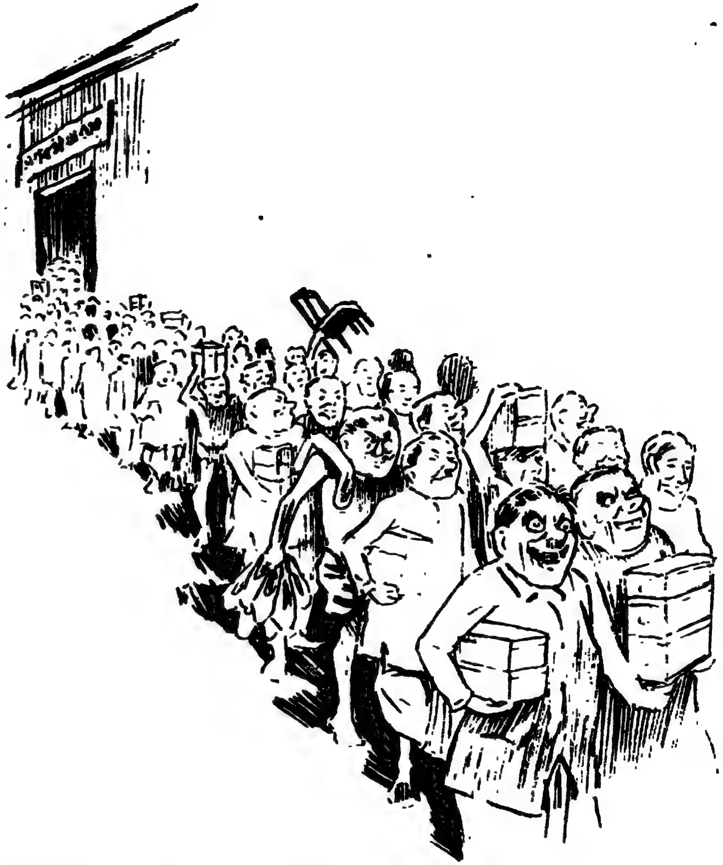

বিনামূল্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই দোকান সাফ ! শেষে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা জুতার অভাবে দোকানের চেয়ার, টেবল, মায় জুতার ফর্ম্মাগুলি পর্য্যন্ত সাবাড় করিয়া—পূজার বাজার সরগরম করিতে করিতে চম্পট দিলেন ! বিজ্ঞাপন সার্থক হইল !

নগদ লাভ !

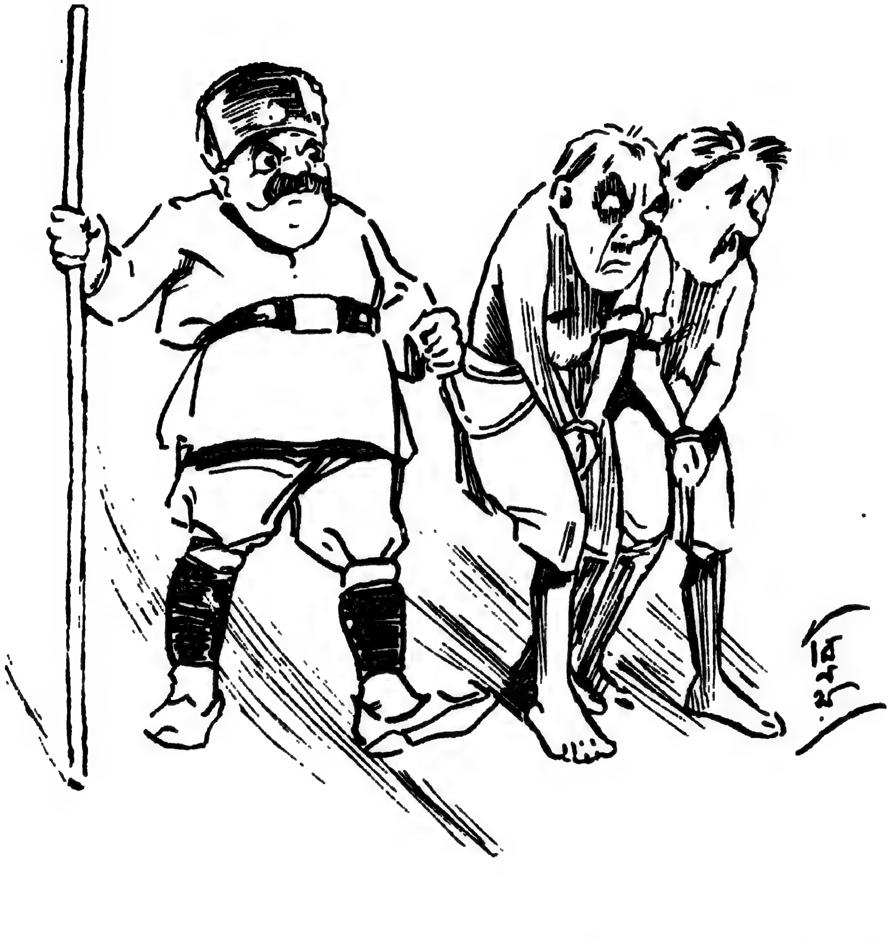

দোকানদারের নগদ লাভ হইল—কিল, চড়, ঘুসি গালি—তাহাতেও নিস্তার নাই, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া হা-হুতাশ করিবারও তিনি বেশীক্ষণ সুযোগ পাইলেন না। দোকান সাফ হইয়া যাইবামাত্র দু’ ঘণ্টার ভিতর পুলিসের দল আসিয়া হানা দিল ! দারোগা খোদাবক্স সাহেব একটি ঘণ্টা নানাবিধ সুমিষ্ট জেরা করিয়া—পরে জামিনে তল্লাস-তদন্ত সারিয়া অনেক গবেষণার পর ‘রিপোর্ট’ লিখিলেন—হিন্দু-মোছলমানের দাঙ্গা—দুই আসামী গ্রেপ্তার !

গ্রেপ্তার

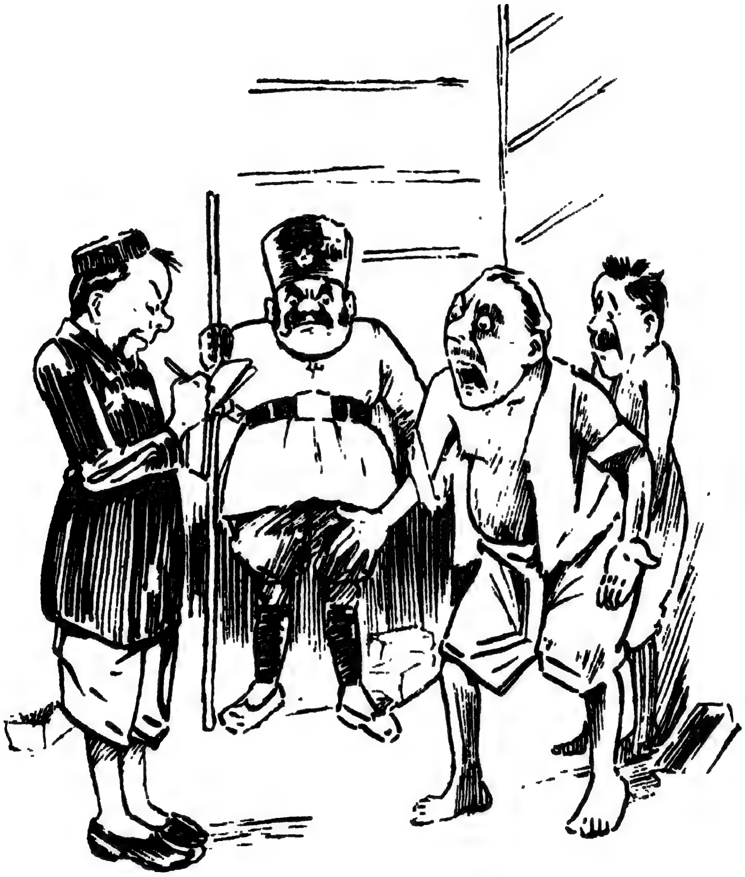

জমাদার জবরদস্ত সিং সদম্ভবিক্রমে আস্ফালন করিতে করিতে চাকর মনিবকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় যাত্রা করিলেন !

[শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু ।

কবির মেয়ে

বৎসর দুই একের মধ্যে আমাদের দলের তিন চারি জন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্তার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মনমরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় এক দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কি না আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙ্গা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় এক দিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত!

—সংবাদ কি?

—কোথায় ছিলি এত দিন?

—গেরুয়া গেল কোথায়?

—ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, "সন্ন্যাসী হয়েছিলুম, ভাই।"

সুরেশ বলিল—"সে ত আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি, তবে ফিরলি কেন?"

দীনবন্ধু বলিল—"ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশী।"

মহেন্দ্র দাদা বলিল, "সেই জন্যই ত পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশী, আর সন্ন্যাসী কম! এই কথাটা বোঝাবার জন্য অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ত এর উত্তর পেতে।"

দীনবন্ধু বলিল—"মহেন্-দা, উত্তরের অভাব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিষ অন্ততঃ তোমার কাছে পাওয়া যেত না।"

মহেন্দ্র বলিল—"কি হয়েছিল, বল ত?"

দীনবন্ধু বলিল—"পৈতৃক বাড়ীখানা বাঁধা পড়েছিল, জান ত! পাওনাদাররা নালিশ ক'রে বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?"

মহেন্দ্র-দা বলিল—"সংসার-সমুদ্রে অর্থই হ'ল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শিকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধ'রে রাখবে বল। কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি। ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ না কি?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল—"না দাদা, আর নোঙরে কায নেই। এই রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।"

সুরেশ বলিল—"আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন আর ফিরেই বা এলে কেন?"

দীনবন্ধু বলিল—"বেরিয়ে যাবার কারণ ত বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।"

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম—"কারণ বলিতেই হইবে।" তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল।

"তোমাদের ত আগেই বলেছি, পৈতৃক আর

স্বোপার্জ্জিত পাওনাদাররা মিলে ভিটেখানা বিক্রী করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরীবাকরীর সুবিধা কোথাও হবে না। ও দিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরোবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবীও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানাদিক ভেবে ঠিক ক'রে ফেল্লুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্। যাহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লালমাটী কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুরবেলায় হরিদ্বারের গাড়ীতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

"হরিদ্বারে গিয়ে ত পৌছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাইনে। অনেকে পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

"হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দ্দেশমতে কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু-দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দেব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করি।

"এই রকম প্রায় মাসখানেক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে এক দিন এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চদরের সাধক ব'লে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকার মধ্যে এঁর মঠ। তিন চারখানি ঘর, তাতে গুটি দুয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

"সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বল্লুম—'বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।'

"সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বল্লেন—'বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।'

"সেখানে দু-তিন দিন থাকার পর এক দিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেয়ে আমি ব'লে ফেল্লুম—'বাবা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।'

"আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বল্লে?'

"স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হ'তে দেখে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'কি, কি বল্লে?'

"এবার আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেল্লুম—'আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—'

"স্বামীজী সেই সুরেই বল্লেন—'কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?'

"কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বল্লেন—'আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছু দিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।'

"জানোই ত! এ রকম ধরণের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যাস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। ব'লে ফেল্লুম—'আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয়নি যে, সে জন্য এই পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে আপনার কাছে আসতে হবে—'

"আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বল্লেন—'তবে ওঠ্। এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।'

"চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বল্লেন—'এখুনি একে মঠের চৌহদ্দী পার ক'রে দিয়ে এস।'

"আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বল্লে—'এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধা হবে না।'

"শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক্ থেকে এক জন লোক আসছে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'চটি কত দূরে?'

"সে বল্লে—'এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।'

"লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না, মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌঁছিবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জ্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

"রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিল। ক'মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যত দূর মনে পড়ে—একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক যায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চল্‌তে সুরু করব।

"একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন্ যে সুষুপ্তির কোলে চ'লে প'ড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

"জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারি দিকে ছোট থেকে বড় একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পিছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে!

"আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাযের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান্ প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়্‌ল।

"মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম—'চল্, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।'

"পিছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বল্লেন, —'তুই ত ভারী অভিমানী ছেলে। চ'লে যেতে বল্লুম বলেই কি চ'লে যেতে হয়?'

"স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বল্লুম—'প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভালই করেছিলেন।'

"স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বল্লেন—'চল্, ফিরে চল্। রাগ করিস্ নি।'

"সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয়, চারদিন পরে স্বামীজী আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হ'লা—'অরূপচৈতন্য।'

"মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাযের মধ্যে ছিল ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না রাত্রি হলেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

"বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুল্‌ত। কিন্তু নির্জ্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরী লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুস্কিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মস্‌গুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হলো।

"মঠে তখন আমরা তিন জনমাত্র শিষ্য ছিলুম।

স্বামীজী এক জনকে সঙ্গে নিলেন, এক জনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ অঞ্চলে আর আমায় বল্লেন—'তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।'

"মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'লো। তিনি আমাদের দুজনকে ব'লে দিলেন—'দুবছর পরে আমি এইখানে ফিরব।'

"বেরিয়ে পড়তে হ'লো। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক, রেল-ভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে রিক্ত। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয়, আর কেউ বা ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি, পরদিন আবার ট্রেণে উঠে চলতে থাকি।

"এই রকম ক'রে অগ্রসর হ'তে হ'তে এক দিন মধুপুর রেলষ্টেশনে এক জন কর্ম্মচারী আমার টিকিট নেই দেখে ট্রেণ থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়ীতে চড়্ব। কিন্তু তা হ'ল না, ষ্টেশন থেকে গাড়ীখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেল-পুলিসের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এ রকম ফ্যাঁসাদে জন্ম আগে আর কখনও পড়িনি। প্রায় আট দশ দিন টানা-পড়েন থানা-পুলিস হ'তে হ'তে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানীর সমস্ত কথা শুনে আমায় বল্লে—'যাও, এমন কায আর করো না।'

"সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই সহরের এক জন ধনী আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'লো না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

"মধুপুর থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই রাস্তা ধ'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে নদীগুলো ভ'রে উঠায় কোনও কোনও যায়গায় পারের জন্য একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। তা না হ'লে সন্ন্যাসীর পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

"মাসখানেক পথ চ'লে বাঙ্গালায় এসে পৌছলুম। বৃষ্টি তখনও থামেনি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ, ঘাট সব জলে ভর্ত্তি, রাস্তাও আর তেমন শুক্‌নো নয়, মধ্যে মধ্যে ভারী কাদা।

"এক দিন,—সে দিন আর কোনও গ্রামের মধ্যে ঢুকিনি। রাস্তা বয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি; কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যার সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার উপরে জলে ভিজে ভিজে ক'দিন থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

"সন্ধ্যার কিছু পরেই আবার বৃষ্টি সুরু হ'লো। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা সেইখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা সুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগ্‌ল।

"আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্য্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে, এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

"দৌড়—দৌড়—দৌড়! কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম ক'রে চল্‌তে চল্‌তে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট্ট একটি চালা-ঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামের রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—'গাঁয়ের ভিতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।'

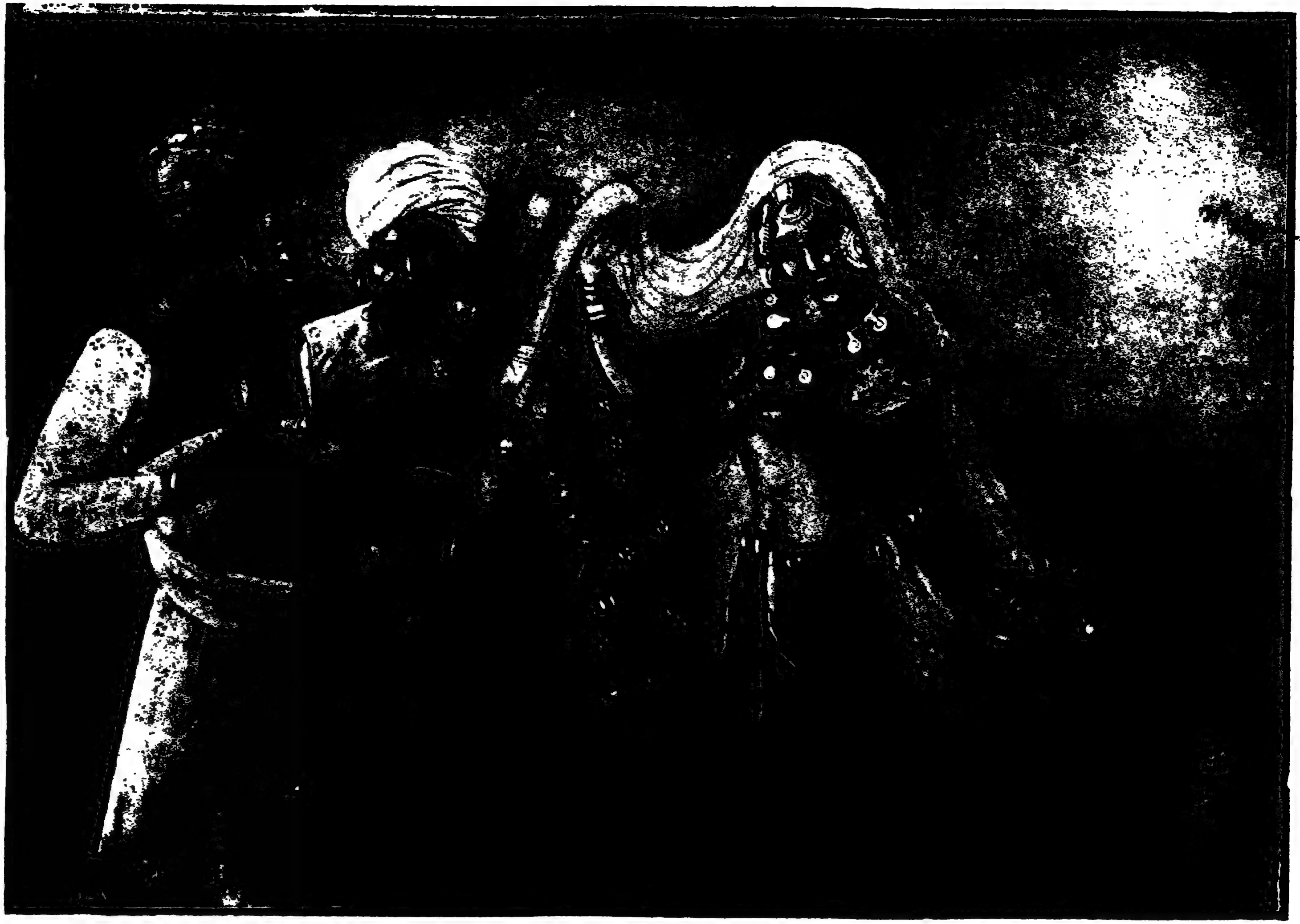

নর্ত্তকী

[শিল্পী —শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার উপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীর যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার উপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

"গ্রাম একেবারে নিশুতি। একে এই দুর্য্যোগ, তার উপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীরা যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ-ত ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্য্যন্ত শুনা যাচ্ছে না। এরই ভিতর দিয়ে আমি পিছ্‌লে পিছ্‌লে টল্‌তে টল্‌তে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তবুও চলেছি। এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

"প্রায় আধঘণ্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'রে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ীর সাম্‌নে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজান ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম,—'বাড়ীতে কে আছেন?' বাড়ীর ভিতরে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল, —'ওরে দেখ, বোধ হয়, ডাক্তার বাবু এলেন।'

"সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে—'কে' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক্ ক'রে নামিয়ে রেখে সে ভিতরে চ'লে গেল।

"একটু পরেই এক জন বিধবা রমণী—'কে'—ব'লে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে গুটি দুই তিন ছেলে-মেয়ে।

"আমি একটু এগিয়ে এসে বল্লুম—'আমি অতিথি। এই দুর্য্যোগে বড় বিপদে পড়েছি; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।'

"রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'তোমার বাড়ী কোথায়, বাবা?'

"বল্লুম—'সন্ন্যাসীর আবার বাড়ী কোথায়, মা!'

" 'ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস, বাবা, ভিতরে এস। ভগবান্ তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙ্গে আসছিল; শোবার জন্য যায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বল্লেন—'বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয়, ভগবান্ এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"ঘুমটুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি বিপদ, বলুন। আমার যদি সাধ্য থাকে—'

"তিনি বল্লেন—'আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় কাস্‌তে কাস্‌তে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয়নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই; ভিন্ গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠান হয়েছে। তা এই দুর্য্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।'

" 'চলুন, তাকে দেখে আসি।'

"এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'রে আমি এসেছি। রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয় ত সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্ম্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্য্যই গ্রাস করেছে।

"অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজিয়ে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম—'এর নাম কি?'

" 'ললিতা।'

"রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম—'ললিতা!'

"ডাকামাত্র তার নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলে।

“রোগিণীর মা বল্লে--‘সন্ধ্যার আগে একবার বমি র সেই যে চোখ বুজেছিল, আর এই খুল্‌ল। াকে কি বল্‌ব, বাবা—’

“আমি বল্লুম—‘আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর র ভয় নেই। কাল ডাক্তার এলে যা হয় া হবে।’

“রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। ই এক কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হ’ল।

“পাশের একটা ঘরে ছেলে-মেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা ছল, ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে লেন।

‘তখনও বৃষ্টি থামেনি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুমপাড়ানিয়া র গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের রুগ্না মেয়েটির জীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে ক। তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত কর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগ্‌ল।

“ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিট্‌ মিট্‌ ছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প’ড়ে অঘোরে নিদ্রা চ্ছ। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তার ভাল ক’রে দেখা যাচ্ছিল না। আমি খাটের ধারে য় ঝুঁকে তার মুখখানা দেখতে লাগ্‌লুম।

“একদৃষ্টে তাকে দেখ্‌ছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা চ্ছে কি না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা ত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবনপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, কোনও মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ ার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে গ উঠল—‘কে! কে তুমি?’

“আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে রেখে ম—‘কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।’

“‘সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ঐ জানালার রে ব’সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?’

“আমি বল্লুম—‘তুমি ঘুমোও। বেশী কথা বল্লে অসুখ ড়বে।’

“‘কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।’

“স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বক্‌ছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—‘তুমি চোখ বুজোও, ঘুমোও।’

“মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনীতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজলো।

“একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। আমি ব’সে ব’সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগ্‌লুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায়নি। তোমাদের সত্যি বল্‌ছি, সেখানে ব’সে ব’সে আমার মনে হ’তে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ’লে কোথাকার লোক আমি আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব’সে কাকে বাতাস করছি। আশ্চর্য্য দৈবের খেলা!

“সূর্য্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছে নি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাসে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় ব’সে থাকতে দেখে বল্লেন—‘সারারাত্রি এইখানে ব’সে আছ, বাবা? তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ’লে—’

“তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লুম—‘আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।’

“আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌ল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব’লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক’রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক’রে আমাকে নমস্কার করলে।

“সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ীর অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন এক জন কবি, কাযেই দরিদ্র। চাকরী-বাকরীর চেষ্টা চার পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনাও হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া

চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছরখানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তার পরে আজ ছ'মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিন্‌গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠান হয়েছিল, লোকও ফেরেনি, ডাক্তারও আসেনি।

"ললিতার মা'র বয়সও বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেল্লেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, ললিতা বাঁচবে ত? কর্ত্তার বড় আদরের মেয়ে ও।'

"আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করলুম। বল্লুম, 'না বাঁচবার ত কোন কারণ দেখ্‌ছি না—ও সেরে উঠ্‌বে।'

"তিনি বল্লেন—'তুমি কটা দিন এখানে থাক, বাবা! তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।'

"মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বল্লুম—'বেশ, আমি আছি।'

"ললিতার মা সংসারের কাযে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্য বল্লুম—'ললিতা, গল্প শুন্‌বে।'

"সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে—'হ্যাঁ, বলুন, শুন্‌ব।'

"একটা গল্প বল্লুম। সে শুনে বল্লে—'এ গল্প আমি জানি।' আর একটা বল্লুম, সে বল্লে—'এ-ও আমি জানি।'

"সকালবেলা গল্প ক'রে কাট্‌ল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিল। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্য দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে, 'রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুসফুসে আর কিছু নেই। যে কোন মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হ'ে পারে।'

"বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আমি অস্তোন্মুখ রবির এক টুক্‌রো ম্লান রশ্মি খোলা জানা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললি অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে- 'সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না

"আমি বল্লুম—'সে কি! কে বল্লে তোমাকে ডাক্তার বল্লে, তুমি শীগ্‌গীর সেরে উঠ্‌বে। ও সব ক ভাবে না, লক্ষ্মীটি।'

"আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুসীতে ভ'ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—'না না, সন্ন্যাসী, আমি ত ে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠ্‌ব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়স, এই বয়সে কি মরতে ইচ্ছা হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক।'

"এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বল্লুম— 'ললিতা, গল্প শুনবে?'

"ললিতা একটু হেসে বল্লে,—'না, গল্প নয়। ঐ তাকের উপরে কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।'

"তাকের উপরে সারি সারি ইংরাজী, বাঙ্গালা কবি- তার বই সাজান ছিল। একখানা বাঙ্গালা বই নিয়ে এসে বল্লুম—'কোন্‌টা পড়্‌ব?'

"ললিতা বল্লে—'যেটা ইচ্ছা পড়।'

"আমি পড়তে লাগলুম আর ললিতা চোখ বুজিয়ে রইল। একটার পর একটা প'ড়ে যাই, তার আ ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অমিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অ কাযে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নাই। একবা সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ করলু কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বল্লে—'কৈ, পড়ছ না?'

"আবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতা

দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

"তার সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম। ললিতা তখনই চোখ চেয়ে বল্লে—'থামলে যে?'

"আমি বল্লুম—'আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে। কি বল?'

"ললিতা বল্লে—'আচ্ছা।'

"তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বল্লে, 'সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পার্‌তেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক'রে কখনও চ'লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ঐ বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে—সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব'সে ব'সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র-মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে ঘাটে কত খেলাই করেছি। আজ প্রায় ছ-মাস হ'লো বাড়ী থেকে বেরুইনি। প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কত দিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী?'

"ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—'তুমি শীগ্‌গীর সেরে উঠবে। সেরে উঠ্‌লে আবার আমরা তেমনই ক'রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক্‌।'

"আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্লুম—'তুমি ঘুমোও, লক্ষীটি, তা না হ'লে আবার অসুখ বাড়বে।'

"ললিতা আর কিছু না ব'লে চোখ বুজিয়ে ফেল্লে।

"সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠলো। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাস্‌তে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন্‌ অমিতা এসে আর্ত্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগলো। বাতাস কর্‌তে কর্‌তে একটু যদি যন্ত্রণা কমে ত অমনই কাসি সুরু হয়, তার পরেই দু ঝলক লাল টকটকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্য সে কি চেষ্টা! শতচ্ছিদ্র ফুস্‌ফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মারুগীকে যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হ'তে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে ত মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিন জনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব'সে ব'সে কাটালুম।

"ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা বয়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাই-বোন্‌দের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক'রে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—'সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি?'

"'হ্যাঁ।'

"'এখন গঙ্গার দুকূল ভ'রে উঠেছে, না?'

"'হ্যাঁ।'

"'আচ্ছা, সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধারে সেই যে বড় বটগাছটা—সেটা দেখেছ?'

"'হ্যাঁ।'

"'তারই একটি মোটা শেকড় মাটী থেকে ধনুকের মত হ'য়ে উঠে আবার মাটীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে—সেটা দেখেছ?'

"'কৈ, তা ত' দেখিনি!'

"'তা হ'লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কত দিনে যে গঙ্গার আবার সে রূপ দেখতে পাব!'

"ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ভাই-বোনেরা চ'লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বোল্লে—'সন্ন্যাসী, এই সময় মাঠে খুব কাশ-ফুল হয়। আমার জন্য কাল এক গোছা তুলে আন্‌বে?'

"আমি বল্লুম—'কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার

জন্ত কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।’

“ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুসীই কচ্ছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে এই মিষ্টি রোদ—এই শেষ—সব শেষ। আর দেখ্‌তে পাব না।’

“ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে, চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম—ছি, এত কোমল তুমি!

“ললিতাকে বল্লুম—‘ললিতা, ও সব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।’

“ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি। এবার সে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, আমার জন্ত তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম’রে যাই—আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম’রে গেলে তুমিও ত এখান থেকে চ’লে যাবে। তার পর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জ্জনে পাড়া-গাঁয়ের এই ললিতার কথা—যার সঙ্গে দুদিনের জন্ত তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাক্‌বে?’

“আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বল্লুম, ‘থাক্‌বে, ললিতা! তোমাকে কখনও ভুলব না।’

“ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—‘আ সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল।’

“ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জ্জনে ডেকে বল্লুম—‘ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয়, দুই এক দিনের বেশী বাঁচবে না।’

“কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি—তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোনও কথা না ব’লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যোবিধবা সেই নারীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব’সে ব’সে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর এই অতি পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতি-বারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতীকার নাই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নাই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মা’র অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স’রে গেলুম।

“বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

“সে দিন সন্ধ্যার দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙ্গল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ান হয়েছিল। আমি তার পাশে বসেছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধ’রে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, ঠিক ক’রে বল ত, আমি বাঁচব কি না? দেখ, আমার কাছে গোপন ক’রো না? যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ’লে তোমায় একটা কথা ব’লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি ম’রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল—বল—আমি কি আর বাঁচব না?’

“ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ’লো না। ব’লে ফেল্লুম—‘তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও মুহূর্ত্তে মৃত্যু হ’তে পারে।’

“আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—‘বড় উপকার করলে তুমি আমার! এ কথাটা তোমায় না বল্লে মরেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?’

“‘বল শুনি!’

“‘আমি তোমায় ভালবাসি।’

“এ্যা! আমার সন্দেহ হ’লো যে, বিকারের ঝোঁকে

সে বুঝি ভুল বক্‌ছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—‘ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশী কথা কইলে—’

“ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক’রে ব’লে যেতে লাগল—‘দেখ,সন্ন্যাসী,জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক’রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারীধর্ম্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম—আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্য। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোনো—আমি তোমায় ভালবাসি।’

“আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক’রে দেখ। বাক্‌পটুতার জন্য তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু-দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না! স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব’সে রইলুম।’

“ললিতা আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—‘সন্ন্যাসী, এ দিকে ফের, আমার দিকে চাও।’

“আমি তার দিকে চাইলুম। সে বল্লে, ‘তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?”

“আমি কি বল্‌ব। তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্য্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তার জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব’লে ফেল্লুম—‘বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?’

“বলেই মনে হ’লো, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

“ললিতা আমার কথা শুনে বল্লে,—‘বুঝতে পারি। সেই জন্যই ত তোমাকে ভালবেসেছি।’

“আমি বল্লুম, ‘ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক’রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।’

“ললিতা একটু হেসে বল্লে, ‘শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিশব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—’

“ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারীজীবনে প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

“ললিতা জিজ্ঞাসা কল্লে—‘তোমার নাম কি, সন্ন্যাসী?’

“আশ্চর্য্য! এত দিন সে আমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে সন্ন্যাসী বলেই ডাকৃত। আমি বল্লুম—‘আমার নাম দীনবন্ধু।’

“সে বল্লে, ‘না না, ও নাম ভাল না। ও আবার কি নাম!’

“বল্লুম, ‘তা হ’লে তুমি আমার একটা নাম দাও।’

“ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বল্লে—‘সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?’

“আমার হাসি পেল। বল্লুম, ‘তোমার যে নাম ইচ্ছা, সেই নাম ধরেই আমায় ডেকো।’

“সে বল্লে, ‘দূর, তোমার নাম বুঝি আমার ধরৃতে আছে?’

“একটু চুপ ক’রে সে আবার বল্লে, ‘ওগো, তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় একটু দাও না।’

“আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বল্লে—‘ওগো, আর একবার—ওগো, আর একবার!’

“আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ’লো। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ’রে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ’লো।

“পরদিন সন্ধ্যার সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।”

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র দাদা জিজ্ঞাসা করিল—“গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?”

দীনবন্ধু বলিল, “শ্মশানঘাটে স্নান ক’রে নূতন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।”

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মাসী

১

সকালবেলা অশ্রু-লাঞ্ছিত গণ্ডে উভয় হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া অস্ফুট স্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মীনু আসিয়া মায়ের জানুদেশে মুখ লুকাইল।

"কি হয়েছে রে?"—বলিয়া মা তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আপনার জানু হইতে খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

মীনু আরও জোরে শক্ত করিয়া মা'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

মা সস্নেহে অভিমানিনী কন্যাকে জানু হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? সকালবেলাই কান্না কেন?"

ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে মীনু বলিল, "অজিত মেরেছে।"

"অজিত মেরেছে? তারই জন্য কান্না? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! ও যে তোমার ছেলে হয়, তুমি হচ্ছ ওর মাসী, ওর মারে তুমি কেঁদে ফেলেছ?"

লজ্জিতা মীনু ময়লা ফ্রকের প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অপ্রতিভ স্বরে বলিল, "শুধু মারেনি, আমার রবারের বেলুনও কেড়ে নিয়েছে!" মীনুর চক্ষুতে আবার বন্যা আসিল।

মা আনতা হইয়া অঞ্চল-কোণে কন্যার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "তারই জন্যে তুমি কাঁদছ? কিন্তু তুমি অজিতের মাসী—তোমার ত নিজ থেকেই বেলুনটা তোমার ছেলেকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

মীনু লজ্জিত হাস্যে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, মা, না, তার জন্যে আমি কাঁদবো কেন? বেলুন ও নিক্ না, কিন্তু ও যে আমার সঙ্গে আর খেলবে না বলেছে!"

মীনুর ধূলি ও অশ্রু-লাঞ্ছিত সুন্দর কচি মুখখানি অঞ্চল দিয়া সস্নেহে পরিষ্কার করিতে করিতে মা হাসিমুখে বলিলেন, "বললেই বা! ওর কথা কি তোমার গ্রাহ্য করতে আছে? তবে তুমি কি রকম মাসী! অজিত তোমার ছেলে কি না, ওর কথায়—ওর মারে কাঁদতে নেই, বুঝেছ?"

মীনু নিতান্ত লজ্জিতভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চপলচরণে শশক-শিশুর মত ছুটিয়া পলাইল। তাহার ক্রন্দনারক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে তখন হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ষণান্তে স্বর্ণ রৌদ্ররেখার ন্যায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে।

অজিত ছিল মীনুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, মীনুর বিধবা বড়দিদির একমাত্র সন্তান। পিতৃ-মাতৃহীন অজিতকে নিরাশ্রয় করিয়া তার মা'ও যখন পরপারে যাত্রা করিল, তখন মীনুর মা কন্যাশোক সংযমিত করিয়া পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্রটিকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

স্বাস্থ্যসবল হৃষ্টপুষ্ট অজিতকে মীনু অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক বলিয়া ভ্রম জন্মিত। দৈহিক আয়তনে বড় হইলে কি হয়? পিতৃমাতৃহীন বালক মাতামহীর স্নেহাদরে লালিত হওয়ায় তাহার স্বভাবটি হইয়াছিল নিতান্ত শিশুর মত চঞ্চল, অবুঝ, আবদারী, অভিমানী।

মীনু বাহিরে গিয়া হাসিমুখে রাঙা বেলুনের স্বত্ব ত্যাগ করিবামাত্র অজিত খুসী হইয়া সন্ধিস্থাপনা করিয়া ফেলিল,—"মীনু ভাই, দাদুকে ব'লে আমি তোকে একটা বেলুন কিনে দেব।"

"না, না, আমার দরকার নেই। ও বেলুনটা আমি তোকে আগেই দিতুম, ভাই! আমি তোর মাসী হই কি না, আমাকে দিতে হয়।"

চিন্তিত মুখে অজিত বলিল, "আচ্ছা, তুই যদি আমার মাসী হ'স, আমি তা হ'লে তোর কে হই, বল দিকিন?"

আনন্দ-দীপ্ত মুখে মীনু বলিল, "ছেলে!"

"দূর! তা কি হয়? আমি তোর চেয়ে ক—ত বড়! আয় না, মেপে দেখ্!"

শঙ্কিত মুখে মীনু বলিল, "না, না, তুমি আমার ছেলে হও, মা ব'লে দিয়েছেন। তাই ত তোমাকে খেলনা দিয়ে কাঁদতে নেই!"

ভ্রূকুটিপূর্ণ সন্দিগ্ধ মুখে অজিত বলিল, "আচ্ছা, চল্ দিকিনি দিদা'র কাছে।"

মীনু উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, "হ্যাঁ, চল না।"

উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে অন্তঃপুরে আসিয়া প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, দিদা, মিনি আমার কে হয়?"

“হ্যাঁ মা, আমি অজিতের মাসী নই ?”

মা কুটনা কুটিতে কুটিতে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন,—“থাম্ থাম্,বঁটীর উপরে প’ড়ে গিয়ে খুন হবি যে।” চলনবেগ সংবরণ করিয়া তাহারা আবার উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল। মা বঁটীখানি কাৎ করিয়া রাখিয়া অজিতকে উভয় বাহু-প্রসারণে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, “মীনা তোমার মাসী হয়, দাদা !”

মীনু আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অজিতের উদ্দীপ্ত মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে দিদিমার ক্রোড়ের মধ্যে নিজের শরীরটাকে একটা বিপুল ঝাঁকুনি দিয়া অসন্তোষ এবং আবদারের সুরে বলিল, “ও আমার মাসী হয়, আমি তা হ’লে ওর কে হই ? আমি যদি ওকে ‘মাসী’ ব’লে ডাকি, ও আমাকে কি ব’লে ডাকবে ?”

মাতা হাসিতে হাসিতে অজিতের গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলেন, “তুমি ওর বোন্-পো হও, ও তোমাকে ‘ছেলে’ ব’লে ডাকবে।”

বিদ্রোহী অজিত সজোরে মাথা নাড়িয়া বিরক্ত স্বরে কহিল, “না, আমায় ‘ছেলে’ বলতে হবে না ! ও কি আমার চেয়ে বড় ? ঐটুকু মিনিকে আমি কক্ষনো ‘মাসী’ বল্‌ব না। আমি ওর চেয়ে ক—ত বড় বল ত ?”

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা হ’লে তুমিই ওকে মেয়ে ব’লে ডেকো ও তোমাকে ‘বাবা’ বল্‌বে—কেমন ?”

অজিত আরও রাগিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, না, তাও হবে না। মীনুর বাবা ত দাদু ! আমি কেন হ’তে যাব ? আমি বাবা হ’তে চাই না !”

মা বলিলেন, “তবে তুমি মীনুর কে হবে, বল, শ্বশুর ?”

রাগান্বিত অজিত বুঝিল, দিদিমা পরিহাস করিতেছে। সে ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে দিশাহারা হইয়া আরও জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, “না না, কিচ্ছু না, আমি ওর কেউ হব না। ভারী ত ঐটুকুন মেয়ে !”

মীনুর ম্লান মুখখানি ক্রমশঃ অশ্রুসজল হইয়া আসিতেছিল, অভিমানিনী কন্যার ছলছল নেত্রের প্রতি কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষিপ্ত নাতির বিপর্য্যস্ত কেশগুলি গুছাইতে গুছাইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বলিলেন, “আচ্ছা, ওকে তোমার কিছুই বলতে হবে না। কিন্তু তুমি যখন ওর চেয়ে অনেক বড়—ও তা হ’লে তোমাকে কি ব’লে ডাকবে, সেটা ব’লে দাও !”

“না, না, ওকে কিচ্ছু বলতে হবে না, হুঁঃ !”

তার চেয়ে তুমি ওকে ‘মিনু মাসী’ ব’লে ডেকো, ও তোমাকে ‘অজি মামা’ ব’লে ডাকবে, সেই বেশ হবে, কেমন ?”

এবারও অজিত প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল,—“না, তা হবে না। আমি ওর চেয়ে ঢের বেশী বড়, ও যদি আমাকে ‘দাদা’ বলে, তবে আমি ওকে ‘মাসী’ বলবো !”

মীনুর বাবা বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে কন্যা ও দৌহিত্রের কলহ শুনিতেছিলেন, উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“দূর শালা !”

অপ্রতিভ অজিত দিদিমার ক্রোড় হইতে নিজেকে সজোরে ছিনাইয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মীনুও তাহার পিছু পিছু ঝুম্‌কো কালোচুলে ঢেউ তুলিয়া, অর্দ্ধমলিন গোলাপী ফ্রকের লেশের ঝালর দোলাইয়া, প্রভাত হাওয়ার মত চপল লঘু নৃত্যতালে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

২

পাঁচ বছরের মীনু এখন বারো বছরের, আর দশ বছরের অজিত সতেরো বছরের হইয়াছে। অজিত মীনুকে আর ‘মাসী’ ব’লতে আপত্তি করে না, মীনুও যখন-তখন মাসীত্বের দাবী লইয়া মায়ের কাছে সাশ্রু নেত্রে নালিশ করিতে ছুটে না। অজিত মীনুকে ডাকে ‘মীনু মাসী’ আর মীনু অজিতকে ডাকে, ‘ছেলে।’

অজিত স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার ছোট পড়ার ঘরখানি সৌখীন-রুচিতে সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। বায়স্কোপ, থিয়েটার, মিটিং, বক্তৃতা, পলিটিক্‌স, সোসিয়্যালিজিম, ইংরাজী সংবাদপত্র, বন্ধুবান্ধব ও কলেজ লইয়া অজিতের দিনগুলি কোথা দিয়া কাটিয়া যাইতেছে, তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না।

আর মীনু মায়ের কাযের সাহায্য করে, পান সাজে, কুটনো কোটে, বাবার ও অজিতের মোজা মেরামত করে, কাপড় রিপু করে, জামার বোতাম বসায়। অবসরমত ‘রয়্যাল রিডার নম্বর থ্রী’ বইখানি পড়িতে বসে। সে আগে স্কুলের গাড়ী করিয়া স্কুলে যাইত, কিন্তু এখন আর তা যায় না, কারণ, তাহার বারো বৎসর বয়স হইয়াছে, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।

বিকালবেলা মীনু কাপড় কাচিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চাঁদের আলো রঙ্গের ডুরে শাড়ীখানি সেমিজের উপর গুছাইয়া পরিতেছিল, অজিত মুগা'র পাঞ্জাবী দোলাইয়া ব্যস্ত ভাবে সেই দিকে আসিয়া বলিল—"মীনু মাসী! একটা চুলের কাঁটা দে ত!"

মীনু কাপড় পরা শেষ করিয়া শাড়ীর প্রান্তে চাবির গুচ্ছ বাঁধিতেছিল। চাবিবদ্ধ আঁচলটা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া, সযত্নরচিত উঁচা জাপানী খোঁপার উপর আলগোছে একবার বাম হাতখানি বুলাইয়া লইয়া বলিল,—"আমার খোঁপায় সেলুলয়েডের ক্লিপ আছে, লোহার কাঁটা নেই!" চঞ্চল অজিত অধীরভাবে বলিল, "একটাও নেই? আঃ, তোরা যে কি-ই ফ্যাসান করতে শিখেছিস্! মেমেদের মত ক্লিপ ইউজ করা!"

ভীত উদ্বিগ্ন মুখে মীনু বলিল, "সেফটিপিনে হবে কি?"

সাগ্রহে ঝুঁকিয়া অজিত বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দে, শীগ্গির—"

বাম হাতের সোনার চুড়িতে দুই তিনটা সেফটিপিন আটকান ছিল, মীনু তাড়াতাড়ি একটা খুলিয়া অজিতের হাতে দিল। সেফটিপিন লইয়া অজিত অতি ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মীনু ভিজা কাপড় বারান্দার রেলিঙ্গের উপর শুকাইতে দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, অজিত কেন তাহাকে এত তাচ্ছীল্য করে? সে অজিতের চেয়ে বয়সে ছোট, এ ছাড়া আর তার কি ত্রুটি আছে?

বারান্দার থামের উপরকার টব হইতে বিলাতী ফুলের তীব্র গন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মীনা চিন্তা-ম্লান মুখে ছাতে উঠিবার কাঠের সিঁড়ির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হয়? সে ত অজিতের আপনার মাসী, বয়সে ছোট বলিয়া অজিত তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে কেন?

দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কটাও তাহাদের মধ্যে এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অজিত জানে, সে যাহা পায়, তাহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, ইহার মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব নাই। আর মীনু জানে, তার দেওয়ারই কথা, ত্রুটি হইলে অজিত অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অজিতের জন্য মীনু নিজের হাতে সুন্দর সুন্দর রুমাল তৈয়ারী করিয়া, কোণে ফুল-লতা আঁকিয়া তাহার মধ্যে অজিতের নামে মনোগ্রাম করিয়া দেয়, ভাল কারুকার্য্যখচিত টেবল্-ক্লথ, জানালার সৌখীন পর্দ্দা সযত্নে বহু পরিশ্রমে নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া দেয়। অজিত গম্ভীরভাবে গ্রহণ করে, যেটা অপছন্দ হয়—'এটা ক্যাডাভারাস্ হয়েছে। অসভ্য ডিজাইন।' এমনই একটা কিছু বলিয়া নিন্দা করে; ভাল হইলে প্রায়ই কিছু বলে না।

মীনু মায়ের সঙ্গে নানা রকম খাবার তৈয়ারী ক'রে অজিতের পাতে দিয়া হয় ত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা ছেলে, বল ত আজকের কপীর কচুরীটা কেমন খেতে হয়েছে?"

অজিত খাইতে খাইতে গম্ভীর ঔদাস্যভরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়—"মন্দ নয়।"

তাহার পর অজিত হয় ত কোনও দিন মীনুকে শুনাইয়া বলে, তাহার কোন বন্ধুর বোন্ কি চমৎকার খাবার তৈয়ারী করিতে পারে। সে খাবার একবার খাইলে বহু দিন তার আস্বাদ ভোলা যায় না। শুধু খাবার তৈয়ারী নয়, তার মত গান গাহিতে এবং এস্রাজ বাজাইতেও না কি কম মেয়ে পারে। পড়াশুনাতেও তার খুব মনোযোগ, হাতের সেলাইও অতি চমৎকার, অথচ বয়সে সে মীনুর চেয়ে ছোট।

সে দিন মীনুরাণীর খাবার তৈয়ারীর সমস্ত উৎসাহই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিভিয়া যায়,—সে মনে মনে ভাবিতে থাকে, সে কেন এমন মূর্খ হইল!

মীনু অজিতকে এক জন অসাধারণের মধ্যে গণ্য করিয়া মনে মনে তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিত; কিন্তু অজিত কোনও দিন কল্পনাই করিতে পারিত না—ছোট্ট মীনুমাসী—সে আবার আলোচনা, নিন্দা, প্রশংসা বা চিন্তার যোগ্য মানুষ হইতে পারে!

এইরূপে বিভিন্ন মনোভাবে দুইটি তরুণ-তরুণীর চিত্ত অভিভাবকদের স্নেহচ্ছায়াতলে পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিতেছিল।

* * * *

দ্বিপ্রহরে তীব্রোজ্জ্বল রৌদ্র কলিকাতা মহা নগরীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বচ্ছ নীল আকাশ গলিত অগ্নিধারা-সিক্ত হইয়া আলোক-প্রতিফলিত একখানি প্রকাণ্ড

আয়নার মত দৃষ্টি ঠিক্‌রাইয়া দিতেছিল। শুভ্র মল্লিকা-দামের মত এক এক স্তবক মেঘ আকাশের এ দিকে ও দিকে লঘুভাবে লাগিয়া আছে। চিলগুলি প্রায় মেঘের কাছ বরাবর উঠিয়া তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকারে ক্রমাগত পাক্ খাইয়া ঘুরিতেছিল। রাস্তার গলীতে গলীতে বাসন-বিক্রেতাদের ঢং—ঢংঢং কাঁসির আওয়াজ ও জামা-বিক্রেতাদের 'বডী—জা—মা - সে—মিজ চাই'র সুর ব্যতীত অন্য ফেরীওয়ালার শব্দ নাই।

মীনু মায়ের ঘরের জানালায় বসিয়া নীল ভেল্‌ভেটের উপর সিল্কের ফুল, জরি, পুঁতি প্রভৃতি বসাইয়া কৃত্রিম লতা-পুষ্প তুলিয়া একটা অ্যাল্‌বাম তৈয়ার করিতেছিল।

চাঁপা রঙ্গের সিল্কের টুকরা কাটিয়া একটি সুদৃশ্য চাঁপাফুল ভেলভেটের উপর বসাইতে বসাইতে তাহার সবুজ পুঁতির বৃন্তটি কেমনভাবে বেঁকাইয়া বসাইলে সুশোভন হইবে, একান্ত মনোযোগ সহকারে যখন সে চিন্তা করিতেছিল, অজিত হাতে একজোড়া সাদা ধবধবে গরম দস্তানা লইয়া তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মিনু মাসী। আজ পিক্‌চার প্যালেসে একটা নতুন ভালো ফিলম আছে,—একটা টাকা দিতে পারিস? এ মাসে আমার সব খরচ-পত্র হয়ে গেছে।"

মীনু "দিচ্ছি" বলিয়া উৎসুক নেত্রে অজিতের হাতের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার হাতে ওটা কি?"

অজিত গম্ভীর স্বরে বলিল—"গ্লাভস্। আমার বন্ধু বিনয়কে জানিস্ ত? তার বৌদি তৈরী করেছেন।"

মীনু উঠিয়া বাক্স খুলিয়া অজিতের হাতে একখানি এক টাকার নোট দিয়া তাহার হাত হইতে দস্তানা জোড়া চাহিয়া লইয়া আগ্রহান্বিতভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

অজিত মীনুর হাতে তৈয়ারী কালো রেশমে বোনা একটি সুদৃশ্য ছোট থলি বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার মধ্যে নোটখানি রাখিয়া পকেটে পুরিতে পুরিতে বলিল—"কেমন হয়েছে, বল্ দিকিনি? ঠিক যেন কলে তৈরী! ধরবার জো নেই! হুঃ, খালি মোজা বুনে আর রুমাল তৈরী করেই তোরা অহঙ্কারে গেলি, এমনি নাইস গ্লাভস করতে পারিস?"

মীনু দীপ্ত মুখে বলিল—"কেন পারবো না? বাবার জন্য যে সোয়েটারটা বুনেছি, সেটা ত এই বুনুনি! দস্তানাটা পেলে ওর ঘর হিসাব ক'রে নিয়ে আমি ঠিক তৈরী করতে পারি।"

"হ্যাঁ, এ রকম আর করতে হয় না! আচ্ছা, তোকে সাদা উল এনে দেব, দেখি কেমন করিস?"

"সাদা উল আমার আছে। তোমাকে ঐ রকম দস্তানা তৈরী ক'রে দিলেই ত হ'ল।"

অ্যালবামটার দিকে তাকাইয়া অজিত বলিল—"ওটা কি হচ্ছে, যত সব জব্বর হিজিবিজি কায! ফাইন টেষ্টই তোদের নেই! কি জিনিষ ওটা?"

মীনু একটু ম্লান মুখে বলিল—"অ্যালবাম।"

ভাল করিয়া অ্যালবামটা দেখিতে দেখিতে সেই দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্যে তৈরী হচ্ছে?"

"বাবার বন্ধু শরৎ কাকাবাবুর জন্যে।"

"গ্লাভস্ জোড়া দে, বিনয়কে দিয়ে আসি।"

মীনু মিনতিভরা চক্ষুতে কহিল—"এটা আজ আমার কাছে থাকল, ছেলে।"

অজিত অবজ্ঞার সুরে বলিল—"না না, পরের জিনিষ, আবার নোংরা-ফোংরা লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, দিয়ে দে। তুই যে কত পারবি, সে জানাই আছে!"

মীনু আহতা হইয়া নিঃশব্দে দস্তানা জোড়া ফিরাইয়া দিল। অজিত দস্তানা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"আমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে, আর গেঞ্জির বোতাম নেই, সেলাই ক'রে রাখিস।"

মীনুর গলার কাছে ঠেলিয়া আসিল,—"আমি পারবো না," কিন্তু সে মুখে কিছু উচ্চারণ করিতে পারিল না।

অজিত বি, এ, পাশ করিয়াছে। মীনুর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘমাসে তাহার বিবাহ।

সন্ধ্যাবেলায় মীনু বারান্দায় গ্যাস ষ্টোভ জ্বালিয়া পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতেছিল। মা ঘরের ভিতর লুচি ভাজিতেছিলেন। মীনুকে ডাকিয়া বলিলেন—"মিনা, অজি'কে ডেকে দে ত! খাবার চেয়ে কোথায় চ'লে গেল? লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!"

মীনু গর্জ্জমান ষ্টোভের উপর এলুমিনিয়ম প্যানের হ্যাণ্ডেলটা বামহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া ডান হাতে

এনামেলের বড় চামচ দিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত জেলিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"ছেলেকে ডাকতে গেলে আমার জেলিটে নষ্ট হয়ে যাবে, মা !"

মা বলিলেন—"ঐখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাক না,—সে বোধ হয় পড়ার ঘরে আছে।"

মীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"ছেলে,—ছেলে—ও ছেলে—তোমাকে মা খাবার খেতে ডাকছেন!"

উত্তর আসিল না, মীনু আবার ডাকিল।

এবার চটি-জুতায় উচ্চ চটপট শব্দ তুলিয়া অজিত ক্রুদ্ধ-মুখে ভিতরে আসিয়া বিরক্তিকঠিন স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি যে অসভ্যের মত চেঁচাতে শিখেছিস! ছেলে ছেলে ছেলে! বন্ধুদের সামনে যখন তখন আমায় অপ্রস্তুত হ'তে হয়! আমার নাম ধ'রে ডাকিস, ছেলে বলিসনি, বারণ ক'রে দিলুম।"

মা ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—"তা 'ছেলে' বল্লেই বা, বেশ মিষ্টিই শোনায় ত বাপু! অত বড় বোনপোকে নাম ধরেই বা ডাকবে কি ক'রে বল্ না?"

"না, না দিদা, আমাকে সকলকার কাছে ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয়! তা ছাড়া এইবার ওর বে'-থা হবে, এখন থেকে ঐ বদ অভ্যেসটা ছাড়ান দরকার।"

অজিত অপ্রসন্ন মুখে লুচির রেকাবীর সামনে পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

মা বলিলেন—"আচ্ছা বাপু, এবার থেকে মীনা অজি' বলেই ডাকবে এখন, থাম্!"

বাহিরে বারান্দায় মীনুর সুন্দর তরুণ মুখখানি লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ হইতে প্রাণান্তেও 'ছেলে' শব্দ উচ্চারণ করিবে না। মনটা এত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্যমনস্কতার সযত্ন প্রস্তুত জেলিটা বেশী পাক হইয়া চিটা হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা অজিত তাহার পড়িবার ঘরের টেবল-সংলগ্ন বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শার্টের উপর গ্যালিস-সংযুক্ত প্যাণ্ট পরিয়া গলার 'কলারে' 'টাই' বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। মীনু অজিতের চা আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া, কিছুক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অজিতের নূতন সাজসজ্জা এবং টাই বাঁধিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঈষৎ উৎসুক অথচ কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে?"

গম্ভীর মুখে নিরুত্তরে অনেকক্ষণ টাই বাঁধিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া অজিত উত্তর দিল—"দরকার আছে এক যায়গায়!"

বার বার নানারকম কায়দায় রঙ্গীন সিল্কের ফিতা-টিতে যত রকমেই ফাঁস টানে উল্টা 'বো' হইয়া যায়, কিছুতেই ঠিক মতটি হইতেছিল না। প্রায় কুড়ি মিনিট আরশীর সামনে দাঁড়াইয়া 'নেকটাই' বাঁধিবার বহু প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর বিরক্ত-অধীর মুখে অজিত 'দূর্ ছাই' বলিয়া টাইটা কলারের ভিতর হইতে সজোরে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

মীনু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। তাহার মনে কৌতুকের সহিত সহানুভূতিও জাগিয়া উঠিতেছিল। একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "আমি বেঁধে দেব, অজি?"

বিপদগ্রস্ত উদ্বিগ্ন অজিত মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, "পারবি কি তুই?"

মীনু বলিল, "হ্যাঁ, পারবো।"

তাহার পর মীনা অগ্রসর হইয়া গিয়া অজিতের নিকট হইতে যথাসম্ভব তফাতে দাঁড়াইয়া সন্তর্পণে ফাঁস টানিয়া অজিতের নেকটাইটিতে নিপুণ সুন্দর 'বো' বাঁধিয়া দিল। সে প্রতিদিন তাহার পিতাকে পোষাক পরার সময়ে সাহায্য করিত, সেই জন্য 'নেকটাই' বাঁধিবার সহজ কৌশলে অভ্যস্তা ছিল।

মীনু অজিতের ওয়েষ্টকোটের পিছনে বক্লস্ আঁটিয়া দিয়া কোট ও ওয়েষ্টকোটটি উত্তমরূপে 'ব্রাস' করিয়া দিল।

অজিত খুসী হইয়া বার বার আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি হেলাইয়া ঘুরাইয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইল। জুতা পরিয়া 'ফেল্ট' টুপীটি মাথায় দিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে সাহেবী কায়দায় লম্বা পাদক্ষেপে অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় সরু লোহার চেন-বাঁধা চাবি-রিংটি ঝনাৎ করিয়া মীনুর সামনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল—

"মীনুমাসী! আমার ডেস্কের ভিতরটা বড় অপরিষ্কার হয়ে আছে, গুছিয়ে রাখিস্ ত।"

মীনু খুসী হইয়া চাবি-রিংটা কুড়াইয়া লইল। সকাল হইতে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ঝাঁটা ও ঝাড়ন লইয়া সমস্ত ঘরখানির কড়িকাঠ হইতে মেঝে পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, সুন্দররূপে বই, খাতা, জিনিষ-পত্র সাজাইয়া, গুছাইয়া, ছবি টাঙাইয়া, ফিটফাট করিয়া রাখিয়া ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে মলিন-বসনে প্রসন্নমুখে স্নান করিতে গেল।

* * * * *

যথাসময়ে মীনুরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে মীনু খুবই সন্তুষ্ট হইল, কারণ, সে প্রচুর জিনিষপত্র, বস্ত্রালঙ্কার, খেলনা-পুতুল, প্রসাধন-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যে ও সকলের নিকটে আদর-সোহাগের আতিশয্যে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি নব-পরিচিত তরুণ বন্ধুটির অশ্রান্ত প্রেম-গুঞ্জন তাহাকে যেন এক মোহন স্বপ্নলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়, অজিত আজকাল তাহার সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কয়,—আর 'তুই' বলে না, বেশী তাচ্ছীল্য করে না। এই আনন্দ এবং এই গর্ব্বই মীনুর ক্ষুদ্র বুকখানিকে পুলকে দোলাইয়া দিতেছিল।

স্বামী সৌরীন্দ্রের সহিত মীনু অধিকাংশ সময়ে অজিতেরই গল্প করিতে ভালবাসিত। সৌরীন্দ্র এক দিন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, মীনু, তুমি ত বল, অজিতকে আগে তুমি ছেলে ব'লে ডাকতে, এখন আর তা' ডাক না কেন?"

মীনু হাস্যোজ্জ্বল-নেত্রে বলিল, "ওর লজ্জা করে ব'লে!"

সৌরীন্দ্র হাসিতে হাসিতে কৌতুকের স্বরে বলিল, "আচ্ছা, আমি এবার যখন তোমাদের বাড়ী যাব, অজিতকে 'ছেলে' ব'লে ডাকবো, দেখবো, সে কি করে?"

মীনু ভীতস্বরে বলিল, "না না, খবরদার, তুমি তাকে 'ছেলে' ব'লো না! তা হ'লে সে বুঝতে পারবে, আমি তোমায় ব'লে দিয়েছি!"

"বাঃ রে, তুমি বলেই দিয়েছ ত সত্যি। আমি গিয়ে বলবো, তোমার মাসী আমাকে তোমার নাম ধ'রে ডাকতে বারণ করেছেন, ছেলে ব'লে ডাকতে ব'লে দিয়েছেন।"

মীনু কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—"আমি তাই বলেছি? ওঃ, কি মিথ্যে কথা!"

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ অতিকষ্টে সংবরণ করিতে করিতে সৌরীন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, তুমি নিজে বলনি অজিত তোমার ছেলে?"

ক্রুদ্ধা মীনু বলিল—"হ্যাঁ, ছেলেই ত—"

সৌরীন্দ্রের এবার হাসির বোঝা সজোরে ফাটিয়া গেল—"বেশ! বেশ! বাহবা, তা' অত বড় ছেলেটির মায়ের আবার বিয়ের কি দরকার ছিল?"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্ট!"

স্বামীর কথার পরিহাস-ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মীনু লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সৌরীন্দ্রেরই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

হাসিতে হাসিতে তরুণী বধূকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সৌরীন্দ্র তাহার কানে চুপি চুপি বলিল—"আচ্ছা, তোমার যখন সত্যিকারের ছেলে হবে, তখন তার অজিত নাম রেখো, কেমন?"

স্বামীর বাহুডোর-বদ্ধ মীনু মুখটা স্বামীর বক্ষের মধ্যে আরও লুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে লজ্জাজড়িত কুপিত স্বরে বলিল—"না না—চুপ কর, ছিঃ!"

৪

মাত্র সাত মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সোনার স্বপ্ন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সৌরীন্দ্র 'ইরিসিপ্লাস' ব্যারামে মীনুরাণীর সীঁথির নবীন সিন্দুর-রেখা মুছিয়া দিয়া অকস্মাৎ অজানা লোকে চলিয়া গেল। মীনুরাণীর পিতা রোরুদ্যমানা সদ্যোবিধবা কন্যাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না। মীনুর পিতা মাসকতক জ্বরাতিসারে ভুগিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। সংসারে রহিল দুইটি শোকাতুরা বিধবা নারী এবং সংসারানভিজ্ঞ তরুণ অজিত।

মীনু বৈধব্যের দারুণ আঘাত সংবরণ করিতে না করিতেই পিতৃশোকে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। বক্ষের

শোকাগ্নিদাহন এবং চক্ষুর অশ্রান্ত অশ্রুধারা তাহাকে নিদাঘশুষ্ক লতা অপেক্ষা শীর্ণ ও করুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

মাতা অভাগিনী কন্যা ও অসহায় দৌহিত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজে সংযতা হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

এমনই করিয়া গম্ভীর শোকস্তব্ধতা ও বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়া বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বাটীর তিনটি প্রাণীর এক জনেরও মুখে পূর্ব্বকার সহজ হাসি ফিরিয়া আসিল না।

বৎসরান্তে অজিত কঠিন ব্যারাম প্লুরিসিতে শয্যাগত হইয়া পড়িল।

মীনু তাহার নির্জ্জন গৃহ-কোণ ছাড়িয়া অজিতের রোগশয্যাপার্শ্বে আশ্রয় লইল এবং সহরের একাধিক নামজাদা চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল।

এই সময়ে মীনুর মা তাঁহার পুরাতন ব্যাধি লিভারের বেদনায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। মীনু দুই ঘরে দুইটি রোগী লইয়া বিশ্রামহীন দিবা এবং নিদ্রাহীন রজনী অচঞ্চলভাবে কাটাইতে লাগিল। মা দিনকতক পরে একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া রহিলেন।

মীনু যন্ত্রপুত্তলীর ন্যায় একভাবে আপনাকে অজিতের শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিয়া রাখিল। সমস্ত দিনে এবং রাত্রিতে ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে স আপনাকে ঘড়ীর কাঁটারই মত নিয়মিত করিয়া অজিতের মুখ ধোয়ান, ঔষধ খাওয়ান, পথ্য প্রস্তুত করা, পথ্য খাওয়ান, বুকে-পিঠে সেক দেওয়া, পুল্‌টিস্ লাগান, মালিস করা, জ্বরের উত্তাপপরীক্ষা, বমি-মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, বিছানা বদলান, সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখা, রোগীর সদাসর্ব্বদার শারীরিক অবস্থা এবং ঔষধ পথ্য সেবনের ভিন্ন ভিন্ন চার্ট লিখিয়া রাখা, রাত্রি জাগা, বাতাস করা, নানাপ্রকার প্রক্রিয়ায় রোগীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা, ঘুম-পাড়ান, গল্প করা, সান্ত্বনা দেওয়া, বই পড়িয়া শুনান প্রভৃতি কর্ম্ম অত্যন্ত ধীরে অথচ ক্ষিপ্রতা সহকারে শিক্ষিতা, সেবাকারিণী ও স্নেহময়ী জননীর মতই সুনিপুণভাবে করিয়া যাইত।

পীড়িত অজিত রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত চঞ্চলতা ও অধীরতা প্রকাশ করিত। মেজাজও অত্যন্ত রুক্ষ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। রোগের যন্ত্রণা তাহার অকালগাম্ভীর্য্য ও মৌনতা ভাসাইয়া দিয়া কিশোরবয়স্ক দুরন্ত অবুঝ বালকে পরিণত করিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া মীনু যেন আরও পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াসুলভ স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার শোকস্তব্ধ শান্ত মুখে সর্ব্বদা প্রসন্নতা বিরাজমান। রোগীর সহস্র অত্যাচারে ও অধীরতায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা চাঞ্চল্য নাই, কর্ম্মে শ্রান্তি বা আলস্য নাই। ধৈর্য্যশীলা জননীর মত, স্নেহময়ী ভগিনীর মত, অন্তরঙ্গ বন্ধুটির মত আপনার বিপুল স্নেহ, যত্ন, সহানুভূতি ও সেবা দ্বারা এই রোগাতুর দুরন্ত, তরুণ শিশুটির দেহে ও মনে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া রাখিত।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নীল রেশমী শেড-ঢাকা ল্যাম্পের মৃদু আলো, গৃহখানি আলোকিত, অথচ স্নিগ্ধ ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। টেবলের উপর বি-টাইমপিস ঘড়ীটি এক সুরে টিক্-টিক্ করিয়া গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ফর্সা ন্যাপ-কিন ঢাকা টুলের উপর ও টেবলের উপর ঔষধের শিশি, ছোট মেজার গ্লাস, বড় কাচের গ্লাস, বার্লির পেয়ালা, ছানার জলের পাত্র, ডালিম, বেদানা, থার্ম্মমিটার, ফিডিং কাপ, 'থার্ম্মফ্লাস্ক', 'হটওয়াটার-ব্যাগ' প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধ-পথ্যাদি শৃঙ্খলা সহকারে সজ্জিত।

স্বল্প আসবাব; ঘরখানির চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইউক্যালিপটাসের তীব্র গন্ধে ও সুমিষ্ট ধূপের সৌরভে কক্ষ বায়ুভারাক্রান্ত। রোগীর মাথার দিকে ও পাশের দিকে দুইটি জানালা রুদ্ধ, আর সমস্ত জানালাগুলি উন্মুক্ত। আধভেজান দরজায় সবুজ ছিটের মোটা পর্দ্দা টানা।

মীনু একখানি টুলের উপর বসিয়া ঘুমন্ত অজিতের শিরে হাতপাখা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল।

অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইয়া 'টং' শব্দে ঘড়ী জানাইয়া দিয়া গেল। অজিত অস্ফুট কাতরোক্তি সহকারে পাশ ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিল, "ক'টা বাজল?"

মীনু বলিল—"আড়াইটা।"

"তুমি এখনও জেগে ব'সে আছ? হাত ব্যথা করছে না? এই বার একটু শোও!"

"শোব অখন! তুমি এখন একটু হরলিক খাবে কি?"

"আচ্ছা, দাও।"

মীনু ঘরের কোণে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া ফুড প্রস্তুত করিয়া ল্যাম্পের নীল শেডটা একটু সরাইয়া দিয়া, বাতিটার বোতাম ঘুরাইয়া, আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ফিডিং কাপে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিল। তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া, মুখের ভিতর একটি লবঙ্গ দিয়া, আবার আলোক মৃদু করিয়া শেড টানিয়া দিয়া পাখা হাতে লইয়া টুলে বসিল।

অজিত বলিল—"আজ আমি অনেক ভাল আছি, তুমি একটু শোও না, মীনু মাসী!"

মীনু বলিল—"আমার এখনও ঘুম আসেনি। ঘুম পেলে শোব। তুমি আবার একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। মাথা চুলকে দেব?"

"না, থাক! আচ্ছা, দাও।—মীনুমাসী—"

"কি বাবা?"

"আমি আর তোমায় 'মীনুমাসী' বলবো না, এবার থেকে 'মাসীমা' বল্‌ব—কেমন?"

"বেশ ত!"

"আচ্ছা, মাসীমা! তুমি আমাকে বড্ডো ভালবাসো—না?"

মীনু একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর সহজ প্রসন্ন স্বরে উত্তর দিল—'তা' আর বাসবো না?'

"না, তুমি ছেলেবেলা থেকেই আমায় খুব ভালবাসো, আমার কত অত্যাচার সহ্য কর। এত দিন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, মাসীমা!"

মীনু একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে অজিত ভাবাধিক্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা সে প্রায় রাত্রির দিকে বেশী বলে। রুগ্নাবস্থায় শরীর ও মনের শক্তির অভাবে অনেক সময়ে মনের গোপন কাহিনী প্রকাশ হইয়া যায় কিংবা অল্পেই অত্যন্ত তুষ্ট বা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠে। দুর্ব্বল অজিতের এই কৃতজ্ঞতার আতিশয্যও যে রোগক্রিয়া-সঞ্জাত, মীনু অনভিজ্ঞা হইলেও বুঝিতে পারিত।

অজিতের কপালে অডিকলোন-মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চিত করিতে করিতে মীনু বলিল—"আচ্ছা, সে হবে এখন, তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি!"

"না না, মাসীমা, আমি এখন ঘুমুব না। আমার কথা কইতে খুব ভাল লাগছে।.........আচ্ছা, তুমি এত আমার সেবা করছো কেন? বল, কেন? কেন? ‥"

মীনু উত্তর না দিয়া বামহাতে অজিতের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডান হাতে পাখার হাওয়া করিতে লাগিল।

"কি? তুমি বলবে না, মাসীমা?‥‥আচ্ছা থাক.........."

প্রায় মিনিট পাঁচেক চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিবার পর আবার চোখ মেলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে মীনুর মুখের প্রতি চাহিয়া অজিত আগ্রহভরে বলিল—আচ্ছা, আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, এই অসুখে এর চেয়েও কি বেশী সেবা করতে পারতেন? এর চেয়েও কি তাঁর প্রাণ আরও ব্যস্ত হ'ত?.........বল না? কথা কইচ না কেন? আর,—বাতাস করতে হবে না, জবাব দাও!"

অজিত রাগিয়া মীনুর হাত হইতে তালপাখাখানি টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মীনু ধীরস্বরে বলিল—"তা কি বলা যায়? কি ক'রে জানব, তিনি কি করতেন?"

"কেন বলা যাবে না? হয় ত তোমার মত এমনই করতেন, কিন্তু এর চেয়ে বেশী করতে পারতেন না।"

"তা' হবে!"

"আচ্ছা, লোক বলে, মা-মাসী, মা আর মাসী প্রায় একই, না মাসীমা?"

অজিত মীনুর ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া চাপিয়া নিজের শীর্ণ বুকের উপর রাখিল।

মীনু শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—"মা আর মাসী একই বৈ কি।"

"মাসী-মা, আমি এবার যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে দেখো, তোমার কখনও কষ্ট হবে না। তোমায় আমি আমার মায়ের মত ক'রে—মেয়েটির মত ক'রে চির দিন আমার কাছে রেখে দেব, কোথাও যেতে দেব না।"

"তোমার আজ কি ঘুম আসছে না, অজি? বেশী রাত জাগলে আবার মাথার যাতনা বাড়বে কিন্তু!"

"আমার ঘুম আসছে না। আচ্ছা, মাসীমা?"

"কি?"

শিশুর মত আবদারের সুরে অজিত বলিল—"তোমাকে যদি আমি 'মা' ব'লে ডাকি, তা হ'লে কি তোমার লজ্জা করবে?...আচ্ছা, যদি শুধু 'মা' বলতে না দাও, তা হ'লে 'ছোট-মা' বলবো কেমন?"

অজিত মীনুর নরম হাতখানি নিজের গণ্ডে, ললাটে ও মুখের উপর বুলাইতে বুলাইতে আদরের সুরে বলিতে লাগিল—"মা-টি—আমার ছোট্ট মা-টি—"

মীনু একটু লজ্জিত ও বিপন্ন বোধ করিতেছিল, অথচ হাতখানি অজিতের মুঠার মধ্য হইতে টানিয়া লইতেও ভরসা হইতেছিল না।

"আচ্ছা মাসী মা, 'কথা ও কাহিনী'র সেই 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটা তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, সেই যে সেইখানটা কি চমৎকার—

'রাখাল থাকিবে সুখে
মা'র চেয়ে আপনার মাসীমারবুকে।'

তোমার কি মুখস্থ আছে সবটা?"

মীনু কুণ্ঠিত আপত্তির সুরে বলিল—"তিনটে বেজে গেছে, অজি! এখন একটু ঘুমোও। সকালবেলা তোমাকে দেবতার গ্রাস প'ড়ে শোনাব।"

"না, না, এখন আমার শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার মুখস্থ না থাকে, বই আনো। এখন আর ঘুম হবে না।"

মীনু বুঝিল, রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী জেদ করিলে উল্টা ফল হইবে। আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া শেল্ফ হইতে "কথা ও কাহিনী" বইখানি টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, ল্যাম্পের শেড অল্প সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিল

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে,
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে।"

ধীর মধুর উদাত্তকণ্ঠে সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বর যথাস্থানে হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া করিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগিল। শেষের স্লিকটা পাঠ করিবার সময়ে ভাবাবেশে মীনুর চক্ষুর্দ্বয় সিক্ত হইয়া কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। পড়া শেষ হইলে আট দশ মিনিট কেহ কোনও কথা কহিল না!

নিশীথ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা, কক্ষের ছায়াময় নীলাভ আলোক, ঘড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ সব কিছু মিলিয়া, মনকে ঘিরিয়া অননুভূতপূর্ব্ব উদাস-বৈরাগ্য, স্নেহাকুল করুণ বেদনা জাগাইতেছিল।

"নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক"—"মাসী - মাসী—মাসী" যেন সত্যই সেই নীরব কক্ষের নিস্তব্ধতায় অনাহত-শব্দে করুণ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত হইয়া "বহ্নিশলাকার ন্যায় রুদ্ধ কর্ণে" বিদ্ধ হইল।

রোগদুর্ব্বল অজিতের গণ্ড বাহিয়া দুই চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ আবেগপূর্ণ স্বরে অজিত বলিল—"আচ্ছা,রাখালের মৃত্যু তার মা মোক্ষদার বেশী বাজবে, না মাসী অন্নদার?"

মীনু ম্লান হাসিয়া উদাস স্বরে কহিল—"দু'জনারই লাগবে।"

"উহুঁ, অন্নদার বেশী লাগবে, সে-ই রাখালকে মানুষ করেছিল। সাগরে পাঠাতে রাজী হয়নি। আর রাখাল যে মায়ের চেয়ে মাসীকেই বেশী ভালবাসত! জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে অন্তিমসময়ে তার ত মায়ের মুখ মনে পড়লো না 'মা' শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল না—মাসী-কেই মনে পড়েছিল '—আঃ—চমৎকার 'সিন্'!"

অজিত ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মীনু প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীথর হইয়া বসিয়া রহিল। টং টং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। মীনু সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত ডাকিল—"মাসীমা!"

"কি বলছো?"

আমার মাথার যাতনাটা বাড়ছে। ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পার?"

মীনু উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—"আমি বলেছিলুম, এখন প'ড়ে কাজ নেই, সকালে প'ড়ে শোনাব। মাথার যাতনা হচ্ছে, হয় ত জ্বর বাড়বে।"

"তুমি গান গেয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও।"

মীনু অজিতের মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, চুলের ভিতর অঙ্গুলিচালনা করিয়া চুলকাইয়া দিতে দিতে মৃদুমন্দ গুঞ্জনে কি একটা গান ছড়ার সুরে গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া নিশাশেষের শীতল হাওয়ার স্পর্শে অজিত ঘুমাইয়া পড়িল। শ্রান্ত মীনু খাটের বাজুর উপর মাথা রাখিয়া ভারাক্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

সকালবেলা পিক্‌দানী ধুইতে দেরী হওয়ায় অজিত মীনুকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল। তীব্র ঝাঁজযুক্ত বিস্বাদ ঔষধের স্বাদে ক্রোধক্ষিপ্ত হইয়া মীনুর হাত হইতে ঔষধের গ্লাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারিল। গ্লাসটা মীনুর কপালে সজোরে লাগিয়া মাটীতে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। কপাল কাটে নাই, তবে বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। সে নিঃশব্দে ভাঙ্গা কাচের টুকরাগুলি গৃহতল হইতে কুড়াইতে লাগিল।

অজিত তখন ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছে—“খবর্দ্দার, তুমি এ ঘরে ঢুকো না। জ্বালাতন হয়েছি! নার্সিং জানে না মোটেই—সবেতেই নিজের বুদ্ধি খাটান চাই। এবার থেকে আমাকে না দেখিয়ে কোনও ওষুধ আমায় খাওয়াবে না, ব'লে রাখলুম।...ওটা কখনও খাওয়ার ওষুধ নয়, নিশ্চয় মালিশ! নইলে এত ঝাঁজ হয়? লেবেল পড়বার বিদ্যে নেই যাদের, তারা আবার আসে ‘নার্স’ করতে! কোন্ দিন ‘মার্ডার’ করবে দেখছি।”

মীনু নিরুত্তরে অবিচলিত মুখে আপনার কায করিয়া যাইতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই! সে যে ঔষধ খাওয়াইতে ভুল করে নাই, ঠিক ঔষধই খাওয়াইয়াছে, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহা বুঝাইতে হইলে বা তর্ক করিলে অজিতের আরও উত্তেজিত হইয়া উঠা সম্ভব। এরূপ ভর্ৎসনা তাহার সদাসর্ব্বদা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

৮

সুদীর্ঘ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মীনু মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে যায়, অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে মায়ের কাছেই থাকিত। কয়েক মাস হইল, মীনুর মা-ও মারা গিয়াছেন।

আষাঢ় মাস। বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্ণে বারিধারা-সিক্ত গাছগুলি স্বর্ণ রবিকরপাতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। দূরে একটা কাঁঠালগাছের উপর এক ঝাঁক শালিক পাখী উচ্চ কোলাহলে বিবাদ করিতেছে।

মীনু বারান্দায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। পৃথিবীর অপর প্রান্তে সুদূর অন্তসীমানার কোন একটি তুষারাচ্ছন্ন দেশের বিবরণ, দেশবাসীর আচার-ব্যবহার, প্রথা, নিয়ম, সেই ‘দেশ-বিবরণে’ লিখিত ছিল। পাঠশেষে মীনু বইখানি মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশের পানে চাহিল। রাশি রাশি ধূমল বর্ণের, শ্যামল বর্ণের মেঘভার আকাশের এক কোণ হইতে অপর কোণে যাতায়াত করিতেছে। আবার বর্ষণের আয়োজনে তাহাদের সুগম্ভীর মূর্ত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

মীনু ভারাক্রান্ত মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। অজিতের বিবাহের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মা নাই, অজিতকে একা রাখিয়া সে শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিতেছে না। অথচ বাড়ীতে এইরূপ ভাবে একাকিনী থাকিতে তাহারও ভাল লাগিতেছে না। অজিতের বিবাহের বয়সও হইয়াছে। একটি বয়স্থা পাত্রী অন্বেষণের নিমিত্ত মীনু ঘটক-ঘটকী নিযুক্ত করিয়াছে।

“কে গো দিদি ঠাকরুণ?”—কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার তুলিয়া জনৈকা ঘটকী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

“কে? ঘটক ঠাকরুণ না কি?”

মীনু ব্যগ্রভাবে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল।

“হ্যাগো আমিই।”

“উপরে এসো।”

ঘটক ঠাকুরাণী দোতলায় উঠিয়া গেলে মীনু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “খিদিরপুরের মিত্রদের বাড়ীর সেই সম্বন্ধটির কি হ'ল? অজি যে কটি মেয়ে দেখে এসেছে, এর মধ্যে ঐটিই ওর পছন্দ হয়েছে ব'লে মনে হ'ল।”

ঘটক ঠাকুরাণী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল “মেয়ে ত দেখতে ভাল আর বেশ ডাগরও, কিন্তু মেয়ের মা বড় দজ্জাল!”

“তা' মেয়ের মা কড়া হলেই বা! মেয়ে ত শান্ত?”

“মেয়ে শান্ত বটে, কিন্তু মায়ের বড় খুঁৎখুঁতে মন!”

"কেন ? অজি'র কি খুঁৎ আছে ?"

"মা বলে—ছেলের ত বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এত দিন কেন বিয়ে করেনি ? বাড়ীতে বিধবা মাসী আছে শুনেছি। সে না কি ছেলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ! সে ছাড়া আর ঘরে মেয়েমানুষ নেই ! তার ছে পিলেও হয়নি ! তা' মাসীর কি শ্বশুরবাড়ী নেই ? সে কি বারো মাস এখানেই থাকে ?"

মীনুর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর যেন জ্বালা করিয়া উঠিল ! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আরক্তমুখে সংযত স্বরে বলিল—"তাঁদের তুমি বোলো, এই মাসকতক হ'ল ছেলের দিদিমা মারা গেছেন, তাই মাসী একলা আছেন। বোন্‌পোর বিয়ে দিয়ে বৌয়ের হাতে সংসার তুলে দিয়ে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবেন। এখানে তিনি থাকবেন না।"

ঘটকী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ঐ সম্বন্ধটা তুমি ছেড়ে দাও, দিদিমণি ! ওদের গিন্নীর বেজায় ছোট মন। তার চেয়ে শ্যামবাজারের রায়েদের বাড়ীর সম্বন্ধটা দেখ। সে মেয়েও দিব্যি সুন্দরী।"

মীনু অন্যমনস্ক শুষ্কস্বরে বলিল—"না, ঐ মেয়েটিই অজি' পছন্দ ক'রে এসেছে, ঐটিই তুমি দেখ। যদি বেশী অমত করে, তা হ'লে - তা হ'লে তুমি আমায় বোলো—আমি না হয়, বিয়ের আগেই চ'লে যাব।"

ঘটকী জিভ কাটিয়া বলিল—"ও মা, ছি ছি, তোমার বাপের বাড়ী, তুমি কেন পরের কথায় গৃহত্যাগী হবে, দিদিমণি !"

মীনু গম্ভীর স্বরে বলিল—"না, ঐ সম্বন্ধটিই ঠিক ক'রে ফেল। টাকা কিছুই চাই না। শুধু তাদের মত হলেই লোহ'।"

ঘটক ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে মীনু চিন্তা-শুষ্ক বিষাদ-গম্ভীর মুখে ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘটক ঠাকুরাণী তাহাকে আজ আভাসে যে অপমানকর কথা শুনাইয়া গেল, তাহা সে আজ নূতন শুনে নাই। মা রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে তখন হইতেই এই রকম কথা সে আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীদের মুখে শুনিয়াছে। অজিতের প্রতি এই অত্যন্ত স্নেহানুরক্তির জন্য শ্বশুরবাড়ীতেও সে অনেকের অপ্রিয়পাত্রী হইয়াছে। অপরাধ ! সে অজিতের জন্মের পাঁচ বৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে ! সেই জন্য অজিতের প্রতি তাহার সন্তান-স্নেহ উদ্ভব হওয়া না কি অসম্ভব ! হায় ! দুনিয়ায় বয়সের তারতম্যের উপরেই কি চিত্তবৃত্তির বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ?

মীনু ভাবিতে লাগিল, যদি এই সকল নীচ সন্দেহের কাহিনী অজিতের কানে উঠে ! ঘৃণায়, অপমানে, ক্ষোভে শিহরিয়া মীনু বালিসের উপরে মুখ লুকাইল।

অজিত বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—'মীনুমাসী !'

মীনু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল।

"সন্ধ্যাবেলায় শুয়েছিলে কেন, অসুখ করেছে না কি ?"

মীনু সংক্ষেপে বলিল, "না।"

অজিত বলিল, "তোমার ভাসুর আর দেওর এসেছেন। তাঁরা দাদামশাইয়ের উইল দেখতে চান। উইল লোহার সিন্দুকে তোমার কাছে আছে।"

মীনু শুষ্কস্বরে বলিল, "আমি সে উইল রাখবার দরকার মনে করিনি। উইল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"

"সে কি ? ছিঁড়ে ফেলেছ কেন ? তাতে যে তোমাকে বাড়ীর অংশ দিয়ে গিয়েছেন !"

ব্যথা-প্রচ্ছন্ন তাচ্ছীল্যের সুরে মীনু বলিল, "আমার বাড়ীর অংশের কিছু দরকার নেই, ও তোমারই থাক্‌। সে উইল থাকলে অশান্তির সম্ভাবনা বেশী, তাই রাখিনি। বাড়ীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী তুমিই।"

"কিন্তু তোমার দেওর-ভাসুর ওঁরা কি ভাববেন ? ওঁরা মনে করবেন, আমিই ঠকিয়ে উইল নষ্ট করেছি। তাও যদি না ভাবেন, তা হ'লে—তা হ'লে—" অজিতের মুখে-চোখে হঠাৎ অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়া কেমন কালো হইয়া গেল।

মীনু বুঝিতে পারিল, অজিত কি যেন বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। তাহার মুখমণ্ডল দীপ্ত হইয়া উঠিল—কঠিন স্বরে মীনু বলিল, "তা ছাড়া কি ?"

অজিত অন্ধকার মুখে বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কিছু বোঝো না, মীনুমাসী ! উইল ছিঁড়ে ভয়ানক খারাপ করেছ তুমি। এতে যা ক্ষতি হবে ? তার চেয়ে বাড়ীর অংশ নিয়ে বিবাদ করা ঢের ভাল ছিল।"

মীনু উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কি বলতে চাও তুমি, স্পষ্ট ক'রে বল, অজি ! নীচ ইতরমনা লোকরা ছোট কথা

বলবে, তাদের নীচতাকে গ্রাহ্য ক'রে আমাকে ভয়ে ভ চলতে হবে, এই কি বলতে চাও তুমি ? বেশ করেছি, আমি আমার বাবার উইল—আমার নিজের উইল ছিঁড়েছি! আমি চাই না, আমার বাবার ভিটায় বাইরের লোক সরিকদার হয়ে এসে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তোলে।"

অজিত কালো মুখে বলিল, "কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে তোমাকেই সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেতে হবে, এও মনে রেখো।"

"তা হোক্।"

৬

অজিতের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বধূ বয়স্থা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। সংসার এবং স্বামীর তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়াছে।

অজিতের প্রতি মীনুর গভীর স্নেহ এবং ত্রুটিহীন যত্ন আর সকলকার মত সে-ও অপরাধেরই চক্ষুতে গ্রহণ করিল। এই লইয়া মীনুর সহিত যত হোক্ না হোক্, অজিতের সহিত শুক্লার মনোমালিন্য-মেঘ যেন একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। মীনু আতঙ্কিতা হইয়া উঠিল। বুঝিল, সে শুধু শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইলেই যে সংসারে শান্তি স্থাপিত হইবে, তাহা নহে। যাইবার আগে অজিতের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।

মীনু অজিতকে ডাকিয়া বলিল, "অজি! আমি উইল ছিঁড়ে ভুল করেছি। মাথার ঠিক ছিল না। বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ আমার ছিল, সেই টাকাটা আমাকে দাও।"

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি এখন টাকা কোথায় পাব? তুমি ত সবই জানো—আমার উপার্জ্জনের উপরই সব নির্ভর করে। নগদ অত টাকা আমার নেই "

"অজি, অনাথা বিধবাকে ফাঁকি দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাকে হয় বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ লিখে দাও, আমি অন্যের কাছে ঐ অংশ বিক্রী ক'রে টাকা নেব, না হয় আমাকে তুমি ন্যায্য দাম দিয়ে দাও, আমি টাকা নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যাব। এখানে তোমার সংসারে আমার পোষাচ্ছে না।"

অজিত বলিল, "আমি কোনও দিন তোমাকে টাকা দেব বলিনি, বাড়ীর অংশও চাইনি। তুমি স্বেচ্ছায় উইল ছিঁড়েছ। তুমি টাকা চাও, আমি উপার্জ্জন ক'রে আমার সাধ্যানুসারে নিশ্চয়ই তোমায় দেব। কিন্তু এখন আমার হাতে একটি পয়সা নেই জেনেও কি জুলুম করতে চাও?"

"বেশ, গরীব অনাথা বিধবা তার ন্যায্য পাওনা চাইলেই বুঝি জুলুম হয়? তোমার টাকা আছে না আছে, আমার জানবার দরকার নেই। আমি তোমার এখানে যখন থাকবোই না, তখন কেন টাকা নেব না?"

অজিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"ন্যায্য প্রাপ্য কিসের? আমি কি তোমায় টাকা দেব বলেছিলুম? না,—বাড়ীর অংশ চেয়েছিলুম, উইল ছিঁড়তে পরামর্শ দিয়েছিলুম? ওঃ, স্ত্রীলোককে মোটে চেনবার উপায় নেই।"

"অজি, আমার টাকা দেবে কি না বল? নইলে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে ভাসুর-দেওরকে দিয়ে আমি তোমার নামে মোকর্দ্দমা করাব।"

"তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, আমি একটি আধলাও দিতে অসমর্থ।"

"বেশ, তাই হবে।"

অজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত, ঘৃণা-কাতর মুখে বলিল, "উঃ, পৃথিবীতে মানুষ চেনা সব চেয়ে শক্ত।"

মীনু অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে মনে মনে বলিল, "সত্যিই।"

পাশের ঘরে শুক্লা টেবল-হার্ম্মোনিয়ামে গাহিতেছিল—

"শ্রান্তি আমার ক্ষমা কর - ক্ষমা কর --প্রভু—"

মীনু টলিতে টলিতে তাহার মায়ের ঘরের ভিতর আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, গুমরিয়া কান্না চাপিতে লাগিল। সে কতক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া ছিল, নিজে জানে না।

শুক্লা ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল- "মাসীমা, ভর সন্ধ্যেবেলা অমন ক'রে কাঁদবেন না, ওঁর অকল্যাণ হবে।"

মীনু ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ষাট্—ষাট্—"

"আপনার কত টাকা চাই, বলুন, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার গায়ের গয়নাও ত রয়েছে। আমি আপনাকে ফাঁকি দিতে চাই না-যদিও আইনতঃ আপনি কিছুই পান না "

মীনু আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল -"হ্যাঁ বৌমা, ঠিক বলেছো মা! মানুষের প্রাণটাকেও প্রাণের মাপকাঠিতে মাপতে যাওয়া ভুল, সেটাও আইনের মাপকাঠিতে মাপতে হয়। নইলে কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। আইনতঃই যে আমার দুনিয়ার কাছে কোনও কিছু পাওনা দাবী-দাওয়া নেই, মা।"

শুক্লা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আপনি শাপ-মন্যি দেবেন না, মাসীমা, আমি আপনার টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে দেব।"

"বৌমা, তুমি মেয়েমানুষ— তুমিও মা, আমায় শাস্তি দিও না।"

শুক্লা মীনুর বেদনাবিবর্ণ কাতর মুখের প্রতি চাহিয়া থমকিয়া গেল।

মীনু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে সুখে থাক, মা, আমাকে তোমায় কিছুই দিতে হবে না। শুধু দয়া ক'রে এইটি দিও,"—মীনুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া আবার বলিল, "শুধু এই চাইছি—যদি কখনও অজির অসুখ-বিসুখ হয় বা তোমাদের দরকার হয়, সে দিন তোমাদের মাসীমাকে ভুলে থেকো না, ডেকো। আমি, মা, তোমার ঘর-কন্না গুছিয়ে-গাছিয়ে নিষ্কণ্টক ক'রে রেখে গেলুম। অজি আর আমায় জীবনে বিশ্বাস করবে না, ক্ষমাও করবে না"—মীনুর স্বর বন্ধ হইয়া গেল, উদ্গত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে মুখে আঁচল দিয়া সে সরিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা মীনু আজন্মের আশ্রয়-নীড় পিত্রালয় জন্মের মত ত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

যাইবার সময় অজিত গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মীনু কথা কহিল না। অজিত প্রণাম করিল, মীনু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বাক্স-তোরঙ্গ তুলিয়া দেওয়া হইল। ঘর্ঘর শব্দে গাড়ী অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অজিতের ম্লান ব্যথা-কাতর মুখের উপর একটা বিরাট ঔদাস্যের ছায়া জাগিয়া উঠিতেছিল। জগৎটা যেন একটা প্রকাণ্ড স্বার্থপরতার ক্ষেত্র, অবিশ্বাসের লীলাভূমিরূপে তাহার আহত অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে শুক্লা তখন ঘরের মেঝেয় মাথা নোয়াইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল—"মাসীমা, আমি তোমায় বুঝতে পারিনি, মাপ করো। তুমি সতীলক্ষ্মী দেবী—আমি যেন শীগ্‌গিরই তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারি।"

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

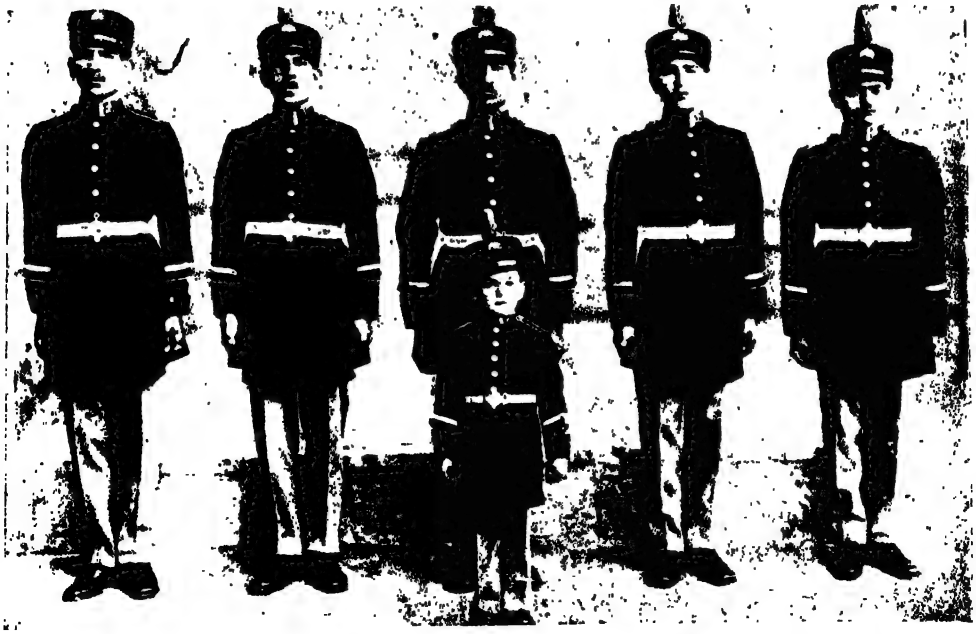

ক্রাউন প্রিন্স শাপুর রেজা খাঁ পহ্লবী। ইনি পারস্যের নূতন শা ইন শা রেজা খাঁ পহ্লবীর পুত্র। ইঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর। ইনি এই বয়সেই পিতার শরীররক্ষী সৈন্যগণের সহিত তাহাদের মত সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন।

মেজর হীরালাল

তখনও সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিম আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া স্নিগ্ধ আষাঢ়ের সন্ধ্যা স্নিগ্ধতর ও মধুরতর করিয়া রাখিয়াছিল। ঊর্দ্ধে লঘু মেঘ পবন-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল।

বীডন উদ্যানে অন্যান্য দিন যেমন নানা বিষয়ের আলোচনা হয়, সে দিনও সেইরূপ হইতেছিল। সে দিন সাহিত্যচর্চ্চা কিছু বেশী মাত্রায় চলিতে লাগিল। আমি বলিলাম— 'হেমবাবুর দশমহাবিদ্যায় নারদের গানটি আপনার মনে পড়ে কি ?

আনন্দধ্বনি করি মুখে বলি হরি, হরি,
নারদঋষি রত সুললিত নটনে ;
প্রবেশিলা হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজায়ে গালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে ;
কেবা হেন মতিমান্, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুৎ ভানু
উদ্ভব কোথা হতে, কি হইবে চরমে ?
হরি হর ব্রহ্মন্, সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে ?
মানব কিরূপ ধন ? জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে, কিবা বিধি মননে ?
সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অথ নির্ব্বাণে ?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা !

দেখুন্ নারদের মুখে কবি যে কথাগুলি দিয়াছেন, তাহা হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর তত্ত্বজিজ্ঞাসার আভাস পাওয়া যায় না কি ? হরি, হর, ব্রহ্ম, শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, পরমাণু, জড়, চেতনা এ সব কি ? জড়বাদই কি দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা ? এই সব বিষয় লইয়া আলোচনা ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু আমার মনে হয় যে, হেমবাবুর নারদ নিতান্ত অসময়ে নিতান্ত বেসুরো কথার অবতারণা করেন নাই। সমগ্র য়ুরোপ ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ তর্ক তুলিয়াছিল। টেনিসনের য়ুলিসিস্ জ্ঞানের সমুদ্রে ভেলা ভাসাইয়া কোথাও কূল পান নাই ; ক্রমাগত চলিয়াছেন, পথ অনন্ত ; কিন্তু যেটি ধ্রুব, সত্য, সুন্দর, সেটির নাগাল পাইলেন না। আর তাঁর সহচর নাবিকগণ এক দ্বীপে আসিয় আর যাইতে চাহিল না ; অপার সাগরবক্ষে তরী বাহিয়া চিরদিন অনন্তের দিকে ধাবিত হইয়া লাভ কি ? যথেষ্ট হইয়াছে ; আর নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা কি ? এত করিয়া কি হইল ? এস, এখানে পদ্মপত্র আহার করিয়া, সংসারের যা কিছু সব বিস্মৃত হইয়া থাকা যাউক্ ! ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কোন্ প্রত্যূষে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি ! কিন্তু যাহার উদ্দেশে এত উদ্যম, তাহার আভাসমাত্র পাইলাম কৈ ? জর্ম্মণীতে পণ্ডিতপ্রবর শোপেন্‌হয়ার বলিলেন, 'সমস্ত সৃষ্ট বিশ্বটা একটা প্রকাণ্ড ভুল' ।"

হঠাৎ আমার উচ্ছ্বাস এইখানেই বন্ধ হইল। দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ; পরণে সাদা ধুতি, লংক্লথের জামা ; মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা ; বেশ বলিষ্ঠ দেহ ; কিন্তু মুখে একটি অমায়িক প্রসন্নভাব ; বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিদূর্দ্ধ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বেঞ্চ হইতে দুই তিন জন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, এক জন বলিলেন, "আজ আর আপনাকে ছাড়া হবে না, আপনার জীবনকাহিনী অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

তখন মেঘনির্মুক্ত আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। নবাগত ভদ্রলোকটি আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমার জীবনে এমন কি আছে—যা আপনাদের শুনাইবার মত বিবেচনা করিতে পারা যায় ? আপনারা

লেফটেনাণ্ট স্বরেশ বিশ্বাসের সহিত আমার তুলনা করিতেছেন, কিন্তু আমার এমন স্পর্দ্ধা নাই যে, আমি নিজেকে আপনাদের প্রশংসার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শ্লাঘা অনুভব করিতে পারি। তবে যখন আপনারা নেহাৎ পীড়াপীড়ি করিতেছেন তখন কিছু বলিতে হইবে। এখন আমি বৌবাজারে হিদারাম বাড়ুয্যের গলীতে অবস্থান করিতেছি। কিন্তু এমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনবেষ্টিত হইয়া থাকা আমার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই।

"আমার নাম যদি জিজ্ঞাসা করেন ত আমার কুল-পরিচয় দিয়া বলিতে হইবে, আমার নাম শ্রীহীরালাল ঘোষাল। কিন্তু কাগজে কলমে আমার নাম শুধু হীরালাল. স্ববাদার মেজর হীরালাল।

"আমরা তিন পুরুষ সৈনিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমার পিতা, জেনারেল ইয়েট্‌ম্যান্ বিগসএর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা এক তাঁবুর ভিতর নিদ্রা যাইতেন। সাহেব বাবাকে বলিতেন, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ঠিক হিন্দুর মত থাকিবে, তোমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, এই আমি চাই; ইংরাজী পড়িবার কোন আবশ্যক নাই; আহার-বিহার ঠিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর মত রাখিও. আমার কোনও আপত্তি নাই।

"আমি পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু খড়দার মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া শৈশবে বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম। যখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর তিন মাস, আমি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই। কিন্তু কয়েক দিবস পরেই আমার পড়াশুনা বন্ধ করা হইল।

"আমার পিতৃবিয়োগ হইল। আমি জেনারল সাহেবের নিকট একটি চাকরীর দরখাস্ত করিয়া রাখিলাম। আমার পিতার পরিচয় দিলে একটা কোনও কায পাইব, এই আশা ছিল। কিন্তু বিশেষ কোনও স্বফল দেখিলাম না।

"আমার বেশ মনে পড়ে,বড লাট লর্ড লীটন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; জিমনাষ্টিক্ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি নানা প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু মা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, মহাগুরু-নিপাতের বৎসরে ব্যায়াম-ক্রীড়া আমি যেন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করি। কিন্তু একটি অনর্থ ঘটিল। এক জন পাকা খেলোয়াড বারের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিল, সাহেব-মেম টিটকারী দিল। জিম্‌নাষ্টিক মাষ্টার আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি এস।' আমি মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া অসম্মত হইলাম। তখন হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমাকে আসরে নামিতে হইবে। আমার অনুরোধ।' আমি অগত্যা যেমন ছিলাম, খালি গায়ে মালকোঁচা মারিয়া অনেক প্রকার ব্যায়ামক্রীড়া দেখাইলাম। বাহবা ও স্বর্ণ-পদক পাইলাম।

"চাকরীও পাইলাম। জেনারেল ইয়েট্‌ম্যান্ বিগস আমাকে পঞ্জাবে লইয়া গেলেন। অমৃতসরে একটি শিখসৈন্য-দলভুক্ত হইলাম। শিখরা আমায় বলিল, 'বাবুজী, তোমাকে গুরু নানকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে তোমাকে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।' আমি সম্মত হইলাম। তখন আমি শুধু হীরালাল,—শিখ হীরালাল; লম্বা চুল রাখিলাম, দাড়ি রাখিলাম, কায়-মনোবাক্যে শিখ হইলাম। তখন আমার অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হইল। চারি বৎসরের মধ্যে আমি অস্ত্রবিদ্যায় স্বনিপুণ হইলাম। আমি একটা ঘোড়া পাইলাম। প্রথম হইতেই আমি অশ্বারোহী সৈন্যদলভুক্ত হইলাম।

"বর্ম্মা অভিযানের পর আমি স্ববাদার পদ প্রাপ্ত হই। কোথায় কি উদ্দেশে যাওয়া হইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বে কিছুই জানান হয় না। রেঙ্গুন অতিক্রম করিয়া মাণ্ডালে অভিমুখে চলিলাম। ইরাবতী নদীতীরে যেখানে রাজা থিব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রাসাদের নাম —'হাওয়া-ঘর।' আমরা তথা হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

"বর্ম্মার রাজার একটি ফরাসী অফিসার ছিল। সন্ধ্যার পর আমি আমাদের সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলাম। জেনারল সাহেব ঐ ফরাসী অফিসারটির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'এই ব্যক্তির মুখ চিনিয়া রাখ; ইঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।'

"গভীর নিশীথে বিউগল্ বাজিল। তৎক্ষণাৎ সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলাম। রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করা হইল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই সহর ঘেরা

হইল। চারিটি গেট। প্রত্যেক গেটের মুখে একটি রেজিমেণ্ট ও চারিটি কামান রাখা হইল। সাহেব আমার হাতে ওয়ারেণ্ট দিয়া বলিলেন,—'তুমি ষোল জন শিখ সঙ্গে লও। রাজাকে ধরিয়া আন।'

"আমি ষোল জন শিখ সমভিব্যাহারে প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে উজ্জ্বল কক্ষে রাজা বসিয়া আছেন; পার্শ্বে সেই ফরাসী অফিসার। সহচরদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া যথোচিত অভিবাদন করিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে তুমি?' আমি ও দেশের কথা গুটিকতক শিখিয়া লইয়াছিলাম। উত্তর করিলাম,—'মহারাজ, আমি একটি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এমন সময়ে আপনার সমক্ষে উপস্থিত। আপনি আমার বন্দী।' সুপ্ত সিংহ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল, 'কি,—বন্দী?' 'হাঁ মহারাজ, বন্দী; এই দেখুন ওয়ারেণ্ট!'

"রাজা স্থির কাগজখানি হাতে লইলেন। তাঁহার পার্শ্বচর ভদ্রলোকটি পড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাস্তবিকই রাজা বন্দী।

"রাজা বলিলেন, 'যদি আমি না যাই?' 'তাহা হইলে অগত্যা আপনার উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে।' রাজা বলিলেন, 'আচ্ছা, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি এক বার ভিতর হইতে দেখা করিয়া আসি।" ফরাসী ভদ্রলোকটি সঙ্কেত দ্বারা আমাকে নিষেধ করিলেন, বোধ হয়, রাজা দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'আপনাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে দিতে পারি না।'

"রাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ করিলেন; আমি হঠাৎ এরূপ ক্ষিপ্র আক্রমণের জন্য ঠিক সে সময়ে প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু আমার শিখদিগের নিকট অস্ত্রশিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই; বজ্রমুষ্টিতে তরবারির ফলক ধরিয়া রাজার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম!"

এই বলিয়া মেজর হীরালাল হস্তমুষ্টি উন্মোচন করিয়া আমাদের দেখাইলেন; প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা ভীষণ ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল।

"রাজা বন্দী হইলেন। অদূরে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। রাজাকে লইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমে আমার অফিসারের কাছে লইয়া গেলাম। রাজা গম্ভীরভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। অফিসার বলিলেন, 'জেনারল্ সাহেবের কাছে লইয়া যাও।' সেখানেও রাজা মৌন রহিলেন। আমার প্রতি হুকুম হইল, 'লাট-সাহেবের কাছে লইয়া যাও।' অদূরে লর্ড ডাফরিন্ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা কথা কহিলেন।

"তখন প্রভাত হইয়াছে। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। দুই একটি কথার পর লাট সাহেব আজ্ঞা করিলেন, 'রাজাকে জাহাজে লইয়া গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর।' আমি তাহাই করিলাম।

"এ দিকে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কি বলিলেন? যুদ্ধের কথা আপনারা শুনেন নাই? সমস্ত সংবাদ কি আপনারা পান? আমরা ইচ্ছামত সংবাদ বাহিরে প্রচার করি; সকল সময় সব কথা প্রকাশ করা উপযুক্ত বিবেচনা করা হয় না।

"বেলা ৮ টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমি আমার বন্দীকে লইয়া জাহাজে রহিলাম। খানিক পরে সেনাপতির নিকট হইতে জরুরী হুকুম আসিল—'তিন রেজিমেণ্টের তিন জন বিউগল্‌দার হত হইয়াছে, চতুর্থ রেজিমেণ্টের লোকটি কেবল জীবিত আছে; তুমি তোমার বিউগল্ লইয়া শীঘ্র এস।'

"মহাশয়, বেলা সাড়ে নয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আমি আমার বিউগল্ বাজাইতে লাগিলাম। পরে পরে ছয়টা ঘোড়া পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার ভাগ্যবিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; আমি বিশেষরূপে আহত হই নাই।

"গর্ব্ব? গর্ব্ব অনুভব করার তখন অবসর কোথায়? কিন্তু যখন সেনাপতি আমার হাতে ওয়ারেণ্ট দিয়া রাজাকে বন্দী করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তখন সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম,—এই আমার প্রথম সুযোগ, আমার উন্নতি এই কাযটির উপর নির্ভর করিতেছে; আজ আমার প্রথম পরীক্ষা; সেনাপতি ইয়েট্‌ম্যান্ বিগস্ আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, তাই এত লোক থাকিতে এই গুরু কার্য্যভার

আমার উপর অর্পিত হইয়াছে; আমি সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত নই কি ?

"যুদ্ধ শেষ হইল। রাজার বড় রাণী ও তাঁহার ধাত্রীর কন্যা রাজার সঙ্গে বন্দী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আদেশ হইল, তাঁহারা কেবলমাত্র গহনার বাক্স লইয়া রাজার নিকট যাইতে পারেন। যেন কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িত না থাকে; বাক্স তাঁহাদের নিকট থাকিবে; কিন্তু চাবী আমার নিকট থাকিবে। তাহাই হইল।

"এই ঘটনার পরেই আমি সুবাদার হইলাম।

"তাহার পরে তিন বৎসর আমাকে বর্ম্মায় থাকিতে হইয়াছিল। অরাজকতা নিবারণ করিয়া ব্রিটিশ শান্তি স্থাপন করাই আমাদের তখন প্রধান চেষ্টা ছিল। দস্যু দমন করিবার জন্য অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইত।

"বিপদ কি কম! একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক রোজ সকালবেলায় আমার বাসায় আসিয়া ফল বিক্রয় করিত। যাহাই বিক্রয় করুক, সে তিন পয়সার বেশী দাম লইত না; কোনও দিন এক ঝুড়ি আঙ্গুর, কোনও দিন এক ঝুড়ি আপেল, কোনও দিন বা বেদানা, যে দ্রব্যই হউক, তার ঐ এক দাম ছিল তিন পয়সা! এক দিন আমি বলিলাম, 'আজ তুই যা, আমার দরকার নাই।' সে নাছোড়বান্দা; আমি তাকে তিন পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম। দুই এক জন গার্ড তাহার ঝুড়ি নামাইয়া লইল; ফলের তলায় একটা ছোরা দেখা গেল। 'এ ছোরা কেন?' যুবতী নির্ভীকভাবে উত্তর করিল, 'সুবাদারকে খুন করিবার জন্য।' তাহারা তখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে আমি নিষেধ করিলাম। তখন তাহারা কিছু বলিল না। কিন্তু পরে শুনিলাম, স্ত্রীলোকটা বাহির হইয়া গেলে পর তাহার প্রাণ-নাশ করা হইয়াছিল।

"তাহার পর মণিপুর, চিত্রল, টেরাই;—গত কয় বৎসর আমি স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বডিগার্ডের কর্ত্তা ছিলাম।"

* * * *

কাহিনী এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইলে পর ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন। আমি সেই রাত্রিতে যথাসম্ভব তাঁহার ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

যতক্ষণ গল্প শুনিতেছিলাম, আমরা সকলে যেন মোহাবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ! "কাব্যকণা"র রচয়িতা পুলিনবা মাঝখানে একবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখু truth is stranger than fiction কাহাকে বলে ওথেলো'র antlers vast and desert wild—"আমি তাঁহাকে চুপ করিতে সঙ্কেত করিলাম।

গল্প থামিল। বক্তার অবর্ত্তমানে শ্রোতৃবর্গ সমালোচকের স্থান অধিকার করিল। এক জন বলিলেন, "সি আই, ডি, নয় ত?" আমি বলিলাম 'না, সি ডি?'

প্রশ্ন। সি ডি কি?

উত্তর। কোনাল ডয়েল্, ব্রিগেডিয়ার জেরাড রচয়িতা। আমাদের মেজরটি ঐ ব্রিগেডিয়ারের বাঙ্গাল সংস্করণ নয় ত?

শান্তিরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড শান্তিময়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। লর্ড ডাফরিন্ মার্কুইস অভ আভা, পেনেল সাহেবের 'গিনিপিগ' বড় লাট এখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানে কূ রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া রাজারাজড়াকে ধরপাক করিতে হয় না। জেনারেল ইয়েটম্যান বিগস আজ পনে বৎসর হইল, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রক্তামাশয় রোগে দেহত্যাগ করেন। জীবিত আছেন মেজর হীরালাল এবং তিনি ১৩১ সালের ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যার সময় বাডন উদ্যানে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।*

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দেও ইঁহাকে বীডন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

উদ্বন্ধন

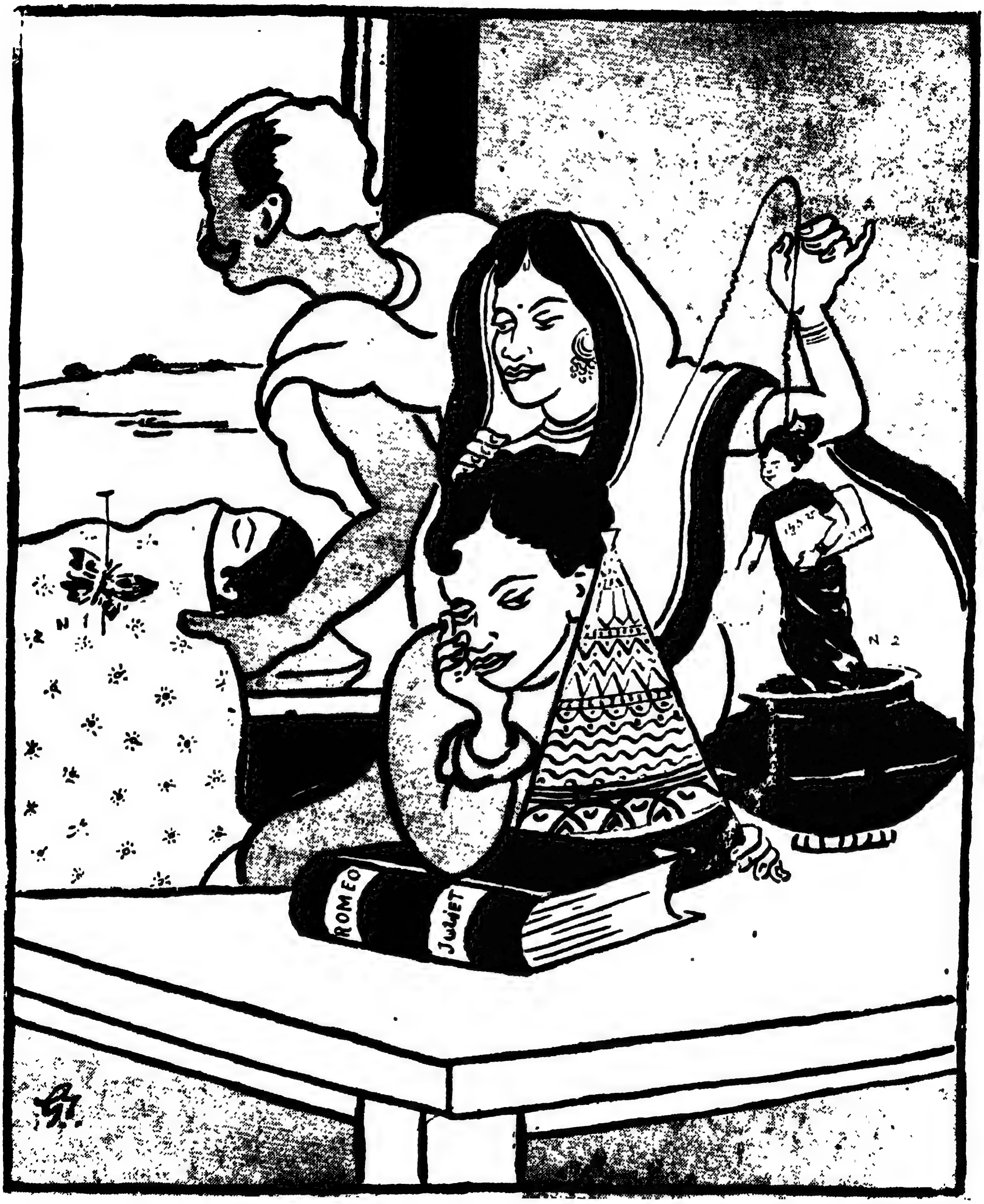
N 1
N 2
ROMEO
JULIET

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চুপি চুপি সারো পূজা

১

চুপি চুপি সারো পূজো করো না'ক গোল।
বাজায়ো না শাঁখ ঘণ্টা বাজায়ো না ঢোল ॥
কাঁসর ঝাঁঝর ঝাঁজে,
ঘড়াপেটা বুকে বাজে,
ঢাকা দিয়ে রাখ ঢাক যত দিন ভোট।
বাঁশী কাঁসী লুকাইয়ে বাঁধ ফাঁকা জোট ॥

২

ঘ্রাণেতে নৈবেদ্য-গন্ধ পশিলে নাসায়।
চাচাদের বাঁচা ভার বসিয়ে বাসায় ॥
পিঁয়াজ-রসুন-বাসে,
পবিত্রতা চিত্তে ভাসে,
কুঁকুড়া কোঁকর কোঁয়ে মুগ্ধ করে মন।
খোলের বোলেতে খালি মাথা জ্বালাতন ॥

৩

হ'তে পারে পূজো-ফুজো পর্ব্ব মন্দ নয়।
বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি কুঠী বন্ধ রয় ॥
(কিন্তু) মনে রেখ' দেশ-মাতা,
দাদার চাঁদার খাতা,
মনে রেখ, ধর্ম্ম হ'তে চর্ম্ম মূল্যবান্।
আবৃত যাহাতে স্বয়ং অহম্ মহান্ ॥

৪

মনে রেখ ব্যাঙ্ক-বই, মিলের সেয়ার।
ভুলো না'ক, 'তিনি' আমি সুখের পেয়ার ॥
ক্যামাক ইষ্ট্রীটে বাড়ী,
ছুটীতে বিলেত পাড়ী,
তাড়াতাড়ি বাঁশ গাড়ি আগে প্রয়োজন।
সদলে কৌন্সিলে গিয়ে নিয়ে পোজেসন ॥

৫

ইংরাজ-চরণ-চিহ্ন করি অনুসর।
চাল-চোল, বাঁধা বোল, শিখেছি বিস্তর।
প্রতিজ্ঞায় দাতাকর্ণ,
চাষারে আশার স্বর্ণ,—
জমীদার অত্যাচার হবে নিবারণ।
নালামে বেনামী কিনে করিলে আপন ॥

৬

ন্যায্যান্যায্য গ্রাহ্য নাহি করি কদাচন।
সরকারী দরবারে বাধা সতত সৃজন।
তরুণ যুবকদল,
বোঝে না চাতুরীছল.
উৎসাহে উন্মত্ত তারা শুনিলে গর্জ্জন।
সরল প্রাণেতে যাচে আত্মবিসর্জ্জন ॥

৭

কার্য্য তরে ধৈর্য্যহারা পিয়াসা প্রবল।
প্রহারে না ডরে, স্বার্থে নাহি চাহে ফল ॥
কল্পনায় আঁকে চিত্র,
সাধের স্বদেশী মিত্র,
স্বপনের ঘোরে দেখে দেশ-দুঃখ দূর।
নেতারে করিলে জেতা ভোটেতে প্রচুর ॥

৮

সেই ভোট ফোট' ফোট' ধরিয়াছে কলি।
পূজো ফুজো বাজে কথা, খালি ঢলাঢলি ॥
মা দুর্গা থাকুন বেঁচে,
মনে মনে রাখ এঁচে,
কেঁচে ঢোল নেচে নেচে, বাজায়ো তখন।
ইলেক্সন চুকে গিয়ে এলে ফিরে সন ॥

৯

যত বড় হোন দুর্গা কালী কি শেতলা।
মনে রেখো স্বদেশেই আমার তেতলা ॥
লোহার বিলাতী-ফ্রেম,
আরো বৃদ্ধি করে প্রেম,
‘দেশ, দেশ’ মুখে তাই বলি অনিবার।
আমার প্রভুত্ব অর্থে, দেশের উদ্ধার ॥

১০

যে দেশের প্রিয়পুত্র পূজ্য মুসলমান।
হিন্দুনাম যাঁর পায়ে দিচ্ছি বলিদান ॥
পরিচিত ধরাতলে,
অ-মুসলমান ব’লে,
মর্ম্মঘাতী এ রিফরম পেয়েছে কে কোথা।
জাতির উপাধি ভুলে হেন জাতীয়তা ॥

১১

এ নহে ভারতবর্ষ, নহে হিন্দুস্থান।
নেশান গড়িতে হবে হয়ে ইণ্ডিয়ান ॥
মোস্‌লিমে করিলে তুষ্ট,
স্ব-দল হইবে পুষ্ট,
বিপক্ষ স্বদেশী দলে করিবারে জয়।
কিছুই নীচতা নয় পলিটিক্স কয় ॥

১২

সতত তস্লীম্ ক’রে সে মোস্লিমের পায়ে।
সারভ্যাণ্টের পারসেণ্টেজ বাড়াও এ দায়ে ॥
চুকে যাক্ ইলেকসান,
মিনিষ্টার সিলেক্‌সান্,
তখন নারার লজ্জা নিবারণ তরে।
আনায় করাবো চাঁদা ছেলেদের ধ’রে ॥

১৩

তখন প্রাণেতে স্ফূর্ত্তি ভর্ত্তি হ’লে থ’লে।
বাজাইব ঢাক-ঢোল ভক্তি-রসে গ’লে ॥
কার্য্যশেষে দশভুজা.
যত পার ক’র পূজা,
মজায় বাজাও বাঁশী দরগার দ্বারে।
কুমীরে দেখাবো কলা এসে গাঙপারে ॥

১৪

তেত্রিশে ছত্রিশ জাতে মিলে একসঙ্গে।
লুট্ ফুট্ ঝুট্ ব’লে মাতো ভোট-রঙ্গে ॥
গিজদা গিজোড় বোল,
যেন না বাজায় ঢোল.
কোলের ছেলেরে দিয়ে ঝুমঝুমি কিনে।
পাঠায়ো না ঝির সাথে লাইসিনী বিনে ॥

১৫

মহিষমর্দ্দিনা মা গো কেশরি-বাহিনী।
দানব বিনাশ কর শুনেছি কাহিনী ॥
ক্ষমা কর অপরাধ,
বাঁশী-কাঁসী দিলে বাদ,
ভোট-দায়ে বন্ধ হ’লে আগমনী-গান।
জবাই করিলে পাঁঠা ভুলে বলিদান ॥

১৬

তুমি মা হিন্দুর দেবী তুষ্ট সমতায়।
নেমাজে পূজায়, কিংবা প্রেয়ারে গির্জ্জায় ॥
আজানে বাজনে মাতা,
দেখ কোথা প্রাণ মাতা,
বজ্রের নিনাদে জানো নহে ধ্যান ভগ্ন।
সাধকের হৃদি যথা ভক্তিরসে মগ্ন ॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, “বসুমতী রোটারী মেসিনে” শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।